৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রতিষ্ঠিত

ভারতবর্ষ

সচিত্র মাসিকপত্র

ষষ্ঠ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড

পৌষ, ১৩২৫—জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬

সম্পাদক—শ্রীজলধর সেন

প্রকাশক —

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্‌—২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রিণ্টার — শ্রীবিহারীলাল নাথ,
এমারেল্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,
৯, নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন, কলিকাতা।

ভারতবর্ষ

সূচিপত্র

ষষ্ঠ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড; পৌষ, ১৩২৫—জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬

বিষয়ানুসারে বর্ণানুক্রমিক

চিত্র-সূচি

পৌষ, ১৩২৫

মাঘ ১৩২৫

ফাল্গুন, ১৩২৫

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬

বহুবর্ণ চিত্র

সদ্যস্নাতা

[শিল্পী—শ্রীযোগেশচন্দ্র শীল]

Emerald Printing Works
CALCUTTA

ভারতবর্ষ

সচিত্র মাসিক পত্র

পৌষ, ১৩২৫

দ্বিতীয় খণ্ড] ষষ্ঠ বর্ষ [প্রথম সংখ্যা

কর্ম্ম-বিজ্ঞানের দুই ধারা *

[শ্রীকৃষ্ণশশী গোস্বামী এম-এ, বি-এল্]

যখন জগতে কোন নূতন পরিবর্ত্তনের সূচনা হয়, তখন মানব বর্ত্তমানের প্রতি অনাসক্ত হইয়া, বর্ত্তমানের দোষ উপলব্ধি করিয়া, উহার প্রতীকার-কল্পে নূতন পদ্ধতি বা নূতন সভ্যতার অনুসন্ধান করে। আমরা যে যুগের মানব, তাহা যে একটী বিশিষ্ট পরিবর্ত্তনের যুগ, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। চতুর্দ্দিকেই নূতন ভাব, নূতন আশা, নূতন রীতিনীতির দিকে একটা ঝোঁক পড়িয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকর, আধুনিক-সভ্যতার কেন্দ্র, কুবেরের ভাণ্ডার, ভোগ-বিলাসের লীলা-নিকেতন য়ুরোপ আজ মহাকুরুক্ষেত্র-সমরে অবতীর্ণ হইয়া বর্ত্তমান সমাজে একটা ঘোর বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছে,—বর্ত্তমান সভ্যতার একটা পরিবর্ত্তনের যুগ আনিয়া দিয়াছে। এই সময়ে পুরাতন ও নূতন ভাবের একত্র সমাবেশ হওয়ায়, উভয়ের বিশ্লেষণ আবশ্যক হইয়াছে। এই সময় প্রাচীন ছাড়িয়া নবীনের অনুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছে; তাই নবীনকে আলিঙ্গন করিবার পূর্ব্বে প্রাচীনের সমালোচনা আবশ্যক হইয়াছে। যে জাতি পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে স্থিত বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে মুহূর্ত্তমধ্যে ভাব-বিনিময়ের সহায়তা করিয়াছে; অসীম, অতলস্পর্শ সমুদ্র যাহার আজ্ঞা অবনত-মস্তকে পালন করিয়া, একদেশ হইতে সুদূর দেশান্তরে ভোগপকরণ বহিয়া লইয়া যাইতেছে;—দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বত, দুর্দ্দান্ত পশুকুল-অধ্যুষিত ভীষণ অরণ্যানী তুচ্ছ করিয়া যে জাতি নিগ্রো প্রভৃতি জাতিসমূহের মধ্যে সভ্যতা বিস্তৃত করিয়াছে;—তুষারাবৃত ভীষণ প্রদেশেও যে জাতি জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিতে উদ্‌গ্রীব—সেই পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে মনুষ্যত্বের উপর ভীষণ আক্রমণ দেখিলে বাস্তবিকই পাশ্চাত্য সভ্যতার উপর সন্দেহ আসিয়া পড়ে। সত্য বটে, যে দেশে কেপ্‌লার, কোপরনিকাস্, গ্যালিলিও, নিউটন প্রভৃতি মনীষিগণ জন্মগ্রহণ করিয়া সূক্ষ্ম গণিতের গণনায় জগতের নিয়ামক প্রকৃতির গূঢ় রহস্যের আলোচনা করিয়াছেন, যে

* মালদহ সাহিত্য সম্মিলনের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

দেশে হ্যানিম্যানের ন্যায় সত্যানুরাগী ব্যক্তি চিকিৎসা-শাস্ত্রে যুগপরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছেন, যে দেশে ষ্টিফেন, ম্যাডিসন, মারকনীর ন্যায় বৈজ্ঞানিকগণ প্রকৃতির উপর রাজত্বের পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, যে দেশে সক্রেটীস, প্লেটো, আরিষ্টটল, ডেকার্ট, ক্যাণ্ট, হেগেল প্রভৃতি পণ্ডিতগণ দর্শনের গভীর গবেষণা করিয়া গিয়াছেন,—সেই দেশের জ্ঞানে, সেই দেশের বিজ্ঞানে, সেই দেশের সভ্যতায় আমরা যে অতিমাত্রায় মুগ্ধ হইব তাহা আর বিচিত্র কি? কিন্তু বিংশ শতাব্দীর মহাকুরুক্ষেত্র আজ জগতে যে ভীষণ ঝঞ্ঝার সৃষ্টি করিয়াছে, যে ভীষণ তরঙ্গ উপস্থিত করিয়াছে, তাহাতে সংসার-সাগরে প্রত্যেক সাম্রাজ্যের কর্ণধার নিজ-নিজ তরী রক্ষায় ব্যাকুল হইয়াছেন। তাই আজ পাশ্চাত্য সভ্যতা আলোচনা করিবার সময় আসিয়াছে। এতদিন পাশ্চাত্য জাতির যাহা দেখিয়াছি, তাহারই অনুকরণের চেষ্টা করিয়াছি; এতদিন প্রতীচ্যের যে কথা শুনিয়াছি, তাহাই বেদবাক্য বলিয়া গণ্য করিয়াছি; এতদিন য়ুরোপ যে জ্ঞান দিয়াছে তাহাই চরম বলিয়া ধরিয়া রাখিয়াছি;—কিন্তু আজ এই গভীর বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সন্দেহের বীজ উপ্ত হইয়াছে। যিনি শান্তির আদর্শ বলিয়া নোবেল প্রাইজের জন্য মনোনীত হইতে যাইতেছিলেন, তাঁহার রক্ত-পিপাসা দেখিয়া শরীর শিহরিয়া উঠে। আজ নন্দন-কাননে আর্ত্তনাদের ভৈরব নিনাদ শুনিতেছি। তাই সেই নন্দন-কাননের ঐশ্বর্য্যের ও ভোগের—সেই পাশ্চাত্য সভ্যতার বীজ ও ক্রমবিকাশ কিরূপে পাশ্চাত্য জগতে আত্মপ্রসার করিয়াছে এবং তাহার কি ফল হইয়াছে, তাহাই সংক্ষেপে আপনাদের নিকট উপস্থিত করিব।

জানি না সুক্ষণে কি কুক্ষণে কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সত্য বটে, এই আবিষ্কারের পর হইতে জগতে একটা নূতন যুগের প্রবর্ত্তনা হইয়াছিল; কিন্তু আশঙ্কা হয় বুঝি এই আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে য়ুরোপীয় সভ্যতায় ও সমাজে নৈতিক যুগেরও একটা ভীষণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে। মেক্সিকো ও পেরুর বিপুল ঐশ্বর্য্য, দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকার উর্ব্বরতা য়ুরোপীয় জাতির বিলাস-বাসনা সহস্রগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছে। প্রথমে স্পেন যে পথের প্রদর্শক হইয়াছিলেন, ক্রমে-ক্রমে ফ্রান্স, ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী প্রভৃতি সেই পথ অনুসরণ করিতে লাগিলেন। আর তাঁহার ফল যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন নীতির (survival of the fittest) পোষকতা করিয়া আদিম Red Indian জাতি স্থান-চ্যুত হইয়া গেল। হায় কলম্বস, হায় ভাস্কোডিগামা, তোমরা জগতে যে বর্ত্তিকা জ্বালিয়াছিলে, তাহার পশ্চাতে যে ছায়া পড়িয়াছিল, তাহার সন্ধান লইয়াছিলে কি? বুঝিয়াছিলে কি—"যে বিদ্যুৎ রমে আঁখি, মরে নর তাহার পরশে"? যে পুষ্পের সৌরভে জগৎ মাতোয়ারা করিয়াছিলে, সেই পুষ্পের ভিতর যে কীটদংশনের আশঙ্কা আছে, তাহা চিন্তা করিয়াছিলে কি? তোমরা অলক্ষ্যে য়ুরোপে যে ভোগ-বাসনার সৃষ্টি করিয়াছিলে,—তাহার তৃষ্ণা যে বড় প্রবল, সে তৃষ্ণায় যে সমুদ্র শোষণ করিতে বাসনা হয়! যে আকাঙ্ক্ষা-স্ফুলিঙ্গ আনিয়াছিলে, ভোগোপকরণ তৃণে পড়িয়া তাহা যে ভীষণ দাবাগ্নিতে পরিণত হয়! দেখিতে-দেখিতে Darwin, Huxly, Spencer প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক দার্শনিকগণ (survival of the fittest) যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন, (struggle for existence) জীবন-সংগ্রাম, (Nature's selection) প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচন প্রভৃতি মতের যে ব্যাখ্যা করিলেন, তাহাতে য়ুরোপ মুগ্ধ হইয়া গেল—প্রকৃতি পূজার শঙ্খ-ঘণ্টার ধ্বনিতে সমস্ত পাশ্চাত্য দেশ নিনাদিত হইল। "দুর্ব্বলের পরাজয়" এই রব জগতে প্রচারিত হইয়া গেল। প্রকৃতি-পূজার আয়োজন করিতে যাইয়া একবার রুসো, ভলটেয়ার প্রভৃতি পূজকগণ য়ুরোপে যে অনল প্রজ্জ্বালিত করিয়াছিলেন, তাহার ভস্ম এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। আজ আবার প্রকৃতি-পূজার ধূম পড়িয়াছে বলিয়া মানুষকে প্রকৃতির সামিল করা হইয়াছে। দয়া-দাক্ষিণ্য দুর্ব্বলতার চিহ্ন বলিয়া গণ্য হইয়াছে। সবলের জয়গান আবার ঘোষিত হইতে যাইতেছে Ideal theoryর পরিপোষক বিখ্যাত জার্ম্মাণ দার্শনিকের মতের বিপরীত ব্যাখ্যা জার্ম্মাণীতে আরম্ভ হইয়াছে। জার্ম্মাণীর দার্শনিক কবি গেটে মৃত্যুর সময় বলিয়াছিলেন, "Light, light, more light" 'আলো—আলো, আরও আলো!' কিন্তু হায়, আজ জর্ম্মণীর কামানের ধূমে জগৎ অন্ধকারের দিকে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রকৃতি-পূজার আয়োজন দেখিতে চাও—বিজ্ঞানের উন্নতির পরাকাষ্ঠা দেখিতে চাও—ইংলণ্ডের নৌবাহিনীর দিকে অবলোকন কর; কিয়েলের মোহানার দিকে অগ্রসর হও; Krupps Arms Factoryতে

যাও। ঐশ্বর্য্যের বিপুলতায়, বিজয়ের বিপুল গৌরবে, ভোগের বিদ্যুচ্ছটায় হয় ত মুগ্ধ হইয়া যাইবে; পাশ্চাত্য সভ্যতার চরণে শতবার নমস্কার করিবে; কিন্তু সমস্তের পশ্চাতে যে বীভৎস ব্যাপার রহিয়াছে, প্রলয়ের যে ভীষণ মূর্ত্তি রহিয়াছে, ধ্বংসের যে বিরাট বপু লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহাও একবার অনুধাবন করিও। Essen নগরে প্রবেশমাত্রই Krupps এর কারখানায় ধ্বংসের যে ভৈরব নিনাদ শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাতে সমস্ত চেতনা লোপ পাইতে বসে। তাই একজন জার্ম্মাণ বলিয়াছিল "This is the place, where we make the stuff, with which to blow the world to pieces." এই সেই স্থান, যেখানে আমরা এমন জিনিস প্রস্তুত করিতেছি, যাহা সমস্ত পৃথিবী টুক্‌রা-টুক্‌রা করিয়া ছিন্নভিন্ন করিবে।

জার্ম্মাণীই না এত দিন পাশ্চাত্য সভ্যতার কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত হইত? জার্ম্মাণীর জ্ঞান-বিজ্ঞান-সভ্যতাই না এতদিন পাশ্চাত্য জগতে আদরণীয় ছিল? কিন্তু যে সভ্যতার এই পরিণাম, যে সভ্যতার উদ্বর্ত্তন ধ্বংসের দিকে, সেই সভ্যতায় জগতের কি প্রকৃত উপকার হয়? যে সভ্যতার উদ্দেশ্য ঐশ্বর্য্য ও ভোগ, সে সভ্যতার স্থায়িত্ব জগতে কতদিন বাঞ্ছনীয় হয়? ইহা খুবই সত্য যে, ঐশ্বর্য্য নলিনীদলগত জলের ন্যায় চঞ্চল। ঐশ্বর্য্য-দৃপ্ত এথেন্সের রাজা ক্রোইসাস একদিন সোলনকে নিজের অতুল ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "সোলন, তুমি ত অনেক রাজ্য অনেক ঐশ্বর্য্য দেখিয়াছ, বল ত সর্ব্বাপেক্ষা সুখী কে?" সোলন যে দুই-চারিজন ব্যক্তির নাম করিয়াছিলেন, তাহাতে সম্রাট্ বড়ই ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু যে দিন তিনি পারস্যরাজ সাইরাস কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া জলন্ত চিতায় নিক্ষিপ্ত হইতে যাইতে-ছিলেন, সেই দিন উচ্চকণ্ঠে সোলনের নাম উচ্চারণ করিয়া উদ্ধার পাইয়াছিলেন, মহম্মদ গজনী সপ্তদশবার ভারত লুণ্ঠন করিয়া যে রত্নরাজি আহরণ করিয়াছিলেন, মৃত্যুর সময় সেই সমস্ত সঙ্গে যাইতেছে না দেখিয়া, কি মর্ম্মন্তুদ যাতণায় না পুড়িয়াছিলেন! মহাবীর নেপোলিয়ান বোনাপার্ট শেষ জীবনে কি যন্ত্রণাই না সহ্য করিয়াছিলেন! ভগবান কি উদ্দেশ্যে জগতে কি অভিনয় করেন, তাহা তিনিই জানেন। ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি একবার কুরুক্ষেত্রের আয়োজন করিয়াছিলেন; নিজ চক্ষে অত্যাচারী যদুকুলের ধ্বংস দেখিয়াছিলেন। জানি না, এই মহাকুরুক্ষেত্রে আবার তিনি কি উদ্দেশ্য সাধিত করিবেন!

পাশ্চাত্য সভ্যতার যে চিত্র আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম, তাহার নৈতিক কারণ অনুসন্ধান করা আবশ্যক। কারণ ব্যতীত কার্য্য অসম্ভব। পাশ্চাত্য দেশে সভ্যতা যে ভাবে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, পূর্ব্বে ইঙ্গিতে তাহার আভাস দিয়াছি। এক্ষণে উহার মূল কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলেই কর্ম্ম-বিজ্ঞানের কথা আসিয়া পড়ে। কর্ম্ম-বিজ্ঞানের দুই ধারা পাশ্চাত্যদেশে ও ভারতবর্ষে কিরূপ কার্য্য করিয়াছে, এবং সামাজিক রীতি-নীতি, জাতীয় জীবন ও ধর্ম্মের কিরূপ গঠন দিয়াছে, তাহাই সামান্য ভাবে আপনাদের নিকটে অতি সংক্ষেপে নিবেদন করিব।

পাশ্চাত্য জাতি কর্ম্মবীর;—কর্ম্ম দ্বারা তাহারা দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বত, অসীম সমুদ্র, তুষারাবৃত ভীষণ প্রদেশ, ভীষণ শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যানী সকলই জয় করিয়াছে। তাহাদিগের কর্ম্মস্পৃহা দেখিলে সত্য-সত্যই চমৎকৃত হইতে হয়। কর্ম্মের প্রতি আগ্রহ ও আসক্তির অনলে শত শত বাধাবিঘ্ন ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। তাহাদের মধ্যে অনেকে কর্ম্মের সাধনা করিতে গিয়া কতদিন অনাহারে অনিদ্রায় কাটাইয়াছে, কতপ্রকার দরিদ্রতাকে বরণ করিয়াছে; এমন কি জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া মন্ত্রের সাধন করিয়াছে। কিন্তু কর্ম্মের প্রতি অতি আসক্তি—এই অসামান্য একাগ্রতা ভোগের প্রশ্রয় দান করিয়াছে। সত্য বটে, "নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ"—ক্ষণমাত্র কর্ম্ম ব্যতিরেকে কেহ থাকিতে পারে না; কিন্তু ভারতবর্ষের কর্ম্ম-বিজ্ঞান য়ুরোপের কর্ম্ম-বিজ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র। পাশ্চাত্য দেশে কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তৃত্বের অভিমান পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। কর্ম্ম-মাত্রই কর্ত্তাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। সুতরাং কর্ম্মের সাধনার সঙ্গে-সঙ্গে কর্ত্তারও গৌরব আসিয়া উপস্থিত হয়। তাই কর্ত্তা কর্ম্মকে ভোগ না করিয়া ছাড়িয়া দিতে চাহে না। কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্য কর্ম্ম তাহাদের নিকট অনেকটা প্রহেলিকা। কর্ম্ম করিতে করিতে কর্ম্মটাকেই তাহারা বড় করিয়া দেখে—জীবনটাকেই কর্ম্মের সামিল গণ্য করে। তাহারা মনে করে "That all business is good"; কিন্তু কর্ম্মের পশ্চাতে যে একটা সংযত উচ্চ আদর্শ রহিয়াছে, তাহা কখন দেখিতে ইচ্ছা করে না। কোন্ আদর্শের দিকে কর্ম্ম

নিয়োজিত হইবে, তাহার দিকে দৃষ্টির প্রয়োজন নাই; কিন্তু কর্ম্মসাধনাই একমাত্র আদর্শ হইয়া উঠে। যাহা সাধন বা means ছিল, তাহাই সাধ্য বা end হইয়া দাঁড়ায়। তাই ভোগের স্পৃহা প্রবল হইয়া উঠে; কারণ, কোন সংযত উচ্চ আদর্শের দিকে কর্ম্ম নিয়োজিত না হইলে, কর্ম্মের ফল ভোগ করিবার মানবের যে স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি আছে,তাহার সম্যক স্ফূর্ত্তি তখন নিশ্চয়ই হইবে। প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। ইংলণ্ডের একখানি সাময়িক পত্রে Supremacy of Great Britain সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে যাইয়া, প্রবন্ধ-লেখক বলিয়াছেন যে, আধ্যাত্মিক ত্যাগ বা উচ্চতায় যে বৃটেনের আজ এত উন্নতি হইয়াছে, তাহা নহে; কিন্তু "It is the cheapness and abundance of our coal which made us what we are." তাই রাস্কিন বড় দুঃখেই বলিয়াছিলেন, "If it be so, then ashes to ashes be our epitaph and the sooner the better." যাক্। যাহা বলিতেছিলাম তাহা এই যে, ফলভোগ করিবার যে স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি আছে, তাহার বিকাশ বা স্ফূর্ত্তি তখন নিশ্চয়ই হইবে। তাই যখন বৈজ্ঞানিকগণ তাড়িৎশক্তির ব্যাখ্যা করিয়া দেন, তাড়িতের উপযোগিতা অঙ্গুলী-নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দেন অমনিই telegraphic communication এর সৃষ্টি হইয়া যায়; অমনই রাজপ্রাসাদে, বিচারালয়ে, আফিস ঘরে, electric fan ঘুরিতে থাকে। যেমনি জল ও অগ্নির ক্রিয়া রাসায়নিকের পরীক্ষাগারে পরীক্ষিত হইয়া যায়, অমনি লৌহ-বর্ত্মে ইঞ্জিন নিজের বীরত্ব দেখাইতে অগ্রসর হয়; আর যেমনি বারুদের শক্তি অগ্নিতে পরীক্ষিত হয়, অমনি কামানে, নৌবাহিনীতে এরোপ্লেনে গোলাগুলির, বোমার ছড়াছড়িতে ধ্বংসের বিরাট মূর্ত্তি মানসপটে অঙ্কিত হয়। তাই আজ য়ুরোপে এত কর্ম্ম, এত গতি, এত উৎসাহ, এত ভোগ, আর এত ধ্বংস। এই ভোগস্পৃহার বলবান প্রভাবকে মহামতি আলেকজান্দারও এড়াইতে পারেন নাই। তাই তিনি তদানীন্তন সমস্ত জগৎ জয় করিয়া, আর জয় করিবার স্থান জগতে নাই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন। এই ভোগবাসনার উৎকট প্রতাপের বশবর্ত্তী হইয়া একান্ত অনুগত কার্থেজবাসীর বাণিজ্যবিস্তার সহ্য করিতে না পারিয়া, রোমকগণ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন "Carthage should be demolished." কার্থেজের ধ্বংস-সাধন করিতেই হইবে।

কর্ম্ম-বিজ্ঞানের আর এক ধারা ভারতকে ভিন্ন প্রকার শিক্ষা দিয়াছে। ভারতীয় কর্ম্ম-বিজ্ঞান কর্ম্মকে কর্ত্তার সহিত জড়াইতে চাহে না। সত্য বটে মীমাংসা-দার্শনিক ভগবানের পরিবর্ত্তে কর্ম্মেরই অনেক সময় গুণগান করিয়াছেন, কিন্তু কর্ম্ম চিরকালই কর্ত্তা হইতে পৃথক রহিয়াছে—

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মানানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।"

কর্ম্ম সকল প্রকৃতির গুণের দ্বারা সম্পাদিত হয়; কিন্তু অহঙ্কার-বিমূঢ় অবিদ্বান ব্যক্তি 'আমি কর্ত্তা' এই মনে করে। আমাদের মতে, কর্ম্মের পশ্চাতে ভোগ নহে, কিন্তু সন্ন্যাস রহিয়াছে। কর্ম্মের প্রয়োজন রহিয়াছে বটে; কারণ, তদভাবে সৃষ্টিতে বিপর্য্যয় উপস্থিত হয়।

"ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোহশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥"

কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া কেহ জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। কর্ম্ম না করায় চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত কেবল সন্ন্যাসেই সিদ্ধি লাভ হয় না। কর্ম্ম আসক্তির জন্য নহে, বরং আসক্তি নাশের জন্য—

"অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥"

তাই পাছে লোকে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বসে, এই আশঙ্কায় ভগবান বলিতেছেন—"যিনি কর্ম্মফলের অপেক্ষা না করিয়া, অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত কর্ম্ম করেন, তিনিই সন্ন্যাসী এবং তিনিই যোগী; নিরগ্নি (যিনি অগ্নিসাধ্য ইষ্টাদি যজ্ঞকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন) অথবা অক্রিয় (যিনি অনগ্নিসাধ্য পূর্ত্তাদি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন) এতদুভয়ের কেহই সন্ন্যাসী নহেন। ভগবানের কর্ম্ম নাই; কিন্তু লোকসংগ্রহার্থ তাঁহার কর্ম্মের প্রয়োজন হইয়াছিল—

"ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি।
যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥"

এই উপদেশ পাইবার জন্য জীবন্মুক্ত শুকদেবকেও গৃহী জনকের নিকট মস্তক অবনত করিতে হইয়াছিল; আর নিজের যোগ-গৌরবের প্রতি ধিক্কার দিতে হইয়াছিল। এই উপদেশের বলে রায় রামানন্দ রাজার দেওয়ান হইয়াও গৌরাঙ্গের শ্রেষ্ঠ ভক্ত, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শুইয়াও প্রেম-বিহ্বল। কর্ম্ম-বিজ্ঞানের এই দুই ধারা প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য ঘটাইয়াছে। আমরা চিরকালই এই উপদেশ পাইয়াছি—

"ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বর॥

কর্ম্মের পশ্চাতে আমাদের আদর্শ—ত্যাগ, সন্ন্যাস, নিবৃত্তি—ভগবানে ফল সমর্পণ ও গভীর আত্ম-নিবেদন—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় কুরুষ্ব মদর্পণম্॥

কিন্তু পাশ্চাত্য জগতে কর্ম্মের পশ্চাতে যে আদর্শ, তাহার মূর্ত্তি উৎকট ভোগ-বিলাসে, বিপুল ধনৈশ্বর্য্যে, অজেয় প্রতাপে, দৃপ্ত বিজয়াকাঙ্ক্ষায়। যে জাতির ধর্ম্মগুরু মেষ-পালক বলিয়া গৌরব অনুভব করিতেন, যিনি এক-গালের চড়ের পরিবর্ত্তে অন্য গাল পাতিয়া দিবার উপদেশ দিতেন, যাঁহার চরিত্রের উপদেশ দিতে যাইয়া Thomas a Kempis বলিয়াছেন, "Show thyself so humble and so lowly that all may be able to walk over thee and to tread thee down as the mire of the street." পথের কাদার মত হইতে বলিয়াছেন, সেই জাতির মধ্যে নরশোণিত পানের আকাঙ্ক্ষা দেখিয়া হৃদয় সঙ্কুচিত হইয়া যায়। তাই কিছু দিন হইল এক-ব্যক্তি একটী ব্যঙ্গ-চিত্রে দেখাইয়াছিলেন যে যীশুখৃষ্ট তাঁহার রাজ্যে শান্তির পরিবর্ত্তে কামানের রাজত্ব দেখিয়া ঘৃণায় ও লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিয়াছেন। তাই Ruskin বড় কষ্টেই বলিয়াছিলেন "The progress of science can not perhaps be otherwise registered than by new facilities of destruction and the brotherly love of your Christianity be only proved by multiplication of murder."

ভোগে কর্ম্মের নিবৃত্তি হয় না, বরং আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া যায়। প্রবৃত্তি-মার্গ অবলম্বন করিলে তৃপ্তি প্রাপ্তি কখনই সম্ভবপর নহে; তাই কর্ম্মের পশ্চাতে ভোগের পরিবর্ত্তে ত্যাগ ও সন্ন্যাস রহিয়াছে; আর এই ত্যাগ বা সন্ন্যাসই চিরকাল বরণীয় ও পূজনীয় হইয়া আসিয়াছে। এই দেশে ঐশ্বর্য্য-শালী সম্রাট অপেক্ষা নগ্ন সন্ন্যাসীর বেশী আদর; তাই রাম-চন্দ্র সন্ন্যাসী বশিষ্ঠকে সসম্মানে আসন ছাড়িয়া দিয়া অভিবাদন করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমেরিকা আবিষ্কারের পর য়ুরোপীয় সভ্যতার একটী যুগপরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে ত্যাগ বা সন্ন্যাসের ধর্ম্মই প্রবল ছিল। তখনও Mammon আসিয়া God এর স্থানে বেশী আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে নাই। তাই Cardinal Ximines এর ন্যায় সন্ন্যাসীর নিকট রাজ-মুকুট অবনত হইত; তাঁহার অঙ্গুলী-চালনে সমাজও পরিচালিত হইত। এই সন্ন্যাসের বলে একদিন ইংলণ্ডের রাজা John রোমের পোপ কর্ত্তৃক সিংহাসন-চ্যুত হইয়াছিলেন এবং পরে Knights Templers at Dover গির্জ্জায় পোপের প্রেরিত দূতের নিকট রাজ্য ভিক্ষা করিতে হইয়াছিল। এই সন্ন্যাসের প্রভাবে এখনও রোমের পোপ Catholic ধর্ম্ম-জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। আর এই ত্যাগের মন্ত্র ভারতীয় রাজা-প্রজাকে যেরূপ মুগ্ধ করিয়াছিল, ইহার প্রভাব সমাজে যেরূপ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, তাহার সাক্ষ্য এই সনাতন হিন্দু সমাজ এখনও সুস্পষ্টভাবে প্রদান করিতেছে। ইহারই প্রভাবে যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর, বশিষ্ঠ, বুদ্ধ, শঙ্কর, নানক, কবীর ও চৈতন্য এখনও সম্রাট অপেক্ষা অধিকতর সম্মান ও পূজা পাইয়া আসিতেছেন। এই ত্যাগেই অমৃতের উৎপত্তি হয়। ত্যাগেই মানুষ অমর হয়। স্বার্থসাধন মৃত্যু। "Self-seeking is self-destruction." ব্রাহ্মণ একদিন এই অমৃতের সন্ধান দিয়াছিলেন; তাই তিনি নিঃস্ব হইয়াও সাম্রাজ্যের কর্ণধার; দীনহীন হইলেও সম্রাটের পূজার পাত্র। এখনও কুম্ভের মেলায় লক্ষ লক্ষ ত্যাগী সন্ন্যাসী দেখিয়া, এখনও কাশীতে প্রতিগ্রহে সঙ্কোচ দেখিয়া, এখনও বৃন্দাবনে মাধুকরীর প্রচলন দেখিয়া ত্যাগের জয়ের কথা মনে হয়। এই জয়ে অস্ত্রের ঝনঝনা নাই—কামানের কর্ণপটহ-বিদারক ভৈরব নিনাদ নাই; রক্তস্রোত দূরের কথা, হিংসার নাম-গন্ধ নাই। ইহার অস্ত্র প্রেম—ইহা প্রেমের জয়। কিন্তু ইহাই প্রকৃত জয়। ইহাতেই প্রকৃত শত্রু এবং ক্রোধের উপশম হয়

—It is not out of the mouths of kintted gun or the smothed rifle but out of the mouths of babes and sucklings that the strength is ordained which shall still the enemy, and anger".—Ruskin. এই সর্ব্ববিজয়ী প্রেমের আস্বাদন পাইয়া কপিলাবস্তুর রাজা শাক্যসিংহ অনায়াসে পথের ভিখারী সাজিয়াছিলেন। ইহারই টানে চণ্ড অশোক হইয়া সমস্ত জীবন ধরিয়া ত্যাগের চর্চ্চা করিয়াছিলেন। এই রসের রসিক হইয়া সনাতন বিপুল ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া ভিখারী হইয়া বৃন্দাবনের রজে দেহ রাখিয়াছিলেন। এই প্রেমের জন্য এখনও তাঁহারা লক্ষ-লক্ষ নরনারীর হৃদয়ের রাজা হইয়া রহিয়াছেন। আজ এই ভীষণ সংগ্রামের দিনে, কালের এই ভৈরব নিনাদের মধ্যে, হিংসার এই প্রচণ্ড মূর্ত্তির মধ্যে শান্তির উৎসের সন্ধান কি পাইব না—প্রেমের পুলকে জগৎ মাতাইবার জন্য কেহ কি দেখা দিবে না? ভগবন্ তুমি না বলিয়াছ—

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানং অধর্ম্মস্য তদাত্মনং সৃজাম্যহম্॥"

তবে একবার ঈশা, মুশা, ডেভিড, ইব্রাহিম অথবা মহম্মদ রূপে আসিয়া শান্তির বার্ত্তা ঘোষণা কর; অথবা কৃষ্ণ, বুদ্ধ, নানক, চৈতন্য রামমোহনরূপে আবার প্রেমের গীতিতে জগৎ মাতাও। সংসারের আবর্জ্জনা দূর করিয়া দাও, অহমিকা, ঐশ্বর্য্য, আকাঙ্ক্ষা ও ভোগের স্থানে বিনয়, দৈন্য, নিবৃত্তি ও সন্ন্যাসের মহিমা প্রচার কর। চতুর্দ্দিকেই ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে। লক্ষ-লক্ষ পরিবার বিধবার ক্রন্দনে, শিশুর আর্ত্তনাদে, বৃদ্ধের মর্ম্মন্তুদ যাতনায় মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। কত যুগ-যুগান্তরের শিল্প, কত নগর, কত পল্লী, কত পথ, কত সেতু, কত প্রাসাদ ধ্বংস হইয়াছে। কত পুণ্যজ্যোতিঃ কলঙ্কিত হইয়াছে। কত সাধু পুরুষের মূর্ত্তি ধূলিসাৎ হইয়াছে। ভগবন্, ঘাতকের ভীষণ লীলা, কামোন্মাদের বিকট বিলাস, নিষ্ঠুর বর্ব্বরতার পৈশাচিক তাণ্ডব, উচ্ছৃঙ্খল পশুত্বের বীভৎস আনন্দ, মৃত্যু ও সংহারের ভয়াবহ দৃশ্য, নরকের এই উৎসব, কত দিনে শেষ করিবে? এখন প্রেমের জয়-গানে আবার জগৎ মাতাও। "স্বজনদেশ ছাড়িয়া যাক, আবার তোরা মানুষ" হইবার বার্ত্তা প্রচার কর "বসুধৈব কুটুম্বকং চরাচরস্য" এই নীতির ঘোষণা কর—হৃদয় পবিত্র হইয়া যাউক। আবার এই সমরানল হইতে পাশ্চাত্য সভ্যতা পরিশুদ্ধি লাভ করুক। কর্ম্মবিজ্ঞানের যে ধারা ভারতে যে মহামন্ত্র প্রচার করিয়াছে, তাহাই আবার সমস্ত জগতে প্রচারিত হউক। বিলাতের এক কবি বলিয়াছেন, "The East is East and the West is West. The twain shall never meet," কিন্তু আমাদের কবি (রবীন্দ্র) প্রচার করিয়াছেন, পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মিলন অবশ্যই হইবে—কর্ম্ম-বিজ্ঞানের গঙ্গা ও যমুনার ধারা ভবিষ্যতে নূতন পূত প্রয়াগ-ক্ষেত্র তৈয়ার করিবে। সেই বাণীর আভাষ এই যুদ্ধের মধ্যেই পাওয়া গিয়াছে। গত ৫ই জানুয়ারী ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মহামতি Loyd George 'War Aims' সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, এই যে অতৃপ্ত বিজয়াকাঙ্ক্ষা—এই যে ভোগ-বিলাস, এই যে স্বার্থসাধন ও তাহার উদ্দেশ্যে যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত করা "These are blots on our civilisation of which every thinking individual would be ashamed. After all, war is a relic of barbarism." তাই তিনি প্রবৃত্তি-মার্গ ছাড়িয়া নিবৃত্তি-মার্গের উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন, "We must see by some international organisation to limit the burden of armaments and diminish the probability of war" সেই দিন বোধ হয়, শীঘ্রই আসিবে, যখন প্রতীচ্যের আসক্তি ও ভারতের সন্ন্যাস, প্রতীচ্যের ভোগ ও ভারতের সংযম, পশ্চিমের কর্ম্মকোলাহল ও পূর্ব্বের শান্তির মধুর ঝঙ্কার একত্র হইয়া জগতে এক নূতন যুগের প্রবর্ত্তনা করিবে। আর সেই দিন আমরা যেন শ্রীমদ্ভাগবতের সুরে সুর মিশাইয়া বলিতে পারি,

"বাণী গুণানুকথনে, শ্রবণৌ কথায়াম।
হস্তৌ চ কর্ম্মসু মনস্তব পাদয়োর্ণঃ॥
স্মৃত্যা শিরস্তব নিবাস জগৎপ্রণামে।
দৃষ্টিঃ সতাং দর্শনেঽস্তু ভবৎ তনূনাম॥

হে ভগবন্, আমাদের বাণী যেন তোমারই গুণগান করে, কর্ণ যেন তোমারই কথায় তৃপ্তি লাভ করে, হস্ত যেন তোমারই কর্ম্মে নিয়োজিত হয়, মন যেন তোমার পদ যুগলে সন্নিবিষ্ট হয়, মস্তক তোমার নিবাস এই জগৎকে প্রণাম করিয়া সার্থকতা লাভ করে, আর দৃষ্টি যেন তোমার শরীর-ভূত সাধুদিগের দর্শনে নিযুক্ত হয়। আর তোমার নাম কীর্ত্তনের সময় যেন মনে হয়,—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরি॥

মা

[শ্রীঅনুরূপা দেবী]

(৮)

সে রাত্রে অরবিন্দ যখন বাড়ী পৌঁছিল, তখন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। সহর নিস্তব্ধ, নিদ্রায় নিঝুম। পথে পাহারাওয়ালা ভিন্ন আর কাহাকেও দেখা যায় না। হ্যাঁ,—দু-একটা মাতাল বা ঐ শ্রেণীর লোক কচিৎ পানালয় বা ঐ প্রকার কোন স্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল। একটা পুলিশের হাতে পড়িল। তাহা দেখিয়া আর একজন 'জানকীর দশা দেখে হাসে দুর্য্যোধন' ইত্যাদি গাহিতে-গাহিতে যথাসাধ্য ত্বরিৎপদে পলায়ন করিতে লাগিল—তাহার অবস্থা কথঞ্চিৎ উন্নত।

দ্বারবান ছোট্টু সিং প্রভুর প্রতীক্ষায় জাগিয়া থাকিয়া তখনও সুর করিয়া তুলসীদাস পড়িতেছিল,—দ্বার খুলিয়া দিয়া সেলাম করিল। "সব কোই আচ্ছা হ্যায়, না ছোট্টু-সিং?" "জী, সব কোই আচ্ছা হ্যায়। লেকেন, বড়া মাইজীকো তবিয়ৎ কুছ খারাপ থা।" "মার? কি হয়েছে?" "হুয়া এইসা কুছ নেই। শুনাথা কি বদনদুখতাথা, অউর বোখারকা এইসা মালুম হোতাথা।" "ওঃ! কার্ত্তিক, দেখে আয় তো, মা ঘুমিয়েছেন কি না। দেখিস্, যদি ঘুমিয়ে থাকেন, যেন জাগাস্ নে।"

কার্ত্তিক খবর আনিতে চলিয়া গেল। ছোট্টু সিংএর হ্যারিকেন লণ্ঠনের সাহায্যে ততক্ষণে অরবিন্দ বৈঠকখানার পাশে নিজের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিয়া, দক্ষিণদিকের একটা বন্ধ জানালা খুলিয়া ফেলিয়া সেইখানে দাঁড়াইল। বাড়ীর এইদিকে বাগানের একটা অংশ আছে। জান্‌লার ধারে-ধারে সারবাঁধা কতকগুলি জুঁই ফুলের গাছ; একটা বিলাতি ফুল—যাহার নাম ম্যাগ্নোলিয়া গ্রাণ্ডিফ্লোরা—তাহারই একটা গাছ ছিল। বাতাসের একটা দমকার সঙ্গে ব খানিকটা ঘন সৌরভ ছুটিয়া আসিয়া, বাতায়ন-সমীপবর্ত্তীর অবসাদ-ক্লান্ত মস্তিষ্কে স্নিগ্ধ প্রলেপমাখা শীতল হস্ত বুলাইয়া দিল। উত্তরীয়ে ললাটের ঘাম মুছিয়া, সে সুদীর্ঘ শ্বাস মোচনপূর্ব্বক, বাহিরের অর্দ্ধস্ফুট অন্ধকার মেঘ দুইটাকে ডুবাইয়া দিল। ছোট্টু সিং ইত্যবসরে ঘরের অন্যান্য দ্বারগুলা একে-একে খুলিয়া ফেলিল।

"মা'ঠান্ ঘুমুচ্চেন। দি'ঠান্ বল্লে 'তেমন কিছু হয় নি। ছোট্টুর বুঝি দাদার বাড়ী ঢুক্‌তে তর সয় নি।' তিনি খাবার আগ্‌লে বসে আছেন।" "তুই আবার একবার যা; গিয়ে বলে আয়,—আমি আজ আর খাবো না। ঐ জান্‌লাটার কাছে আমায় ওঘর থেকে গাল্‌চেখানা এনে পেতে দিয়ে যা দেখি, আজ আমি এইখানে শুয়ে ঘুমুবো।"

কার্ত্তিক অবাক্ হইয়া গিয়া বলিল, "মশা খাবেন নি!" "মশা তেমন নেই, বেশ বাতাস আস্‌চে।" "নীচের ঘরে পোকা-মাকড় কি কোথা আছে, যান্, ওপরে যান্। সেথায় কি হাওয়ার আকাল পড়েচে? দি'ঠান রাগ করবে, কিছু দুটো মুখে দেন্ গে।" "না, তুই গাল্‌চে-খানা পেতে দে।" "তবে ওপোর থে মকমলের গাল্‌চেটা নিয়ে আসি। ওতে রাজ্যিশুদ্ধ ধুলো আছেন, সাত-জন্ম রোদ খান্ নি, ওতে শুয়ে কি ঘুম হবে?" "হবে—হবে। যা বলি তাই শোন্ না। তোর শুধু কথা-টালা।"

এই তিরস্কারে মুখখানা গোঁজের মত করিয়া কার্ত্তিক পাশের ঘর হইতে গালিচা লইয়া আসিল। গজগজ করিয়া বলিল, "কাত্তিক যা বলেন, ভালর জন্যেই বলেন। গরমের কাল,—বিচে আচে,—রেতের বেলা যাদের নাম করতে নেই, তাঁরা সব বাগানে-বাগানে ঘুরচেন। মা'ঠান্ শুনলে কাত্তিককে দুষবেন নি। কাত্তিকে কি আজকের চাকর?"

বিছানা বিছানো ও আবশ্যক বন্দোবস্ত হইয়া গেলে, উপরে খবর দিতে গিয়া অনেক দিনের ভৃত্য আবার সসঙ্কোচে ফিরিয়া আসিল।—"দি'ঠান্ আমার 'পরে ক্ষেক্‌ড়ে উঠ্‌লো। বল্লো যে 'তেনাকে তুই ডেকে দে'তো। খায় না খায়, সে আমি বুঝবো'।"

তন্দ্রা-বিজড়িত গভীর আলসভরে, মুদিতনেত্রে অরবিন্দ

ছাড়াছাড়া করিয়া উত্তর দিল, "বল্‌গে যা, আমার যাবার ক্ষমতা নেই,—ভারী ঘুম লেগে গ্যাছে। আর আমায় জ্বালাতন করতে আসিস্ নি, আমি এখ্‌নি ঘুমিয়ে পড়বো।" "দি'ঠান্ যে শোনে না বাবু, কর্‌বো কি? বল্লু যে লাট্‌-ফরমে যখন ফিরে এলে, তখন থেকেই দাদাবাবুর শরীল-গতিক ভাল নেই,—নেশা খেলে যেম্‌নি টলে পড়ে ওঁনার পা ঠিক তেম্‌নি করে টল্‌ছেলো। এত শ্রেম কি ওই শরীলে সয়? কবে কি করেচে? আমার তো সবই দেখা আছে বাপু।" বলি, কাত্তিক তো আর আজকের নয়।" "আলোটা নিবিয়ে দে'তো কার্ত্তিক।" "তা দিচ্চি। আমি এই সাম্‌নের দালানে শুয়ে থাকচি। আলোও ঐখানেই রেখে দোব। ভোরের বেলা তো ঘুম ভাঙ্গবে—তা যত রাতেই শোও না কেনে। কাত্তিকে আর তোমাদের না জানে কি?"

কার্ত্তিক চলিয়া গেলে উপাধানহীন মস্তক দুই বাহু মধ্যে লুকাইয়া ফেলিয়া, অরবিন্দ উপুড় হইয়া পড়িল। সে যে ঘুমাইল, অথবা জাগিয়া রহিল, ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা গেল না। কেবল কিছুক্ষণ ধরিয়া বড় দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসের ধ্বনি শ্রুত হইবার পর, তাহা ক্রমে থামিয়া আসিলেও, সে রাত্রির সমুদায় অবশিষ্ট কালটাতেই, মধ্যে-মধ্যে এক-একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস যেন একান্ত অসুখী কোন অশরীরী প্রাণীর ন্যায় নিঃশব্দ লঘু চরণে সেই নিস্তব্ধ ঘরময় রাশি-রাশি যন্ত্রণা ছড়াইয়া দিতে-দিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। দ্বারের বাহিরে শুইয়া অনেকদিনের পুরাতন ভৃত্য কার্ত্তিকও ঘুম ভাঙ্গিয়া সে ধ্বনি শুনিতে পাইয়া, মনে-মনে শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করিয়াছে। এসব ঘর অনেক দিনের অব্যবহৃত,—এই রকম কাণ্ড ইহার মধ্যে যে ঘটা সম্ভব, এ ভয় তাহার মনে-মনে যথেষ্টই ছিল। তবে সে যে প্রকাশ করিয়া বলে নাই,—তা এসব কথা উঁহাদের কাছে বলিয়া কি হইবে? যাহারা জলজ্যান্ত—সেই রাত্রে যাঁহার নাম ধরিতে নাই,—তাঁহাকেই মানিতে চাহে না; তাহারা আবার এই সব হাওয়া-বাতাস, অপদেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিবে? যা'হোক, লোহার ছুরিখানা বিছানার তলায় দিতে সে ভুল করে নাই,—এই যা মঙ্গল। সে তো আর ছোট্টু সিংএর মত দুদিনের লোক নয় যে, মনিবকে একেবারে খুলিয়া দিয়াই, মজা করিয়া চারপাইয়ে চাপিয়া নাক ডাকাইবে! সে রাত্রে কার্ত্তিক ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারিল না।

সকালবেলাতেই দু'তিনখানা গাড়ি বোঝাই করিয়া দু'-তিন স্থান হইতে কুটুম্ব-সাক্ষাৎ আসিয়া পৌছিল। মেয়েরা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলে, সেখান হইতে উচ্চ-রোলে কান্না উঠিল; এবং বাহিরের ঘরে মান্য-গণ্য আত্মীয়ের সহানুভূতিসূচক পরিতাপ, প্রবোধ এবং পরামর্শের মধ্যে, পিতৃবিয়োগ-কাতর অরবিন্দ হেঁটমুখে বারম্বার উত্তরীয় প্রান্তে নেত্র মার্জ্জনা করিয়া ফেলিয়া, ধৈর্য্যাবলম্বনে চেষ্টিত হইল। অরু বাপের বড় আদরের সন্তান,—চিরদিনই সে পিতৃবৎসল। পিতার আদর ও শাসন সমান শ্রদ্ধাভরে সে চিরদিন মাথায় তুলিয়া লইয়াছে। সেই পিতাকে হারাইয়া তাহার চারিদিক শূন্য হইয়াছিল। সংসারের ঝড় ঝঞ্ঝা এইবারে যে তাহার মাথার উপর উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে, উচিত-অনুচিতের দ্বিধা-দ্বন্দ্বে অন্তরাত্মা অহোরাত্র ঘূর্ণাবর্ত্ত-বেগে পাক খাইয়া-খাইয়া হাঁফাইয়া উঠিতেছে,—ইহার পূর্ব্বে এমন অবস্থা ঘটিতে পারে, এ ধারণাও যে তাহার ছিল না। ভাল-মন্দ-নির্ব্বিচারেই সে পিতৃ আজ্ঞা পালন করিয়া গিয়াছে, সেখানে নিজের লাভ ক্ষতি বিন্দুমাত্র লক্ষ্য করে নাই। সেনাপতিত্বের দায়িত্ব বড় বেশী,—তার চেয়ে সেনাপতির অধীন থাকিয়া যুদ্ধ করা শতগুণে নিরাপদ। তা, যুদ্ধের সেনাপতিত্বের অপেক্ষা সংসারের সেনাপতিত্বের দায়িত্বও নেহাৎ কম নয়।

(৯)

ভাঁড়ার-ঘরে ব্রজরাণী কুটুম্ব-ছেলেদের জন্য জলখাবার দিতে বলিতে আসিয়া দেখিল, নানাবিধ দ্রব্য-সামগ্রীর মাঝখানে একটা বড় ঝোড়ায় করিয়া এক ঝোড়া বর্দ্ধমানের সীতাভোগ প্রভৃতি রহিয়াছে। ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই "দি'ঠান বল্লেন" বলিয়া কি একটা বলিবার জন্য দ্বার-সমীপস্থ কার্ত্তিককে দেখিতে পাইয়া, 'দি'ঠান' কি বলিলেন সে কথাটি শুনিবার অপেক্ষা না রাখিয়াই, ব্রজরাণী সেই ঘরে উপস্থিত একটী বালিকাকে মধ্যস্থ রাখিয়া, যাহাতে কার্ত্তিক শুনিতে পায় এমনি উচ্চ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল "জিজ্ঞেস কর তো, কাল ওরা কত রাত্রে ফিরেছিল?"

মেয়েটিকে আর জিজ্ঞাসা করিতে হইল না—কার্ত্তিক

স্বকর্ণেই শুনিতে পাইয়া উত্তর দিল, "রাত, তা সে ঢের হয়েছিলেন বৌমার বারোটা-একটা হবেন বোধ করি।" "জিজ্ঞেস কর তো টেঁপি, এ সব খাবার কোথা থেকে এলো?" প্রশ্ন শুনিয়াই মামী-খাশুড়ী-সম্পর্কীয়া ভাণ্ডারের অধিকার-প্রাপ্তা কর্ত্রী ঠাকুরাণী কহিয়া উঠিলেন "কোথা থেকে আবার আস্‌বে বউ মা! দেখ্‌চো না এসব বর্দ্ধমানের খাজা, মতিচুর, সীতেভোগ! গেল-রাত্তিরে অরু নিজে এ সব কিনে এনেছে।" কার্ত্তিকও এ কথায় সম্পূর্ণ সায় দিয়া গেল, "হ্যাঁ মা, মাসী-মা ঠিক বলেচে—বর্দ্ধমান না হলে এমন খাজা কি আর কোথাও জন্মায়! ভগলপুরেও মন্দ করে না, খেতে বরং ভালই; তবে রূপটি অমন ধারা নয়।—মনে আছে মামী-মা, বড়-বউমার বাপ ফুলশয্যের তত্বে খাজা দে'ছলো, এককাখানি একো বারকোসে করে—আর সে খাজার—" "হ্যাঁ রে কার্ত্তিকে, তোকে না আমি পাঠালুম চট করে ছ'খান চাঙ্গারি নিয়ে যেতে,—তুই এখানে এসে মজা করে খাজার গল্প কর্‌ছিস! দিন-দিন তুই হচ্চিস কি?"

শরৎশশীর এইরূপ আকস্মিক উদয়ে কার্ত্তিক থমকিয়া গিয়া, অপ্রতিভের একশেষ হইয়া, আমতা-আমতা করিয়া উত্তর করিল, "আমি তাই তো নিয়ে—তাই তো—দি'ঠান্, সেই নিতেই তো এইছিলুম। তা বউ মা শুদুচ্ছিলেন এই খাজা-সীতেভোগের কথা। তাই বলি জবাবটা দিয়েই একছুটে চলে যাই—" "কই চাঙ্গারি?" বলিয়া কার্ত্তিকের বিপন্ন মুখের দিকে চাহিতেই তাহার অবস্থা বুঝিয়া, "গল্প পেলে আর কিছু হুঁস থাকে না—" বলিতে-বলিতে ঘরের মধ্যে পা দিয়াই, ভ্রাতৃজায়ার অপ্রসন্ন মুখখানা চোখে পড়িল। মিষ্টান্নের ঝুড়িটা যে ইঁহার দৃষ্টিকে আনন্দ দান করিতে পারে নাই, তাহা পলকের ভিতর বুঝিয়া লইয়া, তিনিও নিজের মুখকে ইহার অনুকরণে গম্ভীর করিয়া ফেলিয়া, প্রশ্ন করিলেন, "খাজা-সীতাভোগের কি হয়েছে বৌ?" বধূ উত্তর না দিয়া গুম্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মামী তাহার বদলে উত্তর দিলেন, "না, হয়নি কিছু। বউমা জিজ্ঞেস করছিলেন, এ-সব কোথা থেকে এলো।" "বউমার যেমন হ্যাকাপনা। বর্দ্ধমানের খাবার ও কি কখন দেখেন নি, তাই জিজ্ঞেস করচেন!"

ননন্দার এই টিপ্পনিটুকুতে ক্রুদ্ধ বধূ ঝাঁঝিয়া কহিল, "দেখবো না কেন,—ঢের খাবার দেখেছি। তত আদেখ্‌লে ঘরে ভগবান জন্ম দেননি। কে জানুলে তাই জিজ্ঞেস কর-ছিলুম।" "সেও ত তোমার হ্যাকা সাজা। বেশ জানো যে দাদাই এনেছে। দাদা কাল বর্দ্ধমান গেছলো—সে ছাড়া আবার কে আন্‌তে যাবে?" "যাবার সময় আমার সঙ্গে তো পরামর্শ করে নি। কেমন করে জানবো, কে কখন কোথায় যাচ্চে। জিজ্ঞেস করেছি, তাতে হয়েছে কি?"

"হবে আবার কি? তবে হ্যাকামী দেখলে গা জ্বালা করে। কেন, বর্দ্ধমানের খাবারও কি ঘরে আন্‌তে দোষ আছে?" এই কথাটি বলা শেষ হওয়া মাত্রে শরৎশশী চাঙ্গারি দু'খানা টানিয়া আনিয়া তাহা কার্ত্তিকের হাতে তুলিয়া দিয়া—"নে কার্ত্তিকে, শিগ্‌গির করে আয়, পিসে মশাই ওখানে রাগ করচেন হয় ত" বলিতে বলিতে প্রস্থান করিল। ব্রজরাণীর গভীর কালো চোখে তখন যে বিদ্যুতের ঝলকের মত আলোর আগুন ঝলকিতেছিল, তাহা সে চাহিয়া দেখিয়াও গেল না। আর দেখিলেই বা কি হইত! এ রকম কথার ঠোকর-মারামারি এ তো তাহাদের মধ্যে আকস্মিক নয়,—ইহা নিত্য। এই বধূটি যে দিন ঘরে আসে, সে দিন শরৎশশী পেট-ব্যথার অছিলায় বিছানায় পড়িয়া ছিল,—শুভক্ষণে বধূর মুখ দেখে নাই, মুখে-কানে মধু চোখে সোণার ফুল দিয়া মধু-মাখা কথা শুনিবার-শুনাইবার, সোণার চক্ষে দেখিবার-দেখাইবার বন্দোবস্ত সে কিছুই করিতে চাহে নাই। কেহ সে কথা বলিতে আসিলে, কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিয়া বলিয়াছে, "পেটের ব্যথায় আমি মরে গেলাম,—ও সব আমার ভাল লাগে না।" অনেকেই কান্নায় গলিয়া গিয়া "আহা বাছা রে, আজকের দিনে একবার মাথাটি তুলে উঠে বসতে পারলে না;—মরে যাই!" ইত্যাদি বলিয়া সহানুভূতি দেখাইয়া ফিরিয়া গেল। কেহ পেটে গরম চোকরের সেঁক, কেহ টার্পিন তৈল মালিসের ব্যবস্থা করিয়া গেল। কেহ বা বলিল, "একটুকু পিপারমেন্ট খাইয়ে দাও দেখি, এখনি সেরে যাবে। আমার টেবুর সে দিন অমনি হয়েছিল। দেবা-মাত্তর বল্লে না পেত্যয় যাবে, কে যেন আগুনে জলটুকু ঢেলে দিলে।"

মা আসিয়া বিস্তর সাধিলেন,—একবাটি দুধ-সাবু আনিয়া হাতে দিয়া বলিলেন, "একেবারে নিরম্বু উপোসী থাকলে ব্যথা আরও বাড়বে,—একটু খা।" খাটের তলায় বাটিটা ঠেলিয়া দিয়া, শরৎ পাশ ফিরিয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে

উত্তর করিল, "আমি পার্ব্বো না মা।" মা ভয়ে এতটুকু হইয়া গেলেন। এ কেমন অপয়া বউ ঘরে আসিল? চৌকাট পার হইতে না হইতেই জলজ্যান্ত সহজ মেয়ে এমন হইয়া পড়িল! মামী, মাসী, প্রতিবেশিনী প্রৌঢ়াগণ এক-বাক্যেই এই মন্তব্যে সায় দিলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকারে মুখ লুকাইয়া শরৎ একা পড়িয়া আছে। পায়ের শব্দ শুনা গেল না;—খাট একটু দুলিয়া উঠিল,—কে যেন আসিয়া কাছে বসিয়াছে বুঝা গেল। কিসের যেন একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে অকস্মাৎ শরতের বুকের মধ্যে দুড়্‌দুড়্ করিয়া উঠিল। কে? এমন করিয়া এমন সময় কে আসিল! উঃ! কে? ভয়ে সে প্রশ্ন পর্য্যন্ত করিতে পারিল না। যদি কোন অপরিচিত বালিকা-কণ্ঠ প্রশ্নের উত্তর দেয়? সে সহিতে পারিবে না,—সে সহিতে পারিবে না।—আর যার খুসী সে পারুক,—সে পারিবে না।

বহুক্ষণ নীরবে কাটিয়া যাইবার পর, সঙ্কুচিত মৃদু স্বরে, যে আসিয়া কাছে বসিয়াছিল, সে যেন বড় ভয়ে ভয়ে ডাকিল, "শরৎ!" "কে, দাদা?" ধড়মড়িয়া শরৎশশী বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। মুহূর্ত্তের সে মুক্তির আনন্দে দুর্জ্জয় দুঃখ-অভিমানের প্রচণ্ড ব্যথাও যেন কোথায় সরিয়া গেল। অরবিন্দ আবার তেমনি স্বরেই বলিল, "শরি, এমন করে কেন কষ্ট পাচ্চিস—ওঠ, উঠে খা' দা।"

আবার সব কথা মনে পড়িয়া গেল। শরৎ শয্যাশ্রয়ী হইল। অনেকক্ষণ কোন কথাই সে কহিল না। তারপর ভাইয়ের পুনঃ-পুনঃ অনুনয়ে, অশ্রুমথিত, রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "খেলে আমি মরে যাব। তোমরা জানো না, আমার ভয়ানক যন্ত্রণা হচ্চে।"

অরবিন্দ শান্ত স্বরে কহিল "তা আমি জানি। কিন্তু খেলে এ রোগের কিছুই কম-বেশি হবে না। শরীরে তো তোমার কিছুই হয় নি।"

শরৎ ভাইএর প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া, কঠোর স্বরে তৎক্ষণাৎ কহিয়া উঠিল, "তবে কি আমি শুধু-শুধু ভান করে পড়ে আছি—এই কথা তোমরা বলতে চাও?" "আমরা নয়—আমি।" "তাতে আমার লাভ?" "আপাততঃ একজনের মুখ দেখতে হবে না।" "তুমি কি তার হয়ে আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে এসেছ?" "না" বলিয়া অরবিন্দ একটুখানি হাসিল। সেই হাসিটুকুর সামান্য এতটুকু শব্দে, অকস্মাৎ বারুদের স্তূপের মত ফাটিয়া উঠিয়া, তর্জ্জন-শব্দে শরৎ কহিয়া উঠিল, "হাসচ তুমি! দাদা, তুমি কি!" অরবিন্দ ক্ষণকাল নীরব রহিল; তার পর অত্যন্ত ম্লান স্বরে উত্তর করিল, "আমি কি—তা'কি তুই এতক্ষণে চিন্‌তে পার্‌লি শরৎ? তবে আরও একটা কথা বলি, শুন্‌তে পারবি? কাল বাসর-ঘরে—" "কি? গান গেয়েছিলে?" "হ্যাঁ।" শরৎ ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল। তার পর মুখ তুলিয়া বলিল, "তুমি যাও"। "যাই, কিন্তু তুই খেতে আয়।" "শিগগির যাও বল্‌ছি—" "যাচ্চি রে, তুই আগে ওঠ্।" "কথা শুন্‌লে না? তবে আমিই যাই। তুমি বড় ভাই—তোমার পায়ের ধুলো নিচ্চি,—কিন্তু তোমার মুখ দেখতে নেই।" বলিতে-বলিতে উচ্ছ্বসিত বেদনায়, অভিমানে কাঁদিয়া উঠিয়া, সেই নির্ম্মম, নিষ্ঠুর জ্যেষ্ঠের কোলের ভিতর সে নিজের শতধারা-ধৌত মুখখানা গুঁজিল।

এই তো ননদ-ভাজের প্রথম প্রণয়,—ইহার পরিণতি আর কেমন আশা করা যায়! সেবারে বধূ যে কয়দিন শ্বশুরালয়ে রহিল, সে কয়টা দিনই তাহার বড় ননদের শরীরের অবস্থা মোটে ভাল রহিল না। পাঁচজনে নববধূকেই তাহার ননদের কাছে বসিয়া তাহাকে পাখা করিতে, গায়ে মাথায় হাত বুলাইতে বলিয়া-কহিয়া পাঠাইয়া দেয়। ননদ তাহাকে গায়ে হাত দিতে তো দেয়ই না,—পাখার বাতাস করিতে গেলে "শীত করিতেছে" বলিয়া গায়ে চাদর টানিয়া দেয়। বধূ বেচারা কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া নত মুখে বসিয়া থাকে। সেও ডাগর মেয়ে—বুদ্ধি তার বেশ তীক্ষ্ণ। তাহার প্রতি এই ননদটি যে বেশ সন্তুষ্ট নন, এটুকু সে স্পষ্টই বুঝিতে পারে। নিজের অপরাধ খুঁজিয়া পায় না। একদিন ছোট ননদকে একটুখানি আভাষ দিয়া ফেলিল। কে একজন তাহাকে শরতের কাছে বসিতে বলিতেই, সে জনান্তিকে ঊষাকে বলিল "আমি থাক্‌লে ঠাকুর-ঝি বিরক্ত হন যে,—আমি যাব কি?" ঊষার ইচ্ছা নয় যে, তাহার এই নূতন সঙ্গীটি কেমন করিয়া একটা রোগীর ঘরে বদ্ধ হইয়া থাকে। তাই সে অতি সহজেই ইহার পক্ষাবলম্বন করিয়া সাশ্চর্য্যে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, দি তোমায় বকে না কি?" বধূ নত-নেত্রে নথ খুঁটিতে-খুঁটিতে মৃদুস্বরে কহিল, "না ভাই, বকেন না; কিন্তু

বোঝা যায় যে রাগ করচেন। কেবলি-কেবলি উঠে যেতে বলেন।"

"তবে তুই যাস্‌নে।" এই বলিয়া উষা তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া তাহাকে নিজের খেলাঘরে লইয়া আসিল। ইহার পর হইতে কেহ বধুকে শরতের সেবার কোন ভার দিতে আসিলে, সে বধূর পক্ষে ওকালতি করিয়া জবাব দিতে আরম্ভ করিল যে, "দিদি ওকে বকে—ও কি করতে যাবে? ও যাবে না।"

বধূ ভীত হইয়া বলিল, "ও কি ভাই, ও রকম করে বলচ কেন? ওঁরা হয় ত রাগ কর্ব্বেন।"

"কে আবার রাগ কর্ব্বে।" বলিয়া নিঃশঙ্ক উষা অপ্রতিহত অধিকারে নূতন ভাজের উপর দখল লইয়া বসিল। নববধূ সেই হইতেই দুই ননদের প্রভেদ করিতে শিখিল।

একদিন সুযোগ মত অরবিন্দ কুণ্ঠিত মুখে কাছে আসিয়া বলিল, "শরি ভাই, বউ কিন্তু এ সব কথা কখন ভুলবে না।"

শরৎ জিজ্ঞাসা করিল, "কি সব কথা?"

একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া অরবিন্দ কহিল, "এই তুই—"

"বউ বুঝি তোমায় কাছে লাগিয়েছে?"

"লাগায়নি ঠিক,—দুঃখ করে বলছিল, যে,—" রুষ্ট হাস্যের সহিত শরৎ বাধা দিল, "থামো দাদা,—বউএর সঙ্গে তোমার কি-কি কথাবার্ত্তা হয়েছে, সে কথা শোনবার আমার মোটেই আগ্রহ নেই; তবে তুমি যখন এরি মধ্যে বউএর পক্ষ হয়ে আমার কাজের কৈফিয়ৎ নিতে এসেছ, তখন আমারও জানানো উচিত যে, আমি কার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করবো, তার জন্য কারু কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নই। যার ভাল না লাগবে, সে যেন আমার কাছে আসে না।"

অরবিন্দ তাহার আরক্ত মুখের দিকে চাহিয়া, মৃদু হাসিয়া কহিল, "কেন মিছে এত দুঃখ করছিস শরৎ?" "কি করবে—শরতের ঐ রোগ।" বলিয়া শরৎ চলিয়া যাইতেছিল; অরবিন্দ ডাকিয়া বলিল,—"শুনে যা।"

"কি শুন্‌বো বলো?" "অনর্থক সংসারে অশান্তি আনায় লাভ কি?" শরৎ তখনি জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, "আমি যদি তোমাদের সংসারে অশান্তি আনুচি এই হয়, তাহলে এখনি তোমরা আমায় বিদায় করে দাও না।"

"তুই বড় একরোখা। তা বল্‌চিনে। বলি, ও-বেচারার দোষ কি? ওকে আমরাই না ঘরে এনেচি?" "সেই কি আপনি যেচে এসেছিল?" "সে কথা হচ্চে না, ও তো আর তাকে তাড়ায়নি। বিয়ে করে যখন এনেছি তখন—" "তাকে বোধ করি নিকে করেই এনেছিলে?" "তুই ভারি উল্টো-বোঝা মানুষ। তার কথা ছেড়েই দে না। মনে কর, সে কেউ ছিল না। সে সব স্বপন—"

"মা গো! তুমি মানুষ, না কি!" এই বলিয়া শরৎ মুখে আঁচল গুঁজিয়া দিয়াও কান্না রোধ করিতে পারিল না; এবং কান্নার চোটে তাহার মুখ দিয়া অপর কোন ভর্ৎসনাও বাহির হইতে পারিল না।

তা এ সব পুরানো কথা। এখন শরৎশশী ছেলেপিলের মা,—বয়সও সাত আট বৎসর বাড়িয়াছে—শরীর-মনের ঝাল অনেকখানি কমিয়া আসিয়াছে। কাল-প্রবাহেও সেই কৈশোর-শোকের অনেকখানি ভাসাইয়া লইয়াছিল। দ্বিতীয়ার উপর বৈরভাব আর ততদূর নাই। তবে অশুভ দৃষ্টির ফলে দুজনের কেহ কাহাকেও বেশ যে দেখিতে পারে, তা'ও নয়। মনোরমাকে শরৎশশী আজও ভুলে নাই। তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠার সাধ এ বাড়ীতে তাহার মত আর কাহারও নয়। মায়েরও যে অসাধ ছিল না, সেও অনেকখানি এই মেয়েরই জন্য। (ক্রমশঃ)

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ

[শ্রীঅনাথনাথ বসু]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

প্রাতঃস্মরণীয় দেবপ্রকৃতি ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম পাঠকবর্গের নিকট অপরিচিত নহে। শিক্ষা-বিভাগে কার্য্যকালে শিশিরকুমারের সহিত হঠাৎ তাঁহার একদিন সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ভূদেব বাবু স্বয়ং একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী পুরুষ ছিলেন। তিনি শিশিরকুমারের সহিত আলাপ করিয়াই তাঁহার প্রতিভা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শিশিরকুমারের ন্যায় ধীশক্তিসম্পন্ন যুবককে একজন পরিদর্শক নিযুক্ত করিতে পারিলে শিক্ষা-বিভাগের অনেক উন্নতি হইতে পারে, এই চিন্তা ভূদেববাবুর হৃদয়ে উদয় হইয়াছিল। কিন্তু শিশিরকুমারের নিকট তিনি তাঁহার মনের ভাব প্রকাশ করেন নাই। উভয়ের এই সাক্ষাতের কয়েক দিবস পরে, একদিন জনৈক পত্রবাহক শিশিরকুমারের নিকট একখানি পত্র লইয়া উপস্থিত হয়। পত্র উন্মোচন করিয়া শিশিরকুমার দেখিলেন যে, ভূদেব-বাবু তাঁহাকে মাসিক পঁচাত্তর টাকা বেতনে শিক্ষা-বিভাগের একজন পরিদর্শক নিযুক্ত করিতে মনন করিয়া, তাঁহার অভিমত জানিতে চাহিয়াছেন। ভূদেববাবু শিশির-কুমারের ঠিকানা জানিতেন না; সেজন্য তিনি চুঁচুড়া হইতে লোক মারফত যশোহরে পত্র পাঠাইয়াছিলেন। পত্রবাহক অনেক অনুসন্ধান করিয়া শিশিরকুমারের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। বিনা চেষ্টায় যখন পঁচাত্তর টাকা বেতনের একটী চাকুরী জুটিল, তখন তাহা ভগবানের প্রেরিত মনে করিয়া শিশিরকুমার চাকুরী গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর বসন্তকুমারও ঠিক এই সময়ে শিক্ষা-বিভাগের ডাইরেক্টর মহোদয় কর্তৃক মাসিক ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা বেতনে বাঁকুড়া স্কুলের তৃতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন তিনি দীর্ঘকাল এই কার্য্য করিতে সমর্থ হন নাই, এক বৎসরের মধ্যেই তিনি কার্য্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

শিশিরকুমার যখন শিক্ষা-বিভাগে পরিদর্শকের কার্য্যে নিযুক্ত হন, তখন মিষ্টার জেমস্ মনরো (Mr. James Munro) যশোহর জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাঁহার সহযোগী ছিলেন মিষ্টার জেমস্ ওকিনিলী। ইনি পরে মহামান্য হাইকোর্টের বিচারপতির আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। কবিবর নবীনচন্দ্র সেন মহাশয় "আমার জীবন" নামক গ্রন্থে মিষ্টার মনরো ও মিষ্টার ওকিনিলী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"যেমন ম্যাজিষ্ট্রেট, তেমনই জইণ্ট—সোনা সোহাগার যোগ, অনলের সহায় পবন। ম্যাজিষ্ট্রেট যাঁহাকে ধরিতে বলেন, জইণ্ট তাঁহাকে খুন করেন। যুদ্ধরত গজ-কচ্ছপের পরাক্রম বিশ্বচরাচর সহিতে পারে নাই। এই সম্মিলিত গজকচ্ছপের শক্তি একটা জেলা কিরূপে সহিবে? এই যুগল রূপের—একান্ত হরিহরের শাসনে ও অত্যাচারে যশোহর টলটলায়মান। ভদ্রলোক পর্য্যন্ত অস্থির।" কিন্তু এ হেন সাহেবদ্বয়কে শিশিরকুমার মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার গুণে ম্যাজিষ্ট্রেট ও জইণ্ট তাঁহার প্রতি এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, অনেক সময় তাঁহারা শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে শিশিরকুমারের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। ১৮৬৯ খৃঃ অঃ ভীষণ বাতাবর্ত্ত ও জলপ্লাবনে দক্ষিণ বঙ্গের নানা স্থানের ন্যায় যশোহরেরও বিস্তর ক্ষতি হইয়াছিল। কি উপায় অবলম্বন করিলে রাস্তা ঘাট পরিষ্কার হয়, বন্যা-প্রপীড়িত যশোহরবাসিগণের কষ্টের অবসান হয়, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য মিষ্টার মনরো সর্ব্বদাই শিশিরকুমারের সহিত পরামর্শ করিতেন। এই জলপ্লাবনে কত লোক স্ত্রী-পুত্রহীন ও গৃহশূন্য হইয়াছিল, তাহার প্রকৃত সংখ্যা নির্ণীত হয় নাই। গভর্ণমেণ্টের বেতন-ভোগী কর্ম্মচারিগণ যেভাবে কার্য্য করিতেন শিশিরকুমার বিনা বেতনে তদপেক্ষা অধিক আগ্রহ ও যত্নের সহিত স্বীয় জেলার উন্নতির জন্য পরিশ্রম করিতেন। এইজন্যই জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও তাঁহার সহযোগী সকল বিষয়েই তাঁহার

মতামত গ্রহণ করিতেন। পাছে মিষ্টার মন্‌রো ও মিষ্টার ওকিনিলীর কোনরূপ নিন্দা হয়, এই আশঙ্কায় শিশির-কুমার যখনই তাঁহাদের সহিত কোন কার্য্যে লিপ্ত হইতেন, তখনই বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতেন, এবং কার্য্যটী যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। শিশিরকুমারের যত্নে বন্যা-প্রপীড়িত বহু নরনারী সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার সকল কার্য্যেই একটা বিশেষত্ব লক্ষিত হইত। এই ঝড়ের পর নবীনচন্দ্রের সহিত শিশিরকুমারের সাক্ষাৎ হইলে, নবীনচন্দ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ঝড়ের সময় আপনি কোথায় ছিলেন?" প্রত্যুত্তরে শিশিরকুমার বলিয়াছিলেন, "মাঠে শুইয়া ছিলাম।" নবীনচন্দ্র শুনিয়া অবাক্। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ খেয়াল কেন হইল?" শিশিরকুমার একটু হাসিয়া বলিলেন, "ঝড়ের বেগ (velocity) মাপ করিতে-ছিলাম।"

শিশিরকুমারের ন্যায় বুদ্ধিমান, বিবেচক ও কর্ম্মঠ যুবককে জেলার কোনও দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে স্থায়ী ভাবে নিযুক্ত করিতে পারিলে সর্ব্বদাই তাঁহার পরামর্শ পাওয়া যাইতে পারে, এই ভাবিয়া মিষ্টার মন্‌রো তাঁহার জন্য একটী কার্য্য অন্বেষণ করিতেছিলেন। হঠাৎ এই সময়ে ইন্‌কম্‌-ট্যাক্স বিভাগে দুইটী ডেপুটী কলেক্টরের পদ শূন্য হয়। মন্‌রো শিশিরকুমারকে একটী ও তাঁহার মধ্যমাগ্রজ হেমন্তকুমারকে অন্যটী গ্রহণ করিবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিলে, দুই সহোদর ইন্‌কম্‌-ট্যাক্স ডেপুটীকলেক্টরের কার্য্য গ্রহণ করিয়া-ছিলেন।

নিয়তির বিধান লঙ্ঘন করা মানবের অসাধ্য। সহোদর হীরালালের বিয়োগজনিত নিদারুণ যন্ত্রণা সম্পূর্ণ প্রশমিত হইতে-না-হইতে শিশিরকুমার ও তাঁহার ভ্রাতা-ভগিনী-গণের হৃদয়াকাশ পুনরায় কাল-মেঘাবৃত হইয়াছিল। এই সময় তাঁহাদের জ্যেষ্ঠাগ্রজ বসন্তকুমার তাঁহাদিগকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া অমরধামে চলিয়া যান। বাল্য কাল হইতেই বসন্তকুমারের স্বাস্থ্য ভাল ছিল না; তিনি দুরারোগ্য শ্বাসরোগে ভুগিতেছিলেন, একথা পাঠকবর্গ অবগত আছেন। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে তিনি শিশিরকুমারের সহিত মনোনিবেশ পূর্ব্বক কথা কহিতে-কহিতে কাসিয়া সঙ্গে কাস ফেলিলেন। পাছে শিশিরকুমার দেখিতে পান, সেজন্য কাস ফেলিয়াই বসন্ত তাহা পদদ্বারা আবৃত করিলেন। শিশিরের মনে সন্দেহ হওয়ায়, তিনি দাদার পা ধরিয়া বলিলেন, "তুমি পা সরাও, আমি কাস দেখিব।" বসন্ত পা সরাইতে সম্মত হইলেন না। শিশিরকুমার সমস্তই বুঝিতে পারিলেন; তাঁহার শরীর যেন অবসন্ন হইয়া পড়িল। বসন্তকুমার শিশিরকুমারকে তুলিয়া বলিলেন, "তুমি দেখ্‌বে কি? ও রক্ত।" শিশিরকুমারের চক্ষু ফাটিয়া অশ্রু ছুটিতে লাগিল। যাঁহার পদপ্রান্তে উপবেশন করিয়া তিনি বাল্যে মানব-জীবনের কর্ত্তব্য শিক্ষা করিয়াছেন, যাঁহার স্নেহপ্রবণতায় সকল ভ্রাতা-ভগিনী মুগ্ধ ছিলেন, সেই স্নেহময় জ্যেষ্ঠাগ্রজ সকলকে চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করিবেন, এই চিন্তায় শিশিরকুমারের হৃদয় শান্তিহীন হইয়া উঠিল। যে ভীষণ যন্ত্রণা শিশিরকুমারের অন্তস্তল দগ্ধ করিতেছিল, তাহা তাঁহার বদনে প্রতিভাত দেখিয়া বসন্তকুমার বলিয়াছিলেন, "আমি আগে আসিয়াছি, আগে যাবো। শিশির! আমার দেহের এত কষ্ট যে, আমার আর এ জগৎ সহিতেছে না। আমাকে তুমি স্বচ্ছন্দ মনে অনুমতি কর। আমার নিজের কোন দুঃখ নাই, তবে আমি ভাবিয়া থাকি, আমার বিরহে তুমি বড় দুঃখ পাইবে*।" বসন্তকুমারের শরীর দিন-দিন ক্ষীণ হইতে লাগিল। মৃত্যুর দিন তিনি শিশিরকুমারের অঙ্কে মস্তক রক্ষা করিয়া শয়ন করিলেন, শিশিরের নয়ন-যুগল হইতে অবিরল অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। এমন সময় বসন্ত ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন, "শিশির, ভাই, আমি চলিলাম। প্রকৃত মানুষ হইতে চেষ্টা কর। অকারণে মানসিক দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিয়া আর আমার কষ্ট বৃদ্ধি করিও না, ভাই।" বসন্তকুমার নীরব হইলেন; সঙ্গে-সঙ্গে ঘোষ-পরিবারের মধ্যে করুণ বিলাপ ধ্বনি উত্থিত হইল। বঙ্গ-গগনের একটী নক্ষত্র স্বীয় দীপ্তির পূর্ণ বিকাশের পূর্ব্বেই স্থানচ্যুত হইয়া পড়িল। এই জগতে, মানব-সমাজের অজ্ঞাতে, দূর অরণ্য মধ্যে কতশত দেবভোগ্য কুসুম নিভৃতে স্বীয় পরিমল বিতরণ করিয়া বৃন্তচ্যুত হইতেছে; আবার কত-শত অর্দ্ধস্ফুট কলিকা সুগন্ধ বিলাইবার পূর্ব্বেই অকালে

* অমিয় নিমাই চরিত—৫ম খণ্ড, উপসর্গ পত্র।

ঝরিয়া পড়িতেছে, কে তাহার সংখ্যা নির্ণয় করিবে? ভগবান বসন্তকুমারের হৃদয়ে যে সৎ প্রবৃত্তি প্রদান করিয়া কর্ম্মভূমিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহার সম্পূর্ণ উন্মেষ হইতে-না-হইতেই, দুরন্ত কাল তাঁহাকে তাঁহার কর্ম্ম-জীবনের মধ্যাহ্নে হরণ করিয়া লইল। দেশের র্দুর্ভাগ্য, তাই বসন্তকুমার মাত্র বত্রিশ বৎসর বয়সে ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন। দাদার লোকান্তর গমনে শিশিরকুমার যেন অকূল সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। যে জ্যেষ্ঠাগ্রজ দেশের ও সমাজের হিতকারিণী শক্তি তাঁহার হৃদয়ে সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, তাঁহার অকাল-মৃত্যুতে শিশিরকুমার কিয়ৎকাল হীনবল হইয়া পড়িলেন। উত্তরকালে সংসারে বীরের ন্যায় কার্য্য করিলেও, প্রথম-জীবনের সেই সাহস ও সেই স্ফূর্ত্তি তিনি পুনঃ প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহার হৃদয়ে যে অগ্নি প্রজ্জলিত হইয়াছিল, তাহা তাঁহার জীবনে নির্ব্বাপিত হয় নাই; রাবণের চিতার ন্যায় সে অগ্নি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁহার অন্তস্থলে ধূমায়মান ছিল। শিশিরকুমার তাঁহার 'অমিয় নিমাই চরিতে'র দ্বিতীয় খণ্ড স্বর্গীয় জ্যেষ্ঠাগ্রজকে উৎসর্গ করিয়া লিখিয়াছিলেন,—"বহুদিন তাঁহার সহিত বিচ্ছেদ হইয়াছে, কিন্তু সে বিরহ অগ্নি সমানই রহিয়াছে।" দাদাকে তিনি দেবতার অধিক ভক্তি করিতেন। উক্ত উৎসর্গ পত্রেই তিনি লিখিয়াছেন,—"অদ্যাপি শ্রীভগবানের পূজা করিতে বসিয়া আমি প্রভুকে দেখিতে পাই না, সেস্থানে দাদাকে দেখি।" এরূপ ভ্রাতৃভক্তি জগতে দুর্লভ; অথবা কেবল রঘু-রাজকুমারগণের জন্মভূমি ভারতবর্ষেই লক্ষিত হয়।

মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে বসন্তকুমার সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কৃষিবিষয়ক একখানি পত্রিকা প্রকাশের ইচ্ছা করেন। তিনি শিশিরকুমারকে আপনার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে শিশির সর্ব্বপ্রথমে একটী মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনশত টাকা মাত্র সঙ্গে লইয়া তিনি এই উদ্দেশ্যে কলিকাতায় আসিলেন। তিনশত টাকায় একটি প্রেস্ পাওয়া কতদূর সম্ভব, পাঠক তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারেন। শিশিরকুমারকে কিন্তু উক্ত টাকার মধ্যেই প্রেস সংগ্রহ করিতে হইবে; সুতরাং তিনি কলিকাতার নানাস্থানে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। বহু চেষ্টার পর একটি পুরাতন কাঠের প্রেস্ সংগৃহীত হইল। প্রেস চালাইতে হইলে প্রেসম্যান, কম্পোজিট প্রভৃতি আবশ্যক; কিন্তু পল্লীগ্রামে এ সকল কার্য্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তি তখন আদৌ পাওয়া যাইত না। শিশিরকুমার কলিকাতার একটি ছাপাখানায় প্রেস-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য শিক্ষা করিলেন এবং প্রেসটি লইয়া স্বীয় গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কাকিনার বর্ত্তমান রাজা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্ররঞ্জন চৌধুরী বাহাদুরের পিতা স্বর্গীয় রাজা মহিমারঞ্জন চৌধুরী বাহাদুর সর্ব্বপ্রথমে পল্লীগ্রামে প্রেস লইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার পর শিশিরকুমার তাঁহাদের গ্রামে প্রেস্ লইয়া যান। তাঁহার গ্রামবাসিগণ দলে দলে ছাপাখানা দেখিতে আসিতে লাগিল। বসন্তকুমার এই প্রেস্ হইতে "অমৃত প্রবাহিনী" নামে একখানি পাক্ষিক সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কৃষি সম্বন্ধীয় বিষয় আলোচিত হইত। নানা কারণে পত্রিকাখানির অস্তিত্ব অল্পদিনের মধ্যেই বিলুপ্ত হইয়াছিল।

জ্যেষ্ঠ সহোদর বসন্তকুমারের মৃত্যুর পর প্রথম শোকাবেগ কিয়ৎ পরিমাণে প্রশমিত হইলে, শিশিরকুমারের হৃদয়ে পুনরায় সংবাদপত্র প্রকাশের ইচ্ছা জাগিয়া উঠিল। তিনি ও তাঁহার মধ্যমাগ্রজ হেমন্তকুমার ইন্‌কম্-ট্যাক্স ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিতে-করিতে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, গভর্ণমেণ্টের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া তাঁহারা দেশের বহু প্রয়োজনীয় বিষয়ে মনোনিবেশ করিবার অবকাশ পাইতেছেন না। উভয় সহোদর কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনাদিগের গ্রামে একখানি বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করিবেন স্থির করিয়া, মিষ্টার মন্‌রো ও মিষ্টার ওকিনিলীর নিকট আপনাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। দেশের অভাব-অভিযোগের সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের কার্য্যেরও নানা সমালোচনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়; অনেক সময় রাজকর্ম্মচারিগণের দুর্ব্ব্যবহারের কথাও গভর্ণমেণ্টের গোচর করিবার জন্য সংবাদপত্রে তীব্রভাবে আলোচিত হইয়া থাকে। এই সকল কথা জানিয়াও মিঃ মন্‌রো শিশিরকুমারের উত্তম ও সদনুষ্ঠানে কোনও রূপ বাধা প্রদান করেন নাই। তিনি ও তাঁহার সহযোগী সংবাদ-পত্র পরিচালনে শিশিরকুমারকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। আমরা এইখানেই বলিয়া রাখি, সংবাদপত্র পরিচালনের জন্য হেমন্তকুমার ও শিশিরকুমার

ইন্‌কম্‌ট্যাক্স ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্যপরিত্যাগ করিয়াছিলেন। চাকুরীগত-প্রাণ বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা একটী উল্লেখযোগ্য স্বার্থত্যাগের কার্য্য বলিতে হইবে।

পুরাতন প্রেসটী ঠিক করিয়া লইয়া ১৮৬৮ খৃঃ অঃ মার্চ্চ মাস হইতে শিশিরকুমার একখানি বাঙ্গালা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। স্বীয় গ্রামের নামানুসারে পত্রিকাখানির নাম হইল "অমৃত বাজার পত্রিকা।" হেমন্তকুমার, সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার আনন্দমোহন বসু, যশোহর জিলাস্কুলের তৎকালীন দ্বিতীয় শিক্ষক বাবু জগদ্বন্ধু ভদ্র ও শিশিরকুমারের কনিষ্ঠ ভগিনীপতি শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল সরকার পত্রিকার লেখক নির্ব্বাচিত হইলেন। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক হইলেও মতিলালও ইঁহাদের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। কিশোরীবাবু কলিকাতা হাইকোর্টের একজন বিচক্ষণ উকিল। ইনি এখনও মধ্যে-মধ্যে অমৃতবাজার পত্রিকায় লিখিয়া থাকেন। যাঁহাদের যত্নে ও পরিশ্রমে অমৃতবাজার পত্রিকা আজ এতদূর উন্নত, কিশোরীলাল তাঁহাদের অন্যতম। শিশিরকুমার লেখক-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইলেন না। কিন্তু পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় তিনি যে প্রস্তাবনাটী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা তাৎকালিক সুধীমণ্ডলী পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। শিশিরকুমার ইংরেজীই লিখিতে পারেন, কিন্তু তিনি যে সুন্দররূপে বাঙ্গালা লিখিতে পারেন, তাহা কেহ জানিতেন না। পত্রিকার বাৎসরিক মূল্য পাঁচ টাকা ও ডাক-মাশুল তিন টাকা নির্দ্ধারিত হইল। যশোহরে লোক মারফত কাগজ বিলি হইত, সুতরাং সেখানকার গ্রাহকগণকে ডাক মাশুলের তিন টাকা দিতে হইত না। আমরা যে সময়ের কথার আলোচনা করিতেছি, বর্ত্তমানের তুলনায় তখন ছাপাখানার কার্য্য পরিচালনা যে কিরূপ দুঃসাধ্য ছিল, পাঠক তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারেন। শিশিরকুমারের জন্মভূমি অমৃতবাজার (পলুয়া মাগুরা) হইতে কলিকাতা প্রায় সাতাত্তর মাইল দূরে অবস্থিত। তখন কলিকাতায় আসিবার পথও সুগম ছিল না। প্রেস সম্বন্ধীয় যাবতীয় দ্রব্য কলিকাতা হইতে সরবরাহ করিতে হইত। মধ্যে-মধ্যে অসুবিধায় পতিত হইতেন বলিয়া শিশিরকুমার স্বয়ং গৃহে ছাপার কালি প্রস্তুত করিয়া লইতেন। যশোহরে সকল সময় কাগজ পাওয়া যাইত না। কাগজের অভাব দূর করিবার নিমিত্ত তিনি স্বীয় গ্রামে পত্রিকার জন্য কাগজ প্রস্তুত করিতে মনন করিয়াছিলেন। তৎকালে পাণ্ডুয়া ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের মুসলমানগণ কাগজ প্রস্তুত করিতে জানিত। শিশিরকুমার তাহাদের নিকট হইতে কাগজ প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করিয়া পত্রিকার জন্য স্বহস্তে কাগজও প্রস্তুত করিয়াছিলেন; কিন্তু সে কাগজ ভাল হয় নাই।

এক সময় আমেরিকার কোন এক পল্লীর একটী ছাপাখানা হইতে "S" অক্ষরগুলি অপহৃত হইয়াছিল। এই চুরির সংবাদটি স্থানীয় সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল :—

"We are thorry to they, that our compothing room wath entered latht night by thome unknown thcoundrel, who thtole every "eth" in the ethtablithment, and thucceeded in making hith ethcape undetected, the motive of the mithcreant doubtleth wath revenge for thome thuppothed inthult."

"s" অক্ষরটীর স্থলে "th" দিয়া প্রেসের কর্ত্তৃপক্ষগণ সংবাদটী প্রকাশ করিয়াছিলেন, পাঠকবর্গ তাহা বুঝিতে পারিলেন। শিশিরকুমারের যদি কখনও কোন অক্ষরের অভাব হইত, তাহা হইলে তিনি কিরূপে সেই অভাব পূরণ করিতেন, আমরা তাহাও পাঠকবর্গকে অবগত করাইব। একবার একটী লোক প্রেসে কতকগুলি দাখিলা ছাপিতে দিয়াছিল। দাখিলার একস্থানে ।৵০ ছয় আনা ছাপিতে হইবে, কিন্তু প্রেসের অক্ষরের সারের ভিতর ৵০ এই অক্ষরটীর অভাব দেখা গেল। শিশির এক অদ্ভুত উপায়ে দাখিলা ছাপা শেষ করিলেন। ৵০ স্থলে "হ" এই অক্ষরটী বিপরীত ভাবে বসাইয়া তাহার পূর্ব্বে ইংরাজী পূর্ণচ্ছেদের চিহ্ন দিয়া ।৵০ মুদ্রিত করিয়াছিলেন। যখনই দেখা যাইত যে কোনও একটী অক্ষরের অভাব পড়িতেছে, তখনই তিনি লিখিত প্রবন্ধের যে অংশে সেই অক্ষরটী অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই অংশটী সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন করিয়া লিখিয়া দিতেন। মধ্যে-মধ্যে তিনি অন্য অক্ষর স্বহস্তে কাটিয়া-ছাঁটিয়া প্রয়োজনীয় অক্ষর প্রস্তুত করিয়াও লইতেন।

এইরূপে অমৃতবাজার পত্রিকা প্রকাশিত হইতে

লাগিল। ইহার জন্য শিশিরকুমারকে সকল কার্য্যই পরিদর্শন করিতে হইত। প্রেসম্যান অনুপস্থিত, শিশির তাঁহার কার্য্য চালাইয়া লইলেন; কম্পোজিটর অনুপস্থিত, শিশির তাহার কার্য্যে বসিয়া গেলেন। শিশির যেদিন কম্পোজিটরের কার্য্যে বসিতেন, সেদিন তিনি একই সময়ে কম্পোজিটর ও সম্পাদকের কার্য্য করিতেন। তিনি স্বতন্ত্র কাগজে পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ না লিখিয়া, মনে-মনে প্রবন্ধ রচনা করিতে-করিতে মুদ্রাক্ষর সাজাইবার যন্ত্রে অক্ষর বিন্যাস করিয়া যাইতেন। ইহাতে তাঁহার বড় ভুল হইত না। এরূপ ক্ষমতা কয়জনের মধ্যে লক্ষিত হয়, পাঠকগণই তাহার বিচার করিবেন। ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার মনরো ও তাঁহার সহযোগী মিষ্টার ওকিনিলী সর্ব্বদাই শিশিরকুমারকে উৎসাহ প্রদান করিতেন। গভর্ণমেণ্টের বিজ্ঞাপনগুলি পত্রিকায় প্রকাশ করিতে দিয়া মিষ্টার মনরো শিশিরকুমারের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। মিষ্টার ওকিনিলী দশ কপি পত্রিকার গ্রাহক হইয়াছিলেন। চট্টগ্রামের তাৎকালিক ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার জেড্ডেস্ (Mr. Geddes) একবার মনরোর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য যশোহরে আগমন করিয়াছিলেন। একদিন মনরো, জেড্ডেস্ ও ওকিনিলী কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, এমন সময় শিশিরকুমার সেখানে উপস্থিত হইলেন। মনরো শিশিরকুমারকে জেড্ডেসের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিয়া বলিলেন, "জেড্ডেস্, তোমাকে অমৃতবাজার পত্রিকার গ্রাহক হইতে হইবে।" মিষ্টার জেড্ডেস্ সম্মত হইয়া স্বীয় জেলায় প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক পত্রিকার চাঁদা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। এই সময়ে অর্থাভাব বশতঃ পত্রিকার কার্য্য একেবার বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। কিন্তু নলডাঙ্গার সহৃদয় রাজা ইন্দুভূষণ দেবরায় একশত টাকা সাহায্য দান করিয়া অমৃতবাজার পত্রিকাকে উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। রাজার এই সাহায্য পাইয়া শিশিরকুমার যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, গ্রাহক-সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে পত্রিকার আর্থিক অস্বচ্ছলতাও দূর হইতে লাগিল। বঙ্গদেশে এই সময় ইংলিশম্যান, হিন্দু প্যাট্রিয়ট, ইণ্ডিয়ান মিরর ও সোমপ্রকাশ এই চারিখানি সংবাদপত্রেরই বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। প্রথমোক্ত পত্রিকাখানি ইংরাজদিগের ও শেষোক্ত তিনখানি বাঙ্গালীদিগের তত্বাবধানে পরিচালিত হইত। বর্ত্তমান সময় স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার লাভ করিবার জন্য ভারতবর্ষে আসমুদ্র হিমাচল আন্দোলন চলিতেছে; কিন্তু তখন এ চিন্তা তাৎকালিক রাজনীতিজ্ঞদিগের হৃদয়ে উদিত হয় নাই। বিধাতার অলঙ্ঘনীয় বিধানে আমরা বিদেশীয় রাজার অধীন; সুতরাং আমাদের শুভাশুভ সমস্তই রাজার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে, এই ভাবিয়া দেশবাসিগণ নীরব থাকিতেন। কোনও কারণে রাজকর্ম্মচারিগণের হস্তে নির্য্যাতন ভোগ করিলে, তাহা সহ্য করা ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না। পূর্ব্বোক্ত সংবাদপত্রগুলি যে প্রণালীতে পরিচালিত হইত, শিশিরকুমার অমৃতবাজার পত্রিকা পরিচালনে সে প্রণালী অবলম্বন করেন নাই। কথা-প্রসঙ্গে একদিন শিশিরকুমার বলিয়াছিলেন, "We are we and they are they." অর্থাৎ তাহারা তাহাদিগের সুখ-স্বার্থের কথা ভাবিয়া থাকে, আমরা আমাদিগের সুখ স্বার্থের কথা ভাবিয়া থাকি। আমরা অর্থাৎ ভারতবাসীরা স্বদেশের মঙ্গল সাধনের জন্য যাহা করিতে চাই, বিদেশীয়গণের পক্ষে তাহা করা কখনও সম্ভব নয়। এই কথা সর্ব্বদাই শিশিরকুমারের হৃদয়ে জাগরূক হইত। অমৃতবাজার পত্রিকায় যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত, তাহার প্রায় প্রত্যেকটীতেই শিশিরকুমারের উক্ত চিন্তার আভাষ সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হইত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মিষ্টার মনরো ও মিষ্টার ওকিনিলী প্রথমে শিশিরকুমারকে নানা উপায়ে সাহায্য করিয়াছিলেন; কিন্তু শেষে তাঁহারা পত্রিকা পরিচালনের অভিনব পন্থা লক্ষ্য করিয়া বড়ই বিরক্ত হইয়াছিলেন। সাহেবদিগের পক্ষে বিরক্ত হওয়া অস্বাভাবিক নয়; কিন্তু শিশিরকুমারের স্বদেশবাসিগণও তাঁহার সহিত একমত হইতে পারেন নাই। ইংরেজরাজ যাহা দিতেছেন তাহা সম্পূর্ণ অনুগ্রহ করিয়াই দিতেছেন,—তাহাতে যে আমাদের বিধাতৃ-দত্ত অধিকার আছে, ইহা শিশিরকুমারের সমকালবর্ত্তিগণ ধারণা করিতে পারিতেন না। এইজন্য স্বদেশ-প্রেমিক সাধু রামতনু লাহিড়ীর ন্যায় ব্যক্তিগণও অমৃতবাজার পত্রিকাকে রাজদ্রোহ-প্রচারক বলিয়া মনে করিতেন। দেশের দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞগণ অমৃত বাজার পাঠ করিয়া হৃদয়ে পরম আনন্দ অনুভব করিতেন এবং শতমুখে সম্পাদকের প্রশংসা করিতেন; কিন্তু স্থূলদর্শী, দুর্ব্বলচেতা

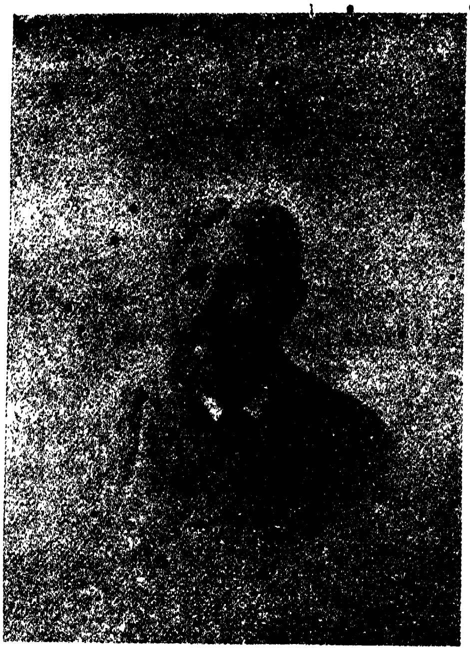

৺আনন্দমোহন বসু

৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়

৺মনোমোহন ঘোষ

ব্যক্তিগণ তাহা পাঠপূর্ব্বক প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণে অশক্ত হইয়া পত্রিকার সম্পাদককে একজন অবিনীত, অজ্ঞ, গ্রাম্য ব্যক্তি বলিয়া ঘৃণা ও উপহাস করিতেন।

জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার মন্‌রো ও তাঁহার সহযোগী মিষ্টার ওকিনিলী, এবং শিশিরকুমার এতদিন যে সখ্যতা-বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন, তাহা এই সময়ে ছিন্ন হইয়াছিল। মন্‌রো ও ওকিনিলীর ন্যায় অন্তরঙ্গ সুহৃদ্‌গণ যে তাঁহার বিপক্ষতাচরণ করিবেন, একথা শিশিরকুমার স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই। অতি অল্প সময়ের মধ্যে অমৃতবাজার পত্রিকা দেশের মধ্যে একখানি অতি উচ্চাঙ্গের সংবাদপত্র বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠিল। পত্রিকা পাঠ করিবার জন্য দেশের সকল সম্প্রদায়ই উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিতেন।

৺নবীনচন্দ্র সেন

শ্রীযুক্ত গোলাপলাল ঘোষ

গভর্ণমেণ্ট পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অমৃতবাজার পত্রিকার প্রবন্ধগুলি পাঠ করিতেন; এবং ইংরেজ-সম্প্রদায়মধ্যে পত্রিকা ও শিশিরকুমারের কথা লইয়া আন্দোলন চলিত। তাঁহাদিগের মনে এই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, শিশির ও তাঁহার সহোদরগণ ভারতবর্ষে একটা ভীষণ বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বালিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। পত্রিকার ধ্বংস-সাধনের জন্য উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণ সুযোগের সন্ধান করিতে লাগিলেন। শীঘ্রই সে সুযোগ উপস্থিত হইল। বারান্তরে আমরা সে ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিব।

মোগল-সম্রাট্ আক্‌বর

[শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

আক্‌বর ও রাজপুত জাতি।

রাণা প্রতাপ; হল্‌দীঘাটের যুদ্ধ; মিবারের পুনরুদ্ধার।

"There is not a pass in the Alpine Aravalli that is not sanctified by some deed of Pratap,—brilliant victory, or oftener, more glorious defeat"—*Tod.*

চিতোর-ধ্বংসের পর রাজপুতানার সেই মহা-দুর্দ্দিনে যে মহাপ্রাণ পূতচরিত্র রাজর্ষি ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্রাটের সহায়-সম্পদ্, সৈন্যবল তুচ্ছ করিয়া একমাত্র জন্মভূমির অনুপ্রাণনায় নিঃসঙ্গ গিরিশৃঙ্গের ন্যায় একেশ্বর দণ্ডায়মান ছিলেন; অতুলনীয় ত্যাগ, ধৈর্য্য, সাহস, সহিষ্ণুতাবলে যিনি বীরকুলে বীরেন্দ্র; যাঁহার পবিত্র পদধূলি গৌরবের বিভূতিরূপে ললাটে ধারণ করিয়া মিবার-ভূমি চিরমহিমময়ী—তাঁহার অমর কাহিনী শ্রবণে আজিও রাজপুত-ধমনীতে

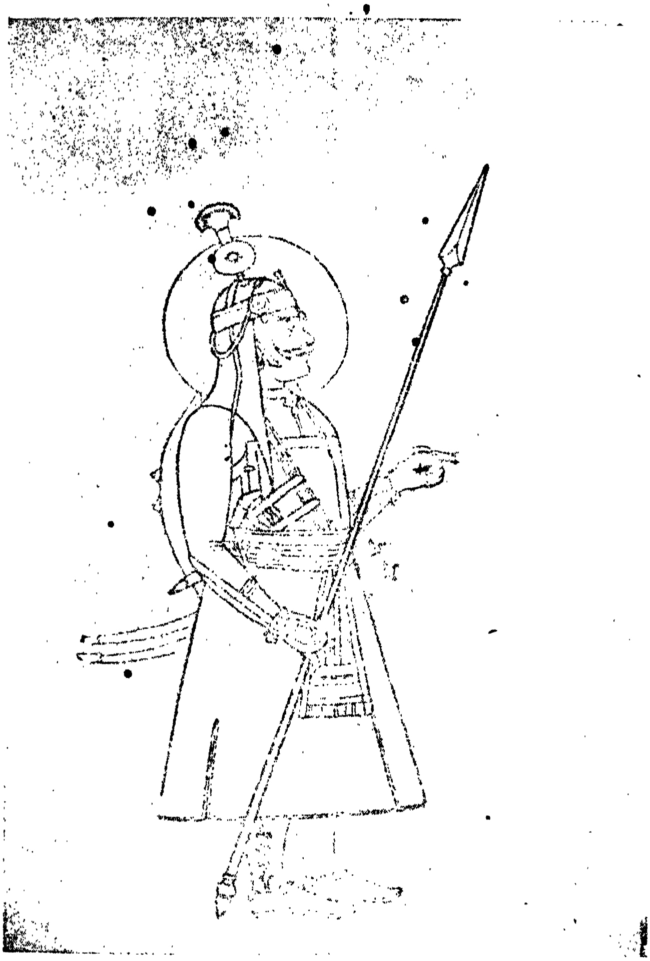

রাণা প্রতাপ

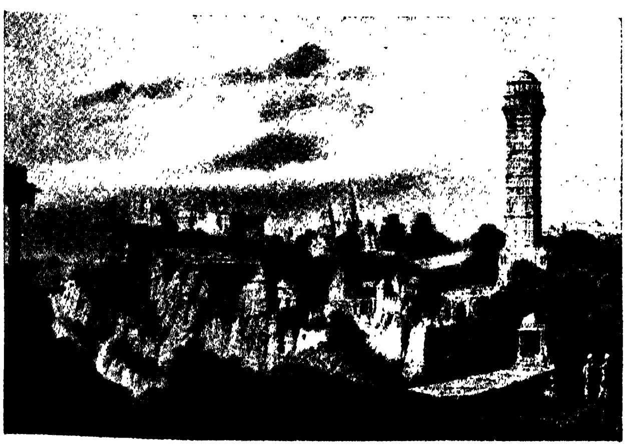

চিতোরের অভ্যন্তর দৃশ্য

মহারাণা প্রতাপ সিংহ

সলীম (জহাঙ্গীর)

সম্রাট্ আকবর

জৌহর

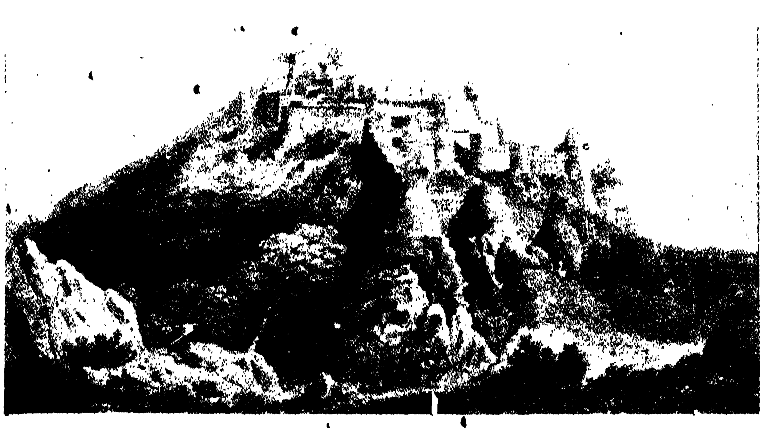

কম্বলমীর গিরিদুর্গ

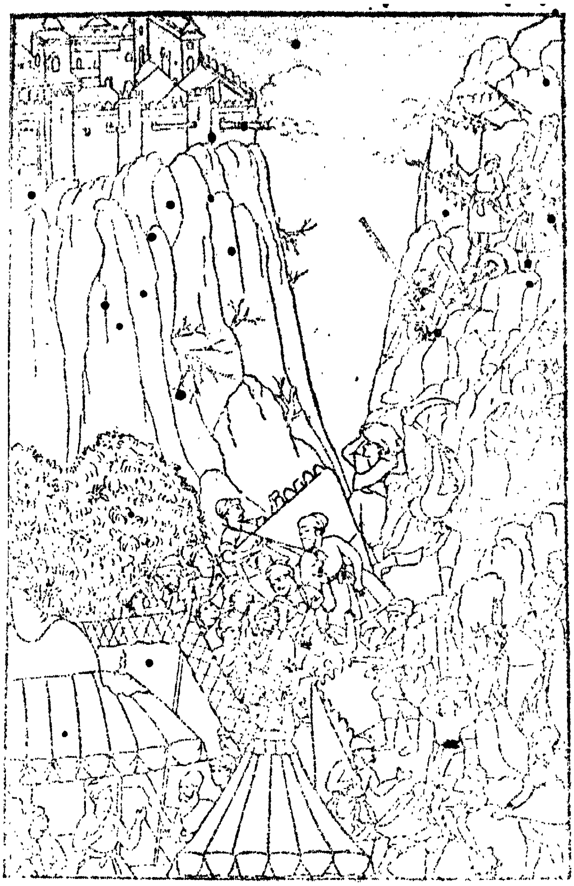

রণথাম্ভোর অবরোধ

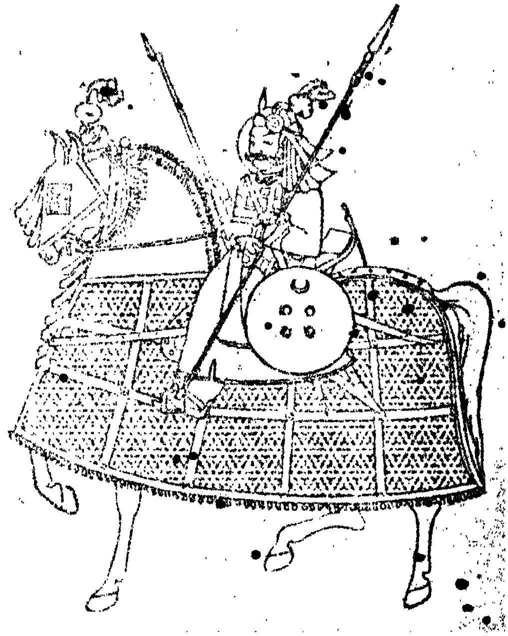

রাজপুত সৈনিক

থর-প্রবাহ বহে,—তাহার অনমিত মস্তক শ্রদ্ধায় অবনমিত হয় এবং ভক্তির বিমল অশ্রুতে চক্ষু সজল হইয়া উঠে। আনন্দে-উৎসবে, বিষাদে-বিপ্লবে আজিও সে পুণ্যগাথা মিবারের ঘরে ঘরে চারণমুখে গীত হয়,—আরাবল্লীর প্রতি গিরিকন্দর তাহার প্রতিধ্বনি করে। জন্মভূমির কল্যাণ-কামনায়-সমুজ্জ্বল যে-সকল অমূল্য জীবন-চরিত্র ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়াছে, বরেণ্য প্রতাপ-চরিত্র সে সকলের অগ্রগণ্য। "স্বদেশের একান্ত অনুরাগী" কোথায় এমন ওয়ালেস্, পাওলী, গ্যারিবল্‌ডী, ম্যাজিনী জন্মিয়াছেন, যাঁহাদের সকলের মিলন-মিশ্রণে প্রতাপের ন্যায় সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর উদ্ভব হইতে পারে?

চিতোর-ধ্বংসের চারি বৎসর পরে (১৫৭২ খ্রীঃ) গোগুণ্ডা গিরিনগরে কুলাঙ্গার উদয়সিংহের কলঙ্কিত-জীবনের অবসান হইল। কাপুরুষ পিতা বীরপুত্র প্রতাপের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি মৃত্যুকালে কনিষ্ঠ পুত্র জগ্‌মল্‌কে উত্তরাধিকার প্রদান করিয়া গেলেন; কিন্তু এই অন্যায়-নির্ব্বাচন মিবার-প্রধানগণের মনোনীত হইল না;—তাঁহারা কনিষ্ঠকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া জ্যেষ্ঠকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন।

প্রতাপ রাজদণ্ড ধরিলেন বটে, কিন্তু রাজ্য বলহীন, রাজকোষ অর্থশূন্য, মিবার করিপদদলিত পদ্মবনের ন্যায় শ্রীভ্রষ্ট;—রাজবারার মুকুটমণি, বীরত্বের খনি, অনন্ত-গৌরবশালিনী, অক্ষয়কীর্ত্তিমালিনী, সংগ্রাম-সমর্ষি-বাপ্পার চিতোর-মোগল-কবলে। প্রতাপ প্রতিজ্ঞা করিলেন, যতদিন না এই বীরবাঞ্ছিত নগরীর পুনরুদ্ধার হয়, ততদিন রাণা-বংশে কেহ রাজবেশ ধরিবেন না—রাজপ্রাসাদে বাস

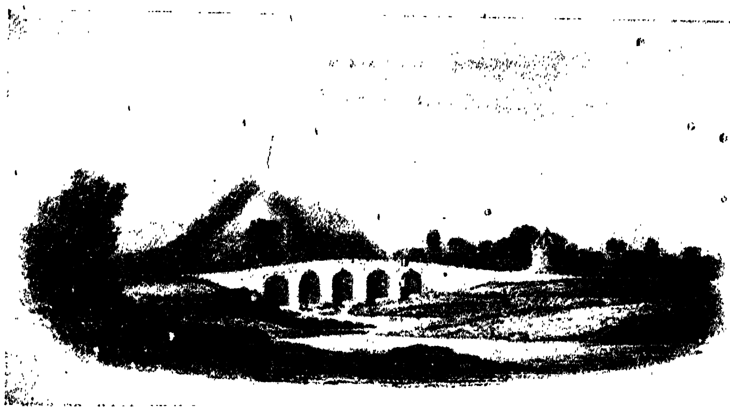

উদয়পুর অধিত্যকা

আজমীর দুর্গ

করিবেন না; ততদিন তাঁহাদিগের শয্যা—ভূমিতল; ভোজন—বৃক্ষপত্রে; ততদিন সকলে মাতৃবিয়োগের শোকচিহ্ন শ্মশ্রুকেশ ধারণ করিবেন, আর রাজপুতের রণডঙ্কা বাহিনীর পুরোভাগে না বাজিয়া পশ্চাতে বাজিবে। প্রতাপ রাজাজ্ঞা প্রচার করিলেন—বীরতীর্থ চিতোর যতদিন বৈরিকরে থাকিবে, ততদিন তাঁহার রাজ্যে আনন্দ-উৎসব নিষেধ; ততদিন কেহ হল-চালন বা মেষ-পালন করিবে না; মিবারের সমস্ত কৃষি-বাণিজ্য বন্ধ; শত্রুর লোভনীয় সমস্ত দ্রব্য বিনষ্ট করিয়া, নিজ নিজ গৃহে আগুন দিয়া প্রজাগণ পর্ব্বতে আসিয়া বাস করিবে। রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে—প্রাণদণ্ড! দেখিতে দেখিতে সুরম্য জনপদ অরণ্য হইল; সমগ্র মিবার ভূভাগ 'বে-চিরাগ্' বা 'নিষ্প্রদীপ' হইয়া গেল!

স্বয়ং এই কঠোর ব্রত গ্রহণ এবং প্রজাগণকে তাহাতে দীক্ষিত করিয়া প্রতাপ মনে মনে সঙ্কল্পবদ্ধ হইলেন যে,—জয়, পরাজয়, মৃত্যু,—ভাগ্যে যাহাই ঘটুক, বাপ্পার বংশধর মাতৃদুগ্ধ কলঙ্কিত করিয়া, জীবন থাকিতে মোগলের দাসত্ব করিবেন না;—রাজপুতের বংশ মান, জাতি-ধর্ম্ম, স্বাধীনতা, তুর্কের সমক্ষে বলি দিবেন না। আরাবল্লীর শিখরে শিখরে এই কঠোর প্রতিজ্ঞা প্রতিধ্বনিত হইল। দিশাহারা রাজবারা শুনিল;—আর শুনিলেন হিন্দুস্থানের একচ্ছত্র সম্রাট্ আক্‌বর। দিগ্বিজয়ী বাদশাহ্ মনে মনে

জৈন মন্দির—কমলমীর

সালুম্ব্রা

প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, ছলে বলে কৌশলে,—যেরূপে হউক, তাঁহার প্রতিষ্ঠাপহারী এই দুর্ব্বার, দুর্ব্বিনীত অরিকে দমন করিতে হইবে। লোলুপ সিংহের ন্যায় তিনি 'আমিষ' অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; তাহা যোগাইয়া দিলেন—মানসিংহ!

স্বদেশ-স্বজাতি-দ্রোহী. যে-সকল রাজপুত-নৃপতি, প্রতিষ্ঠার প্রেরণায় মোগলের বশ্যতা-স্বীকার করিয়া সম্রাটের প্রসাদভোজী হইয়াছিলেন, 'কলিযুগের কালিমা' মান্‌সিংহ তাঁহাদিগের অন্যতম। এই প্রবীণ, পরাক্রান্ত বীর মোগল-সাম্রাজ্যের প্রধান স্তম্ভ ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিস্তীর্ণ মোগল-সাম্রাজ্যের শাসন-সংরক্ষণে রাজপুতের বীরবাহুর বজ্রবল যে অপরিহার্য্য—মোগলের নব-প্রতিষ্ঠিত সিংহাসনভার রাজপুতস্কন্ধে ন্যস্ত না হইলে যে অচিরাৎ ধূলিসাৎ হইবে, প্রজ্ঞাচক্ষু সম্রাট্ তাহা দিব্যচক্ষে দেখিয়াছিলেন। দ্বাদশবর্ষ রাজদণ্ড ধারণ করিয়া রাজনীতিবিশারদ্ আক্‌বর বুঝিয়াছিলেন যে, স্বজাতি এবং বিশেষতঃ আত্মীয়-স্বজনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা মূঢ়তা। এইরূপ করিয়া অধিকাংশস্থলেই তাঁহাকে অনুতাপের তিক্ত ফল আস্বাদন করিতে হইয়াছে। মাহম্, আধম্, মীর্জ্জাগণ, উজ্‌বেগ্-সম্প্রদায়, আট্‌কা-খইল্, তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হকীম্—সকলেই একবার না একবার তাঁহার রাজমুকুটের উপর লোলুপ-দৃষ্টিপাত করিয়াছেন; কিন্তু এই রাজপুতজাতি সৌহৃদ্যবদ্ধ হইলে প্রাণপণে ধর্ম্ম রক্ষা করে। তাঁহার পিতা হুমায়ূন্ যখন স্বধর্ম্মিগণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া, মৃগয়া-

উদয়পুর রাজপ্রাসাদ

ভীমসিংহ ও পদ্মিনীর প্রাসাদ

তাড়িত পশুর ন্যায় বনে মনে মরুভূমে ছুটাছুটি করিয়াছিলেন, সে সময় সহৃদয় রাজপুতই তাঁহার আশ্রয়দাতা; রাজপুতের আশ্রয়েই আকবরের জন্ম; তাহার পর এ জাতির বীর্য্যবল তাঁহার অবিদিত নহে। সুতরাং ভাবী কল্যাণ-কামনায় সম্রাট্ সম্ভবতঃ এই বীরজাতির সহিত বৈবাহিক আদান-প্রদানে শোণিত-সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া হিন্দুস্থানে এক মহাজাতি গঠন করিবার উদার কল্পনা পোষণ করিতেন। রাজপুতানার যে-সকল ভূপতি, বাদশাহের এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায় হইতেন, মোগল-দরবারে তাঁহাদিগের আদর ও উন্নতির সীমা থাকিত না। যাঁহাদের স্বপক্ষভুক্ত করিবার দূর সম্ভাবনা থাকিত, সম্রাট্ তাঁহাদের বিশেষভাবে প্রলুব্ধ করিতেন; কিন্তু যেস্থলে তাঁহার প্রলোভন উপেক্ষিত হইত, কুটনীতিজ্ঞ সম্রাট্ 'বিষে বিষক্ষয়' পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া রাজপুতবলে, রাজপুত-বল ক্ষয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

সূক্ষ্মদর্শী প্রতাপ ভারতপতির এই গূঢ় অভিসন্ধি হৃদয়ঙ্গম করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, মোগল-সংস্পর্শে হিন্দু-শোণিত কলুষিত হইয়া, রাজপুতজাতি নিঃশেষে বিলুপ্ত

হইবে, এবং সেইজন্যই তিনি মোগলের পদসেবী কুলাঙ্গারগণকে নিরতিশয় বিষচক্ষে দেখিতেন;—বিশেষতঃ মান্‌সিংহকে; কারণ এই কাছ্‌ওয়াহ্‌-বংশই সর্ব্বাগ্রে মোগলকে কন্যাদান করে। এই কঠোর স্বাতন্ত্র্যরক্ষার প্রতিফল অচিরেই ফলিল।

ডুঙ্গারপুর-বিজয়ের পর রাজা মান্ যে পথে অম্বরে ফিরিতেছিলেন, তাহার অদূরেই কমলমীর গিরিদুর্গ। মিবারপথে আসিতে আসিতে মান্ দেখিয়াছেন, সমস্ত দেশ যেন এক বিস্তীর্ণ শ্মশানভূমি। ইতস্ততঃ দগ্ধগৃহের ভগ্নাবশেষ, পথরাজি—কণ্টকাকীর্ণ, জনমানব-সম্পর্ক-বিহীন এবং দিবাভাগেই তথায় শৃগাল প্রভৃতি শ্বাপদকুল নিঃশঙ্কে বিচরণ করিতেছে। মিবারপতির কঠোর সঙ্কল্প স্মরণ করিয়া মহারাজ মানসিংহের হৃদয়ে ভক্তির উদ্রেক হইল এবং মুহূর্ত্তের আত্মবিস্মৃতির ফলে তাঁহার হৃদয়ে রাজর্ষিকে সম্মান-প্রদর্শনের বাসনা জাগিয়া উঠিল;—মান্ মিবারেশ্বরের আতিথ্য ভিক্ষা করিলেন। কিন্তু তাহার পরিণাম হইল বিপরীত। রাজপুত-অতিথি-সৎকারের প্রথানুসারে গৃহস্বামীকে স্বয়ং সম্ভ্রান্ত অতিথির সম্মুখে ভোজনপাত্র ধরিয়া দিতে হয়। তাহা দূরে থাকুক, প্রতাপ শিরঃপীড়ার অছিলায় ভোজনস্থলে উপস্থিত হইলেন না। ক্ষোভে অপমানে মানসিংহ উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত; তথাপি শান্তস্বরে বলিলেন,—"যাহা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহার আর প্রতীকার নাই। মহারাণা যদি আমাকে অন্নপাত্র ধরিয়া না দেন, তবে কে দিবে?" প্রতাপ উত্তর পাঠাইলেন,—"যে রাজপুত তুর্কীকে ভগিনী-বিক্রয় করিয়াছেন, মহারাণা তাঁহার সহিত একত্র ভোজন করিতে অসমর্থ।" পাত্র হইতে কয়েকটী অন্ন তুলিয়া মানসিংহ অন্নদেবের সম্মানার্থ উষ্ণীষে রাখিলেন; তারপর প্রতাপকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"আমাদের হীনতায় আপনারই সম্মান বাড়িয়াছে; কিন্তু আজীবন বিপদে মগ্ন থাকাই যদি আপনার অভিপ্রায় হয়, তাহাই থাকুন;—এ রাজ্য হইতে অচিরে আপনার বাস উঠিবে।" সেই সময় প্রতাপ তাঁহার সম্মুখে আসিলেন। মান্ জ্বলন্ত স্তম্ভের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন,—"আপনার এই গর্ব্ব যদি ধূলায় দলিত করিতে না পারি, তবে আমি মানসিংহ নহি।" প্রতাপ অবিচলিত গাম্ভীর্য্যের সহিত উত্তর দিলেন,—"যুদ্ধক্ষেত্রে আপনার সাক্ষাৎ পাইলে সুখী হইব।" তৎপরে পশ্চাৎ হইতে কোন রহস্যপ্রিয় রাজপুত বলিয়া উঠিল,—"তোমার 'ফুপাকে' (পিসাকে অর্থাৎ আক্‌বরকে) যেন সঙ্গে আনিতে ভুলিও না!"

এদিকে অম্বরপতি স্বদেশে না গিয়া একেবারে আজ্‌মীরে সম্রাট্‌সদনে উপনীত হইলেন। চিতোর-বিজয়ী বীর তখন গুজরাট্ ও বঙ্গদেশের বিদ্রোহ-শাসনে ব্যতিব্যস্ত। কিন্তু মানের অভিযান ব্যর্থ হইল না। চিতোর-দুর্গ অধিকার করিয়া সম্রাট্ তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই; বিহঙ্গ পলাইয়াছে, কেবল শূন্যপিঞ্জর লইয়া কি সুখ? অজেয় চিতোর জয় করিয়া সম্রাটের গৌরব প্রতিষ্ঠা বাড়িয়াছে, কিন্তু মহারাণা এখনও তাঁহার পদানত হ'ন নাই। দাম্ভিক পশুরাজ পর্ব্বতশিখরে বসিয়া আস্ফালন করিতেছেন। ধীরে ধীরে রাজা মান্ তাঁহার অপমান-কাহিনী বলিতে বলিতে মহারাণার দম্ভ, ঔদ্ধত্য, মোগল বিদ্বেষ, সম্রাট্‌কে উপেক্ষা, এবং মরণ-পণে স্বাধীনতার সঙ্কল্প বিবৃত করিয়া আহত ভুজঙ্গের ন্যায় ফেনিল গরল উদ্গীর্ণ করিতে লাগিলেন। সে বিষ সম্রাটের মর্ম্মদাহ করিল। তাঁহার একটীমাত্র হুঙ্কারে অসংখ্য বাহিনী সমবেত হইল, এবং যে অঙ্গুলীচালনে সমগ্র ভারত শাসিত, সন্ত্রস্ত হয়, আহতগর্ব্ব ভারতপতি সেই অঙ্গুলী হেলাইয়া তাঁহার দুর্দ্দান্ত-সৈন্যদলকে মিবারের পথ দেখাইয়া দিলেন।

বিপুল গর্জ্জনে নদ যথা শতমুখে সিন্ধুসঙ্গমে ধাবিত হয়, তেমনই কোলাহল তুলিয়া, দেশ দলিয়া, তরঙ্গে-তরঙ্গে উচ্ছ্বাসে-উচ্ছ্বাসে মহোল্লাসে মোগলবাহিনী অভিশপ্ত মিবার অভিমুখে ছুটিল। রণে যাহা কিছু দুর্ব্বার, বলে দুর্দ্দমনীয়, কৌশলে দুর্ভেদ্য, ভারতপতি সেই অদ্বিতীয় মহাস্ত্রসকল ভিখারী প্রতাপের প্রতিপক্ষে নিক্ষেপ করিলেন, এবং তাঁহার অদ্বিতীয় রাজপুত-সৈনাপতি, ক্রুদ্ধ, ঈর্ষাদগ্ধ, প্রতিশোধলুব্ধ মান্‌সিংহের উপর এই বিপুল অভিযানের নেতৃত্বভার দিলেন। কর্ণেল টড্ বলেন, রাজপুতানায় প্রচলিত প্রবাদ যে, সম্রাট্‌পুত্র সলীমের উপর এই যুদ্ধের অধিনায়কত্ব অর্পিত হইয়াছিল। কিন্তু ভারতের ভাবী রাজ্যেশ্বরের বয়স তখন সাত বৎসর মাত্র!

বীরপ্রতিম প্রতাপ এই মহাযুদ্ধাড়ম্বরের সমাচার পাইয়া বুঝিলেন যে, আসন্ন সমরে আত্মবিসর্জ্জন ভিন্ন তাঁহার গত্যন্তর নাই। যাঁহারা স্বদেশ, স্বজাতি, স্বধর্ম্মের

সম্ভ্রম রক্ষা করিবার উপযুক্ত পাত্র, তাঁহারা প্রায় সকলেই সম্রাটের স্বপক্ষ,—তাঁহারা প্রতিকূলে দণ্ডায়মান। এমন কি মহারাণার সহোদর শক্তসিংহ ভ্রাতৃদ্রোহী, সদলবলে মোগল-বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত। এ দুর্দ্দিনে একমাত্র প্রভুভক্ত ভীল সৈন্য ভিন্ন আর কেহ তাঁহার মুখ চাহিবার নাই। আত্মনির্ভরশীল প্রতাপ তাহাতে অণুমাত্র বিচলিত হইলেন না। জন্মভূমির জন্য যুদ্ধের অক্ষয় গৌরব, দেহের শোণিত-দান, বীরের বাঞ্ছিত মৃত্যু, যদি হীনপ্রাণ কাহাকেও প্রলুব্ধ না করে, তিনি স্বয়ং সে অমরত্ব লাভে বঞ্চিত হইবেন কেন? নির্ভর—নিজ ভুজবল; ভরসা—মাতৃনাম মহামন্ত্র; প্রতাপ প্রাণবিসর্জ্জনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

কিন্তু রাজপুতানা তখনও একেবারে নির্ব্বীর, নির্ব্বীর্য্য হয় নাই। তখনও স্বজাতিপ্রীতি, জন্মভূমির প্রতি জ্বলন্ত অনুরাগ, প্রভুভক্তি ও আত্মত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মিবারের ঘোর অন্ধকারে প্রখর রশ্মিপাত করিতেছিল। মহারাণার এই মহাবিপদের দিনে যাঁহারা রণে, বনে, সমরলীলায়, মৃগয়ায়, সম্পদে-সঙ্কটে তাঁহার চিরসহায়,—মিবারের সেই সামন্তরাজগণ দুর্দ্ধর্ষবলসহ একে একে অচলারোহণ করিতে লাগিলেন। জগায়ৎ, চন্দায়ৎ, রাঠোর, প্রমার, চৌহান্, ঝালা—যাঁহাদের পিতৃদেবগণ চিতোররক্ষার্থ অকাতরে শোণিতদান করিয়া বংশ-মান উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন,—তাঁহারা সকলে আসিয়া বীর-অসিস্পর্শে মহারাণার চরণবন্দনা করিলেন। আরাবল্লীর শৃঙ্গে শৃঙ্গে প্রলয়ের বিষাণ—সংহারের ডমরু বাজিয়া উঠিল!

কিন্তু সকলের মিলিতবল দ্বাবিংশ সহস্রের অধিক হইল না। বিরাট্ মোগল-বাহিনীর নিকট ইহা নগণ্য। এই মুষ্টিমেয় বল লইয়া প্রতাপ গিরিসন্ধিতে মান্‌সিংহের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রতাপের পার্ব্বত্যরাজ্যে প্রবেশ করিবার ইহাই প্রধান পথ, এবং এই পথ লক্ষ্য করিয়াই মানসিংহ ও তাঁহার সহকারী সেনাপতি দ্বিতীয় আসফ্ খাঁ হল্‌দীঘাট সমীপস্থ খম্‌নৌর গ্রামে ছাউনী করিয়াছেন।

স্বভাব-সুরক্ষিত এই দুর্গম গিরিসন্ধি শত্রুর দুর্ভেদ্য পথ। অতি সঙ্কীর্ণ পথের উপর উভয় পার্শ্বে উন্নত পর্ব্বতপ্রাচীর অরাতি-বিক্রম উপেক্ষা করিয়া, দৃঢ়বক্ষ পাতিয়া সগর্ব্বে দণ্ডায়মান। সেই প্রাচীর-শিখরে প্রতাপ অভ্রান্ত-লক্ষ্য তীরন্দাজ ভীলসৈন্য স্থাপন করিলেন। তাঁহার রাজপুত-সেনা অধিত্যকাভূমি অধিকার করিয়া রহিল। মিবারের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ সম্পদ্, সমুজ্জ্বল রত্ন, গৌরবে গরিষ্ঠ, আত্মদান মহিমায় মহিমান্বিত,—আজ এই স্থানে সমবেত হইয়াছে,—প্রভুভক্তির মন্দিরে আত্মবলি দিবার জন্য!

হল্‌দীঘাটের সম্মুখে এক অপ্রশস্ত ভূখণ্ডের উপর মান্‌সিংহ মোগল ও রাজপুতসেনা সমাবেশ করিলেন। শ্রেণীতে শ্রেণীতে সারির পর সারি দিয়া, কামান-সহায় অশ্ব-গজ-উষ্ট্রসমন্বিত বাহিনী সুসজ্জিত-শৃঙ্খলায় মৃত্যু-সজ্ঘর্ষের প্রতীক্ষায় স্থির। রণদক্ষ মান্‌সিংহ বহুবিধ গুপ্তবিপদ আশঙ্কা করিয়া সহসা পর্ব্বতপথে অগ্রসর হইতে সাহসী হইলেন না। প্রতাপ সঙ্কল্প করিলেন, মোগলকে তাঁহার শৈলরাজ্যের পথে প্রবেশ করিতে দিবেন না। তিনি সহসা পর্ব্বতের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। অকস্মাৎ একেবারে শতভেরী গর্জ্জন, সহস্র কামান অনল জৃম্ভন করিল। তৎপরেই উভয়পক্ষে দুর্দ্ধর্ষ সজ্ঘর্ষ, কিন্তু সম্রাট্-বাহিনী অচলের ন্যায় অটল হইলেও ক্ষুব্ধ সাগরবৎ মিবার-সেনার সংঘাত সহ্য করিতে পারিল না,—রণে ভঙ্গ দিল। এই সময় নির্ভীক সৈয়দগণ প্রাণ উপেক্ষা করিয়া ইস্‌লামের মান রক্ষা না করিলে বোধ হয়, রাজপুত-ইতিহাসে অন্য কাহিনী লিখিত হইত। ইঁহাদেরই গৌরবের দৃষ্টান্তে ছত্রভঙ্গ-বাহিনী পুনরায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। আর্ত্তনাদ, সিংহনাদ, মুহুর্মুহু কামান-গর্জ্জন, অস্ত্রে অস্ত্রে ঝনাৎকার, রণভেরীর গভীর নিনাদে প্রভাতের সে শান্ত প্রান্তর অবিলম্বে পৈশাচিক লীলাভূমে পরিণত হইয়া গেল। ধূলায় ধূমে প্রান্তর আচ্ছন্ন, মেশামেশি-রণে স্বপক্ষ বিপক্ষ রাজপুত-সৈন্য বিভিন্ন করা দুরূহ। বদায়ুনী আসফ্ খাঁকে ঐ প্রশ্ন করিলেন। আসফ্ উত্তর দিলেন,—"আপনি নির্ব্বিচারে তীর ছাড়িতে থাকুন। স্বপক্ষ হউক, বিপক্ষ হউক, রাজপুত মরিলেই ইস্‌লামের জয়!" মাথার উপর হইতে সূর্য্যদেব নিঃশব্দে অগ্নিবর্ষণ করিতেছেন; রণস্থলে কামান হইতে সশব্দে অগ্নি ছুটিতেছে; তদুপরি তপ্তবায়ু যেন শিরায় শিরায় অগ্নিসঞ্চার করিতে লাগিল।

প্রিয়বাহন, নীলাশ্ব চৈতককে আরোহণ করিয়া প্রতাপ মহামায় নিমগ্ন হইলেন এবং অপ্রতিহতবিক্রমে অরাতি-

লমধ্যে মানসিংহকে অন্বেষণ করিয়া ফিরিতে লাগিলেন। ; মানসিংহ সে উগ্রভৈরবের সম্মুখীন হইতে াহসী হইলেন না, দুর্ভেদ্য ব্যূহমধ্যে লুক্কায়িত রহিলেন। বস্ময়ে মোগল দেখিল, সহস্রপ্রতাপ সহস্রশীর্ষ বাসুকীর বক্রমে শত্রুসিন্ধু মন্থন করিতেছেন। মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের ায় তাঁহার অমিততেজোময় মূর্ত্তি দেখিয়া মোগল প্রমাদ ণিল। অবিরত তরবারি সঞ্চালন করিয়া প্রতাপ অগ্নিচক্রের ন্যায় অসিচক্রে ফিরিতেছেন। এবার আর ানসিংহের নিস্তার নাই! দূর হইতে তাঁহাকে দেখিতে াইয়া প্রতাপ সুতীক্ষ্ণ ভল্ল নিক্ষেপ করিলেন। মানসিংহের ভাদৃষ্টবশতঃ সে বর্শা লোহার হাওদায় লাগিয়া ব্যর্থ হইল; কিন্তু প্রভুর ইঙ্গিত বুঝিয়া বাজীশ্রেষ্ঠ 'চৈতক' শত্রুসৈন্য লিত করিয়া বারণাসীন মানের অভিমুখে ছুটিল এবং ণনিপুণ অশ্ব অবিলম্বে তাঁহার সম্মুখীন হইয়া, হস্তীর মস্তকে রণ স্থাপন করিল; কিন্তু মানকে, সম্মুখে পাইয়াও প্রতাপ নহত করিতে পারিলেন না। তাঁহার উদ্যত অস্ত্র পতিত ইল—হস্তিপকের উপর। মিবারপতি দ্বিতীয় অস্ত্রাঘাত করিতে না করিতে চালকবিহীন ভীত হস্তী লম্ফত্যাগে াহার আঘাত ব্যর্থ করিয়া মানসিংহকে লইয়া ছুটিল। সন্ন নিয়তির কৃপায় মান্ দ্বিতীয়বার রক্ষা পাইলেন।

এদিকে সেনাপতির সমূহ বিপদ-দর্শনে মোগলসেনা লে দলে প্রতাপকে বেষ্টন করিল; কিন্তু রণরঙ্গে প্রতাপ াজ আপনিই মাতিয়া তাঁহার প্রত্যেক সেনাকে াতাইয়াছেন। প্রভুর রক্ষার্থ তাহারাও দলে দলে াসিল। বৈরিবেষ্টিত প্রতাপ জালবদ্ধ সিংহের ন্যায় ঝিতে লাগিলেন। তাঁহার চারিদিকে নিহত-সৈন্যের শব পাকার হইয়া উঠিল। তথাপি বিরাম নাই। মিবারের াজছত্র লক্ষ্য করিয়া দূরে নিকটে অসংখ্য অরি স্ত্রক্ষেপ করিতেছে। রাজ-অঙ্গে অস্ত্রলেখা হইতে গিরি-নির্ঝরের ন্যায় রক্তস্রোত ছুটিতেছে! অবিশ্রান্ত র্ণক্লান্ত অবসন্ন শরীর, নীলাশ্বের উপরে ভূকম্পনে ধরের ন্যায় টলমল্ করিতেছে! তথাপি বিরাম নাই। র হইতে ঝালা-সর্দ্দার মান্না রাওল্ তাহা লক্ষ্য করিলেন। াত্মদানের উচ্চাকাঙ্ক্ষায় উৎফুল্ল, উচ্চহৃদয় মান্না হোল্লাসে মহারাণার জয়ধ্বনি করিয়া ছুটিলেন এবং নিমেষে বারের রাজছত্র লইয়া আপনার মস্তকে ধারণ করিলেন। রাণা-ভ্রমে সম্রাট্‌সৈন্য মান্নাকে বেষ্টন করিল। স্বদেশানুরক্ত, প্রভুভক্ত বীর মহামার করিয়া শত্রুশরশায়ী হইলেন।

মহাপ্রাণ মান্নার আত্মদানে হল্‌দীঘাট যুদ্ধের অবসান হইল।* মহারাণা দেখিলেন, মিবার-বাহিনী বিলুপ্ত-প্রায়, বিজয়াশা আর নাই। তখন দিনদেব পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। প্রতাপ একবার বিষণ্ণ নয়নে সেই শবাকীর্ণ রণস্থল নিরীক্ষণ করিলেন। তৎপরে গভীর দীর্ঘ-শ্বাস ফেলিয়া অস্তোন্মুখ দিনকরের পানে বারেক চাহিয়া রণস্থল ত্যাগ করিয়া গেলেন। বিজয় দুন্দুভি বাজাইয়া মোগল-বাহিনী শিবিরে ফিরিল। রাজপুতের পরাজয় হইল (জুন ১৫৭৬); কিন্তু চারি শতাব্দী ধরিয়া এই পরাজয়ের গৌরব-সৌরভ জগৎ ভরিয়া রাজপুত-মহিমার বৈভব হইয়া রহিয়াছে। যে পরাজয় বিজয়ের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া বিজিতের মস্তকে কীর্ত্তির অক্ষয়-মুকুট পরাইয়া দেয়, হল্‌দীঘাটের পরাজয়,—সেই পরাজয়! পৃথিবীতে বহুবার জয়-পরাজয়,

* হল্‌দীঘাটের যুদ্ধ ইতিহাসে 'গোগুণ্ডার' যুদ্ধ নামেও পরিচিত। কবিরাজ শ্যামল দাস বলেন, স্থানটীর মৃত্তিকা হরিদ্বর্ণ বলিয়া এই গিরিপথের নাম হল্‌দীঘাট। ঐতিহাসিক বদায়ূনী এই সময়ে আক্‌বরের একজন ইমাম্ (Court Chaplain) ছিলেন; তিনি স্বয়ং এই ধর্ম্মযুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত হল্‌দীঘাট যুদ্ধের বিবরণ বিশদ্ ও সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসের যোগ্য। বদায়ূনী লিখিয়াছেন, রাণার অর্দ্ধেক বাহিনী হকীম্ সূর নামক জনৈক আফ্‌গানের নেতৃত্বা-ধীনে ছিল। ইহা একটা নূতন তথ্য,—অন্য কোন ঐতিহাসিকই ইহার উল্লেখ করেন নাই।

মুসলমান-ঐতিহাসিকগণ প্রতাপসিংহকে 'রাণা কীকা' নামে অভিহিত করিয়াছেন। সিংহাসনারোহণের পূর্ব্বে মিবারের মহারাণা-কুমারগণ 'কীকা' বা 'কুকা' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এই কারণে পিতা উদয়সিংহের জীবিতাবস্থায় প্রতাপ 'কীকা' নামে পরিচিত ছিলেন। আক্‌বর প্রতাপকে যে 'কীকা' বলিতেন, ইহাই খুব সম্ভবপর, এবং এইরূপে প্রতাপসিংহ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইবার পরও, মুসলমান-ঐতিহাসিকগণ কর্ত্তৃক 'রাণা কীকা' নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। See Noer's *Emperor Akbar*, Translator's note, i, 245.

যাঁহারা হল্‌দীঘাট যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণী পাঠ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করিবেন:—H. Beveridge কর্ত্তৃক অনুদিত বদায়ূনীর হল্‌দীঘাট যুদ্ধের বিবরণ—See von Noer's *Emperor Akbar*, i, 247-56; Annals of Mewar, *Tod*, i.; *Akbarnama*, Vol. iii; শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র প্রণীত 'প্রতাপসিংহ'।

বহু জাতির উত্থান-পতন হইয়াছে ; কিন্তু মিবারের আজিকার এই বীরত্বকাহিনী ইতিহাসে বিরল। তথাপি সমগ্র মোগল-সাম্রাজ্য মহোৎসবে মাতিয়া উঠিল।

পরাজিত রণস্থল হইতে প্রভুভক্ত 'চৈতক' বিষাদমগ্ন প্রতাপকে লইয়া দক্ষিণ অভিমুখে ছুটিল। সম্রাটের জনৈক খুরাসানী ও একজন মুলতানী সেনা দূর হইতে তাহা লক্ষ্য করিয়া মিবারপতির অনুসরণ করিল। যুদ্ধজয়ের শ্রেষ্ঠ-লুঠ যে হস্তচ্যুত হইয়া যাইতেছে, সে কথা এই দুই নির্ব্বোধ সেনা বুঝিয়াছিল। বিজয়দৃপ্ত মানসিংহ তাহা বুঝেন নাই ; এজন্য সম্রাট্ তাঁহার বিস্তর লাঞ্ছনা করিয়াছিলেন। অপরিমিত পুরস্কারের লোভে সেনাদ্বয় তীরবেগে অশ্ব ছুটাইল ; কিন্তু যেখানে প্রভুর কল্যাণসাপেক্ষ, সেস্থলে বেগবলে চৈতককে পরাজিত করা স্বয়ং পবনদেবেরও দুঃসাধ্য। আজ যেন সে বুঝিয়াছে যে মিবারের আশা-ভরসা, শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ তাহার পৃষ্ঠে ; প্রভুভক্ত বাহন আপনার শ্রান্তি-ক্লান্তি, ক্ষতযন্ত্রণা, সর্ব্বাঙ্গের রক্তধারা, সব ভুলিয়া প্রভুকে লইয়া গোষ্পদের ন্যায় এক গিরিনদী উত্তীর্ণ হইয়া গেল। ইতিমধ্যে কাহার অব্যর্থ-চালিত ভল্লের আঘাতে সেনাদ্বয় নিহত হইল। হত্যাকারী পলাতকের অনুসরণ করিল। 'হো নীলা ঘোড়াকো আসোয়ার !'—সম্ভাষণ শুনিয়া প্রতাপ পশ্চাৎ ফিরিলেন এবং কিছুক্ষণ পরেই দেখিলেন—অনুজ শক্তসিংহ তাঁহার চরণে !

সহোদরের ঈর্ষায় শক্তসিংহ মোগলপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন ; কিন্তু হল্দীঘাটে প্রতাপের অমানুষী বীরত্ব দেখিয়া তাঁহার বিদ্বেষ, শ্রদ্ধায় ও সোদর-অনুরাগে পরিণত হইল। দুইজন মোগল-সেনাকে জ্যেষ্ঠের অনুসরণ করিতে দেখিয়া, তাহাদের দুরভিসন্ধি বুঝিয়া, শক্ত মেবার-পতিকে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে অগ্রসর হ'ন।

অনুজকে আলিঙ্গন করিয়া মিবারপতির হৃদয় হইতে পরাজয়ের তীক্ষ্ণ কণ্টক ক্ষণিকের জন্য মিলাইয়া গেল ; কিন্তু ভ্রাতৃসম্মিলনে মিবারপতির হৃদয়বিগলিত আনন্দধারা তৎক্ষণাৎ নিদারুণ শোকাশ্রুতে পরিণত হইল। মরণাহত হইয়া মহাপ্রাণ চৈতক ভূশয্যা গ্রহণ করিয়াছে। প্রতাপ অধীর হইয়া উঠিলেন। সম্পদে-বিপদে সমসহায়, শতরণ-সঙ্গী, সহস্র সঙ্কটে ত্রাণকর্ত্তা চৈতক ! মিবারের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধৃত হইতে পারে, কিন্তু চৈতক আর ফিরিবে না। শক্তসিংহ ভ্রাতাকে সান্ত্বনা দিয়া, পলায়নের জন্য আপনার অশ্ব অর্পণ করিলেন। যে স্থানে চৈতক দেহরক্ষা করিয়াছিল, সেইখানে 'চৈতক্-কা-চাবুত্রা' নামে তাহার সমাধিবেদী এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে।

জ্যেষ্ঠকে পলায়নে সহায়তা করায় মোগল-শিবিরে আর শক্তসিংহের স্থান হইল না। তিনিও ভ্রাতার সহিত সম্মিলিত হইবার সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। অবসর পাইয়া শক্ত আনন্দচিত্তে সদলবলে সহোদর-সন্নিধানে চলিলেন।

অল্পদিন পরে মোগল-বাহিনী গিরিবর্ত্মে প্রবেশ করিয়া মনোহর পার্ব্বত্যনগর গোগুণ্ডা অধিকার করিয়া লইল। প্রতাপ পূর্ব্ব হইতেই ইহা অনুমান করিয়া সেস্থল লোকশূন্য ও শস্যশূন্য করিয়া, ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। মানসিংহ সৈন্যের রসদ-সংগ্রহে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

ইতিমধ্যে প্রতাপ পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অভিনব যুদ্ধ-প্রণালীতে তাহাদিগকে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন। ইহা আকস্মিক আক্রমণ-প্রণালী (Guerilla warfare) বলিয়া বিখ্যাত। পার্ব্বত্য-প্রদেশ ব্যতীত এরূপ যুদ্ধের সুবিধা হয় না। অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিয়া শত্রুর রসদ লুটপাট ও যথাসম্ভব সৈন্যক্ষয় করিয়া পার্ব্বতীয় সেনা কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যায়, তাহা শত্রুপক্ষ অনুমান করিতে পারে না। হল্দীঘাটে প্রতাপ যদি পর্ব্বত-পথ হইতে বাহির না হইয়া, এইরূপ যুদ্ধপ্রথা অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, ইতিহাসে হল্দীঘাট-কাহিনী অন্যরূপ কীর্ত্তিত হইত।

এদিকে ভীষণ বর্ষাসমাগম হইল, তখন পার্ব্বত্যদেশ মোগল-বাহিনীর পক্ষে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। তাহারা দূরবর্ত্তী সমতলভূমে আশ্রয় লইল। অবসর বুঝিয়া প্রতাপ উদয়পুর অঞ্চল অধিকার করিয়া লইলেন। মিবার-বাহিনী আবার রণরঙ্গে মাতিয়া উঠিল। মিবার-প্রদেশের সুদূর প্রান্ত পর্য্যন্ত চারণগণ পল্লীর ঘরে ঘরে সকলকে উৎসাহিত করিয়া ফিরিতে লাগিলেন। শৈলকন্দর প্রতিধ্বনিত করিয়া আবার মিবারের বিজয় দুন্দুভি বাজিতে লাগিল। সম্রাট্ সচকিত হইয়া উঠিলেন। হল্দীঘাটের সমরানল নির্ব্বাপিত হইলেও তাঁহার মনে বিদ্বেষবহ্নি নিবে নাই ; প্রতাপের জয়ধ্বনিতে তাহা দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল। ইতিমধ্যে সংবাদ আসিল যে, রাজবারার স্থানে স্থানে

বিদ্রোহের সূচনা হইয়াছে। আক্‌বর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। বিদ্রোহ-দমনার্থ সৈন্য পাঠাইয়া স্বয়ং বিপুল আড়ম্বরে প্রতাপের বিরুদ্ধে মিবার যাত্রা করিলেন। ক্রুদ্ধ বাদশাহ্ কিছুতেই মিবারপতিকে ক্ষমা করিতে পারিলেন না—তাঁহার মহাপরাধ স্বদেশানুরাগ! চিতোর-বিজয়ী ভূপাল ভাবিয়া পাইলেন না; যে নিঃসম্বল, লোকবলহীন, গৃহহারা এক তুচ্ছ শত্রু কিরূপে এমন দুর্জ্জেয় হইয়া উঠিল। নিশ্চয়ই তাঁহার সেনাপতিগণ শিথিলপ্রযত্ন। তিনি শুনিয়াছিলেন, মান্‌সিংহ প্রতাপের উপর প্রখর ঈর্ষাবান্ হইলেও মোগল-সৈন্যকে মিবার লুটপাট করিতে দেন নাই। সেইজন্য মান্‌কে যথেষ্ট অপমান করিলেন। কিছুদিনের জন্য তাঁহার সম্রাট্-দরবারের দ্বার রুদ্ধ হইল।

ক্রমে বাদ্‌শাহী সৈন্য কর্ত্তৃক মিবার চারিদিকে অবরুদ্ধ হইল। মিবারের অধিকাংশ সামন্তরাজগণ একে একে মোগলের করে আত্মসমর্পণ করিতে লাগিলেন। চারিদিক্ হইতে অবলম্বন খসিয়া পড়িতেছে, কিন্তু তথাপি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মিবারপতি আরাবল্লী-শিখরের উপরে দ্বিতীয় শিখরের ন্যায় অটল। 'শতশত স্বজাতীয় বীর শত্রুপক্ষ অবলম্বন করিয়াছে, করুক; সহস্র-সহস্র শত্রুসেনা আরাবল্লীর গিরিদ্বারে সমবেত হইয়াছে, হউক; দুর্গের পর দুর্গ, রাজ্যাংশের পর রাজ্যাংশ শত্রুহস্তে যাইতেছে যাউক, তথাপি প্রতাপসিংহ অচল ও অটল। আত্মবিক্রয় বা স্বদেশ-বিক্রয় করিব না—বলিয়া প্রতাপ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা কিছুতেই টলিবে না। মোগলের প্রাধান্য স্বীকার করিলে স্বদেশ প্রত্যর্পিত হইবে, চিরসাধের চিতোরে প্রবেশাধিকার মিলিবে, প্রতাপ তাহা চাহে না।'

তিরস্কৃত মান্‌সিংহের সৈন্যদল পর্ব্বতের কন্দরে-কন্দরে অন্বেষণ করে—কাহারও সাক্ষাৎ পায় না; কিন্তু অকস্মাৎ কোথা হইতে 'আসোয়ার' আসিয়া পড়ে—মোগল-সৈন্য ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া রসদ লুটিয়া যেন যাদুবলে অন্তর্হিত হইয়া যায়। এমনই খণ্ডযুদ্ধে বর্ষ কাটিয়া আবার বর্ষা আসিয়া পড়িল। মোগল-সৈন্য পর্ব্বত ত্যাগ করিয়া গেল। প্রতাপ কিছুদিনের জন্য নিশ্চিন্ত হইয়া কমলমীর দুর্গে অবস্থান করিলেন এবং খাদ্যাদি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

পার্ব্বতীয় দুঃসহ শীত ক্রমে শেষ হইয়া আসিল। কমলমীর আক্রমণের জন্য সম্রাট্, শাহ্‌বাজ্ খাঁর অধীনে নূতন সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। কমলমীর অবরুদ্ধ হইল। প্রতাপের খাদ্যাদি সরবরাহ বন্ধ হইয়া গেল; তথাপি তিনি অবনত হইলেন না;—কঠোর সঙ্কল্পে, অমানুষী বিক্রমে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিমুখ নিয়তির সহিত কে যুঝিবে? একদিন হঠাৎ একটা কামান ফাটিয়া দুর্গের বারুদখানা পুড়িয়া গেল। তারপর মোগলের কৌশলে দুর্গ-বাসীর পানীয় জল বিষাক্ত হইল। নিরুপায় প্রতাপ অবশেষে একদিন রাত্রিযোগে অবরোধকারীদিগের অজ্ঞাত-সারে গুপ্তপথ দিয়া দুর্গ ত্যাগ করিয়া গেলেন।

কমলমীর ত্যাগ করিয়া প্রতাপ চপ্পন্ প্রদেশে ভীল-পল্লী চৌন্দায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মিবারপতিকে দমন করিতে সম্রাট্ যতই ব্যর্থকাম হইতে লাগিলেন, তাঁহার আক্রোশ ও উদ্যম ততই বাড়িতে লাগিল; প্রতাপ যতই দুর্দ্দশাপন্ন হইতে লাগিলেন, তাঁহার সঙ্কল্প ততই দৃঢ়বদ্ধ হইল। চারিদিকে শত্রুবেষ্টিত, নিষ্ক্রমণের পথ নাই, রসদ বন্ধ; শতযুদ্ধজয়ী সেনাপতিগণ তাঁহার শত্রুতাচরণে দৃঢ়পণ; মোগলের বিপুল অর্থ, অতুল লোকবল তাঁহার প্রতিকূলে নিয়োজিত; তথাপি মিবারপতির ভ্রূক্ষেপ নাই। চৌন্দা আক্রান্ত হইল, প্রতাপ এতদিনে নিরাশ্রয় হইলেন।

মিবারপতির সিংহাসন এখন ধরাতল; মুক্ত অম্বর রাজ-ছত্র; গৃহ—গিরিকন্দর; শয্যা কঠিন কঙ্করময় গিরি-ভূমি; আহার—বনের ফল, তৃণের বীজ হইতে প্রস্তুত রুটি, অথবা মৃগয়ালব্ধ মাংস। বন্যজাতি ভীলগণ তাঁহার সঙ্কটে সহায়, বিশ্রামে সেবক, বিপদে রক্ষক। রাজমহিষী এবং রাজসন্ততিগণকে ইহাদের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া প্রতাপ তাঁহার একান্ত আশ্রিত সেনাদলসহ সম্রাটের প্রতিকূলতা-সাধনের জন্য বনে-বনে শৈলে-শৈলে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেন। আপদ উপস্থিত হইলে ভীলগণ রাজপরিবার-বর্গকে ঝাঁপানে তুলিয়া লইয়া গুপ্তস্থানে নিরাপদে রক্ষা করিত। অনেক সময় মুখের গ্রাস ফেলিয়া, ক্ষুধায় রোরুদ্যমান্ শিশুসন্তানগণকে লইয়া ভীল সহায়ে রাজ-মহিষীকে গুপ্ত গিরিকন্দরে লুকাইতে হইত। একদিন দুর্দ্দান্ত শত্রুসৈন্যের আক্রমণে পাঁচবার এইরূপ মুখের গ্রাস ফেলিয়া পলায়ন করিতে হয়।

কূটবুদ্ধি মোগল-সেনাপতিগণ মিবারপতির গতিবিধি কোনমতে নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেন না। কদাচিৎ

তিনি কোন দুরারোহ পর্ব্বতশিখরে দেখা দিতেন। শত্রু-সৈন্য আক্রমণপর হইলে ভীলগণ শর ও শিলাখণ্ড নিক্ষেপে তাহাদিগকে যথাসাধ্য বাধা দিত; প্রতাপ ইতিমধ্যে অন্তর্ধান করিতেন। এমনই করিয়া দিন-দিন মোগল-শোণিতে গিরিগাত্র রঞ্জিত হইতে লাগিল। এক সময়ে ফরীদ্ খাঁ প্রতাপকে জালবদ্ধ করিবার জন্য উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। মিবারপতি পলায়নপর; মোগলসৈন্য বিজয়গর্ব্বে তাঁহার অনুসরণ করিতে-করিতে সহসা এক নিগমবিহীন গিরিসঙ্কটে আবদ্ধ হইয়া পড়িল। তখন তাহাদের চৈতন্যোদয় হইল, কিন্তু অতি বিলম্বে। ফরীদ্ খাঁ বুঝিলেন, যাহাকে তিনি বন্দী করিতে অগ্রসর, তাঁহারই কূটকৌশলে তিনি সসৈন্যে বন্দী। আবার মোগল-রক্তে আরাবল্লী স্নান করিলেন। মোগলসৈন্যের একজনও ফিরিল না। আরাবল্লীর প্রতি শিলাখণ্ড প্রতাপের এইরূপ শত-শত বীরকীর্ত্তির মূক সাক্ষীরূপে আজিও বিদ্যমান। কূট-কৌশল-নিপুণ মোগল-সেনানায়কগণ বুঝিলেন, প্রতাপ অপেক্ষা মুক্ত বায়ুকে বন্দী করা সহজসাধ্য। এইরূপে আবার বর্ষা আসিল; মোগলসৈন্য পর্ব্বত ত্যাগ করিল। মিবারপতি স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িলেন।

এমনই করিয়া কত বর্ষা কাটিল। প্রতি বর্ষায় মোগল-সৈন্য পর্ব্বতগাত্র হইতে মালিন্যের ন্যায় ভাসিয়া যায়, আবার বসন্তাগমে নবোদ্গত-তৃণের মত শৈলদেশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। সম্রাটেরও উদ্যম কমিল না; মিবারপতির হৃদয়ও দমিল না; তাঁহার উচ্চ শিরও নমিল না!

কিন্তু আর বুঝি থাকে না। ধৈর্য্যের মেরু, সহিষ্ণুতার শিখর, বুঝি নিয়তির কঠোর পরীক্ষায়, দুর্দ্দৈব পীড়নে ভাসিয়া যায়। জন্ম হইতে যাহারা রাজভোগের অধিকারী, বনের ফলমূল, তৃণবীজের অন্ন, অর্দ্ধাশন করিয়া তাহারা জীবনধারণ করিতেছে; বন্য ভীলগণ তাহাদের সহচর, তাহারা রাজপরিচ্ছদের পরিবর্ত্তে মলিন ছিন্ন চির পরিতেছে। যাঁহাকে শত দাসী সেবা করিত, চন্দ্র-সূর্য্য যাঁহাকে কখন দেখে নাই, সেই রাজকুলবধূ, পতিব্রতা সীতা-সাবিত্রীর ন্যায় আজ শূন্য অম্বরতলে, তৃণাসনে শায়িতা—শত্রুশঙ্কায় অনাহার অনিদ্রা-পীড়িতা। কঠোর দুর্ভাগ্যের শেষ সীমা আর কত দূর?

একদিন আর কোন খাদ্য সংগ্রহ হয় নাই। মহারাণী মল্লতৃণের শস্য হইতে কয়েকখানি রুটি প্রস্তুত করিয়া ক্ষুধাতুর সন্তানগণের সাগ্রহ-প্রসারিত হস্তে এক একখানি করিয়া বণ্টন করিয়া দিলেন। তাহাও নিয়োগসহ প্রদত্ত হইল—অর্দ্ধখণ্ড এ বেলার, অপরার্দ্ধ সায়াহ্নের আহার। রাজসন্তানগণ হৃষ্টচিত্তে তাহা গ্রহণ করিয়া ভোজন করিতে লাগিল। সেই সময় বৃক্ষশাখা হইতে একটা বন্য-বিড়াল সহসা লাফাইয়া পড়িয়া রাজকন্যার ক্রোড় হইতে তাহার অপরাহ্নের আহার অর্দ্ধখণ্ড রুটি কাড়িয়া লইয়া গেল। বালিকা সহসা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল।

মিবারেশ্বর সন্নিকটে তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া আপনার দুরদৃষ্ট ও মিবারের দুর্দ্দশা চিন্তা করিতেছিলেন। সহসা বালিকার হতাশ করুণ ক্রন্দনে তাঁহার ভগ্নহৃদয় দুলিয়া উঠিল। স্থির, ধীর, রাজর্ষি, রমণীসুলভ উচ্ছলিত অশ্রু রোধ করিবার নিমিত্ত দন্তে দন্ত পিশিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"হতভাগ্য মিবারপতির দুঃখপাত্র পূর্ণ হইয়াছে—আক্‌বর শাহ্ তোমারই জয়!" তৎক্ষণাৎ রুদ্যমানা কন্যাকে পরিত্যাগ করিয়া পতিপরায়ণা রাজমহিষী পতিপার্শ্বে ছুটিয়া আসিলেন। আপনি অঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে মহারাণাকে প্রিয়বাক্যে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন; কিন্তু মহিষীর সান্ত্বনা, মিবার-সর্দ্দারগণের প্রবোধবাক্য, নিজের প্রতিজ্ঞা, চিরসন্ন্যাস ব্রত, স্বাধীনতারক্ষার জন্য দুঃসহ ক্লেশস্বীকার—বালিকার রোদনে সব ভাসিয়া গেল। যাঁহারা অপত্যস্নেহের অপরাজেয় মোহমায়ার বিষয় অবগত, তাঁহারা পিতার এই ক্ষণিক দুর্ব্বলতা বুঝিবেন। মহারাণা রণে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আক্‌বর শাহ্‌র নিকট পত্র প্রেরণ করিলেন।

মোগল-সাম্রাজ্যে বিজয়োৎসব পড়িয়া গেল। রণে ক্ষমা? মোগল-বাদ্‌শাহ্ এখনই তাহা দিতে প্রস্তুত। এই মহা রণসমুদ্র মন্থনে যে গরল উঠিয়াছে—যে বিষ তিনি উদ্গীরণ করিতে পারিতেছেন না—তাঁহাকে নিত্য জর-জর করিতেছে, কোন মতে তাহা হইতে ত্রাণ পাইলে তিনি বাঁচেন! সম্রাট্ সহর্ষে তাঁহার সভাসদ্ বিকানীর কুমার পৃথ্বিরাজকে প্রতাপের পত্র দেখাইলেন। পৃথ্বিরাজের হৃদয় ব্যথিত হইল; কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ আত্মসংবরণ করিয়া সম্রাট্‌কে বলিলেন, "জাঁহাপনা! প্রতাপ আপনার রাজ-মুকুট পাইলেও কখন সন্ধি করিবেন না। আমি তাঁহাকে উত্তমরূপে জানি। এ

পত্র তাঁহার কোন শত্রু লিখিয়াছে—ইহা জাল। ভারতেশ্বর যদি অনুমতি করেন, আমি মিবারপতিকে স্বহস্তে পত্র-লিখিয়া ইহার যাথার্থ্য নিরূপণ করিতে পারি।" সম্রাট্ অনুমতি দিলেন। দারুণ দুর্দ্দশায় হতাশে প্রতাপ যে এরূপ পত্র লিখিয়াছেন, পৃথ্বিরাজ তাহা অবিশ্বাস করেন নাই; কিন্তু প্রতাপকে পত্র লিখিবার উদ্দেশ্য তাঁহাকে সন্ধিপ্রার্থনা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করা। পৃথ্বিরাজ সুকবি ছিলেন; উৎসাহের জ্বলন্ত ভাষায় তিনি লিখিলেন :—

"হিন্দুস্থানের এই মহানিশায় সমস্ত রাজপুতানা মোহ-নিদ্রায় আচ্ছন্ন; বিধর্ম্মিগণ রাজপুতের জাতিধর্ম্মসম্ভ্রম লুটিয়া লইতেছে, এ ঘোর নৈরাশ্য-নিশিথে একমাত্র জাগ্রত-প্রহরী প্রতাপ।

"আর সকলে যখন অবসন্নবাহু, একমাত্র উদয়-কুমার বীরকরে অসিধারণ করিয়া রাজপুতের ধর্ম্ম রক্ষা করিতে-ছেন। সেই অমিততেজ রাজপুত-সূর্য্যের উপর সমগ্র ভারতের আশা দৃষ্টি নিপতিত!

"চিরদিন সমান যায় না। বিপুল সাম্রাজ্যের বিপনীতে আজ যিনি রাজপুতের জাতিধর্ম্ম পণ্যের ন্যায় ক্রয় বিক্রয় করিতেছেন—এ বাণিজ্যে একদিন তাঁহাকে ঠকিতে হইবে। জীবনের দিনও তাঁহার অফুরন্ত নহে; যখন সেই সুদিন আসিবে, তখন প্রতাপ ভিন্ন কে আর রাজ-পুতানার উষর-ক্ষেত্রে জাতীয়তা ও ধর্ম্মের বীজ বপন করিবেন?"

বীর-কবির এই সতেজ পত্র এক অক্ষৌহিনী সেনার কাজ করিল। প্রতাপ আবার হুঙ্কার দিয়া উঠিয়া বসিলেন। কিন্তু উপায় কি? তাঁহার অর্থ নিঃশেষিত, নিত্য রণে যে সৈন্য ক্ষয় হইয়াছে তাহা আর সংপূরিত হয় নাই। এরূপ অবস্থায় অতুল বলশালী মোগল-সম্রাটের সহিত নিষ্ফল রণ-পরিচালনা করা বৃথা। প্রতাপ স্থির করিলেন চিতোরের আশা ছাড়িয়া, জন্মভূমি মিবারের মায়া কাটাইয়া, তাঁহার আশ্রিতগণের জন্য মরুপ্রান্তে সিন্ধুকূলে নব-মিবার স্থাপন করিয়া স্বয়ং চিরসন্ন্যাস ব্রতে দিনযাপন করিবেন। গুপ্তচর দ্বারা রাজ্যময় গুপ্ত সংবাদ প্রেরিত হইল। প্রতাপ স্বদেশ ও স্বদেশবাসিগণের নিকট চির-বিদায় লইবার জন্য আরাবল্লীর পাদমূলে, মরুকূলে শিবির-সন্নিবেশ করিলেন। মিবার-প্রধানগণ সকলে বিদায় লইতে আসিলেন—তাঁহাদিগের মধ্যে আসিলেন মিবারের প্রাচীন রাজমন্ত্রী ভাম্‌শাহ্।

মহারাণ সকলের নিকট মর্ম্মভেদী-বাক্যে বিদায়গ্রহণ করিলেন, পলিতকেশ মন্ত্রী মহারাণার নিকট ধীরপদে অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—"মিবার-রাজগণের সেবা করিয়া আমার পূর্ব্বপুরুষগণ প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন। সে অর্থে পঞ্চবিংশতি সহস্র সেনা দ্বাদশবর্ষ প্রতিপালিত হইবে। মহারাণার চরণে আমার ভিক্ষা, প্রভুবংশের অর্থ, প্রভু-বংশধর গ্রহণ করিয়া বৃদ্ধকে কৃতার্থ করুন।" এই উদার বদান্যতায় সমগ্র শিবির প্রথমে স্তম্ভিত হইয়া গেল। পরক্ষণেই মিবারেশ্বর ও ভাম্‌শাহ্‌র জয়গানে গিরি মুখরিত হইয়া উঠিল। আজি হইতে বৃদ্ধ ভাম্‌শাহ্ মিবারের উদ্ধার-কর্ত্তা নামে অভিহিত হইলেন। মিবারপতির দুর্ভাগ্যপঙ্কিল জীবনস্রোত ফিরিল!

অবিলম্বে কর্ত্তব্য স্থির হইয়া গেল। রণ—রণ—রণ! মোগলের সহিত ক্ষমাশূন্য-রণ! অভিনব সাজ সরঞ্জাম-সহ নূতন বাহিনী প্রস্তুত হইল। প্রতাপের চরম দুর্দ্দশায় নিশ্চিন্ত মোগল তাহার কিছুই জানিতে পারিল না।

মিবারের পার্ব্বত্যপ্রদেশে বহু স্থানে বহু সেনানিবাস স্থাপিত করিয়া শাহ্‌বাজ্ খাঁ স্বয়ং দেবীরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া, নিশ্চিন্ত-নিদ্রায় নব অভিযানে মিবার-বিজয়ের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। প্রতাপ এতদিনে মরুপারে,—আর বাধা দিবার কে আছে? কিন্তু একদিন অকস্মাৎ তূর্য্যধ্বনিতে মোগল-সেনাপতির নিদ্রস্বপ্ন সবই ছুটিয়া গেল। কিন্তু যখন জাগিলেন, তখন আর আক্রমণে বাধা দিতে পারিলেন না। রাজপুত-অসিমুখে ছিন্নভিন্ন মোগল-সৈন্যের হস্তপদ মুণ্ড করকার মত ধরাতল ছাইয়া ফেলিল। জালবদ্ধ সিংহ, কন্দররুদ্ধ ঝঞ্ঝা, মুক্তিলাভ করিয়াছে। প্রতাপের নববলোন্মত্ত বিজয়-বাহিনী প্রবল বন্যার ন্যায় মিবারস্থিত মোগল-সৈন্য ছারখার করিতে করিতে ছুটিল। মোগল-অধিকৃত মিবার লণ্ডভণ্ড হইল। আজ চিতোরের প্রতিশোধের দিন উপস্থিত! তথায় অন্যায়-যুদ্ধে নিহত, জৌহর-দগ্ধ নরনারীর অশরীরী আত্মাসকল উত্তেজনার কষাঘাতে দুর্দ্দান্ত রাজপুত-বাহিনীকে চালনা করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে কমলমীর প্রভৃতি গিরি-দুর্গসকল পুনরধিকৃত হইল। ঐশ্বর্য্যগর্ব্বিত বিজয়দৃপ্ত

মানসিংহকে কথঞ্চিৎ শিক্ষাদানের নিমিত্ত প্রতাপ অম্বর আক্রমণ করিয়া, রাজ্যের প্রধান বাণিজ্যস্থল মালপুরা লুট করাইলেন। মিবারের সৌভাগ্য সূর্য্য পুনরুদিত হইল; কিন্তু চিতোর ফিরিল না। মিবারপতির সন্ন্যাসী-বেশও পরিত্যক্ত হইল না!

উদয়পুরে পেশোলা হ্রদের পার্শ্বে প্রতাপ নবরাজ্য স্থাপন করিলেন; কিন্তু সে রাজধানী পর্ণকুটীর-নির্ম্মিত। এই সকল পর্ণকুটীরে সমস্ত রাজানুষ্ঠান, উৎসবাদি নির্ব্বাহ হইত। চিতোরহারা রাজর্ষি এই পর্ণকুটীরে তাঁহার অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। যৌবনের বল এক্ষণে বার্দ্ধক্যে শিথিল হইয়া গিয়াছে। আকবর এখন পক্ককেশ প্রবীণ সম্রাট্। যৌবনের সে উৎসাহ, উদ্যম, দৃঢ়তা আর তাঁহার নাই। কিন্তু তথাপি মহারাণার উপর তাঁহার বিদ্বেষভাব অনুমাত্র বিদূরিত হয় নাই। তবে এই সময়ে রাষ্ট্রনৈতিক কারণে পঞ্চনদ প্রদেশে তাঁহাকে ১৩ বৎসর অবস্থিতি করিতে হয়; তাহার উপর সেনাপতিগণ, বিশেষতঃ রাজকুমার সলীম্ মিবারের মরুপ্রদেশে আর বৃথা রক্তক্ষয় করিতে অনিচ্ছুক। এই সকল কারণে প্রতাপ জীবন-সন্ধ্যায় শান্তিভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মিবার-পতির মৃত্যুর পর তাঁহার মহান্ প্রতিদ্বন্দী অষ্টবর্ষ মাত্র জীবিত ছিলেন।

কিন্তু সেই পূর্ণশান্তিময় অধিকারেও রাজর্ষির বিষণ্ণ নয়ন তৃষিত আকাঙ্ক্ষায় যখন-তখন দূর চিতোর-দুর্গপানে ধাবিত হইত। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তিনি চিতোর-স্বপ্নে অভিভূত ছিলেন। দিনে দিনে ক্রমে শেষ দিন সমুদিত হইলে, মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে উপস্থিত সকলে দেখিলেন, মহারাণার স্বভাবত প্রশান্ত মুখ অশান্তি-ছায়াক্লিষ্ট। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রাজর্ষি উত্তর দিলেন, "তুর্কের হস্তে মিবারভূমি পুনরর্পিত হইবে না, এ প্রতিজ্ঞা শুনিতে পাইলে আমি চিরশান্তি লাভ করিতে পারি।" তারপর অন্তিমশ্বাসের সঙ্গে বলিতে লাগিল,—"হায়, আমাদ্বারা চিতোর উদ্ধার হইল না; আমার পুত্রও পারিবে না। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, আমার দেহান্তে এই পেশোলা-তটে বহু রাজ-প্রাসাদ উঠিবে! জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে যে দৃঢ়পণ প্রয়োজন, আমার পুত্র অমর তাহা রক্ষা করিতে পারিবে না। যে প্রতিজ্ঞা-রক্ষার জন্য অকাতরে জলের মত, দেহের শোণিতপাত করিয়াছি, তাহা বিলাস-বিভ্রমে ভাসিয়া যাইবে। তখন তোমরাও সেই অসাধু দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া বিলাস-পঙ্কে ডুবিবে।"

মিবার প্রধানগণ স্তম্ভিত হৃদয়ে এই ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন, যে, রাজর্ষির চিরজীবনের পণ প্রতিপালনের জন্য তাঁহারা সকলে প্রতিভূ রহিলেন। এই শান্তিপ্রদ আশ্বাসে রাজর্ষি অন্তিম শ্বাস ত্যাগ করিয়া চিরনিদ্রায় অভিভূত হইলেন (১৫৯৭)। চিতোরহারা চিরসন্ন্যাসীর আত্মা চিতোরাতীত লোকে চলিয়া গেল!

অধ্যাপক যদুনাথ সত্যই লিখিয়াছেন,—'ইতিহাসে শুধু শেষ ফলটা দেখিয়া, লাভ লোকসানের হিসাব খতাইয়া বিচার করে না। চরিত্রের জন্য, শক্তির জন্য জাতি-বিশেষ অমর হয়,—শক্তির ফললাভের জন্য নহে। যাহার কীর্ত্তি, সেই জীবিত থাকে। তাই কবি গাহিয়াছেন—

"উদয়ের পথে শুনি কার বাণী—
'ভয় নাই ওরে ভয় নাই,
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই'।"

রাজপুতেরা অক্ষয়, কীর্ত্তির জন্য অমর। তাহাদের মহত্ত্বের কাহিনী ভারতের চিরকালের সম্পত্তি হইয়া রহিয়াছে। এই মহত্ত্বের দৃষ্টান্তে কোন রাজপুতই প্রতাপ-সিংহকে ছাড়াইতে পারেন নাই।' *

* চুঁচুড়া ফ্রেণ্ডস্ ডিবেটিং ক্লাবের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

সখী

(বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাবলি-অবলম্বনে)

[অধ্যাপক শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, এম-এ]

দ্বিতীয় শ্রেণী

এইবার দ্বিতীয় শ্রেণীর সখীদিগের কথার আলোচনা করিব। এই শ্রেণীর মোটে তিনটি দৃষ্টান্ত বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাবলিতে দৃষ্ট হয়। (১) 'দুর্গেশনন্দিনী'তে অম্বররাজ মানসিংহের অন্যতমা মহিষী উর্ম্মিলা দেবীর সখী বিমলা, (২) 'কপালকুণ্ডলা'য় যুবরাজ সেলিমের প্রধানা মহিষীর সখী লুৎফউন্নিসা, এবং (৩) 'রাজসিংহে' 'রাজকন্যা চঞ্চলকুমারীর সখী নির্ম্মলকুমারী। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইঁহারা বৃত্তিভোগিনী হইলেও, সামান্যা পরিচারিকা বা দাসী নহেন; ইঁহারা ভদ্রবংশজা এবং রাজমহিষী বা রাজকন্যার সহিত অনেকটা সমানভাবে মিশিতে সমর্থা।

(১) 'দুর্গেশনন্দিনী'তে বিমলা

'দুর্গেশনন্দিনী'তে মানসিংহ-মহিষী উর্ম্মিলাদেবীর সহিত বিমলার সখিত্বের রীতিমত চিত্র নাই, বিমলার পত্রে এই সখিত্বের যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনামাত্র আছে (২য় খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ)। বিমলা লিখিতেছেন :—"উর্ম্মিলার গুণ তোমার নিকট কত পরিচয় দিব? তিনি আমাকে সহচারিণী দাসী বলিয়া জানিতেন না; আমাকে প্রাণাধিকা সহোদরা ভগিনীর ন্যায় জানিতেন।... ... তাঁহারই মনোরঞ্জনার্থে নৃত্যগীত শিখিলাম। তিনি আমাকে স্বয়ং লেখাপড়া শিখাইলেন।"

যাহা হউক, এক্ষেত্রে সামাজিক পদবীতে উর্ম্মিলাদেবী প্রধানা ও বিমলা অপ্রধানা হইলেও, কাব্যবর্ণিত ব্যাপারে বিমলা প্রধানা, উর্ম্মিলা অপ্রধানা; অর্থাৎ উর্ম্মিলাদেবীর অম্বররাজের সহিত প্রণয়-ব্যাপারে বিমলা 'নায়িকা-সহায়িনী' নহেন, বিমলার বীরেন্দ্রসিংহের সহিত গুপ্তপ্রণয়-লীলায় উর্ম্মিলাদেবী 'নায়িকা-সহায়িনী।' বীরেন্দ্রসিংহ অন্তঃপুরে গুপ্ত-প্রণয় করিতে আসিয়া মানসিংহ-কর্ত্তৃক কারাগারে আবদ্ধ হইলে, বিমলা উর্ম্মিলাদেবীর শরণ লইলেন। "আমি কাঁদিয়া উর্ম্মিলাদেবীর পদতলে পড়িলাম; আত্মদোষ সকল ব্যক্ত করিলাম।......উর্ম্মিলাদেবী আমার প্রাণরক্ষার্থ মহারাজের নিকট বহুবিধ কহিলেন।" (২য় খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ।) এক্ষেত্রে সখিত্বের কার্য্য এই পর্য্যন্ত।

(২) 'কপালকুণ্ডলা'য় লুৎফউন্নিসা

'রাজপুতপতি মানসিংহের ভগিনী, যুবরাজের প্রধানা মহিষী ছিলেন। যুবরাজ লুৎফউন্নিসাকে তাঁহার প্রধানা সহচরী করিলেন। লুৎফউন্নিসা প্রকাশ্যে বেগমের সখী, পরোক্ষে যুবরাজের অনুগ্রহভাগিনী হইলেন।' (৩য় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ।) অতএব এক্ষেত্রে লুৎফউন্নিসা আপাতদৃষ্টিতে বেগমের সখী হইলেও, প্রকৃত-পক্ষে তাঁহার প্রতিযোগিনী। তথাপি 'লুৎফউন্নিসা আত্মপ্রাধান্য-রক্ষার জন্য', আকবরের মৃত্যুর পরে যাহাতে সেলিমের পরিবর্ত্তে বেগমের গর্ভজাত খস্রু সিংহাসন লাভ করে, তজ্জন্য খস্রুজননীকে প্ররোচিত করিলেন এবং তাঁহার সহিত একাভিসন্ধি হইয়া রাজনীতিক ষড়যন্ত্রে সোৎসাহে যোগ দিলেন। উভয়েরই গূঢ় উদ্দেশ্য, সেলিমের হৃদয়ের উপর মেহের-উন্নিসার ভবিষ্যৎ প্রভাব যাহাতে না ঘটে। 'বেগম সহচরীর অভিপ্রায় বুঝিলেন। হাসিয়া কহিলেন, "তুমি আগ্রায় যে ওমরাহের গৃহিণী হইতে চাও, সেই তোমার পাণিগ্রহণ করিবে।......" শুধু এই লোভে লুৎফউন্নিসা এ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন না। সেলিম যে তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া মেহের-উন্নিসার জন্য এত ব্যস্ত, ইহার প্রতিশোধও তাঁহার উদ্দেশ্য।' (৩য় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ।) যাহা হউক, এই রাজনীতিক ষড়যন্ত্রে সখিত্বের মনোরম চিত্রের আশা করা যায় না। ব্যাপারটিও অপ্রধান। কেবল প্রবন্ধের সম্পূর্ণতার জন্য এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে হইল।

(৩) 'রাজসিংহে' নির্ম্মলকুমারী

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম আমলে লিখিত এই দুইখানি আখ্যায়িকায় দ্বিতীয় শ্রেণীর সখীর তেমন সুন্দর, আদর্শ মিলিল না। কিন্তু তাঁহার শেষ বয়সে 'পুনঃপ্রণীত' 'রাজসিংহে' এই শ্রেণীর সখীর চিত্র অতি সুন্দর, অতি উজ্জ্বল,

অতি মনোরম। বাস্তবিক, নির্ম্মলকুমারী সখীকুলশিরোমণি। তাঁহার সখিত্বের চিত্র আখ্যানের অনেকটা স্থান অধিকার করিয়া আছে। সুতরাং এই চিত্রের আলোচনাও বর্ত্তমান প্রবন্ধের অনেক অংশ অধিকার করিবে। তবে আশা করি, এই মনোরম চিত্রের আলোচনা দীর্ঘ হইলেও তাহাতে পাঠকবর্গের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবে না।

প্রথম পরিচ্ছেদেই, ভারতচন্দ্রের বীরসিংহ রাজার কন্যার ন্যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের বিক্রমসিংহ রাজার কন্যার 'এক পাল' ('দশ জন কি পনর জন') 'যুবতী' 'সখীজন এবং দাসী', 'রঙ্গপ্রিয়া বয়স্যা ও পরিচারিকা'র উল্লেখ আছে। কিন্তু 'কামিনীর কমনীয় কণ্ঠভূষাহারে দ্যুতিমান্ মধ্যমণি যেমন সুন্দর', তেমনই এই সখীমালার মধ্যে 'নির্ম্মল-নাম্নী একজন বয়স্যা' উজ্জ্বলতমা, 'চঞ্চলের সহোদরাধিকা অতি স্থিরবুদ্ধিশালিনী।'

প্রথম দৃশ্যে দেখা যায়, চঞ্চল যখন আলমগীর বাদশাহের তস্বীরের উপর লাথি মারিবার অসমসাহসিক প্রস্তাব করিলেন, তখন একজন সখী বলিল, 'অমন কথা মুখে আনিও না, কুমারীজী।' একটু পরেই বুঝা যায়, এ নিষেধ নির্ম্মলের, কেন না পরেই স্পষ্ট নাম নির্দ্দেশ করিয়া বলা আছে, 'নির্ম্মল-নাম্নী এক বয়স্যা আসিয়া রাজকুমারীর মুখ টিপিয়া ধরিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, "অমন কথা আর বলিও না।"' আবার যখন (২য় পরিচ্ছেদে) চঞ্চলকুমারী 'নির্ম্মলের মুখ চাহিয়া বলিলেন, "সখি নির্ম্মল!...আমি কি কখন জীবন্ত ঔরঙ্গজেবের মুখে এইরূপ—" নির্ম্মল রাজকুমারীর মুখ চাপিয়া ধরিলেন।' এইরূপে রাজকন্যাকে নিবারণ করিবার পুনঃপুনঃ চেষ্টায়ই নির্ম্মল ক্ষান্ত হইল না, সে উপস্থিতবুদ্ধি-বলে তস্বীরওয়ালীর মুখ বন্ধ করিবার জন্য তাহাকে ঘুঁষ দিল ও বিশেষ করিয়া বলিয়া দিল, "আমি বুড়ী, দেখিও, যাহা শুনিলে, কাহারও সাক্ষাতে মুখে আনিও না। রাজকুমারীর মুখের আটক নাই —এখনও উহার ছেলে বয়স।"* (২য় পরিচ্ছেদ।) বুঝা গেল, নির্ম্মল শুধু 'অতিস্থিরবুদ্ধিশালিনী' নহে, রাজকন্যার 'পরমা হিতৈষিণী'; যাহাতে রাজকন্যার ভবিষ্যতে অনিষ্ট না হয়, তজ্জন্য সর্ব্বথা সচেষ্ট। ইহা সূচনামাত্র। আমরা পরে দেখিব, নির্ম্মল চঞ্চলের জন্য কতটা ত্যাগস্বীকার, কতটা প্রাণপাত পরিশ্রম করিবে।

নির্ম্মল গম্ভীরভাবে বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতে জানে, অথচ সে 'পরিহাসে' 'নর্ম্মবিজ্ঞানে'ও অভিজ্ঞা। (অলঙ্কার-শাস্ত্রে সখীর লক্ষণ স্মর্ত্তব্য।) প্রথম পরিচ্ছেদে যখন 'হাসির গোল পড়িয়া গেল', কিন্তু রাজকুমারীর আবির্ভাবে 'হাসির ধূম কম পড়িয়া গেল', তখনও 'এক সুন্দরী হাসি রাখিতে পারিল না...যুবতী হাসিতে হাসিতে লুটাইয়া পড়িল।' অনুমানে বুঝি, এই 'সুন্দরী' 'যুবতী' নির্ম্মলকুমারী, কেননা 'মধুর সরস হাসি' (তৃতীয় পরিচ্ছেদ) তাহার সিদ্ধবিদ্যা। ইহাও সূচনামাত্র। আমরা এই তৃতীয় পরিচ্ছেদে দেখিব, নির্ম্মল কেমন পরিহাস-রসিকা। সে ঔরঙ্গজেবকে বিবাহ করিতে চায় এই কথা লইয়া মজা করিল, চঞ্চলের রাজসিংহের প্রতি পূর্ব্বরাগের আঁচ পাইয়া তাঁহাকে 'জ্বালাতন' করিতে লাগিল। অথচ সে রাজকন্যার দরদের দরদী, মরমের মরমী। যখন (২য় পরিচ্ছেদে) চঞ্চল রাজসিংহের 'চিত্র হাতে লইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন', তখন 'একজন সখী তাঁহার ভাব দেখিয়া চিত্র দেখিতে চাহিল' (অনুমানে বুঝি এ নির্ম্মলকুমারী); রাজকুমারী বলিলেন, "দেখ! দেখিবার যোগ্য বটে।" নির্ম্মলের মুখ চাহিয়াই রাজকুমারী বলিলেন, "সখি নির্ম্মল!...আমার সাধ কি মিটিবে না?" ইহা হইতে বুঝা যায় নির্ম্মলকে হৃদয়ের ব্যথা জানাইয়া রাজকন্যার জ্বালা জুড়ায়। সে 'বিশ্বাস-বিশ্রামকারিণী পার্শ্বচারিণী সখী'।

(তৃতীয় খণ্ডের ১ম পরিচ্ছেদে) যোধপুরীর দেবী চাকরাণী মতিওয়ালীর ছদ্মবেশে আসিয়া রাজকুমারীর সহিত গোপনে কথাবার্ত্তা কহিতে চাহিলে রাজকুমারী বলিলেন, 'নির্ম্মল থাক, আর সকলে বাহিরে যাও।' ইহা হইতেও বুঝা গেল, সে কতদূর বিশ্বাসপাত্রী, তাহার সহিত রাজকুমারীর কতটা অন্তরঙ্গ ভাব।

চিত্রদলনের পর চিত্র-বিচারণ-কালে (৩য় পরিচ্ছেদে) 'একখানা কার ছবি' লুকাইয়া লুকাইয়া রাজকুমারীকে

---

* এই চঞ্চলমতির জন্যই চঞ্চলকুমারী নামকরণ। নির্ম্মলকুমারী ও 'দুর্গেশনন্দিনী'র বিমলা অনেক কার্য্য করিয়াছে যাহা সাধারণ মাপকাটিতে বিচার করিলে ঠিক বলিয়া সামাজিকগণ মানিবেন না, অথচ উভয়েরই চরিত্রে কোন প্রকৃত দোষ নাই, এইটি বুঝাইবার জন্য কবি স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক তাহাদিগের এরূপ নাম রাখিয়াছেন।

'পাঁচবার করিয়া' দেখিতে দেখিয়া নির্ম্মল তাঁহাকে একটু 'জ্বালাতন' করিল। চঞ্চলকুমারী লজ্জায় মনের কথা চাপিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু শেষে রঙ্গপ্রিয়া অথচ স্নেহময়ী সখীর নিকট সব কথা বলিয়া ফেলিলেন। নির্ম্মল ভাবোন্মত্তা নবপ্রণয়মগ্নার কথা শুনিয়া বলিল, 'বল কি রাজকুমার? ছবি দেখিয়া কি এত হয়?' আমরা অবশ্য অতটা বিস্মিত হই নাই, কেননা 'বিরলে বসিয়া পটেতে লিখিয়া বিশাখা দেখালে আনি' বৈষ্ণব মহাজনের এই বাণী আমাদের 'কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশি'য়াছে। যাহা হউক, এক্ষেত্রে নির্ম্মল বিশাখার ন্যায় ছবি আঁকিয়া দেখাইলেন না বটে, কিন্তু ছবি দেখিয়া রাজকন্যার কিরূপ ভাবাবেশ হইয়াছে, তাহা বুঝিলেন। এই পূর্ব্বরাগের বেশী আর প্রথম খণ্ডে কিছু নাই।

দ্বিতীয় খণ্ডে শুধু এইটুকু আছে, বাদশাহ রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে দিল্লীতে লইয়া যাইবার জন্য সৈন্য পাঠাইতেছেন, বিক্রমসিংহের নিকট এই 'রাজাজ্ঞা' (mandate) পৌঁছিলে সকলের 'আনন্দের সীমা রহিল না', কেবল 'চঞ্চলকুমারীর সখীজন নিরানন্দ'। (২য় খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।) সাধারণ-ভাবে সখীজনের কথা আছে, নির্ম্মলের স্বতন্ত্র উল্লেখ নাই।

তৃতীয় খণ্ডে ইহার বিশদ বিবৃতি আছে, নির্ম্মলের সখিত্বের উজ্জ্বল চিত্র আছে। 'নির্ম্মল ধীরে ধীরে রাজকুমারীর কাছে গিয়া বসিলেন। দেখিলেন, রাজকুমারী একা বসিয়া কাঁদিতেছেন।...নির্ম্মল কাছে গিয়া বসিল, বলিল, "এখন উপায়?" সে রাজকন্যাকে দিল্লী যাইতে, 'পৃথিবীশ্বরী' হইতে পরামর্শ দিল (যদিও জানিত 'ও পথে কিছু হইবে না'), তাহার পর 'আর কোন পথে রাজকুমারীর কিছু উপকার যদি করিতে পারে, তাহার সন্ধান করিতে লাগিল।' চঞ্চল দিল্লীযাত্রায় স্বীকৃত না হইলে তাঁহার পিতার কি বিপদ্ হইবে নির্ম্মল তাহার উল্লেখ করিলে, চঞ্চল দিল্লীযাত্রার পর দিল্লীর পথে বিষ খাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তখন নির্ম্মল বলিল, "আর কি কোন উপায় নাই?" চঞ্চল রাজসিংহের আশ্রয় লইবার প্রস্তাব করিলেন, নির্ম্মল অনেক ভাবিয়া সম্মতি দিল এবং রুক্মিণীর যদুপতির শরণ লওয়ার ন্যায় চঞ্চলকুমারীর রাজসিংহের শরণ লওয়া সম্বন্ধে সখীজনোচিত পরিহাস করিল। নির্ম্মল নিজে বৃন্দা-দূতী সাজিয়া গেল না, উভয়ের পরামর্শ হইল, গুরুদেবকে দিয়া পত্র পাঠান। এই উপলক্ষে নির্ম্মল আবার একটু পরিহাস করিল, "সে ত অনেক কাল জানি।" সকল কথা বলিতে চঞ্চলের লজ্জা করিবে বলিয়া নির্ম্মল গুরুদেবকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিবার ভার লইল। পরিহাস-কালে 'নির্ম্মল হাসিল' বটে, কিন্তু তাহার পর সে যখন উঠিয়া গেল, তখন 'কাঁদিতে কাঁদিতে গেল'। (৩য় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ।) বুঝা গেল, নির্ম্মল কত সমবেদনাময়ী এবং রাজকুমারীর সহিত তাহার কত একাত্মতা; উভয়ে একাভিসন্ধি হইয়া পরামর্শ করিল।

পর-পরিচ্ছেদে গুরুদেব অনন্ত মিশ্র যখন বলিলেন, "রাণা রাজসিংহকে একখানি পত্র লিখিয়া দিতে পারিবে?" তখন নির্ম্মল রাজকুমারীর লজ্জানিবারণের জন্য সে ভার লইল, তাহার পর 'চঞ্চল ও নির্ম্মল দুইজনে দুই বুদ্ধি একত্র করিয়া একখানি পত্র সমাপন করিয়াছিল।' এখানেও সেই একাত্মতা। আমরা পরে দেখিব (৩য় খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ), পত্রের একটা 'পুনশ্চ' ছিল সেটা নির্ম্মলের মুন্সীআনা, চঞ্চলকুমারীর লজ্জারক্ষার জন্য, তাঁহার চরিত্রের মর্য্যাদারক্ষার জন্য, সখী এ ভার লইয়াছেন, 'সলজ্জা নবযৌবনা' নায়িকা স্বহস্তে এটুকু লিখিতে পারেন নাই।

যখন মোগলসৈন্য রাজকুমারীকে লইতে আসিল, তখন 'নির্ম্মলের মুখ শুকাইল। দ্রুতবেগে সে চঞ্চলকুমারীর কাছে গিয়া বলিল, "কি হইবে সখী?"...রাজসিংহের উত্তর আসিতে না আসিতেই তোমায় লইয়া যাইবে—কি হইবে সখি?"' সখীর জন্য এই উৎকণ্ঠা হইতে বুঝা যায়, নির্ম্মলের স্নেহ কেমন অকৃত্রিম। 'রজনীতে নির্ম্মল আসিয়া তাঁহার কাছে শয়ন করিল। সমস্ত রাত্রি দুইজনে দুইজনকে বক্ষে রাখিয়া রোদন করিয়া কাটাইল।' সমবেদনাময়ী সখী শুধু কাঁদিয়াই ক্ষান্ত হইল না, রাজকুমারীর সঙ্গে যাইতে চাহিল, তিনি কিছুতেই অনুমতি দিলেন না। 'নির্ম্মল বলিল, "তুমি আমাকে লইয়া যাও, বা না যাও, আমি নিশ্চয় তোমার সঙ্গে যাইব—কেহ রাখিতে পারিবে না।" দুইজনে কাঁদিয়া রাত্রি কাটাইল।' (৩য় খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ।) ইহার উপর টিপ্পনী অনাবশ্যক। আমরা পরে দেখিব, কিরূপে নির্ম্মল নিজ প্রতিজ্ঞা রাখিল।

৪র্থ খণ্ডের ১ম পরিচ্ছেদে সখীদ্বয়ের করুণ বিদায়দৃশ্য।

'নির্ম্মল অলঙ্কার পরাইল; চঞ্চল বলিল, "ফুলের মালা পরাও সখি—আমি চিতারোহণে যাইতেছি।" প্রবলবেগে প্রবহমাণ অশ্রুজল চক্ষুমধ্যে ফেরৎ পাঠাইয়া নির্ম্মল বলিল, "রত্নালঙ্কার পরাই সখি, তুমি উদয়পুরেশ্বরী হইতে যাইতেছ।"...নির্ম্মল...কাঁদিল। কিছু বলিল না। চঞ্চল তখন নির্ম্মলের গলা ধরিয়া কাঁদিল।' এ যেন শকুন্তলার বিদায়দৃশ্য। চঞ্চল বলিল "নির্ম্মল! আর তোমায় দেখিব না!" নির্ম্মল কিন্তু বলিল, "আমায় আবার দেখিবে। তুমি যেখানে থাক, আমার সঙ্গে আবার দেখা হইবে। আমায় না দেখিলে তোমার মরা হইবে না; তোমায় না দেখিলে আমার মরা হইবে না।"...'নির্ম্মল... চঞ্চলের গলা ধরিয়া কাঁদিল।' আমরা ৫ম খণ্ডে দেখিব, কিরূপে নির্ম্মল তাহার প্রতিজ্ঞা রাখিল। এই অটল সঙ্কল্প হইতে তাহার সখিত্বের গভীরতা বুঝা যায়। 'তার পর একে একে সখীজনের কাছে, চঞ্চল বিদায় গ্রহণ করিল। সকলে কাঁদিয়া গণ্ডগোল করিল।' এই ত গেল সাধারণ সখীদিগের কথা। আর নির্ম্মল? 'চঞ্চল ত চলিয়া গেল।...কিন্তু নির্ম্মলের কান্না ত থামে না। একা—একা—একা—শত পৌরজনের মধ্যে চঞ্চল অভাবে নির্ম্মল বড়ই একা। নির্ম্মল উচ্চ গৃহচূড়ার উপর উঠিয়া দেখিতে লাগিল...কতক্ষণ নির্ম্মল চাহিয়া রহিল। চক্ষু জ্বালা করিতে লাগিল। তখন নির্ম্মল চক্ষু মুছিয়া ছাদের উপর হইতে নামিল।...নির্ম্মল একাকিনী রাজপুরী হইতে নিষ্ক্রান্তা হইল। পরে দৃঢ়পদে, অশ্বারোহী সেনা যে পথে গিয়াছে, সেই পথে একাকিনী তাঁহাদের অনুবর্ত্তিনী হইল।' সে ''অগাধ জলে ঝাঁপ' দিল। (৪র্থ খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ।) তাহার সখীর প্রতি অনুরক্তি (devotion) অনসূয়া-প্রিয়ংবদা অপেক্ষাও অধিক নহে কি?

এই খণ্ডের ৫ম পরিচ্ছেদে পথ-চলায় অনভ্যস্তা নির্ম্মল-কুমারী 'পথের ধারে বৃক্ষের ছায়ায় পড়িয়া আছে' মাণিক-লাল দেখিল; নির্ম্মল পরিচয় দিল; * রাজকুমারীর কাছে যাইতেছিল, সে কথাও জানাইল। তাহার পর, মাণিক-লালের সহিত তাহার যেরূপ যোজনা হইল, পাঠকবর্গের তাহা অবিদিত নাই। এই যোজনা পাঠক মহাশয়ের বড় রাগের কারণ। কেননা সখীর কার্য্য (function) সম্বন্ধে (অবতরণিকায়) আলোচনা-কালে (ভারতবর্ষ, আষাঢ় ১৩২৫, পৃঃ ২৬) বুঝাইয়াছি, সখীকে প্রেমে পড়িতে নাই, ইহাই হইল সাধারণ নিয়ম। গিরিজায়া স্বামী গ্রহণ করিয়াছে বটে, কিন্তু তখন তাহার সখীর কার্য্য ফুরাইয়াছে। পক্ষান্তরে এক্ষেত্রে নির্ম্মলের এত শীঘ্র, সখীর কার্য্য অসম্পূর্ণ থাকিতে, প্রেমের ফাঁদে পা দেওয়া অনেকের ভাল লাগিবে না। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে পাঠক মহাশয়ের রাগটা জল হইয়া যাইবে। গ্রন্থকার বুঝিয়াছিলেন, এই উপায় ভিন্ন নির্ম্মলকে নিরাপদে চঞ্চলের কাছে পৌছাইয়া দেওয়া যায় না। তাই এই কৌশলটি উদ্ভাবন করিয়াছেন। অতএব বুঝা গেল, এক্ষেত্রে সখীর প্রণয় ও পরিণয় উভয় সখীর ভবিষ্যৎ পুনর্মিলনের উপায়-স্বরূপ (means to an end); কবির চরম (ultimate) উদ্দেশ্য উভয় সখীর পুনর্মিলন। তাহা আমরা ৫ম খণ্ডের ৪র্থ পরিচ্ছেদে দেখিব। নায়কের সহচরের সহিত নায়িকার সখীর বিবাহ হইল, (গিরিজায়া-দিগ্‌বিজয় তুলনীয়) অবতরণিকায় (ভারতবর্ষ, আষাঢ় ১৩২৫, পৃঃ ২৬) এ তত্ত্বটুকু বুঝাইয়াছি।

মাণিকলালের গৃহিণী হইয়া নির্ম্মল চঞ্চলকুমারী-সম্বন্ধে মাণিকলালের প্রমুখাৎ সংবাদ সংগ্রহ করিলেন, তাহার পর (৫ম খণ্ডের ৪র্থ পরিচ্ছেদে) নির্ম্মল চঞ্চলকুমারীকে রাজ-সিংহের অন্তঃপুরে দেখিতে আসিলেন। 'অনেক দিনের পর নির্ম্মলকে দেখিয়া চঞ্চলকুমারী অত্যন্ত আনন্দিতা হইলেন। সে দিন নির্ম্মলকে যাইতে দিলেন না। নির্ম্মলের সুখ শুনিয়া চঞ্চলকুমারী আহ্লাদিতা হইলেন।' চঞ্চল-কুমারী বলিল, "আমার সঙ্গে আমার একটি চেনা লোক নাই। আমি এ অবস্থায় এখানে থাকিতে পারি না। যদি ভগবান্ তোমাকে মিলাইয়াছেন, তবে তোমাকে ছাড়িব না। তোমাকে আমার কাছে থাকিতে হইবে।" এই ত গেল এক পক্ষের কথা। ইহা হইতে বুঝা গেল, চঞ্চল-কুমারীর নির্ম্মলকুমারীর প্রতি কত গভীর প্রীতি, কত প্রাণের টান।

'পক্ষান্তরে, নির্ম্মল চঞ্চলকুমারীর দুঃখ শুনিয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইল।' ইত্যাদি। ইহাতে বুঝা গেল নির্ম্মলের সখীর জন্য সমবেদনা কত গভীর। কিন্তু চঞ্চলকুমারীর

* নির্ম্মল বলিল, "আমি রূপনগরের রাজকুমারীর দাসী।" এই 'দাসী' শব্দ বিনয় (humility) প্রকাশ করিতেছে। সে সত্য-সত্যই হারাণী বা কারীর মত দাসী অর্থাৎ চাকরাণী নহে, তদপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর।

প্রস্তাব 'শুনিয়া প্রথমে নির্ম্মলের বোধ হইল যেন বুকের উপর পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়িল। এই সে সবে স্বামী পাইয়াছে—নূতন প্রণয়, নূতন সুখ, এসব ছাড়িয়া কি চঞ্চলকুমারীর কাছে আসিয়া থাকা যায়?' নির্ম্মলকুমারী হঠাৎ সম্মত হইতে পারিল না। চঞ্চলকুমারীর চক্ষে একটু জল আসিল; বলিল, "নির্ম্মল, তুমি আমার জন্য একা পদব্রজে রূপনগর হইতে চলিয়া আসিয়া মরিতে বসিয়াছিলে! আর আজ! আজ তুমি স্বামী পাইয়াছ!" নির্ম্মল অধোবদন হইল।' এই জন্যই বলিয়াছি, কাব্য-নাটকে সখীর স্বতন্ত্র অস্তিত্বের, ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের, পারিবারিক জীবনের স্থান নাই, নায়িকার সুখ-দুঃখে সমবেদনাবোধেই তাহার সকল কার্য্য পর্য্যবসিত। নির্ম্মল সেই মামুলি পথ ছাড়িয়াই ফাঁফরে পড়িয়াছে। এক্ষণে তাহার হৃদয়ে পতি-প্রেম ও সখিত্বে তুমুল দ্বন্দ্ব (conflict) উপস্থিত হইল। সুখের বিষয়, অবশেষে সখিত্বই জয়ী হইল, তাহার সখীর কার্য্য বজায় থাকিল, সে আবার 'বিশ্বাস-বিশ্রাম-কারিণী সখী'র পদে বাহাল হইল। পর-পরিচ্ছেদেই তাহার পরিচয় পাই।

সখীর কার্য্যে পুনঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহার প্রথম কার্য্য, জ্যোতিষীর নিকট চঞ্চলকুমারীর ভাগ্যগণনা করান। চঞ্চলকুমারীর অনিশ্চিত, ভবিষ্যতের জন্য নির্ম্মলের দারুণ উৎকণ্ঠা, সেই উৎকণ্ঠাবশতঃই তাহার এই উদ্যম। (৫ম খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ।)

জ্যোতিষী গণিয়া বলিলেন, 'যদি সসাগরা পৃথিবীপতির মহিষী আসিয়া কখন তোমার সখীর পরিচর্য্যা করে, তখন বিবাহ হইবে।' এই জ্যোতিষী-গণনার সূত্র ধরিয়া বিস্ময়কর অভাবনীয় ঘটনা-পরম্পরার, অর্থাৎ রোম্যান্টিক উপকরণের আবার নূতন করিয়া উৎপত্তি হইল। চঞ্চলকুমারীর নির্ব্বন্ধাতিশয়ে নির্ম্মলকুমারী উদিপুরীকে চঞ্চলকুমারীর তামাকু সাজার নিমন্ত্রণ করিতে দিল্লীতে বাদশাহের রঙ্‌মহালে যাইতে, অসমসাহসিক কার্য্যের ভার লইতে বাধ্য হইল। এই উপলক্ষে সখীদ্বয়ের একটু রঙ্গরস হইল (ষষ্ঠ খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ)। তাহার পর, নির্ম্মল কিরূপে স্বামীর সহিত গুপ্ত-পরামর্শ করিল, রঙ্‌মহালে যোধপুরীর সহিত সাক্ষাৎ করিল, উদিপুরীকে পত্র দিল, বাদশাহের কাছে ধরা পড়িয়া বন্দী হইল, মাণিকলালের সহিত কৌশলে পত্র-বিনিময় করিল, ইত্যাদি ঘটনার বর্ণনায় পুঁথি বাড়াইতে চাহি না। যুদ্ধ বাধিলে নির্ম্মল কৌশলে উদিপুরীকে বন্দী করাইয়া রাজসিংহের অন্তঃপুরে চঞ্চলকুমারীর নিকট পৌছাইয়া দিলেন (৭ম খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ) ও 'আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ তাঁহার নিকট নিবেদন করিলেন।' (৮ম খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ)। ফল-কথা, নির্ম্মল যে কার্য্যের ভার লইয়াছিলেন তাহা অদ্ভুত সাহস ও বুদ্ধিকৌশলের প্রভাবে সুসিদ্ধ করিলেন। সখীর জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিয়া কঠিন কার্য্য উদ্ধার করা তাঁহার গভীর সখী-প্রীতির সুন্দর নিদর্শন।

ইহার পর নির্ম্মল একবার রাজকুমারীর অনুমতি লইয়া তাঁহার কাছছাড়া হইলেন, শিবিরে গিয়া বাদশাহের একটা বিশেষ উপকার করিলেন (৮ম খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ)। ইহার সহিত আমাদের বক্তব্য বিষয়ের সংযোগ নাই।

উদিপুরী দ্বারা তামাকু সাজান হইয়া গেলে অর্থাৎ জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্‌বাণী সফল হইলে, উভয় সখীতে মিলিয়া মহারাণার সহিত বিবাহ-সম্বন্ধে পরামর্শ হইল। 'কৈ, রাণা ত কিছু বলেন না। চঞ্চলকুমারী কাঁদিতেছে দেখিয়া নির্ম্মল আসিয়া কাছে বসিল। মনের কথা বুঝিল, নির্ম্মল বলিল, "মহারাণাকে কেন কথাটা স্মরণ করিয়া দাও না?" চঞ্চলের তাহাতে লজ্জা হইল, নির্ম্মল অগত্যা তাঁহাকে পিত্রালয়ে যাইতে পরামর্শ দিল। 'চঞ্চল কি উত্তর করিতে যাইতেছিল। উত্তর মুখ দিয়া বাহির হইল না—চঞ্চল কাঁদিয়া ফেলিল। নির্ম্মলও কথাটা বলিয়াই অপ্রতিভ হইয়াছিল। চঞ্চল, চক্ষুর জল মুছিয়া, লজ্জায় একটু হাসিল। নির্ম্মলও হাসিল। তখন নির্ম্মল হাসিয়া বলিল' ইত্যাদি। এইরূপ হাসি-কান্নার মধ্যে নির্ম্মল আবার 'মুন্‌শীআনা' করিয়া পত্র লেখাইল, কালোচিত সুপরামর্শ দিল, সঙ্গে-সঙ্গে রঙ্গরসও একটু আধটু চলিল। এইভাবে আবার দুই সখীতে একাভিসন্ধি হইয়া কার্য্য করিলেন। পরে পত্রের উত্তর আসিলে উত্তরের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া উভয়ে চিন্তাকুল হইলেন। (৮ম খণ্ড, ১১শ পরিচ্ছেদ।) নির্ম্মলের এই সমবেদনা-প্রকাশ ও পরামর্শদান সখীত্বের শেষ চিত্র।

তাহার পর, মুস্কিল-আসান হইল, রাণা রাজসিংহ বিক্রম সোলাঙ্কির হস্ত হইতে তাঁহার কন্যা চঞ্চলকুমারীকে

যথাশাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। (৮ম খণ্ড, ১৫শ পরিচ্ছেদ।) কিন্তু ঐতিহাসিক আখ্যায়িকায় এ সব ব্যাপারের তেমন গুরুত্ব নাই, সুতরাং গ্রন্থকার সামান্য ইঙ্গিত দিয়াই শেষ করিয়াছেন, এবং সখীর প্রসঙ্গ আর একেবারেই উত্থাপন করেন নাই। 'রাধারাণী'র শেষ পরিচ্ছেদে নায়িকার বিবাহ-কালে নায়িকার সখী বসন্তকুমারী আসিলেন, আসিয়া রাধারাণীর সহিত রঙ্গরস করিলেন, ইত্যাদি ভাবের বর্ণনা ঐতিহাসিক আখ্যায়িকায় উপসংহারে আশা করিতে পারা যায় না। যাহা হউক, প্রথম হইতে প্রায় শেষ পর্য্যন্ত নির্ম্মলকুমারী যে ভাবে চঞ্চলকুমারীর 'বিশ্বাস-বিশ্রাম-কারিণী সখী'র কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই মনোরম। সখীর এই চিত্র অতি সুন্দর, অতি উজ্জ্বল। এরূপ অভাবনীয় ঘটনা-পরম্পরায় সখিত্বের বিকাশ প্রাচীন সাহিত্যে দুর্লভ। ইহার মৌলিকতা স্বীকার করিতেই হইবে।

রাধারাণী

[শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু]

(১)

জয় গঙ্গে, জয় গঙ্গে, জয় গঙ্গে!
হরিপদ-পদ্ম পীযূষ-প্রবাহিণী, পাবনী পুণ্যার্ত্তরঙ্গে!
কলকল ভাষিণী, কলিমল নাশিনী,
অমল তরল সুরবালা,
হর-শির-ভূষণ মালতীমালা!
পুণ্যে, ধন্যে; গিরিবর কন্যে,
অভয় চরণ চির-শরণ প্রপন্নে,—
পতিত প্রসন্নে!
মেদিনীহারে, মুকুতাধারে,
মাধুরী তারে মৃদু ঝঙ্কারে—
তান-তরঙ্গিনী তরঙ্গ-ভঙ্গিনী সাগরসঙ্গম রঙ্গে,
তারিণী—ভব-ভয় হরণ ভ্রূভঙ্গে—
(জয় জয় জাহ্নবী গঙ্গে!)

বাবাজি বিভোর হইয়া গাহিতে-গাহিতে বালুময় বেলাভূমির বাঁকে-বাঁকে ফিরিতেছিল। একটা বাঁক ফিরিয়াই সহসা পিছাইয়া আসিয়া বলিল, "গোবিন্দ! গোবিন্দ!' এখনই যে মাড়িয়ে ফেলেছিলেম! নবাবের বেটি, শোবার আর জায়গা পাও নি? ওগো—ও—কি বলে—গোবিন্দ! গোবিন্দ! কে তুমি গো? ওঃ, অঘোরে ঘুমুচ্ছে! কাঁচা উমের কি না? বয়স হ'লে ঘুম পাৎলা হয়!"—বাবাজীর বাড়ী কোন নবাবী জেলায়, তাই কথায় মাঝে-মাঝে একটু-আধটু খোস্‌বো পাওয়া যায়।

গঙ্গাসাগর-যাত্রীর পর্ব্ব শেষ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অল্প সংখ্যক যাত্রী এখনও মেলাস্থল পরিত্যাগ করে নাই; তাই বেলাভূমি অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন। সন্ধ্যার আসন্ন অভিসার তাহাকে নির্জ্জনতর করিয়া তুলিয়াছে। সম্মুখে কেবল চপল জলরাশির আকুল কোলাহল। পশ্চাতে—দূরে—কাকলি-মিলিত বনানীর মর্ম্মর রব—ঝিল্লি-মুখরিত। মাথার উপর ক্ষণে-ক্ষণে নীড়গামী জলচর পক্ষীর পক্ষ-সঞ্চালন শব্দ। চারিদিকে চাঞ্চল্যের মাঝখানে সেই নীরব নিথর নারী-প্রতিমা মেঘ-চ্যুত খণ্ড-বিদ্যুতের মত তটভূমি আলো করিয়া আছে! বাবাজী সেই এলায়িতা স্বর্ণলতাকে দেখিয়া, ভাবিতে লাগিল, গোবিন্দ! গোবিন্দ! ঠিক যেন রাধারাণীর মূর্ত্তি-খানি! শ্যাম বিরহে স্বর্ণলতা শুকিয়ে গিয়ে ধুলোয় লুটাচ্ছে! মরি মরি!

গঙ্গায় তখন সারাণী ভাটা। কিন্তু সেই শ্যাম-বিরহিণী রাধারাণী যেখানে ধূলায় অথবা বালিতে লুটাইতেছিল, পূর্ণ জোয়ারে সে স্থান নিরাপদ নহে। বাবাজী অধিকতর উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল, "বলি ওগো, ও মেয়ে! হাঁ৷ বাছা, তোমার ঘুম কি আর ভাঙ্‌বে না? গোবিন্দ! গোবিন্দ! বলি, তোমার ব্যাপারখানা কি? এই সাওরে শীত, কন্‌কনে হাওয়া, আর তুমি এই খোলা জায়গায় এলো গায়ে পড়ে আছ? ওগো, ও রাধারাণী! গোবিন্দ! গোবিন্দ!

এখনি যাবে যে—হয় মা গঙ্গার আঁতে, নয় বাঘের দাঁতে। গোবিন্দ! গোবিন্দ! এমন খুব ত কখন দেখিনি! এ কি ফোত না কি? বাবাজীর মনে পড়িল, শুনিয়াছিল কোন্ গৃহস্থ-বধূ বিসূচিকায় আক্রান্ত হইয়াছে। ইহারও দেখিতেছি, সধবার বেশ। তখন সে নিকটবর্ত্তী হইয়া সৈকতশায়িনী রমণীকে সম্যক্‌রূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিল—তাহার নাসায় শ্বাস নাই, ধমনীতে গতি নাই। কিন্তু তথাপি তাহাকে মৃত বলিয়া মনে হয় না। বাবাজী ভাবিতে লাগিল, সকালে যে যাত্রীর দল চলিয়া গিয়াছে, তাহারই মধ্যে ইহার আত্মীয় কেহ ছিল, ইহাকে মৃত মনে করিয়া বিসর্জ্জন দিয়া গিয়াছে। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীক্ষেত্রের পথে সে নিজেও একবার এমনই নির্দ্দয়ভাবে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। রাখে হরি, মারে কে! গোবিন্দ! গোবিন্দ! সকলই কৃষ্ণের ইচ্ছা! এখন কি করি? আঃ, কোন্ আবাগী প্রাণ ধরে এমন সোণার প্রতিমা ভাসিয়ে দিয়ে গেল রে! গোবিন্দ! গোবিন্দ! এ মরে নাই। মরিলে এতক্ষণ কখন এমন টাট্‌কা থাকিত না। কি করি! কুঁড়েয় নিয়ে যাই। আঃ খাই দাই, হরিনাম করি, আমার অত ফ্যাঁসাদে কাজ কি? নবাবের বেটি রোগ করবার আর জায়গা পাও নি? কিন্তু গোবিন্দ! গোবিন্দ! কৃষ্ণের জীব—গৌরচন্দ্র বলেছেন জীবে দয়া! কিন্তু এর মুখ দেখে আমার মায়া হচ্ছে! বোধ করি, আর জন্মে আমার কেউ ছিল! কে আর?—মা হবে। নইলে, গোবিন্দ! গোবিন্দ! আমি ব্যাটা বৈরাগী, আমারই এত দরদ কেন? আর আমার মত লক্ষ্মীছাড়ার মা না হলে, এ বেটীরই বা এমন হাল্ হবে কেন? গোবিন্দ! গোবিন্দ! আর জন্মে কি বলছি, এই জন্মেই হয় ত আমি এর পেটে জন্মেছি? কিন্তু গোবিন্দ! গোবিন্দ! আমার ত তিন কুড়ি পেরিয়েছে, আর একে দেখে মনে হচ্ছে এখনও ছ'গণ্ডা পোয়েনি! মা বড়, না, ব্যাটা বড়? গোবিন্দ! গোবিন্দ! আমার অত হিসেবে কাজ কি? ও—মা, আমি—বেটা! আর তোর সঙ্গে কি ভাই? গোবিন্দ! গোবিন্দ! তবে কি উপযুক্ত বেটার কাজ করব? মুড়ো জেলে আনব? সেই হলেই বেটার ঠিক হয়! ঘর-সংসার ফেলে বৃন্দে এলেন সাগরে! গোবিন্দ! গোবিন্দ! আমি এখন, করি কি? যদি বাঁচাতে পারি ত—গোবিন্দ! গোবিন্দ!

সম্মুখে জলরাশি যেমন অগাধ, অপার, বাবাজীর ভাবনাও আজ তেমনই অন্তহীন। কিন্তু ভাবিবার আর সময় নাই। সন্ধ্যা ক্রমে ঘনাইয়া আসিতেছে। বাতাসের জোর বাড়িয়া উঠিয়াছে। সহসা সাগর-তরঙ্গিণীর প্রমত্ত সংঘাতে যেন ভৈরব গর্জ্জন শ্রুত হইল। ফেন-শীর্ষ তরঙ্গদল কল্ কল্ করিয়া ছুটিল। আবার পশ্চাতে—দূরে—অতি দূরে—বনান্তরে কেন বিকট হুক্কাধ্বনি উঠিল। "গোবিন্দ! গোবিন্দ!"—গাত্রাবরণ কম্বলখানিতে সৈকতশায়িনীকে আচ্ছাদিত করিয়া, বাহূপরি তুলিয়া লইয়া বাবাজী ছুটিতে লাগিল। সাগর সমীরণের ঐকতান-ক্রন্দনে আসমুদ্র-তটভূমির উপর যামিনীর যবনিকা পড়িয়া গেল।

(২)

সিন্ধু-সৈকত-শায়িনী রমণীকে সঞ্জীবিত করিয়া বাবাজী যে নূতন নামকরণ করিয়াছে, আমরা এখন হইতে তাহাকে সেই নামে অভিহিত করিব। রাধারাণীকে আশ্রমে আনা অবধি আমাদের বাবাজী একটু প্যাঁচে পড়িয়াছে। মধুর কৃষ্ণনাম যাহাদের নিম্বপত্র অপেক্ষা তিক্ত বোধ হইত, তাহা এখন তাহারা চিনির পানার ন্যায় মিষ্ট বোধে পান করিতেছে; আর ধাত্তেশ্বরীর উগ্র গন্ধ হইতে তুলসীপত্রের সৌরভ তাহাদিগের প্রিয়তর হইয়া উঠিয়াছে। এ সকলই রাধারাণীর কৃপায়।

যে প্রাচীন নগরীতে বাবাজীর আশ্রম, এক সময় তাহা বেশ লক্ষ্মীমন্ত ছিল। কিন্তু সৌভাগ্য চিরদিন সমান থাকে না। একদিন মহামারী আসিয়া তাহার সকল শ্রী হরণ করিয়া লইল। কালে মহারণ্য জনারণ্যে পরিণত হয়; আবার বন আসিয়া কখন মানব-ভবন অধিকার করে। দখল লইয়া পৃথিবীর আদিম অধিবাসী বৃক্ষের সহিত সভ্য মানবের নিরন্তর দ্বন্দ্ব চলিতেছে—যে যতটুকু জবর-দখল করিয়া লইতে পারে। আমরা যে প্রাচীন সহরের কথা বলিতেছি, সেখানে পাঠক ইহার চাক্ষুষ প্রমাণ পাইবেন। দেখিবেন, কোথাও বৃহৎ অট্টালিকার বক্ষপঞ্জর ভেদ করিয়া অশ্বত্থতরু সগর্ব্বে মাথা তুলিয়াছে; বিশাল-কায় বল্লরী অজগর সর্পের ন্যায় কাহাকে প্যাঁকে-পাকে

বেষ্টন করিয়াছে; কাহাকে শিকড়ে-শিকড়ে অষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া মহারাক্ষস বট শত রসনায় তাহার হৃদয়-রক্ত শোষণ করিতেছে। পল্লী জনশূন্য, মন্দির দেবশূন্য; কোনখানে নিরাশ্রয় বিগ্রহ ভূতলে গড়াগড়ি খাইতেছে! গোয়াল গাভীশূন্য, তড়াগ জলশূন্য—কর্দ্দমপূর্ণ, বৃহৎ উদ্যান সকল জঙ্গলাকীর্ণ। বাবলা, বাঁশ, ছাতিম প্রভৃতি বৃক্ষ সকল ক্রমে-ক্রমে পথিঃপার্শ্ব অধিকার করিয়াছে। বিশাল হাট—মাঠ হইয়াছে। বণিকগণের কুঠীতে কুঠীতে শৃগাল, কুক্কুর ছুটাছুটি করিতেছে। আর অঙ্কপালিতা দুহিতাকে শ্রীভ্রষ্টা দেখিয়া ভাগীরথী মনস্তাপে শীর্ণা হইয়াছেন।

ধ্বংসের সহিত প্রাণপণে সংগ্রাম করিয়া এই প্রাচীন সহর—এখনও আত্মরক্ষা করিতেছে। ইহারই প্রান্ত-দেশে তুলসীবনে ঘেরা বাবাজীর আশ্রম-কুটীর। রাধারাণী আসিবার পর তাহার পার্শ্বে আর একখানি কুটীর উঠিয়াছে। সেখানি রাধারাণীর মন্দির। কিন্তু প্রতিবেশী-দিগের মধ্যে হঠাৎ হরিভক্তি প্রবল দেখিয়া এই নির্দ্দিষ্ট মন্দিরেও রাধারাণীকে একা রাখিয়া বাবাজী নিশ্চিন্তে ভিক্ষায় বাহির হইতে পারে না। কিন্তু নগরেও ত নিস্তার নাই! তাই বলিতেছিলাম, বাবাজী একটু প্যাঁচে পড়িয়াছে। সহরে যে বাড়ীতে ভিক্ষা করিতে যায়, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা বিস্মিত নেত্রে অবাক্ হইয়া রাধারাণীর অর্দ্ধাবরিত মুখপানে চাহিয়া থাকে। লজ্জায় যুবতী অবগুণ্ঠন আরও টানিয়া দেয়। তথাপি নির্লজ্জ নিষ্কর্ম্ম যুবার দল পশ্চাদ্ধাবন করিতেও ত্রুটি করে না। বাবাজীর নিত্য-নিত্য এই বিপদ। কিন্তু আজ কিছু বেশী। সহরের প্রধান পথে বাবাজী গাহিতে-গাহিতে চলিতেছিল—

রূপনগরে এসেছে এক রসিক ব্যাপারী।
রঙমহলে বসতি তার, ব্যাসাৎ রঙ্‌দারী॥
রঙে তার জগৎ আলো,
কখন ধলো, কখন কালো,
ইচ্ছে যেমন, ফলায় তেমন রঙ্ রকমারি,
সে আপন রঙে রঙায় যখন—
চিকণ হয় ভারি॥

একজন উদ্ধত যুবা ডাকিল, "ও রসিক ব্যাপারী, ও রসিক ব্যাপারী! রঙমহলের পথটা বাৎলে দাও না, আমরাও একটু-আধটু রঙ মাখি। ফাগুন মাস, একা একাই হোলি খেল্‌বে? আমাদের ছিটে-ফোঁটা দাও!" বাবাজী সন্ত্রস্ত হইয়া বলিল, "গোবিন্দ! গোবিন্দ! আমি কাঙাল, হোলি খেলবার যোত্তর কৈ বাবা! রঙ পাব কোথা?"

অপর এক বর্ব্বর কহিল, "বাবাজী, কণ্ঠি-বদল কর্‌লে কবে? একদিন হরিলুট দাও।"

বাবাজী এই রসরঙ্গের উত্তর দিতে না দিতে রঙ্গস্থলে এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটিল। স্পর্দ্ধিত যুবকদল বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, বাবাজীর সহচারিণী সেই কুণ্ঠিতগমনা নারী যেন মূর্ত্তিমতী মধ্যাহ্ন দীপ্তির ন্যায় নিঃশব্দে জ্বলিতেছে! তাহার মুখে আর লজ্জার আবরণ নাই। চক্ষু নয়—যেন শিখাদ্বয়! অকস্মাৎ রমণীর এই রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া রসিকের দল রঙ্গে ভঙ্গ দিয়া চলিয়া গেল।

(৩)

গঙ্গার পরপারে বাবাজীর এক আত্মীয়ের গৃহ ছিল, সেইখানে গিয়া ডাকিল, "তুলসী!"

"কে—বাবাজী?" বলিয়া এক কৃশাঙ্গী বহির্দ্বার খুলিয়া দিল। মঞ্জরিত-যৌবনা সেই শ্যামাঙ্গীকে দেখিলে মনে হয়, ইহার 'তুলসীমঞ্জরী' নাম সার্থক। তুলসী বলিল, "ভেতরে এস না, বাবাজী!"

"গোবিন্দ! গোবিন্দ! এখন বস্‌ব না, দিদি! তোর বাপ কোথা?"

"ভিক্ষেয় গেছে।"

"গোবিন্দ, গোবিন্দ! ঐ ওদিকে দুখানা ঘর পড়ে আছে দেখে এলাম, কার বল্‌তে পারিস?"

"রমণীবাবুর। কেন গা?"

"গোবিন্দ, গোবিন্দ! আমরা এ-পারে উঠে আস্‌ব রে! ভাড়া দেবে বল্‌তে পারিস?"

তুলসীর কৌতূহলের আর সীমা রহিল না। বাবাজী আপন ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া, এ-পারে উঠিয়া আসিতেছে—ভাড়া দিয়া বাস করিতে চায়—ইহার রহস্য কি? আবার বলিতেছে—আমরা! বাবাজীর ত চিরকাল এক-বচনে কাটিয়াছে। ষাট বছরের পরে আবার দ্বি-বচন কেন? তবে—তাই না কি? এই বুড়া বয়সে কণ্ঠি-বদল? তুলসীর বিম্বাধরে চাপা হাসির রেখা দেখা দিল। কিন্তু বাবাজীর মনে কোন পাপ নাই। সে তুলসীর নীরবতায় উদ্বিগ্ন হইয়া

জিজ্ঞাসা করিল, "গোবিন্দ, গোবিন্দ! চুপ করে রইলি যে! সাড়া দেবে না?"

"কেন দেবে না? ওনারা ত ভাড়াই দেয়। তুমি যাও না।"

বাবাজী আশ্বস্ত হইয়া বলিল, "গোবিন্দ, গোবিন্দ! কোন্‌খানে রে?" তুলসী এবার দুষ্টামি করিয়া বলিল, "কে কোন্‌খানে? গোবিন্দ, না, যার ঘর, সে?"

"গোবিন্দের তল্লাস তুই পোড়ারমুখী কোত্থেকে দিবি? রাণীবাবুর ঘর কোথা বল?"

তুলসী বলিল, "ঐ যে গো, ঐ কোটা দেখা যাচ্ছে! আমি না হয় তোমার সঙ্গে যাব?"

বাবাজী বলিল, "না! তুই ততক্ষণ রাধারাণীকে রাখ্‌! আমি একাই যাব।"

তুলসীর মনে হইল যেন রহস্যটা একটু পরিষ্কার হইয়া উঠিতেছে। বলিল, "রাধারাণী আবার কে, বাবাজী? কোন্ বৃন্দাবন থেকে এসে তোমার ঘাড়ে চাপ্‌লেন?"

"গোবিন্দ! গোবিন্দ! সাগর থেকে লক্ষ্মী উঠেছেন, শুনেছিস্ ত? এ সেই লক্ষ্মী-প্রিতিমে!"

তুলসী আবার হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ বাবাজি, সাগর থেকে, শুনি না কি, নাক-কাণ নিয়ে কেউ ফেরে না? শুনতে পাই, সেখানকার ঠাণ্ডা হাওয়ার এমনি থর ধার যে, নাক-কাণগুলো কচ্‌কচ্‌ করে মুড়িয়ে কেটে নিয়ে যায়।"

সরল হৃদয় বাবাজী তুলসীর পরিহাসের দিক দিয়াও গেল না। "নাক-কাণ নিয়ে ফেরে না? গোবিন্দ! গোবিন্দ! এগুলো তবে কি?" বলিয়া নাক-কাণ নাচড়াইতে লাগিল।

তুলসী মধুর স্বরে উচ্চহাস্য করিয়া বলিল, "থাক্ বাবাজী, সকাল বেলা আর নাক-কাণ মলার দরকার নেই! এখন তোমার রাধারাণী দেখাও।" অন্তরাল হইতে একটি অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীলোককে ডাকিয়া আনিয়া বাবাজী তুলসীর কাছে রাখিয়া চলিয়া গেল।

রাধারাণী গৃহাভ্যন্তরে আসিয়া অবগুণ্ঠন মোচন করিলে তুলসীর মনে হইল হঠাৎ যেন তাহাদের প্রাঙ্গণে একটা বৃহৎ স্থলপদ্ম ফুটিয়া উঠিয়াছে। সহসা সে চক্ষু ফিরাইতে পারিল না। তাহার বিস্ময়-বিহ্বলতা দেখিয়া রাধারাণী মৃদু-মৃদু হাসিতে লাগিল। তুলসী ইত্যবসরে ছুটিয়া গিয়া ঘরের ভিতর হইতে খঞ্জনী বাহির করিয়া গাহিতে আরম্ভ করিল—

তোরে দেখ্‌লে পরে নারীর মন হরে!
কিশোর নাগর কটাক্ষ-শর স'বে লো কেমন করে॥
এমন মন-মজানো মধুর হাসি শিখ্‌লি কোথা, সই!
সাধ করে তোর টুক্-টুকে মুখ বুকে করে রই;
চাঁদ বদনে ফাঁদ পেতেছ বাঁধতে ছলে নাগরে।
উথ্‌লেছে ঢেউ জোর পবনে যৌবনে-রূপসাগরে॥

তুলসী ঘুরিয়া-ফিরিয়া, নাচিয়া, চিবুক ধরিয়া রাধারাণীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। তারপর বলিল, "রাধারাণীর জয় হ'ক! আমরা, বষ্টুমের মেয়ে, অমনি গাইনি, কি ভিক্ষে চাই।"

"আচ্ছা, যদি কেউ ফাঁদে পড়ে, তাকেই তোমাকে বকশিস্ দেব।"

"হরি বল! সে আমিও ফাঁদ পেতে বসে আছি, পারি ত ধরে নেব।"

'তবে কি চাও বল?"

"আমরা বোষ্টম, আর কি চাইব! রাধারাণীকেই চাই।"

"সে ত দান হয়ে গেছে।"

"হরি বল! সব দান হয়ে গেছে? ছিটে-ফোঁটা মহল কিছু পড়ে নেই?"

"না। কায়, মন, প্রাণ সব একেবারে খোস্-কবলায় লিখে দিয়েছি।"

"তা দিলেই বা! এখন ত সে বেদখল!"

"কৈ বেদখল! এই দেখ না তার দখলের প্রমাণ আমার মাথার ওপর"—বলিয়া রাধারাণী অঙ্গুলিদ্বারা সিঁথার সিঁদূর দেখাইল।

"কিন্তু সে ত আপনার দখল ছেড়ে দেছে। যদি মহাজন দেখে দান দিতে ত দখল ছাড়্‌ত না।"

"মহাজন দেখেও দিয়েছিলাম, অধর ইচ্ছে করেও তিনি দখল ছাড়েন নি।"

"কোথায় তিনি?"

"আপাততঃ নিরুদ্দেশ।"

"তবে বুঝি তাঁর আরও ইজারা-মহল আছে? তাই তদারক করতে গেছেন?"

"না। তিনি যেমন আমার এক মালিক, আমিও তেমনি তাঁর খাস-তালুকের একমাত্র প্রজা।"

"তবে প্রজা বিগ্‌ড়ল কেন?"

"সখ। মনে করলাম খাঁচার পাখী, দিন কতক বনে-জঙ্গলে ঘুরে আসি না। সেই সময় আমার শাশুড়ী গঙ্গাসাগরে যাচ্ছিলেন। আমি তাঁর সঙ্গ নিলুম।"

"খাঁচার দোর খোলা পেলে কেমন করে?

"যিনি খাঁচায় পুরেছিলেন, তিনিই খুলে দিলেন।"

"তবে আর কি, তিনি ত স্ব-ইচ্ছায় ছেড়ে দিয়েছেন!"

"স্ব-ইচ্ছায় নয়। বিদায় দেবার সময় তাঁর চোখের জল যদি দেখ্‌তে, তা হলে বুঝ্‌তে। সাগরে গিয়ে গঙ্গার শতধারা দেখে আমার কেবল সেই কথাই মনে হ'তে লাগল—তাঁর চোখে এমনি শতধারা দেখে এসেছি!" বলিতে বলিতে রাধারাণীর চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। তারপর শরতের আকাশে আচম্বিতে কোথা হতে একখানা উড়ো মেঘ এসে ফোঁটাকয়েক বর্ষিয়া গেল। সেই অশ্রুসিক্ত চক্ষে রাধারাণী দেখিল, তুলসীর বেদনাভরা চোখদুটিও জলে টল্ টল্ করিতেছে। রাধারাণী আর থাকিতে পারিল না। সহসা তুলসীর কণ্ঠলগ্ন হইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। উভয়ের অশ্রু যেন গঙ্গা-যমুনার ন্যায় ধারায় ধারায় যুক্তবেণী হইয়া বহিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে রাধারাণী মুখ তুলিয়া বলিল, "সই, সাধ করে 'সই' বলে ডেকেছিস! লোকে ফুল দিয়ে, মিষ্টি দিয়ে ভালবাসার সম্পর্ক পাতায়, আমরা আজ চোখের জলে 'সই' পাতালাম! এত দিন একলা-একলা হাঁপিয়ে মরছিলাম, আজ তোকে পেয়ে মনের সাধে দুটো দীর্ঘনিঃশ্বাস দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলে নি। তারপর শোন্, সই! আমি বড় পাষাণী! তার চোখের জল দেখে আমি তামাসা করতে লাগ্‌লাম। সে চোখ মুছতে মুছতে আমার পানে চাইতে লাগল—যেন আশ মিটিয়ে জন্মের শোধ দেখে নিচ্ছে! আমি উলটে হেসে ঠাট্টা করে এলাম, 'ছি ছি, পুরুষ মানুষের চোখে জল!' হাস্‌লেম বটে, কিন্তু চোখের জল চেপে! এখন মনে হয়, আস্‌বার সময় কেন তার গলা ধরে এমনি করে কাঁদি নি। তারপর সে যেন বুক-ফাটা চেষ্টায় আমার মুখ চেয়ে বল্লুলে, 'কবে ফিরবে?' আমি তাতেও তামাসা করে বল্‌লাম, 'যাচ্ছি সাগরে, রত্নাকর যদি তোমার রত্ন ফিরিয়ে দেন, তবে ত ফিরব! নয় ত এই শেষ দেখা।' সই, মেয়েমানুষের এই একটু চিমটি কেটে মজা দেখা স্বভাব, তাঁর অত কান্নাতে সে লোভ সাম্‌লাতে পারি নি! হায়, ভগবান্ সত্যিই কি আমার অদৃষ্টে তাই কর্‌লেন! সাগরে গিয়ে কলেরা হ'ল কিছুক্ষণের জন্যে, মনে হয়, মরেও ছিলাম। শাশুড়ী মড়া মনে করে আমায় অকূল পাথারে ভাসিয়ে দিয়ে দেশে ফিরে গেলেন। তারপর একদিকে যম টানে, আর একদিকে সাগর। মাঝ্‌খান থেকে বাবাজী কুড়িয়ে এনে দুজনকেই ফাঁকি দিলেন। সই, আমার কি হবে?"

তুলসী চোখ মুছিয়া হাসিয়া বলিল, "তার ভাবনা কি সই! সে দেশ ত আর উবে যায় নি। আমি তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে রাধাকৃষ্ণের যুগল মিলন দেখে আস্‌ব।"

"আমার বরাতে সে পথও বন্ধ। সেখান থেকে তিনি কোথায় চলে গেছেন। বাবাজী চিঠি লিখিয়েছেলেন, জবাব আসে নি!"

"তা হলে মদনমোহন সত্যিই অনুদ্দেশ! এখন উপায়?"

"উপায় দড়ি আর কলসী, নয় তুলসী! অন্তকালে পায়ে ঠেল না।"

এই সময় বাবাজী আসিয়া বলিল, "গোবিন্দ, গোবিন্দ! রমণীবাবু বড় মহাশয় লোক। সব ঠিক্‌ঠাক্ করে এলাম। তুলসী, রাধারাণীকে সব নতুন হাঁড়ি কুঁড়ি, দুধ-টুধ এনে দে। মেয়ে, আজ এইখানেই রান্নাবান্না কর! ওপার থেকে আজই শ্রীপাঠ তুলে এনে তোমার হাতে পেসাদ পাবো। মেয়ে, তুমি কিন্তু বাছা আমার সত্যি মা! যদি বল, বুড়ো ছেলে। তা হ'ল হ'লই! কি বলিস্, তুলসী? আমার মা নয়?" তুলসী ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল। বাবাজী বলিল, "তবে? যে না বলে,—আসুক মায়ের হাতের পায়েস খাক্, দেখুক, আমার মা কি না! গোবিন্দ। গোবিন্দ! মা, আজ বেলা হয়েছে, খালি পায়েস ভোগ দাও! তুই একটু পেসাদ পাস্ দিকিন্, তুলসী! গোলোকের রান্না কখন খেয়েছিস্? সেখানে লক্ষ্মী ঠাকরুণের হাতে অমনি পায়েস রান্না হয়!"

তুলসী হাসিয়া বলিল, "বাবাজী, গোলোকে বুঝি তোমার নেমন্তন্ন হয়েছিল? তাই সেখানকার পায়েস খেয়ে এসেছ।"

"খাই নি? গোবিন্দ! গোবিন্দ! আচ্ছা, আজ পায়েস পসাদ পা।"

তুলসী কহিল "পোড়াকপাল!. আমি ও রাধি-য়লানির হাতে খেতে গেলাম কি দুঃখে!"

"গয়লানী! গোবিন্দ! গোবিন্দ! তোর যত বড় মুখ, ত বড় কথা। বামুন না হলে গয়লানীর হাতে অমন ায়েস ওৎরায়! বামনী কি? গোবিন্দ! গোবিন্দ! মনীর ওপর বামনী! নইলে অমন মালপো গড়্‌তে ারে? খেয়ে দেখিস! এক এক ঢোক পায়েস খাবি—ার চোক্ কপালে উঠ্‌তে থাক্‌বে।"

"তাহলে মালপোর টুক্‌রো মুখে তুল্‌লেই একেবারে স্তর্জ্জলী করতে হবে!" বলিয়া তুলসী হাসিতে লাগিল।

"শুন্‌লে মা, আবাগীর কথা শুন্‌লে! তুমি ওর কথা ন না, মা।"

"না বাবা! তুমি শীগ্‌গির ফিরে এসো ও পাগলীর থা কে শোনে, বাবা!"

বাবাজী সগর্ব্বে বলিল, "ঐ শোন্! যে সমজ্‌দার হয়, মিষ্টি কথা শুন্‌লেই পায়েসের হাত বুঝ্‌তে পারে। তুই াড়ারমুখী আমার মাতৃানন্দে কিস? তোর মুখ যদি মি আর দেখি ত—গোবিন্দ! গোবিন্দ! তুই ঘসির খবর খিস, মালপোর খবর কি জান্‌বি?" বলিয়া বাবাজী গে গজ্ গজ্ করিতে করিতে বাটীর বাহির হইল। স্তু অনেক দূর হইতে "গোবিন্দ গোবিন্দ" শোনা গেল। লসী ও রাধারাণী হাসিতে লাগিল। অবশেষে রাধারাণী লল, "বাবাকে সত্যিই আমার পেটের ছেলের মত ন হয়।"

তুলসী বলিল, "তোমার জোর বরাৎ! না বিইয়ে নাইয়ের মা হয়, তুমি বাবার মা হয়েছ! কিন্তু মদন-হন নিত্যি নিত্যি ওর পায়েস মালপো যোগাতে কি জি হবেন।"

রাধারাণী ঈষৎ বিষণ্ণ হইয়া বলিল, "যদি এ ভাঙা াল জোড়ে ত সে ভার আমার।"

(৪)

রাধারাণী একাকিনী গৃহকর্ম্ম করিতেছিল। রমণী-হন সহসা প্রবিষ্ট হইয়া বলিলেন, "শোন, রাধারাণি! আমি আর এ তেষ্টা চাপ্‌তে পারছি না। আমার শরীর শুকিয়ে যাচ্ছে! তোমায় দেখ্‌লে আমার বুকের ভেতর দাউ দাউ করে নরকের আগুন জ্বলে ওঠে!"

রমণীমোহনের কথাগুলা যেন সত্য সত্যইসেই নরকাগ্নির স্ফুলিঙ্গের মত ছিট্‌কাইয়া গিয়া রাধারাণীর সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু অতর্কিত আক্রমণে সহসা তাহার মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না, ছবির মত নিশ্চল দৃষ্টিতে রমণীমোহনের মুখ চাহিয়া রহিল। রমণীমোহন আবার কহিতে লাগিলেন, "রাধা-রাণি, আমি পাগল হয়েছি! দিন নেই, রাত নেই, আমার এক চিন্তা কেবল—তুমি। জেগে—তুমি, ঘুমিয়ে —তুমি! আজ একমাস তুমি এ বাড়ীতে এসেছ, আমি সারাদিন ঐ ছাতের ঘুলঘুলিতে চোখ পেতে রোদে দাঁড়িয়ে থাকি, একবার তোমাকে দেখ্‌তে পাব বলে। নির্জ্জনে তোমাকে আমার মনের কথা বল্‌ব বলে কত দিন থেকে এই সুযোগ খুঁজ্‌ছি। আজ বাবাজীকে তুলসীকে কৌশল, করে সরিয়ে দিয়েছি। তেষ্টায় আমার ছাতি শুকুচ্ছে, আর আমি সইতে পারছি না। তুমি আমাকে দয়া কর। চুপ্ করে আছ কেন? কথা কও। তোমার কথা শোন্‌বার জন্যে আমি সারাদিন কাণ পেতে থাকি।"

ভয়ে বিস্ময়ে একান্ত বিহ্বল হইয়া রাধারাণী বলিল, "আপনি কি বল্‌ছেন! আশ্রয় দিয়েছেন, আপনি আমার বাপ! আমি বড় অভাগী, আপনি আমায় দয়া করুন! এখান থেকে চলে যান্। বাড়ীতে কেউ নেই। লোকে এমন সময় আপনার সঙ্গে কথা কইতে দেখ্‌লে কি বল্‌বে?"

"কার সাধ্য কি বলে? কুমীরের সঙ্গে বাদ করে কেউ জলে বাস করতে পারে? এ গ্রাম আমার। আমায় সবাই চেনে। রমণীমোহনকে ভয় করে না, এমন লোক সাতখানা গাঁয়ের ভেতর নেই। শোন! তুমি আমার সঙ্গে চল। আমি নৌকা ঠিক করে রেখেছি, তোমাকে খুব সুখে-স্বচ্ছন্দে রাখ্‌ব।"

রমণীমোহনের দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা-ব্যঞ্জক মুখ দেখিয়া রাধারাণী আপনাকে অতিশয় বিপন্ন মনে করিল। ভীতিচঞ্চল চক্ষে চারিদিক চাহিয়া দেখিল, পলায়নের পথ নাই। সহসা তাহার চক্ষে জলধারা ছুটিল। রোদন

কম্পিত-স্বরে কহিল, "আপনি ভদ্রলোক, আমাকে নিরাশ্রয় অসহায় পেয়ে অপমান কর্‌ছেন? আপনি আমার স্বামীর সন্ধান করে তাঁর কাছে আমায় পাঠিয়ে দেবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন। আমি আপনাকে বাপের মতন ভক্তি করি। আমার স্বামীর সন্ধান করে দিন। আমি চির-জীবন আপনার বাঁদী হয়ে থাক্‌ব।" রোদনে নয়নে অরুণ-রাগ বিকশিত! অশ্রুধৌত সুন্দর মুখ শিশির-ধোয়া গোলাপের মত ঢলঢল করিতেছে! লজ্জায়, উত্তেজনায়, অধরে, গণ্ডে গোলাপের উপর গোলাপ ফুটিয়াছে। পবন-চঞ্চল চূর্ণ কুন্তল উদ্‌ভ্রান্ত ভ্রমরের ন্যায় সেই গোলাপবৃন্দের উপর উড়িয়া পড়িয়া চুম্বন করিতেছে! রমণীমোহন মুগ্ধ লুব্ধ নেত্রে দেখিতে দেখিতে বলিলেন, "কেন? বাঁদী হতে হবে কেন? আমি তোমায় আদরে রাখ্‌ব। তুমি ক্লেশ পাবে বলে তোমায় বলিনি। তুমি কার মুখ চেয়ে মিছে আশায় বসে আছ? তোমার খাশুড়ির মুখে তোমার মরা খবর পেয়ে তোমার স্বামীও শোকে মারা গেছেন!"

মুহূর্ত্তে রাধারাণীর মুখ প্রভাতের চাঁদের মত পাংশু হইয়া গেল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ বিদ্যুৎ-বর্ত্তিকার ন্যায় দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, "তোমার মিথ্যা কথা!"

কথাটা সত্যই মিথ্যা। রাধারাণীকে দেখিয়া এবং বাবাজীর মুখে তাহার বিস্ময়কর কাহিনী শুনিয়া রমণী-মোহন প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, তাহার স্বামীর সন্ধানে লোক নিযুক্ত করিবেন। কিন্তু সে অলীক স্তোক্‌। রাধা-রাণী পাছে তাঁহার হাতছাড়া হইয়া যায়, এই জন্য মিথ্যা ভরসা দিয়া তাহাকে আট্‌কাইয়াছেন। স্বামীর মৃত্যু সংবাদ যে রাধারাণী ঠিক বিশ্বাস করিবে, রমণীমোহন তাহা মনে করেন নাই। তিনি আঁধারে ঢিল ছুড়িতেছিলেন—যেটা লাগে! তথাপি প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "কে বল্‌লে মিথ্যা কথা?"

"আমি বল্‌ছি!"

"তুমি? কেমন করে জান্‌লে?"

"সে কথা তুমি বুঝ্‌বে না। তোমার শুনে দরকার নেই। তুমি কি জান না যে, গাছ শুকুলে ফুল আপনি ঝরে যায়।"

"তাই ত সেই ঝরা ফুলটী কুড়িয়ে নিতে চাই। রাধা-রাণি, তুমি আমার সঙ্গে চল। খুব সুখে থাক্‌বে। এখানে ঐ বাবাজীর ঝুপড়ীর মধ্যে আছ বৈ ত নয়। আমি তোমায় বাড়ী দেব, গয়না দেব—"

"স্বামী ছাড়া পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য আমি চাই নি। তুমি তাঁর সন্ধান করে দেবে বলেছিলে, আমি তোমার কাছে আর সে উপকার চাই নি। তুমি দূর হও!"

রমণীমোহন ইচ্ছায় কখন বাধা প্রাপ্ত হন্‌ নাই। তাঁহার মন ক্রমে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতেছিল। বলিলেন, "বাবা! গুপ্ত-লীলা কর্‌তে বাবাজীর বাড়ী এয়েছ, আত সতীপনা কেন? তোমার মত ঢের ঢের আমি দেখেছি। গোড়ায় গোড়ায় অমন একটু ঝাঁজ্‌ থাকে, সীতা সাবিত্রীর কথা বলে। তার পর অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা, মন্দোদরীর দোহাই পাড়ে। আর জ্বালাও কেন? বলে, এই কাজ করে করে চুল পাকালাম! ভাল করে বল্‌ছি, ভাল এস্তেক চলে এস, নইলে জোর করে নিয়ে যাব।"

রাধারাণী বিস্মিত হইয়া বলিল, "জোর! এ কি মগের মুল্লুক না কি?"

"না। তার চেয়ে বেশী—রমণীমোহনের মুল্লুক। আমাকে সবাই চেনে, ভয় করে। নইলে দিনে ডাকাতি করতে পারি! আমি জোর করে নিয়ে গেলে কে তোমায় রাখ্‌বে? কেন চেঁচামেচি কেলেঙ্কারী করবে। ভালয় ভালয় চলে এস। এমন লোক এ তল্লাটে নেই, যে তোমায় আজ রক্ষে করে।"

রাধারাণীর মুখ সহসা অলৌকিক গর্ব্ব-বিভায় প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বলিল, "যিনি চিরদিন রাখ্‌ছেন, তিনি রাখ্‌বেন।"

"ওঃ তোমাদের ঐ একটা কথা আছে—ধর্ম্ম। ধর্ম্ম-টর্ম্ম কিছু নেই। জোর যার মুল্লুক তার! আমি কত গেরস্তর সর্ব্বনাশ করেছি! কত নিরীহ লোককে পীড়ন করেছি! ধর্ম্ম যদি থাকৃত, তাহলে এতদিন—"

কথাটা শেষ হইল না। রমণীমোহনের ভিতরটা হঠাৎ যেন বরফের মত ঠাণ্ডা হইয়া একটু শিড়্‌ শিড়্‌ করিয়া উঠিল। সে অপ্রিয় অনুভূতি জোর করিয়া হাসিয়া তাড়াইয়া দিয়া রমণীমোহন বলিতে লাগিলেন, "কৈ কখন ত দেখ্‌লাম না, ধর্ম্ম অধর্ম্মের মাথায় বাজ ফেলেছেন। কত ধার্ম্মিক যে না খেতে পেয়ে মরছে, কৈ ধর্ম্ম তাদের এক মুঠো ভাত দিতে পারে না? ধর্ম্ম-টর্ম্ম নেই। আজ যদি

পল্লী-হাটে

[শিল্পী—শ্রীসত্যচরণ ঘোষ

(চিত্রের স্বত্বাধিকারী—শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহার সৌজন্যে)

তিনি তোমাকে [illegible] করতে পারেন—তাহলে মানব, সত্যিই রয়ে আছেন। ধর্ম্মের অবজ্ঞা কোর না। তিনি কাউকে ক্ষমা করেন না।"

"ধর্ম্মের যিনি বড়—সেই নারায়ণ আমাকে রক্ষা করবেন।"

"তিনি কোথায়, সতী ঠাকরুণ?"

রাধারাণী হৃদয়ে হস্তার্পণ করিয়া বলিল, "এইখানে, আমার আশে পাশে—চারিদিকে।"

রমণীমোহন উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, "তিনি রাস-লীলা করেন। বেরসিক ন'ন্—রসরাজ। তিনি রসভঙ্গ করবেন না, আমারই সহায় হবেন। নারায়ণ ত তোমার একলার ন'ন্।"

"আমি অন্য নারায়ণ জানি না, আমার নারায়ণকেই জানি। তিনি আমার কাছে, দূরে, সর্ব্ব জায়গায়, সব সময়, মনের ভেতর জেগে রয়েছেন। তিনিই আমার বল, ভরসা, রক্ষক। নইলে কার ভরসায় আমি কুলের বৌ, বুড়মানুষের সঙ্গে বাড়ীর বাইরে পা দিয়েছিলাম। তুমি যখন বল্ছিলে তিনি মারা গেছেন, কে আমাকে অন্তরে অন্তরে আশ্বাস দিয়ে বলেছিল—আমি বেঁচে আছি।"

রমণীমোহন অতৃপ্ত নয়নে তাঁহার সম্মুখস্থ পুঞ্জীভূত তেজোময়ী প্রতিমা দেখিতেছিলেন। তাঁহার অতৃপ্ত শ্রবণ তাহার মধুর কণ্ঠনিঃসৃত পরুষবাক্য সকল শুনিতে-ছিল। রাধারাণী নীরব হইলে বলিলেন, "কুলের বৌ এখন ত জলে পড়েছ। ওসব বাজে কথা ছেড়ে দাও! এখন আমাকে কি বল্ছ, বল।"

"তুমি পশুর অধম।"

"গোড়ায় অমনি অনেকে কুলোপানা চক্কর ধরে! কিন্তু গয়না-গাঁটি পরে দোতলায় বসে কেঁচো হয়ে থাকে। তুমি দেখ্ছি সোজায় যাবে না। বেশ আমি পশু—পশুর মতই তোমাকে নিয়ে যাব।" বলিয়া রমণীমোহন অগ্রসর হইলেন। কয়েকপদ পিছাইয়া গিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে রাধারাণী বলিল, "সাবধান! আমায় ছুঁয়ো না। তুমি মরা সাপ নিয়ে খেলা করেছ, জ্যান্ত সাপকে ঘেঁটিয়ো না, ঘুমন্ত বাঘকে জাগিয়ো না।" রাধারাণীর মূর্ত্তি দেখিয়া রমণীমোহনের দীর্ঘ ব্যায়াম-পুষ্ট দৃঢ় শরীর তাঁহার অজ্ঞাত-সারে যেন একটু কুঞ্চিত হইয়া পড়িল। রমণীমোহন দেখিলেন, রাধারাণীর কপালের শিরাসকল স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে! জ্যোৎস্নামাখা সেই তরল নীল চক্ষুদুইটীতে যেন বজ্রাগ্নি জ্বলিতেছে! নাসারন্ধ্র ঘন ঘন কুঞ্চিত স্ফুরিত হইতেছে। অগ্নিগর্ভ গিরির ন্যায় যুবতী কাঁপিতে লাগিল। রমণীমোহনের বিশাল বক্ষ ভিতরে ভিতরে একবার একটু মোচড় দিল। কিন্তু আপনার দুর্ব্বলতায় আপনি উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন, "বাঘ বশ করা মন্তরও আমি জানি।" কিন্তু তিনি পুনশ্চ অগ্রসর হইতে না হইতে নিমেষে এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিয়া গেল। তাঁহার মনে হইল, পশ্চাৎ যেন একটা দুর্জ্জয় তরঙ্গ আসিয়া তাঁহাকে ভূপাতিত করিল। তারপর অনুভব করিলেন, কাহার পদতল তাঁহার গ্রীবাদেশ সবলে নিপীড়িত করিতেছে। চাহিয়া দেখিলেন, দুই রক্তবর্ণ ঘূর্ণিত চক্ষু ঊর্দ্ধ হইতে ক্ষুধিতা বাঘিনীর ন্যায় তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। ঠিক সেই সময় বহির্দ্বারে শব্দ হইল, 'গোবিন্দ! গোবিন্দ!'—রাধারাণী ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

(৫)

তুলসী বলিল, "সই, তুমি যেমন রসময়ী, তেমনি দিগ্বিজয়ী! ঐ দশাশই পুরুষটার গলায় পা চাপ্লি কি করে বল্ দিকি?"

"আর লজ্জা দিস্নে, ভাই! মনে হলে লজ্জায় মরে যাই! আমাতে কি তখন আমি ছিলাম। আমার ভেতর তখন যেন দশটা পাগ্লা হাতী ঢুকেছিল।"

কথা হইতেছিল তুলসীদের অঙ্গিনায় বসিয়া। রমণী-মোহনের আসুরিক অত্যাচারের পর, বাবাজী রাধা-রাণীকে লইয়া আপাততঃ তাহাদেরই গৃহে আশ্রয় লইয়াছে।

তুলসী রাধারাণীকে স্পর্শ করিয়া সবিস্ময়ে বলিল, "এই ত ফুলের মত গা। ছুঁলে মনে হয়, ফুলের ঘা সইবে না। দশটা পাগলা হাতীর ভর সইল কেমন করে? শুনতে পাই, মেয়ে পুরুষে লড়াই হয়—ফুলের বাণে! ও পাঠ কখন পড়ি নি, জানি নি! তবে ব্রজবালাদের হাতে শুনেছি এই ছিল মোখ্যম অস্তর। মেয়ে মানুষ যে তোর মতন ধিঙ্গী হয়ে সিঙ্গি চড়ে, তা জান্তাম না!"

রাধারাণী হাসিয়া উত্তর দিল, "কেন? শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধের কথা শোন নি? আমি আমার শাশুড়ীর মুখে শুনেছি সিংহবাহিনী একলাই ত সব অসুর মেরেছিলেন। আমরা সবাই সেই সিংহবাহিনীর জাত। মা বলেন, পুরুষমানুষ পর-নারীর দিকে কুচক্ষে চাইলে তার বুকের বল কমে যায়। সই, মনের জোরই আসৎ জোর।"

তুলসী বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোর মার কথা ত একদিনও বলিস্ নি?"

"ওঃ, তুমি বল্ছ যাঁর পেটে হয়েছিলাম! তাঁকে ত জানিনে, ভাই; আমার শাশুড়ীকেই মা বলে জানি। তাঁর মাই খেয়ে আমি মানুষ! মা বলেছেন, আমি যাঁর পেটে হয়েছিলাম, তিনি আমার খুব ছোট বয়সে মরে গেছ্লেন। তিনি আমার শাশুড়ীর 'গঙ্গাজল' ছিলেন। মরবার সময় এঁর হাতে আমাকে দিয়ে যান। তাই ত মা গঙ্গাসাগরে আমাকে মরা মনে করে ফেলে রেখে চলে আস্বার সময় কেঁদে বলেছিলেন—'মা গো, গঙ্গাজলের কাছ থেকে তোমাকে পেয়েছিলাম, গঙ্গাজলকেই দিয়ে গেলাম।' তাঁর কথা আমার কাণে গেল, কিন্তু তখন আমার এমন শক্তি নেই যে, তাঁকে ডেকে বলি, 'আমি বেঁচে আছি।' তারপর অজ্ঞান হয়ে গেছ্লাম।"

রাধারাণী চক্ষু মুছিতে লাগিল। তুলসী সেই করুণ স্মৃতি চাপা দিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিল, "তোর শাশুড়ী বুঝি তোকে মানুষ করে ছেলের সঙ্গে বে দিলেন?"

"সে, ভাই, এক মজার কথা! আমার যখন পাঁচ বছর বয়েস, একদিন পাড়ার জনকতক ছেলে-মেয়ে মিলে আমরা 'বউ বউ' খেল্ছিলাম। তাতে উনি আমার বর হয়েছিলেন। শাশুড়ী সেই দেখে বলেছিলেন, মেয়েমানুষের খেলার মালাবদলও মিথ্যা নয়। ওই ওর ক'নে, নইলে এত মেয়ে থাক্তে ওরই গলায় মালা দিলে কেন? তারপর একদিন দিন-ক্ষ্যাণ দেখিয়ে পুরুত ডেকে আমাদের বে দিলেন। মিথ্যের বে সত্যি হল।"

"তোর শাশুড়ীর বুঝি আর ছেলেপুলে নেই?"

"না। তিনি মায়ের এক ছেলে আর আমিও এক মেয়ে।"

"তাহলে তিনি তোর কে হলেন লো?"

"দূর পোড়ারমুখী" বলিয়া রাধারাণী তুলসীকে তাড়না করিল। তুলসী হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বে হবার পর বরকে তোর লজ্জা কর্ত না?"

"কিচ্ছু না! আমি পাঁচ বছরের, তিনি দশ বছরের। লজ্জার ধার কে ধারে? দুজনে ছুটোছুটি লুকোচুরি খেলা কর্তাম! কিন্তু তাঁকে জোরে আমি পার্তাম না। তাইতে আমার হিংসে হত। তারপর তিনি যত বড় হতে লাগ্লেন, তাঁর জোর ততই বাড়্তে লাগ্ল। হাতের গুলিদুটো টিপে দেখ্তাম যেন—নোয়া। ভাব্তাম, কি করে এত জোর হয়? শুন্লাম, ব্যায়াম করে। মনে করলাম, বুঝি কোন রকম ব্যায়রাম! শাশুড়ীকে বল্লাম—'মা, ওর যে ব্যায়রামে এত জোর হয়েছে, আমারও সেই ব্যায়রাম করে দাও না।' মা হেসে বল্লেন, 'তুই ওর জোরে পারিস নি, বুঝি? আচ্ছা, আমি তোর গায় খুব জোর করে দেব।' মা সিঁড়ি ওঠা-নাবা করাতেন, বড়-বড় ঘড়া তোলাতেন, সাঁতার কাট্তাম, আরও কত কি? আমাদের একটা দুরন্ত গাই ছিল, সেটা রাগ্লে কেউ তাকে আঁট্তে পার্ত না। আমি তার সিং ধরে রাখ্তাম। তার একটা বাছুর ছিল, তাকে তুল্তাম। আমাদের গাঁয়ে একটা বাগ্দি ছিল, তার গায়ে ভারি জোর। কেউ তার সঙ্গে পার্ত না। ওর যখন বাইশ-তেইশ বছর বয়েস, তখন ওর কাছে সে হেরে যায়। শুনে, মা আমাকে হেসে বল্লেন, 'ও-ছোঁড়া বাগ্দি ছুঁয়েছে, না নাইলে তুই ওকে আমার ঘরে ঢুক্তে দিস্ নি।' 'আমি ওর জোরে পার্ব কেন, মা?' 'খুব পার্বি' বলে তিনি হেসে চলে গেলেন। তারপর উনি বাড়ী এলে বল্লাম, 'নেয়ে এস, নইলে ঘর ঢুক্তে দেব না।' তিনি হেসে বল্লেন, 'তোমার ভারি মুরদ কি না।' আমি যে লুকিয়ে লুকিয়ে গায় কত জোর করেছি, তিনি ত তা জান্তেন না!"

তুলসী মহা কৌতূহলে জিজ্ঞাসা করিল, "তারপর কি হল?"

"আমি ঘরের কপাটদুটো ভেজিয়ে দিয়ে বাঁ হাতে চেপে দাঁড়ালাম। তিনি বল্লেন, 'খিল্ খুলে দাও, নইলে আমি জোরে ঠেল্লে ভেঙে যাবে।"

"তারপর, তারপর?"

"আমি বল্লাম, 'খিল্ দিই নি, কিন্তু খুলেও দেব না।' তিনি একটা জান্লা দিয়ে দেখ্লেন। তারপর দরজার

কাছে এসেই সজোরে এক ধাক্কা! কিন্তু দরজা একটুও ফাঁক হল না। আধঘণ্টা ধস্তা-ধস্তি। শেষে মাকে ডেকে বললে, 'মা, দরজা খুলে দিতে বল!' মা হেসে বললেন, 'ঐখানে হার মান্, তবে খুলে দিতে বলব।' কি আর করে! বললে 'আচ্ছা, মানলাম!' শাশুড়ী আমায় বললেন, 'দাও ত, বউমা, দরজা খুলে! ছোঁড়া বামুনের ছেলে, বাগ্‌দির সঙ্গে লড়াই করে মনে করে মস্ত বীর হয়েছে!' আর একদিন যাত্রা শুনতে যেতে চেয়েছিল। মা বারণ করেছিলেন। শাশুড়ী ঘুমুলে বললে, 'আমি কথা দিয়েছি, একবার গিয়ে চট্ করে চলে আস্‌ব। তুই মাকে কিছু বলিস নি।' আমি বললাম, 'আমি মায়ের কাছে মিছে কথা বলতে পারব না। তুমি মাকে এ কথা বল নি কেন?' সে বললে, 'মাকে আমার বড্ড ভয় করে।' আমি বললাম 'সে যাই বল, আমি তোমাকে যেত দেব না।' বললে, 'আমি গেলে তুই আট্‌কাতে পারিস্?' আমিও তেমনি জোর করে বললাম—'যেতে না দিলে তুমি যেতে পার? কৈ যাও দিকি', বলে হাত ধরলাম!"

"হাত ছাড়িয়ে যেতে পারলে না?"

রাধারাণী সলজ্জ হাসিয়া ঘাড় নাড়িল—না!

"এখন তবে হাতছাড়া করলি কেন, সই?'

নিমেষে রাধারাণীর মুখ মেঘাচ্ছন্ন দিনের মত নিষ্প্রভ হইয়া গেল। বলিল, "অদৃষ্টের ফের, সই! কিন্তু হাতছাড়া সে হয় নি, হবার নয়। জলের আঁক্ ত নয় যে মুছে যাবে!"

"সই, তুই বড্ড ভালবাসিস, না?"

"কে জানে, সই, ভালবাসা কাকে বলে জানি নি! শুনতে পাই, ভালবাসা—ভালবাসা—এ ওকে ভালবাসে'—এমনি কত কথা। সে কথা সেও কখন আমায় বলে নি, আমিও তাকে বলি নি। কিন্তু আমি মনে মনে বেশ করে ভেবে দেখেছি, সে আমি ভেন্ন নই—এক! একে ভালবাসা বলতে হয়, বল। আচ্ছা, সই, তুই কখন কাউকে ভালবেসেছিস?"

তুলসী সলজ্জ হাসিয়া বলিল, "বেসেছি, সই! ও পোড়া ছুটে রোগের হাতে কি এড়ান্ আছে, বোন্?"

রাধারাণী ঈষৎ মুখ ভার করিয়া কহিল, "সই, আমার রোগটি সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তন্ন তন্ন করে দেখে নিচ্ছ, কিন্তু নিজের মনের বোচ্‌কাটি ত খোলনি, ভাই!" তুলসী গুন্‌গুন্ করিয়া গাহিল—'মনের কথা কইব কি, সই, কইতে মানা—'

রাধারাণী হাসিয়া বলিল, "তা হবে না, সই! ফাঁকি দিলে চলবে না। তোমার শ্বশুর-বাড়ী কোথায়?"

"বৈকুণ্ঠপুরে। কিন্তু আমি সেখানে কখন যাই নি।"

"কেন? কেন?"

"সতীনের জন্যে। আমার স্বামী সবাইকে ভালবাসে, আমাকেই কেবল বাসে না। এত ডাকি, এত সাধি, এত কাঁদি, তবু একবার আমার কাছে আসে না।" বলিতে বলিতে তুলসীর চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। রাধারাণী ব্যথিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তবু তুই তারে এত ভালবাসিস?"

"বাস্‌ব না! সে বৈ আমার আর কে আছে, বল? আমার মতন তার কত শত আছে, কিন্তু সে ছাড়া আমার ত আর কেউ নেই। যেদিন বাবা আমায় তার পায় দাসী করে দিলেন, চকিতের মত চার-চক্ষে চাওয়াচাওয়ি হয়ে শুভদৃষ্টি হল, তখন থেকেই তাকে ভালবেসেছি। ভালবেসেছি কি মজেছি! তুই আশ্চর্য্য হয়ে চেয়ে দেখ্‌ছিস্ কি? মনে করছিস, একবার দেখাতে এত হয়? সই, যার হয়, তার একবার দেখাতেই হয়, আর এতই হয়! তোরে যদি একবার তার ভুবন-ভোলানো বাঁশী শোনাতে পারতাম, তুই যদি একবার তার মন-মজানো হাসি দেখ্‌তিস, বুঝ্‌তিস, কেন এমন করে মজেছি!" তুলসীর চক্ষু দিয়া দরদর করিয়া ধারা ঝরিতে লাগিল। রাধারাণী বলিল, 'সে যদি তোকে নাই চায়, তবে তুই তার জন্যে অত করে কেঁদে মরিস কেন? মনকে বোঝাতে পারিস নি?"

"ভালবাসার কান্নাই যে সুখ, বোন্! মন বোঝে কৈ? তাকে যে চেয়েছে, সেই কেঁদে কেঁদে পথে ফিরেছে। তবু মন বোঝে না। সে কি যাদু জানে?"

"এবার যাদুকরের দেখা পেলে ছাড়িস নি, জোর করে ধরে রাখিস।"

"পারি কৈ, সই? তোর লুকোচুরি খেলা ফুরিয়েছে, আমার এখনও শেষ হয় নি। তাকে ধরি ধরি করি, ধরা দেয় না। আমি তার জন্যে বনে বনে ঘুরি; কাঙ্গালিনী

হয়ে নগরে নগরে ফিরি ; সয়ে সয়ে কখন মনে করি তারে ভুল্‌ব। কিন্তু ভুল্‌তে দেয় কৈ ? বনফুলের গন্ধে তার শ্রীঅঙ্গের সৌরভ মনে পড়ে! মাঠের পানে চাই, সবুজ ঘাসে তাকে মনে পড়িয়ে দেয়! নীল আকাশে দেখি, তারই বরণ! অভিমান করে মনে করি, যে এত করে কাঁদায়, আর তারে দেখ্‌ব না, কিন্তু চোখ বুজে দেখি, বুক-জোড়া হয়ে বসে হাস্‌ছে! ভুল্‌তে দেয় কৈ ?"

"সত্যি, সই, ভোলা যায় না! তাকে ভাব্‌ব না মনে করি, কিন্তু সেই ছেলেবেলা থেকে একটী একটী করে কত কথাই মনে ওঠে, বুকের ভেতর যেন ঢেউ খেল্‌তে থাকে। অন্যমনস্ক হয়ে যাই, কিন্তু হুঁস্ হলেই দেখি তারই কথা ভাব্‌ছি!"

"এই বোঝ, সই! ভোলা যায় না। যখন প্রাণ বড় অস্থির হয়, তার নাম করি।"

রাধারাণী হাসিয়া বলিল, "দুধের সাধ কি ঘোলে মেটে, সই ?"

"অমন কথা বোল না! তার সব মধুর! বাঁশী মধুর, হাসি মধুর, নাম বড় মধুর! যখন প্রাণ বড় জ্বলে, তার নাম করি, প্রাণ শীতল হয়! নামেই ত সে ধরা দিয়েছে। নইলে কে তাকে জান্‌ত ? ছিষ্টি-সংসারে আছে কেবল তার ভুবনমোহন নাম আর মদনমোহন রূপ!"

"আহা, তুইও সই আমার মতন অভাগিনী!"

"অমন কথা মুখে এন না! আমি অভাগিনী! আমি তাঁর নাম নিয়েছি, আমার মত ভাগ্যবতী কে ?"

"কিন্তু আমার মত তোর জ্বালাও ত কম নয়! শুনি তাঁকে ডাক্‌লে সকল জ্বালা জুড়োয়।"

"সে সত্যি! চিতের আগুনে সব আগুন নেবে, কিন্তু চিতে জ্বল্‌তে থাকে! কিন্তু সে জ্বলায় কত সুখ, যদি আমার মতন জ্বল্‌তিস, তা হলে বুঝ্‌তে পারতিস্! একবার যদি তার সঙ্গে তোর ভাব হত, তা হলে জান্‌তিস, তার ভাবও যেমন মিষ্টি, আড়িও তেমনি মধুর! ভাব কর্‌বি ?"

"আর নূতন করে কার সঙ্গে ভাব কর্‌ব, সই! যার সঙ্গে ছেলেবেলা থেকে ভাব করেছি, সেই আমার সব। আমি তাকে ছেড়ে আর কাউকে চাই নি।"

"সে সত্যি, বোন্! কিন্তু—"

রাধারাণী ব্যাকুল আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু কি ? বল্‌তে বল্‌তে থাম্‌লে কেন ?"

"ভাব্‌ছি, এতদিন হল, তোমার মদনমোহন ত একবার উদ্দেশ কর্‌লেন না।"

"মরা মানুষের কে খোঁজ করে, সই!"

"তা ঠিক্। কিন্তু আমরাও ত এত চিঠি লেখালিখি করে তার ঠিকানা কর্‌তে পারলাম না।"

"চাক্‌রীর জন্যে তাঁকে ঠাঁইঠাঁই বদ্‌লি হতে হয়। তারপর আমরা সামান্য লোক, আমাদের খোঁজ-খবর কে রাখে বল! দেশ নেই, বাড়ী নেই যে উদ্দেশ পাবে! যেখানে চাকরী, সেইখানেই ঘর।"

"তা যেন হল! কিন্তু সই, একটা কথা তোকে জিজ্ঞাসা করি। তুমি গেরস্তর বউ এতদিন অনুদ্দেশ, তুমি ফিরে গেলে আর কি তোমার শাশুড়ী তোমাকে ঘরে নেবেন ? আর কি তুমি তোমার মদনমোহনকে পাবে, আশা কর ?"

রাধারাণী বলিল, "সই! যাঁকে তুমি কখন চোখে দেখনি, তাঁকে তুমি পাবে, আশা কর ?"

"সে কি সই! নইলে কিসের জন্যে এই বুকপোরা তেষ্টা নিয়ে কেঁদে কেঁদে ঘুরে বেড়াচ্চি।"

"তবেই বোঝ, সই! তোমার মনের মদনমোহনকে একদিন পাবে, তোমার আশা আছে। আর আমি যার কাছে বসেছি, যার সঙ্গে হেসে কথা কয়েছি, যাকে ছুঁয়েছি, যার স্পর্শে শিউরেছি, আমার সে মদনমোহনকে পাবার আশা বিসর্জ্জন দেব কেন ?"

"বোন্, আমার মদনমোহন ভুবন ভরে রয়েছে! তোমার যে অনুদ্দেশ।"

"সই, যদি মরা পতি ফেরে, আমি জীয়ন্ত স্বামীকে ফিরিয়ে আন্‌তে পার্‌ব না ? তা যদি না পারি, তবে আমিই বা কিসের জন্যে এই বুকপোরা তেষ্টা পুষে রেখেছি। ভয় কি, সই, সে-ই হাতছাড়া হয়েছে, গঙ্গা ত আর হাতছাড়া হয় নি!"

(৬)

"গোবিন্দ! গোবিন্দ! এ আমার কি মায়ায় ঠেকালে ঠাকুর! আমার নামে রুচি গেল, জপের মালা শিকেয় তোলা রইল, কেবল রাধারাণী, রাধারাণী, মা আর মা!

এই বাৎসল্য! বোধ করি, নন্দরাণীর এমনি হয়েছিল! গোবিন্দ! গোবিন্দ! একেই বলে বিষ্ণুমায়া! এই চক্রে সংসার চল্‌ছে! গোবিন্দ, গোবিন্দ! তা চল্‌লেই বা! তবে কি না—গোবিন্দ! গোবিন্দ!—এ বৈরাগীর কুঁড়েতে কেন, মা, তুমি? ও বাৎসল্যের হ'ক্ আর যাই হ'ক্—সমান বন্ধন! গোবিন্দ! গোবিন্দ! ভরত মুনি একটা হরিণ-ছানার জন্য মজেছিলেন। তবে কি পাকা ঘুঁটি আবার কাঁচালাম! তা কাঁচালাম—কাঁচালাম! আমার ঘুঁটি আমি কাঁচিয়েছি, বেশ করেছি! গোবিন্দ! গোবিন্দ!"

বাবাজীর আজ ভিক্ষায় যাইতে মন সরিতেছে না। বসিয়া বসিয়া সেই গঙ্গাসাগরের ঘটনা হইতে নানা কথা ভাবিতেছে।

এদিকে রাধারাণী তুলসীকে বলিতেছিল, "আজ আমার মন বড় অস্থির হয়েছে! কিছুতেই ঘরে টেঁক্‌তে পারছি নি। মনে হচ্ছে কে যেন আমায় দড়ি বেঁধে টান্‌ছে। চ' সই, আজ বাবার সঙ্গে ভিক্ষেয় যাই।"

তুলসী হাসিয়া বলিল, 'তবে আয়, তাড়াতাড়ি একটা রসকলি কেটে দি' আর আমার ভিক্ষের ঝুলিটা কাঁধে নে।"

"ঐটী, সই, পার্‌ব না। তাঁর গরবে আমি রাজরাণী, ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে কর্‌ব কি দুঃখে?"

"কেন লো? কৈলাসের সংসার ত ভিখারীর সংসার।"

"ভিখারীর সংসার বটে, কিন্তু মা সেখানেও রাজ-রাজেশ্বরী।"

তুলসী হাঁকিয়া বলিল, "বাবাজি, ভিক্ষেয় যাবে না? আজ সই আর আমি তোমার সঙ্গে ওপারে ভিক্ষেয় যাব।" বাবাজী তুলসীর মুখপানে খুব বড় করিয়া চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে যাবে?"

"সাধে বলি, সাওরে শীতে নাক-কাণ কাটা যায়! এই ত তুমি কাণটী রেখে এসেছ। ভিক্ষেয় যাব আমি আর রাধারাণী।"

"গোবিন্দ! গোবিন্দ! রাধারাণী কেন? তোর যত বড় মুখ তত বড় কথা? মা আমার ভিক্ষেয় যাবে? গোবিন্দ! গোবিন্দ!—"

বাবাজী ক্রমেই উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া রাধারাণী হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিল, "আজ আমায় নিয়ে চল, বাবা! তোমার সঙ্গে যেতে ইচ্ছে কর্‌ছে।"

"গোবিন্দ! গোবিন্দ! তুমি যাবে, সে ত ভাল কথা, মা! ঘরে থেকে থেকে মন কেমন করে কি না? তুলসী, তবে আয় দিদি! খঞ্জনীটা দে।"

তিন জনে খেয়ার নৌকায় পার হইতে হইতে যখন প্রায় এ পারের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, তুলসী দেখিল, রাধারাণী তাহাকে ধরিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতেছে! তাহার মুখ-চোখের ভাব দেখিয়া তুলসীর ভয় হইল। রাধারাণী অসুস্থ হইয়াছে! ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে সই?"

রাধারাণী কূলের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "সই, সই,—ঐ!"

সই দেখিল, কূলে এক পরম সুন্দর যুবাপুরুষ দাঁড়াইয়া আছে! তুলসী পুনরায় রাধারাণীর মুখ চাহিল। তাহার আরক্ত মুখে অশ্রু-বিভাসিত সলজ্জ হাসি দেখিয়া আর বুঝিতে বাকি রহিল না। তুলসী রাধারাণীর কাণে-কাণে জিজ্ঞাসা করিল, 'ঐ'—কি সই? ঐ মদনমোহন?"

রাধারাণী তুলসীর স্কন্ধে মাথা রাখিয়া মূর্চ্ছিতার ন্যায় চক্ষু বুজিল।

মিলনটা পাঠকের মনোমত হইল না। একে ত অতর্কিত, তার উপর স্থান কাল কিছুরই শ্রী-ছাঁদ নাই! একটা ফুল নাই, একটু মলয় পবন নাই; ভৃঙ্গগুঞ্জন, কুহুরব, কিছু নাই; একটু চাঁদের আলোর পর্য্যন্ত অভাব। কিন্তু তবু এই দুইটী প্রাণী পরস্পরের মুখ চাহিয়া হাসিয়া কাঁদিয়া অস্থির হইতেছে! যদি কেহ হারানিধি ফিরিয়া পাইয়া থাক, যদি কেহ মৃত প্রণয়াস্পদকে পুনর্জ্জীবিত হইতে দেখিয়া থাক, বুঝিবে, এই পুনর্মিলিত দম্পতি-হৃদয়ে তখন কি তরঙ্গ খেলিতেছিল! সংসারে এরূপ অভাবনীয় সংঘটন বিরল নহে। বাস্তব ঘটনা অনেক সময় কবি-কল্পনা অপেক্ষা বিস্ময়কর।

রাধারাণীর স্বামী বদ্‌লি হইয়া এই স্থানে আসিয়াছিলেন। উৎকট আনন্দের বেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে তিনি গাড়ী করিয়া পত্নীকে গৃহে লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু বিস্তর সাধ্য-সাধনাতেও বাবাজী তাঁহাদের সঙ্গে গেল না। তুলসী চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, সময়ান্তরে

সাক্ষাৎ করিবে। কিন্তু বাবাজী কোন কথাই কহিল না। গাড়ী ছাড়িল। যতদূর দেখা যায়, বাবাজী একদৃষ্টে দেখিতে লাগিল। যান অদৃশ্য হইলে তাহার অভিভূত প্রাণ, মন, চৈতন্য বক্ষ-পঞ্জর ভেদ করিয়া সহসা যেন 'কোথা যাও, মা' বলিয়া হা-হা রবে চীৎকার করিয়া উঠিল! দুই করে সবলে বুক চাপিয়া ধরিয়া বাবাজী বলিল, "তুলসী রে, সাগর ছেঁচে মাণিক এনেছিলাম! বিষ্ণুমায়ায় বদ্ধ হয়ে গোবিন্দের পায় অপরাধী হয়েছি। আমি আর আশ্রমে ফিরে যাব না। তোর বাপকে বলিস্, বৃন্দাবন চললুম। গোবিন্দ! গোবিন্দ!" বলিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে বাবাজী পথ চলিতে আরম্ভ করিল।*

* সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত।

শৃগালদিগের শিক্ষা-প্রণালী

[রায় বাহাদুর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বি-এ]

(১)

আমাদিগের ধারণা এই যে পশুদিগের মধ্যে কোন বিশেষ শিক্ষা-প্রণালী নাই। তাহাদিগের প্রকৃতিগত ধর্ম্ম ও কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট; এবং সেই অনুসারে প্রকৃতিই তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকে। তজ্জন্য তাহাদের পাঠশালা ও গুরুমহাশয় প্রভৃতির প্রয়োজন হয় না, এবং শিক্ষাপ্রণালী লইয়া কোন বাগ্‌বিতণ্ডা হয় না। কিন্তু বাস্তবিক এই ধারণা ভ্রমাত্মক। আমাদেরও পূর্ব্বে সেই ধারণা ছিল; কিন্তু গত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার অনেক জেলার বন-বাদাড় ও জঙ্গল পরিদর্শন করিয়া, এবং এ বিষয়ে যথাসাধ্য অনুসন্ধান করিয়া যেটুকু বিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাতে আমাদিগের ধারণা হইয়া গিয়াছে যে, শৃগালদিগের মধ্যে একটা রাষ্ট্রগত শিক্ষা-প্রণালী আছে, এবং তাহাদিগের মধ্যেও এ সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। যতদূর জানা গিয়াছে, আমাদের শিক্ষা-প্রণালীর সহিত তাহাদের কতটুকু সাদৃশ্য, তাহারই যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখ করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

অনেকে জানেন যে, শৃগালেরা পোষ মানে না। তাহাদিগের মধ্যে বিশেষ রকম একটা শ্রেণী-স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য আছে। বিষ্ণুশর্ম্মার হিতোপদেশের পর শৃগালের মধুর কাহিনী আমরা অন্য কোন গ্রন্থে পাঠ করি নাই; কিন্তু বিষ্ণুশর্ম্মার যুগের পর শৃগালদিগের মধ্যেও যে ক্রমবিকাশ হইয়া গিয়াছে, তাহা এই প্রবন্ধ দ্বারা অনেকটা বুঝিতে পারিবেন। গোটাকতক লক্ষণ উল্লেখযোগ্য।

শৃগালেরা বিখ্যাত ধূর্ত্ত। তাহাদিগের আত্মরক্ষার কতকগুলি বিশেষ উপায় আছে; তাহা আমাদিগের অগোচর। তাহারা প্রকাশ্যে দল বাঁধিয়া লড়াই (civil wars) করে না। তাহাদিগের মধ্যে দীক্ষাগুরু নাই; শিক্ষাগুরু আছে। তাহারা স্ত্রী কিম্বা পুত্রসন্তানাদি লইয়া সচরাচর বাহির হয় না। অন্যান্য পশুদিগের মধ্যে অবরোধ প্রথা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু শৃগালের মধ্যে আছে। তাহাদিগের লোকসংখ্যা কত, এ সম্বন্ধে পাঠকবর্গের মনে কৌতূহল জন্মিতে পারে। অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে যে, মানব-লোকালয়ের সন্নিকটবর্ত্তী মাঠ ও জঙ্গলই শৃগালের বাসস্থান। তাহারা জলাশয় হইতে বহু দূরে বাস করে না। যেখানে জীবগণের মধ্যে দ্বন্দ্ব বেশী, সেখানেই শৃগালের সংখ্যা বেশী। তাহাদের মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রীর সংখ্যা সমান। পাঁশকুড়ার নিকটবর্ত্তী একটা মাঠে শৃগালের 'সেন্সাস' লইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম; তাহাতে জানা গেল,

৬ বর্গ মাইলের মধ্যে ৩৮৪০ শৃগালের বাস। অর্থাৎ প্রত্যেক তিন বিঘা জমির মধ্যে একটী শৃগাল বাস করে, তন্মধ্যে—

১৯২০ স্ত্রী

১৯২০ পুরুষ

এবং উহাদের মধ্যে প্রায় চতুর্থাংশ যুবক ও যুবতী। শতকরা ২০ জন বুদ্ধির আধিক্য বশতঃ ক্ষিপ্ত। অগ্নিমান্দ্য ও বায়ুরোগ ছাড়া অন্য কোন ব্যাধি নাই। স্ত্রী মরিলে পুরুষ সহমরণে যায়, এবং পুরুষ মরিলে

স্ত্রী তৎক্ষণাৎ দেহত্যাগ করে। উহাদিগের আয়ু নির্দ্দিষ্ট করা সুকঠিন। শৃগাল-সমাজে compulsory education চিরস্মরণীয় কথা। এ সম্বন্ধে কাহারও মতভেদ নাই। যাহারা পণ্ডিত এবং স্বীয় মত প্রচার করিতে কৃতসঙ্কল্প, তাহারাই সন্ধ্যার সময় মাঠে আসিয়া একবার ডাকিয়া যায়। তাহাদিগের বুদ্ধি-প্রাখর্য্য দেখিয়া অন্যান্য পশু, বিশেষতঃ কুকুরমণ্ডলী ক্ষোভ প্রকাশ করে, এবং সেই জন্য মাঠে শৃগালের ধ্বনি শুনিলেই লোকালয়ের সারমেয়বর্গের Protest তৎক্ষণাৎ প্রচারিত হইয়া পড়ে।

মানব-বুদ্ধি মস্তিষ্কগত। শৃগালদিগের বুদ্ধি লাঙ্গুলগত। এই জন্য তাহাদের লাঙ্গুল অপেক্ষাকৃত স্থূল। তাহারা অন্যান্য গৃহপালিত পশুর ন্যায় লাঙ্গুল-আন্দোলনপূর্ব্বক ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রভৃতির অবতারণা করে না। তাহার কারণ, এ লাঙ্গুল সম্পূর্ণ Rationalistic। লাঙ্গুল দ্বারা তাহারা অনেক কর্ম্ম সাধন করে। কর্কটের গর্ত্তে লাঙ্গুল প্রবিষ্ট করিয়া তাহারা কর্কটকে কিরূপে আকর্ষণ করে, তাহা অনেকেই জ্ঞাত আছেন। লাঙ্গুলগত বুদ্ধি বলে তাহারা বৃক্ষ হইতে বড়-বড় কাঁঠাল কি করিয়া পাড়িয়া লয়, তাহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। প্রথমতঃ, কতকগুলি শৃগাল পরস্পরের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া কাঁঠালটাকে ভূমিতে পাড়িয়া ফেলে। তার পর একটা শৃগাল চিৎ হইয়া সেই কাঁঠাল দৃঢ়ভাবে কোলে জড়াইয়া থাকে, এবং সে অন্য একটা শৃগালের লাঙ্গুল কামড়াইয়া ধরে। এই দ্বিতীয় শৃগালটি তৃতীয় একটা শৃগালের লাঙ্গুল কামড়াইয়া ধরে। এইরূপে সারি-সারি অনেকগুলি শৃগাল পরস্পরের লাঙ্গুলের সাহায্যে ভূশায়ী শৃগাল ও তাহার ক্রোড়স্থ কাঁঠাল অবলীলাক্রমে টানিয়া গর্ত্তে গিয়া পৌঁছে। এই অসাধারণ facultyর প্রতিভা অনেক প্রকার Resolutionএ প্রতিপন্ন হইয়াছে। ক্রমে উল্লিখিত হইবে।

শৃগালের মত অন্য কোন বৃহৎকায় জন্তু গর্ত্তে বাস করে না। একটা গর্ত্ত খুঁড়িয়া দেখা গিয়াছিল যে, ইহাদিগের sanitary বন্দোবস্ত খুব ভাল। কখন-কখন ইহারা অস্থাবর সম্পত্তি গর্ত্তে রাখিয়া, রাত্রিকালে বাহিরে আসিয়া পাহারা দেয়।

স্থানীয় শৃগাল-সমাজের মধ্যে একজন করিয়া local correspondent থাকে। তাহারা দিবাভাগে বাহিরে আসিয়া লোকালয়ের সমাচার লুক্কায়িত ভাবে জানিয়া যায়, এবং প্রয়োজনীয় কথাগুলি গর্ত্তে আসিয়া সকলকে বলিয়া দেয়। শৃগালেরা প্লেগের ভয়ে মূষিকের বিবরের নিকট গর্ত্ত স্থাপন করে না; এবং এমন করিয়া গর্ত্ত নির্ম্মাণ করে যে, তাহাতে কোন দূষিত ড্রেণের জল প্রবেশ করিতে পারে না।

শৃগাল সম্বন্ধে এইরূপ অনেক সংবাদ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি; কিন্তু যতদূর এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, তাহাতে কেবল মাত্র বলিয়া রাখা উচিত যে, শৃগালেরা যদিও ধর্ম্মাধর্ম্ম মানে, সেটুকু কেবল রাষ্ট্র-হিতার্থ। তাহাদের মধ্যে ব্যক্তিগত ভক্তিতত্ত্বের অভাব। লাঙ্গুলের আকার utilitarianism এর মত দেখিতে।

(২)

শৃগালেরা 'নাস্তিক' এ কথা বলিলে কোন অর্থ হয় না। মানবসমাজের মধ্যেও অনেকে ঈশ্বর মানিয়া থাকেন; কিন্তু সেটা কেবল তর্কের কিংবা পূর্ব্ব-প্রথার খাতিরে। শৃগাল-মধ্যেও সে রকম অনেকে মানে; কিন্তু তাহাতে বিশেষ কিছু যায় আসে না। পাছে ঈশ্বর-ভক্ত হইলে জীব অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, এই জন্য ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন কথা তাহাদের শিক্ষার মধ্যে স্থান পায় নাই।

পূর্ব্বে কতকগুলি বৃদ্ধ শৃগাল ইহা লইয়া মহা গণ্ডগোল করিয়াছিল; কিন্তু বহু বর্ষব্যাপী ঘোর তর্কের পর তাহার মিটমাট হইয়া গিয়াছিল। প্রথমে যখন শৃগাল-সমাজে ধর্ম্মের কথা উঠে, তখন কেহ-কেহ বলেন:—"কো ধর্ম্ম?" অর্থাৎ ধর্ম্ম কে? (What is the essence of reality)? এবং কেহ কেহ বলেন—"কিং ধর্ম্ম?" (What is the form of reality)? অর্থাৎ ধর্ম্ম কি? বেশী ভাগ শৃগালের মতে ধর্ম্ম জড়পদার্থ, অতএব ক্লীবলিঙ্গ। যদিও গীতা বলিয়াছেন, "এক এব সুহৃৎ ধর্ম্ম, নিধনে প্যনুযাতি যঃ", উহার অর্থ 'পঞ্চভূত'। অর্থাৎ মরিয়া গেলে পঞ্চভূত থাকে, এবং তাহারা দেহমুক্ত আত্মার সঙ্গ ছাড়ে না। এই পঞ্চভূতের কর্ম্ম শৃগালের ধর্ম্ম (শৃগালত্ব) রক্ষা করা। মানব-ধর্ম্মের প্রতিপাদ্য বিষয় পরমাত্মা, এবং উক্ত শ্রেণীর মতে তিনি পুঁথির মধ্য দিয়া অবতীর্ণ ও প্রসারিত হইয়া থাকেন। শৃগালেরা পরমাত্মা ও পুঁথি উভয়কেই শিক্ষা-প্রণালী হইতে

খারিজ করিয়া দিয়াছে। তাহাদের মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য 'আদর্শ শৃগাল হওয়া।'

আদর্শ শৃগাল কি? আদর্শ শৃগাল বরাবর শৃগালই থাকিবে। শৃগাল থাকিয়াই তাহারা মানসিক ঔৎকর্ষ্য লাভ করিবে। সাতিশয় বিজ্ঞতা লাভ করিয়া শৃগাল-সমাজকে পশু-সমাজেরমধ্যে উন্নত করাই আদর্শ শৃগালের কাজ। রাষ্ট্র-হিতই মুখ্য উদ্দেশ্য। সে রাষ্ট্র শৃগাল-সমাজ লইয়া। হইতে পারে, অন্যান্য জীবজন্তু, যেমন গাভী প্রভৃতি, স্বীয় রাষ্ট্রে জলন্ত আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছে; কিন্তু তাহা হইলেও, শৃগাল কখন গাভীর আচার-ব্যবহার ও শিক্ষা-প্রণালী অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মবীররূপে প্রখ্যাত হইতে চাহে না। অর্থ-সঞ্চয় করাই রাষ্ট্র-হিতের অনুকূল; সুতরাং শিক্ষার প্রথম উদ্দেশ্য, বুদ্ধি খরচ করিয়া যেন তেন প্রকারেণ অর্থ-সঞ্চয়। মানব সমাজে যেমন আদর্শ ডাক্তার, আদর্শ উকীল, আদর্শ সাহিত্যিক, আদর্শ বিচারক, ও আদর্শ মাষ্টার প্রভৃতি আছে, শৃগালদিগের মধ্যেও সেই রকম আছে। তাহারা শিক্ষারূপ কলের মধ্যে সমাজের উপযোগী নানাবিধ ব্যবসা-বিশারদ শৃগাল-জীব তৈয়ারি করিয়া রাষ্ট্রপ্রতিভা অক্ষুণ্ণ রাখিতে যত্নবান। ডাক্তারির উদ্দেশ্য, শৃগালের শরীর যেন শৃগাল ভাবেই সুস্থ থাকে। শৃগাল যেন ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া গাভী কিংবা কুক্কুরের মত না হইয়া যায়। ওকালতীর উদ্দেশ্য যাহাতে শৃগাল সম্বন্ধীয় আইন-কানুনের প্রাকৃতিক অর্থ আদালতে সাব্যস্ত হয় এবং তদনুযায়ী স্বত্বাদি ও আচার-ব্যবহার অটুট থাকে। সাহিত্যের উদ্দেশ্য, সম্পূর্ণ শৃগালের আদর্শ শৃগাল-সমাজের সম্মুখে দেখান। ধর্ম্মের অবতার বলিলে 'শৃগাল ধর্ম্মের অবতারই' বুঝিতে হইবে। ইহা হইতে আরও বুঝা যায় যে, শৃগালদিগের মতে 'অবতার' বলিয়া কিছু নাই। যদি কোন ব্যাঘ্র হিংসা পরিত্যাগ করিয়া ব্যাঘ্র-সমাজ সংগঠন করিতে প্রয়াসী হয়, শৃগালদিগের মতে সে 'ব্যাঘ্রকুলাঙ্গার'। 'কো ধর্ম্ম'-পন্থী শৃগালগণের মতে সে 'ব্যাঘ্রের' অবতার। এ সম্বন্ধে মানব-সমাজেও Conservatism দৃষ্ট হয়। হিন্দু-দিগের 'অবতার' হিন্দু ভিন্ন কেহই মানে না; এমন কি, হিন্দুদিগের মধ্যেও অনেকে তাহা কেবল 'আদর্শ মনুষ্যত্ব' বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহে। সেই রকম অন্য রাষ্ট্রের অবতার হিন্দুগণের নিকট 'বিশ্বজনীন অবতার নহেন। সকলেই ঈশ্বরের সার্ব্বভৌমিকতা স্বীয় রাষ্ট্রভুক্ত করিতেই ব্যস্ত। ঈশ্বরের অন্য রাষ্ট্রের উদ্যানে একটু হাওয়া খাইবারও যো নাই।

একই ধর্ম্ম যে কখনও ব্যাঘ্ররূপী, কখন শৃগালরূপী, এবং কখনও গাভীরূপী হইতে পারে, তাহাও শৃগালদিগের শিক্ষা-তত্ত্বের বহির্ভূত। ধর্ম্ম কখনও বহুরূপী হইতে পারে না। মনে করুন, সত্য কথা বলা ধর্ম্ম; কিন্তু সকলে যদি সত্য কথা কহে, তবে সংসার লুপ্ত হইয়া যাওয়া সম্ভব। কারণ, পাপ (সমাজের অহিত) করিয়া যদি কেহ তৎক্ষণাৎ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে, তবে আইনকানুন, সমাজ ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি বিফল হইয়া যায়। শৃগালদিগের মতে প্রত্যেক রাষ্ট্র এক একটা রূপ, এবং প্রত্যেকের মনে করা উচিত, সেই রূপের মধ্যেই ধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ সম্ভব। সুতরাং এক সঙ্গে যদি অনেকগুলি রাষ্ট্র বর্ত্তমান থাকে, তবে দেখিতে হইবে যে, সম্পূর্ণ চালাক কে, অথবা কাহাদের বুদ্ধি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা অর্থ জমাইতে পারে। তাহার পরীক্ষা কর্ম্মে, পুঁথিতে নহে। পুঁথির উদ্দেশ্য মূর্ত্ত পদার্থকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া জগৎভ্রম সাব্যস্ত করা। তদনুযায়ী কর্ম্ম, শিক্ষাপ্রণালীর উপযোগী নহে। ইহাতে শরীর ও মন মাটী হইয়া যায়, এবং মূর্ত্ত পদার্থ হেয় হইয়া পড়ে।

এবম্বিধ নানাপ্রকার তর্কাদির পর একটা মহাসমিতিতে আলোচিত হইয়াছিল—

১। শিক্ষার বিষয় কি?

২। শিক্ষা প্রযুজ্য কিসে?

৩। কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিলে তাহার ক্রমবিকাশ সম্ভব?

শৃগালদিগের মতে, যাহা স্বভাবতঃ কেহ শিখিতে চাহে, তাহারই ঔৎকর্ষ্য সাধন কিংবা অনুশীলনের নাম শিক্ষা। যাহার ঔৎকর্ষ্য-সাধন কাহারও পক্ষে হইয়া গিয়াছে, সে বস্তু শিক্ষার বিষয় নহে। মাতৃস্তন্যপান, এবং ভয় পাইলে চীৎকার প্রভৃতি কর্ম্ম অনুশীলনের বিষয় নহে; কারণ, ইহার যথেষ্ট ঔৎকর্ষ্য-সাধন হইয়া গিয়াছে। কেহ স্বভাবতঃ মিথ্যা কথা শিখিতে চাহিলে, তাহাকে মিথ্যা কথার যত রকম কৌশল আছে, শিখান উচিত; কিন্তু তাহা আত্মরক্ষা ও রাষ্ট্রহিতেই প্রযুজ্য। তাহাতে যদি রাষ্ট্রের অহিত হয়, এবং

আত্মরক্ষার ব্যাঘাত ঘটে, তবে সত্য কথা শিখানও উচিত। একজন শীর্ণ ব্যক্তির যদি মিথ্যা কথা কহিয়া আত্মরক্ষা প্রয়োজনীয় হয়, তবে তাহাকে সুকৌশলে মিথ্যা-তরণীর সাহায্যে ভবনদী উত্তীর্ণ হইতে হইবে। এবং তাহাতে যদি তাহার মনে কষ্ট হয়, তবে সে মধ্যে-মধ্যে সকালে ও সন্ধ্যায় কিংবা রবিবারে অনুতাপ প্রকাশ করিয়া মনের কষ্ট দূর করিতে পারে। আবার, মিথ্যা কথা কহিয়া, কিংবা প্রবঞ্চনা করিয়া যদি কাহারও আত্মরক্ষার পক্ষে, কিংবা রাষ্ট্রহিতের পক্ষে ব্যাঘাত জন্মে, তবে তাহার সত্য কথা কহিতে অভ্যাস করাই যথার্থ শিক্ষা-প্রণালী।

(৩)

আত্মরক্ষার প্রশ্ন খুব জটিল; কিন্তু শৃগালদিগের শিক্ষা-প্রণালীর মধ্যে তাহার বিকাশ কি প্রকারে হয়, এবং তাহার সহিত মানব-ধর্ম্মের কতদূর সাদৃশ্য, তাহা আমরা শীঘ্রই দেখিব। আত্মরক্ষা ব্যক্তিগত ধর্ম্ম। নিজের মন ও শরীর সুস্থ না থাকিলে, ব্যক্তিগত এবং রাষ্ট্রীয় অহিত উভয়ই আসিয়া পড়ে। অপিচ রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য্য রক্ষা করিতে হইলে কতদূর ব্যক্তিগত আত্মত্যাগ করা দরকার, তাহাও শৃগালদিগের শিক্ষাপ্রণালীর অন্তর্ভূত।

শৃগালদিগের প্রত্যেক উপনিবেশেই এক-একটী পাঠশালা আছে। সেগুলি গর্ত্তের মধ্যে লুক্কায়িতভাবে সংস্থাপিত হয় বলিয়া আমরা দেখিতে পাই না। শৃগালদিগের পাঠশালা প্রায়ই জলাশয়ের নিকটবর্ত্তী। এ হেন স্থানে কোন বৃক্ষের উপর যদি কেহ ডালের মধ্যে লুকাইয়া তাহাদের রীতিনীতি লক্ষ্য করিতে চাহেন, তবে দেখিবেন, তাহারা সকলেই বিজ্ঞান-কৌশলসম্পন্ন। আত্মরক্ষার্থ নানাবিধ ব্যায়াম, 'ড্রিল্', এবং একস্‌পেরিমেণ্ট' শৃগাল-শিশুগণ বৈকালে গর্ত্ত হইতে বাহিরে আসিয়া শিক্ষা করে। যাঁহারা গৃহপালিত কুক্কুর ও বিড়াল-শিশুগণের রীতিনীতি লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, সময়ে সময়ে একখণ্ড কাষ্ঠ কিংবা বস্ত্রখণ্ড লইয়া তাহারা অনেকক্ষণ ক্রীড়ায় মত্ত হয়। সেই পদার্থ লইয়া টানাটানি করে, এবং ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া পরস্পরকে কামড়াইয়া দেয় ও অবশেষে সেই অসার পদার্থ ফেলিয়া দিয়া রঙ্গস্থল হইতে সরিয়া পড়ে। কিন্তু শৃগালদিগের শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে আত্মদ্বন্দ্ব নাই। তাহারা যাহা লইয়া চর্চ্চা করে তাহা সার, এবং তাহাদিগের পরিশ্রম ব্যর্থ হয় না। তাহাদের সকল পরিশ্রমই সার (productive) এ বিষয়ে শৃগালদিগের নিকট মানব-সমাজের অনেক শিখিবার বিষয় আছে। অনেকে প্রাতঃকালে দুইক্রোশ হাঁটিয়া ক্ষুধার উদ্রেক করেন; কিন্তু বাটীতে অন্নের সংস্থান নাই। শৃগাল দুইক্রোশ হাঁটিলে নিশ্চয় কিছু চুরি করিয়া আনে, কিংবা অন্ন-সংস্থানের খবর লইয়া আসে। তাহারা 'ফুট্‌বলে'র মত খেলায় রত হয়। কিন্তু হয় ত সেই ফুট্‌বল কোন অপদার্থ শৃগাল-কলঙ্কের স্কন্ধে প্রযুজ্য হয়। অর্থাৎ সকলে তাহাকে ফুটবলের ন্যায় পদাঘাত করিয়া নদীতটে তাড়াইয়া দেয়। প্রত্যেক শৃগাল প্রতিদিন কতখানি পরিশ্রম করে, তাহা তাহার ধর্ম্মকল নামক একটা কলে Metre এর সহযোগে অঙ্কিত হয়, এবং সেই পরিশ্রমের ফল অনুযায়ী রাষ্ট্রহিত হইয়াছে কি না তাহা বিবেচনা করিয়া প্রত্যেক শৃগালের value and wages নির্দ্দিষ্ট হয়। ইহা পরে বর্ণিত হইয়াছে।

শৃগাল-পাঠশালার গুরুমহাশয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমাদিগের ন্যায় তাহাদিগের 'ইনস্পেক্‌টিং' গুরু কিংবা পণ্ডিত নাই। বৎসরের শেষে কোনও স্থানে খাদ্যদ্রব্যের (যেমন ইক্ষু প্রভৃতি, কিংবা গৃহপালিত পক্ষী) প্রাচুর্য্য থাকিলে প্রত্যেক পাঠশালার শীর্ষস্থানীয় ছাত্র (তাহারা ফাইন্যাল সার্টিফিকেট পাইতে পারে) সেই স্থানে আসিয়া নিজ নিজ বুদ্ধিকৌশলের পরিচয় দিয়া থাকে, এবং তদনুসারে তাহাদিগের গুরুমহাশয় আদৃত হইয়া থাকেন। শৃগালগণ মানব সমাজ হইতে এক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। তাহাদিগের গুরুভক্তি আছে। আমাদিগের মধ্যে অনেক বিষয়ী এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তি তাঁহার পূর্ব্বকালের পাঠশালার গুরু, কিংবা স্কুলের 'মাষ্টার', কিংবা কলেজের প্রোফেসরকে হয় ত চিনিতেই পারেন না। কিন্তু শৃগাল-সমাজের গুরুমহাশয় অতিশয় ভক্তির পাত্র। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে, একদল শৃগাল একটা গুরুবিদ্রোহী ছাত্রকে কামড়াইয়া ক্ষত-বিক্ষত করিয়াছিল। এই গুরুভক্তির মুখ্য কারণ যে গুরুর নিকট যে বুদ্ধি শিষ্যগণ প্রাপ্ত হয়, তাহা বিলক্ষণ লাভজনক (profitable)। কোন পাঠশালার গুরু কিংবা 'প্রোফেসর' আজীবন সম্মানিত ও রাষ্ট্রদ্বারা যত্নে লালিত হইয়া থাকেন। আমাদিগের সমাজে

ছয় টাকা বেতনে একজন গুরুমহাশয় পাওয়া যায়, কিন্তু শৃগাল-সমাজে তাঁহা পাওয়া যায় না। (অবশ্য, শৃগাল-সমাজে টাকা প্রচলিত নাই, কিন্তু পরিশ্রমের অনুপাতে মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়া যাহা প্রদত্ত হয়, তাহাকেই টাকা বলিতেছি) ১৯০২ খৃষ্টাব্দে কাঁথি নামক স্থানের শৃগাল শিক্ষা-সমিতির বার্ষিক মন্তব্যের ফলে যে সকল বিধান জারি হইয়াছিল, তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, কয়েক বৎসর ধরিয়া তথাকার শৃগাল-সমাজে অতিশয় মিথ্যার প্রাদুর্ভাব হয়। রাষ্ট্রীয় আদালতে বিচারের সময় একটি সত্যবাদী সাক্ষী পাওয়া যাইত না। ক্রমে রাষ্ট্রের অমঙ্গল হইতে লাগিল। সদস্যগণ তদন্ত করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, পাঠশালার গুরুমহাশয়গণ মিথ্যা কথার কৌশলগুলি ছাত্রগুলিকে রীতিমত শিখাইতেন, এবং তাহাদিগকে ভুলাইয়া পয়সা উপার্জ্জন করিতেন। মিথ্যা কথার ও প্রবঞ্চনার প্রভাবে ছাত্রগণও বেশ রোজগার করিত এবং তাহা রাষ্ট্রহিতার্থে অর্পণ করিত না, সুতরাং তাহারা গুরুমহাশয়কে এক অংশ অক্ষুন্নভাবে ছাড়িয়া দিত। ইহার ফলে নিরীহ শৃগাল-প্রজাগণের স্বীয় স্বত্ব রক্ষা করা, এবং রাষ্ট্রীয় পরিশ্রমের ন্যায্য ফল আহরণ করা সুকঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। তদন্তে প্রকাশ পাইল যে, অতিশয় মাংসাশী শৃগাল গুরুর মধ্যেই মিথ্যার প্রাদুর্ভাব বেশী। ইহাতে সদস্যগণও প্রত্যেক গুরুর জন্য প্রথমতঃ ছাগদুগ্ধ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে, সেই বৎসর অনেকগুলি রামছাগল কাঁথির এলাকায় আসিয়া উপস্থিত! শাস্তি-স্বরূপ মিথ্যাবাদী ছাত্রগণকে সেই রামছাগলের দুগ্ধ দুহিয়া গুরুকুলকে খাওয়াইতে হইত। এইরূপ সাত্বিক আহারে এবং পরিশ্রমে, ছাত্র ও গুরুকুল উভয়েই উদ্ধার লাভ করিয়াছিল। সেই অবধি গুরুকুলও সাত্বিকভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া, ছাত্রগণকে 'বেঞ্চের উপর' দাঁড় না করাইয়া ইক্ষুরস প্রস্তুত করিতে দিতেন। আমাদিগের মধ্যেও এই রকম একটা প্রথা দাঁড় করান যাইতে পারে। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে মানব-সমাজের বিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র মিথ্যা কথা কহিতে কুণ্ঠিত নয়, এবং কিসে 'কোয়েশ্চন্ পেপার' চুরি করা সম্ভব তাহারই জন্য টেষ্ট্ পরীক্ষার তিন-মাস পূর্ব্ব হইতে নানাধিক উপায় উদ্ভাবনা করে। হয়ত Compulsory education হইলে ইহাদের সংখ্যা আরও বাড়িয়া যাইবে। কিন্তু আমাদের হতাশ হওয়া উচিত নয়। শৃগালদিগের শিক্ষা-প্রণালী অনুসরণ করিয়া এই সকল ছাত্রকে আমরা নানাবিধ মঙ্গলজনক কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে পারি যেমন—

(১) তাঁত বুনা।

(২) গোসেবা।

(৩) পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করা।

(৪) মুড়ি, মুড়কি ও বিস্কুট প্রস্তুত করা।

(৫) এমন কি মিথ্যাবাদী ছোট ছোট ছেলে-পুলেদের নাগরদোলায় আরোহণ করাইয়া, তাহারই ঘূর্ণায়মান Energy-র বলে, সর্ষপতৈল ও খলি বাহির করিয়া লওয়া।

ইহাতে রাষ্ট্রীয় উপকার দর্শে এবং মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা-পরায়ণ শিক্ষিত শৃগালের representative leaders হইয়া রাষ্ট্রের অহিত সাধনের পথ রুদ্ধ হয়।

(৪)

সকলের কৌতূহল জন্মিতে পারে যে শৃগালের ভাষা কি? এবং সেই ভাষা রাষ্ট্র মধ্যে সকলে ব্যবহার করে কি না?

এ সম্বন্ধে আমরা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি যে শৃগালদিগের মধ্যে দ্বিবিধ ভাষা প্রচলিত।

১। সরব। objective.

২। নীরব। subjective.

সরব ভাষা তাহাদিগের প্রকৃতিগত—যেমন—ক্যা—ক্যা—ক্যাহুয়া—খ্যা খ্যা—হুক্কা হুয়া—' ইত্যাদি। ইহা শৃগালত্ব ব্যঞ্জক। এ ভাষায় তাহারা শিক্ষা গ্রহণ করে না কিন্তু শিক্ষিত হয়। ইহার অর্থ ক্রমশঃ প্রকাশ্য। যে ভাষায় তাহারা শিক্ষা গ্রহণ করে তাহা নীরব। অর্থাৎ—

তাহারা আদর্শ শৃগালগণের দৃষ্টান্ত দেখিয়া নীরবে শিক্ষালাভ করে। তাহার কোন পুঁথি নাই ও বক্তৃতাও নাই। ইহাই তাহাদের মাতৃভাষা।

তবে অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে, বিজ্ঞতা লাভ করিয়া যদি কোন বৃদ্ধ শৃগাল ক্লিপ্ত হইয়া পড়ে, তবে সে 'হুক্কা হুয়া' প্রভৃতি নানাবিধ শব্দে শৃগাল-সমাজকে আলা-

তন করিয়া বসে। শৃগাল-সমাজে ইহাদিগের আখ্যা 'সং' (Fool)। যদি কোন স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য, কিংবা কোন স্বামী স্ত্রীর অবাধ্য হয়, তবে শাস্তিস্বরূপ তাহাকে এই 'সং'এর নিকট সকালে ছাড়িয়া দেয়, এবং সে অচিরাৎ 'সং'এর ভাবগতিক দেখিয়া জ্ঞানলাভ করে। অর্থাৎ সরব ভাষা, নীরব ভাষা মাতৃভাষায় তর্জ্জমা করিয়া তাহার সারত্ব উপলব্ধি করে।

মানব-সমাজে ভাষার প্রশ্ন অতি জটিল। মানব 'সরব' ভাষায় শিক্ষালাভ করিতে ব্যগ্র। নীরব ভাষা প্রাণপণে বর্জ্জন করিতে চাহে। তাহার কারণ কি?

প্রথম কারণ। মানুষের কোন বিশেষ রব নাই। সকল জানোয়ারেরই এক একটা ধ্বনি-বিশেষ আছে, তদ্দ্বারা তাহারা পরিচিত। মানবধ্বনির সহিত কথা যুক্ত না হইলে কাহাকেও চিনিবার উপায় নাই। সুতরাং আন্তরিক কোন রকম ভাবের উন্মেষ হইলেই কথা বাহির হইয়া পড়ে। সেই খাঁটি ভাবটুকু যে কথায় মানব সহজে প্রকাশ করিতে পারে, তাহাই তাহার মাতৃভাষা। কথা শুনিয়া আমরা মানবের জাতিবিচারে (ascertainment of species) করিতে সক্ষম। কথার উৎপত্তি কেন? মানবের মধ্যে কেবল এক জাতি নাই। বহুজাতি পরস্পরকে জানিয়া, যেটুকু নূতন, তাহা শিখিতে চায়, এবং তাহার সমীকরণে যত্নবান হয়। শৃগাল অন্যজাতীয় পশুর মনের ভাব কখন গ্রহণ করে না, কারণ ইহাতে বর্ণশঙ্করত্ব উৎপন্ন হয় (crossbreeding)।

দ্বিতীয় কারণ। মানবের মতে নীরব ভাষা কেবল প্রেম, ভক্তি, করুণা প্রভৃতির ভাষা। বিশ্বপ্রেম ইহাতেই বদ্ধমূল হয়। কিন্তু পাছে এ হেন কথার সৃষ্টি হইলে দ্বন্দ্বের উৎপত্তি হয় ও শৃগালত্ব লুপ্ত হয়, সেইজন্য সমাজ কোন বাহ্য ভাষা বিশেষ অবলম্বন করে নাই; কোন শৃগাল স্বীয় প্রিয়তমাকে পত্র লিখিবার, কিংবা কোন ধ্বন্যাত্মক শব্দে প্রেম ব্যক্ত করিবার কল্পনা করে নাই।

শৃগালদিগের সহিত অন্য জাতির কথোপকথন কি করিয়া হয়?

তাহারা ব্যবহারে ও ভাবেই বুঝিয়া লয়। হিতোপদেশে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে শৃগাল শিক্ষা-প্রণালীর ভাষা নীরব, কিন্তু সেই নীরব ভাষাতেই তাহারা সুন্দর তর্জ্জমা করে, এবং কোন বিষয় তাহাদিগের রাষ্ট্রীয় জীবনের উপযোগী কি না, তাহা সাধ্যমত পরীক্ষা করিয়া লয়।

ইহার ইতিহাস খানিকটা জানা গিয়াছে। ব্যাঘ্রদিগের কথা তরজমা করিয়া শৃগাল-সমিতি জানিতে পারিয়াছিল যে, তাহা তাহাদিগের উপযোগী নহে। ব্যাঘ্রদিগের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যেমন কথা, ও ব্যাঘ্রীর যেমন হাট বাজারে ও মাঠে গর্জ্জন, তাহাতে গর্ত্তের মধ্যে বাস করা সুকঠিন। খরগোষের ভাষাও তাহাদিগের উপযোগী নহে, কারণ খরগোষ অতিশয় ঈশ্বর-পরায়ণ ও নিরীহ জাতি।

কিন্তু ইহাও পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে, শৃগাল-সমাজ আপনাকে শিক্ষিত বলিয়া পরিচয় দিবার নিমিত্ত অন্য ভাষা কিঞ্চিৎ শিক্ষা করে। তাহার নাম 'ফেরুভাষা'। অনেকে 'ফেউ' ডাকিতে শুনিয়াছেন বোধ হয়, কিন্তু তাহার অর্থ সকলে বিদিত নহেন। সেটুকু আমরা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

যেটুকু জ্ঞান আমাদের পরিপাক হয়, সেটুকু মাতৃভাষার (শৃগালের পক্ষে অব্যক্ত নীরব ভাষা) বলেই হয়। যেটুকু পরিপাক হয় না, তাহা অগ্নিমান্দ্যের ফলে ঘন ঘন উদ্গীরিত হইতে থাকে এবং তাহা শুনিয়া অন্যান্য জাতি সাবধান হয়। একটা উদাহরণ লইলে হয়। আমরা যদি কোন খাদ্য স্বভাবতঃ পরিপাক করিতে না পারি, তবে কিয়দ্দিন সোডা কিংবা পেপসিন্ সাহায্যে পরিপাক করিবার চেষ্টা করিয়া অবশেষে উদ্গার-প্রমুখ হইয়া পড়ি, সেইটুকু ফেরুভাষার ন্যায় তাহা দেখিয়া সমাজ সাবধান হইয়া পড়ে। অনেকের ধারণা যে ব্যাঘ্রের পশ্চাদ্‌গামী হইয়া শৃগাল 'ফেরুভাষায়' আর্ত্তনাদ করে। কিন্তু তাহা ঠিক নয়। শৃগাল পশ্চাৎ দিকে চাহিয়া চলে, অন্ততঃ পশ্চাতে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করে। কেবল রাষ্ট্রের হিতার্থেই শৃগালবৃন্দ ব্যাঘ্রের আবির্ভাব হইবার পূর্ব্বে ভীতি প্রচার করিয়া থাকে। শৃগাল-ফেরুভাষায় স্বজাতির সহিত অন্যান্য জাতির তুলনা করিয়া থাকে এবং তাহাদিগের আত্মোন্নতি কতদূর হইয়াছে, তাহাও অনায়াসে বুঝিতে পারে।

ফেরুভাষায় যে সকল বিষয় শৃগালদিগের চর্চ্চার যোগ্য তাহা ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের মহাসমিতিতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

১। লজিক্' অর্থাৎ ন্যায়-শাস্ত্র।

২। ভূগোল-বৃত্তান্ত ও ইতিহাস।

৩। জড়-বিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্র।

৪। ভার্নেক্যুলর্ অর্থাৎ পোষাকী ভাষা।

এগুলির অধ্যয়ন অপূর্ব্ব উপায়ে হইয়া থাকে।

শৃগালদিগের মধ্যে 'খেঁকশেয়ালি' নামধেয় একদল পণ্ডিত আছে; তাহারা কুরুক্ষেত্রের সমরের পরবর্ত্তী জীব। সন্ধ্যাকালে তাহারা যখন বিচরণ করে, তখন তাহাদিগের মুখগহ্বর হইতে একপ্রকার জ্যোতিঃ বহির্গত হয়। সেই জ্যোতির অন্যতম নাম

'নোট্'।

বঙ্গভাষায় 'নোটে'র কোন প্রতিশব্দ নাই।

পাঠশালার পণ্ডিতগণ সেই জ্যোতির্ম্ময় 'নোট' হইতে ফেরু-সাহিত্যের সার সংগ্রহ করেন। খেঁকশেয়ালির মুখ হইতে শৃগাল পণ্ডিতগণের মুখে সেই নোট্গুলি সংগৃহীত হইলে, তাহার ফল অচিরাৎ লাঙ্গুলে গিয়া প্রকাশ পায়। এবং তাহার ফলে একপ্রকার শব্দ উৎপন্ন হয়, বোধ হয় আপনারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন।

লজিক্ আখ্যা ত ন্যায়-শাস্ত্র অতিশয় গভীর তত্ত্ব। তাহার প্রধান সূত্র ইহাই:—

সকল পশুই মরণশীল
শৃগাল পশুবিশেষ
সুতরাং শৃগাল মরণশীল।

শৃগালেরা পূর্ব্বে জানিত না যে, তাহাদিগের মরণ অবশ্যম্ভাবী। ক্রমে উপরোক্ত সূত্রের অর্থ চিন্তা করিতে করিতে তাহাদিগের ধারণা দৃঢ় হইয়া সমাধির নিশ্চয়তা সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকিল না। এবং সেই অবধি অনেকে শীর্ণ হইয়া পড়িল।

এই সূত্র হইতে অনেক সূত্র বাহির করিয়া শৃগাল ছাত্রগণ 'নোটের' সার্থকতা প্রচার করিয়া থাকে। যথা

১। যদি করুণাময় ঈশ্বর থাকিতেন, তবে অন্ততঃ একটা জীবকেও বাঁচাইতেন। কিন্তু কোন জীবই বাঁচে না। সুতরাং ঈশ্বর নাই।

২। যে সব বিষয় ভবিষ্যতে কোন কাজে লাগে না, সেগুলি যাহারা শিখায় তাহারা হস্তীমূর্খ। অধ্যাপকবৃন্দ যাহা শিখায়, সেগুলি কোন কাজে লাগে না। সুতরাং অধ্যাপকবৃন্দ হস্তীমূর্খ।

৩। যাহাদের লাঙ্গুল নাই, তাহাদের বুদ্ধি নাই; মানবজাতির লাঙ্গুল নাই, সুতরাং তাহাদের বুদ্ধি নাই!

যদিও উপরোক্ত সূত্রগুলির মধ্যে অনেক fallacy আছে, কিন্তু শৃগাল জাতি 'খ্যাঁকশেয়ালির' নোটের সাহায্যে ন্যায়-শাস্ত্রের মর্ম্ম অচিরাৎ বুঝিয়া লয়।

ভূগোল-বৃত্তান্তে শৃগালগণের অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। পৃথিবী গোলাকার কি না, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য তাহারা ব্যস্ত নহে। শৃগালগণের ভূগোল-বৃত্তান্ত ভূগর্ভ লইয়া, এবং স্বীয় বাসস্থানের এবং দেশের অবস্থা সম্যক্‌রূপে নির্ণয় করাই তাহাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য।

দেশের বাহিরের অবস্থা লইয়া আমরা আন্দোলন করি, অন্তরের অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করি না। শৃগালদিগের দৃষ্টি অন্তরের দিকে। জলের গতি কোন্ দিকে, ভূগর্ভে কতপ্রকার কীট জন্মগ্রহণ করিয়া মারাত্মক ব্যাধিসঞ্চার করিতেছে, এবং স্বাস্থ্যের অবনতি কিসে, এ সকল বিষয়ের তথ্য শৃগাল-সমাজ জ্ঞাত। বিশেষতঃ কোন্ কোন্ স্থানে তাহাদিগের ভক্ষণ-যোগ্য শস্যাদি প্রচুর, তাহার তালিকা প্রত্যেক ছাত্রের নিকট থাকে।

অনেকের ধারণা যে, লোমশ জন্তুদিগের ম্যালেরিয়া রোগ হয় না। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। শৃগাল-জাতির মধ্যেও অনেকস্থলে ম্যালেরিয়া দেখা গিয়াছে। জাহানাবাদ (এখন আরামবাগ) নামক মহকুমায় একটি শৃগাল ম্যালেরিয়া-পীড়িত হইয়া খাজনা-ঘরের (Treasury) চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইত। আমরা দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া তাহাকে ঔষধ সেবন করাইতাম। ক্রমে তাহার প্লীহা বৃদ্ধি হওয়াতে একদিন অঙ্গভঙ্গী দ্বারা বুঝাইয়া দিল যে, দারিদ্র্যই ম্যালেরিয়া ও প্লীহা বদ্ধ হইয়া যাইবার কারণ।

দারিদ্র্য কেন হয়, এবং দেশের কোন্ স্থানে তাহা প্রবল, তাহা শৃগালেরা শিক্ষা করে। পৃথিবী লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, এবং সকল জন্তুরই খাদ্য প্রকৃতি দেবী ক্রমাগত যোগাইতেছেন। যদি কোথায়ও দারিদ্র্য ঘটে, তবে শৃগালেরা মনে করে সেই স্থানের অধিবাসী শৃগালের বুদ্ধি-বিকৃতি ঘটিয়াছে, কিংবা শিক্ষা-বিস্তার হয় নাই। সুতরাং তাহারা হয় ত হাসপাতাল কিংবা পাঠশালা খুলিয়া রোগের উপশম এবং শিক্ষা-বিস্তৃতির পথ খুলিয়া দেয়। তাহার প্রমাণ যে, সেই সকল স্থানে গৃহস্থের উদ্যানে এবং গৃহে ফলমূল, এবং ক্ষুদ্র

পশু, পক্ষী প্রভৃতি হৃত হইয়া শৃগালদিগের ভোগে লাগে। যদি লগুড়-হস্ত গৃহস্থ সে শৃগালকে অনুসরণ করে, তবে সে হয় ত করুণ ভাবে কহে, "মহাশয়, আমার বিচার motive দেখিয়া করিবেন, Intention দেখিয়া করিবেন না। শরীর-পালন ও শিক্ষা-প্রণালীর এত খরচ যে চুরি না করিলে উপায় নাই? এই argumentও যদি না মানেন, তবে গীতা খুলিয়া দেখুন যে, কর্ম্মে আপনাদিগের অধিকার আছে, ফলে নাই। অতএব আপনার উদ্যানের ফল ও গৃহ-পালিত মুর্গী (যাহা আপনার শাস্ত্রে অভক্ষ্য) উভয়ই ন্যায়-শাস্ত্রানুসারে আমার প্রাপ্য। টীকা দেখুন।"

ইতিহাস ও Political economy শৃগালদিগের নিকট একই বিষয়। পয়সা উপার্জ্জন কোন্ দেশে ও কি প্রকারে এবং কোন্ সময়ে শৃগাল জাতিদিগের মধ্যে হইয়াছিল, তাহার বৃত্তান্ত শৃগালজাতির পাঠ্য। সুতরাং তাহারা বৈদিক ও পৌরাণিক সময়ের কোন কথা জানিতে চাহে না। গাজনির মাহমুদের ভারতাক্রমণের পর শৃগালজাতি কি প্রকার উন্নতি লাভ করিয়াছিল, কিংবা য়ুরোপে Elizabethan period-এর পর শৃগালগণ বিদেশীয় বাণিজ্যের ফলাফল মানব-ভাণ্ডার হইতে কি প্রকারে আহরণ করিয়াছিল, এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা তাহাদিগের পাঠশালায় হয়। ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, জীবগণের মধ্যে দ্বন্দ্বের উৎপত্তি হইলেই শৃগালদিগের লাভ। দ্বন্দ্বের ফলে যাহা দাঁড়ায়, তাহা মৃতদেহ। এই মৃতদেহকে শৃগাল-সমাজ (capital) মূলধন বলিয়া গণ্য করে (dead labour)। এই মূলধন হইতে তাহারা সুদের দ্বারা নূতন মূলধনের সৃষ্টি করে। শৃগালজাতি ইতিহাস পাঠ করিয়া বিশেষ ভাবে দেখিয়াছে যে, জীবের দ্বন্দ্বই এই মূলধন লইয়া, অর্থাৎ পরিশ্রমের কর্ম্মের ফল লইয়া; সুতরাং ভগবানকে অর্পণ করিবামাত্র তাহা শৃগালের ভক্ষ্য হয়। শৃগালেরা আত্মার অমরত্বে অবিশ্বাস করে।

বিজ্ঞান ও গণিত শাস্ত্রই শৃগালদিগের প্রিয় বিষয় ইহার অনেক আভাস পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে।

বুদ্ধিবলে শৃগালগণ একপ্রকার কল সৃষ্টি করে; তাহার নাম "ধর্ম্মকল"। সে কল খুব লঘু, এবং দেখিতে তাহাদিগের লাঙ্গুলের মত। এত লঘু যে তাহা বাতাসে নড়ে। এই কল পূর্ব্বে তাহাদের লাঙ্গুলেই ছিল। (লাঙ্গুলই শৃগালের বুদ্ধিস্থল)। ক্রমে ক্রমাবর্ত্তনে (Evolution)এ কুণ্ডলী-শক্তির সাহায্যে তাহাদের মাথায় উঠিয়া, কোন ঐতিহাসিক যুগে অনেক শৃগাল ক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। সেই অবধি তাহারা বিজ্ঞান ও গণিত-শাস্ত্র বাহ্য একটা কলে দাঁড় করাইয়াছিল। ইহাই ধর্ম্মকলের ইতিহাস।

কলটা অতিশয় জটিল। তবে যতটুকু এই প্রবন্ধের জন্য প্রয়োজনীয়, তাহা বুঝাইবার জন্য আমরা সেই ধর্ম্মকলের একটা প্রতিকৃতি নিম্নে দিলাম।

ধর্ম্মের কল

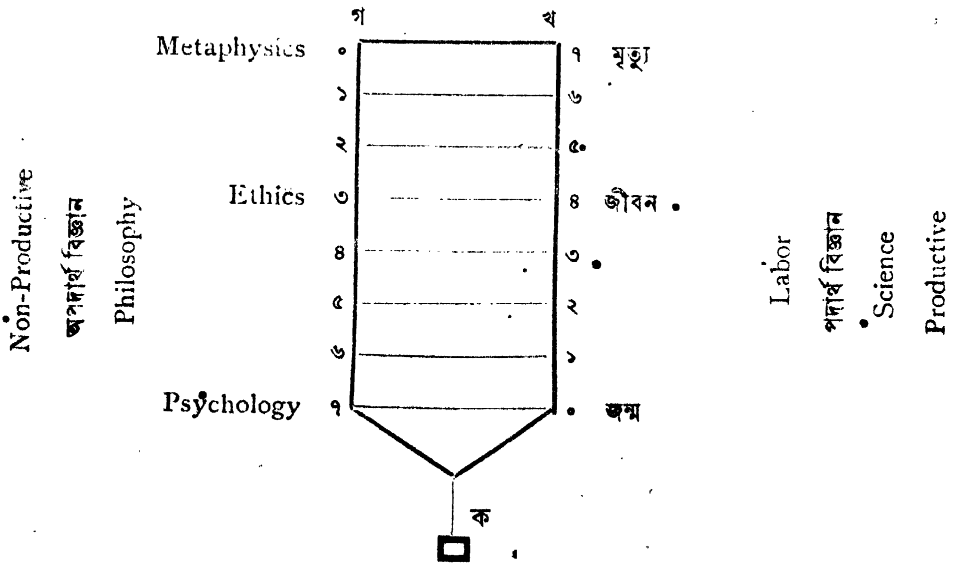

বাতাসে নড়ে

পরিভাষা

ধর্ম্ম—যাহাতে মৃত্যু সহজে হয়।

মৃত্যু—পরিশ্রমের (কর্ম্ম) ফল, যাহা ভগবানে অর্পিত হওয়া শাস্ত্রসম্মত।

জীবন—রাষ্ট্রহিতার্থে পরিশ্রম।

জন্ম—আত্মা পূর্ব্বজন্মে কর্ম্মফল লইয়া যে পরিশ্রম আরম্ভ করে।

সার পরিশ্রম—Productive labour—যাহাতে মৃত্যু সাধিত হইয়া পুনর্জ্জন্ম হয়।

অসার পরিশ্রম—Unproductive labour—যাহাতে মুক্তি হয়।

পদার্থ—যাহা আমরা ইতস্ততঃ দেখিতে পাই। যথা, অন্ন, ব্যঞ্জন, দুগ্ধ, ঘৃত, সিগারেট, মাংস, মৎস্য, মোটরকার প্রভৃতি।

পরিশ্রম—যাহাতে শরীর, পদার্থের যোগে ক্ষয়-প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুকবলে পতিত হয়।

অপদার্থ—ধর্ম্ম ও কর্ম্মের বাহিরে যাহা। যথা, শাস্ত্র, ভগবদ্ভক্তি, দেবসেবা, স্নেহ-মমতা, দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি।

বাতাস—জনসাধারণের রাষ্ট্রীয় মত।

শৃগাল-বিজ্ঞানের মতে, জীবের পরিশ্রম (energy) তাহাদের ভোগ্য বিষয়ে পরিণত হয়। অর্থাৎ জীবশক্তিই রূপান্তরে পরিণত হয়। যেমন (মানব-সমাজে) তূলার বীজ-বপন + পরিশ্রম = তূলা; তূলা + পরিশ্রম = সূতা; সূতা + পরিশ্রম = কাপড়। গরু + পরিশ্রম = দুগ্ধ; দুগ্ধ + পরিশ্রম = ঘৃত; ঘৃত + চাউল + পরিশ্রম = পোলাও।

একটা লোক কেবল নিজের পরিশ্রমে তাহার জীবন রক্ষা করিতে পারে। অর্থাৎ তাহার পরিশ্রমজাত শক্তি সে নিজেই আহার করিয়া নির্দ্দিষ্ট আয়ু বজায় রাখে। কিন্তু, তাহার পরিশ্রমজাত ভোগ্য বস্তুর ভাগ যদি অন্য লোকের ভোগে অর্পিত হয়, এবং তাহার বিনিময়ে যদি সে অন্য লোকের পরিশ্রমজাত জীবন-ধারণোপযোগী অন্য-প্রকার ভোগ্য বস্তু না পায়, তবে তাহার আয়ুক্ষয় হয়।

সকলে একই পরিমাণে শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে না। কাহারও নির্দ্দিষ্ট আয়ুর অর্দ্ধেক, কাহারও কেবল এক-চতুর্থাংশ শক্তি থাকে। কিন্তু অন্যের শক্তির (পরিশ্রমের) ভাগ ফাঁকি দিয়া লইতে পারিলে, তাহাদিগের আয়ুর্বৃদ্ধির একটা পথ হয়।

অন্যের শক্তি উপরোক্ত উপায়ে লাভ করিতে হইলে, এমন ভোগ্য বস্তুর সৃষ্টি করিতে হয়, যাহাতে সেই অন্য লোক তাহাতে বেগতিক আরাম (luxury) পায়, এবং শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

মৃত্যুমুখে পতিত হইলেই শৃগালদিগের লাভ।

সুতরাং অন্য জীব যাহাতে শীঘ্র মরে, তাহার উপায় উদ্ভাবন করা এবং দ্বন্দ্বের উৎপত্তি করাই শৃগালদিগের জ্ঞান-তত্ত্ব।

এ সম্বন্ধে যাহার যত বুদ্ধি, তাহার মূল্য তত বেশী। ইহা রাষ্ট্রহিতার্থে।

অবশ্য মানব-সমাজে আমরা উপরোক্ত বিজ্ঞান অনুমোদন করিতে পারি না, কারণ লোকক্ষয় হইলেই তাহাদের পরিশ্রমও অন্তর্ধান হয়; এবং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির অপরের পরিশ্রম (ঠকাইয়া) লাভ করিবার পথ বন্ধ হয়। যখন প্রাকৃতিক পদার্থের অকুলান হইয়া পড়ে, এবং পরিশ্রম সংযুক্ত করিবার পদার্থই থাকে না, কিংবা ভূমি অনুর্ব্বরা হইয়া যায়, অনাবৃষ্টি হয়, ইত্যাদি, তখন লোক-ক্ষয় হয় ত দরকার হইতে পারে। কিন্তু শৃগালদিগের অপর জীবের মৃত্যুই বাঞ্ছনীয়; অতএব তাহারা বুদ্ধির মূল্য সেই পথেই নির্দ্ধারণ করে।

কি করিয়া নির্দ্ধারণ হয়?

বুদ্ধির ওজন কিংবা পরিশ্রমের মূল্য নির্দ্ধারিত করিতে হইলে, স্বীয় লাঙ্গুল ঐ ধর্ম্মকলে ক অঙ্কিত স্থানে প্রবিষ্ট করাইয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইতে হইবে। লাঙ্গুলের স্পন্দনে (ইহার Vibration ইথারের স্পন্দনের অষ্টমাংশ) কল বাতাসে নড়িতে থাকিবে। এবং তাহার ফলে উত্তাপের সৃষ্টি হইয়া পরীক্ষার্থী শৃগালের মূল্য খ অঙ্কিত পারদযুক্ত নলে Graduated Scaleএ প্রকাশ হইয়া পড়িবে। পারদ যত মৃত্যুর দিকে উঠিবে, ততই পরীক্ষার্থীর মূল্য বেশী।

ইচ্ছা করিলে আমরাও এই কল ব্যবহার করিতে পারি। কেবল লাঙ্গুলের পরিবর্ত্তে মস্তক প্রবিষ্ট করাইলেই হইল। মনে করুন, একজন ভিষক (বৈদ্য কিম্বা ডাক্তার) তাঁহার বুদ্ধি ও পরিশ্রমের মূল্য পরীক্ষা করিতে চাহেন। ধর্ম্মকলে মাথা ঢুকাইয়া দিলে, তাঁহার Index যদি ৭ সংখ্যায়

দাঁড়ায়, তবে তাঁহার মূল্য নিম্নোক্ত Formula অনুসারে নির্দ্ধারিত হইবে, যথা :—

Value = Unit of Energy × (Unit of Faculty)²

মূল্য = পরিশ্রম কিংবা শক্তি × (মৃত্যু-সাধনের উপায়)²

= আটআনা × ৭ × ৭

= ২৪৷৷০ টাকা (দৈনিক ভিজিট)

এখন দেখিতে হইবে যে, unit of energy একটা variable quantity—একটা মুটে-মজুরের দৈনিক পরিশ্রমের মূল্য যত, তাহাই আপাততঃ Wage-standard ধরা হইয়াছে। যদি ধর্ম্মঘট করিয়া তাহারা ১৲ টাকা করিয়া দেয়, তবে শক্তির মূল্য (unit) বাড়িয়া গেল। সুতরাং একজন ডাক্তার কিংবা অন্য বুদ্ধিজীবীর মূল্যও বাড়িয়া যাইবে।

এখন গ অঙ্কিত নলের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখুন। যদি এই নলেও পারদ উঠিয়া পড়ে,—তবে বুঝিতে হইবে যে, পরীক্ষার্থী লোকটার অপদার্থের ভাগ (বেয়াকুফি)ও আছে। সকলেই পূর্ণ বুদ্ধিমান হয় না, এবং তাহার Graduated Scaleও স্থির করা দুষ্কর। সুতরাং অপদার্থের ভাগ বিশ্লেষণ পূর্ব্বক বাহির না করিলে, একটা জীবের খাঁটি মূল্য নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব। আরও ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখুন। একটা বলদকে ধর্ম্মকলে ফেলিয়া দিলে, হয় ত তাহার মূল্য নলে ১ পর্য্যন্ত উঠিবে। অতএব তাহার মজুরি শকট আকর্ষণ করিবার পরিশ্রম, যাহা গাড়ওয়ান কিংবা মালিক বসিয়া খায়) ৷৷০ স্থির হইল। এ স্থলে গ চিহ্নিত নলে পারদ উঠিবে না ; কারণ, গরুর পক্ষে দর্শন-শাস্ত্র নাই ; কারণ, তাহার আত্মা নাই। যাহাদের আত্মা আছে, তাহাদের একটা Subjective Idealism আছে ; এবং Moral consciousness নামক কুপ্রকৃতি আছে, এবং মনোভাবও আছে। এই সব অপদার্থ faculty থাকিবার জন্য মানব পশুদিগের ন্যায় খাঁটি বুদ্ধিজীবী হয় না। Subjective Worldএর (Parallelismএর ফলে) তাহারা বিচার আরম্ভ করে।

সুতরাং গ চিহ্নিত নলের ফল খ চিহ্নিত নলের ফল হইতে বিয়োগ করিতে হইবে। লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন যে, যার যত খ এর দিকে উন্নতি, তত গ এর দিকে অবনতি। ইহা কেবল মানব-পক্ষে। যাহার ৭ নম্বরে স্থিতি সে খুব পাকা লোক এবং মুক্তিতত্ত্ব তাহার কণ্ঠস্থ। ৬ নম্বরের জীবের মূল্য

মূল্য = (৬—১)² × ৷৷০ আনা

= ১২৷৷০ টাকা

সেই প্রকার ৫ নম্বরের জীবের মূল্য

= (৫—২)² × ৷৷০ আনা

= ৪৷৷০ টাকা

আবার লক্ষ্য করুন।

যদি কোন মানবের নম্বর ৩ হয়, এবং পারদের দিকে ৪ নম্বরে গিয়া উঠে, সে এক নম্বরের অপদার্থ। সেই রকম ২নং ওয়ালা (২—৫ = —৩) তিন নম্বরের অপদার্থ ইত্যাদি।

এ প্রকারের লোক (যাঁহাকে আমরা 'ধার্ম্মিক' বলিয়া থাকি) শৃগাল-সমাজে দূষণীয়, এবং তাহাকে বিনামূল্যে (without wages) মোট বহিতে হয়।

এই ধর্ম্মকলের সার্থকতা বহুবিধ। ইহা দ্বারা আমরা পরিশ্রমজাত দ্রব্যেরও মূল্য নির্দ্ধারণ করি, এবং যে সকল বৃত্তি দ্বারা মৃত্যু সহজে সাধিত হয়, তাহারও মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে পারি।

কোন পুস্তক নলে ফেলিয়া দিলে তাহার মূল্য তৎক্ষণাৎ বুঝা যায়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, Realistic Novelগুলির মূল্য বেশী। সেইরূপ ছবি, টেবল, চেয়ার, কোচ, দর্পণ, পাউডার, কাচের খেল্‌না, প্রভৃতির মূল্য বেশী। অপ্রিয় সত্য হইতে প্রেয় মিথ্যার মূল্য বেশী।

এই কল দ্বারা Labour and Wages Problem খুব সহজ হইয়া গিয়াছে।

এই কলের সাহায্যে গণিত দ্বারা শৃগালেরা সুদ কসিয়া লয়। মৃত পরিশ্রমের নাম সুদ। এবং সেই সুদ একত্র হইলে যে পদার্থ সৃষ্ট হয়, তাহার আখ্যা Capital। সুদ মস্তকে আসিয়া জমে। এইজন্য মস্তক ছিন্ন করার পরিভাষা Capital punishment। শূন্য O মূলধন (Capital) নামক পদার্থের Unit, এবং শূন্যের সংখ্যা যত সুদে বৃদ্ধি পায়, ততই জীবেরও উন্নতি। প্রাণীতত্ত্বে ইহাকে Multiplication of cells কহে। শূন্যের সংখ্যা সম্পূর্ণ হওয়ার নাম Evolution.

ধর্ম্মের কল দ্বারা আমরা অন্ততঃ ইহাই বুঝিতে পারি

যে, মরণ ও তাহার আনুসঙ্গিক বৃত্তি ও পদার্থগুলিই জগতে একশ্রেণীর লোক মূল্যবান বিবেচনা করে। যাহাতে দ্বন্দ্ব নাই, এবং যাহাকে আমরা ধর্ম্ম বলিয়া থাকি, Labour-marketএ তাহার মূল্য কম। অসদ্বুদ্ধির মূল্য সদ্‌জ্ঞান হইতে বেশী।

ভর্ণেকুলার অর্থাৎ পোষাকী ভাষা।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, শৃগালদিগের ভাষাতত্ত্ব আমাদিগের মতের বিপরীত। তাহাদিগের মতে ভাষার আয়তন কমাইয়া খুব ছোট করিয়া লইলে, কেবল 'ক্যা হুয়া? ক্যা? ক্যা?' রূপে দাঁড়ায়। তাহার অর্থ 'কি হইল? (কি রকম) এ সব কি? কি?'। জগতে কোন প্রশ্নের এ পর্য্যন্ত মীমাংসা হয় নাই, ইহা শৃগালদিগের বিশ্বাস; সুতরাং তাহারা এক রকম Agnostic বলিলেও চলে। সংসারের অসারত্ব বুঝাইতে হইলে তাহারা কেবল হু——শব্দ দীর্ঘ করিয়া সন্ধ্যার সময় লোকালয়ের নিকট, কোন মাঠে ব্যক্ত করে। সেই উদাস ধ্বনিতে গৃহস্থের মৃত্যু-ভয় উপস্থিত হয়। কোন জীব ব্যঙ্গে বকিলে, শৃগালেরা তাহা তুচ্ছ করিয়া "ক্যা" ধ্বনি প্রকাশ করে। তখন সে লজ্জিত হইয়া পলাইয়া যায়।

(৮)

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, যদিও শৃগালদিগের দীক্ষা-প্রণালী আমরা সম্পূর্ণভাবে জ্ঞাত নহি, তবুও যতদূর জানা গিয়াছে, ইহার মধ্যে মানব-শিক্ষাপ্রণালীর সহিত কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। মানব-শিক্ষাপ্রণালীর এখনও সম্পূর্ণভাবে বিকাশ হয় নাই; তবে মানব এবং শৃগালের ন্যায় কোন বুদ্ধিজীবী পশুর পার্থক্য এই যে, মানবের ধর্ম্ম নামক বৃত্তি পশুধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ। শৃগালেরা তাহা স্বীকার না করিলেও, আমরা তাহা ব্যক্তিগত চৈতন্য হইতে বুঝিতে পারি (Moral consciousness)। যাহাদিগের Individualism এখনও ফুটিয়া উঠে নাই, তাহারা অনেকে শৃগাল-ধর্ম্মী, এবং ব্যক্তিগত অহঙ্কার থাকায় তাহারা শৃগাল হইতেও অধম। শৃগালদিগের চৈতন্য Collective এবং রাষ্ট্রবোধই তাহার চরম স্ফূর্ত্তি। রাষ্ট্রবোধে একতা আছে; কিন্তু তাহা অন্যান্য জীবের রাষ্ট্রবোধের প্রতিদ্বন্দ্বী। অতএব শৃগালদিগের মধ্যে ভক্তি নামক কোন পদার্থ নাই। তাহাদিগের একতা কেবল রাষ্ট্রহিত লইয়া।

এই ভক্তি পদার্থের স্ফুরণ না হওয়াতে আমরা দেখিতে পাই যে, শৃগালগণ ক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে; এবং শ্মশানস্থলে উপস্থিত হইয়া বিকট চীৎকার করে। সেই ধ্বনি অত্যন্ত বিষাদপূর্ণ। তখন পিতা, মাতা, সখা, আত্মীয়স্বজনের ভাব কিছুই থাকে না। বোধ হয় তাহারা বুঝিতে পারে, স্বার্থের জগতে আনন্দ নাই। Collective স্বার্থ শুনিতে ভাল; কিন্তু সেই স্বার্থের ভাব আবার ব্যক্তিগত স্বার্থে প্রতিবিম্বিত হইয়া রাষ্ট্রের মধ্যেও দ্বন্দ্বের উৎপত্তি হয়; এবং সঞ্চিত অর্থ নামক শব লইয়া তখন সকলে কাড়াকাড়ি করে। জীবনের উদ্দেশ্য যে পরম আনন্দ, তাহা নিরানন্দে পরিণত হয়।

বহুধনপূর্ণ, সৌধমালা-সুশোভিত, জনাকীর্ণ বড়-বড় দেশ এবং মহানগরী এইরূপে প্রাচীনকালে ধ্বংসমুখে পতিত হইয়া শৃগালের বাসস্থান হইয়াছিল। বহু রণক্ষেত্রে গলিত শব ও শোণিতের প্রাচুর্য্য দেখিয়া, শৃগালের দল বোধ হয় এককালে বুঝিয়াছিল যে, সংসারের বুদ্ধিই জ্ঞানের চরম। কিন্তু তবুও শৃগালের ক্রন্দনরোল শুনিয়া বোধ হয়, তাহারা শ্মশানে দাঁড়াইয়া তার-স্বরে মানব-সমাজকে উপদেশ দিতেছে, "সাবধান! এ মহাভীতিময় পথে আসিতে হইলে, আমাদের যেটুকু অভাব আছে, তাহা তোমরা পূরণ করিয়া এস। একটা কোন পদার্থবিশেষ আছে, যাহা নিধনের পরও সুহৃদের ন্যায় অনুবর্ত্তী হয়। যখন চক্ষু চিরদিনের জন্য মুদিত হয়, তখন সে সখারূপে তোমাকে সযত্নে অঙ্কে লইয়া কোন অজ্ঞেয় স্থানে তোমাকে রক্ষা করে।"

যে সমাজের শিক্ষাপ্রণালীতে ধর্ম্মের কথা নাই, এবং যে শিক্ষা ধর্ম্মকে প্রকাশ না করিয়া গুহার মধ্যে তাহার তত্ত্ব রাখিয়া দেয়, তাহার ফল এই শ্মশান-গীতি। যেস্থানে ধর্ম্মের মন্দির নাই, সেস্থানে ধ্বংসের চিহ্ন শীঘ্রই প্রকাশ হয়। সেখানকার সঙ্গীত মরণ-সঙ্গীত, সেখানকার বিলাস ও দ্বন্দ্বছন্দ মহাকালের তাণ্ডব নৃত্য।

আদর্শ মানব মানব-সমাজে বিরল। কিন্তু ভক্তিরস সিঞ্চিত হইলে এই শ্মশানেই আদর্শ মানব ফুটিয়া উঠে। ভক্তির প্রভাবে পশুবৃত্তি দূর হয় এবং অত্যন্ত পাপী পুণ্যময় হইয়া পড়ে। পুত্রের স্নেহ ও ভক্তি দেখিয়া অধম পিতা দেবতুল্য হয়; শিষ্যের ভক্তি পাইয়া গুরু আনন্দময়ের সন্ধান পায়; বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনের ভক্তির বলে পরিবার ও সমাজ

ভক্তিপূর্ণ হইয়া উঠে। ভক্তি ব্যক্তিগত। একটী প্রদীপ জ্বলিলে অনেকগুলি জ্বলিয়া উঠে। একটী তার বাজিলে হৃদগত অসংখ্য বীণা বাজিয়া উঠে। একটী গান গাহিলে পুরানো ও হারানো গানগুলি মনে পড়ে।

তাই শ্মশানবাসী শৃগালের উদাস রোল শুনিতে আমরা ভালবাসি। তাহাদের কথা বহু পুরাতন, ঐতিহাসিক এবং বহু ধ্বংসের মর্ম্মবাণী। মানব-সমাজ যদি তাহার মর্ম্ম বুঝিতে না পার, যদি মোহে পড়িয়া আত্মজ্ঞান হারাইয়া বসিয়া থাক, তবে ঘোর সন্ধ্যায় তান্ত্রিকের ন্যায় নর-কপালে প্রদীপ জ্বালিয়া শ্মশানের অনতিদূরে নীরব হইয়া উপবিষ্ট হও। ক্রমে শৃগালের বাণী বুঝিতে পারিবে। ক্রমে তোমার মস্তক বিশ্বদেবতার চরণে প্রণত হইবে। যথার্থ জ্ঞানের উন্মেষ হইবে। জ্ঞানের বলে জগতের হিত বুঝিতে পারিবে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

তন্ত্রশাস্ত্র প্রাচীন কি না?

[পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কাব্য-পুরাণতীর্থ]

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ অতি প্রাচীনকাল হইতে আর্য্য ঋষিগণ-সমীপে কর্ম্মভূমি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। আস্তিক্য-বুদ্ধি মহাত্মগণ ভারত ভূমি ব্যতীত অন্যান্য দেশসমূহকে ভোগ ভূমি বলিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য দেশের সর্ব্বজন প্রশংসিত সভ্যতা ও জ্ঞান-গরিমা যে প্রাচ্য মহাদেশের আদিম সম্পত্তি, তাহা প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত। বিশেষতঃ ভারত ভূমি, প্রাচ্য মহাদেশের মুকুট-স্বরূপ বিরাজিত থাকিয়া, বহু ধর্ম্ম, ধর্ম্ম-প্রচারক, ও ধর্ম্ম-শাস্ত্রের যত অবতারণা করিয়াছে, অন্যান্য দেশ সম্বন্ধে তাহার তত আলোচনা না করিলে বিশেষ ত্রুটি অনুভূত হয় না। ভারতীয় ধর্ম্ম, ধর্ম্ম-প্রচারক ও ধর্ম্ম-সংহিতাদির সহিত তুলিত হইলে, অন্যদেশীয় ধর্ম্ম সংহিতাদির গৌরব অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়। অনেকের মতে, ধর্ম্ম-বিশ্বাসে ভারতবর্ষীয় নিরক্ষর কৃষক অন্য দেশে গুরু পদবী লাভের নিতান্ত অযোগ্য নহে।

কাল-মাহাত্ম্যে দেশ, প্রকৃতি ও জীবগণের আভ্যন্তরিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বহু পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইলেও, প্রাচীনতম কালে আর্য্য ঋষিগণের পূত হৃদয়-মন্দিরে প্রতিধ্বনিত হইয়া, তাঁহাদের কণ্ঠদেশ ভেদ পূর্ব্বক যে সনাতন বেদ-গাথা জীমূত-মন্দ্রে দিগ্‌দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল, স্বতঃপ্রবৃত্ত হৃদয়োন্মাদী যে স্বর-প্রবাহের অপূর্ব্ব তরঙ্গ-বিভঙ্গে তুচ্ছ অস্তিত্ব-অহমিকাদি জলাঞ্জলি দিয়া, বিচিত্র নবভাবে প্রবুদ্ধ ভাগ্যবান আর্য্য ঋষিগণ,—অলৌকিক আনন্দ-চঞ্চল কণ্ঠে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি অপূর্ব্ব বার্ত্তা সর্ব্বাগ্রে জগতে প্রচারিত করিয়া, ভীতকে আশ্বস্ত, ব্যষ্টিকে মিলিত, আত্মন্তরীকে সংযত ও জগৎ-প্রপঞ্চকে স্বপ্নমাত্রে পর্য্যবসিত করিবার যে মঙ্গলময় অভিনব বীজ জনসমাজে নিহিত করিয়াছিলেন, কালসহকারে তাঁহাদের অপূর্ব্ব সাধনা-পরম্পরারূপ নির্ম্মল জলধারে সিক্ত ও তাঁহাদের অধ্যবসায়ের পুরস্কার-স্বরূপ যে প্রাথমিক বীজ অঙ্কুরিত, দ্বিপত্রিত, পল্লবিত, পরিশেষে শাখা-প্রশাখা-স্কন্ধ-পুষ্প-ফল-ভূয়িষ্ঠ মহামহীরুহ রূপে দণ্ডায়মান হইয়া বপ্তার কৃতকৃত্যতা, দর্শকের নয়নাভিরামতা, শ্রোতার বিস্ময়, ফল-প্রেপ্সুর সর্ব্বকালিকতা ও ফলাস্বাদীর আনন্দতন্ময়তা আনয়ন করিয়াছিল, সেই সনাতন, সর্ব্বব্যাপী বেদ-বৃক্ষের এক-একটী শাখা-প্রশাখা হইতে আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ব, জ্যোতিষ, দর্শন, তন্ত্র, সংহিতা, পুরাণ ও স্মৃতি প্রভৃতি সার্ব্বজনীন শাস্ত্রসমূহ আত্ম-প্রকাশিত করিয়া সমাজের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে ও আধিভৌতিকাদি তাপত্রয়-নিরসনে ওতপ্রোতভাবে অহরহঃ ব্যাপৃত রহিয়াছে। সমাজ-বিপ্লবে, রাজবিপ্লবে, ও নৈসর্গিক নানাকারণে সনাতন বেদ-বৃক্ষের বহু অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত, বিচ্ছিন্ন ও অনেকাংশে বিপর্য্যস্ত হইলেও, যে সামান্যাংশ অদ্যাপি অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাহাকে দৃঢ় মূল ভিত্তি রূপে আলিঙ্গন করিয়া, প্রচলিত দর্শন-তন্ত্র-পুরাণাদি স্ব-স্ব বিজয়-গৌরব জলদস্বরে জগৎ-সমক্ষে বিঘোষিত করিতেছে।

কাল-চক্রের কুটিল আবর্ত্তনে নিয়ত ঘূর্ণায়মান আধুনিক আর্য্যসমাজ অপরিহার্য্য নানা কদর্য্য ব্যাপারের অধীন হইলেও, স্বতঃ-পরতঃ বা সংস্কার-বশে বৈদিক আচার-ব্যবহার-পরম্পরার সামান্যাংশও যে নত মস্তকে বহন করিয়া আসিতেছে, এ কথা সহস্র কণ্ঠে অস্বীকৃত হইলেও, তাহার অবলম্বিত কার্য্য-পদ্ধতি বেদ-পরতন্ত্রতার উজ্জ্বল সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

দর্শন-তন্ত্র-পুরাণাদির বিমলচ্ছটায় সাধারণের নয়ন-মন আকৃষ্ট হইলেও, তাহাদের গৌরব-পরম্পরা যে বৈদিক মূল ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, সূক্ষ্ম রূপে পর্য্যালোচিত হইলে ইহা সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে। এজন্য দর্শনাদি নানাসাজে সজ্জিত ও বিবিধ আবরণে সমাচ্ছাদিত হইয়া মনস্বি-সমাজে বেদাঙ্গ নামে কীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। বাস্তব পক্ষে বলিতে হইলে, দর্শন-তন্ত্রাদি লইয়া বেদের সর্ব্বৈশ্বর্য্য সর্ব্বত্র বিরাজিত।

পক্ষান্তরে, বৈদিক মত-সমষ্টি বিবিধ সহজ উপায়ে প্রচারিত ও যুক্তিযুক্ত করিয়া দর্শনাদি সফলতা লাভ করিয়াছে।

আস্তিক্য-বুদ্ধি আর্য্য ঋষিগণ বেদের নিত্যত্ব ও স্বতঃপরতা স্বীকার করিয়া, তদানুসঙ্গিক দর্শনাদি মতবাদেরও নিত্যতা একবাক্যে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তাঁহাদের উপজীব্য স্বীকার-পদ্ধতিকে মূল ভিত্তি রূপে গ্রহণ করিয়া, স্মৃতি-তন্ত্র-দর্শনাদি অধিকারিগণের উপকারার্থ বৈদিক-বাদের উচ্চ-নীচ সোপান-পঙ্‌ক্তি বিভক্ত করিয়া আসিতেছে। পুণ্য-ভূমি ভারতবর্ষে কোন ধর্ম্মমত, সনাতন বেদগাথাকে উপেক্ষা করিয়া স্বীয় স্বাধীন মত প্রকাশ করিতে সাহসী হয় নাই। ন্যায় ও বৈশেষিকের সুযুক্তিপূর্ণ দ্বৈতবাদ,—বেদবাণীরই সুধাময় ফল। সাংখ্য ও পাতঞ্জলের প্রকৃতি পুরুষবাদ,—শ্রুতি-জননীরই বিচিত্র গর্ভ-প্রসূত। পূর্ব্ব মীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসার বিরাট কলেবর শ্রুতিসমূহের আপাত-বিরোধী মতবাদের সামঞ্জস্য-বিধানে সর্ব্বশক্তি নিয়োজিত রাখিয়াছে। দর্শনাদির দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধা-দ্বৈতবাদ, শূন্যবাদ ও নাস্তিক্যবাদ প্রভৃতি যত বাদের অবতারণা, কল্পনা ও পর্য্যালোচনা হউক না কেন, সকলেই স্বীয় মতের প্রাধান্য স্থাপনে শ্রুতি-বাক্যের শরণাপন্ন হইয়াছেন। যাঁহারা আত্ম-অহঙ্কারে জ্ঞানশূন্য হইয়া শ্রুতি-বাক্যে উপেক্ষা বা তীব্র কটাক্ষের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদের অস্তিত্ব বেদাধিকৃত ভারতবর্ষ হইতে প্রায় চির-নির্ব্বাসিত হইয়া, অন্যত্র অন্য রূপে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে উপাস্য, উপাসক ও ধর্ম্ম-সম্প্রদায়, নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেও, একমাত্র শ্রুতি-জননীর সুকোমল অঙ্কে যে তাহারা সকলেই সমধিষ্ঠিত, অল্প আলোচনাতেই তাহা সকলের বোধ-গম্য হয়। বিশেষতঃ, পরম কারুণিক, পরম যোগী মহাদেব মুখারবিন্দ-বিনিঃসৃত তন্ত্রশাস্ত্র যে মঙ্গলময় মতবাদের অবতারণা করিয়া সর্ব্ব-সম্প্রদায়ের উপর মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, তাহাতেই তাহার সর্ব্বতো-মুখী প্রতিভা স্বতঃ প্রকাশিত হইতেছে।

তান্ত্রিক সম্প্রদায় বলেন, আপাত-দৃষ্টিতে বেদ ও তন্ত্রমধ্যে বিষম পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয় সত্য; তথাপি বস্তুতঃ তাহা নাই, বা হইতে পারে না। স্থূল সৃষ্টির নিদানভূত সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বাত্মা হিরণ্যগর্ভের সূক্ষ্ম মানস-পটে যে বেদগাথার প্রাথমিক পরিস্ফুরণ হইয়াছিল, তদনুসৃত স্থূলদেহ মহর্ষি-গণের পূত হৃদয়ে অবাঞ্ছিত স্থূল রূপে তাহাই প্রতিবিম্বিত হইয়া নানা শাখা, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণাদি রূপে স্বীয় বিপুল কলেবর প্রকাশিত করিয়াছে। পরম কারুণিক, পরম পুরুষ পরমেশ-কথিত তন্ত্র-শাস্ত্র স্বতঃসিদ্ধ বেদগাথার বিরোধ-ভঞ্জনে ও অন্তর্নিহিত অভিপ্রায়সমূহের প্রকাশে সঙ্গে-সঙ্গেই আবির্ভূত হইয়াছে।

পাশ্চাত্য বিদ্বন্মণ্ডলী ও তাঁহাদের শিষ্য প্রশিষ্য এতদ্দেশবাসী মহাত্মা-গণ অনেক দিন হইতে বলিয়া আসিতেছিলেন, তন্ত্রশাস্ত্র অত্যন্ত আধুনিক, ও তন্ত্রোক্ত ধর্ম্ম বেদবিরোধী অনার্য্য জাতির ধর্ম্ম। তন্ত্রোক্ত ধর্ম্ম আর্য্য জাতির ধর্ম্ম হউক্ বা না হউক, সম্প্রতি তদ্বিচারের প্রয়োজন নাই; তবে তন্ত্রশাস্ত্র প্রাচীন, কি আধুনিক, তাহার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক নহে। যে শাস্ত্র হিন্দু-নামধেয় আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার হৃদয়ে সাদরে অভ্যর্চ্চিত হইতেছে, যাহার মাহাত্ম্য প্রতি পদে উদ্‌ঘোষিত হইয়া শাস্ত্র-রাজ্যে প্রায় একাধিপত্য বিস্তার করিতেছে, যাহার সলীস অঙ্গুলি-সঞ্চালনে সশঙ্ক আধুনিক ভারতীয় পঞ্চোপাসক, যোগী, ভক্ত, জ্ঞানী—এমন কি, ধনি-সম্প্রদায় যাহার পদাঙ্কের অনুসরণ করিতেছেন,—সংক্ষেপে বলিতে হইলে, যে শাস্ত্রের পুণ্যময় সত্তায় সমাজ, রীতি, নীতি, ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও পরিণতি বর্ত্তমান সময়ে নবসাজে সজ্জিত, পরিবৃদ্ধিত, পরিমার্জ্জিত ও রূপান্তরিত হইয়াছে, সেই তন্ত্রশাস্ত্র কত কাল হইতে ভারতীয় ধর্ম্ম-মন্দিরে অর্চ্চিত, স্তুত ও গুরুবৎ আদেশ প্রচারে সদা নিরত রহিয়াছে, তাহার আলোচনা করা প্রত্যেক ভারতবাসীর অবশ্য কর্ত্তব্য।

পাশ্চাত্য বিদ্বৎ-সমাজের অনেক মহাত্মা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, চির-পরাধীন ভারতবাসীর ধর্ম্মশাস্ত্রাদি নিতান্ত অভিনব ও বীভৎস ব্যাপারে পরিপূর্ণ। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য মহাপণ্ডিত বিচারপতি মহাত্মা উড্‌রফ মহোদয়ের সুদৃষ্টি তন্ত্র-শাস্ত্রের উপর নিপতিত হইয়া, প্রচলিত মতবাদে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। বড় আনন্দের সহিত বলিতে হইতেছে, তাঁহার সুযুক্তিপূর্ণ তন্ত্রশাস্ত্রীয় বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদির প্রচারে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত অনেক মহাত্মার পূর্ব্ব বিশ্বাস সংশয়-দোলায় দোলায়মান হইতেছে; কেহ বা তাঁহার স্বরমন্ত্রে স্বীয় ক্ষীণ স্বর মিশ্রিত করিয়া তন্ত্র-শাস্ত্রের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন। যে তন্ত্র-শাস্ত্রের নামে ভারতীয় শিক্ষিত মহো-দয়গণ ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিতেন, তাঁহারা এক্ষণে পূর্ব্বভাবে জলাঞ্জলি দিয়া তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিয়াছেন। ফলতঃ, বর্ত্তমান সময়ে তন্ত্র শাস্ত্রের একটা প্রশংসার দিন যে সমুপস্থিত হইয়াছে, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। তন্ত্রোক্ত ধর্ম্ম অনার্য্য জাতির ধর্ম্ম বলিয়া আজকাল কেহ প্রায় উল্লেখ করেন না। তবে তাহার আধুনিকত্ব সম্বন্ধে পূর্ব্ব-ধারণা যে পূর্ব্ববৎ বদ্ধমূল রহিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ-রূপে অনুভূত হয়। তন্ত্র-শাস্ত্র প্রাচীন কি আধুনিক, তাহার বিচারে অদ্যাপি কেহ হস্তক্ষেপ করেন নাই। তাঁহা-দিগকে উক্ত কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য অকিঞ্চনের এই সামান্য প্রয়াস।

তন্ত্রশাস্ত্রের আধুনিকত্বে নব্য সম্প্রদায়ের প্রধান যুক্তিবাদ।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত অনেক মহাত্মা বলিয়া থাকেন,—তন্ত্র-শাস্ত্র অতি অল্পকাল হইল প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। এতৎসম্বন্ধে তাঁহারা যে হেতুবাদ প্রদর্শন করেন, সর্ব্বাগ্রে তাহা উল্লিখিত হইতেছে।

১। যদি তন্ত্র ও তান্ত্রিক ধর্ম্ম প্রাচীন হয়, তাহা হইলে প্রাচীন বেদে তাহার উল্লেখ নাই কেন?

২। বৈদিক যুগের কথা দূরে থাকুক, বেদের পরবর্ত্তী উপনিষৎ দর্শন, স্মৃতি, পুরাণ বা ইতিহাসেও তন্ত্রের নামগন্ধ নাই।

৩। বিখ্যাত কোষকার অমরসিংহ স্বরচিত অমরকোষ নামক অভিধান-গ্রন্থে সকল শাস্ত্রের নামোল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তন্ত্র-শাস্ত্রের নাম করেন নাই। যদি অমরসিংহের সময় তন্ত্র-শাস্ত্রের প্রতিপত্তি বা বর্ত্তমানতা থাকিত, তাহা হইলে তদ্রচিত গ্রন্থে তন্ত্র-শাস্ত্রের নাম অবশ্য উল্লিখিত হইত।

৪। পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধমত নিরসনের জন্য স্বয়ং তন্ত্রবাদ প্রচারিত করিয়াছেন।

৫। বৈদেশিক পর্য্যটকগণ এতদ্দেশে বহুদিন যাবৎ অবস্থিতি করিয়া এতদ্দেশীয় যে সকল রীতি, নীতি, ধর্ম্ম, শাস্ত্র ও অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাঁহারা অকপট চিত্তে তত্তৎ বিষয়ের সন্নিবেশ দ্বারা স্ব স্ব দৈনন্দিন গ্রন্থ পরিবর্দ্ধিত করিয়া গিয়াছেন। যদি তত্তৎ কালে তন্ত্র বা তন্ত্রোক্ত ধর্ম্মের অস্তিত্ব থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই তাহার উল্লেখ করিতেন।

৬। তন্ত্রে যে বর্ণমালা লিখন-পদ্ধতি বা তাহার স্বরূপ কথিত হইয়াছে, তাহাতে বঙ্গাক্ষর বা বঙ্গলিপির কথা বলা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বঙ্গলিপি প্রাচীন নহে, আধুনিক। বঙ্গীয় বর্ণমালার উল্লেখ করিয়া তন্ত্র শাস্ত্র স্বয়ং আপনাকে আধুনিক বলিয়া পরিচিত করিয়াছে।

তন্ত্র গ্রন্থের ভাষা, ভাব, রীতি প্রভৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে অনুমিত হয় যে, তন্ত্র সর্ব্বতোভাবে বঙ্গভূমির আত্ম-সম্পত্তি। জন-প্রবাদও উক্ত সিদ্ধান্তের সহায়তা করিতেছে; যথা—

"গৌড়েনোৎপাদিতা বিদ্যা মৈথিলৈ বিপুলীকৃতা।
ক্বচিৎ কচিন্মহারাষ্ট্রে গুর্জ্জরে বিলয়ং গতা॥" ইত্যাদি।

নব্য সম্প্রদায়ের কথিত তন্ত্র-শাস্ত্রের প্রাচীনত্ব বিরোধী প্রধানতম আপত্তিসমূহ প্রায় উল্লিখিত হইল। 'তন্ত্র-শাস্ত্র প্রাচীন কি না' ইহার প্রমাণ করিতে হইলে, আর্য্য শাস্ত্রসমূহের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইবে। দেশ-বিপ্লব, রাজ-বিপ্লব, সমাজ বিপ্লব ও সম্প্রদায়াদি বিপ্লবে আর্য্য শাস্ত্রসমূহ প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে। আর্য্যশাস্ত্র নামে নষ্টাবশিষ্ট যে কয়েকখানি গ্রন্থ লোক সমাজে প্রচলিত রহিয়াছে, তাহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অনেকাংশে কাল-গহ্বরে পতিত। নামে আর্য্য শাস্ত্র থাকিলেও, আর্য্য শাস্ত্র-সমুদ্র গোষ্পদে পরিণত হইয়া, কুটিল কালগতির উজ্জ্বল সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তাহার উপর পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অভিনব বিচার-পদ্ধতি ও গবেষণার দ্বারা আর্য্য-শাস্ত্রসমূহ নানা ভাবে কদর্থিত হইয়া আধুনিক সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। এতদবস্থায় শাস্ত্র হইতে তন্ত্র-শাস্ত্রের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করা কতদূর ধৃষ্টতা ও অসম-সাহসের কার্য্য তাহা সকলে অনুমান করিতে পারেন।

অতি দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে,—সভ্যতা-দৃপ্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আপনাদের আধুনিকত্ব, পক্ষান্তরে, ভারতবাসীর প্রাচীনত্ব স্বীকার করাকে বিষম লজ্জার কারণ বলিয়া বিবেচনা করেন। সেজন্য স্বীয় প্রাচীনত্ব খ্যাপনে ও আর্য্য শাস্ত্রাদির অভিনবত্ব প্রতিপাদনে বদ্ধ-পরিকর হইয়া সভ্যতানুমোদিত আচার-পদ্ধতিকে পরিবর্জ্জিত করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত নহেন। তাঁহাদের বিচিত্র তর্ক-যুক্তিরূপ শাণিত অসিধারায় ছিন্ন-বিছিন্ন, বিকলাঙ্গ, সনাতন বেদবাণী কৃষকের উদ্দাম সঙ্গীতে পরিণত, ইতিহাস-পরম্পরা অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহীর অন্তঃসার-শূন্য উপকথায় উন্নীত এবং প্রাচীন রামায়ণাদি উপাদেয় মহাকাব্যসমূহ পাশ্চাত্য কাব্যরাজির পদাঙ্কানুসরণে রচিত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। আর্য্য জ্যোতিষ, দর্শন, পুরাণাদি জগতের বীজপুরুষ হইলেও, পাশ্চাত্য-মাহাত্ম্যে সদ্যঃপ্রসূত শিশুরূপে সমাখ্যাত হইয়া পাশ্চাত্য অন্নপানাদির উপভোগে পালিত, বর্দ্ধিত ও পরিচিত বলিয়া কীর্ত্তিত হইতেছে। আর্য্য-নমস্কৃত দেবতাবৃন্দ অনার্য্য-সেবিত রাক্ষসীরূপে পরিচিত হইয়া নবসভ্য বিদ্বন্মণ্ডলী পার্শ্বে কুটিল কটাক্ষে নিয়ত উপেক্ষিত হইতেছেন। জগদ্গুরু আর্য্যঋষিগণের সন্ততি আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতা-মদিরা-পানে এতদূর বিভোর হইয়াছি যে, তাহাদের রঞ্জিত প্রলাপ-বাণীকে মহা-সত্য রূপে স্বীকার করিয়া, তাহাদের বিজয়-নিনাদে মনঃপ্রাণ সমর্পণপূর্ব্বক নির্লজ্জ উচ্চকণ্ঠে বলিতেছি;—সভ্যতা-সমুজ্জ্বল পাশ্চাত্য-পার্শ্বে আমরা সদ্যঃ-প্রসূত শিশুমাত্র! আমাদের আপনার বলিয়া অহঙ্কার করিবার কিছুই নাই। যাহা ইতস্ততঃ নয়নগোচর হয়, তাহা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের স্ব-সম্পত্তি নহে, তাঁহারা পাশ্চাত্য ধনভাণ্ডার হইতে কতক দেখাইয়া, কতক না বলিয়া, কতক বা ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছেন। এইরূপ বাক্য-বিন্যাসে আমাদের পাণ্ডিত্য মহিমা প্রকাশিত হইতেছে। এতাদৃশ পাণ্ডিত্যকে সহায় করিয়া তন্ত্রশাস্ত্রের প্রাচীনত্ব আলোচিত হইলে, তন্ত্রবাদের কথা দূরে থাকুক, সনাতন বেদ-বাণীও নিতান্ত আধুনিক হইয়া পড়ে।

কি প্রকারে তন্ত্রশাস্ত্রের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হইতে পারে?

তন্ত্রশাস্ত্র প্রাচীন কি না? এতৎ সম্বন্ধে এরূপ কেহ আশা করিতে পারেন না, যে, সনাতন বেদ-শ্রুতি হইতে আরম্ভ করিয়া স্মৃতি-পুরাণাদি সকল শাস্ত্র,—"তন্ত্র প্রাচীন কি আধুনিক" এই কথা শব্দতঃ বলিয়াছেন। যাঁহারা এই প্রবন্ধে শ্রুতি প্রভৃতির উক্ত রূপ দর্শন-কামনা করেন, তাঁহাদিগকে অবশ্য হতাশ হইতে হইবে। পক্ষান্তরে, যেরূপ পদ্ধতি অবলম্বিত হইলে তন্ত্র-শাস্ত্রের প্রাচীনত্ব কতদূর তাহা প্রমাণিত হইতে পারে, সর্ব্বাগ্রে তাহার নির্দ্দেশ করিয়া অভীষ্ট মার্গের অনুসরণ করা যাইতেছে।

১। তন্ত্রশাস্ত্র-বাচী তন্ত্র বা আগমাদি শব্দ কোন গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে এরূপ দৃষ্ট হইলে, তত্তদ্ গ্রন্থের আবির্ভাব-সময়ে তন্ত্র-শাস্ত্রের বর্ত্তমানতা ছিল।

২। তন্ত্রশাস্ত্র-বাচী তন্ত্রাদি নামের স্পষ্টতঃ উল্লেখ না থাকিলেও, তন্ত্র-শাস্ত্রোক্ত বিশিষ্ট আচার, নিয়ম ও নামাদির ব্যবহার দর্শনে তত্তদ্ গ্রন্থকে তন্ত্র-শাস্ত্রের পরবর্ত্তী বলিব।

তন্ত্রোক্ত আচারাদি বলিতে, যাহা কেবল তন্ত্র-শাস্ত্রের মূলসম্পত্তি, তাহাই উল্লিখিত হইয়াছে। তাহাদের নাম যথা,—

(ক) তন্ত্রোক্ত মন্ত্রের দীক্ষা।

(খ) দীক্ষিত ব্যক্তির গৃহীত মন্ত্রের জপ।

(গ) তন্ত্রোক্ত বিশিষ্ট দেব-দেবীর অর্চনা বা নামোল্লেখ।

(ঘ) পঞ্চমকার প্রসঙ্গ।

(ঙ) পুরশ্চরণ, বীজমন্ত্র, ন্যাস, মুদ্রা প্রভৃতি।

৩। তন্ত্র শাস্ত্র-বাচী তন্ত্রাদি শব্দের তন্ত্র শাস্ত্রোক্ত বিশিষ্ট আচারাদির অভাব সত্ত্বেও, যদি কোন গ্রন্থে তন্ত্রোক্ত আচারাদির প্রশংসা, সমর্থন বা নিন্দাবাদাদি পরিদৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তত্তদ্ গ্রন্থকে তন্ত্রের পরবর্ত্তী বা সমকালবর্ত্তী বলিব।

৪। যদি কোন গ্রন্থ তন্ত্র-শাস্ত্রের একবারে নামোল্লেখ না করিয়া তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত ব্যবহারাদির সামান্যাংশও স্বগর্ভে উদ্ধৃত করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকেও তন্ত্রশাস্ত্রের অবিরোধী ও তৎসমকালিক বলিয়া স্বীকার করিব।

তন্ত্র ও তান্ত্রিক কাহাকে বলে?

বর্ত্তমান সময়ে তন্ত্রশাস্ত্র বলিতে সংক্ষেপে আমরা এইমাত্র বুঝিয়া থাকি, যে শাস্ত্রে বেদ, স্মৃতি, পুরাণাদি বিরোধী মতবাদের অবতারণা করিয়া মদ্য মাংস-ব্যভিচারাদি স্রোতে আর্য্যভূমি প্লাবিত করিতে উপদেশ দেয়, তাহার নাম তন্ত্রশাস্ত্র। পক্ষান্তরে, যাঁহাদের মদ্য-পান-মলিন, কুঞ্চিত ললাট-ফলকে সিন্দুর রচিত অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি বিচিত্র পুণ্ড্র বিরাজ করিতেছে, যাঁহাদের রুক্ষ, লম্বিত কেশজাল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া শীর্ষদেশের অপূর্ব্ব কান্তি প্রকাশিত করিতেছে, যাঁহাদের বিসদৃশ দীর্ঘ শ্মশ্রু-গুম্ফে বিকট মুখ-গহ্বর হইতে সর্ব্বদা তীব্র সুরা সৌরভ উদ্গত হইয়া সমীপবর্ত্তী জনগণের নাসারন্ধ্র-পীড়া উৎপন্ন করিতেছে, যাঁহাদের হস্তে ত্রিশূল, গলে রুদ্রাক্ষ বা অস্থি-রচিত মালা, মুখে বিকট রবে উদ্গত "তারা তারা" বা "কালী কালী" ধ্বনি, যাঁহাদের হঠাৎ সন্দর্শনে আবাল বৃদ্ধ-বণিতার হৃদয়ে যুগপৎ বিস্ময় ও বিভীষিকার উদয় হয়, তাঁহারাই তান্ত্রিক। ধীরভাবে আলোচিত হইলে সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, উক্ত ভীষণ বেশী কয়েকজন মাত্র কেবল তান্ত্রিক নহেন; দীক্ষিত আর্য্যনামধারী প্রত্যেক ভারতবাসীই তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত আচার-সম্পন্ন মহাতান্ত্রিক। রক্তাম্বরধারী মদ্যপাননিরত জনসমূহ তান্ত্রিক-সমাজে একটী প্রসিদ্ধ সম্প্রদায় মাত্র। ভারতীয় আর্য্যসমাজে প্রধানতঃ শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর ও গাণপত্য এই পঞ্চ সম্প্রদায়ের পঞ্চ উপাসনা প্রচলিত রহিয়াছে। যাঁহারা যে ভাবের উপাসক হউন না কেন, সকলেই পঞ্চোপাসনার অন্তর্নিবিষ্ট থাকিয়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে তন্ত্রশাস্ত্রের আদেশ মতে চলিতেছেন। আধুনিক অভিনব উপাসক-সম্প্রদায়-বিশেষের কুটিল ভ্রূভঙ্গি তন্ত্র-শাস্ত্রের উপর অবজ্ঞাভরে নিপতিত হইলেও, তাঁহারা যে পঞ্চোপাসনার অন্তর্নিবিষ্ট থাকিয়া স্বয়ং আত্মনিন্দা করিতেছেন, তাহা অন্য কাহাকেও জিজ্ঞাসা না করিয়া, স্ব সম্প্রদায়ের আদি-গুরুর আচার-ব্যবহারাদির উপর দৃষ্টিপাত করিলে সবিশেষ বুঝিতে পারিবেন।

তন্ত্রশাস্ত্র বলিতে সাধারণতঃ এইমাত্র হৃদয়ঙ্গম হয়,—যে শাস্ত্রে গুরুর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া তন্ত্রোক্ত দীক্ষা, পূজা, হোম ও পুরশ্চরণাদি দ্বারা দেবতা প্রত্যক্ষ করিবার ও মুক্তিলাভের সহজ-সাধ্য উপায় জানিবার কৌশল ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, তাহার নাম তন্ত্রশাস্ত্র। পক্ষান্তরে, যাঁহারা তন্ত্রশাস্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তৎপ্রবর্ত্তিত উপাসনাদি করিয়া ধর্ম্মাচরণ করেন তাঁহারাই তান্ত্রিক।

নদীয়ায় পালরাজগণের কীর্ত্তি

[শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার বি-এ]

উত্তরবঙ্গ বা বরেন্দ্র-ভূমিতে পালরাজগণের অনেক কীর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু দক্ষিণবঙ্গে পালরাজগণের কীর্ত্তির অবশেষ অতি অল্পই দেখা যায়। দক্ষিণবঙ্গে যে তাঁহাদের প্রভাব ছিল না, তাহা নহে। কুমার পাল ও মদন পাল বোধ হয় পালবংশের শেষ রাজা। বৈদ্যদেব কুমার পালের মন্ত্রী ছিলেন। বৈদ্যদেবের তাম্র শাসনে কুমার পালের রাজত্ব কালের ঘটনাবলীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে দক্ষিণবঙ্গে নৌযুদ্ধের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় (১)

দক্ষিণবঙ্গে একটী নৌযুদ্ধে বৈদ্যদেব জয়লাভ করিয়াছিলেন। "দক্ষিণবঙ্গের সমর-বিজয় ব্যাপারে চতুর্দ্দিক হইতে সমুত্থিত নৌবাট হী হী রবে সন্ত্রস্ত হইয়াও, দিগ্‌গজসমূহ গম্যস্থানের অসদ্ভাবেই স্বস্থান হইতে বিচলিত হইতে পারে নাই। উৎপতনশীল ক্ষেপণী বিক্ষেপে সমুৎক্ষিপ্ত জলকণাসমূহ আকাশে স্থিরতালাভ করিতে পারিলে, চন্দ্রমণ্ডল কলঙ্কমুক্ত হইতে পারিত।"(২)

সম্প্রতি আমরা দক্ষিণবঙ্গে নদীয়া জেলাতে পালরাজাদের বিষয়ে প্রবাদ-সংশ্লিষ্ট কয়েকটী স্থানের সন্ধান পাইয়াছি। এই স্থান কয়টীর মধ্যে নবদ্বীপের নিকটে সুবর্ণবিহার ও উত্তর নদীয়ায় অবস্থিত আল্লা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়কে এই দুই স্থানের বিষয়ে সন্ধান দেওয়াতে, তিনি উহাদের বিবরণ সংগ্রহে বর্ত্তমান লেখককে বিশেষ উৎসাহ দিয়াছিলেন। তাঁহার সুবর্ণবিহার পরিদর্শনের ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

সুবর্ণবিহার স্তূপের বিষয় 'বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ' পত্রিকায় ও 'গৃহস্থ' পত্রে আলোচিত হইয়াছিল। ২১ ভাগ সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকাতে মৌলিক গবেষণাপূর্ণ যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাদের সারসঙ্কলনক্রমে 'সুবর্ণবিহারের স্তূপ' নামক প্রবন্ধ বিষয়ে ১৩২২ সালে প্রকাশিত 'সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা'তে লিখিত হইয়াছে।—

---

(১) বাঙ্গলার ইতিহাস—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ।

(২) যস্যানুত্তর বঙ্গসঙ্গর জয়ে নৌবাট হী হী রব
ত্রস্তৈর্দ্দিককরিভিশ্চ যন্ন চলিতং চেন্নাস্তি তদ্গম্যভূঃ।
কিঞ্চোৎ পাতুক কেলিপাতপতনপ্রোৎসর্পিতৈঃ শীকরৈ
রাকাশে স্থিরতাকৃতা যদি ভবেৎ স্যান্নিষ্কলঙ্কঃ শশী॥

গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১৩০

"'সুবর্ণবিহারের স্তূপ' নামক প্রবন্ধে ছাত্রসভ্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয় কৃষ্ণনগরের নিকটে অবস্থিত সুবর্ণবিহার পল্লীর স্তূপের বিবরণ প্রকাশ করেন। এই স্তূপ 'মে (ই) দের বনের ঢিবি' নামে পরিচিত। এই ঢিপির বেষ্টনী প্রায় ৪৮০ হাত, দৈর্ঘ্য প্রায় ১০৫ হাত, প্রস্থ প্রায় ১২৫ হাত ও খাড়াই প্রায় দশ হাত। সুবর্ণ রাজার সম্বন্ধে যে কিম্বদন্তী আছে, তাহার উল্লেখ করিয়া লেখক মহাশয় বলেন যে, খনন ব্যতীত এই স্তূপের ঐতিহাসিক সত্য নির্ণয় করা দুরূহ।" শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ হালদার এই স্তূপের মাপ লইতে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

নদীয়া জেলাতে পলাসী পরগণায় অবস্থিত দেবগ্রাম ও রাণাঘাট সাবডিবিসনে মদনপুরের নিকটে দেবগ্রামের সহিত কেহ কেহ পাল-বংশীয় রাজাদের সম্বন্ধ টানিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি-আই-ই মহোদয় সম্প্রতি 'রামচরিত' নামে রাম পালের কীর্ত্তি বিষয়ে একখানি বহুমূল্য পুঁথি নেপালে আবিষ্কার করেন। তিনি নদীয়ার পলাসী দেবগ্রামকেই 'রামচরিতের বালবলভী' ভূভাগ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। বালবলভীই তাঁহার মতে 'বাগড়ী' ভূভাগ। বাগড়ী বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সি বিভাগের অধিকাংশ লইয়া অবস্থিত ছিল। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় পলাসী দেবগ্রামকেই বালবলভীর ভূমির অন্তর্গত রামচরিতোক্ত দেবগ্রাম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। রাম পালের সামন্ত-চক্রের অন্তর্গত 'দেবগ্রাম প্রতিবদ্ধ তরঙ্গবহুল বালবলভীপতি' চিত্রামরাজ না কি এই দেবগ্রামেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি দেবগ্রামের নিকটে বিক্রমপুর নামক পল্লী ও 'জিতর মাঠ' নামক একটী মাঠের উল্লেখ করিয়াছেন। মঙ্গলকোট, উজানী কয়েক ক্রোশ দূরে বর্দ্ধমান জেলাতে অবস্থিত। উজানী হইতে রাজা বিক্রমাদিত্য প্রত্যহ অগ্রদ্বীপে আসিয়া গঙ্গাস্নান করিতেন, এরূপ একটী প্রবাদ আছে। আমরা কবিকঙ্কণের 'চণ্ডী'তে উজানীর বিক্রমকেশরী রাজার উল্লেখ পাই।

বিক্রমকেশরীর রাজত্বকালে উজানী নগরের ধনপতি সদাগরের পুত্র শ্রীমন্ত সিংহলে বাণিজ্যে গিয়া শালিবান নামক কোন রাজার কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। কবিকঙ্কন 'চণ্ডী'তে এই বিবরণ আছে। সিংহলের ইতিহাসে শালিবান বা শালিবাহন নামে কোন রাজার সন্ধান পাওয়া যায় না। নদীয়া জেলায় অবস্থিত মুড়াগাছার নিকটে ভাগীরথীর প্রায় তটদেশে পুরাতন শালিগ্রাম নামক একটী জঙ্গলাকীর্ণ পল্লীতে শালিবাহন নামক কোন বিস্মৃত-কীর্ত্তি নরপতির রাজত্ব করার কথা ও নিকটে 'মাহেবতলার ঘাটে' সদাগরের ডিঙ্গা-বাঁধার কথা শুনা যায়। মঙ্গলকোট উজানীর সন্নিহিত ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা পূজার ন্যায় যোগাদ্যা পূজা শালিগ্রামে শালিক্ষেত্র নামক স্থানে শালিবাহন কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইত, এইরূপ প্রবাদ। গৌড়ের ইতিহাসে উল্লিখিত উজানীর বিক্রমকেশরীর গড়ের ন্যায় শালিবাহনের গড়ও বেড় বাঁশে ঘেরা দেখিতে পাওয়া যায়। নদীয়া জেলায় অবস্থিত জপুরের নিকটে 'গজেন্দার বাদসাহের' গড়েও প্রচুর বেড়বাঁশ দেখা যায়। চণ্ডীকাব্যে উক্ত বিক্রমকেশরীর সমসাময়িক শালিবাহন রাজাই শালিগ্রামে প্রচলিত প্রবাদের নায়ক বলিয়া আমাদের ধারণা। শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্রবাবু বিক্রমরাজ বিষয়ে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা আমাদের উল্লিখিত শালিবাহনের সম্পর্কে প্রচলিত প্রবাদ কর্ত্তৃক কতকটা সমর্থিত হইতেছে। (এ বিষয়ে ভারতবর্ষ ও গৃহস্থ পত্রে লেখক পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছেন।)

পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রবাবুর মতে "গৌড়াধিপ রামপালের সময়ে বিক্রম নামে একজন পরাক্রান্ত রাজা দেবগ্রাম প্রতিবদ্ধ তরঙ্গ-বহুল—বালবলভী প্রদেশের অধিপতি ছিলেন।" (সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ২২ ভাগ ১ম সংখ্যা।)

নদীয়া জেলার দক্ষিণাংশে অবস্থিত দেবগ্রামে দেবলরাজার গড়' দৃষ্ট হয়। নগেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, 'এইস্থান গৌড়েশ্বর নারায়ণ পালের প্রধান মন্ত্রী গুরব মিশ্রের মাতুলালয় ছিল বলিয়া প্রশস্তিকার সগৌরবে এই গ্রামের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।' তাঁহার মতে এইস্থান খৃঃ দশম শতাব্দীরও পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ ছিল। এই দেবগ্রামের বিষয়ে একটী প্রবাদ আছে। ইহা বাগাচড়া-নিবাসী অশীতিপর বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায় মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি। প্রবাদ আছে যে, জনৈক সন্ন্যাসী দেপাড়ার নৃসিংহ দেবের মাথার 'পরশমণি' চুরি করিয়া লইয়া গিয়া দেগাঁতে এক কুমারের বাটীতে ঝোলার মধ্যে লুকাইয়া রাখে। ঘরের চাল ভেদ করিয়া বৃষ্টির জল ঝোলার মধ্য দিয়া লোহার একখানি ফাওড়ার উপর পড়িবামাত্র ফাওড়াখানি সোনা হইয়া গেল। কুমার ব্যাপার বুঝিয়া সন্ন্যাসীর অসাক্ষাতে পরশমণি চুরি করিল। সন্ন্যাসী শাপ দিলেন 'পরশ পাথর তোর ভোগে লাগিবে না। এগ্রামে কুমার তিন রাত্রির বেশী বাস করিতে পারিবে না। আর তিনখানির বেশী লাঙ্গল রাখিতে পারিবে না।' পরশ পাথরের মাহাত্ম্যে কুমার রাজশ্রী লাভ করিল এবং দেবল রাজা নামে খ্যাত হইল। নবাব সকল কথা জানিতে পারিয়া সৈন্য সমেত অগ্রসর হইলেন। দেবল গ্রামের চারিধারে চারিটী বুরুজ তৈয়ার করিলেন। তিনি কপোত-হাতে অশ্বারোহণে নবাবের সম্মুখীন হইলেন। বাড়ীতে বলিয়া গেলেন 'পায়রা ফিরিলে বুঝিবে আমি মরিয়াছি। আর তোমরা বাড়ীর পুকুরের জলে ঝাঁপ দিয়া মরিবে।' পায়রা হাত ফসকাইয়া পলাইয়া আসিলে রাজ-পরিবার পুষ্করিণীর জলে ডুবিয়া মরিল। দেবল যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিয়া তাহাই দেখিলেন; বৃথাই তাঁহার শত্রু বিজয় হইল। তিনি পরিবারের অনুসরণ করিতে অন্তর্জলে চিরতরে প্রবিষ্ট হইলেন। গবর্ণমেণ্টের প্রকাশিত List of Ancient Monuments এ লিখিত আছে, "They are the only pre-mahomedan ruins seen or heard of in the district." বাস্তবিক ইহা সত্য নহে।

কিছুদিন পূর্ব্বে নদীয়ার মেহেরপুর সাবডিভিসনে জলঙ্গী নদীর প্রায় উপরে অবস্থিত আন্না নামক গ্রামে 'পাকরাজাদের কীর্ত্তি' বলিয়া স্থানীয় লোকেদের নিকট পরিচিত একটী ধ্বংসাবশেষের সন্ধান

পাই। গ্রামখানির আক্না নামটী একটু সন্দেহজনক। আমার আত্মীয় শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় আমাকে সর্ব্বপ্রথমে আক্নার বিষয়ে বলেন। বর্ত্তমান লেখক কর্ত্তৃক আক্নার বিষয়ে ১৩২৫ সালের শ্রাবণের 'ভারতবর্ষে' আলোচিত হইয়াছে।

গ্রামের মধ্যে একটী স্থানের নাম 'গহ্বর পোতা'; এই স্থানে প্রায় দশ বার হাত উচ্চ ও একধারে ঢালু একটী ঢিপি আছে। ঢিপির নিম্নে একটী রাস্তা ও মজা পুষ্করিণী দেখা যায়। এইরূপ আট নয়টী পুকুর নিকটবর্ত্তী স্থানে আছে। ঢিপি ও পুকুরের স্থানবিশেষে চাষ-আবাদ হয়। একটী পুকুরের নাম 'হিরণ্য পালের পুকুর।' ঢিপি ও পুকুরে মধ্যে-মধ্যে প্রস্তরখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানে মাটীর নীচে অনেক মূর্ত্তি আছে, এইরূপ সাধারণের ধারণা।

প্রবাদ আছে, পালবংশীয় রাজা হিরণ্যপাল এক সময়ে এখানে রাজা ছিলেন। ইনি শেষ রাজা। ইঁহার সময়ে বর্গির হাঙ্গামাতে এই রাজবংশ নষ্ট হয়।

ছাত্রদিগের স্বাস্থ্যহীনতা ও তাহার প্রতীকারের উপায়

[শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সরকার বি-এ]

আমরা যে বিষয়ের অবতারণা করিতে যাইতেছি, তাহা আমাদের দেশের ভবিষ্য-বংশীয়দিগের জীবন-গঠন ব্যাপারের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। যাহারা আমাদের দেশের ভবিষ্যতের নিয়ন্তা, যাহাদের উপর দেশের শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে—তাহাদের যে স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অনেকে আমাদের ছাত্রদিগের উপর দোষারোপ করেন যে, তাহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া মানসিক কিম্বা শারীরিক পরিশ্রম করিতে পারে না। অন্যান্য কারণের মধ্যে স্বাস্থ্যহানি—তাহাদের উচ্চ অঙ্গের বিদ্যাচর্চ্চার প্রধান অন্তরায়। বাঙ্গালী যুবকদিগের স্বাস্থ্য যে দিন-দিন নষ্ট হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাঁহারা ছাত্রদিগের—শুধু ছাত্রদিগের কেন, দেশের শুভ-কামনা করেন, তাঁহাদিগের এ বিষয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করা কর্ত্তব্য। আমাদিগের স্মরণ রাখা উচিত যে, আজ যাহারা যুবক, কাল তাহারা আমাদিগের নেতৃস্থানীয় হইবে; তাহারা আমাদিগের ভবিষ্যবংশীয়দের পিতা হইবে। "Heredity" বা কৌলিক গুণাধিকারের একটী সুপরিচিত নিয়ম এই যে, দুর্ব্বল পিতামাতার সন্তান দুর্ব্বল হইবে এবং ভবিষ্যতে তাহাদের যে সকল সন্তান হইবে, সেগুলি আরও দুর্ব্বল হইবে। এইরূপে জাতি ক্রমশঃ অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হইবে। এ সমস্ত বিষয় আমাদের অবিদিত নহে; এই স্বাস্থ্যহানি ও তজ্জনিত অধোগতি আমাদিগের চক্ষুর অগোচর নহে; কিন্তু আমরা অলস হইয়া বসিয়া আছি। আমাদিগের দীর্ঘকায়, বলশালী পূর্ব্ব-পুরুষরা এখন অতীতের স্মৃতিতে পর্য্যবসিত; কতকগুলি শীর্ণকায়, খর্ব্বাকৃতি লোক তাঁহাদিগের স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। এই শোচনীয় অধঃপতনের কারণ এবং তাহার প্রতীকারের উপায় সম্বন্ধে আমরা এস্থলে একটু আলোচনা করিব।

কেহ কেহ বলেন যে, বিদেশীয় জাতির সংস্পর্শ আমাদের স্বাস্থ্যহানির অন্যতম কারণ। এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদিগের মত কি তাহা জানি না। সুতরাং নিজেদের মতামত প্রকাশে বিরত থাকিয়া ইহার উল্লেখমাত্র করিলাম। তবে ইহা স্থির যে, বিদেশীয়ের সংস্পর্শ হেতু আমাদের পুরাতন রীতিনীতির অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ইহা যে ছাত্রদিগের স্বাস্থ্যহানির একটী কারণ, আমরা যথাস্থানে তাহার উল্লেখ করিয়াছি।

ছাত্রদিগের মধ্যে অপবিত্রতা (Impurity) অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যের অভাব তাহাদের স্বাস্থ্যহীনতার আর একটী প্রধান কারণ। লোকে সাধারণতঃ এই বিষয়ে নীরব থাকিতে ইচ্ছা করেন; কিন্তু এই লজ্জাজনিত নীরবতা আমাদিগের পক্ষে বিষম ক্ষতিকর। যে সংক্রামক ব্যাধি আমাদিগের জাতীয় শক্তির মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে—জাতির নিদ্রাভঙ্গ করিয়া সেই ব্যাধির উপযুক্ত ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বর্ত্তমান যুগের শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে Mary Scharlieb, M. D, M. S. বলিতেছেন, "আমরা সভ্যতার এরূপ একটী যুগে উপনীত হইয়াছি যে, বাহ্যিক চাকচিক্য ও পল্লবগ্রাহী বিদ্যার আড়ম্বর ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাই না—প্রকৃত আগ্রহ ও শিক্ষালাভের প্রকৃত উদ্দেশ্যের অনুভূতি কদাচিৎ দৃষ্টিগোচর হয়। * * * তবে ইহা অবশ্য স্থির যে আমাদের এতদিনের নীরবতা অপকার ছাড়া উপকার করে নাই।" পুরাকালে যখন আমাদিগের ছাত্রেরা ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত গ্রহণ করিয়া গুরু গৃহে আদর্শ শিক্ষকের সঙ্গ-সুখ উপভোগ করিত, তখনকার অবস্থা বর্ত্তমান অবস্থার তুলনায় খুব ভাল ছিল। স্বাস্থ্য ও যৌবনের দীপ্তির আধার সেই পুরাকালীন ব্রহ্মচারীর চিত্রের সহিত বর্ত্তমান কালের বিমর্ষ, অকালবৃদ্ধ, দীপ্তিহীন যুবার কি পার্থক্য! সে সকল এখন অতীতে পরিণত হইয়াছে; আমরা এখন এমন একটী পরিবর্ত্তনের যুগের মধ্য দিয়া যাইতেছি—যখন নূতন রীতি-নীতি ও আচার ব্যবহার পুরাতন সামাজিক বন্ধন বা রীতিনীতির উচ্ছেদ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ধর্ম্মহীন বিদ্যা, পিতামাতার ঔদাসীন্য এবং জীবনধারণের নব নব পদ্ধতিনিচয় যে কত যুবকের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যহানির কারণ স্বরূপ হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। যুবাবয়সই জীবনের সন্ধিক্ষণ; এই সময়ে আমাদিগের পদে-পদে পদস্খলন হয়। সৎপথে চলিবার দৃঢ় ইচ্ছা—মনের বল—অনেক সময়ে আমাদের সহায় স্বরূপ হয়। কিন্তু এই বাল-ব্যাধি সমূলে উৎপাটিত করিতে হইলে, আমাদিগের বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে নীতি ও ধর্ম্মকে স্থান দিতে হইবে। ইহা ছাড়া, তরুণবয়স্ক বালককে গৃহে ভালরূপ নীতিশিক্ষা দিতে হইবে। শৈশবে পিতামাতা সৎসঙ্গ ও সৎকর্ম্মের উপকারিতা এবং থিয়েটারে অভিনয় দর্শন ও উপন্যাস পাঠের কুফল সম্বন্ধে সন্তানগণকে উপদেশ দিবেন। বর্ত্তমান কালের উপযোগী করিয়া লইয়া ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মগুলি

যথাসম্ভব পালন করা কর্ত্তব্য। যদি আমাদিগের বালকবৃন্দের জীবন এইরূপে গঠন করা যায়, তাহা হইলে তাহারা মানসিক ও শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিয়া প্রকৃত মানব নামের উপযুক্ত হইতে পারিবে। আবার, Etonএর সুবিখ্যাত হেডমাষ্টার Rev. D. Lyttelton, Rugby স্কুলের Dr. Dukes প্রভৃতি কয়েকজন অভিজ্ঞ, খ্যাতনামা পাশ্চাত্য শিক্ষক ছাত্র দলের নৈতিক চরিত্র-গঠনের উপায় সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহা আমাদের প্রণিধান-যোগ্য। Wycliffe Collegeএর অধ্যাপক Dr. F. A. Sibly, M. A., LL. D. পিতামাতাকে তাঁহাদিগের সন্তান সন্ততিদিগকে তাহাদের আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিতে বলেন। তিনি তাঁহার বিংশতি বর্ষব্যাপী অভিজ্ঞতা হইতে বলেন যে, এইরূপ উপদেশ দেওয়া কোনরূপ দোষের বিষয় নহে। Etonএর ভূতপূর্ব্ব হেড্‌মাষ্টার Canon Lytecltonও ইঁহার মতের পোষকতা করেন। Dr. Sibly বলেন যে, এমন একটী রিপু যাহা যুগে-যুগে দুর্ব্বলকে জয় করিয়াছে,—বলবানের সঙ্গে ভীষণ সংগ্রাম করিয়াছে, এবং মহাজনকেও বিধ্বস্ত করিয়াছে,—ইহার ফলানভিজ্ঞ, নিরীহ বালকের নিকট উহা ছাড়িয়া দেওয়া হইল! হায়! ইহার পরিণাম কি ভীষণ!

স্ত্রীজাতি আমাদের মাতৃস্থানীয়া, এ কথা আমাদের পুরাতন শাস্ত্রের ও সমাজের শিক্ষা; কিন্তু ইংরেজী স্কুলে ও কলেজে আমরা এরূপ শিক্ষা পাই না। বরং অল্পবয়স্ক বালকদিগকেও স্কুলপাঠ্য পুস্তকে বিলাতী সমাজের প্রেমের কথা পড়িয়া, স্ত্রীজাতিকে অন্যভাবে দেখিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। এইরূপ শিক্ষা দ্বারা কখনও রিপু জয়ের আশা করা যাইতে পারে না। ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা করিতে হইলে, আবার সেই প্রাচীন ভাবে ফিরিয়া আসিতে হইবে।

বাঙ্গালী বালকের স্বাস্থ্যহীনতার দ্বিতীয় কারণ—পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব। কাহার কাহারও মতে বাল্যবিবাহও অন্যতম কারণ। শেষোক্ত কারণ সম্বন্ধে অধিকতর উপযুক্ত ব্যক্তির উপর ভার দিয়া আমরা এস্থলে তাহার আলোচনায় বিরত থাকিলাম। উপযুক্ত খাদ্যের অভাবের মূলে দারিদ্র্য বর্ত্তমান, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। লোকের জীবিকা-নির্ব্বাহ করা দিন-দিন কষ্টকর হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আয় পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে, বরং আয়ের উপায় অধিকতর সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। এখন আমাদিগকে প্রচলিতমার্গ ("Beaten track") অর্থাৎ সকলে যে পথে যাইতেছেন সেইপথ চাকরীর মোহ ত্যাগ করিয়া অন্য উপায় দেখিতে হইবে; এবং নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে না শিখিয়া বিবাহের দায়িত্ব গ্রহণ ও বংশবৃদ্ধি করা সঙ্গত কি না, তাহা আমাদিগের বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

এই খাদ্যাভাবের কথার সঙ্গে-সঙ্গে ভেজাল খাদ্যদ্রব্যের সমস্যাও ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল এখনও অবাধে চলিতেছে। বড়-বড় নগরে যে সকল Municipal আইন আছে, সেগুলিও এই রোগ দমনের পক্ষে যথেষ্ট নহে। আমাদিগের মতে, ইহার প্রতীকারের একমাত্র উপায় একটা ভারতবর্ষ-ব্যাপী নূতন আইন প্রণয়ন। (সম্প্রতি এইরূপ একটী আইন ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত হইয়াছে।) অবশ্য কালকাতার মাড়োয়ারী সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত সামাজিক শাসনও এ বিষয়ে ফলপ্রদ হইবে, আশা করা যায়।

বর্ত্তমান কালে এই কৃত্রিমতার যুগে আমরা আমাদিগের পূর্ব্ব আদর্শ—সরল ভাবে জীবন যাপন করা ও উচ্চচিন্তায় রত থাকা ক্রমশঃ ভুলিয়া যাইতেছি। অত্যধিক ধূমপান, পেটেণ্ট ঔষধ-সেবন, চা পান প্রভৃতি আমাদের স্বাস্থ্যহীনতার অন্যতম কারণ। ইহা ছাড়া, আমরা ইদানীং অধিকতর মাংসাপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছি। অবশ্য এস্থলে আমরা আমিষ ও নিরামিষের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলিয়া আসিতেছে, তাহার বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া এইটুকুমাত্র বলিতে পারি যে, কসাইদের নিকট হইতে আমরা যে মাংস ক্রয় করিয়া থাকি, তাহা স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর বহু জীবাণুতে পূর্ণ থাকে। আমরা সচরাচর যে সমস্ত "রেষ্টুরাঁতে" (Restaurants) খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করি, সেই সকলের বিরুদ্ধেও আমাদিগের কিছু বক্তব্য আছে। সেখানে যে সকল দ্রব্য উত্তম ও স্বাস্থ্যকর আহার্য্য ও পানীয়রূপে বিক্রীত হয়, বাস্তবিকই সেইগুলি নিকৃষ্ট উপাদানে ও অপরিচ্ছন্ন ভাবে প্রস্তুত হয়। এইরূপ খাদ্যকে আমরা কখনই "পুষ্টিকর বা স্বাস্থ্যকর খাদ্য" এই আখ্যা প্রদান করিতে পারি না। এই সকল দোকানের উপর Municipalityর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখা আবশ্যক। উপরিউক্ত কারণ-নিচয়ের মধ্যে ধূমপানই সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতিকর; কারণ, ইহা আমাদিগের ছাত্র ও যুবকদিগের মধ্যে অত্যন্ত বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে। "Herald of Health" নামক স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় পত্রে সম্পাদক ধূমপানের অপকারিতা সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহা বাহুল্য ভয়ে এস্থানে উদ্ধৃত করা হইল না। তবে তাঁহার উক্তির সার মর্ম্ম এই যে, ধূমপানের উপায় বা পদ্ধতি অনেক; কিন্তু সকলেরই ফল এক—পানকারীর ক্ষণিক আনন্দ, সঙ্গে-সঙ্গে অজানিত ভাবে তাহার শরীরের ধ্বংস। গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি "Juvenile Smoking Bill" অর্থাৎ তরুণ বয়স্ক যুবকদিগের ধূমপান নিবারণী আইনের পাণ্ডুলিপি ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই আইন ইহার উদ্দেশ্য সাধনে কতদূর কৃতকার্য্য হইবে, তাহা এখন বলা কঠিন। তবে বিধিনিষেধ দ্বারা এই ব্যাধির প্রতীকারের জন্য চেষ্টা করিতে বোধ হয় দোষ নাই।

তবে যে দেশ সংযমের দেশ—যে দেশের লোক সরলতা ও সংযমে অন্য দেশের আদর্শ-স্থানীয়—সে দেশের ছেলেরা ইচ্ছা করিলেই এই বিষপান পরিত্যাগ করিয়া স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারেন এবং রাশি-রাশি অর্থ—যাহা তাঁহারা এইরূপে অপব্যয় করিতেছেন—অন্যবিধ সদুদ্দেশ্যে নিয়োজিত হইতে পারে।

ছাত্রদিগের স্বাস্থ্যহানির অপর একটী কারণ—যথোপযুক্ত শারীরিক ব্যায়ামের অভাব। দুঃখের বিষয়, আমরা এখনও ব্যায়ামের উপকারিতা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। এ বিষয়ে Oxford ও Cambridgeএর যুবকেরা আমাদিগের আদর্শ-স্থানীয়। আমাদের যুবকেরা সর্ব্বদাই পাঠে এরূপ ব্যস্ত যে, তাহারা স্বাস্থ্য বা

শরীরের প্রতি আদৌ লক্ষ্য করে না। কোনরূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের "ছাপ্" লওয়াই যেন তাহাদের জীবনের একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য। আমাদের স্কুল ও কলেজে শারীরিক ব্যায়াম-চর্চ্চা প্রত্যেক ছাত্রের পক্ষে বাধ্যতা-মূলক হওয়া আবশ্যক। আমাদিগের এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, শিক্ষার সম্পূর্ণতা লাভ করিতে হইলে, শুধু মানসিক উৎকর্ষ্য লাভই যথেষ্ট হইবে না, সঙ্গে-সঙ্গে দৈহিক উন্নতিও আবশ্যক।

আর এক কথা—আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি এক একটী ছাত্র-পেষণ যন্ত্রবিশেষ। বৎসর বৎসর কত মেধাবী ছাত্র পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতেছে; কিন্তু হায়! তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই ভগ্নস্বাস্থ্য—জীবন-সংগ্রামের অনুপযুক্ত। অন্যান্য সভ্য দেশের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, জার্ম্মাণ ও ইংরেজ ছাত্রেরা যখন বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন, তখন তাঁহারা নবজীবন লাভ করিয়া, নূতন উদ্যম লইয়া সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। আমাদিগের ছাত্রদের অবস্থা অন্যরূপ। তাহাদের শরীর এক-একটী ব্যাধি-মন্দির। এরূপ অবস্থা বাস্তবিকই শোচনীয়। সমস্ত বিষয়ের পরীক্ষা একসঙ্গে এক সময়ে গ্রহণ না করিয়া, উহাকে ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত করা উচিত; এবং যে ছাত্র একবার একটী বা দুইটি বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইবে, তাহাকে পুনরায় সমস্ত বিষয়ে পরীক্ষা দিতে বাধ্য না করিয়া, কেবল ঐ একটী বা দুইটি বিষয়ে পরীক্ষা প্রদানের অনুমতি দেওয়া কর্ত্তব্য। ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যদেশে এইরূপ নিয়ম প্রচলিত আছে। স্বাস্থ্যকর স্থানে স্কুল ও কলেজ স্থাপন, এবং সমুদ্রতীরে বা শৈলশিখরে ছাত্রদিগের জন্য স্বাস্থ্যনিবাস স্থাপনের প্রস্তাবও সমীচীন বলিয়া মনে হয়। এই সকল স্থানে অবকাশের সময়ে, কিম্বা পরীক্ষার পর কিছুদিন অবস্থান করিলে, তাহাদের শারীরিক ও মানসিক ক্ষয়ের পূরণ হইতে পারে। জার্ম্মাণদেশে এইরূপ রীতি প্রচলিত আছে। বর্ত্তমানকালে ছাত্রদিগের messএ অবস্থান পদ্ধতিও তাহাদিগের স্বাস্থ্যহানির অন্যতম কারণ। ছাত্রা-বাসের আহার্য্য তাহাদের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। যাহা হউক ছাত্রাবাসের প্রতি গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পতিত হইয়াছে,—ইহা সুখের বিষয়।

ছাত্রদিগের স্বাস্থ্যহীনতার আর একটী কারণ, কলিকাতার ন্যায় জনকোলাহলপূর্ণ বৃহৎ নগরের অবিশুদ্ধ বায়ু সেবন। এ বিষয়ে কলিকাতা অপেক্ষা মফঃস্বলের সহরগুলি ভাল। সেখানে নির্ম্মল বায়ু সেবনের সুবিধা ও আহার্য্যদ্রব্যের প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। স্বাস্থ্যহানির আর দুইটি কারণ আছে। প্রথম কারণ—প্রত্যহ আহার সমাপন করিবামাত্রই বিদ্যালয়ে ছুটাছুটি করিয়া গমন। ইহাতে পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে, তাহা সুনিশ্চিত। দ্বিতীয় কারণ—৫।৬ ঘণ্টা একত্র একই স্থানে অবরুদ্ধ থাকা ও "tiffin"এর সময় কিছু না খাওয়া। মধ্যে-মধ্যে ছাত্রদিগকে ক্লাসের বাহিরে অবস্থান করিতে দেওয়া ও বিদ্যালয়ে জলযোগের ব্যবস্থা করা বিধেয়। দেশের বর্ত্তমান স্বাস্থ্যের অবস্থা, ম্যালেরিয়া প্রভৃতির বিস্তার—ছাত্রদিগের স্বাস্থ্যের উপরও প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ম্যালেরিয়ায় শরীর কিরূপ বিধ্বস্ত হয়, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপরে বুঝিতে পারিবেন না। বৎসর বৎসর কত নরনারী যে ম্যালেরিয়ার করাল কবলে পতিত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। যাহারা বাঁচিয়া থাকে, তাহারাও জীবন্মৃত—তাহাদের দেহে বল নাই, মস্তিষ্কে শক্তি নাই, মনে ফূর্ত্তি নাই। কিন্তু এই নৈরাশ্যের মধ্যে "Panama Canal Colony" প্রভৃতির উদাহরণ আমাদিগের মনে আশার সঞ্চার করে। ম্যালেরিয়ার প্রতীকারের উপায় সম্বন্ধে এখনও অনেক পরীক্ষা ও গবেষণা চলিতেছে। গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে যত্নবান হইয়াছেন। এখন দেশের জমীদারেরা—যাঁহারা প্রজার অর্থে পুষ্ট হইতেছেন—তাঁহাদিগের এদিকে দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক।

ইংরাজীতে একটি প্রবাদ আছে—"Prevention is better than cure" রোগের ঔষধ অপেক্ষা তাহার প্রতীকারই অধিক ফল-প্রদ। এই বাক্যের সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া যদি আমরা উপরি-নির্দ্দিষ্ট উপায় নিচয়কে কার্য্যে পরিণত করিতে সচেষ্ট হই, তাহা হইলে এই হতভাগ্য দেশে স্বাস্থ্য ও আনন্দ পুনরায় ফিরিয়া আসিবে, এরূপ আশা করা যায়।

রস-সাগর

স্বর্গীয় কবি কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী

[কবিভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভট-সাগর, বি-এ]

(পূর্ব্ব সাত বার প্রকাশের পর)

(৪৮)

একদিন মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র সভায় বসিয়া অনেক লোকের সম্মুখে স্বীয় প্রপিতামহ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সম্বন্ধে নানা গল্প করিতেছিলেন। কথায় কথায় তিনি রস সাগরের দিকে চাহিয়া সহাস্য-বদনে কহিলেন, "শ্বেতাঙ্গীর গলে।" রস-সাগর মহারাজের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ এইভাবে এই সমস্যা পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

প্রস্তাব। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দুই রাণী ছিলেন। প্রথমার গর্ভে শিবচন্দ্র, ভৈরবচন্দ্র, হরচন্দ্র, মহেশচন্দ্র ও ঈশানচন্দ্র, এবং দ্বিতীয়ার গর্ভে শম্ভুচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। শিবচন্দ্র যেরূপ শান্ত স্বভাব, পিতৃভক্ত ও সুপণ্ডিত, শম্ভুচন্দ্র সেইরূপ উদ্ধত, পিতৃদ্রোহী ও শাস্ত্র-জ্ঞান-বিমুখ ছিলেন। শিবচন্দ্র সাক্ষাৎ শিব। যখন নবাব মীরকাশিম মুঙ্গের-দুর্গে পিতা ও পুত্রকে বধ করিবার জন্য আদেশ দেন, তখন শিবচন্দ্র তাঁহাকে উভয়ের প্রাণ রক্ষার সম্বন্ধে অনেক সৎ-পরামর্শ দিয়া তাঁহার যথেষ্ট সেবা ও শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। এজন্য কৃষ্ণচন্দ্র শিবচন্দ্রেরই নামে সমস্ত বিষয় লিখিয়া দিবার সংকল্প করিয়া বাঙ্গলা ভাষায় এক খানি "দানপত্র' ও পারসী ভাষায় একখানি "তক্‌বিজ নামা" লিখিলেন তৎকালীন গভর্ণর জেনারল্ ওয়ারেণ হেষ্টিংসের কাউন্সেলের একজন সাহেব মেম্বর ও একজন মুন্সী আসিয়া তাহাতেই স্বাক্ষর ও মোহর

করিয়া দিয়া যান। ১১৮৭ বঙ্গাব্দের (১৭৮০ খৃষ্টাব্দের) ৯ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে এই দুই খানি কাগজ লিখিত হয়। এই দানপত্রে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্রকেই সমস্ত সম্পত্তি লিখিয়া দিয়াছেন। অন্যান্য ৫টী পুত্র ও পৌত্রদিগকে সর্ব্বশুদ্ধ কেবল ৪০০০০৲ (চল্লিশ হাজার) টাকার বার্ষিক বৃত্তি দিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

এই দানপত্র লিখিয়া মহারাজ ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে মহারাজ শিবচন্দ্রের নামে সমগ্র জমীদারীর রাজ-সনন্দ প্রাপ্তির উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের কর্ত্তৃত্ব কালে এইরূপ ব্যাপার নির্ব্বাহ-বিষয়ে তাঁহার প্রধান কর্ম্মসচিব দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের প্রভূত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ছিল। তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত কৃষ্ণচন্দ্র সবিশেষ যত্নবান্ হইলেন। গঙ্গাগোবিন্দের মাতৃ-শ্রাদ্ধের সময় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র জ্যেষ্ঠপুত্র শিবচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পাঠাইয়াছিলেন। শিবচন্দ্র সভাস্থলে গিয়া গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ মহাশয়কে বলিলেন "দেওয়ান বাহাদুর! আপনার মাতৃশ্রাদ্ধ ঠিক দক্ষযজ্ঞের মত।" তাহাতে সিংহ মহাশয় ঈষৎ হাস্য করিয়া বিনীত ভাবে বলিলেন, "আমার মাতৃশ্রাদ্ধ দক্ষযজ্ঞ অপেক্ষাও অধিক; কারণ দক্ষযজ্ঞে স্বয়ং শিবের আগমন হয় নাই।" কৃষ্ণচন্দ্র গঙ্গাগোবিন্দকে সন্তুষ্ট করিতে সবিশেষ চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাঁহার উদ্ধত ও অবাধ্য পুত্র শম্ভুচন্দ্র মনে করিয়াছিলেন যে, পৈতৃক সম্পত্তির এক অর্দ্ধাংশ বৈমাত্রেয় ভ্রাতারা পাইবেন এবং অপর অর্দ্ধাংশ তিনি স্বয়ং পাইবেন। এই উদ্দেশ্যে শম্ভুচন্দ্র রাজ পুরুষ-গণের সাহায্য লাভের নিমিত্ত নানা প্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র এই দানপত্র লিখিয়া দিবার পূর্ব্বেই সমস্ত সম্পত্তির দশাংশ শিবচন্দ্রকে এবং ষষ্ঠাংশ শম্ভুচন্দ্রকে দেওয়া স্থির করিয়াছিলেন, এবং শম্ভুচন্দ্রও তাহাতে সম্মত হইয়াছিলেন। এক্ষণে শম্ভুচন্দ্র প্রতিজ্ঞা করিলেন, "যে রূপেই হউক, অর্দ্ধেক রাজ্য লইব। ইহাতে মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর-পতন।"

দানপত্র লেখা হইয়া গিয়াছে, এবং তাহাতে হেষ্টিংসের এক সাহেব মেম্বর ও মুন্সীরও স্বাক্ষর এবং মোহর সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এখন শম্ভুচন্দ্র নিরুপায় হইয়া দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের শরণাপন্ন হইলেন। তিনি তাঁহাকে অর্থলোভ দেখাইলেন; কিন্তু তিনি এক্ষণে কি করেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। এই সময় কৃষ্ণচন্দ্র গঙ্গাগোবিন্দকে একখানি পত্র লেখেন। তাহার একস্থানে এইরূপ লিখিত ছিল "পুত্র অবাধ্য, দরবার অসাধ্য, এখন যা করেন শ্রীগঙ্গাগোবিন্দ।" কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান কালীপ্রসাদ সিংহ, গঙ্গাগোবিন্দকে প্রসন্ন ও হস্তগত করিবার জন্য তাঁহার নিকট প্রত্যহই যাতায়াত করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে কালীপ্রসাদ বুঝিতে পারিলেন যে, গঙ্গাগোবিন্দ তাঁহার সহিত কপট ব্যবহার করিতেছেন। তখন তিনি গঙ্গাগোবিন্দের কপট ব্যবহার ও অন্যান্য নিন্দার কথা লিখিয়া কৃষ্ণচন্দ্রকে একখানি পত্র প্রেরণ করেন। শম্ভুচন্দ্র পত্র-বাহকের নিকট হইতে এই পত্রখানি লইয়া গঙ্গাগোবিন্দের হস্তে অর্পণ করেন। পত্র-পাঠ-মাত্র সিংহের ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের বিপক্ষ হইয়া উঠিলেন। পরদিন হেষ্টিংস ধর্ম্মালয়ে উপবেশন করিবামাত্র তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "শিবচন্দ্র বিষয়কার্য্যে নিতান্ত অপটু, কিন্তু শম্ভুচন্দ্র বিচক্ষণ ও কার্য্যদক্ষ। পক্ষপাতী হইয়াই কৃষ্ণচন্দ্র জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্য দিয়া অন্যান্য পুত্রদিগকে বঞ্চিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। তখন ওয়ারেণ হেষ্টিংস গঙ্গাগোবিন্দের কপট-বচনে প্রতারিত হইয়া শম্ভুচন্দ্রেরই নামে সনন্দ দিবার আদেশ প্রদান করিলেন।

দেওয়ান কালীপ্রসাদ এই বিষয়ের বিন্দু-বিসর্গও জানিতে পারেন নাই। তিনি গঙ্গাগোবিন্দের নিকটে প্রত্যহ যেরূপ যাতায়াত করেন, সেইরূপই করিতে লাগিলেন। একদিন প্রাতঃকালে কালীপ্রসাদ গঙ্গাগোবিন্দের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। গঙ্গাগোবিন্দ তাঁহাকে দেখিবামাত্র ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া তাঁহার অত্যন্ত অবমাননা করেন। কালীপ্রসাদ নিতান্ত অবমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়া বিষণ্ণ-বদনে কৃষ্ণচন্দ্রের নিকটে আসিয়া গঙ্গাগোবিন্দের সমস্ত কথা তাঁহাকে বিজ্ঞাপন করিলেন। মহারাজ অনেক চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন যে, হেষ্টিংসের স্ত্রীকে কোনও কৌশলে হস্তগত করিতে পারিলেই আমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে।

তৎকালে হুগলী ও চন্দন-নগরের বাজারে মণিকারদিগের নিকটে অতি উৎকৃষ্ট বহুমূল্য মুক্তা বিক্রীত হইত। মহারাজ কালীপ্রসাদকে দিয়া ভাল ভাল মুক্তা সংগ্রহ করাইয়া একছড়া মুক্তার মালা প্রস্তুত করাইলেন। পরদিন প্রত্যূষেই কালীপ্রসাদ এই অমূল্য মুক্তামালা লইয়া হেষ্টিংসের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি তৎকালে বায়ু-সেবনার্থ বাটী হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন। কালীপ্রসাদ এই সুযোগ পাইয়া মণিকারের বেশে হেষ্টিংস-পত্নীর নিকটে উপস্থিত হইয়া উক্ত মুক্তার মালা তাঁহাকে দেখাইলেন। তিনি মালা দেখিয়া হৃষ্টমনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার মূল্য কত?" ছদ্মবেশী মণিকার বিনীতভাবে কহিলেন "আপনি মূল্য জানিবার জন্য ব্যগ্র হইতেছেন কেন? অনুগ্রহ করিয়া একবার গলায় পরিয়া দেখুন, কিরূপ শোভা হয়।" তিনি তখন ইহা গলায় পরিয়া ইহার অপূর্ব্ব শোভা দেখিতে লাগিলেন। মণিকার কহিলেন, "আপনার রূপ যেমন মনোহর, মালা ছড়াটীও সেইরূপ মনোহর হইয়াছে।" তখন হেষ্টিংস-পত্নী পুনর্ব্বার ইহার মূল্য জিজ্ঞাসা করিলে ছদ্মবেশী মণিকার কহিলেন, ইহার মূল্য অনেক টাকা। তবে আপনি স্বয়ং ইহা লইলে আমি চল্লিশ হাজার টাকা মূল্যে ইহা আপনাকে বিক্রয় করিতে পারি।" মেম সাহেব দীর্ঘ-নিশ্বাস-পরিত্যাগ করিয়া বিষণ্ণ ভাবে কহিলেন "আমার স্বামী এত টাকা দিবেন না। এজন্য আমার ভাগ্যে এই মুক্তার মালা ক্রয় করা ঘটিয়া উঠিবে না।" মুক্তার মালায় হেষ্টিংস-পত্নীর মন নিহিত রহিয়াছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া দেওয়ান কালীপ্রসাদ বিনীত-ভাবে কহিলেন "আপনি এই মালা কণ্ঠদেশ হইতে মোচন করিবেন না;—আমি ইহা আপনাকে উপহার দিতে আসিয়াছি।" তখন তিনি আপনার পরিচয় প্রদান করিয়া কহিলেন,—"আপনার স্বামী গভর্ণর জেনারেল বাহাদুর, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের আরোপিত

বাক্যে প্রতারিত হইয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বিশেষ ক্ষতি করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এক্ষণে আপনার কৃপা ভিন্ন মহারাজের অন্য উপায় নাই।" হেষ্টিংস-পত্নী ইহা শুনিয়া তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিলেন, এবং হেষ্টিংস সাহেব গৃহে প্রত্যাগত হইলে তাঁহাকে গঙ্গাগোবিন্দের প্রতারণার আমূল বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া মহারাজের প্রার্থনা-সিদ্ধির নিমিত্ত বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। মেমের সহিত সাহেব অনেক তর্ক-বিতর্ক করিয়া মহারাজের প্রার্থনা-পূরণ করিতে সম্মত হইলেন। অনতিবিলম্বে শিবচন্দ্রের নামে লিখিত সনন্দ গভর্ণর জেনারল বাহাদুর স্বাক্ষরিত করিয়া দিলেন। (ক)

সমস্যা—"শ্বেতাঙ্গীর গলে।"

নিবেদন করি ওগো হেষ্টিংস-মহিলা!
আমি এক মণিকার আসিয়াছি তব দ্বার
বিক্রয় করিতে এই মুকুতার মালা॥
ইহা অতি মূল্যবান্ নাহি দোখ ভাগ্যবান্
যে কিনিতে পারে এই মহামূল্য হার।
তুমি হেষ্টিংসের সতী রূপবতী গুণবতী
হেন নিধি সাজে গলে কেবল তোমার॥
ইহার নাহিক তুল্য না লব অধিক মূল্য
চল্লিশ হাজার টাকা করিব গ্রহণ।
একবার দিন গলে দেখুক জগতী-তলে
সোণার সহিত হোগ্ সোহাগ-মিলন।
শুনিয়া হেষ্টিংস-নারী করিলেন মন ভারি
এত টাকা না দিবেন সাহেব আমার।
মৃদুহাস্যে একবার কহিলেন মণিকার
নাহি লব মূল্য আমি,—ইহা উপহার॥
চাঁদপানা মুখখানি তুলিয়া তখন ধনী
ভাবিলেন,—আমি ধন্য এই ভূমণ্ডলে।
শ্রীকালীপ্রসাদ কয় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের জয়
কিবা শোভে মুক্তাহার 'শ্বেতাঙ্গীর গলে॥'

(৪৯)

মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র রস-সাগরকে প্রশ্ন করিলেন—"শ্রীগঙ্গাগোবিন্দ," এবং বলিয়া দিলেন, "ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন করিয়া ইহা আপনাকে পূর্ণ করিতে হইবে।" তখন রস-সাগর, মহারাজের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ইহা পূর্ণ করিয়া দিলেন।

প্রস্তাব। যখন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্রের নামে সমস্ত সম্পত্তির দানপত্র লিখিয়া শম্ভুচন্দ্রকে কেবল বার্ষিক বৃত্তির বন্দোবস্ত করিয়া দেন, তখন শম্ভুচন্দ্র অর্দ্ধেক রাজ্য পাইবার জন্য পিতার অবাধ্য হইয়া দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের শরণাপন্ন হন। ইহা জানিতে পারিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র চিন্তিত ও নিরুপায় হইলেন, এবং গঙ্গাগোবিন্দকে একখানি পত্র স্বহস্তে লিখিয়া তাহাতে এই কয়েকটী কথা সন্নিবেশিত করিয়া দিলেন,—"পুত্র অবাধ্য, দরবার অসাধ্য, যা করেন শ্রীগঙ্গাগোবিন্দ।"

সমস্যা—"শ্রীগঙ্গাগোবিন্দ।"

(গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের প্রতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের উক্তি)

"ভীষণ অরণ্য-সম আমার সংসার,
শম্ভুচন্দ্র ধূর্ত্তপশু,—নাহিক নিস্তার।
তুমি সিংহ পশুপতি তুমিই আমার গতি
তুমি কৃপা করিলেই পরম আনন্দ।
পুত্র হইল অবাধ্য দরবার হ'লো অসাধ্য
এ সময় যা করেন 'শ্রীগঙ্গাগোবিন্দ॥'

(৫০)

যুবরাজ শ্রীশচন্দ্র স্বয়ং গুণবান্, বুদ্ধিমান্ ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন। তিনি রস-সাগরকে দিয়া মধ্যে মধ্যে সমস্যা পূর্ণ করাইয়া পরম আনন্দ অনুভব করিতেন। একদিন তিনি প্রশ্ন করিলেন, "সেই নব-ঘন-শ্যামে।" রস-সাগর তাঁহার মনের প্রকৃত ভাব বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ ইহার উত্তর প্রদান করিলেন।

[প্রস্তাব। গুপ্তিপাড়া-নিবাসী কবিবর বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহাশয়, নবাব আলীবর্দ্দি খাঁ, নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও শোভাবাজারাধিপতি মহারাজ নবকৃষ্ণের পরম প্রিয়পাত্র ছিলেন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মহাশয়দিগকে উদর-চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া নানা ধনাঢ্যের দ্বারস্থ হইয়া স্তুতিবাদ করিতে হয়। বিদ্যালঙ্কার মহাশয়কেও তাহা করিতে হইয়াছিল। এজন্য জীবনের শেষ দশায় মনের আবেগে নিতান্ত অনুতাপ করিয়া তিনি এই শ্লোকটী রচনা করিয়াছিলেন। রস-সাগর মহাশয়ের রচিত বাঙ্গালা কবিতাটী নিম্ন-লিখিত সংস্কৃত শ্লোকের ভাবার্থ মাত্র:—

"আলীবর্দ্দিনবাবমপ্যথ নবদ্বীপেশ্বরঞ্চাশ্রিতং
তৎপশ্চান্নবকৃষ্ণভূপতিমমুং রে চিত্ত বিত্তাশয়া।
সর্ব্বত্রৈব নবেতিশব্দঘটিতং ত্বঞ্চেৎ কমালম্বসে
তদ্ দেবং পরমার্থদং নবঘনশ্যামং কথং মুঞ্চসি॥"

উদ্ভট-সাগরঃ (তৃতীয়-প্রবাহঃ) ১৩১ শ্লোকঃ।

সমস্যা—"সেই নব-ঘন-শ্যামে।"

শুন শুন বলি তোরে ওরে মোর মন!
"নব"-শব্দ ভাল বাস তুমি বিলক্ষণ।
নবদ্বীপ-অধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র মহামতি
কি দুর্গতি না স'য়েছ তাঁহার সভায়!

(ক) এই সমস্যা-পূরণ সম্বন্ধে যে প্রস্তাব লিখিত হইল, তাহা স্বর্গত মহাত্মা কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয় কৃত "ক্ষিতীশ-বংশাবলি চরিত" হইতে গৃহীত মর্ম্মার্থ মাত্র।

নবকৃষ্ণ মহারাজা শোভাবাজারের রাজা
কিবা সাজা না পেয়েছ যাইয়া তথায়।
আলীবর্দ্দি খাঁ নবাব বাঙ্গালায় সুপ্রভাব
তাঁর মত ধনী মানী নাই বঙ্গ-ধামে।
"নব"-শব্দ যদি চাও তবে ইথে কাণ দাও
ধর ধর গিয়া 'সেই নব-ঘন-শ্যামে।'

(৫১)

একদা মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র রাজসভায় বসিয়া রস-সাগর মহাশয়কে বলিলেন "আপনাকে অদ্য একটী জটিল সমস্যা পূরণ করিতে দিব।" ইহা বলিয়া তিনি এই সমস্যাটী দিলেন,—"হরি-ক্রোড়ে উমা আর হর-ক্রোড়ে রমা।" রস-সাগর মহারাজের মনের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ক্ষণ-বিলম্ব ব্যতিরেকে ইহা এইভাবে পূর্ণ করিয়া দিলেন :-

সমস্যা—"হরি-ক্রোড়ে উমা আর হর ক্রোড়ে রমা।"

কৃষ্ণচন্দ্র ঘোর শাক্ত,—এই সবে বলে,
তাঁর মত বিষ্ণুদ্বেষী নাই ভূমণ্ডলে।
কৃষ্ণচন্দ্র শুনিয়াই কাণে এই কথা
মনে মনে পাইলেন নিদারুণ ব্যথা।
শিবচন্দ্রে ডাকি কৃষ্ণচন্দ্র মহামতি
কহিলেন—"গঙ্গাবাসে যাও শীঘ্রগতি।
বন্দোবস্ত কর গিয়া তুমিই এখন,
হরি-হর মূর্ত্তি তথা করিব স্থাপন।
হরি-হরে ভেদ নাই, দেখাতে সকলে
এই মূর্ত্তি খানি আমি রচিব কৌশলে।"
ইহা হ'তে নাহি আর বিষম সুষমা,—
'হরি ক্রোড়ে উমা আর হর-ক্রোড়ে রমা।'

[প্রস্তাব। একদা কবিবর সাধক রামপ্রসাদ সেন মহাশয় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে কহিলেন "মহারাজ! কৃষ্ণনগরের অধিকাংশ লোকে বলেন যে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যেরূপ ঘোর শাক্ত, তাঁহার সভাসদ্ রামপ্রসাদ সেনও সেইরূপ শাক্ত। উভয়েই ঘোর বিষ্ণুদ্বেষী। ইহা শুনিয়াই মহারাজ হৃদয়ে মর্ম্মান্তিক ব্যথা অনুভব করিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্রকে ডাকাইয়া কহিলেন, "তুমি এখনই গঙ্গাবাসে গমন করিয়া স্থান নির্ব্বাচন করিয়া আইস। আমি সে স্থানে শীঘ্রই হরি-হর-মূর্ত্তি স্থাপন করিব।" মহারাজেন্দ্র বাহাদুর কৃষ্ণচন্দ্র জীবনের শেষাবস্থায় নবদ্বীপের নিকটে থাকিবার অভিলাষে কৃষ্ণনগরের দুই ক্রোশ পশ্চিমে ও নবদ্বীপের এক ক্রোশ পূর্ব্বে অলকানন্দা-নদীর তীরস্থিত এক স্থানে নানা মনোহর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া ঐ স্থানের নাম "গঙ্গাবাস" রাখিয়াছিলেন। সেই স্থানে তিনি এক মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে "হরিহর-মূর্ত্তি" স্থাপন করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া তিনি এই বাটীতে আসিয়া অবস্থিতি করিয়াছিলেন। গঙ্গাবাসে যে সকল সুরম্য প্রাসাদ ছিল, তাহা প্রায়ই ভূমিসাৎ হইয়াছে; কেবল হরি হর-মূর্ত্তির মন্দিরটী অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। ১১৮৩ বঙ্গাব্দে (১৬৯৮ শকাব্দে বা ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে) এই মন্দিরটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। (ক)]

(৫২)

মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের একটী কন্যা জন্ম-গ্রহণ করিলে তিনি রস-সাগরকে কহিলেন, "আমার কন্যার কি নাম রাখিব, তাহা আপনি স্থির করিয়া দিন। আমার ইচ্ছা যে, তাহার নাম 'সীতা' রাখি।" তখন রস-সাগর মহারাজকে কহিলেন, "সীতা-নাম কেহ যেন না রাখে কখন!" মহারাজ এই সমস্যাটী পূরণ করিতে বলায় রস-সাগর ইহা এইভাবে পূরণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"সীতা-নাম কেহ যেন না রাখে কখন!"

হইল সীতার জন্ম মৃত্তিকার তলে,
পিতার দুর্জ্জয় পণ বিবাহের কালে।
পরশু-রামের সনে পথে যুদ্ধ হয়;
পতি সনে পঞ্চবটী বনেতে আশ্রয়।
রাবণ হরণ করি' কেশপাশ ধ'রে
লঙ্কায় অশোক-বনে রাখে রোধ ক'রে।
অপযশে পাছে ব্যাপ্ত হয় ত্রিভুবন,
দিতে হ'ল শেষে অগ্নি-পরীক্ষা ভীষণ।
প্রজাগণ নানা কথা কহিতে লাগল,
অবশেষে রামচন্দ্র বনবাস দিল।
অগ্নিও পবিত্র হয় পরশে যাঁহার,
তাঁহারো অদৃষ্টে অগ্নি পরীক্ষা আবার!
দুঃখে দুঃখে কেটে গেল সীতার জীবন,
'সীতা-নাম কেহ যেন না রাখে কখন!'

(৫৩)

একদিন রস-সাগর রামায়ণ-গান শুনিয়া আসিয়া মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রকে কথায় কথায় বলিলেন. "সীতার কঠিন প্রাণ, রামের কোমল!" মহারাজ বলিলেন "একথা অসম্ভব!" তখন রস-সাগর এই সমস্যা পূরণ করিয়া নিজ মতের সাথকতা প্রদর্শন করিলেন।

(ক) এই মন্দিরের উপরিভাগে যে একটী সংস্কৃত শ্লোক অদ্যাপি লিখিত আছে, তাহা এস্থানে উদ্ধৃত করা গেল। শুনিতে পাওয়া যায়, ইহা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং রচনা করিয়াছিলেন :—

"গঙ্গাবাসে বিধিশ্রুত্যনুগতসুকৃতক্ষৌণিপালে শকেঽস্মিন্
শ্রীযুক্তো বাজপেয়ী ভুবি বিদিতমহারাজরাজেন্দ্রদেবঃ।"
ভেত্তুং ভ্রান্তিং মুরারিত্রিপুরহরভিদামজ্ঞতাং পামরাণাং
মদ্বৈতব্রহ্মরূপং হরিহরমুময়াঽস্থাপয়ল্লোলয়া চ॥

উদ্ভট-সাগরঃ (তৃতীয়-প্রবাহঃ) ৯৮ শ্লোকঃ।

সমস্যা—"সীতার কঠিন প্রাণ, রামের কোমল !"

(সীতা-হরণের পরেই রাম ও লক্ষ্মণ সীতাকে কুটীরে দেখিতে না পাইয়া বিষম ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তখন রাম "সীতা, সীতা" বলিয়া পুনঃ পুনঃ ডাকিয়াও উত্তর না পাওয়ায় ক্রোধভরে সীতাকে লক্ষ্য করিয়া কহিতেছেন।)

কোথায় কোথায় সীতে গেলে এ সময়,
এখনি উত্তর দাও,—ব্যাকুল হৃদয় !
এখনি আইস হেথা, ফাটিছে পরাণ,
এই ছিলে, এই কোথা হইলে অন্তর্দ্ধান ?
সমুদায় পঞ্চবটী-বনে ঠাঁই ঠাঁই
খুঁজিতেছি দুই ভাই,—তবু দেখা নাই !
বুঝিলাম পরিহাস করিবে বলিয়া,
পম্পা মধ্যে পদ্ম বনে আছ লুকাইয়া।
এখনো উত্তর নাই জনক-নন্দিনি !
বুঝিনু তোমার মত না আছে পাষাণী !
'সর্ব্বংসহা' মাতা তব, পেটে জন্মি' তার
সব সহ্য হয় তব, বুঝিলাম সার।
দশরথ মোর পিতা,—দিয়া মোরে বনে
সহ্য না করিতে পারি' মরেছেন প্রাণে !
এ রস-সাগর কহে হইয়া বিহ্বল,—
'সীতার কঠিন্ প্রাণ, রামের কোমল !' (ক)

(৫৪)

একদিন এক পণ্ডিত মহাশয় নবদ্বীপ হইতে কৃষ্ণনগরে মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। রস-সাগর তখন রাজ-সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার সহিত পূর্ব্ব হইতেই উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের পরিচয় ছিল। পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন "রস-সাগর মহাশয় ! আপনি পরম বুদ্ধিমান্ পুরুষ।" ইহা শুনিয়া রস-সাগর কহিলেন, "সেবকের মত কেবা বোকা এ সংসারে !" তখন উক্ত পণ্ডিত মহাশয় তাঁহাকে এই সমস্যাটি পূর্ণ করিতে বলায় তিনি এইভাবে ইহা পূরণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"সেবকের মত কেবা বোকা এ সংসারে !"

উন্নত হবার তরে হয় অবনত,
জীবন রাখিতে করে জীবন নিহত ;
দুঃখ পায় সুখভোগ করিবার তরে,
'সেবকের মত কেবা বোকা এ সংসারে !'

(৫৫)

একদিন মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র রস-সাগরকে এই সমস্যাটি পূরণ করিতে দিলেন :—"সে নারী ত নারী নয়, ঠিক নিশাচরী !" রস-সাগর মহাশয় মহারাজের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া এই সমস্যাটি তৎক্ষণাৎ এইভাবে পূরণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"সে নারী ত নারী নয়, ঠিক নিশাচরী !"

যে নারী পতির প্রতি দয়া না রাখিয়া
কেবল তাহার ধনে রহে তাকাইয়া ;
যে নারী পতির হৃদি হানি' বাক্য-বাণ
বিদীর্ণ করিয়া তাহা করে খান্ খান্ ;
যে নারী তনয় কিংবা তনয়ার প্রতি
নাহি রাখে দয়া মায়া কিংবা আর প্রীতি ;
যে নারী চীৎকার করি' ফাটায় মেদিনী,
যে নারী করয়ে গৃহ অশান্তির খনি ;
যে নারী সর্ব্বদা করে নাসিকা কুঞ্চন,
যে নারী সর্ব্বদা কহে অপ্রিয় বচন ;
যে নারী উন্মত্ত রহে লইয়া কলহ,
যে নারী বিবাদ-চিন্তা করে অহরহ ;
যে নারী পিতার গৃহে করিয়া গমন
যার তার ঘরে করে শয়ন ভোজন ;
এ রস সাগর কহে,—দেখহ বিচারি'
'সে নারী ত নারী নয়, ঠিক নিশাচরী !'

(৫৬)

একদিন রস-সাগরের শান্তিপুর-নিবাসী এক বন্ধু তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, "হাটের ভাড়া হুজুক চায়।" রস-সাগর তখনই তাহা পূরণ করিয়া বন্ধুকে পরম প্রীত করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"হাটের ভাড়া হুজুক চায়।"

উকীল খোঁজেন মকদ্দমা, কোকিল বসন্ত গায়,
অগ্রদানী গণেন্ নিত্য,—কোন্ দিন কে অক্কা পায়।
সাধু খোঁজেন পরমার্থ, লম্পট খোঁজেন বেশ্যালয়,
গোলমালেতে রেস্ত কেলে, 'হাটের ভাড়া হুজুক চায় !'

(ক) এই কবিতাটীর ভাব নিম্ন-লিখিত শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায় :—

বিতর বিতর বাচং কুত্র সীতে গতা ত্বং
বিরমতু পরিহাসঃ সর্ব্বথা দুঃসহো মে।
ত্বমসি খলু তনুজা হন্ত সর্ব্বংসহায়াঃ
সুতবিরহবিমুক্তপ্রাণরাজাত্মজোঽহম্।

উদ্ভট-সাগরঃ (দ্বিতীয়-প্রবাহঃ) ১৮ শ্লোকঃ।

(৫৭)

মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের একজন ভৃত্য ত্বরিতানন্দ (গাঁজা) ও অন্যান্য মাদক দ্রব্য সেবন করিত। সে ব্যক্তি একদিন রাজ-সভায় আসিয়া নেসার ঝোঁকে মহারাজের কথার কোনও উত্তর দিতে পারে নাই। তখন সে গাঁজার নেসায় অভিভূত ছিল। তখন মহারাজ রস-সাগরের দিকে সহাস্য-বদনে ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন, "হায় রে ত্বরিতানন্দ! ধন্য তোর জাতি।" রস-সাগরও হাসিতে হাসিতে ইহা পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"হায় রে ত্বরিতানন্দ! ধন্য তোর জাতি।"
আগ্রহে কিনিতে চায় নবাবের হাতী,
চাকর রাখিতে চায় নবাবের নাতি।
মাথায় দিইতে চায় নবাবের ছাতি,
নজর মারিতে চায় বেগমের প্রতি।
বিবিধ নেসার ঝোঁকে এসব দুর্গতি,
'হায় রে ত্বরিতানন্দ! ধন্য তোর জাতি!'

(৫৮)

একদিন মহারাজ গিরীশচন্দ্র সভায় বসিয়া রস-সাগর ও অন্যান্য লোকের নিকটে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অবস্থার সহিত স্বীয় অবস্থার তুলনা করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছিলেন। তখন রস-সাগর মহারাজকে কহিলেন "আপনার গুণধর বাজপেয়ী খুড়া মহাশয়ই, আপনার যাবতীয় মূল্যবৎ বস্তু আত্মসাৎ করিয়া গিয়াছেন" ইহা শুনিয়া মহারাজ দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন "হায় রে পিতৃব্য।" তখন রস-সাগর এই সমস্যাটী এইরূপে পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"হায় রে পিতৃব্য।"
কি আর বলিব বিধাতার ভবিতব্য,
ছাদ ফুঁড়ে ল'য়ে যায় ওমরাও দ্রব্য।
বাদসাহী জিনিস যত ছিল উপজীব্য,
অধনেন ধনং প্রাপ্তং 'হায় রে পিতৃব্য।'

(৫৯)

একদিন রাজ-সভায় প্রশ্ন হইল "হায় হায় হায়।" রস-সাগর ইহা এইভাবে পূর্ণ করিয়াছিলেন :—

সমস্যা—"হায় হায় হায়।"
তনয় কামনা করে পিতৃ-ধন হরি,
শাশুড়ী কামনা করে জামাই-ঘর করি।
বধূর কামনা মনে শ্বশুরকে পায়,
এ বড় আশ্চর্য্য কথা 'হায় হায় হায়।'

(৬০)

মহারাজ গিরীশ চন্দ্র সাধু ও সন্ন্যাসী লইয়াই কাল যাপন করিতেন। বিষয় কর্ম্মে তাঁহার কিছুমাত্র আস্থা ছিল না। একদা তিনি কয়েকটী সাধু লোকের সঙ্গে বসিয়া সংসারের অনিত্যতা ও অপবিত্রতার সম্বন্ধে কথা কহিতে কহিতে বলিলেন, "ভূমিষ্ঠ হইয়া হরি! হারালাম এইমাত্র।" রস-সাগর তৎক্ষণাৎ ভক্তি-ভরে এই সমস্যাটী পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"হারালাম এইমাত্র"
বার বার যাতায়াত, নিজ কর্ম্ম সূত্র,
পূর্ব্ব কথা নাহি মনে,—কি নাম, কি গোত্র।
জঠরে পরমানন্দে ছিলাম পবিত্র,
ভূমিষ্ঠ হইয়া হরি! 'হারালাম এইমাত্র।'

কয়লার খনি

[শ্রীসুশীলচন্দ্র রায়চৌধুরী]

পাথুরিয়া কয়লার ব্যবহার আমাদের দেশে ক্রমশঃই বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে ও করিতেছে। ইহার অভাবে পাটের কল বন্ধ, ময়দার কল বন্ধ '৬ মাসের পথ ৬ দিনে' বহনকারী আমাদের আদরের রেলগাড়ী বন্ধ। এমন কি সহরের প্রত্যেক লোকের ভাত বন্ধ। শুধু সহর কেন, আজকাল পল্লীগ্রামেও ইহা বিশেষ ভাবে প্রবেশ করিয়াছে। সুতরাং এক কথায় বলিতে গেলে, কয়লার অভাবে আমাদের "হাঁড়ি সিকায় উঠে"।

কয়লার সহিত আমাদের এত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। কিন্তু কয়লা কিরূপে বা কোথায় হয়, কি উপায়েই বা তাহা খনন করা হয়—তাহা বোধ হয় খুব অল্প লোকেই জানেন। এই কারণে সাধারণের অবগতির জন্য আমি এ সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিতে চাই।

কয়লা কিরূপে উৎপন্ন হয় তাহা জানিতে হইলে, একটু ভূতত্ত্বের আলোচনা দরকার; সুতরাং ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের সাহায্য আবশ্যক। এই পৃথিবী পূর্ব্বে কিরূপ ছিল, এবং কিরূপেই বা বর্ত্তমান মূর্ত্তিতে পরিবর্ত্তিত হইল, ইহার উপরে বা নিম্নে কি-কি পদার্থ বর্ত্তমান, এই সমস্ত নির্ণয় করা তাঁহাদের কার্য্য। খনিজ বিদ্যা ভূতত্ত্ব বিদ্যার একটি প্রধান অংশ। সুতরাং এই যে পৃথিবীর অভ্যন্তর হইতে আমরা কয়লা, স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরক ইত্যাদি পাইতেছি, এই সমস্তের জন্য আমরা প্রধানতঃ ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট ঋণী।

এই বিশ্বসৃষ্টি বাস্তবিকই এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। কোথা হইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি? কেমন করিয়া ইহা বর্ত্তমান আকার ধারণ করিল? এই প্রশ্ন সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত আছে। তবে আমরা সে সমস্ত গোলমালের ভিতর যাইব না; কারণ ভূতত্ত্বের আলোচনাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং আমরা প্রচলিত মতেরই অনুসরণ করিব।

ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে পৃথিবী প্রথমে একটি গলিত জড়পিণ্ড ছিল। তাহার পর ক্রমশঃ তাহার বহির্ভাগ শীতল হইয়া কঠিন মৃত্তিকায়

পরিণত হইল। এই মৃণ্ময় উপরিভাগই আমাদের বর্ত্তমান বাসস্থান। ইহার অভ্যন্তর যে এখনও অতিশয় গরম, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। যে কোন খনির মধ্যে অবতরণ করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, যত নিম্নে যাওয়া যায়, তাপ ততই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। মোটামুটি ভাবে এরূপ বলা যাইতে পারে যে, ভূগর্ভের প্রত্যেক ৬০ ফিটে এক ডিগ্রি করিয়া উত্তাপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যদি এই পরিমাণে ক্রমশঃই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে ১০০০০ হাজার ফিট নিম্নের তাপ জল ফুটাইতে এবং আরও নিম্নের তাপ শিলা গলাইতে সমর্থ হইবে। ইহা ব্যতীত আগ্নেয় গিরি, উষ্ণ-প্রস্রবণ ইত্যাদি পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ তাপের প্রমাণ দেয়।

যেমন পৃথিবীর উপরিভাগ শীতল হইতে লাগিল, সেই সঙ্গে গলিত জড়পিণ্ড বেষ্টনকারী বাষ্পও (gas) শীতল হইল। তাহা হইতে জল প্রস্তুত হইল এবং ক্রমশঃ তাহা বর্ত্তমান আকার ধারণ করিল। পৃথিবীর উপরিভাগ শীতল হওয়ায় তাহা সঙ্কুচিত হইতে লাগিল; এবং তাহাতে উপরে বিলক্ষণ চাপ (Pressure) পড়িতে লাগিল। এই চাপের দ্বারা পূর্ব্বের মৃত্তিকাস্তূপ বক্র হইতে ও স্থানে-স্থানে ভাঙ্গিতে লাগিল। পৃথিবীর এই সঙ্কোচন ক্রিয়া এখনও চলিতেছে; তবে পৃথিবীর বয়স যেমন বৃদ্ধি পাইতেছে, ভূপৃষ্ঠও তত পুরু হইতেছে; এবং ইহার ভিতরের গলিতাংশ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক মন্থর-গতিতে শীতল হইতেছে। সুতরাং ইহার সঙ্কোচন-ক্রিয়াও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কম। ইহা দ্বারাই প্রমাণ হয় যে, নূতন শিলাস্তূপ অপেক্ষা পুরাতন শিলাস্তূপ (rock) কেন এত প্রচণ্ডরূপে আকুঞ্চিত হইয়াছে।

এইরূপে অগ্ন্যুৎপাতে, জলধারাসম্পাতে এবং সর্ব্বদা তাপ বিকীরণে পৃথিবী শীতল হইতে লাগিল; ভূপৃষ্ঠ কঠিন হইতে কঠিনতর হইতে লাগিল এবং তাহার অভ্যন্তরস্থ গলিত ধাতুসমূহ ধীরে-ধীরে কাঠিন্য প্রাপ্ত হইল। কাঠিন্য হইতে শিলা নির্ম্মিত হইল। ভূতত্ত্ববিদ্গণ এই শিলা (rock) দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন,—

১। আগ্নেয় (Igneous).

২। জলজ (Aqueous).

১। আগ্নেয়।—

আগ্নেয় পর্ব্বতোদ্গীর্ণ গলিত নিঃস্রাবের ন্যায় গলিত জড়পিণ্ড শীতল হইলে সেই শিলাকে আগ্নেয়শিলা (Igneous rock) বলে। ইহাদের কোন বিশেষ আকার থাকে না কিম্বা দানা থাকে না (Not crystalline)। ইহা পৃথিবীর চাপে ভিতর হইতে গলিত অবস্থায় ঊর্দ্ধাংশ ভেদ করিয়া উঠে এবং তথায় শীতল হইয়া কঠিন হয়।

২। জলজ।—

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পৃথিবীর উপরিভাগ ক্রমশঃ যতই সঙ্কুচিত হয়, তাহার চাপে পুরাতন শিলাসকল স্থানে স্থানে ততই ভাঙ্গিতে থাকে এবং তাহা বৃষ্টি-জল দ্বারা ধৌত হইয়া বাতাসের সাহায্যে নদীতে আসিয়া পড়ে এবং নদীর গতির সহিত ধাবিত হয়। যথায় নদী সমুদ্রে পতিত হয়, সে স্থানে তাহার স্রোতগতি মন্দ হয় এবং বালুকা ও কর্দ্দম পঙ্কস্তর রূপে বিন্যস্ত হইতে থাকে। এইরূপে স্তরে-স্তরে সজ্জিত হইয়া বালুকা ও কর্দ্দম রাশি উপরের চাপে কঠিন হইয়া উঠে এবং শিলায় পরিণত হয়। এই প্রকার শিলার বিভিন্ন স্তর থাকে এবং ইহা জলস্রোত দ্বারা উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাকে জলজ বা স্তর-বিন্যস্ত শিলা (aqueous or Stratified rock) বলে।

এই সমস্ত শিলার উপর—জান্তব দেহের বা অস্থি-পঞ্জরের বা উদ্ভিদের ছাপ পাওয়া যায়। অর্থাৎ এই সমস্ত শিলা স্তরে-স্তরে সজ্জিত হইবার সময়ে, তাৎকালিক কোন উদ্ভিদের বা জীবজন্তুর দেহাবশেষ তাহার উপর পতিত হইয়াছে; এবং উপরের স্তরের চাপে ছাপ পড়িয়াছে (ইহাকে fossil বলে)। সুতরাং এই সমস্ত ছাপ দেখিয়া সেই শিলা কোন্ সময়ের, তাহা বলা যাইতে পারে। ইহা হইতেই স্তর-বিন্যস্ত শিলা (Stratified rock) চারিভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, পৃথিবীর প্রথমাবস্থায় সজীব প্রাণীর অস্তিত্ব ছিল না; ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর বহির্ভাগ যত শীতল হইতে লাগিল, ততই বৃক্ষলতাদি জন্মিতে লাগিল এবং ধীরে ধীরে প্রাণিজগতের আবির্ভাব হইতে লাগিল।

Stratified rock এর বিভাগ

4. Cainozoic—(বর্ত্তমান জীবন)

3. Mesozoic—(মধ্য জীবন)

2. Palacozoic—(পুরাতন জীবন)

1. Azoic—(জীবনের চিহ্ন নাই)

ইহারা আবার পুনর্বিভক্ত হইয়াছে; তন্মধ্যে Palæozoicএর বিভাগই আমাদের দরকার।

Palæozoic—
- Permian.
- Carboniferous (অঙ্গারক)
- Devonian.
- Silurian. (প্রথম মৎস্যজাতীয় জীবের আবির্ভাব)
- Cambrian.

ইহাদের মধ্যে Carboniferousএর বিভাগ আমাদের আবশ্যক; কারণ, ইহা হইতেই আমরা কয়লা প্রাপ্ত হই—

Carboniferous
- 3. Coal
- 2. Millstone gri
- 1. Carboniferous limestone

কয়লার উৎপত্তি:—

যেখানে যেখানে কয়লার স্তর আছে, পূর্ব্বে ঐ সকল স্থানে গভীর অরণ্য ছিল। ক্রমে ভূপঞ্জরের গতিতে ঐ সকল স্থান জলে নিমগ্ন হয়; এবং ক্রমে বালুকা ও মৃত্তিকা স্তর তাহার উপর সঞ্চিত হইতে থাকে। ঐ সমস্ত বালুকা ও মৃত্তিকা এক্ষণে বালুকাশিলা (Sand-stone) ও মৃৎপ্রস্তরে (Shale) পরিণত হইয়াছে। ঐ সমস্ত বৃক্ষলতাদি পচিয়া উপরের চাপে ও আভ্যন্তরীণ তাপে মৃদঙ্গার প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার

প্রমাণ-স্বরূপ কখনও-কখনও কয়লার উপর বৃক্ষপত্রের বা বৃক্ষের অন্ত কোন অংশের ছাপ দেখিতে পাওয়া যায়। কয়লার রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারাও ইহার কতক প্রমাণ পাওয়া যায়। বৃক্ষলতাদি কতদিন পচিলে যে কয়লায় পরিণত হয়, তাহা বলা কঠিন; তবে যত বেশী দিন ধরিয়া পচিবে, কয়লা ততই ভাল হইবে।

স্তর-বিন্যস্ত শিলার গঠন—Structure of Stratified rocks

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মৃত্তিকা বা বালুকা স্তরে-স্তরে জমিয়া উপরের চাপে কঠিন হইয়া শিলায় পরিণত হয়। যখন ইহারা গঠিত হয়, তখন ইহাদের স্তর সমতল থাকে; কিন্তু সচরাচর দেখা যায় যে সমতল নাই।

(খনিতে নিম্নলিখিত ভূতত্ত্ব-বিজ্ঞানের কতকগুলি কথা সর্ব্বদাই ব্যবহৃত হয়)।

Dip এবং Strike :—

শিলাস্তর প্রায়ই সমতল দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা যে দিকে ঢালু, সেই দিকের নাম dip। ইহা সমতলের সহিত যে কোণ উৎপন্ন করে, সেই কোণের দ্বারাই ইহার মাপ বুঝা যায়। কিন্তু খনিতে dip কোণ দ্বারা মাপ হয় না।

ক খ যদি শিলাস্তর হয় এবং ক গ যদি সমতল রেখা হয়, তবে—

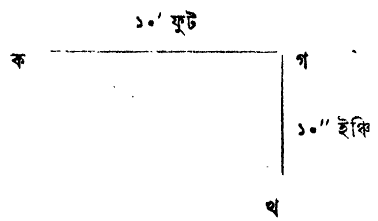

$$\text{dip} = \frac{\text{খগ}}{\text{কগ}} = \frac{১০}{১০\times১২} = \frac{১}{১২}$$

অর্থাৎ dip = 1 in 12 (১২তে ১)

যে স্তর dipএর সহিত সমকোণে অবস্থিত, তাহাই Strike, অর্থাৎ dip যদি উত্তর-দক্ষিণে হয়, তবে Strike পূর্ব্ব-পশ্চিমে হইবে।

Out crop :—যেখানে শিলাস্তর আসিয়া ভূপৃষ্ঠের সহিত মিশিয়াছে সেই স্থানকে সেই স্তরের out crop বলে।

কয়লা-স্তরের বিঘ্ন—Disturbances in coal seam

Fault :—প্রথমে বলিয়াছি যে, যখন কয়লা বা শিলাস্তর জমে, তখন সমতল থাকে; কিন্তু পরে ভূপৃষ্ঠের চাপে ও ভূকম্পনাদি উপদ্রবে স্তরগুলি স্থানে-স্থানে বিপর্য্যস্ত ও ভগ্ন হয়; এবং হয় ত একভাগ উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয়, কিম্বা নিম্নে নামিয়া যায়। কয়লা-স্তরে ইহা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে Fault বলে। দুইটি স্তরের দূরত্ব কয়েক হস্ত হইতে কয়েক গজ পর্য্যন্ত হইতে পারে।

যে স্তর উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয়, তাহাকে up throw, এবং যাহা নিম্নে নামিয়া যায় তাহাকে down throw বলে।

Fault এর তল তাহার লম্বতলের সহিত যে কোণ উৎপন্ন করে তাহার নাম Hade। ইহা দ্বারা স্তর-নির্ণয়ে খুব সাহায্য পাওয়া যায়। মনে করুন, আমি একটী কয়লার স্তর পাইয়াছি; এবং দেখিলাম, তাহাতে একটি Fault আছে; কিন্তু সেই fault down throw কি up throw, তাহা জানিতে না পারিলে, আমি সেই স্তরের কয়লা পাইব কি না, কিম্বা অনর্থক অর্থ নষ্ট হইবে, তাহা বুঝা যাইবে না। Hade হইতে তাহা জানিতে পারা যায়। কোন লোক কোন কয়লাস্তরের উপর দাঁড়াইলে, fault যদি তাহার দিকে ঝুঁকিয়া আসে, অর্থাৎ কয়লাস্তর ও faultএর ভিতরের কোণ সূক্ষ্মকোণ হয়, এবং নিম্নে দাঁড়াইলে Fault তাহার দিক হইতে দূরে থাকে, অর্থাৎ কয়লাস্তর ও Faultএর ভিতরের কোণ স্থূলকোণ হয়, তবে বুঝিতে হইবে, সেখানে down throw হইয়াছে। Up throwর নিয়ম ইহার বিপরীত।

Dyke :—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, কখন কখনও নিম্ন হইতে আগ্নেয়-শিলা গলিত অবস্থায় উর্দ্ধাংশ ভেদ করিয়া উঠে; এবং তথায় শীতল হইয়া কঠিন হয়। এ কয়লার স্তরের ভিতর দিয়া উঠিলে উহা উভয় পার্শ্বস্থ কয়লা কিছু দূর পর্য্যন্ত দগ্ধ ও রূপান্তরিত হইয়া যায়। ইহাকে dyke বলে। ইহা সাধারণ শিলা অপেক্ষা খুব কঠিন। কোন অস্ত্র দ্বারা ইহা কর্ত্তন করা যায় না। ইহার ভিতর দিয়া পথ করিতে গেলে Dynamite (ডিনামাইট) দিয়া ফাটাইয়া তবে পথ করিতে হয়।

এইগুলি ব্যতীত কয়লাস্তরের আরও অনেক বিঘ্ন আছে; কিন্তু অপ্রয়োজনীয় বোধে সেগুলি দিলাম না।

কয়লার বিশ্লেষণ ও পার্থক্য :—

রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা দেখা যায় যে, কয়লা বিভিন্ন প্রকারের আছে, এবং তাহাদের গুণও বিভিন্ন। বৃক্ষলতাদির ক্রম-পরিবর্ত্তনে কয়লার উৎপত্তি; সুতরাং পরিবর্ত্তনের পরিমাণ অনুসারে কয়লার গুণের পার্থক্য হয়। যে কয়লা পরিবর্ত্তনের শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়াছে, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কয়লা। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার কয়লার নাম, ও তাহাদের রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহার পরিচয় দেওয়া গেল।

	অঙ্গার	উদজান্	অম্লজান্ ও যবক্ষারজান
১। Peat—	(Carbon)	(Hydrogen)	(Oxygen & Nitrogen)
শতকরা	৬০		

ইহাই কয়লার প্রথম স্তর।

২। Lignite	৭০	৫৫	২৪.৫

ইহা Peatএর ক্রমোন্নতি। ইহার রং কটা, ঠিক কাল নয়। ইহার তাপশক্তি কম ও ইহাতে ভস্ম (ash) বেশী।

৩। Gas coal—ইহাতে উদজানের (Hydrogenএর) ভাগ বেশী ; সেজন্য ইহা গ্যাস প্রস্তুত করিবার জন্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

	C	H	O & N
Gas coal—	৮৪	৬	১০

৪। Bituminous Coal—ইহাই সচরাচর আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি। House coal, Steam coal, Caking coal সব ইহা হইতে হয়।

House coal—ইহার রং কাল এবং চক্‌চকে। ইহা সহজেই জ্বলে এবং ইহার তাপ বেশী ও ধূম (Smoke) ও ভস্ম (ash) কম।

Steam coal—ইহার রং কাল, কিন্তু চক্‌চকে নয়। ইহা (Dull black)—ইহা House coalএর ন্যায় অত শীঘ্র জ্বলে না। ইহাতে ধূম কম কিন্তু তাপ খুব বেশী। ইহা জ্বলিবার সময় পিণ্ডাকার হয় না (do not cake)।

Caking Coal—কোক প্রস্তুত করিবার জন্য এই কয়লা ব্যবহৃত হয়। ইহা গুঁড়া করিয়া একটি আবদ্ধ পাত্রে জ্বালান হয়—এবং ইহা পরস্পর মিশ্রিত হইয়া পিণ্ডাকার প্রাপ্ত হয় (cake together) ; এবং ইহার জলীয় ও বাষ্পীয় অংশ উড়িয়া যায়। যে সব অংশ উড়িয়া যায়, তাহা হইতে Coal-tar, ammonia ইত্যাদি অনেক জিনিস পাওয়া যাইতে পারে। সাধারণতঃ কোক্ প্রস্তুত করিতে হইলে, কয়লা আবদ্ধ পাত্রে না জ্বালাইয়া বাহিরে একস্থানে সজ্জিত করিয়া জ্বালাইয়া দেওয়া হয় ; এবং কিছুক্ষণ পরে জল দিয়া নিভাইয়া দেওয়া হয়।

	C	H	O & N
Bituminous—	৮৫	৫	১০

৫। Anthracite—ইহাই কয়লা-স্তরের শেষ পরিবর্তন এবং ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কয়লা। ভারতবর্ষে ঠিক্ anthracite পাওয়া যায় না। কেবল দার্জ্জিলিংএ একটি ২ফিট স্তর পাওয়া গিয়াছে ; কিন্তু স্তরের ঘনতা (thickness) কম হওয়ায় তাহাতে খরচ বেশী পড়িবে বলিয়া, সেখানে কাজ হয় নাই। Anthracite এর রং ঘোর কাল এবং উজ্জ্বল। ইহা সহজে জ্বলে না এবং Bituminous coal অপেক্ষা ইহা শক্ত ও ভঙ্গপ্রবণ। ইহার উত্তাপ খুব বেশী এবং ধূম একরূপ নাই বলিলেই হয়।

	C	H	O & N
Anthracite—	৯৫	২.৫	২.৫

রাসায়নিক বিশ্লেষণ হইতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, যে কয়লায় অঙ্গারের (Carbon) ভাগ যত বেশী, সেই কয়লা তত উৎকৃষ্ট ; কারণ, তাহা হইতে তত বেশী উত্তাপ পাওয়া যায়।

আমাদের এখানে অধিকাংশ কয়লা ঝরিয়া ও রাণীগঞ্জ হইতে পাওয়া যায় ; এবং এখানকার মধ্যে গিরিডির কয়লা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহা ই, আই, আর—কোম্পানীর খনি। আর বেলজিয়মের কয়লা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এখানকার খনির গভীরতা পৃথিবীর সব খনির চেয়ে বেশী, সেই জন্যই ইহা এত উৎকৃষ্ট।

মুসলমান কবির বৈষ্ণব-পদাবলী

[শ্রীআবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ]

প্রাচীন কালে মুসলমান কবিগণ বৈষ্ণব-পদাবলী বা রাধাকৃষ্ণের লীলা-বিষয়ক কবিতারাজি রচনা করিয়াছিলেন, ইহা এখন আর নূতন কথা নহে। অনেকেই জানেন, নদীয়া—মেহেরপুরের জমিদার পরলোকগত বাবু রমণীমোহন মল্লিক মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথমে মুসলমান কবিগণের কয়েকটি বৈষ্ণবপদ সংগ্রহ ও প্রকাশ করিয়া সাহিত্য-সমাজের গোচর করেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে এদিকে আমিও বহু পদ সংগ্রহ ও প্রকাশ করিয়া কাব্যামোদিগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে থাকি। আমার সংগৃহীত পদগুলি একত্র করিয়া রাজসাহীর সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্যাল মহাশয় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়া দেন। ইতোমধ্যে আমি আরও বহু পদ সংগ্রহ ও প্রকাশ করিয়াছি। পাঠক পাঠিকাগণ শুনিয়া আনন্দিত হইবেন, একমাত্র আমার চেষ্টায় এরূপ মুসলমান কবির সংখ্যা এখন পঞ্চাশেরও উপরে উঠিয়াছে।

সম্প্রতি আরও অনেক নূতন ও পুরাতন কবির অনেক নূতন পদ আমার হস্তগত হইয়াছে। তন্মধ্যে অনেকগুলি পদ গত বৎসর 'গৃহস্থে' 'ভারতবর্ষে' ও 'ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। আজ আবার আরও কয়েকটি নূতন পদ এস্থলে প্রকাশ করিতেছি।

এই প্রবন্ধে সৈয়দ মর্ত্তুজার ৪টি, আমানের ১টি, মীর ফয়জুল্লার ১টি, সেখ কবিরের ১টি, মনোয়ারের ২টি, এবাদুল্লার ১টি, আলিমুদ্দিনের ১টি, মোহাম্মদ হামিদের ১টি এবং আবঝলের ১টি—মেট ১৩টি পদ প্রকাশিত হইল। এই সকল কবি নূতন নহেন। কিন্তু তাঁহাদের পদগুলি সম্পূর্ণ নূতন বটে।

১০৮৯ মঘী সনে বা ১৬৪০ শকাব্দে লিখিত "রাগমালা" নামক একখানি সঙ্গীত-গ্রন্থের ভিতর এই সকল পদ পাওয়া গিয়াছে। যাঁহারা কখনও প্রাচীন পুঁথির আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বেশ অবগত আছেন যে, একমাত্র প্রতিলিপির সাহায্যে সেকালের কিছু সম্পূর্ণ নির্ভুলরূপে প্রচার করা বড়ই কঠিন। এই কারণে পদগুলির স্থানে-স্থানে অসংলগ্নতাদি প্রমাদ পরিলক্ষিত হওয়ার খুব সম্ভাবনা রহিয়াছে। প্রাচীন সাহিত্যের সংশোধনের ক্ষমতা কাহারও নাই। এজন্য আমরা পদগুলি প্রায়ই 'যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং' করিয়া প্রকাশ করিলাম।

যে দেশে বড়-বড় কবিগণেরই পরিচয় পাওয়া যায় না, সে দেশে এ সব ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পদ-রচয়িতা কবিগণের পরিচয় কোথায় পাওয়া যাইবে?

ব্রজসুন্দর বাবুর "মুসলমান বৈষ্ণব কবি" নামক সংগ্রহ-গ্রন্থগুলির ভূমিকায় ইহাঁদের জীবনী-সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সকল কথা একবার প্রকাশ করিয়াছিলাম। এখানে তাহার পুনরুক্তি না করিয়া কেবল এই কথা বলিয়া রাখি, ইহাঁরা খুব সম্ভব চট্টগ্রামেরই কাব্য-কাননের কোকিল ছিলেন। তাঁহাদের নশ্বর দেহ কোন্ সুদূর অতীতে মাটীতে মিশিয়া গিয়াছে ; কিন্তু তাঁহাদের পরিত্যক্ত বীণা এত দিন পরে আবার

ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়া, দেশবাসীর প্রাণে কি অভূতপূর্ব আনন্দের সঞ্চার করিতেছে!

নিম্নে পদগুলি উদ্ধৃত হইল :—

রাগ—হিল্লোল।

আজু মুই কুলের বাহির হৈলুম।
মথুরাতে (আজু) মুই গোবিন্দ পাইলুম ॥ ধু।

কথা (১) হন্তে আইলা বন্ধু বৈস তরু তলে।
প্রাণি হরিয়া নিল কালার বাঁশী স্বরে।
কথা হন্তে আইলা বন্ধু কর্ণে রাঙ্গা ফুল ॥
মুখের মাধুরী দিয়া নিলা জাতি কুল।
সৈয়দ মর্ত্তুজা কহে অপরূপ লীলা।
শ্যামরূপ-দরশনে দ্রব হয় শিলা ॥

বসন্ত পঞ্চম।

নাগর জাএরে রাধার মন্দিরে
নাগর জাএরে।
পিআ রাধা বুলিআ বিনাইআ বাঁশী বাহে রে ॥ ধু।
গজবর কুসুমিত চরণেতি সাজে। (?)
রাঙ্গা চরণে সোণার নপুর ন চলিতে বাজে।
ছৈঅদ মর্ত্তুজা কহে শুন লো রমণি।
কি সোকে (সুখে ?) রৈআছ ঘরে শুনি বাঁশীর ধ্বনি ॥

রাগ—মারহাটি।

অ কি নাগর কালা বিনে না রৈমু ঘরে।
চিকণ সুতার কাপড় মাঝে কাটিআ গেল।
নৌআলি (২) জৌবনের ভরে ॥ ধু।
সই রে বাথুআ গাছে ত বেল।
আবাল দেআরিআ (৩) লাগি কান্দ পাতিয়া আছম্
ভাই শ্বশুর বাজিআ (৪) গেল ॥
সইরে নেপুর না দিঅ পাএ।
ঘরে আছে দুর্জ্জন ননদী জাগিব
নেপুর শবদ রাএ ॥
সই রে নারী কি কাম কৈলুং।
জাচিআ জৌবন শ্যাম বন্ধুরে দিআ
লোকের কুচর্চ্চাএ মৈলুং ॥
সই রে পোস্তের বহুল দানা।
দেশের মর্ত্তুজা গাজি দেশেত জাইব
বুকে দিআ জাইব হানা ॥
ছুহি বেলোআর।
সাম মোর বন্ধুআ নারে। ধু।
পাখাএ (৫) চরাইনু থির প্রাণি মোর নহে স্থির
বিভোল দুগ্ধেতে দিলু পানি নারে।
জেখানে পিরীতি কৈলা রাত্র দিনে আইলা গেলা
কার বোলে তুহ্মি নিঠুর হইলা।
জাহাতে মজ্জিল মন কিবা হাড়ি কিবা ডোম
জাউক জাতি রহুক পিরীতি।
মুই কেনে জবুনা (৬) আইলুং পাই নিধি হারাইলুং
হারাইলুং মুঞি রসের নাগর।
ছৈঅদ মর্ত্তুজার বাণী শুন রাধে ঠাকুরানি
কাঞ্চা (৭) ঘুমে তোরে কে দিল ভাঙ্গনি ॥

ধানশি—ভাটিআল।

আগো রাই (সই ?) কি দেখিআ কি শুনিআ
তোরা মোরে দোস গো
মুই ত না জান কিছু ননদিনী পিছু পিছু
আজু কার বোলে কুবোল বুলি রোস গো ॥ ধু।
সব সখি এক হৈআ মিছা কথা কৈআ কৈআ
ব্রজ কুলে তোলে মিছা রোল গো।
কারে (?) ভাবে মনে লাজ দিআছে সভার মাঝ
আজু নাগর দিআছে করি কোল গো ॥
হীন আহ্মা নে ভনে এ বচনে রোস কেনে
অঙ্গ (?) তোহ্মারে অপরূপ চিন (৮) (গো)
তরু বাঁসি কদম্বের কুল ত্রিকিনী (৯) জবুনার কুল
আজু প্রতি অঙ্গে দাগ ভিন্ন ভিন গো ॥

কেদার।

রাধা মাধব নিকুঞ্জ বনে। ধু।
ব্রহ্মা জারে স্তুতি করে চারি বআনে (১০)।
হেন হরি নারাঅন দেখিবা নআনে ॥
পুষ্প চন্দন লৈআ গুপি (গোপী) সব ধাএ
মেলি মেলি মারে পুষ্প গুবিন্দের গাএ ॥
পুষ্প চন্দনের ঘাএ জর্জ্জরিত হরি।
মাধবিলতার তলে লুকাএ মুরারি ॥
মাধবিলতার তলে নন্দসুত রৈলা।
শ্রীকৃষ্ণ বুলিআ গুপি কান্দিতে লাগিলা ॥

---

(১) কথা—কোথা।
(২) নৌআলি—নূতন।
(৩) আবাল—বালক; অল্পবয়স্ক। দেআরিআ—দেবর।
(৪) বাজিআ—বদ্ধ হইয়া।
(৫) পাখাএ—চুলায়। (৬) জবুনা—যমুনা। (৭) কাঞ্চা—কাঁচা।
(৮)—চিন—চিহ্ন। (৯) ত্রিকিনী—ত্রিবেণী।
(১০) বআনে—বদনে।

মির ফএজোল্লা কহে অপরূপ লিলা।
সামরূপ দরসনে দরবহে (১১) সিলা ॥

ধানশী—বেলাবলী।

অকি অপরূপ রূপে রমণী ধনি ধনি।
চলিতে পেখল গজরাজগমনী ধনি ধনি ॥ ধু ॥
কাজলে রঞ্জিত নয়ন ধনি ধবল ভালে
ভ্রমর। ভোলল বিমল কমল দলে ॥
গুমান না কর ধনি খিন অতি মাজাখানি
কুচগিরি কলের ভরে ভাঙ্গিআ পড়িব জৌবনি ॥
সুন্দরী চান্দ মুখি বচন বোলসি হাসি
অমিআ বরিখে জানি জৈছে শরদে পুরণ শশী ॥
সেখ কবিরে ভণে অহি (১২) গুণ পামরে জানে
ছলতান নছিরা সাহা ভুলিছে কমল বনে ॥

ছুহি—বেলোআর।

নাচে কানু ঘুমি ঘুমি (১৩) রমণী সমাজে।
ঝুঘুরু ঘুগুরু ঝাকে ঝলকিত বাজে ॥ ধু ॥
কিনি কিনি কিঙ্কিণী নপুর কি রিমি ঝিাম
ঝণু ঝণু পুমু পুমু পুরে রস বাণী।
মৃদঙ্গ কর্ত্তালিআ নাচে তাধিং তাথৈআ
ঝিঙ্কিটি ঝিমি কিটি বাজে তাথাবর থৈআ।
ঝাকে উড়ে পরে (পড়ে) শশি ঝলকএ রাশি রাশি
ঝাকে উড়ে ঝাকে পড়ে সঙ্গে শ্যাম বাঁশী।
রসময় নাট পুরে মাথুরএ নটবরে
ভজ রঙ্গে তা ধনি ভণে মনোঅরে ॥

রাগ—আহির পরছ।

আজু সই কি দেখিলুং স্বপনে।
বিদিত বিমল হরি মিলিল আপনে ॥ ধু ॥
সারদ সমএ (সময়ে) জেন জামিনী উঝল।
ঝলকিত ভেল আভা চমক চপল ॥
নআনে লাগিল রূপ আসি আচুম্বিত।
জাগিতে হারাইলুং হরি শোকে দহে চিত ॥
কি দেখিলুং কি হইল পলক অন্তর।
ভজগুরু পাইবে পুনি কহে মনুঅর ॥

কোড়া।

সহন ন জায় দুঃখ সহন ন জাএ।
জৌবন চলিয়া গেলে পিয়া না বোলাএ ॥
সব নারী প্রিয়া সনে করে আনন্দিত।
আমার মন্দিরে প্রিয়া কেনে রে বঞ্চিত ॥
বদন (বেদন ?) ছতাশে দহে কিবা রাত্র দিন।
হেরিতে পিয়ার পন্থ আখি হৈল ক্ষীণ ॥
আজু কালুকা করি দিন গেল বইয়া।
না ভজিলুম প্রিয়া মোর জৌবন ভেটিয়া ॥
এবাদুল্লা কহে ধনি ভজ গুরু পদ।
কদম্বতলে গিয়া দেখ পিয়ার সম্পদ ॥
এই মোর কপালে ছিল প্রাণনাথ ছাড়ি গেল
সখী লই যাব মথুরাতে।
মথুরাতে প্রাণধন চল চল সখীগণ
ছাড়ি গেল সখা প্রাণনাথে ॥
হাহা প্রভু দীননাথ তুমি বিনে পরমাদ
তুমি বিনে আন্ধার বৃন্দাবন।
শ্রীআলিমদ্দিনে কহে শুন রাধে মহাশয়ে
কৃষ্ণ সাথে হইব দরশন ॥

কানড়া।

নব যৌবনী তোর রূপ নিরাক্ষতে
না রহে পরাণি। ধু।
যমুনার জলেরে জাইতে ননদী চলিল সাথে
লাজে নারী না বোলাই বন্ধেরে (১৪)।
আঞ্চলে ঢাকিয়া বুক মনেত রহিল দুঃখ
কান্দি কান্দি আইলুম নিজঘরে ॥
উঞ্চল নিঞ্চল (১৫) ঘাট নামিতে সঙ্কট তাত
নামিয়াছে এ চন্দ্রবদনী।
তিলেক দাণ্ডাই জাও জুড়াউক শ্যামের গাও
কলসী ভরিয়া দিমু আমি ॥
কহিও বন্ধুর আগে মাথার সপথ লাগে
থাম্বা (১৬) চুকাই পড়ে পানি।
থাম্বার পানিএ লোটন ভিজিল রে
কাঞ্চা ঘুমে কে দিল আগুনি ॥
তুমি নব জৌবনী কানু মন মোহিনী
তাত দেখি ঐরূপ খানি।
মোহাম্মদ হাসিমে কহে এই না দুঃখ গাএ সহে
তোর লাগি তেজিমু পরানি ॥

রামগরী।

রে সাম বিদেশ চাতুরি ছোর (ছোড়)।
কপট না কর কোঁর ॥ ঘুআ।

(১১) দরবহে—দরবয়; দ্রব হয়।
(১২) অহি—ঐ।
(১৩) ঘুমি ঘুমি—ঘুরি ঘুরি।
(১৪) বন্ধেরে—বন্ধুরে। (১৫) উঞ্চল নিঞ্চল—উচ্চনীচ।
(১৬) থাম্বা—থাম।

আছিলা কথাএ সাম সুধামএ (সুধাময়)
স্বরূপে কৈঅরে এথা।
হামো পরিহরি কার সনে নিসি
রজনি গোঁআইলা কথা॥
নিসি উজাগর নআন রাতুল
বআন ঝামর ভেল।
কোন বিদগধি কাম কলা নিধি
রছ (রস) নিঠুরিআ (?) গেল॥
এহ নিসি জাগি নিদে ডগমগি
নআন ওহার সাখি (১৭)।
জেহেন চকোর দেখি দিবাকর
উরিতে লরএ পাখী॥
সুরঙ্গ অধর কাজলে মলিন
সিন্দুর উঝল ভালে।
বিম্বফল পর জেহেন ভ্রমর
সুর সোভে ঘন মালে॥
আবঝলে কহে ধনি দআমএ (দয়াময়)
ও জুগ জিবন সার।
হেন গুণনিধি চাহ (চাহে?) না কি আঁখি
আপে আপ পেখিবার॥

শিখগুরুগণের ইতিহাস

[শ্রীশিবকুমার চৌধুরী]

৬ষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দ

১৫৯৫—১৬৪৫

পিতার মৃত্যুর সময় হরগোবিন্দ অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন। তিনি সংসারানভিজ্ঞ একাদশ বর্ষীয় বালক মাত্র। বিষয়-কর্ম্মের কিছুই বুঝিতেন না। ক্রীড়াই তখন তাঁহার প্রিয়, ক্রীড়াই তখন তিনি জীবনের সারবস্তু মনে করিতেন। তাঁহার এই অসহায় অবস্থা দেখিয়া তদীয় দ্বিতীয় জ্যেষ্ঠতাত পৃথ্বীদাস গুরুপদ অধিকারে সবিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পৃথ্বীদাস সাংসারিক লোক। তাঁহার পিতা তাঁহার জ্যেষ্ঠত্ব উপেক্ষা করিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ অর্জ্জুনমলকে গুরু মনোনীত করিয়াছিলেন। সেই হইতে পৃথ্বীর হৃদয় সতত প্রতিশোধ বাসনায় দীপ্ত। সেই হইতে মানসিক শান্তি তাঁহার অবিদিত। কিরূপে অর্জ্জুনের অনিষ্ট সাধন করা যায়, সেই চিন্তায় তিনি সর্ব্বদা মগ্ন। কথিত আছে, তিনি চণ্ডুসাহার সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া অর্জ্জুনের সর্ব্বনাশ করেন। সেই হইতে শিখগণ তাঁহার প্রতি বিরক্ত, ক্রুদ্ধ, বীতশ্রদ্ধ। সুতরাং তাঁহার সিংহাসন-বাসনা অচিরে আকাশকুসুমবৎ অদৃশ্য হইয়া গেল। তাঁহার চেষ্টা মোটেই ফলবতী হইল না। হৃদয়ের আশা হৃদয়েই মিলিয়া গেল। হরগোবিন্দ গুরু হইলেন।

হরগোবিন্দ একাধারে যোদ্ধা, সাধু, মৃগয়াশীল। রাজযোগ্য সমস্ত গুণেই তিনি অলঙ্কৃত ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব গুরুগণ সাত্ত্বিক আহার-প্রিয় নিরামিষাশী ছিলেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত মাংসপ্রিয় ছিলেন। মৃগয়ালব্ধ বন্য জন্তুর মাংস ভক্ষণ করিতে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম শিখগণকে সামরিকপ্রথা শিক্ষা দেন। স্বীয় অনুচরগণকে অস্ত্রে-শস্ত্রে সুসজ্জিত করিয়া তিনি তাহাদিগকে যুদ্ধার্থ প্রয়োজনীয় বিবিধ শিক্ষায় সুশিক্ষিত করেন। পিতৃশত্রু চণ্ডুসাহার উপর ভীষণ প্রতিশোধ লইবার জন্যই তাঁহার এই উদ্যম। বহু শিখ তাঁহার পতাকাতলে এই ব্রতে ব্রতী হইয়াছিল। গুরুদত্ত উপঢৌকনে সন্তুষ্ট তৎকালীন মোগল বাদসাহ অর্জ্জুন সংক্রান্ত প্রকৃত ব্যাপার হরগোবিন্দ-প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া চণ্ডুসাহাকে হরগোবিন্দের করে সমর্পণ করেন। হরগোবিন্দ স্বীয় প্রতিশোধ-বাসনা অমানুষিক ভাবে চরিতার্থ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, তাঁহার পদদ্বয় রজ্জুবদ্ধ করিয়া প্রথমে তাঁহাকে রাজপথের উপর দিয়া টানিয়া লওয়া হইল। রাজপথের কঙ্কর ঘর্ষণে তাঁহার শরীর ক্ষত-বিক্ষত হইল। খরবেগে রক্তপাত হইতে লাগিল, আর তিনি যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সে হৃদয়মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদে কর্ণপাত না করিয়া প্রথমে উত্তপ্ত কটাহে, অনন্তর উষ্ণ সিকতাসমূহের উপর তাঁহাকে স্থাপন করা হইয়াছিল। এই ভীষণ যন্ত্রণায় তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তাঁহার আর্ত্তনাদ থামিয়া গেল, অলস অবশ অঙ্গ শিথিল হইয়া পড়িল। অচিরেই তাঁহার প্রাণবায়ু তৈলবিহীন প্রদীপের ন্যায় এই জ্বালাযন্ত্রণাময় সংসার ত্যাগ করিয়া অনন্তে মিশিয়া গেল।

বিলাসিতায় হরগোবিন্দ তাঁহার পিতাকেও অতিক্রম করিয়াছিলেন। উচ্চহারে কর ধার্য্য করায় তাঁহার কোষাগারে প্রচুর অর্থ সঞ্চিত হইতে লাগিল। তিনি অত্যন্ত দূরদর্শী ছিলেন। তাঁহার অষ্টশত সুন্দর অশ্ব ছিল। তিনি একটি সুন্দর নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং এই নগরে একটি সুদৃঢ় দুর্গও নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য বিপদের সময় ইহা আশ্রয় করা। তিনি অসাধারণ সাহসী ও যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন। তিনি এক সময়ে মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের অধীনে সৈন্যাধ্যক্ষের কর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়া নির্ভীকতাগুণে বাদসাহের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। তৎকালে সৈন্যগণের বেতন সৈন্যাধ্যক্ষগণের নিকট প্রদান করাই মোগলসরকারের প্রথা ছিল। তাঁহারা যাহার যাহা প্রাপ্য তাহাকে তাহা দিতেন। এই রীতি অনুযায়ী হরগোবিন্দের নিকট তাঁহার অধীন সৈন্যগণের বেতন স্বরূপ প্রচুর অর্থ দেওয়া হইয়াছিল। তিনি সে সমস্ত অর্থ স্বয়ং গ্রহণ করেন। এতদ্ব্যতীরেকে তিনি বহু দস্যু ও রাজদণ্ড হইতে পলায়িত ব্যক্তিগণকে স্বীয় সৈন্যরূপে গ্রহণ করেন। এই সমস্ত কারণে বাদসাহ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বন্দী করতঃ গোয়ালীয়র দুর্গে আবদ্ধ রাখিলেন। এই অবস্থায়

(১৭) ওহার—উহার ; সাখি—সাক্ষী।

তাঁহাকে সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। কারাগারে তিনি অতি সামান্য আহার পাইতেন। সুতরাং তাঁহাকে একরূপ অনশনে বা অর্দ্ধাশনে থাকিতে হইত। শিখগণের গুরুভক্তি কি অসীম, কি প্রবল! শুনিলে হৃদয় বিস্ময় রসে পরিপূর্ণ হয়। হরগোবিন্দের কারাবাসকালে তাহারা প্রত্যহ দুর্গপ্রাচীরের নিকট সমবেত হইয়া গুরুর উদ্দেশ্যে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলী অর্পণ করিত। অনন্তর বাদসাহের কৃপায় তিনি কারাবাস হইতে অব্যাহতি লাভ করেন।

১৬২৮ খৃঃ অব্দে জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হইলে হরগোবিন্দ পুনরায় সাজাহানের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। বাদসাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারার সহিত তাঁহার অত্যন্ত বন্ধুত্ব ছিল। দারা তৎকালে পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা ছিলেন এবং লাহোরে বাস করিতেন। সেই সূত্রে গুরুকেও অধিকাংশ সময় পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোরেই অতিবাহিত করিতে হইত। স্বীয় আশ্রম অমৃতসরে যাইবার বিশেষ অবকাশ পাইতেন না। দারা অত্যন্ত উদারহৃদয় হৃদয়, মহৎ ব্যক্তি ছিলেন। যেখানে যাইতেন সেখানেই গুরুকে সঙ্গে লইতেন। এতই তাঁহাদের প্রগাঢ় প্রণয়, এতই তাঁহাদের সৌহৃদ্যবন্ধন! কিন্তু এত সুখ অধিক দিন স্থায়ী হইল না। বিধাতা বিমুখ হইলেন। পুনরায় মোগলের সহিত হরগোবিন্দের বিরোধ বাধিল। গুরুর জনৈক শিষ্য তাঁহাকে উপহার দিবার জন্য একটি সুন্দর অশ্ব লইয়া আসিতেছিলেন। গুরু তখন অমৃতসরে। পথিমধ্যে মোগল কর্ম্মচারিগণ বলপূর্ব্বক অশ্বটি কাড়িয়া লইয়া সম্রাট সাজাহানের নিকট উপস্থিত হইল। অশ্বটির আকৃতি দর্শনে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া উহা স্বীয় অশ্বশালায় রাখিতে আদেশ দিলেন। কিছুদিন পরে অশ্বটি বিকলাঙ্গ হওয়ায় তিনি উহা লাহোরের কাজিকে প্রদান করিলেন। অচিরকাল মধ্যে কাজি ঔষধাদি দ্বারা অশ্বটিকে নীরোগ করিলেন। গুরু দশ সহস্র মুদ্রায় অশ্বটি ক্রয় করিবেন ভাণ করিয়া কাজির নিকট হইতে লইয়া অমৃতসরে পলাইয়া গেলেন। সেই সঙ্গে কাজির জনৈক উপপত্নীও তাঁহার অনুগমন করিলেন। প্রচার হইল গুরু তাহাকে হরণ করিলেন। এই সময় আরও একটি ঘটনা ঘটিল। গুরুর জনৈক শিষ্য সম্রাটের শ্যেন পক্ষী ধরিল। প্রজ্বলিত ইন্ধনে ঘৃত নিক্ষিপ্ত হইল। সপ্ত সহস্র সৈন্য লইয়া মোগল সেনাপতি মুখলিস খাঁ অমৃতসর অভিমুখে অভিযান করিলেন। হরগোবিন্দও যুদ্ধার্থ প্রস্তুত ছিলেন। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইল। মুসলমানগণের সহিত শিখগণের এই প্রথম সংগ্রাম। মুসলমান বাহিনী বেতনভোগী সৈন্যদল-সমষ্টি মাত্র। একদিকে শিখগণ তাহাদের ধর্ম্মের জন্য, গুরুর জন্য, স্বদেশের জন্য বদ্ধপরিকর; অপর দিকে মুসলমানগণ বেতনের জন্য প্রাণদানে অগ্রসর। সামান্য অর্থের জন্য কয়জন প্রাণ দিতে পারে? মহৎকার্য্য-প্রণোদিত হইলে ভীরুও সাহসী হয়, কাপুরুষও পুরুষকার বিকাশ করে। শিখগণের সে দুর্দ্ধর্ষ আক্রমণ মুসলমান-সৈন্যগণ সহ্য করিতে পারিল না; তাহারা ইতস্ততঃ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। মুখলিস খাঁ স্বয়ং হত হইলেন। তাঁহার বহু সৈন্য সে দুর্ব্বার সমরে হতাহত হইল। অবশিষ্ট সৈন্যগণ লাহোরে পরাভব বার্ত্তা লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

হরগোবিন্দ বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা আরও সতর্ক হইলেন। তিনি জানিতেন মোগল কখনও এ অপমান সহ্য করিবে না। তাহাদের সৈন্যবল ও ঐশ্বর্য্য বিভব হরগোবিন্দ অপেক্ষা অনেকাংশে অধিক। মোগল তখন ভারতের সম্রাট্। বহু রাজন্যবর্গ তাঁহার অধীন। মোগলসম্রাটের এক ইঙ্গিতে লক্ষ তরবারি ঝলসিয়া উঠিতে পারে। হরগোবিন্দের সহায় কেবল তাঁহার শিষ্যবৃন্দ। মোগল সৈন্য-সাগরের তুলনায় তাহারা ক্ষুদ্র জলবিন্দুবৎ। তাহাতে আবার মোগলগণ অস্ত্রে শস্ত্রে অতীব সুশিক্ষিত। যুদ্ধই তাহাদের ব্যবসা, তাহারা সুদূর মধ্য এসিয়া হইতে আসিয়া শুধু অস্ত্রবলেই ভারতে রাজ্য স্থাপন করিয়াছে। তাহাদের সহিত যুদ্ধ করা শুধু সাহসের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিলে চলে না; অস্ত্র চালনায় সুদক্ষ হওয়া চাই। বিগত যুদ্ধে গুরুর অধিকাংশ সুশিক্ষিত সৈন্যই প্রাণত্যাগ করিয়াছে। পুনরায় মোগলগণের সঙ্গে যুদ্ধ করা অসমসাহসের কার্য্য। জয়াশাও সুদূরপরাহত। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া তিনি ভাতিন্দার জঙ্গলে পলায়ন করিলেন। জঙ্গলটি খাদুর হইতে ১৫ মাইল দূরে শতদ্রু নদীর তীরে অবস্থিত। এই স্থান হইতে মোগল-আক্রমণ প্রতিহত করাও অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু মোগলের সঙ্গে তাঁহার আর যুদ্ধ করিতে হইল না। তাঁহার প্রিয় বন্ধু দারাসিকো কর্ত্তৃক একান্ত অনুরুদ্ধ হইয়া সম্রাট সাজাহান যুদ্ধ স্থগিত রাখিলেন। গুরুর বিরুদ্ধে আর সৈন্য পাঠাইলেন না।

ভাতিন্দায় অবস্থানকালে হরগোবিন্দ বহু লোককে শিখধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। বাবা বুদ্ধ তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ। তিনি পূর্ব্বে একজন দুর্দ্দান্ত দস্যু ছিলেন। মনুষ্যত্ব-বিধায়ক গুণরাজি তাঁহার সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। কিন্তু গুরুর সংসর্গে আসিয়া তাঁহার এত পরিবর্ত্তন হইয়াছিল যে, শিষ্যগণ তদীয় গুণাবলীতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে 'বাবা' আখ্যা প্রদান করিয়াছিল। এই বাবা বুদ্ধের কার্য্যকলাপে শিখগণের সহিত মোগলগণের আর একটি যুদ্ধ হয়। বুদ্ধ সম্রাট্ সাজাহানের অশ্বশালা হইতে তাঁহার দুইটি প্রিয় অশ্ব অপহরণ করিয়া হরগোবিন্দকে উপহার প্রদান করেন। সম্রাট্ ঈদৃশ ব্যবহারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি পূর্ব্ব হইতেই গুরুর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। এখন তাঁহার ক্রোধ-বহ্নি অধিকতর প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, তিনি তাঁহাকে দমন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। কুমার বেগ ও লালবেগ নামক দুইজন সৈন্যাধ্যক্ষের অধীনে প্রচুর সৈন্য গুরুর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। বীরদর্পে মুসলমান বাহিনী শতদ্রু নদী পার হইল। অভ্রভেদী ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষরাজি দ্বারা ভাতিন্দার জঙ্গলটী দুর্গম; প্রবেশ বিশেষ আয়াস-সাধ্য। তদুপরি মোগলগণের রসদের অপ্রাচুর্য্য। লাহোর হইতে খাদ্য সংগ্রহ করা অসম্ভব। কিন্তু যুদ্ধ অবধারিত। মোগল-সৈন্যগণ পথশ্রমে ক্লান্ত, ক্ষুধায় প্রপীড়িত, মৃতকল্প। তথাপি তাহারা প্রবল বিক্রমে শিখগণকে আক্রমণ করিল। উভয় পক্ষের রণ-দামামা

বাজিয়া উঠিল। উভয় পক্ষীয় বীরগণের সামরিক ধ্বনিতে, অস্ত্রের ঝনঝনায়' আহতের আর্ত্তনাদে মেদিনী প্রকম্পিত হইতে লাগিল। বিনা মেঘে বজ্রপাত ভাবিয়া সজীব প্রাণীগণ ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। বহু সৈন্য হত হইল। কুমারবেগ, লালবেগ হত হইলেন। তপ্ত শোণিতের প্রবল স্রোতে সেই ভীষণ বনভূমি কর্দ্দমাক্ত হইয়া ভীষণতর হইল। মোগলগণ পরাজিত হইল। হতাবশিষ্ট সৈন্যগণ লাহোরে প্রত্যাগমন করিল। এইরূপে শিখগণের সহিত মোগলগণের দ্বিতীয় যুদ্ধের অবসান হইল। জয়োৎফুল্ল হইয়া হরগোবিন্দ জঙ্গল পরিত্যাগ করিলেন; শতদ্রু অতিক্রম করিয়া কর্ত্তারপুরে আসিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। দুইবার জয়লাভ করায় একটি স্বাধীন রাজ্যস্থাপনের বাসনা তাঁহার হৃদয়ে প্রবল হইয়া উঠিল। সেই অভিপ্রায় সাধন উদ্দেশ্যে তিনি প্রচুর সৈন্য ও নানাবিধ যুদ্ধসম্ভার সংগ্রহ করিলেন এবং সুবিধামত মোগলরাজ্য আক্রমণের সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। সুযোগ শীঘ্রই উপস্থিত হইল। পাইণ্ডা খাঁ নামক একজন পাঠান গুরুর পালিত ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অত্যন্ত বন্ধুত্ব ছিল। একটি সামান্য কারণে সে বন্ধুত্ব জীর্ণভিত্তি অট্টালিকাবৎ নষ্ট হইয়া যায়। এমন কি উভয়ে পরস্পরের প্রাণ-বিনাশে উদ্যত হইয়াছিলেন। গুরুর জ্যেষ্ঠ পুত্র গুরদিতের একটি শ্যেন পক্ষী ছিল। সেই বিহঙ্গমটি খাঁ সাহেবের আবাসে উড়িয়া যাওয়ায় তিনি উহা নিজস্ব করেন; সকলের অনুরোধ সত্ত্বেও ফিরাইয়া দিতে অস্বীকৃত হন। ফলে, তিনি লাঞ্ছিত ও প্রহৃত হইলেন। এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার বাসনায় তিনি মোগল-সম্রাট্ সাজাহানের শরণাপন্ন হইলেন। সাজাহান তখন দিল্লীতে। সাজাহান দেখিলেন গুরু ক্রমেই অপরাজেয় হইয়া উঠিতেছেন। তিনি রাজ্যের কণ্টকস্বরূপ। শত্রুকে প্রবল হইতে দেওয়া অবিবেচকের কর্ম্ম। তাঁহাকে দমন না করিতে পারিলে বিদ্রোহীর বিরুদ্ধতায় রাজ্যের অমঙ্গল হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে বহু সৈন্য প্রেরণ করিলেন। পঞ্জাবে উভয় পক্ষের একটি ভীষণ সংঘর্ষ হয়। মোগলগণ তাহাদের লুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধার করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু বিজয়লক্ষ্মী অবশেষে হরগোবিন্দের নির্ভীকতায় ও তদ্‌কর্ত্তৃক পরিচালিত শিখসৈন্যগণের অতুলনীয় বীরত্বে যেন মুগ্ধ হইয়া গুরুর অঙ্কশায়িনী হইল। পূর্ব্ব দুইটি যুদ্ধে যেরূপ মোগল সেনাপতি নিহত হইয়াছিল, এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। পাইণ্ডা খাঁও গুরুর শাণিত তরবারির আঘাতে সমরশায়ী হইলেন।

হরগোবিন্দকে জীবনে অনেক বাধা বিঘ্নের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল কিন্তু তিনি সে সমস্ত স্বীয় বিশ্বাসী অনুচরবর্গের সাহায্যে হেলায় অতিক্রম করিয়াছিলেন। জীবনের সন্ধ্যাকালে তিনি তদীয় আশ্রম অমৃতসর পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রিয় শিষ্য বুদ্ধের সহিত ক্ষুদ্র পর্ব্বত-রাজি শোভিত কর্ত্তারপুরে শান্তিময় জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে সুখ অধিক দিন স্থায়ী হইল না। এই স্থানেই ১৬৪৫ খৃঃ অব্দে তাঁহার জীবলীলা সাঙ্গ হয়। "সুখ শান্তি হ'ল শেষ, অন্তিম শয্যায়"।

তাঁহার তিন পত্নী ও পাঁচ পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র গুরদত্তের তাঁহার জীবদ্দশায় মৃত্যু হওয়ায় তিনি তদীয় পুত্র হররায়কে গুরু মনোনীত করেন।

চিত্র ও চিত্রকর

[শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র]

(১)

বিশ্ববিখ্যাত আগ্রার তাজমহলের শ্রেষ্ঠ শিল্পী ওস্তাদ ইশা একবার স্বীয় শিষ্যমণ্ডলীর সহিত বিভিন্ন দেশ-প্রদেশের স্থাপত্য-শিল্প-কৌশলাদি পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতে-বেড়াইতে গাজিয়াবাদের অন্তর্গত এক ক্ষুদ্র পল্লী-প্রান্তে অবস্থিত একটী মস্‌জিদ-দ্বারে উপস্থিত হইলেন। মস্‌জিদটী ক্ষুদ্র, অতি সাধারণ এবং প্রাচীন; বিশেষত্ব-বর্জ্জিত বলিলেও চলে। নিঃশব্দে সানুচর ইশা সাহেব মস্‌জিদের ভিতর প্রবেশ করিলেন। তাঁহার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি একখানি লুক্কায়িত-প্রায় আলেখ্যের উপর নিবদ্ধ হইল। তিনি চক্ষু ফিরাইতে পারিলেন না,—বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন; শিষ্যমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"দেখ! দেখ!"

চিত্রখানির সম্মুখ-ভাগে শায়িত একটী মৃত মৌলভী-যুবকের চিত্র। তাহার এক হস্তে একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ, অন্য হস্তে একটী যুবতীর চিত্র। এই চিত্রখানিকে আদরে ধরিয়া সে সযত্নে হৃদয়-মধ্যে রাখিতে ব্যর্থ প্রয়াস পাইতেছে। যেন তাহার আশা মিটিতেছে না—নৈরাশ্যের যন্ত্রণায় তাহার বুক ফাটিতেছে! তাহার সুন্দর বদনমণ্ডল

ও চক্ষুর্দ্বয়ের ভাব-ব্যঞ্জনা এইরূপ। আলেখ্যখানির পশ্চাদ্ভাগে যুবকের হস্তস্থিত রমণীর চিত্রের অনুরূপ একটী সুন্দরী যুবতীর পূর্ণাবয়ব চিত্র। সে মস্‌জিদে ঠেস্ দিয়া শূন্যে ঝুলিতেছে। তাহার এক হস্তে একটী নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ, অন্য হস্ত রজ্জুতে আবদ্ধ।

চিত্রখানির এক স্থান নির্দ্দেশ করিয়া ইশা সাহেব বলিলেন—"এই স্থানে কাহার নাম লেখা ছিল বলিয়া মনে হইতেছে;—সম্প্রতি কে তাহা তুলিয়া দিয়াছে। চিত্রখানি প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে অঙ্কিত।" একজন শিষ্য জিজ্ঞাসা করিল—"ওস্তাদজী, চিত্র-শিল্পী কে?"

চিন্তাক্লিষ্ট মুখে ইশা সাহেব বলিলেন, "হাঁ, আমি সেই কথাই ভাবিতেছি। দেখিয়া মনে হয়, বাপ্‌পুলি চিত্রখানি আঁকিয়াছেন, বাজপেঁই রং ফলাইয়াছেন, নাইডু বিঘরোম ইহাতে জীবন্ত ভাবের সমাবেশ করিয়াছেন। মোট কথা, এই তিনজন প্রতিভাবান চিত্রকরের গুণরাশির একত্র সমাবেশে যাহা হয়, আমাদের এই অজ্ঞাত চিত্রকর তাহাদের অপেক্ষাও প্রতিভাবান্।..."

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া তিনি পুনরায় আরম্ভ করিলেন, —"চিত্রকরকে কোনও রকমেই পাইতেছি না। আমার ধারণা, এই প্রতিভাবান্ শিল্পী কাহারও নিকট অঙ্কন-বিদ্যা শিক্ষা করেন নাই। জীবনে তিনি এই চিত্রখানিই —শুধু এই একখানিমাত্র চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। ঠিক এই ছবির মত আর একখানি ছবি তিনি নিশ্চয় আঁকিতে পারিবেন না। ইহা ক্ষণিক ভাব-উত্তেজনা ও প্রতিভা-উন্মেষের ফল, সাধনার ফল নহে।"

আরও কিছুক্ষণ চিত্রখানি দেখিতে-দেখিতে মুগ্ধপ্রায় ওস্তাদ ইশা সাহেব উন্মত্তের মত চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"চমৎকার! চমৎকার! একখানি নাটকের ঘটনা-বৈচিত্র্য। একটী পবিত্র প্রেমের কাহিনী। চিত্র-করই নায়ক ও নাটককার!"

একজন শিষ্য বলিল—"ওস্তাদজী, আপনি কি রহস্য কর্‌ছেন? মৃত ব্যক্তি নিজের মৃত্যু-চিত্র কি করে আঁক্‌বেন?"

দৃঢ়কণ্ঠে ইশা সাহেব বলিলেন,—"না—না, আমি ঠিকই বলেছি। আমার ধারণা অভ্রান্ত। জীবিত ব্যক্তি কল্পনায় স্বীয় মৃত্যু-যন্ত্রণা ফুটিয়ে তুল্‌বেন, এটা কি অসম্ভব? যখন যুবতীর মৃত্যু হইল, মৌলভী যুবকও মরিল—অর্থাৎ সংসার ছাড়িয়া সে বৈরাগ্য-পথ অবলম্বন করিল। মৌলভীর পবিত্র ধর্ম্মজীবন চিত্রে পরিস্ফুট হইয়া যেন পরজন্মে তাহাদের অনন্ত সুখের সূচনা করিতেছে। আমরা এখন এ ব্যক্তিকে খুঁজিয়া বাহির করিব।"

(২)

ওস্তাদ ইশা দেখিলেন মস্‌জিদ-প্রান্তে একজন বৃদ্ধ মৌলভী 'নেমাজ' পড়িতে বসিতেছেন। তিনি তাঁহার নিকট অধীর ভাবে গিয়া বলিলেন—"আপনি কি একবার মৌলভী সাহেবকে সংবাদ দিবেন? আমি তাঁহার সাক্ষাৎ প্রার্থী হয়ে বাদসাহের নিকট হ'তে আস্‌ছি।"

বাদশাহের নাম শুনিয়া মৌলভী সাহেব বিচলিত হইলেন না, কিন্তু বিস্মিত হইলেন। তাঁহার মত নগণ্য ব্যক্তিকে শাহানশা বাদসাহের এমন কি আবশ্যক প্রকাশ্যে বলিলেন—"আমিই এই মসজিদের মৌলভী আপনার কি আবশ্যক বলুন।"

ভূমিকা করিয়া ওস্তাদ ইশা সাহেব বলিলেন—"আমার কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য আপনার নেমাজ পড়ায় বাধা দিয়ে অন্যায় করেছি। আপনি দয়া করে ক্ষমা করুন। মৌলভী সাহেব সংক্ষেপে বলিলেন—"আপনার অপরাধ কি, তা দেখ্‌তে পাচ্ছি না; এবং যদিই পেতুম্, তাও গ্রহণ করবার মত ক্ষমতা তো আমার নাই!"

ইশা সাহেব—"দ্বারে সংলগ্ন যে চিত্রখানি রহিয়াছে উহার চিত্রকর কে, যদি অনুগ্রহ করে বলেন, আমি বিশেষ উপকৃত হই।"

মৌলভী—"ঐ চিত্রটি! হাঁ—আপনি উপকৃত হন বলেন কি! আমি নামটী বিস্মৃত হয়েছি!"

ইশা—"কি বল্‌ছেন আপনি! আপনি নামটি জান্‌তেন, ভুলে যাচ্ছেন?"

"হাঁ—হাঁ, তাই বটে" সংক্ষেপে এই উত্তর দিয়া বৃদ্ধ মৌলভী পুনরায় 'নেমাজে' বসিবার উপক্রম করিলেন।

দারুণ মনোভঙ্গে ইশা সাহেব বলিলেন—"আমি বাদশাহের নামে আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি।"

মস্তকোত্তোলন করিয়া বৃদ্ধ মৌলভী সাহেব বলিলেন—"আদেশ করুন।"

লজ্জিত হইয়া ইশা সাহেব বলিলেন—"আমি চিত্রখানি কিনিতে ইচ্ছা করি।"

মৌলভী—"ইহা তো বিক্রয়ের জন্য নহে!"

ইশা—"অন্ততঃ আমাকে বলুন, আমি কি উপায়ে চিত্রকরের সাক্ষাৎ পাব। আমি তাঁহাকে আমার আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবো। বাদশাহও তাঁর বিষয় নিশ্চয় জানতে চাইবেন।"

"তা অসম্ভব। চিত্রকর আর নাই!" "তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে?"

"হ্যাঁ—চিত্রকর মৃত।"

"চিত্রকর মৃত!" ধীরে ধীরে ইশা সাহেব বলিলেন—"কেহ তাঁহাকে জানিল না,—বিস্মৃতিতে প্রতিভা-সূর্য্য চির অস্তমিত হইল! তুচ্ছ আমি! তুচ্ছ আমার গৌরব!"

কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া মৌলভী সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন —"আপনি কে?"

"আজ্ঞে, আমি ইশা!"

বিখ্যাত স্থাপত্য-শিল্পী ওস্তাদ ইশার নাম শুনিয়া শ্রদ্ধা ও প্রীতিতে মৌলভী সাহেবের বদনমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাঁহার মনোভাব বুঝিয়া ইশা সাহেব আশান্বিত হইয়া অতি বিনয়ের সহিত বলিলেন—"সাহেব আমাকে কি চিত্রখানি বেচিবেন না? চিত্রকরের নামটী মনে করিয়া বলিতে পারিবেন না?"

"অসম্ভব! আপনাকে বলিয়াছি ত, চিত্রকরের সহিত পৃথিবীর কোনও সম্বন্ধ নাই! তিনি মৃত না হ'তেও পারেন!"

"তবে তিনি বেঁচে আছেন! তাঁহার নামটী কি?" অধৈর্য্য হইয়া শিষ্যমণ্ডলী জিজ্ঞাসা করিল—"তাঁহার নামটী কি?"

"আমি আপনাদের বলিয়াছি ত যে, সে হতভাগ্যের সহিত পৃথিবীর কোনও সম্বন্ধ নাই; সে কোনও বিষয়ে লিপ্ত নহে। তাহাকে শান্তিতে মরতে দিন।"

ইশা সাহেব বলিলেন—"তাতো হয় না সাহেব! খোদা যখন পৃথিবীতে এমন একটা প্রতিভা-রত্ন পাঠিয়েছেন, তখন তাঁর নিশ্চয় এটা অভিপ্রেত নয় যে, শুধু সেই নিজে মজিয়া ভোর হইয়া থাকিবে। পৃথিবীর সকলেই তাহার ফল-ভোগের সমান অধিকারী। শুধু বলুন, তিনি কোথায় লুকিয়ে আছেন—আমরা লোক-সমাজে তাঁকে বাহির করি! পৃথিবীর গৌরব-মাল্যে তিনি বিভূষিত হোন্।" মৌলভী সাহেব বলিলেন—"আর যদি আমি কিছু না বলি?"

"যদি কিছু না বলেন, তা হ'লে—তা হ'লে বাধ্য হয়ে বাদশাহের কাছে আমাকে সমস্ত বলতে হ'বে; তিনি যা' হয় করবেন।"

অতি কাতরভাবে মৌলভী সাহেব বলিলেন—"দোহাই আপনার! দোহাই খোদার! খোদার নামে বলছি, আপনি স্বচ্ছন্দে ছবিখানি নিয়ে যান; কিন্তু চিত্রকরকে শান্তিতে মরতে দিন। সে কোলাহলে যেতে চায় না। আমি তা'কে জানতুম, ভালবাসতুম, আপদে-বিপদে সান্ত্বনা দিতুম। আপনি যাকে প্রতিভা বলছেন, আমি সেই হত-ভাগ্য নরাধমকে শয়তানের কবল থেকে মুক্ত করেছি। জীবনব্যাপী সংগ্রামের ফলে এখন সে পৃথিবীটাকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে পেরেছে। মানুষের যশোলিপ্সার গণ্ডী অতিক্রম করে সে এখন কিছুদূর অগ্রসর হ'য়েছে। দোহাই আপনার—তাকে আর পিছু ডাকবেন না। সে যে অপার্থিব গৌরব-লাভের লোভে ধাবমান, তার কাছে পৃথিবীর স্তুতি-গরিমা একান্ত তুচ্ছ। কেন তার প্রাণে পৃথিবীর অপদার্থ লোভের মোহ জাগিয়ে তুলছেন! আপনি যদি জানতেন, যে, সংসারের সহিত সম্পর্ক রহিত করতে, ধন-জন জীবন-যৌবন-যশঃ প্রভৃতির হাত হতে আত্মরক্ষা করতে তাকে মনের সঙ্গে কি ভীষণ যুদ্ধ করতে হয়েছে! খোদার দোহাই, তা'র প্রাণে আপনি সেই সমর-বহ্নি আর প্রজ্জ্বলিত করে তুলবেন না।"

বিস্মিত ইশা সাহেব বলিলেন—"এ যে অমরত্বের বলিদান!"

স্থির গম্ভীর কণ্ঠে মৌলভী সাহেব বলিলেন—"না, এ অমরত্বের প্রকৃত সোপান।" ইশা সাহেব কৌশল করিয়া বলিলেন—"আপনি কেন ও কি অধিকারে চিত্রকরের পক্ষ নিয়ে এত কথা বলছেন! তিনি স্বয়ং এ বিষয়ে আলোচনা করুন না কেন!" "বাপ, মা, ভাই, বন্ধুর যে অধিকার, সেই অধিকার নিয়ে খোদার নামে আমি তার পক্ষ সমর্থন করছি। দয়া করে আমার কথা রাখুন—আমায় বিশ্বাস করুন!" অতি করুণ কণ্ঠে এই কথা বলিতে-বলিতে, বৃদ্ধ মৌলভী মুখ আবৃত করিয়া, ধীর-মন্থর গতিতে

স্থানান্তরে গমন করিলেন। ইশা সাহেবের মুখ যেন শুষ্ক হইয়া গেল; চোখের পাতা অশ্রুতে আর্দ্র হইয়া উঠিল। অনুচরবর্গকে সংক্ষেপে বলিলেন—"চল, আমরা এখন যাই।"

ইশা সাহেবের একজন শিষ্য বলিয়া উঠিল—"ওস্তাদজী, আপনার কি মনে হয় না যে, এই বৃদ্ধ মৌলভী সাহেবের সহিত চিত্রের বেশ সাদৃশ্য আছে?" ইশা সাহেব যেন কি একটা অমূল্য নিধি কুড়াইয়া পাইলেন। তিনি চিন্তান্বিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। আর একজন শিষ্য জোর গলায় বলিল—"সে তো নিশ্চয়! বৃদ্ধ মৌলভীর মুখ থেকে চল্লিশ বৎসর বয়স কমাইয়া দাও; তা' হ'লেই দেখ্‌বে—আমাদের ওস্তাদজি যে বলেছিলেন, 'ছবিখানি চল্লিশ বৎসর আগে আঁকা—চিত্রকরই নায়ক ও নাটককার'। তা অক্ষরে-অক্ষরে সত্য। আমি বাজি রেখে বল্‌তে পারি, বৃদ্ধ মৌলভী সাহেব ও চিত্রের মৌলভী-যুবক একই ব্যক্তি!"

"নিশ্চয়ই তাই!" গম্ভীর স্বরে ইশা সাহেব বলিলেন—'নিশ্চয়ই তাই! উভয়ে একই ব্যক্তি। সাধু পুরুষ ঠিকই বলেছেন, তাঁর গৌরবের কাছে আমরা কত তুচ্ছ! এ আমরা যাই। তিনি আমরণ শান্তিতে থাকুন।"

* * * * *

ইশা সাহেব কোনও ক্রমে দিবসত্রয় অতিবাহি করিলেন; আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি পুনর সেই ক্ষুদ্র মস্‌জিদে আগমন করিলেন।

দেখিলেন, বস্ত্রাবৃত বৃদ্ধ মৌলভী সাহেবের মৃতদে তথায় শায়িত রহিয়াছে; এবং চারিজন মৌলভী কোর শরীফ্‌ পাঠ করিতেছেন।

স্থানচ্যুত চিত্রখানি গুটাইয়া তাঁহার পার্শ্বে রক্ষি হইয়াছে। ভক্তি ও শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ ইশা সাহেবে চক্ষু হইতে দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। তিনি শু মৃদু আর্দ্র-কণ্ঠে বলিলেন—"বনফুল বনেই শুকাইল!" *

* Two Glories নামক বিখ্যাত স্পেনদেশীয় গল্প অবলম্বনে - লেখক।

হোম-রুল

[শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী]

(১)

গিন্নি বল্লেন—ওগো বুদ্ধির ঢেঁকি,
ছেলেটা যে আট বছরে প'ল,
ইস্কুলে দাও, সুরু কর শাসন;
আদর দিলেই বাপের কাজ হ'ল!

(২)

নাটক লিখ্‌ছ আহার-নিদ্রা ভুলে',
লোক-চরিত্রে দখল তোমার ছাই!
ছেলে যদি মানুষ করতে হয়,
আদর শাসন দুই-ই সমান চাই।

(৩)

যত হাসি, গিন্নি ততই রুষ্ট
মেজাজ একদিন হঠাৎ গেল বেঁকে,
বল্লেম, "খোকা—খুব হুঁসিয়ার কিন্তু!
শাসন সুরু কল্লেম এবার থেকে।"

(৪)

শুনে' দুষ্টু একটু নষ্ট হেসে'
বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বল্লে—"ইস্,
তোমায় দেখে' ভারি আমার ভয়!
আড়ি!—তোমায় কর্‌বো না আর কিস্!"

(৫)

মিষ্টি হাসি ভাসিয়ে দিলে পণ,
বুকের মাঝে রাখ্‌লেম বাছায় ধ'রে ;
আবেগ-ভরা চুমায় চুমায় তারে
দিলাম ভারি ব্যতিব্যস্ত ক'রে !

(৬)

'প্রিয়া এসে ফেল্লেন মোদের ঘরে',
বল্লেন,—"দস্যি, যাবি গুণ্ডার দলে।
কোথায় তোর শেলেট, পেন্সিল্, বই ?"—
আমায় বল্লেন, "শাসন একেই বলে !"

(৭)

বল্লেম,—"ব্যস্ত কেন ? সুদ-আসলে
'বিশ্ববিদ্যা' কর্‌বে ছেলে শাসন !
বেত্র দিয়ে ছাত্র গড়্‌তো আগে,
হালের পাঠ্য ছেলে কর্‌ছে পেষণ !"

(৮)

স্ফূর্ত্তি ক'রে ভর্ত্তি হল যাদু
পেয়ে মোদের স্নেহের বিদ্যালয়,
নিক্ সে পাঠ চুম্ব আলিঙ্গনে,
দু'দিন, আহা, দু'দিন বই ত নয় !

পুরীর কথা

[শ্রীগুরুদাস সরকার এম-এ]

(২)

শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে আরও যে কয়টি ক্ষুদ্রতর মন্দির দেখা যায়, তাহার মধ্যে পাতালেশ্বর, বিমলা, লক্ষ্মীদেবী ও ধর্ম্মরাজ বা সূর্য্য-নারায়ণের মন্দির উল্লেখযোগ্য। আমরা সূর্য্য মন্দিরের পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। পাতালেশ্বর মন্দিরে দরজার পার্শ্বে একখানি খোদিত লিপি আছে ; কিন্তু স্থানটি বিশেষ আর্দ্র, অন্ধকার ও দুর্গন্ধ বাষ্পসমাচ্ছন্ন বলিয়া সেখানে অধিকক্ষণ তিষ্ঠান যায় না। সুধী শ্রীযুক্ত মনোমোহন গাঙ্গুলী মহাশয় লিপিটি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, ইহা তিন প্রকার-বিভিন্ন বর্ণমালায় রচিত (in three different characters) এবং রাজা অনঙ্গ ভীমদেবের রাজত্বকালে খোদিত। ভুবনেশ্বরের মন্দিরে তেলগু ও উড়িয়া এই উভয় ভাষায় খোদিত লিপিমালা আমরা ঘৃত-প্রদীপ সাহায্যে দেখিতে পাইয়াছিলাম। ইহারও একটীতে অনিরুদ্ধ ভীমের নাম আছে। রাজা অনঙ্গভীম ১১৯২ খৃঃ অঃ হইতে ১২০০ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

বিমলা দেবীর মন্দির প্রাচীন বটে কিন্তু ইহাতে সেরূপ কোনও কারুকার্য্য নাই। ইহা তান্ত্রিকগণের একটী তীর্থস্থান বলিয়া বিবেচিত হয়। মৎস্য পুরাণের "বিমলা পুরুষোত্তমে" প্রভৃতি বচন হইতে মনে হয় যে, এ মূর্ত্তিটিও নিতান্ত অল্প দিনের নহে। মৎস্য পুরাণে মৌর্য্য সম্রাটগণের বংশাবলীর পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। ৪৮০ খৃঃ অঃ মৌর্য্য বংশের অবসান হইয়াছিল ; সুতরাং ভিন্সেণ্ট স্মিথ অনুমান করেন যে, মৎস্য পুরাণ সম্ভবতঃ ৫০০ খৃঃ অব্দে সম্পাদিত হইয়া থাকিবে। ইহার পূর্ব্ব হইতেই প্রসিদ্ধি লাভ না করিলে, বিমলা দেবীর উল্লেখ মৎস্য পুরাণে দেখা যাইত না। তান্ত্রিকেরা বিমলা দেবীকে জগন্নাথেরই 'শক্তি' বলিয়া মনে করেন। লক্ষ্মী-মন্দিরের কারুকার্য্য অতি সুন্দর। দেওয়ালের খোল বা কুলঙ্গীতে তিনটি সুন্দর অনতিবৃহৎ স্ত্রী-মূর্ত্তি রহিয়াছে। দেওয়াল হইতে উদ্গত তাক্ বা ব্রাকেটের উপর উপবিষ্ট পদ্মালয়ার সুন্দর মূর্ত্তি। মস্তকো-

পরি হস্তি-কর-ধৃত জল-স্রাবী কলস। এ মূর্ত্তি 'গজ লক্ষ্মী' নামে পরিচিত। স্তম্ভগাত্রে ষট্‌ফণা যুক্ত নাগ-নাগিনীর মূর্ত্তি—নিম্নে হস্তী-পৃষ্ঠে শার্দ্দূল। জৈন খণ্ড-গিরি-গুহার এবং সাঞ্চী ও বারহুতের বৌদ্ধ স্তূপেও এইরূপ "স্ত্রী-মূর্ত্তি" দেখিতে পাওয়া যায়। তবে সেগুলি অনেক স্থলে দণ্ডায়মান অবস্থায় পরিকল্পিত। প্রাচীন ভারত-বাসীরা হিন্দুধর্ম্ম-ত্যাগী হইলেও একেবারে "লক্ষ্মীছাড়া" হইতেন না। জগন্নাথ-মন্দিরে কারু-কার্য্যের অভাব নাই। মন্দিরের "বিমান" অংশটি আগাগোড়া সিমেণ্ট দিয়া পলস্তারা করা। বিমানের গাত্রে জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার মূর্ত্তি। তাঁহার প্রায় ২০ হাত নিম্নে বৃক্ষশাখা-ধারী হনুমান-মূর্ত্তি। (১) দেখিলাম নৃসিংহ, হরিহর, ব্রহ্মা, গণেশ, নারদ, রাম, দশানন প্রভৃতি আরও বহু পৌরাণিক মূর্ত্তি রহিয়াছে। একটী চিত্রে রামগতপ্রাণ হনু জানকী-দেবীকে প্রণাম করিতেছে। বামন ও বরাহ অবতারের মূর্ত্তি দুইটি sculptor বা বর্দ্ধকীর শিল্প নৈপুণ্যের বিশেষ পরিচায়ক। কটিদেশের বর্ত্তুলাকৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'দানা'র মালা, ঝাঁপ্পা প্রভৃতি অলঙ্কার, এমন কি পরিচ্ছদের ভাঁজগুলিও সুন্দররূপে তক্ষিত হইয়াছে। বামন-মূর্ত্তির মস্তকে টোপরের ন্যায় সূচাল মস্তকাবরণ। মুখাবয়ব সুন্দর—তবে নাকটি যেন অধিক উচ্চ বলিয়া মনে হয়। বরাহ-মূর্ত্তি পদ্মাসনের উপর দণ্ডায়মান। সাধারণ বিষ্ণু-মূর্ত্তির ন্যায় এ মূর্ত্তিরও চারিটি হস্ত। ইহার সন্নিকটে পশ্চিম ধারের একটি niche বা কুলঙ্গীতে নৃসিংহ-মূর্ত্তি—চতুর্হস্ত, গদাচক্রধারী; গলায় রুদ্রাক্ষমালা; দুই হস্তে হিরণ্যকশিপুর নাড়ী ছিঁড়িয়া বাহির করিতেছেন। কেবল দেবদেবীর মূর্ত্তি দেখিতে-দেখিতে চিত্রে মানব-হৃদয়ের পবিত্র অভিব্যক্তি দর্শনের জন্য স্বভাবতঃই ঔৎসুক্য জন্মিয়া থাকে। জগন্নাথের মন্দিরে এ শ্রেণীর একটী চিত্র নিতান্ত হৃদয়হীন ব্যক্তিকেও বিচলিত করিয়া তুলে। এটি হিন্দু-রমণীর মাতৃ-মূর্ত্তির চিত্র। মাতার কর্ণে সুবৃহৎ কুণ্ডল; বাহু ও প্রকোষ্ঠে অলঙ্কার। পুত্রকে বক্ষে তুলিয়া ধরিয়া তন্ময় ভাবে তাহার প্রতি চাহিয়া আছেন; শিশুও মাতার মুখের দিকে সহাস্য বদনে চাহিয়া রহিয়াছে পুরী আসিয়া এ চিত্রটি না দেখিলে মন্দিরের কারুকার্য্য দর্শন অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

জগমোহন হইতে পূর্ব্বদিকের দ্বার দিয়া নাট-মন্দিরে এবং পশ্চিমের দ্বার দিয়া বিমানে যাওয়া যায়। নাট মন্দিরটি—ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ-দেবের নাট-মন্দিরেরই অনুরূপ। ভোগমণ্ডপের কৃষ্ণ ক্লোরাইট প্রস্তরে খোদিত মূর্ত্তিগুলির কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; কিন্তু একবারমাত্র দেখিলে এগুলির সৌন্দর্য্য সম্যক রূপে উপলব্ধ হয় না ভোগমণ্ডপের পূর্ব্বদিকের বাম পার্শ্বে দোলযাত্রার চিত্র। দোলনার লোহার শিকল ও ঝাপ্পা প্রভৃতিও অপূর্ব্ব নৈপুণ্যের সহিত খোদিত হইয়াছে। ইহার পর শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা—কৃষ্ণ রাখাল-বালকদিগের সহিত গরু চরাইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বাঁশী বাজাইতেছেন, গোধন-গুলি উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছে। তাহার পর রামের রাজ্যাভিষেক, এবং তৎপরে নৌবিহারের চিত্র। ভোগ-মণ্ডপের উত্তর ধারে সীতার বিবাহ, রামের সিংহাসনারোহণ, ইন্দ্র ও ঐরাবত প্রভৃতির চিত্র বড়ই সুন্দর। ফরাসী পণ্ডিত গুস্তাভ লে বঁ (Gastave le Bon) মন্দিরের এ সকল চিত্রাদির বিষয় বোধ হয় অবগত ছিলেন না; কারণ, মন্দিরে অহিন্দুর প্রবেশ নিষিদ্ধ। শুনিয়াছি, ফটোগ্রাফ লওয়া সম্বন্ধেও অনেক রূপ আপত্তি ঘটে। Le Bon (লে বঁ) বলিয়াছেন, "জগন্নাথের মন্দির ভুবনেশ্বরের অনেক পরবর্ত্তী; অনুমান, খৃঃ ১২০০ অব্দে নির্ম্মিত। আর্ট বা ললিতকলার হিসাবে দেখিতে গেলে ইহা এতই অপকৃষ্ট যে, বাস্তবিকই ভুবনেশ্বরের ব্যঙ্গ প্রতিচ্ছবি (veritable caricature) বলিয়া মনে হয়। মন্দিরের চূড়া ও বিমান প্রভৃতি ভুবনেশ্বরেরই অনুকরণে নির্ম্মিত বটে, কিন্তু প্রস্তরে খোদিত চিত্রগুলি অত্যন্ত স্থূল ও অসংস্কৃত রকমের (grossieres)। পুরীতে যে সকল চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, সে গুলিরও এই দশা। নমুনার চিত্র দৃষ্টে সকলেই এ উক্তির যাথার্থ্য নির্ণয় করিতে পারিবেন।" এই বলিয়া মসিয়ে বঁ নিজ পুস্তকে প্রকাশিত চিত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। দেখিলাম, সব কয়টি ফটোই গুণ্ডিচা-বাড়ীর চিত্র হইতে গৃহীত। মন্দিরস্থ তরুণী-বাহিত তরণীর চিত্রটি দেখিলে ফরাসী পণ্ডিত অন্ততঃ সেটির প্রশংসা না করিয়া

(১) শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সুলিখিত গ্রন্থে মন্দিরের এ অংশের বিবরণ বেশ বিস্তারিত ভাবেই প্রদত্ত হইয়াছে।

থাকিতে পারিতেন না। তবে শুনা যায়, সেটিও না কি কোনার্ক হইতে আনীত। প্রথমবার তাড়াতাড়ি সিংহদ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া সেই পথেই ফিরিয়া গিয়াছিলাম,—অন্য দরজাগুলি বড় লক্ষ্য করি নাই। দেখিলাম, সর্ব্বসমেত চারিটি দরজা আছে—পূর্ব্বে সিংহদ্বার, পশ্চিমে খঞ্জাদ্বার, উত্তরে হস্তিদ্বার, দক্ষিণে অশ্বদ্বার। চতুর্দ্দিকে দুইটি এক-কেন্দ্রিক আয়ত বেষ্টনি (concentric rectangular enclosures)। বহিঃপ্রাচীর দৈর্ঘ্যে ৬৬৫ ফিট, প্রস্থে ৬৪০ ফিট, উচ্চতায় ২০ হইতে ২৪ ফিটের মধ্যে। এই বহিঃ-প্রাচীরেরই উপরিভাগে battlement বা খাঁজবিশিষ্ট অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। শুনিলাম, মন্দির-অভ্যন্তরস্থ মুক্তিমণ্ডপে অদ্যাপি শাস্ত্রালোচনা হইয়া থাকে। দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় লীলাবতী নাটকের মুক্তিমণ্ডপের নামকরণ বোধ হয় এই মুক্তিমণ্ডপেরই বিকৃতার্থে করিয়া থাকিবেন।

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় পুরী প্রাচীন বৌদ্ধ তীর্থ বলিয়া মত প্রকাশ করিবার পর, বৌদ্ধোৎপত্তি বিষয়ক ধারণা ক্রমশঃই বদ্ধমূল হইয়াছে। মূর্ত্তিত্রয় কখনও বা বৌদ্ধস্তূপের অনুকরণে নির্ম্মিত, কখনও বা "ত্রিরত্ন" (বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ) জ্ঞাপক চিহ্নাদির রূপান্তর—এইরূপ বিভিন্ন মতও ব্যক্ত হইয়াছে। রক্ত-গ্রানাইট-প্রস্তর-খোদিত এলোরা গুহায় জগন্নাথ নামে খ্যাত অপর একটী দেবমূর্ত্তির পরিচয় ফরাসী পণ্ডিত Langlois (লাঁলোয়া) তাঁহার Monuments de L. Hindostan নামক গ্রন্থে দিয়াছেন বটে; কিন্তু তাহার সহিত উড়িষ্যার জগন্নাথ-মূর্ত্তির কোনও সাদৃশ্য নাই। এ জগন্নাথ উবু হইয়া (Sur ses kalous) বসিয়া আছেন। হস্তদ্বয় জানুর উপর বিন্যস্ত। পার্শ্বে দক্ষকন্যা জয়া ও বিজয়া নামে পরিচিতা দুইটি স্ত্রী-মূর্ত্তি। প্রবেশ-দ্বারের নিকটে অপর দুইটি মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়; একটীর নাম "সুদ", অপরটির নাম "বুদ"। Langlois সাহেবের মতে সুদ—সুদ্ধ্যেনে (Soudoudheneh) (২) (সুধন্বা নহে ত)? এবং বুদ—বুদ্ধ শব্দের অপভ্রংশ। বিশেষজ্ঞগণের মতে, ইলোরার জগন্নাথসভা এখন জৈন কীর্ত্তি বলিয়াই পরিচিত; সুতরাং এ জগন্নাথ যে বৌদ্ধ-দেবতা, এ কথা জোর করিয়া বলা চলে না। (Burgess Eleura Rock temples, p. 73; and Fergusson and Burgess Cave Temples of India, p. 500) চীন দেশীয় পর্য্যটক ফাহিয়ান-রচিত কো-কু-কী গ্রন্থে আষাঢ় মাসে খোটান ও প্রাচীন পাটলীপুত্রে চারিচক্রবিশিষ্ট রথে করিয়া যে বিভিন্ন বৌদ্ধ মূর্ত্তি সকল লইয়া যাওয়ার বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে রথ-যাত্রাও যে বৌদ্ধ প্রথার অনুকরণ মাত্র—একথা অনেকেই অনুমান করিয়া থাকেন। রাজা রাজেন্দ্রলালের মতে, সুদর্শন-চক্র নামক ঋজু শিবলিঙ্গবৎ প্রস্তরটি বৌদ্ধ ধর্ম্মচক্রেরই প্রচ্ছন্ন মূর্ত্তি। প্রস্তরটি উচ্চে প্রায় ৮.০ গজ হইবে। রাজেন্দ্রলাল বলিয়াছেন যে, এই প্রস্তরখণ্ডের শিরোভাগেই ধর্ম্মচক্র প্রতিষ্ঠাপিত হইত। চক্র-চিহ্ন কিন্তু বৌদ্ধ বা হিন্দুর নিজস্ব নহে। জৈন গুহাদিতেও এরূপ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। শুধু চক্রচিহ্ন বলিয়া নহে—সুদর্শন চক্রের পূজাই যে কেবল জগন্নাথ মন্দিরের বিশেষত্ব, এরূপ বিবেচনা করার কোনও কারণ নাই। "দাক্ষিণাত্যেও 'সুদর্শন চক্র' শ্রীবৈষ্ণব-মন্দিরে 'চক্র পেরুমল' নামে পৃথক ভাবে পূজিত হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণশাস্ত্রী মহাশয় মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রকাশিত তাঁহার দক্ষিণ-ভারতীয় দেব ও দেবী-মূর্ত্তির পরিচয়" (South-Indian Images of Gods and Goddesses) নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, শিল্পশাস্ত্র মতে, সুদর্শনের ষোড়শ হস্ত, ত্রিনেত্র, উদ্গত দন্ত, অগ্নিশিখাবৎ কেশ এবং অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল বর্ণ। বিভিন্ন হস্তে চক্র, ধনু, পরশু, তরবারি, তীর, ত্রিশূল, পাস, অঙ্কুশ, পদ্ম, বজ্র, চর্ম্ম (ঢাল), হল, মুষল, মুদ্গর, বর্ষা প্রভৃতি ধারণ করিয়া আছেন। নৃত্যের ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান সুদর্শনের সুসজ্জিত ধাতব মূর্ত্তি —ধাতব hexagon বা ষট্‌কোণের মধ্যেই স্থাপিত হইয়া থাকে। এই ষট্‌কোণের গাত্রেও অগ্নিশিখাদির চিহ্ন দেখা যায়। সুতরাং চক্রাকার অগ্নিশিখার মধ্যে নৃত্য করিতে করিতে সুদর্শন যে সকল শত্রু বিনাশ করিয়া থাকেন,—শিল্পীর এই পরিকল্পনা দৃষ্টি মাত্রেই বুঝিয়া লইতে বিলম্ব হয় না। দাক্ষিণ ভারতে চতুর্হস্ত ও অষ্টহস্ত বিশিষ্ট 'পেরুমল' মূর্ত্তিও দেখা গিয়া থাকে। এ শ্রেণীর মূর্ত্তির সকল হস্তেই চক্রাস্ত্র থাকে। এই সকল বিভিন্ন প্রকার মূর্ত্তির মধ্যে

(২) Mons. Foucher L' Iconographic Buddhique গ্রন্থে য 'সুধনকুমার' নামক মূর্ত্তির বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার সহিতও ইঁহার বিশেষ কোনও মিল দেখা যায় না।

কোনও একটীও যে উড়িষ্যা দেশের বৈষ্ণবগণের মধ্যে পরিচিত ছিল না, এ অনুমান সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। মান্দ্রাজ ও উৎকলে এখনও বেশ মেশামিশি ভাব রহিয়াছে। অন্যদেশের 'বৈষ্ণবী' নজির থাকিতেও, কেবল শ্রীক্ষেত্রেই যে বৌদ্ধ প্রমাণ বলবৎ হইবে, ইহা হিন্দুগণের নিকট অস্বাভাবিক মনে হওয়া আশ্চর্য্য নহে। হিন্দু-মূর্ত্তি-তত্বে Anthropomorphism বা মানবীয় রূপাদি আরোপের দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নহে। "জনার্দ্দন" বিষ্ণু-মূর্ত্তির দুই পার্শ্বে যে দুইটি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বামনবৎ মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা একটী চক্র ও একটী গদার Personified মূর্ত্তি। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ মহাশয় হেমাদ্রিব্রত-খণ্ড ১ম অধ্যায় হইতে তদ্রচিত বিষ্ণুমূর্ত্তি-পরিচয় গ্রন্থে যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে দেখিতে পাই, "দক্ষিণে তু গদাদেবী তনু মধ্যা সুলোচনা" এবং "বাম-ভাগগতশ্চক্র কার্য্যো লম্বোদর স্তথা, সর্ব্বাভরণ সংযুক্তো বৃত্ত বিস্ফারিতেক্ষণং॥" সুতরাং দেবতার সহিত চক্রের পূজা শাস্ত্রমতেও নিতান্ত হিন্দুধর্ম্ম-বহির্ভূত ব্যাপার বলিয়া মনে হয় না। জনার্দ্দন-মূর্ত্তির পার্শ্বে চক্রের যেরূপ মানবীয় মূর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়া থাকে, তাহাতে যে প্রকার Personification বা নরাকৃতি-পরিগ্রহণ-ধারা ত্রিশূলের সহিত সম্মিলিত হইয়াও যে দারুব্রহ্মের বর্ত্তমান মূর্ত্তিতে পর্য্যবসিত হইতে পারে, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে না। কিরূপ ক্রম-পরিবর্ত্তনে চক্র ও ত্রিশূল নব-সাদৃশ্য-যুক্ত মূর্ত্তিতে পরিণত হইল, তাহার ধারাবাহিক বিবরণ এ যাবৎ পাওয়া যায় নাই; এবং পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের কোন্-কোন্ স্থানে কি প্রকার বৌদ্ধ-মন্দিরাদি অবস্থিত ছিল, তাহাও অদ্যাপি অজ্ঞাত রহিয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসু মনস্বী ডাঃ রাজেন্দ্রলালও এ কথা স্বীকার করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। ফাগুর্সন পুরীতে যে চৈত্য থাকার কথা লিখিয়াছেন, তাহাও অনুমান ব্যতীত আর কিছুই নহে। অতএব এ সম্বন্ধে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, কোন-কোনও স্থানে বৌদ্ধতীর্থ যেরূপ হিন্দুতীর্থে পরিণত হইয়াছিল, এখানেও হয় ত সেইরূপ হইয়া থাকিবে; তবে এ মতটী সমর্থনের জন্য এখনও প্রাচীন পুঁথি, শিলালিপি, তাম্রপট্ট প্রভৃতি অধিকতর সন্তোষজনক বৈজ্ঞানিক প্রমাণের আবশ্যকতা আছে;—ভরসা করি, এ উক্তিতে সত্যের অপলাপ ঘটিবে না। রাজা রাজেন্দ্রলালের মতে বুদ্ধদেব ৪র্থ অব্দে নারায়ণের অবতার রূপে পরিগণিত হইয়াছিলে; কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, পুরুষো[ত্তম] মন্দির-বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিতা এবং এ যাবৎ জগন্নাথের শ[ক্তি] রূপেই পরিচিতা এবং হিন্দুদেবী বলিয়াই স্বীকৃতা—বিম[লা] হিন্দুজগতে খৃঃ ৫০০ অব্দের পূর্ব্ব হইতেই প্রসিদ্ধিলা[ভ] করিয়াছেন। সুতরাং একদিকে মাগুনিয়া দাসের "বি[মলা] বৌদ্ধরূপরে" প্রভৃতি পদ ও দেবীবরের সমসাময়ি[ক] অনুমানিক পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক মুলো-পঞ্চানে[র] গোষ্ঠী কথায় লিখিত

> ইন্দ্রদ্যুম্ন বৌদ্ধ রাজা জগন্নাথে কীর্ত্তি।
> সাম্যবাদী তবু বলায় ক্ষত্রিয় বৃত্তি(৩)॥

প্রভৃতি উক্তি যেরূপ বৌদ্ধ প্রবাদ বহন করি[য়া] আনিতেছে, সেইরূপ প্রাচীন কাল হইতেই শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গ[ণে] বিমলাদেবী ও সুদর্শন চক্র প্রভৃতির পূজা এবং ইন্দ্রদ্যু[ম্ন] কর্ত্তৃক হিন্দু দেবতা নৃসিংহ মূর্ত্তি স্থাপনার প্রবাদ বিরু[দ্ধ] মতেরও সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সুতরাং আর অধি[ক] প্রমাণের অপেক্ষা না রাখিয়া, হিন্দু সংস্কার-পরিপন্থী এক অপেক্ষাকৃত আধুনিক মতবাদ নিশ্চিতরূপে আশ্রয় ক[রা] কতদূর ন্যায়সঙ্গত, তাহা পণ্ডিতগণ বিবেচনা করিবেন উপস্থিত এ সম্বন্ধে open mind বা মন নিরপেক্ষভা[বে] উন্মুক্ত রাখিয়া, সুষ্ঠু প্রমাণ সংগ্রহ করাই সাধারণ বুদ্ধি[তে] সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

রাজা রাজেন্দ্রলাল প্রসঙ্গক্রমে নিজগ্রন্থে (Antiquitie[s] of Orissa) লিখিয়াছেন যে, মানবীয় ধর্ম্মারোপজনি[ত] (anthropomosphic) পূজা-পদ্ধতি চৈতন্যদেবে[র] প্রভাবেই জগন্নাথ-মন্দিরে প্রথম অনুসৃত হয়। ইহা পূর্ব্বে সাধারণ মানবের ন্যায় জগবন্ধুরও ভোজন, শয়ন শৃঙ্গার প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল না। চৈতন্যদেব ১৫১১ অ[ব্দে] দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাগমন করিয়া ১৫৩৪ খৃঃ অ[ব্দে] তাঁহার তিরোধান পর্য্যন্ত জীবনের শেষ অংশ পুরী [ও] বৃন্দাবনেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন।(৪) (শ্রীযুক্ত রাখাল

(৩) ৺ রোহিণীকুমার সেন প্রণীত "বাকলা"য় এই পদটী উদ্ধৃ[ত] হইয়াছে।

(৪) ২৪ বৎসর শেষে করিয়া সন্ন্যাস।
আর ২৪ বৎসর কৈলা নীলাচলে বাস॥

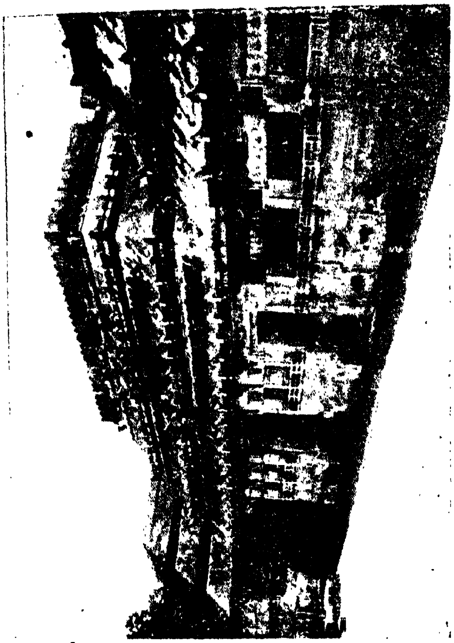
পুরীর মন্দির

মন্দিরের বহির্ভাগ

মন্দিরের মধ্যভাগের দৃশ্য

গুণ্ডিচা-বাড়ীর পথ—পুরী

কোনও একটীও যে উড়িষ্যা দেশের বৈষ্ণবগণের মধ্যে পরিচিত ছিল না, এ অনুমান সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। মাদ্রাজ ও উৎকলে এখনও বেশ মেশামিশি ভাব রহিয়াছে। অন্তদেশের 'বৈষ্ণবী' নজির থাকিতেও, কেবল শ্রীক্ষেত্রেই যে বৌদ্ধ প্রমাণ বলবৎ হইবে, ইহা হিন্দুগণের নিকট অস্বাভাবিক মনে হওয়া আশ্চর্য্য নহে। হিন্দু-মূর্ত্তি-তত্ত্বে Anthropomorphism বা মানবীয় রূপাদি আরোপের দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নহে। "জনার্দ্দন" বিষ্ণু-মূর্ত্তির দুই পার্শ্বে যে দুইটি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বামনবৎ মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা একটী চক্র ও একটী গদার Personified মূর্ত্তি। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ মহাশয় হেমাদ্রিব্রত-খণ্ড ১ম অধ্যায় হইতে তদ্রচিত বিষ্ণুমূর্ত্তি-পরিচয় গ্রন্থে যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে দেখিতে পাই, "দক্ষিণে তু গদাদেবী তনু মধ্যা সুলোচনা" এবং "বামভাগগতশ্চক্র কার্য্যো লম্বোদর স্তথা, সর্ব্বাভরণ সংযুক্তো বৃত্ত বিস্ফারিতেক্ষণং॥" সুতরাং দেবতার সহিত চক্রের পূজা শাস্ত্রমতেও নিতান্ত হিন্দু ধর্ম্ম-বহির্ভূত ব্যাপার বলিয়া মনে হয় না। জনার্দ্দন-মূর্ত্তির পার্শ্বে চক্রের যেরূপ মানবীয় মূর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়া থাকে, তাহাতে যে প্রকার Personification বা নরাকৃতি-পরিগ্রহণ ধারা ত্রিশূলের সহিত সম্মিলিত হইয়াও যে দারুব্রহ্মের বর্ত্তমান মূর্ত্তিতে পর্য্যবসিত হইতে পারে, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে না। কিরূপ ক্রম-পরিবর্ত্তনে চক্র ও ত্রিশূল নব-সাদৃশ্য-যুক্ত মূর্ত্তিতে পরিণত হইল, তাহার ধারাবাহিক বিবরণ এ যাবৎ পাওয়া যায় নাই; এবং পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের কোন্-কোন্ স্থানে কি প্রকার বৌদ্ধ-মন্দিরাদি অবস্থিত ছিল, তাহাও অদ্যাপি অজ্ঞাত রহিয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসু মনস্বী ডাঃ রাজেন্দ্রলালও এ কথা স্বীকার করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। ফার্গুসন পুরীতে যে চৈত্য থাকার কথা লিখিয়াছেন, তাহাও অনুমান ব্যতীত আর কিছুই নহে। অতএব এ সম্বন্ধে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, কোন-কোনও স্থানে বৌদ্ধতীর্থ যেরূপ হিন্দুতীর্থে পরিণত হইয়াছিল, এখানেও হয় ত সেইরূপ হইয়া থাকিবে; তবে এ মতটী সমর্থনের জন্য এখনও প্রাচীন পুঁথি, শিলালিপি, তাম্রপট্ট প্রভৃতি অধিকতর সন্তোষজনক বৈজ্ঞানিক প্রমাণের আবশ্যকতা আছে;—ভরসা করি, এ উক্তিতে সত্যের অপলাপ ঘটিবে না। রাজা রাজেন্দ্রলালের মতে বুদ্ধদেব খৃঃ ৪র্থ অব্দে নারায়ণের অবতার রূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, পুরুষোত্তম মন্দির-বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিতা এবং এ যাবৎ জগন্নাথের শক্তি রূপেই পরিচিতা এবং হিন্দুদেবী বলিয়াই স্বীকৃতা—বিমলা হিন্দুজগতে খৃঃ ৫০০ অব্দের পূর্ব্ব হইতেই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। সুতরাং একদিকে মাঙ্গুনিয়া দাসের "বিজয় বৌদ্ধরূপরে" প্রভৃতি পদ ও দেবীবরের সমসাময়িক অনুমানিক পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক মুলো-পঞ্চাননের গোষ্ঠী কথায় লিখিত

> ইন্দ্রদ্যুম্ন বৌদ্ধ রাজা জগন্নাথে কীর্ত্তি।
> সাম্যবাদী তবু বলায় ক্ষত্রিয় বৃত্তি(৩)॥

প্রভৃতি উক্তি যেরূপ বৌদ্ধ প্রবাদ বহন করিয়া আনিতেছে, সেইরূপ প্রাচীন কাল হইতেই শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে বিমলাদেবী ও সুদর্শন চক্র প্রভৃতির পূজা এবং ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক হিন্দু দেবতা নৃসিংহ মূর্ত্তি স্থাপনার প্রবাদ বিরুদ্ধ মতেরও সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সুতরাং আর অধিক প্রমাণের অপেক্ষা না রাখিয়া, হিন্দু সংস্কার-পরিপন্থী একটা অপেক্ষাকৃত আধুনিক মতবাদ নিশ্চিতরূপে আশ্রয় করা কতদূর ন্যায়সঙ্গত, তাহা পণ্ডিতগণ বিবেচনা করিবেন। উপস্থিত এ সম্বন্ধে open mind বা মন নিরপেক্ষভাবে উন্মুক্ত রাখিয়া, সুষ্টু প্রমাণ সংগ্রহ করাই সাধারণ বুদ্ধিতে সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

রাজা রাজেন্দ্রলাল প্রসঙ্গক্রমে নিজগ্রন্থে (Antiquities of Orissa) লিখিয়াছেন যে, মানবীয় ধর্ম্মারোপজনিত (anthropomosphic) পূজা-পদ্ধতি চৈতন্যদেবের প্রভাবেই জগন্নাথ-মন্দিরে প্রথম অনুসৃত হয়। ইহার পূর্ব্বে সাধারণ মানবের ন্যায় জগবন্ধুরও ভোজন, শয়ন, শৃঙ্গার প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল না। চৈতন্যদেব ১৫১১ অব্দে দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাগমন করিয়া ১৫৩৪ খৃঃ অঃ তাঁহার তিরোধান পর্য্যন্ত জীবনের শেষ অংশ পুরী ও বৃন্দাবনেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন।(৪) (শ্রীযুক্ত রাখাল-

(৩) ৺ রোহিণীকুমার সেন প্রণীত "বাকলা"য় এই পদটী উদ্ধৃত হইয়াছে।

(৪) ২৪ বৎসর শেষে করিয়া সন্ন্যাস।
আর ২৪ বৎসর কৈলা নীলাচলে বাস॥

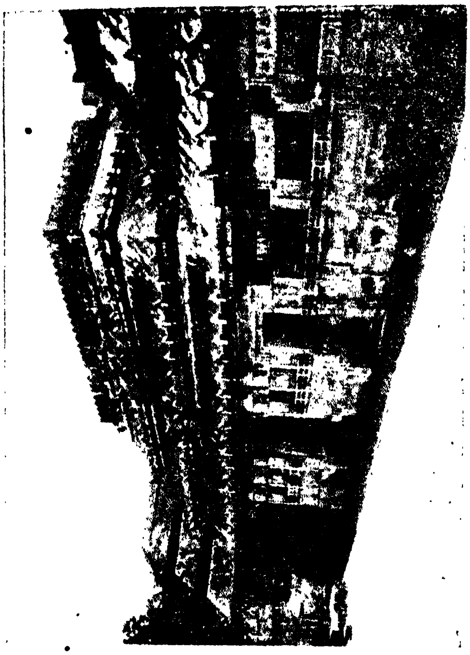

পুরীর মন্দির

মন্দিরের সম্মুখস্থ পথ

মন্দিরের বহির্ভাগ

গুণ্ডিচা-বাড়ীর পথ—পুরী

মন্দিরের পাশের দৃশ্য

মন্দিরের প্রবেশ দ্বার

মন্দির-গাত্রস্থ মহাবীর মূর্ত্তি

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাস ২য় খণ্ড ৩১৫ পৃঃ।) তিনি রাজা প্রতাপরুদ্রদেবের সমসাময়িক। প্রতাপরুদ্রদেব যে গীতগোবিন্দের গীতাদির প্রচলন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার শিলালিপিতেই প্রকাশ; সুতরাং চৈতন্যদেবের চেষ্টাতেই যে এরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল, রাজা রাজেন্দ্রলালের এ উক্তি কল্পনা মাত্র নহে। শ্রীজগন্নাথ দেবের রথযাত্রাকালে চৈতন্যদেব রথের অগ্রে অগ্রে

"যঃ কৌমার হরঃ স এবহিবয়স্তা এব চৈত্রক্ষপা
স্তেচোন্মিলিত মালতী সুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বনিলাঃ

প্রভৃতি শৃঙ্গার-রসাত্মক শ্লোক পাঠ করিতে-করিতে প্রেমে বিভোর হইয়া নাচিতে-নাচিতে গমন করিতেন। (অর্চনা ১৪শ বর্ষঃ ৭ম সংখ্যা পৃঃ ২৪৬।) পুরীর মন্দিরে

তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।
কভু দক্ষিণ কভু গৌড় কভু বৃন্দাবন॥
অষ্টাদশ বৎসর রহিলা নীলাচলে।
কৃষ্ণপ্রেম নামামৃতে ভাসাল সকলে॥

চৈতন্য চরিতামৃত

চৈতন্যদেবের চিহ্নের মধ্যে স্থানীয় পাণ্ডাগণ প্রস্তরের খোদিত পদচিহ্নমাত্র দেখাইয়াছিল মনে আছে। বাঙ্গালীর নিকট বাঙ্গালার 'নিমাইএর' নাম তাহারা বেশ স্পর্দ্ধা-ভরেই উল্লেখ করিতেছিল। কিন্তু তখন আর তাহাদিগের সুদীর্ঘ কাহিনী শুনিবার সময় ছিল না। জগন্নাথের মন্দিরে চৈতন্যদেবের আরও কয়েকটী চিহ্ন আছে। (৫) বাড়ের দক্ষিণ পার্শ্বের খোল বা কুলঙ্গীতে গণেশের সন্নিকটে যে মূর্ত্তিটি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা শ্রীচৈতন্যেরই মূর্ত্তি বলিয়া প্রকাশ। (Vide M. Ganguly's Orissa) মহাপুরুষগণ কালসৈকতে যে সকল পদচিহ্ন রাখিয়া যান, তাহার তুলনায় এ সকল নরকল্পিত স্মরণ চিহ্নগুলি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই মনে হয়।

এদিকে কথায়-বার্ত্তায় মন্দির-দর্শন শেষ করিতে প্রায় ৯টা বাজিয়া গেল। আমরা আর বিলম্ব না করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। পথে চর্ম্মকার-বীথি। গ্রীক আরিয়ান (Arrian) বহুপূর্ব্বে ভারতবাসীগণের যে শ্বেত পাদুকার কথা বলিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি উড়িষ্যায় নির্ম্মিত হইতেছে।

রাত্রি ৮॥টার সময় ট্রেণ। ঘোর বাক্য-যুদ্ধের পর স্থির হইল, অদ্যই এখান হইতে বিদায় লইতে হইবে। দলপতি মহাশয় যেন একটি জীবন্ত আগ্নেয়গিরি—দেহের আয়তনে ও উৎসাহের প্রবল আধিক্যে সৌসাদৃশ্যটি সহজেই ধরা পড়িয়া যায়। অনুকূল ঠাকুর Quick artist—তড়ি-ঘড়িতে অভ্যস্ত। প্রায় তিন কোয়ার্টারের মধ্যে—মনুষ্য-ভোজন-যোগ্য খিচুড়ী নামাইয়া দিল। ভূ—চন্দ্র এ হাঙ্গামের ভিতর কিছুই খাইতে পারিলেন না; নামমাত্র অন্ন স্পর্শ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। আহারান্তে তাড়াতাড়ি জিনিস-পত্র গোছগাছ করিয়া আমরা সকলেই অশ্বযানে সমাসীন হইলাম।

পুরীর কাহিনী এইখানেই শেষ হইয়া গেল।

(৫) গরুড়-স্তম্ভের গায়ে মহাপ্রভুর অঙ্গুলির চিহ্ন কোন কোন পাণ্ডা দেখাইয়া থাকে।

শ্রীযুক্ত মহারাজ সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর প্রেরিত

কলিকাতা পলিটেক্‌নিক্ বিদ্যালয়ে মাননীয় গবর্ণর বাহাদুর

ভাবের অভিব্যক্তি

[কোন সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ-মহিলার ভাবের অভিব্যক্তি]

স্বাভাবিক মূর্ত্তি

আসুন, নমস্কার!

অভ্যর্থনা

বক্রদৃষ্টি

এদিকে এস !

মুখটেপা

আতঙ্ক

অবসাদ

অমর কবি হাফেজ

[শিল্পী—শ্রীবিশ্বেশ্বর সেন।

হাফেজ

[শ্রীনরেন্দ্র দেব]

(২)

নিম্নলিখিত কবিতাটি হাফেজের পুত্র-বিয়োগ-জনিত মর্ম্মোচ্ছ্বাস বলিয়া উল্লিখিত হয়—

একদা বুল্ বুল্ এক
হৃদয়ের রক্ত পান করি,
পেয়েছিল বক্ষে তার
ক্ষুদ্র এক গোলাপ মঞ্জরী !

* * *

কণ্টকে বিক্ষত বক্ষ,
সহসা উঠিল ঝঞ্ঝাবাত,
রক্তাক্ত হৃদয় হ'ল,
শতধা বিক্ষিপ্ত অকস্মাৎ।

* * *

মধু-লোভে ভৃঙ্গ-প্রাণ
হয়েছিল উল্লাসে আকুল ;
ঘূর্ণীবায়ু আচম্বিতে
বৃন্তচ্যুত করিল মুকুল !

* * *

রবি-শশী দৃষ্টি হতে
হৃদি-চন্দ্র আজি অন্তর্ধান
ধরার আঁধার গর্ভে
চিরতরে লভিয়াছে স্থান !

* * *

আশার অশনি হানি
ধ্বংসের করাল ক্রূর ক্রীড়া,
বিহ্বল করেছে মোরে
দিয়া প্রাণে নিদারুণ পীড়া !

* * *

জীবন করিয়া ক্ষীণ
সুখহীন বিষাদ বরণ,
অন্তিমের অন্ধকারে
মৃত্যু তারে করেছে হরণ !

সে যে গো নয়নমণি !
দরিদ্রের বুক-ভরা ধন !
স্মরণে জাগিবে সদা
যতদিন দেহে রবে মন !

* *

আজি আর সেও নাই
হত' যার বুকে বজ্রাঘাত—
কাতর হাফেজ একা
নীরবে করিছে অশ্রুপাত !

ইংরেজী সর্ব্ববৃত্তান্তাভিধান হইতে জানিতে পারা যায় যে, দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা সুলতান মামুদশা বাহমণি কর্তৃক কবিবর হাফেজ ভারতবর্ষে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। মামুদশা শিল্প ও সাহিত্যের একান্ত অনুরাগী ছিলেন। আরব ও পারস্যের বহু কবি তাঁহার রাজসভায় কবিতা আবৃত্তি করিয়া সহস্র-সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক ও বহু উপহার প্রাপ্ত হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। এই গুণ-গ্রাহী সুলতানের নিকটে হাফেজ আপনার কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিতে সম্মত হইয়াছিলেন। সুলতানের উজীর মীর ফজ্‌ল উল্লা আঞ্জু তাঁহাকে পাথেরস্বরূপ প্রচুর অর্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তদীয় প্রভুর দরবারে উপস্থিত হইবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়া পত্র দিয়াছিলেন। হাফেজ এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া ভারতা-ভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। লাহোরে উপস্থিত হইয়া হাফেজ তাঁহার এক পরিচিত বন্ধুর সাক্ষাৎ পাইলেন, এবং দস্যুতে উক্ত বন্ধুটির যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছে শুনিয়া, হাফেজের নিকট যাহা কিছু অর্থ ছিল, তিনি সে সমুদয় বন্ধুকে

অর্পণ করিয়াছিলেন। এইরূপে কপর্দ্দকশূন্য হইয়া অপরিচিত বিদেশে তিনি আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। কয়েকদিন পরে পারস্যের দুইজন বিখ্যাত বণিক ঐ পথে স্বদেশে ফিরিতেছিলেন। তাঁহারা হাফেজের সাক্ষাৎ পাইয়া এবং তাঁহার এরূপ অবস্থা অবগত হইয়া, তাঁহার স্বদেশে ফিরিবার সমুদায় ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। হাফেজ তাঁহাদের সহিত পারস্যোপসাগরের বন্দরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, দাক্ষিণাত্যের সুলতানের প্রেরিত জাহাজ তাঁহার জন্য সেখানে বহুদিন হইতে অপেক্ষা করিতেছে। তখন হাফেজ উক্ত জাহাজে আরোহণ করিয়া পুনরায় ভারত যাত্রা করিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে প্রবল ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া সমুদ্রের আকৃতি এরূপ ভীষণ হইয়া উঠিল যে, হাফেজ তদ্দর্শনে ভীত হইয়া দাক্ষিণাত্য গমনের সকল আশা পরিত্যাগ করিলেন; এবং সমুদ্র প্রকৃতিস্থ হইবার পর, সর্ব্বপ্রথম বন্দরেই তিনি জাহাজ হইতে নামিয়া গেলেন। পরে জাহাজের একজন সহযাত্রীর দ্বারা উজীর মীর ফজল্ উল্লাকে নিম্নলিখিত কবিতাটি রচনা করিয়া পাঠাইয়া দিলেন—

"ধরার ঐশ্বর্য্য আশে
অসহ্য মৃত্যুর ফাঁসে
মুহূর্ত্তও কোরো না যাপন;
এক পাত্র সুরা লয়ে
দাও বেচে বিনিময়ে
ধার্ম্মিকের ছদ্ম আবরণ।
রাজ-মুকুটের দান
দিগ্‌দেশে যশমান
লুব্ধ করে অনেকের মন;
কিন্তু হেন লোভে তবু
যোগ্য নহে বন্ধু, কভু
অপঘাতে হারান জীবন!
বাড়িতে লোভের মাত্রা,
হাফেজ সমুদ্র-যাত্রা
ভাবে নাই কঠিন তেমন!
দগ্ধ আজি তাই ক্ষোভে;
শত জহরত লোভে—
কেহ যেন করে না এমন।

এই কবিতাটী প্রাপ্ত হইয়া মীর ফজল্ উল্লা সুলতানকে ইহা দেখাইয়াছিলেন এবং হাফেজের পথের বিঘ্ন প্রভৃতি বর্ণনা করিয়াছিলেন। সুলতান কবির এই আসিবার উদ্যম ও চেষ্টার জন্য মাশাদের মোল্লা মহম্মদ কাশিমের দ্বারা তাঁহাকে আরও সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রেরণ করিয়াছিলেন।

১৩৯ খৃঃ অব্দে মেবারীজ উদ্দীনের পুত্র শা'সুজা পিতাকে অন্ধ করিয়া স্বয়ং সিরাজের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। এই শা'সুজা হাফেজের অসাধারণ কবিত্ব-শক্তির জন্য হিংসাপরবশ হইয়া কবির বিরুদ্ধে নিজ হৃদয়ে বিজাতীয় বিদ্বেষ পোষণ করিতেন। একদা হাফেজের রচিত কোন একটী কবিতায় ভবিষ্যতের প্রতি কবির অনাস্থা-প্রকাশ দেখিয়া, শা'সুজা সিরাজের প্রধান উল্মার নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে নাস্তিকতার অভিযোগ উপস্থাপন করিয়াছিলেন। হাফেজ সুলতানের এই দুরভিসন্ধি জানিতে পারিয়া, উক্ত কবিতাটির সহিত—যেন উহা কোন খৃষ্টানের উক্তি, এই মর্ম্মে—আরও দুই ছত্র নূতন কবিতা যোগ করিয়া দিয়াছিলেন; এবং এই উপায়ে সে যাত্রা প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। কবিতাটি ছিল এই:—

আজি এ দিবস নিশি,
হায়, যবে হইবে অতীত,—
সত্য যদি জানিতাম
কল্য এক আসিবে নিশ্চিত! ইত্যাদি

হাফেজ ইহার পুরোভাগে সংযোগ করিয়া দিয়াছিলেন—

প্রভাতে খৃষ্টান এক
পানামোদে হারায়ে সম্বিত্,
শুনিলাম, গাহিতেছে,
সুরালয়ে মধুর সঙ্গীত!—

এই শা'সুজার মন্ত্রী খাজা কীবামুদ্দীন হাফেজের একজন প্রধান ভক্ত ছিলেন। উচ্চশিক্ষার সৌকর্য্যার্থ খাজা কীবামুদ্দীন বহু অর্থব্যয়ে একটী বৃহৎ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন; এবং হাফেজকে উক্ত বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম ও ব্যবহার-শাস্ত্রের অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই সহৃদয়, দেশভক্ত ও বিদ্যানুরাগী সচীবের সহানুভূতি ও বদান্যতায় হাফেজ অশেষ প্রকারে উপকৃত হইয়াছিলেন।

বাঙ্গালার নবাব গিয়াসুদ্দীন পূরবী একবার হাফেজকে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। বহু প্রলোভন

সত্ত্বেও হাফেজ সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নাই; তবে নবাবের অনুরোধে গিয়াসুদ্দীনের রচিত একটী অসম্পূর্ণ কবিতা সম্পূর্ণ করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। উক্ত কবিতাটির সম্বন্ধে এই-রূপ একটী সুন্দর গল্প আছে যে, নবাব গিয়াসুদ্দীন বঙ্গদেশ অধিকার করিবার পর কঠিন চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হন; এবং এই রোগ এতদূর সঙ্কটাপন্ন হয় যে, চিকিৎসকগণ তাঁহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করেন। এই সময়ে তাঁহার হারেমের 'গুল্' 'সব্জী' ও 'লালা' নাম্নী তিনজন সুন্দরী পরিচারিকা অতি যত্নের সহিত নবাবের শুশ্রূষা করিতে-ছিল। দেবানুগ্রহে নবাব সেবার আরোগ্য হইয়া উঠিলেন, এবং উক্ত পরিচারিকাত্রয়কে তদীয় বেগমের পদে অধিষ্ঠিত করিয়া, আশাতীতভাবে পুরস্কৃত ও সম্মানিত করিলেন। হারেমের অপরাপর সুন্দরীগণ তাহাদের এই পরম সৌভাগ্য দর্শনে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া, তাহাদিগকে "ঘুসালা" বা গোশল-কারিণী বেগম বলিয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিল। তাহারা তিন-জনে এই ব্যাপার নবাবের কর্ণগোচর করিল। নবাব ইহা শুনিয়া নিম্নলিখিত কবিতার প্রথম চরণটি মুখে-মুখে রচনা করিলেন:—

"গুল্ সব্জী লালার কথা শোন্ লো তবে সাকী।"

কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও তিনি কবিতাটির পাদ-পূরণ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি উহা সম্পূর্ণ করিয়া দিবার জন্য তাঁহার সভা-কবিগণের এবং তৎকালীন দেশের অন্যান্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিগণের উপর ভার দিলেন; কিন্তু কাহারও রচনাই তাঁহার মনোমত হইল না। তখন সকলে মিলিয়া নবাবকে পরামর্শ দিল যে, পারস্যের সুবিখ্যাত কবি হাফেজের নিকটে উহা প্রেরিত হউক। তদনুসারে নবাব বহু উপঢৌকনের সহিত উক্ত কবিতাটি সম্পূর্ণ করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া হাফেজকে এক নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠাইলেন। হাফেজ নবাবের ঐ এক ছত্র কবিতাটি এক রাত্রেই সম্পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। উক্ত কবিতাটিতে তিনি ভারতের তৎকালীন মুসলমান কবিগণের প্রতি কঠোর বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিয়াছিলেন—

"'গুল' 'সব্জী' 'লালার' কথা শোন্ লো তবে সাকী!
তিন 'ঘুসালা'র সঙ্গে সবারই বাধ্‌ছে বিবাদ না কি?
রাজবাগানের দখিন হাওয়া (১) নিত্য নিশি শেষে—
এই তিনটি ফুলের বুকে ঘুমিয়ে পড়ে হেসে!

* * * *

তিনটি মাত্র সুরাপাত্র (২) সর্ব্ব গ্লানি হরে,
পেশাদার ঐ দালালগুলো বৃথাই ভেবে মরে! (৩)
হিন্দুস্থানের টিয়ায় (৪) দাল মিছ্‌রি খেতে চায়!
ফার্সী দেশের শর্করা (৫) তাই বাংলা দেশে যায়;

* * * *

কবির কাছে কতই সোজা বিদেশ যাওয়া কাজ,
চল্‌লো শিশু একটি রাতের (৬) বছর পথে আজ!

'রাইজা কুলি' বলেন, হাফেজ কোরাণের একখানি ব্যাখ্যা-পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সুলেমান্ সাভেজী নামক জনৈক হাফেজ-ভক্ত কবির রচিত কতকগুলি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কবিতা হাফেজেরই রচনা বলিয়া অনেকের ভ্রান্তি উৎপাদন করিত! হাফেজের রচিত একটী কবিতার এক স্থানে আছে—

"হে রূপসী! সিরাজের সৌন্দর্য্য-গরিমা—!
দাও যদি হাফেজেরে ফিরায়ে হৃদয়
তব কপোলের ওই কৃষ্ণ তিল লাগি—
বুখারা সামারখন্দ্ দিবে সে নিশ্চয়—!"

'দৌলৎসা' বলেন, ইরাক্ ও পারস্যের অধিপতি শা মনসুরকে হত্যা করিয়া দিগ্বিজয়ী তৈমুর লঙ্ যখন পারস্য অধিকার করেন, তখন তিনি হাফেজকে বন্দী করিয়া আনিতে আদেশ দেন। হাফেজ বন্দী হইয়া তাঁহার সম্মুখে আনীত হইলে, তিনি হাফেজকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, "ওহে কবি! যে সামারখান্দ্ ও বুখারা আমার জন্ম-স্থান ও আবাসভূমি, যাহার সমৃদ্ধির জন্য আমি মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া, তীক্ষ্ণ-অসি অগ্রে পৃথিবীর চতুর্দ্দিক বিদীর্ণ করিয়া আসিয়াছি—কত দেশ, কত রাজ্য, কত নগর ধ্বংস করিয়াছি,

(১) নবাব গিয়াসুদ্দীন।
(২) গুল, সব্জী, ও লালা।
(৩) গিয়াসুদ্দীনের আহুত কবিগণ।
(৪) কবিতা।
(৫) কবিগণ (যারা শেখা বুলিই) আওড়ায়!
(৬) হাফেজের একরাত্রে রচিত কবিতাটি!

—আমার সেই বড় সাধের সামারখন্দ্ ও বুখারা তুমি না কি তোমার কোন্ প্রেয়সীর গণ্ডের একটী কৃষ্ণ তিলের বিনিময়ে দান করিতে চাহিয়াছ?" ভূমি চুম্বন করিয়া রাজকীয় সম্ভ্রমের সহিত কুর্ণীশান্তে হাফেজ উত্তর দিয়াছিলেন, "হে মুল্কে—জামানিয়া! এই অসম-সাহসিক দানের জন্যই যে আজ এই পথের কাঙ্গাল হাফেজ আপনার মত একজন ভুবনবিদিত মহাবীরের দর্শনরূপ অতুল সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পেরেছে!" তৈমুর লঙ্ হাফেজের এই উক্তি শুনিয়া এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে শাস্তির পরিবর্ত্তে প্রচুর পুরস্কারসহ মুক্তি দিয়াছিলেন। কথিত আছে, কোনও ঈর্ষ্যাপরায়ণ সমসাময়িক কবি হাফেজের অনিষ্টকল্পে সুলতানের নিকট উক্ত কবিতাটি তাঁহার স্পর্দ্ধার নিদর্শনস্বরূপ উল্লেখ করিয়াছিলেন। কিন্তু হাফেজের উপস্থিত-বুদ্ধি ও সরস উত্তর তাঁহাকে সে বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিল।

মীরজা মেদি খাঁ বলেন যে, 'তাউরীর' বিরুদ্ধে অভিযান করিবার পূর্ব্বে নাদির শা হাফেজের 'দেওয়াণ' হইতে তাঁহার সঙ্কল্প স্থির করিয়াছিলেন। পুস্তকের যে কোনও এক স্থান খুলিয়া, প্রথম পৃষ্ঠার ৭টী ছত্র পরিত্যাগ করিয়া, তাহার পর যাহা লেখা আছে তদনুযায়ী কার্য্য করিবেন—এই স্থির করিয়া তিনি যে শ্লোকটী পাইয়াছিলেন, সেটি তাঁহার নিকট অতীব শুভলক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল; এবং তদনুসারে কার্য্য করিয়া তিনি সেবার কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন।

সে শ্লোকটি এই—

"হাফেজ! তোমার এই মধুর কবিতাবলি দিয়া
ইরাক্ পারস্য আজি অবহেলে লয়েছ জিনিয়া;
চল অগ্রসর হয়ে, এইবার জিনিবে "বোগ্দাদ"
স্বর্গীয় সঙ্গীত ঢালি 'তাব্রিজে'র মিঠাইবে সাধ!"

হাফেজের আধ্যাত্মিক জীবন-পথে প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে একটী জনশ্রুতি আছে যে, হাফেজ কবর-ক্ষেত্রে দীপ-দানের কার্য্য করিতেন। একদা সায়াহ্নে প্রদীপ-হস্তে হাফেজ সমাধি-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, শুভ্রবসন-পরিহিত, শ্বেতশ্মশ্রু দুইজন পবিত্র-মূর্ত্তি বৃদ্ধ আরেফ্ (যোগী) তথায় মুদিত নেত্রে ধ্যানস্থ রহিয়াছেন। তাঁহাদের মুখমণ্ডলে একটা স্বর্গীয় দীপ্তি প্রতিভাত! এই দুই দেব-মূর্ত্তি দর্শনে হাফেজের সমস্ত দেহ-মন কি এক অননুভূতপূর্ব্ব, অনির্ব্বচনীয় ভাবের আবেশে বিভোর হইয়া উঠিল! হাফেজের মনে হইল, যেন সেদিন ইঁহাদের উপস্থিতিতে সমস্ত সমাধিক্ষেত্রে একটা নিবিড় পবিত্রতা বিরাজ করিতেছে! দেখিতে-দেখিতে যেন কি এক হিরণ্ময় দিব্য জ্যোতিঃতে, কি এক স্নিগ্ধোজ্জ্বল অলৌকিক সৌন্দর্য্য-ধারায় সমস্ত সমাধি-ভূমি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; একটা অসহ বিপুল আনন্দপ্রবাহ যেন হাফেজের সমস্ত অস্তিত্ব ভাসাইয়া লইয়া গেল! আত্মহারা হাফেজ যেন কোনও ঐশী প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া, ধীরে-ধীরে সেই আরেফ্-যুগলের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন এবং নিমীলিত নয়নে ধ্যানস্থ হইলেন। ধ্যান-যোগে তিনি সেদিন যে পরম সত্যের সন্ধান পাইলেন, যে অনন্তকালের, অনাদিযুগের, অনিত্য সুন্দরের সাক্ষাৎ লাভ করিলেন, সেই একান্ত প্রিয়তমের জন্য সেইদিন হইতে হাফেজ পাগল হইয়া উঠিলেন! হাফেজের উদ্বেলিত হৃদয় সেদিন নবীন সুরে বিশ্বজগৎকে বিস্মিত করিয়া গাহিয়া উঠিল,—

"কুটীরাঙ্গনে কুঞ্জকাননে বিকচ কুসুমরাশি—
সৌরভহীন—বৃথা নিশি-দিন খুঁজিয়ো না সেথা হাসি!
কাঁদ বুল্‌বুল্—কাঁদিতে এসেছ, রোদনের এ যে ঠাঁই—
ফিরে এস ঘরে—খুঁজিছ যাহারে, সে জন বাহিরে নাই!"

হাফেজের অন্তরে-অন্তরে সেদিন যে নবোদ্বোধিত প্রেমের গম্ভীর ঝঙ্কার উঠিয়াছিল, জীবনের শেষ-দিন পর্য্যন্ত তিনি সেই সুমহান রাগিণীই নব-নব ছন্দে, নব-নব ভাবে গাহিয়া গিয়াছেন! কখনও বসন্তের মারুত-হিল্লোলে উৎফুল্ল হইয়া মুগ্ধ কবি তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

হে মলয়! বসন্তের মৃদুল অনিল!
আজি তব বিকম্পিত সঘন হিল্লোল
বহিয়া আনিছে যেন নিঃশ্বাস তাহার,
তাহারই সুরভিশ্বাসে সুবাসিত তুমি—"

কখনও সদ্যস্ফুট গোলাপের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ কবি তাঁহার প্রিয়তমের সহিত গোলাপের তুলনা করিয়া বলিয়াছেন—

"ও গোলাপ! এই রূপে এত অহঙ্কার?
আমার প্রিয়ার রূপে ও রূপ তো ছার!
কঠিন কণ্টক জালে পরিপূর্ণ তুই—
আমার প্রিয়ার প্রেমে আনন্দ শুধুই!"

শারদ-কৌমুদী স্নাত নিশীথে শত-বিকশিত সুবাসিত

কুসুম-বিতানে বসিয়া কবি তাঁহার আরাধ্যা মানস-প্রতিমাকে বলিতেছেন—

"গো পিয়ারী! জ্বালি নাই কোন দীপ আজ
মোদের এ নিভৃত মিলন-কুঞ্জ মাঝ!
জ্যোছনা ছড়ায়ে তব আঁখি-তারা কালো
সকল ভুবন মোর করিয়াছে আলো।
চাহে না সুরভি-গন্ধ মকরন্দ কেহ—
তোমার কুণ্ডলবাসে আমোদিত গেহ!"

এই একনিষ্ঠ সাধক কবি কখনও তাঁহার পরম আকাঙ্ক্ষিতের সহিত যোগসাধ্য মিলনানন্দে বিহ্বল হইয়া গাহিয়াছেন—

"তোমার প্রতি আমার প্রেম
আমার দেহ মনের টান!
তোমার অগাধ ভালবাসায়
উচ্ছ্বসিত আমার গান!
মাতৃস্তন্যে সিক্ত প্রাণে
তোমার প্রেমের পীযুষধারা,
সে প্রেম যাবে যে দিন, হবে
দেহ আমার জীবনহারা!"

কখনও বা বিরহে কাতর হইয়া বলিয়াছেন—

"মধু ঋতু আসিয়াছে ফুটিয়াছে ফুল;
আমার চৌদিকে আজ গাহে বুল্‌বুল্‌!
এখন লুকায়ে তুমি রয়েছ কোথায়?
বসন্ত উৎসব-নিশি বৃথা বহে যায়!
তোমার বিচ্ছেদে আছি হয়ে অচেতন,
তবুও কি বলে' সখা, কঠিন এমন!"

কখনও বা হতাশ হইয়া বলিয়াছেন—দেখা যখন আর দিলে না, তবে শোন—

"যদি কভু ওই চারু চরণ তোমার
স্পর্শ করে হাফেজের কবর-মৃত্তিকা
চুমিতে ও পাদপদ্ম হইবে বাহির
সমাধি গহ্বর হতে মস্তক তাহার!"

কখনও বা অভিমান করিয়া বলিয়াছেন—

"(ওগো!) সাম্‌লে এস আঁচলখানি তব
রক্ত-রাঙা পথের কাদা হতে—
আস্‌বে তুমি যে দিন আমার কাছে!
(কারণ) ঐ পথে সে তোমায় আসার আশে
রুধিরাক্ত ছিন্ন জীবন কত
আমার মত নিত্য পড়ে আছে!"

হাফেজের কবিতার অধিকাংশ উক্তিই রূপক। উহার নানাস্থানে সুরা, সুরাদাতা, সুরালয়, পানপাত্র, অগ্নি, উপাসক, প্রতিমা, মন্দির, বসন্ত, নিকুঞ্জ, উদ্যান, বুল্‌বুল্‌, গোলাপ, ঈদ্‌রোজা, প্রভৃতি শব্দের পুনঃপুনঃ উল্লেখ আছে। অধ্যাত্মতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, ঐ সকল শব্দ কবির দ্ব্যর্থ প্রয়োগ! অর্থাৎ, সুরা অর্থে ভগবৎ প্রেম; সুরাদাতা কে? না, গুরু বা ধর্ম্মোপদেষ্টা; সুরালয় অর্থে ভক্তবৃন্দের মিলন-নিকেতন; পানপাত্র হইতেছে প্রেমিকের হৃদয়; অগ্নি উপাসক হইল প্রেমোৎসাহী সাধক; নিকুঞ্জ ও উদ্যান অর্থে প্রেমিক ও ভক্ত-মণ্ডলী; বুল্‌বুল্‌ কে, না, যিনি প্রেমতত্ত্ববাদী; গোলাপ কি না পবিত্র আত্মা—ইত্যাদি সাধু অর্থ বুঝিতে হইবে; যথা—

"উঠ, ওগো সুরাদাতা! সুরাপাত্র দাও;
মন-বেদনার শিরে ঢাল যত ধূলি।
দাও যদি পানপাত্র মম করতলে
ত্যজিব এ ছদ্মবেশ—বৈরাগ্যের ঝুলি!
নাহি চাহি যশ-মান, কিবা কাজ তায়?
করুক দুর্নাম মম যত জ্ঞানী জনে!
সুরা দাও, সুরা দাও, আর কতদিন
গর্ব্ববায়ু দিবে ধূলি মলিন জীবনে!
আমার এ মত্ত মন পারে বুঝিবারে;
ওগো হেথা নাহি কেহ মর্ম্মজ্ঞ এমন—
মাত্র নিত্য নিরঞ্জনে চিত্ত সুখী হয়।
কিন্তু সে আমার চিত্ত করেছে হরণ!
গোলাপ বুল্‌বুল আছে, কোন চিন্তা নাই।
সুরাপানে সুখে থাক, দিন কেটে যাবে।
হাফেজ অধীর কেন, ধৈর্য্যধর ভাই—
পরিণামে একদিন আশা পূর্ণ হবে!"

আমাদের দেশে যেমন কৃত্তিবাস তাঁহার রামায়ণে, কাশীরাম দাস তাঁহার মহাভারতে, এবং বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি—তাঁহাদের পদাবলীগুলির শেষ চরণে স্ব-স্ব নাম সংযুক্ত করিয়া গিয়াছেন, সেইরূপ হাফেজও তাঁহার প্রত্যেক গজলের শেষ দুই পংক্তির

মধ্যে কোথাও না কোথাও তাঁহার নাম সন্নিবিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। স্যাদীর যুগে ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কালে কবিতার যে কোনও স্থলে কবি তাঁহার নিজের নাম দিতে পারিতেন; কিন্তু হাফেজের ও তাঁহার পরবর্ত্তী যুগে কবিতার সর্ব্বশেষ অংশেই কবির নাম দেওয়া প্রচলিত হইয়া গিয়াছে—যেমন পূর্ব্বোদ্ধৃত কবিতাটিতে রহিয়াছে।

হাফেজের অসংখ্য প্রেমপূর্ণ কবিতার সমস্তই যে শ্রীভগবানের উদ্দেশে রচিত, তাহা নহে;—তিনি তাঁহার প্রণয়িনীর উদ্দেশেও বহু কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। একদিন তিনি তাহার প্রণয়িনীর কণ্ঠে স্বরচিত একটী সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন—

"ওই তব অপরূপ গীতমাঝে সখি—
আপনারে লুকাবারে পারিতাম যদি—
প্রত্যেক নিঃশ্বাসে তব চারু ওষ্ঠ দুটি
প্রেমানন্দে চুমিতাম প্রিয়ে নিরবধি!—"

প্রেমিকের হৃদয়ের অন্তঃস্তলে নিত্য যে অসংখ্য বাসনা জাগ্রত হয়, হাফেজ দু-এক ছত্রে অদ্ভুত কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিয়া, তাহা সুস্পষ্ট, সম্পূর্ণ ও সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করিতে পারিতেন। একদা তিনি প্রিয়তমার আগুলফ-লম্বিত, আলুলায়িত, কৃষ্ণ কুন্তলভার দর্শনে মুগ্ধ হৃদয়ে বলিয়াছিলেন—

"তব কৃষ্ণ কেশপাশে ডুবি
দিন মোর রাত হয়ে যায়—
ওষ্ঠের বেষ্টনী মাঝে পড়ি—
আত্মা মম প্রার্থনা হারায়!—"

প্রণয়িনীর প্রত্যেক রূপ-বর্ণনার সহিত হাফেজ একটা অপার্থিবতার যোগ-সাধন করিয়া, সেগুলিকে সম্পূর্ণভাবে এ জগতের হইতে দেন নাই!—হাফেজের নিপুণ হস্তে বাসনার ফেনিলোচ্ছাস, কামগন্ধশূন্য ও লালসাবর্জ্জিত হইয়া উজ্জ্বল শুভ্র পবিত্রতায় মণ্ডিত ও মহিমান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার প্রধান কারণ এই যে, হাফেজ নিজে নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিতেন যে, একমাত্র প্রেমই মানুষকে স্বর্গের পথে টানিয়া তুলিতে সমর্থ। একটী কবিতায় তিনি তাঁহার প্রেয়সীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

"আরেফ্ বা দরবেশের যাহা নাই প্রিয়ে!
সে বীজ নিহিত আছে প্রেমিক হৃদয়ে—
প্রেম বহে আনে প্রাণে ত্যাগের সন্দেশ,
পারে না আনিতে যাহা তন্ত্র-মন্ত্র বেশ!"

এই বিশ্বাসের জোরেই তিনি ভগবানকে তাঁহার প্রণয়িনীর দাস ও বেহেস্তকে তাঁহার প্রেমের বিলাস-ক্ষেত্র বলিতে বিন্দুমাত্রও সঙ্কোচ বা দ্বিধা বোধ করেন নাই—! জগতের ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রত্যেক সৌন্দর্য্যের মধ্যে তিনি সেই পরম সুন্দরের সত্ত্বা অনুভব করিতেন! প্রেমের ছায়ার অন্তরালে তিনি বিশ্বরূপ প্রত্যক্ষ করিতেন! তাই বোধ হয় সেদিন এই ভাববিহ্বল কবি তাঁহার অনুচরবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—

"আজি এ উৎসব রাতে জ্বালিও না দীপ;
প্রেয়সীর চারু গণ্ডে উদিত চন্দ্রমা!
ছড়ায়ো না পুষ্পগন্ধ সুবাস অলীক,
প্রিয়ার কুন্তল-গন্ধে আমোদিত দিক!"

ইসলাম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাত্মা হজরত মহম্মদের প্রতি হাফেজের প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। এই মহাপুরুষের উদ্দেশে তিনি অসংখ্য শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিয়া গিয়াছেন। আমরা তাহারই একটী পাঠকগণের জন্য নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

"সখার স্বদেশ হ'তে সেই সুবিখ্যাত দূত—
এসেছেন যিনি তাঁর সুগন্ধ-পত্রিকা সনে
সঞ্জীবনী ঔষধ বাহিয়া;
সখার সৌন্দর্য্য আর মহত্ত্বের নিদর্শন
প্রতাপ ও গৌরবের সুন্দর কাহিনী যিনি
গিয়াছেন জগতে গাহিয়া,—
উৎসর্গ করেছি তাঁর চরণে পরাণ মোর
সুসংবাদ লাভ হেতু; কিন্তু গো লজ্জিত অতি—
হেন তুচ্ছ বস্তু তাঁরে দিয়া—!
ধন্য তুমি জগদীশ! অনুকূল ভাগ্যবশে
কৃপায় দিয়াছ করি বাসনার অনুরূপ—
আমার সখার যত ক্রিয়া—!
বিপদের ঝঞ্ঝা যদি স্বর্গ-মর্ত্ত্য ছিন্ন করে
তথাপি রহিব আমি সখার উদ্দেশে বসি
আশাপথে নীরবে চাহিয়া—!
সখার চরণ স্পর্শে—ভাগ্যবান সেই ধূলি
ওগো প্রাতঃসমীরণ নয়ন অঞ্জন হেতু—

আমারে তা দিবে কি আনিয়া ?
হে দূত ! স্বাগত তুমি ! দাও অনুরাগী জনে
সখার সংবাদ যত ; শুনিয়া চরণে তাঁর
দিব প্রাণ হর্ষে নিবেদিয়া !
হাফেজের প্রাণবধে হ'ক্ শত্রু সমুদ্যত
আমি ত' লজ্জিত নহি আমার সখার কাছে—
ভীত হব কিসের লাগিয়া ?"

সার্ উইলিয়াম জোন্স (Sir William Jones) বলেন, হাফেজের রচনার বিশেষত্ব বুঝাইবার জন্য তাঁহার কোনও একটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবিতা বাছিয়া লইয়া উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা অতীব দুরূহ ব্যাপার ! তাঁহার গ্রন্থের যে কোনও অংশ খুলিয়া, যে কোনও একটী কবিতার দুই-এক ছত্র দেখাইয়া দেওয়াই সুবুদ্ধির কার্য্য। কারণ, অসংখ্য প্রফুল্ল গোলাপ-কুঞ্জের মধ্যে কোন্‌টি যে শ্রেষ্ঠ কুসুম, তাহা নির্ণয় করিয়া উঠা একপ্রকার অসম্ভব কার্য্য।

পারস্য-রমণীগণের আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি সম্বন্ধে একখানি পুস্তক আছে ; তাহার নাম—"কিতাব-ই-কুল্‌সুম নানে"। বিবি লুইসা ষ্টুয়ার্ট কষ্টেলো তাঁহার "পারস্যের গোলাপকুঞ্জ"—(Rose-garden of Persia) নামক পুস্তকে উক্ত কিতাব-ই-কুল্‌সুম-নানে হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, পারস্যের মহিলাবৃন্দ নৃত্য-গীতাদি সুকুমার-কলায় শিক্ষালাভ ব্যতীত সাহিত্য-চর্চ্চাও করিতেন। এবং তাঁহারা কাব্য-রসেরই সমধিক পক্ষপাতিনী ছিলেন। বিশেষতঃ, হাফেজের কবিতাবলী তাঁহারা সকলেই কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন। একটা কিছু বাদ্যযন্ত্র তাঁহাদের শিক্ষা করিতেই হইত ; এবং আর কিছু জানুন আর নাই জানুন, —হাফেজের গীতি-কবিতা গোটাকয়েক তাঁহাদের কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেই হইত ; নতুবা তাঁহাদের ভদ্রসমাজে খাতির হইত না।—আজিও ভারতবর্ষের নানাস্থানের প্রসিদ্ধ গায়ক-গায়িকারা যে সকল গজল গাহিয়া থাকেন, তাহার অধিকাংশই পারস্য-কবি হাফেজের বিরচিত। কালের সর্ব্বগ্রাসী রসনা আজিও হাফেজের অমর রচনাবলী বিলুপ্ত করিতে পারে নাই। তাঁহার রচনার এই অমরত্ব সম্বন্ধে শক্তিশালী কবি বহুপূর্ব্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার কিতাবের এক স্থানে আছে—

"সঞ্জীবিত প্রেমে চিত্ত যার
মৃত্যু নাই তার—
অনিত্য এ বিশ্বে মোর
অমরত্ব হয়েছে প্রচার !"

এমার্সন (Emerson) সাহেব বলেন, তদানীন্তন জগতের কবিগণের মধ্যে হাফেজকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া যায়। তাঁহার অসাধারণ কবিত্ব-শক্তির সহিত Pindar, Horace, Anacreon ও Burns-এর কিছু-কিছু মাত্র তুলনা দেওয়া যাইতে পারে।

হাফেজের কবিতাগুলির প্রকৃত ভাব লইয়া পাশ্চাত্য-জগতে চিরকাল দ্বন্দ্ব চলিয়াছে। একদল পণ্ডিত বলেন, "উহা কেবল জড়বাদ ও ইন্দ্রিয়-ভোগ প্রচার করিয়াছে।" অন্য দল বলেন, "উহা স্বর্গীয় রহস্যময় এবং অধ্যাত্ম-তত্ত্বে পরিপূর্ণ !" ঠিক এই বিবাদই হাফেজের জীবিতকালে পারস্যকেও দুই দলে বিভক্ত করিয়া দিয়াছিল। এমন কি, তাঁহার মৃত্যুর পর, সিরাজের উল্মা সাহেব (যিনি হাফেজের কবিতাবলী অপবিত্র মনে করিতেন) তাঁহার শবদেহের উপর অন্তিম উপাসনা পর্য্যন্ত করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন। এক দিকে হাফেজের অনুরাগীরা তাঁহাকে পারস্যের বিখ্যাত কবর-ক্ষেত্রে সমাহিত করিতে উদ্যত ; অন্যদিকে তাঁহার বিপক্ষীয়েরা হাফেজকে সাধারণ কবর-ভূমিতে পর্য্যন্ত স্থান দিতে প্রস্তুত নন ;—উভয় দলে এমন ঘোর বিরোধ উপস্থিত ! এস্থলে কি করা কর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া, অবশেষে সর্ব্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হইল যে, হাফেজের রচনার যে-কোনও এক স্থান উন্মোচন করিয়া দেখা যাউক, সেস্থলে কি লিখিত হইয়াছে। হাফেজ অপবিত্র কি পবিত্র, শুচি কি অশুচি, অশুদ্ধ কি বিশুদ্ধ, তাহা হইতেই স্থির হইবে। অতঃপর, তদনুসারে হাফেজের রচনার যে-কোন এক স্থান উন্মুক্ত করিয়া দেখা হইল যে, সে স্থলেও কবি লিখিয়াছেন—

"আজি আর হাফেজের শবাধার হতে
চরণ তোমার, বন্ধু ! লইও না তুলি ;
যদিও সে ঘোর পাপে ছিল নিমগন,
তবু জেনো, স্বর্গপুরে গিয়াছে সে চলি !

গোলাপের কুঞ্জ হতে ভেসে আসে ওই—
ত্রিদিবের সুরভিত মৃদু মন্দানিল;
আমি আর সুরা আজি আমরা দুজন,
প্রেমাস্পদ প্রেমময়ী প্রণয়ী সমান!
হে ভিক্ষুক! গর্ব্ব কেন করিছ না আজ
দিগন্ত-বিস্তৃত তব নব সাম্রাজ্যের?
শিরে যার নীলাম্বর রাজচন্দ্রাতপ,
পুষ্পিত শ্যামল ধরা যার সিংহাসন;
অনন্ত বসন্ত যার ঐশ্বর্য্য-মহিমা,
তার সম ভাগ্যবান আছে বল কেবা?

* * *

পাপ যদি হয়ে থাকে—ক্ষমা যার নাই,
তবু এই অভাজনে করিও না ঘৃণা;
কে জানে কি অলক্ষিতে লিখেছে নিয়তি—
সুরামত্ত হাফেজের অদৃষ্ট-বিধান!

এই রচনা পাঠ করিয়া হাফেজের অসংখ্য ভক্ত বন্ধুগণ জয়োল্লাস করিয়া তাঁহার শবাধার লইয়া চলিলেন; এবং বিপক্ষপক্ষেরও সমবেত সম্ভ্রান্ত সজ্জন সকলেই কবর-ভূমি পর্য্যন্ত এই মহাকবির মৃতদেহের অনুসরণ করিলেন।

হাফেজের মৃত্যুকালের কোনও সঠিক নির্দ্দিষ্ট তারিখ পাওয়া যায় নাই। সকল গ্রন্থকারই বিভিন্ন তারিখের উল্লেখ করিয়াছেন। 'বিথ্‌নেল্‌' সাহেবের প্রদত্ত তারিখই বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া আমাদের মনে হয়, কারণ, তিনি হাফেজের সমাধি-গাত্রের খোদিত প্রস্তর-লিপি হইতে তুলিয়া দিয়াছেন—১৩৮৮ খৃঃ অব্দে হাফেজ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। (Bicknell's selections; pp. 227)

সিরাজের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে, সহর হইতে দুই মাইল দূরে মুসল্লা নামক একটী কুসুমতরু সমাকীর্ণ কবর-ভূমিতে হাফেজের স্বহস্ত রোপিত একটী 'সাইপ্রাস (৭) বৃক্ষের তলদেশে মহাকবির পাঞ্চভৌতিক দেহ সমাহিত হইয়াছে। হাফেজের এই সমাধি-ক্ষেত্রকে কবিরা "হাফেজিয়া" নামে অভিহিত করেন। উহা এক্ষণে মুসলমানগণের একটী তীর্থ-স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। নানা স্থান হইতে যাত্রীরা উহা দর্শন করিতে আসেন।

১৪৫২ খৃঃ অব্দে সুলতান আবুল কাশেম বাবরের উজীর মৌলানা মহম্মদ মোয়াম্মাই হাফেজের কবরের উপর একটী মনোরম স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। (৮)

(৭) চির হরিৎবর্ণ বৃক্ষ বিশেষ মুসলমানগণের শোকসূচক চিহ্ন।

(৮) Leut Col. H. Wilberforce Clarke R. E. "The Life of Hafiz" অবলম্বনে প্রধানতঃ এই প্রবন্ধ রচিত। ইনি ইংলণ্ড ও আয়র্লণ্ডের এসিয়াটিক সোসাইটির ও বঙ্গদেশের এসিয়াটিক সোসাইটীর সভ্য ছিলেন। ইনি পারস্য-সাহিত্যে সুপণ্ডিত। "Persian Manuel" নামে ইঁহার রচিত পারস্য-ভাষা শিক্ষার উপযোগী একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক আছে। ইনি সর্ব্বপ্রথমে সেখ সাদীর "বস্তান' ও নিজামীর "সেকেন্দারনামা" প্রভৃতি অনেকগুলি অমূল্য পারস্য গ্রন্থ মূল পারস্য হইতে অনুবাদ করিয়াছিলেন।

স্বর্গীয় কবি গোবিন্দচন্দ্র

[শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়]

দুঃখ-দারিদ্র্যের দাবানলে দহিতে দহিতে যে কবি কাতরকণ্ঠে একদিন বাঙ্গালীকে বলিয়াছিলেন—

"ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মর্লে—
তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ?
আজ যে আমি উপোস্ করি, না খেয়ে শুকিয়ে মরি,
হাহাকারে দিবানিশি ক্ষুধায় করি ছট্‌ফট;
ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মর্লে, তোমরা আমার
চিতায় দিবে মঠ?"

সেই কবি—ভাওয়ালের গৌরব সেই গোবিন্দচন্দ্র দাস মৃত্যুময় পৃথিবীতে আর নাই। দুইমাসাধিক কাল গত হইল, মৃত্যু আসিয়া তাঁহাকে সংসারের সকল জ্বালা—সকল যন্ত্রণার হস্ত হইতে মুক্ত করিয়াছে। তাঁহার বিয়োগে বঙ্গ-সাহিত্যের ক্ষতি হইল বটে, কিন্তু তিনি এখন জুড়াইয়া বাঁচিলেন।

কবির ভাগ্যে দুঃখ-ভোগ এ দেশে অবশ্য নূতন ঘটনা নহে। মধুসূদন ও হেমচন্দ্রকে অনেক দুঃখ-কষ্টই সহিতে

হইয়াছিল। কিন্তু গোবিন্দচন্দ্রের জীবন নিরবচ্ছিন্ন দুঃখেরই জীবন।—সে জীবন-ইতিহাসের মত জীবন-ইতিহাস দ্বিতীয় দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। সে ইতিহাসের প্রত্যেক ঘটনা, প্রত্যেক ছত্র করুণ-রসে অভিষিক্ত। মাইকেলের বিদ্যাসাগর ছিলেন,—মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ছিলেন; হেমচন্দ্রেরও লক্ষ্মণসদৃশ অনুজ ছিলেন,—বিশারদ ছিলেন; কিন্তু গোবিন্দচন্দ্রের চোঁখের জলের স্রোত সহস্রধারে বরাবর বহিয়াছে—কেহ তাহা মুছাইবার জন্য অগ্রসর হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের পূজা করিবার জন্য বাঙ্গালী যখন বোলপুরে ছুটিয়াছে, রামেন্দ্রবাবুকে পরিষদ-মন্দিরে যখন সোৎসাহে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে, সেই সময় বাঙ্গালার বিখ্যাত কবি গোবিন্দচন্দ্র ক্ষুধার দারুণ দংশনে অস্থির—অভাবের অশেষ ক্লেশে অবসন্ন। মনে পড়ে, ঠিক সেই সময়েই তাঁহার এক স্বনামধন্য কবি-ভ্রাতা দেশের জনকয়েক মান্য-গণ্য ব্যক্তির নাম সহি করাইয়া ভাওয়ালের রাণীমাতার নিকট এই আবেদন-পত্রখানি প্রেরণ করিয়াছিলেন,—"মহোদয়া, কবিবর গোবিন্দচন্দ্র দাস, ভাওয়ালের কবি—পূর্ব্ববঙ্গের কবি—অধুনাতন বঙ্গ-সাহিত্যের একজন প্রধান কবি। কিন্তু এই চির দরিদ্র কবির দারিদ্র্য এখন চরমে উপস্থিত। এ সময় তাঁহার দেশবাসীরা যদি তাঁহার প্রতি কৃপা-দৃষ্টিপাত না করেন, তাহা হইলে অকৃতজ্ঞতা-পাশে বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাস চিরদিনের জন্য কলঙ্কিত হইয়া রহিবে। গোবিন্দচন্দ্রের কাব্যের সহিত ভাওয়াল-রাজবংশের কীর্ত্তি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তিনি ভাওয়াল-রাজের প্রজা। শৈশব হইতে ভাওয়াল-রাজবাটীতে, রাজ-অন্নে—রাজ-অনুগ্রহে লালিত-পালিত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যে যে গৌরবের আসনে আজ তিনি প্রতিষ্ঠিত, ভাওয়াল-রাজই তাহার প্রধান কারণ। তজ্জন্য কবি এবং কবির গুণমুগ্ধ দেশবাসিগণ ভাওয়াল-রাজ-সংসারের নিকট কৃতজ্ঞ। আমরা আপনাকে এখন এই অনুরোধ করি যে, যে কবি আপনার স্বামী-দেবতার সহিত—আপনার শ্বশুর-কুলের সহিত চিরজীবন জড়িত, সেই দরিদ্র কবিকে আপনি ঢাকা-নগরীতে একটি বাস-গৃহ প্রদান করিয়া তাঁহাকে উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা করুন। তিনি বিক্রমপুরে এখন যে গ্রামে বাস করিতেছেন, তাহা অচিরে পদ্মাগর্ভে বিলীন হওয়ার সম্ভাবনা হইয়াছে। ভাওয়ালেও এখন বাস করা তাঁহার পক্ষে কঠিন; সে সমস্ত কারণ আপনি সবিশেষ অবগত আছেন। পাঁচ কি ছয় হাজার টাকা হইলেই তাঁহার উপযুক্ত একটি বাসগৃহ হইতে পারে। আপনার পক্ষে ইহা অতি সামান্য ব্যয় মাত্র, কিন্তু কবির পক্ষে ইহা ইহজীবনের সংস্থান। আপনি অবগত আছেন যে, আপনার স্বর্গগত স্বামী-দেবতা গোবিন্দ বাবুকে একখানি বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। আশা করি, এই নিরাশ্রয়, বঙ্গ-সাহিত্যের কীর্ত্তিমান কবিকে আপনি একটি বাসোপযোগী গৃহ প্রদান করিয়া রাজ-বংশের পূর্ব্ব-গৌরব ও বদান্যতা অক্ষুণ্ণ রাখিবেন। গোবিন্দ বাবু সেই গৃহ আপনার নামে, অথবা আপনার স্বর্গীয় স্বামীর নামে নামকরণ করিয়া কৃতজ্ঞতার সহিত আমরণ এই দান স্মরণ রাখিবেন, এবং সমগ্র দেশবাসীর হৃদয়ে ও ভবিষ্যৎ বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে আপনার এই কীর্ত্তি চিরোজ্জ্বল থাকিবে। পূর্ব্ববঙ্গের একটি প্রাচীনতম রাজ-বংশের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার ভার ও দায়িত্ব এখন সম্পূর্ণ আপনার উপর নির্ভর করিতেছে। হিন্দু বিধবার নিকট ভরসা করি, এই সমবেত অনুরোধ কখনও উপেক্ষিত হইবে না।"

বলা বাহুল্য, এ সমবেত সানুনয় অনুরোধ সফল হয় নাই। দেশের ধনকুবেরগণের কর্ণকুহরও উহা ভেদ করিতে পারে নাই। যাঁহারা আবেদন-পত্রে নাম সহি করিয়াছিলেন, তাঁহারাও ঐ কার্য্যটুকু ছাড়া গোবিন্দচন্দ্রের প্রতি আর কোনও কর্ত্তব্য করেন নাই। তাই তখন 'প্রবাহিনী' পত্রিকায় লিখিয়াছিলাম—"শুনিতে পাই, আমাদের মনুষ্যত্ব জন্মিয়াছে; আমরা মাইকেলের উদ্দেশে মাঝে মাঝে বিলাপের সুরে বলিয়া থাকি,—

"অযত্নে মা অনাদরে, বঙ্গ-কবি-কুলেশ্বরে,
ভিক্ষুকের বেশে মাতা দিয়াছ বিদায়!"

কিন্তু আজ যে আমরা দেশের আর এক কবিকে সেই 'ভিক্ষুকের বেশেই বিদায়' দিতে বসিয়াছি, তাহার কি? বলিতে নাই—কিন্তু এই গোবিন্দচন্দ্র যখন ইহলোক হইতে বিদায় লইবেন, তখন হয় ত আমরা তাঁহার জন্য স্মৃতি-সভা করিব, শোকের কবিতা ছাপাইব, তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার উদ্দেশ্যে চাঁদার খাতাও তৈয়ারী করিব. কিন্তু তাহাতে কি কবির পেট ভরিবে? স্মৃতি-রক্ষা তো ভবিষ্যতের কথা;—

উপস্থিত যে কবির প্রাণ যায়, তাহা রক্ষার উপায় কি? সেজন্য কি কেহই কিছু করিবেন না? সেজন্য কি কাহারও প্রাণ কাঁদিবে না?"—বলা বাহুল্য, এ রোদন আমাদের অরণ্যে রোদন মাত্র হইয়াছিল। বাঙ্গাল দেশের এ কাঙ্গাল কবিটিও তখন তাহা বুঝিয়াছিলেন;—বুঝিয়া নৈরাশ্যের প্রশ্বাস ফেলিয়াছিলেন। সে প্রশ্বাস বড়ই মর্ম্মান্তিক।—সে প্রশ্বাস তখন কাহারও কর্ণগোচর হয় নাই জানি;—এখন একবার কাণ পাতিয়া সকলে শুনুন,—

"প্রাণের এ হাহাকার, কেহ শুনিল না আর—
আর না শুনাতে চাই,— আর না শুনাতে চাই—
ফিরে যাই, ফিরে যাই!"

কবিবর সত্যই আর তাঁহার 'প্রাণের-হাহাকার' কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। অভাবের শত বৃশ্চিক-দংশন-জ্বালায় জ্বলিয়া জ্বলিয়া নিত্য জীর্ণ হইয়াছেন, তবু সে জ্বালা কাহাকেও জানিতে দেন নাই। অভিমান তাঁহার বড় বেশী ছিল। 'দারিদ্র্যের মৃদু গর্ব্বে' তিনি দরিদ্রের আদর্শ ছিলেন। অত তেজ, অত অভিমান না থাকিলে আমরা গোবিন্দদাসকে যেমন কবিটি পাইয়াছিলাম, ঠিক তেমনটি পাইতাম না সত্য; কিন্তু তাহা হইলে তাঁহাকে অতটা অভাবের উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইত কি না সন্দেহ। মোসাহেবীকে তিনি আজীবনই অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন।

শুধু অর্থের অভাব নহে, বিধাতার বিধানে তিনি কোনও সুখেই সুখী হইতে পারেন নাই। দারিদ্র্য-দুঃখের সঙ্গে-সঙ্গে আত্মীয়-স্বজনের বিয়োগ-ব্যথাও তাঁহাকে নিরন্তর পুটপাকের ন্যায় দগ্ধ করিয়াছে। বাণী-সাধনায় তিনি যখন নূতন ব্রতী, তখনই তিনি তাঁহার "সংসারের সার, দেহের জীবন, জীবনের সর্ব্বস্ব" গৃহলক্ষ্মীকে হারাইয়াছিলেন। সেই সময়ই—"সুখাবহ সহোদর জীবনের ভাই, পৃথিবীতে হেন বন্ধু আর দুটি নাই"—এমন যে তাঁহার সহোদর, তাহাকেও নিষ্ঠুর কাল হরণ করিয়াছিল। প্রায় সেই সময়েই তাঁহার "শত-শশী-রশ্মিমাখা, চারু ইন্দীবর আঁকা" তনয়াও তাঁহার নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছিল। একটি শোক শমিত হইতে না হইতে আর একটি শোক তাঁহার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। বাস্তবিক, এমন শোক-দুঃখময় জীবন আর কোনও কবির দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

এত দুঃখ, এত দৈন্য, তবু কিন্তু গোবিন্দচন্দ্র একদিনের জন্যও সারদা-সাধনায় শৈথিল্য প্রকাশ করেন নাই। দৈন্য-দুঃখের মরু-মারুতে কবিত্বরস সাধারণতঃ শুকাইয়া যায় বটে, কিন্তু গোবিন্দচন্দ্রের তাহা না হইয়া বরং তাহার উল্টাই হইয়াছিল। সাহিত্য-সেবা তাঁহার যেন দুঃখে সুখ, শোকে সান্ত্বনা ছিল। যে সময় অন্য লোক তাঁহার অবস্থা দেখিয়া চক্ষের জল ফেলিত, সে সময়ে তিনি সারদার সেবা করিয়া মনের আগুন নিবাইতেন। তাঁহার কবিতাসকল সুখের দান নহে,—তাহা দুর্দ্দিনের কৃষ্ণমেঘ-সংঘর্ষে উৎপন্ন। দুঃখের বিষয়, এমন ওজস্বিনী প্রতিভা অপুরস্কৃত রহিয়া গেল। কলঙ্কের কথা, এমন অসাধারণ প্রতিভার আমরা গৌরব বুঝিতে পারিলাম না।

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক ও পশ্চাদ্বর্ত্তী কবিগণের মধ্যে যে কয়জন কবির গীতি-কবিতায় স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়, গোবিন্দচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম। শুধু তাহাই নহে, এ যুগের গীতি কবিদের মধ্যে একমাত্র তিনিই বোধ করি খাঁটি বাঙ্গালার খাঁটি বাঙ্গালী কবি। তিনি ইংরাজী ভাষার সহিত অপরিচিত ছিলেন। কাজেই শেলী-ব্রাউনিঙ্ বা বায়রণ টেনিসনের ভাব-সম্পদ লইয়া তাঁহাকে কখনও বাহির হইতে হয় নাই। তাঁহার প্রাণ যাহা বলিতে চাহিত, তাহাই তিনি গাহিতেন। রাখিয়া-ঢাকিয়া কিছু বলিতে পারিতেন না—বলিতে জানিতেনও না। এজন্য তাঁহাকে অনেক সময় অনেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ভোগ করিতে হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে তিনি ভ্রুক্ষেপ করিতেন না। মনে পড়ে, প্রায় সাতাইশ বৎসর পূর্ব্বে 'নব্যভারত' সম্পাদক মহাশয় তাঁহার 'নব্যভারতে' লিখিয়াছিলেন,—"গোবিন্দচন্দ্র দরিদ্র ব্যক্তি, তাহাতে পূর্ব্ব-বঙ্গবাসী, এজন্য একশ্রেণীর হিংসা-পরায়ণ ব্যক্তি রুচি ধরিয়া গোবিন্দচন্দ্রকে কাব্য-জগৎ হইতে অবসৃত করিবার চেষ্টায় আছেন। রবীন্দ্রনাথের রুচি ধরিয়া ভয়ে কেহ কথা বলিতে সাহসী হন না, কিন্তু দরিদ্র গোবিন্দচন্দ্রকে লইয়া কেহ কেহ বড়ই মাথা ঘুরাইতেছেন। গোবিন্দচন্দ্র মনের কথা লেখেন,—প্রাণ খোলা, ভাব খোলা, কোন বাধা তিনি মানেন না, উপদেশের কথা শুনেন না। এ বড় বিষম দায়। গোবিন্দচন্দ্রকে পরামর্শ উপদেশ দিয়া

দিয়া ক্লান্ত হইয়াছি, গোবিন্দচন্দ্র কিছুতেই আপন মনের কাহিনী বলিতে ছাড়িবেন না। আমরা গোবিন্দচন্দ্রের এই স্বভাবের কিন্তু বড়ই পক্ষপাতী। তিনি কাহারও কথায় চলিতে চাহেন না। ফুল ফোটে, চাঁদ হাসে, পাখী গায়, সাগর গর্জ্জন করে, কাহারও কথা মানে না। কবি সেই তানে যখন তান মিলাইয়া জগতের উপরে উঠেন, তখন তিনি কেন জগতের কথা শুনিবেন? গোবিন্দচন্দ্র স্বাধীন স্বভাব কবি।"—কথাগুলি অত্যুক্তির অভিব্যক্তি নহে। লোকে কি বলিবে, কি ভাবিবে, এ কথা ভাবিয়া বাস্তবিকই তিনি কবিতা লিখিতে বসিতেন না! মনে পড়ে, স্নেহলতার আত্মহত্যা দেখিয়া দেশশুদ্ধ লোক যখন তাহার জয়গান আরম্ভ করিয়াছিল, সেই উচ্ছ্বাসের মুখে কেহ স্নেহলতাকে 'দেবী', কেহ বা 'ভগবতী' বলিতে লাগিল, সেই সময় একমাত্র গোবিন্দচন্দ্রই বলিয়াছিলেন,—

"কল্লি কিরে হতভাগী কেরোসিনে পুড়ে,
নারীর মড়ক লাগাইলি বাঙ্গলা মুলুক জুড়ে!
মনে যদি জেদ ছিল তোর কর্ব্বি না তুই বিয়া,
কে নি'ছিল কলাতলায় গলায় গামছা দিয়া?
আর্য্য-নারীর কার্য্য নয়, এ আত্মহত্যা করা,
ইহকালের পরকালের নিন্দা-নরক-ভরা!

*   *   *   *   *   *   *

এ ত নয় সে জহর ব্রত, এ যে বিষম পাপ,
নির্নিমিত্তে আত্মহত্যা বিধির অভিশাপ!
লোকের হিতে দেশের হিতে সমর্পিলে প্রাণ,
সে ত নয় রে আত্মহত্যা, সে যে আত্মদান।
আত্মদান আর আত্মহত্যা স্বর্গ-নরক ভেদ,
বুঝলি না তুই বোকা মেয়ে, অই যে বড় খেদ।

*   *   *   *   *   *   *

হিন্দুর মেয়ে কেউ কি কখন এমন মরণ মরে?
চিরকুমারী ম্লেচ্ছনারী পরের সেবা করে!
সফরীগেটী, মর্দ্দাবেটী বরং ভাল তারা,
এমনতর মর্দানিতে নয় সে আত্মহারা।
তাদের চেয়ে অধম তুই রে তাদের চেয়ে হীন,
হতভাগি, এম্নি করে মাখ্‌লি কেরোসিন!" ইত্যাদি।

এ যেন গৈরিক নিস্রবের মত। যে সময় দেশ শুদ্ধ লোক স্নেহলতার গুণ-গানে উন্মত্ত, সেই সময় অমন ভাবে ভাষার কশা চালনা করা যে কত বড় সাহসের কার্য্য, তাহা বলা যায় না। তাই পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি যে, কাহারও মুখ তাকাইয়া গোবিন্দচন্দ্র কখনও কিছু লিখিতেন না। তাঁহার ভাব-স্রোত যখন উচ্ছলিত হইত, তখন তিনি তাহা চাপিয়া রাখিতে পারিতেন না। কোথাও ভণ্ডামী-ন্যাকামী বা অত্যাচার-উৎপীড়ন দেখিলে, তিনি আগুন হইয়া উঠিতেন;—তখন তাঁহার নিজের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি থাকিত না, নিজের বিপদের কথাও মনে হইত না। অন্যায়ের উপশান্তির জন্য তাঁহার মনের মধ্যে তখন যে ভাব উদ্বেলিত হইত, তাহাই কবিতাকারে প্রকাশ পাইত। তাঁহার 'মগের মুল্লুক' ঐ কথারই উজ্জ্বল উদাহরণ। মনে পরে আজ তাঁহার—

"এই যে ভাওয়ালবাসী,
নিত্য অশ্রুজলে ভাসি,
অবিচারে ব্যভিচারে ভস্মীভূত হয়;
কে করে তাহার খোঁজ,
অসুরেরা রোজ রোজ,
কত যে কুলের বধূ চুলে ধরি লয়!
দিবালোকে দ্বিপ্রহরে,
পতিরে বাঁধিয়া ঘরে,
কোলের কাড়িয়া লয় কত কুবলয়,
কত যে জননী বোন্;
কাটিয়া ঘরের কোণ,
চুরি করে পিশাচেরা নিশীথ সময়।" ইত্যাদি—

নবীন কবিবরেরা বোধ করি এ কবিতা পড়িয়া নাসিকা শিকায় তুলিবেন, কিন্তু আমাদের সৌভাগ্যক্রমে 'বিশ্ব-সাহিত্য' গড়িবার দিকে গোবিন্দচন্দ্রের লক্ষ্য ছিল না। তিনি নিজের সমাজে, নিজের দেশে, নিজেদের জীবন-ঘটনায় কবিতার বস্তু দেখিতে পাইতেন। তাহা দেখিতে পাইতেন বলিয়াই আজ তাঁহার কবিতার মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি। দুর্ব্বল-পীড়ন দেখিলে তাঁহার প্রাণ কিরূপ কাঁদিত, পাঠক তাহা একবার দেখুন—

"ভাওয়াল আমার অস্থি-মজ্জা, ভাওয়াল আমার প্রাণ,
আমি তার নির্ব্বাসিত অধম সন্তান।

*   *   *   *   *   *   *

আহা তার নর নারী, ফেলে যে আঁখির বারি,
অবিচারে ব্যভিচারে হয়ে ম্রিয়মাণ,
বার মাস তের কাতি, দিনে রেতে সে ডাকাতি,
বুকে বিঁধে সদা মোর, শেলের সমান!
তাদের কলিজা ভাঙ্গা যাতনা-আগুন-রাঙ্গা,
শিরায় শিরায় জ্বলে শিখা লেলিহান!

* * * * * *

বুকের শোণিত দিলে, যদি তার শুভ মিলে,
যদি তার দুখ-নিশি হয় অবসান,
আপনি ধরিয়া ছুরি, আকণ্ঠ হৃদয়ে পুরি,
কলিজা কাটিয়া দিই করি শতখান!" ইত্যাদি

—ইহা আন্তরিকতা ও সমবেদনার উৎস! দেশবাসীর দুঃখ কষ্ট দেখিয়া এমন ভাবে রোদন করিতে আজকাল আর কোনও কবিকে দেখি নাই।

দেশাত্মবোধের কথা উঠিলে অনেক কবির নাম করা হয় দেখিতে পাই, কিন্তু গোবিন্দচন্দ্রের নাম কেহ করেন না। অথচ তাঁহার স্থায় মাতৃসর্ব্বস্ব, স্বদেশগতপ্রাণ, দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ সাধক বঙ্গদেশে অতি বিরল আছেন। তাঁহার কবিতায় জাতির যে সঞ্জীবন মহামন্ত্র ঝঙ্কৃত হইতেছে, তাহার তুলনা বড় একটা দেখিতে পাই না। জাতীয়তার গান অনেকেই তো গাইয়াছেন, কিন্তু এমন গান কেহ শুনিয়াছেন কি?—

আমরা হরিহর,
আমরা বঙ্গ, আমরা আসাম,
হোক না মোদের সহস্র নাম,
আমরাই সদিয়া সিন্ধু সেতু রামেশ্বর,
আমরা নাগা আমরা গারো,
কেহই ত পর নহি কারো,
খড়্গী বর্গী গুর্খা জাঠ্ আর পার্শী সওদাগর।
পণ্ডিচেরী ফরাসডাঙ্গা,
নামে কি যায় ভারত ভাঙ্গা?
কেউ বা কালো কেউ বা রাঙ্গা একই কলেবর।
কেউ বা চরণ কেউ বা হস্ত,
বক্ষ চক্ষু ললাট মস্ত,
একই দেহের রক্ত মাংস আমরা পরস্পর।

* * * * * *

আমরা হরিহর।
বাজা রে ভাই বিজয়-শিঙ্গা,
ডুবল কোথায় সপ্ত ডিঙ্গা,
সাগর সেঁচে তুলব এবার 'চাঁদর' 'মধুকর'।
দেখব মায়ের গঙ্গা গিলা,
দেখব মায়ের শক্তি-লীলা,
সাগর সেঁচে তুলব এবার 'শ্রীমন্তের টোপর'।
আয়রে পুজি মায়ের চরণ, মায়ে দিবেন বর!

* * * * * *

আমরা হরিহর।
একটা পদ্ম আঁখি দিয়া,
রাম পুজিল লঙ্কা গিয়া,
শঙ্কা কি রে, আমরা তো ভাই তারি বংশধর!
আয়রে আমরা সবাই যুটি,
পুজি মায়ের চরণ দুটি,
উপাড়িয়া ষষ্টি কোটি নেত্র মনোহর।
হৃৎপিণ্ড মুণ্ড হস্ত
আর যা লাগে সে সমস্ত,
আয়রে সবাই দেই রে মায়ের পদ্ম-পায়ের পর;
অনেক দিন মা পায়নি পূজা,
সাগর-পরা শ্যামল ভুজা,
নলিন চরণ মলিন মায়ের রক্তে রাঙ্গা কর।
আয়রে পুজি মায়ের চরণ মায়ে দিবেন বর।"

—এইরূপ এক-আধটি নহে—বহু সঙ্গীত তিনি রচিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বহু কবিতায় তিনি এইরূপ আগুন ছুটাইয়া গিয়াছেন—এইরূপ সুধাধারা ঢালিয়া দিয়াছেন। বঙ্কিম বাবুর ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয় যে, যদি 'উচ্চৈঃস্বরে রোদন, যদি আন্তরিক মর্ম্মভেদী কাতরোক্তি, যদি ভয়শূন্য তেজোময় সত্যপ্রিয়তা, যদি দুর্ব্বাসা-প্রার্থিত ক্রোধ দেশ-বাৎসল্যের লক্ষণ হয়;—তবে সেই দেশবাৎসল্যের সকল লক্ষণ গোবিন্দচন্দ্রের কবিতায় বিকীর্ণ হইয়া আছে।'

সার্থক-জীবন 'গোবিন্দ দাস' যে ভাবের তুফান তুলিয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত আলোচনার ইহা স্থান নহে—ইহা অবসরও নহে। সময়ান্তরে তাহা আমরা করিব। আজ তাঁহার বিয়োগ-বেদনা অনুভব করিয়া রোদন করিলাম

মাত্র। যাও কবিবর! যে সৎচিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণে শরীর-মন-জীবন যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছিলে, যাও, তাঁহার নিকট যাইয়া শান্তি-সুখ সম্ভোগ কর। তথায় শোক-সন্তাপ-দারিদ্র্য নাই। বিদ্বেষের বিষ নাই। তোমার পুণ্যব্রত পূর্ণ; এখন যাও। আমরা তোমার কবি ভ্রাতার ভাষায় রোদন করিয়া বলি—

"নহে কোন ধনী, নহে কোন বীর,
নহে কোন কর্ম্মী—গর্ব্বোন্নত শির,
কোন মহারাজা নহে পৃথিবীর,
নাহি প্রতিমূর্ত্তি ছবি।
তবু কাঁদ, কাঁদ,—জনমভূমির
সে এক দরিদ্র কবি।"

আন্তর্জাতিক বিধান

(International Law)

[শ্রীনৃত্যগোপাল রুদ্র]

পৃথিবীর সভ্যরাজগণ পরস্পরের প্রতি যথেচ্ছাচার করা উচিত বিবেচনা করেন না। তাঁহাদিগের যাবতীয় কার্য্য কতকগুলি নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে ;—কি সন্ধি, কি বিগ্রহ সকল সময়েই তাঁহারা সেই নিয়মসমূহ পালন করিয়া থাকেন। সেই নিয়ম সমুদায়কেই আন্তর্জাতিক বিধান কহে। বর্ত্তমান কালে সভ্যরাজগণ বিবেচনা করেন, যেমন স্বদেশের রাজবিধান পালন করা প্রত্যেক ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য, তেমনই আন্তর্জাতিক বিধান অনুসারে কার্য্য করা সকল নৃপতির একান্ত কর্ত্তব্য। যে স্থলে কোন নিয়ম নাই, সেই স্থলেই বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। এই হেতু, বিবেকসম্পন্ন মানবজাতি যে প্রত্যেক বিষয়েই নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে, ইহাই স্বাভাবিক। ইহাতেই আন্তর্জাতিক বিধানের আবশ্যকতা সমধিক অনুভূত হইতেছে। যদি নৃপতিগণের কার্য্যসমূহকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য নিয়মাবলী না থাকিত, তাহা হইলে পদে-পদে যুদ্ধ, অশান্তি ও অকারণ লোকক্ষয় সংঘটিত হইত।

আধুনিক অন্তর্জাতিক বিধান কিঞ্চিদধিক তিন শত বৎসর হইতে ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইতেছে। অতি পুরাকালেও নৃপতিগণের মধ্যে আন্তর্জাতিক বিধান বর্ত্তমান ছিল। অতি প্রাচীন কাল হইতে রোমের সাম্রাজ্য-স্থাপন-কাল পর্য্যন্ত আমরা এক প্রকারের অন্তর্জাতিক বিধান তদানীন্তন য়ুরোপীয় রাজাদিগের মধ্যে প্রচলিত দেখিতে পাই। যদি বিভিন্ন দেশীয় লোকগণ একই বংশসম্ভূত হইত, তাহা হইলেই তাহারা পরস্পরের সম্মান রক্ষা করিত, এবং নৃপতিগণ বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ থাকিতেন। প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাস পাঠে জানিতে পারা যায়, তৎকালে দূতগণের কোনরূপ অনিষ্ট করা হইত না। অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষেও দূতগণ অবধ্য বলিয়া বিবেচিত হইত, য়ুরোপে খৃষ্টের জন্মের পর হইতে বহু শত বর্ষ ব্যাপিয়া এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে, সমুদায় নৃপতিকে পরিচালনা করিবার জন্য একটী সর্ব্বপ্রধান শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে; রোমের সম্রাটই সেই প্রধান শক্তি। তাঁহার দ্বারাই আন্তর্জাতিক বিধান নির্দ্ধারিত হইত। তিনি য়ুরোপের সমুদায় নৃপতির শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। যখন তাঁহার ক্ষমতা বিলুপ্ত হইল, এবং পোপের সম্মানও হ্রাস প্রাপ্ত হইল, তখন য়ুরোপের রাজাদিগের মধ্যে আর কোন বন্ধনই রহিল না, আন্তর্জাতিক বিধান লুপ্তপ্রায় হইয়া পড়িল। রোমান সম্রাটের পতনের সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল; সভ্যতার আলোক নির্ব্বাপিত হইবার উপক্রম হইল। এই সময়ে যুদ্ধ-ব্যাপারে আর কোন নিয়ম পালন করা হইত না; বাণিজ্যাদিরও অতীব দুরবস্থা ঘটিয়াছিল। সমুদ্র-পথে দুষ্টবুদ্ধি জলদস্যুর প্রাদুর্ভাব ঘটায়, ব্যবসায়িগণ সবিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিলেন। ১৬২৫ খৃষ্টাব্দ হইতে এই বিশৃঙ্খলার পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল। হিউগোগ্রোসাস্ নামক একজন খ্যাতনামা উদ্যোগী পুরুষের উদ্যমে নৃপতিগণের ও সাধারণ

লোকের মতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল; এবং তাহার ফলে, সমুদায় য়ুরোপ মহাদেশের যথেষ্ট উপকার সাধিত হইয়াছিল। একজন লোকের প্রযত্নে সমুদয় পৃথিবীর যে এতাদৃশ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল, ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই।

১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে হলাণ্ড দেশে হুইগ্ ভ্যান গ্রুট জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সাধারণতঃ হিউগো গ্রোসাস্ নামেই অভিহিত হইতেন। তাঁহার দেশবাসিগণ এই সময়ে স্বদেশের ধর্ম্ম ও স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে স্পেনের সহিত বিষম সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। সেই সমুদায় ঘটনা তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন। আন্তর্জাতিক বিধান লুপ্তপ্রায় হওয়ায় দেশের যে ক্ষতি হইতেছিল, তাহা তাঁহার সম্যক্ অনুভূত হয়। অল্প বয়সেই তিনি বিদ্বান্ ও আইনজ্ঞ বলিয়া খ্যাতি-লাভ করেন। গ্রন্থ রচনা করিয়াও তিনি সাতিশয় যশঃ অর্জ্জন করেন। তাঁহার বহুবিষয়িণী প্রতিভা ছিল। তিনি ইতিহাস, সাহিত্য, আইন, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা করিতেন। তিনি কবিতা রচনা করিতেও পারিতেন। দেশের মধ্যে তৎকালে গৃহ-বিবাদ ঘটিয়াছিল, তাহাতে যোগদান করায়, ১৬০৮ খৃষ্টাব্দ তিনি বন্দী হন এবং তাঁহার প্রতি যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ প্রদত্ত হয়। তাঁহার অনুরক্তা পত্নীর বুদ্ধি-কৌশলে তিনি এই বিষম বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করেন। তাঁহাকে গোপনে একটী বাক্সের মধ্যে বদ্ধ করিয়া কারাগৃহ হইতে বাহিরে আনা হয়;—লোকে বিবেচনা করিল, যেন তিনি তাঁহার বন্ধুবর্গের নিকট হইতে যে সমুদয় পুস্তক পড়িবার জন্য লইয়াছিলেন, সেই গুলিকে বাক্সে পরিপূর্ণ করিয়া বাহিরে লইয়া আসা হইতেছে। অনেক বিপদ-আপদের পর তিনি প্যারিসে উপস্থিত হন। তথায় তিনি অত্যন্ত দারিদ্র্যে কালযাপন করেন। যাহা হউক, যে পুস্তক প্রণয়নের দ্বারা তিনি সমুদয় মানবজাতির উপকার সাধন করিয়াছেন, তাহার নাম De Jure Belli ac Pacis ডি জুরি বেলি এক পেসিস্। ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়। এই সময়ে তিনি দারিদ্র্যে অতীব প্রপীড়িত হন। এই পুস্তক বিক্রয় করিয়া তিনি যে মুদ্রা তৎকালে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার খরচের টাকাও সম্পূর্ণ উঠে নাই। অতি সত্বরই পুস্তকখানি বিদ্বন্মণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল; এই পুস্তক পাঠে চিন্তাশীল রাজনীতিজ্ঞ-গণের মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইল; আন্তর্জাতিক বিধানের অভাবে পৃথিবীর যে অনিষ্ট হইতেছিল, তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগের লক্ষ্য হইল। যাহা হউক, গ্রোসাস্ তৎকৃত পুস্তকে এই মত স্থাপন করিলেন যে, সকল রাজ্যই স্ব স্ব বিষয়ে স্বাধীন এবং সকল রাজারই সমান অধিকার আছে,—কেহ কাহারও অধীন নহে। ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে ওয়েষ্ট ফ্যালিয়ায় যখন সন্ধি স্থাপিত হয়, তৎকালে প্রধান-প্রধান রাজশক্তি-সমূহ স্বীকার করেন যে, সমুদায় খৃষ্টান নৃপতিই গ্রোসাসের মত অনুসারে চলিতে বাধ্য হইবেন। গ্রোসাসের প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করিয়া বহুসংখ্যক চিন্তাশীল লেখক এতৎ সম্বন্ধে বহু পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। তন্মধ্যে ভ্যাটেল, পফেণ্ডর্ফ, উলফ্ প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। অল্প দিন পূর্ব্বে হল্যাণ্ড, ব্লুন্স্লি, হোয়েটন প্রভৃতি খ্যাত-নামা লেখকগণ আন্তর্জাতিক বিধান সম্বন্ধে পুস্তক রচনা করিয়াছেন। জাপানী পণ্ডিত সুকোইস টকহসি (?) এ সম্বন্ধে পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন; জাপান দেশও এই সমুদায় আন্তর্জাতিক নিয়ম মানিয়া চলে।

স্বাধীন নৃপতিগণই আন্তর্জাতিক বিধানের বিষয়ীভূত; তাঁহারাই আন্তর্জাতিক বিধান পালন করিয়া থাকেন; এবং আন্তর্জাতিক বিধানে তাঁহাদিগের সম্বন্ধেই নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু স্বাধীন রাজা বলিলে কি বুঝিতে হইবে? প্রথমতঃ, রাজ্য-সংক্রান্ত ব্যাপার সম্পাদনের জন্য সকল বিষয়ে তাঁহাদিগের স্থায়ী বন্দোবস্ত থাকা চাই। নতুবা আন্তর্জাতিক বিধানের অনুমোদিত কার্য্যাবলী তাঁহারা কিরূপে সম্পাদন করিবেন এবং আন্তর্জাতিক বিধান হইতে উপকারই বা তাঁহারা কিরূপে প্রাপ্ত হইবেন? দ্বিতীয়তঃ, তাঁহাদিগের অধিকারে নির্দ্দিষ্ট রাজ্য থাকা আবশ্যক। তৃতীয়তঃ, সকল বিষয়েই তাঁহাদিগের স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন। কতকগুলি রাজ্যের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা না থাকিলেও, তৎসমুদায় আন্তর্জাতিক বিধানের অধিকার আংশিক ভাবে লাভ করিয়াছে। আবার কয়েকটী রাজ্য আছে, সেগুলি সম্বন্ধে কিছু বিশেষত্ব রহিয়াছে।

যাহা হউক, যে সমুদয় রাজ্যে য়ুরোপীয় সভ্যতা বিরাজমান, সেই সকল রাজ্যই আন্তর্জাতিক বিধানের বিষয়ীভূত। অবশ্য এতাদৃশ কোন রাজ্যের নৃপতি ইচ্ছা

করিলে, প্রকাশ্যে তাঁহার অভিলাষ বিজ্ঞাপিত করিয়া, আন্তর্জাতিক বিধানের সহিত তাঁহার সম্পর্ক বিচ্যুত করিতে পারেন। আবার অপর কোন রাজ্যও আন্তর্জাতিক বিধানের অধীনে আসিতে পারে। এইরূপে কতিপয় য়ুরোপীয়-সভ্যতা-বর্জিত রাজ্যকে আন্তর্জাতিক বিধানের অধিকার প্রদান করা হইয়াছে। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে প্যারীর সন্ধির দ্বারা প্রচার করা হইয়াছে, যে তুরস্কের সুলতান য়ুরোপের আন্তর্জাতিক বিধানের সুবিধা প্রভৃতি ভোগ করিতে পাইবেন। পারস্য, চীন ও জাপানকেও এইরূপ অন্তর্জাতিক বিধানের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে। কিন্তু চীন সব বিষয়ে সভ্য রাজ্যের ন্যায় ব্যবহার করিতে পারে নাই। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে পিকিন নগরে অবস্থিত দূতগণের প্রতি চীন-রাজের ভীষণ আক্রমণই তাহার প্রমাণ। আন্তর্জাতিক বিধান রাজ্যসমূহ সম্বন্ধেই নিয়মাবলী নির্দ্দেশ করে; কোন ব্যক্তিবিশেষের সহিত ইহার সম্পর্ক নাই। তবে যদি কোন ব্যক্তি নিজের উপর দায়িত্ব লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, অর্থাৎ সে যদি রাজা কর্ত্তৃক আদিষ্ট না হইয়া নিজের ঘাড়ে ঝুঁকি লইয়া যুদ্ধ করে, তাহা হইলে সে আন্তর্জাতিক বিধানের গণ্ডির মধ্যে পড়ে। অথবা যদি কোন ব্যক্তি জলদস্যুর কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলেও সে আন্তর্জাতিক বিধানের বিষয়ীভূত হয়। যদি কোন রাজ্যের অংশবিশেষ রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ করে, তাহা হইলে আন্তর্জাতিক বিধান তাহা লক্ষ্য করে না। কিন্তু যদি সেই বিবাদ-বিসম্বাদে অন্য রাজ্যসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহা হইলেই সেই রাজ্যের অংশবিশেষ আন্তর্জাতিক বিধানের বিষয়ীভূত হয়। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় যে গৃহবিবাদ উপস্থিত হয়, তাহাতে এইরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছিল। ঐ বৎসরের প্রথমে ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের দক্ষিণস্থ সাতটী রাজ্য পরস্পর মিলিত হইয়াছিল। ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়াই তাহাদিগের উদ্দেশ্য ছিল। উত্তরস্থ রাজ্যগুলি ইচ্ছা করিল যে, ঐ সাতটী রাজ্যকে বল পূর্ব্বক তাহাদিগের সহিত একত্র থাকিতে বাধ্য করিতে হইবে। এইরূপে ইউনাইটেড ষ্টেটসের দুই অংশের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। আমেরিকা দূরস্থিত রাজ্য; এই হেতু আমেরিকার স্থল-যুদ্ধে অন্যান্য জাতির কোনরূপ ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু যখন জলযুদ্ধ আরম্ভ হইল, তখন অন্যান্য জাতির ক্ষতি হইতে লাগিল; বিশেষতঃ, ইংল্যাণ্ড অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিলেন। এই হেতু বৃটিশ-রাজ ঐ বিদ্রোহকে যুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিলেন। ইউনাইটেড ষ্টেটস্ ইহাতে আপত্তি উত্থাপিত করিয়াছিল। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, কোন্ কোন্ স্থলে এইরূপ বিদ্রোহকে যুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করা অন্য রাজ্যের কর্ত্তব্য? বিদ্রোহকে যুদ্ধ নামধেয় বলিয়া স্বীকার না করিলে, বিদ্রোহী-দলকে আন্তর্জাতিক বিধানের অধীনে আনিতে পারা যায় না। এই জন্যই বাধ্য হইয়া অন্যান্য রাজ্য বিদ্রোহকে যুদ্ধ নামে অভিহিত করে। তবে যদি অন্যান্য রাজ্য কোন-রূপে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তাহা হইলে এরূপ বিদ্রোহকে যুদ্ধ নামে অভিহিত করা অন্যায় বটে। কোন রাজ্য এইরূপ বিদ্রোহকে যুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিলেও, যে রাজ্যের প্রজাগণ বিদ্রোহী হইবে, সে রাজ্যের রাজাও যে সেই বিদ্রোহকে যুদ্ধ বলিবেন, তাহার কোন স্থিরতা নাই; তিনি বিদ্রোহীগণকে কারারুদ্ধ করিবেন, গুলি করিবেন, অথবা অন্য প্রকারে শাস্তি দিবেন;—তাহাতে তাঁহার কোন বাধা নাই। পক্ষান্তরে, এরূপ স্থলে যদি অন্যান্য রাজ্য বিদ্রোহকে যুদ্ধ বলিয়া স্বীকার না করে, তাহা হইলে বিদ্রোহীগণ আন্তর্জাতিক বিধানের অধীনে আসিবে না; আন্তর্জাতিক বিধান অনুসারে তাহাদিগের বিচারও হইবে না। বিদ্রোহী রাজ্যের রাজাই বিদ্রোহী দলের কৃত কার্য্যের জন্য অন্যান্য রাজ্যের নিকট দায়ী হইবেন। এই হিসাবে দেখা যাইতেছে যে, অন্যান্য রাজ্য এরূপ স্থলে বিদ্রোহকে যুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিলে, বিদ্রোহী রাজ্যের রাজাও কতক পরিমাণে উপকৃত হইয়া থাকেন। আর, কোন বিদ্রোহকে যুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিলেই যে, বিদ্রোহীগণের স্বাধীনতা স্বীকার করা হইল, তাহা নহে।

আন্তর্জাতিক বিধান ধীরে ধীরে যেরূপে পরিপুষ্ট হইতেছে, এক্ষণে তদ্বিষয়ে আলোচনা করা যাইতেছে, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, হিউগো গ্রোসাস্ বর্ত্তমান আন্তর্জাতিক বিধানের বীজ বপন করেন। প্রধান প্রধান রাজ্যের নৃপতিগণ একত্র সম্মিলিত হইয়া সকলের উপকার ও সুবিধার জন্য কতকগুলি নিয়ম নির্দ্দিষ্ট ও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং অদ্যাপি মধ্যে মধ্যে এইরূপ করিতেছেন। ইহাতেই আন্তর্জাতিক বিধান ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণতা লাভ

করিতেছে। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে প্যারিসের সন্ধির দ্বারা ক্রিমিয়ান যুদ্ধ শেষ হয়। প্যারিসের সেই মহাসভায় যে সমুদয় নরপতির প্রতিনিধি ছিলেন, তাঁহারা জলযুদ্ধ সম্বন্ধে চারিটী নিয়ম নির্দ্ধারণ করেন। অতঃপর ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে স্থলযুদ্ধে পীড়িত ও আহত ব্যক্তিগণের সুবিধার জন্য জেনেভা নগরে মিলিত সভায় নিয়মাবলী নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে জেনেভায় যে সভা আহূত হইয়াছিল, তাহাতেও এই সমুদয় নিয়ম পর্য্যালোচিত হইয়াছিল। যুদ্ধে যাইতে স্ফোটন-ধর্ম্মী গুলিসমূহ (explosive bullets) ব্যবহৃত না হয় তদ্বিষয়ে নিয়ম নির্দ্দেশের জন্য ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে সেণ্টপিটার্সবর্গে অষ্টদশ রাজ্যের রাজপ্রতিনিধি মিলিত হইয়াছিলেন। প্রাগুক্ত বিধান সমুদয় প্রধান প্রধান রাজ্যের বহু নৃপতির উদ্যমে নির্দ্ধারিত হওয়ায় সেগুলি এক্ষণে সার্ব্বজনীন হইয়াছে এবং সকল নৃপতির দ্বারা পালিত হইয়াছে। সুয়েজখাল সম্বন্ধে যে সমুদয় নিয়ম নিরূপিত হইয়াছে, সেগুলিও সার্ব্বজনীন হইয়াছে। সুয়েজ খাল সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাইবে। যাহা হউক, ১৮৯৯ ও ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে হেগ-সমিতি কর্ত্তৃক যে সমুদায় নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তদ্দ্বারা সমুদয় পৃথিবীর যৎপরোনাস্তি উপকার সাধিত হইয়াছে। এই হেগ সমিতি আন্তর্জ্জাতিক মঙ্গলের উদ্দেশ্যেই মিলিত হইয়াছিল। রুসিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাসের চেষ্টাতেই এই সমিতির উদ্ভব। তাঁহার রাজত্বের প্রারম্ভে লোকক্ষয়কারী ভীষণ সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল। তদ্দর্শনে তাঁহার হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হয়। তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, আন্তর্জ্জাতিক সমিতি স্থাপন করা প্রয়োজনীয়; তদ্দ্বারা লোকহিতকর ব্রত অনুষ্ঠিত হইবে, যাহাতে পৃথিবীময় শান্তি বিরাজ করে, তাহারই উপায় নিরূপিত হইবে এবং অস্ত্রশস্ত্রের ক্রমশঃ বৃদ্ধিও যাহাতে নিবারিত হয়, তদ্বিষয়ে ব্যবস্থা করা হইবে। জগতে শান্তি স্থাপন ও গোলাগুলি, অস্ত্রশস্ত্র নিবারণই এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু রাজপ্রতিনিধিগণের বিচার-বিতণ্ডার পরি-শেষে ইহাই স্থিরীকৃত হইল যে, যুদ্ধ ব্যাপার সম্পূর্ণরূপে তুলিয়া দিবার চেষ্টা করা অপেক্ষা, যুদ্ধ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় নিয়মসমূহ নির্দ্দিষ্ট করাই সমীচীন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে বিভিন্ন রাজ্যের রাজপ্রতিনিধিগণ হেগ নগরে সম্মিলিত হইলেন। যাহাতে বিনাযুদ্ধে আন্তর্জ্জাতিক বিবাদের নিষ্পত্তি হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহারা নিয়ম নির্দ্ধারণ করিতে অগ্রসর হইলেন। স্থলযুদ্ধ ও জলযুদ্ধের কুপ্রথাসমূহ দূর করিতেও তাঁহারা যত্নবান হইলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা তিনটী বিশেষ হিতকর বিধান লিপিবদ্ধ করেন। প্রথমতঃ, বেলুন হইতে গোলা নিক্ষেপ করা পাঁচ বৎসরের জন্য নিষিদ্ধ হয়। দ্বিতীয়তঃ, যেরূপ গোলায় দূষিত গ্যাস বিস্তৃত হয় এবং সৈন্যগণ সাংঘাতিক ভাবে আহত হয়, তাদৃশ গোলার ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। তৃতীয়তঃ, যেরূপ গুলি শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, বিস্তৃত হইয়া শরীর ধ্বংস করে, তাহার ব্যবহারও নিষিদ্ধ হয়। যে ছাব্বিশটী রাজ্যের রাজপ্রতিনিধি সমিতিতে মিলিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই ইহাতে স্বাক্ষর করেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে হেগ নগরে দ্বিতীয়বার যে সমিতি সংগঠিত হইয়াছিল, তাহাতেও বহুসংখ্যক বিধিব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট হয়। যখন কোন রাজা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তখন তিনি, আবশ্যক বোধ হইলে, শত্রুপক্ষ ব্যতীত কোন নিরপেক্ষ রাজ্যের জাহাজও ধৃত করিতে পারেন, এবং তাঁহার নিজ বিচারালয়ে এই জাহাজের বিচার হয়। কার্য্যতঃ সেই রাজা নিজকৃত কার্য্যের বিচারক নিজেই হন। এরূপ ক্ষেত্রে সকল স্থলে ন্যায় বিচারের আশা করা যায় না। এই হেতু বৃটিশরাজ ও জার্ম্মাণ নৃপতির পক্ষ হইতে এইরূপ কার্য্যের জন্য একটী আন্তর্জ্জাতিক বিচারালয় স্থাপনের কথা উত্থাপিত হয়; এবং এইরূপ প্রস্তাব হয় যে, এই বিচারালয়ে পঞ্চদশজন বিচারক থাকিবেন। যে সকল রাজার প্রতিনিধিগণ হেগ সমিতিতে মিলিত হইয়াছেন, সেই সকল নৃপতি কর্ত্তৃক বিচারকগণ ছয় বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হইবেন। ১৯০৮—১৯০৯ খৃষ্টাব্দে যে নৌ-ব্যাপার সম্বন্ধীয় সমিতি গঠিত হইয়াছিল, তদ্দ্বারাও রাজগণের সবিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে। যাহা হউক, এই সমুদায় আন্তর্জ্জাতিক সমিতির দ্বারা যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে আন্তর্জ্জাতিক বিধান বিশেষ ভাবে পরিপুষ্ট হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, গ্রোসাসের আন্তর্জ্জাতিক বিধান সম্বন্ধে পুস্তক রচনার পর হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বহুসংখ্যক ক্ষমতাবান্ লেখক এতৎসম্বন্ধে গবেষণাপূর্ণ পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। তৎসমূহের দ্বারাও বিভিন্ন রাজ্যের নৃপতিগণের হৃদয় জগতের মঙ্গল সাধনের দিকেই আকৃষ্ট হইয়াছে; এবং সেই সমুদায়ের

লেখকের অভিমতও আন্তর্জাতিক সমিতিসমূহে আলোচিত হইয়াছে।

আন্তর্জাতিক বিধান অনুসারে সকল রাজ্যেরই পৃথিবীর কোন-না-কোন অংশের উপর অধিকার রহিয়াছে। যে ভূখণ্ডের উপর রাজ্য স্থাপিত, সেই ভূখণ্ডস্থ সমুদায় জলভাগ ও স্থলভাগ ঐ রাজ্যের রাজার অধিকারভুক্ত। যে সকল নদী ও হ্রদ সম্পূর্ণ ভাবে কোন রাজার রাজ্যমধ্যে অবস্থিত, সেগুলি ঐ রাজারই অধিকারভুক্ত। যদি একটী নদী বহু রাজ্যের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে যে অংশ যে রাজ্যে আছে, তাহার রাজা সেই অংশেরই অধিকারী। জলের ধার হইতে সমুদ্রের তিন মাইল পর্য্যন্ত স্থান সেই সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হয়। যে সময় এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তৎকালে কামানের গোলা ৩ মাইলের বেশী যাইতে পারিত না বলিয়া এই নিয়ম হইয়াছে। যে সকল উপসাগর ও প্রণালী ৬ মাইলের অধিক প্রশস্ত নহে, এবং যাহাদিগের উভয় কূল একই রাজ্যে অবস্থিত, সেগুলিকে সেই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিবেচনা করা হয়। যাহা হউক, পৃথিবীতে জল ও স্থল উভয়ই বিভিন্ন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। কিন্তু আকাশের উপর কি কাহারও অধিকার আছে? এই প্রশ্ন বর্ত্তমানকালে সমালোচিত হইতেছে। নানাপ্রকার ব্যোমযানের উদ্ভব হওয়ায় এই প্রশ্নের মীমাংসা হওয়াও বিশেষ আবশ্যক। এই বিষয়ের মীমাংসার জন্য ১৯১০ খৃষ্টাব্দে প্যারী নগরে একটী আন্তর্জাতিক সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। যদি বহু রাজ্য একই নদীর উপর অবস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই সকল রাজ্য ঐ নদীর সমুদায় অংশ ব্যবহার করিতে পারিবে কি না, এতদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। আন্তর্জাতিক বিধানজ্ঞ হল বলেন যে ঐ নদীর উপর সেই সকল রাজ্যের যে কোন অধিকারে জন্মিয়াছে, জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে তাহা আমরা দেখিতে পাই না। কোনও আন্তর্জাতিক সমিতিতেই এতাদৃশ অধিকারকে ন্যায্য অধিকার বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই। বিজ্ঞতম হোয়েটন সাহেবের এই অভিমত যে, এরূপ স্থলে সেই সকল রাজ্যের কতক অধিকার রহিয়াছে। পূর্ব্বকালে সসাগরা ধরণীর অধীশ্বরগণ সুবিশাল সমুদ্রকেও স্বীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিতেন। ভেনিসের রাজা এড্রিয়াটিক সাগরের দাবী করিতেন; এবং বৃটিশ-রাজ ইংলিশ প্রণালী, উত্তর সাগর ও স্কটলণ্ডের উত্তরস্থ সাগরের দাবী করিতেন। এইরূপে পৃথিবীর প্রায় সমুদায় নৃপতি সমুদ্রের উপর প্রভুত্ব উপভোগ করিতেন এবং অন্যান্য রাজার নিকট হইতে সেই-সেই সমুদ্রে যাতায়াতের জন্য শুল্ক আদায় করিতেন। আর তাঁহাদের অধিকারের মধ্যে যে সকল জলদস্যু উপদ্রব করিত, তাঁহারা তাহাদিগকে দমন করিতেন। যখন ষোড়শ শতাব্দীতে স্পেনের রাজা প্রশান্ত মহাসাগরের এবং পর্টুগালের রাজা ভারত মহাসাগরের ও আটলাণ্টিক মহাসাগরের কতক অংশের দাবী করিলেন, তখন অনেকেরই ধারণা হইল যে, এতাদৃশ সুবিশাল সমুদ্রের উপর প্রভুত্বের দাবী করা ন্যায়সঙ্গত নয়। এইরূপ দাবী মান্য না করায় যখন বৃটিশগণের প্রতি স্পানিয়ার্ডগণ ক্ষুব্ধ হইল, তখন রাজ্ঞী এলিজাবেথ ঘোষণা করিলেন যে, সমুদ্র ও আকাশের উপর সকলেরই সমান অধিকার আছে। বর্ত্তমান আন্তর্জাতিক বিধানের প্রবর্ত্তক গ্রোসাস্‌ও বলেন যে, বিশাল সমুদ্রের উপর প্রভুত্ব বিস্তার সম্ভবে না। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে সফেণ্ডর্ফ এই মত প্রচার করিলেন যে, সমুদ্রের যথোপযুক্ত অংশ তত্তীরবর্ত্তী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। নতুবা সেই রাজ্য নিরাপদ হইবে কিরূপে? যাহা হউক, বর্ত্তমানকালে নৃপতিগণ সুবিশাল সমুদ্রের উপর আর কোন দাবী করেন না। তবে তিন মাইল মাত্র স্থানের উপর যে অধিকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাও পর্য্যাপ্ত নহে। কারণ এক্ষণে কামানের গোলা ৩ মাইল অপেক্ষা বেশী দূরে যাইতে পারে। এই হেতু সমুদ্রের তিন মাইল অপেক্ষা অধিকতর অংশ নৃপতিগণের অধিকারে থাকা আবশ্যক।

এইস্থলে সুয়েজ খাল ও পানামা খাল সম্বন্ধে যে বিশেষ নিয়ম আছে, তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। সুয়েজ খালের সহিত সকল রাজ্যেরই স্বার্থ বিজড়িত আছে। এরূপ খাল এইটীই প্রথম। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ফরাসীগণ এই খাল খনন করিয়াছিলেন। তুরস্কের সুলতানের সম্মতিক্রমে মিশরের খেদিব এই খাল খননে অনুমতি দেন। ইংরেজরাও ইহা খননের সময় অনেক 'শেয়ার' খরিদ করিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বহুরাজ্যের সহিতই ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। বাণিজ্য ও জলযুদ্ধ ব্যপদেশে এই খাল দিয়া যাতায়াত করিবার প্রভৃত

প্রয়োজন আছে। এই হেতু ইহার ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ নিয়মাবলী নির্দ্দিষ্ট করার প্রয়োজন সকল নৃপতিই অনুভব করিলেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ছয়টী প্রধান রাজশক্তি এবং তুরস্ক, স্পেন ও হলাণ্ড এইরূপ নির্দ্দেশ করিলেন যে, এই খালটী সকল সময়েই খোলা থাকিবে,—যুদ্ধের সময়ও বন্ধ করা হইবে না। এই খালের ভিতর অথবা ইহার প্রান্তদেশ হইতে তিন মাইলের মধ্যে সংগ্রামাদি করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। ইহার মুখ অবরোধ করা যাইতে পারে না। যুধ্যমান নৃপতির জাহাজসমূহ সেড বন্দর বা সুয়েজ বন্দরে ২৪ ঘণ্টার বেশী সময় থাকিতে পারে না, অথবা এই খালে ও ইহার বন্দরসমূহে সৈন্য কিম্বা যুদ্ধোপকরণ লইয়া যাইতে পারে না। যদি কোন নৃপতি এই খালে হঠকারিতা প্রকাশে উদ্যত হন, তাহা হইলে মিশরের খেদিব অথবা তুরস্কের সুলতান তাহার প্রতিকারের উদ্যম করিবেন। ইংলণ্ড ও ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের মধ্যে ১৯০১ খৃষ্টাব্দে যে সন্ধি হইয়াছিল, তদনুসারে ইহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, পানামা খালও সকল নৃপতি সমান ভাবে ব্যবহার করিতে পারিবেন। কি বাণিজ্যের জাহাজ, কি যুদ্ধের জাহাজ সমুদয় জাহাজই এই খাল দিয়া যাতায়াত করিতে পাইবে।

প্রত্যেক নৃপতিরই তাঁহার রাজ্যস্থিত ব্যক্তিগণের উপর অধিকার রহিয়াছে। তাহারা যদি সেই নৃপতির প্রজা হয়, তাহা হইলে কোন কথাই নাই; আর যদি তাহারা বৈদেশিক লোক হয়, তাহা হইলেও যাবৎকাল তাহারা তাঁহার রাজ্যের মধ্যে থাকিবে তাবৎকাল তাঁহার শাসনাধীন থাকিবে। য়ুরোপের সভ্যদেশ সমূহে, বা যে সব রাজ্যে য়ুরোপীয় সভ্যতা বিরাজমান, সেই সমুদয় দেশে, বিদেশীয়গণও ন্যায় বিচারের আশা করিতে পারে। কিন্তু তুরস্ক প্রভৃতি দেশে বিচার-প্রণালী ধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট হওয়ায়, বিদেশীয়গণের পক্ষে অনেকস্থলে সুবিচারের আশা করা যায় না। এই হেতু তুরস্ক, মিশর প্রভৃতি রাজ্যে বৈদেশিক বিচারক রহিয়াছেন, তাঁহারাই বিদেশীয়গণের বিচার করিয়া থাকেন। জাপানেও এই নিয়ম ছিল; কিন্তু ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে তাহা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। চীনে এইরূপ বিচারালয় অদ্যাপি রহিয়াছে। যাহা হউক, এইস্থলে স্বাভাবিক-প্রজার ও কৃত্রিম উপায়ে প্রজাস্বত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তির বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে। কিরূপ লোক স্বাভাবিক প্রজা বলিয়া গণ্য হয়? এ বিষয়ে পৃথক দেশের পৃথক নিয়ম। ইহা জন্মভূমি অনুসারে নিরূপিত হইবে, অথবা গোত্র দর্শনে স্থিরীকৃত হইবে, ইহাই প্রশ্ন। যদি একজন লোক ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু তাহার পিতামাতা ফরাসী দেশীয় হয়, তাহা হইলে সেই লোক ইংরেজ হইবে কি ফরাসী হইবে?' যদি জন্মভূমি অনুসারে ইহা নির্দ্ধারিত হয়, তাহা হইলে সেই লোক ইংরেজ; কিন্তু যদি গোত্রই এ বিষয়ের পরিচায়ক হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি ফরাসী। সকল দেশে এ বিষয়ে একই নিয়ম প্রচলিত নাই বলিয়া, একই লোককে পৃথক দেশের রাজা নিজ প্রজা বলিয়া দাবী করিতে পাবেন। ইংলণ্ডে ও ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সে এই নিয়ম প্রচলিত আছে যে, যদি বৈদেশিকগণের সন্তান-সন্ততি ঐ দুই দেশে জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহারা তত্তদ্দেশীয় প্রজা বলিয়া গণ্য হইবে। আর যদি ইংরেজ বা আমেরিকানের সন্তান-সন্ততি অন্য দেশে জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলেও তাহারা ইংরেজ বা আমেরিকান বলিয়া পরিচিত হইবে। এইরূপ ভাবে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নিয়ম প্রচলিত রহিয়াছে। এই স্বাভাবিক প্রজা ব্যতীত অন্য দেশের লোক কৃত্রিম উপায়ে প্রজাস্বত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে। ইংলণ্ডে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে এতদ্বিষয়ে একটী আইন করা হইয়াছে। এতদ্দ্বারা ইহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, ইংলণ্ডে অন্ততঃ পাঁচবৎসর বাসের পর কোন বিদেশীয় লোক প্রজাস্বত্ব প্রাপ্তির সার্টিফিকেট লইতে পারে। অতঃপর সে বৃটিশ প্রজা-রূপেই পরিচিত হয়। এই আইন অনুসারে ইহাও নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, যদি বৃটিশ প্রজা অন্য দেশে স্বেচ্ছায় প্রজাস্বত্ব গ্রহণ করে, তাহা হইলে সে আর বৃটিশ প্রজারূপে গণ্য হইবে না। কোন দেশের জাহাজ যদি সমুদ্রের মধ্যে থাকে, তাহা হইলে সেই সমুদায় জাহাজের উপর সেই দেশের রাজার অধিকার বর্ত্তমান থাকিবে। আর যদি কোন রাজ্যের জাহাজ কর্ত্তৃক জলদস্যুর জাহাজ ধৃত হয়, তাহা হইলে সেই ধৃত জাহাজ ঐ রাজ্যের অধিকারে আসিবে। সভ্য রাজগণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, এইরূপ ভাবে সমুদ্রে লুণ্ঠন আন্তর্জাতিক বিধান অনুসারে অতীব গর্হিত কার্য্য।

সপ্তদশ শতাব্দীতে গ্রোসাস্ যখন পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন, সেই সময় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত আন্তর্জাতিক

বিধানজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলিয়া আসিতেছেন যে, সকল স্বাধীন রাজ্যই আন্তর্জাতিক বিধানের নিকট সমান,—সকল রাজ্যেরই সমান অধিকার রহিয়াছে। কিন্তু ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্যে অবশ্য তাহারা পরস্পর তুল্য নয়। আন্তর্জাতিক বিধানের নিকট অতি পরাক্রমশালী সুবিশাল রাজ্যের অধিপতিরও যেমন মান্য অতীব ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যেরও তাদৃশ সম্মান। কিন্তু বর্ত্তমান কালের আন্তর্জাতিক ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পূর্ব্বকালে স্বাধীন রাজ্যসমূহের যেরূপ সমত্বের কথা বলা হইত, বর্ত্তমান সময়ে ঠিক সেরূপ সমত্ব লক্ষিত হয় না। যদি আমরা প্রথমতঃ য়ুরোপের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, গত শতাব্দীর প্রারম্ভে যে সমুদয় নৃপতি নেপোলিয়ান বোনাপার্টকে পরাভূত করিয়াছিলেন, তাঁহারা কতক পরিমাণে প্রাধান্যের দাবী করিয়াছিলেন। সেই সমুদয় প্রধান রাজশক্তির চেষ্টায় গ্রীস রাজ্যটী গঠিত হইয়াছে, এবং তাঁহারা গ্রীসকে বিপদ-আপদে রক্ষাও করিয়াছেন। সেই সময়ে ইংলণ্ড, ফরাসী, অষ্ট্রিয়া, জার্ম্মানী (প্রুশিয়া), রুসিয়া এবং ইটালী—এই কয়টী রাজ্য মিত্রভাবাপন্ন রাজ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। যদিও নেপোলিয়নের সময় ফরাসীগণ অবশেষে পরাস্ত হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদিগের রাজ্য অন্যান্য প্রধান রাজ্য কয়টীর তুল্য বলিয়াই খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। পরে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে যখন তুরস্ক আন্তর্জাতিক বিধানের অধীনে আইসে, তৎকালে তুরস্কও উচ্চ স্থান লাভ করে। বর্ত্তমান কালে জাপানের অবস্থা সাতিশয় উন্নত হইয়াছে। এক্ষণে আমেরিকার রাজ্যগুলির ঐক্য ও ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের উন্নতি ও প্রাধান্যের কথার উল্লেখ করা যাইতেছে। নেপোলিয়নের পরাভবের পর রুসিয়া, অষ্ট্রীয়া ও প্রুশিয়া পরস্পর মিলিত হইল,—ফরাসীও তাহাদিগের সহিত যোগদান করিল। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে এই সম্মিলিত রাজ্যসমুদায় ঘোষণা করিল যে, তাহারা পরস্পরকে সাহায্য করিবে এবং সকল কার্য্যেই একমত হইয়া চলিবে। পরে ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ট্রোপানেরা (?) কংগ্রেসে প্রকাশ করিল, যে কোন রাজ্যে বিদ্রোহ ঘটিবে, জগতের শান্তিরক্ষা কল্পে তৎক্ষণাৎ তাহারা তাহার দমন করিবে। আন্তর্জাতিক বিধান অনুসারে তাহাদিগের এই সংকল্প ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। ইংলণ্ড ঐ সমুদায় রাজ্যের সহিত যোগদান করিল না। সেই সময়ে ইংলণ্ডে ক্যানিং বৈদেশিক ব্যাপারের মন্ত্রী ছিলেন; তিনি অন্যান্য রাজ্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা উচিত বিবেচনা করিলেন না। তৎকালে ইংরেজগণ দক্ষিণ আমেরিকায় বাণিজ্য করিয়া বিশেষ ভাবে অর্থোপার্জ্জন করিতেছিলেন। পূর্ব্বোক্ত রাজ্য সমুদায়ের হস্তক্ষেপ ব্যাপারের দ্বারা ইংরেজ বণিকদিগের সমূহ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা ছিল। মিঃ রাস্ তখন আমেরিকার দূত রূপে লণ্ডনে উপস্থিত ছিলেন। কথিত রাজ্য-সমূহের হস্তক্ষেপ ব্যাপারের বিরুদ্ধে ইংলণ্ড ও ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স একযোগে আপত্তি উত্থাপন করিবেন কি না, এতদ্বিষয়ে ক্যানিং আমেরিকার মিঃ রাসের সহিত পত্রাদি লেখালেখি করেন। সেই সময়ে মিঃ মনরো আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট্ ছিলেন। মিঃ রাস্ তাঁহাকে সমুদয় ব্যাপার জ্ঞাপন করেন। এই বিষয় লইয়া মিঃ মনরো তাঁহার যে মত ঘোষণা করিলেন, তাহাকেই মনরো ডকট্রিণ্ কহে। তিনি ঘোষণা করিলেন যে, ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ য়ুরোপের যুদ্ধাদি ব্যাপারে কখনও হস্তক্ষেপ করে নাই এবং করিতে ইচ্ছাও করে না; এই হেতু তাহারাও আশা করিতেছে যে, য়ুরোপের রাজশক্তিনিচয় তাহাদিগের কোনও ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন না। সভ্য রাজগণ আমেরিকা মহাদেশের যে সমুদয় রাজ্য ইতিপূর্ব্বেই অধিকার করিয়াছেন, সেই সব রাজ্যে আর কোন নৃপতি উপনিবেশ স্থাপন করিতে পারিবেন না ইহাও ঘোষণা করা হয়। পরবর্ত্তী প্রেসিডেণ্ট্গণ মিঃ মনরোর এই মতের সমর্থন করিয়াছেন, এবং এইরূপে এই মনরো ডকট্রিণ্ ধীরে-ধীরে পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। আজ ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ আমেরিকার অন্যান্য রাজ্যের চালক রূপে প্রধান স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন।

গৃহদাহ

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত অংশের সংক্ষিপ্তসার)

মহিমের পরমবন্ধু ছিল সুরেশ। একসঙ্গে এফ-এ পাশ করার পর সুরেশ গিয়া মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হইল; কিন্তু মহিম তাহার পুরাতন সিটি কলেজেই টিকিয়া রহিল। সুরেশের ইচ্ছা, মহিমও ডাক্তার হয়, কিন্তু মহিম তাহাতে কিছুতেই রাজী হইল না এবং বন্ধুত্বের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার জন্য বাসা বদল করিল। সুরেশও খুঁজিয়া-খুঁজিয়া তাহাকে বাহির করিল; এবং বন্ধুকে নিজের বাড়ীতে আদর-যত্নে রাখিবার প্রস্তাব করিল। মহিম তাহাতেও রাজী হইল না।

ইহার বছর পাঁচ পরে সুরেশ জানিতে পারিল, মহিম কেদার রায় নামক একজন ব্রাহ্ম ভদ্রলোকের কন্যা অচলার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছে এবং উভয়ের মধ্যে বিবাহের কথাবার্ত্তা চলিতেছে। সুরেশ বন্ধুকে এই বিবাহ হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল। ইহার পর একদিন সুরেশ মহিমের বাসায় আসিয়া তাহাকে দেখিতে না পাইয়া তাহার ভাবী শ্বশুরবাড়ীতে গিয়া কেদারবাবুর সঙ্গে আলাপ করিল এবং তাঁহার কন্যা, মহিমের প্রণয়িনী অচলাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল। কথা প্রসঙ্গে সুরেশের মুখে কেদারবাবু জানিতে পারিলেন, মহিমের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়, সে অচলাকে বিবাহ করিয়া তাহাকে তাহার গ্রামের কুটীরে লইয়া গিয়া রাখিবে। কেদারবাবু তখন বাঁকিয়া বসিলেন এবং ধনী-সন্তান সুরেশও মনে-মনে অচলার প্রতি আসক্ত বুঝিয়া এই নূতন পাত্রের প্রতিই তাঁহার লক্ষ্য স্থির করিলেন। এবং, পাত্রও কেদারবাবুর ইঙ্গিত পাইয়া তাঁহার বাড়ী যাতায়াত আরম্ভ করিল। কিন্তু অচলা নিজে মহিমের প্রতি অচলাই রহিল। এবং পিতার আন্তরিক ইচ্ছার বিরুদ্ধেও অবশেষে মহিমকেই বরণ করিল। মহিম অচলাকে লইয়া তাহার পল্লী-গৃহে গমন করিল এবং মৃণাল নাম্নী তাহার এক বাল্য-সঙ্গিনীকে আনিয়া অচলার সাহচর্য্যে নিযুক্ত করিল। কিন্তু উভয়ের মধ্যে মতের ও মনের মিল হইল না। মৃণাল তাহার পতিগৃহে ফিরিয়া গেলে দুই-একদিনের মধ্যে সুরেশ তাহার বন্ধু ও বন্ধু-পত্নীর সহিত দেখা করিবার অছিলায় মহিমের বাটীতে উপস্থিত হইল। সে সেখানে দুই একদিন বাস করিতে না করিতে মহিমের খড়ো ঘর পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল।

পরদিন সকালেই অচলা স্বামীর অনুমতি লইয়া সুরেশের সমভিব্যাহারে বাপের বাড়ী ফিরিয়া আসিল। কিন্তু পিতা কন্যার এই অদ্ভুত আচরণে বিরক্ত ও সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিলেন। এবং নিজের মনের ভাব প্রকাশ করিতে বিলম্বও করিলেন না।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

কেদারবাবু সংসারের সাধারণ দশ-জনের মত দোষে-গুণে মানুষ। মেয়ের বিবাহে জামাই যাহাতে পাশ-করা হয়, অবস্থাপন্ন হয়, এই কামনাই করিয়াছিলেন। মহিম ভাল ছেলে, সে এম-এ পাশ করিয়াছে, দেশে তাহার অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান আছে, অতএব তাহার হাতে কন্যা সম্প্রদান করাকে তিনি সৌভাগ্য বলিয়াই গণ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ তাহার ধনাঢ্য বন্ধু সুরেশ যখন একদিন তাহার বাড়ীর গাড়ী করিয়া আসিয়া একটা উল্টা রকমের খবর দিয়া নিজেই জামাইগিরির উমেদার খাড়া হইল, তখন উভয় বন্ধুর মধ্যে আর্থিক সঙ্গতির হিসাব কষিয়া মহিমকে বরখাস্ত করিতে কেদার বাবুর মনের মধ্যে কোন আপত্তিই উঠিল না। তিনি ভালবাসার সূক্ষ্মতত্ত্বের বড় একটা ধার ধারিতেন না; তাঁহার বিশ্বাস ছিল, মেয়ে মানুষে যাহার কাছে গাড়ী পাল্‌কি চড়িয়া বস্ত্রালঙ্কার পরিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পায়, স্বামী হিসাবে তাহাকেই সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করে। সুতরাং মেয়েকে সুখী করাই যদি পিতার কর্ত্তব্য হয়, ত, এত বড় অযাচিত সুযোগ কোন মতেই যে হাত-ছাড়া করা উচিত নয়, ইহা স্থির করিতে তাঁহাকে অত্যন্ত বেশি চিন্তা করিতে হয় নাই।

এমন কি, বড়লোক জামাতার কাছে কর্জ্জ বলিয়া বিবাহের পূর্ব্বেই হাজার পাঁচেক টাকা লওয়াও তিনি দোষের মনে করেন নাই। এবং বাড়ীটা যখন তাহারই থাকিবে, তখন পরিশোধের দুশ্চিন্তাও তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে নাই।

অথচ, হতভাগা মেয়েটা সমস্ত পণ্ড করিয়া দিল,—কিছুতেই বাগ মানিল না। অতএব, শেষ-পর্য্যন্ত সেই মহিমের হাতেই তাঁহাকে মেয়ে দিতে হইল বটে, কিন্তু, এই দুর্ঘটনায় তাঁহার ক্ষোভের অবধি রহিল না। তা'ছাড়া, যে কথাটা এখন তাঁহাকে নিজের কাছে নিজে স্বীকার করিতে হইল, তাহা এই যে টাকাটা এইবার ফিরাইয়া দেওয়া

প্রয়োজন। কিন্তু জিনিসটা লেখাপড়ার মধ্যে না থাকায়, এবং পরিশোধের রাস্তাটাও খুব সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জল হইয়া চোখে না পড়ায়, ইহার চিন্তাটাকেও তিনি হৃদয়ের মধ্যে তেমন উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে পারিলেন না। সুতরাং প্রশ্নটা যদিচ মনের মধ্যে উঠিল বটে, কিন্তু উত্তরটা প্রায় তেম্‌নি ঝাপ্‌সা হইয়াই রহিল।

অচলা শ্বশুর বাড়ী চলিয়া গেল। ইহার পরে সুরেশের আসা-যাওয়া, ঘনিষ্ঠতা কেদার বাবু পছন্দ করিতেন না। বাটী নাই অজুহাতে অধিকাংশ সময়ে দেখাও দিতেন না। কিন্তু, তাহাকে ভালবাসিতেন বলিয়া, মেয়ের দুর্ব্যবহারে বৃদ্ধ অন্তরের মধ্যে লজ্জিত এবং দুঃখিত হইয়াই রহিলেন।

এই ভাবেই দিন কাটিতেছিল। কিন্তু, হঠাৎ একদিন তিনি অত্যন্ত অসুখে পড়িয়া গেলেন। সুরেশ আসিয়া চিকিৎসা করিয়া এবং নিজে পুত্রাধিক সেবা-যত্ন করিয়া তাঁহাকে আরোগ্য করিয়া তুলিল। তিনি স্বয়ং ঋণের উল্লেখ করিলে, সে তাহা বন্ধুকে যৌতুক দিয়াছে বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিল। সেই অবধি এই যুবকটির প্রতি তাঁহার স্নেহ প্রতিদিন গভীর ও অকৃত্রিম হইয়া উঠিতে লাগিল। এমন কি, সময়ে সময়ে কন্যার বিরুদ্ধে তাঁহার মনের মধ্যে অভিশাপের ন্যায় উদয় হইত, যে-দুর্ভাগা মেয়েটা এমন রত্ন চিনিল না, উপেক্ষা করিয়া ত্যাগ করিয়া গেল, সে যেন একদিন ইহার শাস্তি ভোগ করে।

এই ব্যাপারে মহিম তাঁহার দুচক্ষের বিষ হইয়া গিয়াছিল সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার কন্যা যে নারীধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া স্বামী-ত্যাগের গভীর দুষ্কৃতি সর্ব্বাঙ্গে বহিয়া তাঁহারই গৃহে আসিয়া উঠিবে, ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। এবং এই মহাপাপে যে ব্যক্তি সাহায্য করিয়াছে, সে যত বড় রত্নই হৌক, পিতার মনের ভাব যে তাহার বিরুদ্ধে কিরূপ বাঁকিয়া দাঁড়াইবে, ইহাও অনুমান করা কঠিন নহে।

অন্যপক্ষে, পিতার প্রতি কন্যার মনোভাব পূর্ব্বে যেমনই থাক্‌, যেদিন তিনি শুদ্ধমাত্র টাকার লোভেই মহিমকে বঞ্চিত করিয়া সুরেশের হাতে তাহাকে সমর্পণ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, এবং পরিশোধের কোন উপায় না থাকা সত্বেও তাহার কাছে ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেদিন হইতে মানুষ হিসাবে কেদার বাবু অচলার চক্ষে অত্যন্ত নামিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু সেই অশ্রদ্ধা শতগুণে বাড়িয়া গিয়াছিল কাল রাত্রে, যখন সে স্বকর্ণে শুনিতে পাইল, তিনি নিজের কন্যার চরিত্র সম্বন্ধে গোপনে দাসীর মতামত গ্রহণ করিতেও সঙ্কোচ বোধ করিলেন না।

কিন্তু সেই সঙ্গে অচলা আজ আপনাকেও দেখিতে পাইল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া চোখে পড়িল, যে-মুহূর্ত্তে সে স্বামীকে নিজের মুখে বলিয়াছে তাঁহাকে সে ভালবাসে না, সেই মুহূর্ত্তেই নারীর সর্ব্বোত্তম মর্য্যাদাও জগৎ সংসার হইতে তাহার জন্য মুছিয়া গেছে। তাই আজ সে স্বামীর কাছে ছোট, পিতার কাছে ছোট, নিজের পরিচারিকার কাছে ছোট, এমন কি সেই সুরেশের মত লোকের চক্ষেও আজ সে এত ছোট যে, তাহাকে লালসার সঙ্গিনী কল্পনা করাও তাহার পক্ষে আর দুরাশা নয়। কিন্তু সত্যই কি সে তাই? এম্‌নি ছোট? এই ত, সেদিন সে তাহার ভালবাসাকেই সর্ব্ব-জয়ী করিতে সমস্ত বিরোধ, সমস্ত প্রলোভন পায়ে দলিয়া উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল; আজ ইহারই মধ্যে সে কথা কি সবাই ভুলিয়াছে? তাহাকে সুরেশের সঙ্গে পাঠাইয়া দিয়াও স্বামী আর তাহার কোন সংবাদ লইলেন না। এই ঔদাসীন্যের নিগূঢ় অপমান ও লাঞ্ছনা তাহাকে সমস্ত রাত্রি যেন আগুন দিয়া পোড়াইতে লাগিল।

সকালে যখন ঘুম ভাঙিল তখন বেলা হইয়াছে। তরুণ সূর্য্যালোক খোলা জানালার ভিতর দিয়া ঘরের মেঝের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সে ধীরে ধীরে শয্যায় উঠিয়া বসিয়া শিয়রের জানালাটা খুলিয়া দিয়া বাহিরের পথের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

কলিকাতার রাজপথে জন-প্রবাহের বিরাম নাই। কেহ কাজে চলিয়াছে, কেহ ঘরে ফিরিতেছে, কেহ বা প্রভাতের আলোক ও হাওয়ার মধ্যে শুধু শুধু ঘুরিয়া বেড়াইতেছে;— চাহিয়া চাহিয়া হঠাৎ এক সময়ে তাহার মনে হইল, এ সময়ে কেহই ত ঘরে বসিয়া নাই,—আর আমিই বা যথার্থ কি এমন গুরুতর অপরাধ করিয়াছি, যাহাতে মুখ দেখাইতে পারি না,—আপনাকে আপনি আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি! অপরাধ যদি কিছু করিয়াই থাকি ত সে তাঁর কাছে। সে দণ্ড তিনিই দিবেন; কিন্তু নির্বিচারে যে কেহ শাস্তি দিতে আসিবে, তাহাই মাথায় পাতিয়া লইব কিসের জন্য?

অচলা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং সমস্ত গ্লানি যেন

জোর করিয়া ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া হাত মুখ ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া বসিবার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

কেদার বাবু তাঁহার আরাম কেদারায় বসিয়া খবরের কাগজ পাঠ করিতেছিলেন; একটিবার মাত্র মুখ তুলিয়াই আবার সংবাদ-পত্রের পৃষ্ঠায় মনঃসংযোগ করিলেন।

খানিক পরেই বেহারা কেৎলিতে গরম চায়ের জল এবং অন্যান্য সরঞ্জাম আনিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া গেলে, কেদার বাবু নিজে উঠিয়া আসিয়া নিজের জন্য এক পেয়ালা চা প্রস্তুত করিয়া লইলেন, এবং বাটিটি হাতে করিয়া নিঃশব্দে তাঁহার আরাম চৌকিতে ফিরিয়া গিয়া খবরের কাগজ লইয়া বসিলেন।

অচলা নতমুখে বসিয়া পিতার আচরণ সমস্ত লক্ষ্য করিল; কিন্তু নিজে যাচিয়া আজ তাঁহার চা তৈরি করিয়া দিতে, কিম্বা একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাহার সাহসও হইল না, ইচ্ছাও করিল না।

কিন্তু এক ঘরের মধ্যে এমন করিয়া কাঠের মূর্ত্তির মত মুখ বুজিয়া বসিয়া থাকাও অসম্ভব। এমন কি, এই ভাবে দীর্ঘকাল এক গৃহের মধ্যেও তাঁহার সহিত বাস করা সম্ভবপর এবং উচিত কি না, এবং না হইলেই বা সে কি উপায় করিবে, এই জটিল সমস্যার কোথাও একটু নিরালায় বসিয়া মীমাংসা করিয়া লইতে যখন সে উঠি-উঠি করিতেছিল, এমন সময়ে দুঃসহ বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল সুরেশ ঘরে প্রবেশ করিতেছে।

সে হাত তুলিয়া কেদার বাবুকে নমস্কার করিতে তিনি মুখ তুলিয়া মাথাটা একটু নাড়িয়া পুনশ্চ পড়ায় মন দিলেন।

সুরেশ চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল। চায়ের জিনিস-গুলা সরাইবার জন্য বেহারা ঘরে ঢুকিতেই তাহাকে কহিল, "আমার ব্যাগটা কোথায় আছে, আমার গাড়ীতে তুলে দাও ত। শেভ্ করবার জিনিসগুলো পর্য্যন্ত তার মধ্যে আছে। দেরি কোরো না, আমি এখ্খুনি যাবো।"

'যে আজ্ঞে' বলিয়া সে চলিয়া গেলে আবার সমস্ত কক্ষটা স্তব্ধ হইয়া রহিল। খানিক পরে সুরেশ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল "মহিমের কোন খবর পাওয়া গেল?"

কেদার বাবু মুখ না তুলিয়াই শুধু বলিলেন, না।

সুরেশ কহিল, আশ্চর্য্য!

তারপরে আবার সমস্ত চুপ-চাপ। বেহারা ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, ব্যাগ তাঁহার গাড়ীতে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

"আমি তা'হলে চল্লুম। মহিমের চিঠি এলে আমাকে একটু খবর পাঠাবেন," বলিয়া সুরেশ উঠিবার উপক্রম করিতেই সহসা কেদার বাবু হাতের কাগজখানা মাটিতে ফেলিয়া দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুমি একটু অপেক্ষা কর, সুরেশ, আমি আস্‌চি।" বলিয়া তাহার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত মাত্র না করিয়াই চটিজুতায় চটাপট্ শব্দ করিয়া একটু দ্রুত-বেগেই ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

এতক্ষণ অবধি অচলা অধোমুখেই ছিল। তিনি বাহির হইয়া যাইতেই বিস্মিত সুরেশ অকস্মাৎ মুখ ফিরাইতেই তাহার দৃষ্টি অচলার ত্রস্ত, পীড়িত ও একান্ত মলিন দুই চক্ষুর উপরে গিয়া পড়িল। জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি?"

অচলা মুখ আনত করিয়া শুধু মাথা নাড়িল।

সুরেশ বলিল, "আমি যে কত দুঃখিত, কত লজ্জিত হয়েচি, তা' বলে জানাতে পারিনে।"

অচলা অধোমুখে নীরবে বসিয়া রহিল।

সে পুনশ্চ কহিল, "তোমার বাবা যে আমাকে এমন হীন, এতবড় পাষণ্ড ভাব্‌তে পারেন, এ আমি স্বপ্নেও মনে করিনি।"

এ অভিযোগেরও অচলা কোন উত্তর দিল না, তেমনি স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

সুরেশ বলিল, "আমার এম্‌নি ইচ্ছে হচ্চে যে এখ্খুনি মহিমের কাছে ফিরে গিয়ে তাকে—" কথাটা শেষ হইতে পাইল না, কেদার বাবু ফিরিয়া আসিলেন।

তাঁহার হাতে একখানা ছোট কাগজ। সেই খানা সুরেশের সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া কহিলেন, "গড়িমসি করে তোমার সেই টাকাটার একখানা রসিদ দেওয়া আর ঘটে উঠেনি। পাঁচহাজার টাকার হ্যাণ্ডনোট লিখেই দিলুম,—সুদ বোধ হয় আর দিতে পারব না; তবে এই বাড়ীটা ত রইল, এর থেকে আসলটা শোধ হতে পারবেই।"

সুরেশ স্তম্ভিতের ন্যায় ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল, "আমি ত আপনার কাছে হ্যাণ্ড-নোট্ চাইনি কেদার বাবু!"

কেদার বাবু বলিলেন, "তুমি চাও নি সত্যি, কিন্তু

আমার ত দেওয়া উচিত। এতদিন যে দিইনি, সেই আমার যথেষ্ট অন্যায় হয়ে গেছে, সুরেশ; কাগজখানা তুমি পকেটে তুলে রাখো। বুড়ো হয়েছি,—হঠাৎ যদি মরে যাই, টাকাটা নিয়ে একটা গোল হতে পারে।"

সুরেশ আবেগের সহিত জবাব দিল,—"কেদার বাবু, সুরেশ আর যাই করুক, সে টাকা নিয়ে কথনো কারো সঙ্গে গোল করে না। তা' ছাড়া, আপনি নিজেও বেশ জানেন এ টাকা আমি চাইনে,—এ আমি আমার বন্ধুকে যৌতুক দিয়েচি।"

কেদার বাবু বলিলেন, "তা'হলে সে তোমার বন্ধুকেই দিয়ো, আমাকে নয়। আমি যা' নিয়েছি সে আমারই ঋণ!"

সুরেশ কহিল, "বেশ, আমার বন্ধুকেই দেবো," বলিয়া কাগজখানা টেবিল হইতে তুলিয়া লইয়া দুই পা পিছাইয়া গিয়া অচলার সম্মুখে দাঁড়াইবামাত্রই কেদারবাবু অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। চীৎকার করিয়া বলিলেন, "খবরদার, সুরেশ! কাল থেকে অনেক অপমান আমি নিঃশব্দে সহ্য করেচি, কিন্তু, আমার মেয়েকে আমার চোখের সাম্‌নে তুমি টাকা দিয়ে যাবে, সে আমার কিছুতেই সইবে না বলে দিচ্চি!" বলিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহার আরাম কেদারায় ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন।

প্রথমটা সুরেশ চমকিয়া কেদারবাবুর প্রতি নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তিনি ওইরূপে বসিয়া পড়িলে সে তাহার বিবর্ণ মুখ অচলার প্রতি ফিরাইয়া দেখিল, সে এক মুহূর্ত্তে যেন পাষাণ হইয়া গেছে। প্রবল চেষ্টায় একবার সুরেশ কি একটা বলিতেও গেল; কিন্তু তাহার শুষ্ক কণ্ঠ হইতে একটা অব্যক্ত ধ্বনি ভিন্ন স্পষ্ট কিছুই বাহির হইল না। আবার ফিরিয়া দেখিল কেদার বাবু দুই করতল মুখের উপর চাপিয়া ধরিয়া তেম্‌নি পড়িয়া আছেন। আর সে কোন কথা বলিবার চেষ্টাও করিল না, শুধু আড়ষ্টের মত আরও মিনিট খানেক স্তব্ধভাবে থাকিয়া অবশেষে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সে চলিয়া গেল, কিন্তু কন্যা ও পিতা ঠিক তেম্‌নি একভাবে বসিয়া রহিলেন; এবং দেয়ালের গায়ে বড় ঘড়িটার টিক্ টিক্ শব্দ ছাড়া সমস্ত কক্ষ ব্যাপিয়া কেবল একটা নিষ্ঠুর নীরবতা বিরাজ করিতে লাগিল।

নীচে সুরেশের রবার-টায়ারের গাড়ীখানা যে ফটক পার হইয়া গেল, তাহা ঘোড়ার খুরের শব্দে বুঝিতে পারা গেল, এবং পরক্ষণেই বেহারা ঘরে ঢুকিয়া ডাকিল, বাবু!

কেদারবাবু চোখ তুলিয়া দেখিলেন, তাহার হাতে একখণ্ড ছিন্ন কাগজ। আর কিছু বলিতে হইল না, তিনি লাফাইয়া উঠিয়া তাহার প্রতি দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "নিয়ে যা' বল্‌চি ব্যাটা, নিয়ে যা সুমুখ থেকে! বেরো বল্‌চি—"

হতবুদ্ধি বেহারাটা মনিবের কাণ্ড দেখিয়া দ্রুতপদে পলায়ন করিতেই, তিনি কন্যার প্রতি অগ্নি-দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া কণ্ঠস্বর আরও একপর্দ্দা চড়াইয়া দিয়া বলিলেন, "হারামজাদা নচ্ছার যদি আর কোনদিন কোন ছলে আমার বাড়ী ঢোক্‌বার চেষ্টা করে, ত তাকে পুলিশে দেব—এই আমি তোমাকে জানিয়ে রাখ্‌লুম অচলা!"

নিজের নাম শুনিয়া অচলা একান্ত পাণ্ডুর মুখখানি তাহার ধীরে ধীরে উন্নীত করিয়া ব্যথিত ম্লান চক্ষু দুটি পিতার মুখের প্রতি নিঃশব্দে মেলিয়া চাহিয়া রহিল। পিতা কহিলেন, "টাকা ছড়িয়ে বাপের চোখকে অন্ধ করা যায় না, পাষণ্ড যেন এ কথা মনে রাখে!"

কন্যা তথাপি নিরুত্তর হইয়াই রহিল; কিন্তু তাহার মলিন দৃষ্টি যে উত্তরোত্তর প্রখর হইয়া উঠিতে লাগিল, পিতার দৃষ্টিতে তাহা পড়িল না। তিনি তর্জ্জনী কম্পিত করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হাণ্ডনোট্ ছিঁড়ে ফেলে বাপকে ঘুষ দেওয়া যায় না, এ কথা আমি তাকে বুঝিয়ে তবে ছাড়্‌ব। এ বাড়ী আমি নিজে বিক্রী ক'রে নিজের ঋণ পরিশোধ কোরে যেখানে ইচ্ছে চলে যাবো—আমাকে কেউ আট্‌কাতে পারবে না তা' বলে রাখ্‌চি।"

এতক্ষণ পরে অচলা কথা কহিল। প্রথমটা বাধা পাইল বটে, কিন্তু, তারপরে স্থির অবিচলিত কণ্ঠে কহিল "ঋণ পরিশোধ না কোরে বাড়ীটা আমার জন্যে রেখে যাবে, এই কি আমি প্রত্যাশা করি বাবা? তুমি না করলেও ত এ কাজ আমাকেই কর্‌তে হোতো।"

কেদার বাবু অধিকতর উত্তেজিতভাবে জবাব দিলেন, "তোমরা যা' করে এসেছ, শুধু তাইতেই ত আমি ভদ্রসমাজে মুখ দেখাতে পারচিনে,—তা' তুমি জানো?"

অচলা তেম্‌নি শান্ত দৃঢ়স্বরে প্রত্যুত্তর দিল, "না, আমি

জানিনে। আমি এমন কিছু যদি করতুম বাবা, যার জন্যে তুমি মুখ দেখাতে পারো না, তা' হলে সকলের আগে আমার মুখই তোমরা কেউ দেখ্‌তে পেতে না। সে দেশে আর যারই অভাব থাক্‌, ডুবে মরবার মত জলের অভাব ছিল না।" বলিতে বলিতেই কান্নায় তাহার গলা ধরিয়া আসিল; কহিল, "কাল থেকে যে অপমান আমাকে তুমি কোরচ, শুধু মিথ্যে বলেই সইতে পেরেচি, নইলে—"

এইখানে তাহার একেবারে কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল। সে মুখের উপর আঁচল চাপিয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন কোনমতে সম্বরণ করিয়া দ্রুতবেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

কেদারবাবু একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। ক্রোধ করিবার, আঘাত করিবার, শোক করিবার, অর্থাৎ কন্যার নিন্দিত আচরণে সর্ব্বপ্রকার গভীর বিষাদের কারণ একমাত্র তাঁহারই ঘটিয়াছে, ইহাই ছিল তাঁহার বিশ্বাস; কিন্তু অপর পক্ষও যে অকস্মাৎ তাঁহারই আচরণকে অধিকতর গর্হিত বলিয়া মুখের উপর তিরস্কার করিয়া তীব্র অভিমানে কাঁদিয়া চলিয়া যাইতে পারে, এ সম্ভাবনা তাঁহার স্বপ্নেও উদয় হয় নাই। তাই অভিভূতের ন্যায় কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া তিনি আস্তে আস্তে বসিয়া পড়িলেন, এবং মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বারম্বার বলিতে লাগিলেন,—এই নাও,—এ আবার এক কাণ্ড!

ইহার পরে আট দশ দিন পিতা-পুত্রীর যে কি করিয়া কাটিল, সে শুধু অন্তর্যামীই দেখিলেন। অচলা কোনমতেই নিজের ঘর ছাড়িয়া বাহির হইল না, বাটীর চাকর দাসীর কাছেও মুখ দেখানো তাহার পক্ষে যেন অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বিগত কয় দিনের মত আজও সে পথের দিকে চাহিয়াই দিন কাটাইবার জন্য খোলা জানালায় আসিয়া বসিয়াছিল।

শীতের দিন, মধ্যাহ্নের সঙ্গেসঙ্গেই একটা ম্লান ছায়া যেন আকাশ হইতে মাটির উপরে ধীরে ধীরে ঝরিয়া পড়িতেছিল, এবং সেই মালিন্যের সহিত তাহার সমস্ত জীবনের কি একটা অজ্ঞাত সম্বন্ধ অন্তরের গভীর তলদেশে অনুভব করিয়া তাহার সমস্ত মন যেন এই স্বল্পায়ু বেলার মতই নিঃশব্দে অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল। তাহার চক্ষু যে ঠিক কিছু দেখিতেছিল তাহাও নহে, অথচ, অভ্যাসমত উপরে নীচে আশে পাশে কিছুই তাহার দৃষ্টি এড়াইতেছিল না। এম্‌নি একভাবে বসিয়া বেলা যখন আর বড় বাকি নাই, সহসা দেখিতে পাইল সুরেশের গাড়ী তাহাদের বাটীতে প্রবেশ করিতেছে। চক্ষের পলকে তাহার সমস্ত মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, এবং পুলিশ দেখিয়া চোর যে ভাবে উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করে, ঠিক তেমনি করিয়া সে জানালা হইতে ছুটিয়া আসিয়া একেবারে খাটের উপর শুইয়া পড়িল।

মিনিট কুড়ি পরে তাহার রুদ্ধ দরজায় ঘা পড়িল। এবং বাহির হইতে তাহার পিতা স্নিগ্ধস্বরে ডাক দিলেন, "মা অচলা, জেগে আছ কি?"

কিন্তু সাড়া না পাইয়া অধিকতর কোমল কণ্ঠে কহিলেন, "বেলা গেছে মা ওঠো। সুরেশের পিসীমা তোমাকে নিতে এসেছেন, মহিম না কি ভারি পীড়িত।"

অচলা শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া নীরবে দ্বার খুলিয়া দিতেই সুরেশের পিসি মা আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন।

অচলা হেঁট হইয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল।

কেদারবাবু সকলের পশ্চাতে ঘরে ঢুকিয়া শয্যার একান্তে বসিয়া কন্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তোমাদের চলে আসার পরে থেকেই মহিমের ভারি জ্বর। খুব সম্ভব রাত্রে হিম লেগে, দুশ্চিন্তায়, পরিশ্রমে, নানা কারণে এই অসুখটি হয়েছে।" বলিয়া সুরেশের পিসিকে উদ্দেশ করিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "আমি ভেবে সারা হয়ে যাচ্চি, এদের পাঠিয়ে দিয়ে পর্য্যন্ত সে একটা সম্বাদ দিলে না কেন। সুরেশ আমার দীর্ঘজীবী হোক, সে গিয়ে বুদ্ধি করে তাকে এখানে না এনে ফেল্‌লে কি যে হোতো তা' ভগবানই জানেন!" বলিয়া সস্নেহ অনুতাপে বৃদ্ধের গলা ধরিয়া আসিল।

অচলা নিঃশব্দ নতমুখে দাঁড়াইয়া সমস্ত শুনিল, কোন প্রশ্ন করিল না, কিছুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না।

সুরেশের পিসিমা অচলার বাহুর উপর তাঁহার ডান হাতখানি রাখিয়া শান্ত মৃদু কণ্ঠে বলিলেন, "ভয় নেই মা, সে দু'দিনেই ভাল হয়ে যাবে।"

অচলা কোন কথা না কহিয়া তাঁহাকে আর একবার নত হইয়া প্রণাম করিয়া আলনা হইতে শুধু গায়ের

কাপড়খানি টানিয়া লইয়া যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল।

এই শীতের অপরাহ্ণে, ঠাণ্ডার মধ্যে তাহাকে কিছুমাত্র গরম জামা-কাপড় না লইয়া, খালি পায়ে, অনভ্যস্ত সাজে বাহিরে যাইতে উদ্যত দেখিয়া বৃদ্ধ পিতার বুকে বাজিল; কিন্তু পুরোবর্ত্তী ওই বিধবার সজ্জার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আর তাঁহার বাধা দিতে প্রবৃত্তি হইল না। তিনি শুধু কেবল বলিলেন "চল মা, আমিও সঙ্গে যাচ্চি," বলিয়া চটি-জুতা পায়ে দিয়াই সকলের অগ্রে সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া চলিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

মহিমের প্রতি অচলার সকলের চেয়ে বড় অভিমান এই ছিল যে, স্ত্রী হইয়াও সে একটা দিনের জন্তও স্বামীর দুঃখ দুশ্চিন্তার অংশ গ্রহণ করিতে পায় নাই। এই লইয়া সুরেশও বন্ধুর সহিত ছেলেবেলা হইতে অনেক বিবাদ করিয়াছে, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। কৃপণের ধনের মত মহিম এই বস্তুটিকে সমস্ত সংসার হইতে চিরদিন এম্নি একান্ত করিয়া আগ্‌লাইয়া ফিরিয়াছে যে, তাহাকে দুঃখে দুঃসময়ে কাহারও সাহায্য করা দূরে থাক্, কি যে তাহার অভাব, কোথায় যে তাহার ব্যথা, ইহাই কোনদিন কেহ ঠাহর করিতে পারে নাই।

সুতরাং বাড়ী যখন পুড়িয়া গেল, তখন সেই পিতৃ-পিতামহের ভস্মীভূত গৃহস্তূপের প্রতি চাহিয়া মহিমের বুকে যে কি শেল বিঁধিল, তাহার মুখ দেখিয়া অচলা অনুমান করিতে পারিল না। মৃণালের বৈধব্যেও স্বামীর দুঃখের পরিমাণ করা তাহার তেম্নি অসাধ্য। যেদিন নিজের মুখে শুনাইয়া দিয়াছিল তাহাকে সে ভালবাসে না, সেদিন সে আঘাতের গুরুত্ব সম্বন্ধেও সে এম্নি অন্ধকারেই ছিল। অথচ এতবড় নির্ব্বোধও সে নহে যে, সর্ব্বপ্রকার দুর্ভাগ্যেই স্বামীর নির্ব্বিকার ঔদাসীন্তকে যথার্থই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে তাহার মনের মধ্যে কোন সংশয়ই উঁকি মারিত না। তাই সেদিন ষ্টেসনের উপরে সে স্বামীর অবিচলিত শান্ত মুখের প্রতি বারম্বার চাহিয়া সমস্ত পথটা শুধু এই কথাই ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছিল, সহিষ্ণুতার ওই মিথ্যা মুখোসের অন্তরালে তাহার মুখের সত্যকার চেহারাটা না জানি কিরূপ!

আজ তাহার পীড়ার সংবাদটাকে লঘু এবং স্বাভাবিক ঘটনার আকার দিবার জন্ত কেদারবাবু যখন সহজ গলায় বলিয়াছিলেন, তিনি কিছুই আশ্চর্য্য হন নাই, বরঞ্চ এতবড় দুর্ঘটনার পরে এম্নিই কিছু একটা মনে মনে আশঙ্কা করিতেছিলেন, তখন অচলার নিজের অন্তরে যে ভাব এক মুহূর্ত্তের জন্তও আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহাকে অবিমিশ্র উৎকণ্ঠা বলাও সাজে না।

সুরেশের রবার টায়ারের গাড়ী দ্রুতবেগেই চলিয়াছিল। পিসিমা একদিকের দরজা টানিয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন, এবং তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া অচলা প্রাথরের মূর্ত্তির মত স্থির হইয়া ছিল। শুধু কেদারবাবু কাহারো কাছে কোন উৎসাহ না পাইয়াও পথের দিকে শূন্ত দৃষ্টি পাতিয়া অনর্গল বকিতেছিলেন। সুরেশের মত দয়ালু, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ছেলে ভূভারতে নাই; মহিমের এক-গুঁয়েমির জ্বালায় তিনি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন; যে দেশে মানুষ নাই, ডাক্তার-বৈদ্য নাই, শুধু চোর ডাকাত আর শিয়াল-কুকুরের বাস, সেই পাড়াগাঁয়ে গিয়া বাস করার শাস্তি একদিন তাহাকে ভাল করিয়াই ভোগ করিতে হইবে; এম্নি সমস্ত সংলগ্ন অসংলগ্ন মন্তব্য তিনি নিরন্তর এই দুটি নির্ব্বাক রমণীর কর্ণে নির্ব্বিচারে ঢালিয়া চলিতে-ছিলেন।

ইহার কারণও ছিল। কেদারবাবু স্বভাবতঃই যে এতটা হাল্কা প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাহা নহে। কিন্তু আজ তাঁহার হৃদয়ের গূঢ় আনন্দ কোন সংযমের শাসনই মানিতেছিল না। তাঁহাদের পরম মিত্র সুরেশের সহিত প্রকাশ্য বিবাদ, একমাত্র কন্যার নিঃশব্দ বিদ্রোহ এবং সর্ব্বোপরি একান্ত কুৎসিত ও কদর্য্য সংশয়ের গোপন গুরুভার বিগত কয়েকদিন হইতে তাঁহার বুকের উপর জাঁতার মত চাপিয়া বসিয়াছিল; আজ পিসিমার অপ্রত্যাশিত আগমনে সেই ভারটা অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল। মহিমের অসুখের খবরটাকে তিনি মনের মধ্যে আমলই দেন নাই। যদি বা সে রাত্রির দৈব দুর্ব্বিপাকে ঠাণ্ডা লাগিয়া একটু জ্বরভাবই হইয়া থাকে, ত সে কিছুই নহে। পিসিমা দুই-তিন দিনের মধ্যে আরোগ্য হইবার আশা দিয়াছিলেন; হয় ত সে সময়ও লাগিবে না, হয় ত কাল সকালেই সারিয়া যাইবে। পীড়ার

সম্বন্ধে ইহাই তিনি ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু আসল কথা হইতেছে এই যে, সুরেশ স্বয়ং গিয়া তাহাকে আপনার বাড়ীতে ধরিয়া আনিয়াছে, এবং যে-কোন-ছলে তাহার স্ত্রীকে আনিবার জন্য নিজের পিসিমাকে পর্য্যন্ত পাঠাইয়া দিয়াছে! কন্যা-জামাতার মধ্যে যে কিছুকাল হইতে একটা মনোমালিন্য চলিয়া আসিতেছিল, দাসীর মুখের এ তথ্যটি তিনি একবারও বিস্মৃত হন নাই। অতএব, সমস্তই যে সেই দাম্পত্য-কলহের ফল, আজ এই সত্য পরিস্ফুট হওয়ায়, এই অবিশ্রাম বকুনির মধ্যেও তাঁহার নিরতিশয় আত্মগ্লানির সহিত মনে হইতে লাগিল, ওখানে পৌঁছিয়া সেই সম্পূর্ণ নিরপরাধ ও ভদ্র যুবকের মুখের পানে তিনি চাহিয়া দেখিবেন কি করিয়া? কিন্তু তাঁহার কন্যার সর্ব্বদেহের উপর একটা কঠিন নীরবতা স্থির হইয়া বিরাজ করিতে লাগিল। অসুখটা যে বিশেষ কিছুই নহে, তাহা সেও মনে মনে বুঝিয়াছিল, শুধু বুঝিতে পারিতেছিল না সুরেশ তাঁহাকে ধরিয়া আনিল কিরূপে! স্বামীকে সে এটুকু চিনিয়াছিল।

সন্ধ্যা হইয়া গেছে। রাস্তায় গ্যাস জ্বলিয়া উঠিয়াছে। গাড়ী সুরেশের বাটীর ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং গাড়ী-বারান্দার অনতিদূরে আসিয়া থামিল। কেদারবাবু গলা বাড়াইয়া দেখিয়া সহসা উদ্বিগ্ন স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "দু'খানা গাড়ী দাঁড়িয়ে কেন?" সঙ্গে সঙ্গেই অচলার চকিত দৃষ্টি গিয়া তাহার উপরে পড়িল, এবং লণ্ঠনের আলোকে স্পষ্ট দেখিতে পাইল, সুরেশ একজন প্রবীণ ইংরাজকে সসম্ভ্রমে গাড়ীতে তুলিয়া দিতেছে, এবং আরও একজন সাহেবী-পোষাক-পরা বাঙ্গালী পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। ইঁহারা যে ডাক্তার, তাহা উভয়েই চক্ষের পলকে বুঝিতে পারিল।

তাঁহারা চলিয়া গেলে ইঁহাদের গাড়ী আসিয়া গাড়ী-বারান্দায় লাগিল। সুরেশ দাঁড়াইয়াই ছিল; কেদারবাবু চীৎকার করিয়া প্রশ্ন করিলেন, "মহিম কেমন আছে সুরেশ? অসুখটা কি?"

সুরেশ কহিল, "ভাল আছে। আসুন।"

কেদারবাবু অধিকতর ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অসুখটা কি, তাই বল না শুনি?"

সুরেশ কহিল, "অসুখের নাম করলে ত আপনি বুঝতে পারবেন না কেদার বাবু। জ্বর, বুকে একটু সর্দ্দি বসেছে। কিন্তু আপনি নেমে আসুন, ওঁদের নামতে দিন।"

কেদার বাবু নামিবার চেষ্টামাত্র না করিয়া বলিলেন, "একটু সর্দ্দি বসেছে, তার চিকিৎসা ত তুমি নিজেই করতে পার। আমি ছেলেমানুষ নই সুরেশ, দু'জন ডাক্তার কেন? সাহেব ডাক্তারই বা ক্লিসের জন্যে?" বলিতে বলিতেই তাঁহার গলা কাঁপিয়া গেল।

সুরেশ নিকটে আসিয়া হাত ধরিয়া তাঁহাকে নামাইয়া লইয়া বলিল, "পিসিমা, অচলাকে ভেতরে নিয়ে যাও, আমি যাচ্চি।"

অচলা কাহাকেও কোন প্রশ্ন করিল না। তাহার মুখের চেহারাও অন্ধকারে দেখা গেল না; নামিতে গিয়া পা'দানের উপর তাহার পা যে টলিতে লাগিল, ইহাও কাহারও চোখে পড়িল না; সে যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল, তেম্‌নি নিঃশব্দে নামিয়া পিসিমার পিছনে পিছনে বাটীর ভিতরে চলিয়া গেল।

মিনিট কয়েক পরে দ্বারের ভারি পর্দ্দা সরাইয়া যখন সে রোগীর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন মহিম বোধ করি তাহার বাটীর সম্বন্ধেই কি সব বলিতেছিল। সেই জড়িত কণ্ঠের দুটা কথা কানে প্রবেশ করিবামাত্রই আর তাহার বুঝিতে বাকি রহিল না ইহা অর্থহীন প্রলাপ, এবং রোগ কতদূরে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। মুহূর্ত্তকালের জন্য সে দেয়ালের গায়ে ভর দিয়া আপনাকে দৃঢ় করিয়া রাখিল।

যে মেয়েটি রোগীর শিয়রে বসিয়া বরফ দিতেছিল, সে ফিরিয়া চাহিল এবং ধীর পদে উঠিয়া আসিয়া অচলাকে হেঁট হইয়া প্রণাম করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল। ইহার বিধবার বেশ। চুলগুলি ঘাড় পর্য্যন্ত ছোট করিয়া ছাঁটা; ইহার মুখের উপর সর্ব্বকালের সকল বিধবার বৈরাগ্য যেন নিবিড় হইয়া বিরাজ করিতেছিল। ম্লান দীপালোকে প্রথমে ইহাকে মৃণাল বলিয়া অচলা চিনিতে পারে নাই; এখন মুখোমুখী স্থির হইয়া দাঁড়াইতেই ক্ষণকালের জন্য উভয়েই যেন স্তম্ভিত হইয়া রহিল;—একবার অচলার সমস্ত দেহ দুলিয়া নড়িয়া উঠিল; কি একটা বলিবার জন্য ওষ্ঠাধরও কাঁপিতে লাগিল; কিন্তু কোন কথাই তাহার মুখ ফুটিয়া বাহির হইল না, এবং পরক্ষণেই তাহার সংজ্ঞাহীন দেহ ছিন্ন লতার মত মৃণালের পদমূলে পড়িয়া গেল।

চেতনা পাইয়া অচলা চাহিয়া দেখিল, সে পিতার ক্রোড়ের উপর মাথা রাখিয়া একটা কোচের উপর শুইয়া আছে। একজন দাসী গোলাপ-জলের পাত্র হইতে তাহার চোখে-মুখে ছিটা দিতেছে, এবং পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সুরেশ একখানা হাত-পাখা লইয়া ধীরে ধীরে বাতাস করিতেছে।

ব্যাপারটা কি হইয়াছে স্মরণ করিতে তাহার কিছুক্ষণ লাগিল। কিন্তু মনে পড়িতেই লজ্জায় মরিয়া গিয়া শশব্যস্তে উঠিয়া বসিবার উপক্রম করিতেই কেদারবাবু বাধা দিয়া কহিলেন, "একটু বিশ্রাম কর মা, এখন উঠে কাজ নেই।"

অচলা মৃদুকণ্ঠে বলিল, "না বাবা, আমি বেশ ভাল হয়ে গেছি," বলিয়া পুনরায় বসিবার চেষ্টা করিতে পিতা জোর করিয়া ধরিয়া রাখিয়া উদ্বেগের সহিত বলিলেন, "এখন ওঠবার কোন আবশ্যক নেই অচলা, বরঞ্চ একটুখানি ঘুমোবার চেষ্টা কর।"

সুরেশও অস্ফুটে বোধ করি এই কথারই অনুমোদন করিল। অচলা নীরবে একবার তাহার মুখের পানে চাহিয়া প্রত্যুত্তরে কেবল পিতার হাতখানা ঠেলিয়া দিয়া সোজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "ঘুমোবার জন্যে ত এখানে আসিনি বাবা—আমার কিছুই হয়নি—আমি ও-ঘরে যাচ্চি।" বলিয়া প্রতিবাদের অপেক্ষা না করিয়া বাহির হইয়া গেল।

এ বাটীর ঘর-দ্বার সে বিস্মৃত হয় নাই; রোগীর কক্ষ চিনিয়া লইতে তাহার বিলম্ব হইল না। প্রবেশ করিতেই মৃণাল চাহিয়া দেখিল, কহিল, "তুমি এসে একটুখানি বোসো সেজদি, আমি আহ্নিকটা সেরে নিইগে। বরফের টুপিটা গড়িয়ে না পড়ে যায়, একটু নজর রেখো।" বলিয়া সে অচলাকে নিজের যায়গায় বসাইয়া দিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

কঠিন নিমোনিয়া রোগ সারিতে সময় লাগিবে। কিন্তু মহিম ধীরে ধীরে যে আরোগ্যের পথেই চলিয়াছিল, এযাত্রায় আর তাহার ভয় নাই, এ কথা সকলের কাছেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার মুখের অর্থহীন বাক্য, চোখের উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি ক্রমশঃই শান্ত, এবং স্বাভাবিক হইয়া আসিতেছিল।

দিন দশেক পরে একদিন অপরাহ্ণ বেলায় মহিম শান্তভাবে ঘুমাইতেছিল। এ বৎসর সর্ব্বত্রই শীতটা একটু বেশি পড়িয়াছিল। তাহাতে এইমাত্র বাহিরে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে; রোগীর খাটের সহিত একটা বড় তক্তপোষ জোড়া দিয়া বিছানা করা হইয়াছিল; ইহার উপরেই সকলে বেশ করিয়া কাপড় গায়ে দিয়া বসিয়া ছিল। সকলের চোখে-মুখেই একটা নিরুদ্বিগ্ন তৃপ্তির প্রকাশ; শুধু পিসিমা গৃহকর্ম্মে অন্যত্র নিযুক্ত, এবং কেদারবাবু তখনও বাড়ী হইতে আসিয়া জুটিতে পারেন নাই।

সুরেশের প্রতি চাহিয়া মৃণাল হঠাৎ হাত জোড় করিয়া কহিল, "এইবার আমার ছাড়-পত্র মঞ্জুর করতে হুকুম হোক্ সুরেশবাবু, আমি দেশে যাই। এই দারুণ শীতে আমার বুড়ী শাশুড়ী হয় ত বা মরেই গেল।"

সুরেশ কহিল, "এখনও কি তাঁর বেঁচে থাকা দরকার না কি? না, তাঁর জন্য আপনার যাওয়া হবে না।" মৃণাল পলকের তরে ঘাড় ফিরাইয়া বোধ করি বা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসই চাপিয়া লইল; তাহার পরে সুরেশের মুখের পানে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "শুধু আপনিই নয় সুরেশবাবু, এ প্রশ্ন পূর্ব্বে আমিও অনেকবার করেছি। মনেও হয় এখন তাঁর যাওয়াই মঙ্গল। কিন্তু মরণ-বাঁচনের মালিক যিনি, তাঁর ত সে খেয়াল নেই, থাকলে হয় ত সংসারে অনেক দুঃখ-কষ্টের হাত থেকেই মানুষ নিস্তার পেত।"

অচলা এতক্ষণ চুপ করিয়াই ছিল। মৃণালের কথায় বোধ করি তাহার স্বামীর মৃত্যুর কথাটাই মনে করিয়া কহিল, "তার মানে, যিনি অন্তর্যামী তিনি জানেন মানুষ শত দুঃখেও নিজের মৃত্যু চায় না।" মৃণালের মুখের উপর একটা গোপন বেদনার চিহ্ন প্রকাশ পাইল। মাথা নাড়িয়া কহিল, "না সেজদি, তা নয়। এমন সময় সত্যিই আসে, যখন মানুষে যথার্থ ই মরণ কামনা করে। সেদিন অনেক রাত্রে হঠাৎ তন্দ্রা ভেঙে যেতে শাশুড়ী ঠাকরুণকে বিছানায় পেলুম না। তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দেখি, ঠাকুর-ঘরের দরজাটা একটু খোলা। চুপি চুপি পাশে এসে দাঁড়ালুম। দেখি, তিনি গলায় কাপড় দিয়ে ঠাকুরের কাছে কর-জোড়ে মৃত্যু ভিক্ষে চাইচেন। বল্‌ছেন, ঠাকুর! যদি একটা দিনও কায়মনে তোমার সেবা করে থাকি, ত আজ আমার লজ্জা নিবারণ কর। আমি মুক্তি চাইনে, স্বর্গ চাইনে,

শুধু এই চাই, ঠাকুর, তুমি আর আমাকে লজ্জা দিয়ো না—আমি এ মুখ আর আমার বৌমার কাছে বার করতে পারচিনে!" বলিতে বলিতেই মৃণাল ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

এই প্রার্থনার মধ্যে মাতৃ-হৃদয়ের কতবড় সুগভীর বেদনা যে নিহিত ছিল, তাহা কাহারও অনুভব করিতে অবশিষ্ট রহিল না। সুরেশের দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। কাহারও সামান্য দুঃখেই সে কাতর হইয়া পড়িত; আজ এই সন্তানহারা বৃদ্ধা জননীর মর্ম্মান্তিক দুঃখের কাহিনীতে তাহার বুকের মধ্যে ঝড় বহিতে লাগিল। সে খানিকক্ষণ স্তব্ধভাবে মাটির দিকে চাহিয়া থাকিয়া মুখ তুলিয়া অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা যাও দিদি, তোমার বুড়ো শাশুড়ীর সেবা করে কর্ত্তব্য করগে, আমি আর তোমাকে আট্‌কে রাখ্‌ব না। এই হতভাগা দেশের আজও যদি কিছু গৌরব করবার থাকে, ত সে তোমার মত মেয়ে মানুষ। এমন জিনিসটি বোধ করি আর কোন দেশ দেখাতে পারে না!" বলিয়া সে জিজ্ঞাসু মুখে একবার অচলার প্রতি চাহিল। কিন্তু সে জানালার বাহিরে একখণ্ড ধূসর মেঘের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নিঃশব্দে বসিয়া ছিল, বলিয়া তাহার কাছে হইতে কোন সাড়া আসিল না।

কিন্তু মৃণাল লজ্জা পাইয়া নিজের দিক হইতে আলোচনাটাকে অন্য পথে সরাইবার জন্য তাড়াতাড়ি জোর করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "না, নেই বই কি! আপনি সব দেশের খবর জানেন কি না! আচ্ছা, সেজদার চেয়ে আপনি বড় না ছোট?"

এই অদ্ভুত প্রশ্নে সুরেশ সহাস্যে কহিল, কেন বলুন ত?

মৃণাল বাধা দিয়া বলিল, "না, আমাকে আর আপনি নয়। আমি দিদি হলেও যখন বয়সে ছোট, তখন—মেজ্‌দা? ন'দা?—বলুন, বলুন, শীগ্‌গীর বলুন কি?"

অচলা আকাশ হইতে দৃষ্টি অপসারিত করিয়া এবার তাহার দিকে চাহিল। অনেক দিন পূর্ব্বে যেদিন এই মেয়েটি এম্‌নি দ্রুত, এম্‌নি অবলীলাক্রমে তাহার সহিত 'সেজ্‌দি' সম্বন্ধ পাতাইয়া লইয়াছিল, সে কথা তাহার মনে পড়িল। কিন্তু, মৃণালের চরিত্রের এই দিক্‌টা সুরেশের জানা ছিল না বলিয়া সে এই আশ্চর্য্য রমণীর মুখের পানে তাকাইয়া সকৌতুক হাস্যে বলিল, "ন'দা! ন'দা! তোমার সেজ্‌দার চেয়ে আমি প্রায় দেড় বছরের ছোট।"

মৃণাল কহিল, "তা'হলে ন'দা, দয়া করে একটি লোক ঠিক করে দিন যে আমাকে কাল সকালের গাড়ীতেই রেখে আস্‌বে।"

যাইবার অনুমতি এইমাত্র সুরেশ নিজে দিলেও সে যে কাল সকালেই যাইতে উদ্যত হইবে, তাহা সে ভাবে নাই। তাই ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া ঈষৎ গম্ভীর হইয়া বলিল, "আর দুটো দিনও কি থাক্‌তে পার্‌বে না দিদি? তোমার ওপর ভার দিয়ে আমরা মহিমের জন্যে একেবারে নিশ্চিন্ত ছিলুম। এমন অহর্নিশি সতর্ক, এমন গুছিয়ে সেবা কর্‌তে আমি হাঁসপাতালেও কথনো কাউকে দেখেচি বলে মনে হয় না। কি বল অচলা?"

প্রত্যুত্তরে অচলা শুধু মাথা নাড়িল।

মৃণাল সুরেশের চিন্তিত ভাব লক্ষ্য করিয়া হাসিমুখে বলিল, "আপনি সে জন্যে একটুও ভাব্‌বেন না। যার জিনিস তারই হাতে দিয়ে যাচ্চি,—নইলে আমিও হয় ত যেতে পার্‌তুম না। আপনার ত মনে আছে, আমাদের কি রকম তাড়াতাড়ি চলে আস্‌তে হয়েছিল। তাই, কোন বন্দোবস্ত করেই আসা হয়নি। কাল আমাকে ছুটি দিন ন'দা, আবার যখনি হুকুম কর্‌বেন তখনি চলে আসব।"

সুরেশ আবার কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া, সহসা বলিয়া বসিল, "আচ্ছা, মৃণাল, সেই অজ পাড়াগাঁয়ে শুধু কেবল একটা বুড়ো শাশুড়ীর সেবা করে, আর পুজো-আহ্নিক করে তোমার সমস্ত সময়টা কাট্‌বে কি করে? আমি তাই শুধু ভাবি।"

মৃণালের মুখের উপর পুনরায় ব্যথার চিহ্ন প্রকাশ পাইল। কিন্তু সে হাসিয়া কহিল, "সময় কাটাবার ভার ত আমার ওপর নেই ন'দা। যিনি সময় সৃষ্টি করেছেন, তিনিই তার ব্যবস্থা কর্‌বেন।"

সুরেশ কহিল, "আচ্ছা, সে যেন হোলো। কিন্তু তোমার শাশুড়ী ত বেশী দিন বাঁচবেন না, আর মহিমকেও ডাক্তারের হুকুম মত ভাল হয়ে পশ্চিমের কোন একটা স্বাস্থ্যকর সহরে গিয়ে কিছুকাল বাস কর্‌তে হ'বে। তখন, একলাটি সেখানে তুমি থাক্‌বে কি করে?"

মৃণাল উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া পুনরায় একটু হাসিল। কহিল, "সে উনিই জানেন।"

অজ্ঞাতসারে সুরেশের মুখ দিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল। মৃণাল কহিল, "ন'দা বুঝি এসব মানেন না?"

"কি সব?"

"এই যেমন ভগবান—"

"না।"

"তবে বুঝি আমাদের জন্যে ওটা আপনার অবজ্ঞার দীর্ঘনিঃশ্বাস বয়ে গেল ন'দা?"

সুরেশ এ প্রশ্নের সহসা কোন উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ বিমনার মত তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ ঘাড় নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "না মৃণাল, তা' নয়। একটা অজানা ভবিষ্যতের ভার তেম্‌নি অজানা একটা ঈশ্বরের ওপরে দিয়ে তারা যে বরঞ্চ আমাদের চেয়ে জিতের পথেই চলে তা' আমি অনেক দেখেচি। কিন্তু এ সব আলোচনা থাক্ দিদি, হয় ত আমার প্রতি তোর একটা ঘৃণা জন্মে যাবে।"

মৃণাল তাড়াতাড়ি হেঁট হইয়া সুরেশের দুই পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া কহিল, "আচ্ছা, থাক্।"

সুরেশ বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া কহিল, "এটা আবার কি হ'ল মৃণাল?"

"কোন্‌টা ন'দা?"

"কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ এই পায়ের ধূলো নেওয়াটা?"

মৃণাল কহিল, "বড় ভাইয়ের পায়ের ধূলো নিতে কি আবার দিন ক্ষণ দেখাতে হয় না কি?" বলিয়া হাসিয়া উঠিয়া গেল।

"আচ্ছা মেয়ে ত!" বলিয়া সস্নেহ হাস্যে সুরেশ অচলার মুখের প্রতি চাহিতে গিয়া বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হইয়া গেল। তাহার সমস্ত মুখ শ্রাবণ-আকাশের মত ঘন মেঘে যেন আচ্ছন্ন হইয়া গেছে এম্‌নি বোধ হইল। কিন্তু বিস্ময়ের ধাক্কা সাম্‌লাইয়া এ সম্বন্ধে কোন প্রকার প্রশ্নের আভাস মাত্র দিবার পূর্ব্বেই অচলা হতবুদ্ধি সুরেশকে আকাশ-পাতাল ভাবিবার অজস্র অবকাশ দিয়া ত্বরিত পদে মৃণালের প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

সেইখানে স্তব্ধ ভাবে বসিয়া সুরেশ কেবলি আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, এ কিসে কি হইল! মৃণালের প্রণাম করার সঙ্গে ইহার কেমন করিয়া যেন একটা নিগূঢ় যোগ আছে, তাহা সে নিজের ভিতর হইতেই নিশ্চয় অনুমান করিতে লাগিল; কিন্তু এ যোগ কোথায়? কেন মৃণাল অকস্মাৎ তাহার পদধূলি মাথায় লইয়া চলিয়া গেল, এবং পলক না ফেলিতে কেনই বা অচলা ওরূপ বিবর্ণ মুখে ঘর ছাড়িয়া প্রস্থান করিল! নিজের ব্যবহার ও কথাবার্তাগুলা সে আগাগোড়া বারম্বার তন্ন তন্ন করিয়া স্মরণ করিয়াও কিন্তু কোন কুল-কিনারা খুঁজিয়া পাইল না। অথচ, পাশাপাশি এত বড় দুটা ঘটনাও কিছু শুধু শুধু ঘটে নাই, তাহাও সে বুঝিল। সুতরাং তাহারই কোন অজ্ঞাত নিন্দিত আচরণই যে এই অনর্থের মূল, এ সংশয় তাহার মনের মধ্যে কাঁটার মত বিঁধিতে লাগিল।

কিন্তু মৃণালকেও এ সম্বন্ধে কোন প্রকার প্রশ্ন করা অসম্ভব। রাত্রিটা সে এক রকম পাশ কাটাইয়া রহিল, এবং প্রভাতে এক সময়ে অচলাকে নিভৃতে পাইয়া কহিল, "তোমাকে একটা কথার জবাব দিতে হবে।"

অচলার মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। প্রশ্নটা যে কি, সে তাহার অগোচর ছিল না। গত রাত্রির সেই তাহার অদ্ভুত আচরণের এইবার কৈফিয়ৎ দিতে হইবে বুঝিয়া সে আরক্তমুখে মৃদুকণ্ঠে কহিল, "কি কথা?"

সুরেশ আস্তে আস্তে বলিল, "কাল মৃণাল হঠাৎ আমার পায়ের ধূলো নিয়ে উঠে গেল, তুমি মুখ ভার করে রাগ করে চলে গেলে, সে কি তার শাশুড়ীর মরণের কথা বলেছিলুম বলে?"

এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে অচলা একটা পথ দেখিতে পাইয়া মনে মনে খুসি হইয়া বলিল, "এ রকম প্রসঙ্গ কি তোমার তোলা উচিত ছিল? সে বেচারার স্বামী নেই, শাশুড়ীর মৃত্যুতে তার নিঃসহায় অবস্থাটা একবার ভেবে দেখ দিকি!"

সুরেশ অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া কহিল, "আমার ভারি অন্যায় হয়ে গেছে। কিন্তু, তিনি যে আর বেশি দিন বাঁচতে পারেন না, এ তো মৃণাল নিজেও বোঝে। তা' ছাড়া সে নিঃসহায় হবেই বা কেন?"

অচলা জবাব দিল, "এ কথা আমরা ত তাকে একবারও

বলিনি। বরঞ্চ তুমিই তাকে নানা রকমে ভয় দেখালে, দেশে সে একলাটি থাক্‌বে কেমন কোরে।”

সুরেশ অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “তা’হলে সে যাবার পূর্ব্বে আমার কি তাকে সাহস দেওয়া উচিত নয়? তার যে কোন ভয় নেই এ কথা কি তাকে—”

বলিতে বলিতেই অকৃত্রিম করুণায় তাহার কণ্ঠ সজল হইয়া আসিল।

অচলা তাহার মুখের পানে চাহিয়া হাসিল। এই পরদুঃখ-কাতর সহৃদয় যুবকের সহস্র দয়ার কাহিনী তাহার ত্বক্কে নিমিষে মনে পড়িয়া গেল। ঘাড় নাড়িয়া বলিল, “না, তোমার সাহস দিতেও হবে না, ভয় দেখিয়েও কাজ নেই। যখন সে সময় আস্‌বে তখন আমি চুপ করে থাক্‌ব না।”

সুরেশ আত্মবিস্মৃত আবেগভরে অকস্মাৎ তাহার হাতখানা সজোরে চাপিয়া ধরিয়া প্রচণ্ড একটা নাড়া দিয়া বলিয়া উঠিল, “এই ত তোমার যোগ্য কথা! এই ত তোমার কাছে আমি চাই অচলা!” বলিয়া ফেলিয়াই কিন্তু অপরিসীম লজ্জায় হাত ছাড়িয়া দিয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

তাহার যে উচ্ছ্বাস মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে পরার্থতার নির্ম্মল আনন্দের মধ্যে জন্ম লাভ করিয়াছিল, এই লজ্জিত পলায়নে তাহা এক নিমিষেই কদর্য্য কলুষিত হইয়া দেখা দিল। অচলার বুকের রক্ত বিদ্যুদ্বেগে প্রবাহিত হইয়া বিন্দু বিন্দু ঘামে ললাট ভরিয়া উঠিল, এবং সর্ব্বাঙ্গ বারম্বার শিহরিয়া উঠিয়া নিকটবর্ত্তী একখানা চেয়ারের উপর সে নির্জ্জীবের মত বসিয়া পড়িল। কিছুক্ষণে তাহার সে ভাবটা কাটিয়া গেল বটে, কিন্তু পীড়িত স্বামীর শয্যায় গিয়া নিজের আসনটি গ্রহণ করিতে আজ সমস্ত সকালটা তাহার কেমন যেন ভয়-ভয় করিতে লাগিল।

যাই-যাই করিয়াও যাইতে মৃণালের দিন দুই দেরি হইয়া গেল। মহিমের কাছে বিদায় লইতে গিয়া দেখিল আজ সে পাশ ফিরিয়া অত্যন্ত অসময়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। যে বিদায় লইতে আসিয়াছিল, সে এই মিথ্যা-নিদ্রার হেতু নিশ্চিত অনুমান করিয়াও চুপি-চুপি কহিল, “ওঁকে আর জাগিয়ে কাজ নেই সেজ্‌দি, কি বল?” প্রত্যুত্তরে অচলার ঠোঁটের কোণে শুধু একটুখানি বাঁকা হাসি দেখা দিল। মৃণাল মনে মনে বুঝিল এ ছলনা সে ছাড়াও আরো একটি নারীর কাছে প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার বিরুদ্ধে মৃণাল অন্তরের মধ্যে যে গোপন ঈর্ষার ভাব পোষণ করে, তাহা সে মহিমের কাছে কোন দিন আভাস মাত্র না পাইয়াও জানিত। এই একান্ত অমূলক দ্বেষ তাহাকে কাঁটার মত বিঁধিত। কিন্তু, তথাপি অচলা যে নিজের হীনতা দিয়া আজিকার দিনেও ওই পীড়িত লোকটির পবিত্র দুর্ব্বলতাটুকুকে বিকৃত করিয়া দেখিবে, তাহা সে ভাবে নাই। মুহূর্ত্ত-কালের নিমিত্ত তাহার মনটা জ্বালা করিয়া উঠিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইলা কানে কানে কহিল, “তুমি ত সব জানো সেজদি, আমার হয়ে ওঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ো। বোলো, ভাল হয়ে আবার যখন দেশে ফির্‌বেন, বেঁচে থাকি ত দেখা হবে।”

নীচে কেদারবাবু বসিয়া ছিলেন। মৃণাল প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই তাঁহার চোখের কোণে জল আসিয়া পড়িল। এই অল্পকালের মধ্যেই সকলের মত তিনিও এই বিধবা মেয়েটিকে অতিশয় ভাল বাসিয়াছিলেন। জামার হাতায় অশ্রু মুছিয়া কহিলেন, “মা, তোমার কল্যাণেই মহিমকে আমরা যমের মুখ থেকে ফিরে পেয়েছি। যখনি ইচ্ছে হবে, যখনি একটু বেড়াবার সাধ হবে, তোমার এই বুড়ো ছেলেটিকে ভুলো না মা। আমার বাড়ী তোমার জন্যে রাত্রি দিন খোলা থাক্‌বে মৃণাল।”

অচলা অদূরে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল; মৃণাল তাহাকে দেখাইয়া হাসি মুখে কহিল, “যমের বাপের সাধ্যি কি বাবা, ওঁর কাছ থেকে সেজদা’কে নিয়ে যায়! যে দিন সেজ্‌দি’র হাতে পৌঁছে দিয়েছি, সেইদিনই আমার কাজ চুকে গেছে।”

কেদারবাবুর মুখের ভাব একটু গম্ভীর হইল, কিন্তু আর তিনি কিছু বলিলেন না।

দুইজন বৃদ্ধগোছের কর্ম্মচারী ও একজন দাসী মৃণালকে দেশে পৌঁছাইতে দিতে প্রস্তুত হইয়াছিল; তাহাদের সকলকে লইয়া ষ্টেসনের অভিমুখে ঘোড়ার গাড়ী ফটকের বাহির হইয়া গেলে, কেদারবাবুর অন্তরের ভিতর হইতে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল। ধীরে ধীরে শুধু বলিলেন, “অদ্ভুত, অপূর্ব্ব মেয়ে!” সুরেশের মনটাও বোধ করি এই ভাবেই পরিপূর্ণ হইয়াছিল। সে কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া সায় দিয়া আবেগের সহিত বলিয়া উঠিল, “আমি কখনো এমনটি আর দেখিনি কেদারবাবু। এমন মিষ্টি কথাও কখনো শুনিনি,

এমন নিপুন কাজ-কর্ম্মও কখনো দেখিনি। যে কাজ দাও, এমন অপূর্ব্ব দক্ষতার সঙ্গে করে দেবে যে, মনে হবে যেন এই নিয়েই সে চির কালটা আছে! অথচ, আশ্চর্য্য এই যে কোন দিন গ্রামের বাইরে পর্য্যন্ত যায় নি।"

কেদারবাবু ইহা সত্য বলিয়া জানিলেও বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "বল কি সুরেশ!"

সুরেশ কহিল, "যথার্থই তাই। ওঁর পানে চেয়ে চেয়ে আমার মাঝে মাঝে মনে হোতো, এই যে জন্মান্তরের সংস্কার বলে একটা প্রবাদ আছে, কি জানি সত্যি না কি!" বলিয়া হাসিতে লাগিল।

পরকাল সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গে কেদারবাবু চিন্তাযুক্ত মুখে কিছুক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া সহসা বলিয়া উঠিলেন, "তা সে যাই হোক্, এ কয়দিন দেখে দেখে আমার নিশ্চয় বিশ্বাস হয়েছে, এ মেয়ে স্ত্রীলোকের মধ্যে অমূল্য রত্ন। একে সারাজীবন এমন জীবন্মৃত করে রাখা শুধু পাপ নয় মহাপাপ। ও আমার মেয়ে হলে আমি কোন মতেই নিশ্চেষ্ট থাক্‌তে পারতুম না।"

সুরেশ আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি করতেন?"

বৃদ্ধ উদ্দীপ্ত স্বরে বলিলেন, "আমি আবার বিবাহ দিতুম। একটা বুড়োর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ওর এই উনিশ-কুড়ি বছর বয়সে যারা ওকে সন্ন্যাসিনী সাজিয়েছে, তারা ওর মিত্র নয় শত্রু। শত্রুর কার্য্যকে আমি কোন মতেই ন্যায়সঙ্গত বলে স্বীকার করে নিতুম না।"

একটু মৌন থাকিয়া পুনরায় কহিতে লাগিলেন, "তা'-ছাড়া ওর স্বামীর ব্যবহারটাই একবার মনে করে দেখ দিকি সুরেশ। সে লোকটার দু-দুটো স্ত্রী গত হতে পঞ্চাশ বছর বয়সে যখন এমন মেয়েকে বিবাহ করতে রাজী হোলো, তখন নিজের সুখ-সুবিধে ভিন্ন স্ত্রীর ভবিষ্যতের দিকে পাষণ্ড কতটুকু দৃষ্টিপাত করেছিল কল্পনা কর দেখি?"

সুরেশকে নিরুত্তর দেখিয়া বৃদ্ধ অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, "না সুরেশ, আমি বিধবা-বিবাহের ভাল-মন্দর তর্ক তুল্‌চিনে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তোমার সমস্ত হিন্দুসমাজ চীৎকার করে বলেও আমি মানবো না এই ব্যবস্থাই ওই দুধের মেয়েটার পক্ষে চরম শ্রেয়ঃ। ওর মন এতটুকু কিছু নেই, যার মুখ চেয়ে ও একটা দিন কাটাতে পারে। সমস্ত জীবনটা কি তোমরা খেলার জিনিষ পেয়েছ সুরেশ, যে, ব্রহ্মচর্য্য ব্রহ্মচর্য্য করে চেঁচালেই সারা দুনিয়াটা ওর জন্যে রাতারাতি বদ্‌লে ঋষির তপোবন হয়ে উঠ্‌বে। মেয়েটার শুধু কাপড়-চোপড়ের পানে চাইলে আমার বুক যেন ফেটে যেতে থাকে।"

সুরেশ জবাবও দিল না, মুখ তুলিয়াও চাহিল না; কিন্তু চোখের কোণে দেখিতে পাইল যে চৌকাটে ভর দিয়া অচলা এতক্ষণ পর্য্যন্ত মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া ছিল—সেখানে আর সে নাই, কখন্ নিঃশব্দে ঘরের ভিতরে চলিয়া গেছে।

মৃণাল চলিয়া গেলে, অচলা যখনই সুরেশের মুখের দিকে চাহিয়া দেখে তখনই তাহার মনে হয় সে বিমনা হইয়া আছে, এবং কিসের শোক যেন তাহাকে নিরন্তর শুষ্ক করিয়া ফেলিতেছে।

দিন দুই পরে একদিন অপরাহ্ণে সুরেশ নীচের বারান্দার এক ধারে রৌদ্রের মধ্যে আরাম কেদারাটা টানিয়া লইয়া কি একখানা বই পড়িতেছিল, পদশব্দে চাহিয়া দেখিল, তাহারই জন্য চা লইয়া অচলা নিজে আসিতেছে। এরূপ ঘটনা পূর্ব্বে কোন দিন ঘটে নাই; তাই সে আশ্চর্য্য হইয়া সোজা উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, —"বেয়ারা কই? আজ তুমি যে!"

অচলা এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়া একটা ছোট টিপায় চেয়ারের পাশে টানিয়া আনিয়া চায়ের বাটি নামাইয়া রাখিল এবং আর একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া নিজেও বসিয়া পড়িল।

এই অভিনব আচরণে তাহাকে দ্বিতীয় প্রশ্ন করিতে আর সুরেশের সাহস হইল না। শুধু চায়ের পেয়ালাটা নীরবে হাতে তুলিয়া লইল।

কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিয়া অচলা মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা সুরেশবাবু, আপনি কি বিধবা-বিবাহ কোন ক্ষেত্রেই ভাল বলে মনে করেন্ না?"

সুরেশ চায়ের বাটি হইতে মুখ না তুলিয়াই জবাব দিল, "করি। তার কারণ কুসংস্কার আজও আমার অতদূর পর্য্যন্ত পৌঁছয় নি।"

অচলা চিন্তা করিবার নিজেকে আর মুহূর্ত্ত অবসর না দিয়া বলিল, "তা'হলে মৃণালের মত মেয়েকে বিবাহ করতে আপনার ত লেশমাত্র আপত্তি থাকা উচিত নয়।"

সুরেশ চায়ের বাটিটা হাতে করিয়া কাঠের মত বসিয়া বলিল, "এ কথার মানে ?"

অচলার মুখে বা কণ্ঠস্বরে কোনরূপ উত্তেজনা প্রকাশ পাইল না। বেশ সহজ ভাবে বলিল, "আপনার কাছে আমি অসংখ্য ঋণে ঋণী। তা'ছাড়া আমি আপনার হিতাকাঙ্ক্ষিণী। আপনাকে আমি সুস্থ, সহজ, সংসারী এবং স্বাভাবিক দেখ্‌তে চাই। একদিন আপনি বিবাহ করতে প্রস্তুত ছিলেন, আজ আমার একান্ত অনুরোধ আপনি স্বীকার করুন।"

এক নিঃশ্বাসে মুখস্থর মত এতগুলা কথা বলিয়া অচলা যেন হাঁপাইতে লাগিল।

সুরেশ পাথরে-গড়া মূর্ত্তির মত অনেকক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া থাকিয়া শেষে কহিল, "এতে তুমি কি সত্যিই সুখী হবে ?"

অচলা কহিল, হাঁ।

"সে রাজী হবে ?"

"তাই ত আমার বিশ্বাস।"

সুরেশ একটুখানি ম্লান হাসিয়া বলিল, "আমার বিশ্বাস তা' নয়। বইয়ে পড়েছ ত সহমরণের দিনে কোন-কোন সতী হাস্‌তে-হাস্‌তে পুড়ে মরত। মৃণাল তাদেরই জাত। এদের মুখের কথায় সম্মত করানো ত ঢের দূরের কথা, একটা-একটা করে হাত-পা কাটতে থাকলেও একে আর একবার বিয়ে করতে রাজী করানো যাবে না। এ অসাধ্য সাধনের চেষ্টা করে মাঝে থেকে আমাকে তার কাছে মাটি করে দিয়ো না অচলা। আমাকে সে দাদা বলে ডেকেছে, তার কাছে আমি এই সম্মানটুকুই বজায় রাখ্‌তে চাই।"

দেখিতে দেখিতে অচলার সমস্ত মুখ ক্রোধে কালো হইয়া উঠিল। সুরেশের কথা শেষ হইতেই কঠিন মৃদুকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "সংসারে শুধু মৃণালই একমাত্র সতী নেই সুরেশবাবু। এমন সতীও আছে যারা মনে-মনেও একবার কাউকে স্বামিত্বে বরণ করলে সহস্র কোটী প্রলোভনেও আর তাদের নড়ানো যায় না। এঁদের কথা আপনি ছাপার বইয়ে পড়তে না পেলেও সত্যি বলে জেনে রাখ্‌বেন্ সুরেশবাবু!" বলিয়া স্তম্ভিত, অভিভূত সুরেশের প্রতি দৃক্‌পাত মাত্র না করিয়াই এই গর্ব্বিতা রমণী দৃঢ়-পদক্ষেপে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

একজনের উচ্ছ্বসিত অকপট প্রশংসার মধ্যে যে আ[illegible] একজনের কত বড় সুকঠোর আঘাত ও অপমান লুকাইয়[illegible] থাকিতে পারে, বক্তা ও শ্রোতা উভয়ের কেহই বোধ ক[illegible] তাহা মুহূর্ত্তকাল পূর্ব্বেও জানিত না। সুরেশ হাতের বা[illegible] হাতে লইয়া আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল, এবং অচলা তাহা[illegible] ঘরে ঢুকিয়া নিঃশব্দে দ্বার রুদ্ধ করিয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়[illegible] মর্ম্মান্তিক ক্রন্দনের দুর্ণিবার বেগ রোধ করিতে লাগিল; পাশেই মহিমের ঘর, পাছে বিন্দুমাত্র শব্দও তাহার কানে গিয়া পৌঁছে। বস্তুতঃ, অন্তর্যামী ভিন্ন সে কান্নার ইতিহাস আর দ্বিতীয় ব্যক্তি জানিল না।

কিন্তু সে নিজে এই গভীর দুঃখের মধ্যে এক নূতন তত্ত্ব লাভ করিল। এই নারী-জীবনের সতীত্ব যে কত বড় সম্পদ, এতদিন পরে তাহার পরিপূর্ণ মহিমা আজই প্রথম যেন তাহার চোখের সম্মুখে সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত হইয়া দেখা দিল। সেদিন সুরেশের সংস্পর্শে পিতার সন্দিগ্ধ দৃষ্টিকে সে অন্যায় উপদ্রব মনে করিয়া যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ ও ব্যথিত হইয়াছিল, কিন্তু আজ অকস্মাৎ সেই ধর্ম্মহীন পরস্ত্রীলুব্ধ সুরেশকেই যখন সতীত্বের পাদপদ্মে অমন করিয়া মাথা পাতিয়া প্রণাম করিতে দেখিল, তখন নিজের সত্যকার স্থানটাও আর তাহার দৃষ্টির অগোচরে রহিল না।

আরও একটা জিনিস। সুস্পষ্ট বাক্যের শক্তি যে কত বৃহৎ, আজ এ সত্যও সে প্রথম উপলব্ধি করিল। সে শিক্ষিতা রমণী। স্বামীর প্রতি কায়-মন নিষ্ঠাই যে সতীত্ব, এ কথা তাহার অবিদিত ছিল না। শুধু দেহ বা শুধু মন কোনটাই যে একাকী সম্পূর্ণ নয়, ইহা সে ভাল করিয়াই জানিত। তথাপি মন যখন তাহার বিচলিত হইয়াছে, স্বামীকে ভালবাসে না, জিহ্বা যখন এ কথা উচ্চরবে ঘোষণা করিতেও সঙ্কোচ মানে নাই, তখনও কিন্তু, কোনদিন তাহার আপনাকে ছোট বলিয়া মনে পড়ে নাই। কিন্তু আজ যখন সুরেশের মুখের সুস্পষ্ট বাণী না জানিয়া তাহার নামের সঙ্গে অসতী শব্দটা যোগ করিয়া দিতে চাহিল, তখনই তাহার সমস্ত অন্তরাত্মা যেন এক বুক-ফাটা বেদনার আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

তাই বলিয়া মৃণালের প্রতি যে তাহার শ্রদ্ধা বাড়িল তাহা নহে; কিন্তু এই মেয়েটির প্রসঙ্গে যে চৈতন্য আজ সে

লাভ করিল ইহা সে জীবনে কখনো বিস্মৃত হইবে না, ইহা আপনার কাছে আপনি বার বার প্রতিজ্ঞা করিতে লাগিল।

বাহিরে পিতার লাঠির আওয়াজ এবং পিছনে সুরেশের পদশব্দ সে শুনিতে পাইল। বুঝিল, তাঁহারা মহিমকে দেখিতে চলিয়াছেন। এবং অল্পকাল পরেই পিতার কণ্ঠস্বরে তাঁহার আহ্বান শুনিয়া সে বেশ করিয়া আঁচলে চোখ মুখ মুছিয়া দ্বার খুলিয়া ও-ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল।

কেদারবাবু তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিলেন, "আজ ব্যাপার কি? চারটের সময় সুরুয়া দেবার কথা, ছটা বাজে যে! ও কি, চোখ মুখ অমন ভারি কেন? ঘুমুচ্ছিলে না কি?"

অচলা উত্তর না দিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। রোগীকে সুরুয়া দেবার ব্যবস্থা হইবার পরে এই কাজটা মৃণালই করিত। চাকরে চড়াইয়া দিত, সে আন্দাজ করিয়া যথাসময়ে নামাইয়া লইত। সে চলিয়া গেলে এ ভারটা অচলার উপরেই পড়িয়াছিল। আজ সে কথা তাহার মনেই ছিল না। ছুটিয়া গিয়া দেখিল আগুন বহুক্ষণ নিবিয়া গেছে এবং সমস্তটা শুকাইয়া পুড়িয়া উঠিয়াছে।

বহুক্ষণ সেইখানে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া যখন সে ফিরিয়া আসিল, তখন কেদারবাবু এ কথা শুনিয়া অচলাকে কিছুই না বলিয়া শুধু সুরেশকে লক্ষ্য করিয়া কঠিনভাবে বলিলেন, "তখনি ত তোমাকে বলেছিলুম সুরেশ, এখন একজন ভাল নর্স না রাখ্‌লে মহিমকে বাঁচাতে পারবে না। নিজের মেয়েকে কি আমার চেয়ে তোমরা বেশি বোঝো?"

সুরেশ নিরুত্তরে বসিয়া রহিল। কিন্তু মহিম যে এতক্ষণ নিঃশব্দে স্ত্রীর লজ্জিত ম্লান মুখখানির প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া ছিল, তাহা কেহই দেখে নাই। সে এখন ধীরে ধীরে কহিল, "নর্সের হাতে আমার ওষুধ পর্য্যন্ত খেতে প্রবৃত্তি হবে না সুরেশ। তবে, ওঁকে সাহায্য করবার একজন লোক দাও। কাল পরশু দুটো রাত্রিই ওঁকে সারা রাত্রি জাগতে হয়েছে। দিনের বেলায় একটু বিশ্রামের অবকাশ পেলে কলের মানুষকে দিয়েও কাজ পাবে না ভাই।"

কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্য না হইলেও মিথ্যা নয়। সুরেশ খুসি হইয়া মুখ তুলিল, কিন্তু কেদারবাবু নিজের রূঢ়বাক্যে লজ্জা পাইয়া কোমল কিছু একটা বলিবার উদ্যোগ করিতেই অচলা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। রাত্রে তাহার অনেক বার ইচ্ছা করিতে লাগিল, রুগ্ন স্বামীর কাছে বহু অপরাধের জন্য কাঁদিয়া ক্ষমা ভিক্ষা চাহিয়া একবার জিজ্ঞাসা করে, তাহার মত পাপিষ্ঠাকে বাঁচাইবার জন্য তাঁহার কি মাথাব্যথা পড়িয়াছিল! কিন্তু নিদারুণ লজ্জায় কোনমতেই এ প্রশ্ন তাহার মুখ দিয়া বাহির হইতে চাহিল না।

সুরেশের একটা কাজ ছিল, প্রতিদিন অনেক রাত্রে সে একবার করিয়া মহিমের ঘরে ঢুকিয়া প্রয়োজনীয় সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া দিয়া তবে শুইতে যাইত। মৃণাল থাকিতে সে প্রায় সারা রাত্রিই আনাগোনা করিত, এবং তাহার আবশ্যকও ছিল; কিন্তু কয় দিন হইতে দেখা গেল সে সহজে আর ঘরে প্রবেশ করে না। প্রয়োজন হইলে দাসী পাঠাইয়া খবর লয়, শুধু সন্ধ্যার প্রাক্কালে ক্ষণকালের জন্য একটিবার মাত্র নিজে আসিয়া সম্বাদ গ্রহণ করে। তাহার এই নূতন আচরণ সকলের অগ্রে অচলারই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল; কিন্তু এ বিষয়ে সামান্য একটু মন্তব্য প্রকাশ করাও তাহার পক্ষে সম্ভবপর নহে, তাই সে মৌন হইয়াই ছিল; কিন্তু যে দিন মহিম নিজে ইহার উল্লেখ করিল, তখন তাহাকে বলিতেই হইল, আজকাল তিনি অধিকাংশ সময় বাটীতেও থাকেন না এবং ইহার হেতু কি তাহাও সে জানে না। মহিম চুপ করিয়া শুনিল, কোন প্রকার মতামত প্রকাশ করিল না।

পরদিন সকালে অচলা নিচে নামিতেছিল, সুরেশ বোধ করি কি একটা কাজে এই সিঁড়ি দিয়াই উপরে উঠিতে আসিতেছিল; মুখ তুলিয়া অচলাকে দেখিবামাত্রই অন্যদিকে সরিয়া গেল। সে যে সর্ব্বপ্রকারে তাহাকেই পরিহার করিয়া চলিতেছে, এ বিষয়ে আর তাহার সংশয় মাত্র রহিল না। একদিন যাহা সে সমস্ত মন দিয়া কামনা করিয়াছিল, আজ তাহার সেই মনই সুরেশের আচরণে বেদনায় পীড়িত হইয়া উঠিল।　　　(ক্রমশঃ)

সাময়িকী

আমাদের দেশে দারিদ্র্য-সমস্যা যতই গুরুতর হইয়া উঠিতেছে, শিক্ষা-সমস্যা ততই জটিলতর মনে হইতেছে। যাহাদের ঘরে অন্ন নাই, অর্থকরী বিদ্যা তাহাদের একমাত্র গতি, সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রায় শত বৎসরের অভিজ্ঞতা আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের চরম শিক্ষা বুভুক্ষু বাঙ্গালীর জীবন-সমস্যার সমাধান করিতে অসমর্থ। শুধু তাহাই নহে। খাস বিলাতী শিক্ষাও এ সম্বন্ধে সমান নিরুপায়। পাশ্চাত্য-শিক্ষিত যুবকগণ দেশে আসিয়া দেখেন যে, হেথায় তাঁহাদের যোগ্য কার্য্যক্ষেত্র নাই। তখন তাঁহাদের অপরিমিত শ্রম, যত্ন, অধ্যবসায়, অর্থব্যয়, সমস্তই নিরাশার অন্ধকার ও হতাশের নিঃশ্বাসে পর্য্যবসিত হয়। এইরূপ শোচনীয় দুরবস্থার উপর এই নিষ্ফলা শিক্ষা আবার অতীব দুর্ম্মূল্য। যে গৃহস্থের উপর ষষ্ঠীদেবীর কৃপা সমধিক, তাঁহার জীবন সমপরিমাণে দুঃসহ। কর্ত্তা ঋণদায়ে দিন দিন ভগ্নকায়। গৃহিণী যৌবনে জরাগ্রস্ত, শতগ্রন্থি বসনে কঙ্কালসার দেহের লজ্জাবরণে ব্যস্ত। সন্তানগণ অনাহারে বা অর্দ্ধাশনে রুগ্ন, ঔষধ-পথ্যহীন, অকাল মৃত্যুর অধীন। এ ছবি চাহিলেই চোখে পড়ে, হৃদয় বিদীর্ণ হয়; কিন্তু তাহারা প্রতিকারবিহীন। এই ঘোর মর্ম্মান্তিক জীবন-সমস্যার উপর আবার নিদারুণ পরিহাস—সন্তানগণের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে বিপন্ন গৃহস্থের প্রাণান্ত। কেন না, উচ্চশিক্ষা ব্যতীত চাকরী দুষ্প্রাপ্য, আর চাকরীই বাঙ্গালীর ক্লেশকর জীবন-যাত্রার একমাত্র সম্বল। তাই উচ্চশিক্ষার মূল্য অতীব মহার্ঘ্য হইলেও, চাকরীর বাজার উমেদারে পরিপূর্ণ।

ব্যাধি এই; কিন্তু বিধান কি? যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন—এ তথ্য খুবই সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া অযোগ্য বা অসমর্থের নিধন, নিরতিশয় কঠোর বিধান নহে কি? যাহাতে গরীব গৃহস্থ সন্তান কায়-প্রাণে সম্বন্ধ রাখিয়া পুত্র-পরিবারের মুখে এক মুঠা অন্ন দিতে পারে, ইহাই বর্ত্তমানের জীবন-সমস্যা; এবং সুখের বিষয়, এই দুরূহ সমস্যার মীমাংসা-কল্পে আমাদের জাতীয় চিন্তাধারা প্রবাহিত হইয়াছে। সম্প্রতি সহৃদয় স্বনামধন্য কাশীমবাজার-অধিপতি, মনস্বী কাপ্তেন পেটাভেল-সহযোগে কলিকাতার উত্তর-বিভাগে 'পলিটেক্‌নিক ইনষ্টিটিউট' নামক যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা এই শুভ পরিকল্পনার অন্যতম ফল। ইহার প্রধান লক্ষ্য,—যাহাতে শিক্ষার্থিগণ নিজ পরিবারবর্গকে ভারাক্রান্ত না করিয়া আপনার শিক্ষার ব্যয় আপনি বহন করিতে পারে; এমন কি, শিক্ষাকালে তাহার অর্জ্জিত উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে নিজ পরিবারবর্গকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে সমর্থ হয়।

আপাততঃ এই বিদ্যালয়ে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিভাগ স্থাপিত হইয়াছে;—(১) বিশ্ববিদ্যালয়-সংশ্লিষ্ট ম্যাট্রিকিউলেশন স্কুল। কলিকাতার সকল বিদ্যালয় অপেক্ষা ইহার বেতন অল্প এবং ই[illegible] গ্রাজুয়েট শিক্ষকগণ দ্বারা পরিচালিত। ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষ[illegible] উপযোগী শিক্ষা ব্যতীত বালকগণকে বয়ঃক্রম অনুসারে ছুতারের ক[illegible] (Carpentry), কাঠের কায (Wood-work), কাগজ কা[illegible] (Paper-cutting), ঝুড়ি বোনা (Basket-weaving), ও মৃৎ[illegible] মূর্ত্তি নির্ম্মাণ (Clay-model) শিক্ষা দেওয়া হয়। (২) কমার্শিয়া[illegible] বিভাগ, (Commercial department)। এই বিভাগে সর্টহ্যা[illegible] (Short-hand), টাইপিং (Typing) ও বুক-কিপিং (Book-keeping) শিক্ষা দেওয়া হয়। (৩) টেলারিং বিভাগ (Tailoring)।

মফস্বলের ছাত্রগণের সুবিধার জন্য বিদ্যালয়সংশ্লিষ্ট ছাত্রাবা[illegible] আছে। স্বদেশহিতৈষী মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের স্বার্থশূন্য উদ্যমে সদাশ[illegible] গবর্ণমেণ্টের শুভ দৃষ্টিপাত হইয়াছে। মহামান্য শ্রীযুক্ত বঙ্গেশ্বর কা[illegible] মহোদয়, সহৃদয়া লেডি রোনাল্ডসে সহ এই অভিনব বিদ্যালয় পরি[illegible]দর্শনে আসিয়া সবিশেষ প্রীতিলাভ করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতী[illegible] শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তা মিঃ হর্ণেল, অনারেবল ডাঃ সর্ব্বাধিকারী অনারেবল সার সামশুল হুদা, অনারেবল মিঃ ওয়ার্ডসওয়ার্থ, মহারাজ বাহাদুর দিনাজপুরাধিপতি, সার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন, শ্রীযুক্ত মাধো রাও, ও অন্যান্য বিশিষ্ট, সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণ শ্রীযুক্ত কাশীমবাজার অধিপতির এই সুমহৎ অনুষ্ঠান পরিদর্শন করিয়া যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা নবীন অনুষ্ঠানের পক্ষে গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। মহামান্য হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি স্যার আশুতোষ মুখার্জ্জি, এবং বঙ্গের সহৃদয় বান্ধব স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন এই বিদ্যালয়ের হিতাকাঙ্ক্ষী এবং পৃষ্ঠপোষক। স্বদেশের হিতানুষ্ঠানে, বিশেষতঃ শিক্ষাবিস্তারকল্পে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র মুক্তহস্ত। তাহার উপর বদান্য গবর্ণমেণ্ট স্বতঃ-প্রণোদিত হইয়া এই বিদ্যালয়ে মাসিক সাড়ে চারিশত টাকা সাহায্য করিতেছেন। ইহার স্থায়িত্ব যেমন বাঞ্ছনীয়, তেমনি আশাপ্রদ।

সম্প্রতি বাঙ্গালা দেশের শিক্ষা-ব্যাপারে আর একটা যুগান্তরের সূচনা দেখা যাইতেছে। বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যও একটা যুগ-সন্ধিক্ষণে উপনীত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় Indian Vernaculars অর্থাৎ ভারতের দেশীয় ভাষায় এম-এ উপাধি-পরীক্ষা-দান-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ইহার ফলে বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যে, বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে যে যুগান্তর উপস্থিত হইবে, তাহাতে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বিশ্ববিদ্যালয় এক্ষণে যে শুভ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা এখনও

বাঙ্গালী জনসাধারণ সম্যকরূপে অবগত নহেন; অন্ততঃ এমন একটা গুরুতর বিষয়ে সাধারণের দৃষ্টি সম্যকরূপে আকৃষ্ট হয় নাই। সুতরাং ব্যাপারটি ভাল করিয়া বুঝিবার এবং সাধারণের সহযোগে আলোচনার প্রয়োজন ঘটিয়াছে।

গত ১৯১৮ অব্দের ২৯শে সেপ্টেম্বর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট-সভায় একটী অধিবেশন হইয়াছিল। এই সভায় সার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ভারতের দেশীয় ভাষায় এম-এ পরীক্ষা গ্রহণের পদ্ধতির প্রচলন করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। উক্ত অধিবেশনে প্রস্তাবটি আলোচিত এবং সভায় গৃহীত হয়। ১৯১৮ অব্দের ২৪শে আগষ্ট তারিখে সার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এ সম্বন্ধে যে memorandum সেনেট-সভায় উপস্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার সার মর্ম্ম এই—পূর্ব্বে আমি একটী মেমোরেণ্ডাম প্রস্তুত করিয়াছিলাম। তাহাতে দেশীয় ভাষায় উচ্চাঙ্গের পঠন-পাঠনার জন্য কয়েক শ্রেণীর গ্রন্থ প্রস্তুত করিবার প্রস্তাব ছিল। গত ২৮শে জুন তারিখে সংস্কৃত, পালি ও তুলনামূলক ভাষা বিজ্ঞান সংক্রান্ত বোর্ডসমূহের সম্মিলিত সভায় প্রস্তাবটি অনুমোদিত হইয়াছিল। এই সম্মিলিত সভার মন্তব্য পরে একজিকিউটিভ কমিটী ও কাউন্সিল কর্ত্তৃক অনুমোদিত হয়। সম্প্রতি সিণ্ডিকেট উক্ত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সেনেটকে অনুরোধ করিয়াছেন। বর্ত্তমান মেমোরেণ্ডামে আমি এম-এ উপাধি পরীক্ষায় দেশীয় ভাষাসমূহকে পরীক্ষার বিষয় সমূহের অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রস্তাব করিব। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষার জন্য যেরূপ বিদ্যাবুদ্ধি (intellectual discipline) আবশ্যক, ভারতীয় ভাষাসমূহের সমালোচনামূলক, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক আলোচনা কালে তাহার কিছুমাত্র অভাব হইবে না। অতএব এ সম্বন্ধে যুক্তি-তর্কের অবতারণা অনাবশ্যক।

আমার প্রস্তাবটি সংক্ষেপে এই—

এম এ উপাধি সংক্রান্ত নিয়মাবলীর ৩৩ সংখ্যক পরিচ্ছেদের তৃতীয় ধারায় পরীক্ষার বিষয়সমূহের যে তালিকা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার অষ্টম দফায় ল্যাটিনের পর "(৮ক) ইণ্ডিয়ান ভার্ণাকুলাস" কথা দুইটী বসাইয়া দেওয়া হউক। দ্বিতীয়তঃ, ঐ পরিচ্ছেদেই, ল্যাটিন ভাষায় শিক্ষণীয় বিষয় সমূহের পরে নিম্নলিখিত বিষয়টি সন্নিবিষ্ট হউক, যথা,—

ইণ্ডিয়ান ভার্ণাকুলার্স

পরীক্ষার্থিগণকে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে পরীক্ষা দিতে হইবে—

(ক) Board of Higher Studies in Indian Vernacilars মধ্যে-মধ্যে ভারতীয় ভাষার যে তালিকা প্রস্তুত করিয়া দিবেন, তাহা হইতে পরীক্ষার্থী স্বয়ং একটী ভাষা প্রধান অধিতব্য বিষয় স্বরূপ গ্রহণ করিয়া লইবেন।

(খ) উক্ত তালিকা হইতে পরীক্ষার্থী আর একটী ভারতীয় ভাষা subsidiary subject রূপে নির্ব্বাচিত করিবেন।

(গ) প্রাকৃত, পালি, ফার্সি ও পুস্তু—এই চারিটি ভাষার মধ্যে যে দুইটীর, পরীক্ষার্থীর নির্ব্বাচিত প্রধান ভাষা ও তাহার subsidiary subjectএর উপর কোন প্রভাব আছে, সেই দুই ভাষার Elements পরীক্ষার্থীর পাঠ্য হইবে। [এই তালিকাটি পরিবর্ত্তনশীল।]

(ঘ) উক্ত বোর্ড ইণ্ডো-এরিয়ান কিম্বা ভাষা-বিজ্ঞানের ঐরূপ কোন শাখার মূলতত্ত্ব পাঠ্যরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন।

(ক) চিহ্নিত বিষয়ে চারিখানি, (খ) চিহ্নিত বিষয়ে দুইখানি, এবং (গ) ও (ঘ) চিহ্নিত বিষয় দুইটীর প্রত্যেকটিতে একখানি করিয়া প্রশ্নপত্র প্রস্তুত হইবে।

[ইহার পর প্রত্যেক প্রশ্নপত্রে কি কি বিষয় থাকিবে, কি প্রণালীতে তাহাদের উত্তর লিখিতে হইবে, ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হইয়াছে।]

স্যার আশুতোষ শেষকালে এই কথা বলিয়া তাঁহার মেমোরেণ্ডাম শেষ করিয়াছেন যে, দেশীয় ভাষাসমূহের মধ্যে বাঙ্গলা ত থাকিবেই, পরন্তু, আসামী, উড়িয়া, হিন্দী, উর্দ্দু, গুজরাটী, মারাঠি ও পুস্তু ভাষাও থাকিতে পারে। এগুলি গেল উত্তর ভারতের ভাষা। তা'ছাড়া, কালে তেলুগু, তামিল, মালয়লাম এবং কানাড়ী ভাষা এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। এমন কি, সিংহলী ভাষাও যদি এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইবার দাবী করে, তবে তাহাকেও ঠেকাইয়া রাখা একেবারে অসম্ভব না হইলেও, কঠিন হইবে বটে।

স্যার আশুতোষের এই প্রস্তাব ৩০শে অগষ্ট তারিখে Boards of Higher Studies in Sanskrit, Pali, Arabic, Persian and Comparative Philologyর সম্মিলিত সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে Executive Committee of the Council of Post-Graduate Teaching in Arts এবং ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে কাউন্সিল স্বয়ং এই প্রস্তাবের অনুমোদন করেন। পরে এই প্রস্তাব সিণ্ডিকেটে উপস্থিত হইলে, সিণ্ডিকেট সেনেটের উপর ইহার বিবেচনার ভার অর্পণ করেন। ২৯শে সেপ্টেম্বর সেনেটও প্রস্তাবটি গ্রহণ করিয়াছেন।

উচ্চ শিক্ষায় বাঙ্গলা ভাষার প্রবর্ত্তন, কিম্বা বাঙ্গলা ভাষাতে উচ্চ শিক্ষা, এমন কি, সাধারণ শিক্ষার কথা উঠিলেই অনেকে আপত্তি করিয়া থাকেন যে, বাঙ্গলা ভাষায় উচ্চ-শিক্ষা দান অসম্ভব কল্পনা; কারণ, বাঙ্গলা ভাষায় উচ্চ-শিক্ষা লাভের উপযোগী গ্রন্থের এবং শিক্ষক ও অধ্যাপকের একান্ত অভাব। এক্ষণে স্যার আশুতোষের প্রস্তাব অনুসারে বাঙ্গলা সাহিত্যে এম এ পরীক্ষা দানের প্রথা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবর্ত্তিত হইতে চলিলেও, উহা কতদূর সম্ভবপর হইবে, এ বিষয়ে লোকের মনে সন্দেহ থাকিয়া যাইতে পারে। কিন্তু স্যার আশুতোষ যে কার্য্যে

হস্তার্পণ করেন, সে কার্য তিনি কখনও অসম্পূর্ণ বা অসম্পন্ন রাখিয়া ছাড়িয়া দেন না ; গোড়া না বাঁধিয়া তিনি কোন কাযে হাতই দেন না। উপরি-উক্ত মেমোরেণ্ডামে তিনি আরও যে একটা মেমোরেণ্ডামের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গ-ভাষায় প্রবর্ত্তনের বিরুদ্ধবাদীগণের আপত্তির খণ্ডন করিয়া রাখিয়াছেন। এই মেমোরেণ্ডামেই আমরা দেখিতে পাইতেছি, আশু বাবু বলিতেছেন, "I have long maintained the view that a subject so extensive in scope, so well-calculated to rouse intellectual curiosity may fittingly be included in the scheme for our highest Degree Examination But this object can be successfully attained, only after the materials for study and investigation have been made easily accessible to teachers and students." অর্থাৎ অনেক দিন ধরিয়া আমার মনে এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, এরূপ বৃহৎ ব্যাপার, এমন কৌতুহলজনক বিষয় আমাদের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় পাঠ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে ; কিন্তু ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে, ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েই যাহাতে সহজে পাইতে পারেন, এমন উপকরণ সংগ্রহের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। কেবল এই আবশ্যকতার উল্লেখ করিয়াই আশুবাবু ক্ষান্ত থাকেন নাই ; রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়কে অনুরোধ করিয়া তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য Typical selections in Bengali on a quite comprehensive scale" তৈয়ার করাইয়া লইয়াছেন। এই গ্রন্থরাজিতে বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ও পরিণতির ইতিহাস এমন সুন্দর ভাবে বিবৃত হইয়াছে যে, এরূপ চেষ্টা ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও হয় নাই। ভারতের ভিতরে ও বাহিরে পণ্ডিতগণ এই গ্রন্থগুলির উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। আশুবাবু ইউনিভার্সিটী কমিশনের সদস্য রূপে ভারতের নানা স্থান পরিভ্রমণ কালে, মহামহা পণ্ডিতগণের সহিত এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। এইখানেই তিনি নিরস্ত হন নাই। তিনি ভারতীয় অন্যান্য ভাষা সম্বন্ধেও ঐরূপ সংগ্রহ-গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করিয়াছেন। এবং এই কার্য্যের পারিশ্রমিক স্বরূপ ১০০০ হইতে ২০০০ টাকা ব্যয় করিবার কল্পনা করিয়াছেন। গ্রন্থগুলি বিরচিত হইলে ইউনিভার্সিটী হইতে তাহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিবার ব্যবস্থাও হইয়াছে। আশুবাবুর উৎসাহে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সভ্যতা সম্বন্ধে কারমাইকেল প্রোফেসার শ্রীযুক্ত ডি, আর, ভাণ্ডারকর মহাশয় মারাঠি, স্যার শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর কে-সি-আই-ই, পিএইচ-ডি, এলএল-ডি মহাশয়ের উপদেশ অনুসারে পুণা ফারগুসন কলেজের প্রোফেসার ডাক্তার পি, ডি, গুণী এম-এ, পিএইচ-ডি প্রাকৃত এবং "হেমকোষ" নামক আসামী কোষগ্রন্থের রচয়িতা শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী আসামী ভাষায় ঐ ধরণের সংগ্রহ-গ্রন্থ সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

———

আমরা সংক্ষেপে আশু বাবুর প্রস্তাবের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে চেষ্টা করিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে আশুবাবু যে চেষ্টা করিতেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ এবং অন্যান্য দুই এক ভদ্রলোক এইরূপ চেষ্টায় প্রবৃত্ত আছেন এবং তাঁহাদের পরিশ্রম, যে ও উদ্যম ব্যর্থ হইতেছে না। শ্রীযুক্ত জে, ডি, এণ্ডার্সন নামক ভূতপূর্ব্ব সিবিলিয়ান মহোদয় ১৯৮ অব্দের ১৯শে সেপ্টেম্বরের লণ্ডন টাইমসের এডুকেশনাল সাপ্লিমেণ্টে (The Times Educational Supplement) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বেসরকারী ভদ্রলোকগণের এ সদনুষ্ঠানের কিছু পরিচয় দিয়াছেন। বেসরকারী ভদ্রলোকগণের মধ্যে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তির ইতিহাস সঙ্কলনে নিযুক্ত আছেন। এ দিকে শ্রীযুক্ত বসন্ত রঞ্জন রায় মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহায়তায় চণ্ডীদাস বিরচিত "শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন" নামক গ্রন্থের একটী সটীক সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি বাঙ্গলা ভাষার প্রাচীনতম গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে।

———

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় না কি যে, বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্য বর্ত্তমান কালে একটী যুগ-সন্ধির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে? বাঙ্গলার এমন একদিন গিয়াছে, যে দিন শিক্ষিত ব্যক্তিরা বাঙ্গলা ভাষায় পত্র লেখা, এমন কি, স্থলবিশেষে বাঙ্গালীর সহিতও বাঙ্গলা ভাষায় কথোপকথন করা অপমানজনক বলিয়া মনে করিতেন। বাঙ্গলা ভাষার এবং বাঙ্গলা দেশের সেই দুর্দ্দিনে যাঁহারা ভবিষ্যতের মুখ চাহিয়া বাঙ্গলা ভাষাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া ছিলেন, তাঁহাদের আশা এতদিনে পূর্ণ হইতে চলিল। বাঙ্গলা ভাষা এখন আর অনাদৃতা নহে। বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্য অধুনা শিক্ষিত সম্প্রদায়ে আদৃত ও আলোচিত। বঙ্গবাণী আর দুই চারিদিনের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের ন্যায্য অধিকার গ্রহণ করিতে যাইতেছেন। এই সংবাদে কোন্ বাঙ্গালীর হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া না উঠিবে?

———

বাঙ্গলা ভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার বাহনে পরিণত করিবার জন্য শিক্ষিত সম্প্রদায়, তথা বঙ্গদেশবাসী কিরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, তাহারও কিঞ্চিৎ পরিচয় না দিলে, তাঁহাদের প্রতি অবিচার করা হয়। শ্রীযুক্ত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের শুভ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করার পক্ষে সহায়তা করিবার জন্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় ১৭০০০্ টাকা এবং মহারাজা সার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর ১০০০০ টাকা ইতোমধ্যেই প্রদান করিয়াছেন।

———

স্যার আশুতোষের প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিগৃহীত হইয়াছে বটে, কিন্তু বড় লাট বাহাদুর তথা ভারত গবর্ণমেণ্ট ঐ প্রস্তাবে অনুমোদন না করিলে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। বলা

বাহুল্য, আশুবাবুর প্রস্তাবটি বহু ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। গবর্ণমেণ্ট যদি এই প্রস্তাবে অনুমোদন করিতে স্বীকৃত না হন, তবে সম্ভবতঃ, অর্থাভাব বশতঃই করিবেন না। যুদ্ধ উপলক্ষে গবর্ণমেণ্ট এখন বিব্রত রহিয়াছেন এবং যুদ্ধের প্রয়োজনে সরকারের বিস্তর অর্থ ব্যয়িত হইতেছে। এরূপ অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট যে এরূপ বহুব্যয়সাধ্য ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে স্বীকৃত হইবেন, অথবা, প্রস্তাবটির অনুমোদন করিলেও যে উপযুক্ত পরিমাণে অর্থ সাহায্য করিতে সমর্থ হইবেন, এরূপ আশা করা যায় না। সুতরাং আমাদের মনে হয়, ইহা যখন দেশের কাজ, ইহাতে যখন গবর্ণমেণ্টের অপেক্ষা দেশবাসীরই সমূহ মঙ্গল হইবে, তখন দেশবাসীরই এ ব্যাপারে মুক্তহস্তে অর্থ-সাহায্য করা কর্ত্তব্য। প্রস্তাবটি এখন গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন ও সম্মতির প্রতীক্ষা করিতেছে। এখন আমাদিগকে এমন ভাবে কার্য্য করিতে হইবে যে, গবর্ণমেণ্ট যেন বিশ্বাস করিতে পারেন, এ ব্যাপারে অর্থাভাব হইবে না। তাহা হইলে, আশা হয়, গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতেও আপত্তির কোন কারণ থাকিবে না। এ পক্ষেও সুলক্ষণ দেখা যাইতেছে। মহারাজ নন্দী বাহাদুর এবং অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় মহাশয় পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, আমাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। এখন দেশের লোক নিজেদের কর্ত্তব্য সাধন করুন।

পরিশেষে, আমরা কি বলিয়া যে আশুবাবুর ধন্যবাদ করিব, তাহার ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না। আশুবাবুর ভক্তও যেমন অসংখ্য, তাঁহার নিন্দকেরও তেমনি অভাব নাই। যে বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি কল্পে তিনি প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিতেছেন, সেই বাঙ্গালা সাহিত্য সেবিগণের মধ্যেই তাঁহার শত্রুর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই নিন্দকের দল বহুকাল ধরিয়াই তাঁহার নিন্দা প্রচার করিয়া আসিতেছেন। আশুবাবু যত ভাল কাযই করুন, এই শ্রেণীর লোকে আশু-নিন্দা হইতে কিছুতেই বিরত হইবেন না। কিন্তু আশুবাবু আশুতোষেরই মত নির্ব্বিকার চিত্তে স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইতেছেন। নিন্দকেরা যাহাই বলুন, যাঁহারা বিজ্ঞ, বিচক্ষণ, নিরপেক্ষ,—যাঁহারা দূরদর্শী, দেশের এবং দেশ-ভাষার প্রতি যাঁহাদের হৃদয়ে কিছুমাত্র মমত্ব-বুদ্ধি আছে, তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, এই মহাত্মা যাহা করিয়া যাইতেছেন, তাহার ফলে বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্যের শ্রী একেবারে ফিরিয়া যাইবে, এবং দেশবাসী তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ থাকিবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গলা ভাষার প্রবর্ত্তনে কাহার হাত অধিক পরিমাণে ছিল, বাঁকিপুরের বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের পর এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল এবং তাহার কিছু আলোচনাও হইয়াছিল। কিন্তু তর্কের বিষয়ীভূত প্রশ্নের মীমাংসা চিরকাল যে ভাবে হইয়া আসিতেছে এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল; অর্থাৎ কোন চূড়ান্ত মীমাংসা হয় নাই, এবং কোনকালে হইবার সম্ভাবনাও নাই। এক্ষণে সেই সকল পুরাতন কথার পুনরুত্থাপন অপ্রাসঙ্গিক, নিষ্প্রয়োজন, এবং নিষ্ফল; সেইজন্য আমরা তাহার আলোচনায় বিরত রহিলাম। বাঙ্গলা ভাষার বর্ত্তমান সৌভাগ্য যে আশুবাবুরই চেষ্টার ফল, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। অতএব নিন্দকের রসনা আশু-নিন্দায় নিরত থাকুক, এবং তাঁহার স্তাবকেরা তাঁহার স্তুতিবাদ করিতে থাকুন;—স্বয়ং আশুবাবু কিন্তু নিন্দা প্রশংসার অনেক ঊর্দ্ধে। নিন্দকের নিন্দা বা স্তাবকের স্তুতিবাদ তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারিবে না।

স্বপ্ন-মিলন

[শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য]

(শেষাংশ)

ঘনপ্রভা শ্বশ্রূ, ননদ, ভাশুর প্রভৃতির নিকট যতই লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ভোগ করুক না কেন, তাহা সে গায়ে মাখিত না; কারণ, সে জানে যে, সে স্বামীর নিকট কখনই অনাদৃতা নয়; তিনি তার দোষ-গুণের যথার্থ বিচার করেন। যাহাতে তাহার দোষ সংশোধিত হয়, সে জন্যও তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন। তবে ঘনপ্রভার অপরাধের হেতু পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি যে, সে কাজ-কর্ম্মে বিশেষ পটু নয়; কারণ, মাতাপিতার দোষে সে শিক্ষা সে পায় নাই। তাঁহারা তাহাকে আদুরে মেয়ে করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং দৈব-দুর্ব্বিপাকে শিশুকালে উচ্চ স্থান হইতে পতিত হওয়ায় ঘনপ্রভার দক্ষিণ হস্তও সেই অবধি অপেক্ষাকৃত ক্ষীণবল হইয়াছিল। সেজন্যও সে তার শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীর সেই মহানসের কার্য্য সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন করিতে পারিত না। এই সব কারণেই বোধ হয় শেখর তাহার কর্ম্মাক্ষমতার অপরাধের কথা তত গুরুতরভাবে গ্রহণ করিতে পারিত না।

একদিন ঘনপ্রভা স্নানের ঘাট হইতে স্নান করিয়া জলের

কলসী কক্ষে লইয়া গৃহে ফিরিতেছে,—তাহার পশ্চাতে বড়বধূ ধীরাও আসিতেছে। এমন সময় প্রতিবেশিনী সমবয়স্কা হেমবরণী নাম্নী একটী বালবিধবা কায়স্থ-কন্যা স্নানার্থ সেই সরোবরের দিকে যাইতেছিল। পল্লীগ্রামের চির-প্রচলিত প্রথা অনুসারে হেমবরণী উহাদিগকে স্নান করিয়া আসিতে দেখিয়া, এবং দেখা হইলে পরস্পর কথা না কহা নিতান্ত দোষাবহ এবং অভদ্রতা ও অহঙ্কারের পরিচায়ক জ্ঞানে, ঘনপ্রভার নিকট গিয়া বলিল, "কি ছোট-গিন্নি, আজকাল যে বড় সকাল-সকাল স্নান করা হয় দেখছি; শেখর-দাদা বাড়ী এসেছেন, বটে—তাই বুঝি তাড়াতাড়ি নেয়ে ধুয়ে গিয়ে তাঁর জন্য চারটি রেঁধে-বেড়ে দেবে? নইলে মাসীঠাকরুণের সেতের জন্য এ আয়োজন ত নয়! এ হ'লো ইষ্টদেবের পূজোর আয়োজন—কি বল বড়-গিন্নি!"

"কি জানি দিদি, যাঁর দেবতা তাঁকেই সুধোও" বলিয়া ধীরা এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল।

তখন ঘনপ্রভা বলিল, "তা দেবতাই ত বটে ভাই! সে কথা ত আর মিছে নয়। তবে আমরা সেটা বুঝ্‌তে পারি না, এই যা।"

"আচ্ছা ভাই, তবে এখন নেয়ে আসিগে,—আবার এখুনি প্রসাদ পেতে যাব, মাসীঠাকরুণ ব'লেছেন। তখন দেখা হ'বে।" এই বলিয়া হেমবরণী স্নান করিতে গেল,—ঘনপ্রভা ও ধীরা গৃহে ফিরিল।

পথিমধ্যে ধীরা ঘনপ্রভাকে বলিল, "ঐ দেখেছ ঘনু দিদি, তোমার বড়-ঠাকুর মাঠ হ'তে বাড়ী যাচ্ছেন। উনি আমাদের ঐ আকের জমিতে ব'সে মজুরদের খাটাচ্ছিলেন—আমাদের পথে দাঁড়িয়ে কথা কইতে দেখে, বোধ হয় রেগে বাড়ী যাচ্ছেন। জানি না, আজ কপালে কি আছে। উনি ত জানই যে, পথে কারুর সঙ্গে কথা কওয়া দেখ্‌তে পারেন না। আমি ভাই তখনই ওঁকে দেখেছিলাম,—দেখে একপাশে স'রে দাঁড়িয়েছিলাম। চল ত এখন বাড়ী—দেখি, কার কপালে কি আছে। হরি হে, তোমায় হরির লুট দেব—দেখো যেন আমাদিগকে বকুনি না খেতে হয়।"

"এ্যাঁ, বড়ঠাকুর দেখেছেন না কি? হাঁ দিদি? এই যা, আর রক্ষা নাই! আজ একটা কুরুক্ষেত্র উনি বাধাবেনই—তা আমি বেশ বুঝ্‌তে পারছি। ও হরি ছেড়ে হরির-বাবা মহাকালী এলেও রোধ করতে পারবেন না—এ আমি ব'লে রাখ্‌লাম—দিদি, তুমি দেখো। আমি যে ভাই ঢের দেখলাম কি না।" "না,—আজ ঠাকুরপো বাড়ীতে আছেন—আজ আর কিছু বল্‌তে পারবেন না বোধ হয়।" "হাঁ, তোমার ঠাকুর-পোকে ত তিনি বড্ডই অপেক্ষা রেখে কথা কন কি না! আর তোমার ঠাকুরপোও বড় তাঁর দাদার সুমুখে মুখ তুলে কথা কন্—তাই আবার তাঁর ভয়ে উনি কিছু বল্‌বেন না মনে করেছ!"

এইরূপ কথা কহিতে-কহিতে দুই যা'য়ে আসিয়া বাড়ী পঁহুছিল। ভিতর-বাটীতে পা দিতেই, চন্দ্রনাথের উগ্র কণ্ঠের ভীষণ আওয়াজ তাহাদের কর্ণরন্ধ্র ভেদ করিয়া হৃদয়াভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক অন্তর কাঁপাইয়া তুলিল।

চন্দ্রনাথ শেখরকে বলিতেছেন, "আচ্ছা শেখর, তুই কি বল ত?" "কেন দাদা, কি করলাম আমি?" "কি করলাম আমি?—বলি বউমা যে দিন-দিন কি রকম হ'চ্ছেন, সেটা কি একবার চেয়েও দেখা হয় না কি? এই আজ স্নান ক'রে আস্‌তে-আস্‌তে পথে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে যে বক্তৃতাটা কচ্ছেন,—কই, চ' দেখি, একবার দেখে আয়। ওঠ্, শীগ্‌গির ওঠ—একবার দেখ্‌গে যা—আমি ত অবাক্ হ'য়ে আকের ভুঁই হ'তে সেই তরঙ্গ দেখে ছুটে আস্‌ছি। তেমন অঙ্গভঙ্গি করে বক্তৃতা বোধ হয় কেহ কখন করতে পারে না। তুই একবার দেখ্‌বি চ'—বেরো ঘর থেকে।"

"কি বলছ দাদা! আমি ত তোমার কথাই কিছু বুঝ্‌তে পারছি না—কোথায় কার সঙ্গে গল্প করছে?"

"ঐ আমতলার পথে স্নান ক'রে আস্‌তে আস্‌তে সিংঙ্গীদের হেমার সঙ্গে—আর কার সঙ্গে?—আহা হা—সঙ্গীটিও জুটেছে তেমনি—কোথাকার এক কড়ুই রাঁড়ী—সর্ব্বনাশী! আবার এই বয়সে নাকে-চোকে তেলক কাটে! মার্ সারা বছরের খ্যাংরা ঝাঁটা উননমুখীদের মুখে!"

ঠিক এই সময়ে ঘনপ্রভা ও ধীরা ধীরে-ধীরে খিড়কি-দ্বার দিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

ধীরা বলিল, "ঐ দেখ! ঐ শুন্‌লে ত, উননমুখীদের মুখে কি পড়্‌ছে!"

"তাই ত দিদি, তুমি যা বল্‌লে, ভাই, ঠিক তাই হ'ল। চল ত, এখন দুর্গা ব'লে বাড়ী ঢুকি, তারপর যা কপালে

আছে তাই হবে।” এই বলিয়া উভয়ে ভিতর-বাড়ীতে চলিয়া গেল।

বধূদিগকে দেখিয়া চন্দ্রনাথ ত চটিয়া লাল। বলিলেন, “ওগো, বউমাকে বল, ওঁর জল-ঘড়াটা বাড়ীর বাহিরে ফেলে দিয়ে, পুনরায় ডুব দিয়ে জল নিয়ে আসুক। ঐ হেমাটাকে জল কাঁকে ক'রে ছুঁয়ে আসা হ'ল, তা বুঝি আমি দেখি নাই মনে করেছ?”

“আচ্ছা যদি দৈবাৎ ছোঁয়া প'ড়েই থাকে, তা হ'লে কি আর সেই জল নিয়ে এসে ঠাকুরদের ভোগে দিতে পারে? এত কি পাগল? ঐ বউদিদি ত ছিল সঙ্গে, ওঁকেই আগে জিজ্ঞাসা কর না কেন—সে ছুঁয়েছে কি না।”

“ওরে পাজি, স্ত্রৈণ!—তা নইলে কি ঐ একরত্তি মেয়ের এত বড় আস্পর্দ্ধা, যে, আমাদের কি মায়ের কথা শোনে না!”

“ও কি কথা দাদা! তুমি যেন দিন দিন কি রকম হ'য়ে উঠ্‌ছ! এই সেদিন তুমি সরি-পিসীকে যারপরনাই অপমানটা করলে। তিনি বা রামদা, কি ভুলু, এমন কি রামদার মেয়ে ভুঁটু শুদ্ধ আর আমাদের বাড়ী আসে না। এটা কি তোমার বড্ড ভাল কাজ করা হয়েছে? একটু গম্ভীর চালে চল্‌তে হয়। ঐ যে ওরা ভিজে কাপড়ে উঠনে দাঁড়িয়ে রইল—ওদের দোষটা কি হ'ল? মেয়েছেলেতে-মেয়েছেলেতে দেখা হলে, ও রকম কথাবার্ত্তা হয়েই থাকে। আর তাতে যদি দোষঘাট হয় ত, সে মা ও-দি'গে সাবধান কর্‌বেন—তোমার ওসব বিষয়ে নজর দেওয়া কি কর্ত্তব্য কাজ দাদা?”

বুদ্ধিমতী ধীরা কক্ষস্থ কুম্ভটি রান্নাঘরে রক্ষা করিয়া কলসান্তর গ্রহণপূর্ব্বক ঘনপ্রভার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ চলিল। ঘনপ্রভা বলিল; “দেখ দেখি ভাই, কি বিড়ম্বনাতেই পড়া গিয়েছে। শুধু-শুধু এই রকম শাস্তি কি সহ্য হয়! আমি ত ভাই ডুব কিছুতেই দেব না—মিছিমিছি কেন বারে-বারে মাথা ডুববো বল ত। ছুঁলাম না কিছু না, আর ওদের সঙ্গে কথাবার্ত্তাই না হয় কই, কিন্তু আমি কি কখনও ওকে ছুঁয়েছি, তাই আজ ছুঁতে গেলাম! আর এই পোড়া চুল হয়েছে মাথায় এক রাশ—এ কি ছাই আর এ বেলায় শুকোবে?”

“না ভাই, যখন যাচ্ছ তখন ডুবটা দিও—নইলে কেউ দেখে যদি বলে দেয়।”

“আমি লোকের কথায় ডরাই না ভাই! আমার সে বংশে জন্ম নয়।”

“তবে যা ইচ্ছে তাই কর” বলিয়া কালীগড়ের ঘাট হইতে ধীরা এক ঘড়া জল লইয়া কক্ষে তুলিল। ঘনপ্রভাও যে জলঘড়াটি বাটীর ফুলগাছগুলার গোড়ায় ঢালিয়া দিয়া আসিয়াছিল, এখন শূন্য কলসী পূর্ণ করিয়া কক্ষে লইয়া গৃহে ফিরিল।

সেই দিন রাত্রে ঘনপ্রভা শেখরকে বলিল, “আজ ত তুমি নিজের কাণে শুন্‌লে, চোখেও দেখ্‌লে—আমি এখানে কি ভাবে দিন কাটাই। তবু তুমি বাড়ীতে আছ বলে ত তোমার খাতির করা হয়েছে; নইলে আরও কত হ'তো। তোমার দুটি পায়ে ধর্‌ছি—আমাকে তোমার কাছে নিয়ে চল; নইলে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও। আমি কখন কোন আবদারই তোমার কাছে করি নাই—আজ এ দাসীর কথাটা রাখ্‌বে না? বল। আরও এক কথা—প্রতাপনগর এখন যেঁতে আমার ইচ্ছে নাই—তাই বলি, দয়া করে আমায় একেবারেই অল্পদিনের জন্য সত্যনালায় নিয়ে চল।”

“দেখ, সহসা কোন কাজ করা ভাল নয়। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আমি আজ হ'তে এক মাসের মধ্যেই যা' হয়, একটা ব্যবস্থা কর্‌বোই কর্‌বো।”

(৫)

ইতোমধ্যে একদিন শশিশেখর সত্যনালা হইতে বাড়ী আসিয়া শুনিল যে, ঘনপ্রভা তাহার ভগিনীর বিবাহ উপলক্ষে বাপের বাড়ী গিয়াছে। তাঁহার মাতাঠাকুরাণীর ঘনপ্রভাকে পাঠাইতে সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু ঘনপ্রভা বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায়, পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছেন। শুনিয়া শেখর মনে-মনে ঘনপ্রভার উপর অসন্তুষ্ট হইল; কিন্তু বাহিরে কিছুই প্রকাশ করিল না। পরে তাহার খুড়া মহাশয় যখন সমস্ত কথাই শেখরকে বলিলেন, তখন শেখর মাত্র বলিল—“তা, বেশ করেছেন, ভালই হয়েছে। না পাঠানটা কি ভাল হ'ত?”

“হাঁ বাবা, আমি তাই বলেছিলাম যে, শেখর আজকাল-

কার ছেলেপিলেদের মত নয়। তার বুদ্ধিশুদ্ধি আছে। গুরুজনে যা করেন তার ওপর কোনও বিচারই সে করে না।"

দেখিতে-দেখিতে একদিন দুইদিন করিয়া দশদিন অতিবাহিত হইয়া গেল। চন্দ্রনাথের মা একটি স্ত্রীলোককে ছোট বধূমাতাকে আনিবার জন্য প্রতাপনগর পাঠাইয়া দিলেন। ঘনপ্রভার পিতা মনোহরবাবু তাহাকে বলিয়া দিলেন যে, "আমার মেয়েকে আমি এখন সেখানে কিছুতে পাঠাতে পারব না, বলগে। বিনা দোষে কেন আমার মেয়েকে শশিশেখরের মা ও দাদা যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা দেয়, তার একটা প্রতিকার শেখর না করলে আমি সেখানে পাঠাব না—এই আমার শেষ কথা।"

স্ত্রীলোকটি আসিয়া গৃহিণীকে ও চন্দ্রনাথের খুড়া মহাশয়কে মনোহর বাবুর কথা সালঙ্কারে বিবৃত করিল। শুনিয়া উঁহারা যৎপরোনাস্তি লজ্জিত ও অপমানিত বোধ করিলেন। চন্দ্রনাথ শশিশেখরকে এ সংবাদ জ্ঞাপন করিলে শশিশেখরও তাহার শ্বশুরমহাশয়ের প্রতি বড়ই বিরক্ত হইল এবং ঘনপ্রভাকে আনিবার জন্য স্বয়ং প্রতাপনগর গমন করিল।

(৬)

প্রাতঃকালেই ট্রেণ হইতে নামিয়া শশিশেখর শ্বশুরালয়ে আসিয়া পৌছিল। বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই শেখর দেখিল যে, ঘনপ্রভা তাহার কনিষ্ঠ ভাইটীর নিমিত্ত ঘরের দাবা হইতে এক হস্তে একটী ক্ষুদ্র পেয়ারা গাছের একটী শাখা ধরিয়া টানিয়া, অপর হস্তে বস্ত্রখণ্ডাবৃত কয়েকটি পেয়ারা পাড়িয়া পার্শ্বস্থ ভ্রাতার হস্তে প্রদান করিতেছে। ঘনপ্রভা সহসা শশিশেখরকে দেখিয়া একটুখানি যেন থতমত খাইয়া, নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া শেখরের বসিবার জন্য একখানি আসন আনিয়া দিল; এবং তাঁহার স্বাস্থ্য ও বাটীস্থ সকলের কুশলাদি সংক্রান্ত কতিপয় প্রশ্ন করিয়া, পাদপ্রক্ষালনার্থে একটী জলপূর্ণ ভৃঙ্গার আনিয়া দাবায় রক্ষা করিল। ইতোমধ্যে ঘনপ্রভার ভ্রাতা অমিয় হস্তস্থ পেয়ারা দাবায় রাখিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া উপরে গিয়া, যথায় মাতাপিতা ছিলেন তথায় শশিশেখরের আগমন-বার্ত্তা পেশ করিয়া দিল। জামাতার আগমন শুনিয়া তাঁহাদের আর বুঝিতে বাকি রহিল না যে, শেখর ঘনপ্রভাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছে। কিন্তু তাহাকে না পাঠানর পক্ষে হেতু উদ্ভাবন করিতেও তাঁহাদের ক্ষণমাত্র বিলম্ব হইল না। শশিশেখরের শ্বশ্রূঠাকুরাণী তৎক্ষণাৎ তাঁহার কোলের ছেলেটিকে লইয়া রোগশয্যায় শয়ন করিলেন। মনোহরবাবু পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন,—যেন রোগীদের শুশ্রূষাপরায়ণ।

এদিকে শশিশেখর ঘনপ্রভাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বলি, মাখনের মা যে দিন নিতে এসেছিল, সে দিন যাওয়া হয় নি কেন?"

"কেন, আমি ত তার পরদিনই তোমাকে পত্র দিইছি, সে পত্র কি পাওনি? আমি কি করব বল। এতদূর যে বাবা করবেন, তা আমি ভাব্‌তে পারি নাই। তার পর, আমি বাবাকে বল্‌লাম—'বাবা, আমাকে পাঠিয়ে দেন, আমি যাব। অনেক দিন আপনাদিগকে দেখি নাই ব'লে আমি এখানে আসবার জন্যই অল্পবুদ্ধি বশতঃই ওরূপ কথা বলেছিলাম; নচেৎ সেখানে আমার কোন কষ্টই প্রকৃত পক্ষে নাই।' তাতেও বাবা কিছুতেই পাঠাতে রাজি হন নাই। রেগে আমাকে মারমূর্ত্তি! তখন আমি যে কিরূপ 'ডাঙ্গায় বাঘ জলে কুমীর' অবস্থায় পড়্‌লাম, তা আমার অন্তরাত্মাই জানেন। তাইতেই আমি তোমায় বিশেষ ক'রে আস্‌তে লিখেছিলাম। সে পত্র কি পাও নাই?"

"হাঁ পেয়েছি। আর বাড়ী হ'তে দাদার পত্রও পেয়েছি; এবং সেই জন্যই তোমার শেষ কথা নিতে এলাম। তুমি আমার সঙ্গে যাবে কি না।"

"নিশ্চয় যাব। তোমার সঙ্গে যাব না ত আমি কোথায় থাকব? যে দিন হ'তে মাখনের মা ফিরে গেছে, সেই দিন হ'তে যে আমি কি মনঃ কষ্টেই কাটাচ্ছি, তা আমার একমাত্র অন্তর্যামীই জানেন।"

শশিশেখর তখন একবার শ্বশুর-শ্বশ্রূদের সহিত দেখা করিতে গেল। প্রণাম আশীর্ব্বাদ ও কুশল প্রশ্নাদির পর শশিশেখর স্বীয় আগমন কারণ ব্যক্ত করিল এবং তাহার সহিত ঘনপ্রভাকে সেই দিনই পাঠাইতে অনুরোধ করিল। মনোহর বাবু প্রথমতঃ পত্নীর পীড়া খোকার পীড়া ইত্যাদি হেতু দেখাইয়া ঘনপ্রভার সেদিনে শ্বশুরালয় যাওয়ার অসম্ভবতা ও অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু শশিশেখরের তখন মনে বিরক্তির আগুন জ্বলিতেছিল। উভয় পক্ষে অনেক

বাদানুবাদ হইল। মনোহরবাবুর কন্যা হইয়া এত লাঞ্ছনা ভোগ, যজ্ঞির ভাত রাঁধা—এসব তার কপালে লেখা না থাকার কথা মনোহর বাবুর পত্নী জামাতাকে বেশ করিয়া বুঝাইতে ত্রুটি করিলেন না। তখন শেখর জিজ্ঞাসা করিল যে, তাহা হইলে সম্প্রতি তাঁহারা কি করিতে বলেন। তাহাতে মনোহর বাবু উত্তর দিলেন, যাহাতে আর কেউ কোন কথা তাঁর কন্যাকে না বলিতে পারে, এরূপ কোন প্রতিবিধান করা—এবং সেটা শশিশেখরের পৃথক হইয়া থাকা ভিন্ন অন্য কিছুই নয়—সেরূপ আভাসও শ্বশুর শ্বশ্রূ প্রদান করিলেন। শশিশেখর বলিল, "আপনারা গুরুজন যা ইচ্ছা বল্‌তে পারেন। কিন্তু আমার জীবন থাক্‌তে আমি ইন্দ্রত্ব নিয়েও ম'-ভাইএর সঙ্গে পৃথক হয়ে থাকতে পারব না। এতে আপনারা আপনাদের মেয়ে পাঠান আর না পাঠান।"

"আচ্ছা, বেশ তবে তুমি যাও, আমি পাঠাব না।"

"বেশ," বলিয়া শশিশেখর নীচে নামিয়া আসিল। সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া ঘনপ্রভা তাহার মাতা পিতা স্বামীর কথোপকথন শুনিয়াছিল। এক্ষণে শশিশেখর ঘনপ্রভাকে তদবস্থায় দেখিয়া বলিলেন, "আমি তবে চল্লাম—এই তোমার সঙ্গে আমার শেষ দেখা জান্‌বে। তুমি ত এখন তোমার মাবাপের কথা এড়াইতে পার্‌বে না? তুমি থাক তবে—আমি যাই। আর যদি পার আমার সঙ্গে চল—বাইরে গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। আমি আর ক্ষণমাত্র অপেক্ষা করতে পারি না—এই শেষ সাক্ষাৎ।" বলিয়া দ্রুত-পদে শশিশেখর বাটীর বাহির হইল। তখন তাহার জ্যেষ্ঠ শ্বশুর মহাশয় দ্বারদেশে তদবস্থায় শেখরকে দেখিয়া এবং ইতঃপূর্ব্বেই তাঁহার এক কন্যার মুখে সমস্ত শুনিয়া শেখরকে নিজের বাটীতে লইয়া গেলেন এবং কিছু খাবার না খাওয়াইয়া কিছুতেই যাইতে দিলেন না।

যখন শশিশেখর গাড়ীতে উঠিয়া কোচম্যানকে ঘাট-শীলা ষ্টেশনে যাইবার অনুমতি দিল, তখন রাস্তার দিকের তলের জানালা হইতে একটি বালিকা বলিতেছে—"কোচোয়ান কোচোয়ান, দাঁড়াও; গাড়ী হাঁকিও না—দি যাবে দাঁড়াও।"

শেখর দেখিল জানালার পার্শ্বে বসিয়া ঘনপ্রভা ক্রন্দন করিতেছে "মা, আমার! তুমি থাক্‌লে কি আজ উনি আমায় এমনি ক'রে ফেলে যেতে পার্‌তেন"—

কান্না শুনিয়া শেখর গাড়ী হইতে মুখ বাড়াইয়া পুনরায় ঘনপ্রভাকে আহ্বান করিল। ঘনপ্রভা ভগ্ন স্বরেই বলিল, "তুমি ঐখানে একটু অপেক্ষা 'কর—বাবা ডাক্তার-খানা গেলেই আমি যাব।"

কিন্তু শেখরও উত্তেজনা বশতঃই হোক্ কিংবা ঘনপ্রভার জড়িতোচ্চারিত বাক্যকথন প্রযুক্তই হোক্, শুনিল বিপরীত অর্থাৎ সে শুনিল যেন বলিতেছে "বাবা ডাক্তার-খানায় গেছেন—এলেই যাব।"

এইরূপ অনুমান বশতঃ ঘনপ্রভার উপর বিরক্ত হইয়া শশিশেখর কোচম্যানকে গাড়ী হাঁকাইতে বলিল। গাড়ী ষ্টেশন অভিমুখে চলিল।

(৮)

ষ্টেশনে পৌঁছিয়া শেখর শুনিল যে ট্রেণ আসিতে তখনও তিন ঘণ্টার অধিক বিলম্ব আছে—কারণ একটা পুল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ওয়েটিং রুমে একখানা ইজি চেয়ার টানিয়া শেখর শুইয়া পড়িল এবং অত্যধিক মানসিক উত্তেজনা বশতঃ শীঘ্রই তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িল।

সে স্বপ্নে দেখিল যেন ঘনপ্রভা তাহার জ্যেঠা মহাশয়ের সহায়তায় ষ্টেসনে গিয়া শশিশেখরের দেখা পাইয়াছে। কিন্তু শশিশেখর বলিল, 'না, আর আমি তোমাকে গ্রহণ করিতে পারি না। ও অনুরোধ আর আমায় ক'রো না ঘন! যাও, তুমি, তোমার বাপের আদরে বেশ থাক্‌বে, যাও।'

ঘনপ্রভা কাতরভাবে শশিশেখরের পাদমূলে মাথা রাখিয়া বলিল—'তোমার পাশে আমার স্থান চাই না—আমার যে চিরদিনকার কেনা স্থান ঐ চরণে সেখান হ'তে যে আমাকে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এলেও নড়াতে পার্‌বে না। তা ত তুমি জান—ও যে আমার, কত জন্ম জন্মান্তরের সাধনার ফলে লাভ করেছি—আবার যেন জন্মান্তরে ঐ থানেই স্থান দিও।'

ঘনপ্রভার দেহলতা শশিশেখরের পাদমূলেই নিশ্চল, নিথরভাবে পড়িয়া রহিল। দেখিয়া নিকটবর্ত্তী একটি রমণী দ্রুত আসিয়া ঘনপ্রভাকে পাশ ফিরাইয়া হাত ধরিয়া তুলিতে গিয়া দেখিল তাহার দেহ-পিঞ্জর হইতে প্রাণ বাহির

হইয়া গিয়াছে। শশিশেখর নিষ্পলক নেত্রে সে দৃশ্য দেখিতেছে।

হঠাৎ কি একটা শব্দে তাহার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল; সে তখন চক্ষু চাহিয়া দেখিল, তাহার স্বপ্ন মিথ্যা নয়— ঘনপ্রভা তাহার পাদমূলে।

ঘনপ্রভার সঙ্গে আগত স্ত্রীলোকটী "জামাই বাবু! এই পত্রখানা দেখুন" বলিয়া একখানি পত্র শশিশেখরের হাতে দিয়া বলিল "এখানি বড়বাবু আপনাকে দিয়াছেন। দিদিমণির কান্না দেখে, আর কি স্থির থাকতে পারেন? আপনিও চ'লে এলেন, তার পরেই বাবু ডাক্তারখানায় গেলেন। তখনই দিদিমণি বেরিয়ে এসে আপনার গাড়ী বা আপনাকে না দেখ্‌তে পেয়ে সকলকেই বল্‌লে আপনার কাছে দিয়ে আস্‌তে। বাবুর ভয়ে যখন কেউ আস্‌তে রহিল না। তখন দিদিমণি নদীর জলে ঝাঁপ দিতে গেলেন। ঘাটে বড়বাবু স্নান করে আস্‌ছিলেন। তিনি ঐ কাণ্ড দেখে ওঁকে নিজের বাড়ীতে ডেকে আন্‌লেন। এনে গাড়ী পাল্কী খুঁজতে পাঠালেন। তা এই গাঁ-খানি খুঁজে একখানা গাড়ী কি পাল্কী মিল্‌ল না। অবশেষে আমি এ রাস্তাটুকু দিদিমণিকে হাঁটিয়েই নিয়ে এলাম।"

শশিশেখর তখন তাড়াতাড়ি ঘনপ্রভাকে বসিবার ঘরে লইয়া গেল এবং ক্ষণপরেই ট্রেণ আসিলে উভয়ে গাড়ীর একটি নির্জ্জন কামরা দেখিয়া উঠিয়া পড়িল।

গাড়ী ছাড়িয়া দিলে শশিশেখর জিজ্ঞাসা করিল "এখানে আমায় না পেতে, তা হ'লে কি কর্‌তে? আ ফিরে যেতে ত?"

"হাঁ, তা যেতাম। কিন্তু বাড়ীতে নয়, যেখানে গে মানুষ আর ফেরে না, সেখানেই যেতুম।"

"ছিঃ! অমন কথা ভাবতেও নেই। কিন্তু, ভ আশ্চর্য্য ব্যাপার,—স্বপ্ন যে এমন করে সফল হয়, তা আ কখনও শুনি নাই, দেখিও নাই।"

ঘনপ্রভা আগ্রহভরে কহিল, "স্বপ্ন?—সে আবার কি তুমি কখন স্বপ্ন দেখ্‌লে।"

শশিশেখর বলিল, "আমি ক্লান্ত হয়ে ষ্টেসনের চেয়া ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সেই সময় স্বপ্ন দেখ্‌লাম যে, তু এসে আমার পা জড়িয়ে ধরে বল্‌ছ 'আমি ত তোমার স আস্‌তেই চেয়েছিলাম। সুধু একটু অপেক্ষা কর বলেছিলাম। তুমি তা না শুনে চলে এলে।' এই কথ পরেই হঠাৎ আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল; আমি চেয়ে দে তুমি আমার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদছ। এ অতি আশ্চর্য স্বপ্ন যে এমন ফলে যায়, এ আর দেখিনি।"

ঘনপ্রভা শশিশেখরের পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলি "আমার নারীজন্ম সফল কর্‌বার জন্যই তোমার স্বপ্ন সফ হয়ে গেল।

"কৈশোর-বৃন্দাবন"

[শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য]

মধু বৃন্দাবন ঝঙ্কৃত আজ নন্দলালের সঙ্গীতে;
সারা বিশ্ব-প্রাণের যন্ত্র বাজে মিলন্-সুরের ভঙ্গীতে।
মাতাল বায়ু বইছে বেগে,
সোনার স্বপন-বাসর জেগে,
আছে নাথের মিলন-পন্থ চাহি' ব্রজের যত নন্দিনী;
হবে বিশ্ব-প্রাণ বন্ধু-হিয়ার বন্ধ-মাঝে বন্দিনী।

ওই চন্দ্র-তনুর অমৃত-রস উথ্‌লে ওঠে অম্বরে,
সদা শ্যামের পাগল বংশী বাজে, লজ্জা কে আজ সম্বরে!
নীল যমুনা ধাইলো উজান,
গাইছে শ্যামা বন্দনা-গান,
মাতে ভৃঙ্গ কমল-অঙ্গ পরে রঙ্গভরে চুম্বনে;
প্রেমে ব্রজের সারা অন্তর আজি পড়ছে লুটে ফুলবনে।

ওরে　রঙ্গিণীদের রঙ্গরসে রঙ্গরাজের দোল্‌লীলা ;
এই　হর্ষ প্লাবন-মঙ্গলে আজ আয়না রে মন্‌-প্রাণ মিলা।
　　তমাল-বনের কুঞ্জফাঁকে,
　　আকুল হ'য়ে কোকিল ডাকে,
আয়　কুঙ্কুম-ফাগ-রঙীন-ঘোরে রঞ্জিতে মন-মন্দিরে ;
হোল　মোহন-বাঁশীর রন্ধ্রমাঝে সকল সুর আজ বন্দি রে।

আজি　কালিন্দী প্রাণ আনন্দে ভোর ছন্দে কোটী বন্দনে,
মধু　গন্ধবহের অঙ্গ ভরা নন্দনেরি চন্দনে।
　　ব্রজের নারী কুম্ভ কাঁখে,
　　চল্‌ছে সারি পথের বাঁকে,
তারা　ভক্তহৃদি করতে সোনা স্পর্শমণির গুণ ধরে ;
সারা　ইন্দ্রিয় তার অন্ধ আজি খুঁজ্‌তে শ্যামসুন্দরে।

এল　মত্ত শাঙন্‌ মিলন-গানে বিরহী-প্রাণ জর্জ্জরে,
নীল　কাদম্বিনীর ঝর্‌ছে ধারা অম্বরে ঘোর ঝর্ঝরে।
　　পিয়ারী আজ আকুল প্রাণে,
　　চিত্ত উধাও বঁধুর পানে,
বন　কুঞ্জমাঝে ঝুলন্‌ খেলায় দুল্‌ছে দোদুল অন্তর ;
আজি　কিন্নরীরা গান গেয়ে আয় মন্‌-তরীতে মন্থর।

শত　পূর্ণিমা রাত আকুল হ'য়ে ফুট্‌লো ভুবন নন্দিয়া ;
ওঠে　রসের লহর উথ্‌লে গোপের অঙ্গনা-প্রাণ্‌-মন-দিয়া।
　　রূপরসে আর গন্ধে গানে
　　মত্ত মধুর প্রেম তুফানে,
হোল　চিত্তহারা পাগল রাধা কৃষ্ণ-প্রাণ-নন্দিতে ;
দেহ　আত্মা আজি অর্ঘ্য চাহে প্রাণ্‌-কানায়ে বন্দিতে।

প্রাণ　কান্ত দিল চুম্ব, শিথিল ইন্দ্রিয়েরি বন্ধন,
গেল　অঙ্গে প্রতি অঙ্গ মিশি' মর্ত্ত্য হোল নন্দন।
　　আঁখির দুটী দৃষ্টি দিয়া,
　　মগ্ন দুঁহু যুগল হিয়া,
আজি　মধুর মধুর বংশী বাজে বৃন্দাবনানন্দী গো ;
হোল　বিশ্ব-প্রাণানন্দ-রাধা কৃষ্ণপ্রাণে বন্দী গো।

আলোচনা

[শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ]

চারি বৎসরব্যাপী য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধে মনুষ্যের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির এরূপ অপচয় ঘটিয়াছে যে, অচির-ভবিষ্যতে ঐ সকল দ্রব্যের যথেষ্ট অনাটন ঘটিবার আশঙ্কা দেখা যাইতেছে। যুদ্ধ চালাইবার জন্য যে সকল দ্রব্য যুদ্ধ-স্থলে সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহার কিছু-কিছু সৈন্যগণ এবং যুদ্ধের কার্য্যে নিযুক্ত অন্য লোক-জনের ব্যবহারে আসিলেও, অনেক দ্রব্যের শুধু অপচয় ঘটিয়াছে। এই চারি বৎসরে যুদ্ধে নিযুক্ত উভয় পক্ষকেই কোন সময়ে অগ্রসর এবং কোন সময়ে বা পশ্চাৎপদ হইতে হইয়াছে। এইরূপ পশ্চাদনুবর্ত্তনের সময়, বা অধিকৃত স্থান ছাড়িয়া চলিয়া আসিবার সময়, যুদ্ধ সম্ভার বা রসদাদি পাছে শত্রু-হস্তগত হইয়া তাহাদের কার্য্যে লাগে, এই আশঙ্কায়, ঐ সকল দ্রব্য লইয়া আসিবার সুবিধা না থাকিলে, স্বহস্তে ধ্বংস করিয়া আসিতে হয়। উভয় পক্ষকেই বার-বার এই ভাবে পশ্চাদনুবর্ত্তন করিতে হওয়ায়, অনেক জিনিস নষ্ট করিতে হইয়াছে। আবার আক্রমণের পূর্ব্বে গোলাবর্ষণের ফলে অনেক বস্তু সৈন্যগণের কাযে না লাগিয়া নষ্ট হইয়া যায়। এবারকার যুদ্ধে আবার আরও একটী কারণে অনেক জিনিস নষ্ট হইয়া গিয়াছে ; সবম্যারিণের আক্রমণের ফলে অনেক মালবাহী জাহাজ ডুবিয়া যাওয়ায়, প্রচুর দ্রব্যের অপচয় ঘটিয়াছে। সুতরাং মানুষের প্রয়োজনীয় সব জিনিসেরই যে পৃথিবীব্যাপী একটা অনাটন ঘটিবে, তাহা বিচিত্র নহে ; এবং প্রকৃত পক্ষে ঘটিয়াছেও তাহাই।

কিন্তু অন্যান্য জিনিসের অপেক্ষা, খাদ্য-দ্রব্যই মানুষের সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন হয়। পৃথিবীব্যাপী খাদ্যাভাব ঘটিলে, যুদ্ধে যত লোক মরিয়াছে, তাহার উপর আরও কত লোক যে অনাহারে মরিতে পারে, তাহা বলা যায় না। এই খাদ্যাভাবের আশঙ্কা অনেক দিন পূর্ব্ব হইতেই অনুভূত হইতেছিল। সেই জন্য মিত্রপক্ষীয় রাজ্যসমূহ যথাসাধ্য এই খাদ্যাভাব দূর করিবার উপায় অবলম্বনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যুদ্ধের পূর্ব্বে ইংলণ্ড, তথা, ইউনাইটেড কিংডমে যত শস্য বা শাকসবজি উৎপন্ন হইত, এক্ষণে চাষের জমী বাড়াইয়া, সমস্ত অনাবাদী জমির আবাদ করিয়া, তাহার পরিমাণ অনেকটা বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। অন্য দিকে, অপচয় নিবারণ করিয়া, দেশের মজুত খাদ্যের পরিমাণ স্থির করিয়া এবং আমদানী-রপ্তানীর একটা আনুমানিক হিসাব স্থির করিয়া, খাদ্যদ্রব্যের ব্যবহার নিয়মিত ও সংযত করা হইয়াছে। এ দিকে, আমাদের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র চাষের জমি বাড়াইয়া খাদ্য-শস্য উৎপাদনের জন্য বিশেষ চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। এই চেষ্টার

নিদর্শন পুষার এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট (Agricultural Research Institute Pusa) হইতে ৮৪ নং বুলেটিনের (Bulletin) No. 84) আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে দেখিতেছি, ১৯১৭ অব্দের ডিসেম্বর মাসে পুণা নগরে বোর্ড অব এগ্রিকালচারের একটী বৈঠক বসিয়াছিল। এগ্রিকালচারাল ডিপার্টমেণ্টের ক্ষমতায় কুলাইয়া উঠে, এমন কোন প্রণালীতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন যথা-সম্ভব বাড়াইয়া ফেলিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় কি—এই প্রশ্নটি উক্ত সভার আলোচ্য বিষয় ছিল। এই সভাতে যাহা আলোচিত হইয়াছিল, এবং বিভিন্ন প্রদেশ হইতে এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যে সকল প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, আলোচ্য পুস্তিকায় তাহাই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মোট কথা, খাদ্য-শস্যের উৎপাদন খুব শীঘ্র বর্দ্ধিত করিবার সম্বন্ধে এই বুলেটিন হইতে যথেষ্ট উপদেশ পাওয়া যাইতে পারে।

———

খাদ্য-শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির উপায় প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমটি অতি জটিল; সেই জন্য আমরা তাহার আলোচনা করিব না। দ্বিতীয় প্রণালী কৃষিবিভাগের নিয়মিত কার্য্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত এবং সাধারণের আলোচ্য বিষয়ও বটে। ভারতীয় কৃষিবিভাগ এই দ্বিতীয় উপায় অবলম্বন করিয়াছেন—উন্নত জাতীয় বীজের প্রচলন করিয়া, উৎকৃষ্টতর সার প্রয়োগ করিয়া এবং চাষের প্রণালীর উন্নতি সাধন করিয়া ভারতের কৃষিজ খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি-কল্পে মনোযোগী হইয়াছেন। সরকারী কৃষি-বিভাগ যুদ্ধের সূচনায় বহু কাল পূর্ব্ব হইতেই স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া পুষায়, পঞ্জাবে ও মধ্য ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতীয় গমের বীজ এবং বাঙ্গলা, মান্দ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ ও ব্রহ্মদেশে উৎকৃষ্ট জাতীয় ধান্যের বীজ লইয়া পরীক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। ঐ সকল পরীক্ষার ফল এই দুঃসময়ে খুব কাযে লাগিয়াছে।

———

বর্ত্তমান প্রস্তাবে আমরা অন্যান্য প্রদেশের কথা ছাড়িয়া দিয়া, বঙ্গদেশের কৃষিবিভাগের ডাইরেক্টার মিঃ এস, মিলিগান এম-এ, বি-এসসি মহাশয় বঙ্গদেশের সম্বন্ধে যে রিপোর্ট দিয়াছেন, তাহারই আলোচনা করিব। তিনি লিখিয়াছেন, Season and Crop Reportsএ দেখা যায়, বঙ্গদেশে সাধারণতঃ যে যে শস্য যে পরিমাণ ভূমিতে উৎপন্ন হয়, তাহার হিসাব এইরূপ :—

শস্য	একার
আমন ধান	১৬৬২২৫০০
আউস "	৫০৩১৫০০
বোরো "	৩৭০০০০
ছোলা "	২৪০০০০
গম	২০৫০০০
যব	১৪০০০০
অন্যান্য খাদ্যশস্য	১৭৩০৫০০

বাঙ্গলার কৃষিবিভাগ প্রধানতঃ "নেড়ে-বোনা" (transplanted) ধান্যের বিবিধ শ্রেণীর সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। তাহার ফলে স্থির হইয়াছে যে, শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির পক্ষে ইন্দ্রশালী ধান্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। পূর্ব্ববঙ্গের নিম্ন জমিতে এই ধান্য প্রতি একারে গড়ে ছয় মণ বা বিঘা-প্রতি দুই মণ হিসাবে উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ অন্য শ্রেণীর ধান্যের পরিবর্ত্তে ইন্দ্রশালী ধান্যের চাষ করিলে, প্রতি একারে মোটামুটি সাড়ে চারিমণ ধান্য বা তিন মণ ছাঁটা চাউল বেশী উৎপন্ন হইতে পারে। পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের প্রায় ৪৫০০০০০ একার জমিতে গুণে ও মূল্যে ইন্দ্রশালী ধান্যের সমতুল্য অন্য ধান্য উৎপন্ন হয়। উহাদের পরিবর্ত্তে ঐ জমিতে কেবল ইন্দ্রশালী ধান্যের চাষ করিলে, ৫০০০০০ টন বেশী ধান্য উৎপন্ন হইতে পারিবে। ইহা কি কৃষক, কি দেশবাসী, সকলের পক্ষেই বড় অল্প লাভের কথা নহে। পরীক্ষার ফল অত্যন্ত সন্তোষজনক হওয়ায়, কৃষকদিগকে ইহার উৎপাদনে উৎসাহিত করিবার জন্য এই ধান্যের বীজ বিতরণের ব্যবস্থা হয়। এই বীজ ব্যবহার করিয়া কৃষকেরাও ইহার উপকারিতা উপলব্ধি করিয়াছে, এবং এক্ষণে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া এই ধান্যের বীজের জন্য প্রার্থনা করিতেছে। কৃষি-বিভাগও পঞ্চায়েৎগণের সাহায্যে অধিক পরিমাণে এই ধান্যের বীজ কৃষকগণকে বিতরণের ব্যবস্থা করিতেছেন। ১৯১৭ অব্দে ২০০০ মণ ধান্য-বীজ বিতরিত হইয়াছে; এবং ১৯১৮ অব্দে ৬০০০ ও ১৯১৯ অব্দে ১২০০০ মণ বীজ বিতরিত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষ বিবেচনা করেন, ২০০০০ মণ ধান্য হইতে যে বীজ উৎপন্ন হইবে, তাহাতে পরবর্ত্তী বৎসরে ৪২০০০০০ একার জমি চাস করা চলিবে। আর, একবার এই ধান্য কৃষকদিগের মধ্যে প্রচলিত হইলে, তাহারা ইহার উপকারিতা বুঝিতে পারিয়া, পরে নিজেরাই ইহার চাষ ও বীজ উৎপাদনে প্রবৃত্ত হইবে। এই সকল উপায়ে পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গে খাদ্য-শস্য উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে পারিবে বটে, কিন্তু ইহাতে কতদূর সফলতা লাভ করা যাইবে, তাহা ১৯২০ অব্দের পূর্ব্বে সঠিক জানা যাইবে না।

———

বীজনির্ব্বাচনের পর কর্ত্তৃপক্ষ উৎকৃষ্টতর সারের সন্ধানে পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হন। এ সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষ রেড়ীর খইল ও অস্থিচূর্ণ (bone meal) সমধিক উপযোগী বিবেচনা করেন এবং বিনামূল্যে এই সার বিতরণ করিয়া কৃষকদিগকে ইহার ব্যবহারে উৎসাহিত করিতে চাহেন। কিন্তু ইহা বহুব্যয়সাধ্য ব্যাপার এবং ইহাতে সাফল্য-লাভ দীর্ঘকাল সাপেক্ষ। সেইজন্য এ বিষয়ে তাঁহারা ধীরে-ধীরে অগ্রসর হইতে চাহেন। খইল এবং অস্থিচূর্ণ ব্যতীত, পশ্চিম বঙ্গে "নেড়ে বোনা" ধান্যের জন্য ধৈঞ্চার সার পরীক্ষা করা হইতেছে। ধান্যের চাবের উন্নতি সাধনের জন্য যে চেষ্টা হইতেছে, তাহা বাদে পতিত জমি সমূহে চীনা বাদামের চাষ করিয়াও অধিক পরিমাণে খাদ্য-শস্য উৎপাদনের চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু শ্রমজীবীর অভাবে ইহার দ্রুত

উন্নতির সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। বহু বর্ষব্যাপী চেষ্টার ফলে, বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলায় কয়েক শত একার মাত্র ভূমিতে চীনা বাদামের চাষ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

চেষ্টার ত কোন দিকে কোন ত্রুটিই হইতেছে না। কিন্তু এই চেষ্টা কত দিনে ফলবতী হইবে, তাহার কোনই স্থিরতা নাই। এদিকে ইতোমধ্যেই অবস্থা এমন শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে যে, শীঘ্র ইহার প্রতিকার না হইলে, অদূর-ভবিষ্যতের অবস্থা ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিতে হয়। যুদ্ধে অপচয় যাহা হইবার, তাহা ত হইয়াছেই। তাহার উপর সংবাদপত্রে দেখিতেছি, এবার ভারতের প্রায় সকল প্রদেশেই অন্য-অন্য বৎসর অপেক্ষা খাদ্য-শস্য কম জন্মিয়াছে। মফস্বলে স্থানবিশেষে চাউলের মণ ৮ হইতে ১০ টাকা দাঁড়াইয়াছে। ভরসার মধ্যে রেঙ্গুণের চাউল। ফুড কণ্ট্রোলার মহাশয় রেঙ্গুণের বাজার পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। শুনিতেছি, তিনি সেখানে একরকম ব্যবস্থা করিয়াও আসিয়াছেন। আর দুই একটা প্রদেশ ভ্রমণ করা হইলেই, সম্ভবতঃ তিনি খাদ্যদ্রব্যাদির মূল্য বাঁধিয়া দিবেন। আমরা সেই আশায় হাঁ করিয়া বসিয়া রহিয়াছি।

মাস-দুই-তিন্ কি বড় জোর চারি মাস পূর্ব্বেও বস্ত্রাভাবজনিত আন্দোলন অতি প্রবল ভাবে চলিতেছিল; আজ কিন্তু সব চুপচাপ! বাঙ্গলার বস্ত্রাভাব কি দূর হইয়াছে? না,—হয় নাই। কাপড়ের দাম কিছু কমিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও খুব বেশীই আছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে কাপড়ের যে দাম ছিল, যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর তাহা বাড়িতে বাড়িতে তিনগুণ কি চারিগুণ বাড়িয়াছিল; এখন কিছু কমিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও প্রায় দ্বিগুণ আছে। সুতরাং আন্দোলন বন্ধ হইবার কথা নহে। তবে আন্দোলন হঠাৎ বন্ধ হইল কেন? ইহার কারণ নিতান্তই দুর্ব্বোধ্য। কাপড়ের দাম যাহা কিছু কমিয়াছে, তাহা যে বিলাত হইতে কাপড় বেশী পরিমাণে আমদানী হইতে আরম্ভ হইয়াছে বলিয়াই কমিয়াছে, এমন কথা বলা যায় না। যুদ্ধ থামিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও কলকারখানা রীতিমত চলিতে আরম্ভ হয় নাই; জাহাজের অভাব এখনও রহিয়াছে। বিশেষতঃ, বস্ত্রের এই মূল্য-হ্রাস যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার ফলে ঘটে নাই। যুদ্ধ বন্ধ হইবার সংবাদ এদেশে প্রচারিত হইবার পূর্ব্ব হইতেই কাপড়ের দাম কমিতে আরম্ভ হইয়াছিল। আমাদের বোধ হয়, গবর্ণমেণ্ট এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করাতেই এই শুভ ফল ফলিয়াছে। এই সঙ্গে আরও মনে হইতেছে, গবর্ণমেণ্ট সেই হস্তক্ষেপ করিলেন;—যদি আর কিছু দিন পূর্ব্বে হস্তক্ষেপ করিতেন! যাক্।

সংবাদপত্রে দেখিলাম, মাড়োয়ারী বণিক-সভার পরামর্শের পর স্থির হইয়াছে, তিনমাস কাল বস্ত্র আমদানী করা হইবে না, কিম্বা কোন নূতন কণ্ট্রাক্টও করা হইবে না। মজুত মালের দাম নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে; তাহার কম-বেশী দরে কেহ কাপড় কেনাবেচা করিতে পারিবে না। এ আবার কি রহস্য, তাহা ভাল বুঝিলাম না। যুদ্ধ-বিরামের সংবাদ প্রচারিত হইবার অব্যবহিত পরে এই কাণ্ডটি ঘটিয়াছে। তিনমাস কাল কাপড় আমদানী না করিবার কারণ যখন প্রকাশ করা হয় নাই, তখন সকলেই নিজ-নিজ মনের গতি অনুসারে ইহার একটা কারণ কল্পনা করিয়া লইবার অধিকারী। আমাদের যাহা মনে হইতেছে, তাহাতে বিবেচনা করি, বস্ত্র সম্বন্ধে আন্দোলন চালাইবার এখনও যথেষ্ট প্রয়োজন রহিয়াছে। বিশেষতঃ, যুদ্ধ বন্ধ হইয়াছে; এইবার শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি সাধনের সময় আসিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট যৌথ কারবারের মূলধন সংগ্রহ সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, যুদ্ধ শেষ হওয়ায়, সেই সকল নিয়ম আর প্রচলিত রাখিবার কোন প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না। বোধ হয় শীঘ্রই গবর্ণমেণ্ট সে সকল নিয়ম তুলিয়া দিবেন। আর অল্প দিনের মধ্যেই বোধ হয়, বিলাত হইতে বড় বড় কলকব্জা আমদানী করিবার জন্য জাহাজও পাওয়া যাইবে। এরূপ অবস্থায়, বিশ পঁচিশ বা পঞ্চাশ লক্ষ টাকা মূলধনে বড়বড় কলকারখানা স্থাপনের পক্ষে আর বিশেষ কোন বাধা-বিঘ্ন থাকিবে না। আমরা অচির-ভবিষ্যতে বাঙ্গলাদেশে অন্ততঃ পাঁচশত কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিতে চাই। যুদ্ধ উপলক্ষে আমাদের যে শিক্ষা লাভ হইয়াছে, তাহা যেন ব্যর্থ না হয়। যেরূপ অবস্থায় বঙ্গলক্ষ্মী মিল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, বর্ত্তমান অবস্থা তাহাঅপেক্ষা কোন্ ক্রমে হীন নহে; পরন্তু, কলকারখানা স্থাপনের পক্ষে তখনকার প্রতিকূল অবস্থাসমূহ এখন অনেক পরিমাণে অন্তর্হিত হইয়াছে। এখনও যদি আমরা নিশ্চেষ্ট থাকি, তাহা হইলে, ভবিষ্যতে আবার বস্ত্রাভাব ঘটিলে, নিজেদের নিশ্চেষ্টতা ও অকর্ম্মণ্যতা ভিন্ন অপর কাহাকেও দোষী বা দায়ী করা চলিবে না।

কলকারখানার কথায় আর একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। সেদিন মিঃ এফ, ডি, আসকোলি ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে বাঙ্গলার কুটীর-শিল্প সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বাঙ্গলার কুটীর-শিল্পের অবস্থা বুঝাইবার জন্য প্রসঙ্গক্রমে তিনি বাঙ্গলার ব্যবসায়-বাণিজ্যের ইতিহাস বিবৃত করেন। তিনি বলেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ কয়েক বৎসরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, কুটীর-শিল্প ব্যতীত কলকারখানা বঙ্গদেশে অপরিজ্ঞাত ছিল। এদিকে য়ুরোপে কলকারখানা স্থাপিত হইতে লাগিল, সঙ্গে-সঙ্গে বঙ্গদেশের সহিত য়ুরোপের বাণিজ্য-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইল; অথচ, বাঙ্গলা দেশে কলকারখানা স্থাপিত হইল না। সুতরাং কলকারখানার সহিত প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইয়া বাঙ্গলার কুটীর-শিল্পের অস্তিত্ব ক্রমে-ক্রমে বিলুপ্ত হইল। তবে মিঃ আসকোলি কুটীর-শিল্পের সম্বন্ধে একেবারে হতাশ হ'ন নাই। কলকারখানার সহিত প্রতিযোগিতা করিয়াও বাঁচিয়া থাকিতে পারে, এমন কতকগুলি কুটীর-শিল্পের নামোল্লেখ করিয়া মিঃ আসকোলি বাঙ্গলার কুটীর-শিল্পসমূহকে দুইভাগে বিভক্ত করেন; যথা, (১) industrial arts এবং (২)

manufacturing industries। তাঁহার মতে কলকারখানার প্রতিযোগিতা হইতে প্রথমোক্ত শ্রেণীর কুটীর-শিল্পের কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই। ঢাকার বুটিদার বস্ত্র, মুর্শিদাবাদের হস্তিদন্ত-শিল্প, শঙ্খজাত দ্রব্যাদি এবং রেশমজাত সূক্ষ্ম বস্ত্রাদি এই শ্রেণীর শিল্প। এবং এইগুলি কলে প্রস্তুত হইবার যো নাই—হাতে প্রস্তুত করিতেই হইবে। তবে এদিকেও উন্নতির যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে। পক্ষান্তরে, মিঃ আসকোলির বিশ্বাস, দ্বিতীয় শ্রেণীর কুটীর-শিল্প অর্থাৎ manufacturing industriesএর কলকারখানার সহিত প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠিবার কোন আশাই নাই। মিঃ আসকোলির সিদ্ধান্ত অনুসারে, বাঙ্গলায় এই যে তুলার চাষ করিয়া চরকায় সূতা কাটিয়া তাঁতে বস্ত্র বয়ন করিয়া দেশের বস্ত্রাভাব নিবারণের চেষ্টা হইতেছে, ইহাও তাহা হইলে ব্যর্থ চেষ্টা বলিতে হয়। কিন্তু মিঃ আসকোলি ঠিক সে কথা বলেন না। তিনি এই দ্বিতীয় শ্রেণীর কুটীর শিল্পে অবহেলা করিতে পরামর্শ দেন না। ভারতে কলকারখানা স্থাপন দীর্ঘকাল-সাপেক্ষ। কলকারখানা স্থাপনে কৃতকার্য্য হইতে হইলে, প্রথমে, must be perfected to organise the supply of raw materials, methods of production and ultimate distribution." অর্থাৎ অবিশ্রান্ত ভাবে ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস ও সহযোগিতার ভাবের সৃষ্টি করিতে হইবে; গুপ্তধন বাহির করাইয়া মূলধনে পরিণত করিতে হইবে; এবং কাঁচা মাল সংগ্রহ, উৎপাদন-প্রণালীর উন্নতি এবং উৎপন্ন দ্রব্য কাটাইবার সুব্যবস্থা করিতে হইবে। (গত মাসের "আলোচনায়" সাবানের প্রসঙ্গে আমরাও কতকটা এই ধরণের কথাই বলিয়াছিলাম।) এই সকল কার্য্য সাধন করিতে বহু বৎসর লাগিবে। ততদিন কি কুটীর-শিল্পের কায বন্ধ রাখিয়া, তাঁতিকুল ও বৈষ্ণবকুল—উভয়কুল হারাইয়া জগন্নাথের মত হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে? মিঃ আসকোলি বলেন, না;—ততদিন কুটীর-শিল্পের কাযই চলিবে। তবে কুটীর-শিল্পের সম্বন্ধেও সুব্যবস্থা এবং শিল্পীদিগের শিক্ষা-বিধানের ব্যবস্থা হওয়া চাই।

ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে সে দিন লর্ড রোণাল্ডসে বাহাদুর বাঙ্গলার শ্রমশিল্প সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করিয়াছেন। যুদ্ধ-শেষে সকল দেশের লোকেই শিল্পবাণিজ্যোন্নতির আশা করিতেছেন। বাঙ্গলার এই আশা কতদূর ফলবতী হইতে পারে, লর্ড রোণাল্ডসে বাহাদুরের বক্তৃতা হইতে তাহার আভাষ পাওয়া যাইতে পারে। লাট বাহাদুর বলিয়াছেন, যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্তী একটী পূর্ণ বৎসরে (১৯১৩-১৪ অব্দে) বঙ্গদেশ হইতে ২৮৭৫০০০০ পাউণ্ড মূল্যের পাটজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। আর, বঙ্গদেশ হইতে অন্য যে সকল তৈয়ারী জিনিষ ঐ বৎসর রপ্তানী হইয়াছিল, সমবেত ভাবে তাহাদের মূল্য ১৭৫০০০০, পাউণ্ড। পাটের পর চা উল্লেখযোগ্য রপ্তানী দ্রব্য। ঐ বৎসর ৬০০০০০০০ পৌণ্ড ওজনের চা উৎপন্ন হয়; এবং তাহার অধিকাংশ রপ্তানী হইয়া যায়। ঐ রপ্তানী চায়ের মূল্য ১০০০০০০ পাউণ্ড। আর কোন রপ্তানী দ্রব্যের মূল্য এত বেশী নয়।

সকলেই জানেন, এই দুইটী জিনিসই য়ুরোপীয়ান বণিকগণের হাতে। ইহার লাভ লোকসানের দায়ীও তাঁহারা। পাটের থলিয়া এবং শুষ্ক চা প্রস্তুত করিতে বড় বড় কলকারখানার প্রয়োজন। এই দুই জিনিস প্রস্তুত করিবার ভার দেশীয়দের হাতে না থাকিয়া য়ুরোপীয়ানদের হাতে কেন, সে সম্বন্ধে লাট বাহাদুর বলিয়াছেন,—"The reason for this is, I think, fairly plain. The power factory is an exotic on Indian soil. The people themselves have taken little interest in its development." অর্থাৎ, "ইহার কারণ অতি সোজা। কলকারখানা বিদেশ হইতে ভারতে আমদানী হইয়াছে। ভারতের লোকে ইহার খোঁজ অতি অল্পই রাখিয়া থাকে।" ভারতবাসীর এই বৈরাগ্যের কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া লাট সাহেব বলিয়াছেন, "Some of them regard industrialism not merely with indifference, but with positive horror. 'This one thing,' said Mr. C. R. Das in speaking about Bengal, 'we must remember forever, that this industrialism never was and *never will be* art and part of our nature. If we seek to establish industrialism in our land, we shall be laying down with our own hands the road to our destruction. Mills and factories—like some gigantic monster—will crush out the little life that still feebly pulses in our veins, and we shall whirl round with their huge wheels, and be like some dead and soulless machine ourselves; and the rich capitalist, operating from a distance, will suck us dry of what little blood we still may have. Under these circumstances it was not to be wondered at that such development as took place should be the work of Europeans." অর্থাৎ, "শ্রমশিল্পানুরাগকে কোন কোন ভারতবাসী কেবল যে অবহেলার চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন তাহা নহে, তাঁহারা উহাকে রীতিমত ভয়ের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। মিঃ সি, আর, দাস বাঙ্গলাদেশের কথা কহিতে গিয়া বলিয়াছেন, 'কেবল এই বিষয়টি মনে রাখিতে হইবে যে, ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিজম কোন কালেই আমাদের প্রকৃতিসিদ্ধ বা প্রকৃতির অংশ ছিলও না, এবং কখনও হইবেও না। যদি আমরা আমাদের দেশে শ্রমশিল্পানুরাগের প্রতিষ্ঠা করিতে চাই, তাহা হইলে আমরা স্বহস্তে আমাদের ধ্বংসের পথ প্রস্তুত করিব। কলকারখানা মহাদানবের মত আমাদের ধমনীতে প্রবাহিত জীবনের ক্ষীণ অবশেষটুকুও পেষণ করিয়া ফেলিবে এবং আমরা কল কারখানার প্রকাণ্ড চাকার সহিত ঘুরিতে থাকিব, এবং আমরাও মৃত

আত্মাশূন্য কলের মতহইয়া পড়িব। আর ধনী ক্যাপিট্যালিষ্ট দূর হইতে কার্য্য করিয়া আমাদের রক্তের যেটুকু অবশিষ্ট আছে তাহাও নিঃশেষে শোষণ করিয়া আমাদিগকে শুষ্ক করিয়া ফেলিবে।' এরূপ অবস্থায়, শিল্প-বাণিজ্যের যেটুকু উন্নতি হইয়াছে, তাহা যে য়ুরোপীয়ানদের দ্বারা হইয়াছে, ইহা বিচিত্র নহে।" লাট বাহাদুরের কথাগুলি খুব যুক্তিযুক্ত। অতি অল্প দিন পূর্ব্বে পাটের সম্বন্ধে অনেক লেখালেখি হইয়া গিয়াছে। তদুপলক্ষে পাটের কলওয়ালা য়ুরোপীয় বণিকদিগের উপর অনেক দোষারোপ করা হইয়াছে যে, তাঁহারা চাষীদিগকে অত্যন্ত কম দাম দিয়া পাট কিনিয়া য়ুরোপে খুব বেশী দামে পাটের থলিয়া বিক্রয় করিয়া, অত্যধিক লাভ করিতেছেন। কিন্তু ইহা কি তাঁহাদের অপরাধ? ঠিক এইরূপ অবস্থায় আমরাও কি ঠিক এইরূপ আচরণই করিতাম না? তখন কি সেটা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত? না, সস্তার বাজারে কম দামে জিনিস কিনিয়া মাগ্‌গির বাজারে চড়া দামে বিক্রয় করা ব্যবসায়ের মূলসূত্র বলিয়া, নিজেদের প্রবোধ দিতাম? পাট আমাদের দেশের নিজস্ব জিনিস। য়ুরোপীয়েরা সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া এদেশে আসিয়া বহুমূল্য কল-কব্জা আনাইয়া এখানে থলিয়া প্রস্তুত করিয়া যদি দু'পয়সা লাভ করেন তাহা হইলেই তাঁহারা অপরাধী! আর আমরা নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিয়া বলিতে থাকিব, য়ুরোপীয় বণিকেরা আমাদের শিল ও আমাদের নোড়া লইয়া আমাদেরই দাঁতের গোড়া ভাঙ্গিয়া খুব বেশী লাভ করিতেছেন, ইহা তাঁহাদের বড় অন্যায়! এ দেশের চাষারা বেশী পাট উৎপন্ন করে; তাই পাট সস্তা। পাট বিক্রয় করিতে না পারিলে তাহারা অন্নের সংস্থান করিতে পারে না—তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া পাট বিক্রয় করিতেই হইবে—ঘরে মাল ধরিয়া রাখিলে তাহাদের দিন একেবারেই চলিবে না—তাই পাট সস্তা। তাহারা এত বেশী পাট জন্মায় কেন, যাহাতে পাটের দাম এত কমিয়া যায়? তাহারা মাল ধরিয়া রাখিয়া বেশী দাম আদায় করিয়া লয় না কেন? ইহা অবশ্য য়ুরোপীয় বণিকদিগের অপরাধ নয়। তাহার পর, তাঁহারা বেশী দাম দিয়া পাটজাত দ্রব্য বিক্রয় করেন বলিয়াই চাষাদিগকে পাটের জন্য বেশী দাম দিবেন কেন? ইহা দান হইতে পারে, দয়াধর্ম্মের পরিচায়ক হইতে পারে, কিন্তু বাণিজ্যের নীতি কখনই নয়। য়ুরোপীয়েরা এ দেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছেন, দান-সত্র করিতে আসেন নাই। তাহা তাঁহারা করিবেন কেন? সে জন্য তাঁহাদিগকে কোন ক্রমে অপরাধী করা চলে না।

লাট বাহাদুরের সুদীর্ঘ বক্তৃতায় বঙ্গদেশ ও ভারতের শিল্প-বাণিজ্য সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। আমাদের ঔদাসীন্য সত্ত্বেও এদেশে অনেক কল কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং হইতেছে; যুদ্ধ উপলক্ষে সেই সকল কলকারখানার কাযও বেশ ভালরূপ চলিতেছে। পাট ও চায়ের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তাহা অবশ্য যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী বিবরণ। যুদ্ধ উপলক্ষে এই দুইটী জিনিস আরও অনেক বেশী পরিমাণে উৎপন্ন ও রপ্তানী হইয়া গিয়াছে। তাহার হিসাব শুনিলে পাঠকেরা চমকিয়া উঠিবেন। ১৯১৩-১৪ অব্দে ৩৬৭০০০০০০ থলিয়া রপ্তানী হইয়াছিল, ১৯১৬ ১৭ অব্দে ৮০২০০০০০০ থলিয়া রপ্তানী হয়। চা-বাগানের যন্ত্রতন্ত্র পূর্ব্বে সমস্তই বিলাত হইতে আমদানী হইত। যুদ্ধ বাধিবার পর, সে সুবিধা কমিয়া যাওয়ায় তাহার কিয়দংশ এদেশে প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ১৯১২ অব্দে টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর কার্য্য আরম্ভ হয়; এই কয় বৎসরে তাহার কার্য্য বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে এবং সঙ্গে-সঙ্গে কারখানাও বাড়াইতে হইয়াছে। তা'ছাড়া আরও দুইটী নূতন লোহার কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। লাট সাহেব দুঃখ করিয়াছেন যে, কাঁচা চামড়া এবং তাহার পাট করিবার মসলা ভারতে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং তাহা একই জাহাজে পাশাপাশি বোঝাই হইয়া বিদেশে যায় এবং সেখান হইতে উহাদের সংযোগের ফলে পাকা চামড়া প্রস্তুত হইয়া আবার এদেশে আসে। যুদ্ধ উপস্থিত হওয়ায় এইখানেই কাঁচা চামড়া (hide and skin) পাকা চামড়ায় (leatherএ) পরিণত হইতেছে। এই কাযের জন্য বাঙ্গলা ও বিহারে কয়েকটি কারখানা স্থাপিত হইয়া বেশ চলিতেছে। ঐ পাকা চামড়া হইতে এখানেই উৎকৃষ্ট বুটও প্রস্তুত হইতেছে। তা'ছাড়া, আরও অনেক ছোট-ছোট কারখানা স্থাপিত ও সুপরিচালিত হইতেছে। এই সকল কলকারখানা-জাত মালের অধিকাংশেরই খরিদদার (প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে) স্বয়ং গবর্ণমেণ্ট; সুতরাং ইহাদের কার্য্য যে ভালই চলিবে, এবং এগুলি যে স্থায়ীও হইবে, এমন ভরসা করা যায়। এই সমুদায় কলকারখানার কতক য়ুরোপীয় এবং কতক দেশীয়দিগের হাতে আছে। দেশের লোকে উদ্যোগী হইলে সরকার বাহাদুরের সহায়তায় এখনও আরও অনেক নূতন কলকারখানা স্থাপন করিয়া লাভবান হইতে পারেন। আমরা দেশবাসীকে ব্যবসা-বাণিজ্যে, কলকারখানা স্থাপনে অবহিত হইতে অনুরোধ করি। এমন সুযোগ মানব-জীবনে দুইবার আসে না।

শোক-সংবাদ

এ মাসে আমাদিগকে আরও একটী শোকের সংবাদ পাঠকগণের গোচর করিতে হইল। "ভারতবর্ষে"র অন্যতম লেখক, প্রেসিডেন্সী কলেজের কোষাধ্যক্ষ চুনীলাল মিত্র মহাশয় গত ২২শে অগ্রহায়ণ রবিবার সন্ধ্যাকালে কলেরা রোগে লোকান্তরিত হইয়াছেন। "ভারতবর্ষে" তাঁহার কয়েকটি সুচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয়, প্রায় এক কি দেড় বৎসর পূর্ব্বে তিনি একখানি উপন্যাস লিখিয়া আমাদিগকে দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি যে ভাবে শেষ রাত্রিতে একটী পরিবারের কলেরা রোগে আক্রান্ত হওয়ার বর্ণনা করিয়াছিলেন, তিনি নিজেও প্রায় ঠিক সেই ভাবে রোগাক্রান্ত হন। ইহা কি presentiment? আমরা শুনিলাম, চুনীবাবুর সঙ্গে তাঁহার পত্নীও এই কাল রোগে আক্রান্ত হন। এখনও তিনি জীবিতা আছেন; পরে কি হয় বলা যায় না।

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত নূতন উপন্যাস "নমিতা" প্রকাশিত হইল; মূল্য ২৲ টাকা।

ভারতী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত ৷৹ আনা সংস্করণের ৩৩ সংখ্যক পুস্তক "জলছবি" প্রকাশিত হইল।

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "আরব-অভিযান" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ১৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত নূতন ডিটেক্‌টিভ্ উপন্যাস "রণাঙ্গনের রিপোর্টার" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৷৷৹ আনা।

মল্লিদার সম্পাদিত 'রহস্য পিরামিড' সিরিজের চতুর্থ গ্রন্থ "হত্যা-বিভীষিকা প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য কাপড়ে বাঁধাই ১৷৹, কাগজের মলাট ১৲ টাকা।

মোহাম্মদ আবদুল হাকিম প্রণীত "পল্লী সংসার" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ২৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত "মনাকা" বাহির হইয়াছে। মূল্য ১৷৹ সিকা মাত্র।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের "বৃদ্ধ" ২য় সংস্করণ বাহির হইল। স্থূল সংস্করণ ৷৹, রাজ সংস্করণ ৷৷৹ আনা।

শ্রীযুক্ত হরিপদ সরকার বিদ্যাবিনোদ প্রণীত "সঙ্কল্প" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৷৹ আনা।

মল্লিদার প্রণীত "জীর্ণমুখী" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ১৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর 'নবীনের সংসারে'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works,
9, Nanda K. Chaudhuri's 2nd Lane, CALCUTTA

স্বর-সাধনা

[শিল্পী—শ্রীযুক্ত রামেশ্বরপ্রসাদ

মাঘ, ১৩২৫

দ্বিতীয় খণ্ড] ষষ্ঠ বর্ষ [দ্বিতীয় সংখ্যা

শক্তি-পূজার উৎপত্তি ও প্রচার

[শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু, এম-এ, বি-এল]

শক্তি-পূজার উৎপত্তি বা আরম্ভ আমরা ইতঃপূর্ব্বে সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছি। তাহার দেশ, কাল ও পাত্র সম্বন্ধে আরও বিস্তৃত বিবরণ এ স্থলে সংগ্রহ করা প্রয়োজন। চণ্ডীতে যে বিবরণ আছে, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহা অতি সংক্ষিপ্ত। তাহা হইতে জানা গিয়াছে যে, এই কল্পের দ্বিতীয় মন্বন্তরের কোন সময়ে, অর্থাৎ ১৩৫ কোটী বৎসর পূর্ব্বে, মেধসাশ্রমে ঋষি মেধস্ সুরথ ও সমাধিকে এই শক্তি-তত্ত্ব বুঝাইয়া দেন, এবং শক্তি-পূজা করিতে উপদেশ দেন। সেই উপদেশ অনুসারে, সুরথ ও সমাধি সেই মেধসাশ্রম সন্নিকটস্থ নদী-পুলিনে গিয়া, দেবীর পূজা করিয়া অভিলষিত ফল লাভ করেন। এ কল্পে ইহাই দেবীর প্রথম পূজা, এবং তাহা হইতেই দেবী পূজার আরম্ভ।

এই মেধস্ ঋষি কে? মূল চণ্ডীতে বা দেবী-ভাগবতে তাঁহার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে (প্রকৃতি খণ্ড ৬২।৩৭) আছে যে, মেধস্ ঋষি ব্রহ্মার পৌত্র, প্রচেতার পুত্র। স্বয়ং শঙ্কর তাঁহাকে দেবী-রহস্য শিখাইয়া-ছিলেন। মেধস্ ঋষি সম্বন্ধে আর কোন কথা কোন স্থানে পাওয়া যায় না। রাজা সুরথ সম্বন্ধে চণ্ডীতে এই মাত্র পাওয়া যায় যে, তিনি দ্বিতীয় মন্বন্তরে চৈত্রবংশীয় রাজা ছিলেন। চণ্ডীর আরম্ভ এইরূপ :—

> "সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয়ো যে মনুঃ কথ্যতেঽষ্টমঃ।
> নিশাময় তদুৎপত্তিং বিস্তরাৎ গদতো মম॥
> মহামায়ানুভাবেন যথা মন্বন্তরাধিপঃ।
> স বভূব মহাভাগঃ সাবর্ণিস্তনয়ো রবেঃ॥
> স্বারোচিষেঽন্তরে পূর্ব্বং চৈত্রবংশসমুদ্ভবঃ।
> সুরথো নাম রাজাঽভূৎ সমস্তে ক্ষিতিমণ্ডলে॥"

---

* এই চণ্ডীর বক্তা মৃকণ্ডুর পুত্র ঋষি মার্কণ্ডেয় ত্রিকালদর্শী সপ্তকল্পজীবী। সুতরাং পুরাণ-মতে তিনি, অতীত কল্পে যাঁহারা মনু হইয়াছিলেন, এবং এ কল্পে যাঁহারা মনু হইয়াছিলেন, এবং যাঁহারা মনু হইবেন, তাহা জানিতেন। পূর্ব্ব কল্পে যিনি অষ্টম মনু হইয়াছিলেন, এবং এ কল্পে যিনি অষ্টম মনু হইবেন, তাহা তিনি জ্ঞাত ছিলেন। এ কল্পের অষ্টম মনু—সাবর্ণি। সূর্য্যের ঔরষে সমুদ্ভ-

এই স্বারোচিষ মন্বন্তর এই কল্পের দ্বিতীয় মন্বন্তর; সেই মন্বন্তরেই সুরথ চৈত্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া রাজচক্রবর্ত্তী রাজা হইয়াছিলেন। তাহার পর তিনি দেবী-বরে সূর্য্য হইতে পুনর্জন্ম লাভ করিয়া সাবর্ণি নামে খ্যাত হইয়াছেন, এবং আগামী অষ্টম মন্বন্তরে মন্বন্তরাধিপতি হইবেন। চণ্ডী হইতে সুরথের এইমাত্র বিবরণ পাওয়া যায়। দেবী-ভাগবতেও সুরথ সম্বন্ধে অন্য কিছু জানা যায় না। কেবল ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে সুরথ সম্বন্ধে অন্য বিবরণ পাওয়া যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ অনুসারে ব্রহ্মার পুত্র—অত্রি; অত্রি-পুত্র নিশাকর (চন্দ্র); নিশাকরের পুত্র বুধ; বুধের পুত্র চৈত্র; চৈত্রের পুত্র অতিরথ, এবং অতিরথের পুত্র সুরথ। (প্রকৃতি খণ্ড ৫৮ ও ৬১ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। অতএব সুরথ চন্দ্রবংশীয় রাজা। কিন্তু কথা হইতেছে যে, চন্দ্রবংশ অতি প্রসিদ্ধ বংশ। সুরথ যদি চন্দ্রবংশীয় রাজা হইতেন, তবে চণ্ডীতে তাঁহাকে চৈত্রবংশীয় বলা হইল কেন? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে। সুরথ কোন্ দেশের রাজা ছিলেন, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। তবে তিনি যে এই ভারতেরই কোন দেশের রাজা ছিলেন, তাহা তাঁহার রাজ্যনাশের পর মেধস ঋষির আশ্রমে গমন হইতে বুঝা যায়। কেন না তখন কোন ঋষির আশ্রম পুণ্যভূমি ভারতের বাহিরে কোথাও ছিল না।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ অনুসারে সুরথের রাজধানী কোলা নামক নগরে ছিল (প্রঃ খঃ ৬২,২)। সুরথের শত্রুগণ এই কোলা আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করিয়াছিল। এজন্য চণ্ডীতে সুরথের শত্রুগণকে "কোলা-বিধ্বংশিনঃ" বলা হইয়াছে (প্রঃ খঃ ৬২।০)। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ মতে, যে রাজা সুরথকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার রাজধানী কোলা ধ্বংস করিয়াছিল, তাহার নাম নন্দী। নন্দী পরম বৈষ্ণব ছিলেন। নন্দী ধ্রুবের পৌত্র উৎকলের পুত্র। এই উৎকল হইতেই বোধ হয় "উৎকল" দেশের নাম হইয়াছে। নন্দী সম্ভবতঃ এই উৎকল-দেশীয় রাজা ছিলেন। বর্ত্তমান উড়িষ্যার কোন স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল, এবং উৎকল দেশ হইতেই তিনি সুরথের রাজধানী আক্রমণ করেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে বৈশ্য সমাধিরও কিঞ্চিৎ বিবরণ আছে। সমাধি কলিঙ্গ-দেশীয়—বিরাধের পৌত্র, এবং ধ্রুমিনের পুত্র। (প্রঃ খঃ ৬১।১০৪-৬)। এই কলিঙ্গ বর্ত্তমান উৎকল দেশ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ-মতে, সুরথ রাজা যখন রাজ্যচ্যুত হইয়া, একাকী স্বরাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করিতেছিলেন, তখন পুষ্প-ভদ্রা নামক কোন নদীর নিকটে সমাধি নামক বৈশ্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়।

"দদর্শ তত্র বৈশ্যঞ্চ পুষ্পভদ্রা নদীতটে।" (প্রঃ খঃ ৬২,৬)

তাহার পর সুরথ ও সমাধি উভয়ে মেধসাশ্রমে গমন করেন।

"বৈশ্যেন সার্দ্ধং নৃপতিঃ জগাম মেধসাশ্রমং।
পুষ্করং দুষ্করং পুণ্যক্ষেত্রঞ্চ ভারতে তথা॥" (ঐ ৬২।৭)

সুতরাং তখন ভারত-মধ্যে অতিপ্রসিদ্ধ তীর্থস্থান এই মেধসাশ্রম। সেই মেধসাশ্রম মহা পুণ্যক্ষেত্র। অথবা তাহা পুষ্করের ন্যায় অত্যন্ত দুষ্কর বা দুর্গম ছিল। চণ্ডী হইতে জানা যায় যে, মেধসাশ্রম অতি গহন, বা দুর্গম বন-মধ্যে অবস্থিত ছিল। এবং পুষ্কর তীর্থ যেমন দুরারোহ পর্ব্বতোপরি অবস্থিত, এই মেধসাশ্রমও সম্ভবতঃ সেইরূপ শৈলোপরি ঘোর অরণ্যানী পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থিত ছিল। *

কন্যা সবর্ণির (ছায়ার?) গর্ভে ইঁহার জন্ম হইবে—ইহাই পৌরাণিক উপাখ্যান। কিন্তু গুপ্তবতী রহস্য টীকা অনুসারে মনু অর্থে মন্ত্র। তদনুসারে উক্ত প্রথম শ্লোকের বিভিন্ন অর্থ দ্বারা বিভিন্ন বীজের উদ্ধার হইয়াছে। তাহা এ স্থলে উল্লেখের প্রয়োজন নাই।

উক্ত শ্লোক মধ্যে "স বভূব......" ইত্যাদি হইতে মনে হয় যে, যিনি সাবর্ণি নামে অষ্টম মনু হইয়াছিলেন, তাঁহারই উপাখ্যান এস্থলে উক্ত হইয়াছে। এ কল্পে অষ্টম মনু বা সাবর্ণি মনুর অধিকার-কাল এখনও আইসে নাই। হইতে পারে, ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার উৎপত্তি হইয়াছে; তবে, পরে তাঁহার অধিকার আরম্ভ হইবে। এ জন্য চণ্ডীর শেষে আছে:—

"এবং দেবাদ্ বরং লব্ধা সুরথঃ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ।
সূর্য্যাজ্জন্ম সমাসাদ্য সাবর্ণির্ভবিতা মনুঃ॥

এ স্থলে তিনি পরে সাবর্ণি নামে মনু হইবেন, ইহাই উল্লিখিত আছে। অতএব উক্ত "বভূব" অর্থে এই বোধ হয় যে, সুরথ ইতঃমধ্যে সূর্য্য হইতে জন্ম লাভ করিয়াছেন, পরে মনু হইবেন। অথবা ত্রিকালদর্শী ঋষি যাহা ভবিষ্যৎ তাহা অতীতের ন্যায় দর্শন করিতেছেন—সুরথ এখনও সূর্য্য হইতে জন্ম লাভ করেন নাই।

* উল্লিখিত শ্লোকে "পুষ্করং দুষ্করং" অর্থে অবশ্য পুষ্করের ন্যায় দুষ্কর। পুষ্করই যে সেই মেধসাশ্রমের স্থান এরূপ অর্থ হইতে পারে না। কেন

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের এই বিবরণ হইতে বুঝা যায়, যে, যখন এই বিবরণ লিখিত হইয়াছিল, তখন শক্তিবাদ ও শাক্ত-ধর্ম্মের বিশেষ প্রচার হইয়াছে। এবং এই শাক্ত-ধর্ম্মের মূল চণ্ডীগ্রন্থের বিশেষ আদর ও প্রচার হইয়াছিল। এজন্য ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের এই অংশের বক্তা চণ্ডী-উক্ত পাত্রগণের বিবরণ এবং মেধসাশ্রমের স্থান সম্বন্ধে দুই এক কথা ইঙ্গিতে উল্লেখ করিয়াছেন। যদি এই অংশ মূল পুরাণের অন্তর্গত হয়, তবে ত্রিকালদর্শী ঋষি বেদব্যাস ইহার বক্তা। সুতরাং এ অংশ প্রামাণ্য রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। শাক্তগণ এ অংশ প্রামাণ্যরূপেই গ্রহণ করেন। আর যদি এ অংশ প্রক্ষিপ্ত হয়, তবে ইহা কোন অজ্ঞাত লেখকের স্বকপোল-কল্পিত বলিতে হইবে। সুরথ-সমাধি সংক্রান্ত ঘটনা দ্বিতীয় মন্বন্তরের। সে ঘটনার স্মৃতি থাকিতে পারে না। তবে যিনি ত্রিকালদর্শী ঋষি, তিনি তাহা যোগবলে জানিতে পারেন, ইহা শ্রদ্ধাবান হিন্দুমাত্রেই বিশ্বাস করেন।

যাহা হউক, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের এই বিবরণ হইতে অনুমান করিতে পারা যায় যে, সুরথের রাজধানী কোলা নগরীতে ছিল। সে কোলা নগরী কোথায়, তাহা এই পুরাণে উল্লিখিত হয় নাই। সম্ভবতঃ তাহা এই বঙ্গদেশের পূর্ব্ব-ভাগে অবস্থিত ছিল। উৎকল বা কলিঙ্গ হইতে কোন রাজা সসৈন্যে আসিয়া সুরথকে আক্রমণ করেন, এবং কোলা নগরী ধ্বংস করেন। যখন পশ্চিম দিক হইতে এই আক্রমণ হইয়াছিল, তখন অবশ্য সুরথ পূর্ব্ব দিকেই পলাইয়া গিয়াছিলেন। সেই পলায়ন-পথেই পুষ্পভদ্রা নদী তটে সমাধির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। এবং সমাধির সহিত সুরথ আরও পূর্ব্ব দিকে ঘোর অরণ্যানী ভেদ করিয়া গিয়া তবে মেধস ঋষির আশ্রম-স্থান প্রাপ্ত হন। সুতরাং বর্ত্তমান পূর্ব্ববঙ্গের কোন স্থানে এই মেধসাশ্রম অবস্থিত ছিল, এবং তাহা ঘোর অরণ্য-মধ্যে কোন শৈল-শিরে সন্নিবেশিত ছিল, এইরূপ অনুমানই সমধিক সঙ্গত। ভারতের পূর্ব্বভাগে, বঙ্গদেশের পূর্ব্ব দিকে যে গিরিশ্রেণী আছে, তাহা হিমালয়ের পূর্ব্ব দক্ষিণ প্রান্ত-সীমা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাগ্জ্যোতিষপুর বা বর্ত্তমান আসাম, মণিপুর রাজ্য এবং বর্ত্তমান চট্টলের পূর্ব্ব দিয়া বরাবর ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই পর্ব্বতমালা মধ্যে শক্তিধর্ম্মের মহাকেন্দ্রস্থান প্রধান তীর্থ কামরূপ অবস্থিত। এই পর্ব্বত মালা মধ্যে বর্ত্তমান চন্দ্রনাথতীর্থ অবস্থিত। সুতরাং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের উক্ত উপাখ্যান হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে, এই পর্ব্বত-শ্রেণীর মধ্যে কোন স্থানে শাক্তদের এই মহাতীর্থ মেধসাশ্রম অবস্থিত ছিল।

এই অনুমানের আরও এক কারণ আছে। শাক্ত-ধর্ম্ম বাঙ্গালারই সম্পত্তি। বাঙ্গালা দেশেই ইহার প্রথম প্রচার, বাঙ্গালা দেশেই ইহার বিস্তার, বাঙ্গালাতেই ইহার প্রভাব ও প্রতিপত্তি। শাক্ত-ধর্ম্ম প্রধানতঃ বাঙ্গালীর ধর্ম্ম। বাঙ্গালা হইতে তাহা বৌদ্ধগণ নেপালে, কাশ্মীরে, তিব্বতে, চীনে প্রচার করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী বৌদ্ধ পণ্ডিত ক্ষেমেন্দ্র প্রভৃতিই উত্তরদেশী মহাযান-পন্থীয় বৌদ্ধদিগের মধ্যে তাহার প্রচার করেন। তান্ত্রিক চীনাবার প্রসিদ্ধ, চীনের 'তারা' উপাসনা প্রসিদ্ধ। বাঙ্গালা হইতেই পশ্চিমে, দাক্ষিণাত্যে—একরূপ ভারতের সর্ব্বত্র শাক্ত ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। তন্ত্র সকল বাঙ্গালারই সম্পত্তি। বাঙ্গালাতেই তন্ত্রের সৃষ্টি, বিস্তার ও প্রভাব। আর্য্যাবর্ত্ত যেমন এককালে বেদ-প্রধান ছিল, বাঙ্গালাও সেইরূপ এককালে তন্ত্র-প্রধান ছিল। বাঙ্গালা এখনও তন্ত্র-প্রধান। বাঙ্গালার অনুকরণে সমগ্র ভারতই এখন তন্ত্র প্রধান। পূজা, উপাসনা, ধর্ম্ম-সাধনা সমুদায়ই এখন তন্ত্রমূলক। তন্ত্র এখন কলিতে সমগ্র ভারতের ধর্ম্মের ভিত্তি। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, গাণপত্য বা সৌর সম্প্রদায়,—সকলেরই পূজা ও পদ্ধতি, সাধনাপ্রণালী তন্ত্রসম্মত।

বাঙ্গালার এ গৌরব অসাধারণ। বাঙ্গালা হইতে কত-বার কত নূতন ধর্ম্ম-যুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, কত নূতন ধর্ম্ম-চক্রের প্রবর্ত্তন হইয়াছে। প্রথমে বাঙ্গালা হইতেই এই শক্তি-বাদের ও শাক্ত ধর্ম্মের উৎপত্তি ও প্রচার; তাহার পর বৌদ্ধ-ধর্ম্মের উৎপত্তি ও প্রচার। কারণ বিহার দেশ বাঙ্গালারই অন্তর্গত ছিল। বৌদ্ধ গয়াতেই বুদ্ধদেব সিদ্ধ হন—সেখান হইতেই তিনি প্রথম ধর্ম্ম-চক্র প্রবর্ত্তিত করেন। বিহার ও বাঙ্গালার রাজগণের দ্বারাই বৌদ্ধ-

, তাহা হইলে চণ্ডীতে অবশ্য এরূপ প্রসিদ্ধ তীর্থের উল্লেখ থাকিত। বিশেষতঃ উক্ত বিবরণ হইতে সুরথ উৎকলের নিকটবর্ত্তী সম্ভবতঃ বঙ্গদেশীয় রাজা ছিলেন বোধ হয়। সেখান হইতে একাকী অশ্বারোহণে রাজপুতানার মধ্যে অবস্থিত পুষ্করে গমন সম্ভব নহে।

ধর্ম্মের প্রচার হয়। তাহার পর মহাপ্রভু চৈতন্যদেব অপূর্ব্ব বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচার করেন। বর্ত্তমান কালেও রাজা রামমোহন রায় বাঙ্গালাতেই প্রথম ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রচার করেন। অতএব বাঙ্গালা বরাবরই ধর্ম্ম বিকাশের মহাকেন্দ্রস্থান। বাঙ্গালার এ গৌরব অপূর্ব্ব, অহিংসিত। যাহা হউক, বাঙ্গালা যখন শাক্ত ধর্ম্মের কেন্দ্রস্থান, তখন ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে, বাঙ্গালাতেই শক্তিবাদ বা শাক্ত-ধর্ম্মের প্রথম প্রচার হয়। সেই প্রথম প্রচারের স্থান মেধসাশ্রম। অতএব এ অনুমান অসঙ্গত নহে যে, এই আশ্রম বাঙ্গালাতেই অবস্থিত ছিল।

আমরা এ স্থলে বলিয়াছি যে, বাঙ্গালা হইতেই শক্তিবাদের উৎপত্তি ও প্রচার হইয়াছে। এ কথায় আপত্তি হইতে পারে। অতএব এ কথা আরও বিশদ রূপে বুঝিতে হইবে। মার্কণ্ডেয়-পুরাণে যে মেধসঋষি কর্ত্তৃক শক্তিবাদ-ব্যাপার এবং সুরথ ও সমাধি কর্ত্তৃক দেবীর প্রথম পূজা বিবৃত হইয়াছে, তাহা দ্বিতীয় কল্পের কথা। বলিয়াছি ত তাহার পর প্রায় ১৫৫ কোটী বৎসর চলিয়া গিয়াছে। আমাদের এ পৃথিবীর নিয়ত পরিবর্ত্তন হইতেছে। পূর্ব্বে যেখানে পর্ব্বত ছিল, কয়েক যুগ পরে সেখানে সাগর হইয়াছে; আর যেখানে সাগর ছিল, সেখানে পর্ব্বত হইয়াছে। সুতরাং এত কোটী বৎসর পূর্ব্বে যেখানে মেধস আশ্রম ছিল, এখন যে তাহা সাগর-গর্ভে লীন হয় নাই, তাহা কে বলিতে পারে? ইহার উত্তরে আমরা ইঙ্গিত করিয়াছি যে, যে ঋষি ত্রিকালদর্শী, তিনি যোগবলে এই মেধসাশ্রম পরে আবিষ্কার করিতে পারেন, ইহা বিচিত্র নহে। আস্থাবান হিন্দুমাত্রেরই ইহা বিশ্বাস। মার্কণ্ডেয় ঋষি ত্রিকালদর্শী সপ্তকল্পজীবী বলিয়া খ্যাত। তিনি যদি দ্বিতীয় মন্বন্তরে এই সুরথ-সমাধির বিবরণ জানিতে পারেন, তবে সে সময়ে মেধস-আশ্রম কোথায় ছিল, তাহাও অবশ্য তিনি জ্ঞাত ছিলেন। মার্কণ্ডেয়-চণ্ডীতে অবশ্য সে স্থানের বিবরণ দেওয়া নাই। কিন্তু কথিত আছে যে, মার্কণ্ডেয় ঋষি সেই মেধসাশ্রমের স্থানেই নিজ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সে এই বর্ত্তমান যুগের প্রারম্ভের কথা। এ বিষয় পরে উল্লিখিত হইবে।

সে যাহা হউক, এই দ্বিতীয় মন্বন্তর হইতে আরম্ভ করিয়া এই মন্বন্তরের গত দ্বাপর যুগ পর্য্যন্ত অর্থাৎ মার্কণ্ডেয় ঋষি কর্ত্তৃক এই দেবী-মাহাত্ম্যের পুনঃ-প্রচার পর্য্যন্ত এই শাক্ত-ধর্ম্মের কিরূপ বিস্তার ছিল, তাহার কোন বিবরণই পাওয়া যায় না। কালের তিমির গর্ভে তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে। কোন ত্রিকালদর্শী ঋষি যোগবলে সে তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিয়া প্রচার না করিলে, আর তাহা আমাদের জানিবার জো নাই। আমরা এই যুগের প্রথমে মার্কণ্ডেয় ঋষি কর্ত্তৃক চণ্ডী-মাহাত্ম্যের প্রচার হইতেই শক্তিবাদের ও শক্তি-পূজার আরম্ভ, এই মাত্র জানিতে পারি। মার্কণ্ডেয়-পুরাণ এবং তদন্তর্গত চণ্ডী মহাভারতের পরে রচিত, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

সে সময় হইতে এখনও পাঁচ হাজার বৎসর অতীত হয় নাই। সুতরাং বাঙ্গালায় যে শক্তি-পূজার উৎপত্তি ও প্রচারের কথা উক্ত হইয়াছে, সে অবশ্য এই সময়ের মধ্যেই হইবে।

কিন্তু বাঙ্গালাতেই যে শক্তি-পূজার প্রথম উৎপত্তি, তাহার প্রমাণ কি? আমরা দেবী ভাগবত হইতে জানিতে পারি যে, শক্তি-পূজা প্রথমে সুদর্শন রাজা কর্ত্তৃক কোশলে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

বিখ্যাতশ্চণ্ডিকা দেবী কোশলেষু বভূব হ।

* * *

দেব্যা পূজা তথা প্রীত্যা কোশলেষু প্রবর্ত্তিতা।

* * *

বিখ্যাতা সা বভূবাথ দুর্গাদেবী ধরাতলে।

সর্ব্বত্র ভারতে লোকে সর্ব্ব-বর্ণেষু সর্ব্বথা।

[দেবী-ভাগবত ৩ স্কন্দ, ২য় অধ্যায় ৩৬-৪৪)

কিন্তু এ সম্বন্ধে কথা আছে। এই যে পূজা কোশলে প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা দুর্গাদেবীর পূজা। দুর্গাপূজা প্রকরণেই তাহা উল্লিখিত। ইহা সেই আদ্যাশক্তির বিশেষ রূপের পূজা। চণ্ডীতে তাহার ইঙ্গিত আছে মাত্র। চণ্ডীতে দেবীর চণ্ডিকা, কালিকা, জগদ্ধাত্রী, মহিষমর্দ্দিনী প্রভৃতি রূপে আবির্ভাবের কথা আছে। মহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতীর ইঙ্গিত আছে। দেবী ভবিষ্যতে দুর্গাসুর বধ করিয়া ভবিষ্যতে দুর্গা নামে বিখ্যাত হইবেন, ইহার উল্লেখ আছে। সুতরাং কোশলে দুর্গা পূজার প্রথম প্রচার হইলেও, তাহা আদ্যাশক্তি পূজার প্রথম নহে। আরও এক কথা আছে। দেবী-ভাগবতে মহিষাসুর কোশলের রাজা ছিলেন, মহিষাসুর বধ হইলে দেবগণ শত্রুঘ্নকে কোশলে রাজা করেন, এ কথাও উক্ত

হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বোধ হয়, যিনি দেবী-ভাগবতের এই অংশের বক্তা, তিনি কোশলের লোক—কোশলপ্রিয় ছিলেন। অথবা ইহা এ কল্পের, এই যুগের কথা মাত্র।

দেবী-ভাগবত ব্যতীত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণেও শক্তি-পূজা ও শক্তি-মাহাত্ম্য প্রচারের কথা আছে। তাহার দুই স্থানে যে বিবরণ আছে, আমরা এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

পূজিতা সুরথেনাদৌ দুর্গা দুর্গতিনাশিনী।
দ্বিতীয়ে রামচন্দ্রেন রাবণস্য বধার্থিনা॥
তৎ পশ্চাৎ জতাতাং মাতা ত্রিষু লোকেষু পুজিতা।

(প্রঃ খঃ, ১।১।১৪৫—৬)

অতএব এ কল্পে পৃথিবীতে মানুষের দ্বারা দেবীর প্রথম পূজা এই সুরথের এবং সমাধির পূজা। তাহার পূর্ব্বে দেবতারাই দেবীপূজা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে উক্ত হইয়াছে:—

"প্রথমে পূজিতা সা চ কৃষ্ণেন পরমাত্মনা।
বৃন্দাবনে চ সৃষ্টাদৌ গোলোকে রাসমণ্ডলে॥
মধুকৈটভ ভীতেন ব্রহ্মণা সা দ্বিতীয়তঃ।
ত্রিপুরা প্রেরিতেনৈব তৃতীয়ে ত্রিপুরারিনা॥
ভ্রষ্টশ্রিয়া মহেন্দ্রেন শাপাদ্দুর্ব্বাসসঃ পুরা।
চতুর্থে পূজিতা দেবী ভক্ত্যা ভগবতী সতী॥
তদা মুণীন্দ্রৈঃ সিদ্ধেন্দ্রৈঃ দেবৈশ্চ মুনিপুঙ্গবৈঃ।
পূজিতা সর্ব্ববিশ্বেষু বভূব সর্ব্বতো সদা।

* * *

তেজঃ সু সর্ব্বদেবানাং আবির্ভূতা পুরা মুনে।
সর্ব্বদেবাঃ দদুস্তস্যৈ শস্ত্রাণি ভূষণানি চ॥
দুর্গাদয় দৈত্যাশ্চ নিহতা দুর্গয়াতয়া।
দত্তং স্বরাজ্যং দেবেভ্যঃ বরঞ্চ যদভিপ্সিতম্॥
কল্পান্তরে পূজিতা সা সুরথেন মহাত্মনা।
রাজ্ঞা মেধসশিষ্যেন মৃণ্ময়্যাঞ্চ সরিত্তটে॥
রাজা কৃত্বা পরীহারং বরং প্রাপ যথেপ্সিতম্।
মুক্তিং সংপ্রাপ বৈশ্যশ্চ সংপূজ্য চ সরিত্তটে॥

(প্রঃ খঃ ৫৭ অধ্যায়, ২৯—৩৮ শ্লোক।)

[ইহ]ার অর্থ এই যে, পূর্ব্বকালে মহিষাসুরাদি বধ উপলক্ষে [দে]বতাগণ কর্তৃক দেবী পূজিতা হইয়াছিলেন। সুরথের পূজা অন্য কল্পে—অর্থাৎ এ কল্পে। সুরথের ও সমাধির দেবীপূজা এ কল্পের দ্বিতীয় মন্বন্তরে হইয়াছিল, ইহাই সর্ব্ববাদিসম্মত। এবং এ কল্পে তাহাই দেবীর প্রথম পূজা। যাহা হউক, দ্বিতীয় মন্বন্তরে সুরথ ও সমাধির এই পূজার পরে, এই মন্বন্তরে বর্ত্তমান মহাযুগের ত্রেতায় রামচন্দ্র কর্তৃক দেবীপূজা। অতএব আমরা অন্যান্য কারণে যদি অনুমান করি যে, এই কলিযুগের প্রথমে মার্কণ্ডেয় চণ্ডী অবলম্বন করিয়াই বাঙ্গালা দেশে প্রথম শক্তি-পূজা আরম্ভ হইয়াছিল, অথবা বাঙ্গালা দেশই শক্তি-পূজার কেন্দ্র ছিল, তবে সে অনুমান অসঙ্গত হইবে না। বাঙ্গালায় পূর্ব্বে বৈদিক ধর্ম্মের বিশেষ প্রচার ছিল না। সপ্তশতী (বা সাত শত ঘর) ব্রাহ্মণগণ এবং পরে বৈদিক ব্রাহ্মণগণ যখন পশ্চিম হইতে বাঙ্গালায় আসেন, তখনই বোধ হয়, তাঁহারা বৈদিক ধর্ম্ম প্রথমে বাঙ্গালায় লইয়া আসেন। তখন সম্ভবতঃ বাঙ্গালায় তান্ত্রিক শক্তিধর্ম্মের প্রভাব অত্যন্ত অধিক ছিল; তাই তাঁহারা ক্রমে সেই ধর্ম্ম-প্রভাবে বৈদিক ধর্ম্ম ভুলিয়া যান। তাহার পর বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব অত্যন্ত অধিক হয়। কিন্তু তাহাতে শক্তিধর্ম্মের লোপ হয় নাই; কেন না, তাহার প্রভাবে বৌদ্ধ-ধর্ম্মও রূপান্তরিত হয়,—বৌদ্ধধর্ম্ম মধ্যে মহাযানে শক্তিবাদ প্রবেশ করে, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে।

এইরূপে বাঙ্গালার বৈদিক-ধর্ম্ম বৌদ্ধযুগে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। এ জন্য বাঙ্গালার রাজা আদিশূর যখন বৈদিক যজ্ঞ করিবার অভিপ্রায় করেন, তখন তিনি কনৌজ হইতে পঞ্চ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনিতে বাধ্য হন। তাঁহাদের বংশধরগণও বাঙ্গালার তন্ত্রের ও শাক্ত-ধর্ম্মের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। ক্রমে তাহার প্রভাবে তাঁহারা বৈদিক-ধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়াছিলেন, তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন।

অতএব শাক্ত-ধর্ম্ম প্রধানতঃ বাঙ্গালীর সম্পত্তি। বাঙ্গালাতেই অসংখ্য তন্ত্র প্রচারিত হইয়া, শাক্ত ধর্ম্মের বিশেষ বিস্তৃতি ও পরিণতি, এবং বিকৃতিও হইয়াছে বলিতে হইবে।

বাঙ্গালায় যখন এইরূপে তন্ত্র দ্বারা শাক্ত ধর্ম্মের বিস্তার হয়, এবং তন্ত্রে মার্কণ্ডেয়-চণ্ডীই শক্তিবাদের মূল গ্রন্থ বলিয়া গৃহীত হয়, তখন এই চণ্ডী-উক্ত শক্তিবাদ ও শক্তি-

পূজা প্রচারের আদিস্থান নির্ণয়ের জন্ত অবশ্য চেষ্টা হইয়াছিল, তাহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে। সেই আদিস্থান মেধসাশ্রম অবশ্য শাক্তদিগের সর্ব্বপ্রধান তীর্থস্থান। আমরা দেখিয়াছি যে, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে মেধসাশ্রমকে—

"পুষ্করং দুষ্করং পুণ্যক্ষেত্রঞ্চ ভারতে মতাঃ।"

বলা হইয়াছে। ভারতের মধ্যে এরূপ প্রধান পুণ্যক্ষেত্র কোথায়, শাক্ত পণ্ডিতগণের পক্ষে তাহার অনুসন্ধান-চেষ্টা স্বাভাবিক। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে সে সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত আছে, তাহা আমরা দেখিয়াছি। সুতরাং তন্ত্রে যে মেধসাশ্রমের স্থান—সেই শক্তি-পূজা ও দেবীর আবির্ভাবের প্রথম স্থান নির্ণয়ের চেষ্টা হয় নাই, এবং সে স্থান নির্ণয় করিয়া তাহাকে মহাতীর্থক্ষেত্র রূপে পরিণত করা হয় নাই—ইহা সম্ভব হইতে পারে না। কিন্তু বলিয়াছি ত, তন্ত্র অসংখ্য। অনেক তন্ত্রের লোপ হইয়াছে, অনেক তন্ত্রের সংগ্রহ মাত্র আছে, অনেক তন্ত্রের এখনও কোন সন্ধান হয় নাই, অথবা সন্ধানের কোন চেষ্টাও হয় নাই। প্রচলিত তন্ত্র ও সংগ্রহ মধ্যে মেধসাশ্রমের কোন উল্লেখ নাই। এ জন্য কোন্ তন্ত্রে কোথায় এই মেধসাশ্রমের বিবরণ আছে, তাহা পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হয় নাই। সম্প্রতি দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমদ্ বেদানন্দ স্বামী নামক এক সন্ন্যাসী দৈবযোগে প্রাপ্ত গৌরী-তন্ত্রের কামাখ্যা পটলের এক বচন অবলম্বনপূর্ব্বক অনুসন্ধান করিয়া, চট্টলে চন্দ্রনাথতীর্থের অদূরবর্ত্তী গিরিশ্রেণী মধ্যে এই মেধসাশ্রম তীর্থ আবিষ্কার করিয়াছেন। সে স্থান গহন পর্ব্বতোপরি অবস্থিত। তাহা অরণ্য-পরিব্যাপ্ত ছিল। কিন্তু সে স্থানে পূর্ব্বে যে মহাতীর্থ ছিল, তাহার চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। উক্ত তন্ত্রোক্ত মেধস ও মার্কণ্ডেয় ঋষির আশ্রমের চিহ্নসকল সেখানে স্পষ্ট পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে বোধ হয়, পূর্ব্বে সে স্থান এক মহাতীর্থ রূপে বিখ্যাত ছিল। সম্ভবতঃ দেবীতত্ত্বজ্ঞ মহর্ষি মার্কণ্ডেয় যোগবলে এ স্থানে পূর্ব্বে মেধসাশ্রম ছিল, নির্ণয় করিয়া, এ স্থানেই নিজ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেন। সে অবশ্য চণ্ডী-মাহাত্ম্য প্রচারের পরে—প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর মাত্র পূর্ব্বে। সেই হইতে এ স্থান মহাতীর্থ রূপে পরিণত হইয়াছিল, ইহা অনুমিত হয়। কালবশে তাহা ব্রহ্মদেশীয় মঘ বৌদ্ধদিগের দ্বারা অধিকৃত হয়। তখন এই তীর্থ বৌদ্ধ-তীর্থ রূপে মঘদের নিকট আদৃত হইত। পরে বৌদ্ধ মঘদের অধিকার লোপের সঙ্গে-সঙ্গে সেই তীর্থস্থান ঘোর অরণ্যানীতে পরিবৃত হইয়া তীর্থ-চিহ্ন সকল গোপন করিয়া রাখিয়াছিল। তাই শাক্তগণ সে তীর্থের কথা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। শাক্তগণের সৌভাগ্য যে, সেই মেধসাশ্রম তীর্থ এই বাঙ্গালাতেই আবিষ্কৃত হইয়া শক্তি-পূজার কেন্দ্রস্থল বাঙ্গালার পূর্ব্ব-গৌরব রক্ষা করিয়া পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইয়া দিয়াছে। চট্টগ্রাম ও তৎসন্নিহিত স্থানে ইতোমধ্যে সে তীর্থের বহুল প্রচার হইয়াছে। এই মেধসাশ্রমের কিয়দ্দূরে সুরথের রাজধানী কোলা নগরী অবস্থিত ছিল, ইহা উক্ত তন্ত্রেই উল্লিখিত আছে। গৌরী-তন্ত্রের এই বচন যদি প্রামাণ্য রূপে গ্রহণ করা যায়, তবে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণোক্ত সুরথ-সমাধির উপাখ্যান হইতে আমরা যে অনুমান করিয়াছিলাম যে, সুরথ বঙ্গদেশীয় রাজা ছিলেন, বাঙ্গালার মধ্যেই তাঁহার রাজধানী কোলা অবস্থিত ছিল, এবং তিনি উৎকলের কোন রাজা কর্তৃক পরাজিত হইয়া, বাঙ্গালার পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থিত পর্ব্বতমালামধ্যস্থ মেধসাশ্রমেই গমন করিয়াছিলেন,—তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়। শক্তি-ধর্ম্ম-কেন্দ্র বাঙ্গালার মধ্যেই যে শক্তি-পূজার আদি উৎপত্তি-স্থান, ইহা হইতে তাহা স্বীকার করিতে পারা যায়। অতএব আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, শাক্ত-ধর্ম্মের ও শক্তি পূজার উৎপত্তি সম্বন্ধে স্থান ও পাত্র—এই বাঙ্গালায়। শাক্ত-ধর্ম্মের ও শক্তি-পূজার প্রচার এই বাঙ্গালা হইতে। শাক্ত-ধর্ম্মের মূল গ্রন্থ তন্ত্র শাস্ত্র প্রচারিত এই বাঙ্গালা হইতে। বাঙ্গলাই শাক্ত-ধর্ম্মের কেন্দ্র। ইহা বাঙ্গলার গৌরব—সমস্ত ভারতের গৌরব।

অধুনা শাক্ত-ধর্ম্ম বিকৃত হইয়াছে বলিয়া সে গৌরবের হানি হয় নাই। কোন্ ধর্ম্ম বিকৃত হয় নাই? যে ধর্ম্মই হউক না কেন, মূলে তাহা যতই নির্ম্মল থাকুক না কেন, সে ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সাধারণ লোকের প্রবৃত্তি, প্রকৃতি ও রুচি অনুসারে, তাহাদের অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম অবশ্যই বিকৃত হইবে। বৈদিক ধর্ম্ম বল, বৌদ্ধ ধর্ম্ম বল, ইহুদী ধর্ম্ম বল, খ্রীষ্টান ধর্ম্ম বল, মহম্মদের ধর্ম্ম বল, বৈষ্ণব ধর্ম্ম বল—কোন্ ধর্ম্ম এই রূপে বিকৃত হয় নাই? ধর্ম্মের এই বিকৃতি দূর করিবার জন্য কোথায় বারম্বার চেষ্টা হয় নাই? এবং কোথায় সে চেষ্টার ফলে সে ধর্ম্ম নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয় নাই? ইহার দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাই। শাক্ত-ধর্ম্ম অনেক স্থলে

বিকৃত হইলেও, তাহার মূল নির্ম্মল, পরিষ্কার, বেদসম্মত। শাক্ত-ধর্ম্ম—নিত্য, অপৌরুষেয়, ভোগ-মোক্ষপ্রদ, যুক্তিসম্মত। গঙ্গার মূল উৎস কি নির্ম্মল! গোমুখী হইতে হরিদ্বার পর্য্যন্ত পর্ব্বত-বাহিনীর বারি কি শীতল, কি সুন্দর! কিন্তু গঙ্গা যত সাগরাভিমুখে গমন করিয়াছেন, যতই অন্য নদী তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছেন, যতই গঙ্গামাতৃক দেশের অপবিত্রতা, মলিনতা নিজ অঙ্গে গ্রহণ করিয়া, সে দেশকে পবিত্র করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন, ততই তিনি পঙ্কিল, মলামর হইয়াছেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার সেই চিরপবিত্রতা কি নষ্ট হইয়াছে? বিভিন্ন প্রকৃতির, বিভিন্ন রুচির সাধকগণের অপবিত্রতা, সঙ্কীর্ণতা হেতু শাক্ত-ধর্ম্ম আপাত-দৃষ্টিতে মলিন হইলেও, তাহার মূলের শ্রেষ্ঠত্ব কি নষ্ট হইয়াছে? আমরা ক্রমে এই শাক্ত-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

মা

[শ্রীঅনুরূপা দেবী]

(১০)

শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিন ব্রজরাণীর বাপ জামায়ের বাড়ী দেখা দিলেন। বাড়ীর গাড়িতে ছেলেমেয়েরা কে-কে সঙ্গে আসিয়াছিল; আর আসিয়াছিল ব্রজর দাদা। বাড়ীর মধ্যে থাকিয়া খবর পাইয়া, একটী ভাইঝিকে দিয়া ব্রজ নিজের এই দাদাটিকে আনাইয়া, নিজের ঘরের মধ্যে তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া গেল। সেখানে দুই ভাই-বোনে কি-কি কথা হইল। তাহার খানিক পরে দাদাটি মুখখানি পরম গম্ভীর করিয়া বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেলেন। ব্রজও কাজকর্ম্ম দেখিতে ফিরিয়া আসিল।

বড়-লোকের শ্রাদ্ধ;—শ্রাদ্ধে রূপার ষোড়শ, বৃষ, আরও সব অনেক কাণ্ডেরই ব্যবস্থা হইয়াছে। সেই সব দেখা-শুনা করিয়া, ভাল-মন্দ মন্তব্য প্রকাশ করিতে-করিতে, যুক্তি-পরামর্শের স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়া, সঙ্গে-সঙ্গে বিনীতভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে-বেড়াইতে, সেই সব বহুমূল্য সৎপরামর্শ-গ্রহণ-কার্য্যে নিযুক্ত জামাতাকে উদ্দেশ করিয়া, এক সময়ে কাছাকাছি কেহ নাই দেখিয়া, শ্বশুর-মহাশয় একটুখানি কাসিয়া, কেশবিরল মস্তকে বার-কতক হাত বুলাইয়া, একটু যেন সলজ্জভাবে কহিয়া ফেলিলেন, "কিছু মনে করো না, অরবিন্দ,—আমি তোমায় ভাল রকমেই চিনি। তবে কি না,—তবে কি না এটা সংসার, আর আমরা হচ্চি সংসারী। এখানকার যা কর্ত্তব্য, সেগুলো তো নিয়ম-মতন ঠিক-ঠিক করে যাওয়া চাই। তাই এমন অপ্রিয় প্রসঙ্গটা হঠাৎ একটীবারের জন্যে তুলতে হলো বাবা! তা তুমি সে জন্যে দুঃখিত হয়ো না; আমি তোমায় কিছু অবিশ্বাস করে এ কথাটা তুলছি না। নেহাৎ বাপের প্রাণ কি না! সেইজন্যে তার মুখটা চেয়েই, আমায়—বুঝতে পারচো তো?—নেহাৎ সেইটেরই জন্যে।" অরবিন্দ বিনীত বচনে জিজ্ঞাসা করিল, "কি আদেশ করচেন, বলুন?" "না—না, আদেশ কিছু নয়। সেই তোমাদের বিয়ের সময়কার কথাটা। সেই সময় সকলেই আমায় ছুটকীর বিয়ে এখানে দিতে মানা করেছিল কি না; আর তোমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী—সেও তো শুনেইছ, কেঁদে-কেটে শয্যেধরা হ'য়ে পড়েছিল। বলে, সতীনে মেয়ে দেবার চেয়ে, মেয়ে গঙ্গায় ভাসিয়ে দাও। মেয়েমানুষ কি না! ওদের দশহাত কাপড়ে কাচা নেই,—বুদ্ধির দৌড় ওই পর্য্যন্ত! তা, আমি কারু কথা শুনিনি। সকলে একদিকে, আর আমি একদিকে। আমি বলি, মৃত্যুন্ বোস যখন আমায় কথা দিয়েছে, তখন সে কথার আর নড়চড় নেই,—সে সতীন্ থাকা না থাকা এক কথা। ওরা কেঁদে বলে কি জানো? যে, 'ওগো, তাঁর অবর্ত্তমানে ছেলে যদি সে কথা না মানে?' তা, আমি তার কি জবাবটি দিয়েছিলুম, তা শুনবে? আমি বলেছিলুম যে, 'কেন অত ঘাবড়াচ্চো? সেও মৃত্যুন্ বোসেরই ছেলে! কথায় বলে, বাপকা বেটা, সিপাহিকা ঘোড়া, কুছ্ নেহি তব্ হি থোড়া থোড়া। যারা বাপের বেটা হয়, তারা কি আর বাপের কথার নড়চড় হ'তে দেয়? অরবিন্দ যে স্ত্রীকে বাপের কথায় ত্যাগ করেছেন, তাঁর অবর্ত্তমানেই কি আর তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে মরা বাপের অপমান করতে পারেন। সে রকম ঔরসে

ওর জন্মই নয়।' তা বাবা, তোমার শাশুড়ী ঠাক্‌রুণ হাজারই হোক্‌,—বল্লুম ঐ তো,—মেয়েমানুষ বই আর তো কিছুই নয়! সে এরই মধ্যে অন্নজল ছেড়ে দোর দিয়ে পড়ে আছেন। বল্‌ছেন, 'ছুট্‌কীকে যদি সতীন্‌ নিয়ে ঘর কর্‌তে হয়, তা' হলে মেয়েটা কোন্‌ দিন না কোন্‌ দিন গলায় দড়ি দেবে, কি খিড়্‌কির পুকুরে গলায় কলসী বেঁধেই উলবে।' মায়ের প্রাণ! আর ঐটি ওঁর কোলের সন্তান কি না—বড়ই আদরের—সে ত তুমি সব জানোই বাবা,—"

অরবিন্দ নত মুখে, শান্ত স্বরে উত্তর করিল, "আপনি আমায় অত কথা কেন বল্‌ছেন? আমার বাপের প্রতিজ্ঞা আমার দ্বারা ভঙ্গ হবার কোন সম্ভাবনা কি দেখা গেছে?"

মোক্ষদাচরণ (অরবিন্দের শ্বশুর মহাশয়টির উহাই নাম) কিছু যেন অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "না—না, তা কি বল্‌ছি, তা কি বল্‌ছি—সে ত আমি বরাবরই জানি,—আমায় আর সে বুঝোতে হবে না বাবা! তবে ওরা সব মেয়েমানুষ, —মেয়েমানুষের জাত,—ওদের কথা ধরে কে? আমি এক-রকম বলেই এসেছি; আর এই এখনি বাড়ী গিয়েই ওঁদের বেশ করে বুঝিয়ে দেব 'খন যে, বোস্‌জাই গত হয়েছেন,—তা'বলে' তাঁর ভদ্রলোকের সঙ্গে দত্ত কথার তো আর মৃত্যু হয়নি! তোমাদের এ-সব ছোট ভাবনা কেন? ওহে চন্দর, দেখ দেখি, ছেলেগুলো সব গাড়ীতে গিয়ে উঠেছে কি না, সন্ধ্যে-বেলা আবার এক বেটা মক্কেলের আস্‌বার কথা আছে। শালার বেটার শালা জ্বালিয়ে মেরেচে হে,—তার ইচ্ছে যে, চব্বিশ ঘণ্টাই আমি তার কাগজ-পত্তর নিয়ে বসে থাকি।—আচ্ছা এখন চল্লুম।"

মাতা-পুত্রে কোন এক সময়ে নির্জ্জনে সাক্ষাৎ ঘটিলে, মা ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া সন্দিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, "ওখানে গিয়েছিলি?" পুত্র ইহার জবাব দিল, "হুঁ।" মা বলিলেন, "সবাই ভাল আছে?" ছেলে কহিল, "হ্যাঁ।" "খোকাটিকে দেখ্‌লি?" "দেখেছি।" "কত বড়টি হয়েছে?" "বড় হয়েছে।" "দেখ্‌তে কার মতটি হয়েছে রে? তোর মত, না, আমার বৌমায়ের মত?" "জানিনে।" "আস্‌তে চাইলে না?" "না।" "কিছু বল্লে তোকে? খেলে এলো?" "উহুঁঃ।"—"ওরে, একবার তাকে সঙ্গে করে আন্‌লি নে কেন রে,—একটীবার দাদার আমার মুখখানি দেখ্‌তুম! আমার সোণার চাঁদ রে!"

অরবিন্দকে গমনোদ্যত দেখিয়া, নিজের আকস্মিক উত্থিত শোকোচ্ছ্বাস আপনিই দমন করিয়া লইতে গেলেন; কিন্তু সেই অপরিচিত পৌত্রটির কাল্পনিক সুন্দর মুখখানি স্মৃতিপথে উদিত হইবামাত্র, সহসা ঝরঝরিয়া চোখের জল ঝরিয়া পড়িল; কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন, "উঃ! কি পাষাণই আমি পেটে ধরেছিলুম! কাল অত করে ঠেলে পাঠালেম;—মনে কর্‌লেম, ও স্বোয়াদ তো পাওনি,—ছেলের মুখ চোখে পড়লে, আর এমন করে থাক্‌তে পার্ব্বে না। পৃথিবীতে মানুষ ঐ মুখখানির দিকে চেয়ে আর সবই ভুলে যেতে পারে,—কেবল ঐ খানিকে পারে না। তা, তোরা তাও পারিস্‌। কেমন লোকের ছেলে বাবা তুমি,—তোমার কাছে আমার আশা করাই ভুল হয়েছিল।" মা কাঁদিতে লাগিলেন; ছেলে নিরুত্তরে চলিয়া গেল।

ব্রজরাণী সে রাত্রে নিজের শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, স্বামী শুইয়া আছেন। দেখিয়া সে ঈষৎ বিস্মিতা হইল। পিতৃ-বিয়োগের পর হইতে অরবিন্দ মায়ের কাছেই শয়ন করিয়া থাকে। "আজ এ ঘরে যে?" এই প্রশ্ন করিয়া সে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। অরবিন্দ দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া ছিল; তেমনি থাকিয়াই জবাব দিল, "চারদিকে গোলমাল।" "ওঃ, তাই জন্যে!" স্বরে ঈষৎ ব্যঙ্গের আভাষ ছিল। পরদিন ঘাট,—প্রকাণ্ড বাড়ীটা আত্মীয়-কলরবে পরিপূর্ণ; অসম্ভবতা ইহার মধ্যে কিছুই ছিল না। তথাপি ব্রজরাণীর মনে হইল, স্বামী নিজের শরীরের বিশ্রাম লইবার জন্য আজ তাহার মন্দির পবিত্র করিতে আসেন নাই, অপর উদ্দেশ্য আছে। অন্তরের কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব প্রশমন করণার্থ তাঁহার আজ একটুখানি নির্জ্জন স্থানের প্রয়োজন ঘটিয়াছিল বলিয়াই, হঠাৎ এই ব্রজরাণীর ঘরখানার কথা স্মরণে আসিয়াছে। স্বভাবজ তীব্র অভিমানে বুক ভরিয়া আসিল। কিন্তু মনের মধ্যে যাই হোক্‌, ঝগড়াঝাঁটি করিবার ইচ্ছা ছিল না। পিতা বাড়ী ফিরিবার মুখে শুভ সংবাদ কন্যাকে বিজ্ঞাপিত না করিয়া যান নাই। সেই আনন্দে মনের মধ্যে [illegible]তার হাওয়া বহিতেছিল। তাহাতেই ভাসিয়া গিয়া একটুখানি খরচ করিয়া ফেলিল। স্বামীর কম্বলশয্যার অদূরে, মুক্ত বাতায়নের জ্যোৎস্না-ধারায় মধ্যে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "কাল রাত্রে ফিরে কিছু খেলে-টেলে না, ওখানে বুঝি

খেয়ে এসেছিলে ?" "হ্যাঁ।" "সেইজন্তেই বুঝি অত রাত হ'লো,—এক সুর্য্যিতে তো দুবার খেতে নেই।" "হুঁ।" "আমাদের কিন্তু ভাবনা হচ্ছিল যে, হয় ত শরীর ভাল নেই না কি। খাওয়ার কথা তো কার্ত্তিকেটা কিছু বল্লে না!"

"সে তো তোমার মত পাগল হয়নি!" "আমিই বা পাগল হলুম কিসে ?" "হয়েছ বই কি!" "হ'তে পারে। তবে কি-কি লক্ষণ দেখতে পেলে, সেটা শুন্‌তে পাইনে ?" "আমার কি এখন যেখানে-সেখানে খেয়ে বেড়াবার সময় ?"

"যেখানে-সেখানে নয়; তবে ওখানে খেলে দোষ কি ?" "ওখানেই বা আমার 'যেখানে-সেখানের' সঙ্গে প্রভেদ কি ?" ব্রজরাণী কিছুক্ষণ ঈষৎ অপ্রতিভ ভাবে চুপ করিয়া থাকিল। তার পর হঠাৎ স্বামীর কণ্ঠস্বরের প্রচ্ছন্ন শ্লেষে মনে-মনে তপ্ত হইয়া উঠিয়া, সেও তেমনি শ্লেষ-প্রচ্ছাদিত সহজ স্বরেই জবাব করিল, "তা একটুখানি আছে বই কি।" "কি ?" "আর কোন্ দিন রাত একটায় বাড়ী ফিরে সারা-রাত নিচের ঘরে পড়ে কেঁদেচ!" "কেঁদেছি ?" শব্দটা যেন অরবিন্দের কণ্ঠমধ্য হইতে নয়,—অনেক দূর হইতে অপরিচিত স্বরে আসিয়া ভাসিল। ব্রজরাণী তখন রাগিয়াছে। সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া, কণ্ঠস্বরে যথেষ্ট ঝাঁঝ মাখাইয়া, স্পষ্ট স্বরেই উত্তর দিল, "হ্যাঁ, কাঁদনি ? কার্ত্তিক তোমার দোরে শুয়ে কাল যে সারারাত উপদেবতার বড়-বড় নিশ্বেসের শব্দ শুন্‌লে, সে উপদেবতা কে গো ? আমি তো আর চাষা নই যে কিছু বুঝিনে! মনের সমস্তটাই তোমার সে আজ পর্য্যন্ত জুড়ে আছে। আমার এতটুকু একটু স্থান আছে কোথাও ?"

অরবিন্দ তখন বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। এ কথার কোন প্রতিবাদ সে করিল না! শুধু এই কথাটি জিজ্ঞাসা করিল, "আমি তোমায় অযত্ন করেচি কখনও!"

"যত্ন আর ভালবাসা দুই কি এক ?" অরবিন্দ এ কথার কোনই জবাব দিল না। তখন ব্রজরাণী উঠিয়া স্বামীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সেই স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নালোকের মধ্যে তাহার ঈর্ষ্যা-বিবর্ণ মুখ অত্যন্ত পাণ্ডুর হইয়া ফুটিয়া উঠিল; তাহার দুই চোখ নূতন ইস্পাতের ছুরির মত ঝকিয়া উঠিল। সে কহিল, "অযত্ন যে ঠিক কোন দিন করেছ, সে কথা বল্লে আমার জিভ খসে যাবে,—তা' আমি বল্‌তে পার্‌বো না। কিন্তু তুমি যাকে যত্ন মনে করে করেছ, যত্নের স্বাদও ঠিক তা থেকে আমি কোন দিনই পাই নি। আমায় রাশি-রাশি বই, এসেন্স, গহনা, শাড়ী কিনে এনে দিয়েছ; রাগ করে কথা, নেহাৎ আমি না রাগালে বলোও নি। কিন্তু সেই কি সব ? আমি কিছু বল্‌তে চাইনে,—অনেকবার তো বলেছি,—ওসব ছাই-পাঁশ,—তোমার ও শুধ্‌নো আদর ওসব আমার চাইনে। ওসবে আমার এতটুকুও লোভ নেই। তুমি যখন আমায় সত্যি করে ভালবাসতে পার্ব্বে না, তখন তুমি কেন আমায় বিয়ে করেছিলে ? মনের মধ্যে সমস্তক্ষণ আর একজনকে ধ্যান করে, বাহিরে এই যে একটা টেনে-এনে ঘরকরণা করা,—এ কি ছলনা নয় ? এতে কি পাপ নেই ?"

অরবিন্দ আবার শয়নোদ্যোগ করিয়া ধীরে-ধীরে কহিল, "আমি তো তোমায় নিজে কোর্টশিপ করে বিয়ে করিনি রাণি! বাবারা দুজনেই খুঁজে-পেতে দুজনকে মিলিয়ে দিয়েছেন। তার জন্যে আর চিরকাল ধরে কেঁদে-কেটে কি করবে,—সে তো আর বদল হবে না! এখন নিজের বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ো,—অনেক রাত হয়ে গেছে।"

ব্রজরাণী এ যুক্তিতে টলিল না। সে তেমনি দাঁড়াইয়া থাকিয়াই, গভীর নৈরাশ্যের স্বরে কহিয়া উঠিল, "আমায় তুমি বাপের কথায় বাধ্য হয়ে বিয়ে করেছ, তা আমি জানি। কোর্টশিপ করে তাকে বিয়ে করেছিলে, তা'ও না জেনেছি তাও না; কিন্তু বলো তুমি, এ রকম কর্ব্বার তোমাদের কি অধিকার আছে ? যাকে ভালবাসতে পার্ব্বে না,—কখনও পার্ব্বে না,—তাকে কেন চিরদিন এমন করে পুড়িয়ে মার্ব্বার জন্যে ঘরে নিয়ে এলে ?"

"কি ছেলেমানুষী করচো রাণি! তোমার উপর এতটুকু অন্যায় হয় নি, ভেবে দেখ। তুমি অনর্থক নিজের মনের হিংসেয় যদি জ্বলো, সে দোষ তোমার।"

"সে দোষও আমার নয়। তুমি শুধু বাইরের কথা বল্‌চো; কিন্তু ভেতরে যে সেই তোমার সব। সেখানে আমি যে ভিখিরি—"

"রাণি, তুমি বাড়ালে। সেই একজনকে ভিখারীর অধম করেও কি তোমরা তৃপ্ত হও নি ? মনের খোঁচা চব্বিশ ঘণ্টা দিচ্ছ! তারই বা কি প্রমাণ পেয়েছ, বলো দেখি ?

একবিন্দু মনুষ্যত্ব এ মন থেকে কোন দিন ক্ষরে পড়েছে কি ?"

"তুমি তার কি বুঝবে ? এই যে কথাগুলো বল্লে, ওইগুলো যে তোমার বুকের রক্তে স্নেহের রসে মাখা !"

"তবে নাচার !"

"আমি তো তোমায় কিছু বল্‌চিনে ! এ যে হবেই ! তুমি যে তাকে ভালবেসেছিলে,—কেমন করে ভুলবে ; কেমন করে আবার আর একজনকে ঠিক তেমনি করে ভালবাসবে !—সে কি হয় ?"

"আমি জানিনে রাণি। ঘুমে আমার শরীর পাথর হয়ে আস্‌চে, যদি একটু রেহাই দাও—"

"বেশ তো, ঘুমোও না তুমি ! এ তো আর বর্দ্ধমান থেকে আসা নয় যে—নাঃ ! আমার কপাল মন্দ,—কার দোষ দেবো ?"

একটী মুহূর্ত্তমধ্যে বিছানায় পড়িয়া অরবিন্দের নাসিকা গর্জ্জিয়া উঠিল। আর জানালার নিকটে বসিয়া, তাহারই গরাদে মাথা রাখিয়া, চোখ মুছিতে-মুছিতে ব্রজরাণী মনে-মনে বলিতে লাগিল, "এর চেয়ে যদি সতীন নিয়ে ঘর করতুম, সেও ঢের ভাল হ'তো। সে না হয় দুজনে ঝগড়া হোল,—ওঁকেও দুকথা শুনালাম। এতে বলবার, দোষ দেবার কিছু নেই। অথচ এতে তার উপরও অন্যায়, আর আমার উপরও অন্যায়। কিন্তু তাই বলেই কি আর আমি তাকে আন্‌তে দিতে পারি ? না, সেও পারি না। এর সবটাই দোষ। মা গো ! সতীনের উপর মানুষ কেন মেয়ে দেয় ?"

(১১)

ভাগলপুরে জন্ম, এবং উক্ত প্রদেশীয়া দাসী এতবারিয়া কর্ত্তৃক প্রতিপালিতা উষাকে ছোটবেলায় 'কবুত্‌রি' বলিয়া ডাকা হইত। এখনও মা প্রভৃতি কেহ কেহ তাঁহার উপরি-উক্ত বিশেষণটি একেবারে ত্যাগ করিতে পারেন নাই। পরিহাস করিয়া ননন্দার অপছন্দসই ওই নামটির যখন-তখন ব্যবহার করিয়া তাহাকে ক্ষেপাইয়া তোলা ব্রজরাণীর চিরদিনের আমোদ। "আয় তিতি, আয়, আয়, আয়—" ইত্যাদি জীববিশেষের প্রতি প্রযোজ্য সম্বোধন-পদটি ব্যবহার করিলেই, মুখ রাঙা করিয়া হয় উষা সেখান হইতে চলিয়া যাইত, না হয় "যা—যাঁ, ছুটকি, অত আর বাহাদুরি করতে হবে না।" এই বলিয়া এক দুর্ব্বল কলহের চেষ্টা উপস্থিত করিত। ব্রজরাণীর বাপের বাড়ীর যে ঝী তাহার সঙ্গে আসিয়াছিল, সেই তাহাকে বাড়ীর কনিষ্ঠা কন্যা পদবাচ্য এই নামটিতে সম্বোধন করে। নিরুপায়া উষা আত্মরক্ষার্থ ইহাকেই প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রক্ষেপ করিতে চাহিয়াছিল ; কিন্তু ব্রজরাণী অতি শীঘ্রই একদিন প্রমাণ করিয়া দিয়াছিল যে, 'ছুটকি' আর 'কবুতরি'তে আস্‌মান-জমীন্ ফরখ্। অগত্যা রাগে গর্জ্জিয়াও উষা এই অজ্ঞানাবস্থায় তাহার প্রতি পাঁচজনের দেওয়া অভিশাপকে কোন রকমে হজম করিয়াই চলিত। মার কাছে নালিসে ফল ফলে নাই। বাবার কাছে নালিসে ফল ফলিয়াছিল ; তবে ফলটা কিছু কটু। তিনি অতি শিশুদিগেরও বেয়াদপি সহ্য করিতে পারিতেন না। বউমার এই অশিষ্টতা উপলক্ষ করিয়া সেই হেতু কুশিক্ষা-প্রদাত্রী বধূ-জননীই নিন্দার ভাগিনী হওয়াতে, ব্রজরাণী যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া আসিয়া, ভাঁড়ার হইতে একমুঠি চাল আনিয়া উঠানে ছড়াইতে ছড়াইতে, আকাশের দিকে চাহিয়া কল্পিত পারাবতের উদ্দেশে গলা ছাড়িয়া আরম্ভ করিল, "আয় তিতি, তিতি, তিতি—"

উষা ছুটিয়া আসিয়া—"বোদি ফের !" বলিয়া গর্জ্জাইতেই, সগর্জ্জনে উত্তর হইল, "তুই কি পায়রা না কি ? তবে আয়, ধান খাবি আয়।"

সেই অবধি 'কবুতরি'র ঝগড়া প্রায় মিটিয়াছিল ; অর্থাৎ আর কখন এ লইয়া হাইকোর্ট হয় নাই। আজ আবার সেই নামে আদরের ননদকে ডাকিয়া ব্রজরাণী কহিল, "কবুতরি ! সতীনে পড়ার মত অধর্ম্ম মেয়েমানুষের আর কি আছে বল্ দেখি ?"

বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে 'খুন্‌সুটির' ঝগড়া অনেকখানি কমিয়া গিয়া, গাঢ় প্রণয়ে এই দুইটি সমবয়স্কার চিত্ত পরস্পরের প্রতি নিবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। মা নিজে কোন সময় ভুলিয়া গিয়া ছোটবেলার নাম ধরিয়া ফেলিলে, সে রাগ করিয়া বলিয়া উঠে—"তোমরা কি ওই হাতের নাম চার-কাল ধরেই করবে !—উষা বল্‌তেই বা কতক্ষণ লাগে বাবু !" কিন্তু ইহাকে প্রায় কিছু বলে না। সে মুখ গম্ভীর করিয়া জবাব দিল, "তাতো বটেই ! বগী-বিন্দির মত চব্বিশ-ঘণ্টা সতীনের সঙ্গে লড়তে হচ্চে—অধর্ম্ম না !"

ব্রজরাণীর মুখের ভাব হাসির উপযুক্ত না থাকিলেও, এ কথায় সে হাসিয়া ফেলিল। হাসিয়াই বলিল, "ঠিক তাই রে, ঠিক তাই! ঐ আবাগী ছুটোর মতনই দিন-রাত মনের মধ্যে সতীনের সঙ্গে যে ঝগড়া চলছে, সে তোরা শুন্‌তে না পাস্, আমার নিজের কাণ যে তাতে ঝালাপালা হয়ে গেল।—না ভাই, সত্যি বল্‌ছি তোকে,—সতীনের ওপোর যারা মেয়ে দেয়, তাদের মত মেয়ের শত্তুর আর এ পৃথিবীতে কেউ নেই। তোদের ভাই বেশ, কোন জ্বালা-ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হয় না।"

"হিংসে হচ্চে না কি? বড্ড পছন্দ হয় তো নিয়ে নে' না?"

"বদলে নিস্ তো রাজী আছি।"

"যাঃ!—পোড়ারমুখীর মুখে আগুন জ্বেলে দিতে হয়!"

"তা না হলে আর লাভটা কি হলো? ইংরেজিতে যে বলে from the frying pan to the fire, ভাজনা খোলা থেকে আগুনে পড়া—তাই হবে না কি? কেন, দাদা কি মন্দ?"

"তুই মর!"

"বেশ মজা আর কি! আমি মরি, আর আমার সতীন এসে ঘরকন্না করুক!"

"সতীনের হিংসেয় মরবি নি? যদি সত্যি-সত্যিই মরণ আসে, তাকে ঠেকাবি কেমন করে বউ-দি? সত্যি ভাই, তা হলে কি করবি, বল্ না?"

"তা, সে তখন দেখা যাবে। তুই ভাই অমন কথাগুলো থামকা বলিস্‌নে—শুন্‌লে যেন প্রাণ উড়ে যায়। কথায় বলে 'সোয়ামী যমকে দেওয়া যায়, তবু সতীনকে দেওয়া যায় না।' সে আমি তে পারবো না,—ভূত হয়েও আগ্‌লে বেড়াব।"

ঊষা ঈষৎ শিহরিয়া,ভ্রাতৃজায়ার ঈর্ষ্যা-বিকৃত মুখের দিকে চাহিল।—"মাগো! এমন কথা তোর মুখ থেকে বেরুলো কি করে? সত্যি কি সতীনের উপর অতই হিংসে হয়?" ব্রজরাণী সখীর তিরস্কারে লজ্জিত না হইয়া, সহাস্য মুখে স্কুলপাঠ্য কবিতা-পুস্তকের বাল্যপঠিত কবিতাংশ আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিয়া দিল।—

"চির-সুখী জন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে?
কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে,
কভু আশিবিষে দংশেনি যারে।"

ঊষা একটা ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, শুধু ছোট করিয়া বলিল, "কে জানে ভাই!"

ব্রজও একটা নিঃশ্বাস ফেলিল, সে নিঃশ্বাসটা ননন্দা অপেক্ষা অনেক দীর্ঘ ও তপ্ত। এবার না হাসিয়াই বলিল, "জান্‌বিনি কেন, জানে সবাই। মনে করে দেখ দেখি,—ছোট্‌ঠাকুর-জামাই আর একজনকে নিয়ে হাসছে, কথা কইছে,—তোর ঘরের খাটের বিছানায় দুজনে পাশাপাশি শুয়ে আছে,—ঠাকুরজামাইকে মধ্যে-মধ্যে আদর করছে,—তোর—"

"যাঃ—" বলিয়া এই অপ্রিয়বাদিনীর পৃষ্ঠে ঊষা একটা ছোটখাট কিল বসাইয়া দিল।

"কেন গো! মারো কেন? ছবিখানা কেমন লাগ্‌ছিল? সুন্দর না?"

ঊষা লজ্জা-কুণ্ঠিত সরল হাস্যে স্বীকার করিয়া লইল যে, ভাল লাগে নাই। তার পর ক্ষণকাল নীরবে কি চিন্তা করিয়া, কিছু বিস্ময়ের সহিত কহিয়া উঠিল, "আচ্ছা, একটা আমার বড় আশ্চর্য্য লাগে,—আমরা একটা সতীন সইতে পারিনে; আর সেকালের লোকেরা অত-অত সতীন সইত কি করে? শুনেছি, তখন কুলীন বামুন-কায়েতের ঘরে,—বিশেষ বামুনের একশো, একশো-আট পর্য্যন্ত বিয়ে হতো। তা আমাদের মায়েরই তো তিনজন শাশুড়ী ছিলেন।"

ব্রজ বলিল, "কি আর সইতো? যাদের অতগুলি করে বিয়ে, তাদের তো ওটা বিয়ের হিসেবে ছিল না,—ব্যবসার সামিল ছিল। বউকে ঘরেও আন্‌তো না,—তা ঘরই বা তাদের কোথায়? মামা-ঘরেই ত মানুষ। বছরে দু'একবার পাওনা আদায় উপলক্ষে প্রত্যেক শ্বশুরবাড়ী পায়ের ধূলোর সঙ্গে স্ত্রী-বেচারিকে কৃতার্থ করে আসতেন। একক্ষুরে মাথা মুড়ান,—কে কার হিংসে করে। চাক্ষুষ পর্য্যন্ত কখনও হয়ে ওঠে নি।"

"যারা দু'তিনজনে ঘরকন্না কর্‌তো, তেমনও তো ছিল,—সবাই ত আর 'একশতী' নয়। এই যেমন আমাদের ঠাকুরমায়েরা।"

"তা, তারাই যে খুব গলাগলি ক'রে বসে থাকৃত, তারই বা প্রমাণ কি ? তারাই ওই বগী-বিন্দীর আদর্শ।"

এ যুক্তি খণ্ডনের কোন বিরুদ্ধ নজীর জানা না থাকায়, উষা অগত্যা হারি মানিয়া চুপ করিল। কিন্তু ব্রজকে সতানে পাইয়া রাখিয়াছে,—সে এমন মুখপ্রিয় আলোচনা এত অকস্মাৎ ত্যাগ করিতে পারে না। সপত্নীর কথায় সে যেন মাতিয়া উঠে। সামান্য ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, যেন বিরুদ্ধ পক্ষের যুক্তি খণ্ডন করিয়াই, সে নিজের সপত্নী-দ্বেষের অনুপায়তা প্রদর্শন করিবার জন্যই বলিল, "আবহমান কাল থেকে খুঁজে দেখ, সতীন সইতে কেউ কোনদিন পারে নি। দ্রৌপদী,—যার পাঁচ-পাঁচটা স্বামী, সে মেয়েও—অর্জ্জুন যখন ভদ্রাকে বিয়ে করে আন্‌লেন,—তখন বউ তুল্‌তে বরণডালা সাজাতে বসেনি। একটী দিনের জন্য দেখা হয়েছে কি, অম্‌নি হিড়িম্বার সঙ্গে ঝুটোপুটি লাগিয়ে দিয়েছেন। এমন কি, দুজনে চুলোচুলি হ'তে-হ'তে কটাকট্‌ ছেলেগুলোর মাথা পর্য্যন্ত খেয়ে বস্‌লেন। তার পর সুনীতি-সুরুচি, দেবযানী-শর্ম্মিষ্ঠা কতই বল্‌বো, পুঁথি বেড়ে যায়।"

উষা কহিল, "তা পুরাণে ও-সব অনেক আছে। কৈকেয়ী সতীনটিও কারুর চেয়ে কম নন। কিন্তু ভাই বঙ্কিম বাবুর বইতে—"

"তাই বা কি? সূর্য্যমুখী কি সতীনকে বড়ই ভাল-বেসেছিল ? সতীনের ভয়েই তো ভদ্রলোকের মেয়ে দেশত্যাগী হ'লো!"

"কিন্তু সাগর-বৌ, নন্দা ?" "নন্দাও সতীনের প্রেমে মগ্ন হয়ে কিছুই করে নি। কর্ত্তব্য-বোধটা তার একটু বেশী মাত্রায় থাকায়,তারই তাড়া খেয়ে যা কিছু করেছিল। ঐ যে তারই মুখ দিয়ে লেখক বলিয়েছেন 'সতীন মরিলেই ভাল ; কিন্তু—' ঐ কিন্তুটিতেই সে বেচারাকে সতীন-কাঁটা গলা থেকে নামাতে দ্যায়নি।" "ধরে নিলুম। কিন্তু সাগর-বৌ ? সে যে নিজে জোগাড় করে নিজের ঘরে সতীনকে স্বামীর কোলে তুলে দিলে। তবু কতটুকু মেয়ে সে তখন ! তের-চৌদ্দ বছর বই তার বয়েস না। সাগর কত ভাল ভাই!"

"সংসারে ক'জন সাগর হতে পারে। ওঁর অতগুলি নায়িকার মধ্যেও তো ঐ একটী সাগর। অমনটি আর কই ?"

"তা হলে তুই সেই হালপেঁচা নয়নতারা ?"

ব্রজরাণী হাসিয়া ফেলিয়া বলিল—"যাঃ ! তা বই কি ! কেন, আমি কি তেম্‌নি কালো, না আমার দাঁত তেম্‌নি উঁচু ?"

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ

[শ্রীঅনাথনাথ বসু]

পত্রিকার সপ্তদশ সংখ্যায় যশোহর জেলার কোন মহকুমার জনৈক য়ুরোপীয় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক একটী স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলতার হানি সম্বন্ধে একটী সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। মহকুমা ও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের নাম কিন্তু প্রকাশ করা হয় নাই। জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার ওকিনিলীর হেড্‌ ক্লার্ক বাবু রাজকৃষ্ণ মিত্র ডেপুটীর উক্ত কাহিনীটি অতি তীব্র ভাষায়, বিস্তৃত ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া অমৃতবাজার পত্রিকার অষ্টাদশ সংখ্যায় প্রকাশ করেন। পত্রিকা পাঠ করিয়া মিষ্টার মনরো প্রবন্ধের লেখক কে, তাহা জানিবার জন্য গোপনে অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। "ভারতবর্ষ ভারতবাসিগণের জন্য," যে সংবাদপত্র এই মন্ত্র প্রসব করিয়া থাকে, তাহার ধ্বংস-সাধনের জন্য জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট, বিভাগীয় কমিশনার প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারিগণ যে সুযোগের অনুসন্ধান করিতেছিলেন, এইবার তাহা প্রাপ্ত হইলেন। পত্রিকায় য়ুরোপীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের নাম অপ্রকাশ থাকিলেও, ঝিনাইদহের সবডিবিসনাল অফিসার রাইট সাহেবের দ্বারা মিষ্টার মন্‌রো অমৃতবাজার পত্রিকার পরিচালকগণের বিরুদ্ধে আদালতে এক মোকদ্দমা রুজু করাইলেন। প্রকৃত লেখক কে, তাহা স্থির করিতে না পারায়, শিশির-কুমারের সহিত তাঁহার পরিবারস্থ সকলকেই আসামী করা হইয়াছিল। শেষে মতিলাল ও তাঁহার একজন

খুল্লতাতকে মুক্তি দিয়া সাক্ষী-শ্রেণীভুক্ত করা হয়। এই মোকদ্দমার ব্যাপার লইয়া দেশের মধ্যে একটা মহা আন্দোলন হইয়াছিল। শিশিরকুমারই অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য মতিলাল ও তাঁহার খুল্লতাতের সহিত যশোহরের বহু উকিল, মোক্তার, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট, মুন্সেফ ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে সাক্ষী মানা হইয়াছিল। পত্রিকার প্রিণ্টার চন্দ্রনাথ রায় ও বাবু রাজকৃষ্ণ মিত্রকেও আসামী করা হইয়াছিল। রাজকৃষ্ণ বাবু নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্যই বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। কথা-প্রসঙ্গে তিনি তাঁহার কয়েকজন বন্ধুর নিকট অহঙ্কার করিয়া বলিয়াছিলেন যে, য়ুরোপীয় ডেপুটীর বিরুদ্ধে পত্রিকায় যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা তাঁহারই লেখনী-প্রসূত। এ সংবাদ ক্রমশঃই রাষ্ট্র হইয়া পড়িল; শেষে গভর্ণমেণ্ট জানিতে পারিয়া রাজকৃষ্ণকে আসামী-শ্রেণীভুক্ত করিয়াছিলেন এবং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নকে তাঁহার বিরুদ্ধে সাক্ষী মানিয়াছিলেন। মোকদ্দমা রুজুর পর, হেমন্তকুমার কলিকাতায় আসিয়া উকিলদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া, তাঁহাদের মোকদ্দমার বিচার-ভার যশোহরের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার ওকিনিলীর হস্ত হইতে অন্য কোনও এক বিচারপতির হস্তে প্রদান করিবার প্রার্থনা করিয়া হাইকোর্টে এক আবেদন করিয়াছিলেন।

মোকদ্দমাটী যেন শিশিরকুমার ও গভর্ণমেণ্টের মধ্যেই হইতেছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার মনরো তাঁহার সহযোগী মিষ্টার ওকিনিলীর উপর বিচার-ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। ওকিনিলী একদিন শিশিরকুমারকে বলিয়াছিলেন, "শিশির, এবারে তোমাকে নিশ্চয়ই জেলে দিচ্ছি।" হাসিতে হাসিতে শিশিরকুমার উত্তর করিলেন, "দেখা যাবে; কিছুতেই পারবেন না।" ওকিনিলী একদিন জেল পরিদর্শনে গমন করিয়া জেলারকে বলিয়াছিলেন "শিশিরকুমার ঘোষ শীঘ্রই জেলে আসছেন, তাঁর জন্যে যেন একটা ঘর ঠিক করে রাখা হয়।" কোন-কোনও কর্ম্মচারী খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া মধ্যে-মধ্যে যে অন্যায় কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টেরই দুর্নাম হইয়া থাকে। শিশিরকুমারকে যেরূপেই হউক কারাগারে প্রেরণ করিতে হইবে, এই স্থির করিয়া বাদী পক্ষ হইতে বিশেষ তদ্বির করা হইয়াছিল। যাঁহাদের উদ্যোগে এই মোকদ্দমার সৃষ্টি, তাঁহারাই যখন বিচার-ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তখন শিশিরকুমারের কারাবাস অনিবার্য্য ভাবিয়া যশোহরবাসিগণ উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। শিশিরকুমারের সহিত ওকিনিলীর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল; সেজন্য তিনি মতিলালকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। বিচারের সময় একদিন ওকিনিলী মতিলালকে বলিয়াছিলেন, "তুই রাজকৃষ্ণের নাম কর না, তাহ'লেই তোরা সব খালাস পাবি।" কিন্তু মতিলাল অচল, অটল। হেমন্তকুমার হাইকোর্টে যে আবেদন করিয়াছিলেন, তাহার ফলে তাঁহাদের বিচার-ভার দায়রা-জজের উপর অর্পিত হইয়াছিল। ওকিনিলী আসামীগণকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া শাস্তি দিবেন স্থির করিয়াছেন, এমন সময় হাইকোর্টের আদেশ তারযোগে তাঁহার হস্তগত হয়। হাইকোর্টের আদেশ পাঠ করিয়া রাগে ওকিনিলী কাঁপিতে লাগিলেন এবং শেষে বলিয়া উঠিলেন, "এ দেখিতেছি হেমন্তর কাজ। আচ্ছা, দেখি কে আসামীদের রক্ষা করে।"

দায়রা-জজ মিষ্টার লফোর্ডের উপর বিচার-ভার অর্পণ করা হইল বটে, কিন্তু তিনিও শিশিরকুমারের প্রতি সদয় ছিলেন না; কারণ তাঁহার সম্বন্ধেও অমৃতবাজার পত্রিকায় মধ্যে মধ্যে তীব্র মন্তব্য প্রকাশিত হইত। এই সময় তিনি বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহার স্থলে মিষ্টার লাউইস্ (Mr. Lowis) দায়রা-জজ নিযুক্ত হন। নির্দ্দিষ্ট দিবসে মোকদ্দমার বিচার করিতে বসিয়া তিনি শিশিরকুমারকে বলিলেন, "বাদীপক্ষ আজ প্রস্তুত নহে, সেজন্য মোকদ্দমা অন্য একদিন হইবে।" শিশিরকুমার সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। বিদায়ের পর লফোর্ড যোগদান করিয়া বিচার করিবেন, বাদীপক্ষের এইরূপ ইচ্ছা ছিল। কয়েকমাস মোকদ্দমা স্থগিত রহিল। মিষ্টার লফোর্ড বিদায় হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মোকদ্দমা আরম্ভ করেন। শিশিরকুমারের অন্তরঙ্গ বন্ধু, গভর্ণমেণ্টের উকিল বাবু দক্ষিণাপ্রসাদ বসু তাঁহার বিপক্ষে এবং সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার বাবু মনোমোহন ঘোষ তাঁহার পক্ষে মোকদ্দমা পরিচালনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্যারিষ্টার হওয়ার পর মনোমোহনের এই সর্ব্বপ্রথম মোকদ্দমা। এরূপ কঠিন মোকদ্দমায় জড়িত হইলেও শিশিরকুমার বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। অমৃতবাজার পত্রিকা প্রচারিত হইবার কয়েক দিবস পরেই তাঁহার

সহধর্ম্মিণী একটী পুত্রসন্তান রাখিয়া ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ভগবানের লীলা হৃদয়ঙ্গম করা মানবের সাধ্যাতীত। শিশিরকুমারের সান্ত্বনা-স্থল সেই মাতৃহীন শিশুটীকেও ভগবান কয়েক দিন পরে শিশিরকুমারের হৃদয় অন্ধকার করিয়া কাড়িয়া লইয়াছিলেন। শিশির-কুমার স্বাধীন; সংসারের চিন্তা তাঁহার হৃদয় হইতে এক-রূপ দূর হইয়াছিল। মোকদ্দমার জন্য তাঁহার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবর্গ ও দেশবাসিগণ চিন্তিত হইলেও তিনি বিন্দু-মাত্র বিচলিত হন নাই। বাল্যকাল হইতেই ভগবানে অটল বিশ্বাস স্থাপন করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়াই, শিশির আপনাকে নির্দ্দোষ জানিয়া, মোকদ্দমায় জয় লাভ করিবেন বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি এক হাজার টাকার জামিনে খালাস ছিলেন। যথাসময়ে আদালতে উপস্থিত না হইলে জামিনের টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে এবং ওয়ারেণ্ট বাহির হইবে, এসকল কথা জানিয়াও শিশির আদালতে উপস্থিত হওয়া সম্বন্ধে বিশেষ ব্যস্ত হইতেন না। মোক-দ্দমার সময় একদিন আদালতে যাইবার কথা ভুলিয়া গিয়া, তিনি একটী সঙ্গীত রচনা করিয়া, তাহাতে সুর সংযোগ পূর্ব্বক আলাপ করিতেছিলেন। শিশির বারান্দায় বেড়াইতে-বেড়াইতে গুন্‌গুন্ স্বরে গান করিতেছেন, আর গানের এক-এক পদ খড়ি দ্বারা দেওয়ালে লিখিতেছেন। ভাগ্য-ক্রমে আদালতে রওনা হইবার পূর্ব্বেই গানটী শেষ হইয়া-ছিল; নচেৎ সে দিন হয় ত তাঁহার আর আদালতে যাওয়া ঘটিত না; এবং সঙ্গে-সঙ্গে জামিনের টাকা বাজেয়াপ্ত হইয়া তাঁহার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইত। গানটী আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

"আমি জেনেছি পিতা আমি তোমার সন্তান।
আমি জেনে শুনে বসে আছি আপন মনে কুতূহলে
আর কে আমারে পায়
সংসারেরি দায় সব দূর করেছি।
এখন চরণ সেবি তোমার, গুণ গাই সার মনে।
যদি কেশেতে ধর, মারিবে মার,
আমার তাহে ক্ষতি কি!
ও বাপ্ যেন আমার কাছে
তোমার প্রহার মিঠে লাগে।
যদি ক্রোধ করি চাও, আমার ভয় নাহি হয়,
আমি তোমারি সন্তান।
তোমার রাগে রাঙ্গা পদ্ম চক্ষে
বহে দেখি প্রেমসাগর,
মায়ে সন্তানে মারে, সন্তান কাঁদে ফুঁকারে
আর যায় কোলের ভিতরে।
ও বাপ্ এবে মারো, পরে দিবে শত চুম্বন বদনে।"

মিষ্টার মন্‌রো ইতোমধ্যে কৃষ্ণনগরে বদ্‌লি হইয়াছিলেন। তিনি শিশিরকুমারের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবার জন্য যশোহরে আগমন করিয়া, আদালতে একখানিমাত্র পত্র দাখিল করেন। পত্রখানি শিশিরকুমার তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন। শিশিরকুমার যে অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক, সেই পত্র হইতেই তাহা প্রমাণ করিবার জন্য মিষ্টার মন্‌রো যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। নীলকর সাহেব ও অন্যান্য বহু সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইল; কিন্তু শিশির যে পত্রিকার সম্পাদক, তাহা সপ্রমাণ হইল না। গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে মতি-লালকে সাক্ষী মানা হইয়াছিল, পাঠক তাহা অবগত আছেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স বিংশ বর্ষের অধিক নহে। তিনি ইংরেজীতে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। তাঁহাকে ধমক দিয়া, শেষে রাগাইয়া দিয়া, তাঁহার নিকট হইতে প্রকৃত কথা বাহির করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল; কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই। এই মোকদ্দমার পূর্ব্বে ছাপা-খানার ঘোষণা (declaration) দেওয়া হয় নাই বলিয়া শিশিরকুমার প্রভৃতিকে একবার অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। সেই মোকদ্দমার সময় মতিলাল বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার খুল্লতাত চন্দ্রনারায়ণ ছাপাখানার মালিক। এই মোকদ্দমার সময় জজ সাহেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "অমৃতবাজার পত্রিকার মালিক কে?"

মতি। ইহার কেহ মালিক নাই, ইহা সাধারণের কাগজ।

জজ সাহেব ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "তুমি পূর্ব্বে এক মোকদ্দমায়, নিম্ন আদালতে বলিয়াছ যে, চন্দ্রনারায়ণ মালিক; এখন বলিতেছ কেহই মালিক নহে। তোমার কোন্ কথা সত্য? আমি তোমাকে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার অপরাধে অভিযুক্ত করিব।"

মতি। মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে আপনি অভিযুক্ত করিতে পারেন; কিন্তু আমি মিথ্যা সাক্ষ্য দিতেছি, আপনি কিরূপে জানিলেন?

জজ। তুমি নিম্ন আদালতে এক কথা বলিয়াছ, এখানে আর এক কথা বলিতেছ। তোমার কোন্ কথাটা সত্য?

মতি। আমার দুই কথাই সত্য।

জজসাহেব বড়ই রাগ করিয়া বলিলেন, "কি রকম?"

মতি। "চন্দ্রনারায়ণ ছাপাখানার মালিক। ছাপাখানা ও সংবাদপত্র যে দুইটী পৃথক জিনিস, এ কথা আপনি ভুলিয়া যাইতেছেন কেন।" মতিলালের জবাব শুনিয়া জজ সাহেব অপ্রতিভ হইয়া নীরব হইলেন। তিনি পুনরায় মতিলালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক কে?"

মতিলাল। অমৃতবাজার পত্রিকা মাত্র কয়েক মাস হইল প্রকাশিত হইয়াছে; সুতরাং কে যে তাহার সম্পাদক হইবেন, তাহা স্থিরীকৃত হয় নাই।

জজ। যদি তাহাই হইবে, তবে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, উকিল, শিক্ষক প্রভৃতি স্থানীয় বিশিষ্ট ভদ্রলোকগণ শিশিরকুমারকে সম্পাদক বলিয়া মনে করেন কেন?

মতিলাল। তিনি একজন সুলেখক বলিয়াই বোধ হয় সাধারণে তাঁহাকে পত্রিকার সম্পাদক বলিয়া মনে করেন।

শিশিরকুমার সুলেখক,—কথাটা জজ সাহেবের ভাল লাগিল না। তিনি বিরক্তির সহিত বলিলেন, "তুমি কি বলিতে চাও যে শিশিরকুমারের ন্যায় লেখক এদেশে আর নাই?"

জজ সাহেবের ভাব দেখিয়া মতিলাল হাসিতে-হাসিতে বলিলেন, "তাঁহার ন্যায় লেখক এ দেশে আর নাই, এ কথা আমি ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। তবে আমার বোধ হয় যে, শিশির বাবু অনেক মোটা মাহিনার সিবিলিয়ান অপেক্ষা ভাল লিখিতে পারেন।"

নির্ভীক যুবক মতিলালের এই উত্তর শুনিয়া আদালতে উপস্থিত সাহেব ও ভদ্রলোকগণ স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। ক্রোধে বিচারপতির মুখখানি রক্তিমবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। তিনি ক্রোধ সম্বরণ করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রবন্ধটী কে লিখিয়াছিল?"

মতিলাল। তা আমি জানি না।

জজ। তুমি নিশ্চয়ই জান। তুমি স্মরণ করিয়া দেখ।

মতিলাল। কি স্মরণ করিব?

জজ। তোমাকে পাঁচ মিনিট সময় দিলাম, পাঁচ মিনিটের মধ্যে তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দিবে।

জজ সাহেব ঘড়ি খুলিয়া বসিয়া রহিলেন। মতিলাল নীরব। পাঁচ মিনিট অন্তে জজ সাহেব মতিলালকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে লিখিয়াছে বল।"

মতিলাল। আমি জানি না।

জজ সাহেব রাগে টেবিল চাপড়াইয়া বলিলেন, "তুমি নিশ্চয়ই জান। তোমাকে বলিতেই হইবে।"

মতিলাল মৃদু-মৃদু হাসিতে-হাসিতে বলিলেন, "আপনার মনস্তুষ্টির জন্য আমি ত কিছু নূতন সৃষ্টি করিতে পারি না।"

অনেক চেষ্টা করিয়াও যখন শিশির ও তাঁহার সহোদরগণের বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ পাওয়া গেল না, বিচারপতি তখন বাধ্য হইয়া তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করিলেন। ব্যারিষ্টার মনোমোহন মতিলালের সাক্ষ্য-প্রদানের চতুরতা ও নির্ভীকতা লক্ষ্য করিয়া তাঁহার করমর্দ্দন পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন,—"এ মতির জুড়ি পাওয়া ভার।" যাহাদিগের একান্ত যত্নে ও উদ্যোগে এই মোকদ্দমার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাঁহারা পূর্ণকাম হইতে না পারিয়া বড়ই মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। পত্রিকার প্রিণ্টার ও রাজকৃষ্ণ বাবু বিনাশ্রমে যথাক্রমে ছয় মাস ও এক বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। রাজকৃষ্ণবাবু যে স্বীয় নির্ব্বুদ্ধিতার জন্যই বিপদজালে জড়িত হইয়াছিলেন, পাঠক তাহা পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন।

রাজকৃষ্ণ বাবু য়ুরোপীয় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের বিরুদ্ধে প্রবন্ধটী লিখিয়া যখন অমৃতবাজার পত্রিকা অফিসে প্রেরণ করেন, শিশিরকুমার তখন যশোহরেই ছিলেন। আসামীশ্রেণীভুক্ত হইলে, রাজকৃষ্ণ বাবু ভীত হইয়া, শিশিরকুমারকে তাঁহার স্বাক্ষরিত সেই প্রবন্ধটির পাণ্ডুলিপি প্রত্যর্পণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, শিশিরকুমার হয় ত স্বীয় নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার জন্য সেই পাণ্ডুলিপি আদালতে দাখিল করিবেন। কিন্তু শিশিরকুমারের হৃদয়ে এরূপ নীচতার স্থান ছিল না। রাজকৃষ্ণ বাবু যদি অহঙ্কার করিয়া সকলের নিকট প্রবন্ধ-

লেখক বলিয়া আপনার পরিচয় না দিতেন, তাহা হইলে তাঁহার কোনও বিপদ হইত না। শিশিরকুমার সেই প্রবন্ধের দায়িত্ব স্বীয় স্কন্ধেই গ্রহণ করিতেন। প্রবন্ধটী মতিলালের নিকট ছিল। তিনি শিশিরকুমারের নির্দ্দেশ-মত তাহা লোক-মারফত মাগুরা হইতে যশোহরে প্রেরণ করেন। শিশিরকুমার বাড়ীতে না থাকায়, তাঁহার খুল্লতাত চন্দ্রনারায়ণের হস্তে প্রবন্ধটী পতিত হয়। চন্দ্রনারায়ণ মোকদ্দমার দায় হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য প্রবন্ধটী ওকিনিলীকে দিবার উপক্রম করেন। শিশির-কুমার তাহা জানিতে পারিয়া, খুল্লতাত মহাশয়ের নিকট হইতে জোর করিয়া প্রবন্ধটী কাড়িয়া লইয়া, রাজকৃষ্ণবাবুকে প্রদান করেন। আট মাস কাল মোকদ্দমা চলিয়াছিল। মোকদ্দমা হইতে অব্যাহতি পাইলেও শিশির ও তাঁহার সহোদরগণ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ঋণ-জালে জড়িত হইয়াছিলেন। রাজকৃষ্ণবাবু কারাবাসের সময় জেলে বসিয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। মুক্তিলাভের পর তিনি কলিকাতায় একজন প্রতিষ্ঠাবান হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হইয়া সুখে-সচ্ছন্দে শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

শিশিরকুমারের মোকদ্দমায় জয়লাভের সংবাদ ক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচারিত হইল। তাঁহার মুক্তিলাভে দেশবাসিগণের আনন্দের সীমা রহিল না। শিশিরকুমার এই মোকদ্দমায় একরূপ সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু এই মোকদ্দমার পর হইতেই পত্রিকার গ্রাহক-সংখ্যা দিন-দিন বৃদ্ধি পাওয়ায়, তাঁহার আর্থিক অস্বচ্ছলতা কিয়ৎ-পরিমাণে দূর হইয়াছিল। অমৃতবাজার পত্রিকার প্রবন্ধ-গুলির মধ্যে যে বিশেষত্ব লক্ষিত হইত, তাহা তাৎকালিক অন্য কোন সংবাদপত্রে দেখা যাইত না। স্বদেশ-প্রেমিক সম্পাদকের হৃদয়ে যে স্বদেশ সেবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিত, পত্রিকার প্রত্যেক পংক্তিতে তাহার অভিব্যক্তি লক্ষিত হইত। ভারতবর্ষ যে আমাদের দেশ, জননী জন্মভূমির প্রতি যে আমাদের একটা কর্ত্তব্য আছে, অত্যাচার, উৎপীড়ন নীরবে সহ্য না করিয়া প্রতিবিধানের চেষ্টা করা যে স্বদেশ-হিতৈষীর কর্ত্তব্য, শিশিরকুমারই সর্ব্বপ্রথমে ইহা দেশবাসীকে বুঝাইয়াছিলেন। প্রকৃত রাজনীতিক আন্দোলন যাহাকে বলে, শিশিরকুমার যে তাহার একজন প্রধান প্রবর্ত্তক ছিলেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। অমৃতবাজার পত্রিকায় গবর্ণমেণ্টের কোনও অন্যায় কার্য্যের তীব্র সমালোচনা করিতে তিনি বিন্দুমাত্র ভীত হইতেন না। কর্ম্মচারিগণের অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া শিশিরকুমার স্বীয় পত্রিকায় এরূপ বিদ্রূপাত্মক প্রবন্ধ লিখিতেন যে, যাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া তাহা লিখিত হইত, তাঁহারাও তাহা পাঠ করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেন। এইরূপে অমৃতবাজার পত্রিকার প্রভাব ও প্রতিপত্তি দিন-দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

পাঠক! এই সময় যশোহরের নৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল, এবং শিশিরকুমারকে কিরূপ সংসর্গে অবস্থান করিয়া স্বীয় জীবন গঠন করিতে হইয়াছিল, আমরা তৎসম্বন্ধে এখানে দুই-একটী কথা উল্লেখ করিব। ইংরেজী শিক্ষার ফলে দেশে তখন মদিরা-সেবন-প্রথা এতদূর প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, যাঁহারা সুরাপান করিতেন না, ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহাদিগকে অশিক্ষিত বা অভদ্র বলিয়া ঘৃণা করিতেন। শিশিরকুমার এই অভদ্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অশেষ গুণের অধিকারী হইলেও, তিনি মদিরা স্পর্শ করিতেন না বলিয়া, যশোহরের ইংরেজীনবিশগণ—বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, মুনসেফ প্রভৃতি—তাঁহার সহিত বন্ধুতা স্থাপনে অনিচ্ছুক ছিলেন। শিশির-কুমার ইহাতে বড়ই দুঃখিত ছিলেন। এই সময়ে কবিবর নবীনচন্দ্র যশোহরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। আমরা তাঁহার "আমার-জীবন" নামক আত্ম-কাহিনী হইতে একটী ঘটনা উদ্ধৃত করিলাম; পাঠক তাহা হইতে যশোহরের নৈতিক অবস্থার কথা বুঝিতে পারিবেন। "একদিন ওভারসিয়ার দাদার বাড়ী নিমন্ত্রণ। নৃত্য গীতের তরঙ্গে আমোদ উথলিয়া পড়িতেছে। এমন সময় আর একজন পূর্ত্তবিভাগীয় প্রভু—এ ডিপার্টমেণ্টের রত্নাকর—চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—'বাবা! নাড়ী বসিয়া গিয়াছে।' নৃত্যগীত থামিয়া গেল। সকলেই দেখিলাম যে তিনি নাড়ী ধরিয়া বসিয়া আছেন, আর কাঁদিয়া বলিতেছেন তাঁহার স্ত্রী-পুত্রের কি উপায় হইবে। বলা বাহুল্য যে তিনি সুরা-সুন্দরীর কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহার ডিপার্টমেণ্টের নামই D. P. W—Department of Prostitute and Wine. কিন্তু

বহু চেষ্টা করিয়াও আমরা তাঁহাকে বুঝাইতে পারিলাম না যে, তাঁহার নাড়ী সুরা-প্রবাহে সতেজ চলিতেছে; তাহাতে তাঁহার মস্তিষ্কের যদিও কিঞ্চিৎ বিপ্লব ঘটাইয়াছে, তাঁহার পরিবারবর্গের অনাথ হইবার আশঙ্কা নাই। তিনি যতক্ষণ সজ্ঞান ছিলেন, ততক্ষণ এক একবার—'বাবা! নাড়ী বসিয়া গিয়াছে'—বলিয়া থাকিয়া থাকিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিলেন। আহার করিতে অনেক রাত্রি হইল। আমি ওভারসিয়ার দাদার কাছে শুইয়া রহিলাম। ইনস্পেক্টার দাদাও আমাদের সঙ্গে শুইলেন। অতি প্রত্যুষে কপাটে আঘাত শুনিয়া আমি উঠিয়া কপাট খুলিয়া দেখি গামছা পরিহিত ইনস্পেক্টর দাদা! ঠিক যেন মড়া পোড়াইয়া আসিয়াছেন। তিনি বলিলেন, রাত্রিশেষে কিঞ্চিৎ শৈত্যাধিক্য অনুভব করিয়া জাগ্রত হইয়া দেখিলেন যে, তিনি মাতৃগর্ভ হইতে যেরূপ বস্ত্রহীন ভাবে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ঠিক সেই অবস্থায় একটী বড়ই অস্থানে পড়িয়া আছেন। বহু অন্বেষণে একখানি গামছামাত্র পাইয়া অশ্লীলতা-নিবারণী সভার হস্ত হইতে কোনও রূপে অব্যাহতি লাভ করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন। নিদ্রিত বন্ধু-মণ্ডলী জাগ্রত হইয়া তাঁহার সেই মূর্ত্তি দেখিলেন, আর একটা হাসির তুফান ছুটিল। আমাদের পার্শ্বস্থ শয্যা হইতে তাঁহার সেই অপ্রীতিকর স্থানে কিরূপে যে নৈশ অভিযান ঘটিয়াছিল, তাহা এখন পর্য্যন্ত স্থির হয় নাই। সম্ভবতঃ ইহাও এক প্রকার যোগের ফল—মস্তিষ্কের সহিত মদিরার যোগ। সেই D. P. W. মহাশয় বলিলেন—'আমার নাড়ী উড়িয়া গিয়াছিল। তুমি বাবা! সশরীর উড়িয়া গিয়াছিলে। আমার নাড়ী-হরণ; আর তোমার বস্ত্র-হরণ।" এইরূপ সংসর্গে অবস্থান করিয়াও শিশিরকুমার আপনাকে নির্দ্দোষ রাখিতে পারিয়াছিলেন। কেবল যশোহরে নহে, সমগ্র বঙ্গদেশে তখন ইংরেজী শিক্ষার ফলে বাঙ্গালী যুবকগণের কিরূপ ভীষণ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহা পাঠকবর্গকে অবগত করাইবার জন্য পরম পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু কবিভূষণ মহাশয়ের মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম।—"স্বাধীনতা অর্থে স্বেচ্ছাচার ও সংস্কার অর্থে সমুলোৎপাটন, এই তাঁহারা বুঝিয়া লইলেন। পুরাণোক্ত তেত্রিশ কোটী দেবতার উচ্ছেদ করিতে যাইয়া তাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সন্দিহান হইলেন, এবং হিন্দুসমাজে সহমরণ প্রথার ন্যায় কুসংস্কার ছিল বলিয়া, সমাজ-প্রচলিত যে কোন প্রথাই তাঁহারা কুসংস্কারমূলক বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। সুরাপান, গোমাংস ভক্ষণ, এবং যবনান্ন গ্রহণ প্রভৃতি কার্য্য তাঁহারা সমাজ-সংস্কারের পরাকাষ্ঠা বলিয়া বুঝিয়া লইলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে কাহারও-কাহারও এই অদ্ভুত সংস্কার জন্মিল যে, পৃথিবীতে যখন 'গোখাদক' জাতিরাই অপর সকল জাতিকে পরাজিত করিয়া আসিতেছে, তখন বাঙ্গালীরাও 'গোখাদক' না হইলে তাহাদিগের উন্নতির আশা নাই। এই অদ্ভুত সংস্কার কার্য্যে পরিণত করিতেও তাঁহারা ক্রটি করিতেন না। সকলে দলবদ্ধ লইয়া গোমাংস ভক্ষণপূর্ব্বক, কখন-কখন প্রতিবাসীদিগের গৃহে ভুক্তাবশেষ নিক্ষেপ করিতেন, এবং যে সকল আচার-ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে সমাজ-নিষিদ্ধ, তাহারই অনুষ্ঠান করিয়া আপনাদিগের উচ্ছৃঙ্খলতার (তাঁহাদিগের মতে নৈতিক বলের) পরিচয় দিতেন।"

শিশিরকুমারের গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়া নবীনচন্দ্র তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। নবীনচন্দ্র তাঁহার আত্মকাহিনীতে লিখিয়াছেন, "যশোহরে লিখিত আমার খণ্ড-কবিতায় ও পলাশীর যুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য যে নিঃশ্বাস ও মাতৃভূমির জন্য অশ্রুবিসর্জ্জন আছে, তাহা কথঞ্চিত শিশিরকুমারের সংসর্গের ও শিক্ষার ফল। তিনি ও তাঁহার পত্রিকাই প্রথম এই দেশে স্বদেশভক্তির পথ-প্রদর্শক।" যশোহরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, মুন্‌সেফ ও শিক্ষকগণের সখ্য লাভের জন্য শিশিরকুমার এই নবীনচন্দ্রের শরণাপন্ন হন। শিশিরকুমার একদিন নবীনচন্দ্রকে বলেন, "আমার শরীর এই, মদ খাইলে আমি মরিয়া যাইব। তাই খাই না। আচ্ছা এরূপ কোনও মদ আছে যাহা খাইতে ভাল, নেশা হয় না, বুক জ্বালা করে না?" তিনি যখন শুনিলেন যে "রোজ লিকার" সুমিষ্ট ও নেশাহীন, তখন তিনি তাহাই এক বোতল আনাইলেন এবং একদিন নবীনচন্দ্রের বাসায় বসিয়া একটু মুখে দিয়া বলিলেন, "নবীন, চল যাওয়া যাক্।" তাঁহারা উভয়ে স্থানীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বাসায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে সেখানে বেশ একটী আড্ডা জমিয়াছে। শিশিরকুমার সকলকে বলিলেন, "নবীনকে জিজ্ঞাসা কর, আমি এখনই তাহার বাসায় সুরা

খাইয়া আসিতেছি। বল, তোমরা আর আমাকে ঘৃণা করিবে না।" বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয়—ছাত্রগণের চরিত্র গঠন যাঁহার প্রধান কার্য্য—"ব্রাভো শিশির" বলিয়া খুব একটা বাহবা দিলেন। তখন শিশিরকুমার ব্যতীত সমবেত সভ্যমণ্ডলী সুরা-সুন্দরীর সেবায় উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। শিশিরকুমার স্বীয় সুমধুর সঙ্গীতে সকলকে মুগ্ধ করিলেন।

বিপদ চিরদিনই বিপদের অনুসরণ করিয়া থাকে। মানহানির মোকদ্দমার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া শিশিরকুমার পুনরায় এক নূতন বিপদে পতিত হইয়াছিলেন। শিশিরকুমারকে যেরূপেই হউক দমন করিতে হইবে, তাঁহার পরিচালিত অমৃতবাজার পত্রিকা বিনষ্ট করিতে হইবে,—ইহাই তদানীন্তন রাজপুরুষগণের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। প্রথম মোকদ্দমায় ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া তাঁহারা শিশিরকুমারের বিরুদ্ধে এক অভিনব অভিযোগ আনয়ন করিয়াছিলেন। মিষ্টার জে, ওয়েষ্টল্যাণ্ড এই সময়ে যশোহরের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। পুনঃ-পুনঃ তলব করা সত্ত্বেও শিশির-কুমার মানহানির মোকদ্দমার সময় রাজকৃষ্ণ মিত্রের লিখিত প্রবন্ধটী আদালতে দাখিল না করিয়া সাক্ষ্য গোপন করায় তাঁহাকে অভিযুক্ত করা হয়। মতিলালকে এ মোকদ্দমায়ও সাক্ষ্য দিতে হইয়াছিল। তাঁহাকে পূর্ব্বের ন্যায় এবারও বিশেষভাবে জেরা ও শেষে ভয় প্রদর্শন করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। শিশিরকুমার এবারও মুক্তিলাভ করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভগিনীপতি কিশোরী-বাবু ও কৃষ্ণনগরের প্রসিদ্ধ উকীল বাবু তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার এই মোকদ্দমা পরিচালন করিয়াছিলেন।

স্বীয় গ্রামে স্বাস্থ্য ভাল না থাকায়, শিশিরকুমারকে ইহার পর বাধ্য হইয়া সপরিবারে কলিকাতায় আসিতে হইয়াছিল। বর্ত্তমানের ন্যায় তখনও যশোহর ম্যালেরিয়ার আবাসভূমি ছিল। পরিবারবর্গ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইতেছেন দেখিয়া শিশিরকুমার ১৮৭১ খৃঃ অব্দের শেষভাগে (সেপ্টেম্বর কিম্বা অক্টোবর মাসে) সপরিবারে কলিকাতায় আগমন করেন। যে জন্মভূমি অমৃতবাজারকে তিনি বহু যত্নে ও পরিশ্রমে একখানি আদর্শ পল্লী করিয়া তুলিয়া-ছিলেন, তাহা পরিত্যাগ করিবার সময় শিশিরকুমারের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। কলিকাতায় আসিবার সময় পত্রিকার ঋণ-পরিশোধ জন্য ছাপাখানার যাবতীয় সরঞ্জাম যশোহরের একজন ভদ্রলোককে বিক্রয় করা হইয়াছিল। শিশিরকুমার রিক্তহস্ত, সুতরাং সুদ দিবার অঙ্গীকারে তাঁহাকে জনৈক মহাজনের নিকট হইতে একশত টাকা ঋণ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। মতিলাল খুলনার অন্তর্গত পীলজঙ্গের উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কার্য্য করিয়া বেতন হইতে যে দুইশত টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা তিনি সেজদাদার হস্তে অর্পণ করিলেন। মাত্র তিনশত টাকা সঙ্গে লইয়া শিশিরকুমার বৃহৎ পরিবারসহ কলিকাতায় আগমন করিয়া বউবাজারে ৫২নং হিদারাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলিতে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

দিল্

[শ্রীনিশিকান্ত সেন]

গফুর বাঁচিয়া থাকিতে ছোট ভাই গহেরের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে নাই; এমন কি, কখনো-কখনো লাঠালাঠিও করিয়াছে; কিন্তু হইলে কি হয়, সে মায়ের পেটের ভাই যে! তাহার পর আরো একটা কথা—মানুষ বাঁচিয়া থাকিয়া যদি শত্রুতাও করে, তাহাই বা মন্দ কি; মরিয়া গেলে যে সবই ফুরাইল, তখন আর তাহার উপর রাগ কিসের? হাতেম তাহার সেই মৃত বড়-ভাইয়ের পুত্র। ছেলেটার কি নছিব! আর তার মায়েরই বা কি প্রাণ! বিধবা হইতে-না-হইতেই মা ছয়-সাত বছরের এই ছেলেটাকে রক্তশোষী জোঁকের মত টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া, কোথায় যে উধাও হইয়া চলিয়া গেল, কেহ জানিতেও পারিল না। এই পিতৃহীন মাতৃ-পরিত্যক্ত শিশুটিকে দেখিলে পরের চোখেই জল আসে, তাঃ—গহেরের কান্না পাইবে বিচিত্র কি?

কিন্তু ছেলেটাকে কোলে করিয়া বসিয়া থাকিলেও যে পেট চলে না! বিষয়-আশয়, জমি-জমা, চাষ-বাস নাই। সোণাপাড়ার চৌধুরীদের কাছারীতে তাহাকে কাজ করিতে হয়। এই ইলিসখালি হইতে সে প্রায় তিন-চার দিনের পথ,—মনে করিলেই যে বাড়ী-ঘরের মুখ দেখা যাইবে, এমন নহে। বিশ্বাসী বলিয়া তাহার উপর মনিবের একটু নেক-নজরও আছে। কাজেই, দরোয়ানগিরি হইতে সুরু করিয়া মুটেগিরি পর্য্যন্ত অনেক কাজেই তাহাকে মাথা দিতে হয়। ছুটি-ছাটা প্রায় ঘটিয়াই উঠে না। এবার ভাইয়ের মৃত্যু উপলক্ষে অতি কষ্টে ছুটির ব্যবস্থা হইয়াছিল। ছুটি ফুরাইয়াছে,—একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও গহেরকে কর্ম্মস্থানের উদ্দেশে ছুটিতে হইল। হাতেম তাহার চাচী দিল্জানের কাছে রহিল।

ভাই-পোর প্রতি কাকার টান থাকিলেই যে ভাশুর-পোর প্রতি কাকীর টান থাকিবে, এমন কোনও কথা নাই। স্বামী উপস্থিত থাকিতে যদিও দিল্জান কষ্টেসৃষ্টে হাতেমকে আদর-যত্ন করিয়াছিল,—তাহার অসাক্ষাতে সে কিছুতেই সে ভাব বজায় রাখিতে পারিল না। যে ভাশুর তাহার স্বামীর সঙ্গে বিবাদ না করিয়া জলগ্রহণ করে নাই, হাতেম ত তাহারই পুত্র! দ্বিতীয়তঃ, ভাশুরের জীবদ্দশায় যে স্বামী তাহাকে নিজের দিলের মতই দেখিত,—ভাশুরের ফোত হইবার পর, ছেলেটা স্কন্ধগত হইয়া তাহাকে এমনই যাদু করিয়াছে যে, সে আর দিলের মুখের দিকে ফিরিয়াও তাকায় না। এরূপ ক্ষেত্রে মানুষের মন কেমন করিয়া সরস ও স্নিগ্ধ ভাব ধারণ করিতে পারে? কিন্তু তাই বলিয়া কি দিল্জান তেমন বাপের বেটি! অমন অলক্ষণে, অনামুখো, মূর্ত্তিমন্ত উৎপাতকেও সে ঘাড় হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দেয় নাই। আর কোনও মেয়ে হইলে, কস্মিন্-কালেও কি সে ইহার মুখদর্শন করিত?—ইস্!

বাপের বাড়ী কাছেই। ছোট-ছোট ভাই-বোনেরা সেখান হইতে আসিয়া দিল্জানকে এবং দিল্জানের সংসারটিকে মাতাইয়া রাখে। পাশে যাহার বাড়ী, সে গ্রামসম্পর্কে গহেরের নানা। হাট-বাজারের ব্যবস্থা এবং সংসারের তদ্বিরের ভার তাহার। তদ্বিরের সম্বন্ধে বিশেষ কোনও আপত্তি না থাকিলেও, হাট-বাজারের সম্বন্ধে দিলের ঘোর আপত্তি দেখা গেল।—নানা এক পয়সার সওদা আনিয়া নগদ পাঁচ পয়সা দাবী করে! কাজেই অচিরে বাজারের ভার হাতেমের ঘাড়েই পড়িল!

সে ছেলেমানুষ সন্দেহ নাই, কিন্তু চাষার ছেলে যে! পেট হইতে পড়িয়াই চাষার ছেলেকে সংসারের অনেক কাজের আনুকূল্য করিতে হয়। না করিলে লায়েক হইবে কিরূপে?

গ্রামখানি পদ্মার উপরে; মাছ কিনিবার জন্য বাজারে না গেলেও চলে। ইলিসখালির বাঁকে প্রচুর ইলিস,—পদ্মার ধারে গিয়াই হাতেম মাছ কিনিয়া আনে; কিন্তু মাছের উত্তমাংশ তাহার ভাগ্যে জোটে না। দিলের বাপের বাড়ীর গোষ্ঠী বৃহৎ,—সেখানে নিতান্ত পক্ষে বারোআনা অংশ দিতে হয়। বাকী রহিল সিকি। ভাই-বোনেরা আছে, দিদির সঙ্গে না খাইলে তাহাদের পেট ভরে না। তাহাদের মুখ এমনি কচি ও কোমল যে, মনে হয়, কাঁটা-বিহীন মাছেও বুঝি বা ছড়িয়া যাইবে! কাজেই, কাঁটাযুক্ত মাছ তাহাদিগকে দেওয়া যাইতে পারে না। তাহারা পেটির মাছ, ডিম, এবং মুড়ার ঘি খাইতে-খাইতে পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করিয়া হাসে—দেখ্ ভাই, দেখ্, রেকুবের কাণ্ড! কান্কো দেও কান্কো, ফুল্কো দেও ফুল্কো; দাঁড়া দেও দাঁড়া,—কেমন মজা করিয়া খায়! আমাদের দিকে একবার চাহিয়াও দেখে না!

বস্তুতঃ, সংসারে যাহার দারুণ চোট্ খাইবার সম্ভাবনা, বিধাতা তাহার চাম্ড়া প্রায় পাতলা করেন না;—চোট্ খাইবার উপযুক্ত করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেন। হাতেম গাছের ফল-পাকড় পাড়িয়া আনিলেই, দিল্ কাছে গিয়া হাতেমের কোঁচড় হইতে নির্ব্বিকার চিত্তে ভাল-ভাল রসাল, সুডৌল, পাকা ফলগুলি বাছিয়া তুলিয়া লয়। দিলের ভাই-বোনেরা সেইগুলি খাইতে-খাইতে জিজ্ঞাসা করে, "ওরে ও হাতেম! তুই অমন কাঁচা, ডাঁশা, শুঁট্কে ফলগুলি কেমন করিয়া খাস্?" হাতেম কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলে, "তোরা পাকা পচা ফল যেমন করিয়া খাস্।" প্রশ্ন-কারীরা অবাক্ হইয়া যায়।

দিলের বাপেরা চাষী গৃহস্থ। ধানের সময় তাহাদের কাজ অফুরন্ত। দিল্ হাতে কাস্তে দিয়া হাতেমকে সেই-খানে পাঠাইয়া দেয়; কাজ শেখা তো চাই! তা ছাড়া, হাত-পা কোলে করিয়া বসিয়া থাকিলে কুঁড়ে হইয়া যাইবে।

যে! কাজেই, গহেরের পরম স্নেহের শিশু বাপজান্‌কে সারাদিন মাঠে থাকিয়া ধান কাটিতে, আঁটি বাঁধিতে, এবং আঁটি মাথায় করিয়া নানাদের উঠানে ফেলিয়া আসিতে হয়। আঁটি অবশ্য ছোটই; কিন্তু তাহা হাতেমের কচি ঘাড়ের পক্ষে কিরূপ ছোট, তাহা যিনি বিশ্বভারবাহী তিনিই বলিতে পারেন, অন্যের পক্ষে বুঝিয়া উঠা অসম্ভব। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, হাতেমের ইহাতে আপত্তি দেখা যায় না।

কাজের অবসানে পদ্মার ধারটিতে গিয়া বসিলেই চাচার কথা হাতেমের মনে হয়। দূরের পাল-তোলা নৌকার দিকে চাহিয়া-চাহিয়া তাহার মনে হয়, ঐ—ঐ বুঝি চাচার নৌকা! দেখ চাচার কি দরদ! চাচা সে-বার তাহার জন্যে কেমন তোফা, নয়া কাপড় কিনিয়া আনিয়াছিল! সেই কাপড় পরাইয়া সে তাহাকে কাঁধে করিয়া লক্ষ্মীপুরের হাটে লইয়া গিয়াছিল। হাতেম হাঁটিয়া যাইতে চাহিলে বলিয়াছিল, "ওরে বাপজান্, সে কি কাছের পথ যে তুই হাঁইটা যাবার চাস্?" চাচা ভাবিয়াছিল, ভাই-পোর পায়ে বুঝি ব্যথা ধরিবে—ছেলেমানুষ কি না! কি বুদ্ধি চাচার! যাহার ঘাড় এত বড়-বড় বোঝা বহিতে পারে, তাহার পা বুঝি অত নরম হইলে চলে? পালের নৌকা নিকটবর্ত্তী হয়, আবার দেখিতে-দেখিতে দূর হইতে দূরান্তরে চলিয়া যায়, ঘাটে আসিয়া ভিড়ে না। হাতেমের ক্ষুদ্র, কোমল, কচি হৃদয়টি কাঁপাইয়া একটা বৃহৎ দীর্ঘশ্বাস শূন্যে মিলাইয়া যায়।

কিন্তু গহেরের প্রাণটাও কি হাতেমের জন্য কাঁদে না? স্নেহের বিনি-তারের খবরের কল যে খোদার কারিগরি—কি মজার চিজ তাহা বুঝিয়া উঠিবার উপায় নাই। সেই কলটি গহেরের কাণে-কাণে দিনরাত ফিস্‌ফিস্ করিয়া যে সব কথা কয়, তাহা শুনিলে কোন্ পাষণ্ড স্থির হইয়া থাকিতে পারে? অনেকবার সে বাড়ী ঘরে যাইবার জন্য চৌধুরী সাহেবের কাছে ছুটির আর্জ্জি করিয়াছে,—মঞ্জুর একবারও হয় নাই। মামলা-মোকর্দ্দমার কাজ যেমন বাড়িয়াছে, চুরি-ডাকাতিও তেমনি। এমন সময়ে তাহার ন্যায় পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্যের ছুটি মঞ্জুর কিরূপে হইবে? কিন্তু এইরূপ একাদিক্রমে যখন তিন-চারি বৎসর পার হইয়া গেল, তখন আর গহের স্থির থাকিতে পারিল না। নিজেই চৌধুরী সাহেবের কাছে হাজির হইয়া, সেলাম জানাইয়া কহিল, "আমার আর নোকরী পোষাইল না জনাব।" সাহেব হাসিয়া কারণ জানিতে চাহিলে, গহের নিবেদন করিল, গোলামেরও বাড়ীঘর আছে, ভাঙা কুঁড়ে হইলেও সে বাড়ী—বাপদাদার ভিটা, আর গরিবের জরু খুব খোপ্-সুরৎ না হইলেও সে জরু, এবং ছাওয়াল-পুত না থাকিলেও একটা ভাই-পো আছে, সে ছেলের বাড়া। চৌধুরী-সাহেব কথা শুনিয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন; কিন্তু ছুটি মঞ্জুর হইল। বলিয়া দিলেন, "আগে আসিতে পারিলেই ভাল, নিদেন, মিয়াদের মাথায়-মাথায় আসিবে।"

(২)

বহুদিন পরে দেশে ফিরিয়া গহের পদ্মার ঘোলা জলের খেলা,—বেত-বাঁশ-তেঁতুল-গাছ-ঘেরা বাড়ী,—বেশর, রূপোর চুড়ি, পৈঁছা, গোট এবং চুমুরে ডুরে সাড়ী-পরা স্ত্রীটিকে দেখিয়া খুসী হইল; কিন্তু ভাই-পোকে দেখিয়া খুসী হইতে পারিল না। একেবারে রোগা টিম্‌টিম্ করিতেছে—গায়-পায় কিছু নাই। সর্ব্বাঙ্গের মধ্যে চোখে পড়ে শুধু একজোড়া বৃহৎ নীল চক্ষু। কিন্তু সেদিকে চাহিলে দুঃখ বাড়ে বই কমে না,—বুকের ভিতর খালি হু হু করিতে থাকে। গহের স্নেহার্দ্রস্বরে বারবার প্রশ্ন করিতে লাগিল, "ওরে তোর এ কি হাল্? এ কি হাল্?" হাতেমের কোন জবাব নাই,—চাচার মুখের দিকে চাহিয়া সে কেবল ক্ষীণ করুণ হাসি হাসে। কিন্তু দিলের অসহ্য বোধ হইতেছিল; একটু খোঁচা দিয়া কহিল, "এ তোমার মাছভাতের গুণ, বোঝ্‌লা, মাছভাতের গুণ।"

গহের স্ত্রীর দেহের দিকে একটু কটাক্ষ করিতেই, সে চুপ হইয়া গেল। বলা বাহুল্য, সেখানে গহেরের মাছ-ভাতের গুণের বৈলক্ষণ্য ঘটিবার বিশেষ কোন হেতু দেখা যাইতেছে না।

গহের মুখ ফিরাইয়া প্রশ্ন করিল, "কোনে বেমার-টেমার নাই ত হাতেম?"

"না চাচা, বেমার আমার একদিনও হয় নাই।"

"তবে?"

হাতেম জবাব না দিয়া, দুই হাতে গহেরের কোমর জড়াইয়া, স্থির হইয়া রহিল।

আউশ-ধানের মোটা, মিষ্ট ভাত, আর পদ্মায় তৈলাক্ত,

টাট্কা ইলিসমাছের ঝোল রান্না হইয়াছিল। বহুদিন পরে খুড়া-ভাইপো দুইজনে একসঙ্গে আহারে বসিল। তখন হাতেমের মুখের আগল খুলিয়া গিয়াছে। সে চাচার মুখে বিদেশের গল্প শুনিতে, এবং নিজের মুখে স্বদেশের গল্প শুনাইতে ব্যস্ত—আহারের সম্বন্ধে একেবারেই উদাসীন। অবশেষে চাচার তাগিদে মাছের বাটীতে হাত দিতে গিয়া দেখিল, তাহার বরাদ্দ—ঘাড়া পোছা প্রভৃতি কিছুই দেখা যাইতেছে না! সে অধীর হইয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "ও চাচি, চাচি, আমার মাছ?" কিন্তু গহের দেখিল, উতলা হওয়ার কারণ নাই, বাটী ভরপুর,—বড়-বড় পেটির মাছ, ডিম, মুড়া প্রভৃতি কিছুরই অভাব নাই। কহিল, "খাও না বাপজান্, তুমি যত পার।" গহের মাথা নাড়িয়া কহিল, "ও মাছ তো আমার না চাচা!" গহের বিস্মিত হইয়া কহিল, "তোমার না তো কার তা হ'লে?"

দিলের দিল্ বেতের পাতার মত থর্থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল, ভয়ে এবং রাগে। রাগ এই যে, কি চশমখোর এই ছেলেটা! ভিক্ষা যে পাইতেছিল, ইহাই কি ঢের নহে? সে ভিক্ষার চাল কাঁড়া, কি আঁকাড়া—তাহাই লইয়া নালিস! স্পর্দ্ধা তো কম নহে! ভয় এই জন্য যে, স্বামী পাছে বা এই তুচ্ছ ব্যাপারটা লইয়া একটা মহা অনর্থের সৃষ্টি করিয়া বসে,—যেমন উহার বুদ্ধি! কিছু তো বলা যায় না!

হাতেম কহিল, "এ সব মাছ আমি খাই না, চাচা!" দরজার আড়ালে থাকিয়া দিল্ মনে-মনে কহিল, "আমার মুণ্ডু খাও তুমি!" গহের সকৌতুকে হাতেমকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি তা হ'লে কোন্ সব মাছ খাও হাতেম?"

হাতেমের মনে গোল নাই,—সে সরল ভাবে বলিতে লাগিল, "ক্যান, ঘাড়া, ফুল্কা, তার পরে—" দিল্ আর ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিল না; ঝাঁপের আড়াল হইতে মুখ বাড়াইয়া দাঁত মুখ এবং পৈছা-শোভিত হাতের মুষ্টি সহযোগে তীব্র শাসনের যে নীরব নমুনা দেখাইল, তাহাতে হাতেমের পেটের পাথরের মত নিশ্চল, শক্ত প্লীহাটি চমকাইয়া কাঁপিয়া উঠায়, সে একেবারে থামিয়া চুপ করিয়া গেল। কিন্তু দিলের এই সতর্কতাপূর্ণ ইঙ্গিত চৌধুরীদের কাছারীর হুঁসিয়ার নোকরের নজর এড়ায় নাই। সে দিলের দন্তরুচি-কৌমুদীর ঈষৎ বিকাশ দেখিয়াই, মনের সংশয়-তিমির অনেকখানি নাশ করিয়া ফেলিল; হাতেমের বক্তব্যের উপসংহার শুনিবার জন্য কিছুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করিল না; নিরতিশয় নিঃশব্দে আহার-কার্য্য সমাধা করিয়া উঠিল।

অপরাহ্ণে গহের পদ্মার ধারে বসিয়া হাতেমের কপালের চুলগুলি সরাইয়া দিতে-দিতে কহিল, "চাচি বোধ করি তোরে প্যাট ভইরা দুই বেলা দুই মুঠা ভাতও দেয় নাই রে হাতেম।" হাতেম হাসিয়া কহিল, "তা ক্যান্ দেবে না চাচা?" গহের কহিল, "না রে না, দেয় নাই,—দিলি তোর এমুন বেহাল হয়? যে তোরে এত্তটুকু ভাল মাছ পরাণ ধইরা দেবার পারে নাই, সে-যে তোরে প্যাট ভইরা ভাত দেয়, সে তো আমি চৈক্ষে দেখ্‌লিও পেত্তয় করি না রে।" হাতেম কহিল, "কিন্তু তাতে চাচির কোন দোষ নাই। তার ভাই-বুন্‌রা আইসা খায়; তার পর বাপের বাড়ী—" বলিতে-বলিতে হাতেম থামিয়া গেল। তাহার মনে হইয়াছিল, কথাটা বলিয়া ফেলিয়া হয় ত ভাল করিল না। যে আশঙ্কা সেই কাজ! গহের তৎক্ষণাৎ বিদ্রূপের স্বরে কহিল, "বাপের বাড়ীতেও খয়রাৎ হয় বুঝি! বাঃ—বাঃ—বেশ মুসাফেরখানা খুল্‌ছে রে তোর চাচি!"

হাতেম কথা কহিতে পারিল না,—বোকার মত চাচার মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল।

গহের পুরা একমাসের ছুটি লইয়া আসিয়াছিল; কিন্তু সপ্তাহের বেশী কাটাইল না। তাহার বাড়ী হইতে রওনা হইবার প্রাক্কালে দিল্‌জান্ দুঃখিত হইয়া কহিল, "আর দুইডা দিন।—" গহের গম্ভীর মুখে কহিল, "ঢের-ঢের দুইডা দিন হইয়া গেছে, আর ক্যান্?" কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া দিল্ কহিল, "হাতেমও দেখি নাচ্‌তিছে।" গহের গম্ভীর মুখেই কহিল, "হু, ও-ও যাবি।"

অভিমানিনী দিলের দিল্‌টা অভিমান-ভরে ফাটিয়া পড়িবার মত হইল; কিন্তু সে কাঁদিল না,—জলধারাহীন স্তব্ধ মেঘের মত থমথমে আঁধার মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

(৩)

হাওয়া-পরিবর্ত্তনে এবং তার উপর গহেরের স্নেহ-যত্নে কয়েক মাসের মধ্যেই হাতেমের চেহারা ফিরিয়া গেল। গহের বুঝিল, চাচির অনাদর-অযত্নই যে হাতেমের স্বাস্থ্য-

নাশের মূল, তাহাতে সন্দেহ নাই। নতুবা এই কয় মাসে তাহার হাল ফিরিয়া গেল কেন? কিন্তু দিলের বিরুদ্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সে কিছুই বলে না। ইহার রহস্য কি?

কিছু দিন পরে ইলিস্‌খালি হইতে গহেরের নামে একখানি চিঠি আসিল। দিল্ স্বামীকে লিখিয়াছে, "টাকা-পয়সা দেও না, অনাহারে, ছেঁড়া নেকড়া পরিয়া দিন কাটাইতেছি। তাহাতেও দুঃখ নাই; কিন্তু তোমার স্ত্রী আমি—আমার এই দুর্দ্দশায় কি তোমার মানের হানি হইতেছে না? গুনা যদি হইয়া থাকে মনে কর, সাজাও ত কম দেও নাই—আর কত দেবে?"

চিঠিখানি যখন কাছারীর মুহুরী গহেরকে পড়িয়া শুনায়, হাতেম তখন সেইখানে। সে তখন চাচাকে কোন কথা বলিল না। সন্ধ্যাবেলা একেলা পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "চাচা, তুমি বাড়ীতে টাকা-পয়সা দেও না, চিঠি পত্তরও না?" গহের রাগিয়া উঠিয়া বলিল, "না। কিসির জন্যি দেব শুনি?" "কিসির জন্যি!"—হাতেম অবাক হইয়া চাচার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। গহের উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগিল, "বোকা আহাম্মক কি না, তাই তুই অমুন কথা কইস্। সে তোরে মাইরা ফেলাইছিল না?" "মাইরা ফেলাইছিল!"—হাতেম খিল-খিল করিয়া হাসিতে লাগিল, —"মাইরা ফেলাইলে মানুষ আবার বাঁচে না কি?"

"না! বাঁচ্‌বি ক্যান্! আস্তা কুলুর বলদা যে,—কেমুন কইয়া বুঝ্‌বি তুই?"

"কিন্তু চাচির চিঠি শুন্‌লি চৈক্ষে পানি আসে।"

"তা তোর আস্‌বি। ইচ্ছায় কি তোরে আমি কলুর বলদ কই। কিন্তু আমার চৈক্ষে কি আসে জানিস? পানি না, ফুল্কি—আগুনের ফুল্কি। ওর সব নষ্টামি—আগাগোড়া সব বানাইনা মিথ্যা। ভুলাইয়া টাকা নেবার চায়। সেই টাকায় ওর ভাইবুনির প্যাট ভরাবি।—কি, এত্তদুর কথা!" গহেরের চোক দুটি বাঘের চোখের মত জ্বলিতে লাগিল।

গহেরের রাগটা একটু পড়িয়া আসিলে হাতেম কহিল, "আমার মনডায় কয়, চাচি এবার মর্‌বি—না খাইয়াই মর্‌বি।" গহের উত্তেজিত হইয়া কহিল, "মর্‌বি!—মরুক, মরুক,—এ আল্লা, সে মরুক। মর্‌লি, আমি মিঞ্যা সায়েবের দরগায় গিয়া নগদ সোয়া পাঁচ গোণ্ডা কয়তা দেব।" চাচার যেমনি দরদ, তেমনি গোসা!—হাতেম গম্ভীর হইয়া ভাবিতে লাগিল।

(৪)

হাতেম তাহার চাচার সঙ্গে প্রবাসে চলিয়া গেলে, দিল্ মনে করিয়াছিল, আপদটা আপনা হইতে বিদায় হইল, ভালই। সে তাহার জন্য মনের কোণে আর এতটুকু দুঃখও পোষণ করিবে না। পরের ছেলের জন্য আবার দুঃখ কিসের গা?

কিন্তু কিছুদিন যাইতে-না-যাইতেই তাহার প্রাণের ভিতরটা চিন্‌-চিন্ করিতে লাগিল। জ্বালাতন হওয়ার অন্তরে-অন্তরে যে একটা অপূর্ব্ব, মধুর সুখ সুপ্ত হইয়া থাকে, এতকাল সত্য-সত্যই সে রহস্য তাহার অজ্ঞাত ছিল। সময়ে-অসময়ে, কারণে-অকারণে কাছে আসিয়া, হাতেম তাহার বড়-বড় নীল চক্ষু দুটি তুলিয়া চাচির মুখের দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকিত। ক্ষিদে পাইলে ত মানুষে বলে যে, ক্ষিদে পাইয়াছে,—ওগো, কি আছে,—আমায় খাইতে দাও। কিন্তু সে তাহা বলিত না; শুধু কাছে আসিয়া ভয়ে-ভয়ে একটা ডাক দিত—'চাচি!' বাস্, আর কিছু না। তার চাচি কি জান্ না কি যে, শুধু ঐ ডাকটি শুনিয়াই ঠিক করিবে—পেটে তাহার ক্ষিদের আগুন জ্বলিয়াছে! রাগ হইত। কিন্তু আজ যেন দিলের সমস্ত প্রাণটি সেই সসঙ্কোচ ডাকটির জন্য কাণ পাতিয়া আছে; আর চোখ দুটি যেন হাতেমের সেই স্নেহ-পিপাসু করুণ দৃষ্টিটুকুর জন্য চঞ্চল হইয়া রহিয়াছে।

ইতোমধ্যে দিলের ভাই-বোনেরা এক বিভ্রাট ঘটাইল। গহের বাড়ী আসিবার কালে হাতেমের জন্যে কয়েকটি কাঁচামিঠে আম আনিয়াছিল। তাহার মধ্যে একটী ছিল পাকা। গাছ জন্মাইবার জন্য গহের নিজের হাতেই তাহার আঁটি পুঁতিয়াছিল। বাড়ীতে এত যে আমের চারা, হতভাগা ছেলেমেয়েগুলি সে দিকে নজর দিল না; একটেরে কোথায় যে কাঁটার বেড়ার মধ্যে সেই আঁটিটি গজাইয়াছে, সেইখানে গিয়া তাহারা চারাটি সমূলে উপড়াইল। তারপর সেই আঁটি গাছে ঘষিয়া, বাঁশী বানাইয়া ধেই-ধেই নৃত্য! কেন গা, এত আমোদ, এত লাফালাফি কিসের? সন্দেহ হওয়ায় দিল্ খোঁজ লইয়া দেখিল, সর্ব্বনাশ! গহেরের

বড় সাধের, দিলের পুত্রাধিক যত্নের সেই কাঁচামিঠা গাছের কর্ম্ম ফতে! অন্য সময়ে দিল্ যে ভাই-বোনের এরূপ অন্যায় অত্যাচার মুখ বুজিয়া সহ্য করে নাই, এমন নহে। কিন্তু এবার হাতেমের জন্য যখন তাহার মনটা অত্যন্ত খারাপ, সেই সময় এই ঘটনা ঘটায়, সে কোনমতেই তালটা সামলাইয়া উঠিতে পারিল না,—তালটা সবলে এবং সশব্দে পড়িল তাহাদের পিঠে। কিন্তু ইলিসমাছের পেটির ন্যায় মোলায়েম বস্তু ভোজন করাই যাহাদের অভ্যাস, তাহারা এরূপ কঠিন বস্তু কিরূপে নীরবে পরিপাক করিবে? তাহাদের দেহে যত না বাজিল, তাহারা চেঁচাইল তাহার দশগুণ। তাহার পর আবার বাড়ী গিয়া লাগাইল। তাহাই লইয়া অবশেষে দিল্‌কে ভালমন্দ কত কথা শুনিতে হইয়াছে।

হায় রে হাতেম, হায়! তোর মুখে যে এতটুকু কথা ছিল না! কত গালি-মন্দ, কত প্রহার তুই যে ধূলোর মত গা হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়াছিস! তার পর মুহূর্ত্ত যাইতে-না-যাইতে কোলের কাছে আসিয়া ডাকিয়াছিস—'চাচি!'—দিল্ আকুল হইয়া ভাবে, আমি যে তোর সেই স্নেহের ডাক শুনিয়াও শুনি নাই,—এতদিনে এইরূপে তার শাস্তি আরম্ভ হইল। ওরে মাতৃহারা, স্নেহের কাঙাল হাতেম! তোর সেই কাতরতা-ভরা, নীল, নির্ম্মল চক্ষু দুটি আমার মুখের ভিতর যে কিসের সন্ধান করিত, এতদিন অন্ধ হইয়া আমি তাহা বুঝিতে পারি নাই; আজ বুঝিয়াছি। তুই ঘরে ফিরিয়া আয়,—আমার যে স্নেহ রাখিবার আর ঠাঁই নাই! গহের তোকে পিতার অভাব বুঝিতে দেয় নাই,—তাহার কর্ত্তব্য সে করিয়াছে। আমার কর্ত্তব্য আজ আমি ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে চাই।

কিন্তু দিলের অন্তরের কামনা সত্ত্বেও হাতেম সোণাপাড়া হইতে ফিরিল না। এ দিকে ভাই-বোনেরা অভিভাবকের শাসন এড়াইয়া, সরস ফলাদির লোভে আবার একে-একে আসিয়া হাজির হইতে লাগিল। কিন্তু দিল্ তাহাতে তুষ্ট হইল না। ঐ রবাহূতগণকে সুতরাং দিদির তাচ্ছিল্য ও বিরক্তির ভাব লক্ষ্য করিয়া যথাস্থানে সরিয়া পড়িতে হইল।

স্বামীর প্রতি অনুরাগের অভাব দিলের কোন কালেই নাই,—শুধু মাঝে-মাঝে অভিমান আসিয়া তাহাকে আড়াল করিয়া রাখে মাত্র। গহের যখন হাতেমকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়, তখনও এই কারণেই তাহার উপর দিলের গোসা হইয়াছিল। কিন্তু হাতেমের উপর স্নেহের সঞ্চার হওয়ায় সে বুঝিয়াছে, গহের কেন তাহাকে বুকে করিয়া বিদেশে লইয়া গেল। অমন বাপ-মা-হারা গোবেচারিকে কি মানুষ ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে? নিজের পূর্ব্বকৃত আচরণ স্মরণ করিয়া এখন সে একেবারে মরমে মরিয়া যাইতে চায়। পোড়া চোখদুটিও তার মাঝে-মাঝে ভরিয়া উঠে। লজ্জিত ও অনুতপ্ত দিল্ তাই মনে-মনে ঠিক করিয়া রাখিয়াছে, গহের এবার ঘরে ফিরিলে, দোষ কবুল করিয়া পায়ে ধরিয়া তাহার কাছে ক্ষমা চাহিবে।

কিন্তু তাহার বিশ্বাস ছিল, স্বামী আর কোন কঠোরতা করিবে না,—হাতেমকে তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়াই, তাহার শেষ—চরম শাস্তি হইবে। কিন্তু দিল্ যখন আশা করিয়া-করিয়াও চিঠি পাইল না, খরচপত্র অভাবে মহা কষ্টে পড়িল, তখন বুঝিল, বরাত বড় মন্দ। অভিমান আসিয়া আবার তাহার হৃদয় পূর্ণ করিয়া ফেলিল। স্বামীকে দুঃখ-কষ্টের কথা না জানাইয়া, গয়নাগাঁটি বেচিল, জিনিসপত্র বাঁধা দিয়া কায়ক্লেশে দিন কাটাইতে লাগিল। কিন্তু পাছে আত্মীয়স্বজন বা গাঁয়ের লোকের কাছে গৃহস্থের মাথা হেট হয়,—সে ভয়টাও অল্প নহে। তাই, বিক্রয়-আদি যাহা করিতে হয়, সেই প্রতিবেশী নানার সাহায্যে দূরের লোকের কাছে গোপনেই হইয়া থাকে। কিন্তু এ সংসারে ঢাকাঢুকি, চাপাচুপি দিয়া যে কিছুই রাখিবার জো নাই, দশের চক্ষু যে অন্ধকারেও ঘুরিয়া-ফিরিয়া নিগূঢ় ব্যাপারের খবর লইতে পারে, ইহা সে এ যাবৎ সন্দেহমাত্র করে নাই। অবশেষে একদিন থলে-মাথায় একটী লোককে উঠানে আসিতে দেখিয়া, বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি!" লোকটা দাঁত বাহির করিয়া কহিল, "চাইল-ডাইল। তোমার বাপ—মুন্সি-সাহেবের বাড়ীর।" দিল্‌জানের মুখখানি কালি হইয়া গেল। তাহার মনে হইল কিছুই আর গোপন নাই, ঘরের কথা বাহির হইতে-হইতে একেবারে বাপ-মায়ের কাণে গিয়া উঠিয়াছে! তাঁহারা দিলের সম্বন্ধে এতদিন উদাসীন থাকিলেও, আর চুপ করিয়া থাকিতে পারেন নাই—দয়া করিয়াছেন।

আর কেহ হইলে নিশ্চয়ই এই দয়ায় কৃতার্থ হইত। কিন্তু দিল্ এমনি আহম্মুক মেয়ে যে, একেবারে খোঁকি হইয়া কহিল, "কে তাকে এসব দিতে কইছে?" মুটিয়ার দাঁতের পাঁটি মুহূর্ত্তে ঠোঁটের আড়ালে মুখ লুকাইল। সে ঢোক গিলিয়া কহিল, "তা তো পুছ করি নাই।" বলিয়াই মাথা হইতে থলে নামাইবার উদ্যোগ করিল! দিল্ ভ্রূকুটি করিয়া কহিল, "খবরদার! নামাইস্ না—এখানে নামাইস না বল্‌ছি।" মুটিয়া হতভম্ব হইয়া কহিল, "কোথায় তা অইলে নামাই?" দিল্ বলিতে যাইতেছিল, এই আমার কপালের ওপরে; কিন্তু সামলাইয়া লইয়া বলিল, "এখানে না,—এখানে না; যেখানে থিকা আইছিস সেইখানে—"

মুটিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে, দিল্ তাহাকে বলিয়া দিল, "একটা কথা—বাপজানকে কইস যে, যাইয়া তার ফকিরের ঘরে পড়ে নাই, যার ঘরে পড়েছে, সে সোণা-পাড়ার চৌধুরীদের নোকর।"

ইহার পর সে আর স্বামীকে চিঠি না লিখিয়া থাকিতে পারে নাই।

(৫)

চিঠিখানা যে দিন সোণাপাড়ায় পঁহুছে, সেই দিন সন্ধ্যা-বেলা দিলের সম্বন্ধে খুড়া ভাইপোতে একটু বিশেষ আলোচনা হইয়াছিল। পরদিন দ্বিপ্রহরে হাতেমকে আহারের স্থানে উপস্থিত দেখা গেল না। ঐ সময় তাহার উপস্থিতি এক-রূপ অনিবার্য্য ব্যাপার বলিয়াই গণ্য ছিল। খেলা-ধূলা বা বেগারের কাজ কিছুতেই তাহাকে ভুলাইয়া রাখিতে পারিত না,—সব ফেলিয়া রাখিয়া সে ছুটিয়া আসিত, এক সঙ্গে না খাইলে যে চাচার পেট ভরে না।

ভাত বাড়িয়া লইয়া গহের বহুক্ষণ অপেক্ষা করিল; ভাত শুখাইয়া চা'ল হইবার উপক্রম করিলে, সে আর বসিয়া থাকিতে পারিল না; যেখানে-যেখানে হাতেমের থাকিবার সম্ভাবনা, সর্ব্বত্র তাহার খোঁজ লইল। যখন কোথাও উদ্দেশ পাওয়া গেল না, তখন গহের ভাবিয়া-চিন্তিয়া এইরূপ বুঝিল যে, সে ভাগিয়াছে—দেশে চাচির কাছে যাইবার জন্যই এখান হইতে ভাগিয়াছে। হাতেম যে চিঠি শুনিয়া চাচির জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল, তাহা তাহার ভাবে ও কথায় প্রকাশ। কিন্তু হাতেমের সম্বন্ধে স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াও সে স্থির হইতে পারিল না। কেন না, পথ যেমন দীর্ঘ তেমনি বিপদসঙ্কুল। তার পর পথ পার হইয়া যে আশ্রয়, তাহাও নিরাপদ নহে,—ইহাই গহেরের ধারণা। অতএব বাড়া-ভাত, আর সাধের চাকরী ফেলিয়া রাখিয়া তৎক্ষণাৎ সে হাতেমের উদ্দেশে দেশের পথ ধরিল।

কিন্তু ছুটাছুটি করিয়াও হাতেমের নাগাল পাইল না। দূর হইতে অনেককেই হাতেম বলিয়া মনে করিয়া তাহা-দের পিছনে-পিছনে সে অনেক ঘুরিল। আবার অনেকের কাছে হাতেমের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াও বিড়ম্বিত হইল। তাহার প্রশ্নে যে যেখানে হাতেমের মতো বালক দেখিয়াছে বলিয়া নির্দ্দেশ করিল, গহের সেই-সেই স্থানে তাহার সন্ধান না করিয়া নিরস্ত হইল না। এইরূপে তিনদিনের পথে ছয় দিন কাটিয়া গেলে তাহার হুঁস হইল যে, এত দিনে হয় ত সে বাড়ী পৌঁছিয়াছে; অতএব পথে-পথে খুঁজিয়া বেড়ানো পণ্ডশ্রম মাত্র।

মাঠে-মাঠে সোণা ফলিয়াছে। কোথাও ধানের ভারে গাছ নুইয়া পড়িয়াছে, কোথাও দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে। গ্রামপ্রান্তে তালবনের ধারে যে ক্ষেত, তাহাতে বাবুইগণের মহোৎসবের মহা সমারোহ। সেখানে গান-বাজনা, দীয়তাং-ভুজ্যতাং রবের বিরাম নাই। এ সকলের দিকে দৃষ্টি দিবার অবসর গহেরের ছিল না,—সে আপন মনে ছুটিয়া চলিয়াছে। কিন্তু এক জায়গায় আসিলে, তাহার চরণের গতি স্থগিত হইল। সে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল, ধান কাটিতে-কাটিতে কে গাহিতেছে,—

"আইস আইস আইস ফিরা
বঁধুরে মোর মাথার কিরা।
যে সব দুঃখ দিছি তোমায়
মনে প'লে মরি ব্যথায়,
এবার আইলে রাখ্‌ব রে প্রাণ,
বুকের মাঝে আঁচল দিয়া।"

মুহূর্ত্তে দিল্‌জানের সেই স্তব্ধ, বিষণ্ণ মূর্ত্তি, যাহা সে প্রবাসে আসিবার কালে দেখিয়া আসিয়াছিল, মানসপটে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কিন্তু সে তাহাকে কিছুমাত্র খাতির করিল না, তাড়াতাড়ি মন হইতে দুঃস্বপ্নের মত ঝাড়িয়া ফেলিয়া

জাগিয়া উঠিল, এবং হাতেমের কথা ভাবিতে-ভাবিতে দ্রুত-বেগে অগ্রসর হইতে লাগিল।

(৬)

সব ফুরাইয়াছে—বাঁধা দিয়া চালাইবার মত আর কিছু অবশিষ্ট নাই। কাল সারা দিন এবং আজিও বেলা তিন প্রহর অনাহারে কাটাইয়া, ক্ষীণ, অবসন্ন দেহে দিল্ শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে,—আহারের চেষ্টা করে নাই। পরের দ্বারস্থ হইলে যে ধার মেলে না, তাহা নহে; কিন্তু এ দীনতা সে প্রাণান্তেও স্বীকার করিতে রাজি নহে। যে শয্যা গ্রহণ করিয়াছে, তাহা আর পরিত্যাগ করিবে না,—ইহাই তাহার সঙ্কল্প। স্বামী যাহার বিরূপ হইল,—স্ত্রী মরিল কি বাঁচিল খবর লইল না,—তাহার আবার আহারের দুশ্চেষ্টা কেন? সে মরিবে, মরিবে—নিশ্চয় মরিবে।

বহুক্ষণ চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিয়া সে মনে করিল, কিন্তু যদি গহের আসিত, হাতেম আসিয়া একবার চাচি বলিয়া ডাকিত, তাহা হইলে মরণে তাহার কোন দুঃখই থাকিত না। আসিবে না? চিঠি তো পাইয়াছে, আসিবার হইলে এতদিন নিশ্চয় আসিত। না—না আসিবে না,—তাহারা আর তাহার মুখ দেখিবে না। এই শূন্য ঘরেই তাহার শূন্য প্রাণ শূন্যে মিলাইবে।

অশ্রুধারা-বিগলিত চক্ষু দুটি মুদ্রিত করিয়া দিল্ কল্পনা করিতে লাগিল, যেন তাহার মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুর পর খুড়া-ভাইপো দুই জনে আসিয়া তাহার 'মড়ামুখ' দেখিতেছে। গহের কোঁচার খুঁটে মুখ মুছিতেছে, আর হাতেম তাহার বুকের উপর পড়িয়া চাচি বলিয়া চীৎকার করিতেছে। তাহার পর তাহার জন্য কত দুঃখ করিতে-করিতে তাহারা তাহার গোর দিল। মাটির উপর মাটি, তাহার উপর মাটি চাপাইল। আর কথা শোনা যায় না। আলো নাই, বাতাস নাই, গহের নাই, হাতেম নাই—নাই বলিতে কিছুই নাই, শুধু অন্ধকার—যেন ভাদুরে মেঘে ঢাকা অমাবস্যার রাত কালকেউটের মত গর্ত্তের ভিতর ঢুকিয়া ভীড় পাকাইয়া আছে। তার পাকে-পাকে ডরের বাসা। বাপ্‌রে, গা ছম্‌ছম্ করে যে! দিল্ ভীত হইয়া চোখ চাহিল। আলোর কি সুন্দর মুখভরা হাসির আভা, হাওয়ার কি মধুর প্রাণভরা আনন্দের ঢেউ! তার মধ্য দিয়া ও কে আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল? গহের! দিল্ বাঁচিয়া আছে, না সত্য-সত্যই মরিয়া ভূত হইয়া তাহাকে দেখিতেছে—ইহা সে যেন প্রথমে বুঝিতেই পারিল না। তার পর ভুল ভাঙ্গিতে-না-ভাঙ্গিতেই, অভিমান-ভরে মুখ ফিরাইতে গেল, কিন্তু পারিল না। গহেরের উদ্বেগ-পীড়িত, রুক্ষ, ধূলিধূসর মুখের ছবি যেন তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিল। দিল্ স্তম্ভিত হইয়া গহেরকে দেখিল; তাহার পর তাহার পশ্চাতে দ্বারের দিকে চাহিল—হাতেম নাই! প্রাণটা দুড়্‌দুড়্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল—কি অমঙ্গল ঘটিয়াছে না-জানি! অতি কষ্টে দুই, তিনবার ঢোক গিলিয়া দিল্ জিজ্ঞাসা করিল, "হাতেম! হাতেম! হাতেম কই?"

অনাহার, অনিদ্রা ও পথশ্রম তখন গহেরের পেটে ও মাথায় আগুন জ্বালিয়াছে—মেজাজ একেবারে রুক্ষ। তাহার উপর যে লোক হাতেমের সকল দুর্দ্দশার, এমন কি উপস্থিত নিরুদ্দেশেরও একমাত্র কারণ, তাহারই মুখে—'হাতেম কই' প্রশ্ন—গহেরের দেহে যেন বিষ ছড়াইয়া দিল। সে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া কহিল, "হাতেম কই! হাতেম কই!—দরদ একেকালে জ্বালের দুধির মতো উৎলাইয়া উঠ্‌ল যে! ক্যান্, কিছুই তো আর বাকি রাইখা ছাড়ো নাই—গতরের হাড্ডি তক চাবাইয়া খাবার জো কর্‌ছিলা। আবারও হাতেম কই! হাতেম কই! মনে কি ভাবছো তাই কও দেখি?"

হাতেমকে দুঃখ দেওয়ার দুঃখ দিলের অন্তস্তলে যেন একটী স্থায়ী ক্ষতের সৃষ্টি করিয়াছিল,—ইহার কথা তাহার কিছুতেই ভুলিয়া থাকিবার উপায় নাই। এই ব্যথার উপর গহেরের কথার বিষাক্ত ছুরির নিদারুণ, নিষ্ঠুর আঘাত তাহার অনাহার-শীর্ণ, দুর্ব্বল দেহের পক্ষে বরদাস্ত করা কঠিন হইয়া উঠিল। তাহার দিশাহারা চক্ষু দুটি রক্ত-মোক্ষণ করার ন্যায় ভিতরের উষ্ণ অশ্রুধারাকে অবারিত, উচ্ছ্বসিত করিয়া দিল। শয্যার উপর বাহু দুইটির ভর রাখিয়া অতি কষ্টে আত্ম-সংবরণ করিয়া দিল্ কহিল, "আমি কেমুন কইরা তোমারে বুঝাইমু যে হাতেম—"

দিলের মুখে আবার হাতেমের নাম শুনিয়া গুহের অধীর হইয়া কহিল, "বুঝ্‌ছি, বুঝ্‌ছি—আর বুঝাবার কাম নাই। এত কইরাও মনডা খুসী হয় নাই, পরাণডা ভইরা

ওঠে নাই। তার জাঁলি মাথাডা কচমচ কইরা চাবাইয়া খাবার না পার্লি প্যাটটা ভর্‌বি ক্যামায়! তার জন্থিই জিহ্বার নালা দর্‌দর্ কইয়া কাট্‌বার লাগছে। হাতেম কই? হাতেম কই?—গাজিরে গাজি!—কয় কি! শুন্‌লিও যে ডর করে।"

মাথার উপরকার খোদাতাল্লা, যিনি চুপ করিয়া বসিয়া দিন-দুনিয়ার নাড়ী-নক্ষত্রের খবর রাখেন, তিনি জানেন, হাতেমের জন্যে দিলের সন্তানের ব্যথা জন্মিয়াছে কি না? তারি সম্বন্ধে বার-বার এই অন্যায়, অসঙ্গত তীব্র আঘাত! আঘাতকারী আর কেহ নহে, তাহারই দরদের দরদী স্বামী!

একটা অব্যক্ত মর্ম্মবিদারী শব্দ করিয়া দিল্ বিছানার উপর পড়িয়া গেল। তাহার অন্তরের উদ্বেলিত, অশান্ত বেদনা বাহির হইবার পথ না পাইয়া, প্রবল পীড়নে হৃদয়টিকে স্ফীত, কম্পিত করিয়া তুলিল।

কিন্তু গহেরের রোক চড়িয়া গিয়াছিল। সে নিবৃত্ত হইতে পারিল না। উন্মত্তের ন্যায় বিকট হাসি হাসিয়া বলিতে লাগিল, "তাজ্জব! তাজ্জব! এ যে ব্যাঙের শোকে সাপের চোখে সাঁতার পানি। দরদ—দরদ—দরদের জালায় আর বাঁচলাম না। লজ্জাও নাই সরমও নাই!—"

দিলের মরণজয়ী অভিমান আঘাতের পর আঘাতে মরিয়া হইয়া, দিল্‌কে জাগাইয়া দৃপ্ত করিয়া তুলিল। ধীরে-ধীরে মুখ তুলিয়া দিল্ কহিল, "না হয় সরম আমার নাই, কিন্তু তোমার খুব আছে তো! যারে বিয়া করছো, তোমার সেই ঘরের জরু কি খায়, কি পরে, খবর নেও না, মইল, কি বাঁচল ডাইকা জিগাও না। দোষ-ঘাইট মাইয়া-মানুষে করে। আর তা কর্লি পুরুষ মানুষে ঢাইকা নেয়, তারে বুঝাইয়া কয়, মাপ করে। তারে ভাঙ্গা পাতিলের মতো টান মাইরা ফেলাইয়া দেয়, তাতো জান্‌তাম না। তুমি আমারে কিছু বুঝাইয়া কইছিলা কি? কও নাই। এখন জবাই করা মুরগীডার মতো আমারে দাও দিয়া চুরাবার আইছ! তোমার যদি সরম থাকে, তার ওপরে দরদও থাকে --আমার থাক্‌বে না ক্যান, তাই কও দেখি, শুনি?" দিলের কণ্ঠ যন্ত্রণাতুর, দেহ রোদনোচ্ছ্বাসে কম্পিত।

গহের চাহিল। ক্রোধে অন্ধ হইয়া এতক্ষণ সে যেন কিছুই দেখিতে পায় নাই। এইবার একে-একে সমুদয় দৃশ্য তাহার চোখে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। ফোটা পদ্মের মত দিলের সেই ভরপুর সুন্দর মুখখানি শুখাইয়া খড়ের আকার পাইয়াছে, অবারিত চোখের ধারা তাহাকে ধৌত, ধবল ও করুণ করিয়া তুলিয়াছে। তৈলহীন, রুক্ষ চুলগুলি উদাসীন ভ্রমরের মত তাহার উপর উড়িয়া-উড়িয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। দেহের বসন মলিন, ছিন্ন। আর গয়না—নাকের বেশর, কাণের মাকড়ি কোথায় গেল তাহার? ঘরেরই বা এ কি সর্ব্বহারা জীর্ণ মূর্ত্তি! গহেরের প্রাণটা তো আর সত্যসত্যই কঠিন কঠোর নহে। দেখিতে দেখিতে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "ওরে এ কি! এ কি হাল!—এ সব কি হয়েছে, ওরে ও দিল্?"

অশ্রুর পর অশ্রু—গহেরের স্নেহ-সহানুভূতির মৃদুস্পর্শ দিলের প্রাণের শোক-দুঃখ, মান-অভিমান, প্রেম-প্রীতি, সব যেন গলিয়া-গলিয়া ঝলকে-ঝলকে বাহির হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ তাহার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। তাহার পর কহিল, "আমার কথা ছাইড়া দেও তুমি। দুইডি পায় ধরি তোমার, হাতেমের কথা কও—কোথায় সে? পাছে আবার দুঃখু দেই, সেই ভয়ে বুঝি, তুমি তারে সোনাপাড়াই রাইখা আইছ?"

বুলি বড় মিঠে—স্নেহের মধুতে ভরা বলিয়া বোধ হয়, চোখের জল যে মোটে মানা মানে না! এ যেন সত্যই কেমন-কেমন বলিয়া বোধ হইতেছে। গহের অবাক্ হইয়া দিলের জলমাখা মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

দিল্ অধীর হইয়া কহিল, "কথা কও না যে! হাতেম কই?"

গহের মনে মনে কহিল, 'তাই তো!' প্রকাশ্যে কহিল, "সে পলাইয়া আইছে, তোমার কাছে আস্‌বে বইলা। ক্যাবল আসবে বইলা না, পাছে তুমি না খাইয়া মরো সেই ভয়ে।" গহেরের সুর খাদে নামিয়াছে।

দিল্ কাঁদিয়া ভাসাইতে লাগিল,—আহা রে বাপজান! এমন স্নেহের বাছাকেও আমি কত না দুঃখু দিছি। গহেরকে বলিল, "কোথায় গেল? কোনো বিপদ-আপদ ঘটল না তো?"

"আল্লা জানে। বোধ করি, পথ হারাইছে। আমি

চল্লাম, তার উদ্দিশে।" বলিয়া গহের পা বাড়াইল। চলিয়া-চলিয়া পা ফুলিয়াছে, কোমরে ব্যথা ধরিয়াছে, দুর্ব্বল, অবসন্ন দেহ চলিতে একান্ত অনিচ্ছুক। তবু অবোধ অস্থির মনের হুকুম তামিল না করিলেই নয়।

দিল্ উঠিয়া আসিয়া হাত ধরিল। সস্নেহে বলিল, "মইরা যাবা যে! তালাস যে করবা, কেমুন কইরা করবা।"

হঠাৎ দূর হইতে ক্লান্ত, করুণ, ক্লিষ্ট কণ্ঠের একটি ডাক আসিয়া উভয়কে চকিত করিয়া দিল—"চাচি!—ও চাচি!"

কুন্দনন্দিনী

[শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু]

যে নিবিড়, তামসী নিশায় স্নিগ্ধ-জ্যোতিঃ, সুকোমল, শুভ্র কুন্দকলিটী আমাদের প্রথম দৃষ্টিপথে পড়ে, তাহা তাহারই ক্ষুদ্র জীবনের প্রতিচ্ছবি। কুন্দের জীবনে এ নিরানন্দময়ী যামিনী আর সুপ্রভাত হয় নাই; আলোক তাহাকে ফুটিবার অবসর দেয় নাই। একবার এই ঘনান্ধকারে ক্ষণেকের তরে উষারাগ দেখা দিয়াছিল,—সে কেবল সেই তিমিরকে গাঢ়তম করিবার জন্য। কুন্দের জীবনাবসানে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—'অপরিস্ফুট কুন্দ-কুসুম শুকাইল।'

জাগরণ ও সুষুপ্তির মধ্যবর্ত্তী একটা দেশ আছে,—সাধারণতঃ লোকে তাহাকে স্বপ্নলোক বলিয়া থাকে। এই বিচিত্র রাজ্যে স্থান পরিমাণহীন, কাল অনির্দ্দিষ্ট, গতি ও স্থিতি অনিশ্চিত। এ লোকে আলোক ও অন্ধকার, বাস্তব ও অবাস্তব, স্মৃতি ও কল্পনা, হাসি-অশ্রু, আশা-ভয়-বিস্ময় একাধারে একাকারে বিরাজমান। হেথা মুদিত চক্ষু অদ্ভুত দর্শন-শক্তি-সম্পন্ন,—মুক্ত নয়ন অন্ধ। এস্থানে মৃত সঞ্জীবিত,—জীবিত সমাধিগত হয়; কল্পবৃক্ষে লোচন-লোভন ফল ফলে,—কিন্তু কর-প্রসারণমাত্রে বিলীন হইয়া যায়। এখানকার অমৃত-প্রস্রবণে তৃষ্ণার তৃপ্তি হয় না, কাম্যফলে ক্ষুধা মেটে না। কুন্দনন্দিনী এই স্বপ্নলোকের জীব। বাস্তব সংসারে তাহার জীবন—স্বপ্নের জীবন।

বঙ্কিম তাঁহার স্বপ্নময়ী নায়িকার বাল্যজীবন সবিশেষ বর্ণনা করেন নাই; কিন্তু তাহা অনুমান করা কষ্টসাধ্য নহে। জনশূন্য জীর্ণ গৃহে বালিকা সমবয়স্কা সঙ্গিনী চাঁপার সঙ্গে খেলা করে; কিন্তু খেলিতে-খেলিতে অন্যমনস্ক হইয়া যায়। তাহাদের খিড়কীর বাগানে বালকের দল কোলাহল করিয়া ফল পাড়িতে আসে। কুন্দ ছুটিয়া যায়, কিন্তু কিছুদূর যাইয়াই থমকিয়া দাঁড়ায় ও অবাক্ হইয়া বালকদিগকে দেখিতে থাকে। মনে হয়, তাহার সে মুগ্ধ, বিহ্বল, স্বচ্ছ নীল চক্ষু দুটি যেন এ বাস্তব জগতকে সর্ব্বদাই দেখিবার, জানিবার, চিনিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছে। ভোজনপাত্র হইতে বিড়াল মাছ তুলিয়া লইলে, কুন্দ ভয়ে জড়সড় হয়; মূষিক দেখিলে চমকিয়া উঠে; রাত্রিতে সহসা পেচকের ফুৎকার শুনিলে ঘুম ভাঙ্গিয়া কাঁপিতে থাকে। সন্ধ্যার সময় যখন আঁধারের ঘোর ঘনাইয়া আসে, ঝিল্লীরবে বিজন ভবন মুখরিত হইয়া উঠে, গৃহ-প্রাঙ্গণে অযত্ন-রক্ষিত ফুলগাছে ফুল ফুটে, কুন্দ তখন ভাবিতে থাকে, তাহার মা, ভাই, বোনের মুখগুলিও এমনি ফুলের মত ফুটিয়া থাকিত, তাহারা সব কোথায় ঝরিয়া গেল! বুঝি ঐ আকাশে নক্ষত্র হইয়া আছে! মৃত আত্মীয়গণকে নক্ষত্র কল্পনা করিয়া কুন্দ চিনিতে চেষ্টা করিত, কোন্‌টী কে।

এই কল্পনা বা ভাবপ্রবণতা কুন্দ-চরিত্রের প্রধান উপাদান—মূল ধাতু।

কুন্দ শৈশবে মাতৃহীনা। মাতার স্নেহের শিক্ষার অভাবে তাহার সংসার-শিক্ষা সুসম্পন্ন হয় নাই। তার উপর কুন্দের পিতা বেশ বিচক্ষণ ছিলেন না। মৃত্যু একে-একে তাঁহার হৃদয়-রত্নগুলিকে হরণ করিয়া বারবার শিখাইয়াছে যে, জীবন অনিশ্চিত, হেথা ইচ্ছামত সকল কাজ সম্পন্ন করা যায় না। তথাপি, কুন্দের বিবাহযোগ্য বয়স হইলে তিনি ভাবিতেন, "কুন্দকে বিলাইয়া দিয়া কোথায় থাকিব, কি লইয়া থাকিব?" "এ কথা তাঁহার মনে হইত না যে, যে দিন তাঁহার ডাক পড়িবে, সে দিন কুন্দকে

কোথায় রাখিয়া যাইবেন।" তাহাই হইল। একদিন অকস্মাৎ তাঁহার ডাক পড়িল।

সে দিন ভারি ঝড়-বৃষ্টি। প্রকৃতি যেন কুন্দের ভাবী জীবন তাহাকে অভিনয় করিয়া দেখাইতেছেন। ক্রমে বাহিরের ঝড় থামিল। বৃদ্ধের জীবনে যে রোগ-শোক-দৈন্যের ঝড় উঠিয়াছিল, তাহারও অবসান হইল। "কুন্দ-নন্দিনী একাকিনী পিতার মৃতদেহ ক্রোড়ে লইয়া রহিলেন।" কিন্তু সে বুঝিতে পারিল না, ইহা নিদ্রা কি মহানিদ্রা। কিছুক্ষণ বুঝিবার চেষ্টা করিয়া সে ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘুমাইয়া কুন্দ স্বপ্ন দেখিল, যেন তাহার জননী এক বিপুল আলোকমণ্ডলে আরূঢ় হইয়া তাহাকে নক্ষত্রলোকে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছেন। কিন্তু কুন্দ যাইতে স্বীকৃত হইল না। তাহাতে মাতা বিষণ্ন হইয়া বলিলেন—"বাছা, যাইলে ভাল করিতে। তুমি অনেক কষ্ট পাইয়াছ ও পাইবে। কিন্তু আমি তোমাকে দুইটী মনুষ্য-মূর্ত্তি দেখাইতেছি; যদি পার, তবে ইহাদিগকে বিষবৎ প্রত্যাখ্যান করিও।" তার পর গগন-পটে এক দিব্য পুরুষ ও শ্যামাঙ্গী নারী-মূর্ত্তি অঙ্কিত হইল। মাতা বলিলেন, "এই পুরুষের দেবকান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া ভুলিও না। ইনি তোমার পক্ষে মহা অমঙ্গলের কারণ। আর এই শ্যামাঙ্গী নারীবেশে রাক্ষসী।"

ইতিমধ্যে নদীপথে কলিকাতা-যাত্রী নগেন্দ্র দত্ত ঝড়ের জন্য ইহাদের জীর্ণ ভবনে আশ্রয় লইয়াছেন। তিনি মুমূর্ষু বৃদ্ধের মুখে কুন্দের অসহায় অবস্থার কথা শুনিয়াছেন। নগেন্দ্র গ্রামে গিয়া বৃদ্ধের সৎকারের ব্যবস্থা করিলেন।

স্বপ্নময়ী কুন্দ কি ধাতুতে গঠিত, বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমেই তাহার পরিচয় দিয়াছেন। পিতার শবদেহ স্থানান্তরিত হইলে, কুন্দ কাঁদিতে বসিল। চাঁপা তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য আসিল। চাঁপা কুন্দের সমবয়স্কা ও সঙ্গিনী হইলেও, সে এই প্রত্যক্ষ লৌকিক জগতের জীব। অলৌকিক যেমন তাহার চর্ম্ম-চক্ষুর বহির্ভূত, তেমনি তাহার প্রত্যয়ের অতীত। চাঁপা দেখিল, "কুন্দ কাঁদিতেছে এবং এক-একবার প্রত্যাশাপন্নবৎ আকাশ-পানে চাহিয়া দেখিতেছে।" সে কৌতূহল-প্রযুক্ত জিজ্ঞাসা করিল, "এক-শ'-বার আকাশ-পানে চাহিয়া কি দেখিতেছ?"

কুন্দ অসঙ্কোচে উত্তর দিল, "আকাশ থেকে কাল মা আসিয়াছিলেন।"

কিন্তু কুন্দের কাছে যাহা প্রত্যক্ষ সত্য, চাঁপার কাছে তাহা অবিশ্বাস্য। চাঁপা বলিল, "হাঁ! মরা মানুষ না কি আবার আসিয়া থাকে!"

কুন্দ স্বপ্ন-বৃত্তান্ত সব বলিল। চাঁপা বিস্মিত হইল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করিল, "সেই আকাশের গায় যে পুরুষ আর মেয়েমানুষ দেখিয়াছিলে, তাদের চেন?"—অর্থাৎ তাহারা বাস্তব জগতের লোক কি না।

কুন্দ বলিল, "না, তাহাদের আর কখন দেখি নাই। সেই পুরুষের মত সুন্দর পুরুষ যেন কোথাও নাই। এমন রূপ কখনও দেখি নাই।"

কুন্দের এখন রূপ দেখিবার চক্ষু হইয়াছে; আর সেই স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষ সে চক্ষুকে আকৃষ্ট করিয়াছে।

বৃদ্ধের সৎকারের পর, সহায়শূন্যা, উপায়বিহীনা বালিকার কোন ব্যবস্থা করিতে না পারিয়া, অনন্যোপায় নগেন্দ্রনাথ যখন কুন্দকে তাঁহার সঙ্গে লইয়া যাইতে স্বীকৃত হইলেন এবং সেই কথা বলিবার জন্য তাহাকে ডাকিতে পাঠাইলেন, কুন্দ আসিতে-আসিতে দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া অকস্মাৎ স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইল। সেই স্বপ্ন-দৃষ্ট মূর্ত্তি, স্বপ্ন-জগতের পুরুষ শরীরী হইয়া যে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবে, কুন্দ ইহা প্রত্যাশা করে নাই। সে বিস্ময়োৎফুল্ল-লোচনে বিমূঢ়ের ন্যায় নগেন্দ্রকে দেখিতে লাগিল। তার পর চাঁপাকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা নগেন্দ্রকে দেখাইয়া কহিল, "এই সেই।"

"এই কে?"

"কাল রাত্রে মা যাহাকে আকাশের গায় দেখাইয়াছিলেন।"

প্রথম কৌতূহল, তার উপর রূপের আকর্ষণ। নগেন্দ্রকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াই যে, কুন্দের মনে অনুরাগ-সঞ্চার হইবে, তাহা বিচিত্র কি? নগেন্দ্র যখন তাহাকে বলিয়াছিলেন, "কুন্দ, বোধ হয়, তুমি আমাকে কখন ভালবাসিতে না।" কুন্দ এই জন্যই তখন উত্তর দিয়াছিল, "বরাবর বাসি।"

নগেন্দ্র কুন্দকে লইয়া কলিকাতায় গেলেন। সেখানে তাহাকে তাঁহার ভগিনী কমলমণির নিকট রাখিয়া, কুন্দের আত্মীয়-স্বজনের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কাহাকেও পাওয়া গেল না। অগত্যা কুন্দকে সঙ্গে লইয়া তিনি

গোবিন্দপুর যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে বিস্মৃত প্রায় স্বপ্ন-কথা একবার কুন্দের স্মরণ-পথে আসিল। "কিন্তু নগেন্দ্রের কারুণ্য-পূর্ণ মুখ-কান্তি এবং লোক-বৎসল চরিত্র মনে করিয়া, কুন্দ কিছুতেই বিশ্বাস করিল না যে, ইঁহা হইতে তাহার অনিষ্ট হইবে। অথবা কেহ-কেহ এমন পতঙ্গবৃত্ত যে, জলন্ত বহ্নিরাশি দেখিয়াও তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হয়।"

সত্য! পতঙ্গ যে মোহিনীতে আকৃষ্ট হইয়া অনলে আত্মবিসর্জ্জন করে, ব্যাধের বংশী-ধ্বনি শুনিয়া মৃগ যে মোহিনীতে অভিভূত হয়, যে মোহিনীতে আচ্ছন্ন হইয়া কল্পনা অজ্ঞাতের গূঢ়, গুপ্ত রহস্যের সন্ধানে ছুটিতে থাকে, নগেন্দ্রের মূর্ত্তি সেই মোহিনীতে কুন্দ-নন্দিনীকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। কিন্তু আকর্ষণের ধর্ম্ম এই যে, কর্ত্তা-কর্ম্ম উভয়েরই উপর তাহা সমভাবে আপনার প্রভাব বিস্তার করে। নগেন্দ্র যেমন কুন্দকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন, আপনিও তেমনি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কুন্দকে কিছুদিন দেখিবার পর, তিনি হরদেব ঘোষালকে পত্র লিখিতেছেন,—

"এই কুন্দের সরলতা চমৎকার; সে কিছুই বুঝে না। ······লেখাপড়ায় তাহার দিব্য বুদ্ধি। কিন্তু অন্য কোন কথাই বুঝে না। বলিলে, বৃহৎ নীল দুইটী চক্ষু—চক্ষু দুইটী শরতের মত সর্ব্বদাই স্বচ্ছ জলে ভাসিতেছে—সেই দুইটী চক্ষু আমার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া চাহিয়া থাকে, কিছু বলে না।—আমি সে চক্ষু দেখিতে-দেখিতে অন্যমনস্ক হই, আর বুঝাইতে পারি না। তুমি আমার মতি-স্থৈর্য্যের এই পরিচয় শুনিয়া হাসিবে। কিন্তু তোমায় যদি সেই দুইটী চক্ষুর সম্মুখে দাঁড় করাইতে পারি, তবে তোমারও মতি-স্থৈর্য্যের পরিচয় পাই। চক্ষু দুইটী যে কিরূপ, তাহা আমি এ পর্য্যন্ত স্থির করিতে পারিলাম না। তাহা দুইবার এক রকম দেখিলাম না। আমার বোধ হয়, যেন এ পৃথিবীর সে চোক নয়, এ পৃথিবীর সামগ্রী যেন ভাল করিয়া দেখে না, অন্তরীক্ষে যেন কি দেখিয়া তাহাতে নিযুক্ত আছে। কুন্দ যে নির্দ্দোষ সুন্দরী, তাহা নহে। অনেকের তুলনায় তাহার মুখাবয়ব অপেক্ষাকৃত অপ্রশংসনীয় বোধ হয়; অথচ আমার বোধ হয়, এমন সুন্দরী কখনও দেখি নাই। যেন কুন্দনন্দিনীতে পৃথিবী ছাড়া কিছু আছে, রক্ত-মাংসের যেন গঠন নয়।"

কুন্দনন্দিনীকে দেখিয়া নগেন্দ্রের মনে যে তরঙ্গ উঠিয়াছে, তাহা তিনি এখনও স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারেন নাই। স্থির স্বচ্ছ জলে "শরচ্চন্দ্রের কিরণ সম্পাত" (তুলনাটা বঙ্কিমচন্দ্রেরই), সরোবর যেমন বুঝিতে পারে না, কিন্তু তাহার অন্তরের অন্তস্তল পর্য্যন্ত যেমন সে আলোক-পুলকে নাচিয়া উঠে, নগেন্দ্রের অবস্থা এখন সেই মত। নগেন্দ্র কুন্দকে যথাযথই বর্ণনা করিয়াছিলেন। কিন্তু এত পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করাটাই যে কুলক্ষণ! বর্ণনা করিয়া নগেন্দ্রের কিছুতেই আর তৃপ্তি হইতেছে না।—"যেন চন্দ্রকর কি পুষ্পসৌরভকে শরীরী করিয়া তাহাকে গড়িয়াছে। তাহার সঙ্গে তুলনা করিবার সামগ্রী হঠাৎ মনে হয় না। অতুল্য পদার্থটী, তাহার সর্ব্বাঙ্গীন শান্ত ভাবব্যক্তি—"শরচ্চন্দ্রের কিরণ-সম্পাতে স্বচ্ছ সরোবরের ভাবব্যক্তি" ইত্যাদি।

কুন্দ যে অপূর্ব্ব সুন্দরী তাহা নহে, কিন্তু "লোক-মনোমোহিনী।"

সূর্য্যমুখী পত্রে লিখিলেন,—"একটী বালিকা কুড়াইয়া পাইয়া কি আমায় ভুলিলে?······যদি কুন্দকে স্বয়ং বিবাহ করিবার অভিপ্রায় করিয়া থাক, তবে বল, আমি বরণডালা সাজাইতে বসি।" কথাগুলা এখনও পর্য্যন্ত ঠাট্টা-তামাসা বটে, কিন্তু অনেক সময় যে হাসিতে-হাসিতে মাথা ব্যথা করে! নগেন্দ্র মুগ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত লুব্ধ হন্ নাই।

ভার্য্যার অনুরোধে নগেন্দ্র কুন্দকে গোবিন্দপুরে লইয়া গেলেন। সূর্য্যমুখী তাঁহার আশ্রিত তারাচরণের সহিত তাহার বিবাহ দিলেন। বিবাহের তিন বৎসর পরে কুন্দ বিধবা হইল। কুন্দের বিবাহিত জীবনের এই তিন বৎসরের ইতিহাস উপন্যাসে নাই। কিন্তু তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। বনের পাখীকে ধরিয়া আনিয়া পিঞ্জরে পূরিলে, সে যেমন তাহার সঙ্গীর জন্য উন্মনা হইয়া সতত আকাশ-পানে চাহিয়া থাকে, কুন্দের অবস্থা এখন তাই। তারাচরণের অনেক কাজ। বধূ লইয়া সময়ক্ষেপ করিবার অবসর তাহার নাই। সে দিনের বেলায় স্কুল-মাষ্টার। সন্ধ্যার পর দেবেন্দ্র দত্তের বৈঠকখানায় রিফরমার। এ সকলের উপর আবার তাহার একটা পোষা বাঁদরী ছিল। এরূপ অবস্থায় সে যে বধূর চিত্তাকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিবে বা তাহাতে কৃতকার্য্য হইবে, তাহা কল্পনা করা যায় না।

মনে হয়, কুন্দ যেন প্রবাসে কোন বিদেশীর সঙ্গে বাস করিতেছে। এখানে চাল ডাল বাজার-খরচের হিসাব ছাড়া আর কিছুরই নিকাশ দিতে হয় না। অমূল্য যৌবনের যে কতটা বাজে-খরচ হইতেছে, কুন্দের কাছে সে হিসাব লইবার কেহ ছিল না। তারাচরণের সে বাঁদ্‌রীটা মাঝে মাঝে তাঁহাকে আঁচড়ায়-কামড়ায়, তিনি নারী-জাতির ব্যবহার সম্বন্ধে বধূকে বিশেষ-ভাবে উপদেশ দেন। তারাচরণ পত্নীর সঙ্গে প্রেমালাপ করিতেন ময়্যাল্ রীডার নম্বর থ্রী (Moral Reader no. 3)হইতে; আর রবিবার মধ্যাহ্ন-ভোজনান্তে তাহাকে সিটিজেন্ অভ্ দি ওয়ার্ল্ড্ (Citizen of the World) ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতেন। তদ্ভিন্ন প্রায়ই কুন্দকে দাঁড় করাইয়া বক্তৃতার মহলা দিতেন। এইরূপে তারাচরণ একদিকে বক্তৃতার স্রোতে, অন্যদিকে কুন্দ আপনার মনের স্রোতে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। গভীর রাত্রে কুন্দ যখন জাগিয়া-জাগিয়া স্বপ্ন দেখিত, তখন দেখিত, ঘুমের ঘোরে তারাচরণ হাতড়াইয়া-হাতড়াইয়া কোন বিস্মৃত-পাঠ বালকের কর্ণান্বেষণ করিতেছেন। কুন্দ অতি কোমল, অতি ভীরু, ভ্রমরের লুব্ধ দৃষ্টি তাহাকে পীড়িত, ব্যথিত করে।

কুন্দনন্দিনীর "নবযৌবন সঞ্চারের অপূর্ব্ব শোভা" তারাচরণ না দেখুন, কথিত দেবেন্দ্র দত্ত তাহা দেখিয়াছিল এবং দেখিয়া আর ভুলিতে পারে নাই। তাই বিধবা হইবার পর কুন্দ যখন নগেন্দ্রের অন্তঃপুরবাসিনী হইল, তাহাকে দেখিবার জন্য হরিদাসী বৈষ্ণবী সাজিয়া দেবেন্দ্র দত্ত মাঝে-মাঝে সেখানে আনাগোনা করিত।

কুন্দ গোবিন্দপুরে নগেন্দ্র দত্তের গৃহে আসা অবধি, প্রথম কিছুদিনের কাহিনী বঙ্কিমচন্দ্র সুস্পষ্ট প্রকাশ করেন নাই। কুন্দ গোবিন্দপুরে আসিয়াই "নগেন্দ্রের বাড়ী দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল।" তার পর সূর্য্যমুখীর খাস-দাসী হীরাকে দেখিয়া "তাহার শরীর কণ্টকিত এবং আপাদমস্তক স্বেদাক্ত হইল।" কুন্দের স্বপ্ন-দৃষ্ট অপরা মূর্ত্তি এই। ইহার অধিক কথা আর উপন্যাসে নাই। কিন্তু না থাকিলেও, পাঠকের কাছে তাহা অজ্ঞাত থাকে না। আমরা প্রথম যে বালিকাকে দেখিয়াছি, কখনও ধীর, কখনও চঞ্চল,—কুন্দ এখন আর ঠিক তেমনটী নাই। পুষ্পিত যৌবনে তাহার গতি এখন স্থির, ধীর, ব্রীড়াসঙ্কুচিত; অপরাধ-ভয়ে ঈষৎ শঙ্কিত, প্রতি পদক্ষেপে আপনা-আপনি কুণ্ঠিত। সে এখন কুটুম্বিনীদের মহলে থাকে; পদ্মের মত—পাঁকে থাকে, পাঁক মাখে না। কুন্দের জীবন স্বতন্ত্র, কাহারও সহিত মিশ খায় না। স্বল্পভাষিণী, স্বভাবতঃ-ভীরু, সকলকে সন্তুষ্ট করিতে অনুক্ষণ যত্নবতী। একটু অন্যমনা। নয়ন যেন নিয়ত কি অন্বেষণ করিতেছে। শ্রবণ যেন কোন্ দূর বংশীধ্বনি শুনিবার আকাঙ্ক্ষায় সতত উৎকর্ণ। পূর্ব্ব-দৃষ্ট স্বপ্নের কথা কুন্দের আর এখন মনে নাই। সে স্বপ্ন আর এক স্বপ্নে পরিণত হইয়াছে। কুন্দের হৃদয় সর্ব্বদাই তাহাতে বিভোর। এই স্বপ্নই তাহার জীবন—তাহার জীবনের অনন্য অবলম্বন। এই প্রেম-স্বপ্ন হইতে কুন্দের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই।

হরিদাসী বৈষ্ণবী যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁগা—তুমি কিছু ফর্‌মাস করিলে না?"

ভিখারিণীকেও ফরমাস করিতে কুন্দের মুখে বাধে। "সে তখন লজ্জাবনতমুখী হইয়া, একটু হাসিয়া,—সখী নয়, সঙ্গিনী নয়—এক বয়স্থার কাণে কাণে কহিল, কীর্ত্তন গাইতে বল না।"—এ গান যে বহুদিনের আর এক প্রেমস্বপ্নের গান! এ গানে যে চির-প্রেমের উচ্ছ্বাস, আশা-আকাঙ্ক্ষা-ভয়, চির-বিরহের ব্যথা, চোখের জলে কথায়-কথায় গাঁথা! ইহাতে যে পূর্ণ আত্ম-নিবেদন, অপূর্ণ মিলন, অতৃপ্তির নিঃশ্বাস, আশার বিলাস, ভক্তের চিরাভিলাষ, প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয়ের ভাষা অক্ষরে-অক্ষরে প্রকটিত! কুন্দের মুখে প্রাণের কথা বলিবার ভাষা নাই—তাই, কুন্দ বলিল, কীর্ত্তন গাইতে বল না।

কুক্ষণে সূর্য্যমুখী কুন্দকে গৃহে স্থান দিয়াছিলেন। এই অপার্থিব কুসুমের সৌরভে নগেন্দ্র উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন।—"দিনকয় মধ্যে ক্রমে ক্রমে নগেন্দ্রের সকল চরিত্র পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। নির্ম্মল আকাশে মেঘ দেখা দিল। নিদাঘ-কালের প্রদোষাকাশের মত অকস্মাৎ সে চরিত্র মেঘাবৃত হইতে লাগিল। দেখিয়া সূর্য্যমুখী গোপনে আপনার অঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন" ও কমলমণিকে পত্র লিখিলেন—"একবার এসো! কমলমণি! ভগিনি! তুমি বই আর আমার সুহৃদ্ কেহ নাই। একবার এসো!"

"কমলমণি আসিলেন। কিন্তু অনাথিনী, অভাগিনী, কুন্দের দুঃখেও তাহার হৃদয় কাঁদিল। কমল বুঝিলেন,

সকল দিক বজায় রাখিতে হইলে কুন্দকে স্থানান্তরিত করিতে হইবে। কথায় কথায় কমল কুন্দকে বলিলেন, "যদি আমি তোমায় ভালবাসি—আর তুমি আমায় ভালবাস, তবে কেন আমার সঙ্গে চল না—যাবে?"

কুন্দ ঘাড় নাড়িল—"যাব না।" মনে-মনে বলিল, গেলে যে, নগেন্দ্রকে দেখিতে পাইব না। কুন্দ আর কিছুই চায় না, কেবল নগেন্দ্রকে দেখিতে চায়। দূর হইতে, অতি দূর হইতে, নক্ষত্র যেমন অসীম তম-সিন্ধু ভেদ করিয়া পৃথিবীকে দেখে তেমনি করিয়া দেখিতে চায়।—"সেই ক্ষুদ্র হৃদয়খানির মধ্যে অপরিমিত প্রেম। প্রকাশের শক্তি নাই বলিয়া তাহা বিরুদ্ধ বায়ুর ন্যায় সতত কুন্দের সে হৃদয়ে আঘাত করিত।" বাল্য-কালাবধি কুন্দ নগেন্দ্রকে ভালবাসিয়াছিল—কাহাকে বলে নাই। নগেন্দ্রকে পাইবার বাসনা তাহার মনে ছিল না—কোন আশা কখন করে নাই। আপনার নৈরাশ্য আপনি সহ্য করিত। সেই গভীর নৈরাশ্যপূর্ণ হৃদয়ের গভীরতম অন্ধকূপে নক্ষত্রচ্ছায়ার মত কুন্দ নগেন্দ্রের মূর্ত্তি লুকাইয়া রাখিত। কমল সরলা কুন্দের মনের কথা বুঝিলেন, বলিলেন, "তুই দাদাবাবুকে বড় ভালবাসিস্—না?"

কুন্দ কথায় এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না। কিন্তু যে উত্তর মুখের কথা হইতে মুখর, ভাষা হইতেও স্পষ্টতর, কুন্দ সেই উত্তর দিল—চোখের জলে। মুখের কথা প্রতারণা করিতে পারে; চোখের জল মিছা বলে না।

কমল বলিলেন, "বুঝেছি—ম'রেছ। মর, তাতে ক্ষতি নাই—কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে অনেকে মরে যে?"

কুন্দ এ কথা ঠিক বুঝিতে পারিল না। সে ভালবাসে বলিয়াই দোষী? ফুলের বুকে গন্ধ থাকে, সে কি ফুলের অপরাধ! নারীর পক্ষে পরকীয়া প্রেম যে দুর্নীতি, বিধবাকে যে পরপুরুষের ধ্যান করিতে নাই, কুন্দ সে কথা ঠিক বুঝিত না। এইজন্য তাহার চরিত্রে কোথাও আত্ম-শাসনের প্রয়াস বা আত্মগ্লানি নাই। স্বভাব-দুহিতা কুন্দের স্বভাব-ভূষণ সরলতা। পরদুঃখকাতরতা তাহার চরিত্রের অলঙ্কার। পরের জন্য, বিশেষ উপকারীর জন্য আত্মত্যাগ তাহার ধর্ম্ম। কুন্দ কমলের বক্ষ হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া স্থির-দৃষ্টি করিয়া রহিল। কমলমণি তাহার নয়নের সে নীরব প্রশ্ন বুঝিলেন, বলিলেন, "পোড়ারমুখী, চোখের মাথা খেয়েছ? দেখিতে পাও না যে—" কমলের কথা শেষ না হইতেই কুন্দের উন্নত মস্তক ঘুরিয়া কমলমণির বক্ষের উপর পড়িল। সহসা উজ্জ্বল আলোক পড়িলে চক্ষু যেমন অন্ধকার দেখে, কুন্দ তেমনি অন্ধকার দেখিল। তার পর দুইজনে অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল। অবশেষে কমল বলিলেন, "আমার সঙ্গে চল। নহিলে নয়। সোণার সংসার ছারখার গেল।"

কুন্দ বুঝিল। বুঝিল, চির-দুঃখিনীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ্—প্রেমাস্পদকে চোখের-দেখা দেখা, তাহার আঁধার জীবনের একমাত্র আলো—হতাশা-সাগরের ধ্রুবতারা, আশাশূন্য ভালবাসার একমাত্র তৃপ্তি, তাহাও বিসর্জ্জন দিতে হইবে। কুন্দ অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিয়া-কাঁদিয়া আপনাকে বুঝাইল। তার পর চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল—"যাব।"

কুন্দ যে কতখানি বিসর্জ্জন দিতেছে,—আপনার হিতের জন্য নয়—কুন্দ তাহা বুঝে না,—পরের মঙ্গলের জন্য, নগেন্দ্রের হিতার্থ, সূর্য্যমুখীর হিতার্থ, যে আত্মবলি দিতেছে, কমল তাহা বুঝিলেন।

কিন্তু যদি জীবনের এই একমাত্র সুখ বিসর্জ্জন দিয়া স্থানান্তরে যাইতে হয়, তবে লোকান্তরে যাইতেই বা ক্ষতি কি? অন্ধকার বাপীতটে একাকিনী বসিয়া কুন্দ সেই কথাই ভাবিতেছিল। তাহার উর্ব্বর, উত্তপ্ত কল্পনায় কত কথাই উঠিতেছে। কুন্দ অন্ধকারে বসিয়া, আকাশ চাহিয়া ভাবিতেছে—"মানুষ কি মরিয়া নক্ষত্র হয়?" তবে মরি না কেন? কেমন করিয়া মরিব? জলে ডুবিয়া? ভালই ত! মরিলে নক্ষত্র হব, তাহ'লে তাঁহাকে রোজ-রোজ দেখিতে পাব। কাকে? কাকে? মুখে বল্‌তে পারিনে কেন?

সাধক যেমন ইষ্ট-দেবতার নাম অন্তরের অন্তরে গোপন করিয়া রাখে, প্রকাশ করিলে মহাপ্রত্যবায়ের ভাগী হয়, কুন্দ তেমনি তাহার ইষ্টদেবতার নাম হৃদয়ের নিভৃত স্থলে গোপন করিয়া রাখে। কিন্তু আজ জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া কুন্দ আপনাকে আপনি প্রশ্ন করিতেছে—"নাম মুখে আনিতে পারিনে কেন? এখন ত কেউ নেই—কেহ শুনিতে পাবে না, একবার মুখে আনিব? কেহ নেই, মনের সাধে নাম করি।" অন্তিম সময়ে মুমূর্ষু যেমন ইষ্টনাম

উচ্চারণ করে, অভাগিনী কুন্দ তেমনি তাঁহার ইষ্টনাম জপ করিতে লাগিল। প্রথম যেমন রুদ্ধ কন্দর হইতে ফোঁটায়-ফোঁটায় জল পড়ে, তার পর নির্ঝর-ধারে বহিয়া যায়, কুন্দ বলিতে লাগিল,—ন—নগ—নগেন্দ্র, নগেন্দ্র-- নগেন্দ্র—নগেন্দ্র"—নামে মাতোয়ারা হইয়া বলিতে লাগিল—"নগেন্দ্র—নগেন্দ্র—আমার নগেন্দ্র!" তখনি জিহ্বা দংশন করিয়া বলিল,—"না না—সূর্য্যমুখীর নগেন্দ্র!" তার পর বুভুক্ষায় মানুষ যেমন উপাদেয় ভোজ্য কল্পনা করে, কুন্দের মনে হইল—আচ্ছা, সূর্য্যমুখীর সঙ্গে বিয়ে না হয়ে যদি আমার সঙ্গে হতো!—কিন্তু কল্পনা সে সুখের চিত্র আঁকিতে-না-আঁকিতে, কুন্দ হতাশের নিঃশ্বাস ফেলিয়া প্রাণ-পণ বলে তাহাকে ফিরাইল। সে এত সুখ, চিরদুঃখিনী কুন্দ তাহা কল্পনা করিতেও ভয় পায়। তবে এ দুর্ব্বিসহ জীবন-ভার কেন বহি? এ দুঃসহ জ্বালা কেন সহি? দূর হউক্! এই স্নিগ্ধ সরোবরে ডুবিয়া মরি! কিন্তু না। তখনই কুন্দের কল্পনা তাহার মানসচক্ষের সমক্ষে এক অতি কুৎসিত, অতি বীভৎস চিত্র অঙ্কিত করিল,—"ডুবে ম'লে ফুলে পড়িয়া থাকিব, দেখিতে রাক্ষসীর মত হব।" তার-পর কুন্দ ভাবিল, "বিষ-খাইলে হয় না? কিন্তু বিষ পাব কোথা? কে আনিয়া দিবে? দিলে যেন, মরিতে পারিব কি? পারি। কিন্তু আজ না। একবার আকাঙ্ক্ষা ভরিয়া মনে করি, তিনি আমায় ভালবাসেন।" কিন্তু সে কথা কি সত্য? মনে হইল, কমল সে-দিন এই সত্যের ইঙ্গিত করিয়াছিল। কুন্দ আবার ভাবিতে লাগিল, "কিন্তু কিসে তিনি আমায় ভালবাসেন? রূপ—দেখি!" কুন্দ সরোবরে আপনার ছায়া দেখিতে গেল। তাহার রূপ যে নগেন্দ্রের দর্শনীয়, এমন কথা ত সে কখন ভাবে নাই। কিন্তু সরোবরে আপনাকে দেখিতে পাইল না। ভাবিল, দূর হউক, যা নয়, তা ভাবি কেন? আমার চেয়ে এ সুন্দর, সে সুন্দর!—তা রূপ ত গোল্লায় গেল,—গুণ কি? কুন্দ আপনার রূপ-গুণ কিছুই দেখিতে পাইল না।—"তবে কেন নগেন্দ্র আমায় ভালবাসিবেন?—মিছে কথা!" কিন্তু কুন্দের উত্তপ্ত কল্পনা বলিল, হউক না মিছে-কথা, ঐ মিথ্যাটাই সত্য করিয়া ভাব না! কুন্দ ভাবিল, তাই ভাবি। কিন্তু "কলিকাতায় যেতে হবে যে! তা' ত পারিব না! দেখিতে পাব না যে! আমি যেতে পারব না—পারব না—পারব না।" কিন্তু তখনই তাহার মনে হইল—তাহার জন্য সোণার সংসার ছারখার যাইতেছে। সূর্য্যমুখী তাহাকে অপরাধী করিয়াছে। সে কথা সত্য হউক মিথ্যা হউক, সূর্য্যমুখী তাহার হিতকারিণী, সুতরাং তাহার সুখের পথে কাঁটা হইয়া থাকা উচিত নয়। কুন্দকে যাইতে হইবে। কিন্তু থাকাও যেমন অসম্ভব, যাওয়াও তেমনি অসম্ভব। এ কঠিন হৃদয়-দ্বন্দ্বে কুন্দ অধীর হইয়া কাঁদিল—"বাবা গো, তুমি কি আমাকে ডুবিয়া মরিবার জন্য রাখিয়া গিয়াছিলে?—"

সহসা কুন্দের পূর্ব্ব-স্বপ্ন সব মনে পড়িল। সঙ্কল্প স্থির হইল—মরিবে। কুন্দ ধীরে-ধীরে সোপান অবতরণ করিতে লাগিল। সেই সময় নগেন্দ্র অঙ্গুলীতে তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া ডাকিলেন—"কুন্দ।" সে দিন আর কুন্দের মরা হইল না।

তার পর নগেন্দ্র সেই মুগ্ধা, বিহ্বলা, বাত্যাবিলোড়িত পত্রবৎ বিকম্পিতা, বিপরীত তরঙ্গাহতা তরঙ্গিনীর ন্যায় বিক্ষুব্ধা, এই তরুণীর কর্ণে আগ্নেয়গিরির ন্যায় তাঁহার অন্তর্জ্জ্বালা উদ্গীরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মনের আবেগে নগেন্দ্র যত কথাই বলিলেন, কুন্দ কেবলই বলিল,—"না।"

কুন্দ বুঝিয়াছে অমৃতের পাত্র তাহার অধর-সংলগ্ন হইলেও, তাহার জন্য নয়। এ তপস্যার স্বর্গ, এ কামনার ফল, তাহার জন্য নয়।—নয়, নয়, নয়! কিন্তু তবু কুন্দ মরিতে পারিল না। নগেন্দ্রের এই অপ্রত্যাশিত প্রণয়-সম্ভাষণ, এই স্পর্শ-সুখস্মৃতি আর কিছুদিন প্রাণ ভরিয়া ভাবিবার জন্য!

ইতিমধ্যে ঘটনা-স্রোত ভিন্ন মুখে বহিল। হীরার মুখে সূর্য্যমুখী শুনিয়াছেন, হরিদাসী বৈষ্ণবী আর কেহই নহে,—ছদ্মবেশী দেবেন্দ্র দত্ত। কুন্দের জন্য আনাগোনা করে। দারুণ ক্রোধে তিনি জ্ঞানশূন্য হইলেন। একটা কুলটার জন্য তাঁহার স্বামী উন্মত্তপ্রায়, সংসার ছারেখারে যাইতেছে! তিনি তীব্র তিরস্কার করিয়া কুন্দকে দূর হইতে বলিলেন। গভীর রাত্রিতে কুন্দ নগেন্দ্রের গৃহ ত্যাগ করিল। নগেন্দ্র ইহার কিছুই জানিলেন না।

দৈবযোগে কুন্দ হীরার গৃহে আশ্রয় পাইল। দেবেন্দ্র দত্তের অনুরাগিনী হীরা দেবেন্দ্র-বাঞ্ছিত কুন্দকে দারুণ

ঈর্ষ্যার চক্ষে দেখিত। কিন্তু হীরা জানিত, নগেন্দ্রবাবু কুন্দের জন্য পাগল। কুন্দের গৃহত্যাগে দত্তদের অমন হাস্যমুখ বাড়ীখানা যেন ঘোম্‌টা টানিয়া বসিয়া আছে। তাহার উপর যেন একটা আসন্ন বিপদের বিষন্ন ছায়া পড়িয়াছে। নগেন্দ্রের হৃদয়াকাশে সন্ধ্যা লাগিয়াছে, সূর্য্য ডুবুডুবু, এখন চাঁদ উঠিবার সময়। পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র—কুন্দ। হীরা সঙ্কল্প করিল, চাঁদকে কিছুদিন লুকাইয়া রাখিয়া সময়মত সে আকাশে উদয় করিবে। হীরা ভাবিয়াছিল, কুন্দ বোকা মেয়ে, সে তাহাকে শীঘ্রই বশ করিতে পারিবে। বাবু হবেন কুন্দের আজ্ঞাকারী, আর সে হবে কুন্দের গুরুমহাশয়। এখন সূর্য্য যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র অস্ত যায়, হীরা সেই চেষ্টায় দত্তবাড়ী গেল। ছল-ছুতায় কলহ করিয়া নগেন্দ্রকে বলিল, সে বিদায় চায়। মা ঠাকুরাণীর মুখের জ্বালায় আর কেহ টিকিতে পারিবে না। সে-দিন তিনি যা-তা বলিয়া কুন্দ ঠাকুরাণীকে দূর করিয়া দিয়াছেন। সন্ধ্যা আরও ঘোর হইল। নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীকে বলিলেন, তিনি কুন্দের জন্য গৃহত্যাগী হইবেন, তাহাকে অন্বেষণ করিয়া দেশে-দেশে ফিরিবেন। অস্তগামী সূর্য্য তাঁহার পায় গড়াইয়া পড়িয়া বলিল, "আর একমাস থাক। কুন্দকে না পাওয়া যায়, গৃহত্যাগ করিও।"

হীরা অনেক ভাবিয়া এই চাল চালিয়াছিল। মানুষ এমনি ভাবে। সাত চাল চিন্তিয়া ঠিক করে, মন্ত্রীকে চাপায় রাখিয়া বোড়ের কিস্তিতে মাৎ করিবে। কিন্তু কোথা হইতে ঘোড়ার আড়াই চাল তাহার সব মতলব লণ্ডভণ্ড করিয়া দেয়। তাহাই হইল। হীরার গৃহে কিছুদিন থাকিতে-থাকিতে বোকা মেয়ে ভাবিল, "এ আমার কি হইল। আমি কেন সে গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিলাম। আমি ত নগেন্দ্রকে দেখিতে পাইতাম। এখন একবারও দেখিতে পাই না।" ক্রমে তিরস্কার, অপমান, লজ্জা সব ভুলিয়া, চাঁদ আপনি আসিয়া ধরা দিল।

সূর্য্যমুখী মনে-মনে স্থির করিয়াছিলেন, যদি কুন্দনন্দিনী আসে, তাহাকে স্বামী-দান করিয়া, গৃহত্যাগ করিবেন। কুন্দ ফিরিয়া আসিলে তিনি স্বয়ং ঘটক হইয়া নগেন্দ্রের সহিত তাহার বিবাহ দিলেন।

মানবজীবনে কখন-কখন এমন কঠিন সমস্যায় উদয় হয়, যাহাতে ভিতরকার অব্যক্ত মানুষটী এক মুহূর্ত্তে ব্যক্ত হইয়া পড়ে। এই অনুসন্ধান-আলোকের সমক্ষে তাহার অন্তর্নিহিত প্রকৃতি, প্রবৃত্তি, বল, বুদ্ধি, অভিসন্ধি কিছুই অপ্রকাশ থাকে না। এই সকল সমস্যাই লোক-চরিত্র পরীক্ষার কষ্টি-পাথর। এই পরীক্ষায় মানবের চরিত্রগত স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয়। নগেন্দ্রের সহিত বিবাহ কুন্দনন্দিনীর জীবন-সমস্যা।

কুন্দের যদি কিছুমাত্র সংসার-বুদ্ধি থাকিত, তাহা হইলে সে এ পরিণয়ে কখনই সম্মত হইত না। একদিকে বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার লেলিহান্ জিহ্বা, আত্মতৃপ্তির জন্য অসংযত প্রবৃত্তির উদ্দাম উচ্ছ্বাস, অন্যদিকে অভিমানে অনিচ্ছায় আত্ম-বলিদান। এ পরিণয়ের পরিণাম কখন শুভপ্রদ হইতে পারে না। কিন্তু পরান্নপালিতা, পরাধীনা, চিরদুঃখিনী কুন্দ চিরদিন পরের ইচ্ছায় চালিত। স্বেচ্ছাচালিত হইয়া কুন্দ ইহজীবনে কেবল একটীমাত্র কার্য্য করিয়াছিল, তাহা বিষপান। সূর্য্যমুখী ভাবিলেন, কুন্দকে পাইয়া নগেন্দ্র সুখী হইবেন; নগেন্দ্র ভাবিলেন, কুন্দকে পাইয়া আমি সুখী হইব; কুন্দ ভাবিল, তাহার আত্মদানে সূর্য্যমুখী, নগেন্দ্র উভয়েই তৃপ্ত হইবেন।

কুন্দের এ ভ্রান্তি অচিরাৎ ভাঙ্গিয়া গেল। নগেন্দ্রের বিবাহের পর-রাত্রেই সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিলেন, কিন্তু তাঁহাকেও জাগাইয়া দিয়া গেলেন।

আরব্য-কাহিনীতে শুনা যায়, আবুহোসেনের একদিনের জন্য রাজ্যপ্রাপ্তি হইয়াছিল। অভাগিনী কুন্দের একদিনের রাজত্ব একদিনে অবসান হইল। সহসা মোহভঙ্গে নগেন্দ্র দারুণ বিচলিত হইয়া উঠিলেন। কুন্দও ব্যথিত হইল। সূর্য্যমুখী তাহার জন্য এত করিয়াছে, আজ সেই সূর্য্যমুখী তাহার জন্য গৃহত্যাগিনী। কুন্দ ভাবিল, আমি সুখী না হইয়া মরিলে ভাল ছিল। কুন্দের মনে ঈর্ষা ছিল না। যে ভালবাসা ভোগলালসা-বিহীন, কেবল আত্মদান করিয়া তৃপ্ত, আত্ম নিবেদনের চরিতার্থতায় সুখী, সে ভালবাসায় বিষের বিষ স্পর্শ করে না। তাহার সরল, উদার হৃদয় সূর্য্যমুখীর দুঃখে গলিয়া গেল। কুন্দ নগেন্দ্রকে প্রশ্ন করিল, "কি করিলে আবার যেমন ছিল তেমনি হয়?"

নগেন্দ্র ভাবিলেন, এ প্রশ্ন অনুতাপের আত্মগ্লানি। তাঁহার হৃদয়ে বড় গুরুতর বাজিল। যাহার জন্য তিনি ধর্ম্ম, লোকলজ্জা, চরিত্র, আত্মসম্মান, এমন কি সূর্য্যমুখীকে

পর্য্যন্ত হারাইয়াছেন, সেই বলিতেছে, কি করিলে যেমন ছিল আবার তেমনি হয়। তিনি বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে বিবাহ করিয়াছি বলিয়া কি তোমার অনুতাপ হইয়াছে?"

কুন্দ বুঝাইয়া বলিল, "তাহা নহে। তুমি আমাকে বিবাহ করিয়া যে সুখী করিয়াছ তাহা আমি কখন আশা করি নাই। আমি তা বলিতেছি না। আমি বলিতেছিলাম কি করিলে সূর্য্যমুখী ফিরিয়া আসে।"

কুন্দের মুখে সূর্য্যমুখীর নাম শুনিয়া নগেন্দ্র জ্বলিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "তোমারই জন্য সূর্য্যমুখী আমায় ত্যাগ করিয়া গেল।"

এ কঠোর আঘাত কুন্দ নীরবে সহ্য করিল। নগেন্দ্রের হৃদয় তখন অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছে, ছট্‌ফট্ করিতেছে। কুন্দের এই শান্তভাব তাঁহার ভাল লাগিল না। কথায়-কথায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি আমায় আর ভালবাস না?"

কুন্দ বলিল, "বাসি বৈ কি।" "বাসি বৈ কি! এ যে বালক ভুলান কথা!" "কুন্দ, বোধ হয়, তুমি আমাকে কখন ভালবাসিতে না।"

"বরাবর বাসি" বলিয়া কুন্দ ঘন ঘন বাতাস করিতে লাগিল।

বিষয় অর্জ্জন করিলেই হয় না, রাখিতে জানা চাই। নগেন্দ্রের মন এখন অনুতাপে ধু-ধু করিয়া জ্বলিতেছে। তিনি চাহিতেছেন সান্ত্বনা, খুঁজিতেছেন—শান্তি। সূর্য্যমুখী হইলে উদ্বেলিত প্রেম-ধারায়, কথার নির্ঝরে নগেন্দ্রকে নিষিক্ত করিয়া স্নিগ্ধ করিয়া দিত। কিন্তু কুন্দ কথা জানে না। নগেন্দ্র তাহা বুঝিলেন না, বলিলেন, "আমাকে সূর্য্যমুখী বরাবর ভালবাসিত। বানরের গলায় মুক্তার হার সহিবে কেন? লোহার শিকলই ভাল।"

কুন্দ ক্রমে নগেন্দ্রের চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিল। নগেন্দ্র হরদেবকে লিখিলেন, "কুন্দের দোষ নাই, দোষ আমারই, কিন্তু আমি আর তাহার মুখদর্শন সহ্য করিতে পারিতেছি না।" দাওয়ানের উপর বিষয়-কর্ম্ম রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া তিনি গৃহত্যাগ করিলেন—দেশে-দেশে সূর্য্যমুখীকে খুঁজিবার জন্য। কুন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করিলেন না। সহায়হীনা, সহানুভূতি-বিহীনা কুন্দের জীবন দুঃসহ হইয়া উঠিল। নগেন্দ্র একখানা পত্র লিখিয়াও তাহার তত্ত্ব করেন না। দাওয়ানের নিকট মধ্যে-মধ্যে যে পত্র আসে, কুন্দ সেগুলিকে জপমালা করিয়াছে।

কুন্দ রাত্রিদিন কাঁদে, রাত্রিদিন ভাবে, কেন এমন হইল। আমি কখন নগেন্দ্রকে পাইবার আশা করি নাই। হায়, কে আমাকে আকাশের চাঁদ ধরিয়া হাতে দিল। আমি কি দোষে সে চাঁদ হারাইলাম। আবার যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা। তাহারই জন্য সূর্য্যমুখী, তাহার পরম হিতকারিণী, পথের কাঙ্গালিনী হইয়াছেন। কুন্দ সঙ্কল্প করিল, মরিবে। কিন্তু এখন নয়। নগেন্দ্রকে আর একবার দেখিবে। আর সূর্য্যমুখী যদি ফিরিয়া আসেন, তবে মরিবে। আর তাঁর সুখের পথে কাঁটা হবে না। হায়, জাগ্রত স্বপ্ন কিছুতেই ভাঙ্গে না! দুঃসহ যন্ত্রণায় হৃদয় ছট্‌ফট্ করিতে থাকে, তবু মানুষ প্রাণপণে দুঃস্বপ্নকে বুকে আঁকড়িয়া ধরে!

ইতিমধ্যে সূর্য্যমুখীর মিথ্যা মৃত্যু-সংবাদ রটিল। কুন্দ কাঁদিল। কিন্তু নগেন্দ্র ফিরিয়া আসিতেছেন শুনিয়া তাহার শীর্ণ অধরে হাসি দেখা দিল। তার পর নগেন্দ্র ফিরিলেন। আত্মীয়-স্বজন সকলকে সম্ভাষণ করিলেন। কেবল চির-দুঃখিনী কুন্দনন্দিনীর সহিত সাক্ষৎ করিলেন না। মর্ম্মান্তিক যাতনায় কুন্দ পরিতাপ করিতে লাগিল, "কেন আমি স্বামী-দর্শন-লালসায় প্রাণ রাখিয়াছিলাম। এখন আর কোন্ সুখের আশায় প্রাণ রাখি।"

নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীর শয়ন-কক্ষে গেলেন—সূর্য্যমুখীর জন্য রোদন করিতে; কুন্দ আপনার শয়ন কক্ষে গেল—আপনার জন্য কাঁদিতে! যে পরের জন্য কাঁদে, তার রোদন বরং সহনীয়; যে আপনার জন্য কাঁদে, তার রোদন দুঃসহ। সে সুদীর্ঘ বিরহ-রজনীর অন্তরালে যে করুণ, হৃদয়ভেদী নাট্যের অভিনয় হইয়াছিল, তাহা লোক-চক্ষুর অগোচর। সে উপেক্ষিতার ব্যথা, আকুল অশ্রুজল; সে আশায় নিরাশা, নিরাশায় প্রতীক্ষা; সে বাসনার উত্তেজনা, লজ্জার অবসাদ; সে ব্যাকুল বুক-ফাটা কান্না বুকে চাপিয়া রাখা; সে পদশব্দের জন্য কাণ পাতিয়া থাকা; দেখিয়াছিলেন কেবল অন্তর্যামী।

সমস্ত রাত্রির পর প্রভাতে কুন্দের একটু তন্দ্রা আসিল। তখন সে আবার তাহার মাতাকে স্বপ্নে দেখিল। মাতা

তাহাকে লইবার জন্য আসিয়াছেন। নিদ্রাভঙ্গে কুন্দ দেবতার নিকট ভিক্ষা চাহিল—"এবার আমার স্বপ্ন সফল হউক।"

হীরা তখন কুন্দের পরিচর্য্যা করে। সে প্রভাতে আসিয়া বুঝিল, কুন্দ সারা রাত্রি কাঁদিয়াছে। কথায় সহানুভূতি জানাইয়া চতুরা হীরা কুন্দের সব কথা জানিয়া লইল। কৃত্রিম সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিল, "আমার মত যদি তোমাকে দুঃখ সহিতে হইত, তবে এতদিনে তুমি আত্মহত্যা করিতে।"

আত্মহত্যার নাম শুনিয়া কুন্দ চমকিয়া উঠিল। রাত্রিতে সে অনেকবার এই কথা ভাবিয়াছে। ভাবিল, এ কি বিধাতার সঙ্কেত!

হীরা আপনার দুঃখের কাহিনী, বলিয়া বলিল, "এই দেখ, আত্মহত্যা করিব বলিয়া আমি বিষ কিনিয়াছিলাম।" বলিয়া বিষ দেখাইল।

সেই সময়ে সহসা দত্ত-গৃহে মঙ্গল শঙ্খরোল উঠিল। হীরা ছুটিয়া দেখিতে গেল। কুন্দ একদিন বাপীকূলে বিষ পান করিবার কল্পনা করিয়াছিল। তখন ভাবিয়াছিল, বিষ কোথায় পাইবে, কে আনিয়া দিবে। সেই বিষ তাহার সম্মুখে। একি দৈব-প্রেরিত! কুন্দ বিষ পান করিল। প্রেমের অমৃত সিন্ধু মন্থনে অভাগিনী কুন্দের ভাগ্যে উঠিল কেবল হলাহল।

ইতিমধ্যে সূর্য্যমুখী গৃহে ফিরিয়াছেন। আত্মীয়-স্বজনকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া কমলের সঙ্গে তিনি কুন্দকে দেখিতে আসিলেন। কুন্দের অবস্থা বুঝিতে তাঁহার আর বাকী রহিল না। নগেন্দ্রকে ডাকিতে পাঠাইলেন।

নগেন্দ্র আসিলে কুন্দ ছিন্নবল্লীবৎ তাঁহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল। নগেন্দ্র গদগদ কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—"এ কি এ কুন্দ, তুমি কি দোষে ত্যাগ করিয়া যাইতেছ?"

কুন্দ কখন স্বামীর কথার উত্তর করিত না। আজি সে অন্তিমকালে মুক্তকণ্ঠে স্বামীর সঙ্গে কথা কহিল, বলিল, "তুমি কি দোষে আমায় ত্যাগ করিয়াছ?"

বাক্‌পটু নগেন্দ্র আজ সরলা বালিকার কাছে নিরুত্তর! কুন্দ বলিতে লাগিল, "কাল যদি তুমি আসিয়া, এমনি করিয়া একবার কুন্দ বলিয়া ডাকিতে, কাল যদি তুমি একবার আমার নিকট এমনি করিয়া বসিতে তবে আমি মরিতাম না। আমি অল্পদিনমাত্র তোমায় পাইয়াছি, তোমায় দেখিয়া আমার আজিও তৃপ্তি হয় নাই।"

নগেন্দ্র মর্ম্মপীড়িত হইয়া কাতর স্বরে কহিলেন, "কেন এমন কাজ করিলে? আমাকে একবার ডাকিলে না কেন?"

পাছে অন্তিম-অভিমান-বেদনার চিরস্মৃতি স্বামীর মনে থাকিয়া যায়, তাই কুন্দ দিব্য হাসি হাসিয়া বলিল, "তাহা ভাবিও না। যাহা বলিলাম, তাহা কেবল মনের আবেগে বলিয়াছি। তোমার আসিবার আগেই আমি মনে স্থির করিয়াছিলাম যে তোমাকে দেখিয়া মরিব।······ আমি মরিব বলিয়াই স্থির করিয়াছিলাম, তবে তোমাকে দেখিলে আমার মরিতে ইচ্ছা করে না।"

নগেন্দ্র তখন নীরবে বসিয়া সেই "মৃত্যুচ্ছায়া-ম্লান মুখে স্নেহ প্রফুল্লতা দেখিতেছিলেন।" সে আধিক্লিষ্ট মুখে তিনি যে হাসি দেখিয়াছিলেন, প্রাচীন বয়স পর্য্যন্ত তাহা তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত ছিল।

কুন্দ আবার বলিতে লাগিল;—অন্তিম শ্বাসের সঙ্গে তীব্র বিষের তীব্রতর জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করিতে-করিতে কুন্দ বলিতে লাগিল;—মৃত্যুচ্ছায়াচ্ছন্ন নয়নপথ হইতে চির-বাঞ্ছিতের বিলীনপ্রায় মুখমণ্ডল দেখিতে-দেখিতে কুন্দ বলিতে লাগিল;—প্রিয়দর্শনের চিরসাধ শেষ দেখা দেখিতে-দেখিতে কুন্দ বলিতে লাগিল;—"আমার কথা কহিবার তৃষ্ণা নিবারণ হইল না। আমি তোমাকে দেবতা বলিয়া জানিতাম, সাহস করিয়া মুখ ফুটিয়া কখন কথা কহি নাই। আমার সাধ মিটিল না।" কিন্তু হায়, "সময় হয়েছে নিকট এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে!" নয়নের অগ্রভাগ হইতে সোণার স্বপন ক্রমে মিলাইয়া যাইতেছে! ক্ষীণ—ক্ষীণতর—ক্রমে শূন্য! অপরিস্ফুট কুন্দকলি কলিকা-যৌবনে বুক-ভরা মধু লইয়া অকালে কালসাগরে ঝরিয়া পড়িল! হায়, এখনও যে "অমিয়রচন, সোহাগ-বচন, অনেক রয়েছে বাকি!" জ্যোৎস্না যেমন নীরবে আসিয়া নিঃশব্দে চলিয়া যায়, পৃথিবীর উপর তাপলেশটুকু রাখিয়া যায় না, তেমনি এই স্বল্পভাষিণী, নিরভিলাষিণী নিরভিমানিনী বালিকা স্বপ্নের মত আসিয়া স্বপ্নের মত চলিয়া গেল। রহিল কেবল তাহার চিরস্মরণীয় স্মৃতি! জীবিতে আত্মগোপন করিয়া মৃত্যুতে কুন্দ আপনাকে ধরা দিয়া গেল। সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিলেই জানা যায়।

গোবিন্দপুরের অন্ধকার ভবন সূর্য্যালোকে আবার হাসিবে। কিন্তু এই একরাত্রির জ্যোৎস্নাটুকু যে নির্ম্মল, স্নিগ্ধ কিরণ বিস্তার করিয়া গেল, নিষ্ঠুর নগেন্দ্রনাথ, সেই চিরবঞ্চিতা, চিরদুঃখিনীর জন্য একটী ক্ষোভের নিঃশ্বাস, এক ফোঁটা অশ্রুজল দাও।

উৎকল-সাহিত্য

[শ্রীরমেশচন্দ্র দাস]

উৎকল-সাহিত্য,—ভাদ্র, ১৩২৫।

কেউঞ্ঝর প্রজা-বিদ্রোহ—(৩) আমি মহারাণী-পুত্র ধরণীধরের মন্ত্রী—এ কথা ভুঞা-সমাজে প্রচারিত হইয়া গিয়াছে। ধরণীরও আমার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস। রাজকার্য্য-নির্ব্বাহ সম্বন্ধে আমার পরামর্শ অগ্রাহ্য হয় না। ধরণী এখন সেই প্রদেশে দেবতুল্য পূজ্য। প্রতিদিন ভিন্ন-ভিন্ন গ্রাম হইতে দলে-দলে স্ত্রীলোক শাঁক বাজাইয়া ও উলুধ্বনি দিয়া ধরণীকে পূজা করিতে আসিতেছে। ধরণীর পদযুগল হরিদ্রা জলে ধৌত করিয়া পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিয়া তাহারা আমার দিকে আগমন করে। আমি অনেক মিনতি করিয়া তাহাদিগকে নিবৃত্ত করি। ধরণীর সহিত আমার নানারূপ কথাবার্ত্তা হয়। সময়ে-সময়ে ধরণী আমার ঘরে আসিয়া পান খায়। সেইজন্য গোপালিয়া ও মহাপাত্র আমার উপর ভারি অসন্তুষ্ট এবং আমার প্রাণনাশের সুযোগ-অনুসন্ধানে তৎপর। কেবল ধরণীর ভয়ে তাহারা এ পর্য্যন্ত কোনরূপ অত্যাচার করিতে পারে নাই। সত্য-সত্যই একদিন ধরণীর অনুপস্থিতি কালে তাহারা আসিয়া আমায় ঘিরিয়া ফেরিল। সৌভাগ্যক্রমে ধরণী সংবাদ পাইয়া আমায় উদ্ধার করে। আমার গৃহের চতুর্দ্দিকে অনেকগুলি সশস্ত্র প্রহরী নিযুক্ত। আমি কিন্তু তাহাদের উপর বিশেষ প্রভুত্ব প্রদর্শন করিতাম। আমি যে বন্দী, তাহারা সে বিষয় বুঝিতে না পারিয়া ভয়ে-ভয়ে আমার আদেশ প্রতিপালন করিতেছে।

রাজকোষ হইতে ধনরত্নাদি লুণ্ঠন করিয়া রাজ-পরিবারদিগকে বন্দী করা ভুঞাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু আমাকে বন্দী করিয়া পুনরায় মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করিতে ব্যস্ত থাকায়, তাহারা এতদিন সে বিষয়ে মনোযোগ করিতে পারে নাই। বর্ত্তমানে সে সময় উপস্থিত। রাজরাণী, রাজকন্যা ও অন্যান্য পরিজনদের বাসের নিমিত্ত পর্ব্বতমূলে সারি-সারি 'ছমুড়িয়া' গৃহ নির্ম্মিত হইতেছে। পূর্ব্ব হইতে গৃহাদি প্রস্তুত করিয়া না রাখিলে তাঁহারা ধৃত হইয়া কোথায় থাকিবেন? সে দিন আবার একটী বৃহৎ সভার আয়োজন হইয়াছে। ভুঞা-মণ্ডলীর সমস্ত সর্দ্দার, প্রধান-প্রধান ভুঞা, স্বয়ং মহাপাত্র ও পাইক-দলপতি গোপালিয়া—সকলেই উপস্থিত। বহু আলোচনার পরে স্থির হইল, নির্দ্দিষ্ট দিন প্রাতঃকালে চার-পাঁচ সহস্র পদাতিক তীর, ধনু, বন্দুক, তরবারি লইয়া একযোগে নগর আক্রমণ করিয়া রাজপ্রাসাদ লুণ্ঠন করিবে। সমস্ত প্রায় ঠিক হইয়া গিয়াছে, কেবল ধরণী অনুমতি প্রদান করিলেই হয়। কিন্তু মন্ত্রীর পরামর্শ ব্যতীত ধরণী কিরূপে কার্য্য করিবেন? অবশেষে ধরণী আমায় ডাকিয়া সকল কথা বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার মত কি?" আমি গম্ভীর ভাবে চিন্তা করিয়া উত্তর করিলাম, "নিশ্চয়, রাজার ভাণ্ডারে যাহা আছে তাহা আনিতে হইবে। কিন্তু রাজপ্রাসাদে যে দুই তিনশত বন্দুকধারী পদাতিক আছে, তাহারা একবার বন্দুক ছাড়িলে বাহিরের তিনশত লোক মরিয়া যাইবে। এদিকে আবার সিংহদ্বারে যে কামান পাতা আছে, তাহাতে একবারে পাঁচশত কোথায় উড়িয়া যাইবে। ভুঞাদের যদি এত লোকই বিনষ্ট হয়, তবে কাহার জন্য এরূপ পরিশ্রম? তখন টাকায় কি হইবে? টাকা বড় না ইহারা বড়?"

মন্ত্রীর এই সারগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহারা বলিয়া উঠিল, "তাহা হইলে কি আর কোন উপায় নাই?"

মন্ত্রী। এমন উপায় আছে যাহাতে কাহারও গায়ে আঁচড় পর্য্যন্ত লাগিবে না, অথচ টাকা আনিতে পারা যায়; কিন্তু তাহাতে চার-পাঁচ দিন বিলম্ব হইবে।"

ভুঞাগণ। বিলম্ব কেন? উপায় কি?

মন্ত্রী। উপায় বোমা—ডিনামাইট!

ভুঞাগণ। বোমা—ডিনামাইট কি?

মন্ত্রী। বলিতেছি। আমরা রাজপ্রাসাদের পশ্চাৎভাগে পর্ব্বতে লুক্কায়িত থাকিয়া এক-একটী বোমা কি ডিনামাইট ফেলিয়া দিব, আর এক-এক দিকের প্রাচীর আদি ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে। প্রহরীদের অস্থি-কঙ্কাল খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। আমাদের কুড়িটা বোমার দরকার। একশত হইলে এই পর্ব্বত উড়াইয়া দিতে পারা যায়। সাহেবদের কথা মহারাণী পুত্রের অবিদিত নাই। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পার। কিন্তু কলিকাতা ভিন্ন সে সকল পাওয়া যায় না।

স্থির হইয়া গেল, লোক যাইয়া কলিকাতা হইতে এক শত বোমা কিনিয়া আনিবে। মূল্য স্বরূপ এক হাজার টাকার প্রয়োজন। সাধ্যানুসারে অর্থ-সাহায্য করিবার জন্য বড়-বড় প্রজার উপর আদেশ প্রচারিত হইল। 'পরওয়ানা' লিখিবার জন্য দুই জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইল। হাজার-হাজার আদেশ-পত্র লিখিত হইল। সকলের উপর আবার স্বাক্ষর হইল—"মহারাণী-পুত্র ধরণীধর"। এ কি সহজ কাজ! মন্ত্রী কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করিতে লাগিলেন।

কেউঞ্ঝর গড় রক্ষা করিতে সরকার হইতে সৈন্য আসিবার কথা; কৈ, এখনও তাহারা আসিয়া উপস্থিত হইতেছে না। আর কতদিন ভুঞাদের ভুলাইয়া রাখিব? যাহা হউক মহারাজকে এখানের সংবাদ দেওয়া উচিত। কিন্তু তিনি কোথায়? কিরূপে জানিব বা সংবাদ দিব? ইত্যাদি নানা কথা মনে-মনে আলোচনা করিয়া স্থির করিলাম, বালেশ্বর নিবাসী ভোলানাথ দে আনন্দপুর আফিসের 'সার্ভেয়র'।

তাঁহাকে সংবাদ পাঠাইলে মহারাজা জানিতে পারিবেন। পাঠকদের বোধ হয় স্মরণ আছে, পানের প্রতি ধরণীর ভারি টান। অনেক সময় আমার নিকটে আসিয়া পান খাইয়া থাকে। আমি তাহার নিকট গিয়া জানাইলাম, "এখানে ভাল পান পাওয়া যায় না, আমার নিকট যে পান ছিল তাহাও শেষ হইয়া গিয়াছে। ভদ্রকে আমার চাষী ভোলানাথকে লিখিলে ভাল পান ও সুপারি পাঠাইতে পারে।" আজ্ঞা হইল, "শীঘ্র লিখ—এখনি লিখ।" চিঠিতে পানের কথা শেষ করিয়া পুনরায় বলিলাম, "সেখানে আমার একখানি আখের ক্ষেত ছিল। আমিও চলিয়া আসিলাম, বোধ হয় জলের অভাবে গাছগুলি মরিতে বসিয়াছে। অনুমতি হইলে জল সেচন করিবার জন্য চাষীকে লিখিয়া পাঠাই।" আজ্ঞা হইল, "হাঁ, লিখ।" যে পত্রখানি লিখিয়াছিলাম তাহার অবিকল অনুবাদ—

রাইসুয়া,
১৬ই মে, ১৮৯১।

ভোলানাথ খমারিয়া জানিবে—

বিশেষ দরকার। মহারাণী-পুত্রের জন্য অন্ততঃ একশত পান ও দুইশত সুপারি অতি শীঘ্র পাঠাইবে। পশ্চিম দিক হইতে লহর কাটিয়া আখের ক্ষেতে জল আনিবে। নচেৎ ক্ষেত নষ্ট হইবে। ইতি—

ফকিরমোহন সেনাপতি।

ধরণী চিঠি শুনিয়া ছাড়পত্রে স্বাক্ষর করিয়া দিল। কেউঞ্ঝর ও আনন্দপুর পথে তিন চারি স্থানে ঘাঁটি বসিয়াছে। ছাড়পত্র ব্যতীত যাতায়াত করিবার উপায় নাই। চারিজন বলবান পদাতিক পত্র লইয়া রওনা হইল। একজন খণ্ডায়ত পাইকের পৈতায় সোডা বোতলের তিনখানি ছোট ছোট তার বাঁধিয়া দিলাম। তাহারা এত দিন বন্দী ছিল, গৃহে যাইবার অনুমতি পাইয়া দিবারাত্রি অশ্রান্তভাবে আনন্দপুর অভিমুখে ছুটিল। ভাগ্যক্রমে মহারাজা অনন্তপুরে ছিলেন। পাইকগণ পত্র ও তার তিনখানি তাঁহার হস্তে প্রদান করিল। মহারাজা ধনঞ্জয়নারায়ণ বড় বুদ্ধিমান্। তিনি পত্রখানি পাঠ করিয়া ও তার তিনখানি দেখিয়াই তাহার অর্থ বুঝিতে পারিলেন। তার তিনখানি আর কিছুই নয়—গবর্ণমেণ্ট, কটক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও নন্দকিশোর বাবুর নিকট টেলিগ্রাম করিবার সঙ্কেত মাত্র। আর পত্রখানির ভাবার্থ এই যে, অন্তত পক্ষে একশত বন্দুকধারী সিপাহী পশ্চিম হইতে যাইয়া না পৌঁছিলে 'গড়' নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। সিপাহীগণও উত্তর দিক হইতে রাইসুয়া পথে আসিবে। তবে পশ্চিমের অর্থ কি? বলা বাহুল্য আমারই লিখিতে ভুল হইয়াছিল।

সৈন্যগণের আগমন-প্রতীক্ষায় দিনযাপন করিতেছি। ভুঞাদের গুপ্তচর চারি দিকে ঘুরিতেছে। আমার বন্দী হইবার অষ্টম দিবস প্রত্যুষে সংবাদ পাইলাম, সরকারী ফৌজ নিকটে পৌঁছিয়াছে। অপরাহ্ণকালে তৎকালীন সেনাপতি ডাইস্ সাহেবের পত্র পাইয়া সিংহভূমবাসী জনৈক ভদ্রলোক ধরণীধরের নিকট উপস্থিত হইলেন। ধরণী পত্র পাঠ করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া তরবারি দ্বারা পত্রখানি ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিল। পত্র-বাহক ভদ্রলোকটীকে নিকটে বসাইয়া সৈন্য সংখ্যা, সাহেবের অভিপ্রায়, রাইসুয়ায় আগমনের সময় ইত্যাদি বিষয় সংগ্রহ করিয়া ডাইস সাহেবকে রাইসুয়ার বর্ত্তমান অবস্থার সংবাদ পাঠাইলাম। এই ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পরে ঘটগ্রাম হইতে বালেশ্বরের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের একখানি পত্র আসিল। বলা বাহুল্য, সে পত্রখানিও পূর্ব্বদশা প্রাপ্ত হইল। ডাইস্ সাহেবের সহিত একশত সিপাহী, এবং স্বয়ং মহারাজা ছিলেন। মহারাজাকে সঙ্গে আসিতে নিষেধ করিয়া পাঠাইলাম। কি জানি যদি কোন ভুঞা মহারাজার উপরে তীর নিক্ষেপ করিয়া বসে। বড় আশঙ্কা হইতে লাগিল।

নবম দিন প্রাতঃকালে চারি জন সাহেবের ঘোড়ায় চড়িয়া অনেকগুলি সিপাহী সহিত রাইসুয়া অভিমুখে আসিবার সংবাদ পাওয়া গেল। ধরণী আমাকে ডাকিয়া, কর্ত্তব্য কি, জিজ্ঞাসা করিল। আমি বলিলাম—"ইহাতে চিন্তার বিষয় কিছুই নাই। আপনি মহারাণীর পুত্র, আর যে সাহেব আসিতেছেন তাঁহারা মহারাণীর চাকর মাত্র। তবে মহারাণীর সম্মান রক্ষার জন্য তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া আনা আপনার উচিত।" মহারাণী-পুত্র তাঁহাদের আগ-বাড়াইয়া আনিতে প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার পরিধানে একখানি রক্তবর্ণের ধুতি ও মস্তকে একটী মূল্যবান্ সাচ্চার কাজ-করা টুপি; টুপিটী পশ্চিম দেশীয় কোনও সদাগরের দ্রব্য—লুণ্ঠনে প্রাপ্ত। হস্তে উন্মুক্ত তরবার। সঙ্গে আট দশ জন ধনুর্ধারী ভুঞা। আমার পরামর্শ অনুসারে গ্রাম হইতে সদ্দারের একটী বুড়া রোগা ঘোড়া ধরিয়া আনা হইলে, একখানি কম্বল উত্তম রূপে তাহার পৃষ্ঠে পাতিত হইল। খানদুই ছালের দড়ি লাগাম করিয়া ও কাঁধে তরবারি ফেলিয়া ধরণী যাত্রা করিল।

হায়, হায়! মহাপাত্রকে ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না। ধরণী এখন আমার করায়ত্ত। তাহাকে লইতে না পারিয়া মহাপাত্র একাকী বন-মধ্যে পলায়ন করিয়াছে। আমার সহিত যে দুই শত পদাতিক বন্দী হইয়াছিল, তাহাদিগকে কেউঞ্ঝর গড় যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে আদেশ প্রদান করিলাম। আমি জয়ন্তীগড় পথে দৃষ্টি রাখিয়া অপেক্ষা করিতেছি। ঘণ্টাখানেক পরে দেখা গেল, ধরণীকে ৫।৬ জন বন্দুকধারী সিপাহী বেষ্টন করিয়া লইয়া আসিতেছে; ধরণীর আর সে ঘোড়া বা তরবারি নাই। সম্মুখে ও পশ্চাতে চারি জন সৈনিকবেশী অশ্বারোহী সাহেব। অল্প দূরে শ্রেণীবদ্ধ সৈন্য। রাইসুয়ায় উপস্থিত হইয়া সাহেবেরা ধরণীর সমস্ত 'ছমুড়িয়া' ঘরে অগ্নি প্রদান করিলেন। হস্তী প্রস্তুত ছিল। বন্দী লইয়া আমরা গড়ের দিকে চলিলাম। কিছুক্ষণ পরে বন্দুকের শব্দ শোনা গেল। ভুঞাগণ ডাইস্ সাহেবের পথ রোধ করায় যুদ্ধ হয়। জনকতক ভুঞা মৃত্যুমুখে পতিত হইল। আর কতকগুলির হস্ত পদ ছিন্ন হওয়ায় পলায়ন করিতে বাধ্য হইল। সাহেব সহিত মহারাজা কেউঞ্ঝর গড়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ধৃত আসামীগণের বিচার করিবার জন্য 'গড়জাত মহালের' সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট টয়নবী সাহেব কটক হইতে ষ্টীমারে কলিকাতা, পরে রেল পথে চক্রধরপুর ও সেখান হইতে হস্তিপৃষ্ঠে কেউঞ্ঝর গড়ে আসিলেন।

সঙ্গে একমাত্র ভৃত্য। আর কোন কর্ম্মচারী আসেন নাই। আমি একাধারে সাহেবের পেস্কার, কেউঞ্ঝর পক্ষের রাজকীয় অভিযোক্তা ও সরকারী উকিল হইয়া কার্য্য করিলাম। পুনরায় আমাকেই সাক্ষীদের এজাহার লিপিবদ্ধ করিতে হইল।

কি কারণে কাহার জন্য বিদ্রোহ আরম্ভ হয়, তাহার লিখিত জবাব দাখিল করিতে মহারাজা আদিষ্ট হইলেন। কাছারীর সেরেস্তাদারের আগ্রহাতিশয্যে লিখিবার ভার তাঁহার উপর অর্পিত হয়। আমিও হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। কারণ সে সময় কেউঞ্ঝর গড় লোকে লোকারণ্য হইয়া পড়িয়াছে। বিপৎ-কালে সাহায্যের জন্য মিত্ররাজ্য ঢেঙ্কানাল, বামড়া, সিংহভূম প্রভৃতি হস্তী, পদাতিক ও কর্ম্মচারী প্রেরণ করিয়াছেন। সকালে হাকিম, সৈন্য ও আগন্তুকগণের আহারাদির তত্ত্বাবধারণ করিয়া ১০টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সাহেবের পেস্কারী ও তৎপরে রাত্রি ১০ কি ১২ ঘটিকার সময় মহারাজার দরবারে ম্যানেজারের কার্য্য করিয়া থাকি। অতিরিক্ত কার্য্য ত বোঝার উপর শাকের আঁটি। বোঝা যতই কমে ততই মঙ্গল।

পরদিন প্রাতঃকালে সেরেস্তাদার বাবু এক তাড়া লেখা কাগজ মহারাজার সম্মুখে রাখিয়া, একটু গর্ব্বভরে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"ম্যানেজার বাবু, গত রাত্রে আহার কি বিশ্রাম করিতে সময় পাই নাই। সমস্ত রজনী লিখিয়াছি।" দেখিলাম, তাঁহার কথা সত্য। সারা রাত্রি পরিশ্রম না করিলে সাত ফর্দ্দ কাগজ দুই পৃষ্ঠে লেখা সম্ভব নয়। মহারাজার আজ্ঞানুসারে পড়িতে আরম্ভ করিলাম। খুব ধৈর্য্য ধারণ করিয়া অর্দ্ধেকটা পড়িয়া গেলাম, আর পারিলাম না। হা কপাল! এ কি? ইহাতে যে চাণক্য হইতে আরম্ভ করিয়া রামায়ণ-মহাভারতের বহু উদাহরণ ও বাক্যাবলী উদ্ধৃত হইয়াছে, ইতিহাস-ভূগোলও বাদ পড়ে নাই। আর সময় নাই, ৯টা বাজিয়া গিয়াছে। ১০টার সময় রিপোর্ট দাখিল করিতে হইবে। মহারাজার সম্মতি লইয়া সেইখানে বসিয়াই লিখিলাম—"ধরণীর বাতুলতা ও ভুঞাদের স্বভাব বশে অকারণ বিদ্রোহ ঘটিয়াছে।" মহারাজা রিপোর্ট শুনিয়া স্বাক্ষর করিয়া দিলেন।

যথাসময়ে কাছারী আরম্ভ হইলে, রিপোর্ট পঠিত হইল। সাহেব মহোদয় ক্রোধ-কম্পিত স্বরে বলিলেন—"এ তোমার লেখা, ফাঁকি মাত্র। আমি তোমাকে নিশ্চয়ই জেলে দিব।" কি করিব, বর্ত্তমান অবস্থায় ক্রোধ প্রদর্শন বা কার্য্য ত্যাগ আমার উচিত নয়। নীরবে সমস্ত সহ্য করিলাম।

* * * *

মহারাজার নির্দ্দোষতা প্রদর্শন করিতে যত্ন করায় সাহেবের যত রাগ আমার উপর পতিত হইল। যাই হউক, বিচার-কালে সাক্ষীগণ ভুঞাদের অপরাধে বিদ্রোহ ঘটিয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিল। সাহেব মহোদয়ের উদ্দেশ্যের সাফল্য আপাততঃ দেখা গেল না। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব নিজ গড় ত্যাগ করিয়া আসামীগণের সহিত কটক যাত্রা করিলেন। আনন্দপুরে এক দিন থাকিয়া ধরণী প্রভৃতির বিচার শেষ করিয়া রায় প্রকাশ করিলেন। কঠোর পরিশ্রমের সহিত ধরণীর পাঁচ বৎসর কারাবাস হইল। অন্যান্য আসামীরা দুই কি তিন বৎসরের কারাদণ্ড প্রাপ্ত হইল।

বিবিধ প্রসঙ্গ

বাঙ্গালীর খাদ্য।—(১)

[ডাক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল্-এম্-এস্]

হিন্দু বাঙ্গালীর খাদ্য কি, তাহা এক্ষণে বলা বড় শক্ত। বাঙ্গালী এখন বহুরূপী। বাঙ্গালী যেমন বহু ভাষা সহজে আয়ত্ত করিতে শিখিয়াছে, তেমনি সহজেই সে বহু জাতীয় খাদ্য গলাধঃকরণে পটু হইয়াছে। বিশ-ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালীর খাদ্য মোটামুটিভাবে নির্দ্দেশ করিতে পারা যাইত; এখন তাহা করা কঠিন। এখন বাঙ্গালী প্রাতরাশে সাহেবী খানা খায়, মধ্যাহ্ন-ভোজনে নিজস্ব "ভোগ" গ্রহণ করে; সান্ধ্যভোজনে মোগলাই খানায় মত্ত থাকে। এখন কাযে-কর্ম্মে এক সময়ে, একপাত্রে মোগলাই পোলাও, সাহেবী চপ-কাটলেট ও হিন্দুর সন্দেশ-মোণ্ডা খাদ্যরূপে একত্র ব্যবহৃত হয়। আজকাল বিবাহে ও শ্রাদ্ধে পোলাও এবং মাংস খাওয়া, অন্ততঃ কলিকাতায়, অনেকস্থলেই প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। এক দিকে যেমন বাঙ্গালীর অজীর্ণতা ও ক্ষুধামান্দ্য বৃদ্ধি পাইতেছে, অপর দিকে, তেমনি খাদ্যের ঘটা বৃদ্ধি পাইতেছে। এ ঘটা অরুচি দমনের জন্য নহে, স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য নহে, এ ঘটা দেবতা, ব্রাহ্মণ, সমাজ বা জাতীয় তুষ্টির জন্য নহে—এ ঘটা আত্মাভিমান পরিপোষণেরই জন্য। খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল যে ভাবে বাড়িতেছে, খাদ্যদ্রব্যের বাহুল্যও তেমনি দৃষ্ট হইতেছে—খাইয়া অসুখের সৃষ্টিও তদনুযায়ী হইতেছে। ফল কথা,—বাঙ্গালীর খাদ্যকে যে দিক দিয়াই দেখি, সেই দিকেই "অপচয়" প্রকটিত হইয়া পড়ে।

বাঙ্গালী মুসলমান ভ্রাতৃগণের খাদ্যসম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা না থাকায়, এবং তাঁহাদিগের খাদ্যসম্বন্ধে বাঁধাবাঁধি নিয়ম না থাকায়, মুসলমানদিগের খাদ্য-সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম না; এতদ্ব্যতীত, বিলাসী ধনী হিন্দু বাঙ্গালীদিগের কথাও এ প্রবন্ধে আলোচিত হইবে না;

যে হেতু, খাদ্যাখাদ্য, ভোজনের সময়, ভোজ্যের উপযোগিতা প্রভৃতি কখনও তাঁহাদিগের গণনার মধ্যে আসে না; খেয়াল ও রসনাতৃপ্তিই তাঁহাদিগের ভোজনের উদ্দেশ্য। নিতান্ত দুঃখী-দরিদ্রের মধ্যে খাদ্যের অভাব বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই দুবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। কেহ-কেহ বা সারাদিনে যতবারই খায়, শুধু ভাতই খাইতে পায়। একটু লবণ, একটু তিন্তিড়ী, একটা লঙ্কা, বা বন্য শাকপত্র সিদ্ধ ব্যতীত অপর কোন খাদ্য হয় ত অনেকেরই জোটে না। অতএব, এই প্রবন্ধে মাত্র মধ্যবিত্ত হিন্দু বাঙ্গালী ভদ্রলোকদিগের আহার্য্যের উপরেই বেশী লক্ষ্য রাখা হইবে। খাদ্য বিচার করিতে বসিলে, শিশু-খাদ্য, গর্ভিণীর খাদ্য, রোগীর খাদ্য, বৃদ্ধের খাদ্য প্রভৃতির বিভাগ আসিয়া পড়েই; পরন্তু তৎসঙ্গে এদেশে পুরুষদিগের খাদ্য ও স্ত্রীলোকদিগের খাদ্য-বিভাগের কথাও আসিয়া পড়ে। শিশু-খাদ্য প্রভৃতি এ প্রবন্ধের সীমা বহির্ভূত—বারান্তরে অন্ততঃ শিশু-খাদ্যের আলোচনা করিবার মানস রহিল। কিন্তু মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর খাদ্য-বিভাগকালে, স্ত্রী-পুরুষবিশেষে যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পূর্ব্বে যে নিয়মই থাকুক, বর্ত্তমান কালে, আপিসে চাকুরী করিতে বাধ্য হওয়ায়, বাঙ্গালীর আহারের সময় ও উপাদানের বিলক্ষণ তারতম্য ঘটিয়াছে। সাধারণতঃ, "বাল্যভোগ" (early breakfast বা "ছোট হাজিরি") বাঙ্গালী পুরুষদিগের মধ্যে প্রচলিত নাই বলিলেও চলে। বর্ত্তমান কালে কেহ-কেহ, অর্থের অস্বচ্ছলতা হেতু, অশ্বত্থামার দুগ্ধ-পানের ন্যায়, সস্তার চা পান করিয়া ভোজনের পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন। স্থলবিশেষে, বলিতে লজ্জা করে, বাসি মুখেও চা পান ও পান চর্ব্বণ অবাধে চলিয়া থাকে। পুরুষদিগের মধ্যে বাল্যভোগের প্রচলন না থাকিলেও স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে উহার প্রচলন অধিকাংশ স্থলেই আছে—তবে পুরুষেরা বাসি-মুখে অতি প্রত্যূষেই চা পান করেন, রমণীরা স্নান-আহ্নিক সম্পাদন করিয়া হয় ত মধ্যাহ্নেই "বাল্যভোগ" গ্রহণ করেন। "বাল্যভোগের" কথা বাদ দিলে, বাঙ্গালীর প্রধান খাবার দুইটি থাকে—একটী মধ্যাহ্নে, অপরটি রাত্রিকালে; বৈকালে tiffin জলযোগ করা সকলের সহ্য হয় না। যাহা হউক, মোটামুটি হিসাবে বাঙ্গালী পুরুষদিগের যত রকম আহার্য্য আছে, সেই সকল আহার্য্যের তালিকা এই :—

প্রাতে—চা-বিস্কুট, চা, দুধ, মোহনভোগ, বাসি (দৈবাৎ টাটকা) রুটি, পরোটা বা দোকানের মিঠাই, মিছরির পানা, ছোলা বা মুগের ডাইল ভিজান, ফলমূল (সময়োপযোগী)।

দুপুরে—ভাত, ডাইল (সাধারণতঃ মুগের, কলাইয়ের বা ছোলার), সামান্য একটু মাছ, সময়োপযোগী শাক তরকারী, দুধ বা দধি, অম্ল।

বৈকালে—চা, চা-বিস্কুট, মোহনভোগ, লুচি-রুটি, চিঁড়া-দধি, সময়োপযোগী ফলমূল বা দোকানের মিঠাই।

রাত্রিতে—ভাত (বা রুটি), ডাইল-তরকারী (বা কদাচিৎ, মাংস), দধি বা দুধ।

যে তালিকা দেওয়া গেল, তাহা মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর পক্ষে বেশ liberal বা যথেষ্ট বলিয়াই ধরা যাইতে পারে। কারণ, তালিকায় যত দেওয়া গেল, তাহার মধ্যে অধিকাংশই এক সময়ে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না—খাদ্যবিশেষ ব্যক্তিবিশেষ কর্ত্তৃকই ব্যবহৃত হয় মাত্র। এই সঙ্কীর্ণ শেষোক্ত তালিকা হইতে আবার বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরা অনেক জিনিসে বঞ্চিত থাকেন। দুধ তাঁহাদের মধ্যে চলে না বলিলেই হয়। রুটি-লুচির আদরও কম এবং অভাবও খুব। ভাতে দুবেলা ডাইল সব দিন জোটে না। ডিম্ব ও মাংস বাঙ্গালী মেয়ের পক্ষে অধিকাংশ স্থলেই অখাদ্য। দোকানের মিঠাই অপেক্ষা তেলে-ভাজা লবণাক্ত খাদ্যগুলিই তাঁহারা বেশী পছন্দ করেন—কেহ-কেহ বা তদভাবে মুড়ি বা খৈ ব্যবহার করেন। দুবেলা পেট-ভরা ভাত, দুবেলা যাহা-হউক কিছু অম্ল ও গৃহস্থের সেবার শেষে যে তরকারী থাকে—সচরাচর এই-ই গৃহস্থ হিন্দু বঙ্গ-রমণীর ভোগ্য।

আহারের সহিত স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ।

খাদ্যের সঙ্গে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য অতি ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ। শরীর ধারণার্থই আহার্য্যের প্রয়োজন,—আহার করিবার জন্য জীবনধারণের প্রয়োজন কচিৎ দেখা যায়। যেভাবে আহার করা যায়, মানসিক বৃত্তি ও স্ফূর্ত্তি কতকটা তদনুযায়ী হইয়া থাকে। এ কথা যে শুধু আর্য্য-ঋষিগণই বলিয়া গিয়াছেন, তাহা নহে। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণও ঐ মতের পরিপোষণ করিয়া থাকেন। যাঁহারা চিন্তাশীল লেখক, তাঁহাদিগের পক্ষে মিতাহারী হওয়া একান্ত আবশ্যক। বিনা বিচারে, লোভের বশবর্ত্তী হইয়া কতকগুলা মাংস, ডিম্ব প্রভৃতি খাইলে, অথবা অতি-ভোজন বা গুরুপাক আহার্য্য ভোজন করিলে, শরীরের ও মনের জড়তার উদ্রেক হওয়া অবশ্যম্ভাবী। কন্দ-মূল-ফলাহারী আর্য্য-ঋষিগণ মানবের চিন্তা-জগতে যে অমল-ধবল কৌমুদীরাশি ছড়াইয়া দিয়াছেন, আজ তাহার তুলনা অপর দেশে কোথায়? একজন মার্কিণ-দেশবাসী চিন্তাশীল চিকিৎসক, একদিকে শূকরের ছবি দেখাইয়া ও অপরদিকে সুপক্ব ফলের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন—"ঐ পশুটি যাঁহার উদরস্থ হইবে, তিনি বুদ্ধি, বৃত্তি, আকৃতি ও প্রকৃতিতে পশুত্বেরই পরিচয় দিবেন; যাঁহার উদরে ঐ মনোজ্ঞ ফলমূলগুলি যাইবে, তাঁহার বুদ্ধি, বৃত্তি, আকৃতি ও প্রকৃতি মনোজ্ঞ হইতে বাধ্য।" ঐ কথাগুলি বর্ণে-বর্ণে সত্য না হইলেও, উহার মধ্যে অতি সুন্দর সত্য নিহিত আছে। আহার্য্যের সঙ্গে যে শুধু বুদ্ধি-বৃত্তিরই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহা নহে; আহার্য্যের উপরে স্বাস্থ্যও অত্যন্ত বেশী পরিমাণে নির্ভর করে। মাংসাশীদের পক্ষে আমাশয়, টাইফয়েড জ্বর প্রভৃতি সহজেই মারাত্মক হইয়া পড়ে। মাংসভোজী সিংহ বা ব্যাঘ্র ক্ষিপ্রতার সহিত বলসাধ্য কার্য্য করিতে সমর্থ; কিন্তু তাহারা দীর্ঘায়ুঃ হয় না। শাকভোজী হস্তী মন্থরগমনে সমস্তদিন পরিশ্রমসাধ্য কায করিয়াও ক্লান্ত

হয় না ; এবং হস্তী দীর্ঘায়ুঃ হয়। মাংসভোজীরা কৃশ-কায়, দৃঢ় পেশীবহুল হয়, শাক-ভোজীরা মেদবহুল হয়। বর্ত্তমান কালে বাঙ্গালী উভয়-ভোজী। মাংস রীতিমত ব্যবহার না করিলেও, বাঙ্গালী মাত্রেই মৎস্যাহারী। মৎস্য ভোজনে কিয়ৎ পরিমাণে মাংস-ভোজনেরই কায হয়। বর্ত্তমান কালের কথা ছাড়িয়া দিলে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, বাঙ্গালী যখন স্ব-বৃত্তির এতটা বশীভূত হয় নাই, যখন পল্লীজীবন বাঙ্গালায় দেবতার প্রত্যক্ষ আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ বিরাজমান ছিল, তখন প্রত্যেকেরই ক্ষেতে ধান, গোয়াল-ভরা দুগ্ধবতী গাভী ও পুষ্করিণীতে মাছ ছিল। তখন কেহই রুক্ষান্ন (অর্থাৎ বিনা ঘৃতসংযোগে অন্ন) গ্রহণ করিতেন না, তখন বাসি তরকারী বা পচা মাছ বা অতি কৃশকায় মাছও কেহ খাইতেন না এবং তখন বাজারের মাংস ও মিষ্টান্ন গ্রহণ করায় প্রত্যবায় ছিল। তখন দেশে অসংযম, ম্যালেরিয়া ও তৎসহোদর—শিক্ষার নামে মন ও দেহকে পেষণ করিবার যন্ত্রও—এদেশে ছিল না। তাই তখন দেশে দীর্ঘাকার, বলিষ্ঠ, সুস্থ ও দীর্ঘায়ুঃ লোকেরও অভাব ছিল না। কিন্তু এখন দেশে খাদ্যাভাব, ভাল জিনিসের অসদ্ভাব, ম্যালেরিয়া যথাতথা এবং শিক্ষা-রাক্ষসী ঘরে-ঘরে। তাই আজ বাঙ্গালী খর্ব্বাকৃতি, দুর্ব্বল, রোগ-প্রবণ ও স্বল্পায়ুঃ।

খাদ্যের সঙ্গে দেহের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে গিয়া পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ দুই-একটী অমূল্য তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছেন। সে তথ্যগুলি পরীক্ষামূলক। তাহাদের মধ্যে মূল তথ্যটি এই :—যদি বাঁচিতে হয়, তবে আমাদিগের খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে এমন একটী জীবনী-শক্তি-বিশিষ্ট পদার্থ থাকা চাই, যদ্দ্বারা দেহটি সুস্থ ও অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে। কারণ, সকলেরই মনে ধারণা আছে যে, খাইলেই দেহের পুষ্টি ও স্বাস্থ্য একত্র আসে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। বহুকাল ধরিয়া, বাসি অথচ উৎকৃষ্ট বলকারী খাদ্য খাইলেও, বাহ্যতঃ শারীরিক পুষ্টি বজায় থাকিতে পারে বটে, কিন্তু অন্তরে-অন্তরে স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হইতে থাকে। সেই স্বাস্থ্য-ক্ষুণ্ণতাকে deficiency disease (অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে জীবনীশক্তির অভাবজনিত ব্যাধি) কহে। বেরিবেরি, স্কার্ভি, পেলাগ্রা, রিকেট্স্ প্রভৃতি ঐ জাতীয় ব্যাধি। যে জীবনীশক্তির অভাবে পুরা খাদ্য খাইয়াও স্বাস্থ্যরক্ষা করা সম্ভবপর হয় না, সে জীবনীশক্তিযুক্ত পদার্থকে ভাইটামীন (vitamine) বলা হইয়া থাকে। ঐ ভাইটামীন এক এবং অদ্বিতীয় নহে— অর্থাৎ বেরি-বেরির ভাইটামীন স্কার্ভির ভাইটামীন হইতে স্বতন্ত্র, স্কার্ভির ভাইটামীন বেরিবেরির ও রিকেট্সের ভাইটামীন হইতে স্বতন্ত্র। এই তথ্য আবিষ্কৃত হয় বেরিবেরি ব্যারামের কারণানুসন্ধান কালে। অনেকেই জানেন যে, কলে মাজা চাউল খাইলে বেরিবেরি হয়। কারণ, তণ্ডুল-গাত্রে তুঁষ ব্যতীত একটী খুব পাতলা অথচ ঘনিষ্ঠভাবে সংলগ্ন আবরক থাকে। ঐ আবরকেই বেরিবেরি-নিবারক ভাইটামীন থাকে। কলের সাহায্যে তণ্ডুলগাত্রে দৃঢ়সংলগ্ন ঐ আবরকটিকে স্বতন্ত্র করাই অনিষ্টের হেতু।

এই কারণে, যাঁহারা কলে উৎকৃষ্টরূপে "মাজা" চাল ব্যবহার করেন, যে চাউলের গাত্র হইতে আবরক-বিশেষটি উঠিয়া গিয়াছে, তাঁহারাই বেরি-বেরি প্রভৃতি উৎকট ব্যাধি হইতে ভুগিয়া থাকেন। এই তথ্যটী সপ্রমাণ করিবার জন্য এই পরীক্ষাটি করা হয় :- সুস্থ পারাবতকে উৎকৃষ্টরূপে মাজা চাউল অনবরত খাইতে দিলে, ঐ পারাবতটি প্রথমে ক্ষীণ, পরে পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও শেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয় ; কিন্তু, যখন তাহার পক্ষাঘাত বেশী হইতে পায় নাই, সেই অবস্থায় যদি পারাবতটিকে উৎকৃষ্ট আটা বা উক্ত তণ্ডুলের আবরক চূর্ণ খাইতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে পক্ষাঘাত অচিরে দূর হইয়া যায়। অতএব, বেশ বুঝা গেল যে, উদর-পূর্ত্তি এবং শারীরিক পরিপোষণ করিবার ক্ষমতা বাদে, খাদ্য দ্রব্যে এমন একটী জীবনী-শক্তিময় পদার্থ থাকা চাই, যদ্দ্বারা দেহকে সুস্থ রাখিতে পারা যায়। এইরূপ আর একটী দৃষ্টান্ত দিব। পূর্ব্বে জাহাজে করিয়া দেশদেশান্তরে যাইতে অনেক কালবিলম্ব ঘটিত। সেই দীর্ঘকাল, জাহাজে বরফে বা লবণে বা তৈলে রক্ষিত বা শুষ্ক খাদ্য দ্রব্য খাওয়া ব্যতীত উপায়ান্তর ছিল না। দীর্ঘকাল ধরিয়া বাসি খাদ্য খাইলে, প্রাণ ধারণ করা যায় বটে, শারীরিক পরিপোষণও সম্ভবপর হয়, কিন্তু স্কার্ভি নামক রক্তস্রাবকারী এক প্রকারের ব্যারামও ধরিয়া থাকে। সেই দুর্ঘটনা নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যে, বর্ত্তমান কালে বহুদূরগামী প্রত্যেক জাহাজের আরোহীকে টাট্‌কা লেবুর রস কতকটা খাইতে দিতে হয়। ফল কথা, আমরা যে খাদ্যই খাই না কেন, প্রত্যহ কতকটা টাট্‌কা মাংস বা ফলমূলের রস গ্রহণ করা স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্তই আবশ্যক। কারণ প্রত্যেক টাট্‌কা শাকশব্জী ও মাংসে কিছু না কিছু পরিমাণে স্কার্ভি নিবারক ভাইটামীন থাকে। যে অপরিণামদর্শী জননী নিজ শিশুকে স্তন্য দুগ্ধে বঞ্চিত করিয়া, ক্রমাগতই বিলাতী গাঢ় দুগ্ধ বা কোন একটা "ফুড" খাওয়াইতে আরম্ভ করেন, তাঁহার শিশু দৃশ্যতঃ হৃষ্ট-পুষ্ট হইলেও, রিকেট্‌স রোগে একেবারে এমন অন্তঃসারহীন হয় যে, সামান্য ব্যারামেই মারা পড়ে। অতএব এই স্থূল দুইটি কথা সকলেরই স্মরণ-যোগ্য—(১) চাউলকে বেশী মাজিয়া খাওয়া অনুচিত। (২) সকল খাদ্য টাটকা না হইলেও, প্রত্যহই অন্ততঃ অধিকাংশ খাদ্য দ্রব্যই টাট্‌কা হওয়া চাই।

সামাজিক বিপর্য্যয় ও বাঙ্গালীর খাদ্য।

আজ বাঙ্গালীর সামাজিক, সাংসারিক ও আর্থিক বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে বলিয়াই, তাহার আহারেরও বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে ; তাই আজ বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য এত খারাপ।

তাবৎ বাঙ্গালীই যখন পরজীবী ছিল না, তখন বাঙ্গালার সমৃদ্ধ অবস্থা। তখন ম্যালেরিয়া ও শিক্ষার বিড়ম্বনা ছিল না ; এবং ঘরে ধন না থাকিলেও ধান্য প্রচুর পরিমাণে ছিল। ক্রমে, দেশে একদিকে যেমন ম্যালেরিয়া দেখা দিল, সেই সঙ্গে অন্যদিকে বিলাসিতার আকাঙ্ক্ষাও বাঙ্গালীর হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। কাযেই, বাঙ্গালী চাকুরীর সন্ধানে পঙ্গপালের ন্যায় বাহির হইতে লাগিল। পল্লীবাস কালীন, মুক্ত বায়ু সেবন, উৎকৃষ্ট ভোজ্য ভোজন, এবং শুধু ক্ষুধার সময়েই ভোজন

রয়া—এসব ছাড়িয়া বাঙ্গালী সহরে পিঞ্জরাবদ্ধ হইল,—বাসি, অপকৃষ্ট ও ভেজাল খাদ্য ধরিল; এবং ক্ষুধার সময় খাদ্য না খাইয়া, আপিসে ক্ষুধা পাইবার আশঙ্কায়, অসময়ে খাইতে অভ্যাস করিল। বাঙ্গালী চিরকালই প্রাতে সামান্য কিছু খাইয়া, পূর্ণ ক্ষুধার উদ্রেক হইলে তবে মধ্যাহ্নে ভোজন করিত এবং ভোজনান্তে বিশ্রাম করিবার সুযোগও পাইত। এখন সমস্তই উল্টাইয়া গিয়াছে। এখন প্রাতে চা পান অথবা পূর্ণ উপবাস করিয়া বেলা ৮টা হইতে ৯॥০ টার মধ্যে অসিদ্ধ বা অর্দ্ধসিদ্ধ অন্ন ভোজন করিয়া দুপুরে কেহ কেহ আপিসে চা বা দোকানে কদর্য্য মিষ্টান্ন ভোজন করিয়া, সন্ধ্যাকালে শ্লথ দেহে, ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া বাঙ্গালী রাত্রে ভাত খাইয়া প্রাণ ধারণ করে। আপিসে যাইতে দেরী হইবার ভয়ে, প্রাতঃকালে আহারটি অতীব দ্রুত ভাবে সংসাধিত হয়। সান্ধ্য-ভোজনটি যেমন গুরুপাক হয়, তেমনি শারীরিক অনুপযুক্ত অবস্থায় গৃহীত হয়। চিকিৎসকমাত্রেই জানেন যে, প্রথমতঃ, কখনো উদরকে পূর্ণ ভর্ত্তি করিতে নাই; দ্বিতীয়তঃ, শারীরিক ক্লান্তির সময় পরিপাক ভাল হয় না; এবং তৃতীয়তঃ, আহারের সময় ও পরিমাণ একটা হিসাব নিয়মের বশীভূত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু শ্রমজীবী বাঙ্গালীর পক্ষে এই তিনটি নিয়ম প্রতিপালন করা অসম্ভব। যদি ধরা যায় যে, প্রাতে ৬টায় চা পান করা হইল, তাহার সাড়ে তিন ঘণ্টা পরে (৯॥০ টার সময়ে) অন্ন গৃহীত হইল, আবার তাহার চারি ঘণ্টা পরে (বেলা ১॥০ কিম্বা ২টার সময়ে) সামান্য জলযোগ করা হইল, এবং তাহার ছয় ঘণ্টা পরে (রাত্রি ৭।৮টা নাগাইৎ) আবার অন্ন পথ্য গৃহীত হইল,—তাহা হইলেই বেশ বুঝা যায় যে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে, আহারের সময়ের যথাযথ বিভাগ করা হয় নাই। পরিপাক-যন্ত্র সর্ব্বংসহ ও মৌনী হইলেও, তাহারও সুস্থতা অসুস্থতা আছে। এই অব্যবস্থার ফলে আজ অজীর্ণতা বাঙ্গালীর ঘরে-ঘরে। এবং এই অজীর্ণতার মূলে আছে বাঙ্গালীর সাংসারিক বিপর্য্যয়। সাহেবের ভয়, চাকুরীর মমতা, এবং পদ-গৌরবের লালসাই এই সাংসারিক বিপর্য্যয়ের মূল।

বাঙ্গালীর সংসারে অন্যরূপ বিপর্য্যয়ও যথেষ্ট ঘটিয়াছে। দুঃখ-দৈন্যের বৃদ্ধির অনুপাতে, বাঙ্গালীর একান্নবর্ত্তিতাও লোপ পাইয়াছে। এখনো যেখানে উহার খোলসটি আছে, সেখানে প্রকৃত মনের মিলের সহিত একান্নবর্ত্তিতা নাই,—আছে শুধু সুবিধাবাদের একাধিপত্য। এই একান্নবর্ত্তিতার লোপের সঙ্গে সঙ্গে, ঘরে-ঘরে বিলাসিতার উন্নতি দেখা যাইতেছে। তাহার ফলে আজ শুদ্ধাচারে স্বপাক ভোজন করার প্রথা উঠিয়া গিয়াছে, এবং তৎপরিবর্ত্তে, কুৎসিত রোগগ্রস্ত, দদ্রু-কণ্ডুগ্রস্ত, যক্ষ্মারোগগ্রস্ত প্রভৃতি নানারূপ রোগগ্রস্ত, অর্থের দাস, লোভী পাচক ও পরিচারিকার দ্বারা সেবিত হইয়া আমরা নানা রোগগ্রস্ত ও স্বল্পায়ুঃ হইয়া পড়িতেছি। সেই সঙ্গে, রন্ধনের যে art, রসনার যে delicacy, তাহা এই বাঙ্গালাতেই চরমসীমা লাভ করিয়া, আজ লোপ পাইতে বসিয়াছে। আজ গৃহিণীরা স্বাস্থ্য ব্যায়াম-কার্য্য হইতে বঞ্চিত হইতেছেন, গৃহস্থ স্বাস্থ্য ভোগ হইতে বঞ্চিত হইতেছে, পল্লীতে-পল্লীতে কাটা মাংসের দোকান, হোটেল, মিষ্টান্নের দোকান প্রভৃতি সজ্জিত হইতেছে!

বাঙ্গালীর সাংসারিক বিপর্য্যয়ের প্রথম ও প্রধান হেতু—সুবিধাবাদের আশ্রয় গ্রহণ করা। সুবিধাবাদের মূলে আছে বিলাসিতা; বিলাসিতার মূলে অনুচিকীর্ষা। সাহেবেরা বেশ দুপয়সা হাতে পাইলে সংসারটাকে ভোগ করিতে পারে,—এই আদর্শ, ত্যাগী হিন্দুকে ক্রমশঃ ভোগের পিচ্ছিল পথে লইয়া গিয়াছে। ভোগ করিতে করিতে, এবং প্রতিনিয়ত ভোগের উপকরণ হাতের কাছে পাইয়া, আজ বাঙ্গালী অতৃপ্ত, দুরাকাঙ্ক্ষ, দীনহীন। এরূপ অবস্থায় দূরদৃষ্টির লোপ হয়, ভোগের লালসা অদম্য হইয়া পড়ে, বাসনার উদ্দাম নৃত্য হইতে থাকে। তাই ক্রমশঃ সংসারের পবিত্র গণ্ডী ছাড়াইয়া, আজ সমাজেও নানা রকম অবস্থা-বিপর্য্যয় পরিদৃষ্ট হইতেছে। সাহেবদিগের মন্দ অভ্যাসটুকু গ্রহণ করা হইয়াছে; কিন্তু তাহাদিগের অদম্য উৎসাহ, নিরন্তর শ্রম চেষ্টা প্রভৃতির দিকে আমাদিগের দৃষ্টি আদৌ পড়ে নাই।

এখন সামাজিক অনুষ্ঠানে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় না। প্রগল্‌ভতা, অহমিকা ও ধৃষ্টতার পরিচয় পদে-পদে। উচ্ছৃঙ্খলতা এখন সমাজের শিরোভূষণ। এখন সকল দিকেই লাভের হিসাব করিয়া কায করিবার প্রবৃত্তি অতীব প্রকট। তাই আজ বাঙ্গালীর উদর "কুকুরের পেটে" পরিণত হইলেও, বাঙ্গালীর ভোজ্য তালিকা ক্রমশঃই দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইতেছে। আজ দোকানের পাক-করা মাংস, ডিম্ব * প্রকাশ্য ভাবে ছাত্রেরা উপভোগ করিয়া ছাত্র-জীবনেই সংযম ও শিক্ষার পথ সুগম করিয়া রাখিতেছে। আজ গুরুজনেরা অবাধে দোকানের মিষ্টান্ন বিধবাদিগকেও দিতেছেন। আজ শুভ-কর্ম্মে সুগ্রণ করিয়া দিয়া অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তি দ্বারা খাওয়ানর ব্যবস্থা প্রচলিত হইতেছে। আজ ক্রিয়া-কর্ম্মে গৃহস্থ সকল সময়ে খাদ্যদ্রব্যের বিশুদ্ধতার দিকে লক্ষ্য রাখেন না—যেমন-তেমন উপাদানে ভোজ্য প্রস্তুত করিতে দ্বিধা বোধ করেন না। এই বিষম অনাচারের ফলে বাঙ্গালী আজ এক দিকে যেমন লোভী হইতেছে, অপর দিকে তেমনি অজীর্ণ রোগ ভোগ করিতেছে। তাই আজ "টাইফয়েড্ ফিভার" বা বাতশ্লেষ্মা বিকার বঙ্গদেশে যথা-তথা।

দেশ হইতে আজ গো-সেবা উঠিয়া গিয়াছে—মাতৃত্ব হইতে গাভী পশুত্বে পরিণত হইয়াছে। আজ তাই দেশে কঙ্কালসার যুবক, লোলচর্ম্ম, স্ফীতোদর, যকৃত-দূষিত শিশু, এবং পঞ্চাশ বর্ষে বাঙ্গালী

---

* দোকানে যে রাঁধা মাংস বিক্রীত হয়, তাহা কোন্ পশুর মাংস, বলা কঠিন। তাহাতে কুকুরের মাংসও থাকিতে পারে। সকল সময় যে জীবিত পশু হনন করিয়া দোকানের মাংস সংগৃহীত হয়, তদ্বিষয়েও আমার সন্দেহ আছে। প্রত্যহই যে নূতন করিয়া মাংস আনিয়া প্রত্যহই রন্ধন করা হয়, এমনও বিশ্বাস হয় না। সাধারণতঃ যে কোনও পশুর অন্ত্রখণ্ড কাটিয়া তীব্র ঝাল সংযোগে চর্ব্বিতে রাঁধিয়া চপ প্রস্তুত হয়। অনেক স্থলে কাহারো ভুক্তাবশিষ্ট মাংসকে পুনরায় সাঁতলাইয়া বহুদিন ধরিয়া ব্যবহার করা হয়। মামুলি সরকারী ফুড ইন্‌স্পেক্টর দ্বারা এ সকল তথ্য রীতিমত সংগৃহীত হওয়া কঠিন।

স্থবির। আজ গরুর সেবা নাই বলিয়া দেশে যক্ষ্মা রোগের প্রসার বৃদ্ধি, আজ তাই বিলাতী ফুডের জয়ডঙ্কা চতুর্দ্দিকে! আজ খাদ্যাভাবে জীর্ণ দেহে ম্যালেরিয়ার অতি-বিস্তৃতি!

সামাজিক বিপর্য্যয়ের মধ্যে "বাবুয়ানা"ও অন্যতম। ইহার মোহে পড়িয়া বাঙ্গালী নিজ উদরকে বঞ্চিত করিয়া বাহিরের ঠাট-সাজ বজায় রাখিতে চেষ্টা করে। কাযেই দেহের পুষ্টি যথাযথ ভাবে হইবার অবসর পায় না। আমি সামাজিক বিপর্য্যয়ের দৃষ্টান্ত আর দিব না—কারণ শুধু ঐ বিষয় লইয়াই বহু প্রবন্ধ রচনা করা চলে। আমার উদ্দেশ্য সামাজিক বিপর্য্যয়ের ফলে বাঙ্গালীর খাদ্য সম্বন্ধে কি-কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে বা হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। আশা করি পাঠক-পাঠিকাগণ তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত আছেন।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে এই—দেশে খাদ্য প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে, অথচ আমরা ধ্বংসোন্মুখ কেন? এই প্রশ্নের এক কথায় সদুত্তর দেওয়া কঠিন। দেশে খাদ্য প্রচুর পরিমাণে আছে বটে, কিন্তু কত জনে তাহা স্বচ্ছন্দে সংগ্রহ করিয়া উপভোগ করিবার আর্থিক ও শারীরিক ক্ষমতা রাখে? খাদ্য থাকিলেও, শিক্ষার অভাবে, কোন্ খাদ্য কি ভাবে ব্যবহার করা উচিত, তাহা অনেকে জানেন না। খাদ্য থাকিলেও, তাহাতে পর্ব্বত-প্রমাণ ভেজাল চাপিয়াছে; এবং খাদ্য থাকিলেও, দেশব্যাপী ম্যালেরিয়া বাৎসরিক কলেরার তাণ্ডব নৃত্য, বসন্তের উৎকট ব্যাপ্তি বঙ্গদেশে যথা-তথা। পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে, দেশে ম্যালেরিয়া থাকিলেও, দৈন্যের এমন বিকট মূর্ত্তি এতটা প্রকট হয় নাই। নিত্য দুঃখ-দুশ্চিন্তা, নিত্য অভাব, নিত্য রোগ—এত লইয়া প্রাণ বাঁচে কেমন করিয়া? পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে এ দেশে বলিষ্ঠ, দীর্ঘকায় ও কর্ম্মকুশল ব্যক্তির অভাব ছিল না; এখন তাহার অত্যন্ত অভাব হইয়াছে।

বাস্তবিক, বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ মহা সঙ্গীন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ সমস্যার সমাধান কোন একটা দিক দিয়া হইবে না। যিনি বাঙ্গালীর শুধু আহারের দোষ দেখাইয়া পথ্যাবিশেষ নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন, তিনি ঐ সমস্যার আংশিক সমাধান করিবেন মাত্র। যিনি দেশ হইতে ম্যালেরিয়া দূর করিতে পারিবেন, তিনিও আংশিক সমাধানের বেশী কিছু করিতে পারিবেন না। যিনি জাতীয় শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিবেন, তিনিও আংশিক সমাধানের বেশী কিছু করিবেন না। ফল কথা, এক কালে একযোগে বাঙ্গালীর শিক্ষা, বাঙ্গালীর আহার, বাঙ্গালীর চিন্তার স্রোত, বাঙ্গালীর সামাজিক অবস্থা, বাঙ্গালীর দৈহিক পরিশ্রম প্রভৃতির এবং সেই সঙ্গে, বাঙ্গালার জলবায়ুর পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করিতে না পারিলে, এ জাতির ভবিষ্যৎ নিতান্ত আশাপ্রদ নহে। ঐ সকল কার্য্য করিতে হইলে, দেশের কর্ণধারগণের বিলাতী চসমার সাহায্যে কায করিলে চলিবে না—দেশের লোককে উদ্বুদ্ধ করিয়া, দেশের লোকেরই সাহায্যে, দেশের কায করাইতে হইবে।

যে রকমে কায হইবে, তাহা অন্তর্যামীই জানেন। 'আমাদের কায—ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, দেশের লোককে সকল কথা শুনাইয়া ও জানাইয়া রাখা। এখন হইতে শনৈঃ-শনৈঃ ঐ সকল বিষয়ের আলোচনা করিলে, ক্রমে দেশের লোকের চক্ষু ফুটিবে। তাই আজ খাদ্যঘটিত এ বিষয়টি বাঙ্গালীর জীবনের আংশিক আলোচনা হইলেও, এবং এ বিষয়টিতে "রস" না থাকিলেও এবং তদ্ধেতু সাহিত্যের অঙ্গে আশ্রয় পাইবার অনুপযুক্ত হইলেও, সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্রের ক্রোড়স্থ করিলাম।

অন্ন

বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য ভাত। সেই ভাত ধান্য হইতে হয় এবং ধান্য দুই দফায় সিদ্ধ হয়। প্রথমবারে চাষার গৃহে সিদ্ধ হওয়ায় উহার তুঁষ বিচ্যুত হয়, এবং তৎসঙ্গে তণ্ডুলকণার সামান্যাংশ লবণ-গুলির হ্রাস হয়। দ্বিতীয়বারে তণ্ডুলকে সিদ্ধ করিয়া "ফেন" নামক পদার্থের সঙ্গে তণ্ডুলের লবণাংশ ও কিয়ৎ পরিমাণে শ্বেতসার (starch) আমরা নষ্ট করি। এবং যাঁহারা "কলের মাজা" চাউল খাইয়া থাকেন, তাঁহারা তণ্ডুলের ভাইটামীনযুক্ত পরম উপকারী আবরকটি হইতে বঞ্চিত হন। যাঁহারা আতপ তণ্ডুলাহারী তাঁহারা উক্ত ভাইটামীন হইতেও বঞ্চিত হন না এবং তাঁহাদের অন্নে অপেক্ষাকৃত শ্বেতসার ও লবণ বেশী থাকে। এই জন্য আমাদের দেশের পুরোহিত ও বিধবারা অধিকাংশ স্থলেই সুস্থদেহ। যে সকল বিলাসী মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী পুরাতন, সিদ্ধ চাউল বেশ করিয়া গলাইয়া ভোজন করেন, স্থূল হিসাবে, তাঁহারা তণ্ডুলের চারি আনা অংশ হইতে বঞ্চিত হন। এই দৈনন্দিন ক্ষতি বৎসরের শেষে সামান্য আকার ধারণ করে না। ভাতকে বেশী "গলান" অনুচিত। ভাত যত নরম হইবে, তত শীঘ্রই উহাকে গলাধঃকরণ করা যাইবে। ভাতকে শীঘ্র গলাধঃকরণ করিলে উহা সহজে পরিপাক হয় না। ভাতকে যত বেশীক্ষণ ধরিয়া মুখে রাখিয়া চর্ব্বণ করা যাইবে, উহা তত সহজেই পরিপাক হইবে। "গলা" ভাতকে বেশী করিয়া চর্ব্বণ করার প্রয়োজন হয় না—কাযেই সে ভাত পরিপাক হইতেও দেরী হয়। বর্ত্তমান কালে, ঘৃতে ভেজাল হওয়ায় ও ঘৃত দুর্মূল্য হওয়ায়, ঘৃত ভোজন করা সহজ-সাধ্য নহে। কিন্তু হিন্দুর পথ্যবিচারে, ঘৃতহীন অন্নকে "রুক্ষান্ন" বলিয়া নিন্দা করা আছে। এবং চিকিৎসাশাস্ত্রেরও প্রমাণ এই যে, ভাতের অধিকাংশই ক্লোমরস দ্বারা (pancreatic juice) পচিত হয়। ক্লোমরসের বৃদ্ধির পক্ষে ঘৃত পরম উপকারী। এই জন্যই, অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে ব্যক্তির শুধু ভাত পরিপাক হয় না, তাহাকে "ঘি-ভাত" খাওয়াইলে তাহার পক্ষে ভাত সহজপাচ্য হইয়া উঠে। অতএব ভাত সম্বন্ধে এই কয়েকটি কথা সকলেরই মনে রাখা প্রয়োজন:—

(১) কলে মাজা চাউল খাইতে নাই।

(২) সহ্য হইলে, আতপ-তণ্ডুলই ঘৃত সংযোগে ও সফেণ ভোজন করাই পরম উপকারী। প্রত্যহ সহ্য না হইলেও মধ্যে মধ্যে ঐরূপ খাওয়া ভাল।

(৩) ভাত খুব গলাইয়া খাওয়া উচিত নহে। প্রত্যেক তণ্ডুল-[ক]ণা আস্ত অথচ সুসিদ্ধ হইবে, ইহাই বাঞ্ছনীয়।

চাউলকে সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্য, উহার অভ্যন্তরস্থ শ্বেতসারের [দা]নাগুলিকে ফাটাইয়া দেওয়া। সেগুলি ফাটিয়া গেলে, পরিপাক রস [সহ]জে প্রত্যেক দানার মধ্যে ঘনিষ্ঠ ভাবে প্রবিষ্ট হইতে পারে এবং [প]রিপাক কার্য্যটি সুসম্পন্ন ও সহজসাধ্য হয়। কিন্তু চাউলে ত্বরিত [বে]শী উত্তাপ দিলে, উহার অভ্যন্তরস্থ শ্বেতসারের দানাগুলি সম্পূর্ণ [রূ]পে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা কম। এই জন্য ঘুঁটের পোড়ে বা [ক]াঠের জ্বালে সিদ্ধ অন্ন, কয়লার বা ষ্টোভের জ্বালে সিদ্ধ অন্ন অপেক্ষা [স]হজ-পাচ্য। এদেশে পর্য্যুসিত অন্ন (বাসি ভাত) খাইবার প্রথা [আ]ছে। সুস্থদেহে, গ্রীষ্মকালে, ঐরূপ অন্ন কখনো-কখনো খাইতে [বা]ধা নাই; কিন্তু অসুস্থাবস্থায় উহা কদাপি সেব্য নহে। ভাত বাসি [হ]ইলে উহাতে কতকগুলি অম্লের সৃষ্টি হয়—সেই অম্লগুলি পাকস্থলীর [প]রিপাককারী অম্লরসের ক্রিয়ার হ্রাস ঘটায় বৈ বৃদ্ধি ঘটায় না। [এ]দেশে গরম ভাত জলে ধৌত করিয়া ভোজন করারও প্রথা দেখা যায়। [ত]াহাতে রোগীর মানসিক উপকার ব্যতীত, অপর কোনও উপকার হয় [ব]লিয়া বোধ হয় না;—অর্থাৎ রোগী দেখে যে তাহার জন্য "একটা [কি]ছু" করা হইল, অতএব সে মনে-মনে খুসি হয়। এই মানসিক [স]ন্তোষ পরিপাকের পক্ষে কম উপকারী নহে। এদেশে উদরাময় [প]ীড়ার শান্তির জন্য ভাতের মণ্ড ও চিঁড়া (চিপিটক) ভক্ষণ করিবার [প্র]থা আছে। উভয়ই অতীব লঘুপাক খাদ্য; তন্মধ্যে চিঁড়া আরো [ল]ঘু। যেহেতু, যে প্রক্রিয়ায় চিঁড়া প্রস্তুত হয় তাহাতে উহা স্বতঃই [সু]পাচ্য হইয়া থাকে—উহার শ্বেতসারগুলি সহজ পাচ্য dextrine [(]ডেক্‌স্‌ট্রিনে) পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে আমেরিকায় [ই]হার বিশেষ সমাদর হইয়াছে। উহাকে puffed rice নাম দিয়া [ত]াঁহারা খুব ব্যবহার করিতেছেন। বস্তুতঃ খৈ ও চিঁড়া অতীব [স]হজপাচ্য।

মোটামুটি ভাবে ধরিলে, ভাত অতীব সহজপাচ্য খাদ্য। কিন্তু যে [ভা]বে আমরা উহাকে অন্তঃসারশূন্য করিয়া ভোজন করি, তাহাতে [দে]হের পুষ্টিরক্ষার্থে অনেক পরিমাণে ভাত একত্র আহার না করিলে [চ]লে না; অথচ মানুষের পাকস্থলীর একটা বাঁধাবাঁধি আয়তন আছে। [ত]াই সেই আয়তনকে সজোরে বাড়াইতে থাকিলে গর্ভবতী রমণীর [উদ]রে যেমন ফাট ধরে, পাকস্থলীর গাত্রও তেমনি ফাটিয়া যায়। [সু]খের বিষয় এই যে, গর্ভবতী রমণীর উদর-প্রাচীর ফাটিলে [বি]শেষ কিছু অনিষ্ট হয় না বটে; কিন্তু পাকস্থলীর যেখানে যতটুকু ফাটে, [সে]ইখানে ততটুকু পরিমাণে পরিপাক যন্ত্রের ধ্বংস হয়। তদ্ব্যতীত, [প]াকস্থলীর নিত্যপ্রসারণ ফলে উহার সঙ্কোচন ক্ষমতার হ্রাস হয়; অথচ [প]াকস্থলীর এই সঙ্কোচন-ক্ষমতা পরিপাক কার্য্যের সহায়ক। অতএব [বে]শ দেখা যাইতেছে যে, গোড়ায় ভাতকে "নিরেস" করার ফলে, [প]রিমাণে অনেকগুলি ভাত খাইবার প্রয়োজন হয়, এবং অলস দেহে [এ]কত্র অনেকগুলি ভাত খাইলে পরিপাক-ক্রিয়ার ক্রমশঃই হ্রাস হইয়া থাকে। পরিপাক-ক্রিয়ার হ্রাস হইলেই "পেটের ভাত" পেটের মধ্যেই পচিতে থাকে এবং তাহার ফলে নানা রকমের পচনজনিত অম্ল ও গ্যাস্ (বায়ু) সৃষ্ট হয়। দিনের পর দিন ঐ সকল দূষিত পদার্থ সৃষ্ট হওয়ার ফলে, "ডিস্‌পেপ্‌সিয়া" বা অম্ল ও অজীর্ণ রোগ পাকাপাকি রকমে দাঁড়াইয়া যায়। এই জন্যই, দৈহিক-শ্রম-কাতর, নিত্য-উষ্ণ-মস্তিষ্ক, অপকৃষ্ট-অন্নসেবী বাঙ্গালী আজ ডিস্‌পেপ্‌সিয়া ও বহুমূত্ররোগী। আজ বাঙ্গালীকে তিনটি কাজ করিতেই হইবে, তবে বাঙ্গালী আবার সবল ও সুস্থ হইতে পারিবে। বাঙ্গালীর প্রথম কর্ত্তব্য—রীতিমত দৈহিক পরিশ্রমে অভ্যস্ত হওয়া; ধুতিচাদর পরিয়া এবাড়ী-ওবাড়ী পর্য্যন্ত একটু "প্রাতর্ভ্রমণ"কে পরিশ্রম করা আদৌ বলা যায় না। নিতান্ত রুগ্ন, বৃদ্ধ ও শিশু ব্যতীত পদব্রজে এক আধ ক্রোশ ভ্রমণ করা কাহারো পক্ষে শ্রমের কথা বলিয়া গণ্য নহে। শ্রম করিতে হইলে বয়স, প্রবৃত্তি, স্বাস্থ্য, অবকাশ, পারিপার্শ্বিক ঘটনানিচয়ের উপরে নির্ভর করিয়া, নানা রকমেই অঙ্গচালনা করা যায়। ফল কথা, যে ভাবেই হউক, সমস্ত দেহকে কর্ম্মঠ রাখিলে, তবে পরিপাকের অবস্থাও ভাল থাকিবে। পাঠকগণকে স্মরণ করান ভাল যে, পাকস্থলী ও অন্ত্র, এই যে দুইটি যন্ত্রের মধ্যে পরিপাক-কার্য্য সংসাধিত হয়, সেই দুইটিই পেশীবহুল যন্ত্র এবং পেশীর সঙ্কোচনের ক্ষমতার উপরে তাহাদিগের পরিপাক-কার্য্য-কুশলতা নির্ভর করে। যে ব্যক্তি শ্রমবিমুখ, অথচ বহুপরিমাণে অন্নাহারী, তাঁহার পরিপাকযন্ত্র অধিক পরিমাণে অন্নাহারের ফলে যেমন একদিকে অতি প্রসারিত হইতে থাকে, তেমনি তাঁহার শ্রমকাতরতার ফলে পরিপাক যন্ত্রের শৈথিল্য অবশ্যম্ভাবী। এই উভয়ের সম্মিলনে, অজীর্ণও অবশ্যম্ভাবী। তাই বলিতেছিলাম যে, বাঙ্গালীর পক্ষে রীতিমত ভাবে অঙ্গচালনা করা অতীব প্রয়োজনীয় ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিদ্যালয় হইতে রীতিমত ব্যায়াম-চর্চ্চার প্রবর্ত্তনা না হইলে, ঘরে-ঘরে শারীরিক পরিশ্রমের মর্য্যাদা অনুভূত না হইলে আমাদিগের ভদ্রস্থতা নাই। পরিশ্রম করিলে, বাহুর পেশীর উন্নতি অনিবার্য্য।* আমাদের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য—খাদ্যদ্রব্যের অপচয় নিবারণ করা। তণ্ডুলকণার গাত্রসংলগ্ন ভাইটামীনযুক্ত আবরককে রাখিয়া দিতেই হইবে, যদিও তজ্জন্য তণ্ডুলকণাটি সুদৃশ্য না হইতে পারে। ভাতের ফেন গালা বন্ধ করিতে হইবে; অন্ততঃ অপর কোনও প্রকারে ফেনকে উদরস্থ করিতেই হইবে। এই দীন বঙ্গদেশে কত টাকা সাগু বার্লি প্রভৃতি ক্রয়ের জন্য রোগবহুল বাঙ্গালীকর্ত্তৃক নিত্য ব্যয়িত হয়, তাহা ভাবিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। তৎপরিবর্ত্তে ভাতের ফেন অনায়াসেই ব্যবহার করা যাইতে পারে। আমাদের তৃতীয় কর্ত্তব্য—ভাত অত্যন্ত কম-সারযুক্ত হওয়ায়, তৎসহিত বা

---

* শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র রায় কৃত "স্বাস্থ্য ও শক্তি" পুস্তকখানি সকলকেই পড়িতে অনুরোধ করি।

অন্ততঃ একবেলা তৎপরিবর্ত্তে, আটা ময়দার ব্যবহার করা। এক ছটাক চাউল সিদ্ধ করিলে, তিন ছটাক ভাতে দাঁড়ায়; অর্থাৎ এক ছটাক চাউল হইতে পুষ্টিলাভ করিবার জন্য সেই সঙ্গে পাকস্থলীর মধ্যে দুই ছটাক জলেরও স্থান সঙ্কুলান করাইতে আমরা বাধ্য হই। যদি আটার ময়দা এক ছটাক ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করি, তবে তৎসঙ্গে কতকটা ঘৃত ভোজন করিতে বাধ্য হই—যে প্রয়োজনীয়তা ভাতের বেলাও সমানভাবে আছে, অথচ তাহার বেলায় বাধ্যবাধকতা আদৌ নাই। কাযেই, আটা-ময়দা ভক্ষণে তিনটি লাভ আছে; প্রথমতঃ, পুষ্টির হিসাবে, আটা চাউল হইতে খুব বেশী পুষ্টিকর; দ্বিতীয়তঃ, আটাময়দা ভক্ষণ করিতে হইলেই তৎসঙ্গে কিঞ্চিৎ ঘৃতভোজনও হওয়ায় পুষ্টির মাত্রা বাড়িয়া যায়; এবং তৃতীয়তঃ, আটা-ময়দা সঙ্কুলান করিবার জন্য উদরে বেশী স্থানের প্রয়োজন হয় না। এই সকল কারণে, প্রত্যহ ভাতের সঙ্গে, অথবা একবেলা ভাতের পরিবর্ত্তে, আটা ময়দার প্রচলন করা আমাদের উচিত। অথবা, বর্ত্তমান সময়ে নিরামিষাশী ও সাধারণ গৃহস্থ কলিকাতাবাসী অনেকের পক্ষে "হিন্দুস্থানী"রা যে ভাবে ভাত খান তাহা করাও সমীচীন। হিন্দুস্থানীরা আতপ তণ্ডুলই ব্যবহার করেন। ঐ তণ্ডুলের সঙ্গে, সমপরিমাণে, অন্ততঃ তিন প্রকারের ডাইল মিশ্রিত করিয়া তাহাতেই ঘৃত ও আলু পটোল প্রভৃতি একত্র সিদ্ধ করিয়া খিচুড়ি ভক্ষণ করেন। প্রথম-প্রথম এইরূপ পরিবর্ত্তন করিলে কষ্ট হইতে পারে; কিন্তু ক্রমশঃ সুহাইয়া লইলে, কষ্ট হইবার কোন কারণ নাই। যে সকল বাঙ্গালী পূজাবকাশে বহুব্যয়ে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে যান, তাঁহাদের পক্ষে আমার কথিত যুক্তি অতীব প্রযোজ্য। সেখানে উৎকৃষ্ট আবহাওয়ার সাহায্যে ঐরূপ পুষ্টিকর আহার্য্য ভোজনে অভ্যস্ত হওয়াই বুদ্ধিমানের কায। নতুবা বহু অর্থব্যয়ে, বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া কার্য্যতঃ শুধু হাওয়াই খাওয়া হয়—আর কিছুই হয় না।

ভাতের পর, বাঙ্গালীর দ্বিতীয় প্রধান খাদ্য—ডাইল। কিন্তু বাঙ্গালী ডাইল ভক্ষণ করা অবশ্যকর্ত্তব্য মনে করেন না। অনেক গৃহস্থের বাটীর মেয়েরা ও চাকরেরা ডাইল পায় না। এবং বাটীর পুরুষেরাও যে ডাইল 'ভক্ষণ' করেন তাহাও যথেষ্ট নহে। একবাটি জলে গোটা কয়েক ডাইলের দানা থাকে মাত্র, তাহারও কিয়দংশ ভুক্তাবশিষ্ট রূপে পড়িয়া থাকে। আমার মনে হয়, ডাইলের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অজ্ঞতাই ডাইল ব্যবহারের ন্যূনতার কারণ। গরীব দুঃখীরা রন্ধন করা ডাইল খাইতে না পাইলেও, চাল, ছোলা, মটর, কড়াই, চীনা বাদাম প্রভৃতি কাঁচা বা ভাজা খাইয়া অনেক স্থলে রন্ধন করা ডাইলের উপকারিতা কিয়ৎপরিমাণে ভোগ করে। এতদ্দেশের "হবিষ্যান্ন" পরম উপাদেয় আহার্য্য। এই জন্যই যাঁহারা হবিষ্যাশী তাঁহারা বেশ সুস্থদেহ। হবিষ্যান্নে ডাইল একটি প্রধান খাদ্য। অর্থের অভাবের জন্যই হউক বা পরিপাক শক্তির হ্রাসের জন্যই হউক, বা মাংসাদি খাদ্যে বেশী রুচি থাকার জন্যই হউক বর্ত্তমান কালে ডাইলের আদর কম হইয়াছে। কিন্তু কিছুকাল পূর্ব্বে, প্রাতঃকালে রীতিমত এবং কোন কোন বৃহৎ ভোজের প্রারম্ভে ভিজান কাঁচা মুগের ডাইল খাইবার প্রথা ছিল। তখন আমাদের গৃহলক্ষ্মীরা ডাইল ভাতে, ডাইলের বড়া, বড়ি, ধোঁকা প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিতেন। সরু চাকুলি, পিঠা, প্রভৃতির আদর লোপ পাইতেছে। এখন কেবল কাযে-কর্ম্মে ডাইল ও পাঁপর ব্যবহৃত হয়, কিন্তু আদৃত হয় না; এবং নিত্য ব্যবহারে, গৃহস্থের ঘরে ডাইলের হোমিওপ্যাথিক ঝোলই দেখা যায়। ডাইলের এই কম ব্যবহার নিতান্ত দুঃখের কথা। আবার, সীম, কড়াই শুঁটি, বরবটিও অনেকের মুখে রুচে না। ডাইল ভক্ষণে মাংস ভক্ষণের কায হয়। এমন অবস্থায়, ডাইল পরিবর্জ্জন অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। আমার মনে হয়, যত রকমে সম্ভব ও যথাসম্ভব, ডাইলের ব্যবহার করা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কাঁচা মুগের ডাইল, মসুর, কুলথকলাই ও মকুষ্ঠ সহজ পাচ্য। মসুর ডাইলের কতকটা ধারক গুণও আছে। এবং কাঁচা মুগের ডালে ভাইটামীন বিস্তর পাওয়া যায়। বালকবালিকাদিগকে জঘন্য দোকানের মিষ্টান্ন না খাওয়াইয়া, বাল্যকাল হইতে "চাল, কড়াই" ভাজা, ছোলা ভিজান, মুগের ডাইল ভিজান খাওয়াইতে শিখাইলে বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা আছে। রুগ্নদেহে গলা-ভাত, মাছের ঝোলের মত কম-পুষ্টিকর খাদ্য অনবরত খাইয়া বাঙ্গালীর দৈহিক পুষ্টি, রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা, মানসিক স্ফূর্ত্তি প্রভৃতির হ্রাস হইয়া পড়িয়াছে। এই ক্ষয় নিবারণ করিতেই হইবে। আমি উপরে যে কথাগুলি বলিয়াছি বা পরে যাহা-যাহা বলিব, তাহার মধ্যে অধিকাংশই গৃহস্থেরা বিনা ব্যয়ে, এবং অল্লায়াসেই ঘরে-ঘরে করিতে সমর্থ হইবেন। যাঁহারা মাংস খান, তাঁহাদিগের পক্ষে এরূপ তদ্বির করিয়া ডাইল ভক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অল্প। ভাল করিয়া এবং নিয়ম মত মাছ খাইতে পাইলেও, ডাইল ভক্ষণের তাদৃশ আবশ্যকতা হয় না। কিন্তু নিরামিষাশীদিগের পক্ষে এবং সাধারণ গৃহস্থ, বিশেষতঃ গৃহিণীগণের, পক্ষে বেশি করিয়া ডাইল ভক্ষণ করা একান্ত আবশ্যক।

বাঙ্গালীর তৃতীয় খাদ্য—মাছ। মাছ ক্রমশঃই দুর্ম্মূল্য ও দুর্লভ হইয়া উঠিতেছে। তদ্ব্যতীত, মাছের জাতীয় অধঃপতন হওয়ায়, অনেক স্থলে হৃষ্টপুষ্ট মাছের পরিবর্ত্তে শীর্ণকায় ও ক্ষুদ্রায়ত মাছ দেখা যাইতেছে। টাট্‌কা মাছ বড় একটা পাওয়া না যাওয়ায় আরো কষ্টের পরিসীমা নাই। সর্ব্বোপরি কষ্ট—আজকাল মাছ খাওয়া, নামে পর্য্যবসিত হইয়াছে মাত্র—অর্থাৎ একখণ্ড মাছ ব্যতীত এই অগ্নিমূল্যতার দিনে পূরা একটা ছোট মাছও সকলের ভাগ্যে জোটে না। সহরে পুষ্করিণী রাখিবার উপায় নাই। কিন্তু পল্লীগ্রামে পুষ্করিণীর বাহুল্য থাকিলেও, অধিকাংশ পুষ্করিণীর স্বত্বাধিকারী সহরবাসী হওয়ায়, অথবা বহু স্বত্বাধিকারী হওয়ায়, পুষ্করিণীগুলি পরিত্যক্ত ও সংস্কারহীন অবস্থায় আছে; কাযেই মৎস্যের চাষও নাই, মৎস্যও নাই। এই ক্রমিক মৎস্যের অভাব বাঙ্গালাদেশের পক্ষে একটা জটিল সমস্যা হইয়া দাঁড়াইতেছে। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মৎস্যবিভাগ খোলায় ইহার বিশেষ কোনও সুবিধা হইয়াছে বা হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

মৎস্য মাংসেরই ন্যায় উপকারী; বরং মাংস অপেক্ষা মৎস্য সহজপাচ্য বলিয়া তুল্যমূল্য হইয়াও লঘুপথ্য। এই হিসাবেই মৎস্যের সমাদর সমধিক। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আমরা যে হোমিওপ্যাথিক মাত্রায় মৎস্য খাই, তাহা পরিতাপের বিষয়। মৎস্যের মধ্যে অধিক পরিমাণে ফস্‌ফরাস্ আছে বলিয়া যে সাধারণে একটা বিশ্বাস আছে, তাহার মূলে সত্য নাই। তবে লঘুপাচ্য বলিয়া, শ্রমকাতর বাঙ্গালীর পক্ষে মাংস অপেক্ষা মৎস্য বেশী উপযোগী। মৎস্য ভোজনে মস্তিষ্কের বা চক্ষুর জ্যোতির কোনও হ্রাস-বৃদ্ধিরও সম্ভাবনা নাই। ঐ সকল লৌকিক ধারণার মূলেও সত্য নাই। শল্ক (আঁইস) হীন মৎস্য তাদৃশ সহজপাচ্য নহে। অধিক তৈলাক্ত মৎস্যও গুরুপাক। ডিম্বযুক্ত মৎস্যও গুরুপাক। আমরা আজকাল যেরূপে মৎস্য ভোজন করি, তাহা প্রণিধান করিবার যোগ্য। বস্তুতঃ, আমরা মৎস্যের পরিবর্ত্তে মৎস্যের একখানি আঁইস পাইয়া থাকি। ঝোলে বা ঝাল-হলুদে সিক্ত করিয়া একখানি বা দুইখানি মৎস্যখণ্ড আমরা ভোজন করি। কিন্তু অন্ততঃ একপোয়া মৎস্য সারাদিনে খাওয়া উচিত; কারণ আমরা যেদিন মাংস বা ডিম্ব ভোজন করি, সে দিন পূর্ণ এক বাটি মাংস বা দুই তিনটি ডিম্ব না খাইয়া ক্ষান্ত হই না; তবে আজকাল মাংস বা ডিম্ব রীতিমত গরম-মসলা ও তৈল ঘৃত সংযোগে যথেষ্ট গুরুপাক করিয়া গলাধঃকরণ করার রীতিটা বাড়িয়া গিয়াছে। সেই জন্যই কোন বিজ্ঞ চিকিৎসক আমাদের মাংসযুক্ত ব্যঞ্জনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ঠিকই বলিয়াছিলেন—"All our meat dishes are curries." (অর্থাৎ অত্যন্ত মসলা না দিয়া আমরা মাংস খাইতে পারি না)। কিন্তু যতদিন ভাল করিয়া মাছ খাইতে না পাই, ততদিন যদি দুই-একখণ্ড মৎস্য ভোজনের সঙ্গে আমরা দু'একখণ্ড মাংস ভক্ষণ করিতে পাই, তবে মাছের দুর্ম্মূল্যতার জন্য তত কষ্ট পাইতে হয় না। সামান্য মসলা সংযোগে মাংস খাওয়াই উচিত। সাহেবরা যেমন সিদ্ধ ও ঝল্‌সান মাংস খান, তেমনি করিয়া খাইলে মাংসও সহজপাচ্য হয়। এই মাংস ভক্ষণের সঙ্গে একটা কথা বলিয়া রাখি। প্রাতঃকালে অতিশয় দ্রুত আহারাদি নিষ্পন্ন করিতে হয় বলিয়া, আমাদিগের মধ্যে মাংস প্রভৃতি গুরুপাক খাদ্য রাত্রিকালে ভোজনই প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রীতি-ভোজন, বিবাহাদি সামাজিক কার্য্যের ভোজনও সন্ধ্যার পরে ঐ কারণেই হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ সময়ে গুরুপাক খাদ্য ভোজন কোনও রকমে যৌক্তিক নহে। তাহার কারণ, প্রথমতঃ, দিবাভাগে, জাগ্রত অবস্থায়, পরিপাক-ক্রিয়া যেমন সজোরে ও সত্বর হয়, নিদ্রিত অবস্থায় পরিপাক-ক্রিয়া তেমন ভাবে হইতে পায় না। দ্বিতীয়তঃ, সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর, শরীরের শ্রান্ত অবস্থা পরিপাকের, বিশেষতঃ গুরুপাক খাদ্য পরিপাকের, অনুকূল অবস্থা নহে। এবং তৃতীয়তঃ, রাত্রে গুরুভোজনের ফল অনিদ্রা; এবং অনিদ্রার ফল শারীরিক শ্রান্তি। এই সকল কারণে, সন্ধ্যাকালে প্রীতি বা সামাজিক ভোজনের প্রথা উঠাইয়া দেওয়া উচিত। মাংসাহার সম্বন্ধে পরে কিছু বলিব বলিয়া এস্থলে মৎস্যেরই কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইলাম। মৎস্য সুপাচ্য কিন্তু মহার্ঘ্য। একপোয়ার কম করিয়া মৎস্যাহারে পুষ্টির সুযোগ নাই। কিন্তু যতদিন তাহা না হয়, ততদিন স্বল্প মৎস্য ও স্বল্প মাংস খাইলে ব্যয়-লাঘব ও পুষ্টিবৃদ্ধির যুগপৎ সম্ভাবনা অধিক।

দুগ্ধ।—দুগ্ধ পান করা সকলের রুচির বা সামর্থ্যের অন্তর্গত নহে। কেহ-কেহ দুইবেলা রীতিমত দুগ্ধ পান করিয়া থাকেন; কেহ বা ক্ষীর, দধি ও তক্র ব্যবহার করেন। রাবড়ী ও সন্দেশ রসগোল্লার নিত্য ব্যবহার বিরল। সুস্থ সবলকায় যুবকগণ সাধারণতঃ দুগ্ধ পান করেন না; যেহেতু, প্রথমতঃ, খাঁটি দুগ্ধ অতীব বিরল; এবং দ্বিতীয়তঃ, সুস্থদেহে দুগ্ধ পান করিয়া পুষ্টি সংগ্রহ করা একরাশি মিরেস ভাত খাইয়া পুষ্টি সংগ্রহেরই তুল্যমূল্য। এই জন্য দুধের আদর ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছে। পরিপাক করিতে পারিলে, ঘন দুধ, ক্ষীর, খোয়া ক্ষীর, রাবড়ী নিত্যই ব্যবহার করা যাইতে পারে। যদি তরল দুধই পান করিতে হয়, তবে কাঁচা দুগ্ধ পরম হিতকারী। কিন্তু যেরূপ প্রচণ্ড ময়লার মধ্যে গাভী রক্ষিত হয়, এবং যে ঘৃণাজনক ময়লা অবস্থায় গাভীকে দোহন করা হয়, তাহাতে কাঁচা দুধ খাওয়ায় বিপদ আছে। তদ্ব্যতীত, গাভীকে দিবারাত্রি আর্দ্র অন্ধকারময় গৃহে আবদ্ধ রাখিলে, তাহার যক্ষ্মা রোগ হইবার কথা। গাভীর যক্ষ্মারোগ যে শুধু তাহার বক্ষের মধ্যে হয় তাহা নহে; গাভীর স্তনের মধ্যে যক্ষ্মা-জনিত একপ্রকারের স্ফোটক উৎপন্ন হয়; গাভীকে দোহনকালে, দুগ্ধের সহিত ঐ যক্ষ্মা-স্ফোটকের পূঁয অনায়াসে মিশিয়া যায়—এবং একবার মিশিলে, দুধ ও পূঁয স্বতন্ত্র আকারে দৃষ্টিগোচর হয় না। এই জন্য ফুটাইয়া দুধ পান করাই নিরাপদ, যদিও boiled milk is spoilt milk. কাঁচা দুধে যথেষ্ট ভাইটামীন্ আছে; দুধকে ফুটাইলে উক্ত ভাইটামীন্ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। কলিকাতা সহরে যত দুগ্ধ সরবরাহ হয়, তাহা পূর্ব্বরাত্রিতে দোহন করা দুধ। উক্ত টাট্‌কা দুগ্ধ কোনও পাত্রে রক্ষিত হইলে, ঐ দুগ্ধের স্নেহ-বহুল অংশ উপরে ভাসিয়া উঠে; ঐ দুগ্ধের উপরাংশকে (top milk) নবনীত কহে (cream)। দুধ ফুটাইলে তাহাতে সর পড়ে;—সর ও নবনীত এক নহে। ঐ নবনীতে দুগ্ধের স্নেহময় ভাগটা বেশী পরিমাণে থাকায়, গোয়ালারা রাত্রির দোহন-করা দুধের নবনীত আস্তে-আস্তে ঢালিয়া লইয়া বাকী দুগ্ধটুকুকে বিক্রয় করে। সুস্থদেহীর পক্ষে খাঁটি দুগ্ধ উপকারী হইলেও রোগীর পক্ষে জলমিশ্রিত "কলিকাতার দুধই" উৎকৃষ্ট পথ্য, সন্দেহ নাই।

ঘৃত।—দুগ্ধপান করা সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে ত বটেই; পরন্তু ঘৃত ভোজন করা আরো অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। অথচ অন্নাহারী বলিয়া এবং মস্তিষ্কের বেশী চালনা হয় বলিয়া, স্থবির বাঙ্গালীর পক্ষে ঘৃত পরম উপকারী খাদ্য। বাস্তবিক, যদি প্রকৃত "brain-food" অর্থাৎ মস্তিষ্কের পক্ষে হিতকর খাদ্য কিছু থাকে, তবে তাহা একমাত্র ঘৃত। ঘৃত ভোজনে মনে সাত্ত্বিক ভাব আসে, শীতাতপ-বোধের হ্রাস হয়, শরীরে শ্রমের উপকরণ সংগৃহীত হয়। সেই পরম উপকারী ঘৃত আজ আমাদিগের নিকটে অজ্ঞাত। ঘৃত ভোজনে মুনি ঋষিগণ কত তৃপ্ত হইতেন, ঘৃতাহুতি দ্বারা দেশের বায়ু কত পবিত্র হইত—আজ অধঃপতিত তথাকথিত শিক্ষিত বাঙ্গালী আমরা তাহা

ভাবিয়াও দেখি না! আজ আমাদের মস্তিষ্কের অপকর্ষতা ঘটিয়াছে, নতুবা আমরা গো-মাতাকে মাতৃজ্ঞান করা কেন কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিই? আমরা স্বার্থের প্রেরণায় গরু রাখি, কিন্তু তাহার সেবা করি না; আমরা গো-বৎসতরীকে হত্যা করা দেখিয়া শিহরিয়া উঠি না! আমরা হিন্দুর সমাজের প্রত্যেক গ্রন্থিই শিথিল করিয়া দিয়া, তথাকথিত পরবিদ্যা-দম্ভে আজ স্বকীয় মহত্ত্ব স্থাপন করিতে যাইয়া, মর্ম্মে-মর্ম্মে বুঝিতে পারিতেছি না যে, আমরা বুঝি কতটুকু, আমাদের বুঝিবার ক্ষমতাই বা কতটুকু? হিন্দুর দৈনিক জীবনে গো-মাতার স্থান অতি উচ্চে;—তাহা বুঝি না বলিয়া, আজ দেশে খাঁটি দুধ ও ঘৃতের অভাবে আমাদের বংশধরেরা ক্ষীণজীবী, যকৃতদোষগ্রস্ত, স্বল্পায়ুঃ। গো-বধের প্রায়শ্চিত্ত আজ আমরা হাতে-হাতে করিতেছি।

দধি।—কতকটা অর্থাভাবেও বটে, কতকটা মুখরোচক বলিয়াও বটে এবং কতকটা "হুজুগে" মাতিয়া আজ বাঙ্গালী দধির বেশী-বেশী ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, ঋষিকল্প অধ্যাপক মেচ্‌নিকফ্‌ বুলগেরিয়ায় পরিভ্রমণকালে তথায় শতাধিক বৎসর আয়ুষ্মান্ বহু লোককে দেখিতে পান। এক দেশে অতগুলি দীর্ঘায়ুঃ বৃদ্ধ দেখিয়া, তিনি দীর্ঘায়ুর কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। অনুসন্ধানকালে তিনি জানিতে পারেন যে, তথায় ঘোটকীর দুগ্ধের দধি পান প্রথা সাধারণের মধ্যে প্রচলিত। অধ্যাপক মেচ্‌নিকফ্‌ জীবাণু-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ছিলেন; কাযেই তিনি কাকতালীয় ন্যায়ানুসারে, সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিলেন যে, ঐ দধি ভোজনই বুলগেরিয়া-বাসীর দীর্ঘায়ুঃ লাভের একমাত্র কারণ। প্রকৃতপক্ষে দধিতে যে জীবাণু জন্মায়—অর্থাৎ দম্বলস্থ যে জীবাণু দুগ্ধে যাইয়া উহাকে দধিতে পরিণত করে—সে জীবাণু অনেক প্রকার রোগোৎপাদক জীবাণুর পক্ষে মারাত্মক সাধারণতঃ মানুষের উদরে নানাজাতীয় রোগোৎপাদক জীবাণু প্রবেশলাভ করে; রীতিমত দধি ভোজনে ঐ রোগোৎপাদক জীবাণুগণ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়; কাজেই মানুষ দধি ভোজনে নিরাময় হয়, ইহাই মেচ্‌নিকফের সিদ্ধান্ত। দধিস্থ জীবাণুগণ যে অনেক প্রকারের রোগ-জীবাণুর হন্তারক, তাহা দূরদর্শী আয়ুর্ঋষিগণও জানিতেন; তাই তাঁহারা বিসর্পে (erysepelas) ঘোল লেপনের ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, মেচ্‌নিকফের সিদ্ধান্তের হুজুগে পড়িয়া অনেক চিকিৎসক ভ্রান্ত হইয়াছেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? এবং ডাক্তারদিগের দোহাই দিয়া জনসাধারণে অতিমাত্রায় দধি ভোজনে রত হইয়া পড়িয়াছেন। তাই আজ এ সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলিব। অপর জিনিসের ন্যায় দধি উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট হইতে পারে। অতি যত্নে খাঁটি দুধে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অবস্থায় পাতা টাট্‌কা দধি খাইতে কখনো "দন্তহর্ষ" বা "রোমহর্ষ" হয় না—এমন কি তাহাতে অম্লত্বের মাত্রা এতই সামান্য যে, বিনা লবণ বা চিনিতে উহা খাইতে কোনই কষ্ট বোধ হয় না। সেই দধিতে শুধু lactic acid bacillus (অর্থাৎ খাঁটি দধি প্রস্তুতকারক জীবাণু) ব্যতীত আর কোনও জীবাণু থাকে না। কিন্তু বাজারে রাস্তার ধারে যে দধি দিনের পর দিন অকথ্য অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় রক্ষিত হইতেছে, বা ক্রিয়া-কর্ম্মের দিনে যে রাশিপ্রমাণ দধি অকস্মাৎ গোপগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যেমন-তেমন পাত্রে রক্ষিত, যেমন-তেমন হস্তে পরিবেশিত ও যেমন-তেমন অবস্থায় ভুক্ত হয়;—সে সকল দধিতে কত রকমের বিজাতীয়, এমন কি রোগোৎপাদক জীবাণু যে আছে, তাহা কে বলিতে পারে? অথবা কোথায় মেচ্‌নিকফ্‌ কৃত সিদ্ধান্ত, আর কোথায় কলিকাতার পথধূলিলিপ্ত, কুৎসিৎ রোগগ্রস্ত ও অপরিচ্ছন্ন বিক্রেতা কর্ত্তৃক যেমন-তেমন ভাবে স্পৃষ্ট, কতকালের বাসি দধি! আমরা ঐ মূর্ত্তিমান্ আবর্জ্জনাকে উদরাময়ে ঘোলরূপে ব্যবহারে কুণ্ঠা বোধ করি না, এবং ক্রিয়া-কর্ম্মে আকণ্ঠ ভোজন করিতে দ্বিধা বোধ করি না। এদেশে যখন গোজাতি মাতৃজ্ঞানে আদৃতা ছিলেন, যখন দুগ্ধ, ঘৃত ও দধি অতীব পবিত্র ভাবে প্রস্তুত হইত, তখন মধুপর্কের দ্বারা অতিথিকে আপ্যায়ন করার প্রথা ছিল; কিন্তু কৈ কোনও ভারতবর্ষীয় মেচ্‌নিকফ্‌ জীবাণুর চসমার ভিতর দিয়া দধিকে দীর্ঘায়ুর কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে সাহসী হন নাই। আমি দধি ভোজনের বিরুদ্ধবাদী নহি। অতিমাত্রায় দধি ভোজনে বা নিত্য দধি ভোজনে বাতব্যাধি, অজীর্ণ প্রভৃতি হইতে দেখিয়াছি বলিয়াই আজ প্রকৃত কথা শুনাইয়া রাখিতে চাহি। বাঙ্গালীর আহারের সম্বন্ধে সে কয়েকটি কথা বলিয়া লইয়াছি, উপসংহারে সেগুলিকে একত্র করিয়া দিতেছি:—

(১) অপচয় নিবারণ কর:—ভাতের ফেন, আলুর খোসা, ডালের খোল, মাংসের হাড়—ইহাদিগের হইতেও অনেক পুষ্টিলাভ করিবার আছে।

(২) দৈনিক রীতিমত অঙ্গচালনা কর:—যাহার যেমন সুযোগ ও সামর্থ্য, সে সেই ভাবে ও সেই মত করুক। আমার মনে হয় যে, এক কলিকাতাতে যত ছাত্র আছে (পাঠশালা হইতে এম্-এ ক্লাস পর্য্যন্ত), তাহাদের সকলেরই রীতিমত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া, বয়স, স্বাস্থ্য, শারীরিক সামর্থ্যানুসারে ক্রমিক ব্যায়ামের তালিকা প্রস্তুত করিয়া, প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সেই সকল ব্যায়ামে অনুরক্ত করা উচিত।

(৩) দুইবেলা ভাত না খাইয়া অন্ততঃ একবেলা রুটি খাওয়া অভ্যাস কর।

(৪) শিক্ষিতই হও আর অশিক্ষিতই হও, গো-পালনে মন দাও। গোকুলের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন করা ব্যতীত পতিত বাঙ্গালী জাতির উদ্ধারের আশা কম। সেই সঙ্গে কৃষাণের সঙ্গে সৌহার্দ্দ্য স্থাপন কর। "চাষা" কথা অতি হেয় গালিগালাজের কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে সকল কথা ভুলিয়া যাও। চাষাও বাঙ্গালীর দৈনিক জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় সখা। তাহাকে সখা বলিয়া হাতে ধরিয়া তুলিয়া লও, তাহার কাযে যথাবিধি সাহায্য কর। এই

রূপে সমাজের তথাকথিত শুক্লপক্ষীয়েরা সমাজের কৃষ্ণপক্ষীয়দিগের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে একত্রিত হউক।

খাদ্যে ভেজাল* :—উপরে খাদ্যে ভেজালের কথা বারম্বার বলিয়াছি। কি খাদ্যে কি-কি ভেজাল থাকে, তাহার কথঞ্চিৎ বিবরণ নিম্নে দিলাম :—

আটা, ময়দায়—রামখড়ি (soap-stone), চা-খড়ি, চুণ, ফটকিরি, চিনামাটি, তুঁতের সাহায্যে বিবর্ণকৃত ভুষির চূর্ণ, চালের গুঁড়া, ভুট্টাচূর্ণ, আলুর ময়দা।

বার্লিতে—শটির পালো, কেশুরাদানা চূর্ণ, টেপিওকা চূর্ণ, চা-খড়ি, গমের চূর্ণ, আলুর ময়দা, ছোলার ছাতু।

মাখনে—সোরগোঁজার তৈল, তিলতৈল, মহিষের বা শূকরের চর্ব্বি, মোমবাতি, পাকা কলা চট্‌কান, নারিকেল তৈল, বাদাম তৈল, তুলার বীজের তৈল, জল।

ঘৃতে—ফুলওয়ারা মাখন, কুসুমবীজের তৈল, মহুয়ার তৈল, কাঁচা এরণ্ড তৈল, ভ্যাসেলীন, চিনাবাদাম তৈল, নারিকেল তৈল, পোস্ত তৈল, শূকর, ভেড়া, গরু প্রভৃতির চর্ব্বি, চাউল ও বাজরা চূর্ণ, আলু, রাঙা আলু, কচু, পাকা কলা চট্‌কান। [অতি খারাপ ঘৃত বা ঘোল আনা চর্ব্বিকে যদি একটু দুধ বা দধি এবং সামান্য ভাল ঘৃত সংযোগে ফুটান যায়, তবে অতি উৎকৃষ্ট ঘৃতের ন্যায় সুগন্ধ বাহির হয় এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ব্যতীত সে ভেজাল সন্দেহ করা পর্য্যন্ত শক্ত হয়]

মধুতে—জেলাটিন নামক মাংসের "টেংরি" হইতে জাত পদার্থ, চিনি।

আমসত্বে—তেঁতুল, গুড়, ময়দা, ধূলাবালি।

মালাইতে, রাবড়ীতে—এরোরুট, চিনি, গঁদ।

দুধের—নবনীত উঠাইয়া লইয়া তাহাতে বাতাসা, এরোরুটের পালো, চূণের জল, মহিষের দুধ, পচা পুষ্করিণীর জল।

সর্ষপতৈলে—সোরগোঁজার তৈল, পোস্তুতৈল, চিনাবাদাম তৈল, লঙ্কার গুঁড়া, ঝাল মূলার রস, সজিনার রস, ব্লুমলেস তৈল নামক এক প্রকারের কেরোসীন তৈল।

ডাইলে—রামখড়ি ও চিনামাটি চূর্ণ। (বারান্তরে সমাপ্য।)

অপর দিক

[শ্রীহরিহর শেঠ]

কালের আবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। ধীরে-ধীরে লক্ষ্যে বা অলক্ষ্যে ক্রমে আমাদের বহু বিষয়েই বিস্তর পরিবর্ত্তন হইয়াছে ও হইতেছে। তাহার মধ্যে কতক হয় ত আমরা বুঝিয়াছি, কতক বুঝি নাই; আর কতক বুঝিবার সময় হয় ত এখনও আইসে নাই। পরিবর্ত্তনের ফলে লাভ যাহা হইয়াছে বা হইবার সম্ভাবনা আছে, সে জন্য কোন কথাই নাই; কিন্তু ক্ষতির জন্য আমরা চিন্তিত, উদ্বিগ্ন; কোন-কোন বিষয়ের পরিণাম ভাবিয়া আমাদের হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে।

আমরা এখন চারিদিকে কেরোসিনে আত্মহত্যা দেখিয়া বিহ্বল, বিবাহের পণপ্রথায় উত্যক্ত, যুবক ও বালকগণের উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য চিন্তিত; আবার অন্য দিকে নিত্য ব্যাধি ও স্বাস্থ্যহীনতার জন্য কাতর, নিত্য নূতন অভাবে জর্জ্জরীভূত। আবার দেশের বর্ত্তমান অবস্থার কথা ভাবিয়াও চিন্তার মাত্রা আমাদের কম নহে। বস্ত্র-সমস্যা, জীবন-যাপন-সমস্যা, অর্থ-সমস্যার কথা ক্রমে আমাদিগকে দিশাহারা করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু ইহার জন্য আমরা করিতেছি কি? গালে হাত দিয়া বসিয়া আছি,—আর কখন হায়-হায় করিতেছি, কখন অদৃষ্টের দোহাই দিয়া নিশ্চিন্ত আছি, কখন নেতাদের অদূরদর্শিতার উপর দোষারোপ করিয়া কর্ত্তব্য শেষে করিতেছি; কখন হয় ত বিজাতীয় রাজার শাসনে এই সব অনিবার্য্য, এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বিজ্ঞতার পরিচয় দিতেছি। আবার একদল, কিছু রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ করিতে পারিলেই সকল অভাব ঘুচিয়া চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হইবে, স্থির করিয়া, উঠিয়া-পড়িয়া, সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, তাহা লাভের জন্য বক্তৃতা করিতেছেন, সংবাদপত্রে আলোচনা করিতেছেন।

আমরা আত্মহত্যা, পণপ্রথা, বালক ও যুবকদের উচ্ছৃঙ্খলতা স্বাস্থ্যহীনতা বা জীবন-ধারণ-সমস্যা, প্রভৃতির জ্বালায় ভুগিতেছি, ইহাতে কোন সংশয় কথা নাই। কিন্তু কেন? কিসের জন্য এই বিড়ম্বনা, এই অভাব, এই ত্রুটী? আমরা বিলাতের সিনিয়র র‍্যাঙ্গলার হইতে পারি; ট্রাইপোস্ ও সিবিল সার্ব্বিশ পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকারের যোগ্যতা দেখাইতে পারি, দেড়শত বৎসরের অনভ্যাস সত্বেও এই ভীষণ সময়ে আমাদের বীরত্ব দেখাইতে পরাঙ্মুখ নহি। সুযোগ পাইলে আমরা কোন বিষয়েই জগতে সভ্য ও উন্নত বলিয়া পরিচিত জাতিসকলের সহিত প্রতিযোগিতায় পরাঙ্মুখ নহি। যদি আমাদের এই সকল ক্ষমতায় সন্দেহ করিবার কিছুই না থাকে, আমাদের আত্মোৎকর্ষ লাভ আমাদেরই আয়াস-সাধ্য ইহা বুঝিবার যদি কারণ থাকে, তবে আমাদের দ্বারা আমাদের নিজের চেষ্টায় উক্ত সকল অত্যাবশ্যক সংস্কার হইতে পারে না, এ কথা কিরূপে বিশ্বাস করা যাইতে পারে? সুতরাং সংস্কারের জন্য, ইহার প্রতিকারের জন্য, আমাদের চেষ্টা যে পথে পরিচালনা করা আবশ্যক, আমাদের শিক্ষার যে দিক অবলম্বন করিলে আমাদের জাতীয় দুর্ব্বলতা, দুর্ব্বার সমাজ-ব্যাধি সকল যথার্থ দূরীভূত হইতে পারে, চেষ্টা, পরিশ্রম ও বিবেচনাকে যে দিকে চালনা করিলে আমাদের স্বাস্থ্য-সমস্যা, জীবন-ধারণ-সমস্যা

* যাঁহারা ভেজালতত্ত্ব বেশী করিয়া জানিতে চাহেন, তাঁহারা লেখককৃত Outlines of Hygiene and Public Health পাঠ করুন।

প্রকৃত পক্ষে সহজ হয়, আমরা সে দিকটা বড় দেখি না বা লক্ষ্য করি না, এ কথায় কি সংশয় থাকিতে পারে?

দেশের প্রধানগণ, জাতীয় নেতৃগণ, বহু নীরব-কর্ম্মী মহাত্মগণ আজীবন দেশের চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। আমাদের রাজনৈতিক অধিকারের সীমা বৃদ্ধির জন্য বা নূতন অধিকার লাভের জন্য কত মহাত্মা কত পরিশ্রম করিতেছেন, সময় সময় হয় ত কত নির্য্যাতন ভোগ করিতেছেন, তাহার শেষ নাই। হয় ত তাঁহারা, তাঁহাদের ঐ চেষ্টায় আমাদের সকল ব্যথা, সকল অভাব, সকল সামাজিক ব্যাধি প্রভৃতির মূলোৎপাটন হইবে, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, উহাই তাঁহাদের জীবনের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু ভীষণ ব্যাধির মূলোৎপাটনে ব্যস্ততা প্রযুক্ত, ব্যাধিজনিত অবান্তর যাতনা বা উপসর্গসমূহের আশু প্রতিকারে উদাসীন থাকিলে, যে ব্যাধির মূলোৎপাটন সময় পর্য্যন্ত রোগীর প্রাণ থাকিবে কি না তাহাও ভাবিবার বিষয়। পরোক্ষের সন্ধানে ধাবিত হইয়া, হেলায় কুয়াসা আবৃত প্রত্যক্ষকে অবহেলা করিয়া আমরা কতটা সমীচীনতার পরিচয় দিতেছি, তাহা অগ্রে ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

দেশের ছোট-বড় অনেক লোকই এখন স্বায়ত্ত-শাসন পাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। রাজনৈতিক-জ্ঞানশূন্য আমরা সামান্য লোক। স্বায়ত্ত-শাসন পাইলে আমাদের দুঃখ-দারিদ্র্যের, অভাব-অভিযোগের কতটা অবসান হইবে, তাহা আমরা ঠিক জানি না। যদি ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা পাইলে আমাদের আর কোন কষ্ট থাকিবে না, তাহা হইলেও, যখন রাজা সে অধিকার লাভের যোগ্যতা এক্ষণে আমাদের মধ্যে দেখিতে পাইতেছেন না, তাহা যখন এক্ষণেও সহজলভ্য নয়, তখন কি, উহা পাইবার চেষ্টার সঙ্গে, কেবল রাজার দোহাই না দিয়া, উন্নতি লাভের অপর পথের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক নহে? রাজার সাহায্য ব্যতীত উন্নতি লাভ করা সহজ-সাধ্য নহে, এ কথা সহস্রবার স্বীকার্য্য। তথাপি আজীবন হায় হায় করিয়া চতুর্দ্দিকে অন্ধকার দেখা অপেক্ষা নিজ ক্ষমতাধীন বৈধ ও সঙ্গত উপায়ে আমাদের পথ আবিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হওয়া কি দরকার নয়? রাজপুরুষদের চক্ষে আমরা যাহার অযোগ্য, তাহা পাইবার জন্য প্রতি-নিয়ত চেষ্টা করিলেও, যে বিষয়ে আমাদের যোগ্যতা সম্বন্ধে তাঁহাদের সন্দেহ থাকিতে পারে না বা থাকিবার আবশ্যকতা নাই, তাহার সুবিধার জন্য তাঁহাদের নিকট হইতে যাহা পাওয়া যাইতে পারে, সে জন্য সোজা পথ ধরিয়া প্রার্থনা করিয়া দেখাও কি অন্ততঃ এক্ষণে কর্ত্তব্য নহে? আমাদের নিজের কোন ভার লইবার ক্ষমতা আমাদের নাই, এই ভাব দেখাইয়া যাঁহারা আমাদের শাসন করেন, তাঁহাদের কাছে যতক্ষণ বড়-বড় অধিকার সকল পাইবার জন্য আমরা কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছি, অপর দিকে ততক্ষণ আমাদের কত যোগ্যতা সাহেবের অফিসে পাখার নীচে উড়িয়া যাইতেছে, কত দৈহিক বল মাঠের মাটিতে মিশাইয়া যাইতেছে, কত শক্তি পথে-ঘাটে গড়াগড়ি যাইতেছে। এইরূপ কত যোগ্যতা, কত শক্তি আমাদের হেলায় নষ্ট হইয়া যাইতেছে। যখন সমস্ত জগতে মানুষ জীব-জন্তুর শক্তি, জল-বাতাসের শক্তি, বাষ্প বিদ্যুতের শক্তি নিজের সুখ-সুবিধার জন্য কাজে লাগাইয়াও নিরস্ত নহে, —পুনরায় প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতে আর কি সামগ্রী লইয়া নিজের কাজে লাগাইতে পারা যায় তাহার চিন্তায় নিমগ্ন, অতি ক্ষুদ্রতম সামান্য দ্রব্যও, এমন কি মনুষ্য ও পশুদের মল মূত্রটুকু হইতেও তাঁহাদের প্রয়োজনীয় পদার্থ সংগ্রহ করিতে বিরত নহেন। সেই সময়ে আমাদের ক্ষুদ্র-বৃহৎ কত শক্তির, কত সামর্থ্যের চারিদিকে অপচয় হইয়া যাইতেছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিতেছেন? আমাদের নিজেদের দৈহিক ও মানসিক শক্তির সম্যক বিকাশেরও সুযোগ নাই। আমরা প্রলুব্ধ আশায় মীনের মত যে দিকে এতাবৎ স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছি, এখনও যদি সেই মত আশা-পথ চাহিয়া থাকি, আমাদের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য যদি এখনও অপর দিকের অনুসন্ধান না করি, যাহা আমাদের, আমরা যাহাদের, তাহাদেরই যদি আবার আদর করিয়া আমাদের করিতে না পারি,—দুঃখিনী মায়ের স্নেহের দান অন্ন-কণা ছাড়িয়া, পরের উচ্ছিষ্ট ক্ষীর সরের মোহ ভুলিতে না পারি,—তাহা হইলে এখনও যাহা আছে, তাহাও ফুরাইয়া, আমাদের শেষের দিন আরও নিকট হইয়া আসিবে, আমাদের ধ্বংস অনিবার্য্য হইয়া দাঁড়াইবে—তাহাতে সন্দেহ করিবার নাই।

আমাদের বাঙ্গালার মাঠ এখনও সোণার ধানে পরিপূর্ণ থাকে, পাটের ক্ষেত এখনও সমস্ত জগতের পাট চটের অভাব পূরণ করিয়া বিদেশীয় বণিকগণের ধনভাণ্ডার পূর্ণ করিতেছে; তথাপি আমরা পেট ভরিয়া দু'বেলা দু'মুঠা খাইতে পাই না, চাষিদের দাঁড়াইবার স্থান নাই, পরণে বস্ত্র নাই। দেশে এখনও তাঁতি আছে, কার্পাসের চাষ এখনও পূর্ব্বেরই মত হইতে পারে; মিহি সূতা প্রস্তুত করিবার পক্ষে এখানে সুযোগ আছে, তাহার দ্বারা আমাদের লজ্জা নিবারণ হইতে পারে, তথাপি আজ বাঙ্গালী বিবস্ত্র হইতে বসিয়াছে। ছেলেদের শিক্ষার জন্য পূর্ব্বের তুলনায় এখন কত অধিক ব্যবস্থা হইয়াছে, কত ব্যয় হইতেছে,—তথাপি এখনকার তথাকথিত শিক্ষিত যুবকদের শিক্ষায় ঝাঁজে কোথাও কোথাও অভিভাবকদিগকে অস্থির হইতে দেখা যায়। পুত্র কন্যার বিবাহ দিতেই হয়, দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়িতেছে, তথাপি আজ শিক্ষিত ও অপেক্ষাকৃত উচ্চ সম্প্রদায় বলিয়া যাঁহাদের খ্যাতি আছে তাঁহাদের মধ্যে বিবাহ-পণের জ্বালায় সমাজ বিব্রত। দেশে শিক্ষা-বিস্তারের চেষ্টা ক্রমে বাড়িতেছে, বালিকা ও যুবতীদের শিক্ষার জন্য চারিদিকেই ক্রমশঃ সমধিক যত্নের লক্ষণ দেখা যাইতেছে, কেরোসিনে আত্মহত্যা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। এইরূপ কত শত যন্ত্রণায় দিন দিন আমাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে। আমরা তাহার পীড়নে মরিতে থাকিলেও, মুখে বলিতেছি রপ্তানি বন্ধ না হইলে আর চাউল ডাউল সস্তা হইবার উপায় নাই, কাপড়ের সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট কড়া আইন না করিলে মাড়বাড়ী ব্যবসাদারদের জন্য কাপড়ের বাজার ক্রমেই আগুন হইবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা

বিষয়ের আমূল সংস্কার না হইলে ছেলেপিলেরা প্রকৃত মানুষ হইবে না। সমাজের এখন মা-বাপ নাই, সুতরাং যাঁহার যাহা ইচ্ছা তিনি তাহাই করিতেছেন। আর মেয়েদের কথায়-কথায় এই সখের মরণ, এই আপদ কোথা থেকে এসে এদেশে জুটিল, এই কথা বলিয়াই নিশ্চিন্ত। কিন্তু এই মৃত্যু যে অনিবার্য্য, মৃত্যু ভিন্ন যে অন্য পথ তাহাদের আশ্রয় করিবার নাই, সে কথা মনেও আইসে না।

এক্ষণে কথা হইতেছে, এই সকলের প্রতিকার-কল্পে আমাদের কি কিছুই করিবার নাই? ধরিয়া লওয়া যাউক যে, রপ্তানি বন্ধ হইবে না; বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার রীতি পরিবর্ত্তন বর্ত্তমান অবস্থায় সম্ভবপর নয়, ব্যবসাদার যদি অসাধু হয় ত সে অসাধুই থাকিবে; সমাজের মা বাপ হঠাৎ নূতন করিয়া আর হইবে না; মেয়েদের কেরোসিনে পুড়িয়া মরা সখেরই মৃত্যু! কিন্তু এই সকলগুলিই যখন বহুপ্রকারে আমাদের অসুখ অশান্তির আকর, ইহাদের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে-করিতেই যখন আমাদের জীবনান্ত হয়, তখন যে উপায়েই হউক প্রতিকার ত করিতেই হইবে! তাহা না পারিলে, ফলভোগ করা ভিন্ন আর উপায় কি? ভ্রান্ত হইয়া যে দিক সহজ মনে করিয়া এতাবৎ ধাবিত হইয়াছি, বা সোজা দিক বলিয়া যাহাকে মনে করা যায়, সে দিকে যাওয়া যখন আমাদের নিজ ইচ্ছার অধীন নয় জানিয়াছি, ভিক্ষায় যখন নৈরাশ্যের বৃদ্ধি ভিন্ন আর কিছু লাভ নাই বুঝিয়াছি, তখন অপর দিক যদি কিছু থাকে তাহার অনুসন্ধান আবশ্যক। বৈধ ও সঙ্গত উপায়ে নিজেদের ক্ষমতা-মত তাহা করিতেই হইবে। অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতির অন্য দিক দেখিতে হইবে। অর্থাৎ বস্ত্রব্যবসায়িদের গালাগালি না দিয়া, বস্ত্র-সঙ্কটের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য, ছেলে-মেয়েদের প্রকৃত শিক্ষার জন্য, পণ-প্রথা ও কেরোসিনে মৃত্যুর হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য,—এবং এই সকলের পরও যদি পুনরায় রাজনৈতিক অধিকার লাভের প্রয়োজন হয় তাহা পাইবার জন্যও, অন্য প্রকৃষ্ট পথ ধরিতে হইবে। অনেক সময়ে বড় প্রশস্ত ও পরিষ্কার পথের অপেক্ষা সংকীর্ণ অপরিষ্কার গলি পথ ধরিয়া শীঘ্র গন্তব্য স্থানে পৌঁছান যায়। বড়-বড় জাহাজ যে খালে যাইতে পারে না, ছোট পান্‌সি অনায়াসে তথায় যাইতে পারে। আমাদের এইবার সেই অপ্রশস্ত গলি পথ বাহির করিতে হইবে, সেই ছোট পানসির আশ্রয় লইতে হইবে। ভগবানের অভিসম্পাতে আমাদের এ কষ্ট সহ্য করিতেই হইবে, নচেৎ গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে এখনও বিলম্ব ঘটিবেই। চাই কি বড় জাহাজে হয় ত কোন দিনই সেখানে যাইতে পারিব না।

জাতির স্বার্থ, দেশের স্বার্থ, নিজেদের যথার্থ স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য ব্যক্তিগত অলীক ও ক্ষুদ্র স্বার্থ সকল ভুলিতে হইবে। বিলাসিতা ও আর্থিক ত্যাগ দেখাইতে হইবে। কোথায় কি শক্তি, কতটুকু সামর্থ্য নষ্ট হইতেছে তাহা দেখিতে হইবে। সামর্থ্যের বিনিময়ের জন্য সর্ব্ব-শক্তি-নিয়োগ করিতে হইবে। সমবায়ের পথ অবলম্বন করিয়া দরিদ্র কৃষক, কৃষাণ ও কর্ম্মজীবীদের ক্ষমতাটুকু যাহাতে আর না নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, সাবধানে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই সকলের জন্য যে কোন স্বার্থত্যাগ প্রয়োজন তাহা করিতে হইবে, যে কোন বাধা তাহা প্রবল হইলেও অপসারিত করিবার জন্য যত্নবান হইতে হইবে। এই সব ছোট-ছোট বিষয়ের সমষ্টিতেই আমাদের জাতীয় উন্নতি-সৌধের ভিত্তি স্থাপিত করিতে হইবে।

সোণার বাঙ্গালায় প্রাকৃতিক সম্পদের যেমন অভাব নাই, তেমনই বুদ্ধিবল, ধন ও জন-বলের এখানে এখনও অভাব হয় নাই। প্রতাপ ও সীতারামের বীরত্ব, জগদীশ ও প্রফুল্লচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক ধীশক্তি, রবীন্দ্রনাথ ও ব্রজেন্দ্রনাথের প্রতিভা, অবস্থার অনুকূলতা পাইলে সমদ্ভূত হইবার মত জল, মাটি ও বায়ুর এখনও অভাব হয় নাই। জগতের যে কোন প্রদেশে যে কোন বিষয়ে মানুষ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারিয়াছে, বাঙ্গলার লোকেরও সে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের পূর্ণ দাবী আছে,—ইহা একরূপ প্রমাণিত সত্য। বাঙ্গলার মাটিতে নিউটন্‌, ফ্যারাডে, গ্যালিলিও, নেপোলিয়ন প্রভৃতির ন্যায় মহাপুরুষের উদ্ভব হওয়া বিচিত্র ব্যাপার নহে। আমাদের দুরদৃষ্ট, তাই আজ আমাদের শক্তির অনেকটা বিদেশীয়ের উপার্জ্জন-মন্দিরে, চটের কলে বৈদেশিক বণিক-দিগের সম্পদ-বৃদ্ধির সহায়তায় পঁচিশ-পঞ্চাশ টাকা বেতনের বিনিময়ে বিক্রীত।

প্রকৃতির সম্পদ এবং দেশের এই যুবকগণই আমাদের জাতীয় ঐশ্বর্য্যের প্রধান উপাদান। দেশে ধনী আছেন, তাঁহাদের ধন-বৃদ্ধির স্পৃহা আছে; দেশে প্রচুর পরিমাণে মালের এখনও অভাব হয় নাই। ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করিবার উপযুক্ত শক্তিরও অভাব নাই। এখন দেখিতে হইবে তবে কেন এ সকলের সমন্বয় না হয়! খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে বাধা কোথায়,—সকলের মধ্যে সকলের ব্যবধান কতটা। তারপর সেই বাধা সরাইতে হইবে, বিশ্বাসের অভাবই যদি ইহাদের পথে দাঁড়াইয়া থাকে তাহা ঘুবাইতে হইবে। যতটা সম্ভব বিলাস-বর্জ্জিত হইয়া আত্মস্থ হইবার সঙ্কল্প করিয়া যাহা আমাদের চিরদিনের তাহার প্রেমে আবার আকৃষ্ট হইয়া পরের মোহে ও প্রলোভনের জলন্ত চিহ্নসকল যথাসম্ভব মুছিয়া ফেলিয়া, দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের সহিত আমাদের দেশের রত্ন যুবকদিগের হাতে-কলমে বিশেষ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দিতে না পারি; কালের প্রভাব অনিবার্য্য হইলেও, যদি জাতির স্বাভাবিক প্রবণতার দিকে লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতে না পারি; যদি,—আমাদের যে শিক্ষায়, যে বিদ্যার প্রভাবে মানুষকে বিনয়ের আধার করিয়া তুলে, পশুত্ব হইতে দেবত্বের কাছে লইয়া যায়—বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সঙ্গে বা তাহার মোহ ছাড়িয়া শিক্ষার সেই দিক গ্রহণের ভার নিজেরা লইতে না পারি; আমাদের মাতৃ-জাতিকে বর্ত্তমান কালের উপযোগী শিক্ষার সহিত জ্ঞানালোক প্রদান করিয়া উন্নত করিতে না পারি; আমাদের সামর্থ্য যেমনই হৌক, আমাদের সেবার ভার যদি আমরা নিজে লইতে না পারি; নিজের কুকুরকে অন্যের ঠাকুরের অপেক্ষা যদি আপনার মনে করিতে না পারি,—তবে আমাদের আর উদ্ধারের কোন উপায় নাই। আর ইহা পাইলে যে তৃপ্তি লাভের সম্ভাবনা, জানি না,—স্বায়ত্ত-শাসন রূপ অধিকার লাভের অভাবে তাহার কতটা ক্ষতি হইতে পারে।

স্বীকার করি, চিরাগত অভ্যাসের সহিত নব উদ্যমের সংঘর্ষে, প্রাচীনের সহিত নবীনের সংঘর্ষে, চলিতের সহিত নবাগতের সংঘর্ষে প্রথমাবস্থায় অনেক অসুবিধা, বিড়ম্বনা ভোগ কতকটা অনিবার্য্য; কিন্তু মনে হয় ইহাও ঠিক যে, এই অসুবিধা-বিড়ম্বনার পশ্চাতে অনেক অজ্ঞাতপূর্ব্ব সুবিধা, মানুষোচিত বাঞ্ছিত বস্তু অপেক্ষা করিতেছে। অপরের সমৃদ্ধি-বৃদ্ধির সহায়তায় আত্ম-নিয়োগ করিয়া এতাবৎ কোন প্রকারে যদি মাত্র সংসার চালাইতে পারিয়া থাকি, তাহা হইলে নিজ সম্পদ জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির জন্য আত্মবলি দিতে পারিলে উপস্থিত হয় ত দুদিনের জন্য একটু ক্লেশ বৃদ্ধি পাইলেও, বঙ্গ-জননীর প্রসাদে কামনা কখন বিফল হইবে না। এত দিনের বিজাতীয় শিক্ষারীতির প্রভাবে এখন যদি অনুশোচনার কারণ ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে জাতীয় শিক্ষার আপাত-কণ্টকাকীর্ণ পথ পার হইতে চরণ একটু-আটটু কণ্টকবিদ্ধ হইলেও, শিক্ষার বিভব কখনও বিফল হইবে না। স্ত্রীলোকদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারের ফলে তাহাদের মধ্যে আত্মহত্যার সংখ্যা হয় ত প্রথম-প্রথম বাড়িতেও পারে বলিয়া কেহ কেহ সন্দেহ করিলেও, উপযোগী শিক্ষার দ্বারা দূর ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই যে সুফল প্রসব করিবে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

এক্ষণে শিক্ষার, জীবন-সংগ্রামের, সমাজের এই অপর পথে প্রবেশের দ্বার একেবারে বেশ সুগম ও সরল না হইবারই কথা। সুতরাং এই প্রবেশ-পথে যে সংগ্রামের সম্ভাবনা, সেই সংগ্রামে জয়ী হইবার জন্য উপস্থিত রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের আন্দোলনেও যদি উদাসীন থাকিতে হয়, রাজনৈতিক আলোচনার সময় যদি সংক্ষেপ করিতে হয়, তাহা করিয়াও দেশের প্রধানগণ, নেতৃগণ শিক্ষিতগণ ও ধনিগণের যথেষ্ট চেষ্টা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদের উপরই নবীন জাতীয় জীবনের ভিত্তি স্থাপনের ভার অপেক্ষা করিতেছে। ইহার জন্য চাই সাহস, চাই একাগ্রতা, চাই চারিত্র্য, চাই উদ্যম উৎসাহ, চাই নিষ্ঠা, চাই লিপ্সা, আর চাই অসীম অধ্যবসায় ও প্রতিজ্ঞা। এ কার্য্যের জন্য দেশের ধনকুবেরগণের আপাততঃ কিছু স্বার্থত্যাগ প্রয়োজন। তাহাতে কর্ম্মক্ষেত্রের পথ সুগম হইবে, অথচ অদূর-ভবিষ্যতে সেই ধনিগণের অর্থ সুদে-আসলে আদায় হইবে। দেশের কর্ম্মীগণ যদি এখনও অপর দিকের প্রতি লক্ষ্য না করেন, তাহা হইলে যত রাজনৈতিক আন্দোলন করাই হোক না কেন, যেমন এতাবৎ বাঙ্গালার বহু যোগ্যতা চারিদিকে নষ্ট হইয়া যাইতেছে, তেমনই যাইতে থাকিয়া আমাদের অভাব, অশান্তি, দারিদ্র্য নিত্য বৃদ্ধি করিবে। তাহাতে আমাদের পতন নিশ্চয়, আমাদের মৃত্যু অনিবার্য্য।

"ঋগ্বেদে সূর্য্য-গ্রহণ"

[শ্রীবিনোদবিহারী রায়]

গত অগ্রহায়ণ মাসের ভারতবর্ষ পত্রে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারাপদ মুখোপাধ্যায় এম-এ মহাশয়, "ঋগ্বেদে সূর্য্য-গ্রহণ" নামক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে নিম্নে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম।

তিনি লিখিয়াছেন—"ঋষি দেখিলেন সূর্য্য অন্ধকার দ্বারা আবৃত হইয়া গেল। প্রাণিগণ পথ দেখিতে না পাইয়া মূঢ়ের মত অবস্থান করিতে লাগিল। সূর্য্যের এই অবস্থা অবলোকন করিয়া ঋষি স্থির করিলেন, এই অন্ধকার স্বর্ভানু নামক অসুরের মায়া। তিনি আরও মনে করিলেন, অসুর সূর্য্যকে গিলিয়া ফেলিতেছে।"

সায়ণাচার্য্য ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। তখন বেদের অর্থ সকলে ঠিক বুঝিতে পারিতেন না। পৌরাণিক যুগেই বেদের অর্থ দুর্বোধ্য হইয়াছিল। সুতরাং এই বিজ্ঞানের উন্নতির যুগে, সায়ণের ভাষ্যের সাহায্যে বেদ বুঝিতে গেলে, ঠিক অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে না। বৈদিক কালের প্রথম ভাগে বিজ্ঞানের বিশেষ উন্নতির পরিচয় ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। এখনকার উন্নত বিজ্ঞানের সাহায্যে তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিলে, তখনকার বিজ্ঞানের উন্নতির পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইতে হয়।

অনেকে এক্ষণে বেদের ঋকের নানাপ্রকার অর্থ করিয়া ঋষিদিগের প্রতি কটাক্ষ করিতেছেন। কিন্তু বেদ আদি গ্রন্থ; সুতরাং প্রতিবৈদিক শব্দের ধাতুগত অর্থ ধরিয়া এখনকার বিজ্ঞানের সহিত ঐক্য করিয়া রূপক ভাঙ্গিয়া বেদকে বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে। তাহা হইলে অধ্যাপক মহাশয় দেখিতে পাইবেন, "অসুর সূর্য্যকে গিলিয়া ফেলিতেছে" এ কথা ঋষি লিখেন নাই। "অন্ধকার পৃথিবীকে গ্রাস করিতেছে" বলিলে "গ্রাস" অর্থ যাহা বুঝায়, ৭ম ঋকের "গারীৎ" শব্দের অর্থ তাহাই বুঝিতে হইবে। সকলেই মনে রাখিবেন, বেদ রূপকে বর্ণিত।

অধ্যাপক মহাশয় বেদের যে ঋক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার অর্থ এক্ষণে বিচার করা যাউক। ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলের ৪০ সূক্তের ৫।৬।৭।৮।৯ ঋকের অর্থ অধ্যাপক মহাশয় লিখিয়াছেন *—

হে সূর্য্য! তোমাকে যখন অসুরবংশীয় স্বর্ভানু অন্ধকার দ্বারা বিদ্ধ (অর্থাৎ আবৃত) করিয়াছিল, সকল প্রাণী পথজ্ঞানশূন্য মূঢ়ের মত হইয়াছিল। ৫

হে ইন্দ্র! অনন্তর যখন স্বর্ভানু হইতে উৎপন্না, নিম্নে বর্ত্তমানা মায়া সকলকে দিব্যলোক হইতে (তুমি ও মরুৎগণ) দূর করিয়াছিলে, ব্রত নষ্টকারী অন্ধকার দ্বারা আচ্ছাদিত সূর্য্যকে চতুর্থ মন্ত্র দ্বারা অত্রি লাভ করিয়াছিলেন। ৬

হে অত্রে! তোমার শত্রুতার ভয় দ্বারা দ্রোহকারী (স্বর্ভানু) এই অবস্থাপ্রাপ্ত আমাকে নিঃশেষে গ্রাস করে নাই। তুমি আমার মিত্র হইতেছ। সত্যরাধ (ইন্দ্র) ও রাজা বরুণ দুইজনে আমাকে এইস্থানে রক্ষা করুন। ৭

(যজ্ঞের) ব্রহ্মা (অত্রি) দুষল সকল নিয়োগ করিয়া পূজা করিয়াছিলেন; দেবদিগকে নমস্কার ও (সোমরস) নিক্ষেপ দ্বারা তুষ্ট

---

* মূল ঋক অগ্রহায়ণ মাসের ভারতবর্ষে দেখিবেন।

করিয়াছিলেন ; অত্রি সূর্য্যের চক্ষুকে (বা তেজকে) দিব্যলোকে স্থাপন করিয়াছিলেন ও স্বর্ভানুর মায়া দূর করিয়াছিলেন। ৮

অসুরবংশীয় স্বর্ভানু অন্ধকার দ্বারা যে সূর্য্যকে বিদ্ধ (বা আবৃত) করিয়াছিল, অত্রিগণ তাঁহাকে লাভ করিয়াছিলেন। অন্য কেহই সমর্থ হয় নাই। ৯

সূর্য্যগ্রহণ সময়ে প্রাণিগণ পথ দেখিতে পায় না, এত অন্ধকার হয় না। স্বর্ভানু যে "অসুরবংশীয়" তাহাও এই ঋকের অর্থ দ্বারা বুঝা যায় না। অধ্যাপক মহাশয় হয় ত স্বর্ভানুকে পুরাণের রাহু নামক অসুর মনে করিয়া থাকিবেন, তাই "অসুরবংশীয়" লিখিয়াছেন। বাস্তবিক স্বর্ভানুর বৈদিক অর্থ রাহু নহে। স্ব স্বর্গীয় -ভা দীপ্তি পাওয়া + নু (নুদ্) প্রেরণ করা অর্থাৎ প্রেরিত স্বর্গীয় দীপ্তি যে পায়। স্বর্গীয় দীপ্তি অর্থাৎ সূর্য্যের রশ্মিতে কে আলোকিত হয়? পৃথিবী এবং চন্দ্র। অতএব ইহারা উভয়েই স্বর্ভানু। পুরাণের রাহুর কার্য্য ইহারাই করে। এই সূক্তের কদর্থ দ্বারাই স্বর্ভানু পুরাণে রাহু বলিয়া অসুর মধ্যে গণ্য হইয়াছে। অধ্যাপক মহাশয়ের একটী ঋকের অর্থও ঠিক হয় নাই। নবম ঋকের অর্থ দ্বারা ঋষি কি বলিয়াছেন, তাহা বুঝা যায় না।

৺ রমেশ বাবুর অর্থ—

হে সূর্য্য! যখন অসুর স্বর্ভানু তোমাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়াছিল ; নিজস্থান নিরূপণে অসমর্থ হতবুদ্ধি ব্যক্তি যেরূপ দৃষ্ট হয়, তৎকালে ত্রিভুবনও সেইরূপ লক্ষিত হইয়াছিল। ৫

হে ইন্দ্র! যখন তুমি সূর্য্যের অধঃস্থিত স্বর্ভানুর সেই সকল মায়া (অন্ধকার) দূরে অপসারিত করিয়াছিলে, তখন অত্রি চারিটি ঋকের দ্বারা কার্য্যবিঘাতক, অন্ধকার দ্বারা সমাচ্ছন্ন সূর্য্যকে প্রকাশিত করিলেন। ৬

(সূর্য্য বলিতেছেন) হে অত্রি! আমি তোমার আত্মীয়। দ্রোহকারী যেমন ক্ষুধাবশতঃ ভীষণ অন্ধকার দ্বারা আমাকে গ্রাস না করে। তুমি মিত্র ও সত্যপরায়ণ; তুমি ও রাজা বরুণ উভয়ে আমাকে রক্ষা কর। ৭

তখন সেই ঋত্বিক (অত্রি) সূর্য্যকে উপদেশ দিয়া, প্রস্তরখণ্ডের ঘর্ষণ করিয়া এবং স্তোত্র দ্বারা দেবগণকে পূজা করিয়া, মন্ত্রপ্রভাবে অন্তরীক্ষে সূর্য্যের চক্ষু সংস্থাপিত করিলেন ; তিনি স্বর্ভানুর মায়া দূরে অপসারিত করিলেন। ৮

অসুর স্বর্ভানু অন্ধকার দ্বারা সূর্য্যকে আবৃত করিলে, অত্রি-পুত্রগণ অবশেষে তাঁহাকে মুক্ত করিয়াছিলেন, অন্য কেহই সমর্থ হয় নাই। ৯

৺ রমেশ বাবুর এই অর্থও ঠিক হয় নাই। ৪টী ঋকের দ্বারা অন্ধকারাচ্ছন্ন সূর্য্যকে প্রকাশ করা অসম্ভব। সূর্য্য অত্রির আত্মীয়—ইহাও সঙ্গত অর্থ নহে। অত্রি অর্থাৎ পৃথিবীর আত্মীয় বলিলে ঠিক হইত। স্বর্ভানু অন্ধকার দ্বারা সূর্য্যকে আবৃত করিলে, অত্রিপুত্রগণ কিরূপে তাঁহাকে মুক্ত করিবেন? নবম ঋকের অর্থ দ্বারা ঋষির উদ্দেশ্য বুঝা যায় না। এই সমস্ত কারণে রমেশ বাবুর অর্থও গ্রহণযোগ্য নহে।

আমার অর্থ—

হে সূর্য্য! যখন স্বর্ভানু (চন্দ্র) ভয়ঙ্কর অন্ধকার দ্বারা তোমাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল (তখন) কি হইয়াছে বুঝিতে অক্ষম ব্যক্তির ন্যায় সমস্ত ভুবন মুগ্ধ লক্ষিত হইয়াছিল। ৫

যখন ইন্দ্র আকাশে বিস্তৃত অধঃস্থিত স্বর্ভানুর (চন্দ্রের) মায়াতে পতিত হইয়াছিল (তখন) অত্রি অর্থাৎ সতত গমনশীল (পৃথিবী) গতি দ্বারা, কার্য্যবিঘাতক অন্ধকারাচ্ছন্ন, বৃহৎ সূর্য্যকে অবয়বীভূত অর্থাৎ প্রকাশ করিলেন। ৬

হে অত্রি অর্থাৎ সতত গমনশীল (পৃথিবী)! তোমার এই পীড়াদায়ক সন্তান (অর্থাৎ চন্দ্র) যেন আমাকে গ্রাস না করে। তুমি ও রাজা বরুণ মিত্র এবং সত্যপরায়ণ, তোমরা এই বিস্তৃত তমকে পরিমাণ কর। ৭

(স্বর্ভানু) গমনশীল শরীর দ্বারা বৃহৎ সূর্য্যকে গ্রহণ ও রশ্মিদিগকে নত করিয়া দমন করতঃ বিস্তৃতভাবে ক্রমে ক্রমে সংযোজিত হইল। পৃথিবী সূর্য্যের চক্ষু অন্তরীক্ষে স্থাপন করিলেন, স্বর্ভানুর অনিষ্টকর মায়া (অন্ধকার) অপসারিত করিলেন। ৮

যখন স্বর্ভানু (চন্দ্র) ভয়ঙ্কর অন্ধকার দ্বারা সূর্য্যকে আচ্ছাদন করিয়াছিল, (তখন) অত্রিগণ তাহা কর্তৃক প্রকাশ করিয়াছিলেন। অন্যে পারে নাই। ৯

এই অর্থ হইতে নিম্নলিখিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব পাওয়া যায়—

(১) সূর্য্যগ্রহণের সময় চন্দ্র সূর্য্যের নিম্নে থাকিয়া সূর্য্যকে আবৃত করে। এই "নিম্নে" অর্থ সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যভাগে বুঝিতে হইবে।

(২) পৃথিবী (অত্রি = অৎ সতত গমন করা অর্থে) সতত গমনশীলা। অনেকের ধারণা, পৃথিবীর গতি থাকা আর্য্যগণ জানিতেন না। কিন্তু এই ঋকগুলি দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে "পৃথিবী সতত গমনশীলা"। আরও প্রমাণ আছে।

(৩) চন্দ্রগ্রস্ত সূর্য্যকে পৃথিবী স্বীয় গতি দ্বারা, সরিয়া গিয়া, প্রকাশিত করে। অর্থাৎ পৃথিবীর গতি দ্বারাই আমরা গ্রহণের স্থিতি ও মুক্তি দেখিতে পাই।

(৪) চন্দ্র অত্রি অর্থাৎ পৃথিবীর সন্তান। অর্থাৎ পৃথিবী হইতে চন্দ্রের জন্ম হইয়াছে।

(৫) গ্রহণ সময়ে চন্দ্র দ্বারা সূর্য্যরশ্মি আবৃত হয়।

(৬) অত্রিগণ অর্থাৎ অত্রি ঋষি ও তৎপুত্রগণ গ্রহণ গণনা করিয়া মুক্তির সময় বলিতে পারিতেন, আর কেহ গ্রহণ গণনা করিতে পারিতেন না।

এখন অধ্যাপক মহাশয় দেখিবেন, সেকালে অর্থাৎ বৈদিককালে জীবিত প্রাণী দ্বারা গ্রহণ হওয়া ঋষিগণ মনে করিতেন না। অন্ধকার অর্থাৎ ছায়া দ্বারা সূর্য্য আবৃত হইয়া গ্রহণ হয়, ইহাই মনে করিতেন। মধ্যে পৌরাণিক যুগে স্বর্ভানু জীবিত অসুরে পরিণত হইয়াছে। এ সব বিষয় বিশেষ রূপে অনুসন্ধান করিয়া বুঝিয়া লেখকগণ মত প্রকাশ করিলে ভাল হয়। হিন্দু শাস্ত্র বিশাল এবং দুর্বোধ্য। অনু-

সন্ধিৎসুগণ বিশেষ পরিশ্রম করিয়া সতর্কতার সহিত অনুসন্ধান করিবেন, এবং কোন ধারণা লইয়া অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইবেন না, ইহাই প্রার্থনা। বেদ কৃষকের গান বলিয়া যিনি ধারণা করিবেন, তিনি তাহাতে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব কিছুই পাইবেন না। অপিচ, সেই ধারণাবলে কার্য্য করিলে, বেদের প্রতি—শাস্ত্রের প্রতি—বৈদিক ঋষিদিগের প্রতি—দেশের প্রতি ঘোর অবিচার করা হইবে।

বঙ্গের শিক্ষা-সমস্যা ও তাহার প্রতীকার চিন্তা

(সাধারণ শিক্ষা)

[অধ্যাপক শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত এম-এ, বি-টি]

শিক্ষাক্ষেত্রে বঙ্গদেশে সুপ্রভাতের সূচনা লক্ষিত হইতেছে। ভারতের রাজপ্রতিনিধি, বিদ্যোৎসাহী, মহামান্য লর্ড চেমস্‌ফোর্ড কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার-সাধনের জন্য শিক্ষাভিজ্ঞ, সুপণ্ডিত সম্বলিত এক শিক্ষা-কমিশন গঠন করিয়াছেন। কৃষিবিষয়ক শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনকল্পে ভারত-গবরমেণ্টের রাজস্ব ও কৃষি-বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় স্যার ক্লড্ হিল্ (The Hon'ble Sir Claude Hill) প্রাদেশিক গবরমেণ্টসমূহের নিকট এক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। এই শিক্ষানীতি অনুসৃত হইলে ভারতের উন্নততর প্রদেশসমূহের প্রতি জিলায় এক-একটী করিয়া উচ্চ-কৃষিবিদ্যালয় ও কয়েকটি করিয়া মধ্য-কৃষিবিদ্যালয় স্থাপিত হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্রবে, শিল্প ও বাণিজ্য সম্বন্ধে উচ্চ-শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করা সম্ভবপর কি না, তাহা বিবেচনা করিতেছেন। এদিকে ভারত গবরমেণ্ট কলেজের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রগণের শিক্ষা সহজলভ্য ও অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়সাধ্য করিবার এক সুচিন্তিত প্রস্তাব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

প্রস্তাবটি যে সম্পূর্ণ সময়োপযোগী হইয়াছে, এবং কার্য্যে পরিণত হইলে দেশের যথেষ্ট কল্যাণ সাধন করিবে, তাহা নিঃসংশয়িতরূপে বলা যাইতে পারে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজে অধ্যয়ন করিবার সুবিধা মফঃস্বলের সকল সহরে হইয়া উঠে না। কাজেই ছাত্রগণ কলিকাতা সহরের দিকে প্রধাবিত হয়। কলিকাতায় ছাত্র-সংখ্যা দিন-দিন এত বর্দ্ধিত হইতেছে যে, তাহাদের বাস সংস্থান বর্ত্তমানে এক জটিল সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দ হইতে এ পর্য্যন্ত কলিকাতা সহরে ছাত্রাবাস নির্ম্মাণের জন্য ভারত গবরমেণ্ট অন্ততঃ পক্ষে (২৬০০০০০) ছাব্বিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। সুতরাং ভারত-গবরমেণ্ট প্রস্তাব করেন যে, মফঃস্বলে যে যে সহরে কলেজ নাই, এইরূপ কতিপয় স্থানে কলেজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া, অথবা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের সঙ্গে কলেজের প্রথম দুই বৎসরের পাঠ সমাপন করিবার বন্দোবস্ত করিয়া, এই সমস্যার মীমাংসা করা যায় কি না, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাহা বিবেচনা করুন।

প্রতি জিলায় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা দিন-দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, মধ্য-বাঙ্গলা বিদ্যালয় দিন-দিন লোপ পাইতেছে। দেশের ছোট-বড় সকলের মধ্যেই ইংরাজী শিক্ষালাভের আকাঙ্ক্ষা সংক্রামক ব্যাধিতে পরিণত হইয়াছে। ইংরেজী রাজভাষা, এবং এই ভাষা আমাদের কার্য্যময় জীবনে বিশেষ প্রয়োজনীয়। সুতরাং এই ভাষায় সাধারণ জ্ঞান লাভের বাসনা স্বাভাবিক। তাই আমরা বঙ্গদেশের প্রধান-প্রধান গ্রামে পর্য্যন্ত সুপরিচালিত উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয় দেখিতে পাই। তার পর আমাদের দেশে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি কার্য্যকরী শিক্ষার সুবন্দোবস্ত না থাকায়, ইহাদের উপকারিতা এবং প্রয়োজনীয়তা অনেকেই উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন নাই। তাই কলেজে উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দাম লালসা যুবক-জীবনে সঞ্জাত হইয়াছে। যখন সহরে-সহরে এবং গ্রামে গ্রামে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে, যখন যুবকেরা দেখিতে পাইবে যে, তাহাদের অপেক্ষা অল্পবুদ্ধি যুবকগণ কৃষি শিল্প ও বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়া, জীবনে তাহাদের অপেক্ষা উন্নততর অবস্থায় আছে, যখন তাহারা দেখিতে পাইবে যে, সমাজের উপর তাহাদের যে কর্ত্তৃত্ব বা নেতৃত্ব ছিল, তাহা দিন-দিন অপহৃত হইয়া, কৃষিজীবী, শিল্পী ও বাণিজ্য-ব্যবসায়ী লোকের হস্তে পতিত হইতেছে, তখন তাহাদের মোহনিদ্রা অপগত হইবে, তখন তাহাদের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইবে, তখন তাহারা জীবন-সংগ্রামে অতি প্রয়োজনীয় কার্য্যকরী শিক্ষার দিকে প্রধাবিত হইবে। সে সময় আগমনের অধিক বিলম্ব নাই। সেই উষাকালীন আলোক-রেখা সম্পাত ইতোমধ্যেই সমাজশীর্ষে পতিত হইয়াছে। ভারত-গবরমেণ্টের ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে; অতএব, অচিরেই শিক্ষাক্ষেত্রে এক যুগান্তর উপস্থিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

কিন্তু বর্ত্তমানে, কলিকাতা সহরে কলেজের ছাত্র সংখ্যার অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি-প্রাপ্তিহেতু, ভারত-গবরমেণ্ট ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখে যে সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, আশু তাহার প্রতীকার সাধন করিতে হইবে। (১) কলিকাতায় কলেজের সংখ্যা-বৃদ্ধি ও ছাত্রাবাসের উপযুক্ত সংস্থান করিয়া এই সমস্যার সমাধান করা যাইতে পারে। (২) মফঃস্বলে নূতন কলেজ স্থাপন করিয়াও ইহার প্রতিবিধান সম্ভবপর হইতে পারে। (৩) উচ্চবিদ্যালয়ের সঙ্গে অতিরিক্ত ক্লাশ সংযোজন করিয়াও এই সমস্যার মীমাংসা সংসাধিত হইতে পারে। এখন কোন্ পথ অবলম্বনীয়? কোন্ পথ অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়সাধ্য? কোন্ পথ ছাত্রের পক্ষে অধিকতর কল্যাণকর? কোন্ পথ বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী?

কলিকাতায় কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি করা সম্ভবপর; কিন্তু মফঃস্বলের ছাত্রগণের পক্ষে কলিকাতায় অধ্যয়ন ব্যয়সাধ্য। অনেক ভদ্রলোক মফঃস্বলে ছোট ছোট সহরে তাঁহাদের কর্ম্মস্থলে সপরিবারে

বাস করেন। তাঁহাদের পুত্র, ভ্রাতা ও অন্যান্য আত্মীয় তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে। কিন্তু যখন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তাহারা কলেজে প্রবেশ করিতে চায়, তখন অনেকে তাহাদের অধ্যয়নের ব্যয় সঙ্কুলান করিতে অসমর্থ হইয়া উঠে। কলিকাতার ন্যায় সহরে, উপযুক্ত ছাত্রাবাসে রাখিয়া পড়াইতে হইলে, একটী ছাত্রের জন্য মাসে প্রায় ৩০।৩৫ টাকা ব্যয় করিতে হয়। আমাদের গরীব দেশের কয়জন লোক এইরূপ গুরু ব্যয়ভার বহন করিতে সমর্থ? মফঃস্বলের সহরে কলেজের প্রথম দুই বৎসরের পাঠ সমাপন করিবার সুবিধা থাকিলে, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের অনেক ছাত্র প্রত্যহ বাড়ী হইতে আসিয়াই অধ্যয়ন করিতে পারে; অনেকে তাহাদের নিকট-আত্মীয়গণের বাসায় থাকিয়া অধ্যয়ন করিতে পারে। সুতরাং কলেজের প্রারম্ভিক শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে কোনরূপ শিক্ষালয় মফঃস্বলে প্রতিষ্ঠিত হইলে, অনেক গরীব অথচ মেধাবী ছাত্রের অধ্যয়ন-পথ উন্মুক্ত হইবে।

যে সকল ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজে প্রবেশলাভ করে, তাহারা অপরিণত-বয়স্ক যুবক। তাহাদের বয়স সাধারণতঃ ১৬।১৭ বৎসরের বেশী নয়। যে বয়সে যৌবনের প্রথম উন্মেষ হইতে থাকে, যে বয়সে যুব-জন-সুলভ সম্ভোগ-লালসা উদ্দাম মুর্ত্তি ধারণ করে, যে বয়সে হিতাহিত বিবেচনা-বুদ্ধি যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতা-মেঘে আচ্ছন্ন থাকে, যে বয়সে সঙ্গদোষে বিপথগামী হইবার আশঙ্কা পদে-পদে বিরাজিত, সেই বয়সে কলিকাতার ন্যায় পাপ-প্রলোভন-সঙ্কুল সহরে অভিভাবকহীন অবস্থায় অবস্থান যে কিরূপ আশঙ্কাজনক, তাহা সহজেই অনুমেয়। যুবকগণ আড়ম্বরহীন ছোট সহরে পিতামাতার শাসনাধীনে সরল পবিত্র জীবন যাপন করিয়া হঠাৎ বিলাস-পূর্ণ বড় সহরের মুক্ত মাঠে, মুক্ত হাটে, মুক্ত রঙ্গমঞ্চে, মুক্ত ভাবে ভ্রমণের অধিকার লাভ করে। নানাপ্রকার লোভনীয় দৃশ্য তাহাদের নয়নপথে পতিত হয়; মনোহারী সঙ্গীত-সুধা তাহাদের শ্রুতিমূলে অমৃত বর্ষণ করে; বিলাসের আপাত-মধুর মোহন মূর্ত্তি তাহাদের প্রাণ মন অধিকার করিয়া বসে; কপটের প্রতারণাময় চাতুরীজালে সময়ে-সময়ে তাহারা জড়িত হইয়া পড়ে। এইরূপে অনেক সময়ে নিরীহ যুবক জীবন-পথে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া নীতি-বিগর্হিত ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেও দ্বিধা বোধ করে না।

এই অবস্থায় তাহাদের উপর সতর্ক অথচ স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি রাখা অতীব প্রয়োজনীয়। কিন্তু অভিভাবকহীন যুবক কোথায় কি করিতেছে, কে তাহার খোঁজ রাখে? ছোট সহরে অভিভাবকহীন যুবকও সর্ব্বদা শিক্ষকের দৃষ্টির অধীনে থাকে। কিন্তু বড় সহরের বড়-বড় অধ্যাপকবর্গ অভিভাবকহীন ছাত্রের কথা বড় ভাবেন না, অথবা ভাবিবার সময় ও সুযোগ তাঁহাদের ঘটিয়া উঠে না। ছোট সহরে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে যে প্রীতির বন্ধন, স্নেহের আধিপত্য ও ভক্তির আনুগত্য লক্ষিত হয়, বড় সহরে অধ্যাপক ও ছাত্রে সেই বন্ধন শিথিল হইয়া যায়। মুক্ত হাওয়ার সংস্পর্শে সকলেই সকল বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া স্বাধীন সুখের জীবন যাপন করে; দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যজ্ঞানের মাত্রা যেন জ্ঞানবৃদ্ধির বিরুদ্ধ অনুপাতে হ্রাস পাইতে থাকে। ছাত্রগণ ছোট সহরে শিক্ষকের নিকট যেরূপ সহানুভূতিসূচক ব্যবহার, স্নেহপূর্ণ উপদেশ, সাদর সম্ভাষণ ও আরামে ব্যারামে সহায়তা প্রাপ্ত হয়, বড় সহরে সে সকলে বঞ্চিত হইয়া তাহারা স্বভাবতঃ একটু উচ্ছৃঙ্খল ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠে, এবং অনেক সময় হুজুগের মাথায় অনেক অন্যায় কার্য্য করিয়া বসে। তাই বড় সহরের মন-মাতান, ছেলে-ভুলান দৃশ্য অপেক্ষা ছোট সহরের স্নিগ্ধ-শীতল প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-সুষমা যুবকগণের প্রকৃত শিক্ষার পক্ষে অধিকতর উপযোগী। একটু পরিণত বয়সে বড় সহরে গেলে, ভয়ের তত আশঙ্কা থাকে না। অতএব, কলেজের প্রথম দুই বৎসরের পাঠ যাহাতে মফঃস্বলে সমাপন করিবার বন্দোবস্ত হইতে পারে, তজ্জন্য দেশহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেই সচেষ্ট হইবেন, এরূপ আশা করা যায়।

ছাত্রের পক্ষ হইতে দেখিতে গেলে, মফঃস্বলে কলেজের প্রথম দুই বৎসরের পাঠ সমাপন করা যেরূপ সুবিধাজনক ও কল্যাণকর, শিক্ষা-কর্তৃপক্ষীয় ব্যক্তিগণের দিক হইতে দেখিতে গেলেও ইহা সেইরূপ সুকর ও অল্পব্যয়সাধ্য। মফঃস্বলের সহরে যে ব্যয়ে শিক্ষার সুবন্দোবস্ত সম্ভবপর, কলিকাতার ন্যায় সহরে সেই ব্যয়ে উহা একরূপ অসম্ভব ব্যাপার। তারপর ছাত্রাবাসের উপযুক্ত সংস্থান করা, বিদ্যালয়ের বাহিরে ছাত্রদের কার্য্যের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং নৈতিক জীবন-গঠনে ছাত্রদের প্রকৃত সহায়তা করা, আরও কষ্টসাধ্য বা দুষ্কর। এখন প্রশ্ন এই, মফঃস্বলের সহরে কিরূপ বন্দোবস্ত করা সমীচীন? দুইটি ক্লাশ লইয়া নূতন কলেজ স্থাপন করা? না, দুইটি অতিরিক্ত ক্লাশ উচ্চ বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযোজনা করিয়া দেওয়া?

কেহ কেহ হয় ত বলিবেন যে, মফঃস্বলে কলেজ প্রতিষ্ঠিত না করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত বড় বড় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের সঙ্গে দুইটি অতিরিক্ত ক্লাশ যোজনা করিয়া দিলে, আপাততঃ অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়ে সুশিক্ষার বন্দোবস্ত হইতে পারে। এইরূপে বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত ক্লাশ খুলিলেও স্থানাভাব হইবে বলিয়া মনে হয় না; অথবা, অভাব হইলেও, অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়ে তাহার বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে।

তারপর গবরমেণ্টের শিক্ষাবিভাগে শিক্ষকতাকার্য্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা অধ্যাপনাকার্য্যে অধ্যাপকদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারিবেন। অবশ্য বিদ্যালয়ের সঙ্গে অতিরিক্ত দুইটি ক্লাশ যোজনা করিলে, তাহাদের অধ্যাপনার জন্য উপযুক্ত অধ্যাপক নিযুক্ত করিতে হইবে, এবং দেখিতে হইবে যে, তাহাদের গুণগ্রাম যেন কোনও অংশে অন্যান্য কলেজের অধ্যাপক অপেক্ষা হীনতর না হয়। এইরূপে অধ্যাপক ও শিক্ষক পরস্পরের সাহায্যে যথেষ্ট উপকৃত হইবে। কলেজের লাইব্রেরী, কলেজের বিজ্ঞানাগার এবং কলেজের কমন রুম, বিদ্যালয়ের শিক্ষকবর্গের ও উচ্চশ্রেণীর ছাত্রগণের অনেক কল্যাণ সাধন করিবে। বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী, বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের অধ্যাপনা-কৌশল, বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে স্নেহ-ভক্তিপূর্ণ ব্যবহার প্রভৃতি হইতে, অপ্রাপ্তবয়স্ক যুবক-

গণের পক্ষে কিরূপ শিক্ষাপ্রণালী সম্পূর্ণ উপযোগী, কলেজের অধ্যাপকবর্গ এ বিষয়ে অনেক অভিজ্ঞতালাভ করিতে পারিবেন। কলেজের নিম্ন-শ্রেণীর অধ্যাপনা-প্রণালী উচ্চশ্রেণীর অধ্যাপনা-প্রণালীর সমরূপ না হইয়া, উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রথম দুই শ্রেণীর শিক্ষা-প্রণালীর অনুরূপ হইলে, অধিক ফললাভের আশা করা যাইতে পারে; কারণ, কলেজের অপরিণত-বয়স্ক যুবকগণের চিন্তা, ভাব ও কার্য্য অনেকটা বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রগণের অনুরূপ। সুতরাং কলেজের অধ্যাপকবর্গ, বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী কলেজের ছাত্রগণের উপযোগী কি না, তাহা তুলনা দ্বারা পরীক্ষা করিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইবেন।

য়ুরোপ, আমেরিকা বা জাপানের বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির আলোচনা করিয়া দেখা যায় যে, যুবকগণ বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপন করিয়া ১৯।২০ বৎসর বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশলাভের অধিকার পায়। তাহাদের বিদ্যালয়ের পঠনীয় বিষয় আমাদের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের পাঠ্যমান অপেক্ষা অনেক উচ্চ। আমাদের দেশের কলেজের প্রথম দুই বর্ষে যে কাজ হয়, তাহাদের দেশে বিদ্যালয়েই সেই শিক্ষা সমাপ্ত হয়। সেই শিক্ষা-প্রণালী কলেজের শিক্ষা-প্রণালী হইতে স্বতন্ত্র। যে বিজ্ঞান-সম্মত শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করিয়া এই সকল সুসভ্য দেশ কৃতকার্য্য হইয়াছে, সেই শিক্ষা প্রণালী অনুসরণ করিয়া, আমাদের দেশের কলেজসমূহে, প্রথম দুই শ্রেণীতে অধ্যাপনা-কার্য্য পরিচালন করিলে সুফল লাভের সম্ভাবনা।

এই সকল দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে, কলেজের প্রথম দুই শ্রেণী উচ্চ বিদ্যালয়ের সঙ্গে যোজনা করিয়া দিলে মন্দ হয় না। কিন্তু এই ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত করা সম্ভবপর কি না, তাহা ভাবিবার বিষয়। নূতন দুইটি ক্লাশ যোজনা করিলে, উচ্চ বিদ্যালয়ে সর্ব্বশুদ্ধ বারোটি ক্লাশ হইবে। ছয় বৎসরের শিশু হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮ বৎসরের যুবক পর্য্যন্ত এই বিদ্যালয়ে পাঠ করিবে। এইরূপ বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন-ভাবাপন্ন বালক ও যুবকের সংমিশ্রণ বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের কার্য্য এত জটিল করিয়া তুলিবে যে, ইহার সুপরিচালনা একরূপ অসম্ভব ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে,—সুশাসন ও সুশিক্ষার ব্যাঘাত ঘটিবে। সুতরাং শাসন ও শিক্ষার সৌকর্য্য-সাধনের জন্য বাধ্য হইয়া উক্ত বিদ্যালয়কে দুইভাগে বিভক্ত করিতে হইবে। বর্ত্তমান অবস্থায় এইরূপ ভাঙ্গাগড়া সহজসাধ্য নয়। অতএব আপাততঃ মফঃস্বলে নূতন কলেজ স্থাপন করিলে বর্ত্তমান শিক্ষাসমস্যার সহজ মীমাংসা হইতে পারে।

কিন্তু এই ভাঙ্গাগড়া আমরা অধিক দিন স্থগিত রাখিতে পারিব না। শিক্ষা-ক্ষেত্রে অচিরেই সময়োপযোগী নূতন ব্যবস্থার প্রয়োজন আসিয়া উপস্থিত হইবে। বর্ত্তমান প্রবেশিকা পরীক্ষার শিক্ষামান বড় নিম্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং শিক্ষার বিষয়গুলি য়ুরোপ বা জাপানের প্রবেশিকা পরীক্ষার অনুরূপ নয়। আমাদের দেশের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যুবক যে শিক্ষালাভ করে, লণ্ডন প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যুবকগণ তাহাদের অপেক্ষা অনেক উচ্চতর শিক্ষালাভ করে। সুতরাং আমাদের দেশের প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিয়া বিলাতে গেলে, যুবকগণের কোনরূপ সুবিধাই হয় না; তাহাদিগকে আবার নূতন করিয়া সে স্থানের প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়।

য়ুরোপের শিক্ষা-ব্যবস্থা আমাদের দেশের পক্ষে যতটা উপযোগী, জাপানের শিক্ষা-ব্যবস্থা তাহা অপেক্ষা অধিকতর উপযোগী। সুতরাং জাপানের শিক্ষা-ব্যবস্থা আমাদের দেশের ও অবস্থার উপযোগী করিয়া আমরা, বোধ হয়, গ্রহণ করিতে পারি। আমাদের আদ্য, মধ্য ও উচ্চ শিক্ষার মধ্যে যাহাতে জাপানের ন্যায় একটা অবিচ্ছেদ্য ধারা-বাহিক যোগ থাকিতে পারে, তাহার বিধান করিতে হইবে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রবেশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শিক্ষা-কালকে পনের বৎসরে পরিণত করিয়া উহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে—আদ্য-শিক্ষা-বিভাগ, মধ্য শিক্ষা-বিভাগ এবং অন্ত্য বা কলেজের শিক্ষা-বিভাগ। প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের জন্যে আদ্য বিদ্যালয় (Elementary School) প্রতিষ্ঠিত হইবে, এবং সেখানে বালক ষষ্ঠ বৎসরের প্রারম্ভে প্রবেশ করিবে। যাহারা আদ্য বিদ্যালয়ে পাঠ করিয়াই শিক্ষা সমাপন করিতে চায়, তাহাদিগকে সেখানে পূর্ণ আট বৎসর অধ্যয়ন করিতে হইবে। কিন্তু যাহারা মধ্য-বিভাগে প্রবেশ করিতে চায়, তাহারা যাহাতে প্রাথমিক বিভাগে সাত বৎসর অধ্যয়নের পর মধ্য-বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার পায়, তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। মধ্য বিদ্যালয়ে পাঁচ বৎসর অধ্যয়ন করিয়া সতের বৎসর বয়সে যুবক প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রদান করিবে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সে কলেজে প্রবেশ করিবে, এবং সেখানে তিন বৎসর অধ্যয়ন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাধি লাভ করিবে। এই উপাধি লাভের পর যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ বিষয়ের গবেষণা ও মৌলিক তত্ত্বালোচনা করিয়া উচ্চতর উপাধি লাভ করিবে। এইরূপে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের পূর্ব্বে শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ের তিন বিভাগ অতিক্রম করিয়া আসিতে হইবে। আদ্য বা প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগে সাত বৎসর, মধ্য শিক্ষা বিভাগে পাঁচ বৎসর, অন্ত্য বা কলেজের শিক্ষা বিভাগে তিন বৎসর তাহাকে অধ্যয়ন করিতে হইবে। সুতরাং ছাত্রের শিক্ষা জীবন ১৫ বৎসরে পরিণত হইবে। ছয় বৎসর বয়সের প্রারম্ভে আদ্য-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলে বিশ বৎসর বয়সে শিক্ষার্থী বিশ্ব বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে।

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় নামে যে সকল বিদ্যালয় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই ভবিষ্যতে আদ্য বিদ্যালয় বলিয়া পরিগণিত হইবে। এই সকল আদ্য বিদ্যালয়ে তিন বৎসর কাল অধ্যয়নের পর, চতুর্থ বৎসরের প্রারম্ভ হইতে, ইংরেজী একটি বিষয়-রূপে পঠিত হইবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এই বিদ্যালয়ে ৭ম বর্ষের পাঠ সমাপন করিয়া বালকগণ মধ্য বিদ্যালয়ের সর্ব্বনিম্নশ্রেণীতে প্রবেশ করিতে পারিবে। কিন্তু যাহারা অন্যান্য বিভাগে (নরম্যাল স্কুলে বা

নিম্নস্তরের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য বিদ্যালয়ে *) প্রবেশ করিতে চায়, তাহাদিগকে অষ্টমবর্ষ অন্তে আদ্য বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা প্রদান করিতে হইবে। যাহারা উত্তীর্ণ হইবে, তাহারা পাশ সার্টিফিকেট (pass certificate) লইয়া অন্যান্য বিভাগে প্রবেশ করিতে পারিবে।

এই বিদ্যালয়ে ইংরেজী ভাষা প্রথমতঃ ইচ্ছাধীন বিষয় রূপে পঠিত হইবে। যখন ইংরেজী ভাষা শিক্ষার প্রতি লোকের আগ্রহ বৃদ্ধি পাইবে, তখন ইহাকে (compulsory) অবশ্য-পাঠ্য করিতে হইবে। বর্ত্তমানে যে সকল উচ্চ-প্রাথমিক ও মধ্য-বাঙ্গলা বিদ্যালয় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কোনও প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না। এই সকল বিদ্যালয়ের সঙ্গে বর্ত্তমান সময়ের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের কোনও যোগ না থাকায়, ইংরেজী শিক্ষালাভেচ্ছু ছাত্রগণের বিশেষ অসুবিধা হয়।

ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র গ্রামে আদ্য-বিদ্যালয়ের প্রথম চারিটি ক্লাশ লইয়া নিম্ন-আদ্য-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে; কারণ, এইরূপ বিধান দেশবাসীর পক্ষে শিক্ষা অনায়াসলভ্য করিয়া তুলিবে। বিশেষতঃ, দেশে বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিতে হইলে, এইরূপ নিম্ন আদ্য-বিদ্যালয়ের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা লক্ষিত হইবে। এইরূপ বিদ্যালয়ের সংখ্যা শীঘ্রই যথেষ্টরূপ বৃদ্ধি করিতে হইবে; এবং উপযুক্ত শিক্ষকের সংস্থান-সমস্যার মীমাংসা করিতে হইবে। তার পর কালবিলম্ব না করিয়া শিক্ষার জন্য সর্ব্বসাধারণের ভিতর স্বতন্ত্র কর স্থাপন করিয়া, গবরমেণ্ট প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিবেন। প্রথমতঃ, বোধ হয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চারি বৎসরের পাঠ বাধ্যতা-মূলক (compulsory) করিতে হইবে। কিন্তু ইহাতে সন্তুষ্ট না থাকিয়া, ধীরে-ধীরে শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে-সঙ্গে আদ্য-বিদ্যালয়ের আট বৎসরের পাঠ বাধ্যতামূলক করিলে দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে এবং ভারত পৃথিবীর অন্যান্য সুসভ্য ও সমুন্নত জাতির সমকক্ষ হইতে চেষ্টা করিবার সুযোগ পাইবে।

মধ্য-বিভাগে পাঁচ বৎসর অধ্যয়ন করিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে হইবে। প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠমান উচ্চতর করিয়া, উহাকে বর্ত্তমান I. A বা I. Sc.র প্রায় সমতুল্য করিতে হইবে। আমাদের দেশের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র যাহাতে পৃথিবীর অন্যান্য সুসভ্য দেশের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রের অনুরূপ জ্ঞান লাভ করিয়া, সর্ব্বপ্রকারে তাহাদের সমকক্ষ হইতে পারে, তাহার বিধান করিতে হইবে। আর এই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াই শিক্ষার্থী যাহাতে সাধারণ কলেজ-বিভাগে, মেডিক্যাল কলেজে ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রবেশের উপযোগী হইতে পারে, তাহার আয়োজন করিতে হইবে। সুতরাং I. A. বা I. Sc. পরীক্ষার আর কোন প্রয়োজন থাকিবে না।

বর্ত্তমান সময়ের উচ্চ-বিদ্যালয়গুলি এই প্রস্তাবিত মধ্য-বিদ্যালয়ে পরিণত হইবে। উহাদের নিম্নের ক্লাশগুলি লইয়া প্রাথমিক বিভাগ গঠিত হইবে। এই প্রাথমিক বিভাগের জন্য একজন স্বতন্ত্র হেড্ মাষ্টার নিযুক্ত হইবেন। কিন্তু প্রথমতঃ তিনি মধ্য-বিদ্যালয়ের হেড্ মাষ্টারের অধীন থাকিবেন। ধীরে-ধীরে নিম্ন-ক্লাশগুলি বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বতন্ত্র আদ্য বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। শুধু উপরের চারিটি ক্লাশ লইয়া, এবং তাহাদের সঙ্গে আর একটী উচ্চতর ক্লাশ যোজনা করিয়া দিয়া, মধ্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এই মধ্য-বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শিক্ষার্থী কলেজে প্রবেশ করিবে।

এখনকার কলেজগুলিতে সর্ব্বত্রই অধ্যয়নকাল তিন বৎসর করিতে হইবে, এবং তিন বৎসরকাল অধ্যয়ন করিয়া এই সকল কলেজ হইতে শিক্ষার্থীগণ বি এ বা তত্তুল্য উপাধিলাভের জন্য পরীক্ষা প্রদান করিতে পারিবে। এইরূপ কলেজ নগরে-নগরে স্থাপন করিয়া উচ্চ শিক্ষার পথ প্রশস্ত করিয়া দিতে হইবে। ইহার পর যাহারা আরও উচ্চতর জ্ঞান লাভ করিতে চায়, অথবা উচ্চ বিষয়ে গবেষণা ও মৌলিক তত্ত্বানুসন্ধান করিতে চায়, শুধু তাহারাই বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে।

পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত বিষয়টির বোধ-সৌকর্য্যার্থ নিম্নে একটী রেখাচিত্র প্রদত্ত হইল।

দ্রষ্টব্য— যাহারা সাধারণ শিক্ষা বিভাগে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে চায়, তাহারা আদ্য বিভাগের ৭ম বৎসরের পাঠ সমাপন করিয়াই যেন মধ্য-বিভাগে প্রবেশ করিতে পারে, এইরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছে; সুতরাং তাহাদের মধ্য-বিভাগে প্রবেশের বয়স ১৪ না হইয়া ১৩ হইবে।

	আদ্য-শিক্ষা-বিভাগ	মধ্য-শিক্ষা-বিভাগ	অন্ত্য বা কলেজ-বিভাগ	বিশ্ববিদ্যালয়ী-বিভাগ
১ । ২ । ৩ । ৪ । ৫	৬ । ৭ । ৮ । ৯ । ১০ । ১১ । ১২ । ১৩	১৩ । ১৪ । ১৫ । ১৬ । ১৭	১৮ । ১৯ । ২০	২১ । ২২ । ২৩
	অধ্যয়নকাল ৮ বৎসর	৫ বৎসর	৩ বৎসর	৩ বৎসর

* ভারত গবরমেণ্টের কৃষিবিভাগ কৃষিবিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন। শীঘ্রই শিল্প-বিভাগ নামে আর একটা নূতন বিভাগের সৃষ্টি হইবে। এই শিল্প বিভাগ দেশে শিল্প ও বাণিজ্য শিক্ষা-বিস্তারের জন্য ৫।৭ বৎসরের মধ্যেই শিল্প-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবে বলিয়া আশা হয়।

বর্ত্তমান যুগের জ্যোতিষ্ শাস্ত্র *

[শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাসগুপ্ত, বি-এ]

[ভারতবর্ষের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় "প্রাচীন যুগের জ্যোতিষ শাস্ত্র" শীর্ষক প্রবন্ধে ইউরোপে renaissance বা জ্ঞানোন্নতির পুনরুন্মেষের পূর্ব্ব-কাল পর্য্যন্ত "প্রাচীন যুগ" আখ্যায় বিভাগ করিয়াছি, তাহার পর হইতেই জ্যোতিষের বর্ত্তমান যুগ।]

ক্রমে পুনরায় বিজ্ঞানের দীপ্ত কিরণে পাশ্চাত্য ভূমিখণ্ড উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; নব জ্ঞানোন্মেষে বহুকালের পুঞ্জীভূত অজ্ঞান-তিমির পরাহত হইল। সেই সময়ে কোপারনিকস নামে প্রুশিয়া-দশীয় এক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত নূতন নূতন জ্যোতিষিক তথ্য লইয়া জ্ঞানের উজ্জ্বল বর্ত্তিকা হস্তে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি টলেমির প্রমাদপূর্ণ ও অনৈসর্গিক মতবাদের খণ্ডন করিয়া এই অভিনব তত্ত্ব প্রচার করিলেন যে, সূর্য্য স্থির, রাশি-চক্রের মধ্যস্থানে অবস্থিত এবং পৃথিবী ও অপরাপর গ্রহ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। পাশ্চাত্য ভূমিখণ্ডে পৃথিবীর গতির বিষয় সর্ব্বপ্রথম কোপারনিকসই স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেন (পাইথাগোরাস ইহার সঙ্কেত দিয়াছিলেন মাত্র); কোপার্নিকসের আবির্ভাব-কাল পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। আর চতুর্দ্দশ শত বৎসরেরও বহুপূর্ব্বে ভারতে আর্য্যভট্ট যে পৃথিবীর গতি নিরূপণ করিয়াছিলেন, তাহা ব্রহ্মগুপ্তের টীকাকার পৃথূদক স্বামী দ্বারা উদ্ধৃত নিম্নলিখিত বচন হইতে বেশ প্রমাণিত হয়—

ভূপঞ্জরঃ স্থিরো ভূরেবাবৃত্যাবৃত্য প্রাতিদৈবসিকৌ।
উদয়াস্তময়ৌ সম্পাদয়তি নক্ষত্রগ্রহাণাম্ ॥

নক্ষত্রমণ্ডল স্থির রহিয়াছে; কেবল পৃথিবীর আবৃত্তি অর্থাৎ পরিভ্রমণ দ্বারা গ্রহনক্ষত্রের প্রাত্যহিক উদয়াস্ত হইতেছে। হিন্দুমতে খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে এবং পাশ্চাত্য মতে খ্রীষ্ট-পরে প্রথম শতাব্দীতে আর্য্যভট্ট জীবিত ছিলেন। বস্তুতঃ ইহাই অনুমান করা সঙ্গত যে, হিন্দুগণের সিদ্ধান্ত-প্রস্রবন গ্রীসদেশের মধ্য দিয়া অন্তঃসলিল প্রবাহে প্রবাহিত হইয়া য়ুরোপে বেগবতী স্রোতস্বতী রূপে পরিণত হইয়াছে। যাহা হউক এই নূতন উদ্ভাবনের ফলে গ্রহগণের বক্রগতির রহস্য (The mystery of the retrograde motion of the planets) যাহা এতাবৎ কাল জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের গবেষণায় বিশেষরূপে খণ্ডিত হয় নাই, তাহা এক্ষণে অতি সরলভাবে বোধগম্য হইল; সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ কালে পৃথিবী ও অপরাপর গ্রহের পারস্পরিক অবস্থিতির জন্যই যে পর্য্যবেক্ষণকারীর চক্ষে অগ্রগতি নাও বক্রগতিরূপ দৃষ্টিবিভ্রম উপস্থিত হয়, ইহা এক্ষণে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। এই বক্রগতি বিষয়টীর একটু বিশদ আলোচনা করিতে হইলে গ্রহদিগের যুতিগত অবস্থান (conjunction) ও ষড়্‌ভাস্তরে অবস্থান (opposition) সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। পৃথিবীর যে দিকে সূর্য্য থাকে, সেইদিকে ও সমসূত্রপাতে যদি কোনও গ্রহ থাকে, তাহা হইলে সেই গ্রহকে সূর্য্যের সহিত যুতি-অবস্থাগত বলা হয়। পৃথিবীর যেদিকে সূর্য্য থাকে, তাহার বিপরীত দিকে ও সমসূত্রপাতে যদি কোনও গ্রহ থাকে, তাহা হইলে সেই গ্রহকে সূর্য্যের ষড়্‌ভাস্তরে (six signs apart) অবস্থিত বলা হয়; পৃথিবীর যেদিকে সূর্য্য থাকে, সেইদিকে ও সমসূত্রপাতে অথচ সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে যদি কোনও গ্রহ থাকে, তখন গ্রহযুতিকে লঘুযুতি কহে (inferior conjunction) পৃথিবীর যে দিকে সূর্য্য, সেইদিকে ও সমসূত্রপাতে অথচ সূর্য্য পৃথিবীর মধ্যে নহে (অর্থাৎ সূর্য্য পৃথিবী ও গ্রহের মধ্যে) তখনকার গ্রহযুতিকে প্রধানযুতি (superior conjunction) কহে। যখন পৃথিবী ও ও অপর একটী গ্রহ যুতি-অবস্থাগত থাকে, তখন ঐ গ্রহ ও পৃথিবীর পারস্পরিক অবস্থিতির নিমিত্ত গ্রহের যে গতি হয়, তাহাই উহার বক্রগতি। কিন্তু কোপারনিকসের বক্রগতি নিরূপণ-প্রণালীটি তেমন সর্ব্বতোভাবে বিজ্ঞান-সম্মত হইতে পারে নাই; গ্রহগণ নিজ-নিজ বৃত্তাকার কক্ষায় যে তুল্যগতিতে পরিভ্রমণ করিতেছে, এই প্রাচীন ধারণাটি তিনি স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন এবং ইহাতে তাঁহাকে নীচোচ্চবৃত্তের (epicycles) ব্যবহার-পদ্ধতিও কতকটা ধরিয়া লইতে হইয়াছিল। কারণ এইরূপে নীচোচ্চবৃত্তের উপযোগিতা স্বীকার করিয়া লইলে সূর্য্যকে গ্রহগণের কক্ষার কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করা সাধ্য নহে এবং তাহা হইলে কোপর্নিকসের সিদ্ধান্ত যে সূর্য্য রাশিচক্রের মধ্যে স্থির রহিয়াছে, ইহা কতকটা কাল্পনিক অনুমান হইয়া পড়ে; এইজন্য তাঁহার সংশোধিত প্রণালীটি আংশিক সত্য ছিল এবং প্রাচীন অনুমানগুলির তুলনায় উহার বিশুদ্ধতা ও সরলতা অতি অল্পই ছিল। এইরূপে উহার সুষ্ঠু ও সুসঙ্গত ব্যবহারের পক্ষে কতকগুলি আন্তর-বৈষম্য উপস্থিত হইল। ইহা সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে প্রাচীন নীচোচ্চ বৃত্তের ভঙ্গীটির একটু বিশদ আলোচনা আবশ্যক। একটি বৃত্তের কেন্দ্র অপর আর একটি বৃত্তের পরিধির উপর বৃত্তাকারে ঘুরিতেছে এবং বৃত্ত দুইটির উত্তান ভাগ (concavities) পরস্পর বিপরীত দিকে অবস্থিত; এইরূপ অবস্থায় পূর্ব্বোক্ত বৃত্তস্থিত একটি বিন্দু কেন্দ্রের পরিভ্রমণকালে একটি নীচোচ্চ বৃত্ত অঙ্কিত করিবে। ঐ নীচোচ্চ বৃত্তের প্রকৃত আকার বৃত্ত দুইটির ব্যাসার্দ্ধের উপর নির্ভর করে; আর যদি দ্বিতীয় বৃত্তটিও ঘুরিতে থাকে, তাহা হইলে ঐ নীচোচ্চ বৃত্তের আকার আরও জটিল হইয়া পড়ে। আবার যদি ঐ ভ্রাম্যমান কেন্দ্রটি দ্বিতীয় বৃত্তের পরিধির উপর সংস্থিত না হয়, তাহা হইলে প্রথম বৃত্তস্থিত বিন্দুর গতির জটিলতা আরও বর্দ্ধিত হইবে। কোপার্নিকস প্রাচীন নীচোচ্চ বৃত্তের সাহায্য লইয়া এইরূপ ভাবে গ্রহগণের গতি নির্দ্ধারণ করিলেন—পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে গ্রহটি (যেমন চন্দ্র) এমন ভাবে ঘুরিতেছে যে, ঐ গ্রহকক্ষার কেন্দ্র পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া একটি বৃত্ত অঙ্কিত করিল, আর পৃথিবী ও গ্রহ উভয়েই সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। কোপার-

* ভবানীপুর সাহিত্য-সমিতির সাধারণ অধিবেশনে পঠিত।

নিকসের এই অভিনব তত্ত্ব পৃথিবীর স্থিরতা অস্বীকার করিয়া প্রাচীন বদ্ধমূল ধারণাসমূহকে একেবারে উৎপাটন করিতে অগ্রসর হইল। সুতরাং ইহা বিন্দুমাত্রও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, তাঁহার এই মতবাদ অত্যুজ্জ্বল মনীষা প্রসূত বলিয়া প্রশংসিত হইলেও, অতি ধীরে-ধীরে" পাশ্চাত্য জগতে আপনার ন্যায্য অধিকার লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

বর্ত্তমান জ্যোতিষের অধিকাংশই পর্য্যবেক্ষণ-সাপেক্ষ,—দর্শকের চক্ষে গ্রহাদির গতি-সংক্রান্ত যে সমস্ত জ্যোতিষিক ঘটনা লক্ষিত হয়, তাহারই কতকটা সুসঙ্গত ও সুশৃঙ্খল সমাবেশ। সুতরাং পর্য্যবেক্ষণের নির্ভুলতার উপরই বৈজ্ঞানিক উপায়ে জ্যোতিষ শাস্ত্রের দ্রুত উন্নতি নির্ভর করে। কিন্তু দূরবীক্ষণ ও ঘটিকাযন্ত্র আবিষ্কারের পূর্ব্বে ইহা সহজসাধ্য ছিল না আমরা দেখিয়াছি, অতি প্রাচীন যুগেও কত বিস্ময়কর জ্যোতিষিক তথ্য উদ্ভাবিত হইয়াছিল। দূরবীক্ষণ বা ঘটিকাযন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত পর্য্যবেক্ষণ সাপেক্ষ জ্যোতিষিক উন্নতি টাইকোব্রাহির হস্তে চরম সীমায় উপনীত হইল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে টাইকোব্রাহি ডেনমার্কঅধিপতি ফ্রেডারিকের অনুকম্পায় ও উৎসাহে রস্‌ফিল্ড দ্বীপে একটী অতি মনোজ্ঞ বেধালয় নির্ম্মাণ করেন। তথায় তিনি গোল-যন্ত্র, ভিত্তি-যন্ত্র (mural quadrant) প্রভৃতি কয়েকটি নূতন যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া পর্য্যবেক্ষণে নিযুক্ত হইলেন। যন্ত্রগুলির নির্ম্মাণগত অসম্পূর্ণতাসত্ত্বেও, তিনি অনেক অভিনব ও নির্ভুল তথ্য আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি সূর্য্যের পরমক্রান্তি (greatest declination) ঠিকমত অবগত হইয়াছিলেন; এবং আর সপ্রমাণ করেন যে, নক্ষত্র ও ধূমকেতুর কোনও বার্ষিক লম্বন (annual parallax) নাই; অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান সূর্য্যকক্ষার ব্যাস অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্রেরও সহিত যে কোণ ধারণ করে (angle subtended by the diameter of the Sun's orbit) তাহা অতি ক্ষুদ্র; সুতরাং ইহাই নির্দ্ধারিত হয় যে, নক্ষত্রসমূহের দূরত্ব অত্যধিক। তিনি চন্দ্র ও গ্রহগণের গতি সম্বন্ধে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর নির্ভুল তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। এইরূপে টাইকোব্রাহি আপনার অনন্য সাধারণ প্রতিভার বলে জ্যোতিষের অভূতপূর্ব্ব উন্নতিসাধন করেন এবং যেন মনীষার ক্ষণিক স্ফুরণে, অয়নগতির সম্বন্ধে বহু নূতন তথ্যের উদ্ভাবন করেন। কিন্তু ভূ-ভ্রমণবাদ সম্বন্ধে টাইকোব্রাহি কোপারনিকসের মত অগ্রাহ্য করেন। তিনি উহার যুক্তি খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন,—"যদি পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে আবর্ত্তন করিতেছে, তবে ঊর্দ্ধ হইতে পতিত লোষ্ট্র পশ্চিমদিকে পড়িতে দেখা যায় না কেন?" ভারতেও ইহার সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যভট্টের পরবর্ত্তী জ্যোতির্বিদগণ তাঁহার ভূ-ভ্রমণবাদ খণ্ডন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। লল্ল আর্য্যভট্টের শিষ্য হইয়াও লিখিতেছেন; —"যদি পৃথিবী ভ্রমণ করিতেছে, তবে পক্ষীসমূহ বিমানমার্গে উড্ডীন হইয়া কিরূপে স্ব-স্ব কুলায়ে প্রত্যাগমন করিতে পারে? আকাশ-অভিমুখে প্রক্ষিপ্ত বাণ পশ্চিমদিকে পতিত হইতে দেখা যায় না কেন? মেঘসমূহকে কেবল পশ্চিমদিকেই গমন করিতে দেখা যায় না কেন? যদি বল, পৃথিবী মন্দ মন্দ গতিতে চলিতেছে বলিয়া এ সকল সম্ভবপর হইয়াছে তাহা হইলে এক দিনে উহার কিরূপে একবার আবর্ত্তন ঘটে?" বরাহমিহির ও ব্রহ্মগুপ্ত উভয়েই ঐ সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়া আর্য্যভট্টের মতবাদ খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহা বস্তুতঃ বিশেষ কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সহস্র বৎসর পরেও যখন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ টাইকোব্রাহি কোপারনিকসের ভূ-ভ্রমণবাদের বিরোধী হইয়াছিলেন, যখন খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতেও পাশ্চাত্যদেশে কোন কোন জ্যোতিষী এই তর্কের মীমাংসা অসম্ভব বুঝিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন, তখন ভারতের অতি প্রাচীন জ্যোতিষিগণের মনে যে সন্দেহ উপস্থিত হইবে এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে তাঁহারা যে ভূ-ভ্রমণবাদ স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবেন, ইহা বোধ হয় তেমন আশ্চর্য্যের কথা নহে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পৃথিবীর সহিত ভূ-বায়ুর আবর্ত্তন ঘটিতে পারে—ইহা তাঁহাদের কাহারও মনে উদিত হয় নাই। টাইকোব্রাহির আপত্তির খণ্ডনে বলা হইয়াছিল যে, মৃন্ময় পৃথিবীর সহিত ভূ বায়ু এবং লোষ্ট্রখণ্ডও ভ্রমণ করিতেছে, এজন্য লোষ্ট্রটি ঠিক নিম্নে পতিত হইবে। কিন্তু ইহার দ্বারা উক্ত আপত্তির খণ্ডন হইল মাত্র, ভূ-ভ্রমণ সপ্রমাণ হইল না। আর্য্যভট্টের মতবাদ খণ্ডনের নিমিত্ত ব্রহ্মগুপ্ত একটি আপত্তি তুলিয়াছিলেন—"আবর্ত্তনমুর্ব্ব্যাশ্চেন্ন পতন্তি সমুচ্ছ্রায়াঃ কস্মাৎ",—পৃথিবীর যদি আবর্ত্তনই থাকিবে, তবে সমুচ্ছ্রিত বস্তু পড়ে না কেন? টীকাকার পৃথুদক-স্বামী ইহার উত্তর দিয়াছিলেন—"পৃথিবীর আবর্ত্তন হইলে উচ্ছ্রিত বস্তু পড়িবে কেন? কারণ ঊর্দ্ধও যাহা, নিম্নও তাহা; বস্তুতঃ দ্রষ্টার অবস্থিতি অনুসারে ঊর্দ্ধাধঃ প্রভেদ হইয়া থাকে।"

জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে টাইকোব্রাহির পর কেপ্‌লারের আবির্ভাব জ্যোতিষের ক্রমিক উন্নতির ধারাবাহিক ইতিহাসে একটা প্রকাণ্ড অসঙ্গতি, অথচ নূতন আবিষ্কারের মাহেন্দ্রযুগ বলিয়া সূচিত হইয়াছে। টাইকোর পর্য্যবেক্ষণে ধারণা শক্তির যে অভাব ছিল, কেপ্‌লারের অত্যুজ্জ্বল প্রতিভা অনেকাংশে তাহার পূরণ করিয়া লইতে পারিয়াছিল। বস্তুতঃ, পর্য্যবেক্ষণশক্তি টাইকোর পরে কেপ্‌লারে অনেকটা লোপ পাইয়াছিল; কিন্তু গবেষণার দ্বারা উদ্ভাবনীশক্তির প্রভাবে কেপ্‌লার জ্যোতিষের উন্নতি ক্ষেত্রে একটা নূতন যুগের সূচনা করিয়া দেন। টাইকোব্রাহির দীর্ঘকালব্যাপী নির্ভুল পর্য্যবেক্ষণাবলীর সাহায্য লইয়া কেপ্‌লার গ্রহমণ্ডলের প্রকৃত গতি নির্ণয় করিতে অগ্রসর হইলেন। প্রথমেই পৃথিবীকে নিশ্চল ধরিয়া গ্রহগণের পরিলক্ষিত গতির নির্দ্ধারণ-প্রয়াসই স্বাভাবিক; কিন্তু এইরূপ ধারণার উপর নির্ভর করিয়া গ্রহগণের গতির একটা সুসংলগ্ন বিবরণ দেওয়া এক প্রকার অসম্ভব। খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে গ্রীসদেশে প্লেটো স্থির করিয়াছিলেন যে, গ্রহগণের বৃত্তাকার কক্ষায় ভ্রমণই সর্ব্বাপেক্ষা সরল ও সুসঙ্গত। প্রায় দুই সহস্র বৎসর যাবৎ পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদগণ এই মতবাদের উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন

করিয়া প্রতিবৃত্ত ও নীচোচ্চ-বৃত্তের সাহায্যে গ্রহসমূহের গতির একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। টলেমির সময় পর্য্যন্ত গণিত-জ্যোতিষের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল, কতকগুলি বৃত্তের কল্পনা করিয়া উহাদের সমবায়ে পরিলক্ষিত গ্রহগণের গতির একটা সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল বিবরণ লিপিবদ্ধ করা। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, এইরূপ চেষ্টা নিষ্ফল হইতে বাধ্য। কারণ, একে ত ঐরূপ উপায়ে গতির নির্দ্দেশ তেমন সর্ব্বতোভাবে নির্ভুল হইত না; তাহার উপর, ঐ অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যাটি এমন জটিল হইল যে, উহার দ্বারা জ্যোতিষের উন্নতি-চেষ্টা কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িল। ঠিক এই সময়ে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কেপ্‌লারের আবির্ভাব হয়। কেপ্‌লার টাইকোর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া, অধ্যাপকের মৃত্যুর পর তাঁহার অগাধ পর্য্যবেক্ষণ-লব্ধ গবেষণার উত্তরাধিকারী হইলেন। কয়েক বৎসর এই সকল গবেষণার সাহায্যে প্রাচীন নীচোচ্চ বৃত্ত-পদ্ধতির (epicyclical machinery) উপর নির্ভর করিয়া গ্রহগণের গতিবিষয়ে নূতন তথ্য উদ্ভাবন করিতে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু সফলকাম হইতে পারিলেন না। তখন তিনি, পৃথিবী যে নিশ্চল, এই মতবাদটি পরিত্যাগ করিলেন; এবং তৎপরিবর্ত্তে, পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। অবশ্য কল্পনাটি মৌলিক নহে; ইহার বহুকালপূর্ব্বে ভারতে ও পাশ্চাত্য প্রদেশে এইরূপ মতের প্রচলন ছিল। কিন্তু ইহা এক সময়ে একেবারে লোপ পাইয়া যায়। পরে ষোড়শ খৃষ্টাব্দে কোপার্নিকস ইহার পুনরস্থাপন করেন। কিন্তু তিনিও, গ্রহগণের বৃত্তমার্গে গতি—এই সিদ্ধান্তটি স্বীকার করিয়া লইলেন; এবং সেই জন্য আপনার নূতন মতবাদের উপযোগিতা সপ্রমাণ করিতে পারিলেন না। কেপ্‌লারই সর্ব্বপ্রথম এই নূতন সিদ্ধান্তের ঠিকমত প্রবর্ত্তন ও প্রচলন করিয়া জ্যোতিষের রাজ্যে যুগান্তর আনয়ন করিলেন। তিনি সৌরমণ্ডলের কেন্দ্রে সূর্য্যকে স্থিরভাবে স্থাপন করিলেন এবং টাইকোর পর্য্যবেক্ষণপ্রসূত ফলসমূহের বিশিষ্ট আলোচনার দ্বারা স্থির করিলেন, গ্রহগণের কক্ষা ঠিক বৃত্তাকার নহে, পরন্তু দুই পার্শ্বে চাপা অঙ্গুরীয়কের (ellipses) ন্যায় এবং ঐ অঙ্গুরীয়ক (বৃত্তাভাস) ক্ষেত্রের ব্যাসস্থিত বিন্দুদ্বয়ের একটীতে (one of the focii) সূর্য্য নিশ্চলভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। এইসকল পর্য্যবেক্ষণ হইতে কেপ্‌লার তাঁহার জগৎ-প্রসিদ্ধ তিনটি নিয়ম লিপিবদ্ধ করেন—

(১) সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তনকালে প্রত্যেক গ্রহ সমান সমান সময়ে সমান-সমান ক্ষেত্রাংশ অঙ্কিত করে।

(২) সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে গ্রহকক্ষাটি একটী অঙ্গুরীয়কের ন্যায়, এবং ঐ অঙ্গুরীয়ক-ক্ষেত্রের ব্যাসস্থিত বিন্দুদ্বয়ের একটীতে সূর্য্য নিশ্চলভাবে অবস্থিত।

(৩) গ্রহের পূর্ণ আবর্ত্তন সময়ের বর্গফল (square of the periodic time) অঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক-কক্ষার মধ্য-দূরত্বের ঘনফলের অনুবর্ত্তী (varies as the cube of the mean distance)।

কেপ্‌লারের এই তিনটি নিয়মের ফলে গণিত জ্যোতিষ একটা বাঁধা-ধরা গণ্ডীর মধ্যে আসিয়া পড়িল; গ্রহগণের গতি ও অবস্থান নির্ণয় অতিশয় সহজসাধ্য হইয়া আসিল এবং তাহাদিগের আবির্ভাব ও তিরোধানের পূর্ব্ব-সংবাদ দান গণিতের সাধারণ অঙ্কপাতের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া, কেপ্‌লারের অপূর্ব্ব প্রতিভার বিজয়-ঘোষণা করিতে লাগিল।

অপর দিকে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কেপ্‌লারের বিখ্যাত সতীর্থ গেলিলিয়ো, গণিত-জ্যোতিষের ভিত্তিমূলে যে কুসংস্কার-কীট আত্মগোপন করিয়া ছিল, তাহার ধ্বংস-সাধনে বদ্ধপরিকর হইলেন। তাঁহারই অদম্য উৎসাহের ফলে নবাবিষ্কৃত দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পর্য্যবেক্ষণ-সাপেক্ষ জ্যোতিষের বহু উন্নতি সাধিত হইল। অবশ্য এক্ষেত্রে তাঁহার সহকর্ম্মীর অভাব ছিল না। কিন্তু গেলিলিয়োর পর্য্যবেক্ষণগুলি কেপ্‌লারের সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল; এবং ইহাও কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, কেপ্‌লারের গ্রহগতি-নির্ণয়ের নিয়মগুলিও গেলিলিয়ো একেবারে অবগত ছিলেন না। এইরূপে দুই ভিন্ন প্রণালীতে দুইটি মনীষার প্রভাবে বিজ্ঞানের উন্নতি বেশ দ্রুত হইতে লাগিল। কিন্তু সমসাময়িক জ্যোতির্বিদগণের উপর গেলিলিয়োর প্রভাবই অধিক ছিল। এমন কি, যতদিন না নিউটন তাঁহার অপূর্ব্ব জ্ঞান-সৌধের ভিত্তিস্তম্ভরূপে কেপ্‌লারের নিয়মগুলিকে স্থাপন করিয়াছিলেন, ততদিন পর্য্যন্ত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উহাদিগের উপযোগিতা সাধারণের নিকট সুন্দর ভাবে প্রতিপন্ন হয় নাই। বস্তুতঃ, কেপলার ও গেলিলিয়ো দুইটি বিভিন্ন পথে আপন-আপন প্রতিভা নিয়োজিত করিয়াছিলেন। সুগঠিত দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে গ্রহগণের পর্য্যবেক্ষণ বিষয়ে গেলিলিয়োই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃতিত্ব দেখাইতে পারিয়াছিলেন। গেলিলিয়োর আবিষ্কৃত তথ্যগুলি সকলেরই বোধগম্য ছিল; কারণ, একটী দূরবীক্ষণ যন্ত্র লইয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলেই, উহাদের বিশুদ্ধতা ও নির্ভুলতা সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসার চরম উত্তর পাওয়া যাইত। গেলিলিয়োর পর্য্যবেক্ষণ-সামর্থ্য অতি অদ্ভুত ছিল। যেমন একদিকে অত্যাশ্চর্য্য পর্য্যবেক্ষণের শক্তি লইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ তাঁহার ব্যাখ্যান-প্রণালীও নূতন ও চমকপ্রদ ছিল। তিনিই পর্য্যবেক্ষণমূলক জ্যোতিষের প্রকৃত উন্নতি-বিধাতা এবং তাঁহারই পর্য্যবেক্ষণ-চাতুর্য্যকে ভিত্তি করিয়া জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর নির্ভুল বিবরণ লিপিবদ্ধ হইতে পারিয়াছিল।

এইবার গণিত-জ্যোতিষে মাধ্যাকর্ষণের নিয়মটি প্রবর্ত্তিত ও প্রচলিত হইলে, উহা উন্নতির আর একটী সোপানে উপস্থিত হইল। কেপ্‌লার যখন তাঁহার জগৎ-প্রসিদ্ধ নিয়ম তিনটি লিপিবদ্ধ করেন, তখন তিনি জানিতেন এবং বুঝিতে পারিয়াছিলেন, মাধ্যাকর্ষণের নিয়মটী তাঁহার আবিষ্কারের ক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল; কারণ, মোটামুটি মাধ্যাকর্ষণের ব্যাপারটি কেপ্‌লারের বহু পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। বস্তুতঃ, ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, প্রাচীন চিন্তাশীল জ্যোতিষিগণের উর্ব্বর মস্তিষ্কে ইহার একটী আবছায়া কল্পনাও জাগিয়া উঠিয়াছিল।

এমন কি, ইহা যে অঙ্কুর অবস্থায় ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের মনে স্থান পাইয়াছিল, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। বরাহমিহির লিখিয়াছেন—পৃথিবী কেন্দ্রের দিকে সকল বস্তু আকর্ষণ করিতেছে। ব্রহ্মগুপ্ত আর একটু বিশদ করিয়া বলিয়াছেন—প্রকৃতির নিয়মে সকল বস্তুই পৃথিবীর অভিমুখে পতিত হয়; কারণ, পৃথিবীর প্রকৃতিই আকর্ষণ ও ধারণ করা;—যেমন জলের প্রকৃতি বহিয়া যাওয়া, অগ্নির প্রকৃতি দগ্ধ করা ও বায়ুর প্রকৃতি গতির সৃষ্টি করা। যদিও মাধ্যাকর্ষণের তথ্যটি অঙ্কুর অবস্থায় প্রচলিত ছিল, এবং যদিও কেপ্‌লার ইহার উপযোগিতার বিষয়ে সবিশেষ অবগত ছিলেন, তথাপি ইহা পরিণতির অভাবে ফলপ্রসূ হইতে পারে নাই। জ্যোতিষের ক্ষেত্রে মাধ্যাকর্ষণ-তথ্যের প্রবর্ত্তন, বিস্তৃতি ও ব্যবহার নিউটনের অলোকসামান্য প্রতিভার অপেক্ষা করিতেছিল। গেলিলিয়ো, কেপ্‌লার প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ গ্রহসমূহের গতি সম্বন্ধে যে সকল মূল তথ্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সেই সমস্তকে ভিত্তি করিয়া তিনি দেখাইলেন, কেপ্‌লারের নিয়ম তিনটি মাধ্যাকর্ষণের একটী মাত্র তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই তথ্যটি এই—সূর্য্য স্বীয় কেন্দ্রের দিকে গ্রহগণকে আকর্ষণ করিতেছে। নিউটনের কথায় মাধ্যাকর্ষণের নিয়মটি এইরূপ ভাবে লিপিবদ্ধ করা যায়—"জড় পদার্থদ্বয় তত্তৎ বস্তুর পরিমাণানুসারে এবং তাহাদের দূরত্বের বর্গ-বিপর্য্যয়ে (inverse square) পরস্পরের অভিমুখে সরল পথে আকৃষ্ট হইতেছে।" এই মাধ্যাকর্ষণের ব্যাপার হইতে নিউটন যে তিনটি সর্ব্বজনবিদিত নিয়ম উদ্ভাবন করিলেন, তাহাও নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

১। কোনও দ্রব্যের অচল অবস্থা বা সরল পথে সমগতিত্ব অপর শক্তি দ্বারা প্রহত না হইলে পরিবর্ত্তিত হয় না।

২। অবস্থা পরিবর্ত্তন অপর শক্তির অনুপাতে ও অভিমুখে সংঘটিত হয়।

৩। প্রতি দুই পদার্থের সম্বন্ধ ঘাত-প্রতিঘাতাত্মক।

এই তিনটি গতিই জগতের স্বভাব। জগতে প্রতি পদার্থ অপর পদার্থকে স্ব-স্ব পরিমাণানুসারে ও পরস্পরের দূরত্ববর্গের বিপর্য্যয়ানুপাতে (inverse square of the distance) আকর্ষণ করে। বস্তুতঃ উপরিলিখিত গতিবিধির ধারণাই পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদ্যার ভিত্তিমূল। এই নিয়মের সাহায্যে নিউটন দেখাইলেন, সূর্য্য, পৃথিবী ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রহগণের আকর্ষণের ফলে চন্দ্রের এইরূপ বিশৃঙ্খল গতির উৎপত্তি। তিনি আরও বলিলেন, আমরা জানি পৃথিবীর আকৃতি ঠিক গোলকের মত নহে, পরন্তু উত্তর পার্শ্বে কিছু চাপা। পৃথিবীর ঐ স্ফীত অংশে সূর্য্য ও চন্দ্রের আকর্ষণ-ফলে অয়নাংশ (precession) হইয়া থাকে। এই একই কারণে জোয়ার-ভাটাও হইয়া থাকে। আর পৃথিবীর অংশগুলি পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে বলিয়া, এবং সেই অবস্থায় পৃথিবী স্বীয় অক্ষের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তিত হইতেছে বলিয়া, পৃথিবীর আকার ঠিক গোলকের ন্যায় নহে। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ নিয়মটি হইতে জ্যোতিষ্কগণের পরস্পরের পরিমাণ তুলিতে হইতে পারে। এইরূপে নিউটনের গবেষণার দ্বারা সৌরমণ্ডলে একটা শৃঙ্খলা স্থাপিত হইলে, সকল গতি-বৈষম্য ও বিশৃঙ্খলতার একটা হেতু পাওয়া গেল; এবং গণিতের দৃঢ় ভিত্তির উপর জ্যোতিষের প্রতিষ্ঠা হওয়ায়, উহা অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিকে উন্নতির পথে ধাবিত হইতে লাগিল।

নিউটনের এই আবিষ্কারটিকে জ্যোতিষের ভিত্তিমূলে স্থাপিত করিয়া, নূতন নূতন সূক্ষ্ম অথচ আবশ্যক তথ্য উদ্ভাবন করিবার নিমিত্ত গণিতের ও গতিবিজ্ঞানের বিশেষ উন্নতির একান্ত প্রয়োজন হইল। এই সময়ে পাশ্চাত্য ভূমিখণ্ডে বিশিষ্ট শক্তিসম্পন্ন তিনজন মনীষীর আবির্ভাব হইল—অয়লার (Euler), ক্লেরো (Clairaut) ও ডালাম্‌বার্ট (D' Alambert)। তাঁহারা প্রথমেই লক্ষ্য করিলেন, চন্দ্র-কক্ষার নীচ পাতবিন্দু, অর্থাৎ যে বিন্দুতে অবস্থান কালে চন্দ্র পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে আইসে, সেই বিন্দুটি কোন্ এক অজ্ঞাত কারণে দ্রুতগতিতে অগ্রে সরিয়া যাইতেছে। এই আপাত-বৈষম্যের ঠিক মত কারণ নির্দ্দেশ করিবার জন্য মাধ্যাকর্ষণের সাহায্য লইয়া তাঁহারা গতিবিজ্ঞানের পথে অগ্রসর হইলেন। প্রথমে (Euler) অয়লার তাঁহার অদ্ভুত প্রতিভাবলে ইহার মোটামুটি তথ্য নিরূপণ করিলেন। পরে ক্লেরো ইহার বিবৃতি সাধন করিয়া সবিশেষ কারণ লিপিবদ্ধ করিলেন। এইবার তাঁহারা গ্রহগণের গতিবৈষম্য গতিবিজ্ঞানের সাহায্যে বুঝাইতে সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, সৌরমণ্ডলের জন্ম, বৃদ্ধি এবং বোধ হয় ধ্বংসও ঐ একমাত্র মাধ্যাকর্ষণের তথ্যটির উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং যতদিন পর্য্যন্ত না মাধ্যাকর্ষণের আভ্যন্ত কারণ অবগত হওয়া যায়, ততদিন ঐ বিভিন্ন কক্ষবিহারী জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতি বিজ্ঞান যে এক গভীর রহস্যজালে আচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহার উন্মোচনের পক্ষে জ্যোতিষ বড় বেশী অগ্রসর হইয়াছে, এই কথা আমরা বলিতে পারিব না। তবে (Halley) হেলি যখন এই মাধ্যাকর্ষণ তথ্যটির অবলম্বনে স্বনামে প্রসিদ্ধ ধূমকেতুটির পুনরাবির্ভাবের সময় নির্দ্দেশ করিলেন, এবং উহাও যখন তাঁহার নির্দ্দেশিত সময়ে পুনরায় বিমানমার্গে আবির্ভূত হইল, তখন ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য, যে পর্য্যবেক্ষণের সাহায্যে মাধ্যাকর্ষণের চূড়ান্ত প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহাও নির্দ্দেশ করা বোধ হয় অসঙ্গত নহে যে, বিশুদ্ধ-গণিত বা গতিবিজ্ঞানের দ্বারা মাধ্যাকর্ষণের কারণ-নিদর্শন এই বিজ্ঞানের অত্যুন্নতির দিনেও ঘটিয়া উঠে নাই। তবে ইহাও বলা কর্ত্তব্য যে, যখন এডেমস্ (Adams) ও লাভেরিয়ার (Leverrier) এই মাধ্যাকর্ষণ নিয়মটির অবলম্বনে ইউরেনাস্ (Uranus) গ্রহের গতিবৈষম্য নিরূপণ করিতে গিয়া একটী অজ্ঞাত গ্রহের অবস্থিতি সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হইলেন এবং যখন তাঁহাদিগের এই ধারণা বিশিষ্ট পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত হইয়া পর্য্যবেক্ষণ-রাজ্যে জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের একটা প্রকাণ্ড বিজয়বার্ত্তা ঘোষিত করিয়া দিল, তখন নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তথ্যটিকে বিজ্ঞানের মহাসত্য, ধ্রুবসত্যরূপে গ্রহণ করিতে কাহারও কিন্দুমাত্র দ্বিধা থাকিতে পারে না। কারণ, সৌর-

মণ্ডল ও জ্যোতিষ্কমণ্ডলের গতিবিষয়ে মাধ্যাকর্ষণই একমাত্র নিয়ামক ও পরিচালক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

কেপ্‌লার ও নিউটনের পরে যে পাশ্চাত্য মনীষিগণের প্রতিভাগুণে জ্যোতিষ্‌ শাস্ত্রের এতটা দ্রুত উন্নতি হইতে পারিয়াছিল, তাঁহাদিগের মধ্যে জোসেফ লাগ্রাঞ্জ (Joseph Lagrange) ও সাইমন লাপ্‌লাস্‌ (Simon Laplace)এর নাম সর্ব্বপ্রথমেই উল্লেখযোগ্য। এই দুই মনীষীই কেপ্‌লার ও নিউটনের আবিষ্কৃত তথ্যকে ভিত্তি করিয়া গ্রহগণের বিষয়ে বিবিধ নূতন সত্যের উদ্ভাবন করিলেন, বস্তুতঃ এই সকল উদ্ভাবনার দ্বারাই মাধ্যাকর্ষণ নিয়মটির উপযোগিতা সম্বন্ধে চরম প্রতিপাদন হইলে, ইহার আদর ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিল। আপনার প্রতিভাবলে মৌলিক গবেষণার দ্বারা লাগ্রাঞ্জ চন্দ্রকক্ষার দোলন বিষয়ে (lunar libration) চূড়ান্ত প্রমাণ দিলেন। একদিকে যেমন লাগ্রাঞ্জ বিশিষ্ট গণিতজ্ঞরূপে আপনার কৃতিত্ব সংস্থাপিত করিতেছিলেন, অপরদিকে সেইরূপ তাঁহার সামসময়িক পণ্ডিত লাপ্‌লাস আপনার অদ্ভুত কল্পনাবলে ও ব্যাখ্যান-প্রণালীর গুণে অক্ষয় কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতেছিলেন। তাঁহাদিগেরই যুক্ত-প্রয়াসফলে সৌর-মণ্ডলের কক্ষাগত স্থিরতা (mechanical stability) অতি সুন্দর রূপে প্রমাণিত হইল। এই অত্যুজ্জ্বল মনীষা-প্রসূত গবেষণায় উভয়ের মধ্যে কাহার কতটা কৃতিত্ব, তাহা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করা সহজ নহে। যদিও এক্ষণে আমরা মোটামুটি উহা লাপ্‌লাসের প্রতিভা-সম্ভূত বলিয়াই ধরিয়া লই, তথাপি সত্যের খাতিরে বলিতে হয় যে, তাঁহারা উভয়ে পরস্পরের নিকট সমভাবে ঋণী,—একে অপরের সংশোধন ও সংস্কারের সাহায্য লইয়া গবেষণায় অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন। বস্তুতঃ, পরস্পরের আদান-প্রদানের দ্বারাই পূর্ব্ব-লিখিত সত্যটি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই আকর্ষণ-সাপেক্ষ জ্যোতিষের ইতিহাসে লাপ্‌লাসের চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি—চন্দ্রগতির স্থানীয় বেগ-বৃদ্ধি (secular acceleration) সম্বন্ধে কারণ নির্দ্দেশ। লাপ্‌লাস দেখিলেন, চন্দ্রের স্থানীয় গতি নির্দ্ধারণকালে গতির মীমাংসক রাশির একাংশ সময়ের বর্গফলের উপর নির্ভর করে, কাজেই গতির উত্তরোত্তর বেগ বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু লাপ্‌লাসের গবেষণায় কিছু ভুল রহিয়া গেল। তাঁহার বিচার প্রক্রিয়ায় তিনি ভূ-কক্ষার উৎকেন্দ্রতাকে (eccentricity) সদা-স্থির সংখ্যা ধরিয়া লইলেন; এবং শুধু শেষে উত্তর-ফল রাখিবার সময় উহাকে পরিবর্ত্তনশীল ধরিয়া একটু সংশোধন করিলেন। অবশ্য ইহাতে বিচার-পদ্ধতিটি অনেকটা সরল হইল এবং ইহাতে ঠিক ফল না পাইলেও একটা কাছাকাছি ফল পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, প্রাচীন ও আধুনিক সকল পর্য্যবেক্ষণ-প্রাপ্ত উত্তরের সহিত ইহার বেশ সামঞ্জস্য হইল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অধ্যাপক এডেমস্‌ (Adams) এই রহস্যের উদ্‌ঘাটন করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি আদি হইতে সংশোধন করিতে সচেষ্ট হইলেন; এবং আরম্ভেই বিচার প্রক্রিয়াতে ভূ-কক্ষার উৎকেন্দ্রতাকে (eccentricity) পরিবর্ত্তনশীল মানিয়া লইলেন। এতনির্ভুল বিচার-পদ্ধতি সত্ত্বেও তিনি যে উত্তর পাইলেন, তাহা লাপ্‌লাসের উত্তরের অর্দ্ধেক হইল এবং কাজেই পর্য্যবেক্ষণ-লব্ধ উত্তরেরও প্রায় অর্দ্ধেক হইল। সুতরাং অধ্যাপক এডমসের সকল চেষ্টা একরূপ পণ্ড হইল মাত্র। এই জন্য আমাদিগের মনে হয়, কেবল ভূ-কক্ষার উৎকেন্দ্রতা পরিবর্ত্তনশীল ধরিলে চলিবে না। এমন কোনও অজ্ঞাত কারণ নিশ্চয়ই আছে, যাহার ফলে উৎকেন্দ্রতার পরিবর্ত্তন-জনিত অসামঞ্জস্য নিরাকৃত হইতেছে। যাহা হ'ক, ইহার সম্যক্‌ বিচার ভবিষ্যদ্বংশীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের গবেষণার অপেক্ষা করিতেছে। ইহার পর গ্রহগতি সম্বন্ধে যে সকল তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, সে সকল আর একটী প্রবন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

ইহাই মোটামুটি বর্ত্তমান যুগের জ্যোতিষ-শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। জ্যোতিষ শাস্ত্রের এই যে ধারাবাহিক উন্নতি, ইহাও অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বিজ্ঞানের শৈশবে গগনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া পরিদর্শক-গণ মনে করিতেন—বুঝি পৃথিবী স্থির, বুঝি বা সূর্য্য, চন্দ্র ও গ্রহমণ্ডলী একটার উপর আর একটা এইরূপ পৃথক-পৃথক্‌ ব্যোমে সংলগ্ন রহিয়াছে —যেন একটী চন্দ্রের ব্যোম-কক্ষা, একটী বুধের ব্যোম-কক্ষা, একটি বৃহস্পতির ব্যোম-কক্ষা এইরূপ পৃথক্‌ পৃথক্‌ ব্যোম-কক্ষায় চন্দ্র, বুধ, বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহগণ অবস্থান করিতেছে; এবং নিজ-নিজ পথে পরিক্রমণ করিয়া বৃত্তমার্গ অঙ্কিত করিতেছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রথম অবস্থায় এই ধারণ টিই তাঁহারা লিপিবদ্ধ করিলেন—

> ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে পরিধির্ব্যোমকক্ষাভিধীয়তে।
> তন্মধ্যে ভ্রমণং ভানামধোহধঃ ক্রমশস্তথা ॥
> মন্দামরেজ্যভূপুত্র সূর্য্যশুক্রেন্দুজেন্দবঃ।
> পরিভ্রমন্ত্যধোঽধস্থাঃ সিদ্ধবিদ্যাধরা ঘনাঃ ॥
> মধ্যে সমন্তাদণ্ডস্য ভূগোলো ব্যোম্নি তিষ্ঠতি।
> বিভ্রাণঃ পরমাং শক্তিং ব্রহ্মণো ধারণাত্মিকাম্‌ ॥

ব্রহ্মাণ্ডের মধ্য-পরিধির নাম ব্যোম-কক্ষা তাহাতে নক্ষত্রগণের ভ্রমণ। তন্নিম্নে ক্রমে শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল, সূর্য্য, শুক্র, বুধ, চন্দ্র পরিভ্রমণ করিতেছে। তাহার নিম্নে সিদ্ধ বিদ্যাধরগণ ও সর্ব্বনিম্নে মেঘসকল অবস্থিত। ব্রহ্মার ধারণাত্মিকা পরমাশক্তি বলে ভূলোক গর্ভকেন্দ্রে অবস্থিত। ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্ব প্রদেশের ব্যোম ভূলোককে বেষ্টন করিয়া আছে।

ক্রমে যখন জ্যোতিষের অল্পমাত্র উন্নতি সাধিত হইল, তখনই পর্য্যবেক্ষণের উপযোগিতা অনুভূত হইল; এবং শীঘ্রই ইহা প্রতীয়মান হইল যে, যদিও এরূপ একটা সহজ কারণ নির্দ্ধারণের দ্বারা সূর্য্য ও চন্দ্রের গতি নির্দ্দেশ করা সম্ভবপর; তথাপি এত সহজে গ্রহগণের জটিল গতি-সমস্যার মীমাংসা মোটেই সম্ভবপর ছিল না। সুতরাং জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ উহাদের গতি নিরূপণ করিতে গিয়া স্থির করিলেন, সূর্য্য ও চন্দ্র নিশ্চল ভূলোককে কেন্দ্র করিয়া ভ্রমণ করিতেছে আর সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে গ্রহগণ পরিক্রমণ করিতেছে। কিন্তু ইহাতেও একটা অসঙ্গতি দেখা দিল। অবশ্য যদি গ্রহ-কক্ষা বাস্তবিক বৃত্তাকার হইত এবং ভূ-কক্ষার

হিত একই তলভাগে অবস্থিত থাকিত, তাহা হইলে ঐরূপ মীমাংসা অনেকটা নির্ভুলরূপেই গ্রহগণের গতি নির্দ্দেশ করিতে পারিত। কিন্তু গ্রহ-কক্ষার প্রকৃতি অতটা সরল নহে। এই জন্যই বিবিধ জটিলতাপূর্ণ নীচোচ্চবৃত্ত ও প্রতিবৃত্তের (epicycles and eccentrics) প্রবর্ত্তন অনিবার্য্য হইয়া পড়িল। ইহাতেও বড় সুবিধা হইল না। কাজেই, পৃথিবী যে স্থির, এই ধারণাটি চির-বিসর্জ্জিত হইল। এই সময়ে কেপ্‌লারের আবির্ভাবে গ্রহগণের গতি-সমস্যা এত সরল ও সুন্দররূপে নির্দ্দেশিত হইল যে, গতি-বিজ্ঞানের ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া জ্যোতিষের ক্রমিক উন্নতির ধারা অব্যাহত ভাবে প্রধাবিত হইল। তাহার পরে নিউটনের অদ্ভুত মনীষার ফলে মাধ্যাকর্ষণ তথ্যের আবিষ্কার হইলে, গণিত-জ্যোতিষের রাজ্যে এক নূতন যুগের সূচনা হইল। যেমন রজনীর গভীর অন্ধকারের শেষে ঊষার অরুণচ্ছটা বাতায়নের পার্শ্ব দিয়া প্রবেশ লাভ করে, ক্রমে বালার্কের আলোকরশ্মি স্ফুটতর হইয়া গৃহপ্রাঙ্গণ প্লাবিত করে, আর সেই ধ্বান্তারি অংশুমালী গগনের ঊর্দ্ধভাগে উঠিতে থাকে, ঠিক সেইরূপ জ্যোতির্বিজ্ঞানও প্রথমে দুই এক স্থানে ফুটিয়া উঠিয়া, ক্রমে বিস্তৃতি লাভ করিয়া সভ্য জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে; আর শিক্ষার গগনে বিজ্ঞান-রবি ক্রমেই ঊর্দ্ধে উঠিতেছে। কিন্তু বোধ হয় এখনও সেই বিজ্ঞান-রবি মধ্য গগনে উপনীত হইতে পারে নাই,—পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে পশ্চিমাভিমুখে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াছে মাত্র।

তার পর যখন দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে নভোমণ্ডলের অসীমতা ও অনন্ত রহস্যের কথা হৃদয়ঙ্গম করি, এবং যখন আলোক-চিত্র গ্রহণ করিয়া নির্জ্জনে ইহার অপরূপ ঐশ্বর্য্যের বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে থাকি, তখন আমরা বুঝিতে পারি, আমরা যত সংস্কৃত ও সুগঠিত পর্য্যবেক্ষণ যন্ত্রের অধিকারী হই না কেন, আমরা ঐ অনন্ত নক্ষত্র-খচিত আকাশ-গঙ্গার আলোক-নির্ঝরের কতটুকু বিশ্লেষণ করিতে পারিয়াছি;—এমন কোনও যন্ত্র আমরা আবিষ্কার করিতে পারি নাই, যাহাতে নক্ষত্রগণকে বৃহদায়তন করিতে পারি। তাহারা আমাদিগের নিকট বিন্দুবৎই রহিয়া গিয়াছে, সৌরমণ্ডলের আয়তনের তুলনায় তাহাদিগের আকার এবং সৌরমণ্ডল হইতে তাহাদিগের দূরত্ব কেবল অসীম বলিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছি। বস্তুতঃ বিজ্ঞানের অত্যুন্নতির দিনেও আমরা বলিতে বাধ্য যে, প্রাচীন পর্য্যবেক্ষণকারিগণ ব্রহ্মাণ্ডকে যে অচ্ছেদ্য রহস্যজালে আবৃত দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলেন, তাহার বড় বেশী আমরা উদ্‌ঘাটিত করিতে পারি নাই; এবং আমরা এই জ্ঞান-গরিমার যুগেও আমাদিগের প্রাচীন ঋষিগণকে অদৃষ্টবাদী ও ধর্ম্মান্ধ বলিয়া বিদ্রূপ করিতে পারি না—যখন সেই সুদূর মানব-সভ্যতার শৈশবে তাঁহারা এই কুহকাবিষ্ট অথচ অপরূপ রহস্যধার বিশ্বকে নিরীক্ষণ করিয়া নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে সর্ব্বশক্তিমান্ পরব্রহ্মের চরণে প্রণত হইয়া বলিতেন—

> অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।
> সমস্ত জগদাধার মূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ॥

যিনি অচিন্ত্য অব্যক্ত, নির্গুণ অথচ গুণাত্মক, সেই সমস্ত জগতের আধার মূর্ত্তি ব্রহ্মকে নমস্কার করি।

স্মৃতির সমাধি

[শ্রীহিরণকুমার রায়চৌধুরী বি-এ]

বহুকাল পূর্ব্বে একবার শারদীয়া পূজা উপলক্ষে লক্ষ্ণৌ-ভ্রমণে গিয়াছিলাম। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় গোমতীর পুল পার হইয়া অস্তগামী সূর্য্যের ম্লান-কিরণ-রঞ্জিত, জন-কোলাহল-বিহীন পল্লী-অভিমুখে ভ্রমণ করিতে যাইতাম।

সেদিন সপ্তমী। শুভ্র লঘু মেঘখণ্ডের অন্তরালে মৃদু জ্যোৎস্না ফুটিয়া উঠিয়াছে। চারিদিকে চাঁদের আলো। গোমতীর জলে কে যেন আলোর ফুলঝুরি ফুটাইতেছিল। তপ্ত ধরণী যেন চাঁদের স্নিগ্ধ আলোকে আপনার নিহিত মর্ম্ম-বেদনা জুড়াইতেছিল।

অলস-মন্থর চরণে একটী প্রায়-জন-শূন্য গ্রামের মধ্য দিয়া আসিতেছিলাম। গভীর, মধুর মাদকতাময় সোণালী জ্যোৎস্না নীরব গ্রামখানির উপর একটা স্বপ্নময় আবরণ টানিয়া দিয়াছিল। আনমনে চলিতে চলিতে সহসা একটী ধ্বংসোন্মুখ বিশাল অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। স্থানটী বড়ই নির্জ্জন। দেখিলেই মনে হয় যেন কি একটা মৌন বিষাদ ইহাকে ঘেরিয়া রাখিয়াছে। বড় বড় গাছগুলির ঘন কালো ছায়া ভেদ করিয়া চন্দ্রকিরণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

নিবিষ্ট মনে আলোক-ছায়ায় রচিত এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেছি, এমন সময়ে পশ্চাতে পদশব্দ শুনিয়া চকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিলাম, একটী বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাকে অভিবাদন করিলে,

তিনি স্মিত মুখে বলিলেন, "বাবুজি, এই যে বিশাল ভবন দেখিতেছেন, ইহা এক কালে শিল্পের অপূর্ব্ব নিদর্শন ছিল। ইহার পরিকল্পনা দিল্লীর বাদশাহী মহালকেও কারুকার্য্যনৈপুণ্যে পরাস্ত করিয়াছিল; কিন্তু শক্তিময় কালের কঠোর শাসনে আজ ইহার সমস্ত বিভব বিশুষ্ক ফুলদলের মত ঝরিয়া গিয়াছে। কেবল একটী ব্যর্থ প্রেমকাহিনীর করুণ নৈরাশ্যময় স্মৃতি এই প্রাসাদের প্রতি ইষ্টকখণ্ডের সহিত বিজড়িত রহিয়াছে।"

কাহিনী শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করায়, তিনি আমাকে প্রাসাদ-মধ্যস্থিত একটী সুবৃহৎ চত্বরে লইয়া গেলেন। তরু-বীথিকা-অন্তরালে হসিত চন্দ্রালোকে মর্ম্মর গঠিত একটী সমাধি-পার্শ্বে বসিয়া তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন।—

"দুই শত বৎসরেরও পূর্ব্বে সেলিম শা এই বিরাম-সদন নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। আজ যে শ্রীবিহীন প্রাসাদ দেখিতেছেন, তখন ইহা দীপোজ্জ্বল নাট্যশালার ন্যায় শত চক্ষুর মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। ইহার প্রতি কক্ষে কত অতৃপ্ত বাসনা, কত ব্যর্থ প্রতীক্ষা, কত মধুর মিলন, কত সপ্রেম স্নেহসম্ভাষণ, কত সুখ-দুঃখ, কত বিয়োগ, কত অশ্রু বিজড়িত রহিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? শত যৌবন-কুসুম-পেলবা, অলোকসামান্যা রূপ-লাবণ্যময়ী তরুণী ইহার শোভা বর্দ্ধন করিত। আলোকাম্বরা চিরহাস্যময়ী ঊষার আগমনের সঙ্গে-সঙ্গেই সমগ্র ভবন আবেগময় সঙ্গীত-প্রবাহে মুখর হইয়া উঠিত এবং সন্ধ্যা-সমাগমে শত দীপমালা ইহাকে আলোক-সৌন্দর্য্যময় করিয়া তুলিত। প্রায় প্রত্যহ প্রদোষ সময়ে নবাব বিশ্রাম-ভবনে উপস্থিত হইতেন। তখন অখণ্ড উল্লাস-হিল্লোল যেন আকুল বায়ু-প্রবাহের মত প্রতি কক্ষ-দুয়ারে ও বাতায়নে উছলিয়া উঠিত। অপ্সরা-বিনিন্দিত কণ্ঠের সুস্বর গীতলহরী ও তাল লয়-নন্দিত নূপুরের নিক্কণ কুসুম-গন্ধ-স্নিগ্ধ বায়ুস্তরকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিত। উচ্ছ্বাসময়ী গোমতী ক্ষুদ্র বীচিমালিনী হইয়া সে উৎসবে যোগদান করিত। এক বিরাট আনন্দ রাগিণী যেন জলে, স্থলে, গগনে, পবনে সর্ব্বত্রই ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিত।

"হায়, সে কি দিনই গিয়াছে! কত গভীর রাজনীতি, কত মন্ত্রণা, কত ঐশ্বর্য্য, অবাধ বিলাস-প্রবাহে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে। স্ফটিকাধারস্থিত ফেনিলোজ্জ্বল কত তীব্র বিষময়ী মদিরা, কত চঞ্চল আবেশময় কটাক্ষ, কত লাস্য, কত কম্পিত চরণ-ভঙ্গ, কত আবেগ, কত সরম-বিজড়িত মৃদু প্রণয়-বাণী, কত বেদনা, কত বাসনা—আজ সকলই কোন্ অতীত মহিমাতটে সমাহিত।

"আজ যাঁহার সমাধি-সমীপে আমরা উপবেশন করিয়া আছি, এই গুলনেয়ার বেগমই ছিলেন নবাবের প্রিয়তমা। কৈশোরের কোন্ অজ্ঞাত নবীন প্রভাতে এই সুদূর-বাসিনী আরাম-মঞ্জিলের কক্ষ সুশোভিত করিয়াছিলেন, তাহা কেহই বলিতে পারে না। ইতিহাসে তাহা অখ্যাত হইলেও সৌন্দর্য্য সম্ভারে সে নবাবের অন্য সকল বেগমকে নিষ্প্রভ করিয়াছিল। রস-পরিপূর্ণ সুপুষ্ট দাড়িম্বের মত তাহার দেহলাবণ্য যৌবনভারে বিকশিত ছিল। তাহার হাসি ও অশ্রু উভয়ই সমভাবে প্রেমিকের মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। সে যখন তাহার অলক্ত-রঞ্জিত, কুসুম-কোমল চরণ বিক্ষেপ করিত, তখন চারিদিকস্থ সুপ্ত সৌন্দর্য্য যেন জীবনী-শক্তি লাভ করিত। প্রতি কথাটী, দৃষ্টিপাতটী, মিলন-রাগিণী-ঝঙ্কৃত করিত। রূপ-বিমুগ্ধ নবাব তাঁহার নবজাগ্রত হৃদয়ের সমস্ত কামনা, সমস্ত প্রেম অযাচিত ভাবে এই তরুণীর পদপ্রান্তে উপহার দিয়াছিলেন। তাঁহার ধ্যান ও ধারণার উপাস্য মাত্র ছিল এই স্নেহময়ী, মাতৃক্রোড়চ্যুতা, স্বজনপরিহিতা তরুণী। জীবনে যেন তাঁহার অন্য কিছুই লাভ করিবার ছিল না। এই অজ্ঞাত-কুলশীলা সুন্দরীই যেন তাঁহার জীবনে শ্রেয়সী ও প্রেয়সী ছিল।

উচ্ছ্বসিত সিরাজী ও ললিত নৃত্যনৈপুণ্য নবাবের দিনগুলি মোহ ও স্বপ্নের ভিতর দিয়া চালিত করিতে লাগিল। রাজ্য-লিপ্সা, শাসন, দণ্ড প্রভৃতি কোথায় ভাসিয়া গেল।

কিন্তু চিরদিন কাহারও সমান যায় না। নিভৃতে কল্পনায় আশার মোহিনী তুলিকা দিয়া মানব যে বর্ণ-বৈচিত্র্যময়, অনাগত চিত্র অঙ্কিত করে, বাস্তব ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে তাহা ধূলিকণার ন্যায় শূন্যতায় বিলীন হইয়া যায় এবং কোন অদৃশ্য নিপুণ চিত্রকরের হস্তে তাহার বিনিময়ে এক সম্পূর্ণ নবীন চিত্র পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

রজনী সেদিন জ্যোৎস্নাময়ী ছিল। সমস্ত নীলাকাশ ভরিয়া হীরক-দীপ্তি নক্ষত্ররাজি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। স্নিগ্ধ চাঁদের আলো ও সুগন্ধ পবন প্রাণের মধ্যে একটা

ব্যথাভরা আবেগ জাগাইয়া তুলিতেছিল। মর্ম্মর-মণ্ডিত অলিন্দোপরি পারস্য-দেশ-জাত বহুমূল্য গালিচার উপরে নবাব অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় ছিলেন এবং শুভ্র চাঁদের আলোক রূপজ্যোতিঃতে ম্লান করিয়া একটু দূরে গুলনেয়ার বসিয়া ছিলেন। উভয়েই নির্ব্বাক্। কি এক সুখ-স্বপ্ন যেন উভয়কেই বিভোর করিয়া তুলিয়াছিল।

সহসা সেই সুপ্ত জ্যোৎস্নালোক কম্পিত করিয়া দূরে বাঁশরী বাজিয়া উঠিল। নবাব ও বেগম দুইজনেই চমকিত হইয়া উঠিলেন। বাঁশীর স্বর ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে উঠিতে লাগিল। চন্দ্রালোক প্লাবিত করিয়া সেই অশ্রান্ত করুণ রাগিণী প্রবাহিত হইতে লাগিল। সে যেন এক বিরহীর তপ্ত আকুল ক্রন্দন।

আবেশবিহ্বলময়ী মৌনা প্রকৃতি আজি উৎসবময়ী। চারিদিকে কি মহান্, কি বিরাট ঐশ্বর্য্যের সমাবেশ! মৃদু-পবন-কম্পিত শ্যামল প্রান্তর চন্দ্র-কিরণে সমুদ্ভাসিত— দূরে উচ্ছ্বাসময়ী গোমতী। প্রাণের সমস্ত আকুল আশা ও আকাঙ্ক্ষা যেন শরীরিণী হইয়া এই সৌন্দর্য্য-পান-লালসায় উন্মুখী হইয়া আছে। সহসা এ কাহার হৃদয়ের ব্যর্থ মৌন প্রেমগীতি আজি মুখরিত হইয়া উঠিল। কোথায় সে! কি তাহার কামনা! কোন্ সাধনার ধন আজ সে হারাইয়া ফেলিয়াছে! বহুক্ষণ বাজিয়া হতাশ বাঁশীর সুর দিশাহারা হইয়া দিগন্তে বিলীন হইয়া গেল। বাঁশীর গান শুনিতে-শুনিতে নবাব নিদ্রামগ্ন হইলেন। সেদিনকার মত উৎসব সমাপ্ত হইল।

প্রত্যহ বাঁশী বাজিতে লাগিল। সন্ধ্যার ম্লান ছায়া জমাট বাঁধিয়া আসিলে, রজনীর রহস্যের মত কখনো করুণ সুরে, কখনো বা উদ্দাম পবনের মত বাঁশী আকাশ ও ধরণী প্লাবিত করিতে লাগিল। ক্রমে-ক্রমে সকলেই সেই বাঁশীর সঙ্গীতের প্রতি উদাস হইয়া পড়িল। একমাত্র গুলনেয়ার বেগম ব্যতীত সে সঙ্গীত আর কাহারও চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিত না। বাঁশী বাজিতে আরম্ভ করিলে গুলনেয়ার যেন সকলই ভুলিতেন। তাঁহার হৃদয় যেন কি এক ভাবে অভিভূত হইয়া যাইত। কত কালের কোন্ দীপ্তোজ্জ্বল অতীতের মহিমময় ছবি স্মৃতি-স্নাত নিভৃত হৃদয়-কোণে ফুটিয়া উঠিত। আত্মহারা হইয়া প্রতি ইন্দ্রিয় দিয়া তিনি সে সঙ্গীত যেন পান করিতেন। প্রাসাদের শত প্রমোদ-তরঙ্গ তখন তাঁহাকে বাঁধিতে পারিত না। কোন্ সীমাহীন শব্দহীন নীলিমার অন্তরালে যেখানে সেই অজ্ঞাত অদৃষ্ট বাঁশীর সুর লহরী গুঞ্জরিত হইতেছে, সেখানে ছুটিয়া যাইত।

সেদিন নবাব কোন গুরু রাজকার্য্যোপলক্ষে অনুপস্থিত। সঙ্গীত-মুখর প্রাসাদ মৌন। প্রাসাদসংলগ্ন পুষ্প-বীথিকা মধ্যে শূন্যমনে গুলনেয়ার একাকিনী বসিয়া ছিলেন। এমন সময়ে গগনতল প্লাবিত করিয়া বাঁশী বাজিয়া উঠিল। সচকিতা গুলনেয়ার একাগ্রচিত্তে বাঁশীর গান শুনিতে লাগিলেন। বাঁশী আজ কত না করুণ সুরে বাজিতে লাগিল। কে যেন তাহার ভগ্ন হৃদয়ের প্রতি সজল কাহিনী বাঁশরী রন্ধ্রে ফুটাইয়া তুলিতে লাগিল। এক নিষ্ফল পরিম্লান বাণী অন্তহীন বায়ুস্তরের মধ্য দিয়া সমগ্র বিশ্ব ছাইয়া ফেলিল। বাঁশীর সুর ধীরে-ধীরে স্পষ্টতর হইতে লাগিল। গুলনেয়ার নিবিষ্ট চিত্তে শুনিতে লাগিলেন। সহসা বাঁশী নীরব হইয়া গেল। গুলনেয়ার মুখ তুলিয়া দেখিলেন, ফুল্ল জ্যোৎস্নালোকে এক অনিন্দ্য-কান্তি যুবক দণ্ডায়মান।

দৃষ্টিমাত্রেই গুলনেয়ার তাহাকে চিনিতে পারিলেন। সে তাঁহাদের প্রতিবেশী ছিল; শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হইয়া তাঁহার পিতৃগৃহে আশ্রয় প্রাপ্ত হয়। তাঁহার অন্তর মধ্যে গত জীবনের শত স্মৃতি নিমেষমধ্যে মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠিল।

দূর পারস্যের নির্ঝর শীতল কোন এক পার্ব্বত্য পল্লী-কুটীরে দেবকন্যার ন্যায় রূপলাবণ্যময়ী এক ক্ষুদ্রা বালিকা ও সবল সুস্থকায় এক কৃষক-দম্পতি। তাহাদের কোন অভাব ছিল না। দরিদ্রের কুটীরে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য উছলিয়া পড়িত। কৃষক ও তাহার শ্রমপরায়ণা পত্নীর যত্নে উৎপন্ন শস্যে ও অনায়াসলব্ধ ফলমূলে তাহাদের জীবিকা সহজেই নির্ব্বাহ হইত। বিলাস, ঐশ্বর্য্য ও ভোগলিপ্সা তাহাদের নিকট চির-অপরিচিত ছিল। তাহাদের জগৎ, তাহাদের সুখ-দুঃখ সেই পর্ব্বত-পরিবেষ্টিত তরুচ্ছায়াচ্ছন্ন ক্ষুদ্র গ্রাম-খানির মধ্যে আবদ্ধ ছিল।

প্রতি প্রভাতে প্রথম অরুণ-আলোকে বিহঙ্গ-কলরবে জাগরিত হইয়া অখণ্ড শান্তি ও অবাধ আনন্দের মধ্য দিয়া তাহাদের দিনগুলি সন্ধ্যার কালো ছায়ায় মিশিয়া যাইত। অস্তগামী সূর্য্যের কনক কিরণে সমস্ত পর্ব্বত ও বনস্থলী

তখন রঞ্জিত হইয়া উঠিত, তখন নির্ঝরের অগভীর স্বচ্ছ বারিরাশিতে উপর্য্যুপরি উপলখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া তাহারা কত না আনন্দ লাভ করিত। সন্ধ্যা-সমাগমে প্রতি কুটীর-প্রাঙ্গণে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিখণ্ডের পার্শ্বে বসিয়া তাহারা কত গল্প, কত কাহিনী শ্রবণ করিত; এবং তাহাদের অবাধ কল্পনা মধুর স্মৃতি বহন করিয়া কোন দূর অতীতের অজ্ঞাত রহস্যময় রাজ্যে আশ্রয় লাভ করিত। আবার যখন নিদাঘ সময়ে স্নিগ্ধ শুভ্র চাঁদিনী নৈশ বন প্রকৃতিকে আলোক-ছায়ার আলিম্পনে চিত্রিতা করিত, তখন পল্লীবালাগণ দলে-দলে মধুর সঙ্গীত-ঝঙ্কারে আনন্দ ও তৃপ্তি বিলাইত। জীবনের প্রথম প্রভাতে যে সুখ, যে আনন্দ নিত্য সহচর ছিল, এতদিনের বিলাস-তরঙ্গ তাহাদের একেবারে মুছিয়া দিতে পারে নাই। নিকষে সুবর্ণ-রেখার ন্যায় মাঝে-মাঝে মরমের নিভৃত প্রান্তে বিদ্যুদ্দাম-স্ফুরণের ন্যায় তাহারা ক্ষণেকের জন্ম ফুটিয়া উঠিত।

ধীরে ধীরে আপনাকে সংযত করিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গুলনেয়ার মারয়ান্‌কে জনক-জননীর কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। নিষ্ঠুর পণ্য-দাস-ব্যবসায়ী গুলনেয়ারের অতুল্য দেব-বাঞ্ছিত দেহ-লাবণ্যে প্রলুব্ধ হইয়া নবাবের প্রাসাদ-কক্ষ পরিশোভনের নিমিত্ত অপহরণ করিবার পর তাঁহার পিতামাতা শোকে একান্ত অভিভূত হন। যখন অনুসন্ধান ও উদ্ধারের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল, তখন সকলেই তাঁহার জীবন সম্বন্ধে হতাশ্বাস হইলেন। আর মরিয়ন্ শিশুকাল হইতেই গুলনেয়ারের সহিত একত্র পালিত ও একই জনক-জননীর স্নেহধারায় লালিত হইয়া, বয়োবৃদ্ধির সহিত সংগোপনে যে আশা পোষণ করিতেছিল, তাহা মুকুলিত হইয়াই ঝরিয়া গেল। যে ধরণী এতদিন সুন্দরী, সুখময়ী হইয়া শীর্ণা ও বীভৎসতার সমস্ত সৌন্দর্য্য ও বিচিত্রতাহীনা ছিল, আজি যেন সহসা সে আধারে পরিণত হইল। বিপুলা পৃথিবীর এক প্রান্তে মুকুলিত বয়সে জনকের অম্লান স্নেহ ও জননীর নিঃস্বার্থ প্রীতিহারা হইয়া সে নূতন করিয়া যে স্নেহ নীড় রচনা করিতেছিল, ভাগ্যদেবতার মৃদু অঙ্গুলি-সঞ্চালনে নিমেষে তাহার অবসান হইয়া গেল।

কত মধুর প্রভাত তাহার শিশির-সিক্ত কুসুমদল লইয়া আসিল, কত মৌন সন্ধ্যা তাহার নীরব সঙ্গীত গাহিয়া চলিয়া গেল, কত পুরাতন বর্ষ অতীতে চলিয়া পড়িল, কত নবীন বর্ষ তাহার বর্ণ-গন্ধ-গানে নিখিল বিশ্বে পুলকের ও প্রাণ-হিল্লোল আনয়ন করিল, কত বিরহের, কত ব্যথার অবসান হইয়া গেল; তথাপি এই দরিদ্র-কুটীরে যে দুঃখ জমাট বাঁধিয়াছিল, তাহার বিন্দুমাত্র অবসান হইল না। অবিসম্বাদী সুরের ন্যায় তাহা যেন সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে এক তানে বাজিতে লাগিল।

বৎসরের পর বৎসর আসিয়া ব্যবধান সৃজন করিতে লাগিল। ক্ষুদ্র পল্লীর ভীতি-চঞ্চল ভাব বিগত হইয়া ক্রমশঃ পূর্ব্বের শান্ত, সৌম্য অবস্থা ফিরিয়া আসিল। প্রতিবেশী-বর্গ গুলনেয়ারের বেদনা-ব্যথিত স্মৃতিকথা প্রসঙ্গচ্ছলে উত্থাপন ব্যতীত আর কখন তুলিত না। এমন কি কাল-মাহাত্ম্যে বৃদ্ধ কৃষক-দম্পতিরও শোকাবেগ মন্দীভূত হইয়া আসিল। কিন্তু প্রেমের চির-বিজয়িনী শক্তি মরিয়নের নিকট গুলনেয়ারের স্মৃতি অম্লান ও অক্ষয় করিয়া রাখিল। তিলে-তিলে সঞ্চিত, রুদ্ধ গৈরিক প্রবাহবৎ অসীম প্রেমরাশি প্রতিদিন প্রগাঢ় হইতে লাগিল।

যখন আত্মীয়বর্গের বিফল অনুসন্ধানের পরিসমাপ্তি হইল, তখন মরিয়ন্ সহসা একদিন গুলনেয়ারের সুখৈশ্বর্য্যের সংবাদ লইয়া আসিল। পূর্ব্বদেশ-প্রত্যাগত কোন বণিকের নিকট সে এই অপ্রত্যাশিত সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিল। কৃষক-দম্পতি এ সংবাদে একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। প্রতি প্রভাতে যে সঞ্জীবিত আশা সন্ধ্যায় ম্লান হইয়া যাইত, বহুবর্ষ পরে অতীতের কোন রহস্যময় অন্তরাল হইতে সে শরীরিণী হইয়া দেখা দিল। মরিয়নের যেন বহু সাধনার ধন আজি অকস্মাৎ মিলিয়া গেল। গুল-নেয়ারের শত স্মৃতি তাহাকে যেন সতত কণ্টকে বিদ্ধ করিত। দিবসের ধ্যান ও ধারণা ও নিশীথের স্বপ্ন ছিল গুলনেয়ার। মরিয়নের পরম যত্ন ও সাধনার বংশী, যাহা প্রতি সায়াহ্নে উদার আকাশ ও মৌন বনস্থলীকে উচ্ছ্বাস-মুখর করিত, যেন চিরতরে মূক হইয়া গিয়াছিল। বহুদিন পরে আজি আবার তাহার সুরলহরী বায়ুস্তরে মৃদু কম্পন জোগাইয়া তুলিল। কিন্তু আজি যেন তাহাতে অতীতের আনন্দ ও সুখের একান্ত অভাব ছিল। এ যেন ভগ্ন হৃদয়ের আকুল দীর্ঘশ্বাস। উচ্ছ্বসিত শোকোচ্ছ্বাস যেন বাঁশীর রন্ধ্রে-রন্ধ্রে গুমরিয়া উঠিতে লাগিল। শত চেষ্টাতেও আর যেন নিভৃতে নীরবে থাকিতে চাহে না। প্রেমের তূলিকা

দিয়া যে মাধুর্য্যময়ী প্রতিমা সে এত কাল ধরিয়া গঠন করিয়াছিল, বিচ্ছেদে যাহার প্রতি প্রেম শত ধারার ন্যায় উচ্ছল ও বেগময় হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার সংবাদ লাভে এ কি হইল! শত পরিবর্ত্তনের মধ্যেও যে স্থির ছিল, সু-কঠোর দুঃখরাশি যাহাকে মুহূর্ত্তেরও জন্য ম্রিয়মান ও নিরাশ করিতে সমর্থ হন নাই, আজি এ কি সহনাতীত অন্তর্বেদনায় সে ভাঙ্গিয়া পড়িল!

সহসা এ কোন্ মধুময়ী অনন্ত প্রেম-রাগিণী ছন্দে ছন্দে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। উন্মুক্ত আকাশ ও ধরণী পুলকিতা হইয়া সে গান শুনিতে লাগিল। সমস্ত সুখ-দুঃখের, সমস্ত ব্যথার যেন অবসান হইয়া গেল। কি তৃপ্তি! কি আনন্দ! দিকে-দিকে কি অপূর্ব্ব শ্রী উদ্ভাসিতা হইয়া উঠিল! কি গায় বাঁশী ওই! প্রেম ত পৃথিবীর নহে যে সঙ্কীর্ণ ও স্বার্থপর হইবে। যে প্রেমে আত্ম-বিসর্জ্জন নাই, তাহা যে প্রাণহীন—সে ত প্রেম নহে, আত্মসুখবোধ।

সন্তানের প্রতি মমতা বৃদ্ধ কৃষক দম্পতিকে তাহার দর্শন লাভের নিমিত্ত দিন-দিন ব্যাকুল করিয়া তুলিল। অবশেষে বসন্তের এক নির্ম্মল প্রভাতে চিরস্নেহময়ী পল্লী ও শত স্মৃতি-বিজড়িত কুটীর পশ্চাতে রাখিয়া তাঁহারা মরিয়নের সহিত হিন্দুস্থানে যাত্রা করিলেন। দিগন্ত বিস্তৃত, ধূসর, বন্ধুর পর্ব্বতমালা ও শ্বাপদ-সঙ্কুল গহন অরণ্যানীর মধ্য দিয়া বহু আয়াসে তাঁহারা এই কুসুমিত, শস্য-শ্যামল, নদ-নদী-বিধৌত ভারত-সমতলে উপনীত হইলেন। মরিয়নের একাগ্র চেষ্টা ও বহু পরিশ্রমের পর এই বিশ্রাম-ভবনের সন্ধান হইল। গুলনেয়ারের সহিত সাক্ষাতের সমস্ত পন্থাই যখন বিফল হইয়া গেল, তখন সহসা এক মাধবী রজনীতে মরিয়ন্ প্রাসাদ-প্রান্তে নির্জ্জন গোমতীতীরে বৃক্ষতলে বসিয়া বাঁশরী বাজাইতে আরম্ভ করিলেন।

বাঁশীর সুর যাহা আকৈশোর গুলনেয়ারের অত্যন্ত প্রিয় ছিল এবং যাহা তাহাকে বহুবার সঙ্গিনীগণের চঞ্চল হাস্য-ক্রীড়া হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া মরিয়নের নিকট টানিয়া আনিয়াছে, তাহা যদি এই সুদীর্ঘ বিয়োগের অবসান করে, যদি উচ্ছল প্রমোদ-তরঙ্গের মধ্যে অতীত স্মৃতি জাগাইয়া তুলে—বুঝি বা এই আশা তাহার মর্ম্মপটে ফুটিয়া উঠিতেছিল।

তাহার সে সাধনা, সে অর্চ্চনা সার্থক হইয়াছে। বাল্যের নর্ম্ম-সহচরী, যৌবনের মানস-বাহিনী আনন্দ-প্রতিমা, জীবন সংগ্রামে পরাহত হইয়াও যাহাকে সে প্রেমের হৈম বেদীতে স্থাপিত করিয়াছিল, যাহার প্রতি তাহার প্রেম ভোগলিপ্সা-বিহীন ছিল, আজ যে সে তাহার সম্মুখে বিরাজিত। সাধকের যেমন সাধনার ধন লোক-চক্ষুর অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকে, মরিয়নেরও তেমনি অনন্ত প্রেমরাশি এক প্রেম-দেবতা ব্যতীত আর কেহই জানিত না। এমন কি তাঁহার এই প্রণয়-কাহিনী গুলনেয়ারেরও অজ্ঞাত ছিল।

অম্লান শারদ-শ্রীসমা বিকশিত কুসুমের ন্যায় হাস্য ও আনন্দে প্রফুল্লময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া মরিয়নের তৃষিত নয়ন-যুগল পরিতৃপ্তি লাভ করিল। স্বভাব-সরলা গুলনেয়ার শিশুর ন্যায় শত সহস্র প্রশ্নে কত কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন। মরিয়ন্ অসঙ্কোচে সে সকলের উত্তর দিলেন। অবশেষে পর রাত্রিতে নবাবের অনুমতি লইয়া জনক-জননীর দর্শনের কথা বলিয়া নবাবের প্রতি অনন্যপ্রেম-পরায়ণা হর্ষোচ্ছল হৃদয়ে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

কিন্তু হায়! এই বহুবর্ষ পরে আনন্দ-মিলনই তাঁহার কাল-স্বরূপ হইল। গুরুতর রাজকার্য্যোপলক্ষে নবাব সেদিন প্রদোষ সময়ে বিশ্রাম-ভবনে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। অধিক রাত্রিতে কার্য্য যখন সমাপ্ত হইয়া গেল, তখন নবাবের চিত্ত প্রিয়তমা গুলের জন্য আকুল হইয়া উঠিল। নবাবের বিচিত্র তরণী যখন উদ্যান-প্রান্তে সংলগ্না, তখন মরিয়ন্ ও গুলনেয়ার পরস্পরের নিকট বিদায় লইতে-ছিলেন। শুভ্র জ্যোৎস্নালোকে গুলনেয়ারের মূর্ত্তি নবাবের বিস্ময়-বিহ্বল নেত্রে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। কিয়ৎকাল নিশ্চল থাকিবার পর বিস্ময়ের পরিবর্ত্তে সুতীব্র রোষানল ও দারুণ প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি নবাবকে অধীর করিয়া তুলিল। এতকাল ধরিয়া যাহার চরণ-তলে উদ্বেল হৃদয়ের সমস্ত কামনা, প্রেম, অতুল ঐশ্বর্য্য, রাজ্য-সুখভোগ উপহার দিয়াছেন, সে আজ অবিশ্বাসিনী! এই মায়াবিনী এতকাল ধরিয়া তাহার কুটিল হাসি ও মিথ্যা বাণী দিয়া তাঁহার সরল হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। তিলে-তিলে পদানত করিয়া তাঁহার যাহা কিছু মনের ও বাহিরের ছিল, সমস্তই অপহরণ করিয়াছে! তাহার অতুল্য রূপরাশি, মনোহর শ্রী, ও প্রেমভারানত দৃষ্টি কি কুহক-পাশ রচনা করিয়াছিল! বিধাতা সার সৌন্দর্য্যের আবরণে কি নগ্ন বীভৎসতা প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছে! সমস্তই মিথ্যা! সমস্তই মায়া!

উন্মত্ত নবাব দারুণ প্রতিশোধ বাসনায় সেই মর্ম্মর-শুভ্র, অনবদ্যরূপশালিনী ও ততোঽধিক পূত-চরিত্রা তরুণীর জীবন্ত-সমাধির কঠোর আদেশ প্রদান করিলেন। হিতাহিত-জ্ঞান-বিবর্জ্জিত নবাব মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার অখণ্ড প্রণয়ের একান্ত নির্ভরতার ও শিশুর ন্যায় সরলতার কথা ভাবিয়া দেখিলেন না। তাঁহার অদর্শনে যে গীতহীনা বীণার ন্যায় ভূমিতল আশ্রয় করিত, যে চিরদিনই তাঁহার সুখে হর্ষশালিনী, দুঃখে বিষাদিনী ছিল, সেই শিরীষ-স্তবকনম্রা ললনার উপর কি নির্ম্মম আদেশ প্রদত্ত হইল!

গুলনেয়ারের জীবন-লীলা অবসানের পর প্রাসাদের উৎসব-তরঙ্গ যেন প্রাণহীন হইয়া পড়িল। এই নৃশংস ঘটনা সকলের মনে একটা আতঙ্কের সঞ্চার করিয়াছিল। নবাব প্রায়ই অনুপস্থিত থাকিতেন। তাঁহার মনেও একটা গভীর কৃষ্ণচ্ছায়া পতিত হইয়াছিল। এই সময়ে একদিন বিশ্রামভবনে আসিয়া নবাবের চন্দ্র-কিরণে উচ্ছলিতা গোমতী-বক্ষবিহারে সাধ হইল। তরণী মৃদু মন্থরে চলিয়াছে, এমন সময় বিস্তীর্ণ প্রান্তর প্লাবিত করিয়া সহসা বাঁশরী বাজিয়া উঠিল। জ্যোৎস্নালোকে নবাবের মনে অদূর অতীত কাহিনী ও তাহার সহিত মৃদু বেদনা জাগিয়া উঠিতেছিল। বাঁশীর ঝঙ্কারের সহিত তাঁহার সমস্ত হৃদয়-তন্ত্রী বিপুল বেদনা-বলে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। স্মৃতির তাড়নে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া নবাব বংশীবাদনকারীকে ধৃত করিবার আজ্ঞা প্রদান করিলেন। মুহূর্ত্তে তাঁহার আজ্ঞা পালিত হইল। হতভাগ্য মরিয়ন্ তরণী পরে নীত হইল।

নবাব যখন গুলনেয়ারের বিগত জীবন ও মরণ রজনীর আমূল কাহিনী অবগত হইলেন, তখন কুহরিত মর্ম্ম-বেদনায় শরাহত কুরঙ্গের ন্যায় লুটাইয়া রড়িলেন। বিদ্বেষ, অভিমান, রাজপদ কোথায় ভাসিয়া গেল। অবাধ, উত্তপ্ত অশ্রুবারি অজস্র ধারায় হতভাগিনী গুলনেয়ারের নিষ্কলঙ্ক চরিত্রকে স্ফুটতর করিয়া তুলিতে লাগিল।

হায় সে রজনী! মরিয়ন্ কেন তুমি আসিলে না। কেন এই ক্রোধ-তাড়িত মন্দভাগ্যকে এ কাহিনী এমন করিয়া শুনাইলে না। হয় ত তাহা হইলে আজ অনুতাপের প্রয়োজন হইত না; এবং একটী অম্লান কুসুমের ক্ষুদ্র জীবন-সঙ্গীতের অকালে পরিসমাপ্তি হইত না। কোথায় তুমি গুল—কোথায় কোন্ নন্দনে পরিপূর্ণ মহিমায় প্রস্ফুটিত রহিয়াছ! সেখানে বুঝি প্রণয়ে অবিশ্বাস নাই, মিলনে বিরহ নাই। অনন্ত সুখ, অনন্ত প্রীতি বুঝি নিত্য সেখানে বহিয়া যায়! কোন্ পুণ্য-লগ্নে স্বর্গচ্যুতা কুসুম তুমি, ধরণীবক্ষে ফুটিয়া উঠিয়াছিলে—নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে শুধু মধুর স্মৃতির অম্লান সৌরভ রাখিয়া অকাল সন্ধ্যায় ঝরিয়া পড়িলে!

চা-তত্ত্ব

[অধ্যাপক শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ]

হে কলিকালের সোমরস! তোমাকে নমস্কার করি। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ আমাকে একবাক্যে 'সায়' দিন, আমি নেপাল, চীন ও খোটান দেশীয় পুঁথি প্রভৃতি হইতে প্রমাণ করিয়া দিই যে, তুমিই সোমরসের বিবর্ত্ত বা পরিণতি। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ যদি এ কথার সমর্থন না করেন, বা হঠকারিতায় প্রতিবাদ করিয়া ফেলেন, তবে বুঝিব তাঁহারা 'চা' এর সেবা করিয়াও ঘোর নিমকহারাম—অথবা চিনিহারাম; কারণ, চাএর অপূর্ব্ব পদার্থে 'নিমক্' থাকিতে পারে না, চিনিই থাকে। হায়! আমার কথায় আমিই প্রতিবাদী হইলাম (আজকালকার দিনের ধাঁজই এই)! কারণ, কতকগুলো "নীরস তরুবর" শ্রেণীর লোক আবার কুৎসিত 'নুন চা' খাইয়া থাকেন।

খোটান ও চীনে যখন ইহার এত প্রচলন, আর ঐ দুই দেশ যখন অতি প্রাচীন দেশ, (বোধ হয়, আর্য্যগণ খোটানের নিকট হইতেই আসিয়াছেন, তাই আর্য্যাবর্ত্তবাসিগণ বা হিন্দুস্থানীগণ 'খোট্টা' নামে অভিহিত), তখন প্রমাণিতই হইল যে 'চা' এক অতি 'প্রাগৈতিহাসিক' বস্তু। অতএব ঐতিহাসিক প্রমাণে স্থিরীকৃত হইল যে 'চা' পূর্ব্বে

'সোম' রূপে পরিচিত ছিল। (১) তিব্বতের 'খুলিং' মঠের কোন পুঁথিতে ইহার আরও স্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। 'এসিয়াটীক সোসাইটী', আপাততঃ বন্ধ রাখিয়া, গবেষণাকারিগণ কি 'কোমর বাঁধিয়া' ইহার রিসার্চ্চ করিবেন না? তাহার পর দেখুন, দার্শনিক হিসাবেও সোমরস যে 'চা' তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। কারণ, evolution বা অভিব্যক্তিবাদের নিয়মানুসারে আর কোন্ স্ফূর্ত্তি-কারক পানীয় (অথচ মাদক নহে) সোমরসের স্থানীয় হইবে? পৃথিবীতে কোন জিনিসেরই একবারে ধ্বংস হয় না—শুধু রূপান্তর হইয়া থাকে, দার্শনিকগণ তারস্বরে এই কথা বলিতেছেন। অতএব, যে ভাবে বৌদ্ধগণ হইতে উত্তরবঙ্গের কোন শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ উদ্ভূত হইয়াছেন (প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণবের মতে), সেই ভাবেই কালে সোমরস 'চা' রূপে পরিণত হইয়াছে। দার্শনিকগণের বর্ত্তমান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ—intuition (Bergson) বা সোজা কথায় "বুকে হাত দিয়া বলা।" আচ্ছা, আমি যদি জিজ্ঞাসা করি, যে, সকলেই বুকে হাত দিয়া বলুন দেখি, 'চা' 'সোমরস' কি না? সকলেই intuitively বলিয়া উঠিবেন (বিশেষ চা পান করিতে-করিতে) আঃ, কি আরাম! ইহাই ত আসোল সোমরস! ডারউইন প্রমাণ করিয়াছেন যে, নর বানর হইতে জন্মিয়াছেন। সে বানরকেও 'চা' খাওয়াইয়া দেখা গিয়াছে, সে বড়ই আরাম অনুভব করিয়া থাকে। অতএব আর বলিবার 'জো' টী নাই যে, 'চা' অতি অর্ব্বাচীন সামগ্রী।

হায়, আমরা 'চা'এর মর্য্যাদা ভুলিয়া গিয়াছি। (২) কই, দেশে ত সোমযজ্ঞের ন্যায় 'চা-যজ্ঞ' অনুষ্ঠিত হইতেছে না? শুধু য়ুরোপীয়গণের 'গোমেধ' ও 'বরাহমেধ' যজ্ঞে ও আমাদের ত্রিসন্ধ্যার উদর-যজ্ঞে চা একটী নিত্য অঙ্গ হইয়া আছে। পুনশ্চ, চায়ের আমরা আজও কোন স্তুতি-গীতি রচনা করি নাই। আসুন, আমরা সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আজ 'চা'এর গুণ-কীর্ত্তন করি।

সত্যযুগ সাত্ত্বিকযুগ ছিল। অতএব সে যুগে সাত্ত্বিকতার বৃদ্ধির জন্য সোমরস পান করা হইত। আমরা অবশ্য সেই সত্যযুগের লোকেরই বংশধর। এই কলিযুগে বা তামসিক যুগে উষ্ণ চা ব্যতীত কে আমাদিগকে রক্ষা করিবে? এ কথায় কি কেহ অসঙ্গতি বাহির করিতে পারিবেন?

'চা' নামের উৎপত্তি কি কেহ trace করিয়াছেন? আর্য্যাবর্ত্তে হিন্দি ভাষায় 'চা' কে 'চায়' বলা হয়। যখন আর্য্যগণ আর্য্যাবর্ত্তে আসিলেন, তখন সকলে সোমরস চাহিতে লাগিলেন। বালক, বৃদ্ধ, যুবা সকলেই 'চায়' 'চায়' করিতে লাগিলেন। অমনি সোমরস এই নাম লুপ্ত হইল, 'চায়' নাম চলিতে লাগিল। অলসতার খাতিরে আমরা আরও ছোট করিয়া—'চা' করিয়া ফেলিলাম।

আজ যে আমরা 'চাকরি' করিতেছি, ইহা কি? চা যাহারা করিত বা জন্মাইত, তাহারাই ছিল চা-কর। সেই কর্ম্ম চাকরি। চা-বাগানের চা-করগণ কুকুরের ন্যায় জীবন যাপন করিয়া থাকে। সেই হইতে চাকরি কুকুরি! 'চা' না হইলে যাহাদের জীবন তিলমাত্র বাঁচে না, প্রাভাতিক কর্ম্ম বন্ধ হইয়া যায়, তাহাদের নিমকহারামি চিরবিখ্যাত। যাহার দুগ্ধ পান করা হয়, তাহাকেই হনন করা হয়। চা-এর কি মহিমা! চায়ের কুলিগণ জগতের মধ্যে অতি দুর্ভাগ্য, আর চায়ের কুঠীয়ালগণ একেবারে ধনকুবের। 'চা'কে যাহারা বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, তাহারা জগতের শ্রেষ্ঠ জাতি। আর কে অস্বীকার করিতে পারে যে, যাহারা 'চা'কে মারিয়াছে, তাহারাই 'চা-মার'। হায়! এ হেন

(১) আজকালকার দিনে নজির ছাড়া কোন কথা বলিব না। নজির দেখুন,—"According to Chinese legend, the virtues of tea were discovered by the Emperor Chinnung, 2737 B. C. to whom all agricultural and medicinal knowledge is traced." সুতরাং শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হউন যে, কাজে-কাজেই বৈদিক যুগেও 'চা' বা সোম ব্যবহৃত হইত। ভারতবর্ষ হইতে যে চা 'চীনে' গিয়াছে, তাহার কথাও শুনুন, ও বুক গৌরবে দশ হাত ফুলিতে দিন।—"A tradition exists in China that a knowledge of tea travelled eastward to and in China, having been introduced 543 A. D. by Bodhidharma, an ascetic, who came from India on a missionary expedition"—Encyclopaedia Britannica, Vol. 26 (11th Ed.) pp. 476—483.

(২) অথচ ভারতীয় 'চা' যে শ্রেষ্ঠ চা তাহার নজির লউন—"The finest teas are produced at high elevations in Darjeeling, Ceylon and in the plains of Assam." Ibid. হায়! "আমার দেশ" গানে এই কথাটী বাদ পড়িয়া গিয়াছে! বুক আরও স্ফীত হইল।

'চা'কে যে ডাক্তারগণ অপকারী বলিয়াছেন,—গবেষণায় ধরা পড়িয়াছে, তাঁহারাই বাড়ীতে তিন বেলা তিন-তিন পেয়ালা 'চা' উদরস্থ করিয়া থাকেন। 'চা'এর একবার সেবক হইলে, আর এ চাকুরি ত্যাগ করা অসম্ভব,—একেবারে জীবন-যৌবন সমর্পণ! অল্প রোগীগণের ঘোর দুর্ভাগ্য, 'সে রসে বঞ্চিত, গোবিন্দ দাস।"

আজ এই ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার দিনে, চিরকাল যে সকল চিকিৎসক, 'চা'এর দুর্নাম রটাইয়াছেন, তাঁহারাই আবার জিব্ কাটিয়া বলিতেছেন, চা এই অসুখে পরম হিতকারী। ঘন-ঘন পিপাসায় দেখা গিয়াছে যে, চা পিপাসার শান্তি করে। ম্যালেরিয়ার দেশে, বলিতে কি সমগ্র বাঙ্গালীর দেশে (যায় যে দেশে বাঙ্গালী গিয়াছেন সে দেশেও) চা-খোরগণ উহা হইতে পরিত্রাণ পান। চা কাঁচা সর্দ্দিতে উপকারী। শীতল চা উদারময়ে উপকারী। দুর্ভিক্ষের দেশে আহার কমাইবারও ইহা একটী অমোঘ ঔষধ। অতএব এমন "সর্ব্বরোগগজাসংহ" আর কি দুনিয়ায় আছে? তথাপি 'চা' এর নিন্দা! নিন্দুকের মুখ কে বন্ধ করিবে?

'চা'কে স্ত্রীলিঙ্গ বলিব, কি পুংলিঙ্গ বলিব,—ইহা লইয়া খট্‌কা উঠিতে পারে। 'চা' এর সর্ব্বব্যাপিত্বের কথা ভাবিলে, ব্রহ্মের ন্যায় ওঁ তৎ সৎ বৎ নপুংসক লিঙ্গ বলিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু হায়, এত বড় শক্তিমতীকে ক্লীব বলিব? আমার মনে হয়, ইহা তান্ত্রিকী শক্তির ন্যায় একটী মহা-শক্তি। ইহা যে এক সর্ব্বব্যাপিনী শক্তি, তাহার প্রমাণ কি পান নাই? একজন ইংরেজ পণ্ডিত বলিতেছেন যে, পরিমাণে ও পানকারীগণের সংখ্যা হিসাবে জগতে যত পানীয় খরচ হয়, তাহাতে জলের পরেই চা এর স্থান ("Next to water, tea is the beverage most widely in use throughout the world as regards the number of its votaries as well as the total liquid quántity consumed")। ভুলিবেন না যে, জল নপুংসক লিঙ্গ, কজের বেলাতেও তাই। কোন উন্মাদিনী শক্তি উহাতে নাই, বরং উল্টা গুণ আছে। (৩) চায় কিন্তু ঐ শক্তি রীতিমত বর্ত্তমান। অতএব প্রমাণে 'চা'ই শ্রেষ্ঠ স্থান পাইল। সেই কারণেই দেখুন, কলিকাতার রাস্তায় "যে দিকে ফিরাই আঁখি, সে দিকে তোমারে দেখি।" চারিদিকেই চায়ের জীবন্ত রক্তাভ মূর্ত্তি প্রকটিত! কত লোকে বাসায় প্রস্তুত পবিত্র চা ছাড়িয়া বারওয়ারী মজ্‌লিসে চা এর আশায় চাতকের ন্যায় ছুটিতেছে। এটা যে Democratic age!

"চা" এই শব্দ হইতে কত গভীর তত্ত্ব সূচিত হইতেছে। "চালাখ" কথার উৎপত্তির দিকে নজর করিয়াছেন কি? যাহারা লাখ্ লাখ্ পেয়ালা চা খাইয়াছেন তাহারাই চালাখ। বস্তুতঃ অধিক চা না খাইলে চালাখ হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প। মুসলমানী ও হিন্দুস্থানী "চাচা" শব্দের বীজার্থ কি? শব্দতত্ত্বের গবেষণায় দেখা যাইবে যে, পূর্ব্বে বালকগণ খুড়ার নিকট আব্দার করিয়া (বাপ অপেক্ষা খুড়ার নিকটেই আব্দার বেশী চলে) "চা" "চা" করিয়া জিদ্ ধরিত; সেই হইতে "চাচা" শব্দের সৃষ্টি হইল। এই ভাবে তবলার "চাটী" দিবার সময় বাদ্যকরগণ "চা" "টী" (Tea) বলিয়া ইঙ্গ বঙ্গ ভাষায় কলরব করে। সেই হইতে তবলার "চাটী" হইয়াছে। "চা-মুণ্ডা" শব্দের তথ্যপূর্ণ ইতিহাস "চামুণ্ডা" শ্রেণীর স্ত্রীলোকগণের নিকট হইতে পাইবার সম্ভাবনা আছে।

'চা' এর উপর সত্য ও মিথ্যা কত গল্প রচিত হইয়াছে। সত্য ঘটনার প্রথমে একটা নমুনা দেই। তার পর মিথ্যা কথার জন্য ত নভেল-নাটক আছেই। পশ্চিমে থাকিবার সময়ে সংবাদ-পত্রে এক অপূর্ব্ব ঘটনার বিবরণ পাঠ করিয়া-ছিলাম। পাঠকগণ এইবার একটু গম্ভীর হইয়া শ্রবণ করুন। যুক্তপ্রদেশের একটী সহরে এক সাহেব সস্ত্রীক বাস করিতেন। তাঁহার মেজাজটী সর্ব্বদাই "পঞ্চমে চড়িয়া" থাকিত। তিনি তাঁহার খানসামা বেচারীকে সময়ে-অসময়ে খুব গালিগালাজ করিতে John Bull হইয়া উঠিতেন। এক দিন 'চা' দিবার সময়ে সামান্য কারণে সাহেব তাহাকে, যে নাম উচ্চারণে মুসলমান "তোওবা, "তোওবা" উচ্চারণ করিয়া থাকেন, তাহারই "বাচ্চা" বা পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিলেন। ইহাতে মুসলমান খানসামার আর ধৈর্য্য টিকিল না। সে অপমান পকেটে করিয়া রাখিল। পরদিন প্রভাতে সাহেবের চা খাইবার সময়ে, সে নিজের ফন্দিমত একটী জলীয় পদার্থ উষ্ণ করিয়া তাহাতে চা, দুগ্ধ ও চিনি মিশাইয়া

(৩) এই সঙ্গে তুলনীয়—"Throwing cold water upon"। তুলনা না করিলে কি পাণ্ডিত্য প্রকাশ সম্ভবে?

"দিব্যগঠনা, লজ্জাভরণা, বিনত-ভুবন-বিজয়ী-নয়না—"

—৺ দ্বিজেন্দ্রলাল

শিল্পী—শ্রীআদ্যকুমার চৌধুরী]

[শ্রীশিবকুমার চৌধুরীর অনুগ্রহে প্রকাশিত]

Emerald Printing Works
CALCUTTA

'ট্রে'তে করিয়া সাহেবের টেবিলে রাখিয়া আসিল। সঙ্গে-সঙ্গে নিজের পোঁটলা পুঁটলী লইয়া একেবারে চম্পট্ দিল। এদিকে সাহেব নিশ্চিন্তমনে "চা" কয়েক চামচ খাইয়াই সেদিনের চায় লবণস্বাদ আবিষ্কার করিলেন। তৎক্ষণাৎ খানসামার তলপ্ হইল। সাহেব জানিলেন যে, সে পলায়ন করিয়াছে। তখন সাহেবের সন্দেহ হইল, 'চা'তে কোন বিষাক্ত পদার্থ মিশান হইয়াছে। সাহেব অবশিষ্ট 'চা' পুলিশের দ্বারা রাসায়নিক পরীক্ষার্থ পাঠাইয়া দিয়া 'উইল' লিখিতে বসিলেন। তাঁহার মনে হইল, মাথা ঘুরিতেছে। কিছুক্ষণ পরেই খবর আসিল যে, রাসায়নিক পরীক্ষায় স্থির হইয়াছে যে, ঐ পানীয়ে Uric Acid বা মূত্র সম্বন্ধীয় অম্ল পাওয়া যাইতেছে; সুতরাং মূত্রের মিশ্রণ বুঝা যাইতেছে। সাহেব ঘৃণায় বমির চেষ্টায় অকৃতকার্য্য হইয়া মোকর্দ্দমার সূত্রপাত করিলেন। খানসামা ধরা পড়িল। বিচারালয়ে খানসামা নিজের দোষ স্বীকার করিল ও সাহেবের শূকর-পুত্র সম্বোধন করার কথাও বলিয়া ফেলিল। বিচারক উভয় পক্ষের কথা শুনিয়া শেষে খানসামার সামান্য কিছু জরিমানা করিলেন, এবং রায়ে লিখিলেন যে, "আমরা রাসায়নিক পরীক্ষায় অবগত হইলাম যে, চা-য়ে যে প্রস্রাব মিশান হইয়াছে, তাহা মনুষ্য-মূত্র, অন্য কোন হীন জন্তুর নহে, এবং ইহাও জানা গেল যে, মনুষ্য মূত্র কোনক্রমেই প্রাণ-নাশক নহে; সুতরাং আসামীর দণ্ড গুরুতর হইতে পারে না।" ইত্যাদি। এই শ্রেণীর মোকর্দ্দমার আর আপীল নাই ভাবিয়া সাহেব শুধু মস্তকে করাঘাত করিতে লাগিলেন।

এইবার কাল্পনিক গল্পে ও সাহিত্যে 'চা'র প্রতিপত্তির কথা বলিয়া এই স্তুতিগান সাঙ্গ করিব। 'চা'র চাষ ও বাণিজ্যের কথা ভারতবর্ষের পাঠকগণ পূর্ব্বেই পড়িয়াছেন। ভ্রমণ-কাহিনীতে ষ্টেশনে-ষ্টেশনে "চা-পান করা গেল" ইত্যাদি না থাকিলে সরস হয় না। "চা-পার্টি" বা "চা"এর নিমন্ত্রণ যেমন আধুনিক গল্পের অঙ্গীভূত, তেমনি সামান্য কারণে "মুখ ভার করা" বচসা তর্ক করা বা "চাএর পেয়ালায় ঝড় তোলা" (tempest in the tea pot) নায়ক-নায়িকাগণের স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপার। 'চা'এর উপর গল্প করিতে-করিতে কত প্রণয়ের পরিণতি (development) নভেলে দেখিতে পাওয়া যায়। হায়! চা না থাকিলে "নৌকা-ডুবি"তে রমেশ ও হেমনলিনীর মানসিক বন্ধনের কে পরিচয় পাইত? "নবীন সন্ন্যাসী"র 'সন্ন্যাস' রোগ সারাইতে "চিনি"র রসে পূর্ণ চা একরূপ প্রজাপতির কাজ করিয়াছিল। "নবীন সন্ন্যাসী" পড়িয়া চক্ষু মুদিলে দেখিতে পাই তিনটী শক্তি—নবীন সন্ন্যাসী—পুরুষ, চিনি—প্রকৃতি, চা—প্রকৃতির ক্রিয়া। ইহাকেই বলে দার্শনিক উপন্যাস! সম্প্রতি জলধর বাবু—"এক পেয়ালা চা" তৈরি করিয়াছেন। এইবার 'চা'এর লোভে বঙ্গীয় পাঠকবর্গ তাঁহার ন্যায় প্রবীণ ব্যক্তির নিকটে কেবলি "চা চা" করিয়া কলরব করিবে। সাহিত্যের 'চা'র মৌতাতই এমনি!

গলগ্রহ

[শ্রীযতীশচন্দ্র বাগ্‌চি]

দুর্গাপূজায় ছুটীর বন্দোবস্ত করিতে পারি নাই। চল্লিশ টাকা বেতনের কেরাণী,—বেশী আবেদন-নিবেদন করিলে হয় ত চাকরীটির মায়া ত্যাগ করিতে হইবে। যাহা হউক, ঠাকুরমার শ্রাদ্ধ, ঠাকুরদাদার বিবাহ ইত্যাদি নানা-রকম ওজর ফাঁদিয়া কালীপূজার পূর্ব্বে আট দিন ছুটী পাইলাম। সেই রাত্রেই বাক্স-বিছানা মুটের মাথায় চাপাইয়া শিয়ালদা অভিমুখে রওনা হইলাম।

"কাণা না কি মশাই?" "আঙ্গুলগুলো থেঁৎলে দিলেন যে!" "উঃ! কনুয়ের গুঁতো মার কেন হ্যা?" "আহা—হা, ঠেলবেন না।" ইত্যাদি নানাবিধ লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, অনুনয়-অনুযোগ শ্রবণ ও কথনের পর টিকিট ক্রয় অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

যথাসময়ে ট্রেণ ছাড়িল। গাড়ী প্লাটফরম ছাড়াইয়া গেলে, একটী পরিত্রাণসূচক নিঃশ্বাস ছাড়িলাম। যাক্, বাড়ী যাওয়া তাহা হইলে একরকম ঠিকই হইল। মহা আনন্দে আমার জীবন-মরণের সম্বল পানের কৌটাটী বাহির

করার উদ্দেশ্যে পকেটে হস্ত প্রবিষ্ট করাইলাম। হরিবোল! কৌটা নাই। দুর্য্যোধনের মত মর্ম্মান্তিক রকম হর্ষে-বিষাদ দাঁড়াইয়া গেল।

পাশে একজন ভদ্রলোক বসিয়া ছিলেন। বর্ণ ঘোর কৃষ্ণ; ক্ষুদ্র ও কোটরগত চক্ষু দুইটী মুদিত-প্রায়; শ্মশ্রু-গুম্ফ পরিপাটী রূপে উৎপাটিত; অবিরাম স-দোক্তা তাম্বুল চর্ব্বণে দশনপঙ্‌ক্তি বিকৃতবর্ণ। গাত্রে কুষ্টিয়া ছিটের চীনে কোট; তদুপরি একখানি মোটা লুই।

পা-দুখানি বেঞ্চের উপর গুটাইয়া শুঁড় বাহির করা আরসুলার মত বসিয়া ছিলেন। মস্তকে প্রকাণ্ড এক কালো কম্ফার্টার ৬' র মত করিয়া বাঁধা। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি।

পার্শ্বে একটী ৭।৮ বৎসরের বালক কম্ফর্টার এবং আলোয়ান জড়াইয়া একটী পুঁটলীর মত বসিয়া আছে। চক্ষু দুইটী করুণ ও সশঙ্ক। মুখখানি দেখিয়া মায়া হয়।

ভদ্রলোক চট্ করিয়া আমার বিপন্ন অবস্থা বুঝিয়া লইলেন। বিনাবাক্যব্যয়ে পকেট হইতে প্রকাণ্ড এক ডিবা (ডাবর বলিলেও চলে) বাহির করিয়া আমার সম্মুখে ধরিলেন; বলিলেন, "নিন্ তুলে দুটো।"

আমি প্রথমে একটু ইতস্ততঃ বোধ করিলাম। তৎক্ষণাৎ সে ভাব সামলাইয়া লইয়া একটী পান তুলিয়া লইলাম। আকাশ-পাতাল-ব্যাপী বিরাট এক হাঁ করিয়া, তাহার মধ্যে দুইটী পান ফেলিয়া দিয়া, ভদ্রলোক নড়িয়া-চড়িয়া বসিলেন। গায়ের কাপড়খানি একটু টানিয়া দিয়া বলিলেন, "বেশ শীত পড়ল।"

আমি। পড়ল বই কি! কার্ত্তিক মাসও তো পড়েছে।

ভদ্র। এই, এই ছোঁড়া! র‍্যাপারখানা টেনে দে না। প্রভু, তুমিই ভরসা। (ভাল করিয়া উপবেশন) মশায়ের নাম?

আমি নাম বলিলাম।

"আমার নাম শ্রীভজগোবিন্দ পাল। মশায় ব্রাহ্মণ, একটু চরণ ধূলি—" আমি তারস্বরে আপত্তি করা সত্ত্বেও, জুতার উপর হাত বুলাইয়া বক্ষে, কপালে এবং জিহ্বায় সেই হাত ঠেকাইয়া, ভজগোবিন্দ বাবু বলিলেন, "হাজার হোক, ব্রাহ্মণ ত! আমি শূদ্দুর, চিরদিন চরণাশ্রিত। পায়ের ধুলো দেবেন বই কি! তবে কি জানেন,—আজকাল আপনাদেরও মোজা-আঁটা পায়ের ধুলো মেলা ভার; আমাদেরও টেড়ী ভাঙ্গে, মাথা হেঁট হয় না। এই তো দেশের অবস্থা! হা—হা—হা—"

দেশের অবস্থা আবিষ্কার ও প্রকাশ করিয়া পাল মহাশয় অট্টহাসি যুড়িয়া দিলেন। আমি নির্ব্বাক্!

"মহাশয়ের নিবাস?" নিবাস বলিলাম।

"আমার বাড়ী এই আড়ংঘাটার কাছে। ইষ্টিশান্ থেকে বরাবর পূবদিকে চলে যাবেন। প্রকাণ্ড দালান। অবিশ্যি পুরোনো হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও বেশ বড় বাড়ী। আমার ঠাকুর একজন মহাশয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর নাম ছিল গে ৺গয়ারাম পাল। তস্য পিতা ৺স্বরূপচন্দ্র পাল। তস্য পিতা ৺উদ্ধবচন্দ্র পাল। তস্য—"

তস্যের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য আমি সেই ছেলেটীর উপর ঝুঁকিয়া পড়িলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার নামটী কি খোকা?" আমার দিকে একবার চাহিয়াই তৎক্ষণাৎ চোখ নামাইয়া বালক বলিল, "প্রসাদদাস।"

"প্রসাদদাস কি? পাল?"

বালকটী কাতর নয়নে একবার আমার মুখের দিকে, পরবার ভজগোবিন্দ বাবুর প্রতি চাহিয়া চোখ ফিরাইল। পরে একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "তা তো জানি না।"

বিস্মিত হইয়া আমি ভজগোবিন্দ বাবুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। দেখিলাম, সেই বালকের মত হাসি মুখ তাঁহার আর নাই। তীব্র ব্যথায় মুখখানি পাংশুবর্ণ হইয়া গিয়াছে। কোটরগত ক্ষুদ্র চক্ষু দুইটী সজল হইয়াছে। ভজগোবিন্দ বাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, "ও তো তা জানে না।"

আমি হতবুদ্ধি হইয়া চাহিয়া রহিলাম। ভজগোবিন্দ বাবু বলিলেন, "একটু বসুন। তামাকটা খেয়ে নিয়ে সব বল্‌ছি।"

তার পর তিনি টীনের একটী বৃহৎ চোঙা বাহির করিলেন। তাহার দুইদিকে দুই বিশাল গহ্বর;—একদিকে তামাক, একদিকে টীকে। মধ্যে জানালা-ঢাকা একটী ক্ষুদ্র ঘুলঘুলি, তাহাতে দিয়াশালাই ইত্যাদি রহিয়াছে। ক্যাম্বিসের ব্যাগ হইতে ছোট হুঁকা ও কলিকাটী

বাহির করিলেন। দমদম্ ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে "পাণিপাঁড়ে" ডাকিয়া জল সংগ্রহ করিলেন। অতঃপর হুঁকায় জল ভরিয়া, তামাক সাজিয়া লইলেন। তার পর গোটা-দুই-চার মাতব্বর রকমের টান দিয়া আরম্ভ করিলেন "বংশ-পরম্পরা-ক্রমে ব্যবসায়-বাণিজ্য করিয়া আমার পূর্ব্ব-পুরুষগণ অনেক টাকা রোজগার করিয়াছিলেন। সকলেই টাকা জমাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমার পিতার স্বভাব বংশ-ছাড়া ছিল। প্রতি মাসে মহোৎসব, বৎসর-বৎসর দোল-রাস ইত্যাদি করিয়া তিনি সমস্ত টাকা উড়াইয়া দিলেন। ব্যবসায়ের দিকেও মন তেমন ছিল না। সব উড়াইয়া দিয়াও শুধু সেই জরাজীর্ণ বাস্তুভিটা ও পৈতৃক বিগ্রহ রাধাকান্তের মায়া ছাড়িতে পারেন নাই। ভগ্ন-বাড়ীর ভিটাটুকু ও রাধাকান্তের রাতুল চরণ দুইখানি আঁকড়াইয়া ধরিয়া কোন মতে পড়িয়া থাকিতেন। আমার অতি শৈশবেই মা বৈকুণ্ঠ পাইয়াছিলেন। সুতরাং আশৈশব তাঁহার একার বাৎসল্য-রসে পুষ্ট হইয়াছিলাম। এমনি করিয়া হঠাৎ যে দিন তিনি তাঁহার সেই চির-আপন বাস্তু-ভিটারই এক মুক্ত প্রাঙ্গণে তুলসীতলায় ক্ষীণ, কম্পিত কণ্ঠে তাঁহার চির-আরাধ্য "রাধাকান্ত"কে স্মরণ করিতে-করিতে শেষ নিঃশ্বাস অসীম আকাশে মিলাইয়া দিলেন, তখন আমার জন্য রাখিয়া গেলেন আমার স্ত্রী অনঙ্গমঞ্জরী, দুই বৎসরের কন্যা তিলকমঞ্জরী এবং একখানি ছোট মুদীর দোকান।

অনেক পরিশ্রমে ও চেষ্টায় দোকানের কিছু উন্নতি সাধন করিলাম। দু-চার টাকার সংস্থান হইল। পুনরায় সুখের মুখ দেখিব আশা করিতেছি, এমন সময় অনঙ্গ এক-দিন দুই হাতে আমার পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া অনন্তের পথে যাত্রা করিল। তিলক তখন পাঁচ বছরের মেয়ে। সকাল-বেলা গোঁসাইদাস খুড়ার বাড়ী হইতে দুটি ভাত খাওয়াইয়া তিলককে লইয়া দোকানে বসিতাম। দুপুরে নিজেই চারিটী রাঁধিয়া লইতাম। দুই জনে তাহাই খাইতাম। নির্জ্জন দ্বিপ্রহরে যখন দোকানে খরিদ্দারের গোলমাল থাকিত না, তখন শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কিম্বা রামায়ণখানি খুলিয়া পড়িতে বসিতাম। তিলক কাছে বসিয়া বিড়াল লইয়া খেলা করিত। রাত্রে তিলকের জন্য দুটী ভাত রাঁধিতাম। নিজে খাইতাম না। তাহাকে খাওয়াইয়া বারান্দায় জীর্ণ মাদুরখানি বিছাইয়া শয়ন করিতাম। শুইয়া-শুইয়া কোন্ তারায় তাহার মা আছে, মা তাহাকে দেখিয়া তাহার চুমা খাইতে চাহিতেছে না কেন, মা কবে আসিবে, তাহার জন্য নীলাম্বরী শাড়ী, কাঠের ঘোড়া আনিবে কি না—এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতাম। একই কথা প্রত্যহ শতবার জিজ্ঞাসা করিতে-করিতে সে ঘুমাইয়া পড়িত। আমি স্তব্ধ, শান্ত নীলা-কাশের বুকে-ছড়ান উজ্জ্বল তারিকাগুলির দিকে স্থির-নেত্রে চাহিয়া থাকিতাম।"

ভজগোবিন্দ বাবু চুপ করিলেন। একবার মাথাটী জানালার বাহিরে গলাইয়া চারিদিক দেখিয়া লইলেন। দুই হস্তে চক্ষু দুইটী কিছুক্ষণ ঢাকিয়া রাখিয়া আবার আরম্ভ করিলেন—

"এইবার আসল ঘটনাটা আসিতেছে। পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। খুলনা সহরে তিলকের বিবাহ দিয়াছি। মা আমার ভাল ঘরেই পড়িয়াছে। ছেলেটীও ভাল।

গোঁসাইদাস খুড়োর কন্যা তারামণি বাল-বিধবা, সুশ্রী, শান্ত। মেয়েটী বড় লক্ষ্মী। মা-মরা মেয়ে তিলকের মাতার স্থানটী সে-ই দখল করিয়াছিল। এজন্য আমিও মনে-মনে তাহাকে বড় শ্রদ্ধা করিতাম।

একদিন সকালে উঠিয়া তারামণিকে পাওয়া গেল না। সেই সঙ্গে পাওয়া গেল না গোঁসাই-খুড়ার গুড়ের আড়তের এক ছোকরা সরকারকে। তার নাম ফটিক মিত্র।

হাহাকার করিতে-করিতে গোঁসাইখুড়া আমার দোকানের দরজার গোড়ায় বসিয়া পড়িলেন। ব্যথা ও যন্ত্রণায় বৃদ্ধের মুখ বিকৃত ও পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছিল। আমি গামছা দিয়া বাতাস করিতে লাগিলাম।

ক্রমে-ক্রমে সকলে আসিয়া জুটিলেন। তামাকে একটা টান দিয়া রামযদু ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "এখন থানায় একটা এজেহার দিয়ে এসো।" ছিদাম ঘোষ বলিল, "এজেহার লিখিয়ে কি হবে ছাই! একটা কেলেঙ্কারী আর গোলমাল বাড়বে বই তো নয়!" রামযদু হুঙ্কার করিয়া বলিলেন, "তুই থাম্ না! বেটা ভেমো গয়লা এসেছে আমায় বুদ্ধি বাৎলাতে!" ভেমো গয়লা চুপ করিল। কাঙালীর পিসী বলিল, "তার আর কি করবে বাপু! যে গেছে, সে তো গেছেই। মেয়ে তো নয়, শত্তুর। এখন দুটো

দান-ধ্যান কর, জ্ঞাত-কুটুম্বোকে খাওয়া-দাওয়াটা দিয়ে উঠে পড়ো আর কি!"

রামযদু বলিলেন, "তা তো বটেই! একটা ভাল রকম প্রায়শ্চিত্ত-ট্রায়শ্চিত্ত করতে হবে বই কি! যে সে কথা নয় তো! কুলত্যাগ! এইটুকু মেয়ে, তার ভেতরে-ভেতরে এতো! পাপিয়সি, দুশ্চারিণি!" রামযদু ঘন-ঘন হুঁকা টানিতে লাগিলেন। আর্ত্তকণ্ঠে গোঁসাইখুড়ো কহিল, "তার কোন দোষ নেই দেবতা! একেবারে ছেলেমানুষ সে! সব কাণ্ডের মূলাধার হচ্ছে ঐ ফটকে ছোঁড়া!" "হ্যাঁ, হ্যাঁ, —কারে পড়লে সবাই অমন বলে থাকে।" ভট্টাচার্য্য মহাশয় গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন।

গোঁসাই খুড়ো প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সমাজে উঠিলেন। গ্রামের সমস্ত ব্যাপার নির্ব্বিঘ্নে চলিতে লাগিল। কেবল মধ্যে-মধ্যে সেই কন্যাহারা, স্নেহশীল বৃদ্ধের কাতর নয়ন হইতে অশ্রান্ত অশ্রুধারা তাহার দুঃখ-লজ্জা-ক্লিষ্ট, ম্লান মুখ-মণ্ডল বিধৌত করিয়া অঝোরে ঝরিয়া যাইত। ভেমো গয়লা ছিদাম ঘোষ কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে বলিত, "যাই বল খুড়ো, এটা কিন্তু বড় অন্যায়! যত সব বজ্জাত বেটারা জুটে"—ত্বরিত হস্তে অশ্রু মুছিয়া গোঁসাই খুড়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া স্থিরকর্ণে শুনিতেন, আশে পাশে রামযদু ভট্টাচার্য্যের খড়মের চটপট ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেছে কি না।

বছর-কয়েক ভাঙ্গা বাড়ীতে পড়িয়া থাকিয়া ভাবিলাম, আর কেন? সংসারের সুখ ত যথেষ্টই হইল। এখন সংসারের সমস্ত দেনা-পাওনা চুকাইয়া দিয়া, রাধাকান্তের চরণ শরণ করিয়া শেষের দিনকয়টা শ্রীধামে কাটাইয়া দিই। তাহাই করিলাম।

সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া ভাবিলাম, একবার মেয়েটাকে দেখিয়া আসি। খুলনা গেলাম। যাইয়া দেখি—একটী ৩৷৪ বৎসরের ছেলে কোলে তারামণি আমার জামাইবাড়ী পরিচারিকার কাজ করিতেছে।

আমাকে দেখিয়া তারামণি কাঁদিয়া ফেলিল। সত্য কথা বলিতে কি, তাহার অবস্থা দেখিয়া আমার মনে ক্রোধের পরিবর্ত্তে অনুকম্পার উদ্রেক হইল। তাহাকে সমস্ত জিজ্ঞাসা করিলাম।

অনেকক্ষণ কাঁদিয়া-কাঁদিয়া, শেষে শান্ত হইয়া সে যাহা বলিল, তাহার সারমর্ম্ম হইতেছে এই, যে, ফটিক তাহাকে লইয়া খুলনায় আসে। এখানে তাহারা একটী ছোট বাড়ী ভাড়া করিয়া থাকে। ফটিক একটী ছোট খাট মুদীর দোকান খুলিয়াছিল। কিছু দিন পরে তাহাদের একটী পুত্র-সন্তান হয়। বছরখানেক পরেই ওলাউঠা রোগে ফটিকের মৃত্যু হয়। অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া, এবং জীবন-ধারণের অন্য সদুপায় না দেখিয়া, সে তিলকের শ্বশুর-বাড়ীতেই দাসী হইয়া রহিয়াছে। তাহার পরিচয় তিলকের শাশুড়ীকে বলিতে, বা তাহার কথা তাহার গ্রামে জানাইতে সে তিলককে নিষেধ করিয়া দিয়াছে। স্নেহপরবশ হইয়া তিলক তারা দিদির এই অনুরোধ এ পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়াছে।

আমি নিস্তব্ধ হইয়া সমস্ত শুনিলাম। অভাগিনি! চপল যৌবনের মুহূর্ত্তের ভুলে আজ তুই সমাজ পরিত্যক্তা! অথচ, যে এই ব্যাপারের প্রধান কারণ, যে পিশাচ ভোগ-লালসার মায়াময় চিত্র তোর ভরা যৌবনের, সরল মনের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছিল,—সে বাঁচিয়া থাকিলে সমাজ হয় তো আজ তাহাকে বুকে তুলিয়া লইত।

হঠাৎ একদিন তারামণির বড় জ্বর আসিল। দ্বিতীয় দিন সে জ্ঞান হারাইল। তৃতীয় দিন নিশাবসানের সঙ্গে-সঙ্গে তাহার অনুতাপ-মলিন পাপ জীবন-প্রদীপ স্বজন-নয়নান্তরালে নিবিয়া গেল। আপন জন কেহ দেখিল না, কেহ এক বিন্দু অশ্রু ত্যাগ করিল না। সে মরিয়া বাঁচিল। নিমেষের ভুলে পথভ্রষ্টার দাবদগ্ধ জীবন মরণের স্নিগ্ধ সলিল-সেচনে শান্তিলাভ করিল বটে, কিন্তু হতভাগিনী তাহার পাপের ফল রাখিয়া গেল—একটী চারি বৎসরের শিশু।

বেয়ান ঠাকুরাণী বলিলেন, "এ কি গলগ্রহ জুটলো বাপু! কোথায় রাখি, কি করি! পাঁচজন জ্ঞাত্‌-কুটুম্ব তো আছে। তারা পাঁচ কথা বলবে। কাজ নেই বাপু। তার চেয়ে পাদরী সাহেবের হাতে দিয়ে এসো। সেই যা হয় একটা বিলিব্যবস্থা করবে'খন্।"

সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া আমি বলিলাম, "সে টা কি ভাল হয়? নিজের স্বজাতি, নিজের দেশের লোক, একজন বিদেশীর হাতে সঁপে দেব? তার পর সে তো ছেলেটাকে খৃষ্টান করবে?"

বেয়ান ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, "তা, আবার কি হবে?

ভারি আমার গুরুদেব ছেলে হয়েছেন।—ছেলে খৃষ্টান হবে না তো কি ?”

তা ঠিক্। এই পুষ্পপেলব-হৃদয়, নিষ্পাপ শিশু আজ তাহার জন্মদোষে পাপের অবতার। সমাজ তাহাকে আশ্রয় দিতে বিমুখ। সকলে আজ তাহাকে ঠেলিয়া দূরে রাখিতে চায়। কেন ? কি তাহার অপরাধ ? কোন্ পাপে আজ সে নরশিশু হইয়া কুকুরের চেয়েও ঘৃণ্য অবস্থায় সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইতেছে ? তাহার আপন সমাজের এই বিশাল বক্ষ থাকিতে, সে কি একজন বিদেশীর লোলুপ আলিঙ্গনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে ছুটিবে ! তাহার শাসনে তাহার পরলোকগত পিতামাতা শাসিত হইবে কি ? পাপের শাসন কর, আপত্তি নাই। কিন্তু সে কোন্ অপরাধে অপরাধী ? সকল সমাজই কুলত্যাগিনীকে শাস্তি দেয়, তাহাকে ঘৃণা করে। কিন্তু তাহার সন্তানকে তো কোন সমাজই তাহার ক্রোড় হইতে দূরে নিক্ষেপ করে না ! তাহাকে আশ্রয় দেয়,—তাহাকে বাঁচিয়া থাকার অবসর এবং উন্নতি করিবার সুবিধা দেয়। কই, আমার সমাজ তো তাহা দেয় না ! সে শুধু ভ্রূকুটী-ভঙ্গে শাসন করিতেই জানে,—বুকে টানিয়া লইতে জানে না ; শান্তি ও সুখ দিতে পারে না।

বৃদ্ধের নয়ন-প্রান্ত হইতে বিন্দু-বিন্দু অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িল। বস্ত্রপ্রান্তে চক্ষু মুছিয়া পুনরায় আরম্ভ করিলেন, “বেয়ানের শত নিষেধ সত্ত্বেও ছেলেটীকে কোলে করিয়া আমি সেই দিন বাড়ী রওনা হইলাম। গ্রামে পৌছিতেই একটা কোলাহল পড়িয়া গেল। গোঁসাই খুড়ার সঙ্গে পথে দেখা হইল। চক্ষুদ্বয় করতলে আবৃত করিয়া বৃদ্ধ কহিলেন, ‘ভজা, সরে যা বাবা ! ও যে—ও যে—তারা যে আমার’—খুড়া হা হা করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। আমি সরিয়া গেলাম।

সন্ধ্যাবেলা রামযদু ভট্টাচার্য্য, শ্রীনাথ ঘোষ, কেবল গুঁই প্রভৃতি গ্রামের মাতব্বরগণ আমার বাটীতে জমায়েৎ হইলেন। চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় পাটী পাতিয়া দিলাম। এক ছিলিম তামাক পোড়াইয়া, এদিক-ওদিক চাহিয়া গুঁই মহাশয় বলিয়া ফেলিলেন, “তা হলে দাদাঠাকুর, আপনই বলো। আপনি হচ্ছ গে পালেদের পুরুতবংশ।”

“তা, হ্যাঁ—বল না, ঘোষজাই বল না।”

“আহা, আপনিই বলুন না। না হয়, গুঁই মশাই বল না কেন।”

“না—না, দাদাঠাকুরই বলো।”

কিছুক্ষণ এইরকম গণ্ডগোল করার পর একটু কাশিয়া, একটু নড়িয়া-চড়িয়া বসিয়া দাদাঠাকুরই বলিলেন, “দেখ ভজগোবিন্দ, তুমি স্বনামধন্য লোকের ছেলে। মহৎবংশে জন্ম তোমার। নিজেও একজন মহাশয় লোক। তোমার কি এইটে ভাল হচ্ছে ?”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “কোন্‌টা !”

রামযদু বলিলেন, “এই ছেলেটাকে বাড়ীতে রাখা !”

আমি কহিলাম, “তাতে হয়েছে কি ! পাপ যা করেছে, ওর বাপ-মা। ও তো নিষ্পাপ।”

রামযদু বলিলেন, নিষ্পাপ হলো ? এঁ্যা, অবাক্ করলে যে তুমি ! দুশ্চারিণী কুলটার ছেলেও নিষ্পাপ হলো ? বাপু হে ! তিলির ছেলে, দোকান-পাট করে খাও, বিদ্যের দৌড় বড় জোর “দাতাকর্ণ” পর্য্যন্ত,—তোমার এ পণ্ডিতি বাতিক কেন ? চিরকাল বেদে-পুরাণে বলে আসছে কুলটার সন্তান সর্ব্বথা পরিত্যজ্য, আর তুমি গয়াপালের বেটা ভজাপাল বেদব্যাস হয়েছ ; বল কি না ও নিষ্পাপ !”

আমি উত্তর করিলাম, “দাদাঠাকুর ! আমি ওর কোন পাপই দেখতে পাচ্ছি না। আমি দিব্য চক্ষে দেখছি, সমাজ এই অসহায়, নিরাশ্রয়, দীন শিশুটীর উপর অত্যাচার করছে। আমি কোন্ প্রাণে ওকে এই রাক্ষস সমাজের নির্ম্মম অত্যাচারের কবলে ছেড়ে দিই ?”

রামযদু কহিলেন “দেখ বাপু, ও সব বক্তৃতে মথুর সা’র দলে গিয়ে কোরো ! সোজা কথা হচ্ছে, ওকে বাড়ীতে রাখলে তোমাকে সমাজ ত্যাগ করতে হবে। এক, ওই গল-গ্রহটাকে বিদেয় করে দাও,—নয়, তোমার পিতৃ-পিতামহের সমাজ ত্যাগ কর।—কি বল ?”

আমি একবার মণ্ডপ-ঘরের মধ্যে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিলাম। দেখিলাম, ঘৃত-প্রদীপের ম্লান আলোকে আমার নিকষ-পাষাণ রাধাকান্তের নিবিড়-কৃষ্ণ মূর্ত্তিখানি মৃদু উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। মুখকমলের প্রতি চাহিলাম। দেখিলাম, ললিত বিম্বাধরের প্রান্তে মনোমোহন হাসি জাগিয়া উঠিয়াছে,—বড় মধুর ! চন্দনচর্চ্চিত বদন উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছে,—বড় সুন্দর ! ঈষদ্-বিকশিত নলিন-নয়ন-যুগলে

স্নিগ্ধ শান্তশ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছে,—বড় প্রীতিময়। যুক্ত-করে প্রণাম করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম, "পারলাম না দাদাঠাকুর! রাধাকান্ত তাকে আমার কোলে তুলে দিয়েছেন।"

"গোল্লায় যাও, নিপাত যাও! রাধাকান্ত ওঁর কাণে কাণে বলে গেছেন, 'ওরে, ওই বেবুশ্যের ছেলেটাকে কাঁধে তুলে ধেই-ধেই করে নাচ্'। রসাতলে যাও, ভজগোবিন্দ পাল, তুমি রসাতলে যাও। চলহে ঘোষজা,—তখনই বলেছিলাম।"

একটা অস্ফুট কলরোল করিতে-করিতে সকলে বাহির হইয়া গেল। আমি একঘরে হইলাম।

সেইদিনই রাধাকান্তকে মাথায় এবং তাঁহার প্রসাদ-দাসকে বুকে করিয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে রওনা হইলাম। সেখানে প্রভুর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। পূজার জন্য পুরোহিত নিযুক্ত করিয়াছি। কন্যা জামাতা, সমাজ, দেশ পরিত্যাগ করিয়াছি। করিয়াছি সবই। কিন্তু রাধাকান্তের দান আজ আমার গলগ্রহ হইয়াছে। সকল ত্যাগী হইয়াও আজ আমি এই লোহার বাঁধনে সংসারে বাঁধা পড়িয়া রহিয়াছি। রাধাকান্ত হে! স্থান দাও প্রভু!"

অশ্রুসজল নেত্রে বৃদ্ধ বালককে ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন। আত্মবিস্মৃত হইয়া আমি এই সর্ব্বত্যাগী ভোলানাথ বৃদ্ধের চরণধূলি লইতে যাইতেছিলাম। বাধা দিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "করেন কি? আপনি ব্রাহ্মণ যে!"

প্রণাম করি নাই বটে, কিন্তু আজও আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই,—সেই নিরপেক্ষ বিচারকের চক্ষে কে ব্রাহ্মণ, কে শূদ্র,—কে উচ্চ কে নীচ!

জমি-বিলির "উটবন্দী" প্রণালী

[শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার বি, এ]

সর্ব্বপ্রথমে "উটবন্দীর" অর্থ কি, তাহার আলোচনা করা যাউক। "আবাদ অনুসারে জমির কর নির্দ্ধারণ" 'উটবন্দী' কথাটীর সরল অর্থ।

'উটবন্দী' প্রণালীর কথা ১৮৮৪ খৃঃ অব্দের Bengal Tenancy Bill এ বঙ্গীয়গভর্ণমেণ্টের রিপোর্টে নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে :—

"ইহা একরূপ বাৎসরিক ভাড়াটিয়া প্রজাত্ব। কখনও কখনও ইহা সাময়িক হইয়া থাকে। কর্ষিত ভূমির কর নগদ টাকায় দিতে হয় না; কিন্তু ভূমিস্থ শস্যের গুণাবধারণ পূর্ব্বক তাহা স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। ভাওলি প্রণালীর শস্যের গুণাবধারণ পূর্ব্বক করগ্রহণের সহিত ইহার এ পর্য্যন্ত মিল আছে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে এই বিশিষ্ট বিভিন্নতা আছে যে, শেষোক্তটীতে জমি যেরূপ বৎসরে বৎসরে এক ব্যক্তির হস্ত হইতে অপর ব্যক্তির হস্তে যায় না, প্রথমোক্তটীতে কিন্তু তাহা যাইতে পারে।"

(J. H. E. Garrette's Nadia Gezetteer.)

"কেবল মাত্র বৎসরকালের কিম্বা এক ঋতুর জন্য গৃহীত ভূমিতেই 'উটবন্দী' নিয়ম প্রয়োগ করা হয়। সাধারণতঃ কৃষককে জমিদারের মৌখিক অনুমতি লইতে হয়, এবং এক নির্দ্দিষ্ট হারে কিছু জমি বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া চাষ করিতে হয়। যখন সেই ক্ষেত্রে শস্য উৎপন্ন হয় তখন ঐ জমির মাপ লওয়া হয় এবং উহার উপর কর ধার্য্য করা হয়।"

(W. W. Hunter's Statistical Accounts, Nadia).

Rampini তাঁহার Tenancy Actএ বলিতেছেন, "উটবন্দী" রাইয়তীসমূহ অন্তর্ভূত চুক্তি (implied contract) হইতে উৎপন্ন রাইয়তীর দৃষ্টান্ত। এ ক্ষেত্রে জমিদারের বা তাঁহার গোমস্তার স্পষ্ট অনুমতি না লইয়াই কৃষক জমি আবাদ করিতে থাকে এবং জমিদার তাহাতে কোন আপত্তি উত্থাপন করেন না।

* * *

বাস্তবিক বলিতে গেলে, এইরূপ লোক পরের ভূমিতে অনধিকার-প্রবেশকারী। কিন্তু যদি তাহাকে থাকিতে দিয়া ভূমি কর্ষণ করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে রাইয়তীর চুক্তি ধার্য্য হইতে পারে, কিম্বা যদি করের জন্য তাহাকে আদালতে অভিযুক্ত করা হয়, তাহা হইলে রাইয়তী পরিস্কার ভাবেই স্থাপিত হয়!

* * * যদি সে জমিদারের ভূমি কর্ষণ করিতে ইচ্ছা করে এবং জমিদার তাহাকে জমি বিলি করেন, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে অন্তর্ভূর্ত চুক্তি হয় এবং ভূস্বামী-প্রজা সম্বন্ধ স্থাপিত হয়।

* * *

পুনরায় উক্ত হইতেছে "কেবল কর দাবী করণই ভূস্বামী-প্রজা সম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্য পর্য্যাপ্ত নহে। ইহাকে রাইয়তী দানের প্রস্তাবের অধিক আর কিছুই বলা যায় না।"

Tenancy Actএর ১৮০ ধারা বলিতেছে, "এই আইন থাকা সত্ত্বেও যে যে স্থানে 'উটবন্দী' প্রণালী বর্ত্তমান, এমন স্থানে যদি কোনও প্রজার সেই প্রণালী অনুসারে গৃহীত জমি থাকে, এবং সে জমি যদি সে সময়ের জন্য তাহাকে বিলি করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে যদি উপর্য্যুপরি ১২ বৎসর ধরিয়া সে জমি না লয়, তাহা হইলে সে এ জমি দখল করিবার ক্ষমতা পাইবে না এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে দখল করিবার অধিকার পাইবে না, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাকে ঐ জমির জন্য জমিদার এবং তাহার মধ্যে চুক্তি কর প্রদান করিতে হইবে।"

রাইয়তীর এই প্রণালী অনুসারে ঋতু কিম্বা জমা লওয়ার সময় শেষ হইলে সে ভূমির অনুর্ব্বরতা বা অন্য কেহ না লওয়া বশতঃ পতিত থাকে বলিয়াই বোধ হয় "উটবন্দী" কথাটী উৎপন্ন হইয়াছে। (Rampini)

১৮৮৪ খৃঃ অব্দে নদীয়া জেলার কলেক্টার বলেন, যে সকল কৃষক এইরূপ ভূমি গ্রহণ করে, তাহারা সেই ভূমি দ্বিতীয় বৎসরেও কর্ষণ করিতে বাধ্য নহে। কিন্তু সাধারণতঃ তাহারা ইচ্ছা করিলে সে ভূমিকে তিন বৎসর কাল রাখিতে পারে। প্রধানতঃ, এই প্রণালী অনুসারে গৃহীত ভূমিসকল এক হইতে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত কর্ষিত হইতে পারে, এবং ঐ সময় ব্যাপিয়া পতিত থাকিতেও পারে। কৃষকসমূহ ভূমি দখলের কোনও অধিকার প্রাপ্ত হয় না এবং তাহারা প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছাও করে না।"

Rampini পুনরায় বলিতেছেন "ইহা কেবলমাত্র এক বৎসরের ইজারা বলিয়া প্রজার 'উটবন্দী' রাইয়তী ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে জমিদারকে কোনও বিজ্ঞাপন দিতে হয় না।"

'উটবন্দী' প্রণালীর প্রধান বিশেষ লক্ষণসমূহ নিম্নলিখিত প্রকারে সংক্ষেপে বর্ণিত হইতে পারে ঃ—

(১) * * *

"উটবন্দী" রাইয়তী অন্তর্ভূর্ত চুক্তি। (implied contract)। কৃষক প্রধানতঃ এক অঙ্গীকৃত হারে ভূস্বামীর নিকট হইতে মৌখিক অনুমতি পাইয়া থাকে।"

(২) কেহ কেহ বলেন যে ক্ষেত্রস্থ শস্যের গুণাবধারণ পূর্ব্বক কর স্থিরীকৃত হয়।

(৩) এই প্রণালী অনুসারে গৃহীত ভূমি কেবল মাত্র এক বৎসর অথবা এক ঋতুর জন্য রাখা যাইতে পারে। ইহা এক হইতে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত রাখা যায় এবং তৎপরে পতিত থাকিতে পারে।

(৪) ধারাবাহিক ভাবে দ্বাদশ বৎসর ভূমি কর্ষণ না করিলে কৃষক সে ভূমি দখল করিবার ক্ষমতা পাইবে না। বলিতে গেলে ইহা প্রায় হয় না এবং কৃষককে যে কোনও সময়ে বহিস্কৃত করিয়া দেওয়া যায়।

(৫) প্রজার ভূমি পরিত্যাগ কালে জমিদারকে কোনও বিজ্ঞাপন দিতে হয় না।

(ক) কার্য্যতঃ নদীয়ার কোন স্থানে প্রথমে একটী হার স্থিরীকৃত হয় এবং শস্য কাটা হইলে সেই হারে জমিদারকে নগদ টাকায় কর দেওয়া হয়।

(খ) যখন কৃষক ভূমি কর্ষণ করিয়া থাকে, কেবল মাত্র তখনই তাহার জমিদারকে কর দিতে হয় এবং জমি পতিত থাকিলে তাঁহাকে কর দিতে হয় না।

কর প্রদানের এইরূপ প্রণালী হইতেই 'উটবন্দী' কথাটীর উৎপত্তি হইয়াছে। ভূমি কর্ষিত হইলে কৃষক 'উঠিয়াছে' বা 'উঠা' এবং পতিত থাকিতে দেওয়া হইলে 'পতিত' বা 'পড়া' এই দুইটী কথা ব্যবহার করিয়া থাকে। জমি কর্ষিত হইলে সে কর প্রদান করিয়া থাকে এবং পতিত হইলে করে না। এই নিমিত্তই 'উটবন্দী' কথাটীর সৃষ্টি হইয়াছে।

এই প্রণালীর উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

W. W. Hunter তাঁহার Gezetteerএ বলিতেছেন,—

"নদীয়া জেলার 'উটবন্দী' রাইয়তীর বর্ত্তমান সংখ্যাধিক্যের কারণ তত্রস্থ কলেক্টর কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত রূপে

নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—১৮৬৫-৬৬ অব্দে দুর্ভিক্ষ এবং '১৮৬১-৬৮ অব্দে মহামারীর নিমিত্ত অন্যান্য স্থায়ী রাইয়তী উঠিয়া যাওয়ায় এই জেলায় 'উটবন্দী' রাইয়তীর সংখ্যা অধিক।"

Garrette সাহেব তাঁহার Gezetteerএ লিখিতেছেন, "নদীয়াই 'উটবন্দী' নামে জ্ঞাত রাইয়তীর উৎপত্তি স্থল। এই জেলা হইতেই রাইয়তী সন্নিহিত জেলাসমূহে বিস্তৃত হইয়াছে। নদীয়া জেলার ন্যায় কোথাও ইহা এত সাধারণ নহে। এই স্থানে কর্ষিত ভূমির ⅙ অংশ এই প্রণালী অনুসারে গৃহীত।"

কেহ কেহ বলেন নীলকর জমিদারেরা নীল চাষের সুবিধার জন্য ভাল ভাল জমি "উটবন্দী" নিয়মে বিলি করাতে অনেক ভাল জমি 'উটবন্দী' জমা হইয়া যায়।

১৮৭১ অব্দে Montresor সাহেব নিম্নলিখিত প্রকারে এই প্রণালীর বর্ণনা করিয়াছেন :—

"উটবন্দী রাইয়তী এই জেলাতেই উৎপন্ন হইয়াছে এবং ইহা নদীয়া জেলার স্বকীয়। প্রায় সকল গ্রামেই প্রজাদিগের জমাবন্দী ব্যতীত কিছু জমি আছে। তালুকের পরিজ্ঞাত স্বত্বাধিকারীই ইহার প্রভু। আইনের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত পলায়িত প্রজাগণের জোত জমা এবং পলিমাটি উৎপন্ন নব ভূমি ভাগ, সম্প্রতি কর্ষিত বনভূমি যাহা বিনা জমাতে কর্ষিত এবং "খাস খামার" হইতে এই সকল বে-বন্দোবস্ত জমির সৃষ্টি হইয়াছে।

যে জমী স্বত্বাধিকারী কর্ত্তৃক স্বীয় সংসারের জন্য রক্ষিত হয়, তাহাকে 'খাস খামার' বা 'লোকসানি জমি' বলে।

'ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতম্' নামক একখানি মূল্যবান বাংলা পুস্তক হইতে 'উটবন্দী' নিয়ম সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ দেওয়া গেল :—

যদিও ১৭৯৩ অব্দের অষ্টম ও চতুর্থ আইন অনুসারে জমিদারগণ তাঁহাদের প্রজাগণ কর্ত্তৃক দখলীকৃত ভূমির জন্য তাহাদিগকে পাট্টা দিতে বাধ্য ছিলেন এবং তাহারা চাহিলে যদি জমিদার 'পাট্টা' না দেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে বিচারালয়ে দণ্ড দেওয়া হইবে, তথাপিও প্রথমে পাট্টা দান ও গ্রহণ প্রণালী নদীয়া-রাজের ইলাকার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত ছিল না। * * * * * অধিকাংশ রাইয়ত 'উটবন্দী' প্রণালী অনুসারেই ভূমি কর্ষণ করিত এবং যদি তাহারা চিরকালের জন্য বন ভূমি রাখিতে চাহিত, তাহা হইলে তাহারা নায়েব কিম্বা গোমস্তাকে কিছু টাকা প্রদান করিত এবং তাহার নাম এবং তাহার জমার সংখ্যা তালিকাভুক্ত করা হইত অথবা সে নায়েব বা গোমস্তা কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত * পাট্টা লইত, * কিন্তু ইহা কখনও শ্রুত হয় নাই যে এইরূপ কর্ম্মচারী বা প্রতিনিধিগণ পাট্টা প্রদান করিবার অধিকারযুক্ত।"

অতএব দেখা যাইতেছে যে, পূর্ব্বে নদীয়া রাজের ইলাকার মধ্যে 'উটবন্দী' প্রণালী অত্যন্ত প্রচলিত ছিল। মহারাজ রাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে নদীয়া-রাজের রাজ্য উত্তরে মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত, দক্ষিণে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত, পূর্ব্বে ধূল্যাপুর পর্য্যন্ত এবং পশ্চিমে ভাগীরথী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত নদীর পশ্চিমে কৃষ্ণেপুর নামক এক বৃহৎ পরগণাও ইহার অন্তর্গত ছিল। বর্ত্তমান সময়ে এই রাজ্যের অন্তর্গত স্থানগুলি নদীয়া, ২৪ পরগণা, মুর্শিদাবাদ, যশোহর এবং বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে আছে। *

(অন্নদামঙ্গল)

আমরা জানি যে 'উটবন্দী' প্রণালী নদীয়া, ২৪ পরগণা, যশোহর, খুলনা, মুর্শিদাবাদ এবং পাবনা জেলায় বর্ত্তমান। (Bengal Government's Report on the Bengal Tenancy Bill, 1884, VII cited by Rampini). এবং Garrett সাহেবের মতানুসারে 'উটবন্দী' নামে পরিচিত রাইয়তী নদীয়া জেলায় উৎপত্তি লাভ করিয়া তথা হইতে সন্নিহিত জেলাসমূহে বিস্তৃত হইয়াছে।"

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে 'উটবন্দী' প্রণালীর উৎপত্তি নদীয়ারাজ হইতেই এবং অন্য কিছু হইতে নহে। নদীয়া এবং তৎসন্নিহিত জেলাসমূহের যে সকল স্থানে 'উটবন্দী' প্রণালী অধুনা পর্য্যন্ত বর্ত্তমান, সে সকল পূর্ব্বে নদীয়া-রাজের জমিদারীর অন্তর্গত ছিল। এ স্থলে ইহা দ্রষ্টব্য যে যেমন-

অধিকার রাজার চৌরাশী পরগণা।
খাড়ি জুড়ি আদি করি দপ্তরে গণনা ॥
রাজ্যের উত্তর সীমা মুরশিদাবাদ।
পশ্চিমের সীমা গঙ্গা ভাগীরথী খাদ ॥
দক্ষিণের সীমা গঙ্গা সাগরের ধার।
পূর্ব্ব সীমা ধুল্যাপর বড় গঙ্গা পার ॥

(অন্নদামঙ্গল, ভারতচন্দ্র

সিংহে এবং নদীয়াতে কোরফা প্রণালী বলিয়া একরূপ প্রণালী আছে। ইহার সহিত 'উটবন্দী' প্রণালীর কিছু সাদৃশ্য আছে।

'উটবন্দী' প্রণালী অনুসারে গৃহীত ভূমির মোট ক্ষেত্রফল (area) ঠিক নির্দ্দেশ করা যায় না। প্রতি বৎসর ইহার তারতম্য হয়। আজকাল এই প্রণালী অনুসারে গৃহীত জমির পরিমাণ বর্দ্ধিত হইতেছে কিংবা হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে, তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না।

১৯১০ খৃঃ অব্দে Garrett সাহেব লিখিয়াছেন যে, কর্ষিত ভূমির প্রায় ৮ অংশ এই প্রণালী অনুসারে গৃহীত। এক্ষণে এই প্রণালীর ফল কি তাহা দেখা যাউক। ইহার একটী মন্দ ফল এই হইতেছে যে, জমিদারগণ অতিরিক্ত খাজনা লইবার সুবিধা প্রাপ্ত হন। রাইয়তকে পত্তনী জমা প্রণালী অপেক্ষা এই প্রণালীতে অনেক বেশী কর দিতে হয়। সুতরাং এই অত্যধিক করই রাইয়তদিগের ঋণগ্রস্ত হইয়া সর্ব্বস্বান্ত হওয়ার কারণ। অপর একটী ফল এই হইতেছে যে, রাইয়ত এই প্রণালী অনুসারে গৃহীত ভূমির ঔৎকর্ষ্য সাধন করিতে চেষ্টা করে না। জমা প্রণালী অনুসারে গৃহীত হইলে সে এরূপ করে, কারণ সে জানে যে ভূমির ঔৎকর্ষ্য সাধন করিলে সে নিজে লাভবান্ হইতে পারিবে। আর এক জিনিসও লক্ষ্য করিবার উপযুক্ত এবং তাহা এই :—জমিদার এবং 'উটবন্দী' রাইয়তের সম্বন্ধ জমিদার এবং অন্যান্য প্রজার সম্পর্কের ন্যায় ঘনিষ্ঠ নহে। প্রথমোক্ত প্রজাদিগের নিমিত্ত জমিদার অতি অল্পই করিয়া থাকেন। কিন্তু এই প্রণালীর অনুকূলে একটী কথা বলা যাইতে পারে। রাইয়ত জমিদারকে যে উচ্চ কর প্রদান করে, ভূমি পতিত থাকিলে তাহার কিছু কিছু পূরণ হয় ; (কিন্তু জমাগ্রাহক প্রজাকে জমি পতিত থাকিলে বা না থাকিলেও প্রতি বৎসর কর দিতে হয়।)

অধিকাংশ সময়ে রাইয়ত 'উটবন্দী' অপেক্ষা জমা বিলিই পছন্দ করিয়া থাকে।*

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিণ্টো প্রফেসর মিষ্টার হ্যামিণ্টন ও কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ মিষ্টার গিলক্রীষ্টের উৎসাহে এই প্রবন্ধ লিখিত হইল। শ্রীযুক্ত ভুপেন্দ্রনাথ সরকার বি-এ ও শ্রীমান্ গৌরগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রবন্ধ লিখিতে সাহায্য করিয়াছেন।

মনোবিজ্ঞান

[অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র সিংহ এম-এ]

চিন্তা

সামান্য জ্ঞান

"সামান্য জ্ঞানের" অর্থ।—আমি একটী কমলা লেবু দেখিলাম। পরে একটী বাতাবি লেবু দেখিলাম। আবার একটী পাতি লেবু দেখিলাম। প্রত্যেকেরই পৃথক-পৃথক 'ফল জ্ঞান' লাভ হইল। প্রত্যেকেরই স্মৃতি মনোমধ্যে স্থান পাইল। কিন্তু মনোমধ্যে তাহারা পৃথক-পৃথক থাকিতে পারে না। পৃথক-পৃথক লেবুর স্মৃতি মিশিয়া এক হইতেছে। এইরূপে বহু স্মৃতির সমন্বয়হেতু একটী স্মৃতির নাম "সামান্য-জ্ঞান"। কুকুর দেখিলাম, গরু দেখিলাম, ছাগল দেখিলাম, হাতী দেখিলাম, প্রত্যেকেরই ফলজ্ঞান হইল। প্রত্যেকেরই স্মৃতি মনোমধ্যে স্থান পাইল। এবং সকলগুলি মিলিয়া একটী স্মৃতিতে পরিণত হইল। এইরূপ সম্মিলিত (?) স্মৃতিকে—"জন্তু" নামে অভিহিত করিলাম। এইরূপ সম্মিলনকালে ব্যক্তিগত পার্থক্যগুলি অদৃশ্য হইয়া যায়। যাহা সাধারণ, যাহা সকলেরই আছে, সেইটিই থাকিয়া যায়।

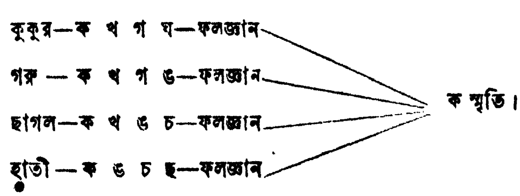

'ক' পুনঃপুনঃ স্মৃতিপটে উদিত হইতেছে; সুতরাং পৌনঃপুন্য হেতু ক এর স্মৃতি ক্রমশঃই স্পষ্ট এবং স্থায়ী হইতেছে; অপরগুলি ক্রমশঃই মুছিয়া যাইতেছে। এখন বুঝিলাম 'ক' বিশিষ্ট প্রাণীমাত্রেই জন্তু। জন্তু বলিলে এখন কুকুর বা গরু বুঝি না—জন্তুমাত্রেরই একটা ধারণা হয়। জন্তু এই সামান্য কথা হইতে সকল জন্তুরই জ্ঞান হইতেছে। জন্তু জাতিবাচক শব্দ। যে জ্ঞান অবলম্বনে এই জাতিবাচক শব্দ সৃষ্ট, সেই জ্ঞানকে সামান্য জ্ঞান বলে।

সামান্য জ্ঞানের সৃষ্টি।—বালকে কুকুর লইয়া খেলা করে। প্রথমে সে যখন একটী কুকুর দেখে, তখন তাহার সেই কুকুটিরই জ্ঞান হয়; কুকুরজাতির কোন জ্ঞান হয় না। পরে যখন তাহার অভিজ্ঞতার প্রসার বৃদ্ধি হয়, যখন ধারণাশক্তি প্রবল হয়, তখন নানা প্রকারের কুকুর দেখে। এইরূপে অনেক কুকুর দেখিতে দেখিতে কোন একটী কুকুরের জ্ঞান তাহার থাকে না; অথচ এক অভিনব জ্ঞানের সৃষ্টি হয়, যে জ্ঞানের বলে সে দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট কুকুরেরও ধারণা করিতে পারে। এইরূপ জ্ঞানকে সামান্য জ্ঞান বলে। এই সামান্যজ্ঞানের সাহায্যে এক জাতীয় বহু বস্তুর ধারণা সম্ভব হয়।

প্রথমে বালকটি একটী কুকুর দেখিয়া লক্ষ্য করিল—

১। ইহা দৌড়িতে পারে
২। ইহার পা চারিটি
৩। ইহা 'ঘেও ঘেও' শব্দ করে
৪। ইহা প্রকাণ্ড
৫। ইহা পীতবর্ণের

আর একটী কুকুর দেখিয়া লক্ষ্য করিল—

১। ইহা দৌড়িতে পারে
২। ইহার পা চারিটি
৩। ইহা 'ঘেও ঘেও' শব্দ করে
৪। ইহা প্রকাণ্ড
৫। ইহা কৃষ্ণবর্ণের

এইবার বালকের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল, তবে কি সব কুকুর এক রকমের নয়? আবার আর একটী তাহার লক্ষ্যপথে পতিত হইল; এবার সে দেখিল—

১। ইহা দৌড়িতে পারে
২। ইহার পা চারিটি
৩। ইহা 'ঘেও ঘেও' শব্দ করে
৪। ইহা ক্ষুদ্র
৫। ইহা শ্বেতবর্ণের

এইরূপে বহু কুকুর দেখিয়া বালক বুঝিতে পারিল, কতকগুলি লক্ষণ সকল কুকুরেই আছে; আর কতকগুলি কোনটিতে আছে এবং কোনটিতে নাই। সুতরাং কতকগুলি লক্ষণ সাধারণ এবং কতকগুলি অসাধারণ। বালক অনেক কুকুর দেখিয়াছে; কিন্তু সকলেরই সাধারণ এবং অসাধারণ লক্ষণ মনে রাখা সম্ভব নহে; সুতরাং কতকগুলি লক্ষণের বিস্মৃতি অনিবার্য্য। কিন্তু যাহারা বারংবার স্মৃতিপটে আনীত হয়, তাহাদের বিস্মরণ অসম্ভব। যতবার কুকুর দেখিতেছে, ততবারই সাধারণ লক্ষণগুলি স্মরণ-পথে আসিতেছে। আর, অসাধারণ লক্ষণগুলি কখনও আসিতেছে, আবার কখনও আসিতেছে না। সুতরাং সাধারণ লক্ষণগুলিই বালকের মনে থাকে এবং অসাধারণ লক্ষণগুলি সে ভুলিয়া যায়। এই সাধারণ লক্ষণগুলি অতি সামান্য; কিন্তু এই সামান্য লক্ষণ হইতে সমস্ত কুকুরের বিষয় আমরা ধারণা করিতে পারি। যে বস্তুতে এই সামান্য লক্ষণ বর্ত্তমান, তাহাই কুকুর; আর যেখানে ইহার অভাব, সেখানে কুকুরেরও অভাব। এই সামান্য লক্ষণ, কুকুরজাতি মাত্রের লক্ষণ।

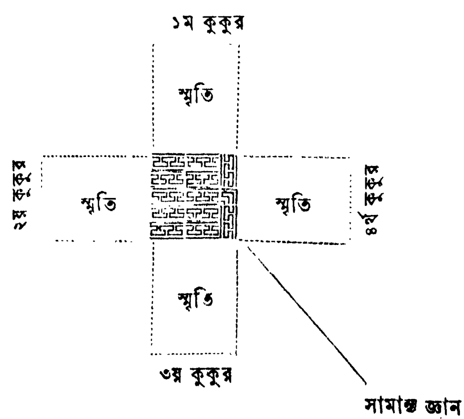

সামান্য-জ্ঞান প্রকরণ।—"কুকুর" বলিতে তুমি কোন একটী নির্দ্দিষ্ট কুকুর বুঝিতেছ না—এই কুকুর বা সেই কুকুর বুঝিতেছ না। বুঝিতেছ কোন সামান্য গুণবিশিষ্ট একটী জন্তু। এই সামান্য-জ্ঞান লাভ করিবার জন্য তুমি কতিপয় কুকুর পর্য্যবেক্ষণ করিলে; তাহাদের গুণাবলি

নির্ণয় করিলে (বিশ্লেষণ) কোন গুণটি সকলের আছে, এবং কোন্‌টি সকলের নাই বিচার করিলে, সাধারণ গুণগুলি অসাধারণ গুণ হইতে পৃথক ভাবে চিন্তা করিলে; মনে-মনে সাধারণ গুণগুলিকে একত্র করিয়া তাহাতে "কুকুর" নাম আরোপ করিলে। অতএব সামান্য জ্ঞান লাভের এই কয়টি মানসিক প্রক্রিয়া—

১। পর্য্যবেক্ষণ
২। বিশ্লেষণ
৩। বিচার
৪। অসাধারণ লক্ষণ বাদ দিয়া সাধারণ লক্ষণ চিন্তন
৫। সাধারণ লক্ষণ একত্রীকরণ
৬। একত্রীভূত লক্ষণের নামকরণ।

প্রত্যক্ষ স্মৃতি ও সামান্য-জ্ঞানের সম্বন্ধ।—এই প্রকার সামান্য-জ্ঞানকে ফলজ্ঞান বলা যায় না। ফলজ্ঞানে স্পর্শানুভূতি আবশ্যক। এখানে কোনপ্রকার স্পর্শানুভূতি নাই। এরূপ জ্ঞানকে স্মৃত বস্তুও বলিতে পারি না, কারণ স্মৃত বস্তু ফলজ্ঞানের প্রতিকৃতি মাত্র। সামান্য-জ্ঞানের অনুরূপ কোন স্বরূপ পদার্থ বাহ্য জগতে থাকিলেও তাহার ফলজ্ঞান সম্ভব নহে। অবশ্য বহু স্মৃতির সমবায়ে এই সামান্য স্মৃতির উদ্ভব হইতেছে সত্য, কিন্তু এই সামান্য স্মৃতি কোন একটীও স্মৃতির মত নহে। এই—"সামান্য স্মৃতি" কোন স্মৃতিরই অবিকল প্রতিকৃতি নহে। ইহাকে কল্পনাও বলা যাইতে পারে না; কারণ, কল্পনায় উপকরণ আবশ্যক। পৃথক জাতীয় নানা বস্তুর ফলজ্ঞান হইতে কল্পনার উপকরণ সংগৃহীত হয়। কিন্তু এক জাতীয় পৃথক বস্তুর ফলজ্ঞান হইতে সামান্য-জ্ঞানের উপকরণ সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। কল্পনা এবং সামান্য-জ্ঞান এই দুইয়েরই উপকরণ ফলজ্ঞান সরবরাহ করিয়া থাকে—কিন্তু কল্পনার উপকরণের মধ্যে পার্থক্য প্রবল এবং সামান্য-জ্ঞানের উপকরণের ভিতর সাদৃশ্যই অধিক।

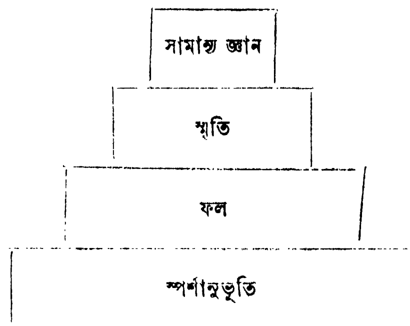

সামান্য জ্ঞানের মূল ভিত্তি স্পর্শানুভূতি। স্পর্শানুভূতি হইতে ফলজ্ঞান, ফলজ্ঞান হইতে স্মৃতি এবং স্মৃতি হইতে সামান্য-জ্ঞানের উদ্ভব হইতেছে। সামান্য-জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, এক জাতির অন্তর্গত বহু বস্তুর স্মৃতি প্রয়োজন; কিন্তু ফলজ্ঞান ব্যতীত স্মৃতি এবং স্পর্শানুভূতি ব্যতীত ফলজ্ঞান সম্ভব নহে। কোন একটী বস্তুর ফলজ্ঞান বা স্মৃতি সম্ভব; কিন্তু এক কালে এক জাতীয় বহু বস্তুর জ্ঞানকে স্মৃতি বা ফলজ্ঞান বলা যায় না।

ফল	স্মৃতি	সামান্য জ্ঞান
অবলম্বন—স্পর্শানুভূতি	অবলম্বন—স্পর্শানুভূতি	অবলম্বন—স্মৃতি
প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	অতিপরোক্ষ
উপস্থিত বস্তুর জ্ঞান	অনুপস্থিত বস্তুর জ্ঞান	একজাতীয় বহুবস্তুর জ্ঞান
"বাস্তব"	"চিচ্ছায়া"	"চিহ্ন"

অস্পষ্ট সামান্য জ্ঞানের হেতু।—বালক দেখিল, তাহার পিতার কেশ এবং শ্মশ্রু দীর্ঘ এবং কৃষ্ণ বর্ণ। বালক এখন তাহার পিতাকে "বা" (বাবা) বলিতে শিখিয়াছে। বালক ঐ প্রকার কেশ এবং শ্মশ্রুবিশিষ্ট আর একটী লোক দেখিলেও তাহাকে 'বা' বলিয়া থাকে। বালক তাহার বাড়ীতে অনেক লোকই দেখিতে পায়; এবং অনেক লোকের মধ্যে যাহার কেশ এবং শ্মশ্রু দীর্ঘ, তাহাকেই 'বা' বলিয়া থাকে; এবং ঐরূপ কেশ এবং শ্মশ্রুবিশিষ্ট অপর লোক দেখিলেও 'বা' বলিয়া হাত তুলিয়া তাহার কোলে যাইতে চাহে। বালকের হয় ত মনে-মনে হইতেছে যে, দীর্ঘ কৃষ্ণবর্ণ কেশ শ্মশ্রুবিশিষ্ট মানুষই "বা"। বালকের পিতার আরও অনেক এমন গুণ আছে, যাহা অপরের নাই; কিন্তু

বালক এখন নিতান্ত শিশু ; সুতরাং সেই গুণগুলি বিশেষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিবার শক্তির অধিকারী সে এখনও হইতে পারে নাই। সেই জন্য বালকের ভ্রম হইতেছে। তবে বালকের সামান্য-জ্ঞান লাভের সূচনা দেখা দিয়াছে। তাহার পরিবারস্থ বহু লোকের মধ্যে সে এমন একটী লক্ষণ বাছিয়া লইতে'পারিয়াছে, যাহা তাহার পিতা ব্যতীত অপর কাহারও নাই। বালকেরা অপর স্ত্রীলোককেও নিজের মা বলিয়া ভুল করিয়া থাকে সত্য ; কিন্তু সে ভুল কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে। বালক তাহার মাতার প্রতি অধিক আকৃষ্ট ; সুতরাং তাহার মাতার বিষয় যত মনোযোগ পূর্ব্বক প্রণিধান করিয়া থাকে, পিতার বিষয় তত করে না। অনেকেই তিমিকে মৎস্য বলিয়া থাকে। তাহার কারণ, মৎস্য জলজন্তু, তিমিও জলজন্তু। তিমি মৎস্য জাতীয় কি না দেখিতে হইলে, ভাল রূপে পর্য্যবেক্ষণ করা উচিত যে, তিমির সহিত মৎস্যের সাদৃশ্য অধিক, কি বৈসাদৃশ্য অধিক। কিন্তু সেরূপ পর্য্যবেক্ষণের সুযোগ অনেকেরই হইয়া উঠে না। সুতরাং 'জলে বাস করাটা'ই মৎস্য জাতির সাধারণ গুণ বলিয়া মনে করিয়া লয়। আমরা পয়সাকে গোল বলি, ডিম্ব গোল বলি, লেবু গোল এবং ছড়িও গোল বলিয়া থাকি। এখানে 'গোল' কথাটি বড়ই অসতর্ক ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে ; এবং অনেক স্থলেই আমরা এমনি ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকি। পয়সা, ছড়ি, ডিম্ব, লেবু প্রভৃতিকে যথাযথ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করা হয় নাই ; তাহাদের মধ্যে সদৃশ এবং বিসদৃশ গুণাবলীর সম্যক বিশ্লেষণ করা হয় নাই ; অসাধারণ গুণ হইতে সাধারণ গুণগুলি বাছিয়া লওয়া হয় নাই এবং অবশেষে এই সাধারণ গুণের সমন্বয়কে 'গোল' বলিয়া অভিহিত করা হয় নাই। অতএব অসংযত ভাষাই এই অস্পষ্ট সামান্য-জ্ঞানের হেতু। সামান্য-জ্ঞান স্মৃতি-শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ; সুতরাং স্মৃতি-শক্তি দুর্ব্বল হইলে কিংবা সময়ের ব্যবধান-হেতু স্মৃতির লোপ হইলে সামান্য-জ্ঞান সুস্পষ্ট হইতে পারে না। অপরিস্ফুট ফল-জ্ঞান, অসম্যক পর্য্যবেক্ষণ, অসংযত ভাষা, সময়ের ব্যবধান, স্মৃতি-শক্তির অভাব ইত্যাদি অস্পষ্ট সামান্য-জ্ঞানের হেতু।

সামান্য-জ্ঞানের উপকারিতা।—সামান্য-জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে অপরাপর মানসিক বৃত্তিনিচয় স্ফুর্ত্তি লাভ করিয়া থাকে। সামান্য-জ্ঞান নানা প্রকার মানসিক ক্রিয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। ফলজ্ঞান, অবধান, বিশ্লেষণ, স্মৃতি-যুক্তি, বিচার প্রভৃতি বহুবিধ ক্রিয়ার প্রয়োজন। অতএব সামান্য-জ্ঞানের ঔৎকর্ষ্য সাধন করিলে অপরগুলিরও ঔৎকর্ষ্য সাধন হইবে। প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা কতশত বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিতেছি ; কত শত বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতেছি ; কিন্তু এই প্রত্যেকটিকেই যদি পৃথক ভাবে আমাদিগকে মনে রাখিতে হইত,—তাহা হইলে আমাদের মন একবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িত, জ্ঞানের প্রকাশ বা বিস্তার সম্ভব হইত না। কিন্তু সামান্য-জ্ঞান ভাবসমূহের মধ্যে শৃঙ্খলা আনয়ন করিতেছে, ভাবসমূহের শ্রেণীবিভাগ করিতেছে ; অসামান্যগুলি বাদ দিয়া সামান্যগুলি গ্রহণ করিতেছে। অসামান্যগুলির বিয়োগ-হেতু স্মৃতির কার্য্য সহজ হইতেছে ;—অন্য ভাব গ্রহণের পথ প্রশস্ত হইতেছে, জ্ঞানের বিস্তার হইতেছে ; একত্বে বহুত্বের চিন্তা সম্ভব হইতেছে। সামান্য-জ্ঞান হইতে আমরা ভবিষ্যৎ এবং অতীতকে বর্ত্তমানে চিন্তা করিতে পারি—জ্ঞাত বিষয় হইতে অজ্ঞাত বিষয়ের অনুমান করিতে পারি। সামান্যজ্ঞানের উপর বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। সাধারণ জ্ঞানই বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। বিজ্ঞান পৃথক পৃথক বস্তু পর্য্যবেক্ষণ এবং আলোচনার পর সাধারণ নিয়মের প্রতিষ্ঠা করে। সামান্য-জ্ঞান ব্যতীত শ্রেণীবিভাগ বা নিয়ম-প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না।

"বহুরে যা এক করে ; বিচিত্রের করে যা সরস ;—
প্রভুতেরে করি' আনে নিজ ক্ষুদ্র তর্জ্জনীর বশ

* * * *

—সেই প্রেম হ'তে মোরে প্রিয়া
রেখো না বঞ্চিত করি।"

অবগতি।

বালক ক্রীড়াশীল
কুকুর গৃহপালিত পশু
মেষ হিংস্র জন্তু নহে

এই বাক্য কয়টি নিম্নলিখিত প্রকারে বিশ্লেষণ করা যায়—

	উদ্দেশ্য	সংযোজক	বিধেয়	
ইহারা এক একটি পদ	বালক	হয়	ক্রীড়াশীল	ইহারা এক একটি পদ
	কুকুর	হয়	গৃহপালিত পশু	
	মেষ	নয়	হিংস্রক জন্তু	

"যে পদের উদ্দেশে অপরটির অন্বয় কিংবা নিষেধ করা হয়, সেইটিকে উদ্দেশ্য বলে। এবং উদ্দেশ্যের সহিত যে পদটির অন্বয় কিংবা নিষেধ করা হয়, সেই পদটিকে বিধেয় বলে। যে শব্দের দ্বারা উদ্দেশ্যের সহিত বিধেয়ের অন্বয় কিংবা নিষেধ করা যায়, তাহাকে সংযোজক বলে।"

আমরা যখন বলি "কুকুর গৃহপালিত পশু," তখন "কুকুর" এবং "গৃহপালিত পশু" এই দুইটি প্রত্যয়ের সম্বন্ধ জ্ঞান প্রকাশ করিল। এইরূপ সম্বন্ধজ্ঞানরূপ মানসিক ক্রিয়াকে অবগতি বলে। যখন এই মানসিক সম্বন্ধ জ্ঞানকে ভাষায় প্রকাশ করা যায়, তখন ইহাকে বাক্য বলে।

বাক্য	অবগতি	
১। উদ্দেশ্য	১।	দুইটি প্রত্যয়
২। বিধেয়	২।	
৩। সংযোজক	৩।	তাহাদের সম্বন্ধ

দুইটি প্রত্যয়ের স্বরূপতা (স্বরূপ সম্বন্ধ) বা বিরূপতা-জ্ঞানের নাম অবগতি।

——————— ক

———————— খ

এখানে দুইটি সরল রেখা আছে। এই রেখাদ্বয় তুলনা করিয়া আমি মীমাংসা করিলাম যে, ক খ অপেক্ষা ছোট।

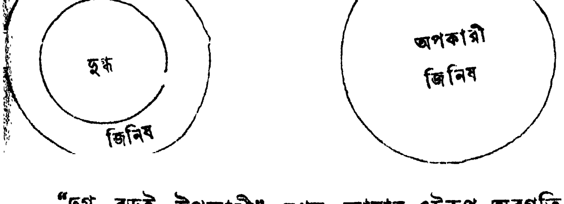

"দুগ্ধ বড়ই উপকারী" যখন আমার এইরূপ অবগতি হয়, তখন যেন আমি সমস্ত জিনিসকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া ফেলি। উপকারী জিনিস এবং অপকারী জিনিস। আমি দুগ্ধকে উপকারী জিনিস এবং অপকারী জিনিসের সহিত তুলনা করি, এবং পরে আমার এই মীমাংসা হয় যে, অপকারী জিনিস অপেক্ষা উপকারী জিনিসের সহিত দুগ্ধের সাদৃশ্য অধিক। অতএব তুলনা এবং মীমাংসা এই দুইটি অবগতির প্রক্রিয়া।

ফলজ্ঞানে আমরা এক একটী বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করি ফলজ্ঞান হইতে বিশেষ প্রত্যয়ের উৎপত্তি হয়। সামান্যজ্ঞান হইতে একজাতীয় বহু বস্তুর জ্ঞান হয়। সামান্য-জ্ঞান হইতে সাধারণ প্রত্যয়ের সৃষ্টি হয়। দুইটি বিশেষ প্রত্যয়ের কিংবা দুইটি সাধারণ প্রত্যয়ের অথবা একটী বিশেষ এবং একটী সাধারণ প্রত্যয়ের সম্বন্ধ নিরূপণ অবগতির কার্য্য। অতএব ফলজ্ঞান এবং সামান্য-জ্ঞান হইতে অবগতির উপকরণ পাওয়া যায়।

অবগতি ব্যতীত ফলজ্ঞান অসম্ভব ; কারণ, তুলনা এবং মীমাংসার পরিণামই ফলজ্ঞান, এবং তুলনা এবং মীমাংসারূপ প্রক্রিয়াকেই অবগতি বলে। ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া বলিলে "কলেজের ঘড়ি বাজিতেছে"—তোমার ফলজ্ঞান হইল ; কিন্তু অবগতি ব্যতীত ফলজ্ঞান অসম্ভব। যখন শব্দ শুনিলে, তখন বর্ত্তমান শব্দটি অন্য শব্দের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে যে, ইহা ঘড়ির শব্দের মত—অন্য শব্দের মত নহে ; আরও বুঝিলে যে, এই শব্দ তোমার পূর্ব্বশ্রুত কলেজের ঘড়ির শব্দের মত। অতএব মীমাংসা করিলে যে, এটিও কলেজের ঘড়ির শব্দ। অবগতি ব্যতীত সামান্য-জ্ঞানও অসম্ভব ; কারণ তুলনা এবং মীমাংসা দ্বারাই সাধারণ লক্ষণ নির্ণীত হয়। একজাতীয় বহু বস্তু পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয় ; পৃথক-পৃথক বস্তুর লক্ষণাবলী বিশ্লেষণ করিতে হয়। বিশ্লিষ্ট (?) লক্ষণাবলির তুলনা করিয়া সাধারণ লক্ষণের মীমাংসা করিতে হয়। এক কথায় বলিতে হইলে, প্রত্যেক মানসিক ক্রিয়াতেই সমস্ত মানসিক ক্রিয়াগুলি বর্ত্তমান। সকলেই একই মনের ক্রিয়া, আমরা কেবল চিন্তাবলে তাহাদিগকে পৃথক-পৃথক করিয়া ভাবি।

দুইটি প্রত্যয়ের সম্বন্ধ নির্ণয় করা অবগতির কার্য্য; সুতরাং প্রত্যয় অস্পষ্ট হইলে অবগতিও অস্পষ্ট হইবে। প্রত্যয়গুলি সংখ্যায় যত বেশী হইবে এবং যত সুস্পষ্ট হইবে, অবগতিও তত প্রমাদশূন্য হইবে। বালক-বালিকাদের প্রত্যয়গুলি তত স্পষ্ট নহে—সংখ্যাতেও কম; সেইজন্য তাহাদের বিচারও দোষশূন্য হয় না। দুইটি প্রত্যয়ের সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে হইলে, কিঞ্চিৎ সময়ের প্রয়োজন; সুতরাং সময়ের অভাব হইলেও অবগতি ভুল হইতে পারে; প্রথম-বারে সত্য বলিয়া মনে হইয়াছিল, দ্বিতীয়বারে তাহা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। অন্যের কথায় অযথা আস্থা স্থাপন করিলেও অনেক সময়ে ভ্রমে পতিত হইতে হয়। অনুভূতির প্রাবল্য অনেক সময়ে যথার্থ অবগতির অন্তরায় হইয়া থাকে। আমি যাহাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি, সে মন্দ করিলেও ভাল বলিয়া বোধ হয়। আমি যাহাকে অত্যন্ত ঘৃণা করি, তাহার ভাল কাজও মন্দ বলিয়া মনে হয়। পূর্ব্ব হইতে কোন ধারণার বশবর্ত্তী হইলে অবগতির ক্রিয়া নির্দ্দোষ না হইতে পারে।

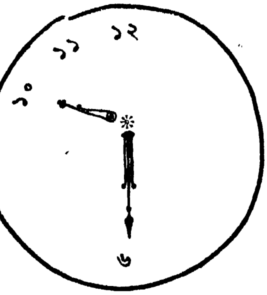

তোমাকে আজ ১১॥ টার সময় কলেজে যাইতে হইবে। তোমার ঘড়িটি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তুমি সময় ঠিক করিতে পারিতেছ না। কিছুক্ষণ পরে কাছারির ঘড়ির শব্দ শুনিতে পাইলে। কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত থাকায় কয়টা বাজিল তাহা তোমার গণনা করা হইল না, কিন্তু তোমার মনে হইল ১১টা বাজিল। তাড়াতাড়ি আহারাদি সমাপন করিয়া কলেজে ছুটিলে। কলেজে প্রবেশ করিয়া ঘড়ির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে। প্রথমেই তোমার মিনিটের কাঁটাতে নজর পড়িল। দেখিলে উক্ত কাঁটাটি ৬এর দাগে আছে। বাড়ীতে তোমার বিশ্বাস হইয়াছিল ১১টা বাজিয়াছে—আবার এখন দেখিলে মিনিটের কাঁটাটি ৬এর দাগে আছে। সুতরাং তোমার আর সন্দেহ থাকিল না; ১১॥টা বাজিয়াছে—তোমার এই অবগতি হইল। তুমি আর কালবিলম্ব না করিয়া তোমার গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইলে। কিন্তু সেখানে গিয়া দেখিলে, তোমার আসিবার এখনও সময় হয় নাই। তুমি সে স্থান ত্যাগ করিয়া ফিরিয়া আসিলে। পুনরায় ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে। পূর্ব্বে ছোট কাঁটাটির দিকে তাকাও নাই—এখন তাকাইলে। দেখিলে ১১॥টা নয়, মাত্র ১০॥টা বাজিয়াছে। বুঝিতে পারিলে, তোমার পূর্ব্ব অবগতিতে ভুল ছিল।

জীবনের প্রথম উন্মেষ হইতেই বিচার-শক্তির বিকাশ হয়। যেখানে জ্ঞান, সেইখানে বিচার। বৈসাদৃশ্য আনয়ন ব্যতীত জ্ঞান থাকে না। তুলনা এবং মীমাংসা ব্যতীত বৈসাদৃশ্য নিরূপিত হয় না। সুতরাং যখনই জ্ঞানের বিকাশ, তখনই বিচার-শক্তিরও বিকাশ। জীবনের প্রথম অবস্থায় ভাষার অভাব বলিয়া বিবেচনাশক্তিরও অভাব মনে করা ভুল। কথা কহিতে পারিবার বহুপূর্ব্বে বিচার করিবার ক্ষমতা আসিয়া থাকে। অবশ্য ভাষা অবগতির প্রকাশক। ভাষার উন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে বিচারশক্তির উন্নতি অনুমিত হয়। বালক প্রথমে ভাবে, পরে বলে। প্রথমে "কুকুর" ভাবিয়া লয়, পরে বলে "কুকুল"; তার পর হয় ত বলে "কুকুল পা" এবং অবশেষে "কুকুলেল পা আথে"। ভাষা বিচার-শক্তির চিহ্ন হইলেও, এ চিহ্নকে অভ্রান্ত মনে করা উচিত নয়। বালকেরা অনুকরণপ্রিয়; সুতরাং অনুকরণ করিয়া জ্ঞানীর মত কথা বলিলেও, উহাদের বিচার-শক্তি জ্ঞানীর মত নহে। বিচারশক্তির যতই উন্মেষ হয়, জ্ঞানেরও ততই বিকাশ হয়। যাহা প্রথমে অস্পষ্ট, তাহা পরে সুস্পষ্ট হয়। মনে কর, মাকড়সা সম্বন্ধে তোমার বিশেষ জ্ঞান নাই। তবে তুমি এই মাত্র জান যে—

১। ইহা একটী কদর্য্য জীব
২। ইহা জাল তৈয়ার করে (?)

পরে এই জন্তুটিকে ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলে, এবং ইহার সম্বন্ধে আরও কয়েকটি বিষয় অবগত হইলে—

৩। ইহার আটটি পা আছে
৪। ইহার শরীর দুই অংশে বিভক্ত
৫। ইহার পালক নাই।

এইরূপে যতই তোমার অবগতির সংখ্যা বাড়িয়া

হইবে, ততই মাকড়সা সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান পরিস্ফুট হইবে।

যুক্তি।

মন আমাদের নানাবিধ প্রত্যয়ের আধার। প্রত্যয়গুলি পরস্পর সংশ্লিষ্ট। একটী অপরটির সহিত সহজেই মিলিত হয়। 'সম্পূর্ণ' 'অংশ' এবং 'বৃহৎ'—এই তিনটি প্রত্যয়। যাহার এই তিনটির জ্ঞান আছে, সেই ইহাদের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনে সমর্থ হইবে। সে মনে করিতে পারিবে, 'অংশ' অপেক্ষা 'সম্পূর্ণ' বৃহৎ। 'অংশ' এবং 'বৃহৎ' এই দুইটি প্রত্যয়ের ধারণা না করিয়া 'সম্পূর্ণে'র ধারণা করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইবে। মনে কর "জননী" "কন্যা" এবং 'ভালবাসা" এই তিনটি প্রত্যয়ের তোমার ধারণা আছে; সুতরাং এই তিনটি প্রত্যয়ের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তুমি একটী বাক্যের সৃষ্টি করিতে পার; যথা—"জননী কন্যাকে ভালবাসেন"। কিন্তু জননী এবং কন্যা উভয়কেই যদি ভালবাসার পাত্র করিতে চাও, তাহা হইলে তোমাকে একটী নূতন 'উদ্দেশ্য' খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। মনে কর, এই নূতন উদ্দেশ্যটি 'মানুষ' কিংবা "জ্ঞানী মানুষ"। এখন তুমি বলিতে পার, "জ্ঞানী মানুষ জননী এবং কন্যাকে ভালবাসে"। এই নূতন উদ্দেশ্যটি পাইবার জন্য মনুষ্যের কথা কেন ভাবিলে—"আতা" কিংবা 'পয়সা'র কথা কেন ভাবিলে না? 'আতা' কিংবা 'পয়সা'কে উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করিলে, বর্ত্তমান প্রত্যয়গুলির মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন অসম্ভব ব্যাপারে পরিণত হইত। অতএব দেখা যাইতেছে যে, প্রত্যয়ের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন আমাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন নহে। সত্যের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া প্রত্যয়গুলির মধ্যে সম্বন্ধ আনয়ন করিতে হইলে, প্রত্যয়গুলির স্বাভাবিক সম্বন্ধের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

প্রত্যয়গুলির মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনের ক্ষমতা থাকিলেও আমাদের অধিকার নাই। যদি ক্ষমতার অপব্যবহার কর, তবে সত্যের অপলাপ হইবে। প্রত্যয়ের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হইবে, উহাদের ধারণা যতই প্রবল এবং স্পষ্ট হইবে, ততই তাহাদের প্রকৃতিগত সম্বন্ধ নির্ণয়ে সমর্থ হইব। বর্ত্তমান হইতে অতীতের এবং ভবিষ্যতের কথা জানিতে পারিব। আমরা সকলেই জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত। এই সংগ্রামে জয়লাভ করিতে হইলে পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিষয় অবগত হওয়া আবশ্যক। যখন নূতন অবস্থার মধ্যে পতিত হই, তখন পুরাতন প্রথা কার্য্যকরী হইবে বলিয়া মনে করি না। পুরাতনকে পরিহারপূর্ব্বক নূতনকে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করি।

> "ভাঙ্গিতেছে পুরাতন, গড়িছে নূতন,—
> জগতের নীতি এই মহা বিবর্ত্তন।"

সুপ্ত প্রত্যয়সঙ্ঘকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহার সাহায্যে নূতন অবস্থাতেও জয়লাভে প্রয়াস পাইয়া থাকি। এইরূপে পুরাতনের সাহায্যে নূতনের সম্মুখীন হইতে হইলে শক্তির আশ্রয় লইতে হইবে;—এই শক্তির নাম যুক্তি। যুক্তিবলে নূতন প্রত্যয়ের সৃষ্টি হয় না; কিন্তু পুরাতন প্রত্যয়ের সাহায্যে নূতন জ্ঞানের বিকাশ হয়। সকল মানুষ মরে। যদু মানুষ, অতএব যদু মরিবে। এখানে কোন প্রত্যয় নূতন নহে—কিন্তু যদু মরিবে—এ জ্ঞানটি নূতন। অথবা, রাম মরিয়াছে, যদু মরিয়াছে, শ্যাম মরিয়াছে—অতএব মানুষ অমর নয়। এখানেও পুরাতনের সাহায্যে নূতনের সৃষ্টি হইল।

মানুষ সতত জ্ঞানান্বেষণে রত। জ্ঞানের যতই বিস্তৃতি হউক না কেন, আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইবে না। যতই জানি না কেন, তৃপ্তি কিছুতেই হইবে না। যাহা জানি না, তাহা জানিতে চাই। যাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান অসম্ভব, তাহার অনুমিত জ্ঞান লাভে সচেষ্ট। আমরা বর্ত্তমানে আবদ্ধ থাকিতে পারি না,—বর্ত্তমানকে ভেদ করিয়া অতীত এবং ভবিষ্যতে যাইতে চাই। প্রত্যক্ষের সাহায্যে পরোক্ষের যবনিকা সরাইতে চাই। যে মানসিক ক্রিয়ার সাহায্যে জ্ঞাতপূর্ব্ব সম্বন্ধ হইতে অজ্ঞাতপূর্ব্ব সম্বন্ধ নিরূপিত হয়, তাহাকে যুক্তি বলে।

দার্জিলিং ও কালিম্পং

[শ্রীরামরতন চট্টোপাধ্যায়, বি-এল্]

দার্জিলিং পূর্ব্বে সিকিমাধিপতির অধিকৃত ভূমি ছিল। গুর্খারা এক সময়ে ইহা অধিকার করিবার প্রয়াসী হইয়া কতকাংশে সফলকাম হইয়াছিল। নেপালের সীমান্ত-প্রদেশ লইয়া ১৮১৪ অব্দে ইংরেজের সহিতও নেপালের যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই যুদ্ধের ফলে, নেপাল সিকিম-রাজের যে সকল ভূমি অধিকার করিয়াছিল, তাহা ইংরেজের হস্তে সমর্পণ করে। ইংরেজ সেই সকল ভূমি সিকিম-রাজকে প্রত্যর্পণ করেন; কিন্তু এইরূপ সন্ধি স্থাপিত হয় যে, ইংরেজ সিকিম-রাজের অভিভাবক স্বরূপ থাকিবেন, এবং সিকিমের সহিত নেপালের বা অপর কাহারও কোনও বিরোধ উপস্থিত হইলে, সেই বিরোধের মীমাংসার ভার ইংরেজের উপর ন্যস্ত হইবে। কিছুকাল পরে নেপাল ও সিকিমে বিরোধ উপস্থিত হইলে লাট সাহেবের উপর তাহার বিচারের ভার অর্পিত হয়। তদনুসারে লাট সাহেব ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে (Lloyd) লয়েড সাহেবকে বিরোধের বিষয়ীভূত স্থানে উপস্থিত হইয়া সকল বিষয়ের অনুসন্ধানের জন্য প্রেরণ করেন। লয়েড ও গ্রাণ্ট সাহেব রিঙ্কিনপং পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন এবং পথিমধ্যে দার্জিলিংএর সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হয়েন। লয়েড সাহেব ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ছয়দিন মাত্র দার্জিলিং দেখিয়াছিলেন—তাহার পূর্ব্বে কোনও য়ুরোপবাসী দার্জিলিং দর্শন করেন নাই। লয়েড এবং গ্রাণ্ট উভয়েই দার্জিলিং দেখিয়া স্থির করেন যে, স্বাস্থ্যের জন্য, ব্যবসায়ের জন্য, এবং নেপাল-ভূটানের দ্বারদেশে সামরিক উদ্দেশ্যে ঐ স্থান ইংরেজের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়, এবং তাঁহারা উভয়েই তদানীন্তন বড়লাট বেণ্টিঙ্ক সাহেবকে ঐ স্থান স্বাধিকারভুক্ত করিবার জন্য বিশেষভাবে উপদেশ দেন। সুযোগও শীঘ্রই উপস্থিত হইয়াছিল। কতকগুলি নেপালী লেপ্চা সিকিম-রাজ্যে দৌরাত্ম্য করিলে, লয়েড সাহেব তাহার অনুসন্ধানের ভার গ্রহণ করেন এবং নেপালীগণকে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য করেন। তাহার পরেই ১৮৩৫ খৃঃ অব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে এক দলিল সম্পাদন করিয়া সিকিম-রাজ ইংরেজ-রাজকে বিনামূল্যে দার্জিলিং অর্পণ করিলেন। দলিলখানি অতি ক্ষুদ্র। তাহাতে লিখিত আছে যে, "লাট সাহেব দার্জিলিং পাহাড়টী পাইবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন—কারণ উহা শীতপ্রধান; গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীরা অসুস্থ হইলে ঐ স্থানে আসিয়া স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারিবেন। তজ্জন্য লাট সাহেবের সহিত বন্ধুতা প্রযুক্ত আমি সিকিমাধিপতি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে দার্জিলিং দান করিলাম।" রাজা কোনও মূল্যের দাবী করেন নাই। তখন উহার মূল্যই বা কি ছিল? তথাপি ইংরেজ-রাজ স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া প্রথমতঃ বার্ষিক ৩০০০৲ টাকা, পরে ৬০০০৲ টাকা রাজাকে দিয়া আসিতেছেন। ইংরেজাধিকারে আসিয়া দার্জিলিংএর লোকসংখ্যা ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতেছে। ১৮৩৮ খৃঃ অব্দে সমগ্র দার্জিলিং জেলার অধিবাসী সংখ্যা ১০০ জন ছিল—১৯০১ খৃষ্টাব্দে দার্জিলিং জেলার অধিবাসীর সংখ্যা ২৪৯১১৭ হইয়াছিল, তন্মধ্যে কেবলমাত্র দার্জিলিং সহরেই ১৬৯২৪ জন অধিবাসী ছিল।

দার্জিলিংএর রূপ-সম্ভার অপূর্ব্ব ও অনন্য-সাধারণ। যখন রৌদ্র হাসিতেছে, তখন কি সুনীল আকাশ, মহামহিমময় কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষাররাশির সহিত কি মহান্ ভাব বিজড়িত! দূরে-অদূরে গিরিশ্রেণী-তরঙ্গের কি মনোরম লীলাভঙ্গী! গিরি-অঙ্গে বৃহৎ-বৃহৎ কত বৃক্ষ, কত লতা, কত রকমের কত বর্ণের কুসুমারাণা! কি বিচিত্র কারুকার্য্যময় গুল্ম ও শৈবালদল! স্থানে-স্থানে কলনাদিনী নির্ঝরিণী চির গীতরতা।

কখনও মাথার উপরে রৌদ্র,—কিন্তু দূর গিরিশ্রেণীর উপর মেঘান্ধকার—নিম্নদেশ হইতে লঘুপক্ষ মেঘরাশি ধীরে ধীরে উঠিতেছে। কখনও বা মাথার উপর মেঘ,—দূরে রৌদ্র চক্চক্ করিতেছে। কখনও বা দূরে মেঘের ভিতর দিয়া সূর্য্য-রশ্মি পাহাড়ের উপর পড়িয়াছে—সে দৃশ্য বর্ণনাতীত। রৌদ্র মেঘের ভিতর দিয়া গিয়াছে বলিয়া তাহার তীব্রতা নাই—অথচ মধুর দীপ্তি আছে; কিন্তু জ্যোৎস্নার

মত কোমল নহে—সেটা যেন পৃথিবীর সহিত আমাদের নিত্য সম্বন্ধ। তাহা হইতে কিছু নূতন ও পৃথক—একটা মায়া-রাজ্য—একটা স্বপ্ন-ভুবনের মত দেখায়।

দুইটী গিরিশ্রেণীর মধ্যে যে গহ্বর তাহাতে শুভ্র মেঘ-রাশি সুষুপ্ত ফেন-পুঞ্জের ন্যায় কখন-কখনও শয়ান থাকে। ইচ্ছা হয়, কাছে গিয়া একবার তাহাদের গায়ে হাত বুলাইয়া আসি। দেখিতে-দেখিতে তাহারা ঈষৎ ফুলিয়া উঠিতে থাকে—একটু-একটু করিয়া শিথিল-কলেবর মেঘরাশি কুয়াসা হইয়া উড়িতে থাকে। বায়ু যেন ঘন হইয়া, ঈষৎ কাল হইয়া উড়িতেছে। তরুলতা কুসুমরাশির উপর কুয়াসা আসিতেছে—তাহারা যেন সুস্পষ্ট আছে—একটু অস্পষ্ট - আরও অস্পষ্ট—তাহাদের বেশ ছায়া-কায়া দেখাই-তেছে—তারপর একেবারে অদৃশ্য—আবার একটা ছায়ার মত—আবার একটু-একটু করিয়া কুয়াসার বন্যা সরিয়া গেলে তাহাদের বিকাশ হয়।

সম্মুখে গিরি-লহরী। কোনও গিরি দুই ক্রোশ, কেহ দশ ক্রোশ, কেহ বা কুড়ি ক্রোশ দূরে,—গিরিশ্রেণীর অন্ত নাই। গিরি-তরঙ্গের পর তরঙ্গ, আবার তরঙ্গ - আবার তরঙ্গ। গিরি-সমুদ্রের উপর রৌদ্র ঝলসিতেছে.—রৌদ্রা-লোকে কোথাও সবুজবর্ণ তরুরাজি, কোথাও মকমলের সিঁড়ির ন্যায় চা-বাগান, কোথাও রজত-রেখা জলপ্রপাত, কোথাও শুষ্ক পাহাড়, কোথাও বা শ্বেত-বিন্দুমালা-সম কুটীরশ্রেণী নয়নকে চরিতার্থ করিতেছে। দেখিতে-দেখিতে কুয়াসা উঠিল,—কুয়াসা সব ঢাকিয়া ফেলিল,—যেন রঙ্গ-শালায় কেহ যবনিকা ফেলিয়া দিল। সম্মুখে কেবল এক স্বল্পান্ধকার মহাসমুদ্র—পৃথিবী হইতে যেন সব মুছিয়া গিয়াছে—এক নীরব বিরাট মহাশূন্য! আবার যেন কে একজন চিত্র-শিল্পী তুলিকা লইয়া চিত্রপটে যাদুহস্তের অঙ্গুলি-সঞ্চালনে মনোরম চিত্র অঙ্কিত করিতেছে—একপার্শ্বে রং ফুটিয়া উঠিতেছে—ক্রমে-ক্রমে এধারে-ওধারে চারিধারে চিত্র বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। আবার সেই পরিষ্কার—সূর্য্য-কর-সমুজ্জ্বল—বিবিধ-রূপ-সমলঙ্কৃত গিরি-লহরী। সেই রৌদ্র-কর-সমুদ্রে মাঝে-মাঝে মেঘের ছায়া কৃষ্ণবর্ণ দ্বীপের মত রহিয়াছে;—কোথাও বা শুভ্র মেঘপুঞ্জ যেন পাহাড়ের অঙ্গে অঙ্গ ঢালিয়া ঘুমাইয়া রহিয়াছে।

দার্জ্জিলিং হইতে যে সকল চিরতুষারমণ্ডিত গিরিশ্রেণী নয়নগোচর হয়, তন্মধ্যে কাঞ্চনজঙ্ঘাই প্রধান। ইহা ২৮১৪৬ ফিট উচ্চ। রবিকরে কাঞ্চনজঙ্ঘা ও তাহার নিকটস্থ গিরিশ্রেণী বড়ই সুন্দর দেখায়। সূর্য্য-কিরণ কোনও গিরি-শৃঙ্গের ললাটে তিলকের ন্যায় ঝলমল করে—কোনও পাহাড়ের ধারটীতে ঠিক সোণালী পাড়ের মত ঝকমক করে—আবার কোথাও বা সমুদয় পাহাড়ের উপর পড়িয়া তাহাকে "রজত-গিরি সন্নিভ" করে। বহুক্ষণ ধরিয়া দেখিয়াও তৃপ্তি হয় না;—নীচে মেঘ—পাশে মেঘ—এক-একবার মেঘ আসে—কতক ঢাকে, সব ঢাকে—আবার সরিয়া যায়—আবার আসে। সূর্য্যোদয়ে ও সূর্য্যাস্তে কত বর্ণের লীলা প্রকাশিত হইতে থাকে। পাহাড়ের সেই সৌন্দর্য্য—পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগরাজের শিরোভূষণ চির-তুষাররাজি আলো ও ছায়া-গঠিত সুবর্ণ-কিরীট—সেই সৌন্দর্য্য যাহার কিয়দংশ চক্ষু দর্শন করে, কিয়দংশ কল্পনা গড়িয়া তোলে—তাহা যতক্ষণ দেখা যায়, ততক্ষণই উপভোগ করা যায়। কিন্তু তাহা সঙ্গে করিয়া আনা যায় না—বাক্যেও প্রকাশ করা যায় না।

এত যে সুন্দর দার্জ্জিলিং, তবু এখানে আসিয়া,—আমি নিজের বাড়ী আসিয়াছি—আমার মনে সহজে এ ভাবটী আইসে না। এটা ত একটা প্রকাণ্ড সহর—তাহাও সাহেবী সহর—বৃহৎ বৃহৎ দোকান, বৃহৎ-বৃহৎ হোটেল, বৃহৎ বাজার, সুপ্রশস্ত পথ, প্রকাণ্ড বাটী, ড্যাণ্ডী রিক্স, ঘোড়া লইয়া সাহেবিয়ানারই জন্য বিরচিত। দার্জ্জিলিং ত সাহেব-মেমের একটা বিরাট বিলাস-ক্ষেত্র। বাঙ্গালী নরনারী যাঁহারা এখানে বিচরণ করেন, তাঁহাদের অধিকাংশই নকল সাহেব-মেম মাত্র। একটা সহজ স্বচ্ছন্দ সুখ—নিজের জিনিস ভোগ করিবার সুখ—এখানে পাওয়া যায় না। চারিদিকে মানুষের মুখ দেখিলে মনে হয় যে, ইহাদের সহিত আমার কোনও সম্বন্ধ নাই—আমি যেন কোনও অনধিকারী, অপর কাহারও দেশে আসিয়াছি।

দার্জ্জিলিংএর মধ্যে বার্চ হিল আমার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম। বার্চ হিলে শেষ যে দিবস গিয়াছিলাম, সেই দিবসের ডায়েরী হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি:—

"বার্চ হিলে যাইবার জন্য ক্রমে উপরে উঠিতে লাগিলাম। এই স্থানে প্রকৃতির স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য বিরাজমান আছে—নরহস্তে তাহা বিকৃতি প্রাপ্ত হয় নাই। আমি একাকী এই

পাহাড়ে উঠিতেছি ;—সহরের বিকট চীৎকার এখানে নাই। শান্ত, নীরব নির্জ্জনতায় বড়ই শান্তি অনুভব করিলাম। কিছু উপরে উঠিয়া দেখি—সেই কুকুরের কবর! তাহাতে কি স্নেহ, কি করুণা, কি প্রেম বিজড়িত! সাদা মার্ব্বেল পাথরের ভিত—তাহার উপর সেই পাথরেরই স্তম্ভ ;—স্তম্ভটী সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই—জীবনের অর্দ্ধপথে প্রিয়জনকে হারাইলে যেমন ভগ্নমনোরথ হয়, তেমনই ভগ্ন অবস্থায় ;—সেই স্তম্ভের উপর স্তম্ভকে জড়াইয়া দোঁদুল গোলাপের মালা—যেন প্রেম গতায়ু প্রিয়জনের স্মৃতিকে জড়াইয়া রহিয়াছে। কি সুন্দর! কাহার স্মৃতি বুকে করিয়া দাঁড়াইয়া আছ স্তম্ভ! একটী কুকুরের—তাহার নাম ছিল জিম। কাহার বুকের ব্যথা এই পাহাড়ের উপর—এই উত্তুঙ্গ হিমশৃঙ্গের উপর জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে—তাহার নিজের নাম পর্য্যন্ত নাই। 'আমার বিশ্বস্ত বন্ধু ও সঙ্গী কুকুর জিম ৯ বৎসর বয়সে ১৯০০ অব্দে আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে—আমি একজন ফরেষ্টার।' আহা, ভালবাসার কি দুঃখ—ভালবাসা কি সুন্দর! প্রাণ যখন ভালবাসিল, আর একটা কিছুর জন্য পাগল হইল—তখন মানবে দেবত্ব আসিল। ভালবাসিলে প্রাণ কোমল হইল—তরল হইল—মন্দাকিনী ছুটিল। ভালবাসিলেই হইল,—তুমি মানুষকে ভালবাস, দেবতাকে ভালবাস আর কুকুরকে ভালবাস। আজ জিমের এই ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সমাধি-স্তম্ভের নিকট দাঁড়াইয়া মনে হইল—এই সমাধি-স্তম্ভও যাহা, আর পৃথিবীর সৌন্দর্য্য সার তাজমহলও তাহাই। মানুষ আর একটা কিছু ভালবাসিয়াছিল—তাহাকে হারাইয়াছে ; যাহার জন্য প্রাণ পাগল হয়, সে জন্মের মত চলিয়া গিয়াছে ; যাহাকে নিশিদিবা চোখে-চোখে রাখিতে সাধ যায়—তাহাকে আর তিলেকের তরে দেখিতে পাইবে না—হৃদয়ের অশ্রু জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে—মর্ম্মের বেদনা শ্বেত-কুসুমের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। দিল্লীর বাদশাহ তাঁহার প্রাণাধিকা প্রিয়তমাকে হারাইয়া যে মনোবেদনা পাইয়াছিলেন—সেই মনোবেদনা পৃথিবীর সর্ব্বত্র। তাজমহলকে ঘিরিয়া বায়ু যেরূপ হাহাকার করে, এই ক্ষুদ্র জিমের সমাধি-স্তম্ভ ঘিরিয়াও বায়ু সেইরূপই হাহাকার করিতেছে!

"আরও উপরে উঠিলাম—শিখরদেশে গিয়া ক্ষুদ্র শ্যামশষ্পখণ্ডের উপর বর্ষাতি ফেলিয়া শুইয়া পড়িলাম। চারিপার্শ্বে সরল, দীর্ঘ তরুরাজি ব্যূহ রচনা করিয়া রাখিয়াছে,—অদৃশ্য বিহঙ্গাবলীর মধুর কাকলি ভাসিয়া আসিতেছে,—মাথার উপর নীলাকাশ-সমুদ্র—লঘুপক্ষ, শুভ্র মেঘ-বিহঙ্গ কোথাও-কোথাও মন্থর ভাবে চলিয়াছে। চারিধার নীরব, নিস্তরঙ্গ, কোলাহল-শূন্য। আমি একাকী। মনের মধ্যে ঘুরিয়া-ফিরিয়া জিমের সমাধির কথা জাগিতে লাগিল। হায় রে মানব! দুঃখ তুমি এত ভালবাস—দুঃখ লাভ করিবার অবসর কখনও তুমি পরিত্যাগ কর না। যেখানে যে দুঃখ পাওয়া যায়, সব সযত্নে সংগ্রহ করিয়া তাহার মাল্য রচনা কর—আর আপনার জনকে তাহা দেখাও। মানবের, নিজের—কত দুঃখের কথাই মনে পড়িতে লাগিল। উঠিয়া বসিলাম। দূরে সবুজবর্ণ গিরি-অঙ্গে রৌদ্র ঝক্‌মক করিতেছে,—রৌদ্রের উপর ক্ষীণ, শিথিল, স্বচ্ছ মেঘ—মেঘের ভিতর দিয়া প্রখর জ্যোৎস্নার মত সূর্য্যালোক বড়ই সুন্দর দেখাইতে লাগিল। দেখিতে-দেখিতে সেই লঘু, স্বচ্ছ মেঘাবলী কোথায় বাতাসে মিলাইয়া গেল—প্রোজ্জ্বল রৌদ্র হাসিতেছে। আবার দুর্ভেদ্য মেঘরাশি সূর্য্যকিরণ অবরোধ করিল—গিরি-অঙ্গ ছায়ায় আবৃত। আবার কতক আলো, কতক ছায়া—আলো-ছায়ার কত খেলাই হইতে লাগিল। কে নিশিদিন জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে এই খেলা খেলাইতেছে ;—খেলার অন্ত নাই, বিশ্রাম নাই, আলস্য নাই। ভাবিতে-ভাবিতে আবার শুইয়া পড়িলাম। শুভ্র-মেঘ-খচিত নীলাকাশ দেখিতে-দেখিতে আঁখি মুদিত হইয়া আসিল,—পাখীর কাকলি মৃদু হইতে মৃদুতর হইয়া কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল,—বায়ুর শীতলতা কোমল হইতে কোমলতর হইয়া অঙ্গ-স্পর্শ করিতে লাগিল। আমি যেন সমগ্র পৃথিবী হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছি—সকল-সংস্পর্শ-বিহীন একটী প্রাণ অনন্ত কাল-সাগরে ভাসিতেছি। কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় আছি, কোথায় যাইব? রাত্রিদিন কর্ম্ম করিতেছি—পাপ-পুণ্যের, দুঃখ-সুখের তিলার্দ্ধ বিশ্রাম নাই। কবে এ কর্ম্মক্লান্ত দেহের কর্ম্মের অবসান হইবে, মাথার বোঝা ফেলিয়া দুই দণ্ড বিশ্রাম করিতে পারিব।

"সহসা হাসির কলরোল কর্ণে প্রবেশ করিল। উঠিয়া দেখি, একদল সাহেব-মেম আসিয়াছে। কোনও চিন্তা নাই, কোনও দুঃখ নাই, কোনও শোকের ছায়া নাই—কেবল চীৎকার, প্রতি কথাতেই হাসির কল্লোল ও তাহার

প্রতিধ্বনি, প্রতি মুহূর্ত্তেই নূতন-নূতন খেলা। এই শান্ত আশ্রমে এই চপলতা ও চাঞ্চল্য আমার ভাল লাগিল না। আমি ধীরে-ধীরে নামিলাম—নামিবার সময় আর একবার জিমের সমাধি দেখিলাম—ধীরে-ধীরে বাসায় আসিলাম।"

তাহার পর কালিম্পং হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলাম। তৎসম্বন্ধে আমার ডায়েরী :—

১৯১৬।২৩এ অক্টোবর বেলা ১১টার সময় ডাণ্ডী আরোহণে দার্জিলিং হইতে কালিম্পং যাত্রা করি। দার্জিলিং চৌরাস্তা (৭০০২ ফিট উচ্চ) হইতে ক্রমে সণ্ট হিল রোড দিয়া—জলাপাহাড় রোড দিয়া—জলা-পাহাড়ে (৭৫২০ ফিট উচ্চ) উপস্থিত হই। পথে দিঘাপতিয়া-রাজের মনোরম "গিরিবিলাস" নয়ন-গোচর হয়। তাহার পর ঘুমে (৭৪০৭ ফিট উচ্চ) আসিলাম। সেখান হইতে ক্রমশঃ নীচে নামিতে লাগিলাম। পথের দুই ধারে হিমারণ্যের মনোরম সৌন্দর্য্য,—উপরে সুনীল আকাশ—দূরে কাঞ্চনজঙ্ঘা—কখনও চক্ষে পড়ে, কখনও পড়ে না। কোথাও আকাশ-স্পর্শী সুদীর্ঘ তরুরাজি—মহাযোগীর ন্যায় সমাধিমগ্ন—কোথাও অবিরল পাইন-শ্রেণী—কত তরু, কত লতা, কত গুল্ম, কত শৈবাল, কত বর্ণের কত কুসুম-সম্ভার। মানুষের হস্ত-চিহ্ন কেবল সেই শীর্ণ ক্ষুদ্র পথ। মানবের হস্ত-রচনা সেখানে আর কিছুই নাই। সেই ক্ষুদ্র পথ বাহিয়া চলিয়াছি। পথের দুই পার্শ্বেই বিশ্বপতির স্ব-হস্ত-রচনা। যে দিকেই তাকাই, আঁখির ভিতর দিয়া যে রূপ-লহরী মরমে পশে, তাহাকে কথা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবার সুযোগ পাই না। "কি সুন্দর!" "কি সুন্দর!" প্রাণের মধ্যে কেবল এই দুইটী কথারই পুনঃপুনঃ আবৃত্তি হইতে থাকে। মাঝে-মাঝে মুখরা নির্ঝরিণী মহারণ্যের স্তব্ধতাকে সহসা চমকিত করিয়া সুউচ্চ অজানা প্রদেশ হইতে নিজের দুগ্ধ-ফেণ-শুভ্র দেহলতাকে দোলাইয়া দিয়াছে। ক্রমে সন্ধ্যা-অন্ধকার আকাশ-পাতাল ছাইয়া ফেলিল। এখানে গোধূলির আলোক অপেক্ষাকৃত দীর্ঘায়ু—সেই গোধূলি-আলোকে ডাণ্ডি চলিতেছে। নদীর কলধ্বনি ক্রমে কর্ণ-গোচর হইল। "তারে চোখে দেখিনি" কিন্তু তার বংশীধ্বনি বেশ শুনিতে পাইলাম। বুঝিলাম, ত্রিস্রোতানদীর নিকট আসিয়াছি। ত্রিস্রোতার কূলে এক বাঙ্গলায় রাত্রি-যাপন করিলাম। সমস্ত দিনব্যাপী ডাণ্ডীর আন্দোলনে নিদ্রা সহজেই আসিল। রাত্রিতে যখনই নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে, তখনই ত্রিস্রোতার কলধ্বনি শ্রুতিগোচর হইয়াছে।

প্রভাতে উঠিয়াই যাহার আকুল আহ্বান কিছুতেই থামিতে চাহে না—সেই ত্রিস্রোতানদী দেখিতে গেলাম। দুই পার্শ্বে উচ্চ গিরিশিখর—মধ্যে উপত্যকার অঙ্ক-সুশোভিনী, খরবাহিনী, কলনাদিনী, ত্রিস্রোতা ছুটিয়াছে। ত্রিস্রোতা এখানে বালিকা—জন্মস্থান অদূরবর্ত্তী;—শীর্ণকায়া, চটুলা—বড়ই—মুখরা।

একটু বেলা হইলে পুনরায় ডাণ্ডী আরোহণ করিলাম। প্রথমেই ত্রিস্রোতার পুল পার হইলাম। এই পুলটী ৯ ফিট প্রশস্ত এবং ৩৩০ ফিট দীর্ঘ। পুল পার হইয়া এবার ক্রমশঃ উপরে উঠিতে লাগিলাম। এবার বহুদিন পরে ধানের ক্ষেত, বাঁশের বাগান দেখিতে পাইলাম। আর দেখিলাম—যাহা পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই—কমলা-লেবুর বাগান।

আড়াই ঘণ্টা পরে দার্জিলিং হইতে ২৮ মাইল দূরবর্ত্তী কালিম্পংএ পৌছিলাম। কালিম্পং অতি ক্ষুদ্র সহর। অল্প কয়েকটী রাস্তা, সামান্য কয়েকখানি দোকান, একটী কাছারী, এতদ্ভিন্ন থানা, ডাকঘর, বাজার প্রভৃতি আছে। কাছারীতে বিচারপতি একজন সাহেব—তিনিই ম্যাজিষ্ট্রেট—তিনিই মুনসেফ। কিন্তু এখানে উকীল নামক ত্রিবিধ দুঃখদ জীবের ঐকান্তিক অভাব। সুতরাং সাহেব বিচারপতির নিত্য পরম পুরুষার্থ লাভের কোনও বিঘ্ন নাই। সিকিম এখান হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। তিব্বতে যাইবার পথ এই কালিম্পং এর বাজারের ভিতর দিয়া গিয়াছে। এখানকার প্রধান পণ্যদ্রব্য পশম—ব্যবসায়ী মাড়োয়ারী। তাহার ব্যবসায়ের সোণার শিকলী কলিকাতা হইতে দার্জিলিং আসিয়াছে—দার্জ্জিলিং হইতে কালিম্পং আসিয়াছে—আবার কালিম্পং হইতে তিব্বতের মধ্যবর্ত্তী গিয়াংসী প্রভৃতি স্থানে গিয়াছে।

কালিম্পংএ সুপ্রসিদ্ধ মিশনারি রেভারেণ্ড ডাক্তার জে, গ্রেহাম এম্-এ, সি-আই-ই বাস করেন। কালিম্পং-এর নানা স্থানে তাঁহার সাধু চেষ্টা নানারূপে ফলবতী হইয়াছে। তিনি দরিদ্র খ্রীষ্টানদিগের জন্য একটী আবাসভূমি রচনা করিয়া তাহাদের বিশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। সুন্দর হাসপাতাল ও সুন্দর বিদ্যালয় তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন দরিদ্র পাহাড়ীয়াগণ

যাহাতে নানা শিল্প শিক্ষা করিতে পারে, তিনি তাহার বিশেষ আয়োজন করিয়াছেন। কোনও স্থানে সূত্রধরের কর্ম্ম সম্বন্ধে, কোনও স্থানে বস্ত্র-বয়ন সম্বন্ধে, কোনও স্থানে কার্পেট প্রস্তুত সম্বন্ধে, কোনও স্থানে লেস্ প্রস্তুত সম্বন্ধে সুন্দর শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। কার্পেটের রং এইখানেই প্রস্তুত হইতেছে। কালিম্পং লেস্ ইতঃমধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এখানে ৷৷০ আনা গজ হইতে ১২০৲ টাকা গজের লেস প্রস্তুত হইতেছে। এই-রূপ শিল্প-শিক্ষা যাহাতে বাঙ্গলা দেশে গ্রামে-গ্রামে কুটীরে-কুটীরে বিস্তৃত হয়, গ্রেহাম সাহেবের তাহাই ইচ্ছা। বাঙ্গালীর কি সে ইচ্ছা হইবে না ?

২৬এ অক্টোবর—আজ কালীপূজা। বাজারে দোকান-দারেরা দীপাবলী জ্বালাইয়াছিল। পাহাড়ের উপর আলোকমালা আকাশের তারকার সমজাতীয় বলিয়া প্রতিভাত হইতেছিল। বাজারে আনন্দ-উৎসব, ক্রীড়া-কলরোল দেখিয়া চিত্ত পুলকিত হইল।

২৭এ অক্টোবর প্রাতে দূরবীণ-দাড়া দেখিতে গিয়া-ছিলাম। রাস্তাটীতে ধূলি নাই। সেখানে পৌছিয়া দেখি, চারিদিকেই মেঘ—স্থানটী গিরি-বৃত্তের কেন্দ্র স্বরূপ। চতুর্দ্দিক কুয়াসাচ্ছন্ন থাকায় কোনও দিকেরই দৃশ্য দেখিতে পাইলাম না। কর্ণে ত্রিস্তার কল্লোলের ন্যায় একটা শব্দ আসিতে লাগিল। হঠাৎ দক্ষিণ দিকের মেঘ সরিয়া যাওয়ায় দেখিলাম—সেই গিরিপাদ-চারিণী শীর্ণকায়া ত্রিস্তা চিত্রিতা নদীর ন্যায় অঙ্কিত রহিয়াছে। উত্তর দিকে মধ্যে মধ্যে অভ্রভেদী তুষার-ধবল গিরিরাজি নয়নগোচর হইতে লাগিল। ধীরে-ধীরে বাসায় ফিরিতে লাগিলাম। এখানে যে ১২৷১৪ জন বাঙ্গালী আছেন, সকলেরই সহিত পরিচয় হইয়াছে। যাঁহার সহিত দেখা হয়, তিনিই যেন একটা আনন্দ অনুভব করেন—বাঙ্গালী বলিয়া বাঙ্গালীর পরিচয়ে প্রীতি বোধ করেন। দার্জ্জিলিংএ সাহেবিয়ানার যে একটা চক্ষু-ঝলসান জ্বালা দেখিয়া আসিলাম, এখানে তাহা নাই। দুই পার্শ্বের রূপ-সাগরে নয়ন স্নাত করাইয়া, এখানকার বাঙ্গালী অধিবাসীগণের কথা মনে করিতে-করিতে বাসায় ফিরিলাম।

২৮এ অক্টোবর সকালেই উঠিলাম। আজ কালিম্পং হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিব। স্থানটী আমার বড়ই ভাল লাগিল। দার্জিলিংএর মত শীত-প্রধান নহে—অথচ বেশ শীত আছে। চারি পাশের পাহাড়ের দৃশ্যগুলিও সুন্দর। আমার বাসার সম্মুখের পাহাড়গুলি ও তাহাদের মধ্যগামী নদীরেখা বড়ই সুন্দর। সকালে আকাশ বেশ পরিষ্কার। একটু উচ্চ স্থানে গিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখি, কি সুন্দর! গিরিশ্রেণীর মধ্যে যে গহ্বর আছে,—তাহার মধ্যে গভীর শুভ্র মেঘরাশি সুষুপ্ত—যেন মেঘনদী চলিতে চলিতে পথ-শ্রান্ত হইয়া গিরি তটে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে—ভোর হইলে আবার চলিতে আরম্ভ করিবে। তুষার-মণ্ডিত গিরিরাজি দেখা যাইতেছে; কিন্তু এখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই;—তাহারা জ্যোতিহারা, যেন একটা ছায়া-মাখান পূর্ব্বদিকের মেঘ কিন্তু বেশ জমকাল—বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত। আজ যেন ওদিকে একটা কি মহোৎসব। একবার পূর্ব্ব-দিকে তাকাইতেছি—একবার তুষার-গিরির দিকে ফিরিতেছি। হঠাৎ দেখি সর্ব্বোচ্চ গিরির শিখর-দেশে সোণার তিলক ঝলমল করিয়া উঠিল। তার পর ক্রমে-ক্রমে অপর গিরিসকলের শিখর অমনি আলোক-তিলকে ঝলকিয়া উঠিল। আজ ভাই-ফোঁটার দিন। আমার মনে হইল, আজ ঊষারাণী তাঁহার ভাইদের কপালে ফোঁটা দিলেন। ঊষার আনন্দ, ভাইদের আনন্দ—আর সেই আনন্দ ধারায় বসুন্ধরা প্লাবিত হইয়া উঠিল।

আজ শনিবার কালিম্পংএর হাটবার। কিছুক্ষণ পরে হাটে গিয়া দেখি হাটে একটীও লোক নাই। আজ "ধেউসি"—ভাই-ফোঁটার দিন। আজ যাহারা পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিবে, তাহাদের বাড়ীতে আনন্দোৎসব; আর যাহারা ক্রয় করিবে, তাহাদের বাড়ীতেও উৎসব;—কে হাটে আসিবে? এই একটী উৎসবের বন্ধনে দেখি, আমি কালিম্পংএর সহিত বাঁধা রহিয়াছি। মনে মনে বুঝিলাম যে, কালিম্পং আমার বাড়ী হইতে যত দূর হউক, এখানকার লোক আমারই স্বদেশবাসী।

আহারান্তে বন্ধু-বান্ধবের নিকট হইতে বিদায় লইলাম—চারিদিনের প্রবাসান্তেও বিদায় লইতে চক্ষুতে জল আসিল। দার্জিলিং রূপ এবং অর্থের গৌরবে ও অহঙ্কারে ভাল করিয়া কথা কহে না। তাহার রূপ নয়ন ঝলসিয়া দেয় বটে, —কিন্তু তাহার হৃদয় আছে কি না, সে স্নেহ কাহাকে বলে জানে কি না—তাহার পরিচয় কখনও পাই নাই। কিন্তু এই

বাজার—দার্জিলিং

সেণ্ট জোসেফ গির্জ্জা—দার্জিলিং

কাট রোড—দার্জিলিং

রাস্তা—দার্জিলিং

ক্ষুদ্র স্থান কালিম্পং ১২।১৪টী দরিদ্র বাঙ্গালী কোলে করিয়া, মাতৃ স্নেহের অতুল ঐশ্বর্য্যে মহিমান্বিত হইয়া আমার স্মৃতিপট উজ্জ্বল করিয়া রাখিবে। পৌনে এগারটার সময় কালিম্পংএ ডাণ্ডী আরোহণ করিয়া একটার কিছু পরেই কালিম্পং রোড ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। দুইটার সময় গাড়ী ছাড়িল। একখানি প্রথম শ্রেণীর, একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর ও একখানি তৃতীয় শ্রেণীর—এই তিনখানি গাড়ী লইয়া ট্রেণ। গাড়ী চলিতে লাগিল—তিস্তার কূলে কূলে

ভিকটোরিয়া পার্ক—দার্জিলিং

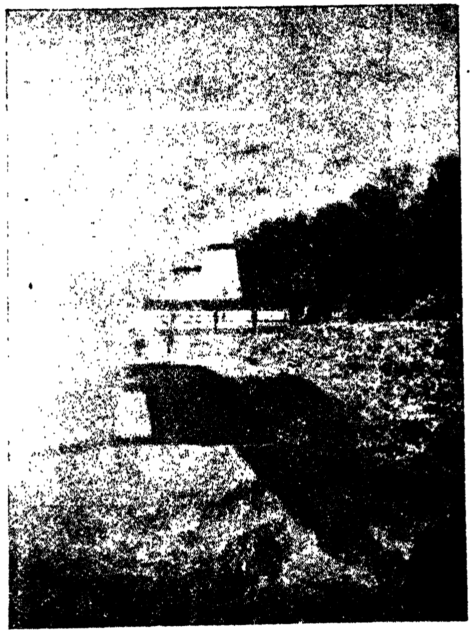

কাকঝোরা—দার্জিলিং

চৌরাস্তায় যাইবার পথ - দার্জিলিং

কুয়ানা—দার্জিলিং

—একেবারে নদীর গা দিয়া। সেই শীর্ণকায়া ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর দুই পার্শ্বেই প্রায় দুই হাজার ফিট উচ্চ পাহাড় উঠিয়াছে। সেই পাহাড় হিমারণ্যের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের আবাসভূমি। সেই রূপারণ্যের মাঝখান দিয়া তিস্তা একটী রেখার মত চলিয়াছে। তাহারই অঙ্গস্পর্শ করিয়া রেল-রাস্তায় রেল চলিয়াছে। রূপের ভারে প্রাণ যেন বিকল হইয়া পড়ে—নয়নের আর যেন বাসনা করিবার কিছুই নাই। উপরে সুনীল আকাশ,—সেই আকাশ

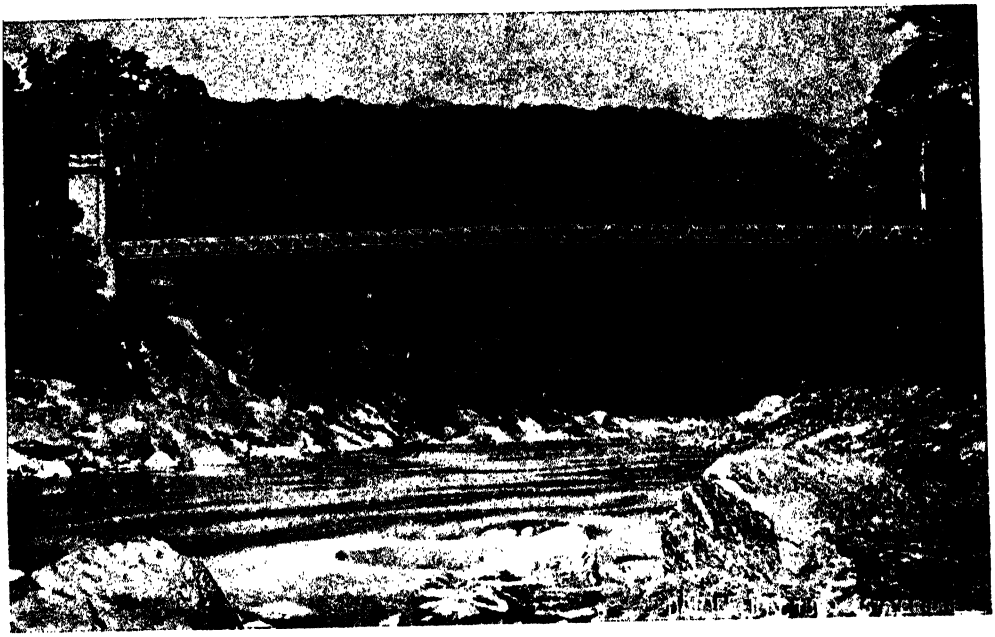

ত্রিস্তা সেতু - দার্জিলিং

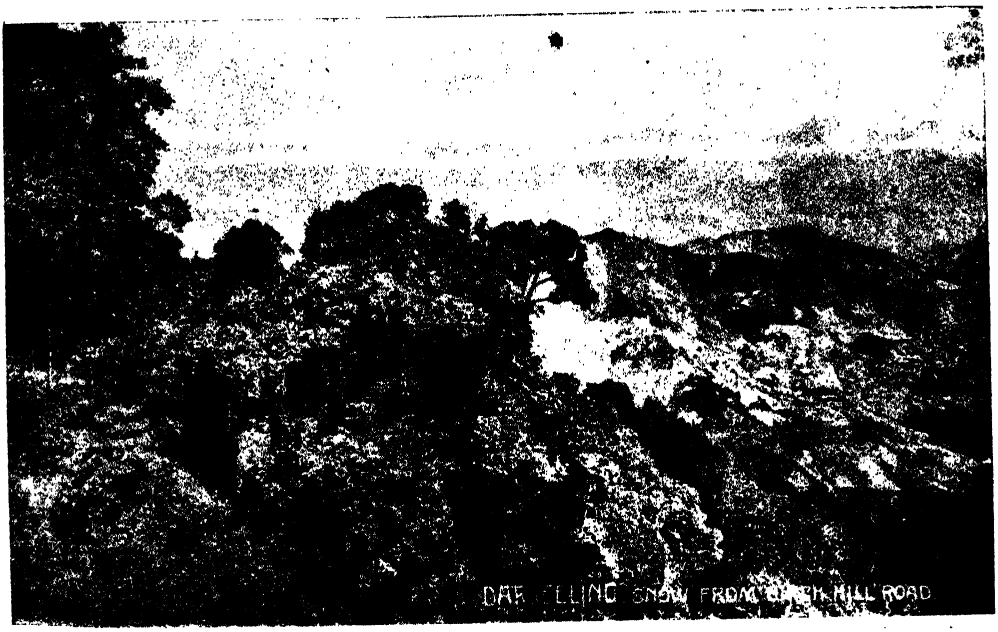

বার্চ্চহিল হইতে তুষার দৃশ্য

স্পর্শ করিয়া গিরিশ্রেণী,— সেই গিরিশ্রেণীর অঙ্গে বিধাতার স্বহস্ত-রচিত সৌন্দর্য্য-উদ্যান,—সেই গিরি-পাদ স্পর্শ করিয়া কলগান করিতে করিতে ছুটিয়াছে সেই গিরি-বালিকা ত্রিস্তা। রেল চলিয়াছে—চক্ষে সেই রূপভার—কর্ণে সেই কলতান;—মুখরা ত্রিস্তার কলগানের অন্ত নাই—তাহার অশ্রান্ত দ্রুতগতির অন্ত নাই;—পাশে পাশে ছুটিয়াছে—

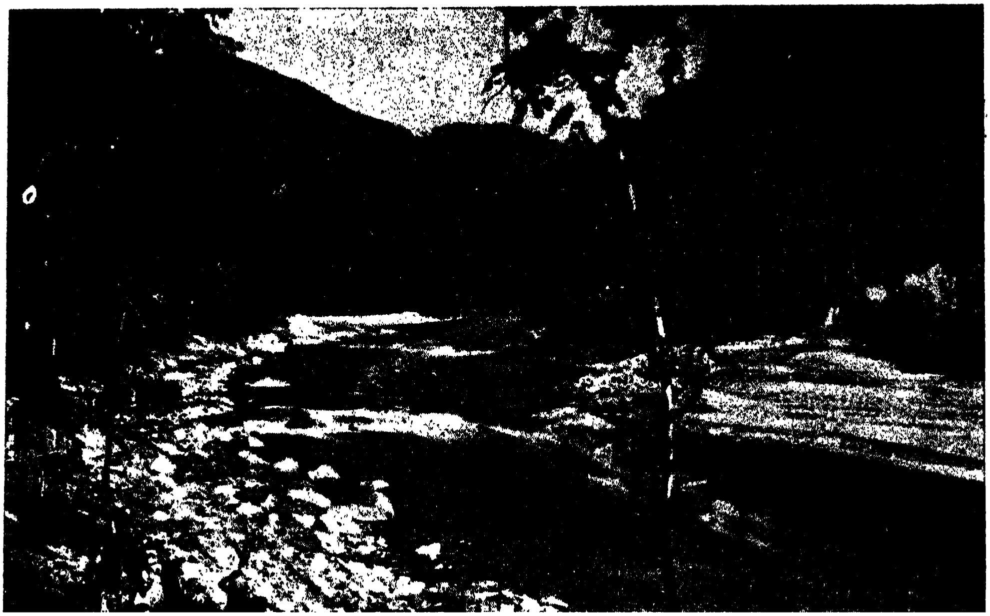

বাজার হইতে ত্রিস্তা নদীর দৃশ্য

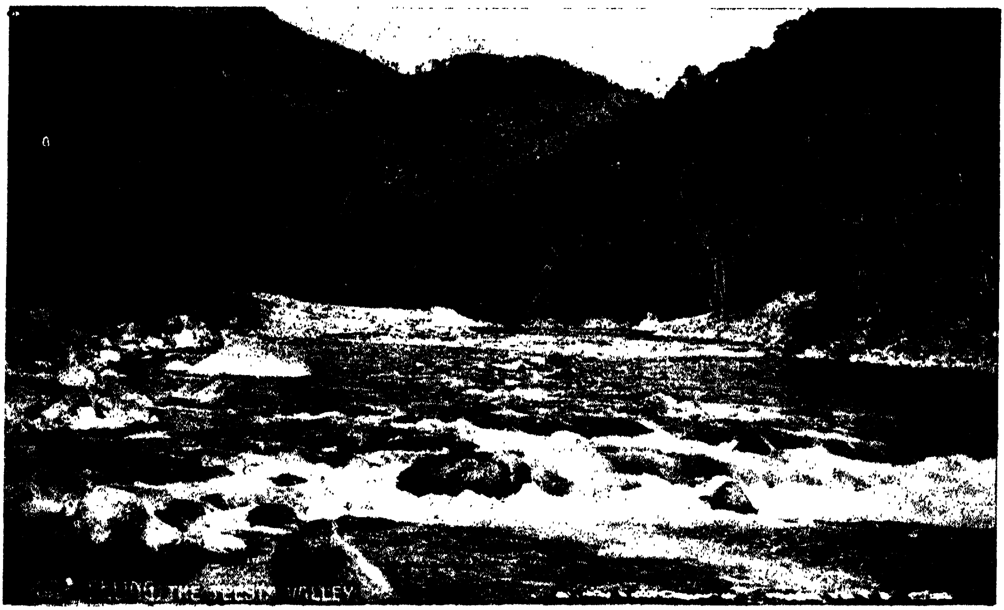

ত্রিস্তা উপত্যকা

যেন কোথায় কোন উৎসবে যোগদান করিতে হইবে—ত্রস্ত ব্যস্ত আনন্দ-অধীর হইয়া ছুটিয়াছে। রেলে বসিয়া এমন অবাধ অনন্ত রূপরাশি আর কখনও দেখি নাই—কল্পনাও করি নাই। আকাশ অনন্ত, গিরিশ্রেণী অনন্ত, অরণ্য অনন্ত—ত্রিস্তার গীত ও গতিরও অন্ত নাই। চারিদিকে অনন্ত—মাঝখানে ক্ষুদ্র আমি। আমি ক্ষুদ্র,

পুট হইতে এভারেষ্ট শৃঙ্গের দৃশ্য

সন্ধ্যাকালে তুষারের দৃশ্য

স্ত আমার সুখ-দুঃখ ক্ষুদ্র নহে - আমার আশা ক্ষুদ্র নহে—আমার কল্পনা ক্ষুদ্র নহে। ভাবিতে-ভাবিতে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল—ক্রমে শিলিগুড়ি পৌছিলাম।

পর দিবস গৃহে প্রত্যাগমন করিলে, বন্ধু-বান্ধবেরা পৃথিবী গোল—ইহা স্থির বুঝিয়া লইলেন।

ভাবের অভিব্যক্তি

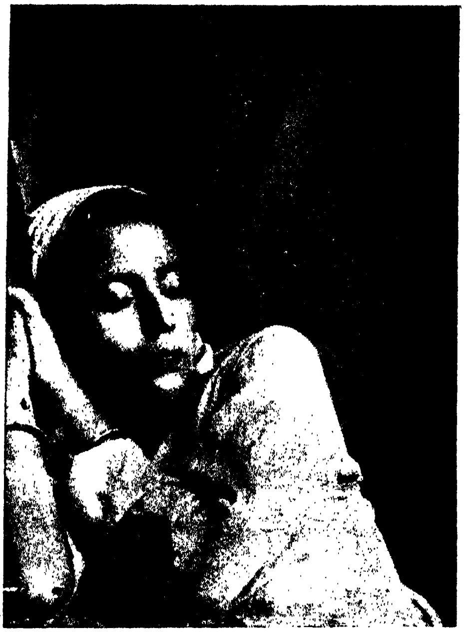

সুখ নিদ্রা

ঘুমভাঙ্গা

আঘাত (ব্যথা)

ক্রোধ

মুখভঙ্গী

মনোনিবেশ

আশ্চর্য্য!

বিরক্তি

শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর আখ্যায়িকাবলি

(সমালোচনা)

[অধ্যাপক শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যারত্ন, এম এ]

'ভারতবর্ষে'র শ্রাবণ-সংখ্যায় শ্রীমতী ইন্দিরা (সুরূপা) দেবীর 'স্পর্শমণি'-সমালোচনা-প্রকাশের অব্যবহিত পরেই তাঁহার ভগিনী শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর 'বাগ্‌দত্তা', 'পোষ্যপুত্র', 'মন্ত্রশক্তি', 'মহানিশা' ও 'রামগড়' এই পাঁচখানি পুস্তক 'সমালোচনা বা আলোচনার্থ' উপহার পাইয়াছি। (সহৃদয় পাঠক হয় ত বলিবেন, 'জ্যোতিঃহারা' খানি হইলেই আধ ডজন পুরিত!) উভয় ঘটনার পৌর্ব্বাপর্য্য কাকতালীয়-ন্যায়ে ঘটিয়াছে, এরূপ বিবেচনা হয় না। যাহা হউক, পাঁচ পাঁচখানি পুস্তকের বিস্তারিত ভাবে সমালোচনা করি, এমন সময়ও নাই, এরূপ প্রবৃত্তিও নাই—কেন না সমালোচনা করাই বর্ত্তমান লেখকের পেশা নহে। ইহার কয়েকখানি পুস্তক অনেক দিন পূর্ব্বে প্রকাশিত এবং একাধিক পত্রে সমালোচিত হইয়াছে। সুতরাং সেগুলির নূতন করিয়া সমালোচনার তত প্রয়োজনও দেখি না। তবে গ্রন্থকর্ত্রী হয় ত সবগুলি সম্বন্ধেই এ পক্ষের অভিমত জানিতে উৎসুক। যাহা হউক, যথাশক্তি অল্পবিস্তর সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। শেষরক্ষা করিতে পারিব কি না জানি না।

'বাগ্‌দত্তা'র দ্বিতীয়, 'পোষ্যপুত্রে'র তৃতীয় ও 'মন্ত্রশক্তি'র দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে, সুতরাং নবপ্রকাশিত পুস্তকের ন্যায় এগুলির বিস্তারিত সমালোচনা না করিলেও ক্ষতি নাই। বিশেষতঃ, পাক দিয়া সূতা লম্বা করিতে গেলে, অর্থাৎ পাঁচখানি আখ্যায়িকারই বিস্তারিত সমালোচনা করিতে গেলে, প্রবন্ধ অতিরিক্ত দীর্ঘ ও একঘেয়ে হইবে, তাহাতে পাঠক, সমালোচক ও লেখিকা তিন পক্ষেরই ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবে। অতএব পুরাতনগুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া নূতনগুলির সবিস্তারে সমালোচনা করিব। সূচি-কটাহ-ন্যায়ে প্রথমে সংক্ষিপ্ত সমালোচনা সারিয়া লই।

মন্ত্রশক্তি

'মন্ত্রশক্তি' সম্বন্ধে অনেক কথা 'দিদি' ও 'স্পর্শমণি'র সমালোচনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছি, 'পাগলা ঝোরা'য় 'ভর্ত্তার উত্তরে' ইহার গুণগানও করিয়াছি, আর পুনরালোচনার প্রয়োজন কি? এক কথায় শুধু এইটুকু বলিয়া রাখি, 'মন্ত্রশক্তি' গ্রন্থকর্ত্রীর সর্ব্বোত্তম আখ্যায়িকা,—সুলিখিত, সুচিন্তিত, সুশিক্ষাপ্রদ। আমাদের নারীসমাজে ইহার বহুল-প্রচার ঘটিলে সমাজের মঙ্গল হইবে। সাধারণতঃ, গ্রন্থকর্ত্রীর আখ্যায়িকা-সমূহের নায়কদিগের চরিত্রে একটা না একটা দুর্ব্বলতা থাকে, তাহার ফলে নায়কের নিজের জীবন ও সঙ্গে সঙ্গে অপরের জীবনও বেদনাময় হইয়া পড়ে; কিন্তু এই আখ্যায়িকার প্রধান আখ্যানের নায়ক আদর্শ পুরুষ, এমন কি অপ্রধান আখ্যানের নায়কও তাঁহার অন্যান্য আখ্যায়িকার নায়কের তুলনায় উচ্চশ্রেণীর চরিত্র।

পোষ্যপুত্র

'পোষ্যপুত্র'ও লেখিকার আর একখানি উৎকৃষ্ট আখ্যায়িকা। ঘটনা-পরম্পরার জটিলতা ও বৈচিত্র্যে, চমকপ্রদ আকস্মিক ঘটনার সমাবেশে, কৌতূহলোদ্দীপন পটুত্বে রহস্যভেদ কৌশলে ও চরিত্রাঙ্কননৈপুণ্যে গ্রন্থকর্ত্রী যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। প্রকৃতি-চিত্র এবং বৃন্দাবন, মাদুরা, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা বেশ মনোজ্ঞ হইয়াছে। নায়ক বিনোদ ওরফে নীরদের হৃদয়ের দ্বন্দ্ব, পিতা শ্যামাকান্তের স্নেহশীলতা, রজনীনাথের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, তাঁহার পত্নী বসুমতীর মাতৃহৃদয়ের বসুমতীর মতই সহিষ্ণুতা, শান্তির আদর্শ শান্ত সংযত স্নেহপ্রবণ প্রকৃতি, সিদ্ধেশ্বরীর স্বার্থপরতা ও নীচাশয়তা, তাহার কন্যা শিবানীর তদ্বিপরীত প্রকৃতি, প্রতিবেশিনী মাতঙ্গিনীর সমবেদনা, যোগেনের বন্ধুত্বের প্রগাঢ়তা, সাধুর চরিত্র মাহাত্ম্য, সুপ্রকাশের শিশুচরিত্র, পোষ্যপুত্রের উচ্ছৃঙ্খলতা ও শেষে চরিত্র-সংশোধন, ইত্যাদি সমস্ত অংশই সুন্দর হইয়াছে। শান্তি ও শিবানী এই দুইটি আদর্শবধূর চরিত্রই এই পুস্তকের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্। মোসাহেব যোগেশের প্রভুপত্নীর প্রতি আসক্তি সম্বন্ধে খুব সামলাইয়া লেখনী চালনা করিয়া গ্রন্থকর্ত্রী সুরুচি ও সুনীতির সম্ভ্রম রক্ষা করিয়াছেন। রজনীনাথ ও তাঁহার শিষ্য নীরদের 'স্বদেশী'র জন্য উৎসাহ গ্রন্থকর্ত্রীর পিতার 'অনাথবন্ধুর' জের।

বাগ্‌দত্তা

'বাগ্‌দত্তা' পাঠ করিয়া তেমন আনন্দ পাই নাই, ইহা গ্রন্থকর্ত্রীর অন্যান্য আখ্যায়িকা অপেক্ষা নিকৃষ্ট; বোধ হয় এইখানি তাঁহার প্রথম রচনা। ইহাতে 'অনাথবন্ধু'র অনুকরণের চিহ্ন অনেক স্থলে বিদ্যমান; ফলতঃ ইহা গ্রন্থকর্ত্রীর শিক্ষানবিশী বা নকলনবিশী অবস্থার নিদর্শন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। পুস্তকের প্রধান দোষ, সন্ধিক্ষণে নূতন নূতন লোকের আকস্মিক আবির্ভাব এবং তজ্জন্য ঘটনাস্রোতের অচিন্তিতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন। এরূপ ঘটনা দুই একটি হইলে চমকপ্রদ হয়, কিন্তু বাহুল্য হইলে একঘেয়ে ও অবিশ্বাস্য হইয়া দাঁড়ায়। রাঢ়ী বারেন্দ্র দুই দুইটি বিবাহের ব্যবস্থা গ্রন্থকর্ত্রী করিয়াছেন বটে, সমাজেও এরূপ দুচারিটি ঘটিয়াছে তাহাও বটে; কিন্তু ইহাতে যে এই সামাজিক সমস্যার

াধান হইবে, আমাদের ত তাহা বোধ হয় না। এরূপ একটা bbyর জন্য মাথাঘামানর প্রয়োজন আছে, আমাদের তাহাও বেচনা হয় না। যাহা হউক, দোষ থাকিলেও পুস্তকের যে গুণ ই তাহা নহে। গ্রন্থকর্ত্রীর অন্য পুস্তকগুলি প্রকাশিত হওয়াতেই গুলির সহিত তুলনায় এখানি এতটা নিকৃষ্ট বোধ হইতেছে। নতুবা াদর্শ ব্রাহ্মণ সার্ব্বভৌম মহাশয়ের মহৎ চরিত্র (লেখিকার ভগিনী র্ত্তৃক পরে লিখিত 'স্পর্শমণি'র বিশ্বনাথ এই প্রসঙ্গে স্মর্ত্তব্য), সেই াদর্শে অনুপ্রাণিত ভক্তিমান্ বন্ধুবৎসল কর্ম্মযোগী মণীশের পূত চরিত্র পরে লিখিত 'মন্ত্রশক্তি'র অম্বরনাথ এই প্রসঙ্গে স্মর্ত্তব্য), শচী-ান্তের হৃদয়ের দ্বন্দ্ব ও শেষে প্রেমের প্রভাবে স্বার্থসর্ব্বস্ব শচীকান্তের ার্থে আত্ম-বিসর্জ্জন, কমলার দুঃখময় জীবন, মাতুল করালীচরণের স্তব চিত্র, সত্য ও গৌরীর বাল্যলীলা এবং অনেক বাধাবিঘ্নের পর াল্যপ্রণয়ের সুখময় পরিণাম, গৌরীর পিতার স্নেহময় হৃদয় (পরে িখিত 'মহানিশা'য় মুরলীধর স্মর্ত্তব্য)—পুস্তকের এই সমস্ত উপাদান পভোগ্য, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। দ্বিতীয় সংস্করণে পুস্তক-ানির ছাপা ও কাগজ বড়ই খারাপ।

মহানিশা

'মহানিশা' যখন 'ভারতবর্ষে' ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছিল, তখন ড়িয়াছিলাম, আবার এখন পুস্তকাকারেও আগ্রহের সহিত পড়িলাম। খানিও 'পোষ্যপুত্রে'র ন্যায় একখানি উৎকৃষ্ট আখ্যায়িকা। বঙ্কিম-ন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'র ন্যায়, এই আখ্যায়িকায়ও দুইটি স্বতন্ত্র আখ্যান বং একই নায়ক উভয় আখ্যানের সংযোগী পুরুষ। অপ্রধান াখ্যানের নায়িকা ধীরা বঙ্কিমচন্দ্রের রজনীর ন্যায় অন্ধ যুবতী। পুস্তকে দেখা যায়, নায়ক নির্ম্মল নায়িকা ধীরাকে বঙ্কিমচন্দ্রের াখ্যায়িকাবলি পড়িয়া শুনাইতেছেন। অনুমান করি, তাহার মধ্যে রজনী' সর্ব্বাগ্রে নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। বোধ হয়, এই কৌশলে লেখিকা বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট অন্ধ-যুবতীর জন্য ঋণ স্বীকার করিয়াছেন।) ঙ্কিমচন্দ্র 'রজনী'তে অন্ধ যুবতীর মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ করিয়া আমাদের াহিত্যে এই শ্রেণীর চরিত্র-সৃষ্টির পথ দেখাইয়াছেন। অধুনা 'মহানিশা'য় শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ভট্টের 'স্বেচ্ছাচারী'তে এই পথ অনুসৃত হইয়াছে। বোদ্ভাবিত না হইলেও এই চরিত্রাঙ্কনে লেখিকা যথেষ্ট কৃতিত্ব খাইয়াছেন। অন্ধের অনুভূতি, অন্ধের সুখদুঃখ, অন্ধের পিতার তি প্রাণভরা ভালবাসা, অন্ধের হৃদয়ে স্বামিপ্রেমের বিকাশ ও স্বামীর খের জন্য আত্মত্যাগ, অপ্রধান আখ্যানে পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদে ন্দররূপে অঙ্কিত হইয়াছে। ধীরার পিতার প্রতি প্রাণভরা ভালবাসা র্ম্মস্পর্শী, আবার হিন্দু সতীর ভাব-ভাবিতা ধীরার স্বামীর সুখের জন্য তঃপ্রবৃত্ত হইয়া আত্মবলিদান আরও মর্ম্মস্পর্শী।* (শেষোক্ত শোকাবহ ঘটনায় 'মহানিশা' নামের সার্থকতা, ৪৯ সংখ্যক পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।) অপ্রধান আখ্যান হইলেও ধীরার প্রভাবে ইহা পাঠকের হৃদয়ের অনেকখানি জায়গা যুড়িয়া রহিয়াছে। উভয় আখ্যানের সংযোগী পুরুষ নায়ক নির্ম্মলের হৃদয়ের দ্বন্দ্ব ও অনুশোচনার বৃশ্চিক-দংশনও মর্ম্মস্পর্শী। ধনবান্ মুরলীধরের বন্ধুপ্রীতি ও তাহারই অনুবৃত্তি বন্ধুপুত্রের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ ও উদারতা, সর্ব্বোপরি তাঁহার প্রগাঢ় কন্যাস্নেহ, তাঁহাকে আদর্শ-পুরুষে পরিণত করিয়াছে। আহা, স্বাবলম্বনের বলে প্রভূত ধন উপার্জ্জন করিয়া সকলেই যদি তাঁহার ন্যায় হৃদয়বান্ হইত! (গ্রন্থকর্ত্রীর ভগিনী-কর্ত্তৃক পরে লিখিত 'স্পর্শমণি'র রুদ্রকান্ত এই প্রসঙ্গে স্মর্ত্তব্য।) মুরলীধরের উচ্ছৃঙ্খল পুত্র ব্রজরাজের অপ্রত্যাশিত চরিত্র-পরিবর্ত্তনও এই অপ্রধান আখ্যানের একটি উল্লেখযোগ্য (feature) অঙ্গ। ('বাগ্‌দত্তা'য় শচীকান্ত, 'পোষ্যপুত্রে' পোষ্যপুত্র হেমেন্দ্র, 'স্পর্শমণি'তে মুরারি এই প্রসঙ্গে স্মর্ত্তব্য।)

প্রধান আখ্যানে নায়িকা অপর্ণার চরিত্রের দৃঢ়তা, তাঁহার অভাগিনী মাতা সৌদামিনীর সহিষ্ণুতা ও সংযম, জামাতার আচরণে মর্ম্মাহত তিক্তস্বভাব রাধিকাপ্রসন্নের রূঢ় বাক্য ও ব্যবহারের অন্তরালে স্নেহপ্রবণ হৃদয় এবং সর্ব্বোপরি রাধিকাপ্রসন্নের বিনা-বেতনের সরকার বিহারীর প্রাণঢালা প্রভুভক্তি ও তাহারই অনুবৃত্তি—প্রভুর দৌহিত্রী ও প্র-দৌহিত্রীর জন্য সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্গ—এইগুলি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাধিকাপ্রসন্নের উত্তরাধিকারী কামাখ্যাচরণ, বিশেষতঃ কামাখ্যাচরণের স্ত্রী, শাশুড়ী, কন্যা কালিন্দী ও শ্যালক কেষ্টধনের চিত্র (realistic picture) বাস্তব-চিত্র হিসাবে উপভোগ্য। 'স্পর্শমণি'-সমালোচনায় কয়েকখানি আখ্যায়িকায় অঙ্কিত এই শ্রেণীর চরিত্রে 'শক্ত খোলার মধ্যে নরম শাঁসে'র কথা বলিয়াছিলাম; এই শ্রেণীর মধ্যে রাধিকা-প্রসন্নের চরিত্রাঙ্কনে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মৌলিকতা আছে। রাধিকা-প্রসন্নের সহিত তাঁহার উত্তরাধিকারী কামাখ্যাচরণ ও তাহার পরিবারবর্গের তুলনা করিলে, রূঢ় ব্যবহারের অন্তরালে স্নেহপ্রবণতা এবং অকৃত্রিম হৃদয়হীনতা—এতদুভয়ের প্রভেদ সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। বিহারী শেক্‌স্‌পীয়ারের Adam, স্কটের Caleb Balderstone, বঙ্কিমচন্দ্রের রামচরণ ও রবীন্দ্রনাথের 'পুরাতন ভৃত্যে'র পার্শ্বে স্থান পাইবার যোগ্য। (অবশ্য সামাজিক পদবীতে সে তাহাদের অপেক্ষা উচ্চ।) ফলতঃ এই প্রভুভক্ত সরকারের চরিত্রই পুস্তকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সামগ্রী। অপর্ণা নির্ম্মলকে প্রত্যাখ্যান করিয়া বিহারীকে বরণ করিবার যে শেষ সঙ্কল্প করিয়াছিল, তাহা পূর্ণ হইলে বিহারীর প্রতি সুবিচার হইত, তাহার গুণের উপযুক্ত পুরস্কার হইত—তবে তাহাতে বিহারীর

* ধীরার জাহাজ হইতে জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া আত্মহত্যা টনের The Last Days of Pompeii আখ্যায়িকায় অন্ধ যুবতী Nydiaর ঐ প্রকারের আত্মহত্যার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু Nydiaর প্রেমে একটু স্বার্থের কলুষ আছে, সে প্রতিযোগিনীর সুখ সহ্য করিতে না পারিয়া মর্ম্মাহতা হইয়া আত্মহত্যা করিল, আর ধীরা প্রতিযোগিনীকে বিবাহ করিয়া সুখী করিবার জন্য আত্ম-সুখে জলাঞ্জলি দিল। ধীরার চরিত্রের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতে হইবে।

আদর্শ চরিত্রের খর্ব্বতা হইত (আর পাঠক-পাঠিকার চক্ষে এই যুগল-মিলন বড়ই বেখাপ্পা বেমানান ঠেকিত), এই যা' আপশোষ। পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠায় নির্ম্মলের প্রতি বিহারীর কথাগুলি কি সুন্দর, কি মধুর, কি আন্তরিকতাপূর্ণ!

প্রাকৃতিক দৃশ্য-বর্ণনায় ও বাহ্য-প্রকৃতির সহিত মানব-প্রকৃতির নিগূঢ় সংযোগ-কল্পনায় গ্রন্থকর্ত্রী যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহাতে হৃদয় বিস্ময় ও আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। নিত্য-পরিবর্ত্তনশীলা প্রকৃতির নব-নব রূপে তাঁহার বহির্দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি যেন ডুবিয়া আছে। ইহা আমাদের সাহিত্যে একেবারে অভিনব না হইলেও দুর্লভ। গ্রন্থকর্ত্রীর ভাষার প্রবাহ তাঁহার বর্ণিত ইরাবতীর প্রবাহের মতই (৩৫ সংখ্যক পরিচ্ছেদ) বৈচিত্র্যময়। তাঁহার মন্তব্যগুলি চিন্তাশীলতা ও সহৃদয়তার পরিচায়ক। তবে এগুলিতে স্থানে স্থানে বিদ্যার জাঁক প্রকটিত হইয়াছে। বিজ্ঞান, দর্শন, বৈদ্যক শাস্ত্র, ভূগোল, হিন্দু আইন, আধ্যাত্মিক হিন্দুধর্ম্ম, কিছুই বাদ পড়ে নাই। এইটুকুই 'একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে'। উল্লিখিত দোষটুকু George Lewesএর শিষ্যা ও সঙ্গিনী George Eliot ছদ্মনামধারিণী আখ্যায়িকা-রচয়িত্রীর বেলায়ও দেখা যায়, এই বড় নজির খাড়া করা যায় বটে, কিন্তু এটুকু না থাকিলেই যেন ভাল হইত। ইহা অধিকাংশ পাঠককে—এমন কি সুপণ্ডিত পাঠককেও সুখ না দিয়া পীড়া দেয়। তবে গ্রন্থকর্ত্রী হয় ত এই ত্রুটিপ্রদর্শনকে পুরুষ-জাতির মুরুব্বিয়ানা বলিয়া মনে মনে হাসিবেন। হইতেও পারে; ব্যক্তিগত ঝোঁক (personal equation) ত' একেবারে বর্জ্জন করা যায় না, তা' সমালোচক যতই বিজ্ঞতা ও নিরপেক্ষতার ভান করুন।

রামগড়

'রামগড়' ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা—ইংরেজীতে যাহাকে Historical Romance বলে। নামটি সাধারণ পাঠকের কর্ণে ঠিক মধুধারা ঢালিবে না, হয় ত নায়িকা শুক্লার নামে আখ্যায়িকার নামকরণ হইলে সাধারণের প্রীতিকর হইত। বিশেষজ্ঞ অবশ্য বলিবেন, এই নামের সঙ্গে প্রাচীন ভারতের একটি বিস্মৃত কাহিনী জড়িত আছে, অতএব এই নামের উপযোগিতা আছে। তথাস্তু। আমরা প্রত্নতত্ত্ব-রসিক নহি, সুতরাং ইহার কতটুকু ইতিহাসের 'দরের সোণা', আর কতটুকু কল্পনার 'চাঁদি রূপা', তাহা আমাদের কষিয়া দেখিবার শক্তি নাই। এইরূপ একটা আশঙ্কা গ্রন্থকর্ত্রীর মনেও হইয়াছিল, তাই তিনি ভূমিকায় কিঞ্চিৎ কৈফিয়ৎ দিয়াছেন; বঙ্কিমচন্দ্রও এই আশঙ্কায় 'আনন্দমঠ' প্রভৃতির বেলায় কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। ফলতঃ এই শ্রেণীর আখ্যায়িকার বিচারে বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অধিকারী, আমাদের মত অনধিকারীর হাতে এ ভার দেওয়া বিড়ম্বনা-মাত্র। তবে যখন ইহা 'আপসে আওতা হায়', তখন 'যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি' এই বিধিতে কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াই উচিত।

আখ্যায়িকাখানি বৌদ্ধ-ভারতের একটুকরা ইতিহাস বা কিংবদন্তী-অবলম্বনে লিখিত। বৌদ্ধ-ভারতের ইতিহাস-অবলম্বনে আখ্যায়িকা-রচনায় বোধ হয় প্রথম পথ দেখাইয়াছেন—বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়; তাঁহার 'কাঞ্চনমালা' পুরাতন 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হইয়াছিল; সম্প্রতি ইহা গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের আট আনা সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। হালে আর একজন বিশেষজ্ঞ, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বৌদ্ধ-ভারত সম্বন্ধে অনেকগুলি সুখপাঠ্য আখ্যায়িকা রচনা করিয়াছেন। সুতরাং বর্ত্তমান গ্রন্থকর্ত্রী এক্ষেত্রে নূতন পথ আবিষ্কার করেন নাই। তবে তাঁহার বিশিষ্টতা এই যে, তিনি বুদ্ধদেবের জীবদ্দশার সময়ের চিত্র অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এমন কি ভগবান্ তথাগতকে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ করিয়াছেন। ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী আখ্যায়িকাকারগণ কেহই করেন নাই। ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা-রচনায় গ্রন্থকর্ত্রীর এই প্রথম উদ্যম, ইহাও মনে রাখিতে হইবে।

আমরা ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা-রচনার প্রয়োজনীয়তা (বিশেষতঃ এই জাতীয় ভাবের নব-জাগরণের দিনে) খুবই স্বীকার করি; কিন্তু, দুঃখের বিষয়, বয়সের দোষে বা রুচি-প্রকৃতির দোষে আমরা 'রীতিমত রোম্যান্সে'র রসগ্রহণে তাদৃশ পটু নহি; 'বিষবৃক্ষ' 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'মহানিশা', 'মন্ত্রশক্তি' প্রভৃতি আধুনিক বাঙ্গালী-জীবনের সাধারণ ঘরসংসারের চিত্রের মধ্যে যে অসাধারণ করুণ রস ও প্রেমস্নেহের নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহাতে আমরা যে তৃপ্তি, যে আনন্দ লাভ করি, প্রাচীন ইতিহাসের অসাধারণ ঘটনাবলী ও পাত্রপাত্রীর বর্ণনায় আমরা সে তৃপ্তি, সে আনন্দ পাই না। অবশ্য ইহার জন্য লেখিকা দায়ী নহেন, বর্ত্তমান সমালোচকই দায়ী। যাহা হউক, যাঁহারা রোম্যান্স ভালবাসেন, তাঁহাদের কৌতুহল-উদ্রেকের জন্য বলিতে পারি যে, এই পুস্তকে রোম্যান্সের বহু উপকরণ সজ্জিত আছে, ঘটনা-সজ্ঘাত ও চরিত্র-বৈচিত্র্যের ঘন-সমাবেশ আছে। তিন তিনটা রহস্য (mystery) ও চারি চারিটা শোকাবহ ব্যাপার (tragic theme) আখ্যায়িকার অন্তর্ভুক্ত করিয়া আখ্যানবস্তু (plot) খুবই ঘোরালো করা হইয়াছে। দেবগড়ের যুবরাজ ইন্দ্রজিতের অসংযত প্রবৃত্তির তাড়নায় ভীষণ প্রতিশোধ-গ্রহণ ও তাহার ভীষণতর প্রায়শ্চিত্ত, শুক্লার দেশের জন্য আত্মত্যাগ ও পতিকুলের সম্মানরক্ষার জন্য আত্ম-হত্যা, দেবগড়ের রাজা সুরজিতের বহুকাল পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত পাপের জন্য অনুতাপ দহন ও উন্মাদ, ভিক্ষুণী সুপ্রিয়ার স্বামি পুত্রীর মায়া, বৈশালীর রাজকন্যা সুদক্ষিণার সাধনা ক্ষমা-পারমিতা, কৌশাম্বীর যুবরাজ পুষ্পমিত্রের প্রকৃত প্রেমের পরশ-পাথর-স্পর্শে পশুত্ব হইতে মনুষ্যত্ব লাভ, অহেতুক ঈর্ষ্যা-সন্দেহে কপিলাবস্তুর যুবরাজ বসন্তশ্রীর বাগ্দত্তা প্রণয়বতী সরলা অমিতার প্রত্যাখ্যান এবং এই হঠকারিতার জন্য পরে তীব্র অনুতাপ ও পুনর্মিলনের পরিবর্ত্তে শোকাবহ মৃত্যু—ইত্যাদি বহু চিত্তবিদ্রাবী ব্যাপার ইহাতে বর্ণিত আছে। ইন্দ্রজিতের অপরাধের বিচার, সুপ্রিয়ার আত্মপ্রকাশ, শুক্লার জন্মরহস্যোদ্ভেদ, (কালিদাসের ইন্দুমতীর স্বয়ংবরের আদর্শে) সুদক্ষিণার স্বয়ংবর-

ব্যাপার, অম্বরীষের ছদ্মবেশত্যাগ ও কৌশাম্বীরাজ বিরূঢ়কের সহিত শেষ বুঝাপড়া, পুরুষ-বেশিনী রাজকুমারী অমিতার প্রিয়তম বসন্তশ্রীর মৃতদেহের সহিত সহমরণ, ইত্যাদি বহু (sensational) রোমাঞ্চকর ব্যাপারে আখ্যানটি বিলক্ষণ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। চরিত্রগুলিও বেশ উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে।

গ্রন্থকর্ত্রী প্রত্যেক পরিচ্ছেদের শীর্ষে একটি করিয়া বিষয়োপযোগী ইংরেজী কবিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বপ্রকাশিত কয়েকখানি পুস্তকে এই বিশিষ্টতাটুকু লক্ষিত হয় না।. অবশ্য ইহা গ্রন্থকর্ত্রীর ইংরেজী সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সাক্ষ্য দেয়, কিন্তু ইহাও (pedantry) পাণ্ডিত্য-প্রকাশের প্রয়াস বলিয়া পরিগণিত হইবে না কি? ৺রমেশচন্দ্র দত্ত প্রথম প্রথম (স্কটের অনুকরণে) এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শেষের দিকে এ অভ্যাস ত্যাগ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র 'এক 'কপালকুণ্ডলা'য় এই পথে চলিয়াছেন, কিন্তু তিনি ইংরেজী, বাঙ্গলা, সংস্কৃত তিন ভাষা হইতেই বাক্যাবলী উদ্ধৃত করিয়া পক্ষপাত-দোষ পরিহার করিয়াছেন। এতদিন পরে বর্ত্তমান গ্রন্থকর্ত্রী এই পথ ধরিলেন। ইহাতে একটু বিস্মিত, একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াছি।

পুস্তকের ভাষা বিষয়ের গাম্ভীর্য্যের উপযোগী গম্ভীর ও মার্জ্জিত, তবে কোথাও কোথাও অতিমাত্রায় গুরুগম্ভীর হইয়া পাঠকের পীড়া উৎপাদন করে। ঈষিকা (তুলি), কাদম্বী (সুরা), বনায়ুজ (অশ্ব) ইত্যাদি দুরূহ শব্দের প্রয়োগ সুবিবেচিত বলিয়া বোধ হয় না। 'অংশতর' কি অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে এবং কোথা হইতে ভাষায় আসিয়াছে, বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। 'উদগ্র আতঙ্কের সজ্বাতে', 'বৈখরীরূপে বহিঃপ্রকাশ', 'উদীচীর তীরে দিবসাধিপের শেষ শয্যা-রচনার উজ্জ্বলচ্ছটা-বিকীর্ণকারী কনকসূত্র-বিরচিত আস্তরণ',—ইত্যাদি একেবারে 'গীর্ব্বাণসজ্বাত-ঈড্য কপর্দ্দীর অঙ্ঘ্রি'র মতই বিকট নহে কি? এরূপ পাণ্ডিত্য-প্রকাশের প্রয়াস আমরা সমর্থন করিতে পারি না। রাজা মান্ধাতার আমলের না হইলেও, রাজা রামমোহন রায়ের আমলের 'হওন'কে পুনর্জ্জীবিত করিবার চেষ্টা নিতান্তই পণ্ডশ্রম নহে কি?

দোষ পরিচ্ছেদ

ভাষার কথা যখন উঠিল, তখন কতকগুলি ব্যাকরণগত ভ্রম-প্রমাদের উল্লেখ না করিলে সমালোচকের কর্ত্তব্যের ত্রুটি হয়। এই দোষ অবশ্য গ্রন্থকর্ত্রীর বিশিষ্টতা নহে, আজকালকার ছোট, বড়, মাঝারী প্রায় সকল লেখকের রচনায়ই ইহা দেখা যায়। তবে এক্ষেত্রে আক্ষেপের বিষয় এই যে, এমন সুন্দর রচনায় এরূপ খুঁত রহিয়াছে। সুকণ্ঠ গায়কের গান শ্রবণে মোহিত হইয়া তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, তাহার সর্ব্বাঙ্গ কুৎসিত চর্ম্মরোগে কুদর্শন,—ইহাতে যেমন প্রাণে ব্যথা লাগে, রসভঙ্গ হয়, সেইরূপ সুলিখিত পুস্তকে মুদ্রাকর-প্রমাদ ও ব্যাকরণ-ভুল দেখিলেও প্রাণে ব্যথা লাগে, রসভঙ্গ হয়। বড় আক্ষেপের কথা যে, গ্রন্থকর্ত্রী সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি সমস্ত আয়ত্ত করিয়াছেন; অথচ কেবল ব্যাকরণটাকেই তুচ্ছ-বোধে অবহেলা করিয়াছেন। প্রতিভা ব্যাকরণের বিধিনিষেধের বন্ধন মানে না, এ সংস্কার বর্জ্জনীয়। একটু যত্ন করিলে, একটু সাবধানতা অবলম্বন করিলে, প্রয়োজন হইলে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ লইলে, এ দোষ নিরাকৃত হয় না কি?

'ব্যাকরণ-বিভীষিকা'য় যে সব বিভ্রাটের কথার আলোচনা করিয়াছি—অর্থাৎ হসন্ত-স্থানে অজন্ত; অজন্ত-স্থানে হসন্ত; বিসর্গ-বিসর্জ্জন ও তজ্জন্য বিসর্গ-সন্ধিতে বক্ষারূঢ়, বক্ষচ্যুত, বৃক্ষতলে প্রভৃতি পদনির্ম্মাণ; সন্ধির নিয়মের অন্যান্য ব্যতিক্রম যথা হৃদপিণ্ড; মৌন, রক্তিম, উন্মাদ, গোপন এই বিশেষ্যগুলির বিশেষণবৎ প্রয়োগ; ইহারই জের মৌনতা, সখ্যতা, ঐক্য (?) মত্যতা, অস্থৈর্য্যতা প্রভৃতি পদনির্ম্মাণ; ইন্‌ভাগান্ত শব্দের সম্বোধনে 'লোভি', 'মহামন্ত্রি', 'অপরাধি' প্রভৃতি পদ; সমাসে (খাঁটি বাংলার নিয়মে?) প্রতিবেশীবর্গ, ধনীগৃহিণী প্রভৃতিতে ইবর্ণের দীর্ঘত্ব; মুদ্রিত অর্থে 'মুদিত', স্ত্রী কয়েদী অর্থে 'বন্দিনী', মহাবৃক্ষ অর্থে 'মহাটবি', গ্রহীতা অর্থে 'গৃহীতা'; 'শায়িতা' 'আকর্ষিত', 'অন্বেষিত', 'দাহ্যমান' প্রভৃতি স্থলে অনর্থক ণিজন্ত-প্রয়োগ; আর সর্ব্বাপেক্ষা বিকট হাল বাঙ্গালার সংক্রামক ব্যাধি—বিশেষ্য-বিশেষণে লিঙ্গের সমতার অভাব এবং সমাসস্থলে স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্যের স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণের পুংবদ্ভাবের অভাব;—এ সমস্তই পুস্তকখানিতে যুড়িয়া রহিয়াছে। কয়েকটি বাছা বাছা উদাহরণ দিতেছি:—বেগবান্ গতি, তেজীয়ান্ দৃষ্টি, বলীয়ান্ যুক্তি, অশরীরী বাণী, মর্ম্মবিদারী যন্ত্রণা, প্রাণঘাতী কথা, অস্থায়ী রেখা, গগনস্পর্শী শিখা; সর্ব্বংসহা মাতৃহৃদয়, বিলাসিনী নারীসঙ্গ, পতিগতপ্রাণা সতীচিত্ত, অমানুষী চেষ্টা বলে; অফলা জন্ম, অক্ষয়া স্বর্গ, অহেতুকী আনন্দ, তামসী নিশীথ, বাসন্তী প্রভাত, বৈশাখী গগন, ভাগ্যহীনা সন্তান, শব্দময়ী জগৎ, সর্ব্বদুঃখহরা বক্ষে, সম্মুখবর্ত্তিনী সুন্দরী ঘাতুক, কৈশোরশ্রীমণ্ডিতা ভাস্বর রূপ, অহেতুকী স্নেহরস, উৎসবময়ী সংসার, মূর্ত্তিমতী সংযম, তুষারবিমণ্ডিতা হিমগিরিশৃঙ্গ, মরীচিকাময়ী নবযৌবন!!! এই শেষোক্ত দৃষ্টান্তগুলি অসাবধানতার চরম অভিব্যক্তি নহে কি? আখ্যায়িত, আহ্বানিতা, সোৎসুকে, সদৃঢ়, সচিন্তিত, সপ্রমাণিত, উৎসর্গিত, এগুলি কি? বিশেষতঃ প্রথম তিনটি? অহোরহঃ, সচক্ষে, যুদ্ধমান, দীপ্তিমান্, উদাসীনী, এগুলি ছাপার ভুল না আর কিছু? 'সখাভাবে' না হয় বাঙ্গালায় চলিল, কিন্তু 'শ্রোতাদলে' ও 'জামাতাপ্রাণ'ও কি চলিবে? 'যশোকীর্ত্তন', 'হবির্তেজে', 'চতুর্ত্রিংশ', বিসর্গসন্ধির এই ভুলগুলি অমার্জ্জনীয় নহে কি? 'সেথানের' বিশুদ্ধ বটে, কিন্তু 'সেথানকার'ই আমাদের ভাষার idiom নহে কি? 'ইহ দর্শনে' সমাস ও 'ইহাপেক্ষা' 'আমাপেক্ষা' সন্ধি বিসদৃশ নহে কি? 'কৈশোর-অতিক্রান্ত' না হয় দ্বিতীয়া তৎপুরুষ বলিয়া সামলাইলাম, কিন্তু 'পঙ্কোত্থিত', 'হাস্যবিস্মৃত অধর' ও 'মরণ-প্রতীক্ষিত বৃদ্ধ' কি অগ্যাহিতবৎ সমাস? 'স্বামীদেবতায় স্বাহা' এখানে সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণগত ভুল কি অজ্ঞ নারী ধীরার উচ্চারিত

বলিয়া 'মূর্খো বদতি বিষ্ণায়' নজীরে 'ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ' বচনে সারিয়া লইতে হইবে? 'কোলভ্রষ্ট', 'সদ্যফোটা' এই দুইটি স্থলে গুরুচণ্ডালী দোষ এবং 'মনকে নেত্রসঙ্কেত' ও 'উড়ুম্বর পুষ্প-সদৃশ' এই দুইটি স্থলে চলিত কথার বদলে অযথা সাধুভাষাপ্রবণতা নিন্দার্হ। ('মন্ত্রশক্তি'র) 'নীলাঞ্জনীল নেত্র' বুঝি; কিন্তু 'নীলিমানীল নেত্র' (মহানিশা ৩৬৪ পৃঃ) কি পদার্থ? চকোরের সুধাপান ও চাতকের বৃষ্টিধারাপান কবি-প্রসিদ্ধি, চকোরের বারিপান (মহানিশা ৩৫৩ পৃঃ) কিরূপে ঘটিল?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উৎকৃষ্ট জিনিসে খুঁত থাকিলে বড় কষ্ট হয়, তাই এই অপ্রিয় প্রসঙ্গ তুলিয়াছি। গ্রন্থকর্ত্রী নিজগুণে এই দুর্ম্মুখ সমালোচককে ক্ষমা করিবেন, এই প্রার্থনা।

আশ্চর্য্যের বিষয়, পুস্তকগুলি প্রথমে মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইয়া পরে পুস্তকাকারে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে, কয়েকখানির একাধিক সংস্করণ হইয়াছে, একখানির ভূমিকায় দেখিলাম—ইহা 'সংশোধিত হইয়া' পুনর্মুদ্রিত হইল, তথাপি মুদ্রাকরপ্রমাদ ও ব্যাকরণের ভুল অজস্র মিলে। কয়েকটি নমুনা দিলাম মাত্র, রীতিমত শুদ্ধিপত্র দাখিল করা আমার উদ্দেশ্যও নহে, সাধ্যও নহে। পরবর্ত্তী সংস্করণে গ্রন্থকর্ত্রীকে এ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে অযাচিত উপদেশ (advice gratis) দিয়া—(সমালোচক-শ্রেণীর এই মুরুব্বিয়ানার অধিকার সাহিত্যক্ষেত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে)—এই সুদীর্ঘ ও নীরস সমালোচনা শেষ করিলাম।

হিসাব-নিকাশ

[শ্রীদরবেশ]

জননি, তুমি বিশ্বমাতা, চাহ না আঁখি মেলে'—
আমরা যত নিঃস্ব, দীন-দুঃখী তব ছেলে!
নিকাশ ধরে দেখ না মাতা,
বুঝ্‌বে তবে মোদের ব্যথা;
জননী হ'য়ে সন্তানেরে কতটা দিলে ঢেলে',
কাঙাল তব ছেলের কাছে কত বা তুমি পেলে!

তুমি যে রাজ-রাজেশ্বরী যাই নি তাহা ভুলে,'
কিন্তু তব জন্ম সেই পাষাণ-রাজ-কুলে!
ভিখারী মোরা যদিও মাতা,
মোদের পিতা মহান্ দাতা,
ভুবন তিন করিয়া দান তোমারি পদ-মূলে,
রিক্ত বেশে বসতি তাঁর শ্মশান-চিতা-ধূলে।

ভাণ্ডারেতে রত্ন-ধন গণনা নাহি হয়,
দু'হাতে যদি বিলাও তবু হবে না তিল ক্ষয়।
কৃপণ তুমি এম্‌নি ধারা—
দাও না কিছু দুঃখ ছাড়া,
দিনের শেষে শূন্য ঝুলি শূন্য পড়ে' রয়,
—একটী মুঠি অন্ন তব কর না অপচয়!

এমন দয়া শিখ্‌লে কোথা? বুঝ্‌তে নারি মাতা!
—ওজন-দরে যে দান করে, সে নয় কভু দাতা।
আপন কড়া-ক্রান্তি মিল,
উসুলে নাই ভ্রান্তি তিল,
বিন্দু যদি হয় গো দিতে, অম্‌নি খোলো খাতা;
কতই যেন হিসাবে গোল, কতই পাও ব্যথা!

মোদের তুমি দাও নি কিছু, মোরাই দিছি সব,
দেবার কালে হিসাব খুলে' তুলি নি কলরব,
এই যে তব স্বরূপ খানি
—মুগ্ধ যাহে পিণাক-পাণি,—
অরূপ তুমি কোথায় পেলে এরূপ অভিনব?
মোদের হাতে রচিত তব যা' কিছু বৈভব।

ছিল না বাড়ী, ছিল না ঘর, ছিল না দাস-দাসী;
ছিল না কোনো বসন-ভূষা, রতন রাশি-রাশি;
ভোলার মত ভর্ত্তা পে'লে,
দুইটি মেয়ে, দুইটি ছেলে;
বাসের লাগি অলকাপুরী; মর্ত্ত্যে পে'লে কাশী;
ধনের রাজা কুবের তব দয়ার অভিলাষী!

আমরা বোকা ; লাগায়ে ধোঁকা গড়েছ রূপ নানা,—
কথনো ভীমা ভয়ঙ্করী, কথনো চাঁদ-পানা ;
দুইটা নহে—দশটা হাত !
মোদের তবু শূন্য পাত !
ভাতের লাগি দুয়ারে তব পেতেছে পতি থানা,
এম্‌নিতর করুণা তব আছে গো, আছে জানা !

সবার থাকে দুইটা চোখ্,—তোমায় দিছি তিন,
একটা তুলে' চাইলে কি গো রইতো কেহ দীন ?
মোদের গড়া চরণ দু'টি ;
ধর্‌তে গেলে পালাও ছুটি !'
পরের ধনে পোদ্দারীটা কুলের তব চিন্‌
মোদের কাছে বাড়্‌ছে না কি বহুৎ তব ঋণ ?

অরূপা তুমি সুরূপা হ'লে ; কতই হ'লো ঠাট্‌ ;
আমরা দিছি ; তাইতো, হেন সুখের রাজ-পাট !
ইন্দু-আঁখি মেলিয়া চাও !
বিন্দু—ওগো, বিন্দু দাও !
বিন্দু দানে সিন্ধু তব হ'বে না লুঠ-পাট,—
একটী কাণা-কড়ির দানে ভাঙ্‌বে না এ হাট !

অনাথ

[শ্রীমৃণালিনী দেবী]

তার বাপ-মায়ের দেওয়া নাম কি ছিল, তা জানি না। তবে সবাই তাকে "দুঃখী" বলিয়া ডাকিত। একরাশ কাল চুলে ঘেরা কপালের নীচে দু'টী শান্ত সজল চক্ষের স্থির দৃষ্টি, আজও আমার মনে বাল্য-জীবনের একটী করুণ স্মৃতি-কাহিনী বহন করিতেছে। আমি তখন চতুর্দ্দশ বর্ষের বালক। তারপরে আজ দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরের ঘটনা-স্রোত জীবনের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, কিন্তু আজও সে স্মৃতি ম্লান হয় নাই। কোমরে একটী তাগা, কণ্ঠে একটী মাদুলী ও হাতে দু'গাছি পিতলের সরু বালা—এই বেশে যেদিন প্রথম আমাদের গৃহ-প্রাঙ্গণে তার বাপের হাত ধরিয়া সে দাঁড়াইয়াছিল—কে জানিত অদৃষ্ট-দেবতা তাকে আমাদেরই একজন পরিজন করিয়া দিবে ? কে জানিত আমাদেরই প্রাঙ্গণের তুলসী-তলে তার ক্ষুদ্র বক্ষের শেষ নিঃশ্বাস অনন্তে মিলাইয়া যাইবে !

জাতে ছিল তারা—নাপিত। বাপ-মায়ের এক ছেলে, একমাত্র আদরের ধন—সে ছাড়া তাদের আর কেউ ছিল না। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর, যখন তার বৃদ্ধ বাপ আর একটী বিবাহ করিয়া আনিল, তখন জরার শীতলস্পর্শে তার শুষ্ক হৃদয়ের সমস্ত রস প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছিল ; নবাগতা তরুণীর জীবন-ভাণ্ড ভরিয়া দিবার মত বড় বেশী কিছু অবশিষ্ট ছিল না। কিন্তু, যখন এই ক্ষুদ্র প্রাণীটি দেবতার আশীর্ব্বাদের মত তাদের নিরানন্দ গৃহ-কোণটীতে আনন্দ চঞ্চল দীপশিখার মত আসিয়া দেখা দিল—সেইদিন হইতে এই কিশোরীর তৃষিত হৃদয়ের সব আকাঙ্ক্ষা এই ক্ষুদ্র শিশুটীকে কেন্দ্র করিয়া ঘিরিয়া রহিল। সুখে-দুঃখে চারিটী দীর্ঘ-বর্ষ অতীত হইয়া গেলে একটা সন্দেহের ঘন ছায়া বৃদ্ধের হৃদয়ে কালিমা লেপিয়া দিতেছিল। কি একটা সংশয়ের দহন-জ্বালা তার বৃদ্ধ বয়সের অলস দিনগুলি দুর্ব্বহ করিয়া তুলিতেছিল।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ফিরিয়া আসিয়া সে দেখিল, গৃহকোণে শিশুপুত্রটীকে শোয়াইয়া, জননী তার কোথায় গিয়াছে। রান্নাঘর, ভাণ্ডার, পুষ্করিণীর তীর একে-একে সব জায়গা খুঁজিয়া, নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া তার সাড়া না পাইয়া, বৃদ্ধ ঘরে আসিয়া যখন দাঁড়াইল, ক্রোধে, ঘৃণায় তার মুখমণ্ডল বিবর্ণ, বীভৎস হইয়া গিয়াছে। শিরায়-শিরায় রক্ত-প্রবাহে একটা প্রতি-হিংসার পাশব উল্লাস নাচিয়া উঠিল। ঘুমন্ত পুত্রের দিকে একবার সে চাহিল,—সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে সে নিষ্পাপ মুখখানিতে একটি মৃদুহাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ব্যভিচার-ভরা জগতের কালানল মধ্যে সে শুভ্র হাসির কতটুকু মূল্য, আজ তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। শুধু অপলক নেত্রে তার দিকে চাহিয়া-চাহিয়া একটী দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিল ;

তারপরে রাত্রির সেই আসন্ন অন্ধকারে বাহির হইয়া গেল।

যখন সে ঘরে ফিরিয়া আসিল, রাত্রি তখন গভীর হইয়াছে। ঘন-সন্নিবিষ্ট বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে একটা গাঢ় অন্ধকার এক অজানিত বিপত্তির সম্ভাবনায় জমাট বাঁধিয়াছিল। দূরে শৃগালের উচ্চ চীৎকার ও ঝিল্লীর সকরুণ ক্রন্দন নৈশবায়ু বহন করিয়া আনিতেছিল। সমস্ত পল্লী আজ সুপ্তির শান্তিময় অঞ্চল-তলে শায়িত। ধীরে দ্বার ঠেলিয়া সে ভিতরে প্রবেশ করিল। বাতায়ন-পার্শ্বে একটী প্রদীপের ক্ষীণ শিখা বাহিরের বায়ু-স্পর্শে শিহরিয়া উঠিল। তারই ম্লান আলোকে সে দেখিল—পুত্রকে বক্ষে জড়াইয়া জননী নিদ্রিতা। ঘুমন্ত নারীর অনাবৃত অচেতন মুখে তখনও যেন নির্ম্মল বাৎসল্যের স্ফুট-উচ্ছ্বাস বিলসিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু—না—সয়তান তার নিষ্ঠুর হৃদয়ে প্রতিহিংসার লোলুপ বহ্নি-শিখা জ্বালাইয়া দিয়াছে। দ্বিধা-কম্পিত হস্তে ধীরে সে বাঁশের ফাঁক হইতে তীক্ষ্ণধার ছুরিকা টানিয়া লইল। ধীরে শয্যার পাশে গিয়া তার তীক্ষ্ণ-ফলক সেই সুকোমল তরুণ-কণ্ঠে বসাইয়া দিয়া ক্ষিপ্র-হস্তে পুত্রকে তুলিয়া লইল। একটী ভীত-চকিত দৃষ্টি—একটা মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ;—তারপরে সব শেষ। একটী প্রতিবাদের সময় না পাইয়া, একটী সমর্থনের ধ্বনি না তুলিয়া রজনীর এই নিষ্ঠুর পাপ অভিনয়ের মধ্যে হতভাগিনী অকালে জন্মের মত স্বামীগৃহ হইতে বিদায় লইল।

নারীরক্তে যখন সেই মলিন-শয্যার আস্তরণখানি প্লাবিত হইয়া গেল,—রক্ত নয়—সে যেন কালী, নিষ্কম্প প্রদীপ-শিখার ম্লান আলোকে রক্তের সে ঘন কালিমা তখন নরকের বীভৎসতা সৃষ্টি করিল। সহস্র বৃশ্চিক যেন সেই শোণিত-রাশির মধ্যে পৈশাচিক উল্লাসে শিহরিয়া উঠিল। সে ভীষণ দৃশ্যে তার মন কেমন হইয়া গেল—মাথা ঘুরিয়া উঠিল। নিদ্রাতুর পুত্রকে প্রাণপণে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া রজনীর সেই স্তব্ধ অন্ধকারে পাগলের মত সে বাহির হইয়া গেল। তার মনে হইল পথঘাট আজ কে যেন রক্তে লেপিয়া দিয়াছে। চক্ষের সম্মুখে এই রক্তের বিভীষিকা লইয়া টলিতে-টলিতে থানায় গিয়া উপস্থিত হইল। উচ্চ চীৎকারে সকলকে জাগাইয়া, আর্ত্তস্বরে কহিয়া উঠিল, "আমি খুন করেছি, আমায় ফাঁসী দাও।"

আমার পিতা তখন সেই জেলার একজন হাকিম। পরদিবস জবানবন্দী লিখিয়া লইবার জন্য তাঁর সম্মুখে যখন তাকে উপস্থিত করিল—এই নিদারুণ হত্যা-কাহিনী অকম্পিত কণ্ঠে সে কহিয়া গেল। নয়নে তার স্থির উদাস-দৃষ্টি—যেন ভবিতব্যের অন্ধ-যবনিকা ভেদ করিয়া কোন্ এক অজানিত লোকের উদ্দেশে তার জ্যোতিঃহীন আঁখি দুটী বেদনায়—পরিতাপে সজল হইয়া উঠিল। পাশে বসিয়া তার বালক-পুত্র সদ্য-মাতৃ-বিচ্ছেদের তীব্র বেদনায় মূক হইয়া রহিল। নিষ্ঠুর নিয়তি আজ তার ক্ষুদ্র জীবনের পৃষ্ঠায় কতখানি ক্ষতি আঁকিয়া দিল—কে তাকে বুঝাইয়া দিবে।

বৃদ্ধ কহিল "হুজুর! মরিতে আমার কিছুমাত্র ক্ষোভ নাই। আমি যে পাপ করেছি, হাজার অপমৃত্যুতেও তার প্রায়শ্চিত্ত হ'বে না। আর বাঁচিতেও আমার সাধ নাই। স্ত্রী-হত্যার নিষ্ঠুর স্মৃতি জীবনের উপরে যে বিষ ছড়িয়ে দিয়েছে, তার জ্বালা আমি বৃদ্ধ বয়সে সইতে পারব না। তবে অভাবের শূন্যপথে এই অবোধ বালককে একাকী ফেলে মৃত্যুর কোলে গিয়েও আমি শান্তি পা'ব না—এই আমার একমাত্র আক্ষেপ।" বলিতে বলিতে তার কণ্ঠ কাঁপিয়া গেল। জরাস্পর্শ-রেখাঙ্কিত কপোল বহিয়া দরবিগলিত ধারায় অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

বাতায়ন হইতে আমার মা এই শোচনীয় দৃশ্য দেখিতেছিলেন। আমাকে ইসারায় ডাকিয়া লইয়া মা বলিলেন, "আহা বেচারাদের জন্য বড় দুঃখ হয়। হয় ত আজ সারাদিন ওদের খাওয়া হয়নি। যা, ডেকে এনে কিছু খেতে দে।" আমি গিয়া বৃদ্ধকে সেই কথা বলিলে সে অসম্মতি জানাইল। শুধু পুত্রের দিকে ইঙ্গিত করিয়া দেখাইল, যেন বলিল "আমার কিছু দরকার নাই—যদি খাইতে দেও ত ইহাকে কিছু দাও।" আমি তাকে তুলিয়া লইলাম। স্থাণুর মত অচল হইয়া সে বসিয়া ছিল। তুলিয়া লইতে সে কাঁদিল না। যেন অসহ্য শোকে তার সকল ইন্দ্রিয় নিঃস্পন্দ হইয়া গিয়াছে। ভিতরে লইয়া গিয়া তাকে খাইতে দিলাম। কিছুই সে স্পর্শ করিল না। শুধু আমার দিকে ব্যথা-ভরা অনিমেষ দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। খাওয়াইয়া দিতে গেলাম—সে মুখ ফিরাইয়া লইল। অনেক চেষ্টায় কিছুমাত্র খাওয়াইতে না পারিয়া তার বাপের কাছে যখন

লইয়া গেলাম, আমার পিতার তখন জবানবন্দী লেখা হইয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ উঠিয়া দাঁড়াইল। তুইজন পুলিস কনষ্টেবল আসিয়া তার শীর্ণ হাতে হাতকড়ি পরাইয়া দিল, কোমরে একগাছি স্থূল রজ্জু বাঁধিয়া দিল। একজন শিশুটীকে কোলে তুলিয়া লইল। যাইবার আগে বৃদ্ধের চক্ষু আবার সজল হইয়া উঠিল। অন্দরের দিকে একটী কৃতজ্ঞ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সে বিদায় হইল। সন্ধ্যার সেই ম্লান আকাশতলে মাতৃহীন বালকের অচঞ্চল চক্ষে যে বেদনা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, শোক-দুঃখ বিয়োগ ব্যাথার মধ্যে কতখানি তার তীব্রতা, কে তার পরিমাপ করিবে ?

বিচারে বৃদ্ধের ফাঁসির হুকুম হইয়া গেল। মানুষের বিধান আজ বিধিলিপির মতই অমোঘ হইয়া উঠিল। পতিহন্তার পুত্র-বিচ্ছেদে কতখানি গুরু বেদনা, কেহ তা বিবেচনা করিল না। মানুষের শাসন আজ মানুষের দুর্ব্বলতার কোনও প্রশ্রয় স্বীকার করিল না। মরিবার আগে বৃদ্ধ কহিল "আমি সেই হাকিমের সহিত একবার দেখা করিতে চাই—এই আমার শেষ ভিক্ষা।" পুত্রকে বক্ষে করিয়া আমার পিতার সম্মুখে যখন সে দাঁড়াইল—শোকের নিষ্ঠুর আঘাতে তার কণ্ঠ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সেই ভগ্ন-কণ্ঠ হইতে মর্ম্মন্তুদ দহন-জ্বালা লইয়া শুধু একটি ক্ষীণ স্বর বাহির হইয়া আসিল "অনাথকে দয়া করবেন।"

এত বড় একটা শোচনীয় বিয়োগ-কাহিনী জীবনের পাতায় শোণিতের অক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া, সে আসিয়া যখন আমাদের গৃহতলে দাঁড়াইল, সেই পিতৃ-মাতৃহীন অনাথের জন্য আমার মন মমতায় ভরিয়া গেল। ইচ্ছা হইল তাকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া তার মাতৃহারা তৃষিত হৃদয়ে স্নেহস্পর্শ বুলাইয়া দিই ; তার অশ্রুসিক্ত কোমল কপোলে একটি সস্নেহ চুম্বনে মাতৃ বিচ্ছেদ-ব্যথা ভুলাইয়া দিই। এই চিন্তার চৌম্বক-শক্তি কি সেই বাল-হৃদয় স্পর্শ করিল ! সে উজ্জ্বল চক্ষু দুটী তুলিয়া আমার দিকে একবার চাহিল ও ধীরে-ধীরে আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। মা তাকে খাবার খাইতে ডাকিলেন। সে আমার হাঁটু জড়াইয়া ধরিল—গেল না। তখন তার হাত ধরিয়া আমার ঘরে লইয়া গেলাম। একটা ছোট টুলের উপরে তাকে বসাইলাম ও নিজে তার সম্মুখে একখানি চেয়ারে বসিলাম। মা আসিয়া টেবিলের উপরে খাবার রাখিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁর বস্ত্রাঞ্চল যতক্ষণ না দুয়ারের আড়ালে অন্তর্হিত হইয়া গেল, সে স্থির হইয়া টুলের উপর বসিয়া রহিল। তারপরে নামিয়া আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। "খাও" বলিয়া তার মুখে খাবার দিতে গেলাম—হাত দিয়া সে সরাইয়া দিল। একটা বিষাদের গাম্ভীর্য্যে তার কমনীয় মুখখানি বড় সুন্দর বলিয়া মনে হইল। তাকে কোলে তুলিয়া লইলাম। চক্ষু তার জলে ভরিয়া গেল। কি এক গভীর নির্ভরতায় আমার বক্ষে মুখ লুকাইয়া ধীরে, সন্তর্পণে সে কাঁদিতে লাগিল। সেই রোরুদ্যমান নীচজাতির ছেলেটীকে বক্ষে লইয়া আমার আভিজাত্য কি সঙ্কোচে মরিয়া গেল,—অথবা কোন এক অজানিত উর্দ্ধলোক হইতে একটি মাতৃহৃদয়ের মূক আশীর্ব্বাদে তাহা অমর হইয়া রহিল—কে বলিবে !

কাঁদিতে-কাঁদিতে তার তপ্ত দেহ নিদ্রার শান্তিময় কোলে ঢুলিয়া পড়িল। কিছুকালের জন্য বিস্মৃতি আসিয়া সেই ব্যথাক্ষত হৃদয়ে স্নিগ্ধ প্রলেপ মাখাইয়া দিল। সেই ঘরেই একটা ক্ষুদ্র চৌকীতে তাকে শোয়াইয়া দিলাম। ভাবিলাম কি করিয়া এই শোকাতুর প্রাণকে সুস্থ করিব—কি কহিয়া এই মাতৃহারা অবোধ বালককে সান্ত্বনা দিব। দুর্দ্দৈব আজ তার ক্ষুদ্র জীবনের উপরে যে নিদারুণ দৈন্যের দুর্ব্বহ ভার চাপাইয়া দিল, আজ প্রভাতের এই যাত্রারম্ভে কে তার ক্ষুধিত অভাব মিটাইয়া দিবে– কে তার স্নেহ-মমতা দিয়া এই ক্ষুদ্র কলিটিকে ফুটাইয়া তুলিবে—অকালে বৃন্তচ্যুত হইতে দিবে না।

এইরূপে সেই অনাথ বালক আমাদের গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইল। আমারই সহিত তার ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়া গেল ;—আর কাহারও কাছে সে যাইত না। খাওয়ার সময়ে আমাকেই তার কাছে বসিয়া থাকিতে হইত—না হইলে সে খাইত না। আমি বিদ্যালয়ে চলিয়া গেলে আমারই ক্ষুদ্র ঘরটিতে সেই ক্ষুদ্র টুলখানির উপর আমারই অপেক্ষায় সে বসিয়া থাকিত। ফিরিয়া আসিলে সেই নির্জ্জন ঘরটিতে বসিয়া তার শান্ত মুখশ্রীতে একটা আনন্দের দীপ্তি ভাসিয়া উঠিত, তার তরুণ অধরের কোণে একটু যেন মৃদুহাসি ফুটিয়া উঠিত,—সে হাসিতে কি গোপন বেদনা ঝরিয়া পড়িত।

সন্ধ্যার পরেই তাকে খাওয়াইয়া দিতাম। আমি আলো

জ্বালিয়া পড়িতে বসিলে সে আমার টেবিলের পাশে সেই ক্ষুদ্র টুলে উঠিয়া বসিত; অনিমেষ চক্ষে আমার দিকে চাহিয়া থাকিত। আমার পড়া হইত না। পুস্তকের সাদা পৃষ্ঠায় কাল-কাল অক্ষরের শ্রেণী আমার মনের দুয়ারে কোনও অর্থ বহন করিত না। মন তখন সেই মাতৃহারা বালকের মৌন প্রতিচ্ছায়া ধারণ করিয়া একটা অব্যক্ত বেদনায় নিস্পন্দ হইয়া থাকিত। ক্রমে ঘুমে তার চক্ষু আচ্ছন্ন হইয়া গেলে আমারই বিছানার পাশে সেই ক্ষুদ্র চৌকীখানিতে তাকে শোয়াইয়া দিতাম। প্রতিদিন গভীর রাত্রে একটা অনুচ্চ চীৎকারে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত। শুনিতাম, সেই মাতৃস্নেহ-পাশছিন্ন বালক "মা, মা" বলিয়া করুণ কণ্ঠে কাঁদিতেছে। রজনীর স্তব্ধ অন্ধকারে সে ধ্বনি যখন কাঁপিয়া-কাঁপিয়া গৃহছাদতলে প্রতিধ্বনিত হইত—মনে হইত যেন সেই মাতৃবিয়োগ-বিধুর বালকের আকুল ক্রন্দনে জননী তার কোন প্রেতলোক হইতে অশরীরী ছায়ামূর্ত্তি ধরিয়া তার শয্যা-পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কি বলিয়া তাকে সান্ত্বনা দিব, কি করিয়া তার তৃষিত হৃদয় হইতে এই জ্বালাময়ী মাতৃস্মৃতি মুছিয়া দিব—তাহা ভাবিয়া না পাইয়া মূক হইয়া থাকিতাম।

গভীর রাত্রির এই শান্তি ভঙ্গ করায় ও দিবসে তার অস্বাভাবিক মৌনতায় বাড়ীর লোকের তার প্রতি করুণার পরিবর্ত্তে অনাদরের ভাব আসিয়া দেখা দিল। কত বড় দুঃখে আজ বালকের কলকণ্ঠ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে—কতখানি বেদনার অসহ্য উত্তাপে তার মাতৃহারা হৃদয় হইতে ক্রন্দনের উচ্ছ্বাস নৈশ অন্ধকারে বাহির হইয়া যায়, সংসারের স্বার্থপরতা তার কতটুকু আর হিসাব লইবে।

বাড়ীর পাশে নবাবী-আমলের একটা ভগ্ন অট্টালিকা ছিল। তার জীর্ণ প্রাচীরগাত্রে লতাগুল্মাদি দিয়া কাল তার নশ্বর গতি-চিহ্ন আঁকিয়া দিয়াছিল। দ্বিপ্রহরে সেই পুরাতন হর্ম্ম্যতলে দাঁড়াইয়া আমার মনে হইত ওই ভগ্ন ইষ্টকস্তূপে শতাব্দীর কত সুখ-দুঃখের অতীত কাহিনী প্রোথিত হইয়া আছে—মুসলমান আভিজাত্যের কত গৌরব তার মধ্যে আজ সমাধিস্থ। বড় বড় খিলান-করা প্রকোষ্ঠের শৈবাললিপ্ত দেওয়ালগুলিতে একটা বিষাদের ম্লানছায়া জমাট হইয়া থাকিত। ঘনসন্নিবিষ্ট আম্রবৃক্ষের নিবিড় বেষ্টনের অন্তরালে থাকিয়া সেই হৃতসৌন্দর্য্য ভগ্ন অট্টালিকার জীর্ণতার মধ্যে সর্ব্বদা একটা সহজ শান্তি ফুটিয়া থাকিত। বাড়ীতে যখন বিদেশ হইতে আত্মীয় স্বজন আসিত, পাঠের বিঘ্ন আশঙ্কা করিয়া আমি প্রায়ই এই নির্জ্জন পুরীর নিভৃত শান্তির মধ্যে আশ্রয় লইতাম। একটা ভাঙ্গা দুয়ারের জীর্ণ তক্তা পাতিয়া বই লইয়া বসিয়া পড়িতাম।

একদিন সেইখানে বসিয়া ছিলাম। আকাশটা সে দিন মেঘাচ্ছন্ন ছিল। তাই যেন সেই নিবিড় শান্তির ম্লান ছায়া বিষাদের ভারে গাঢ়তর হইয়া উঠিয়াছিল। চারিদিকে অবিচ্ছিন্ন নিস্তব্ধতা। শুধু সেই বিষাদলিপ্ত একটা দেওয়ালের ছিদ্রমধ্যে বাতাস প্রবেশ করিয়া করুণ আলাপনে কোন্ এক বিষাদ-কাহিনী গাহিতেছে। এমন সময়ে ধীরে মূর্ত্তিমান বিষাদেরই মত আসিয়া সে উপস্থিত হইল। নয়নে কখনও তার বালকসুলভ চাঞ্চল্য দেখি নাই। কিন্তু তার স্নিগ্ধ নীলিমায় এমন একটা শান্ত-সৌন্দর্য্য ফুটিয়া থাকিত, যে তাকে মনে-মনে ভাল না বাসিয়া পারিতাম না। গুচ্ছে গুচ্ছে কুঞ্চিত ঘনকৃষ্ণ অলক তার ক্ষুদ্র মুখখানিকে ঘিরিয়া ছিল। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মলিন ছায়াতলে সে মুখখানিকে বড় সুন্দর বলিয়া মনে হইল। স্নেহস্বরে বলিলাম, "দুখী, আমার পাশে এসে বস"। সে বসিল। একান্ত অনুগতেরই মত সে আমার কথা শুনিত। আমি নিবিষ্টমনে বই পড়িতে লাগিলাম ও মাঝে-মাঝে আড় চক্ষে তার দিকে চাহিতেছিলাম। দূরে মেঘম্লান আকাশের গায়ে একটা চিল ঘুরিয়া-ঘুরিয়া উড়িতেছিল। ভাঙ্গা দেওয়ালের ফাঁকের মধ্য দিয়া সে তাহাই একাগ্র মনে দেখিতেছিল। হঠাৎ আমার মুখের দিকে চাহিয়া অভিমানের সুরে সে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, কই?"—আমি একটু বিস্মিত হইলাম। মায়ের কথা ত সে আমাদের কাহারও কাছে জিজ্ঞাসা করিত না—দিবসে কখনও সে "মা" বলিয়া ডাকিত না। তবে আজ সহসা এ প্রশ্ন কেন? তবে কি রজনীর স্তব্ধ অন্ধকারে যে মাতৃস্মৃতি তার বালহৃদয়ে বেদনার উচ্ছ্বাস তুলিত—আজ কি এই বিষণ্ণ প্রকৃতির মৌন ছায়া তার মানস-নয়নের সম্মুখে সেই মাতৃমুখকে জাগাইয়া দিয়াছে। বলিলাম—"মা যে তোর বাড়ী গেছে।" অভিমানে ক্ষুদ্র অধর স্ফুরিত করিয়া কহিল "আমি মার কাছে যাব—" আমি আদর করিয়া

কহিলাম "আমি যে তোর মা, আমায় ফেলে কোথা যাবি?" দ্বিগুণ অভিমানে সে উত্তর করিল "না—তুমি মা নও—তুমি বাবু। আমায় কোলে করে তুমি মায়ের কাছে নিয়ে চল।" তার ক্ষুদ্র হাতখানি বক্ষের উপরে রাখিয়া কহিলাম, "এই দেখ, এইখানে তোমার মা লুকিয়ে আছে। এখানে বসে সে তোমার সব কথা শুনতে পাচ্চে, তুমি কাঁদ্‌লে সে কাঁদে, তুমি হাস্‌লে সে হাসে। লক্ষ্মীটি, তুমি আর তার জন্য কেঁদো না।" চক্ষে তার অশ্রু উদ্বেল হইয়া উঠিল, কিন্তু সে কাঁদিল না। কথাটিতে কতখানি সান্ত্বনার স্নিগ্ধ আশ্বাস নিহিত ছিল, সে যেন তাহা বুঝিল। ধীরে তার অলক-শোভিত ক্ষুদ্র মাথাটী আমার বক্ষের উপরে রাখিয়া মৃদুকণ্ঠে সে কহিল "তুমি মা"। দুই তিনটী তপ্ত অশ্রু আমার দেহ স্পর্শ করিল।—সে কি স্নেহের—না বেদনার! হায় হতভাগিনি, ধরিত্রীর ব্যথাভরা বুকে যে রিক্ততার মধ্যে এই প্রিয় প্রাণটীকে রাখিয়া গিয়াছিলি, তাই কি মিটাইবার জন্য মরণের অন্তরাল হইতে এই পঞ্চদশ-বর্ষীয় বালকের হৃদয়ে অলক্ষ্যে তোর ক্ষুধিত হৃদয়ের স্নেহধারা ঢালিয়া দিয়াছিস্। আবেগে তাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলাম, বুঝিলাম, পুরুষের মধ্যে যাহা পুরুষত্ব তার সবটুকুই পৌরুষ নয়—তার মধ্যে যে নারী আছে তার ব্যথা, তার ব্যাকুলতা, তার অধিকার কম নয়; এই নারীরই স্নেহ, কোমলতা বিশ্বের উপরে যাহা কল্যাণ স্পৃহা লইয়া ব্যাপ্ত হইয়া আছে, পৌরুষ অপেক্ষা তার শক্তি, তার মর্য্যাদা বড় অল্প নয়।

সে দিন রজনীতে সে আর 'মা মা' বলিয়া কাঁদিল না। মধ্য-রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় তার বিছানার দিকে চাহিয়া দেখিলাম—সে উঠিয়া বসিয়াছে। আমি ডাকিলাম —"দুখী!"—ব্যগ্র কণ্ঠে সে কহিয়া উঠিল "বাবু, মা"!—আমি বলিলাম "কেন?" সে মিনতি স্বরে বলিল, "তোমার কাছে যাব?"—বুঝিলাম কেন আজ আমার কাছে আসিবার জন্য তার এই ব্যাকুলতা। বলিলাম, "এস।" জানালার একটা উন্মুক্ত খড়খড়ির মধ্য দিয়া জ্যোৎস্নার রজত-রেখা আসিয়া পড়িয়াছিল। তারই অস্পষ্ট আলোক দেখিলাম, সে তাড়াতাড়ি নামিয়া আমার শয্যায় উঠিয়া বসিল। ধীরে তার মুখখানি আমার বক্ষের পাশে রাখিয়া সে কহিল "মা";—পাছে তার এই অদ্ভুত মাতৃ-সম্বোধন পাশের ঘর হইতে কেহ শুনিয়া ফেলে ও ইহাকে একটা পরিহাসের বিষয় করিয়া তোলে, এই ভাবিয়া আমি একটু লজ্জিত হইলাম। তার মাথায় হাত রাখিয়া কহিলাম, "দুখী, এখন ঘুমাও, রাত্তিরে কথা বল্‌তে নেই"। সে চুপ করিল। কিন্তু সেই প্রায়ান্ধকারে আমার মনে হইল—তার চক্ষু দুটী উন্মুক্ত হইয়া আছে। অতি সন্তর্পণে তার নিঃশ্বাস পড়িতেছিল—যেন কিসের একটা উৎকণ্ঠা তার ক্ষুদ্র বক্ষখানিকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল। বুঝিলাম আমার কাছে আসিয়া তার মাতৃস্নেহক্ষুধা মিটে নাই। তখন ধীরে তাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলাম ও তার সুকুমার গণ্ডে একটা চুম্বন রেখা আঁকিয়া দিয়া কহিলাম, "লক্ষ্মীটি, ঘুমাও,"—সে ঘুমাইয়া পড়িল। বক্ষের কাছে সেই নিদ্রিত নীচ জাতির ছেলেটির দিকে চাহিয়া আমার মনে হইল, নীচ বলিয়া যারা মানুষকে ঘৃণা করে, মানুষের ধর্ম্মকে তারা জানেনা;—অবস্থার প্রতিকূলতায় যারা পিছে পড়িয়া আছে, তুচ্ছ আত্মপরতার মোহে যারা তাদের অবজ্ঞা করে, তারা মূর্খ, তারা দুর্ব্বল—বাহিরের তারা ক্রীতদাস হইয়া আছে, অন্তরকে তারা চেনে নাই।

তার সহিত আমার এই ক্রমবর্দ্ধমান ঘনিষ্ঠতাকে বাড়ীর লোকে একটা অস্বস্তির চক্ষে দেখিতেছিল;—বুঝিলাম, তাদের মধ্যে ইহা লইয়া গোপনে একটা আলোচনা চলিতেছে। তথাপি সেই ক্ষুদ্র বালকের প্রতি আমার মমতার কিছুমাত্র হ্রাস হইল না, বরং উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল। সেও তার ক্ষুদ্র হৃদয়ের যতখানি ভালবাসা, তার সবটুকু ব্যাকুলতা দিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিতে লাগিল। দিবসে তার প্রতি কাজের ভিতরে আমারই স্মৃতির একটু অনুপ্রাণনা থাকিত বলিয়া মনে হইত। বৈকালে তাকে যে খাবার দেওয়া হইত, তার ভাল অংশটুকুই সে গোপনে আমার জন্য লুকাইয়া রাখিত। বিদ্যালয় হইতে ফিরিয়া আসিলে, সে আমার হাত ধরিয়া বসাইত ও তার বঞ্চিত খাদ্য আনিয়া আমার মুখে তুলিয়া দিত। একটা অহেতুকী তৃপ্তিতে তার সুন্দর মুখখানি ভরিয়া যাইত।

একদিন স্কুল হইতে আসিয়া দেখিলাম, আমার ঘরের দরজায় তালা দেওয়া—বন্ধ জানালার একটা উন্মুক্ত খড়খড়ির মধ্যে কার দুটী ব্যাগ্র চাহনি ফুটিয়া আছে। আমাকে দেখিয়াই সে অভিমানভরা সুরে কহিয়া উঠিল "খুলে দাও।"

"দিই" বলিয়া ভিতরে চাবী আনিতে গেলাম। শুনিলাম, "সাপেভরা ভাঙ্গা বাড়ীতে" একটা তক্তার উপরে একাকী বসিয়া থাকার জন্য, আজ তার এই শাস্তি। কিছু না বলিয়া তালা খুলিয়া ঘরে ঢুকিলাম। "মা" বলিয়া ছুটিয়া আসিয়া সে আমার হাঁটু জড়াইয়া ধরিল—তাকে কোলে তুলিয়া লইলাম। দুই হাতে আমার চিবুক ধরিয়া স্নেহমাখা কণ্ঠে সে কহিল, "আজ যে খাবার দেয় নি, তুমি কি খাবে?" বুঝিলাম তার বৈকালের খাবারও আজ কেহ দেয় নাই। ভিতরে গিয়া খাবার লইয়া আসিলাম। কিন্তু সে কিছুতেই খাইল না। আমার হাত হইতে পাত্র কাড়িয়া লইয়া সে আমাকেই খাওয়াইতে লাগিল। তার সব যত্ন, সব সেবা আমাকে দিয়াই সে তৃপ্ত—আমার তৃপ্তির কণাটিতেও সে ভাগ বসাইতে চাহে না। এই ক্ষুদ্র বালকের মনে এই দুর্জ্জয় স্নেহ-প্রবৃত্তি কে দিল? কে তার ক্ষুদ্র বক্ষখানির কাণায়-কাণায় অমৃত ঢালিয়া আমার তৃষিত হৃদয়ের কাছে ধরিয়া দিল—কে আমায় তা বলিয়া দিবে?

এইরূপে একটী স্বর্ণ-সূত্রে দুটী জীবনের গ্রন্থি বাঁধিয়া লইয়া কাল তার লীলাঞ্চিত গতিতে বহিয়া যাইতেছিল। এমন সময়ে একদিন আমার পিতার বদলির সংবাদ আসিল। বৈকালে জানালার ধারে বসিয়া আমি একখানি মাসিক পত্র পড়িতেছিলাম। বারান্দার উপরে বসিয়া আমার একখানা বই খুলিয়া সে ছবি দেখিতেছিল। কিছু দূরে বসিয়া আমার দিদি সেলাই করিতেছিল। হঠাৎ দিদি তাকে জিজ্ঞাসা করিল, "দুখী, আমাদের সঙ্গে কৃষ্ণনগরে যাবি?" বই হইতে চক্ষু না তুলিয়াই সে কহিল, "না।" "তবে এখানে থাকবি?" এবার সে চাহিল—বলিল, "না।" "তবে কোথা যাবি?" ঊর্দ্ধে অনন্ত নীলিমার দিকে তার নীল নয়ন দুটী তুলিয়া, একটু মৃদু হাসিয়া সে কহিল, "ওইখানে।" দূরে আকাশের গায়ে একখানা মেঘ অস্তগামী সূর্য্যের বিদায় চুম্বনে আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছিল। তারই লোহিত বর্ণরাগ তার মুখখানিতে পড়িয়া একটা অমঙ্গল ছায়াকে দীপ্ত করিয়া দিল। একটা অজানিত আশঙ্কায় আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল। দিদিরও মুখে একটা ভীত ভাব দেখিলাম। আমার দিকে একবার চাহিয়া, সে কথাটী চাপা দিল—বলিল, "দুখী, তোর জন্য একটা জামা তৈয়ারী করেছি, চল, পরিয়ে দেব।" এই বলিয়া তার হাত ধরিয়া লইয়া গেল। সে দিন আর মাঠে খেলিতে গেলাম না। স্তব্ধ হইয়া সেইখানেই বসিয়া রহিলাম। ক্রমে গেরুয়া বসনে সন্ধ্যা নামিয়া আসিল। বিষাদের মহাশান্তি ক্লান্ত গায়ে সান্ত্বনা-স্পর্শ বুলাইয়া দিল। কিন্তু আমার শঙ্কিত হৃদয় যে বিষাদ-ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল, সন্ধ্যার সে স্নিগ্ধ স্পর্শে তাহা অপসারিত হইল না।

একদিন সকালবেলায় মা আসিয়া বলিলেন "ভাঙ্গা বাড়ীর দক্ষিণের আমগাছটায় অনেক গুটী পড়েছে; যা, দুখীকে নিয়ে কয়েকটা পেড়ে নিয়ে আয়।" তাকে লইয়া আমগাছতলায় উপস্থিত হইলাম। তখনও কুয়াসায় অবগুণ্ঠিত ধরণীর সজল মুখখানি অরুণ চুম্বনে হাস্যোজ্জ্বল হইয়া উঠে নাই। প্রকৃতির শ্যাম অঞ্চল ঘিরিয়া একটা বিষাদের গাঢ় ছায়া জমাট বাঁধিয়াছিল। গাছে উঠিয়া আমি আম পাড়িতে লাগিলাম। নীচে সযত্নে সে তাহা কুড়াইতেছিল! আজ প্রভাতে তার ক্ষুদ্র দেহের লীলায়িত গতিভঙ্গিতে কি জানি কেন, একটা অমঙ্গলের ছায়া খেলা করিতেছিল। এক সঙ্গে অনেকগুলি আম্রগুটিকা ফেলিয়া দিয়া আমি ঘন পল্লবশাখে বসিয়া তাকে দেখিতেছিলাম। একটা ভবিষ্য অকল্যাণের আশঙ্কা আমার ধমনীতে দ্রুততালে স্পন্দন তুলিয়াছিল। একটা গুটি কিছু দূরে ভগ্ন ইষ্টক-স্তূপের পাশে গিয়া পড়িয়াছিল। সে তাহা কুড়াইতে গেল। হঠাৎ "মা" বলিয়া চীৎকার করিয়া সে বসিয়া পড়িল। সে করুণ ধ্বনি আমার দ্রুতকম্পিত হৃদয়ে শেলের মত আসিয়া বাজিল। ক্ষিপ্রহস্তে বৃক্ষ শাখা ধরিয়া নীচে লাফাইয়া পড়িলাম। ছুটিয়া গিয়া তার অবলুণ্ঠিত দেহখানি কোলে তুলিয়া লইলাম। আমার বুকের উপরে, ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া সে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। আমার দিকে বেদনায় পাণ্ডুর মুখখানি তুলিয়া জড়িত কণ্ঠে সে কহিল "মা, চল বাড়ী যাই।" দ্রুতপদে গৃহপ্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মাকে ডাকিয়া বলিলাম "মা, দুখী আজ কেমন কচ্চে।" সকলে ছুটিয়া আসিল। বারান্দায় তারই ক্ষুদ্র বিছানাখানি পাতিয়া তাকে শোয়াইলাম। যন্ত্রণায় সে অস্থির হইয়া পড়িল। সকলে বলিতে লাগিল সাপে কামড়াইয়াছে। দেহের কোনও অংশে দংশনের চিহ্ন না দেখিয়া কি উপায় করিব ভাবিয়া পাইলাম না। একজন তাড়াতাড়ি বৈদ্য

আনিতে গেল। মুখ দিয়া তখন তার ফেণা উঠিতেছিল। বুঝিলাম খুব বিষাক্ত সর্প তাকে দংশন করিয়াছে, নতুবা এত শীঘ্র এইরূপ তীব্র প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয় না। মরণোন্মুখ সেই লুণ্ঠিত প্রিয় দেহখানির পাশে বসিয়া ডাকিলাম, "দুখী।" জ্যোতিঃহীন আঁখিতারা দুটী তুলিয়া সে একবার চাহিল,—আবার তখনি মুদ্রিত করিয়া লইল;—আমায় সে চিনিতে পারিল না। হায় নিষ্ঠুর নিয়তি যে তার ক্ষুদ্র হৃদয়ের সব ভালবাসা আমাকে অর্পণ করিয়া তার অভিশপ্ত ক্ষুদ্র জীবনের সবটুকু তৃপ্তি আহরণ করিত—আমাকে তার মায়ের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভিখারীর মত যে তার মাতৃস্নেহ-ক্ষুধা মিটাইত—ধরণীর বক্ষ হইতে শেষ বিদায়-ক্ষণে সে আজ আমাকে চিনিল না!

অন্তিম সময় উপস্থিত হইয়াছে জানিয়া তুলসীতলায় তাকে লওয়া হইল। বৈদ্য আসিবার পূর্ব্বেই তার শেষ নিঃশ্বাস বাতাসে মিশিয়া গেল। আর সে তরুণ কণ্ঠ মা বলিয়া ডাকিল না। আর সে নীল নয়নে স্নেহের হাসি ফুটিল না। উষার স্বর্ণরাগে যে কলিটি ফুটিয়াছিল—প্রভাত না হইতে যার কোমল পেলবে দুঃখের নিষ্ঠুর আঘাত লাগিয়াছিল, প্রভাতেরই আজ রক্তহাস্যে সে অকালে ঝরিয়া পড়িল। হিন্দুর এই তুলসীতলে যুগ হইতে যুগান্তর কত-প্রাণ অতীতের পথে তীর্থ যাত্রা করিয়াছে—জলভরা কত আঁখি কত অজানিতপথ যাত্রীকে এইস্থানে শোক অশ্রু উপহারে বিদায় দিয়াছে—আজ প্রভাতে, কুয়াসার অবগুণ্ঠনতলে, এই তুলসীতলায় একটী অভিশপ্ত ক্ষুদ্র জীবনের উপরে ভবিতব্য যে মৃত্যুর অন্ধ যবনিকা টানিয়া দিল, বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চের এই বিয়োগান্ত দৃশ্যটী কাল তার নিত্য বিস্মৃতির মধ্যে বহন করিবে না জানি, কিন্তু আজও আমার মর্ম্ম-বীণার সকল তন্ত্রীতে এই স্মৃতি একটী করুণ সুরে গাঁথা আছে—আজও আমার নিশীথ-স্বপ্নে কার তরুণ কণ্ঠের সুমধুর মাতৃ-সম্বোধন অতীতের একটি বিয়োগ-বেদনাকে প্রদীপ্ত করিয়া দেয়।

রামাশ্রম

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ]

['স্বর্গাশ্রমে'র অপর পারে, লছমনঝোলার নিকট এই সুন্দর পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠিত। একেবারে পাহাড়ের বুকে। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের একজন হিন্দু জজ তাঁহার গুরুদেবের নামে এই পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইহাতে সাধারণের পাঠের জন্য সংস্কৃত ও ইংরাজী অনেকগুলি পুস্তক আছে।]

পাহাড় চিরে　　পুস্তকালয়
করলে হেতা তৈরি কে?
কাশ্মীরি পাড়　　বসিয়ে দিলে
বনবাসীর গৈরিকে।

নীবার ভূমে　　বাণীর মরাল
মগ্ন হেতা বিশ্রামে,
বাঁধলো মুখর ময়না বাসা
'মৌনী বাবা'র আশ্রমে
সত্য এ কি 'কেদারনাথে'
তুষার 'পরে পদ্মফুল,
আকাশ দেউল নামিয়ে এনে
করলে কে হে বদ্ধমূল?
কে জোটালে বাণীর বীণা
একতারারি সঙ্গতে
'আট্‌কা ভোগের' ভাণ্ডারা কে
দিলে 'নাগা'র পংগতে।

খাজা মাইনুদ্দিণ মোহাম্মদ চিস্তি (১)

[শ্রীমৌলবি আস্‌মত আলি নসিরাবাদী]

সত্যবাদিগণের মধ্যে সকলের অগ্রগণ্য খাজা মাইনুদ্দিণ মোহাম্মদ চিস্তি সাহেব ভারতীয় তাপসকুলের শিরোমণি ছিলেন। তিনি মিজিস্তান শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং খোরাসানে প্রতিপালিত হন। তাঁহার পিতা গিয়াসুদ্দিণ হাসাণ অত্যন্ত সঙ্গতিপন্ন ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন। পিতার মৃত্যুকালে খাজা মাইনুদ্দিণ চিস্তি সাহেবের বয়স ছিল পনর বৎসর। পৈতৃক উত্তরাধিকার-সূত্রে তিনি একটী রমণীয় উদ্যান এবং একটী যাঁতা প্রাপ্ত হন।

তাঁহার আবাসস্থানের অনতিদূরে ইব্রাহিম কন্দুজি নামক এক জন মজ্জুব (উন্মাদ দরবেশ) ছিলেন। একদা খাজা সাহেব বৃক্ষে জল সেচন করিবার সময় সেই ভাবোন্মত্ত মহাপুরুষ তাঁহার উদ্যানে আসিয়া উপস্থিত হন। যখন খাজা সাহেবের দৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হইল, তখনি তিনি দৌড়িয়া গিয়া, সসম্মানে তাঁহার হস্ত চুম্বন করতঃ, এক বৃক্ষতলে বসাইয়া, একটী আঙ্গুরের গুচ্ছ তাঁহার সম্মুখে রাখিলেন। তিনি স্বীয় স্কন্ধাভার (থলি) হইতে কাঞ্জারার খোসা বাহির করিয়া চর্ব্বন করতঃ তাহা খাজা সাহেবকে খাইতে দিলেন। ইহা ভক্ষণমাত্রই খাজা সাহেবের মনের কবাট খুলিয়া গেল,—অন্তর দিব্য জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল। এই ঘটনা হইতেই তিনি বিষয়-বাসনা ছাড়িয়া মুক্ত হইয়া পড়িলেন; এবং সমস্ত ধন সম্পদ দীন-দুঃখীদিগকে দান করিয়া ভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

কতক দিন তিনি সমরকন্দ ও বোখারায় থাকিয়া কোরাণ শরীফ কণ্ঠস্থ করিবার পর, বিদ্যাশিক্ষায় মনোনিবেশ করিলেন। বিদ্যালাভের পর তিনি এরাক প্রদেশাভিমুখে গমন করেন।

যখন তিনি নিশাপুর অঞ্চলের কস্‌বায়ে হারুণীতে উপস্থিত হন, তখন শেখ উসমাণ হারুণী সাহেব সর্ব্বাগ্রগণ্য মহাপুরুষ (পীর) ছিলেন। খাজা সাহেব তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া আড়াই বৎসরকাল তৎসহবাসে কাল-যাপন করিয়া গভীর তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন। (২)

খাজা সাহেব সেখ হারুণী সাহেবের নিকট হইতে খেলাফত প্রাপ্ত হইয়া, বাগ্দাদাভিমুখে গমন করিয়া কস্‌বায়ে সাঞ্জারে পঁহুছিলেন। জায়েল কস্‌বা যেমন রমণীয় ও পবিত্র ভূমি, তেমনি দীক্ষালাভের উপযুক্ত স্থান। ইহা বাগ্দাদ হইতে ৭ দিবসের পথ দূরবর্ত্তী জুদি পর্ব্বতের তল-দেশে অবস্থিত। ইহার জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। মহা জল-প্লাবনের সময় হজরত নূহের নৌকা এইস্থানে রক্ষা পাইয়া-ছিল। এই স্থানই সেখ মহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী (কং) সাহেবের পবিত্র জন্মস্থান। নজমদ্দিণ কোব্রা সাহেব যখন তথায় পদার্পণ করেন, তখন খাজা সাহেব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সাঞ্জারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তথায় তাঁহার দর্শন লাভ না হওয়ায়, সেখান হইতে প্রত্যা-বর্ত্তন করতঃ বাগ্দাদে উপস্থিত হইলেন। প্রাথমিক শরীফ সেখ আউহাদুদ্দিণ কেরমানী সাহেব খাজা সাহেবের দর্শনে তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়েন এবং

(১) তয়ারিখে ফেরেস্তা হইতে অনূদিত।

(২) শেখ উসমাণ হারুণী সাহেব হাজী শরীফ জেন্দানির মুরিদ ছিলেন। জেন্দানী সাহেব খাজা মৌদুদ চিস্তির, খাজা মৌদুদ চিস্তি সাহেব খাজা নাসিরুদ্দিণ চিস্তির, খাজা নাসিরুদ্দিণ সাহেব ইউছুফ চিস্তির, ইউছুফ চিস্তি সাহেব সাহেব খাজা নাসেরুদ্দিণ আবু মোহাম্মদ চিস্তির, আবু মোহাম্মদ সাহেব খাজা নাসেরুদ্দিণ আহ্‌মদ চিস্তির, আহমদ চিস্তি সাহেব খাজা ইসহাক শামী প্রকাশ বচিস্তি সাহেবের, ইসহাকশামী সাহেব খাজা মোমসাদ-দীনওয়ারি সাহেবের, দীনওয়ারি সাহেব খাজা হাবিবারে বসরি সাহেবের, বসরি সাহেব খাজা হোজায়কারে মুরাইশী সাহেবের, মুরাইশী সাহেব সোলতান ইব্রাহিম আদহাম সাহেবের, আদ্‌হাম সাহেব খাজা ফাজেল আইয়াজ সাহেবের, আইয়াজ সাহেব খাজা হাবিব আজামীর সাহেবের, হাবিব সাহেব খাজা হাসাণ বসরী সাহেবের হাসাণ বসরী সাহেব আমিরুল মোমেণিণ ইমামুল মুত্তাকিন বীর কেশরী হজরত আলী (রাং) সাহেবের, এবং হজরত আলী সাহেব রসুলে মকবুল সাল্লে-আলায় হো সালামের মুরিদ ছিলেন।

তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্ব্বক দীক্ষা লাভ করেন। পীর-শ্রেষ্ঠ সেখ সাহাবুদ্দিন সহরওয়ারদ্দিও প্রথমাবস্থায় খাজা সাহেবের সংসর্গে গভীর তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।

ইহার কিছুকাল পরে খাজা সাহেব বাগদাদ হইতে হাম্‌দানে আসিলেন। তিনি সেখ ইউসুফ হামদানী সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তেব্রিজাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। শেখ জালালুদ্দিণ তিব্রিজির পীর আবুসাইদ তিব্রিজি সাহেবকে প্রাপ্ত হইয়া খাজা সাহেব কিছুকাল তাঁহার সংসর্গে রহিয়া গেলেন। (৩)

শেখ ফরিদউদ্দিণ গঞ্জে শকর খাজা কুতুবউদ্দিণ বখ্‌তিয়ার কাফী সাহেব হইতে বর্ণনা করেন, "খাজা মাইনুদ্দিণ চিস্তি সাহেব প্রথম অবস্থায় এরূপ কঠোর উপবাসব্রত করিতেন যে, সাতদিবস রোজা রাখিয়া ৫ মেস্‌কাল হইতে কম ওজনের একটী রুটি পাণিতে ভিজাইয়া এফ্‌তার করিতেন।"

নিজামুদ্দিণ আউলিয়া বলেন যে, "খাজা মাইনুদ্দিণ চিস্তি সাহেবের পরিধানে সামান্য খেরকা ছিল, কোন স্থান ছিঁড়িয়া গেলে তাহা নিজ হাতেই শেলাই করিয়া লইতেন। বগলের দিকে ছিন্ন হইলে, যে কোনরূপ কাপড় পাইতেন, তদ্দারা ছিন্নাংশ তালি দিতেন।"

খাজা সাহেব যখন তেব্রিজ হইতে ইস্পাহানে উপস্থিত হন, তখন শেখ মোহাম্মদ ইস্পেহানী সাহেব তাঁহার সংসর্গে কালযাপন করিতে লাগিলেন। সেই সময় খাজা কুতুবউদ্দিণ বখ্‌তিয়ার কাফী সাহেব ইস্পাহানে ছিলেন। তিনি মোহাম্মদ ইস্পেহানীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবেন মনন করিয়াছিলেন; কিন্তু যখন খাজা সাহেবের দর্শন পাইলেন, তখন তিনি ইস্পেহানীর নিকট মুরিদ হওয়ার সঙ্কল্প পরিত্যাগপূর্ব্বক খাজা সাহেবের নিকট মুরিদ হইলেন। খাজা সাহেব উক্ত খেরকা বখ্‌তিয়ার কাফী সাহেবকে দান করিলেন।

কুতুবউদ্দিণ সাহেবের অন্তিম সময়ে তিনি সেই খেরকা ফরিদুদ্দিণ গঞ্জে শকর সাহেবকে, ফরিদুদ্দিণ সাহেব নিজামুদ্দিণ আউলিয়া সাহেবকে ও নিজামুদ্দিণ আউলিয়া সাহেব নাসিরুদ্দিণ চেরাগ দেহেলী সাহেবকে দান করিয়াছিলেন।

খাজা সাহেব হাজকানে দুই বৎসর অবস্থান করিবার পর আস্তারাবাদে চলিয়া যান। তথায় শেখ নাসেরুদ্দিণ আস্তারাবাদী সাহেবের সংসর্গে সম্মানিত হন। তিনি একজন বিশিষ্ট মহাপুরুষ ছিলেন। তখন তাঁহার বয়স ১২৭ বৎসর উত্তীর্ণ হইতেছিল। তিনি তায়ফূ এবং বায়জিদ বুস্তামী—এই দুই তাপসপ্রবর হইতে দীক্ষিত ছিলেন। খাজা সাহেব কতকদিন তাঁহার সহবাসে থাকিয়া অসীম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন। অতঃপর তিনি হারির দিকে প্রস্থান করেন। তাঁহার এমন অভ্যাস ছিল যে, তিনি এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে বহুদিন অবস্থান করিতেন না। দিবাভাগে ভ্রমণ করিতেন, এবং রাত্রিতে প্রায়ই খাজা আবদুল্লা আউখারির মনোনীত স্থানে রাত্রি যাপন করিতেন। একজন দরবেশের অধিক সঙ্গী করিতেন না।

তিনি এশার নামাজের সময় যে অজু করিতেন, তাহাতেই সারানিশি উপাসনা-আরাধনা করিয়া সেই অজু-দ্বারা প্রাভাতিক উপাসনা শেষ করিতেন।

যখন হেরাত প্রদেশের চতুর্দ্দিকে তাঁহার নাম রাষ্ট্র হইয়া পড়িল, তখন বহু লোক-সমাগম হইতে আরম্ভ হইল। (খাজা সাহেব নির্জ্জনতাপ্রিয় ছিলেন, জনসমাগম তিনি ভালবাসিতেন না।) তাই তিনি সবজওয়ারের দিকে চলিয়া গেলেন।

তথায় একজন শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার নাম ছিল এয়াদ-গার-মোহাম্মদ। তিনি অত্যন্ত বদ্‌মিজাজি ও মন্দ প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি রাফিজি সম্প্রদায়ভুক্ত থাকা বশতঃ, পয়গাম্বর (দঃ) সাহেবের সঙ্গীবর্গকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন; এমন কি, যাহাদের আবুবাকের, উমর নাম থাকিত তাহাদের প্রতি কঠোর ব্যবহার করিতেন; এমন কি, তাঁহাদের বিনাশ সাধনেও প্রয়াস পাইতেন।

সহরতলিতে উক্ত শাসনকর্ত্তার একটী রমণীয় উদ্যান ছিল। উহার মধ্যস্থলে অতি নির্ম্মল একটী হাউস ছিল। খাজা সাহেব তাহার পার্শ্বে অবতরণ করিলেন এবং গোসল করিয়া অদ্বিতীয় খোদাতালার নিকট দু'রাকাত নামাজ পড়িয়া পবিত্র মহাগ্রন্থ কোরাণ পাঠে নিমগ্ন হইলেন।

সেই দিবসই উক্ত শাসনকর্ত্তা উদ্যানে আসিবেন সংবাদ

---

(৩) সেখ নিজামুদ্দিণ আউলিয়া সাহেব বর্ণনা করিয়াছেন, "শেখ আবু সাইদ তিব্রিজ সাহেব শ্রেষ্ঠতম পীর ছিলেন। শেখ জালালুদ্দিণ তিব্রিজির মত পূর্ণ দীক্ষা প্রাপ্ত ৭০ জন মুরিদ রাখিতেন।"

আসিল। খাজা সাহেবের সহিত যে দরবেশ ছিলেন, তিনি ভীত হইয়া কহিতে লাগিলেন, "হজরত, উঠুন,—আমরা এ উদ্যান হইতে বাহিরে চলিয়া যাই।" খাজা সাহেব তাঁহার ব্যাকুলতা দর্শনে মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "যদি ভয় পাইয়া থাক, তবে ঐ বৃক্ষতলে গিয়া বসিয়া থাক।" দরবেশ দ্রুত-পদে তথায় গিয়া উপবেশন করিলেন। এমন সময় বাগানা-ধিপতি এয়াদ-গার-মোহাম্মদের পার্শ্বচরগণ তথায় উপস্থিত হইয়া হাউসের পার্শ্বে গালিচা বিছাইল। কিন্তু তাহারা খাজা সাহেবের প্রতি কোনরূপ সম্মান প্রদর্শন না করিয়া অবহেলার সহিত বলিল, "এখান হইতে উঠিয়া যাও।" তখন এয়াদ-গার-মোহাম্মদও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। খাজা সাহেবকে হাউসের পার্শ্বে দেখিয়া স্বীয় ভৃত্যগণকে গর্জ্জিয়া হুকুম করিলেন, "তোমরা এ দরবেশকে এখান হইতে তাড়াও নাই কেন?" এতচ্ছ্রবণে খাজা সাহেব মস্তক উত্তোলন করিয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবা-মাত্র তিনি থরথর করিয়া কাঁপিতে-কাঁপিতে অজ্ঞান হইয়া ভূপতিত হইলেন। ভৃত্যগণ তাঁহার শোচনীয় অবস্থা দর্শনে খাজা সাহেবের সম্মুখে ভূ-নতজানু হইয়া করযোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। খাজা সাহেব সেই বৃক্ষতলস্থ ভীরু দরবেশকে ডাকিয়া কহিলেন, "এই হাউস হইতে কিঞ্চিৎ পাণি উঠাইয়া "বিস্‌মিল্লা" পড়িয়া ইহার নাকে মুখে ছিটা-ইয়া দাও।" দরবেশ তাহা করিবামাত্রই বাগানাধিপতির চৈতন্য লাভ হইল। তিনি খাজা সাহেবের চরণতলে পতিত হইয়া নিবেদন করিলেন, "হজরত, আমি সমস্ত পাপকার্য্য হইতে বিরত হইয়া তোবাতল্লছোল করিলাম। আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।" খাজা সাহেব দয়াপরবশ হইয়া তাঁহার মাথা উঠাইলেন, কহিলেন, "হজরত রসুলের (দং) বংশধরগণের মহব্বতের দাবি দিয়া তাঁহাদিগের পদানুসরণ না করিলে তাহার কোন মূল্য নাই।" এই বলিয়া খাজা সাহেব ইমামগণের প্রশংসা আরম্ভ করিলেন। উদ্যানাধি-পতি ও তাঁহার সঙ্গীবর্গ ইহা শ্রবণ করিতে-করিতে মুগ্ধ হইয়া গেলেন এবং ক্রন্দন করিতে-করিতে সকলেই পূর্ব্ব-কৃত পাপ হইতে তোবা করিয়া প্রকৃত মুসলমান হইলেন। তৎপর এয়াদ-গার-মোহাম্মদ দুইরাকাত নামাজ আদায় করিয়া খাজা সাহেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি খাজা সাহেবকে দান করিলেন। কিন্তু খাজা সাহেব তাহা গ্রহণ করিলেন না। তিনি বলিলেন, "তুমি যাহা অপর হইতে জুলুম বা বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছ, তাহা তাহার মালিকগণকে প্রত্যর্পণ কর। তাহা হইলে রোজকেয়ামতে কেহই তোমার অঞ্চল স্পর্শ করিতে পারিবে না।" এয়াদ-গার-মোহাম্মদ খাজা সাহেবের আদেশ পালন করিলেন। যাহা অবশিষ্ট রহিল, তাহাও দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরণ করিলেন। ইহা ভিন্ন আপন ক্রীতদাসগণকে মুক্তিদান করিলেন; এবং স্বীয় সহধর্ম্মিণীকেও তালাক দিয়া খাজা সাহেবের সঙ্গী হইয়া হেসারে-সাদমান্দ পর্য্যন্ত সহযাত্রী হইলেন।

যখন এয়াদ-গার-মোহাম্মদ সাহেব তত্ত্বজ্ঞান লাভ করি-লেন, তখন খাজা সাহেব হেসারে-সাদমান্দ অঞ্চল তাঁহার তত্ত্বাবধানে রাখিয়া বল্‌খে চলিয়া গেলেন। তথায় শেখ আহমদ খজ্‌রোবিয়া সাহেবের বাড়ীতে কতকদিন অবস্থান করিলেন।

সেই সময়ে মৌলানা জিয়াউদ্দিণ হেকিম নামক একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তিনি বিজ্ঞান শাস্ত্রে মহা পণ্ডিত ছিলেন। তছ্‌উফ্‌-শাস্ত্রে তাঁহার বিশ্বাস ছিল না। তিনি স্বীয় শিষ্যগণকে বলিতেন, জরাক্রান্ত ও বুদ্ধিহীন লোকেরাই তছ্‌উফ্‌ মুখে আনে। বল্‌খ অঞ্চলের কোন একটী গ্রামে তাঁহার একটী মাদ্রাসা ও একটি উদ্যান ছিল। তথায় তিনি বিজ্ঞান-শিক্ষা দিতেন।

সর্ব্বদা দুই-এক মুঠা তীর, কামান, চক্‌চকে পাথর ও নিমকদান সঙ্গে রাখা খাজা সাহেবের অভ্যাস ছিল। কদাচিৎ যদি লোকালয় হইতে দূরে অবস্থিতি করিতে হয়, কিম্বা কোন কিছু শিকার করিয়া নিঃসন্দেহে আহার করিতে হয়, সেই জন্যই তিনি এরূপ করিতেন।

মৌলানা জিয়াউদ্দিণ সাহেবের গ্রামে হঠাৎ খাজা সাহেব উপস্থিত হইলে, সেই দিন তিনি তীর দিয়া একটী কুলান্দ পাখী শিকার করিয়া কোন এক বৃক্ষ-নিম্নে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। সঙ্গীয় খাদেমকে পাখিটি কাবাব করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিয়া তিনি ধ্যানমগ্ন হইলেন। ঘটনাক্রমে সেই বৈজ্ঞানিক তথায় উপস্থিত হইয়া ধ্যানাবিষ্ট খাজা সাহেবকে দেখিতে পাইলেন। কিছুকাল অপেক্ষা করিবার পর, খাজা সাহেবের ধ্যানভঙ্গ হইলে, তিনি তাঁহাকে সেলাম করিয়া বসিয়া গেলেন। ইত্যবসরে খাদেম কাবাব

আনিয়া খাজা সাহেবের সম্মুখে স্থাপন করিল। খাজা সাহেব বিসমিল্লা বলিয়া ঐ কাবাবের কতকঅংশ পৃথক করিয়া বৈজ্ঞানিকের সম্মুখে দিয়া, অপর অংশ নিজে লইলেন। বৈজ্ঞানিক কাবাব ভক্ষণ মাত্রেই বিজ্ঞান-শাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক মরিচা তাঁহার বক্ষঃস্থল হইতে অপসারিত হইল। তাহাতেই তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। খাজা সাহেব তাঁহার পবিত্র মুখের চর্ব্বিত গ্রাস মূর্চ্ছিত বৈজ্ঞানিকের মুখে দেওয়া মাত্র তাঁহার চৈতন্য-সঞ্চার হইল। সেই সময়ে তিনি তাঁহার সমুদয় বৈজ্ঞানিক পুস্তকাদি পাণিতে নিক্ষেপ করিয়া, শিষ্যগণসহ খাজা সাহেবের নিকট তোবা করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

খাজা সাহেবের অলৌকিকতার কথা সেই অঞ্চলের চারিদিকে অতিমাত্রায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য বহু লোক দলে-দলে আগমন করিতে লাগিল। তাই খাজা সাহেব মৌলানা জিয়াউদ্দিণ সাহেবকে শিক্ষা-দীক্ষা দিবার জন্য খলিফা নিযুক্ত করিয়া গজনী চলিয়া গেলেন। তথায় নিজামুদ্দিণ আবুলমোয়াইয়াদের পীর তাপসপ্রবর আবদুল ওয়াহেদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া লাহোরে আসিলেন। তৎপরে তিনি দিল্লীতে আগমন করেন। এখানেও অত্যন্ত লোক-সমাগম হইতে লাগিল। তজ্জন্য তিনি আজমীর শরীফের দিকে যাত্রা করিলেন। কারণ বহু জনতা তিনি আদৌ পছন্দ করিতেন না। ৫৬১ হিঃ ১০ই মহরম তিনি আজমীরে উপস্থিত হইলেন।

সিয়ামতাবলম্বী হাসালমস্‌হাদী প্রকাশ জঙ্গে সওয়ার অত্যন্ত ধার্ম্মিক ও বিনয়ী ছিলেন। সুলতান কুতুবউদ্দিণ এরাক তাঁহাকে আজমীরের দারুগা করিয়াছিলেন। তিনি খাজা সাহেবকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিলেন। তিনিও এল্‌ম তাছুউফ্ ও দরবেশী শাস্ত্রে পূর্ণ জ্ঞান রাখিতেন। তাই খাজা সাহেবের সংসর্গে বাস করা যৎপরোনাস্তি সৌভাগ্য মনে করিতেন। তিনি প্রায়ই খাজা সাহেবের দরবারে উপস্থিত থাকিতেন। আজমীরের অনেক বিধর্ম্মী খাজা সাহেবের পবিত্র শ্বাস-প্রশ্বাসের বরকতে সত্য সনাতন ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। অপরন্তু, যাহারা ইস্‌লাম গ্রহণ করিল না, তাহারাও খাজা সাহেবকে আন্তরিক ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে লাগিল। ইহাতে অসংখ্য উপঢৌকনাদি তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল।

দিল্লীর পাঠান সম্রাট আমসুদ্দিণ আল্‌তামাসের রাজত্ব-কালে খাজা সাহেব স্বীয় মুরিদ কুতুবউদ্দিণ বখ্‌তিয়ার কাকী সাহেবকে দেখিবার জন্য দুইবার দিল্লীতে আসিয়াছিলেন। দ্বিতীয়বার তথা হইতে প্রত্যাগমন করিবার পর তিনি সংসারী হইলেন। তাহার বিবরণ এইরূপ—

সৈয়দ হোসাইন মাসহাদির চাচা সৈয়দ ওয়াজিহ্‌দ্দিণ মাসহাদী ওরফে—জঙ্গে সওয়ার আজমীরের দারুগা ছিলেন। তাঁহার দুহিতা অতিশয় রূপ-লাবণ্যবতী ও পরম ধার্ম্মিকা ছিলেন। দারুগা বয়স্কা কন্যাকে কোন এক সদ্বংশজাত পাত্রে সমর্পণ করিবার জন্য চিন্তিত থাকিতেন। এমতাবস্থায় এক রজনীতে তিনি হজরত ইমাম হাম্মাম জাফর সাদেককে (রাং) স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন। তিনি বলিলেন, "হে আমার প্রিয় পুত্র ওয়াজিহ্‌দ্দিণ, হজরত রসুলের (দং) ইহাই ঈঙ্গিত যে, তুমি এই বালিকাকে খাজা মাইনুদ্দিণ চিস্তির সহিত উদ্‌বাহ-সূত্রে আবদ্ধ কর। কারণ সে খোদাতালার অত্যন্ত প্রিয় এবং পায়গাম্বর সাহেবের খান্দানের (বংশের) একান্ত অনুরাগিনী।"

সৈয়দ ওয়াজিহ্‌দ্দিণ খাজা সাহেবকে এ সংবাদ জ্ঞাপন করিলে, তিনি উত্তর করিলেন, "যখন হজরত (দং) ও ইমাম হাম্মাম সাহেবের ঈঙ্গিত, তখন ইহা আমাকে পালন করিতে হইবে; ইহা ভিন্ন অন্য উপায় দেখি না।" তৎপরে হজরতের শরিয়ত মত খাজা সাহেব উক্ত বিদুষী ললনাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার গর্ভে কয়েকটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। খাজা সাহেব এ বিবাহের সাত বৎসর পরে ৬৩৩ হিঃ ৬ই রজব পবিত্র আজমীর শরীফে ইহলীলা সম্বরণ করিয়া পবিত্র ধামে গমন করিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ছিল ৯৭ বৎসর।

তাঁহার মৃত্যুর পর ভারতের সম্রাটগণ সকলেই তাঁহার পবিত্র মাজার শরীফে বরকত প্রাপ্তির আশায় উপঢৌকন পাঠাইতেন। বিশেষতঃ সর্ব্বজনপ্রিয় দেশ প্রসিদ্ধ সম্রাট জালালুদ্দিণ মোহাম্মদ আকবর আপন রাজত্বকালে প্রতি বৎসরই পদব্রজে খাজা সাহেব ও হাসান মাস্‌হাদী সাহেব উভয়ের মাজার জেয়ারত করিবার জন্য আজমীর শরীফে যাইতেন। তিনি অন্যান্য সকলের অপেক্ষা খাজা সাহেবের প্রতি অত্যধিক ভক্তি ও বিশ্বাস রাখিতেন।

হাজী মোহাম্মদ কান্দারী সাহেব আপন ইতিহাসে

লিখিয়াছেন যে, খাজা সাহেবের পীর শেখ উস্‌মান হারুণী সাহেব সম্রাট সামসুদ্দিণ মোহম্মদ আলতামাসের রাজত্বকালে দিল্লীতে আগমন করিয়াছিলেন। সম্রাট তাঁহার মুরিদ ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত আদর অভ্যর্থনা করিতে তিলমাত্রও ক্রটী করিতেন না। তৎকালে খাজা সাহেবও আজমীর শরীফে বাস করিতেন। এমতাবস্থায় ভারতে তাঁহাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হইয়াছিল কি না তাহা জানা যায় না। শেখ উস্‌মান হারুণী সাহেব হইতে অনেক অলৌকিক কাণ্ড প্রকাশ পাইত। নিম্নলিখিত বিবরণটিও তাহাদের অন্যতম।

খাজা সাহেব যখন তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া বাগদাদ যাত্রা করেন, তখন হারুণী সাহেব তাঁহার বিরহে ব্যাকুল হইয়া ভ্রমণে বহির্গত হন। ভ্রমণ করিতে-করিতে তিনি এক স্থানে উপস্থিত হইলেন। তথাকার অধিবাসিগণ মগ —অগ্নি-উপাসক। তাহারা এক সহস্র বৎসর হইতে একটী প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড অনবরত প্রজ্জলিত রাখিয়া আসিতেছিল। সেই রক্ষিত অগ্নিকুণ্ডে তাহারা প্রত্যহ ১০০ গাধায় বোঝাই করা কাষ্ঠ জ্বালাইত। হারুণী সাহেব উক্ত অগ্নিকুণ্ডের নিকটে এক বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। প্রত্যহ তিনি রোজা রাখিতেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে খাদেম ফখরুদ্দিণকে এফ্‌তারের জন্য রুটী সংগ্রহ করিতে বলিলেন। সে রুটি তৈয়ার করিবার জন্য অগ্নি-উপাসক মগদিগের নিকট গিয়া অগ্নি চাহিল। কিন্তু তাহারা অগ্নি না দেওয়াতে সে ফিরিয়া গিয়া হারুণী সাহেবের নিকটে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিল। হারুণী সাহেব স্বয়ং অগ্নিকুণ্ডের নিকটে গিয়া দেখিলেন, মোক্তার নামক একজন মগ ৭ম বর্ষীয় একটী ছেলেকে কোলে লইয়া অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। তিনি তাহাকে বলিলেন, "এক অঞ্জলি পাণি দিলে যে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইতে পারে, তোমরা কেন তাহার পূজা কর? যিনি আগুনকে সৃজন করিয়াছেন, সেই সৃষ্টিকর্ত্তা খোদাতালার অর্চ্চনা কর।"

বৃদ্ধ উত্তর করিল, "আমাদের ধর্ম্মে আগুনের শক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল; সুতরাং কেন তাঁহাকে পূজা না করিব?"

হারুণী সাহেব উত্তর করিলেন, "এতকাল হইতে তোমরা সরল প্রাণে এই অগ্নিকে পূজা করিয়া আসিতেছ; দগ্ধ না হয় এমতাবস্থায় তোমার হাত-পা অগ্নিতে স্থাপন করিতে পার কি?"

বৃদ্ধ উত্তর করিল, "দগ্ধ করাই আগুনের ধর্ম্ম; কাহার শক্তি তাহার নিকট যায়?" এতচ্ছ্রবণে হারুণী সাহেব বৃদ্ধের কোল হইতে তাহার পুত্রকে কৌশলে গ্রহণ করিয়া অগ্নিকুণ্ডের দিকে ধাবিত হইলেন। তিনি "বিস্‌মিল্লা" বলিয়া কোরাণ শরীফের একটী আয়েত পাঠ করিতে-করিতে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিলেন।

এই সংবাদ চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইয়া পড়ায়, তিন-চারি হাজার মগ অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে সমবেত হইয়া গোলযোগ আরম্ভ করিল। চারি ঘণ্টা পরে হারুণী সাহেব অগ্নিকুণ্ড হইতে বালকসহ অক্ষত দেহে বাহির হইলেন। বালকের ও তাঁহার শরীরের কোন অংশ অগ্নিতে দগ্ধ হয় নাই।

তৎপর মগগণ দলে-দলে আসিয়া বালককে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, সে তথায় কিরূপ অবস্থায় ছিল। বালক বলিল, "তথায় আমি অত্যন্ত আমোদ-আহ্লাদে শেখ সাহেবের চরণতলে ফল-ফুলে শোভিত একটী অতি সুন্দর বাগানে ভ্রমণ করিতেছিলাম।"

অগ্নি-উপাসকগণ অবশেষে হারুণী সাহেবের শরণাগত হইয়া পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। তিনি মোক্তার নামক বৃদ্ধকে আবদুল্লা ও তৎপুত্রকে ইব্রাহিম নাম দিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। পরিশেষে এই দুইজন আউলিয়া মধ্যে গণ্য হইয়াছিলেন।

সাময়িকী

বড়দিনের সময় খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মহোৎসব। তাঁহারা এই সময়ে আমোদ-আনন্দে কয়েকদিন অতিবাহিত করেন। আর আমাদের দেশে এই সময় সভা-সমিতির মরশুম্ লাগে। যেমন করিয়া হউক, দুই-তিন গণ্ডা সভা-সমিতি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে হইয়া থাকে। এবারে জাতীয় মহা-সমিতির অধিবেশন দিল্লীতে হইয়া গেল; সেই সঙ্গে-সঙ্গে আরও কয়েকটি সম্মেলনও সেখানে হইয়াছে। সুতরাং আমাদের বাঙ্গালাদেশের যাঁহারা দরবারী মানুষ, তাঁহাদের অনেকেই দিল্লীতে গিয়াছিলেন। কন্‌গ্রেসের প্রধান বাঙ্গালী পাণ্ডা মাননীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কন্‌গ্রেসের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছেন; তাই তিনি দিল্লীতে যান নাই। দুঃখের কথা বটে!

রাজধানী দিল্লী এবার অধিকাংশ সভাসমিতির কেন্দ্রস্থল হইলেও আমাদের কলিকাতা একেবারে নীরব নহে। ভারত-রাজ-প্রতিনিধি মহোদয় দিল্লীর রাজপাট কয়েক-দিনের জন্য কন্‌গ্রেস-কন্‌ফারেন্স কোম্পানীর হস্তে ন্যস্ত করিয়া কলিকাতায় শুভাগমন করিয়াছিলেন। পরিত্যক্ত রাজধানী এবার রাজ-প্রতিনিধিকে পাইয়া খুব আমোদ-আনন্দ, খানা-পিনা করিয়াছেন। সভা-সমিতির বিশেষ সম্ভাবনা বড়দিনের কিছুকাল পূর্ব্বেও ছিল না। অকস্মাৎ দ্বারভাঙ্গার মহারাজা বাহাদুর কলিকাতায় আগমন করিয়া এবারের কলিকাতার সভা-সমিতির আসর বেশ জম্‌কাইয়া লইয়াছিলেন। বোম্বাইয়ের মাননীয় শ্রীযুক্ত প্যাটেল মহাশয় বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় হিন্দুর অসবর্ণ বিবাহ আইন-সঙ্গত করিবার জন্য এক বিল পেশ্ করিয়াছেন। ব্যবস্থাপক সভাতেই কয়েকজন মাননীয় সদস্য এই বিলের বিপক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিগত বড়দিনের সময় দ্বারভাঙ্গার মহারাজা বাহাদুর কলিকাতায় আসিয়া এই বিলের বিরুদ্ধে বিপুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। এখানে, সেখানে, নানাস্থানে সভা হইয়াছিল। অবশেষে কলিকাতার ময়দানে একটা রাক্ষসী (Monster) সভা হইয়াছিল; বাঙ্গলা ও বিহারের মহারাজা, রাজা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এই সভা আহ্বান করেন। গড়ের মাঠে কুড়িটি মঞ্চ হইতে বক্তৃতা হয়। বলিতে গেলে সেদিন বক্তৃতার বান ডাকিয়াছিল। এবার বিহারের মহারাজবৃন্দ কলিকাতার সভা-সমিতির আসর রক্ষা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত প্যাটেল মহাশয়ের বিলের অদৃষ্টে যাহা হয় হইবে; আমরা কিন্তু বড়দিনের মামুলী সভা-সমিতির অধিবেশন হইতে বঞ্চিত হই নাই।

মাননীয় শ্রীযুক্ত প্যাটেল মহাশয়ের বিলের নাম—The Hindu Inter-marriage Validity Bill. অর্থাৎ এই বিলে হিন্দুজাতির মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ ব্যবস্থা-সঙ্গত করিবার বিধান আছে। বৎসর কয়েক পূর্ব্বে মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই ভাবের—ঠিক এই নহে—একটা বিল বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত করেন। সে সময়ে বিশেষ প্রতিবাদ হওয়ায় বিলখানি পরিত্যক্ত হয়। এখন আবার সেই রকমের বিল ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করা হইয়াছে; এবং এবার সে সময়ের অপেক্ষাও গুরুতর ভাবে প্রতিবাদ হইতেছে। হিন্দুজাতির মধ্যে এখন অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত নাই; যাঁহারা অসবর্ণ বিবাহ করেন, তাঁহারা এখন তিন-আইন অনুসারে রেজেষ্টরী করিয়া বিবাহ সিদ্ধ করিয়া লন। গোঁড়া হিন্দুসমাজ তাঁহাদিগের সহিত আদান-প্রদান করেন না। শ্রীযুক্ত প্যাটেল মহাশয় হিন্দুর পক্ষে এই তিন-আইনের আশ্রয় গ্রহণের বিরোধী,—তিনি এই অসবর্ণ বিবাহ হিন্দু-বিবাহ বলিয়া স্বীকার করাইতে চান। কিন্তু, এইটুকু স্বীকার করাইয়া কি লাভ হইবে? হিন্দুসমাজ অসবর্ণ-বিবাহকারীকে সমাজে সহজে গ্রহণ করিবেন না, গ্রহণ করা বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অসম্ভব। তবে উত্তরাধিকারের কথা—তাহা ত তিন আইন অনুসারেই সিদ্ধ হইতেছে। সুতরাং শ্রীযুক্ত প্যাটেল মহাশয় শুধু একটা নামের দোহাই দিবার জন্যই এই বিলখানি উপস্থিত করিয়াছেন। তিন-আইনে একটা বিধান আছে, যে, যাঁহারা বিবাহ করেন, তাঁহাদিগকে বলিতে হয় যে, তাঁহারা হিন্দু, বা অন্য কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়-ভুক্ত

নহেন। সুতরাং তাঁহারা জাতির বাহিরে। এখন যদি ঐ ধারাটা তুলিয়া দেওয়া যায়, অর্থাৎ বিবাহ-কারীরা কোন ধর্ম্মান্তর্গত নহেন, এই কথাটা তাঁহাদের না বলিতে হয়, তাহা হইলে বিবাহের পর তাঁহারা যাঁহার যাহা খুসী সেই ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে পারিবেন। ইচ্ছা হয় তাঁহারা হিন্দু বলুন, তাহার জন্য কে তাঁহাদিগকে কি বলিতে পারেন? তাহার পর, সমাজ এই অসবর্ণ-বিবাহকারীকে কি ভাবে গ্রহণ করিবে, তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। আমাদের মনে হয়, তিন-আইন হইতে ধর্ম্ম সম্বন্ধে declarationর ধারাটা তুলিয়া দিলে, এই বিলের স্বপক্ষ ও বিপক্ষবাদী,—উভয় পক্ষেরই বিশেষ কোন আপত্তি না-ও হইতে পারে।

দিল্লীতে এবার জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হইয়া গেল। মাননীয় শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালবীয় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ভয়ানক শীতেও দিল্লীতে পাঁচ হাজার প্রতিনিধি ও পাঁচ হাজারের অধিক দর্শক উপস্থিত হইয়াছিলেন। সুতরাং অধিবেশন খুব ভালই হইয়াছিল। কন্‌গ্রেস উপলক্ষে আর যে-যে সম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাদের বিশেষ বিবরণ প্রদান করিবার স্থান আমাদের নাই। আমরা শুধু একটী সম্মেলনের কথা বলিব। তাহার নাম ভারতীয় চিকিৎসক-গণের সম্মেলন। এই সম্মেলনের সভাপতি হইয়াছিলেন, আমাদের মাননীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সার নীলরতন সরকার মহাশয়। অতি উপযুক্ত ব্যক্তির উপরেই সম্মেলন পরিচালনের ভার অর্পিত হইয়াছিল। সার নীলরতন সরকার মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে একটী অতি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে অন্যান্য বিদ্যা শিক্ষার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা হইতেছে;—সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি শিক্ষার দিকে লোকের মন যথেষ্ট আকৃষ্ট হইতেছে। তাহার ফল স্বরূপ নানা স্থানে বিদ্যালয়, কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। কিন্তু চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার জন্য নানাস্থানে কলেজাদি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা তেমন লক্ষিত হইতেছে না বলিয়া সার নীলরতন আক্ষেপ করিয়াছেন। কথাটা খুব সত্য। আমাদের এই বাঙ্গালা দেশের কথাই ধরা যাউক। আমাদের দেশে কলিকাতায় একটী মেডিকেল কলেজ এত দিন ছিল। পরলোকগত ডাক্তার আর, জি, কর মহাশয়ের অবিচলিত অধ্যবসায়, যত্ন ও পরিশ্রমের ফলে এবং উপযুক্ত চিকিৎসকগণের সাহচর্য্যে বেলগেছিয়া মেডিকেল কলেজ সেদিন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সমস্ত বাঙ্গালা দেশে এই দুইটী মাত্র কলেজ। আর স্কুল ছিল তিনটী—কলিকাতার ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুল, ঢাকার মেডিকেল স্কুল, আর ডাক্তার করের মেডিকেল স্কুল। তাহার মধ্যে ডাক্তার করের স্কুলটী ত কলেজে পরিণত হইয়া গিয়াছে। এখন কলিকাতায় একটী এবং ঢাকায় একটী,—এই দুইটী স্কুল মাত্র বাঙ্গালা দেশের সম্পত্তি। আমরা দেখিয়াছি, এই চারিটী কলেজ ও স্কুলে শত-শত ছাত্র প্রতি বৎসর প্রবেশার্থী হইয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক ছাত্রই প্রবেশের অধিকার লাভ করিয়া থাকেন; স্থানাভাবে অধিক সংখ্যক ছাত্রকে বিফল-মনোরথ হইতে হয়। বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালা দেশের স্বাস্থ্যের অবস্থা যে প্রকার শোচনীয়, গ্রামে-গ্রামে যে প্রকার ম্যালেরিয়া, ওলাউঠার প্রকোপ—তাহাতে অনেক রোগী যে চিকিৎসার অভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে, এ কথা সকলেই জানেন। যথেষ্ট সংখ্যক চিকিৎসকের অভাবই যে ইহার কারণ, তাহা আর বলিতে হইবে না। চিকিৎসা-বিদ্যা-শিক্ষার্থীর অভাব নাই, কিন্তু শিক্ষা-বিধানের ব্যবস্থা নাই; এবং এদিকে অনেকেরই দৃষ্টি নাই। স্বীকার করি, মফঃস্বলের বড়-বড় কয়েকটী সহরে চিকিৎসা-বিদ্যালয় স্থাপন বহুব্যয়সাপেক্ষ; কিন্তু এ কথা কিছুতেই স্বীকার করিতে পারি না যে, বাঙ্গালা দেশে এই বহুব্যয়ভার বহনের সামর্থ্য কাহারও নাই। বাঙ্গালা দেশের জমীদারদিগের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা মলিন হইলেও, তাঁহারা দুই-চারিজনে মিলিয়া যে এই দেশ-হিতকর অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করিতে পারেন না, এ কথা কিছুতেই বলা যায় না। তাহার পর দেশী-বিদেশী অনেক লোক, অনেক কোম্পানী এখানে ব্যবসায়-বাণিজ্য করিয়া অতুল ধন সঞ্চয় করিয়াছেন এবং এখনও করিতে-ছেন। দেশহিতকর সৎকার্য্যে যে তাঁহারা মুক্তহস্তে দান করেন না, তাহা নহে। কলিকাতার মেডিকেল কলেজ ও বেলগেছিয়ার কলেজে অনেকেই যথেষ্ট দান করিয়াছেন। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে কি বাঙ্গালা দেশের মফস্বলে দুই-চারিটী মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন না? বেল-

গেছিয়ার স্কুলটী কলেজে উন্নীত হইলে, ডাক্তার কর মহাশয় আর একটী মেডিকেল স্কুল স্থাপিত করিতে চাহিয়াছিলেন। অক্লান্তকর্ম্মী, পরহিতব্রত কর মহোদয় বাঁচিয়া থাকিলে এ কার্য্য সিদ্ধ করিতে পারিতেন। এখন এমন কি কেহ নাই, যিনি বা যাঁহারা কলিকাতার বাহিরে দুই-চারিটী স্বাস্থ্যকর স্থানে চিকিৎসা-বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য অগ্রসর হন? বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে চিকিৎসা-শাস্ত্র শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা খুবই যে কঠিন ব্যাপার, তাহা নহে। মফস্বলের বড়-বড় সহরে বৃহৎ হাসপাতাল আছে। সেই সকল হাসপাতালে ছাত্রগণ হাতে-কলমে শিক্ষালাভ করিতে পারেন; এবং মফস্বলে অনেক স্থানে বহু সুযোগ্য ও বহুদর্শী চিকিৎসক আছেন; তাঁহারা সামান্য একটু স্বার্থত্যাগ করিয়া অনায়াসে ছাত্রগণকে শিক্ষাদান করিতে পারেন। সার নীলরতন সরকার মহাশয় এ বিষয়ে উদ্যোগী হইলে দেশের মহদুপকার সাধিত হইতে পারে।

বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে কয়েকদিন পূর্ব্বে আমরা বোলপুরে শ্রীযুক্ত সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। আমরা যে দিন বোলপুরে যাই, সেই দিন (৭ই পৌষ) শান্তিনিকেতনের সপ্তবিংশতি সাম্বৎসরিক উৎসব ছিল। আমরা এ সংবাদ জানিতাম না। বর্দ্ধমান ষ্টেশনে আমরা এই সংবাদ জানিতে পারি। এই দিনে বোলপুর গমনের সঙ্কল্প না করিলে আমরা একটী অতি পবিত্র ও সুন্দর উৎসবের আনন্দ উপভোগে বঞ্চিত হইতাম। আমরা উৎসবের কথা শুনিয়া মনে করিয়াছিলাম, অন্যান্য স্থানে এই-প্রকার উৎসবে যেমন অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, বোলপুরেও তাহাই হইবে; অর্থাৎ বক্তৃতা হইবে, সময়োপযোগী দুই-চারিটী গান হইবে; তাহার পর কিঞ্চিৎ জলযোগান্তে উৎসবের কার্য্য পরিসমাপ্ত হইবে। কিন্তু অপরাহ্নকালে বোলপুর ষ্টেসনে গাড়ী হইতে নামিয়াই আমাদের ভ্রম দূর হইল। আমরা ষ্টেসন হইতে বাহির হইয়াই দেখি, পিপীলিকার সারির মত স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা বোলপুরের শান্তি-নিকেতন অভিমুখে ছুটিতেছে। তখন বুঝিলাম, এ শুধু সভা নহে, বক্তৃতা নহে; মহর্ষিদেব শান্তি-নিকেতনের বার্ষিক উৎসব, আমাদের দেশের চিরবহমানকাল-প্রচলিত, অধুনা অনাদৃত, ভাবে সম্পন্ন হইবার সুব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন; এবং সেই ব্যবস্থা অনুসারেই উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। শান্তি-নিকেতনের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসর ৭ই পৌষ তারিখে নিকেতনে একটী মেলা হয়।

আমরা এই শান্তি-নিকেতনের মেলা দেখিবার সৌভাগ্য সেদিন অতর্কিতভাবে লাভ করিয়াছিলাম। দেখিলাম, অনেক স্থান হইতে বহু দোকানদার নানা দ্রব্যের দোকান সাজাইয়া বসিয়াছে। সহস্র-সহস্র নর-নারী, বালক-বালিকা অনেক দূর হইতে এই মেলা দেখিতে এবং নানা দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করিতে আসিয়াছে। অনেকগুলি গো-যানে চড়িয়া গৃহস্থ মহিলারাও মেলা দেখিতে আসিয়াছেন। আমাদের দেশে আমরা বাল্যকালে এই রকম মেলা দেখিতে পাইতাম। এখনও মেলা আছে বটে, কিন্তু তাহাতে তেমন লোক-সমাগম হয় না; কারণ, এখন আমরা অর্থাৎ ভদ্র-নামধারী ব্যক্তিগণ এ সকল মেলায় যোগদান করা ভদ্রতা-বিরুদ্ধ মনে করি; অশিক্ষিত সাধারণ লোকেই এখন আমাদের দেশের মেলাগুলি রক্ষা করিতেছে। কিন্তু বীরভূম জেলার অন্তর্গত এই শান্তি-নিকেতনের মেলায় সেই পূর্ব্বের ভাবই দেখিলাম; এবং আরও দেখিলাম মহর্ষিদেবের পরিবারের যাঁহারা এই শান্তি-নিকেতনের উৎসবে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই অসঙ্কোচে এই পল্লী-মেলার আনন্দ-উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

মেলায় শুধু দোকানপাট আসিলেই হয় না, অন্য প্রকার আমোদেরও আয়োজন করিতে হয়। শান্তি-নিকেতনে তাহারও অভাব দেখিলাম না। এক স্থানে প্রকাণ্ড এক সামিয়ানা খাটাইয়া তাহার নীচে যাত্রা-গান আরম্ভ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যাত্রাওয়ালারা কংসবধ পালা গান করিতেছিল, আর শত-শত নর-নারী সেই যাত্রা শুনিতেছিল। সার রবীন্দ্রনাথের পুত্র শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ও জামাতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথকে অগ্রণী করিয়াও আমরা সেই যাত্রার আসরে প্রবেশের পথ পাইলাম না। এক স্থানে দেখিলাম, বাউলেরা গানের আসর জমাইয়া বসিয়াছে; আর একদিকে কতকগুলি লোক নাগর-দোলায় দোল খাইতেছে। সকলেরই মুখে আনন্দের দীপ্তি প্রকাশ পাইতেছে। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়

মহাশয় বলিলেন যে, এবার দেশে ব্যাধির বড়ই প্রকোপ; তাই এবার অধিক লোক-সমাগম হয় নাই,—অন্যান্য বৎসরের তুলনায় এবার সিকি লোকও আসে নাই। তা না আসুক,—যাহারা আসিয়াছিল, তাহাদের আনন্দ-কোলাহল দেখিয়াই আমরা শান্তি লাভ করিয়াছিলাম।

আমরা মনে করিয়াছিলাম এই মেলা, এই কেনা-বেচা, এই যাত্রীগণনেই হয় ত মেলার শেষ। তাহা নহে; রাত্রিতে অনেক টাকার সুন্দর-সুন্দর বাজী পোড়ান হইবে; এবং বাজী পোড়ান শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত জন-সমারোহ কমিতেছে না। বাজী পোড়াইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইবে শুনিয়া আমরা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম দর্শন করিতে গেলাম। কিন্তু, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে জন্য ভাল করিয়া কিছুই দেখিতে পাইলাম না; বিশেষতঃ একটু পরেই শান্তি-নিকেতনের উপাসনা-মন্দিরে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উপাসনা করিবেন। তাহাতেও ত যোগদান করা চাই। উপাসনার স্থানে যাইবার পূর্ব্বেই আমরা আর এক মহোৎসব দেখিতে গেলাম। প্রকাণ্ড ভোজন-গৃহে দলে-দলে ভদ্রলোক—ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকগণ, আগন্তুক ভদ্রলোকগণ আহারে বসিয়া গিয়াছেন,—বলিতে ইচ্ছা হইতেছে, প্রসাদ পাইতেছেন। সত্যই এ মহোৎসব দেখিবার মত। মনে হইল, স্নেহময়ী মাতা আজ

"নিমন্ত্রণ করি সবে, এনেছেন এই মহোৎসবে
বিতরিতে প্রেম-অন্ন ক্ষুধিত জনে।"

আমরা যথাসময়ে শান্তি-নিকেতনের উপাসনা-মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, এই উৎসবে যোগদান করিবার জন্য কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে অনেক ভদ্রলোক ও ভদ্র-মহিলা সমবেত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উপাসনা করিলেন। বলা বাহুল্য যে, তাঁহার উপাসনা ও প্রার্থনা মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ছাত্রগণ এই উপলক্ষে সার রবীন্দ্রনাথের রচিত তিনটী গান গাহিয়া উৎসবের আনন্দ বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। নিম্নে সেই তিনটী গান উদ্ধৃত করিয়া দিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না।

১

অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো,
সেইত তোমার আলো।
সকল দ্বন্দ্ব-বিরোধমাঝে জাগ্রত যে ভালো,
সেইত তোমার ভালো।
পথের ধূলায় বক্ষ পেতে রয়েছে যেই গেহ,
সেইত তোমার গেহ।
সমর-ঘাতে অমর করে রুদ্রনিঠুর স্নেহ,
সেইত তোমার স্নেহ।
সব ফুরালে বাকি রহে অদৃশ্য যেই দান,
সেইত তোমার দান।
মৃত্যু আপন পাত্রে ভরি বহিছে যেই প্রাণ,
সেইত তোমার প্রাণ।
বিশ্বজনের পায়ের তলে ধূলিময় যে ভূমি,
সেইত স্বর্গভূমি।
সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি,
সেইত আমার তুমি।

২

সারা জীবন দিল আলো
সূর্য্য গ্রহ চাঁদ,
তোমার আশীর্ব্বাদ, হে প্রভু,
তোমার আশীর্ব্বাদ।
মেঘের কলস ভরে ভরে
প্রসাদ-বারি পড়ে ঝরে,
সকল দেহে প্রভাত-বায়ু
ঘুচায় অবসাদ,—
তোমার আশীর্ব্বাদ, হে প্রভু,
তোমার আশীর্ব্বাদ।
তৃণ যে এই ধূলার পরে
পাতে আঁচলখানি,
এই যে আকাশ চির-নীরব
অমৃতময় বাণী,—
ফুল যে আসে দিনে দিনে
বিনা রেখার পথটি চিনে,
এই যে ভুবন দিকে দিকে
পুরায় কত সাধ,

তোমার আশীর্ব্বাদ, হে প্রভু,
তোমার আশীর্ব্বাদ।

৩

আকাশ জুড়ে শুনিনু ঐ বাজে
তোমারি নাম সকল তারার মাঝে।
সে নামখানি নেমে এল ভুঁয়ে,
কখন, আমার ললাট দিল ছুঁয়ে;
শান্তি-ধারায়, বেদন গেল ধুয়ে,
আপন আমার আপনি মোরে লাজে।
মন মিলে যায় আজ এই নীরব রাতে
তারায় ভরা ঐ গগনের সাথে।
এমনি করে আমার এ হৃদয়
তোমার নামে হোক্‌না নামময়,
আঁধারে মোর তোমার আলোর জয়
গভীর হয়ে থাক জীবনের কাজে।

উপাসনা শেষ হইলে আমরা বাজী পোড়ান দেখিতে গেলাম। শুনিলাম, বীরভূম অঞ্চলের কারিগরেরাই এই উপলক্ষে বাজী সরবরাহ করিয়া থাকে,—কলিকাতা বা অন্য স্থান হইতে বাজী আনা হয় না; সুতরাং আমরা মনে করিয়াছিলাম, বিবাহ-আদি ব্যাপারে যে সকল মামুলী বাজী পোড়ান হয়, তাহাই হইবে; এই কন্‌কনে শীতের মধ্যে শুধু কর্ম্মভোগই হইবে। কিন্তু বাজী পোড়ান আরম্ভ হইলে আমরা অবাক্ হইয়া গেলাম; মফস্বলে, বিশেষতঃ বীরভূম জেলার পল্লী-কারিগরেরা যে সমস্ত বাজী প্রস্তুত করিয়াছিল, সে প্রকার বাজী মফস্বলে অতি কমই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কে ইহাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিবে? এই বোলপুর অঞ্চলের কারিগরেরা উৎসাহ পাইলে আরও কত উন্নতি করিতে পারে। উৎসাহের অভাবে আমাদের দেশের কত উৎকৃষ্ট শিল্প যে ক্রমে লোপ পাইয়া যাইতেছে, তাহার কথা কে ভাবে? বোলপুরের এই মেলা দেখিয়া একটী কথাই বার-বার আমাদের মনে হইয়াছিল। এই মেলা উপলক্ষে যদি অনুষ্ঠাতৃগণ এই জেলার বা জেলার এই অংশের কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন, উৎকৃষ্ট দ্রব্যের জন্য পুরস্কার দেন এবং সমাগত কৃষক ও শিল্পীদিগকে নানা বিষয়ে উপদেশ দিবার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে এই মেলার আয়োজন অধিকতর সার্থক হয়।

শান্তি-নিকেতনের মেলার কথাই বলিলাম; কিন্তু এই স্থানের যাহা প্রধান বিষয়, সেই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের সম্বন্ধে এতক্ষণ কিছুই বলা হয় নাই। আমরা অতি অল্প সময়ই আশ্রমে ছিলাম; তাহার পর, এই উৎসব উপলক্ষে আশ্রমের ছুটী ছিল; তাই আশ্রমের প্রধান বিষয়ই আমরা দেখিবার সুযোগ পাইলাম না। কিন্তু বিদ্যার্থীদিগকে দেখিলাম, অধ্যাপকগণকে দেখিলাম, আশ্রমের সুবন্দোবস্ত দেখিলাম; বুঝিতে পারিলাম, আমাদের কবি-সম্রাট এই আশ্রমে যে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন, এবং ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও আগ্রহের সহিত যে সাম্রাজ্য শাসন-সংরক্ষণ করিতেছেন, তাহা কবির সাম্রাজ্য অপেক্ষা অনেক উন্নত, অধিকতর বাঞ্ছনীয়। সার রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁহার সহকারী মহাশয়-গণের স্নেহ-ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়া পাঁচ ছয় বৎসর বয়সের বালকেরা পর্য্যন্ত এখানে সুখে বাস করিতেছে; মা-বাপের স্নেহ, ভালবাসা, যত্ন তাহারা এখানে পাইয়াছে বলিয়াই, মা-বাপ হইতে বহু দূরে এই প্রান্তরের মধ্যে তাহারা মনের আনন্দে বাস করিতেছে। এই আশ্রমের জন্য যেখানে যাহা প্রয়োজন, তাহার কিছুরই অভাব ত আমরা দেখিলাম না। সার রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ এই আশ্রমের উন্নতি-কল্পে প্রাণ মন উৎসর্গ করিয়াছেন। আমাদের দেশের যাঁহারা পবিত্র শিক্ষকতা-কার্য্যে ব্রতী, তাঁহাদের সকলেরই একবার করিয়া এই আশ্রমে আসিয়া শিক্ষাদান-প্রণালী ও শিক্ষাদান-ব্যবস্থা দেখিয়া যাওয়া উচিত। আমার সঙ্গী প্রসিদ্ধ উপন্যাসিক শ্রীমান শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সমস্ত দেখিয়া (এই তাঁহার ও আমার প্রথম শান্তি-নিকেতন দর্শন) বলিলেন, 'সবই ত দেখিলাম, কিন্তু স্কুল কৈ?" রথীন্দ্রবাবু কতকগুলি গাছ দেখাইয়া বলিলেন, ঐ সকল গাছ-তলাতেই শিক্ষা দেওয়া হয়; শিক্ষার্থীরা নগ্ন-পদে মৃত্তিকাসনে উপবিষ্ট হইয়া শিক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকে। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম দেখা হইল না বলিলেই হয়; যদি কখন আবার দেখিবার সৌভাগ্য হয়, তাহা হইলে এই আশ্রমের বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার বাসনা রহিল। সর্ব্বশেষে যাঁহারা একরাত্রির জন্য আমাদিগকে আশ্রয়দান করিয়া-

ছিলেন, যাঁহাদিগের আদর-আপ্যায়নে আমরা মহা সুখে, মহা আনন্দে এই আশ্রমে কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত করিয়াছিলাম, তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

এবারের ইংরেজী নববর্ষ উপলক্ষে উপাধি বিতরণ হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা দেশের মস্তকে যথেষ্ট উপাধি বর্ষিত হয় নাই; কিন্তু যে দুই-চারিটী হইয়াছে, তাহার জন্য আমরা সদাশয় গবর্ণমেণ্টের আন্তরিক ধন্যবাদ করিতেছি। সর্ব্বাগ্রে নাম করিতে হয় আমাদের গৌরব-কেতন, সদাপ্রফুল্ল শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের। তিনি এবার 'সার' হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্রের ন্যায় পৃথিবীখ্যাত পণ্ডিত যে এতদিন 'সার' উপাধি লাভ করেন নাই, ইহাই আমাদের নিকট বিস্ময়ের বিষয় ছিল। এবার সেই ত্রুটী সংশোধিত হওয়ায় আমরা পরম আনন্দিত হইয়াছি। ডাক্তার রায় আদর্শ পুরুষ; তাঁহার এই সম্মানে আমরা বাঙ্গালীমাত্রেই সম্মানিত হইয়াছি। তাহার পরই দেখিলাম, শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মিত্র মহাশয় সি-আই-ই উপাধি লাভ করিয়াছেন। উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র, মনস্বী মিত্র মহাশয়ের সম্মানে সকলেই আনন্দিত হইবেন। আমরা আর একটী নাম উল্লেখ করিব। পাবনার গবর্ণমেণ্ট উকিল শ্রীযুক্ত প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী মহাশয় এতকাল পরে রায় বাহাদুর হইলেন। তিনি গবর্ণমেণ্টের উকিল বলিয়াই এই উপাধি লাভ করিলেও, একজন প্রবীণ সাহিত্যিক, প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ও আমাদের 'ভারতবর্ষে'র বিশিষ্ট লেখক বলিয়াই আমরা তাঁহার এই উপাধি লাভে আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। বাঙ্গালীর মধ্যে আর যাঁহারা উপাধি লাভ করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকেও অভিনন্দিত করিতেছি।

প্রেম

[শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ]

প্রেম নহে এ ধরার—সে দেব-বাঞ্ছিত—
অমরার প্রিয়তম দুর্লভ অমিয়া,
রসে যার চিত্তখানি হয় সঞ্জীবিত,
অনন্ত সৌন্দর্য্য মাঝে ডুবে যায় হিয়া।
এ নহে গরল কভু কাম-মদিরার—
মিটে যাহে ক্ষুধিতের লালসার ক্ষুধা;
এ যে ওগো, বিধাতার শ্রেষ্ঠ উপহার,
মর্ত্ত্য-মাঝে মূর্ত্তিমতী শান্তিময়ী সুধা।
কল্যাণী, আনন্দ-মধু অন্তরেতে বহি—
কোন্ সে বসন্ত-প্রাতে এলে বসুধায়,—
আজো তাই যাতনার লক্ষ ক্ষত সহি
বাঁচিয়া রয়েছে ধরা সে পুণ্য-ধারায়।
সাধনা সার্থক করি যুগ-যুগ ধরি,
হে দেবি, রয়েছ জাগি চিত্ত-বেদি 'পরি!

গৃহদাহ

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

অচলার সমস্ত কাজ-কর্ম্ম, সমস্ত ওঠা-বসার মধ্যেও নিভৃত হৃদয়-তলে যে কথাটা অনুক্ষণ জ্বালা করিতেই লাগিল তাহা এই যে, সুরেশের মনের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড পরিবর্ত্তন কাজ করিতেছে, যাহার সহিত তাহার নিজের কোন সম্বন্ধ নাই। যে উদ্দাম ভালবাসা একদিন তাহারই মধ্যে জন্মলাভ করিয়া বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে, সে আজ জীর্ণ আশ্রয়ের ন্যায় তাহাকে ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাত্রা করিয়াছে। আপনাকে আপনি সে সহস্র তিরস্কার, সহস্র কটূক্তি করিয়া লাঞ্ছনা করিতে লাগিল; কিন্তু তথাপি এই বিদায়ের বেদনাকে আজ সে কোনক্রমেই মন হইতে দূরে সরাইতে পারিল না। এমন কি মাঝে মাঝে বিকট ভয়ে সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত করিয়া এ সংশয়ও উঁকি মারিতে লাগিল, নিজের অজ্ঞাতসারে সেও সুরেশকে গোপনে ভালবাসিয়াছে কি না! প্রতিবারই এ আশঙ্কাকে সে অসঙ্গত, অমূলক, বলিয়া উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিতে লাগিল; আপনাকে আপনি বিদ্রূপ করিয়া বলিতে লাগিল, এ অসম্ভব সম্ভব হইবার পূর্ব্বে সে গলায় দড়ি দিয়া মরিবে; তথাপি ছায়ার মত এ কথা যেন তাহার মনের পিছনে লাগিয়াই রহিল, ঘুরিতে-ফিরিতেই যেন সে ইহাকে চোখে দেখিতে লাগিল। এবং বোধ করি বা, এই বিভীষিকা হইতেই আত্মরক্ষা করিতে সে স্নানাহারের সময়টুকু ব্যতীত দিবা-রাত্রির এতটুকু কাল স্বামীর কাছ-ছাড়া হইতে সাহস করিল না। পাশের যে ঘরটা তাহার নিজের ব্যবহারের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, কয়দিনের মধ্যে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতেও তাহার প্রবৃত্তি হইল না;—এমন করিয়াও কিছুদিন অতিবাহিত হইয়া গেল।

মহিম প্রায় আরোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। শীঘ্রই জব্বলপুরে চেঞ্জে যাইবার কথাবার্ত্তা চলিতেছে। সেদিন সকালবেলা অচলা মেঝের উপর বসিয়া একটা ছোট ষ্টোভে স্বামীর জন্য দুধ গরম করিতেছিল, দুধ মুহুর্মুহু উথলিয়া উঠিতেছে, কোনদিকে চাহিবার তাহার এতটুকু অবসর নাই,—মহিম এতক্ষণ যে একদৃষ্টে তাহারই প্রতি চাহিয়া ছিল ইহা সে জানিত না—হঠাৎ স্বামীর দীর্ঘশ্বাস কানে যাইতেই সে মুখ তুলিয়া একটীবার মাত্র চাহিয়াই পুনরায় নিজের কাজে মন দিল।

মহিম কোন দিন বেশি কথা কহে না; কিন্তু আজ সে সহসা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, বাস্তবিক অচলা, বড় দুঃখ ছাড়া কোন দিন কোন বড় জিনিস লাভ করা যায় না। আমার বাড়ীও আবার হবে, রোগও একদিন সারবে; কিন্তু এর থেকে যে অমূল্য বস্তুটি লাভ করলুম সে তুমি। আজকাল আমার মনে হয়, তুমি ছাড়া আর বোধ হয় আমার একটা দিনও কাট্‌বে না।

অচলা নিঃশব্দে গরম দুধ বাটিতে ঢালিয়া ঠাণ্ডা করিতে লাগিল, কোন উত্তর করিল না। মহিম একটু থামিয়া পুনশ্চ কহিল, মৃণাল, সুরেশ এরা আমার সেবা কিছু কম করেনি, কিন্তু কি জানি কেন, যখনি জ্ঞান হোতো তখনি কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করতুম। কেবলি মনে হোতো হয়ত এদের কত কষ্ট, কত অসুবিধে হচ্চে,—এদের দয়ার ঋণ আমি কেমন কোরে এ জীবনে শোধ দেব। কিন্তু, ভগবানের হাতে-বাঁধা এম্‌নি সম্বন্ধ যে, তোমার বিষয়ে কখনো মনে হয় না, এই সেবার দেনা একদিন আমাকে শুধ্‌তেই হবে! আমাকে বাঁচিয়ে তোলা যেন তোমার নিজেরই গরজ। বলিয়া মহিম একটুখানি হাসিল।

অচলা ঘাড় হেঁট করিয়া দুধ নাড়িতেই লাগিল, কোন কথা কহিল না।

মহিম বলিল, আর কত ঠাণ্ডা করবে, দাও?

তবুও অচলা জবাব দিল না, তেম্‌নি অধোমুখেই বসিয়া রহিল। প্রথমটা মহিম একটুখানি বিস্মিত হইল, কিন্তু পরক্ষণেই বুঝিতে পারিল স্বামীর কাছে অচলা চোখের

জল গোপন করিবার জন্যই অমন করিয়া একভাবে অধোমুখে বসিয়া আছে।

কেন যে সুরেশ বড়-একটা আর আসে না, তাহার হেতু নিশ্চয় করিয়া মহিম না বুঝিলেও, কতকটা যে অনুমান করে নাই তাহা নহে। ইহাতে ক্ষোভ-মিশ্রিত একটা আনন্দের ভাবই তাহার মনের মধ্যে ছিল। কারণ, অচলা যে সতর্ক হইয়াছে, নির্জ্জনে অকস্মাৎ দেখা হইতে না পায় এই ভয়েই সে যে ঘর ছাড়িয়া সহজে অন্যত্র যাইতে চাহে না, ইহা সে মনে মনে অনুভব করিল। আজ তাই সারাদিন ধরিয়া মন যেন তাহার বসন্ত-বাতাসে উড়িয়া বেড়াইয়া কাটাইল। তাহার শয্যার কিছু দূরে একটা আরাম-চৌকি ছিল। সেদিন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাহারি উপরে বসিয়া অচলা কি একখানা বই পড়িতেছিল, এবং ক্লান্তিবশতঃ সেইখানেই অবশিষ্ট রাতটুকু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। পরদিন সকালে মহিমের ডাকে শশব্যস্তে উঠিয়া বসিল, এবং জানালা খুলিয়া দিয়া দেখিল বেলা হইয়া গেছে।

মহিম কি একটা কাজ বলিতে গিয়া সহসা চুপ করিয়া গেল, এবং স্ত্রীর আপাদ-মস্তক বারবার নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়ের স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার নিজের গায়ের কাপড় কি হোলো?

অচলা ততোধিক বিস্ময়ে নিজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, এইমাত্র ঘুম ভাঙিয়া যেখানা সে তাড়াতাড়ি নিজের গায়ে জড়াইয়া লইয়া উঠিয়া আসিয়াছে, সেখানা সুরেশের। স্বামীর প্রশ্নটা তাহাকে যেন মারিল। লজ্জায়, ব্যথায় তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল; কিন্তু এ যে কি করিয়া ঘটিল তাহা কোনমতেই ভাবিয়া পাইল না। তাহার স্মরণ হইল, গত রাত্রে তিনি ঘুমাইয়া পড়িলে সে নিজের শালখানা পাট করিয়া তাঁহার পায়ের উপর চাপা দিয়া অঞ্চল মাত্র গায়ে দিয়া পড়িতে বসিয়াছিল। ঘুমের মধ্যে মাঝে মাঝে তাহার অত্যন্ত শীত করিতেছিল মনে পড়ে, তাহার পরে জাগিয়া উঠিয়া ইহাই দেখিতেছে।

কিন্তু, স্ত্রীর একান্ত লজ্জিত ম্লান মুখের পানে চাহিয়া মহিম সস্নেহে সকৌতুকে হাসিল। কহিল, এতে আর লজ্জা কি অচলা? চাকরটাই হয়ত উল্টোপাল্টা কোরে তোমারটা তার ঘরে দিয়ে তারটা এখানে রেখে গেছে। না হয়, সুরেশ নিজেই হয়ত কাল বিকেল বেলা ফেলে গেছে, রাত্রে চিনতে না পেরে তুমি গায়ে দিয়েছ। বেয়ারাকে ডেকে বদলে আনতে বলে দাও।

দিই, বলিয়া সেখানা হাতে করিয়া অচলা বাহির হইয়া আসিল এবং পাশের ঘরে ঢুকিয়া যখন অবসন্নের মত বসিয়া পড়িল, তখন বুঝিতে কিছুই আর তাহার অবশিষ্ট ছিল না। অনেক রাত্রে সকলে ঘুমাইয়া পড়িলে সুরেশ যে নিঃশব্দে ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল, এবং শীতের মধ্যে তাহাকে ও-ভাবে নিদ্রিত দেখিয়া আপনার গাত্রবাসখানি দিয়া ঘুমন্ত তাহাকে সস্নেহে সযত্নে আচ্ছাদিত করিয়া নীরবে চলিয়া গিয়াছিল, ইহাতে তাহার আর লেশমাত্র সংশয় রহিল না। সে চোখ বুজিয়া সেই আনত সতৃষ্ণ দৃষ্টি যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইয়া রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, শুধু তাহাকেই দেখিবার জন্য, এবং ভাল করিয়াই দেখিবার জন্য সে অমন করিয়া আসিয়াছে, এবং হয়ত, প্রতিরাত্রেই আসিয়া থাকে, কেহ জানিতেও পারে না।

এই কদাচারে তাহার লজ্জার পরিসীমা রহিল না; এবং ইহাকে সে কুৎসিত বলিয়া, গর্হিত বলিয়া, অভদ্র বলিয়া সহস্র প্রকারে অপমানিত করিতে লাগিল; এবং অতিথির প্রতি গৃহস্বামীর এই চৌর্য্যবৃত্তিকে সে কোনদিন ক্ষমা করিবে না বলিয়া নিজের কাছে বারম্বার প্রতিজ্ঞা করিল; কিন্তু, তথাপি তাহার সমস্ত মনটা যে এই অভিযোগে কোনমতেই সায় দিতেছে না, ইহাও যে তাহার অগোচর রহিল না; এবং কোথায় কিসে যে তাহাকে এতদিন উঠিতে-বসিতে বিঁধিতেছিল, তাহাও যে একেবারে সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দিল!

কেদারবাবুর এক বাল্যবন্ধু জব্বলপুর সহরে বাস করেন; তাঁহার নিকট হইতে উত্তর আসিল, জল-বায়ু ও প্রাকৃতিক দৃশ্যে এ স্থান অতি উৎকৃষ্ট। তাঁহার নিজের বাসাও খুব বড়; অতএব মহিমের যদি আসাই হয়, ত, সে সচ্ছন্দে তাঁহার কাছেই থাকিতে পারে।

একদিন সকালে কেদারবাবু আসিয়া এই সম্বাদ জ্ঞাপন করিলেন; এবং মাঘ মাস যখন শেষ হইয়াই আসিতেছে, এবং পথের অল্প-স্বল্প ক্লেশও যখন সহ্য করিতে মহিম সমর্থ, তখন আর কালবিলম্ব না করিয়া তাহার যাত্রা করাই কর্ত্তব্য। যুবা বয়সে তিনি নিজে একবার জব্বলপুরে

গিয়াছিলেন, সে স্মৃতি তাঁহার মনে ছিল, মহা উল্লাসে সেই সকল বর্ণনা করিয়া কহিলেন, জগদীশের স্ত্রী এখনো জীবিতা আছেন, তিনি মায়ের মত মহিমকে যত্ন করিবেন, এবং চাই কি, এই উপলক্ষ্যে তাঁহারও আর একবার দেশটা দেখা হইয়া যাইবে। মহিম চুপ করিয়া এই সকল শুনিল, কিন্তু কিছুমাত্র উৎসাহ প্রকাশ করিল না। এই আগ্রহহীনতা শুধু অচলাই লক্ষ্য করিল। পিতা প্রস্থান করিলে সে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, কেন, জব্বলপুর ত বেশ যায়গা, তোমার যেতে কি ইচ্ছে নেই?

মহিম কহিল, তোমরা সকলে আমাকে যতটা সুস্থ-সবল ভাবচ, ততটা এখনো আমি হইনি। কোন দিন হ'ব কি না, তাও আমি আশা করিনে।

অচলা বলিল, সেই জন্যেই ত ডাক্তার তোমার চেঞ্জের ব্যবস্থা করেছেন। একবার ঘুরে এলেই সমস্ত সেরে যাবে।

মহিম ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল। পরে কহিল, কি জানি। কিন্তু এ অবস্থায় আমার নিজের বা পরের উপর নির্ভর ক'রে স্বর্গে যেতেও ভরসা হয় না। অচলা, ভেতরে ভেতরে আমি বড় দুর্ব্বল, বড় অসুস্থ। তুমি কাছে না থাক্‌লে হয়ত আমি বেশি দিন বাঁচ্‌বো না। বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠস্বর যেন সজল উঠিল।

যে মুখ ফুটিয়া কখনো কিছু চাহে না, কখনো নিজের দুঃখ অভাব ব্যক্ত করে না, তাহারই মুখের এই আকুল ভিক্ষা, ঠিক যেন শূলের মত আঘাত করিয়া অচলার হৃদয়ে যত স্নেহ, যত করুণা, যত মাধুর্য্য এতদিন রুদ্ধ হইয়া ছিল, সমস্তরই এক সঙ্গে এক মুহূর্ত্তে মুখ খুলিয়া দিল। সে নিজেকে আর ধরিয়া রাখিতে না পারিয়া পাছে অসম্ভব কিছু একটা করিয়া বসে, এই ভয়ে চক্ষের জল চাপিতে চাপিতে একেবারে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। মহিম হতবুদ্ধির মত অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বিস্ময়ে ব্যথায় সেই উন্মুক্ত দ্বারের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া থাকিয়া আবার ধীরে ধীরে শুইয়া পড়িল।

আবার যখন উভয়ের সাক্ষাৎ হইল, তখন স্বামী-স্ত্রীর কেহই এ সম্বন্ধে কোন কথা কহিল না। পরদিন অচলা একখানা টেলিগ্রাম হাতে করিয়া আসিয়া হাসিমুখে কহিল, জগদীশ বাবু টেলিগ্রাফের জবাব দিয়েছেন, তাঁর বাসার কাছেই আমাদের জন্যে তিনি একটা ছোট বাড়ী ঠিক করেছেন।

মহিম কথাটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া বলিল, তার মানে?

অচলা কহিল, বাবার বন্ধু বলে তোমাকেই না হয় তিনি বাড়ীতে যায়গা দিতে পারেন। কিন্তু দু'জনে গিয়ে ত তাঁর কাঁধে ভর করা যায় না। তাই কালই একটা বাসা ঠিক করবার জন্যে টেলিগ্রাফ করতে বাবাকে চিঠি লিখে দিই। এই তার জবাব। বলিয়া সে হলুদে খামখানা স্বামীর বিছানার উপর ছুড়িয়া দিল।

মহিম হাতে লইয়া সেখানা আগাগোড়া পড়িয়া শুধু বলিল, আচ্ছা।

অচলা যে স্বেচ্ছায় সঙ্গে যাইতে চাহে ইহা সে বুঝিল। কিন্তু কন্যাকার আচরণ, যাহা আজিও তাহার কাছে তেমনি দুর্বোধ, তেমনি দুর্জ্ঞেয়, তাহাই স্মরণ করিয়া কোনরূপ অযথা চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে আর তাহার প্রবৃত্তি হইল না।

কিন্তু অচলার তরফ হইতে যাত্রার উদ্যোগ পুরা মাত্রায় চলিতে লাগিল। সেদিন দুপুর-বেলা সে এ বাটীতে আসিয়া তাহার জিনিস-পত্র গুছাইতেছিল, কেদারবাবু দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ নিঃশব্দে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, তোমার না গেলেই কি নয় মা?

অচলা চমকিয়া মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন বাবা?

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার দিক দিয়া তাহার সঙ্গে থাকাটা যে ঠিক সঙ্গত নয়, পিতা হইয়া কন্যাকে এ কথা জানাইতে কেদারবাবু লজ্জা বোধ করিলেন। তাই তিনি মহিমের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থার ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন, বেশী দিন ত নয়। তা'ছাড়া, জগদীশের ওখানে তার কোন অসুবিধেই হোতো না। এই অল্পকালের জন্যে বেশি কতকগুলো খরচ-পত্র করে—

আসল কথাটা অচলা বুঝিল না। সে পিতার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া প্রশ্ন করিল, তিনি বলছিলেন বুঝি?

"না না, মহিম কিছুই বলেনি, শুধু আমি ভাবচি—"

"তুমি কিছু ভেবো না বাবা, সে আমি সমস্ত ঠিক করে

নেবো', বলিয়া অচলা পুনরায় তাহার কাজের মধ্যে মনোনিবেশ করিল। এবং, পরদিনই লুকাইয়া তাহার দু'খানা গহনা বিক্রী করিয়া নগদ টাকা সংগ্রহ করিয়া রাখিল।

ফাল্গুনের মাঝামাঝি যাত্রার সঙ্কল্প ছিল, কিন্তু সুরেশের পিসিমা পুরোহিত ডাকাইয়া পাঁজি দেখাইয়া মাসের প্রথম সপ্তাহেই দিন-স্থির করিয়া দিলেন। সেই মতই সকলকে মানিয়া লইতে হইল।

যাইবার দিন দুই পূর্ব্বে হইতেই অচলার সারা প্রাণটা যেন হাওয়ায় ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। এই কলিকাতা ত্যাগ করিয়া কিছুদিনের নিমিত্ত স্বামীগৃহ বাস ব্যতীত তাহাকে জীবনে কখনো অন্যত্র যাইতে হয় নাই। আজিও সে পশ্চিমের মুখ দেখে নাই। সেখানে কত প্রাচীন কীর্ত্তি, কত বন-জঙ্গল পাহাড় পর্ব্বত, কত নদ-নদী জলপ্রপাত এমন আর কি আছে, যাহার গল্প লোকের মুখে শুনিয়া নিজে দেখিবার কল্পনা কোনদিন তাহার মনে স্থান পায় নাই। এইবার সেই সকল আশ্চর্য্য সে স্বচক্ষে দেখিতে চলিয়াছে। তাহা ছাড়া সেখানে তাহার স্বামী ভগ্ন দেহ ফিরিয়া পাইবে, একাকী সেই সেখানে ঘরণী, গৃহিণী, সর্ব্বকার্য্যে স্বামীর সাহায্যকারিণী। সেখানে জল-বায়ু স্বাস্থ্যকর সেখানে জীবনযাত্রার পথ সহজ ও সুগম, তিনি ভাল হইলে, হয়ত একদিন তাহারা সেইখানেই তাহাদের ঘর-সংসার পাতিয়া বসিবে, এবং অচির-ভবিষ্যতে যে সকল অপরিচিত অতিথিরা একে একে আসিয়া তাহাদের গৃহস্থালী পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবে, তাহাদের প্রিয় মুখগুলি নিতান্ত পরিচিতের মতই সে যেন চোখের উপর স্পষ্ট দেখিতে লাগিল। এম্‌নি কত কি যে সুখের স্বপ্ন দিবানিশি তাহার মাথার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল তাহার ইয়ত্তা নাই। আর সকল কথার মধ্যে স্বামী যে তাহাকে ছাড়িয়া আর স্বর্গে যাইতেও ভরসা করেন না, এই কথাটা মিশিয়া যেন তাহার সমস্ত চিন্তাকেই একেবারে মধুময় করিয়া তুলিল। আর তাহার কাহারও বিরুদ্ধে কোন ক্ষোভ, কোন নালিশ রহিল না,—অন্তরের সমস্ত গ্লানি ধুইয়া মুছিয়া গিয়া হৃদয় গঙ্গাজলের মত নির্ম্মল ও পবিত্র হইয়া উঠিল। আজ তাহার বড় সাধ হইতে লাগিল, যাইবার আগে একবার মৃণালকে দেখে, এবং সমস্ত বুক দিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া জানা, অজানা সকল অপরাধের ক্ষমা ভিক্ষা মাগিয়া লয়। আজ সুরেশের জন্যও তাহার প্রাণ কাঁদিতে লাগিল। সে যে পরম বন্ধু হইয়াও লজ্জায় সঙ্কোচে তাহাদের দেখা দিতে পারে না, তাহার এই দুর্ভাগ্যের গোপন বেদনাটি সে আজ যেমন অনুভব করিল, এমন বোধ করি কোন দিন করে নাই। তাঁহারো কাছে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা চাহিয়া বিদায় লইবার আছে। কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া জানিল তিনি কাল হইতেই গৃহে নাই।

যাইবার দিন সকাল হইতেই আকাশে মেঘ করিয়া টিপিটিপি বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। জিনিস-পত্র বাঁধা-ছাঁদা হইয়াছে, কিছু কিছু ষ্টেসনেও পাঠানো হইয়াছে, টিকিট পর্য্যন্ত কেনা হইয়া গেছে। অচলার জন্যও সেকেণ্ড ক্লাস টিকিট কেনার প্রস্তাব হইয়াছিল; কিন্তু সে ঘোরতর আপত্তি তুলিয়া মহিমকে নিরস্ত করিয়াছিল, টাকা মিথ্যে নষ্ট করবার সাধ থাকে ত কিন্‌তে দাও গে। আমি সুস্থ সবল, তা'ছাড়া কত বড়-লোকের মেয়েরা ইন্‌টার ক্লাসের মেয়ে-গাড়ীতে যাচ্চে, আর আমি পারিনে? আমি দেড়া-ভাড়ার বেশী কোনমতেই যাবো না।

সুতরাং সেইরূপ ব্যবস্থাই হইয়াছিল।

সম্পূর্ণ দু'টা দিন সুরেশের দেখা নাই। কিন্তু আজ সকালে দুর্য্যোগের জন্যই হোক্, বা, অপর যে কোন কারণেই হোক্ সে তাহার পড়িবার ঘরে ছিল। এই আনন্দহীন কক্ষের মধ্যে অচলা ঠিক যেন একটা বসন্তের দম্‌কা বাতাসের মত গিয়া প্রবেশ করিল। তাহার কণ্ঠস্বরে আনন্দের আতিশয্য উপ্‌চাইয়া পড়িতেছিল; বলিল, সুরেশ-বাবু, এ জন্মে আমাদের আর মুখ দেখ্‌বেন না না কি? এত বড় অপরাধটা কি করেছি বলুন ত?

সুরেশ চিঠি লিখিতেছিল, মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহাদের বাড়ী পুড়িয়া গেলে আশে পাশের গাছগুলার যে চেহারা অচলা আসিবার দিন চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছিল, সুরেশের এই মুখখানা এম্‌নি করিয়াই তাহাদের স্মরণ করাইয়া দিল যে, সে মনে-মনে শিহরিয়া উঠিল। বসন্তের হাওয়া ফিরিয়া গেল,—সে কি বলিতে আসিয়াছিল, সব ভুলিয়া কাছে আসিয়া উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কি অসুখ করেছে সুরেশবাবু? কৈ, আমাকে ত এ কথা কেউ বলেনি!

শুধু পলকের নিমিত্তই সুরেশ মুখ তুলিয়াছিল। তৎক্ষণাৎ আনত করিয়া কহিল, না, আমার কোন অসুখ

করেনি, আমি ভালই আছি। বলিয়া সে বইখানার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে পুনরায় কহিল, আজি ত তোমরা যাবে,—সমস্ত ঠিক হয়েচে? কতকাল হয় ত আর দেখা হবে না!

কিন্তু মিনিট-খানেক পর্য্যন্ত অপর পক্ষ হইতে কোন উত্তর না পাইয়া সুরেশ বিস্ময়ে মুখ তুলিয়া চাহিল। অচলার দুই চক্ষু জলে ভাসিতেছিল, চোখো-চোখি হইবামাত্রই বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা টপ্ টপ্ করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

সুরেশের ধমনীতে উষ্ণ রক্তস্রোত উন্মত্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু আজ সে তাহার সমস্ত শক্তি একত্র করিয়া আপনাকে সংযত করিয়া দৃষ্টি অবনত করিল।

অচলা অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া গাঢ়স্বরে বলিয়া উঠিল, তোমার কথ্খনো শরীর ভাল নেই, সুরেশবাবু, তুমিও আমাদের সঙ্গে চল।

সুরেশ মাথা নাড়িয়া শুধু বলিল, না।

না, কেন? তোমার জন্যে—" কথাটা শেষ হইতে পাইল না। দ্বারের বাহিরে হইতে বেহারা ডাকিয়া কহিল, বাবু আপনার চা—বলিতে বলিতে সে পর্দ্দা সরাইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। এবং পরক্ষণেই অচলা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বাহির হইয়া গেল।

ঘণ্টা খানেক পরে সে তাহার স্বামীর কক্ষে প্রবেশ করিলে মহিম জিজ্ঞাসা করিল, সুরেশ ক'দিন থেকে কোথায় গেছে জানো? পিসিমাকেও কিছু বলে যায়নি; সে কি আজও আমার সঙ্গে দেখা ক'রবে না না কি?

অচলা আস্তে-আস্তে কহিল, আজ ত তিনি বাড়ীতেই আছেন।

মহিম কহিল, না। এইমাত্র আমাকে ঝি বলে গেল সে সকালেই কোথায় বেরিয়ে গেছে।

অচলা চুপ করিয়া রহিল। ক্ষণকাল পূর্ব্বেই যে তাহার হিত সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল, সে যে অতিশয় অসুস্থ, সে যে লে-বেলার মত এবারও তোমার জীবন রক্ষা করিয়াছে, শুধু কেবল এইটুকু কৃতজ্ঞতার জন্যও একবার তাহাকে মাদের ওখানে আহ্বান করা উচিত,—আর তাহাকে ভয় ই—লজ্জিতাকে সংশয়ের চক্ষে দেখিয়া আর লজ্জা দিয়ো —তাহার অন্তরের এই সকলের একটা কথাও জিহ্বা জ উচ্চারণ করিতে পারিল না। সে স্বামীর মুখের প্রতি ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিতে পর্য্যন্ত পারিল না; নিঃশব্দে নিরুত্তরে হাতের কাছে যে-কোন-একটা কাজের মধ্যে আপনাকে নিযুক্ত করিয়া দিল।

ক্রমশঃ ষ্টেসনে যাইবার সময় নিকটবর্ত্তী হইয়া উঠিল। নীচে কেদারবাবুর হাঁক-ডাক শোনা গেল, এবং পিসীমা পূর্ণ-ঘট প্রভৃতি লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। চাকরেরা জিনিস-পত্র গাড়ীর মাথায় তুলিয়া দিল;—শুধু যিনি গৃহস্বামী তাঁহারই কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না। অথচ, এই লইয়া প্রকাশ্যে কেহ আলোচনা করিতেও সাহস করিল না,—ব্যাপারটা ভিতরে ভিতরে এম্‌নিই যেন সকলকে কুণ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছিল।

কেদারবাবু কন্যাকে একটু নিরালায় পাইয়া মাথায় হাত দিয়া স্নেহার্দ্র কণ্ঠে কহিলেন, সতীলক্ষ্মী হও মা, মায়ের মত হও। বুড়ো-বয়সে না বুঝে অনেক মন্দ কথা বলেচি মা, রাগ করিস্‌নে। বলিয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া গেলেন।

মহিম গাড়ীতে উঠিতে গিয়া অচলাকে একান্ত ক্ষুণ্ণস্বরে চুপি চুপি কহিল, সে সত্যিই আমাদের সঙ্গে দেখা করলে না। একটা কথা তাকে বল্‌বার জন্যে আমি দু'দিন পথ চেয়ে ছিলাম।

পিতার বাক্যে তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল, সে কেবল ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না।

দ্বারের অন্তরালে পিসীমা দাঁড়াইয়া ছিলেন। অচলা প্রগাঢ় ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিতেই তিনি গদ্গদ কণ্ঠে অসংখ্য আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, হাতের নোয়া অক্ষয় হোক্, মা, স্বামীকে নীরোগ কোরে শীগ্‌গীর ফিরিয়ে এনো, এই প্রার্থনা করি!

এই আমার সব চেয়ে বড় আশীর্ব্বাদ পিসীমা! বলিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে সে গাড়ীতে গিয়া বসিল। কথাটা কেদারবাবুরও কানে গেল। তিনি নিজের অমার্জ্জনীয় সন্দেহের লজ্জায় মরমে যেন মরিয়া গেলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

হাওড়া ষ্টেসন হইতে পশ্চিমের গাড়ী ছাড়িতে মিনিট-দশেক মাত্র বিলম্ব আছে। বাহিরে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, টিপি-টিপি বৃষ্টির আর বিরাম নাই। লোকের পায়ে-পায়ে জলে কাদায় সমস্ত প্ল্যাটফর্ম ভরিয়া উঠিয়াছে,—যাত্রীরা

পিছল বাঁচাইয়া, ভিড় ঠেলিয়া কোনমতে মোট-ঘাট লইয়া যায়গা খুঁজিয়া ফিরিতেছে;—এম্‌নি সময়ে অচলা বিবর্ণ মুখে চাহিয়া দেখিল প্রকাণ্ড একটা ব্যাগ হাতে করিয়া সুরেশ আসিতেছে!

বিস্ময়ে, দুশ্চিন্তায় কেদার বাবুর মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল; সে কাছে আসিতে-না-আসিতে তিনি চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি সুরেশ? তুমি কোথায় চলেচ?

জবাবটা সুরেশ অচলাকে দিল। তাহারই মুখের প্রতি চাহিয়া শুষ্ক হাসিয়া বলিল, না:—তোমার উপদেশ এবং নিমন্ত্রণ কোনটাই অবহেলা করা চলে না দেখ্‌লুম। আজ সকালবেলা তুমি অমন কোরে চোখে আঙুল দিয়ে না দেখালে হয়ত ধরতেই পারতুম না, শরীর আমার কত খারাপ হয়ে গেছে! চল, তোমাদের অতিথি হয়েই দিন-কতক দেখি সারতে পারি কি না! বাস্তবিক বলচি ম——

বেশ্‌ত, বেশ্‌ত, সুরেশ। তা'ছাড়া নূতন যায়গায় আমাদেরও ঢের সাহায্য হবে। বলিয়া মহিম পলকের জন্য একবার অচলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। সেই মুহূর্ত্তের নিঃশব্দ ব্যথিত দৃষ্টি যেন সকলকেই উচ্চকণ্ঠে শুনাইয়া অচলাকে কহিয়া উঠিল, আমাকে বলিলে না কেন? যাহার স্বাস্থ্য লইয়া মনে মনে এত উৎকণ্ঠা ভোগ করিয়াছ, আজ সকালবেলা পর্য্যন্ত উভয়ে যে কথা আলোচনা করিয়াছ, আমাকে তাহা ঘুণাগ্রে জানিতে দাও নাই কেন? এই লুকাচুরির কি প্রয়োজন ছিল অচলা!

কিন্তু অচলা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল এবং সুরেশ ক্ষণকাল বিমূঢ়ের মত থাকিয়া অকস্মাৎ ভিতরের উত্তেজনা বাহিরে ঠেলিয়া আনিয়া অকারণ ব্যস্ততার সহিত বলিয়া উঠিল, কিন্তু আর ত দেরি নেই। চল চল, গাড়ীতে উঠে তার পরে কথাবার্ত্তা। চলুন কেদারবাবু। বলিয়া সে কেবল মাত্র সম্মুখের দিকেই চোখ রাখিয়া সকলকে এক-প্রকার যেন ঠেলিয়া লইয়া চলিল।

কেদারবাবু বহুক্ষণ পর্য্যন্ত কোন কথা কহিলেন না। মহিমকে তাহার যায়গায় বসাইয়া দিয়া অচলাকে মেয়েদের গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন। শুধু গাড়ী ছাড়িবার সময় সুরেশ হেঁট হইয়া যখন তাঁহাকে নমস্কার করিয়া মহিমের পার্শ্বে গিয়া বসিল, তখনই তাহাকে বলিলেন, তুমি সঙ্গে আছ, আশা করি পথে বিশেষ কোন কষ্ট হবে না। মেয়েদের গাড়ীটা একটু দূরে রইল, মাঝে মাঝে খবর নিয়ো সুরেশ। এবং মহিমকে আর একবার সতর্ক করিয়া দিয়া কহিলেন, পৌঁছেই খবর দিতে যেন ভুল হয় না—দেখো। আমি অতিশয় উদ্বিগ্ন হয়ে থাক্‌ব,—বলিয়া চোখের জল চাপিয়া প্রস্থান করিলেন। তাঁহার বিষণ্ণ মলিন মুখ, ও স্নেহার্দ্র কণ্ঠস্বর বহুক্ষণ পর্য্যন্ত দুই বন্ধুরই কানের মধ্যে বাজিতে লাগিল।

গাড়ী ছাড়িলে ঠাণ্ডার ভয়ে মহিম কম্বল মুড়ি দিয়া অবিলম্বে শুইয়া পড়িল, কিন্তু সুরেশ সেইখানে এক-ভাবে পাথরের মূর্ত্তির মত বসিয়া রহিল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিবার সেখানে লোক কেহ ছিল না, থাকিলে, যে-কেহ বলিতে পারিত, ওই দুটো চোখের দৃষ্টি আজ কোন মতেই স্বাভাবিক নয়;—ভিতরে অতি-বড় অগ্নিকাণ্ড ঘটিতে না থাকিলে মানুষের চোখ দিয়া কিছুতেই অমন কঠিন আলো ফুটিয়া বাহির হয় না।

স্লো-প্যাসেঞ্জার ছোট-বড় প্রত্যেক ষ্টেসনেই ধরিতে ধরিতে মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল, এবং বাহিরে গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি সমভাবেই বর্ষিতে লাগিল। একটা বড় ষ্টেসনে গাড়ী থামিবার উপক্রম করিলে মহিম তাহার আবরণের ভিতর হইতে মুখ বাহির করিয়া কহিল, ভিড় ছিল না, একটু শুয়ে নিলে না কেন সুরেশ? এমন সুবিধে ত বরাবর আশা করা যায় না।

সুরেশ চমকিয়া বলিল, হাঁ, এই যে শুই!

এই চমকটা এম্‌নি অসঙ্গত ও অকারণে কুণ্ঠিত দেখাইল যে, মহিম সবিস্ময়ে অবাক্ হইয়া রহিল। সে যেন তাহার অগোচরে কি একটা অপরাধ করিতেছিল, ধরা পড়ার ভয়েই এমন ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, এই ভাবটা মহিম অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মন হইতে দূর করিতে পারিল না।

গাড়ী আসিয়া ষ্টেসনে থামিল।

সুরেশ আপনার অবস্থাটা অনুভব করিয়া একটুখানি হাসির আভাসে মুখখানা সরস করিয়া কহিল, আমি ভেবে-ছিলুম তুমি ঘুমোচ্চ, তাই এম্‌নি চম্‌কে উঠেছিলুম—

মহিম শুধু কহিল, হুঁ; কিন্তু এই অনাবশ্যক কৈফিয়ৎ-টাও তাহার ভাল লাগিল না।

সুরেশ বলিল, তাঁর কিছু চাই কি না, একবার খবর নিতে পারলে—

"কিন্তু জল পড়চে না ?"

"ও কিছুই নয়, আমি চট্ করে দেখে আস্‌চি" বলিয়া সুরেশ দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গেল। সে মেয়ে-গাড়ীর সুমুখে আসিয়া দেখিল অচলা ইতিমধ্যে একটী সমবয়সী সঙ্গী পাইয়াছে, এবং তাহারই সহিত গল্প করিতেছে। সেই অগ্রে সুরেশকে দেখিতে পাইয়া অচলার গা টিপিয়া দিয়া মুখ ফিরিয়া বসিল। অচলা চাহিয়া দেখিতেই সুরেশ কিছু চাই কি না, জিজ্ঞাসা করিল।

অচলা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না। তোমার জলে ভিজতে হবে না, যাও। বলিয়াই কিন্তু নিজে জানালার কাছে উঠিয়া আসিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, আমার জন্যে তোমাকে ভাব্‌তে হবে না, কিন্তু যাঁর জন্যে ভাবনা তাঁরি প্রতি যেন দৃষ্টি থাকে।

সুরেশ কহিল, তা' আছে; কিন্তু তোমার কিছু খাবার কিম্বা চা, কিম্বা শুধু একটু জল—

অচলা সহাস্যে বলিল, না গো না, আমার কিচ্ছু চাই-নে। কিন্তু তুমি নিজে কি জলে ভিজে অসুখ করতে চাও না কি ?

সুরেশ পলক মাত্র অচলার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই চক্ষু আনত করিল; কহিল, অনেকদিন থেকেই ত চাইচি, কিন্তু হতভাগোর কাছে অসুখ পর্য্যন্ত ঘেঁস্‌তে চায় না যে!

কথা শুনিয়া অচলার কর্ণমূল পর্য্যন্ত লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু পাছে সুরেশ মুখ তুলিয়াই তাহা দেখিতে পায়, এই আশঙ্কায় সে কোনমতে ইহাকে একটা পরিহাসের আকার দিতে জোর করিয়া হাসিয়া বলিল, আচ্ছা, এবার চল না। তখন এমন খাটুনি খাটাবো যে—

কিন্তু কথাটাকে সে শেষ করিতে পারিল না। তাহার সুগুপ্ত লজ্জা এই ছদ্ম-রহস্যের বাহ্য প্রকাশকে যেন অর্দ্ধপথেই ধিক্কার দিয়া থামাইয়া দিল।

গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিল; সুরেশ কি বলিবার জন্য মুখ তুলিয়াও অবশেষে কিছুই না বলিয়াই চলিয়া যাইতেছিল, সহসা বাধা পাইয়া ফিরিয়া দেখিল তাহার র‍্যাপারের একটা খুঁট অচলার হাতের মুঠার মধ্যে। সে ফিস্ ফিস্ করিয়া অকস্মাৎ তর্জ্জন করিয়া উঠিল, তোমাকে যে আমি সঙ্গে যেতে ডেকেচি, এ কথা সকলের কাছে প্রকাশ করে দিলে কেন? কেন আমাকে অমন অপ্রতিভ করলে?

ঠিক এই কথাটাই সুরেশ তখন হইতে সহস্রবার তোলাপাড়া করিয়া অনুশোচনায় দগ্ধ হইতেছিল; তাই প্রত্যুত্তরে কেবল করুণ কণ্ঠে কহিল, আমি না বুঝে অপরাধ করে ফেলেচি অচলা!

অচলা লেশমাত্র শান্ত না হইয়া তেম্‌নি উত্তপ্ত স্বরে জবাব দিল, না বুঝে বই কি! সকলের কাছে আমার শুধু মাথা হেঁট করবার জন্যেই তুমি ইচ্ছে করে বলেচ!

ট্রেন চলিতে সুরু করিয়াছিল; সুরেশ আর কথা কহিবার অবকাশ পাইল না; অচলা তাহার গায়ের কাপড় ছাড়িয়া দিতেই সে নিরুত্তরে দুরু দুরু বক্ষে দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল। সে কোনদিকে না চাহিয়া ছুটিয়া চলিল বটে, কিন্তু তাহাকে দৃষ্টি দ্বারা অনুসরণ করিতে গিয়া আর একজনের হৃদ্‌স্পন্দন একেবারে থামিয়া যাইবার উপক্রম করিল। অচলার সোজা চোখ পড়িয়া গেল, আর একটা জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া মহিম ঠিক তাহাদের দিকেই চাহিয়া আছে। সে স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া যখন উপবেশন করিল, সেই মেয়েটি জিজ্ঞাসা করিল, উনিই বুঝি আপনার বাবু?

অন্যমনস্ক অচলা শুধু একটা হুঁ দিয়াই আর একটা জানালার বাহিরে গাছ-পালা মাঠ-ময়দানের প্রতি শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল; যে গল্প অসমাপ্ত রাখিয়া সে সুরেশের কাছে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ করিবার আর তাহার প্রবৃত্তি মাত্র রহিল না।

আবার গ্রামের পর গ্রাম, সহরের পর সহর পার হইয়া যাইতে লাগিল, আবার তাহার মনের ক্ষোভ কাটিয়া গিয়া মুখ নির্ম্মল ও প্রশান্ত হইয়া উঠিল, আবার সে তাহার সঙ্গিনীর সহিত সচ্ছন্দ চিত্তে কথাবার্ত্তায় যোগ দিতে পারিল; —যে লজ্জা ঘণ্টাকয়েক মাত্র পূর্ব্বে তাহাকে এরূপ পীড়িত করিয়া তুলিয়াছিল, সে আর তাহার মনেও রহিল না।

একটা বড় ষ্টেসনে সুরেশ খানসামার হাতে চা ও অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী উপস্থিত করিল। অচলা সেগুলি গ্রহণ করিয়া সস্নেহে অনুযোগের স্বরে কহিল, তোমাকে এত হাঙ্গামা করতে কে বলে দিচ্চে বল ত? তোমার বন্ধুরত্নটি বুঝি?

এ বিষয়ে সুরেশ কাহারো যে বলার অপেক্ষা রাখে না অচলা তাহা ভাল করিয়াই জানিত, তথাপি এই অযাচিত যত্নটুকুর পরিবর্ত্তে সে এই স্নিগ্ধ খোঁচাটুকু না দিয়া যেন থাকিতে পারিল না।

সুরেশ মুখ টিপিয়া হাসিয়া চলিয়া যাইতেছিল, অচলা ফিরিয়া ডাকিল। সেই চাপা হাসির আভাসটুকু তখনও তাহার ওষ্ঠাধরে লাগিয়া ছিল; তাহার প্রতি দৃষ্টিপাতমাত্রই অচলা সহসা মুচ্‌কিয়া হাসিয়া ফেলিয়াই লজ্জায় কুণ্ঠায় রাঙা হইয়া উঠিল। এই আরক্ত আভাটুকু সুরেশ দুই চক্ষু দিয়া যেন আকণ্ঠ পান করিয়া লইল।

অচলা স্বামীর সংবাদের জন্যই সুরেশকে ফিরিয়া ডাকিয়াছিল। তাঁহার কোন প্রকার ক্লেশ বা অসুবিধা হইতেছে কি না, কিছু আবশ্যক আছে কি না,—একবার আসিতে পারেন কি না, এই সকল একটী একটী করিয়া জানিয়া লইতে সে চাহিয়াছিল; কিন্তু ইহার পরে এ সম্বন্ধে আর একটী প্রশ্ন করিবারও তাহার শক্তি রহিল না। সে অসঙ্গত গাম্ভীর্য্যের সহিত শুধু জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের ত এলাহাবাদে গাড়ী বদল করতে হবে? কত রাত্রে সেখানে পৌঁছবে জানেন? একবার জেনে এসে আমাকে বলে যেতে পারবেন?

আচ্ছা, বলিয়া সুরেশ একটু আশ্চর্য্য হইয়াই চলিয়া গেল।

অচলা ফিরিয়া আসিয়া দেখিল সেই মেয়েটি তাহার যায়গা ছাড়িয়া দূরে গিয়া বসিয়াছে। অচলা অন্তরের বিরক্তি সম্পূর্ণ গোপন করিতে না পারিয়া কহিল, আপনাদের বাড়ীতে বুঝি কেউ চা-রুটি খায় না?

মেয়েটি সবিনয়ে হাসিয়া বলিল, হায় হায়, ও দৌরাত্ম্য থেকে বুঝি কোন বাড়ী নিস্তার পেয়েচে ভাবেন? ও ত সবাই খায়।

অচলা কহিল, তবে যে বড় ঘৃণায় সরে বস্‌লেন?

মেয়েটি লজ্জিত স্বরে বলিল, না ভাই, ঘৃণায় নয়,—পুরুষেরা ত সমস্তই খায়, তবে আমার স্বামী এ সব পছন্দ করেন না, আর—আমাদের মেয়ে-মানুষের ত—

একদিন এম্‌নি একটা খাওয়া-ছোঁয়ার ব্যাপার লইয়া মৃণালের সহিত তাহার বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল। সেদিনও সে যে কারণে নিজেকে শাসন করিতে পারে নাই, আজও সে তেম্‌নি একটা অন্তর্জ্জ্বালায় আত্ম-বিস্মৃত হইয়া গেল। এবং মেয়েটির কথাটা শেষ না হইতেই রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিল, আপনাকে বিব্রত করতে আমি চাইনে, আপনি সচ্ছন্দে ফিরে এসে আপনার যায়গায় বসুন; বলিয়া চক্ষের নিমিষে চা এবং সমস্ত খাদ্যদ্রব্য জানালা দিয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। মেয়েটি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিঃশব্দে চাহিয়া কাঠের মত বসিয়া রহিল, তাহার পরে একেবারে সম্পূর্ণ মুখ ফিরাইয়া বসিয়া আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে লাগিল। বোধ করি সে ইহাই ভাবিল এতক্ষণের এত আলাপ, এত কথাবার্ত্তার যে বিন্দুমাত্র মর্য্যাদা রাখিল না, না জানি সে এ অশ্রু দেখিয়া আবার কি একটা করিয়া বসিবে।

কিছুক্ষণের জন্য বৃষ্টি থামিলেও আকাশে ঘনমেঘ উত্তরোত্তর জমা হইয়া উঠিতেছিল। অপরাহ্নের কাছাকাছি পুনরায় চাপিয়া জল আসিল। এই জলের মধ্যে মেয়েটি আরায় নামিয়া যাইবে, সে তাহার উদ্যোগ আয়োজন করিতে লাগিল।

অচলা আর স্থির থাকিতে না পারিয়া, একেবারে তাহার পাশে আসিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল, নিজের ব্যবহারের জন্য আমি অত্যন্ত লজ্জিত। আমাকে আপনি মাপ করুন।

মেয়েটি হাসিল, কিন্তু সহসা উত্তর দিতে পারিল না। অচলা পুনরায় কহিল, আমার মন খারাপ থাক্‌লে কি যে করে ফেলি, তার কোন ঠিকানা থাকে না। স্বামী পীড়িত, তাঁকে নিয়ে হাওয়া বদ্‌লাতে যাচ্চি—ভাল হ'ন ভালই, না হলে ওই বিদেশে কি যে আমার হবে তা শুধু ভগবানই জানেন। বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠ আর্দ্র হইয়া উঠিল।

মেয়েটি বিস্মিত হইয়া কহিল, কিন্তু আপনার স্বামীকে দেখ্‌লে ত পীড়িত বলে মনে হয় না।

অচলা কহিল, আমার স্বামী এই গাড়ীতেই আছেন, কিন্তু, আপনি তাঁকে দেখেন নি। উনি আমার স্বামীর বন্ধু।

মেয়েটি অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া চুপ করিয়া রহিল।

এই বন্ধুটি তাহার স্বামী কি না জিজ্ঞাসা করায় সে যে হুঁ বলিয়া সায় দিয়াছিল, এ কথা অচলার মনেই ছিল না, কিন্তু মেয়েটি তাহা বিস্মৃত হয় নাই। কিন্তু, তাহার

বিস্ময়কে অচলা সম্পূর্ণ অন্য ভাবে গ্রহণ করিল। সুরেশের সহিত তাহার আচরণ ও বাক্যালাপকে সে নিজের অন্তরের লজ্জা দিয়া বিকৃত করিয়া সাধারণ হিন্দুনারীর চক্ষে ইহা কিরূপ বিসদৃশ দেখাইয়াছে, তাহাই কল্পনা করিয়া লজ্জায় মরিয়া গেল। এবং একান্ত নিরর্থক জবাবদিহির স্বরূপে বলিয়া ফেলিল, আমরা হিন্দু নই—ব্রাহ্ম।

মেয়েটি তবুও মৌন রহিল দেখিয়া অচলা সসঙ্কোচে তাহার হাতখানি ছাড়িয়া দিয়া কহিল, আমাদের আচার-ব্যবহার আপনারা সমস্ত বুঝ্‌তে না পারলেই আমাদের অদ্ভুত বলে ভাব্‌বেন না।

এইবার মেয়েটি হাসিল, কহিল, আমরা ত ভাবিনে, বরঞ্চ আপনারাই যে-কোন কারণে হোক আমাদের থেকে দূরে থাকতে চান্‌। কেমন কোরে জান্‌লুম? আমাদেরই দুই একটি আত্মীয় আছেন যাঁরা আপনাদের সমাজের। তাঁদের কাছে থেকেই আমি জান্‌তে পেরেচি। বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

অচলা জিজ্ঞাসা করিল, সেই কারণটি কি?

মেয়েটি কহিল, সে আপনি নিশ্চয় জানেন। না জানেন ত সমাজের কাউকে জিজ্ঞেসা করে নেবেন। বলিয়া হাসিয়া প্রসঙ্গটা অকস্মাৎ চাপা দিয়া কহিল, আচ্ছা, অত দূরে না গিয়ে আপনার স্বামীকে নিয়ে কেন আমাদের ওখানে আসুন না!

"কোথায়, আরায়?"

"মাগো! সেখানে কি মানুষ থাকে! আমার উনি ঠিকেদারী কাজ করেন বলেই আমাকে মাঝে মাঝে আরায় গিয়ে থাকতে হয়। আমি ডিহ্‌রীর কথা বল্‌চি। শোন নদীর ওপর আমাদের ছোট একটী বাড়ী আছে, সেখানে দু'দিন থাক্‌লে আপনার স্বামী ভাল হয়ে যাবেন। যাবেন সেখানে? বলিয়া মেয়েটি অচলার হাত দুটি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া উত্তরের আশায় তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

এই অপরিচিতার ঔৎসুক্য ও আন্তরিক আগ্রহ দেখিয়া অচলা মুগ্ধ হইয়া গেল। কহিল, কিন্তু আপনার স্বামীর ত অনুমতি চাই। তিনি না বল্‌লে ত যেতে পারি নে।

মেয়েটি মাথা নাড়িয়া বলিল, ইস্‌, তাই বই কি! আমরা সেবা করতে দাসী বলে বুঝি সব তাতেই দাসী? মনেও করবেন না। হুকুম দেবার বেলায় আমরাই ত কর্ত্তা। সে দেশ পছন্দ না হলে সোজা ডিহ্‌রীতে চলে আস্‌বেন,—এতটুকু চিন্তা করবেন না, এই আপনাকে আমি বলে দিলুম। অনুমতি নিতে হয়, আমি তাঁর নেব, আপনার কি গরজ? বলিয়া এই স্বামী-সৌভাগ্যবতী মেয়েটি তাহার আনন্দের আতিশয্যে অচলাকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া ধরিল।

আরা ষ্টেসন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে তাহা ট্রেণের মন্দ-গতিতে বুঝা গেল। সে অচলার হাত দুটি পুনরায় নিজের ক্রোড়ের মধ্যে টানিয়া লইয়া আবেগ ভরে বলিল, আমার সময় হ'ল আমি চল্‌লুম, কিন্তু আপনি ভেবে ভেবে মিথ্যে মন খারাপ করতে পাবেন না, বলে যাচ্চি। আপনার কোন ভয় নেই, স্বামী আপনার খুব শীগ্‌গীর ভাল হয়ে উঠ্‌বেন। কিন্তু কথা দিন, ফেরবার পথে একটীবার আমার ওখানে পায়ের ধূলো দিয়ে যাবেন?

অচলা চোখের জল চাপিয়া বলিল, সে দিন যদি পাই, নিশ্চয় আপনাকে একবার দেখে যাবো।

মেয়েটি বলিল, পাবেন বৈ কি, নিশ্চয় পাবেন। আপনাকে আমি চিন্‌তে পেরেচি। এই আমি বলে যাচ্চি, আপনার এত বড় ভক্তি-ভালবাসাকে ভগবান কখনো বিমুখ করবেন না,—এমন হতেই পারে না!

অচলা জবাব দিতে পারিল না, মুখ ফিরাইয়া একটা উচ্ছ্বসিত বাষ্পোচ্ছ্বাস সম্বরণ করিয়া লইল।

বৃষ্টির মধ্যে গাড়ী আসিয়া প্ল্যাটফর্মে থামিল। মেয়েটির ছোট দেবর অন্যত্র ছিল, সে আসিয়া গাড়ীর দরজা খুলিয়া দাঁড়াইল। অচলা তাহার কানের কাছে মুখ আনিয়া চুপি চুপি কহিল, আপনার স্বামীর নাম ত মুখে আন্‌বেন না জানি, কিন্তু আপনার নিজের নামটি কি বলুন ত? যদি কখনো ফিরে আসি, কি কোরে আপনার খোঁজ পাব?

মেয়েটি মৃদু হাসিয়া কহিল, আমার নাম রাক্ষুসী। ডিহ্‌রীতে এসে কোন বাঙালীর মেয়েকে জিজ্ঞেসা করলেই সে আমার সন্ধান বলে দেবে। কিন্তু দুজনে একত্রে একবার এসো ভাই। আমার মাথার দিব্যি রইল, আমি পথ চেয়ে থাক্‌বো! শোন নদীর উপরেই আমাদের বাড়ী। এই বলিয়া মেয়েটি দুই হাত জোড় করিয়া হঠাৎ একটা নমস্কার করিয়াই ভিজিতে ভিজিতে বাহির হইয়া গেল।

বাষ্পীয় শকট আবার ধীরে ধীরে যাত্রা করিল। এই মাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে; কিন্তু, অবিশ্রাম বারিপাতের সঙ্গে বাতাস যোগ দিয়া এই দুর্য্যোগের রাত্রিকে যেন শতগুণ ভীষণ করিয়া তুলিয়াছে। জানালার কাচের ভিতর দিয়া চাহিয়া তাহার দৃষ্টি পীড়িত হইয়া উঠিল,—তাহার কেবলি মনে হইতে লাগিল এই সূচিভেদ্য অন্ধকার তাহার আদি-অন্ত যেন গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। আলোর মুখ, আনন্দের মুখ আর সে কখনো দেখিবে না,—ইহা হইতে এ জীবনে আর তাহার মুক্তি নাই! সঙ্গীবিহীন নির্জ্জন কক্ষের মধ্যে সে একটা কোণের মধ্যে আসিয়া গায়ের কাপড়টা আগা-গোড়া টানিয়া দিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িল; এবং এইবার তাহার মুদিত দুই চক্ষু বাহিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কেন যে এই চোখের জল, ঠিক কি যে তাহার এতবড় দুঃখ, তাহাও সে ভাবিয়া পাইল না, কিন্তু কান্নাকেও সে কোন মতে আয়ত্ত করিতে পারিল না। অদম্য তরঙ্গের মত সে তাহার বুকের ভিতরটা যেন চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া গর্জ্জিয়া ফিরিতে লাগিল। তাহার পিতাকে মনে পড়িল, তাহার ছেলেবেলার সঙ্গী-সাথীদের মনে পড়িল, পিসীমাকে মনে পড়িল, মৃণালকে মনে পড়িল, এইমাত্র যে মেয়েটি রাক্ষসী বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়া গেল তাহাকে মনে পড়িল,—যদু চাকরটা পর্য্যন্ত যেন তাহার চোখের উপর দিয়া বারবার আনাগোনা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। সকলের নিকট হইতেই সে যেন জন্মের শোধ বিদায় লইয়া কোথায় কোন্ নিরুদ্দেশ যাত্রা করিয়াছে, বক্ষের মধ্যে তাহার এম্‌নি ব্যথা বাজিতে লাগিল।

এই ভাবে নিরন্তর অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া গাড়ী যখন পরের ষ্টেসনে আসিয়া থামিল, তখন বেদনাতুর হৃদয় তাহার অনেক শান্ত হইয়া গিয়াছে। সে উঠিয়া বসিয়া ব্যাকুল দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল যদি কোন স্ত্রীলোক যাত্রী এই দুর্য্যোগের রাত্রেও তাহার কক্ষে দৈবাৎ পদার্পণ করে। ভিজিতে ভিজিতে কেহ কেহ নামিয়া গেল, কেহ কেহ উঠিলও বটে, কিন্তু তাহার কামরার সন্নিকটেও কেহ আসিল না।

গাড়ী ছাড়িলে শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া সে তাহার যায়গায় ফিরিয়া আসিল, এবং আপাদ-মস্তক আচ্ছাদিত করিয়া পূর্ব্ববৎ শুইয়া পড়িতেই এবার কোন্ অচিন্তনীয় কারণে তাহার দুঃখার্ত্ত চিত্ত অকস্মাৎ সুখের কল্পনায় ভরিয়া উঠিল। কিন্তু ইহা নূতন নহে; যে দিন বায়ু-পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব প্রথম উত্থাপিত হয়, সেদিনও সে এম্‌নি স্বপ্নই দেখিয়াছিল। আজও সে তেমনি তাহার রুগ্ন স্বামীকে স্মরণ করিয়া তাঁহারই স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুঃ কামনা করিয়া এক অপরিচিত স্থানের মধ্যে আনন্দ ও সুখ-শান্তির জাল বুনিতে বুনিতে বিভোর হইয়া গেল।

কখন্ এবং কতক্ষণ যে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তাহার স্মরণ নাই। সহসা নিজের নাম কানে যাইবামাত্রই সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া দেখিল দ্বারের কাছে সুরেশ দাঁড়াইয়া, এবং সেই খোলা দরজার ভিতর দিয়া অজস্র জল-বাতাস ভিতরে ঢুকিয়া প্লাবনের সৃষ্টি করিয়াছে।

সুরেশ চীৎকার করিয়া কহিল, শীগ্‌গীর নেবে পড়, ও প্লাটফর্মে গাড়ী দাঁড়িয়ে! তোমার নিজের ব্যাগটা কোথায়?

অচলার দুই চক্ষে ঘুম তখনও জড়াইয়া ছিল, কিন্তু তাহার মনে পড়িল এলাহাবাদ ষ্টেসনে জব্বলপুরের জন্য গাড়ী বদল করিতে হইবে। সে ব্যাগটা দেখাইয়া দিয়া শশব্যস্তে নামিয়া পড়িয়া ব্যাকুল হইয়া কহিল, কিন্তু এত জলের মধ্যে তাঁকে নামাবে কি করে? এখানে পাল্কী-টাল্কি কিছু কি পাওয়া যায় না? নইলে অসুখ যে বেড়ে যাবে সুরেশ বাবু!

সুরেশ কি যে জবাব দিল জলের শব্দে তাহা বুঝা গেল না। সে এক হাতে ব্যাগ ও অপর হস্তে অচলার একটা হাত দৃঢ়মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়া ওদিকের প্লাটফর্মের উদ্দেশে দ্রুতপদে টানিয়া লইয়া চলিল। এই ট্রেনটা ছাড়িবার জন্য প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। তাহারই একটা যাত্রীশূন্য ফার্ষ্ট ক্লাস কামরার মধ্যে অচলাকে ঠেলিয়া দিয়া সুরেশ তাড়াতাড়ি কহিল, তুমি স্থির হয়ে বোসো, তাকে নামিয়ে আনিগে।

"তা'হলে আমার এই মোটা গায়ের কাপড়টা নিয়ে যাও, তাঁকে বেশ করে ঢেকে এনো" বলিয়া অচলা হাত বাড়াইয়া তাহার গাত্রবস্ত্রটা সুরেশের গায়ের উপর ফেলিয়া দিতেই সে দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

অন্ধকারে যতদূর দৃষ্টি যায় অচলা সম্মুখে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। পোষ্টের উপর দূরে দূরে ষ্টেসনের লণ্ঠন জ্বলিতেছে; কিন্তু এই প্রচণ্ড জলের মধ্যে সে আলোক

এমনি অস্পষ্ট ও অকিঞ্চিৎকর যে তাহার সাহায্যে কিছুই প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। জলে ভিজিয়া যাত্রীরা ছুটাছুটি করিতেছে, কুলিরা মোট বহিয়া আনাগোনা করিতেছে, কর্ম্মচারীরা বিব্রত হইয়া উঠিয়াছে,—ঝাপ্‌সা ছায়ার মত তাহা দেখা যায় মাত্র। ক্রমশঃ তাহাও বিরল হইয়া আসিল, ষ্টেসনের ঘণ্টা তীক্ষ্নরবে বাজিয়া উঠিল এবং যে ট্রেন হইতে অচলা এইমাত্র নামিয়া আসিয়াছে, ভীষণ অজগরের ন্যায় ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দে তাহা আকাশ কম্পিত করিয়া প্লাটফর্ম ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া গেল। এবং যতদূর দেখা যায় এক অখণ্ড অন্ধকার ব্যতীত সম্মুখে আর কোন ব্যবধানই রহিল না।

আবার ঘণ্টায় ঘা পড়িল। ইহা যে এ গাড়ীর জন্য অচলা তাহা বুঝিল, কিন্তু তাঁহারা উঠিলেন কি না, কোথায় উঠিলেন, জিনিস-পত্র সমস্ত তোলা হইল, কিম্বা কিছু রহিয়া গেল, কিছুই জানিতে না পারিয়া সে অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া উঠিল।

একজন পিয়াদা সর্ব্বাঙ্গ কম্বলে ঢাকিয়া নীল লণ্ঠন হাতে বেগে চলিয়াছিল; সুমুখে পাইয়া অচলা ডাকিয়া প্রশ্ন করিল সমস্ত প্যাসেঞ্জার উঠিয়াছে কি না। প্রথম শ্রেণীর কাম্‌রা দেখিয়া লোকটা থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, হাঁ মেম্‌সাহেব। অচলা কতকটা সুস্থির হইয়া সময় জিজ্ঞাসা করায়, লোকটা কহিল, নয় বাজ্‌কে—

নয় বাজ্‌কে? অচলা চমকিয়া উঠিল। কিন্তু এলাহাবাদ পৌঁছিতে ত প্রায় শেষ-রাত্রি হইবার কথা! ব্যাকুল হইয়া প্রশ্ন করিল, এলাহাবাদ—

কিন্তু লোকটা আর দাঁড়াইতে পারিতেছিল না। উপরে ছাদ ছিল না, তাই আকাশের বৃষ্টি ছাড়া গাড়ীর ছাদ হইতে জল ছিট্‌কাইয়া তাহার চোখে-মুখে সূচের মত বিঁধিতেছিল; সে হাতের আলোটা সবেগে নাড়িয়া দিয়া 'মোগলসরাই! মোগলসরাই!' বলিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

বাঁশী বাজাইয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল। এম্‌নি সময়ে সুরেশ তাহার সম্মুখ দিয়া ছুটিতে ছুটিতে বলিয়া গেল—ভয় নেই—আমি পাশের গাড়ীতেই আছি!

সহযোগী সাহিত্য

[শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ]

পরলোক-রহস্য।

(The Edinburgh Review, April, 1918.)

ংরেজ কবি বলিয়া গিয়াছেন, "Old order changeth, ielding place to new." ইংরেজ ভাবুক বলিতেছেন, History repeats itself." অর্থাৎ কবি পুরাতনকে দায় দিয়া নূতনের জন্য স্থান দিতেছেন; আর ভাবুক লিতেছেন, ও সব কিছু নয়; যাহা পূর্ব্বাপর ঘটিয়া াসিতেছে, বরাবরই তাহাই ঘটিবে। পৃথিবীতে নূতন ছুই নাই (There is nothing new under the ın.) এই দুই শ্রেণীর কথার মধ্যে কি কিছু সামঞ্জস্য ছে?

শুনিতে পাই, য়ুরোপীয়ানরা পরলোক মানেন না, জন্ম মানেন না।—ইহলোকই তাঁহাদের সর্ব্বস্ব; মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে সকলই শেষ হয়। তার পর, শেষ বিচারের দিনে (Last Day of Judgment or Doomsday) কবর হইতে মৃতদেহের পুনরুত্থান, ঐ দেহাশ্রয়ী আত্মার পুনরায় তাহাতে সংযোগ এবং ঈশ্বরের নিকট কৃত কর্ম্মের বিচার। খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে স্বর্গ ও নরক আছে। বিচারফলে হয় স্বর্গবাস, না হয় নরক-বাস। পরলোক বা প্রেতলোক সাধারণতঃ য়ুরোপীয়ের নিকট কুসংস্কার বলিয়া বিবেচিত হয়।

কিন্তু ইদানীং য়ুরোপে, বিশেষতঃ আমেরিকায় পরলোক সম্বন্ধে কিছু-কিছু আলোচনা চলিতেছে। সম্প্রতি The Edinburgh Review নামক সাময়িক পত্রে April,

1918) Mr. A. Wyatt Tilby পরলোক-রহস্যের সমাধানের চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি প্রথমেই বলিতেছেন, "The recent revival of interest in psychic questions, and more particularly in the possibility of communion with the dead is undoubtedly a direct outcome of the war." অর্থাৎ আত্মিক ব্যাপারসমূহের প্রতি লোকের পুনরায় মনোযোগ প্রদান এবং বিশেষভাবে মৃত আত্মার সহিত সংযোগের সম্ভাবনার প্রতি লোকের বিশ্বাস, প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধের ফল।

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে আলোচনা হইত এবং পরলোকের অস্তিত্বে লোকের বিশ্বাস ছিল। মধ্যে হয় ত উহা কুসংস্কার বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছিল। এবং কবির সিদ্ধান্ত অনুসারে নূতন মত পুরাতনের স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। তার পর আবার এখন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি আরম্ভ হইয়াছে।

যাহা কুসংস্কার বলিয়া বর্জ্জিত হইয়াছিল, তাহা আবার এখন পুনর্গৃহীত হইতেছে কেন, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া লেখক বলিতেছেন,—লোকে বেশ সুখে-শান্তিতে বাস করিতেছিল, হঠাৎ যুদ্ধ উপস্থিত হইল, আর "the world had changed. When the material universe that had seemed so safe and sufficient was subject to such convulsions, people turned naturally to the older spiritual conceptions for consolation, or at least for some explanation of these disasters." অর্থাৎ পৃথিবীটার অবস্থা হঠাৎ বদলাইয়া গেল। এই জড়-জগৎ বেশ নিরাপদ ও যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইতেছিল। ইহাতে যখন এরূপ আক্ষেপ উপস্থিত হইল, তখন, লোকে সান্ত্বনা লাভের জন্য, অন্ততঃ এই সকল বিপর্য্যয়ের একটা কৈফিয়ৎ লাভের জন্য স্বভাবতঃই তাহাদের সেই পুরাতন আত্মিক বিশ্বাসের আশ্রয় গ্রহণ করিল।

গির্জ্জায় কোনরূপ শান্তি না পাইয়া এবং নূতন কোন তত্ত্ব অবগত হইতে না পারিয়া, "Men and women, and more particularly those women who had lost their men, looked elsewhere for sympathy. Many found it in spiritualism. Seances were organised, mediums brought messages from the dead." অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষ, বিশেষতঃ যে সকল স্ত্রীলোকের পুরুষরা মরিয়া গিয়াছে তাহারা অন্যত্র সহানুভূতির সন্ধান করিতে লাগিল। অনেকে আত্মিক চর্চ্চায় সান্ত্বনা লাভ করিল। মেসমেরিজমের সাহায্যে মধ্যবর্ত্তিরা মৃতের সংবাদ আনিতে লাগিল।

কিন্তু এই ভূত-নামানোর ব্যাপার কি সত্য এবং বিশ্বাসযোগ্য? লেখক নিজে বোধ হয় ইহা বিশ্বাস করেন না; কারণ, তিনি ইহার পরেই বলিতেছেন, "There are thousands of such mourners now, and their grief has created a sinister industry—it has raised up among us a host of seers who profess communication with the dead * * * * * For a few guineas one may purchase a glimpse into a pretended heaven, for a somewhat higher fee the trader in bereavement will undertake to disturb the dead and bring us their authentic messages." অর্থাৎ এখন সহস্র সহস্র ব্যক্তি শোকগ্রস্ত হইয়াছে। তাহাদের দুঃখ একটা অসৎ ব্যবসায়ের সৃষ্টি করিয়াছে। আমাদের মধ্যে এমন একদল অতীন্দ্রিয়-দর্শন-শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছে, যাহারা লোকান্তরিত আত্মার সহিত আলাপ রাখিবার ভান করে; * * * * কয়েক গিনি ব্যয় করিলে যে কেহ অলীক স্বর্গের অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করিবার অধিকার ক্রয় করিতে পারে; আর কিছু বেশী ফী দিলে পরলোক-ব্যবসায়ীরা মৃতব্যক্তিকে নাড়াচাড়া দিয়া তাহাদের সম্বন্ধে সাচ্চা খবর আনিয়া দিতে পারে।

লেখক বলিতেছেন, ক্যাথলিক ধর্ম্ম-সংক্রান্ত উপাখ্যানে এবং বাইবেলে মৃত ব্যক্তির সহিত আলাপের সম্ভাবনা থাকার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এই ব্যাপারটি অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর বিষয়—মানবের অমরত্ব-সমস্যার অংশ মাত্র। আর, মানবের আত্মা যদিই অমর না হয়, তথাপি

অতীন্দ্রিয় একটা জগৎ আছে, যেখানে দেবদূত, ভূত, প্রেত প্রভৃতি বাস করে। "But there can be no communion with the dead." - কিন্তু মৃতের সহিত আলাপ করা অসম্ভব। "And it was largely on this question that Christianity first took its stand." অর্থাৎ প্রধানতঃ এই প্রশ্নটি অবলম্বন করিয়াই প্রথমে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের উদ্ভব হয়। ইহুদি লেখকগণ আত্মার অমরত্ব প্রায়ই স্বীকার করিতেন না; যাঁহারা করিতেন, তাঁহাদের মধ্যেও ইতস্ততঃ ভাব ছিল। কিন্তু "The doctrine of human immortality·········was triumphantly affirmed by the early Christians." প্রথম আমলের খৃষ্টানরা মানবাত্মার অমরত্ব-তত্ত্ব দৃঢ়তার সহিত প্রচার করিলেন। স্বয়ং খৃষ্ট নিজের জীবদ্দশায় ইহার প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তার পর তাঁহার পুনরুত্থান ইহার চূড়ান্ত প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছে।

লেখক মৃত ব্যক্তির পুনরায় জীবন লাভ, আত্মার সহিত দেহের পুনঃসংযোগ প্রভৃতির কথা, যাহা খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে, বিশ্বাস করেন বলিয়া বোধ হয় না; তিনি বলিতেছেন, খৃষ্ট স্বহস্তে তিনটী মৃত ব্যক্তির জীবন দান করিয়াছিলেন; সেণ্ট পলও একজন মরা লোককে বাঁচাইয়াছিলেন; "Must we assume that each of these four had died again, before their evidence which should surely have proved convincing even to the sceptical, could be produced before these doubting crowds?" এই চারিটী লোকের সাক্ষ্য অবিশ্বাসী লোকদিগের হৃদয়ে বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারিত; আমরা কি মনে করিব যে ইহাদের সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই ইহারা পুনরায় মরিয়া গিয়াছিল?

আবার, খৃষ্ট যখন ক্রুশে আবদ্ধ হন, তখন জেরুসেলেমের সমস্ত কবর উন্মুক্ত হইয়াছিল এবং মৃত মুনিঋষিরা জীবিত হইয়া কবরের বাহিরে আসিয়া অপর জীবিত ব্যক্তিগণের সহিত মিশিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের একজনেরও সাক্ষ্য গৃহীত হয় নাই। সেইজন্য লেখক প্রশ্ন করিতেছেন, "Are we, then to assume, what is not even hinted in the text, that these also had all returned to their tombs?" আমরা কি সিদ্ধান্ত করিব যে, এই সকল লোক আবার তাহাদের কবরে ফিরিয়া গিয়াছিল? অথচ, ধর্ম্মশাস্ত্রে এই ঘটনায় আভাষ মাত্র নাই!

The Old and the New Testamentsএ এরূপ মৃতের পুনরায় জীবিত হওয়ার অনেক ঘটনার উল্লেখ আছে; কিন্তু তাহাদের কোন্ প্রমাণও নাই, বিস্তৃত বিবরণও নাই। "Had they been recorded, we should at least have known whether the soul retains its consciousness after its separation from the body." এই সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ হইলে অন্ততঃ জানিতে পারিতাম, দেহের সহিত বিচ্ছিন্ন হইবার পর আত্মার বোধ-শক্তি থাকে কি না।

"It would seem that the prevalent theory among the early Christians was that death entailed a simple suspension of consciousness, a dreamless sleep from which all men should be awakened when the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first." এইরূপ অনুমান হয় যে, প্রথম-প্রথম খৃষ্টানদের মধ্যে এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে, মৃত্যু আর কিছুই নয় - কেবল বোধ-শক্তির সুপ্ত অবস্থা মাত্র—এক প্রকার স্বপ্নহীন নিদ্রা, যে নিদ্রা হইতে—যখন খৃষ্ট স্বয়ং স্বর্গ হইতে নামিয়া দেবদূতগণের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া এবং ঈশ্বরের ভেরিধ্বনির সহিত আহ্বান করিবেন, তখন সকল লোকই জাগ্রত হইবে, এবং সর্ব্বপ্রথমে খৃষ্টের মৃতদেহ উত্থিত হইবে।

কিন্তু বর্ত্তমান বিজ্ঞানের যুগের লেখক দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বেকার সরলবিশ্বাসী খৃষ্টানদের বিশ্বাসে সায় দিতে পারিতেছেন না। তাই তিনি সন্দেহাকুল চিত্তে সিদ্ধান্ত করিতেছেন, "If that were so, the dead would have nothing to reveal." তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে, মৃত ব্যক্তিগণের কিছুই প্রকাশ করিবার থাকিবে না।

কিন্তু ইহাতে এখন আর লোকের তৃপ্তি জন্মিতে পারে না। বিজ্ঞান সমস্ত উল্টাইয়া দিয়াছে। তাই লেখক এই বলিয়া পাঠকগণকে আশ্বস্ত করিয়াছেন যে, "But this theory of a suspension of consciousness slowly faded and ultimately vanished. * * * The theory was insensibly modified to suit the necessity of the case : in place of the dreamless sleep in which Christian and pagan alike awaited the final audit of their deeds and the apportionment of eternal bliss or punishment arose the theory of immediate judgment at the very hour of death, and the existence of a heaven and hell and purgatory as the present destiny of departed souls." কিন্তু এই বোধ-শক্তির সুপ্তিমূলক থিয়োরীটা ক্রমশঃ মলিন হইয়া গিয়া অবশেষে একেবারে অদৃশ্য হইয়াছে। * * * থিয়োরীটা লোকের অজ্ঞাতসারে সংশোধিত হইয়া বর্ত্তমান প্রয়োজনের অনুরূপ আকার ধারণ করিয়াছে। খৃষ্টান এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্মে অবিশ্বাসী উভয় পক্ষই যে স্বপ্নহীন নিদ্রাবস্থায় তাহাদের কার্য্যাবলীর শেষ হিসাব-নিকাশের এবং তাহার ফলাফল অনুসারে অনন্ত স্বর্গ বা নরক ও পাপ-স্খালনের প্রতীক্ষা করিত, তাহার স্থলে এই থিয়োরী গৃহীত হইল যে, মৃত্যুর সময়েই আত্মার পাপ-পুণ্যের বিচার হইয়া যায় এবং আত্মা নরদেহাশ্রয়ে অবস্থিতি কালীন স্বীয় কর্ম্মফলে স্বর্গ বা নরকে প্রেরিত হইয়া থাকে।

কিরূপে ঐ থিয়োরীর ৵প্রাপ্তি হইল তাহার বর্ণনা করিয়া এবং বহু নজীর উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধ-লেখক বলিলেন, "But although the theory was modified from time to time the essential doctrine of the resurrection of the body and the immortality of the soul, which appeared incredible to so many who heard the preaching of the apostles, triumphed, nor has there been any greater or completer triumph of an idea in the whole history of the world. ……The triumph was complete and absolute. ………To this day it remains the central fact of Christian belief, and it is equally accepted by the Mahomedan theology." কিন্তু যদিও ঐ থিয়োরী সময়ে-সময়ে সংশোধিত হইয়াছে, তথাপি, দেহের পুনরুত্থান এবং আত্মার অমরত্ব সংক্রান্ত মূল মতবাদ, যাহা অনেক লোকের নিকট—যাহারা খৃষ্টের শিষ্যগণের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিল—বিশ্বাসের অযোগ্য বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল, জয়লাভ করিয়াছিল; সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাসে অপর কোন মতবাদ এত বেশী এবং এমন সম্পূর্ণভাবে জয়লাভ করিতে পারে নাই।……এই জয়লাভ কেবল সম্পূর্ণ নহে, ইহা অকাট্য, অবিসম্বাদিত। ………আজ পর্য্যন্ত ইহা খৃষ্টানদিগের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের মূল তত্ব, এবং মুসলমানদিগের ধর্ম্ম-বিজ্ঞানে ইহা সমান আদরে গৃহীত হইয়াছে।

ইহা সত্বেও, লেখকের বিশ্বাস, অল্পবয়সে যাহাদের মৃত্যু হয়, তাহারা পরলোকে অনন্ত জীবনের কামনা করিয়া কাল্পনিক তৃপ্তি ও সান্ত্বনা লাভ করিতে পারে বটে, কিন্তু যাহারা দীর্ঘকাল এই সংসার উপভোগ করিয়া বৃদ্ধ বয়সে মরিবে, তাহারা নিশ্চয়ই বলিবে, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি; অনন্ত জীবনের বালাই আর কাজ নাই।

তার পর লেখক দুঃখ করিতেছেন যে, ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতে স্পষ্টাক্ষরে মৃতের ভবিষ্যৎ অবস্থা সম্বন্ধে কিছু নির্দ্ধারিত না হওয়ায় অনেক ক্ষতি হইতেছে; "the obscurity has led directly to spiritualism and its allied follies or rogueries." এই অস্পষ্টতা প্রত্যক্ষভাবে প্রেততত্ত্বের এবং তদনুসঙ্গিক মূর্খতা বা বজ্জাতির সৃষ্টি করিয়াছে।

যুদ্ধে অনেক লোক মারা যাওয়ায়, তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজন শোকার্ত্ত হইয়া প্রেততত্ত্বের সাহায্যে আত্মপ্রসাদ লাভের চেষ্টা করিতেছেন; ইহাতে লেখক আতঙ্কিত হইয়াছেন। তবে তিনি আশা করেন, কালে শোক অপনোদিত হইলে spiritualismএর প্রভাবও কমিয়া আসিবে।

মানবের মৃত্যুর পরবর্ত্তী অবস্থা সম্বন্ধে ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে কোন সদুত্তর পাইবার আশা নাই দেখিয়া, লেখক অন্য

পন্থার সন্ধান করিয়াছেন—"It is a road which starts from the purely material conception of modern biology. জীব বিজ্ঞানের পূর্ণ পার্থিব ধারণা হইতে এই পন্থার আরম্ভ হইয়াছে।

ইহা হইতে জীবন-সংগ্রামের কথা আসিয়া পড়িতেছে। কি মানুষ, কি পশু—উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই জন্মের পরিমাণ বৰ্দ্ধিত হইলেই সঙ্গে-সঙ্গে মৃত্যু-সংখ্যাও বাড়িয়া যাইবে। স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু (natural death) না হইলেও, মানুষ এবং পশুরা পরস্পর কাটাকাটি, মারামারি করিয়া মরিবে; এবং এই জীবন-সংগ্রামে যোগ্যতমের উদ্বর্তন (survival of the fittest) হইবে। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ "may be politically a struggle between democracy and militarism," (রাজনৈতিক হিসাবে ইহা ক্ষাত্রশক্তি ও ডেমোক্রেসীর মধ্যে বিবাদ বলিয়া উক্ত হইলেও) আসলে ইহার কারণ হচ্চে, ("the fact that the rapidly increasing population of Germany sought a redistribution of the world's soil at the expense of the stationary populations of France, while it was itself frightened at the (apparently) still more rapid increase of the rival Slavonic populations" (এইটুকু যে, জার্ম্মাণীর লোকসংখ্যা দ্রুতগতি বৰ্দ্ধিত হইতে থাকায়, এবং ফ্রান্সের লোকসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি না হওয়ায়, জার্ম্মাণী ফরাসীর ঘাড়ে চাপিয়া পৃথিবীর ভূমির নূতন করিয়া ভাগাভাগি করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছিল; পক্ষান্তরে, জার্ম্মাণী অনুমান করিতেছিল যে, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী শ্লাভোনিক জাতি সকলের লোকসংখ্যা জার্ম্মাণীর লোকসংখ্যা অপেক্ষাও দ্রুতগতি বাড়িয়া যাইতেছে; ফলে, জার্ম্মাণীর নিজেরও উদ্বাস্ত হইবার আশঙ্কা জন্মিয়াছিল।)

অতঃপর লেখক প্রকৃত কথার অবতারণা করিয়াছেন,—science ও theologyর দ্বন্দ্ব। "Theology presents us with conclusions; science insists on the investigation of origin." ধর্ম্ম-বিজ্ঞান আমাদের কেবল মীমাংসা দিয়া সন্তুষ্ট করিতে চায়; কিন্তু বিজ্ঞান ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারে না;—বিজ্ঞান বলে, উৎপত্তি-স্থানের অনুসন্ধান কর।—একেবারে গোড়া ধরিয়া টান! "Theology informs us whither the human soul is bound, science would prefer to investigate whence it comes as a preliminary." মানুষ মরিবার পর তাহার আত্মা কোথায় যায়, ধৰ্ম্ম-বিজ্ঞান আমাদিগকে কেবল তাহাই বলিয়া দেয়; বিজ্ঞান চাহে, আত্মা কোথা হইতে আসিল, আগে তাহারই অনুসন্ধান হউক, তার পর সে কোথায় যায় তাহার কথা পরে হইবে।

সর্ব্বশেষে লেখক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, "on the chance meeting of a man and a woman and all that it entails, must depend in the last resort the condition if not the existence of the spirit world." স্ত্রী-পুরুষের দৈবাৎ মিলন ও তাহার পরবর্ত্তী ঘটনাবলীর উপরই প্রেত-জগতের অস্তিত্ব না হউক অবস্থাটা নির্ভর করিতেছে বটে।

কেবল তাহাই নহে; "the doctrine of personal immortality as well as the current theories of the origin of the soul seem to depend upon it." ব্যক্তিগত অমরত্ববাদ এবং আত্মার উৎপত্তি সংক্রান্ত প্রচলিত থিয়োরীগুলিও উহার উপর নির্ভর করে বলিয়া অনুমান হয়।

বৈজ্ঞানিকেরা পশুপক্ষীর বংশানুক্রমের ধারার (heredity) কথা অনেকটা জানেন, কিন্তু মানুষের সম্বন্ধে বড় বেশী কিছু জানেন না। "yet, without this knowledge we cannot expect to investigate the problem of human origins with any success; nor until we have that knowledge can we demand or expect to add or substitute a strictly scientific proof to the religious doctrine of the immortality of the soul." অর্থাৎ মানুষের বংশানুক্রমের ধারা সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিতে না পারিলে, আমরা মানবের উৎপত্তির সমস্যা সম্বন্ধে অনুসন্ধানে কৃতকার্য্য হইবার আশা করিতে পারি না; কিম্বা, যতক্ষণ না আমাদের এই জ্ঞান জন্মে, ততক্ষণ আমরা আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে ধৰ্ম্ম-বিশ্বাসের উপর খাঁটি বৈজ্ঞানিক প্রমাণ যোগ-বিয়োগের আশা বা দাবী করিতেও পারি না।

চট্টগ্রামের সাহিত্য *

[শ্রীআবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ]

আমাদের এই শৈল-কিরীটিনী সাগরাম্বরা জন্মভূমি শুধু নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের আধার নয়, শুধু ফকির-দরবেশের আবাস-স্থল নয়, ইহা চিরদিন কবিত্বেরও পরম রমণীয় নীলোদ্যান—বঙ্গবাণীর প্রিয় বিহার-কানন। বসন্ত-সমাগমেই শুধু কোকিল-কুলের সুধা-নিস্যন্দিনী কাকলী শ্রুতিগোচর হয়, কিন্তু আমাদের জন্মভূমিতে যেন চিরবসন্ত বিরাজমান। বিধাতার অপার অনুগ্রহে চট্টগ্রাম সুপ্রাচীন কাল হইতেই কলকণ্ঠ কবি-কোকিলের মধুর ঝঙ্কারে মুখরিত। মনে হয় যেন সে ঝঙ্কার কখন থামিবার নয়,—সে স্বর-লহরী যেন ফুরাইবার নয়! কালচক্রের আবর্ত্তনে সেই পিককুল কবে কোন্ স্বপ্নময় রাজ্যে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাদের মধুস্রাবী সঙ্গীত-মুর্চ্ছনা আজও বিষয়-তাপ-দগ্ধ মানবের শ্রুতি-বিবরে ধ্বনিত হইয়া অমৃতধারা বর্ষণ করিতেছে! সে অমৃতের রসাস্বাদনে আমরা চিরদিন বিভোর—আজ সমস্ত বঙ্গদেশ প্রমত্ত!

'সংসার-বিষ-বৃক্ষস্য দ্বে ফলে অমৃতোপমে।
কাব্যামৃত-রসাস্বাদঃ সঙ্গমঃ সুজনৈঃ সহ॥

বিধাতার অপার করুণায় এই মহাজনোক্তি আমাদের পক্ষে চিরসত্য। অসংখ্য তাপসের পদরেণু-সংস্পর্শে আমাদের দেশ যেমন ধন্য, অসংখ্য কাব্যামৃতবর্ষী কবির বীণা-ঝঙ্কারেও তেমনি ইহা মুখরিত। মানবের পরম কামনার বস্তু কাব্যামৃত এবং সুজন-সঙ্গম দুইই যেখানে একত্রে মিলে, সে দেশ ধরাতলে নিশ্চয়ই ধন্য!

চট্টগ্রামের নৈসর্গিক অবস্থা কবিত্ব-শক্তি স্ফুরণের পক্ষে একান্ত অনুকূল। এজন্য ইহা চিরদিনই অসংখ্য কবির প্রসূতি। এ দেশবাসীর কাব্য-রস-পিপাসার তীব্রতা অত্যন্ত বিস্ময়োৎপাদক। তাঁহারা কেবল নিজেরাই মধুচক্র নির্ম্মাণ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, নানাদিগ্দেশ হইতে মধু আহরণ করিয়া আনিয়াও তাঁহারা আপনাদের ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছেন। আধুনিক সাহিত্যের কথা যাহাই হউক, এজন্য এ দেশের প্রাচীন সাহিত্য বহুদূর-প্রসারী। সে বিষয়ে বঙ্গের অন্য কোন জেলা ইহার সহিত তুলিত হইতে পারে কি না, সন্দেহ আছে। কেবল শিক্ষিত লোক নয়, এ দেশের অশিক্ষিত কৃষক-হৃদয় পর্য্যন্ত কবিত্ব-প্রবণ। এ দেশের 'সারিগানের' নাম অনেকে শুনিয়াছেন। সেই 'সারিগান' এই কৃষক-হৃদয়েরই ভাবের অভিব্যক্তি। তাহার সরল হৃদয়ে কখন কি ভাবের ঢেউ উঠিয়া উহাকে তরঙ্গায়িত করিয়া তোলে, তাহার ইতিহাস আমাদের মত আর কোন দেশ কখন রক্ষা করে নাই। আমাদের কবি নবীনচন্দ্র এ সকল গানের সরল সৌন্দর্য্যে অত্যন্ত মুগ্ধ ছিলেন। তিনি উহাদের সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইতেন, আর আমরা অবাক্ হইয়া তাঁর সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতাম। এদেশের মাঝিমাল্লাদের মুখে—গ্রাম্য গায়কদের মুখে যে সকল প্রাচীন গান অদ্যাপি শ্রুত হওয়া যায়, এদেশে যে সকল হকিয়ত ও ভাটিয়াল গান আজও প্রচলিত আছে, তাহা সংগৃহীত হইলে দেশের সেকালের কি একটা সুন্দর সুখদ ছবি অঙ্কিত হইয়া যাইবে!

এক সময়ে চট্টগ্রামের পল্লীতে-পল্লীতে প্রাচীন তুলট কাগজে লিখিত অসংখ্য পুঁথি বিরাজ করিত। অধুনা তাহার অধিকাংশই অযত্নে বা কাল প্রভাবে, অগ্নি বা কীটের উপদ্রবে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখনও যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহাও নানা কারণে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। স্বদেশের বা স্বজাতির বিলুপ্তপ্রায় প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধার-কল্পে এখানে কি অন্যত্র দুই চারিজন কর্ত্তৃক কোন চেষ্টা মুসলমানসমাজে অদ্যাপি হয় নাই। একমাত্র এই দীন অভাজনই আপনার অযোগ্যতা ও অক্ষমতা সহকৃত ক্ষুদ্র শক্তির বিনিয়োগে একান্ত সহায়-সম্বল-

* বিগত ১২ই পৌষ হইতে তিন দিন চট্টগ্রামে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ মহাশয় যে অতি সুন্দর অভিভাষণ পাঠ করেন, বিলম্বে হস্তগত হওয়ায় তাহার সমস্তটা প্রকাশ করিবার স্থানাভাব বশতঃ 'চট্টগ্রামের সাহিত্য' শীর্ষক অংশ মাত্র প্রকাশিত হইল।—ভারতবর্ষ-সম্পাদক।

হীন ভাবে আজ ২৫ বৎসর যাবৎ প্রাচীন সাহিত্যের রত্ন-রাজি-সংগ্রহে ব্যাপৃত রহিয়াছে। তাঁহার গবেষণার ফলে হিন্দু কবি ছাড়া এ পর্য্যন্ত শত শত মুসলমান কবির কীর্ত্তি আবিস্কৃত হইয়াছে। আপনারা প্রদর্শনী গৃহে দেখিবেন, আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের সেই অবদানসমূহ যুগ-যুগান্তর ধরিয়া কালের নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও শুধু আমাদের হিতার্থ কেমন দীনহীন বেশে ও করুণ মূর্ত্তিতে আজও আমাদের কৃপা-কটাক্ষ ভিক্ষা করিতেছে।

প্রাচীন সাহিত্যের বহু গ্রন্থ এখনও গৃহস্থের নিভৃত নিকেতনে কাষ্ঠচাপে নিষ্পিষ্ট থাকিয়া কীটকুলের আহার ও হুতাশনের আহুতি যোগাইতেছে। সুতরাং চট্টগ্রামে প্রাচীন কবির সংখ্যা কত, তাহা আজও নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে না। অধুনা দেশে শিক্ষিত লোকের অসদ্ভাব নাই এবং মাতৃভাষার সেবাতেও অনেকের অনুরাগ জন্মিয়াছে। আশা করা যায়, তাঁহাদের চেষ্টায় আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের এই কীর্ত্তিনিচয় সমুদ্ধারের একটা উপায় অবলম্বিত হইবে। আমার জীবন-সূর্য্য এখন মধ্যাহ্ন গগন পার হইয়া পশ্চিমদিকে হেলিয়া পড়িয়াছে। কালের ঝঞ্ঝাবাত আসিয়া কখন এ জীবন-প্রদীপ নিবাইয়া দেয়, জানি না। এ অবস্থায় আমার উপর নির্ভর করিয়া না থাকিয়া আমার স্বজাতীয় যুবক বন্ধুগণ এ মহা গৌরবকর কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করুন। তাঁহারাই দেশের ও সমাজের একমাত্র ভবিষ্য ভরসার স্থল। এই সকল সাহিত্যোপকরণ সংগৃহীত হইলে একদিকে দেশের ও সমাজের গৌরব শতগুণে বর্দ্ধিত হইবে, অপর দিকে মাতৃভাষার মহোপকার সাধিত হইবে।

বঙ্গের আধুনিক সাহিত্য-গগন আমাদের নবীনচন্দ্রের প্রতিভার ভাস্বর আলোকে সমুদ্ভাসিত। আর আমাদের আলাওলকে লইয়া শুধু চট্টগ্রাম নয়, সমগ্র বঙ্গদেশ গৌরবান্বিত। কেবল এই দুইজনকে লইয়াই আমরা স্ফীত বক্ষে বঙ্গ-সাহিত্যের আসরে দণ্ডায়মান হইতে পারি। ইস্লামিক ধর্ম্ম ও সভ্যতায় আমাদের চট্টগ্রামের আসন যেমন অত্যুচ্চে প্রতিষ্ঠিত, ঐস্লামিক বঙ্গ-সাহিত্যেও চট্টগ্রাম তেমনি চিরদিন সাহিত্য-গুরুর সমুচ্চ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিবার অধিকারী। বঙ্গের মুসলমান সাহিত্যরাজ্যে আমাদের আলাওল একচ্ছত্র সম্রাট। তিনি হিন্দু সাহিত্যেও অনেকের উপরে আসন পাইবার উপযুক্ত। তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত ও কবি বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে কখন জন্মগ্রহণ করেন নাই; আর কখন করিবেন কি না, ভবিতব্যতাই জানে। এই স্থান হইতে ৮ মাইল উত্তরে ফতেআবাদের নিকটবর্ত্তী জালালপুর নামক গ্রামে আমাদের এই মহাকবির জন্ম। তিনি ফতেআবাদের তৎকালীন অধিপতি মজলিস কুতুবের অমাত্য-তনয় ছিলেন। অদ্যাপি এই মজলিসের দীঘি বর্ত্তমান। কোন কার্য্যোপলক্ষে তিনি রোসাঙ্গে (আরাকানে) যাইতেছিলেন। পথে হার্ম্মাদের হস্তে পতিত হইয়া তাঁহার পিতা সহিদ হন। তিনি কোন-রূপে প্রাণ লইয়া রোসাঙ্গ-রাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তারপর সুলতান শাহ সুজা ঘটিত বিপ্লবে পড়িয়া তিনি রোসাঙ্গের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। পঞ্চাশ দিন 'গর্ভবাস সম' কারাক্লেশ ভোগ করিয়া তিনি মুক্তি লাভ করেন। মুক্তিলাভের পর তিনি রোসাঙ্গ-রাজের অমাত্য মাগন ঠাকুর, সৈয়দ মুছা, মহন্ত ছোলেমান, সৈয়দ মোহম্মদ খান, নবরাজ মজলিস প্রভৃতি নামধেয় মহোদয়গণের প্রীতি-লাভ করিয়া তাঁহাদেরই আগ্রহে তদীয় কাব্যগুলি রচনা করেন। আপনারা দীনেশ বাবুর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' এবং এই দীনের লিখিত বিবিধ প্রবন্ধে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও কবিত্বাদি সম্বন্ধে সকল কথা অবগত আছেন। সুতরাং এখানে তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, এই মহাকবি কোন্ স্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত হইয়াছেন, অদ্যাপি তাহা জ্ঞানগোচর হয় নাই। তাঁহার নামীয় এক সুবৃহৎ দীঘি ও তৎপারস্থিত মসজিদ আজও এই সহরের ১০ মাইল উত্তরে তদীয় কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। আলাওলের জন্মস্থান হিন্দু মুসলমান সকল সাহিত্যসেবীরই তীর্থ-ক্ষেত্র রূপে পরিগণিত হওয়া উচিত। এ অধঃপতিত সমাজে না জন্মিয়া যদি তিনি অন্য কোন সমাজে জন্মপরিগ্রহ করিতেন, আজ তাঁহার জন্মস্থান সত্য সত্যই তীর্থ-ক্ষেত্রে পরিণত হইত। কিন্তু হায়! ঘরের রত্ন না চিনিয়া আজ আমরা অনাদরে ফেলিয়া রাখিয়াছি।

কেবল আলাওল নহেন, এই দেশে আরও অনেক কবি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, যাঁহাদের সদৃশ কবি বঙ্গের মুসলমান সমাজে আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। এরূপ কবির মধ্যে দৌলত কাঁজি, সৈয়দ সুলতান, মোহাম্মদ খাঁ, দৌলত

উজির, সেখ ফরজুল্লা, সৈয়দ মর্ত্তুজা প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দৌলত কাজি প্রায় আলাওলের সমকক্ষ কবি। রোসাঙ্গরাজের লস্কর উজীর আশরফ খানের আদেশে তিনি 'লোর চন্দ্রানী সতী ময়না' নামক কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। কদলপুর নামক গ্রামে লস্কর উজীরের প্রকাণ্ড দীঘি এই আশরফ খাঁরই অবিনশ্বর কীর্ত্তি। দৌলত কাজি রাউজানের অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ সুলতানপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ভিটায় এখন বাতি দিবার কেহ নাই। তিনি আলাওলের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী। গ্রন্থখানি সমাপ্ত না হইতেই তিনি পরলোকে গমন করেন। এজন্য কবি আলাওল ইহার শেষাংশ রচনা করিয়া দেন।

প্রাচীনকালে চট্টগ্রামে সঙ্গীত-শাস্ত্রের বিশেষ আদর ও অনুশীলন ছিল। তাহার ফলে এই দেশে তখন অনেক সঙ্গীতশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতের আবির্ভাব ও বহু সঙ্গীত গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছিল। সেই গ্রন্থগুলি সাধারণতঃ 'রাগমালা' বা 'রাগনামা' নামে পরিচিত। তাহাতে রাগরাগিণীর পরিচয়াদি বর্ণিত আছে। প্রত্যেক রাগে গেয় এক বা ততোঽধিক সঙ্গীত প্রত্যেক রাগের নীচে সংগৃহীত হইয়াছে। সেই সঙ্গীতগুলি বিভিন্ন কবির রচিত। রচয়িতৃগণের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান। সে সমস্ত মুসলমান কবিই প্রাগুক্তরূপ পদাবলী প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। সে সমস্ত পদাবলীতে হিন্দুর রাধাকৃষ্ণের প্রেমের বর্ণনা আছে। সে বর্ণনা এমন সুন্দর যে, কবির নাম উঠাইয়া দিলে ঐ সকল পদ যে মুসলমান কবির লিখিত, তাহা বুঝা বড় কঠিন হয়।

হিন্দু সাহিত্যিকগণ এ সকল কবিকে 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' আখ্যা দিয়াছেন। তাহার সঙ্গতি-অসঙ্গতির বিচার আপনারা করিবেন। আমার মতে তাঁহাদিগকে 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' না বলিয়া 'বৈষ্ণব পদাবলী লেখক মুসলমান কবি' নাম দিলেই ঠিক হইত। আমার মনে হয়, বৈষ্ণব পদাবলীর অনুপম সৌন্দর্য্যই তাঁহাদিগকে উক্তরূপ পদ রচনায় প্রলুব্ধ করিয়াছিল, কেবল সাহিত্যামোদের খাতিরেই তাঁহারা উক্তরূপ পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। উহা কতকটা সখের খাতিরে হইলেও তাঁহারা উহাতে একেবারে বিভোর হইয়াছিলেন। এ ইস্লামের দেশে তাঁহারা সত্য-সত্যই রাধাকৃষ্ণের ভক্ত হইয়াছিলেন, এমন ধারণা আমি কল্পনায় আনিতে অক্ষম। রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে লক্ষ্য করিয়া প্রেম কবিতা রচনায় সকল পিপাসাই মিটান যায়। এইজন্যও বোধ হয় তাঁহারা রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে আদর্শ করিয়াছিলেন। সাংসারিক দৃষ্টিতে আমি ইহা অপেক্ষা বেশী কিছু বুঝি না। কেহ-কেহ বলেন, উপাস্যকে কৃষ্ণ এবং উপাসককে রাধা কল্পনা করিয়াই তাঁহারা রূপকচ্ছলে এরূপ পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। আর কেহ-কেহ বলেন, মনকে কৃষ্ণ এবং দেহকে রাধা কল্পনা করিয়াই তাঁহারা এরূপ কবিতায় দেহ-মনের সম্বন্ধ বর্ণনা করিয়াছেন। কাহার কথা ঠিক, তাহার বিচার করিবার শক্তি আমার নাই। আমি এইমাত্র বুঝি, উক্তরূপ উভয় উক্তিতেই কিছু-কিছু সত্য নিহিত আছে। তবে সকল কবিই যে দরবেশী ভাব-প্রণোদিত হইয়া ঐরূপ পদ রচনা করিয়াছিলেন, আমি এমন অনুমান করিতে অক্ষম। কেহ-কেহ কেবল সাহিত্যামোদের বশবর্ত্তী হইয়াও ঐরূপ পদ লিখিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। সম্প্রতি চট্টগ্রামের মাইজভাণ্ডারে সুপ্রসিদ্ধ ফকির মৌলবী আহামদ উল্লা সাহেবের শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে যে সকল ফকির কবির আবির্ভাব দেখা যায়, তাঁহারাও রাধাকৃষ্ণের প্রেমোল্লেখ করিয়া কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যাহা হউক, প্রাগুক্ত পদাবলী-রচয়িতৃগণের মধ্যে অনেক উৎকৃষ্ট কবি আছেন। গুণ-তুলনায় তাঁহাদের অনেকেই হিন্দু কবির সহিত একাসনে বসিবার যোগ্য।

বঙ্গদেশের প্রাচীন সারস্বত-কুঞ্জে চট্টগ্রাম যাহা করিয়াছে, ইহা তাহার অতি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস মাত্র। বিস্তৃত বিবরণ প্রদানের স্থান ইহা নহে বলিয়া বাধ্য হইয়াই আমাকে লেখনী সংযত করিতে হইল। মুসলমান-বাঙ্গালার আর কোন দেশের সারস্বত কাননে এতগুলি কোকিলের কলনিনাদ আর কখনও উত্থিত হয় নাই। এই দেশের শৈল-কন্দর-লীন গ্রামগুলি চিরদিন সাহিত্য-সাধনার সহায়। সকলেই কিছু-না-কিছু ভূ-সম্পত্তির অধিকারী বলিয়া এদেশে জীবন-সংগ্রাম আজকালকার মত পূর্ব্বে এত কঠোর ছিল না। তাই সেকালে সাহিত্য-সাধনায় এমন মন্দাকিনী-ধারা প্রবাহিত করা সম্ভব হইয়াছিল। 'এ দেশের প্রকৃতি তাঁহার অনিন্দ্য-সুন্দর লীলা-বৈচিত্র্য বিস্তার করিয়া চিরদিন মনুষ্য হৃদয়ের ভাবতন্ত্রীকে সচেতন রাখেন' বলিয়াও এরূপ

সাধনা সম্ভব হইয়াছিল। 'এই দেশ যেমন হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃষ্টানের সৌভ্রাত্র সম্মিলন-স্থল থাকিয়া আসিয়াছে, তেমন বঙ্গ সাহিত্যের যুগে-যুগে বঙ্গীয় কবি ভারতীয় ঐক্যতান মধ্যে যথোচিত মতে নিজের কণ্ঠও মিলাইয়া আসিয়াছে।' কবিবর নবীনচন্দ্রের শ্মশানকৃত্য সম্পন্ন করিয়া আমাদের জনৈক হিন্দু সাহিত্যিক তাঁহার শোকসভায় যে উক্তি করিয়াছিলেন, শশাঙ্কবাবুর মত এস্থলে আমিও তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিয়া আমার এতদ্বিষয়ক বক্তব্যের পরিসমাপ্তি করিতেছি :—

"এই ভূমি চিরকাল কবিভূমি! সাধুসন্ত ফকির দরবেশের সাধনভূমি! এই ভূমিই অতীতকালে নিজের মহনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে এবং জ্ঞান-গরিমায় 'রম্যভূমি', 'সহরে সব্‌জ' এবং 'পণ্ডিতবিহার' নামে খ্যাত হইয়াছিল। * * * এই ভূমিই মোস্‌লেম-যুগে সংস্কৃত, পারসীক, উর্দ্দু ও বঙ্গভাষার এবং ভাবের মহামিলন সংঘটনা করিয়া বাঙ্গালীর সাহিত্য-মঞ্চে কবিগুণাকর ভারতচন্দ্রের সহিত একাসনে বসিবার জন্য কবিবর আলাওলকে সমুদ্দীপ্ত করিয়াছিল! এই ভূমিই পরিশেষে উনবিংশ শতাব্দীতে প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য সভ্যতা-আদর্শের সম্মিলন-স্থলে ভারতীয় এবং ইয়োরোপীয় সাহিত্য, ধর্ম্মনীতি এবং সমাজ-রীতির সঙ্কট-যুগে নিজে শৈল-নদী-সমুদ্রের প্রতিভায় সমুদ্দীপ্ত করিয়া নবীনচন্দ্রকে বঙ্গদেশের সাহিত্যরঙ্গে প্রেরণ করিয়াছিল।" বঙ্গের সকল মুসলমান সাহিত্যসেবকই ধর্ম্ম এবং জাতীয়তা-সূত্রে আমাদের এক পরিবারভুক্ত। সে হিসাবে আমাদের এই কবিগণও তাঁহাদেরই, আমাদের এই সাহিত্যও তাঁহাদেরই। আপনারা আমাদের গৌরবে নিজকে গৌরবান্বিত মনে করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যে পূর্ব্বপুরুষীয় উত্তরাধিকার-স্বত্ব বলবৎ রাখিবার জন্য সচেষ্ট হইলে আমরা নিজেকে পরম কৃতার্থ জ্ঞান করিব। সমগ্র বঙ্গ-সাহিত্যে আমাদের জাতি ও ধর্ম্মের, আমাদের সমাজ ও সভ্যতার, আমাদের সাহিত্য ও ইতিহাসের একটা বিশেষ সুর, বিশেষ বক্তব্য এবং বিশেষ সাধনীয় রহিয়াছে বলিয়া প্রত্যেকেই ধারণা পূর্ব্বক একাগ্র মনে অগ্রসর হউন। সাহিত্য চিরকাল সাধনার জিনিস। সাধনা ভিন্ন এ ক্ষেত্রে প্রকৃত উন্নতি অসম্ভব। জাতীয়তা লাভ করার সাহিত্যই একমাত্র উপায়। জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ভিন্ন কোন জাতির বড় হওয়ার আশা আকাশকুসুমবৎ অলীক। জাতীয় বা মাতৃ-ভাষার সাহিত্যই জাতীয় সম্মিলন এবং উন্নতির সর্ব্বপ্রধান হেতু। জাতীয় সাহিত্যের উন্নতিকে পরমার্থ জ্ঞানে তাহার সাধনা করাই সাহিত্যসেবিগণের একমাত্র কর্ত্তব্য।

আমাদের আধুনিক সাহিত্য সাধনা এই সবেমাত্র আরব্ধ হইলেও আমাদের বিরাট প্রাচীন সাহিত্য আছে। অনেকেই বোধ হয় জানেন না, কলিকাতায় এবং মফঃস্বলে মুসলমানদিগের পরিচালিত প্রায় ৪০টি ছাপাখানা আছে। এ সকল ছাপাখানা হইতে এ পর্য্যন্ত সহস্র-সহস্র বাঙ্গালা পুস্তক ছাপা হইয়া প্রচারিত হইয়া গিয়াছে। শিক্ষিতাভিমানী বিংশ-শতাব্দীর বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে অত্যল্প লোকেও তাহার খবর রাখেন কি না, সন্দেহ। সেই সমস্ত পুস্তককেই আমরা 'বটতলার পুথি' নাম দিয়াছি। সেই 'বটতলার' সাহিত্যকেই প্রধান ভিত্তি করিয়া আমাদের হিন্দু ভ্রাতৃগণ বঙ্গ-সাহিত্যে অভ্রংলিহ সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন; সেই 'বটতলার পুঁথি'র নাম শুনিয়া আমরা ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করি!—তাহাতে কুরুচিপূর্ণ ও কুভাবের ছায়া আছে কল্পনা করিয়া আমরা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠি! তার পর স্বজাতি-প্রেমে গদগদ হইয়া অনুনাসিক সুরে বলিতে থাকি, আমাদের জাতীয় সাহিত্য নাই! আমাদের যুগ-যুগান্তরের সেই নীরব সাহিত্য-সাধনা ইস্‌লামের কীর্ত্তি-গাথা বক্ষে ধারণ করিয়া আজও অবজ্ঞাত ভাবে বটতলায় পড়িয়া রহিয়াছে, আর যুগের পর যুগ ধরিয়া আমাদের ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের মধ্যে থাকিয়াও আমাদের করুণা ভিক্ষা করিয়া আসিতেছে! একবার একটু প্রেমের চক্ষে—একটু অনুরাগ-রঞ্জিত নয়নে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই আপনারা বুঝিতে পারিবেন, আমাদের এই ঘৃণা ও অবজ্ঞা কিছুতেই তাহার উচিত প্রাপ্য হইতে পারে না। ঐ সকল অবজ্ঞাত পুস্তকের মধ্যে রচয়িতৃগণের কবিত্ব-শক্তি, শব্দ-যোজনার পারিপাট্য, ভাষার লালিত্য, বর্ণনার স্বাভাবিকতা ও ভাবের মৌলিকতা দেখিলে হৃদয়ে যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দের সঞ্চার হইয়া থাকে। এই হতভাগ্য ও অকৃতজ্ঞ সমাজে না জন্মিয়া যদি তাঁহারা অপর কোন সমাজে জন্ম-পরিগ্রহ করিতেন, তাহা হইলে সমাজের নিকট সম্মান ও মর্য্যাদা পাইয়া

আজ তাঁহাদের আত্মা পরিতৃপ্তি লাভ করিত, সন্দেহ নাই। *

জানা গিয়াছে, এ পর্য্যন্ত প্রাগুক্ত 'বটতলার' মুসলমান কবিগণ ৮৩২৫ খানি পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু ইহার মধ্যে এখন কেবল ৪৪৪৬ খানি গ্রন্থ ছাপা হয় এবং বাজারে প্রচলিত আছে। ২৯৮২ খানি গ্রন্থের অস্তিত্ব নানা কারণে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ৭৯৫ খানি গ্রন্থ কবিগণের উত্তরবংশীয়দের মধ্যে বিরোধের ফলে এখন আর ছাপা হয় না। ১০২ খানি পুস্তকের প্রচার সরকারী আইনানুসারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন সাহিত্যে আমাদের ধর্ম্মমূলক গ্রন্থই বেশী। ঐ সকল গ্রন্থের ভাবরাশি যদি নূতন ভাষায়—নূতন ছন্দে আমাদের মর্ম্মে-মর্ম্মে প্রবাহিত করা যায়, তাহা হইলে আমাদের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের ইতিহাস, আমাদের সাহিত্য, আমাদের পূর্ব্বপুরুষের অতুলনীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান বঙ্গ-সাহিত্যের ভিতর দিয়া সমাজ-দেহে প্রবিষ্ট করাইতে পারিলে তাহাতে নূতন উদ্দীপনা ও উদ্বোধনের সঞ্চার হইবে, এবং বঙ্গভাষা ও সাহিত্য আমাদের সম্পূর্ণ নিজের হইবে। বিজাতীয় ভাব এবং বিজাতীয় সাহিত্যে আমরা নিজকে হারাইয়া ফেলিয়াছি। আমরা কি ছিলাম আর কি হইয়াছি, তাহা চিনাইয়া দেওয়াই এখন আমাদের সাহিত্য-সাধনার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। আপনারা স্থির লক্ষ্যে সেই সাধনায় অগ্রসর হউন। খোদাতালা আপনাদের সহায় হইবেন।

মুসলমান সাহিত্যের ভাষা ও গতি

আমাদের সাহিত্যের ভাষা কিরূপ হওয়া উচিত, সে বিষয়ে এখানে দুটি কথা বলা আবশ্যক। আপনারা দেখিয়াছেন, আধুনিক সাহিত্যে নূতন ব্রতী হইলেও সাহিত্য-ক্ষেত্রে আমরা নূতন ব্রতী নহি। হিন্দুর মত আমাদেরও সাহিত্যের একটা সুদৃঢ় বনিয়াদ আছে। সেই বনিয়াদের উপরেই আমরা সাহিত্যের নূতন হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিতে পারি। মুসলমান সাহিত্যের ক্রমবিবর্ত্তন আলোচনা করিলে দেখা যায়, বরাবর যুগে-যুগে ভাষা সংস্কৃত হইয়া আসিয়াছে। যতই পশ্চাদ্দিকে যাইবেন, ততই আরবী-পারসী শব্দ-বহুল ভাষা দেখিতে পাইবেন; আর যতই সম্মুখ দিকে অগ্রসর হইবেন, ততই আরবী-পারসীর শব্দ কমিয়া প্রায় হিন্দুর ভাষার মত ভাষা হইয়াছে দেখিবেন। আমাদের পূর্ব্ব সূরিগণ বুঝিয়াছিলেন, আমাদের সাহিত্য শুধু আমাদের জাতির মধ্যেই আবদ্ধ রাখিলে চলিবে না, অন্য জাতির জন্যও তাহার দ্বার মুক্ত রাখিতে হইবে। বিজাতীয়ের সহিত ভাবের আদান-প্রদানের প্রয়োজন তাঁহাদের অপেক্ষা আমাদের এখন অনেক বেশী হইয়াছে। এই অবস্থায় আমাদের সাহিত্যের ভাষা সর্ব্বজাতি-বোধ্য হওয়া একান্ত আবশ্যক। আমাদের জাতি ও ধর্ম্মের স্বরূপ নিজের বুঝা যেমন আমাদের আবশ্যক, পরকে বুঝানও আমাদের কম আবশ্যক নহে। প্রধানতঃ, অজ্ঞতা-বশতঃ বুঝিতে না পারিয়াই যে বিজাতীয়েরা আমাদিগকে মসী-বর্ণে চিত্রিত করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহা একেবারে অস্বীকার করিবার কথা নহে। মুসলমানেরা বঙ্গভাষার জন্মদাতা, মুসলমানের রক্ত-মাংসে, মুসলমানের অস্থি-মজ্জায় বঙ্গভাষার দেহ গঠিত, মুসলমানের আদরে ও অনুগ্রহে তাহা লালিত, পালিত ও বর্দ্ধিত। এ অবস্থায়ও বঙ্গভাষা জাতি ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহ করিবে, সে ভয়ে আমাদের কি বিচলিত হওয়া উচিত? বঙ্গভাষার অঙ্গে আমাদের অগণিত শব্দ ও ভাব এবং অসীম প্রভাব মিশ খাইয়া গিয়াছে। তৎসমুদয় বিচ্ছিন্ন করিতে গেলে তাহার লোম বাছিতে কম্বল শেষ হইয়া যাইবে, কুষ্ঠরোগীর ন্যায় তাহার দেহ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যাইবে। সুতরাং অন্যের পক্ষে অবোধ্য বা দুর্ব্বোধ্য নূতন শব্দাদির আমদানী করিয়া ভাষায় জটিলতা সৃষ্টির প্রয়োজন কি? আমাদের বাঙ্গালায় মনের ভাব প্রকাশোপযোগী শব্দ পাইলে তাহা ত্যাগ করিয়া পরের দ্বারে ভিক্ষা করিতে যাইব কেন, আমি বুঝিতে পারি না। অবশ্য যেখানে বাঙ্গালায় ঐরূপ শব্দ নাই, সেখানে আমরা যে-কোন ভাষার শব্দ গ্রহণ করিতে পারি। (এখানে পরিভাষা ব্যবহার সম্বন্ধে কোন কথাই হইতেছে না)। আগেই বলিয়া আসিয়াছি, কবি আলাওল আমাদের মুসলমান সাহিত্যের গুরু। গুরুর অনুকরণ ও অনুসরণ করাই ভক্তিমান শিষ্যের সর্ব্বতোভাবে উচিত। তাঁহার ভাষা আদর্শ করিয়া আমরা অনায়াসেই নূতন স্রোতে সাহিত্যের ধারা প্রবাহিত করিতে পারি। বাঙ্গালার

* বন্ধুবর ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী সাহেবের একটি প্রবন্ধ হইতে উক্ত কথাগুলি উদ্ধৃত হইল।

বর্ত্তমান ভাষা ব্যবহার করিয়াও আমাদের সাহিত্যকে ইস্‌লামী সাহিত্যে পরিণত করা অসম্ভব নহে। ভাবসম্পদে সম্পন্ন না হইলে শুধু শব্দসম্পদে কোন সাহিত্য জাতি-বিশেষের প্রকৃত সাহিত্য-পদবাচ্য হইতে পারে না। ভাষা চিরদিন ভাবের অনুগামিনী, ভাব ভিন্ন কেবল ভাষায় কোন জাতির প্রকৃত জাতিত্ব হৃদয়ঙ্গম করা বড়ই কঠিন। মনে হয় গায়ে নামাবলী ও কপালে ত্রিপুণ্ড্রক কেবল বৈষ্ণবতার বাহ্য চিহ্ন মাত্র; তাহাতে ভিতরের বৈষ্ণবতার পরিমাণ করা চলে না। ধর্ম্মের পার্থক্যে দেশে এখন এত অশান্তি; তার উপর ভাষারও যদি পার্থক্য ঘটে, তবে পরিণাম আমাদের বড়ই ভয়াবহ হইয়া উঠিবে বলিয়া মনে হয়। আমাদের লেখকগণ এই কথাটুকু স্মরণ করিয়া সাহিত্য-সাধনার পথে অগ্রসর হইলে দেশের পক্ষে পরম কল্যাণের কারণ হইবে বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

আমি জানি, বঙ্গসাহিত্যে আমরা অনেক লাঞ্ছনা, অনেক অত্যাচার, অনেক নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছি; আমাদের সে ব্যথাও সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করিয়াছে। কিন্তু উপায় কি? খোদাতালা যখন রোগ-শোক দেন, তাহার প্রতীকারের সমস্ত উপায় গ্রহণ করিয়াও যখন বিফল-কাম হই, তখন কি আমরা আত্মহত্যা করিয়া সে রোগ-যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হই, না খোদার নামে সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া থাকি? এখানেও সহিষ্ণুতাই আমাদের একমাত্র ঔষধ। কুকুরে দংশন করিলে কেহ প্রতিশোধ-বাসনায় কুকুরকে প্রতিদংশন করে না, কিন্তু সুচিকিৎসায় রোগমুক্তির চেষ্টাই করিয়া থাকে। বিজাতীয়ের দংশনে তাহাকে প্রতিদংশন না করিয়া আমাদের সুচিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত। সে চিকিৎসা হইতেছে এই সাহিত্য-সেবা। বিজাতীয়েরা যখন বুঝিবে যে, আমরা সাহিত্যের সমর-ক্ষেত্রে তাহাদের সমকক্ষ হইয়াছি, তখন তাহারা নিজেরাই আমাদিগকে ভয় করিয়া চলিবে। দুর্ব্বল চিরদিনই সবলের অত্যাচার ভোগ করিয়া থাকে। আমি দেখিতেছি পূর্ব্বাশার ললাটে আশার যে ক্ষীণ আলোক-রশ্মি দেখা দিয়াছে, তাহা অচিরে প্রসারিত হইয়া আমাদের এ অমানিশার গাঢ় অন্ধকার বিদূরিত করিবে। আপনারা খোদার নামে ধৈর্য্য ধরিয়া স্থির লক্ষ্যে সাধনা করিতে থাকুন।

আলোচনা

সংবাদপত্রাদিতে সহকারী ভারতসচিব লর্ড আইলিংটন (Right Hon'ble Lord Islington) লিখিত একটী বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমান য়ুরোপীয় মহাসমরে ভারতবর্ষ হইতে কি সাহায্য পাওয়া গিয়াছে, তাহাই তাহাতে বিশদ ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহা হইতে জানা যায়, ধন, জন, ও যুদ্ধের উপকরণ প্রধানতঃ এই তিন বিষয়েই ভারতবর্ষ রাজশক্তির যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে।

---

(১) ধন।—১৯১৭ অব্দের জানুয়ারী মাসে ভারতীয় প্রজাবৃন্দের সম্মতিতে ভারত গভর্ণমেণ্ট যুদ্ধের ব্যয় বিধানে দশকোটী পাউণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ১৯১৭ অব্দের প্রথম war loan দ্বারা ৩ কোটী ৬০ লক্ষ পাউণ্ড এবং ১৯১৮ অব্দের দ্বিতীয় war loan দ্বারা ২ কোটী ১০ লক্ষ পাউণ্ড উঠিয়াছে; বাকী ৪ কোটী ৩০ লক্ষ পাউণ্ড British war loan বিক্রয় করিয়া তোলা যাইবে, আশা করা যাইতে পারে। ১৯১৮ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রস্তাবিত হইয়াছে যে, অতঃপর ভারতীয় সৈন্য-সংখ্যা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করিতে হইবে।

বর্ত্তমান সময়ে সমর-বিভাগে মাত্র ১ লক্ষ ৬০ হাজার ভারতীয় সৈন্য আছে; ইহার উপর আরও দুই লক্ষ সৈন্য বাড়াইতে হইবে। সুতরাং তজ্জন্য সেনা-বিভাগে ব্যয়ও তদনুরূপ বাড়িয়া যাইবে। সৈন্য-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে পেন্‌সন খরচও প্রায় এক কোটী পাউণ্ড হইবে। ভারত গবর্ণমেণ্ট এই সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়াও ইংলণ্ড, ইংলণ্ডের উপনিবেশ ও তাহার মিত্ররাজ্য সমূহে বহু টাকার শস্যাদিও রপ্তানি করিয়াছেন। ১৯১৭-১৮ অব্দে এই সমস্ত রপ্তানি দ্রব্যের আনুমানিক মূল্য প্রায় ৬ কোটী ৩০ লক্ষ পাউণ্ড। ইষ্ট আফ্রিকা, পারস্য, লঙ্কা, মরিশস্ এবং মিশর দেশেও অনেক সময়ে ভারতবর্ষ হইতে অর্থ সাহায্য প্রেরিত হয়।

ভারতীয় রাজন্যবর্গ এই দীর্ঘকালব্যাপী মহাসমরে মুক্তহস্তে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রদত্ত অশ্বারোহী ও উষ্ট্রারোহী সৈন্যগণ প্রায় প্রত্যেক স্থানেই যুদ্ধে লিপ্ত রহিয়াছে। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সর্ব্ববিধ ভারতীয় রাজগণ ব্যক্তিগত অসুবিধা ভোগ করিয়াও যুদ্ধব্যয় নির্ব্বাহের জন্যই ১৫ লক্ষ পাউণ্ড দান করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত মোটর লঞ্চ

(motor launch), হস্পিটাল জাহাজ, নানাবিধ যান ও বাহন এবং শস্য ও বস্ত্র প্রচুর পরিমাণে দান করিয়াছেন।

(২) জন।—১৯১৪ অব্দের ৪ঠা আগষ্ট হইতে ১৯১৮ অব্দের ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে য়ুরোপীয় ও ভারতীয় সৈন্য মোট ১১,১৫,১৮৯ জন প্রেরিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ২৯,৬৪৩ জন যুদ্ধে এবং রোগে মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে ইংরেজ কর্ম্মচারী ৯৬৩, ভারতীয় কর্ম্মচারী ৫৮৯ এবং বাকী ২৮০৯১ জন সাধারণ সৈন্য। বলা বাহুল্য, ভারতীয় সৈন্যদলের সকলেই স্বেচ্ছায় যুদ্ধে যোগদান করিয়াছে, কাহাকেও জোর করিয়া সৈন্য-দলভুক্ত করা করা হয় নাই। যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে প্রতি বৎসরে গড়ে ১৫০০০ ভারতবাসী সৈন্য-দলভুক্ত হইত; কিন্তু যুদ্ধারম্ভের পর প্রতি মাসেই ইহা অপেক্ষা বহুগুণ ভারতবাসী সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইতেছে।

১৯১৮ অব্দের এপ্রিল মাসে বড়লাট বাহাদুরের সভাপতিত্বে দিল্লী নগরে এক সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে ভারতের জনসাধারণের বহু প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। যুদ্ধের জন্য আরও অধিক সংখ্যক ভারতীয় সৈন্য ও অধিক পরিমাণ উপকরণ সংগ্রহের প্রস্তাব এই সভায় ধার্য্য হয়। এই সময়ে ভারতীয় সৈন্যের সংখ্যা দশ লক্ষেরও উপর হইয়াছিল; তথাপি গত বর্ষে আরও পাঁচ লক্ষ সৈন্য সংগ্রহের প্রস্তাব হইয়াছিল। সৈন্য-সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারীং, চিকিৎসা ও রসদ বিভাগেও বহু ভারতবাসী নিযুক্ত হইয়াছেন; এতদ্ব্যতীত ফ্রান্স ও মেসোপটেমিয়ায় দেশীয় শ্রমজীবী ও কারিকর ইত্যাদির সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে।

নূতন সৈন্যদিগের শিক্ষা দানের নিমিত্ত বহু সামরিক কর্ম্মচারী আবশ্যক হওয়ায়, তাহার সংখ্যাও যথেষ্ট বড়াইতে হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে এই কার্য্যের জন্য ৪০ জন মাত্র অতিরিক্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিল; কিন্তু বর্ত্তমানে এইরূপ কর্ম্মচারীর সংখ্যা ৫০০০ হইয়াছে।

Indian Defence Force নামে একদল সৈন্য গঠিত হইয়াছে। ভারতপ্রবাসী ও ইংলণ্ডের প্রজাশ্রেণীভুক্ত ইউরোপীয়গণকে এই সৈন্য শ্রেণীভুক্ত হইতে বাধ্য করা হয়; কিন্তু ভারতীয় প্রজাগণ স্বেচ্ছায় ইহাতে যোগদান করিতে পারে। ভারতের যে কোন স্থানে যুদ্ধ-বিগ্রহ উপস্থিত হইলে আবশ্যক মত ইহাদের সাহায্য লওয়া হইবে। এই দলে এক্ষণে ৫ হাজার সৈন্যকে শিক্ষা দান করা হইয়াছে।

যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতেই ফ্রান্স, ইজিপ্ত, প্যালেষ্টাইন, দার্দ্দানেলস্‌ সালোনিকা, মেসোপটেমিয়া, পূর্ব্ব আফ্রিকা, পশ্চিম আফ্রিকা, এডেন, চীন এবং ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে ভারতীয় সৈন্যগণ যুদ্ধে লিপ্ত রহিয়াছে। ইদানীং প্যালেষ্টাইনের যুদ্ধে যে জয়লাভ হইয়াছে, ভারতীয় সেনাদল, বিশেষতঃ তাহাদিগের অশ্বারোহী সৈন্যগণই তাহাতে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছে।

ভারতীয় সৈন্যগণের এইরূপ একনিষ্ঠা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও সাহসিকতার জন্য, তাহাদিগের যথাবিধি পদোন্নতি ও পুরস্কারের যথেষ্ট ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভারতীয় সামরিক কর্ম্মচারীদিগের বেতনের হার বর্দ্ধিত করা হইয়াছে,এবং তাহাদিগের পেন্সনাদিরও পরিমাণ যথেষ্ট বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। যুদ্ধে কার্য্যকুশলতার জন্য ভারতবাসী সৈন্যদিগকে জায়গীর প্রদান করিবার ব্যবস্থাও করা হইতেছে।

গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে, এখন হইতে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ভারতবাসীকে মিলিটারী কলেজে উচ্চশ্রেণীর যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা প্রদান করা হইবে; এবং তাহাদিগের মধ্যে যাহারা কার্য্যপটু হইবে, তাহাদিগকে King's Commission প্রদান করা যাইবে। ফল কথা, ভারতবাসী সৈন্যগণ যাহাতে সর্ব্ববিষয়ে য়ুরোপীয় সৈন্যদলের সমকক্ষ হইতে পারে, তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন।

(৩) উপকরণ।—এই ভীষণ সমরকালে যদি ভারতবর্ষ হইতে যথেষ্ট পরিমাণ যুদ্ধোপকরণ না পাওয়া যাইত, তবে যুদ্ধ-জয়ের আশা অনেকটা কমিয়া যাইত সন্দেহ নাই। এই সব উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ইংলণ্ডে ও যুদ্ধস্থলে প্রেরণ করিবার জন্য ভারতবর্ষে একটী Munition Board স্থাপিত হইয়াছে। কেবল যুদ্ধের জন্যই যে এই বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে, তাহা নহে; ভবিষ্যতে যাহাতে এই সমস্ত উপকরণ ও বিদেশীয় বাণিজ্য-দ্রব্যের জন্য ভারতবর্ষকে পর-মুখাপেক্ষী হইয়া না থাকিতে হয়, তাহার উপায়ও ইহা দ্বারা সাধিত হইবে। এই বোর্ড এক্ষণে প্রতিমাসে প্রায় ২০ লক্ষ পাউণ্ড মুদ্রার মূল্যের যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত ও সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

বাগদাদ ও জেরুসালেমে যে রেলপথ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা সমস্তই ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাতে প্রস্তুত এবং উহার নির্ম্মাণকারকও অধিকাংশই ভারতীয় মজুর। প্রায় ১৭০০ মাইল দীর্ঘ রেলপথ, ২০০ ইঞ্জিন এবং ৬০০০ রেল-শকট ভারতবর্ষ হইতে যুদ্ধ স্থলে প্রদত্ত হইয়াছে। টাইগ্রিস্‌ ও ইউফ্রেটিস নদীতে যে সমস্ত ষ্টীমার ও জাহাজ চলিতেছে, তাহা সমস্তই ভারতবর্ষ হইতে প্রেরিত হইয়াছে, এবং ভারতবাসী দ্বারাই পরিচালিত হইতেছে।

মেসোপটেমিয়ায় চাষ-আবাদের জন্য যে সমস্ত কৃষিকার্য্যোপযোগী যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হইতেছে, তাহাও প্রায় সমস্তই ভারতবর্ষ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। মেসোপটেমিয়া ও পূর্ব্ব আফ্রিকায় অবস্থিত সৈন্যদিগের কার্য্যের নিমিত্ত সহস্রাধিক মাইলব্যাপী টেলিগ্রামের তার ও তাহার পরিচালনের জন্য কর্ম্মচারিগণও ভারতবর্ষ হইতেই সরবরাহ করা হইয়াছে। Trenchএ ব্যবহার করিবার জন্য বালির বস্তা প্রভুত পরিমাণে ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী হইয়াছে। এক কলিকাতার কলওয়ালারাই মাসে ১ কোটী ৪০ লক্ষ বালির বস্তা পাঠাইয়াছেন। তদ্ভিন্ন খালি বস্তা প্রস্তুত করিবার জন্য বহু পাট ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছে। সৈন্যগণের বুট্‌জুতা, ঘোড়ার জিন প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য পশাদির চামড়াও ভারতবর্ষ হইতে কম রপ্তানী হয় নাই। ১৯১৭ অব্দে ৪০ লক্ষ জোড়া বুট জুতার উপযুক্ত চামড়া ইংলণ্ডে পাঠান হইয়াছিল; ইহা ছাড়া প্রায় ৩৫ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের চামড়া ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ড ও ইতালীতে প্রেরণ করা হইয়াছিল।

৺ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর

গত ১৯শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ সময়ে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর মহাশয় ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগে পরলোকে গমন করিয়াছেন। ইনি স্বনামধন্য ডাক্তার দুর্গাদাস কর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইংলণ্ড হইতে চিকিৎসা-বিদ্যা শিখিয়া আসিয়া ইনি ৩০ বৎসরের ঊর্দ্ধকাল যাবৎ কলিকাতায় বিশেষ দক্ষতার সহিত চিকিৎসা-কার্য্য পরিচালন করিয়াছিলেন। সাধারণ্য ইনি ডাক্তার কর সাহেব নামে পরিচিত। ইনি স্বাবলম্বন ও অধ্যবসায় বলে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন। কলিকাতায় উত্তরাঞ্চলে তাঁহার প্রসার যথেষ্ট ছিল। বেলগেছিয়া আলবার্ট ভিক্টর স্কুল, হাসপাতাল ও কলেজ তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। এই জনহিতকর অনুষ্ঠানের সাফল্যের জন্য তিনি দ্বারে-দ্বারে ভিক্ষা করিয়াছেন। ইহার উন্নতি কল্পে তাঁহার অমূল্য সময় ও অর্থ ব্যয় করিতে কোন দিনই তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। সত্য কথা বলিতে হইলে বলিতে হইবে, ইহার স্থায়িত্বের ও উন্নতি-সাধনের জন্য তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন, বাঙ্গালাদেশের ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত পল্লীতে-পল্লীতে শিক্ষিত চিকিৎসকের অভাব যথেষ্ট রহিয়াছে। কেবলমাত্র কলিকাতা মেডিকেল কলেজ ও ঢাকার স্কুল হইতে প্রতি বৎসর যত ছাত্র বাহির হয়, তদ্দ্বারা দেশের অভাব মোচন হইতে পারে না। তাই তাঁহার অদম্য উৎসাহ ও যত্নে লালিত ও বর্দ্ধিত বিদ্যালয় হইতে বৎসর-বৎসর বহু ছাত্র বাহির হইয়া দেশের ও দশের উপকার সাধন করিতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে মহাশয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টী কলেজে পরিণত করিয়া দিয়া দেশের যে কতটা অভাব দূর করিয়াছেন, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার সময়ে ডাক্তার কর-প্রমুখ স্বদেশ হিতৈষিগণের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, অপনাদের চেষ্টায় জাতীয় ভাষায় চিকিৎসা-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া। তাঁহারা এ বিষয়ে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। পরে গবর্ণমেণ্ট যখন স্কুলটী কলেজে পরিণত করিবার অনুমতি দিলেন, তখন ইংরেজী ভাষাতেই অধ্যাপনা আরম্ভ হইল। তাহার পরই ডাক্তার কর মহাশয় দেশীয় ভাষায় চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য একটী স্কুল প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে বাসনা পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তিনি সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিলেন। রাধাগোবিন্দ বাবু স্বয়ং বাঙ্গালা ভাষায় কয়েকখানি উৎকৃষ্ট চিকিৎসা-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বাঙ্গালা ভাষার সৌষ্ঠব বর্দ্ধিত করিয়াছেন এবং বাঙ্গালী ছাত্রদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। কলিকাতার জনহিতকর অনুষ্ঠানে তিনি সর্ব্বদাই অগ্রণী ছিলেন। তিনি যে কেবলমাত্র একজন কর্ম্মবীর ছিলেন, তাহা নহে; তিনি একজন দানবীরও ছিলেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। মৃত্যুর সময়ে তিনি একটী দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহার সর্ব্বস্ব দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিধবা পত্নীর দেহান্তর হইলে, তাঁহারই পৈতৃক বাস-ভবনে এই নিকেতন প্রতিষ্ঠিত হইবে। তিনি তাঁহার পিতার নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য এই দাতব্য চিকিৎসালয়কে "দুর্গাদাস আরোগ্য-নিকেতন" নাম দিয়াছেন; এবং তাঁহার বড় সাধের আলবার্ট ভিক্টর কলেজের অনুষ্ঠাতৃগণকে ইহার পরিচালন কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অন্যান্য কীর্ত্তিকাহিনীর উল্লেখ করিয়া তাঁহার চরিত্র-বিশ্লেষণ করিতে হইবে না। উদার-হৃদয় রাধাগোবিন্দ দেখিয়াছিলেন, প্রকৃত চিকিৎসার অভাবে বাঙ্গালী জাতিটা ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে। সেই চিরবরেণ্য জাতিকে সুস্থ ও সবল করিবার জন্য তাঁহার যে বলবতী ইচ্ছা ছিল, তাহারই জন্য পূর্ব্বোক্ত দুইটী অনুষ্ঠান। এই দুই কীর্ত্তি তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। গরীব বাঙ্গালাদেশ তাঁহার প্রস্তর-মূর্ত্তি স্থাপিত করুক আর নাই করুক,—তাঁহার স্মৃতি-চিহ্ন রাখুক আর নাই রাখুক, তিনি স্বয়ং যে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গেলেন, তাহা চিরোজ্জ্বল থাকিবে। দুঃস্থ, রুগ্ন বাঙ্গালী তাঁহার কৃপায় ব্যাধি-নির্ম্মুক্ত হইয়া মুক্তকণ্ঠে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবে—শ্রদ্ধা-স্রক্‌চন্দনে তাঁহার স্মৃতির পূজা করিবে। বাঙ্গালী জাতির চরিত্র-গঠন-কল্পে তিনি যে সহায়তা করিয়া গেলেন, কাল তাহার প্রকৃত বিচারক হইবে। তাঁহার শোকার্ত্ত পরিবারবর্গকে আমরা আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

শোক সংবাদ

৺অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী

সুলেখক, অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী আর ইহজগতে নাই। ইনফুয়েঞ্জা রোগে অকালে ৩, বৎসর বয়সে অজিতকুমার বৃদ্ধা মাতা, বিধবা পত্নী ও শিশু সন্তানগণকে ফেলিয়া চলিয়া গেলেন। অজিতকুমার প্রতিভাশালী লেখক ছিলেন। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের একখানি বিস্তৃত জীবনচরিত লিখিয়াছেন; মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত লিখিবার উপকরণ সংগ্রহ করিতেছিলেন; কিন্তু সে জীবন চরিত আর লিখিয়া যাইতে পারিলেন না। বাঁচিয়া থাকিলে অজিতকুমার প্রভূত যশঃলাভ করিতেন। তাঁহার ন্যায় একনিষ্ঠ সাহিত-সেবকের অকাল বিয়োগ-বেদনা আমাদিগের বড়ই লাগিয়াছে। ভগবান তাঁহার শোক-সন্তপ্ত আত্মীয়গণের হৃদয়ে শান্তিধারা বর্ষণ করুন।

৺রাজা বীরেন্দ্রচন্দ্র সিংহ

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম, ইতিহাস-প্রথিত পাইকপাড়া রাজবংশীয় রাজা বীরেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর গত ২৮শে ডিসেম্বর শনিবার সহসা লোকান্তরিত হইয়াছেন। তিনি অল্প দিন হইল রাজা উপাধি পাইয়াছিলেন; এই উপাধি ভোগ করিবার অবসর না পাইয়াই তিনি চলিয়া গেলেন। ১৮৮১ অব্দের ২৪শে ডিসেম্বর তাঁহার জন্ম হয়; সুতরাং মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৩৭ বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন Prince of Walesএর ভারত ভ্রমণকালে রাজা বীরেন্দ্রচন্দ্র যুবরাজের pageএর কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি উইল করিয়া কান্দির স্কুল তহবিলে একলক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। এই অর্থ-সাহায্যে স্কুলটী কলেজে পরিণত হয় ইহাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। শ্রীভগবান তাঁহার আত্মার মঙ্গল করুন।

৺রামদেব মুখোপাধ্যায়

শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে চুঁচুড়ার স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সুযোগ্য পৌত্র রামদেব মুখোপাধ্যায় গত ৩০শে নভেম্বর তারিখে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে অকালে (৩৩ বৎসর) বয়সে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। ইনি ভূদেব বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় গোবিন্দদেবের দ্বিতীয় পুত্র। এম-এ পাশ করিয়া পাটনায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হন। পরে কার্য্যে অসাধারণ কৃতিত্ব ও পটুতা দেখানর গুণে বেহার গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক Personal Assistant to the Cloth Controllerএর কার্য্যে নির্ব্বাচিত হন। ৺গোবিন্দ বাবুও তৎপত্নীর মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার শিশু পুত্র কন্যাগণকে পুত্রাধিক স্নেহ যত্নে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। পিতামাতার মৃত্যুকালে ৺রামদেবের বয়স অষ্টম বর্ষ ছিল; এবং পত্নীর মৃত্যুর পর ৺গোবিন্দদেব বাবু এক বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। ৺রামদেব পিতৃ-প্রতিম খুল্লতাত এবং মাতৃসমা খুড়িমাতার অকালে অপ্রত্যাশিত ভাবে পুত্রশোক জর্জ্জরিত অন্তরে শেলাঘাত করিয়া চলিয়া গেলেন।

৺ডাক্তার আর, সি, নাগ

আমরা শোকসন্তপ্ত চিত্তে এবার আরও একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকের মৃত্যু-সংবাদ পত্রস্থ করিতেছি। ডাক্তার আর, সি, নাগ নিজের চেষ্টায় দরিদ্র অবস্থা হইতে ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়া আমেরিকায় গিয়া হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিদ্যায় এম-ডি উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার চিকিৎসা-নৈপুণ্যের প্রশংসা অনেকের মুখেই শুনা যাইত। রেগুলার হোমিওপ্যাথিক কলেজ স্থাপন করিয়া তিনি এদেশের যুবকগণের পক্ষে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষার পথ সুগম এবং তাহাদের উপজীবিকার সদুপায় নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

পুস্তক-পরিচয়

শ্রীকৃষ্ণ-লীলামৃতম্

মহাপ্রভুপাদ শ্রীমতা নীলকান্ত-দেব-গোস্বামিনা প্রণীতম্, মূল্য সার্দ্ধমুদ্রামাত্রম্।

এই পরম পবিত্র গ্রন্থখানিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা ব্যাখ্যা করাই পূজনীয় প্রভুপাদের উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু পারম্পর্য্য রক্ষার জন্য ইহাতে গোলোকলীলাও বর্ণিত হইয়াছে। এখানি প্রথম খণ্ড, ইহাতে রাসলীলা পর্য্যন্তই বিবৃত হইয়াছে। পূজ্যপাদ গোস্বামী মহাশয় এই গ্রন্থে প্রধানতঃ শ্রীধর-স্বামীর টীকাই গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার পর যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন, তাহা যেমন সুন্দর, তেমনই মধুর, আবার তেমনই ভাবপূর্ণ; প্রকৃত সাধক ও লীলারসজ্ঞ মহাত্মা ব্যতীত আর কাহারও লেখনী-মুখে এমন সুমধুর বাণী নিঃসৃত হইতে পারে না। প্রভুপাদ-রচিত সংস্কৃত শ্লোকগুলি এমনই সুন্দর যে, আজকালকার পণ্ডিতগণের লিখিত বলিয়া মনেই হয় না; মনে হয়, যেন কোন মহাকবির রচিত শ্লোকাবলি পাঠ করিতেছি। তাহার পর ব্যাখ্যার কথা। অতি সহজ ও সুললিত গদ্যে ব্যাখ্যা লিখিত; কোথাও পাণ্ডিত্য প্রকাশের অনুমাত্র চিহ্ন নাই; অথচ ভাবৈশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ। এই লীলামৃত পাঠে সকলেই পরিতৃপ্ত হইবেন। লেখক মহোদয় ভগবদ্-গুণানুকীর্ত্তন করিয়াই কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহার শ্রম সফল হইয়াছে।

মহাত্মা গান্ধী

শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত; মূল্য আট আনা।

মহাত্মা গান্ধীর জননী পুত্রের বিলাত-গমনের সময় আদেশ করিলেন 'প্রতিজ্ঞা কর, মদ্য, মাংস ও রমণী স্পর্শ করিবেন না!' 'মাতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলাম'। সতর বৎসরের যুবক এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন; তাই তিনি আজ প্রাতঃস্মরণীয়, ত্যাগী মহাপুরুষ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী; তাই আজ শ্রদ্ধাস্পদ গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত যোগেশবাবু এই মহাত্মার জীবন-কথা বাঙ্গালা ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া ধন্য হইয়াছেন, আমাদিগকেও ধন্য করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীর অতুলনীয় জীবন-কথা ঘরে-ঘরে পঠিত হওয়া উচিত; প্রত্যেক বালক প্রত্যেক যুবকের হস্তে এই পুস্তকখানি আমরা দেখিতে চাই। সুলেখক যোগেশ বাবুকে আমরা সাহিত্য-ক্ষেত্রে সাদরে আহ্বান করিতেছি। জীবন-চরিত লিখিতে হইলে যে সমস্ত গুণের প্রয়োজন, যোগেশ বাবুতে তাহা প্রচুর পরিমাণে আছে, মহাত্মা গান্ধীর জীবন-চরিত তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

মায়ের প্রসাদ

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত, মূল্য আট আনা।

এখানি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্ প্রকাশিত আটআনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালার একত্রিংশ গ্রন্থ। এই গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বেও পড়িয়াছিলাম, পরেও পড়িয়াছি। গল্পাংশে একটা কল্পনার বাহাদুরী বা লোমহর্ষণ ঘটনার সমাবেশ নাই—সাদাসিধে ব্যাপার; কিন্তু লেখকের সরল সহজ রচনার গুণে বইখানি পড়িতে ক্লান্তিবোধ হয় না; কোনখানে বর্ণনার প্রাচুর্য্যে বিরক্তিবোধ হয় না, এবং কোথাও অকারণ পাণ্ডিত্য প্রকাশের চেষ্টাও নাই। সুতরাং বইখানি সাধারণ পাঠকের চিত্তাকর্ষণ করিবে; এবং তাহাতেই পুস্তকের সার্থকতা। গল্পটী বেশ ঝরঝরে, বলাও হইয়াছে বেশ সোজা করিয়া।

মনোরমার জীবন চিত্র

শ্রীমনোরঞ্জন গুহ-ঠাকুরতা কর্ত্তৃক লিখিত; মূল্য দেড়টাকা (বাঁধান)

এখানি মনোরমার জীবন-চিত্রের দ্বিতীয় খণ্ড। প্রথম খণ্ড যখন প্রকাশিত হয়, তখন আমরা দ্বিতীয় খণ্ড পড়িবার জন্য বিশেষ ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছিলাম; মনোরঞ্জনবাবু এতদিনে আমাদের আশা পূর্ণ করিলেন। এই মহিয়সী মহিলা দেবী মনোরমা মনোরঞ্জনবাবুর স্বর্গতা সহধর্ম্মিণী, সহকর্ম্মিণী: সুতরাং মনোরমার জীবন-কথা বলিতে হইলে মনোরঞ্জনবাবুর আত্ম-জীবন-কথা বলিতেই হয়। প্রথম খণ্ড প্রকাশের সময় মনোরঞ্জনবাবু এই জন্য যথেষ্ট সঙ্কোচ বোধ করিয়াছিলেন। আমরা তখনই বলিয়াছিলাম, তাঁহার এ সঙ্কোচের কোন কারণ নাই। দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি নিঃসঙ্কোচে সমস্ত কথা বলিয়া গিয়াছেন; এবং যেমন করিয়া বলিলে দেবী মনোরমার চিত্র পরিস্ফুট হয়, খ্যাতনামা প্রবীণ লেখক তাহাই করিয়াছেন। আমরা এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া শুধু আনন্দিত নহি, উপকৃত হইয়াছি। মনোরমা অকালে চলিয়া না গেলে, তাঁহার জীবনে আরও কত অলৌকিক ব্যাপার দেখিতে পাইতাম।

রাণী ব্রজসুন্দরী

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য দুই টাকা, উত্তম বাঁধাই আড়াই টাকা।

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী-লেখক, তাঁহার সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশবাবু বাঙ্গালী পাঠকের নিকট অপরিচিত নহেন। তিনি মধ্যে কিছুদিন নীরব ছিলেন, এখন এই রাণী ব্রজসুন্দরীকে লইয়া আবার দেখা দিয়াছেন। এখানি উপন্যাস; সুপ্রসিদ্ধ কালাপাহাড়ের কথা এই উপন্যাসের বিষয়; সুতরাং এ উপন্যাসখানি লোকে আগ্রহের সহিত পাঠ করিবেন। আমাদের দেশে উপন্যাস লেখার দুইটী ধারা দেখিতে পাই; একটী বঙ্কিমী ধারা, আর একটী সার রবীন্দ্রনাথের ধারা। শচীশবাবু পূর্ব্বোক্ত মহাত্মার ধারাই অবলম্বন করিয়াছেন। কালাপাহাড়ের চিত্র অতি সুন্দর হইয়াছে; গদাধরও বেশ ফুটিয়াছে। বাঙ্গালীর মেয়ে ব্রজবালা যে রাণী ব্রজসুন্দরী হইতে পারে, তাহা ত সহজে মনে হয় না; এ যে এক অমানুষী চিত্র! শচীশবাবুর বর্ণনা-কৌশল বেশ—তাঁহার কলমও খুব চলে।

কথা সরিৎসাগর

শ্রীকুলদারঞ্জন রায় প্রণীত, মূল্য নয় আনা।

দেখিতে-দেখিতে শ্রীমান কুলদারঞ্জন ছেলেদের জন্য অনেকগুলি বই লিখিয়া ফেলিলেন। তাঁহার 'পুরাণের গল্প' 'ছেলেদের বেতাল পঞ্চবিংশতি' 'ছেলেদের বত্রিশ সিংহাসন' 'রবিন হুড্' প্রভৃতি যথেষ্ট আদর লাভ করিয়াছে। ক্রিকেট-ক্ষেত্রে শ্রীমানের যে ক্ষিপ্রতা ও দক্ষতা দেখিয়া আমরা কত সময় প্রশংসা করিয়াছি, এখন আবার শিশু-সাহিত্য-ক্ষেত্রেও সেই ক্ষিপ্রতা ও দক্ষতা দেখিয়া আমরা তাঁহার ততোঽধিক প্রশংসা করিতেছি; তাঁহার 'কথা সরিৎসাগর' তাঁহার পূর্ব্ব যশঃ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।

সবিতারাধনা

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী প্রণীত, মূল্য এক টাকা।

শ্রীমান মুনীন্দ্রপ্রসাদ সত্যসত্যই 'সর্ব্বাধিকারী'। তিনি উপন্যাস লেখেন, কবিতা লেখেন, গান লেখেন, স্কুলপাঠ্য পুস্তক লেখেন, জীবনী, ভ্রমণ, নীতিপুস্তক, বিবাহের কবিতা, চম্পু কাব্য, কাব্য, রঙ্গ ও ইংরাজী প্রবন্ধও লেখেন; বাকী ছিল নাটক, তাহাও লিখিয়া ফেলিয়াছেন। এই 'সবিতারাধনা'ই সেই নাটক। এখানি কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে অভিনীতও হইয়াছে, সুতরাং নাটক লেখাও সার্থক হইয়াছে। এই নাটকখানি আর কিছুই নহে—আমাদের দেশ-প্রচলিত ইতু-পূজার গল্প। সেই গল্প অবলম্বন করিয়া এই নাটকখানি লিখিত হইয়াছে। যোয়াল নাম শুনিয়া কিন্তু সহজে কথাটা ধরা যায় না। সকলেই ইহা পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিবেন।

হেরফের

শ্রীশরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য পাঁচ সিকা।

এখানি গল্পপুস্তক;—ছোট গল্পের সমষ্টি নহে, একটা ধারাবাহিক গল্প। পূজনীয় কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই গল্পের প্লটের মূল ধারাটি লেখক মহাশয়কে দান করিয়াছিলেন। পাকা আর্টিষ্টের প্লট, তাহার পর সৌষ্টব-সাধনের ভারও লইয়াছিলেন নিপুণ শিল্পী; গল্পটী যে জমিয়াছে, তাহা না বলিলেও চলে। রজতের চরিত্র অতি সুন্দর ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার অধঃপতনের কাহিনী যথাযথ হইয়াছে; তবুও আমাদের মনে হয়, ক্ষণপ্রভার সোণাগাছির বাড়ীর দৃশ্যটা সামান্য একটু ইঙ্গিতে সারিয়া দিলেই হইত; তাহাতেও রজতের অধঃপতনের ইতিহাসের অঙ্গহানি হইত না। বিদ্যুৎ ও শিশির অতি সুন্দর ফুটিয়াছে। বইখানি পড়িয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

বৃদ্ধের বচন

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মূল্য এক টাকা।

'হিতবাদী' পত্রে বহুদিন হইতে 'বৃদ্ধের বচন' প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। যে বৃদ্ধ প্রথমে এই 'বচন' আরম্ভ করেন, তাঁহাকেও আমরা জানি, আর আজ যে বৃদ্ধ সেই 'বচন' চালাইতেছেন ও সম্পাদন করিলেন, তিনিও আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু। এই বচনগুলি 'হিতবাদী'র পাঠকগণ পরম আগ্রহে পাঠ করিয়া থাকেন। সম্পাদক বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র বাবু এগুলি সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত করায় আমরা বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। আজকাল স্পষ্ট-বক্তার বড়ই অভাব হইয়াছে। এ সময়ে এই বচনগুলি বড়ই কাজে লাগিবে।

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় কৃত "সৈনিকের কার্য্যকাল" বাহির হইয়াছে মূল্য ৸০।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত সচিত্র "প্রেমপত্রাবলী" প্রকাশিত হইয়াছে মূল্য ১৲।

মন্দিদার সম্পাদিত রহস্য পিরামিড্ সিরিজের ৫ম গ্রন্থ "লুব্ধ মরীচিকা" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য হাফ রেশমী বাঁধাই পাঁচসিকা, কাগজের মলাট একটাকা।

শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী প্রণীত "দেশের বড়দা" প্রকাশিত হইয়াছে মূল্য ১।০।

শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত, আটআনা-সংস্করণের ৩৪ সংখ্যক গ্রন্থ "শয়তানের দান" প্রকাশিত হইল।

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ প্রণীত "সুনীতি" বাহির হইয়াছে ১।০ ডাকব্যয় ।০।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works,
9, Nanda K. Chaudhuri's 2nd Lane, CALCUTTA.

"কলসী লয়ে কাঁখে   পথ সে বাঁকা"

—রবীন্দ্রনাথ

শ্রীযুক্ত আর্য্যকুমার চৌধুরী-গৃহীত আলোকচিত্র হইতে। [শ্রীশিবকুমার চৌধুরীর অনুমতি অনুসারে

Emerald Printing Works
CALCUTTA.

সচিত্র মাসিক পত্র
ভারতবর্ষ

ফাল্গুন, ১৩২৫

দ্বিতীয় খণ্ড] ষষ্ঠ বর্ষ [তৃতীয় সংখ্যা

নব পরমাণুবাদ

[অধ্যাপক শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্-এ]

পরমাণু বিশ্বের সূক্ষ্মতম জড়োপাদান। সুতরাং পরমাণুবাদ যে জড়বাদ হইবে, তাহা অতীব সহজবোধ্য। আমাদের ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন পরমাণুবাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত। এই উভয় দর্শনেই জড় রূপেই পরমাণুর ধারণা দেখা যায়। পাশ্চাত্য পরমাণুবাদেও জড় রূপেই পরমাণুর ধারণা। এই প্রকারে পরমাণু জড়তত্ত্ব রূপেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় জগতেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। জড় রূপে পরমাণুর ধারণা এতকাল পর্য্যন্ত আমাদের মধ্যে এরূপ বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, এক্ষণে পরমাণু সম্বন্ধে অন্য কোনরূপ সন্ধান আমাদিগকে কেহ প্রদান করিতে চাহিলে, আমরা যে তাহা শুনিতে চাহিব না,—বরঞ্চ উপেক্ষা করিতেই উদ্যত হইব, তাহা কিছুই বিচিত্র নহে। আমরা কিন্তু পরমাণু সম্বন্ধে নূতন সন্ধান প্রদান করিতেই অগ্রসর হইয়াছি। আমাদের সেই সন্ধানে পূর্ব্বেই উপেক্ষা প্রদর্শন না করিয়া, বিচার পূর্ব্বক যেন উপেক্ষা প্রদর্শন করা হয়, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

প্রথমেই আমরা বায়ুপুরাণ হইতে একটী স্থল উদ্ধৃত করিতেছি :—

> "তাসুপ্রকৃতি মং সূক্ষ্মমধিষ্ঠাতৃত্বমব্যয়ম্।
> অনুৎপাদ্যং পরং ধাম পরমাণুপরেশয়ম্॥
> অক্ষয়শ্চাপ্যনূহ্যশ্চ অমূর্ত্তিমূর্ত্তিমানসৌ।
> প্রাদুর্ভাবস্তিরোভাবঃ স্থিতিশ্চাপ্যনুগ্রহঃ॥
> বিধিরন্যৈরনৌপম্যঃ পরমাণুর্মহেশ্বরঃ॥"

—বায়ুপুরাণ, ১০১ অধ্যায়।

"তন্মধ্যে প্রকৃতিমান্, সূক্ষ্ম, অক্ষয়, অব্যয়, অনুৎপাদ্য, অতর্ক্য, অমূর্ত্ত অথচ মূর্ত্তিমান্, পরমাণুস্বরূপ, অধিষ্ঠানাত্মক, পরমধাম পরমেশ্বর বিরাজমান, তিনি প্রাদুর্ভাব, তিরোভাব, স্থিতিবিধি দয়াদির মূল আশ্রয়, অথচ সর্ব্ববিধ বৃত্তির দ্বারা অনৌপম্য।"

এস্থলে পরমাণুর জড়ত্বের সহিত ঈশ্বর-চৈতন্যের সংমিশ্রণেরই আশ্চর্য্য চেষ্টার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ন্যায় ও বৈশেষিক মতে পরমাণু বিশ্বের উপাদান-কারণ,

আর ঈশ্বর নিমিত্ত-কারণ বা কর্ত্তা। ইহাতে পরমাণু স্বতন্ত্র তত্ত্ব রূপে পরিণত হওয়াতেই দ্বৈতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। এই দ্বৈতবাদ স্বীকার করিতে গেলে, ঈশ্বরকে খর্ব্ব করিতে হয় বলিয়াই, অদ্বৈতবাদের পক্ষ হইতে পরমাণুতে চৈতন্যের আরোপ করতঃ, উপাদান-কারণকেই নিমিত্ত-কারণে পরিণত করা হইয়াছে। উদ্ধৃত বর্ণনায় পরমাণু ও ঈশ্বরের মধ্যে কিরূপ চমৎকার সাদৃশ্য প্রদর্শন পূর্ব্বক সামঞ্জস্য বিধান করা হইয়াছে, তাহা বিশেষরূপেই লক্ষ্যণীয়।

বায়ুপুরাণেরই অন্য একটী বাক্যেও স্পষ্টভাবেই পরমাণুর সহিত পরমেশ্বরের অভেদ ভাব স্বীকৃত হইয়াছে; যথা :—

"ঈশ্বরঃ পরমাণুত্বাদ্ভাবগ্রাহ্যমনীষিণাম্॥"

"ঈশ্বর পরমাণুস্বরূপ বলিয়া মনীষিদিগের ভাবের দ্বারাই মাত্র গ্রাহ্য।"

ঈশ্বরের এই পরমাণুরূপ যে কেবল পুরাণের উক্তিতেই সন্নিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা নহে; এতদনুসারে বিষ্ণুর এক নামও "পরমাণ্বঙ্গক" হইয়াছে। এইরূপে ভাষাতে পর্য্যন্ত যে পরমাণুর ঈশ্বরত্ব-ধারণার সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহাই আমরা দেখিতে পাইতেছি। কেবল তাহাই নহে। পরমাণুর ঈশ্বরত্ব-ধারণার উৎপত্তি কিরূপে হইয়াছে, তাহাও আমরা এখানেই দেখিতে পাই। পরমাণু ঈশ্বরের অঙ্গ রূপে স্বীকৃত হইয়াই ঈশ্বরত্বে পরিণত হইয়াছে, ইহাই আমরা জানিতে পারিতেছি। এই প্রকারে ঈশ্বরের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাব হইতেই জড়-পরমাণুবাদ চেতন-পরমাণু-বাদে পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে। পরমণুবাদের দ্বৈতবাদের সহিত এখানেই অদ্বৈতবাদের সমন্বয় ঘটিয়াছে।

পুরাণে যাহা সিদ্ধান্ত রূপে প্রকাশিত, উপনিষদে তাহারই যুক্তি, বিবিধ দৃষ্টান্ত সহকারে গুরুশিষ্যসংবাদচ্ছলে প্রদর্শিত। এস্থলে আমরা সেই বিচিত্র দৃষ্টান্ত পরম্পরার দুইটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিব :—

"ন্যগ্রোধফলমত আহরেতীদং ভগবইতি ভিন্ধীতি ভিন্নং ভগবইতি কিমত্র পশ্যসীত্যণ্ব্য ইবেমাধানা ভগব ইত্যাসা-মঙ্গৈকাং ভিন্ধীতি ভিন্না ভগব ইতি কিমত্র পশ্যসীতি ন কিঞ্চন ভগব ইতি। ১ তং হোবাচ যং বৈ সোম্যৈতদণিমানং ন নিভালয়স এতস্য বৈ সোম্যৈষোঽণিম্ন এবং মহান্ ন্যগ্রোধস্তিষ্ঠতি। শ্রদ্ধৎস্ব সোম্যেতি স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্য-মিদং সর্ব্বং তৎসত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ ইতি দ্বাদশখণ্ডঃ।"

"লবণমেতদুদকেঽবধায়াথ মা প্রাতরুপসীদথা ইতি সহ তথা চকার তং হোবাচ যদ্দোষা লবণমুদকেঽবাধা অঙ্গ-তদাহরেতি তদ্ধাবমৃশ্য ন বিবেদ। ১ যথা বিলীন মেবাঙ্গা-স্যান্তাদাচামেতি কথমিতি লবণমিতি মধ্যাদাচামেতি কথমিতি লবণমিত্যন্তাদাচামেতি কথমিতি লবণমিত্যভি-প্রাস্যৈনদথ মোপসীদথা ইতি তদ্ধ তথাচকার তচ্ছশ্বৎ সংবর্ত্ততে তং হোবাচাত্র বাব কিল সৎসোম্য ন নিভালসেঽ-ত্রৈব কিলেতি। স চ এষোঽণিমৈতদাত্ম্যামিদং সর্ব্বং তৎ-সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি॥" ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

"ইহা হইতে ন্যগ্রোধফল আহরণ কর।" (শিষ্য বলিতেছে) "ভগবন্! এই ন্যগ্রোধফল।" "ইহাকে ভগ্ন কর।" "ভগবন্! ভগ্ন করা হইয়াছে।" "ইহাতে কি দেখিতে পাইতেছ?" "হে ভগবন্! এই ক্ষুদ্র বীজসকল।" "ইহাদের একটীকে ভগ্ন কর।" "ভগবন্! ভগ্ন করা হইয়াছে।" "ইহাতে কি দেখিতে পাইতেছ?" "ভগবন্! কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।" তাহাকে (গুরু) বলিলেন, "হে সৌম্য! যে অণু রূপকে নিরীক্ষণ করিতে পারিতেছ না—এই অণু রূপেরই (বিকাশরূপে) এই প্রকাণ্ড ন্যগ্রোধবৃক্ষ বর্ত্তমান রহিয়াছে। হে সৌম্য! ইহা বিশ্বাস কর যে, সেই অণুত্বই এই (বৃক্ষ)। এই সমস্ত বিশ্বই অণিমাত্মক, উহাই সত্য। উহাই আত্মা। হে শ্বেতকেতো! উহাই তুমি।" (গুরু এইরূপ বলিয়া বিরত হইলে, শিষ্য বলিলেন) "হে ভগবন্! পুনর্ব্বার আমাকে বিশেষভাবে বলুন।" (গুরু বলিলেন) "হে সৌম্য! তাহাই করিতেছি।"

"এই লবণ জলে রাখিয়া প্রাতঃকালে আমার নিকট আসিও।" সে তাহাই করিল। তাহাকে গুরু বলিলেন, "ওহে! রাত্রিতে যে লবণ জলে রাখিয়াছিলে, তাহা আনয়ন কর।" তাহা সে হাতের দ্বারা খুঁজিয়া পাইল না; যেহেতু তাহা জলে বিলীন হইয়া গিয়াছে। (গুরু বলিলেন) "ইহার উপর হইতে আচমন করিয়া কিরূপ স্বাদ পাওয়া যায় দেখ।" শিষ্য বলিলেন, "লবণের স্বাদ।" "ইহার

মধ্য হইতে আচমন করিয়া দেখ কিরূপ স্বাদ?" "লবণাস্বাদ।" "তল হইতে আচমন করিয়া দেখ কিরূপ স্বাদ?" "লবণাস্বাদ।" "ইহা পান করতঃ আমার নিকট আসিও।" সেই শিষ্য তাহাই করিল, ইহা পুনঃ-পুনঃ হইতে লাগিল। তাঁহাকে গুরু বলিলেন, "হে সৌম্য! ইহাতেই সদ্বস্তু বিদ্যমান আছে। কিন্তু তাহা নিরীক্ষণ করিতে পারিতেছ না।" "এই যে অণুত্ব তাহাই সেই সদ্বস্তু। সমস্ত বিশ্বই এই অণুস্বরূপ। উহাই সত্য, উহাই আত্মা। তুমিও, হে শ্বেতকেতো! উহাই।"

এস্থলে বিশ্বের মূল অণুস্বরূপ প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই অণু যে চৈতন্যস্বরূপ, জড়স্বরূপ নহে, তাহাও ছান্দোগ্যোপনিষদেরই অপর স্থলে স্পষ্টরূপেই প্রতিপাদিত দেখা যায়। এখানে আমরা তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি:—

"অন্নমাশিতং ত্রেধা বিধীয়তে তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তৎ পুরীষং ভবতি যো মধ্যমস্তন্মাংসং যোঽণিষ্ঠস্তন্মনঃ। ১ আপঃপীতা স্ত্রেধা বিধীয়ন্তে তাসাং যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তন্মূত্রং ভবতি যো মধ্যমস্তল্লোহিতঃ যোঽণিষ্ঠঃ স প্রাণঃ। ২ তেজোঽশিতং ত্রেধা বিধীয়তে তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তদস্থি ভবতি যো মধ্যমঃ স মজ্জা যোঽণিষ্ঠঃ সা বাক্। ৩ অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ীবাগিতি ভূয় এব মা ভগবান্বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ। ৪ ইতি পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।"

"ভুক্ত অন্ন তিন প্রকারে পরিণত হয়। যাহা স্থূলাংশরূপ বস্তু তাহা মল হয়; যাহা মধ্যম প্রকারের বস্তু তাহা মাংস হয়; আর যাহা সূক্ষ্মতম বস্তু তাহা মন হয়। পীত জল তিন প্রকারে পরিণত হয়,—ইহার স্থূলাংশ মূত্র হয়; মধ্যমাংশ রক্ত হয়; আর সূক্ষ্মতমাংশ প্রাণ হয়। ভুক্ত তেজঃ পদার্থ তিন প্রকারে পরিণত হয়,—স্থূলাংশ অস্থি; মধ্যমাংশ মজ্জা ও সূক্ষ্মতমাংশ বাক্ রূপে পরিণত হয়। হে সৌম্য! মন অন্নময়, প্রাণ জলময় ও বাক্ তেজোময়।" "হে ভগবন্! পুনর্ব্বার আমাকে বলুন।" "হে সৌম্য! তাহাই করিব।"

এই বর্ণনা হইতে সমস্ত স্থূল রূপের মূল অবলম্বন স্বরূপেই যে পরমাণু বর্ত্তমান এবং এই পরমাণু যে চৈতন্যাত্মক, তাহাই প্রতীয়মান হয়।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে পরমাণু অপেক্ষাও সূক্ষ্ম পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার নাম "Electron" বা "তাড়িতাণু"। এই তাড়িতাণু সকল শক্তির আধার বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। পরমাণু সকল এই সকল তাড়িতাণু দ্বারাই গঠিত। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে এতৎ সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়:—"Each atom has proved to be remarkable collection of electrons, a colossal reservoir of energy." The Evolution of Mind, by MacCabe, p. 14.

"প্রত্যেক পরমাণুমাত্রই সুস্পষ্ট লক্ষিত তাড়িতাণুপুঞ্জ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। প্রত্যেকটীই শক্তির বিপুল আধার।"

পরমাণু যে শক্তির আধার বলিয়া উক্ত হইয়াছে, উহার সেই শক্তি যে তাড়িৎ হইতেই প্রাপ্ত, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। কারণ, তাড়িৎ নিজেই যে শক্তি পদার্থ, তাহা সকলেরই সুবিদিত। তাড়িতের কার্য্যের দ্বারাই পরমাণু সকলের সংযোগ-বিয়োগ সাধিত হইয়া বিশ্বের পদার্থ-সকলের সৃষ্টি হয়। উপনিষদের "অণিষ্ঠ" বা অণুতম সূক্ষ্মতত্ত্ব তাড়িতাণুর অনুরূপ বলিয়াই আমাদের মনে হয়। কিন্তু কেবল তাড়িতাণুর অনুরূপ বলিলেই ইহার যথার্থ স্বরূপ বলা হইল বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি না। তাড়িতাণু কেবল শক্তি স্বরূপ; কিন্তু উপনিষদের "অণিষ্ঠ" কেবল শক্তি স্বরূপই নহে; ইহা তদতিরিক্ত চৈতন্য-স্বরূপও বটে; অর্থাৎ উপনিষদের "অণিষ্ঠ" চৈতন্যানুপ্রাণিত শক্তি স্বরূপ। পরমাণুতে এইরূপ চৈতন্যের আরোপ না করিলে, পরমাণু যোগে চেতন সৃষ্টির কোন ব্যাখ্যাই দেওয়া যাইতে পারে না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পরমাণুবাদীদিগের মতে ঈশ্বর জগতের স্বতন্ত্র চেতনরূপী কর্ত্তা ও পরমাণু স্বতন্ত্র জড়োপাদান রূপে স্বীকৃত হওয়ায়, এবং ঈশ্বর সৃষ্টি হইতে পৃথক্রূপে অবস্থিত থাকায়, সৃষ্টিতে চৈতন্যের স্ফুরণ অতীব দুর্জ্ঞেয় রহস্যরূপেই পরিণত হয়। কিন্তু, চেতনরূপী বিশ্বস্রষ্টার বিকাশরূপে পরমাণুর কল্পনা করিলে, চেতন সৃষ্টির সুব্যাখ্যা যেমন আমরা পাইতে পারি, জড় সৃষ্টির সুব্যাখ্যাও তেমনই আমরা পাইতে পারি। কারণ, জড় চেতনেরই স্থূল রূপ এবং চেতন, জড়েরই সূক্ষ্ম মূলতত্ত্ব বা আত্মা। উপনিষৎ "অণোরপি অণিয়ান্" বলিয়া এই সূক্ষ্ম মূলতত্ত্ব বা আত্মাকেই নির্দ্দেশিত করিয়াছে। অণু হইতেও অণুরূপে

বর্ত্তমান থাকিয়া, বিশ্বের এই চরম তত্ত্ব রূপে পরমাত্মা, পরমাণু অপেক্ষাও সূক্ষ্মরূপে ইহার মূলস্বরূপ হইয়াছেন। এইরূপেই উপনিষৎ ও পুরাণে পরমাণুতত্ত্ব চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরতত্ত্বের অভিন্নরূপে পরিণত হইয়া এক অভিনব পরমাণু-বাদের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহা প্রচলিত জড়-পরমাণুবাদ নহে, পরন্তু, চেতন-পরমাণুবাদ। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে ইহার যে সূচনামাত্র হইয়াছে, প্রাচ্য দর্শনের শেষ মীমাংসাতেই তাহার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

মা

[শ্রীঅনুরূপা দেবী]

(১২)

বিবাহের পর একটী বৎসর কাল মনোরমা পতিগৃহে স্থান লাভ করিয়াছিল। এক বৎসর সময় খুব দীর্ঘ নয়—তিনশত পঁয়ষট্টি দিন মাত্র; কিন্তু মনোরমার নিকট সেই একটী বৎসর,—কাল-সমুদ্রের সেই এতটুকু একটী বিন্দু,—ঘটনা-বৈচিত্র্যময় একটী পূর্ণ যুগেরই ন্যায় সুদীর্ঘ। সেই ক্ষুদ্র বৎসরটি তাহার স্মৃতির ভাণ্ডারে যে সব অমূল্য রত্ন সম্পদ প্রদান করিয়াছে, সে সকলের দীপ্তি এখনও তো ম্লান হয়ই নাই, কখনও হইবে এমনও মনে হয় না। যেহেতু তাহার মধ্যে তো একটীও খুঁটা নাই। সেই বৎসরের অসংখ্য ছোট-বড় সুখের আলোয় এতটা কাল ধরিয়াই এই অভাগী মেয়েটার বুকের মধ্যটা অন্ধকারের কালো কালিতে ভরিয়া উঠে নাই; বরং আজও আঁধার আকাশের গায়ে-গায়ে ছিটানো নক্ষত্র-বিন্দুগুলির মত ফুটিয়া-ফুটিয়া আলো হইয়া আছে। মনোরমা সব ছাড়িতে পারে; কেবল সেই সুধাসিক্ত বৎসরটির স্মৃতিটি সে ইহজীবনের সার করিয়া তো রাখিবেই; যদি সম্ভব হয়, তবে হয় ত পরকালেও ইহাকেই মাথায় করিয়া লইয়া যাইবে। শ্বাশুড়ী সোণার চক্ষে দেখিয়াছিলেন, ননন্দার সৌখ্য উপমার স্থল হইয়া উঠিয়াছিল;—আর স্বামি-প্রেম?—তা বৈকুণ্ঠবাসিনী নারায়ণীরও ভাগ্যে ঠিক অমনটি ঘটিয়াছে কি না, এ বিষয়ে এই মুগ্ধা নারীটির মনের মধ্যে আজও বিষম সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে। অরবিন্দ নিজে দেখিয়া, বড় সাধ করিয়া বধূ ঘরে আনিয়াছিল। বধূর অঙ্গে দুগাছি হোগলা-পাকের বালা এবং ইহারই উপযুক্ত আরও খানকয়েক হাল্কা পুরাতন প্যাটার্ণের জলুষবিহীন সোণারূপা দর্শনে মাতা ক্ষুব্ধ; বধূর সঙ্গে একখানি মাত্র কোম্পানি কাগজের উপযুক্ত রৌপ্যমুদ্রা গৃহপ্রবিষ্ট হওয়ায় পিতা রুষ্ট; বধূর পিত্রালয় হইতে মিষ্টান্নাদির অপ্রচুরতায় আত্মীয়া-কুটুম্বিনী, দাসদাসী, প্রতিবেশী সকলেই অসন্তুষ্ট হইয়া, যাহার যেমন ইচ্ছা নববধূর পিতৃবংশে ইচ্ছা-সুখে কালির আঁচড় কাটিতে দ্বিধা করে নাই। কেবল একা অরবিন্দের চিত্তের কোন অংশে কোনও অপ্রসন্নতার ছায়াপাত পর্য্যন্ত করিতে সমর্থ হয় নাই। সে চারি পাশের বিপ্লব-বিদ্রোহ সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করিয়া উড়াইয়া দিয়া কিশোরী বধূটির সহিত আলাপ-পরিচয় করিয়া ফেলিবার জন্য একান্ত উৎসাহের সহিত লাগিয়া গেল। হিন্দুর ঘরের হিসাবে বধূ নিতান্ত বালিকা নয়; দরিদ্র পিতাকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করায় প্রথমাবধিই মনে-মনে সে স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞ; তাহার উপর চিরসঙ্গিনী ভগিনী শরৎশশীর সহায়তা; দেখিতে-দেখিতে বর-বধূ পরস্পরের কাছাকাছি আসিয়া পড়িল। গ্রীষ্মাবকাশ, একজামিনের পড়া বলিয়া ছেলে-বউএর স্বতন্ত্র থাকিবার ব্যবস্থা কর্ত্তা করিয়া দিলেন। অরবিন্দ শুষ্ক মুখে শরতের কাছে-কাছে ঘুর ঘুর করিয়া বেড়ায়, পান-সুপারির প্রয়োজনে ঘন-ঘন বাড়ীর মধ্যে যাতায়াত করে, রাত্রিতে আহারাদির পর শরতের ঘরের বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়ে, —উহারা আসিলে বলে, "আজ আমার ভারি মাথা ধরেছে, তোরা ওঘরে শুতে যা।" শরৎ বধূর উপর মাথা-ধরার চিকিৎসা-ভার চাপাইয়া দিয়া, মুখ টিপিয়া হাসিতে-হাসিতে সরিয়া যায়। ভোরের বেলা কোন দিন সেই আসিয়া ডাকিয়া দেয়, কোন দিন বধূ বা অরবিন্দ জাগিয়া উঠিয়া তাহার

সহিত ঘর-বদল করে। তা এমন প্রায় প্রত্যহই ঘটিতে লাগিল। বিশেষ, এই রকম ঔষধের ব্যবস্থায় রোগ কি কখনও সারিতে চাহে? বরং দিনে-দিনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া, এমন কি, সুযোগ বুঝিলে—অকস্মাৎ যখন-তখন দিবা দ্বিপ্রহরেও, ইহার আক্রমণ ঘটিতে লাগিল। পিতা কোর্টে চলিয়া যান, ঊষা স্কুলে যায়, মাতা দিবানিদ্রায় একটা ঘরে কোথায় সুপ্ত থাকেন; আর জানিতে পারিলেও তিনি কখন এসব বিষয় চোখ দিয়া দেখেন না,—বরং স্নেহের কৌতুকে মনে-মনে একটুখানি হাস্য করিয়া, নিজেদের এই বয়সের কথাগুলি স্মরণ করেন। এমন দিন সকলেরই এক সময় আইসে,—শুধুই যে ইহাদেরই আসিয়াছে তা নয়। এই বলিয়া অপরাধীদের ক্ষমা করিয়া যান। এমন করিয়া যে দিন কাটিতেছিল, সেই স্বপ্নালস-ভরা সুখের দিন অকস্মাৎ কি নির্ম্মম বেদনার আঘাতেই দুঃখের কালরাত্রিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

দীননাথ মিত্রের প্রতিশ্রুত অলঙ্কারের মধ্যে ভরি-দশ-বারো সোণা মৃত্যুঞ্জয় বসুর গৃহে পৌঁছিয়া উঠিতে পারে নাই। বিবাহের সময় বড়লোকের সহিত কুটুম্বিতার আনন্দে মিত্রজা খাট-বিছানা, চেয়ার-টেবিল, রূপার দান এবং বিবাহ-রাত্রির খাওয়া-দাওয়ায় অবস্থার অতিরিক্ত ব্যবস্থা করিয়া ফেলিয়া, স্বর্ণকারটিকে এক পয়সা দিতে না পারায়, দু'তিনখানি গহনা আদায় করিতে পারেন নাই। বিবাহ-সভায় সমস্ত দেনা-পাওনা বুঝাইয়া দেওয়া হইল। বসুমহাশয় মানী লোক, তিনি এ সকল ছোট বিষয়ের মধ্যে থাকিতে পারেন না। বাড়ীর প্রাচীন সরকার বিধুভূষণ নগদ টাকা গণিয়া, এবং বধূর অঙ্গের অলঙ্কার ফর্দ্দ সহিত মিলাইয়া লইতে গিয়া দেখিল কাণ, রতনচূড় এবং খোঁপায় দিবার সোণার আটটি প্রজাপতির অভাব ঘটিতেছে। কন্যাকর্ত্তা মিনতি করিয়া জানাইলেন, উহা সেকরায় এখনও দিতে পারে নাই, ফুলশয্যার সঙ্গে নিশ্চিত ঐ কয়টি বস্তু পৌঁছাইয়া দিব। বরকর্ত্তা দু চারিটি বিশিষ্ট বন্ধুর সহিত সে সময়ে আলাপ করিতেছিলেন। বন্ধু কয়টির মধ্যে একজন বিখ্যাত রিফরমার ছিলেন; 'বরপণ' সম্বন্ধে তাঁহার মতটা বেশ সুবিধামত নয়। বিধুভূষণের খবরটা কাণে পৌঁছিতেই, তিনি কিছু গরম হইয়া উঠিয়া বসুজর দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "সে কি হে, এই না শুন্‌লাম, তুমি বিনা-পণে ছেলের বে' দিচ্ছো?"

মৃত্যুঞ্জয় ভাবী বৈবাহিক এবং বিধুভূষণের উপর মনে-মনে অত্যধিক রুষ্ট হইয়া, প্রকাশ্যে ক্রোধটাকে দমনে রাখিয়াই, সহাস্যে উত্তর দিলেন, "দিই নি কি? তা' না দিলে এই বাড়ীতে কি অরুকে নিয়ে আমরা পা দিই?" বন্ধুদের মধ্যে মর্য্যাদাশালী সব কয়টিই। বসুজ মহাশয়ের খাতিরে ভিন্ন এ বাড়ীতে ইঁহারা পা ধুইতেও আসেন না। এরূপে বাধ্য হইয়া আসিতে হওয়ায় কন্যাকর্ত্তার উপরে মন কাহারও বিশেষ ভাল ছিল না। ইঁহাদেরই একজন বসু মহাশয়ের বাক্য সমর্থন করিয়া তাই আগ্রহের সহিত সায় দিয়া উঠিলেন, "সে কথা আর তোমায় কষ্ট করে বল্‌তে হবে কেন ভয়? যাদের-যাদের কপালের মধ্যে দুটো চক্ষু আছে, তারাই কি এটা দেখ্‌তে পাচ্চে না? ওই সোণার চাঁদ ছেলে—দশটি হাজার টাকা নগদ গুণে দিয়ে জড়াও-সুট গহনায় মেয়ের গা ঢেকে দিলেও, যে ছেলে লোকে পায় না, সেই ছেলের কি না ঐ একটা হাজার টাকাকে গণপণ বল্‌তে হবে? আজকালের কানা-খোঁড়া ছোঁড়া-গুলোও তো এর চেয়ে বেশী আনে।" অপর একটী ভদ্রলোক—ইঁহার একটী দৌহিত্রীর সহিত এক সময় অরবিন্দের বিবাহের কথাবার্ত্তা হয়;—মৃত্যুঞ্জয় বসুর ফর্দ্দ মিলাইয়া আর-আর সমস্তই দিতে প্রস্তুত ছিলেন, কেবল নগদ পাঁচ হাজারটাকে তিন হাজারে নামাইয়া দিতে অনুরোধ করায় কোষ্ঠির কি অমিল বাহির হইয়া পড়িয়া বিবাহ ভাঙ্গিয়া যায়। ইনি এই সুযোগে সেই কথাটি একটুখানি স্মরণ করাইয়া দিতে চাহিলেন—"আমরা যে এই ছাপোষা মানুষ, বেশী পারিনে, তবু নগদে গহনায় সাত-আট হাজারের কমেও তো মেয়ে সভাস্থ কর্‌তে লজ্জা বোধ করি। তবু কি আর সকল দিক থেকে অমন পাত্তরটি পেয়েচি!" "আরে ছ্যাঃ, এ কি আবার একটা বিয়ে! বোস্‌জা, পাঁশগাদায় মুক্তো ছড়ালে!" "তা যা বলো যা কও, মনুষ্যত্ব দেখিয়েছে বটে! আজকালকার দিনে এমন কে পারে বল দেখি? এ একটা এক্‌জাম্‌পল হলো।"

"যথার্থ! ধন্য আপনি! দেশের কাছে এ মহত্ত্বের সংবাদ পৌঁছান উচিত। বেঙ্গলী, হিতবাদী, বসুমতী আর সঞ্জীবনীতে এ সম্বন্ধে খবর পাঠান উচিত।"

মৃত্যুঞ্জয় সসব্যস্তে কহিয়া উঠিলেন, "আরে রাম রাম, ওসব কর্ব্বেন না। এতো সাধারণ কর্ত্তব্য করেছি,—এতে আর 'মহত্ব'টা আমার এমনই কি দেখলেন!—"

"বলেন কি! মহত্ব নেই!—দু'দশটা টাকার লোভই লোকে ছাড়তে না পেরে গরীবের ভিটে বেচে নেয়,—মনীবের টাকা ভেঙ্গে কত লোক এই কন্যাদায়ে জেল খেটেচে, অথবা অপমান এড়াবার জন্যে আত্মহত্যা করে মরেচে। আর আপনি আপনার এই অগাধ টাকা,—কন্দর্পের মত সুন্দর এম-এ পাশ করা ছেলে, এই দরিদ্র ঘরে স্বেচ্ছায় এসে বিয়ে দিচ্চেন, এর চেয়ে আর—"

এই সময় রিফরমার বন্ধুটি আবার বলিয়া উঠিলেন—"কিন্তু ঐ যে গহনা সম্বন্ধে কি একটা কথা শুনছিলেম না? বড়লোকের কাছে দশ হাজার ছেড়ে চল্লিশ হাজার টাকা নগদ গুণে দিলে তেমন কোন ক্ষতি হয় না, যত এই ক্ষীণপ্রাণ গরীব গৃহস্থকে পেষণ করায় হয়।" "গরীব গরীবের মত থাকলেই পারে, তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা করে উঁচু ডালের ফল ধরতে যাবার দরকার কি?" "কার না সাধ হয় মেয়েটি একটু সুখে থাকে? কন্যাপুত্রের সুখাকাঙ্ক্ষী মা-বাপকে অপরাধী মনে করতে পারিনে। ধনীর মনে যদি ধনাকাঙ্ক্ষা বড়ই প্রবল থাকে, তাঁরই প্রথমাবস্থায় দরিদ্রকে নিবৃত্ত করা উচিত। নতুবা সম্মত হয়ে অভাগা লুব্ধকে আশা-স্বর্গে তুলে ক্রমে-ক্রমে তার গলা টিপে ধরা—"

নতমুখ কন্যাকর্ত্তা গলবস্ত্রে আসিয়া কুণ্ঠিত অস্ফুট ভাষে জানাইলেন, "লগ্ন উপস্থিত, অনুমতি হইলে"—কথাটা সমাধা হইতে না দিয়া মধ্যপথেই ভাবী বৈবাহিক মহাশয় ব্যস্ত হইয়া বাধা দিলেন "বিলক্ষণ! অনুমতিই যদি না দেবো, তাহলে কি আমরা এখানে বন-ভোজন করতে এসেছি?"

সঙ্গে-সঙ্গেই বিষাক্ত তীরের মত আক্রোশ পরিপূর্ণ একটা তীক্ষ্ণদৃষ্টি—যে ব্যক্তি প্রাংশু লভ্য ফল লাভার্থ নিজের খর্ব্বতা সত্ত্বেও উদ্বাহু হইয়া উঠিয়াছে,—তাহারই প্রতি নিক্ষিপ্ত হইল। ইহার মধ্যে আর যে অর্থ নিহিত থাকে থাক, প্রীতির উৎস যে তন্মধ্য হইতে উৎসারিত হইয়া উঠিতেছিল না, সেটুকু বেশ বুঝিতে পারা যায়। এমনি দশে-চক্রে পড়িয়া মনোরমা মেয়েটীর বরণমালা তাহার নাগাল পাওয়ার অনেক উর্দ্ধে, বিখ্যাত ধনীপুত্র কৃতবিদ্য অরবিন্দের গলায় পৌছিয়াছিল।

তা পৌছিলে আর কি হইবে, মালা-গাঁথা সুতাটার হয় ত বা তেমন জোর ছিল না; অথবা বুঝি সুতাই তাহাতে ছিল না,—বিনা সুতার মালা গলায় উঠিয়াই খসিয়া পড়িয়া গেল। লোকলজ্জায়ই বোধ করি অনিচ্ছুক বিরক্তিভরে বসু মহাশয় বধূ লইয়া ঘরে ফিরিলেন; কিন্তু যাত্রাকালে এবং ইহার পর হইতে সকল সময়েই তিনি বধূ এবং তদ্দাতা পিতাকে শুনাইতে লাগিলেন যে, যে ছোট ঘর হইতে তিনি মেয়ে লইতে বাধ্য হইয়াছেন, সেখানে আর তাহাকে পাঠাইবেন না। ফুলশয্যার তত্ত্ব আসিলে দ্বারের বাহির হইতেই সে সকল দ্বারবান, মেথর ও ডোমকে বাঁটিয়া দিয়া, কুটুম্ব-গৃহের দাসী-চাকরগণকে শুধু ন ভূতো ন ভবিষ্যতি গালি বকশীষ করিয়া বিদায় দেওয়া হইল। পাকস্পর্শে বর্দ্ধমানের অনেক গণ্যমান্য ভদ্র ব্যক্তির নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, দীনুমিত্রের হয় নাই। কেমন করিয়া হইবে? সেই নেংটি পরা ছোট-লোকটা কি তাঁহাদের মত, মেয়ের অঙ্গ সোণা-হীরায় মুড়িয়া দিতে পারিয়াছে? না ফুলশয্যার তত্ত্বে একশত জন দাসী-চাকর কুটুম্ব-বাড়ী পাঠাইয়াছিল? তা যাই হোক, এমন করিয়া যে গরল সেই মৃত্যুঞ্জয়ের কণ্ঠে জমিয়া রহিল, তাহা তাঁহার কোন অপকার করিতে না পারিলেও, তাহার মুহুর্মুহুঃ উদ্গীরণে ক্ষুদ্র-প্রাণ ব্যক্তিগণ জর্জ্জরীভূত হইয়া উঠিতেছিল। পূজার তত্ত্ব অবমানিত হইয়া ফিরিয়া গেল। জামাইএর চাকর জামাইএর ধুতী-চাদরটা কুটুম্ব-গৃহের দাসীদের সাক্ষাতেই বখশিষ লাভ করিল। মেয়ের সাড়িখানা শুধু মেয়ের কাছে পৌছিল। বাকী জিনিসপত্র গালির চোটে ফেরৎ লইয়া, ধনীগৃহে ভালরূপ পাওনার আশায় এতখানি পথ বাহিয়া আগত পাড়াপ্রতিবেশিদের এবং বাড়ীর দাস-দাসীগণ বর্দ্ধমানে ফিরিয়া গিয়া দুর্গাসুন্দরীর উপর মনের ঝাল মিটাইয়া ছাড়িল। সকলেই একবাক্যে শপথ করিয়া বলিল যে, তেমন ছোটলোকের বেহদ্দ ঘরে তাহারা আর এজন্মে কখন পা দিবে না। তাহারাও ঢের-ঢের তত্ত্ব লইয়া গিয়াছে, এমন করিয়া কখন অপমানিত হয় নাই। অমুক জায়গায় অমুক বাবুর বাড়ী দু'টাকা করিয়া নগদের উপর আবার স্বয়ং বাড়ীর কর্ত্তা নিজে হাতে করিয়া পান খাইবার জন্য পাঁচ টাকা বখশিষ করিয়াছিলেন। অমুক গাঁয়ের অমুক জমিদারের গৃহিণী নিজের হাতে লুচি ভাজিয়া কাছে

দাঁড়াইয়া খাওয়াইয়াছিলেন ইত্যাদি। মনোরমার যেমন চামার-শ্বশুর, গড় করি বাবা শ্বশুরের পায়ে!

দুর্গাসুন্দরী কাঁদিয়া বলিলেন, "ওগো, ওরা মেয়েটাকে আমার কতই না লাঞ্ছনা করচে; তুমি যেমন করে হয়, আমার মেয়ে এনে দাও।"

দীননাথ ইতঃপূর্ব্বে কয়েকবার কন্যা আনিবার চেষ্টা করিয়া সফল-প্রযত্ন হইতে না পারায় হাল ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। পূজার পূর্ব্বে দেশে আসার খবর পাইয়া স্বয়ং হাবড়া গিয়া বেহাইএর সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিয়া আসিয়াছেন। গহনার দামের বাকী আড়াই শতের মধ্যে দেড় শত টাকা জমা করিয়া দিয়া মেয়েটিকে একবার বর্দ্ধমানে লইয়া যাইবার জন্য অনেক মিনতি করিয়াছিলেন; কিন্তু কিছুই ফল হয় নাই। ওকালতি কার্য্যে মক্কেলের নিকট করিয়া আদায় করা যাঁহার নিত্যকার্য্য, এবং সেই সেই টাকার তেজারতিতে সুদের সুদ তাহার সুদ আদায় করায় যাঁহার একমাত্র আনন্দ, বিবাহের পর বছর ঘুরিতে যায়,—সুদ ও তস্য তস্য সুদ তো বহু দূরের কথা,—আসলেরই এখনও একশত টাকা বাকি রহিয়া গিয়াছে। তার পর এই এক বৎসরের বারমাসে তের পার্ব্বণের মধ্যে আঠারো-আনা ত্রুটি। মৃত্যুঞ্জয় বসুর মহাজনী কারবারে এত বড় কলঙ্ক তাঁহার শত্রুতেও আর কখন খুঁজিয়া পাইবে না। তথাপি বহুকষ্টে প্রচণ্ড ক্রোধোচ্ছ্বাসকে দমনে রাখিয়া, অতি কষ্টে-মুখে একটুখানি কঠিন হাসি টানিয়া আনিয়া, তিনি যথেষ্ট সংযতভাবেই বেহাইকে বিদায় দিয়াছিলেন। নিজেও সেই লজ্জা-ঘৃণা-পরিশূন্য ছোটলোকটাকে তাঁহার লোকজনে পরিপূর্ণ পূজাবাড়ীর বাহির হইয়া যাইতে বলেন নাই; আর মনে মনে অত্যন্ত ক্ষোভোদয় হইতে থাকিলেও, চকচকে চাপরাস-লাগান নূতন লাল-নীলের পোষাকপরা দ্বারবানগুলাকে ডাকিয়াও বৈবাহিকের বিদায়-অভিনন্দনের ভারার্পণ করিতে পারেন নাই। শুধু শান্ত, উদার স্বরে সংসার-নির্লিপ্ত ভাবেই এই জবাবটুকু তিনি দিয়াছিলেন—"কি জান বেয়াই, আমি আর ওসবের মধ্যে নেই। ছেলে এখন ডাগর হয়েছে, তার পছন্দেই বিয়ে দিয়েছি, বউ পাঠান তার মত নয়। আর গিন্নি বলেন, ছোটঘরের মেয়ে এনেছি, ভদ্ররীতি মোটেই শেখেনি—আমাদের ঘরে দেখে-শুনে সব শিখে নিক্। আমরা তো কবে আছি কবে নেই, এসব ভালরকম না শিখলে কি শেষে দশের মাঝে অক্রর আমার মুখ হাসাবে! আমাদের এই বোসেদের তো নামটা কম নয়! আর ক্রিয়াকর্ম্মেরও অন্ত নেই! তা, গিন্নির তো এই মত। ছেলেও ঐ কথা বলে যে, রূপটাই বাহিরে থেকে দেখা যায়, শিক্ষা-দীক্ষাটা তো আর বোঝা যায় না;—তা যাই হোক, যা হবার তাতো হয়েই গেছে, এখন একটু মানুষ করে তো নিতে হবে।"

বেয়াই মাথা চুলকাইয়া আমতা-আমতা করিয়া জবাব দিলেন, "সেতো ঠিক কথাই বলেছেন, তাতে আর সন্দেহ কি? তবে মেয়ের মা একটীবার—আর তো নেই আমাদের—সেইজন্যেই—"

"ওহে, তুমি কিছুই বোঝ না। বোসেদের বাড়ীর বউ কখনও ফার্ষ্ট ক্লাস রিজার্ভ না করে ট্রেণে চড়েনি। পার্ব্বে তেমন করে নিয়ে যেতে? আবার তেমনি করে পৌঁছে দিয়েও যেতে হবে।" দীননাথ ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া, পরে মৃদুস্বরে কহিলেন "তাই হবে, কবে পাঠাবেন?" "বলি অনেক টাকা হয়েছে যে দেখতে পাচ্ছি! তবে গরীবকে অনর্থক স্বীকৃত টাকাটা ফাঁকি দেওয়া কেন? ঋণ শোধটা আগে করলেই ভাল হয় না?" হেঁটমুখে বসিয়া থাকিয়া-থাকিয়া দীনুমিত্র অনেকক্ষণ পরে যখন বৈবাহিকের সুসজ্জিত বৈঠকখানার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, কর্ম্মবাড়ীতে লোকজন ব্যস্তভাবে ঘোরাঘুরি করিতেছে; তাঁহার মত নগণ্য ব্যক্তির পানে কেহ একবার ফিরিয়াও তাকাইল না। সেইক্ষণে বাড়ীর মধ্য হইতে সাজিয়া-গুজিয়া, চাদরে খুব দামী এসেন্স মাখিয়া, পান চিবাইতে-চিবাইতে অরবিন্দ কোথায় বেড়াইতে বাহির হইতেছিল,—শ্বশুরকে অকস্মাৎ সম্মুখে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। সেই যৌবনোৎফুল্ল সুন্দর মুখের দিকে চাহিতেই দীননাথের ক্ষুব্ধ চিত্ত হইতে সমুদয় ক্ষোভের জ্বালা জুড়াইয়া শীতল হইয়া আসিল। স্নেহসিক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন "ভাল আছ তো বাবা?" "হ্যাঁ" বলিয়া কিছুক্ষণ অপ্রস্তুতের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া, তারপর বারেক চারিদিকে চাহিয়া লইয়া, ধনীপুত্র অরবিন্দ গরীব শ্বশুরের পায়ের গোড়ায় অতি সংক্ষেপে একটা প্রণাম করিয়াই, আর একবার এদিক-ওদিক চাহিতে-চাহিতে সরিয়া পড়িল; যেন কি একটা অপরাধজনক কার্য্যই করিয়া গেল, ঠিক

এমনই ভাবখানা প্রকাশ পাইল। দীননাথ একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বিদায় হইলেন। কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিবার ভরসা হইল না।

এদিকে দিনের পর দিন দুর্গাসুন্দরী মেয়ে আনার জন্য কান্নাকাটি শতগুণ বর্দ্ধিত করিয়া স্বামীকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন। সকল বিষয়ে বুদ্ধিমতী হইলেও, এই একটী বিষয়ে তাঁহার বুদ্ধি-বিবেচনা সমস্তই যেন লোপ পাইতে বসিয়াছিল। বিশেষ করিয়া কুটুম্বের ব্যবহারে ও জামাতার নিঃসম্পর্কতায় কন্যার সম্বন্ধে তাঁহার ভয়-ভাবনার আর আদি-অন্ত ছিল না। এই রকম কষাই যাহারা, তাহারা কি গরীবের মেয়ে বলিয়া তাহারই লাঞ্ছনা-গঞ্জনার কিছু বাকী রাখিবে? হয় ত পেট ভরিয়া তাহাকে খাইতেও দিবে না, অনেক শাশুড়ী বাপের বাড়ীর অপরাধে বধূকে শুধু মুখে গালমন্দ করিয়াই নিবৃত্তা হয় না, বউ কাঁদিলে কিম্বা এতটুকু জবাব করিলে গাল টিপিয়া দেয়, গালে ঠোনা মারে, এমনি কতই খোয়ার করে শুনিতে পাওয়া যায়। না জানি তাঁর মনুটার কি অবস্থা হইয়াছে! গরীবের ঘরে জন্মিলেও দুঃখ কখনও তাহাকে সহিতে হয় নাই। হয় ত ভাবিয়া, কাঁদিয়া, না খাইয়া তাঁহার সেই সোণার প্রতিমা কালি আড়িয়া গিয়াছে। হয় ত অকস্মাৎ একদিন শুনা যাইবে, অনাদরে, অযত্নে মনোরমার কঠিন পীড়া হইয়াছে এবং তার পর হয় ত—উঃ ভগবান! এই জন্যই কি তিনি সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া বড়ঘরে মেয়ে দিয়াছিলেন? এমন কুমতি তাঁহার কেনই বা হইয়াছিল! সমাবস্থা গরীবের ঘরের ভাল একটী পাত্র দেখিয়া মেয়ে দিলে তো আর মেয়েটি তাঁহার এমন করিয়া বড়লোকের লাথি-ঝাঁটা খাইয়া মনের দুঃখে শুকাইয়া মরিয়া যাইত না!—ষাট্ ষাট্, এ কি করিতেছি? কি মহাপাপী মন এই অভাগী মায়েদের? মঙ্গল-কামনাও এমন করিয়া কেহ করিতে জানে না, আবার অমঙ্গল চিন্তার উদয়ও এমন আর কোথাও হয় না।

ইতোমধ্যে কয়েকটি ঘটনা ঘটিল, এ পর্য্যন্ত যা কখনও ঘটে নাই। অরবিন্দ এবার পরীক্ষায় ফেল করিয়া বসিল। মাতা মুখখানি ম্লান করিয়া বলিলেন, "বউমার আমার আয়-পয় তো তেমন ভাল দেখিনে বাবু! সেই ইস্কুলে থেকে অরু আমার কখ্নো পড়ে থাকে নি।"

পিতা অগ্নিমূর্ত্তি ধরিয়া বাড়ীর মধ্যে আসিয়া গৃহিণীকে উল্লেখ করিয়া হাঁকিয়া বলিলেন "দূর করে দাও ঐ হতচ্ছাড়া দীনুমিত্তিরের লক্ষ্মীছাড়া মেয়েটাকে। ছোটলোকের ঘরের মেয়ে ঘরে আন্‌লে বড় ঘরও ছোট হয়ে যায়। ও বেটি যেদিন আমার ঘরে ঢুকেছে, সেইদিনই আমি জান্‌তে পেরেছি, যে এ বাড়ীর আর ভদ্রস্থ নেই। গিধোরের অমন জোরালো কেসটা মাটী হয়ে গ্যাল,—আজ আবার ইত্যাদি, ইত্যাদি।

সন্ধ্যার পর ছাদের সিঁড়ির ঘরে শরতের দৌত্যে সাক্ষাৎ ঘটিলে মনোরমা স্বামীর ম্লান মুখের পানে চকিত কটাক্ষে চাহিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল। অরবিন্দের নিজের মনটা জীবনে সর্ব্বপ্রথম এই অকৃতকার্য্যতার প্রবল ধাক্কা খাইয়াছিল; কিন্তু মনোরমার চোখের জলে তাহার নিজের ব্যথা, লজ্জা মুহূর্ত্তে বিস্মৃত হইল; তখন সে সেই বিষাদ-প্রতিম খানি যত্নে বক্ষে টানিয়া লইয়া, চোখদুটী মুছাইবার চেষ্টা করিয়া সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "কাঁদো কেন মনো, ফেল কি কেউ হয় না? এবার না হলো, আসছে বারে ভাল করে চেষ্টা কর্ব্বো; হয়ে যাবে কি না।"

মনোরমার কান্না ইহাতে বাধা মানিল না; বরং গ্রন্থি-ছিন্ন মুক্তামালার ন্যায় শুভ্র ও স্থূল অশ্রুবিন্দু তাহার পরিপুষ্ট উজ্জ্বল দুটি গণ্ড বাহিয়া ঝরিতেই থাকিল। রোদনে ফুলিতে-ফুলিতে ভগ্নকণ্ঠে সে বলিল, "আমার জন্যেই এই হ'লো!" "তোমার জন্যে?" অতিকষ্টে ঘাড় নাড়িয়া সে জানাইল যে, হ্যাঁ তাহার জন্যই বটে। অরবিন্দ ঘোর বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিল, "বটে, তা তো জানতাম না। তুমিই কি তা'হলে এবারকার কশ্চেন তৈরি করেছিলে? না, পেপার একজামিন কর্ব্বার সময় আমার মাথা খেয়ে অমন বিষম ভুল করে ফেলেছ! অথবা আমার স্কন্ধে দুষ্ট সরস্বতী রূপে ভর করে আমায় দিয়ে ভুল আন্‌সার করিয়েছ? কি করেছ সেইটে ভেঙ্গে বলো দেখি?"

কান্নার মধ্যে ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া, স্বামীর বুকের মধ্যে সেই হাসি-মাখা মুখ লুকাইয়া, অস্ফুটে কহিল, "যাও, তা কেন; আমি যে অপয়া! যদি তুমি আমার বিয়ে না করতে—"

"তাহলে আর কোন ভাগ্যবানের ভাগ্যে আমার লক্ষ্মীটি লাভ হতো, না মনু, যে আমার মত ফেল করে মরেনি।"

হাসি এবং কান্না এ দুইই বিস্মৃত হইয়া ঘোর লজ্জায়

আকর্ণ-ললাট আরক্ত হইয়া উঠিল, অরবিন্দের এই বিপন্না বধূটি তাহারই কোলের মধ্যে অসহায় ভাবে নিজেকে লুটাইয়া দিয়া, দুই হাতে তাহাকে চাপিয়া ধরিল। লজ্জার তাড়নায় সবেগে তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল "ছি, ছি! কি যে তুমি যা তা সব কথা বলো!" অরু দুষ্টামির হাসি হাসিতে-হাসিতে সেই সরম-রাগ-সুন্দর প্রিয় মুখখানি দু'হাতে তুলিয়া ধরিয়া, গভীর দৃষ্টিতে সেই মুখে চাহিয়া, লজ্জিতাকে অধিকতর লজ্জা দিয়া কহিল, "তুমিই তো বল্লে যে আমি যদি তোমায় বিয়ে না করতুম, তাহলে কি যে সব ভাল ভাল ব্যাপার ঘটতো! তা আমি বিয়ে না করলেও তো আর তুমি চিরদিনই কিছু আইবুড় হয়ে থাকতে না। তোমার সঙ্গে আর একজনের বিয়ে তো হতোই।" এমন অন্যায় কথা শুনিলে কাহার সহ্য হয়? স্বামীর হাত হইতে মুখখানা ছিনাইয়া লইয়া, সবেগে উঠিয়া বসিয়া মনু উত্তর করিল, "তা কি কখন হ'তে পারে? তোমার যা বিদ্যে!" "ঐ জন্যেই তো আমায় ফেল করে দিয়েছে। বিদ্যে থাকলে কেউ কখন ফেল হয়? তাহা কি হতে পারে না? আমি তোমায় দেখতে গিয়ে লুটে না নিলে, এজন্মে তোমার বর জুটতো না? এ সুবিস্তৃত বঙ্গদেশে আমি ছাড়া জহুরী আর কি একটীও ছিল না? হ্যাঁ রে মনুয়া?" স্বামীর আদরে গলিয়া পড়িয়া সেই ক্ষুদ্র পাখীর সহিত উপমিতা আদরিণীটি হাসিতে হাসিতে তখন কত কথাই কহিয়া গেল। অরবিন্দ ভিন্ন তাহার যে অপর কাহারও সহিত বিবাহ হওয়া সম্ভবই ছিল না। সেই সব দার্শনিক মহাতত্ত্ব সে অনেক যত্নে বিশ্লেষণ করিয়া একালের অর্দ্ধ-নাস্তিক, পাশ্চাত্য বিদ্যায় সুপণ্ডিত স্বামীকে বুঝাইবার বিশেষ চেষ্টা-যত্ন করিল। স্বামীটি সে সব জন্মজন্মান্তরের সহিত সংশ্লিষ্ট নিগূঢ় তত্ত্ব বিশ্বাস করিলেন কি না তাহা তাঁহার কৌতুক-হাস্য-মণ্ডিত আনন্দোজ্জ্বল মুখখানি হইতে ঠিক আন্দাজ করিয়া উঠা যায় না। তবে ইহাঁরা গুরুবাক্যে এবং বেদের বচনে সুস্পষ্ট অশ্রদ্ধা দেখাইতে কুণ্ঠাবোধ না করিলেও, রূপসী এবং তরুণীদের মুখের বাণী সশ্রদ্ধ চিত্তে মাথায় করিয়া লইয়া থাকেন, এটা জানা কথা। মনে-মনে অবিশ্বাস জাগিলেও সে অপ্রিয় সত্য প্রকাশে প্রিয়চিত্তে বেদনা দান করিতে ব্যথিত হন।

সাহিত্য *

[শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এম-এ]

আজ এই বস্তুতন্ত্রতা, বাস্তবতা, mysticism এবং art for art's sakeএর দিনে উভয় পক্ষের ওকালতীর প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া নিরপেক্ষ ভাবে সাহিত্যের আলোচনা অসাধ্য না হউক, দুঃসাধ্য ত বটেই। সমালোচনার কোলাহলে বঙ্গ-বাণীর বীণার তান ডুবিয়া গেল, তবুও দ্বন্দ্ব মিটিল না। উদ্দেশ্য আসিয়া লগুড় হস্তে আনন্দের পশ্চাদ্ধাবন করিল, কিন্তু অসীমের মধ্যে আনন্দ এমনই নিরুদ্দেশ-যাত্রায় বাহির হইয়া পড়িল যে, অশ্রান্ত অন্বেষণে এখনও তাহার সন্ধান মিলিল না। কাকের পিছনে দৌড়াইতে রাজী আছি, কিন্তু কাণের দিকে চাহিবার অবসর নাই। সমালোচনার 'না' আমাদের আকুল করিয়া তুলিল, কিন্তু সাহিত্যের অন্তর্নিহিত নীরব প্রতিবাদ আমাদের অন্তরের কর্ণে প্রবেশলাভ করিল না। সত্য এবং কল্পনা, ছায়া এবং আলো, মায়া এবং বস্তু, কৌশল এবং স্বভাব, বাস্তব এবং আদর্শ একের সহিত অন্যে এতই ঘনিষ্ঠভাবে জড়াইয়া গেছে যে, কোনও সাহিত্য-রচনায় ইহাদের একটিকে অবিমিশ্রভাবে আজ পর্য্যন্ত পাওয়া গেল না। চণ্ডীদাস জয়দেব, গেটে শেলী, হুগো হাইন হইতে বর্ত্তমান বাঙ্গালার কবি পর্য্যন্ত কেহই এই নিয়মের ব্যতিক্রম-স্থল নহে।

ইংরাজীতে classicism এবং romanticismএর বিসম্বাদ ম্যাথু আর্ণল্ডের মধ্যে নিবৃত্তিলাভ করিতে না করিতে, realism এবং idealismএর তুমুল তর্ক-কোলাহল পাশ্চাত্য-সাহিত্য আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিল। আজ তাহারি প্রতিধ্বনি বাঙ্গালার মাসিক পত্রগুলি গৃহে

* Rainbow Clubএর সপ্তম অধিবেশনে পঠিত।

গৃহে প্রচার করিতেছে। কিন্তু পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুসরণ করিয়া বাঙ্গালায় উঠিয়াছে বলিয়াই কি এই তর্ক উপেক্ষণীয়? তাহা হইলে ত জারমাণি হইতে আমদানি বলিয়া romanticism অথবা স্বভাব-ও-বিস্ময়বাদ ইংরাজী হইতে বহু পূর্ব্বেই অর্দ্ধচন্দ্র প্রাপ্ত হইত; এবং বাস্তববাদ ফরাসী নভেলে প্রথম জন্মগ্রহণ করে বলিয়া Russiaর Tolstoy এবং Norwayর Ibsen তাহাকে "ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই"—বলিয়া দ্বারদেশ হইতেই বিতাড়িত করিয়া দিত! বাস্তব ও আদর্শবাদের বাঙ্গালার আলোচনাকে পাশ্চাত্য তর্কের প্রতিধ্বনি না বলিয়া পুনর্ব্বিচার বলাই হয় ত সঙ্গত। তাহা না হইলে নব জর্ম্মণ-দর্শন হইতে Transcendentalism বা অতি-লোকবাদ আহরণ করিয়া ইংরাজি সাহিত্য উপহার দিয়াছিলেন বলিয়া Coleridge এবং Carlyleএর উপর অপহারকের অপবাদ দিতে হয়।

কিন্তু আমি এ কি বলিতেছি? সাহিত্যের প্রকৃতি এবং লক্ষণের কাহিনীর অবতারণা করিতে সাহিত্যের অঙ্গ লইয়া আলোচনা করিতেই যে বসিয়া গেলাম। কাব্য ও উপন্যাস লইয়াই ত কেবল সাহিত্য নয়। নানা বিভাগ ও বৈচিত্র্যকে আত্মসাৎ করিয়া এক বিরাট বিশ্ব-সাহিত্য বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। আর্য্য এবং অনার্য্য, প্রাচীন এবং নবীন, সভ্য এবং বর্ব্বর, নারী এবং পুরুষ সকলেই এক 'মানব'-সমাজের অন্তর্ভুক্ত। তাহাদের সমস্ত বিভেদ এবং বৈষম্যকে অতিক্রম করিয়া ফুটিয়া উঠে যে তাহাদের বৈশিষ্ট্য, সে তাহাদের মানবতা। অতীত এবং বর্ত্তমান, পরিণত এবং অপরিণত, স্বদেশী এবং বিদেশী, কাব্য এবং গদ্য, প্রবন্ধ এবং সমালোচনা প্রভৃতি নানা রচনার ভিতর দিয়াও তেমনিই-একটি বৈশিষ্ট্য, একটি ঐক্য প্রকাশিত হইয়া পড়ে। সেই বিশেষ স্বভাবটি থাকে বলিয়াই আমরা সেই রচনা-সমষ্টিকে সাহিত্য বলিয়া অভিহিত করি। গৌরীশঙ্করের পাটীগণিত বা জগদ্বন্ধুর ব্যাকরণকে আমরা সাহিত্যের দলে আমল দিই না; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্ম্মতত্ত্ব' বা রামেন্দ্রসুন্দরের 'প্রকৃতি'কে সাহিত্যের অন্তর্গত না করিয়াও থাকিতে পারি না; কিন্তু শেষ দুইখানি গ্রন্থ যে প্রকৃত সাহিত্য, তাহাও নয়।

সাহিত্য ও ইতিহাস, সাহিত্য ও দর্শন, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের মধ্যকার সীমারেখাটি কোথায়, তাহা অনেক সময় ধরা যায় না—কেন না বিজ্ঞান, দর্শন এবং ইতিহাস সমস্তই সাহিত্যের উপাদানীভূত হইয়া পড়িয়াছে। প্রাণি-পদার্থই হউক আর উদ্ভিদ্-পদার্থই হউক, মানুষ যেমন সমস্ত আহার্য্য জীর্ণ করিয়া আপনার শোণিতের সঙ্গে মিশাইয়া দেয়, সাহিত্যও তেমনি সমস্ত উপাদান পরিপূর্ণ-রূপে আত্মসাৎ করিয়া পুষ্ট হইয়া উঠে। বিজ্ঞান এবং দর্শন এবং ইতিহাস এবং সমাজতত্ত্ব—আপনাদের বিশেষত্ব হারাইয়া সাহিত্যের অঙ্গীভূত হইয়া পড়ে।

তাই ত সাহিত্যের উপর প্রাণধর্ম্মের আরোপ করিতে হয়। যন্ত্রের মত অন্ধ এবং যন্ত্রের মত জীবনহীন হইলে, সাহিত্য ত কিছুকে কোনরূপে আপনার নিজস্ব করিয়া লইতে পারিত না। কলের ভিতর ইট ফেলিয়া দিলে গুঁড়া হইয়া সুরকী হইয়া যায়; কিন্তু উদরের ভিতর গজা ফেলিয়া দিলে, পাকযন্ত্র নিঃশেষে তাহাকে পরিপাক করিয়া ফেলে। ইটের গুঁড়ার মত, গজার গুঁড়া সুরকী হইয়া পাকা ভিতের জন্য অপেক্ষা করে না; শরীর-বস্তুর সহিত তাহা একীভূত হইয়া যায়। এই একীকরণের ক্ষমতার মধ্যেই প্রাণশক্তির পরিচয়। আবার মানুষের যেমন জন্ম আছে, বৃদ্ধি আছে, বার্দ্ধক্য আছে—সাহিত্যও তেমনি জন্ম গ্রহণ করে, পরিণত হয় এবং প্রাচীন হইয়া পড়ে। এই দিক দিয়া দেখিলেও সাহিত্যের উপর জীবন-ধর্ম্মের আরোপ করা যায়। আর একদিক দিয়া দেখিলে, সাহিত্য কেবল জীবের মত, মানুষের মত নয়, সমাজের মতও বটে। সমাজের মত সাহিত্যও মরে না। চতুর্দ্দিকের মৃত্যুর মধ্য দিয়া সাহিত্য অমর হইয়া আছে। অতএব সাহিত্যকে প্রাণধর্ম্মী বলিলে অন্যায় বলা হয় না।

সাহিত্য জীবনের বলে চির-চঞ্চল। কিন্তু সেই প্রাণ-শক্তির উৎস কোথায়? রূপকথার রাক্ষসের প্রাণ থাকিত, দক্ষিণপুকুরের ডুবডুব জলের নীচে সিঁদুর কৌটার ভিতর যে চির-চঞ্চল ভ্রমর আছে তাহারই মধ্যে। সাহিত্য-দেবতার প্রাণও তেমনি গোপনে লুকানো থাকে—মানব-হৃদয়ের অন্তঃস্থলে। মানুষের কাছে, মানুষের সংস্রবেই সাহিত্য প্রাণবন্ত। লোহা চুম্বকের কাছেই চঞ্চল হয়; সাহিত্যের প্রাণের সাড়াও পাওয়া যায় তেমনই মানুষের মনের কাছে; সাহিত্য ও মানবজীবনের মধ্যে এমনই একটি গভীর অচ্ছেদ্য এবং নিগূঢ় সংযোগ আছে।

বিজ্ঞান বা দর্শন একজন নিউটন, একজন লাপ্লাস, একজন মাধবাচার্য্য, একজন বার্গসঁ বা তাঁহাদের সহস্র অথবা লক্ষ শিষ্যের মনোহরণ করিতে পারে, কিন্তু সাহিত্য আপনা হইতেই সর্ব্ব-সাধারণের প্রীতি আকর্ষণ করে।

মানুষ সঙ্ঘবদ্ধ, সামাজিক জীব। একেলা সে বাঁচিতে পারে না। কেবল নিজের চিন্তার মধ্যে ডুবিয়াও সে থাকিতে পারে না। যতই সে স্বার্থপর হউক, পরকে ভাল তাহাকে বাসিতেই হইবে, পরের সংস্রবে তাহাকে আসিতেই হইবে। সে যদি বনেও চলিয়া যায়, তবুও যুগ-যুগান্তরের সঞ্চিত পূর্ব্বপুরুষের চিন্তারাশির দায়-ভার প্রত্যাখ্যান করিবার সাধ্য তাহার নাই। অথচ পরকে পর বলিয়াই যে ভাবিতে হয় তাহা নয়। পরের মধ্যে সে নিজেকে প্রত্যক্ষ করে, নিজের মধ্যে সে পরকে অনুভব করে বলিয়াই পর তাহার চিন্তার মধ্যে আপন হইয়া যায়। অনুভব করে বলিয়াই কবির মুখে শুনিতে পাই—

"পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর—
ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।"

মানুষের সহিত মানুষের সহানুভূতি আছেই। এই সহানুভূতি যতই গভীর এবং ব্যাপক হইয়া পড়ে, মনুষ্যত্ব ততই উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে। এই সহানুভূতির বিষয় আমি, তুমি এবং সকলেই। অর্থাৎ মানব-জীবনই মানবের সাধারণ অনুভূতির বস্তু।

যেখানে জীবনের সম্পর্ক, মানুষের চিন্তা সেখানে গিয়াই উপস্থিত হয়। অথচ এই ভাবনা যে দুঃখের কারণ, তাহাও নয়। মানব-জীবনের আলোচনায় মানুষের একটা অকারণ আনন্দ আছে। এই অহেতুক আনন্দ হইতেই সাহিত্যের উৎপত্তি।

জীবনের সম্পর্ক আছে বলিয়াই সাহিত্য আমাদের আদরের বস্তু। জীবন-ধর্ম্ম-বিচ্যুত হইলে গ্রন্থ ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে পারে, দর্শন হইতে পারে, বিজ্ঞান হইতে পারে; সাহিত্য হয় না। যে গ্রন্থে যতটা বিস্তৃত এবং যতটা গভীর জীবনের আলোচনা পাওয়া যায়, সে গ্রন্থ ততটা পরিমাণে সাহিত্য। সিন্ধুকূলের মূর্চ্ছিত শঙ্খকে তুলিয়া লইয়া কাণের পাশে ধরিলে যেমন তাহার মধ্য হইতে সমুদ্রের অশ্রান্ত সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়, সাহিত্যের মধ্য দিয়াও তেমনি আমরা চিরদিন ধরিয়া অনন্ত জীবনের কল্লোল শুনিতে পাই। চণ্ডীদাসের পদাবলী, কবিকঙ্কণের চণ্ডী, মধুসূদনের কাব্য, বঙ্কিমের উপন্যাস, কালীপ্রসন্নের প্রবন্ধ—সকলের মধ্যেই অল্প বা অধিক পরিমাণে এই জীবন-সঙ্গীত বাজিতেছে বলিয়াই ইহারা সাহিত্য। ধানচালের হিসাব, পাটের দর, জমিদারীর জমাখরচ, ম্যালেরিয়া নিবারণের উপায়, এবং মশা মারিবার কৌশল, হাজার সুষ্ঠুভাবে লিখিত হইলেও—কখনও সাহিত্য হইয়া উঠিবে না।

সাহিত্য পরীক্ষা করিবার আর একটি উপায় আছে। আকাশের চাঁদকে দুইরকম করিয়া দেখিতে পারা যায়। এক বিচারের ভিতর দিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, পরীক্ষা করিয়া, যুক্তির দূরবীক্ষণ লাগাইয়া; আর এক আমাদের ভাল-লাগা মন্দ-লাগা আমাদের আবেগ, আমাদের আনন্দ, আমাদের বেদনা দিয়া। এক দিকে কার্য্য করিতেছে আমাদের মস্তিষ্ক, আর একদিকে কার্য্য করিতেছে আমাদের হৃদয়। যেখানেই ভাবাবেগ হইতে বিচ্ছিন্ন—কেবল প্রজ্ঞা মাত্রের আধিপত্য, সেইখানেই বিজ্ঞান; এবং আমাদের হৃদয়ের রঙে চিন্তা যেখানেই রঙীন হইয়া উঠিয়াছে—সেইখানেই সাহিত্য। অতএব এই মানব হৃদয়তা সাহিত্যের একটি প্রধান লক্ষণ। সংসারের মধ্যে যেমন, সাহিত্যের মধ্যেও তেমনি আমরা মানব-হৃদয়ের পরিচয় পাই। কিন্তু সংসারের মধ্যে যে পরিচয়, তাহা আংশিক পরিচয়, অসম্পূর্ণ পরিচয়, হয় ত বা ভ্রান্ত অথবা একদেশদর্শীর পরিচয়। কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে যে পরিচয়, তাহা ব্যবসায়ের নয়, কর্ত্তব্যের নয়, অংশের নয়, তাহা সমগ্র হৃদয়ের আনন্দপূর্ণ পরিচয়। মানব-হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে যে ভাবরাশি জলধিতলের রত্নরাশির মত নিতান্তই নয়নের অন্তরালে অনাদিকাল হইতে বিরাজ করিতেছে, সাহিত্যের মধ্যে সহসা আমরা সেই নিভৃত-স্থায়ী অপূর্ব্ব ভাবপুঞ্জের সাক্ষাৎ লাভ করি। ইহাই ত সাহিত্যের গৌরব!

কিন্তু এইরূপ অবচ্ছিন্ন ভাবে দেখিলে ত সাহিত্যের সম্পূর্ণ তাৎপর্য্য আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। সাহিত্য ত আকাশ হইতেও পড়ে না, গাছের মতও গজায় না। মানুষের সঙ্গে-সঙ্গেই সে পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয় নাই। সভ্যতার প্রথম আবির্ভাবে তাহার জন্ম হইয়াছে; এবং মানবের অভিব্যক্তির সঙ্গে-সঙ্গে সেও ক্রমে-ক্রমে অভিব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে। হয় ত বা সমস্ত কলা, সমস্ত আর্টের মত

সাহিত্যও মানুষের সুপ্ত চেতনার ভিতর নিহিত ছিল। আত্মিক বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে সাহিত্যও ক্রমে ক্রমে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ইহা বলিলে ত সাহিত্য সম্বন্ধে সমস্ত কথা বলা হইল না। এই art-consciousness বিশেষ দেশ, বিশেষ জাতি, বিশেষ কাল, এবং বিশেষ ব্যক্তির মধ্য দিয়াই অভিব্যক্ত হইতেছে। সাহিত্য সাধারণের অভিজ্ঞতা, অনুভূতি এবং আবেশ হইতে বিকশিত হইয়া উঠে নাই। কখনো কাব্য, কখনো কাহিনী, কখনো নাট্য, কখনো উপন্যাসরূপে যুগে-যুগে সাহিত্য বিশেষ প্রতিভার মধ্য দিয়া বিশেষ ভাবে স্ফূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

এক দিক দিয়া মানুষ স্বার্থপর, আর এক দিক দিয়া মানুষ পরার্থপর। এক পক্ষে মানুষ নিজের কথা বলিতে চায়, আর একপক্ষে মানুষ পরের কথা শুনিতে চায়। এক দিক দিয়া সে নিরন্তর আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য উন্মুখ, আর এক দিক দিয়া সে সর্ব্বদা অপরের অভিজ্ঞতার পরিচয় লাভের জন্য উদ্‌গ্রীব। অথচ এইজন্য মানুষকে স্বার্থপর অথবা পরার্থপর বলিলে বোধ হয় ভুল বলা হয়। মানুষ আত্মপ্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারে না বলিয়াই আত্মপ্রকাশ করে, এবং অন্যের কথার মধ্যে আত্ম উপলব্ধি করে বলিয়াই পরের কথা শুনে। কোকিল যেমন আপনার আনন্দে গাহিয়া চলে, সাহিত্য-স্রষ্টাও তেমনি আপনার আনন্দে আপনাকে ব্যক্ত করে। কিন্তু কবির সেই আত্ম-প্রকাশ সাহিত্য হইত না, যদি না তাহার মধ্যে পাঠক আপনার মনোভাবের সাড়া পাইত। সাহিত্য কবির ভাবাবেগের ভিতর দিয়া পাঠকের হৃদয়াবেগকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলে। ধরা যাক্ কালিদাসের 'মেঘদূত'।

কতকগুলি ভাব আছে, তাহা মানুষের মধ্যে সাধারণ। সেই ভাবগুলি সাধারণ মানুষের মনে স্থাবর ভাবেই থাকিয়াই যায়। প্রিয়ের বিরহ এমনি একটা ভাব। ইহা সকলেরই মনে ছিল এবং আছে। কিন্তু কালিদাস এই স্থাবর ভাবের মধ্যে আবেগ আনিয়া দিলেন। এই ভাব চঞ্চল হইয়া, জীবন্ত হইয়া কবির মন হইতে পাঠকের মনে সঞ্চারিত হইয়া গেল; এবং পাঠক কবির সহিত বলিয়া উঠিলেন,—

তাং জানীথাঃ পরিমিত কথাং জীবিতং মে দ্বিতীয়ং
দূরীভূতে ময়ি সহচরে চক্রবাকী মিবৈকাম্।
গাঢ়োৎকণ্ঠাং গুরুষু দিবসেষেষু গচ্ছৎসু বালাং
জাতাং মন্যে শিশির-মথিতাং পদ্মিনীং
বাল্যরূপাম্॥

কবির হৃদয়ের এই গতি এবং ভাব-প্রাথর্য্য যুগ-যুগান্তর ধরিয়া পাঠকের হৃদয়ে আবেগ সঞ্চার করিয়া আসিতেছে; এবং পাঠকের আবেগের ভিতর দিয়া বহিঃ-প্রকৃতি পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষায় বিরহ-বেদনায় আবেগময় হইয়া উঠিতেছে।

অথবা ধরা যাক Shelleyর Epipsychidion. সুন্দরতম এবং কল্যাণতমের জন্য যে আকাঙ্ক্ষা, তাহা আমাদের মনের স্থায়ী ভাব। এই ভাব সাধারণের মনে মূর্চ্ছিত হইয়া স্থাণুর মত পড়িয়া আছে। শেলীর আবেগ এই ভাবের মধ্যে চেতনার সঞ্চার করিয়া দিল; এবং কবি হইতে পাঠকের হৃদয়ে সেই চেতনা বিদ্যুতের মত প্রবাহিত হইয়া গেল।

পাঠকও কবির সহিত গাহিতে লাগিলেন,

Spouse! Sister! Angel! Pilot of the Fate
Whose course has been so starless!
O too late
Beloved! O too soon adored by me!

এবং মানসীর সহিত কল্পনায় একত্ব অনুভব করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—

One hope within two wills, one will beneath
Two over-shadowing minds, one life;
one death,
One heaven, one hell, one immortality,
And one annihilation.

আমরা যে উদাহরণ দিয়াছি তাহা কাব্য হইতে। কিন্তু তাই বলিয়া যে আমাদের কথা-সাহিত্যের অন্যান্য অঙ্গ সম্বন্ধে খাটিবে না, তাহা নহে।

ধরা যাক বঙ্কিমের 'কপালকুণ্ডলা'। ইহার মধ্যেও একটী প্রধান ভাব আছে,—তাহাকে কেন্দ্র করিয়া অন্যান্য আনুষঙ্গিক ভাব তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে। সে ভাবটি হইতেছে—প্রেম ও বৈরাগ্য, সংসার ও স্বভাব, আকাঙ্ক্ষা ও ত্যাগের সম্বন্ধ নির্ণয়। প্রেম, সংসার ও আকাঙ্ক্ষা মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে পুরুষে। সে পুরুষ নবকুমার। ত্যাগ, প্রকৃতি এবং বৈরাগ্য মূর্ত্তি ধরিয়াছে নারীতে। সে নারী

কপালকুণ্ডলা। একটী মাত্র ভাব নবকুমার এবং কপালকুণ্ডলার সম্বন্ধের মধ্যে আন্দোলিত হইতেছে। এই সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে স্থিরীকৃত হয় নাই,—অথচ আর একটু হইলেই যেন ইহা নির্ণীত হইয়া যাইত। এই ভাবটির মধ্যে কবি যে অস্থিরতা, যে উদ্বেগ দিয়া দিয়াছেন, তাহা চিরদিন ধরিয়া পাঠকের হৃদয়াবেগ উচ্ছ্বসিত করিয়া রাখিবে।

অথবা দেখা যাক্ Shakespeareএর Hamlet. Hamletএর মধ্যে Shakespeare আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন—এই কথা বলিবার পূর্ব্বে দেখা যাক, Shakespeare আপনার মনের কোন্ ভাবটি জীবন্ত করিয়া পাঠকের হৃদয়ে সঞ্চারিত করিতে চাহিয়াছেন। এক দিকে কর্ত্তব্য, আর এক দিকে চিন্তা, এক দিকে নিশ্চিত, এক দিকে অনিশ্চিত, এক দিকে কার্য্য, আর এক দিকে আত্মানুসন্ধান, এক দিকে সাধনা, এক দিকে সন্দেহ, এক দিকে চেষ্টা, আর এক দিকে অক্ষমতা,—এই দ্বিধার মধ্য দিয়া ট্রাজিক ভাবটি ফুটিয়া উঠিয়াছে—নিত্য-নূতন অথচ চির-পুরাতন কবির সেই ভাবটিই নানা অর্থ, নানা আলোচনা, এবং নানা ব্যাখ্যার মধ্য দিয়া সপ্তদশ শতাব্দীর আরম্ভ হইতে বিংশ শতাব্দীর আরম্ভ পর্য্যন্ত পাঠকের হৃদয়কে বারম্বার আলোড়িত করিয়া তুলিতেছে। অথচ এই ভাবের গতি আজও শেষ হয় নাই। যতই দিন যাইতেছে, ততই এই গতির বেগ বাড়িয়াই চলিয়াছে।

অতএব ইহাই সত্য যে, সাহিত্য কবি ও পাঠকের মধ্যে একটী জীবন্ত যোগ সাধন করিয়া দেয়। কিন্তু ইহা বলিলেও, সাহিত্যে যে কবি আত্ম-প্রকাশ করিয়াছেন, এ কথা বলা হইল না। তাহা বুঝাইতে হইলে আরও কিছু বলিতে হয়।

দেখানো গিয়াছে—সাহিত্যে জীবনের সম্পর্ক আছে। সে সম্পর্ক কিরূপ, তাহাও কিছু বলা গিয়াছে। সাহিত্য যে মানব-জীবনের আলোচনা—এ কথা বলিলে ভুল বলা হয় না; এবং সাহিত্যেই যে জীবনের অভিব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, এ কথাও সত্য। অতএব এক দিক দিয়া সাহিত্য জীবনের অভিব্যক্তি, এবং আর এক দিক দিয়া সাহিত্য জীবনের আলোচনা; এবং সাহিত্যে মানব-জীবনের আলোচনা চলে বলিয়া, সাহিত্যেই জীবন-সমস্যার মীমাংসা পাওয়া যায়। অতএব, সাহিত্যকে জীবনের ব্যাখ্যাও বলা চলে।

কিন্তু যে-কোনও সাহিত্য-গ্রন্থ খুলিলেই দেখিতে পাই এই যে, জীবনকে প্রকাশ করিবার ধরণও এক রকম নহে, এবং ইহার ব্যাখ্যাও একটী নহে। বিভিন্ন সাহিত্যিক বিভিন্ন প্রকারে জীবনের আলোচনা করিয়াছেন এবং বিভিন্ন মীমাংসায় আসিয়া পৌছিয়াছেন। সাহিত্যের মধ্যে এই বিচিত্রতা, এই বিভিন্নতা কবিদের ব্যক্তিত্ব বা স্বভাবের বিশেষত্বের ফল। রাধা-কৃষ্ণের চিরন্তর প্রেমলীলা—বিদ্যাপতিও গাহিয়াছেন, চণ্ডীদাসও গাহিয়াছেন। অথচ উভয়ের গানে কত প্রভেদ।

যে-কোনও গ্রন্থ জীবনের প্রতি রচয়িতার বিশেষ ধারণার আলোকে অনুরঞ্জিত। প্রতিভার ধারণা সাধারণের ধারণা হইতে অন্যতর এবং সত্যতর। এই ধারণা যতই সত্যতর হইবে, ধারণার আলোকও ততই স্পষ্টতর হইবে; আলোক যতই স্পষ্টতর হইবে, অনুরঞ্জন ততই প্রগাঢ়তর হইয়া উঠিবে। সেই জন্য প্রতিভাশালীর সাহিত্য-রচনার মধ্যে তাহার ব্যক্তিত্ব স্পষ্টতর, প্রগাঢ়তর ভাবে অঙ্কিত থাকিয়া যায়। কিন্তু কি করিয়া এইরূপ হয়?

কবির ভিতরে এক আত্মপুরুষ বিরাজ করিতেছে এবং বাহিরে এক বিশ্ব পড়িয়া আছে। এই বাহিরের বিশ্ব প্রাণে ও প্রকৃতিতে বিজড়িত। কবির আত্মা বাহিরের মানব-জীবন এবং জড়-প্রকৃতিকে সমগ্র করিয়া কখনো এক ভাবে, এবং কখনো বিচ্ছিন্ন করিয়া বহু ভাবে উপলব্ধি করে। এই উপলব্ধির গাঢ়তার উপর সাহিত্যের গভীরতা নির্ভর করে। যাহাই হউক, যে কথা বলিতে যাইতেছিলাম, তাহা এই।—কবির আত্মার সহিত বাহিরের সত্বার মিলনে একটী হর্ষের হিল্লোল পড়িয়া যায়। সেই আনন্দের মুহূর্ত্তে সাহিত্যের জন্ম। সাহিত্য সেই আনন্দের মূর্ত্ত প্রকাশ।

বাহির প্রতি মুহূর্ত্তেই অন্তরকে আকর্ষণ করিতেছে; এবং অন্তর প্রতি মুহূর্ত্তেই বাহিরকে গ্রহণ করিতেছে। সকলের মধ্যেই এই মিলনের আকুল চেষ্টা অহরহঃ চলিতেছে। সাধারণ মানুষ স্বপ্নের মত এই অনুভূতির সাড়া পায়। কিন্তু এই উৎকণ্ঠা সচেতন ভাবে অনুভব করে বলিয়াই কবির অন্তর এত অনুভূতি-প্রবণ। কবির

অন্তঃশক্তি বাহিরের সত্তার উপর সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে আকৃতি প্রদান করে, কবির প্রকৃতির 'ছাপ' তাহার উপর অঙ্কিত করিয়া দেয়। তাই একই বহির্জগৎ Wordsworth, Shelley এবং Keatsএর কাব্যে বিভিন্ন 'রূপ' ধারণ করিয়াছে। তাই 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এবং 'চোখের বালি'র গল্পাংশে ঐক্য থাকিলেও, বিনোদিনীর সহিত রোহিণীর, মহেন্দ্রের সহিত গোবিন্দলালের মৌলিক প্রভেদ আছে। তাই Emerson এবং Carlyleএ একই Napoleonএর বিভিন্ন মূর্ত্তি। তাই Ruskin এবং Lowell একই Carlyleকে এমন বিপরীত চক্ষে দেখিয়াছেন। সেই হেতু সাহিত্যে ব্যক্তিত্বের প্রভাব এমন গুরুতর বিষয়। এই ব্যক্তিত্বকে বাদ দিয়া সাহিত্যালোচনা করিলে, কবির রচনাকে নিতান্তই বিবর্ণ এবং নির্জ্জীব করিয়া দেখানো হইবে। রামের চরণ-রেণুস্পর্শে একদা অহল্যা যেমন জাগিয়া উঠিয়াছিল, এই ব্যক্তিত্বের পুণ্য স্পর্শেও তেমনিই কত জড় সাহিত্য জীবন্ত হইয়া, যেন যুগযুগান্তরের নিদ্রার পর জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। এই ব্যক্তিত্বের প্রভাবেই সাহিত্যে বর্ণ, বৈচিত্র্য, উত্তাপ এবং চঞ্চলতা সঞ্চারিত হইয়া যায়।

এই, ব্যক্তিত্বকে বরণ করিয়া লইলে কিন্তু তর্ক উঠিতে পারে। ব্যক্তিত্ব-বিরোধীরা হয় ত বলিতে পারেন, "আচ্ছা, Byronএর কাব্যে না হয় পদে-পদে Byronএর সাক্ষাৎ লাভ করি। কিন্তু Browning ত নিজের কাব্যে নিজেকে প্রকাশ করেন নাই; তিনি চরিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন মাত্র। উত্তরমেরু হইতে দক্ষিণমেরু যত দূরে, Browning হইতে Browningএর চরিত্রও তত দূরে। তাঁহার Pippa বা Fralippo Lippi হইতে Browningকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে কি? তিনি নিজেই ত বলিয়াছেন, যদি Shakespeare নাটকে কি সনেটে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন ত less Shakespeare he" —ইত্যাদি।

Pippa বা Filippo Lippi, My last Duchessএর Duke বা The Statue and the Bustএর প্রেমিক-প্রেমিকা সকলেই বিভিন্ন প্রকৃতির; কিন্তু সকলেই Browningএর মানস-সন্তান। এই চরিত্রগুলির নিজস্ব বস্তু, এবং জীবনের উপর Browningএর ধারণা—এই উভয়ে মিলিয়া সাহিত্যে ইহাদের উদ্ভব সম্ভব হইয়াছে। ব্যক্তিত্ব-বিরহিত উপাদান এবং ব্যক্তিগত শক্তি ও ধারণা এই দুই না মিলিলে কোনপ্রকার সাহিত্য-সৃষ্টিই অসম্ভব হইত। Hamletএ যেমন Shakespeare, Falstaffএ তেমনি Shakespeare, Othelloতে যেমন Shakespeare, Iagoতে তেমনি Shakespeare। তবে সেক্‌সপীয়রের ব্যক্তিত্ব ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ, অপরিসর নহে—তাহা বৃহৎ, উদার এবং মহৎ। সহানুভূতি ইহাকে সুন্দর, এবং অন্তর্দৃষ্টি ইহাকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। পৃথিবী বৃহৎ এবং আমরা ক্ষুদ্র বলিয়া পৃথিবীর সসীমতা আমরা সহসা ধারণা করিয়া উঠিতে পারি না। Shakespearএর নাটকেও Shakespeare এত বৃহৎ ভাবে অবস্থান করিতেছেন যে, তাহার মধ্যস্থ সীমাবদ্ধ Shakespeareএর অস্তিত্ব আমরা অনেক সময় ভুলিয়া যাই। এই হিসাবেই বলা যায়, সাহিত্য কবির আত্মপ্রকাশ মাত্র।

কিন্তু ইহারই সঙ্গে আর একটী কথা আসিয়া পড়ে। Artকে বিচার করিতে গেলে, তাহার মধ্যে তিনটি মূল উপাদান পাওয়া যায়। একটী ভাব, একটী ভাবের প্রতিমা এবং আর একটি প্রতিমার উপর ভাবের প্রভাব। মানুষকে বিচার করিলে, মানুষের মধ্যেও আমরা এই তিনটি জিনিষ দেখি। একটি আত্মা, একটি আত্মার বহিরাবরণ মূর্ত্তি, এবং আর একটি দেহের ভিতর দিয়া আত্মার প্রকাশ বা দেহের উপর আত্মার প্রভাব। সাহিত্যের আত্মা তাহার ভাব, মূর্ত্তি বা প্রতিমা তাহার ভাষা বা অলঙ্কার, এবং মূর্ত্তির উপর আত্মার প্রভাব হইতেছে ভাষা ও অলঙ্কারের উপর ভাবের প্রতিচ্ছায়া। এই প্রতিচ্ছায়া যাহার মধ্যে যতই স্পষ্ট, কবির ক্ষমতা তাহার মধ্যে ততই পরিস্ফুট।

একদিকে ত ভাবের সঙ্গে কবির নিজস্ব ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত হইয়া আছে; আর একদিকে আবার ভাষার উপর ভাবের প্রতিচ্ছবি বিশেষ কবি বিশেষ ভঙ্গীতে ফুটাইয়া তুলেন। এই ফুটাইয়া তুলিবার কৌশলই কবির style বা রচনা-কলা। এই রচনা-কলার মধ্যে কবির নিজত্ব এত অধিক পরিমাণে সঞ্চারিত হইয়া যায় যে, যে-কোনও রচনার বাহিরের রূপটি দেখিয়া আমরা বলিয়া দিতে পারি, ইহা কোন্ কবির সৃষ্টি। অন্তরস্থ ভাবটি যদি পুরাতনও হয়, তবু চুম্বক যেমন করিয়া লৌহচূর্ণকে একটা বিশিষ্ট ভঙ্গীতে সাজাইয়া লয়, তেমনি করিয়া সেই ভাবটি

সকলের ব্যবহৃত এই ভাষাকে একটা বিশেষ পদ্ধতিতে বিন্যস্ত করিয়া, রচনাটিতে এমন একটা 'রূপ' প্রদান করিবে যে, সেই বিশেষ রূপটির মধ্যে বিশেষ কবিটিকে চিনিয়া লইতে আমাদের কোনই কষ্ট হইবে না।

কিন্তু কেবল লেখকের দিক দিয়া, অথবা পাঠকের দিক দিয়া, কেবল কবির দিক দিয়া অথবা ভোগীর দিক দিয়া বিচার অথবা বিশ্লেষণ করিলে, সাহিত্যের অনেক রহস্য অমীমাংসিত থাকিয়া যায়। সাহিত্যকে গঠন করিতে আরো অসংখ্য শক্তি কার্য্য করিতেছে। তাহার মধ্যে দুই-তিনটির উল্লেখ না করিলে, প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। সাহিত্যের উপর জাতীয় চরিত্রের প্রভাব, এবং দেশের আকাশ-বাতাস, শাসন-তন্ত্র, সমাজ-ব্যবস্থা অর্থাৎ দেশ-প্রকৃতির পরিবেশ-প্রভাব স্পষ্ট চিহ্ন রাখিয়া যায়। বঙ্গ-সাহিত্যের উপর ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাব যথেষ্ট থাকিলেও, বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্য অনেক পরিমাণে ইংরেজীর অনুসরণে গড়িয়া উঠিলেও, বঙ্গ-সাহিত্যে ও ইংরেজী সাহিত্যে একটা জাতিগত প্রভেদ বর্ত্তমান। ফরাসী সাহিত্য ও ইংরেজী সাহিত্যের মধ্যে কেবল ভাষাগত ভিন্নতা নহে, জাতিগত বিভেদ রহিয়া গেছে। ফরাসী চরিত্রের সরলতা, শোভনতা, ঋজুতা, ফরাসী সাহিত্যে প্রাঞ্জলতা, স্পষ্টতা এবং সৌষ্ঠব রূপে, জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে। আবার ভাষা এবং জাতির প্রায় সর্ব্বাংশে ঐক্য থাকিলেও, জল-বায়ু শাসন-সমাজ-দেশ-দৃশ্য English literature এবং American literatureএর মধ্যে কত যে পার্থক্য আনয়ন করিয়াছে, তাহা Carlyle ও Emerson, Robert Browning ও Walt Whitman, Lord Alfred Tenneyson ও Edgar Allan Poeএর তুলনায় সমালোচনা সাক্ষ্য দিবে।

Celtic ও Teutonicএর জাতীয় বিশেষত্ব ইংরেজী সাহিত্যকে কতকটা বিশিষ্টতা প্রদান করিয়াছে; এবং বিভিন্ন ভাবে তাহা কোন্ কোন্ বিশেষ দিক ফুটাইয়া তুলিয়াছে, তাহার তর্ক-কলহে একদা ইংরেজী সমালোচনা-সাহিত্যে সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। Teutonic জাতি কতকটা সাদাসিধা, গোঁয়ার-গোবিন্দ গোছের কাযের লোক; জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে হইলে যে সব গুণের প্রয়োজন—সেই ব্যবহার-বুদ্ধি, বিচার-বিবেচনা প্রভৃতি তাহাদের যথেষ্ট পরিমাণে আছে। ইংরেজী সাহিত্যের বস্তুতন্ত্রতা এই Teutonic বা Anglo-Saxon বিশেষত্বের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু Celtic জাতি মূলতঃ কল্পনা-প্রবণ। অনির্ব্বচনীয়তা, রহস্যচ্ছায়া এবং অলোকজগতের অস্পষ্ট আভাষ প্রভৃতি ইংরেজী সাহিত্যের 'মায়িক-ভাব Celtic প্রভাবের ফল। Pope, Dryden যেন ইংরেজের Teutonic অংশ হইতে উৎপন্ন; এবং Wordsworth, Shelley যেন তাহার Celtic অংশ হইতে জাত।

হিন্দু-সাহিত্যেরও দুইটি দিক আছে। একটী তাহার আধ্যাত্মিক বা spiritual দিক, আর একটী তাহার erotic বা কামনারাগাত্মক দিক। কে জানে কোন্ দুই বিভিন্ন মহাজাতির মিলনে বিশাল হিন্দুজাতি গঠিত হইয়া উঠিয়াছে!

কিন্তু সকলের চেয়ে যাহার প্রভাব মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করিতে হয়, যাহার প্রভুত্ব অনতিক্রমনীয়, যাহার ক্ষমতা অপ্রতিহত—সে যুগধর্ম্ম। যাহার প্রতিভা আছে এবং যাহার প্রতিভা নাই, যে পণ্ডিত এবং যে মূর্খ, যে মৌলিক এবং যে অনুকারী—তাহাদের সকলকেই যুগধর্ম্মের অধীনতা স্বীকার করিতেই হইবে। মানুষ ত কেবল নিজের দেশের মধ্যে নহে, সে তাহার কালের মধ্যেও যে বাস করে। কোনও লেখকের রচনায় যেমন তাহার জাতীয় বৈশিষ্ট্যের, তেমনি তাহার যুগধর্ম্মের পরিচয়ও পাওয়া যাইবে। ভারতচন্দ্র যে বাঙ্গালার অষ্টাদশ শতাব্দীর এবং বিহারীলাল যে উনবিংশ শতাব্দীর কবি, তাহা তাঁহাদের জন্ম-মৃত্যুর তারিখ মিলাইয়া না দেখিলেও চলে; তাহার নিদর্শন "অন্নদা-মঙ্গল" এবং "সারদা-মঙ্গলে"র পৃষ্ঠায়-পৃষ্ঠায় বর্ত্তমান। জাতীয় বৈশিষ্ট্য এবং যুগধর্ম্মের Criterion অবলম্বন করিয়া "সাহিত্য জাতীয় জীবনের মুকুর স্বরূপ", "সাহিত্যে সমসাময়িক সমাজকে প্রতিবিম্বিত দেখি" প্রভৃতি কথা পূর্ব্বতন সমালোচনায় বলা হইত। এখন সে সব কথা পুরাতন হইয়া গেছে; তাহাদের পুনরুক্তি বাহুল্য মাত্র।

সাহিত্যের অনেক সমালোচনা হইয়া গিয়াছে। জীবনের ব্যাখ্যার মত সাহিত্যের ব্যাখ্যাও আমাদিগকে রহস্য হইতে রহস্যান্তরে লইয়া চলে। সভ্যতার প্রথম প্রভাতে একদা সাহিত্য কাব্য রূপে কবির হৃদয়-উৎস হইতে উৎসারিত হইয়া পড়িল। প্রকাশ-কামনার দারুণ ব্যথায় যখম মানব-

প্রকৃতি অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল, তখন কে জানে সে কোন্ বাল্মীকি, যাহার শোক, প্রথম শ্লোক রূপে আদিযুগের ছায়া-নিবিড়তার মধ্য হইতে, করুণা-কল্পিত দেবতার বাণীর মত আকাশে-বাতাসে মন্ত্রিত হইয়া উঠিল! তাহার পর বহুদিন পরে আবার একদিন, ভাবের আদান-প্রদানের ব্যাবহারিক ভাষা সমস্ত অপমান-অবহেলাকে তুচ্ছ করিয়া গদ্য রূপে সাহিত্যে আপনার যথার্থ স্থান অধিকার করিয়া বসিল। সেও এক স্মরণীয় দিন। পুরুষ ও নারীর মত, দিবস ও রাত্রির মত, কাব্য ও গদ্য সাহিত্যকে সুন্দর এবং বিচিত্র করিয়া রাখিয়াছে। জীবনের আলোচনা, জীবনের ব্যাখ্যা এবং জীবনের অভিব্যক্তিতে কাব্য এবং গদ্য উভয়েই পূর্ণতর, উদারতর এবং গভীরতর হইয়া উঠিতেছে। এমনি করিয়া পুরুষের মত ঋজু ভাষায় গদ্য জীবনকে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর, এবং কাব্য নারীর মত বর্ণ, বিক্ষেপ, ভঙ্গী এবং শিঞ্জিনীতে বিচিত্র হইয়া, জীবনকে সুন্দর হইতে সুন্দরতর করিয়া তুলিবে। সাহিত্য অমৃতের মত মানবকে দেবত্ব দান করে; জীবন হইতে পুষ্ট হইয়া সে জীবনকে পোষণ করে। এই দুঃখ-দারিদ্র্য-দৈন্য-দুর্দ্দশা হইতে অমৃত লোকে যে লইয়া যায়—সে সাহিত্য। চতুর্দ্দিকের এই অশ্রান্ত কলহ, কোলাহল, উচ্চ ভাষকে ডুবাইয়া—যুগে যুগে, দেশে-দেশে, মনে-মনে দেবী সরস্বতীর বীণা বাজিতে থাকুক। জগতের সকল কল্যাণ সেই বীণা-ধ্বনি আনিয়া দিবে।

চিঠি

[শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ]

শৌণ্ডিক যেমন সুরার ব্যবসা ফাঁদিয়া কত লোককে ক্ষণেকের জন্য হাসায়, কাঁদায়, পরিণামে মজায়,—নিজে কিন্তু হাসে না, কাঁদে না, মজে না, আমিও তেমনি এতটা জীবন ধরিয়া চিঠি-বিলির ব্যবস্থা করিয়া কত লোককে হাসাইয়াছি, কাঁদাইয়াছি, মজাইয়াছি—নিজে কিন্তু হাসি নাই, কাঁদি নাই, মজি নাই! কারণ, আমি চিঠি বিলি করিবার ভার লইয়াই জন্ম গ্রহণ করিয়াছি; কাহারও চিঠি পাইবার অদৃষ্ট লইয়া আসি নাই!

মানুষ একা আসে, একা যায়—এ কথাটা আমাতে যেমন খাটে, এমন বোধ হয় আর কাহারও পক্ষে খাটে না! জ্ঞানোদয়ের পহেলা তারিখ হইতে এ সংসারে আমি—একা! জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে এবং পরে নিরাশ্রয় হইয়া যখন অবস্থার স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছিলাম, তখন যে আশ্রয় পাই নাই তাহা নহে; তবে সে আশ্রয়ের পরমায়ু-কাল এত অল্প যে, তাহা মনে করিয়া রাখিবার মত নহে। স্রোতে-ভাসা পাতা যখন অকূলের দিকে ভাসিয়া চলে, সে অনেক স্থানে আশ্রয়ের বাঁধনে আট্‌কা পড়ে বটে, কিন্তু মনে রাখিবার মতন কোথাও বেশী দিন ধরা থাকে না। যেখানে সে ধরা পড়ে, সেখানে সে আপনাকে হারাইয়া দেয়—সে সেই অকূলে! আমিও অনেক আশ্রয়ের বন্দরে বন্দরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শেষে এই চিঠি-বিলি করার ব্যবসায়ে বাঁধা পড়িয়া গিয়াছি।

শৌণ্ডিকের কখনও মদ্যপানে লালসা হয় কি না জানি না; আমার মনে কিন্তু সুখ-দুঃখের তীব্র-মধুর মদিরময় চিঠি পাইবার জন্য একবার উৎকট লালসা জাগিয়া উঠিয়াছিল। তখনই নিরাশার একটা দমকা বাতাস বিশুষ্কতা ঢালিয়া বলিয়া গেল—"হায়, অবোধ হতভাগ্য, তোর এ কি আকাঙ্ক্ষা! এ তোর কি বিষম আত্মবিস্মৃতি। তোর জীবনের মূল নেই, ফুল নেই, তোর এ কি ভুল!"

আশ্চর্য্য! সেই রাত্রে এক চিঠি পাইলাম। মিশ্‌মিশে কালো রঙের পুরু খামে চিঠি আঁটা। চিঠির উপর আমার নামের প্রথম তিনটি অক্ষর 'জী-ব-ন' অতি অস্পষ্ট ভাবে পড়া যাইতেছে মাত্র! নামের আদিতে 'শ্রী' নাই, অন্তে পদবী নাই, ঠিকানা ত নাই-ই! ডাকঘরের ছাপ্ খুঁজিলাম; দেখি,—একটা মাত্র ছাপ আছে, কিন্তু তা সেই লেফাপার কালো বুকে এমন লুকাইয়া, মিশাইয়া আছে, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আগ্রহের আবেগে লেফাপা ছিঁড়িয়া ফেলিতে চাহিলাম; কিন্তু কি অচ্ছেদ্য উপাদানে সে লেফাপা

তৈরী জানি না, কিছুতেই ছিঁড়িতে পারিলাম না। তখন লেফাপার সেই সংযুক্ত স্থানটা খুলিতে চেষ্টা করিলাম; লেফাপার উপর জলের পর জল দিতে লাগিলাম; কিন্তু কিছুতেই খুলিল না!—ক্ষোভে দুঃখে চিঠিখানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলাম! এ কাহার নির্ম্মম পরিহাস? আমার প্রাণের নীরব বাসনা তো কাহাকেও জানাই নাই! কে আমার মনের কথা চুরি করিয়া আমায় এমন করিয়া কাঁদাইতে চায়?

আবার চিঠিখানি তুলিয়া লইলাম। হায় রে বিফল চেষ্টা! হৃদয়ের দারুণ পিপাসা জমাট বাঁধিয়া পাথরের মত বিঁধিতে লাগিল। সহসা যেন কাহার উপর অভিমান ঘনাইয়া আসিল; অমনি ঝরঝর করিয়া খানিকটা চোখের জল লেফাপার আবদ্ধ বুকে ঝরিয়া পড়িল। সবিস্ময় আনন্দে দেখিলাম, কখন অলক্ষ্যে লেফাপা আপন হৃদয়-দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে! পত্রে লেখা:—"আমার মনে পড়ে, বন্ধু? আমি আত্মানন্দ স্বামী—তোমার কত দিনের বন্ধু। হয় ত তুমি আমাকে ভুলিয়া গিয়াছ, আমি কিন্তু ভুলি নাই। বন্ধুত্বের মাঝে বিস্মৃতির যে একটা বিচ্ছেদ ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল, তাহাই বিদূরিত করিবার জন্য, হে আমার চির-পুরাতন, বন্ধু সনাতন, তোমায় আজ এই সপ্রীতি আহ্বান-লিপি পাঠাতেছি; প্রাপ্তি মাত্র আমার সঙ্গে মিলিত হইবে। আমার আবাস-স্থান যদি ভুলিয়া গিয়া থাক, তবে এই পত্রের সাহায্যে পথের সন্ধান পাইবে।"

২

চলিয়াছি, চলিয়াছি—ক্রমাগতই চলিয়াছি! কেবলি মনে হইতে লাগিল—এই বুঝি বন্ধুর দেশে এসেছি! দিন যত যাইতে লাগিল, ততই লেফাপার সেই ঘন কালো রংটা যেন ফিকে হইয়া আসিতেছিল। শেষে এক দেশে আসিয়া বুঝিলাম, এ বন্ধুর দেশ না হইয়া আর যায় না!—চিঠির বর্ণনার সঙ্গে সেই দেশ হুবহু মিলিয়া গেল।

তখন এক পথিককে বন্ধু আত্মানন্দের আশ্রমের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে একটা দূরবর্ত্তী আকাশ-স্পর্শী বৃক্ষ নির্দ্দেশ করিয়া বলিল—"ঐ গাছের উপরে।" বিদেশীর প্রতি এ প্রকার পরিহাসে ভারি বিরক্ত হইয়া আবার পথ চলিতে লাগিলাম। হঠাৎ লেফাপাখানার উপর দৃষ্টি পড়িল; দেখি, কালো রংটা আবার গাঢ় হইয়া আসিয়াছে। অনেক দূরে গিয়া আর এক জনের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তাহাকে আত্মানন্দের আবাসের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল "ঐ যেখানে একটা হল্লা হচ্চে, ঐখানে আত্মানন্দের বাড়ী।" শব্দ লক্ষ্য করিয়া সেখানে গিয়া দেখি—সে একটা তাড়িখানা!—এক পলিত কেশ ব্যক্তি একখানি চৌকিতে বসিয়া যত তাড়িখোরকে তাড়ি বিক্রয় করিতেছে! তাহাদের এক জনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখানে আত্মানন্দের আশ্রম কোথা?" সে আমার পানে তার জবাফুলের মত চোখ মেলিয়া বলিল "কে বাবা তুমি বে-রসিক? আত্মানন্দকে চেন না!" আর এক ব্যক্তি বলিল—"আ-হা!…চিন্‌বে কেমন করে ..এ রসে যে বঞ্চিত দেখ্‌চি—ও! চিন্‌বে যদি বাবা, আত্মানন্দের তাড়ি একটু চুমুক দাও!" সেই লোকগুলার হাবভাবে আমি ঘৃণায় সে স্থান ত্যাগ করিয়া আবার চলিতে লাগিলাম। খানিক দূরে গিয়া দেখি, এক সু-সজ্জিত বাটীর ভিতর হইতে বামা-কণ্ঠে সঙ্গীতের উচ্ছৃঙ্খল হিল্লোল বহিতেছে! বিলাসীর দল যাওয়া-আসা করিতেছে। অতি অনিচ্ছায় তাহাদের একজনকে আত্মানন্দের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে ভারি আশ্চর্য্য হইয়া কিছুক্ষণ আমার দিকে চাহিয়া রহিল! তার পর বলিল, "এস না আমার সঙ্গে! শুধু আত্মানন্দ কেন, অনেক আনন্দ এ বাড়ীতে আছেন!" আমি তাহার ঘৃণিত পরিহাসে ব্যথিত হইয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিব, এমন সময় দেখি সেই বৃদ্ধ তাড়িওয়ালা বাহির হইয়া আসিল। এবার আর তার সে তাড়িওয়ালা মূর্ত্তি নয়, বেশ নটবর বেশ! আমি আবার সম্মুখের দিকে চলিতে লাগিলাম। পথে আর এক বাড়ী পড়িল। দেখি, কয়েকটী লোক গৃহস্বামীকে মৃদু কণ্ঠে গালি বর্ষণ করিতে-করিতে বাহির হইয়া আসিতেছে! আমি একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ওহে বাপু! আত্মানন্দ স্বামীর আশ্রম কোথায় বল্‌তে পার?" সে ব্যক্তি আত্মানন্দের প্রতি একটা কুৎসিত গালি প্রয়োগ করিয়া বলিল, "সে সুদখোর বদমাইসকে আর আত্মানন্দ বল্‌তে নেই। ব্যাটা ঘোর কসাই মশাই, ঘোর কসাই! ব্যাটার আবার নামের বহর কত—আত্মানন্দ স্বামী!"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "তিনি কি কুশীদজীবী?" সে বলিল, "ভিতরে গিয়া দেখুন না, ঐ তার বাড়ী।" আমি

ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখি, সেই তাড়িওয়ালা একটা ফরাসে বসিয়া অতি নির্ম্মম ভাবে সুদ আদায় করিতেছে। অধমর্ণদের মধ্যে যে অক্ষমতা জানাইয়া দয়ার প্রার্থী হইতেছে, তাহাকে অকথ্য ভাষায় গালি দিতেছে! দেখিয়া, আমার অন্তর ঘৃণায় ভরিয়া উঠিল। এই নীচাশয় কখনই আমার বন্ধু আত্মানন্দ হইতেই পারে না। আমি আর মুহূর্ত্ত কাল সেখানে অবস্থান করিলাম না।

এই রকম করিয়া নানা জঘন্য বীভৎস স্থানে আত্মানন্দের উদ্দেশ করিয়া ক্রোশের পর ক্রোশ চলিতে লাগিলাম। আশ্রম আর মেলে না! আশ্চর্য্যের বিষয়, যেখানে যাই, সেইখানেই সেই বুড়ো তাড়িওয়ালা হাজির। মনে কেমন সন্দেহ হইল, এ কোন্ মায়াপুরে আসিলাম! পথশ্রমে দেহ ক্লান্ত, হতাশ্বাসে মন অবসন্ন হইয়া আসিল। একবার মনে হইল, আর বন্ধুর সহিত সাক্ষাতে কাজ নাই—ফিরিয়া যাই। বন্ধুর লেখা লেফাপা-মোড়া চিঠিখানার উপর নজর পড়িল; সে যেন আমার মনের কথা জানিতে পারিয়া ভ্রূকুটি করিয়া উঠিল! ফিরিবার পথে পা যেন অবশ হইয়া আসিল; গতি নাই—আবার সামনের পথেই চলিতে লাগিলাম।

৩

বন্ধুর চিঠি জীর্ণ, বিবর্ণ হইয়া আসিয়াছে; মনের ভিতরটাও হতাশে নুইয়া পড়িয়াছে—অথচ চলার শেষ নাই! সহসা অদূরে এক আশ্রম দেখা দিল। অমনি মনের ভিতরে কে যেন বলিয়া উঠিল, "ওই—ওই আশ্রমেই তোমার বন্ধুকে পাইবে।"

আশ্রমের সামনে এক কিশোর দাঁড়াইয়া। সে যেন আমারি প্রতীক্ষায় রহিয়াছে! আমায় দেখিয়া বলিল, "এত দেরী হ'ল?"

আমি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই কি আত্মানন্দ স্বামীর আশ্রম?"

সে বলিল "হাঁ, এখানেও তাঁর দেখা পাবেন।"

আমি বলিলাম, "উঃ কম খুঁজে আস্‌চি!"

"কেন, পথে ত অনেক বার দেখা হয়েচে তাঁর সঙ্গে।"

আমি সবিস্ময়ে তার পানে চাহিয়া রহিলাম।

সে সহাস্যে বলিল "তাঁকে বুঝি চিন্‌তে পারেন নি?"

"আমি যে তাঁকে চিনি না।"

সে বলিল "চেনেন না—এত কাছে থেকেও?"

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম "কাছে থেকে? কি রকম?"

"এই ছায়া যেমন কায়ার কাছে থাকে!"

আমি আবার হতবুদ্ধি হইয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিলাম। সে এক অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ হাসি হাসিয়া বলিল "ভিতরে আসুন।"

ভিতরে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে ক্ষণেকের জন্য তড়িতাহতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। ওই যজ্ঞবেদী-সমাসীন, রজত-শুভ্র শ্মশ্রুমণ্ডিত, শান্ত-সৌম্য মূর্ত্তি বৃদ্ধ, যিনি শৌণ্ডিকালয়ে বিরাজিত হইয়া হৃদয়ে অশ্রদ্ধার উদ্রেক করিয়াছিলেন, যাঁহাকে গণিকালয়ে দেখিয়া তীব্র ঘৃণায় হৃদয় আমার ভরিয়া উঠিয়াছিল, যাঁহার ঘৃণিত কুশীদজীবি-সুলভ নির্দ্দয় ব্যবহারে আমার অন্তরাত্মা বিমুখ হইয়া উঠিয়াছিল—অই বৃদ্ধ—উনি আমার বন্ধু আত্মানন্দ স্বামী! সাশ্চর্য্য আনন্দের নেশা তখনো কাটে নাই,—বন্ধু আত্মানন্দ তাঁহার আলিঙ্গনউন্মুখ বাহু প্রসারিত করিয়া বলিলেন, "এস বন্ধু—হৃদয়ে এস!"

আমি ভাবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলাম, "এ বহুরূপী বেশ কেন বন্ধু?"

প্রসন্ন দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া বন্ধু আমায় বলিলেন, "ইহার উত্তর গীতায় পাইবে।"

সহসা স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল! দেখিলাম, আমি নিজের কুঁড়ে-ঘরে শয্যালীন! মূর্খ আমি, বন্ধুর কথা বুঝিলাম না! হ্যাঁ গো গীতা কি?

পাটীগণিতের অঙ্ক

[অধ্যাপক শ্রীসারদাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ]

বাস্তবিকই ভারতে একটী নূতন যুগের সূচনা হইয়াছে। সকল ক্ষেত্রেই শুভ পরিবর্ত্তনের লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে। আমাদের গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীর হস্তে প্রাদেশিক শাসনকার্য্য-ভার এখন কিয়ৎ পরিমাণে অর্পণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, এবং ক্রমে-ক্রমে আরও অর্পণ করিবেন বলিয়া আশা দিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত কন্‌ভোকেশনে বড়লাট বাহাদুর বলিয়াছেন, "এ দেশে শিল্প-বাণিজ্যক্ষেত্রে কেবল ভারতীয় অর্থ খাটিলেই চলিবে না; ভারতের অধিবাসিগণ যাহাতে উহার অংশভাগী হইতে পারে তাহা করিতে হইবে। তাহারা যে শুধু কুলি মজুরের ন্যায় কার্য্য করিবে তাহা নহে; পরন্তু শিল্প-বাণিজ্যের নেতৃত্ব তাহাদের হাতে যাওয়া চাই।" * ভারতে ছাত্রদিগের অধ্যাপনা ও পরীক্ষাগ্রহণ মাতৃভাষায় চলিবে কি না, এবং চলিলে কোন্ পরীক্ষা পর্য্যন্ত এবং কোন্-কোন্ বিষয়ে মাতৃভাষায় চলিতে পারিবে, তাহাও আজকাল আলোচনার বিষয় হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার-কল্পে যে কমিশন বসিয়াছিল, তাহারও রিপোর্ট লিখিত হইতেছে। উহাতে, আজকালকার সময়োপযোগী উচ্চশিক্ষা কি প্রকার উন্নত প্রণালীতে দেওয়া যাইতে পারে, তাহাও আলোচিত হইবে। এই সকল পরিবর্ত্তন হইতে সুফল পাইতে হইলে, আমাদের দেশের নিম্নশিক্ষার বর্ত্তমান অবস্থাও একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা এবং প্রয়োজন অনুসারে যথাস্থানে সংস্কার সাধন করা আবশ্যক। দেশের অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে শিক্ষা সম্বন্ধেও যথোচিত পরিবর্ত্তন শুধু বাঞ্ছনীয় নহে, পরন্তু অত্যাবশ্যক। যাহারা ভবিষ্যতের আশাস্থল, তাহাদিগকে সর্ব্বাগ্রে রক্ষা করিতে হইবে, এবং কি প্রণালীতে শিক্ষা দিলে তাহা দেশের, তথা সমাজের পক্ষে অধিকতর কার্য্যকর হইবে, তাহা স্থির করিয়া কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে।

আমি এই প্রবন্ধে শিশুদের গণিত-শিক্ষা সম্বন্ধেই আলোচনা করিব। যে পদ্ধতিতে গণিতের শিক্ষা দিলে, উহা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার অন্তরায় না হইয়াও, ছাত্রদিগকে ভবিষ্যতে কি শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ে, কি অন্য কোনও কার্য্য-ক্ষেত্রের উপযোগী করিয়া তুলিতে পারে, সেই পদ্ধতিই অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। ইহাতে আমাদের অভ্যস্ত পদ্ধতিগুলি পরিত্যাগ করিতে হইলেও, কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নহে।

অনেকে হয় ত মনে করিবেন, পাটীগণিতের যোগ, বিয়োগ, গুণন, ভাগ, ইত্যাদির পদ্ধতির পরিবর্ত্তন কি হইতে পারে? বিশ্ববিদ্যালয়ের মেট্রিকিউলেশন পরীক্ষায় পাটীগণিতের প্রশ্ন-পত্রের উত্তর দেখিয়া বুঝিয়াছি যে, পাটীগণিতের পদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন দরকার। আমাদের দেশে ৫০ বৎসর পূর্ব্বে পাটীগণিত যে ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইত, আজও সেই ভাবেই শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। আমাদের দেশে আজকাল পাটীগণিতের যে সকল পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা প্রায়ই, ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে যে সকল পুস্তক ব্যবহৃত হইত, তাহাদের অনুরূপ। পাটীগণিত-শিক্ষার কোনও পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে বলিয়া এই সকল পুস্তক পাঠে বুঝিতে পারা যায় না। এক স্থলে পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহাকে উন্নতির পরিবর্ত্তে অবনতি বলিয়া মনে করিলে অন্যায় হয় না। আমেরিকায় বা ইংলণ্ডে পাটীগণিত সংক্রান্ত যে সকল পুস্তক ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা যদি কেহ কষ্ট স্বীকার করিয়া দেখেন, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন যে, পাটীগণিতের প্রথম চারি নিয়মেও পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা আছে। এই আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, পাটীগণিত শিক্ষার উদ্দেশ্য কি তাহা বুঝিতে হইবে; এবং বর্ত্তমান প্রণালীতে ঐ উদ্দেশ্য কতদূর সিদ্ধ হইতে পারে, তাহাও দেখিতে হইবে।

---

* ১৩২৫ সালের ৬ই পৌষের "বঙ্গবাসী" হইতে উদ্ধৃত।

পাটীগণিত শিক্ষার উদ্দেশ্য তিনটি। প্রথমতঃ, ইহার ন্যায় নিত্যপ্রয়োজনীয় শিক্ষার বিষয় বোধ হয় জগতে আর নাই। জীবনধারণ করিতে হইলে প্রত্যহই পাটীগণিতের প্রয়োগ করিতে হইবে। আজকালকার গণনায়, শিক্ষিতই হউন আর অশিক্ষিতই হউন, প্রত্যেকেই পাটীগণিতের ব্যবহার করিয়া থাকেন। অতএব ব্যাবহারিক জীবনে পাটীগণিতের যথেষ্ট উপকারিতা আছে। এই উপকারিতাই পাটীগণিত শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়তঃ, ইহা দ্বারা মানসিক বৃত্তিগুলির ঔৎকর্ষ্য সাধিত হয়। তৃতীয়তঃ, ইহা দ্বারা গৌণভাবে চরিত্র গঠিত হয়। প্রত্যেক অঙ্কের সঠিক ভাবে উত্তর পাওয়ার জন্য যাহারা সাধুভাবে চেষ্টা করে, তাহাদের ভ্রমশূন্যতা বা যাথার্থ্যের প্রতি অনুরাগ হওয়া স্বাভাবিক। অঙ্কের সমাধান সুন্দররূপে সাজাইয়া লেখাই বাঞ্ছনীয়। ঐরূপ লিখিলে পরিচ্ছন্নতা অভ্যস্ত হয়। সময় লাঘব করিবার উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়া শিখিতে-শিখিতে ক্ষিপ্রতার প্রতি আগ্রহ জন্মে।

আজকাল যেরূপ ভাবে পাটীগণিত শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহাতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়; কিন্তু প্রথম উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। আমরা পাটীগণিত যে ভাবে শিখিয়াছি, তাহাতে কার্য্যকালে উপকার পাওয়া যায় না। কাগজ, পেন্সিল না হইলে এবং যথেষ্ট সময় না পাইলে আমরা সামান্য অঙ্কটি পর্য্যন্ত কষিতে পারি না। পাটীগণিত শিক্ষা কিরূপ কার্য্যকরী হইয়াছে, তাহা একবার থালা, ঘটি ইত্যাদি কিনিবার নিমিত্ত দোকানে গেলেই বুঝিতে পারা যাইবে। সেখানে মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, দোকানদারের হিসাব অনুসারে মূল্য দিয়া আসিতে হইবে। ঐ মূল্য ঠিক হইল কি না, তাহা অল্প সময়ের মধ্যে স্থির করা আমাদের পাটীগণিতের বিদ্যায় কুলাইবে না। অনেকে হয় ত বলিবেন যে, আমরা শুভঙ্করী শিখি নাই বলিয়াই আমাদের এইরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছে। কিন্তু মনে রাখা উচিত যে, শুভঙ্করী পাটীগণিতের কৌশল ব্যতীত আর কিছুই নহে। যাঁহারা বুদ্ধির সহিত পাটীগণিত শিক্ষা করেন, তাঁহাদের শুভঙ্করী শিখিবার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু যাঁহারা কেবল না বুঝিয়া কতকগুলি নিয়ম কণ্ঠস্থ করিয়া অঙ্ক কষিতে থাকেন, তাঁহাদের পক্ষেই শুভঙ্করীর আর্য্যা-রূপে আরও কতকগুলি নিয়ম কণ্ঠস্থ করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে। অতএব যে সকল প্রণালীতে সংক্ষেপে সমাধান হইতে পারে, সেই সকল প্রণালী প্রথম হইতেই শিক্ষা দেওয়া উচিত। কারণ, প্রথমে কোনও এক প্রণালী অভ্যস্ত হইলে, উহা পরিত্যাগ করা কঠিন হইয়া উঠে; এবং বহুদিনের অভ্যাসের ফলে উহার সহিত তুলনায় অন্য কোন প্রণালী, অপেক্ষাকৃত সহজ হইলেও, কঠিন বলিয়া মনে হয়। যে সকল প্রণালী অবলম্বন করিলে সময় এবং পরিশ্রমের লাঘব হয়, অথচ ঈপ্সিত ফল পাওয়া যায়, তাহাদের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বাণিজ্য, পূর্ত্তকার্য্য বা এই জাতীয় অন্য কোনও কর্ম্মক্ষেত্রে লিপ্ত কাহারও সন্দেহ নাই। লণ্ডন চেম্বার অব্ কমার্সের পরীক্ষায় আধুনিক নিয়মের পরিবর্ত্তে প্রাচীন ধরণের নিয়মে অঙ্ক কষিলে, উহা অগ্রাহ্য করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। এই জন্য ইংলণ্ডে পুরাতন প্রণালী পরিত্যাগ করিয়া নূতন-নূতন প্রণালী অবলম্বন করা হইয়াছে। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী ব্যাবহারিক জগতে কার্য্যকরী করিবার নিমিত্ত অন্যান্য পরীক্ষার জন্য লিখিত পাটীগণিতেও নূতন-নূতন প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে। বঙ্গদেশেও শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত P. W. D. Fourth grade (আজ কাল Second grade) Accountantship পরীক্ষার প্রশ্নপত্র দেখিলেও বুঝিতে পারা যাইবে যে, ঐ পরীক্ষা আধুনিক সংক্ষিপ্ত প্রণালীই চাহিয়া থাকে। পাটীগণিতের প্রশ্নপত্রে এই মর্ম্মে টীকা থাকে। এক বৎসর লেখা ছিল যে, প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরেই সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে হইবে। সেই বৎসর একটী প্রশ্ন এই ছিল :—"Find the L. C. M. of 18, 28, 108, 105." (Vide Hall & Stevens' School Arithmetic, page 78.) Hall & Stevensএর পাটীগণিত দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, আমরা যেরূপে ল. সা. গু. বাহির করিতে শিখিয়াছি, তাহা অপেক্ষা কিছু সংক্ষিপ্ত প্রণালী ঐ পাটীগণিতে প্রদর্শিত হইয়াছে। কেহ-কেহ হয় ত বলিতে পারেন যে, এক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়ায় বিশেষ লাভ হয় নাই। বিশেষ লাভ হইয়াছে কি না তাহা সিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব্বে, যোগ ও গুণনের আধুনিক প্রণালী সম্বন্ধে যাহা নিম্নে লিখিত হইল, তাহা পাঠ করিয়া দেখিবেন। এক্ষেত্রে বিশেষ লাভ না

হইলেও এরূপ সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়া অভ্যাস করিলে অনেক সময় সুবিধা হইয়া থাকে। আরও, এই সকল স্থলেই বুঝিতে পারা যায় যে, শিক্ষার্থী সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়ায় অভ্যস্ত হইয়াছে কি না। লোকচরিত্র পরীক্ষা করিতে হইলে সামান্য সামান্য ঘটনার প্রতিই লক্ষ্য রাখা উচিত। কারণ, সামান্য-সামান্য ঘটনায় বিশেষ লাভ বা ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না বলিয়াই লোকে সতর্কতা অবলম্বন করে না; এবং তখন প্রকৃত চরিত্র বাহির হইয়া পড়ে। মিতব্যয়িতা যাঁহার মজ্জাগত হইয়াছে, অন্যকে অমিতব্যয়ী হইতে দেখিলে তাঁহার মনে একটু চাঞ্চল্য উপস্থিত হইবেই। কলিকাতা গবর্ণমেণ্টের Commercial Instituteএ আধুনিক প্রণালী অবলম্বনে পাটীগণিত শিক্ষা দেওয়াই অভিপ্রেত। উপরিউক্ত তিনটী দৃষ্টান্ত হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, যাঁহারা আধুনিক প্রণালী জানেন, তাঁহারা উহারই পক্ষপাতী। এই পক্ষপাতিত্বের কারণ ব্যাবহারিক জীবনে আধুনিক প্রণালীর অধিকতর উপকারিতা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

অঙ্ক কষিবার প্রচলিত প্রণালীর পরিবর্ত্তন করা স্থির করিবার পূর্ব্বে, এই দুইটি বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে যে, নূতন প্রণালী অবলম্বন করিলে উহা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার অন্তরায় এবং কোমলমতি বালকবালিকাগণের উহাতে অসুবিধা উপস্থিত হইবে কি না। মেট্রিকিউলেশন পরীক্ষার পরে পাটীগণিত পড়ান হয় না। অতএব যে ভাবেই শিক্ষা দেওয়া হউক না কেন, তাহা ভবিষ্যতের শিক্ষার বিরোধী হইতে পারে না। বরং আধুনিক প্রণালীতে পাটীগণিত শিক্ষা করিলে ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষার্থিগণেরও অনেক সুবিধা হইবে। আজকাল দেখিতে পাওয়া যায় যে, Hydrostaticsএর অঙ্ক কষিবার সংখ্যার গুণফল নির্ণয় করিবার নিমিত্ত বি. এ. ক্লাসের ছাত্রেরাও পাটীগণিতের প্রথম শিক্ষার্থীর ন্যায় গুণনের প্রক্রিয়া করিয়া থাকেন। ছাত্রদের এইরূপ অবস্থা যত শীঘ্র পরিবর্ত্তিত হয় ততই ভাল।

কোমলমতি শিক্ষার্থীর পক্ষেও নূতন প্রণালী অসুবিধাজনক হইবে না। কটকে বাঙ্গালী বালক-বালিকাদের জন্য একটী বঙ্গবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ে অঙ্ক কষিবার আধুনিক প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হয়। সপ্তম বর্ষের শিশুরাও গুণন ও ভাগের আধুনিক প্রণালী শিখিয়াছে। কোনও প্রকার অসুবিধা হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। গত ডিসেম্বর মাসে যে বার্ষিক পরীক্ষায় গুণন ও ভাগের অঙ্ক ছিল, প্রায় ছাত্রই আধুনিক প্রণালীতে গুণন ও ভাগ করিয়াছিল। যে অল্প কয়েকটী ছাত্র পূর্ব্বে বাড়ীতে পুরাতন প্রণালী অনুসারে ঐ দুইটি নিয়ম শিক্ষা করিয়াছিল, কেবল তাহারাই আধুনিক প্রণালী অবলম্বন করে নাই। লেখকের বাড়ীর ছেলে-মেয়েদিগকে পাটীগণিত শিক্ষার প্রারম্ভ হইতেই আধুনিক প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। তাহাতে কাহারও অসুবিধা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

অঙ্ক কষিবার আধুনিক প্রণালী কি? আধুনিক প্রণালীতে সময় ও পরিশ্রমের লাঘবের চেষ্টা হইয়াছে; এবং যাহাতে ছোট-ছোট গণনা মনে-মনেই সম্পাদিত হইতে পারে, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। ৮০ বৎসর পূর্ব্বে Girdlestone তাঁহার Arithmeticএ লিখিয়াছিলেন, "Let the learner try to acquire habits of rapidity in his calculations as well as accuracy : too much time is generally wasted in *counting up* in addition, in using *too many words* in multiplication, etc., whereas these processes ought to be done instantaneously and without effort. The habit of making short calculations *in the head* instead of writing down every figure is as much to be commended as it is generally neglected." অর্থাৎ শিক্ষার্থী যেন তাহার গণনা ভ্রমশূন্য করিবার ও শীঘ্র-শীঘ্র সম্পাদন করিবার অভ্যাস অর্জ্জন করিতে চেষ্টা করে। যোগের সময় সংখ্যা-গণনে, গুণনের সময় অত্যধিক শব্দ ব্যবহারে, ইত্যাদি নানা প্রকারে অত্যধিক সময় সাধারণতঃ নষ্ট হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, এই সকল প্রক্রিয়া নিমেষমধ্যে ও অনায়াসে সম্পাদিত হওয়া উচিত। ছোট-ছোট গণনা না লিখিয়া মনে-মনে অভ্যাস করিতে শৈথিল্যই সচরাচর লক্ষিত হয়। কিন্তু ঐরূপ অভ্যাসই অতীব বাঞ্ছনীয়। কিন্তু কেহ মনে করিবেন না যে, কতকগুলি নিয়ম কণ্ঠস্থ করিয়া সময় ও পরিশ্রমের সংক্ষেপ সাধন করিতে হইবে। পুরাতন পাটীগণিতেই কণ্ঠস্থ করিবার

জন্য এক-একটী নিয়ম দিয়া ঐ নিয়মানুসারে কষিবার জন্য কতকগুলি অঙ্ক দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। আজকাল ঐ ব্যবস্থা আমাদের দেশে বর্ত্তমান থাকিলেও, অন্যান্য দেশে যথাসম্ভব পরিত্যক্ত হইতেছে। Sydney Jones (Headmaster of Cheltenham Grammar School) তাঁহার Modern Arithmetic-এর ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "An efficient teaching of Arithmetic must aim at (1) a clear conception of units of the quantities involved in calculations, (2) accuracy, (3) quickness in the manipulation of numbers, (4) cultivation of the reasoning faculties." অর্থাৎ পাটীগণিতের শিক্ষা ফলোৎপাদিকা করিতে হইলে, এই চারিটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে:—(১) গণনায় ব্যবহৃত রাশিসমূহের একক সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা, (২) ভ্রমশূন্যতা, (৩) সংখ্যা ব্যবহারে ক্ষিপ্রতা, (৪) বিচার-শক্তির ঔৎকর্ষ্য সাধন। এই কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রচলিত প্রণালীর সংস্কার সাধন করিলেই আধুনিক প্রণালী পাওয়া যায়। এখন এক-একটী নিয়ম ধরিয়া প্রচলিত ও আধুনিক প্রণালীর পার্থক্য দেখান যাউক।

যোগ।—মনে করুন, ২, ৩, ৫, ৭, ও ৮ এই কয়েকটি অঙ্ক যোগ করিতে হইবে। প্রচলিত প্রক্রিয়া এই:— "২ আর ৩, পাঁচ; আর ৫, দশ; আর ৭, সতর; আর ৮, পঁচিশ।" আজকাল চক্ষুর শিক্ষা এরূপ দেওয়া হইয়া থাকে যে, নিমেষ মধ্যে ২, ৩, ৫ এই তিনটি অঙ্ককে চক্ষুর সাহায্যে একত্র করিয়া যোগফল দশ এবং ৭, ৮, এই দুইটি অঙ্ক একত্র করিয়া যোগফল পনর ধরিয়া লইতে অভ্যাস হইয়া যায়। আধুনিক প্রণালীতে এইরূপে যোগ করিতে হয় "দশ, পঁচিশ।" শৈশব হইতেই এই প্রকারে যোগ করাইতে শিক্ষা দেওয়া ভাল। দুই তিনটি অঙ্ক একত্র করিয়া মিশাইবার অভ্যাস হইলে, বয়স এবং বুদ্ধির বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে সময় সংক্ষেপের উপায় নিজে উদ্ভাবন করিতে পারা যাইবে।

বিয়োগ।—আজকাল শিশুদের জন্য লিখিত বাঙ্গালা পাটীগণিতে বিয়োগের যে প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা বাঞ্ছনীয় নহে। উহা দ্বারা বিয়োগফল পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ঐ নিয়ম শিক্ষা করিলে একই প্রক্রিয়ায় গুণন ও বিয়োগের কার্য্য সম্পাদন করা সুকুমার শিক্ষার্থীর পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অতএব ভাগের আধুনিক প্রণালী (ইতালীয় প্রণালী) শিক্ষার পথে ঐ নিয়ম কণ্টকস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা যে পূরকযোগের সাহায্যে বিয়োগ (subtraction by complementary addition) শিখিয়াছিলাম, তাহাই উৎকৃষ্ট প্রণালী। উহাকে বিয়োগের Austrian method বলে। এই Austrian method সম্বন্ধে Hall and Stevens তাঁহাদের School Arithmetic-এ লিখিয়াছেন "in some subsequent rules is indispensable for rapid work." অর্থাৎ পরবর্ত্তী কতকগুলি নিয়মানুসারে দ্রুত কার্য্যের জন্য অপরিহার্য্য বা একান্ত আবশ্যক। আজকাল যে নিয়ম শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা বস্তু সাহায্যে বুঝাইয়া দেওয়া সহজ। কিন্তু ঐই নিয়ম শিক্ষা করিলে ভবিষ্যতে ভয়ানক অসুবিধায় পতিত হইতে হয়। বিয়োগে "ধার করিবার" যে প্রণালী আছে, তাহাও বস্তু সাহায্যে বুঝাইয়া দেওয়া সহজ; এবং এই "ধার করা" প্রণালী হইতে পূরকযোগের প্রণালীতে অনায়াসেই যাইতে পারা যায়। অতএব বস্তু সাহায্যে বিয়োগের প্রণালী শিক্ষা দেওয়ার সময় বর্ত্তমানে প্রচলিত নিয়মের পরিবর্ত্তে "ধার করা" নিয়মটি শিক্ষা দেওয়া বাঞ্ছনীয় ও মঙ্গলজনক। এ বিষয়ে শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের, তথা গ্রন্থকারদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া অত্যাবশ্যক। Austrian method শিক্ষা করিলে একটী সংখ্যা হইতে অপর কতকগুলি সংখ্যার সমষ্টির অন্তর একই প্রক্রিয়ায় বাহির করা যাইতে পারে।

গুণন।—গুণনে গুণকের ডাইন দিকের অঙ্কটি হইতে আরম্ভ করিয়া পর-পর গুণকের অঙ্কগুলি দিয়া গুণ করাই আমাদের দেশে প্রচলিত রীতি। গুণকের বামদিকের অঙ্কটি হইতে গুণনের কার্য্য আরম্ভ করাই আজকালকার নিয়ম। গুণকের অঙ্কগুলি দ্বারা গুণনের পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধে Hall ও Stevens তাঁহাদের পাটীগণিতে লিখিয়াছেন, "In theory the order in which these separate multiplications is (?) performed is immaterial; but there are great advantages in

* * * beginning with the figure of the highest place-value in the multiplier." অর্থাৎ শুষ্ক জ্ঞানের দিক হইতে দেখিলে কোন্‌টির পর কোন্‌টি দিয়া গুণ করিতে হইবে, তাহা দেখা না দেখা সমান; কিন্তু গুণকের সর্ব্বোচ্চস্থানীয় মান বিশিষ্ট অঙ্কটি দ্বারা গুণন আরম্ভ করিলে অনেক সুবিধা হয়। গুণন সম্বন্ধে Dr. Workman (Senior Wrangler) যাহা লিখিয়াছেন তাহার উল্লেখ পরে করা যাইবে। সংখ্যা পড়িবার বা উল্লেখ করিবার সময় যে কারণে ডাইন দিকের অঙ্কটি হইতে আরম্ভ না করিয়া বাম দিকের অঙ্কটি হইতে আরম্ভ করিয়া থাকি, ঠিক সেই কারণেই গুণকের বাম দিকের অঙ্কটির দ্বারা গুণন আরম্ভ করা উচিত। 'তিন শ', পঁচিশ' বলিলে যাহা বুঝায় 'পঁচিশ, তিন শ' বলিতে তাহা বুঝায়। তবে তিন শ আগে বলা হয় কেন? মনে করুন, একখানা বাড়ী তৈয়ার করাইতে কত টাকা খরচ লাগিবে জিজ্ঞাসা করায়, কেহ এইরূপে বলিতে লাগিলেন, "পঁচিশ, তিন শ, দশ হাজার, টাকা"। যখন "পঁচিশ" বলা হইল তখন খরচ সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণাও জন্মিল না। "পঁচিশ, তিন শ" বলা হইলেও ধারণা প্রায় তদ্রূপই রহিয়া গেল। উত্তর সমাপ্ত না হইলে খরচ সম্বন্ধে কোন ধারণা করিতে পারা যায় না। কিন্তু "দশ হাজার, তিন শ, পঁচিশ, টাকা" বলিলে, যখন 'দশ হাজার' বলা হইল তখনই মোটামুটি বুঝিতে পারা গেল, দশ ও এগার হাজারের মধ্যে খরচ লাগিবে। যখন "দশ হাজার, তিন শ" বলা হইল, তখন বুঝা গেল যে প্রকৃত খরচ আর এক শ টাকার মধ্যেই থাকিবে। এই জন্যই সংখ্যা বলিবার বা পড়িবার সময় বামদিক হইতে বা সর্ব্বোচ্চস্থানীয় মানের অঙ্কটি হইতে আরম্ভ করা হইয়া থাকে। গুণনের সময়ও এই একই যুক্তি। যদি ৩০৪৭ দিয়া গুণ করিতে হয়, ৭ দিয়া গুণ করিলে যে আংশিক গুণফল পাওয়া যায়, তাহা হইতে নির্ণেয় গুণফলের মোটামুটি ধারণাও জন্মে না; তিন হাজার দিয়া গুণ করিলে কতকটা ধারণা জন্মে। ৩, হাজারের ঘরে আছে। ৩ দিয়া গুণ করিয়া গুণফল হাজারের ঘরে রাখিলেই ৩ হাজার দ্বারা গুণফল পাওয়া গেল বলিয়া বুঝিতে পারা যাইবে। এইরূপ গুণকের বামদিকের অঙ্কটি হইতে আরম্ভ করিয়া গুণন করিলে প্রথম হইতেই গুণফল সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা জন্মিতে থাকে। এইরূপে গুণন করিতে গেলে, গুণকের মধ্যস্থিত ০ দ্বারা গুণনের অনাবশ্যকতা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। যথা, ৩০৪৭ দিয়া গুণ করিতে হইলে ৩ হাজার ও ৪৭ দিয়া গুণ করিতে হইবে বুঝা যায়। ০ দ্বারা গুণনের কথা মনে আসা উচিত নহে। কিন্তু মেট্রিকিউলেশন পরীক্ষায়ও গণিতের প্রশ্নের উত্তরে গুণনের অঙ্কে ০ দ্বারা গুণনের ফল স্বরূপ এক সারি ০ দৃষ্ট হইয়া থাকে! দুঃখের বিষয় এই যে আমাদের বঙ্গদেশের কোনও ইংরেজি পাটীগণিতে লেখা আছে যে, গুণকের এককাঙ্ক হইতে আরম্ভ করিয়া গুণন করাই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক। এই সুবিধা কাল্পনিক, বাস্তবিক নহে। কারণ, ইহা বহু দিনের অভ্যাস হইতেই উৎপন্ন। আরও পরিতাপের বিষয় এই যে, ডাইন দিক হইতে গুণনের প্রণালী দেখাইতে গিয়া আমাদের বঙ্গদেশে একখানি অত্যন্ত সমাদৃত ইংরেজি পাটীগণিতে আংশিক গুণফলগুলি এরূপ উদাসীনভাবে স্থাপিত হইয়াছে যে, উহাদের কোনও অর্থ আছে বলিয়া মনে হয় না। ছাত্রগণ যে অসাবধানতা বা চিন্তাশক্তি-হীনতার পরিচয় দিয়া থাকে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? গুণনের এই আধুনিক প্রণালী শিক্ষা করিলে অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক পংক্তিতে গুণনের প্রক্রিয়া সহজে আয়ত্ত হয়। গুণনে পটুতা না থাকিলে, পাটীগণিতের বিদ্যা তত কার্য্যকরী হইতে পারে না।

ভাগ।—ভাগের যে প্রণালী আমাদের দেশে আজকাল প্রচলিত আছে, তাহা কোন-কোনও দেশে একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে, কোন কোনও দেশে পরিত্যক্ত হইতেছে। আজকাল ইতালীয় প্রণালীতে (Italian method) ভাগের পদ্ধতিই অন্যান্য দেশে পূর্ব্ব-প্রচলিত পদ্ধতির স্থান অধিকার করিতেছে। আমরা ভাগফলের যখন যে অঙ্কটি বাহির করি, ভাজক ও সেই অঙ্কটির গুণফল আংশিক ভাজ্যের নীচে রাখিয়া অবশিষ্ট বিয়োগের সাহায্যে স্থির করিয়া থাকি। ইতালীয় প্রণালীতে ঐ গুণফল একেবারেই লিখিত হয় না, গুণন ও বিয়োগ একই প্রক্রিয়াতে সম্পাদিত হয়। ইহাতে সময় ও পরিশ্রমের লাঘব হয়, প্রক্রিয়া সংক্ষিপ্ত হয় এবং কাগজ রক্ষা হয়। ইতালীয় প্রণালী সম্বন্ধে D. E. Smith

(Professor, Columbia University, New York) তাঁহার Teaching of Elementary Mathematics নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন, "the introduction of the 'Italian method', which we commonly use, was a great improvement." অর্থাৎ যে ইতালীয় প্রণালী আমরা (অর্থাৎ আমেরিকাবাসিগণ) সচরাচর ব্যবহার করি, তাহার প্রচলন দ্বারা পাটীগণিতের অত্যন্ত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ইহা হইতে মনে হয় যে, আমেরিকায় ইতালীয় প্রণালীই ব্যবহৃত হয়। ইংলণ্ডে Hall ও Stevens, এবং Dexter ও Garlick ইতালীয় প্রণালীর প্রচলনই অনুমোদন করিয়াছেন। ইংলণ্ড-দেশীয় আধুনিক প্রত্যেক পাটীগণিতেই ইতালীয় প্রণালী বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে; এবং ইহার সুবিধা প্রত্যক্ষ করাইবার উদ্দেশ্যে অনেক পাটীগণিতে উভয় প্রণালী অনুসারে প্রক্রিয়া পাশা-পাশি স্থাপিত হইয়াছে।

ভাগের প্রক্রিয়ায় ভাজ্যের উপরে ভাগফল স্থাপন করাই আজ-কালকার রীতি। ইহাতে ভাগফলের প্রত্যেক অঙ্কের স্থানীয় মান স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। কিন্তু আমাদের দেশে পুরাতন পদ্ধতি অনুসারে ভাজ্যের ডাইনে ভাগফল রাখা হয়। ইহাতে ভাগফলের অঙ্কের স্থানীয় মান সহজে বোধগম্য হয় না। এই জন্যই দশমিক ভগ্নাংশের ভাগে ভাগফলের দশমিক বিন্দু যথাস্থানে স্থাপন করিতে মেট্রিকিউলেশন পরীক্ষার্থীদের অনেকেও ভ্রমে পতিত হয়। কিন্তু ভাজ্যের উপরে ভাগফল লিখিলে, প্রত্যেক অঙ্কের স্থানীয় মান দৃষ্ট হয় বলিয়া, ভাগফলের দশমিক বিন্দু বসাইতে ভুল হওয়াই অস্বাভাবিক। Dr. Workman লিখিয়াছেন, "It is recommended that *Partial Products* of a Multiplication should be arranged to slope from left to right and not from right to left as is sometimes done and that the Quotient of a Division should be placed *over*, and not to the right of the dividend." (School Arithmetic, page 10) অর্থাৎ গুণনের প্রক্রিয়ায় আংশিক গুণফলগুলি মাঝে-মাঝে যেমন ডাইন দিক হইতে বাম দিকে বাঁকাইয়া রাখা হয় সেই রকম না রাখিয়া বাম দিক হইতে দক্ষিণ দিকে বাঁকাইয়া রাখাই উচিত, এবং ভাগের প্রক্রিয়ায় ভাগফল ভাজ্যের ডাইনে না রাখিয়া উপরে রাখাই উচিত; সকলে যেন এই পদ্ধতিরই অনুসরণ করেন।

গ. সা. গু।—ভাগের ইতালীয় প্রণালী প্রচলিত হইলে গ. সা. গু. নির্ণয় করিবার প্রণালী অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করিতে পারা যায়। ভাগের প্রক্রিয়ায় পটুতা লাভ করিলে, ভাজ্যকে ভাজকের বামে রাখিয়াও ভাগ করা যাইতে পারে; এবং ভাগফল ভাজ্যের বামে রাখিতে পারা যায়। এইরূপ করিলে গ. সা. গু. বাহির করিবার প্রক্রিয়ায় কোনও ভাজককে ভাজ্যরূপে ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে পুনরায় অন্য স্থানে না লিখিয়াও ভাগের কার্য্য সমাধা করিতে পারা যায়। এই সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়া অবলম্বন করিলে একটী অঙ্কের জন্য যতটুকু কাগজ লাগে, ততটুকু কাগজে অন্ততঃ দুইটি অঙ্ক অনায়াসে কষা যাইতে পারে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উপরি-উক্ত কয়েকটী প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত প্রণালী শিক্ষা করিতে ছোট ছোট ছেলেদের পক্ষে, নূতন বিষয় শিক্ষাজনিত স্বাভাবিক অসুবিধা ব্যতীত, অন্য অসুবিধা হয় না।

সামান্য ভগ্নাংশ।—(ক) কতকগুলি ভগ্নাংশের মধ্যে ছোট-বড় তুলনা করিয়া দেখিতে হইলে, সাধারণ হরবিশিষ্ট করাই প্রচলিত রীতি। কিন্তু অনেক স্থলে ভগ্নাংশগুলিকে সাধারণ লববিশিষ্ট করিলে অথবা এক করিয়া লইলে যথেষ্ট সময় ও পরিশ্রম বাঁচিয়া যায়। অবস্থা বিশেষে সাধারণ রীতির পরিবর্ত্তন করা উচিত। না করিলে, বুদ্ধিহীনতারই পরিচয় দেওয়া হয়, ইহা শিক্ষার্থীদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

(খ) জটিল ভগ্নাংশের হর ও লবের ভগ্নাংশগুলির হরের ল. সা. গু. দ্বারা হর ও লবকে গুণ করিলে উহারা অখণ্ড সংখ্যায় পরিণত হয়। তাহাতে অনেক সময় প্রক্রিয়া অত্যন্ত সক্ষিপ্ত হয়, সময় ও পরিশ্রমের লাঘব হয়, এবং ভুল করিবার সম্ভাবনা কম থাকে। সকল পাটীগণিতেই এই প্রণালী বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

পাঠক, একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে সকল নিয়ম অন্যান্য দেশে অভিজ্ঞতার ফলে পরিত্যক্ত হইয়াছে, আমাদের শিশুরা আর কত কাল সেই নিয়ম শিক্ষা করিতে থাকিবে? পাটীগণিতের কয়েকটি নিয়ম শিক্ষা দেওয়াতেও কি আমরা পিছনে পড়িয়া থাকিতে চেষ্টা করিব? আমাদের ছেলে মেয়েদিগকে কি বিংশশতাব্দীর মানুষ করিয়া তুলিতে চেষ্টা করা উচিত নহে?

দাদা-ম'শায়ের বে

[কৌতুক-চিত্র]

[শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া]

(কথায় কথায় দ্বন্দ্ব !)

গত কল্য first year class'এর পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে। ভূপেন পরীক্ষাটা বেশ ভাল রকমই দিয়া আসিয়াছে; সুতরাং নিশ্চিত সাফল্যের সম্ভাবনায় তাহার মনটা খুবই স্ফুর্ত্তি-প্রফুল্ল ছিল। আজ সকালে নিত্য-অভ্যস্ত ডন, কুস্তি প্রভৃতি ব্যায়াম সারিয়া, জলযোগান্তে পড়িবার ঘরে ঢুকিয়া, সেইমাত্র পাঠ্য-বইখানি খুলিয়া বসিয়াছে, এমন সময় মাসতুতো ভাই ভূষণচন্দ্র আসিয়া ঘরে ঢুকিল।

ভূষণ আই-এস-সি পড়ে,—তাহার বার্ষিক পরীক্ষা কয়দিন পূর্ব্বে শেষ হইয়া গিয়াছে। সে ভূপেনের সমবয়স্ক,—দুই ভাইয়ে খুব ভাব। দু-জনেই মাতুলালয়ে থাকিয়া কলেজে পড়িতেছে, মাতামহ কৃপানাথবাবু কলেজের প্রফেসার।

ভূষণ ঘরে ঢুকিয়াই, চশমার ভিতর হইতে গৃহের তাবৎ পদার্থের উপর সতর্ক দৃষ্টি বুলাইয়া—হঠাৎ ব্যস্তভাবে বলিল, "এই মরেছে রে! ছুটির দিনে কুমারসম্ভব! ওরে রাখ্, রাখ্,—এখনি মুস্কিল বেধে যাবে!"

ভূপেন আয়ত-উজ্জ্বল চক্ষু দুটি তুলিয়া সবিনয় হাস্যে বলিল "মাভৈঃ বন্ধু, স্থিরোভব! কেবল একজামিনে পাশ করবার জন্যে মাত্র, নইলে তোর দিব্যি বলছি, ও ব্যাপারে আমার একবিন্দুও সহানুভূতি নাই!"

"সুখবর, তোমার মঙ্গল হোক!" বলিয়া ধপ্ করিয়া ইজি-চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িয়া, দু'দিকের হাতার উপর দুই পা তুলিয়া দিয়া ভূষণ সশব্দে নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল—"আজ ছুটির দিনটা কি করে কাটান যায় ভাই ভূপেন?"

ভূপেন একটু ভাবিল; তার পর গম্ভীর ভাবে বলিল, "কারুর মাথায় লাঠি মারতে পারলে বেশ মজা হয়, না?"

ভূষণ বিজ্ঞানের ছাত্র; সুতরাং সকল বিষয়েই তাহার জ্ঞানটা একটু বিশেষত্বসূচক হওয়া উচিত ভাবিয়া, সে ততোধিক গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল, "Certainly, but—"

ভূপেন এক নামজাদা উকীলের পুত্র; কাজেই আইনের অন্ধি-সন্ধির খোঁজ-খবর সে কিছু-কিছু রাখিত;—অতএব তৎক্ষণাৎ ত্রস্তভাবে বলিয়া উঠিল "অথবা if যোগ করতেও পার ওখানে,—আইনে বাধ্‌বে না—"

উদাস দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া ভূষণ বলিল "তথাস্তু, if নিরঙ্কুশ তৃপ্তিতে ও-আমোদের শোচনীয় ফলটা উপভোগ করতে পারা যায়! ও কি!—"

হঠাৎ তাহাদের ছোটমামা চঞ্চলকুমার সতর্ক, নিঃশব্দ বিড়াল-লম্ফে তুড়ুক করিয়া ঘরের মেঝেয় লাফাইয়া পড়িলেন! ছোটমামা ভাগিনেয়দ্বয় অপেক্ষা বয়সে তিন-চারি বছরের ছোট,—এ বছর সেকেণ্ড-ক্লাসে উঠিয়াছে। নামের উপযুক্ত দুরন্ত, দুষ্ট। স্বভাবে মাতুল-জনোচিত গাম্ভীর্য্যের আঁচ না থাকায়, ভাগিনেয়গণও তাহাকে উপযুক্ত সম্মান, উপযুক্ত মর্য্যাদা দেখাইতে নিতান্ত উৎসাহহীন! ছোটমামাও অবশ্য তাহাতে বিশেষ কিছু মনঃপীড়িত নহেন।

পরম পূজনীয় মাতুল মহাশয়কে অমন ভাবে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া, ভাগিনেয়দ্বয় কৌতূহল-উৎসুক ভাবে প্রশ্ন করিতে উদ্যত হইল; কিন্তু মামা পরম গম্ভীর ভাবে উভয়কে স্তব্ধ থাকিতে ইঙ্গিত করিয়া, নিঃশব্দ-পদে পাঠগৃহের ভিতর-ঘরের দিকে সরিয়া গিয়া, দুয়ারের আড়ালে লুকাইয়া দাঁড়াইয়া উৎকর্ণভাবে কি যেন কিসের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

ভাগিনেয়দ্বয় উৎকণ্ঠিতভাবে সেইদিকে চাহিল। খোলা দুয়ার দিয়া পাশের ঘরটা বেশ পরিস্কার দেখা যাইতে-

ছিল। উভয়ে দেখিল, ঘরের মেঝেয় বসিয়া তাহাদের বড়মামার পুত্র—আট বছরের বালক মাণিক ছেঁড়া ঘুঁড়ি আঠা দিয়া জুড়িতেছে, আর গুণ্ গুণ্ করিয়া গান গাহিতেছে "প্রথম যখন ছিলাম কোন ধর্ম্মে অনাসক্ত—"ইত্যাদি।

নিকটে বসিয়া তাহার ছোট বোন খুদু অবাক্ হইয়া দাদার 'রিফু-কর্ম্মের' নৈপুণ্য দেখিতেছে।

প্রথম দু-ছত্র গাহিয়া মাণিক যোড়ের উপর আঠাটা টিপিয়া বসাইতে-বসাইতে অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে গান ধরিল:—

"বিশ্বাস হোল খৃষ্টধর্ম্মে ভজ্‌তে যাচ্ছি খৃষ্টে,
এমন সময় দিলেন পিতা—"

অকস্মাৎ পিছন হইতে আসিয়া, তাহার পিঠে ডান-পা চাপাইয়া দিয়া, চঞ্চলকুমার সুরে সুর মিলাইয়া আবৃত্তি করিল,—

"......দিলেন পিতা, পদাঘাত এক পৃষ্ঠে"!—

সঙ্গে-সঙ্গে চঞ্চলের ভাগিনেয়দ্বয় পটাপট্ হাততালি দিয়া উচ্চহাস্যে চীৎকার করিয়া একজন বলিল "Excellent!" অন্যে বলিল "Bravo!"

একতঃ অপমান! তাহাতে আবার পূর্ব্বাহ্নে ষড়যন্ত্র করিয়া, 'ভুপেন-দা' ও ভুষো-দার' মত মাননীয় দাদাগণকে সাক্ষ্য রাখিয়া—এমন নির্ম্মম অপমান! ঘুড়ি, কাগজ, আঠার হাতা, লাঠাই, সুতা সব ফেলিয়া, এক লম্ফে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, ঘাড় বাঁকাইয়া ক্রুদ্ধস্বরে মাণিক বলিল "বাবাঃ! কাকা!"

কাকা পরম স্নেহভরে চুম্‌কুড়ি দিয়া আরামের আবেশে চক্ষু মুদিয়া উত্তর দিল "আহা! বৎস, বাছা আমার!"

ভাগিনেয়দ্বয় ততক্ষণে চৌকাঠের ব্যবধান ডিঙ্গাইয়া হাসিতে-হাসিতে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত! মাণিকলাল ক্রোধের উত্তেজনায় মুখ রাঙা করিয়া বলিল "তুমি কিসের জন্যে আমার পিঠে লাথি মারলে?"

চঞ্চল মাথা নাড়িয়া, প্রশান্ত ভাবে বলিল—"Should not make so far চটিতং স্যার, যে হেতু, I have done this, only তোমার পিতার জবানী!"

ভাগিনেয়দ্বয় এইবার পঞ্চম হইতে—সোজা সপ্তমে কণ্ঠস্বর চড়াইয়া—বিপুল আনন্দে অট্টহাস্য করিয়া উঠিল!

দাদাদের এই নির্দ্দয় ব্যবহারে নিদারুণ মর্ম্মবেদনায় অস্থির হইয়া নিরুপায় মাণিকলাল দু'হাত ঊর্দ্ধে ছুড়িয়া অধীরভাবে লম্ফ-ঝম্ফ করিয়া ক্রোধ-কম্পিত ওষ্ঠে বলিল, "কী! পিতার জবানী! বাবার জবানী! ওঃ ভারী তো পিতা! ভারী তো! উনি আমার পিতা! এঃ, বাবা — ভারী তো বাবা!"

ভূপেন ও ভূষণের নিরঙ্কুশ কৌতুক-আনন্দ-বিচ্ছুরিত হাস্যধ্বনিতে সমস্ত গৃহখানা মুখর হইয়া উঠিল! মাণিকলাল সদ্যঃ জল হইতে তোলা কুচো চিংড়ির মত ঘরময় তিড়িং-তিড়িং করিয়া লাফাইতে লাফাইতে, সেই এক "পিতা" শব্দকে লক্ষ্য করিয়া ক্ষুব্ধ আক্রোশে অজস্র অর্থহীন বাক্য বর্ষণ করিতে লাগিল। চঞ্চল অচঞ্চল ভাবে ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া, দেওয়ালের গায়ে লম্বমান পঞ্চম জর্জ্জের চিত্র-সম্বলিত এ বছরের ক্যালেণ্ডারখানা নিপুণ মনোযোগ সহকারে দেখিতে-দেখিতে, বিজ্ঞ ভাবে নিঃশব্দে ঘাড় নাড়িতে লাগিল, কোন কথা কহিল না।

অনর্থক বকাবকিতে ক্লান্ত হইয়া, মাণিকলালের মাথায় হঠাৎ এক সার্থক, সদর্থপূর্ণ সুবুদ্ধির উদয় হইল! লাফাইয়া আসিয়া অন্তঃপুরের দিকে জানালায় মুখ বাড়াইয়া প্রাণপণ চীৎকারে এক নিঃশ্বাসে সে অভিযোগ ঘোষণা করিল—"ওমা, মা, শুনছ,—শোন, কাকা বলছে, উনি আমার বাবা হবেন—"

এবার চঞ্চলকুমারের অচঞ্চল গাম্ভীর্য্য টলিল! মাথা নাড়িয়া ক্ষুব্ধ ভৎর্সনার স্বরে সে বলিল,—"আহাম্মক্ বাঁদর! আমি তাই বল্লুম! আমি বল্লুম 'পিতার জবানী বলেছি—' মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ খুলে ছাখ্, ও কথাটা Present prefect tense ছাড়া আর কিছু হতেই পারে না, আর তুই কি না আকাট গোঁয়ারের মত ওকে ঠেলে দিলি ডাহা future tenseএর ধাক্কায়! তুই নিশ্চয় মরে এবার স্কন্ধকাটা ভূত হয়ে জন্মাবি!"

মাণিক স্তম্ভিত হইয়া গেল! এ জন্মের এই সুন্দর টুক্‌টুকে মূর্ত্তি—যে মনোরম মূর্ত্তি দেখিয়া, প্রীতিমুগ্ধা হইয়া, ঠাকুরমা আদর করিয়া তাহার নাম রাখিয়াছেন—"মাণিক-লাল,"—সে মূর্ত্তিটা কি না, ব্যাকরণের বিধি-লঙ্ঘনের দোষে, জন্মান্তরে কদর্য্য কুৎসিত স্কন্ধ-কাটা ভূতে পরিণত হইবে! সত্যই কি সে এত বড় মহাপাপ করিয়া ফেলিল! সন্দেহ

করিবারও পথ নাই,—যেহেতু ব্যাকরণ-বিদ্ মহাপণ্ডিত কাকার শ্রীমুখে ঐ নিদারুণ ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারিত হইয়াছে!

মাণিক ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া ভূপেনের মুখপানে চাহিয়া শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁ ভূপেন-দা, সত্যি তাই হয়—"

মাণিকের উপর আন্তরিক স্নেহের টানটা কিছু বেশী থাকায়, ভূপেন প্রায়ই তাহার পক্ষ লইয়া চঞ্চলের সঙ্গে কিছু-কিঞ্চিৎ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া থাকে; কাযেই তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল—"কখনো না, কখনো না! ও কথার মাথাই নেই, তা মুণ্ড থাক্‌বে। মূলে ভুল! মৃত্যুর পর এবং পুনরায় জন্মগ্রহণের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থাতেই আত্মার প্রেতত্ব বিশেষণ চল্‌তে পারে,—জন্মের পর, অর্থাৎ স্কন্ধকাটা ভূত হয়ে জন্মান একেবারেই অসম্ভব—একেবারেই!"

মাণিক এই পণ্ডিতী ব্যাখ্যার এক বর্ণও বুঝিল না; কিন্তু বুঝিল, কাকার পাণ্ডিত্য এই পাণ্ডিত্যের ধাক্কায় ধূলিসাৎ হইয়া গেল। মহোল্লাসে লাফাইয়া উঠিয়া, হো হো শব্দে হাসিয়া, হাততালি দিতে-দিতে বলিল, "এইবার! কেমন এইবার! হয়েছে তো! ইঃ, ভারী কন্দকাটা, ভারী ফিউচং টং শিখেছেন ছেলে!—হুঁ!—আবার 'পিতার জবানী' বল্‌তে এসেছেন! ভারী তো!"

চঞ্চল নিঃশব্দে একটা মর্ম্মভেদী অবজ্ঞার কটাক্ষ হানিয়া ভূপেনের দিকে একবার চাহিল; তার পর নিকটস্থ আর্ম চেয়ারখানার উপর শুইয়া পড়িয়া সুর করিয়া গান ধরিল—

"There is a wise awful গাধা
তিনি হচ্ছেন মাণিকের পিস্‌তুতো দাদা—"

মুহূর্ত্তে ভূপেনের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। ঘুসী বাগাইয়া রুষ্ট স্বরে সে বলিল—"ত্থাখো চঞ্চল-মামু, নিজের মান নিজের কাছে! বেশী বাড়াবাড়ি কর তো আমি খাতির-ফাতির রাখ্‌বো না!—আমায় মাণিক পাওনি বুঝ্‌লে—হ্যাঁঃ!"

ক্ষণমধ্যে চঞ্চল কোমর বাঁধিয়া কোন্দলের জন্য খাড়া হইয়া দাঁড়াইল! মুখে-চোখে যথাসাধ্য উত্তেজনার ভাব আনিয়া বেশ চড়া গলায় বলিল "তোমায় কে বলছে হে বাপু! তুমি কেন গায়ে পড়ে ঝগড়া কর্‌তে আস্‌ছ?—"

উত্তেজিত ভাবে ভূপেন বলিল, "মাণিকের পিস্‌তুতো দাদাটি কে, শুনি? আমি নয় তো—কে? আমায় বলনি?"

বাধা দিয়া চঞ্চল বলিল—"তুমি! তুমি? তোমার নাম করে বলেছি আমি? মাণিকের পিস্‌তুতো দাদা আর নাই? এই তো সামনে ভূষণ একজন আছে,—আমি ভূষণকে বল্‌ছি, তোমার কি?"

এই প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর ব্যতিরেক ন্যায়ের তর্কটা কেমন করিয়া চালাইতে পারা যাইবে, ক্রোধান্ধ ভূপেন তাহা সম্‌ঝাইতে পারিল না, অধীর হইয়া বলিল "ভূষণকেই বলবার তুমি কে? তোমার এক্‌তার কি বল তো,—জানো, এ রকম অবস্থায় একজন মানুষ আর একজন মানুষের নামে ডিফামেশন স্যুট্ আন্‌তে পারে!"

ব্যঙ্গস্বরে চঞ্চল বলিল "য্যা'জ্ঞে—"

ক্ষিপ্ত উত্তেজনায় ভূপেন বলিল, "যাও তুমি আমাদের পড়বার ঘর থেকে! খবর্দ্দার, আর এখানে ঢুকো না, যাও বল্‌ছি—আচ্ছা, আসুন আজ দাদামশাই বাড়ীতে, আমি নিশ্চয় বল্‌ব, চঞ্চল-মামু এসে আমাদের পড়ার ব্যাঘাত করেছে, সকালে আমাদের পড়তে দেয় নি। হুঁঃ, নিজের পড়া নাই, কিছু নাই,—খালি ছিদ্র খুঁজে পরের সঙ্গে ঝগড়া করা! আমি আজ দিদিমাকে সব বল্‌ব, দাঁড়াও—"

উৎসাহের সহিত লাফাইয়া উঠিয়া মাণিক বলিল "আমিও বল্‌বো"—তর্জ্জনি হেলাইয়া পুনশ্চ বলিল "সব বল্‌বো, ছাদের ওপর মার্‌বেল খেলার জন্য গাবু কাটার কথা বল্‌বো, কুল-আচার চুরির কথা বল্‌বো, চানাচুর ভাজার কথা বল্‌বো--"

বাধা দিয়া ব্যঙ্গস্বরে চঞ্চল বলিল, "এবং—গোলাপ ফুলটি লও—তার ইংরেজি কি?—না 'the rose is take' সে কথাও বল্‌বো! বুঝলে হে ভূষণ, তোমার মাষ্টার যদি কখনো তোমায় বলেন যে, 'গোলাপ ফুলটি লও;—তার ইংরেজি কর তো হে বাপু'—তুমি তক্ষুণি বলো—the rose is take বুঝ্‌লে?"

বলা বাহুল্য মাণিকের মাষ্টারের কাছে মাণিক একদা ঐ পরীক্ষা দিয়াছিল!

মাণিক রাগে লজ্জায় অধীর হইয়া বলিল—"বেশ, বেশ, —তুমি তো খুব বিদ্বান, তুমি থাম! তাই সেদিন দাদাবাবুর কাছে—সেই—হুঁঃ!"—কি প্রশ্নের কি উত্তর দিয়া যে

কাকা অকৃতকার্য্য হইয়াছিল, মাণিকের সেটা আদৌ বোধগম্য হয় নাই; কাযেই শুধু "হুঁঃ!" বলিয়া সেইখানেই থামিয়া পড়িল।

ভূষণচন্দ্র ভূপেনের চেয়ে মাস কতকের ছোট হইলেও, ভূপেনের মত অত খেলো-প্রকৃতির মানুষ ছিল না,—সহজে উত্তেজিত হইয়া ঝগড়া ঝাঁটিতে লাগিত না,—সকল বিষয়ে বেশ একটু সংযত সদ্বিবেচকের পরিচয় দিত। এতক্ষণ সে চুপ করিয়া ছিল; এবার ভূপেনকে পুনরায় উত্তেজিত হইয়া কি একটা কথা বলিতে উদ্যত দেখিয়া—তাহাকে বাধা দিয়া ধীর ভাবে বলিল "শোন, শোন—"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বাহিরের রাস্তা হইতে দ্রুতোচ্চারিত কণ্ঠে দুইজন ডাকিল, "ভূপেন বাবু, ভূপেন বাবু—"

মুহূর্ত্তে সকলে সংযত হইয়া গেল। ভূপেন পড়িবার ঘরে আসিয়া বলিল, "কে সতীশ? বিনোদ? এস, এস।"

সঙ্গে-সঙ্গে এ ঘরের সব লোক কয়টি ওঘরে গিয়া হাজির হইল। সতীশ ও বিনোদ নামক ভূপেনের সহাধ্যায়ী বন্ধু-দুটি ঘরে ঢুকিল। সতীশ ব্যস্ত স্বরে বলিল "এই যে মাণিক, চঞ্চলমামু, দুজনেই আছে, বেশ। শোন, তোমাদের বুড়োটি আস্‌ছেন এখানে। ওহে ভূপেন, তুমি বোলো আমি এলাহাবাদ থেকে আস্‌ছি। নিষ্ঠাবান গোঁড়া হিন্দু আমি, পরম বৈষ্ণব,—আর কন্যাদায়গ্রস্ত। নগদ তিনটি হাজার টাকা, দুশো বিঘা দেবোত্তর জমি, আর একটি বিষ্ণু বিগ্রহ এবং একমাত্র কন্যারত্ন সমর্পণ করবার জন্যে একটা নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব পাত্র খোঁজবার জন্যে এখানে এসেছি। তার পর ভূপেন তুমি ঘটকালী কোরো।—ভূষণ, তুমি আমার পক্ষে। চঞ্চল মামু, তুমি বরকর্ত্তা হোয়ে পড়ো। মাণিক, তুমি নিদ্‌ বর হবে।"

মুহূর্ত্তে কলহ-তাণ্ডবের উদ্দাম উত্তেজনা প্রহসনাত্মক অভিনয়ের উৎসবে পরিণত হইল। সতীশ ও বিনোদ গা হইতে ইস্ত্রি-করা শার্ট খুলিয়া ফেলিয়া আন্‌লা হইতে এক-একটা চাদর টানিয়া লইয়া গায়ে জড়াইয়া নিকটস্থ সোফায় বসিল। চঞ্চল মহা চঞ্চল হইয়া ব্যস্ত ভাবে বলিল, "আরে না—না, সতীশ মামু, আপনি সোফায় নয়, এই কম্বলের আসনে বসুন।—হাঁ, ঐ ঠিক, একগাছা হরিনামের মালা হলে হাতে বেশ মানাতো, নয়?"

মাণিক উৎসাহের সহিত লাফাইয়া অন্তঃপুরের দিকে ছুটিতে উদ্যত হইয়া বলিল "দাঁড়ান, ঠাকুমার হরিনামের মালাটা চেয়ে আনি।"

খপ্‌ করিয়া তাহার হাত ধরিয়া থামাইয়া, সতীশ উদ্দেশেই সসম্ভ্রমে নমস্কার করিয়া বলিল,—"আরে না,—না,—সে মালা কি নিতে আছে?—ছিঃ,—Give not which is holy unto dogs."

চঞ্চল বলিল "আমার চন্দন কাঠের মালাটা দেব? এই নিন,"—ব্র্যাকেটের উপর হইতে মালা পাড়িয়া সে সতীশের হাতে দিল।

ঠিক সেই সময়ে বাহিরের দুয়ারে ঢুকিতে ঢুকিতে পরুষ কর্কশ কণ্ঠে এক বৃদ্ধ ডাকিলেন, "কৃপানাথ আছ হে, কৃপানাথ,—ওহে ভূপীন, ভূপীন হে—"

ভূপেন বলিল, "আজ্ঞে এই যে, মেজ-দা-মশাই,—আসুন, আসুন,—আমরা এইমাত্র আপনার কথাই কইছিলাম,—আসুন।"

(কথায় কথায় ছন্দ)

বৃদ্ধ ঘরে ঢুকিলেন। তাঁহার পরাণ লুইয়ের থাটো কাপড় ও শাদা ফ্লানেলের পিরাণ; গায়ে খাস অমৃতসরের শিখ হস্তে-বোনা, দড়ির শুকতলাযুক্ত ক্যাম্বিশের জুতা। মাথার চুলগুলি সব শাদা, দাঁতগুলি কিন্তু একটীও স্থানভ্রষ্ট নয়; গায়ের চাম্‌ড়া সমস্ত কুঁচ্‌কাইয়া গিয়াছে, চক্ষু জ্যোতিঃহীন—ভাল করিয়া দেখিতে পান না; কিন্তু সেটুকু কাহারও কাছে স্বীকার করিবা থাটো হইতে তিনি আদৌ রাজি ন'ন। হাতে হরিনামের ঝুলি।

ঘরে ঢুকিয়া চারিদিক চাহিবার চেষ্টা করিতে-করিতে বৃদ্ধ সজোরে মালা ঝাকড়াইয়া বলিলেন "আমায় খুঁজছিলে? কেন বল তো হে? সেই বাকী খাজনার নালিশের শমনটা বুঝি এসেছে হ্যা?"

ভূপেন বলিল "আজ্ঞে বাকা খাজনার শমন কি? এ মস্ত শমন!—এই ঘোষজা মশাই এসেছেন আজ এলাহাবাদ থেকে। এঁরই কথা আপনার কাছে সেদিন বলছিলুম। নগদ তিন হাজার টাকা, বিষ্ণু-বিগ্রহ, দুশো বিঘে দেবোত্তর—আর পরম ধর্ম্মশীলা মেয়েটি, বুঝলেন দাদামশাই,—আহা বসুন, বসুন, এই চেয়ারটায় বসুন। এ বেতের ছাউনি চেয়ার, কিছু অপবিত্র নয়। ঘোষজা মশাই, ইনিই আমার

মেজদা মশাই, প্রাতঃস্মরণীয় পরম বৈষ্ণব ননীলাল রায়। এঁরই কথা আপনাকে লিখেছিলুম—"

ঘাড় হেঁট করিয়া তদ্গত চিত্তে মালা-জপ-নিরত সতীশ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া সসৌজন্যে নমস্কার করিয়া বলিল, "মহা সৌভাগ্য, মহা সৌভাগ্য আমার। বৈষ্ণব দর্শনে আজ সপ্তজন্মের পাপ খণ্ডন হোল, কৃতার্থ হলুম—"

বিনোদ মৃদুস্বরে বলিল "তা তো বটেই। কথায় বলে, 'বৈষ্ণব শরীরে কৃষ্ণ করেন বিহার'—"

চঞ্চল অগ্রসর হইয়া বিনয়-নম্র স্বরে বলিল, "জ্যাঠা-মশাই, দাঁড়িয়ে রইলেন যে, বসুন—"

ভূপেনের অপ্রত্যাশিত বক্তৃতা-সংঘাতে ও নবাগত অপরিচিতের আকস্মিক সম্ভাষণে বৃদ্ধ হঠাৎ যেন একটু থত-মত খাইয়া গেলেন; বিস্ময়-বিমূঢ়ের মত নির্ব্বাকভাবে চাহিয়া রহিলেন, কোন উত্তর দিতে পারিলেন না!—মাণিক চেয়ারটা পাশে সরাইয়া দিয়া, ফিক্ ফিক্ করিয়া একটু হাসিয়া বলিল "বসুন দাদামশাই, নইলে পড়ে যাবেন যে—"

আর যায় কোথা! সশব্দে জুতা ঠুকিয়া, অধীর উত্তেজনায় চীৎকার করিয়া বৃদ্ধ বলিল, "পড়ে যাব? কিসের জন্যে পড়ে যাব? ইঁচড়ে পাকা, ডেপো ছোকরা!—তোমার হুকুমে আমি পড়ে যাব!—" সঙ্গে সঙ্গে পুনর্ব্বার মাটীর উপর সশব্দে পদাঘাত! মাণিক ভয়ে ছিট্‌কাইয়া দুয়ারের বাহিরে গিয়া পড়িল!

ভূপেন মুখে কাপড় দিয়া হাসিয়া উঠিল—"হুঁ হুঁ হুঁ, হুঁঃ!"

বৃদ্ধ স্তিমিত নয়নে প্রাণপণ শক্তি নিয়োগ করিয়া, রুক্ষ ভ্রূভঙ্গী সহকারে তাহাকে দেখিবার চেষ্টা করিলেন। তার পর নবাগতের দিকে চাহিয়া ক্রোধস্ফুরিত ওষ্ঠে বলিলেন, "দেখ্‌ছেন—দেখ্‌ছেন, হাসির ভঙ্গী দেখছেন্—" তর্জ্জনি আন্দোলন করিয়া, চড়া গলায় দমক্ দিয়া-দিয়া বলিলেন "ঐ হাসিই সর্ব্বনাশী! ও হাসি তো ভাল নয়,—ঐ হাসির জন্যই উচ্ছন্ন যাবে, উচ্ছন্ন যাবে—"

ভূষণ অগ্রসর হইয়া বলিল "দাদামশাই—শুনুন, ঐ অনুকূলবাবু—"

রুষ্ট স্বরে বৃদ্ধ বলিলেন. "কে তুমি?"

ভূষণ বলিল, "আজ্ঞে, আমি, ভূষণ—"

তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধ অতি উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ভূষণ! সেই চশমাওলা ফচ্‌কে ছোকরা। আরে যাও, যাও,—তোমার কথা আমি শুনতে চাই না—" বৃদ্ধ চেয়ার লইয়া কাল্পনিক ঘোষজা মহাশয়ের দিকে ফিরিয়া বসিয়া, রোষভরে মালা ঝাঁকুনী দিতে-দিতে বলিলেন "বুঝ্‌লেন মশাই, এই সব ফচ্‌কে ছোকরাদের হাসি-তামাসা দেখ্‌লে আমার সব্ব-অঙ্গ জ্বলে যায়! ঐ হাসির জন্যেই ওরা উচ্ছন্ন যাবে,—উচ্ছন্ন যাবে—হেঁ!"

বিনোদ সুকৌশলে জিহ্বা উল্টাইয়া, বৃদ্ধজনোচিত তোৎলামি-স্খলিত বচনে বলিল, "আহা, রায় মশায়, হাস্‌বে বৈ কি ওরা,—এই তো হাসির বয়েস ওদের—এখন ওরা হাস্‌বে না তো কি, আপনি হাসবেন, না আমি হাসব? আমাদের সে দিন কেটে গেছে রায় মশাই, আমরা আর সে দিন পাব না। এখন শুধু ওদের হাসি দেখে সুখী হয়ে আনন্দ করাই আমাদের উচিত, কি বলুন ঘোষজা?"

ঘোষজা ওরফে সতীশ মালা জপিতে-জপিতে ঘাড় নাড়িয়া স্মিত হাস্যে বলিলেন, "আজ্ঞে, তার আর সন্দেহ কি? ছেলেদের হাসি, আহা, এমন মিষ্টি জিনিস আর কি আছে?—হরি হে, দীন বন্ধু—গোবিন্দ, গোবিন্দ—"

চঞ্চল বেশ গাম্ভীর্য্যের সহিত বিনোদের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি ঠিক বলেছেন বাঁড়ুজ্যে মশাই,—ঠিক কথা। আপনি বাইবেল পড়েন নি, কি আর বলব,—নইলে দেখ্‌তেন্ যিশু খৃষ্টও ঠিক ওই কথা বলেছেন, তার বাংলা অনুবাদ হচ্ছে—

'দাও ঐ শিশুদের নিকটে আসিতে মম
স্বর্গ রাজ্য তাহাদের, যারা শিশুদের সম—"

বিনোদ ভক্তি-বিগলিত কণ্ঠে, উচ্ছ্বাস ভরে বলিয়া উঠিল, "আহা, আহা—গোবিন্দ হে! সাধে নারায়ণ যেচে এসে ধ্রুব-প্রহ্লাদকে কোল দিয়েছিলেন! আহা, শিশু যে!"

ছেলেদের হাসির পক্ষ-সমর্থন ও যিশু খৃষ্টের বচন উদ্ধারটা বৃদ্ধের আদৌ মনঃপূত হয় নাই; কিন্তু এই ধ্রুব-প্রহ্লাদের নামটা তাঁহার কাণে বেশ লাগিল। ক্ষিপ্র হস্তে মালা ঘুরাইতে-ঘুরাইতে, একটু আগ্রহের সহিত বলিলেন, "তুমি কে হে বাপু?"

বিনোদকে চোখ টিপিয়া, ভূপেন গম্ভীর ভাবে বলিল, "উনি অনুকূল বাবুর কুলপুরোহিত বাঁড়ুজ্যে মশাই, মহা

পণ্ডিত লোক, মহা বৈষ্ণব। আর অনুকূল বাবু তো সাক্ষাৎ ভক্ত-অবতার, ওঁর সঙ্গে আলাপ কর্‌লেই বুঝ্‌তে পারবেন।"

চঞ্চল বলিল, "যাক্—এর পর কুটুম্বিতে হলে কি সে আলাপ-পরিচয়ের বাকী থাক্‌বে? এখন—"

বাধা দিয়া গদ্‌গদ্ কণ্ঠে সতীশ বলিয়া উঠিল, "আহা, তাই বল বাবা, তাই বল,—তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক, এইখানেই যেন কুটুম্বিতে করতে পারি! এমন বংশ, এমন সৎপাত্র,—আহা লক্ষণ দেখ্‌লেই বৈষ্ণব চেনা যায়, —রায় মশায়, সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ অবতার! এ অমূল্য রত্ন কি আমার রাধারাণীর অদৃষ্ট আছে বাবা—" সতীশ বিহ্বল-বিভোর হইয়া ফোঁস-ফোঁস করিতে-করিতে চাদরের খুঁটে চোখ মুছিতে লাগিল।

ভূষণ গম্ভীর ভাবে বলিল, "আজ্ঞে, তার জন্যে কিছু দ্বিধা কর্‌বেন না। সেই জন্যেই তো আপনাকে আনান হোল। আপনি নিজের চোখে জামাই দেখে নেন। আমরা পাষণ্ড, পাপমুখে কি আর বল্‌ব—কিন্তু এমন বৈষ্ণব ভূভারতে খুঁজলেও পাবেন না।"

সতীশ হাউ হাউ করিয়া দস্তুর মত এক চোট কাঁদিয়া লইয়া বলিল, "আহা, সে কি আর বল্‌তে, না সে সব শুন্‌তে আমার বাকী আছে? আমি এত আরাধনা করে এসেছি কি সাধে! এখন দয়া করে উনি যদি পদপ্রান্তে ঠাঁই দেন, —যদি কন্যাদানে অনুমতি করেন, তবে আজই আমার সাতপুরুষ সশরীরে বৈকুণ্ঠে চলে যাবে!" সতীশ আবার মুখে কাপড় চাপিয়া উচ্ছ্বাস ভরে ফোঁপাইয়া-ফোঁপাইয়া কান্না জুড়িয়া দিল।

বৃদ্ধ বিচলিত হইয়া উঠিলেন। মালা ঝাঁকাইয়া, অনেক কষ্টে, নিতান্ত অস্বাভাবিক রকমের একটুখানি সলজ্জ-বিনয়-সূচক কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া—কণ্ঠস্বর একটু নরম করিয়া বলিলেন, "তা—তা, আপনারা কখন এলেন? এইখানেই কি প্রথম পদার্পণ হোল? কৃপানাথের সঙ্গে দেখা হয়েছে?"

ভূপেন বলিল, "আজ্ঞে না, তিনি যে ডিপুটী বাবুর ছেলেকে পড়াতে বেরিয়েছেন, এখনো তাঁর আস্‌তে ঢের দেরী, উনি তো এই মাত্রই আস্‌ছেন্। এই আপনার কথাটি জিজ্ঞাসা করছেন, আর আপনি এলেন—"

মাণিক ইতিমধ্যে গুটি-গুটি চরণে ঘরে ঢুকিয়াছিল, এবার প্রাণপণে সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল, "নাম করতেই আপনি এসে পড়েছেন দাদামশাই, আপনি অনেক দিন বাঁচ্‌বেন—"

এই কথাটি শুনিলে, বৃদ্ধ চিরদিনই বড় খুসী হন। আজ অত্যধিক খুসী হইয়া বলিলেন, "বাঁচবো, বটে হ্যা—অনেক দিনই বাঁচ্‌বো—কি বল, এঁ্যা? তা বাঁচবো বৈ কি! হরি-নামের জোর হে,—হরিনামের জোর! এই বয়েসে আমার মত কটা লোক পথ হাঁটতে পারে বল দেখি? আর দাঁত, —এই দেখো একটাও পড়ে নি, আমার বড় ব্যাটা ভরতের দাঁত—সে তো একটাও, একটাও অবশিষ্ট নাই; কিন্তু আমার দাঁত সবই রয়েছে!—হুঁঃ! হরিনামের জোরে হে!"

সতীশ টুকটুক্ করিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "তার আর সন্দেহ কি বাবা! সাধে এসে শ্রীচরণে আশ্রয় নিয়েছি! এখন দয়া করে এ অভাগার দায় উদ্ধার করুন, রাধা-রাণীকে পায়ের তলায় ঠাঁই দিয়ে কৃতার্থ করুন।"

সাগ্রহে বৃদ্ধ বলিলেন, "কি? কি নাম বল্লেন? রাধারাণী? আহা, খাসা নাম। যে নামে জীব উদ্ধার হয়, আহা!"

চঞ্চল মাণিকের কাণে কাণে-কি বলিল। মাণিক একটু পিছু হটিয়া ভয়ে ভয়ে বলিল, "আচ্ছা দাদামশাই, বিয়ের পর রাধারাণী ঠাকুমাকে আমরা যদি রাধি-ঠাকুরমা' বলে ডাকি, তা হলে আমরাও উদ্ধার হবো তো?"

মহা উত্তেজিত হইয়া, সশব্দে জুতা ঠুকিয়া, সজোরে তর্জ্জনি আন্দোলন করিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "আরে যাও, যাও, ফাজিল ছোকরা সব! সকল কথায় ডেঁপোমী! উচ্ছন্ন যাবে সব! ঐ ফাজ্‌লিমিই তো উচ্ছন্ন যাওয়ার হেৎ!" (অর্থাৎ হেতু)।

চঞ্চল তাড়া দিয়া বলিল, "তাই বটে। এই মাণ্‌কে, কেন বদ্‌মাইসি করিস্? ভারী বদ্ ছেলে, থাম—এ কি ঠাট্টার কথা?"

মালা ঝাঁকুনী দিতে-দিতে, হুঙ্কার করিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "উচ্ছন্ন যাবে,—উচ্ছন্ন যাবে!"

দুই পক্ষে তাড়া খাইয়া, মাণিকের মেজাজ বিগড়াইয়া গেল। হঠাৎ সে বলিয়া ফেলিল—"আমি না দাদামশাই, কাকা আমায় শিখিয়ে দিলে—"

ভূপেন, ভূষণ এক সঙ্গে চল্লা করিয়া উঠিয়া সে কথাটা নিশ্চিহ্ন রূপে চাপা দিয়া ফেলিল! বিনোদ ভক্তি-বিহ্বল কণ্ঠে বলিল, "আহা, তাই বল বাবা, তাই বল। তোমাদের ঠাকুমা হওয়ার সৌভাগ্যই যেন আমাদের রাধারাণীর হয়!—মেয়ে নামেও রাধারাণী, কাজেও রাধারাণী! মেয়ের বয়স তের-চোদ্দ বছরের বেশী হবে না; কিন্তু ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবে কি নিষ্ঠা, কি ভক্তি! অনুকূল বাবাজীর ঠাকুরবাড়ীতে দিনান্তে কুড়ি-পঁচিশটি বৈষ্ণব-মূর্ত্তির সেবা হয়,—তা সেই রাধারাণী নিজে তাদের পা ধুইয়ে দেবে, তিন প্রহর পর্য্যন্ত উপবাস করে থেকে তাদের সেবা-শয়নের বন্দোবস্ত করে দেবে, পদসেবা করবে—কি ভক্তি মেয়ের! দেখলে চক্ষু জুড়ায়......" ইত্যাদি ইত্যাদি। বিনোদ ঝাড়া আধঘণ্টা ব্যাপী, একটানা ছন্দে প্রকাণ্ড বক্তৃতা করিয়া গেল! গৃহস্থ সবাই স্তব্ধ।

বৃদ্ধ এক মনে (?) মালা জপিতে-জপিতে পরম মনোযোগের সহিত বক্তৃতাটা শুনিয়া লইলেন, কিছু বলিলেন না। কিন্তু ললাটের স্ফীত শিরায় বেশ একটু চিন্তার লক্ষণ দেখা দিল। ভূষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখভাব পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলিল, "দেখুন অনুকূল বাবু, আপনাকে সোজাসুজি কথা বলে দিই,—আপনি তো মেয়ের বাপ, আপনিই বুঝে বলুন। দাদামশায়ের কি আমাদের এরই মধ্যে বিয়ে করবার বয়স গেছে, না উনি সত্যিই তেমন অথর্ব্ব বুড়ো হয়ে পড়েছেন? এই তো মোটে ওঁর ছিয়াত্তর বছর বয়েস, এই বয়েসে কত কুলীন ব্রাহ্মণ—কত বড়-বড় বনেদী কায়স্থ—চতুর্থ পক্ষ থেকে চতুর্দ্দশ পক্ষ পর্য্যন্ত পার করে দিচ্ছে,—তাদের তুলনায় উনি তো ছেলে মানুষ! এই দেখুন, এখনো ওঁর একটীও দাঁত পড়ে নি। কেমন সুন্দর পথ হাঁটেন, আর কি রকম জোর আওয়াজে কথা কইতে পারেন, সে তো আপনারা দেখ্‌ছেন! আমরা অত জোরে কথা কইতে গেলে বোধ হয় লাংস্ ফেটে মরে যাই—আর উনি—"

ভূপেন খপ করিয়া বলিল, "শুধু চোখটাই যা একদম গেছে!"

বৃদ্ধ মনে করিলেন, কথাটা বুঝি ভূষণই বলিল!—তৎক্ষণাৎ সক্রোধে জুতা ঠুকিয়া বজ্র নিনাদে হুঙ্কার করিয়া বলিলেন, "ওরে শা—' আমার চোখ গেছে! তোমার হুকুমে গেছে, না? তোমাদের মত চশমা-পরা বাবু না হলে চোখ থাকে না, নয়?" প্রসারিত হস্তে তর্জ্জনি আন্দোলন করিয়া বলিলেন, "আরে যাও, যাও, তোমাদের মত ফচ্‌কে ছোকরাদের সঙ্গে আমি কোন কথা কইতে চাই না—আসুন মশাই, আসুন আপনারা আমার বাড়ীতে, সেইখানে সব কথা হবে—"

বৃদ্ধ সত্য-সত্যই উঠিলেন। বিনোদও তৎক্ষণাৎ উঠিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, "আরে করেন কি, করেন কি রায় মশায়, ছেলেদের কথা কি ধর্ত্তব্য! কে ওদের কথায় কাণ দিচ্ছে! বলুক না ওরা কি বল্‌বে!"

উপর্য্যুপরি ঘাড় নাড়িয়া রোষ-ভরে বৃদ্ধ বলিলেন, "না,—না, মশাই, এখানে বসে ওসব কথা হবে না—ও-সব 'তোঁয়েরি' ছেলে! 'তোঁয়েরি' ছেলে! ওদের সামনে আবার কথা কইতে আছে?—নাঃ, আমি ওদের সামনে কোন কথা কইব না, আমি চল্লুম!"

চঞ্চল সবিনয়ে বলিল, "বসুন জ্যাঠামশাই, বসুন,—একটু তামাক খেয়ে যান—"

বিনোদ সনির্ব্বন্ধ অনুরোধের স্বরে বলিল, "আমি ব্রাহ্মণ,—অনুকূল ঘোষের কুল-পুরোহিত, বিপিন বাঁড়ুজ্যে আমি,—বাবা, আমার কথা রাখুন,—ওদের ওপর রাগ করবেন না বাবা, বসুন তামাক খান—" বিনোদ জোর করিয়া বসাইল। ভূষণ বাহিরে গিয়া চাকরকে ডাকিয়া তামাক দিতে বলিল।

বৃদ্ধ অপ্রসন্ন মুখে, ক্ষিপ্রহস্তে মালা জপিতে লাগিলেন। চঞ্চল অতীব কোমল কণ্ঠে বলিল, "বাস্তবিক জ্যাঠামশায়, ঠিকই বলেছেন, এসব কথা এখন এখানে বসে হবে না। বিকেল বেলা জ্যাঠামশায়ের বাড়ীতে গিয়ে ও-সব কথা ঠিক করাই উচিত। সে বেশ নিরিবিলি যায়গা—ছেলেপিলের গোলমাল কিছুই নাই। বৈকালে আমি শুদ্ধ সেখানে থাক্‌ব। ঘোষজা আর বাঁড়ুজ্যে মশায়, আপনারা দয়া করে সেইখানেই আজ পায়ের ধুলো দেবেন। আর দেখুন, মেয়েটিকে শুদ্ধ যখন আপনারা সঙ্গে করে এনেছেন—তিনি এখন আপনার বন্ধুর বাড়ীতে রয়েছেন তো (গোপনে মাণিকের দিকে আঙুল দেখাইয়া)? বৈকালে তাঁকে শুদ্ধ নিয়ে আস্‌বেন—জ্যাঠামশায় নিজের চোখেই তাঁকে দেখে নেবেন। সেইটেই ভাল হবে, না বাঁড়ুজ্যে মশাই?"

বাঁড়ুজ্যে মশাই উচ্ছ্বাস ভরে বলিলেন, "খুব ভাল, খুব ভাল, খুব ভাল! সে আর বলতে? রায় মশায় মেয়ে দেখে যদি মত করেন, তবে চাই কি—কালই সুতহিবুক যোগে শুভ বিবাহটা সুসম্পন্ন করে দিয়ে তবে আমি দেশে ফিরব!"

কপালে মালা ঠেকাইয়া নমস্কার করিতে-করিতে বৃদ্ধ ঈষৎ ব্যগ্রতার সহিত বলিলেন, "কাল কি লগ্ন আছে?"

বিনোদ বলিল "খুব ভাল লগ্ন।"

একটু আমতা-আমতা করিয়া বৃদ্ধ বলিলেন "তা—তা—ঠিকুজি-কুষ্ঠিটা মেলানর কি হবে?

বিনোদ বলিল "তা! তার জন্যে চিন্তা কি? বৈকালে আমি একজন জ্যোতিষীকে যোগাড় করে ঐ সঙ্গে নিয়ে যাব।"

চঞ্চল বলিল "হ্যাঁ, সেই ভাল কথা। দেখুন, আর এক কথা,—এখন আমাদের ধূমধাম কিছু করা হবে না। বিয়েটা এখন আপনাদের আশীর্ব্বাদে নির্বিঘ্নে আগে চুকে যাক, তার পর ধূমধামের কথা! কেন না, বুঝতেই পারছেন,—আজ ত্রিশ বৎসর আমার জ্যাঠাই-মা মারা গেছেন,—জ্যাঠামশাই আর দারপরিগ্রহ করবেন না-ই স্থির করেছিলেন। এত দিনের পর, এ শুধু—"

ভূষণ বলিল "কেবল আপনাদের কন্যাদায় উদ্ধার করবার জন্যেই—"

ভূপেন বলিল, "আর আমার একান্ত অনুরোধেই রাজি হয়েছেন। আপনার কথা সবই ওঁকে বলেছি। নগদ তিন হাজার টাকা, দু'শো বিঘা জমি, বিষ্ণু-বিগ্রহ, আর অমন চমৎকার মেয়ে!"

এবার হঠাৎ সাতিশয় প্রসন্নতা সহকারে বৃদ্ধ বলিলেন "তা সে যাই হোক। বিয়ে আমি করবই ঠিক করলুম। এখন এ কথা আমার কোন আত্মীয়কে বলবেন না, আমার ভাইকেও না—"

চঞ্চল তৎক্ষণাৎ বলিল "না—না, বাবাকে বলবার দরকার কি?—আর বাবা শুনেই বা করবেন কি? আমরা রয়েছি, আমরা এখন যোগাড়-সোগাড় করে—আগে দু'হাত এক করে দিই, তার পর—"

ভূপেন বলিল "তার পর বৌভাতের দিন তাঁকে নিমন্ত্রণ করে পেট ভরে খাইয়ে দিলেই হবে। তবে কাল যদি বিয়েটা হয়, তা'হলে 'আভ্যুদয়িক ছরাদ্দ'টা স্বগোত্রে একজনকে করতে হবে তো, তা চঞ্চল মামা, তুমিই করো। আজ তাহলে তোমায় বোধ হয় নিরমিষ খেতে হবে,—না বাঁড়ুয্যে মশাই?"

বাঁড়ুজ্যে মশাই বলিলেন "হাঁ, সম্পূর্ণ নিরামিষ!"

তার পর সেইখানে বসিয়াই—আগামী কল্য যদি সত্যই বিবাহ হয়, তবে কি-কি আয়োজন-উদ্যোগ করা হইবে, সে সম্বন্ধে একটা সংক্ষিপ্ত হিসাব প্রস্তুত হইয়া গেল। ভূপেন বলিল "মাণিক হবে নিত্‌বর, কি বলুন দাদা-মশাই?—"

চিন্তিত ভাবে বৃদ্ধ বলিলেন "তা যেন হোল হে। কিন্তু কালকেই যদি বিয়েটা সত্যি হয়, তাহ'লে সময় আর কৈ? এর মধ্যে কি সব গোছান হবে?"

বুক ফুলাইয়া ভূপেন বলিল, "কিছু ভাববেন না দাদা মশাই, আমরা সব সামলে নেব। আমি আছি, ভূষণ আছে,—আরো দুই-একটি বিশ্বাসী বন্ধুকে সঙ্গে নেব, ব্যস্! তার পর? আমরা কি ভদ্রলোক অনুকূল বাবুকে 'অভ্রম' হতে দেব, না আপনাকে কোন অসুবিধায় পড়তে দেব..." ইত্যাদি।

ইতিমধ্যে কাল কুচকুচে চেহারার হিন্দুস্থানী ভৃত্যটি শালপাতার ঠোঙা ও কলিকা হাতে লইয়া ঘরে ঢুকিয়া বৃদ্ধের কাছে আসিয়া বলিল "কল্কি নেন্ জিঠা মুশা'—আমি রামভজন চাকর—"

বৃদ্ধ চোখে ভাল দেখিতে পান না, সেইজন্য রামভজন যখনই তামাক দিতে আসিত—তখনই আগে নিজের পরিচয়টি দান করিত। কিন্তু আজ হিতে-বিপরীত ঘটিল; তর্জ্জন করিয়া বৃদ্ধ বলিলেন "রামভজন কি রে ব্যাটা? রামভজন কি? গোবিন্দ-ভজন বল্!"

ভূপেনের চোখে ইসারার টেলিগ্রাফ পাইয়া রামভজন মহা আপত্তির সহিত প্রতিবাদ করিল,—"কেনে জিঠা মুশা, গোবিন্দ-ভজন বল্‌ব কেনে? বাপ মায়ে হামার নাম রাখিয়েসে রামভজন,—হামি রামভজনই থাক্‌বে? গোবিন্দভজন হোবে কাঁহে,—"

সশব্দে জুতা ঠুকিয়া বজ্র-হুঙ্কারে বৃদ্ধ বলিলেন "তবে রে ব্যাটা! গোবিন্দ-ভজন হবি না, নিকালো আবি আমার সামনে থেকে!"

রামভজন কলিকা দিতে-দিতে মিহিসুরে বলিল—"ঐ! জিঠা মুশা, ই-তো আপনার বড়া জুলুমবাজি! হামার বাপে-মায়ে যো নাম রাখিয়েসে, সো নাম কি—"

পুনশ্চ জুতা ঠুকিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "আলবৎ বদল্ করনে হোগা! রামভজন! ও তো ম্লেচ্ছ নাম।—আমাদের ইষ্ট দেবতার নাম গোবিন্দ,—বল ব্যাটা গোবিন্দভজন!"

মহা বিস্ময়ে রামভজন বলিল, "তা জিঠা-মুশা, হামি আপনার তামাকুল সাজনেবালা নোকর, হামি আপনার ইষ্টু দেওতা হব কেনে, হামার পাঁপ লাগ্‌বে যে!"

উৎকট গর্জ্জনে বৃদ্ধ বলিলেন, "তবে রে ব্যাটা!" সঙ্গে-সঙ্গে অশ্রাব্য কটূক্তি!—চঞ্চলের ইঙ্গিতে রামভজন মুহূর্ত্তে পলায়ন করিল।

অনেক সাধ্য-সাধনায় ঠাণ্ডা হইয়া, ছুই টান তামাক টানিয়া,—তার পর বৈকালে কন্যাকর্ত্তা, জ্যোতিষী ও কুল-পুরোহিতকে লইয়া তাঁহার বাড়ীতে গিয়া পাকা বন্দোবস্ত ঠিক করিবার জন্য বলিয়া বৃদ্ধ উঠিলেন। যাইবার সময় মেয়েটিকে শুদ্ধ লইয়া যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ বলিয়া গেলেন।

(আগামীবারে সমাপ্য)

বিবিধ প্রসঙ্গ

রসসাগর

স্বর্গগত কবি কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী

[শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর বি-এ]

(৬১)

শান্তিপুর-নিবাসী কোন ভদ্রলোক একদিন রস সাগরকে কহিলেন, "মহাশয়! গভর্ণর জেনারল হেষ্টিংস কি সূত্রে কান্তবাবুর বাটীতে গিয়া আশ্রয় লইয়া আহার করিয়াছিলেন, তাহা আপনাকে বর্ণনা করিতে হইবে।" তথন রস-সাগর কহিলেন, "আপনি আমা'কে এ সম্বন্ধে একটী সমস্যা দিন। তাহা হইলেই আমি এই বিষয় বর্ণনা করিতে পারিব।" ইহা শুনিয়া উক্ত ভদ্রলোক এই সমস্যাটী পূর্ণ করিতে দিলেন,—"হেষ্টিংস ডিনার খান্ কান্তের ভবনে!" রস-সাগর ইহা এইরূপে পূর্ণ করিয়াছিলেন:—

সমস্যা—"হেষ্টিংস ডিনার্ খান্ কান্তের ভবনে!"

হেষ্টিংস সিরাজ-ভয়ে হইয়াই ভীত
কাশীম-বাজারে গিয়া হন উপনীত।
কোন্ স্থানে গিয়া আজ লইব আশ্রয়,
হেষ্টিংসের মনে এই নিদারুণ ভয়।
কান্ত-মুদি ছিল তাঁর পূর্ব্বে পরিচিত,
তাহারি দোকানে গিয়া হন উপস্থিত।
নবাবের ভয়ে কান্ত নিজের ভবনে
সাহেবেরে রেখে দেয় পরম গোপনে।
সিরাজের লোক তাঁর করিল সন্ধান,
দেখিতে না পেয়ে শেষে করিল প্রস্থান।
মুস্কিলে পড়িয়া কান্ত করে হায় হায়,
হেষ্টিংসে কি খেতে দিয়া মান রাখা যায়।
ঘরে ছিল পান্তা-ভাত, আর চিংড়ী-মাছ,
কাঁচা লঙ্কা, বড়ি পোড়া,—কাছে কলাগাছ।
কাটিয়া আনিল শীঘ্র কান্ত কলা-পাত,
বিরাজ করিল তাহে পচা পান্তা ভাত।
পেটের জ্বালায় হ'য় হেষ্টিংস তখন
চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় করেন ভোজন।
এ রস-সাগর বলে কি হ'ল কি হ'ল,
হেষ্টিংস তিলির বাড়ী জাত হারাইল।
সূর্য্যোদয় হ'ল আজ পশ্চিম গগনে,
'হেষ্টিংস ডিনার খান্ কান্তের ভবনে!'

(৬২)

একদিন যুবরাজ শ্রীশচন্দ্র কতিপয় বন্ধু-সমভিব্যাহারে সভায় বসিয়া আছেন, এমন সময় রস-সাগর গিয়া সে স্থানে উপস্থিত হইলেন। তখন শ্রীশচন্দ্র কহিলেন, "রস-সাগর মহাশয়! দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ

সিংহ বাহাদুরের মাতৃশ্রাদ্ধে কিরূপ মহা-সমারোহ হইয়াছিল, তাহা এখনই আপনাকে বর্ণনা করিতে হইবে।" ইহা বলিয়াই তিনি এই সমস্যাটী পূর্ণ করিতে দিলেন,—"হদ্দ মাতৃশ্রাদ্ধ কল্লে গোবিন্দ দেওয়ান!" বাঙ্গালা-দেশের ঐতিহাসিক ঘটনা রস-সাগর মহাশয়ের কণ্ঠস্থ ছিল। এই সমস্যাটী শুনিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে গঙ্গাগোবিন্দের মাতৃশ্রাদ্ধ বর্ণনা করিলেন :—

সমস্যা—"হদ্দ মাতৃশ্রাদ্ধ কল্লে গোবিন্দ দেওয়ান!"

মুরশিদাবাদ জেলা খ্যাত বাঙ্গালায়,
কাঁদী-নগরের নাম প্রসিদ্ধ তথায়।
শ্রীগঙ্গা-গোবিন্দ সিংহ তথায় থাকিয়া
করিলেন মাতৃশ্রাদ্ধে সমারোহে ক্রিয়া।
এই শ্রাদ্ধে হ'য়েছিল কিবা সমারোহ,
করে নাই, করিছে না, করিবে না কেহ।
স্বয়ং হেষ্টিংস, বন্ধু বারোয়েল তাঁর
শ্রাদ্ধের সভায় দোঁহে করেন বিহার।
জেমোর রাজারে সিংহ ভূস্বামী ভাবিয়া
নিজ শাল পেতে দেন সম্মান করিয়া।
এই মানে সম্মানিত জেমো-রাজ-গণ
অদ্যাপি শ্রাদ্ধের কথা করেন কীর্ত্তন।
নদীয়ার নাটোরের আসন প্রথমে,
বর্দ্ধমান দিনাজপুর রন্ ক্রমে ক্রমে।
ক্রমে বসিলেন অগ্রদ্বীপ যশোহর,
এইরূপে বসিলেন সবে পর পর।
কৃষ্ণচন্দ্র দয়ারাম পীড়িত থাকায়
কিছুতে না পারিলেন যাইতে তথায়।
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞা লইয়া তখন
শিবচন্দ্র কাঁদী-ধামে করেন গমন।
কিবা রাজা মহারাজ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত
সভায় যাইয়া তাহা করেন মণ্ডিত।
লক্ষ লক্ষ ভিক্ষু গিয়া পুরাইল মাঠ,
চতুর্দ্দিক্ হ'তে এল লক্ষ লক্ষ ভাট।
কত শত বাসা-বাড়ী নির্ম্মিত হইল,
নানাবিধ সিধা তথা পৌঁছিতে লাগিল।
চাউল, ডাউল, মস্লা যায় গাড়ি গাড়ি,
হুলস্থূল প'ড়ে গেল সকলেরি বাড়ী।
দধি দুগ্ধ ঘৃত তৈল রাখিবার তরে
বড় বড় খাত কেটে রাখে থরে থরে।
মিষ্টান্নের কত নাম কে করে সন্ধান,
প্রত্যেক বাসার কাছে পর্ব্বত-প্রমাণ।
হেন কোন ফল নাহি ছিল বাঙ্গালায়,
যাহা নাহি পৌঁছছিল বাসায় বাসায়।
বিবিধ আনাজ-দ্রব্য রন্ধনের তরে
বিরাজ করিল গিয়া প্রত্যেকের ঘরে।
তাকিয়া তোষক লেপ বালিস বিছানা,
খাট পালঙ্গের সংখ্যা নাহি যায় গণা।
সন্ধ্যা আহ্নিকের বন্দোবস্ত হ'ল খাসা,
কোষা কুসী ফুলে পূর্ণ হ'ল সব বাসা।
কোমর বাঁধিয়া শিবচন্দ্র যুবরাজ
দেয়ানের সভাস্থলে করেন বিরাজ।
চতুর্দ্দিক্ যুবরাজ করি' নিরীক্ষণ
দেওয়ান বাহাদুরে কহেন তখন,—
"দেখি আজ বাহাদুর! গৃহে আপনার
হইয়াছে ঠিক দক্ষ-যজ্ঞের ব্যাপার।"
ইহা শুনি' বাহাদুর তখন হাসিয়া
শিবচন্দ্রে কহিলেন বিনয় করিয়া,—
"আমার মাতার শ্রাদ্ধ দক্ষ যজ্ঞ হ'তে
অনেকাংশে বড় আমি বলি বিধিমতে।
দক্ষের যজ্ঞেতে শিব না পেলেন স্থান,
মোর মাতৃশ্রাদ্ধে শিব নিজে বিদ্যমান।"
শুনিয়া সভাস্থ লোক বলিয়া উঠিল,
"ধন্য তব মাতৃ শ্রাদ্ধ সভা আজ হ'ল।
রাখিলে মানীর মান, দেখালে বিনয়,
আপনারে ছোট দেখে বড় যেই হয়!"
দেওয়ান সিংহের কিবা ভাণ্ডার মজুত্,
জানিবারে শিবচন্দ্র হ'লেন প্রস্তুত।
শিবচন্দ্রে যত সিধা পাঠান্ দেওয়ান,
তাহা তিনি ভিক্ষুকেরে করেন প্রদান।
পুনঃপুনঃ যত সিধা আসিতে লাগিল,
সমস্তই শিবচন্দ্র প্রদান করিল।
তখন বুঝেন শিবচন্দ্র মহাশয়,
সিংহের ভাণ্ডার কভু ফুরাবার নয়।
সোণা রূপা শাল খাটে হইয়া মণ্ডিত
ব্রাহ্মণীর করে দেন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত।
নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য, বস্ত্র আর ধন
পাইয়া ভিক্ষুক-গণ করে আগমন।
এ শ্রাদ্ধের কথা কেবা না করে সম্মান,
'হদ্দ মাতৃশ্রাদ্ধ কল্লে গোবিন্দ দেওয়ান!'

(৬৩)

একবার মহারাজ গিরীশচন্দ্র প্রশ্ন করিলেন, "ভাঙ্‌লো এইবার।" রস-সাগর মহারাজের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ এই ভাবে প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন :—

সমস্যা—"ভাঙ্‌লো এইবার।"

একদা মুরশিদাবাদে নবাব সিরাজ
নিজ গৃহে সভা করি' করেন বিরাজ।
রাজা মহারাজ যত ছিলেন যেখানে,
একে একে আসিলেন নবাব-ভবনে।
লইয়া গোপাল ভাঁড়ে কৃষ্ণচন্দ্র রায়
উপস্থিত হইলেন নবাব-সভায়।
নৃপগণ সভাভঙ্গ হইবার পর
আপন আপন গৃহে ফিরিতে তৎপর।
তৎকালে বেগমেরা উপর হইতে
নিম্ন-দিকে লোকগণে লাগিলা দেখিতে।
তখন গোপাল ভাঁড় অবাক্ হইয়া
বেগমদিগের দিকে রহে তাকাইয়া।
এই কথা শুনিয়াই নবাব তৎক্ষণে
ক্রোধভরে কহিলেন আরক্ত-লোচনে,—
"এখনি গোপাল ভাঁড়ে আনহ ধরিয়া
বিধিমতে শাস্তি তারে দিব বিচারিয়া।"
যখন গোপাল ভাঁড় সভায় আসিল,
সভাস্থ সকল লোক হাসিতে লাগিল।
একজন কহিলেন,—"রক্ষা নাই আর,
গোপাল ভাঁড়ের ভাঁড় 'ভাঙ্‌লো এইবার।'"

প্রস্তাব। কোনও কারণ-বশতঃ নবাব সিরাজউদ্দৌলা স্বীয় রাজধানী মুরশিদাবাদে একবার সভা করিয়া বঙ্গালা-প্রদেশের যাবতীয় রাজা ও মহারাজদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকেও তদনুসারে যাইতে হইয়াছিল। গোপাল ভাঁড়ও নবাব-বাড়ী দেখিবার জন্য মহারাজের সঙ্গে মুরশিদাবাদে গিয়াছিল। সভাভঙ্গের পরে যখন রাজা ও মহারাজ-গণ বাটীতে ফিরিয়া আসিতেছিলেন, তখন নবাবের বেগমেরা কৌতুহল-বশতঃ উপরে দাঁড়াইয়া নিম্ন দিকে তাঁহাদিগকে দেখিতেছিলেন। গোপাল রগড় ছাড়িবার লোক নহে। সে রাজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিল; কিন্তু মধ্যে মধ্যে গুপ্তভাবে বেগমদিগের প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে এই বিষয় নবাবের কর্ণ-গোচর হইলে তিনি ক্রোধভরে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকটে লোক পাঠাইলেন। তখন মহারাজ ভীতচিত্ত হইয়া গোপালকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এ কি তোমারই কাণ্ড?" গোপাল নির্ভয়-চিত্তে কহিল "ধর্ম্মাবতার! এত বড় মহৎ কর্ম্ম আর কে করিতে পারে? ঠাকুর, আপনি এজন্য চিন্তিত হইবেন না।" এই বলিয়া গোপাল নবাবের প্রেরিত লোকের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। নবদ্বীপের রাজার লোক নবাবের বেগমদিগের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছে এবং প্রাণদণ্ড করিবার নিমিত্ত নবাবের লোক তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে, এই জনরব নগরের চতুর্দ্দিকে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। অনন্তর গোপাল নবাবের নিকটে নীত হইলে সভাস্থ লোকদিগের মধ্যে যাঁহারা গোপালকে চিনিতেন, তাঁহারা বলিতে লাগিলেন "এইবার ভাঁড় ভাঙ্গিল!" নবাব ক্রোধভরে ও আরক্ত নয়নে গোপালের দিকে চাহিবামাত্র গোপালও প্রথমতঃ নবাবের দিকে তীব্র কটাক্ষপাত করিল, এবং তৎপরে সভাস্থ সকল লোকেরই প্রতি সেইরূপ করিতে লাগিল। নবাব তাহার তীব্র কটাক্ষপাত স্বাভাবিক বুঝিয়া নিতান্ত লজ্জিত হইলেন এবং ঈষৎ হাস্য করিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন।

(৬৪)

একদিন শ্রীশচন্দ্র রস-সাগর মহাশয়কে এই সমস্যাটী পূর্ণ করিতে দিলেন, "ব্রাহ্মণের পদধূলি একমাত্র সার!" এবং আদেশ করিলেন যে "ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন করিয়াই আপনাকে এই সমস্যাটী পূর্ণ করিতে হইবে।" রস-সাগর শ্রীশচন্দ্রের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ইহা এইভাবে পূর্ণ করিয়া দিলেন:—

সমস্যা—"ব্রাহ্মণের পদধূলি একমাত্র সার!"

নন্দ কুমারের পূর্ব্ব পুরুষ-কুল,
সামাজিক মর্য্যাদায় ছিলেন দুর্ব্বল।
মর্য্যাদা-বৃদ্ধির হেতু তন্ময় হইয়া,
করিলেন ক্রিয়া এক আনন্দে মাতিয়া।
হেন ক্রিয়া করিলেন গৃহে তিনি আজ,
যাহা করে নাই কভু কোন মহারাজ।
এক লক্ষ ব্রাহ্মণের হ'ল নিমন্ত্রণ,
ধূমধাম হ'ল যত,—কে করে গণন!
বেছে বেছে আনিলেন ভাদুর-ভবনে,
কৃষ্ণচন্দ্র দয়ারাম, এই দুই জনে।
একে একে এক লক্ষ ব্রাহ্মণ বসিয়া
আহার করিলা সুখে সন্তুষ্ট হইয়া।
লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি-কণা ল'য়ে,
যতনে রাখেন রাজা ভাদুর-আলয়ে।
তুমিই বুঝিয়াছিলে শ্রীনন্দ কুমার!
'ব্রাহ্মণের পদধূলি একমাত্র সার!'

(৬৫)

ফতেচাঁদ জগৎশেঠ অতি মহাশয় লোক ছিলেন। জমীদার, রাজা, মহারাজ ও ইংরাজ বাহাদুরকেও টাকা কর্জ্জ দিয়া তাঁহাদিগকে আসন্ন বিপদ্ হইতে রক্ষা করিতেন। এজন্য তাঁহার নিকটে সকলেই মস্তক নত করিয়া থাকিতেন। তিনি দিল্লীর বাদশাহ-কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইতেন এবং জমীদার, রাজা ও মহারাজ-গণের দেয় কর স্বয়ং দিল্লীর দরবারে পাঠাইয়া দিতেন বলিয়া বাঙ্গালার নবাব-গণ তাঁহার যথেষ্ট সম্মান করিতেন। কিন্তু সর্ফরাজ খাঁ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন। একদিন মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র এই সকল বিষয় লইয়া

রস-সাগরের সহিত আলাপ করিতে করিতে মনের কষ্টে বলিয়া ফেলিলেন, "ফতেচাঁদ জগৎশেঠ ফাঁপরে পড়িল!" রস-সাগর এই সমস্যাটী এই ভাবে পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"ফতেচাঁদ জগৎশেঠ ফাঁপরে পড়িল!"

সর্ফরাজ খাঁ নবাব বাঙ্গালার পতি,
সুন্দরী নারীর প্রতি ছিল তাঁর প্রীতি।
নসরৎ খাঁ সাহেব মোসাহেব তাঁর,
সুন্দরী সংগ্রহ করা ভার ছিল তাঁর।
রূপসী রমণী যদি জাঁহাপনা চান,
এখনি জগৎশেঠে ডাকিয়া আনান্।
জগৎশেঠের এক নাত্‌বৌ আছিলা,
রূপসী যাহার মত কভু নাহি ছিলা।
সবে মাত্র বয়ঃসন্ধি হইয়াছে তার,
না বালিকা, না যুবতী, মাঝামাঝি সার।
নাত্‌বৌএ উপহার দিবার কারণ
ডাকিলা জগৎ শেঠে নবাব তখন।
ইহা শুনি' ফতেচাঁদ প্রমাদ গণিল,
আকাশ তাঁহার শিরে ভাঙ্গিয়া পড়িল।
একদিন সৈন্যগণ পাঠাইয়া তারে
নবাব আনিলা ধরি' আপনার ঘরে।
কেবল তাহার রূপ দর্শন করিয়া
সন্ধ্যাকালে গৃহে তারে দিলা পাঠাইয়া।
শেঠ-রাণী কেঁদে বলে কি হ'ল হ'ল,
'ফতেচাঁদ জগৎ-শেঠ ফাঁপরে পড়িল!'

(৬৬)

একদিন যুবরাজ শ্রীশচন্দ্র রস-সাগরকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি কারণে পদ্মিনী সন্ধ্যাকালে মুদ্রিত হইয়া যায়?" এই প্রশ্ন করিয়াই তিনি এই সমস্যাটী পূর্ণ করিতে দিলেন :—"পদ্মিনী নয়ন মুদে সন্ধ্যাকাল হ'লে।" ইহা শুনিবামাত্র রস-সাগরের রস উথলিয়া উঠিল। তিনি তখন এইভাবে ইহা পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"পদ্মিনী নয়ন মুদে সন্ধ্যাকাল হলে।"

চলিয়া গেলেন সূর্য্যদেব অস্তাচল,
জ্বলিতে লাগিল যত জোনাকির দল।
চক্রবাক চক্রবাকী মরমে মরিল,
পেচকসকল রব করিতে লাগিল।
হাসিতে লাগিল সুখে যত কুমুদিনী,
ভাসিল চক্ষের জলে যত বিরহিণী।
বালিকা বধূর মনে আতঙ্ক জন্মিল,
সূর্য্যের অভাবে হায়, এ সব ঘটিল!
পোড়া বিধাতার লীলা বুঝে উঠা ভার,
কিছুতে না সহ্য হয় এসব ব্যাপার।
হেন অপরূপ কাণ্ড হেরিয়া ভূতলে
'পদ্মিনী নয়ন মুদে সন্ধ্যাকাল হ'লে।'

(৬৭)

একদিন মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র রস সাগরকে প্রশ্ন করিলেন, "কোন্ অঙ্গ দিয়া নারী পুরুষকে মুগ্ধ করিয়া করিয়া রাখে?" রস-সাগর উত্তর দিলেন, "সর্ব্বাঙ্গ"। তখন মহারাজ কহিলেন, "পরম প্রবল বিষ নয়নের কোণে!" রস-সাগর মহারাজের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া হাসিতে হাসিতে ইহা পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"পরম প্রবল বিষ নয়নের কোণে!"

দেবগণ করে যবে সমুদ্র মন্থন,
তা হ'তে কতই বস্তু উঠিল তখন,—
বিধাতা সে সবগুলি গ্রহণ করিয়া
যতনে নারীর মুখে দিলেন রাখিয়া।
গণ্ডস্থলে রাখিলেন শুভ্র শশধরে,
অমৃতে রাখিয়া দেন রম্য ওষ্ঠাধরে।
রম্য পারিজাত পুষ্প নিশ্বাস-পবনে,
'পরম প্রবল বিষ নয়নের কোণে!'

(৬৮)

একদা মহারাজ গিরীশ চন্দ্র রস-সাগরকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "পায় পায় পায় না।" রস-সাগর হাসিতে হাসিতে তাহা এইভাবে পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"পায় পায় পায় না।"

চিনিতে নারিনু আমি, আসিল জগৎ-স্বামী,
মাগিল ত্রিপাদ-ভূমি, আর কিছু চায় না।
খর্ব্ব দেখি উপহাস, শেষে দেখি সর্ব্বনাশ,
স্বর্গ মর্ত্ত্য দিব আশ, তাই মন ধায় না॥
দিয়া সকল সম্পদ্, এ দেখি ঘোর বিপদ্,
বাকী আছে এক পদ, ঋণ শোধ যায় না।
কি আর জিজ্ঞাস প্রিয়ে, বিন্ধ্যাবলি! দেখসিয়ে,
অখিল ব্রহ্মাণ্ড দিয়ে 'পায় পায় পায় না॥'

(৬৯)

একদিন রাজসভায় প্রশ্ন উঠিল, "প্রাণপাখী ফাঁকি দিয়া যাবে পলাইয়া!" রস-সাগর ইহা এইভাবে পূরণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"প্রাণপাখী ফাঁকী দিয়া যাবে পলাইয়া!"

এ দেহ পিঞ্জর,—তায় আছে নব দ্বার,
প্রাণপাখী তার মধ্যে করিছে বিহার।

এদিক্ ওদিক্ করি' ঘুরিছে সদাই,
পাছে পাখী যায় চ'লে—এই ভয় পাই।
জানি না পিঞ্জর হ'তে কোন্ দ্বার দিয়া
'প্রাণপাখী ফাঁকী দিয়া যাবে পলাইয়া!'

(১০)

একদিন যুবরাজ শ্রীশচন্দ্র কতিপয় বন্ধু লইয়া স্বীয় সভায় বসিয়া আছেন, এমন সময়ে রস-সাগর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সকলেই তৎকালে বসন্ত-কালের নিরতিশয় প্রশংসা করিতেছিলেন। তখন শ্রীশচন্দ্র কহিলেন, "রস-সাগর মহাশয়! বসন্ত-কালের নিন্দা করিয়া আপনাকে একটী কবিতা রচনা করিতে হইবে।" ইহা বলিয়া তিনি এই সমস্যাটী পূর্ণ করিতে দিলেন, "বসন্ত-কালের পদে লক্ষ নমস্কার!" রস-সাগর তখনই ইহা এইভাবে পূরণ করিলেন :—

সমস্যা—"বসন্ত-কালের পদে লক্ষ নমস্কার!"

(বসন্ত-কালের প্রতি কুল-গাছের উক্তি)
দুরন্ত বসন্ত! তব অন্ত পাওয়া ভার,
কেবা দিল 'মধু-মাস' নামটী তোমার!
বিরহী পুরুষ, কিবা বিরহিণী নারী
তোমার জ্বালায় জ্বলে চিরদিন ধরি'।
থাকুক্ পরের কথা, কহি নিজ কথা,
শুনিলে তোমার নাম পাই বড় ব্যথা!
তুমি আসিলেই হায় যত তরুগণ
সুন্দর পল্লব পত্র ধরে অগণন!
আমি ক্ষুদ্র কুল-গাছ! কি বলিব হায়,
ডাল পালা কাটে লোক, মাথাটী মুড়ায়!
এ রস-সাগর তাই কহিতেছে সার,—
'বসন্ত-কালের পদে লক্ষ নমস্কার!'

(১১)

মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের সময়ে রাজবাটীতে সুচতুর ও বুদ্ধিমান্ কর্ম্মচারী না থাকায় রাজ-সংসারে নিরতিশয় বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল। মহারাজের স্বজন বর্গ তৎকালে হরধাম, আনন্দধাম, শিব-নিবাস প্রভৃতি স্থানে গিয়া বসতি করিতেছিলেন। তৎকালে হরধামে রাজা গঙ্গেশচন্দ্র অবস্থিতি করিতেন। তিনি সম্পর্কে মহারাজের খুড়া ছিলেন এবং বাজপেয় যজ্ঞ না করিয়াও "বাজপেয়ী" উপাধি গ্রহণ-পূর্ব্বক নিজ নামের সহিত "বাজপেয়ী" শব্দটী যোগ করিয়া লিখিতেন। এজন্য মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র তাঁহাকে "বাজপেয়ী খুড়া" বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার সাংসারিক অবস্থা ভাল না থাকায় তিনি রাজবাটীতে কর্ম্ম করিতে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি রাজবাটীর কর্ম্ম-কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যে, তিনি রাজ-বাটীতে কর্ম্ম করিয়া ক্রমে ক্রমে রাজ-বাটীর মহামূল্য দ্রব্য সামগ্রীগুলি আত্মসাৎ করিয়া প্রস্থান করেন! তিনি প্রকৃত-পক্ষে তাহাই করিয়াছিলেন। একদিন মহারাজ গিরীশচন্দ্র রস-সাগরকে কহিলেন, "বাজপেয়ী খুড়া" তখন রস-সাগর উক্ত গুণধর খুড়া মহাশয়কেই লক্ষ্য করিয়া এই সমস্যাটী পূর্ণ করিয়াছিলেন।

সমস্যা—"বাজপেয়ী খুড়া।"

নবদ্বীপের অধিপতি নৃপতির চূড়া,
কত ইন্দ্র চন্দ্র এই দরজায় খেয়ে গেছেন হুড়া।
সকল নিলে লুটে পুটে রাখ্‌লে না এক গুঁড়া,
না বিইয়ে কানাইএর মা 'বাজপেয়ী খুড়া।'

(১২)

একদিন মহারাজ গিরীশচন্দ্র, স্বীয় বৈবাহিক ও রস-সাগরকে লইয়া নানাপ্রকার পরিহাস ও কৌতুক করিতেছিলেন। কথায় কথায় বৈবাহিক মহাশয় কহিলেন, "রস-সাগর মহাশয়! আপনাকে একটী সমস্যা দিব; ইহা আপনাকে এখনই পূরণ করিতে হইবে।" ইহা বলিয়াই তিনি এই সমস্যাটী পূর্ণ করিতে দিলেন, "বারাণসী পরিহরি' ব্যাসকাশী বাস!" রস-সাগর বৈবাহিক মহাশয়ের প্রকৃত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া নিম্ন-লিখিত কবিতায় সমস্যাটী পূর্ণ করিয়া দিলেন :—

সমস্যা—"বারাণসী পরিহরি ব্যাসকাশী বাস!"

বৃন্দাবন পরিহরি' হরি! মথুরায়
কুব্জারে বসালে বামে,—লজ্জা নাহি তায়!
কুবুজার শ্রীচরণে সঁপিয়াছ মন,
কি গুণে করিল গুণ, হে রাধা-রমণ!
কুবুজার বাঁকা অঙ্গ, তুমি বাঁকা শ্যাম,
বাঁকায় বাঁকায় মিলে, ওহে গুণধাম!
কিশোরীর কি শরীর ভাবিয়া দেখ না,
তার সঙ্গে কুবুজার হয় কি তুলনা!
দাঁড়কাক পুষিয়াছ ছাড়ি শুক-সারী,
হৃদয়-পিঞ্জরে তারে রাখিয়াছ ধরি'!
যাহারে দেখিলে হয় নারীতে অরুচি,
তোমার প্রেমের গুণে সেও হ'ল শুচি!
কুবুজা নয়ন-তারা হইল তোমার,
অঘটন ঘটাইলে,—সুন্দর বিচার!
হেন অপরূপ প্রেম শিখিলে কোথায়,
মেথরাণী রাণী হ'ল আজ মথুরায়!
প্যারীকে ত্যজিয়া শেষে কুব্জার প্রয়াস,
'বারাণসী পরিহরি' ব্যাসকাশী-বাস!'

(৭৩)

একদা কোন কার্য্যোপলক্ষে মহারাজ গিরীশ-চন্দ্রের বাটীতে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মহাশয়দিগকে বিদায় দেওয়া হইতেছিল। নবদ্বীপ হইতে সমাগত একটী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সভায় বসিয়া নানাপ্রকার বাগ্-বিতণ্ডা করিতেছিলেন। তিনি সুপণ্ডিত হইলেও চিত্ত-চাঞ্চল্য ও বৃথা বাক্য-ব্যয়-দোষে সামান্য ছাত্রদিগের নিকটেও বিচারে পরাজিত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে অধ্যক্ষ মহাশয়ের প্রদত্ত বিদায়ে সন্তুষ্ট না হইয়া মহারাজের সমীপে গিয়া নানা প্রকারে স্বীয় বিদ্যা-বুদ্ধির উৎকর্ষ দেখাইয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। তখন মহারাজ তাঁহার দাম্ভিকতা সহ্য করিতে না পারিয়া রস-সাগরের দিকে ইঙ্গিত করিয়া এই সমস্যাটী পূর্ণ করিতে দিলেন, "বেহায়ার চুপ ক'রে থাকাই মঙ্গল!" রস-সাগর মহারাজের প্রকৃত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তীব্রভাবে এই সমস্যাটী পূর্ণ করিয়া দিলেন।

সমস্যা—"বেহায়ার চুপ্ ক'রে থাকাই মঙ্গল!"

(সমুদ্রের প্রতি উক্তি)

ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ তোমায় সাগর!
কত কাণ্ড হ'ল তব বুকের উপর।
লক্ষ লক্ষ দেবাসুর একত্র হইয়া,
লণ্ড ভণ্ড ক'রে দিল তোমায় মথিয়া।
যে সব বানর ঘুরে ফিরে ডালে ডালে,
তারাও লঙ্ঘন করি' গেল পালে পালে।
নুড়ি নাড়া জড় করি' বানর বানরী,
সেতু বেঁধে রেখে দিল বুকের উপরি।
অগাধ অপার তুমি, শুনি নিরন্তর,
অগস্ত্য গণ্ডূষে পূরে পেটের ভিতর।
তৃষ্ণার্ত্ত পথিক জল খাইলে তোমার,
লোণা জলে মুখখানি পুড়ে যায় তার।
সহ্য করিয়াও তুমি এত অপমান,
এখনও প্রাণ ধরে আছ বিদ্যমান।
ভীষণ গর্জ্জন তব, ভীষণ তরঙ্গ,
এই সব লইয়াই কর কত রঙ্গ।
মুখের সাপট্ তব পরম প্রবল,
'বেহায়ার চুপ্ ক'রে থাকাই মঙ্গল!'

(৭৪)

একদিন কৃষ্ণনগরাধিপতি মহারাজ গিরীশ-চন্দ্র রস-সাগরকে এই সমস্যাটী পূর্ণ করিতে দিয়াছিলেন:—"ভক্তি-তরি দাও হরি! পার হ'য়ে যাই।" রস-সাগর তৎক্ষণাৎ তাহা এইভাবে পূর্ণ করিয়া দিলেন:—

সমস্যা—"ভক্তি-তরি দাও হরি! পার হ'য়ে যাই!"

অতি ভয়ঙ্কর এই সংসার-সাগর,—
বিষয়-বাসনা জল তথা নিরন্তর;
বহিতেছে সর্ব্বক্ষণ মদন-পবন,
সর্ব্বদা উঠিছে মোহ-তরঙ্গ ভীষণ;
গৃহিণী-আবর্ত্ত পাক দিতেছে কেবল,
ভাসিছে দুরন্ত পুত্র কুম্ভীর সকল;
মধ্যে মধ্যে দেয় কন্যা-হাঙ্গর দর্শন,
ভীষণ জামাতৃ-সর্প করিছে গর্জ্জন;
জ্ঞাতি-বাড়বাগ্নি কিবা দিতেছে উত্তাপ,
ধক্ ধক্ জ্বলিতেছে বাপ্ রে বাপ্!
সমস্ত ভয়ের বস্তু র'য়েছে তথায়,
রস-সাগরের রস বুঝি বা শুকায়;
এ হেন সাগরে মগ্ন আছি হে সদাই,
'ভক্তি তরি দাও হরি! পার হ'য়ে যাই!'

বাঙ্গালীর খাদ্য—(২)

[ডাক্তার—শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল্-এম্-এস্]

প্রথম প্রবন্ধে, কতকটা ধারাবাহিকরূপে, খাদ্যসম্বন্ধে স্থূল আলোচনা করিয়াছি। এ প্রবন্ধে, অসংলগ্নভাবে, নিত্যপ্রয়োজনীয় কতকগুলি বিষয়ের আলোচনা করা হইবে। আজকাল খাদ্য সম্বন্ধে বিচার বড় একটা দেখা যায় না;— তাহার প্রধান কারণ, বোধ হয়, অনভিজ্ঞতা। এই অনভিজ্ঞতা ও ঔদাসীন্য যে শুধু সাধারণের মধ্যে দেখা যায়, তাহা নহে; এমন কি বহুদর্শী চিকিৎসকেরাও খাদ্য সম্বন্ধে সাহেব গুরুদিগের মুখাপেক্ষী। পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষা সর্ব্বাংশে প্রতীচ্য দেশে প্রযোজ্য নহে।

সাহেবী খাদ্য

কয়েকঘর সম্ভ্রান্ত-বংশীয় বাঙ্গালী খৃষ্টানকে নিত্য পুরাদস্তুর সাহেবী খানা খাইতে দেখিয়াছি। তাঁহারা সাদাসিধা মাছের ঝোল-ভাত কচিৎ খান। তাঁহারা শীত গ্রীষ্ম সকল ঋতুতেই তিন সন্ধ্যায় মাংস, ডিম, পাঁউরুটি, মাখন ইত্যাদি ভোজন করিয়া থাকেন। চক্ষে না দেখিলে, এরূপ সাহেবী-বিড়ম্বনা, বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না—কারণ, দেশ, কাল, পাত্র-নির্ব্বিশেষে, শুধু অনুচিকীর্ষার প্রেরণায়, মানুষ যে এতটা মোহান্ধ হইতে পারে, তাহা কল্পনাতীত। মাংসাশী ও মাংসলোলুপদিগের পক্ষে মাংস রুচিকর খাদ্য হইলেও, শ্রমবিমুখ, গ্রীষ্ম-দেশবাসী, চিরকাল স্বল্প-পরিধেয়োপযোগী-দেশবাসী হইয়াও নিত্য-পরিধেয়াধিক্যে ভূষিত বাঙ্গালীর পক্ষে সে খাদ্য বিষবৎ হইয়া দাঁড়ায়। মোটামুটি বলিতে গেলে, যে ব্যক্তি রীতিমত ও বেশ পরিশ্রম করে, শুধু

তাহারই মাংস ভক্ষণে অধিকার আছে। এইজন্যই বৃথামাংস ভক্ষণ এদেশে নিষিদ্ধ; এবং এইজন্যই বন্য-কুক্কুট, বন্য-বরাহ, বন্য মৃগ প্রভৃতিকে শিকার করিয়া ভোজন করিতে এদেশের শাস্ত্রকারেরা বাধা দেন নাই। সেকালে রাজাদিগের মধ্যে মৃগয়া করা একটা অবশ্য-প্রতিপাল্য কর্ত্তব্য ছিল—তাঁহাদিগেরও অঙ্গচালনা করা আবশ্যক ছিল। কিন্তু আজ আমরা ট্রামগাড়ীর কল্যাণে পঙ্গু, ও পাশ্চাত্যশিক্ষার গুণে দৈহিক শ্রমের মর্য্যাদায় অনভিজ্ঞ—অথচ আজ আমরা পলান্ন, মাংস ও ডিম্ব অযথা পরিমাণে গলাধঃকরণে বিশেষ পটু! সাহেবরা যে এত গরমদেশে অত মাংস খান, তাহার কারণ, প্রথমতঃ, বহুজন্মার্জ্জিত রুচি তাঁহাদিগকে ঐ পথে ধাবিত করায় এবং দ্বিতীয়তঃ, যে সাহেব যেমনই অবস্থাপন্ন হউক না কেন, সকালে ও বৈকালে, ঘোড়ায় চড়া, ক্লাবে খেলা করা বা অন্ততঃ রীতিমত অনেকদূর পর্য্যন্ত দ্রুতপদে বেড়ান, তাঁহাদের পক্ষে প্রাত্যহিক অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম। সাহেবদিগের গাড়ী থাকিলেও তাঁহারা বহুক্ষণ রীতিমত শারীরিক ব্যায়াম করাকে ধর্ম্মকর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত করেন। রীতিমত শারীরিক ব্যায়াম করিলে রীতিমত মাংস ভক্ষণে প্রত্যবায় নাই।

সাহেবেরা মাংস ভক্ষণ করিলেও কখনো বেশী মসলা সংযোগে উহা আহার করেন না বলিয়া, তাঁহাদিগের পক্ষে মাংস গুরুপাক হয় না। কিন্তু মাংস খাইলেই, মোগলাই প্রথায় অতিরিক্তি ঘৃত ও মসলা সংযোগে বাঙ্গালী মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকেন। ঐরূপ করার ফলে মাংস গুরুপাক হয়।

যে সকল বাঙ্গালী সাহেবীয়ানার অনুকরণ করেন, তাঁহারা সাহেব-দিগের দেখাদেখি সারাদিনই জামাজোড়া পরিধান করিয়া থাকেন। এই অনুকরণটিও যেমন হাস্যকর তেমনি অনিষ্টকর। সাহেবরা যে দেশে বাস করেন, সে দেশে শীত প্রবল; কাজেই, তাঁহাদিগকে সারাদিন আবৃত থাকিতে হয়। ঐরূপ থাকার ফলে, সাহেব-দিগের চর্ম্ম একপ্রকার অকর্ম্মণ্য হইয়াই থাকে। তাঁহাদিগের বৃক্ক (Kidneys) নামক যন্ত্রই একসঙ্গে ঘর্ম্ম ও মূত্র এতদুভয়ের কার্য্যভার নির্ব্বাহ করে; এই জন্যই, তাঁহাদিগের দেশে সামান্য ঠাণ্ডা লাগিয়াই বৃক্ক প্রদাহ (Bright's disease) হইয়া প্রাণনাশ করে এবং সেইজন্য সাহেবদিগের মধ্যে হাম, বসন্ত ও অপরাপর চর্ম্মরোগ সহজেই মারাত্মক হয়। কিন্তু, যে দেশের পূর্ব্ব পুরুষেরা বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া সহজে দেহ আবৃত করেন নাই, যে দেশে চর্ম্ম দ্বারাই শরীরের অধিকাংশ ক্লেদ দূরীভূত হয়, যে দেশে প্রত্যহ তৈলাভ্যঙ্গ করিয়া চর্ম্মকে মসৃণ, দেহকে বলিষ্ঠ ও স্নায়ুমণ্ডলীকে সুস্থ রাখাই বিধি ছিল, সেদেশে অকস্মাৎ জামাজোড়ার বাহুল্য করিয়া, সাহেবীয়ানার অনুকরণে তৈল ত্যাগ করিয়া, চর্ম্মের উগ্রতাসাধক সাবান নিত্য ব্যবহার করিলে যে বাত, বৃক্কপ্রদাহ, অকাল-বার্দ্ধক্য, চর্ম্মরোগবাহুল্য ঘটিবে, তাহাতে বিস্মিত হইবার কি আছে? ফল কথা, দেশ, কাল, পাত্র বুঝিয়া চলিলে কোনই অপকারের সম্ভাবনা নাই। বাহিরের চালচলনে, বেশ-ভূষায় সাহেবীয়ানা করিয়া লাভ থাকে, করিতে পার; কিন্তু যুগযুগান্তর-ব্যাপী অভ্যাসের ফল, বহুপুরুষানুক্রমিক মজ্জাগত সংস্কারকে অকস্মাৎ পরিবর্ত্তন করা এবং সেইসঙ্গে দেশের প্রাকৃতিক অবস্থানিচয়কে অগ্রাহ্য করা কোন প্রকারে সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না।

তাই আমরা দেখিতে পাই যে, যে সকল বাঙ্গালী পুরাদস্তুর সাহেবী খানায় অভ্যস্ত, তাঁহারা অকালে বৃদ্ধ, এবং নানা রোগের আকর হইয়া থাকেন। সাহেবী খানা খাইয়া সাহেবদিগের মত অসুরোচিত পরিশ্রম করেন, এমন বাঙ্গালী ত দেখি না।

ডিস্‌পেপ্‌সিয়া ও বহুমূত্র

ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গালা দেশেতেই এই দুইটি ব্যারাম খুব বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। সহরে, শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত হিন্দুদিগেরই মধ্যে ইহাদের প্রাদুর্ভাব বেশী। এ যাবৎ উক্ত দ্বিবিধ ব্যারামের যথার্থ কারণ নির্ণীত হয় নাই। তবে বোধ হয় এটুকু নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে, অন্নাহারী, এবং শ্রমকাতর অথচ অমিতাহারী ব্যক্তিদিগের মধ্যেই এই দুইটি ব্যারাম দেখিতে পাওয়া যায়। ডিস্‌-পেপ্‌সিয়া ও বহুমূত্র—এতদুভয় ব্যারামের নিদানভূত কারণ এক নহে; তবে, উভয়েই যে ক্ষয়রোগের উত্তরসাধক এবং সময়বিশেষে মূর্ত্তান্তর, তাহা চিকিৎসকমাত্রেই অবগত আছেন। জানি না, সূতিকা ব্যারামের সহিত ইহাদের কোনও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে কি না। চিকিৎসকদিগের বাদানুবাদ ছাড়িয়া দিয়া, আমরা যদি শুধু স্থূল ঘটনাগুলির উপরে দৃষ্টি রাখি, তাহা হইলে আমরা এই কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করি:—(১) বহুমূত্র, ডিস্‌পেপ্‌সিয়া ও সূতিকা—এ তিনটিই, একরকম বাঙ্গালাদেশের নিজস্ব। কিন্তু দুই পুরুষ পূর্ব্বে এই তিনটির অস্তিত্ব থাকিলেও এত ব্যাপ্তি ছিল না। (২) শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, অসংযতাহারী ও শ্রমবিমুখ বাঙ্গালীরাই সহজে এই ব্যারামের কবলিত হন। টোলের পণ্ডিতগণের মধ্যে ইহার তাদৃশ ব্যাপ্তি না থাকিলেও, ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের মধ্যে, এবং মুন্সেফ ও সবজজদিগের মধ্যে ইহার প্রসার বেশী। (৩) পল্লীগ্রামবাসী, বিরাট অন্নস্তূপ ধ্বংসকারী কিন্তু শ্রমনিষ্ঠ দরিদ্রদিগের মধ্যে ইহা নাই, কিন্তু স্বল্পাহারী, অত্যাচারী, বিলাসী সহরের বাবুরাই ইহার প্রধান লক্ষ্যস্থল। এই ঘটনাগুলি হইতে কি তথ্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, তাহা চিকিৎসক শ্রেণীর ভাবিবার বিষয়। আমরা কিন্তু যুগপৎ দুইটি জিনিষের সম্মিলন দেখিতে পাইলাম; সে দুইটি এই—একদিকে শ্রমবিমুখতাজনিত শারীরিক দৌর্ব্বল্য এবং অপরদিকে অন্নের মত অন্তঃসারহীন খাদ্য নিত্য ভোজন ও তৎসঙ্গে মধ্যে মধ্যে গুরুপাক ভোজন;—বাঙ্গালীর জীবনে ইহা নিত্যই দেখা যায়। অঙ্গচালনার অভাবে, দেহের পেশীসমূহই যে দুর্ব্বল হয় তাহা নহে; তৎসঙ্গে রক্তাল্পতা, পরিপাক শক্তির হ্রাস, শারীরিক ক্লেদ নির্গমের ব্যাঘাতও অল্পবিস্তর পরিমাণে দেখা দেয়। কাজেই, এবং হয় ত কতকটা অর্থাভাবেও বটে, "পুরাতন চালের গলা ভাত, ডাইলের জল (ঝোল) ও একটু জীবিত মৎস্যের ঝোল" ব্যতীত নিত্য অপর কিছু আহার করিলে সহ্য হয় না। কিন্তু নিত্য এই অন্তঃসারহীন

খাদ্য খাইলেও মধ্যে মধ্যে মাংস, পলান্ন প্রভৃতি ভোজনের অত্যাচার যথেষ্টই আছে। কাজেই, বাঙ্গালীর দেহের আকৃতি, প্রকৃতি ও অন্তঃসারবর্ত্তিতা ক্রমশঃই ন্যূনতা প্রাপ্ত হইতেছে; কাজেই, বাঙ্গালীর বিদ্যালয়ের পুরুষ-ছাত্রগণ পাশ্চাত্যদেশীয় ছাত্রীদের অনুপাতে গড়িয়া উঠিতেছে—এ দেশের পুরুষেরা বিদেশী রমণীর হারে গড়িয়া উঠিতেছে। প্রধানতঃ শারীরিক ব্যায়ামকে অগ্রাহ্য করিয়া এইসকল অনিষ্টের সূত্রপাত হইয়াছে। বহুমূত্র ও ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার কারণ ও চিকিৎসা নির্দ্দেশ করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তবে নিঃসঙ্কোচে এ কথা বলিতে পারি যে, আহারের ত্রুটির জন্যই ডিস্‌পেপ্‌সিয়া হয় এবং আহারের সুবন্দোবস্তের সঙ্গে-সঙ্গে ব্যায়ামের সংযোগ থাকিলেই ডিস্‌পেপসিয়া সারিয়া যায়। বহুমূত্রও আহারের দোষঘটিত ব্যারাম; আহারে সংযম ও অপরাপর ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে বহুমূত্র সারিয়া যায়। যাঁহারা এদেশীয় বিধবাদিগের ও যাজক ব্রাহ্মণগণের উপবাস করা দেখিয়া শিহরিয়া উঠেন, তাঁহারা একবার প্রণিধান করিয়া দেখিবেন, উপবাস করা ভাল কি মন্দ। শিক্ষিত বাঙ্গালী-সমাজে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের একচ্ছত্র-আহার-প্রথা প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে বেচারী একাদশীও বাঁধা পড়িয়াছে! কিন্তু দেশবাসীর প্রতি আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই যে, বাঙ্গালী মাত্রেরই সর্ব্বদা বহুমূত্র ও ডিস্‌পেপ্‌সিয়া এই দুই রাক্ষসীর বিষয়ে অবহিত হইয়া, রীতিমত শরীর চালনায়, ও পুষ্টিকর অথচ মিতাহার এবং আবশ্যক মত উপবাসাদি দ্বারা সুস্থদেহ রক্ষা করা উচিত।

তিথিভেদে নিষিদ্ধ খাদ্য।

পঞ্জিকায় দেখিতে পাওয়া যায় যে,—পূর্ণিমায় তৈল, মৎস্য, মাংস ও কুষ্মাণ্ড; প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড; দ্বিতীয়ায় বৃহতী; তৃতীয়ায় পটোল; চতুর্থীতে মূলক; পঞ্চমীতে বিল্ব; ষষ্ঠীতে নিম্ব; সপ্তমীতে তাল; অষ্টমীতে নারিকেল, তৈল, মাংস, মৎস্য; নবমীতে অলাবু; দশমীতে কলম্বী শাক; একাদশীতে শিম; দ্বাদশীতে পুতিকা; ত্রয়োদশীতে বার্ত্তাকু; চতুর্দ্দশীতে মাষকলাই, তৈল, মৎস্য, মাংস; এবং অমাবস্যায় তৈল, মৎস্য, মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

আমরা যখন বালক ছিলাম এবং ইংরেজী ভাবে আচ্ছন্ন ছিলাম, তখন পঞ্জিকায় ঐ সকল কথা লেখা দেখিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিতাম। কিন্তু চিকিৎসা-ব্যবসায় অবলম্বন করা অবধি; আর ঐ সকল কথাকে অগ্রাহ্য করিতে পারি নাই। কেন যে অগ্রাহ্য করিতে পারি নাই, তাহা বুঝাইতেছি। ইংরেজেরা পুরা বণিক প্রকৃতি জাতি। উহারা সকল জিনিসকেই ওজন ও মাপ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করে। এবং সকল জিনিসেরই লাভ-ক্ষতিটা বুঝিতে পারিলেই সন্তুষ্ট হয়। তাই ইংরেজের চক্ষে যে কোনও খাদ্যদ্রব্য পড়িলে, উহারা তাহার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়াই ক্ষান্ত হয়। যখন ইংরেজ দেখে যে বেদানা ফলে শতকরা ৬৷৷ ভাগ শর্করা মাত্র আছে, তখনই ইংরাজ বুঝিয়া লয় যে উহার দ্বারা ২৯ "ক্যালোরি"* উত্তাপ হইবার বেশী আর কোনও উপকারের আশা নাই। অর্থাৎ বণিক-প্রকৃতির প্রেরণায়, ইংরাজ বেদানাকে সামান্যই উপকারী বলিয়া ধরিয়া লয়—যদিও তৃষ্ণার্ত্ত জ্বররোগী উহার অমৃতময় রসে রসনা সিক্ত করিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করে; এবং সঙ্গে-সঙ্গে তাহার প্রস্রাবের মাত্রাও বৃদ্ধি পাইয়া জ্বরের উত্তাপের হ্রাস ঘটাইয়া থাকে। ফল কথা এই, পাশ্চাত্য চিকিৎসকদিগের চক্ষে খাদ্যাখাদ্যের উপযোগিতার মানদণ্ড—সেই খাদ্যের পরিপোষণ-ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী হিন্দুরা শুধু পরিপোষণের স্থূল দিক দিয়া কখনো খাদ্যদ্রব্যের বিচারে বসেন নাই। "বায়ু পিত্ত-কফ" যাহাই বুঝা'ক, প্রাচীনদিগের বর্ণনার মধ্যে খুঁটিনাটি ভাব যতই আমরা দেখি না কেন, এ কথাটি কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, রসায়নাগারে খাদ্যদ্রব্য বিশেষে যে হারে পরিপোষণ-সক্ষম পদার্থ পাওয়া যা'ক্ না কেন, শতসহস্র সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিপরীত-ধর্ম্ম-জড়িত জীবন্ত মানবদেহে পরিপোষণের হিসাব-নিকাশ অত সহজে পাওয়া যায় না। আর পাওয়া যায় না জানিয়াই, মনীষী আর্য্য ঋষিগণ সূক্ষ্ম তত্ত্ব দর্শনের চক্ষে মীমাংসা করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন তিথিতে ভিন্ন ভিন্ন খাদ্য গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা তুলাদণ্ডে এক-দিকে পরিপোষণ মাপ অপরদিকে মূল্য নির্দ্ধারণ করেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহারা মানবদেহের Metabolismএর গূঢ়তম রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া শারীরিক রসের অবস্থার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই ঐরূপ তিথি অনুযায়ী বিধি-নিষেধ করিয়াছেন। এই কথাগুলি আনুমানিক মাত্র; সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইহা প্রমাণিক হইতে পারে না।

চিকিৎসকদিগের জানা আছে যে, ঋতু ও তিথিভেদে গাছগাছড়ার বীর্য্যের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। এইজন্য, ভৈষজ্য-তত্ত্বের গ্রন্থে নির্দ্দেশ করা আছে, কোন্ কোন্ গাছ রাত্রে সংগ্রহ করিতে হয়, কোন্ কোন্ গাছ বর্ষায় সংগ্রহ করিতে হয়। মানব-শরীরের উপরেও তিথ্যাদির প্রভাব কম নহে। ম্যালেরিয়া জ্বর, বাতশিরা জ্বর (filariasis) প্রভৃতি অষ্টমী হইতে প্রতিপদের মধ্যে ঘটিয়া থাকে। ইংরেজেরা ম্যালেরিয়া ও বাতশিরা জ্বরের জীবাণুকে ধরিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা "কোটালে" জ্বর আসার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। তাই বলিতেছিলাম যে, তিথি হিসাবে খাদ্যবিশেষকে ত্যাগ করিবার কারণ দর্শাইতে না পারিলেও, তাহার সারবত্তা অস্বীকার করিবার ক্ষমতা আমার নাই। আশা করি মদ্‌গুরুদ্বয় আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু ও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহোদয়গণ একত্র হইয়া এ বিষয়ের যথাযথ মীমাংসা করিতে সক্ষম হইবেন।

প্রসাদ ভক্ষণ—পাতে খাওয়া।

পূর্ব্বে যেরূপ ভক্তিভরে প্রসাদ গ্রহণের প্রথা প্রচলিত ছিল, আজ-কাল আর তাহা দেখা যায় না। লোকের ভক্তির হ্রাস হইয়াছে বলিয়াই

* প্রায় একসের জলকে এক ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড্ উত্তাপে তুলিতে যে উত্তাপের প্রয়োজন হয় তাহাকে এক ক্যালোরি কহে।

হয় ত প্রসাদ ভোজনের মাত্রা কমিয়াছে। ভক্তির দিক দিয়া বলিতে চাহি না, লৌকিক হিসাবে একপ্রকার ভালই হইয়াছে বলিতে হইবে। বাঙ্গালীর জীবনে তিন রকমের প্রসাদ-গ্রহণ করার প্রথা দেখা যায়। প্রথমতঃ তীর্থস্থানে দেবতার প্রসাদ; দ্বিতীয়তঃ, নিম্নজাতি কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণের প্রসাদ; এবং তৃতীয়তঃ গৃহস্থ হিন্দুর নিত্যজীবনে দেবর-ভাসুরের প্রসাদ গ্রহণ প্রথা। ইহাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা প্রয়োজন বোধে নিম্নে বিবৃত করিলাম।

তীর্থস্থানের প্রসাদ।—তীর্থস্থান মাত্রেই অতি স্বাস্থ্যকর স্থান। স্বাস্থ্যকর হইলেও, তীর্থের পাণ্ডারা স্বাস্থ্যনীতি সম্বন্ধে যতদূর অজ্ঞ, অর্থগৃধ্নুতায় তাদৃশ পটু। এমন অবস্থায়, যত বাসি, পচা, ও অপকৃষ্ট খাদ্যই তীর্থস্থানে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; তাহার উপরে, নিবেদিত সমস্ত নৈবেদ্য ও ভোগ একত্র স্তূপীকৃত হইয়া যে উৎকট বিষাক্ত পদার্থে পরিণত হয়, পাণ্ডারাও তাহা জানেন না, ভক্তও তাহা বুঝেন না; কাযেই সেই সকল আবর্জ্জনা, বাজারে দেবতার প্রসাদ বলিয়া উচ্চমূল্যে বিক্রীত হয় এবং ভক্তগণের মধ্যে বিতরিত হয়। বর্ত্তমান কালে, তীর্থস্থানের প্রসাদই কলেরা রোগের বিস্তৃতির প্রধান সহায়। লোকের ভক্তি নিত্যই বৃদ্ধিলাভ করুক; কিন্তু আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই যে, ভক্তগণ যে-কোনও তীর্থস্থানেই যান না কেন, তীর্থের প্রসাদ মস্তক-স্পৃষ্ট করিয়া পশুপক্ষীদিগের ভোগের জন্য যেন ব্যবহার করেন—তাহাতে আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রসাদ উভয়ই লাভ হইবে।

ব্রাহ্মণের প্রসাদ। গুরু, পুরোহিত কর্ত্তৃক ভুক্তান্নের অবশিষ্টাংশ ভক্ষণ করা এদেশে এককালে খুবই প্রচলিত ছিল। এখন তাহার একচতুর্থাংশও দেখিতে পাওয়া যায় না। আমার বিবেচনায় তাহাতে দুঃখের কোনও কারণ নাই। প্রথমতঃ, "শরীরমাদ্যং খলুধর্ম্মসাধনম্" এই মহামন্ত্রের ঋষি আর্য্যগণ যে সত্য সত্যই ভুক্তাবশিষ্ট ভোজনের মত জঘন্য প্রথার সাহায্যে ভক্তির মার্গ সুগম করিবার কল্পনাও করিয়াছিলেন, এ কথা আমি বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। হিন্দুমাত্রেই নিত্য ভোজনের পূর্ব্বে, সমস্ত ভোজ্যই ভগবানকে নিবেদন করিয়া, জনার্দ্দনের নামোচ্চারণ করিয়া খাইতে বসেন; ভোজ্যদ্রব্য উপভোগ সুখের জন্য হিন্দু ভোজনে বসেন না; হিন্দু নিত্যই দেবতার প্রসাদগ্রহণরূপ পুণ্যকার্য্য করা হিসাবে ভোজন করিয়া থাকেন—তাই স্বপাক ভোজন, সংযত ও বাকসংযত হইয়া ভোজন করা প্রভৃতি স্বাস্থ্যানুমোদিত ও ধর্ম্মানুমোদিত প্রথাগুলি হিন্দুর মধ্যে প্রচলিত। যে হিন্দু নিত্য দেবতার প্রসাদ গ্রহণ করেন তাঁহার পক্ষে মানুষের প্রসাদ গ্রহণ করিবার প্রয়োজন কোথায়? আর যদিই মানুষের প্রসাদ গ্রহণে পুণ্য থাকে, সে পুণ্য কখনো একতরফা হইতে পারে না; অর্থাৎ যিনি প্রসাদ ভোজন করিবেন শুধু তাঁহারই পুণ্য হইবে, অথচ যিনি প্রসন্ন হইয়া আহার করিতে অনুমতি দিলেন, তাঁহার কোনও পুণ্য হইল না, তাহা হইতে পারে না। যে হিন্দুর প্রত্যেক আচারে এবং প্রত্যেক ব্যবহারে স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু লাভেচ্ছা ওতঃপ্রোত ভাবে মিশ্রিত আছে, যে হিন্দু প্রত্যহ "আয়ুর্দেহি" বলিয়া প্রার্থনা করেন, যে হিন্দু স্বপাক ভোজনবিধি এবং জাতিবিচারের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, সে হিন্দু কখনো প্রসাদ ভক্ষণ বলিতে ভুক্তান্ন-শেষ গ্রহণ করিবার কল্পনাও করেন নাই। এ জঘন্য প্রথা লোকাচার-মূলক। শাস্ত্রে প্রসাদ-গ্রহণের মর্ম্ম এই যে, যে ব্যক্তি ভোজন করিবে, সে ব্যক্তি গুরুজনকে তাহা নিবেদন করিয়া দিবে; সেই গুরুজন তাহার দিকে প্রসন্নচিত্তে দৃষ্টিপাত করিয়া ভোজনের অনুমতি দিবেন—এই ত প্রসাদ গ্রহণের মর্ম্ম। সকল সময়েই এই ভাবে প্রসাদ-গ্রহণের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়—বর্ত্তমানকালে, ত বটেই! কারণ, বর্ত্তমান কালে, ব্রাহ্মণই বল আর মহাব্রাহ্মণই বল, যক্ষ্মা ও অপরাপর কুৎসিত রোগ বহু লোকেরই আছে। অন্ততঃ কলিকাতা সহরে, ভদ্র-বংশে, শতকরা অনূন ২০।৩০ জনের স্বকৃত বা পৈতৃক কুৎসিত ব্যারাম আছে। সেরূপ স্থলে, ভক্তি করিতে যাইয়া ব্যারাম সংগ্রহ করা কোনও মতে বুদ্ধিমানের কায নহে। তাই বলিতেছিলাম যে, প্রসাদ-দাতা লোভ সম্বরণ ও আত্মশ্লাঘা সম্বরণ করিয়া, প্রসন্ন হইয়া, প্রসাদ গৃহীতাকে অনুমতি দিলেই ভাল হয়।

গৃহস্থের গৃহে প্রসাদ গ্রহণ।—নূতন বধূ সংসারে আসিলেই, তাহাকে আপনার করিবার জন্য ও মর্ম্মে মর্ম্মে তাহাকে সংযম শিক্ষা দিবার জন্য যত কিছু আয়োজন করা হয়, তন্মধ্যে নিত্য প্রসাদ-গ্রহণ ব্যবস্থাটি অন্যতম। বধূটিকে স্বামীর "পাতে" ত খাইতে হয়ই—সময়ে-সময়ে ভাসুর এমন কি দেবরেরও "পাতে" খাইতে দেখিয়াছি। স্বামীর পাতে স্ত্রীর খাইতে বাধা নাই—বিশেষতঃ যদি স্বামী পাত ত্যাগ করিবার অব্যবহিত পরেই স্ত্রী সেই "পাতে বসেন।" কিন্তু অনেক গৃহস্থের ঘরে দেখা যায় যে, স্বামীর ভোজনের বহুক্ষণ পরে স্ত্রীকে সেই "পাতা" ধরিয়া দেওয়া হয়। ভুক্তান্নে স্বামীর মুখের যে কত লালা লাগিয়াছে; এবং সময়ে যে তাহাতে জীবাণুর দ্বারা কি কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে বা হইতে পারে তাহা চিন্তার বিষয়। আমাদের দেশে মেয়েরা যে "কুড়ি বছরে বুড়ী" হন, তাহার অপরাপর কারণের মধ্যে নিত্য পর্য্যুসিত অন্ন ভোজনও একটী কারণ বলিয়া মনে করি। কিন্তু, এ আচার-বিড়ম্বিত বাঙ্গালাদেশে ভাসুর প্রভৃতির ভুক্তাবশেষও ভোজনের প্রথা আছে। কোন্ যুবকের কি ব্যারাম আছে, কোন্ যুবকের চরিত্র কিরূপ, তাহা যখন তাঁহার পিতামাতারও অগোচর, তখন কোন্ বিচারে, নিরীহ পরের কন্যাকে শ্বশ্রূঠাকুরাণী বিপন্ন করেন? যদি সংযম শিক্ষার নামে শাসন করাই উদ্দেশ্য হয়, তবে শুধু স্বামীর প্রসাদই দেওয়া উচিত। যদি নিজ পুত্রগণ কর্ত্তৃক অন্নব্যঞ্জনের অপচয় নিবারণের জন্য সেই ভুক্তাবশেষ ভোজন করাবার প্রয়োজন হয়—তবে প্রথমতঃ পুত্রদিগের পরিবেশনে সংযত হস্ত হইলেই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয়। যিনি যাহাই বলুন, আমি কোনও প্রকারে এ হীন প্রথার সমর্থন করিতে পারি না। বর্ত্তমান কালে যক্ষ্মারোগের বহুল বিস্তৃতি ঘটিয়াছে। একত্র, একপাতে, সুস্থ শিশু ও অসুস্থ শিশু ভোজন করার ফলে, সুস্থ শিশুকে যখন যক্ষ্মাগ্রস্ত হইতে হয়, তখন যাহার-তাহার পাতে মূক বধূটিকে ভোজন করান প্রথার কেমন করিয়া সমর্থন

করিব? এই প্রথার ফলে, সামান্য খাদ্যদ্রব্যের অপচয় নিবারণ করিতে যাইয়া অমূল্য, স্বাস্থ্য ও ততোধিক অমূল্য জীবন অপচিত হইয়া থাকে।

পুষ্টিকর আহার্য্যের অভাব

টাকাকড়ির হিসাবের মত আহারটাও হিসাব-নিকাশের জিনিস। যাহার যেমন প্রয়োজন, তেমনই উপার্জ্জন করা উচিত এবং তৎসঙ্গে কিঞ্চিৎ সঞ্চয় রাখাও ভাল। কিন্তু যে ব্যক্তি শুধু সঞ্চয় করার তৃপ্তির জন্য অর্থোপার্জ্জনে উন্মত্ত হয়, সে ব্যক্তি উন্মাদ, সে ব্যাধিগ্রস্ত। আবার, যে ব্যক্তির কোনও অভাব নাই, সংসারে যে উদাসীন, তাহার পক্ষে গ্রাসাচ্ছাদনোপযোগী অর্থের সমাগমই যথেষ্ট। যে দাতা তাহার অর্থের, বহু অর্থের প্রয়োজন।

আহার ব্যাপারটাও ঠিক তাই। দেহ রক্ষা করা, দেহকে কর্ম্মঠ ও সুস্থ রাখার জন্য আহার করা প্রয়োজন। শুধুই ঔদরিকের মত অহোরাত্র আহার্য্য চিন্তায় ফিরিলে, সুস্থ ও কর্ম্মঠ থাকা দূরের কথা, দেহ ভাঙ্গিয়া পড়ে। অর্থাৎ আবশ্যকাতিরিক্ত পরিমাণে বা গুরুত্বে অধিক ভোজনে, শরীর সুস্থ না থাকিয়া রুগ্ন বা রোগপ্রবণ হইয়া পড়ে। এই স্থূল কথাটি সকলেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। স্থূল হিসাবে, বাঙ্গালীর জীবনের প্রথম পঁচিশ বৎসর গঠন ও বৃদ্ধির কাল। তৎপরবর্ত্তী পনর বৎসর (২৬—৪০) স্থিরভাবের সময়; এবং তৎপরে (৪১) হইতে ত্বরিত-পদে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হইতে থাকে। এই হিসাবও ঠিক হইল না বলিয়া অনুমান করি। সত্য কথা বলিতে গেলে, বাঙ্গালীর জীবনের ইতিহাস এইরূপ;—

শৈশব হইতে কিশোর বয়স পর্য্যন্ত—দেহের বৃদ্ধি যথাযথ হারে হয় না; যে কিছু গঠন বা বৃদ্ধি ঘটে, সেটুকুও কাহারো যত্ন বা চেষ্টার ফলে নহে। বরং সাংসারিক শত সহস্র প্রতিকূল ঘটনা সত্ত্বেও সেটুকু ঘটিয়া থাকে। পিতামাতার চেষ্টা, তাঁহাদিগের সহস্র অজ্ঞতার ফলে ব্যর্থ হইয়া যায়।

কিশোর হইতে প্রৌঢ়ত্বের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত (১৬—৩০)—এই সময়ে যাহা কিছু দৈহিক উন্নতি ঘটিয়া থাকে।

ত্রিশ হইতে—চল্লিশ পর্য্যন্ত—স্বাস্থ্য "ন যযৌ ন তস্থৌ" এইরূপ অবস্থায় থাকে। তখন হইতে দেহের প্রত্যেক যন্ত্রের কার্য্যের উপরে তীব্র লক্ষ্য রাখিতে আরম্ভ করিতে হয়। নতুবা পীড়া অবশ্যম্ভাবী।

চল্লিশের পর হইতেই—স্বাস্থ্য ক্রমশঃ ভঙ্গ হইতে থাকে।

অতএব আমরা দেখিলাম যে, বাঙ্গালীজীবনে, মোটামুটি ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত উন্নতির চেষ্টা করা চলে; তাহার পর হইতেই সাবধান হইতে হয়।

দেহের উন্নতি কিসে হয়? কতকগুলি ঘটনা-নিচয়ের উপরে দৈহিক উন্নতি নির্ভর করে—কোন একটি কারণ-বিশেষের উপরে নহে। যতগুলি কারণ আছে, সে সকলগুলির উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। এখানে শুধু খাদ্যেরই বিচার করিতে বসিয়াছি, অতএব পুষ্টিকর খাদ্যেরই উল্লেখ করিব। বাঙ্গালীর পুষ্টিকর খাদ্য—শৈশবে,—মাতৃস্তন্য, বাল্য হইতে পরের সময়ে—মাছ, মাংস, ডাইল (বা তজ্জাতীয় সীম, বরবটি, মটর, ছোলা ইত্যাদি) ঘৃত, মিষ্টান্ন, ডিম্ব, গোধুম ইত্যাদি। তালিকাটি দেখিতে শুনিতে ভাল হইলেও, কার্য্যতঃ উহার ব্যবহার বড়ই কম।

ব্যবহারের ন্যূনতার প্রথম কারণ, অনভ্যাস; আমরা বহুযুগ ধরিয়া যে খাদ্যে অভ্যস্ত নহি, সে খাদ্য অকস্মাৎ প্রচলিত করিতে গেলে অনিষ্ট হইবারই সম্ভাবনা। এই জন্য, মাংস এমন উপকারী খাদ্য হইলেও, অলস বাঙ্গালীর সংসারে নিত্য মাংস প্রচলন করা চলে না। মাংস বেশী বেশী খাইয়া, যদি তদনুযায়ী শারীরিক পরিশ্রম না করা যায়, তবে অকাল-বার্দ্ধক্য ও অকাল-জরা উপনীত হয়। বাত-ব্যাধি, অজীর্ণ প্রভৃতিও শ্রমবিমুখ মাংসাহারীর পক্ষে অপর কুফল। মাংসের ন্যায়, ডিম্বও অতি পুষ্টিকর খাদ্য। কিন্তু অধিকদিন ধরিয়া ডিম্ব ভোজনে অর্শ, অজীর্ণ, বাত, প্রস্রাবে অ্যালবুমেন বাহির হওয়া প্রভৃতি ঘটিতে পারে। গোধূমও পরম উপকারী খাদ্য; কিন্তু অনভ্যস্ত পক্ষে উহা সহজেই অজীর্ণ ও প্রস্রাবে পাথরী ব্যাধির সৃষ্টি করিতে পারে।

ব্যবহারের ন্যূনতার দ্বিতীয় কারণ, অজ্ঞতা। কোন্ বয়সে শারীরিক কত ওজনে ও কিরূপ গঠনে, কিরূপ পরিশ্রমের অনুপাতে, কোন্ অবস্থায়, কোন্ খাদ্য কতটা ও কিরূপে খাইতে হয়, তাহা আমরা অবগত নহি। আমাদিগের পাশ্চাত্য গুরুরা যেমন-যেমন শিক্ষাদান করিয়াছেন, আমরা তাহার "মাছি মারা কপি" করিতে পারি মাত্র। কিন্তু বিলাত ও ভারতবর্ষ, বাঙ্গালী ও সাহেব, তুল্যমূল্য নহে। কাজেই সারাদিন বিলাতি বিদ্যা এদেশে আমদানি করিলে চলিবে কেন? এদেশের চিকিৎসককুল এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও উদাসীন, কাজেই সরাসরি আরো অজ্ঞ। কতকটা এই অজ্ঞতা দূরীকরণ মানসে, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে (১৩২৪ মাঘ) শিক্ষা কমিসনকে এই মর্ম্মে আবেদন করিয়াছিলাম:—কলিকাতা, ঢাকা, রাজসাহী প্রভৃতি বড়-বড় সহর কয়টিতে যত ছাত্র আছে (পাঠশালা হইতে এম্, এ, ক্লাস পর্য্যন্ত), তাহাদিগের প্রত্যেকের খাদ্য ও দৈহিক পুষ্টির রীতিমত বাৎসরিক বা ষাণ্মাসিক পরীক্ষা, উপর্যুপরি পাঁচ বৎসর ধরিয়া করা হউক। সেই পাঁচ বৎসর কালের পরীক্ষার ফল সাধারণ্যে প্রচার করা হউক। এবং সেই বিবরণী হইতে, বাঙ্গালী ছাত্রদিগের বৎসর-বৎসর শারীরিক পুষ্টি কি হারে হইয়া থাকে, তাহা সঠিক নির্ণীত হউক। সেই নির্ণয়ের পরে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত এ দেশীয় চিকিৎসক ও কবিরাজ মহাশয়েরা পরামর্শ করিয়া ছাত্রদিগের আহারের ও ব্যায়ামের "নিরিখ" বাঁধিয়া দিন। সেই "নিরিখ" অনুসারে, আপাততঃ সমস্ত সরকারী হোষ্টেলে ও যথাসম্ভব গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়সমূহে আহার ও ব্যায়ামের ব্যবস্থা করা হউক। পুনরায় এই প্রথার পাঁচবৎসর পরে তাহার ফল কি হয় সেই বুঝিয়া, পাকা ব্যবস্থা করা উচিত। এইরূপে কার্য্য হইলে, দেশের মধ্যে ছাত্র-স্বাস্থ্য, খাদ্য-বিচার ও শারীরিক পরিশ্রমের সার্থকতা সম্বন্ধে দেশে একটা সাড়া পড়িয়া যাইবে, এবং তাহার ফলে,

খাদ্য বিচার লইয়া দেশের লোকের অনেকটা অজ্ঞতা দূর হইয়া যাইবে।

জ্ঞানের বিকাশ ও প্রচেষ্টার সঙ্গে-সঙ্গে আমাদিগের স্বাস্থ্যের উন্নতি হওয়া অবশ্যম্ভাবী। সেই শুভ সময় আসিলে, তখন এই কৃষিপ্রধান-দেশে, ভদ্রলোকেরাও কেরাণীগিরি ছাড়িয়া, সমবায় প্রথার সাহায্যে, বা অপর যে কোনও উপায়ে হউক, খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করণে মনোযোগ দিয়া স্বাস্থ্য ও অর্থ দুইই লাভ করিতে পারিবেন। সে দিন "চাষা" আর ঘৃণিত থাকিবে না—সে দিন "চাষা" ব্রাহ্মণের সঙ্গে একযোগে কায করিতে পাইবে। ব্রাহ্মণ মুচির দোকান করিতে পারিয়াছে; ব্রাহ্মণ বা অপর কোনও "ভদ্র" জাতি তবে কেন পশুপালন করিতে পারিবে না? বর্ত্তমান যুগে, যে সেবাব্রত এ দেশে জাগিয়াছে, সেটা যে ষোল-আনা করুণা-প্রণোদিত, এমন বোধ হয় না। একটা অব্যক্ত কর্ম্ম-লিপ্সা লোকের প্রাণের মধ্যে জাগিয়াছে, একটা যাহা কিছু-হউক-করা-উচিত, এই ভাব আজ প্রকট—সেবা-ব্রতটা তাহারই আংশিক অভিব্যক্তি মাত্র। সেই কর্ম্ম-লিপ্সাকে লাভের পথে চালাইলে দেশেরও মঙ্গল, দশেরও মঙ্গল। কিন্তু ধার্ম্মিক, দূরদর্শী, চিন্তাশীল, স্বার্থত্যাগী মহাপুরুষদিগের নেতৃত্বের আজ মহা অভাব। তাই, আজ যিনি যেখানে আছেন, সেই মহাপুরুষেরা দেশের লোককে দেশের উন্নতিকর ব্যবসার পথে চালিত করিবার জন্য অগ্রসর হউন—আমরা সেই মহাপুরুষদিগের জন্য উন্মুখ হইয়া বসিয়া আছি। দেশের খাদ্যের জন্য দেশের লোকেরই মুখ তাকাইব—"Not to be reimported into……" অঙ্কিত পাশ্চাত্য বাসি খাদ্য চাহি না—যে খাদ্য সেই দেশের লোকেরাই চাহে না, অথচ অবাধে এ দুর্ভাগ্য দেশে বিক্রয় করিবার জন্য কত চাতুরী-জাল বিস্তৃত করা হয়।

আজ দেশের লোক দেশের খাদ্য-সম্বন্ধে উদাসীন বলিয়া, শিশুরা মাতৃস্তন্যে ও গোদুগ্ধে বঞ্চিত। আজ দেশের লোকেরা উদাসীন বলিয়া পুষ্করিণীতে ও নদীতে মাছ কমিয়া গিয়াছে। আজ দেশের লোকেরা উদাসীন বলিয়া, যে-সে ডিম্ব ব্যবহৃত হইতেছে—তাহার আকৃতি, ওজন বা গুরুত্ব সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণরূপেই উদাসীন। আজ দেশের লোকেরা উদাসীন বলিয়া আমরা মাংস বলিয়া যে-সে জন্তুর ও যে-সে অবস্থাপন্ন ছাগ-মেষাদির মাংস অবাধে ভক্ষণ করিতেছি! এই সকল করার ফলে, আমরা পুষ্টি-অপুষ্টি, স্বাস্থ্য-অস্বাস্থ্য—সকল বিষয়েই অনভিজ্ঞ। কিন্তু আর উদাসীন থাকিলে চলিবে না। ঔদরিক হও আর নাই হও, খাদ্য সম্বন্ধে বিশিষ্টরূপে মনোযোগ দিতেই হইবে। নতুবা—ক্রমিক জাতীয় অধঃপতন ও ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

আমিষ ও নিরামিষ আহার।

আমরা খাদ্য সম্বন্ধে অজ্ঞ ও উদাসীন বলিয়া আমিষ ও নিরামিষ খাদ্য সম্বন্ধে যা-তা মতামত দিয়া থাকি; কিন্তু সে মতের সার্থকতা আছে কি না তাহা বিবেচ্য। আমাদের দেশে এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা পুরাপুরি সাত্তিকভাবে আহার্য্য প্রচলন করিবার জন্য ব্যস্ত। অপর দল পুরাপুরি আসুরিক ভোজনের অনুরাগী। আমার সামান্য অভিজ্ঞতায় ও বিবেচনায় বোধ হয় যে, মোটামুটিভাবে, চল্লিশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে পর্য্যন্ত, এদেশে মাছ মাংস-ডিম্ব প্রভৃতি সহমত কর্ম্মকুশল সকলেরই খাওয়া উচিত; তন্মধ্যে, শীতকালে উহার সার্থকতা আরো বেশী; গ্রীষ্মকালে উহাদের একেবারে বর্জ্জন না হউক, অন্ততঃ আংশিকভাবে ত্যাগ বিধেয়। বাঙ্গালাদেশ উষ্ণপ্রধান দেশ হইলেও একবারে উষ্ণ নহে। বাঙ্গালাদেশে মৎস্যেরও যথেষ্ট বাহুল্য ছিল। যদি প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে দুধ, ঘি ব্যতীত, প্রত্যহ একপোয়া আন্দাজ মাছ খাইবার সুযোগ ঘটিত, তাহা হইলে মাংস-ডিম্বের ওকালতী করিতাম না। কিন্তু যে-হেতু সে সুযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা বর্ত্তমানে নাই, এবং যেহেতু দেশের লোকের স্বাস্থ্য ক্রমশঃই মন্দ হইতেছে, সেই জন্য, দৈহিক-ক্ষয়পূরক মাছ-মাংস-ডিম্ব প্রভৃতির প্রচলন হওয়া বাঞ্ছনীয় হইয়া পড়িয়াছে। সে প্রচলনের অনুকূল-প্রতিকূল ব্যবস্থা পরে বলিতেছি।

নিরামিষ আহারে মনে সাত্ত্বিকভাব জাগে বটে, এবং নিরামিষ আহারে দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি রক্ষা করা সম্ভবপর হয় বটে, কিন্তু উহার জন্য, অন্ততঃ বর্ত্তমানকালে, ব্যয়বাহুল্য অবশ্যম্ভাবী। অর্থাৎ, অর্থের স্বচ্ছলতা থাকিলে, নিরামিষাশী হওয়া সম্ভবপর হয়। তদ্ব্যতীত, যেরূপ একরাশি অন্নগ্রহণ করিলে তবে তাহা হইতে সামান্য পুষ্টি সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়, সেইরূপ, একরাশি নিরামিষ খাদ্য খাইলে তবে পুষ্টিসংগ্রহ করা সম্ভবপর হইয়া উঠে। এইজন্য, আমিষভোজী অপেক্ষা নিরামিষাশীদিগকে বেশীমাত্রায় খাদ্য খাইতে হয়। সেই কারণেই, নিরামিষাশীদের উদর-স্ফীতি ঘটা অনিবার্য্য। নিরামিষ খাদ্য অনেক পরিমাণে স্বভাবের সমতা ও শীতলতা রক্ষা করে এবং কোষ্ঠঘটিত ব্যারাম নিরামিষাশীদিগের কদাচ হয়। নিরামিষ ভোজনে অকালে জরা আইসে না বটে, কিন্তু পরিপাক যন্ত্রের পক্ষে নিরামিষ ভোজন গুরুতর ভারস্বরূপ। ব্যয়বাহুল্য, মেদবৃদ্ধি, পরিপাক-যন্ত্রের শ্রমাধিক্য, খাদ্যদ্রব্যের অপচয়—এই সকলগুলি নিরামিষাশের বিরুদ্ধযুক্তি হইলেও এদেশে পাশ্চাত্যশিক্ষিত লোকের ধারণা একরূপ এবং এতদ্দেশ শিক্ষিত ব্যক্তিগণের অভিজ্ঞতা অন্যরূপ। পাশ্চাত্যমতে-শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই ধারণা এই যে, মাংস-ডিম্ব প্রভৃতি না খাইলে প্রাণধারণ করা অসম্ভব, —দেহের পুষ্টি বা বৃদ্ধি দূরের কথা। এই হেতু যাবতীয় পাশ্চাত্য মনীষিগণ লিখিত খাদ্যসম্বন্ধীয় পুস্তকে ঐরূপ খাদ্যের প্রশংসার শেষ নাই।

কিন্তু এদেশে আমরা কি দেখিতে পাই? মাংস-ডিম্বপুষ্ট বিলাত-প্রত্যাগত বাঙ্গালীর দেহের দিকে একবার দেখ, আবার মাত্র রাশিকৃত অন্নধ্বংসকারী পল্লীবাসী চাষা, মুটে, কুলি, গোয়ালা এমন কি ডাকাত-দিগের প্রতি দেখ—কাহার দেহের বল, আকৃতি ও পুষ্টি বেশী, তাহা বুঝিতে কষ্ট হইবে না। সাধারণ গৃহস্থের বাটীর ভৃত্যেরা একরাশি অন্নই ধ্বংস করে, মাছও তাহাদিগের প্রায়শঃ জোটে না। কিন্তু তাই বলিয়া, তাহারা ঘৃত-দুগ্ধপুষ্ট মনিবগণের অপেক্ষা কম শ্রমসহিষ্ণু ও কম বলশালী নহে। উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশবাসীরা মাছ-মাংস ভক্ষণ

করেন না ;—তাঁহারা তাই বলিয়া দুর্ব্বল বা খর্ব্বাকৃতি বা স্বল্পায়ু নহেন। বাঙ্গালীর ঘরের বিধবারা অনেকে সিদ্ধচাউল আহার করিলেও স্বাস্থ্যে, সামর্থ্যে ও সহিষ্ণুতায় তাঁহারা কম নহেন। এই জন্যই মনে হয় যে, শুধু আহারের পুষ্টিকারিতাই দেহের পুষ্টির সাধক নহে—সহায়ক মাত্র। ইন্দ্রিয়সংযম, শারীরিক রীতিমত পরিশ্রম ও আবহাওয়ায় যত দৈহিক পুষ্টি হয়, মাত্র আহারের তদ্বির করিয়া তাহার সিকিও হয় না।

তবে কি আমি আমার সমস্ত দেশবাসীকে নিরামিষাশী হইতে পরামর্শ দিতেছি? আমি তাহা দিতেছি না। যাঁহারা সাত্ত্বিকপ্রকৃতি-প্রধান, তাঁহারা পুরা নিরামিষাশী হউন। তাঁহারা আতপ-তণ্ডুল, ঘৃত ও অধিক পরিমাণে ডাইল ভক্ষণ করুন। কিন্তু যে ব্যক্তি খাটিয়া খাইবে, যে ব্যক্তি রীতিমত পরিশ্রম করিবে, অথচ যাহার আর্থিক স্বচ্ছলতা নাই, তাহার মাছ মাংস খাইবার পুরা অধিকার আছে এবং তাহার অন্ততঃ বর্ত্তমান একাকারের যুগে তাহা খাওয়া উচিত। বলা-বাহুল্য শুধু আপিষে যাওয়া বা শুধু ছয়ঘণ্টা আপিষে "কলম-পেশা"কে আমি পরিশ্রম বলিয়া গণ্য করিতেছি না। প্রত্যহ নিয়মিতরূপে ব্যায়াম বা অপর কোনও রূপে শারীরিক চালনা করাকেই পরিশ্রম করা বলা যায়। এই কারণে, যে সকল বাঙ্গালী-যুবক "কলাই-ডাইল ও গলা ভাত" খাইয়া ফুটবল ক্রীড়া করে, আমি তাহাদিগের অপরিনাম-দর্শিতার নিন্দা করি। আবার যে সকল ব্যক্তি জামাজোড়া পরিধান করিয়া এবাড়ী ওবাড়ী বেড়াইয়া "ভ্রমণ"কৃত্য সম্পন্ন করেন, অথচ মাছ মাংসের যম সাজেন, আমি তাঁহাদিগেরও নিন্দা করি। এই কথাগুলি পাঠ করিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, আমি এই বলিতেছি,—খাটিতে হইলেই মাংস মাছ খাওয়া আবশ্যক। যদি সেই পাশ্চাত্য-শিক্ষার পোষকতা করাই আমার উদ্দেশ্য থাকিত, তাহা হইলে শ্রমনিষ্ঠ পল্লীবাসিদের শুধু অন্নাহারে পুষ্ট দেহের কথার উল্লেখ করার সার্থকতা কোথায়? আমি এই বলিতে চাই যে, বর্ত্তমান সময়ে, বাঙ্গালীর শারীরিক অধঃপতন যথেষ্টই ঘটিয়াছে; সেই অধঃপতনের আংশিক পূরণ-স্বরূপ, মাছ-মাংসের ন্যায় অপেক্ষাকৃত স্বল্পমূল্যে ও স্বল্পায়াসে লভ্য খাদ্যের ব্যবহার প্রচলিত হইলেই ভাল হয়। আমরা যদি একই গ্রাম-বাসী একই অবস্থাপন্ন বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমানের স্বাস্থ্যের তুলনা করি, তবে মুসলমান ভ্রাতাদিগেরই স্বাস্থ্যের পোষকতা করিতে হয়। এই একই অবস্থাপন্ন, একই গ্রামবাসীর মধ্যে একমাত্র প্রভেদ—মাংসের ব্যবহার। এই ধ্বংসোন্মুখ হিন্দু মধ্যবিত্তদিগকে গড়িয়া তুলিতে হইলে, উৎকৃষ্ট ঘৃত দুগ্ধের সচ্ছলতা একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু সে জিনিস আর সহজে পাইবার নহে। কাযেই, তদভাবে, মৎস্য-মাংসের কথঞ্চিৎ অধিক প্রচলনের আবশ্যকতা। আমার সামান্য বুদ্ধিতে এই বুঝিয়াছি যে, যৌবনকালে একসঙ্গে রীতিমত ব্যায়ামের আয়োজন ও সেই সঙ্গে-সঙ্গে অধ্যয়ন-ভারের লঘুত্বসাধন ও মাংসাহারের সুযোগ দেওয়া ভাল। শীতকালে মাংস ব্যবহার চলিবে, গ্রীষ্মে তাহার তিরোভাব না ঘটিলেও হ্রাস ঘটান একান্ত প্রয়োজনীয় এবং বাঙ্গালীর পক্ষে চল্লিশবৎসর পার হইলে মাংসের ব্যবহার কম হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

অনেকে মাংসের ওকালতী শুনিয়া, আমার উপরে বিরক্ত হইবেন। আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে চাহি যে, এই প্রবন্ধে আমার সরল বিশ্বাস ও সামান্য অভিজ্ঞতার ফলে যাহা বুঝিয়াছি, মাত্র তাহারই আলোচনা করিয়াছি। সমগ্র হিন্দু-শাস্ত্র পড়িয়াছি, এমন স্পর্দ্ধা করিতেছি না। কিন্তু যতটুকু সন্ধান লইয়াছি, তাহাতে আমার দুইটী কথা মনে লাগিয়াছে। প্রথমতঃ, হিন্দুধর্ম্মের প্রতি পাদবিক্ষেপে স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু লাভের প্রতি তীক্ষ্ণ লক্ষ্য আছে। যাহাতে স্বাস্থ্যের বা আয়ুর তিল-মাত্র ক্ষতি হয়, এমন কথা হিন্দু কোথাও বলেন নাই। দ্বিতীয়তঃ,—বৈদিক যুগ হইতে রাজা অশোকের সময় পর্য্যন্ত, মাংসব্যবহারের ভূরি-ভূরি প্রমাণ প্রয়োগ আছে। অধিকন্তু, দুর্গাপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা, কালী-পূজা, বাসন্তীপূজা প্রভৃতিতে মাংস ভক্ষণের বিধি আছে এবং অমাবস্যা, পূর্ণিমা, অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী প্রভৃতি তিথি ব্যতীত, প্রত্যহই মাংস খাইবার বিধি পঞ্জিকাতে দেওয়া আছে। হিন্দুদিগের চরক ও সুশ্রুতে মাংস ভোজনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা হয় নাই, এবং কুক্কুট, বরাহ, কচ্ছপ প্রভৃতি কতরকম মাংসের গুণাগুণ দেওয়া আছে।

আমার বিশ্বাস এই যে, বৌদ্ধদিগের প্রাদুর্ভাব কাল হইতেই এদেশে মাংস ব্যবহার কমিয়া বা স্থানে স্থানে উঠিয়া গিয়াছে। এবং চৈতন্য প্রভৃতির কাল হইতে, মাংসের বিরুদ্ধ মতের সৃষ্টি হইয়াছে। নতুবা, হিন্দুরা ধর্ম্মের হিসাবে, কখনো মাংস ব্যবহার বিরোধী ছিলেন, আমার বোধ হয় না। (মল্লিখিত ১৩২০ সালের শ্রাবণ মাসের "আর্য্যাবর্ত্তে" "প্রাচীন ভারতে মাংস ভক্ষণ" প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য)।

বর্ত্তমানকালে যে রকম "দিনকাল" পড়িয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালীকে দেশদেশান্তরে যাইতে হইতে পারে। বাঙ্গালীকে মানুষ হইতে হইলে, পৃথিবী পর্য্যটনের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। সংসারে উন্নতি চাহিলে, নানা জাতীয় লোকের সঙ্গে মেলা-মেশা করিতে হইবে—সেরূপ করিতে হইলে মাংসভক্ষণে অভ্যস্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিরাট কর্ম্মের যুগে, জাতি ও সংস্কারের গণ্ডীর মধ্যে আত্মাভিমানে গরীয়ান্ হইয়া বসিয়া থাকা শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে হয় না। এইজন্য, যিনি সাত্ত্বিকপ্রকৃতি তিনি ব্যতীত, সকল বাঙ্গালীরই মাছমাংস ভক্ষণ করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। আমি এমন বলি না যে, মাংসাশী না হইলে পৃথিবীতে বড় জাতি হওয়া যায় না, যদিও বর্ত্তমান কালে সকল তথাকথিত প্রধান জাতিই মাংসাশী—এমন কি বৌদ্ধ চীন, জাপানও তাই। একদিকে কাযকর্ম্মের সুবিধাবাদের দোহাই দিয়া, অপর দিকে ধ্বংসোন্মুখ জাতিকে সহজে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে, বর্ত্তমান কালে, মাংস প্রচলনের আমি পক্ষপাতী। তমোপ্রকৃতির লোকের সহিত ঘর করিতে হইলে, তমোভাব দ্বারাই তাহাদিগের সঙ্গে মিশিতে পারিব। ষোল আনা সুবিধাবাদের ভিতর দিয়া এবং স্বয়ং চিকিৎসক হইয়াই মাংস খাদ্যের অনুকূলে মত দিতেছি। তবে আমি এমন বলি না যে, সকল বাঙ্গালীই মাংসাশী হউন। আমি এমন চাহি না যে, বাঙ্গালী তিনসন্ধ্যা মাংসাহার করুন এবং প্রত্যেকেরই পাতে জাগাড় সৃষ্ট হউক। আমি এমনও বলি না যে, মাংস না খাইতে পাইলে

বাঙ্গালীর দিন বৃথা যাইবে। আমি বলিতে চাই যে, যে ব্যক্তির অবস্থায় কুলাইবে, তিনি যথেষ্ট পরিমাণে মাছ খাইয়া পুষ্টি লাভ করুন, যাঁহার অভিরুচি হইবে তিনি মাংসেই পরিতৃপ্ত হউন। ফল কথা, মাংস অপেক্ষাকৃত সস্তা এবং পুষ্টির হিসাবে মাছ মাংস প্রায়ই তুল্য-মূল্য।

আমার মনে হয় যে, যেমন যৌবনে অর্থোপার্জ্জন করিলে বার্দ্ধক্যে বিনাশ্রমে ভোগ করা যায়, তেমনি শৈশবে দুধ ঘি ভোজন করিয়া ও যৌবনে দুধ-ঘি বা তদভাবে যথেষ্ট পরিমাণে মাছ খাইয়া বা তৎপরিবর্ত্তে উভয় দ্রব্যই খাইয়া ও যথোপযুক্ত পরিশ্রম করিয়া শরীরকে তৈয়ারি করিয়া রাখা সকলেরই উচিত। পরে, ৪০ বা তদূর্দ্ধ বয়সে মাংস বর্জ্জন করিয়াও দেহকে সুস্থ ও কর্ম্মঠ রাখা সহজ-সাধ্য হইয়া পড়ে। ঔদরিক হইয়া, শুধু রসনার পরিতৃপ্তির জন্য শ্রম না করিয়া মাংস খাওয়া পাগলের কায। ক্ষুধা পাইলে খাইতে হয়—নতুবা খাওয়া উচিত নহে। শারীরিক ক্ষয় হইলেই ক্ষুধার উদ্রেক হয়—কিন্তু অলস মাংসলোলুপদিগের প্রকৃত ক্ষুধা না হইয়া দুষ্ট ক্ষুধাই বেশী-বেশী হয়। কাযেই সেরূপ করিয়া খাইলে শরীরের অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী।

কবিরাজী মতে খাদ্যাখাদ্যের দোষগুণ।

ভাত।—(১) নূতন চাউলের ভাত—সুস্বাদু, পুষ্টিকর কিন্তু গুরুপাক।

(২) পুরাতন চাউলের ভাত—সহজপাচ্য কিন্তু স্বাদবিহীন।

(৩) অত্যন্ত গরম ভাত—বলক্ষয়কারী; জলে ধৌত ভাত—সহজপাচ্য (?) বাসি ভাত—দূষণীয়। আমানি—পুষ্টিকর, ক্রিমি ও পাণ্ডুরোগে হিতকর।

(৪) ভাতের ফেন—ক্ষুধা ও মূত্রবর্দ্ধক।

(৫) চিঁড়া—গুরুপাক; কিন্তু উহার উপরে যে গুঁড়া থাকে সেগুলি ধারক।

(৬) খৈ—লঘুপথ্য।

গম।—ইহা পুষ্টিকর, বলকারক এবং শরীরের দৃঢ়তা-সাধক।

জাঁতায় ভাঙ্গা গমের সঙ্গে যে উহার গাত্রাবরক মিশ্রিত থাকে ("চোকর") তাহা কোষ্ঠশুদ্ধিকারক; কিন্তু অধিক দিন ব্যবহারে আমাশয় সৃষ্টি-কারক।

ডাইল।(১) মুগের ডাইল—লঘুপাক, পুষ্টিকর।

(২) কলাই বা মাষকলাই—গুরুপাক, স্নিগ্ধ, মলবৃদ্ধিকর, প্রস্রাববৃদ্ধিকর।

(৩) মসুর—ধারক।

(৪) ছোলা—গুরুপাক, পিত্তরোগে হিতকর, পুরুষত্বহানিকর।

(৫) মটর—মলরোধকারী।

(৬) অরহর—গুরুপাক, মলমূত্র-রোধক।

কুষ্মাণ্ড—প্রস্রাব পরিষ্কার করে। উন্মাদ ও মূর্চ্ছারোগীর পথ্য। ক্রিমি ও রক্তদোষনাশক; শুক্র-বৃদ্ধিকারক; পুষ্টিকর।

চালকুমড়ার ডাঁটা—পাথরী রোগীর পথ্য।

অলাবু (লাউ)—রেচক; চুলকনার পক্ষে হিতকর।

আলু—পুষ্টিকর। গুরুপাক, শুক্রবৃদ্ধিকর।

পটোল—বাত পিত্ত কফে উপকারী। কাশী ও কুষ্ঠে উপকারী।

ওল—অর্শরোগীর পথ্য।

কচু—রেচক ও আমবাত রোগীর পথ্য।

মানকচু—শোথ রোগীর পথ্য।

মূলা (কাঁচা)—অপকারী। পুরাতন ও শুষ্ক হইলে—শোথে হিতকর।

শাক। (১) কলমী—মল মূত্র, শুক্র ও স্তনদুগ্ধ বর্দ্ধক। (২) কাঁটানটে—গুরুপাক। (৩) পুঁই—ক্রিমিঘ্ন, রেচক। (৪) বেতো—রেচক। (৫) সর্ষের—ক্রিমিবর্দ্ধক। (৬) সুষুনি—নিদ্রাজনক ও উন্মাদের হিতকর। (৭) বিমি—মেধা ও আয়ুর্বর্দ্ধক। (৮) পালং—রক্তপিত্তে ও উন্মাদে হিতকর। (৯) চাঁপানটে—অর্শ ও রক্তপিত্তে উপকারী।

কদলী—(১) পাকা—রেচক, ধাতুবর্দ্ধক, গুরুপাক। (২) কাঁচা—পুষ্টিকর, ধাতুবর্দ্ধক, ধারক। (৩) মোচা—ক্রিমিনাশক; মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে পথ্য। (৪) মর্ত্তমানকলা—আমাশয়ে উপকারী। কাঁটালি কলা—ধাতুপোষক ও বলকর।

বেগুণ—শুক্রবর্দ্ধক। রক্তপিত্ত, মেহ, কফ, বাত ও কাশে হিতকর।

আম্র—গুরুপাক, শুক্রবৃদ্ধিকর ও বলকারক।

মাংস—চতুষ্পদদিগের মধ্যে স্ত্রীজাতীয় ও পক্ষীদিগের মধ্যে পুং জাতীয় মাংস উৎকৃষ্ট। কিন্তু হিন্দুর শাস্ত্রে স্ত্রীজাতীয়ের মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ। ফলাহারী পক্ষীদিগের মাংস রুক্ষ, ধান্যাহারীদিগের মাংস পিত্তবর্দ্ধক। সমস্ত জন্তুর যকৃত প্রদেশস্থ মাংসাহার করা উচিত। পচা, শুষ্ক, বিষাক্ত, পীড়িত, বৃদ্ধ, কৃশ ও নিতান্ত কচি মাংসকে অধম মাংস কহে। কুক্কুটের মাংস—বাতনাশক।

ডুমুর—গর্ভরক্ষাকারী,—স্তনদুগ্ধ বৃদ্ধিকারী।

বিরুদ্ধ-ভোজন।

কবিরাজী মতে একপ্রকারের খাদ্য খাইলে অন্য প্রকারের আহার গ্রহণ করা অস্বাস্থ্যকর এবং অশাস্ত্রীয়—যথা একসঙ্গে মাংস ও দুধ ভোজন করা অনুচিত। যদি আয়ুর্ব্বেদ ও হিন্দুশাস্ত্র মানিতে হয়, তাহা হইলে অনেক জিনিসই খাইলে অন্য অনেক প্রকারের জিনিস সেই সঙ্গে খাওয়া চলে না। এ সকল কথা সাধারণে হাসিয়া উড়াইয়া দেন। জানি না সকল কথাই উপহাসযোগ্য কি না। তবে আমা-দিগের বুদ্ধি ও জ্ঞান এত অল্প যে, উপহাস না করাই শোভন বলিয়া প্রতীতি হয়। একত্রে মাংস ও দুধ খাইতে নাই—সাহেবেরা একথা জানিতেনও না এবং স্বীকারও করিতেন না। কিন্তু বর্ত্তমানকালে ফিজিওলজিবেত্তারা স্বীকার করেন যে, দুধের সহিত লবণ বা লবণাক্ত

খাদ্য খাইলে দুগ্ধ সহজে পরিপাক হয় না এবং মাংস সংযোগে, মাংস ও দুগ্ধ উভয়েই গুরুপাক হয়। এই জন্য যে বালক বালিকাদের দুধের সঙ্গে তরকারি বা ভাজা আলু ভক্ষণ করা অভ্যাস আছে, তাহাদিগের সেই অভ্যাস শীঘ্রই ত্যাগ করান উচিত।

যদিও ঠিক বিরুদ্ধ ভোজন বলিয়া বলা যায় না, তথাপি আহার্য্যের আকস্মিক পরিবর্তন সম্বন্ধে এই স্থলে উল্লেখ করা উচিত মনে করি। কচি শিশুদিগকে হঠাৎ গো দুগ্ধ হইতে ছাগ-দুগ্ধে বা হঠাৎ এক খাবার হইতে অপর খাবারে লইয়া যাওয়া অনুচিত। বৃদ্ধ বয়সেও ঠিক তাই। এই কারণেই বোধ হয় প্রবাদ বচন হইয়াছে—"আপ্‌রুচি খানা"

কবিরাজী মতে দুই একটী বিরুদ্ধ ভোজনের ক্ষুদ্র তালিকা দিলাম :—

দুধের সঙ্গে বিরুদ্ধ—মৎস্য, মূলা, লবণ, কয়েদ্‌বেল, তেঁতুল ও অপর অম্ল, নারিকেল।

দধির সহিত—মুরগীর মাংস, কদলী, তাল। [রাজবৈদ্য শ্রীযুক্ত বিরজাচরণ গুপ্ত মহাশয়ের বনৌষধি দর্পণ গ্রন্থে এই সকল তথ্য বিস্তর দেওয়া আছে]।

নানকপন্থী—নানকশাহী

[শ্রীআশুতোষ তরফদার]

নানক ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে লাহোর জেলার অন্তর্গত তালবন্দী নামক গ্রামে ক্ষেত্রীকুলে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৫৩৮—৯ খৃষ্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন। নানক একজন প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম-সংস্কারক। পঞ্জাবের অধিকাংশ অধিবাসী নানক-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের অনুসরণকারী। নানক-কথিত ঈশ্বর স্রষ্টা, নিত্য, অচিন্তনীয় ও অনন্ত। তিনি সত্য, সৃষ্টির পূর্ব্বেও বর্ত্তমান ছিলেন, বর্ত্তমান সময়েও বর্ত্তমান আছেন এবং সৃষ্টি-প্রলয়েও বর্ত্তমান থাকিবেন। তিনি এক, অদ্বিতীয় ও অকাল। নানক মোল্লা ও পণ্ডিত, দরবেশ ও সন্নাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিতেন যে, পরমেশ্বর কত শত মহম্মদ, বিষ্ণু ও শিবের আবির্ভাব ও লয় দর্শন করিয়াছেন ও করিতেছেন। তিনি আরও কহিতেন যে, ধর্ম্ম, দান, সৎকার্য্যে জীবনোৎসর্গ ও জ্ঞান কোন ফলোপধায়ক নহে; সেই জ্ঞানই জ্ঞান যদ্দারা ঈশ্বর উপলব্ধি হয়। নানকের মতে যে ব্যক্তির উপর ঈশ্বরের অনুগ্রহ হয়, সেই ব্যক্তিই তাঁহার দর্শন লাভ করিতে সক্ষম হয়। নতুবা, যাহাদিগের বিশ্বাস স্বধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া স্বকীয় সৎকর্ম্ম দ্বারা অনন্ত জীবন লাভ করিবে নানক তাহাদিগকে অনুযোগ করিতেন। সদাচরণ ও সৎকর্ম্মদ্বারা মুক্তি লাভ হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতেও ঈশ্বরানুগ্রহের অপেক্ষা করে। নানকের মতে, হিন্দু ও মুসলমান এক। উপাসনার নিমিত্ত আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই। জাতিভেদ নাই; মনুষ্যমাত্রই এক।

আজিকালি নানক-পন্থী বলিলে শিখ বুঝায়। ইহাদিগের উপাধি সিংহ। ইহারা পূর্ব্ববর্ত্তী গুরুগণের অনুমোদিত নিয়ম পালনকারী, বাহ্যাড়ম্বরশূন্য ও সামাজিক নিয়মের বহির্ভূত। সামাজিক নিয়ম ও বাহ্যাড়ম্বর গুরু গোবিন্দ সিংহ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয়। গুরু গোবিন্দ সিংহের মতানুসারিগণ ধূমপান করে; মস্তকের কেশ রক্ষা করিতে বাধ্য নহে, কিম্বা চারি 'ককা'রও ধার ধারে না। তাহারা 'পাহুল' (পদ প্রক্ষালন জল) দ্বারা দীক্ষিত হয় না এবং ব্রাহ্মণগণকে সাধারণ মানুষের ন্যায় দর্শন করে না। নানক-পন্থী শিখ হিন্দুদিগের ন্যায় মস্তক মুণ্ডন করিয়া মধ্যস্থলে 'বোদী', 'চোটী' (শীখা) রক্ষা করে। অপর শিখেরা কেশ মুণ্ডন করে না। এইহেতু পূর্ব্বোক্ত শিখগণকে 'মুনা', 'মুণ্ডা' বা 'বোদীওয়াল' শিখ কহে। ইহাদিগের অপর নাম 'সাঝধারী'। দীক্ষাকালে নানকপন্থীগণ গুরুর চরণামৃত পান করে; ইহার নাম 'চরণ-কা-পাহুল'। গুরু গোবিন্দ সিংহের মতানুসারিগণ 'খাণ্ডে-কা-পাহুল' (খড়্‌গ-ধৌত জল) পান করে।

যুক্ত-প্রদেশে নানক-শিষ্যগণ নানকশাহী নামে পরিচিত। ইহাদিগের ছয় শাখা :—উদাসী, নির্ম্মল, অকালী, সুথরাশাহী ও রাগরেতি। ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি যখন দীক্ষিত হয়, তৎকালে কেশ-শ্মশ্রু মুণ্ডন করে এবং সমস্ত শরীর দধি ও জল দ্বারা প্রক্ষালন করে। অপরেরা একেবারেই ক্ষৌরকারকে স্পর্শ করে না; গঙ্গাজলে দেহ ধৌত করে এবং গুরুর চরণামৃত পান করে। তৎপরে গুরু কর্ত্তৃক 'সত্য নাম' শিষ্যের কর্ণে অনুচ্চ স্বরে উচ্চারিত হয়। এক্ষণে শিষ্য উন্নত সোপানে আরোহণ করিলেন, কারণ, তিনি 'মন্ত্রতত্ত্বমসি মহাবাক্য' প্রাপ্ত হইলেন। চারি বর্ণের লোক নানকশাহী ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে পারেন। দীক্ষিত হইতে হইলে বয়ঃক্রমের কোন নিয়ম নাই।

১। উদাসিগণের মধ্যে অনেকে কেশ ও শ্মশ্রু মুণ্ডন করে; অনেকে আবার কেশ রক্ষা করে। ইহারা গেরুয়া রঙের কৌপিন পরে এবং এক বস্ত্রখণ্ড দ্বারা কটিদেশ বন্ধন করে। এই কটিবেষ্টন বসনের নাম 'অফ্লন'। তাহারা সন্ন্যাসীদিগের ন্যায় আপনাদিগের নিকট এক জলপাত্র (কমণ্ডলু) রক্ষা করে। যিনি মঠের প্রধান, তিনি মোহান্ত নামে অভিহিত হন। মোহান্ত মস্তকে লালবর্ণের পাগ্‌ড়ী (সাফা) বন্ধন করেন।

২। নির্ম্মলগণের পরিধেয় উদাসিগণের ন্যায়। ইঁহারা কেশ কর্ত্তন করেন না; তবে কখন-কখন শ্বেত বস্ত্র পরিধান করেন।

৩। কুকাপন্থী গৃহস্থ; ইহারা কেশ কর্ত্তন করে না, মস্তকে পাগড়ী বাঁধে এবং সাধারণ বস্ত্র ব্যবহার করে। ইহাদিগের জপমালা শ্বেতবর্ণের।

৪। অকালীগণ কেশ রক্ষা করে; জাংঘিয়া পরিধান করে এবং কখন কৃষ্ণবর্ণ ও কখন বা শ্বেতবর্ণের পাগড়ী ব্যবহার করে।

৫। সুথরাশাহী গৃহস্থও উদাসীন বা সন্ন্যাসী। ইহারা দুইটী কাঠী

বাজাইয়া গুরু নানক সম্বন্ধীয় গান গায়; ইহারা শ্বেত বসন পরিধান করে; কিন্তু মস্তক ও গলদেশে কৃষ্ণবর্ণ রজ্জু ধারণ করে। এই রজ্জু পশম নির্ম্মিত।

৬। রাংরেতিগণ নিকৃষ্ট; ইহারা চামার (চর্ম্মকার) শ্রেণীভুক্ত। ইহারা গুরু গোবিন্দ সিংহের মতাবলম্বী।

উদাসী ও নির্ম্মলগণ আপনাদের ভোজনের নিমিত্ত অন্ন পাক করে না। ইহারা হয় দ্বারে-দ্বারে ভ্রমণ পূর্ব্বক প্রস্তুত অন্ন ভোজন করে; নতুবা ক্ষেত্রে (ছত্রে) গমন পূর্ব্বক ভোজন করে। অনেকের নিজস্ব আয় আছে; অনেকে ধনী শিষ্যগণ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হয়। ইহারা ভিক্ষাকালে 'নারায়ণ' শব্দ উচ্চারণ করে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের গৃহে দাল, ভাত ও রুটী ভোজন করিবে; কিন্তু শূদ্রের গৃহে কেবল পক্বান্ন (পুরী, তরকারী, মিঠাই ইত্যাদি) ভোজন করে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারি বর্ণের মধ্যে যে কোন বর্ণের স্পৃষ্ট জল পান করিতে কোন আপত্তি নাই। ইহাদিগের মধ্যে যাহারা সন্ন্যাসী, তাহারা আমরণ অবিবাহিত থাকে; যাহারা গৃহস্থ হইতে ইচ্ছা করে, তাহারা আপন শ্রেণীস্থ পরিবার-মধ্য হইতে কন্যা মনোনীত করিয়া লয়। কেহ-কেহ উপপত্নী রক্ষা করে। শূদ্রগণের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে। উদাসীনগণ দিবসের মধ্যে একবার ভোজন করে; অপরে দিবা-রাত্রির মধ্যে দুইবার আহার করে। ইহাদের মধ্যে তাম্রকূট, মদ্য ও মাংস ব্যবহার নিষিদ্ধ; কিন্তু কোন-কোন উদাসীকে নস্য গ্রহণ করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। যাহারা গৃহস্থাশ্রমে বাস করে, তাহারা স্ব-স্ব জাতীয় রীতি অনুসারে পান ও ভোজন করিয়া থাকে। ইহাদিগের পাকপাত্র হিন্দুদিগের ন্যায়। ইহাদিগের ধর্ম্মালয়ের নাম 'সঙ্গৎ'। তথায় ইহারা নানকের গ্রন্থ অর্চ্চনা করে। ইহাদিগের প্রধান তীর্থ অমৃতসর; কিন্তু ইহারা জগন্নাথ, বদ্রিকাশ্রম, সেতুবন্ধ রামেশ্বর, দ্বারকা প্রভৃতি তীর্থস্থানেও গমন করিয়া থাকে; এবং হিন্দু দেব-দেবীর উপাসনা করে। 'জয় গুরু কি ফতে' বলিয়া ইহারা পরস্পরকে অভিবাদন করিয়া থাকে। কিন্তু উদাসিগণ 'দণ্ডবৎ' শব্দ উচ্চারণ করে। মঠধারী ও গৃহস্থের শব দাহ হইয়া থাকে। সন্ন্যাসীগণের শব নদী-জলে নিক্ষিপ্ত হয়। নানক-কথিত গ্রন্থ ব্যতীত ইহাদিগকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও শক্তির অর্চ্চনা করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। গুরুগণ গ্রন্থ পাঠ করেন এবং শিষ্যগণকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন। শিষ্য-প্রদত্ত সমস্ত দ্রব্যই গুরু গ্রহণ করেন এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে শিষ্যের পরামর্শ গ্রহণ করেন।

নানকশাহীদিগের ছয় শাখার বিশেষ বিবরণ বারান্তরে প্রকাশিত হইবে।

বকাসুরের হাড়

[শ্রীসত্যেশচন্দ্র গুপ্ত, এম্‌-এ]

বক রাক্ষসের হাড় লইয়া ভেল্কী খেলিবার উদ্দেশ্যে আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হই নাই। কারণ আমার সে গুণ নাই। প্রত্নতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, বা ইতিহাসের ধারা আমি জানি না। এককালে কিন্তু, প্রত্নতাত্ত্বিকের গৌরবময় পদলাভের ইচ্ছা আমাকে অদ্ভুতকার প্রদর্শিত অস্থিখণ্ড সংগ্রহে চেষ্টান্বিত করিয়াছিল। এখন পুরাতত্ত্ব মহার্ণবে হাবুডুবু খাইয়া, প্রত্নতত্ত্বের কঠিন শিলায় আঘাত প্রাপ্ত হইয়া, সে বাসনা লয় পাইয়াছে। তবে আমার মত ঐতিহাসিক-যশঃ-প্রার্থিগণকে সাবধান করিয়া দিবার মানসে অদ্য 'হাড়ের' কথা বিবৃত করিতে সাহসী হইতেছি। আপনারা ধৈর্য্য ধরিয়া শ্রবণ করিলে কৃতার্থ হইব।

একচক্রায় অজ্ঞাতবাসে অবস্থানকালে, ভীম যখন পঙ্কগ্রাহী বক রাক্ষসের নিধন করেন, তখন তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে অসুরের অস্থি ভবিষ্যতে গণ্যমান্য সাহিত্যসেবীর আসরে স্থান পাইবে। আপনারা অধীর হইবেন না,—অগৌণে দেখিতে পাইবেন যে, এই অস্থিখণ্ড লইয়া আমার মত লেখকাসুরের বদন ব্যাদান সম্ভব হইলেও, ইহা হইতে বকাসুরের পুনর্জ্জন্মলাভ ও তৎপরে বিদ্বানমণ্ডলীকে গ্রাস করিবার অভিপ্রায়ে তাণ্ডব নৃত্য একবারে অসম্ভব। অস্থিখণ্ডের ইতিহাস—ক্ষমা করিবেন—ইতিহাস নহে, কাহিনী—আপনাদের নিকট ব্যক্ত করিলে, আপনারা আশ্বস্ত হইবেন।

১৯১২ খৃঃ অব্দের জুন মাসে কর্ম্মোপলক্ষে যখন মেদিনীপুর জিলার তমোলুক মহকুমায় ছিলাম, তখন তথাকার হ্যামিল্টন স্কুলের প্রাঙ্গণে বাঁধান এক খণ্ড প্রস্তরের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। অনুসন্ধানে জানিলাম যে, কোন এক প্রত্নতত্ত্বগ্রস্ত মুন্সেফ মহাশয় উহা গড়বেতার জঙ্গল হইতে আনয়ন করিয়া বিদ্যালয়ে প্রোথিত করিয়া যান। দুর্ভাগ্যবশতঃ মুন্সেফ মহাশয়ের নাম জানিতে পারি নাই। একরূপ ভাল হইয়াছে; কারণ অস্থি আবিষ্কারের গৌরবের ভাগী তাঁহাকে করিতে হইলে যে আমার ধৈর্য্যচ্যুতি হইত! যাহা হউক, তদবধি উক্ত প্রস্তরখণ্ডের আদি-স্থান গড়বেতায় গিয়া নূতন তথ্য প্রচারের দ্বারা ঐতিহাসিক জগৎকে চমকিত করিবার প্রবল ইচ্ছা মনে জাগরূক থাকিল। ঘটনাক্রমে, ১৯১৩ অব্দে মে মাসে বগড়ী পরগণার বন্দোবস্তের কার্য্যে আমাকে আমলাগোড়া ও গড়বেতায় অনেকদিন থাকিতে হয়। আমিও প্রত্নতাত্ত্বিকের যশোলাভের সেই সুবর্ণ-সুযোগ পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না। প্রথমেই বগড়ী পরগণার কিম্বদন্তী সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলাম। জন-প্রবাদ আমার তাম্বুর অনতিদূরে, গণগণির ডাঙ্গায়, মহাভারত-প্রসিদ্ধ বক রাক্ষসের নিধন-ভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করিল। আমি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া প্রত্নতত্ত্বের অনুশীলনে ব্রতী হইলাম। আমলাগোড়ায় মেদিনীপুর জমিদারি কোম্পানির বাঙ্গলার হাতায় রক্ষিত বকরাক্ষসের উরুদেশীয় অস্থির অংশ লইয়া, দাহ, চূর্ণ, ঘ্রাণ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চলিতে লাগিল। ক্রমে, আমার মনে গণগণির ডাঙ্গার ভূগর্ভস্থ অস্থি উত্তোলন করিবার স্পৃহা জন্মিল। কিন্তু বগড়ী পরগণার ব্রাহ্মণগণ নিষেধ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন যে অসুরের হাড় ঘরে আনিলে পারিবারিক সর্ব্ববিধ অনিষ্ট, এমন কি বংশ-লোপ পর্য্যন্ত হইবে। আর কোদালীর আঘাতে রাক্ষস-পুঙ্গবের আত্মা জাগিয়া উঠিলে, খননকর্ত্তার আশু

বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, এ কথাও তাঁহারা প্রচার করিলেন। কিন্তু স্বদেশের উপকারার্থ, ও সত্যোদ্ঘাটনের চেষ্টায় মৃত্যুও শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়া, আমি ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। ষোড়শজন বলিষ্ঠ সাঁওতাল কুলির সাহায্যে, শিলাবতী-তীরে, গণগণির ডাঙ্গার প্রান্ত-দেশে ৫ ঘণ্টাকাল খননের পর ৬ ফিট দীর্ঘ, অসুরের হাঁটুর অস্থির উদ্ধার করিলাম। আনন্দের পরিসীমা রহিল না। কিন্তু ডাঙ্গায় উত্তোলন কালে অস্থি দ্বিখণ্ড হইল। যাহা হউক, কোনরূপে খণ্ডদ্বয় তাম্বুতে আনয়ন করিয়া জনপ্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া গভীর গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলাম।

সন্দেহের কি কোনও কারণ থাকিতে পারে? মহাভারতের বর্ণিত সমস্ত কথাই ত মিলিয়া যাইতেছে! ঐ যে শিলাবতীর উত্তর পারে "একেড়ে" গ্রাম,—উহাই ত একচক্রার অপভ্রংশ! একচক্রায়, ব্রাহ্মণ পরিবারে গোপনে পঞ্চপাণ্ডব ও কুন্তীদেবীর অবস্থানকালে, তাঁহারা ভিক্ষা দ্বারা অন্ন সংগ্রহ করিতেন। অর্দ্ধেক ভীম খাইতেন, আর অর্দ্ধেক অপর চারি ভ্রাতা পাইতেন। একচক্রার নিকটে ঐ যে "ভিক্‌নগর";—পঞ্চপাণ্ডব ভিক্ষা করিতেন বলিয়াই ত উহার ভিক্‌নগর নাম! ইহাতে মূর্খ লোকেরই সন্দেহ হওয়া সম্ভব। গ্রাম্য কবির ভাষায়—

"ভিক্ষা করিতেন পাণ্ডুপুত্র গুণাকর।
একেড়ের দক্ষিণেতে সে ভিক্‌নগর॥" (১)

বাহুবলশালী ভীম অজ্ঞাতবাসেও কি অলস থাকিতে পারেন! একচক্রার যুবকগণকে তিনি নানাবিধ ক্রীড়া-কৌশল শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাঁহার 'আখড়া' যে স্থানে ছিল, ভবিষ্যতে তাহা "ভীম-পুর" নামে প্রচারিত হইল। 'ভীমপুর' ত একেড়ের পশ্চিমে অর্দ্ধ-ক্রোশ-মধ্যে অবস্থিত। মহাভারতের আদি পর্ব্বে ব্যাসদেব বর্ণনা করিয়াছেন যে, একচক্রায় লক্ষাধিক লোকের বাস ছিল; নিশ্চয়ই সেখানে অনেক বাণিজ্যগোলা ও অনেক হাট ছিল। একেড়ের পার্শ্বেই, তাই, "গোলা হাট হাট পাড়া" গ্রাম!

"সহরেতে বহু গোলা বহু হাট পাড়া।
একেড়ের পার্শ্বে "গোলা হাট হাটপাড়া॥" (২)

ইহাতেও যদি সন্দেহের কারণ থাকে, তাহা হইলে অকাট্য প্রমাণ দিতেছি, শ্রবণ করুন। একচক্রায় বক নামক এক রাক্ষস বাস করিত। সেই সেখানকার রাজা ছিল। তাহার মত দুর্দ্দান্ত ও বিক্রমশালী সে অঞ্চলে আর কেহ ছিল না। নগরবাসী সকলে, তাহার কর স্বরূপ "পঞ্চক" নির্ণয় করিয়া দিয়াছিলেন। কাশীরামের ভাষায়—

নগরের মধ্যে ইথে আছে যত নর।
রাক্ষসের নির্ণয় করিল এই কর॥
পায়স পিষ্টক অন্ন শকট পুরিয়া।
এক নরবলি দুই মহিষ করিয়া॥
এই কর বিনা অন্য নাহিক তাহার।
বহুকালে ঘর প্রতি পড়ে একবার॥ (৩)

এখনও এই "পঞ্চক" কর যে বগড়ী পরগণায় প্রচলিত! বগড়ীর ব্রাহ্মণগণ পায়স, পিষ্টক, অন্ন, ১ নর, ২ মহিষ—এই পঞ্চককর দেন না বটে; এবং আপনারা জানেন, বিষ্ণুপুরের রাজবংশ-প্রদত্ত কতকগুলি লাখরাজ মহাল পঞ্চকি মহাল নামে খ্যাত। প্রচলিত করের পঞ্চমাংশ লইয়া এই সকল ভূমি বিলি হইয়াছিল। পঞ্চক করের ইহাই আদি হইলেও, বগড়ী পরগণা ব্যতীত আর কুত্রাপি এই পঞ্চক-কর যে প্রচলিত নাই! নামের ঐক্য যে ঐতিহাসিক সত্যের সর্ব্বপ্রধান সূত্র। সুতরাং আপনাদের আর কিছু বলিবার রহিল না। যদি থাকে তবে "বগড়ীর" নামতত্ত্ব শুনিলে আর বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইবে না। আপনারা সপ্তদ্বীপের অন্যতম জম্বু-দ্বীপের বিষয় জানেন। সে দেশে খুব জাম গাছ আছে, সেইজন্য জম্বুদ্বীপ নাম। প্রমাণ যথা,—কুশদ্বীপে কুশ আছে, শাল্মলী দ্বীপে শিমূল গাছ আছে—আর কত চান?

জম্বুদ্বীপ সপ্তদ্বীপের মধ্যে প্রধান; তাহার উপর আবার বকদ্বীপ প্রধানতম। প্রমাণ শ্রবণ করুন।

"শম্ভুশিরে ফণি তদুপরে যথা মণি।
জম্বুপরে বকদ্বীপ উজলে তেমনি॥
দ্বীপের উপরে দ্বীপ অক্ষয় প্রদীপ।
সে কারণে হ'ল নাম খ্যাত বকদ্বীপ॥"
(বগড়ীর কৃষ্ণরায় ছড়া।)

বকদ্বীপ যে বগড়ী, তাহা বহুপূর্ব্বে নির্ণীত হইয়াছে। বিশ্বকোষ বলেন, "বিষ্ণুপুরের চারি ক্রোশ দক্ষিণে মল্লভূমির অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম বকদ্বীপ। এখানে কৃষ্ণরায়ের প্রসিদ্ধ মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। 'দেশবাসী' পাঠে জানা যায়, এই স্থান বগড়ী নামে পরিচিত (বিশ্বকোষ, ১৭শ খণ্ড, ৩৬৬ পৃঃ)। আপনাদের অবিদিত নাই, বগড়ী পরগণার উত্তর-পশ্চিম সীমায় বর্ত্তমান বাঁকুড়া জিলার বিষ্ণুপুর মহকুমা অবস্থিত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বকাসুর এই দ্বীপের রাজা ছিল। সেই জন্যই যে ইহার বকদ্বীপ নাম হইয়াছে, তাহা কে না বলিবে? বকের "ডিহি", অর্থাৎ গ্রাম—বকডিহি। বক "ডিহি" হইতে "বগড়ী" অপভ্রংশ অতি সহজ ও সুসাধ্য।

ইহাতেও আপনাদের সন্দেহের নিরাকরণ হইল না? তবে এক-বার আমলাগোড়ার পশ্চিমে, গণগণির বনে গিয়া অসুরের রক্তাপ্লুত

(১) বগড়ী পরগণার নোহারি গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সরকার প্রণীত "বগড়ীর কৃষ্ণরায়, দেখ্‌লে প্রাণ জুড়ায়" নামক মুদ্রিত ছড়া হইতে।—লেখক।

(২) বগড়ীর কৃষ্ণ রায় হইতে।

(৩) মহাভারত—কাশীরামদাস, আদি পর্ব্ব, "পাণ্ডবগণের এক-চক্রা নগরে বাস ও বক বধ বৃত্তান্ত"।

ভূমি স্বচক্ষে দর্শন করিয়া আসুন। গভীর বন পাইবেন না বটে, তবে ঈষৎ রক্তাভ-কৃষ্ণবর্ণ, প্রচুর পরিমাণে ল্যাটিরাইট মিশ্রিত মাটির বর্ণ, ও বিশুষ্ক রক্তের বর্ণের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখিতে পাইলে আমি হার মানিব। "গণগণি" নামেরও কি কোনও সার্থকথা নাই? কাশীদাস আদিপর্ব্ব পাঠ করুন, দেখিবেন, কিরূপে বীর বৃকোদর 'বাম হস্তে দুই জানু ডান হস্তে শির' লইয়া, বুকে জানু দিয়া, বকারাক্ষসের দেহ একেবারে ভাঙ্গিয়া দুইখানা করিয়া দিলে, 'গণগণ' মহাশব্দে বক প্রাণত্যাগ করিল। মহাভারতে অবশ্য 'গণগণ' শব্দ নাই; তথাপি গণগণির ডাঙ্গার যে ঐ ভয়াবহ শব্দ হইতে নামকরণ হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহের কোন কারণ দেখি না।

আপনারা বিশ্বাস না করিলে চলিবে না, প্রমাণ অজস্র দিব। অসুরের "পদজঁখা" এখনও বিদ্যমান, 'কাদবনি জঁখাতে' কি তাহাই সূচিত হইতেছে না? তাহার অর্দ্ধক্রোশ দূরে 'তালজিয়া' গ্রামে অপর এক পদ দেখিতে পাইবেন! রঘুনাথপুরে যে সুদীর্ঘ বিল দেখিতে পাইতেছেন, তাহা যে বকাসুরের পাঁজ, তাহা কি আপনাদের বিদিত নহে?

আপনারা কি মহাভারত-বর্ণিত, একচক্রা নগরীর অনতিদূরে অবস্থিত, "বেত্রকীয় গৃহ" নামক নগরের কথা বিস্মৃত হইয়াছেন? গড়-'বেতা' নামের মধ্যে 'গড়' ত মেদিনীপুর-সুলভ উপসর্গ মাত্র। স্থানটির আসল নাম 'বেতা'—আপামর সাধারণ এই নাম ব্যবহার করেন। 'বেতা' যে 'বেত্রকীয়' গৃহের অপভ্রংশ, তাহা কি আর বলিয়া দিতে হইবে? এই বেত্রকীয় গৃহের রাজা প্রজাপীড়ক ও অত্যাচারী ছিলেন, বক-রাক্ষস তাঁহাকে নিহত করিয়া বেত্রকীয় গৃহ অধিকার করিয়া বসে।

পুনশ্চ, আরার ব্রাহ্মণেরা বলিয়া থাকেন যে, ভীম 'মঙ্গলবারে' বকাসুর বধ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, বগড়ীর 'বেতা' পুরাকালে, 'বেত্রী' নামক বিশাল নগর ছিল, যথায় বিক্রমাদিত্য রাজা সিদ্ধ হইয়া, বেতাল হইয়াছিলেন। এই বেতা নগরেই বকরক্ষঃ নিধনের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ দেবী "সর্ব্বমঙ্গলা" অধিষ্ঠিতা আছেন। গড়বেতার ১৬ ক্রোশ দক্ষিণে, কংশাবতী নদীতীরে 'গোপের অস্তিত্ব' বিদিত আছেন ত? 'গোপই' যে বিরাট রাজার দক্ষিণ গোগৃহ, তাহার প্রমাণ স্বরূপ 'গোপগড়ের' বাহিরে 'গোপনন্দিনী বন্দিনী' বিদ্যমান রহিয়াছেন।

এখনও সন্দেহ? বুঝিলাম, আপনারা শ্রীকবিকঙ্কণের 'চণ্ডিকা-মঙ্গলে' বর্ণিত 'বগার' কথা ভাবিতেছেন। 'বগা' হইতে 'বগড়ীর' উৎপত্তি চিন্তা করা বাতুলের কার্য্য। যদিও বগড়ী ডিহির পাশ দিয়া 'বগা' এখনও প্রবাহিতা, তথাপি ইহা স্বীকার্য্য হইতে পারে না যে, বগা হইতে বগড়ী নামের উৎপত্তি হইয়াছে। কথিত আছে যে, শ্রীশ্রীচৈতন্য-দেবের সহচর শ্রীদাম অভিরাম গোপাল বকদ্বীপে শ্রীশ্রীকৃষ্ণরায়জীউ দর্শন মানসে আসিয়াছিলেন। বগড়ীডিহির আইচ্ রাজার সভা-পণ্ডিত রাজ্যধর রায় উক্ত বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহা হইলে দেখিতেছেন, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতেই বগড়ী কৃষ্ণনগরে শ্রীশ্রীকৃষ্ণরায়জীউ প্রতিষ্ঠিত আছেন। সুতরাং বগা হইতে বগড়ী নাম হয় নাই। দেখিতেছি, আপনাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলাম না। অতএব বগড়ীর শ্রীশ্রীকৃষ্ণরায়জীউ আপনাদের সন্দেহ ভঞ্জন করুন।

আমি ত অকাট্য যুক্তি বলে সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলাম যে, একেড়াই একচক্রা, আর মেদিনীপুরই মৎস্যদেশ। কিন্তু দেখিতেছি যে, পুরাতত্ত্বের কণ্ঠকাকীর্ণ ক্ষেত্রে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী অনেকে ছিলেন ও আছেন। বহু পূর্ব্বেই বিচিত্র প্রমাণ প্রয়োগের দ্বারা সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে যে, বরেন্দ্রভূমিই (রাজসাহী) মহাভারত-প্রসিদ্ধ বিরাট রাজ্য। আবার, বিহার প্রদেশস্থ সাহাবাদ অর্থাৎ আরা জিলায় বিরাট রাজার ভূরি-ভূরি কীর্ত্তি-চিহ্ন, আমার অনেক পূর্ব্বেই আবিষ্কৃত হইয়া গিয়াছে। বিপদের উপর বিপদ,—একখণ্ড অস্থি কলিকাতার সাহিত্য-পরিষদে পাঠাইবার পূর্ব্বে, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের 'বিশ্বকোষে' আমার সপক্ষে প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা করিতে গিয়া দেখি যে, তিনি তিনটী বিরাটের কল্পনা করিয়াছেন। মধ্য-ভারতের জয়পুরের সন্নিকটস্থ বৈরাট পর্ব্বতের উপত্যকায় আদি বিরাট, আরাতে পূর্ব্ব বিরাট, আর তাঁহার নিজাবিষ্কৃত ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের কোঁইসারী গ্রামে দক্ষিণ বিরাটের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মেদিনীপুর বা রাজসাহীকে আমল দেন নাই। আমি ত অবাক্। মেদিনীপুর জিলার দক্ষিণ সীমা-সংলগ্ন রাইবনিয়ার গড় ও জঙ্গল যদি দক্ষিণ বিরাটের অন্যতম কীর্ত্তিস্থল হয়, তাহা হইলে রাইবনিয়া গড়ের ১০ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে, এই জিলায় নয়াগ্রাম পরগণা-স্থিত চন্দ্ররেখাগড়, যাহা রাজা চন্দ্রকেতু কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া কথিত হয়, (ইনি লক্ষ্মণের পুত্র চন্দ্রকেতু কি না, ঐতিহাসিকগণ তাহা নির্ণয় করিবেন) এবং তাহারই দুই ক্রোশ পূর্ব্বে দোল গ্রামে হুসেন রাজা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত দোলমঞ্চ, দক্ষিণ বিরাটের সহিত সম্বন্ধযুক্ত নহে কেন? স্বীকার করি, উভয় পক্ষেরই প্রমাণাভাব; কিন্তু ঐতিহাসিক মামলা প্রমাণাভাবে খারিজ করিবার বিধান নাই, তাহা আপনাদের অজ্ঞাত নহে।

এ দিকে আর এক বিপদ উপস্থিত হইল। আমার ফানুনগো মৌলভী আবু সায়েদ মহাশয়, আমার প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসা সংক্রামিত হওয়ায়, অসুরাস্থির একখণ্ড লইয়া বীরভূম জিলার রাজনগরের সন্নিকটে তাঁহার বাস-গ্রামে লইয়া গেলেন। অদূরে 'একচক্রা' গ্রামস্থিত, বকাসুরের বিশাল অস্থি, অভিমান ও ঈর্ষ্যায় কম্পিত হইল। আমি বীরভূমবাসী। বীরচন্দ্রপুর ওরফে একচক্রাও দেখিয়া আসিয়াছি, বকাসুরের কথাও শুনিয়াছি। নিকটে 'ভীমগড়া' 'অর্জ্জুনপুর' ত আছেই। কিছুদূর দক্ষিণে অজয়নদের তীরে, পঞ্চ পাণ্ডবের অজ্ঞাত-বাস কালে তৎকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত "পাণ্ডবেশ্বর" মহাদেব অজ্ঞাতবাসের সাক্ষীরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন। মনে হইল, নিজের জিলাকেই বা কেন বিরাটরাজ্যের গৌরব-প্রভায় মণ্ডিত না করি? কিন্তু তাহা হইলে আমার আবিষ্কারের দশা কি হইবে?

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট

শুনিলাম যে, রঙ্গপুর জিলাতেও বিরাট রাজার গোগৃহ বিদ্যমান। এখন করি কি? হতাশ হইয়া মৌলিক গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলাম। আর মৌলিকতার প্রধান উপকরণ, Cunningham, Hunter, Price, Bailey, Ricketts প্রভৃতি মেদিনীপুরের ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থের শরণাপন্ন হইলাম। কি দুর্দ্দৈব! কোথাও আমার আবিষ্কারের সপক্ষে পোষক প্রমাণ খুঁজিয়া পাইলাম না। উপরন্তু, দেখিলাম যে, তাঁহারা গোপগড়কে, 'Den of a robber chief' অর্থাৎ দস্যু সর্দ্দারের গুপ্তাবাস বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। গড়বেতার মহাভারতীয় ব্যাখ্যা ত ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়াছেন। সকলই তাঁহাদের অজ্ঞতার ফল!

একেবারে নিরাশ হইলাম না। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায় অসুরাস্থির একখণ্ড পরীক্ষার্থ, শিবপুর ইন্‌জিনিয়ারিং কলেজে লইয়া গেলেন। উক্ত কলেজের ভূতত্ত্ব ও খনিজ-বিদ্যার অধ্যাপক অস্থিখণ্ডের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিলেন। বড় আশায় পরীক্ষার ফল জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম। কিন্তু ইন্দু বাবুর পত্র পাইয়া স্তম্ভিত হইলাম। তিনি লিখিলেন যে, প্রস্তরখণ্ড কোন প্রকারেই Osam fossil অর্থাৎ প্রস্তরীভূত অস্থি হইতে পারে না; পরন্তু উহা নিঃসন্দেহে fossilised wood অর্থাৎ প্রস্তরীভূত দারু। হায় রে কপাল! আমার এই সুদীর্ঘ ৪ বৎসরের সমস্ত শ্রম বৈজ্ঞানিকের বিশ্লেষণের ফলে পণ্ড হইয়া গেল! প্রমাণিত হইল যে, আমি যাহা সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা 'হাড়' নহে পাথর, কেবল পাথর নহে প্রস্তরীভূত দারু। আমি একেবারে হাল ছাড়িয়া দিবার পাত্র নহি। সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় তাঁহার প্রণীত 'পৃথিবীর ইতিহাসে' ভরসা দিয়াছেন যে, বঙ্গদেশে বিরাট রাজ্যের শাখা থাকা অসম্ভব নহে। তবে বরেন্দ্রখণ্ডের দিকে, স্বভাবতঃই, তাঁহার টান বেশী। রাঢ়ের দিকে কাহারও দৃষ্টি পড়িবে না।

এখন ত পৌরাণিক revivalএর যুগ। ভারতে, বৌদ্ধ প্রভাব খর্ব্ব হইবার পর এইরূপ এক যুগ আসিয়াছিল যখন, বৌদ্ধ কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষের উপর পৌরাণিক কীর্ত্তিনিচয় উজ্জ্বলতররূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই যুগের চেষ্টার ফলে, এখন ভারতে একই মুনির একাধিক আশ্রম, অসংখ্য গুপ্ত-কাশী ও গুপ্ত-বৃন্দাবন, একাধিক পঞ্চবটী বন, প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। সেই যুগের চেষ্টার ফলে দুর্দ্দশাগ্রস্ত পঞ্চপাণ্ডবকে আর্য্যাবর্ত্তের সমস্ত দেশ পরিভ্রমণ করিয়া শ্রান্ত হইতে হয় নাই; পরন্তু, সুদূর দাক্ষিণাত্যে ও আমাদের এই বঙ্গদেশের জিলায় জিলায় অজ্ঞাতবাস করিতে হইয়াছিল। এই revival বা পুনরুত্থানের ধারা এখনও সমভাবে প্রবাহিত। আমার জন্মভূমি গোপালপুরের কিছুদূর পশ্চিমে নব-বৃন্দাবনের বাল্য-কল্পনাচিত্র এখনও মানস নয়নে প্রতিভাত হয়। বৃদ্ধা ঠানদিদি চিরকাল বলিয়া আসিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের আটপৌরে বৃন্দাবনে অরুচি ধরিলে, তিনি বিশ্বকর্ম্মাকে নূতন বৃন্দাবন প্রস্তুত করিতে আদেশ করেন। বিশ্বকর্ম্মার মহা মুস্কিল! তাঁহাকে যে রাতারাতি পুরী প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতে হয়! কতকগুলি বড় বড় প্রস্তরখণ্ড ও কামিনী পুষ্পের গাছ লইয়া, বিশ্বকর্ম্মা যেমন দুবরাজপুর পার হইয়াছেন, অমনি ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে কোকিল ডাকিয়া উঠিল। বিশ্বকর্ম্মা বেচারী সেই জন্য দুবরাজপুরের নিকটে 'মামাভাগনে' পাথর, ও আমাদের গ্রামের পশ্চিমে কামিনী বৃক্ষ রাখিয়া অন্তর্হিত হইতে বাধ্য হইলেন। নহিলে এই সব আসিল কোথা হইতে? আবার, ভাগলপুরেই ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রম থাকার কথা শুনিয়াছিলাম। কিন্তু, লোক-গণনা কার্য্যে যখন বীরভূম জিলার বোলপুর থানায় যাই, তখন আর একটী ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম দেখিতে পাইলাম। বশিষ্ঠ মহাশয়কেও, বীরভূমের ময়ূরেশ্বর থানার নিকটে আশ্রম বাঁধিতে হইয়াছিল,—নর্ম্মদা-তীরে নহে। আমাদের মত নগণ্য লোকের কথা আপনারা অবশ্য উড়াইয়া দিতে পারেন; কিন্তু আপনারা বোধ হয় জ্ঞাত আছেন যে, কলিকাতার কোনও প্রথিতনামা দার্শনিক ও সাহিত্যিক মহাশয়ের গুরু চট্টল অঞ্চলে মেধস মুনির আশ্রম আবিষ্কার করিয়াছেন; কেবল আমার সাধই কি অপূর্ণ থাকিবে? আপনারা যাহাই বলুন, আমি নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে বলিতে পারি যে, এই যে প্রস্তরীভূত দারু,—এই দারু প্রহারেই বীরবপু বৃকোদর বকাসুরের বিশাল দেহ জর্জ্জরিত করিয়াছিলেন। প্রমাণ, মহাভারতে; যথা—

"ভোজনান্তে বৃকোদর কৈল আচমন।
বৃক্ষ উপাড়িল এক ঘোর দরশন॥
বৃক্ষে বৃক্ষে যুদ্ধ হইল না যায় কথনে।
উচ্ছন্ন হইল বৃক্ষ না রহিল বনে॥"

—(কাশীরাম দাস, আদি পর্ব্ব।)

এক্ষণে আপনারা উক্ত রূপ ব্যবস্থা আমার প্রতি প্রয়োগ না করিলেই বাঁচি। *

রসায়ন-শাস্ত্র

[শ্রীআদীশ্বর ঘটক]

ভারতবর্ষে রসায়ন-শাস্ত্রের চর্চ্চা অনেক দিন পূর্ব্বে হইয়াছিল। এক আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রই তাহার প্রমাণ। তন্ত্র-পুরাণেও তাহার প্রকীর্ণ অংশ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এখনকার দিনে রসায়ন-শাস্ত্র বলিতে যাহা বুঝায়, পুরাতন ভারতে তাহা বুঝাইত না। রস শব্দে পারদের নানাবিধ পরিবর্ত্তন বুঝাইত। ভারতীয় রাসায়নিকেরা পারদকে ধাতু বলেন নাই।

"স্বর্ণং রূপ্যঞ্চ তাম্রঞ্চ বঙ্গং যশদমেব চ।
সীসং লৌহঞ্চ সপ্তৈতে ধাতবো গিরিসম্ভবা॥"

উক্ত বচনে পারদ উল্লিখিত হয় নাই। এ প্রবন্ধে আমি কেবল

---

* মেদিনীপুর সাহিত্য-সমাজের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে এই প্রবন্ধ লেখক কর্ত্তৃক পঠিত হইয়াছিল।

পারদ সম্বন্ধীয় কথাই বলিব। পারদ তরল পদার্থ। ভারতে বহু-কালাবধি উহার ব্যবহার আছে। এখানে উহা শিববীর্য্য বলিয়া প্রসিদ্ধ।

"শিবাঙ্গাৎ প্রচ্যুতং রেতঃ পতিতং ধরণীতলে।
তদ্দেহসার জাতত্বাচ্ছুক্লমচ্ছমভূচ্চতৎ ॥"

ঐ ভাবে হরিতাল হরির, মনঃশিলা লক্ষ্মীর, এবং গন্ধক পার্ব্বতীর বীর্য্য বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। এই সকল কথা কি রহস্যপূর্ণ নহে?

বহুপূর্ব্বকালে যে সময়ে চরক ঋষি চরক-সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে পারদ-ঘটিত কোনও ঔষধের কথা তিনি জানিতেন না। কথিত আছে, ভগবান্ মহেশ্বর তন্ত্রশাস্ত্র-মধ্যে প্রথমতঃ এই পারদ পদার্থের ব্যবহার প্রণালী প্রকটিত করিয়াছেন।

"ভূতানুকম্পা প্রবনো মহেশঃ।
শ্মশানবাসী জগদাদিনাথঃ ॥
স্ববীর্য্যযুক্তা গদযোগরত্নৈঃ।
কীর্ণানি তন্ত্রানি বহুনি চক্রে ॥"

শ্মশানবাসী জগদাদিনাথ মহেশ্বর ভূতানুকম্পাপরবশ হইয়া স্ববীর্য্য (পারদ) ঘটিত নানাবিধ যোগরত্ন (অর্থাৎ প্রেস্‌ক্রিপসন্) তন্ত্র মধ্যে প্রকীর্ণ অংশ রূপে প্রকাশিত করিয়াছেন।

"রস প্রবন্ধাস্বধুনাতনাযে।
তন্মূলকা এব কৃতা সুধীভিঃ ॥"

আজকাল সকল চিকিৎসা-শাস্ত্রেই পারদের ব্যবহার-প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়; ভগবান্ মহাদেব-প্রকটিত ঐ সকল প্রবন্ধই তাহার মূল। পরে অন্যান্য মহাত্মগণও পারদ ঘটিত গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

"অতঃ সিদ্ধো নিত্যনাথঃ পার্ব্বতী-তনয়ঃ সুধী।
রস রত্নাকরাখ্যঞ্চ রসগ্রন্থঃ প্রণীতবান্ ॥

পার্ব্বতী-তনয়, (অর্থাৎ শক্তি-উপাসক) সিদ্ধ, সুবুদ্ধিমান্ নিত্যনাথ নামক মহাত্মা রসরত্নাকর নামে এক গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

"রসেন্দ্র-চিন্তামণি নামধেয়ং।
টুণ্টুনিনাথো ভিষগগ্রগণ্যঃ ॥
রসেন্দ্র যুক্তৈর্বিবিধৈশ্চকারঃ।
সুভেষজৈঃ কীর্ণমতীব চিত্রম্ ॥

চিকিৎসক-প্রধান টুণ্টুনিনাথ রসেন্দ্র-চিন্তামণি নামক একখানি রস-গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে পারদ সম্বন্ধীয় অনেক আশ্চর্য্য ঔষধের কথা লিখিত হইয়াছে। "রসেশ্বর-দর্শন" নামক একখানি দর্শন-শাস্ত্রও আছে। গোপালকৃষ্ণ কবিরাজ কৃত "রসেন্দ্রসার সংগ্রহঃ" নামক চিকিৎসা-গ্রন্থে উল্লিখিত ঔষধাদির খুব প্রচলন এখনো দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া এক্ষণে যাহা বুঝিতে পারা যায়, তাহা বর্ত্তমান যুগের কেমিষ্ট্রি নহে; তাহা আর কিছু। আমি নিজে ঐ বিষয়ে যে প্রকার বুঝিয়াছি, তাহাই আমার বলিবার ইচ্ছা হইয়াছে। তন্ত্র-শাস্ত্রে পারদ লইয়া সাধারণতঃ দুই প্রকার সাধনা হইয়াছে। প্রথমতঃ, উহাকে রোগনাশক নানাবিধ দিব্যৌষধিতে পরিণত করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, উহাকে ভালরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া উহা দ্বারা সুবর্ণ প্রস্তুত করিবার প্রথা বর্ণিত হইয়াছে। শেষোক্ত এই কথা লইয়া বহুকাল হইতেই বাদানুবাদ চলিয়া আসিয়াছে। প্রিষ্টলি, ড্যালটন্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণের Atomic Theory মতে তাম্রধাতু সুবর্ণ হইতে পারেই না। কিন্তু আধুনিক প্রোফেসর্ র‍্যাম্‌জে যখন ঢাক বাজাইয়া বলিলেন, আমি সুবর্ণ প্রস্তুত করিয়াছি, তবে তাহা সর্ব্ব-সাধারণের সমক্ষে এক্ষণে প্রকাশিত করা যাইবে কি না, তাহা বিবেচনার স্থল, কৈ তখন ত পৃথিবীর কোনও বৈজ্ঞানিক প্রোফেসর কে কিছু বলিতে পারিলেন না। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা এক্ষণে বোধ হয় ঠিক পথে আসিয়াছেন। এখন অনেক বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন, সুবর্ণ প্রস্তুত করা একেবারে অসম্ভব না হইতেও পারে। র‍্যাডিয়ম্-তত্ত্ব, ইউর‍্যানিয়ম্ প্রভৃতি ধাতুর সম্বন্ধে আলোচনা ফলে এক্ষণে সুবর্ণাদি প্রস্তুত করা সম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছে। য়ুরোপের বৈজ্ঞানিকদিগের চিন্তা-তরঙ্গে পড়িয়া হাবুডুবু খাইয়া আমরা এক্ষণে সংস্কৃত গ্রন্থের তীরভূমি পাইয়াছি। এই তীরভূমিতেই আমরা অনেক রত্ন পাইব।

স্বনামধন্য অধ্যাপক সার শ্রীযুক্ত জে, সি, বোস্ সি-আই-ই, দেখিয়াছেন, ধাতু সকলেরও প্রাণ অথবা চৈতন্য আছে। স্বর্ণের পত্রও ক্লোরোফরম্ প্রয়োগের ফলে মূর্চ্ছিত হয়। তন্ত্রশাস্ত্রে শিব বলিয়াছেন—

"হতে হন্তিজরাব্যাধিং মূর্চ্ছিতো ব্যাধিঘাতবঃ।
বদ্ধঃ খেচরতাং ধত্তে কোহন্য সূতাৎ কৃপাকরঃ ॥"

অর্থাৎ পারদ ভস্ম হইলে ব্যাধি, জরা, ও কেশপকাদি রোগ বিনাশ পায়; মূর্চ্ছিত সূত প্রয়োগে নানাবিধ রোগ নাশ করে, এবং বদ্ধসূত মানবকে আকাশ-গমনাদি শক্তি প্রদান করে। অতএব পারদ হইতে মনুষ্যের হিতজনক বস্তু আর কি আছে?

পারদ-ভস্ম ব্যাপারটা কি? যাহা জলের মত গুণসম্পন্ন, তাহার আবার ভস্ম কি? জল কি ভস্ম হয়? বহুপূর্ব্বে আমার মনে এই সকল প্রশ্ন উঠিয়াছিল। তন্ত্রমতে পারদকে ভস্ম করিবার কয়েকটি বিধি আমি সন্ন্যাসীদিগের নিকট হইতে পাইয়াছিলাম। রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ও প্রকাশিত 'ইন্দ্রজালাদি সংগ্রহ' নামক পুস্তকেও কয়েকটা বিধি পাইয়াছিলাম। উহার ভিতরের থিওরি কি, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। যাঁহারা ঐ সকল বিধি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহারাও বোধ হয় উহার থিওরি ভাবেন নাই। একটা বিধি নমুনা স্বরূপ দিতেছি।

"কৃষ্ণসর্পমেকং গৃহিত্বা তস্যমুখে শিববীর্য্যং পূরয়িত্বা সর্পস্ত মুখঞ্চ গুহ্যঞ্চ বদ্ধা নূতন মৃন্ময় স্থালী মধ্যে সংস্থাপ্য স্থালীমুখং মৃদাদিনা সংলিপ্য নির্জ্জন স্থানে প্রাতরারভ্য পুনঃপ্রাতর্যাবৎ বহ্নিনা জ্বালং দদ্যাৎ। ততঃ শুভক্ষণে স্থালীমুখং সমুদ্ঘাট্য সর্পভস্ম বিহায় তৎ শিববীর্য্যং গৃহ্নিয়াৎ। ততস্তোলকমিতং তাম্রং গালয়িত্বা তস্মিন্ গালিত তাম্রে রক্তিক মাত্রং তৎ শিববীর্য্যং দদ্যাৎ তত্তাম্রং তৎক্ষণাদেব সুবর্ণীভূতং জাতমিতি ॥"

কৃষ্ণসর্প (অর্থাৎ কেউটে সাপ) ধরিয়া তাহার মুখে পারদ ঢালিয়া

সর্পের মুখ এবং গুহ্যদেশ উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া একটী নূতন হঁাড়িতে রাখিতে হইবে। পরে সেই হাঁড়ির মুখে সরা রাখিয়া তাহাতে মৃত্তিকার লেপ দিতে হইবে। পরে নির্জ্জন স্থানে প্রাতঃকালাবধি পুনঃ প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত অগ্নির জ্বাল দিতে হইবে। পরে শুভক্ষণে স্থালীমুখ খুলিয়া সর্পভস্ম মধ্য হইতে পারদ গ্রহণ করিবে। একতোলা তাম উত্তাপে তরল করিয়া, তাহাতে সেই পারদ একরতি দিবামাত্রই সেই তাম্র সুবর্ণ হইবে।

লেখকের বয়ক্রম সেই সময়ে ১৮।১৯ বৎসর। সেই সময়ে শিববাক্য সকল যথাথে বিশ্বাস করিতাম। প্রথমতঃ, ঐ কর্ম্ম বড়ই কঠিন বলিয়া বোধ হইয়াছিল। কেউটে সাপ ধরিতে হইবে ত! সেটা নিতান্ত সহজ নহে। যাহা হউক, সেই সময়েও আমি পারদ লইয়া খল করা আরম্ভ করিয়াছি। একদিন দেখিলাম, একজন সাপুড়ে সর্পের বোঝা বাঁকে ঝুলাইয়া তুবড়ী বাজাইয়া চলিয়াছে। আমি তখন তাহাকে ডাকাইয়া একটা কেউটে সাপ চাহিলাম। সে পাঁচ টাকা মূল্যে একটা সর্প আমাকে দিল। তাহার হস্ত দ্বারাই সর্পের দেহের মধ্যে দশ ভরি পারদ পুরিয়া লইলাম। সর্পটাকে হাঁ করাইয়া পারা ঢালিবামাত্রই সমস্ত পারদ সর্পের দেহে প্রবিষ্ট হইল। পরে পিত্তলের তার দিয়া সর্পের মুখ এবং গুহ্যের উপরিভাগে বন্ধন করিয়া একটা নূতন হাঁড়িতে রাখিয়া হাঁড়ির মুখ সরা দিয়া ঢাকিলাম।

এই সময়ে আমি সোণা প্রস্তুত করিবার লোভে এমনি অন্ধ হইয়াছিলাম যে, বিনা কারণে একটা কেউটে সাপ মারিয়া ফেলিলাম! একটা বিষাক্ত সাপ মারিলে আবার পাপ কি? তখন মনের এই অবস্থা। একটা নির্জ্জন বাগানে গিয়া এক গজপুট খুঁড়িলাম। এক হস্ত ব্যাস-যুক্ত এবং দুই হস্ত গভীর একটা গর্ত্ত করিয়া তাহা বনঘুটিয়া দ্বারা পরিপূর্ণ করিতেছি, এমন সময়ে সেই নির্জ্জন বাগানের ধারের পথ দিয়া একজন ভিখারী যাইতেছিল। ভিখারী আমার কর্ম্ম দেখিয়া বাগানের মধ্যে আসিয়া আমাকে নানাপ্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিল। পারা ভস্ম করিবার সময় সত্য কথাই বলিতে হয়; সুতরাং সে ব্যক্তি জীর্ণ, মলিন, গৈরিকধারী হইলেও, তাহাকে সকল কথাই বলিলাম। সে বলিল, "বাবা, তুমি দুইটি মহাপাপ করিতেছ। কেউটে সাপ ব্রাহ্মণ, কেউটে মারিলে ব্রহ্মহত্যা, এবং পারাতে অগ্নি দিলে পুত্রশোক প্রাপ্ত হয়।" অবশ্য তখন এ কথা শুনিয়া আমি হাসিয়াছিলাম। পারাতে অগ্নি দিলে যদি পুত্রশোক প্রাপ্ত হয়, তবে শিব কেন পারদ ভস্মের বিধি তন্ত্রে লিখিযাছেন?

আমি গজপুটে নিজেই অগ্নি দিয়াছিলাম। প্রায় ২৪ ঘণ্টাকাল ঐ স্থালী অগ্নি-মধ্যে ছিল। অপরাহ্নে ঐ গজপুটের বহ্নি নির্ব্বাপিত হইলে, আমি উহা উঠাইয়া লইলাম।

কেহ কেহ বলিলেন, ঐ সরা খুলিবামাত্র এমন একটা বিষাক্ত গ্যাস হঠাৎ নির্গত হইবে যে, তাহাতেই মৃত্যু হইতে পারে। একে কেউটে সাপ, তায় আবার সাক্ষাৎ যমস্বরূপ পারা! বলিতে কি, আমি একটু ভীতও হইয়াছিলাম।

যাহাই হউক, সরা তো খুলিতেই হইবে। আমি প্রাণায়ামও কতকটা অভ্যাস করিয়াছিলাম। মনে-মনে ভাবিলাম, হাঁড়ি খুলিবার সময় নিশ্বাস বন্ধ (কুম্ভক) করিয়া খুলিব। তাহাই করিলাম।

হাঁড়ি খুলিয়া দেখিলাম, সেই সর্পটার সমস্ত দেহ পুড়িয়া অঙ্গার হইয়াছে। সর্পের কাঁটাটি ঠিকঠাক্ পুড়িয়া চূণ হইয়াছে। আর পারদ প্রায় সমস্ত হাঁড়ির নীচে টল্ টল্ করিতেছে। ধীরে-ধীরে সমস্ত পারদটাই ঢালিয়া লইলাম, এবং ওজন করিয়া ৯৮০ পাইলাম। সিকি ভরি আন্দাজ তখন পাইলাম না। মনে করিলাম যে, উহা উড়িয়া গিয়াছে। অগ্নি সন্তাপে পারদ উপিয়াই যায়, কিছুই থাকে না। কি কারণে সেই অষ্টপ্রহরাগ্নি সহ্য করিয়াও সমস্ত পারদ থাকিল? পর দিবস প্রাতে আবার সেই সর্প-ভস্মগুলা দেখিতে-দেখিতে বুঝিতে পারিলাম যে, সর্পের কাঁটা পুড়িয়া যে চূণ হইয়াছিল, সেই চূণের সঙ্গে মিশিয়া অল্প-অল্প পারা রহিয়াছে। তাহা নিতান্ত সামান্য। যাহা হউক, সেই কাঁটাগুলিও রাখিলাম। সর্পের কাঁটা-সংলগ্ন পারদ কোনও মতেই বাছিতে পারিলাম না। একটুতেই তাহা চূণ হইয়া যায়, এবং তখন আর চাকচিক্যও থাকে না।

পারা ভস্ম ত হইল না; মিছামিছি সর্পটা মারিলাম। কিছুদিন পরে একজন আত্মীয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যে সাপ পোড়াইয়া ভস্ম করিলে, সেই ভস্ম তামা গলাইয়া তাহাতে দাও না। দেখ না একবার, কি হয়?"

আমার মনে ছিল, পারদ ভস্ম না হইলে ত সোণা হইবে না; ভস্ম হয় নাই, সুতরাং উহা দেখিবারও প্রয়োজন নাই। কিন্তু আত্মীয়টির বারম্বার জেদে অবশেষে তাম্র গলাইবার ব্যবস্থা করিলাম। আমাদের দেশের স্বর্ণকারেরা এমনি অশিক্ষিত এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন যে, তাম্র গলাইয়া দাও বলিলে, উহারা কোনও মতেই রাজি হয় না। "বিশকর্ম্মা"র বারণ আছে—শুধু তাম্র গলাইবে না। সুতরাং তাম্র গলাইবার ব্যবস্থাও আমাকেই করিতে হইল।

আমি একটা কোক্ কয়লার উনান করিয়া তাহার উপরে একটা টিনের দুই হাত উচ্চ চিম্‌নি করিলাম। মুচী করিয়া তাম্রের পাত রাখিয়া, কয়লার মধ্যে বসাইলাম। পরে উনানের উপর চিম্‌নি বসাইয়া, হাত-পাখার বাতাস দিতে লাগিলাম। সত্বরই তাম্রপাত সকল দ্রব হইয়া নীলবর্ণাভ বহ্নিময় জল রূপ ধারণ করিয়া ঘুরিতে লাগিল।

এখনও এক বিষম সমস্যা উপস্থিত হইল। উত্তপ্ত তাম্র ধাতুর উপর পারদ দিবামাত্রই ছিট্‌কাইয়া উঠিবে, এবং পারদের বিষাক্ত বাষ্প সেই স্থানের বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইবে; সুতরাং এই কার্য্যেও নিঃশ্বাস বন্ধ করা নিতান্ত প্রয়োজন। প্রথমতঃ, তরল পারদ এক রতি একটী ছোট লৌহনির্ম্মিত হাতায় লইয়া তরল তাম্রধাতুর উপর ঢালিয়া দিলাম। দিবামাত্রই উহা ছিট্‌কাইয়া উঠিল, এবং গালিত তাম্র-ধাতু সেই মুচীর মধ্যেই কঠিন ভাব ধারণ করিল। আর সেই মুষার মধ্যে গালার মত একটা পদার্থ সেই তাম্র হইতে নির্গত হইল। উহা সুবর্ণ

THE Emerald Printing Works CALCUTTA

অবসান

শিল্পী— শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ব গচী

হইয়াছে কি না, তাহা বুঝিবার জন্য, এবং উহা পুনর্ব্বার তরল করিবার জন্য খুব জোরে পাথার বাতাস দিতে লাগিলাম। কিন্তু ঐ তাম্র আর কোনও মতেই তরল হইল না। সুতরাং উহা মুষা সমেত উঠাইয়া উহাতে জল দিয়া শীতল করিলাম। দেখিলাম, তাম্র ধাতুর বর্ণ ঈষৎ পীতাভ হইয়াছে; কিন্তু উহাকে সুবর্ণ বলিতে পারা যায় না; কারণ, নাইট্রিক্ এসিড্ দিবামাত্রই উহা হইতে ধূম নির্গত হয়।

এই পরীক্ষা দ্বারা বুঝিলাম, পূর্ব্বোক্ত দত্তাত্রেয় তন্ত্রমধ্যে সংস্কৃত ভাষাতে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা কোন দুষ্টবুদ্ধি লোকের রচনা। উহাতে প্রথমতঃ কৃষ্ণসর্পের হাতেই মৃত্যুর সম্ভাবনা; দ্বিতীয়তঃ ধন-লোভে ব্রহ্মহত্যার পাতক; তৃতীয়তঃ একবার সর্পভস্মের হাঁড়ি খুলিবার সময়, আর একবার গালিত তাম্র মধ্যে পারদ প্রয়োগ কালে নিঃশ্বাসের সহিত পারদের বাষ্প মিশিয়া দেহ একেবারে পারদের বিষে পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা। কি সামান্য ধন-লোভ! আর, সে জন্য কি প্রকার বিপজ্জনক অনুষ্ঠান!

সর্পের কাঁটা পুড়িয়া যে চূর্ণ হইয়াছিল, এবং তৎসংলগ্ন একটু একটু যে পারদ ছিল, তাহা একটী কাঁচের ছিপিযুক্ত শিশিতে রাখিয়াছিলাম। সর্পের সেই কাঁটাগুলি রাখিবার কারণ এই যে, তাহাতে যে ঝিক্ ঝিকে পারাটুকু দেখা যাইতেছিল, অনুবীক্ষণে সেইগুলি রৌপ্যের গুঁড়ার মত দেখাইত। একবার মনে করিলাম, ঐ চূর্ণ-সংলগ্ন পারদই বোধ হয় ভস্ম হইয়াছে। ঐ চূর্ণ-সংলগ্ন পারদই গালিত তাম্রে দিয়া দেখিবার ইচ্ছা হইল।

ইহার পর-দিবস একটা নূতন গ্রাফাইট্ মুষা করিয়া গোটাকতক ডবল্ পয়সা গালাইলাম। উত্তম রূপে তরল হইলে, রৌপ্যবৎ চাকচিক্য বিশিষ্ট সর্পের কাঁটা একটা ফেলিয়া দিলাম। সেই সময়ে তাম্রধাতুর নীল শিখা অগ্নিমধ্য হইতে উঠিতেছিল। সর্পাস্থি চূর্ণ-সংলগ্ন পারদ অতি সামান্যই ছিল সন্দেহ নাই; কিন্তু উহা দিবামাত্রই তাম্রের নীল শিখার পরিবর্ত্তন হইয়া হরিদ্বর্ণ শিখা নির্গত হইয়াছিল। পূর্ব্বদিবস তরল পারদ প্রয়োগে তাম্র এবং পারদ যে প্রকার ছিট্‌কাইয়া উঠিয়াছিল, পর দিবস তাহা হয় নাই। বিশেষতঃ দ্বিতীয় দিবসে তাম্রধাতুর বর্ণ ঠিক সুবর্ণের মতই হইয়াছিল। গালার মত পদার্থও অধিক পরিমাণে নির্গত হইয়াছিল। সত্যই কি সুবর্ণ হইল না কি? তরল ধাতু একটা ইষ্টক-নির্ম্মিত ছাঁচে ঢালিয়া 'কামি' করিলাম। পিটিয়া দেখিলাম, পাতও হয়। পর দিবস তাহা নানা প্রকারে পরীক্ষা করিলাম। নাইট্রিক্ এসিড্ তাহার উপর অনেক পরে কার্য্য করে। সাধারণ সুবর্ণবণিকেরা ১৪ টাকার সোনা বলিয়া লইতে চাহে। আমি তাহা বিক্রয় করিলাম না; তাহা নমুনা স্বরূপ রাখিয়া দিলাম।

ইহার কিছুদিন পরে Specific Gravity দেখিবার একটা মোটা-মুটি যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া দেখিয়াছিলাম যে, উহা সুবর্ণ হয় নাই; তাম্র-ধাতুর বর্ণ-পরিবর্ত্তন হইয়াছে মাত্র।

বহু পূর্ব্বকালে বোধ হয় ঐ প্রকার পরিবর্ত্তিত তাম্র সুবর্ণ বলিয়া চলিয়া যাইত। এখনও উহা স্বর্ণের সঙ্গে মিশাইয়া বিক্রয় করিলে, কষ্টি-প্রস্তরে, অথবা এসিড পরীক্ষায় সহজে ধরা বড়ই দুর্ঘট।

এই স্থলে একটী কথা এই হইতে পারে যে, পারদ ভস্ম হয় নাই। সুতরাং পুনর্ব্বার একটা কৃষ্ণ সর্পের আবশ্যক। কিন্তু সেই সময়ে অপর কোনও সাপুড়ে ঐ প্রকারে সর্প দিতে চাহিল না। আমার মনে পূর্ব্বাপরই ইচ্ছা ছিল, ঐ পরীক্ষা আবার করিব। কিন্তু একটী বিশেষ কারণে উহা হইতে বিরত হই।

অনেক দিন পূর্ব্বে কালিঘাটে গোপাল গির্ নামক এক অবধূত আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাম্রধাতু পারদ ভস্ম সহযোগে সুবর্ণ হয় কি না। তিনি ইহার উত্তরে নিম্নলিখিত কবিতাটি আমাকে বলেন;—

"কহ না কেমনে সখি,
রাম কৃষ্ণ এক দেখি।
কৃষ্ণ রাম এক তনু,
এই তো শুনিয়াছিনু।
সুনীল মেঘের বর্ণে হবে দুর্ব্বাদল শ্যাম,
লক্ষ্মী রূপা সীতা দেবী বামে দেখি অনুপাম।"

ঐ কবিতার অর্থ গোপাল গির্ যে প্রকার বুঝাইয়াছিলেন, আমি তাহা লিখিলাম।—

রাম = সবুজবর্ণ।
কৃষ্ণ = নীলবর্ণ।

তাম্র গালিত হইলে তাহা হইতে নীলবর্ণের বহ্নি-শিখা নির্গত হয়; স্বর্ণ গালিত হইলে, সবুজবর্ণের বহ্নি-শিখা নির্গত হয়। অতএব এই সঙ্কেতে রাম শব্দে সুবর্ণ, এবং কৃষ্ণ শব্দে তাম্র ধাতু বুঝায়। হিন্দু শাস্ত্রমতে দেবোপাসনায় স্বর্ণ-পাত্রের অভাবে তাম্র-পাত্র ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা আছে। কবিতার স্থূল অর্থ এই যে, বহ্নিমধ্যস্থ গালিত তাম্রের নীল শিখা পরিবর্ত্তিত হইয়া যদ্যপি হরিৎবর্ণ ধারণ করে, তবেই রাম এবং কৃষ্ণ (অর্থাৎ তাম্র সুবর্ণ হয়) এক হয়। এবং তাহাতেই লক্ষ্মী, অর্থাৎ ধন লাভ হয়।

পাশ্চাত্য এল্-কেমিষ্ট-(রসায়নবিদ্) গণ তাম্রকে 'ভিনস্' নাম দিয়াছেন। তাহার কারণ এই যে, উহার সহিত কোনও একটা শ্বেতবর্ণ ধাতু মিশ্রিত হইলেই উহা পীতবর্ণ ধারণ করে। উদাহরণ স্থলে তাঁহারা বলেন যে, তাম্র এবং দস্তার মিশ্রণে পিত্তল, তাম্র এবং রঙ্গের মিশ্রণে কাংস্য, তাম্র এবং এলুমিনমের মিশ্রণে সোয়াসা (Rolled gold) হইয়া থাকে। পিত্তল, কাংস্য, অথবা সোয়াসা দেখিতে প্রায় সুবর্ণেরই মত। তাম্রের সহিত কোনও প্রকারে পারদ মিশ্রিত করিতে পারিলেই সেই মিশ্রধাতু সুবর্ণের গুণ প্রাপ্ত হয়। তাম্রের সহিত পারদ মিশিলে, উহা সুবর্ণের মত ভারি, এবং উজ্জ্বল পীতবর্ণ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তাম্রের সহিত পারদ মিশ্রিত হইবার পক্ষে অনেক অসুবিধা আছে।

যে প্রকার উত্তাপে তাম্র তরল হয়, সেই উত্তাপে পারদ বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়। রস-রত্নাকর রসেন্দ্র-চিন্তামণি, এবং রসেন্দ্র-সার গ্রন্থাদির মতে পারদের অষ্ট দোষের মধ্যে "বহ্নি-দোষ" হেতু পারদ তরল হইয়া থাকে। ঐ বহ্নি-দোষটী নিরাকৃত করিতে পারিলেই, উহা অন্যান্য ধাতুর ন্যায় কাঠিন্য প্রাপ্ত হয়। তখন উহা পিটিলে পাত হইবে, এবং তারও হইতে পারে। এই প্রকার বহ্নি-দোষ নিরাকৃত পারদ এবং প্লাটিনম্ ধাতু প্রায় এক প্রকার দৃষ্ট হয়।

প্লাটিনম্, এলুমিনিম্ এবং তাম্র সহযোগে এক প্রকার মিশ্র ধাতু হয়; তাহা সুবর্ণের সহিত মিশ্রিত করিলে, সুবর্ণের বর্ণ ও অন্যান্য গুণের বিশেষ পরিবর্ত্তন উপলব্ধি হয় না। নাইট্রিক্ এসিডে তাহা দ্রব হয় না। কষ্টি পাথরেও তাহার খাদ ঠিক ধরা যায় না। বিলাতী ৯ ক্যারাট্ সুবর্ণের সহিত ঐ প্রকার খাদ দেওয়া থাকে বলিয়া সেই প্রকার কম দরের সোণায় চেন্, ঘড়ী, অঙ্গুরী, এবং অন্যান্য অলঙ্কারাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঐ সকল দ্রব্যে (9. carat অথবা) ·৩৭৫ এই প্রকার হলমার্ক থাকে।

পারদকে কোনও প্রকারে কঠিন করিতে পারিলেই, উহা তাম্রের সহিত মিশ্রিত হইবে; এবং ঐ মিশ্রধাতু সর্ব্ব প্রকারেই খনিজ সুবর্ণের মত হইবে। আসল হইতে নকল সুবর্ণের কিছুই পার্থক্য বোধ হয় না। এমন কি, এখনো অনেক সন্ন্যাসী এই বিদ্যাপ্রভাবে "ভাণ্ডারী" নাম পাইয়াছেন। অন্যান্য সাধু সন্ন্যাসীগণের সর্ব্বপ্রকার অভাব মোচন করিবার জন্যই তাঁহারা এক তীর্থ হইতে অপর তীর্থে ভ্রমণ করেন। পারদের ভস্ম-প্রস্তুত করণ-প্রণালী বিশেষ কঠিন কর্ম্ম নহে। যাঁহারা উহা করিতে পারেন, তাঁহাদের অধিক মূল্যবান্ যন্ত্রাদির বা বহুমূল্য কোনও পদার্থ আবশ্যক হয় না। সামান্য মৃত্তিকা-নির্ম্মিত পাত্রাদি, একটা খল, এবং বনঘুঁটিয়া অথবা বালুকা-যন্ত্রের অগ্নি-দ্বারাই তাঁহারা কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথাও বলা আবশ্যক। সোণা প্রস্তুত করিতে পারে, এই প্রকার অনেক বুজরুকও স্থানে-স্থানে ঘুরিয়া ভালমানুষদের ঠকাইয়া থাকে। আমরাও ঐ প্রকার ঠকদিগের হস্তে পড়িয়াছি। উহাদের প্রচলিত কয়েকটি সাধারণ পদ্ধতি পাঠকবর্গের গোচর করা আবশ্যক।

১। গাঁজার কলিকায় তাম্র-নির্ম্মিত ঠিক্‌রা দিয়া তাহার উপরে গাঁজা সাজিয়া গাঁজা খায়, এবং গাঁজা পুড়িয়া গেলে, সেই কলিকার ঠিক্‌রাটী সুবর্ণ হয়।

কিঞ্চিৎ পরিমাণ সুবর্ণের ঠিক্‌রা প্রস্তুত করিয়া তাহার উপর তাম্রের গিল্টি করিয়া ইহারা ঝুলির মধ্যে রাখিয়া দেয়। ইহাতে এই সকল ভণ্ড সাধুদিগের দুইটি উদ্দেশ্য সাধিত হয়। সোণার উপর তাম্রের গিল্টি করিয়া রাখিলে, কেহ হঠাৎ ঐ ঠিকরাগুলি সুবর্ণ বলিয়া বুঝিতে পারে না; এ কারণ দস্যু অথবা চোরেও উহা লয় না (১)। যেখানে ঐ প্রকার একটু বুজরুকি দেখাইলে কিছু লাভের প্রত্যাশা আছে, সেখানে একটা ঠিক্‌রা অগ্নিতে পোড়াইয়া তাহার গিল্টি উঠাইয়া সুবর্ণ করিয়া দেখাইলে, হয় ত বেশ দু' এক হাজার টাকার কিনারা হইয়া যায়।

২। পারা জমাইয়া চাঁদি করা।—ইহাও এমন ভাবে দেখানো হয় যে, সহজে কেহ উহা বুঝিতে পারেন না। প্রথমতঃ সন্ন্যাসী কিছু খাইতে চাহে। যদি আহার্য্য পাইল, তাহা হইলে প্রায়ই চলিয়া যায়। যদি না পাইল, তবে সন্ন্যাসী ভাবগতিকে এই প্রকার বুঝাইয়া দেয় যে, তাহার গুরু তাহাকে এমন বিদ্যা দিয়াছেন যে, সে একটু পারা পাইলে, আধ ঘণ্টার মধ্যে চাঁদি প্রস্তুত করিতে পারে। এই কথা শুনিলে অনেকেই 'চাঁদি করা' দেখিবার জন্য সন্ন্যাসীকে থাকিবার স্থান এবং আবশ্যক দ্রব্যাদির যোগাড় করিয়া দেন। হয় ত, বিল্বপত্রের রস অথবা পানের একটু রস লইয়া তাহাতে একটু চিনি মিশাইয়া সেই রসটা পারায় দিবামাত্র পারা জমিয়া যায়, এবং দর্শকমণ্ডলী সকলে আশ্চর্য্য হইয়া পড়েন, এবং ঐ জমা পারদ গলাইলে চাঁদি হইবে, এই কথা শুনিয়া সকল যোগাড় করিয়া দেন। সত্যই উহা গালাইয়া উৎকৃষ্ট চাঁদি হইবে।

বিল্বপত্রের রসের সহিত চিনি বলিয়া যে গুঁড়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহা বস্তুতঃ চিনি নহে, তাহা নাইট্রেট্-অব্-সিল্‌ভার্। পাড়াগাঁয়ে কয় জন নাইট্রেট-অব্-সিল্‌ভার দেখিয়া বুঝিতে পারেন?—সুতরাং চাঁদি প্রস্তুত হইয়া গেলে, সাধুর নাম চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়, এবং একটুকু সিল্‌ভার্-নাইট্রেট্ খরচ করিয়া সাধু নানা প্রকারে বিশেষ লাভবান্ হইয়া প্রস্থান করে।

৩। পারা জমাইয়া পাকা সোণা করা।—এই বুজরুক্ আরও উচ্চদরের। আমরা একবার এই প্রকার বুজরুকী দেখিয়াছি। পাঠকবর্গের গোচরার্থ তাহা আনুপূর্ব্বিক লিখিলাম। একজন মুসলমান ফকীর এক পুষ্করিণীর ঘাটে বসিয়া ছিলেন। আমরা চারি-পাঁচজন বয়স্য মিলিয়া সেই ঘাটে গিয়া তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিলাম। ফকীর সাহেব কিছু খাইতে চাহিলেন। কি খাইবেন জিজ্ঞাসা করায়, তিনি প্রায় ১৫।১৬ টাকার দ্রব্যাদি ফরমায়েস্ করিলেন। দুইটা মুরগী, একবোতল শ্যাম্পেন্, সন্দেশ, কমলালেবু, রাবড়ী, ভাল লুচী, ইত্যাদি ফর্দ্দ দেখিয়া আমরা সকলে হাসিয়া উঠিলাম। ইহাতে ফকীর কিছুমাত্র কুণ্ঠিত না হইয়া আমাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ফকীরি আর আমীরি এক কথা। তোমরা এই সামান্য খাবার দ্রব্যাদি শুনিয়া অবাক্ হইয়াছ, কিন্তু আমি প্রতিদিন ঐ প্রকার আহার করি।" অবশেষে তিনি এক ভরি পারা, দুইখানা সরা, এবং চারি পয়সার ঘুঁটে চাহিলেন। আমরা তাহার যোগাড় করিয়া দিলাম। ফকীর সাহেব ঠায় বসিয়া রহিলেন। আমরাই তাঁহার কথামত কার্য্য করিতে লাগিলাম। প্রথমতঃ পারা কাপড়ে ছাঁকিয়া একখানি সরায় তাহা রাখিতে বলিলেন। পরে তাঁহার জামার বুক-পকেট হইতে একটা কাচের শিশি বাহির করিয়া হরিদ্রাবর্ণের একটা গুঁড়া শিশি হইতে বাহির করিয়া সেই পারার সহিত মিশাইবামাত্র পারা জমিয়া গেল। পরে আর একটী সরা তাহার উপর চাপা দিয়া ঘুঁটের উপর

বসাইতে বলিলেন। আমরা তাহা করিলাম। পরে তাহাতে অগ্নি দেওয়া হইল। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত ঘুঁটিয়া পুড়িয়া গেল। এ পর্য্যন্ত ফকীর সাহেব বসিয়া মালা জপিতেছিলেন। অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে সরাদ্বয় উঠানো হইল, এবং তাহার মধ্যে সিন্দুরাভ একটা গুঁড়া পাওয়া গেল। ফকীর তাহা একটী ছোট নিক্তি করিয়া ওজন করিলেন, এবং আমাদের বলিলেন যে, উহা প্রায় এক ভরি পাকা সোণা হইয়াছে। নিকটেই একটা সুবর্ণবণিকের দোকানে উহা পুনর্ব্বার গালানো হইল। পাকা সোণাই বটে। সেই সময়ে পাকা সোণার দর ১৮ টাকা ছিল। উহা বিক্রয় করিয়া ১৭৷৷৶৹ হইয়াছিল। আমরা তখন এই ব্যাপারের কিছুই বুঝিতে পারি নাই। ফকীর সাহেব ঐ পীতবর্ণ গুঁড়ার নাম "সুলেমানী নিমক্" বলিয়াছিলেন। পরে যখন আমরা ফটোগ্রাফী অভ্যাস করিলাম, তখন ফকীর সাহেবের সেই সুলেমানী নিমক Gold chloride নামে চিনিতে পারিলাম।

কালিদাস ও ভবভূতির নাটকে নারী-চরিত্র

[অধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্রদাস চৌধুরী, এম্-এ]

ভারত বীরভূমি,—সাধ্বীর দেশ। সেই বৈদিক যুগ হইতেই আধুনিক কাল পর্য্যন্ত আমরা প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক শতাব্দীতে সাধ্বীর সম্মান দেখিতে পাই! দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ প্রতিশোধে যে অনল জ্বলে, উহাতে উত্তরভারত বিধ্বস্ত হইয়াছিল,—বীরহীন হইয়াছিল; রাবণ সীতার অঙ্গ স্পর্শ করে সোণার লঙ্কায় দেবতার ক্রোধ টেনে এনেছিল, শান্তির রাজ্যে আগুন জ্বেলে দিয়েছিল! গ্রীসের 'হেলেন্'কে অপহরণ করিবার প্রতিশোধে 'ট্রয়' নগর ভস্মে পরিণত হইয়াছিল। এমন আরও কত আছে। প্রাচীন জগতে ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। সেই মহান্ নারী-চরিত্রের বর্ণনই অদ্যকার উদ্দেশ্য; কিন্তু তজ্জন্য 'নাটকের' আশ্রয় লইলাম কেন? চরিত্রের পরিস্ফুটতা আর কোথায় পাইব? অভিনয়ে একটী ভ্রূ-ভঙ্গিতে, একটী তীব্র কটাক্ষে, একবার মাত্র অঙ্গুলি-সঙ্কেতে নায়ক-নায়িকা যত ভাব, যত কথা ব'লে দেয়, শ্রাব্য-কাব্যে অনন্ত শব্দ বিন্যাসেও হয় ত, কবি ততদূর করিয়া উঠিতে পারেন না। যদি মানবচরিত্র চক্ষুর সম্মুখে উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত দেখিতে চান—নাটকে দৃষ্টিপাত করুন। 'কালিদাস ও ভবভূতির নাটকদ্বয়ের নারীচরিত্র বর্ণনই অদ্যকার উদ্দেশ্য! কিন্তু প্রত্যেক নাটকের প্রত্যেক রমণীর চরিত্র বর্ণনা করা বড়ই অপ্রীতিকর হইবে মনে করিয়া, আমি ভালমন্দে উজ্জ্বলতম চরিত্রগুলি নিয়াছি। কালিদাস বলুন, ভবভূতি বলুন, কিম্বা শূদ্রকই বলুন, প্রত্যেকের নাটকেই ভালমন্দ দুই রকমের চিত্র পাশাপাশি দেওয়া আছে! কেবল ভাল বা কেবল মন্দ এ পৃথিবীতে সম্ভবে না; তাই অসতের পার্শ্বে সৎ, নষ্টের পার্শ্বে উন্নত, কৃষ্ণের পার্শ্বে শুক্লের সন্নিবেশ! আবার মন্দ না থাকলে উৎকৃষ্টের উৎকর্ষ প্রমাণিত হয় না; অন্ধকার না থাক্‌লে আলোকের আদর হইত না, আকাশের গায় কৃষ্ণমেঘের সঞ্চার না থাকিলে তাহার মলিনবক্ষে সৌদামিনীর হাস্য মনোরম হইত না। তাই অধমের পার্শ্বে উত্তমের সন্নিবেশ! কেবল ভাল বা কেবল মন্দে নাটক হইতে পারে না; তাই মহাকবি Shakespearএর নাটকেও আমরা দেখিতে পাই—Goneril, Regalএর পার্শ্বে Cordelia, Perdita, Miranda; Lady Macbethএর পার্শ্বে Lady Macduff আর Portia, তেমন আরি কত আছে! এখন সেই ভালমন্দের নারীচরিত্র সমালোচনা আরম্ভ হউক।

কালিদাস

১। মালবিকাগ্নিমিত্র

সংক্ষিপ্ত বিবরণ:—অগ্নিমিত্র বিদিশার পরাক্রমশালী রাজা। ধারিণী তাঁহার পত্নী, প্রধানা মহিষী। ইরাবতী নামিকা ধারিণীরই জনৈক পরিচারিকা, সৌন্দর্য্যে ও গুণশীলতায় ইন্দ্রিয়-পরায়ণ রাজার মনোহরণ করে। সেই অবধি অগ্নিমিত্র প্রৌঢ়া রাজ্ঞী ধারিণীকে পরিত্যাগ করিয়া ইরাবতীতে আসক্ত হন। ধারিণী ধৈর্য্যশীলা ও পতিপরায়ণা। কিন্তু রাজ্যে ধারিণীর যথেষ্ট ক্ষমতা; ইচ্ছা করিলেই তিনি ইরাবতীকে বিস্মৃতির অন্তরালে সরাইতে পারিতেন। কিন্তু তাহাতে পতির প্রাণে কষ্ট হইবে বুঝিয়া তিনি নীরবে সমস্ত সহ্য করিতেছিলেন। মুখে প্রকাশ করিয়া না বলিলেও ইরাবতীর প্রতি তিনি বিদ্বেষ চক্ষুতে চাহিতেন, এবং পরিচারিকাকে এই অন্যায় অনধিকার চর্চ্চার জন্য শিক্ষা দিতে সুযোগ খুঁজিতেছিলেন।

ওদিকে বিদর্ভের যুবরাজ মাধবসেন, ভগ্নী মালবিকাকে অগ্নিমিত্রের হস্তে প্রদান করতঃ তাঁহার বন্ধুত্বলাভের জন্য বহু দিবস হইতে যত্নবান্ ছিলেন। ইতিমধ্যে বিদর্ভে অন্তর্বিপ্লব জ্বলিয়া উঠিল, চতুর্দ্দিকে হিংসার উৎসবে মৃত্যুরঙ্গ আরম্ভ হইল। মাধবসেন মন্ত্রী সুমতি, তদ্‌ভগ্নী বৃদ্ধা কৌশিকী ও ভগ্নী মালবিকাকে সঙ্গে করিয়া বিপন্মুক্তি আশায় পলায়ন করতঃ বিদিশার অভিমুখে আসিতেছিলেন। পথে দস্যুগণ মন্ত্রী সুমতিকে বধ করিয়া মাধবসেন ও মালবিকাকে বন্দী করিল, কৌশিকী মূর্চ্ছিতাবস্থায় বনে পড়িয়া রহিলেন।

ধারিণীর ভ্রাতা বীরসেন নর্মদাতীরে অগ্নিমিত্রের সীমান্তরক্ষকরূপে নিযুক্ত ছিলেন। দৈবযোগে একদিন মালবিকা দস্যু-কবল হইতে তাঁহারই হস্তে পতিত হয়। তৎকালে সুন্দরী বালিকাদিগকে রাজমহিষীগণ, অন্তঃপুরে শিল্পদারিকারূপে নিযুক্ত করিতেন। রূপশালিনী মালবিকাকে তাই বীরসেন ভগ্নীর নিকট প্রেরণ করিলেন। ধারিণী মালবিকার প্রাণোন্মাদি রূপ দেখে চমকিলেন, বুঝিলেন ইরাবতীকে শিক্ষা দেওয়ার অস্ত্র এতদিনে আসিয়াছে। তিনি ত তৎক্ষণাৎ তাহাকে নৃত্যগীতাদি শিক্ষক বৃদ্ধ গণদাসের গৃহে প্রেরণ করিয়া তাহার সম্যক্ শিক্ষার বন্দোবস্ত করিলেন। একদিন রাজা ধারিণীর গৃহে মালবিকার অপরিচিত ছবি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। দুষ্ট বিদূষক সব জানিত, ও গণদাসের গৃহে মালবিকার গুপ্ত অবস্থান-বিষয় সমস্ত

রাজাকে বলিল। রাজা ইহাতে আরও চঞ্চল হইয়া মালবিকাকে দেখিতে উৎসুক হইলেন। বিদূষক চক্রান্ত করিয়া গণদাস ও হরদত্ত-নামক কলাবিদ্যা-শিক্ষকের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করিল। 'উভয়ের মধ্যে কে অধিকতর বিজ্ঞ, এই বিচারের মীমাংসার জন্য উভয়েই রাজ-সম্মুখে উপস্থিত হইলে,—বিদূষকাদি এই সিদ্ধান্ত করিয়া দিল যে যাহার শিষ্যা নৃত্যে অধিকতর পটুতা দেখাইবে, সেই শ্রেষ্ঠ! গণদাসও বুঝিল না, হরদত্তও এই রহস্য বুঝিল না। রাজ-সমক্ষে আসিয়া নৃত্যে পরীক্ষা দিবার জন্য মালবিকা আহূতা হইল। ভীত-চকিতা বালিকা আসিয়া রাজার সম্মুখে দাঁড়াইল। নৃত্য আরম্ভ হইল, অঙ্গের প্রত্যেক সঞ্চালনে যেন, তাহার প্রত্যেক রোমকূপ হইতে কি এক স্বর্গীয় সুষমা নির্গত হইয়া অগ্নিমিত্রকে মুগ্ধ করিল। কামুক নৃপতি ইরাবতীকে ভুলিলেন, প্রণয় গাঢ়তর করিবার জন্য দেবী ধারিণী নানা ছলে মালবিকাকে আরও কতদিন রাজার দৃষ্টি হইতে লুকাইয়া রাখিলেন। পরে উভয়ের মধ্যে ধর্ম্মবিবাহ স্থির হইল, ধারিণীই তাহার ঘটকা। দৈবচক্রে ইতিমধ্যে মালবিকার প্রকৃত পরিচয় জ্ঞাত হয়। আনন্দের মাত্রা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইল, বিবাহের মঙ্গলবাদ্য বাজিয়া উঠিল।

ধারিণী :—নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিলে মনে হয় যেন 'মালবিকাগ্নিমিত্রই' কালিদাসের নাটকত্রয়ের প্রথম-রচনা। কালিদাসের হস্ত তখনও যেন পরিপক্ক হয় নাই। মালবিকাগ্নির চরিত্রের সঙ্গে শকুন্তলার চরিত্রগুলির তুলনা করিলেই উহা উপলব্ধ হয়। ধারিণীর চরিত্রও তাই। উহা পরিস্ফুট হয় নাই। উহা এক অদ্ভুত সৃষ্টি। ধারিণী যেন অন্তঃসলিলা ফল্গুনদী। মুখ ফুটিয়া কিছু প্রকাশ করেনা, অথচ অন্তরের মধ্যে যে একটা বিদ্রোহ চলিতেছে, একটা ক্ষুদ্র ষড়যন্ত্র চলিতেছে, তাহা বেশ অনুমান করা যায়। ইরাবতী ও মালবিকার প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ও প্রীতি কতদূর আমরা পরিষ্কার কিছু বুঝি না, ধারিণী ভয়ঙ্কর গম্ভীর, সে গাম্ভীর্য্য দেখিয়া সন্দেহ হয়, ভয়ও হয়। তাই অনেক স্থলে অনুমানেই তাঁহার চরিত্র কল্পনা করিতে হয়। ধারিণী গাম্ভীর্য্য, দয়া দাক্ষিণ্য ও ক্ষমতার জীবন্ত মূর্ত্তি। রাজা তাঁহাকে ভয় করেন ও ভক্তি করেন। হরদত্ত ও গণদাসের বিবাদভঞ্জনে রাণীর পরামর্শই গৃহীত হয়,—রাজা স্বাধীন ভাবে সম্মতি দিতে পারেন না। মালবিকা, রাজ্ঞীর সঙ্কেতমাত্রই মঞ্চ হইতে অপসারিত হয়; অন্তর জ্বলিয়া গেলেও অগ্নিমিত্র, আর একবার নৃত্য করিবার জন্য মালবিকাকে অনুরোধ করিতে সাহস করেন না। মালবিকার সহিত রাজার গুপ্ত মিলনে ইরাবতী অভিযোগ করিলে, ধারিণী অগ্নিমিত্রের বিচারকের মত শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন, মালবিকাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। ইহা দ্বারা উপায়ান্তরে রাজাকেই দণ্ড দেওয়া হয়। কিন্তু প্রাণ-প্রতিমা মালবিকাকে কারাগার হইতে মুক্তি দিবার জন্য আদেশ করা দূরে থাকুক—ধারিণীকে সবিনয়ে প্রার্থনা করিতেও রাজার সাহস হয় না। রাজা কথায় কথায় বিদূষককে বলেন—"ধারিণীকে ভয় হয়!" সতীর চক্ষুতে যে স্বর্গজ্যোতিঃ অহর্নিশ দীপ্ত হয়, উহার আলোকে, পাপ-হৃদয়ের সমস্ত কলুষ, মুহূর্ত্তে গভীর-গর্ত্তে আত্মসংবরণ করিতে চায়। সতীকে ভয় না করে কে? বিশেষতঃ অগ্নিমিত্রের হৃদয় পঙ্কিলতার আধার! ধারিণী বিনীতা, ভক্তিমতী ও দেব-দ্বিজ-সেবিকা হিন্দুনারী। দিগ্বিজয়ে প্রস্থানপর পুত্র বসুমিত্রের মঙ্গল কামনায় ধর্ম্মপ্রাণা জননী যেই সমস্ত দেবদ্বিজ সেবার আয়োজন করেন, উহা পাঠ করিতেও ভক্তি জন্মে। পণ্ডিতা কৌশিকীর সহিত তাঁহার প্রত্যেক আচরণেই আমরা বুঝিতে পারি যে, তাঁহার হৃদয় বিনয় ও সজ্জনতার আধার। ধারিণী মঙ্গলময়ী। পবিত্রতা ও সতীত্বের সজীব আদর্শ। রাজা কৌশিকীর সঙ্গে তাঁহাকে দেখিয়াই বলেন,—"এষা, মঙ্গলালঙ্কৃতাভাতি, কৌশিক্যা যতিবেশয়া। (খলু) বিগ্রহবত্যেব সমমধ্যাত্ম বিদ্যয়া॥" ধারিণীর আত্মত্যাগ অদ্ভুত! তিনি ইচ্ছা করিলেই ইরাবতীকে দূর করিয়া দিয়া ভীত রাজাকে স্ববশে স্থির রাখিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি পতিপরায়ণা, পতিকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন। যাঁহাকে ভালবাসেন, তাঁহার সব অত্যাচার সহ্য করিতে হইবে, এই ভাবিয়া তিনি নীরব ছিলেন। তিনি জানিতেন কামুক অগ্নিমিত্রের পিপাসা বারণ করিবার ক্ষমতা আর তাঁহার নাই। ইরাবতীর প্রেমে বাধা দিলে কাজেই অগ্নিমিত্রের প্রাণে আঘাত করা হইত। তাই তিনি ক্ষুদ্রা পরিচারিকাকে নির্ব্বিবাদে আপন স্থান ছাড়িয়া দিলেন। তৎপর দেখি আবার নূতন অভিনয়! সকল দেহের ক্ষয় আছে, সকল সৌন্দর্য্যেরই হ্রাস আছে, ইরাবতীরও তাই হইতেছিল। ইরাবতীর পতন নিকটে আসিতেছিল। যে উত্থান রূপজাত,—তাহার পতন শীঘ্র ও অবশ্যম্ভাবী। যতক্ষণ প্রাণে অগ্নিতেজ থাকে, দেহে জ্বালাময়ী দীপ্তি থাকে, ততক্ষণই অগ্নি-অস্ত্র আকাশ-বক্ষঃ ভেদ করিয়া মেঘ চুম্বনের আশায় অগ্রসর হয়; কিন্তু যখন সে আলোক নিবিয়া যায়, তখন উহা এত বেগে পতিত হয় যে, তাহাতে বায়ুবক্ষঃ বিদীর্ণ হইয়া যায়, অতল-নিম্নের ঘনীভূত তিমিরও যেন তাহার আঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যায়। ধারিণী বুঝিতে পারিল, ইরাবতীর যৌবনেও অবসাদ আসিয়াছে, কালিমা প্রবেশ করিয়াছে। এখন আবার প্রিয়তমের মনোরঞ্জনের জন্য নূতন-সৌন্দর্য্য চাই! মালবিকা আসিল। ধারিণী তাহাকে কত যত্নে সাজাইয়া, গুণশীলা করাইয়া আবার অগ্নিমিত্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন, আমরা তাহা দেখিয়াছি। এই আত্মত্যাগে দোষ থাকিলেও ধারিণীর চরিত্রে আমরা স্বর্গসুষমা দেখিতে পাই! মালবিকার সঙ্গে পরিণয় হইয়াছে। রাজার আর একটা নূতন জীবন আরম্ভ হইয়াছে,—ইহার অবসান হইবে, আবার বুঝি কিছু নূতনত্বের প্রয়োজন হইবে, ইহা ভাবিয়াই বোধ হয় ধারিণী বিবাহ-সভায় করজোড়ে অগ্নিমিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে প্রিয়, আমি আপনার আর কি মনস্তুষ্টি করিতে পারি, আদেশ করুন।"—এমন আত্মত্যাগ; এমন পতিপ্রিয়তা জানি না কয়জন সতী দেখাইতে পারে! রমণীর সপত্নী-বিদ্বেষ কতই অসহ্য, তাহা রমণীই জানে। অথচ পতির প্রীত্যর্থে ধারিণী নিজের ভোগ বিসর্জন দিয়া নূতন নূতন সপত্নী

আনয়ন করত: অগ্নিমিত্রের মনোরঞ্জন করিতেছেন। এমন চরিত্র মানব-সমাজে কতদূর সম্ভব জানি না। যাহা হউক, দোষগুণ লইয়াই মানুষ। ধারিণীর চরিত্রে একটুও যে কিছু খারাপ ছিল না এমন নহে। ইরাবতীর সঙ্গে ধারিণী মৌখিক ব্যবহারে সরলতা দেখাইলেও অন্তরে তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পোষণ করিতেছিলেন। ইরাবতী সরলা, ধারিণী কৌশলে কার্য্যোদ্ধার করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে ইরাবতীর সর্ব্বনাশ ঘটিল। প্রকাশ্যে ধারিণী বড় ভগ্নীর মত আচরণ করিতেন, ইরাবতীও তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ভক্তি করিত, কিন্তু ধারিণী অন্তরে অন্তরে ইরাবতীর জন্য কঠোর বজ্র নির্ম্মাণ করিতেছিলেন। এই সমস্ত প্রচ্ছন্ন শত্রু বড়ই ভয়ঙ্কর! তাই মহাকবি ভবভূতি বলিয়াছেন—

"শান্তিঃকৃতস্তস্তভুজঙ্গশত্রোযস্মিন্ নিবদ্ধানুশয়া সদৈব।
জাগর্ত্তি দংশায় নিশাতদংষ্ট্রা-কোটির্বিষোদ্গার-গুরুর্ভুজঙ্গী॥"

ইরাবতী:—ইরাবতী পরিচারিকা হইলেও সুন্দরী ও নৃত্য-গীতাদি কলানিপুণা। তাই নরপতি সমস্ত দেবীজনকে পরিত্যাগ করিয়া ইরাবতীতে অনুরক্ত ছিলেন। ইরাবতী জানিত সে ধারিণীকে তাঁহার ধন হইতে বঞ্চিত করিয়াছে; কিন্তু যখন দেখিল যে ধারিণী তাহাতে বিরক্ত হইলেন না,—গম্ভীর উপেক্ষায় উহা ক্ষমা করিলেন, সেই হইতে সরলা-ইরা ধারিণীকে দেবীর মত ভক্তি ও সম্মান করিত। এক দিনের জন্যও ধারিণীর বিরুদ্ধে রাজাকে একটী কথাও বলে নাই। সপত্নীবিদ্বেষ কা'কে বলে ইরা তাহা জানিত না, সপত্নীর প্রতি যে সপত্নীর বিদ্বেষ জন্মিতে পারে তাহাও সে বিশ্বাস করিত না। তাই হতভাগিনী, ধারিণীকে প্রাণ ভরিয়া বিশ্বাস করিত। ইরাবতী সরলতার অবতার। কালিদাসের কোন চিত্রে জীবন্ত সরলতার এমন উজ্জ্বল চিত্র দেখিতে পাই না। ইরাবতী জানিত না যে মানুষ একবার উঠিলে, আবার পড়িতে পারে, সে উহা কখনও ভাবেও নাই; তাই কোনও দিন আত্মরক্ষার্থে এবং আত্মাধিকার বজায় রাখিবার জন্য কোনও প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করে নাই। সে গভীর ধ্যানে তাহার প্রিয়তম রাজাকেই ধ্যান করিয়া অন্তঃপুরের এক কোণে কাল কাটাইত। তার কার্য্য ছিল অগ্নিমিত্রের চিন্তা। তাহার বিশ্বাস ছিল না যে, পুরুষ একবার যে রমণীকে ভালবাসে, তার চেয়ে উৎকৃষ্ট পাইলে আবার তাহাকে ভুলিতেও পারে। সে বুঝে নাই যে, অগ্নিমিত্রের এই অনুরাগ সৌন্দর্য্যজাত,—সনাতন নহে! তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিনী মালবিকা আসিয়া কত কাল হইতে রাজ-অন্তঃপুরে স্থান পাইয়াছে, কতদিন হইতে সে রাজার চিত্তহরণ করিয়াছে, এমন কি প্রকাশ্য রাজসভায় নৃত্য করিয়া পর্য্যন্ত অগ্নিমিত্রের মনোরঞ্জন করিতেছে। রাজ্যময় সকলেই ইহা জানিত, সকলেই ইহার উদ্দেশ্য বুঝিত। কিন্তু ইরাবতী?—সে মালবিকার আবির্ভাব সম্বন্ধে যেন কিছুই জানিত না, কোনও দিন একটী পলকের জন্যও সন্দেহ করে নাই যে, মালবিকা তাহার ভাগ্যাকাশের ধূমকেতু! তাহার ধ্রুব বিশ্বাস ছিল যে, রাজা তাহাকে পরিত্যাগ করিবে না, এবং তাহাকে ব্যতীত অন্য কাহাকেও ভালবাসিতে পারে না। হায় রে সরলা নারী!—একদিনের জন্যও সে সন্দেহ করে নাই যে, রাজার হৃদয়ে মালবিকার প্রেম অলক্ষ্যে প্রসার পাইতেছে। Shakespeareএর কথায়—

"Grew like the summer grass, fastest by night,
Yet cressive in its faculty."—(Henry V.).

যখন হঠাৎ একদিন ইরাবতী দেখিল যে, গোপনে রাজা মালবিকার সহিত উদ্যানে কি আলাপ করিতেছে, রাজার মুখে, চক্ষুতে গভীর উত্তাপের লক্ষণ; ইরাবতী শিহরিল! এক লহমার মধ্যে, একটীমাত্র বিদ্যুৎ সঞ্চালনে যেন অনন্ত নৈশ আকাশের সহস্র চিত্র এক একটী করিয়া চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া গেল; বিগত জীবনের একটা বৃহৎ ইতিহাস, একটা বৃহৎ রহস্য যেন কৃষ্ণ যবনিকার অন্তরাল হইতে আত্মপ্রকাশ করিল। বজ্র গর্জ্জিয়া গেল। ইরাবতীর মাথা ঘুরিতে লাগিল, সে আর স্থির থাকিতে পারিল না;—পদদলিতা ভুজঙ্গীর মত ফণা বিস্তার করিয়া দাঁড়াইল, এবং অঙ্গ হইতে মেখলা মুক্ত করিয়া সন্ত্রস্ত রাজাকে, এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য প্রহার করিতে উদ্যত হইল! সুন্দর দৃশ্য! হায় রে সরলতার পরিণাম!! তৎপর হইতেই ইরার পতন,—হতভাগিনী কোথায় অন্ধকারে মিশিয়া গেল!

মালবিকা: মালবিকা কবির অদ্ভুত সৃষ্টি! মালবিকার জীবনে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সমস্তই স্বাভাবিক এবং মানবদৃষ্টিতে দৈনন্দিন দৃষ্ট হয়। কালিদাসের প্রত্যেক নাটকেই তিনি দেখাইয়াছেন যে, পবিত্র প্রণয়ের পথ কঠোর কণ্টকাকীর্ণ। "Love's course never runs smooth"; কিন্তু উহা প্রতিপাদন করিতে গিয়া তিনি শকুন্তলা বিক্রমোর্ব্বশীতে অনৈসর্গিক বৃত্তান্তের অবতারণা করিয়াছেন, কিন্তু মালবিকাগ্নিমিত্রে যাহা যাহা দেখাইয়াছেন, তাহা স্বাভাবিক ও মনুষ্যজীবনের দৈনন্দিন ঘটনা। তাই মালবিকার চরিত্র আদর্শস্থানীয় ও মনোরম!

মালবিকা ভ্রাতার সঙ্কেত পাইয়া বাল্যকাল হইতে রাজা অগ্নিমিত্রের ছবি নিজ হৃদয়ে পোষণ করিতেছিল। স্থির করিয়াছিল যদি মরিতে হয় তাও মরিবে, তথাপি একবার বিদিশার রাজ-চিত্র চক্ষুর সম্মুখে দেখিবে! তাই যখন মাধবসেন বিদর্ভ হইতে পলায়নের প্রস্তাব করে, মালবিকা একটীমাত্র আপত্তিও না করিয়া মহোল্লাসে বিদিশাভিমুখে যাত্রা করে। বালিকা একবারও চিন্তা করিল না যে তাহার এই ক্ষুদ্র শক্তিতে, পদব্রজে সুদূর বিদিশায় উপস্থিতি অসম্ভব। পথে কত বিপদ্ আপদ্। কত শত্রু! সে কিছুতেই বিচলিত হইল না। সেই চির-আরাধ্য মূর্ত্তিটী ধ্যান করিতে করিতে বিদর্ভ হইতে যাত্রা করিল। ধন্য নারী! তাই ত কবি বলিয়াছেন—তোমরা কুসুম হইতে সুকুমার হইলেও বজ্র হইতে কঠোর। তোমরা সূর্য্যালোক-স্পর্শ-ভয়ে অবগুণ্ঠনবতী হইলেও, সময়ে হাসিতে হাসিতে অগ্নিপ্রবেশ করিতে পার। কুশাঙ্কুরও তোমাদের কোমল চরণে আঘাত প্রদান করিতে পারে বটে, কিন্তু যখন প্রণয়ের উত্তাপ হৃদয়ে জাগে, তখন তোমরা

ক্ষিপ্রপদে দুর্লঙ্ঘ্য, কণ্টকাকীর্ণ পর্ব্বতও অতিক্রম করিতে পারে। মালবিকার চরিত্রে তাহা দেখিলাম, আবার শকুন্তলাতেও উহা দেখিব! মালবিকার জীবন ঘটনাসঙ্কুল ও ক্লেশময়। তথায় প্রত্যেক দৈনন্দিন ঘটনা মালবিকার এক একটী মানসিক গুণের পরিচয় দেয়। মালবিকাকে কবি ভারতের সাম্রাজ্ঞী করিবেন—তাই দর্শকগণের সম্মুখে তাহার অগ্নিপরীক্ষা আরম্ভ হয়। হতভাগিনীকে, সমস্ত পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইতে হইবে। রাজার মেয়ে, পথে দস্যু কর্ত্তৃক হৃত হইল, তথাপি কি ধৈর্য্য। একটীবারও আত্ম-প্রকাশ করিল না! তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী মালবিকা, জানি না কি কৌশলে, কালান্তকসম দস্যুগণ হইতে পলায়ন করিয়া, বীরসেনের আশ্রয় লইল, অথচ আত্মপ্রকাশ করিল না। মালবিকা জানিত, যদি সে আত্মপ্রকাশ করিয়া বিদিশা গমনের কি উদ্দেশ্য তাহা বলিয়া দেয়, তবে কেহ তৎ-কথায় কর্ণপাত করিবে না এবং উন্মাদিনী জ্ঞানে তাড়াইয়া দিবে। বিদিশায় আসিয়াও কত কষ্ট! রাজার মেয়ে—ভিক্ষুক বালিকার মত পরিচারিকাবৃত্তি অবলম্বন করিল! গভীর অধ্যবসায়ে গণদাস-গৃহে নৃত্যগীতাদি অভ্যাস করিতে লাগিল; কতবার কত ছলে রাজার সম্মুখে আসিল, গোপনে দেখা সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত হইল, অথচ মালবিকা একটীবারও বলিল না—সে কে! মালবিকা জানিত তাহার মধ্যে ভুবনমোহন গুণরাশি আছে; সে জানিত, যাহা তাহার লক্ষ্য উহা ভারতের সিংহাসন! সে সিংহাসনের অধিষ্ঠাত্রী হইতে হইলে কেবল দৈহিক সৌন্দর্য্যে চলিবে না, অনন্ত ধৈর্য্য—অনন্ত ক্ষমা, উদারতা ইত্যাদি মানসিক গুণেরও প্রয়োজন। তাই সে ইচ্ছা করিয়াই কষ্টের মধ্যেই আপনাকে পাতিত করিয়াছিল, এবং অবিচল চিত্তে উহা সহ্য করিতেছিল। সে ধৈর্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়! সীতার অনন্ত পরীক্ষার মত মালবিকার জীবনেও অনন্ত পরীক্ষা আমরা দেখিতে পাই। মালবিকা রাজার সম্মুখে আসিয়া নৃত্যগীতাদিতে নিজের পটুতা দেখাইল। সেই সময় হয় ত কত দিক্ হইতে কত শত কুৎসিত দৃষ্টি হতভাগিনীর মর্ম্মভেদ করিয়া যাইতেছিল, সব সহ্য করিল, তথাপি আশা—প্রিয়তমের মনোরঞ্জন। রাজার জন্য মালবিকা পৃথিবী লঙ্ঘন করিয়া আসিয়াছে, তদনুপাতে রাজসভায় নৃত্য অতি তুচ্ছ কথা। ধারিণী, ইরাবতীর অভিযোগে তাহাকে কারারুদ্ধ করিল, তখন মালবিকা অগ্নিমিত্রের মনোহরণ করিয়াছে, ইচ্ছা করিলেই তাঁহার দ্বারা রাজ্যমধ্যে একটী প্রলয় আনিয়া দিতে পারিত। কিন্তু সেই কারা-যন্ত্রণাও সে নীরবে সহ্য করিল। ধারিণী তাহার শুভাকাঙ্ক্ষিণী তাহা সে বুঝিয়াছিল। আজ না হয় ক্রোধবশে একটু যন্ত্রণা দিতেছেন, কিন্তু তজ্জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে রাজার নিকট অভিযোগ করিলে রাজা হয় ত তাঁহার মনে কষ্ট দিবেন এই ভয়ে মালবিকা নীরব রহিল। সত্যই মালবিকা অনন্ত ধৈর্য্যশালিনী নারী। মালবিকা সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়া। সেই দীপ্তিতে ইরাবতীর ছায়া মলিন দেখাইত, সেই সুষমা দর্শনে ধারিণী চমকিয়াছিলেন, সেই সুঠাম অঙ্গরাজির সামান্য একটী চিত্র দর্শনে রাজা বিচলিত হইয়াছিলেন—উহা সাধারণ সৌন্দর্য্য নহে, কবির কথায় তাহার—

"কটাক্ষে অমর জয়ী, বদনমণ্ডলে সপ্তসমুদ্রের সুধা
মন্থন বিবাদে, থুয়েছে গোপনে যেন অমর মণ্ডলী!"

মালবিকার প্রতিভা অনন্তমুখী! মালবিকার অধ্যবসায় দর্শনে আচার্য্য গণদাস বিস্মিত হইলেন। মালবিকা বৃদ্ধের বিস্ময় উৎপাদন করিল। ধারিণী যখন খবর লইলেন—গণদাস বলিয়া পাঠাইলেন "মালাবিকা শিল্পচাতুর্য্যে ও কলাবিদ্যায় আমাকেও অতিক্রম করিয়াছে।

"যদযৎ প্রয়োগ বিষয়ে ভাবিকমুপদিশ্যতে ময়াতস্যৈ।
তত্তদ্‌বিদ্ধকরণাৎ প্রত্যুপাদিশতীব মে বালা॥"

সহজ কথা নহে! তবে আর বাকী কি? সব ত হইল! ধারিণী বুঝিলেন ঠিক হইয়াছে! মালাবিকা সত্যই ভারত সম্রাজ্ঞীর উপযুক্তা! তখন আনন্দে রাণী, বালিকা 'মালা'কে নিজের স্থানে বসাইলেন; মন্দারের মালা প্রিয়তম রাজার গলে স্বহস্তে পরাইয়া দিলেন! ইরাবতী বিস্মৃতির তলে ডুবিল।

আশ্বাস

[শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, এম্-এ]

ভারতের ভবিষ্যতে রেখেছি ভরসা,
মানবের ভবিষ্যতে রেখেছি বিশ্বাস;
জীবনের মাধুরীতে পেয়েছি আশ্বাস;
প্রকৃতি অগাধ প্রেমে অনন্ত-হরষা।
নিদাঘে মিলেছে, কান্ত, বারুণী বরষা,
আকাশ নিকষ-কালো দুরন্ত দুর্য্যোগ,
ভীষণে সুন্দরে একি নিবিড় সংযোগ!
ক্রন্দসী ধরণী হ'ল আনন্দ সরসা।
ভুলি নাই বর্ত্তমান, রাখিয়াছি আশা;
—ভাব চিরন্তন, ভুল হ'তে পারে ভাষা।
চেয়ে দেখ ঊর্দ্ধপানে অমার আকাশ,
চেয়ে দেখ যুথি-কুঞ্জে ঐ ছোট ফুল!
ভয় নাই, হে পিপাসু, পেয়েছি আশ্বাস,
—সত্য যাহা সত্য, তবু ভুল নহে ভুল।

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ

[শ্রীঅনাথনাথ বসু]

তৃতীয় অধ্যায়।

কলিকাতায় আগমনের পর শিশিরকুমারকে অমৃত-বাজার পত্রিকার কার্য্য কিছুদিনের জন্ম বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল। পত্রিকার গ্রাহকগণকে জ্ঞাপন করা হয় যে, পত্রিকার স্বত্বাধিকারিগণ কলিকাতায় আসিয়াছেন; নানা কারণে কিছুদিনের জন্য কাগজ বন্ধ থাকিবে; এবং পরে পত্রিকাখানি নূতন ভাবে পুনঃ প্রকাশিত হইবে। গ্রাহকগণই সংবাদপত্রের পৃষ্ঠপোষক; পত্রিকার গ্রাহকগণ অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের দেয় চাঁদা প্রেরণ করিয়া পত্রিকার জীবন-রক্ষায় সহায়তা করিলে স্বত্বাধিকারিগণ তাঁহাদের নিকট আজীবন কৃতজ্ঞ থাকিবেন, এ কথাও জ্ঞাপন করা হইয়াছিল। অমৃত-বাজার পত্রিকা দেশের যে মহদুপকার করিতেছিল, তাহা স্মরণ করিয়া গ্রাহকগণ পত্রিকা বন্ধ থাকিলেও আপনাদের দেয় চাঁদা সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিতে লাগিলেন। শিশিরকুমার গ্রাহকগণের এই সাহায্যের কথা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করিতেন।

কলিকাতায় আসিয়া শিশিরকুমার ভালই করিয়াছিলেন। যশোহরে থাকিলে তাঁহাকে যে নিশ্চয়ই কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইত, পাঠক নিম্নলিখিত ঘটনাটী হইতে তাহা বুঝিতে পারিবেন। কলিকাতায় আগমনের পর একটী মোকদ্দমায় সাক্ষ্য প্রদানের জন্য শিশিরকুমারকে একবার যশোহরে যাইতে হইয়াছিল। তদানীন্তন অন্যতম ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু রাসবিহারী বসুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে, রাসবিহারীবাবু বলিয়াছিলেন, "শিশির, যত শীঘ্র পার তুমি কলিকাতায় ফিরিয়া যাও।"

শিশির—"কেন?"

রাস—"এখানে অধিক দিন থাকিলে তোমাকে বিপদে পড়িতে হইবে।"

শিশির—"কি বিপদ্?"

রাস—"আমি আর জইণ্ট-ম্যাজিষ্ট্রেট সেদিন একত্র বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলাম। তিনি হঠাৎ আমাকে বলিলেন,—'শুনিতেছি শিশির ঘোষ কলিকাতা হইতে যশোহরে আসিয়াছে। এখনই তাহার নামে একখানা পরোয়ানা বাহির করিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করা হউক।"

শিশির—"আমার অপরাধ কি?' "

রাস—"আমি তাঁহাকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আগে পরোয়ানা বাহির করিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করা হউক, পরে যাহা হয় করা হইবে।"

শিশিরকুমার শুনিয়া অবাক্। তিনি হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। মিষ্টার স্মিথ তখন যশোহরের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি তাঁহার সহযোগীর কাণ্ড-কারখানা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। তিনি নিষেধ না করিলে, জইণ্ট সাহেব যে শিশিরকুমারকে গ্রেপ্তার করিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। মিষ্টার স্মিথ পরে বিভাগীয় কমিশনারের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন।

মানহানির মোকদ্দমার ব্যাপার লইয়া শিশিরকুমার অনেকেরই নিকট পরিচিত হইয়াছিলেন। কলিকাতায় আগমনের পর, তিনি সুপ্রসিদ্ধ ঠাকুর-বংশের মহারাজা সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর রাজা সার সৌরীন্দ্রমোহন এবং ঝামাপুকুরের রাজা দিগম্বর মিত্র প্রভৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ রূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশের জমিদার-সম্প্রদায়-মধ্যে তৎকালে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন বিদ্যা, বুদ্ধি ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার জন্য বিশেষরূপে সমাদৃত ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন। যতীন্দ্রমোহন সাহিত্যানুরাগী ও গুণগ্রাহী পুরুষ ছিলেন; বহু দুঃস্থ সাহিত্যসেবী তাঁহার নিকট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইতেন। শিশিরকুমারের সহিত আলাপ করিয়া মহারাজা বাহাদুর তাঁহার প্রতিভা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। উভয়ের পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহারা রাজনৈতিক বিষয় লইয়া আন্দোলন করিতেন। মহারাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজা সৌরীন্দ্রমোহন অসাধারণ

সঙ্গীত-শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। সঙ্গীত-শাস্ত্রে শিশিরকুমারের ব্যুৎপত্তি লক্ষ্য করিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে, তাঁহারা সঙ্গীত-শাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। ইহাঁদিগের দুইজনের ন্যায় রাজা দিগম্বর মিত্রও শিশিরকুমারের গুণে এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহাকে আপনার পরিবারভুক্ত বলিয়া মনে করিতেন।

কলিকাতায় আসিয়াই শিশিরকুমার একটী নূতন প্রেস ক্রয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু অর্থাভাববশতঃ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন, রাজা সৌরীন্দ্রমোহন, রাজা দিগম্বর প্রভৃতি জমিদারগণের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে পরিচিত হইয়াও, শিশির একদিনের জন্যও তাঁহাদের নিকট আপনার অভাবের কথা প্রকাশ করেন নাই। একটী নূতন প্রেস ক্রয় করিতে ছয়শত টাকা আবশ্যক। শিশিরকুমার, এই টাকার জন্য যদি উক্ত তিন জনের মধ্যে কাহাকেও বলিতেন, তাহা হইলে প্রেস ক্রয় করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইত না। কিন্তু পাছে তাঁহারা মনে করেন যে, শিশির অর্থের প্রত্যাশায় তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন, এই আশঙ্কায় তিনি তাঁহাদের নিকট টাকাকড়ি সম্বন্ধে কোন কথাই উত্থাপন করিতেন না। যাহা হউক, প্রেস ক্রয় করিবার টাকা অভাবনীয় উপায়ে শিশিরকুমারের হস্তগত হইয়াছিল। তিনি প্রায়ই রাজা দিগম্বর মিত্র মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। একদিন তিনি রাজার নিকট উপস্থিত হইলে, রাজা তাঁহাকে বলিলেন,—"শিশির, তুমি যে আসিতেছ, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম।"

শিশির—"কিরূপে?"

রাজা—"তোমার পদধ্বনি শুনিয়া।"

শিশিরকুমার উপবেশন করিলেন। উভয়ের মধ্যে নানা কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। রাজা বলিলেন, "শিশির, আমি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি যে, তুমি ভবিষ্যতে একজন মহৎ লোক হইবে।" রাজার এই কথাগুলি শুনিয়া শিশিরকুমার আপনার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হইয়াছিলেন। রাজা দিগম্বর তাঁহাকে পুনরায় বলিলেন, "শিশির, একটী লোকের নিকট কিছু টাকা পাইতাম; লোকটী টাকাগুলি কাল পরিশোধ করিয়া গিয়াছে। এই টাকাগুলি কিরূপে খাটান যায় বল দেখি?" শিশিরকুমার কি উত্তর দিবেন স্থির করিতে না পারিয়া নীরব রহিলেন। রাজার সহিত নানা কথাবার্ত্তার পর তিনি বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। পর দিবস ঘটনাক্রমে তাঁহার জনৈক আত্মীয় তাঁহার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি একজন জমিদারের অধীনে কার্য্য করিতেন। জমিদার মহাশয়ের কিছু টাকা কর্জ্জ করা আবশ্যক; সেই জন্য তিনি উক্ত কর্ম্মচারীকে কলিকাতায় পাঠাইয়াছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে জমিদারের কর্ম্মচারীটী শিশিরকুমারের নিকট তাঁহার মনিব মহাশয়ের ঋণ গ্রহণের কথা প্রকাশ করেন। পূর্ব্বদিন রাজার সহিত শিশিরকুমারের যে কথা হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিয়া তিনি তাঁহার আত্মীয়টীকে আশা প্রদান করেন। জমিদারের কর্ম্মচারীটী শিশিরকুমারের নিকট টাকা ধার করিবার চেষ্টায় আসেন নাই, কলিকাতায় তাঁহার বাসায় আশ্রয় লইবার জন্য আসিয়াছিলেন। শিশিরকুমার তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া রাজা দিগম্বর মিত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া সকল কথা প্রকাশ করেন। রাজা ঋণদানে সম্মত হইলেন। যথারীতি দলিলাদি সম্পাদিত হইলে, রাজা ষাট হাজার টাকা ধার দিলেন এবং তাঁহার চেষ্টায় শিশিরকুমার দালালিস্বরূপ জমিদারের নিকট হইতে আটশত টাকা পাইলেন। এই টাকার মধ্যে ছয়শত টাকা দিয়া শিশিরকুমার একটী নূতন প্রেস ক্রয় করিলেন। জন্মভূমির কার্য্য করিবার ইচ্ছা শিশিরকুমারের হৃদয়ে বলবতী দেখিয়া ভগবান যেন অলক্ষ্যে তাঁহার হস্তে উক্ত অর্থ প্রদান করিলেন।

কলিকাতায় আগমনের কয়েক মাস পরে শিশিরকুমারের যত্নে ও চেষ্টায় অমৃত-বাজার পত্রিকা নূতন সৌষ্ঠবে পুনঃ প্রকাশিত হইতে লাগিল। এই সময় কলিকাতা নিমতলা-ঘাট ষ্ট্রীট নিবাসী জমিদার ও সুনিপুণ চিত্র-শিল্পী স্বর্গীয় গিরিন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়ও শিশিরকুমারকে পত্রিকা প্রচারে নানারূপ সহায়তা করিয়াছিলেন। কলিকাতার একজন প্রেসম্যান দ্বারা নূতন প্রেসটী ঠিক করিয়া লইয়া, শিশির তাঁহারই শিক্ষিত কম্পোজিটর প্রভৃতি অন্যান্য লোক যশোহর হইতে আনাইয়াছিলেন। এই সময়ে ইন্‌কম্‌-ট্যাক্সের কথা লইয়া দেশে একটা মহা আন্দোলন পড়িয়া গিয়াছিল। এই ট্যাক্স যাহাতে প্রচলিত না হয়, তাহার জন্য তৎকালীন সংবাদপত্রগুলি ঘোর আন্দোলন করিতে-

ছিলেন। কিন্তু শিশিরকুমার অমৃত-বাজার পত্রিকায় গভর্ণমেণ্টের পক্ষসমর্থন করিয়া, ইন্‌কমট্যাক্স দ্বারা দেশের বিশেষ কোন ক্ষতির আশঙ্কা নাই, ইহাই প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন। ইংরেজদিগকে কোন ট্যাক্স দিতে হয় না; ইন্‌কমট্যাক্স প্রচলিত হইলে লাট সাহেব হইতে সাধারণ ইংরেজ কর্ম্মচারীকে পর্য্যন্ত, এবং দেশের ধনবানদিগকে তাহা দিতে হইবে; সুতরাং সাধারণ জন-সম্প্রদায়ের তাহাতে কোন ক্ষতির আশঙ্কা নাই, শিশিরকুমার স্বীয় পত্রিকায় এই যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইংরেজ-সম্প্রদায় প্রস্তাবিত ট্যাক্সের বিরুদ্ধে ঘোর আন্দোলন করিতে লাগিলেন। এদেশীয়গণও যাহাতে তাঁহাদের সহিত যোগদান করেন, তাহার জন্ম তাঁহারা নানা কৌশল অবলম্বন করিতেন। তখন আমাদের দেশের রাজনীতিজ্ঞগণ কিরূপে ইংরেজদিগের কথায় আপন-আপন মত গঠন করিতেন, তাহা দেখাইবার জন্ম শিশিরকুমার অমৃত-বাজার পত্রিকায় একটী ব্যঙ্গ-চিত্র প্রকাশ করেন। জনৈক চাপকান পরিহিত বাঙ্গালী বাবুর নাকে দড়ি দিয়া জনৈক ইংরাজ টানিয়া লইয়া যাইতেছেন। এই চিত্রটী শিশির ১৮৭৩ খৃঃ অঃ ১০ই এপ্রিল তারিখের পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছিলেন,—

Saheb—Babu, you understand politics ?

Babu—Very much, Sir.

S—You know the country well ?

B—Thoroughly, Sir. My great-grand-father came from the country, and my aunt is married to a villager of great experience.

S—Of course you have an independent opinion of your own ?

B—I am particularly strong and tenacious in that respect, Sir.

S—What is the most oppressive of all taxes ?

B—That, Sir, is a question, Sir, which Sir, I, Sir (scratches his head).

S—I dare say, you would name the Income Tax.

B—Assuredly, Sir. I was going to name that hateful tax when you interrupted me, Sir.

S—Is not this tax very much hated in the Muffosil ?

B—They hate ! They,—Sir, language fails me to express their feelings, Sir. My aunt has heard from her husband some of the doings of the Income Tax Assessors.

S—The Assessors are not to be blamed, poor fellows. It is the unnatural, inequitable, and—

B—Beg your pardon, Sir. I was going to say the same thing. My aunt has heard that the assessors are good, very excellent, jolly fellows, but the tax,—the tax—what were you going to say, Sir ?

S—The inquisitorial nature of the tax makes the Assessors unpopular.

B—Yes Sir, I strongly believe—a belief which is not to be shaken—that the Assessors inspite of their jolliness are very inquisitive Sir..

S—The tax is simply detested.

B—Yes Sir, absolutely detested by those who pay it.

S—Not only by those who pay it—

B—Yes Sir, it is much more hated by those who do not pay it, Sir, than by those who pay it, Sir. I am absolutely certain of that, Sir.

S—It is demoralising in its effect.

B—Who with a pair of noses in his head can doubt that ? I am quite sure that if a proper statistics could be taken, it would undoubtedly prove that since the introduction of this demoralising tax, thefts have increased

in the land, Sir, cyclones have become more frequent, Sir, epidemic fevers universal Sir, floods more violent Sir, cattle plagues more virulent Sir, and—and—Sir,—Sir—

S—You must then cry down the Income Tax.

B—I was going to propose the same thing to you, Sir.

S—You can talk loud.

B—I am a Calcutta Babu, Sir.

S—Then we will join with you for your sake and cry down the hateful tax.

B—Many thanks, Sir. I am particularly thankful Sir, that I have been able at least to convince you, Sir, that the Income Tax Sir, is a hateful impost, Sir. I very much understand politics, Sir.

পার্লামেণ্টে ইন্‌কম্ ট্যাক্সের কথা উঠিলে, তৎকালীন ভারত-সচিব বলিয়াছিলেন যে, অমৃতবাজার পত্রিকার ন্যায় প্রভাবশালী সংবাদপত্র যখন ট্যাক্সের সমর্থন করিয়াছেন, তখন এই ট্যাক্সের বিরুদ্ধে কোনও আপত্তি শুনিবার প্রয়োজন নাই।

অমৃতবাজার পত্রিকা নিয়ম-মত প্রকাশিত হইতে লাগিল। এই সময়ে রাজা দিগম্বর মিত্র মহাশয় শিশিরকুমারের বিশেষ উপকার করিয়াছিলেন। পাঠক স্মরণ রাখিবেন যে, শিশির তাঁহার নিকট হইতে অর্থ-সাহায্য গ্রহণ কিম্বা তাহার প্রত্যাশাও করেন নাই। একদিন তিনি রাজাকে বলেন যে, তিনি যদি অনুগ্রহ করিয়া পত্রিকার জন্য কয়েক-জন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন, তাহা হইলে বড়ই উপকার হয়। শিশিরকুমারের কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন—"এ আর বেশী কথা কি? আচ্ছা, আমি পত্রিকার কতকগুলি গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিতেছি।" যেমন কথা, তেমনই কাজ। রাজা তৎক্ষণাৎ একখণ্ড কাগজ লইয়া [illegible] টালার বাবু পরাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শোভাবাজারের মহারাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, হাইকোর্টের বিচারপতি বাবু দ্বারকানাথ মিত্র প্রভৃতি তাঁহার প্রায় পঞ্চাশ জন বন্ধুর নাম লিখিয়া প্রত্যেককে অমৃতবাজার পত্রিকার গ্রাহক হইবার জন্য তিনি অনুরোধ-পত্র লিখিলেন। শিশিরকুম এক-একখানি অমৃতবাজার পত্রিকার সহিত পত্রগুলি ডাক যোগে যথাস্থানে প্রেরণ করিলেন। কেবল মহারাজা কমল কৃষ্ণ বাহাদুর ও বাবু দ্বারকানাথ মিত্রের সহিত শিশিরকুমা স্বয়ং সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। টালার পরাণবাবু ব্যতী সকলেই পত্রিকার গ্রাহক হইয়াছিলেন। শিশিরকুমা ইন্‌কম্ ট্যাক্সের প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছিলেন; সুতর তাঁহার ন্যায় দেশদ্রোহীর পত্রিকার গ্রাহক হওয়া পরাণবা সঙ্গত বলিয়া মনে করেন নাই। জজ দ্বারকানাথ শিশি কুমারকে বলিয়াছিলেন,—"আমি আপনার পত্রিকার গ্রাহক হইলাম বটে; কিন্তু আপনার লেখার ভিতর এমন একট তীব্র ভাব লক্ষিত হয়, যাহা হয় ত সময়ে ভারতবর্ষে সাধার লোকদিগের মধ্যে অসন্তোষ ও শেষে অশান্তি উৎপাদ করিবে।" প্রত্যুত্তরে শিশিরকুমার বলিয়াছিলেন,—ভারত বাসীকে তাহাদিগের দুরবস্থার কথা বুঝাইয়া তাহাদে হৃদয়ে স্বদেশ-সেবার প্রবৃত্তি জাগাইয়া, দিবার জন্যই অমৃত বাজার পত্রিকার সৃষ্টি। ভারতবাসী স্বদেশের দুরবস্থা কথা সম্যক্ অবগত নহে বলিয়াই, আপনাদের উন্নতি সাধনে বড়ই উদাসীন। তাহাদের ঔদাসীন্য দূর করিতে হইলে তাহাদের মধ্যে একটু উত্তেজনার সঞ্চার করিয়া দেওয়া আবশ্যক।

অমৃতবাজার পত্রিকার দিন-দিন উন্নতি হইতে লাগিল। আমরা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, কলিকাতায় আসিবার পরে পত্রিকার কতক অংশ ইংরেজী ও কতক অংশ বাঙ্গালাতে লিখিত হইত। পত্রিকার সরস ও সদ্‌যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য জনসাধারণ যে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন, অন্য কোন সংবাদ-পত্র পাঠে তাঁহাদের সে আগ্রহ লক্ষিত হইত না। গভর্ণমেণ্টের কোনও কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে হইলে, তাহা এরূপভাবে লিখিত হইত যে, পাঠকবর্গের সহিত গভর্ণমেণ্টও তাহা পাঠ করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেন। স্যার জর্জ ক্যাম্বেল যখন বাঙ্গালার ছোট-লাট বাহাদুরের মসনদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, শিশিরকুমারের অমৃতবাজার পত্রিকা সেই সময় দেশের জন্য কি করিয়াছিল, আমরা এক্ষণে তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। স্যার জর্জ প্রজাপুঞ্জের প্রতি যে পরিমাণ প্রীতি ও সহানুভূতি প্রদর্শন

করিতেন, জমিদারগণ তাহা তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইতেন না। ছোটলাট বাহাদুরের সহানুভূতি পাইয়া হিন্দু ও মুসলমান প্রজাগণ জমিদারদিগের উপর বিদ্বেষ-পরায়ণ হইয়া উঠিয়াছিল। পাবনা জেলায় একবার প্রজাগণ জমিদারগণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উত্থাপন করিয়াছিল। এই বিদ্রোহের ফলে ঈশানচন্দ্র রায় নামক জনৈক ব্রাহ্মণ লক্ষাধিক লোক লইয়া ইংরেজাধীনে, কিন্তু জমিদারের শাসনের বাহিরে—একটী স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। মিষ্টার নলেন তখন পাবনার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ছোটলাট সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল ও ম্যাজিষ্ট্রেট নলেনের ব্যবহার সম্বন্ধে অমৃতবাজার পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল। মতিলাল এ সম্বন্ধে একটী সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। শিশিরকুমার সেই প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া মতিলালকে বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন। যে কোন বিষয়েই হউক না কেন, শিশিরকুমার সংবাদপত্রে আন্দোলন করিবার পূর্ব্বে তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া দেখিতেন। তিনি কোন বিষয় লইয়া "হুজুগ" করিতে ভালবাসিতেন না। সত্যাসত্যতার অনুসন্ধান না করিয়া তিনি কোন বিষয়েই হস্তক্ষেপ করিতেন না। সার জর্জ্জ ক্যাম্বেলের শাসন-কালে বিহারে একবার দুর্ভিক্ষ হইয়াছে বলিয়া সংবাদপত্রে মহা আন্দোলন হইয়াছিল। লর্ড নর্থব্রুক তখন ভারতের বড়লাটের পদে বিরাজমান ছিলেন। দুর্ভিক্ষের সংবাদে তিনি বড়ই বিচলিত হইয়াছিলেন। অন্নাভাবে যাহাতে একজন লোকও মৃত্যুমুখে পতিত না হয়, তিনি তাহার বন্দোবস্ত করিবার জন্য ছোট লাট বাহাদুরকে আদেশ করেন। সার জর্জ্জ সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন; কিন্তু শিশিরকুমার এই দুর্ভিক্ষের ব্যাপারটী পত্রিকায় বিভিন্ন ভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন। অনুপযুক্ত কালে গভর্ণমেণ্ট প্রচুর অর্থব্যয় করিতেছেন, কিন্তু প্রকৃত দুর্ভিক্ষের সময় হয় ত অনশন-ক্লিষ্ট ব্যক্তিগণ সাহায্যের অভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, শিশিরকুমার ইহাই আশঙ্কা করিয়াছিলেন। অমৃতবাজার পত্রিকার পক্ষ হইতে শিশিরকুমারের মধ্যমাগ্রজ হেমন্তকুমার বিহারের পল্লীতে-পল্লীতে পরিভ্রমণ করিয়া, তত্রত্য অধিবাসিগণের অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া আসিয়া বলিয়াছিলেন যে, বিহারে প্রকৃত দুর্ভিক্ষ হয় নাই; তবে দেশবাসিগণ চিরকাল যে দুঃখ ও কষ্ট ভোগ করিয়া আসিতেছে, এবারেও তাহারা তাহার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে নাই। শিশিরকুমার ইহা তাঁহার পত্রিকায় বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অমৃতবাজার পত্রিকার পূর্ব্বে, ভারতবাসী-পরিচালিত কোনও সংবাদপত্র মফস্বলের প্রকৃত অবস্থার অনুসন্ধানের জন্য যে কখন কোন প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিলেন, এ কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। অমৃতবাজার পত্রিকার কথা গভর্ণমেণ্ট সমীচীন বলিয়া মনে করেন নাই। তথাকথিত দুর্ভিক্ষের প্রতীকার-কল্পে গভর্ণমেণ্ট প্রায় ছয় কোটী টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে এই টাকার অধিকাংশই ন দেবায় ন ধর্ম্মায় ব্যয় হইয়াছিল। যে সময়ে সাহায্য না করিলে বিশেষ কোনও ক্ষতির আশঙ্কা ছিল না, গভর্ণমেণ্ট সেই সময়ে কতকগুলি অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন; কিন্তু দক্ষিণ-ভারতে যখন সত্য-সত্যই দুর্ভিক্ষ ভীষণ মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়াছিল, তখন সাহায্যাভাবে কত লক্ষ লোক যে অনশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। দূরদর্শী শিশিরকুমারের পরামর্শ-মত কার্য্য করিলে, গভর্ণমেণ্ট হয় ত দক্ষিণ-ভারতের লক্ষ-লক্ষ প্রকৃত দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত ব্যক্তির জীবন রক্ষা করিতে পারিতেন।

সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল যে সকল বিধির প্রচলন কিম্বা প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহার কোন-কোনটী বড়লাট বাহাদুর কর্ত্তৃক অগ্রাহ্য ও সার রিচার্ড টেম্পল কর্ত্তৃক রহিত হইয়াছিল। কিন্তু সার জর্জ্জের কৃত সবডেপুটী ও কানন্‌গুর পদগুলি আর পরিবর্ত্তিত হয় নাই। সব্‌ডেপুটী পদের সৃষ্টির ব্যাপার লইয়া অমৃতবাজার পত্রিকায় "সার জর্জ্জ ক্যাম্বেলের আদর্শ ডেপুটী" শীর্ষক একটী সচিত্র ক্ষুদ্র বিদ্রূপাত্মক কবিতা বাহির হইয়াছিল। অমৃতবাজার পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত করিয়া হিন্দু পেট্রিয়টও চিত্রটী প্রকাশ করিয়াছিলেন। কবিতাটী এই—

"সেলামে মজবুত অশ্বা-রোহণেতে।
লাঙ্গুল স্থানে চেন কম্পাশ কাণেতে॥
তিন হাত সাত ইঞ্চি দুই আঙ্গুল দু পাটী।
আমাদের হুজুরের মনমত ডেপুটী॥"

চিত্রটী প্রকাশিত হইলে দেশমধ্যে একটা মহা উত্তেজনা পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ইংরজে-সম্প্রদায়-মধ্যে অনেকেই

উক্ত চিত্রটীর জন্য অমৃতবাজার পত্রিকা ক্রয় করিয়াছিলেন। সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল হিন্দুদিগের প্রতিজ্ঞা করিবার জন্য এক অতি অদ্ভুত বিধানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কোন হিন্দুকে শপথ করিতে হইলে, গরুর ল্যাজ ধরিতে হইবে, ছোটলাট বাহাদুর যখন এই ব্যবস্থা করেন, তখন শিশিরকুমার অমৃতবাজার পত্রিকায় একটী বিদ্রূপাত্মক চিত্র প্রকাশ করেন।

পাঠক! আমরা এইখানে বলিয়া রাখি, ১৮৭৪ খৃঃ অঃ ২রা এপ্রিল হইতে, অমৃতবাজার পত্রিকা ২নং আনন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গলি হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৮৭৪ খৃঃঅঃ ৩০শে এপ্রেল তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় রংপুরের তৎকালীন জজ মিষ্টার লেবিনের বিরুদ্ধে দুইটী এফিডেবিট প্রকাশিত হইয়াছিল। জজ সাহেব বাঙ্গালা জানিতেন না; আইনেও তাঁহার জ্ঞান অতি অল্প; এজন্য তাঁহার সেরেস্তাদারই মোকদ্দমার রায় লিখিয়া দিতেন। জজকোর্টের কয়েকজন উকিল এই সংবাদ শিশিরকুমারকে জানাইয়া তাঁহার পত্রিকায় আন্দোলন করিবার জন্য অনুরোধ করেন। আমরা একটী এফিডেবিট হইতে অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

"We Hiralal Mitra, Matiar Rahaman, Ramkamal Roy, Koylashchandra Sen, Mahima ch. Mazumdar, Krishna ch. Sircar, Gopal ch. Chakrabutty, Shyamamohan Chakrabutty, Mahesh eh. Sircar, Pyarilal Roy, Prosannanath Chowdhury, Kalidas Moitra, pleaders practising at the Judge, and Sub-Judge's Court at Rungpore do solemnly declare and affirm as follows :—

(I) That we know and believe that the present Judge A. Levin does not understand the current language of the Court, has no adequate knowledge of the Law and Regulations in force and is regardless of the duties of his high and responsible post.

(II) That we know that the Sherristadar of the Court Womachurn Sen sits with the Judge in the ijlas, takes down notes of the arguments addressed to the Court by the pleaders, dictates to the Judge in open Court the orders that have to be passed in the ordinary course of the Judge's official duties and that the said Sherristadar does write out the Judgments decreeing or dismissing cases which the Judge afterwards merely copies out and passes off as his own.

* * * * *

(VIII) "That we do believe that the said Sherristadar Womachurn Sen is the real Judge and the Judge is a mere puppet in his hands and that the Sherristadar takes bribes and disposes of cases in favour of the highest bidder.

Sd. Above-named 12 pleaders. Solemnly affirmed before me this 21st day of April, 1874.

O. C. Roy
Sub-Judge and Commissioner to
administer oathes and affirmations.

বাঙ্গালীর সংবাদপত্রে ইংরেজ জজের বিরুদ্ধে গুরু অভিযোগের কথা প্রকাশিত হইলে, ইংরেজ রাজপুরুষগণের মধ্যে একটা মহা উত্তেজনা পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক ও রংপুরের উকিলগণকে অভিযুক্ত করিবার জন্য তাঁহারা গভর্ণমেণ্টকে উত্তেজিত করিতে ক্রটি করেন নাই। শিশিরকুমারের তীব্র আন্দোলনের ফলে সংবাদটীর সত্যাসত্যতার অনুসন্ধান করিবার জন্য তৎকালীন মাননীয় বিচারপতি সার লুই জ্যাক্সন রংপুরে গমন করিয়াছিলেন। অনুসন্ধানে সকল কথা প্রকাশিত হইয়া পড়িল। সার লুই জ্যাক্সন জানিতে পারিলেন যে, জজ লেবিনের বিরুদ্ধে, অমৃতবাজার পত্রিকায় যে অভিযোগ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। ইহার ফলে বাঙ্গালী সেরেস্তাদারকে তৎক্ষণাৎ কর্ম্মচ্যুত করা হইয়াছিল; কিন্তু তিনি যাঁহার আদেশ-মত কার্য্য করিতেন, সেই ইয়ুরোপীয়

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জজসাহেবকে তাঁহার সহিত কর্ম্মচ্যুত না করিয়া তাঁহার কৈফিয়ৎ তলব করা হইয়াছিল। কৈফিয়ৎ দিবার জন্য মিষ্টার লেবিন বিদায় গ্রহণ করেন; কিন্তু তাঁহার কৈফিয়ৎ দিবার কিছুই ছিল না। তাঁহাকে শেষে গভর্ণমেণ্ট বাধ্য হইয়া কর্ম্ম হইতে অপসৃত করিয়াছিলেন। এই সময়েই দেশপূজ্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অভিযুক্ত ও এসিস্‌টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন। মিষ্টার লেবিন সাহেব, সুরেন্দ্র বাবু বাঙ্গালী।

স্বর্গীয় বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র

স্বর্গীয় রাজা দিগম্বর মিত্র

স্বর্গীয় মহারাজা সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর

সুরেন্দ্র বাবুর মোকদ্দমার ব্যাপার লইয়া শিশিরকুমার অমৃতবাজার পত্রিকায় যথেষ্ট আন্দোলন করিয়াছিলেন; কিন্তু সে সমস্তই নিষ্ফল হইয়াছিল। লেবিনের ও সুরেন্দ্রবাবুর বিচার-পদ্ধতি লক্ষ্য করিয়া শিশিরকুমার বড় দুঃখে লিখিয়াছিলেন,—"লিবিন সাহেব কর্ম্ম হইতে অপসৃত হইয়াছেন। পাঠকবর্গ জানেন যে, লিবিন সাহেব রংপুরের জজ ছিলেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধে সেখানকার উকিলরা হাইকোর্টে অভিযোগ করেন। এরূপ অভিযোগ কোন বাঙ্গালী হাকিমের বিরুদ্ধে হইলে তাঁহার শুদ্ধ চাকরি যাইত না, তাঁহাকে নানা রূপে অবমানিত হইতে হইত। গভর্ণমেণ্ট সুরেন্দ্র বাবুকে যদি শুদ্ধ কর্ম্ম হইতে অপসৃত করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি বিস্তর অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেন; কিন্তু সামান্য কয়েদীর ন্যায় তাঁহার বিচার হইল; তাঁহার দোষগুণ গভর্ণমেণ্ট নানা রূপে দেশ-বিদেশে রাষ্ট্র করিলেন এবং ইংরেজী সংবাদপত্রেরা তাহা লইয়া নানা গালি-গালাজ দিলেন।" শিশিরকুমারের লেখনী কিন্তু সুরেন্দ্র বাবুকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই।

ভাবের অভিব্যক্তি

একাগ্রতা

তাচ্ছিল্য

প্রার্থনা

চোখটেপা

চিন্তিতা

মুখ বিকৃতি

হাঁচি

পাগ্‌লী

রাণীক্ষেত্র-ভ্রমণ

[শ্রীপ্রবোধচন্দ্র রক্ষিত]

রাণীক্ষেত্রের সাধারণ দৃশ্য

ষ্টেসন হাসপাতাল—রাণীক্ষেত্র

প্রকৃতির লীলাভূমি দেখিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? সেই বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া গত ২৫শে অক্টোবর পাঞ্জাব মেলে কাশী হইতে পাহাড়াভিমুখে রওনা হইলাম। লক্ষ্ণৌ জংসনে গাড়ীতে জনতা হইয়াছিল। রাত্রি ৮টার সময় বেরিলি জংসনে গাড়ী বদল করিলাম। তিন ঘণ্টা পরে রোহিল-খণ্ড-কুমায়ুন রেলওয়ের ছোট ট্রেণ (metre gauge train) ছাড়িল। এখন শীতের প্রারম্ভ। শেষরাত্রে খুব বেশী শীত অনুভব করিলাম;—কারণ অনুসন্ধানের জন্য জানালা খুলিয়া ক্ষীণ চন্দ্রালোকে দেখিতে পাইলাম যে, দূরে অচল অটল পর্ব্বতশ্রেণী জগৎ-পিতার কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ

পাহাড়ী কুলী

পাহাড়ের সেতু

দার্জ্জিলিঙের নিকটস্থ পথ

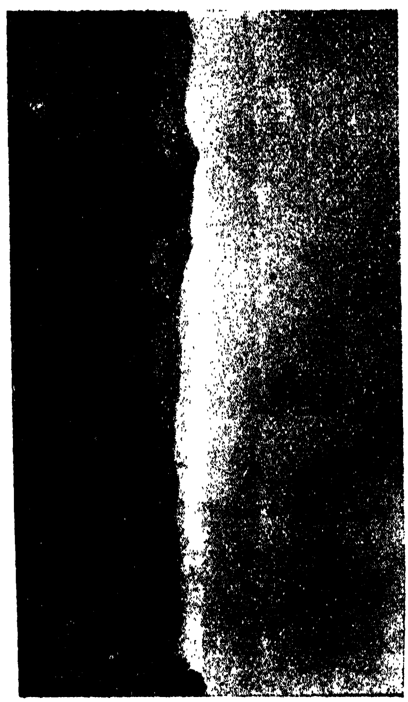

হিমাচল

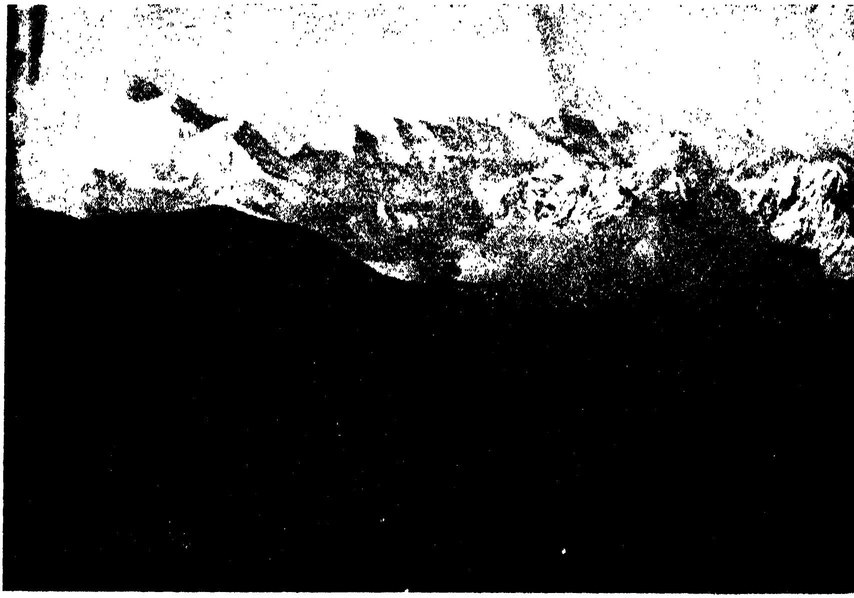

রাণীক্ষেত্র হইতে বরফের পাহাড়

পাহাড়ীর বিবাহ

দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ঊষার আলোকের সহিত কাঠগোদাম নামক সীমান্ত ষ্টেসনে পাহাড়ের পাদদেশে গাড়ী পৌঁছিল। কাশী হইতে কাঠগোদামের দূরত্ব ৪৯৯ মাইল। ষ্টেসনের নিকটে নৈনিতাল, ভাওয়ালি, রাণীক্ষেত্র, আলমোড়া, প্রভৃতি স্থানে পাহাড়-যাত্রী য়ুরোপীয়গণের জন্য বিশ্রামাগার (Resting house) আছে। আমরা ষ্টেসনের বিশ্রাম-কক্ষেই (waiting room) অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। এখানে ভাল ধর্ম্মশালা আছে। শকটের গমনোপযোগী কার্ট রোড (cart road) দিয়া গেলে নৈনিতাল এই স্থান হইতে ২২ মাইল। এক্কা, অশ্ব, ডাণ্ডী, টোঙ্গা অর্থাৎ টম্‌টম্ বা, মোটরে যাওয়া যায়। আমরা রাণীক্ষেতের যাত্রী। এই স্থান বা আলমোড়া যাইবার জন্য সাধারণতঃ

চৌভাটিয়া সেনা-নিবাস

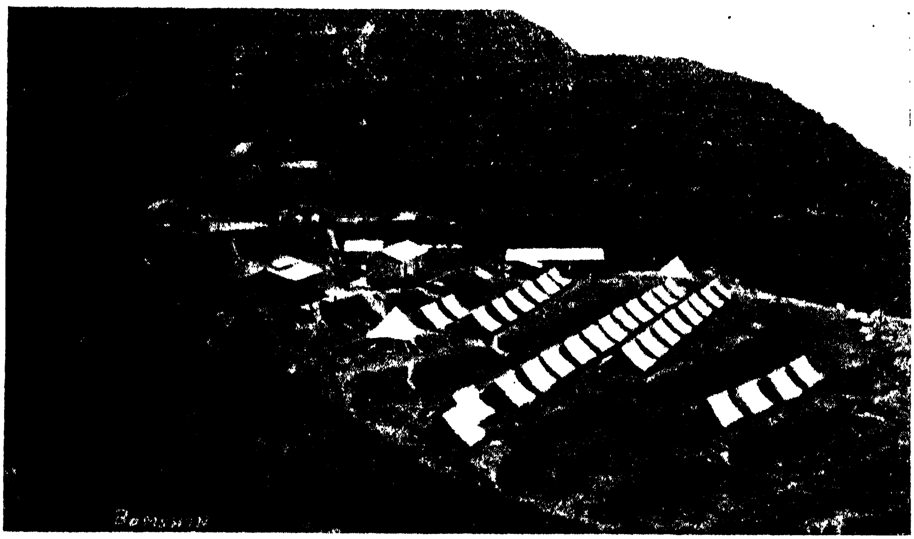

বক্সনের গোরানিবাস

প্রত্যহ গাড়ী পাওয়া যায় না, পূর্ব্ব হইতে বন্দোবস্ত করিতে হয় এবং ভাড়াও অত্যধিক। সেই জন্য এই অঞ্চলে বড় একটা কেহ ভ্রমণ করিতে আসেন না। মোটর, টোঙ্গা বা একাযোগে কার্ট রোড দিয়া রাণীক্ষেত্রে যাইতে ৪৯ মাইল পথ অতিক্রম করিতে হয়। অশ্বগমনের রাস্তা (Bridle path) দিয়া ৩৯ মাইল মাত্র,—বীরভট্টির এই রাস্তা দিয়া ঘোড়া, ডাণ্ডী ও মানুষ যাতায়াত করে। পথে ভীমতালের মনোরম হ্রদের দর্শন-লাভও হইয়া যায়। এতদিন বিখ্যাত স্মিথ রডোয়েল কোম্পানীর টোঙ্গার অনুগ্রহে লোকের যাতায়াতের সুবিধা ছিল। সংপ্রতি ৩০শে অক্টোবর হইতে উক্ত কোম্পানী উঠিয়া গিয়াছে। দেরাদুনে তাহাদের টোঙ্গায় চড়িয়াছি; মসুড়ি পাহাড়ের জন্য তাহাদের ডাণ্ডী পাওয়া যাইত; শুনিয়াছিলাম যে ড্যালহাউসি পাহাড়েও তাহাদের ডাণ্ডীর বন্দোবস্ত ছিল। ৪৯ মাইল পথ

একা-রথে যাওয়া মোটেই প্রীতিপ্রদ নহে। ডাণ্ডী নামক যানে, কুলীর স্কন্ধে বা অশ্বপৃষ্ঠে যাইতে দুই দিন লাগে। সাধারণতঃ ছয় জন কুলী ডাণ্ডী বহন করে। প্রত্যেক কুলীর মজুরী ১॥০; ডাণ্ডী যাতায়াতের ভাড়া ৩৲; প্রত্যেক কুলীর কমিশন ৵০ আনা হিসাবে দিতে হয়। আবার কুলীর জন্য কাঠগোদামের গবর্ণমেণ্টের কুলীর ঠিকাদারকে পূর্ব্বাহ্নে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক। ঘোড়ার ভাড়া ৭॥০ টাকা মাত্র। মালবাহী কুলীর মজুরী ১॥০ টাকা। টম্‌টম্ ভাড়া একজনের জন্য স্থান পাওয়া গেলে ১৮৲ টাকা ছিল; নচেৎ পূর্ণ টম্‌টম্ ভাড়া ৩৫৲ টাকা দিয়াও একদিনে পৌঁছান যাইত না; এবং পাহাড়ের দেশে রাত্রি ভ্রমণের সুখও সহজে অনুমেয়। এই সকল সুবিধা-অসুবিধা খতাইয়া দেখিয়া ১৯॥০ টাকা ভাড়া দিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর মোটরে যাইবার বন্দোবস্ত করিলাম। পূর্ব্ব হইতে স্থানীয় টোঙ্গা ইনস্পেক্টরকে পত্র দেওয়ায়, সাহেব আমাকে ১৯॥০ টাকায় একজনের স্থান দিয়াছিলেন; নচেৎ ৭৫৲ টাকা ভাড়ায় সম্পূর্ণ মোটরখানি লইয়া যাওয়া ঘটিয়া উঠিত না। কাঠগোদামে নৈনিতাল ট্রান্সপোর্ট কোম্পানী নামে যে আর একটী মোটর কোম্পানী আছে, তাহা রাণীক্ষেত, আলমোড়া প্রভৃতি স্থানে যাত্রী বহন করে। রাণীক্ষেত হইতে প্রত্যাগমন কালে তাহাদের আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। মোটরে আমার সমভিব্যাহারী জনৈক সাহেব ৪৲ টাকা ভাড়া দিয়া নৈনিতাল ব্রুয়ারি (ভাটিখানা) পর্য্যন্ত যাইবার টিকিট লইয়াছিলেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ ও গল্প করিতে-করিতে ১৪ মাইল পথ বেশ সুখে কাটিয়া গেল। এ পর্য্যন্ত রাস্তা খুব ভাল; কারণ যুক্ত-প্রদেশের ছোটলাট সাহেব গ্রীষ্মের সময় নৈনিতালে অবস্থান করেন। ভাটিখানায় আমাদের সাহেব নামিয়া গেলেন। তিন মাইল মাত্র অশ্বারোহণে বরাবর খাড়া পথে উঠিলেই তিনি ইংরেজের সাধের শৈলনিবাস নৈনিতালে পৌঁছিবেন। অদূরে নৈনিতালের বাড়ীগুলি সূর্য্য-কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া বড়ই মনোরম দেখাইতেছিল। সেখানকার বিখ্যাত হ্রদ (lake) দেখিবার জন্য মন বড় চঞ্চল হইল। মোটর-চালককে বলিলাম যে "মোটর লইয়া চল, অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দিব।" সে কহিল, "বাবুজী, ভাটিখানা হইতে নৈনিতাল পর্য্যন্ত মোটরে যাইবার পথ নাই। কাঠগোদাম হইতে ১০॥০ মাইল উঠিলে, অপর এক মোটরের রাস্তা আছে। তাহা হইলে আবার আমাদিগকে অনেক নামিয়া যাইতে হয়।" বিশেষ দুঃখের সহিত এখন সেখানে যাইবার প্রস্তাব পরিত্যাগ করিতে হইল। স্থির করিলাম যে, ফিরিবার পথে হ্রদ দেখিয়া যাইব। পাহাড়ে চারি স্থানে ইংরেজ সৈন্যগণের বস্ত্রাবাস (camp) আছে,—ভাটিখানায় প্রথম দেখিলাম। মোটরে আমি ও চালক।

মতিঘাট

আপন মনে স্বভাবের অনাবিল শোভা সন্দর্শন করিতে-করিতে উপরে উঠিতে লাগিলাম। একবার যে পথ দিয়া যাইলাম, ক্ষণেক পরে ঘুরিতে-ঘুরিতে তাহার উপরের রাস্তা দিয়া গাড়ী চলিতে লাগিল। পর্ব্বতমালার প্রত্যেক স্থান অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যরাশি-বিভূষিত। নানা স্থানে সুবৃহৎ স্বভাবজাত পাইন ও দেবদারু বৃক্ষরাজি উন্নত শিরে দণ্ডায়মান থাকিয়া ধরাকে শোভাদান করিতেছে। সিমলা ও দারজিলিং

পাহাড় রডোডেনড্রন (Rhododendron)বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায় ; এখানে তাহা দেখিতে পাইলাম না। মাইল-ষ্টোন পাথরে যেখানে ২২ মাইল খোদিত আছে, সেখান হইতে ভাওয়ালি আরম্ভ হইল। এখানে গোরাদের দ্বিতীয় বস্ত্রাবাস রহিয়াছে দেখিলাম। Mrs. Cotton's Viewforth Hotelএ জলযোগ সারিয়া লইলাম। নিকটে যক্ষ্মারোগীর স্বাস্থ্যনিবাস। যাঁহারা এই সম্বন্ধে সংবাদ পাইতে ইচ্ছা করেন,তাঁহারা King Edward Sanatorium, Lotni, Dt. Almora এই ঠিকানায় পত্র দিবেন। দারজিলিং,সিমলা,মসুরি প্রভৃতি হিমালয়-বক্ষস্থ স্থানে স্বাস্থ্যনিবাস প্রতিষ্ঠিত না করিয়া এখানে, আলমোড়া, ধরমপুর প্রভৃতি স্রোতস্বিনী কুলুকুলু নাদে বহিয়া যাইতেছে। পাহাড়ের নদীর জল স্বচ্ছ ও নদীটী ক্ষীণতোয়া। রতিঘাট ও বম্‌সন্ নামক স্থানদ্বয়ে গোরাদের বস্ত্রাবাস রহিয়াছে। তাঁবুতে গোরার সংখ্যা কম। ক্রমে রাণীক্ষেত ছাউনীর (cantonment) ঘর-বাড়ী নয়ন-পথে পড়িতে লাগিল। পাইন গাছের সারি চলিয়াছে। অবশেষে ৪ ঘণ্টাকাল মোটরে আরোহণ করিয়া আমরা রাণীক্ষেতে আসিয়া পৌছিলাম। এই কার্ট রোড ধরিয়া গেলে আলমোড়া এখনও প্রায় ৩০ মাইল। খড়িবাজারের প্রান্তভাগে আমাদের গন্তব্য স্থানে যাইয়া আরাম বোধ করিতে লাগিলাম।

নৈনিতাল, আলমোড়া ও গড়বাল এই তিনটি জেলা

রাণীক্ষেত্রের কাওয়াজ ভূমি

দুর্গম স্থানে যক্ষ্মারোগীগণের স্বাস্থ্যনিবাস স্থাপনের কারণ পাইন বৃক্ষের জঙ্গল বলিয়া মনে হইতেছে। পাইনের বাতাস তাহাদের পক্ষে পরম হিতকারী। Olei Pine Sylvestris নামক ঔষধ এই রোগে বিশেষরূপে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। আমরা ক্রমে গরমপাণি নামক গ্রামে পৌছিলাম। এখানে দেশীয়গণের বিশ্রামের স্থান আছে। চালক বলিল যে, "এখানকার ঝরণার জল গ্রীষ্মকালে অপেক্ষাকৃত গরম বলিয়া এই স্থানের নাম গরমপাণি।" খয়েরনা নামক স্থানের সেতুটি বেশ সুন্দর। আমরা এতক্ষণ কেবল উঠিতেছিলাম ; মধ্যে-মধ্যে যে নামিতে হয় নাই এমন নহে। এখন সমতল-ভূমিতে মোটর দ্রুতগতিতে ছুটিল। রতিঘাটের দ্বারা কুমায়ুন বিভাগ বিভক্ত। গড়বাল জেলার বদরিনাথ তীর্থের কথা অনেকেই শুনিয়াছেন। উত্তর-পূর্ব্বে তিব্বত, উত্তর-পশ্চিমে গড়বাল, দক্ষিণ-পশ্চিমে নৈনিতাল, ও দক্ষিণ-পূর্ব্বে নেপাল রাজ্য আলমোড়া জেলাকে চতুঃসীমাবদ্ধ করিয়াছে। আলমোড়া এই জেলার প্রধান সহর এবং রাণীক্ষেত দ্বিতীয় সহর। ইংরেজ সেনাগণের ছাউনী (cantonment) থাকায় আজকাল এখানকার বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। এখানকার জলবায়ু বিশেষ স্বাস্থ্যকর। গ্রীষ্মকালে নানা দেশ হইতে অনেক সাহেব স্বাস্থ্যলাভের নিমিত্ত এখানে আসিয়া থাকেন। দারজিলিং, নৈনিতাল, মসুরি, সিমলা প্রভৃতি হিমালয়ের স্বাস্থ্যনিবাসগুলি জনতাপূর্ণ বলিয়া অনেকে

এই মনোরম, নির্জ্জন স্থান পছন্দ করেন। ইহা অপেক্ষাকৃত কোলাহলশূন্য, অথচ বাজার, হাসপাতাল, ক্লাব প্রভৃতি থাকায় সুবিধাজনক। যথেষ্ট সমতল-ভূমি ও অন্যান্য সুবিধা থাকায়, এক সময়ে সিমলা পাহাড় হইতে রাণীক্ষেতে সামরিক সদর (military headquarters) স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে এখানে তিন পল্টন(battalion) গোরা সৈন্য এবং Supply Transport Corpsএর খচ্চর (অশ্বতর) বাহিনী ছিল। শীতের দরুণ অধিকাংশ গোরা বেরিলী প্রভৃতি সমতল-ক্ষেত্রে নামিয়া গিয়াছে। এখন বাজার হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরস্থ চুলীক্ষেতের ছাউনীতে গোরা আছে। নিকটেই কাওয়াজের সুবিস্তৃত ময়দান (parade ground)। এখানে ঘোড়-দৌড় হয়। ১২।১৩ বৎসর পূর্ব্বে ডিনামাইটের দ্বারা পাহাড় ভাঙ্গিয়া এই স্থান সমতল-ভূমি করা হইয়াছিল। প্রত্যহ আলমা ব্যারাক্ হইতে ১২টার সময় তোপধ্বনি হয়।

এই প্রদেশের প্রাচীন কাহিনী ঐতিহাসিক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে চিরস্মরণীয়। বিখ্যাত ঐতিহাসিক তেরিস্তার মতে যে পুরুষসিংহ পোরস বা পুরু বিতস্তা (Hydaspes) নদীতীরে ভুবন-বিজয়ী আলেক্‌জান্দারের পথরোধ করিয়াছিলেন, তিনি ও কুমায়ুনের রাজা ফুর (Phur) একই ব্যক্তি। ইহা সত্য হইলে এদেশবাসিগণের গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। চন্দ্রবংশীয় রাজপুত সোমচাঁদ বিখ্যাত চাঁদবংশীর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। আত্মচাঁদ ও তাহার বংশধরগণ কয়েক শতাব্দী রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে গুর্খাগণ আলমোড়া অধিকার করে। গুর্খাগণ গোরখপুর ও অন্যান্য বৃটিশ অধিকৃত স্থানে লুণ্ঠন প্রভৃতি আরম্ভ করিলে, লর্ড হেষ্টিংশ তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে জেনারেল জিলিপসি দেরাছুনের নিকটস্থ কালঙ্গাদুর্গ আক্রমণ করেন। একদল গুর্খা কুম্‌পুরে (বর্ত্তমান রাণীক্ষেত্রে) পরিখাবদ্ধ হইয়া কয়েকদিন যাবৎ বিজয়ী ইংরেজ সৈন্যের গতিরোধ করিয়াছিল। অবশেষে কর্ণেল গার্ডিনার স্থির করিলেন যে,যদি কুম্‌পুর ও আলমোড়ার মধ্যস্থিত স্যাহিদেবী নামক পাহাড় জয় করা যায়, তাহা হইলে সুবিধা হইবে। কাজেও তাহা হইল। কিন্তু পরাজিত গুর্খাগণ কাপ্তেন হিয়ারসিকে বন্দী করিয়া লইয়া আলমোড়া রক্ষা করিতে পলায়ন করিল। তৎপরে কর্ণেল নিকোলাস যুদ্ধ-যাত্রা করেন। তাঁহার সহিত যুদ্ধে গুর্খানেতা হস্তিদল মৃত্যুমুখে পতিত হইল। বিজয়-লক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হইয়া ইংরেজের গলে জয়মাল্য অর্পণ করিলেন। দেশে শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল। গার্ডিনার সাহেব কুমায়ুনের কমিসনার এবং ট্রেল তাঁহার সহকারী নিযুক্ত হইলেন। রামসে সাহেবের আমলে এদেশের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। দুর্গম পর্ব্বত আলমোড়াতে দেশীয়গণের জন্য কলেজ স্থাপন,—তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তির একটী নিদর্শন।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে এই স্থানে লোক-বসতির সূত্রপাত হয়। সর্ণা, কোটলি, টানা, রাণীক্ষেত্র গ্রামগুলি লইয়া এই সহর স্থাপিত হইয়াছিল। আলমোড়া জেলার চির পাইন (chir pine) বৃক্ষ হইতে ধূণা বা রজন ও এক প্রকার আল্‌কাতরা বাহির করা হয়। এই গাছ খুব উচ্চ এবং পাতাগুলি মোটা সূচীর মত সরু ও খুব লম্বা। এই প্রদেশের ঘর-বাড়ী, দরজা-জানালা ইহার গন্ধযুক্ত, কঠিন ও দীর্ঘকালস্থায়ী কাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মিত হয়। ইহার নির্য্যাস প্রভৃতি বাহির করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট-প্রতিষ্ঠিত কারখানা আছে। রাণীক্ষেত্রের সেনা-নিবাসের চতুঃসীমার মধ্যে, সাধারণকে বন কাটিতে দেওয়া হয় না,—আইন-ভঙ্গকারী শাস্তি লাভ করে। সেনানিবাসের ম্যাজিষ্ট্রেট ও সব্‌-ডিভিসনাল অফিসারের কাছারী দুইটী দেখিবার জিনিস। শেষোক্ত কাছারীর নীচে প্রকাণ্ড মাঠে শিক্ষা-নবীশ গুর্খাসৈন্যগণ রণ-বিদ্যা শিক্ষা লাভ করিতেছে। তাহাদের কয়েকটি তাঁবু পড়িয়াছে। কাছারীর অপর পার্শ্বে রাজকোষ (Treasury); ১৯০৭ সালে আলমোড়া হইতে এখানে কোষখানা স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

বাজার হইতে ৫ মাইল দূরস্থিত সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গকে চৌভাটিয়া বলে। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহার উচ্চতা ৬৯৪২ ফিট। গত ৩০শে নভেম্বর কয়েক ঘণ্টা বৃষ্টিপতনের পর ২ ইঞ্চি পরিমাণ বরফপাত হইয়াছিল, ক্রমে সূর্য্য-কিরণ-সম্পাতের সহিত গলিয়া যায়। রাণীক্ষেত্রের উচ্চতা ৫৯৮৩ ফিট মাত্র। এখানে অন্যান্য বৎসর শীতকালে বরফ পড়ে নাই। এবার মাঝে-মাঝে বরফের শিল পড়িতে দেখিয়াছিলাম। পাহাড়ের উচ্চতার উপর বরফপাত নির্ভর করে। নৈনিতাল ৬৪০০ ফিট এবং আলমোড়া ৫৪০০

ফিট মাত্র উচ্চ। চৌভাটিয়ার পাহাড় কাটিয়া বেশ সমতল করা হইয়াছে। শীতের দরুণ এখানকার সেনা-নিবাসে কোন গোরা নাই। পাহাড়ের উপর হইতে চিরতুষারাবৃত দিগন্তবিস্তৃত হিমাচলের দৃশ্য অতি সুন্দর, অতি মহান্। জল সরবরাহের জন্য এখানে জলের কল (Pumping station) আছে। ১০০০ ফিট নিম্নের ঝরণাগুলি হইতে জল টানিয়া সুবৃহৎ টাঙ্কে জমা করিয়া সহরে বিতরিত হইয়া থাকে। লোকের বাড়ীতে কল নাই, রাস্তার কল হইতে জল আনিতে হয়। শুনিলাম সহরে যে একজন প্রবাসী বাঙ্গালী আছেন, তিনি জলের কলের ইঞ্জিনিয়ার। যে ৭।৮ জন বাঙ্গালী স্থানীয় কমিসেরিয়েটে কার্য্য করিতেন, যুদ্ধারম্ভে তাঁহারা মেসোপটেমিয়াতে প্রেরিত হইয়াছেন। পূর্ব্বে ইন্‌সিনারেটার (Incenerator) যন্ত্র দ্বারা সহরের সমস্ত মল ভস্ম করা হইত; সেই প্রণালীতে অকৃতকার্য্য হওয়ায় এক্ষণে নানাস্থানে পাইনের শুষ্ক-পত্র দ্বারা ভস্মীভূত করিয়া নষ্ট করা হয়। কলিকাতাতেও এক সময়ে এই প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছিল,-- কিছুদিন পূর্ব্বে ২নং কন্‌ভেণ্ট লেনস্থ বঙ্গদেশের স্যানিটারি কমিশনার সাহেবের আফিসে এই যন্ত্র অকর্ম্মণ্য অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম।

রাণীক্ষেত্রের সদর বাজার প্রসিদ্ধ, ৮।১০ মাইল দূরস্থ গ্রামবাসিগণও এখানে বাজার করিতে আসে। সব দেশের মত এখানকার বাজার অপরিস্কার ও অস্বাস্থ্যকর। অন্য দেশে যেমন দেশীয় লোকের উত্তম স্থানে বাসভূমি মিলে, এখানে অর্থ দিলেও তাহা পাওয়া যায় না। পাদরী সাহেবগণের স্থাপিত স্কুলে (middle vernacular school) অষ্টমশ্রেণী পর্য্যন্ত পাঠের বন্দোবস্ত আছে, অর্থাভাবে ইহা উচ্চশ্রেণীর স্কুলে পরিণত হইতেছে না। এখানে ধর্ম্মশালা আছে; কিন্তু শীতনিবারণের জন্য যেমন প্রায় সব গৃহেই চিম্‌নি আছে, ধর্ম্মালয়ে সে বন্দোবস্ত নাই।

সেপ্টেম্বর মাসে জরিল (অর্থাৎ গরীবদের) বাজারে নন্দাদেবীর মেলা উপলক্ষে নাচ-গান ও ছাগল-মহিষ বলি হয়। পাহাড়ীয়াদের ধর্ম্মবিশ্বাস ও পূজা-পদ্ধতি অদ্ভুত। বিষ্ণু, শিব, কালী প্রভৃতি দেবতার পূজাতে বিশ্বাসবান্ হইলেও, তাহাদের মধ্যে গ্রাম্যদেবতা ও প্রেতপূজা এখনও সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত। প্রেত দুই রকম, রাজা ও ভূত জাতীয়, তাহারা বিশ্বাস করে যে, যাহার অপমৃত্যু হইয়া শ্রাদ্ধ হয় না, সে ভূত হয়। অবিবাহিত পুরুষ ভূতকে তোলা বলে। শিকার-রত মৃত ব্যক্তি আহরি হয়। শিশু মরিলে মসন্ বলে। যে সকল পরী যুবক যুবতীকে মুগ্ধ করে, তাহারা আচিরি নামে খ্যাত। তাহারা দেবতাগণের নিকট লাউ, পুরুষ-মহিষ, ছাগ, শূকর, এমন কি টিকৃটিকি পর্য্যন্ত বলি দিতে দ্বিধা বোধ করে না। রাজপুত ব্রাহ্মণ, ছত্রি ও ডোম, এই তিন প্রকার জাতি পাহাড়ে দেখিতে পাওয়া যায়। আদিমনিবাসী ডোমেরা গ্রামের নীচ কর্ম্ম করে, কদাচ কৃষি-কর্ম্ম করে বা জমিদার হইতে পারে। এই জেলায় যত ভুটিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, যুক্তপ্রদেশের অন্য কোন স্থানে তত দেখা যায় না। বহু-বিবাহ কখন-কখনও দেখা গেলেও তাহা অধিক প্রচলিত নহে। বালিকাগণের ৯ হইতে ১৮ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সে বিবাহ হইতে দেখা যায়। ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের কথা স্বতন্ত্র। গণেশ-পূজা করিয়া বিবাহ-কার্য্য সংক্ষেপে সাধিত হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীকে ছোট ভ্রাতার নিকট সমর্পণ করা হয়, জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার নিকট কখনও নহে। কাশীতে কাহার প্রভৃতি জাতির মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত আছে। পাহাড়ীয়া রমণীগণ গৃহে বাস করে, এবং লাঙ্গল দেওয়া ব্যতীত শস্যোৎপাদনের সমস্ত কাজ দেখে। ইহাদের মধ্যে পর্দ্দা প্রথা নাই। পাহাড়ে কখনও মোটা লোক দেখা যায় না; পাহাড়ী খুব সবল ও কর্ম্মঠ। যুক্ত-প্রদেশের অধিকাংশ স্থানে হিন্দুস্থানী স্ত্রী-কুলি পাওয়া যায়; কিন্তু বাঙ্গালা, বা উড়িষ্যাদেশে ইহা বিরল। দার্জ্জিলিং পাহাড়ের মত এখানে স্ত্রী-কুলি প্রচুর নহে। তাহারা ২।৩ মণ পর্য্যন্ত ভারী মোট অক্লেশে বহন করিতে পারে, পুরুষগণ ততোঽধিক। পাহাড়ের জল-বায়ু ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাহাদিগকে জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ স্বাস্থ্যধনে ধনী করিয়াছে। শরীরের সহিত মনের ঔৎকর্ষ্য সাধনে সমর্থ হইলে তাহারা এক শ্রেষ্ঠ জাতিরূপে পরিগণিত হইবে। আমাদের পাঠকগণ মানসিক উন্নতি-বিধানে তৎপর, কিন্তু শরীরের প্রতি অবহেলা করিয়া তাহার ফলভোগ করিতেছেন। ম্যালেরিয়া-জর্জ্জরিত বঙ্গ-ভূমি স্বাস্থ্যের পক্ষে তেমন অনুকূল নহে। কিন্তু তাঁহারা যদি লজ্জা-ভয় পরিত্যাগ করিয়া বাল্যকাল হইতে শারীরিক ঔৎকর্ষ্য লাভে ব্রত হয়েন, তবেই এই

অধঃপতিত বাঙ্গালি-জাতি জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে পারিবে।

সরকারী বাড়ীগুলি প্রস্তর-নির্ম্মিত; কাষ্ঠ ও করোগেট্ ও লৌহ দ্বারা তাহাদের ছাদ প্রস্তুত হইয়া থাকে। পাহাড়ীয়াগণের গৃহের ছাদ প্রস্তর বা পাইন-কাষ্ঠ দ্বারা গঠিত হইতে দেখা যায়। আলমোড়া ও রাণীক্ষেত্র সহর ব্যতীত এই জেলায় পুলিশের তেমন বন্দোবস্ত নাই। গ্রামের প্রধানগণ দোষীকে গ্রেপ্তার করিয়া পাটোয়ারীর নিকট সংবাদ দেয়, পাটোয়ারী ও থোকদারগণ থানায় পুলিশের নিকট নালিশ করে। ইংরেজরাজের আগমনের পূর্ব্বে গ্রামের স্বায়ত্তশাসন এইরূপ ভাবে সম্পন্ন হইত।

প্রকৃতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্যখনি তুষারমণ্ডিত হিমাচল সকল স্থানের পাহাড় হইতে দৃষ্ট হয় না। রাণীক্ষেত্রের অনেক স্থান, এমন কি আমাদের বাসা হইতে যে অনিন্দ্য রূপরাশি দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তাহার বর্ণনা করিতে বাক্য স্তব্ধ হয়, ভাষা পরাস্ত হয়। বহুনিম্নে শৈল-মালার অধিত্যকাংশে আমাদের পাচক ও ভৃত্য লছমনসিংহের বাসস্থান সণৌলি গ্রাম সন্ধ্যার পূর্ব্বে সূর্য্য-কিরণ-সম্পাতে চিত্রপটে প্রতিফলিত পার্থিব-জগতে সৌন্দর্য্যময়ী দৃশ্যাবলীর ন্যায় হৃদয়হারী। অপূর্ব্ব শস্যশোভার শ্রীসম্পদে এই প্রদেশের চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত হইতেছে; সেই জন্যই বুঝি এই স্থানের নাম রাণীক্ষেত্র হইয়াছে। পর্ব্বতশ্রেণী পরস্পর সংলগ্ন হইয়া যেন জালের ন্যায় নিবদ্ধ রহিয়াছে। এই পর্ব্বত-নিচয় যেন তরঙ্গায়িত—একটীর উপর আর একটী উঠিয়াছে এবং ক্রমে তাহা উচ্চ হইতে উচ্চতর ও তুষারমণ্ডিত হইয়া অনন্ত আকাশে মিশিয়া গিয়াছে। বরফরাশির উপর নানা ক্ষণে নানা স্থানে সূর্য্যরশ্মি বা জ্যোৎস্নার অমল-ধবল-ছটা নিপতিত হওয়ায় উহাদের সৌন্দর্য্য মুহুর্মুহু পরিবর্ত্তন-শীল। এ দৃশ্য যে দেখিয়াছে সেই মুগ্ধ হইয়াছে।

রঙ্গমহাল

[শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী]

(১)

প্রণয়ের ধ্বংস-শেষ, রূপের সমাধি অভিরাম!
এই প্রেম? এই পরিণাম?
না ফুরাতে বসন্তের মেলা
ভেঙ্গে গেল কবে ফুল-খেলা?
কোন্ বিশ্বদাহী তৃষাতাপে,
কোন্ বিরাগীর অভিশাপে
ভস্ম আজ তব পঞ্চশর,
ভগ্ন তব কোয়েলার স্বর?
শূন্য মৌন মহলে-মহলে
গম্বুজের ফাটলে-ফাটলে
সাহারার হা-হা সম তৃষা শুধু উঠিছে উধাও—
মেরি জান, আও—আও, কলিজামে আও!

(২)

শিলা-সৌধে ছল্‌ছল্ লীলাময় মর্ম্মর-মূরতি!
হো হো প্রেম! হায় কি নিয়তি!
সে স্বর্ণ-শতাব্দী যেন আজি
মায়াবীর রঙ্গ-ছায়াবাজী,
অতীতের নেপথ্য হইতে
দেখা দেয় ঝিলিকে চকিতে
কত রূপ-যৌবন-ইতিহাস,
কত সুধা, গরল-উচ্ছ্বাস,
কত ভান, মান-অভিমান
কত দান, কত প্রত্যাখ্যান!
সাহারার হা-হা সম আজ শুধু উঠিছে উধাও-
মেরি জান, আও—আও, কলিজামে আও!

(৩)

অশরীরি দেওয়ানা পীরিতি কোন্ টানে নেমে আসে হেথা ?
এই প্রেম ? এত তার ব্যথা ?
জ্যোৎস্না-যামিনীর স্রোতে ভাসি,
বুকভরা স্বপনের রাশি—
কবরের আবরণ খুলি'
বিস্মৃতির যবনিকা তুলি'
কক্ষে-কক্ষে এ শ্মশান-পুরে
ছায়া-মূর্ত্তি সারারাত্রি ঘুরে !
হাসে, কাঁদে—কি যেন কুহকে !
চলে' যায় দিনের আলোকে।
সাহারার হা-হা সম শুধু আহা, উঠিছে উধাও—
মেরি জান, আও—আও, কলিজামে আও !

(৪)

কাণে আসে পদ-শব্দ, প্রাণে বাজে কাদের ঘুঙুর !
এই প্রেম ? এতই ভঙ্গুর ?
ফিরোজা-রঙ্গের পেশোয়াজ,
পাদুকায় চুম্‌কীর কাজ,
বেণী বাঁধা জরীর ফিতায়,
কালো আঁখি শোভিত সুর্ম্মায়,
ভুর্‌ভুর্ হেনার আতর,
ঝুর্‌ঝুর্ ফোয়ারার স্বর,
এস্রাজের সাথে গলা সাধে
প্রেম-গীত লাজে যেন বাঁধে।—
সাহারার হা-হা সম রেশ আহা, উঠিছে উধাও—
মেরি জান, আও—আও, কলিজামে আও !

(৫)

কে তোমরা শায়িত কবরে ? ঘুমাও, ঘুমাও অবিরাম !
এই প্রেম ! এই পরিণাম !
প্রিয়-বক্ষ উপাধান করি,
ঘুমা'তি না তোরা, নারী-পরী ?
অর্দ্ধ-রাতে জাগি প্রিয়তম
চিবুকটি ধরি, ক্ষিপ্তসম
'দিলজান' বলিয়া আদরে
প্রেম-চিহ্ন আঁকিত অধরে !
সে চুম্বন-সরস অধর
হয়ে আছে কাতর পাথর !—
সাহারার হা-হা সম শিলা ফাটি' উঠিছে উধাও—
মেরি জান, আও—আও, কলিজামে আও !

(৬)

কে সে জান? কাহার কলিজা? কোথায় সে দেওয়ানা পীরিতি?
হো হো প্রেম, এই তোর রীতি !
বুক-ফাটা পাষাণের মুখে
শ্মশানের ক্ষুব্ধ বায়ু-বুকে
শোন পান্থ কি অভয় ভাষা,
"অমর ! অমর ! ভালবাসা !"
নিশ্চল সমাধি শুনি' নড়ে,
কবরে-কবরে সাড়া পড়ে,
"মরি নাই, মরি নাই, প্রিয়,
প্রেম, সে যে ধরার অমিয় !"
সাহারার হা-হা সম তার সাথে উঠিছে উধাও—
মেরি জান, আও—আও, কলিজামে আও !

দু'কুড়ি সাত

[শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম-এ, বি-এল]

(১)

"সহজে নাম কিন্‌তে গেলে যেমন যোগ্যতার আবশ্যক, তেমনি নামটাও একটু কট্‌মটে রকমের হওয়া চাই।"

টেবিলের উপর শ্রীচরণ তুলিয়া চেয়ারের উপর অর্দ্ধ-শায়িত অবস্থায় খবরের কাগজ পাঠ করিতে-করিতে আমার অংশীদার প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভ সতীশচন্দ্র অলসভাবে এই কথাগুলি বলিল। অবশ্য আমার দিকে তাকায় নাই বা তর্কের অবতারণা করিবার জন্য আমাকে সম্বোধন করিয়াও সে এ কথাগুলা উচ্চারণ করে নাই। আমি কিন্তু তর্কের সুবিধাটুকু পরিত্যাগ করিয়া কাপুরুষোচিত মৌনাবলম্বন যুক্তিসিদ্ধ মনে করিলাম না। আমাদের পল্লীর প্রখ্যাত-নাম্নী "লড়ায়ে পিসির" কলহ-প্রণালীর অনুকরণ করিয়া বলিলাম—"তার কি কোনও মানে আছে?"

সতীশ বলিল,—একটু আছে বই কি!

আমি বলিলাম,—অমনি থাকলেই হ'ল? গায়ের-জুরি কথা বল কেন?

সে টেবিলের উপর হইতে পা' নামাইল। জৃম্ভন ত্যাগ করিয়া চেয়ারে উঠিয়া বসিল। টেবিলের উপর খবরের কাগজখানা রাখিয়া একবার চক্ষু মুছিল। (এ সবগুলা তাহার বাক্‌-যুদ্ধের উদ্যোগ-পর্ব্ব।) আমিও কোমর বাঁধিলাম। সে বাক্স হইতে সিগারেট বাহির করিয়া আমাকে একটা দিল—পালোয়ানেরা কুস্তি লড়িবার পূর্ব্বে যেমন মৃত্তিকা-বিনিময় করে। নিজের সিগারেটটা টেবিলের উপর ঠুকিয়া সে বলিল—নয় কি?

আমি বলিলাম—মোটেই না।

সে বলিল—এই কাগজ দেখ, এই ব্যারিষ্টার আর এই উকীলের নাম,' এদের নাম দুটা অসাধারণ, তাই লোকে একবার শুন্‌লে ভোলে না।

আমি বলিলাম—বটে! বেচারাদের কি যোগ্যতা নাই?

সে বলিল—নিশ্চয় আছে। কিন্তু কট্‌মটে নামও একটু সাহায্য করে।

আমি বিদ্রূপ করিয়া বলিলাম—যথা গুরুদাস, আশু-তোষ, কেশবচন্দ্র, রামপ্রসাদ—

সে বলিল—ঐ দেখ রামপ্রসাদ! ঈশ্বরচন্দ্র একটু সাধারণ হ'লেও বিদ্যাসাগর অসাধারণ। রামকৃষ্ণের সঙ্গে পরমহংস যোগ হ'য়েছে ব'লে এমন কি ইংরাজেরাও ও-নামটা ভোলে না। বিবেকানন্দ, গোখ্‌লে, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু—

আমি বলিলাম—সুরেন্দ্র, দেবেন্দ্র, জগদীশ, প্রফুল্ল, দ্বিজেন্দ্র—

এবার সে পরাস্ত হইল। বলিল—না, তা' বলছি না; —অর্থাৎ

আমি বলিলাম—বেশী কথায় কাজ কি? এখন পৃথি-বীতে সকলের চেয়ে ক্ষমতাবান লোক—উইল্‌সন্‌। নামটা কি পেট্রোকোচিন, ব্লাডিভোষ্টক্‌, কুরোপ্যাট্‌কিন্‌ বা কামাস-কাট্‌কার মত চোয়াল-ভাঙ্গা? ফক্‌ বা হেগ বা জর্জ্জও খুব গালভরা নাম নয়।

সে বলিল—লয়েড্‌ জর্জ্জে বিশেষত্ব আছে। আমার কথাটা বুঝলে না। আমি বল্‌ছিলাম কি, গালভরা নাম-গুলা কষ্ট করে শিখ্‌তে হয় বটে, কিন্তু একবার কায়দা কর্‌তে পারলে, স্মৃতিতে বেশ চেপে বসে থাকে। উইল্‌সন্‌ খুব মস্ত লোক, কিন্তু তাকে ভুল করে লোকে উইলিয়ম্‌স বল্‌তে পারবে; কিন্তু লয়েড্‌ জর্জ্জ বিকৃত হ'বে না।

আমি বলিলাম—বাজে তর্ক।

সে বলিল—এই আমাদের দেখ না। তুমি আমি কাজ করি; কিন্তু কারবারের নাম—নরেশ সেন, প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভ। যদি আমার নাম হ'ত—সতীশ চাটুয্যে ডিটেক্‌টিভ—নামটার অন্ততঃ একটা বিশিষ্টতা থাকৃত না।

আমি বলিলাম—হ্যাঁ! ফারমটা প্রায় প্রসিদ্ধি লাভ করেছে নামের বিশিষ্টতার জন্যে। আমাদের নাম বেরিয়েছে "বিবাহ-বিপ্লবের" কেসের জন্য। এবং মনে করিয়ে দেওয়া বাহুল্য যে, সে মামলার কিনারা করেছিলেন অধীন মিঃ নরেশ সেন।

"ভাগ্যবলে। যাক্। কিন্তু যার প্রণালীতে আমরা কাজ করি তারই নামটা দেখ না—সারলক্ হোম্‌স্।

উভয়ে হাসিলাম। আর তর্ক হইল না। মক্কেল আসিল। সতীশ উঠিল না।

মক্কেল আসিল—একজন নয় দুই জন। পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া ব্যবসাদার বলিয়া মনে হইল। একটু ইতস্ত করিয়া বসিল—সতীশ যে কটাক্ষে তাহাদিগকে দেখিতেছিল, তাহাতে একটু ইতস্ততঃ করিবার কথা।

একটু সুস্থ করিবার জন্য আমি তাহাদিগকে বলিলাম—বসুন। সিগারেট খান?

তাহারা পরস্পর মুখের দিকে চাহিল। একজন অর্দ্ধ-স্ফুট স্বরে বলিল—আঁজ্ঞে, হাঁ,—না, থাক্।

অপরটি বলিল—আর বাবু, ক্ষিধে তেষ্টা থাক্‌লে আর আপনাদের শরণাপর্ণ হই? বাবু আমাদের সব্ব্‌নাশ হ'য়ে গেছে।

সতীশ হাসিয়া বলিল,—হাঁা কতকটা হ'য়েছে বই কি? কি ব্যাপারটা বলুন দেখি।

দুইজন পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল। উভয়ে এক সঙ্গে বলিল—বল না।

ওস্তাদজী গান শিখাইবার সময় ছাত্রীর সহিত যখন গলা মিলাইবার চেষ্টা করিয়া গায়—'তেরে বাজারিয়া'—তখন যেমন শব্দ হয়, ইহাদের উভয়ের মিলিত কণ্ঠের সমস্বরটা প্রায় সেই প্রকারের অসমান ধ্বনির সৃষ্টি করিল। যে লোকটি অধিক শিক্ষিত, যাহার "সব্ব্‌নাশের" দায়ে "তেষ্টা" ছিল না—অতি তীক্ষ্ণ অথচ সরু সুরে কথা কহিতেছিল। আর অপরটির গলা বেশ মোটা এবং গম্ভীর।

সরুগলার দিকে চাহিয়া সতীশ বলিল—আপনিই বলুন না।

একটু কাশিয়া কণ্ঠস্বর পরিস্কার করিয়া লইয়া সে বলিল—"আঁজ্ঞে, বেলেঘাটায় আমাদের চালের যৌথ কারবার আছে—আধা-আধি বখরা—সনাতন ত্রিবিক্র দলুই।"

আমি অতর্কিতে বলিয়া ফেলিলাম—বাপ্‌স্।

লোকটি একটু বিস্মিত হইয়া আমার দিকে চাহিল আমি সতীশকে বলিলাম,—যে কথা হ'চ্ছিল। কিন্ত প্রসিদ্ধি চুলোয় যাক্, এমন নামটা পূর্ব্বে তো কখন শুনিনি

সতীশ বলিল—না। কিন্তু এখন শুন্‌লে। একবার কায়দা করতে পারলে আর ভোলবার ভয় নেই। হ্যাঁ, কার নাম সনাতন, আর কার নাম ত্রিবিক্রম?

মোটা-গলা সূক্ষ্ম-কণ্ঠকে দেখাইয়া বলিল—আঁজ্ঞে, ইনি সনাতন দলুই। ইনি বোধমান—বিদ্দেসিদ্ধে আছে—

আমি বলিলাম—হ্যাঁ তা' শুদ্ধ ভাষাতেই প্রকাশ। তা' ত্রিবিক্রম বাবু—

সনাতন বলিল—আঁজ্ঞে ইনি দোলগোবিন্দ বাবু—ত্রিবিক্রম এঁর ছেলের নাম।

মনে-মনে ভাবিলাম, লোকটা কি পাষাণ প্রাণ! অম্লান-বদনে নিজের ছেলের নাম রাখিতে পারে—ত্রিবিক্রম। এমন লোকও দেশে আছে! প্রকাশ্যে বলিলাম—তা' মহাশয়দের শুভাগমনের কারণ কি?

সনাতন—শুনেছি, মশায়রা টিক্‌টিকি—এই ওর নাম কি গোয়েন্দা—অর্থাৎ পুলিস—

উৎসাহ দান করিয়া সতীশ বলিল—বেশ—

সনাতন বলিল—আঁজ্ঞে, আমাদের একটা চুরি হ'য়ে গেছে—নগদ টাকা—রোক টাকা আর নোট,—অধিক টাকা—অর্থাৎ প্রায় চ্যাল্লিশ হাজার টাকা।

আমি বলিলাম—কত? চুয়াল্লিশ হাজার টাকা!

দোলগোবিন্দ বলিল—আঁজ্ঞে চাল্লিশ।

স্বভাবতঃ সতীশ জিজ্ঞাসা করিল,—কিরূপে অত অধিক অর্থ চুরি হইল?

তাহারা বলিল—একটা লোহার ক্যাস-বাক্সে টাকা মৃত্তিকায় প্রোথিত ছিল, গত রাত্রে কে সেই টাকার বাক্স চুরি করিয়া পলাইয়াছে। তাহাদের কর্ম্মস্থল বেলিয়াঘাটা; কিন্তু তাহারা বাস করিত তিলজলা লেনে একখানি দ্বিতল বাটীতে। তাহারা দুইজন ব্যতীত বাসায় থাকিত একটী উৎকলবাসী পাচক ব্রাহ্মণ; আর দিবাভাগে একজন ঠিকা দাসী গৃহস্থালীর কর্ম্ম করিত; রাত্রে সে নিজের বাসায়

থাকিত। তাহাদের একটী মাত্র সরকার, সে বেলিয়াঘাটার গদিতে থাকিত।

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল,—গদিতে বাক্স সিন্দুক নাই?

সনাতন বলিল—আঁজ্ঞে হ্যাঁ, লোহার সিন্দুক আছে, কাঠের ক্যাসবাক্স আছে; খাতাপত্র মাল মজুত সবই গদিতে আছে।

"তবে টাকা বাসায় আনা হ'ত কেন?"

"আঁজ্ঞে না, আনা হ'ত না। গদির টাকা গদিতে থাকৃত। এ টাকা বাসার।"

আমি বলিলাম—গদিতে কত টাকা আছে?

"আঁজ্ঞে তা দুশ' চার শ' যা খাতাদৃষ্টে ঠিক আছে। তহবিলে কোন দিন ঘাটতি-বাড়তি হয় না।

আমি বলিলাম—তবে বাড়ীতে ৪০ হাজার টাকা পুঁতে রেখেছিলেন কেন?

তাহারা পরস্পর মুখের দিকে চাহিল। সতীশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে উভয়ের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিতেছিল। তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেখিয়াই সনাতন কেমন একটু অশান্তি ভোগ করিতে লাগিল। আমিও সাধারণ বিস্ময়ের অংশ ভোগ করিলাম। প্রখর দৃষ্টিতে সেই দলুই-যুগলের দিকে চাহিলাম।

সনাতন বলিল—আর বলই না দলু, সত্যি কথাটা। বদ্দির কাছে ব্যারাম লুকোলে চল্‌বে কেন?

সতীশ বলিল—ওটা বুঝেছি। কারবার বুঝি শীঘ্র উঠ্‌বে, তাই টাকাটা তুলে নিয়ে বাড়ীতে রেখেছিলেন?

সনাতন সতীশের পদধূলি গ্রহণ করিল। বলিল—এ রকম না হ'লে আর মশায়ের খ্যাতি এতটা দূর পর্য্যন্ত বিরিস্তার করেছে।

আমি বলিলাম—তা হ'লে কেসটা চোরের উপর বাট্‌পাড়ি। মশায়রা বাজার মেরে টাকাটা সরিয়েছিলেন —খাতায় বাজে জমা-খরচ করে তহবিল ঠিক্ রেখেছেন; কিন্তু মশায়দের সেই ৪০ হাজার টাকাটি চোরে নিয়ে গেছে।

দোলগোবিন্দ মস্তকে করাঘাত করিয়া বলিল—তা যা বলেন আঁজ্ঞে। তবে হ্যাঁ, এ বিপদটা হবে জান্‌লে ধর্ম্ম-প্রমাণ করে লোকের ল্যাহ্যগণ্ডা বুঝিয়ে দিতেম হুজুর।

আমি বলিলাম—হ্যাঁ তা' নিঃসন্দেহ! তবে খাতা সাফ করার পরিশ্রমটা বৃথাই গেল। এ যুক্তিটা আগে হ'লে—

সতীশ বড় বিরক্ত হইয়া বলিল—আঃ তোমার ওসব ঠাট্টা-বিদ্রূপে কাজ কি? আমাদের কাছে যে মামলা এসেছে, আমরা তারই কথার আলোচনা করব। যেমন করেই হ'ক ওঁদের ৪০ হাজার টাকা একটা টিনের বা লোহার বাক্সয় করে পোঁতা ছিল,—

উভয়ে আবার সেই সরু-মোটা গলায় ঐক্যতান বাজাইয়া বলিল—আঁজ্ঞে।

"কোথায় পোঁতা ছিল?"

"আজ্ঞে নীচের ঘরে, যে ঘরে বামুন ঠাকুর শুতেন।"

সতীশ বলিল—বটে? কেন, সে ঘরে কেন?

দোলগোবিন্দ অভিমান-ভরে সনাতনের দিকে চাহিল। বুঝিলাম, সনাতনের বুদ্ধিতেই টাকার বাক্স নীচের ঘরে পোঁতা হইয়াছিল। সনাতন সেই অভিমানের কটাক্ষের উত্তরে বলিল—আজ্ঞে, আমাদের কু-অভিপ্রায় মোটেই ছিল না। তবে বুঝলেন তো, কু-লোকে কু-কথা রটিয়েই থাকে—বিশেষ একটা গদি দেউলে হ'লে। ওপরে পোঁতবার জায়গাও ছিল না। আর নীচে বেমালুম করে পুঁতে ফেললে কোনও সন্দেহও হ'বে না। এ কষ্টের উপোর্জ্জনের টাকা যে পাচক ঠাকুরের শোবার ঘরে পোঁতা থাকবে এ সন্দেহ কেউ করত না। তবে যখন বিপদ হয়—তখন তো আর কোন বুদ্ধিই হালে পানি পায় না। টাকা তুলে নেবার বুদ্ধিটাও অধীনের, আর স্থান নিৰ্ণয়টাও।

সতীশ নিস্তব্ধে শুনিতেছিল। সনাতন শেষ কথাগুলি একটু গর্ব্ব করিয়া বলিল। তাহার কৈফিয়ত শেষ হইলে বলিল—বেশ কথা। বামুন ঠাকুর কাল রাত্রে শুয়েছিলেন কোথা?

"আজ্ঞে সেই ঘরে।"

"সকালে কোথা?"

"আজ্ঞে নিরুদ্দেশ। ঘরের কপাট খোলা, মাটির তলা থেকে বাক্স বার করে নিয়ে হুজুর মাটি অবধি চাপা দেয়নি।

আমি বলিলাম—তবে আর এ মামলা নিয়ে আমাদের কাছে এসেছেন কেন? পুলিসে খবর দিন, হুলিয়া করিয়ে দিন, তার দেশে লোক পাঠান্, ধরা পড়বে এখন।

সতীশ হতাশভাবে সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনস্তম্ভে মনো-

নিবেশ করিল। সকালে বাঁজে বকিয়া একটা পয়সা আসিল না—কেবল কর্ম্মভোগ। আমিও বড় বিরক্ত হইলাম। তাহাদিগকে উপরোক্তরূপে উপদেশ দিয়া স্থানান্তরে যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলাম। হঠাৎ সতীশের মুখ উজ্জ্বল হইল। সে যেন একটা ভ্রম করিয়াছিল; অকস্মাৎ সংশোধনের অবসর বুঝিয়া, কাগজ ফেলিয়া বলিল—হ্যাঁ, বুঝেছি। এ ব্যাপার পুলিসের হাতে যাবার নয়। তা'হলে মালটা কোথা থেকে এলো সে বিষয় খোঁজ হবে, আর ইনসলভেণ্টের দরখাস্ত মঞ্জুর হবে না।

সনাতন মহা আড়ম্বর করিয়া আর একবার তাহার পদধূলি গ্রহণ করিল। বিনয় সহকারে বলিল—হুজুর মনের কথা বলতে পারেন। হুজুর বাহাদুর স্পষ্টবক্তা। এ ব্যাপারটা কি পুলিসের হাতে দেওয়া যায়? ভীষণ ব্যাপার। শ্রস্তাস্ততা চাই।

দোলগোবিন্দ বলিল,—আরও একটু কথা আছে। হুজুর, বামুন ঠাকুরেরও টাকাটা ভোগে হয় নি।

আমি বলিলাম—কেন?

সনাতন কিছু না বলিয়া বাহিরে গেল। তখনই একটা বিস্কুটের টিন লইয়া ঘরে ফিরিল। বাক্সের ভিতর হইতে অবাধে একটা ছিন্ন হস্ত বাহির করিল। আমরা বিস্মিত হইলাম। উভয়ে একটু পিছাইয়া পড়িলাম। কি পৈশাচিক দৃশ্য!

আমি বলিলাম—কার হাত?

সে বলিল—আজ্ঞে বলু ঠাকুরের—আমাদের পাচকের।

সতীশ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া, বিস্ফারিত নেত্রে সেই ছিন্ন হস্তের দিকে চাহিয়া ছিল। যে শৃগালটা তাহার কতকটা অংশ উদরসাৎ করিয়াছিল সেও ঐরূপ লোলুপ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহে নাই। মণিবন্ধের নিম্ন হইতে হস্তের প্রায় সমস্তটাই ছিল—কেবল কনিষ্ঠা অঙ্গুলির এক গাঁইট বোধ হয় কোন একটা জন্তুর জঠরে বিরাজ করিতেছিল। হাতটা একটু ফুলিয়াছিল—রক্তহীন পাণ্ডুবর্ণের ছিন্ন-হস্ত আমাদিগের সকলকে একেবারে নির্ব্বাক করিয়া দিয়াছিল।

আমিই প্রথমে কথা কহিলাম। বলিলাম—হাতটা সনাক্ত ক'রছেন কি ক'রে? কার হাত?

সতীশ সেই ছিন্ন হস্তের দিকে চাহিয়া বলিল—ঐ আং দেখে বুঝি? আংটি কার? বলরাম ঠাকুরের?

সনাতন বলিল—আঁজ্ঞে ঠিক বলচেন হুজুর। ও আং আমরাই গত বৎসরে দিয়েছিলেম। সোণার আংটি—গিঁ সোণার হুজুর।

(২)

ট্যাক্সিতে বসিয়া সতীশ বলিল—ব্যাপারটা যত সোজ ভাবা গিয়াছিল, ততটা সোজা নয়। হাত—আংটি—চুি —দেউলিয়া আড়তদার—

আমি বলিলাম—হ্যাঁ, কেট্ কেট্ গরম্- আছে সবই কিন্তু খরচা বাবদ আগে শ'দুয়েক টাকা আদায় ক'রে নাও। যে রকম বাজার-মারা পার্টি—একবার নদী পেরুতে পারলেই অমনি কুমীরকে দেখাবে যোড়া রম্ভা।

সতীশ জবাব দিল না। সে গম্ভীরভাবে কেসের কথা ভাবিতেছিল। সম্মুখে মোটর-চালকের পার্শ্বে দলুই যুগল বসিয়া ছিল। সকালে রাস্তায় ভিড় ছিল না। গাড়ী বেশ সবেগে বেলিয়াঘাটার পুলের উপর গিয়া উঠিল। ভীষণ আর্ত্তনাদ করিতে-করিতে পুলের নিম্ন দিয়া বজবজের ট্রেণ ছুটিতেছিল।

সতীশচন্দ্র ভ্রূকুঞ্চন করিয়া অর্দ্ধ-নীমিলিত নেত্রে যতই চিন্তা করুক, ব্যাপারটা আমার নিকট খুব স্পষ্ট বলিয়া বোধ হইতেছিল। বলু ঠাকুর অর্থের সন্ধান পাইয়াছিলেন,—রাত্রে সুযোগ বুঝিয়া বাক্সটি লইয়া পলাইতেছিলেন। ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের অনুগ্রহে তিলজলা, গোব্‌রা, গোরাচাঁদ রোড, চিংড়িহাটা একেবারে ধাপার মাঠ অবধি কলিকাতার গেঁড়াতলার বিশিষ্ট ভদ্রসন্তানদিগের নূতন বাসস্থান হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে কেহ বলু ঠাকুরের শ্রম লাঘব করিয়া বাক্সটির গুরুভার গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু ছিন্ন-হস্তটা আসিল কোথা হইতে? একটা পুকুর, ডোবা বা ধাপার প্রশস্ত ময়দানে লাসটার সদ্গতি হওয়া সম্ভব। কিন্তু হাতটা? নয়—রসিকতা করিবার জন্য—না ঠিক হইয়াছে হাত দিয়াই সে বাক্সটি রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। অগ্রে হাতটাই কাটিয়াছে। শেষে হয় ত শৃগাল কুকুরে-মুখে করিয়া—

যেন আমারই মানসিক প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য সতীশ বলিল—হাতটা এলো কোথা থেকে? আর কি অস্ত্রের

খাইয়াই বা কাটলে। কজির কাছটা শিয়ালে খেয়ে মাটি ক'রেছে।

আমাদের গাড়ী বেলিয়াঘাটার বাজারের নিকটে আসিল। সনাতন পিছনে আমাদের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল—এইবার গদিতে আস্‌ছি। দেখবেন বাবু, সরকার যেন কোন কথা সন্দেহ না করে। আর হুজুরদের কাছে সে কথার উত্থাপন করাই বাহুল্য।

আমি বলিলাম—বেশ কথা।

গদিতে বিশেষ কিছু তদন্ত হইল না। একখানা আম-কাঠের তক্তপোষের উপর মাদুর বিছাইয়া অনেকগুলি খাতাপত্র লইয়া সরকার কাজ করিতেছিলেন। এককোণে বেশ ভাল একটী লোহার সিন্দুক। আমাদিগকে দেখিয়াই সরকার বনমালী বলিল—বাবু দাসী এসেছিল, বলে ঠাকুর ঘরে চাবি দিয়ে কোথা গেছে—এখনও এসে নি।

সনাতন বলিল—বল কি? আচ্ছা দেখ্‌ছি।

আমরা বাহিরে আসিলাম। বনমালী চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করিল—বাবুরা কে?

দোলগোবিন্দ বলিল—উকীল।

বাহিরে আসিয়া সনাতন বলিল—বাবু, আমি ঘরটা তালা বন্ধ করে এসেছি—গর্ত্তটা আপনাকে দেখাব ব'লে। আর ঝি বেটী যাতে না সন্দেহ করে।

আমি বলিলাম—বনমালীর বাড়ীর ঠিকানা জান?

কেহ জানে না। পুরী বা কটক বা বালেশ্বর এই রকম একটা কোন দেশ হইবে। তাহার দেশের কোন লোকের সন্ধানও তাহারা কেহ জানে না।

মোটরে বসিয়া চিংড়িহাটা রোডের উপর দিয়া তিল-জলার দিকে ছুটিলাম। দামিনী-আলোক-সুশোভিত এক বৃহৎ অট্টালিকার দ্বারে ধপ ধপে টুইলের পিরাণের আস্তিন গুটাইয়া এক গোরা সাহেব পা ফাঁক করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে সেটা মুন্সিপালের কষাইখানা—নিত্য তথায় অসংখ্য গো-হত্যা হয়। ইহার সন্নিকটে হিন্দু-মুসলমানের মাথা-ফাটা-ফাটি হয় না—মাথা-ফাটা-ফাটি হয় যখন ধর্ম্মের নামে মুসলমান একটা গরু জবাই করে।

একটা গলির মোড়ে আসিয়া মোটর থামিল। আমরা মোটর হইতে নামিয়া গলির মধ্যে প্রবেশ করিলাম। বাটীটি ক্ষুদ্র। নিচে দুইখানি উপরে দুইখানি ঘর। সম্মুখে বারান্দা, পিছনের বারান্দার এক পার্শ্বে সিঁড়ি—অপর পার্শ্বে দরমা ঘেরা ছোট কুটুরির মধ্যে রন্ধন-শালা। বাটীর বাহিরে রেলিং—মধ্যে ছোট ফটক। ফটক হইতে বাটী অবধি প্রায় তিন চারি কাঠা জমি। একতলার বারান্দায় নিচে দুইটি ধাপ দিয়া সেই জমি হইতে বাটীতে উঠিতে হয়। ফটক হইতে সিঁড়ি অবধি সোজা রাস্তা—প্রায় ১৩ ফুট। রাস্তার দুই পার্শ্বের জমি দুই টুকরায় ফুলের বাগান;—অবশ্য কোনও সৌন্দর্য্য নাই—গাঁদা ফুলের গাছ—মাঝেমাঝে দুই একটা চন্দ্রমল্লিকা। এক কোণে একটা বড় শেফালী বৃক্ষ। বারান্দায় উঠিয়াই দক্ষিণ দিকের ঘরটি পাচকের, উত্তর দিকের গৃহটীর ভিতর দিয়া ভিতরের বারান্দায় যাইবার পথ।

বাটীর পিছনেও প্রায় দুই তিন কাঠা জমি পড়িয়া আছে। সেইখানে দাসী বাসন মাজিতেছিল। আমা-দিগকে দেখিয়া সে দাঁড়াইয়া উঠিল, অবগুণ্ঠিতা হইল, আমাদের দিকে পিছন করিয়া তাহার ভগবান দত্ত ক্যাঁক-কেঁকে স্বরকে যথা-সম্ভব মোলায়েম করিয়া বলিল—বাবু বামুনের তো দেখা নেই—কি জানি কোথা গেছে—তা বাবা খাওয়া-দাওয়ার কথা আমি জানি নি।

সনাতন তাহার ভগবান দত্ত স্বরকে কোন প্রকার নম্রতা বা উগ্রতার আবরণ না দিয়া বলিল—হ্যাঁ দেখছি। তুমি সব জোগাড় কর। আর দেখ দর্প, তুমি বাজার থেকে চারটে কমলা লেবু, আর কিছু শাঁক আলু, আর দেখ যদি পেঁপে পাও তো পেঁপে আর—

আমি বলিলাম—থাক্‌, থাক্‌।

সতীশ ভ্রূকুটি করিল। আমি সামলাইয়া গেলাম। বাস্তবিকই ত, দর্প ঠাকুরাণীকে বাজারে না পাঠাইতে পারিলে অবাধে আমাদের কার্য্য চলিতে পারে না। অপর সময় দর্পকে এই সামান্য হুকুম তামিল করাইতে হইলে দলুই-নন্দনকে সবিশেষ বেগ পাইতে হইত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে দুইটা বাহিরের লোক দেখিয়া সে কেবল নিজের মনেই অনেকের মুণ্ডপাত করিতে-করিতে প্রস্থান করিল। কেবল শুনিতে পাওয়া গেল, বলু-ঠাকুরের মুণ্ডপাতের রায়টা—"মুখপোড়া মিন্‌সে। মরে না, কে রাঁধে-বাড়ে তার ঠিক্‌ নেই। মর্‌ বিটলে বামনা, উড়ে মিন্‌সে"।

বাহিরের কটক অর্গলবদ্ধ করিয়া সনাতন বলু-ঠাকুরের ঘরের দরজা খুলিল। চাবি তাহারই নিকটে ছিল। ঘরের সাজ-সরঞ্জামের মধ্যে একখানা কালীঘাটের পট—জটায়ু পক্ষী রাবণের রথ গিলিতেছে; আর একখানা জীর্ণ মাদুরের উপর দুইখানা শতগ্রন্থি কন্থা। শয্যা দেখিয়া মনে হইল, বলু-ঠাকুর রাত্রে অন্ততঃ কিয়ৎক্ষণ শয্যায় শয়ন করিয়াছিল। একখণ্ড কন্থা শয্যার কার্য্য করিত; অপরখানি লেপ। শয্যার হাত-দুই দূরে প্রায় এক হাত গভীর গর্ত্ত। মাত্র একখানি টালি তুলিয়া, গর্ত্ত খনন করিয়া, চোর বাক্সটা বাহির করিয়া লইয়াছিল। সতীশ বহু পরিশ্রম সহকারে, অতি যত্নের সহিত মেজের টালিগুলি পরীক্ষা করিতেছিল। মাটিগুলার উপর সে একদৃষ্টে দেখিতেছিল। দোলগোবিন্দ বা আমি তাহার অত সূক্ষ্ম পরীক্ষায় বিশেষ মোহিত হই নাই। মোহিত হইতেছিল সনাতন। কিয়ৎক্ষণ পরে সতীশ আমাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া একেলা পকেট-বহিতে নোট করিতে লাগিল। কার্য্য শেষ করিয়া বলিল, "এবার আপনারা গর্ত্তটা বুজাইতে পারেন,—দাসীর আসিবার সময় হইয়াছে।"

তাহার পর সে বারান্দায় দাঁড়াইয়া গাঁদা-ফুলের বাগান দেখিয়া হাসিতে লাগিল। গাঁদা ফুলের ডাল পুঁতিয়া কিরূপে বড় ফুল পাওয়া যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া সে দেখিতে চাহিল, ছিন্নহস্তটি কোথায় পাওয়া গিয়াছিল। সনাতন বাটীর বাহিরে প্রাচীরের ধারে একটা স্থান দেখাইল। সেখানে রক্তের দাগ ছিল না, কোনও টুকরা অস্থিও ছিল না। সতীশ মাঠের উপর নানা প্রকার তদন্ত করিয়া উপরে তাহাদের শয্যাগৃহে আসিল। আমরা নানা প্রকার কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলাম। সে বারান্দায় পায়চারি করিতে লাগিল।

(৩)

সমস্ত দিন সনাতন দলুইকে সঙ্গে রাখিয়া, সন্ধ্যার সময় সতীশ যখন বলিল যে, সে রাত্রে তিলজলায় শয়ন করিবে, তখন তাহার উপর আমার একটু ক্রোধের উদ্রেক হইল। তাহার মত বুদ্ধিমান ও বিবেচক ব্যক্তি আমি অতি অল্পই দেখিয়াছিলাম। কিন্তু, তাহার সকল কার্য্যে একটা বাড়াবাড়ি। সেটুকু আমার আদৌ ভাল লাগিত না। আমি তাহাকে বলিলাম,—রাত্রে আর এই শীতে জা[গ] কেন ভাই। আবার কাল সূর্য্যির আলোয় যা হয় ক[রা] যাবে।

সে বলিল,—তা হ'লে সমস্ত দিনের পরিশ্রমটা মা[টি] হ'বে।

আমি বলিলাম,—আচ্ছা উদ্দেশ্যটা একটু বোঝাও; তা[] হ'লেও একটু শান্তি হ'বে।

সে বলিল,—কথাটা পুরাতন, সে কথাটা নিয়ে রাশিয়ান ঔপন্যাসিক ডস্টিওয়াস্কি, "দোষ ও দণ্ড" বইখানা লিখে ফেলেছে। তুমি তো জান যে, বড়-বড় পাপীরা তাদের পাপের স্থান দেখবার জন্যে এক-একবার আসে। যদি বলরাম বেঁচে থাকে, তা হ'লে নিশ্চয় সে একবার দেখ্‌তে আসবে, চাল্লিশ হাজার টাকা হারিয়ে তার মনিবেরা কি কর্‌ছে! অবশ্য রাত্রের অন্ধকারেই আসবে। আর যদি কাটা হাতটা বলরামের হয়, তা হ'লে তার হত্যাকারী অবশ্য একবার ঘটনাস্থল দেখ্‌তে আসবে। বিশেষ যখন সে রসিকতা করে হাতটা বাড়ীর পাশের মাঠে রেখে দিয়ে গেছে। লক্ষ্মী ভাই চল।

একটা হোল্ড-অলে দুইখানা বিলাতী কম্বল, দুইখানা কাপড়, এক বাক্স চুরুট, মোমবাতি, দিয়াশালাই প্রভৃতি ভর্ত্তি করিয়া অন্ধকারে গিয়া বলু-ঠাকুরের কক্ষে প্রবেশ করিলাম। দোলুই-দ্বয় উপরে নিজেদের শয্যায় শয়ন করিল। অর্দ্ধরাত্রে সতীশ ঘুম ভাঙ্গাইয়া বলিল,—ধীরে-ধীরে উপরে যাও; যদি ওরা ঘুমায় তো কোন কথা নাই। যদি জেগে থাকে তো কোন ক্রমে যেন বাহিরের বারান্দায় না আসে। আমি উপরে না যাওয়া পর্য্যন্ত তুমি ওদের সঙ্গ ত্যাগ ক'র না।

অগত্যা তাহাই করিলাম। তাহারা সারাদিনের উৎকণ্ঠা ও পরিশ্রমের পর একেবারে অকাতরে নিদ্রা যাইতেছিল। দোলগোবিন্দের নাক ডাকিতেছিল, সনাতন মস্তকে লেপ জড়াইয়া কুম্ভকর্ণের মত পড়িয়া ছিল।

প্রায় দশ মিনিট পরে সতীশ উপরে আসিয়া ধীরে-ধীরে আমার স্কন্ধ স্পর্শ করিল। অন্ধকারে মুখ দেখিতে পাইলাম না। নিঃশব্দে উভয়ে নামিয়া গেলাম। কক্ষের দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া সে বাতি জ্বালিল। মুখে চিন্তার লক্ষণ নাই, চোখের কোণে ভ্রূর উপর, ললাটের রেখায়

উদ্বেগের চিহ্ন নাই। নিশ্চয়ই সে কিছু-একটা আবিষ্কার করিয়াছে।

আমি তাহাকে বলিলাম,—ব্যাপার কি?

সে বলিল,—তদন্তের গণ্ডী খুব সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেছে।

আমি বলিলাম, "কিসে?"

সে বলিল,—কারণ আছে,—কাল আমরা ভোরে বাড়ী যাব। যতক্ষণ না ওরা এসে উঠায়, ততক্ষণ মটকা মেরে পড়ে থাকতে হবে। বুঝেছ?

আমি সম্মত হইলাম। উপরে একটু শব্দ হইল। সতীশ বাতি নিভাইয়া শুইল। কথা কহিতে নিষেধ করিল।

(৪)

প্রথমে কষাইখানার সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম। সে কোনও সংবাদ দিতে পারিল না। তাহার পর অপর একটা কারখানায় গেলাম। অনেক কুলি স্নান করিতেছিল। তখন বেলা প্রায় বারোটা। ভোর হইতে বারোটা অবধি পরিশ্রম করিয়া তাহাদের আর কুতূহল ছিল না। কেহ আমাকে লক্ষ্য করিল না। আমি কল-ঘরের দিকে অগ্রসর হইলাম। একটা ছোট ছেলে অপর একটা ছোকরার সহিত কলহ করিতেছিল। কলহের সামগ্রী একটা পীপার বাঁধন, লোহার হালের চাকা। উভয়েই সেইটার দাবী করিতেছে। আমি মধ্যস্থ হইয়া বলিলাম, —কেয়া হুয়া?

প্রথম ছোকরা খুব সপ্তমে চড়িয়া বলিল,—দেখো না বাবু, হামারা চাক্কা—হাম্‌কো ঐ উস্‌তরফ মিলা।" তাহার পর অপর ছোকরাকে ও তাহার পিতামাতা, ভ্রাতা, ভগিনী সকলকে গালি দিল।

দ্বিতীয় ছোকরা গালি দিয়া আরম্ভ করিল; বলিল, "হামারা চাক্কা—" আবার গালি দিল। তখন প্রথম বালক চাকা ছাড়িয়া দ্বিতীয় বালকের গলা টিপিয়া ধরিল। সেও ছাড়িবার পাত্র নয়,—উহাকে জড়াইয়া ধরিল। উভয়ে মল্লযুদ্ধ হইল—ভূমিতে গড়াগড়ি। কিন্তু এমন কারখানাওয়ালার ক্ষমতা—দুই শত কুলির মধ্যে কাহারও এমন উৎসাহ ছিল না যে, আসিয়া সে কলহে মধ্যস্থ হয়। প্রত্যেকটী কলে-মাড়া নীরস ইক্ষু-দণ্ডের মত। তাহারা স্নানাহারের চেষ্টা করিতেছিল—আবার তিনটার সময় কার্য্য আরম্ভ হইবে। অগত্যা ভূমি হইতে আমাকেই বালক দুইটাকে টানিয়া তুলিতে হইল। আমার দুই হস্তে দুইটা বালক টান মারিতেছিল। আমি একটু ঝট্‌কান দিয়া দুইটাকে থামাইলাম। চাকাটা লইয়া পুকুরে ফেলিয়া দিলাম। থলি হইতে দুইটা আনি বাহির করিয়া দুইটার হস্তে দিয়া, একটাকে তাড়াইয়া দিলাম, আর অপরটাকে ধরিয়া রাখিলাম।

প্রথম বালকটা দূরে চলিয়া গেল। মধুর বাল্যকাল। অত ঝগড়া, অত দ্বেষ, অত ক্রোধ এক মুহূর্ত্তে অপসারিত হইল। দূরে গিয়া ডাকিল,—আরে রহিম, বিঁড়ি নেহি পিওগে? সিগ্‌রেট-উগ্‌রেট।

রহিম হাসিল বলিল, "আবেহেঁ।"

আমি বলিলাম,—আচ্ছা ছোক্‌ড়া; ইয়েতো বাতাও—যিস্‌কা হাত কাট্‌ গিয়া থা ও কাঁহা হ্যায়?

রহিম একটু চিন্তা করিল; বলিল,—হাত কাট্‌ গিয়া এ কল্‌মে? এবে ফজলু—

দ্বিতীয় বালকটা নিকটে আসিল। রহিম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তাহাদের কল্‌ঘরে কাহারও হাত কাটিয়া গিয়াছিল কি না? ফজলু বলিল, "ও, হাঁ,—হাত দাব গিয়া থা; এ কল্‌মে নেহি—হাড্ডি কল্‌মে।"

হাড্ডি-কলটা কি পদার্থ, এবং কোথায় অবস্থিত—সে বিষয়ে অনুসন্ধান করিলাম। তাহারা আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে স্বীকৃত হইল। অবশ্য এ সাহচর্য্যের জন্য আরও দুই আনা পয়সা খরচ হইল।

দলুইদের বাসার পার্শ্বেই বলিয়াছি একটী প্রাঙ্গণ। তাহার অপর দিকেই খুব বড় কারখানা। ভাগাড়ে যত মৃত জীব পড়ে, কষাইখানায় যত অস্থি জমে, কলিকাতার অলিতে-গলিতে পাঁটাওয়ালারা, মুসলমান কষাইয়েরা যত হাড় বিক্রয় করে,—এ কারখানায় সে সব হাড় চূর্ণ হয়। চূর্ণ হয় ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা-শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য—কিন্তু আমাদের বিশাল ক্ষেত্রগুলার জন্য নয়—জাপান, অষ্ট্রেলিয়া, প্রশান্তসাগরের দ্বীপমালার শ্বেত ও হরিদ্রাবর্ণের কৃষিজীবির সুবিধার জন্য। আর কারখানার কুলীরা আটআনা, দশ-আনা, বারআনা রোজ পায় বটে,—কিন্তু কলের ইংরাজ ম্যানেজার ইঞ্জিনীয়ারের বেতন বেশ হৃষ্টপুষ্ট এবং শেয়ারের

মুনাফাও খুব অধিক। দোষ আমাদের, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই পল্লীতে আর একটা কারখানা আছে; সেথায় নিহত জীবের রক্ত জমাট বাঁধান হয়। সে জমাট-রক্তের চাঙ্গরগুলাও বিদেশের জমির উর্ব্বরতা সম্পাদন করিতে যায়।

যাহা হউক এ কলে সংবাদ পাইলাম, কিছু দিন পূর্ব্বে একটী কুলির হাত কলে চাপিয়া গিয়াছিল। মণিবন্ধের উপর হইতে সেটি কাটিয়া গিয়াছে। ছিন্ন হস্ত কোথায় গেল, তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না। তাহার হাড়গুলা কলের কাজে লাগে নাই, এ প্রকারেরই সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া গেল। কলের মেথর বলিল যে, সে কাটা হাতটা মাঠে ফেলিয়া দিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এ সংবাদ দিয়াও সতীশের নিকট ধন্যবাদ পাইলাম না। সে খুব বড় একটা বক্তৃতা করিয়া বলিল—"এখনি ক্যাম্বেলে যাও। হাত-কাটা কুলির কাছ থেকে সন্ধান নিয়ে এস, তার হাতে আংটি ছিল কি না?"

কুড়ে অর্দ্ধেক গণৎকার। আমি বলিলাম—নিঃসন্দেহ ছিল না।

"কেন?"

"কেন? কলের কুলির হাতে আংটি থাকে না। দুয়ের নম্বর, হাড্ডি-কলের মেথর এত উদার হবে না যে, কাটা হাতটা ফেলে দেবার সময় সোণার আংটিটা খুলে নেবে না, এবং তিন নম্বর—"

সতীশ বলিল—সনাতন আংটি সনাক্ত করেছে। তবু একবার জেনে আসতে দোষ কি?

"অগত্যা! তবে দাও, একটা সিগারেট দাও।" যে গতিতে বালিকা প্রথম শ্বশুর-গৃহে যায়, বাড়ীতে লক্ষ্মী-পূজার দিন বালক যে গতিতে বিদ্যালয়ে যায়, সেই গতিতে হাসপাতালের দিকে অগ্রসর হইলাম।

(৫)

দ্বিতীয় দিন দলুইদের মধ্যে কেহই আসিল না। সতীশ তাহাদের চিন্তা একেবারে ছাড়িয়া দিয়া, খরগোষ ও কাঠ-বিড়ালীর মধ্যে কি-কি প্রভেদ এবং শশক হইতে কাঠ-বিড়ালীর অভিব্যক্তি হইয়াছে, না কাঠ-বিড়ালী হইতে শশকের অভিব্যক্তি হইয়াছে, সে সম্বন্ধে খুব মনোযোগের সহিত প্রবন্ধ পাঠ করিতেছিল। সন্ধ্যার একটু পরে আমি বলিলাম—কি হে? তিলজলার কথা যে আর আলোচনা কর না, এর কারণ কি?

সে বলিল,—ও সব ঠিক আছে।

আমি বলিলাম,—কি ঠিক?

সে বলিল,—এটা সপ্রমাণ হয়েছে যে, বলরাম মরে নাই; মণিবন্ধ বলরামের নয়; আর আংটিটা—

"আংটিটা বলরামের।"

"হ্যাঁ ঠিক্ বলেছ। বলরামেরই বটে,—ওরা দুজনে সনাক্ত করেছে—ওটা ভুল হবার নয়।"

"বিশেষ যখন কুলি নিরঞ্জরও সাক্ষ্য পাওয়া গেছে। আমি আংটি তার হাতে লাগালাম, একেবারে ঢল্‌ঢল্ করতে লাগল। অবশ্য সে একটু রোগা হ'য়ে গেছে।"

সতীশ বলিল—তা'হলে আমরা মোটের উপর এই পেলাম, টাকাটা চুরি হ'য়েছে রাত্রে—চোর যেই হ'ক, নিরঞ্জ কুলির কাটা হাতটায় বলরামের আংটি লাগিয়ে বাড়ীর পাশে ফেলে গেছে, বলরাম অদৃশ্য।

আমি বলিলাম—যদি বলরাম নিয়ে থাকে, তা' হলে সে কাটা হাতটায় নিজের আংটি লাগিয়ে চলে গেছে। তখন ভেবেছিল যে, তার কাটা হাত পেয়ে লোকে মনে করবে যে, চোরে তাকে কেটে বাক্স নিয়ে গেছে; কিম্বা বাক্স নিয়ে যাবার সময় তাকে চোরেরা মেরে গেছে।

সতীশ একটু চিন্তিত হইল; বলিল—তার বিরুদ্ধে মস্ত একটা তর্ক আছে। যার মাথায় এতখানি বুদ্ধি, সে নিশ্চয় জানবে যে, এসব ব্যাপারে হুড়া-হুড়ি হবে। তার মনিবরা কিছু শোনে নি; সুতরাং সে কথাটা বিশ্বাস করবে না। আমার বিশ্বাস যে, যখন চুরি হ'য়েছে তখন বলরাম ঘরে ছিল না। চোর চুরি করবার সময়—

"আংটি।"

সে বলিল—হয় ত আংটিটা আগে থেকে সরিয়েছিল—তা'হলে হাতটা আগে পেয়ে সমস্ত মতলবটা করেছিল। কিম্বা—

আমি বলিলাম—হয় ত বলরামের, আংটিটা খুলে গিয়েছিল, চোরে সেটা নিয়ে কাটা হাতে লাগিয়ে দিয়েছে।"

সে বলিল—কাটা হাত পরে পাওয়া যায় নি, আগেই পাওয়া গেছে। আর আংটি লাগাবার বহু পূর্ব্বে কাটা হাত

মাঠে পড়ে ছিল না—তা'হলে কুকুর-শেয়াল রাখত না। কাটা হাতটা একটু ফুলেও ছিল—

আমি বলিলাম—হ্যাঁ; তা' না হলে আংটিটা লাগত না—

"পরে লাগান হ'য়েছিল, সে কথাও প্রথম দেখে আমার বিশ্বাস হ'য়েছিল—"

"বটে।"

দরজা খুলিল। দুইটা লোক প্রবেশ করিল। একজন সতীশের উড়ে গোয়েন্দা। অপর লোকটি অপরিচিত।

অপরিচিতকে সম্বোধন করিয়া সতীশ বলিল—"বলরাম!"

বলরাম কাঁপিতেছিল। সে সতীশের পদ স্পর্শ করিয়া বলিল—মু নিরপরাধ হজুর! মু নিরপরাধ!

সতীশ বলিল—তোমার আংটি কোথা?

বলরাম নিজের দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর দিকে চাহিল। তাহার ভাবগতিক দেখিয়া আমার সন্দেহ রহিল না যে, সে তখন প্রথম দেখিল যে, তাহার অঙ্গুরীয়ক হারাইয়াছে। সে পৈতায় খুঁজিল, পাইল না। বিস্মিত হইয়া শূন্য-দৃষ্টিতে চাহিল।

বাক্স হইতে অঙ্গুরী বাহির করিয়া সতীশ তাহাকে দেখাইল। সে বলিল—হাঁ হুজুর এই আঙ্গুটি। এ সব-থানাই যেন যাদু, ভোজবাজী। আমি ব্রাহ্মণের সন্তান হজুর—হাঃ প্রভু জগন্নাথ! হা ললাটঙ্ক লিখন!

বেহারা আসিয়া সংবাদ দিল—সনাতন বাবু এসেছেন।

(৫)

তাড়াতাড়ি বলরাম ও স্বপ্না গোয়েন্দাকে পার্শ্বের কক্ষে লুক্কায়িত রাখিয়া আমরা সনাতনকে গৃহে প্রবেশ করিতে দিলাম। বোধ হয় তাহার সম্মানের জন্য সতীশ আর একটা তাড়িত অলোক জ্বালিয়া দিল। দুই দিনে তাহার মুখের ভাব একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। তাহার চক্ষু দুইটা বসিয়া গিয়াছিল কোটরে—অথচ কোটর হইতে বাহির হইবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিতেছিল। মাথার চুলের কোনও পরিচর্য্যা হয় নাই; মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি।

সতীশ তাহার মুখ-ভাব লক্ষ্য করিয়া একটু মৃদু হাসিয়া বলিল—কেমন আছেন?

আজ তাহার কণ্ঠস্বর আরও সূক্ষ্ম এবং বিষম রুক্ষ হইয়াছিল। সে বলিল—মশায় আমাদের হ'ল কি? ধনে-প্রাণে মারা গেলাম—খাব কি? পরব কি? হায়! হায়!"

সতীশ বলিল—কেন, নূতন কিছু হ'য়েছে না কি?

সে বলিল—নূতন আর কি হ'বে? নূ—ত—ন—হ্যাঁ—না—নূতন আর কি? টাকার বাক্সটা একেবারে গেছে—একেবারে।

সতীশ বলিল—হুঁ, একেবারে গেছে। আগে আশা ছিল?

সে এবার কাঁদিল—বলিল—হ্যাঁ। মোটে আশা নেই? দোহাই বাবু! বলুন! আশা নাই? হায়, হায়! চোরের ওপর বাটপারি হ'ল। কেন তখন বাজার মারতে গিয়েছিলেম!

আমি বলিলাম—আশা আছে—আশা আছে। অধৈর্য্য—

সে বলিল—বাবু, ধৈর্য্য যে আর থাকে না!

সতীশ বলিল—বাক্সে ঠিক কত টাকা ছিল?

সে বলিল—১০০ টাকা কম চাল্লিশ হাজার।

সতীশ বলিল—বলরামের একটা উপপত্নী ছিল। সে রাত্রে বাড়ী থাকিত না—এ কথা আপনার অংশীদার দোলগোবিন্দ বাবু জানিতেন?

সে বলিল—আঁজ্ঞে?

সতীশ বলিল—সত্য কথা না বললে, টাকা বার করতে পারব না।

সে বলিল—বোধ হয় না।

সতীশ বলিল—হুঁ। শুনেছেন, বলরাম বেঁচে আছে?

সে বলিল—হ্যাঁ—না, হ্যাঁ, বেটা বেঁচে আছে বই কি! বেটা নেমহারাম, বেইমান—উড়ে, সেই বেটারই কাজ—বেটা জালিয়াৎ—ভোগে হবে না, বেটার ভোগে হবে না। আমিই ধরব। বেটা বেমালুম সরিয়েছে।

সতীশ বলিল—কোন্ চুরিটা সে করেছে?

সনাতন একটু বিস্মিত হইয়া বলিল—কোন্ চুরিটা কেমন?

সতীশ বলিল—ঘর থেকে চুরি, না গাঁদাগাছের তলা থেকে?

কথাটা ভাল বুঝিলাম না; কিন্তু সনাতন বুঝিল। তাহার চক্ষের দৃষ্টি স্থির হইল, অধরোষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল; হাত কাঁপিতে লাগিল। শেষে সে বসিয়া পড়িল।

সতীশ বলিল—আপনাদের মাত্র দু'শো টাকা নিয়েছি—তার কাজ করেছি কি?

লোকটা সতীশের পা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। অতি কাতরকণ্ঠে বলিল—বাঁচান্ বাবু, বাঁচান্—ধনে-প্রাণে মারবেন্ না।

(৬)

সতীশ বলিল—দেখ নরেশ, আমি তোমাকে বরাবর বলেছি যে, জাতিভেদ সর্ব্বত্র বিদ্যমান—চোর-জুয়াচোর অপরাধীদের মধ্যেও। যে গাড়ি মারে, সে পকেট মারে না; যে পকেট মারে, সে সিঁদ কাটে না। জুয়াচোর চোরকে ঘৃণা করে; চোর কোকেন-বিক্রেতাকে বলে, ছোট কাজের কাজী। আমার প্রথম হইতে মনে হইল—সনাতন টাকা লুকাইয়া আত্মসাৎ করিবার অপরাধের সংস্কার লইয়া জন্মিয়াছে। যদি উহার জীবনের ইতিহাস আলোচনা কর, দেখিবে, শৈশবে ও মাতার ভাণ্ডার হইতে সন্দেশ চুরি করিয়াই খাইত না—অগ্রে তাহা কোথাও লুকাইয়া রাখিত, পরে ভোজন করিত।"

সনাতন বলিল—হুজুর অন্তর্যামী। ঠিক বলেছেন।

সতীশ বলিতে লাগিল—তাহার পর কতকগুলা কথা মনে কর—বাজার মারিবার পরামর্শ সনাতনের, নিম্নের ঘরে টাকা পুঁতিবার ব্যবস্থা ইঁহার—চুরিটা প্রথম ধরিল সে—হাতটা প্রথম দেখিল সে। এই হাতের বিষয়ে দুটা কথা বলিয়া রাখি। দেখ, হাতটা সারারাত মাঠে থাকিলে, কুকুর-শৃগাল ছাড়িত না, আর আংটি পূর্ব্বের হইলে তাহার চারিদিক ফুলিত; আংটি ফুলার মধ্যে বসিয়া থাকিত। এ ক্ষেত্রে কিন্তু আংটিটি আমরা খুলিতেও সক্ষম হইয়াছিলাম। তখনই আমার সন্দেহ হইয়াছিল যে, আংটি পরে শবের হস্তে পরান হইয়াছিল। বেশ কথা। করিল কে? হয় বলু-ঠাকুর, না হয় সনাতন। বলু-ঠাকুর টাকার সন্ধান জানিত, না সনাতন জানিত? কিন্তু আমার সন্দেহ দূর হইল সরজমিনে তদারক করিয়া। অপরে যেখানে অন্ধের মত চলে, আমাদের সেখানে চক্ষু মেলিয়া চলা উচিত। তুমি লক্ষ্য ক'রেছিলে কি না জানি না,—আমার প্রথমেই মনে খট্‌কা লাগিয়াছিল যে, গাঁদার জঙ্গলে দুটা গাছের পাতা নিম্নমুখ, ডালগুলা লতানো।

সনাতন বলিল—হুজুর অন্তর্যামী। আমি দিনের বেলা দেখেই বুঝেছিলাম। হাঃ ভগবন্! শেষে বলা বেটা ঠকালে?

সতীশ বলিল—আমার তখনই সন্দেহ বদ্ধমূল হইল। আজকাল শিশিরের দিনে অত বড়-বড় দুইটা গাঁদা ফুলের গাছ অবনত-মস্তক হইতে পারে, তুলিয়া পুনরায় রোপণ করিলে। নিশ্চয় ভোর রাত্রে কেহ তাহাদিগকে উৎপাটন করিয়া আবার পুনরায় রোপণ করিয়াছে। কে এমন কাজ করিতে পারে? বলু ঠাকুর পলাইয়াছে—সে নিশ্চয় টাকা পুঁতিয়া পলাইবে না—কাজেই ন্যায়শাস্ত্রের মতে—কেহ সে স্থানে টাকা পুঁতিয়াছে—হয় দোল, নয় সোণা। দলু গাধা, সোণা চালাক, বিশেষ উপরে যে সকল কারণ বলিয়াছি, সেগুলা আমার মনের মধ্যে গুমরাইতেছিল। আমি সিদ্ধান্ত করিলাম - সনাতন টাকার বাক্স ঐ স্থানে পুঁতিয়া রাখিয়াছে। কোনও একটা ধাপ্পা দিয়া সে ব্রাহ্মণকে দেশছাড়া করিয়াছে।

সনাতন বলিল—আজ্ঞে? হুজুর সাক্ষাৎ শ্রীহরি! অন্তর্যামী। কিন্তু বেটা আগে থেকে দেখেছিল। তাই রাত্রে বাক্সটা তুলে নিয়ে গেছে।

সতীশ বলিল—"তোমার স্মরণ থাকিতে পারে, সে দিন রাত্রে সনাতনকে কাছছাড়া করিলাম না। রাত্রে তাহাদের বাড়ীতে শয়ন করিলাম। তোমাকে উপরে পাঠাইয়া গাঁদার তলা খুঁড়িলাম; যাহা ভাবিয়াছিলাম তাই—বাক্স সশরীরে বিরাজমান!"

সনাতন উন্মত্তের মত লাফাইতে লাগিল। ঘুরিয়া-ফিরিয়া নাচিতে লাগিল। এক হাত কোমরে দিয়া অপর হাত মাথায় দিয়া নাচিল। মাঝে-মাঝে সতীশের পদধূলি গ্রহণ করিল। উন্মত্তের মত বলিল—সন্ধ্যার পর নিরিবিলি দেখে, বাক্সটা বার করতে গিয়ে দেখলাম, বাক্সটা নাই। ভেবেছিলাম, বলা বেটা চোর; এখন দেখ্‌ছি হজুর চোর—অর্থাৎ—"

সতীশ বলিল—চোপ্! অর্থ-পিশাচ, তস্কর! টাকার বাক্স পুলিশের হাতে; তুমিও পুলিসের হাতে যাবে।

সে আবার কাঁদিল। তাহার পা ধরিয়া বলিল— দোহাই হুজুরের—

সতীশ বলিল—চুপ করে বস।

সে দুই হাত মাথায় দিয়া তাহার পায়ের কাছে বসিল।

সতীশ বলিল—তাহার পর বলরাম ঠাকুর ইহার ভিতর আছে কি না, এবং হাতের রহস্যটা জানিবার জন্য, তোমাকে কল-কারখানাগুলায় পাঠাইয়াছিলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল, হাতখানা কোন অভাগা কুলির। সনাতন, তুমি হাতটা কখন পেয়েছিলে?

"আঁজ্ঞে, সন্ধ্যার সময়।"

"আর আংটিটা?"

"তার পর। কদিন ধরেই নানা রকম ফন্দি ভাবছিলাম। হঠাৎ দু'টো জিনিস পেয়ে কাজটা করে ফেললাম।"

সতীশ বলিল—সন্দেহের আরও একটা বিশেষ কারণ বলতে ভুলে গেছি। প্রথম দিন আমাদের দেখাবার সময় দোলগোবিন্দ হাতটা স্পর্শ করে নাই; কিন্তু হিন্দু-সন্তান অথচ ডাক্তার নয়—সনাতন যেরূপ ভাবে পিশাচের মত হাতটা তুলিয়া আমাদের নিকট ধরিল, তাহাতে আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম। পিশাচ!

আমি বলিলাম—বলরামের সন্ধান পেলে কোথা?

সে বলিল—বলরাম লুকাইয়া আছে, জানিতাম। স্বপ্না গোয়েন্দাকে দাসীর কাছে পাঠাইয়া তাহার উপপত্নীর সন্ধান পাইয়াছিলাম। শেষে তাহাকে স্তোক-বাক্য দিয়া, অনেক শপথ করিয়া স্বপ্না আনিয়াছিল। কি প্রকারে সনাতন তাড়াইয়াছিল—"

সনাতন বলিল—আঁজ্ঞে, বলছি।

সতীশ বলিল—নরাধম, তোমার মুখে শুনতে চাই না।

সে ইঙ্গিত করিল। আমি বলরামকে লইয়া আসিলাম। সনাতন একেবারে বিস্মিত হইয়া গেল।

সনাতন জানিত যে, বলরাম রাত্রি চারিটার সময় গৃহে আসে। সে রাত্রে সে অপেক্ষা করিয়াছিল। বলরাম গৃহে ফিরিবামাত্র সে তাহাকে বুঝাইয়াছিল যে, রাত্রে তাহার কক্ষ হইতে তাহাদের বহুমূল্য দলিল ও অলঙ্কারাদি চুরি হইয়া গিয়াছে। সে তাহাকে সন্দেহ করে না। কিন্তু দোলগোবিন্দ পুলিস ডাকিতে গিয়াছে। বলরাম পলাইয়া দেশে যাক। ডামাডোল মিটিলে আসিবে। সে দোলগোবিন্দর কোপ হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। তাই বলরাম পলাইয়াছিল।

ঠিক্ এই সময় দোলগোবিন্দ আসিয়া পৌছিল। সে বলরামকে দেখিয়া বিস্মিত হইল।

সতীশ বলিল—আপনাদের মামলায় তদন্ত শেষ হ'য়েছে। বলরাম নির্দ্দোষ। এই নিন টাকার বাক্স।

সে আমাদের লোহার সিন্দুক হইতে বাহির করিয়া কাদামাখা বাক্সটা দিল। সে সময় দলুইয়ের যেরূপ মুখের ও মনের ভাব হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা অপেক্ষা অনুমান করা সহজ।

তাহারা সতীশের কথা মত টাকা গণিয়া লইল। সনাতন হাজার টাকা বাহির করিয়া আমাদের পুরস্কার দিল।

দোলগোবিন্দ বলিল—আঁজ্ঞে, চোর?

সতীশ বলিল—সনাতন বাবুকে জিজ্ঞাসা করবেন। আর দেখুন, বাজার মারবেন না। যান্।

তাহারা চলিয়া গেলে সতীশ বলিল—এদের কাছে টাকা আছে, এ কথাটা বাজারের লোকেদের জানাতে পারলে, এস্তক-বিস্তির কাজ হয়। কিন্তু আমাদের কর্ত্তব্য নয় মক্কেলের ক্ষতি করা। সনাতন একটা মিথ্যে জবাব দেবে এখন—হয় ত বাজার মারবে না।

আমি বলিলাম—সে বিষয়ে আমাদের বিশেষ সন্দেহ আছে।

"হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। আমরা অর্থের দাস। আমাদের এ ক্ষেত্রে দুকুড়ি সাতের খেলা ভিন্ন আর অন্য কি খেলা ছিল?"

স্ত্রীশিক্ষা ও তাহার আবশ্যকতা

[অধ্যাপক শ্রীতড়িৎকান্তি বক্সী এম্-এ, এফ্-সি-এস্ (লণ্ডন)]

আমাদিগকে প্রথমেই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে, ভগবান স্ত্রীলোক ও পুরুষের কর্ম্মের পার্থক্য করিয়া দিয়াছেন—জগতের বহির্জীবন পুরুষের ও অন্তর্জীবন স্ত্রীলোকের। ইহাও সত্য যে, আমাদের সংসারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে স্ত্রীলোকেরা আবহমানকাল হইতে এরূপ নিপুণতার সহিত সংসার প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন যে, তাঁহাদের পক্ষেও শিক্ষা যে কত প্রয়োজনীয়,তাহা অনেক সময় আমাদের মনে থাকে না। কিন্তু অধিক শিক্ষার অভাব সত্ত্বেও তাঁহারা যে এরূপ নিপুণতার সহিত সংসার চালাইয়া আসিতেছেন, যাহাতে তাঁহাদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা আদৌ আমাদের মনে হয় না, সেটি তাঁহাদেরই কার্য্যকুশলতার পরিচায়ক, আমাদের বুদ্ধি এবং চিন্তা-শক্তির পরিচায়ক নহে। কোন বিষয়ের আলোচনার পূর্ব্বে, সে বিষয়টির ভিতর কি-কি কথা আসে, প্রথমেই তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিয়া, যদি আমরা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে অনেক সময়ে বৃথা তর্ক হইতে বাঁচিয়া যাইতে পারি।

শিক্ষা শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? শিক্ষার অর্থ কি কেবল চলিত-ভাষায় আমরা যাহাকে লেখা-পড়া শিক্ষা বলি, তাহাই,—না আরও কিছু? কতকগুলি বিশেষ কারণে আজকাল শিক্ষার অর্থ—যাহাকে লেখা-পড়া শিক্ষা বলে, প্রধানতঃ তাহাই দাঁড়াইয়াছে; কিন্তু শিক্ষার অর্থ তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক বিস্তৃত। সম্পূর্ণভাবে জীবন যাপন করিতে হইলে, তাহা পুরুষেরই হউক বা স্ত্রীলোকেরই হউক, আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদের জীবন অনেকগুলি অনেক-রকমের কর্ত্তব্য কার্য্যের সমাবেশ,—ইংরাজিতে যাহাকে বলে harmonious combination of manifold duties। এই কর্ত্তব্য কাজগুলির মধ্যে কতকগুলি দেশ ও সমাজ-সম্বন্ধীয়,কতকগুলি পরিবার-সম্বন্ধীয় ও কতকগুলি নিজের সম্বন্ধীয়; এবং উহারা পরস্পর এরূপভাবে জড়িত যে, একটা স্বকীয় অথবা ব্যক্তিগত জীবন সম্পূর্ণভাবে গড়িতে হইলে, তাহাদের মধ্যে কোনটিকে বাদ দিলে চলিবে না। সুতরাং, এই সমস্ত কর্ত্তব্য কাজের মধ্যে যাহাতে তাহাদের কোনটির অভাব না হয়, অথবা তাহাদের কোনটির মধ্যে অসম্পূর্ণতা না আসে,সে জন্য প্রত্যেকটির উপর ভাল করিয়া দৃষ্টি রাখিতে হইবে; এবং যদি কোনটির মধ্যে অভাব অথবা অসম্পূর্ণতা ঘটিয়া যায়, তবে তাহা তদুপযোগী শিক্ষার দ্বারা পূর্ণ করিয়া লইতে হইবে। সুতরাং, ছোট হউক, আর বড় হউক, সব বিষয়েই বাল্যকাল হইতে অল্পবিস্তর শিক্ষার প্রয়োজন, যাহাতে সে সমস্ত বিষয়ে কোনরূপ অভাব অথবা অসম্পূর্ণতা না থাকিয়া যায়। তবে এটি আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, সব শিক্ষা এক ধরণের নহে—কতকগুলি এরূপ সহজভাবে আপনা আপনি হয় যে, তাহাতে কোনরূপ বিশেষ শিক্ষা হইতেছে বলিয়া আমরা জানিতে পারি না—যাহাকে আমরা ইংরাজীতে spontaneous unconscious education বলিয়া থাকি; এবং কতকগুলি অধিক সময় ও শ্রম-সাপেক্ষ। শিক্ষার স্বরূপ ও বিভাগ সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহাতে, বোধ হয়, কাহারও কোন আপত্তি হইবে না। এক্ষণে দেখা যাউক, বালিকাদিগের শিক্ষার প্রণালী নির্ণয় সম্বন্ধে ঐ তথ্যগুলি কি পরিমাণে আমাদিগকে সাহায্য করিতে পারে। একটী কথা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, এখানে প্রত্যেকের জীবন তাহার অবস্থার অনুরূপ হওয়া উচিত; অর্থাৎ যে বালিকা দরিদ্রের ঘরে পড়িয়াছে, তাহার জীবন ঠিক রাজরাণীর জীবনের মতন হইতে পারে না; তাহাকে এমন অনেকগুলি কর্ত্তব্যের অভ্যাস রাখিতে হইবে, যাহা রাজরাণীর অভ্যাস না রাখিলেও চলিতে পারে। এইরূপ মধ্যবিত্ত অবস্থার গৃহিণীর জীবনের একদিকে দরিদ্রের গৃহিণী ও অন্যদিকে খুব বড়ঘরের গৃহিণী,—উভয়েরই জীবন হইতে কিয়ৎপরিমাণে পার্থক্য আছে। তথাপি, যে অবস্থারই স্ত্রীলোক হউন না কেন, আমরা তাঁহাদের প্রত্যেকের পক্ষে এমন কতকগুলি অবশ্য কর্ত্তব্য অংশ দেখিতে পাই, যাহা

তাঁহাদের সকলের মধ্যেই এক। চলিত ভাষায় আমরা যাহাকে গৃহিণীর পক্ষে সংসার বলিয়া থাকি, অর্থাৎ পারিবারিক জীবনের ভিতরের ব্যবস্থা,—তাহার সম্পূর্ণ ভার স্ত্রীলোকের হাতে; সুতরাং, সংসারের সেই কর্ত্তব্যগুলি, যাহার জন্য স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বপ্রধানতঃ দায়ী, এবং যাহা নহিলে কোন সংসারই সুশৃঙ্খলায় চলিতে পারে না, সেইগুলি বালিকাদের সকলের আগে শেখা প্রয়োজন। যাহাকে আমরা গৃহস্থালীর কাজ বলিয়া থাকি—অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে গৃহটিকে সুন্দরভাবে চালান—গৃহটিকে পরিষ্কার রাখা, রন্ধন, গুরুজনদিগের সেবা, সন্তান-প্রতিপালন এবং তাহাদিগকে উপযুক্তভাবে গড়িয়া তুলা, দাস-দাসীদিগকে উপযুক্তভাবে কার্য্যে নিযুক্ত রাখা ও যত্ন করা—এই শিক্ষা প্রত্যেক বালিকারই সর্ব্বপ্রথম শিক্ষা হওয়া উচিত। কিন্তু এইটি সুখের বিষয় যে, এই শিক্ষা যেরূপ সর্ব্বপ্রথমে প্রয়োজনীয় ও সময়-সাপেক্ষ, প্রত্যেক বালিকাই নিজ-নিজ পিতৃ-ভবনে ও পরে শ্বশুরালয়ে ইহা আস্তে-আস্তে শিখিয়া থাকে। প্রত্যেকের নিজের সংসারই এই সম্বন্ধে প্রকৃত বিদ্যালয়। এ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে কাহারও সহিত মতদ্বৈধ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এখন হইতেই মতদ্বৈধের যথেষ্ট সম্ভাবনা। এক পক্ষ বলিয়া থাকেন যে, উপরিউক্ত গৃহস্থালীর কার্য্যই স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ জীবন, ইহা অপেক্ষা তাহাদের আর কিছুই প্রয়োজনীয় নহে; সুতরাং,তাহাদের লেখা-পড়া শিক্ষার প্রয়োজন কি? লেখা-পড়া শিখিয়া তাহাদের অপকার ভিন্ন উপকার হয় না। অপর পক্ষ বলেন যে, উপরিউক্ত সাংসারিক কার্য্য শিক্ষার সহিত লেখা পড়া শিক্ষাও খুব প্রয়োজন; এবং যে যত অধিক শিখিতে পারে, তাহার পক্ষে ততই ভাল। এখন এই উভয় মতের মধ্যে সত্য কোন্ দিকে ও কতখানি, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে একটু নিরপেক্ষভাবে বিচার করা আবশ্যক। যে সংসারিক কার্য্যগুলি স্ত্রীলোকের প্রথম কর্ত্তব্য বলিয়া উভয় পক্ষই মানিয়া লইয়াছেন, এক্ষণে দেখা যাউক যে, কিছু লেখা-পড়া জানা থাকিলে তাহার সাহায্য হয়, কি অসুবিধা হয়। অযথা ব্যয় না হইয়া উপযুক্ত ব্যয়ে যাহাতে সংসার চলে, ইহার জন্য পদে-পদে হিসাব আবশ্যক;—কি দরে কত জিনিস আসিল, তাহা ঠিক পরিমাণে আসিয়াছে কি না, প্রত্যহ কি পরিমাণে খরচ হওয়া উচিত, ইত্যাদি ভাণ্ডারের হিসাব,ধোপার হিসাব, দুধের হিসাব,দাস-দাসীর বেতনের হিসাব—এগুলি সংসারের প্রাত্যহিক ব্যাপার; অন্ততঃ এগুলি প্রত্যেক গৃহিণীর জানিয়া রাখা উচিত। প্রথম পক্ষীয়েরা হয় ত বলিবেন যে, এই কাজগুলি গৃহকর্ত্তার করা উচিত। কিন্তু সারা দিন অফিসে অথবা অন্যরূপে খাটিয়া এইগুলি গৃহকর্ত্তার সুচারুরূপে করা সম্ভব কি না, তাহা সকলেরই বিবেচ্য। অবশ্য এ কথা সত্য যে,যেখানে গৃহিণী এ বিষয়ে অশিক্ষিত, সেখানে স্বামী বেচারার এই কাজগুলি না করিয়া উপায় নাই। পক্ষান্তরে,ইহাও সত্য যে,গৃহিণী এ বিষয়ে শিক্ষিতা হইলে,স্বামী বেচারার এ বিষয়ে অনেক ঝঞ্ঝাট বাঁচিয়া যায়; এবং তিনি তাঁহার বাহিরের কার্য্যগুলি, যাহা অর্থোপার্জ্জন ও সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের উপায়, সে দিকে অনেক অধিক মন দিতে পারেন এবং সুচারু ভাবে সম্পন্ন করিতে পারেন। তাহার পর, গুরুজনদিগের সেবার মধ্যে তাঁহাদিগের হইয়া পত্রাদি লেখা, রামায়ণ মহাভারত ইত্যাদি পড়িয়া শুনান—ইহাও কম সেবা নহে। স্বামীর নিকট সদ্গ্রন্থ পাঠ উভয়ের উন্নতির একটী প্রকৃষ্ট উপায়; এবং ইহা স্পর্দ্ধা করিয়া বলা যাইতে পারে যে, মাতার কিছু লেখা-পড়া জানা থাকিলে, ছেলেমেয়েদের লেখা পড়া শিখা যত সহজে হয়, আর কিছুতে সেরূপ হয় না। সুতরাং নিতান্ত সঙ্কীর্ণ সাংসারিক সুবিধারূপ চসমার ভিতর দিয়া দেখিলেও, আমরা অতি সহজে বুঝিতে পারি যে, মেয়েদের লেখা-পড়া শিক্ষা সাংসারিক সুবিধা ছাড়া অসুবিধার কারণ নহে।

আর একটু উচ্চ ভাবে দেখিলে কথাটি আরও পরিষ্কার হইবে। পুরুষের পক্ষে লেখা-পড়া শিক্ষার আবশ্যকতা কি? না হয় স্বীকার করিলাম, প্রথমতঃ অর্থোপার্জ্জন করিয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য; কিন্তু উহা অপেক্ষাও একটী উচ্চতর উদ্দেশ্য আছে—মানসিক ও নৈতিক উন্নতি। এই মানসিক ও নৈতিক উন্নতি পুরুষের পক্ষে যেরূপ প্রয়োজন, স্ত্রীলোকের পক্ষেও সেইরূপ। আমাদের শাস্ত্রের মতও তাহাই,—কেন না,স্ত্রী প্রতি বিষয়ে স্বামীর সহধর্ম্মিণী। আমরা অর্থাৎ পুরুষেরা উঠিব, কিন্তু স্ত্রীলোকদিগকে অজ্ঞান অবস্থায় ফেলিয়া রাখিব,—ইহা নিতান্ত স্বার্থপরের কথা! এবং এরূপ অবস্থায় অর্থাৎ একজন উচ্চশিক্ষিত এবং অন্যজন নিতান্ত অশিক্ষিত হইলে,উভয়ের প্রকৃত মনের মিলন অসম্ভব। এ সম্বন্ধে আমার অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন; কেননা,

অনেকেই নিজের সংসারে এ বিষয়ে ভুক্তভোগী আছেন। তবে এ বিষয়ে আমি আমাদের স্ত্রীলোকদিগকে আদৌ দোষী করি না; তাহাদের মতন শান্ত, বাধ্য স্ত্রী-জাতি পৃথিবীর আর কোনও স্থানে আছে কি না জানি না; তাহাদের অজ্ঞতার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী আমরা,— শুধু আলস্য বশতঃ আমরা এ বিষয়ে আদৌ চেষ্টিত হই না।

স্ত্রীলোকের জ্ঞানার্জ্জন এবং মানসিক ও নৈতিক উন্নতি আরও একটী কারণে বিশেষ প্রয়োজন,—তাহার আভাষ পূর্ব্বেই দিয়াছি। সন্তান, পিতা ও মাতা উভয়েরই দোষ ও গুণের অংশ লইয়া জন্মগ্রহণ করে। সে এক দেড় বৎসর পর্য্যন্ত সম্পূর্ণভাবে মাতার দুগ্ধে বর্দ্ধিত হয় এবং যে বয়সে তাহার মানসিক বৃত্তির ভিত্তি ক্রমে নিহিত হয়, এবং যে সময়ের ফল লইয়া ভবিষ্যতে সে ভাল অথবা মন্দ দাঁড়ায়, অর্থাৎ জন্ম হইতে ৭৮ বৎসর পর্য্যন্ত সেই কোমল বয়সের শিক্ষার ভার মাতার উপর সম্পূর্ণ ভাবে ন্যস্ত থাকে। ইহা হইতে আমি বুঝিতে পারি যে, জাতীয় ভবিষ্যৎ জীবনের উপর মাতার প্রভাব কতদূর। এই জন্যই ইংরেজিতে একটী কথা আছে—"The future of a nation depends upon its mothers." "যে কোন জাতির ভবিষ্যৎ সেই জাতির মাতৃকুলের উপর নির্ভর করে"; কেন না, মাতা যেরূপ শিখান, সন্তান সেইরূপ দাঁড়ায়। ইহা সত্ত্বেও যদি আমরা জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি স্বরূপ স্ত্রী-জাতিকে শুধু রন্ধন এবং বাসন-মাজার প্রধান উপায় মনে করিয়া মূর্খ রাখিতে চাই, তাহা হইলে একটী গল্পে যেরূপ শুনিয়াছি যে একজন লোক গাছের যে ডালে বসিয়াছিল, সেই ডালই কাটিতেছিল, সেই গল্প আমার মনে পড়ে।

তবে এখন কথাটি এরূপ দাঁড়ায় যে, এই বিষয়টি যদি আমরা এত সহজে এরূপে মীমাংসা করিতে পারি, তবে প্রথম পক্ষ—যাঁহারা এখন পর্য্যন্ত দেশের লোকের অধিকাংশ—তাঁহারা ইহার এত প্রতিকূলে কেন? ইহার উত্তরও তত কঠিন নহে;—প্রকৃত ঐতিহাসিক জ্ঞানের অভাব! প্রথম পক্ষ—যাঁহারা স্ত্রী-শিক্ষার বিরোধী বলিয়া নিজেদের পরিচিত করেন—তাঁহাদের মনে বিশ্বাস যে, এদেশে স্ত্রী-শিক্ষা পূর্ব্বে কখনও ছিল না, ইহা ইংরেজ রাজত্বের সহিত এদেশে নূতন আমদানী হইয়াছে; এবং যখন এতদিন স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা না থাকাতেও দেশ চলিয়াছে, তাহা হইলে এখনই বা চলিবে না কেন? তাঁহাদের এ বিশ্বাসটি সম্পূর্ণ সত্য নহে। যখন আমাদের প্রাচীন হিন্দু জাতির সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত অবস্থা ছিল, তখন পুরুষদের শিক্ষার অপেক্ষা স্ত্রী-শিক্ষার আদর কম ছিল না,—ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। ঋষিরা সাংসারিক কার্য্যের পর সংসারস্থ স্ত্রীলোকদিগকে একত্র করিয়া তাঁহাদের সহিত শাস্ত্রআলোচনা করিতেন। এমন কি, ঋষি-মহিলাদের মধ্যে কেহ-কেহ বেদের মন্ত্রও লিখিয়া দিয়াছেন, এরূপ প্রমাণ আছে। গার্গী, মৈত্রেয়ী, অষ্টাবক্র মুনির জন্ম—এই সমস্ত আখ্যান হইতে তাহা সম্পূর্ণ প্রতীত হইবে।

পরে ইহারও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, যে সময় হইতে হিন্দুদের ক্রমে পতনাবস্থা আরম্ভ হয়, তাহার কিছু পূর্ব্ব হইতে স্ত্রীলোকদিগের বেদাধ্যয়ন ক্রমে বন্ধ হয়। তথাপি শঙ্করাচার্য্যের সময় পর্য্যন্ত স্ত্রী-শিক্ষার কিরূপ আদর ছিল, তাহা তাঁহার উভয় ভারতীর সহিত বিচার হইতে বুঝা যাইবে। শঙ্করাচার্য্যের সর্ব্বপ্রধান বিচার পুরুষের সহিত নহে, স্ত্রীলোকের সহিত। গণিত-শাস্ত্রে লীলাবতীর নাম সকলের নিকট সুপরিচিত।

আর একটী অতি সহজ কথা হইতে প্রাচীন ভারতে স্ত্রী-শিক্ষার কিরূপ আদর ছিল, সহজে বুঝা যাইবে। বিদ্যার যিনি অধিষ্ঠাত্রী, তিনি দেবতা নহেন, দেবী —স্বয়ং সরস্বতী। যদি প্রাচীন ভারত স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী হইত, তাহা হইলে বিদ্যা বিষয়ে কোন দেবীর নাম থাকিত না, দেবতারই নাম থাকিত। যদি আমাদের আর কোনও প্রমাণ না থাকিত, তথাপি শুধু এই প্রমাণটুকু হইতে আমরা প্রাচীন ভারতে স্ত্রীশিক্ষার আদর বুঝিতে পারিতাম। সুতরাং, এই সকল প্রমাণ হইতে আমরা বলিতে পারি যে, স্ত্রীশিক্ষা এখনকার নূতন আমদানী নহে, অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে চলিয়া আসিতেছিল। মুসলমানদিগের ভারতবর্ষ বিজয়ের পর অনেক পুরাতন ভাল জিনিসের সহিত ইহাও চাপা পড়িয়াছিল এবং কালের ও অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত ইহার পুনরুদ্ধারের সময় হইয়াছে। তবে এ কথা সত্য যে, ইংরেজ-জাতির সংস্পর্শে আসিয়া আমরা আমাদের অনেক পুরাতন জিনিস পুনরায় নূতন করিয়া চিনিয়া লইবার সুযোগ পাইয়াছি। এটিও তাহাদের মধ্যে একটী। তবে আমাদের পুরাতন-তন্ত্রীদের সহিত

একমত হইয়া আমি এটুকু মানি যে, বালিকাদের লেখা-পড়া শিখানটা দেশী ধরণেই হওয়া উচিত। ইংরেজি ভাষাতে জ্ঞান বাড়াইবার যেরূপ অসীম উপায় আছে, তাহাতে, নিজের মাতৃভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান লাভের পর যদি কাহারও ইংরেজি শিখিয়া সেই জ্ঞান বাড়াইবার সময় ও সুবিধা থাকে, তিনি শিখুন; তাহা ভাল ছাড়া মন্দ নহে। তবে সকলের আগে নিজের মাতৃভাষা ও সেই সাহিত্যের জ্ঞান আবশ্যক। স্ত্রী-শিক্ষার বিরোধীরা আর একটী আপত্তি করিয়া থাকেন যে, লেখাপড়া শেখানতে স্ত্রীলোকেরা সাংসারিক কার্য্যে অপটু হয়, তাহাদের অহঙ্কার জন্মে এবং গুরুজনদিগের প্রতি ভক্তি থাকে না। একথার মূলে যে একেবারে কোনও ভিত্তি নাই, তাহা বলিতে পারি না। তবে যে স্থলে এরূপ ঘটিয়া থাকে, সেখানে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, যে শিক্ষার এরূপ ফল, সে শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা নহে।

যাঁহার উপর সংসারের ভার, তাঁহার পক্ষে সাংসারিক কাজ ও লেখাপড়া এই দুইটির মধ্যে আগে সাংসারিক কাজ। সাংসারিক কাজ সারিয়া সময় থাকিলে গ্রন্থপাঠের জন্য সময় ব্যয়—এই শিক্ষা বালিকাকে অথবা গৃহিনীকে দেওয়া থাকিলে, গৃহিনী সাংসারিক কাজে অবহেলা করিয়া গ্রন্থপাঠে সময় কাটাইতে পারেন না। আর একটী কথা—প্রকৃত জ্ঞান কখনও মানুষকে অহঙ্কারী অথবা অবিনীত করে না। কেন না তিনি যাহা জানেন, তাহার তুলনায় তাঁহার অজ্ঞাত কত জিনিস পড়িয়া আছে, সেটি সর্ব্বদা তাঁহার মনে জাগরূক থাকে। ইংরেজিতে কথা আছে যে, সক্রেটিস্ সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী ছিলেন; কেন না, তিনি তাঁহার জ্ঞানের সীমা জানিতেন। প্রসিদ্ধ জ্ঞানী নিউটন বলিয়া গিয়াছেন যে, শুধু জ্ঞান-সমুদ্রের তীরে উপল-খণ্ড সংগ্রহ করিতেই তাঁহার সমস্ত জীবন কাটিয়াছে,—জ্ঞান-সমুদ্রে ডুব দিবার তাঁহার আর সময় হয় নাই। কিন্তু যাহা জ্ঞানের ভানমাত্র অথচ প্রকৃত জ্ঞান নহে, তাহাই মানুষকে গর্ব্বিত এবং অহঙ্কারী করে- ইহা সর্ব্বত্রই বিদিত। ইংরেজিতে আছে, Little learning is a dangerous thing অর্থাৎ অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী। সংস্কৃতে আছে—'অগাধ জলসঞ্চারী বিকারী ন চ রোহিত, গণ্ডুষ জলমাত্রেণ শফরী ফর্ফরায়তে।' সুতরাং অল্পবিদ্যা-জনিত অহঙ্কারের ঔষধ, বিদ্যাদান না করা অথবা বিদ্যা-লাভের অধিকার কাড়িয়া লওয়া নহে;—অধিক বিদ্যা ও শিক্ষা দ্বারা স্বল্প বিদ্যাকে আরও গভীর করা ও প্রকৃত জ্ঞানের স্বরূপ বুঝান। যে সময়ে মন কোমল থাকে, সেই সময়েই শিক্ষার ভিত্তি আরম্ভ হওয়া উচিত। তবে আমাদের যে সমস্ত সামাজিক নিয়ম চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে বালিকা বয়সে যে শিক্ষা আরম্ভ হয়, সাধারণতঃ অতি অল্প বয়সে বিবাহ হইলেই তাহা বন্ধ হইয়া যায়। এরূপ অবস্থায় বালিকার মন যে সঙ্কীর্ণ ও জ্ঞান যে অগভীর থাকিবে, তাহা আশ্চর্য্য কি? কিন্তু তাহা বলিয়া যে শিক্ষাটুকু তাহারা বালিকা বয়সে পায়, সেটুকুও বন্ধ করা উচিত, অথবা, যে শিক্ষাটুকু সে পাইয়াছে, তাহা শ্বশুর-শাশুড়ি ও স্বামীর নিকট হইতে বাড়াইয়া লইয়া তাহাকে সম্পূর্ণ করা উচিত,—এ দুটি রাস্তার মধ্যে কোন্‌টি প্রশস্ততর তাহা একটু চিন্তা করিলে সকলেই নিজের মনে বুঝিতে পারিবেন; সুতরাং আমার অধিক বলা নিষ্প্রোয়জন।

বালিকাদের শিক্ষার আবশ্যকতা লোকে তর্কের খাতিরে স্বীকার করিলেও শেষে এই কথা বলেন যে, শিক্ষা ঘরে দিলেই চলিতে পারে, তাহার জন্য স্কুল ইত্যাদির প্রয়োজন কি? সেটি শুধু মুখের কথা মাত্র; কেন না প্রত্যেকে নিজের ঘরের অবস্থা হইতে জানেন যে, সাংসারিক কার্য্যের পরে বাপ-মা ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার জন্য কিছু সময় দিতে পারেন ও দিয়া থাকেন বটে, কিন্তু দুই-তিনটি অল্পবয়স্ক সন্তানকে ঘরে নিয়মমত শিক্ষা দেওয়া সাংসারিক কার্য্যের পর কিরূপ দুরূহ ও অসাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়, তাহা যাঁহারা এ বিষয়ে একটু চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন।

বলাইএর কাণ্ড

[শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্]

(১)

রাত্রি ৯টা বাজিয়া গিয়াছে ; গ্রামখানি ক্রমশঃ নিস্তব্ধ হইয়া আসিয়াছে। আকাশে মেঘও কিছু জমিয়া শীতের কন্‌কনে বাতাস দিতে আরম্ভ করিয়াছে।

এমন সময় বলাইচাঁদ একটা ছোট পুঁটুলি সন্তর্পণে কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া লইয়া, বাজারের প্রান্তে শিউশরণ মাড়ওয়ারির দোকানের বন্ধ দরজায় ঘা দিল।

ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা হইল, "কে ?"

বলাই এদিক-ওদিক দেখিয়া কহিল, "আমি বলাই।"

ভিতর হইতে দোর খুলিল ; বলাই ঢুকিতেই আবার দরজা বন্ধ হইল। কালো মুখে একরাশ সাদা দাঁত বাহির করিয়া শিউশরণ কহিল, "বলাই যে হঠাৎ ! নতুন শিকার কিছু আছে না কি ?"

বলাই কাজের মানুষ ;—সে তার পুঁটুলিটা ফেলিয়া দিয়া কহিল, "লও।"

ক্ষিপ্রহস্তে শিউশরণ তাহা খুলিয়া ফেলিল। তাহার ভিতর হইতে বাহির হইল একছড়া চেন সমেত সোণার ঘড়ি, একসেট সোণার বোতাম, এক জোড়া শান্তিপুরী ধুতি, এবং জল-খাইবার কাঁসার গ্লাস একটা।

আবার তেমনি প্রসন্ন দন্ত-পংক্তি বিকাশ করিয়া শিউ-শরণ কহিল, "বাহ্‌রে বলাই ! চমৎকার শিকার ! কোথায় মারলে ?"

বলাই বহিল, "তা যেখানেই হোক্ না, কত দিচ্ছ বল-দিকিনি !"

শিউশরণ কহিল, "ওটা বল্‌তে হবে। জানো তো, আমাদেরও সাবধান হ'তে হয়।"

বলাই বলিল, "আসানসোল ষ্টেশনে ভিড়ের মধ্যে এক বাবুর কাছ থেকে। যাচ্ছিল কল্‌কাতায়। নাও, কত দেবে বলো।"

শিউশরণ একবার জিনিষগুলা শ্যেন-দৃষ্টিতে পরখ করিয়া লইয়া কহিল, "টাকা ৩০।৪০—আর কত ?"

বলাই বলিল, "আমার দর-দস্তুরের সময় নেই ; ৭৫৲ টাকার কমে হবে না, একা চেনটারই দাম হবে ১৫০৲ টাকা।"

শিউশরণ অনেক দর-কসাকসি করিল ; অনেক বুঝাইল, যে, ও-গুলার শুধু সোণাটুকুই পাওয়া যাইবে। তা' ছাড়া এর ভেতরে ভয়ের কথা বিস্তর। সুতরাং ৫০ টাকার এক পাই বেশী হয় না।

অবশেষে ৬০৲ টাকা স্থির হইল। শিউশরণ সেকরা ডাকাইয়া সেগুলা তৎক্ষণাৎ ভাঙ্গিবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিল।

(২)

বলাই সি-ক্লাস বদমায়েস, এবং সংসারে তাহার আপনার বলিতে কেহ নাই। আছে কেবল মোক্ষদা আর তার পুত্র কেষ্ট। এই মোক্ষদা বলাইএর বন্ধু—আরও একটী সি-ক্লাস—বেচারামের বিধবা কন্যা। একবার বলাই যখন খুব বিপদে পড়ে, তখন তাহাকে বাঁচাইতে গিয়া বেচারাম নিজের প্রাণ হারায়। সেই হইতে বলাই মোক্ষদা আর তার ছেলের ভার নিজের উপরই লইয়াছে। তাহা-দেরই বাড়ীর পাশে নিজে একটা ঘর বাঁধিয়া বাস করে। কেষ্টাকে সম্প্রতি গাঁয়ের ইস্কুলে ভর্ত্তিও করিয়া দিয়াছে।

শিউশরণের দোকান হইতে বরাবর আসিয়া বলাই মোক্ষদার ঘরে ঢুকিল। বলিল, "কিছু আছে মোক্ষ, বড় ক্ষিদে পেয়েছে।"

মোক্ষদা বলিল, "কেন, তোমার ভাতই ত রয়েছে—বেড়ে দিচ্ছি।"

ভাত আনিয়া মোক্ষদা কহিল, "আজ আবার কোথায় গিয়েছিলে কাকা ?"

বলাই কাপড়ের খুঁট হইতে টাকাটা বাহির করিয়া কহিল, "এই নে ; টাকা-পাঁচেক আমি রেখেছি, ওতে বাকী ৫৫ টাকা আছে।"

মোক্ষদা বলিল, "আবার ঐ সব করতে গিয়েছিলে !

আর কেন কাকা! টাকা ত অনেক হ'য়েছে, আর কেন অধর্ম্ম করা!"

প্রচুর পরিমাণে একগ্রাস ভাত মুখে তুলিতে-তুলিতে বলাই কহিল, "ওতে অধর্ম্ম হয় না। আমি যদি টাকা না আনতাম ত তোরা বাঁচতিস্ কি করে। বুঝেছিস্, মানুষের প্রাণটাই সবচেয়ে বড়,—তাকে বাঁচাবার জন্যে যে-কোন কাজ করা যায়, তাতে অধর্ম্ম হয় না। তা ছাড়া গরীবের টাকা ত' আর আমি নিই নে। বেচাদাদা বল্‌ত' সোণা চুরি করলে পাপ হয় না, কেন না ওটা ত' আর দরকারী জিনিস নয়। একজন যে সোণা দিয়ে বাবুয়ানা করবে, তাই নিয়ে যদি আমি অসহায়দের দু'মুটো খাওয়াই, ত' তাতে পাপ হয় না রে, বরং পুণ্যি হয়। আমি ত' এই শাস্তর বুঝি!"

এত বড় প্রবল শাস্ত্রীয় যুক্তি খণ্ডন করা অসম্ভব বুঝিয়া মোক্ষদা বলিল, "তা যেন হোল, কিন্তু টাকা ত' হাতে অনেক জমেছে—আর কেন? ধরা পড়বার ভয়ও যে আছে।"

বলাই কহিল, "দে আর চারটি ভাত দে!" ভাত দেওয়া হইলে বলাই কহিল,—"একজন গোণকার গুণে বলেছে, আমি আর বেশী দিন বাঁচবো না,—তাই তোদের একটা উপায় ক'রে রেখে যাচ্চি—বুঝলি?"

মোক্ষদা বলিল, "ষাট! ও-সব কথা আবার কি?"

বলাই হাসিবার চেষ্টা করিল, পারিল না। কথাটা উল্‌টাইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "মোক্ষ, কেষ্ট কোথায় রে, ঘুমুচ্ছে বুঝি?"

এমন সময় বলাইএর সদর দরজায় হাঁক হইল, "এ বলাই, ঘরমে বা?"

বলাই তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল, "ঐ এসেছে।"

(৩)

যে আসিয়াছিল, সে কনষ্টেবল রামলোচন। বলাইএর নৈশ হাজিরি লইতে আসিয়াছিল; এবং তাহার সঙ্গে আরও যদি কিছু মেলে। বলাই দরজা খুলিয়া দিতে, সে চারি-হস্ত-প্রমাণ বাঁশের লাঠিটা দরজার গোড়ায় রাখিয়া ঘরে ঢুকিতে-ঢুকিতে "আ রে" জিলার টানে কহিল—"গাঁজা বা?"

বলাই হাসিয়া কহিল, "আছে বৈকি!" বলিয়া ক্ষিপ্র-হস্তে কলিকা সাজাইয়া রামলোচনকে দিয়া কহিল "ধরাও।"

রামলোচন প্রচণ্ড তিন টান দিয়া চক্ষু উল্টাইয়া দিয়া অবিলম্বে কলিকা বলাইকে দিতে-দিতে কহিল, "আজ শুনলাম বড় শিকার মিল্‌লো?"

বলাই হাসিয়া কহিল, "তোমাদের জ্বালায় কি আর শিকার-টিকার মেলবার জো আছে? রাত্তির-দিন পাহারা—পাহারা! আগে কিন্তু এ সব জ্বালা ছিল না। নাম লেখা থাকৃত এই মাত্র!"

রামলোচন হাতে তামাকু ডলিতে-ডলিতে কহিল, সুপারিন্‌টেন্‌টেন্ বড়া বদমাস্ বা। সুতরাং সে কি করিবে? যা হোক, তার পাওনা?

বলাই দুটো টাকা ফেলিয়া দিয়া কহিল, "সময় বড় মন্দা যাচ্ছে—এ মাসে আর না।"

টাকার মনোমোহন ঝনৎকারে রামলোচনের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল; কহিল,"তুম্ বড়া আচ্ছা বদমাইস্ আছে,—সেলাম, সেলাম।" বলিয়া বাঁশের লাঠি লইয়া নামিয়া পড়িল।

বলাই শয়ন করিতে যাইতেছিল, এমন সময় বাকী টাকা তিনটা হাতে লাগায় সে উঠিয়া বসিল। মনে পড়িল, সকাল বেলায় এলোকেশী আসিয়াছিল; তাহার হাতে এক পয়সা নাই, কিছু চাহিয়াছিল। বলাই বলিয়াছিল, আজই কিছু তাহাকে দিবে। তখন সে তাহার ছোট এক-হাতের লাঠিটা কাপড়ে লুকাইয়া টাকা তিনটা লইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

এলোকেশীর কলঙ্কের ইতিহাস বিস্তর। সম্প্রতি সে দুস্থ অবস্থায় এই গ্রামে আসিয়া আছে—ভিক্ষা এবং বলাইএর দয়ার উপর নির্ভর। গ্রামের আর একপ্রান্তে তাহার ঘর।

বলাই তাহার দুয়ারে ঘা দিয়া ডাকিল, "এলোকেশী!"

এলোকেশী দরজা খুলিয়া দিতে, বলাই ঘরে ঢুকিয়া তাহাকে টাকা তিনটা দিয়া কহিল, "আজ এই নাও।"

এলোকেশী কহিল, "এই জন্যে এত রাত্রে?"

বলাই হাসিল; কহিল, "আমার মনে থাকে না; তাই যখন মনে পড়ল, তখনই নিয়ে এলাম। নইলে ভুলে যেতাম।"

শুনিয়া এলোকেশীর চোখে জল আসিল। কথাটা

মিথ্যা,—কেন না, বলাই দিব বলিয়া কোনও দিন ভুল করে নাই। মুখ নীচু করিয়া এলোকেশী কহিল, "বসো, তামাক সেজে দি।"

বলাই কহিল, "না,—আমি যাই, বড় ঘুম পেয়েছে।"

(৪)

সকাল বেলায় বড় দারোগা-বাবুর বাসন মাজিতে হয়। এটাও হাজিরার অন্তর্ভুক্ত। সে দিন উঠিতে একটু বিলম্ব হওয়ায় বলাই তাঁহার নিকট অনেক গালি খাইল। তিনি বলিলেন যে, ফের যদি এরূপ হয়, ত, তিনি বলাইকে চালান না দিয়া ছাড়িবেন না!

মনটা ভাল নাই,—তাহার উপর আরও একটা গোলযোগ উপস্থিত। বলাই বাড়ী আসিতেই দেখিল, সম্মুখে ইস্কুলের পণ্ডিত মশাই। জাতিতে ব্রাহ্মণ, সুতরাং চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কহিলেন, "জাতে ছোটলোক কি না—আর কত হবে?"

প্রথম সম্ভাষণ বেশ শ্রুতিরোচক না হইলেও, বলাই রাগ না করিয়া কহিল, "কি হয়েছে ঠাকুর?"

ঠাকুর কহিল, "আর হবে কি? বলে কি না আমাকে শালা,—তোর ঐ কেষ্টা!"

বলাই ডাকিল, "কেষ্টা, এদিকে আয়!"

পণ্ডিত-মশায় তখনও সপ্তমে। তিনি কহিলেন, "নিজের ছেলে হোলে কি আর এ-সব বদ্ শিক্ষা হোতো,—পরের ছেলে কি না!"

যাহার ভবিষ্যতের জন্য সে ধর্ম্ম-অধর্ম্মও মানে নাই, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া এই কথাটা বলাইএর বুকে তীরের মত বিঁধিল। মুহূর্ত্তে রাগে জ্ঞান হারাইয়া সে কেষ্টাকে এমন মার মারিল যে, সে সেখানে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল, এবং পণ্ডিত মশাইও নিজের মান বাঁচাইতে দুর্লভ হইয়া গেলেন।

কেষ্টার কান্না শুনিয়া তাহার মা ছুটিয়া আসিয়া,তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া কহিল, "ছেলেটাকে মেরে ফেল্লে? শরীরে কি একটু মায়া-দয়া নেই?"

বলাই কাঠের মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল; সত্যই রাগের বশে সে এমন মার মারিয়াছে!

অনুতপ্ত বালকের মত তাহার মনটা খুঁতখুঁত করিতে লাগিল। অত্যন্ত সুবোধের মত খাওয়া-দাওয়া সারিয়া সে যখন আসিয়া বসিল, তখন মোক্ষদার মিষ্ট সান্ত্বনার কথাগুলাও তাহার মনকে বারম্বার চঞ্চল করিয়া তুলিতে লাগিল।

এমন সময় নিতাই আসিয়া খবর দিল যে, সন্ধ্যার সময় ক্রোশ-দুয়েক দূরে জঙ্গলা মাঠের কাছে থাকিতে হইবে,—একটা শিকারের সম্ভাবনা।

বলাই কহিল, "আজ আমাকে মাপ কর নিতাই, -আজ মনটা ভাল নয়।"

নিতাই বলিল,"ধর্ম্ম-ভাব হোল না কি? এ ত ভাল নয়! বাড়ীতে বসে থাকলে কি মন ভাল হবে? তার চেয়ে বয়ং চল; ভারী শিকার।"

বলাই ভাবিয়া দেখিল কথাটা ঠিক! একবার ঘুরিয়া আসিতে পারিলে মনটা ভাল হইবে বোধ হয়। বলিল, "আচ্ছা যাব।"

(৫)

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বি-মাথনে স্ফীতোদর তহশীলদার বাবু আড়াই হস্ত পরিমিত এক ঘোটক-পৃষ্ঠে সওয়ার হইয়া চলিয়াছেন,—অগ্র-পশ্চাতে দুইজন বরকন্দাজ। কা'ল লাট দাখিল করিতে হইবে,—সঙ্গে হাজার খানেক টাকা। রেলে চড়িয়া সদরে যাইতে হইবে। আরও সকাল-সকাল বাহির হইবার কথা ছিল,—কিন্তু অসময়ে নিদ্রাকর্ষণ হওয়ায় বিলম্ব হইয়া গেছে। গাড়ীর দেরী আছে; কিন্তু এখনও তিন মাইল পথ অতিক্রম করিতে হইবে। বিশেষ এই মাঠটায় ভয় আছে।

ঠিক একটা ঝোপের পাশে আসিতেই, সাঁ করিয়া একটা লাঠি প্রথম বরকন্দাজের পায়ে আসিয়া সজোরে লাগিল। তৎক্ষণাৎ 'মারলে রে' বলিয়া সে ভূপতিত হইল।

অবিলম্বে দ্বিতীয়েরও সেই অবস্থা হইল। তখন বেগতিক দেখিয়া তহশীলদার বাবু ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহাকে বেশী দূর যাইতে হইল না। ঘোড়া-শুদ্ধ তাঁহাকেও আছাড় খাইতে হইল, এবং ক্ষিপ্রগতিতে দুইজন লোক আসিয়া তাঁহার হাজার টাকার তোড়ার ভার হইতে তাঁহাকে মুক্তি দান করিল।

সন্ধ্যার পর ফিরিয়া আসিয়া বলাই ডাকিল, "মোক্ষ, ও মোক্ষ!"

মোক্ষদা কহিল, "কি।"

"কেষ্ট কোথায় রে?"

মোক্ষদা বলিল, "তার পর থেকে তার জ্বর এসেছে—বড্ড জ্বর।"

বলাইএর মুখ শুকাইয়া গেল; কহিল, "কোথায় আছে সে?"

যেখানে কেষ্ট শুইয়া ছিল, সেখানে তাহার নিকটে গিয়া বলাই ডাকিল, "কেষ্ট, দাদা, জ্বর হ'য়েছে রে?"

কেষ্ট দুই রাঙা চোখ খুলিয়া কহিল, "হ্যাঁ দাদামশাই।"

বলাই কেষ্টর বিছানায় বসিয়া তাহার মুখে-চোখে হাত বুলাইতে লাগিল; কহিল, "সেরে যাবে এখন।"

(৬)

একুশ দিন জ্বর ভোগ হওয়ার পরও ভাল হইবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। এ কয় দিন বলাই কেষ্টর শয্যা এক রকম ত্যাগ করে নাই বলিলেও চলে। পরিশ্রমে সে কোনও দিনই কাতর নয়;—কিন্তু তাহার একটা ধারণা এই হইয়াছিল যে, কেষ্টর রোগের কারণ সে-ই; ইহাই তাহাকে অমানুষিক বল দিয়াছে।

সন্ধ্যার পর রোগীর অবস্থা আরও খারাপ হইয়া আসিল, এবং হিক্কা আরম্ভ হইল। মোক্ষদা কাঁদিয়া কহিল, "কাকা, কি হবে?"

বলাই খানিকটা চুপ্‌চাপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া, হঠাৎ স্ফূর্ত্তির স্বরে বলিল, "মোক্ষ, মনে পড়েছে রে,—আচ্ছা, আমি ভাল করে দিচ্ছি।"

মোক্ষদা আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি ক'রে?"

বলাই কহিল, "দেখ্‌ ত! একটা মন্তর শিখেছিলাম, সেটা মনে পড়ল।" বলিয়া বিড়-বিড় করিয়া মন্ত্র পড়িতে পড়িতে কেষ্টর বিছানার চারিদিকে সাতবার ঘুরিয়া আসিল।

তাহার পর মাটিতে বসিয়া পড়িয়া কহিল, "দে—একটা বিছানা ক'রে দে। মাথাটা ভারী হ'য়ে আস্‌ছে; বস্‌তে পারছিনে।"

মোক্ষদা বলিল, "এ আবার কি হ'ল? তোমারও মাথা ভারী হয় কেন?"

বলাই শুইতে-শুইতে কহিল, "ভারী জোর প্রত্যক্ষ মন্ত্র। এক মিনিটে ফল হয়। আমি গুরুঠাকুরের কাছে শিখেছিলাম। দেখ্‌, তোর কেষ্টা ভাল হয়ে গেল। রোগটা আমি নিলাম। আমি সহ্য করতে পারব। আর দিয়েছিলাম ত আমিই"—বলিয়া সে হাসিবার চেষ্টা করিল।

মোক্ষদা কেষ্টর গায়ে হাত দিয়া কহিল, "সত্যিই ত গা জুড়িয়ে এসেছে। আর তোমার গা ত খুব গরম হ'য়েছে। কাকা, এ সব কি?"

মুখে তখনও সাফল্যের হাসি। বলাই কহিল, "হ'তেই হবে! ঝাড়-ফুঁক কি মিছে শিখেছি—না মন্তর মিথ্যে হয়?"

মোক্ষদা চিকিৎসার ত্রুটি করিল না। গাঁয়ের যত ভাল ডাক্তার, বৈদ্য—সকলকে দেখাইল। কিন্তু রোগ কিছুতেই কমিল না। সকলেই মাথা নাড়িয়া কহিল, "এতটা বাড়াবাড়ি হ'য়ে রোগ আরম্ভ হওয়া ত' কখনও দেখিনি! লক্ষণ ভাল নয়।"

সে-দিন ক্ষণে-ক্ষণে চৈতন্যে-অচৈতন্যে সমস্ত দিনটা কাটিল। রাত্রে অবস্থা আরও খারাপ হইল। নাড়ী বসিয়া যাইতে লাগিল,—ডাক্তার, কবিরাজ জবাব দিয়া গেল।

বিছানায় উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিতে-করিতে বলাই কহিল, "মোক্ষদা, একবার কেষ্টকে নিয়ে আয়। বেশ সেরেছে ত?"

কেষ্টকে আনিলে,তাহার মাথায় হাত বুলাইতে-বুলাইতে কহিল, "আঃ, বেঁচে থাক দাদা, বেঁচে থাক।"

সান্ত্বনার স্বরে মোক্ষদাকে কহিল, "কাঁদিস্‌ নি মোক্ষ! ভাঁড়ার-ঘরে মেজেয় পোঁতা অনেক টাকা আছে, নিস্‌। তোর ভাবনা কি? এইবার আমাকে ভাল ক'রে শুইয়ে দে,—দোরটা খুলে দে, একবার চারিদিকে ভাল ক'রে দেখে নি!"

বাহিরে রামলোচনের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল,—"বলাই, ওয়ারিণ্ট বা।"

বলাই হাসিয়া কহিল, "শুনেছিস্‌ মোক্ষ, ও আমাকে ওয়ারেণ্টের ভয় দেখাতে আস্‌ছে! ডাক্‌ তো—ডাক্‌ তো!"

রামলোচন ঘরে ঢুকিয়া সমবেদনার স্বরে কহিল, "বলাই, এ কি!"

বলাই ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া কহিতে লাগিল, "ফাঁকি দিয়েছি,—তোদের সবাইকে ফাঁকি দিয়েছি! এবার ঐ ওপর থেকে ওয়ারেণ্ট এসেছে,—বলাই সেইখেনে চ'ল্লো।"

জাতি-রক্ষা

[শ্রীপূর্ণচন্দ্র আঢ্য, বি-এ]

বছর তিনেক পরে
বিশু যখন ফিরে এল আপন গাঁয়ের ঘরে,
'মনুর' স্মৃতি গেল না'ক অনেক তীর্থ ঘুরে ;
অন্তর তার জুড়ে ;
তারই ছবিখানি
ছিল তাহার বুকের মাঝে, সেই যে ব্যথার গ্লানি
বক্ষ তাহার অন্ধকারে রেখেছিল ঢেকে,
মাঝে থেকে থেকে
বিদ্যুতেরই মত সেথায়, উঠ্‌ত বেগে জ্বলে
কচি মুখের হাসির আলো, হাসি চোখের জলে
ভোরের আলোয় আধ বাণী, গলা জড়িয়ে ধরা,
তারই মুখে তারই মায়ের মুখটী মনে পড়া ;
সেই যে মনু বাস্‌তো ভাল ঘুড়ি লাটাই স্থতো,
পূজোর সময় ছুটোছুটি পরে নতুন জুতো ;
এমনিতর কত
বিশুর মনে উঠ্‌ত শত শত ;
তীর্থে তাহার হারায়নি ক স্মৃতি
ঘরে এসে আগুন আবার জ্বল্‌ল যথারীতি।

দারুণ জ্বালার তাপে
পূজো-আহ্নিক ব্যথা নিয়েই দিনগুলি তার যাপে ;
হঠাৎ সেদিন দেখে নদীর তীরে
দুপুর বেলার তীক্ষ্ণ রোদে তপ্ত বালুর' পরে,
যেথায় নদীর চরে
কলসী ভাঙ্গা ছেঁড়া মাদুর পোড়া বাঁশের রাশি ;
সেইখানেতে আসি
জায়গা যেন পেয়ে
চিরতরে ঘুমিয়ে আছে গাঁয়ের চাঁড়াল মেয়ে ;
তারই বুকের' পরে
কাদা-মাখা শিশুটী তার বেড়ায় খেলা করে ;
মায়ের স্তন নিয়ে
নিজের ক্ষুধা মিটাতে সে যাচ্ছিল প্রাণ দিয়ে।
হঠাৎ বিশুর কি যে হল মনে,
বক্ষে তার তুলে নিলে ; হারান রতনে
সে যেন তার ফিরে পেলে কোলে।
সুপ্ত স্নেহের দোলে
সকল ব্যথা জুড়িয়ে গেল শিশুর পরশ পেয়ে,
শিশু-কোলে ছুট্‌ল বিশু গাঁয়ের মাঝে ধেয়ে।

গাঁয়ের লোকে বল্‌লে যখন "সে কি, বামুন বিশু
দাহ কর্‌বে চাঁড়াল মাগীর ? পাগল কিংবা শিশু
ওটা"—তখন বিশু গিয়ে
শিশুর মায়ে দাহ করে, তাকে কোলে নিয়ে
ফিরে এল নিজের ঘরে ; নিজের বুকের পরে
শিশুরে তা'র রাখ্‌লে চেপে ধরে।

অনেক দিনের পরে
আজকে তাহার বুকের স্নেহ উথ্‌লে যেন পড়ে,
বিশুরে তার ভিজিয়ে দিলে এ যে
তারই মাঝে সে যে
হারান তার মনুরে সে ফিরিয়ে পেয়ে আজ
পেয়েছে যে কাজ!
কোথায় তাহার ঝুমঝুমিটি, কোথায় কাঠের ঘোড়া,
কোথায় আছে লাল পশমের ছোট্ট মোজা জোড়া,
কাগজ পুড়িয়ে গরম করা কোথায় দুধের বাটী,
কোথায় আছে সেই ছোট্ট লাল কাঠের লাটী ;
এমনিতর কত
ছোট ছোট স্নেহের কাজে রইল সে আজ রত।
দীর্ঘ রাতের মাঝে
পাছে খোকার ঘুমটী ভাঙ্গে ভয়টী তাহায় বাজে ;
প্রদীপ জ্বেলে ঘরে
পাখা নিয়ে বস্‌ল গিয়ে খোকার শিয়র 'পরে।

রাত্রিশেষে গ্রামের মাঝে উঠ্‌ল গণ্ডগোল
"বিশুর ঘরে চাঁড়াল ছোঁড়া"—সে এক ভীষণ রোল
উঠ্‌ল ভীষণ ভাবে
"এমনতর অনাচারে দেশটা ভেসে যাবে
কপোতাক্ষীর জলে,
গ্রামের পুণ্যফলে,
যায়নি শুধু আজ্‌কে এতক্ষণও ; এখন শুধু তার
উপায় এসে করুক জমীদার।"
জমীদার মুখুয্যে মশাই এসে—
"পাগলামি যা করেছ তার দণ্ড কিছু নিয়ে
ছেলে ফেলে দিয়ে
জাতে তোমায় উঠ্‌তে হবে বিশু!"
"কোথায় যাবে শিশু?"
"চাঁড়ালের ছেলে
দাও ওটাকে ফেলে
প্রাঙ্গনে যা আছে ওটার হবে—
অশুচিকে ফেলে দিয়ে শুচি কর সবে"।
শান্ত স্বরে বল্‌লে বিশু, "শুনুন সমাজ-স্বামী,
খোকাকে তুলেছি বুকে ফেলব না'ক আমি।"
রেগে বল্লে সমাজপতি "তোমার জাতি যাবে
চাঁড়াল-ছোঁয়া বামুনের হাতের জল খাবে
এমন পাত্র নয় ক গ্রামের লোক।"
বল্লে বিশু "নাইক দুঃখ শোক,
মানুষ আমি সেইটী জাতি জানি,
মানুষের যা ধর্ম্ম আমি সেইটী শুধু মানি ;
সেই জাতিটি রা্‌তে আমায় হবে।
এখন তবে
মুক্ত কর সমাজ আমায় তোমার বাঁধন হতে
মহা জাতির পথে।"
এই বলে তার যজ্ঞসূত্র নিজের হাতে খুলে
পরম স্নেহে খোকায় বিশু নিলে কোলে তুলে॥

নাম-যজ্ঞের মহাসাধক

[অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ]

'শুদ্ধ বিষ্ণু-ভক্তি'র মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ হরিদাস মুসলমান-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও 'গোবিন্দ-রস-সমুদ্র-তরঙ্গে' নিয়ত ভাসমান থাকিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের শিরোমণি রূপে আজও পূজিত হইয়া থাকেন। এইরূপ মহান্ত সাধুসন্তের জীবনের কথা জানিতে কা'র না প্রবৃত্তি হইয়া থাকে? কিন্তু দুঃখের বিষয় হরিদাস ঠাকুরের ন্যায় মহাত্মার জীবনের অতি অল্প কথাই আমরা জানিবার অধিকারী হইয়াছি। তাঁহার গার্হস্থ্য-জীবনের কোন কথাই জানিবার উপায় নাই। ব্যাসাবতার বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের কৃপায় ও শ্রীচৈতন্য-কৃপাপাত্র কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর অনুগ্রহে নামযজ্ঞের মহাসাধক হরিদাসের চরিত-কথার যে অতি সামান্য বিবৃতি-মাত্র পাইয়াছি, আমার বিশ্বাস, শুধু তাহাই মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে, প্রকৃত বৈষ্ণবের প্রেমভক্তি লাভ করা অনায়াস হইয়া পড়ে।

উদার বৈষ্ণব-ধর্ম্মের উদারতার চূড়ান্ত উদাহরণ হরিদাসের প্রতি ছোট-বড় সকল বৈষ্ণবের আন্তরিক প্রীতি। বৈষ্ণবগণ শুধু মুখেই বলিতেন না—

"অধম কুলেতে যদি বিষ্ণু-ভক্ত হয়।
তথাপি সে-ই সে পূজ্য" সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়॥

তাঁহারা স্বীয়-স্বীয় আচরণ দ্বারা এই ভগবদ্-বাক্যের সার্থকতা প্রতিপাদন করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা হরিদাসকে পূজা ত করিয়াছেনই,—তাঁহাদের পূজা অতিমাত্রায় উঠিয়া—হরিদাসকে তাঁহারা মহান্ত-বাঞ্ছিত 'ঠাকুর' উপাধিতে ভূষিত করিয়াই ক্ষান্ত হ'ন নাই। বৈষ্ণবদিগের মধ্যে যিনি যত বড়ই হউন না কেন, স্বয়ং মহাপ্রভু, শ্রীমদ্ অদ্বৈতাচার্য্য ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ ব্যতীত মহাপ্রভুর সময়ে কাহাকেও "প্রভু"

নামে অলঙ্কৃত করিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। (১) কিন্তু আশ্চর্য্য বৈষ্ণব-প্রীতি! অত্যাশ্চর্য্য তাঁহাদের মহিমা! হরিদাসকে তাঁহারা এতই আপনার করিয়া লইয়াছিলেন যে, তাঁহাকেও 'প্রভু' বলিয়া গৌরবান্বিত করিতে ছাড়েন নাই। শ্রীচৈতন্য-ভাগবত আমাদের এ কথার জলন্ত সাক্ষী! শ্রীবৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন—

'প্রভু হরিদাস মাত্র নৃত্যে প্রবেশিলে।
সকল আসিয়া তান শ্রীবিগ্রহে মিলে॥'

(১১৮ পৃঃ)

গুণীই গুণের আদর করে; বৈষ্ণবই বৈষ্ণবত্বের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে পারে। বৈষ্ণব বলেন, হরিদাস নীচ জাতি হইলেও সকলের তিনি মাথার মণি। সকলেই তাঁহার সঙ্গ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া থাকে।

চৈতন্যভাগবত বলেন—

"প্রহ্লাদ যে হেন দৈত্য, কপি হনুমান।
সেই মত হরিদাস নীচ জাতি নাম।"

কিন্তু নীচ জাতি হইলে কি হয়?

"হরিদাস স্পর্শে বাঞ্ছা করে দেবগণ।
গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরিদাসের মজ্জন॥
স্পর্শের কি দায়, দেখিলেও হরিদাস।
ছিণ্ডে সর্ব্বজীবের অনাদি-কর্ম্মপাশ॥
হরিদাস আশ্রয় করিব যেই জন।
তানে দেখিলেও খণ্ডে সংসার-বন্ধন॥
* * * * *
সকৃত যে বলিবেক হরিদাস নাম।
সত্য-সত্য সেহ যাইবেক কৃষ্ণ-ধাম॥

(১) শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—
"ইথে ভক্তভাব ধরে চৈতন্য গোসাঞি
ভক্ত-স্বরূপ তাঁর নিত্যানন্দ ভাই॥
ভক্ত-অবতার তাঁর আচার্য্য গোসাঞি।
এই তিন তত্ত্ব সবে প্রভু করি গাই॥"

শ্রীচৈতন্যগণোদ্দেশেও ইহারই প্রতিধ্বনি আছে। মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত ভিন্ন কেহই প্রভুপদবাচ্য হইতে পারেন না এবং হন নাই। তবে যে শ্রীনিবাস ও হরিদাসকে প্রভু বলা হইয়া থাকে, তাহাতে তাঁহাদের নামের 'প্রভু' শব্দকে সঙ্কুচিত বৃত্তিতে ধরিতে হইবে। নরহরি ঠাকুরের 'ভক্তি রত্নাকরে'ও 'প্রভু হরিদাসে'র যে প্রয়োগ আছে, তাহাও এই সঙ্কুচিত-বৃত্তি।

হরিদাস বৈষ্ণবের এক অপূর্ব্ব রত্ন। তাঁহার প্রেমের তুলনা নাই—প্রেমাবেশে তাঁহার নৃত্য অনুপম। সে নৃত্য এমনই যে

"হরিদাস-নৃত্যে কৃষ্ণ নাচেন আপনে।
ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র হয়ে ও-নৃত্য-দেখনে।"

হরিদাসের বাল্য-কথার মধ্যে এইটুকুই জানিতে পারা যায় যে,

"বুঢ়ন-গ্রামেতে অবতীর্ণ হরিদাস।
সে ভাগ্যে সে সব দেশে কীর্ত্তন প্রকাশ॥"

যশোর জেলায় বনগ্রাম সবডিভিসনের নিকটে বর্ত্তমান ষ্টেশনের সন্নিকটে 'বুড়ন' গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া হরিদাস সেই গ্রাম পবিত্র করিয়াছেন। সম্ভবতঃ তাঁহার বাল্য-জীবন এই পল্লীতেই অতিবাহিত হইয়াছিল। কোন প্রামাণ্য গ্রন্থে তাঁহার পিতা-মাতার নামের উল্লেখ নাই। সম্প্রতি কয়েক-জন লেখক কল্পনা-সাহায্যে হরিদাসের পিতা-মাতার নাম ও জাতি-কুলের অদ্ভুত তথ্যসকল আবিষ্কার করিয়া তাঁহাদের উর্ব্বর-মস্তিষ্কের পরিচয় দিয়াছেন। কেহ কেহ মুসলমান কর্ত্তৃক প্রতিপালিত বলিয়া হরিদাসকে মূলতঃ হিন্দু করিয়াই তুলিয়াছেন। এ সমস্ত মত যে আদৌ গ্রাহ্য নয়, তাহা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি। বস্তুতঃ হরিদাস যে মুসলমান এবং মুসলমানদের মধ্যে বড় বনিয়াদি ঘরের ছেলে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। (২)

মুসলমান-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া হরিদাস কি নামে অভিহিত হইতেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। যাহা হউক,

(২) হরিদাসকে কাজি নবাবের নিকট আনয়ন করিলে নবাব যাহা বলিয়াছিলেন, সেই উক্তি হইতেও, হরিদাস যে মুসলমান ও বড় বংশের ছেলে, তাহা জানা যায়।

ভাগবতে আছে—"আপনে জিজ্ঞাসে তানে মুলুকের পতি।
"কেনে ভাই! তোমার কিরূপ দেখি মতি॥
কত ভাগ্যে দেখ তুমি হৈয়াছ যবন।
তবে কেনে হিন্দুর আচারে দেহ মন॥
আমরা হিন্দু দেখি নাহি খাই ভাত।
তাহা তুমি ছোড় হই মহাবংশজাত॥
* * * * * *
না জানিঞা যে কিছু করিলা অনাচার।
সে পাপ ঘুচাহ করি কলিমা উচ্চার॥" (১২০ পৃঃ)

হিন্দু-আচারসম্পন্ন ও হরিভক্তি-পরায়ণ হইয়া বোধ হয় তাঁহার নাম হরিদাস হইয়া থাকিবে। তবে তিনি কাহার প্রেরণায় কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ হইয়াছিলেন, বৈষ্ণব-গ্রন্থে তাহার কোন ইঙ্গিত নাই। (৩)

হরিদাস হরি-প্রেমে বিভোর হইয়া বুঢন পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিকটবর্ত্তী বেনাপোলের জঙ্গলময় স্থানে সাধনা-নিরত হইলেন।

"নির্জ্জন বনে কুটীর করি তুলসী-সেবন।
রাত্রিদিনে তিনলক্ষ নাম সঙ্কীর্ত্তন।
ব্রাহ্মণের ঘরে করে ভিক্ষা নির্ব্বাহণ।
প্রভাবে সকল লোক করয়ে পূজন॥"

এই সময়ে সেখানে রামচন্দ্র খাঁ নামক বৈষ্ণবদ্বেষী পাষণ্ড সেই দেশাধ্যক্ষ ছিলেন। হরিদাসের এত নাম, সমাদর, তাঁর সাধন-ভজনের এরূপ সুখ্যাতি—রামচন্দ্র খাঁর আর সহ্য হইল না। রামচন্দ্র

"তাঁর অপমান করিতে নানা উপায় করে।" কিন্তু—"কোন প্রকারে হরিদাসের ছিদ্র না পাইয়া" শেষে "বেশ্যাগণ আনি করে ছিদ্রের উপায়।"

বেশ্যাগণ যখন তৎকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া ভক্ত হরিদাসের বৈরাগ্য-ধর্ম্ম নষ্ট করিতে পারিল না, তখন

"বেশ্যাগণ মধ্যে এক সুন্দরী যুবতী।
সেই কহে তিন দিনে হরিব তার মতি॥"

হরিদাসকে সাধন-পথ হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য রাত্রি-কালে সেই বেশ্যা বেশবিন্যাস করিয়া উৎফুল্ল-হৃদয়ে হরি-দাসের নির্জ্জন কুটীরে গিয়া উপস্থিত হইল।

"তুলসী নমস্কারি হরিদাসের দ্বারে যাঞা।
গোসাঞিরে নমস্করি রহিলা দাণ্ডাইয়া।
অঙ্গ উঘাড়িয়া দেখায় বসিয়া দুয়ারে।
কহিতে লাগিলা কিছু সুমধুর স্বরে॥
ঠাকুর! তুমি পরম সুন্দর প্রথম যৌবন।
তোমা দেখি কোন্ নারী ধরিতে পারে মন॥
তোমার সঙ্গ লাগি লুব্ধ মোর মন।
তোমা না পাইলে প্রাণ না যায় ধারণ॥"

কিন্তু হরিদাসের ত কাহারও সহিত কথা বলিবার অথবা অন্য কিছু ভাবিবার অবসর নাই। নামে তিনি একেবারে বিভোর হইয়া আছেন। তিনি যে সৌন্দর্য্য-রসের আস্বাদন করিতেছেন, তাহা যে "কন্দর্প-দর্প-হর"। সামান্য সুন্দরী বেশ্যা তাঁহার নিকট অকিঞ্চিৎকর সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার লইয়া কাম উৎপাদন করিবে? বেশ্যার কথা শুনিয়া

"হরিদাস কহে তোমায় করিব অঙ্গীকার।
সংখ্যা নাম সমাপ্তি যাবৎ না আমার॥
তাবৎ তুমি বসি শুন নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
নাম সমাপ্তি হইলে করিব যে তোমার মন॥"

সেই রাত্রি ত বেশ্যা সমস্ত রাত্রি বসিয়া নাম শ্রবণ করিল। প্রাতঃকালে উঠিয়া গেল। পুনরায় রাত্রিকালে বেশ্যা আসিল। হরিদাস তাহাকে বলিল, কাল তুমি কষ্ট পাইয়াছ, ইহাতে আমার অপরাধ লইও না। তুমি এখানে বসিয়া নাম-সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ কর।

"নাম পূর্ণ হৈলে তোমার পূর্ণ হবে মন।"

এইরূপে সেই রাত্রি ত গেল। তার পরদিন সন্ধ্যায় বেশ্যা—

"তুলসীকে ঠাকুরকে নমস্কার করি।
দ্বারে বসি নাম শুনে বলে "হরি হরি"॥

আজ সে হরিদাসের নিকট বিশেষ আশ্বাস পাইল। কিন্তু—

"কীর্ত্তন করিতে তবে রাত্রি শেষ হৈল।
ঠাকুরের সনে বেশ্যার মন ফিরি গেল।"

বেশ্যা হরিদাস-চরণে প্রণাম করিয়া তাহার কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত প্রার্থনা করিল। ঠাকুরের উপদেশে সেই বেশ্যা—

"গৃহ বিত্ত যেবা ছিল ব্রাহ্মণেরে দিল॥
মাথামুড়ি এক বস্ত্রে রহিলা সে ঘরে।
রাত্রি দিনে তিন লক্ষ নাম গ্রহণ করে॥

ভক্তমালও বলিয়াছেন—"যবনের কুলে জন্ম হইল যে কারণ।"
চৈতন্যচরিতামৃতে আছে—"হীনজাতি জন্ম মোর নিন্দ্য কলেবর।"
অন্ত্য—১১শ পরিচ্ছেদ
ভাগবতে কাজির উক্তি—"যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার।
ভালমতে তারে আনি করহ বিচার॥ ১।১১ পৃঃ

(৩) সাধকদিগের মতে তিনি না কি ঋচীক মুনির পুত্র ছিলেন। তখন তাঁহার নাম "ব্রহ্ম" ছিল। তিনি পিতৃ-শাপে হীন কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। ভক্তমালে এই অভিশাপের বিবরণ আছে। এই জন্য কেহ-কেহ তাঁহাকে "ব্রহ্ম হরিদাস" বলিয়াও অভিহিত করিয়া থাকেন।

পরে সে এমন ভক্তিমতী হইয়া উঠিয়াছিল যে, পরম মহান্তী নামে খ্যাতা হইল। তাহার আশ্রম তীর্থে পরিণত হইল। বড়-বড় বৈষ্ণব তাহাকে দর্শন করিবার জন্য আগমন করিতে লাগিলেন।

হরিদাস তার পর হুগলীর নিকটবর্ত্তী চাঁদপুর নামক গ্রামে গিয়া তাঁহার এক কৃপাপাত্র বলরাম আচার্য্যের গৃহে উঠিলেন। সেখানে তিনি তাঁহাকে যত্ন করিয়া সেই গ্রামে রাখিলেন। হরিদাস এক নির্জ্জন পর্ণশালায় থাকিয়া কীর্ত্তনালাপ করেন, আর বলরামের গৃহে ভিক্ষা নির্ব্বাহণ করেন। এই সময়ে বৈষ্ণব-জগতের অমূল্য নিধি রঘুনাথ দাস গোস্বামী বালকমাত্র। তাঁহার তখন পঠদ্দশা ;—তিনি পড়েন আর নিত্য গিয়া হরিদাস ঠাকুরকে দর্শন করিয়া আসেন। হরিদাস সেই বালকের হৃদয়ে যে ভক্তি-বীজ বপন করিয়া দিয়াছিলেন, তাহারই ফলে কালে এই দ্বাদশ-লক্ষাধিপতি অতুল ধনৈশ্বর্য্য তুচ্ছ করিয়া কৌপীন ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। চরিতামৃত বলেন—

"হরিদাস কৃপা করে তাহার উপরে।
সেই কৃপা কারণ হইল চৈতন্য পাইবারে॥"

হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন তৎকালে সেই দেশের অধিপতি (মজুমদার) ছিলেন। বলরাম আচার্য্য তাঁহাদেরই পুরোহিত। তিনি একদিন তাঁহাদের সভায় হরিদাসকে লইয়া যান। সেই সভায় উপস্থিত ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, সজ্জন এবং হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন তাঁহার যথেষ্ট স্তুতি করিলেন এবং তাঁহার মুখে নাম-মাহাত্ম্য শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। এইখানে গোপাল চক্রবর্ত্তী নামে হরিনামদ্বেষী এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ নাম-মাহাত্ম্যের বিশেষ প্রতিবাদ করায়, তিনি ভগবানের নিকট অপরাধী হইয়া কুষ্ঠ-রোগাক্রান্ত হ'ন। হরিদাস এই বিপ্রের দোষ গ্রহণ করেন নাই, তথাপি তাঁহাকে তাহার ফলভোগ করিতে হইল।

"বিপ্রের দুঃখ শুনি হরিদাসের দুঃখ হৈলা।
বলাই পুরোহিতে কহি শান্তিপুরে আইলা।"

তিনি গঙ্গাতীরে আসিয়া ফুলিয়ায় রহিলেন। শ্রীমদ্ অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিলেন এবং গঙ্গাতীরে তাঁহার নির্জ্জন ভজনের জন্য এক গোফা করিয়া দিলেন। হরিদাস অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে ভিক্ষা নির্ব্বাহণ করিতেন, আর আচার্য্য তাঁহাকে ভাগবত ও গীতার ভক্তি-অর্থ শুনাইতেন। শ্রীমদ্ অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহার সঙ্গ পাইয়া আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। হরিদাসও অদ্বৈতদেব-সঙ্গে আনন্দে মাতোয়ারা হইয়াছিলেন। বিষয়-সুখে তাঁহার রতি আদৌ ছিল না। ভাগবত বলেন—

"বিষয় সুখেতে তিনি বিরক্তের অগ্রগণ্য।
কৃষ্ণ নামে পরিপূর্ণ শ্রীবদন ধন্য॥"

ক্ষণমাত্রও তাঁহার গোবিন্দ-নামে বিরক্তি ছিল না। তিনি সর্ব্বদাই গঙ্গার তীরে-তীরে উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে-করিতে ভ্রমণ করিতেন। আর ভক্তি-রসে আপ্লুত হইয়া কখনও আপনা-আপনি নৃত্য করিতেন, কখনও বা মত্ত সিংহের ন্যায় ধ্বনি করিতেন ; আবার কোন সময়ে উচ্চৈঃস্বরে রোদন অথবা মহা অট্টহাস্য করিতেন। অশ্রুপাত, রোমহর্ষ, মূর্চ্ছা, ঘর্ম্ম প্রভৃতি কৃষ্ণভক্তি-বিকারের সমস্ত মর্ম্মই তাঁহাতে প্রকটিত হইত। এই সময়ে তিনি নিত্য গঙ্গাস্নান-পূর্ব্বক সমস্ত স্থানে উদাত্তস্বরে হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেন। হরিদাস প্রত্যহ অদ্বৈত-দেবের অন্ন গ্রহণ করেন। ইহাতে তাঁহার একদিন নির্বেদ উপস্থিত হইল। তিনি অদ্বৈতদেবকে বলিলেন।

"মোরে প্রত্যহ অন্ন দেহ কোন্ প্রয়োজন?
মহা মহা বিপ্র হেথা কুলীন সমাজ।
নীচে আদর কর, না বাসহ লাজ॥
অলৌকিক আচার তোমার কহিতে পাই ভয়।
সেই কৃপা করিবে যাতে মোর রক্ষা হয়॥
আচার্য্য কহেন তুমি না করিহ ভয়।
সেই আচরিব যেই শাস্ত্রমত হয়॥
তুমি খাইলে হয় কোটী ব্রাহ্মণ-ভোজন।
এত বলি শ্রাদ্ধপাত্র করায় ভোজন।
জগৎ নিস্তার লাগি করেন চিন্তন।
অবৈষ্ণব জগৎ কৈছে হইবে মোচন।
কৃষ্ণ অবতারিতে আচার্য্য প্রতিজ্ঞা করিলা।
গঙ্গাজল তুলসী লইয়া পূজিতে লাগিলা।
হরিদাস করে গোফায় নাম সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হ'ন, এই তার মন।

দুই জনের ভক্ত্যে কৃষ্ণ কৈল অবতার।
নাম প্রেম প্রচারি কৈল জগৎ নিস্তার ॥"

বেনাপোলের বনে বেশ্যা যে ভাবে হরিদাস ঠাকুরকে প্রলোভিত করিতে আসিয়াছিল, সেই ভাবের অনুকরণ করিয়া মায়াদেবী স্বয়ং এক জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে ঠাকুর হরিদাসকে পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু মহাভাগবত ঠাকুরের নাম-কীর্ত্তনে ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং ইন্দ্রিয়-সংযমের অলোকিক ক্ষমতা দেখিয়া কৃষ্ণ-নাম-প্রার্থিনী হইয়া একেবারে তাঁহার চরণ বন্দনা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। হরিদাসের নাম-সাধনার আরও অনেক অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত আছে ;—আমরা আর একটীমাত্র দৃষ্টান্ত দেখাইয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

হরিদাস ত ফুলিয়ায় সর্ব্বদাই হরিনাম করিয়া বেড়ান। কাজি দেখিলেন যে, তাঁহাদেরই একজন মুসলমান স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুর আচার অবলম্বন করিয়াছেন। মুসলমান-শাসনাধীনে মুসলমানের এ দৃষ্টান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। কাজি দেশাধিপতিকে সমস্ত বিবরণ জানাইলেন ;—শুনিয়া তিনি বলিলেন—

"যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার।
ভাল-মতে তারে আনি করহ বিচার ॥"

অতঃপর হরিদাসকে ধরিয়া আনা হইল। তিনিও কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে-করিতে তৎক্ষণাৎ চলিয়া আসিলেন। মুলুকপতি তাঁহার তেজঃপুঞ্জ মনোহর কলেবর দর্শন করিয়া স্বয়ং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কেনে ভাই! তোমার কিরূপ দেখি মতি।
কত ভাগ্যে দেখ তুমি হৈয়াছ যবন।
তবে কেনে হিন্দুর আচারে দেহ' মন ॥
আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত।
তাহা তুমি ছোড় হই মহাবংশজাত ॥
জাতি-ধর্ম্ম লঙ্ঘি কর অন্য ব্যবহার।
পর-লোকে কেমতে বা পাইবা নিস্তার ॥
না জানিঞা যে কিছু করিলা অনাচার।
সে পাপ চযুাহ করি কলিমা-উচ্চার ॥"

তখন হরিদাস তাঁহাকে মধুর বচনে বলিতে লাগিলেন—

"শুন বাপ! সভারই একই ঈশ্বর ॥
নামমাত্র ভেদ করে হিন্দুয়ে যবনে।
পরমার্থে এক কহে কোরাণে পুরাণে ॥
এক শুদ্ধ নিত্য বস্তু অখণ্ড অব্যয়।
পরিপূর্ণ হই বৈসে সভার হৃদয় ॥
সেই প্রভু যারে যেন লওয়ায়েন মন।
সেই মত কর্ম্ম করে সকল ভুবন ॥"

হরিদাসের এইরূপ সত্য কথা শুনিয়া উপস্থিত মুসলমানগণ সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু কাজি ইঁহাকে শাস্তি দিবার জন্য বহু প্রকারে বলিলেন। শেষে বাইশ বাজারে তাঁহাকে নির্দ্দয় রূপে প্রহার করিয়া প্রাণ লইবার আদেশ লইলেন। পাইকগণ তাঁহাকে বাইশ বাজারে নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিতে লাগিলেন।

"বাইশ বাজারে সব বেড়ি দুষ্টগণে।
মারয়ে নির্জ্জীব করি মহাক্রোধ মনে ॥"

কিন্তু—

" 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' স্মরণ করেন হরিদাস।
নামানন্দে দেহ দুঃখ না হয় প্রকাশ ॥"

পাইকগণকে অনেকে সাধ্য-সাধনা করিল ;—

"কেহো গিয়া যবনগণের পায়ে ধরে।
কিছু দিব, অল্প করি মারহ উহারে ॥"

কিন্তু কিছুতেই তাহাদের মনে দয়ার উদ্রেক হইল না। ইহাদের এইরূপ নির্দ্দয় প্রহারেও কিন্তু কৃষ্ণনামের প্রভাবে

"কৃষ্ণের প্রসাদে হরিদাসের শরীরে।
অল্প দুঃখ নাহি জন্মে এতেক প্রহারে ॥"

শুধু তাহাই নয়। হরিদাস পাইকদের উপর একটুও অসন্তুষ্ট হন নাই। তাহারা যতই প্রহারে করে—তিনি ততই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলেন। আর বলেন—

"এ সব জীবেরে কৃষ্ণ! করহ প্রসাদ।
মোর দ্রোহে নহু এ-সভার অপরাধ ॥"

বাইশ বাজারে নির্ম্মম প্রহার খাইয়াও হরিদাস মরিলেন না। তখন,

"যবন-সকল বোলে অরে হরিদাস!
তোমা হৈতে আমা' সভার হইবেক নাশ ॥

এত প্রহারেও প্রাণ না যায় তোমার।
কাজী প্রাণ লইবেক আমা সভাকার ॥"

ইহাদের এই কথা শ্রবণ করিয়া—

"হাসিয়া বোলেন হরিদাস মহাশয়।
আমি জীলে যদি তোমা সভার মন্দ হয় ॥
তবে আমি মরি এই দেখ বিদ্যমান।"

এই বলিয়া তিনি গভীর ধ্যানাবিষ্ট হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে রহিলেন। দেখিয়া তাহারা মনে করিল, হরিদাসের মৃত্যু হইয়াছে। তাহারা বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে লইয়া নবাবের দ্বারে রাখিয়া দিল। নবাব শবদেহটীকে সমাধিস্থ করিতে বলিলেন। কিন্তু কাজী নবাবকে বলিলেন, এই কাফেরকে সমাধিস্থ করা কর্ত্তব্য নয়, ইহার শবদেহ গাঙ্গে ফেলিয়া দেওয়াই উচিত। নবাবের আদেশে তাহাই করিবার ব্যবস্থা হইল। কিন্তু তাঁহাকে তুলিবার সময় তাঁহার দেহে বিশ্বম্ভর-অধিষ্ঠান হইল। কেহ তাঁহাকে নড়াইতেই পারে না। শেষে ইনি গঙ্গাজলে নিক্ষিপ্ত হইয়া ভাসিতে-ভাসিতে কিছুদূর গেলে, তাঁহার নিজ-ইচ্ছায় বাহ্যজ্ঞান হইল। পরম আনন্দময় হরিদাস চৈতন্য পাইয়া তীরে উঠিলেন এবং হরিনাম করিতে-করিতে ফুলিয়া নগরে আসিলেন। সেখানে নবাবকে দর্শন দিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন। তখন নবাব বুঝিলেন যে হরিদাস প্রকৃত সাধুপুরুষ। তার পর তিনি তাঁহাকে মহা-পীর জ্ঞানে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া হরিদাসকে যথেচ্ছ বিচরণের আদেশ প্রদান করিলেন। অতঃপর তিনি কীর্ত্তন করিতে-করিতে বিপ্রগণের সভায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা তাঁহাকে পাইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। হরিদাসের চরিত্রে এইরূপ অদ্ভুত আখ্যানের কথা আরও আছে; বাহুল্য ভয়ে তাহা উল্লিখিত হইল না।

হরিদাস নবদ্বীপে গমন পূর্ব্বক ভক্ত বৈষ্ণবগণের সহিত মিলিত হইতেন। স্বয়ং মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ইঁহাকে এতই অন্তরঙ্গ করিয়া লইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে আলিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য নীলাচলে গমন করিলে, হরিদাসও তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন। নীলাচলে তিনি ভক্ত বৈষ্ণবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, মনের আনন্দে হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া ভজনানন্দে কালযাপন করিতেন।

একদিন মহাপ্রভুর সেবক গোবিন্দ হরিদাসকে মহা-প্রসাদ দিতে গিয়াছেন। তখন ঠাকুর হরিদাস শয়ন করিয়া মন্দ-মন্দ সংখ্যা-সংকীর্ত্তন করিতেছিলেন।

"গোবিন্দ কহে উঠ আসি করহ ভোজন।
হরিদাস কহে আজি করিব লঙ্ঘন ॥
সংখ্যা-কীর্ত্তন নাহি পূজে কেমনে খাইব।
মহাপ্রসাদ আনিয়াছ কেমনে উপেক্ষিব ॥
এত বলি মহাপ্রসাদ করিল বন্দন।
এক রঞ্চ লঞা তার করিল ভক্ষণ ॥"

তার পরদিন মহাপ্রভু হরিদাসের কুটীরে আসিয়া তিনি কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করিলেন। হরিদাস বলিলেন—

"শরীর অসুস্থ নহে মোর, অসুস্থ বুদ্ধি মন।"

মহাপ্রভু তখন তাঁহার অসুস্থতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, হরিদাস বলিলেন, সংখ্যা-সঙ্কীর্ত্তন পূর্ণ না হওয়াই তাঁহার ব্যাধি। ইহার উত্তরে—

"প্রভু কহে বৃদ্ধ হৈলা সংখ্যা অল্প কর।
সিদ্ধ-দেহ তুমি সাধনে আগ্রহ কেনে ধর ॥
লোক নিস্তারিতে তোমার এই অবতার।
নামের মহিমা লোকে করিলা প্রচার ॥"

হরিদাস অনেক দৈন্য ও বিনয় সহকারে প্রভুকে অনেক কথাই বলিলেন; আর বলিলেন,—

"এক বাঞ্ছা হয় মোর বহুদিন হৈতে।
লীলা সম্বরিবে তুমি মোর লয় চিত্তে ॥
সেই লীলা প্রভু মোরে কভু না দেখাইবা।
আপনার আগে মোর শরীর পাড়িবা ॥
হৃদয়ে ধরিব তোমার কমল চরণ।
নয়নে দেখিব তোমার চাঁদ বদন ॥
জিহ্বায় উচ্চারিব তোমার কৃষ্ণচৈতন্য নাম।
এই মত মোর ইচ্ছা ছাড়িবু পরাণ ॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু তদুত্তরে বলিলেন, হরিদাস! এই অবতারের যাহা কিছু সুখ-সম্পদ, তাহা ত তোমাকে লইয়াই।

হরিদাস ঠাকুরের সমাধি

সিদ্ধ বকুল

আমাকে ছাড়িয়া যাওয়া তোমার যুক্তিযুক্ত হয় না। অতঃপর মহাপ্রভু হরিদাসকে আলিঙ্গন করিয়া মধ্যাহ্ন করিতে সমুদ্রে গমন করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে লইয়া হরিদাসকে দেখিতে আসিলেন। হরিদাস মহাপ্রভুকে ও বৈষ্ণবগণকে বন্দনা করিলেন। মহাপ্রভু তখন হরিদাসের অঙ্গনে মহাসঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং সর্ব্বসমক্ষে হরিদাসের গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। হরিদাস প্রভুকে সম্মুখে বসাইয়া তাঁহার সেই অপরূপ ভুবনমোহন মূর্ত্তি অনিমেষ নয়নে দর্শন করিতে লাগিলেন। তাহার পর সমবেত ভক্তজনগণের পদরেণু শিরোভূষণ করিয়া বারবার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম উচ্চারণ করিলেন। মহাপ্রভুর মুখমাধুরী অবলোকন করিতে-করিতে নাম-মহাসাধক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম উচ্চারণপূর্ব্বক অসার জড়-দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অমর চিন্ময় ধামে গমন করিলেন। তার পর মহাপ্রভু হরিদাসের দেহ কোলে লইয়া নাচিতে লাগিলেন। নাচিতে-নাচিতে সমুদ্রে গমন করিলেন ও তথায় হরিদাসকে সমুদ্রজলে স্নান করাইলেন। তার পর—

"হরিবোল হরিবোল বলে গৌর রায়।
আপনি শ্রীহস্তে বালু দিল তাঁর গায়॥"

হরিদাসের সমাধি তীর্থে পরিণত হইয়া অদ্যাপি সাগর-তটভূমির শোভা সম্বর্দ্ধন করিতেছে। ভক্ত সাধকের ভজন-কুটীর তাহারই পূর্ব্বদিকে অবস্থিত থাকিয়া নাম-সাধনের কীর্ত্তি বিঘোষিত করিতেছে।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
এ-এম্‌, আই-ই-এস্‌

স্বর্গীয় ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
(বিলাতে বাঙ্গালা সংবাদপত্রের প্রতিনিধি)

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বাগ্‌চি
(প্রসিদ্ধ চিত্র-শিল্পী। ইঁহার অঙ্কিত ত্রিবর্ণ-চিত্র 'অবসান' এই সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইল)

ভীষণ কামান বা অগ্নিবাণ

[৺চুনীলাল মিত্র]

বর্ত্তমান মহাসমরের বহু কাল পূর্ব্বে কোন এক জার্ম্মাণ সামরিক কর্ম্মচারী বলিয়াছিলেন, Artillery will decide the next war ; অর্থাৎ ভবিষ্যতে যে কোন মহাসমর হইবে, তাহার জয়পরাজয় কামানের গোলার দ্বারা স্থির হইবে। এই সামরিক কর্ম্মচারীর বাক্যের সার্থকতা এখন বেশ উপলব্ধ হইতেছে। বলিতে কি, এই যুদ্ধে লোকবল অপেক্ষা অস্ত্রবলই শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে।

রামায়ণ ও মহাভারতে বর্ণিত আগ্নেয়াস্ত্র সকল কবি-কল্পনা বলিয়া বোধ হইত। অনেকেই পাশুপত অস্ত্র, শব্দ-ভেদী বাণ, সুদর্শন-চক্র বিমান প্রভৃতির কথা আদৌ বিশ্বাস করিত না। কিন্তু আজ যুরোপীয় মহাসমরে ব্যবহৃত অস্ত্র সকলের বর্ণনা শুনিয়া, আমাদের পৌরাণিক যুগের যুদ্ধাস্ত্রগুলির কথা আর অবিশ্বাস করিতে সাহস হইতেছে না। জার্ম্মাণীর দূর-পাল্লার কামানের কথা শুনিয়া জগৎ স্তম্ভিত। আবার জেপলিন, সি প্লেন, বাইপ্লেন, liquid fire, air gas প্রভৃতি নারকীয় যুদ্ধ-উপাদানের কথা শুনিয়া সকলে একেবারে চমৎকৃত।

বলকান যুদ্ধের প্রথমেই এই বর্ত্তমান কালের আগ্নেয়াস্ত্রের ঔৎকর্ষ্য প্রতিপন্ন হইয়াছে। Spanish-American ও South-African যুদ্ধে এই অস্ত্রগুলি কতক পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছিল। তাই দুই যুদ্ধেই বর্ত্তমান আগ্নেয়াস্ত্রের উন্নতির পথ অনেকটা সুগম হইয়াছে।

সামরিক বিশেষজ্ঞগণ (Military Stratagists) এই আগ্নেয়াস্ত্রের আবশ্যকতা ও উপযোগিতার বিষয় Russo-

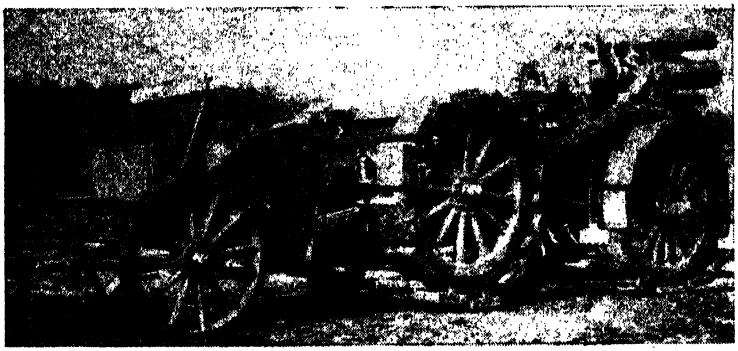

১১ ইঞ্চি ব্যাসের রন্ধ্র যুক্ত ক্রুপ কামান
(অগ্নিবর্ষণের উপযোগী করিয়া বসানো হইতেছে)

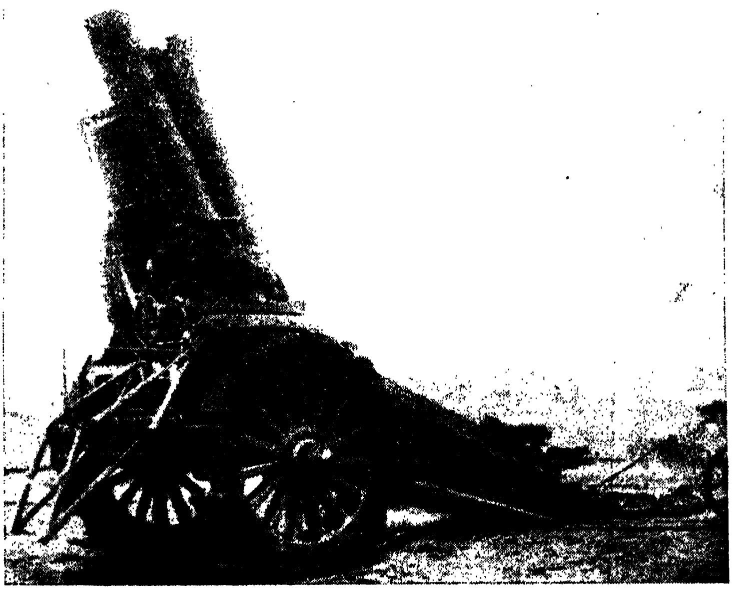

গোলাবর্ষণোন্মুখ বৃহত্তম ফীল্ড হাউইজার

Japanese যুদ্ধে প্রথমে বিশেষরূপে চিন্তা করেন। জার্ম্মাণগণ কত বৎসর ধরিয়া যে এই আগ্নেয়াস্ত্রের উন্নতি-কল্পে চেষ্টা করিতেছিল, তাহা কে বলিতে পারে? তবে যে দিন তাহাদের সহিত রুষগণের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল, সেই দিন তাহারা আপনাদের গবেষণার ফল এই মহাযুদ্ধে প্রয়োগ করিবার ব্যবস্থা করিল।

পোর্ট আর্থারের দুর্গগুলি তোপে উড়াইবার কালে জাপান কামানের ভীষণ ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছে। তখন তাহারা উহার দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছিল যে, রুষগণ যতই কঠিন করিয়া দুর্গ নির্ম্মাণ করুক না কেন, কামানের গোলার মুখে উহা বৃথা। জাপানীরা দুর্গের সুদৃশ্য প্রাচীর-সকল কামানের গোলায় ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছিল। ফলে, দুর্গস্থিত সৈনিকগণ আত্মরক্ষণে অসমর্থ হইয়া আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিল। এই যুদ্ধে যদি জনবল অস্ত্রবল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইত, তাহা হইলে এই দুর্গের পতন সম্ভব হইত না। পোর্ট আর্থারের দুর্গটী নির্ম্মাণ করিতে মানুষের বিদ্যা-বুদ্ধি ও অর্থ সম্পূর্ণরূপে নিয়োগ করা হইয়াছিল; কিন্তু তা হইলে কি হইবে, সহিষ্ণুতার একটা সীমা আছে;

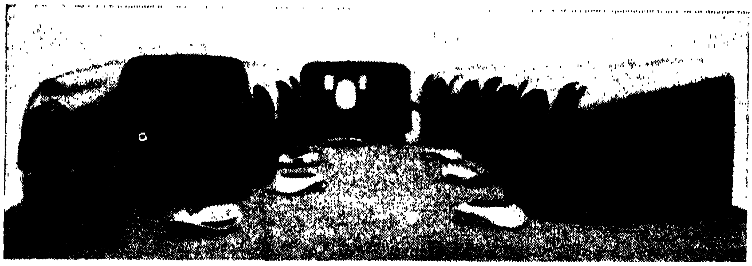

৬ ইঞ্চি মাপের দ্রুত গোলাবর্ষী কামানের ইস্পাত-আচ্ছাদন

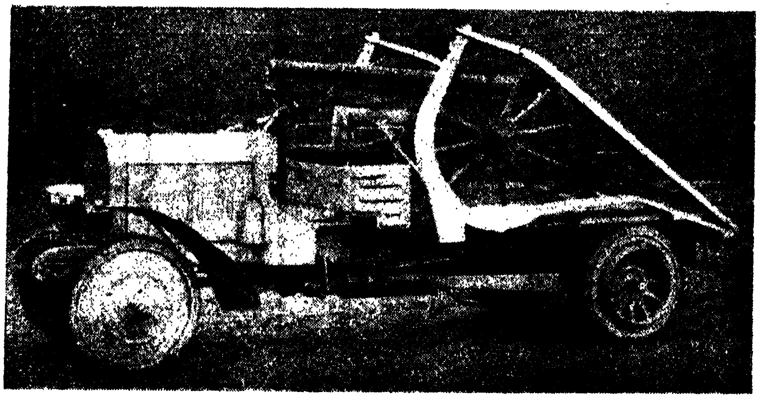

৬॥ সেন্টিমিটার মাপের ফীল্ড বেলুন কামান (গাড়ীতে)

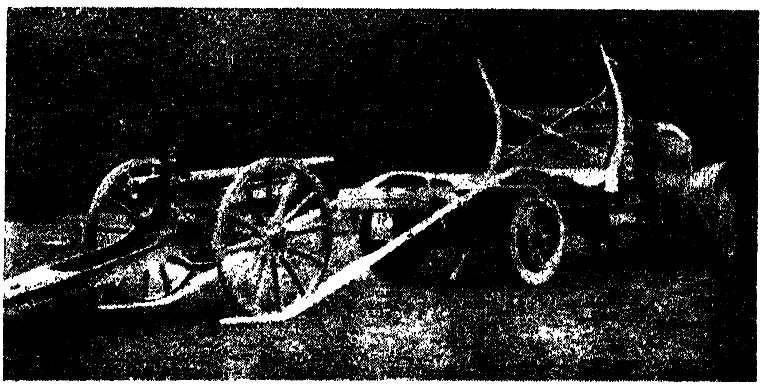

ক্রুপ-নির্ম্মিত ৬॥ সেন্টিমিটার ফীল্ড বেলুন কামান (ভূমিতে)

তাই:রুষ সৈনিকগণ জাপানী কামানের গোলায় বিধ্বস্ত হইয়া আর দুর্গরক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই।

বলকান যুদ্ধেও কামানে শত্রুকে বিধ্বস্ত করিবার ভীষণ ক্ষমতা সপ্রমাণ হইয়াছে। তুর্কি সৈনিক যে পৃথিবীর মধ্যে দুর্জ্জেয় যোদ্ধা, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ভাল যোদ্ধা হইয়া কি করিবে, উপযুক্ত চালক ও অস্ত্রশস্ত্রের অভাবে তাহারা আপনার সামর্থ্য প্রতিপন্ন করিতে পারে নাই; আপনাদের আগ্নেয়াস্ত্রের ক্ষমতা কোন মতেই প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। অধিক কি তাহারা শত্রুর কামানের প্রতাপে এত বিধ্বস্ত হইয়াছিল যে, শেষে তাহারা একত্র হইয়া কোন মতে আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই।

কেহ কেহ বলেন যে, এই বলকান যুদ্ধে কোন পক্ষের

জয়-পরাজয় ঠিক মত নির্দ্ধারিত হয় নাই। তাঁহাদের সে ধারণা ভুল; কারণ, হারই হৌক, আর জিতই হৌক, ইহাতে জার্ম্মাণগণের যুদ্ধ-পিপাসা বাড়াইয়া দিয়াছে,—তাই আজ তাহারা পৃথিবীর সকল জাতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে সাহসী হইয়াছে। যখন সার্ভিয়ান জাতি বুলগেরিয়ানগণের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল, তখন উভয় পক্ষের অস্ত্রশস্ত্র ও জনবল সমানই ছিল; কিন্তু যে পক্ষের অধিক যুদ্ধসম্ভার ও গোলন্দাজ ছিল, তাহারাই জয়লাভ করিয়াছিল।

প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যত না হউক, আগ্নেয়াস্ত্রের ক্ষমতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য যেন এই বলকান যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। স্থলে ক্রুপের কামান তুর্কি দেশে বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল; কিন্তু জলপথে ব্রিটিশ কামান

ক্রুপ ৭॥ সেণ্টিমেটার বিমানধ্বংসী কামান

ক্রুপ ৬॥ সেণ্টিমিটার বিমানধ্বংসী কামান

আপনার অক্ষুণ্ণ প্রতিষ্ঠা ম্লান হইতে দেয় নাই। ফরাসী (School of artillerists and methods) আগ্নেয়াস্ত্র পরিচালকগণ এই তুর্কি পরিচালিত যুদ্ধ-বিদ্যার বিরোধী ছিলেন। ফল কথা, এই দুই শক্তির armament schoolsএর মধ্যে ঘোর বিরোধ আছে। তুর্কিগণ ক্রুপপন্থী এবং বলকানগণ ক্রসোপন্থী। কে না জানে ক্রসোপন্থী আজ ফরাসী সমরাঙ্গনে কত উচ্চ আসন লাভ করিয়াছে? ফরাসী কামানের এই প্রাধান্যের কারণ কি? ইহার গূঢ় কারণ এই যে, ফরাসীগণ পৃথিবীর সকল দেশের সংবাদ লইয়া কামানের উন্নতির সম্বন্ধে অনুশীলন করিতেছে; আর জার্ম্মাণগণ তাহাদের ক্রুপ কামানের অজেয়তার বিষয় ভাবিয়া নিশ্চিন্ত আছে।

বর্ত্তমান যুদ্ধে সেই পুরাতন পদ্ধতির অনুসরণ করা হইতেছে। একদিকে ক্রুপ নির্ম্মিত কামান, আর অপর দিকে বর্ত্তমান বিজ্ঞানানুমোদিত কামান। প্রায় ষাট বৎসর কাল জার্ম্মাণী এই ক্রুপকে ধরিয়া বসিয়া আছে। জার্ম্মাণী যেখানে আপনার প্রভাব বিস্তার করিতে গিয়াছে, সেইখানেই ক্রুপকে আশ্রয় করিয়াছে। অর্থাৎ জার্ম্মাণীর

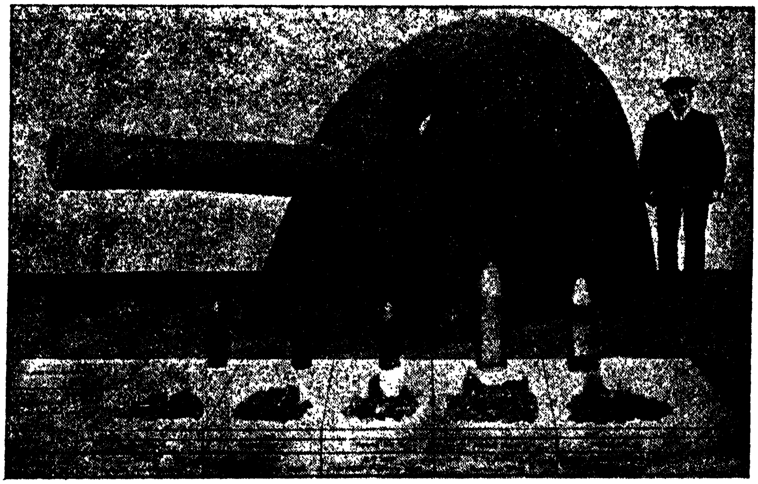

৬ ইঞ্চ কামানের ইস্পাতের আচ্ছাদন

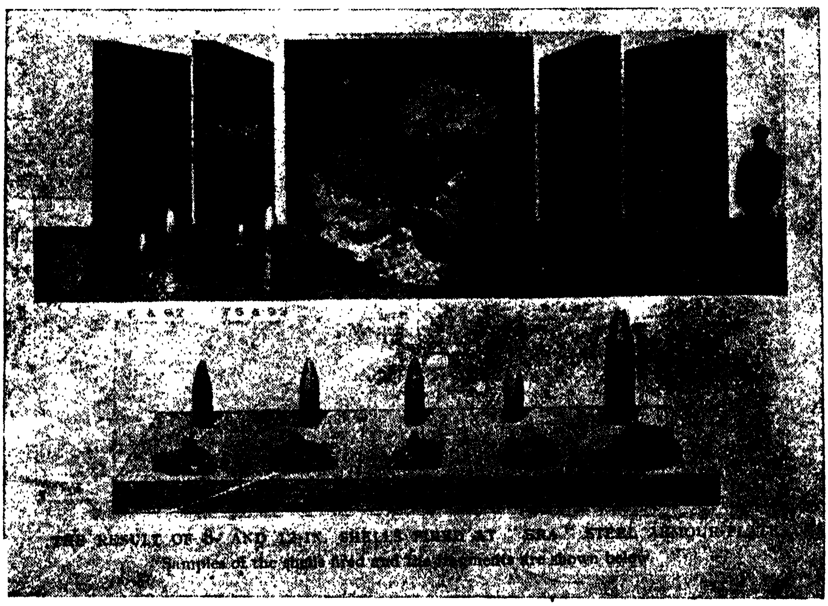

ইস্পাতের বর্ম্ম—তাহার উপর বিভিন্ন শেল গোলাঘাতের ফল

দূতগণ পৃথিবীর সকল দেশেই ক্রুপ কামান বিক্রয় করিবার চেষ্টা করিয়াছে। অধিক কি, তাহারা স্থির করিয়াছে যে, যদি দেশের ও জাতির মঙ্গল কামনা করিতে হয়, তাহা হইলে ক্রুপের সাহায্য গ্রহণ ভিন্ন তাহাদের আর অন্য গতি নাই।

বর্ত্তমান যুদ্ধের কিছু দিন পূর্ব্বে কোন এক সুইশদেশীয় সমরজ্ঞ পণ্ডিত (artillery technician) বলিয়াছিলেন যে বর্ত্তমান যুদ্ধেই জার্ম্মাণীর ও তাহার ক্রুপ কামানের দর্প খর্ব্ব হইবে; অর্থাৎ জার্ম্মাণীর পতনের সহিত উহার কামানের অস্তিত্ব লোপ পাইবে। এই পণ্ডিতের ভবিষ্যৎ বাণী অনেকটা ঠিক হইয়াছে বলিতে হইবে। জার্ম্মাণগণ ক্রুপ কামানের প্রসার বৃদ্ধি করিবার জন্ত কত রকম গল্প যে রচনা করিয়াছে, তাহা বলা যায় না। উহাদের প্রধান উদ্দেশ্য শত্রুর মনে একটা ভয় উৎপাদন করা। জার্ম্মাণ সৈন্যের

সহিত ১০·৫, ২৮ ও ৪২ centimetre কামান আছে। ঐ সকল কামানের বৃটিশ মাপ ধরিতে হইলে ।।০, ১১ ও ১৭ ইঞ্চি ধরা হয়। জার্ম্মাণী যখন লিজ, নামুর ও আন্তোয়ার্প দুর্গ অধিকার করে, তখন ক্রুপ কামানের যে দুর্দ্ধর্ষতার কত গল্প রচনা করিয়াছিল, তাহা অনেকেরই বিদিত আছে। পরে জানা গিয়াছে যে, এই সকল দুর্গ ধ্বংস করিতে ২৮ centimetre কামান ব্যবহৃত হইয়াছিল—তাহার উর্দ্ধ নয়। বড়-বড় কামান প্যারীর দুর্গ দখল করিবার জন্য মজুত রাখা হইয়াছিল; কিন্তু তাহাদের সে আশা আকাশ-কুসুমে পরিণত হইয়াছে।

জার্ম্মাণরা ক্রুপ কামান স্থানান্তরে লইয়া যাইবার বেশ বন্দোবস্ত করিয়াছে। তাহারা এ বিষয়ে অনেক মাথা খেলাইয়াছে। এ কামানের barrel-বোর্ড ও mounting সাজ দুইটী স্বতন্ত্র ভাবে নির্ম্মাণ করা হয়। প্রত্যেকটীর একটী করিয়া স্বতন্ত্র গাড়ী আছে। তাহার দ্বারা উহারা যুদ্ধস্থলে নীত হয় ও তথায় দুইটী অংশ একত্র করা হয়। পাছে যাতায়াতের সময় কিংবা কামান ছুড়িবার সময় ঐ গাড়ী মাটীতে বসিয়া যায়, তাই উহার mountingটী caterpiller system-এর উপর বসান হয়।

এই যন্ত্রটীর মোট ওজন প্রায় ৪০ টন অর্থাৎ ১০৮০ মণ এবং উহা হইতে যে গোলা নির্গত হয়, তাহার প্রত্যেকটীর ওজন অন্যূন ৭৫ পাউণ্ড অর্থাৎ ২০ মণ। এই কামানের Firing angle অর্থাৎ ছুঁড়িবার হিসাব জিরো (শূন্য) হইতে গোলা ছাড়িলে ঐ গোলা সাড়ে চারি মাইল পথ ছুটিয়া থাকে।

বর্ত্তমান কামান যে কি ভয়ানক মারণ-যন্ত্র হইয়া উঠিয়াছে, তাহা আমরা কল্পনা করিতে পারি না। একটী গোলা ছাড়িলে উহা এক মিনিটের মধ্যে উদ্দিষ্ট বস্তুর সংস্পর্শে আসিয়া উহাকে ধূলিসাৎ করে। উহা বর্ত্তমান মহাসমরে অতি আশ্চর্য্যজনক ফল প্রদান করিয়াছে। যদি আমরা কামানের কোন ক্রটী দেখি, তাহা উহার নিজের দোষ নয়—হয় indifferent explosive কিংবা পুরাতন detonator এর দরুণ ঘটিয়া থাকিবে।

কোন-কোন স্থানে ৪২ centimetre কামান ব্যবহৃত হইতেছে। ইহার একটী গোলার ওজন ১৫০০ পাউণ্ড এবং ৪২।।০ ডিগ্রি angle হইতে গোলা ছাড়িলে উহা দশ মাইল পথ অনায়াসে ছুটে। ইহার গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১০০০ ফিটের অধিক হয় না। ক্রুপ কামান ছাড়িবার সময় যে পশ্চাৎ-গতি উৎপন্ন হয়, উহা প্রতিরোধ করিবার নিমিত্ত উহার সহিত brake সংযুক্ত করা হয়। ঐ brake-এর একটী চোঙ্গের ভিতর piston দেওয়া থাকে। তাহাতে তৈল ও গ্লিসিরিণ্ ঐ গতিকে অনায়াসে প্রশমিত করে।

যে কোন কারণেই হউক, ক্রুপ এই প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকে। কিন্তু ফরাসী ও ব্রিটিশ জাতি hydro-pneumatic system অর্থাৎ চলিত সাইকেল পম্পের ন্যায় কাজ করে।

জার্ম্মাণীর এই সকল বড়-বড় যন্ত্র ইস্পাত ঢালাই প্রথা অনুসারে নির্ম্মিত হইয়া থাকে; কিন্তু পৃথিবীর বর্ত্তমান প্রসিদ্ধ artilleristsগণের মতে উহা অতি প্রাচীন পদ্ধতি এবং বর্ত্তমান কালের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। ইংরাজ ও ফরাসী কামানে screw mechanism আছে।

জার্ম্মাণ সংবাদপত্রে মধ্যে-মধ্যে যে সকল সংবাদ বাহির হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, ৪২ centimetre কামান অতি অল্পই ব্যবহৃত হইয়াছে। ঐ কামান এত অল্প ব্যবহার করিবার কারণ এই যে, উহার জীবনীশক্তি অতি অল্প। বড় কামান শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। দশটী গোলা ছাড়িলে উহার জীবনীশক্তি শতকরা ৪০ অংশ ক্ষয় হয়। ২৫টী হইতে ৩০টী গোলা ছাড়িলে উহা এক রকম অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। ইহার কেবল যে নলটী খারাপ হইয়া যায় তাহা নয়, সমস্ত mechanism নষ্ট হইয়া যায়। কামানের প্রতিঘাত (Strain and stresses of the recoil) এত কঠিন যে, ইহাতে সমস্ত যন্ত্রাদি নষ্ট হইয়া যায়। মেরামত করিলেও আর তাহা কার্য্যকরী হয় না। ফলে উহা এত অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে যে, উহাকে পরিত্যাগ করিয়া একটী নূতনের আশ্রয় লইতে হয়।

আইনী নদীর তীরে যে মহাযুদ্ধ হয়, তাহাতে একটী কামান ফাটিয়া যায়। এই দুর্ঘটনার কারণ, অতিরিক্ত বৈদ্যুতিক শক্তি প্রয়োগ (overcharge) বলিয়া নির্দ্ধারণ করা হয়; কিন্তু পরে যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে স্থির হইয়াছে যে, উহার জীবনী-শক্তি শেষ হইবার পর (after its life was completed) বারবার ইহাকে ব্যবহার করাতে উহার এই দুর্গতি ঘটিয়াছিল।

গোলার দ্বারা শত্রুর যে ক্ষতি করা হয়, তাহার অপেক্ষা এক-একটা গোলার মূল্য অনেক বেশী। কারণ, প্রত্যেক গোলার জন্য আঠার হাজার টাকা ব্যয় হইয়া যায়। অর্থাৎ কামানটী যখন শেষ গোলা ছাড়ে, তখন উহাতে ৩২০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ চারি লক্ষ আশী হাজার টাকা ব্যয় হয়।

ফরাসীগণ দুই রকম কামান ব্যবহার করে; যথা "Soixantequinze" ও "Canona lancer"। এই রকম কামানই আধুনিক প্রণালী অনুসারে নির্ম্মিত এবং Crensotও গভর্ণমেণ্ট কারখানায় নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

উপরি-উক্ত কামানের মধ্যে প্রথমটী তিন ইঞ্চি; কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে যে সকল কামান ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাদের কোনটীর এত ধ্বংস করিবার ক্ষমতা নাই। ইহার গোলার ওজন ১৫ পাউণ্ড, কিন্তু ইহা Melinite ও Shrapnelএ পরিপূর্ণ। অপরটীর মাপ ৫ ইঞ্চি এবং তাহার এক একটী গোলার ওজন ৩৬ পাউণ্ড।

বর্ত্তমান ফরাসী (artillery) গোলন্দাজী যুদ্ধ-সম্ভার অতি আধুনিক সৃষ্টি। এই মহাসমরের প্রথম ভাগেই ফরাসীগণ দিনরাত্রি কারখানার কাজ চালাইয়া তাহাদের আগ্নেয়াস্ত্রের অভাব পূরণ করিয়া লইয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে জার্ম্মাণগণ একপ্রকার দূর-পাল্লার কামান ব্যবহার করিয়াছে; তাহা হইতে গোলা ৭৫ মাইল, ৮০ মাইল, এমন কি ১০০ মাইল পর্য্যন্ত ছুটিয়াছে। এখন শোনা যাইতেছে যে, উহা অষ্ট্রীয়ান বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত-গণের গবেষণার ফল। সংবাদপত্রে উহার যে বর্ণনা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা যায়—

The Canon which bombarded Paris is an Austrian gun of a calibre of 20 mm. The cost of firing works at about $ 4000 a time so that as twenty four shells were thrown into Paris at the suberbs, the bombardment cost the Germans about $ 96000 for their eight hours' amusement.

অর্থাৎ যে কামানটী দ্বারা প্যারী নগরী আক্রান্ত হইয়াছিল, তাহা অষ্ট্রীয়ানদের দ্বারা নির্ম্মিত। উহার রন্ধ্রের ব্যাস ২০ মিলিমিটার। উহা হইতে এক-একটী গোলা দাগিবার খরচ প্রত্যেক বার ১০০০০ টাকা; অর্থাৎ আট ঘণ্টায় জার্ম্মাণগণের যে চব্বিশটী গোলা পড়িয়াছিল, তাহার খরচ ২৪০০০০ টাকা লাগিয়াছিল। কামান হইতে যে গোলা নির্গত হয়, তাহা প্রতি সেকেণ্ডে ৪০০০ ফিট ছুটিয়া থাকে।

জার্ম্মাণীর এই নূতন কামান হইতে গোলা ৭৫ মাইলের অধিক গিয়া থাকে। কামানটী অত্যন্ত সুবৃহৎ বলিয়া একশতের অধিক গোলা বর্ষণ করিতে পারে না। গোলা-সকল আকাশমার্গে বক্রপথে ধাবন করিবার সময় বিশ মাইল উর্দ্ধে উঠে। আমাদের পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল বিশ মাইলের অধিক হইবে না। গোলাগুলি এই বিশ মাইল পথ উর্দ্ধে উঠিলে, তথায় একটা নূতন বৈদ্যুতিক শক্তি প্রাপ্ত হয়। এই শক্তির বলে উহা তাহার গন্তব্য পথে অর্থাৎ ৭৫ মাইল পর্য্যন্ত অনায়াসে যাইতে পারে।

বর্ত্তমান যুগে কামানের যে লীলাখেলা দেখিতেছি, তাহাতে মনে হয় যে, একদিন উহা ভারতবর্ষে বসিয়া সুদূর আমেরিকা কিংবা জাপানে গোলা ছুড়িতে পারিবে।

শাঁখারী

[শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য, বি-এ]

(১)

কয়েকটী যুবক মিলিয়া কলিকাতার ৮।৯ হ্যারিসন রোডের মেসের পূর্ব্বদিকের একটী কক্ষে বসিয়া বেলা দুইটার সময় প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যের একখানি বই পড়িতেছিল। একজন পড়িতেছিল, আর সকলে শুনিতেছিল।

'মহাদেব শাঁখারীর বেশে আসিয়া পার্ব্বতীকে শাঁখা পরাইতেছেন'—এই স্থানে যখন তাহারা আসিল, তখন সূর্য্যকুমার বলিল, "আচ্ছা, শাঁখারী সেজে কে তোরা বৌকে শাঁখা পরিয়ে আসতে পারিস্?"

সহসা কেহ উত্তর দিল না।

ক্ষীরোদ বিছানায় শুইয়া চোখ্ বুজিয়া শুনিতেছিল; সে অলসভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "যদি কেউ পারে, তাকে কি দে'য়া হবে?"

সূর্য্যকুমার বলিল, "পঁচিশ টাকা খরচ করে তোদের এক দিন ভোজ দেব।"

ক্ষীরোদ হাই তুলিয়া উঠিয়া বলিল, "বেশ, আমি যাব; কিন্তু ভাড়াটা তোদের দিতে হবে।"

সূর্য্যকুমার বলিল, "আচ্ছা রাজী আছি, যদি তুই শুধু শাঁখা পরিয়েই চলে আসিস্।"

ক্ষীরোদ খানিক চুপ করিয়া ভাবিয়া বলিল, "আচ্ছা, ভাড়া না হয় নাই দিলে, কিন্তু ভোজটা তো নিশ্চিত?"

"জরুর নিশ্চিত।"

"আচ্ছা, এখনো তো তিন দিন ছুটী আছে,—আজ রাত্রের ট্রেণেই তা হ'লে আমি যাব"। বলিয়া ক্ষীরোদ পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিল।

ক্ষীরোদের মনে তখন একটা মতলব জাগিতেছিল। তাহার স্ত্রী তখন গয়ায় তাহার শ্যালক সুধাময়ের নিকটে ছিল। সুধাময় সেখানে শ্বশুরের বহু ধনী মক্কেল পাইয়া ওকালতি আরম্ভ করিয়াছে। দুই বৎসর পূর্ব্বে যখন ক্ষীরোদের বিবাহ হয়, সুধাময়ের আসন্ন-প্রসবা স্ত্রী বীণাপাণি পিত্রালয়ে ছিল; সুতরাং তাহাকে সে দেখে নাই। তার পর ২।৩ বার সে শ্বশুরবাড়ী নৈহাটী গিয়াছিল; কিন্তু বীণাপাণি তাহার সম্মুখে বাহির হয় নাই। না বাহির হইবার অবশ্য সামান্য একটা কারণ ছিল। এই বীণাপাণির সহিতই ক্ষীরোদের পূর্ব্বে বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল; কিন্তু ঠিকুজির কি একটা গরমিল হওয়ায় বিবাহ হয় নাই। তাহার পর সুধাময়ের সহিত বীণাপাণির বিবাহ হয়। তাহার ননদ চারুলতার সহিত যখন ক্ষীরোদের বিবাহ হয়, তখন এ কথা লইয়া তাহার শ্বশুরবাড়ীতে সামান্য একটু আলোচনাও হইয়াছিল।

ক্ষীরোদ তবু তাহার শ্যালককে অনেকবার বলিয়াছে—"কেন বৌ'দি আমার সামনে বা'র হবেন্ না? আইবুড় মেয়ে থাক্‌লে অমন অনেকের সঙ্গেই সম্বন্ধ হয়ে থাকে; তা ব'লে কি সে বেচারাদের একেবারে দ্বীপান্তরে পাঠাতে হবে? আরও—বৌ'দি তোমাদের ঠাকুরের সাম্‌নে বা'র হন্, চাকরের সঙ্গে কথা ক'ন্; আর আমি অবিশ্যি সামান্য রকমের একটু শিক্ষা পেয়েছি, চরিত্রও নেহাৎ খারাপ নয়,—কেন না, তা' হলে তোমরা আমার সঙ্গে এত বড় সম্বন্ধটা স্বীকার কর্‌তেই পার্‌তে না—তবু কি আমি তোমার ঠাকুর-চাকরের চেয়েও অবিশ্বাস্য?"

সুধাময়ও অনেকবার তাহার স্ত্রীকে এ সম্বন্ধে অনেক অনুরোধ করিয়াছিল। কিন্তু বীণাপাণি একটু অধিক লজ্জাশীলা ছিল বলিয়া এবং পূর্ব্বোক্ত ঘটনা ঘটায়, কিছুতেই তাহার নন্দাইয়ের সম্মুখে বাহির হয় নাই। এমন কি, স্ত্রী-স্বভাব সুলভ কৌতূহলবশে সে একবার নন্দাইকে লুকাইয়াও দেখে নাই—পাছে কেহ তাহাকে ক্ষীরোদের সম্মুখে বাহির হইবার জন্য ধরিয়া বসে। ক্ষীরোদ তাহার স্ত্রীর নিকট বলিয়াছিল, যেমন করিয়া হউক বৌ'দিকে তাহার সম্মুখে বাহির করিবেই।

শাঁখা বেচিবার কথা উঠিবামাত্র, ক্ষীরোদের মাথায় একটা ফন্দী আসিল,—'যদি শাঁখা লইয়া গয়ায় যাওয়া যায়, তাহা হইলে ঠিক্ হয়। সেখানে শ্বশুর-খাশুড়ীও নাই যে কোন মুস্কিল বাধিবে।'

(২)

অপরাহ্নে ক্ষীরোদ যখন সূর্য্যকুমারকে বলিল, "তা হ'লে সুযি-দা' শাঁখা-টাঁখা সব আনিয়ে দাও,—আজই রাতের ট্রেণে যাব", তখন মেসের সকলেই সত্য-সত্যই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। উহা যে রহস্য ব্যতীত আর কিছু হইতে পারে, এ কথা তাহাদের মধ্যে কেহ ভাবেও নাই। কিন্তু ক্ষীরোদের কথাবার্ত্তায় যখন তাহারা বুঝিল সত্যই সে ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে যাইবে, তখন সকলে মহোল্লাসে নূতন-বাজার হইতে জোড়া-কুড়ি শাঁখা কিনিয়া আনিল। ইহা গেল বন্ধু-বান্ধবের খরচ। তাহার পর নিজের ব্যয়ে সে দুই জোড়া সুন্দর কারুকার্য্য-খচিত ঢাকাই শাঁখা কিনিয়া লইল।

মেসে আসিয়া এক-এক জোড়া শাঁখা পৃথক করিয়া কাগজে মোড়ক করিয়া লইল। একটা পুরাতন ক্যাম্বিশের ব্যাগ তার পূর্ব্বেই সংগ্রহ করা ছিল,—তাহাতে বেশ করিয়া শাঁখাগুলি গুছাইল। একখানি দেশী কোঁচান সূক্ষ্ম-পাড় ধুতি, একটা আদ্দির পাঞ্জাবী, মিহি উড়ানি

একখানি ও একজোড়া পম্প সু ব্যাগের ভিতর লইল। পরিল একখানি আধ-ময়লা থান, একটা আধ-ময়লা সার্ট ও একখানি বিলাতী উড়ানি; পায়ে একজোড়া সাদা-সিধা ব্রাউন রংয়ের চটি।

রাত্রে কয় বন্ধু মিলিয়া একখানি ঘোড়ার গাড়ী করিয়া ক্ষীরোদকে হাওড়া ষ্টেসনে তুলিয়া দিয়া গেল। যাইবার সময় শশধর বলিল, "দেখো ভাই, শেষটা যেন বাবুটী সেজে 'তাঁর' কাছে গিয়ে আমাদের কেমন বোকা বানিয়েছো, এ সব বলে হাসির ফোয়ারা তুলো না।"

ক্ষীরোদ বলিল, "এ সামান্য কাজটাও যদি না পারি, তা হ'লে ফিরে এসে, তোমাদের কাছে নিজের দুর্ব্বলতা স্বীকার করে, ভোজের টাকাটা আমিই দেব। আমি সত্যি বল্‌বো এ বিশ্বাস তো আছে?"

সকলে সমস্বরে বলিল, "হাঁ—হাঁ, তা আছে।"

গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

(৩)

বেলা আন্দাজ বারটার সময় ট্রেণখানি গয়া ষ্টেসনে থামিতেই, নবীন শাঁখারিটী প্লাটফর্মে নামিয়া পড়িল। তাহার গায়ের কামিজটী তখন ব্যাগের গর্ভে অন্তর্হিত হইয়াছে; আধ-ময়লা উড়ানিখানি এক কাঁধে ফেলা, আর এক কাঁধে ব্যাগ।

নবীন শাঁখারী কিয়ৎক্ষণ চলিয়া, একটা নির্দ্দিষ্ট পথের মোড়ে দাঁড়াইয়া, ব্যাগটী বেশ করিয়া কাঁধে বাগাইয়া লইল; ও "শাঁখা চাই, ভাল শাঁখা" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে সেই পথে চলিতে লাগিল।

সেই রাস্তায় বাঙ্গালীর বসতিই বেশী। সেই দূর বিহার প্রদেশে বাঙালীর মেয়ে হইয়া শাঁখা পরিবার লোভ সম্বরণ করা নিতান্তই দুঃসাধ্য। অনেক বাড়ী হইতে আহ্বান আসিল। দুই-এক বাড়ীতে শাঁখা দিয়া এবং কতকগুলি বাড়ীর আহ্বান উপেক্ষা করিয়া শাঁখারী একটা লাল-রঙের দ্বিতল বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দ্বারের এক পার্শ্বে কৃষ্ণ প্রস্তর-ফলকে ইংরেজীতে সোণার জলে লেখা ছিল 'সুধাময় রায়, এম্-এ, বি-এল্'। একটু-খানি ভাবিয়া লইয়া শাঁখারী ভিতরে প্রবেশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাঁকিল, "চাই ভাল কাজ-করা ঢাকাই শাঁখা।"

শাঁখারী যেখানে দাঁড়াইয়াছিল তাহা বহির্বাটী। একটু পরেই স্থূলাঙ্গী তদ্দেশীয়া দাসী আসিয়া তাহাকে বসিতে বলিয়া গেল। শাঁখারী অন্তঃপুর হইতে বাহির হইবার দুয়ারের পাশেই দাঁড়াইয়া রহিল। অনতিবিলম্বে একটী গৌরাঙ্গী সুন্দরী কিশোরী 'কি রকম শাঁখা দেখি' বলিয়া বসন্ত-হিল্লোলের মত দুয়ারের কাছে আসিতেই, শাঁখারীকে দেখিয়া বিস্ময় ও হর্ষে চমকিয়া উঠিল। শাঁখারী তাড়াতাড়ি নিম্নস্বরে বলিল, "চুপ, চুপ,—বৌ'দিকে যেন কিছু ব'লো না; তোমাদের শাঁখা পরাতে এসেছি।"

চারুলতা স্বামীর নিকট অনেকবার শুনিয়াছে যে, কোন-না-কোন ফিকির করিয়া তিনি বউদিদিকে সাম্‌নে বাহির করিবেনই। সুতরাং সে তৎক্ষণাৎ ব্যাপারটা বুঝিয়া লইল। একবার মৃদু-মধুর হাসিয়া যে তখনই বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল।

তাহার বৌদিদি বীণাপাণি তখন উপরের ঘরে ছিল। চারু তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "বৌ'দি, শাঁখারীকে তা হ'লে ভিতরে ডাকি, তুমি নেমে এস, দেখ্‌বে।"

বীণাপাণি নামিয়া আসিতেই, চারু বহির্ব্বাটীর দিকে চাহিয়া বলিল, "ওগো, শাঁখা নিয়ে এদিকে এস।"

শাঁখারী বিশেষ চেষ্টা করিয়া হাস্য দমনপূর্ব্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। প্রথমেই একবার বাড়ীর চারিদিকটা দেখিয়া লইয়া উঠানে বসিয়া ব্যাগটী খুলিল।

দুটী তরুণীই তখন ঘরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিল। বীণাপাণির মুখে ঈষৎ অবগুণ্ঠন ছিল, যদিও তাহার মধ্য হইতে তাহার সুন্দর মুখখানি দেখিতে পাইবার কোন বাধা ঘটিতেছিল না।

"তা হ'লে, কি রকম শাঁখা নেবেন, দিদিমণি, একবার দেখুন" বলিয়া শাঁখারী বীণাপাণির দিকে চাহিল।

বীণাপাণি নিম্নস্বরে চারুলতাকে বলিল, "তুমি পছন্দ করে নাও ভাই, ঠাকুরঝি।"

"খুব ভাল কাজ-করা শাঁখা বার কর" বলিয়া চারুলতা উঠানে নামিয়া আসিল।

বেশ সুদৃশ্য, কারুকার্য্য-খচিত দুই জোড়া ঢাকাই শাঁখা বাহির করিয়া শাঁখারী বলিল, "আপনারা নিজেরা প'র্‌বেন, না পরিয়ে দিতে হবে? নিজেরা প'র্‌তে গিয়ে যদি ভেঙ্গে ফেলেন, সে কিন্তু আপনাদের যাবে।"

চারুলতা বলিল, "তা তুমিই পরিয়ে দাও।" পরে তাহার বৌদিদির পানে চাহিয়া বলিল, "নিজেরা পর্‌লে ঠিক্ মানান্‌সই হয় না, বড় ঢল্‌ঢলে হয়, না বৌ'দি ?"

বলিয়া চারুলতা অগ্রসর হইয়া সেখানে বসিল ও শাঁখারীর প্রসারিত হস্তের উপর আপনার সুন্দর সুকোমল করযুগল একে-একে স্থাপিত করিল।

শাঁখা পরিবার সময় চারুলতার হাস্যরঞ্জিত মুখখানি ও শাঁখারীর মুখের হাসি লুকাইবার ব্যর্থ চেষ্টা যদি বীণাপাণির দৃষ্টিগোচর হইত, তাহা হইলে অনর্থ ঘটিত,—বীণাপাণি কিছুতেই শাঁখারীর কাছে শাখা পরিতে চাহিত না। কিন্তু চারুর মুখ বীণাপাণির বিপরীত দিকে ছিল ও শাঁখারীর মুখ চারুলতার অন্তরালে লুকান ছিল,—তাই বীণাপাণি এ সব কিছুই লক্ষ্য করিতে পারে নাই।

এস্থলে একটা কথা বলিয়া রাখি ;—আমাদের অন্তঃপুরে এমন অনেক পুরনারী আছেন, যাঁহারা নিকট আত্মীয়ের সম্মুখে বাহির হইতে লজ্জা বোধ করেন ; কিন্তু ফিরিওয়ালাদের নিকট চুড়ি বা শাঁখা পরিতে বিশেষ কুণ্ঠা বোধ করেন না।

সুন্দর মনোরম শাঁখা দুগাছি পরিয়া চারু বীণাকে বলিল, "বৌদি, এইবার এস।"

বীণাপাণি একবার মৃদুস্বরে বলিল, "তুমি পছন্দ করে এনে পরিয়ে দাও না ভাই, আমার লজ্জা করে।"

চারু নিকটে আসিয়া মিনতি করিয়া বলিল, "না বৌ'দি, তুমি ওরই কাছে পরে নাও। মানানসই হ'লে খাসা দেখাবে 'খন।"

বীণাপাণি আর আপত্তি না করিয়া চারুর সঙ্গে নামিয়া আসিল। চারু পাশে দাঁড়াইয়া রহিল,—বীণাপাণি বসিয়া শাঁখা পরিতে লাগিল।

চারুকে শাঁখা পরাইতে শাঁখারী যত দেরী করিয়াছিল, তাহার অপেক্ষা অল্প সময়ে বীণাপাণিকে শাঁখা পরাইয়া দিয়া সে মৃদু হাস্যের সহিত বলিল, "দিব্যি মানিয়েছে !"

বীণাপাণি নিরতিশয় লজ্জিত ও ঈষৎ বিরক্ত হইয়া বারান্দায় উঠিয়া আসিল।

প্রগল্‌ভা চারু জিজ্ঞাসা করিল,—"আর আমাকে ?" আর একবার হাসিবার অবকাশ পাইয়া হাসিয়া লইয়া শাঁখারী বলিল, "আপনাকেও চমৎকার দেখাচ্ছে।"

দাম মিটাইয়া দিয়া উপরে আসিতেই, বীণাপাণি একটু বিরক্তস্বরে বলিল, "ছি ঠাকুর্‌ঝি, ওর সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করা তোমার ভাল হয় নি।"

চারু একটু অপ্রস্তুতের ভাব দেখাইয়া চুপ করিয়া রহিল।

উঠান হইতে শাঁখারী বলিল, "ঠাক্‌রুণ, একটু খাবার জল পাব ? গরমে ঘুরে-ঘুরে বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।"

বীণাপাণি পূর্ব্ব হইতেই শাঁখারীর উপর একটু চটিয়াছিল ; সে চারুকে বলিল, "ঠাকুর্ঝি, ওকে বাইরে গিয়ে বস্‌তে বল ; লছমন্ গিয়ে জল দিয়ে আস্‌ছে।" চারু তাহাই বলিল। শাঁখারী উঠিয়া বাহিরে গিয়া বারান্দায় বেশ একটু আরাম করিয়া বসিল।

শুধু জল মানুষকে দিতে নাই,—তাই লছমন্ খানিকটা চিনি দিয়া শাঁখারীকে জল দিয়া গেল। লছ্‌মনের সহিত বেশ একটু ভাব করিয়া শাঁখারী বলিল, "ঠাক্‌রুণদের বলগে সন্ধ্যার সময় চাট্টি পেসাদ পেয়ে যেতে চাই। আজ সকাল বেলা খাওয়া হয় নাই।"

লছ্‌মন্ আসিয়া 'বহুমা'কে সে কথা বলিল। খানিক পরে চারুলতা বীণাপাণির কাছে আসিয়া বলিল, "সত্যি, বৌদি, শাঁখাগুলি সুন্দর দেখাচ্ছে।"

বীণা বলিল, "তা হো'ক্, মিন্সেটা কিন্তু ভারী বদ্। গেরস্তর বৌ ঝিদের মুখের পানে চেয়ে অমন ক'রে বেহায়ার মত হাসে কোন্ আক্কেলে !"

চারু হাসিয়া বলিল, "শাঁখারীর চেহারাটা ভাল কি না, তাই বোধ হয় ভাবে—হাস্‌লে ওকে বেশী ভাল দেখাবে। চেহারাটা কিন্তু সত্যি বেশ, নয় বৌ-দি ?"

গ্রীবা বাঁকাইয়া, ঈষৎ ক্রুদ্ধ ভাবে চারুর পানে চাহিয়া, বীণাপাণি কহিল, "তোমার আজ হ'য়েছে কি ঠাকুর্ঝি ? —শাঁখারী সুন্দর কি কুৎসিত, আমাদের তা'তে দরকার কি ?"

চারু একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, "সুন্দরকে সুন্দর বল্‌লে কি কোন দোষ হয়, বৌদি ?"

বীণাপাণি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, "হ্যাঁ, আমাদের হয়। স্ত্রীর চোখে স্বামী ছাড়া কাউকে সুন্দর দেখ্‌তে নেই।"

চারু বলিল, "কি জানি ভাই, স্বামী অসুন্দর সে কথা

বলছিনে; কিন্তু তাই বলে একেও কুৎসিত বলতে পারিনে।"

"তুমি তাকে শুনিয়েই ভাই, দুবার 'সুন্দর' 'সুন্দর' বলে এস না। আমার ও-সব ভালো লাগে না।" বলিয়া বীণাপাণি বিরক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করিল।

এ সমস্ত লইয়া রহস্য সে ভালবাসিত না।

(৪)

রাগ করিয়া বীণাপাণি আপনার ঘরে গিয়া অনেকক্ষণ চুপ্‌টী করিয়া বসিয়া ছিল। তাহার পর স্বামীর জন্য জল-খাবার ঠিক্ করিয়া, পান সাজিয়া রাখিয়া, তাহার মনে হইল, ঠাকুঝির উপর অত রাগ করাটা ভাল হয় নাই; হয় ত তাহার মনে আঘাত লাগিয়াছে।

তথন বীণাপাণি চারুকে তুষ্ট করিবার নিমিত্ত তাহার ঘরে গেল; কিন্তু সেই ঘরে চারুকে পাওয়া গেল না। উপরের সব ঘর-কটাই বীণাপাণি খুঁজিল, কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইল না।

যে অভিমানী মেয়ে,—হয় ত নীচে কোথাও বসে কাঁদ্‌ছে ভাবিয়া সে নীচে নামিয়া আসিল। দাইএর নিকট জানিল চারু বাগানের দিকে গিয়াছে। বাগানটী তাহাদের বাসারই সহিত সংলগ্ন।

একটু অনুতপ্ত চিত্তে বীণাপাণি বাগানের দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু দ্বার অতিক্রম করিয়া বাগানের মধ্যে আসিতেই সে দেখিল, চারু ও সেই শাঁখারী মুখো-মুখী হইয়া একটা গাছের তলায় দাঁড়াইয়া; এবং চারুর হাত খানি তাহার হাতে বদ্ধ। বীণাপাণির পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত কি যেন একটা বহিয়া গেল;—বাহ্যজ্ঞান লুপ্তপ্রায় হইল। কতক্ষণ যে সে সেখানে হতজ্ঞান অবস্থায় ছিল, তাহা তাহার মনে নাই। প্রকৃতিস্থ হইয়াই একবার তীক্ষ্ণ কণ্ঠে 'ঠাকুঝি' বলিয়া ডাকিয়াই বীণাপাণি দ্রুতবেগে উপরে আসিয়াই, তাহার ঘরের দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল।

বীণাপাণির বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তাহার সাধের ঠাকুঝি, যাহাকে সে প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়া আসিয়াছে, তাহার এই কাজ! ক্ষোভে, দুঃখে তাহার চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল।

ঘণ্টা খানেক পরে সুধাময় আদালত হইতে ফিরিয়া নিজের কক্ষ-দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া বিস্মিত হইল। অন্য দিন সোপানের উপর-প্রান্তে বীণার কমলপাণি দুটী তাহার কণ্ঠের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিয়া থাকিত; আর আজ এ কি!

একবার ডাকিতেই বীণাপাণি দুয়ার খুলিয়া দিল। তাহার মুখ চোখ দেখিয়া, সে যে কাঁদিতেছিল, তাহা বুঝিতে সুধাময়ের বিলম্ব হইল না।

সুধাময় সস্নেহে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হয়েছে পাণি?"

সুধাময় স্ত্রীকে 'পাণি' বলিয়া ডাকিত। প্রথম-প্রথম এ ডাক শুনিয়া বীণাপাণি বলিয়াছিল, "বা রে, আমায় তো সবাই বীণা বলেই ডাকে! তুমি আবার পাণি বল কেন?"

সুধাময় উত্তর দিয়াছিল, 'পাণি' মানে জল জান ত। তুমি আমার তেষ্টার পাণি কি না, তাই।"

বীণাপাণি খুব হাসিয়া বলিয়াছিল, "ও হরি, এই বুঝি তুমি বাঙ্গলা জান! এখানে পাণি মানে বুঝি জল, এ পাণি মানে তো হাত।"

সুধাময় বিস্ময়ের ভান করিয়া উত্তর দিয়াছিল, "ও, তাই বুঝি! তা'হলে, তুমি আমার ডান হা'ত কি না, তাই।" অগত্যা বীণাকে পাণি নামই মানিয়া লইতে হইয়াছিল।

স্বামীর প্রশ্ন শুনিয়া বীণাপাণি কি যে বলিবে খুঁজিয়া পাইল না। একটু ভাবিয়া বলিল, "আমি একটা কথা বল্‌বো, শুন্‌বে?"

সুধাময় হাসিয়া বলিল, "এই তো পাণির বেশ বুদ্ধি হয়েছে দেখ্‌ছি,—দিব্বি করিয়ে নিয়ে কথা বল্‌তে শিখেছে।"

বীণাপাণি স্বামীর হাত ধরিয়া বলিল, "না, তুমি ঠাট্টা ক'রো না; আমায় কিছু না জিজ্ঞাসা করে আমার কথা রাথ্‌বে বল?"

"আচ্ছা, বল কি কথা।"

সহসা বীণাপাণির মনে পড়িল, স্বামীর এখনও যে হাত-মুখ ধোওয়া পর্য্যন্ত হয় নাই। সে নিরতিশয় লজ্জিত হইয়া বলিল, "সে কথা এখন থাক্,—তুমি আগে জলটল খাও, তার পর বল্‌বো।" বলিয়া একে-একে স্বামীর জুতা, মোজা, জামা ইত্যাদি খুলিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিল। সুধাময় তখন পাৎলুন খুলিয়া কাপড় পরিতে-পরিতে বলিল, "উঁ হুঁ, কথাটা না শুনে আমি কিছুতেই খা'ব না।" পাণিকে

চোখে পানি বেরিয়েছে, এত বড় কথা না শুনে কি আমি স্থির হতে পারি ?"

'পাণি' তখন বড়ই মুস্কিলে পড়িল। একটু ভাবিয়া অগত্যা সে বলিল, "ঠাকুর্ঝিকে তুমি এবার ঠাকুরজামাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দাও।"

সুধাময় একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, "কেন বল দেখি ?"

পাণি। আমি তো বলেছি, তুমি কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌তে পাবে না।

সুধাময়। তা না শুন্‌লে, হঠাৎ কি বলে তাকে পাঠাই বল ? চারু কি যেতে চায় বলেছে ?

পাণি। তা আমি বল্‌বো না।

সুধাময় ঈষৎ গম্ভীর ভাবে বলিল, "এ যে তোমার বহাৎ ছেলেমানুষী, পাণি !"

স্বামীর গাম্ভীর্য্যকে বীণাপাণি সবচেয়ে বেশী ভয় করিত। তখন সে একে-একে শাঁখারী সংক্রান্ত কথাগুলি বলিল; দুজনের হাতে হাত দেওয়া ছিল, এ কথাটা বাদ দিয়া গেল। শাঁখারী যে এখনও বাহিরের ঘরে আতিথ্যের অপেক্ষায় বসিয়া আছে, তাহাও বীণাপাণি বলিল।

অধিকতর গম্ভীর হইয়া সুধাময় বলিল, "এ অসম্ভব, পাণি,—নিশ্চয় তুমি ভুল দেখেছ।"

পাণি কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, "আমি ঠাকুর্ঝিকে এত ভালবাসি, আমি বুঝি তার নামে একটা মিছে কলঙ্ক দিতে পারি ! ঠাকুর্ঝি ভাল হবে বলেই তো আমি এ কথা বল্‌ছি। নইলে, সে চলে গেলে আমার বুঝি মন কেমন কর্‌বে না ?"

"আচ্ছা, এখনি তোমাকে আমি সঠিক খবর দিচ্ছি।" বলিয়া সুধাময় তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া বরাবর নীচে নামিয়া গেল।

একটু পরেই বীণাপাণির বড়ই ভয় হইতে লাগিল; এখনি হয় ত একটা কি কাণ্ড হইয়া পড়িবে। কেন সে মরিতে এ কথা বলিতে গেল !

অস্থির হইয়া সে ঘরের বাহিরে আসিবে, এমন সময় চারুলতা মুখখানি ম্লান করিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "দাদাকে বলে তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ !"

এ কথা শুনিয়া বীণাপাণির চক্ষু হইতে টপ্‌-টপ্‌ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সে বলিল, "তুমি কেন ঠাকুর্ঝি ওর সঙ্গে দেখা কর্‌লে ? আমি যে নিজে দেখ্‌লাম তুমি তার হাতে—"

বীণাকে থামিতে দেখিয়া চারু বলিল, "হাত দিয়েছিলাম এই তো ? তবু তো ভাই, গলা জড়িয়ে ধরি নি !"

বীণা চারুর এই প্রগল্‌ভতায় অবাক্ হইয়া গেল। অত্যন্ত আহত হইয়া সে বলিল, "ছিঃ !—"

চারুলতা তখন হাসিয়া বলিল, "ও শাঁখারী কে,—চিন্‌তে পারনি বৌ'দি ? ও যে তোমার নন্দাই—শ্রীযুক্ত ক্ষী—বাবু।"

বীণা একেবারে আকাশ হইতে পড়িল।

চারুলতা বলিল, "তুমি কিছুতেই ওঁর সুমুখে বা'র হ'তে না কি না—তাই উনি শাঁখারী সেজে এসে তোমার হাত পর্য্যন্তও—"

এমন সময় সুধাময় ব্যাগ সমেত ক্ষীরোদকে টানিয়া আনিয়া সেই ঘরের মধ্যে হাজির করিয়া বলিল, "এই দেখ পাণি, এনেছি শাঁখারীকে ধরে। নাও তো সব শাঁখাগুলো কেড়ে। আমার পরিবারকে কি না শাঁখা পরাতে আসা !"

সাহিত্য-প্রসঙ্গ

[শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়]

নাটকের কথা :—

বঙ্গভাষায় প্রকৃত নাটক নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ অনেক লেখকই করিয়াছেন ও করিতেছেন; কিন্তু নাটক কিসে বলে, নাটক কাহাকে বলে, এ সব কথা বেশ করিয়া বুঝাইয়া বলিবার জন্য বড় বেশী কেহ চেষ্টা করিয়াছেন, এমন স্মরণ হয় না। যে দুই চারিজন লেখক অল্প-স্বল্প সে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের তাহা যে সফল হইয়াছে, এমনও মনে করি না। কেন তাহা মনে করি না, সেই কথাই প্রথমে

বুঝাইয়া বলিবার চেষ্টা করিব। তাহা বুঝাইয়া বলিতে পারিলে মনে হয়, বাঙ্গালা নাটকের উপর বাঙ্গালী সমালোচকগণের অযথা আক্রমণের কতকটা কারণ উপলব্ধির সঙ্গে-সঙ্গে নাটক জিনিষটার বিশেষত্বটুকু যে কি, তাহাও বুঝিয়া লইবার পক্ষে সকলের একটু সুবিধা হইবে। অনেক সময় দেখিয়াছি, ইহা কি, তাহা প্রথমে না বলিয়া, ইহা কি কি নহে, তাহা বলিলে জিনিষটার পরিচয় কতকটা সহজ-বোধ্য হইয়া আসে।

মনে হইতেছে, সমালোচকের আসনে বসিয়া বঙ্কিম বাবুই সর্ব্বপ্রথম বঙ্গীয় নাটকের প্রতি উৎকট উপেক্ষা প্রদর্শন করেন। তিনি "নয়শো রূপেয়া" গ্রন্থের সমালোচনা-প্রসঙ্গে ১২৮০ সালের 'বঙ্গদর্শনে' লিখিয়াছিলেন,—"বাঙ্গালা ভাষায় প্রকৃত নাটক একখানিও নাই। যে যে গুণ থাকাতে হামলেট, ম্যাকবেথ, ওথেলো প্রভৃতি জগতের মধ্যে মনুষ্যের অসামান্য কার্য্যরূপে পরিগণিত হইতেছে, সে গুণ বাঙ্গালা কোন নাটকেই নাই। একটি গুণের কথা বলি। মানসিক পরিবর্ত্তন। একজন বুদ্ধিজীবী ব্যক্তি অপর এক বা বহুব্যক্তি দ্বারা ভাল পথে বা মন্দ পথে কিরূপে যায়, তাহা ভাল নাটকে সুন্দর রূপে চিত্রিত থাকে। ওথেলো—সদাশয় ওথেলো—যে অতি অল্পকাল মধ্যে স্ত্রীঘাতক হইবেন; অনন্ত চিন্তাশীল হামলেট যে স্বীয় জীবনের জীবন ওফিলিয়াকে বিসর্জ্জন করিবেন, সেই প্রণয়িনীর পিতাকে স্বহস্তে বধ করিবেন; কার্য্য-কুশল রাজ সম্মানধারী ম্যাকবেথ যে নিদ্রিত গৃহাগত অন্নদাতা রাজাকে স্বগৃহে হত্যা করিবেন, তাহা পূর্ব্বে জানা যায় না। কি কৌশলে, কি রূপে, মানব-চিত্তের এরূপ পরিবর্ত্তন হয়, নাটকে তাহাই চিত্রিত থাকে। বাঙ্গালা কোন নাটকেই তাহা নাই।"—কিন্তু নাটকের বিচার কি এইখানেই শেষ হইল? বঙ্কিম বাবু যখন উহা লিখিয়াছিলেন, তখন অবশ্য 'প্রফুল্ল' বা 'বিল্বমঙ্গল' বা ঐরূপ মানসিক পরিবর্ত্তনের অপূর্ব্ব চিত্র-সম্বলিত অন্য কোনও বাঙ্গালা নাটক একখানিও রচিত হয় নাই, এ কথা সত্য। কিন্তু নাটকের নাটকত্ব কি কেবল ঐ চিত্ত-পরিবর্ত্তনের চিত্রের উপরই নির্ভর করে? যদি তাহা করিত, তাহা হইলে কালিদাসের অমূল কীর্ত্তি অভিজ্ঞান শকুন্তলা কখনই নাটক নামে অভিহিত হইত না। শুধু অভিজ্ঞান শকুন্তলা কেন, তাহা হইলে সংস্কৃত-সাহিত্যে নাটক বলিয়া বোধ হয় কোনও জিনিষই থাকিত না। এমন কি, যে সেক্সপীয়রের নাটককে আদর্শ ধরিয়া বঙ্কিম বাবু বঙ্গভাষায় নাটক নাই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন, সেই সেক্সপীয়রের 'মার্চেন্ট অফ্-ভিনিস্' ও 'রোমিও-জুলিয়েটে'র মত অমূল্য নাটক দুইখানিও তাহা হইলে নাটকের তালিকা হইতে বাদ পড়িত। ঐ সকল কোনও নাটকেই তেমন মানসিক পরিবর্ত্তনের চিত্র নাই। "একজন বুদ্ধিজীবী ব্যক্তি অপর এক বা বহু-ব্যক্তি দ্বারা ভাল পথে বা মন্দ পথে কিরূপে যায়, তাহা' ঐ সকল কোনও নাটকেই চিত্রিত হয় নাই। আমাদের বিবেচনায় বঙ্কিমবাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা নাটকের প্রকৃত ও প্রধান লক্ষণ নহে;—তাহা আখ্যান-কাব্যের গুণ বিশেষ। উহা না থাকিলেও নাটকের অঙ্গহানি হয় না। নাটকের প্রকৃত ও প্রধান লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কথা কহিলে, বঙ্কিম বাবু বোধ হয় লিখিতে পারিতেন না,—"বাঙ্গালা ভাষায় প্রকৃত নাটক একখানিও নাই।"—কেন না, বঙ্গীয় নাট্য-জগতের তখন সুপ্রভাত,—তখন 'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হইয়া অভিনীত হইতেছে। 'নীলদর্পণে' নানা গুণপনা' না থাকিতে পারে, কিন্তু নাটকাংশে উহা দুর্ব্বল নহে। কেন দুর্ব্বল নহে, সে কথা পরে বলিতেছি।

বঙ্কিম বাবুর পর স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় আবার নাটকের লক্ষণ আর একরূপ দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি ১২৮৭ সালের 'বঙ্গদর্শনে' যখন 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা'র সমালোচনা করেন, তখন তাহার একস্থানে লিখিয়াছিলেন,—"জনরব উঠিল যে, অশ্বত্থামা হত হইয়াছে। দ্রোণাচার্য্যের হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। তিনি সত্যপ্রিয় ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ধর্ম্মপুত্রের ধর্ম্ম-নিষ্ঠা 'ইতি গজস্থে' পরিণত হইল। * * * কি ভয়ানক আত্মহত্যা! যে মহাত্মা কখনও প্রবঞ্চনার কথা কহেন নাই, যিনি সত্য রাজ্যের অধীশ্বর বলিয়া পরিচিত, যিনি সত্য এবং ঐশ্বর্য্যের মধ্যে সত্যকেই অক্ষয়নিধি বলিয়া আদর করিয়া আসিয়াছেন, তিনিই কি না আজ চির সংস্কার দূরে নিক্ষেপ করিয়া ঐশ্বর্য্যের লোভে সত্য সংহার করিলেন! একেই বলে প্রকৃত আত্ম-হত্যা,—আত্মহত্যা দ্রোণের নহে যুধিষ্ঠিরের। একেই বলে বাহ্যশক্তির দ্বারা অনুশাসিত হওয়া—বাহ্যশক্তির দ্বারা নিধন-প্রাপ্তি। নাটককার এই প্রকার আত্মহত্যা নিবারণ

করেন। এমন স্থলে আত্মহত্যা না দেখাইয়া নাটককার আত্ম-গৌরব দেখাইয়া থাকেন; আত্মার পরাজয় না দেখাইয়া বিজয় দেখান।”—‘আত্মার পরাজয় ও বিজয়’ কথা দুইটা ব্যবহার করিয়া চন্দ্রনাথ বাবু যেন কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিয়াছেন; কিন্তু ঐ কথার গোলযোগের মধ্যে এখানে আমরা প্রবেশ করিব না। ‘ঐশ্বর্য্যের লোভে যুধিষ্ঠির সত্য সংহার করিলেন’ বলিয়াও ‘চন্দ্রনাথ বাবু যুধিষ্ঠির-চরিত্রের প্রতি অবিচার করিয়াছেন, কিন্তু সে কথার আলোচনা এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া উহার সম্বন্ধেও কোনও কথা কহিব না। নাটকের নাটকত্ব বলিতে তিনি কি বুঝিতেন ও বুঝাইতে চাহিতেন, সেই-টুকুই এখানে আমাদের বুঝা প্রয়োজন।

যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে মনে হয়, বঙ্কিম বাবুর মতের সহিত চন্দ্রনাথ বাবুর মতের কতকটা সংঘর্ষ হইয়াছে। বঙ্কিম বাবু যে মানসিক পরিবর্ত্তনের চিত্রকে নাটকের সর্ব্বস্ব বলিয়া মনে করিয়াছেন, চন্দ্রনাথ বাবু সে চিত্রকে আদৌ আমল দেন নাই। বিপদে পড়িয়া—প্রলোভনে পড়িয়া, ভাল লোক কেমন করিয়া ভাল থাকে, এ ছবি নাটকে যদি অঙ্কিত হয়, তাহা হইলেই চন্দ্রনাথ বাবুর মতে তাহা ‘ভাল নাটক’। বঙ্কিম বাবু যেমন হ্যামলেট, ম্যাকবেথ ও ওথেলো প্রভৃতি সেক্সপীয়রের-সৃষ্ট-চরিত্রের নির্দ্দেশ করিয়া নিজ উক্তি সমর্থনের চেষ্টা করিয়াছেন, চন্দ্রনাথ বাবুও তেমনই সেক্সপীয়রের এন্টোনিয়ো-চরিত্র আলোচনা করিয়া নিজ-মত দৃঢ় করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি এন্টো-নিয়োর এই উক্তি—

“I have heard,
Your grace hath ta’en great pains to qualify
His rigorous course; but since he stands obdurate,
And that no lawful means can carry me
Out of his envy’s reach, I do oppose
My patience to his fury; and am arm’d
To suffer with a quietness of spirit,
The very tyranny and rage of his.”

উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার ‘অভিজ্ঞান শকুন্তলা’ প্রবন্ধের একস্থানে বলিয়াছেন,—“এই কি সেই ঐশ্বর্য্যশালী, সুখ-শয্যাশায়ী, প্রিয়বন্ধু-বেষ্টিত, সস্মিতমুখ প্রেমপূর্ণ এণ্টোনিও? তাঁহার কথা শুনিয়া ত তাহাই বোধ হয়। কিন্তু বাস্তবিক আজ তিনি কি? বাস্তবিক আজ তিনি পথের ভিখারী। আজ তিনি তাঁহার প্রফুল্লতাময় করুণা-জ্যোতিবিভূষিত, প্রীতিপূর্ণ, হাস্যময় গৃহ হইতে তাড়িত হইয়া বিচারালয়ে দাঁড়াইয়া মৃত্যুর আজ্ঞা প্রতীক্ষা করিতেছেন! তবুও তাঁহার এই রকম কথা! পাঠক! ইহাকেই প্রকৃত নাটক-রহস্য বলে।”—কিন্তু ‘প্রকৃত নাটক-রহস্য’ যদি উহাই হয়, তাহা হইলে জগতের বহু বিখ্যাত নাটকেই ঐ নাটক-রহস্য নাই, স্বীকার করিতে হইবে। এমন কি, ম্যাক্‌বেথ, হ্যামলেটও তাহা হইলে নাটক নামের যোগ্য হয় না। আমাদের বিবেচনায়, উহাকে ‘প্রকৃত নাটক রহস্য’ বলে না। উহা আখ্যান-কাব্য-বিশেষের গুণের কথা হইতে পারে, কিন্তু উহাকে নাটকের নাটকত্ব বলা যায় না।

বঙ্কিম বাবু ও চন্দ্রনাথ বাবু ইঁহারা কেহই সংস্কৃত-অলঙ্কার-শাস্ত্রের বিধি-নিয়ম অনুসরণ করিয়া বা ইংরাজী সমালোচনার যুক্তি-তর্ক প্রয়োগ করিয়া নাটক জিনিষটার বিচার করেন নাই। তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের মন-গড়া কথা।—মন-গড়া কথা বলিয়া যে সেটা উপেক্ষার বিষয়, এমন কথা অবশ্য বলি না। সমালোচনা যদি সমালোচনার বিষয়ীভূত সামগ্রীর মূলতত্ত্ব অনুসন্ধান ও উদ্ঘাটন করিয়া স্বাধীন ভাবে যুক্তির সহিত লিখিত হয়, তবে তাহা তো খুবই ভাল কথা। কিন্তু বঙ্কিম বা চন্দ্রনাথ তাহা করেন নাই। তাঁহারা তাঁহাদের ইচ্ছামত দুই-এক-খানি ইংরাজী নাটককে আদর্শ ধরিয়া আখ্যান-কাব্যের গুণ-বিশেষকে নাটকের প্রধান লক্ষণ বলিয়া প্রচার করিয়া-ছেন। নাটকের প্রাণ-বস্তু কোথায়, তাহা তাঁহারা খুঁজিয়া দেখেন নাই।

ভারতীয় আলঙ্কারিকগণও যে এ বিষয়ে তেমন কৃত-কার্য্য হইয়াছেন, এখনও মনে করি না। রস-তত্ত্বের বিচার-বিশ্লেষণে বা উপমা-অলঙ্কারাদির বিভেদ-নির্ণয়ে সংস্কৃত-অলঙ্কার-শাস্ত্রে যে সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, বাস্তবিকই তাহার তুলনা নাই। কিন্তু সে বিচার-নৈপুণ্যের পরিচয় উহার ‘নাটক-পরিচ্ছেদে’ পাওয়া যায় না। নাটক সম্বন্ধে কতকগুলি বিধি-নিষেধ তাহাতে আছে বটে,

কিন্তু কিসের প্রভাবে নাটকের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়, সে কথা সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের কোথাও স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। এই জন্য, সংস্কৃত পণ্ডিতেরাও নাটক-আলোচনার সময় বড় একটা সুবিচার করিতে পারেন না। নান্দী ও প্রস্তাবনাদি নাটকে না দেখিলেই তাঁহারা নাসিকা কুঞ্চিত করেন। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় 'নীলদর্পণ' নাটকে "প্রজা-দিগের উপর শ্যামচাঁদ রামকান্ত প্রহার, গর্ভবতী ক্ষেত্রমণির উদরে মুষ্ট্যাঘাত, উড়ানি-পাকান দড়ীতে গোলোকচন্দ্রের মৃতদেহ দোদুল্যমান রাখা, গলায় পা দিয়া সরলাতাকে হত্যা করা প্রভৃতি কাণ্ড সকল" দেখিয়া উহাকে নাটকাংশে দুর্ব্বল বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু 'নীলদর্পণ' তো তুচ্ছ কথা,—সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের মাপকাটি দিয়া বিচার করিলে একমাত্র সংস্কৃত নাটক ছাড়া পৃথিবীর আর কোনও নাটকই বোধ হয় টিঁকিতে পারে না।

আমাদের মনে হয়, 'দৃশ্যকাব্য' ও 'Drama' এই দুইটা শব্দ দুই ভাষা হইতে লইয়া উহাদের ব্যাখ্যা করিলে নাটক জিনিষটার বিশেষত্বটুকু যে কি, তাহা বুঝিবার পক্ষে কতকটা সুবিধা হইতে পারে। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে 'দৃশ্যকাব্য' শব্দের যে ব্যাখ্যা আছে, তাহার মর্ম্ম এই,—"শ্রব্য কাব্যের ন্যায় নাটকেরও শ্রবণ হয়, অধিকন্তু রঙ্গ-ভূমিতে নট দ্বারা অভিনয়কালে দর্শনও হইয়া থাকে; এবং ইহাই নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য। এই নিমিত্ত নাটকের নাম দৃশ্য কাব্য।" আর, ইংরাজী 'Drama' পদটি দেখা যায় যে উহা Drao ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। Drao কথাটা গ্রীসীয়। Drao অর্থে ক্রিয়া বুঝায়। এই ক্রিয়াকে মূল ধরিয়া ইংরাজ-সমালোচকেরা নাটককে ক্রিয়ার অনুকরণ-চিত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এখন ঐ দুইটা ব্যাখ্যার প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, উভয় ব্যাখ্যার মধ্যে একই ভাবের কথা আছে,—শুধু বলিবার ভঙ্গীটুকু বিভিন্ন রকমের। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ ইংরাজ সমালোচকের ন্যায় 'ক্রিয়া' কথাটা কোথাও বলেন নাই বটে, কিন্তু 'অভিনয়' কথাটা তাঁহারা ব্যবহার করিয়াছেন। অভিনয় অর্থে, তাঁহারা বলিয়াছেন যে, 'ব্যক্তি বিশেষের অবস্থাদির অনুকরণকে অভিনয় কহা যায়।'—কিন্তু মানুষের' অবস্থাদির অনুকরণ' ব্যাপারটা ক্রিয়ার অনুকরণ ছাড়া কিছুই নহে। অতএব বুঝিতে হইবে, মানব-জীবনের ক্রিয়াশীল অংশটুকু লইয়াই নাটকের কারবার।

মনুষ্য-জীবনের ক্রিয়াশীল অংশ কি তবে নাটক ছাড়া আর কিছুতে অঙ্কিত হয় না?—কেন হইবে না! কবি কাব্যের ভিতর দিয়া দুই রকম উপায়ে উহা দেখাইয়া থাকেন। একটি উপায়—বর্ণনা। বর্ণনার সাহায্যে কবি মানবের কর্ম্ম-লীলা মানব-চক্ষুর সম্মুখে ধরিতে পারেন। কিন্তু ইহা ছাড়া মানবের কর্ম্ম জীবন দেখাইবার আরও এক উপায় আছে। তাহাতে বর্ণনার অস্তিত্ব নাই। তাহাতে কবির কথা শুনিতে হয় না। কবি নিজেকে কাব্য হইতে দূরে রাখিয়া, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার লীলা এ সংসারে যে ভাবে চলে, ঠিক সেই ভাবে কাব্যে তাহা প্রতিফলিত করিয়া থাকেন। কাব্যে শেষোক্ত প্রকারের চিত্রণ-প্রণালী অভিনয়-উদ্দেশ্যেই কল্পিত হইয়াছে। এইজন্য ঐ কাব্যের এক নাম হইয়াছে—দৃশ্য কাব্য। রবীন্দ্রনাথ কেন যে তাঁহার 'রঙ্গমঞ্চ' শীর্ষক প্রবন্ধের একস্থলে লিখিয়াছেন,—"নাটকের ভাবখানা এইরূপ হওয়া উচিত যে—আমার যদি অভিনয় হয় ত হইতে পারে, না হয় ত অভিনয়ের পোড়াকপাল—আমার কোনই ক্ষতি নাই।"—ইহা বুঝিতে পারি না। রবীন্দ্রনাথের উক্তি শিরোধার্য্য করিলে নাটকের প্রধান উদ্দেশ্যটাকেই অস্বীকার করা হয়। উপন্যাসেও ক্রিয়া-চিত্র আছে, কিন্তু আস্ত উপ-ন্যাস লইয়া অভিনয় করা চলে না। নাটকের ক্রিয়া-চিত্র নট-চর্য্যায় উপলব্ধি করিবার জন্যই সৃষ্টি। উপন্যাসের অভিনয় করিতে হইলে তাহা ভাঙ্গিয়া আগে নাটক গড়িতে হয়।

নাটকের জন্ম-ইতিহাসে আমরা 'ক্রিয়ার অনুকরণ' বলিয়া যে কথাটি পাইয়াছি, উহাই হইতেছে আসল কথা। কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল বলেন,—"নাটক—কাব্য ও উপন্যাসের মাঝামাঝি।" আমরা কিন্তু তাহা বলি না। আমাদের মতে, উপন্যাস জিনিষটাই কাব্য ও নাটকের মাঝামাঝি। উপন্যাস-রচয়িতা দৃশ্য-কবি ও গীতি-কবির ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারেন। এবং তাহা করিয়াও থাকেন। কিন্তু নাটককার ঠিক তাহা করিতে পারেন না। মানব-মনোভাবের যে অংশ ক্রিয়া বা কথার দ্বারা প্রকাশিত হয়, সেই অংশে শুধু তাঁহার অধিকার। মানব.

হৃদয়ের যে অংশ ক্রিয়া বা কথা দ্বারা প্রকাশিত হয় না—যাহা মনোমধ্যে রুদ্ধ থাকিয়া উদ্বেলিত হয়, সে অংশের ছবি নাটকে একটু বেশী দিতে গেলেই নাটক-জীবনের পক্ষে তাহা মারাত্মক হইয়া উঠে। অভিনয়ে সে জিনিষ কখনও স্ফূর্ত্তি পায় না। কিন্তু ঐ দুই অধিকারই উপন্যাস-লেখকের আছে। ঔপন্যাসিক গল্পের ভিত্তি বর্ণনা করিতে পারেন—উপন্যাসের দুইটা চরিত্র সম্বন্ধে দুইটা কথা বলিয়া পাঠকের মনে সে চরিত্র সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মাইয়া দিতে পারেন। যেমন 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র একস্থানে আছে,—গোবিন্দলাল ভ্রমরকে বলিতেছে—"আমার বিশ্বাস হইল না যে, রোহিণী চুরি করিতে আসিয়াছিল। তোমার বিশ্বাস হয়?" ভোমরা বলিল—"না।"

গো। কেন তোমার বিশ্বাস হয় না, আমায় বল দেখি? লোকে ত বলিতেছে।

ভ্র। তোমার কেন বিশ্বাস হয় না, আমায় বল দেখি?

গো। তা সময়ান্তরে বলিব। তোমার বিশ্বাস হইতেছে না কেন, আগে বল।

ভ্র। তুমি আগে বল।

গোবিন্দলাল হাসিল। বলিল—"তুমি আগে।"

ভ্র। কেন আগে বলিব?

গো। আমার শুনিতে সাধ হইয়াছে।

ভ্র। সত্য বলিব?

গো। সত্য বল।

ভ্রমর বলি-বলি করিয়া বলিতে বলিতে পারিল না। লজ্জাবনতমুখী হইয়া নীরবে রহিল। গোবিন্দলাল বুঝিলেন। সে বিশ্বাসের অন্য কোনই কারণ ছিল না—কেবল গোবিন্দলাল বলিয়াছেন যে, "সে নির্দ্দোষী, আমার এইরূপ বিশ্বাস।" গোবিন্দলালের বিশ্বাসেই ভ্রমরের বিশ্বাস। গোবিন্দলাল তাহা বুঝিয়াছিলেন।" —এ ভাবে চরিত্র-চিত্রণ নাটকে চলে না। কলিকাতার পেশাদারী থিয়েটারে 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র যে অভিনয় দেখিয়াছি, তাহাতে এ চিত্রটিকে একেবারে নষ্ট করা হইয়াছে। তাহাতে গোবিন্দলাল ভ্রমরকে যেমন বলিল "সত্য বল।"—অমনি ভ্রমর বলিল—"তোমার বিশ্বাসেই আমার বিশ্বাস।" যে কথা ভ্রমর বলি-বলি করিয়া বলিতে পারে নাই, সেই কথা থিয়েটারের ভ্রমর অসঙ্কোচে বলিয়া যায়। কিন্তু সুনিপুণ নাট্যকারের হাতে পড়িলে ভ্রমর-চরিত্রের এরূপ অপমৃত্যু ঘটিত না। তাহা হইলে অন্যরূপ কথা ও কাজের ভিতর দিয়া ভ্রমর-মূর্ত্তি সজীব হইয়া উঠিত। ক্রিয়ার ও কথার ঘাত-প্রতিঘাতে নাটকের যে শুধু গল্প অগ্রসর হয়, তাহা নহে,—সেই সঙ্গে নাট্যোল্লিখিত নর-নারীর চরিত্রগুলিও ফুটিয়া উঠিতে থাকে। 'নীলদর্পণে' উহা কতকটা আছে বলিয়াই 'নীলদর্পণ'কে নাটক বলিতে আমরা ইতস্ততঃ করি না।

অবান্তর ঘটনা ও অবান্তর বাক্য নাটকে যত কম থাকে, ততই ভাল। চরিত্র ফুটাইবার জন্য যে ঘটনা ও যে বাক্যের আবশ্যক, নাট্যকারের তাহাই অবলম্বন। নাটকেও চন্দ্রোদয় ও ভ্রমর-গুঞ্জন দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহা কবি-বর্ণিত নহে। নাটকের পাত্র-পাত্রীর জীবন-লীলার সহিত সে দৃশ্য গ্রথিত দেখিতে পাই। 'রোমিও জুলিয়েটে' যে চন্দ্রোদয়ের চিত্র আছে, তাহা জুলিয়েট-হৃদয়-প্রতিঘাত-কারী চিত্র। শকুন্তলা নাটকে যে, ভ্রমর-গুঞ্জন আছে, তাহাও হৃদয়-প্রতিঘাতকারী। সে ভ্রমর-গুঞ্জনের সহিত কালিদাসের সম্পর্ক নাই। সে দৃশ্যে শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের হৃদয় আমরা দেখিতে পাই। এ সব দৃশ্য হৃদয়কে ধাক্কা দিয়া জীবনের ঘটনা-স্রোতকে অগ্রসর করিয়া দিবার জন্যই সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপ অঙ্কন-প্রণালীর উপরই নাটক-জীবনের সার্থকতা নির্ভর করে।

আলোচনা

[শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ]

ভারতবর্ষে যে সকল শস্য উৎপন্ন হয়, প্রতি বৎসর সরকার হইতে তাহার যে একটী করিয়া হিসাব বাহির হয়, ১৯১৭-১৮ অব্দেরও সেইরূপ একটী হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে। দুই-এক মাস পূর্ব্বে আমরা পৃথিবীব্যাপী খাদ্যাভাবের উল্লেখ করিয়াছিলাম। এই দুই মাস অন্তে সে অভাব বরং অধিকতর তীক্ষ্ণভাবে অনুভূত হইতেছে। য়ুরোপের যে সকল দেশ যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, এবং যাহারা লিপ্ত ছিল না, অর্থাৎ নিরপেক্ষ ছিল,—খাদ্যাভাব সম্বন্ধে সে সকল দেশেরই প্রায় সমান দশা ঘটিয়াছে। এই বিষয়টি যুদ্ধেরই একটী অপরিহার্য্য অঙ্গ বিবেচনা করিয়া, ইহার প্রতিকারার্থ একটী আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হইয়াছে। প্রধানতঃ আমেরিকা, এবং কিয়ৎ পরিমাণে অষ্ট্রেলিয়া পৃথিবীর খাদ্যাভাব দূর করিবার ব্যবস্থা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। এরূপ অবস্থায় ভারতবর্ষে এবার কি পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হইল, তাহার সংবাদ লইলে মন্দ হয় না। তাহা হইলে, আমরা কি পরিমাণে নিজেদের অভাব নিজেরাই মোচন করিতে পারিব, এবং কি পরিমাণেই বা আমাদিগকে পরের সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে হইবে, তাহা কতকটা বুঝা যাইবে। বস্তুতঃ খাদ্য-সংস্থান সম্বন্ধে আমাদেরও চিন্তার কারণ অল্প নহে। তাহার লক্ষণও চারিদিকে দেখা যাইতেছে। কেবল যে খাদ্য দ্রব্যাদির মূল্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা নহে; যুদ্ধ শেষ হইলেও, খাদ্যের অপ্রাচুর্য্য বশতঃ, ভারতেরই এক প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে খাদ্য-শস্য চালান দেওয়া সম্বন্ধে সরকার হইতে ধরাবাঁধা ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিতে হইয়াছে; এবং পাছে দেশের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য অবাধ রপ্তানীর ফলে দেশের বাহিরে চলিয়া যায়, এই আশঙ্কায় রপ্তানীর উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইয়াছে। আমরা সেইজন্য সরকারী শস্য-বিবরণ হইতে কিছু কিছু সংবাদ পাঠকপাঠিকাগণকে শুনাইয়া রাখিতে চাহি। বলা বাহুল্য, প্রসঙ্গক্রমে খাদ্যশস্য ব্যতীত ভারতে উৎপন্ন অন্যান্য শস্যের কথাও অল্পবিস্তর আলোচিত হইবে।

ভারতজাত কতকগুলি শস্যের হিসাব নির্দ্ধারণের সাধারণ প্রণালী এই যে, ঐ সকল শস্য যে পরিমাণ ভূমিতে উপ্ত হয়, তদনুসারে প্রথমে দুইবার, কি পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হইতে পারিবে, তাহার একটা আনুমানিক হিসাব (estimates or forecasts) প্রস্তুত হয়; এবং সর্ব্বশেষে যতদূর সম্ভব, প্রকৃত পরিমাণ নির্দ্ধারণের চেষ্টা করা হয়। এই হিসাব লইয়া লাভ এই হয় যে, দেশে যে পরিমাণ খাদ্য-শস্যের প্রয়োজন, উৎপন্ন শস্য কি পরিমাণে সেই প্রয়োজন সাধন করিতে পারিবে, উহা দেশের প্রয়োজনের অপেক্ষা কম কি বেশী, কম হইলে বাহির হইতে শস্য আমদানী করিতে হইবে কি না, এবং উদ্বৃত্ত হইলে তাহা রপ্তানী করিয়া দেশের কি পরিমাণ ধনবৃদ্ধি করা সম্ভবপর, তাহা অনেকটা বুঝা যায়। দ্রব্যাদির বাজার-দরের হ্রাস-বৃদ্ধিও আমাদের মনে হয় এই হিসাবের উপর বহু পরিমাণে নির্ভর করে। বর্ত্তমান প্রস্তাবে, কেবল ঐ শেষোক্ত চূড়ান্ত হিসাবটিই আমাদের আলোচ্য।

ভারতে উৎপন্ন খাদ্য ও অন্যান্য শস্যের মধ্যে ধান্য, গোধুম, ইক্ষু, (অধুনা) চা, তুলা, পাট, তিসি বা মসিনা, সরিষা, rope, তিল চীনাবাদাম ও নীল প্রধান। ইহাদের মধ্যে ধান্য প্রধানতঃ বঙ্গদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা, মান্দ্রাজ, ব্রহ্মদেশ, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বেরার, আসাম, বোম্বাই, সিন্ধু এবং কুর্গ প্রদেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, ইহাদের মধ্যে বঙ্গদেশ, মান্দ্রাজ এবং ব্রহ্মদেশেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ধান্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সকল প্রদেশে সমবেত ভাবে উক্ত বৎসরে ৭৯৭১২০০০ একার এবং তৎপূর্ব্ব বৎসর ৮০০৮০০০০ একার জমিতে চাষ হইয়াছিল (এক একার প্রায় তিন বিঘার সমান)। ১৯১৬-১৭ অব্দের অপেক্ষা ১৯১৭-১৮ অব্দে যেমন কিছু কম পরিমাণ জমিতে ধান্যের চাষ হইয়াছে, তেমনি ১৯১৭-১৮ অব্দের অল্প পরিমাণ জমিতেই তৎপূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ধান্য উৎপন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ ১৯১৬ ১৭ অব্দে ৩৪৭৯১০০০ টন এবং ১৯,৭ ১৮ অব্দে ৩৫৯৫২০০০ টন ধান্য উৎপন্ন হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত প্রদেশগুলি ব্যতীত আরও কোন-কোন স্থানে কিছু-কিছু ধান্যের চাষ হয় এবং কিছু ধান্য উৎপন্নও হয়; কিন্তু তাহা রীতিমত হিসাবের মধ্যে আসে না। তবে এইরূপ চাষের জমির পরিমাণ মোটামুটি ৭৬৪০০০ একার এবং উৎপন্ন ধান্যের পরিমাণ ৩৪৫০০০ টন। (এক টন প্রায় ২৮ মণ)। এই হিসাব হইতে দেখা গেল, ধান্য মোটের উপর মন্দ জন্মে নাই। কিন্তু উহা অভাব মোচনের পক্ষে যথেষ্ট কি না, সে স্বতন্ত্র কথা।

ধান্যের পরেই গোধুম অন্যতম প্রধান খাদ্যশস্য। গোধুম প্রধানতঃ পঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, পশ্চিমোত্তর সীমান্ত প্রদেশ, আজমীর মাড়োয়ার, দিল্লী, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার, বোম্বাই, সিন্ধু, বঙ্গদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা, মধ্যভারতবর্ষ, রাজপুতানা, হায়দরাবাদ, ও মহীশূর প্রদেশে উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে পঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশ গোধুমের চাষের প্রধান স্থান। এই সমস্ত প্রদেশে ১৯১৭-১৮ অব্দে মোট ৩৫৫১৩০০০ একার জমিতে গোধুমের চাষ হইয়াছিল। ১৯১৬-১৭ অব্দের চাষের

জমির পরিমাণ ইহা অপেক্ষা ২৫৭৩০০০ একার বা শতকরা ৮ হিসাবে কম ছিল ; অর্থাৎ পূর্ব্ব বৎসর ৩২৯৪০০০০ একার জমিতে গোধুমের চাষ হইয়াছিল। ১৯১৭-১৮ অব্দের উৎপন্ন গোধুমের পরিমাণ ছিল ১০১৬২০০০ টন। আর ১৯১৬-১৭ অব্দে উহা অপেক্ষা ৭২০০০ টন বেশী গোধুম উৎপন্ন হইয়াছিল। যুদ্ধ উপলক্ষে খাদ্য-শস্যের অভাব ঘটিবে, এইরূপ অনুমান করিয়াই সম্ভবতঃ একটু চেষ্টা করিয়া গোধুমের চাষের জমি বাড়াইতে হইয়াছিল। কিন্তু জমির পরিমাণ বাড়াইয়াও, বিধাতার ইচ্ছায় শস্যের পরিমাণ বাড়িল না। এরূপ ঘটিবার কারণ, সময়ে সুবৃষ্টির অভাব। সে যাহা হউক, বৃষ্টি হওয়া না হওয়ার উপর যখন মানুষের কোন হাত নাই, তখন জমির পরিমাণ পূর্ব্ব বৎসরের সমান থাকিলে বোধ হয় গোধুম আরও কম জন্মিত। সুতরাং জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করায় ভালই হইয়াছিল বলিতে হইবে। অনুমান হয়, আগামী বর্ষে খাদ্যশস্য উৎপাদনের জমির পরিমাণ—অন্যান্য শস্যের চাষ কমাইতে হইলেও—সম্ভবতঃ আরও বাড়াইতে হইবে। ইহা ছাড়া, হিসাবের মধ্যে ধরা হয় নাই এমন ৪৪০০০০ একার জমিতে ১৫০০০০ টন গোধুম জন্মিয়াছিল।

ভারতবর্ষের মধ্যে যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা, বঙ্গদেশ, আসাম, পঞ্জাব, পশ্চিমোত্তর সীমান্ত প্রদেশ, বোম্বাই (ও সিন্ধুদেশ), মান্দ্রাজ এবং মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে ইক্ষুর চাষ হইয়া থাকে। ১৯১৭-১৮ অব্দে ২৭৯৮০০০ একার জমিতে অর্থাৎ পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা শতকরা ১৬ অংশ অধিক জমিতে ইক্ষুর চাষ করা হয়। আর ১৯১৬-১৭ অব্দে ২৭৩০০০০ টন ও ১৯১৭-১৮ অব্দে ৩২৬৬০০০ টন, (অর্থাৎ শতকরা প্রায় ২০ অংশ বেশী) শস্য উৎপন্ন হয়। ইহার উপর ২৯০০০ টন ইক্ষু অন্যান্য স্থানে ফাউ স্বরূপ উৎপন্ন হইয়াছিল।

চা আজকাল পানীয়ের হিসাবে সর্ব্বসাধারণের পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং ইহারও একটা হিসাব লইতে হয়। প্রধানতঃ আসাম, এবং কিয়ৎ পরিমাণে বঙ্গদেশ, মদ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ, পঞ্জাব, বিহার ও উড়িষ্যা, ব্রহ্মদেশ ও ত্রিবঙ্কুর রাজ্যে চায়ের চাষ হয়। ১৯১৭ অব্দে ঐ সকল প্রদেশে সর্ব্বসমেত ৬৬৪৩০০ একার (অর্থাৎ পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা শতকরা দুই অংশ বেশী) জমিতে চায়ের চাষ হইয়াছিল। এবং উৎপন্ন চায়ের পরিমাণ ৩৭০১৮১০০০ পৌণ্ড। আর, ১৯১৬ অব্দে ৩৬৮৪২৯০০০ পৌণ্ড চা উৎপন্ন হইয়াছিল। চায়ের ব্যবহার এদেশে দিন-দিন এমন বাড়িয়া যাইতেছে যে, অনুমান হয়, অচির-ভবিষ্যতে চায়ের জমি এবং উৎপন্ন চায়ের পরিমাণ আরও না বাড়াইলে চলিবে না। কিন্তু নিতান্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, এমন একটা লাভকর এবং অপরিহার্য্য পণ্যের ব্যবসায়ে বা চাষে দেশীয় লোকের অংশ খুব বেশী নহে!

বস্ত্রাভাবে বাঙ্গলাদেশের যে কি পর্য্যন্ত দুর্দ্দশা হইয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এই বস্ত্রাভাব দূর করিবার জন্য বাঙ্গলাদেশে তুলার চাষ করিয়া তাঁতে বস্ত্র বয়নের জন্য দেশের লোকে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন বলিলেই হয়। কিন্তু কৃষি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা এবং মনে হয়, সরকারী বিশেষজ্ঞগণও বিবেচনা করেন যে, বঙ্গদেশের ভূমি বিস্তৃত ভাবে তুলার চাষের পক্ষে সম্যক উপযোগী নহে। আমরা অবশ্য কাহাকেও নিরুৎসাহ করিতে চাই না; আমাদের এ কথার উল্লেখের তাৎপর্য্য এই যে, অর্থব্যয় করিয়া চাষ করিবার পর যদি তুলা উৎপন্ন না হয়, তাহা হইলে চাষের উদ্দেশ্য ত সিদ্ধ হইবেই না, অধিকন্তু অর্থ-নাশের মনস্তাপ সহ্য করিতে হইবে। সে যাহাই হউক, বর্ত্তমান অবস্থায়, তুলার চাষে আমরা কৃতকার্য্য হই আর না হই, ভারতে তুলার চাষের অবস্থা কিরূপ সে সন্ধান রাখা সকলেরই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি।

১৯১৭-১৮ অব্দে সরকারের সংগৃহীত বিবরণে দেখা যায়, সমগ্র ভারতে ২৫৮১০০০ একার জমিতে তুলার চাষ হইয়াছিল। আর ১৯১৬-১৭ অব্দে তুলার চাষের জমির পরিমাণ ছিল ২১৭৪৫০০০ একার। যে সকল স্থানে তুলার চাষ হয়, সে সকল স্থানেই চাষের জমির পরিমাণ বাড়িয়াছে। অনুমান হয়, তুলা ও তুলাজাত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধিই চাষের পরিমাণ বৃদ্ধির কারণ। আবার, তুলার বীজ বপনের সময়ে ঋতুর অবস্থাও চাষের খুব উপযোগী ছিল। কিন্তু অসময়ে অতিবৃষ্টি নিবন্ধন অনেক স্থানে শস্য হানি হওয়ায় আশানুরূপ ফসল উৎপন্ন হয় নাই। তবে মান্দ্রাজ, সিন্ধু, পশ্চিমোত্তর সীমান্ত প্রদেশ, আসামপ্রদেশ এবং বরোদা ও মহীশূর রাজ্যে তুলা মন্দ জন্মে নাই। ১৯১৭-১৮ অব্দে, প্রত্যেক গাঁট ৪০০ পৌণ্ড ওজনের এমন ৪০৩৫০০০ গাঁট তুলা সমগ্র ভারতে উৎপন্ন হয়। উহার পূর্ব্ব বৎসর উহা অপেক্ষা ৪৫৪০০০ গাঁট বা শতকরা ১০ অংশ বেশী তুলা উৎপন্ন হইয়াছিল। ভারতে উৎপন্ন তুলার কিয়দংশ আমাদের ব্যবহারে আসে, এবং কিয়দংশ রপ্তানী হয়। গত তিন বৎসরে উৎপন্ন তুলা যে ভাবে খরচ হইয়াছে তাহার হিসাব এই—

	হাজার গাঁট		
	১৯১৫-১৬	১৯১৬-১৭	১৯১৭-১৮
রপ্তানী	২৪৮৬	২০৮৩	১৪০৯
দেশীয় কলে ব্যবহৃত	১৮৭৩	১৭৯৫	১৭০১
সাধারণ্যে ব্যবহৃত	৭৫০	৭৫০	৭৫০
মোট—	৫১০৯	৪৬২৮	৩৮০৬
উৎপন্ন	৩৭৩৮	৪৪৮৯	৪০৩৫

ফাজিল (—) বা উদ্বৃত্ত (+)	—১৩৭১	—১৩৯	+১৭৫

এই হিসাবে যেখানে-যেখানে ফাজিল অঙ্ক আছে, সেখানে বুঝিতে হইবে যে, উৎপন্ন তুলার অপেক্ষা অতিরিক্ত ব্যয় পূর্ব্ব-পূর্ব্ব বৎসরের সঞ্চিত মাল হইতে নির্ব্বাহিত হইয়াছে। তুলা যেমন আমাদের দেশে উৎপন্ন হয় এবং এখান হইতে রপ্তানী হয়, তেমনি বোধ হয় (ইজিপ্ট, আমেরিকা প্রভৃতি) ভারতের বহির্ভাগ হইতে দীর্ঘ তন্তু তুলা কিছু-কিছু আমদানীও করিতে হয়। পশ্চিমোত্তর সীমান্তপ্রদেশে, পঞ্জাবে, সিন্ধুদেশে এবং অন্য কোন-কোন স্থলে খালের জল সেচন করিয়া মিশর ও আমেরিকার এবং অষ্ট্রেলিয়ার দীর্ঘতন্তু তুলার চাষের চেষ্টা হইতেছে। এই চেষ্টা ফলবতী হইলে হয় ত ভারতকে আর বিদেশ হইতে দীর্ঘতন্তু তুলা আমদানী করিতে হইবে না।

তুলার পরেই পাটের কথা আসিয়া পড়িতেছে। চা আমরা আজ-কাল কিছু-কিছু ব্যবহার করিতেছি বটে, কিন্তু ভারতে উৎপন্ন চায়ের অধিকাংশ বিদেশে রপ্তানী হইয়া যায়। চায়ের ন্যায় পাট ও পাটজাত দ্রব্যও এদেশের অন্যতম প্রধান রপ্তানী পণ্য। পাট প্রধানতঃ বঙ্গ-দেশ ও কুচবিহার, বিহার ও উড়িষ্যা এবং আসাম প্রদেশে উৎপন্ন হয়। ১৯১৭ অব্দে এই কয় প্রদেশে মোট ২৭৩৬০০০ একার জমিতে ৮৮৬৪৬০০ গাঁট (প্রতি গাঁটে ৪০০ পৌণ্ড) পাট উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯১৮ অব্দে পাটের চাষের জমির পরিমাণ ২৪৯৭২০০ একার এবং উৎপন্ন পাটের পরিমাণ ৬৯৪৫৬০০ গাঁট। বলা বাহুল্য, পাটের চাষ আমাদের দেশের চাষীদের হাতে থাকিলেও, উহার ব্যবসায় ষোলআনা য়ুরোপীয়ানদের হাতে। তবে এখানে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, পাট আমাদের নিজস্ব জিনিস হইলেও, য়ুরোপীয়েরা পাটের ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে উহার এখনকার ন্যায় বিস্তৃত ভাবে চাষও হইত না, বাণিজ্যও হইত না। তৎপূর্ব্বে শাক খাইবার জন্য এবং গৃহস্থের ব্যবহার্য্য দড়ি ইত্যাদির জন্য সামান্য দুই-চারি বিঘা মাত্র পাটের চাষ হইত। য়ুরোপীয়েরাই সর্ব্বপ্রথমে ইহার বাণিজ্যোপযোগিতা বুঝিতে পারেন; এবং প্রধানতঃ তাঁহাদেরই চেষ্টায় পাটের চাষের এবং বাণিজ্যের বর্ত্তমান শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। সুতরাং পাটের বাণিজ্যের লাভ তাঁহারা ভোগ করিবেন না ত আর কে করিবে? চায়ের ব্যবসায়ও সম্পূর্ণরূপে য়ুরোপীয়ানদের চেষ্টার ফল। তাঁহারা আসামের জঙ্গলে উহার আবিষ্কার করিবার পূর্ব্বে, উহার কথা এদেশের কে জানিত? ভারতের বন-জঙ্গলে চা ও পাটের ন্যায় এমন কত জিনিষ অবহেলায় নষ্ট হইতেছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? তার পর হয় ত কোন সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন য়ুরোপীয় সেই সকল দ্রব্যের বাণিজ্যোপযোগিতা আবিষ্কার পূর্ব্বক তাঁহার ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ লাভ করিবেন, আর আমরা হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া আপশোস করিয়া মরিব মাত্র।

তালিকা ক্রমশঃ দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে—এখনই হয় ত পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছে। সুতরাং আর পুঁথি বাড়াইতে সাহস হইতেছে না। এইবার তিসি, Rape ও সরিষা, তিল চীনাবাদাম ও নীলের চাষের জমি এবং উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণের একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা দিয়াই এ যাত্রা ক্ষান্ত হইতেছি—

	১৯১৬-১৭	১৯১৭-১৮
শস্য	জমি—একার	মাল—টন
তিসি	৩৭৩৮০০০	৫০৭০০০
Rape সরিষা	৬৯২৪০০০	১১১৬০০০
তিল	৪৩৪২০০০	৩৮৬০০০
চীনাবাদাম	১৮৯৪০০০	১০৪২০০০
নীল	৬৯০৬০০	৮৭৮০০ হন্দর

যুদ্ধ থামিয়াছে; শান্তির উদ্যোগ হইতেছে। সন্ধির কথাবার্ত্তা স্থির করিবার জন্য যে শান্তি-সংসদ গঠিত হইয়াছে, আমাদের সার শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ ভারত-গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি স্বরূপ সেই শান্তি-সমিতিতে যোগ দিবার জন্য বিলাতে গমন করিয়াছেন। সার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন গিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি আর ফিরিবেন না; যিনি ফিরিবেন তিনি লর্ড সিংহ। সার শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ বিলাতী আমীর-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন, এবং ওমরাহ পদবী লাভ করিয়াছেন।

ভারত-সচিব মিঃ মণ্টেগু এবং ভারতের বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ড ভারতবর্ষকে যে স্বায়ত্ত-শাসন ভার দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তাহারই নমুনা স্বরূপ ভারত-সচিব মহোদয় সার শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়কে তাঁহার আণ্ডার সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। বিলাতের মন্ত্রী-সমাজের সদস্যরূপে ভারতবাসীর নিয়োগ এই প্রথম। ইহাতে ভারতবর্ষের আনন্দের সীমা রহিল না। আর, সার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় বাঙ্গালী বলিয়া, তাঁহার নিয়োগে বঙ্গদেশ গৌরবান্বিত হইল।

এই সংবাদ পুরাতন হইতে না হইতে সংবাদ আসিল, সিংহ মহাশয় পীয়ার বা বিলাতী আমীর-শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছেন। এই নিয়োগ যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনি অচিন্তনীয় এবং তদ্রূপ অভূতপূর্ব্ব। সুতরাং বলা বাহুল্য, ভারতবাসীমাত্রেই এই সংবাদে আনন্দিত হইয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে কতকগুলি পুরাতন কথা আমাদের মনে পড়িতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে হয় রূটার না হয় সহযোগী "ইংলিশম্যান ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, সার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ যুক্তপ্রদেশের শাসনকর্ত্তার

় পাইতে পারেন। তৎপূর্ব্বেই এ দেশে মণ্টেগু-চেমসফোর্ড কর্ম্ম-স্কীম প্রচারিত হইয়াছিল। সে সময়ে আমরা ঐ ভবিষ্যদ্বাণীতে ্যক আস্থা স্থাপন করিতে না পারিলেও, পত্রান্তরে উহার এই বে বিচার করিয়াছিলাম যে, এতদ্দেশে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার ে লোক নিয়োগের সময়ে যে প্রথা অনুসৃত হয়, তদনুসারে চীফ-মিশনার ও ছোটলাটের পদে গোলা (common) শ্রেণী হইতে এবং র্ণর ও গবর্ণর-জেনারেলের পদে (peers) আমীর শ্রেণী হইতে লোক র্ব্বাচিত হ'ন। এ দিকে রিফর্ম্ম-স্কীমে প্রস্তাব হইয়াছে যে, ভারতের ান প্রদেশেই আর ছোটলাট বা চীফ-কমিশনার থাকিবেন না,—ত্যেক প্রদেশেই এক-একজন করিয়া গবর্ণর নিযুক্ত হইবেন। সুতরাং র সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন যদি যুক্তপ্রদেশের শাসনকর্ত্তার পদ প্রাপ্ত হ'ন, হা হইলে, হয় তাঁহাকে লর্ড পদবীতে উন্নীত করিতে হইবে, । হয় গবর্ণরের পদে পীয়ার শ্রেণী হইতে লোক নির্ব্বাচনের াতন প্রথার পরিবর্ত্তন করিয়া গোলা শ্রেণী হইতেও গবর্ণর যুক্ত করিতে হইবে, অথবা রিফর্ম্মস্কীম অনুসারে কার্য্য হইবে না—র্থাৎ প্রত্যেক প্রদেশেই গবর্ণর নিযুক্ত হইবেন না, কোন কোন দেশে ছোটলাটও নিযুক্ত হইবেন। কিম্বা সার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন ংহ মহাশয়ের প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার পদে নিয়োগের সম্ভাবনা াজে কথা মাত্র—উহা কখনও কার্য্যে পরিণত হইবে না। এক্ষণে ংহ মহাশয় লর্ড শ্রেণীতে উন্নীত হওয়ায় আমাদের কোন আশাই ার সুদূর-পরাহত বা দুরাশা বলিয়া মনে হইতেছে না।

———

সার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের লর্ড উপাধি লাভে প্রত্যক্ষ বা রোক্ষভাবে আরও কতকগুলি অভাবনীয় ঘটনার সূত্রপাত হইল। ১) এতদ্দ্বারা, মুখে কিম্বা কাগজে-কলমে না হউক, কার্য্যতঃ ইংরেজ ারতবাসী প্রজাবৃন্দকে নিজেদের সমকক্ষ বলিয়া স্বীকার করিয়া ইলেন,—ইংরেজদের সহিত ভারতবাসীর আর জেতা বিজিত সম্বন্ধ হিল না। (২) গ্রেটবৃটেন ও আয়র্লণ্ড ছাড়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের অপর কান উপনিবেশের (ডোমিনিয়নস্) যে অধিকার নাই, ভারতবাসী ই অধিকার লাভ করিল। কানাডা, দক্ষিণ-আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া বা উজীলণ্ড—ইহাদের কেহই বিলাতী পার্লামেণ্টে সদস্য প্রেরণের ধিকারী নহে (যদিও তাহাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র পার্লামেণ্ট বা ঐরূপ িছু-না-কিছু আছে); কিন্তু সিংহ মহাশয়ের লর্ড উপাধি লাভে ারতবাসী পরোক্ষভাবে সেই অধিকার লাভ করিল। সার মুঞ্চারজী বনগরী, স্বর্গীয় লালমোহন ঘোষ বা স্বর্গীয় দাদাভাই নাওরোজীর ক্ষে যে পার্লামেণ্টের জনসভার (House of Commons) সদস্য-দ-লাভ বহু আয়াস ও বহু ব্যয়সাধ্য ব্যাপার ছিল, সিংহ মহাশয়ের ক্ষে সেই পার্লামেণ্টের একেবারে অভিজাত-শাখা বা House of ordsএর সদস্য-পদ অনায়াস-লভ্য (by right) হইয়া উঠিল। এই কল কথা বিবেচনা করিয়া মনে হয় সিংহ মহাশয়ের লর্ড উপাধি াভ বড় সাধারণ ঘটনা নহে। ভারতবাসীর রাজনীতিক ও সামাজিক জীবনের উপর এই ঘটনা অসীম প্রভাব বিস্তার করিবে। আমরা সিংহ মহাশয়ের এই পদোন্নতিতে অন্তরের সহিত আনন্দ প্রকাশ করিতেছি এবং ইহার মূল যিনি, সেই প্রধান মন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জ্জের নিকট কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন ও তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতেছি।

———

বাঙ্গলা-সংবাদপত্রসমূহের প্রতিনিধি স্বরূপ বসুমতী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় ভারত-গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া বিলাতী গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শন করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে গমন করিয়াছিলেন। কয়েক দিন হইল, তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সেদিন ওভার টুন হলে তাঁহার সংবর্দ্ধনার্থ একটী সভাও হইয়া গিয়াছে। ঘোষ মহাশয়ের গৌরবে বাঙ্গ'লা সংবাদপত্র সকল গৌরবান্বিত হইয়াছে। আমরা সানন্দ চিত্তে ঘোষ মহাশয়ের অভিনন্দন করিতেছি।

———

এইসঙ্গে আমরা বাঙ্গালার আর একটী সুসন্তানকে ভারতবর্ষের পাঠক-পাঠিকাগণের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। ইঁহার নাম শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ-এম্, আই-ই এস্। ইনি নিজের চেষ্টায় সবিশেষ উন্নতি লাভ করিয়া বাঙ্গলার যুবক সম্প্রদায়ের সমক্ষে একটী নূতন আদর্শ ধরিয়াছেন, তাঁহার স্বদেশবাসী যুবকগণকে একটী নূতন পন্থার সন্ধান দিতেছেন। উপেন্দ্র বাবু ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে শিক্ষানবীশরূপে মেসার্স বার্ণ এণ্ড কোম্পানীর কারখানায় নিযুক্ত হ'ন। সেখানে পাঁচ বৎসর প্রভূত পরিশ্রম সহকারে রীতিমত কর্ম্ম শিক্ষা করিয়া এবং কলিকাতা টেকনিক্যাল স্কুল নামক নৈশ বিদ্যালয়ে লেকচার শুনিয়া, তিনি যথেষ্ট যোগ্যতা অর্জ্জন পূর্ব্বক ই, বি, রেলের সিগন্যাল ও ইণ্টারলকিং কারখানায় কর্ম্মে নিযুক্ত হন। সেখানে দুই বৎসর কার্য্য করিবার পর আবার মেসার্স বার্ণ কোম্পানীর কর্ম্মশালায় নিযুক্ত হইয়া আসেন। সেখানে কর্ম্ম করিতে-করিতে সরকারী বৃত্তি পাইয়া তিনি বিলাতে গমন করেন এবং নর্থ-বৃটিশ লোকোমোটিভ কোম্পানীর বিরাট কর্ম্ম-শালায় প্রবেশ-লাভ করেন। ১৯১৫ অব্দের সেপ্টেম্বর হইতে দুই বৎসর ধরিয়া তিনি তথায় ইঞ্জিন, রেলগাড়ী প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিবার বিদ্যা শিক্ষা করেন; সঙ্গে-সঙ্গে তত্রত্য রয়েল টেকনিক্যাল কলেজের মেকানিক্স্, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং ষ্টীম ইত্যাদি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ক্যালিডোনিয়ান রেলওয়ের কার-খানার শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন। তিনি এক্ষণে ভারতের সরকারী রেল পথে উচ্চ পদে নিযুক্ত হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছেন। আগামী মার্চ্চ মাসের মধ্যে তাঁহার কলিকাতায় ফিরিবার কথা আছে। আমরা তাঁহার সাদর অভ্যর্থনা করিতেছি।

———

বিহার ও উড়িষ্যার ছোট লাট বাহাদুরের ব্যবস্থাপক সভায় একটী সুপ্রস্তাব হইয়াছে। প্রস্তাবটী কার্য্যে পরিণত হইলে বিহারবাসীর

এবং তাহা অনুসৃত হইলে অন্যান্য প্রদেশবাসীর সমূহ মঙ্গল সাধিত হইবে বলিয়া বোধ হয়। বিহার ব্যবস্থাপক সভায় উড়িয়ার প্রতিনিধি মাননীয় শ্রীযুক্ত গোপবন্ধু দাস মহাশয় প্রস্তাব করিয়াছেন যে, উক্ত প্রদেশের বিদ্যালয় সমূহে যাহাতে যথাসম্ভব খোলা জায়গায় শিক্ষাদানের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার উপায় অবলম্বন করা হউক, এবং দালান না হইলে স্কুল মঞ্জুর করা হইবে না, এমন ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়া হউক। শুনা যায়, ব্যবস্থাপক সভার কয়েকজন সদস্য এই প্রস্তাবের সারবত্তা স্বীকার করিয়াছেন। তবে ইহা কতদূর কার্য্যে পরিণত হইবে, তাহা এখনও বলা যায় না। হইলে কিন্তু ভালই হয়। কারণ, বদ্ধ বায়ুতে এক কক্ষ মধ্যে অনেক বালক একসঙ্গে বসিয়া লেখা-পড়া শিখিতে বাধ্য হইলে, তাহাদের শ্বাস প্রশ্বাসে কক্ষের বায়ু দূষিত হইয়া ছাত্রদের স্বাস্থ্যহানি ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা, এবং হয় ত ঘটেও তাই। পক্ষান্তরে, খোলা জায়গায় শিক্ষার ব্যবস্থা হইলে এই স্বাস্থ্যহানির প্রতিকার ত হইবেই; অধিকন্তু, ইহাতে আমাদের দেশের স্বাভাবিক এবং প্রাচীন নীতির অনুসরণ করা হইবে। আমাদের দেশে অতি প্রাচীনকাল হইতেই খোলা জায়গায় অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার প্রথা প্রচলিত ছিল। পৌরাণিক যুগে ব্রহ্মচর্য্যনিরত ছাত্রগণ গুরুগৃহে গমন করিয়া শিক্ষালাভ করিতেন। কুটীরবাসী দরিদ্র গুরু খোলা জায়গাতেই ছাত্রগণকে শিক্ষা দিতেন। তদনুকরণে টোল, চতুষ্পাঠী এবং পাঠশালা—সর্ব্বত্রই খোলা জায়গায় অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ব্যবস্থা ছিল। এখনও অনেক পল্লীগ্রামে গুরু মহাশয়ের পাঠশালা সম্পন্ন গৃহস্থের চণ্ডীমণ্ডপ বা ঠাকুর দালান বা আটচালায় বসিয়া থাকে। কিন্তু কেবল ইংরেজী স্কুলে এবং কলেজে এই রীতি অনুসৃত হয় না। সেকালে খোলা জায়গায় বসিয়া শিক্ষালাভ করিয়া অনেক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রস্তুত হইতেন। ইংরেজী স্কুলেই বা তাহা না হইবে কেন? মুক্ত স্থানে অধ্যয়ন অধ্যাপনার ব্যবস্থায় বিশেষ কোন ক্ষতি ত দেখা যায়ই না; পক্ষান্তরে, বড়-বড় দালানে বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা হওয়াতে, এবং প্রাসাদ-তুল্য অট্টালিকায় হোষ্টেল স্থাপন করিয়া তথায় ছাত্রদিগকে বাস করিতে বাধ্য করাতে, তাহাদের চাল বিগড়াইয়া যায়। যৌবন কাল যেমন বিদ্যাভ্যাসের সময়, সেইরূপ চরিত্র-গঠনেরও উপযুক্ত কাল। সংসারে প্রবেশ করিয়া যেরূপভাবে জীবন যাপন করিতেই হইবে, শৈশবে এবং যৌবনে বিদ্যাভ্যাসের সঙ্গে-সঙ্গেই সেইরূপ ভাবে চরিত্র গঠন করা, সেইরূপ ভাবে জীবন যাপন করিতে অভ্যস্ত হওয়া কর্ত্তব্য। প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড বিদ্যালয়-মন্দিরে বিদ্যাভ্যাস করিয়া এবং তৎসংলগ্ন হোষ্টেল নামক প্রাসাদ-তুল্য অট্টালিকায় বাস করিয়া এবং রাজভোগ খাইয়া জীবনের সর্ব্ব প্রধান কয় বৎসর কাটাইবার কালে যে বিলাসিতা অভ্যস্ত হইয়া যায়, পরিণত জীবনে মাসিক ২০, ২৫, ৫০, বা ১০০, টাকা উপার্জ্জন করিয়া সে বিলাসিতা-বৃত্তি চরিতার্থ করা যায় কি? কাযেই আমাদের মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র ভারতবাসী গৃহস্থের সংসার এক-একটা জীবনব্যাপী অসন্তোষ মাত্রে পরিণত হয়। কিন্তু ভবিষ্যৎ জীবনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বাল্যে ও যৌবনে বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সেইরূপ জীবন যাপনে অভ্যস্ত হইলে, এই দোষটুকু সহজেই পরিহার করা যাইতে পারে। আমাদের দেশে শিক্ষাদান ব্যাপার যাঁহাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাঁহাদের সদিচ্ছার কোন অভাব দেখা যায় না; কিন্তু ভবিষৎ জীবনের আর্থিক, পারিবারিক, পারিপার্শ্বিক এবং সামাজিক অবস্থার কথা ভাবিয়া এবং তাহার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া শিক্ষাদান-পদ্ধতি নির্দ্ধারণ করিবার মত দূরদর্শিতা প্রদর্শন করিবার অবসর বোধ করি তাঁহাদের ঘটিয়া উঠে না। সে যাহা হউক, শীঘ্রই যখন বিশ্ববিদ্যালয়-কমিশনের মন্তব্য অনুসারে এদেশের শিক্ষাপদ্ধতির সংশোধনের সম্ভাবনা রহিয়াছে, তখন আশা করি, এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া শিক্ষা-সংক্রান্ত নূতন বিধি-ব্যবস্থা প্রণীত হইবে। এইখানে প্রসঙ্গক্রমে আমরা সার ডাক্তার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় প্রতিষ্ঠিত বোলপুর শান্তি-নিকেতনের বিদ্যামন্দিরের প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের এবং সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আমাদের মনে হয়, আমাদের দেশের বিদ্যালয়সমূহ যে আদর্শে গঠিত হওয়া কর্ত্তব্য, বোলপুর শান্তি-নিকেতনের ব্রহ্ম-বিদ্যালয়টি ঠিক সেই আদর্শে গঠিত। এখানে খোলা ময়দানে, বৃক্ষ-তলে, মুক্ত বায়ুতে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। তবে সমগ্র দেশে এই একই আদর্শে সকল শ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপন করা সম্ভবপর কি না, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু সেটা বিবেচনা করিয়া দেখিলে ক্ষতি কি?

———

সে-দিন ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে বাঙ্গলার সব-এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন-দিগের বার্ষিক অধিবেশনে লর্ড রোণাল্ডশে বাহাদুর সভাপতিরূপে একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সেই বক্তৃতায় তিনি সব-এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জনদিগের কর্ম্মকুশলতার অনেক প্রশংসা করেন, এবং ভবিষ্যতে তাঁহাদের যাহাতে আরও উন্নতি হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে প্রতিশ্রুত হ'ন। বর্ত্তমান যুদ্ধে এই সব-এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জনরা তাঁহাদের যথাসাধ্য সহায়তা করিয়াছেন, এইরূপ কথাও লর্ড বাহাদুরের বক্তৃতায় প্রকাশ পাইয়াছে। লাট সাহেব বলিয়াছেন, যুদ্ধ শেষ হইয়াছে বটে, কিন্তু এই যুদ্ধ বিজয়ী-পক্ষের হাতে অনেক কাযের ভার দিয়া গিয়াছে। বিজিত রাজ্যসমূহ পুনর্গঠন পূর্ব্বক তথায় শান্তি, শৃঙ্খলা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। সে বড় সহজ কায নহে। মেসোপোটেমিয়া দেশে সব-এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জনদের বিস্তৃত কার্য্যক্ষেত্র রহিয়াছে। সেখানে যাঁহারা সিবিল বিভাগে কায করিতে যাইতে ইচ্ছুক, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের জন্য অনেক সুবিধাজনক বন্দোবস্ত করিয়া দিতে প্রস্তুত আছেন। আশা করি, সব-এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জনগণ লাট বাহাদুরের উল্লিখিত এই সকল সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না।

———

এই সকল কথার পর লাট সাহেব এমন কতকগুলি কথা বলেন, যাহার সহিত সর্ব্বসাধারণের স্বার্থ বিজড়িত রহিয়াছে। বাঙ্গালাদেশের সাধারণ [illegible]

ম্যালেরিয়ায় জরজর। এই ম্যালেরিয়া ত দমন করিতেই হইবে, তাহার উপর মশক বাহনে চড়িয়া পীতজ্বর এদেশে প্রবেশ করিতে না পারে, সে পক্ষেও সাবধান হইতে হইবে। ইহা ছাড়া hook-worm বা বক্রকীট ধ্বংসের জন্য লাট বাহাদুর বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। আবার এদিকে যক্ষ্মা, কলেরা, প্লেগ, রক্তামাশয়, কুষ্ঠ এবং কালা আজর আছে। ইহারা সকলেই দেশের স্বাস্থ্যের এক একটী প্রবল শত্রু। ইহাদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইলে, বিরাট উদ্যোগ আয়োজন করিতে হইবে। প্রথমতঃ, দেশের লোকদের মধ্যে স্বাস্থ্য-তত্ত্বের প্রচার করিতে হইবে; দ্বিতীয়তঃ, প্রচুর অর্থব্যয় করিতে হইবে; তৃতীয়তঃ, বহুসংখ্যক অভিজ্ঞ চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিকে তৈয়ার করিয়া লইতে হইবে। ইহাদের মধ্যে প্রথমটি কার্য্যে পরিণত করা যেমন কঠিন, তেমনি সময়-সাপেক্ষ। দ্বিতীয়টিও তথৈবচ। তবে তৃতীয়টির অবস্থা অনেকটা আশাপ্রদ—সে পক্ষে উদ্যোগ, আয়োজন এবং চেষ্টা যথেষ্ট পরিমাণে হইতেছে, এবং তাহা সফল হইবে এরূপ লক্ষণ দেখা যাইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে "ভারতবর্ষের" সাময়িকী স্তম্ভে এদেশে যথেষ্ট সংখ্যক সুচিকিৎসকের অভাবের কথা উল্লিখিত হইয়াছিল এবং এই অভাব দূর করিবার জন্য মফস্বলে স্থানে স্থানে চিকিৎসা-বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছিল। লাট বাহাদুরের এই বক্তৃতা হইতে জানা গেল, তিনিও মফস্বলে মেডিক্যাল স্কুল স্থাপনের আবশ্যকতা অনুভব করিতেছেন এবং বর্দ্ধমানে শীঘ্রই একটী মেডিক্যাল স্কুল স্থাপিত হইবে এরূপ আশ্বাস দিয়াছেন।

গত ২৪শে জানুয়ারী ২নং কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ারে ইউনাইটেড ফ্রী-চর্চ্চ-অব-স্কটলণ্ড মিশনের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত তিনটী বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক-বিতরণ উৎসব হইয়াছিল। বাঙ্গালার গবর্ণর লর্ড রোণাল্ডশে বাহাদুর এই উৎসব-সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে একটী বক্তৃতাও করিতে হইয়াছিল। বক্তৃতার মুখে তিনি বলেন, ৬০ বৎসর পূর্ব্বে ডাক্তার ডাফ কলিকাতায় হিন্দু-বালিকাদিগের জন্য সর্ব্বপ্রথম একটী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তার পর তিনি বলেন, "One of the most crying needs of the time is a wide diffusion of primary education; and I am one of those who believe that when you set about the task of providing elementary education for the people, you would find that you had built upon foundations which to say the least, were inadequate if you were to confine your attentions to one half of the population—to educate the boys and leave the girls in the darkness of ignorance." অর্থাৎ, বর্ত্তমান সময়ে প্রাথমিক শিক্ষার অতি-বিস্তৃতি সাধন করা খুব আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। অনেকের সঙ্গে একথা আমিও বিশ্বাস করি যে, আপনারা যখন জনসাধারণকে প্রাথমিক শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হ'ন, তখন আপনারা নিশ্চয়ই দেখিতে পান যে, আপনারা যদি লোকগণের অর্দ্ধাংশকে শিক্ষা দান করেন, অর্থাৎ কেবল বালকগণকে শিক্ষা দেন এবং বালিকাগণকে অন্ধকারে রাখেন, তাহা হইলে, খুব কম করিয়া বলিলেও, এ কথা বলিতেই হইবে যে, আপনারা অসম্পূর্ণ ভিত্তির উপর শিক্ষার অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতেছেন।

---

৬০ বৎসর পূর্ব্বে যখন আধুনিক প্রণালীতে এদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয়, তখন দেশের অবস্থা এবং লোকের মনের অবস্থা যাহাই থাকুক, এখন দেশের অধিকাংশ লোকেই লাট বাহাদুরের এই উক্তির সমর্থন করিবে। ছেলে এবং মেয়ে উভয়কেই যে শিক্ষা দেওয়া দরকার,' এ বিষয়ে বোধ করি এখন আর বেশী মতভেদ হইবে না; তবে, ছেলেকে যে প্রণালীতে যাহা শিক্ষা দেওয়া হইবে, মেয়েকেও ঠিক সেই প্রণালীতে তাহাই শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক কি না, এই বিষয়েই সকলের মত এক না হইতেও পারে।

যে দিন বালিকা-বিদ্যালয়ের পুরস্কার-বিতরণ সভা হয়, তাহার পূর্ব্ব দিনই লাট বাহাদুরকে ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে সব-এসিষ্ট্যান্ট সার্জ্জন-দিগের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিতে হইয়াছিল। সেই সভায় তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন (আমরা পূর্ব্বেই এই সভার কথার আলোচনা করিয়াছি), তাহার উল্লেখ করিয়া লাট বাহাদুর বলিলেন, ঐ সভায় তিনি বলিয়াছিলেন যে, দেশের লোকের মূর্খতা এত বেশী যে, তাহাদের মধ্যে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের প্রচার করা খুবই কঠিন এবং দীর্ঘকাল-সাপেক্ষ। আবার, পারিবারিক স্বাস্থ্যরক্ষা-কল্পে, স্ত্রীলোক-দিগকেও, পুরুষদের অপেক্ষা বেশী না হউক, অন্ততঃ তাহাদের সমান শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। অতএব বাঙ্গালার স্ত্রীলোকদের মধ্যেও রীতিমত শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করিতে হইবে। স্বয়ং বাঙ্গলার শাসন-কর্ত্তা যখন এই কথা বলিতেছেন, তখন আমরা আশা করিতেছি যে, যদি বাঁচিয়া থাকি, তাহা হইলে আগামী ১০।১৫ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলার অশিক্ষিতা মূর্খ স্ত্রীলোকগণের অন্ততঃ অর্দ্ধাংশের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার পূর্ণ বিস্তার দেখিতে পাইব।

এদিকে কিন্তু সহযোগী ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মাননীয় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তরের প্রসঙ্গে, গবর্ণমেণ্টের প্রতি শ্লেষ করিয়া বলিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট এদেশে শিক্ষা-বিস্তার কল্পে, বড়-বড় হোষ্টেল নির্ম্মাণে অজস্র অর্থব্যয় করিতেছেন (অবশ্য আমরাও খুব বড়-বড় হোষ্টেল নির্ম্মাণের পক্ষপাতী নহি,—খুব বড়-বড় হোষ্টেল তৈয়ার করিয়া ছেলেদের রাজার হালে বাস করিবার ব্যবস্থা করিয়া না দিলে যে তাহাদের বিদ্যাশিক্ষা হয় না, এ বিশ্বাস আমাদেরও নাই।), অথচ, দেশটী ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, প্লেগ, বিসূচিকা, বসন্ত প্রভৃতি রোগের প্রভাবে

উজাড় হইয়া যাইতেছে। যে টাকায় একটা হোটেল নির্ম্মিত হয়, সেই টাকায় ছয়টা হাসপাতাল তৈয়ার হইতে পারে এবং তাহাতে অনেক লোকের প্রাণ রক্ষা পাইতে পারে। সহযোগী কি তাহা হইলে বলিতে চান যে, লাট বাহাদুরের সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত? রোগ হইলে তাহার চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা অপেক্ষা, রোগ যাহাতে আদৌ হইতে না পারে এরূপ ব্যবস্থা করা কি অধিকতর মঙ্গলজনক নহে? অবশ্য, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্বন্ধে দেশের লোকের মধ্যে যতই শিক্ষার বিস্তার হউক না কেন, রোগ যে একেবারে হইবে না এমন কথা আমরা বলি না; রোগ নিবারণের জন্য যতই উৎকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করা হউক না কেন, রোগ হইবেই এবং তাহার চিকিৎসার জন্য হাসপাতালও রাখিতে হইবে; কিন্তু বাঙ্গলা দেশে পূর্ব্বোক্ত রোগগুলি এবং হুক্‌ওয়ার্ম প্রভৃতি আরও কয়েকটি রোগের বিস্তৃতি যেরূপ অধিক, তাহাতে দেশের লোকের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার-সাধন-পূর্ব্বক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান-ঘটিত উপদেশ দিবার ব্যবস্থা না করিলে, হাজার হাজার হাসপাতাল নির্ম্মাণ করিলেও বিশেষ কোন ফল ফলিবে না। লাট সাহেবের উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া (এবং আমাদের বিশ্বাসও তাই) আমরা বলিতে চাহি যে, দেশব্যাপী ব্যাধির বিস্তৃতির সঙ্কোচ সাধন করিতে হইলে, জনসাধারণকে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ দিতে হইবে; এবং সেই উপদেশ যাহাতে ফলপ্রসূ হইতে পারে, তজ্জন্য জনসাধারণের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে প্রাথমিক শিক্ষার যথাসাধ্য বিস্তার ঘটাইতে হইবে। ডেলি নিউজের বিদ্রূপে দেশের নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিবে না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মেয়েদের শিক্ষা দিবার আবশ্যকতা সম্বন্ধে মতভেদ নাই; কেবল পাঠ্য-নির্ব্বাচন এবং শিক্ষাদান-প্রণালী সম্বন্ধেই যা-কিছু মতভেদ দেখা যায়। লাট বাহাদুরও অবশেষে প্রায় এই কথাই বলিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার মত এই—"I have no wish to enter at any length into the vexed question as to the goal which we should set up as the end of the high school course for girls. It must be perfectly obvious, I should imagine, to every impartial observer, that a curriculum which includes such subjects as hygiene, nursing, needle-work, cookery and domestic work, must be of far greater practical value to an Indian girl than a curriculum designed with a single eye upon the Matriculation examination. Yet it must be equally obvious to any moderately observant person that the Matriculation certificate in Bengal has acquired so extraordinary and so fictitious a value in the eyes of the people that it is difficult to persuade them to adopt what is obviously the more rational course." অর্থাৎ বালিকাদিগের উচ্চশিক্ষার [illegible] কি হইবে, এই অপ্রিয় প্রশ্নটির দীর্ঘ আলোচনা করিতে আমি চাহি না। তবে আমার মনে হয়, নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন যে, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, সেবাধর্ম্ম, সূচীকর্ম্ম, রন্ধন-বিদ্যা ও গৃহধর্ম্ম—এই বিষয়গুলি যদি স্ত্রীলোকদিগের পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তাহা হইলে তাহা, কেবল ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নির্ব্বাচিত পাঠ্য-তালিকার অপেক্ষা, স্ত্রীলোকদিগের সমধিক উপযোগী হইবে। তথাপি, ইহাও অনেকের বোধগম্য হইবে যে, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা বাঙ্গালা দেশে এমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, লোকে উহার এমন অসাধারণ এবং কাল্পনিক মূল্য নির্দ্দেশ করিয়াছে যে, তাহাদিগকে অপেক্ষাকৃত অধিক উপযোগী পন্থা অবলম্বন করানো কঠিন।

ইহা হইতে পাঠক-পাঠিকারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, সাধারণতঃ হিন্দু সংবাদপত্র-সম্পাদকগণ স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে যেরূপ মত পোষণ করেন, লাট সাহেবের মত তাহার পক্ষে বিশেষ অনুকূল। যদি লর্ড রোণাল্ডশে বাহাদুরের মতের অনুসরণ করিয়া এদেশে স্ত্রী-শিক্ষার প্রণালী সংশোধিত এবং পাঠ্য বিষয় নির্ব্বাচিত হয়, তাহা হইলে অনেকেই সন্তোষ লাভ করিবেন, এবং আমাদের বিশ্বাস, তাহাতে মেয়েদেরও যথার্থ উপকার হইবে, গৃহস্থের গৃহস্থালীও সুখের আগার হইয়া উঠিবে। এই ভাবে স্ত্রী-শিক্ষার প্রণালীর সংশোধন প্রথমটা যদিও কষ্টকর হইবে, তথাপি, লাট বাহাদুরের উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া আমরাও বলিতে পারি যে, "perseverance deserves to be rewarded by success," এবং "in due time wisdom must prevail." অর্থাৎ ধৈর্য্য ধরিয়া নূতন পন্থার অনুসরণ করিলে উহার ফল ভাল হইবেই,—যথা সময়ে সুবুদ্ধির জয় হইবেই।

স্ত্রী-শিক্ষার কথায় আমরা আরও একটী কথার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কয়েকদিন হইল, বঙ্গদেশে স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার-কল্পে সার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের নেতৃত্বে রামমোহন লাইব্রেরীতে একটী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। এই সভায় মাননীয় বিচারপতি সার শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় শিক্ষার্থিনী-গণকে যে উপদেশ দিয়াছেন, আমরা সকলকেই সেই উপদেশটি সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া কায করিতে অনুরোধ করি। সার আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় বলিয়াছেন, বাঙ্গালা দেশে অবরোধ প্রথা বর্ত্তমান থাকায় এখানে স্ত্রী-শিক্ষার সুচারু ব্যবস্থা করা বোম্বায়ের মত সহজ নহে। বঙ্গদেশে বাঙ্গলা দেশের উপযোগী ভাবেই শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তদুদ্দেশ্যে একটী নারী-শিক্ষা-সমিতি গঠনপূর্ব্বক প্রথমে কলিকাতাতেই কার্য্যারম্ভ করিতে হইবে। সমস্ত সহরটিকে কয়েকটী [illegible]

সকল পরিবারে স্ত্রী-শিক্ষা রীতিমত প্রবর্ত্ত হইতেছে, সেখানে একটা াব এই দাঁড়াইয়াছে যে, শিক্ষিতা মেয়েরা একেবারে ইংরেজী ভাবাপন্না ইয়া পড়িতেছে—মেমসাহেব বনিয়া যাইতেছে। লাট সাহেবও হা লক্ষ্য করিয়াছেন,—তাহার আভাষ আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি যে, য়েরা ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিবার জন্ত খুঁজিয়া পড়িয়াছে। সার াশুতোষ চৌধুরী মহাশয় এই কথার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, বাঙ্গালীর মেয়েদের মেমসাহেব সাজিলে চলিবে না, তাঁহাদিগকে বাঙ্গালীই থাকিতে হইবে; সুতরাং তাঁহাদিগকে বাঙ্গালা ভাষা, বাঙ্গালা সাহিত্য অধ্যয়ন করিতে হইবে এবং সর্ব্বপ্রকারে বাঙ্গালা ভাবেই শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। আশুবাবুর মুখে এ কথা খুবই সাজে; কারণ, তিনি স্বয়ং এবং তাঁহার পরিবারবর্গ বাঙ্গালা ভাষা এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের পরম অনুরাগী।

গৃহদাহ

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

সুরেশ পাশের গাড়ীতে গিয়া উঠিল সত্য, কিন্তু তিনি? এই ত সে চোখ মেলিয়া নিরন্তর বাহিরের দিকে চাহিয়া আছে,—তাঁহার চেহারা, তা' সে যত অস্পষ্টই হোক্, সে কি একবারও তাহার চোখে পড়িত না? আর এলাহাবাদের পরিবর্ত্তে এই কি-একটা নূতন ষ্টেসনেই বা গাড়ী বদল করা হইল কিসের জন্য? জলের ছাটে তাহার মাথার চুল, তাহার গায়ের জামা কাপড় সমস্ত ভিজিয়া উঠিতে লাগিল, তবুও সে খোলা জানালা দিয়া বার-বার মুখ বাহির করিয়া একবার সম্মুখে একবার পশ্চাতে অন্ধকারের মধ্যে কি যে দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, তাহা সেই জানে; কিন্তু এ কথা মন তাহার কিছুতে স্বীকার করিতে চাহিল না যে, এ গাড়ীতে তাহার স্বামী নাই,—সে একেবারে অনন্য-নির্ভর, একান্ত ও একাকী সুরেশের সহিত কোন্ এক দিগ্বিহীন নিরুদ্দেশ-যাত্রার পথে বাহির হইয়াছে! এমন হইতেই পারে না! এই গাড়ীতেই তিনি কোথাও না কোথাও আছেনই আছেন!

সুরেশ যাই হোক, এবং সে যাই করুক, একজন নিরপরাধা রমণীকে তাহার সমাজ হইতে, ধর্ম্ম হইতে, নারীর সমস্ত গৌরব হইতে ভুলাইয়া আনিয়া এই অনিবার্য্য মৃত্যুর মধ্যে ঠেলিয়া দিবে, এতবড় উন্মাদ সে নয়। বিশেষতঃ, ইহাতে তাহার লাভ কি? অচলার যে দেহটার প্রতি তাহার এত লোভ, সেই দেহটাকে একটা গণিকার দেহে পরিণত দেখিতে অচলা যে বাঁচিয়া থাকিবে না, এই সোজা কথাটুকুও যদি সে না বুঝিয়া থাকে ত, ভালবাসার কথা মুখে আনিয়াছিল কোন্ মুখে? না না, ইহা হইতেই পারে না! ইঞ্জিনের দিকে কোথাও তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়াছেন, সে দেখিতে পায় নাই!

সহসা একটা প্রবল জলের ঝাপ্টা তাহার চোখে মুখে আসিয়া পড়িতে সে সঙ্কুচিত হইয়া কোণের দিকে সরিয়া আসিল, এবং এতক্ষণে নিজের প্রতি চাহিয়া দেখিল সর্ব্বাঙ্গে শুষ্ক বস্ত্র কোথাও আর এতটুকু অবশিষ্ট নাই! বৃষ্টির জলে এমন করিয়াই ভিজিয়াছে যে, অঞ্চল হইতে, জামার হাতা হইতে টপ্ টপ্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছে। এই শীতের রাত্রে সে না জানিয়া যাহা সহিয়াছিল, জানিয়া আর পারিল না। এবং কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিবার মানসে কম্পিত হস্তে ব্যাগটা টানিয়া লইয়া যখন চাবি খুলিবার আয়োজন করিতেছে, এমন সময়ে গাড়ীর গতি মন্দ হইয়া আসিল, এবং অনতিবিলম্বেই তাহা ষ্টেসনে আসিয়া থামিল। জল সমানে পড়িতেছে, কোন্ ষ্টেসন জানিবার উপায় নাই; তবুও ব্যাগ খোলাই পড়িয়া রহিল, সে ভিতরের অদম্য উদ্বেগের তাড়নায় একেবারে দ্বার খুলিয়া বাহিরে নামিয়া অন্ধকারে আন্দাজ করিয়া ভিজিতে-ভিজিতে দ্রুতপদে সুরেশের জানালার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

চীৎকার করিয়া ডাকিল, সুরেশ বাবু!

এই কামরায় জন দুই বাঙ্গালী ও একজন ইংরাজ ভদ্রলোক ছিলেন। সুরেশ একটা কোণে জড়সড় ভাবে দেয়ালে ঠেস দিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়াছিল। অচলার বোধ করি ভয় ছিল, হয় ত তাহার গলা দিয়া সহজে শব্দ

ফুটিবে না। তাই তাহার প্রবল উদ্যমের কণ্ঠস্বর ঠিক যেন আহত জন্তুর তীব্র আর্ত্তনাদের মত শুধু সুরেশকেই নয়, উপস্থিত সকলকেই একেবারে চমকিত করিয়া দিল। অভিভূত সুরেশ চোখ মেলিয়া দেখিল দ্বারে দাঁড়াইয়া অচলা। তাহার অনাবৃত মুখের উপর একই কালে অজস্র জলধারা এবং গাড়ীর উজ্জ্বল আলোক পড়িয়া এমনই একটা রূপের ইন্দ্রজাল রচনা করিয়াছে যে, সমস্ত লোকের মুগ্ধ দৃষ্টি বিস্ময়ে একেবারে নির্ব্বাক হইয়া গেছে! সে ছুটিয়া আসিয়া কাছে দাঁড়াইতেই অচলা প্রশ্ন করিল, তাঁকে দেখ্‌চিনে,—কই তিনি? কোন্ গাড়ীতে তাঁকে তুলেচ?

"চল, দেখিয়ে দিচ্চি" বলিয়া সুরেশ বৃষ্টির মধ্যেই নামিয়া পড়িল, এবং যে দিক হইতে অচলা আসিয়াছিল, সেই দিক পানেই তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

বাঙালী দু'জন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া একটু হাসিল, ইংরাজ কিছুই বুঝে নাই, কিন্তু নারী-কণ্ঠের আকুল প্রশ্ন তাহার মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছিল; সে ভূ-লুণ্ঠিত কম্বলটা পায়ের উপর টানিয়া লইয়া শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল এবং স্তব্ধ মুখে বাহিরের অন্ধকারের প্রতি চাহিয়া রহিল।

অচলার কামরার সম্মুখে আসিয়া সুরেশ থমকিয়া দাঁড়াইল, ভিতরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সভয়ে প্রশ্ন করিল, তোমার ব্যাগ খোলা কেন? এবং প্রত্যুত্তরের জন্য এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা না করিয়া দরজাটা সজোরে ঠেলিয়া দিয়া অচলাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া ভিতরে তুলিয়া লইয়াই দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

সুরেশ অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, এটা খুল্‌লে কে?

অচলা কহিল, আমি। কিন্তু ও থাক্,—তিনি কোথায় আমাকে দেখিয়ে দাও,—না হয়, শুধু বলে দাও কোন্ দিকে, আমি নিজে খুঁজে নিচ্চি—বলিতে বলিতে সে দ্বারের দিকে পা বাড়াইতেই সুরেশ তাহার হাত ধরিয়া ফেলিয়া কহিল, অত ব্যস্ত কেন? গাড়ী ছেড়ে দিয়েচে দেখ্‌তে পাচ্চো?

অচলা বাহিরের অন্ধকারে চাহিয়াই বুঝিল কথাটা সত্য। গাড়ী চলিতে সুরু করিয়াছে। তাহার দুই চক্ষে ভয় যেন মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দিল। সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সেই দৃষ্টি দিয়া শুধু পলকের জন্য সুরেশের একান্ত পাণ্ডুর শ্রীহীন মুখের প্রতি চাহিল, এবং পরক্ষণেই ছিন্নমূল তরুর ন্যায় সশব্দে মেঝেয় লুটাইয়া পড়িয়া দুই বাহু দিয়া সুরেশের পা জড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিল, কোথায় তিনি? তাঁকে কি তুমি ঘুমন্ত গাড়ী থেকে ফেলে দিয়েচ? রোগা মানুষকে খুন করে তোমার—

এত বড় ভীষণ অভিযোগের শেষটা কিন্তু তখনও শেষ হইতে পাইল না। অকস্মাৎ তাহার বুক-ফাটা কান্নায় যেন শতধারে ফাটিয়া পড়িয়া সুরেশকে একেবারে পাষাণ করিয়া দিয়া চতুর্দ্দিকের ইহারই মত ভয়াবহ এক উন্মত্ত যামিনীর অভ্যন্তরে গিয়া বিলীন হইয়া গেল। এবং সেইখানে, সেই গদি-আঁটা বেঞ্চের গায়ে হেলান দিয়া সুরেশ অসহ্য বিস্ময়ে শুধু স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল। তাহার পদতলে কি যে ঘটিতেছিল, কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা যেন উপলব্ধি করিতেই পারিল না। অনেকক্ষণ পরে সে পা দু'টা টানিয়া লইবার চেষ্টা করিয়া ধীরে ধীরে কহিল, এ কাজ আমি পারি বলে তোমার বিশ্বাস হয়?

অচলা তেম্‌নি কাঁদিতে-কাঁদিতে জবাব দিল, তুমি সব পারো। আমাদের ঘরে আগুন দিয়ে তুমি তাঁকে পুড়িয়ে মার্‌তে চেয়েছিলে। তুমি কোথায় কি করেচ, তোমার পায়ে পড়ি আমাকে বল। বলিয়া সে আর একবার তাহার পা দুটা চাপিয়া ধরিয়া তাহারই পরে সজোরে মাথা কুটিতে লাগিল। কিন্তু পা দুটি যাহার সে কিন্তু একেবারে অবশ অচেতনের ন্যায় কেবল নিঃশব্দে চোখ মেলিয়া চাহিয়া রহিল।

বাহিরে মত্ত রাত্রি তেম্‌নি দাপাদাপি করিতে লাগিল, আকাশের বিদ্যুৎ তেম্‌নি বারম্বার অন্ধকার চিরিয়া খণ্ড-খণ্ড করিয়া ফেলিতে লাগিল, উচ্ছৃঙ্খল ঝড়-জল তেম্‌নি ভাবেই সমস্ত প্রকৃতি লণ্ড-ভণ্ড করিয়া দিতে লাগিল, কিন্তু এই দুটি অভিশপ্ত নর-নারীর অন্ধ হৃদয়তলে যে প্রলয় গর্জ্জিয়া ফিরিতে লাগিল, তাহার কাছে এ সমস্ত একেবারে তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর হইয়া বাহিরেই পড়িয়া রহিল।

সহসা অচলা তাহার ভূ-শয্যা ছাড়িয়া তীরবেগে উঠিয়া দাঁড়াইতেই সুরেশের যেন স্বপ্ন ছুটিয়া গেল। সে চাহিয়া দেখিল পরের ষ্টেসন সন্নিকটবর্ত্তী হওয়ায় গাড়ীর বেগ হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। অচলা কেন যে এমন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। প্রবল চেষ্টায় আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইয়া সুরেশ ডান হাত বাড়াইয়া তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, বোস। মহিম এ গাড়ীতে নেই।

নেই! তবে কোথায় তিনি? বলিতে-বলিতে অচলা সম্মুখের বেঞ্চের উপর ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল।

সুরেশ লক্ষ্য করিয়া দেখিল তাহার মুখের উপর হইতে রক্তের শেষ চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গেছে। বোধ করি এতক্ষণের এত কান্না-কাটি, এত মাথা-কোটা-কুটীর মধ্যেও হৃদয়ে তাহার সমস্ত প্রতিকূল যুক্তির বিরুদ্ধেও এক প্রকার অব্যক্ত অন্তর্নিহিত আশা ছিল, হয় ত, এ সকল আশঙ্কা সত্য নহে, হয় ত এই প্রচণ্ড দুঃস্বপ্নের দুঃসহ বেদনা ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই শুধু কেবল একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসেই অবসান হইয়া গিয়া পুলকে সমস্ত চরাচর রাঙা হইয়া উঠিবে। --এম্‌নি কিছু একটা অচিন্তনীয় পদার্থ হয় ত তখনও তাহার আগাগোড়া বুকখালি করিয়া দিয়া বিদায় গ্রহণ করে নাই। কেন না, এই ত তখন পর্য্যন্তও তাহার সংসারে যাহা কিছু কামনার সবই বজায় ছিল; অথচ, একটা রাত্রিও কি পোহাইল না, আর তাহার কিছু নাই,—একেবারে কিছু নাই! চক্ষের পলক ফেলিতে না-ফেলিতে জীবনটা একেবারে দুর্ভাগ্যের শেষ সীমা ডিঙাইয়া বাহির হইয়া গেল! এতবড় পরিমাণ-বিহীন বিপত্তিতে তাহার বাঁচিয়া থাকাটাই বোধ করি কোন মতে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না।

উভয়েই স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। গাড়ী আসিয়া একটা অজানা ষ্টেসনে লাগিল এবং অল্পকাল পরে ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

সুরেশ একবার কি একটা বলিবার চেষ্টা করিয়া আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া এবার উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং জানালার কাঁচ তুলিয়া দিয়া কয়েকবার পায়চারি করিয়া সহসা অচলার সম্মুখে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া কহিল, মহিম ভাল আছে। এতক্ষণে বোধ হয় সে এলাহাবাদে পৌঁচেছে। একটুখানি থামিয়া বলিল, ওখান থেকে সে জব্বলপুরেও যেতে পারে, কলকাতায়ও ফিরে আস্‌তে পারে।

অচলা ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমরা কোথায় যাচ্চি?

সেই অশ্রু-কলঙ্কিত মুখের উপর দুঃখ ও নিরাশার চরম প্রতিমূর্ত্তি আর একবার সুরেশের চোখে পড়িল। তাহার ভুল যে কত বড় হইয়া গেছে, এ কথা আর তাহার অগোচর ছিল না এবং ইহার জন্য আজ সে নিজেকে হত্যা করিয়া ফেলিতেও পারিত। কিন্তু, যাহার সহস্র ছলনা তাহার সত্য দৃষ্টিকে এমন করিয়া আবৃত করিয়া এই ভুলের মধ্যেই বাঁরম্বার অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াছে, সেই ছলনাময়ীর বিরুদ্ধেও তাহার সমস্ত অন্তর একেবারে বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাই সে অচলার জিজ্ঞাসার উত্তরে সহসা তিক্তস্বরে বলিয়া উঠিল, বোধ হয় আমরা সশরীরে নরকেই যাচ্চি। যে অধঃপথে পথ দেখিয়ে এতদূর পর্য্যন্ত টেনে এনেচ, তার মাঝখানে ত ইচ্ছে করলেই দাঁড়াবার যায়গা পাওয়া যাবে না! এখন শেষ পর্য্যন্ত যেতেই হবে।

কথা শুনিয়া অচলার আপাদ-মস্তক একবার কাঁপিয়া উঠিল, তারপরে সে নিরুত্তরে মাথা হেঁট করিয়া রহিল। যে মিথ্যাচারী কাপুরুষ পরস্ত্রীকে এমন করিয়া বিপথে ভুলাইয়া আনিয়াও অসঙ্কোচে এতবড় নির্লজ্জ অপবাদ মুখ দিয়া উচ্চারণ করিতে পারে, তাহাকে বলিবার আর কাহার কি থাকে!

সুরেশ আবার পায়চারি করিতে লাগিল। বোধ হয় এই পাষাণ-প্রতিমার সুমুখে দাঁড়াইয়া কথা কহিবার তাহার শক্তি ছিল না। বলিতে লাগিল,—তুমি এমন ভাব দেখাচ্চ যেন একা তোমারই সর্ব্বনাশ। কিন্তু সর্ব্বনাশ বল্‌তে যা বোঝায় তা' আমার পক্ষে কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, জানো? আমি তোমাদের মত ব্রহ্মজ্ঞানী নই, আমি নাস্তিক। আমি পাপ-পুণ্যের ফাঁকা আওয়াজ করিনে, আমি নিরেট সত্যিকার সর্ব্বনাশের কথাই ভাবি। তোমার রূপ আছে, চোখের জল আছে, মেয়ে মানুষের যা' কিছু অস্ত্রশস্ত্র তোমার তূণে সে সব প্রয়োজনেরও অতিরিক্ত আছে,—তোমার কোন পথেই বাধা পড়বে না। কিন্তু আমার পরিণাম কল্পনা করতে পারো? আমি পুরুষ মানুষ,—তাই আমাকে জেলের পথ বন্ধ করতে নিজের হাতে এইখানে গুলি করতে হবে! বলিয়া সুরেশ থমকিয়া দাঁড়াইয়া বুকের মাঝখানে হাত দিয়া দেখাইল।

অচলা কি একটা বলিতে উদ্যত হইয়া মুখ তুলিয়াও নিঃশব্দে মুখ ফিরাইয়া লইল। কিন্তু তাহার চোখের দৃষ্টিতে ঘৃণা যে উপ্‌চাইয়া পড়িতেছিল, তাহা দেখিতে পাইয়া সুরেশ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল, ময়ূর-পুচ্ছ পাখায় গুঁজে দাঁড়কাক কথনো ময়ূর হয় না অচলা। ও চাহনি আমি চিনি, কিন্তু সে তোমাকে সাজে না। যাকে সাজ্‌তো

সে মৃণাল, তুমি নয়! তুমি অসূর্য্যম্পশ্যা হিন্দুর ঘরের কুল-বধূ নও, এতটুকুতে তোমাদের জাত যাবে না। তুমি যেখানে খুসি নেবে চলে যাও। আমি চিঠি লিখে দিচ্চি, মহিমকে দেখিয়ো, সে ঘরে নেবে। টাকা দিচ্চি তোমার বাপকে দিয়ো—তাঁর মুখ বন্ধ হয়ে যাবে। তোমার চিন্তা কি অচলা, এ এম্‌নিই কি বেশী অপরাধ?

সে আবার পায়চারি করিতে লাগিল, একবার চাহিয়াও দেখিল না তাহার জ্বলন্ত শূল কোথায় কি কাজ করিল। খাবারের লোভে বন্যপশু ফাঁদে পড়িয়া অন্ধ ক্রোধে যাহা পায় তাহাই যেমন নিষ্ঠুর দংশনে ছিঁড়িতে থাকে, ঠিক সেই ভাবে সুরেশ অচলাকে একেবারে যেন টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেলিতে চাহিল। হঠাৎ মাঝখানে দাঁড়াইয়া পড়িয়া কহিল, এ এম্‌নি কি ভয়ানক অপরাধ? স্বামীর ঘরে দাঁড়িয়ে তার মুখের উপর বলেছিলে একজন পর-পুরুষকে ভালবাসো,—সে কি ভুলে গেছ? যে লোক ঘরে আগুন দিয়ে তোমার স্বামীকে পোড়াতে চেয়েছিল বলে তোমার বিশ্বাস, তার সঙ্গেই চলে আস্‌তে চেয়েছিলে,—এবং এলেও তাই;—স্মরণ হয়? তার ঘরে, তার আশ্রয়ে বাস করে গোপনে কেঁদে তাকেই সঙ্গে আস্‌তে সেধেছিলে,—মনে পড়ে? তার চেয়েও কি এটা বেশি অপরাধ? আরও কত কি প্রতিদিনের অসংখ্য খুঁটি-নাটি! তাই আজ আমার এত সাহস! আসলে তুমি একটা গণিকা, তাই তোমাকে ভুলিয়ে এনেচি! ভেবেছিলুম প্রথমে একটুখানি চম্‌কে উঠ্‌বে মাত্র! তার বেশি তোমার কাছে আশা করিনি! তোমাকে বারবার বলে দিচ্চি, অচলা, তুমি সতী-সাবিত্রী নয়! সে তেজ, সে দর্প তোমারে সাজে না, মানায় না,—সে তোমার একান্ত অনধিকার-চর্চ্চা! বলিয়া সুরেশ রুদ্ধশ্বাসে নির্জ্জীব হইয়া থামিতেই অচলা মুখ তুলিয়া ভগ্নকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, আপনি থাম্‌বেন না সুরেশবাবু, আরও বলুন, আরও বলুন। আমাকে দুই পায়ে মাড়িয়ে-মাড়িয়ে সংসারে যত কটু কথা, যত কুৎসিৎ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, যত অপমান আছে সব করুন। বলিয়া মেঝের উপর অকস্মাৎ উপুড় হইয়া পড়িয়া অবরুদ্ধ রোদনের বিদীর্ণ-স্বরে বলিতে লাগিল,—এই আমি চাই, এই আমার দরকার! এই আমাদের সত্যিকার সম্বন্ধ! পৃথিবীর কাছে, ভগবানের কাছে, আপনার কাছে এই আমার একমাত্র প্রাপ্য!

সুরেশ দেয়ালে ঠেস দিয়া কাঠ হইয়া চাহিয়া রহিল। অচলার সুদীর্ঘ কেশভার স্রস্ত-বিপর্য্যস্ত হইয়া মাটিতে লুটাইতে লাগিল, তাহার জলসিক্ত গাত্রবাস ধূলায়-কাদায় মলিন, কদর্য্য হইয়া উঠিল, কিন্তু সেদিকে সুরেশ পা' বাড়াইতে পারিল না। নূতন শিকারী তাহার প্রথম ভূ-পতিত পক্ষিণীর মৃত্যু-যন্ত্রণা যেমন অবাক হইয়া চাহিয়া দেখে, তেম্‌নি দুই মুগ্ধ চক্ষের অপলক দৃষ্টি দিয়া সে যেন কোন্ এক মরণাহত নারীর শেষ মুহূর্ত্তের সাক্ষ্য দাঁড়াইয়া রহিল।

আবার গাড়ীর গতি মন্দ হইতে মন্দতর হইয়া ধীরে ধীরে ষ্টেসনে আসিয়া থামিল। সুরেশ সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া শান্ত সহজ গলায় বলিল, লোকে তোমাকে এ অবস্থায় দেখ্‌লে আশ্চর্য্য হ'য়ে যাবে। তুমি উঠে বোসো, আমি আমার ঘরে চল্‌লুম। সকাল হ'লে তুমি যেখানে নাব্‌তে চাইবে আমি নাবিয়ে দেব, যেখানে যেতে চাইবে আমি পাঠিয়ে দেব। ইতিমধ্যে ভয়ঙ্কর কিছু একটা করবার চেষ্টা কোরো না, তাতে কোন ফল হবে না! এই বলিয়া সুরেশ কপাট খুলিয়া নীচে নামিয়া গেল, এবং সাবধানে তাহা বন্ধ করিয়া কি ভাবিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পরে মুখ বাড়াইয়া কহিল, তুমি আমার কথা বুঝ্‌বে না, কিন্তু এইটুকু শুনে রাখো যে, এ সমস্যার মীমাংসার ভার আমিই নিলুম।—আর তোমার কোন অমঙ্গল ঘট্‌তে দেব না,—এর সমস্ত ঋণ আমি কড়ায়-গণ্ডায় পরিশোধ ক'রে যাবো। এই বলিয়া সে ধীরে ধীরে তাহার নিজের কামরার দিকে প্রস্থান করিল।

ট্রেণের টানা ও একঘেয়ে শব্দর বিরামের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবারই সুরেশের তন্দ্রা ভাঙিতেছিল বটে. কিন্তু চোখের পাতার ভার ঠেলিয়া চাহিয়া দেখিবার শক্তি আর যেন তাহাতে ছিল না। ভিজা কাপড়ে তাহার অত্যন্ত শীত করিতেছিল, বস্তুতঃ সে যে অসুখে পড়িতে পারে, এবং বর্ত্তমান অবস্থায় সে যে কি ভীষণ ব্যাপার, ইহা ভিতরে ভিতরে অনুভব করিতেও ছিল, কিন্তু ব্যাগ খুলিয়া বস্ত্র-পরিবর্ত্তনের উদ্যম একটা অসাধ্য অভিলাষের মতই তাহার

মনের মধ্যে অসাড় হইয়া পড়িয়াছিল। ঠিক এম্নি সময়ে তাহার কানে গিয়া একটা সুপরিচিত কণ্ঠের ডাক পৌঁছিল,—কুলি! কুলি! সে অর্দ্ধ-সজাগভাবে চোখ মেলিয়া দেখিল গাড়ী কোন্ একটা ষ্টেসনে থামিয়া আছে, এবং কখন্ অন্ধকার কাটিয়া গিয়া ক্ষান্ত-বর্ষণ ধূসর মেঘের মধ্যে দিয়া একপ্রকারের ঘোলাটে আলোকে সমস্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। দেখিতে পাইল, অনেকে নামিতেছে, অনেকে চড়িতেছে,—এবং তাহারই মাঝখানে দাঁড়াইয়া একটী শোকাচ্ছন্ন রমণী-মূর্ত্তি কিসের তরে আগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়া আছে। এ অচলা। একজন কুলি ঘাড়ে একটা মস্ত চামড়ার ব্যাগ লইয়া গাড়ী হইতে নামিয়া আসিয়া কাছে দাঁড়াইতে সে তাহাকে কি একটা জিজ্ঞাসা করিয়া গেটের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত সুরেশ নিশ্চেষ্টভাবে শুধু চাহিয়াই ছিল। বোধ হয় তাহার চোখের দেখা ভিতরে ঢুকিবার পথ পাইতেছিল না। কিন্তু গাড়ী ছাড়িবার বেলের শব্দ প্ল্যাটফর্ম্মের কোন্ এক প্রান্ত হইতে সহসা ধ্বনিয়া উঠিয়া তড়িৎ স্পর্শের মত তাহার অন্তর-বাহিরকে এক মুহূর্ত্তে এক করিয়া তাহার সমস্ত জড়িমা ঘুচাইয়া দিল, এবং পলকের মধ্যে সে নিজের ব্যাগটা টানিয়া লইয়া দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল।

টিকিটের কথা অচলার মনেই ছিল না। সে দ্বারের মুখে টিকিট বাবুকে দেখিয়া থম্‌কিয়া দাঁড়াইতেই সুরেশ পিছন হইতে স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল, দাঁড়িয়ো না, চল। আমি টিকিট দিচ্চি।

তাহার আগমন অচলা টের পায় নাই। মুহূর্ত্তের জন্ত কুণ্ঠায়, ভয়ে তাহার পা উঠিল না, কিন্তু এই সঙ্কোচ অপরের লক্ষ্য-বিষয়ীভূত হওয়ায় পূর্ব্বেই সে আস্তে আস্তে বাহির হইয়া আসিল।

বাহিরে আসিয়া উভয়ের নিম্নলিখিত মত কথাবার্ত্তা হইল।

সুরেশ কহিল, আমি ভেবেছিলাম তুমি সোজা কলকাতাতেই ফিরে যেতে চাইবে, হঠাৎ এই ডিহ্‌রিতে নেবে পড়লে কেন? এখানে কি পরিচিত কেউ আছেন?

অচলা অন্তদিকে চাহিয়াছিল, সেই দিকে চাহিয়াই জবাব দিল, কলকাতায় আমি কার কাছে যাবো?

"কিন্তু, এখানে?"

অচলা চুপ করিয়া রহিল। সুরেশ নিজেও কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিল, আমার কোন কথা হয় ত আর তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না, আর সেজন্তে আমার নালিশও কিছু নেই, আমি কেবল তোমার কাছে শেষ সময়ে কিছু ভিক্ষে চাই।

অচলা তেমনি নীরবে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সুরেশ কহিল, আমার কথা কাউকে বোঝাবারও নয়, আমি বোঝাতেও চাইনে। আমার জিনিস আমার সঙ্গেই যাক্। যেখানে গেলে এখানের আগুন আর পোড়াতে পারবে না, আমি সেই দেশের জন্যই আজ পথ ধরলুম, কিন্তু আমার শেষ সম্বলটুকু আমাকে দাও,—আমি হাত জোড় করে তোমার কাছে এই প্রার্থনা জানাচ্চি।

তথাপি অচলার মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না। সুরেশ কহিতে লাগিল, আমি নিজে তোমাকে অনেক কটু কথা বলেচি, অনেক দুঃখ দিয়েছি; কিন্তু পরে যে ভালো-থাকার দম্ভে ওপরে বসে তোমার মাথায় কলঙ্কের কালি ছিটিয়ে কালো করে তুলবে, সে আমি মরেও সইতে পারবো না। আমার জন্যে তোমাকে আর না দুঃখ পেতে হয়, বিদায় হবার আগে আমাকে এইটুকু সুযোগ ভিক্ষে দিয়ে যাও অচলা।

তাহার কণ্ঠস্বরে কি যে ছিল তাহা অন্তর্যামীই জানেন, অকস্মাৎ তপ্ত-অশ্রুতে অচলার দুই চক্ষু ভাসিয়া গেল। কিন্তু তবুও সে নিজের কণ্ঠ প্রাণপনে অবিকৃত রাখিয়া মৃদুস্বরে শুধু জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে কি করতে হবে বলুন?

সুরেশ পকেট হইতে টাইম্-টেবিলখানা বাহির করিয়া গাড়ীর সময়টা দেখিয়া লইয়া কহিল, তোমাকে কিছুই করতে হবে না। কিন্তু সন্ধ্যার আগে যখন কোনদিকে যাবারই উপায় নেই, তখন এইটুকু কাল আর আমাকে অবিশ্বাস কোরো না, এই শুধু আমি চাই। আমা হতে তোমার আর কোন অকল্যাণ হবে না একথা তোমার নাম করেই আজ আমি শপথ করচি।

প্রত্যুত্তরে সে কোন কথাই কহিল না, কিন্তু সে যে সম্মত হইয়াছে তাহা বুঝা গেল।

লোকের দৃষ্টি এবং কৌতূহল আকর্ষণ করিবার আশকায়

ষ্টেসনে ফিরিয়া তাহার ক্ষুদ্র বসিবার ঘরে গিয়া অপেক্ষা করিতে দু'জনের কাহারও প্রবৃত্তি হইল না। সন্ধান লইয়া জানা গেল বড়-রাস্তার উপরে সম্রাট শের-শাহের নামে প্রচলিত সরাইয়ের অস্তিত্ব আজিও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। সহরের একপ্রান্তে তাহারই একটার উদ্দেশে দুজনে ক্ষণকালের জন্য নিজেদের মর্ম্মান্তিক দুঃখ বিস্মৃত হইয়া একখানা গরুর গাড়ী ভাড়া করিয়া যাত্রা করিল।

পথে কেহ কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিল না, কেহ কাহারও মুখের প্রতিও চাহিয়া দেখিল না। শুধু গো-শকট আসিয়া যখন সরাইয়ের প্রাঙ্গণে থামিল, তখন নামিতে গিয়া পলকের জন্য সুরেশের মুখের প্রতি অচলার দৃষ্টি পড়িয়া সে মনে মনে শুধু কেবল আশ্চর্য্য নয়, উদ্বিগ্ন হইল। তাহার দুই চোখ ভয়ানক রাঙা, অথচ মুখের উপর কিসে যেন কালী মাখাইয়া দিয়াছে। সংসারের অনেক ঝড়-ঝাপটের মধ্যেই সে তাহাকে দেখিয়াছে, কিন্তু তাহার এ মূর্ত্তি সে আর কখনও দেখিয়াছে বলিয়া স্মরণ করিতে পারিল না।

গাড়োয়ানকে ভাড়া দিয়া বিদায় করিয়া সুরেশ মনি-ব্যাগটা সেইখানে রাখিয়া দিয়া বলিল, এটা আপাততঃ তোমার কাছেই রইল, যদি কিছু দরকার হয় নিতে লজ্জা কোরো না।

অচলার ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করে, এ কথার অর্থ কি? কিন্তু পারিল না। সুরেশ কহিল, এই সুমুখের ঘরটাই সম্ভবতঃ কিছু ভালো, তুমি একটুখানি বিশ্রাম কর, আমি পাশের কোন একটা ঘর থেকে এই জামা-কাপড়গুলো ছেড়ে আসি। কি জানি এইগুলোর জন্যেই বোধ করি এ রকম বিশ্রী ঠেকচে। বলিয়া সে অচলার সুবিধা-অসুবিধার প্রতি আর লেশমাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়া নিজের ব্যাগটা হাতে লইয়া ঠিক মাতালের মত টলিয়া টলিয়া বারান্দা পার হইয়া কোনের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

এই অচিন্তনীয় রূঢ় আচরণে অচলার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। কিন্তু এমন করিয়া একাকী পথের ধারে দাঁড়াইয়া থাকাও যায় না; তাই সে অনেক কষ্টে নিজের ভারি ব্যাগটা টানিয়া টানিয়া সম্মুখের ঘরের মধ্যে আনিয়া ফেলিল, এবং তাহারই উপরে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রাস্তার উপরে লোক-চলাচল দেখিতে লাগিল।

রাষ্ট্রনীতি ও ধর্ম্মনীতি

অভিভাষণ*

[মাননীয় বিচারপতি সার্ শ্রীআশুতোষ চৌধুরী, এম-এ, বার-এট্-ল]

সভা চ মা সমিতিশ্চাবতাং প্রজাপতের্দুহিতরৌ সংবিদানে।
যেনা সংগচ্ছা উপ মা স শিক্ষাচ্চারু বদানি পিতরঃ
সংগতেষু॥
বিদ্ম তে সভে নাম নরিষ্টা নাম বা অসি।
যে তে কে চ সভাসদস্তে মে সন্তু সবাচসঃ॥
এষামহং সমাসীনানাং বর্চো বিজ্ঞানমা দদে।
অস্যাঃ সর্ব্বস্যাঃ সং সদো মামিন্দ্র ভগিনং কৃণু॥
যদ্ বো মনঃ পরাগতং যদ্ বদ্ধমিহ বেহ বা।
তদ্ ব আবর্ত্তয়ামসি ময়ি বো রমতাং মনঃ॥

অথর্ব্ববেদসংহিতা ৭।১২।১-৪

ধর্ম্মসভায় ধর্ম্মোৎসবের দিনে যাহা আমাদিগের দূর হইতেও সুদূর তাহা সন্নিকট হয়; যাহা প্রচ্ছন্ন তাহা বিকশিত হয়; যাহা সুযুপ্ত তাহা জাগ্রত হয়। আজকার দিনে সমাসীন সভাসদ্‌বর্গের হৃদয়ের আনন্দ সকলের হৃদয়কে অধিকার করে। অন্য সময়ে সাম্প্রদায়িক বা জাতীয় গৌরবের ভাব কিংবা অহঙ্কার যাহা অব্যক্ত থাকে আজ তাহা পরিস্ফুট হয়। সেই সাম্প্রদায়িক গৌরবের ভাব আমার মনকে অধিকার করিয়াছে বলিয়াই সাহস পূর্ব্বক আজ আপনাদিগের সম্মুখীন হইয়াছি। সেই সামাজিক গৌরবে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতে কুণ্ঠা কিংবা সঙ্কোচ হয় না। সমবেত সকল হৃদয়ের প্রসূত আনন্দ

* আদি ব্রাহ্মসমাজের উননবতিতম সাম্বৎসরিক উৎসবে পঠিত।

আমার নিজের হৃদয়কে আনন্দময় করিয়াছে বলিয়াই সানন্দে অদ্যকার অধিবেশনে আদিসমাজের সভাপতিরূপে সমাজের যাহা উদ্দেশ্য ও নিবেদন, তাহা বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আপনাদের শুভ ইচ্ছা পাই, এই প্রার্থনা। এইরূপ আনন্দ, ভক্তিতে পরিণত হয়, পরম প্রেমরূপের সাধনার সাহায্য করে।

যে সাম্প্রদায়িক ভাবের কথা উল্লেখ করিলাম, তাহাই আমাদের জাতীয় ভাবের ভিত্তি, তাহাই আমাদিগের জাতীয়তার স্রষ্টা। সেই সাম্প্রদায়িক ভাব হিন্দুর বলিয়া আমরা আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করি। বহু দিন পূর্ব্বে এই সমাজের একজন পূজ্য স্বনামধন্য আচার্য্য মহোদয় * হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার উপসংহারে তিনি এই কয়েকটী কথা বলেন—

"আমি দেখিতেছি আমার সম্মুখে মহাবল-পরাক্রান্ত হিন্দুজাতি নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া বীর কুন্তল পুনরায় স্পন্দন করিতেছে এবং দেববিক্রমে উন্নতির পথে ধাবিত হইতে প্রবৃত্ত হইতেছে। আমি দেখিতেছি যে এই জাতি পুনরায় নব-যৌবনান্বিত হইয়া পুনরায় জ্ঞান ধর্ম্ম সভ্যতাতে উজ্জ্বল হইয়া পৃথিবী সুশোভিত করিতেছে; হিন্দুজাতির কীর্ত্তি, হিন্দুজাতির গরিমা পৃথিবীময় পুনরায় বিস্তারিত করিতেছে।"

আমারও সেই আশা ও বিশ্বাস। তাঁহার উপসংহার আমার উদ্বোধন স্বরূপে গ্রহণ করিলাম। আমি বিশ্বাস করি, আমরা মরি নাই। হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দুজাতি মরিবার নহে। যাহা সত্য, সত্য-প্রতিষ্ঠ, তাহার মরণ নাই। আশা হয় আমাদের ধর্ম্মকেন্দ্রক জাতীয় ভাব জাগিয়া উঠিলে সেই ভাব সমগ্র পৃথিবীকে অধিকার করিবে, পৃথিবীতে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। সত্যমেব জয়তে নানৃতং।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন,—"আমরা ভারতবাসী যে এই দুঃখ-দারিদ্র্য, ঘরে-বাহিরে উৎপাত সয়ে বেঁচে আছি, তার মানে আমাদের একটী জাতীয় ভাব আছে, সেটা জগতের জন্য এখনও আবশ্যক।" আমারও তাহাই মনে হয়। আমরা যে শক্তি আশ্রয় করিয়া বাঁচিয়া আছি, তাহা ধর্ম্মশক্তি। সে শক্তির বিস্তার নিশ্চয় হইবে। মরাগাঙ্গে আবার জোয়ার বহিবে, আমার বিশ্বাস। আশা হয় পোড়া ক্ষেত আবার অঙ্কুরিত হইবে। সেই আশার উপর নির্ভর করিয়া আজ দুচার কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছি।

ইউরোপে যে সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল, যাহা এখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই, যাহা এখনও ধোঁয়াইতেছে, যতদিন ধর্ম্মাধিকার ও রাষ্ট্রধর্ম্ম স্বতন্ত্র থাকিবে ততদিন সে আগুন নিভিবে না। ইউরোপীয় জগতে স্বাধিকার ও স্বকর্তৃত্বের ভাব প্রবল। তাহা হইতেই সেখানে তুমুল বিরোধের উৎপত্তি হয়। এই যুদ্ধই তাহার পরিণাম। সেখানে যে আগুণ জ্বলিয়াছিল, তাহাতে সন্ধিপত্র কাগজের টুকরা মাত্র। League of Nationsই বল, Parliament of menই বল, আর Federation of the worldই বল—যে ভাবেই উল্লেখ কর না কেন, সেই League, Federation, Parliamentএর ধর্ম্মভিত্তি না থাকিলে নামেমাত্রেই থাকিবে। সে নামে মুক্তি নাই। মোক্ষ ধর্ম্মভাবের উপর নির্ভর করে; ঐহিক প্রতিপত্তির উৎপত্তি ও শেষ এইখানে। কর্ম্মী হও, কিন্তু কর্ম্মের শেষে "ব্রহ্মার্পণমস্তু" বলিয়া কর্ম্মের ফল পরব্রহ্মকে অর্পণ না করিলে মুক্তি নাই, শান্তি নাই।

কর্ম্মী কর্ম্মবল চায়। তুমি যতই সেই শক্তি উপার্জ্জন কর ততই তাহা অসংযত হইয়া পড়ে, তাহার উপসংহার কল্যাণময় হয় না; সে শক্তি-সাধনা আসুরিক।

নিটস্কের (Nietzsche) অ্যান্টি ক্রাইষ্ট গ্রন্থে (Anti-Christ) পড়িতে পাই—

"শুভ কিসে? ক্ষমতা প্রসারে। ক্ষমতা লাভের আকাঙ্ক্ষা যাহাতে প্রবল হয় তাহাতে। মানুষের শক্তি প্রতাপে। আনন্দ কিসে? ক্ষমতা প্রসারের অনুভূতিতে। বাধা বিঘ্নের অতিক্রমে। ক্ষমতা অর্জ্জনে অক্লান্তি ও অপরিতৃপ্তিতে। সর্ব্বস্ব বিনিময়ে শান্তিলাভে নহে, সংগ্রামে। কর্ম্মবলে, ধর্ম্মবলে নহে।" *

* ৺রাজনারায়ণ বসু মহোদয়।

* "What is good? All that increases the feeling of power, will to power, power itself in man. What is happiness? The feeling that power increases, that resistance is overcome. Not contendedness but more power; not peace at any price but warfare, not virtue but capacity."

জার্ম্মাণীতে তিনি এই শিক্ষা দেন। সে জাতি এই আসুরিক মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিল। এখন তাহার অবস্থা কি?

ম্যাট্‌সিনি তাঁহার "মানবধর্ম্মে" (Duties of man) স্পষ্টভাবে ঐহিক প্রতিপত্তি সম্বন্ধে বলেন, "যদি ইহাকেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া মানিয়া লও, তবে বিরোধ লইয়া জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের ফলে প্রেম, প্রীতি, আনন্দ লাভ হয় না।" ঐহিক প্রতিপত্তি যাহাদিগের একমাত্র উদ্দেশ্য, তাহারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পথ আবিষ্কারে ব্যস্ত। সে পথ ধরিয়া চলিতে কাহার বুকে পা পড়িতেছে, তাহা ভাবিবার প্রয়োজন নাই; কি দলাইয়া যাইতেছে, তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। মুখে 'ভাই, ভাই", কিন্তু কার্য্যে বৈরী—ইহাই স্বাধিকারবাদীদিগের শিক্ষার ফল। ম্যাট্‌সিনি বলেন যে বিরোধ, স্বতন্ত্রভাব, ধর্ম্মবন্ধন না থাকিলে ঘটিবেই ঘটিবে। নির্ব্বিরোধ হইতে চাহিলে লক্ষ্য এক হওয়া,—একীভূত হওয়া চাই;—সেই লক্ষ্য ধর্ম্ম। ব্যক্তিগত অধিকার আছে সত্য, কিন্তু সেই অধিকার রক্ষার চেষ্টাতে স্বভাবতই অন্য জন বা অন্য জাতি প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায়—যতদিন তাহাকে ধর্ম্মভাবের উপর প্রতিষ্ঠা করিতে না পার। সমাজ কিংবা জাতি-সংস্করণে ধর্ম্মভাবের প্রয়োজন; আমরা এক পিতার সন্তান—এই বোধ জীবনের মধ্যবিন্দু হওয়া চাই; এই ভাব জীবনের প্রত্যেক অংশে ব্যাপ্ত হওয়া আবশ্যক। তিনি ফরাসী দেশের Lamennaisএর উপদেশের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন 'অধিকারলিপ্সা ও কর্ত্তব্যপালন দুইটি স্বতন্ত্র জিনিষ'। প্রাপ্তির চেষ্টাতে ত্যাগের ভাব না থাকিলে জাতিগত বিরোধের অবসান হয় না। স্বাধিকার-চেষ্টায় বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে বৈষম্যের সামঞ্জস্য করিতে পারা যায় না, জাতীয় একতা গড়িয়া তুলিতে পার না। যে জাতি স্বাধিকার-প্রসারে আত্ম-নিবিষ্ট, সে জাতির জীবন শোণিত-সিক্ত। এই চেষ্টার নিবৃত্তি কিসে, শেষ কোথায়? যতদিন সেই জাতি অপেক্ষা দুর্ব্বল জাতি জগতে থাকিবে, ততদিন সেই অধিকারের প্রসার চলিতে থাকিবে। নির্জ্জীব জাতি দলিত হইবে। বলবানের কথা,—'আমার শক্তি আছে, আমি সেই শক্তির উপর নির্ভর করি। আমার পথে যে পড়িবে তাহাকে দমন করিব, যাহার সহিত বিরোধ তাহাকে উচ্ছেদ করিব; সংগ্রামই আমার জীবন। বাধা বিঘ্ন সহ্য করিব না। আমার শক্তির বিস্তার চাই'।

এই আসুরিক ভাব প্রবল হইলে পৃথিবী দানব-রাজ্য হয়। যদি পৃথিবীর কোন স্থানে ধর্ম্মরাজ্য থাকে, তবে তাহার সহিত সেই ধর্ম্মরাজ্যের সংগ্রাম বাধে, তাহাতেই দেব-দানবের যুদ্ধ হয়। যে মহাসমর হইয়া গেল, তাহার শেষ অঙ্কে এই ধর্ম্মভাব জাগ্রত হইয়াছিল বলিয়া আসুরিক বলের দমন হইয়াছে। এই যুদ্ধে আমেরিকার যোগদান সেই ধর্ম্মভাবের উত্তেজনা। আমেরিকার নিজের সুবিধা কিংবা প্রতিপত্তিলাভের কিছুই ছিল না। Crusadeএর সময় যেমন God wills it! God wills it! বলিয়া বিবিধ জাতি একত্রিত হইয়াছিল, ঈশ্বরের আদেশপালনরূপ কর্ত্তব্যজ্ঞানের উপর—বিশ্বাসের উপর তাহারা একত্রিত হইয়াছিল, আমেরিকাও সেই ধর্ম্মভাব লইয়া এই মহাযুদ্ধে যোগদান করে। ইহাই দেবদানবের যুদ্ধ। ব্রহ্মশক্তির অভাবে রিপু দমন হয় না। যে শক্তিসাধনায় মুক্তি লাভ হয়, তাহা ঐশীশক্তি—তাহা ঐহিক প্রতিপত্তি নহে। ঐশী শক্তিই প্রাণশক্তি। সেই শক্তির সাধনাতেই মানবের মোক্ষ লাভ হয়। যাহা কিছু কর্ম্ম, তাহাই ব্রহ্মে অর্পণ করিলে শান্তি। অশান্ত বিক্ষিপ্ত হৃদয়, রিপু-উত্তেজিত জীবন, ধ্বংসের কারণ, প্রলয়ের কারণ। ধর্ম্মই কর্ত্তব্য। প্রাপ্তিতে ত্যাগের ভাব চাই। আমার যাহা, তাহা আমারই নহে, আমাদের সবাকার। আমি কয়দিনের? যাহা আমার, তাহার শেষ আমাতেই। যাহা সবাকার, তাহার শেষ নাই; সবটা শেষ হইবার নহে। সেই "আমিত্ব" পরিত্যাগ আবশ্যক। সব জগতের যাহা, তাহা অনন্তের; হৃদয়ের সেই সর্ব্বব্যাপক ভাব ধর্ম্মেই অর্জ্জনীয়। কর্ম্মবলের উপর প্রতিষ্ঠিত রাজ্যতন্ত্র আসুরিক শক্তির উপর নির্ভর করে। তাহা মরণশীল।

Mazzini বলেন—"যদি মানব-মনের অধীশ্বররূপে একটি মহা-মন না থাকেন, তবে বলবত্তর ব্যক্তিরা আমাদের উপর অত্যাচার করিলে কে সেই অত্যাচার হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারে? মানুষের রচিত নহে, এমন কোন পবিত্র ও অলঙ্ঘ্য নিয়ম যদি না থাকে, তবে ন্যায় অন্যায় বিচার করিবার মাপদণ্ড কোথায় থাকে?

অত্যাচারের বিরুদ্ধে, অনিয়মের বিরুদ্ধে কাহার বলে প্রতিবাদ করিব? আমাদের ব্যক্তিগত মতামতের দোহাই দিয়া জনসাধারণকে কি প্রকারে স্বার্থত্যাগ করিতে, আপনাকে বলি দিতে আহ্বান করিব? যত দিন প র্যন্ত আমরা আমাদের বুদ্ধিপ্রসূত মতামতের উপর দাঁড়াইয়া উপদেশ দিতে থাকিব, ততদিন কথায় মিল পাইতে পারি, কিন্তু কাজে পাইতে পারিব না। *

জর্ম্মাণ জাতি শক্তিকেই মানবজাতির প্রধান সাধনা বলিয়া তাহাদের দেশের শিক্ষাপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত করেন। সংগ্রামেচ্ছা মানবপ্রকৃতিগত, অতএব সংগ্রাম-চেষ্টা, সংগ্রাম করিতে শিক্ষা মানবজীবনের একটি প্রধান উদ্দেশ্য, ইহা (Baron von Freytag Loringhoven) জর্ম্মাণীর এক জন সর্ব্বপ্রধান সৈনিক লেখকের মত।

ট্রাইস্‌কে (Treitschke) বলেন—

"সুসভ্য বল, বর্ব্বর বল, উভয়েরই পশুবৃত্তি আছে। বাইবেলের এ কথা সত্য—মানবচরিত্রের পাপভাব, মানুষ যে সময় সৃষ্টি হয় সেই সময় হইতেই। সভ্যতা সে পাপ হইতে উদ্ধার করিতে অপারক—যতই কেন সভ্য হও না তাহা যাইবার নহে। পশুপ্রবৃত্তিকে দমন করিতে মানুষ কখনই পারিবে না।" †

কিন্তু তাঁহারও মতে মানবজাতির আধ্যাত্মিক পরিবর্ত্তন না হইলে শক্তিপূজাতে মানবের হিতসাধন হইবে না। আত্মার সংস্কার যদি আবশ্যক হয়, তাহা ধর্ম্মভাব ভিন্ন কিসে হইবে? জর্ম্মাণসম্রাট যিশুখৃষ্টের পদ পাইয়াছেন ভাবিতেন। তিনি প্রকাশ্যভাবে তাঁহার প্রজাবর্গকে বলেন "আমি সমরেশ—আমি তোমাদের রণদেবতা। আমি যদি তোমাদিগকে আজ্ঞা করি, পিতা-মাতাকে সংহার কর, তোমাদিগের তাহা তৎক্ষণাৎ প্রতিপালন করিতে হইবে। সে কার্য্য ভাল কি মন্দ তোমাদের বিচারাধীন নহে। তোমাদের শক্তিতে আমার রাজশক্তি, কিন্তু আমার উপরে আর কেহ নাই। আমার আজ্ঞাপালনই তোমাদের প্রধান ধর্ম্ম।"

জর্ম্মাণীর নেতাগণ সৈনিককে এই ভাবে শিক্ষা দেন যে তাহারা সততই মরিবার জন্য প্রস্তুত থাকে।—শিক্ষা দেন, "বল, আমরা কোথায় গিয়া প্রাণ দিব? আমরা বলিবামাত্র প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকিব।" তাঁহাদের মত এই যে, রাজা রাজ্যের জন্য। রাষ্ট্রনীতি ও ধর্ম্ম শাসনতন্ত্র (State and Church) বহু দিন হইতে ইউরোপে স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছে—রাষ্ট্রনীতি ধর্ম্মনীতি হইতে স্বতন্ত্র রাখাই কর্ত্তব্য। রাজনীতি ধর্ম্মের শাসনের অধীন নহে এই তাঁহাদিগের কথা।

কিন্তু হিন্দুর সাধনাতে পরব্রহ্ম লক্ষ্য। ব্রহ্মই আমাদের নেতা ও নিয়ন্তা। পৃথিবীতে যখন ধর্ম্মভাব প্রবল হইয়াছে, তখনই মানবহৃদয়ে আনন্দ দেখা গিয়াছে। Mazzini এই কথা ইতালীতে প্রচার করেন। তিনি বলেন—

"সমস্ত বড় বিপ্লবের ভিতর যে ধ্বনি বাহির হইয়াছিল, তাহাই ক্রুজেডের ধ্বনি—"ঈশ্বর সহায় আছেন, ঈশ্বর সহায় আছেন।" এই ধ্বনিই নিষ্কর্ম্মাকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতে পারে। স্মরণ রেখো যে ফ্লুরেন্সের শিল্পীগণ মেডিচিদিগের অধীনে নিজেদের জনতন্ত্রীয় স্বাধীনতা বলি দিতে অস্বীকার করিয়া যিশুখৃষ্টকেই জনতন্ত্র রাজ্যের নেতা বলিয়া অভিষেক করেন।" *

---

* "If there be not a Supreme mind reigning over all human minds who can save us from the tyranny of our fellowmen, whenever they find themselves stronger than we. If there be not a holy and inviolable law, not created by man, what rule have we to judge whether an act is just or unjust? In the name of whom, in the name of what shall we protest against oppression and irregularity? How shall we demand of men self-sacrifice, martyrdom in the name of our individual opinions? As long as we speak as individuals in the name of whatever theory our individual intellect suggests to us, we shall have what we have to-day adherence in words not in deeds."

† The polished man of the world and the savage have both the brute in them. Nothing is truer than the biblical doctrine of original sin, which is not to be uprooted by civilisation to whatever point you may bring it.

* The cry which rang out in all the great revolutions the cry of the crusade "God wills it"! "God wills it!" alone can rouse the inert into action. Remem-

ইতালীতেই স্থাভনরোলা (Savanorola) ম্যাট্‌সিনি (Mazzini) এবং গ্যারিবল্ডি (Garibaldi) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের শিক্ষা—জ্ঞানময় পিতা পরব্রহ্মের উপর বিশ্বাস রাখিয়া জ্ঞান অর্জ্জন কর, এবং তাঁহার নিয়ম, সত্যের নিয়ম জান। আর আমাদের পুরাতন ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন—

"সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম"

তাঁহাকে ভক্তি করা সম্বন্ধে তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন;—

"সা তস্মিন্ পরম প্রেমরূপা"

তাঁহাকে "প্রেমস্বরূপম্" বলিয়াছেন—তাঁহাকে লাভ করিলে,—

'সিদ্ধো ভবতি'
অমৃতো ভবতি
তৃপ্তো ভবতি' বলিয়াছেন।

ভন মল্কি (Von Moltke) একটী শান্তি-সঙ্গতে (Peace Deputation) এই কথা বলেন :—

"যুদ্ধ পুণ্যকার্য্য, বিধাতার বিধান। এই পুণ্য-বিধানে জগতের শাসন চলিতেছে। যুদ্ধ মানবপ্রকৃতির মহত্ত্ব ও উন্নতির উপায়। তাহাতেই মনুষ্যত্ব, নিঃস্বার্থপরতা, সাহস বদান্যতা প্রভৃতি গুণের পরিচয় পাওয়া যায়; এক কথায়, অত্যন্ত নীচ, হেয়, বৈষয়িক ভাব হইতে মানুষকে উদ্ধার করে।"*

এই কপট আধ্যাত্মিক ভাবের কথা পড়িলে বিস্মিত হইতে হয়। জর্ম্মাণীতে কি ভাব দাঁড়াইয়াছে তাহা দেখিলেই ইহা সত্য কি মিথ্যা বুঝা যায়। যে যাহাই বলুক, ইহা মিথ্যা, সম্পূর্ণ মিথ্যা। এই ধর্ম্মসভায় উপস্থিত সকলেই নিশ্চয় বলিবেন, ইহা মিথ্যা, সম্পূর্ণ মিথ্যা। পাপকে পুণ্য করিয়া তুলিতে কেহ কখনও পারিবে না। কর্ম্মকে ধর্ম্ম করিয়া তুলিলে অধঃপতন নিশ্চয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

অষ্ট্রিয়ার একজন বিখ্যাত অধ্যাপক বলেন, মানব-সম্প্রদায়ের বিবেক নাই—"Human communities have no conscience." তিনি বলেন—"উদ্দেশ্য সাধনে সব পন্থাই সাধু।" সেখানকার একজন নীতিবৈজ্ঞানিক বলেন, রাজনীতিক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ অনিবার্য্য। জেনারল বার্ণহার্ডি বলেন, যুদ্ধ স্বভাবদত্ত জৈবিক প্রয়োজন (biological necessity); যুদ্ধ হইতে জীবন লাভ হয়। আজকালকায় অষ্ট্রিয়া ও জর্ম্মাণীর এই ভাব। কিন্তু সেই জর্ম্মাণীতেই ক্যাণ্ট জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষা এই যে, "মানুষ স্বাধীন; স্বাবলম্বন তাহার প্রকৃতি। যখন সে কোন স্বার্থের দ্বারা বাধ্য না হইয়া কর্ত্তব্যপরায়ণ হয়, তখনই সে ন্যায়ের পথে চলে।" তিনি বলেন যে "ঐশী প্রকৃতির পূর্ণ সাগর হইতে অভিব্যক্ত অন্তর্নিহিত এক পবিত্র উৎস হইতে মানুষ নিজের শক্তি লাভ করে। তাই মানুষ কর্ত্তা, নিজের ভিতরে নিজের ইচ্ছা পরিচালনের নিয়ম ধারণ করে। Kant আরও বলেন "মানব হৃদয়ে জ্ঞানই ব্রহ্মোদ্ভূত। যাহা ন্যায় তাহাই পবিত্র। এই নীতিধর্ম্ম রাজারও প্রাপ্য। তাঁহাকে তাহা হাঁটু পাতিয়া লইতে হয়।" *

কিন্তু Barnhardi বলেন—"ঈশ্বরের প্রেম সর্ব্বোচ্চ সাধনা, এবং, প্রতিবাসীকে আত্মবৎ দেখ, এই দুই কথা রাজ্যতন্ত্রে খাটে না। খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মনীতি নিজের জন্য, সমাজের জন্য, তাহা কখনই শাসনতন্ত্রের জন্য হইতে পারে না। যিশুর শিক্ষা স্বাভাবিক নিয়মের বিরুদ্ধে।" Barnhardi হউন, মল্কি (Moltke) হউন, কিংবা কাইজার (Kaiser) হউন, কাহারও এসব কথা আমাদের মনে স্থান পাইবে না। আমরা দাস জাতি; কিন্তু আমাদের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব আছে,—আমাদের অন্তর্নিহিত বিপুল ধর্ম্মশক্তি আছে;

ber the Florentine artisans who refused to submit their democratic liberty to the domination of the Medicis by solemn vote, elected Christ as head of the republic.

(৭) "War is sacred and instituted by God; it is one of the holy bonds which rule the world; war maintains in man all the great and noble feelings, sense of honour, unselfishness, magnanimity, courage, in short, it prevents man from sinking into the most repulsive materialism."

* He derives his power from an inward spring, a sacred source from the ultimate deeps of the Divine nature. Man is then a sovereign entity, bearing within himself the law of his own will.

আমাদের মনে তাঁহাদিগের এ কথা কথনও স্থান পাইবে না। আমাদের কথা,—সত্যং জ্ঞানঃ অনন্তং ব্রহ্ম।

"তদেব সাধ্যতাম্, তদেব সাধ্যতাং"

তাঁহাকেই সাধনা কর, তাঁহাকেই সাধনা কর। তিনি আমাদের পিতা, 'পিতানোঽসি' তিনি পিতার ন্যায় আমাদিগকে জ্ঞান দান করুন—

"পিতা নো বোধি"।

অন্যস্মাৎ সৌলভ্যং ভক্তৌ

ভক্তদিগেরই তিনি সুলভ।

নাস্তি তেষু জাতিবিদ্যারূপকুলধনক্রিয়াদিভেদঃ

তাঁহাদিগের মধ্যে জাতি বিদ্যা রূপ কুল ধন ক্রিয়াদির ভেদ নাই।

তন্ময়া

তাঁহাতে সকলই সম্পূর্ণ

যত স্তদীয়া

সবই তাঁহার;

এই সহজ শিক্ষা হিন্দুধর্ম্মের। যিনি এই শিক্ষা অনুসরণ করেন,

স শ্রেষ্ঠং লভতে, স শ্রেষ্ঠং লভতে

তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠকে প্রাপ্ত হয়েন।

আদি সমাজের এই সাধনা ও শিক্ষা—হিন্দুধর্ম্মের এই বীজ-মন্ত্রজালই আদিসমাজের বীজমন্ত্র। আদিসমাজ হিন্দুর সমাজ; আদিসমাজের ধর্ম্ম হিন্দুর ধর্ম্ম। হিন্দুর সাধনাতে জাতি-বিদ্যা-রূপ-কুল-ধন-ক্রিয়াদির ভেদ নাই। সকল হিন্দুকেই, সমগ্র মানব জাতিকে এই শিক্ষা গ্রহণ করিতে বলিতে কুণ্ঠা হয় না—সংবদদ্ধং সংগচ্ছদ্ধং বলিতে সাহস হয়, বলিতে গৌরবান্বিত মনে হয়। সাধকসমবায় ইহাতেই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। আমাদের জাতীয় সমীকরণ ইহাতেই সম্ভব। উপস্থিত ভূত-ভবিষ্যতের এই শেষ শিক্ষা—ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা।

ত্রিসত্যস্য ভক্তিরেব গরীয়সী ভক্তিরেব গরীয়সী—

স্বত্বাধিকার অর্জ্জন কর কিন্তু ধর্ম্মার্জ্জনের অনুশীলন না করিলে, ব্রহ্মে তাহা সমর্পণ না করিলে বিরোধের সামঞ্জস্য সম্ভব নহে। দেশ কাল পাত্রের উপর এ শিক্ষা নির্ভর করে না। সব শিক্ষার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা স্বাবলম্বন। এই শিক্ষা নিজের উপর নির্ভর করে; ইহার জন্য মধ্যবর্ত্তী কোন কিছুর প্রয়োজন নাই। ইহার মধ্যবিন্দু 'ত্বং অস্মাকং তবাস্মি'। এই ধর্ম্ম সনাতন—ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষের শিক্ষা নহে।

ম্যাট্‌সিনি বলেন—ভগবান ক্রমান্বয়ে মানবের ভিতর দিয়াই প্রকাশ পান—God manifests himself successively in humanity.

হিন্দুধর্ম্মেও জগতের হিতের জন্য—

'সম্ভবামি যুগে যুগে'

ভগবানোক্তি বলিয়া উল্লিখিত।

ম্যাট্‌সিনি ইতালি সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"আমাদের জাতির ভিতরে ধর্ম্মভাব নিদ্রিত আছে—জাগ্রত হইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। রাশি রাশি রাজনৈতিক তত্ত্ব প্রচার অপেক্ষা যিনি সেই সুপ্ত ধর্ম্মভাবকে জাগ্রত করিতে পারিবেন, তিনিই জাতির অধিকতর উপকার সাধন করিবেন।*

আমারও আজ সেই কথা। এই কোটি কোটি হিন্দুর মধ্যে এরকম একটি লোকও জন্মে নাই, ইহা বিশ্বাস করি না। আজ এই ধর্ম্মসভা হইতে ধর্ম্মোৎসবের দিনে সেই ভাব জাগ্রত হয়, এই আমার প্রার্থনা।

ওঁ ব্রহ্মার্পণমস্তু

* The religious sentiment sleeps in our people waiting to be awakened. He who knows how to raise it, will do more for the nation than can be done by twenty political theories.

পুস্তক-পরিচয়

মৌমাছি-পালন

শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ বি-এ প্রণীত, মূল্য চৌদ্দ আনা

ভারতীয় কৃষি-বিভাগের কীটতত্ত্ববিদের সহকারী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এই পুস্তকখানি প্রকাশিত করিয়াছেন। পুসা এগ্রিকল্-চারেল রিসার্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউট বৎসরের মধ্যে অনেক পুস্তক ও পুস্তিকা প্রকাশিত করেন; কিন্তু সে সমস্তই ইংরাজী ভাষায় লিখিত হয় বলিয়া ইংরাজী-অনভিজ্ঞ লোকের কোনই উপকারে আইসে না। এই মৌমাছি-পালন পুস্তকখানিও ইংরাজীতেই পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল; সদাশয় চারুবাবু এক্ষণে তাহা বাঙ্গালায় প্রকাশিত করিয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। মৌমাছি-পালন করিয়া কেমন করিয়া লাভবান্ হওয়া যায়, কি ভাবে মৌমাছি-পালন করিতে হয়, তাহার সমস্ত বিবরণ এই পুস্তকে অতি সহজ ও সুন্দর ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। চাকুরীজীবী বাঙ্গালী এই পুস্তক পাঠ করিলে দেখিতে পাইবেন, আমাদের দেশে কত লাভজনক ব্যবসায়ের পথ রহিয়াছে; শুধু একটু যত্ন-চেষ্টার প্রয়োজন। আমরা সকলকেই এই পুস্তকখানি পড়িবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। শুধু যে ব্যবসায়ীরাই পড়িবেন তাহা নহে, অপরেরও পড়া উচিত। বইখানির ছাপা অতি সুন্দর; অনেকগুলি উৎকৃষ্ট ছবিও আছে। পুসা কৃষি কলেজে গ্রন্থকারের নিকট বইখানি পাওয়া যায়।

নমিতা

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত, মূল্য দুই টাকা

শ্রীমতী শৈলবালা বাঙ্গালা উপন্যাস-পাঠকগণের নিকট অপরিচিতা নহেন; তাঁহার কয়েকখানি উপন্যাস বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। এই 'নমিতা' উপন্যাস তাঁহার যশঃ ক্ষুণ্ণ করে নাই। পুস্তকখানির আখ্যানভাগ খুব বিস্তৃত নহে; কিন্তু সুলেখিকা ইহাতে মনস্তত্ত্বের যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দর। কর্ত্তব্য-পরায়ণতা যে কেমন করিয়া জয়যুক্ত হয়, পরের অনিষ্ট করিতে গেলে যে কেমন করিয়া নিজেরই অনিষ্ট হয়, তাহা অতি সুন্দরভাবে এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। 'নমিতা'র চরিত্রে যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য লেখিকা মহোদয়া লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা সার্থক হইয়াছে। এই উপন্যাসখানির যথেষ্ট আদর হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

সুর সঙ্গীত

শ্রীনিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য এক টাকা

'সুর-সঙ্গীত' একখানি কাব্য। আজকালকার দিনে নূতন কবিতা বা কাব্যের নাম শুনিলে লোকের মনে আতঙ্কের সঞ্চার হয়; বিশেষ লেখক যদি অপরিচিত হন। কিন্তু আমরা নিঃশঙ্কচিত্তে বলিতে পারি, সুর-সঙ্গীত একখানি কাব্য—উৎকৃষ্ট কাব্য। যিনি এই কাব্যখানি পাঠ করিবেন, তিনিই লেখকের কবিত্বশক্তির ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। কি বিষয়-নির্ব্বাচন, কি বর্ণনা, কি শব্দযোজন, কিছুতেই এই কাব্যখানি অনাদরণীয় নহে। ইহা বিদ্যালয়ের পাঠ্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি।

সুনীতি

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ প্রণীত, মূল্য দেড় টাকা

পুস্তকখানির নাম পড়িয়া মনে হইয়াছিল, ইহা হয় ত কোন রমণীর নাম; কিন্তু তাহা নহে। সুনীতি পুরুষমানুষ এবং একটা মানুষের মত মানুষ। দরিদ্র অনাথ বালক নিরাশ্রয় অবস্থায় পতিত হইয়াও স্বাবলম্বনের বলে কেমন করিয়া উন্নতি লাভ করিতে পারে, এই উপন্যাসে তাহাই বলা হইয়াছে; এবং যেমন করিয়া বলিলে ঠিক বলা হয়, তাহাই বলা হইয়াছে। বইখানি আজকালকার উপন্যাস লিখিবার ধরণে লিখিত নহে; পূর্ব্বে যে ভাবে আখ্যায়িকা লিখিত হইত, সেই ভাবেই লিখিত। লেখক মহাশয় অতি কৌশলে ইহার মধ্যে নানাস্থানের ভ্রমণ বৃত্তান্তও দিয়াছেন। লেখকের লিপিকুশলতা প্রশংসনীয়; ভাষার উপর তাঁহার বেশ অধিকার, দৃশ্য-বর্ণনাও অতি সুন্দর; আখ্যানভাগেও বৈচিত্র্য আছে।

জলছবি

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য আট আনা

এখানি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌স প্রকাশিত আট-আনা-সংস্করণ গ্রন্থমালার ত্রয়স্ত্রিংশ গ্রন্থ। ইহাতে কতকগুলি ছোট গল্প প্রকাশিত হইয়াছে। গল্পগুলির প্রায় সবই ইতঃপূর্ব্বে মাসিকপত্রে পাঠ করিয়াছিলাম; কিন্তু সেগুলি এতই সুন্দর, এমনই ঝরঝরে, এমনই চিত্তাকর্ষক যে, এই পুস্তকে সেগুলি পুনরায়, বলিতে গেলে, এক নিঃশ্বাসে পড়িয়া ফেলিতে হইল। ছোট গল্পের আর্ট যে কি, তাহা মণিলাল বাবুর এই গল্পগুলি পড়িলে বেশ বুঝিতে পারা যায়। কোন্‌টী রাখিয়া কোন্‌টীর নাম করিব,—সবগুলিই মনোহর। এই পুস্তকখানি আটআনা-সংস্করণের অন্তর্গত দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

পুষ্পরাণী

শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল বি-এ প্রণীত, মূল্য দেড় টাকা

এখানি উপন্যাস। ইহাতে বিস্ময়কর কোন ঘটনার সমাবেশ নাই, দরিদ্র বাঙ্গালী গৃহস্থের সুখ-দুঃখের কথাই ফণীন্দ্রবাবু এই উপন্যাসে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বাঙ্গালী গৃহস্থের গৃহিণী একমাত্র ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া কি ভাবে সংসার-সংগ্রামে জয়ী হইতে পারে, 'পুষ্পরাণী'র নির্ভরশীল চরিত্রে তাহা অতি সুন্দররূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। মাতার সুশিক্ষায় সন্তানগণ কেমন উন্নত-চরিত্র হইতে পারে, এই উপন্যাসে তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পুস্তকখানি নিঃসঙ্কোচে স্ত্রী, কন্যা, পুত্রবধূদিগের হস্তে দেওয়া যাইতে পারে; এবং তাঁহারা এই পুস্তক পাঠে সুশিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন।

প্রাচীন উৎকল (গঙ্গাবংশ)

[আলোচনা]

[শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার বি-এল্]

বিগত ১৩২৫—ভাদ্র সংখ্যা ভারতবর্ষে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দাস মহাশয় কর্তৃক সঙ্কলিত "উৎকল সাহিত্য" শীর্ষক প্রবন্ধটীর মধ্যে মুকুর (জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫) হইতে 'প্রাচীন উৎকল' (গঙ্গাবংশ) প্রবন্ধ গৃহীত হইয়াছে। ঐ প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। 'প্রাচীন উৎকল' প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত জগবন্ধু সিংহ মহাশয় মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যাদির মাহিষ্য ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণাদির কৈবর্ত্ত জাতিকে অভিন্ন স্বীকার করিয়াও বলিতেছেন—"উড়িষ্যার কেওটেরা অতি নীচ জাতি ও ইহাদের জল অস্পৃশ্য। নৌ-চালন ও মৎস্য ব্যবসায় ইহাদের প্রধান ব্যবসায়। সুতরাং গজপতিগণের সহিত ইহাদের সম্বন্ধ অতি হাস্যাস্পদ কথা।" উড়িষ্যার কেওটেরা যাজ্ঞবল্ক্যাদির মাহিষ্য জাতি নহে। উড়িষ্যার কেওটদিগের সহিত মাহিষ্য জাতির কোন সম্বন্ধ নাই। সুতরাং গজপতিগণের সহিত উক্ত কেওটদিগের কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। উড়িষ্যার কেওটেরা মনূক্ত নৌ-কর্ম্মজীবী কৈবর্ত্ত। উহারা নিষাদ পিতার ঔরসে আয়োগবী মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। উহাদের জাতীয় ব্যবসায় নৌ-কর্ম্ম ; পৈতৃক ব্যবসায় মৎস্য-ঘাত। যথা—

নিষাদো মার্গবং সূতে দাশং নৌকর্ম্মজীবিনম্।
কৈবর্ত্তমিতি যং প্রাহুরার্য্যাবর্ত্ত নিবাসিনঃ॥

মনু, ১০ম অধ্যায়, ৩৪ শ্লোক।

অন্যত্র নিষাদের ব্যবসায় আছে—'নিষাদানাং মৎস্যঘাতঃ'। উড়িষ্যার কেওটদিগের যখন নৌকর্ম্ম ও মৎস্যবিক্রয়াদি ব্যবসায় পাইতেছি, তখন উহারাই মনূক্ত নৌকর্ম্মজীবী কৈবর্ত্ত। উহাদের সহিত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণাদির লিখিত কৃষিজীবী ক্ষত্রিয়-নন্দন মাহিষ্যজাতির কোন সম্বন্ধ নাই।

এক্ষণে গঙ্গাবংশের কথা। লেখক নরসিংহ তাম্রশাসনের প্রমাণে বলেন, গঙ্গাবংশীয়েরা চন্দ্রবংশসম্ভূত। গঙ্গাবংশীয়েরা মাহিষ্য হইলেও চন্দ্রবংশীয় হওয়া অসম্ভব নহে। মাহিষ্যজাতির পিতা ক্ষত্রিয়, মাতা বৈশ্যা। সুতরাং পিতৃকুল স্মরণে তাঁহারা স্বীয় বংশ-প্রশস্তিতে নিজেদের চন্দ্রবংশ-সম্ভূত বলিবেন, বিচিত্র কি ?

এক্ষণে দেখা যাউক, চন্দ্রবংশসম্ভূত গঙ্গাবংশীয়দিগের আদি বাসস্থান কোথায় ? লেখক বলিতেছেন, অনন্তবর্ম্মার রাজধানী গঞ্জাম-জেলার অন্তর্গত গঙ্গাবাড়ী গ্রামে ছিল ; এবং ইহা তাম্রশাসনের উক্তি বলিয়া তিনি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। অনন্তবর্ম্মার রাজধানী গঙ্গাবাড়ী হইতে পারে। তাহাতে তাঁহারা যে গঞ্জামের লোক বা উড়িয়া, ইহা সপ্রমাণ হয় না।

গঙ্গাবংশানুচরিতও সমসাময়িক ইতিহাস নহে। ইহা অনন্তবর্ম্মার বহুকাল পরে রচিত। উহাতেও গঙ্গাবংশীয় চুড়গঙ্গদেবকে "কেহ কেহ 'গৌড়শঙ্খ' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন" লিখিত আছে। "গৌড়শঙ্খ-বংশই পরিণামে গঙ্গাবংশ নামে খ্যাত হইয়াছে।" লেখকের উদ্ধৃত গঙ্গাবংশানুচরিতেও এই কথার উল্লেখ আছে। "গৌড়শঙ্খ" বংশ বলাতেই গঙ্গাবংশের বাঙ্গালীত্ব সূচিত হইতেছে।"

মূল মাদলা পঞ্জিকা বহুকাল হইল বিলুপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান মুদ্রিত মাদলা-পঞ্জিকার হস্তলিপি জনশ্রুতিমূলে লেখা।

'গঙ্গাবাড়ী' শব্দ কখন 'গঙ্গারাঢ়ী'তে পরিণত হইতে পারে না। অনন্তবর্ম্মা বা কোলাহল একাদশ শতাব্দীতে উৎকলের রাজা হন। 'গঙ্গারাঢ়ী' রাজ্যের উল্লেখ আমরা খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে প্রাপ্ত হই। মৌর্য্য সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। গ্রীক্ দূত মিগাস্থিনিস্ মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের সভায় বিদ্যমান ছিলেন। তিনি গঙ্গারিডি নামক এক জনপদের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, "গঙ্গারিডি" রাজ্য খৃষ্ট জন্মের ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল ; এবং মিগাস্থিনিস্ উক্ত রাজ্যের পূর্ব্ব সীমায় গঙ্গানদী প্রবাহিত হইতে দেখিয়াছিলেন। তৎপর খৃষ্টের প্রথম শতাব্দীতে পিরিপ্লাশ, খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে টলেমি, ১ম শতাব্দীতে রোমীয় মহাকবি ভার্জিল 'গঙ্গারিডি' রাজ্যের ও গঙ্গারাঢ়ী বীরগণের বীরত্বের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। (গৌড়রাজমালা দ্রষ্টব্য।) এই গঙ্গারাঢ়ী রাজ্যের অধীশ্বরই অনন্তবর্ম্মা বা কোলাহল। এ কথাও প্রস্তর-শাসনে লিখিত আছে। (P. C. XXXVIII Wilson's Preface to Mackenzie collections) ; সুতরাং পরবর্ত্তী কালের তাম্রশাসনে লিখিত গঙ্গাবাটী শব্দ দেখিয়া আমরা উহাকে বহুপূর্ব্বের গঙ্গারাঢ়ী বলিয়া অনুমোদন করিতে পারি না। এক্ষণে তাম্রশাসনের ও প্রস্তর-শাসনের ঐক্য করিলে প্রতীত হয়, রাঢ়ীয় কোলাহলই উড়িষ্যা-বিজেতা। সুদূর দাক্ষিণাত্যে গঞ্জাম জেলা পর্য্যন্ত তাঁহাদের অধিকারভুক্ত ছিল, এবং ঐ প্রদেশে গঙ্গাবাড়ী নামে রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল।

গঙ্গারাঢ়ী-রাজ মাহিষ্য ক্ষত্রিয়। ইঁহার স্বজাতীয়গণ উড়িষ্যায় খণ্ডাইত বা খড়্গধারী এই দেশীয় নামে পরিচিত হইয়াছেন। সকলেই জানেন ইতঃপূর্ব্বে উড়িষ্যায় খণ্ডাইত জাতিই শাসক জাতি রূপে গণ্য ছিল। এখনও সে শক্তি সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয় নাই। খুর্দ্দার রাজা (পুরীর রাজা) ও অন্যান্য গড়জাত রাজা সকলেই খণ্ডাইত-বংশোদ্ভুত। ইঁহারা ক্রমোন্নতিতে ক্ষত্রিয়পদবাচ্য হইয়াছেন। উড়িষ্যায় এরূপ কাণ্ড

প্রতি নিয়তই হইতেছে। (শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সিংহ প্রণীত 'উড়িষ্যার চিত্র' দ্রষ্টব্য) উড়িষ্যার খণ্ডাইত জাতিই মাহিষ্য ; তাই উড়িষ্যার স্মৃতিকার পণ্ডিত সর্ব্বস্য গ্রন্থে মাহিষ্য বৈশ্যধর্ম্মকৃৎ বলিয়া ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। উড়িষ্যায় মাহিষ্য না থাকিলে তদ্দেশীয় স্মৃতিতে মাহিষ্যের বিধিব্যবস্থা থাকিত না। তৎপরে প্রবন্ধ-লেখক লিখিয়াছেন, গঙ্গাবংশের রাজগণ "বাঙ্গালী" হইলে উড়িষ্যায় বঙ্গভাষা প্রচলিত হইত। এ কথা ঠিক নহে। দেশের অধিকাংশ অধিবাসী যে ভাষায় কথা বলে, দেশীয় রাজার রাজকীয় ভাষাও তাহাই হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ বঙ্গভাষার সহিত উড়িয়া ভাষার পার্থক্য অতি অল্প। প্রজার প্রীতি আকর্ষণের জন্য এবং শাসন-সৌকর্য্যের জন্য রাজার অধিকৃত দেশের ভাষার গ্রহণে জেতা জিত বৈদেশিক ভাব দূর হইয়া যায় ; প্রজাগণ রাজাকে স্বজাতি বলিয়া ভাবিতে অভ্যস্ত হয়। এই জন্যই দিল্লীর বাদশাহগণ স্বজাতীয় ভাষা পরিত্যাগ করিয়া উর্দ্দু ভাষা ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

গঞ্জাম জেলার অন্তর্গত বড় ক্ষেমুড়ি, ছোট ক্ষেমুড়ি, পারল্ ক্ষেমুড়ির রাজগণ গজপতি বা গঙ্গাবংশীয় লিখিত হইয়াছে। গজপতিবংশীয় হইলেই গঙ্গাবংশীয় হয় না। গজপতি উপাধি ভারতবর্ষের অংশবিশেষের রাজগণের উপাধি। ইহাতে বিভিন্নবংশীয় রাজগণ সকলেই গজপতি হইতে পারেন, অথচ গঙ্গাবংশীয় নাও হইতে পারেন। "নরপতি বিজয়" নামক জ্যোতিষ-শাস্ত্রে বর্ণিত আছে—গোদাবরী সাগর-সঙ্গম বিন্দু হইতে হরিদ্বার পর্য্যন্ত রেখা টানিতে হইবে। উক্ত রেখার ঈশান-কোণ ভাগ গজপতি ছত্রান্তর্গত ; অর্থাৎ ঐ রেখার উত্তর ভাগের রাজারা গজপতি (মহাভারত, ভীষ্মপর্ব্ব, ৩য় অধ্যায়, ৩১ শ্লোক। মহামহোপাধ্যায় চতুর্দ্ধুরীণ নীলকণ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য।) গজপতি ছত্রের অন্তর্গত দেশ, যথা—

"তত্রৈব গঙ্গাদ্বারং কুরুক্ষেত্রং শ্রীকণ্ঠং হস্তিনাপুরম্
অশ্চবক্ত্রে কপাদাশ্চ কর্ণ প্রাবারণ স্তথা।
বিনশ্যন্তি চ সর্ব্বে দেশাস্ত্বীশান গোচরে।"

তার পর গোদাবরী-সাগর-সঙ্গম-বিন্দু হইতে গঙ্গাদ্বার পর্য্যন্ত পাতের রেখার উত্তরে কলিঙ্গ, উৎকল, কর্ণাটাংশ, অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ, প্রয়াগ, মিথিলা, অযোধ্যা, কাশী, হস্তিনাদি এই সকল দেশের রাজারা গজপতি। সুতরাং এই সকল দেশের রাজারা যে-কোন জাতি ও যে-কোন বংশ হউক না কেন, গজপতি হইতে পারেন। অতএব পারল্ ক্ষেমুড়ির রাজগণের গজপতি উপাধি থাকিলেও, তাঁহারা যে গঙ্গাবংশীয় হইবেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই। যদি তাঁহারা গঙ্গাবংশীয় হ'ন তাহা হইলেও তাঁহারা গঙ্গারাঢ় দেশীয় গঙ্গাবংশীয় বটেন। তাঁহারা বাঙ্গালী মাহিষ্য-ক্ষত্রিয়ের স্বজাতীয় বটেন। বাঙ্গালী মাহিষ্য-জাতি বহু প্রাচীন কাল হইতে রাজদণ্ড হাতে লইয়া সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত ও ভারতসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই রণপোত প্রাচীনকালে "সদর্পে ভ্রমিত ভারতসাগরময়।" বিষ্ণুপুরাণে যে বিশ্বস্ফটিক বংশের বর্ণনায়, সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে যে পালবংশ ও দিব্যক্ প্রভৃতি রাজগণের বর্ণনায়, এসিয়াটিক্ সোসাইটীর জর্ণালে যে যবদ্বীপে মাহিষ্য রাজগণের এবং মাহিষ্মতী-মান্ধাতা ও মাহিষ্য মণ্ডলের বর্ণনায় এই জাতির অতীত গৌরব কাহিনী স্বর্ণাক্ষরে গ্রথিত হইয়াছে, প্রত্নতত্ত্ববিৎ চিন্তাশীল ঐতিহাসিক ভারতী মহাশয় তমোলুকের ইতিহাসে সেই মাহিষ্যজাতীয় নৃপতিগণের লীলা-নিকেতন তাম্রলিপ্ত রাজ্যের কথা লিখিতে গিয়া প্রসঙ্গক্রমে গঙ্গারাঢ়ী উৎকল বিজেতা গঙ্গাবংশের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা বাঙ্গালী মাহিষ্য-ক্ষত্রিয়।

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "পরদেশী" বাহির হইয়াছে মূল্য ॥০।

শ্রীযুক্ত কানাইলাল গুপ্ত প্রণীত "সদৃশ ভৈষজ্য বিজ্ঞান" প্রকাশিত হইয়াছে মূল্য ২৲।

শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত আটআনা-সংস্করণের পঞ্চত্রিংশ গ্রন্থ "ব্রাহ্মণ-পরিবার" ফাল্গুনের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাড়ী বিজ্ঞানের পদ্যানুবাদ "হাত দেখা" নামে প্রকাশিত হইল মূল্য ।০।

শ্রীযুক্ত নবচন্দ্র ন্যায়রত্ন প্রণীত "গৃহিণী" প্রকাশিত হইয়াছে ১।০।

"পরিচারিকা"—সম্পাদিকা শ্রীমতী রাণী নিরুপমা দেবীর "ধূপ" নামক কবিতা পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে ; মূল্য পাঁচসিকা।

শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় মহাশয়ের "পোকা মাকড়" নামক একখানি পুস্তক যন্ত্রস্থ। ইহাতে আমাদের দেশের সুপরিচিত কীট পতঙ্গের জীবনের ইতিহাস ও তাহাদের বংশের ধারা বিবৃত হইয়াছে।

মেদিনীপুর সাহিত্য-সভার বার্ষিক উৎসব আগামী শিবরাত্রির অবকাশে হইবে। এই সভার স্থায়ী সভাপতি রায় কৃষ্ণচন্দ্র প্রহরাজ মহাশয়ের অকালে পরলোক গমনে মহিষাদলের কুমার শ্রীযুক্ত গোপাল প্রসাদ গর্গ বাহাদুর সভার স্থায়ী সভাপতি হইয়াছেন।

এবার নিম্নলিখিত বাঙ্গালী ভদ্রলোকগণ বঙ্গীয় এবং বিহারের প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগ হইতে ভারতীয় শিক্ষা বিভাগে উন্নীত হইয়াছেন; (১) মিঃ জে, এন, দাস গুপ্ত, (২) মিঃ এস, সি, মহলানবীশ, (৩) মিঃ ডি, এল, মল্লিক, (৪) শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এবং (৫) মিঃ এম, ঘোষ।

কাশিম বাজারাধিপতি মাননীয় মহারাজা সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর চুঁচুড়া ফ্রেণ্ড্স্ ডিবেটিং ক্লাবের আগামী বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সত্যচরণ মিত্র প্রণীত "বড় বউ" বাহির হইয়াছে মূল্য ৸০।

এবার বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন হাবড়ায় হইবার ব্যবস্থা হইতেছে। কবে সম্মিলন হইবে, তাহা এখনও স্থির হয় নাই।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works.

"নিবিড়-কেশী, মুক্তা-দশনা, রক্তকমলাধরা রে"—৺দ্বিজেন্দ্রলাল

[শ্রীশিবকুমার চৌধুরীর অনুগ্রহে
শ্রীযুক্ত আযাকুমার চৌধুরীর আলোকচিত্র হইতে]

(Engraved at the Bharatvarsha Office).

Emerald Printing Works
CALCUTTA

চৈত্র, ১৩২৫

দ্বিতীয় খণ্ড] ষষ্ঠ বর্ষ [চতুর্থ সংখ্যা

জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত না বিকার ?

[শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম-এ]

বৈষ্ণব ও অদ্বৈতবাদী উভয়েই স্বীকার করেন যে, জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ উভয়ই। অর্থাৎ জগৎ-সৃষ্টি-ক্রিয়ার কর্ত্তা ব্রহ্ম; এবং যে উপাদান দ্বারা জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা ব্রহ্ম ব্যতীত কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। বৈষ্ণব ও অদ্বৈতবাদীর মতের মধ্যে এই পর্য্যন্ত সামঞ্জস্য থাকিলেও, উভয়ের মধ্যে, জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত না বিকার, এই লইয়া মতভেদ আছে। অদ্বৈতবাদী বলেন, জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত। বৈষ্ণব বলেন, জগৎ ব্রহ্মের বিকার।

বিবর্ত্ত ও বিকারের প্রভেদ এই ভাবে নির্দ্দেশ করা হয়—

সতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিকার ইত্যুদাহৃতঃ।
অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ॥

যেস্থলে দুইটী পদার্থ ভিন্ন বলিয়া প্রতীতি হয় এবং তাহারা বাস্তবিক ভিন্ন, সে স্থলে ঐ দুই পদার্থের মধ্যে যে পদার্থটি অপর পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাকে অপর পদার্থের বিকার কহে। যে স্থলে দুইটি পদার্থ ভিন্ন বলিয়া প্রতীতি হইলেও বাস্তবিক তাহারা ভিন্ন নহে, সে স্থলে একটী পদার্থকে অপর পদার্থের বিবর্ত্ত বলা হয়। দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা আরও পরিষ্কার হইবে। দুগ্ধ হইতে দধি উৎপন্ন হয়। দুগ্ধ ও দধি ভিন্ন বলিয়া প্রতীতি হয়। এবং তাহারা বাস্তবিকই ভিন্ন। এজন্য দধিকে দুগ্ধের বিকার বলা হয়। কিন্তু অল্পান্ধকারে রজ্জু দেখিয়া যখন সর্প ভ্রম হয়, তখন দৃশ্যমান বস্তুটি রজ্জু হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হইলেও, বাস্তবিক তাহা রজ্জু হইতে ভিন্ন নহে। এস্থলে কল্পিত সর্পটি রজ্জুর বিবর্ত্ত। উল্লিখিত দৃষ্টান্তদ্বয় বিকার ও বিবর্ত্তের প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত। অতএব অদ্বৈতবাদী যে বলেন, এ জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত, তাঁহার উদ্দেশ্য এই যে, যাহাকে আমরা জগৎ বলিয়া মনন করি, বাস্তবিক তাহা ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কিছু নহে। আমরা জগৎ বলিয়া ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন যে একটা

স্বতন্ত্র পদার্থের কল্পনা করি, তাহা আমাদের মনের ভ্রম। বৈষ্ণব বলেন তাহা নহে; যাহাকে আমরা জগৎ বলিয়া অনুভব করি, তাহা ব্রহ্ম নহেন; জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং তাহা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন।

উভয় মত আপাত-বিরোধী বলিয়া প্রতীত হইলেও, উহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, জগৎ যে ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন, ইহা বৈষ্ণব ও অদ্বৈতবাদী উভয়েই স্বীকার করেন। কিন্তু এই ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি ব্যাপারের উভয়ে ভিন্ন-ভিন্ন দৃষ্টান্ত দিয়া থাকেন। বৈষ্ণব বলেন, দুগ্ধ হইতে যেমন দধির উৎপত্তি, ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি সেইরূপ। অদ্বৈতবাদী বলেন, অস্পষ্ট দৃষ্ট রজ্জু হইতে যেরূপ সর্পের উৎপত্তি, ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি সেইরূপ। আমাদের মনে হয়, উভয় দৃষ্টান্তই কিয়দংশে দার্ষ্টান্তিকের অনুরূপ, কিয়দংশে বিভিন্ন। রজ্জু হইতে সর্পের উৎপত্তি ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তির অনুরূপ—এই অংশে যদিও আমরা সর্প দেখিতেছি, তথাপি রজ্জু রজ্জুই রহিয়াছে, তাহার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। সেইরূপ, যদিও জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, তথাপি, জগতের উৎপত্তির পরও, ব্রহ্মের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই;—তিনি জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে যেমন ছিলেন, পরেও সেইরূপ আছেন; তিনি অবিকারী, তাঁহার বিকার সম্ভব নহে। কিন্তু রজ্জুতে সর্পভ্রম দৃষ্টান্তটি ব্রহ্ম হইতে জগৎ-উৎপত্তির এই অংশে অনুরূপ হইলেও, উভয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে। রজ্জুতে যখন সর্প ভ্রম হয়, তখন আমাদের মনের মধ্যে সর্পের ধারণা হয়, মনের বাহিরে সর্পের কোন অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু জগৎ যে আমাদের মনের কল্পনা মাত্র। আমাদের মনের বাহিরে যে জগৎ বলিয়া কিছু নাই, ইহা যথার্থ নহে। আমাদের মনের বাহিরে যে জগৎ বলিয়া কিছু নাই, সমস্তই মনের কল্পনা—ইহা বিজ্ঞানবাদ; ইহা বেদান্তের মত নহে। বাস্তবিক, শঙ্করাচার্য্য "নাভাব উপলব্ধেঃ" এই বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্যে এই বিজ্ঞানবাদের খণ্ডন করিয়াছেন।* সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, রজ্জু হইতে সর্পজ্ঞানের উৎপত্তির সহিত ব্রহ্ম হইতে জগৎ-উৎপত্তির যেমন সাদৃশ্য আছে, সেইরূপ প্রভেদও আছে।

অপর দৃষ্টান্তটিও তথাবিধ। দুগ্ধ হইতে দধি উৎপত্তির সহিত ব্রহ্ম হইতে জগৎ-উৎপত্তির সাদৃশ্য এই পর্য্যন্ত যে, দধি নামক পদার্থের একটা অস্তিত্ব আছে, উহা আমাদের মনের ভ্রম নহে। সেইরূপ জগৎ নামক পদার্থের একটা অস্তিত্ব আছে, উহা আমাদের মনের ভ্রম নহে। কিন্তু দুগ্ধ হইতে দধির উৎপত্তির সহিত ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তির প্রভেদ এই যে, দধির উৎপত্তিকালে দুগ্ধের বিকার ঘটিয়া থাকে। যে দুগ্ধ হইতে দধি উৎপন্ন হইল, সে দুগ্ধটা আর দুগ্ধ থাকে না, একটা স্বতন্ত্র আকারে পরিণত হয়। কিন্তু জগতের উৎপত্তিকালে ব্রহ্মের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। তিনি জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে যেরূপ ছিলেন, পরেও অবিকল সেইরূপ থাকেন। তিনি বিকার-রহিত; তাঁহার কোন রূপ পরিবর্ত্তন সম্ভবপর নহে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, জগতের উৎপত্তি-ব্যাপারের যে অংশে প্রথম দৃষ্টান্তের সহিত সাদৃশ্য আছে, সেই অংশে অপর দৃষ্টান্তের সহিত প্রভেদ; আবার যে অংশে প্রথম দৃষ্টান্তটির সহিত প্রভেদ, ঠিক সেই অংশে অপর দৃষ্টান্তটির সহিত সাদৃশ্য। ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি এক অলৌকিক ব্যাপার। ঠিক তাহার অনুরূপ কোন লৌকিক দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে না। যে দৃষ্টান্তই দেওয়া যাইবে, তাহারই সহিত কিছু সাদৃশ্য থাকিবে, আবার কিছু প্রভেদও থাকিবে। জগতের উৎপত্তি-ব্যাপারের মধ্যে দুইটি বিশেষত্ব আছে। এক, ব্রহ্মের কোন পরিণতি বা বিকার হয় না; দ্বিতীয়, জগৎটা মনের কল্পনা বা ভ্রম নহে,—মনের বাহিরে জগৎ বলিয়া একটা কিছু আছে। বৈদান্তিকের দৃষ্টান্ত, রজ্জুতে সর্প ভ্রম, শুক্তিতে রজত-ভ্রম, ঐন্দ্রজালিকের ক্রীড়া, এই সকল দৃষ্টান্তই প্রথম লক্ষণ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে; কিন্তু ইহাদের দ্বারা দ্বিতীয় লক্ষণের ব্যত্যয় ঘটিয়াছে। পরন্তু, দ্বিতীয় লক্ষণ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যদি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়,—দুগ্ধ হইতে দধির উৎপত্তি, সমুদ্র হইতে ঊর্ম্মি ও ফেণরাশির উৎপত্তি,—তাহা হইলে দৃষ্টান্তগুলিতে প্রথম লক্ষণের ব্যত্যয় ঘটিবে; কারণ, দুগ্ধের যে অংশ হইতে দধি হইতেছে, তাহা আর দুগ্ধ থাকিতেছে না, সমুদ্রের যে অংশ ঊর্ম্মি ও ফেণরাশিতে পরিণত হইতেছে, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী আকারের

* প্রবন্ধান্তরে এই প্রসঙ্গের বিস্তারিত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

পরিবর্ত্তন হইতেছে। দৃষ্টান্ত দ্বারা ভগবানের মহিমা সম্পূর্ণ ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা ব্যর্থ হইবেই। তিনি অবাঙ্মনস-গোচর, তাঁহার দৃষ্টান্ত বা উপমা তিনি নিজেই।*

পূর্ব্বে যাহা বলা হইল, তাহাতে জগৎ ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অদ্বৈতবাদী ইহাতে আপত্তি করিতে পারেন। কারণ, তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে, জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। কিন্তু বাস্তবিক তাঁহার আপত্তির কারণ নাই। 'জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন'—বেদান্তবাদীর এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, জগৎ ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে; কারণ, বেদান্তবাদী বলেন যে, কার্য্য কারণ হইতে অভিন্ন; ব্রহ্ম যখন কারণ এবং জগৎ যখন কার্য্য, তখন জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। "তদনন্যত্বং আরম্ভণ শব্দাদিভ্যঃ" এই সূত্রের ভাষ্যে এ কথা বিস্তৃত ভাবে বলা হইয়াছে। বৈষ্ণবও যখন স্বীকার করেন যে, জগৎ ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন, তখন এ বিষয়ে তত্ত্বহিসাবে উভয়ের মধ্যে কোন মতভেদ নাই। বৈষ্ণব ব্রহ্ম হইতে জগতের ভেদ ব্যবহারিক হিসাবে বলিয়া থাকেন। ব্রহ্ম ও জগতের এই ব্যবহারিক ভেদ অদ্বৈতবাদীও অস্বীকার করেন না।

* বিবর্ত্তবাদ খণ্ডন করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব জগতের উৎপত্তি কিরূপে হয়, তাহা এই বলিয়া বুঝাইয়াছেন,

"মণি যথা অবিকৃতে প্রসবে হেমভার"

মণি হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ স্বর্ণের উৎপত্তি হয়, অথচ মণির কোন বিকার হয় না। এই দৃষ্টান্ত, জগতের উৎপত্তি-ব্যাপারের যে দুইটি লক্ষণ আমরা নির্দ্দেশ করিয়াছি, উভয় লক্ষণই অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। কিন্তু এই দৃষ্টান্তকে লৌকিক দৃষ্টান্ত বলা যাইতে পারে কি না সন্দেহ। স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়া স্বর্ণরাশি প্রসব করে এরূপ মণি কেহ দেখিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। পুরাণে এরূপ মণির উল্লেখ থাকিতে পারে।

মা

[শ্রীঅনুরূপা দেবী

(১৩)

মৃত্যুঞ্জয়ের এক সহপাঠী রেঙ্গুনে ওকালতি করিয়া বিপুল অর্থোপার্জ্জনান্তর ভবানীপুরের ভদ্রাসনে ফিরিয়া আসিলেন। সঙ্গে করিয়া আনিলেন একটী বয়স্থা অবিবাহিতা কন্যা। তিনি আসিয়াই যৌবনবন্ধু মৃত্যুঞ্জয়কে পত্র লিখিলেন যে, পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতি-মত তাঁহার পুত্রের সহিত কন্যা ব্রজরাণীর বিবাহ দিয়া এইবার তাঁহাকে নিশ্চিন্ত করা হোক। বিবাহের সমস্তই প্রস্তুত; কেবল কন্যা-পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া দিন স্থির করা বাকী। মেয়েকে তিনি বিশ হাজার টাকা নগদ এবং হাজার-পাঁচ-ছয়ের গহনা দিবেন, তা ভিন্ন আর যা কিছু। চিঠি পড়িয়া মায়ের বুক ঠেলিয়া একটা নিশ্বাস পড়িল; বলিলেন, "বরাতে নেই, কে দেবে?" পিতা উগ্রমূর্ত্তিতে প্রতারক ছোটলোক দীনু মিস্তিরের চতুর্দ্দশ পুরুষের পর্য্যন্ত সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া, শেষে যোগ করিলেন "যেমন কাল পড়েছে, বেহায়া ছেলেগুলো একটা নোলক-পরা মুখ দেখলেই তার পায়ে গিয়ে গলে পড়বে। দু'দিন আর সবুর সয় না। আমি বরাবর জানি............দত্ত আমার দোরে আসবেই আসবে, সেইজন্যেই না যেখানকার যত সম্বন্ধ, সব ছেড়ে দিচ্ছিলুম। ছেলে আমার মনে করলেন, বাবা বুঝি আর বিয়ে দেবেই না, নিয়ে এলেন দুম্ করে এক ডোমের বুড়ি ধরে! এখন কেমন হলো? এই পনের-ষোল হাজার হাত-ছাড়া হয়ে গেল কি না?"

কর্ত্তার রাগের সময় কথা কহিবার ভরসা কেহই রাখেন না; গৃহিণী তথাপি অনুচ্চকণ্ঠে ধীরে ধীরে যে যুক্তি দ্বারা আত্মসান্ত্বনা সম্পাদন করিয়াছিলেন, সেই যুক্তিটাকে স্বামীর ক্রোধ-নিবৃত্তির জন্য প্রয়োগ করিতে চাহিলেন; কহিলেন—"তা বউমাটি আমার রূপে গুণে লক্ষ্মী। এমন হাজারে একটী মেলে কি না সন্দেহ।" "ওঃ! পরীর বাচ্ছা আর কি! রেখে দাও রূপ-গুণ! বাপ যার অষ্ট ভক্ষ ধনুর্গুণ—তার মেয়ের আবার রূপ-গুণ কিসের? ....দত্তর কত বড় নাম। দশের কাছে বলতে মুখ উজ্জ্বল হতো। বল কি তুমি, এ কি কম আপশোষ!"

মনে-মনে নিজের গালে-মুখে চড়াইতে-চড়াইতে প্রকাশ্যে দীনু মিত্র প্রভৃতির পিতৃপুরুষগণকে উদ্ধার করিতে-করিতে গৃহস্বামী গৃহের বাহির হইলেন। সেদিন হইতে মনোরমার

প্রতি বিদ্বেষের মাত্রা শতগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। অরবিন্দকেও অনেকখানি ভৎর্সনা সহ্য করিতে হইল।

এমনি দুঃসময়ে কঠিন রোগে শয্যাশায়িনী দুর্গাসুন্দরীর অজস্র অশ্রুজলে বিগলিত দীনু মিত্র অনেক দুঃখে সংগৃহীত অলঙ্কারের শত মুদ্রা এবং ফার্ষ্ট ক্লাস রিজার্ভের হিসাব মত টাকাগুলি বৈবাহিকের দরবারে পেঁাছাইয়া ভিখারীর মত একটী পাশে জড়-সড় হইয়া বসিয়া পড়িলেন, মুখ ফুটিয়া কথা বলিবার ভরসা হইল না। এই চেষ্টাই যে শেষ চেষ্টা, সে সম্বন্ধে তাঁহার চিত্তে কোনই সংশয় ছিল না; পাছে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব বারের ন্যায় এবারও প্রার্থনা নামঞ্জুর হইয়া যায়, সেই ভয়ে গলা দিয়া স্বর ফুটিতেছিল না। স্ত্রী যে মৃত্যুশয্যায় শুইয়া উৎকণ্ঠা-দিগ্ধ ব্যাকুলতায় দ্বারের দিকে চাহিয়া আছে, নিরাশার আঘাতে হয় ত সেই নির্ব্বাণোন্মুখ জীবন-প্রদীপ-টুকু মুহূর্ত্তে নিবিয়া যাইবে; সে যে তাহার একমাত্র জীবিত সন্তানকে মরণকালে শেষ দেখা দেখিতে চাহিয়াছে,—আর বুঝি বা শুধু সেই আশাটুকু অবলম্বন করিয়াই এখনও বাঁচিয়া আছে। দীননাথের বুকের মধ্যে হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিল! চেষ্টা যদি সফল না হয়!

একটী দুইটি করিয়া পাঁচ সাতটি মক্কেল-মহাজনের আগমন ঘটিল; কাগজ-পত্র দেখাইল, অগ্রিম দর্শনী দান করিল। বসুমহাশয় কাহারও প্রদত্ত দক্ষিণা হাত পাতিয়া লইলেন, কাহারও বা পা দিয়া ছড়াইয়া ফেলিলেন। আবার তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে দেব-তুষ্টি সম্পাদিত হইল। কাগজপত্রে কোথাও একবার কটাক্ষক্ষেপ হইল, কেহ বা সময়ান্তরে আসিবার হুকুম লইয়া ফিরিয়া গেল,—সহস্র কাকুতি-মিনতিতেও দৈব-প্রসন্নতা-লাভ ভাগ্যে ঘটিল না। মৃত্যুঞ্জয় বসুর মস্ত নাম,—অ-প্রতিহত প্রভাব। লাথি খাইয়াও বন্যার বেগে টাকা আইসে,—গালি খাইয়াও মক্কেল ভাঙ্গিয়া যায় না। দরিদ্র দীননাথ বিস্ময়-স্তিমিতনেত্রে চাহিয়া-চাহিয়া এই সব দেখিতেছিলেন; আর ভাবিতে-ছিলেন শত-শত মিষ্টভাষী, শিষ্ট, শান্ত, নূতন-পুরাতন নিরীহ উকিলের কথা।

মক্কেলগণকে বিদায় দিয়া গাত্রোত্থান করিতে উদ্যত বসুজের পায়ের কাছে নোটের গোছাগুলা রাখিয়া দিয়া, সশঙ্ক সন্দেহে অস্ফুট স্বরে দীনু মিত্র কহিলেন, "আমি এই টাকাটা দিতে এসেছিলুম,—আর অমনি একটীবারের জন্য—"

"টাকা তো ইন্‌সিওরড্ হয়েই আসতে পারতো, অনর্থক আবার আসা কেন?" দুঃখিত নম্রকণ্ঠে দীননাথ উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে, আপনার বেয়ান ঠাকরুণের জীবনের আশা বড়ই কম,—ডাক্তার-কবিরাজে একরকম জবাবই দিয়েছে। তাঁর বড় সাধ—একটীবার মেয়েটার মুখটি দেখে যান। যদি অনুগ্রহ করে একটী হপ্তার জন্যেও একটীবার পাঠিয়ে দেন, তা'হ'লে তাঁর শেষ মুহূর্ত্তটা হয় ত এতটুকু সুখের হয়!"

দরিদ্র বৈবাহিকের অশ্রু-বাষ্প-রোধে বিজড়িত বিনীত ভিক্ষা মৃত্যুঞ্জয়ের সংসারাভিজ্ঞ চিত্ত বিন্দুমাত্র টলাইতে সমর্থ হয় নাই, তাহা তাঁহার ওষ্ঠাধরের কঠিন অবিশ্বাসের অবজ্ঞার হাস্যরেখাটুকুতেই প্রকাশ পাইল। তিনি মৃদুমৃদু হাস্যের সহিত মাথা দুলাইতে-দুলাইতে উত্তর দিলেন, "তা এ' একটা বড় মন্দ চাল চালনি বেয়াই। তা মতলবটা করেছিলে ভালই; তবে কি না,—কি জান, এসব চাল একদম পুরণো হয়ে গিয়েছে। এ'তে আর এই জোচ্চোর, বেঁটে, চুল-পাকানো মৃত্যুন্ বোসের চোখে ধুলো দেওয়া যায় না। স্বচক্ষে দেখলে ত—সকাল থেকে অমন কত শালার-বেটা-শালা এসে ঐ জোচ্চুরি ঢাকবার মতলবেই এই দু'পায়ে জলের মতন টাকা ঢেলে দিচ্চে। ওসব এখানে চলবে না ভাই,—ওসব ফন্দি খাটবে না।"

দীননাথের গৌর মুখ অপমানে রাঙা হইয়া উঠিল। অতি কষ্টে আত্মদমন করিয়া তিনি রুদ্ধকণ্ঠে কেবলমাত্র প্রত্যুত্তর করিলেন—"জোচ্চুরি করা কখনও ত অভ্যাস ছিল না বেয়াই!" "সত্যি? আমি ত দেখছি, এ অভ্যাসটি তোমাদের চোদ্দপুরুষে পাকাপোক্ত। এই যে ছলে-কলে ছেলেটাকে, প্রতিবেশী বন্ধু লাগিয়ে, একটা খেড়ে, ধিঙ্গী মেয়ে দেখিয়ে, নিজেদের খপ্পরে ফেল্লে—হাত করলে,—এটা কি জোচ্চোর, বাটপাড়ের চেয়ে কোন অংশে কম? এই যে সিকিপয়সার গয়নায় দাম আদায় হয়ে আসতে পুরো একটী বচ্ছর কাল কেটে যায়, এটা কোন্ সাধুতা? তা'পর দূর দূর করে বিদায় দিলেও ফের এই যে জ্যান্ত মানুষকে মরিয়ে দিয়ে মেয়ে নিতে এসেছ, এর চেয়ে হারাম-জাদকি আর কিছু সংসারে আছে? তুমি জোচ্চোর নও? তোমার চোদ্দপুরুষ জোচ্চোর।"

দীননাথ বসিয়া ছিলেন, বিবর্ণ মুখে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন,—"আমি আপনার ঘরে মেয়ে দিয়ে যে মহাপাতক করেছি, তার প্রায়শ্চিত্তের জন্য আমায় আপনি ছোটলোক, জোচ্চোর, বাটপাড়—সবই বল্‌তে পারেন ; যেহেতু, আমি যখন দরিদ্র, আমি যখন মেয়ে-জামাইকে সোণায় মুড়তে পারিনে,আপনার প্রকাণ্ড দর-দালান তক্তের আস্‌বাবে ভরিয়ে দেওয়া যখন আমার সাধ্য নয়—তখন জোচ্চোর, বাটপাড়, ছোটলোক ছাড়া আমি কি ? কিন্তু আমার বাপ-পিতামহ—হরনাথ মিত্র, সুরনাথ মিত্র নিতান্তই ছোটলোক ছিলেন না, তাঁদের নাম কীর্ত্তি এখনও দেশ হতে একেবারে লোপ পায় নি। তাঁদের আপনি অপমান কর্ব্বেন না,—তাঁরা মহাপুরুষ ছিলেন।" "মহাপুরুষের ঔরসে মহাপাতকীর—বিশ্বাসঘাতক, জোচ্চোর, বজ্জাতের জন্ম হয়—এটা একটু আশ্চর্য্য না ?—আমাদের মাঠাকুরুণের কি কোন রকম—"

দীননাথের শান্ত দুটি চোখ হইতে দগ্ধকারী অগ্নিকণা ঠিক্‌রাইয়া পড়িতে চাহিল ; এবং কম্পিত ওষ্ঠাধর-মধ্য হইতে লজ্জা-ঘৃণা-অপমান-মিশ্রিত তীব্র ক্রোধ-জ্বালার সহিত অতি তীব্রস্বরে বাহির হইয়া আসিল—"মুখ সামলাও—"

মুখের উপর এতখানি অপমানিত হইয়াও উদার-চিত্ত বৈবাহিক এতটুকু বিচলিত হইলেন না। যেমন ছিলেন তেমনি স্থির থাকিয়া, ঠিক তেমনি একটুখানি টেপা হাসির সহিত দীননাথের অরুণবর্ণ মুখের দিকে সোজা চাহিয়া কহিলেন "বলি আপনি যাবে, না, দরোয়ানদের ডাক্‌তে হবে ?" দীননাথ অর্দ্ধমুহূর্ত্তকাল নিরুত্তর থাকিয়াই, ক্ষণপরে ক্রোধ-সংহত সহজকণ্ঠে উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে না,—আমি আপনিই যাচ্চি। মনোর গর্ভধারিণী পথ চেয়ে আছেন, তাকে তা' হ'লে বল্‌বো—তাঁর কন্যা এইখানেই মাতৃকৃত্য সমাধা কর্ব্বেন। তাঁর—"

অত্যন্ত আশ্চর্য্যসূচক দৃষ্টিতে চাহিয়া কন্যার শ্বশুর মহাশয় সঙ্গে-সঙ্গেই ব্যস্তভাবে বাধা দিলেন, "বলো কি ? তোমার মেয়ের এই বাড়ীতে আর তিলার্দ্ধও স্থান নেই। গাড়ী ডেকে আনো—না হয়, প্রবৃত্তি হয়, হাঁটিয়েও নিয়ে গেলে যেতে পারো। ও আর আমার কেউ নয়—স্রেফ্‌ তোমার মেয়ে। ওরে, এই চতুরিয়া—"

দীননাথের পায়ের তলার সমস্ত মাটীটা পদতল হইতে সরিয়া চলিয়া গিয়া সেইখানে প্রকাণ্ড একটা খাদ বাহির হইয়া পড়িল। এই খাদটার শেষ দেখা যায় না,—বোধ করি ইহার তল একেবারে সেই রসাতলেরই সমতলে! তিনি উন্মাদের মত ছুটিয়া আসিয়া বৈবাহিকের পা জড়াইয়া ধরিতে চেষ্টা করিলেন—"মেয়ের আমার অপরাধ কি ? এজন্মে সে আর তার বাপের বাড়ীর নাম শুনতে পাবে না ; এই আমি বিদায় নিয়ে চলে যাচ্চি—". বলিতে-বলিতে সত্যই উঠিয়া তিনি ঘরের বাহির হইতে গেলেন। কিন্তু গমনে বাধা পড়িল ; পশ্চাৎ হইতে গৃহস্বামীর গম্ভীর, অটল স্বর তাঁহার দুই জ্বলন্ত কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে গতিশক্তিহীন করিয়া দিল। নতুবা এসব কাহিনী এ বাড়ীতে প্রচার হইবার পূর্ব্বেই, ছুটিয়া গিয়া ষ্টেশনে পৌঁছিয়া, যে-দিককার যে-কোন একটা ট্রেণে চাপিয়া দেশ ছাড়িয়া পলাইতে তাঁহার ইচ্ছা করিতেছিল। লজ্জা, অপমান সমস্ত বিস্মৃত করিয়া দিয়া, প্রবল একটা আতঙ্কমাত্র এক্ষণে তাঁহার অপরাধী পিতৃ-হৃদয়কে অগ্নিদগ্ধ মুদ্গরাঘাত করিতে-করিতে ভর্ৎসনা করিয়া বলিতেছিল—'ওরে পাপিষ্ঠ! এই করিতেই কি তুই আসিয়াছিলি? নির্ব্বোধ নারীর অশ্রুজলে গলিয়া মেয়েটার কি সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছিস্‌, তাহা কি এখনও বুঝিস নাই?' কেমন করিয়া নিজের এই মহা অপরাধের বোঝা সমেত নিজেকে তিনি অকস্মাৎ এইখান হইতে লুপ্ত করিয়া মুছিয়া ফেলিতে পারেন, সেই একমাত্র মহা-চিন্তায় যখন হতভাগ্যের সর্ব্ব-শরীরে বিদ্যুতের ঝঞ্ঝনা বাজিতেছিল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে পিছন হইতে ডাক আসিল, "দীনু মিত্তির! মেয়ে নিয়ে গেলে ভাল কর্‌তে ; নতুবা পরে আপশোষ করবে। বোসেদের ঘরে তার স্থান তুমিই ঘুচিয়ে দিয়েছ ; না নিয়ে যাও,—হয় সে পরের ঘরে দাসীবৃত্তি করে খাবে, না হয় মা, ঠাকুমার কাছে যদি কোন বিদ্যে শেখা থাকে, তাও করে খেতে পারে,—আমার তাতে কোন লজ্জা নেই। আমি ওকে ত্যাগ করেছি।"

দীননাথ সহসা দুই জানু ভাঙ্গিয়া সেইখানে থপ্‌ করিয়া বসিয়া পড়িয়া, হতাশার্ত্ত ঊর্দ্ধশ্বাসে, ঊর্দ্ধমুখে শ্বাস টানিয়া উচ্চারণ করিলেন, "তবে নিয়েই যাবো।"

এক বৎসরের পরে পিত্রালয়ে প্রত্যাবর্ত্তনে বালিকা-বধূর চিত্তে যে অনির্ব্বচনীয় সুখের তরঙ্গ উত্থিত হওয়া স্বাভাবিক, এরূপ আকস্মিক স্তব্ধ, গম্ভীর বিষাদে তাহার

সে-রকমটা ঠিক হইতে পারিল না। বাহিরে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার কোন চাক্ষুস-সাক্ষী উপস্থিত না থাকায়, সব ঘটনাটার ইতিহাস ঠিক-ঠিক অন্তঃপুরে আসিয়া পৌছায় নাই। চতুরিয়া চাকর শশব্যস্তে আসিয়া খবর দিল যে, বৌমার মার কঠিন ব্যায়রাম; বাবা আসিয়াছেন; ১১টার ট্রেণে বৌমাকে লইয়া যাইবেন। বাবু বলিয়া দিলেন খুব শীঘ্র তাঁকে তৈরি করে দিন,—বাপের বাড়ীর গহনা ভিন্ন আর কিছু যেন না দেওয়া হয়, বলে দিলেন।" শরতের মুখ একটু ম্লান দেখাইল; তথাপি সখীর আনন্দে আনন্দিত হওয়ার চেষ্টা করিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এখানের গহনা দিতে বারণ করেছেন কেন মা?"

মা যেমন বুঝিয়াছিলেন তেমনি বলিলেন, "রোগের বাড়ী; তা'ছাড়া, এই ত সাতটা বদল হয়ে যাবে। দামী গহনা, তাই বারণ করেছেন। তা দেখ বৌমা, কাণের ইয়ারিং হু'চারটে ভাল-ভাল আংটি, মুক্তের জেলি, কণ্ঠি,—আর তোমার যা ইচ্ছে হবে, তুমি নিয়ে যাও। বাপ রয়েছেন সঙ্গে, ভয় কিসের? আহা, মা মাগি কিছুই দেখবে না? এই তো রোগ হয়েছে, যদি নাই বাঁচে!"

মা যদি না বাঁচেন! শুনিয়াই মনোরমার ছুটি চক্ষু দিয়া জলের ঝরকা ঝরিতে লাগিল। হাত দিয়া সেই জল মুছিয়া শেষ করিবার অনর্থক চেষ্টা করিয়া, সে ঘাড় নাড়িয়া অনিচ্ছা জানাইল; বলিল, "বাবা বারণ করেছেন, থাক না মা। মা ভাল হলে, এর পরে আবার যখন যাব, তখন নিয়ে যাব।" স্নেহময়ী শাশুড়ী কহিলেন, "তাই হোক মা, তাই হোক। আহা মা'টি তোমার সেরে উঠুন,—বাপ মিন্‌ষের আর তো ঘরে কেউ নেই।"

গহনা বাহির করিবার সময় শরৎশশী ছু'একখানা দামী গহনা, মনোরমার পিতৃদত্ত সামান্যগুলির সহিত যেন ভুল করিয়াই দিয়াছিল; সেগুলি ফিরাইয়া দিতে গেলে, সে ধমকিয়া উঠিল, "ওগো থাক্ থাক্, ও টায়রাটি না পরিলে তোমার মুখই মানায় না। কাণে কি শুধু ছুখানা কাণ ঝুলিয়ে নেমন্তন্ন খেতে যাবে? রেখে দাও ও সব।"

মনোরমার মনে বারেকের জন্য এই প্রিয়বস্তুগুলির প্রতি লোভ জাগিল। কিন্তু সে তখনি তাহা দমন করিয়া ফেলিল। শাশুড়ীর হাতে সেগুলি ফিরাইয়া দিয়া, একটু হাসিয়া বলিল, "এবারে থাক, বাবা যে বারণ করেছেন।"

শরতের মুখ ভার হইয়া রহিল! শাশুড়ী গলিয়া গিয়া মামীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "অমন সুবোধ মেয়ে কি আর আছে?"

আড়ালে আসিয়া মনোরমা হৃদয়-সঙ্গিনী ননন্দাকে চুপি-চুপি বলিল, "তাড়াতাড়ি একখানা চিঠি লিখে রেখে যাব, পাঠিয়ে দিবি ভাই?" শরৎ অশ্রু-স্তম্ভিত নতবক্ষে চাহিয়াই উত্তর দিল, "দেব না কেন!" "তুই রোজ একখানা করে চিঠি লিখবি?" "লিখব না কেন?" "আমি ভাই হয় ত রোজ জবাব দিতে পারব না।" "তা জানি।" "জান ত ভাই, মায়ের অসুখ—তাঁকে দেখতে-শুনতে হ'বে,—রাঁধতে হবে হয় ত। ও কি ভাই, তুই রাগ করছিস্ বুঝি? না ভাই, যেমন করে পারি, আমি রোজ চিঠি দোব দেখিস্।" মনোরমা শরতের গলা জড়াইয়া ধরিল, "লক্ষিটি, দিদিটি, আমার যাবার সময় চুপ করে থাকিস্ নে।" এই 'দিদিটি আমার' কথাটা সে স্বামীর নিকট লিখিয়াছিল। শরতের চক্ষু দিয়াও এইবার জলের ধারা নামিল।

আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন

[অধ্যাপক শ্রীজগদানন্দ রায়]

গরীব প্রতিবেশী দুই বেলা দুই মুঠা খাইতে পাইল কি না, আমরা তাহার সন্ধান রাখি না। কারণ ফুরসৎ নাই! তুলা বা পাটের দর নরম রহিল, কি গরম হইল,—তাহার খবরও আমরা পনেরো আনা লোকে লই নাই। কারণ এখন খবরের প্রয়োজন নাই। বিবাহে পণ লওয়ার বিরুদ্ধে যাঁহারা যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাঁহারা কি হালে আছেন, তাহারও খোঁজ করি না, কারণ মেয়ের বিবাহ দিয়া সারিয়াছি,—এখন ছেলের বিয়ের পালা। কিন্তু অসময়ে যদি দুই দিন মেঘে আকাশ ঢাকা থাকে বা তিন দিন বাতাস বন্ধ থাকিয়া রাত্রিতে গুমট হয়, তবে

তাহা আমাদিগকে এমন খোঁচা দেয় যে, ব্যাপারটাকে আমরা উড়াইয়া দিতে পারি না। তখন মনে হয়, প্রকৃতির এমন বে-নিয়মটি বুঝি কোন কালেই ঘটে নাই! ছেলে-বুড়ো, ধনী-নির্ধন,কুলি-বেহারা—সকলেই বলিয়া উঠে, এমন অপ্রাকৃত ঘটনা দেশের দুর্লক্ষণ! আরো আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে, প্রত্যেকেই ইহার এক-একটা কারণ দেখাইবার চেষ্টা করে।

সে দিন মাঘ মাসে ঘোর বর্ষার আবির্ভাবে যখন আমরা ঘরের কোণে আশ্রয় লইয়াছিলাম, তখন ঠিক্ ঐ কথাগুলিই মনে হইতেছিল। তখন একজন বন্ধু বলিতেছিলেন, য়ূরোপের যুদ্ধে চারি বৎসর ধরিয়া যে বারুদের ধোঁয়া উড়িয়াছে, তাহারি চারিদিকে জলের বাষ্প জমা হইয়া এই অকাল-বর্ষণের সূত্রপাত করিয়াছে। সঙ্গে-সঙ্গে আর এক বন্ধু বলিয়া উঠিলেন,—পঞ্জিকা-বিভ্রাটই এই সব অনর্থের কারণ; পঞ্জিকার শুদ্ধি কাজটায় হাত না দেওয়া-তেই আষাঢ়ে গ্রীষ্ম ঋতু দেখা দেয়; সুতরাং মাঘে যে বর্ষার উৎপাত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

এই সকল কথায় মন সায় দিল না। পৃথিবীতে বৎসরে যত বৃষ্টি-পাত হয়, তাহার মোটামুটি হিসাব তো জানাই আছে। বৎসরে-বৎসরে হিসাবের অঙ্কেও প্রায়ই মিল থাকে। তবে কেন এত ভাবনা-চিন্তা?

আমার মনে হইল, ঋতুর স্থায়ী পরিবর্ত্তন হইতেছে বলিয়া ধারণাটা আমাদের সম্পূর্ণ কাল্পনিক। ইহার কারণ আবিষ্কার মনস্তত্ত্বের বিষয়। ব্রণের বেদনায় যখন আমরা রাত্রিতে অনিদ্রায় ছট্‌ফট্ করি, তখন মনে হয় ইহার চেয়ে জ্বর হওয়া ভাল ছিল। আবার জ্বর হইলে মনে করি, জ্বরের যন্ত্রণা অসহ্য; ইহার চেয়ে ব্রণ হইলে সুস্থ থাকা যাইত। পূর্ব্বে ব্রণ যে বেদনা দিয়াছিল, তাহার কথা তখন মনেই পড়ে না। শীতকালে দু'দিনের জন্ম বর্ষণ নামিয়া যদি আরাম-ভোগেও একটু বাধা দেয়, তবে তখন ঐ রকম কারণেই আমরা ভাবি, এমন অনাসৃষ্টি ব্যাপার বুঝি পৃথিবীতে আর কখনো ঘটে নাই। আমরা অতীতের জ্বালা-যন্ত্রণা ভুলিয়া বর্ত্তমানের সামান্য বেদনাকেই গুরুতর মনে করি। বোধ করি, মানুষের ইহাই স্বভাব। সম্প্রতি একখানি বিদেশী খবরের কাগজে পড়িতেছিলাম; কিছুদিন পূর্ব্বে আমেরিকার কয়েকটি নদীতে যে ভয়ানক বন্যা হইয়াছিল, তার-হীন টেলিগ্রাফের প্রচলনই না কি তাহার কারণ। বৈজ্ঞানিক দেশের খবরের কাগজেরও সেই কল্পনা এবং সেই ভ্রান্তি! আকাশের বিদ্যুতের সঙ্গে আমাদের আব-হাওয়ার যে কোন সম্বন্ধ নাই, এমন কথা বলিতেছি না! কিন্তু তার-হীন টেলিগ্রাফের বৈদ্যুত-হিল্লোলই যে, দেশে প্রাকৃতিক অনর্থ টানিয়া আনিতেছে, ইহা হাস্যকরই মনে হয়।

প্রবন্ধের এই দীর্ঘ ভূমিকা দেখিয়া পাঠক যদি মনে করেন, রৌদ্র বৃষ্টি মেঘ কুয়াসা লইয়া আব-হাওয়ার যে সকল পরিবর্ত্তন আমাদিগকে পীড়া দেয়, আমরা এখানে তাহারি কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ দেখাইব, তবে তিনি মহা ভুল করিবেন। চৈত্রে আকাশের অবস্থা কি রকম থাকিবে, তাহা কোন পণ্ডিতই ফাল্গুন মাসে গণনা করিয়া বলিতে পারেন না। এমন কি ১৫ই তারিখে দেশের আবহাওয়া কি রকম দাঁড়াইবে, ১৪ই তারিখে ঠিক্ বলা যায় না,—খানিকটা অনুমান করা যায় মাত্র। এত শত শত প্রাকৃতিক ব্যাপারের সহিত আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন সম্পর্কিত যে, সকলগুলিকে বিশ্লেষ করিয়া সূর্য্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণের নিয়মের মত একটা নিয়ম খাড়া করা প্রায় অসাধ্য। বোধ করি, ইহার কাছে, নিউটন্ বা কেপলারের ন্যায় প্রতিভাও হার মানে। পৃথিবীর সকল দেশেই বৈজ্ঞানিকেরা অনেক দিন ধরিয়া দলে-দলে আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছেন; কিন্তু ইহা কোন নিয়ম মানিয়া চলে কি না এবং চলিলে সে নিয়মটার উৎপত্তি কোথায়, তাহা এ পর্য্যন্ত কেহ আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। যে সকল অবস্থার উপরে সাধারণতঃ আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন হওয়ার সম্ভাবনা, আমরা এই প্রবন্ধে তাহার একটু পরিচয় দিব।

সূর্য্যই সকল শক্তির কেন্দ্র, সুতরাং আবহাওয়ার উপরে যে ইহার প্রভাব নাই, এমন কথা কখনই বলা যায় না। প্রথমে সূর্য্যের কথাই আলোচনা করা যাউক।

প্রথমেই দেখিতে পাই, পৃথিবীর নিরক্ষ-বৃত্তের (Equator) নিকটবর্ত্তী জায়গায় সূর্য্যের কিরণ প্রায় সোজাসুজি আসিয়া পড়ে; কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণে মেরুর নিকটের জায়গায় তাহাই বাঁকিয়া আসিয়া ভূতলকে উত্তপ্ত করে। সোজা রাস্তা ধরিয়া চলার গুণ অনেক। ইহাতে বেশি রাস্তা চলিতে হয় না; পথের মাঝে বাধা-বিঘ্নও কম দেখা দেয়। কিন্তু বাঁকা রাস্তা ধরিলে পথের মাঝে অনেক সময়

কাটিয়া যায়, বাধা-বিঘ্নও খুব বেশি আসে। নিরক্ষ-দেশে সূর্য্যের যে সকল কিরণ সোজা আসিয়া পড়ে, তাহা আমাদের বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া বেশি সময় নষ্ট করে না, কাজেই বাতাসের জলীয় বাষ্প প্রভৃতিও তাহার তাপ অধিক পরিমাণে হরণ করিতে পারে না। ইহার ফলে, নিরক্ষমণ্ডলের নিকটবর্ত্তী জায়গায় সূর্য্যের তাপ বেশ কড়া রকম হইয়া আসে। উত্তর ও দক্ষিণ দেশে সূর্য্য-কিরণ বাঁকিয়া পড়ে বলিয়া, পথের মাঝে তাহার অনেক তাপই ক্ষয় পাইয়া যায়। কাজেই ঐ সকল দেশে সূর্য্যের তাপ খুবই মৃদু ভাবে আসিয়া দেখা দেয়।

নিরক্ষ প্রদেশ এবং মেরুর নিকটবর্ত্তী প্রদেশের সূর্য্যতাপের এই অসমতা পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ অর্দ্ধে দুইটা বড় রকমের বায়ু-প্রবাহের সৃষ্টি করে। নিরক্ষ-প্রদেশের বাতাস তাপ পাইয়া আকাশের উপরে উঠিতে আরম্ভ করে, তখন এই শূন্য স্থান পূর্ণ করিবার জন্য উত্তর ও দক্ষিণ মেরু হইতে শীতল বায়ু ছুটিয়া আসে। এই প্রকারে পৃথিবীর দুই গোলার্দ্ধে উত্তর হইতে দক্ষিণে এবং দক্ষিণ হইতে উত্তরে, দুইটি প্রবল বায়ু-প্রবাহ উৎপন্ন হয়। কিন্তু তাহা খাড়া উত্তর-দক্ষিণে বা দক্ষিণ-উত্তর মুখে আসিতে পারে না। পৃথিবী স্থির নাই। মেরুদণ্ডের চারিদিকে উহা পশ্চিম হইতে পূর্ব্বমুখে নিয়তই লাট্টুর মত ঘুরিতেছে। কাজেই ঐ প্রবাহ দু'টি নিরক্ষ-প্রদেশে সোজা না আসিয়া, উত্তর-পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়।

এ পর্য্যন্ত যাহা বলিলাম, তাহা স্কুলের পাঠ্য পুস্তকের কথা। কিন্তু তথাপি ইহা উপেক্ষার বিষয় নয়। বাতাসের চাপ ও তাপের হ্রাস-বৃদ্ধিতে পৃথিবীতে আবহাওয়ার যে পরিবর্ত্তন হয়, তাহার গোড়ায় এই বায়ু-প্রবাহকেই দেখা যায়। এই জন্যই বিষয়টি উল্লেখযোগ্য।

বাতাস জিনিসটা স্বচ্ছ বাষ্পীয় বস্তু হইলেও, তাহার ভার আছে। সুতরাং আকাশের উপরে পঞ্চাশ ষাট্ মাইল পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত থাকিয়া ইহা যে চাপ দেয়, তাহা সামান্য নয়। ভূতলের এক বর্গ-ইঞ্চি পরিমাণ জায়গায় সাধারণতঃ ইহার পরিমাণ প্রায় সাত সেরের সমান। পাত্রে গাঢ় জিনিস রাখিলে তাহার তলায় যে চাপ পড়ে, পাত্লা জিনিস রাখিলে তাহা অপেক্ষা অনেক কম চাপ পড়ে। বাতাসে ঠিক্ তাহাই দেখা যায়। জলীয় বাষ্পপূর্ণ গরম বাতাসের চেয়ে গাঢ়, শুষ্ক বাতাসের চাপ অনেক বেশি। চাপের এই রকম অসমতার সহিত ঝড়-বৃষ্টির ও আবহাওয়া-পরিবর্ত্তনের খুব নিকট সম্বন্ধ আছে।

পৃথিবীর সকল দেশেই জায়গায়-জায়গায় বায়ুর চাপ ও উষ্ণতার পরিমাপ করিবার ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক দিন চাপ ও তাপের যে পরিবর্ত্তন হয়, তাহার সংবাদ সংগ্রহ করিয়া দেশের মানচিত্রে সেগুলি অঙ্কিত রাখার রীতি আছে। যে সকল জায়গায় চাপের পরিমাণ একই থাকে, সেই সকল জায়গাকে রেখার দ্বারা সংযুক্ত করিয়া রাখা হয়। আমাদের দেশে কখনো-কখনো এই সকল সমচাপ-রেখা (Isobars) কোনো এক নির্দ্দিষ্ট স্থানকে কেন্দ্র করিয়া বৃত্তাকারে সজ্জিত থাকিতে দেখা যায়। এ দেশে কেন্দ্র-স্থানেই চাপ কম থাকে। এই প্রকার ঘটিলে ঝটিকাবর্ত্তের সম্ভাবনা দেখা দেয়। তখন সম-চাপের নিকটবর্ত্তী জায়গার বাতাস কেন্দ্রের দিকে ছুটিয়া চলিতে আরম্ভ করে; এবং সঙ্গে-সঙ্গে সমচাপ-রেখাকে ধরিয়া প্রবল বেগে পাক খাইতে থাকে। ইহাই ঝটিকাবর্ত্ত বা Cyclone.

রেলের রাস্তা যখন পাহাড়ে দেশের উপর দিয়া চলে, তখন প্রতি মাইলে রাস্তাটা কত উঁচু হইতেছে, তাহার পরিমাণ পথের পাশে কাষ্ঠফলকে লেখা থাকে। বোধ করি, রেলের গাড়ির চালক উহা দেখিয়া গাড়ি কি প্রকার বেগে চালাইতে হইবে, তাহা স্থির করিয়া লয়। সমচাপের রেখাগুলির চাপ কেন্দ্র হইতে কি পরিমাণে পর-পর বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহাও কতকটা ঐ রকমে আবহাওয়ার মানচিত্রে দেখানো হয়। কোনো রেখার চাপের তুলনায় তাহার খুব নিকটবর্ত্তী অপর রেখার চাপের পরিমাণ অত্যন্ত অসম হইলে, ঝড়ের প্রচণ্ডতা অত্যন্ত অধিক হয়।

কি প্রকারে আকাশের বাতাস ও জলীয় বাষ্প মোটামুটি ভাবে চলা-ফেরা করিয়া ঝড়-বৃষ্টির সূচনা করে, তাহার উল্লেখ করিলাম। কিন্তু এখানেই শেষ হইল না। জল ও স্থলের অবস্থান অনুসারে দেশে যে আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়, তাহাও বিবেচ্য।

সমস্ত দেশে জল ও স্থলের পরিমাণ সমান নয়। এই জন্য সমুদ্রের ধারে যে সকল স্থান আছে, তাহাদের আবহাওয়ার সহিত, সমুদ্র হইতে পাঁচশত মাইল দূরের জায়গার আবহাওয়ার ঐক্য দেখা যায় না। এই জন্যই, আবহাওয়ার

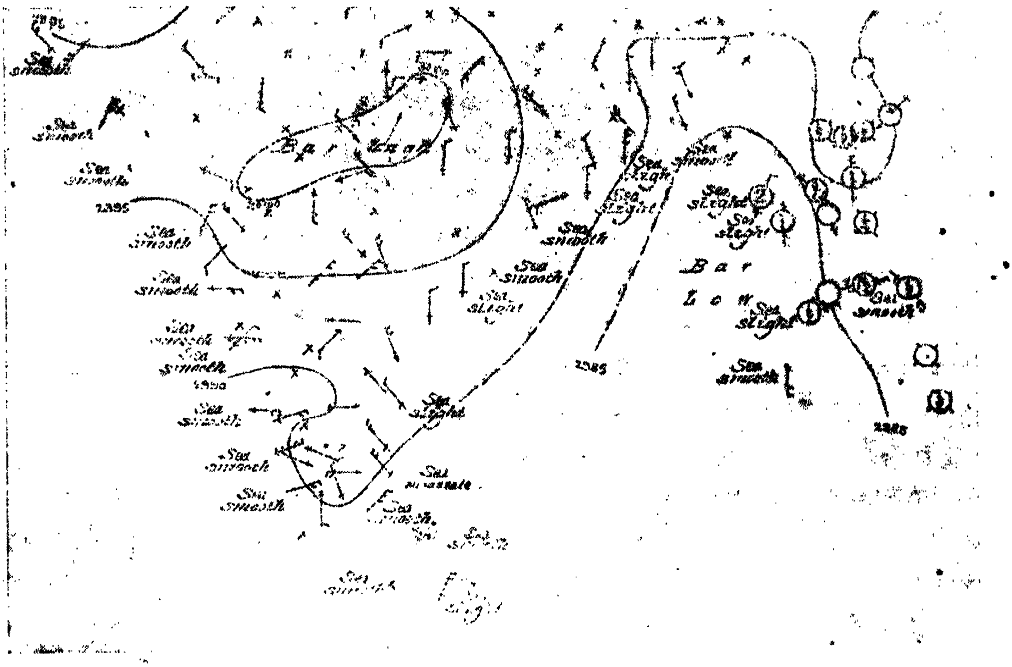

আবহাওয়ার মানচিত্র

আন্দাজ করিতে হইলে, দেশের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রের অবস্থান কি রকম, তাহা লইয়া হিসাব করা প্রয়োজন।

সূর্য্যের তাপে জল অপেক্ষা মাটী বেশি গরম হয়। ইহার ফলে দিনের বেলায় সমুদ্র হইতে ডাঙার দিকে একটী বায়ু-প্রবাহ চলিতে আরম্ভ করে। সূর্য্য অস্ত গেলে কিন্তু ইহার ঠিক বিপরীত ব্যাপারই দেখা যায়। তাপ ত্যাগ করিয়া তখন স্থল-ভাগ তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হইয়া যায়, কিন্তু সে রকমে তাপ ছাড়িতে পারে না বলিয়া জল ডাঙার তুলনায় বেশ গরম থাকিয়া যায়। কাজেই তখন বাতাস স্থল-ভাগ হইতে জলের দিকে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে। ইহা জল ও স্থলের উপরকার বায়ু-প্রবাহের সাধারণ কথা। দেশের উঁচু-নীচু স্থান, পাহাড়-পর্ব্বত এবং সমতল-ভূমিতে মিলিয়া আবহাওয়ার যে পরিবর্ত্তন করে, তাহা অত্যন্ত জটিল। এই পরিবর্ত্তনগুলিকে নির্দ্দিষ্ট নিয়মের গণ্ডির মধ্যে ফেলা যায় না। দেশের প্রকৃতি অনুসারে প্রত্যেক দেশেই উহা স্বতন্ত্র।

পাহাড়-পর্ব্বত ও সমভূমি দ্বারা আমাদের ভারতবর্ষে কি রকমে আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন হয়, তাহার আলোচনা করা যাউক। ইহা বুঝিলে, অন্য দেশে সেই অবস্থায় কি প্রকারে আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন হয়, তাহা সেই দেশের মানচিত্র হইতেই বুঝিতে পারিবেন।

ভারতবর্ষের দক্ষিণে মহাসাগর রহিয়াছে। গ্রীষ্ম ও বর্ষার দীর্ঘ দিনে যখন সমুদ্রের জলের তুলনায় স্থলভাগ বেশি গরম হয়, তখন দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে সমুদ্রের সরস বাতাস স্থলভাগের দিকে ছুটিতে আরম্ভ করে। ইহা জলীয় বাষ্প-পূর্ণ দক্ষিণ-বায়ু। জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি সময় হইতে আশ্বিনের কিছু দিন পর্য্যন্ত ইহা ভারতবর্ষে প্রবাহিত থাকে। এই বাতাস যদি পাহাড়-পর্ব্বতে বাধা পায়, তবে তাহার জলীয় বাষ্প জমাট বাঁধিয়া বৃষ্টির সূচনা করে।

ভারতবর্ষের মানচিত্রের দিকে তাকাইলেই দেখা যায়, দক্ষিণ-ভারতে করাচি হইতে নর্ম্মদা নদী পর্য্যন্ত কোনো জায়গায় উঁচু পর্ব্বত নাই। এইজন্য রাজপুতানা ও সিন্ধু দেশের উপর দিয়া ঐ জলীয় বাষ্পপূর্ণ বাতাস বৃষ্টি উৎপন্ন না করিয়া অবাধে চলিয়া যায়, এবং পরে যখন তাহা পঞ্জাব

ও যুক্ত-প্রদেশের সীমান্তে হিমালয় পর্ব্বতমালায় বাধা প্রাপ্ত হয়, তখন সেখানে প্রচুর বৃষ্টি উৎপন্ন করিতে থাকে।

দক্ষিণ-ভারতের তিন দিকে সমুদ্র। পশ্চিম-ঘাট পাহাড়ে বাধা পাইয়া ঐ দক্ষিণে-বাতাস মালাবার দেশে ভয়ানক বর্ষণ সুরু করে। এখানে বৎসরে প্রায় এক শত কুড়ি ইঞ্চি বৃষ্টি হয়!

আমাদের বঙ্গদেশে ও আসামে যে বায়ুতে বৃষ্টি হয়, তাহা বঙ্গোপসাগর হইতে ডাঙায় প্রবেশ করিয়া খাসিয়া পর্ব্বতে প্রথমে ধাক্কা খায়। ইহাতে চিরাপুঞ্জী অঞ্চলে ভয়ানক বৃষ্টি হয়। এ প্রকার বৃষ্টি পৃথিবীর অন্য কোনো স্থানেই হয় না। তার পরে সেই বায়ু যখন হিমালয়ে বাধা পাইয়া পশ্চিম-উত্তর দিকে চলিতে আরম্ভ করে, তখন বঙ্গদেশে বর্ষার সূত্রপাত হয়। কিন্তু এই বাতাস কখনই হিমালয় লঙ্ঘন করিয়া উত্তরে যাইতে পারে না। হিমালয়ের অপর পাশের তিব্বত প্রভৃতি দেশে এই কারণেই কদাচিৎ বৃষ্টি হয়।

ইহারই বিপরীত দেখা যায় কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে। তখন ভারতের স্থলভাগ সুদীর্ঘ রাত্রিতে তাপ ত্যাগ করিয়া সমুদ্র-জলের চেয়ে শীতল হইয়া পড়ে। কাজেই তখন আর একটী বায়ুর প্রবাহ ভারতের উপর দিয়া সমুদ্রের দিকে ছুটিতে আরম্ভ করে। ইহাই উত্তরে বাতাস। ভারতের উত্তরে সমুদ্র নাই। সুতরাং এই বায়ুতে জলীয় বাষ্প থাকে না এবং ইহা বৃষ্টিও উৎপন্ন করে না। কেবল বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়া আসিয়া এই প্রবাহের যে অংশটি ভারতের পূর্ব্ব-দক্ষিণ উপকূলের পর্ব্বতে বাধা প্রাপ্ত হয়, তাহাই জলীয় বাষ্প বহিয়া আনিয়া করমণ্ডল প্রদেশে বৃষ্টিপাত আরম্ভ করে।

সূর্য্যই যখন সকল তাপের আধার, তখন ইহার দেহের তাপ বাড়িলে বা কমিলে পৃথিবীর আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন হওয়া খুবই স্বাভাবিক। সূর্য্যের তাপ সত্যই বাড়ে এবং কমে। ইহার সহিত আবহাওয়ার কি প্রকার সম্বন্ধ তাহার একটু আভাস দিব।

পাঠক বোধ হয় জানেন, মাঝে-মাঝে উজ্জ্বল সূর্য্যমণ্ডলে এক রকম কাল দাগ দেখা যায়। জ্যোতির্ব্বিদ্গণ ইহাকে সৌরকলঙ্ক বলেন। আমাদের পৃথিবীর চারিদিকে যেমন বায়ুমণ্ডল আছে, সূর্য্যের চারিদিকে সেই রকম একটা অতি গভীর বাষ্পাবরণ আছে। সেই বাষ্পরাশি সর্ব্বদাই জ্বলিতেছে এবং চারিদিকে তাপ ছড়াইতেছে। আমরা পৃথিবীতে সূর্য্যের যে তাপ পাই, তাহা ঐ বাষ্পাবরণেরই তাপ। আমাদের আকাশে যেমন কখনো-কখনো ঝড় ও ঘূর্ণিবায়ু উঠিয়া বায়ুমণ্ডলকে চঞ্চল করে, সূর্য্যের বাষ্পাবরণ প্রায়ই ঝটিকাবর্ত্ত ও ঘূর্ণি দ্বারা ঐ রকম চঞ্চল হইয়া পড়ে। যখন ঘূর্ণি উঠিয়া সূর্য্যের বাষ্পাবরণকে এদিকে-ওদিকে সরাইয়া গর্ত্তের সৃষ্টি করে, তখনই সৌরকলঙ্কের উৎপত্তি হয়। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে, সূর্য্যমণ্ডলে যখন বেশি সৌরকলঙ্ক দেখা যায়, তখন তাহার তাপও অত্যন্ত অধিক হইয়া পড়ে। ইহাতে সমুদ্র হইতে জলীয় বাষ্প অধিক জন্মে এবং তাহার ফলে পৃথিবীতে সময়ে বা অসময়ে ঝড় বৃষ্টি প্রভৃতি নানা উপদ্রব দেখা দিয়া, একটা বিশ্রী কাণ্ড করিতে থাকে।

সৌর-কলঙ্ক

ইহাই সৌরকলঙ্কের একমাত্র কাজ নয়। পাঠক অবশ্যই দেখিয়াছেন, কম্পাসের কাঁটা সর্ব্বদাই উত্তর ও দক্ষিণে লম্বা হইয়া স্থির থাকে। সূর্য্যে বেশি কলঙ্ক দেখা দিলে, কম্পাসের কাঁটা আর ঐ রকমে স্থির থাকিতে চায়

না,—ক্রমাগত এদিক-ওদিক ঘুরিয়া বেড়ায়। তা'ছাড়া, ঐ সময়ে পৃথিবীকে ঘেরিয়া একটা প্রবল বৈদ্যুৎ-প্রবাহ চলিতে আরম্ভ করে। ইহার উৎপাতে টেলিগ্রাফের এবং টেলিফোনের কাজও বন্ধ হইয়া আসে। বৈজ্ঞানিকগণ ইহাকে চৌম্বক-ঝটিকা (Magnetic Storm) বলেন। কোনো জিনিস খুব গরম হইলে, তাহা হইতে স্বভাবতঃই অনেক বিদ্যুৎ-যুক্ত অতি-পরমাণু (Electron) বাহির হইয়া চারিদিকে ছুটাছুটি আরম্ভ করে। বস্তুমাত্রেরই ইহা সাধারণ ধর্ম্ম। সুতরাং সূর্য্যের জ্বলন্ত বাষ্পাবরণ হইতে যে নিয়তই কোটি-কোটি অতি-পরমাণু বাহির হয়, তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি। বৈজ্ঞানিকেরা আজকাল এই অনুমানকে অবলম্বন করিয়া চৌম্বক-ঝটিকার ব্যাখ্যান দিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, সৌরকলঙ্কের আবির্ভাব সময়ে সূর্য্যের বাষ্পাবরণে যে ঘূর্ণির সৃষ্টি হয়, রাশি রাশি বিদ্যুৎ যুক্ত অতি-পরমাণু তাহাতে আট্‌কাইয়া ক্রমাগত ঘুরপাক খায়। কাজেই লোহার চারিদিকে জড়ানো তারে বিদ্যুৎ চালাইলে যেমন লোহা চুম্বকত্ব পায়, ঘূর্ণ্যমান অতি-পরমাণুর দ্বারা সূর্য্যের বাষ্পাবরণও সেইরূপ জায়গায়-জায়গায় চুম্বকধর্ম্মী হইয়া পড়ে। তার পরে সেই চুম্বকের প্রভাবেই পৃথিবীতে চৌম্বক-ঝটিকার সৃষ্টি হয়।

চৌম্বক-ঝটিকা অন্য অপকার করিলেও, আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন করিয়া উপদ্রব করে না; কিন্তু সৌরকলঙ্ক দ্বারা সেই উপদ্রব যথেষ্ট হয়। এই প্রসঙ্গে বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করিতেছেন,—সূর্য্যের বাষ্পাবরণে যখন ঝটিকাবর্ত্ত চলে, তখন যে সকল অতি-পরমাণু ঝড়ে বেগ সঞ্চয় করিয়া পৃথিবীর বায়ু-মণ্ডলে আসিয়া পৌঁছে, সেইগুলিই আমাদের আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন ঘটায়। জলীয় বাষ্প যখন জমাট বাঁধিয়া মেঘের উৎপত্তি করিতে যায়, তখন তাহা কোনো কঠিন বস্তুকে আঁকড়াইয়া ধরিতে চায়। বায়ু-মণ্ডলে ধূলিকণার অভাব নাই। জলীয় বাষ্প সাধারণতঃ ধূলি-কণাকে আশ্রয় করিয়াই মেঘের উৎপত্তি করে। যেখানে ধূলিকণা বা সেই রকম কোনো অবলম্বন না জোটে, সেখানকার জলীয় বাষ্প অনায়াসে মেঘে পরিণত হইতে পারে না। সূর্য্যের অতি-পরমাণু পৃথিবীর বায়ু-মণ্ডলে আসিয়া পৌঁছিলে, জলীয় বাষ্পের আর আশ্রয়-বস্তুর অভাব থাকে না। তখন অতি-পরমাণুগুলিকে অবলম্বন করিয়া আকাশের জলীয় বাষ্প জমাট বাঁধে এবং রাশি রাশি মেঘের সৃষ্টি করিয়া বর্ষণ সুরু করিয়া দেয়।

এগারো বৎসর অন্তর সূর্য্যমণ্ডলে বেশি কলঙ্কের উৎপত্তি হয়, এবং প্রায়ই এই সময়ে পৃথিবীর নানা স্থানে ঝড় বৃষ্টি প্রভৃতি উৎপাত দেখা দেয়। কিন্তু এগার বৎসরের সঙ্গে সৌরকলঙ্কের সম্বন্ধ কোথায়, তাহা আজও জানা যায় নাই। তা' ছাড়া' সৌরকলঙ্ক দ্বারা যে সত্যই পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মেঘোৎপত্তি হয়, তাহাও সপ্রমাণ হয় নাই। কাজেই সূর্য্যের বাষ্পমণ্ডলের প্রভাবে পৃথিবীর আবহাওয়ার যে পরিবর্ত্তন হয়, তাহাতে কোনো নিয়মের বন্ধন আছে কি না, ইহাও জানা যাইতেছে না।

দাদামশায়ের বে'

[শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া]

(শেষার্দ্ধ)

(কথায় কথায় কাসি !)

বেলা তখন দুটা বাজিয়াছে।

বৃদ্ধ রায় মহাশয়ের নিভৃত ছোট বাড়ীখানির সদরের ঘরে উড়িয়া চাকর হরেকৃষ্ণ ও বাঁকুড়ার বাঙ্গালী বামুণ উপেন্দ্র বসিয়া, কলিকা ফুঁকিতে ফুঁকিতে ভূতপূর্ব্ব মনিবদের অজস্র সুখ্যাতির সহিত—বলাবলি করিতেছিল, তাহাদের মত গুণবান জীবের গুণ মর্য্যাদার সম্যক সমাদর পূর্ব্ব-মনিবরাই জানিতেন – অর্থাৎ বর্ত্তমান মনিব কিছুই জানেন না! এবং সেই হেতু তাহারা এক্ষেত্রে গুণপ্রকাশে উৎসাহহীন—ইত্যাদি।

এমন সময় সদলবলে চঞ্চল আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। ব্রামুণ ঠাকুর ব্যস্ত হইয়া বলিল, "এই যে ছোট খুড়োমশাই আলেন্। আমাদের বুড়ো বাবুটি তো আপনার

তরে হেঁপিয়ে সারা হচ্ছে—আসেন্ আসেন্, চলেন তেন্নার কাছে—"

চাঁকর হরেকৃষ্ণ দোক্তা-পানের ছোপে বিকৃত রক্তদন্ত বাহির করিয়া, এক গাল হাসিয়া বলিল, "হাঁ, ভোপুনো বাবু —আমারো বুঢ়াবাবু বিয়া করিবে কিড়ি—?"

সকলে মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করিয়া হাসিল। ভূপেন বলিল, "হাঁ গো কিড়িমিড়ি চন্দ্র, তোমার বাবু বিয়া করিবে কিড়ি, মোদ্দা তুমি কার কাছে খবর পেলে?"

হরেকৃষ্ণ অনেক হাসিয়া বিপুল-রসগর্ভ-বচন-বিন্যাসে যে সুদীর্ঘ কাহিনী বলিয়া গেল, তাহার সংক্ষিপ্ত অর্থ এই যে, —বুড়াবাবু আজ সকালে তাঁহাদের বাড়ী হইতে বেড়াইয়া ফিরিয়া অবধি অর্দ্ধোন্মাদ অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন! প্রায় পাড়াশুদ্ধ সকল মানুষের কাছেই তিনি—নগদ তিন হাজার টাকা, দুশো বিঘা দেবোত্তর জমি ও বিষ্ণু বিগ্রহ সহ সুন্দরী পাত্রীটির কথা বলিয়াছেন; এবং বৃদ্ধের উপযুক্ত পুত্রগণ যখন সকলেই নিজ-নিজ পরিবারবর্গ সহ যে-যার কর্ম্মস্থলে আড্ডা দিয়াছে, তখন বৃদ্ধের এই শূন্য আড্ডায় যে একটী গৃহিণী প্রতিষ্ঠা করা অত্যাবশ্যক, সে সম্বন্ধে প্রায় সকলকেই ধমকাইয়া সম্মতি দানে বাধ্য করিয়াছেন—এমন কি চাকর হরেকৃষ্ণ হইতে বামুণঠাকুর—'বাবা ওপীন্দো' পর্য্যন্ত সকলেই ধমকের ভয়ে খুসির সহিত সম্মতিদান করিয়াছে!—তার পর একজন জ্যোতিষীকে আনাইয়া, বেলা একটা পর্য্যন্ত বসিয়া বৃদ্ধ নিজের কুষ্ঠি দেখাইয়াছেন, তবে স্নানাহার করিয়াছেন। এখন হরিনামের মালা লইয়া তিনি চঞ্চলের আগমন-প্রতীক্ষায় ছট্‌ফট্ করিতেছেন—যেহেতু, আজ না কি এখানে কে তাঁহার 'কুটুম্বগণো' আসিবে,—চঞ্চলই তাহাদের অভ্যর্থনা করিবে কি না!

চঞ্চল গম্ভীরভাবে স্বীকার করিল, হাঁ, সে সম্ভাবিত কুটুম্বগণের অভ্যর্থনার তদন্তেই আসিয়াছে।—তার পর খুব সংক্ষেপে আর গুটিকতক জরুরী উপদেশ দান করিয়া—কুটুম্বদের আগমন-প্রতীক্ষায় তাহাদের বাহিরে বসিতে বলিয়া দলবল সহ চঞ্চল বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল।

বারেণ্ডায় কম্বল বিছাইয়া বসিয়া বৃদ্ধ মালা জপ করিতেছিলেন। মাণিক সঙ্গীদের ইঙ্গিতে জুতা খট্‌মট্ করিয়া সামনে গিয়া ডাকিল "দাদামশাই—"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া, চারিদিক চাহিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "কে হে, ভূপীন?"

মাণিক বলিল "আজ্ঞে না, আমি মাণিক—আপনাকে দেখ্‌তে এলুম"—মাণিক সসঙ্কোচে নিকটে গিয়া বসিল।

নাতিদের মুখে এই 'দেখ্‌তে এলুম্' কথাটা শুনিলেই বৃদ্ধের পিত্ত জ্বলিয়া যাইত!—যেহেতু তিনি নিশ্চয় জানিতেন, ঐ—'দেখ্‌তে এলুম' এর মুখ্য অর্থ—'জ্বালাতে এলুম' মাত্র! কাযেই ঈষৎ রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "কি দেখ্‌তে এলে? আমি সোণা না জহর, যে, আমায় দেখ্‌বে?"

মাণিক একটু পিছাইয়া বসিল; তার পর খুব ভয়ে-ভয়ে এবং অত্যন্ত ধীরে ধীরে বলিল "এই দেখ্‌তে এলুম,—আপনি মরে গেছেন, না এখনো বেঁচে আছেন!"

একে ত কর্ণদাহী "দেখ্‌তে এলুম্"—তার পর আবার এই মর্ম্মদাহী সুকঠোর উক্তি! ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া, গভীর গর্জ্জনে হুঙ্কার করিয়া বৃদ্ধ মাণিকলালের উর্দ্ধতন সপ্ত-পুরুষকে যথেচ্ছ গালাগালি দিয়া,—সজোরে ঝুলি ঝাঁকুনী দিয়া বলিলেন, "নিকাল যাও—তোম্ হামারা মোকামসে আবি নিকাল যাও"—রাগের চোটে তিনি সর্ব্বদাই বাংলা ভুলিয়া যাইতেন!

মাণিক এক লম্ফে আসিয়া থামের আড়ালে লুকাইল। তাহার সাড়াশব্দ বন্ধ হইয়াছে দেখিয়া, বৃদ্ধ গালাগালি থামাইয়া আবার মালাজপ সুরু করিলেন।

রান্নাঘরের আড়ালে লুকায়িত সঙ্গীদের নিকট হইতে বিস্তর রকমের উৎসাহ-সূচক নীরব ইঙ্গিত পাইয়া, ভয়ার্ত্ত মাণিকের বুকের ধড়্‌ফড়ানিটা অল্পক্ষণেই সারিয়া গেল। আবার পা টিপিয়া-টিপিয়া আসিয়া সে বৃদ্ধের সামনে বসিল। তার পর খানিক ভাবিয়া-চিন্তিয়া, বার কতক কাসিয়া, গুণ-গুণ স্বরে কবিতা গুঞ্জনে সুরু করিল—

"নাতি, নাতি, নাতি,—নাতি স্বর্গের বাতি!"

বলা বাহুল্য, কবিতা শুনিয়া বৃদ্ধের অন্তরাত্মা শীতল হইয়া গেল! রাগ সামলাইতে না পারিয়া, সজোরে তর্জ্জনি আস্ফালন সহকারে, তিনি গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "নেহি মাংতা!"—অর্থাৎ কি না নাতি আমি চাই না!

ভয়ে মাণিকের বুক দুরুদুরু করিতে লাগিল,—আড়-চোখে একবার সঙ্গীদের দিকে চাহিয়া, কোনক্রমে কিঞ্চিৎ সাহস সঞ্চয় করিয়া—তার পর সেও তেমনি ভাবে তর্জ্জনি

আন্দোলন করিয়া ঈষৎ জোরের সহিত বলিল—"মাংনে হোগা যাতা—"

উত্তেজিত হইয়া বৃদ্ধ বলিলেন "কভি নেই মাং'এঙ্গা—"

অধিকতর জোরের সহিত মাণিক বলিল,"আলবৎ মাংনে হোগা!—এখুনি যদি আপনি মরে যান, তা'হলে, কাঁধে করে নিয়ে যাবে কে?"

বৃদ্ধ হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন! সঙ্গে-সঙ্গে মাণিকও এক লাফে উঠানে পড়িয়া, উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া, রান্নাঘরের মধ্যে অন্তর্দ্ধান করিল!—চঞ্চল ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে অগ্রসর হইয়া বলিল—"কি হয়েছে জ্যাঠামশায়, কি হয়েছে?"

সঙ্গে-সঙ্গে, খক্-খক্-খক্ শব্দে বিকট কাসি কাসিয়া, সতীশ গুরু-গম্ভীর নিনাদে বলিল, "আশীর্ব্বাদ রায় মশাই, আশীর্ব্বাদ,—আমি জ্যোতির্ব্বিদ—লক্ষ্মীপতি শর্ম্মা।—পাত্রীর ঠিকুজি কোষ্ঠি দিয়ে, অনুকূল ঘোষ আমায় পাঠিয়ে দিলে। আপনার কোষ্ঠিটা দিন—মিলিয়ে দেখি।"

গলার মালায় হরিনামের ঝুলিটি আট্‌কাইয়া বৃদ্ধ সংযত হইয়া বলিলেন "আসুন, আসুন—"তার পর বিনা প্রশ্নেই অপ্রসন্ন গম্ভীর মুখে বলিলেন যে, তাঁহার 'উচ্ছন্ন গামী' নাতিদের উপদ্রবে তিনি বড়ই বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছেন; এইমাত্র একজন আসিয়া তাঁহাকে বড়ই জ্বালাতন করিয়া গেল; ইত্যাদি।

চঞ্চল বৃদ্ধের পক্ষ সমর্থন করিয়া, তাঁহার দুর্ব্বৃত্ত নাতিদের সম্বন্ধে অনেক অপ্রিয় মন্তব্য প্রকাশ করিল; এবং শ্রীগৌরাঙ্গদেব যখন বাংলাদেশ জুড়িয়া পাষণ্ড-দলন করিয়া বেড়াইয়াছিলেন, তখন এই কয়টা মহাপাষণ্ডকে যে তিনি কেন 'ক্যামা-ঘেন্না'র উপর দস্তুরমত দলন করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে অনেক আক্ষেপ ও অনুতাপ করিল।

বৃদ্ধের কোষ্ঠি লইয়া,তাঁহার দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়া, শাদা শনের দাড়ি-গোঁফ-ভূষিত লক্ষ্মীপতি শর্ম্মা, ওরফে সতীশ, নিজের লজিক বই খুলিয়া, বিড়্‌বিড়্‌ করিয়া পড়িতে-পড়িতে "শনি-রাহু-বুধ—পাতকি' চক্র, সাবিত্রী যোগ, লগ্নে চন্দ্র, একাদশে বৃহস্পতি" ইত্যাদি এক-একটা কথা মাঝে-মাঝে উঁচু গলায় বলিতে লাগিল। বৃদ্ধ উৎকণ্ঠাকুল চিত্তে বার-বার তাহাকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সতীশ যথাসাধ্য অনুকূল উত্তর দিয়া চলিল। আর যেখানেই প্রশ্ন কঠিন হইয়া উঠিল—সেইখানেই খক্‌খক্ রবে বিষম, উৎকট কাসি কাসিয়া—নিজের বার্দ্ধক্য-জীর্ণ হৃদ্‌যন্ত্রকে শত ধিক্কার দিয়া, নানা বাগাড়ম্বর-ছন্দে বিলাপে পরিতাপে গোলমাল করিয়া প্রশ্ন চাপা দিয়া ফেলিতে লাগিল। যাহাই হউক, ঘণ্টা দুই ধরিয়া, বিপুল পরিশ্রমে বিস্তর কাসিয়া, অনেক হিসাব-নিকাশের আঁক-জোক লিখিয়া, নিজের লজিকের বইখানির সঙ্গে বৃদ্ধের কোষ্ঠি মিলাইয়া (?), শেষে বিজ্ঞ ভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিল—"এ বিবাহ নির্জ্জলা-খাঁটি রাজ-যোটক বিবাহ হইবে। পাত্রীর কোষ্ঠিতে অকাট্য সধবা মৃত্যুযোগ আছে। যদিও আজ হইতে ৫১ বৎসর ছমাস তের দিন পরে পাত্রীর মৃত্যুর দিন ধার্য্য হইয়াছে। কিন্তু বিবাহ হইলে—সেই সধবা-মৃত্যু-যোগ-বলে—রায় মহাশয় ততদিন পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতে বাধ্য হইবেন,—নচেৎ তাঁহার পরিত্রাণ নাই।"

সবিস্ময়ে বৃদ্ধ বলিলেন, "সে কি হে, দুপুর-বেলা মহানন্দ জ্যোতিষী কুষ্ঠি দেখে বল্লে যে, এবার আমার ত্রিপাপের বৎসর, এই চৈত্রে আমার মৃত্যুযোগ আছে—"

চড়া গলায় বিরাট হুঙ্কার করিয়া সতীশ বলিল, "কে বলে! কোন্ জ্যোতিষী বলে! কই পাত্রীর কুষ্ঠি মিলিয়ে প্রমাণ করুক দেখি!"

বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি বলিলেন—"হাঁ হাঁ—সেও বল্লে—সেটা—সেও বল্লে যে, বিবাহ হলে,—যদি পাত্রীর গ্রহ-নক্ষত্র-যোগ তেমন বলবান হয়, তবে,—এটা খণ্ডে যেতেও পারে, বুঝ্‌লে হে—এটা খণ্ডে যেতেও পারে।"

জ্যোতির্ব্বিদ্-প্রবর ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "হাঁ, তাই বলুন!"

উঠানে ঘুঙুর-গাঁথা মলের ঝম্ ঝম্ আওয়াজ বাজিয়া উঠিল। সকলে চমকিয়া বলিল, "ও কি?"

মহা ব্যস্ততার সহিত উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া ভূপেন তড়্‌বড়্‌ করিয়া বলিল, "দাদামশাই, দাদামশাই—অনুকূল বাবু মেয়ে নিয়ে এসেছেন; সঙ্গে ঝি আছে, আর ওঁর বন্ধুর দুই মেয়ে আছে।—তাঁদের সবাইকে এইখানেই আন্‌ব?"

ব্যস্ত-সন্ত্রস্ত বৃদ্ধ কিছু বলিবার পূর্ব্বেই, চঞ্চল শশব্যস্তে বলিল, "হাঁ-হাঁ—এইখানেই আন। গণৎকার মশাই, চলুন আমরা বাইরে গিয়ে অনুকূল বাবুকে সেইখানে কুষ্ঠী দেখাই

—কি বলুন জ্যাঠামশাই, মেয়েরা তা'হলে এইখানেই আসুন ?"

জ্যাঠামশাই সে কথার উত্তর দিতে-না-দিতেই,—তাঁহার পরম হিতাকাঙ্ক্ষী নাতি-মশাই তৎক্ষণাৎ বলিলেন—"হাঁ-হাঁ —সেই ভাল কথা ! দাদামশাই, আপনি তা'হলে ভাল করে 'কনেটিকে' দেখে নেবেন, বুঝ্‌লেন—" সঙ্গে-সঙ্গে চট্‌পট্‌ শব্দে জুতার আওয়াজ করিয়া সকলে প্রস্থানোদ্যত হইলেন।

দুই পা গিয়া,—হঠাৎ ফিরিয়া আসিয়া—ভূপেন চুপি-চুপি বৃদ্ধকে বলিল, "দাদামশাই, শুনুন, শুনুন,—নূতন কুটুম্ব এঁরা আজ প্রথম এলেন,—কিছু জল খাওয়ান উচিত নয় ?"

নিরীহ বৃদ্ধ এই সব লোক লৌকিকতা, কুটুম-কুটুম্বিতার বিধি-ব্যবহার তত্ত্ব বহুদিনই ভুলিয়া গিয়াছেন,—আজ এই নূতন কাঁচিয়া গণ্ডুষ !—অত্যন্ত বিচলিত হইয়া ব্যস্ত-ভাবে বলিলেন "হাঁ-হাঁ—উচিত বৈ কি। উচিত বৈ কি !—বড্ড কথা মনে পড়িয়ে দিয়েছ হে ! বড় লক্ষী ছেলে তুমি,—নিতাই প্রভুকে তোমাদের জন্যে বলছি হে, তিনি যেন একজামিনে তোমাদের পাশ করিয়ে দেন।"

ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া, বৃদ্ধের পায়ের ধুলা লইয়া,—ভূপেন করযোড়ে মিনতির স্বরে বলিলেন—"দেখ্‌বেন্‌ দাদামশাই,—আমাদের উচ্ছন্নই যেতে বলুন, আর যাই করুন,—মোদ্দা একজামিনে পাশ হওয়ার আশীর্ব্বাদটা যেন অন্তরের সঙ্গেই করেন ! সে আশীর্ব্বাদটা যেন মিথ্যা না হয় !"

হাসি-মুখে আশ্বাসের স্বরে বৃদ্ধ বলিলেন "না হে, না,—তার জন্যে কি আর আমাকে বেশী বল্‌তে হয় ! তোমাদের ওপর কি আমি রাগ কর্‌তে পারি হে—তোমাদের ওপর আমি রাগ কর্‌তে পারি কি ? তা নয়, তবে ঐ মাণুকে শা—' এসে মাঝে মাঝে আমায় বড্ড জ্বালাতন করে—বুঝ্‌লে হে—ঐ জন্যেই যা—" ঘরে ঢুকিয়া, হাতড়াইয়া-হাতড়াইয়া টাকার বাক্সটির চাবি খুলিয়া একটী টাকা বাহির করিয়া ভূপেনের হাতে দিয়া বলিলেন—"ত্যাখো, ওপীন্দো ঠাকুরকে বল, হাত-পা ধুয়ে, কাপড় ছেড়ে গিয়ে বড়বাজারে ব্রজবাসীর দোকান থেকে এক টাকার মিষ্টি কিনে আনুক, —বুঝ্‌লে !"

আব্‌দারের স্বরে ভূপেন বলিল, "তা তো বুঝ্‌লুম দাদামশাই,—আজকের দিনে আমাদেরও অমি কিছু খাইয়ে দেন,—দেখুন, আপনার জন্য এত খাটুনী খাট্‌ছি,—আপনি তো কখনো কিছু খেতে দেন নি,—সেদিন প্যাঁজ-বড়া কিনে খাব বলে দুটি পয়সা চাইলুম, তাও তো আপনি দিলেন না, —আজকে কিছু না খাওয়ালে কিন্তু আমরা ছাড়্‌ব না—"

বিপদগ্রস্ত হইয়া বৃদ্ধ বলিলেন ,"আচ্ছা, আচ্ছা তোমাদের আর একটা টাকা দিচ্ছি,—তোমরা মিষ্টি কিনে খাও গে—"

হাত কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধের স্বরে ভূপেন বলিল, "সেটি হবে না দাদামশাই,—আজকের দিনে ও কথাটি বল্‌বেন না। আজ—ঠাকুরের প্রসাদই বলুন, আর ব্রজবাসীর দোকানের মিষ্টিই বলুন, আজ আমরা সে সব কিছু খাব না—"

এবার বৃদ্ধের ধৈর্য্য লোপ হইল। হাত নাড়িয়া উগ্রভাবে বলিলেন "তবে কি খাবে, তাই বল হে ! আমার কুটুমরা এখন বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, তোমার সঙ্গে হ্যাক্‌রা করবার সময় নেই আমার—"

ভূপেন বলিল, "তা'তো বটেই,—কদ্দিনের পর আজ আমাদের নতুন দিদিমা আস্‌ছেন—কি আনন্দের দিন আজ ! দোহাই দাদামশাই, আজ আমাদের লুচি আর মাংস খাইয়ে দেন !"

প্রস্তাবটা বৃদ্ধের আদৌ ভাল লাগিল না ; কিন্তু ভূপেন না-ছোড়বান্দা ! অনেক তর্ক-বিতর্ক, কাকুতি-মিনতি করিয়া সে বৃদ্ধের নিকট হইতে আরও দুটা টাকা আদায় করিয়া লইল। টাকা দিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "দেখো হে, চঞ্চলকে ও-সব ম্লেচ্ছ খাদ্য আজ খেতে দিও না,—কাল সে আভ্যুদিক ছরাদ কর্‌বে,—বুঝ্‌লে ?"

ভূপেন ত্রস্ত ভাবে তড়্‌বড়্‌ করিয়া বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, হ্যাঁ,—সে আপনার ছরাদ কর্‌বে বৈ কি,—সে ও-সব খাবে না।—ওই মেয়েরা আস্‌ছেন্‌, আপনি 'কনে'টিকে ভাল করে দেখে নেবেন দাদামশাই,—বেশ ভাল করে।—দেখুন, এ দুদিন-একদিনের জন্যে নয়, এ জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ক ! —মরে গেলেও বাঁধন ছিঁড়্‌বে না,—এই বেলা ভাল করে দেখে নেওয়া উচিত, বুঝ্‌লেন দাদামশাই,—লজ্জা করে যেন চোখ বুজে থাক্‌বেন্‌ না। এ হচ্ছে জন্ম-জন্মান্তরের আধ্যা-

ত্মিক সম্পর্ক, এর মধ্যে আধিভৌতিকতা, আধিদৈবিকতার নামগন্ধও তিষ্ঠুতে পারে না,—এতে লজ্জা সঙ্কোচ কি ?"

বৃদ্ধকে বাহিরে আনিয়া বসাইয়া ভূপেন প্রস্থান করিল। ক্ষণমধ্যে ঘুঙুর-গাঁথা মলের ঝম্‌ঝম্ আওয়াজে চারিদিক মুখর হইয়া উঠিল। সালঙ্কারা, সুসজ্জিতা 'কনের' হাত ধরিয়া একটী স্ত্রীলোক ঘোমটা টানিয়া সামনে আসিয়া গলবস্ত্রে প্রণাম করিয়া নাকি-সুরে পরিচয় দিল—"এইটি হচ্ছে 'কনে', আমি হচ্ছি ঝি – আর ঘোমটা দিয়ে ঐ যে বড় দুজন এসেছেন, ওঁরা হচ্ছেন কর্ত্তা মশাইয়ের 'বন্ধুর কন্যে'। সম্পর্কে ওঁরা 'কনের' দিদি।"

খুসীর সহিত বৃদ্ধ বলিয়া উঠিলেন, "বটে, বটে,—'কনের' দিদিরা শুদ্ধ এসেছে ? বেশ, বেশ,—বসো সবাই। আচ্ছা ঝি, তুমি কনেটিকে রোদে দাঁড় করিয়ে দাও দেখি—আমি দেখি ভাল করে—"

বারেন্দার থামের ফাঁকে যে রৌদ্র আসিয়া পড়িয়াছিল, 'কনে'কে সেইখানে দাঁড় করান হইল। ভুরু কুঁচকাইয়া ঠাহর করিয়া দেখিতে-দেখিতে বৃদ্ধ বলিলেন, "রংটি বেশ সুন্দর, নয় গা ? কিন্তু একটু যেন কাহিল-কাহিল দেখ্‌ছি—একটু খাটোও আছে ; নয় ?"

পরিচয়-দাত্রী ঝি-ঠাকুরাণী পুনর্ব্বার নাকি সুরে পরিচয় দান সুরু করিলেন—"এজ্ঞে,খাটো নয়,—এই তেরো বছরের মেয়ে—আমার বুকে পড়ে—আপ্নার সঙ্গে বেশ সাজুন্ত হবে। তবে কাহিল একটু আছে বটেন, তা মেয়ের উপোষ-তিরেশ, বিষ্ণু-সেবা, বোষ্ণুম-সেবা, কত 'তন্তরের' ঘটা ! এমন মেয়ে দেখবে নি,—বলতো দিদি তোমার নামটি—আগে পেন্নাম কর—"

প্রণাম করিয়া মিহি সুরে 'কনে' বলিল "শ্রীমতী রাধা-রাণী বৈষ্ণব-দাসী।"

বৃদ্ধ বলিলেন "বেশ, বেশ, বেশ,—খাসা নাম !"

—•—

(কথায় কথায় হাসি !)

পিছন হইতে একজন ডাকিল "জামাই বাবু !"

চমকিয়া বৃদ্ধ বলিলেন "কে হে ?"

সঙ্গে-সঙ্গে খুক্‌খুক্ করিয়া একাধিক কণ্ঠের চাপা হাসির ধ্বনি উঠিল !—বৃদ্ধ অতীব রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "কে তুমি ?"

ক্ষীণ কোমল কণ্ঠে উত্তর হইল—"আমি কনের বড়-দিদি, জামাই বাবু—"

বৃদ্ধ কাহারো অন্যায় বরদাস্ত করিতে পারেন না। তৎক্ষণাৎ উগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,"দাঁড়ারে বাপু, এখনি কি জামাই বাবু ? আগে বিয়ে হোক তা'পর জামাইবাবু—"

উত্তরে তিনি বলিলেন, "কনে বেশ গান গাইতে পারে। তাই বল্‌ছি, একটু গান শোনাবে আপনাকে ?--"

"গান ! মেয়েমানুষের গান !"—বলিয়া বৃদ্ধ অপ্রসন্ন ভাবে নীরব হইলেন।

আর একজন বলিল, "আজ্ঞে,খাঁটি ভাগবতের কথা নিয়ে রাধাকৃষ্ণের লীলার বিষয় গান।—গাও তো কনে, তোমার বরকে একটু গান শুনিয়ে দাও তো—ভক্তের মুখে ভগবানের কথা বেশ মিষ্টিই লাগবে, সেই জন্যে শুকের মুখে পরীক্ষিৎ···ইত্যাদি।"

আচম্বিতে নিকটে হার্ম্মোনিয়াম বাজিয়া উঠিল,—কনে গান ধরিল,—"আমার পরাণ যাহা চায়, তুমি তাই, তুমি তাই গো—"

নিতান্ত অসন্তোষের সহিত বৃদ্ধ বলিলেন, "ও আবার কি গান ! ও গান গাইতে হবে না—"

খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া আর একজন বলিল, "আজ্ঞে জামাইবাবু,—কেলি-কদম্বের মূলে শ্রীমতি গোবিন্দের কাছে ঐ গান দ্বাপর-যুগে গেয়েছিলেন—" সঙ্গে-সঙ্গে খুব হাসি !

যিনি হার্ম্মোনিয়াম বাজাইতেছিলেন, তিনি হার্ম্মোনিয়াম বন্ধ করিয়া ঘোমটার ভিতর হইতে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন, "আরে দূৎ, কেলি-কদম্ব কেন হবে,--ধীর-সমীরেই তো গোবিন্দের সঙ্গে প্রথম দেখা —"

প্রথমা উত্তেজিতা হইয়া বলিলেন,"তবে তো তুমি বড্ডই জানো, ধীর-সমীরে প্রথম দেখা হয়,—না যমুনা-পুলিনে ? আচ্ছা দাদামশাই—"বলিয়াই গোপনে জিভ্ কাটিয়া ত্রস্তে কথাটা সামলাইয়া লইয়া খুব তাড়াতাড়ি বলিলেন—"ওর নাম কি জামাইবাবু—ও-জামাইবাবু, আপনি বলুন তো—ধীর-সমীরে গোবিন্দের সঙ্গে রাধিকার প্রথম দেখা হয়, না—কুঞ্জবনে, না নিধুবনে, না যমুনা-পুলিনে ?"

হতবুদ্ধি জামাইবাবু কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই—অন্য শ্যালিকা মহোদয়া বাজনার চাবি টিপিয়া সবিদ্রূপ হাস্যে বলিল—"আরে নাও, হাজার মাইল দূরে যমুনা-

পুলিনের তর্ক ছেড়ে দাও—ধরো এই রায় মশায়ের দালানেই রাধিকা ঠাকুরুণ গোবিন্দকে First দেখে side-long glance করেছিলেন! মরুক গে যাক্ সে,—এখন রাধারাণী, তুমি গাও তো সেই গানটি—কি ক্ষণে দেখিনু শ্যামে—"

মুখে রুমাল চাপিয়া ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিয়া 'কনে' গান ধরিল—"সই, কি ক্ষণে দেখিনু শ্যামে কদম্বের মূলে—সেই দিন পুড়িল কপাল আমার—"

(রস ভঙ্গ !)

অকস্মাৎ বাহির হইতে উষ্ণ, গম্ভীর কণ্ঠে কে ডাকিল, "মাণিক !"

ত্রস্তে গান থামাইয়া 'কনে' বলিল, "আজ্ঞে"—পরক্ষণেই হঠাৎ একলাফে হার্ম্মোনিয়ামওয়ালাকে ডিঙ্গাইয়া পাশের ঘরে ঢুকিয়া পড়িল! সঙ্গে-সঙ্গে ঘুঙুর-গাঁথা মল দুইটা, কনের পা হইতে খসিয়া ঝম্‌ঝম্-ঝনাৎ শব্দে একটা পড়িল হার্ম্মোনিয়ামের উপর, একটা পড়িল হার্ম্মোনিয়ামওয়ালার পিঠে!

ঝি ও কনের দুই দিদি একসঙ্গে ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "সর্ব্বনাশ! মামাবাবু যে!—"সঙ্গে-সঙ্গে ঘোমটা খুলিয়া, লাফাইয়া উঠানে পড়িয়া, একএক লাফে টপাটপ্ রান্নাঘরের পিছনের ছোট পাঁচিল ডিঙ্গাইয়া তিনজনে দ্রুত অদৃশ্য হইল!

বিস্ময়-স্তম্ভিত কণ্ঠে বৃদ্ধ বলিলেন, "কে হে ভূপীন না কি? ভূপীন! তোমরা! এ্যাঁ—সে কি হে, তোমরা—"

চঞ্চলের কাণ ধরিয়া তাহার বড়দাদা বিনয়বাবু সামনে আসিয়া বলিলেন, "জ্যাঠামশাই, ছেলেগুলি সব গেল কোথা?"

সকরুণ কণ্ঠে বৃদ্ধ বলিলেন, "কি জানি বাবা, আমি কিছুই জানি না! বুড়ো মানুষ, নিশ্চিন্ত হয়ে হরিনাম করছি, তারও ব্যাঘাত! ঐ ভূপীন শা—কোথা থেকে এক অনুকূল ঘোষ আর তার মেয়েকে এনে হাজির করেছে,—বলে, নগদ তিন হাজার টাকা, দুশো বিঘে জমি, আর বিষ্ণু বিগ্রহ পাওয়া যাবে,—আমায় তো বাবা মহা পীড়াপীড়ি সুরু করেছে। ওই যে কনের বাপ শুদ্ধ এসে এইখানেই কোথা রয়েছেন—ছাখো না বাবা, চঞ্চল তার কাছে আছে।"

বিনয়বাবু চঞ্চলের কাণ ধরিয়া নাড়িয়া মুখ টিপিয়া-টিপিয়া নিঃশব্দে হাসিতে লাগিলেন। তাহার পিছন হইতে অগ্রসর হইয়া বৃদ্ধের পরম স্নেহভাজন সুহৃদ্ কবিরাজ মহাশয় প্রসন্ন-কৌতুক-স্মিত হাস্যে বলিলেন "রায় মশাই, আপনার নাতিরা তো বেশ বিয়ের আমোদ জমিয়ে তুলেছে,—এখন আমরা এর মধ্যে দু'একখানা লুচি-মোণ্ডা পেতে পারি বোধ হয়?"

নিরুৎসাহ-ক্ষীণ কণ্ঠে বৃদ্ধ বলিলেন, "কে হে, কব্‌রেজ্? এস এস,—আর লুচি-মোণ্ডা! আজ সকাল থেকে 'শালারা' আমায় উদ্বাস্ত করে তুলেছে হে,—ওদের সঙ্গে বকে-বকে আমার মাথা ধরে গেছে, উঃ—"হরিনামের মালাটি হাতে লইয়া বৃদ্ধ অবসন্ন ভাবে কম্বলের উপর সেই-খানেই শুইয়া পড়িলেন।

চঞ্চলের কাণ ধরিয়া বেশ জোরের সঙ্গে আর একটু নাড়া দিয়া, গালে চড় কসাইয়া বিনয়বাবু বলিলেন, "জ্যাঠা মশাই, বাবার বড় ভাই,—তাঁর সঙ্গে রঙ্গ করা? এই বিদ্যে হচ্ছে? এ্যাঁ?—"প্রশ্নের সঙ্গে-সঙ্গে ও-গালে আর এক চড়।

যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া চঞ্চল ব্যাকুল ভাবে চারিদিকে চাহিল,—এক-যাত্রার সঙ্গীদের কাহাকেও এই সময় আবিষ্কার করিতে পারিলে—তাহার শাস্তিটা লাঘব হইতে পারে তো!—মাণিক ঘরের ভিতর হইতে সভয়ে উঁকি-ঝুঁকি মারিতেছিল—হঠাৎ তাহার দিকে চোখ পড়িতেই চঞ্চল চেঁচাইয়া উঠিল—"ঐ যে—ঐ যে, মাণ্‌কে ঐ ঘরে রয়েছে—ঐ কনে সেজেছিল—"

বিনয়বাবু ডাকিলেন—"মাণ্‌কে, এধারে আয়—"

গহনা-পত্র ও পার্শি সাড়ী খুলিয়া, নাকের রসকলি মুছিয়া ধুতি ও পাঞ্জাবী পরিয়া মাণিক শুষ্ক, কুণ্ঠিত মুখে বাহিরে আসিয়া, সরোদনে বলিল, "আমি তো শুধু 'কনে' হয়েছিলুম, আর ভূপেন-দা আর ভুষোদা যে কনের দিদি হয়েছিল, আর কাকা তো দাদামশাইয়ের 'হাবাতের ছরাদ্' পর্য্যন্ত করবে বলেছিল—"

সবিস্ময়ে বিনয়বাবু বলিলেন "হাবাতের ছরাদ্! সে কি?"

বৃদ্ধ বলিলেন "আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ হে! ও সব 'তৈয়ার' ছেলে কি না?—মানুষকে 'থ' বানিয়ে দেয় বাপু, আজ

আমার মালাজপে বড়ই ব্যাঘাত করেছে, মাণ্‌কে শা—আবার কনে সেজে টপ্পা গেয়ে শোনায় হে!"

"এই যে গাওয়াই টপ্পা—"বলিয়া উত্তমরূপে দুই জনের কাণ ধরিয়া নাড়া দিয়া, দুজনকে পাশাপাশি দাঁড় করাইয়া, ভর্ৎসনা-ব্যঞ্জক স্বরে বিনয়বাবু বলিলেন "আমার জ্যাঠা মশাই, বুড়ো মানুষ, একে ওঁর চোখের জোর কমে গেছে,—এখন কোথায় তোমরা ওঁর সেবা-শুশ্রূষা করবে, শ্রদ্ধা-ভক্তি করবে,—তা চুলোয় গেল, এখন ওঁকে নিয়ে তামাসা! ওঁর শান্তির বিঘ্ন!—হতভাগা ছেলে সব, দে জ্যাঠামশায়ের সামনে নাক খৎ, মল্ দুজনে নিজের নিজের কাণ!—"

দুজনে তাহাই করিল। বিনয়বাবু দুজনকে টানিয়া আনিয়া বৃদ্ধের পায়ের কাছে বসাইয়া দিয়া বলিলেন, "যতক্ষণ না জ্যাঠামশায়ের মাথা ছাড়ে, ততক্ষণ দুজনে বসে পা টেপ।"

তার পর বৃদ্ধের অনুমতি লইয়া,—কবিরাজ মহাশয়ের হাত হইতে ঠাণ্ডা তৈলের শিশি লইয়া, স্বয়ং বৃদ্ধের মাথায় ও কপালে তৈল মালিশ করিয়া দিতে লাগিলেন।

কবিরাজ মহাশয় প্রসন্ন হাস্যে বলিলেন, "দেখুন দেখি রায় মশাই, আপনার ছোট নাতিটি আপনার পদসেবা কর্‌ছে—এইবার আপনাকে কেমন চমৎকার দেখাচ্ছে! যাক্, ওর জন্যে এবার আপনি ওর দাদাদের দৌরাত্ম্যটা সন্তুষ্ট-চিত্তে মাপ করুন। আর দেখুন, নাতিরা মিছামিছি আপনাকে নিয়ে যে কৌতুক করেছে, এই ভাল,—ধরুন সত্যি-সত্যি যদি বিয়েটা দিয়ে দিত, তবে সে যে বড় ভয়ানক হ'ত!"

অস্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া মুক্ত উচ্ছ্বাসে বৃদ্ধ বলিলেন, "নিশ্চয়, নিশ্চয়,—তার আর সন্দেহ কি! সেই কথাই তো আমি ভাবছিলুম্ হে, তা ঐ ভূপীন্—শা'—যে কিছুতেই ছাড়ে না, বলে জাগ্রত বিষ্ণু-বিগ্রহ আছে তাদের বাড়ীতে! উঃ শা—কি ধড়িবাজ হে!—কুটুমদের জল খাওয়াবে, আর নিজেরা সেই সঙ্গে, লুচি মাংস খাবে বলে—আমার কাছ থেকে আজ চার-চাট্যে টাকা আদায় করে নিয়ে গেছে হে!"

সদানন্দ কবিরাজ মহাশয় স্মিত হাস্যে বলিলেন, "আহা, যাক্—যাক্, আপনার বিবাহের উৎসবে তারা যথেষ্ট পরিশ্রম করেছে, তাদের কিছু খাওয়ান উচিত বৈ কি!—যাক্—আপনার নাতিরা যখন বাজনাটা ফেলে রেখে গেছে, তখন আমি এটার একটু সদ্ব্যবহার করি—কি বলেন?"

সাগ্রহে বৃদ্ধ বলিলেন "গাও, গাও—"

সঙ্গীতবিশারদ কবিরাজ মহাশয় হার্মোনিয়ামের চাবি টিপিয়া গম্ভীর কোমল কণ্ঠে গায়িলেন—

"চলিয়াছি গৃহ পানে, খেলা-ধূলা অবসান।
ডেকে লও,—ডেকে লও, শ্রান্ত বড় মন প্রাণ।
ধূলায় মলিন বাস, আঁধারে পেয়েছি ত্রাস—
মিটাতে প্রাণের তৃষা—বিষাদ করেছি পান!"

অশ্রু-সজল নয়নে বৃদ্ধ বলিলেন "নারায়ণ, নারায়ণ!"

সখী

(বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাবলি-অবলম্বনে)

[অধ্যাপক শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম্-এ]

প্রথম শ্রেণী

এইবার প্রথম শ্রেণীর সখীদিগের চিত্র আলোচনা করিব। যে চিত্রগুলি গ্রন্থকার অল্পে সারিয়াছেন, অগ্রে সেইগুলির আলোচনা করিয়া পরে পূর্ণায়তন চিত্রগুলির আলোচনা করিব।

(১) বিমলা ও আশ্‌মানি

'দুর্গেশনন্দিনী'তে বিমলা জগৎসিংহকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার শেষার্দ্ধে (২য় খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ) বিবৃত আছে যে, মানসিংহের মহিষী ঊর্ম্মিলাদেবীর আশ্‌মানি-

নাম্নী এক পরিচারিকা ছিল। বিমলাও উক্ত উর্ম্মিলা-দেবীর সখী (বা 'সহচারিণী দাসী') ছিলেন। অর্থাৎ আশ্‌মানি বিমলার পরিচারিকা নহে, উভয়েই উর্ম্মিলা-দেবীর বৃত্তিভোগিনী, সুতরাং উভয়ের সখিত্ব দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর নহে, প্রথমশ্রেণীভুক্ত। বিমলা লিখিয়া-ছেন :—'আশ্‌মানির সহিত আমার বিশেষ সম্প্রীতি ঘটিল ; আমি তাহাকে প্রভুর সংবাদ আনিতে পাঠাইলাম। সে তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে আমার সংবাদ দিয়া আসিল। প্রত্যুত্তরে তিনি আমাকে কত কথা কহিয়া পাঠাইলেন,...আমি আশ্‌মানির হস্তে তাঁহাকে পত্র লিখিয়া পাঠাইলাম, তিনিও তাহার প্রত্যুত্তর পাঠাইলেন। পুনঃ পুনঃ এইরূপ ঘটিতে লাগিল।' বুঝা গেল, এক্ষেত্রে আশ্‌-মানি পত্রহারী বা সন্দেশহারিকা দূতীর কার্য্য করিয়াছে। তাহার পর, আবার বীরেন্দ্রসিংহ আশ্‌মানির সাহায্যে ও 'সমভিব্যাহারে বারি-বাহক দাস সাজিয়া পুরী মধ্যে প্রবেশ করিয়া' নিশাকালে বিমলার শয়নকক্ষে দর্শন দিয়াছিলেন। এক্ষেত্রে আশ্‌মানি বিমলার সমবেদনাময়ী সাহায্যকারিণী সখী। যাহা হউক, বৃত্তান্তটি নিতান্ত সংক্ষিপ্ত, তাহাও আবার পত্রে বিবৃত, রীতিমত চিত্রিত নহে।

পরে উভয়ে বীরেন্দ্রসিংহের অন্তঃপুরে বাস করিয়াছিল, তখনও তাহাদের পূর্ব্বের হৃদ্যতা ছিল, তবে পাছে জগৎ-সিংহ আশ্‌মানিকে চিনিতে পারেন, এই জন্য বিমলা জগৎ-সিংহের নিকট যাইবার সময় তাহাকে সঙ্গে ল'ন নাই। দিগ্‌গজহরণ ব্যাপারে উভয়ের হৃদ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। (১ম খণ্ড, ১১শ, ১২শ, ১৩শ ও ১৪শ পরিচ্ছেদ।)

(২) লুৎফউন্নিসা ও মেহেরউন্নিসা

'কপালকুণ্ডলা'য় লুৎফউন্নিসা ও মেহেরউন্নিসা পরস্পরের 'বাল্যসখী'। ৩য় খণ্ডের ২য় পরিচ্ছেদে মতিবিবি (লুৎফউন্নিসা) বলিতেছেন :—'মেহেরউন্নিসাকে আমি কিশোর বয়োঽবধি ভাল জানি। মেহেরউন্নিসা আমার বাল্যসখী'। আবার ঐ খণ্ডের ৩য় পরিচ্ছেদে জানা যায়, 'মেহেরউন্নিসার সহিত তাঁহার বিশেষ প্রণয় ছিল। পরে উভয়েই দিল্লীর সাম্রাজ্যলাভের জন্য প্রতিযোগিনী হইয়া-ছিলেন।'. অনুমান হয় যে, এক সময়ে তাঁহারা শেক্‌স্‌-পীয়ারের হার্ম্মিয়া-হেলেনার ন্যায় পরস্পরের নিবিড় প্রীতি-বন্ধনে বদ্ধ ছিলেন, পরে হার্ম্মিয়া-হেলেনার মতই প্রেমের প্রতিযোগিতায় সেই নির্ম্মল প্রীতি বিকৃত ঈর্ষ্যা-কলুষিত হয়। ৩য় খণ্ডের ১ম পরিচ্ছেদে দেখা যায়, 'সেলিম যে তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া মেহেরউন্নিসার জন্য এত ব্যস্ত ইহার প্রতিশোধও তাঁহার উদ্দেশ্য।'

পুস্তকের একটি মাত্র পরিচ্ছেদে উভয় সখীকে একত্র দেখা যায়। মতিবিবি (লুৎফউন্নিসা) রাজনীতিক ষড়-যন্ত্রের ব্যাপার সমাধা করিয়া উড়িষ্যা হইতে ফিরিবার পথে সেলিম (জাঁহাগীর) বাদশাহ হইয়াছেন সংবাদ পাইয়া 'মেহেরউন্নিসার চিত্ত জাঁহাগীরের উপর কিরূপ' তাহা জানিবার উদ্দেশ্যে 'প্রতিযোগিনী-গৃহে' যাইবার সঙ্কল্প করিলেন, কেননা বাদশাহ মেহেরউন্নিসাকে বিবাহ করিলে লুৎফউন্নিসা প্রতিযোগিনীর নিকট হইতে অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়াছিলেন। (৩য় খণ্ডের ২য় পরিচ্ছেদে) পেষ্‌মনের সহিত মতিবিবির কথালাপে এই উদ্দেশ্য জানা যায়।

পর-পরিচ্ছেদে (৩য় খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ) উভয় সখীর বহুকাল পরে দেখা হইল, মতিবিবি 'অত্যন্ত সমাদরে' গৃহীত হইলেন। কিন্তু ব্যাপারটা শেয়ানে-শেয়ানে কোলাকুলি। মতিবিবির ভিতরে-ভিতরে জানিবার উদ্দেশ্য 'মেহেরউন্নিসার চিত্ত জাঁহাগীরের উপর কিরূপ', আবার মেহেরউন্নিসা ভাবিতেছিলেন "দেখি, লুৎফউন্নিসা কি কিছু প্রকাশ করিবে না ?' 'মেহেরউন্নিসা খাসকামরায় বসিয়া তসবীর লিখিতে-ছিলেন। মতি মেহেরউন্নিসার পৃষ্ঠের নিকট বসিয়া চিত্র লিখন দেখিতেছিলেন এবং তাম্বূল চর্ব্বণ করিতেছিলেন।' ইত্যাদি। এ যেন মৃণালিনী-মণিমালিনীর মুসলমানী সংস্করণ! প্রথমে উভয়ের কথাবার্ত্তায় সখীস্নেহের পরিচয় পাওয়া যায়। মেহেরউন্নিসা বলিতেছেন, 'তুমি যে আমাকে কাল প্রাতে ত্যাগ করিয়া যাইবে, তাহাই বা কি প্রকারে ভুলিব ? আর দুই দিন থাকিয়া তুমি কেনই বা চরিতার্থ না করিবে ?···আমার প্রতি তোমার ত ভালবাসা আর নাই, থাকিলে তুমি কোন মতে রহিয়া যাইতে।' তাহার পর সেলিমের প্রণয়ের কথা লইয়া তিনি সখীকে একটু পরিহাস করিলেন, একটু খোঁচাও দিলেন। এই ভাবে কথাবার্ত্তা অনেকক্ষণ চলিল। (পাঠকবর্গকে সমগ্র পরিচ্ছেদটি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।) মতিবিবি

স্নেহের সুরেই মেহেরউন্নিসাকে সেলিমের কথা বলিলেন, তাহার পর তিনি যখন সেলিমের সিংহাসনারোহণের সংবাদ দিলেন, তখন আর মেহেরউন্নিসা হৃদয়ের ভাব গোপন করিতে পারিলেন না, আবেগভরে সেলিমের প্রতি গাঢ় অনুরাগ অকপটে প্রকাশ করিলেন। 'মেহেরউন্নিসা আর কিছু শুনিলেন না। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া কাঁপিতে লাগিল। লোচনযুগলে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। মেহের-উন্নিসা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "সেলিম ভারতবর্ষের সিংহাসনে, আমি কোথায় ?" মতির মনস্কাম সিদ্ধ হইল।' তাহার পর, মতিবিবির প্রশ্নে তিনি প্রকৃত মনোভাব বিশদ-ভাবে প্রকাশ করিলেন, সেলিমকে কি বলিতে হইবে তাহা স্পষ্টবাক্যে বলিয়া দিলেন। আপাতদৃষ্টিতে মতিবিবি যেন বিশ্বাসবিশ্রামকারিণী সখী বা সন্দেশহারিকা দূতী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা প্রতিযোগিনী, সুতরাং এই চিত্র আপাত-মনোরম হইলেও অকৃত্রিম সখিত্বের নিদর্শন নহে। বিমল সখী-প্রীতি এক্ষেত্রে প্রেমে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দ্বারা কলুষিত বিকৃত হইয়াছে। 'মতির মনস্কাম সিদ্ধ হইল,' —এই কথাই ইহার শেষ কথা। কৌশলে মেহেরউন্নিসার চিত্ত জানিবার জন্যই মতিবিবি এই হৃদ্যতার ভান করিয়াছিলেন। ইহা সখিত্ব নহে, সখিত্বাভাস।

(৩) মৃণালিনী ও মথুরার রাজকন্যা

'মৃণালিনী'তে নায়িকা মৃণালিনী মথুরার রাজকন্যার সখী ছিলেন। মৃণালিনী 'পূর্ব্ব পরিচয়' দিতেছেন (৪র্থ খণ্ড, ১১শ পরিচ্ছেদ) :—"আমার পিতা……অত্যন্ত ধনী ও মথুরারাজের প্রিয়পাত্র ছিলেন—মথুরার রাজকন্যার সহিত আমার সখীত্ব ছিল।" মৃণালিনী যখন ধনিকন্যা, তখন তিনি অবশ্যই রাজকন্যার বৃত্তিভোগিনী ছিলেন না, সুতরাং এ 'সখীত্ব' প্রথমশ্রেণীভুক্ত। যাহা হউক, এই 'সখীত্বে'র কোনও চিত্র নাই, কেবল মথুরার রাজকন্যার সহিত জলবিহারে গিয়া মৃণালিনী নৌকাডুবিতে জলমগ্ন হইলে হেমচন্দ্র মৃণালিনীকে উদ্ধার করিলেন এবং উদ্ধারের ফলে হেমচন্দ্র মৃণালিনীর অন্যোন্যানুরাগ জন্মিল, ইত্যাদি ঘটনার উল্লেখ (উক্ত পরিচ্ছেদে) আছে। এই ঘটনা ঘটাইবার জন্যই মথুরার রাজকন্যার সহিত জলবিহারের অবতারণা। সুতরাং এই 'সখীত্বে'র প্রসঙ্গ এক কথাতেই শেষ করিলাম।

(৪) মৃণালিনী ও মণিমালিনী

মৃণালিনী যখন গৌড়নগরে হৃষীকেশ ব্রাহ্মণের গৃহে 'পিঞ্জরের বিহঙ্গী' তখন তিনি হৃষীকেশ-কন্যা মণিমালিনীর সহিত 'স্নেহ-শিকলে' অর্থাৎ সখিত্বসূত্রে বদ্ধ হইয়াছিলেন; অল্প দিনের পরিচয় হইলেও এই স্নেহ অকৃত্রিম। ১ম খণ্ডের ২য়, ৩য় ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে এই সখিত্বের চিত্র আছে, বিশেষতঃ ২য় পরিচ্ছেদে। অপরিচিত স্থানে মণিমালিনীর সখিত্বই মৃণালিনীর একমাত্র অবলম্বন ছিল। তাহার পর, মৃণালিনী হৃষীকেশের গৃহ হইতে বিতাড়িত হইলে এই সখিত্বের আর অবসর ঘটে নাই, কেবল 'পরিশিষ্টে' জানা যায় যে এই সখিত্ব দীর্ঘকাল পরস্পরের অদর্শনেও অটুট ছিল, Out of sight out of mind হয় নাই। 'মৃণালিনী… মণিমালিনীকে আপন রাজধানীতে আনাইলেন। মণি-মালিনী রাজপুরী মধ্যে মৃণালিনীর সখীস্বরূপে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বামী রাজবাটীর পৌরোহিত্যে নিযুক্ত হইলেন।' (শেষ বাক্য হইতে বুঝা গেল, সখী মণিমালিনী 'কাব্যের উপেক্ষিতা' নহেন !)

১ম খণ্ডের ২য় পরিচ্ছেদে দেখা যায়, এই 'দুইটী তরুণী কক্ষপ্রাচীরে আলেখ্য লিখিতেছিলেন' ও কথোপকথন করিতেছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যে বহু নায়িকা চিত্রবিদ্যায় পারদর্শিনী। বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজী সাহিত্যের আদর্শে আখ্যা-য়িকা-রচনায় প্রবৃত্ত হইলেও এক্ষেত্রে মৃণালিনীর চিত্রবিদ্যা-পটুতার বেলায় সংস্কৃত সাহিত্যের আদর্শই গ্রহণ করিয়াছেন। * মৃণালিনী চিত্রবিদ্যায় পারদর্শিনী, মণিমালিনী শিক্ষানবিশ। মণিমালিনী কি আঁকিতেছিলেন উভয়ের কথাবার্ত্তা হইতে তাহা জানা যায়, কিন্তু মৃণালিনী কি আঁকিতেছিলেন তাহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই। তিনি যদি বিরহাবস্থায় হেমচন্দ্রের প্রতিকৃতি আঁকিয়া থাকেন, তাহা হইলে ঠিক সংস্কৃত সাহিত্যের অনুরূপ হইয়াছে, কেননা উক্ত সাহিত্যে নায়ক-নায়িকার বিরহকালে প্রেমাস্পদের প্রতি-কৃতি-অঙ্কন 'বিনোদোপায়'। (মেঘদূতে 'মৎসাদৃশ্যং বিরহতনু বা ভাবগম্যং লিখন্তী' স্মর্ত্তব্য।)

---

* তবে ইংরেজী সাহিত্যে অনেক স্থলে নায়িকাকে চিত্র-বিদ্যায় পারদর্শিনী দেখা যায়। উক্ত সাহিত্যে বহুতর স্থলে নায়িকাকে সেলাই-কার্য্যে ব্যাপৃতা দেখা যায়। মৃণালিনীও সূচিকর্ম্মনিপুণা ছিলেন। ২য় খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। ('কাপড়ের উপর ফুল তুলিতে জানি।')

অবতরণিকায় (ভারতবর্ষ, আষাঢ় ১৩২৫, পৃঃ ২৬) বলিয়াছি, সখীর ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের, পারিবারিকজীবনের প্রসঙ্গ কাব্য-নাটকে স্থান পায় না ইহাই সাধারণ নিয়ম হইলেও কোথাও কোথাও ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। এবং দৃষ্টান্তস্বরূপ সখী সুভাষিণী ও সখীস্থানীয়া ননন্দা কমলমণি ও শ্যামার উল্লেখও তথায় করিয়াছি। এক্ষেত্রেও সখী মণিমালিনীর স্বামিসুখের (?) প্রসঙ্গ এই পরিচ্ছেদের কথোপকথনে একটু-আধটু আছে, তবে মণিমালিনী সে কথায় বড় অঙ্গ দেন নাই। না দিয়া ভালই করিয়াছেন, কেননা নায়িকা মৃণালিনীর পূর্ব্ববৃত্ত বর্ণনাকে প্রাধান্য দেওয়াই এখানে কবির উদ্দেশ্য। তিনি সুকৌশলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছেন। ('মেঘনাদবধ' কাব্যে সীতা ও সরমার কথোপকথন স্মর্ত্তব্য।) পাঠকবর্গকে সমগ্র ২য় পরিচ্ছেদটি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ইহা হইতে উভয় সখীর বিশ্রম্ভালাপ তথা নর্ম্মালাপের নিদর্শন পাওয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরের অকৃত্রিম স্নেহেরও পরিচয় পাওয়া যায়। 'এ ত মৃণালিনী নহে যে স্নেহ-শিকলে বাঁধিয়া রাখিব।' 'তোমাকে ভগিনীর ন্যায় ভালবাসি।' 'আমি তোমাকে ভালবাসিব, বাসিয়াও থাকি।' মণিমালিনীর এই সকল উক্তি এবং 'কেবলমাত্র তুমি আমার সখী—তুমি আমাকে ভাল না বাসিলে কে আর ভালবাসিবে?' মৃণালিনীর এই উক্তি উভয়ের গভীর প্রীতির প্রমাণ। মৃণালিনীর পূর্ব্ববৃত্ত শুনিয়া মণিমালিনী অনুযোগ করিলেন, 'তুমি কুমারী হইয়া কি প্রকারে পুরুষের সহিত গোপনে প্রণয় করিতে?'—ইহা স্নেহের অনুযোগ, বিচারকের তীব্র তিরস্কার-বাক্য নহে। মৃণালিনীও মণিমালিনীকে ভালবাসিতেন বলিয়া ইহাতে ব্যথা পাইলেন এবং স্নেহময়ী সখীর খারাপ ধারণা দূর করিবার জন্য, তাঁহাকে অন্য কাহারও কাছে কথাটা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া ও তজ্জন্য শপথ করাইয়া গুহ্যকথা (হেমচন্দ্রের সহিত চৌরিকা-বিবাহের কথা) বলিলেন। † এই শপথ করানর ব্যাপার হইতে ও পরে মণিমালিনী দ্বারা ভিখারিণীর জন্য ভিক্ষা আনাইবার ছলে তাঁহাকে গৃহাভ্যন্তরে পাঠাইয়া গিরিজায়ার নিকট হেমচন্দ্রের সংবাদ লওয়ার ব্যাপার হইতে বুঝা যায় যে মৃণালিনী সখীকে পুরাপুরি বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, তিনি একটু আশঙ্কিতা পাছে মাধবাচার্য্যের শিষ্যকন্যা কর্ত্তব্যবোধে এ সব গুপ্ত কথা আপন পিতাকে জানায়। উভয়ের পরিচয়ও ত বেশী দিনের নহে। সুতরাং এ অবস্থায় এরূপ আশঙ্কা স্বাভাবিক। যদিও ইহা 'বিশ্বাস-বিশ্রামকারিণী' সখীর শাস্ত্রোক্ত লক্ষণের সহিত মিলে না, কিন্তু তথাপি মণিমালিনী সেমদুঃখসুখঃ সখীজনঃ'। মণিমালিনী যখন ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সই ভিখারিণীকে কাণে কাণে কি বলিতেছিলে?" তখন মৃণালিনী ছড়া কাটিয়া রঙ্গব্যঙ্গ করিয়াই সারিয়া লইলেন, মণিমালিনীও সেই রঙ্গব্যঙ্গে যোগ দিলেন। কথাটা ঐ ভাবেই চাপা পড়িল।

যাহা হউক, উভয়ের হৃদয়ের এইটুকু ব্যবধান থাকিলেও উভয়ের স্নেহপ্রীতি অকৃত্রিম। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে হৃষীকেশ যখন মৃণালিনীকে দুশ্চরিত্রা মনে করিয়া সেই রাত্রেই তাঁহাকে গৃহ হইতে চলিয়া যাইতে বলিলেন, তখন এমন বিপদে এত অপমানেও মৃণালিনী হৃষীকেশের কন্যা ও পাষণ্ড ব্যোমকেশের ভগিনী 'সখী মণিমালিনীর নিকট বিদায়' না লইয়া যাইতে পারিতেছিলেন না। হৃষীকেশ কটুবাক্য বলিয়া তাঁহাকে নিষেধ করিলে, 'এবার মৃণালিনীর চক্ষে জল আসিল।' এতক্ষণ তিনি কাঁদেন নাই। ইহা হইতে বুঝা যায়, মণিমালিনীর প্রতি তাঁহার স্নেহ কত গভীর।

আবার মণিমালিনীর স্নেহও সমান গভীর। 'প্রাঙ্গণ-ভূমে দ্রুতপাদবিক্ষেপিণী মৃণালিনীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সই, অমন করিয়া এত রাত্রে কোথায় যাইতেছ?" মৃণালিনী কহিলেন, "সখি, মণিমালিনি, তুমি চিরায়ুষ্মতী হও। আমার সহিত আলাপ করিও না। তোমার বাপ মানা করেছেন।" মণি। সে কি মৃণালিনি! তুমি কাঁদিতেছ কেন? সর্ব্বনাশ! বাবা কি বলিতে না জানি কি বলিয়াছেন! সখি, ফের। রাগ করিও না।" মণিমালিনী মৃণালিনীকে ফিরাইতে পারিলেন না। তখন অতি ব্যস্তে মণিমালিনী

† মৃণালিনী মণিমালিনীর কাণে কাণে কি বলিলেন, পাঠক আপাততঃ তাহা জানিতে পারিলেন না। ইহা আখ্যানের ক্রমিক বিকাশের জন্য অবলম্বিত একটি কাব্যকৌশল। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে ঠিক অনুরূপ কৌশল আছে। জগৎসিংহ যখন দুর্গস্বামীর অনুরোধ ব্যতীত দুর্গপ্রবেশে আপত্তি করিলেন, তখন বিমলা তাঁহাকে কাণে কাণে নিজের সম্পর্কের কথা বলিলেন। (১ম খণ্ড, ১৭শ পরিচ্ছেদ।)

পিতৃসন্নিধানে আসিলেন'—এই অত্যাহিতের প্রতিবিধানের চেষ্টায়। মৃণালিনীর তৎক্ষণাৎ গিরিজায়ার সহিত গৃহত্যাগে, অবশ্য সকল চেষ্টাই পণ্ড হইয়াছিল। ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে, হৃষীকেশ পুত্রস্নেহে অন্ধ হইয়া পুত্রের পক্ষপাতী হইলেন ও পুত্রের কথায় বিশ্বাস করিলেন, পুত্রের দোষ দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু মণিমালিনী ভ্রাতৃস্নেহে অন্ধ হইলেন না, 'ভ্রাতার দুশ্চরিত্র বুঝিতে পারিয়া, তাহাকে ভর্ৎসনা করিতেছিলেন।' ইহাও তাঁহার গভীর সখী-প্রীতির প্রমাণ। ফলতঃ এই চিত্র ক্ষুদ্র হইলেও হৃদয়গ্রাহী ও উজ্জ্বল-মধুর।

(৫) মৃণালিনী, গিরিজায়া ও রত্নময়ী

মৃণালিনী যেমন গৌড়নগরে হৃষীকেশ ব্রাহ্মণের বাটীতে বাসকালে গৃহস্বামীর কন্যা মণিমালিনীর সহিত অল্পদিনের পরিচয়েই সখিত্বসূত্রে বদ্ধ হইয়াছিলেন, সেইরূপ তিনি আবার নবদ্বীপে পাটনীর গৃহে বাসকালে 'পাটনীর যুবতী কন্যা রত্নময়ী'র সহিতও অল্পদিনের পরিচয়েই সখিত্বসূত্রে বদ্ধ হইয়াছিলেন; তবে তখন তিনি গভীর দুঃখে বিকল-চিত্ত, গিরিজায়া বহু চেষ্টায় তাঁহাকে মুখ ফুটিয়া কথা কহিতে প্ররোচিত করিত, সুতরাং রত্নময়ীর সহিত মৃণালিনীর সাক্ষাৎসম্বন্ধ তেমন স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হয় নাই, গিরিজায়ার সাহচর্য্য ও সাহায্যেই তাঁহার সখীর প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইয়াছে। আর অভিজাত-তনয়া মৃণালিনী অপেক্ষা ভিখারীর মেয়ে গিরিজায়ার সহিতই পাটনীর কন্যা রত্নময়ীর মাখামাখি বেশী হইয়াছিল, কেননা তাহারা অনেকটা সমান সামাজিক শ্রেণীর। যাহা হউক, মৃণালিনীর সহিত রত্নময়ীর সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে তেমন সখিত্ব না থাকিলেও গিরিজায়ার সহিত উভয়ের সখিত্ব থাকাতে ইউক্লিডের প্রথম স্বতঃসিদ্ধ অনুসারে এই সখিত্ব স্বীকার করিতে হইবে! রত্নময়ী যখন হেমচন্দ্রকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুরাণি, উনি তোমার কে?" মৃণালিনী কহিলেন, "দেবতা জানেন।" মৃণালিনী সব কথা তাহার কাছে ভাঙ্গিলেন না। (৩য় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ।) ইন্দিরাও সব কথা হারাণীর কাছে ভাঙ্গেন নাই—বোধ হয়, একই কারণে—সে এমন অভাবনীয় ঘটনায় বিশ্বাস করিবে না বলিয়া। ইহার পরে রত্নময়ীর আর বার্ত্তা পাওয়া যায় না। তথাপি বলিব, তাহাকে একেবারে সখী-হিসাবে অগ্রাহ্য করা চলে না, বাদ দেওয়া যায় না। 'পরিশিষ্টে' দেখা যায়:—'রত্নময়ী এক সম্পন্ন পাটনীকে বিবাহ করিয়া হেমচন্দ্রের নূতন রাজ্যে গিয়া বাস করিল। তথায় মৃণালিনীর অনুগ্রহে তাহার স্বামীর বিশেষ সৌষ্ঠব হইল। গিরিজায়া ও রত্নময়ী চিরকাল "সই" "সই" রহিল।' (এক্ষেত্রেও গ্রন্থকার তাহার বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন, অতএব সে 'কাব্যের উপেক্ষিতা' নহে!)

একটিমাত্র পরিচ্ছেদে (৩য় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ) সখিত্বের চিত্র থাকিলেও গিরিজায়ার সহিত রত্নময়ীর রঙ্গব্যঙ্গটুকু বেশ অম্লমধুর। 'র। "সই?" গি। কি সই? র। তুমি কোথা সই? গি। বিছানাসই। র। গায়ে জল দিব সই। গি। জলসই? ভাল সই, তাও সই। র। কথায় সই তুমি চিরজই—আর মিলাইতে পারি কই? তোমার মুখে ছাই।'...† এই দাশুরায়ী ধরণের পাঁচালীর 'ছাই'মুঠাটাও মিষ্ট। অতএব এ চিত্রও ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বলিয়া উপেক্ষণীয় নহে।

(৬) কুন্দ ও চাঁপা

অবতরণিকায় বলিয়াছি (ভারতবর্ষ, আষাঢ় ১৩২৫, পৃঃ ৩০ ১২ নং পাদটীকা) বঙ্কিমচন্দ্র 'মন্দভাগিনী চির-দুঃখিনী' কুন্দনন্দিনীকে একেবারে সখীভাগ্যে বঞ্চিত করেন নাই। বাল্যে পিতৃবিয়োগের পরেই তাহার 'সমবয়স্কা ও সঙ্গিনী' চাঁপাকে তাহার পার্শ্বে বসাইয়াছেন। চাঁপা তাহাকে সান্ত্বনা দিয়াছে, কুন্দও তাহাকে অদ্ভুত স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিয়াছে। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন.—'চাঁপা কুন্দের সমবয়স্কা ও সঙ্গিনী। চাঁপা আসিয়া কুন্দের সঙ্গে নানাবিধ কথা কহিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। কিন্তু দেখিল যে কুন্দ কোন কথাই কহিতেছে না, রোদন করিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে প্রত্যাশাপন্নবৎ আকাশপানে

† দুই সখীর এই ছড়াকাটা ও (১ম খণ্ডের ৩য় পরিচ্ছেদে) মৃণালিনী ও মণিমালিনীর ছড়াকাটা "সই মনের কথা সই; মনের কথা সই...সই কথা কোস্ কথা কব নইলে কারো নই" "হ'লি কিলো সই?" "তোমারই সই"—'দীনবন্ধু মিত্রের 'লীলাবতী'তে (২য় অঙ্ক ১ম দৃশ্য) লীলাবতী ও সারদাসুন্দরীর 'সই মনের কথা তোরে কই, আমার কে আছে আর তোমা বই'—'হাঁ সই, আমি কি কেউ নই' স্মরণ করাইয়া দেয়।

চাহিয়া দেখিতেছে। চাঁপা কৌতূহল-প্রযুক্ত জিজ্ঞাসা করিল, "এক শ বার আকাশপানে চাহিয়া কি দেখিতেছ ?" কুন্দ তাহাকে স্বপ্নবৃত্তান্ত আদ্যন্ত বলিল এবং পরে নগেন্দ্র দত্তকে দেখিয়া চাঁপাকে দেখাইল, "এই সেই স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষ।" ('বিষবৃক্ষ', ৪র্থ পরিচ্ছেদ।) স্বপ্নবৃত্তান্ত উভয় সখীর কথাপ্রসঙ্গে কৌশলে পাঠকবর্গের গোচর করিবার জন্য কবি বাল্যসখীর অবতারণা করেন নাই, কেননা কবি ইহা নিজেই পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বিবৃত করিয়াছেন। তবে কুন্দ যে কতদূর অসামান্য সরলা, স্বপ্নবৃত্তান্তে সম্পূর্ণ বিশ্বাসপরায়ণা, কবি চাঁপার সহিত কুন্দর কথাবার্ত্তায় এইটুকু কৌশলে বুঝাইয়াছেন। যাহা হউক, তথাপি বলা যাইতে পারে যে কবি, ভবভূতি ও মাইকেল মধুসূদনের মত, করুণাপরবশ হইয়াই এই দারুণ শোকের সময় বালিকা কুন্দনন্দিনীর একজন সখীর ব্যবস্থা করিয়াছেন, এক দণ্ড জুড়াইবার স্থান মিলাইয়াছেন। ইহার পর কুন্দ অন্যত্র নীতা, আর তাহার সারাজীবনে চাঁপার সহিত দেখা হয় নাই। তবে সদ্যঃ সদ্যঃ অপরিচিত স্থানে গিয়া সে কমলমণির স্নেহযত্ন পাইয়া কতকটা সুস্থ ও শান্ত হইয়াছিল, ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে। (৫ম পরিচ্ছেদ।)

(৭) কুন্দ ও কমলমণি

যৌবনকালে যখন কুন্দ প্রণয়ের ব্যথায় কাতর, তখন আবার কবি করুণা-পরবশ হইয়া কমলমণিকে ক্ষণেকের তরে তাহার সমবেদনাময়ী সখীর ভূমিকা গ্রহণ করাইয়াছেন। অবতরণিকায় (১২ নং পাদটীকায়) ইহারও আভাস দিয়াছি। নগেন্দ্রনাথ বালিকা কুন্দকে কলিকাতা লইয়া গেলে কমলমণি তাহাকে ছোট বোনটির মত যত্ন আর্ত্তি করিলেন, ইহা অবশ্য সখিত্বের চিত্র নহে। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে সূর্য্যমুখীর যাতনার সংবাদ জানিয়া এবং তাঁহার অনুরোধপত্র পাইয়া কমলমণি যখন গোবিন্দপুরে গেলেন ও সূর্য্যমুখীর 'কণ্টক উদ্ধার' করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন, তখন তিনি যে কৌশলে কুন্দর মনোভাব জানিবার জন্য তাহার প্রতি (মতিবিবির মত) স্নেহের ভান করিলেন তাহা নহে, তিনি প্রকৃতই কুন্দকে ভালবাসিলেন। আর কুন্দও যে 'বোকা মেয়ে' বলিয়া, হীরার মৌখিক যত্ন-আদরের মত, কমলমণির স্নেহের ভান দেখিয়া ভুলিয়া গেল তাহা নহে, উভয় পক্ষেই প্রকৃত ভালবাসা ঘটিল। 'কমলের যে প্রকৃতি চির-প্রেমময়ী, তাহাতে সে তখন হইতেই তাঁহাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। মধ্যে কয় বৎসর অদর্শনে কতক কতক ভুলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে কমলের স্বভাবগুণে, কুন্দেরও স্বভাবগুণে, সেই ভালবাসা নূতন হইয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রণয় গাঢ় হইল।' (১৪শ পরিচ্ছেদ।)

'কুন্দনন্দিনী কমলের যাওয়ার কথা শুনিয়া আপনার ঘরে গিয়া লুকাইয়া কাঁদিল, কমলমণি লুকাইয়া লুকাইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেল।......কুন্দের মাথা তুলিয়া, কমল তাহার মস্তক আপনার কোলে রাখিলেন। অঞ্চল দিয়া তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিলেন।' তাহার পর কমলমণি কুন্দকে তাঁহার সঙ্গে কলিকাতা যাইতে বলিলেন এবং 'সস্নেহে' তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই দাদাবাবুকে বড় ভালবাসিস্—না ?" 'কুন্দ উত্তর দিল না। কমলমণির হৃদয়মধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।' তাহার পর যখন কমলমণি তাহাকে বুঝাইলেন এই ভালবাসায় কত অনিষ্ট হইতেছে, তখন 'ঘুরিয়া কুন্দের উন্নত মস্তক আবার কমলমণির বক্ষের উপর পড়িল। কুন্দনন্দিনীর অশ্রুজলে কমলমণির হৃদয় প্লাবিত হইল। কুন্দনন্দিনী অনেকক্ষণ নীরবে কাঁদিল—বালিকার ন্যায় বিবশা হইয়া কাঁদিল। সে কাঁদিল, আবার পরের চক্ষের জলে তাহার চুল ভিজিয়া গেল। ভালবাসা কাহাকে বলে, সোণার কমল তাহা জানিত। অন্তঃকরণের অন্তঃকরণ মধ্যে কুন্দনন্দিনীর দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী হইল।' (১৪শ পরিচ্ছেদ।) ইহা 'সমদুঃখসুখ সখীজনে'র চিত্র নহে কি ? যদিও কমলমণি সূর্য্যমুখীর সুখের জন্য সতত সচেষ্ট, এবং সূর্য্যমুখীর 'কণ্টক উদ্ধারের' জন্যই কুন্দকে কলিকাতা লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন, তথাপি তিনি এক্ষেত্রে কুন্দর প্রতি পূর্ণ সমবেদনা দেখাইয়াছেন, স্বীকার করিতে হইবে।

আবার ১৭শ পরিচ্ছেদে সূর্য্যমুখী কুন্দকে কর্কশ-ভাষায় গৃহ হইতে চলিয়া যাইতে বলিলে, 'কুন্দের গা কাঁপিতে লাগিল। কমল দেখিলেন যে, সে পড়িয়া যায়। কমল তাহাকে ধরিয়া শয়নগৃহে লইয়া গেলেন। শয়নগৃহে থাকিয়া আদর করিয়া সান্ত্বনা করিলেন।' পরে তিনি

সূর্য্যমুখীকে বুঝাইলেন যে কুন্দ-সম্বন্ধে দেবেন্দ্র দত্তর কুৎসা বিশ্বাসযোগ্য নহে এবং পলায়িতা কুন্দর সন্ধানে সচেষ্ট হইলেন। (২০শ পরিচ্ছেদ।) ইহাও কুন্দর প্রতি পূর্ণ সমবেদনার পরিচায়ক।

৩১শ পরিচ্ছেদে বিধবা-বিবাহ ও সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগের পর নগেন্দ্রের ব্যবহারে ও সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগে ব্যথিত-হৃদয়া কুন্দ 'আজিকার মর্ম্মপীড়া, সহৃদয়া স্নেহময়ী কমলমণির সাক্ষাতে বলিতে ইচ্ছা করিলেন। সেদিন, প্রণয়ের নৈরাশ্যের সময়, কমলমণি তাঁহার দুঃখে দুঃখী হইয়া, তাঁহাকে কোলে লইয়া চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়াছিলেন—সেই দিন মনে করিয়া তাঁহার কাছে কাঁদিতে গেলেন। কমলমণি কুন্দনন্দিনীকে দেখিয়া অপ্রসন্ন হইলেন—... কুন্দ তাঁহার কাছে আসিয়া বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কমলমণি কিছু বলিলেন না; জিজ্ঞাসাও করিলেন না, কি হইয়াছে।' এ ক্ষেত্রে কমলমণির সমবেদনার উৎস শুকাইয়াছে, সূর্য্যমুখীর গভীর ভাবনা ও গৃহত্যাগের জন্য তিনি মর্ম্মপীড়িতা, তাঁহার সূর্য্যমুখীর প্রতি প্রীতি এখন সর্ব্বাতিশায়িনী।

কিন্তু ৪৩শ পরিচ্ছেদে আবার যখন কমলমণি গোবিন্দপুরে আসিলেন, তখন তিনি আবার পূর্ব্ববৎ কুন্দর প্রতি স্নেহময়ী সমবেদনাময়ী। 'যে অবধি সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, সেই অবধি কুন্দনন্দিনীর উপর কমলমণির দুর্জ্জয় ক্রোধ; মুখ দেখিতেন না। কিন্তু এবার আসিয়া কুন্দনন্দিনীর শুষ্ক মূর্ত্তি দেখিয়া কমলমণির রাগ দূর হইল—দুঃখ হইল। তিনি কুন্দনন্দিনীকে প্রফুল্লিত করিবার জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন, নগেন্দ্র আসিতেছেন, সংবাদ দিয়া কুন্দের মুখে হাসি দেখিলেন।' এবার আবার তিনি সমবেদনাময়ী সখীর কার্য্য করিলেন।

শেষে কুন্দনন্দিনীর মৃত্যুকালে 'কমলমণি ভয়নিক্লিষ্ট-বদনে কুন্দের ঘর হইতে বাহির হইলেন এবং অতিব্যস্তে নগেন্দ্রকে ডাকিতে পাঠাইলেন।' এবং তাহার জন্য 'উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিলেন।' (৪৮শ ও ৪৯শ পরিচ্ছেদ।) ইহার উল্লেখ না করিলেও চলে—কেননা তখন সপত্নী সূর্য্যমুখী পর্য্যন্ত সমবেদনায় পূর্ণহৃদয়া, 'চিরপ্রেমময়ী' কমলমণির ত কথাই নাই।

কমলমণি প্রধানতঃ সূর্য্যমুখীর স্নেহময়ী ননন্দা বা সখীর ভূমিকাগ্রহণের জন্যই পরিকল্পিতা। তথাপি তিনি উল্লিখিত স্থলগুলিতে কুন্দনন্দিনীরও সমদুঃখসুখা সখীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা এই শতদল কমলের পাপড়িতে পাপড়িতে সঞ্চিত প্রীতি-মধুর পরিচয়, এই 'চিরপ্রেমময়ী'র সর্ব্বত্রপ্রসারী প্রেম-স্নেহের নিদর্শন। তাই 'ননদ-ভাজ' প্রবন্ধে * ভাব-গদ্গদচিত্তে বলিয়াছি, 'কমলমণি আমার favourite, আমি চিরদিনই কমলমণির গুণপক্ষপাতী। কমল সত্যই সোণার কমল, নারীরত্ন। তাই সে প্রস্ফুটিত শতদল কমল (full-blown Rose)।' যাক্, সখীর চিত্র-বিচারে এই উচ্ছ্বাস বর্জ্জনীয়। এই চিত্র নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে, এবং সুন্দর ও উজ্জ্বল, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

(৮) হীরার গঙ্গাজল মালতী গোয়ালিনী

কুন্দ-কমলের এই রোম্যাণ্টিক চিত্রের পরে হীরার গঙ্গাজল মালতী গোয়ালিনীর (realistic) বাস্তব চিত্রের আলোচনা করিয়া আপাততঃ প্রবন্ধ শেষ করিব। তিনটি পরিচ্ছেদে (১৯শ, ২২শ, ৩৬শ) আমরা 'গঙ্গাজলের' দর্শন-সৌভাগ্য লাভ করি। ১৯শ পরিচ্ছেদে শিকল নাড়ার শব্দ শুনিয়াই হীরা বুঝিল ইহা বাবুর বাড়ীর দ্বারবানের শিকল নাড়া নহে, 'তাহার হাতে শিকল অমন মধুর বলে না',...... 'এ শিকল বলিতেছে' "কিট্ কিট্ কিটী! দেখি কেমন আমার হীরেটি!" ইত্যাদি। ইহা হইতে আমরাও বুঝিতে পারি, উভয়ের গলায় গলায় ভাব। মালতী নিতান্ত নোংরা ব্যাপারে দূতীর কার্য্য করে। (তাহার ব্যবসায়ের ঠিক নাম-নির্দ্দেশ করিয়া লেখনী কলঙ্কিত করিতে চাহি না। 'সই' 'বেগুন ফুল' প্রভৃতি অভিধা ছাড়িয়া 'গঙ্গাজল' অভিধায় তাহার চরিত্র-সম্বন্ধে গূঢ় ব্যঙ্গ—Irony—লক্ষণীয়।) সে হীরাকে বলিল "তোকে দেবেন্দ্র বাবু ডেকেছে।" ইহার অর্থ হীরা বুঝিল। রতনে রতন চেনে। দুই সখী—অভিসারিকা ও দূতী 'গলা মিলাইয়া' দেশকালপাত্রোপযোগী 'গীত গায়িতে গায়িতে চলিল'। যাহা হউক, এক্ষেত্রে দেবেন্দ্র বাবুর উদ্দেশ্য অন্যরূপ ছিল, হীরা গোড়ায় একটু ভুল বুঝিয়াছিল।

তাহার পর, 'হীরার বাড়ী মালতী গোয়ালিনীর কিছু ঘন ঘন যাতায়াত হইতে লাগিল।' (২২শ পরিচ্ছেদ।)

* ভারতবর্ষ, কার্ত্তিক ১৩২০, অথবা 'কাব্যসুধা' ২৮ পৃঃ।

হীরার সঙ্গে তাহার গলায় গলায় ভাব থাকিলেও এই যাতায়াত কিন্তু সখীপ্রীতির ফল নহে। মালতী দেবেন্দ্র বাবুর কার্য্য উদ্ধারের জন্য কৌশলে কুন্দকে হীরার ঘরে আবিষ্কার করিল এবং দেবেন্দ্রকে সংবাদ দিল। এরূপ চরিত্রের স্ত্রীলোকের সখীপ্রীতি অপেক্ষা স্বার্থানুরাগই প্রবল।

যাহা হউক, আবার ৩৬শ পরিচ্ছেদে দেবেন্দ্র 'মালতী দ্বারা হীরাকে ডাকাইলেন।' এবার মালতীর কার্য্যটি তাহার ব্যবসায়ের হিসাবে। যাহা হউক, এই বাস্তব চিত্রের আর আলোচনা করিব না। শুধু প্রবন্ধের সম্পূর্ণতার জন্য ইহার উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম।

এই প্রবন্ধে যে আটখানি চিত্রের আলোচনা করিলাম, ইহার মধ্যে শেষেরটি (realistic) বাস্তব চিত্র হিসাবে উল্লেখযোগ্য—এইমাত্র। বাকী সাতখানির মধ্যে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ও নগণ্য; কিন্তু মৃণালিনী ও মণিমালিনীর সখিত্বের চিত্র ক্ষুদ্র হইলেও উজ্জ্বল ও মনোরম, গিরিজায়া ও রত্নময়ীর সখিত্বের চিত্র ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইলেও সুন্দর এবং কুন্দর সহিত কমলমণির সখিত্বের চিত্র নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে, এবং সুন্দর ও উজ্জ্বল। বারান্তরে প্রথম শ্রেণীর অবশিষ্ট কয়েকখানি চিত্রের বিচার করিব; সেগুলি এগুলি অপেক্ষা পূর্ণায়তন ও হৃদয়গ্রাহী।

ভক্তের ভগবান

[শ্রীহরনাথ বসু]

শীতকাল। হিমালয় প্রদেশে হিমের পরিমাণ নাই। উপরে হিম—নীচে হিম—হিমানীর হিমশয্যা—হিমদেহ—হিমপ্রাণ—হিম আত্মা! সে হিমে মানুষ জমাট হইয়া যায়—জল জমাট হইয়া যায়—পৃথিবী জমাট হইয়া যায়। সম্মুখে পশ্চাতে দূরে অদূরে শিখরের পর শিখর যোজন ব্যাপিয়া পড়িয়া আছে। বৃক্ষ নাই—লতা নাই—শুধু যোজনব্যাপী অনন্ত তুষাররাশি। মাতা বসুমতীর অঙ্গ কে যেন শুভ্র বসনে ঢাকিয়া দিয়াছে। হিমগিরির শীতল করস্পর্শে অপরাহ্ণ-রবি ম্লান হইয়া পড়িয়াছে। মানুষ—পশু-পক্ষী—শব্দ-গন্ধ কিছুই নাই। স্থানে স্থানে শুধু রজত-ধবল তুষার-কিরীটিনী পূত-প্রবাহিণী গোমুখী গঙ্গা মন্দাকিনী রূপে বহিয়া কঠিন বরফরাশি বক্ষে ধারণ করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বিশ্বনাথের নাম গান করিতে-করিতে মন্থরগতিতে চলিতেছে। প্রবাহিনীর আর সে প্রাবৃটের নৃত্য নাই—উৎস সকল নিরুদ্ধ—সমীরণ তুষার-রাশি ছড়াইয়া দিতেছে। দেখিলে আতঙ্ক হয়—মনে হয় সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড বুঝি হিমপিণ্ডে পরিণত। সব শূন্য—শুধু কন্—কন্—কন্!

এই নিদারুণ হিমে দিন-শেষে এক অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধ দ্রুত পর্ব্বতারোহণ করিতেছেন। সন্ন্যাসী ঊর্দ্ধমুখে ছুটিতেছেন। উপলখণ্ডের আঘাতে কঙ্করাদির নিষ্পেষণে তাঁহার পদদ্বয় ক্ষতবিক্ষত। পরিধানে কৌপীন মাত্র—অঙ্গের আবরণ কোথায় খসিয়া গিয়াছে। ক্ষণে-ক্ষণে কুজ্ঝটিকা-রাশি ছুটিয়া আসিয়া পথিকের গতিরোধ করিতেছে। হিমশীতল সমীরণ তাঁহার জীর্ণ দেহে সুতীক্ষ্ণ শর বিদ্ধ করিতেছে। সন্ন্যাসীর তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপও নাই। দুই বাহু ঊর্দ্ধে তুলিয়া, দেবাদিদেব বদরিনারায়ণের পবিত্র নামোচ্চারণ করিতে-করিতে দ্রুত পাদবিক্ষেপে তিনি সেই বন্ধুর পথ অতিক্রম করিতেছেন। বৃদ্ধ পশ্চিমদেশীয় রামানুজ সম্প্রদায়ভুক্ত একজন বৈষ্ণব সাধু। জীবনের প্রান্তে আসিয়া বৈষ্ণবের পরম স্থান বদরিকা দর্শনের জন্য ভক্তের প্রাণ লালায়িত। তাই আজ ধর্ম্মপিপাসা-নিবৃত্তিকল্পে সেই জীর্ণদেহে অসুরের বল আসিয়াছে। ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, ভয় নাই, ক্লান্তি নাই। মূর্ত্তি শান্ত, সৌম্য, জ্যোতির্ম্ময়,—তাহাতে জ্যোতির্ম্ময়ের করুণাধারা সহস্রধারে প্রবাহিত। সে মূর্ত্তি দেখিবার জন্য পার্শ্বে তুষাররাশির মধ্য হইতে পরমানন্দে অলকানন্দা নাচিয়া উঠিল, সায়াহ্ন-রবি শিখরে-শিখরে গলিত স্বর্ণরাশি ছড়াইয়া দিল,—নিমেষের জন্য জড়জগতের চেতনা ফিরিয়া আসিল। ধূসর সন্ধ্যার অস্পষ্ট

আলোকে, হিমবর্ষী আকাশতলে, অলকানন্দার সৈকত-সন্নবর্ত্তী তুষারমণ্ডিত পাষাণগাত্রে সেই দিব্য পুরুষের দিব্য মূর্ত্তি চিত্র-লিখিতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

আজ দীপান্বিতা অমাবস্যা। ছয় মাসের পর ছয় মাসের জন্য আজ বদরিনাথের মন্দির-দ্বার রুদ্ধ হইবে। যাত্রীরা সকলেই সে স্থান হইতে নামিয়া আসিয়াছে। যাহারা সর্ব্বশেষে গিয়াছিল, তাহারা হনুমান-চটি অভিমুখে ছুটিতেছে। সন্ধ্যা অতীত হইলে সে বিপদ-সঙ্কুল ভীষণ পথে ভ্রমণ অসম্ভব। হনুমান-চটি বদরিকা হইতে ৩।৪ মাইল মাত্র দূরে। কিন্তু এই পথটুকু অতি দুর্গম। সাধু সন্ধ্যার অন্ধকারে এই পথে যাইতেছেন। কালবিলম্বের অবসর নাই। অধিক রাত্রি হইলে তাঁহার আরাধ্য দেবের দ্বার রুদ্ধ হইবে। তাহা হইলে ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে না। সাধু প্রাণের মমতা ত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে আরম্ভ করিলেন। যে যাত্রীর দল হনুমান-চটি অভিমুখে নামিতেছিল, তাহারা সম্মুখে ঐ নগ্নপ্রায় সাধুকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। একজন তাঁহার হস্তধারণ-পূর্ব্বক বলিল,—"কাঁহা যাও ভাই ?"

ব্রহ্মচারী গুরুগম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন,—"যাঁহা মেরা ভগবানজী হ্যায়।"

প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ব্রাহ্মণ যাইবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলেন। বক্তা পুনরায় বলিল, "আরে ভাই, তোম কি পাগলা হুয়া? আবি ত এক পহরকা রাস্তা হ্যায়। ঘণ্টা ভরমে ত বেলকুল বরফ হো জাগি। হামারা সাথ চলো ভাইজী,— ছ-মাহিনা বাদ আকে, ভগবানজীকো দর্শন করো, জনম সফল হো জাগি।"

উত্তর দিবার অবসর নাই। উপেক্ষার হাসি হাসিয়া উদাসী নির্ভয়ে ছুটিলেন। অনেকে তাঁহার গতিরোধের চেষ্টা করিল। কিন্তু, ঝটিকাবেগে ব্রহ্মচারী সকলের আকর্ষণ ছিন্ন করিয়া অন্ধকারে মিশিয়া গেলেন।

২

অমাবস্যার রাত্রি; কিন্তু অন্ধকারের সে ঘনঘটা নাই। গগনস্পর্শী পর্ব্বতের হিমময় প্রদেশসমূহ অন্ধকার রাত্রিতেও নক্ষত্রালোকে উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। অনেক সময়ে তাহা চন্দ্রালোক বলিয়া ভ্রম হয়। উন্মুক্ত বাতাস, উন্মুক্ত আকাশ—(নক্ষত্রের আলোকে কি?) আমরা সহরবাসী তাহা জানি না।

হিমালয়ের সঙ্কীর্ণ উপত্যকায় বদরিনারায়ণের মন্দির দেখা যাইতেছে। সীমাশূন্য, সুন্দর, সুনীল আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র ফুটন্ত ফুলের মত ঝলমল করিতেছে। আর সেই ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর সুমধুর আলোকরশ্মি শৈলে-শৈলে, শিখরে-শিখরে, নির্ঝরিণীর ধারায়-ধারায়, অলকানন্দার লহরে-লহরে,—সমগ্র গিরিরাজের প্রতি অঙ্গে প্রতিফলিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা প্রকটিত করিতেছে। উপরে আকাশ-ভরা ফুল—নীচে দর্পণ-বিনিন্দি তুষারাবৃত হিমাচলে তাহার প্রতিচ্ছবি। উপরে ফুল, নীচে ফুল; উপরে আকাশ—নীচে আকাশ; স্বর্গমর্ত্ত্যের শোভাময় সম্মিলন! এখানে পাপের কলুষ নাই, লোকালয়ের কোলাহল নাই—পীড়িতের আর্ত্তনাদ নাই। সব নির্ম্মল, শীতল শান্তরসাস্পদ! তাই এই স্বর্গরাজ্যে অন্ধকারের মধ্যে আলোকের খেলা! ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজাল!

ক্ষুদ্র মন্দিরমধ্যে চতুর্ভুজ বিষ্ণু-মূর্ত্তি। পুরোহিত পূজায় ব্যাপৃত। সম্মুখে দীপাধারে বৃহৎ প্রদীপ জ্বলিতেছে। দর্শক নাই, বাদ্যকর নাই, কলরব নাই। কদাচিৎ পুরোহিতের ঘণ্টারব ও মন্ত্রধ্বনি দূরাগত সঙ্গীতের ন্যায় শ্রুত হইতেছে। জনহীন মন্দিরমধ্যে ব্রাহ্মণ একাকী। আজ শেষ পূজা। ছয় মাসের উপযোগী ভোগাদির দ্রব্য-সম্ভারে ক্ষুদ্র গৃহটী পরিপূর্ণ।

পূজা সম্পাদন পূর্ব্বক পুরোহিত দেবতার পানে চাহিয়া আছেন, অনিমেষে শ্রীভগবানের মূর্ত্তি দর্শন করিতেছেন। বিগ্রহের বড় মধুর বেশ, বড় শান্ত মূর্ত্তি। ছয়মাসের জন্য দেবতার সমাধি হইবে, তাই আজ দেবাদিদেব যেন ধ্যানমগ্ন হইয়াছেন।

রাত্রি প্রায় এক প্রহর—একটী স্তিমিতপ্রায় দীপ হস্তে পুরোহিত বাহিরে আসিয়া মন্দির-দ্বার রুদ্ধ করিলেন। সহসা নেপথ্যে শ্রুত হইল—"ঠাকুর বাবা! দ্বার খুলিয়া দাও, আমি যাইতেছি।" ভীত ও বিস্মিতভাবে ব্রাহ্মণ চারিদিকে চাহিয়া ডাকিলেন,—"বিজনে কে এ?" এমন সময়ে পূর্ব্বোল্লিখিত কৌপীনধারী বৈষ্ণব ব্রহ্মচারী তথায় উপস্থিত হইলেন। পুরোহিত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে তুমি?"

ব্রহ্মচারী সোৎসাহে উত্তর করিলেন,—"দেখিতেছ না—বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, দেবতা-দর্শনে আসিয়াছি। মন্দির খুলিয়া দাও ভাই, দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করি।"

পুরোহিত। দ্বার আর ছয় মাস খোলা হইবে না।

সাধু হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িলেন। আবার তথনই পুণ উদ্যমে উঠিয়া বলিলেন,—"সে কি! না—না, তুমি উপহাস করিতেছ? উপহাস কেন ভাই, দ্বার উন্মোচন কর। একবার দর্শন করি।"

পুরোহিত। শুন ব্রাহ্মণ, আমি তোমায় উপহাস করি নাই। হিমে আমি কাঁপিতেছি—তুমিও অবসন্ন; এখন কি উপহাসের সময়?

সাধুর মনে একটু ক্রোধের সঞ্চার হইল। অপেক্ষাকৃত উচ্চৈঃস্বরে তিনি বলিলেন,—"তবে—তবে—"পুরোহিত কহিলেন,—"দ্বার রুদ্ধ করিবার পর ছয় মাসের মধ্যে আর খুলিবার নিয়ম নাই। ইহা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ।" গম্ভীর স্বরে ব্রহ্মচারী উত্তর করিলেন,—"তবে কি দেবদর্শন আমার অদৃষ্টে নাই?"

পুরোহিত। কেন থাকিবে না?—এখন ফিরিয়া যাও, ছয় মাস পরে আসিও।

বৈষ্ণব ব্রহ্মচারী বজ্রাহত হইলেন। পদতলে পৃথ্বী টলমল করিতে লাগিল। যে চরণ এই দীর্ঘ দুর্গম পথের সর্ব্ব-বাধা তুচ্ছ করিয়াছিল—সহসা তাহা অবশ হইয়া পড়িল—মস্তক বিঘূর্ণিত হইল—তপ্ত অশ্রু গণ্ড প্লাবিত করিল—সর্ব্বাঙ্গে স্বেদ-বিন্দু দেখা দিল। কিয়ৎক্ষণ তাঁহার বাঙ্‌নিষ্পত্তির ক্ষমতা রহিল না। বহুকষ্টে আশা-যষ্টি অবলম্বনে কিঞ্চিৎ শক্তি সঞ্চয় করিয়া কাতরভাবে পুরোহিতকে কহিলেন, "কি বলিতেছ ব্রাহ্মণ—তুমি কি উন্মাদ? দেখিতে পাইতেছ না—এই গলিত-অঙ্গ, পলিত-কেশ বৃদ্ধ শীতাতপের কত কষ্ট সহ্য করিয়া দেহরক্ষার জন্য দেবতার স্থানে আসিয়াছে? আবার এই দীর্ঘ পথ যাতায়াত—দীর্ঘ ছয় মাস জীবন-ধারণ? অসম্ভব! তাই বলি ভাই, নিয়ম ভঙ্গ কর—দরজা খোল—আমায় দেবদর্শন করিতে দাও। নারায়ণ তোমার মঙ্গল করিবেন।"

পুরোহিত অধিক বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন বোধে শুধু বলিলেন, "মার্জ্জনা কর,—ও-কার্য্যে আমি অক্ষম। শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কাজ আমার দ্বারা হইবে না।"

সাধু বর্ষার মেঘ-গর্জ্জনবৎ গুরুগম্ভীর স্বরে কহিলেন, "সম্মুখে ব্রহ্মহত্যা হয়, তাহার অপেক্ষা তোমার শাস্ত্র বড়?"

পুরোহিত বিরক্ত হইয়া উত্তর করিলেন, "তর্কে আবশ্যক নাই।—কিছুতেই আমি এ কাজ করিতে পারিব না।"

সাধু। তোমার কি দয়া নাই?

পুরোহিত। হইতে পারে; এখন পথ দাও।

সাধু। দরজা খুলিবে না?

"না"—বলিয়া পুরোহিত অগ্রসর হইলেন। সাধু সলম্ফে তাঁহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক কহিলেন, "যদি তোমায় পীড়িত করি?"

পুরোহিত। আমি তাহার প্রত্যুত্তর দিব।

উদ্দীপ্ত-ক্রোধ ব্রহ্মচারীর চক্ষু-কর্ণ দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল; আত্মহারা হইয়া তিনি কহিলেন, "তবে তাই হউক। তুমি দস্যু, আমার মন্দিরের চাবি চুরি করিয়াছ, শীঘ্র চাবি ফিরাইয়া দাও।"

পুরোহিত ব্রহ্মচারীর হাত ছাড়াইয়া সবেগে প্রস্থান করিলেন। বৈষ্ণব সাধু শোকে মূর্চ্ছিত হইয়া বরফময় শিলাতলে নিপতিত হইলেন। সহসা নক্ষত্রের আলো নিভিয়া গেল। বুঝি সেই বিষাদের দৃশ্য দেখিতে না পারিয়া দেববালাগণ মেঘাবগুণ্ঠনে বদন আবৃত করিল। অনতিকাল মধ্যে সেই অচেতন দেহে নির্ম্মম তুষাররাশি কঠিন শয্যা বিস্তার করিয়া দিল। বহুক্ষণ পরে তাঁহার চৈতন্য হইল। তখন তিনি উঠিয়া বসিয়া মন্দির সম্মুখে করযোড়ে উচ্চকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। নিজের দুরদৃষ্টের কথা বলিতে-বলিতে এবং জন্মান্তরীণ দুষ্কৃতির অনুশীলন করিতে-করিতে ব্রহ্মচারী আত্মহারা হইয়া বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিলেন। দেবতার কাছে কত দুঃখের কান্না কাঁদিলেন—কত অভিমানের কথা বলিলেন—তাঁহাকে কত তিরস্কার করিলেন—কত দম্ভের কথা শুনাইলেন। মহাপুরুষের ঘন-ঘন দীর্ঘশ্বাসে সহসা তুষার-পাত বন্ধ হইয়া গেল। সম্মুখের প্রস্রবণ হইতে তাঁহার তপ্ত অশ্রুর অনুরূপ উষ্ণ জল ছুটিতে লাগিল; হিমশীতল গিরিকন্দরে গ্রীষ্মের উত্তাপ অনুভূত হইল।

নিশীথ রাত্রে এক ফকীর-বেশধারী সাধু তথায় আসিয়া উপনীত হইলেন। ফকীরের করে কমণ্ডলু—

ঙ্গে পশুচর্ম্মের আংরাখা—মস্তকে বৃক্ষছালের আচ্ছাদন—কণ্ঠে পলা-শঙ্খস্ফটিক-তুলসী প্রভৃতির মালা। তাঁহার সঙ্গে একটী ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য অশ্ব—তৎপৃষ্ঠে কিঞ্চিৎ আহার্য্য, তৈজস ও কাষ্ঠাদি স্থাপিত। ফকীর বহু দূর হইতে আসিতেছেন—অশ্বের মুখ-নিঃসৃত ফেণরাশি, মন্থর গতি, ও গমনে অনিচ্ছা ক্লান্তি জ্ঞাপন করিতেছে। ফকীরের শরীরে কিন্তু ক্লান্তির কোন চিহ্ন নাই। তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চাশের উর্দ্ধ হইলেও শরীরে অসুরের বল—বদনে বালকের লাবণ্য—নয়নে অপূর্ব্ব মাধুরী বিকশিত। সেই সুললিত, সুঠাম, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, সতেজ হোমাগ্নিশিখার ন্যায় পূর্ণাবয়ব স্বতঃ-উৎপন্ন মূর্ত্তি দর্শন করিলে জীবন সার্থক হয়।

অশ্বটীকে নিকটস্থ কোন নিরাপদ স্থানে রক্ষা করিয়া ফকীর-বৈষ্ণব সাধুর সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে স্নেহার্দ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ভাই, তুমি এই হিমে নগ্নদেহে বসিয়া কাঁদিতেছ?"

সমবেদনার কোমল আঘাতে ব্রহ্মচারীর ব্যথাভরা বুক আরো আন্দোলিত হইতে লাগিল—শোকের নদী উছলিয়া উঠিল। তিনি অধিকতর আবেগে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

ফকীর সন্ন্যাসীর চক্ষু মুছাইয়া ঈষৎ কম্পিতস্বরে কহিলেন, "ছি ভাই, কাঁদিও না; সংসার-বিরাগী সাধু তুমি, তোমার এ দৌর্ব্বল্য কেন?"

ব্রহ্মচারী ফকীরের সুন্দর মুখের পানে চাহিয়া একটু স্থির হইলেন। পরে বলিলেন, "তুমি কে ভাই, জানি না; দেখিতেছি তোমার ফকীরের বেশ। বৈরাগী, কাকে কি বলিতেছ? আমি যদি সাধু হই, তবে জগতে অসাধু কে? আমি যদি বলীয়ান হই তবে দুর্ব্বল কোথায়? ভুল বুঝেছ ফকীর, লোকালোকদর্শী মহাপুরুষ তুমি—তোমার উদার হৃদয়, উন্নত মন ক্ষুদ্র জিনিসের কল্পনা করিতে পারে না। তাই তুমি আমায় অযোগ্য বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছ। ভ্রান্ত বিশ্বাস পোষণ করিও না। আমি বড় দুর্ব্বল; এ ভঙ্গুর জগতে একগাছি ক্ষুদ্র তৃণের যে সামর্থ্য আছে, আমার তাও নাই। আমার ন্যায় মহাপাতকীই বা কে আছে? এই দেখ, সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত করিয়া, সহস্র ক্রোশ দূর হইতে দেবদর্শনে আসিয়াছিলাম; বাবা আমায় দেখা দিলেন না। কেন দিবেন—আমি যে তাঁর অযোগ্য সন্তান! ফকীর বাবা, আপনাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব—ঠিক উত্তর দিবেন?"

ফকীর হাস্যমুখে কহিলেন, "বল।"

সাধু। কি করিলে আত্মহত্যা করা যায়, অথচ পাপ না হয়?

ফকীর। কেন—মরিবে কেন?

সাধু। বাঁচিবারই বা প্রয়োজন কি? যিনি দুর্ব্বলের বল, অসহায়ের সহায়—তিনি ত আমায় ত্যাগ করিলেন! তবে আর কার জন্য বাঁচিব? অনুশোচনার তীব্র বহ্নিতে বিদগ্ধ হওয়া অপেক্ষা এই মহাস্থানে অলকা-নন্দার শীতল শয্যায় শয়ন করা কি সৌভাগ্যের কথা নহে? বৈরাগী, তুমি সাক্ষী—দেবতার পরিত্যক্ত আমি—আমার একমাত্র ঔষধ।

ফকীর। প্রলাপ বলিতেছ কেন? তুমি দেবের পরিত্যক্ত কিসে?

সাধু। আমি বড় আশা করিয়া তাঁর কাছে আসিয়াছিলাম। তিনি ত দেখা দিলেন না। দ্বার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

ফকীর। আজ দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে, কাল খুলিবে। তখন দর্শন পাইবে। এই জন্য এত বিচলিত?

ফকীরের কথায় সাধু চমকিয়া উঠিলেন। হঠাৎ তাঁহার ভাঙ্গা বুকে কে যেন লোহার বর্ম্ম পরাইয়া দিল। উদ্‌গ্রীব হইয়া তিনি বলিলেন,—"ফকীর, কে বলিল মন্দির-দ্বার কাল খোলা হইবে?"

ফকীর কহিলেন,—"আমি বলিতেছি।"

সাধু। আপনি জানেন না, পুরোহিতের সহিত আমার দেখা হইয়াছিল—তিনি বলিলেন, 'ছয়মাস পরে খোলা হইবে।' তাঁহাকে খুলিবার জন্য কত কাকুতি-মিনতি করিলাম—নিষ্ঠুর আমার কথা শুনিল না।

ফকীর। সে তোমায় বিদ্রূপ করিয়াছে—আমি বলিতেছি, কাল প্রাতে মন্দির খোলা হইবে।

সাধু। সত্য কি—না আমায় ভুলাইবার জন্য উপন্যাস রচনা করিয়াছ?

ফকীর। বিশ্বাস না হয়, কয়েক দণ্ড এসো দুইজনে গান-গল্পে কাটাইয়া দিই; প্রভাত হইলেই বুঝিতে পারিবে।

ব্রহ্মচারী বালকের ন্যায় আহ্লাদে আটখানা হইয়া

ফকীরের কণ্ঠ বেষ্টন করিলেন। দুইটী হৃদয় এক হইয়া গেল।

ফকীর কহিলেন,—"দেখ, এখানে দুরন্ত শীত—চল আমরা নিকটস্থ কোন গুহামধ্যে গিয়া রাত্রিটুকু অতিবাহিত করি।"

তাহাই হইল। দুইজনে একটী ক্ষুদ্র গুহায় প্রবেশ করিলেন। ফকীর স্বীয় অশ্বপৃষ্ঠ হইতে কিঞ্চিৎ কাষ্ঠ আনয়নপূর্ব্বক, তাহা অগ্নিসংযুক্ত করিয়া, উভয়ে তাহার উত্তাপে বসিয়া নানাকথা কহিতে লাগিলেন। ফকীর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভাই, তুমি কিছু খেলা জান? সময়টা ত কাটাইতে হইবে!"

সাধু। বহুকাল পূর্ব্বে যখন গৃহস্থাশ্রমে ছিলাম, তখন পাশা খেলিতে জানিতাম; এখন বোধ হয় তাহা ভুলিয়া গিয়াছি।

ফকীর। বেশ—বেশ; আমার ঝুলিতে পাশা আছে। এসো, খেলা আরম্ভ করি।

সাধু সম্মত হইয়া অনন্যমনে ফকীরের সহিত পাশা ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। বহুক্ষণ অতীত হইল। অবশেষে যখন বাল-সূর্য্যের অস্ফুট আলোক-রেখা গুহাদ্বারে দৃষ্ট হইল, ফকীর তখন তাঁহার বন্ধুর হস্ত ধারণপূর্ব্বক বাহিরে আসিয়া কহিলেন,—"এইবার দেবদর্শনে চল। তুমি অগ্রসর হও—আমি যাইতেছি।"

ব্রহ্মচারী দেব-দর্শনে চলিলেন;—যাইবার পূর্ব্বে ভাবে গদ-গদ হইয়া ফকীরের হাত ধরিয়া প্রগাঢ় অনুরাগভরে কহিলেন,—"তোমারই দয়ায় আজ আমি ধন্য হইলাম। বিশ্ব-প্রেমিক বৈরাগী, তুমি কে? তুমি অসহায়ের সহায়—দুর্ব্বলের বল—নিরাশের আশা! তোমারই অযাচিত করুণায় আজ আমি ভাগ্যবান। তোমার পরিচয় দাও ভাই!"

ফকীর সংক্ষেপে উত্তর করিলেন,—"ভিখারীর আবার পরিচয় কি ভাই! যাও—স্বকার্য্যে যাও! বদরিনাথ তোমায় আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য ডাকিতেছেন।" "জয় বদরী বিশালাক্ষী জয়" বলিয়া সাধু প্রস্থান করিলেন।

প্রভাত হইয়াছে। আজ হিমালয়ের নূতন সাজসজ্জা। কি অভিনব সূর্য্যোদয়! এ শুধু পূর্ব্বাকাশ লোহিত-রাগ-রঞ্জিত নহে; এ শুধু একখানি সোণার থালা আকাশের কোলে পড়িয়া নাই। এক সূর্য্য লক্ষ হইয়া লক্ষ তুষার-শিখরের উপর ধক্-ধক্ জ্বলিতেছে। আবার সেই রবি শৈলসুতাসমূহের প্রতি তরঙ্গের সঙ্গে ভাসিয়া যাইতেছে। বদরিকার ক্ষুদ্র উপত্যকা হইতে যে দিকে দেখ, সেই দিকেই দিবাকর দিব্য করে দিঙ্মণ্ডল প্লাবিত করিতেছে। অনন্ত আকাশ—তাহারই মাঝে অনন্ত রবির বিকাশ—দিক-বিদিক কিছুই বুঝা যায় না। সকলই সেই আনন্দময়ের অনন্ত সৌন্দর্য্যের অভিব্যক্তি।

উপত্যকা, নদী ও গিরিগাত্রের তুষাররাশি সরিয়া গিয়াছে। অলকানন্দার স্ফটিকতুল্য বারিরাশি নাচিতে-নাচিতে ছুটিতেছে। প্রতিপদে ক্ষুদ্র-বৃহৎ শিলাখণ্ড তাহাকে বাধা দিতেছে। কিন্তু চঞ্চলা উর্ম্মিমালা স্বীয় তারল্যে কঠিন শিলাগাত্র সিঞ্চিত করিয়া সহর্ষমনে সাগরাভিমুখিনী। কল-কল ধ্বনি করিয়া নদী যেন বলিয়া যাইতেছে,—কঠোরতা নিষ্ঠুরতা কি কখন স্নেহ-দয়ার কোমল প্রভাব রুদ্ধ করিতে পারে! শত নির্ঝরিণী স্রোতস্বিনীর-অঙ্গ-পুষ্টি সাধনে অবিরাম ধাবিত। উচ্চ হইতে কত উৎফুল্ল হইয়াই তাহারা নামিতেছে,—তাহাদের উল্লাস-ধ্বনিই বা কি মনোরম! শত-শত নির্ঝরিণীর সমবেত শব্দ শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে ধ্বনিত হইয়া যেন প্রকৃতির মহোল্লাস জ্ঞাপন করিতেছে।

ব্রহ্মচারী প্রাতঃকৃত্যাদি সমাধানপূর্ব্বক উষ্ণ-কুণ্ডে স্নান করিয়া মন্দির-সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আরো কয়েকটী যাত্রী তথায় সমবেত। পুরোহিত দ্বার উন্মোচন করিতেছেন। ফকীরের কথাই সত্য হইল। পুরোহিতের পূর্ব্বরাত্রির ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়া সন্ন্যাসীর মনে সহসা ক্রোধের সঞ্চার হইল। তিনি তাঁহাকে একটী ক্ষুদ্র চপেটা-ঘাত করিয়া কহিলেন,—"ঠাকুর, তোমার এ কি আচরণ?"

সাধুর এবম্বিধ ব্যবহারে পুরোহিত ঠাকুর বিস্মিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। পরে প্রহারোদ্যত হইয়া বলিলেন,—"কে হে বেল্লিক—মিছামিছি মার কেন?" সাধুও উদ্ধতভাবে কহিলেন,—"আমি বেল্লিক, না, তুমি বেল্লিক? মিছামিছি মেরেছি! তুমি আমায় গত রাত্রে মিছামিছি এত কষ্ট দিলে কেন? জান, ফকীর না এলে আমি মরিতাম!"

পুরোহিত বক্তার কথা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, অবাক্ হইয়া তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

যাত্রিগণের মধ্যেও একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। ব্রহ্মচারীকে কেহ বিকৃত-মস্তিষ্ক সাব্যস্ত করিল—কেহ বা তাহার উর্ব্বর মস্তিষ্কের সাহায্যে এই প্রহার-কাণ্ডের একটা কারণ বাহির করিয়া মনে-মনে পুরোহিতকেই দোষী সাব্যস্ত করিল। দুই-একজন তাহাদের স্বভাবগত রঙ্গ ও কলহপ্রিয়তা গুণের মর্য্যাদা রক্ষার্থ অনুচ্চ স্বরে অলক্ষ্যে নখে-নখে আঘাত করিতে লাগিল।

পুরোহিতকে নির্ব্বাক দেখিয়া বৈষ্ণব তাঁহাকে বলিলেন, "চুপ করিয়া রহিলে কেন ঠাকুর "

পুরোহিত। কি উত্তর দিব। গত রাত্রির কথা কি বলিতেছ?

সাধু। বা—বাঃ! দিব্য তোমার স্মরণ-শক্তি! কা'ল আমায় দেব-দর্শন করিতে দাও নাই কেন?

পুরোহিত। সে কি! কাল ত আমি এখানে ছিলাম না!

সাধু। ছি ঠাকুর!—তুমি এত মিথ্যা কথা কও?

পুরোহিত। মিথ্যা কি—সত্যই আমি ছিলাম না। ছয় মাস পরে আজ আসিয়া এই প্রথম দ্বার খুলিতেছি।

সাধু। কথনই নয়—ফকীরকে ডাক।

পুরোহিত। কে ফকীর?

সাধু। তিনি এ দিকে আছেন

পুরোহিত বলিতেছেন, ছয় মাস পরে আজ তিনি তথায় উপনীত—সাধু বলিতেছেন, গতরাত্রিতে পুরোহিত তাঁহাকে তাড়াইয়াছেন—এই লইয়া উভয়ের মধ্যে বাক্‌বিতণ্ডা। ব্যাপার রহস্যজনক। প্রকৃত ঘটনা জানিবার জন্য সকলেই কৌতূহলী হইয়া উঠিল।

তখন ব্রহ্মচারী-বর্ণিত ফকীরের খোঁজ পড়িল। পাঁচ জনে তাঁহার অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে মন্দির দ্বার খোলা হইল। বৈষ্ণব সাধু বদরিনারায়ণ দর্শন করিয়া জীবন চরিতার্থ করিলেন। তাঁহার গণ্ড বহিয়া আনন্দাশ্রু ঝরিতে লাগিল।

ফকীরকে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। তখন একজন যাত্রী, কি ঘটিয়াছিল, জিজ্ঞাসা করিল। সাধু সংক্ষেপে সকল কথা বলিলেন। শেষে পুরোহিতকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—"ঠাকুর আর কাহাকেও কখন আমার মত নির্য্যাতন করিও না। আহা, সেই ফকীর গুহামধ্যে পাশা খেলাইয়া যদি আমার রাত্রিটুকু ভুলাইয়া না রাখিতেন তাহা হইলে মনঃকষ্টে আমার প্রাণান্ত ঘটিত।"

পুরোহিতের চক্ষুর সম্মুখ হইতে একটা বিরাট সন্দেহের আচ্ছাদন সরিয়া গেল। প্রকৃত অবস্থা তাঁহার উপলব্ধি হইল। তিনি সব বুঝিতে পারিয়া সন্ন্যাসীর পদধূলি মস্তকে লইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—"ভাগ্যবান বৈরাগী—ফকীর কে—এখনও তা চিনিতে পারিলে না? তিনি যে ভক্তের ভগবান! এক রাত্রি নয় দেব, দীর্ঘ ছয়মাসকাল তুমি তোমার সেই ইষ্ট দেবতার মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়াছিলে। তাঁহাকে পাইয়াও চিনিতে পার নাই। তবুও তুমিই ধন্য সাধু! তোমার দেবদর্শন সার্থক হইয়াছে। ঐ দেখ, সে তুষাররাশি সরিয়া গিয়াছে—তমসা-শূন্য নভোমণ্ডল রবিকরোজ্জ্বল—যাত্রীসমাগমে নিস্তব্ধ উপত্যকা মুখরিত।"

সাধুর দিব্য-চক্ষু প্রস্ফুটিত হইল। তিনি অস্ফুট স্বরে,—

"নমঃ ব্রহ্মণ্য দেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥"

এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতে-করিতে ধ্যানস্থ হইলেন। সে ধ্যান আর তাঁহার ভাঙ্গিল না।

আজিও সেই মহাপুরুষের সমাধি বদরিনারায়ণের মন্দির পার্শ্বে বিদ্যমান। আজও শত-শত যাত্রী এই সাধকের সমাধি-মন্দিরের সম্মুখে নতমস্তক হয়;—আজিও সেই কত কাল পূর্ব্বের ঘটনা স্মরণ করিয়া লোকে ভক্তিভরে বলিয়া উঠে—

জয় বদরী বিশালাক্ষী জয়!

প্রেয়সী

[শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য]

হে প্রেয়সি হে কল্যাণি! সুন্দরের রাজ্য হ'তে
কবে কার প্রেম-তপস্যায়
এ মর্ত্ত্যে আসিলে নামি'; নয়নের দৃষ্টি দিয়া—
করুণার গঙ্গা গলে যায়।
ধরার ধূলির মাঝে নন্দনের আলো করি' হাতে,
যাদুর প্রতিমা যবে মধুহাস্যে দাঁড়াইলে রাতে,
ভেসে গেল অকস্মাৎ নিখিলের যত অন্ধকার,
তোমার বদন হেরি' অন্তরের শত হাহাকার;—
সান্ত্বনার শান্তি-মন্ত্রে প্রতি বক্ষে লভিল নির্ব্বাণ,
মানব-জীবন-'পরে এস এস 'অমৃতের দান'।
যত দুঃখ যত গ্লানি ধৌত হ'য়ে গেছে আজি,
নির্ব্বাপিত সব হাহাকার;
তব প্রতিবিন্দু প্রেমে, আশা-সিন্ধু-তটে বসি,
বিশ্ব ওগো পেতেছে সংসার।

জীবন-সমুদ্র-বুকে মন্থনের মাঝ হতে
উঠিয়াছ হে তুমি কল্যাণি,
অবসন্ন এ চিত্তের মৃত্যু নাশ করি' দিতে
ত্রিলোকের সুধা দিলে আনি'।
সে প্রেম-অমৃত পানে ভুলে গেছি বিশ্ব চরাচর,
সহস্র দুয়ার দিয়া বাহিরিতে চাহে এ অন্তর,—
পৃথিবীর প্রতি গৃহে ঢালি' দিতে তব স্নেহধার;
একা সে সুখের হর্ষ নাহি শক্তি নাহি রোধিবার।
হে প্রেয়সি, একাধারে শক্তি আর করুণার ছবি,
মহীয়সী মূর্ত্তি-তলে লুটি' লুটি, পড়ে শত কবি।
তোমায় রঙীন্ হাস্যে সোণার স্বপনরাজ্য
ভাঙি' গড়ি' উঠে প্রতিদিন,
তুমি যারে দেছ ধরা রাজরাজেশ্বর সে যে,
নহে আর নহে দীন হীন।

তব চিত্ত-তুলনায়, তোমার হিয়ার পাশে,
শূন্য রাজসম্পদের ডালা,
এ সৃষ্টির কণ্ঠে দেবি দুলায়ে দিয়াছ অয়ি,
সত্য শিব সুন্দরের মালা।
সাধ যায় ধরণীর কোটী আঁখি দিয়া অনিবার,
মিলায়ে এ দুটী আঁখি মূর্ত্তি চির হেরি গো তোমায়।
প্রতি আত্মা প্রতি বুকে মিলাইয়া মম আত্মা প্রাণ,
তব প্রেম-উৎসধারা করিবারে চাহি ওগো পান।
এস মোর সর্ব্বসুখে সর্ব্বদুঃখে শান্ত করি শোক,
ব্রহ্মার মানস হতে ঝরিয়াছ মিলনের শ্লোক।
প্রতি কর্ম্ম মাঝে তুমি মর্ম্ম তলে আছ যার
তুমি যারে সঁপেছ পরাণ,
তুমি যারে দেছ ধরা তুমি যার প্রিয়া—সে যে,
তুচ্ছ করে কুবেরের দান।

নাহি চাই রাজতক্ত নাহি চাহি অভিষেক,
লভিয়াছি তব ভালবাসা,
প্রেয়সী সঙ্গিনী যার, সংসার-আশ্রম-তলে,
বাঁধা তার নন্দনের বাসা।
কণ্ঠের ঝঙ্কারে তব বাজি' উঠে নিখিলের বীণ্,
তব আলিঙ্গনপাশে মাঙ্গলিক বাঁধা নিশিদিন।
লুকায়ে রেখেছ বক্ষে মানবের সর্ব্ব প্রয়োজন,
প্রিয়েরে আনন্দ দিতে রুদ্ধ করি নিজের বেদন,
ঢেলে দেছ শান্তি সুখ নিঃস্ব করি' আপনার হিয়া,
বিস্মিত এ রুদ্ধ কণ্ঠ, নাহি জানি পূজিব কি দিয়া?
জীবনের প্রতি অংশে, আছ সঙ্গিনীর বেশে,
প্রণয়ের ওগো পূর্ণ গান!
হে প্রেয়সি! হে প্রেয়সি! তব পুণ্য-বেদীতলে,
হবে চির আত্মবলিদান।

ব্যথিতের অভিসম্পাত

[শ্রীচন্দ্রশেখর কর বিদ্যাবিনোদ, বি-এ]

পৃথিবীর সকল দেশেই সকল জাতির মধ্যেই অভিসম্পাতের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। মানবের ধর্ম্মশাস্ত্র মাত্রেই অভিসম্পাতের উল্লেখ এবং দৃষ্টান্ত আছে। আমরা ভারত-বাসী—অভিসম্পাতকে অতিশয় ভয় করি। আমাদের রামায়ণ মহাভারতাদিতে অভিসম্পাতের এবং তাহার বিষময় ফলের দৃষ্টান্ত অত্যন্ত অধিক। রাজা দশরথ মৃগ-ভ্রমে সিন্ধু মুনিকে বধ করিয়া সিন্ধুর পিতা অন্ধ কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হন, এবং পুত্রবিরহে প্রাণত্যাগ ও চারি পুত্র থাকিতেও তাহাদের সকলেরই অসাক্ষাতে পরলোকে প্রস্থান করেন। রাজা পরীক্ষিত ধ্যানমগ্ন মুনির গলদেশে মৃত সর্প নিক্ষেপ করিয়া মুনিপুত্র শৃঙ্গির অভিসম্পাতে তক্ষক-দংশনে গতাসু হন।

আমাদের প্রাচীন কাব্য-পুরাণাদিতে ব্রহ্মশাপের কথাই অধিক। দুই এক স্থলে অভিসম্পাতে কিঞ্চিৎ অত্যাচারও লক্ষিত হয়। শকুন্তলা কণ্বের আশ্রমে বসিয়া দুষ্মন্তের চিন্তা করিতে-করিতে অতিথি দুর্ব্বাসা ঋষির বাক্য শুনিতে পান নাই বলিয়া মুনি তাঁহাকে শাপ দিলেন যে তুই যাহার বিষয় চিন্তা করিতেছিস, সে তোকে চিনিতে পারিবে না। ইহাতে শকুন্তলাকে বিগম দুর্ভোগ ভুগিতে হইয়াছিল। এখানে মুনির মনঃপীড়ার অনুপাতে পতিচিন্তারতা শকুন্তলার প্রতি অভিসম্পাতের মাত্রা অতিরিক্ত বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু যেখানে মনঃপীড়ার পরিমাণ অধিক, সেখানে অভিসম্পাতের হাত হইতে কাহারও পরিত্রাণ নাই। আমাদের শাস্ত্রের কথা এইরূপ যে শ্রীরামচন্দ্র ত্রেতাযুগে সীতা-উদ্ধারের নিমিত্ত সুগ্রীবের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া সুগ্রীবাগ্রজ বালিকে বিনা অপরাধে বধ করিয়াছিলেন বলিয়া সেই শাপে দ্বাপর যুগে কৃষ্ণরূপে ব্যাধের শরে বিদ্ধ হইয়া দেহত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে হয় ত কেহ কেহ অভিসম্পাতকে ততটা গ্রাহ্য করেন না। কিন্তু ব্যথিতের অভিসম্পাত সকল যুগেই অব্যর্থ। অনেক স্থলে উহার ফল এমনভাবে ফলিয়া থাকে যে, ঘটনা শুনিলে শরীর শিহরিয়া উঠে।

কেহ কাহারও মনে অকারণে বা অল্পকারণে অধিক পীড়া দিলে পীড়িত ব্যক্তি পীড়াদায়কের অমঙ্গল কামনা করিবে, ইহা স্বাভাবিক। আর এইরূপ কামনা সর্ব্বদাই ফলবতী হইয়া থাকে। বাঙ্গালায় একটী চলিত কথা আছে যে, "দুঃখ পেয়ে চাঁড়ালে শাপে, এড়াতে পারে না বামুণের বাপে।" এ কথাটী বড়ই সত্য। ফলতঃ, ব্যথিতের অভিসম্পাত কখনই নিষ্ফল হইবার নহে। তবে কোন কোন স্থলে উহার ফল হয় ত হাতে-হাতে না ফলিয়া কিছু বিলম্বে ফলে; কিন্তু তাহাতেও অভিসম্পাত অগ্রাহ্য করিবার বিষয় নহে। কবিশ্রেষ্ঠ দাশরথী রায় কহিয়াছেন—

"যে দিনে কুপথ্য যোগ, সে দিনে কি হয় রোগ,
কুপথ্য রোগের মূল বটে।"

আমরা দুইটী প্রকৃত ঘটনার উদাহরণ দিয়া দেখাইব যে, মনঃপীড়াপ্রাপ্ত লোকের অভিসম্পাত ব্যক্তই হউক বা অব্যক্তই হউক, উহাতে পীড়াদায়কের সর্ব্বনাশ সাধিত হয় এবং ঐরূপ সর্ব্বনাশ সাধিত হইতেও অধিক সময় লাগে না।

বঙ্গের এক গণ্ডগ্রামে সতীনাথ বাবুর বাস। সতীনাথ উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী। বিদায় লইয়া বাটীতে আছেন। একদিন অপরাহ্নে গ্রামের নিকটস্থ নদীর তীরে বেড়াইতে বেড়াইতে সতীনাথ দেখিলেন নদীর একটী ঘাটের পথের পার্শ্বের এক অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে এক সন্ন্যাসী ধুনী জ্বালিয়া বসিয়া আছেন। সতীনাথ উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত; সন্ন্যাসীমাত্রেই ভণ্ড, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস। সন্ন্যাসী যে ঘাটের পথের পার্শ্বে বসিয়া আছেন, ঐ ঘাটে অনেক কুল-ললনা জল লইতে বা স্নান করিতে আসিয়া থাকেন; উলঙ্গবৎ সন্ন্যাসীকে দেখিলে তাঁহাদের লজ্জাবোধ হইতে পারে, এই

ভাবিয়া সতীনাথ তাহাকে তড়াইবার জন্য তাহার সম্মুখীন হইয়া রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি এখানে কাহার হুকুমে আসিয়া বসিয়াছ?" সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন, "কাহারও হুকুম লই নাই, কালই উঠিয়া যাইব।" সতীনাথ কহিলেন, "কাল নয়, আজই এখনই উঠিয়া যাইতে হইবে।" সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি এ স্থানের জমিদার?" ইহাতেই সতীনাথ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, কেন না তিনি গ্রামের জমিদার না হইলেও একজন সম্ভ্রান্ত অধিবাসী। তিনি সন্ন্যাসীকে অকথ্য ভাষায় গালি দিলেন। সন্ন্যাসী প্রতিবাদ করিলে সতীনাথের ক্রোধের মাত্রা বৰ্দ্ধিত হইল এবং তিনি পাদুকা খুলিয়া তদ্দ্বারা সন্ন্যাসীকে অত্যন্ত নির্ম্মম ভাবে প্রহার করিলেন। সন্ন্যাসী প্রহারের স্থানে হাত বুলাইতে বুলাইতে দু' একবার 'হা বিশ্বনাথ! হা বিশ্বনাথ!' শব্দ উচ্চারণ করিয়াই আপনার লোটা, চিম্‌টা, আসন প্রভৃতি গুছাইয়া লইলেন এবং তৎক্ষণাৎ স্থান-ত্যাগ করিলেন।

সতীনাথ বাড়ী ফিরিলেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই তাঁহার সন্ন্যাসীকে প্রহার করিবার কথা গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। অনেকেই বলিলেন সতীনাথ অতিশয় অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। সন্ন্যাসীর অভিসম্পাতে তাঁহার ভাবী অমঙ্গল অনিবার্য্য। তিনি এখনও যাইয়া সন্ন্যাসীকে যেখানে পান সেখানে তাহার চরণে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করুন্। সতীনাথ এ কথা গ্রাহ্য করিলেন না। সতীনাথের বৃদ্ধ পিতা সন্ন্যাসীর পথ অনুসরণ করিয়া অনেক দূর গিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার দেখা পান নাই।

সতীনাথের বিদায়-কাল ফুরাইয়া আসিল, তিনি কর্ম্মস্থলে ফিরিয়া গেলেন। দু' চারিদিন চাকরি করিবার পরই সতীনাথ কার্য্য করিতে অক্ষম হইয়া পড়িলেন। তিনি দেখিলেন, যে হস্তে সন্ন্যাসীর পৃষ্ঠে পাদুকা প্রহার করিয়াছিলেন, সেই দক্ষিণ হস্ত আর লেখনী-চালনায় সমর্থ নহে। হস্তে বিষম বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। পুনরায় বিদায় লইতে হইল। কিন্তু তাঁহার দেহ আর সুস্থ হইল না। হাতের ব্যথা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল, এবং অল্পদিনের মধ্যেই মহাব্যাধি কুষ্ঠের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। দশ বার বৎসর রোগের অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া সতীনাথ পৃথিবী হইতে প্রস্থান করিলেন। হস্তের অঙ্গুলিগুলি সমস্তই খসিয়া পড়িয়াছিল, এবং মৃত্যুর চারি পাঁচ বৎসর পূর্ব্ব হইতে তাঁহার গাত্রে এমন দুর্গন্ধ হইয়াছিল যে, নিকট আত্মীয়েরাও তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিতে চাহিতেন না। এই সময়ে গ্রামের সকল লোকেই বলিতেন যে, অকারণে সন্ন্যাসীকে পাদুকা-প্রহার করিবার ফল হাতে-হাতেই ফলিল। সতীনাথ নিজেও তখন আর ইহা অস্বীকার করিতেন না, এবং মধ্যে মধ্যে প্রায়ই বলিতেন, "সেই সন্ন্যাসীকে পাইলে তাহার পদধূলি লইয়া সর্ব্বাঙ্গে লেপন করি। উহাই বোধ হয় আমার রোগের একমাত্র মহৌষধ।"

দ্বিতীয় ঘটনাটী আরও ভয়ানক। বঙ্গের কোন এক প্রসিদ্ধ জনপদে জগৎবাবু বাস করিতেন। কলিকাতায় ব্যবসায় করিয়া জগৎবাবু প্রচুর অর্থের অধিকারী। তাঁহার বাসস্থান প্রকাণ্ড অট্টালিকা। এই অট্টালিকার পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিকে সুন্দর পুষ্করিণী এবং তাহার পূর্ব্বে বিস্তৃত উদ্যান। পুষ্করিণীর উত্তর ধারে বাঁধা ঘাট এবং ঘাটের উপরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বৃহৎ চাতাল। এই চাতালের পশ্চিমদিকে বাটীর প্রবেশ-পথ, এবং ইহার পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিক দিয়া উদ্যানে প্রবেশ করিতে হয়। চাতালের উত্তরে নগরের এক রাজপথ।

একদিন বেলা তৃতীয় প্রহর সময়ে এক ক্ষুধার্ত্ত ভিখারী এই রাজপথ দিয়া যাইতেছিল। তাহার হস্তে ভিক্ষালব্ধ কিঞ্চিৎ তণ্ডুল আর এক কুম্ভকারের নিকট যাচ্‌ঞা করিয়া প্রাপ্ত একটী ক্ষুদ্র মৃৎপাত্র ছিল। ভিখারী কতকটা বিকৃত-মস্তিষ্ক বলিয়া লোকে তাহাকে পাগ্‌লা ভিক্ষুক বলিত।

আহারার্থে চাউলকটী সিদ্ধ করিবে বলিয়া ভিখারী একটু স্থান খুজিতেছিল। জগৎবাবুর পুষ্করিণীর উপরিস্থ চাতালটি দেখিয়া সে ভাবিল, স্থানটী বেশ পরিষ্কার, জলও নিকটে, এখানেই চাউলকটী সিদ্ধ করিয়া লই। চাতালের যে দিকটা উদ্যানসংলগ্ন, ভিক্ষুক সেইদিকের এককোণে কয়েক খানি ইষ্টক সংযোগে একটী উনুন করিয়া তাহাতেই হাঁড়িটী চড়াইয়া—অন্ন প্রস্তুত করিতে লাগিল। জগৎবাবুর বাড়ীর লোকে ইহা কেহ দেখিতে পায় নাই। বাবু তখন নিদ্রিত। ভিখারীর ভাত কয়টী ফুটিয়া উঠিয়াছে, এমন সময়ে জগৎবাবুর এক ভৃত্য উহা দেখিতে পাইল এবং তৎক্ষণাৎ যাইয়া বাবুকে জানাইল। বাবু দ্রুতপদে সেখানে আসিলেন এবং অগ্নি-সংযোগে চাতালের কিয়দংশ কলঙ্কিত হইয়াছে

দেখিয়াই ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। ভিখারী তখন ভাত ঢালিবে বলিয়া একখানি কলার পাতা আনিতে গিয়াছিল। সে পাতা হাতে করিয়া ফিরিয়া আসিতেই জগৎবাবু "শালা, ভাত রাঁধিবার আর যায়গা পাওনি ?" বলিয়া জুতোশুদ্ধ-পায়ে হাঁড়ির গায়ে এক লাথি মারিলেন। মৃৎপাত্রটী ভগ্ন হইয়া ক্ষুধার্ত্ত ভিখারীর মুখের অন্ন মৃত্তিকায় নিক্ষিপ্ত হইল! ভিক্ষুকের চক্ষে দর-দর ধারে অশ্রু বহিল। হস্তস্থিত কদলীপত্রখানি ভূমিতে ফেলিয়া দিয়া সে কাঁদিতে কাঁদিতে রাজপথ ধরিয়া চলিয়া গেল। জগৎবাবু কেবল "যা শালা, তোকে আর কিছু বল্লাম না" বলিয়া চাতালটীর কালিময় অংশ পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত ভৃত্যকে রাজমিস্ত্রী ডাকিবার আদেশ দিয়া এবং বিনামার তলদেশ জলে ধৌত করাইয়া তাঁহার সুধা-ধবল গৃহে প্রবেশ করিলেন।

এ গৃহ কিন্তু আর অধিক দিন মনুষ্য কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইল না। ভিখারীর মুখের অন্ন নষ্ট হইবার পরই জগৎ বাবুর সংসারে অবনতির সূত্রপাত হইল। বাবু নিজে বাতরোগে শয্যাশায়ী হইলেন। কলিকাতার ব্যবসায়ে প্রচুর ক্ষতি হওয়ায় উহা তুলিয়া দিতে হইল। তিন-চারি বৎসরের মধ্যে যমরাজ জগৎ বাবুর সুরম্য ভবন জনশূন্য করিলেন। বাবু নিজে গেলেন এবং স্ত্রী পুত্র সকলেই গেল। যে কয়েকজন আত্মীয় উত্তরাধিকার-সূত্রে জগৎ বাবুর ত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারী হইলেন, তাঁহারা কেহই এ গৃহে প্রবেশ করিলেন না। লোকে তাঁহাদিগকে ভিখারীর অভিসম্পাতের ফলভোগের ভয় দেখাইল। এমন কি বাড়ীর ইট, কাঠ, জানালা, দরজা প্রভৃতি বিক্রয় করিতে চাহিলেও উহা কেহই ক্রয় করিল না।

ঐ নগরের এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের লোকের কেমন এক বিশ্বাস যে, জগৎ বাবুর বাড়ীর কোন জিনিষ বাড়ীতে আনিলে বা ব্যবহার করিলেই ক্রেতা গৃহস্বামীর অনিষ্ট হইবে! ইহার ফল এই হইয়াছে যে, জগৎ বাবুর সেই অট্টালিকা কালের প্রভাবে কোথায়ও বা অল্প কোথায়ও বা অধিক পরিমাণে ভগ্ন হইয়া খসিয়া গলিয়া পড়িতেছে। ভগ্ন অংশের পরিমাণ অনুসারে উহাকে এখন এত খণ্ডে বিভক্ত দেখায় যে ভিখারীর প্রস্তুত অন্নপূর্ণ ক্ষুদ্র মৃৎপাত্রও হয় ত জগৎ বাবুর পদাঘাতে তত খণ্ডে বিভক্ত হয় নাই।

আর সেই চাতাল এবং পুষ্করিণী? বহু দিন ধরিয়া উহারা মনুষ্য-পরিত্যক্ত এবং শৃগাল কুক্কুরের মূত্র পুরীষে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। লোকে ভুলিয়াও ঐ চাতালে পদার্পণ করে না কিংবা ঐ পুষ্করিণীর জল ব্যবহার করে না।

অনেকে হয় ত বলিবেন যে, জগৎ বাবুর সংসারের এই পরিণামের সহিত দরিদ্র ভিখারীর প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহারের কোনই সম্বন্ধ নাই। বস্তুতঃ ইহাদের মধ্যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করা কঠিন। আর এক হিসাবে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, ভিখারীই জগৎ বাবুর যায়গায় অনধিকার প্রবেশ করিয়াছিল, এবং চাতালটী নষ্ট করিয়াছিল বলিয়া সেই দণ্ডার্হ। কিন্তু এরূপ তর্কে লোকের বিশ্বাস অপনোদিত হইবার নহে। এই বিশ্বাস এমনই বদ্ধমূল যে, জগৎ বাবুর বাসস্থান, এই জনপদের যাহাকে জিজ্ঞাসা করা যায় সেই বলিবে, এই সেই অভিসম্পাতের বাড়ী। এমন কি ঝড়বৃষ্টি বজ্রপাতের সময়েও কোন বিপন্ন পথিক বা পথভিখারী এই বাড়ীতে আশ্রয় লয় না।

পাশ্চাত্যদেশে একটী কথা আছে যে "দশজন যাহা বলে ভগবানও তাহাই বলেন" অর্থাৎ দশজনের মতই ভগবানের মত ধরিয়া লইতে হইবে। সুতরাং দশজনের যাহা বিশ্বাস, তাহা অন্ধ বিশ্বাস বলিয়া কখনই উপেক্ষা করিবার নহে। ইহাকে অভিসম্পাতের ফলই বলিতে হইবে।

হায়! মানুষ কেন নিঃসহায়ের প্রতি এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়া অভিসম্পাতের বোঝা মাথায় তুলিয়া লয়, ইহা বুঝা যায় না! ঐশ্বর্য্য-মদিরার মত্ততা এবং তজ্জনিত ক্রোধই কি ইহার কারণ? তাহা হইলে ধনী-দরিদ্রের সৃষ্টি-কর্ত্তা সর্ব্বশক্তিমান দয়াময়ের রাজ্যে এইরূপ মত্ততা এবং ক্রোধ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।

যখন বৈজ্ঞানিক আমাদিগকে দেখাইতেছেন যে অচেতন উদ্ভিদ প্রভৃতি পদার্থেরও বেদনা বোধ করিবার শক্তি আছে, তখন আমরা বিশ্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব মানুষের মনে বিষম ব্যথা দিয়া তাহার অভিসম্পাত মাথায় লইব, ইহা কেমন কথা? মানুষ ইচ্ছা করিলে কি এইরূপ অভিসম্পাতের কার্য্য হইতে বিরত থাকিতে পারে না? "পরপীড়ন মহাপাপ" ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিলে বোধ হয় মানুষের এমন মতিভ্রম ঘটে না, এবং কেহ কাহারও প্রতি কোন অমানুষিক ব্যবহার করে না।

টাটার কারখানা

[শ্রীগৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়]

বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের বোম্বাই লাইনে অতি অল্প বাঙ্গালীই যাতায়াত করেন। এই পথের ধারে,—কলিকাতা হইতে অধিক দূরে নহে—একটী দ্রষ্টব্য বস্তু রহিয়াছে, যাহা অনেক সময়ে দেশ-দেশান্তর হইতেও অনেকে দেখিতে আসেন। এই দ্রষ্টব্য বস্তু—টাটার লোহার কারখানা।

হাওড়া হইতে ১৫৫ মাইল দূরে অবস্থিত কালিমাটী ষ্টেসনের ধারে টাটার অনতিবৃহৎ সাক্‌চী সহর (নূতন নাম জেমসেদ্‌পুর) অবস্থিত। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় বোধ হয় সাক্‌চী ভারতের অনেক বড়-বড় সহর অপেক্ষাও উন্নত। 'হাট ঘাট বাট মাঠ' সমস্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কোথাও এতটুকু ময়লা, আবর্জ্জনা বা দুর্গন্ধ নাই; বা কোথাও বন্য লতাগুল্মাদি তাহাদের ভূগর্ভস্থিত নিভৃত আশ্রয় হইতে সগর্ব্বে মস্তকোত্তোলন করিয়া অধিকক্ষণ বিজয়বার্ত্তা ঘোষণা করিবার অবসর পায় না।

এখানে সমস্তই টাটার নিজস্ব; এবং ভিন্ন-ভিন্ন বিভাগের ভার বিভিন্ন কর্ম্মচারীদিগের উপর ন্যস্ত। হাট-বাজার, রাস্তা-ঘাট, পুলিশ-পাহারা, চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়—সমস্তই টাটার। এখানে মিউনিসিপালিটী নাই, কিন্তু কোম্পানীর 'টাউন অফিস' ও স্বাস্থ্য-বিভাগ আছে। তাহাদের দ্বারা সাধারণের কাজ যেরূপ সুচারু রূপে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে, অনেক বড়-বড় মিউনিসিপালিটীর দ্বারাও সেরূপ হয় না।

সাক্‌চীর পশ্চিমে ক্ষুদ্র নদী খরকায়ী; দক্ষিণে বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথ খরকায়ীর উপর পুল বাঁধিয়া চলিয়া গিয়াছে; পূর্ব্বে দিগন্ত-বিস্তৃত অসমতল মাঠ ও পাহাড় এবং উত্তরে কিছুদূরে সুবর্ণরেখা। কিন্তু যে দিকেই দৃষ্টিপাত করা যাউক না কেন, ছোট বড় 'ধূম্র পাহাড়'-শ্রেণী চোখে পড়ে। দূরের পাহাড়গুলি মাথা উঁচু করিয়া আকাশ-গায়ে মেঘের মত দণ্ডায়মান; এবং কাছের পাহাড়গুলি যেন স্থির-গম্ভীর প্রশান্ত দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া কালের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছে। যে সাক্‌চী এখন এরূপ সুন্দর সহর, সেই সাক্‌চী কিছুদিন মাত্র পূর্ব্বে শ্বাপদ-সঙ্কুল পাহাড় ও জঙ্গলময় ছিল। সেই সব পাহাড়ের ধ্বংসাবশেষ এখনও স্থানে-স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া তাহার সাক্ষ্য দিতেছে এবং আবশ্যকমত রাস্তায় 'খোয়া' জোগাইতেছে।

আর তাহার সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন—টাটার লোহার কারখানা (the Tata Iron and Steel Works)। অক্লান্ত-কর্ম্মা টাটারই মত তাঁহার কারখানাও দিবারাত্রি অবিশ্রাম চলিতেছে (ইহার স্থাপনকর্ত্তা—শ্রীযুক্ত জেম্‌সেদ্‌জী নাসেরওয়ান্‌জী টাটা)। অনর্গল ধূমরাশি ও অগ্নির লেলিহান শিখা বহুদূর হইতেই দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দিন নাই, রাত্রি নাই, চারিদিকে ভূমিকম্পের সৃষ্টি করিয়া সশব্দে, ভীষণ গর্জ্জনে চারিদিক্ পরিপূর্ণ করিয়া কল চলিতেছে। কারখানার বিচিত্র বংশীধ্বনি ও রেলওয়ে এঞ্জিনের মুহুর্মুহুঃ তীব্র চীৎকার চারিদিক মুখরিত করিয়া রাখিয়াছে। দেখিলে মনে হয়, প্রাচ্যের এই অভিনব ও সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ কারখানা যেন বিশ্বকর্ম্মার সুনিপুণ হস্ত-নির্ম্মিত। ইহার সংলগ্ন নূতন কারখানার (Greater Extension) কার্য্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছে; এবং ইহা শেষ হইলে, টাটার কারখানা সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম বৃহৎ কারখানা বলিয়া পরিগণিত হইবে। প্রায় ২০,০০০ লোক এখানে নানা বিভাগে কর্ম্মে নিযুক্ত। ইহা ছাড়া, জেসপ্ কোং, বার্ম্মা জিঙ্ক কোম্পানী প্রভৃতি কতকগুলি কোম্পানী তাঁহাদের নানা প্রকার কারখানা সাক্‌চীর আশে-পাশে স্থাপন করিতেছেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে কারখানার ভিত্তি-স্থাপন ও ১৯০৭ অব্দে কারখানা বাড়ীর নির্ম্মাণ আংশিক-ভাবে শেষ হইয়া কার্য্য আরম্ভ হয়। সেই সময় হইতে কারখানার অগ্নি আর নির্ব্বাপিত হয় নাই। এক্ষণে আমরা কারখানা সম্বন্ধে আলোচনা করিব। বিভিন্ন বিষয় ক্রমান্বয়ে বিবৃত হইবে।

কোক্ ওভেন্‌স (Cock Ovens)

কয়লার কারখানা;—টাটার অনেকগুলি কয়লার খনি আছে। তথা হইতে এবং অন্যান্য নানা স্থান হইতে

প্রস্তরবৎ কাঁচা কয়লা এইস্থানে আনীত হয় এবং পোড়াইয়া কোক্ প্রস্তুত হয়। এখানে দুই প্রকার কোক ওভেন্‌স্ আছে—যথা Non-recovery Coppee Ovens ও Kopper's Bye-product Ovens। প্রথমগুলি হইতে কোন প্রকার bye product পাওয়া যায় না। ইহা সাধারণতঃ বায়ুর সহিত মিশিয়া যায়; অবশিষ্ট যাহা কিছু থাকে, তাহা কোক্ প্রস্তুত করিবার সময় পুড়িয়া যায়। দ্বিতীয়গুলি হইতে আপাততঃ তিন প্রকার bye-product পাওয়া যায়—যথা (১) 'কোল্ গ্যাস্', (২) 'আলকাত্‌রা (coal tar) ও (৩) 'এ্যামোনিয়াক্যাল লিকার' (ammoniacal liqr.)—এই শেষোক্ত পদার্থ 'সাল্‌ফিউরিক এ্যাসিড' সংযোগে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা 'সালফেট্ অব এ্যামোনিয়া'তে পরিণত হয় ও দেশ-বিদেশে রপ্তানি হয়। ইহা সাধারণতঃ উৎকৃষ্ট 'সার' (manure) রূপে ব্যবহৃত হয়।

কোক্ ওভেন্‌স্ রাত্রিতে দেখিতে অতি সুন্দর,—দেখিলে মনে হয়, যেন বায়স্কোপ দেখিতেছি। ওভেন্‌স্ (ovens)এর ভিতর কাঁচা কয়লাগুলি যখন পুড়িয়া কোক্ হয়, তখন সম্মুখের লৌহ-দ্বার উন্মুক্ত করিয়া, পশ্চাৎ হইতে এঞ্জিনের সাহায্যে সেগুলিকে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দেওয়া হয়। ওভেন্‌স্ হইতে যখন সেগুলি বাহির হইতে থাকে, তখন মনে হয়, যেন অগ্নিময় পাহাড় সচল হইয়া বাহিরে আসিতেছে। পরক্ষণেই সেই পাহাড়-সদৃশ অগ্নি প্লাট্‌ফরমের উপর ভাঙ্গিয়া পড়ে। তখন 'হোজ্' পাইপ (hose pipe) দ্বারা সেগুলির উপর অনবরত জল ঢালা হইতে থাকে।

বয়লার (Boiler)

(Boiler);—ভিন্ন ভিন্ন কারখানার কাজ চালাইবার জন্য ১৬টী বয়লার আছে। ইহার মধ্যে ৮টী সাধারণতঃ কোক্ ওভেন্‌স্‌এর ও 'ব্লাষ্ট ফারণেসে'র (blast furnace) গ্যাস্ দ্বারা পরিচালিত হয়। এই সমস্ত বয়লার অন্যান্য নানা কার্য্যের মধ্যে বিদ্যুদাগার (power house)এর কার্য্য পরিচালনা করিতেছে।

পাওয়ার হাউস (Power-House)

একটী বৃহৎ বিদ্যুদাগার সমস্ত কারখানাটিকে এবং সহরের সমস্ত আলো, পাখা ইত্যাদির জন্য বৈদ্যুতিক শক্তি প্রদান করিতেছে। ইহা ভারতবর্ষের অন্যতম বৃহৎ বিদ্যুদাগার। অবশ্য টাটার Hydro-Electric Power-House ইহার চেয়ে অনেক বড় এবং পৃথিবীর মধ্যে একটী আশ্চর্য্য ব্যাপার। তাহা পৃথিবীর সমস্ত পাওয়ার-হাউসের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। তথায় এক লক্ষ ভোল্টেজএ (100,000 Voltage) কাজ হইতেছে। এখানকার Voltoge ৩,০০০ এবং K. V. O. ৫,০০০। ব্যাপারটী কিরূপ, সহজেই অনুমেয়। ট্রামওয়ে চালাইবার পক্ষে ৪৪০ ভোল্টেজ যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহার ভিতরে প্রবেশ করিলে শব্দে কর্ণ বধির হইবার আতঙ্ক আছে। এই বৃহৎ কারখানাটী একরূপ এই বিদ্যুদাগারের উপরেই নির্ভর করিতেছে। এস্থলে ইহা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে, এই বৈদ্যুতিক বিভাগ সম্পূর্ণ ভাবে ভারতবাসীদের তত্ত্বাবধানে চলিতেছে। চীফ ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনীয়ার একজন বাঙ্গালী—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, M. S. T., A. M. I. E. E. etc. etc.। ইনি ম্যাঞ্চেষ্টার ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ইঁহার সহকারী শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সরকার M. C. T. মহাশয়ও ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আমেরিকার ছাত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় এখানকার অন্যতম এঞ্জিনীয়ার। অন্যান্য সহকারিগণ পার্শি, কাশ্মীরি ও পাঞ্জাবী। বিদ্যুদাগারটী ভারতবাসীদের কার্য্যতৎপরতার একটী উৎকৃষ্ট উদাহরণ। আরও একটী উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, এই বিদ্যুদাগারের কার্য্য যেরূপ সুন্দর ভাবে নির্ব্বাহ হয়, অন্যত্র সচরাচর সেরূপ সুব্যবস্থা দৃষ্ট হয় না। আরও ২।১টী বিভাগ ভারতবাসী তথা বাঙ্গালী কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে; তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইবে। তবে এখানে ইহা বলিয়া রাখা ভাল যে, কারখানার অন্যান্য অধিকাংশ বিভাগই বিদেশীয়গণের তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে।

বিদ্যুদাগার বৈদ্যুতিক প্রবাহ প্রস্তুত করিতেছে এবং ব্লাষ্ট ফারণেসের জন্য Turbo-Blower চালিত করিতেছে। Turbo-Blowerগুলি ফারণেসে যথেষ্ট পরিমাণে বাতাস (Blast) প্রেরণ করিতেছে।

ব্লাষ্ট ফারণেস্ (Blast Furnaces)

আপাততঃ এই কারখানায় দুইটী ব্লাষ্ট ফারণেস্

আছে। প্রত্যেকটীর সহিত একসেট্ (৪টী) করিয়া ষ্টোভ্ (Stove) আছে। এই ষ্টোভগুলি গ্যাস্ দ্বারা উত্তপ্ত রাখা হয়; এবং Blower হইতে যে বাতাস আসে, তাহা এখানে যথোপযুক্ত ভাবে গরম হইয়া ফার্‌ণেসের অভ্যন্তর প্রদেশ আবশ্যক মত উত্তপ্ত রাখে। ব্লাষ্ট্ ফার্‌ণেসে সাধারণ লৌহ (Pig Mn.) ও ফেরো-ম্যাঙ্গানিস্ (Ferro-Manganese) প্রস্তুত হয়। সাধারণ লৌহ (Pig Iron) প্রস্তুতের জন্য লৌহ-প্রস্তর (Iron ore), সামান্য পরিমাণে ম্যাঙ্গানিস্ (Iron), কোক্ (Coke) ও ডলোমাইট্ (dolomite) নামক এক প্রকার নরম প্রস্তর আবশ্যক হয়। ভিন্ন-ভিন্ন স্থানে কোম্পানীর নিজের এই সকল খনিজ পদার্থের পাহাড় আছে। সাধারণ লৌহ যখন ফার্‌ণেস্ হইতে উতপ্ত ও তরল অবস্থায় নির্গত হয়, তখন তাহাকে অগ্নির রূপান্তর ব্যতীত অন্য কিছু বলিয়া বোধ হয় না। এই অবস্থায় ইহার কতক অংশ খণ্ড-খণ্ড ভাবে জমাইয়া ফেলা হয়; এবং তাহা pig iron নামে অভিহিত হয়। অবশিষ্টাংশ ইস্পাত প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত ষ্টিল্ ওয়ার্কস্ (Steel Works)এ প্রেরিত হয়।

লৌহ-প্রস্তর (Iron Ore)

লৌহ-প্রস্তর বা Iron Ore নানা স্থানে পাওয়া যায়। আপাততঃ যাহা ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা কালিমাটী হইতে ৩৩ মাইল দূরে অবস্থিত ও ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের অন্তর্গত গরুমহিষাণী পাহাড় হইতে আনীত হয়। এত অধিক লৌহ অন্য কোন প্রস্তরে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। পাহাড় হইতে প্রস্তর কাটিয়া ট্রেণে বোঝাই দিয়া কারখানায় আনা হইতেছে। টাটার ব্লাষ্ট ফার্‌ণেস্‌গুলি যেরূপ অবিরত লৌহ উদ্গীরণ করিতেছে, সেইরূপ এই প্রকাণ্ড পাহাড়টীকে ক্রমশঃ উদরসাৎ করিতেছে। কালে ইহার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া দূরে থাকুক, উচ্চ স্থানের পরিবর্তে নিম্ন অসমতল ভূমি ব্যতীত আর কিছুই পরিদৃষ্ট হইবে না। এখানেও টাটার প্রসাদে প্রায় তিন-চার হাজার লোকের অন্নের সংস্থান হইতেছে।

লৌহ প্রস্তর, ডলোমাইট প্রভৃতি দ্রব্যগুলি যথা পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া ইলেক্‌ট্রিক্ ট্রলিতে ঢালিয়া দেওয়া হয়। ঐ ট্রলি প্রায় ৮৫ ফিট্ উর্দ্ধে অবস্থিত ব্লাষ্ট ফার্‌ণেসে ফানেল (Funnel)এর মুখে ঐ সমস্ত দ্রব্য ঢালিয়া দে ও ঐগুলি গলিয়া লৌহ হইয়া পুনরায় বাহিরে আসে প্রতি ফার্‌ণেসে দুইখানি করিয়া ট্রলি আছে। একখানি ফানেল্ অভিমুখে বোঝাই লইয়া যাইতে থাকে ও অপর খানি তাহার দ্রব্যাদি ফানেলে ঢালিয়া দিয়া অবতর করিতে থাকে। মধ্য-পথে দুইটার দেখা হয়। চিম্‌নি নিকট হইতে একটী রেলিং-দেওয়া রেল লাইন নামিয় আসিয়া দক্ষিণ দিকের গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে— উহাই ট্রলি লাইন। উক্ত গৃহে ভূগর্ভে দ্রব্যাদি মিশ্রিত হইয়া ট্রলিতে বোঝাই হইয়া থাকে। ঐ ঘরটীর ভিতরের বন্দোবস্ত সুন্দর। একজন মাত্র লোক এখানকার সমস্ত কাজ চালায়। দ্রব্যাদি থাকে-থাকে সাজান থাকে। একখানি ইলেক্‌ট্রিক্ ট্রলি একপ্রকার দ্রব্য লইয়া গিয়া অন্য একস্থানে থামে; এবং ঐ লোকটী সুইচ্ সাহায্যে এক স্থানে দাঁড়াইয়া, যথাপরিমাণে অন্য দ্রব্য তাহাতে মিশ্রিত করিয়া, তাহাকে চালাইয়া পুনরায় অপর স্থানে থামায়; এবং ঐরূপে আর এক প্রকার দ্রব্য লইয়া গাড়ীখানিকে চালাইয়া প্রথমোক্ত ট্রলির নিকট আনিয়া তাহাতে সমস্ত দ্রব্যাদি ঢালিয়া দেয়।

ব্লাষ্ট ফার্‌ণেসে ফেরো-ম্যাঙ্গানিস্ (Ferro-manganese)ও প্রস্তুত হয়। সম্প্রতি এই পদার্থ প্রস্তুত করিবার জন্য Battelle Furnace নামক একটী নূতন Furnace প্রস্তুত হইতেছে।

লৌহ-প্রস্তুতকালে যে ময়লা (লৌহ-গাদ) পাওয়া যায়, তাহাকে Slag বলা হয়। এই Slag জমিলে চূর্ণ করিয়া বিক্রয় করা হয়। ইহা সার (manure) ও সিমেণ্ট রূপে ব্যবহৃত হয়। চূর্ণ করিবার জন্য এগুলিকে skull-cracker নামক গোলার নিকট আনা হয়। তথায় একটী তিন টন ওজনের গোলা (২৭৷৷০ মণে এক টন) ক্রেনের সাহায্যে উপরে উঠাইয়া ইহাদের উপর নিক্ষেপ করিয়া ইহাদিগকে চূর্ণ করা হয়। ক্রেনের সহিত একটী magnetic plate (চুম্বক) সংযুক্ত আছে। ঐ চুম্বক গোলাটীকে আকর্ষণ করিয়া রাখে ও ক্রেন তাহাকে উপরে লইয়া যায়। উপরে চুম্বকের শক্তি কাটিয়া দেওয়া হইলে, গোলাটী নীচে আসিয়া পড়ে। ইহার নিকটে আর একটী

skull-cracker (গোলা) আছে, তাহার ওজন ৪ টন। এটীকে অতি উৰ্দ্ধে উঠাইয়া ঐরূপভাবে নিক্ষেপ করিয়া লৌহাদি চূর্ণ করা হয়। এই লৌহ-চূর্ণ বা টুক্‌রা লৌহ (Iron or steel scrap) ষ্টিল ওয়ার্কসে ব্যবহৃত হয়। এই স্থানে আসিলে 'ভরতের গোলা'র কথা মনে উদয় হয়। রাত্রিকালে যখন উত্তপ্ত Slag বাহিরে ঢালিয়া দেওয়া হয়, তখন সমস্ত আকাশ তাহার দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া সহরটীকে কিছুক্ষণের জন্য আলোকিত করিয়া তোলে।

ষ্টিল্ ওয়ার্কস্ (Steel Works)

এখানে ৬টী ফার্‌ণেস্ আছে,—ইহাদিগকে Open Hearth Steel Furnaces বলা হয়। এই সকল ফার্‌ণেসে, এবং অন্যান্য যে সকল স্থানে অগ্নির প্রয়োজন হয়, তাহার অধিকাংশ স্থলে, গ্যাসের অগ্নি ব্যবহৃত হয়। ষ্টিল ওয়ার্কস্‌এর পার্শ্ববর্ত্তী বৃহৎ গ্যাস-প্রডিউসার (Gas Producer)এ গ্যাস্ প্রস্তুত করিয়া সকল স্থানে সরবরাহ করা হয়।

ব্লাষ্ট ফার্‌ণেস্ হইতে তরল লৌহ আনিয়া Open Hearth Steel Furnaceএ ঢালিয়া দেওয়া হয়। এই-রূপ তরল লৌহ লইয়া আসিবার জন্য রেলওয়ে ওয়াগন ব্যবহৃত হয়। কারখানার ভিতরে সকল স্থানেই রেল লাইন আছে, এবং টাটার নিজের অনেকগুলি এঞ্জিন আছে। লাইনগুলি একস্থানে মিশিয়া বরাবর কালিমাটী ষ্টেসন পর্য্যন্ত গিয়াছে। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ভারী বা উত্তপ্ত বা অন্য কোন প্রকার আবশ্যক দ্রব্যাদি লইয়া যাইবার জন্য রেলওয়ে ওয়াগন্ কিংবা ষ্টীম বা ওভারহেড ইলেক্‌ট্রিক্যাল্ ক্রেনের (Overhead Electrical Crane) সাহায্য লওয়া হয়। তরল লৌহ লইয়া যাইবার গাড়ীগুলিতে বড়-বড় লৌহ-নির্ম্মিত পাত্র বসান আছে। ফার্‌ণেসের ভিতর তরল লৌহের সহিত লৌহ-প্রস্তর (Iron ore), চূর্ণ প্রস্তর (lime stone) এবং লৌহ বা ইস্পাতের টুক্‌রা (Iron or Steel scrap) মিশ্রিত করিয়া তরল ইস্পাত প্রস্তুত হয়। এই অগ্নিবৎ তরল ইস্পাত ছাঁচে (Ingot mould) ঢালিয়া দেওয়া হয়; পরে তাহা কঠিন হইয়া আসিলে ছাঁচ হইতে বাহির করিয়া লওয়া হয়। এগুলিকে তখন ইন্‌গট্ (ingot) বলা হয়। একটী ইন্‌গটের ওজন প্রায় সওয়া তিন টন।

সোকিং পিট্ (Soaking Pits)

ইন্‌গটগুলিকে 'রোল' (roll) করিয়া কড়ি, বরগা ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। এগুলিকে 'রোল' করিবার উপযোগী করিবার জন্য পুনরায় উত্তাপ দ্বারা অগ্নিবৎ করিতে হয়। ভূগর্ভে চারিদিকে লৌহ-পাতে আবৃত স্থানে গ্যাস্ জ্বলিতে থাকে। এইগুলিকে সোকিং পিট্ (Soaking Pit) বলে। ইহাতে 'রোল' করিবার পূর্ব্বে ইন্‌গট্ (ingot) গুলিকে আবশ্যকমত উত্তপ্ত করা হয়। এই স্থানে Overhead Electrical Craneএর সাহায্য লওয়া হয়। একটী হস্তিশুণ্ডাকার প্রকাণ্ড লৌহ ইনগটগুলিকে লইয়া আসিয়া সোকিং পিটের ভীষণ অগ্নিমধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দেয় ও যথাকালে বাহিরে আনিয়া 'ইন্‌গট্ বগি' (Ingot Bogie) নামক গাড়ীর উপর বসাইয়া দেয়। ইলেক্‌ট্রিক-চালিত 'ইন্‌গট্ বগি' তাহাদিগকে লইয়া গিয়া ব্লুমিং মিলে (Blooming mill) শোয়াইয়া দেয়।

ব্লুমিং মিল (Blooming Mills)

ইন্‌গট্‌গুলিকে এখানে পিটিয়া লম্বা করা হয় ও তৎপরে দ্রব্যাদি প্রস্তুতের উপযোগী ষ্টিল যাহাতে থাকে, এইরূপ ভাবে তাহাদিগকে কয়েক খণ্ড করা হয়। এইরূপ প্রতি খণ্ডের নাম ব্লুম (Bloom)। কতকগুলি ইন্‌গট "বার্-মিলে" (Bar mills) দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইবার জন্য অপেক্ষাকৃত ছোট করিয়া কাটা হয়। তাহাদিগকে 'বিলেট্' (billets) বলে। ব্লুমিং মিল এঞ্জিনটীর শক্তি 20,000 H. P.। এই এঞ্জিন যতক্ষণ কাজ করে, ততক্ষণ সমস্ত সহরটি কাঁপিতে থাকে।

রি-হিটিং ফার্ণেস্ (Re-heating Furnaces)

প্রত্যেক ব্লুম বা বিলেট্ 'রোল্' হইবার পূর্ব্বে পুনরায় উত্তপ্ত করা হয়। যেস্থানে এগুলি এই অবস্থায় উত্তপ্ত হয়, সেই স্থানকে রি-হিটিং ফার্ণেস্ (Re-heating Furnaces) বলে। প্রত্যেক মিল-সংলগ্ন একটী করিয়া রি-হিটিং ফার্ণেস্ আছে।

রোলিং মিল (Rolling or 28 inch-mills)

ব্লুমগুলিকে এইখানে আনিয়া কয়েকটী 'রোলারে' পিষিয়া ক্রমশঃ রেল, কড়ি, বৃহৎ বৃহৎ ত্রিকোণ (angles) চ্যানেল (channel) ইত্যাদি প্রস্তুত হয় এবং সঙ্গে-সঙ্গে সেগুলি ইলেক্‌ট্রিক্-চালিত হইয়া (Finishing Mill) ফিনিসিং মিলে উপস্থিত হয়। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে এই কারখানা গবর্ণমেণ্টকে অপর্য্যাপ্ত রেল, মেসোপটেমিয়া, বাগদাদ, প্যালেষ্টাইন্ প্রভৃতি স্থানের জন্য জোগাইয়াছে। বিড়াল যেরূপ তাহার শিশু শাবককে মুখে করিয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যায়, সেইরূপ এখানকার crane অগ্নিবর্ণ বৃহদাকার লৌহগুলিকে এক রোলার হইতে অন্য রোলারে লইয়া যাইতেছে। বস্তুতঃ—রোলিং মিল একটী অপূর্ব্ব দৃশ্য। এখানকার কাজের বিষয় বর্ণনা দ্বারা প্রকাশ করা দুরূহ।

ফিনিসিং মিল (Finishing mills)

এই মিল-সংলগ্ন লৌহদ্রব্যগুলিকে ইচ্ছামত আকারে কাটিবার জন্য দুইখানি চক্রাকার বৈদ্যুতিক করাত আছে। রোলিং মিল্ হইতে দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইলে সেগুলি যন্ত্রচালিত হইয়া এইস্থানে আসে। তখন সেগুলিকে ইচ্ছামত আকারে কাটা হয়। তাহার পর ঐ ভাবে ফিনিসিং মিলে গিয়া সোজা ও পরিষ্কার হয়।

এখান হইতে সেগুলি বরাবর সিপিং ইয়ার্ডে (Shipping yard) গিয়া উপস্থিত হয়। ঠাণ্ডা অবস্থায় যে সকল দ্রব্যাদি কাটিবার আবশ্যক হয়, তাহাদিগকে এই yardএ cold saw নামক করাতে কাটা হইয়া থাকে। Hot saw অথবা cold saw যন্ত্রে লোহাগুলিকে কাটিবার সময় এরূপভাবে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ চারিদিকে ছুটিতে থাকে যে, মনে হয় সে স্থানে অগ্নিবৃষ্টি হইতেছে।

বার্ মিলস্ (Bar Mills)

এখানকার কাজ অনেক অংশে রোলিং মিলের মত। পার্থক্য কেবল এই যে এখানে ছোট ছোট দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়। ইহার নিকটে একটী গ্যাস প্রডিউসার (Gas Producer) আছে এবং এখানকার আবশ্যক গ্যাস এই স্থান হইতে সরবরাহ হইয়া থাকে। বিলেটগুলি রিহিটিং ফার্ণেসে পুনরায় উত্তপ্ত হইলে, ছোট-ছোট নানা আকারের রোলারের সাহায্যে ক্রমশঃ লম্বা হইয়া আবশ্যকানুরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এখানে গরাদে, মোটা পাত (Flat) বরগা (tees), ত্রিকোণ লৌহ (angles), ছোট কড়ি, চ্যানেল্ (channels), লাইট রেল (light rails) এবং ফিস্-প্লেট (Fish plates) প্রস্তুত হয়। যেস্থানে গরাদে প্রস্তুত হয়, সে স্থানের কার্য্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। একজন লোক সেগুলিকে যন্ত্রমধ্যে প্রবিষ্ট করাইবার সময় সাহায্য করিতেছে; এবং অন্য দল অপর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, সেগুলি যখন আরও সরু হইতেছে, তখন সাবধানে নামাইতেছে এবং পরক্ষণেই পার্শ্ববর্ত্তী কলে স্থাপন করিতেছে। চারিদিকে অগ্নি এবং শ্রমজীবীদের নির্ব্বাক মহা ব্যস্ততা ও অবিরাম শব্দ। মনে হয় যেন কতকগুলি লোক অগ্নিক্রীড়ায় মত্ত। যে সকল স্থানে এইরূপ অগ্নিক্রীড়ার হুড়াহুড়ি, সেই সকল স্থান রাত্রিতে দেখিতে অতি সুন্দর। এখান হইতেও দ্রব্যাদি সিপিং ইয়ার্ডে আসিয়া উপস্থিত হয়।

ফাউণ্ড্রি (Foundries)

কারখানার ভিতর দুটী বড় বড় ফাউণ্ড্রি আছে। একটীর নাম জেনারেল ফাউণ্ড্রি (General Foundry)—এখানে কারখানার দ্রব্যাদি প্রস্তুতের উপযোগী নানাপ্রকার ছাঁচ প্রস্তুত হয়; এবং অপরটী—স্লিপার ফাউণ্ড্রি (Sleeper

Foundry)—এখানে স্লেল ও স্লিপার (Pot or Plate sleeper) প্রস্তুত হয়। জেনারেল ফাউণ্ড্রিতে লৌহ বা ইস্পাতের অথবা লৌহ ও ইস্পাত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা ছাঁচ প্রস্তুত হয়।

প্যাটার্ণ সপ্ (Pattern shop)

এই স্থানে নানারূপ ছাঁচ কাষ্ঠ দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। অসংখ্য চীনা মিস্ত্রি এই স্থানে কার্য্য করিতেছে। এই স্থানে প্রস্তুত প্যাটার্ণ হইতে বালুকা মিশ্রিত মৃত্তিকায় ছাঁচ লওয়া হয় ও তাহা হইতে ফাউণ্ড্রীতে আসল ছাঁচ প্রস্তুত হয়।

মেসিন সপ্ (Machine shop)

ফাউণ্ড্রিতে ছাঁচ প্রস্তুত হইলে, সেগুলি এই বৃহৎ সপে আনা হয় ও আবশ্যকমত সেগুলির পালিশ ও অন্যান্য সূক্ষ্ম কার্য্য সমাপ্ত হইলে, তখন সেগুলি কার্য্যোপযোগী হয়। মিলে যে সকল 'রোল' (Roll) আবশ্যক হয়—তাহা সমস্তই এই ভাবে প্রস্তুত হয়। আগে এগুলি বাহির হইতে আনিতে হইত। এখানে কলকব্জা মেরামত প্রভৃতিও হইয়া থাকে। রেলওয়ে এঞ্জিনগুলি এখানে অতি সুন্দররূপে মেরামত হয়। এতৎসংলগ্ন স্মিথ সপে একটী প্রকাণ্ড ষ্টিম্ হ্যামার্ (Steam Hammer) আছে। সেটী নিজ কার্য্যে রত হইলে চারিদিকে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়।

বাইপ্রডাক্ট প্লাণ্ট (Bye-Product Plant)

এখানে যথেষ্ট পরিমাণে অ্যালকাত্রা প্রস্তুত হইয়া বাজারে বিক্রীত হয়। Ammonium Sulphateএর বিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইহার সংলগ্ন সল্ফিউরিক্ এ্যাসিড্ প্লাণ্ট (Sulphuric Acid Plant)এ প্রচুর পরিমাণে সল্ফিউরিক্ এ্যাসিড্ প্রস্তুত ও বিক্রীত হয়। এই শেষোক্ত গৃহটীর উচ্চতা প্রায় ৭০ ফিট।

ক্যাল্সাইনিক্ প্লাণ্ট (Calcinic Plant)

এই স্থানে ডলোমাইট্ (Dolomite) ও লাইমষ্টোন্ (lime stone) পোড়াইয়া চূণ প্রস্তুত হয়।

সোডা ও আইস্ প্লাণ্ট (Soda & Ice Plant)

কোম্পানীর আবশ্যক সকল প্রকার সোডা, লেমনেড ইত্যাদি পানীয় ও বরফ এইস্থানে প্রস্তুত হইয়া থাকে। শ্রমজীবিগণ কঠিন পরিশ্রমের সময় অনবরত জলপান করিলে অসুস্থ হইতে পারে, এবং এতদুদ্দেশ্যে পুনঃপুনঃ বাহিরে যাইতে হইলে কার্য্যেরও ক্ষতি হয়—এই হেতু তাহাদের জন্য কারখানার ভিতর সোডা-ওয়াটার সরবরাহ করা হইয়া থাকে।

লেবরেটরি (Laboratories)

দ্রব্যাদির পরীক্ষার জন্য একটী ফিজিক্যাল ও একটী কেমিক্যাল লেবরেটরি (Physical & Chemical Laboratories) আছে। অনেকগুলি কেমিষ্ট এখানে কার্য্য করিতেছেন। ইহা ছাড়া ইণ্ডিয়ান মিউনিসন্স্ বোর্ডের (Indian Munitions Board) অধীনে মেটালার্জিকাল ইন্সপেক্টরের (Metallurgical Inspector's) একটী অফিস আছে। দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইলে, ঠিক হইয়াছে কি না তাহা এই অফিস কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হয়।

মাইনিং ও প্রস্পেক্টিং বিভাগ (Mining & Prospecting)

কোথায় কোন্ পাহাড়ে বা জঙ্গলে কিরূপ খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়, তাহা অনুসন্ধানের জন্য কোম্পানীর একটী মাইনিং ও প্রস্পেক্টিং (Mining & Prospecting) বিভাগ আছে; এবং এই কার্য্যে বিশেষজ্ঞ অনেকগুলি উচ্চ শিক্ষিত যুবক এখানে নিযুক্ত আছেন। ইঁহারা সুবিধামত স্থানের সন্ধান দিলে, কোম্পানী তাহা লইবার ব্যবস্থা করেন।

দপ্তর বা অফিস বিভাগ (Office)

কোম্পানীর অফিসগুলিতে বহু উপযুক্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত রহিয়াছেন। এ সকল অফিস সাধারণ অফিসের ন্যায় নহে—এখানে 'সর্ব্ব-জাতি-ধর্ম্ম-সমন্বয়'। বাঙ্গালী, বেহারী, পাঞ্জাবী, পেশোয়ারী, কাশ্মীরি, কচ্ছি, গুজরাটী, মারহাট্টি, পার্শী, হাইদ্রাবাদী, মহীশূরী, মালাবারী, মান্দ্রাজী—(তামিলী, তেলেগু, কানাড়ী) উড়িয়া, আদিম, মধ্যপ্রদেশী কেহই বাদ যান নাই। চীনা, য়ুরোপীয়, আমেরিকানও অনেক—তবে মান্দ্রাজী সংখ্যায় বাঙ্গালীর ঠিক পরেই; এবং আমদানীর অনুপাতে অনুমান হয়—শীঘ্রই বাঙ্গালীকে পরাস্ত করিবে।

উপস্থিত কারখানায় প্রস্তুত দ্রব্যাদির পরিমাণ—

কারখানা	পরিমাণ (মাসিক)		
কোক ওভেন্‌স্ (কয়লা)	কিঞ্চিদধিক	২৭,০০০হাজার	টন
ব্লাষ্ট-ফার্‌নেস্ (লৌহ)	প্রায়	১৬,৫০০	"
ষ্টিল ওয়ার্কস্ (ইস্পাত)	প্রায়	১৬,০০০	"
রোলিং মিল (বৃহৎ দ্রব্যাদি)	প্রায়	৭,২০০	"
বার মিল (ছোট ")	প্রায়	৩,৭০০	"

বলা বাহুল্য, এরূপ লোহার কারখানা ভারতবর্ষের অন্য কোথাও নাই।

কুল্‌টীর বেঙ্গল আয়রণ্ এণ্ড ষ্টিল কোম্পানী (Bengal Iron & Steel Co. Ltd.) সাধারণ লৌহ (Pig Iron) পর্য্যন্ত প্রস্তুত করিয়াই খালাস। আর এবার একটী য়ুরোপীয় কোম্পানী আসানসোলের নিকট ইণ্ডিয়ান আয়রণ্ এণ্ড ষ্টিল কোম্পানী (The Indian Iron & Steel Co. Ltd.) খুলিবার জন্য বিপুল উদ্যমে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন।

পৃথিবীর অধিকাংশ বড়-বড় সহরে টাটার ব্রাঞ্চ অফিস আছে। এখানকার লৌহ এখন সর্ব্বাংশেই উৎকৃষ্ট এবং আমেরিকা; জাপান, চীন, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলাণ্ড, আফ্রিকা ফ্রান্স ও ইটালী পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

দূরদেশ হইতে যাঁহারা এদিকে ভ্রমণ করিতে আসেন, তাঁহারা প্রায়ই একবার টাটার কারখানা দেখিয়া যান। জাপান ও চীন হইতেও কেহ কেহ আসিয়া দেখিয়া গিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে বিহার-উড়িষ্যার ছোটলাট বাহাদুর আসিয়াছিলেন। সেদিন বাংলার লাট লর্ড রোণাল্ডসে ও সম্প্রতি রাজ-প্রতিনিধি লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড বাহাদুরও এখানে আসিয়া সমস্ত দেখিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছেন। তিনি সারাদিন টাটার নানা বিভাগ দেখিতে বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন। ডাইরেক্টরগণের নূতন বাংলায় তাঁহার বিশ্রাম-স্থান নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। এই উপলক্ষে সার্ টমাস্ হল্যাণ্ড, সার্ জর্জ্জ বার্‌নেস্, সার দোরাব টাটা এবং আরও অনেকে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। নগর-ভ্রমণের পর তাঁহারা উল্লিখিত বাংলায় ফিরিয়া আসিলে লর্ড চেমস্‌ফোর্ড বাহাদুর একটী প্রকাশ্য সভায় কয়েকটী সময়োপযোগী সুন্দর কথা কহিয়া 'সাক্‌চী'র নাম পরিবর্ত্তন করতঃ উহার স্থাপন-কর্ত্তা জেম্‌সেদ্‌জী টাটার নামানুসারে "জেম্‌সেদ্‌পুর" নাম ঘোষণা করেন। তাঁহার বক্তৃতাটী এস্থানে উদ্ধৃত করিলে পাঠকগণ তাহা হইতে অনেক বিষয় জ্ঞাত হইবেন—

"Gentlemen,

"I have come down here to-day in the first place to see this fine example of Indian Industry. As you know, it is the policy of my Government to encourage all industries in India as far as possible to do so. And I wanted to be able to see this fine example of Indian Industry which has been set up at Sakchi. In the second place, I wanted to come here to express my appreciation of the great work which has been done by the Tata Company during the past four years of this War. I can hardly imagine what we should have done during these four years of this War if the Tata Company had not been able to give us steel rails which have been provided for us not only for Mesopotamia, but for Egypt, Palestine and East Africa. And I have come to express my thanks to the Directorate of this Company for all that they have done and to Mr. Tutwiler the General Manager of this Company for the

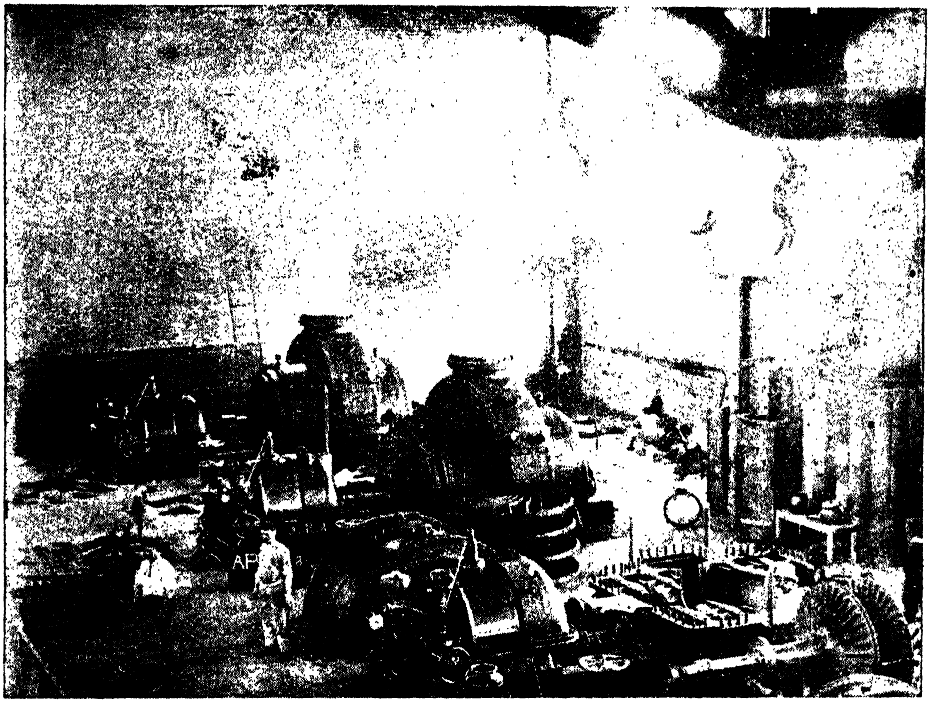

টারবাইন্‌স্ (জলচক্র)—পাওয়ার হাউস বা শক্তি উৎপাদনের কারখানা

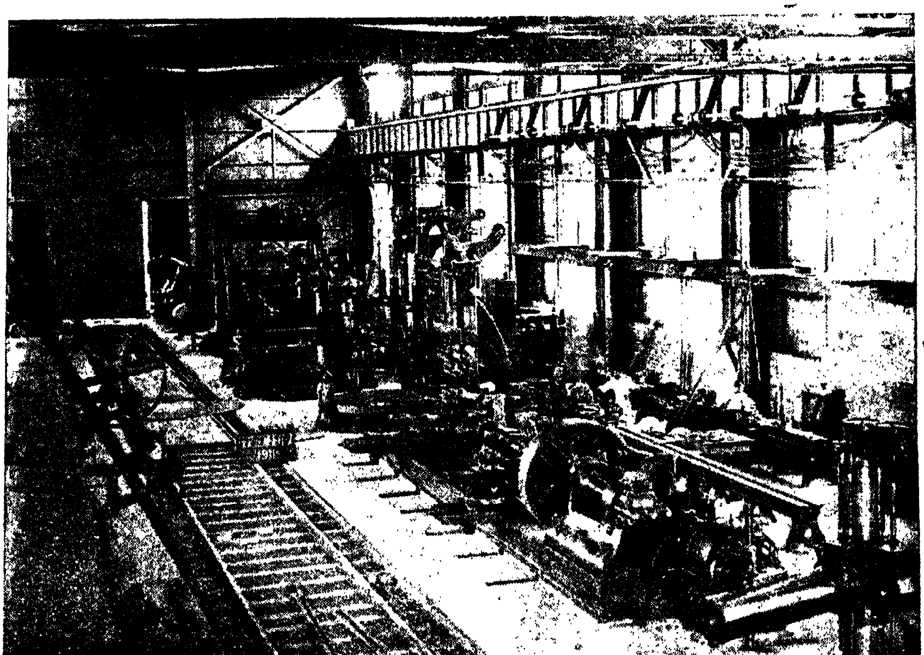

মেসিন সপ

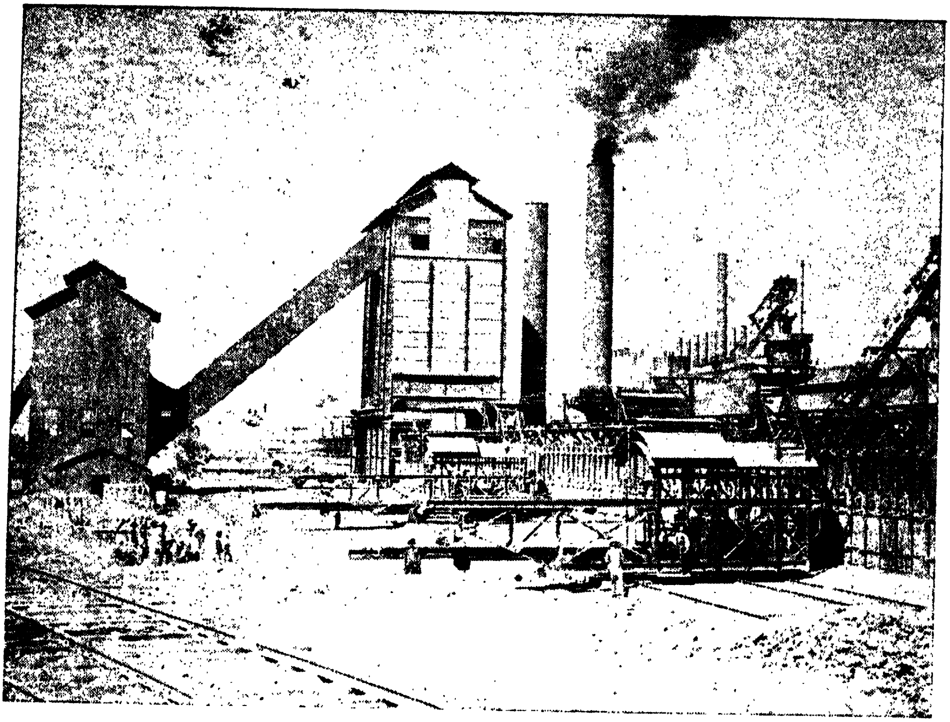

কোক তৈয়ারি করিবার উনান

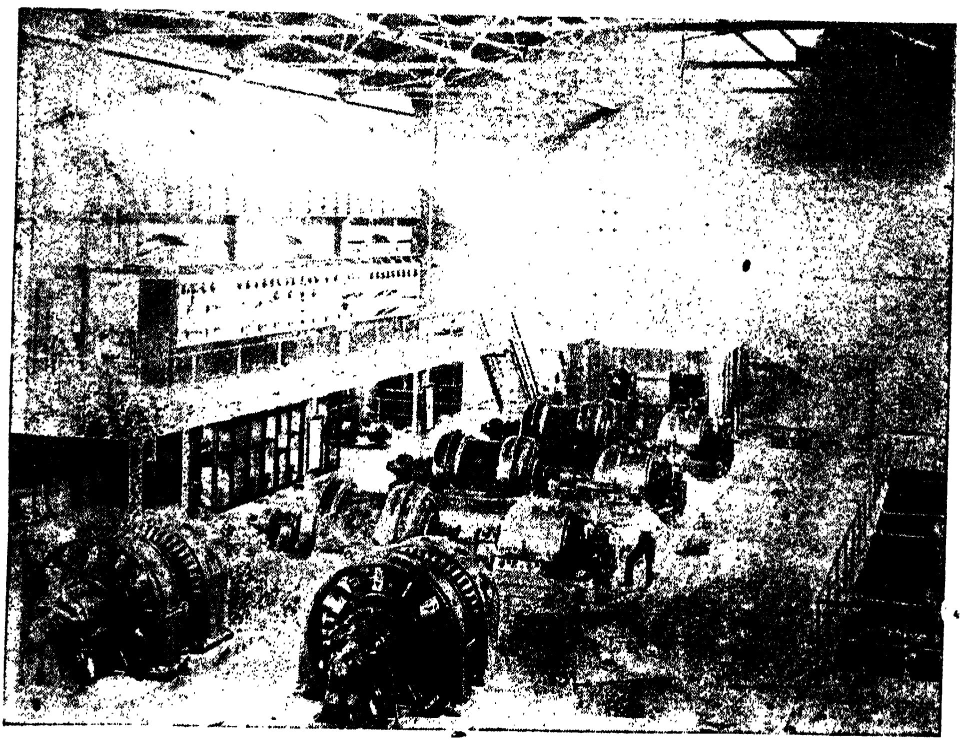

পাওয়ার হাউস—বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের কারখানা

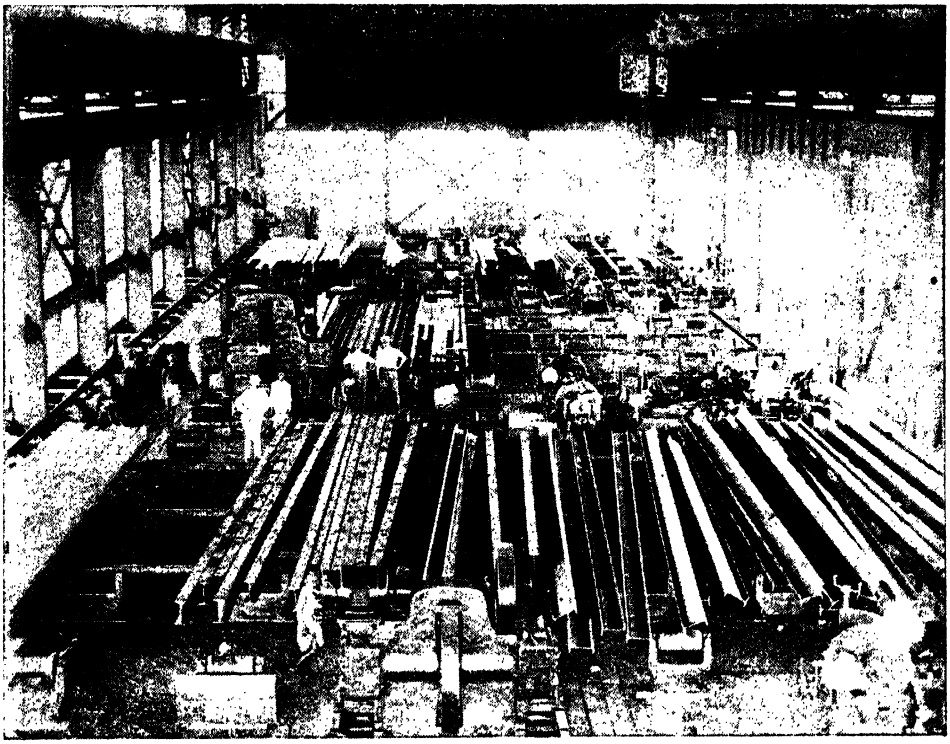

রেল তৈয়ারীর কারখানা

মাল চালান দিবার প্ল্যাটফর্ম্ম

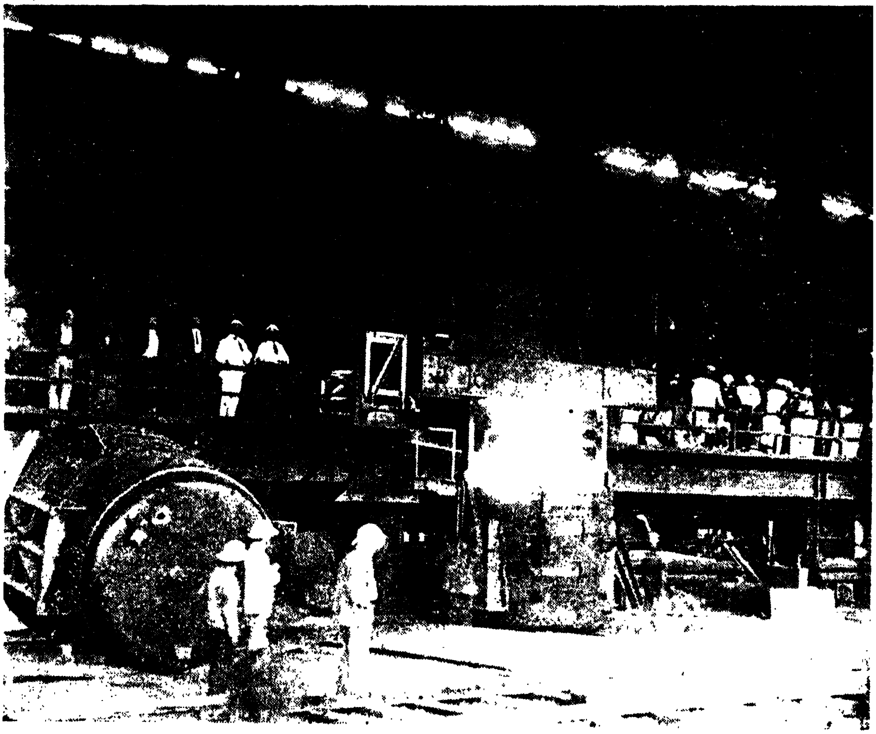

ইস্পাতের কারখানা

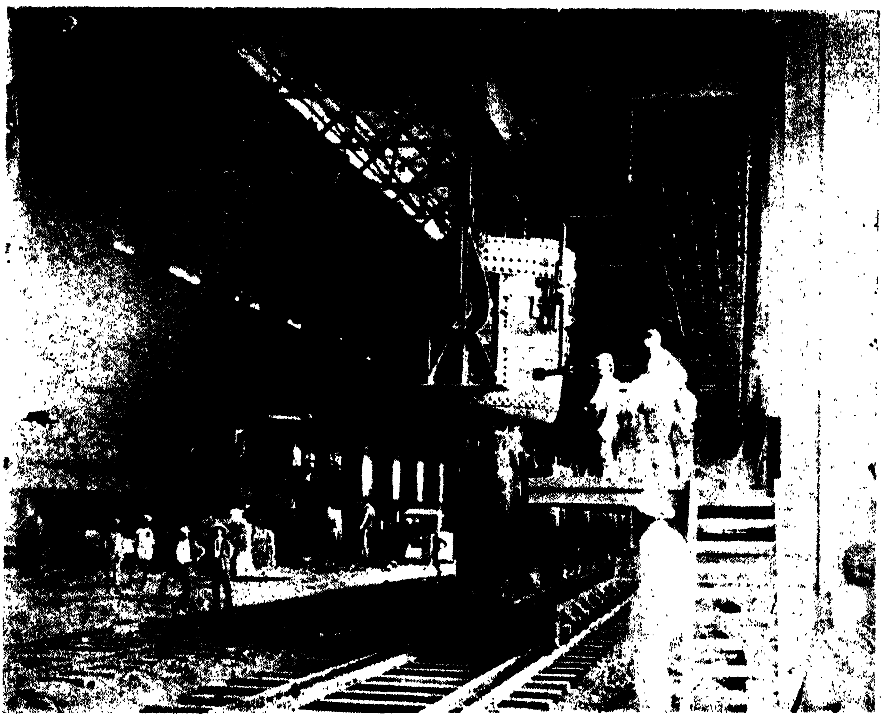

বার মিল্‌স্‌

enthusiastic work which he brought to bear in this behalf during the past four years (applause).

"It is hard to imagine that 10 years ago this place was scrub and jungle and here we have now this place set up with all its foundries and its workshops and its population of forty to fifty thousand men. This great enterprise has been due to the prescience, imagination and genius of the late Mr. Jamsetji Tata. We may well say that he has his lasting memorial in the Works that we see here all round. But you will be pleased to learn when I tell you to day that on account of the filial reverence of Sir Dorab Tata this place will see a change in its name and will no longer be known as Sakchi but will be identified with the name of the founder, bearing down through the ages the name of Mr. Jamsetji Tata. Hereafter this place will be known by the Name of JAMSHEDPUR. (Applause). It is my privilege here to-day to have been able on this the occasion of the first visit of a Viceroy to this place to pay my tribute to the memory of that great man." (loud applause).

সাক্‌চী সম্বন্ধে এবার এই পর্য্যন্ত; সময়ান্তরে—নূতন সহর "জেম্‌সেদ্‌পুর" সম্বন্ধে আমরা ২।১টী কথার অবতারণা করিব।

ভাবের অভিব্যক্তি

দান

গ্রহণ

ভাবমগ্না

চিন্তান্বিতা

হাসি

কান্না

সলজ্জা

অভিনিবেশ

দেশী ও বিদেশী

[শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম্-এ, বি-এল্]

(১)

জ্যোতির্ম্ময়ের কথা

আমরা সহরের ছেলে, আমরা সভ্য, আমরা সাহেব-বাবু বা বাবু-সাহেব; সুতরাং আমরা যে প্রকৃতি-মাতার ত্যজ্য-পুত্র,—এ খাঁটি সত্যটুকু আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম, প্রকৃতির লীলা-ভূমি খাসিয়া-পাহাড়ে গিয়া। আমাদের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক—এই ইন্দ্রিয় পাঁচটীও প্রকৃতিগত কর্ত্তব্য-সাধন করিতে পরাঙ্মুখ হয়, যে পর্য্যন্ত না আমরা কতকগুলা আদব-কায়দার বাহিক চাকৃচিক্যে তাহাদের প্রকৃতিগত কর্ত্তব্যের "খেই" ধরাইয়া দিই। অনেকগুলা কাপড়ের ভারে ত্বগেন্দ্রিয়কে স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে স্থানটী কন্‌কনে ঠাণ্ডা। সরল দেবদারুর পাতাগুলির মুখে ঝর্‌ঝর্ ফর্‌ফর্ শব্দের মৃদু হাস্যের রোল তুলিয়া সদাই শ্রমহারী শীতল মলয় আমাকে অভিবাদন করিত। কিন্তু তাহার শৈত্যের মাত্রাটুকু ঠিক মাপিয়া লইতে পারিতাম না। কারণ সংবাদপত্র খুলিয়া প্রত্যহ প্রাতে যেমন কলিকাতার শীতোষ্ণের স্বরূপ-সম্বন্ধে তাপমান যন্ত্রের সাক্ষ্য-প্রমাণ পাইতাম, শিলঙের মানমন্দিরের তাপমান যন্ত্রের দৈনিক উঠা-নামার কোনও সংবাদ কোনও পত্রিকা চক্ষের সম্মুখে আনিয়া চায়ের পেয়ালার পাশে রাখিত না।

শিলঙ শীতল। সুতরাং অঙ্গে উঠিবার দাবী ধুতির মোটেই ছিল না। আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট সার্জ্জের পোষাক পরিয়া লাবানের পথ চিনিয়া যখন চৈতন্য বাবুর বাঙ্গালার প্রাঙ্গণে গিয়া পৌছিলাম, তখন সেই অশান্তি—প্রাণ লইয়া তত নয়, যত কর্ম্মেন্দ্রিয় লইয়া। এক-বাগান সুন্দর ফুল—অতি মৃদু সৌরভ; মৃদু সমীরণে রবির কর মাখিয়া বড় মধুর স্পন্দনে স্পন্দিত। কিন্তু তাহাদের বর্ণ ও সৌরভের ঠিক স্বরূপ আবিষ্কার করিবার শ্রমটুকু চক্ষু ও নাসিকা মোটেই ঘাড়ে লইতে চাহিল না, যতক্ষণ না চৈতন্য বাবু বলিয়া দিলেন—এগুলা কসমস্, এগুলা ডালিয়া, এগুলা চন্দ্রমল্লিকা—অর্থাৎ ক্রিসেন্ থিমাম, এগুলা ফুসিয়া

চোখ টেপা

খাসিয়া বালিকাগণ

এবং এগুলা গোলাপ। তখন যেন সেই সুন্দর বাগানভরা, রবিকর-স্নাত কুসুম-সম্পদের গৌরব-বৃদ্ধি হইল। তখন নভেল-পড়া, কবি-দীক্ষিত মিলন-তৃষিত প্রাণ বড় অশান্ত হইল—যাহার হাতে-গড়া এই পুষ্প-বীথিকা, যাহার দর্শন-লাভে ধন্য হইবার জন্য এত দূর আসিয়াছি, এত পোষাক পরিচ্ছদ পরিয়াছি, প্রাণে এত আশা পুষিয়াছি—তাহাকে দেখিবার জন্য, আমার আকস্মিক আগমনে তাহার পিতাকে যেমন বিস্মিত করিয়াছি, তাহাকে তাহার শতগুণ পুলকে পুলকিত করিবার জন্য।

চৈতন্য বাবু বলিলেন, "তুমি পাগলা ছেলে, তুমি এসে কোথায় মোথারে পরের বাসায় রয়েছ,—ছিঃ! ছিঃ!!"

আমি বলিলাম, "না, ও বাসাটী আমার এক বন্ধুর; তিনি ছুটিতে বাড়ী গেছেন; কাজেই ওখানে এসে উঠেছি। এখানে স্থান আছে কি না—"

"তা ত' সংবাদ নাও নি। বাড়ীতে বড় রাগ করবে—তোমার খুড়ি-মা—"

আমি সুবিধা পাইয়া বলিলাম, "তিনি কোথা?"

চৈতন্য বাবু একটী গোলাপ ফুল ছিঁড়িয়া বলিলেন, "এই নাও। তিনি গেছেন অশোকাকে নিয়ে মহিলা-সমিতির সভায়। এখানে আমাদের ব্রহ্মমন্দিরে ওঁরা একটী সভা করেছেন, প্রতি বুধবারে বৈঠক হয়। এখানকার মহিলারা কুমারী মেয়েদের খুব যত্ন করেন, আর সব আপনা-আপনির মত—বাঙ্গালী তো বেশী নেই। চা খাবে?"

আমি তাঁহার সজ্জিত গৃহে একখানা বেঞ্চে বসিলাম। খুড়িমা ও অশোকার নিকট আমার আগমন-সংবাদ গোপন রাখিতে বলিলাম। তিনি হাসিয়া কর্ম্মস্থলে গেলেন।

পাহাড়গুলার সৌন্দর্য্য অফুরন্ত,—চারিদিকে সরল

দেবদারুর বন একেবারে উপত্যকা হইতে স্তরে-স্তরে পাহাড়ের মাথার উপর পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। আর শৈল-গুলারও কি তেমনি সৌষ্ঠব !

অকস্মাৎ পিছন হইতে কে আমার চোখ টিপিয়া ধরিল। সে ঈষৎ-কম্পিত মৃদু-স্পর্শের স্বত্ব-স্বামিত্ব কি গোপন করিবার উপায় আছে! আমার সর্ব্বশরীরে শত দামিনী খেলিয়া যাইতেছিল। তাহারও কোমল স্পর্শের আবেগে বিদ্যুতের চাঞ্চল্য স্পষ্ট অনুভূত হইতেছিল। চোখ-টেপার আইন-মতে নাম বলিলেই চোখ ছাড়িয়া দিতে হয়। কাজেই পাঁচটা মিথ্যা নাম করিয়া অশোকার সেই চম্পক-অঙ্গুলি পাঁচটা আপনার চক্ষের উপরেই বা কতক্ষণ রাখি সে স্পর্শ-শক্তি অপরের থাকিতে, পারে, এ অসম্ভাবনাটাকেই বা প্রশ্রয় দিই কেমন করিয়া? কাজেই প্রকৃতিজাত বাসনারাশির সরল পরামর্শকে আমলে আসিতে না দিয়া অতি মৃদু স্বরে, বিলম্বিত-লয়ে বলিলাম, "অ—শো—কা।"

অশোকা হাত ছাড়িয়া দিল। হাসির অত গৌরব পূর্ব্বে দেখি নাই; হাসি যে শ্রেষ্ঠ মানব-প্রকৃতির অঙ্গ, মানুষের সহজাত-সংস্কার, তাহা পূর্ব্বে কখনও বুঝি নাই। অমল সরস হাস্যে তাহার মুখের স্বর্গীয় সুষমা যে কতদুর বাড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। নিজেরও দেহে, মনে, প্রাণে যেন মোহ-মদিরার আবেশ ছুটাছুটি করিতেছিল। জীবনে এমন অনুভূতি হয় ত দুই এক মুহূর্ত্ত আসে —বাকী জীবনটুকু সেই দুই একটা মুহূর্ত্তের শুভাগমনের জন্য সাধনা মাত্র।

অশোকার কথা

ভবিষ্যতের তিমির-গর্ভে মানুষের দৃষ্টি চলে—নিশ্চয় চলে। বড়-বড় ঘটনার ছায়া তাহাদের সম্মুখে পড়ে—নিশ্চয় পড়ে। আজ ভোরে যখন শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রার্থনা করিতেছিলাম,—ভগবানকে বলিতেছিলাম, "পিতঃ জগতে শান্তি বিরাজ করুক" তখন মাদার গাছের উপর বড় ললিত সুরে স্থির ছন্দে একটা দোয়েল গান গাহিতেছিল; আর কমলালেবুর গাছের বড়-বড় পাতার মধ্যে লুকাইয়া একটা বুলবুলি লয় মিলাইয়া গাহিতেছিল, "পিক্‌রো—পিক্‌রো"। পূর্ব্ব-মুখ কসমসগুলার অতি মৃদু গন্ধ আসিতেছিল; চামেলীর গন্ধের সহিত গোলাপ-গন্ধ মিলিতেছিল। সেই সময় জ্যোতি-দাদাকে মনে পড়িতেছিল, —আহা! আমরা এমন সৌন্দর্য্য, এমন বিভবের মধ্যে কাল-যাপন করিতেছি—আর তিনি চৌরঙ্গীর গাড়ির ঘড়-ঘড়ানী, মোটরের পোঁ-পোঁ, ঝগ্‌-ঝগ্‌ শব্দের মাঝখানে ধূলা ও ধোঁয়ার দেশে কত না কষ্ট ভোগ করিতেছেন! আজ বাগানে কত ফুল ফুটিয়াছিল, এত ফুল এক সঙ্গে কোন দিন ফোটে না। প্রাণের ভিতরটা দুরুদুরু করিতেছিল। জ্যোতি দাদা কতবার শিলঙে আসিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন —কই একবারও তো আসিলেন না। শুনিলাম, তিনি বিলাত যাইতেছিলেন,—তবু তো আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন না। আপনার মনে সাজ করিলাম, পোষাক পরিলাম--আর্সির সম্মুখে দাঁড়াইয়া চুলের উপর খুব পরিপাটীরূপে ফিতা বাঁধিলাম। আর ভাবিতেছিলাম তাঁহার কথা—তাঁহার সরলতা, ভাব-প্রবণ চঞ্চলতা, আর তাঁহার মিষ্ট ব্যবহার। সমিতিতে যাইবার সময় মা চিবুকে হাত দিয়া বলিলেন, "অশোকা, আজ তোমার সাজটি বেশ হ'য়েছে।" আমার প্রাণ দুরুদুরু কাঁপিয়া উঠিল,—সন্দেহ হইল, মা বুঝি বুঝিয়া ফেলিয়াছেন, অন্য-মনে কাহার কথা ভাবিতে-ভাবিতে পোষাক পরিয়াছি।

তাই, যখন সভা ছাড়িয়া গৃহে আসিয়া দেখিলাম, আমাদের ফুল দিয়া সাজানো ঘরে বেতের বেঞ্চে জ্যোতি-দাদা বসিয়া সম্মুখে সোপাটের পাহাড়ের দিকে চাহিয়া আছেন, তখন আনন্দে, আবেগে, উৎসাহে ছুটিয়া গিয়া পিছন হইতে তাঁহার চোখ টিপিয়া ধরিলাম। চালাকী করিবে আমার সঙ্গে? চিঠি না লিখিয়া অকস্মাৎ শিলঙে আসিয়া তুমি আমাকে বিস্মিত করিবে? বটে! চোখ টিপিয়া ধরি,—দেখি, কে বিস্মিত হয়! পাহাড়ের উপর থাকি বলিয়া বুঝি আমাদের বুদ্ধি নাই? আমার অনুমান সত্য হইল। জ্যোতি-দাদা বিস্মিত হইলেন। মুখে এক মুখ হাসিলেন বটে, কিন্তু কিছুতে বুঝিতে পারিলেন না আমি কে! দুই পার্শ্বে দুইটা হাত তুলিয়া তিনি অনেকটা ইতস্ততঃ করিয়া তবে আমার নাম বলিতে পারিলেন। জাহাজের মাল্লারা যেমন জল মাপিয়া অগ্রসর হয়, সেই রকম মাপিয়া-মাপিয়া প্রথমে বলিলেন, "অ—"; কোনও আপত্তি হইল না বুঝিয়া বলিলেন, "শো—"; তাহার পর একেবারে সাহস করিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "কা"।

আমি হাত ছাড়িয়া হাততালি দিলাম। তিনি দাঁড়াইয়া আমার দিকে ফিরিয়া হাসিলেন। তাঁহার মুখে খুব লাবণ্য ছিল। আমি বলিলাম, "কেমন জব্দ, কেমন ঠকিয়েছি।"

তাঁহার মনের মধ্যে আত্ম-প্রশংসার ধ্বনি উঠিতেছিল—যেন তিনিই আমাদের প্রতারিত করিয়াছেন; কিন্তু যখন আপনার অবস্থাটা ষোলআনা উপলব্ধি করিলেন, তখন বলিলেন, "হাঁ, তোমাদের বাড়ীর যে দরজাগুলা জানতেম না। তা হ'লে কে কাকে ঠকিয়েছে দেখাতাম।"

কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলাম। এমন সময় আমার জননী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "জ্যোতি!"

জ্যোতি-দাদা মাতাকে প্রণাম করিলেন। মা তাঁহাকে চিবুক ধরিয়া আদর করিলেন; তাঁহার কণ্ঠস্বর একটু কাঁপিল, চোখ-দুটা একটু ছল-ছল করিল। করিবারই কথা, জ্যোতি-দাদার জননী ও আমার জননী বাল্যসখী—এক গ্রামের মেয়ে, এক সঙ্গে স্কুলে পড়িয়াছেন। জ্যেঠাই-মা প্রায় দশ বৎসর হইল স্বর্গে গিয়াছেন; তাঁহার পুত্রকে দেখিয়া কি মা বিচলিত না হইয়া থাকিতে পারেন? একটু সামলাইয়া লইয়া মা বলিলেন, "অশোকা বুঝি জানতিস্?"

আমার চুলের সবুজ ফিতার ফাঁসটায় অতর্কিতে আমার হাত পড়িল। আমি সলজ্জভাবে বলিলাম, "না মা, মোটেই না।"

শুনিলাম, তিনি মোথারে কোন্ বন্ধুর খালি বাড়ীতে উঠিয়াছেন। আমাদের পাড়ার নাম লাবান—মোথার আর একটা পাহাড়ে, ভিন্ন পাড়া। সেখানে ইংরাজি-শিক্ষিত সৌখীন খাসিয়ারা বাস করে। জননী বড় বিরক্ত হইলেন; বলিলেন, "তোমার এ কি পাগলামি!" আমিও খুব রাগ করিয়াছিলাম। জ্যোতিদাদা অপ্রস্তুত হইয়া একবার আমার মুখের দিকে চাহিলেন! আমার চোখে কোনও উৎসাহ না পাইয়া তিনি মাতার দিকে চাহিলেন। মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, "খুড়িমা, একটু মুস্কিলে পড়েছি। পথে একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'য়েছে,—তিনিও আছেন কি না।"

অবশ্য সে অপরিচিতের থাকিবার স্থান আমাদের গৃহে ছিল না। অনেক বাদানুবাদ হইয়া শেষে স্থির হইল যে, জ্যোতিদাদা মোথারের বাড়ীতে রাত্রে শুইবেন মাত্র, কিন্তু দিন-রাত তাহাকে আমাদের সহিত থাকিতে হইবে। আজ বৈকালে তাহাকে কোন্ কোন্ দৃশ্য দেখাইব, সব বলিলাম। আমাদের একঘেয়ে জীবনে অতিথির সঙ্গে কত আনন্দ আসে, তাহা প্রবাসী মাত্রেই বিদিত। বিশেষতঃ অতিথি যদি আত্মীয় হন,—অতিথির শুভাগমনের জন্য যদি বহুদিন প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়।

জ্যোতির্ম্ময়ের কথা

কার্য্য-কারণের রহস্য বিশ্লেষণ করিতে পারেন যাঁহারা, তাঁহারাই প্রতিভার দাবী করিতে পারেন। কি সামান্য কারণে কি গুরুতর ফল ফলিতে পারে, তাহা নিত্যই দেখিতে পাওয়া যায়। যদি অসাবধানতা বশতঃ দশরথ রাজা বেচারা সিন্ধু মুনিকে বধ না করিতেন, তাহা হইলে সোণার লঙ্কা দগ্ধ হইত না, রাবণ রাজা মরিতেন না এবং রাম, লক্ষ্মণ বা সীতাদেবীর আদর্শ চরিত্রের বিকাশ হইত না। মিঃ চম্পটীর সহিত সান্তাহারে পরিচয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম, লোকাভাবে। ছোট রেল-গাড়িতে দুইজন মাত্র আরোহী ছিলাম—চম্পটী ও আমি। নিস্তব্ধতার ভীম কঠোরতাকে উপেক্ষা করিবার একমাত্র উপায় ছিল—পরস্পরের পরিচয়। পরিচয়ে দুঃখিতও হই নাই; কারণ, তিনি কথাবার্ত্তা কহেন ভাল, রসবোধও কতকটা আছে। গৌহাটী হইতে শিলঙে উঠিবার সময় পাহাড়ের দৃশ্যপটগুলা যখন জীবন্ত ছায়াবাজীর মত পরিবর্ত্তিত হইতেছিল, তখন মোটর গাড়ীতে একজন সাথী না থাকিলে পথের ধারের পাহাড়ের মতই জীবনটা কঠিন ও গুরুভার হইত। যখন পাহাড়ের উপর একটা ছোট গ্রামের ধারে মোটর আসিল, তখন চম্পটী বলিলেন, "শিলঙে তাঁহার বাসস্থানের স্থিরতা নাই।" ন্যাংপো পার হইয়া বনের মধ্যে ছুটিতে-ছুটিতে যখন দেখিলাম, পথের ধারে দুইটা মৃগ রোমন্থন করিতেছে, তখন চম্পটী আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল; চালককে বলিয়া গাড়ী থামাইয়া সে দৃশ্য উপভোগ করিতে লাগিল। এই রসবোধের পরিচয় দিয়াই একটা আকর্ষণী শক্তিতে সে আমাকে নিজের

দিকে টানিতেছিল। ম্যাংপোর আরও উপরে যখন দেখিলাম, আমরাও যত বেগে উপরে উঠিতেছি—উপর হইতে ততোঽধিক বেগে একটা প্রকাণ্ড গিরিনদী ভীষণ কল-কল ধ্বনিতে আমাদের মোটর-পথের নীচে সগর্ব্বে ছুটিতেছে, তখন চম্পটী আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "বাঃ! কি মধুর! কি চমৎকার! আমি জাপান, সিঙ্গাপুর, হংকং সর্ব্বত্র ঘুরেছি,—এত সৌন্দর্য্য কোথাও দেখিনি।"

সেই সৌন্দর্য্যবোধের আবেগ আমাকে পরাজিত করিল। আমি তাহাকে নিমন্ত্রণ করিলাম। আমি বাসায় একাকী থাকিব,—সে ইচ্ছা করিলে আমার সহিত বাস করিতে পারে।

কিন্তু একত্র সাত দিন বাস করিয়া বুঝিয়াছিলাম, চম্পটী নানা রসের রসিক। দুঃখের বিষয়, তৃতীয় দিবসে আমি চৈতন্য বাবুর বাটীতে লইয়া গিয়া তাহার সহিত সকলের পরিচয় করিয়া দিয়াছিলাম। সে ভাল সমাজে মিশিয়াছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ ছিল না। সে খুড়ি-মা ও অশোকার সহিত অতি সশ্রদ্ধভাবে কথা কহিত। এক দিন আমাদের সহিত সে চৈতন্য বাবুর বাটীতে রাত্রে ভোজন করিল। সৌজন্যে ও শ্রদ্ধায় সে অশোকাকে মুগ্ধ করিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু অশোকা কোনও প্রকারে তাহাকে সহ্য করিতে পারিল না।

এইটাই আমার দুঃখের কারণ হইয়া উঠিল। তাহাকে বিধি-মতে বর্জ্জন করিতাম, তবু ধূমকেতুর মত সে আমাদের শান্ত আকাশে মাঝে-মাঝে উদয় হইত। অশোকা বিরক্ত হইত; নানা প্রকার কৌশল করিয়া তাহার সঙ্গ এড়াইতে হইত।

দ্বিতীয় দুঃখের কারণ হইয়া উঠিল, যেদিন দেখিলাম যে সে মদ্যপায়ী। আমার পিতা ব্যারিষ্টার;—আমি যে সমাজে পালিত হইতেছিলাম, সে সমাজে মদ্যের তেমন অনাদর ছিল না। কিন্তু আমার পিতার পান-দোষ ছিল না; এবং তিনি সর্ব্বদা আমাকে মদ্যপের ভীষণ পরিণাম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন। কিন্তু তাঁহার অপেক্ষা মদ্যে বেশী ঘৃণা ছিল চৈতন্য বাবুর। তিনি ধর্ম্মের জন্য, অমল জীবন-যাপন করিবার জন্য ব্রাহ্ম-সমাজে যোগদান করিয়াছিলেন;—পবিত্রতা তাঁহার জীবনের ইতিহাসের প্রতি ছত্রে লিখিত ছিল। সুতরাং চম্পটী যেদিন আমার অনুমতি লইয়া প্রথম সুরা পান করিল, সেদিন আমি আপনাকে ঘোরতর অপরাধী মনে করিলাম। যদি চৈতন্য বাবু জানিতে পারেন! যদি অশোকা বুঝিতে পারে!

তাহার পর বুঝিলাম, চম্পটী আরও রসিক। শিলঙ-যাত্রীর প্রথম লক্ষ্য হয় খাসিয়া স্ত্রীলোক। বেশ হৃষ্টপুষ্ট সবল রমণীর দল—একটু হরিদ্রাভ দেহ, রক্তাভ গণ্ড, চেপটা নাসিকা—দিবা-রাত্রি মৌমাছির মত পরিশ্রম করিতেছে। তাহারা আমাদের মত সুসভ্য নয়; তাই তাহাদের সমাজ-বন্ধনে শাসন-অনুশাসন দুঃশাসনের ধুমধড়াক্কা নাই। ইহারা প্রকৃতির সন্ততি, প্রবৃত্তিবশে কার্য্য করে। ইহাদের নীতি বা দুর্নীতি সম্বন্ধে সাহেব ও বাঙ্গালীদের ধারণার কতক আভাস পাইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, পাণ্ডু হইতে আমিনগাঁও পার হইবার সময়, ব্রহ্মপুত্রের উপর ষ্টিমারে খানা খাইতে বসিয়া। তিন-চারি দিনের মধ্যে দেখিলাম, চম্পটী বাজারে-বাজারে ঘুরিয়া তাহাদের ভাষাটা কথঞ্চিৎ আয়ত্ত করিয়াছে। একদিন আমরা বাঙ্গালার বারান্দায় বসিয়া গল্প করিতেছি, তিনটী খাসিয়া বালিকা পৃষ্ঠে বাঁশের চোঙ্গা বাঁধিয়া কোথায় যাইতেছিল। চম্পটী চীৎকার করিয়া বলিল—"আলে, আলে, আলে হাঙ্গনে।" পরে শুনিয়াছিলাম কথাগুলার অর্থ—এস, এস, এখানে এস।

বালিকাত্রয় হাসিয়া নিকটে আসিল। একজন বলিল—"খুবলে, বাবু, খুবলে।" আমি "খুবলে" জানিতাম; খুবলে মানে সেলাম।

সে বলিল—"লেই সেনো?"

বালিকা বলিল—"টণ্ড্ উম্।"

চম্পটী বুঝাইয়া দিল। বলিল—উহারা জল আনিতে যাইতেছে।

আমি বলিলাম—"এ ভাষা শিখ্‌ছেন কেন?"

চম্পটী হাসিল। বলিল—"আমার খাসিয়া পাহাড়ে আসার উদ্দেশ্যটা ভুলে যাচ্ছেন। আমি জাপান থেকে মৌমাছির চাষ করবার প্রণালী শিখে এসেছি। এখানে মৌচাকের ব্যবসা করব। আর বুঝেছেন তো, মধু আহরণটা সর্ব্ব প্রকারেই করা চাই। কেন খাসিয়া যুবতীগুলা—"

আমি বলিলাম—"রক্ষা করুন। আপনি খাসিয়া বিবাহ করুন, আমার ওদিকে রুচি নাই।"

দেখিতাম, লোকটা হাটে-বাজারে খাসিয়া যুবতীদিগের সহিত রহস্যালাপ করিত। আমাদের বাসায় একটা যুবতী কাণ্টাই ছিল। কাণ্টাই বলে দাসীকে। কাণ্টাই বেশ সুন্দরী—বাঙ্গালীর মত মুখ;—নাম শেল্লাক। কাণ্টাই তাহাকে ঘৃণা করিত, অবিশ্বাস করিত, বোধ হয় একটু ভয় করিত। কাজেই সে আমাকে শ্রদ্ধা করিত; আমার কার্য্য করিতে, আমার সেবা করিতে সুখানুভব করিত। ভোর হইলেই দরজার পার্শ্বে আসিয়া বলিত "উম্ শীট বাবু।" চম্পটি বলিয়াছিল, তাহার অর্থ গরম জল। সুতরাং শেল্লাকের অনুগ্রহে আমি ভোরে উঠিয়াই গরম জলে মুখ ধুইতাম। তাহার পর সে আনিত "সি খুরী সা" এক পেয়ালা চা। এ সকল কৃপাকণার পরিবর্ত্তে আমি তাহাকে দিতাম—দুই চারি আনা পয়সা আর এক একবার হাসি মুখে বলিতাম—'খুব্‌লে'। শেল্লাক ভারি রহস্য বোধ করিত। আমার জামা ঝাড়িত, জুতা ঝাড়িত, "শীট্ সা" আনিয়া দিত।

এ বিষয় লইয়াও চম্পটী আমাকে পরিহাস করিত। লোকটার উপর আমার বিতৃষ্ণা দিন-দিন বাড়িতেছিল। কিন্তু অচল টাকার মত কিছুতেই তাহাকে বর্জ্জন করিতে পারি নাই।

অশোকার কথা

যেমন নির্ম্মল শরতের আকাশ অনাবিল, সূর্য্যালোক-মণ্ডিত,—আমার মনের আকাশও তেমনি নির্ম্মল, তেমনি সুন্দর। আমাদের লাবান পাহাড়টার সর্ব্বোচ্চ শিখরের নাম শিলঙ। শুনিয়াছি, খাসিয়া-শৈলপুঞ্জে শিলঙ শিখরই সর্ব্বোচ্চ। সেই শিখরদেশে এক-আধ টুকরা কুয়াসা ঐশ্বর্য্যবানের মোসাহেবের মত, সর্ব্বদাই ঝুলিয়া থাকিত। সে কুয়াসা এত দূরে যে, তাহাতে শিলঙবাসীর সুখের ব্যত্যয় হইত না। আমারও সুখাকাশে বহু দূরে এক টুক্‌রা কালো মেঘ ভীত শিশুর জুজুর ভয়ের মত, বিভীষিকা সৃষ্টি করিত। সে চম্পটী সাহেবের উপস্থিতি। লোকটা কথাবার্ত্তা কয় ভাল, শিক্ষিত বলিয়া মনে হয়, স্বদেশের উপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা; তাই মধু-মক্ষিকার আবাদ করিয়া বঙ্গমাতাকে ঐশ্বর্য্যশালিনী করিতে মনস্থ—কিন্তু তালকানা। কখন কোথায় যাইতে হয়, কাহার সঙ্গে মিশিতে হয়, তাহা জানে না। আর আমার মনে হইত, তাহার চক্ষে একটা প্রবঞ্চনার ভাব আছে। এ কথায় ইঙ্গিত আমি জ্যোতি-দাদাকে একদিন দিয়াছিলাম; কিন্তু তিনি আমাকে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। সে প্রতারক হউক, সাধু হউক,—তাহাতে আমাদের কিছু আসে-যায় না। কিন্তু সে অতিশয় বে-তালা বাদ্যকরের মত মাঝে-মাঝে আমাদের সঙ্গ লইত, কিছুতেই ভদ্রভাবে তাহাকে বর্জ্জন করিতে পারিতাম না। তাহাতে এক-একবার বিরক্তি আসিত। কারণ জ্যোতি-দাদার সহিত গল্প করিবার প্রসঙ্গ আমার অনেক। তাহার সহিত গল্প করিবার সুখে অংশী-দারের চিন্তা একেবারে অসহনীয়। আর সত্য কথাই বা লিখিতে দোষ কি? এ ডায়েরি তো আমার নিজস্ব।

সে দিন শিলঙ সরোবরের গড়ানে জমিতে ঘাসের উপর বসিয়া জ্যোতি-দাদার সঙ্গে গল্প করিতেছিলাম। দুদিকের গড়ানে জমি স্তরে-স্তরে উঠিয়া গিয়াছিল। চারিদিকের সুবৃহৎ তরুরাজির কালো ছায়া শিলঙ হ্রদের স্বচ্ছ জলে মৃদু বায়ু-হিল্লোলে স্পন্দিত হইতেছিল। মস্তকের উপর দোয়েল ডাকিতেছিল—সমস্ত জগতটা একটা সুখের স্পন্দনে স্পন্দিত হইতেছিল; সেই সময় আমার সেই স্পন্দন আসিয়াছিল—যে আনন্দ, যে শান্তি বিশ্ব-পিতার নিকটে প্রতিদিন প্রভাতে উঠিয়া চাহিতাম—সেই আনন্দের লহরে-লহরে সারা সৃষ্টি, সারা প্রকৃতি বিভোর হইয়া উঠিল। কিরূপে সে সুখ-মদিরার স্বাদ পাইলাম, তাহা বলিতেছি।

হ্রদের ধারে বসিয়া ছিলাম। আমি বলিলাম—"জ্যোতি-দাদা, বিলেতে গিয়ে যদি আমাদের ভুলে যাও!"

পুলের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন—'যা'তে না ভুলি, সেই ব্যবস্থা করবার জন্যেই তো শিলঙে এসেছি অশোকা।"

কি জানি, কি একটা অজানা সন্দেহে বুকটা দুরুদুরু করিতেছিল। চিফ্-কমিশনরের বাড়ীর ময়দানের ইউ-ক্যালিপ্‌টাস্ গাছে বসিয়া একটা ঘুঘু খুব করুণ স্বরে ডাকিতেছিল। আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। তিনিও যেন একটু লজ্জিত। আমার মুখ হইতে বাহির হইল—"কি রকম?"

জ্যোতি-দাদা বলিলেন—"বাবার ইচ্ছা যে বিলাত

যাইবার পূর্ব্বে—মানে বিলাতে বাঙ্গালী যুবকদের বিপদ খুব বেশী—তাই মানে—বাবার ইচ্ছা—"

আমি বলিলাম—"কি ?"

"বিবাহ করে যাই। তাই শিলঙে পাঠিয়েছেন।"

বুকের ভিতর একেবারে আসাম মেল ছুটিতেছিল—হুড় হুড়, দুর্‌দুর্‌ গলা শুকাইতেছিল, তবু কি জানি কেন বলিলাম—"শিলঙে কেন ?"

কেন ? তাঁহার স্নেহের চক্ষের মৃদু ভৎর্সনা উত্তর দিল—বিবাহ করিতে শিলঙে কেন ? তাঁহার অভিমান-ভরা কম্পিত কণ্ঠস্বর জোর করিয়া কাণ মলিয়া বলিয়া দিল—তিনি কাহাকে বিবাহ করিতে শিলঙে আসিয়াছেন। তাঁহার আগুনের মত গরম কম্পিত অঙ্গুলিগুলা বলিয়া দিল—কেন ? তবু তিনি কম্পিত-ওষ্ঠে অভিমান-ভরা তিরস্কারের কম্পিত স্বরে আমার হাত ধরিয়া বলিলেন—"অশোকা !"

আমি তাঁহার সে আবেগের গভীর দৃষ্টি সহ্য করিতে পারিলাম না তাঁহার কম্পিত হস্তের উষ্ণস্পর্শ সহ্য করিতে পারিলাম না। আমি দুই হাতে চোখ টিপিয়া ধরিলাম। মনের ভিতর যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদূর চাহিয়া দেখিলাম—হৃদয়ের পরদায়-পরদায়, শোণিতের স্পন্দনে-স্পন্দনে রমণী-প্রকৃতির সঙ্গে ওতঃপ্রোত ভাবে মিলিয়া-মিশিয়া এক হইয়া আছে তাঁহার মধুর মূরতি, তাঁহার কণ্ঠস্বর, তাঁহার উদারতা। ও মা ! আমার অতর্কিতে চোরের মত তিনি কেমন করিয়া আমার প্রাণের কেল্লার সকল অস্ত্র, সকল কক্ষ, সকল প্রাচীর দখল করিয়া লইলেন ? এতদিন আমার নারীসুলভ লজ্জা কেবল এ কথা স্বীকার করিতে দেয় নাই ; কিন্তু এ অনন্ত ভালবাসার ভাগীরথী তো আমার ধমনীতে বহিয়া যাইতেছিল ! আজ মন স্পষ্ট করিয়া গাহিল সেই সুর—যে একমাত্র সুর সে আজীবন সাধিয়াছে।

একবার আঙ্গুলের ফাঁকে দিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। তিনি নির্নিমেষ লোচনে আমার দিকে চাহিয়া ছিলেন।

আমার ধ্যান ভাঙ্গাইয়া তিনি বলিলেন—"চল।"

আমি উঠিলাম। উভয়ে বিজয়গর্ব্বে উঁচু-নীচু পথের উপর দিয়া চলিতে লাগিলাম। পথে ক্লিপ্টোমেরিয়া ও উইলো আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। সরল গাছগুলা উর্দ্ধমুখে আমাদের সুখের সংবাদ বিশ্ব-পিতার শ্রীচরণে নিবেদন করিল।

জ্যোতির্ম্ময়ের কথা

যে সমাজে পালিত হইয়াছিলাম, সে সমাজে বিবাহের বিষয়ে চক্ষুলজ্জা, দুর্ব্বলতা বলিয়া পরিগণিত হয়। যখন পিতা শিলঙে পাঠাইয়াছিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন—"আমি নিজে চৈতন্যকে লিখ্‌তে পারি। কিন্তু তোমার বিবাহের ব্যবস্থা করা উচিত্র তোমার নিজের। প্রথমে অশোকার সম্মতি নিও। যেন আমাদের দুই পরিবারের বন্ধুত্বের খাতিরে তুমি বা অশোকা চিরদিনের জন্য কষ্ট পেও না।" আমি জানিতাম, এ সম্মতি পাইতে এত দূর পথ-ভ্রমণ অনাবশ্যক। কিন্তু অনাবশ্যকতাও সামাজিক নিয়মের বশে অনেক সময়ে আমাদের পরিশ্রমের দাবী করে। শিলঙে প্রথম মিলনেই বুঝিয়াছিলাম, যে দুর্গ অধিকার করিবার জন্য গুলি-বারুদ ঘাড়ে বহিয়া আনিয়াছি, সে দুর্গ-স্বামী আমি। শিলঙের হ্রদের ধারেও অশোকার মৌন-সম্মতি পাইলাম। কিন্তু কেমন একটা লজ্জা আসিতেছিল, আমি চৈতন্য বাবুর সম্মুখে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে পারিলাম না। আহা ! অশোকার কি রূপ-মাধুরী সে দিন দেখিয়াছিলাম, যে দিন হ্রদে সরোবরতীরে তাহাকে মনের ভাব বিবৃত করি। এ কথা কাহাকেও বলি নাই। বলি-বলি করিয়া দুইবার চৈতন্যবাবুকে বলিতে পারি নাই। অশোকার সম্মতি পাইবার দুই দিন পরে লাবানের পুলের উপর দাঁড়াইয়া অন্য-মনে একটা খঞ্জন পাখীর নৃত্য দেখিতেছিলাম। লাবানের পুল হাওড়ার পুলের মত দীর্ঘায়তন নয়, লাবানের নদীকেও সৌজন্য প্রকাশ করিয়া নদী বলিতে হয় মাত্র। একটা বড় ঝরণা কথঞ্চিৎ সমতল ভূমি পাইয়া কিয়দ্দূর সমভাবে ছুটিয়াছে। নানা রকম আকারের উপলখণ্ডের বাধা পাইয়া তাহার জল খুব গভীর কলরব করিয়া আপনাকে স্রোতস্বতী বলিয়া চীৎকার করিবার অবসর পাইয়াছে। কাজেই সেতুটি ২০ ফিটের অধিক প্রশস্ত নয়। যখন পুলের উপর দাঁড়াইয়া খঞ্জনের নৃত্য দেখিতেছিলাম, দেখিলাম, চৈতন্যবাবুর সহিত চম্পাটী আসিতেছে। আমাকে দেখিয়া চৈতন্যবাবু বলিলেন—"কবে কলিকাতা যাবে ? শুনছি না কি আর বেশীদিন থাকবে না ?"

আমি বলিলাম—"হ্যাঁ, গেলেই হয়। তা' আপনার সঙ্গে একটা বিশেষ কথা আছে—বাবা বল্‌তে বলে দিয়েছিলেন।"

চৈতন্যবাবু বলিলেন—"আজ বিশেষ কথা শুনবারই আমার দিন। তোমার বন্ধু চম্পটী সাহেবও আজ বিশেষ কথা বলবার ভণিতা করে—"

তিনি হাসিয়া চম্পটীর দিকে চাহিলেন। চম্পটী খুব সপ্রতিভ ভাবে বলিলেন—"আমি মিস্ সেনের সম্বন্ধে প্রপোজ করছি।"

আমার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে বিস্ময়ের প্রশ্ন উঠিল "—কি ?"

চৈতন্যবাবু খুব সরল ভাবে হাসিয়া বলিলেন—"চম্পটী মশায় আমার কন্যাকে বিবাহ করতে চান। অশোকা এখন ছোট—ওর বিবাহ কি ?"

সমস্ত লাবানের পুলটা কাঁপিতেছিল, লাবানের পাহাড়টা কাঁপিতেছিল, আমার জিহ্বাটাকে অসুর-বিক্রমে কে ভিতর হইতে টান মারিতেছিল, কে যেন আমার হৃদপিণ্ডটাকে ভীম পরাক্রমে চাপিয়া ধরিতেছিল। ইংরেজ বাঙ্গালীর হস্তে অস্ত্র দেয় নাই,—খুব বুদ্ধির কাজ করিয়াছে। সে সময় আমার নিকট কোনও অস্ত্র থাকিলে নিশ্চয় তাহাকে খুন করিতাম। কি স্পর্দ্ধা! ছোট মুখে কত বড় কথা! অজ্ঞাতকুলশীল, কুচরিত্র, মাতাল—উঃ! কাল কীট! ফুলের সঙ্গে তুমিও সাধুদের শিরে উঠিবার দাবী রাখ!

এ সব চিন্তাগুলা মুহূর্ত্তের জন্য আমার মাথার ভিতর খেলিয়া গেল। তখনই সামলাইয়া লইলাম। প্রকৃতিস্থ হইলাম। ইহার নাম সভ্যতা, সভ্য সমাজে ইহার নাম ভদ্রতা। যে যত মনোভাব গোপন করিতে পারে, সহজ-সংস্কারের গলা টিপিতে পারে, সে তত সভ্য, তত ভদ্র।

চৈতন্যবাবু আমার মনোভাব বুঝিতে পারিলেন কি না জানি না; আমাকে বলিলেন—"চল।"

আমি বলিলাম—"আপনাদের ওখান থেকেই আসছি, —এখন বাসায় যাব।"

চম্পটী বলিল—"আমিও মিঃ দাসের সঙ্গে যাই।"

চৈতন্যবাবু চলিয়া গেলেন। চম্পটী বলিল—"আমি আর্ল সেনিটেরিয়মে বাসা ঠিক্ করেছি। কাল বাদ পরশু সেখানে উঠে যাব।"

আমি আপত্তি করিলাম না। সে রাত্রে যতদূর পারিলাম, তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিলাম। পরদিন প্রভাতে সে আমার কক্ষে আসিয়া বলিল—"আজ বড়বাজারে যাবে না ?"

আমি বলিলাম—"না; পরে যাব। আমার ছোট টাকার থলেটা কোথা গেল কে জানে ?"

সে বলিল—"কত টাকা ছিল ?"

আমি বলিলাম—"না, টাকা বেশী ছিল না,—পাঁচ দশ টাকা।"

সে বলিল—"কাণ্টাইকে বললে খুঁজে দেবে এখন। ব'লো—জ্রেঁইইয়েঙ্ ফে।"

একটা কাগজে সে কথা কয়টা লিখিয়া চলিয়া গেল। শিলঙে প্রতি অষ্টম দিনে একটা করিয়া খুব বড় হাট বসে —তাহার নাম বড়বাজার। বড়বাজারে সমস্ত খাসিয়া পাহাড়ের লোক জমে। খাসিয়াদের সে দিন বড় উৎসবের দিন। সপ্তাহের মধ্যে সেই এক দিন তাহারা উত্তম বেশ-ভূষা করে। পূর্ব্বদিন স্নান করিয়া আপনাদিগকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে। শেল্লাকও সে দিন খুব সাজিয়াছিল—পরিষ্কার ঘাঘরা পরিয়া, যাত্রার দলের রাখাল বালকদের পীতধড়ার ধাঁজে একখানি সস্তা অথচ চটক্‌দার শাল বাঁধিয়া, একটি "কমুনা"য় (থলিতে) পান ও সুপারী লইয়া সে কাজ করিতে আসিয়াছিল। আমার বাসার সম্মুখেই বড়বাজার। সে আমার জিনিসপত্র ঝাড়িতেছিল। আমি তখনও পোষাক পরি নাই—স্নানের ফ্লানেলের ইজার পরিয়া বসিয়া ছিলাম। হঠাৎ আমার মণি-ব্যাগের কথা মনে হইল। আমি তাহাকে বলিলাম—"হামারা মণি-ব্যাগ জানতা ? মণি-ব্যাগ—টাকা যিস্‌মে রাখতা।"—বাকীটুকু ইঙ্গিতে বুঝাইলাম।

সে হাসিয়া বলিল—"এম্‌টিপ।"

আমি বলিলাম, "এমটিপ কাঁহা হায়—এম্‌টিপ্।"

সে বলিল—"এম্‌টিপ্। কিজ্‌নি।"

আমি 'কিজ্‌নি' জানিতাম। কিজ্‌নি বাঙ্গালার "কি জানির" অপভ্রংশ। এম্‌টিপ্ কিজ্‌নির খাসিয়া। বুঝিলাম, সে আমার প্রশ্নটি বুঝে নাই। তখন চম্পটির কাগজে লেখা কথাগুলা বলিলাম।—জ্রেঁ ইইয়েঙ্ ফে।

প্রথমে যুবতী একটু স্তম্ভিতের মত হইল। তাহার

পর তাহার গণ্ডদ্বয় ঘোরতর লাল বর্ণ ধারণ করিল—সে জানু পাতিয়া বসিয়া আমার হাঁটু ধরিয়া অপর হস্তে চক্ষু ঢাকিল। সেই রকম চক্ষু ঢাকিয়াছিল অশোকা। যুবতী আমার ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল; এখন তাহা বুঝিতে পারিলাম। কি সর্ব্বনাশ! কি শয়তানী! ফাঁসি যাইতে হয় যাইব,—চম্পটীকে খুন করিব! জেঁ ইইয়েং ফে,—পরে বুঝিয়াছিলাম—তাহার অর্থ "আমি তোমায় ভালবাসি।" আমি কি করিব ঠিক্ করিতে পারিলাম না। অভদ্রতা করিবারও কারণ দেখিলাম না। আমি সস্নেহে তাহার পিঠে হাত দিলাম—সহসা জানালার দিকে চাহিয়া দেখিলাম—অশোকা!

অশোকা! সর্ব্বনাশ! তাহার চক্ষের অপরূপ কটাক্ষ দেখিলাম। তাড়াতাড়ি উঠিয়া জানালার নিকট গেলাম। বাঘের ভয়ে ভীতা হইয়া কুরঙ্গিনী যেমন পলায়ন করে, অশোকা সেই রকম পলাইতেছিল—তবে একটু হাত-পা বেএক্তার, একটু মাতলামির ভাব। আমি ডাকিলাম—সে সাড়া দিল না। পোষাক পরা ছিল না—ছুটিয়া তাহার দিকে যাইতে পারিলাম না। ঘরের ভিতর চাহিয়া দেখিলাম, শেল্লাক উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে—নিনিমেষ নয়নে আমার দিকে চাহিয়া আছে। তাহারও চক্ষে অপূর্ব্ব বিস্ময়ের ভাব—বিস্ময়ের সহিত ভালবাসা মিশ্রিত। আমার অবস্থা ভীষণ! মধ্যে আমি—দুই দিকে দুই জন যুবতী;—উভয়েই আমাকে ভালবাসে—একজন দেশী,—একজন বিদেশী।

অশোকার কথা

সুখের স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। বিশপ জলপ্রপাতের ধারে তাঁহাতে-আমাতে বসিয়াছিলাম। তিনি বলিতেছিলেন—"অশোকা, যখন দুজনে নীড় বাঁধিয়া সংসার করিব, তোমার দয়ার ধারা যেন বর্ষিত হইয়া পাষাণগুলার উপর এই রকমে শান্তিদান করে। আমাদের উপার্জ্জনের অর্দ্ধেক যেন আমরা দরিদ্রসেবায় ব্যয় করিতে পারি।" তাঁহার মুখ স্বর্গীয় দীপ্তিতে উদ্ভাসিত—তিনি যেন আমার চিরদিনের সুরে-বাঁধা তারগুলায় ঝঙ্কার দিলেন।

এই সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিল একটা করুণ আর্ত্তনাদে। কাতর পক্ষীর স্বর। তাড়াতাড়ি উঠিয়া কম্বল জড়াইয়া বারান্দায় গেলাম—একটা বিড়াল একটা পাখীর ছানা ধরিয়াছিল। আমাকে দেখিয়া পলাইল, পাখীর ক্ষুদ্র প্রাণ বাহির হইয়া গেল, তাহার কাতর আর্ত্তনাদ স্তব্ধ হইল।

সেদিন বড়বাজার। বাবার সহিত বড়বাজারে গেলাম। অন্য দিন অত চক্ষের উপর পড়ে না। আজ প্রভাতের শোকের দৃশ্যে মনটা ভিজিয়াছিল। খাসিয়াগুলা বড় বড় শূকর সিদ্ধ করিয়া বিক্রয় করিতেছে,—খাঁচা ভরিয়া মোরগ আনিয়াছে, মৌচাক ভাঙ্গিয়া আনিয়াছে—বেচারা মৌমাছির কত কষ্টের মধুতে ভরা চাক। বাবা ফুলকপির দর করিতেছিলেন, আমি তাঁহার নিকট অনুমতি লইয়া তাঁহাকে ডাকিতে গেলাম—বাজারের নীচেই তাঁহার বাসা। পথে চম্পটীর সহিত দেখা হইল। সে খুব সৌজন্য দেখাইয়া জোড়পদে টুপি খুলিয়া আমাকে অভিবাদন করিল। আমি কি করি? অগত্যা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"জ্যো—মিঃ দাস কোথা?"

তিনি বলিলেন—"বাড়ীতে ভাল সঙ্গীর কাছে আছেন।"

তাঁহার চক্ষের কোণে বিষের ছুরি লুকান ছিল—সে ক্রূর, কুটিল ভাবটা আমার ভাল লাগিল না। তাড়াতাড়ি তাঁহার বাসায় গেলাম। দৃষ্টি পায়ের চেয়ে অনেক দ্রুতগতিতে তাঁহার গবাক্ষের ভিতর দিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। সর্ব্বনাশ! তাঁহার পদপ্রান্তে একটা খাসিয়া যুবতী এক হাতে জানু ধরিয়া বসিয়া আছে,—অপর হাত বক্ষে। আর যাঁহার স্নেহের স্মৃতিতে আমার সারা প্রকৃতি ধরিত্রীর অঙ্গে ত্রিদিবের শান্তি মাথাইতেছিল—তিনি—সস্নেহে সেই নির্লজ্জ পথের রমণীটার শিরে হাত দিয়া তাহাকে শান্ত করিতেছিলেন। কি মর্ম্মভেদী প্রেমের আখ্যায়িকা—কি পাশব দৃশ্য!

কি প্রকারে নিজের কক্ষে প্রবেশ করিয়াছি জানি না—কিসের জলে আমার বালিস ভিজিয়াছিল, তাহা অনুমান করিলাম মাত্র। কতক্ষণে হৃদয়ের, সারা জীবনের, সঞ্চিত আশা গলিয়া চোখের ভিতর দিয়া উপাধান সিঞ্চিত করিয়াছে, তাহার সংবাদ রাখি না। বুঝিতেছিলাম, বুকের উপরে একটা ভীষণ গুরু ভার। লাবান-শিখর সর্ব্ব অঙ্গে সূচিকার পরিচ্ছদ পরিয়া আমার বক্ষের উপর চাপিয়া বসিয়াছিল। আমার তাসের ঘর পদাঘাত করিয়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল—জ্যোতির্ম্ময়—ঘৃণ্য, নৃশংস, ভণ্ড! ওঃ! সামান্য

একটা পথের কাঁটা-ফুলের জন্য তিনি আমার এই নির্ম্মল মন্দার-ফুলের পূজার ডালিতে পদাঘাত করিলেন।

রমণী বাঁচিয়া থাকে প্রেমে, কষ্ট সহ্য করে প্রেমের দায়ে, তাহার কাণে বিশ্ব-প্রকৃতির এক সুর—প্রেমের সুর। আর আজ আমি ঘৃণিতা, উপেক্ষিতা, প্রতারিতা। এক মুহূর্ত্তে বালিকা অশোকা মরিয়াছিল—তাহার সঙ্গে তাহার যত প্রেম, যত আশা, যত নির্ম্মলতা, ওঃ! মাগো! এক মুহূর্ত্তে! হা ভগবন্!

সহসা গৃহে জননী প্রবেশ করিলেন। আমি নিদ্রার ভান করিলাম। ভান করিলাম,—জননীকে প্রতারণা করিলাম,—এই প্রথম। আমি তো আর অশোকা নহি—আমি রাক্ষসী, প্রেতিনী, ছায়া-বাজীর সুন্দরী—ভিতরে প্রাণ নাই, আত্মা নাই।

মা ডাকিলেন—"অশোকা!"

আমি চক্ষু মুছিয়া উঠিলাম। তিনি বলিলেন—"কখন এলি? অসুখ করেচে?"

আমি বলিলাম—"হ্যাঁ, মাথা ধরেছে।"

মাতা বিস্মিতা হইলেন। আমি ছায়াবাজীর ভূত—আত্মাহীন দেহ। আমার আবার সত্য-মিথ্যা? মাতা কার্য্যান্তরে গেলেন। আমি অনেক সমালোচনা করিয়া একটা সঙ্কল্প করিলাম—চম্পটীকেই বিবাহ করিব।

বাঃ! বাঃ! ভারি সাধু সঙ্কল্প, বড় সমীচীন! যে মন্দির হইতে দেবতা পলাইয়াছেন—সে মন্দিরের আবার পবিত্রতা কি? যে দেহ হইতে আত্মা পলাইয়াছে—সে দেহের দাবী তো শৃগাল, কুকুর, গৃধ্রের। আমার দেহটা চম্পটীর হাতে ফেলিয়া দিব—ইহাতে আবার ভাবিবার কি আছে? আর হৃদয়ের খুব নীচে একটু ঈর্ষ্যার অগ্নি,—একটা নরকের শিখা, লকলকে জিহ্বায় আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিতেছিল। প্রতিহিংসা! ছিঃ! ছিঃ! না। কেন না?—আমার কেমন রত্নাগার হরণ করিয়াছে, আমার কি অমল পবিত্র কুসুমরাজি পদদলিত করিয়াছে, আমার কত সাধের গড়া, কত সুখস্বপ্নে রচিত সুখ-সৌধে—ওঃ! ভগবন্! কেন এ শাস্তি দিলে—কেন আমার কুসুমে-গড়া প্রাণটাকে পাষাণে পরিণত করিলে?

জ্যোতির্ম্ময়ের কথা।

প্রাণের মধ্যে লক্ষ কথা গুমরিতেছিল; কিন্তু সেগুলা ভীষণ পীড়ার কারণ হইয়া উঠিয়াছিল, মনের মধ্যে কারারুদ্ধ হইয়া রুদ্ধ বাক্যের যাতনা বিষম, বিশেষতঃ যদি বাক্য-গুলাকে থাক্ দিয়া সারি দিয়া মনের মধ্যে সাজাইয়া-গুছাইয়া রাখা হয়। যাহার নিকট বুঝাইবার জন্য এত মানসিক উত্তেজনা, এত অবসরের অনুসন্ধান, সে যদি শুনিতে না চায়, অবসর দিতে একান্ত পরাঙ্মুখ হয়, তখন সংগ্রামটা কত অধিক হয়, তাহা বুঝিবার অধিকার আছে শুধু ভুক্তভোগীর। অনেক অবসর খুঁজিলাম, অনেক সাধ্য-সাধনা করিলাম, অশোকা কোনপ্রকারে মাতার কাছ-ছাড়া হইল না। তাহার মনে কি ছিল জানি না। সে সাক্ষাতে কাহাকেও জানিতে দিল না—আমার সম্বন্ধে তাহার কি ধারণা জন্মিয়াছে। কিন্তু তাহার চক্ষের কাতরতা দেখিয়া তাহার কথাবার্ত্তার দৃঢ়তা দেখিয়া—অশোকার আসল মনোভাব আমি বুঝিয়াছিলাম। নরঘাতকও বিচারালয়ে আপনার কথা বলিতে পারে। কিন্তু হা অদৃষ্ট! অশোকা আমার সাফাই শুনিল না, এ বড় বিড়ম্বনা।

এই রকমে সাত দিন কাটিল। বাড়ী ফিরিতে পারি না—একটা জবাব না দিয়া; চৈতন্য বাবুকে বিবাহের কথা বলিতে পারি না—কারণ, জানি না, এখন অশোকা আমাকে গ্রহণ করিবে কি না! অশোকা গ্রহণ করিবে কি না? ওঃ! চিন্তাটার ভিতর সহস্র গোখুরা সাপের বিষ লুক্কায়িত ছিল।

অষ্টম দিনে চৈতন্যবাবুর সহিত লাবানের ময়দানে সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার মুখ চিন্তাভারক্লিষ্ট। আমি তাঁহাকে অভিবাদন করিলাম। তিনি বলিলেন—"তুমি চম্পটীর বিষয় কিছু জান?"

আমি বলিলাম—"কেন?"

"একটা বড় বিপদে পড়েছি। কেমন ক'রে কি হ'ল জানি না।"

আমার হৃদয় স্পন্দিত হইতেছিল। এমন কি অমঙ্গল হইতে পারে? আমি বলিলাম—"কি বিপদ?"

তিনি বলিলেন—"জান, সে একবার অশোকাকে বিবাহ করবার প্রস্তাব করেছিল? আজ আমায় বললে, অশোকার কাছে সে প্রস্তাব করেছিল—অশোকা সম্মত হ'য়েছে। অজ্ঞাতকুলশীল—"

আমি আর শুনিতে পাইলাম না। একটা দেবদারু

বৃক্ষের স্কন্ধ ধারণ করিয়া আপনাকে স্থির করিলাম। মুখের ভাব কি রকম হইয়াছিল জানি না। চৈতন্যবাবু আমার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—"জ্যোতি, আমি তোমাকে পুত্রের মত স্নেহ করি। আমি আমার অবস্থা জানি—আমি দরিদ্র কেরাণী মাত্র। তোমার পিতা ধনে মানে আমার চেয়ে বড়। আমার স্ত্রী লোভ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি কোনও দিন ভাবি নাই--"

আমি একটু সামলাইয়া লইলাম। সভ্যতা! ভদ্রতা! বলিলাম—"কি ?"

তিনি বলিলেন—"আমি সত্যের অনুরাগী। আমি কোনও দিন ভাবি নাই যে, তুমি আমাদের--ওর নাম কি ?—"

আমি বলিলাম—"জামাই হ'তে পারব ? আমি সেই জন্যই এখানে আসিয়াছিলাম। কিন্তু—"

তিনি বিস্মিত হইলেন। বলিলেন—"তবে এতদিন বলনি কেন ?"

মুহূর্ত্তের জন্য সংগ্রাম হইল—আত্মাভিমান এবং নিজের সুখ—তিনি সত্যনিষ্ঠ ব্রাহ্ম, তাঁহাকে কি শেল্লাকের গল্প বলিয়া—না—না—আমি দৃঢ়স্বরে বলিলাম--"অশোকা আমাকে গ্রহণ করবে না বলে।"

তিনি বলিলেন—"অশোকা তোমায় গ্রহণ করবে না ?"

আমি বলিলাম—"আমি তার মনোভাব জানি। আপনার পায়ে পড়ি, তাহাকে অনুরোধ করবেন না।"

তিনি বলিলেন—"না—অনুরোধ ক'র্‌ব না। আমি স্বাধীন বিবাহের পক্ষপাতী। তবে চম্পটী—"

আমি ক্ষিপ্তের মত তাঁহার হাত ধরিলাম। বোধ হয়, আমার হাত সেই শীতপ্রধান শিলঙ পাহাড়েও জ্বলিতেছিল। তিনি যেন একটু শিহরিয়া উঠিলেন। আমি বলিলাম—"না—দোহাই আপনার। এমন নিষ্ঠুর কাজ ক'রবেন না। তার সঙ্গে আপনার কন্যার—"

তিনি বলিলেন—"কি জান, বল ত।"

আবার ভদ্রতা ও সভ্যতা আসিল। পরের চরিত্রের কথা বলিতে সমাজ নিষেধ করে। তবে বন্ধুর হিতের জন্য—না কাজ নাই। অন্যরূপে কার্য্য হাসিল করিব।

আমি বলিলাম,—"তা' ব'লব না। কিন্তু কোনও মতে না,—আপনার পায়ে ধরছি, খুড়িমার পায়ে ধ'রে আসব—কোনও মতে না।"

তিনি বলিলেন—"বুঝি না, কে কোথায় একটু সত্য গোপন করছে, তাই এত হাঙ্গামা হ'চ্চে। চল তোমার খুড়িমার কাছে।"

যেমন রোগ তার তেমনি ঔষধ। অশোকা জোর করে,—চম্পটীকে হত্যা করিব। তাহা হইলে তো' তাহার হস্ত হইতে অশোকা রক্ষা পাইবে। আমার ফাঁসির পরও কি সে বুঝিবে না যে, আমার হৃদয়ে একাধিক দেবীর আসন নাই ?

অশোকার কথা।

হাঃ! হাঃ! হাঃ! বাঙ্গালা দেশে তো আপামর সাধারণের আগে হয় বিবাহ—তাহার পর প্রেম। কয়টা খ্রীষ্টান আর ব্রাহ্ম-ঘরে মাত্র পরিণয়ে স্বাধীনতা আছে। আমার ঠাকুরমার কি হইয়াছিল ? কেন হ'বে না। বিবাহ তো হউক, পরে দেখিব। প্রেম হইবে কোথা ? মাথা নাই তার মাথা ব্যথা! প্রেম তো আত্মায় গজায়, হৃদয়ে গজায়। আত্মারাম তো খাঁচাছাড়া হইয়াছেন—হৃদয় তো জমাট বাঁধিয়া পাথর হইয়া গিয়াছেন। আচ্ছা, তবু তো বিবাহ হ'ক। আর কি কষ্ট হবে ? ওগো! আর যে সহিতে পারি না। দণ্ডে-দণ্ডে যে যম-দণ্ড ভোগ করিতেছি। কেন এত উপেক্ষা করিলে—কেন এত প্রতারণা! মাতাও বুঝাইলেন, পিতাও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইলেন—আমার সংকল্প অচল, অটল। আর তো বালিকা নই—এখন প্রৌঢ়া—হয় ত বিধবা! না,—না,—পরিত্যক্তা! বাঁচিয়া থাকুক—জ্বলুক, জ্বলুক—এমনি জ্বলুক!

হাঃ হাঃ! আবার একদিন কৈফিয়ত দিবার চেষ্টা করিল। এক মিনিটের জন্য মা উঠিয়া গিয়াছিলেন—দ্বার রোধিয়া দাঁড়াইল। নিশ্চয় কলিকাতায় থিয়েটার দেখে! কেমন হাতযোড় করিয়া বলিল—"অশোকা, একবার শুন্‌বে না ?"

আমিও কম মেয়ে নই। আমিও বলিলাম—"শুন্‌ব কেন,—দেখেছি। শোনার চেয়ে দেখা শক্ত প্রমাণ।"

কেমন উত্তর! বলিল—"অশোকা, আমাকে বর্জ্জন কর,

ক্ষতি নাই। নিজের চিতা সাজাইও না। চম্পটী মাতাল, কু-চরিত্র—"

আমি বলিলাম—"তিনি আমার স্বামী হ'বেন। তাঁর নিন্দা, বোধ হয়, আমার কাছে নীতি-বিরুদ্ধ। চিতার কথা জানি না। তবে আর দশ দিন বাদে ফুলশয্যা হবে।"

তিনি চলিয়া গেলেন। আহা! একবার শুনিলে হইত। না, না। ঠিক হইয়াছে। মুখের মত জবাব দিয়াছি। ওঃ! ভগবান্, বুকের এ ব্যথাটা কি?

সকলকে সম্মত হইতে হইল। ঠিক দশ দিন পরে বিবাহ। কেহ জানিবে না—কেবল মা, বাবা, আর আমরা, —আর অবশ্য আচার্য্য—রেজিষ্টার। বিবাহের পরদিনই রওনা হইব। একেবারে ভিন্ন দেশে। হাঁা গা! আর কি শিলঙে থাকা যায়? যেখানে এত জ্বালা! এত কষ্ট! এত কঠোরতা!

জ্যোতির্ম্ময়ের কথা

আহা! সোণার কমল পাগলের মত নাচিতেছিল। পিতা-মাতাও অন্ধ! আমি তো নিজের কথা ভাবিতেছি না! সাগর-পারে পলাইব—না—না, জীবনের পর-পারে—ফাঁসি যাব। কিন্তু মারিব। হঠাৎ চম্পটীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তাহাকে ধরিলাম, ক্ষিপ্তের মত ধরিলাম, বলিলাম "চম্পটী, তুমি কি, আমি জানি।"

সে বলিল—"আমাদের পরস্পরের জ্ঞান উভয়তঃ সমান।"

আমি বলিলাম—"মাতাল, লম্পট, এত স্পর্দ্ধা রাখ! জান, কিছুতে না পারি—তোমায় খুন করিয়া এ বিবাহ বন্ধ রাখিব।"

চম্পটী হাসিয়া বলিল—"যদি তেমন মনের ভাব, তো তোমাকে তার পূর্ব্বে পুলিসের হাতে—"

আমি খুব জোরে তাহার মুখ লক্ষ্য করিয়া ঘুসি মারিলাম। সে অনায়াসে আমার হাত ধরিয়া ফেলিল। কে অগ্রে জানিত লোকটা এত বলবান! বড় লজ্জিত হইলাম। ছি! ছি! শেষে একটা কেলেঙ্কারি করিব? যখন মারিব, তখন একেবারে মারিব।

সে হাসিয়া আমায় নমস্কার করিল; বলিল—"পাগলামি করো না। বাড়ী যাও। আর দেখো, বিবাহের পর আমরা ব্যাঙ্গালোর যাব—একবার এসো।"

ক্রোধে ও ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেলাম।

অশোকার কথা

কাল বিবাহ! হাঁা সত্য বিবাহ! ভগবন্, এ কি করিলে! এ কি আগুনে ভস্ম করিলে! ওমা! কি হবে? না—না, মন স্থির হও। "নাইতে খেতে" অনেক জিনিস সারে। ছিঃ ছিঃ! দুর্ব্বলতা! কাল্ বিবাহ। বেশ্ কথা! কাহার বিবাহ? অশোকার? অশোকা ত মরিয়াছে। ছায়ামূর্ত্তির বিবাহ। পাষাণের বিবাহ! হাঃ হাঃ! বড় মজা!

জ্যোতির্ম্ময়ের কথা

তাও কি কখন হয় যে ঈশ্বরের রাজত্বে ন্যায়বিচার নাই! কয়দিন এত ছুটাছুটির কি ফল ফলিবে না? কিন্তু আর এক দিনের বিলম্ব হইলে?—সর্ব্বনাশ! ভাবিতেও শোণিত-প্রবাহ স্তব্ধ হইয়া যায়।

মোটর আফিসে গেলাম গাড়ী রিজার্ভ করিতে। রাত্রে বিবাহ;—যদি তাহাকে মারি, আমার পাপটা আবিষ্কার হইবার পূর্ব্বেই ভোরে পলাইতে পারিব। যখন মোটর-অফিসে, তখন বেলা প্রায় একটা। একখানা গাড়ী আসিল, তাহার একজন আরোহী আমার কলেজের সতীর্থ মন্মথ বরাট। মন্মথ গুপ্ত-পুলিসের ইন্‌সপেক্টর,—একবার প্রাণটা চমকাইয়া উঠিল। তাহাকে বলিলাম, "কি হে, তুমি!"

সে বলিল, "হাঁা ভাই, আমাদের চলাফেরা তো সর্ব্বত্রই। একটা জালের আসামী ধর্‌তে এসেছি।"

আমি তো পাগল,—হাস্যাস্পদ হইবার ভয় রাখি না,—মনে করিলাম, দেখি না। বলিলাম, "জাপান-ফেরত, গোঁফ-দাড়ী নাই—"

সে বলিল, "হাঁা, দোহারা, ইংরাজি কয়, মাঝে-মাঝে কাঁধ-তোলে।"

আমি বলিলাম, "নাম চম্পটী!"

সে বলিল, "না, চম্পটী নয় মিত্তির—সাক্ষীগোপাল মিত্তির!"

আশা কখনই পরিত্যাজ্য নয়। আমি বলিলাম, "হাঁা সে-ই! তুমি চিন্‌তে পার্‌বে? বল না?"

সে বলিল, "চিন্‌তে খুব পারব। আর একবার ধাওয়া

করেছিলাম,—দাগাবাজীর মামলায়,—একটু প্রমাণ অভাবে বেঁচে গেছে। এবারে একেবারে পাকা প্রমাণ।"

আমি বলিলাম, "কি করেছে?"

"হুণ্ডী জাল করে পাঁচ হাজার টাকা হস্তগত করেছে।"

তাহাকে আর্ল সেনিটেরিয়মে লইয়া চলিলাম। সে ইতিমধ্যে একখানা চাক্‌তি দেখাইয়া থানা হইতে চারিজন গুর্‌খা পুলিস লইল। বলিল, "লোকটা ভারি ষণ্ডা।"

আমি বলিলাম, "তবে সে-ই ঠিক্,—বল্‌তে ভুলে গিয়েছিলাম,—বাঁ নাকে একটা বড় তিল আছে।"

সে আনন্দে লাফাইয়া উঠিল। বলিল, "তবে দেখ্‌বে?"

পকেট হইতে একখানা ছবি বাহির করিয়া সে আমার সম্মুখে ধরিল—মিঃ চম্পটী!

অশোকার কথা

এ বিবাহ কি দিনের আলোয় হইতে পারে? কে বলিতে পারে—পাষাণ ফাটিয়াও তো সময়ে-সময়ে জল বাহির হয়। বিবাহের সময় হইয়াছিল রাত্রি দশটায়। আমার মুখের ভাব দেখিয়া পিতামাতা কোনও সন্দেহ করেন নাই। তাঁহারা কেবল আমার সুখের জন্য সমস্ত দিন উপাসনা করিয়াছিলেন। আহা! কি অন্ধ স্নেহ!

তখন বেলা পাঁচটা। জনক-জননীকে ভুলাইবার জন্য অনেক গোলাপ ফুল তুলিয়াছিলাম। প্রত্যেক ফুলদানে নূতন চন্দ্রমল্লিকা দিয়াছিলাম। জননী বেশ পরিবর্ত্তন করিবার জন্য নিজের গৃহে বদ্ধ ছিলেন—ঠিক সেই অবসরে জ্যোতির্ম্ময় দাস আসিয়া আমার গৃহে প্রবেশ করিল। পোষাক পরিচ্ছদ ম্লান, কেশ রুক্ষ; কিন্তু মুখের ভাব আনন্দের। ছুটিয়া আমার ঘরে ঢুকিল, আমার পায়ের কাছে জানু পাতিয়া বসিল। আমি বলিলাম, "কি ও?"

সে বলিল, "অশোকা, কাল ভোরে চলে যাব। জীবনে হয় ত আর দেখা হ'বে না। একটা কথা শুন অশোকা,—এক মিনিট।"

আমি ব্যস্ত করিয়া বলিলাম, "আর তো আশা নেই, সব ঠিক্‌-ঠাক্।"

সে বলিল, "তোমাকে পাবার আশা রাখি না। কিন্তু নিজের একটা জবাব দিয়ে যাই। অশোকা, ঈশ্বর সাক্ষী ক'রে বল্‌ছি, আমার মৃতা জননীকে—"

সে বালকের মত রোদন করিল; বলিল, "তাঁর পবিত্র নাম নিয়ে বল্‌ছি, আমি নির্দ্দোষ। চম্পটী আমাকে একটা খাসিয়া বুলি শিখিয়েছিল,—বলেছিল, এর মানে আমার ব্যাগ কোথা। কিন্তু তার আসল মানে,—'তোমায় ভালবাসি।' আমি সেই কথাটা বলেছিলাম,—যুবতী ভুল করে আমার—"

আমি ভাবছিলাম চম্পটীর শয়তানি,—সে-ই আমাকে আবার সে দৃশ্য দেখাইয়াছিল। কথাটা বিশ্বাস হইল; কিন্তু আর তো আশা ছিল না—

সে বলিল, "বল, আমায় ক্ষমা করিলে?"

আমি নিজের ভাবে নিস্তব্ধ রহিলাম। সে উঠিল; বলিল, "কিন্তু তোমাকে চম্পটী শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করেছি। সে পুলিসের হাতে।"

মাথা ঘুরিতেছিল। সে উঠিল; বলিল, "অশোকা! বোন আমার! দেবী আমার! এই শেষ দেখা, ক্ষমা কর ভাই। ভগবান্ তোমার—"

আর বলিতে পারিল না। আবার কাঁদিল, মাতালের মত টলিতে-টলিতে বাহিরে গেল।

হাঃ পোড়া কপাল! আবার আশা! হৃদয় তবে পাষাণ হয় নাই—অগ্নি নিভে নাই, ছাই-চাপা ছিল। ছিঃ ছিঃ! ভালবাসিয়া বিনিময় চাহিয়াছিলাম, ললনা আমি—সীতা, সাবিত্রীর দেশে জন্মিয়া, সেবা না করিয়া, সেবা চাহিয়াছিলাম। সময় আছে,—নিশ্চয় আছে! ঐ তো যাইতেছে—মাতালের মত, পাগলের মত, কর্ণধারহীন তরণীর মত। ঐ তো ফটকের পার্শ্বে। ছুটিয়া গিয়া ধরিলাম—"জ্যোতি! জ্যোতি! জ্যোতির্ম্ময়, ক্ষমা কি—।"

হোঃ হোঃ হাসির শব্দ পাইলাম। সেই খাসিয়া যুবতীটা—শেল্লাক একটা খাসিয়া যুবকের সঙ্গে রহস্যালাপ করিতে করিতে যাইতেছে।

জ্যোতির্ম্ময় দেখিল। সে স্বপ্নোত্থিতের মত বলিল, "কোন দোষে দোষী নই অশোকা, ঐ দেখ বিদেশিনী। ক্ষমা কর অ—"

ও মা! এ কি হল! তিনি ভূমিতে লুটাইয়া পড়িলেন কেন? দয়াময়! বিশ্বপিতা! মা! মা!

তিনি শুইয়া পড়িলেন। আমিই তাঁহার এ দশা করিলাম!
"মা! মা!"

ছুটিয়া মা আসিলেন।

অশোকা ও জ্যোতির্ম্ময়ের কথা

আজ আবার আমরা সেই হ্রদের ধারে। কি রম্য স্থান! কি পবিত্র তীর্থ! মোগল বাদশাহের কথা এই স্থান সম্বন্ধে প্রযুজ্য—

"আগর্ ফারদৌশ বা রুঁয়ে জমিনস্ত।
হামিনোস্ত! হামিনোস্ত! হামিনোস্ত!॥"

যদি পৃথিবীতে স্বর্গ থাকে তাহা এই স্থানে, এই স্থানে, এই স্থানে!

বিবিধ প্রসঙ্গ

মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের পরিচয় (১)

[অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম-এ]

মুকুন্দরামের পুরা নাম মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী; অন্যতর উপাধি—মিশ্র। "কবিকঙ্কণ" রাজপ্রদত্ত সম্মানসূচক পদবীমাত্র। তাঁহার পিতামহের নাম জগন্নাথ মিশ্র ও পিতার নাম হৃদয় মিশ্র। পুত্রের নাম ছিল শিবরাম ও কন্যার নাম যশোদা। পুত্রবধূ ও জামাতার নামও ভণিতায় পাওয়া যায়— চিত্রলেখা ও মহেশ।

১। মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন (২)।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

২। উরিয়া কবির কামে, কৃপা কর শিবরামে,
চিত্রলেখা যশোদা মহেশে।

প্রথমোক্ত ভণিতায় দেখা যায় যে, কবির অগ্রজের নাম কবিচন্দ্র। সম্ভবতঃ এই কবিচন্দ্র আসল নাম নহে, উপাধিমাত্র। এই কবিচন্দ্র ভণিতাযুক্ত দুইটী কবিতা পাওয়া যায়। বটতলার ছাপা সর্ব্বজন-বিদিত "শিশুবোধকে" আবাল বৃদ্ধ-বণিতার প্রিয় "দাতাকর্ণ" ও "কলঙ্ক ভঞ্জন" নামক দুই কবিতা দেখা যায়,—উহা কবিচন্দ্রের ভণিতা-যুক্ত। ঐ শিশুবোধকে কবিকঙ্কণ ভণিতাযুক্ত যে "গঙ্গার-বন্দনা" আছে, তাহা সম্ভবতঃ মুকুন্দরাম-রচিত। কবিচন্দ্রের আর কোন লেখার খোঁজ পাওয়া যায় নাই।

মুকুন্দরামের বংশাবলী নিম্নে প্রদর্শিত হইল -

দামুন্যা গ্রামে রক্ষিত "চণ্ডীমঙ্গলের" পুঁথিতে যে বংশ-পরিচয় আছে, তাহা হইতেই এই বংশ-তালিকা সঙ্কলিত হইয়াছে। এই

তপন ওঝা (কয়ড়ি গাঁই)
|
উমাপতি
|
মাধব
|
উদ্ধরণ | পুরন্দর | নিত্যানন্দ | সুরেশ্বর | বাসুদেব | মহেশ | সাগর | জগন্নাথ মিশ্র

জগন্নাথ মিশ্র
|
হৃদয় মিশ্র = দেবকী
|
কবিচন্দ্র | মুকুন্দরাম | রামানন্দ

রামানন্দ
|
(রমানাথ)

শিবরাম = চিত্রলেখা | পঞ্চানন | যশোদা = মহেশ

শিবরাম = চিত্রলেখা
|
অভিরাম

(১) গৌহাটী শাখা পরিষদের দশমবর্ষের চতুর্থ অধিবেশনে পঠিত।

(২) হৃদয়নন্দন—হৃদয়মিশ্রের নন্দন।

বংশ-পরিচয় দামুন্যার পুঁথি ছাড়া অন্য কোন পুঁথিতে না থাকিলেও, ইহা কবিকঙ্কণের উত্তরবংশীয়দিগের নিকট পাওয়া যাওয়াতে, তাহা প্রামাণিক বলিয়াই ধরিতে হইবে। এই বংশ-পরিচয় অংশ সবিস্তারে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

কুলে শীলে নিরবদ্য ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য,
দামুন্যায় সজ্জনের স্থান।
অতিশয় গুণ বাড়া, সুধন্য দক্ষিণপাড়া, (৩)
সুপণ্ডিত সুকবি সমান॥
ধন্য ধন্য কলিকালে, রত্নানু নদের (৪) কূলে,
অবতার করিলা শঙ্করে।
ধরি চক্রাদিত্য নাম, দামুন্যা করিলা ধাম,
তীর্থ কৈলা সেই সে নগর॥
বুঝিয়া তোমার তত্ত্ব, দেউল দিল ধূসদত্ত,
কথো কাল তথায় বিহার।
কে বুঝে তোমার মায়া, সুরকুল তেয়াগিয়া,
বরদান করিলা সঞ্চার॥
গঙ্গাসম সুনির্ম্মল, তোমার চরণ জল (৫)
পান কৈনু শিশুকাল হৈতে।
সেই তো পুণ্যের ফলে, কবি হই শিশুকালে,
রচিলাম তোমার সঙ্গীতে॥
হরি নন্দী ভাগ্যবান্, শিবে দিল ভূমি দান,
মাধব ওঝা ধনাদি কারণ। (৬)
দামুন্যার লোক যত, শিবের চরণে রত,
সেই পুরী হরের ধরণী॥
কয়ড়িকুলের অরি যশোমন্ত অধিকারী,
কল্পতরু নাগ উমাপতি।
অশেষ পুণ্যের কন্দ, নাগঋষি, সর্ব্বানন্দ
সেই পুরী সজ্জন বসতি॥
কাঁটা দিয়া বন্দ্যঘাটী, বেদান্ত নিগম পাঠী,
ঈশান পণ্ডিত মহাশয়।
ধন্য ধন্য পুরবাসী, বন্দ্য সে বাঙ্গাল পাশী,
লোকনাথ মিশ্র ধনঞ্জয়॥

(৩) দক্ষিণপাড়া—দামুন্যার দক্ষিণপাড়া।

(৪) রত্নানু—কুন্তনদ। এখন প্রায় ভরাট হইয়া গিয়াছে।

(৫) তোমার চরণ জল—কবির বিশ্বাস, শিবপূজার ফলে তিনি কবিত্বশক্তি লাভ করিয়াছিলেন। "শিব-সংকীর্ত্তন" নামে কবি এক-খানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন, তাহা এখন আর পাওয়া যায় না।

(৬) ধনাদি কারণ—পাঠের কিছু গোলমাল আছে—"ধরণী"র সহিত মিল কৈ?

কাঙ্গাড়ী (৭) কুলের আর, মহামিশ্র অলঙ্কার,
শব্দ বোধ কাব্যের নিদান।
কয়ড়িকুলের রাজা, *সুকৃতি তপন ওঝা,
তস্য সুত উমাপতি নাম॥
তনয় মাধব শর্ম্মা, সুকৃতি সুকৃতবর্ম্মা,
তার নয় তনয় সোদর।
উদ্ধরণ, পুরন্দর, নিত্যানন্দ, সুরেশ্বর,
বাসুদেব, মহেশ, সাগর॥
সর্ব্বেশ্বর অনুজাত, মহামিশ্র জগন্নাথ,
একভাবে সেবিল শঙ্কর।
বিশেষ পুণ্যের ধাম সুধন্য হৃদয় নাম,
কবিচন্দ্র তার বংশধর॥
অনুজ মুকুন্দ শর্ম্মা, সুকবি সুকৃতশর্ম্মা,
নানা শাস্ত্রে নিশ্চয় বিদ্বান্।
শিবরাম বংশধর, কৃপা কর মহেশ্বর,
রক্ষ পুত্রে পৌত্রে ত্রিনয়ন॥

শেষ দুই পংক্তি পড়িয়া মনে হয়, "বংশধর" শিবরাম ভিন্ন কবির আর এক পুত্র ছিল। ইহারই নাম পঞ্চানন ছিল, বিদ্যানিধি মহাশয় এইরূপ অনুমান করেন।

এইস্থানে কবির দ্বিতীয় ভ্রাতা রমানাথ বা রামানন্দের উল্লেখ নাই; "গ্রন্থোৎপত্তি বিবরণে" আছে, তাহা পরে উদ্ধৃত হইবে।

মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন, কবির মাতার নাম ছিল দেবকী। লিখিত ভণিতা উদ্ধৃত করিয়া তিনি এই বাক্য সমর্থন করিতে চাহেন—

চণ্ডীর চরিত, রচিয়া সঙ্গীত,
দেবকী নন্দন ভণে। (চণ্ডীবন্দনার ভণিতা)

কিন্তু বঙ্গবাসী সংস্করণ বা ইণ্ডিয়ান প্রেস সংস্করণে এই ভণিতার আকৃতি এইরূপ—

চণ্ডীর চরিত মধুর সঙ্গীত
শ্রীকবিকঙ্কণ ভণে।

সুতরাং কবির মাতার নামের মীমাংসা করিতে পারিতেছি না।

মুকুন্দরামের স্ত্রীর নাম পাওয়া যায় নাই। এক রসিক সমালোচক বলিতে চাহেন যে চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের দুই স্ত্রী ছিল। প্রমাণ—ভগবতী ঘরে আসিলে পর ফুল্লরার সতীন-আশঙ্কা ও ধনপতির দুই স্ত্রীর কোন্দল বর্ণনা। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এই সপত্নী-ব্যাপার প্রত্যক্ষ না থাকিলে, কবি এত সুনিপুণ বর্ণনা করিলেন কি করিয়া? অধিকন্তু, এই রসিক সমালোচক মহাশয় কবির স্বীকারোক্তি পর্য্যন্ত হাজির করিতেছেন—

(৭) কাঙ্গাড়ী—কয়াড়ি বা কয়ড়ী।

ঘুচিল কোন্দল দোঁহে করিল ভোজন ॥
একজন সহিলে কোন্দল হয় দূর।
বিশেষ জানেন চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ॥
(বঙ্গবাসী সং পৃঃ ১৫৯)

ইহার বিচার পাঠক করিবেন।

বর্দ্ধমান জেলায় সেলিমাবাদ থানার অন্তর্গত দামুন্তা গ্রাম কবিবরের পৈত্রিক বাসভূমি ছিল ;—এই স্থানে মুকুন্দরামের ছয়-সাত পুরুষ বাস করিয়াছিলেন। ঐ গ্রামের ডিহিদার মামুদ সরিফের অত্যাচারে তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ঐ গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র আশ্রয় খুঁজিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অতঃপর সদারাগত্য তিনি মেদিনীপুরের অন্তর্গত ব্রাহ্মণভূমি পরগণার আড়রা গ্রামে গিয়া তত্রত্য রাজা বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয় লাভ করেন। এই মহাত্মা তাঁহাকে নিজ পুত্রদিগের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করেন ও কবির পরিবার পোষণের যথোপযুক্ত বন্দোবস্ত করিয়া দেন।(৮)

এই আড়রা গ্রামে থাকিয়াই মুকুন্দরাম চণ্ডীকাব্য প্রণয়ন করেন। যে সময়ে তিনি দামুন্তা পরিত্যাগ করিয়া আশ্রয়ান্বেষণে বহির্গত হইয়াছিলেন, তৎসময়ে পথিমধ্যে চণ্ডীদেবী তাঁহাকে স্বপ্নাদেশ করেন। আড়রা গ্রামে অবস্থিত হইলে পর, রাজা এই স্বপ্নের বিবরণ অবগত হইয়া, তাঁহাকে কাব্য-রচনায় উৎসাহিত করেন। এই নরপুঙ্গব বাঙ্গালী জাতির ধন্যবাদার্হ—তাঁহার উত্তেজনা ব্যতীত বঙ্গভাষায় এই অতুলনীয় কাব্যের সৃষ্টি হইতে পারিত না।

উপরিলিখিত কবির জীবনী তাঁহার কাব্যের সূচনাভাগ প্রদত্ত "গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ" হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে—ইহা ছাড়া কবির জীবনের আর কোন ঘটনা এখন পর্য্যন্ত উদ্ঘাটিত হয় নাই। এই "বিবরণ" উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

শুন ভাই সভাজন, কবিত্বের বিবরণ,
এই গীত হৈল যেন মতে।
উরিয়া মায়ের বেশে, কবির শিয়র দেশে,
চণ্ডিকা বসিলা আচম্বিতে ॥
সহর সিলিমাবাজ, তাহাতে সজ্জন রাজ,
নিবসে নিয়োগী গোপীনাথ।
তাঁহার তালুকে বসি, দামিন্তায় চাষ চষি,
নিবাস পুরুষ ছয় সাত ॥
ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণু পদাম্বুজ ভৃঙ্গ,
গৌরবঙ্গ উৎকল-অধিপ।
সে মানসিংহের কালে, প্রজার পাপের ফলে,
ডিহিদার মামুদ সরিফ ॥ (৯)
উজির হলো রায়জাদা (১০) বেপারিরে দেয় খেদা,
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হল্য অরি।
মাপে কোণে দিয়া দড়া, পনর কাঠায় কুড়া, (১১)
নাহি শুনে প্রজার গোহারি ॥ (১২)
সরকার হইলা কাল, খিল ভূমি (১৩) লেখে লাল (১৪)
বিনা উপকারে খায় ধুতি। (১৫)
পোদ্দার হইল যম, টাকা আড়াই আনা কম,
পাই লভ্য লয় (১৬) দিন প্রতি ॥
ডিহিদার অবোধ খোজ(১৭), কড়ি দিলে নাহি রোজ(১৮)
ধান্য গোরু কেহ নাহি কেনে।
প্রভু গোপীনাথ নন্দী, বিপাকে হইলা বন্দী,
হেতু কিছু নাহি পরিত্রাণ ॥
পেয়াদা সবার কাছে, প্রজারা পালায় পাছে,
দুয়ার চাপিয়া দেয় থানা। (১৯)
প্রজা হইল ব্যাকুলি, বেচে ঘরের কুড়ালি,
টাকার দ্রব্য বেচে দশ আনা ॥
সহায় শ্রীমন্ত খাঁ, চণ্ডীবাটী যার গাঁ,
যুক্তি কৈলা মুনিবখাঁ'র সনে।
দামুন্তা ছাড়িয়া যাই, সঙ্গে রমানাথ (২০) ভাই,
পথে চণ্ডী দিলা দরশনে ॥

---

(৮) "কবিকঙ্কণের বংশধরগণ একণে বর্দ্ধমান জেলার ছোট বৈঙ্গান নগরে বাস করিতেছেন। বাঁকুড়া রায়ের বংশীয়দিগের বর্ত্তমান বাস সেনাপতি গ্রামে। এই গ্রামে ইঁহাদের বাটীতে মুকুন্দরামের স্বহস্ত-লিখিত একখানি চণ্ডী পুঁথি এখনও প্রত্যহ ফুল-চন্দনে পূজিত হইয়া থাকে।" ("বঙ্গভাষার লেখক")

(৯) মামুদ সরিফ—হুগলী আরামবাগ থানার মায়াপুর গ্রামে এই ডিহিদার সরিফের বংশীয়েরা এখনও বাস করিতেছে।

(১০) রায়জাদা—ব্যক্তি বিশেষের নাম।

(১১) কুড়া—বিঘা।

(১২) গোহারি—কাতরোক্তি।

(১৩) খিল ভূমি—অনুর্ব্বর ভূমি।

(১৪) লাল—উর্ব্বর।

(১৫) ধুতি—উৎকোচ। "ধুতি খেয়ে ছেড়ে দিল মালিনী পলায়" ভারত। কো।

(১৬) লভ্য—সুদ। দিন প্রতি এক পয়সা সুদ লয়।

(১৭) অবোধ খোজ—পাঠান্তর যথা আরোজ খোজ—সৈনিক-কর্ম্মচারীর উপাধি বিশেষ।

(১৮) রোজ—দৈনিক খাস্ত।

(১৯) থানা—পাহারা।

(২০) রমানাথ—পাঠান্তরে—রামানন্দ।

ভেঠনায় (২১) উপনীত,　　রূপরায় (২২, নিল বিত্ত,
যদুকুণ্ডু তিলি কৈল রক্ষা।
দিয়া আপনার ঘর,　　নিবারণ কৈল ডর,
দিবস তিনের দিল ভিক্ষা ॥
বাহিয়া গোড়াই (২৩) নদী,　　সদাই স্মরিয়ে বিধি,
তেউট্যায় (২৪) হইলু উপনীত।
দারুকেশ্বর তরি,　　পাইল পতন গিরি, (২৫)
গঙ্গাদাস (২৬) বড় কৈলা হিত ॥
নারায়ণ পরাশর, (২৭)　　এড়াইল দামোদর, (২৮)
উপনীত কুচট্যা (২৯) নগরে।
তৈল বিনা কৈলু স্নান,　　করিলু উদক পান,
শিশু (৩০) কাঁদে ওদনের তরে ॥
আশ্রম পুখুরি আড়া, (৩১)　　নৈবেদ্য শালুক (৩২) পোড়া,
পূজা কৈনু কুমুদ প্রসূনে।
ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমে,　　নিদ্রা যাই সেই ধামে,
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে ॥
হাতে লইয়া পত্র মসী,　　আপনি কলমে বসি,
নানা ছন্দে লিখেন কবিত্ব।
যেই মন্ত্র দিল দীক্ষা,　　সেই মন্ত্র করি শিক্ষা,
মহামন্ত্র জপি নিত্য নিত্য ॥

দেবী চণ্ডী মহামায়া,　　দিলেন চরণ-ছায়া,
আজ্ঞা দিলেন রচিতে সঙ্গীত।
চণ্ডীর আদেশ পাই,　　শিলাই (৩৩) বাহিয়া যাই,
আড়রায় হইনু উপনীত ॥
আড়রা ব্রাহ্মণভূমি,　　ব্রাহ্মণ যাহার স্বামী
নরপতি ব্যাসের সমান।
পড়িয়া কবিত্ব বাণী,　　সম্ভাষিণু নৃপমণি,
পাঁচ আড়া (৩৪) মাপি দিলা ধান ॥
সুধন্য বাঁকুড়া রায়,　　ভাঙ্গিল সকল দায়,
শিশু পাছ কৈল নিয়োজিত।
তার সুত রঘুনাথ,　　রাজগুণে অবদাত,
গুরু করি করিল পূজিত ॥
সঙ্গে দামোদর (৩৫) নন্দী,　　যে জানে স্বপন সন্ধি,
অনুদিন করিত যতন।
নিত্য দেন অনুমতি,　　রঘুনাথ নরপতি,
গায়নেরে দিলেন ভূষণ ॥ (৩৬)
বীর মাধবের সুত,　　রূপে গুণে অদভুত
বীর বাঁকুড়া ভাগ্যবান্।
তার সুত রঘুনাথ,　　রাজগুণে অবদাত,
শ্রীকবিকঙ্কণে রস গান ॥

এখন মুকুন্দরামের আবির্ভাব কাল নিরূপণ করা যাউক (৩৭) ১৮২০ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত বটতলার মুদ্রিত চণ্ডীমঙ্গলের শেষে সময় নিরূপণ সূচক একটা শ্লোক দেখা যায়। পরবর্ত্তী বটতলার সংস্করণগুলিতেও এই শ্লোক যথাযথ উদ্ধৃত হইয়াছে। এই শ্লোকটী যথা—

শকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা ॥

শাস্ত্রীয় প্রথামত অঙ্কস্য বামা গতি ধরিয়া ইহা হইতে পাওয়া যায় ১৪৬৬ শকাব্দা রস=৬, বেদ=৪, শশাঙ্ক=১) অথবা ১৫৪৪ খৃষ্টাব্দ। কিন্তু উপরি উদ্ধৃত "গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণে" রাজা মানসিংহের উল্লেখ আছে যে তিনি তৎকালে বঙ্গ, বিহার ও উৎকলের অধিপতি ছিলেন। রাজা মানসিংহ ১৫৮৯ খ্রীঃ হইতে ১৬০০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত বাঙ্গলার সুবাদার

(২১) ভেঠনায়—পাঠান্তর তেলিয়া গাঁয়ে। এই গ্রাম দামুন্যার এক ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে।

(২২) রূপরায়—জনৈক রাজপুত দস্যু। পাঠান্তর যথা—রূপরায় কৈল হিত।

(২৩) গোড়াই—মুড়াই বা মুণ্ডেশ্বরী নামে এক নদী আছে, তাহাই বোধ হয়।

(২৪) তেউট্যায়—পাঠান্তর—কেঁউটায়। এই গ্রাম বর্দ্ধমান থানার অন্তর্গত।

(২৫) পতন গিরি—পাঠান্তর—মাতুলসুরী (হুগলী জেলার এক খানি গ্রাম।)

(২৬) গঙ্গাদাস—কবির মাতুল-পুত্র।

(২৭) নারায়ণ পরাশর—দুইটী ক্ষুদ্র নদী অধুনা বিলুপ্ত।

(২৮) দামোদর—পাঠান্তর -আমোদর। "দুর্গেশনন্দিনী"তে এই আমোদরের উল্লেখ আছে। এই নদীর পাড়েই গড়মান্দারণ অবস্থিত।

(২৯) কুচট্যা—পাঠান্তর—তেউট্যা আধুনিক নাম তেউড়ী।

(৩০) শিশু—পুত্র শিবরাম (বিদ্যানিধি); পৌত্র অভিরাম (গুপ্ত)

(৩১) আড়া—পাড় (পুকুরের)

(৩২) শালুক কুমুদের ডাঁটা। কুমুদ ফুলে পূজা হয় না। কিন্তু কবিকে বাধ্য হইয়া তাহা দিয়াই পূজা করিতে হইয়াছিল।

(৩৩) শিলাই—মেদিনীপুর জেলায়।

(৩৪) পাঁচআড়া—১০ মণ।

(৩৫) দামোদর—পাঠান্তর—দামাল। এই ব্যক্তি কবির জনৈক শিষ্য ছিল। অপর পাঠ—সঙ্গে ভাই রামানন্দী। ইহা যুক্তিযুক্ত। পূর্ব্বে এই ভাইয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে—"সঙ্গে রমানাথ (রামানন্দ) ভাই।"

(৩৬) ভূষণ—"কবিকঙ্কণ" এই উপাধি।

(৩৭) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩শ ভাগে অম্বিকাচরণ গুপ্ত মহাশয় লিখিত কবি-কঙ্কণ প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত।

ছিলেন। অতএব এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় যে ১৪৬৬ শকে পাওয়া যাইতেছে, তাহা অসঙ্গত হয়। সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য রস শব্দে ৬ না বুঝিয়া যদি ৯ বুঝা যায়, তবে শ্লোক নির্দ্দিষ্ট কাল ১৪৯৯ শকাব্দা বা ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দ হইয়া পড়ে। ইহাও মানসিংহের সুবাদারী প্রাপ্তির পূর্ব্বে হইয়া পড়ে। এই অসামঞ্জস্য অপনোদন করিবার জন্য অনেকে বলেন যে, আধুনিক গ্রন্থকারবর্গ সেরূপ গ্রন্থ লেখা শেষ করিয়া পরে পুস্তকের বিজ্ঞাপন বা সূচনা লেখেন, কবিকঙ্কণও সেই প্রকার গ্রন্থ সমাপ্তি করিয়া গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ লিখিয়া থাকিবেন। এই ব্যাখ্যা সমীচীন নহে। কারণ আধুনিক গ্রন্থকারদিগের রীতি অনুসারে পুরাতন গ্রন্থকারদিগকে বাঁধিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

তার পর এই শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া কবির কাল-নিরূপণ করিবার আর এক প্রধান অন্তরায় আছে। কোন মুদ্রিত সংস্করণে এই শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায় নাই। কোন হস্ত-লিখিত পুঁথিতেও এই শ্লোক এ পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় নাই। কবির বংশধরদিগের নিকট রক্ষিত পুঁথিতেও এই শ্লোক নাই। রঘুনাথ রায়ের বংশধরদিগের নিকটে যে পুঁথি আছে, তাহাতেও এই শ্লোক পাওয়া যায় না শেষোক্ত প্রামাণিক পুঁথিদ্বয়ের শেষাংশ না থাকাতে জোর করিয়া বলা যায় না যে, উহাতে এই শ্লোক ছিল না। যাহা হউক, দেখা যাইতেছে যে, বটতলার পুস্তক ছাড়া অন্য কোন পুঁথি বা মুদ্রিত পুস্তকে যখন এই শ্লোক পাওয়া যায় না, তখন ঐ শ্লোক অত প্রামাণিক বলিয়া না ধরাই ভাল। অতএব কবির কাল-নিরূপণ করিবার উপাদান মাত্র দুইটী—মানসিংহের উল্লেখ ও বাকুড়া রায়ের উল্লেখ। ইহা মুদ্রিত-অমুদ্রিত সকল পুঁথিতেই প্রায় অবিভিন্ন আকৃতিতে পাওয়া যায়। মানসিংহ ১৫৮৯ খৃঃ বাঙ্গালায় আসেন। তাঁহারই শাসন সময়ে কবিবর ডিহিদারের অত্যাচারে জন্মস্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; সুতরাং মানসিংহের শাসন আরম্ভ হইবার কয়েক বৎসর পরেই কবি এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। মানসিংহের মত নামজাদা শাসকের সময়েও প্রজাপীড়ন হইতে পারে, কবি এইরূপ ক্ষোভ করিয়া লেখাতে মনে হয়, লোকের এই অত্যাচার স্মরণ থাকিতে থাকিতেই তিনি এই বিষয়ের উল্লেখ করিতেছেন - নতুবা উল্লেখ করিবার কোন তাৎপর্য্য দেখা যায় না। অতএব মানসিংহের আগমনের অল্প কয়েক বৎসর মধ্যেই এই কাব্য রচিত হইয়াছিল। আন্দাজ ১৫৯৫ খৃঃ এই কাব্যের রচনা-কাল ধরিলে বোধ হয় বড় ভুল হইবে না।

বাঁকুড়া রায় ও রঘুনাথ রায়ের সময় নিরূপণ করিতে পারিলে কবিকঙ্কণের উপরিধৃত কাল সঠিক কি না তাহা জানা যাইতে পারে। সৌভাগ্য ক্রমে এই ব্যাপার সহজ হইয়াছে। আড়ার ব্রাহ্মণভূমির রাজবংশ-তালিকায় দেখা যায় যে, কবিকঙ্কণের প্রতিপালক রাজা রঘুনাথ দেব রায় ১৪৯৫ শক (১৫৭৩ খৃঃ) হইতে ১৫২৫ শক (১৬০৩ খৃঃ) পর্য্যন্ত ৩০ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। আর রাজা রঘুনাথ রায়েরই উৎসাহে যে কবি এই চণ্ডীকাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহার প্রভূত প্রমাণ এই কাব্যের প্রায় প্রত্যেক ভণিতাতেই আছে। অতএব আমরা ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দকে যে এই কাব্য-রচনার কাল ধরিয়াছি, তাহা এই প্রমাণ দ্বারাও সমর্থিত হইতেছে।

"বংশ পরিচয়" পত্রে আছে—

শিবরাম বংশধর, কৃপা কর মহেশ্বর,
রক্ষ পুত্রে পৌত্রে ত্রিনয়ন।

অতএব এই গ্রন্থ লিখিবার সময় কবির পৌত্র জন্মিয়াছিল। "গ্রন্থোৎপত্তি বিবরণে"ও বোধ হয় এই পৌত্রেরই উল্লেখ করিয়া কবি লিখিয়াছিলেন,

কাঁদে শিশু ওদনের তরে।

গ্রন্থ লিখিবার সময় কবির বয়স আন্দাজ ৪৫ বর্ষ ধরিলে পৌত্র-সম্ভাবনা হয়। এই হিসাবে ১৫৫০ খৃঃ আন্দাজ কবির জন্ম হইয়াছিল ধরিতে হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে, এই বাঙ্গালী কবি সেক্‌স্‌পিয়রের সমসাময়িক ছিলেন।

কবি কতদিন জীবিত ছিলেন, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার কোন উপায় আপাততঃ বর্ত্তমান নাই।

কবিকঙ্কণ কতদূর লেখাপড়া জানিতেন, তাহা জানিতে আমাদের স্বতঃই ঔৎসুক্য জন্মিবার কথা। যোড়শ শতাব্দীতে বাঙ্গালা দেশে লেখাপড়ার অর্থ সংস্কৃত বিদ্যা। এই সংস্কৃত বিদ্যা তাঁহার কতদূর ছিল, এই কাব্য হইতে তাহা বড় বেশী জানা যায় না। ভারতচন্দ্রের মত তিনি নিজ বিদ্যা জাহির করিবার চেষ্টাও কোথাও করেন নাই। তবে তিনি যে সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীমন্তের বিদ্যা-শিক্ষার বর্ণনাস্থলে তিনি সংস্কৃতে অধ্যেতব্য গ্রন্থের একটা লম্বা ফর্দ্দ দিয়াছেন। তিনি এই সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন করুন আর না করুন, কতকগুলি অন্ততঃ পড়িয়াছিলেন বোধ হয়। একস্থানে বর্ণিত বর-কন্যা দেখিবার জন্য রমণীদিগের ত্রস্ততা কবি নিশ্চয়ই কালিদাসের প্রসিদ্ধ বর্ণনা হইতে লইয়াছেন। কমলে-কামিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি কালিদাসের অকাল বসন্তোদয় বর্ণনা হইতে কিছু ধার করিয়াছেন দেখা যায়। এই সব দেখিয়া মনে হয় কবি সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন। অধিকন্তু আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি যে, এই কবিবর বিশেষভাবে সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন না হইলে, রাজা বাঁকুড়া রায় রাজপুত্রদিগের শিক্ষকতা কার্য্যে তাঁহাকে নিযুক্ত করিতেন না। তিনি যে রাজপুত্রদিগের গুরু-মহাশয় ছিলেন, তাহার প্রমাণ কবির আপন স্বীকারোক্তি; যথা,

সুধন্য বাঁকুড়া রায়, ভাঙ্গিল সকল দায়,
শিশু পাছে কৈল নিয়োজিত।
তারসুত রঘুনাথ, রাজগুণে অবদাত,
গুরু করে করিল পূজিত॥

এই প্রসঙ্গে প্রবাদ বাক্যেরও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। "প্রবাদ এইরূপ যে কবি বাল্যকালে পাঠশালায় পাঠ সমাপন করিয়া দামুন্যার দেড় ক্রোশ দূরবর্ত্তী ভাঙ্গামোড়া গ্রামে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার ও স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তৎকালে ভাঙ্গামোড়া

সংস্কৃত চর্চার জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে এখানে ৩০।৩৫টী চতুষ্পাঠী ছিল। অনেকে আদর করিয়া ইহাকে ছোট নদে বলিত।" (সাঃ পঃ পঃ ১৩শ ভাগ পৃঃ ১২৬)

কবিকঙ্কণ চণ্ডীর উপাখ্যান-ভাগ দুইটী। প্রথম ভাগে কালকেতুর উপাখ্যান, দ্বিতীয় ভাগে ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান। দুইটী উপাখ্যানই মনোহর; তন্মধ্যে শ্রীমন্তের কাহিনী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকল বাঙ্গালীই জানে অথবা জানিত। এরূপ করুণরসপূর্ণ কাহিনীর যিনি প্রথম সৃষ্টি করিয়াছিলেন, বঙ্গ-নরনারী তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ দিবে সন্দেহ নাই। কবিকঙ্কণ এই উপাখ্যান-ভাগ কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার সঠিক সংবাদ পাওয়া যায় নাই। তবে এই উপাখ্যান পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত ছিল, কবি তাহাই পুনরায় সাজাইয়া নূতন করিয়া আমাদিগের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। চণ্ডীর গান পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত ছিল; কবিরা তাহাই উপজীব্য বিষয় করিয়া নূতন বাক্যে রচনা করিতেন। এইরূপেই বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই যে "ধর্ম্মমঙ্গল" "বিদ্যাসুন্দর" ও "মনসার ভাসান" বহু কবির হাত দিয়া আসিয়াছে। প্রথমে কোন্ ব্যক্তি এই সকলের সৃষ্টি করেন, তাহা নির্ণয় করা বড়ই সুকঠিন। দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন, "মুকুন্দরামের পূর্ব্বে কতজন কবি এই উপাখ্যান লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন, ঠিক বলা যায় না।" বলরাম কবিকঙ্কণের চণ্ডী মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। মাধবাচার্য্যের চণ্ডী ১৫৭৯ খৃঃ প্রণীত হয়। এই চিত্রগুলি সংশোধন করিয়া মুকুন্দরাম নূতন কাব্য প্রণয়ন করেন। মুকুন্দরাম তাঁহার হস্তলিখিত পুঁথির দীর্ঘ বন্দনাপত্রে লিখিয়াছেন,

গীতের গুরু বন্দিলাম শ্রীকবিকঙ্কণ।

ইহা দ্বারা অনুমান হয়, বলরাম কবিকঙ্কণের চণ্ডী অবলম্বন করিয়া তিনি স্বীয় কাব্য রচনা করেন। মেদিনীপুরের লোকদিগের সংস্কার, এই বলরাম কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের শিক্ষাগুরু। (৩৮)

সে যাহা হউক, গল্পটী মৌলিক নহে বলিয়া মুকুন্দরামের কাব্যের অপ্রশংসা করিবার কিছু নাই। তিনি কেমন সাজাইয়াছেন, তাহাই দেখিতে হইবে। ইংরাজ কবি সেক্সপীয়র যে সকল নাটক লিখিয়া এত যশস্বী হইয়াছেন, তাহার প্রায় প্রত্যেক উপাখ্যানই তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব লেখকদিগের নিকট হইতে ধার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার মৌলিকতার হানি নাই। তিনি যে প্রকার সাজাইয়াছেন, তাহাতে অভিনবত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। কি রচনা-ভঙ্গীতে, কি নায়কনায়িকা পাত্রপাত্রীর চিত্রাঙ্কনে কবিকঙ্কণ যে শিল্প-চাতুর্য্য দেখাইয়াছেন, তাহা অতীব প্রশংসার্হ,—গল্প মৌলিক না হইলেও ক্ষতি নাই।

কবিকঙ্কণের ভাষা অতি সরল। তাঁহার রচনাতে ছত্রে-ছত্রে প্রসাদগুণ পরিস্ফুট। পরবর্ত্তী গ্রন্থকার রায়-গুণাকর ভারতচন্দ্রের ভাষার পারিপাট্য তাঁহার নাই;—এই ভাষার পারিপাট্য নাই বলিয়াই আমার মনে হয়, তাঁহার কবিত্ব এত সুন্দর ফুটিয়াছে। ভারতচন্দ্র কৃত্রিম কবি—ভাষার জাঁকজমকে আসল কবিত্ব হারাইয়াছেন। যেন মনে হয়, ভারতচন্দ্র রাজারাজড়াকে চমকাইবার জন্যই তাঁহার সমস্ত ভাষা-সম্পদ ও শিল্পচাতুর্য্য প্রয়োগ করিয়াছেন। বর্ণনার মূল বিষয় তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদিগের নিকট হইতে বেমালুম গ্রহণ করিয়া ভাষার ছটায় নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন। ভারতচন্দ্র যে অকবি, তাহা বলিতেছি না; তবে স্বভাব-কবি যাহাকে বলে, তিনি তাহা ছিলেন না, এই গৌরব কবিকঙ্কণেরই।

মুকুন্দরাম স্বভাব-কবি বলিয়াই প্রাণের সুখ-দুঃখের কথা এত সোজা ভাষায় অথচ এমন মর্ম্মস্পর্শী কথায় ব্যক্ত করিতে পারিয়াছেন। কবি দরিদ্র ছিলেন; দরিদ্রের কাহিনী বলিতে তিনি যেরূপ পারিয়াছেন, এরূপ বোধ হয় অল্প কবিই পারেন। কালকেতুর উপাখ্যান অন্য বিষয়ে নিকৃষ্ট হইলেও এই জন্যই এত হৃদয়গ্রাহী। বস্তুতঃ কবি নিজে যাহা ভুগিয়াছেন, তাহাই যেন অকপটে বলিয়া আমাদিগের প্রাণ স্পর্শ করিয়াছেন। গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণে তিনি যে নিজের করুণ কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা পড়িয়া পাষণ্ডেরও চক্ষু অশ্রু বর্ষণ করিতে বাধ্য হয়।

ভারতচন্দ্র কোন কোন স্থানে এইরূপে পাঠকের প্রাণ স্পর্শ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। তিনি ভাষা ও বর্ণনার ছটাতে আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়া ফেলেন; কিন্তু সে মোহ অপনীত হইলে আমরা দেখি আমাদের হৃদয়ে কোন দাগ বসে নাই। কি ভাষার লালিত্যে, কি ছন্দের মাধুর্য্যে, অন্য কোন বাঙ্গালী কবি ভারতচন্দ্রের সমকক্ষ নহেন। কিন্তু প্রকৃত কবিত্বে তিনি কতই হীন! প্রাণস্পর্শী কবিতা তিনি কত কমই লিখিয়াছেন।

কবিকঙ্কণের কবিত্বের আর এক বিশেষত্ব এই যে, তিনি তৎকালের সমাজের এক নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। লোকে তখন কিরূপ জীবন যাপন করিত, কি খাইত পরিত, কি ভাবিত, চিন্তা করিত, এ সকলের পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র তাঁহার কাব্যে পাওয়া যায়। এ সকল বিষয়ে কবির অতিরঞ্জনের একটুকুও প্রয়াস নাই, বরং খুঁটিনাটি লইয়াই তিনি এই সকল চিত্র আঁকিয়াছেন। কেহ-কেহ মনে করেন যে, মানুষে কি খায় পরে, কি প্রকার থাকে, বেড়ায়, ইত্যাদি সামান্য কথার বর্ণনায় আর কবিত্ব কি? কিন্তু লোক-চরিত্রের প্রকৃত ছবি দিতে গেলে, এই সকলের আবশ্যকতা আছে,—নতুবা কাব্যে প্রকৃত লোক-চরিত্র বুঝান অসম্ভব। এই সকল খুঁটিনাটির মূল্য আছে বলিয়াই দুর্ব্বলা দাসীর নিখুঁত চরিত্রটী এত স্পষ্ট। দুর্ব্বলা ধনপতির শয্যা রচনা করিয়া যে ক্ষুদ্র কাণ্ডটা করিল, তাহা যদি কবি না বলিতেন, তবে দুর্ব্বলা-চরিত্র বুঝিতাম কি প্রকারে?

শয্যা বিছায়্যা দাসী, ধরিতে না পারে হাসি,
বার চারি গড়াগড়ি যায়।

পুনশ্চ, দুর্ব্বলার বেসাতি করার খুঁটিনাটি বর্ণনা না দিলে কি তাহার

(৩৮) মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ও এই প্রবাদ উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ইহা সত্য নহে। তিনি বলিতে চাহেন যে, বরং মুকুন্দরামই বলরামের গুরু। এই বিশ্বাসের কোন প্রমাণ উদ্ধৃত হয় নাই।

প্রকৃত চরিত্র হৃদয়ঙ্গম হইত? এই প্রকারে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ধনপতির ন্যায় বিষয়ী, লহনা ও খুল্লনার ন্যায় সপত্নী, ভাঁড়ুদত্তের ন্যায় প্রবঞ্চক (কালকেতু উপাখ্যান), দুর্ব্বলার ন্যায় দাসী সংসারের নিখুঁত চিত্র; এবং নিপুণ কবি খুঁটিনাটি দিয়াই এই সকলের বর্ণনা আমাদিগের নিকট উজ্জ্বল করিয়া ধরিয়াছেন।

নিখুঁত চিত্র আঁকিতে কবিকঙ্কণ ভারতচন্দ্রের অনেক উপরে আসন পাইতে পারেন। এই সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অতীব সত্য কথা। তিনি বলেন, "সংসার দেখিয়া মুকুন্দরাম নায়ক-নায়িকা চিত্রিত করিয়াছেন। ভারতচন্দ্র অসাধারণ পণ্ডিত, অসাধারণ চতুর, বাক্যবিন্যাসে অসাধারণ ক্ষমতাশালী, কিন্তু তাঁহার নায়ক-নায়িকাগুলি কি সংসারের নরনারী? হীরার ন্যায় চতুরা মালিনী, সুন্দরের ন্যায় বিলাসপরায়ণ নায়ক, বিদ্যার ন্যায় বিলাসিনী নায়িকা সংসারের সচরাচর নরনারী নহে। মুকুন্দরাম সংসারের কথা বর্ণনা করিয়াছেন, ভারতচন্দ্র কুৎসিৎ সমাজ-বিশেষের কুৎসিৎ রসিকতা বর্ণনা করিয়াছেন।"

উপসংহারে এই মাত্র বক্তব্য যে, মুকুন্দরাম বাঙ্গালী মহাকবিদিগের মধ্যে একজন প্রধান। কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাসের পরেই তাঁহার আসন।

তন্ত্র-নাম কতদিন হইয়াছে?

[শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কাব্যপুরাণতীর্থ]

তন্ত্রশাস্ত্রের তন্ত্র নাম কত দিন হইতে হইয়াছে, ইহা বলা সুদুষ্কর। তবে এ কথা ঠিক যে, প্রাচীনকালে তন্ত্রশাস্ত্র তন্ত্র নামে কেবল পরিচিত ছিল না। সংস্কৃত কোষাদিতে সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ তন্ত্র নামে পুনঃ-পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। মেদিনী-কোষে তন্ত্র পর্য্যায়ে লিখিত হইয়াছে,—

"তন্ত্রং কুটুম্বকৃত্যে স্যাৎসিদ্ধান্তে চৌষধোত্তমে।
প্রধানে তন্তুবায়ে চ শাস্ত্রভেদে পরিচ্ছেদে॥"

তন্ত্রশব্দ,—কুটুম্বকৃত্য, সিদ্ধান্ত, উত্তম, ঔষধ, প্রধান, তন্তুবায়, শাস্ত্রভেদ ও পরিচ্ছেদ অর্থে ব্যবহৃত হয়। শাস্ত্রভেদ অর্থে যে প্রসিদ্ধ তন্ত্র-শাস্ত্রের বোধক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রাচীন কোষকার অমর-সিংহ স্বরচিত অমরকোষ নামক কোষ-গ্রন্থে তন্ত্র পর্য্যায়ে লিখিয়াছেন, "তন্ত্রং প্রধানে সিদ্ধান্তে সূত্ররূপে, পরিচ্ছেদে।" প্রধান, সিদ্ধান্ত, সূত্ররূপ ও পরিচ্ছেদ অর্থে তন্ত্র শব্দ ব্যবহৃত হয়। বিষ্ণুশর্ম্ম-প্রণীত পঞ্চতন্ত্র তন্ত্রশাস্ত্রের সংস্রবশূন্য হইয়াছে ও পঞ্চতন্ত্র নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। প্রসিদ্ধ বৈদ্যক চরক গ্রন্থ,—তন্ত্রশাস্ত্রের সীমা-বহির্ভূত হইয়াও তন্ত্রনামে সভ্য সমাজে পরিচিত রহিয়াছে। চরকে তন্ত্র নাম বহু পরিমাণে পরিদৃষ্ট হয়। যথা,—

"বিস্তারয়তি লেশোক্তং সংক্ষিপত্যতি বিস্তরং।
সংস্কর্ত্তা কুরুতে তন্ত্রং পুরাণঞ্চ নবং নবং॥
অতস্তন্ত্রোত্তমমিদং চরকেণাতি বুদ্ধিনা।
কৃত্বা বহুভ্যস্তন্ত্রেভ্যঃ * *
তন্ত্রস্য কর্ত্তা প্রথমং * * ইত্যাদি।

মেদিনী ও অমরসিংহ তন্ত্র অর্থে যে সকল পর্য্যায় উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই সকল স্থলে উপরি-উক্ত তন্ত্র শব্দের অর্থ প্রায়শঃ সিদ্ধান্ত বা প্রধানার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং তন্ত্র শব্দের প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হইলেই যে তাহা কেবল তন্ত্রশাস্ত্রকে বুঝাইবে তাহা নহে। মেদিনীকোষে তন্ত্রার্থে বেদভেদের উল্লেখ করিয়া প্রচলিত তন্ত্রশাস্ত্রের নামোল্লেখ যদিও করা হইয়াছে, তথাপি, অমরসিংহের কোষ-গ্রন্থের তন্ত্র পর্য্যায়ে তাহার উল্লেখ না থাকায়, আপত্তিকারিগণের উক্তি সমীচীন বলিয়াই মনে হইতেছে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে তন্ত্রশাস্ত্র বলিতে আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি, প্রাচীন কালে তাহা বুঝাইত না। উদ্ধৃত প্রমাণই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তন্ত্রোক্ত বচন-পরম্পরাও উক্ত বাক্যের সমর্থন করিতেছে। তন্ত্রশাস্ত্রে তন্ত্রলক্ষণ প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে,—

"সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ তন্ত্র নির্ণয় এবচ।
* * *
ইত্যাদি লক্ষণৈর্যুক্তং তন্ত্রমিত্যভিধীয়তে॥"

তন্ত্রনির্ণয় পদদ্বারা তন্ত্রশব্দ যে তন্ত্রেতর পদার্থকেও বুঝাইতেছে, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যদি তন্ত্রশব্দ তন্ত্রশাস্ত্রের বোধক না হয়, বা প্রাচীন কালে তন্ত্রশাস্ত্র যদি তন্ত্র ও তন্ত্রেতর নামে পরিচিত না থাকে, তাহা হইলে তন্ত্রশাস্ত্র যে নিতান্ত আধুনিক তাহাতে সন্দেহ নাই। বাস্তবিক, প্রাচীন কালে তন্ত্রশাস্ত্র বর্ত্তমান কালের ন্যায় কেবল তন্ত্র নামে পরিচিত ছিল না; উহা তৎকালে আগম, নিগম, ও মন্ত্র নামেও সুবিদিত ছিল। তন্ত্রশাস্ত্র পর্য্যায়ের সিদ্ধান্ত ও প্রধান অর্থ লইয়া সার্ব্বভৌম মন্ত্রশাস্ত্র যে তন্ত্র নামে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহকার মাধবাচার্য্য পাতঞ্জলোক্ত মন্ত্রের দশ সংস্কারের বর্ণনা সময়ে বলিয়াছেন,—

"তদনং অকাণ্ডতাণ্ডব কল্পেন মন্ত্রশাস্ত্র রহস্যোদ্‌ ঘোষণেন।"

এস্থলে মন্ত্রশাস্ত্র তন্ত্রশাস্ত্রেতর নহে। মন্ত্রের দশ সংস্কার কেবল মাত্র তন্ত্রশাস্ত্রে নিবদ্ধ। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রধান কবি বাণভট্ট মহোদয় কাদম্বরী গ্রন্থে তন্ত্র স্থানে মন্ত্রশব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, যথা—

"সুরাজেব নিগূঢ় মন্ত্র সাধনক্ষয়িত বিগ্রহঃ (হারিত বর্ণনা)

জ্যোতিষ-শাস্ত্রেও তন্ত্র স্থানে মন্ত্র শব্দ পরিদৃষ্ট হয়; যথা,—

"জ্যোতিষ মন্ত্রবাদে চ বৈদ্যকে দেব কর্ম্মাণি।
অর্থ মাত্রন্ত গৃহ্নীয়াৎ নাপশব্দং বিচারয়েৎ॥"

এখানে মন্ত্রবাদ অর্থে যে তন্ত্রবাদ অভিপ্রেত, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিতে হইবে না।

জৈমিনি-প্রণীত প্রাচীনতম জ্যোতিষ-সূত্রেও তন্ত্রের মন্ত্র নাম উদাহৃত হইয়াছে; যথা,—

"ত্রিকোণে পাপদ্বয়ে মান্ত্রিকং।"

ইহার ব্যাখ্যা স্বরূপ পরাশর-সংহিতায় পরাশর বলিয়াছেন,—

"কারকাংশে ত্রিকোণস্থে খেটে চ তান্ত্রিকো ভবেৎ।
পাপেন ক্ষুদ্রদেবস্তু শুভেন শুভসেবকং॥"

ইত্যাদি প্রমাণ দৃষ্টে অনুমিত হয়, প্রাচীন কালে বিদ্বৎ-সমাজে তন্ত্র-শাস্ত্র মন্ত্র প্রভৃতি নামেও পরিচিত ছিল। অমরসিংহও এতদনুমানের সার্থকতা বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন; যথা,—

"বেদভেদে গুপ্তিবাদে মন্ত্রঃ।"

"আগমঃ পঞ্চমো বেদঃ" আগম অর্থাৎ তন্ত্র পঞ্চম বেদ বলিয়া সভ্য-সমাজে সুপরিচিত। অমরসিংহও বেদভেদ অর্থ উদ্ধৃত করিয়া তাহার সমর্থন করিতেছেন। নব্য অভিধান মেদিনীকোষে তন্ত্রশাস্ত্রের নাম দেখিয়া, ও অমরকোষে তাহার উল্লেখ না পাইয়া যাঁহারা উভয়ের মধ্যবর্ত্তী সময়ে তন্ত্রশাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া মনে করেন, অমরসিংহের কোষ হইতে তাঁহাদিগকে পরে দেখাইব যে, সে সময়েও তন্ত্রশাস্ত্র প্রচলিত ছিল। এতাবৎ প্রমাণ দ্বারা প্রদর্শিত হইল, তন্ত্রশাস্ত্র প্রাচীন কালে কেবল তন্ত্র নামে পরিচিত ছিল না। বর্ত্তমান স্বাধীন নেপাল রাজ্যে তন্ত্রশাস্ত্র মন্ত্রশাস্ত্র নামে সর্ব্বত্র সমাদৃত রহিয়াছে।

ভারতবর্ষে তন্ত্রশাস্ত্রের উপর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। বরং তন্ত্রশাস্ত্রকে প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ শাস্ত্র জানিয়া ভারতীয় প্রাচীন পণ্ডিত-সমাজ তাহার আসন সকল শাস্ত্রের উপর স্থাপন করিয়াছেন, যথা—

"অন্যান্য শাস্ত্রেষু বিবাদ মাত্রং
ন তেষু কিঞ্চিদ্ ভুবি সত্যমস্তি।
চিকিৎসিত জ্যোতিষ তন্ত্রবাদাঃ।
পদে পদে বিশ্বাস মাবহন্তি॥"

স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রসমূহ পরস্পর কেবল তর্কবিতর্কাদি বিবাদ মাত্রে রত রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে সংসারে সত্য কিছু নাই। চিকিৎসা, জ্যোতিষ ও তন্ত্রশাস্ত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা বিশ্বাস উৎপন্ন করে।

প্রকাশে সিদ্ধিহানি হইবে, এবং ফলপ্রদ হইবে না বলিয়া তন্ত্রশাস্ত্র ভূয়োভূয়ঃ তন্ত্রোক্তি গোপন করিবার আদেশ করিয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্রের উপর ভক্তিসম্পন্ন প্রাচীন ঋষিগণ ও পণ্ডিতসমাজ তাহা অক্ষরে-অক্ষরে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন, সেজন্য কোন গ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরে তন্ত্রোক্ত ব্যাপারের উল্লেখ নাই। বহির্দৃষ্টি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সেজন্য তন্ত্র-শাস্ত্রকে আধুনিক বলিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তন্ত্রশাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে।

"শ্রুতি স্মৃতি পুরাণানি সামান্যগণিকা ইব।
ইয়ন্তু শাম্ভবী বিদ্যা গুপ্তা কুলবধূরিব॥"

শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রসমূহ সাধারণ গণিকার মত সাধারণের সেব্য; শিব-কথিত তন্ত্রশাস্ত্র কুলবধূর ন্যায় সকলের নিকট গোপনীয়।

তন্ত্রশাস্ত্র কুলবধূর ন্যায় গুপ্ত, সত্য, তথাপি প্রাচীন গ্রন্থে তন্ত্র-শাস্ত্রের যে নামোল্লেখ আছে, ক্রমে ক্রমে তাহা দেখাইবার চেষ্টা করা যাইতেছে।

পুরাণে তন্ত্রশাস্ত্রের উল্লেখ আছে কি না?

১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপ-শারদ-গগনে অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র চৈতন্যচন্দ্র সমুদিত হইয়া নির্ম্মল ভক্তিচন্দ্রিকাস্রোতে প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকাল অমান্ধপূর্ণ বঙ্গভূমি প্লাবিত করেন। তৎপূর্ব্বে তান্ত্রিক সম্প্রদায় বঙ্গ-প্রদেশে ধর্ম্মরাজ্যে প্রায় একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। রাজ-চক্রবর্ত্তীর উত্তুঙ্গ সিংহাসন হইতে অকিঞ্চনের পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত সে সময়ে তন্ত্রশাস্ত্রের নামে নতশির হইত। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট অবগত হওয়া যায়, সে সময়ে তন্ত্রোক্ত পঞ্চমকার-স্রোত প্রতি গৃহ-প্রাঙ্গণ প্লাবিত করিয়া দিগ্‌দিগন্তরে প্রধাবিত হইয়াছিল। জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি তান্ত্রিক সমাজের পৈশাচিক বিচিত্র বর্ণে নানা সাজে সজ্জিত হইয়া বিবিধ বীভৎস ভাবের অবতারণা করিয়াছিল। চৈতন্যচন্দ্রের শুভোদয়ে তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের পৈশাচিক তামসীলীলা প্রায় সমূলে উৎসাদিত হইয়া নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। বঙ্গীয় ধর্ম্ম-সমাজে অভিনব কৃষ্ণোপাসনার বীজ নিহিত করিয়া অপূর্ব্ব চন্দ্র ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে অস্তমিত হন। তন্ত্রাচারকে নিরস্ত করিবার জন্য তাঁহার অভিনব আবির্ভাব হইয়াছিল, এ কথা আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় ধ্রুব বিশ্বাস করেন ও এতদ্বার্ত্তা উচ্চকণ্ঠে সর্ব্ব সমক্ষে প্রকাশিত করেন। তাহা হইলে বর্ত্তমান সময় হইতে আরম্ভ করিয়া খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রায় ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে যে, তন্ত্রশাস্ত্রের বর্ত্তমানতা ও বহুল প্রচার ছিল, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে প্রমাণিত হইতেছে। পূজ্যপাদ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, রঘুনাথ শিরোমণি ও রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহোদয়গণ মহাপ্রভুর সমসাময়িক, এমন কি অনেকে তাঁহার সহাধ্যায়ীও বলিয়া থাকেন। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ মহোদয়, চৈতন্য-চন্দ্রের হরিভক্তি প্রচারের সময়ে "তন্ত্রসার" নামক সুপ্রসিদ্ধ তন্ত্র-সংগ্রহ-গ্রন্থ সঙ্কলিত করেন। মহাত্মা রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই সময়ে স্বকৃত স্মৃতি-নিবন্ধে ঋষিবাক্যের বিরোধভঞ্জনে ও দেবদেবীর পূজার ব্যবস্থা সংকলনে নানা তন্ত্রমত উদ্ধৃত করিয়া, মনীষা-বিচার-পদ্ধতি ও ঋষিবাক্যের তাৎপর্য্য বিচিত্র কৌশলে বিজ্ঞাপিত করেন। বর্ত্তমান বৈষ্ণব-সমাজের সংস্থাপয়িতা মহাত্মা চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ প্রভৃতি মহোদয়গণ, তৎকালে তন্ত্র-শাস্ত্রকে পরম দৈবত বলিয়া মনে করিতেন। চৈতন্য-ভাগবত, চৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি প্রামাণিক বৈষ্ণব-গ্রন্থে পূজ্যপাদ ঈশ্বরপুরী ও কেশব-ভারতীর নিকট মহাপ্রভুর তন্ত্রোক্ত মন্ত্র-দীক্ষার কথা স্পষ্টাক্ষরে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। নিত্যানন্দ প্রভুর সম্বন্ধে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। অনেকে তাঁহাকে প্রচ্ছন্ন বামাচারী তান্ত্রিক নামেও অভিহিত করেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে নিত্যানন্দ প্রভু বলরামের অবতার বলিয়া কীর্ত্তিত। শুনিতে পাই, তিনি না কি

বলদেবের অনেক গুণের প্রকৃত অধিকারী ছিলেন। প্রসিদ্ধ খড়দহ গ্রামে তাঁহার স্থাপিত ত্রিপুরা যন্ত্র অদ্যাপি লোক-চক্ষের গোচর রহিয়াছে। যিনি বলদেবের অবতার বলিয়া খ্যাত, যাঁহার স্থাপিত তন্ত্রোক্ত দশ-মহা-বিদ্যার অন্তর্গত ত্রিপুরাসুন্দরী যন্ত্রের বর্ত্তমানতা রহিয়াছে, তাঁহাকে প্রচ্ছন্ন বামাচারী তান্ত্রিক না বলিয়া আর কি বলা যাইতে পারে? তন্ত্রশাস্ত্রে ভাব গোপন সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে,—

"অন্তঃ শাক্তা বহিঃ শৈবাঃ
অন্তারাং বৈষ্ণবং চরন্।
নানারূপ ধরাঃ কৌলাঃ
বিচরন্তি মহীতলে ॥"

মহাপ্রভু চৈতন্যদেবও মধ্যে-মধ্যে বলদেব ভাবে বিভোর হইয়া 'মদ্য আন, মদ্য আন' রবে সমাজের ভীতি উৎপাদন করিতেন। সংক্ষেপে এইমাত্র বলা যায়, সে সময়ে তন্ত্রাচারের প্রবল বন্যায় বঙ্গভূমি একবারে নিমজ্জিত। নবদ্বীপ হইতে সুদূরস্থ মিথিলা প্রদেশে সে বন্যা যে প্রবেশলাভ করে নাই তাহা নহে। মৈথিল পণ্ডিত-সমাজের উজ্জ্বলতম রত্ন দিগবিজয়ী পক্ষধর মিশ্রও বামাচারী তান্ত্রিক ছিলেন; নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্রের প্রবর্ত্তয়িতা কাল ভট্ট শিরোমণি মহাশয়ের সাহঙ্কার কটাক্ষোক্তিতে স্ফুটরূপে পরিব্যক্ত হয়। রঘুনাথ শিরোমণি মহাশয় পক্ষধর মিশ্র মহাশয়কে উপলক্ষ করিয়া স্বপ্রণীত ন্যায়শাস্ত্রের টীকা মধ্যে বলিয়াছেন,—

"অনাস্বাদ্য গৌড়ী মনারাধ্য গৌরীং
বিনা তন্ত্র মন্ত্রৈর্বিনা শব্দ চৌর্য্যাৎ।
প্রবুদ্ধ প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ প্রবক্তা
বিধিক্ষি প্রপঞ্চে মদন্যঃ কবি কঃ॥"

বিধিক্ষি-বিরচিত সংসার প্রপঞ্চে স্ফুটার্থ প্রবন্ধের প্রবক্তা আমার তুল্য অন্য কোন পণ্ডিত আছে? কেন না আমি মদ্যপান করি না, গৌরী উপাসনা করি না, তন্ত্রমন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করি না, ও প্রতি পক্ষকে অপদস্থ করিবার জন্য শব্দ গোপনও করি না।

শুনিতে পাওয়া যায়, পক্ষধর মিশ্র ঠাকুর শিরোমণি কথিত দোষ বা গুণের প্রকৃত আধার ছিলেন। শিরোমণি মহাশয় তন্ত্রোক্ত শুদ্ধাচারী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত। বর্ত্তমান সময়ে মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে অনেক মহাত্মার চক্ষে তন্ত্রশাস্ত্র উপেক্ষার সামগ্রী হইলেও, উক্ত সম্প্রদায়ের প্রকৃত মহাত্মগণমধ্যে বৈষ্ণব-তন্ত্রের মহিমা অণুমাত্র স্খলিত হয় নাই। পূজ্যপাদ মহাপ্রভু হইতে তচ্ছিষ্য-প্রশিষ্য সকলে অদ্যাপি তন্ত্রোক্ত বৈষ্ণব-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া পরম নির্ব্যাতিলাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন। প্রকৃত বৈষ্ণব-সন্তানকে জিজ্ঞাসা করিলে, বা বৈষ্ণব-সমাজের প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ পর্য্যালোচিত হইলে, এই বাক্যের যাথার্থ্য উপলব্ধ হইবে। বর্ত্তমান সমাজে তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতিপত্তি কতদূর, তাহা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার অজ্ঞাত নহে।

এতাবৎ আলোচনা দ্বারা মহাপ্রভুর আবির্ভাব সময়ে অর্থাৎ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বা তৎপূর্ব্ব শতাব্দীতে তন্ত্র শাস্ত্রের প্রবল প্রতিপত্তি ছিল, তাহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে তন্ত্র-শাস্ত্রের যে বহু মানতা ছিল কি না, তাহা প্রমাণিত করিতে হইলে, পুরাণাদি শাস্ত্র সমূহের সাহায্য নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ও এতদ্দেশীয় পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মনীষিবৃন্দের বিচিত্র বিন্যাসে প্রাচ্য পূজিত পুরাণসমূহ অদ্যাপি সহস্র বৎসরের ঊর্দ্ধসীমা অতিক্রম করিতে পারে নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও তৎশিষ্য-প্রশিষ্যগণের প্রচারিত পুরাণ সমূহের রচনাকাল দৃষ্টে অবগত হওয়া যায় পুরাণসমূহ অত্যন্ত আধুনিক। তাঁহাদের মতে অনেক পুরাণের বয়ঃক্রম এক শত কি দেড় শত বৎসর। সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ পুরাণের বয়ঃক্রম অদ্যাপি সহস্র বৎসরের ঊর্দ্ধ সোপান লঙ্ঘন করিতে পারে নাই। সুতরাং পাশ্চাত্য মতোক্ত পুরাণসমূহের পৌর্ব্ব্য-পৌর্ব্বানুসারে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, তাহাদের মধ্যে তন্ত্রশাস্ত্রের উল্লেখ আছে কি না?

অকালী, নিহঙ্গ

[শ্রীআশুতোষ তরফদার]

গুরু গোবিন্দসিংহের পৃষ্ঠপোষকতায় এই ধর্ম্মোন্মত্ত অকালী বা নিহঙ্গ সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। একদা গুরু দেখিলেন যে, তাঁহার পুত্র ফতে সিং চূড়াদার পাগড়ী (এক্ষণে এইরূপ পাগড়ী অকালীরা বাঁধিয়া থাকে) বাঁধিয়া তাঁহার সম্মুখে ক্রীড়া করিতেছে। তিনি পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ঐরূপ পাগড়ীওয়ালা এক সম্প্রদায়ের গঠন করিলেন। অন্য মত এই যে, গুরু যখন অম্বালার চামকউর হইতে সামরালার মাচিবারাতে একজন পাঠান বন্ধুর বাটীতে পলায়ন করিতেছিলেন, তৎকালে অকালী পরিচ্ছদের (ছদ্মবেশ) আবিষ্কার করেন। অকালী অর্থে অমর। অনেকে বলেন যে, অমর ব্যক্তির (অকাল পুরুষ বা অকাল পুরুষ অথবা ঈশ্বর) ধর্ম্মাচারী। মতান্তরে, ইহারা যুদ্ধে অজেয় এই হেতু অকালী নাম হইয়াছে। যাহা হউক পূর্ব্বোক্ত অর্থ সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। গোবিন্দের সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র অজিৎ সিং সর্ব্ব প্রথম এই সম্প্রাদায়ে দীক্ষিত হন বলিয়া কোন-কোন ব্যক্তি স্ব-স্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। গুরু গোবিন্দের মৃত্যুর পর যে সময় বৈরাগী বন্দা কর্ত্তৃক নূতন প্রার্থনার প্রচলন হয়, তৎকালে অকালীগণ সর্ব্বপ্রধান বিরুদ্ধবাদী রূপে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। পরবর্ত্তী শতাব্দীতে ইহাদিগের ক্ষমতা যেরূপ হ্রাস হইয়াছিল, মহারাজা রণজিৎ সিংহের সময় তদ্রূপ অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। মহারাজা রণজিৎ সিংহের সময়ে বিখ্যাত ফুল সিং এই পন্থী হন। তিনি স্বয়ং চরিত্রবান হওয়ায় অনেক শিখ তাঁহার অনুসরণ করে। এই সকল শিখই শিখ সৈন্য মধ্যে অদম্য ও অসম-সাহসী বলিয়া পরিগণিত। ইহাদিগের প্রধান স্থান অমৃতসর; ইহারা ধর্ম্মরক্ষক, ও ধর্ম্ম-সভা আহ্বানের ক্ষমতা লাভ করে। ইহারা ধর্ম্মের নামে বলপূর্ব্বক অর্থ সংগ্রহ করিত এবং সেই হেতু শিখ সর্দ্দারগণের

মেনকা ও উমা

শিল্পী—শ্রীসারদাচরণ উকিল

(Engraved at the Bharatvarsha Office).

ভীতিপ্রদ হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাদিগের সহায়তার প্রতি মহারাজা রণজিৎ সিংহের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এবং ইহাদিগের বিবিধ সদ্গুণে তিনি বশীভূত হইয়াছিলেন। যখনই সিন্ধুর পর-পারবর্ত্তী দুর্দ্দান্ত পাঠানগণের সম্মুখীন হইবার আবশ্যকতা হইত, তৎকালে অকালীগণ সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী-রূপে দৃষ্ট হইত।

অকালীর কাল, নীল ও ডোরাদার পরিচ্ছদ, চূড়াকৃতি পাগড়ী ও তদুপরি লৌহবলয় আবদ্ধ। ইহারা কেশ কর্ত্তন করিবে না, কাছ (ল্যাঙ্গট—ছোট পায় জামা—জাঙ্গিয়া) পরিবে, কড়া (লৌহ-বলয়) ধারণ করিবে, খড়্গ (ছুরি) রাখিবে ও কাংঘা (চিরুনী) সঙ্গে-সঙ্গে রাখিবে, অর্থাৎ গুরু গোবিন্দসিংহের আদেশ মত বাহ্যিক নিয়ম সকল অবশ্য পালন করিবে। অকালীরা হরিদ্রাবর্ণের পাগড়ী ব্যবহার করিতে ভালবাসে। শিখগণ কেবল বসন্ত-পঞ্চমীতে হরিদ্রাভ বর্ণের পাগড়ী ব্যবহার করে। কতকগুলি অকালী নীল পাগড়ীর নিম্নে হরিদ্রা বর্ণের পাগড়ী পরিধান করে। ললাটের উপর নীল বর্ণের পাগড়ীর নিম্নে হরিদ্রাবর্ণের পাগড়ীর অংশবিশেষ বেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

ভাই গুরুদাস বলেন :—

"সিয়াই (কাল) সফেদ (শাদা) সুর্খ (লাল) জরদাই (হলুদে)
যো পহনে (পরিধান করে) সোই গুর (গুরু) ভাই।"

কাল পরিচ্ছদধারী অকালী, শ্বেত পরিচ্ছদধারী নির্ম্মল, লাল বা হরিদ্রাবর্ণ পরিচ্ছদধারী উদাসী প্রভৃতি শিখ সম্প্রদায়ের সকলেই ভ্রাতৃ-ভাবে আবদ্ধ। অকালীগণ অন্যান্য লোকের ন্যায় সুরাপায়ী বা আমিষ-ভোজী নহে কিন্তু অধিক মাত্রায় ভাঙ (সিদ্ধি) সেবন করে।

খাল্সাগণের প্রাদুর্ভাবের দিন মনে হইলে, অকালীগণের পূর্ব্ব-স্মৃতি জাগিয়া উঠে। যে সৈন্য নহে সে কিছুই নহে। অস্ত্র সৈন্য নহে—গুরুর সৈন্য! সৈন্য স্বপ্নেও সৈন্য দেখিবে। এক লক্ষের কম চিন্তাই করিবে না। যদি পাঁচ জন অকালী উপস্থিত থাকে, তবে কহিবে "তোমার সম্মুখে পাঁচ লক্ষ বর্ত্তমান।" যদি সে একাকী হয়, তবে কহিবে যে, তাহার সহিত ১২৫০০০ এক লক্ষ পঁচিশ হাজার খাল্সা আছে। যদি কোন খালসাকে প্রশ্ন করা হইত, "তুমি কেমন আছ?" অমনি উত্তর সে দিত, "সৈন্যদল উত্তম আছে।" যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত যে, সে কোথা হইতে আসিতেছে? অমনি উত্তর দিত, "সৈন্যদল লাহোর হইতে অগ্রসর হইতেছে।"

নিহঙ্গ অর্থে অসাবধান—অমতর্ক।

কেহ-কেহ কহেন যে, 'ভাঙ্গা' (নগ্ন) হইতে নিহঙ্গ শব্দের উৎপত্তি; অথবা উহা সংস্কৃত নিরঙ্গের অপভ্রংশ। অমৃতসরের অকালতাঙ্গা, আটকের পীর সাহিব, পাটনায় ও আপেহাল নগরে গোবিন্দ সিংহের মন্দির ইহাদিগের সমবেত হইবার স্থান; কিন্তু ইহাদিগের প্রধান স্থান হসিয়ারপুর জেলায়—কিরাৎপুরে। এই স্থানে ফুল সিংহের পবিত্র মন্দির বর্ত্তমান। আনন্দপুর গুরু দোয়ারা আনন্দপুর সাহিব—গুরু গোবিন্দ সিংহের নিজ বাটী। আনন্দপুরে বার্ষিক হোলী মেলায় অকালীগণ বড়ই দৌরাত্ম্য করিত। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে লুধিয়ানা মিশনের একজন পাদরী একজন ধর্ম্মোন্মত্ত শিখ কর্তৃক এই মেলায় নিহত হয়। শিখ ক্ষমতার হ্রাসের সহিত অকালীগণের শক্তিরও হ্রাস হইয়াছে।

সুথর শাহী (Suthra Shahi)

সুথর শাহী হিন্দু উদাসীন সম্প্রদায়। যুক্ত-প্রদেশে ইহাদিগের সংখ্যা অতি অল্প। গুরুদাসপুর জেলায় (পাঞ্জাব) বহরমপুরে সুথর শাহ নামে একজন বুদোয়ান ক্ষেত্রী ছিলেন। ইনি গুরু অর্জ্জুনের (শিখ-গুরু) শিষ্য হ'ন। তাঁহার সত্যবাদিতার জন্য তাঁহাকে সুথর (পবিত্র) নামে অভিহিত করা হয়। সুথর শাহ হইতে 'সুথর শাহী' বা সম্প্রদায়ের নামের উৎপত্তি। (১)

অধ্যাপক উইলসন বলেন "গুরু তেগ বাহাদুর এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক।"

ডাক্তার ট্রুম্পের (Dr. Trumpp) মতে এই সম্প্রদায়ের আবিষ্কর্ত্তা একজন ব্রাহ্মণ, তাঁহার নাম সুচ। মতান্তরে ইহারা গুরু হরগোবিন্দের শিষ্য। ঔরঙ্গজেব কর্ত্তৃক গুরু হর রায় দিল্লীতে আহূত হন। কিন্তু হর রায় স্বয়ং গমন না করিয়া শিষ্য সুথর শাহকে প্রেরণ করেন। সুথর গুরুবাক্যে দিল্লী উপনীত হন এবং আপন অসাধারণ বুদ্ধিমত্তায় ও রহস্যে ঔরঙ্গজেবকে সন্তুষ্ট করেন। মোগল সম্রাট পুরস্কার স্বরূপ প্রত্যেক বিপণি হইতে এক এক পয়সা লইতে আজ্ঞা প্রদান করেন।

যাহা হউক, এক্ষণে এই সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিরা ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যে জীবনধারণ করে এবং দোকানে গিয়া এরূপ অন্যায় জেদ করে যে, ভিক্ষা না পাইলে কোন মতেই দোকান পরিত্যাগ করিয়া যাইবে না। ইহারা যখন বাজারের মধ্য দিয়া গমন করে তখন ইহাদিগের আকার-প্রকার দেখিয়াই সকলেই ইহাদিগকে 'সুথর শাহী' বলিয়া জানিতে পারে। ললাটে কৃষ্ণ বর্ণ তিলক, কাল পশমের রজ্জু (সেলি, মস্তকে ও গলদেশে বেষ্টিত এবং হস্ত পরিমিত দুইটী কাষ্ঠ-দণ্ড (ডাণ্ডা) পরস্পরে আঘাত করতঃ পাঞ্জাবী ভাষায় গুরু নানক বা দেবীর গীত গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে।

ইহারা শব দাহ করে—অস্থি গঙ্গায় নিক্ষেপ করে; যজ্ঞোপবীত বা শিখা ধারণ করে না। ইহারা মাদক দ্রব্য সেবন করে; অনেকে ধূমপান করিতেও পশ্চাৎপদ নহে। ইহাদিগের ব্যবহার দেশ-প্রসিদ্ধ। অনেকে বলেন যে, ইহারা জুয়া খেলায় হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছে। ইহারা অন্যান্য জাতি হইতে চেলা সংগ্রহ করে, এবং সকলের নামের অন্তে 'শাহ' যোগ করে। ইহারা প্রধানতঃ বড়-বড় সহরে বাস করে। ইহাদিগের প্রধান গুরুদোয়ারা (গুরুদ্বার) লাহোরে। কাশীর নিকট নাগর সৈনে (Nagar Sain) ও পাতিয়ালায় ইহাদের ধর্ম্ম-ভবন আছে। ইহারা যুক্ত-প্রদেশে আসিলে সেখানকার অধিবাসিগণ ত্রস্ত হয়।

---

(১) Punjab Census Report 154.

তাহার প্রথম কারণ, ভিক্ষা প্রার্থনা করিবার সময়ও ইহারা জুলুমের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। দ্বিতীয় কারণ, অভাব পূর্ণ না হইলে দাতাকে শ্লেষ-সূচক বাক্যে অপমানিত করে বা গালি প্রদান করিয়া থাকে। তৃতীয় কারণ, চেলা করিবার নিমিত্ত বড়-বড় লোকের সন্তানকে লইয়া যায়। ইহাদিগের মধ্যে কেহ-কেহ কহে যে, ইহারা ঝক্কর শাহর চেলা।

ইহাদের কপালে কাল রঙের চিহ্ন; ইহারা হাতে দুইটী আবলুশ (অব্নুস) কাঠের কাঠি লইয়া দুই কাঠী বাজাইয়া ভিক্ষা করে।

ইহাদিগের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রবাদ প্রচলিত আছে :—

"কেহ মুই, কেহ জীই,
সুথরা ঘোড় বাতাসা পিই।"

লোকে মারুক বা বাঁচুক (ক্ষতিবৃদ্ধি নাই) কিন্তু সুথরা নিশ্চয় বাতাসা গুলে খাইবে।

কেহ=কেহ; মুই=মরিল; জীউ=বাঁচিল, সুথরা=সুথর শাহী; ঘোড়=গুলিয়া; বাতাসা=বাতাসা; পিই=পান করিবে।

নিরঞ্জনী।

নিরঞ্জনী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক হাণ্ডাল; হাণ্ডাল গুরু অমরদাসের সুপকার ছিলেন। গুরু অমর দাসের সময় ১৫৫২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দ অবধি। বাবা হাণ্ডাল, নিরঞ্জন নামে ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন। ইঁহার মতানুসারিগণের বিশেষত্ব এই যে, ইহারা শিখ বা হিন্দুদিগের ন্যায় শবদাহ প্রথার অনুসরণ করে না। মৃত্যুর পর কোন ক্রিয়া কর্ম্ম (কিরিয়া করম) করে না বা মৃতাস্থি গঙ্গায় নিক্ষেপ করে না। ইহাদিগের বিবাহ-পদ্ধতিও পৃথক; বিবাহে ব্রাহ্মণ (পুরোহিত) আহুত বা সম্মানিত হন না। বাবা হাণ্ডালের গুরুদোয়ারা (ধর্ম্মালয়) 'দরবার সাহিব' নামে সাধারণের নিকট পরিচিত এবং অমৃতসর জেলার অন্তর্গত জন্দিয়ালা নামক স্থানে অবস্থিত।

অনন্ত পন্থী।

ইহারা বৈষ্ণব সম্প্রদায়। রায় বেরেলী ও সীতাপুর জেলাদ্বয়ে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা অনন্ত নামে বিষ্ণুর উপাসক; একেশ্বরবাদী।

অপা পন্থী।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়। মণ্ডোয়ারের মুন্নাদাস নামক একজন স্বর্ণ এই পন্থের প্রচারক। মণ্ডোয়াক্বেরী জেলায়। একবার ইহারা অত্যদ্ভুত ক্ষমতা দ্বারা অনাবৃষ্টি হইতে দেশ রক্ষা করিয়াছিল; তদবধি ক্বেরী, সীতাপুর ও বারাইচ জেলার অনেক ব্যক্তি এই সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হয়। মুন্নাদাসের সম্প্রদায় ও সাধারণ বৈষ্ণব সম্প্রদায় অধিক মাত্রায় বিভিন্ন নহে।

আকাশমুখী।

ইহারা শৈব। আকাশের দিকে মুখ করিয়া থাকে, এই হেতু ইহাদিগের 'আকাশমুখী' নাম হইয়াছে। অনবরত আকাশের দিকে চাহিয়া থাকায় ইহাদিগের গ্রীবাদেশের শিরা সকল এরূপ আবদ্ধ হইয়া যায় যে, অন্য দিকে মুখ ফিরাইতে পারে না। অনেকে নির্জ্জন-বাসে যোগ-সাধনা করে। অনেকে মঠে আশ্রয় লয়; ভক্তগণ তাহাদিগের ভরণ পোষণ করে। ইহারা মস্তক ও মুখমণ্ডলের কেশ মুণ্ডন করে না। অঙ্গে ভস্ম মাখে ও গেরুয়া রঙের কাপড় পরে।

অলখ্‌গীর, অলখনামী, অলক্ষ্যিয়া।

ইহারা শৈব সম্প্রদায়। লালগীর নামক একজন চর্ম্মকার এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। ইহারা 'অলখ্' 'অলখ্' বলিয়া চীৎকার করে বলিয়া ইহাদিগের উক্ত নাম হইয়াছে। 'অলখ্' অর্থে ঈশ্বর অলক্ষ্য। সচরাচর ইহারা আঙ্গরাখা ব্যবহার করে। 'অঙ্গরাখা' কম্বলে নির্ম্মিত এবং গলদেশ হইতে পদদ্বয়ের গুল্ফ পর্য্যন্ত ঝুলিতে থাকে। ইহারা গৃহস্থের দ্বারদেশে আসিয়া 'অলখ্' 'অলখ্' বলিয়া চীৎকার করে; যদি তৎক্ষণাৎ ভিক্ষা প্রাপ্ত হয়, গ্রহণ করিবে নতুবা চলিয়া যাইবে। ইহারা নির্ব্বিবাদী, শান্ত; কাহারও ক্ষতিকারক নহে। ভিক্ষা ইহাদিগের উপজীবিকা। ইহাদিগকে এক প্রকার যোগী শ্রেণীভুক্ত বলা যাইতে পারে। ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকের আদেশানুসারে ইহারা ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য দ্বারা উদর পোষণ করে; কিন্তু কোন জীব হত্যা বা মৎস্য মাংস আহার ইহাদিগের ধর্ম্মবিরুদ্ধ। বৈরাগ্য সম্বন্ধে শিষ্যগণকে উপদেশ দেওয়া হয়। পবিত্রতা, নিরুপদ্রবে ঈশ্বর চিন্তা ও শান্তি লাভ করাই জীবনে উদ্দেশ্য ও পুরস্কার। ভবিষ্যৎ কোন অবস্থা নাই। স্বর্গ ও নরক (সুখ ও দুঃখ) এই স্থানে। শরীর পতনের সঙ্গে সব শেষ হইয়া যায় (শরীর পঞ্চভূতে বিলীন হয়)। মানুষ কখনও অমর হইতে পারে না।

রণ্‌জেন্ রশ্মি

[শ্রীরাধারমণ গঙ্গোপাধ্যায়]

উনবিংশ শতাব্দীতে যে সমস্ত আশ্চর্য্য বস্তু উদ্ভাবিত হইয়াছে, তন্মধ্যে রণ্‌জেন-রশ্মি সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। কারণ, ইহার সাহায্যে মানব যে দৃষ্টিশক্তি পাইয়াছে, তাহা তাহাদের কখনও ছিল কি না, তাহা তাহারা স্বপ্নেও অনুভব করিতে পারে নাই। অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহার সাহায্যে মানব শরীরের ভিতর দিয়া দেখা সম্ভব।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে, অধ্যাপক রণ্‌জেন্ ইহার উদ্ভাবন করেন। যখন তিনি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগৃহে বায়ুহীন নল লইয়া পরীক্ষা করিতে-

ছিলেন, তখনই হঠাৎ ইহার উদ্ভাবন হয়। উক্ত নল কাচ-নির্ম্মিত এবং দেখিতে প্রায় গোলাকার। যাহার ভিতর বৈদ্যুতিক আলো জ্বলে, সেই ফানুসকে ইহার উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে; কিন্তু সেই ফানুসের ভিতর যে সূক্ষ্ম ধাতুনির্ম্মিত তারটী আছে, তাহা অধ্যাপক রণ্‌জেনের পরীক্ষা-যন্ত্রে নাই। অধিকন্তু, দুইটি তার বিভিন্ন দিক হইতে তাহার ভিতর এরূপভাবে প্রবিষ্ট যে, তাহাদের শেষভাগ পরস্পরের সম্মুখীন কিন্তু পরস্পরের সহিত সংলগ্ন নহে, উহাদের মধ্যস্থ ব্যবধান প্রায় ৪।৫ ইঞ্চি মাত্র। তার দুইটীর শেষভাগে দুইখানি ছোট চক্রাকার ধাতুনির্ম্মিত পাত্র সংযুক্ত আছে। তাহারা পরস্পর সমান্তরাল নহে; একখানি লম্বভাবে সংলগ্ন এবং অন্যখানি হেলান। উভয়েই বর্দ্ধিত হইলে সংযোগস্থলে ৪৫ ডিগ্রী কোণ প্রস্তুত করে। তার এবং চক্রাকার পাত্র দুইটী প্লাটিনাম্ ধাতু নির্ম্মিত, সুতরাং তাড়িৎ-পরিচালনশীল; কিন্তু তাহাদের মধ্যস্থল বায়ুহীন হওয়ায় তাড়িৎ-প্রবাহ এক তার হইতে অন্য তারে পৌঁছিতে পারে না। বাস্তবিক, নলটী সম্পূর্ণরূপে বায়ুহীন হইলে, তাড়িৎ-পরিচালন একেবারেই অসম্ভব হইত। যাহা হউক, ইহার ভিতর যে অত্যল্প বায়ু থাকিয়া যায়, তাহা সত্ত্বেও তাড়িৎ-প্রবাহ এক তার হইতে অন্য তারে পৌঁছিতে হইলে, প্রবাহের চাপ অত্যন্ত অধিক হওয়া আবশ্যক। বৈদ্যুতিক আলোকের সাহায্যে উল্লিখিত সূক্ষ্ম তারটী প্রজ্বলিত করিবার জন্য যতটা চাপ আবশ্যক, তাহাও ইহার তুলনায় অল্প। তাড়িৎ-প্রবাহ যখন মধ্যস্থিত অত্যল্প বায়ুর ভিতর দিয়া চলিয়া যায়, তখন ইহা নানা বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠে; কিন্তু যে তারটী হেলান চক্রাকার পাত্রে শেষ হইয়াছে, তাহার নিকট সাদা বা বেগুণে আলোর স্তর দেখিতে পাওয়া যায়; এবং তাহার পরেই অন্ধকার এই দুই উজ্জ্বল স্থানকে পৃথক করিয়া আছে। এই অন্ধকার ক্রমে নিজ আয়তন বর্দ্ধিত করিয়া শেষে সমস্ত নলের ভিতর ব্যাপৃত হইয়া পড়ে। তৎপরে এক অদ্ভুত দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়। উল্লিখিত লম্বমান পাত্রটীর সম্মুখস্থ সমস্ত স্থানে একটী সবুজ আভা সৃষ্ট হয়। এই সবুজ আভা হইতেই রণ্‌জেন্ রশ্মির উৎপত্তি।

এখন এক্স-রেজ্ কি করিয়া উৎপন্ন হয়, তাহা বলিবার পূর্ব্বে, বায়ুহীন নলের ভিতর কিরূপে সবুজ আভার সৃষ্টি হয়, তাহা বলা আবশ্যক। যদি আমরা অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে লম্বমান পাত্রটীর দিকে তাকাই, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, অতি ক্ষুদ্র অণুরাজি ইহা হইতে অত্যন্ত বেগে নির্গত হইয়া অপর পার্শ্বস্থ কাচের গায়ে পড়িয়া উক্ত আভার সৃষ্টি করিতেছে। এই সমস্ত অণু ইংরেজীতে "ইলেকট্রন্‌স্" নামে অভিহিত, এবং ইহাদেরই প্রবাহ তাড়িৎ-প্রবাহের কারণ। অবশ্য ইহাদিগকে দেখিতে গেলে অত্যন্ত শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রয়োজন, সন্দেহ নাই।

যে অণুরাজির সমষ্টিতে তারের গঠন, তাহাদের অপেক্ষা "ইলেকট্রন্" অনেক ছোট। তাই তাহারা ধীরে-ধীরে তারের অণুরাজির মধ্যবর্ত্তী স্থান দিয়া নির্গত হয়। উভয়ের ক্ষণে-ক্ষণে সংঘর্ষণ হেতু তাপের সৃষ্টি হয়। বলা বাহুল্য, যে তার যত সূক্ষ্ম হইবে, ইহার ভিতর দিয়া পরমাণুসমূহের গতিও তত প্রবল হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে তাপের আধিক্য হেতু তারটী প্রজ্বলিত হইয়া উঠা অসম্ভব নয়। এই সিদ্ধান্তের উপরেই বৈদ্যুতিক আলোর ভিত্তি। যখন এই পরমাণু-শ্রেণী তার হইতে বাহির হইয়া যায়, তখন পশ্চাদ্বর্ত্তী অণুরাজির বেগ হেতু এবং অপর পার্শ্বস্থিত তারের আকর্ষণ হেতু, ইহাদিগের গতির বেগ অত্যন্ত প্রবল হয়;—এমন কি সেকেণ্ডে পঞ্চাশ হাজার মাইল। ইহারা যখন কাচের গায়ে আসিয়া প্রতিরুদ্ধ হয়, তখন যে এক অদ্ভুত ফল ঘটিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? ইহারা সম্মুখস্থ হেলান পাত্রটীর উপর পড়িয়া তাহাকে অত্যন্ত উত্তপ্ত করিয়া তোলে; এবং তাহা হইতেই বিখ্যাত রণ্‌জেন্ রশ্মি বহির্গত হয়।

এই রশ্মি উদ্ভাবনের ইতিহাস নিম্নে লিখিত হইল। একদিন অধ্যাপক রণ্‌জেন্ অন্ধকারে উজ্জ্বল দেখায়, এরূপ একটী আস্তরণের উপর তাড়িৎ-পরমাণুদের কিরূপ ব্যবহার, তাহা অধ্যয়ন করিবার মানসে, বায়ুহীন নল লইয়া পরীক্ষা করিতেছিলেন। তাহাদের উন্মুক্ত বায়ুতে নির্গত হইবার পথ একটী পাতলা এ্যালুমিনিয়াম্ ধাতুনির্ম্মিত চতুষ্কোণ পাত মাত্র। এরূপ পরীক্ষা পূর্ব্বে অনেকবার হইয়াছিল; কিন্তু রণ্‌জেন সাহেব নলটী কাল পিজবোর্ডে আবৃত করিয়া সম্পূর্ণ অন্ধকারের ভিতর ইহার পরীক্ষা করেন। তাহার ফলে দেখিতে পান যে, পিজবোর্ড থাকা সত্ত্বেও পরমাণুদের প্রভাব আস্তরণটী পর্য্যন্ত পৌঁছে। তৎপরে তিনি স্বীয় হস্তদ্বারা রশ্মি প্রতিরুদ্ধ করিবার চেষ্টা করেন; ফলে সেই আস্তরণটীর উপর হস্তের প্রতিবিম্বের পরিবর্ত্তে অস্থিসমূহের প্রতিবিম্ব দেখিতে পান। বাস্তবিক তাঁহার হাত কঙ্কালে পরিণত হইয়া যায় নাই; উপরিস্থ মাংস এই রশ্মির সাহায্যে স্বচ্ছ হইয়াছিল মাত্র। ইহা যে একটী অতি আশ্চর্য্য উদ্ভাবন তাহাতে সন্দেহ নাই।

শরীরে যদি কোনও গুলি, সূচ বা ধাতুনির্ম্মিত পদার্থ বিদ্ধ হয়, তাহা হইলে কোথায় বিঁধিয়াছে তাহা ইহার সাহায্যে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। সার্‌জন্ সাহেবেরা এই অদ্ভুত উদ্ভাবন তাঁহাদের কাজে লাগাইতে অধিক বিলম্ব করেন নাই। সত্যই ইহা বিজ্ঞান-জগতে একটা নূতন যুগের সৃষ্টি করিয়াছে।

কার্পাস

[শ্রীমতিলাল লাহা]

আজকাল বস্ত্রস-মস্যা বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং এই সমস্যার সমাধান করিবার নিমিত্ত নানা জনে নানা রকম উপায় চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অনেকে কার্পাস-চাষের আবশ্যকতা অনুভব করিয়াছেন, এবং কেহ কেহ বা দেশবাসীদিগকে কার্পাস চাষ করিতে উপদেশও দিতেছেন। তদুদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে আশা করি নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি সাধারণের উপকারে আসিতে পারে।

কার্পাস সমস্ত উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলেই জন্মিয়া থাকে ; কিন্তু ভারতবর্ষই যে কার্পাসের জন্মভূমি এবং এই দেশেতেই যে ইহার প্রচলন সর্ব্বপ্রথমে আরম্ভ হয়, তাহার ভূরিভূরি প্রমাণ আছে। গ্রীস-দেশীয় প্রথম ঐতিহাসিক লেখক হেরোডেটস্ বলিতেছেন "ভারতবর্ষে একপ্রকার বৃক্ষ আছে, তাহাতে উল বা পশম ফলে এবং তাহা হইতে ভারতবর্ষের লোকেরা বস্ত্রাদি প্রস্তুত করে।" জার্ম্মানরাও এইজন্য কার্পাসকে "বমউম" বা বৃক্ষজ-উল বলে। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থ যে বেদ, তাহাতেও কার্পাসের উল্লেখ আছে। ইহা হইতেই স্বতঃসিদ্ধ হইতেছে যে, ভারতবর্ষেই সর্ব্বপ্রথমে কার্পাসের প্রচলন আরম্ভ হয়।

পৃথিবীর কোন্ কোন্ অংশে কার্পাস জন্মিতে পারে, এক্ষণে তাহাই দেখা যাউক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কার্পাস উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ দেশেরই ফসল। বিষুবরেখার ৪৫ উত্তর হইতে বিষুবরেখার ৩৫ দক্ষিণ মধ্যে যে বিস্তৃত ভূমিখণ্ড আছে, তাহাতেই কার্পাস জন্মিতে পারে; অর্থাৎ আমেরিকার যুক্তরাজ্যে, দক্ষিণ আমেরিকার তিন-চতুর্থাংশে, আফ্রিকায়, দক্ষিণ এসিয়ায়, অষ্ট্রেলিয়ায় এবং অষ্ট্রেলিয়া ও এসিয়ার মধ্যে যে সমুহ দ্বীপপুঞ্জ আছে—সেইগুলিতেই কার্পাস জন্মিতে পারে। কিন্তু আজকাল যুক্তরাজ্যের দক্ষিণ প্রদেশসমূহে ভারতবর্ষে, মিসরে ও ব্রাজিলেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে কার্পাস উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অধিকন্তু, পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে, পশ্চিম আফ্রিকায়, এসিয়া মাইনরে, রুসিয়া, চীন ও জাপান রাজ্যেও কিছু কিছু কার্পাস উৎপন্ন হয়; কিন্তু ঐ সমস্ত কার্পাস উক্ত দেশসমূহেই ব্যবহৃত হয়, বাহিরে রপ্তানি হয় না।

কার্পাসের জাতি নির্ণয়

উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ কার্পাসের নানা জাতির নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; কেহ পাঁচ, কেহ সাত, আবার কেহ বা ততোধিক জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। যাহা হউক, নিম্নলিখিত যে কয়েকটী জাতি সকল উদ্ভিদতত্ত্ববিদ পণ্ডিতই নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাদিগের বৈজ্ঞানিক নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল ; যথা :—

প্রথম। বার্ব্বাডেনস্ জাতীয়।

দ্বিতীয়। হারস্থটুম জাতীয়।

তৃতীয়। ওষধি জাতীয়।

চতুর্থ। পেরু জাতীয়।

কোমল, মসৃণ, দীর্ঘ-তন্তবিশিষ্ট যে সকল মূল্যবান কার্পাস বার্ব্বাডোস দ্বীপে এবং ফ্লরিডা ও জর্জ্জিয়ার সমুদ্রোপকূলে জন্মে, সেইগুলিকে বার্ব্বাডেনস্ জাতীয় কার্পাস কহে। বার্ব্বাডোস নামক দ্বীপ হইতে এই জাতীয় কার্পাস বার্ব্বাডেনস্ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। এই কার্পাসের ফুল হরিদ্রা বর্ণের এবং ইহার বীজের নিম্নভাগে সূক্ষ্ম লোম জন্মে না! এই জাতীয় কার্পাসের গাছ ৫ হইতে ৮ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ হয়।

গুল্ম জাতীয় কার্পাস বৃক্ষোৎপন্ন তুলাকে হারস্থটুম জাতীয় কার্পাস বলিয়া উদ্ভিদতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই কার্পাসের কোষ বা ঢেঁড়ীগুলি লোমশ এবং ইহার বীজগুলিতে সূক্ষ্ম সবুজ আভাবিশিষ্ট লোমে আবৃত থাকে। মার্কিন কার্পাস এই জাতির অন্তর্গত।

বর্ষজীবি ক্ষুদ্র দৃঢ়কায়বিশিষ্ট কার্পাসের গাছ ওষধি জাতীয়ের অন্তর্গত। এই বৃক্ষ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে ৩ হইতে ৬ ফিট মাত্র উচ্চ হয়। এই কার্পাস বৃক্ষ অঙ্কুরিত হইবার পর গড়ে ৮ মাস মধ্যেই ইহার ঢেঁড়ীগুলি পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইহারও ফুল হরিদ্রাবর্ণের। ভারত-বর্ষীয় সমস্ত কার্পাসই প্রায় এই জাতীয়।

দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত ব্রাজীল ও পেরু দেশে যে সমস্ত কার্পাস উৎপন্ন হয়, তাহাকে পেরু জাতীয় কার্পাস কহে। এই জাতীয় কার্পাস-বৃক্ষ ১০ হইতে ১২ ফিট উচ্চ হইয়া থাকে এবং ইহার ফুল লাল বর্ণের। এই জাতীয়ের একই বৃক্ষ হইতে ১০।১২ বৎসর পর্য্যন্ত কার্পাস পাওয়া যায় বটে, তবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৎসরের কার্পাসই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। পরে যেমন ইহা বড় হইতে থাকে, কার্পাসও তেমনি নিকৃষ্ট হইতে নিকৃষ্টতর হইয়া পড়ে।

সি-আইলাণ্ডীয়, ফ্লরিডা-সি-আইলাণ্ডীয়, ফিজি-সি-আইলাণ্ডীয়, টাহাটা-সি-আইল্যাণ্ডীয়, পেরু সি-আইলাণ্ডীয় ও গ্যালেনী কার্পাস—বার্ব্বাডেনস্ জাতীয়।

আপলাণ্ডীয়, মোবাইলী, টেক্সাসী, অরলিন্সী ও শ্বেত মিসরীয় কার্পাস—হারস্থটুম জাতীয়।

ব্রাউন মিসরীয়, স্মিরণা, গ্রীক, হিঙ্গনঘাটী ধারওয়ারী, বরোচী, ধোলেরা, অমরাবতী, কামতী, সিন্ধি, "বেঙ্গল," তিনিভেল্লী কার্পাস ওষধি জাতীয়।

ব্রাজিলী ও পেরু দেশীয়কার্পাস—পেরু জাতীয়। অন্যান্য দেশের কার্পাসের বিশেষ বিবরণ লিখিতে গেলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িবে মনে করিয়া নিম্নে কেবল ভারতবর্ষীয় কার্পাসের বিবরণই প্রদত্ত হইল, প্রসঙ্গক্রমে অন্যদেশজাত কার্পাসের কথাও বলা হইল।

ভারতবর্ষীয় কার্পাসকে তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে— যথা, ১ম, দেশীয় বীজ হইতে উৎপন্ন ; ২য়, মার্কিন বীজ হইতে উৎপন্ন এবং ৩য়, মিসরীয় ও সি-আইল্যাণ্ডী বীজ হইতে উৎপন্ন। অন্য দেশীয় কার্পাসাপেক্ষা ভারতবর্ষীয় কার্পাস নিকৃষ্ট জাতীয়;

হিঙ্গনঘাটী কার্পাস

ভারতবর্ষীয় কার্পাসের মধ্যে হিঙ্গনঘাটী কার্পাসই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহা মধ্য প্রদেশান্তর্গত ওয়ারদা, নাগপুর, নিমার প্রভৃতি স্থানে উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং উক্ত প্রদেশের হিঙ্গনঘাট নামক সহরের নামানুসারে ইহার নাম হিঙ্গনঘাটী কার্পাস হইয়াছে। ইহাতে আবর্জ্জনাদি থাকে বটে, কিন্তু ইহার তন্তু বেশ মজবুত। ইহার রং হালকা কাকনাভাবিশিষ্ট এবং ইহার তন্তু দৈর্ঘ্যে ⅞ ইঞ্চি হইতে ১⅛ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহা

হইতে ৩২ নম্বর পর্য্যন্ত টানা সূতা কাটা যাইতে পারে; কিন্তু মার্কিন কার্পাসের সহিত মিশ্রিত হইলে ৪০ নম্বর পর্য্যন্ত সূতা ইহা হইতে প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ইহা ১৫০ গ্রেণ ভারসহ এবং ইহার ব্যাস এক ইঞ্চির বারশত ভাগের একভাগ।

বরোচী কার্পাস

বরোচী কার্পাস ভারতবর্ষীয় কার্পাসের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানীয়। বোম্বাই প্রদেশস্থ বরোচ, বড়োদা, সৌরাষ্ট্র, রেওয়া কাণ্টা প্রভৃতি স্থানে ইহা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার রং ঈষৎ পিঙ্গল বর্ণ এবং ইহা মধ্যম রকমের পরিষ্কার। এই কার্পাস অল্পপরিমাণে গ্রন্থিযুক্ত হইলেও বেশ শক্ত ও স্থিতিস্থাপক। ইহার তন্তু দৈর্ঘ্যে ২৭/৩২ ইঞ্চি হইতে ১ ইঞ্চি এবং ইহার ব্যাস হিঙ্গনঘাটী কার্পাসের সমান। ২৪ নম্বর পর্য্যন্ত টানা পোড়েন সূতা ইহাতে কাটা যাইতে পারে।

ধোলেরা কার্পাস

বোম্বাই প্রদেশান্তর্গত কাথিবাড়, আহাম্মদাবাদ, কচ্ছ, বড়োদা, অমরালী, পালমপুর, খয়রা, মাহিকাণ্টা প্রভৃতি স্থানে উৎপন্ন হয়। ইহাতে অপক্ক তন্তু ও আবর্জ্জনাদি যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। ইহার রং সাদা এবং তন্তুও যথেষ্ট মজবুত নহে। ২৪ নম্বর পর্য্যন্ত পোড়েন সূতা মাত্র ইহা হইতে প্রস্তুত হইতে পারে। তন্তুর দৈর্ঘ্য ১৩/১৬ হইতে ১ ১/১৬ ইঞ্চি এবং ইহার ব্যাস এক ইঞ্চির ১২৮০ ভাগের এক ভাগ।"

মাদ্রাজী কার্পাস

মাদ্রাজ প্রদেশে চারি প্রকারের কার্পাস উৎপন্ন হইয়া থাকে; যথা, পশ্চিমে কোকোনদী, তিনিভেল্লী ও কোয়েমবাটোরী বা সালেমী। নিজাম রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলে পশ্চিমে কার্পাসই অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। কোকনদী কার্পাস হরিদ্রাভ লাল বর্ণের। ইহা ১০ হইতে ১২ নম্বরের সূতার পক্ষে উপযুক্ত। মাদ্রাজ প্রদেশে যত প্রকার কার্পাস উৎপন্ন হয়, তাহাদের মধ্যে তিনিভেল্লি কার্পাসই পরিমাণে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং ইহা ভারতবর্ষীয় কার্পাসের মধ্যে তৃতীয় স্থানীয়। ইহা মাদ্রাজ প্রদেশের দক্ষিণাঞ্চলে উৎপন্ন হয় এবং এই স্থানের জলবায়ু কার্পাসের পক্ষে অনুকূল হওয়ায় ইহার দিন-দিন উন্নতি হইতেছে বলিয়া বোধ হয়। ইহার তন্তু বেশ মজবুত ও স্থিতিস্থাপক এবং চলনসই রকমের পরিষ্কার।

ইহার তন্তু দৈর্ঘ্যে ১৩/১৬" হইতে ১ ১/১৬" এবং ইহার ব্যাস ১/১৩০০" ২৬ নম্বর পর্য্যন্ত টানা সূতা ইহা হইতে প্রস্তুত হয়।

ধারওয়াড়ী কার্পাস

ধারওয়াড়ী কার্পাস দুই প্রকারের; যথা, একপ্রকার দেশীয় বীজ হইতে, আর অন্য প্রকার মিসরীয় এবং মার্কিন বীজ হইতে উৎপন্ন। বিজাপুর, ধারবাড়, বেলগাঁও, শোলাপুর ও দক্ষিণ মহারাষ্ট্রীয় দেশীয় রাজ্যে উৎপন্ন হয়। দেশী বীজোৎপন্ন কার্পাস শক্ত বটে, তবে কর্কশ এবং মাঝামাঝি রকমের পরিষ্কার। ইহার তন্তু দৈর্ঘ্যে ১৫/১৬" হইতে ১৩/১৬" ইহার ব্যাস ১/১২১৪" এবং ২৬ নম্বর পর্য্যন্ত টানা সূতা প্রস্তুত করিতে ইহা যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

অমরাবতী কার্পাস

অমরাবতী কার্পাস বেরার, খান্দেশ, বরসি, আহ্মদনগর ও নিজাম রাজ্যের উত্তরাংশে উৎপন্ন হইয়া থাকে। যদিও ইহা আজকাল লিভারপুলে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়, যথা—অমরাবতী, খান্দেশী ও বিলাতী—কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহা বেরারী, খান্দেশী ও বরসীনগরী নামে নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত। সর্ব্বোৎকৃষ্ট অমরাবতী কার্পাস বেরার প্রদেশে জন্মে। খান্দেশী কার্পাস ঐ নামীয় জেলাতে ও অল্প পরিমাণে নাসিক অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। বরসী এবং নগরী শ্রেণীয় কার্পাস বরসী এবং আহ্মদনগর নামক সহরদ্বয়ের নামানুসারে অভিহিত হইয়াছে।

ইহার তন্তু দৈর্ঘ্যে ৩/৪" "হইতে ১ ১/১৬" এবং ইহার ব্যাস ১/১৫০৮ ইহাতে অপরিপক্ক তন্তু অধিক থাকায় সূতা কাটিতে "গোদোড়" বা ছাঁট অনেক পড়ে। যাহা হউক ইহার সূতা মন্দ না হইলেও ব্রোচের সমকক্ষ নহে। ইহার রং জরদা এবং ইহা হইতে ২০ নম্বরের টানা ও পোড়েন উভয় প্রকারের সূতাই প্রস্তুত হয়।

কোমতাই কার্পাস।

ইহা বোম্বাই প্রদেশান্তর্গত বিজাপুর, ধারবার, বেলগাঁও, শোলাপুর এবং দক্ষিণ মহারাষ্ট্রীয় রাজ্যে উৎপন্ন হয়। ইহার তন্তু কোমল ও ক্ষুদ্র এবং তন্তুতে স্বাভাবিক পাক খুব কমই থাকে। ইহার তন্তু দৈর্ঘ্যে ৫/৮" হইতে ১" এবং ইহার ব্যাস ১/১১৫০"। ইহাতে প্রচুর পরিমাণে আবর্জ্জনাদি বর্ত্তমান থাকে। ইহার রং পিঙ্গলাভ। ইহা হইতে ১৫ নম্বর পর্য্যন্ত পোড়েন সূতা মাত্রই কাটা যাইতে পারে।

"বেঙ্গল" কার্পাস

ভারতবর্ষে যতপ্রকার কার্পাস উৎপন্ন হয়, তাহাদিগের মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট হইলেও অন্যান্য কার্পাস অপেক্ষা ইহাই অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে; এবং ইহা কেবলমাত্র যে বঙ্গদেশেই উৎপন্ন হয় তাহা নহে; পরন্তু, যুক্ত-প্রদেশ ও অযোধ্যায়, মধ্য প্রদেশে, রাজপুতানায়, পাঞ্জাবে এবং সিন্ধু প্রদেশেও উৎপন্ন হয়। এই কার্পাস "বেঙ্গল" কার্পাস নামে অভিহিত হইলেও, বাস্তবিক পক্ষে বঙ্গদেশে ইহা অতি অল্প পরিমাণেই উৎপাদিত হয়। ইহাতে অত্যধিক আবর্জ্জনাদি থাকে। ইহার তন্তু শক্ত হইলেও মোটা, কর্কশ এবং তারের মত ও ছোট। ইহা শ্বেত বর্ণের। ইহার তন্তু দৈর্ঘ্যে ৩/৪" হইতে ১" এবং ইহার ব্যাস ১/১১৫০"। ১০ নম্বর হইতে ১৫ নম্বর পর্য্যন্ত টানা সূতা প্রস্তুত করিতে ইহা ব্যবহৃত হয়।

সিন্ধি কার্পাস

সিন্ধু প্রদেশে জন্মে বলিয়া ইহাকে সিন্ধি কার্পাস বলে। ইহার তন্তুও ক্ষুদ্র এবং শ্বেত বর্ণের। ইহা চলনসই রকমের মজবুত এবং পূর্ব্বোল্লিখিত কয়েক প্রকার কার্পাস অপেক্ষা পরিষ্কার। ইহাতে

তন্তু দৈর্ঘ্যে ৩/৪" হইতে ৭/৮" এবং ইহার ব্যাস ১/১০৯০" ইহা হইতে উত্তম ১২ নম্বর পর্য্যন্ত টানা ও পোড়েনের সূতা প্রস্তুত হইতে পারে।

এসমীরণাই কার্পাস

এস্মীরণাই কার্পাস—এসিয়াটিক টার্কীর পশ্চিমোপকূলে জন্মিয়া থাকে। ইহার বর্ণ অনুজ্জ্বল শ্বেত এবং ইহা মধ্যমরূপ পরিষ্কার ও শক্ত। ইহার তন্তু দৈর্ঘ্যে ৭/৮" হইতে ১ ৩/১৬" এবং ইহার ব্যাস ১/১৩০০"। ২০ নম্বর পর্য্যন্ত পোড়েন সূতা ইহা হইতে প্রস্তুত হয়।

পশ্চিম ভারতীয় কার্পাস

পশ্চিম ভারতীয় কার্পাস বলিতে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জোৎপন্ন কার্পাসই বুঝায়। ইহা উক্ত দ্বীপপুঞ্জের—কুবা, ডমিনিকা, জামাইকা প্রভৃতি দ্বীপে জন্মে। ইহাতে অল্পাধিক আবর্জ্জনাদি থাকে ও ইহা মধ্যমরূপ শক্ত, কিন্তু কর্কশ ও শুষ্ক। ৩০ নম্বর পর্য্যন্ত টানা ও পোড়েন সূতা প্রস্তুত হইতে পারে। তন্তু দৈর্ঘ্যে ১ ৫/১৬" হইতে ১ ৩/৮" এবং ইহার ব্যাস ১/১৩০০।

আফ্রিক কার্পাস

ইহা আফ্রিকার অন্তর্গত নাটালের দক্ষিণ-পূর্ব্বোপকূলে, আপার গিনির পশ্চিমোপকূলে ও লাইবেরিয়া নামক স্থানে জন্মিয়া থাকে। ইহা উজ্জ্বল, হালকা, স্বর্ণাভ। ইহাতে অল্পাধিক ক্ষুদ্র তন্তু থাকে বটে, কিন্তু আবর্জ্জনা প্রায় থাকে না বলিলেই হয়। ইহার তন্তু মধ্যমরূপ শক্ত এবং ২০ নম্বর পর্য্যন্ত টানা সূতার জন্যই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়। তন্তু দৈর্ঘ্যে ৭/৮" হইতে ১ ৩/১৬" এবং ইহার ব্যাস ১/১২২০"।

আমেরিকার যুক্তরাজ্যে আরও দুই প্রকার বিশেষ গুণবিশিষ্ট কার্পাস উৎপন্ন হয়; যথা বেণ্ডারস্ ও পিলারস্। ইহাদের চাষে খুব যত্ন লওয়া হয়। মিসিসিপি প্রভৃতি উৎকৃষ্ট জমিতে বাছাই বীজ হইতে এই দুইটী কার্পাস উৎপন্ন করা হয়।

বেণ্ডারস্ কার্পাস দীর্ঘ, শক্ত ও মিহি। পিলারস্ কার্পাসও দীর্ঘ, শক্ত এবং সূক্ষ্ম; অধিকন্তু ইহা রেশমের ন্যায় চিক্কণ, কোমল ও দুধের মত সাদা। ইহা সাধারণতঃ মখমল প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়।

মোজা, গেঞ্জি ইত্যাদি বুনিবার জন্য যে সূতা ব্যবহৃত হয় তাহা ব্রাজিল, পেরু ও ব্রাউন মিসরীয় কার্পাস হইতে প্রস্তুত হয়। ব্রাজিলী পেরু কার্পাস হইতে অতি উৎকৃষ্ট শ্বেতবর্ণের মোজা গেঞ্জির সূতা হয় এবং মিসরীয় হইতে "কোপিতা" বা হালকা গেরুয়া রঙ্গের সূতা প্রস্তুত হয়।

কার্পাসের পশমী সূতা প্রস্তুত করিতে ধোলেরা, মোবাইলী ও মার্কিণী কার্পাসের গোদোড় ব্যবহৃত হয়। মখমল প্রস্তুত করিতে শ্বেত মিসরীয় কার্পাসের সূতা ব্যবহৃত হয়। পিলারস্ ও ব্রাউন মিশরীয় কার্পাসও ব্যবহৃত হয়।

মারসারাইসিং—ব্রাউন মিসরীয় কার্পাসই মারসারাইজ্ করার পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

লেস ও ব্রেড—প্রস্তুত করিতে সী-আইল্যাণ্ডী ও মিসরীয় কার্পাস ব্যবহৃত হয়।

সূচীকার্য্যোপযোগী সূতা প্রস্তুত করিতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মিশরীয় ও সী-আইল্যাণ্ডী কার্পাস মাত্রই ব্যবহৃত হয়।

বাণিজ্যার্থ যত প্রকার কার্পাস ব্যবহৃত হয়, গুণানুসারে সী-আইল্যাণ্ডী কার্পাসই তন্মধ্যে প্রথম স্থানীয়। মিসরীয় কার্পাস দ্বিতীয় স্থানীয়। ব্রাজিলী ও পেরুদেশীয় কার্পাস তৃতীয় স্থানীয়। মার্কিন চতুর্থ স্থানীয়। এবং ভারতবর্ষীয় পঞ্চম স্থানীয়। কিন্তু যতপ্রকার কার্পাস উৎপন্ন হয়, পরিমাণ হিসাবে তাহাদিগের মধ্যে মার্কিন কার্পাসই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ভারতীয় কার্পাস দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে, মিসরীয় তৃতীয় স্থানীয়, ব্রাজিলী ও পেরুদেশীয় চতুর্থ স্থানীয় এবং সী-আইল্যাণ্ডী কার্পাসই সর্ব্বাপেক্ষা অল্প উৎপন্ন হইয়া থাকে।

যে সকল বন্দর হইতে উপরিলিখিত কার্পাস ভিন্ন ভিন্ন দেশে আমদানি অথবা রপ্তানি করা হয়, তাহাদের নামও এই স্থানে প্রদত্ত হইল। যথা—

আমেরিকার—নিউইয়র্ক, নিউ অরলিনস্ ও চারলসটন।
ইংলণ্ডের—লিভারপুল ও ম্যাঞ্চেষ্টার।
জর্ম্মাণীর—ব্রীমেন।
ফান্সের—হাভার।
হলণ্ডের—আমষ্টারদাম।
মিশরের—আলেকজান্দ্রিয়া।
ভারতবর্ষের—বোম্বাই।

কোন্ কোন্ দেশে কোন্ কোন্ জাতীয় কার্পাস ব্যবহৃত হয়, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল। যথা :—

আমেরিকায়—মার্কিন কার্পাস ব্যবহৃত হয়।
বিলাতে—মার্কিন ও মিশরীয়।
জার্ম্মাণিতে—মার্কিন ও কিছু ভারতবর্ষীয়।
ফ্রান্সে—ভারতবর্ষীয়।
হলণ্ডে— ঐ
ভারতবর্ষে— ঐ

যে সকল প্রত্যক্ষ লক্ষণ দ্বারা কার্পাসের উৎকর্ষ নিরূপিত হয়, সেগুলি এই স্থানে উল্লেখ করা যাইতেছে ; যথা।—

১। তন্তুর দৈর্ঘ্য। ২। সূক্ষ্মতা। ৩। বর্ণ। ৪। নির্ম্মলতা। ৫। সমত্ব বা সমরূপতা। ৬। শক্তি। ৭। স্থিতিস্থাপকতা। ৮। বাহ্য রূপ।

আনুবীক্ষণিক লক্ষণ—

১। স্বাভাবিক পাক। ২। তন্তুর ত্বকের স্থূলত্ব। ৩। ঘনতা। ৪। সমত্ব। ৫। শূন্যগর্ভতা ইত্যাদি।

এই বিভিন্ন গুণগুলি প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কারণের উপর নির্ভর করে ; যথা :—

১। বীজের প্রকৃতি। ২। জমির প্রকৃতি। ৩। জমি-প্রস্তুত-প্রণালী। ৪। চাষের প্রণালী। ৫। বায়ুর উষ্ণতা ও আর্দ্রতা। ৬। কার্পাস চয়ন ও বীজ পৃথকীকরণ।

এই ছয়টী বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা বারান্তরে করিবার বাসনা রহিল।

জাপানের শিক্ষা-ব্যবস্থা ভারতের উপযোগী কি না ?

[অধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, এম্‌-এ, বি-টি]

কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে জাপান অতি দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে। গত বিশ বৎসরের মধ্যে এই সকল বিষয়ে জাপান এত উন্নতি লাভ করিয়াছে যে, সে আজ পৃথিবীর অন্যান্য বিজ্ঞানোন্নত জাতির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। ভারতের বিপণিশ্রেণী আজ জাপানী দ্রব্যসম্ভারে পরিপূর্ণ। জাপানের এইরূপ আশাতীত বৈষয়িক উন্নতির মূল তাহার সুপ্রণালীবদ্ধ ব্যবহারিক শিক্ষাব্যবস্থা। ভারতও আজ কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ে উন্নতি লাভার্থ ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। কি প্রণালী অবলম্বন করিলে ভারতবর্ষ এ সকল বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে, তাহা এখন দেশবাসী জনসাধারণ ও শাসনকর্তৃপক্ষ উভয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করিতেছেন। অল্প দিন হইল ভারতীয় শিল্প-কমিশনের কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে শিল্প-শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহারা কতকগুলি সুচিন্তিত, লোক-হিতকর প্রস্তাব উপস্থাপন করিয়াছেন। অতএব এ সময়ে জাপানের কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য-ব্যবস্থার আলোচনা অসাময়িক বা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। জাপানের এই শিক্ষা-ব্যবস্থা ভারতের পক্ষে কতটা উপযোগী, তাহা শিক্ষাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বিবেচনা করিবেন।

জাপানে সাধারণ শিক্ষা বিষয়ে যেরূপ আদ্য, মধ্য, উচ্চ, ও কলেজ—এই চারি বিভাগ আছে, ব্যবহারিক শিক্ষা সম্বন্ধেও জাপানে তদ্রূপ চারিটি বিভাগ আছে। ব্যবহারিক শিক্ষার বিভাগগুলি সাধারণ শিক্ষা-বিভাগের সঙ্গে বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। ব্যবহারিক শিক্ষা বলিতে জাপানে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, নৌবিদ্যা, কলাবিদ্যা প্রভৃতি বিষয় বুঝায়। কিন্তু এই প্রবন্ধে শুধু কৃষি, শিক্ষা আলোচিত হইবে।

জাপানে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য বিদ্যালয়গুলি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত—আদ্য বিদ্যালয়, মধ্য বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ। আদ্য বিদ্যালয়গুলি আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—'পরিপূরক' (supplementary) ব্যবহারিক বিদ্যালয় ও "খ" মিতির ব্যবহারিক বিদ্যালয়।

'পরিপূরক' ব্যবহারিক বিদ্যালয়।

(Supplementary Technical Schools)

যে সকল বালক নিম্ন-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (Ordinary Primary School) চারি বৎসরের পাঠ সমাপন করিয়াছে, তাহাদিগকে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য জাপানে এক প্রকার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; ইহাদিগকে 'পরিপূরক' ব্যবহারিক বিদ্যালয় বলা হয়। এই বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ দুই-তিন বৎসর পড়িতে হয়। বিদ্যালয় সাধারণতঃ সন্ধ্যাবেলায় বসে; কারণ, ইহাদের নিজ গৃহ নাই বলিয়া, ইহারা সন্ধ্যাবেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়-গৃহগুলিই ব্যবহার করে। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের অধিকাংশই দিনের বেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। অবশ্য এই সকল শিক্ষককে অবকাশ সময়ে ব্যবহারিক বিদ্যালয়ে পাঠ করিয়া 'পরিপূরক' বিদ্যালয়ের শিক্ষাকতা-কার্য্যের উপযোগী শিক্ষা লাভ করিতে হয়।

এই বিদ্যালয়ে জাপানী ভাষা, গণিত ও নীতি সম্বন্ধে পাঠ গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু ব্যবহারিক শিক্ষার প্রতিই এখানে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি হইতে ব্যবহারিক শিক্ষার বিষয়গুলি ইচ্ছামত বাছিয়া লইতে হয়—

(১) শিল্প-বিদ্যা—পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন-বিদ্যা, চিত্রাঙ্কন, ক্ষেত্রতত্ত্ব, যন্ত্রাদির চিত্রাঙ্কন (Mechanical Drawing), আদর্শানুযায়ী কাঠের কাজ (Wood-modelling), নক্‌শা প্রস্তুত করণ (Designing), গতিবিজ্ঞান (Dynamics), যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করণ।

(২) কৃষি-বিদ্যা—পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন, জীব-বিদ্যা (Natural History), ভূবিদ্যা (Soils), ভূমির সার, চাষের প্রণালী, চাষের যন্ত্র, শস্যহানিকর কীট পতঙ্গ, শস্যের ব্যাধি, উদ্যান করণ (Horticulture), পশু-পালন, জরিপের কাজ (Surveying)

(৩) বাণিজ্য-বিদ্যা—বাণিজ্য সংক্রান্ত গণিত ও চিঠিপত্র, পণ্যদ্রব্য, ভূগোল, হিসাবপত্র (Book-keeping), বাণিজ্য-বিষয়ক আইন, বৈদেশিক ভাষা, ইত্যাদি।

"খ"মিতির ব্যবহারিক বিদ্যালয়।

(Technical School of Class "B")

প্রাথমিক ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদানের জন্য জাপানে আর এক প্রকার আদ্য ব্যবহারিক বিদ্যালয় আছে। ইহাদিগকে "খ" মিতির ব্যবহারিক বিদ্যালয় বলা যাইতে পারে। এই "খ"মিতির বিদ্যালয়ে স্থানীয় প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা অনুসারে কোথাও বা কৃষি, কোথাও বা বাণিজ্য, আর কোথাও বা শিল্প-কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হয়। এই সকল বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে হইলে, শিক্ষার্থীকে উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষের পাঠ সমাপন করিতে হয়। দ্বাদশ বৎসর বয়সের নিম্নবয়স্ক বালককে এখানে লওয়া হয় না। এখানে ৩।৪ বৎসর অধ্যয়ন করিতে হয়। এই বিদ্যালয়গুলি 'পরিপূরক' ব্যবহারিক বিদ্যালয় অপেক্ষা উন্নততর। ইহাদের নিজেদের বিদ্যালয়-গৃহ এবং নিজেদেরই শিক্ষক আছে। সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের সাহায্যে ইহার কার্য্য পরিচালিত হয় না।

মধ্য ব্যবহারিক বিদ্যালয়

পূর্ব্বোক্ত ব্যবহারিক বিদ্যালয় অপেক্ষা উন্নততর আর এক প্রকার ব্যবহারিক বিদ্যালয় আছে। ইহাদিগকে 'খ'মিতির ব্যবহারিক বিদ্যালয় বলা হয়। বিভিন্ন স্থানের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে এখানেও কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদত্ত হয়। উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপনান্তে চতুর্দ্দশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া এই সকল বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে হয়। এখানে অধ্যয়নকাল সাধারণতঃ ৩।৪ বৎসর।

উচ্চ ব্যবহারিক বিদ্যালয়।

উচ্চ ব্যবহারিক বিদ্যালয়ে প্রবেশার্থী যুবকগণকে সাধারণ মধ্য বিদ্যালয়ের (Middle School) পাঠ সমাপন করিতে হয়। মধ্য ব্যবহারিক বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করিয়াও তাহারা এ সকল বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারে। এই বিদ্যালয়ে প্রবেশকালে শিক্ষার্থীর বয়স ১৭র উপরে হওয়া আবশ্যক। এখানে সাধারণতঃ ৪ বৎসর অধ্যয়ন করিতে হয়। কোন কোনও বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকাল ৪ বৎসরেরও অধিক।

কলেজ বিভাগ।

উচ্চ ব্যবহারিক বিদ্যালয় অপেক্ষা উচ্চতর আর এক প্রকার বিদ্যালয় আছে। উহাদিগকে 'কলেজ' আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। এখানে প্রবেশ করিতে হইলে, শিক্ষার্থীকে সাধারণ বিভাগে বিশ বৎসর পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া জাপানের উচ্চ বিদ্যালয়ের (আমাদের প্রথম শ্রেণীর কলেজের তুল্য) পাঠ সমাপন করিতে হয়। এই প্রকার কলেজে সাধারণতঃ তিন বৎসর অধ্যয়ন করিতে হয়।

সুতরাং আমরা দেখিতে পাই যে, জাপানে সাধারণ শিক্ষার প্রত্যেক স্তরের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি ব্যবহারিক শিক্ষার স্তর বিন্যস্ত রহিয়াছে। আমাদের দেশে, বালক নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয় ভিন্ন শিক্ষালাভের দ্বিতীয় স্থান দেখিতে পায় না। কৃষকের সন্তানই হউক, বা শিল্পীর সন্তানই হউক, বা ব্যবসায়ীর সন্তানই হউক, বা মসীজীবী মধ্যবিত্ত লোকের সন্তানই হউক, সকলকেই, শিক্ষালাভ করিতে হইলে, সেই উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আশ্রয় লইতে হয়; তারপর মধ্য বিদ্যালয়, তারপর উচ্চ বিদ্যালয়। এইরূপে সকলকেই এক যন্ত্রে পিষ্ট হইতে হয়। তাই, যে কৃষক কৃষি-ব্যাপারে তাহার সন্তানের সাহায্য পাইতে ইচ্ছুক, সে সন্তানকে কৃষি-বিষয়ে শিক্ষা প্রদানের আর উপায় নাই দেখিয়া, বাধ্য হইয়া তাহাকে নিজ গৃহে লইয়া আসে। এইখানেই হয় ত বালকের শিক্ষার পরিসমাপ্তি হয়। অপর কোনও কৃষক হয় ত পুত্রকে উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রেরণ করে। সেখানে পাঠ সমাপনান্তে বালক ধীরে-ধীরে উচ্চ হইতে উচ্চতর বিদ্যালয়ে প্রেরিত হয়। এইরূপে পিতার বহু অর্থব্যয়ে শিক্ষিত হইয়া পুত্র যখন গৃহে প্রত্যাগত হয়, তখন সে পিতাকে কৃষিকার্য্য বিষয়ে সহায়তা করিতে অবমাননা বোধ করে। অথচ সামান্য কৃষিকার্য্য করিয়া পিতা যেরূপ সুখে-স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করে, পুত্র শিক্ষিত হইয়াও তদনুরূপ অর্থোপার্জ্জনে অক্ষম হয় এবং অতৃপ্ত ও অনুতপ্ত জীবন যাপন করে। শিক্ষা-ব্যবস্থার দোষেই দিন-দিন সমাজমধ্যে এইরূপ অসন্তোষের ও দুঃখ-দৈন্যের সৃষ্টি হইতেছে। এই মন্তব্য কৃষক-সন্তানের শিক্ষা সম্বন্ধে যেরূপ প্রযোজ্য, শিল্পী ও ব্যবসায়ীর সম্বন্ধেও তদ্রূপ প্রযোজ্য।

জাপানের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অন্যরূপ। নিম্ন-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চারি বৎসরের বশ্যতামূলক পাঠ সমাপন করিয়াই, বালক সম্মুখে বহু পথ উন্মুক্ত দেখিতে পায়। সে দেখিতে পায়, তাহার জন্য সাধারণ বিভাগ উন্মুক্ত রহিয়াছে; কৃষি-বিভাগ, বাণিজ্য-বিভাগ, শিল্প-বিভাগ প্রভৃতি তাহার সম্বর্দ্ধনার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। আবার সাধারণ বিভাগের উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুই বৎসর অধ্যয়ন করিয়া, সে আর একপ্রকার শিল্প কৃষি-বাণিজ্য বিদ্যালয় তাহার জন্য উন্মুক্ত দেখিতে পায়। তারপর উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চারি বৎসরের পাঠ সমাপন করিয়া, সে আবার আর এক প্রকার কৃষি শিল্প বাণিজ্য বিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকার পায়। তারপর মধ্য-বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করিয়াও সে উচ্চ কৃষিশিল্প-বাণিজ্য বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারে, অথবা তারপর মধ্যবিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করিয়া সে কৃষি শিল্প-বাণিজ্য কলেজে অধ্যয়ন করিতে পারে। এইরূপে যে কোনও স্তরের সাধারণ শিক্ষার অন্তে শিক্ষার্থী মনোমত বিভাগ নির্ব্বাচন করিতে সুযোগ পায়; আমাদের দেশের ন্যায় সকল ছাত্র শুধু চাকুরী বা বারের (Bar) দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে না।

এখন আমি একে একে জাপানের কৃষিশিল্প-বাণিজ্য বিদ্যালয়গুলির বিশেষ বিবরণ প্রদান করিব।

কৃষি-বিদ্যালয়।

'পরিপূরক' কৃষি-বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয়ের কথা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। সেখানে কৃষি বিষয়ের শিক্ষা বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে প্রদত্ত হয় কি না সন্দেহ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রদত্ত পাঠের পরিপূরণ (supplement) করাই এই বিদ্যালয়গুলির প্রধানতম উদ্দেশ্য। কিন্তু "খ"মিতির কৃষি বিদ্যালয়ে (Agricultural School Class B) বিষয়গুলি রীতিমত পঠিত হয়। সুতরাং এই 'খ'মিতির বিদ্যালয়গুলিকেই আদ্য কৃষি বিদ্যালয় বলা সঙ্গত। 'ক'মিতির কৃষি-বিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় বিষয়গুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। সাধারণ বিষয় ও কৃষি বিষয়। নীতি শিক্ষা, জাপানী ভাষা, গণিত, বিজ্ঞান, এবং ড্রিল সাধারণ বিষয়ের অন্তর্গত। ইহা ছাড়া ইতিহাস, ভূগোল, অর্থশাস্ত্র (Political Economy) এবং চিত্রাঙ্কনও সাধারণ বিষয়রূপে ইচ্ছানুসারে পঠিত হইতে পারে। কৃষি সংক্রান্ত বিষয়ের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের মৃত্তিকা, ভূমির সার, কৃষিজাত দ্রব্য, শস্য-হানিকর কীটপতঙ্গ, পশুপালন প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানার্জ্জন করিতে হয়।

এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কাল সাধারণতঃ তিন বৎসর। কিন্তু যে

সকল শিক্ষার্থী এই কৃষি বিদ্যালয় হইতে উচ্চ কৃষি বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে চায়, তাহাদিগকে তিন বৎসরের অতিরিক্ত আরও কতক সময় এই বিদ্যালয়ে বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করিতে হয়। এইরূপ অধিকাংশ বিদ্যালয়ের সংলগ্ন কয়েক বিঘা জমী থাকে। সেই বিদ্যালয়-সংলগ্ন জমীতে ছাত্রগণ নিজে শাকশব্জী ও ধান্যাদি শস্য রোপণ করে। কতক পরিমাণ ভূমি গোচারণ জন্যও ব্যবহৃত হয়।

উচ্চ কৃষি-বিদ্যালয়।

এই শ্রেণীর সকল বিদ্যালয়ের অধ্যয়ন-কাল সমান নয়। জাপান যে চারিটি দ্বীপ লইয়া গঠিত, তাহাদের মধ্যে সর্ব্বোত্তরস্থ দ্বীপটীকে হকিডো (Hokkaido) বলে। এই দ্বীপের রাজধানী সেপোরোতে (Sapporo) একটী প্রসিদ্ধ কৃষিবিদ্যালয় আছে। সেখানে সর্ব্বশুদ্ধ ৬ বৎসর অধ্যয়ন করিতে হয়। প্রথম দুই বৎসরকে শিক্ষানবিশীর কাল বলা যাইতে পারে (Preparatory Course)। চারি বৎসরই প্রকৃত অধ্যয়ন কাল। (Main Course)।

শাখাবিভাগের অধ্যয়নের বিষয়।
(Preparatory Course)

প্রথম বর্ষ—নীতি-শিক্ষা, জাপানী ভাষা, চীনের ভাষা, ইংরেজী জার্ম্মাণ, ইতিহাস (বর্ত্তমান), বীজগণিত ও ত্রিকোণমিতি, পদার্থ বিদ্যা, জড়-রসায়ন (Inorganic Chemistry), চিত্রাঙ্কন ও ড্রিল।

দ্বিতীয় বর্ষ—নীতি শিক্ষা, জাপানী, চীনা, ইংরেজী ও জার্ম্মাণ ভাষা, সমীকরণ (Equation), বিশ্লেষণ মূলক ক্ষেত্রতত্ত্ব (Analytical Geometry) সার্ভেইং, প্রাণিতত্ত্ব (Zoology), উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব, খনিজ তত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা, জৈব-রসায়ন (Organic Chemistry) এবং ড্রিল।

প্রধান বিভাগের অধ্যয়নের বিষয়:—
(Main Course)

প্রথম বর্ষ—কৃষিবিষয়ক সাধারণ জ্ঞান (General outline of Agriculture), বিশ্লেষণমূলক রসায়ন (Analytical Chemistry), শস্যের বলকারক খাদ্য (Nutrition of plants), মৃত্তিকা (Soils), যন্ত্রপাতি, শাকশব্জী সম্বন্ধীয় বিদ্যা (vegetable histology), কৃষিজাত পদার্থবিদ্যা, (Agricultural physics), তুলনামূলক শরীর-ব্যবচ্ছেদ-বিদ্যা (Comparative Anatomy of Animals), উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব ও প্রাণিতত্ত্ব সম্বন্ধে পরীক্ষামূলক জ্ঞান (Experiments in plants and in animals).

দ্বিতীয় বর্ষ—অর্থশাস্ত্র ও আইন সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান, ভূমির সার, ভূমির উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি-চেষ্টা, (Improvement of Soils) উদ্ভিদ্-ব্যাধি-বিজ্ঞান (Pathology), জীব-শরীর-বিদ্যা ও ভ্রূণতত্ত্ব (Animal Physiology and Embryology), পতঙ্গাদি বিষয়ক বিদ্যা (Entomology), কৃষিবিষয়ক যন্ত্রবিদ্যা (Agricultural Engineering) এবং কৃষিবিষয়ক ইতিহাস। (History of Agriculture)।

দ্বিতীয় বর্ষের অন্তে ছাত্রকে নিম্নলিখিত বিষয়ের যে-কোন একটীর সম্বন্ধে ব্যবহারিক (Practical) শিক্ষা লাভ করিতে হয়—জীবজন্তু পালন ও পোষণ সম্বন্ধীয় বিদ্যা (Zoo-techny), কৃষিবিষয়ক ব্যবহারিক বিদ্যা (Agricultural Economics), কৃষিবিষয়ক রসায়ন (Agricultural Chemistry), উদ্ভিদ সম্বন্ধীয় ব্যাধি-বিজ্ঞানপতঙ্গ-বিষয়ক বিদ্যা রেশমের চাষ-আবাদ (Sericulture) ইত্যাদি।

তৃতীয় বর্ষ—বিশিষ্ট প্রকৃতির শস্য (Special Crops), উদ্যান-কর্ষণ (Horticulture), কৃষিবিষয়ক ব্যবহার-বিদ্যা (Agricultural Economy), জীবজন্তু পালন ও পোষণ বিদ্যা (Zoo-techny), গৃহপালিত পশু সম্বন্ধীয় শারীর-বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য-তত্ত্ব (Physiology and Hygiene of Domestic Animals), পশু-পালন (Feeding of Animals), রেশমের চাষ, অরণ্য-রক্ষণ-কার্য্যের সাধারণ জ্ঞান (Elements of Forestry), মৎস্য পালন সম্বন্ধীয় সাধারণ জ্ঞান (Elements of Fishery), বীজাণুতত্ত্ব (Bacteriology), এবং কার্য্যকরী শিক্ষা (Practical Works)।

চতুর্থ বর্ষ—জীবজন্তু পালন ও পোষণ বিদ্যা (Zoo-techny), পশু-চিকিৎসার মূল তত্ত্ব (Elements of Veterinary medicine), কৃষি-বিষয়ক পারিভাষিক শব্দের ব্যাখ্যা (Agricultural Technology) ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত ব্যবহারিক শিক্ষা ও প্রদত্ত হয়, এবং অধ্যয়ন শেষে ছাত্রকে মৌলিক গবেষণা-পূর্ণ প্রবন্ধ লিখিতে হয়।

বিশ্ব-বিদ্যালয় পরিচালিত কৃষি কলেজ।

রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংশ্রবে কৃষি কলেজও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। টকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়-সংশ্লিষ্ট এরূপ একটী কলেজ আছে। সাধারণ বিভাগের উচ্চ বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করিয়া শিক্ষার্থী সেখানে প্রবেশাধিকার পায়। সেই কলেজে তাহাকে তিন বৎসর পড়িতে হয়। পাঠ্য বিষয়গুলি সেপোরো (Sapporo) উচ্চ কৃষি-বিদ্যালয়ের প্রায় অনুরূপ। উক্ত বিষয় ব্যতীত এখানে বিজ্ঞানাগারে ও কৃষিক্ষেত্রে (Farm) হাতে কলমে কার্য্যকরী শিক্ষা লাভ করিতে হয়।

জরথুশ্‌ত্রের জীবনী ও ধর্ম্ম-মত

[শ্রীহেমন্তকুমার সরকার, বি-এ,]

পার্শীদিগের ধর্ম্ম-সংস্থাপকের নাম জরথুশ্‌ত্র। এই নামের মূল অর্থ—স্বর্ণের ন্যায় যাঁহার ভাতি,—এক কথায় হিরণ্যজ্যোতিঃ। গ্রীকেরা

জরথুশ্‌ত্রকে Zoroaster (জোরোয়াস্তার) বলিতেন—ইংরেজরাও তাহাই বলেন।

জরথুশ্‌ত্রের জন্ম-তারিখ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। তবে খৃঃ পূঃ ৬৬০ অব্দে তাঁহার জন্ম ও ৫৮৩ অব্দে মৃত্যু,—এই তারিখ অনেকটা ঠিক বলিয়া ধরা যাইতে পারে। তাহা হইলে বলিতে হইবে, জগতের ধর্ম্মের ইতিহাসের এক মাহেন্দ্রক্ষণে জরথুশ্‌ত্র ধরাতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—কেন না খৃঃ পূঃ ৫ম-৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতে বুদ্ধ, চীনে কন্‌ফুসিয়স্‌ ও গ্রীসে সক্রেটিস্‌ অবতীর্ণ হন।

পারস্যদেশের অন্তর্গত আদরবাইজান নামক স্থানে জরথুশ্‌ত্রের জন্ম হয় এবং তাঁহার বাল্যকাল তথায় অতিবাহিত হয়। তাঁহার মাতার নাম 'দুঘধোবা' ছিল। জরথুশ্‌ত্রের মাতুল-বংশ তিহরাণের নিকটবর্ত্তী মিদিয়ার অন্তর্ভুক্ত 'রাই' নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল 'পৌরুশস্প' (পুরু, বহু, অস্প, অশ্ব, আছে যাহার অর্থাৎ বহুঅশ্বসমন্বিত)। তাঁহাদের গোষ্ঠীগত উপাধি ছিল 'স্পিতম' (সংস্কৃত-শ্বেততম)।

জরথুশ্‌ত্রের স্ত্রীর নাম 'হ্বোবী'। নৃপতি বিস্তাস্পের রাজসভার কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির তিনি কন্যা ছিলেন। এই বংশের দুই ভ্রাতা—ফ্রষওশত্র ও জামাস্প—জরথুশ্‌ত্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে ধর্ম্মপ্রচারে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। ফ্রষওশত্র তাঁহার শ্বশুর ছিলেন, আবার এদিকে জামাস্প তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইসৎ-বাস্ত্র, উর্বতাৎ-নর, হ্বরে-চিথ্র নামে জরথুশত্রের তিন পুত্র ছিল; এবং ফ্রেনী, থ্রিতি ও পৌরুচিশতি নামে তিন কন্যাও ছিল।

জরথুশ্‌ত্র ধর্ম্ম প্রচারের জন্য প্রাচ্যইরাণে (Bactria) গমন করেন এবং অনেক নৈরাশ্য ও বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বিস্তাস্প নামক নরপতিকে নিজ ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। তৎপরে তিনি পূর্ণ সফলতা লাভ করিয়া স্বদেশে নিজ মত প্রচার করিতে ব্রতী হন। খৃষ্ট-ধর্ম্মের ইতিহাসে রোমাণ সম্রাট কনস্তানতাইনের যে স্থান—পারসীক ধর্ম্মে নৃপতি বিস্তাস্পেরও সেই স্থান।

জরথুশ্‌ত্রের সম্বন্ধে পরে অনেক গল্প প্রচলিত হইয়াছে। সেগুলির উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কথিত আছে—তিনিই একমাত্র মানবশিশু, যিনি জন্ম গ্রহণ করিবামাত্রই হাসিয়াছিলেন।

এখন জরথুশত্রের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে কিছু বলিব। তাঁহার ধর্ম্মে জগদীশ্বরের নাম অহুর মজদা। অহুর মানে সংস্কৃত—অসুরঃ, অসূন্‌ প্রাণান্‌ রাত দদাতি ইতি—ইং, The Life-giver; আর মজদা=সং মেধস্‌, ইং omniscient—সুতরাং সমস্ত কথাটার মানে দাঁড়াইল—The omniscient Life-giver, The Wise Lord। জরথুশ্‌ত্রের সময় কখনও অহুর, কখনো মজদা, কিম্বা অহুর মজদা শব্দদ্বয় একসঙ্গে পরমেশ্বরার্থে ব্যবহৃত হইত। পরে অহুর মজদা সর্ব্বত্রই একত্র ব্যবহৃত হইত। পারসিক সম্রাট দরায়ুস (খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দী) অরমুজাদ শব্দটী ব্যবহার করিয়াছেন।

জরথুশ্‌ত্রের চিন্তা-প্রণালী অতি সূক্ষ্ম ধরণের। সদসতের বিচার-বুদ্ধিই তাঁহার মতে জীবনের শ্রেয়তম জ্ঞান। ঈশ্বরে মানবীয় ধর্ম্মের আরোপ করিয়া পূজা, কিম্বা প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের পূজা তিনি গর্হিত বলিয়া মনে করিতেন। প্রাচীন ইরাণীয় আর্য্যগণের ন্যায় তাঁহার চিন্তা-প্রণালী সোজাসুজি রকমের ছিল। তাহাতে দুর্ব্বোধ্যতা, অজ্ঞেয়তা কিম্বা অবাস্তবতার স্থান ছিল না। সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাস অবলম্বনেও তাঁহার মত ছিল না। সু-চিন্তা, সু-বাক্য ও সু-কর্ম্ম—এই তিনটিই জীবনের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। বৃথা যাগ-যজ্ঞ, পূজানুষ্ঠান কিম্বা তপঃক্লেশে তাঁহার ধর্ম্ম সাধন হইবে না। পরিশ্রমের সহিত চাষ-বাস কর, প্রবঞ্চনা ও মিথ্যাকে হৃদয়ের সহিত ঘৃণা কর এবং অহুর মজদার জীবগণের প্রতি দয়া দেখাও—ইহাই তাঁহার ধর্ম্ম-কথার সার মর্ম্ম।

মিথ্র (সং সূর্য্য দেবতা মিত্র), অনাহত (সং অনাহিত, নদী-দেবতা বিশেষ), ফ্রবশী (সূক্ষ্মাত্মা), বেরেথ্রঘ্ন (সং বৃত্র হন্‌), হওম (সং সোম) প্রভৃতি দেবতার পূজা জরথুশত্রের পূর্ব্বে এবং তৎপরে ইরাণ-বাসীর মধ্যে বহুল প্রচলিত ছিল, কিন্তু জরথুশ্‌ত্রের প্রচারিত ধর্ম্মে এ সকলের স্থান ছিল না। এমন কি ঐরূপ অনেক দেবতার নাম 'দক্র' অর্থাৎ দৈত্য দেওয়া হইয়াছিল।

কৃষ্ণের যেমন শত নাম অহুর মজদারও সেইরূপ অনেকগুলি নাম আছে। জরথুশ্‌ত্র অহুর মজদা ব্যতীত আরো ছয়টি দেবতার পরি-কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু এইগুলিকে ভিন্ন দেবতা না বলিয়া অহুর মজদার বিভিন্ন প্রকাশমাত্র বলিলেই সঙ্গত হয়। সৃষ্টি-শক্তি যেমন ব্রহ্মা হইতে ভিন্ন নয়, পালনী-শক্তি যেমন বিষ্ণু হইতে ভিন্ন নয়—সেইরূপ এইগুলিও অহুর মজদা হইতে ভিন্ন নয়। ইহাদিগের নাম অমেষস্পেন্ত—সং 'অমৃত পবিত্র'—The Immortal Holy Ones। ইহাদের অনেকের নামের আগে অহুর অর্থাৎ Life-giver বিশেষণটি দেখিতে পাওয়া যায়। স্বয়ং মজদাও সময়ে-সময়ে অমেষস্পেন্ত সমূহের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। এই সকল দেবতা মর্ত্ত্যরাজ্যের এক-একটি বিভাগের অধিষ্ঠাত্রী। প্রবন্ধান্তরে এই সপ্ত দেবতার পরিচয় দেওয়া যাইবে।

সপ্তপদী গমন

(বৈদিক মন্ত্র হইতে অনূদিত)

[শ্রীকিরণচাঁদ দরবেশ]

বর

বিষ্ণুরূপ আমি প্রিয়ে! গৃহে মোর যত
আহার্য্য-সামগ্রী আছে, সে সব নিয়ত
তোমার সেবার লাগি নিয়োজিত রবে;
আজি হ'তে তুমি গৃহ-অধিষ্ঠাত্রী হবে।
প্রথম চরণ-ক্ষেপ মম গৃহপানে
কর দেবি!

বধূ

আনন্দ-তরঙ্গ বহে প্রাণে
প্রাণনাথ! শুনি মধু বচন তোমার।
ধন-ধান্য-ব্যাঞ্জনাদি মিষ্টান্ন-সম্ভার,
তোমার যা' কিছু আছে,—সকলি আমার!

বর

বিষ্ণু-রূপ আমি প্রিয়ে! বহিবারে ভার
একান্ত সক্ষম আমি। সচ্ছন্দ-অন্তরে—
দ্বিতীয় চরণ-ক্ষেপ কর মোর ঘরে।

বধূ

চিরদিন শক্তি-রূপে বিরাজিব আমি,—
তব বাম-পার্শ্বভাগে। হে আমার স্বামি!
দুঃখে ধৈর্য্য ধরি, হয়ে হৃষ্ট-চিত্তা সুখে,
তোমার কুটুম্বগণে নিত্য হাস্য-মুখে
নিয়ত করিব সেবা।

বর

বিষ্ণু-রূপ আমি।
একান্ত নির্ভয়ে তুমি হও অনুগামী—
তৃতীয় চরণ-পাতে। মোর বিত্ত যত,
নিয়োজিত রবে তব সেবায় সতত।

বধূ

কি আর কহিব প্রিয়! ধন-ধান্য দিয়া
তুষিয়াছ মোরে তুমি! এ আমার হিয়া
একান্ত তোমারি রবে। ভ্রম-বশে কভু,
পর-পুরুষের মুখ হেরিব না প্রভু!
ঋতু-স্নাতা শুদ্ধা শুচি হইয়া, তোমারে
তুষিব একান্ত নাথ! মন্মথ-বিহারে।

বর

ধীরে—সতি, ধীরে!—চতুর্থ চরণ ফেলে
মোর গৃহ-পানে. চল সুখে অবহেলে।
তবালোকে লুকাইবে আঁধারের রাত্রি,
সকল সুখের মোর তুমি অধিষ্ঠাত্রী।

বধূ

প্রতিদিন দিব্য গন্ধ করিব লেপন
মোর এই বর-অঙ্গে,—তোমার কারণ।
প্রস্ফুট কুসুমে মাল্য করিয়া রচনা,
সাজিয়া মোহিনী-সাজে পুরা'ব কামনা।
কাঞ্চন-ভূষণে নিত্য বাঁধিয়া কবরী,
প্রতীক্ষা করিয়া র'ব দিবস-সর্ব্বরী।

বর

মোর গৃহে আছে প্রিয়ে! যত পশুপাল,
আজি হ'তে তব বাধ্য রবে চিরকাল।
গো-মহিষ সেবা-রতা তুমি, হাস্যমুখে—
প্রতিদিন দুগ্ধ মোরে পিয়াইবে সুখে।
পঞ্চম চরণ-ক্ষেপ কর পথ চিনে;
আজি হ'তে পশুপাল তোমারি অধীনে।

বধূ

তোমার সর্ব্বস্ব মোরে করিলে প্রদান!
কে আছে ভুবনে বঁধু, তোমার সমান?
প্রিয় সখীগণ সাথে একান্ত যতনে,
নিত্য নিয়োজিত র'ব গৌরী-আরাধনে।
সতীর চরণ-পূজি, সতীত্ব লভিয়া,
তোমাতে অচলা ভক্তি লইব মাগিয়া।

বর

গ্রীষ্ম, বর্ষা, কি শরৎ, হেমন্ত, বা শীত,
বসন্ত ঋতুর প্রিয়ে! যা কিছু সম্বিৎ,
আজি হ'তে তারা রবে অধীন তোমার।
ষড়-ঋতু-অধিষ্ঠাত্রী, হে কর্ত্রী আমার!
সুখে ষষ্ঠ পদক্ষেপ, কর গৃহ-পানে।

বধূ

যোগ্য যেন হই নিতে তোমার এ দানে।
যজ্ঞ, হোম, দান আদি যত অনুষ্ঠান,
সর্ব্ব কার্য্যে তব বামে করি অধিষ্ঠান
সম্পাদিব মনের হরষে! যা' করাবে
তুমি, তব অনুগামী আমি,—সেই ভাবে—
করিব পালন। আমি তব অর্দ্ধাঙ্গিনী,
আমি তব দাসী!

বর

প্রিয়তমা লো সঙ্গিনি!
এ মহা-মুহূর্ত্তে তুমি এস সপ্ত-পদ।
ভূ-আদি এ সপ্ত-লোকে যা' কিছু সম্পদ,
তোমার অধীন হোক্। আমি বিষ্ণু-রূপ!
হে অনুগামিনি! তুমি বুঝিয়া স্বরূপ,
এস মোর গৃহমাঝে, এস গৃহলক্ষ্মী!

বধূ

অন্তরীক্ষে দেবগণ রহিলেন সাক্ষী!
তুমি—তুমি—তুমি মম ভর্ত্তা প্রাণ-পতি!
সুখে দুখে এ জনমে আমি চির-সাথী।

সহযোগী সাহিত্য

পৃথিবীর জন্ম-কথা

[শ্রীবারেন্দ্রনাথ ঘোষ]

'য়্যাষ্ট্রনমিক্যাল সোসাইটী অব-ইণ্ডিয়া'র তরফ থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-কমিশনের সদস্য, অধ্যাপক জে, ডবলিউ, গ্রেগরী "পৃথিবীর জন্ম-কথা" (Genesis of the Earth) সম্বন্ধে ড্যালহাউসী ইনষ্টিটিউটে একটী বক্তৃতা করেছিলেন। এই বক্তৃতায় আমাদের জানবার অনেক কথা আছে।

আমরা যে পৃথিবীতে বাস করছি, এই পৃথিবীটার জন্ম কেমন করে হ'ল, তা' জানবার জন্যে মানুষের মনে অনেক দিন থেকে কৌতূহল আছে। আর, এর একটা মীমাংসা করবার জন্যে অনেক বড়-বড় পণ্ডিত অনেক মাথা ঘামিয়ে এক-একটা থিয়োরী খাড়া করেছেন। এঁদের মধ্যে লাপলাস (Laplace) নামক একজন মহাপণ্ডিত যে থিয়োরীটা খাড়া করেছিলেন, সেটার নাম nebular theory; অর্থাৎ, প্রথমে পৃথিবী বাষ্প বা চলিত কথায় ধোঁয়া ছিল। পরে জমাট বেঁধে বর্ত্তমান আকার ধারণ করেছে। আর, সার নরম্যান লকইয়ার (Sir Norman Lockyer) নামে আর একজন পণ্ডিত আর একটা থিয়োরী খাড়া করেন; সেটা হচ্চে, পৃথিবী কতকগুলা উল্কাপিণ্ডের সমষ্টি মাত্র। অধ্যাপক গ্রেগরী তাঁর বক্তৃতায় যা' বলেছেন, তার সার মর্ম্ম এই যে, লাপ্‌লাসের থিয়োরী-মতে পৃথিবী যেমন ধোঁয়াটে পদার্থ থেকে জন্মে কঠিন হয়ে পৃথিবী হয়েছে,—ঐ থিয়োরীটাও তেমনি ধোঁয়াটে, ওর ভিতর থেকে স্পষ্ট কিছু বোঝবার যো নেই;—থিয়োরীটা ধোঁয়ার মত,—মানুষের জ্ঞানবুদ্ধির কাছে তেমন ধরা দেয় না। আর

উল্কাপিণ্ড থেকে পৃথিবীর উৎপত্তি হয়েছে, এই যে থিয়োরীটা, এটা জড় পদার্থের মতন স্পষ্ট এবং এটাকে বেশ ধরা-ছোঁয়াও যায়।

এ রকম গুরু বিষয়ে কেবল থিয়োরী খাড়া করাই যথেষ্ট নয়; বিনা সাক্ষ্য-প্রমাণে এ সকল থিয়োরী পণ্ডিত-মহলে গ্রাহ্য হবার যো নেই। অধ্যাপক গ্রেগরী সেই জন্যে তাঁর থিয়োরী সমর্থন করবার জন্যে অনেক প্রমাণও হাজির করেছেন। সেই সকল প্রমাণ থেকে তিনি এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, যে সকল উল্কায় লোহার ভাগ বেশী, পৃথিবী সেই সব উল্কার মতন; পৃথিবীটার ভিতরেও খুব বেশী রকম ধাতব পদার্থ আছে।

প্রমাণগুলোকে মোটামুটি তিন ভাগ করা যেতে পারে। (১) পৃথিবীর ভার খুব বেশী। এ থেকে এই প্রমাণ হয় যে, পৃথিবীর শাঁসটা খুব ভারী; আর, খোঁসাটা তার চেয়ে হাল্‌কা; অর্থাৎ ধাতুময় পদার্থগুলা অন্য জিনিসের চেয়ে বেশী ভারী বলে', মাধ্যাকর্ষণের টানে ভিতরের দিকে গিয়ে পড়েছে; আর, হাল্‌কা জিনিসগুলো উপরে ভেসে রয়েছে বলে সেগুলো দিয়ে পৃথিবীর আবরণটা গড়ে উঠেছে। (২) পৃথিবীর যেটুকু কিরণ বিতরণ করবার শক্তি আছে, সেই কিরণ যে সকল জিনিস থেকে বেরোয়, সেই সব পদার্থ পৃথিবীর ঐ পাতলা আবরণটার মধ্যেই আছে; আর যে সকল উল্কা নিকেল-লোহায় গড়া, তা' থেকে যেমন কোনও কিরণ বেরোয় না, পৃথিবীর শাঁসটা যে সকল জিনিসে গড়া, সেগুলা থেকেও তেমনি কোন কিরণ বেরোয় না। (৩) পৃথিবীতে মাঝে-মাঝে যে ভূমিকম্প হয়, তা' থেকে এই প্রমাণ হয় যে, পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে ভিতরের দিকে ৫০ কি ৬০ মাইল গেলেই, তার খোসায় পাথরের অংশের বদলে এমন ঘনীভূত পদার্থ দেখা যায়, যার ধর্ম্ম ঠিক ধাতুর মত।

এই সকল প্রমাণের আলোচনা করে' অধ্যাপক গ্রেগরী সিদ্ধান্ত করেছেন যে, পৃথিবীটা একটা গোলাকার লৌহ-পিণ্ড, এখনকার কামানের গোলার মত খুব কঠিন; আর ঐ লৌহের সঙ্গে (৩০ ভাগে ১১ ভাগ) কিছু নিকেল মিশানো আছে। এই প্রকাণ্ড লৌহময় কামানের গোলার উপর একটা পাতলা পাথরের আবরণ আছে; যাকে পৃথিবীর খোসা বলা যেতে পারে। পণ্ডিতেরা সাধুভাষায় তার নাম দিয়েছেন, ভূপঞ্জর। এই খোসাটার মস্‌লা কোথা হতে এল? খনি থেকে ধাতু বার করে নিলে সেটা যেমন আর-পাঁচটা জিনিসের সঙ্গে মেশানো অবস্থায় থাকে,—তার পর তাকে গলিয়ে ধাতুটা বার করে নিলে যেটা বাকী পড়ে থাকে, সেটা যে জিনিস, পৃথিবীর উপরকার কঠিন খোলাটার মস্‌লাও প্রায় সেই রকম একটা জিনিস, পৃথিবীর গর্ভ থেকে ওরই কোন শক্তিতে বাইরে বেরিয়ে এসেছে।

তা'হলেই দেখা যাচ্ছে, যদি অসংখ্য উল্কা জমাট বেঁধে গিয়ে এই পৃথিবী তৈরী হয়ে থাকে, তা'হলে তার যে রকম অবস্থা হওয়া উচিত, তার সঙ্গে থিয়োরীটা ঠিক-ঠিক মিলে যাচ্ছে। পৃথিবী যদি উল্কারই সমষ্টি হয়, তা'হলে তার উৎপত্তি এই রকমে হয়েছে—চাপে এবং পরস্পরের সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে উল্কাগুলো প্রথমে খুব গরম হয়ে গলে গেল; তার পর সেগুলো একসঙ্গে তাল পাকিয়ে খুব উত্তপ্ত একটা প্রকাণ্ড পিণ্ডে পরিণত হল; তার পর সেই পিণ্ডের ভিতর থেকে পাথরের অংশটা ক্রমে-ক্রমে বেরিয়ে ভেসে উঠ্‌ল। তাই থেকে পৃথিবীর উপরের পাথরের পাতলা আবরণটা—যার নাম ভূপঞ্জর—সেটা গড়ে উঠ্‌ল; আর ভিতরের দিকে ধাতুর অংশটা তাপ বের করে দিয়ে ঠাণ্ডা হবার পথ না পেয়ে, পিণ্ডের আকারে গরম অবস্থায় রয়ে গেল।

আগে মনে করা হ'ত, আকাশের তাপের খানিকটা অংশ পৃথিবীর ভিতরে আবদ্ধ রয়েছে, সেটা এখনও ঠাণ্ডা হবার সুযোগ কিম্বা অবসর পায়নি। কিন্তু উল্কার থিয়োরী সত্য হলে, পৃথিবীর ভিতরের তাপ যে আকাশের তাপের খানিকটা অংশ, এখন আর তা' বলা চলে না। বর্ত্তমান থিয়োরী-মতে পৃথিবীর গর্ভের ধাতুময় পদার্থ তাপের পরিচালক হওয়ায়, স্থানভেদে এই তাপের একটা সামঞ্জস্য থাকবে। পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে যতই ভিতরের দিকে যাওয়া যাবে, ভিতরের তাপের পরিমাণ ততই বেড়ে যাবে। পৃথিবীর পৃষ্ঠের সঙ্গে ভিতরের তাপের সকল যায়গায়ই এই রকম একটা সামঞ্জস্য থেকে যাবে। সূক্ষ্ম হিসাবে পৃথিবীর ভিতরের তাপের পরিমাণ ১৫০০ সেন্টিগ্রেড বা ৩০০০ ফারেণহীট দাঁড়াতে পারে। এটা বড় কম তাপ নয়; তবু, আগে পৃথিবীর তাপ যতখানি হওয়া উচিত বলে' মনে করা যেত, তার চেয়ে অবশ্য অনেকটা কম! পৃথিবীর

উপরের আবহাওয়ার বিবরণের সম্বন্ধে ভূপঞ্জরঘটিত যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে, তার সঙ্গে এই যে তাপের হিসেব করা হ'ল, তার বেশ মিল হচ্চে। এক সময়ে পণ্ডিতেরা মনে করতেন, এখন সূর্য্য যত বড় আর যত উত্তপ্ত, আগে তার চেয়ে বড়, আর বেশী গরম ছিল; ক্রমে তাপ বিকীরণ করতে-করতে এখন অনেকটা ঠাণ্ডা, এবং কাজে-কাজেই আকারে অনেকটা ছোট হয়ে এসেছে। আরও মনে করা হ'ত যে, সে সময়ে পৃথিবীর ভিতরের তাপ যতটা বাইরে বেরিয়ে আসত, এখন আর ততটা পারে না। তখন লোকের ধারণা ছিল যে, এখন গ্রীষ্মকালে কলিকাতায় যতখানি উত্তাপ পাওয়া যায়, সে সময়ে সমস্ত পৃথিবীর আবহাওয়া তার চেয়ে বেশী উত্তপ্ত ছিল। এই পৃথিবীব্যাপী গরম আবহাওয়ার দরুণ লোকের মনে বিশ্বাস জন্মেছিল যে, পৃথিবী ঠাণ্ডা হ'য়ে আসতে-আসতে ক্রমে মেরু-প্রদেশ দুটো শীত-প্রধান হয়ে পড়েছে; আর বাঙ্গালা দেশের আবহাওয়া আগেকার চেয়ে অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে; আর এই রকম অবস্থাই গ্রীষ্মপ্রধান অংশে আর তার চেয়ে ঠাণ্ডা অংশে, সাধারণ হয়ে পড়েছে। কিন্তু এই যে লোকের বিশ্বাস যে, পৃথিবী ধীরে-ধীরে অনেক কাল ধরে ঠাণ্ডা হয়ে-হয়ে, শেষকালে তার স্থানে-স্থানে বরফ জমে থাকতে সুরু করেছে, এই মতটার সঙ্গে,—ভূপঞ্জর অনুসন্ধান করে' তার পরীক্ষা করে' যে সকল কথা জানা গিয়েছে, সেটা ঠিকমত খাপ খাচ্ছে না। সমস্ত পৃথিবীটায় এক সময়ে একই রকম গ্রীষ্মপ্রধান আবহাওয়া বর্ত্তমান ছিল, এইরূপ মনে করবার একটা কারণ ছিল। অর্থাৎ এই রকম একটা সিদ্ধান্ত না করে নিলে, যে সকল গাছপালা, বনজঙ্গল থেকে এখন পাথুরে কয়লা পাওয়া যাচ্চে, সেগুলো জন্মাবার কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে পারা যায় না। যে সময়ে ঐ সকল অরণ্যের উৎপত্তি হয়েছিল, তার নাম দেওয়া হয়েছে Carboniferous Period। সেই সময়টাকে আমরা বাঙ্গালায় বল্‌ব, কয়লার যুগ। এই কয়লার যুগের জন্যই ঐ রকম ব্যাখ্যা করা দরকার হয়ে পড়েছিল। এই কয়লার যুগটা নিয়েই যত গোলযোগ বেধে গেছে। গরম ঋতু না হলে গাছপালা জন্মাবার যো নেই বলে, এক শ্রেণীর পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করে নিলেন যে, ঐ সময়ে পৃথিবী খুব গরম ছিল; আবার এক শ্রেণীর পণ্ডিত নানারকম গবেষণা করে প্রমাণ করে দিলেন যে, যে সময়টাকে কয়লার যুগ সুতরাং গ্রীষ্মপ্রধান যুগ বলা হচ্চে, ঠিক সেই সময়েই এই গ্রীষ্মপ্রধান ভারতবর্ষেই নাগপুরের দক্ষিণ অঞ্চলে glacier বর্ত্তমান ছিল। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর পণ্ডিতেরা যে সকল প্রমাণ হাজির করেছেন, তা' একেবারে অকাট্য। কিন্তু এই যে নাগপুরের দক্ষিণ অঞ্চলের যে দেশের কথা হচ্চে, সেখানকার এখনকার আবহাওয়া মোটেই জল জমে বরফ হবার উপযোগী নয়। গ্লাসিয়ার বর্ত্তমান থাকার যে সব প্রমাণ দাখিল করা হয়েছে, তা' এই রকম—সেখানকার পাহাড়গুলার উপর-দিকটা এমন মাজাঘষা, যা' কেবল গ্লাসিয়ারের দ্বারাই হওয়া সম্ভব। কেবল এই একটা প্রমাণই নয়, আরও প্রমাণ আছে। মধ্য-ভারতবর্ষের অনেক যায়গাতেই নদীর গর্ভে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের চাঁই পাওয়া গেছে,—যাদের গায়েও এমন মাজাঘষার দাগ আছে,—যা' থেকে মনে করা যেতে পারে, ঐ সকল দাগ গ্লাসিয়ারের মধ্যে পাথরগুলার পরস্পরের সঙ্গে ঘষড়ানির ফল,—অন্য কোন রকমে সে রকম দাগ উৎপন্ন হতে পারে না। এই সকল প্রমাণ থেকে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, যে সময় য়ুরোপ, আমেরিকা ও চীনের স্থানে-স্থানে ঘন অরণ্য ও জঙ্গল ছিল, যা' থেকে পৃথিবীর সমস্ত কয়লার খনি উৎপন্ন হয়েছে, সেই সময়েই মধ্য-ভারতবর্ষে গ্লাসিয়ারও ছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকা এবং অষ্ট্রেলিয়াতেও সে সময়ে গ্লাসিয়ার থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে। অষ্ট্রেলিয়াতে আবার, কেবল যে এখনকার গ্রীষ্মপ্রধান অংশে তখন গ্লাসিয়ার ছিল, তা' নয়,—সমুদ্রের পৃষ্ঠের সমান উঁচু যায়গাতেই ঐ সকল গ্লাসিয়ার ছিল বলে স্থির হয়েছে। এই সকল তত্ত্ব থেকে নিঃসন্দেহ প্রমাণ হচ্চে যে, কয়লার যুগে পৃথিবীর যায়গায়-যায়গায় আবহাওয়া এখনকার চেয়ে অনেক বেশী ঠাণ্ডা ছিল। তবে অবশ্য ঐ যুগে সমস্ত পৃথিবীর আবহাওয়া এখনকার চেয়ে ঠাণ্ডা ছিল, এরকম মনে করবার কারণ ঘটেনি। তখন কতকটা যায়গা যেমন ঠাণ্ডা ছিল, আবার কতকটা সেই রকম গরমও ছিল। তবে গড়পড়তায় শীতোষ্ণতা এখনকার সমানই ছিল মনে করা যেতে পারে। কয়লার যুগের আগের যুগটাকে ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা Cambrian যুগ নাম দিয়েছেন; আর তারও আগের যুগের নাম

হচ্ছে pre-Cambrian যুগ। পৃথিবীর ইতিহাসের এই দুই যুগে ভূপঞ্জরের অবস্থা কেমন ছিল, তা' কিছু-কিছু জানতে পারা গেছে। তার আগেকার কোন যুগের বিশেষ কোন কথা এখনও অনুসন্ধানে ধরা পড়েনি; সেখানে কেবল অনুমান ছাড়া অন্য কোনরূপে দন্তস্ফুট করবার যো নেই। ঐ দুটো যুগেও পৃথিবীর স্থানে স্থানে সমুদ্রের সমতলে গ্লাসিয়ার থাকার কথা জানতে পারা যায়; কিন্তু এখন ঐ সব যায়গায় বরফ নেই। এই সব ঘটনার মধ্যে যেগুলো পণ্ডিতদের খুব মনে লেগেছে, তা' এই যে, কাম্ব্রিয়ান যুগে মধ্য-অষ্ট্রেলিয়ার গ্রীষ্মপ্রধান অংশে সমুদ্রের সমতলে যে সব যায়গায় গ্লাসিয়ার ছিল, সেই সব যায়গায় গ্লাসিয়ারদের পদচিহ্ন, অর্থাৎ কি না, তাদের নড়াচড়ার দরুণ মাটীতে যে সব গভীর গর্ত্ত উৎপন্ন হয়েছিল, তার চিহ্ন এখনও দেখা যায়। আসল কথা, যতদিন ধরে ভূ-পঞ্জর গড়ে উঠেছে, ততদিন ধরেই পৃথিবীর আবহাওয়া এখনকার গড়পড়তা আবহাওয়ার প্রায় সমান-সমানই গিয়েছে—একটু উনিশ-বিশের তফাৎ হয়ে থাকতে পারে।

ভূপঞ্জর-ঘটিত যে সব তত্ত্ব জানা গেছে, তার মধ্যে এইটেই সব চেয়ে বড় যে, ভূপঞ্জরের যত দিনের বিবরণ সংগ্রহ করতে পারা গেছে, তার গোড়া থেকেই, যে সব শক্তি পৃথিবীর আবহাওয়ার ও জীব-জগতের উপর কাজ করে, তাদের মধ্যে ইতরবিশেষ ঘটায়, সেই সব শক্তি এখন যেমন আছে, তখনও প্রায় সেই রকমই ছিল। এখনকার হাওয়ার জোর যতখানি, তখনকার হাওয়ার জোরও প্রায় ততখানি ছিল। এই তত্ত্বটা জানা গেছে এই রকম করে যে, এখনকার যে-সব বালুকণা হাওয়ার জোরে এক যায়গা থেকে আর এক যায়গায় উড়ে যেতে পারে এবং যায়, তাদের আকার যত বড়,—সেই সেকালের যুগের যে-সব বালুকণা ভূপঞ্জরের ভিতর ধরা পড়েছে, সেগুলাও ঠিক তত বড়; সুতরাং যে হাওয়া তাঁদের চালিয়ে নিয়ে বেড়াত, তার জোরও এখনকার হাওয়ার জোরের সমানই ছিল—এটা নিঃসন্দেহ প্রমাণ হ'য়ে গেল। কোন-কোন স্থলে এমনও প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, এখনকার হাওয়া যে দিক দিয়ে যেমন করে বইছে, তখনকার হাওয়াও সেই দিক দিয়ে ঠিক তেমনি করেই বইত। পৃথিবীর তাপও তখন মোটামুটি সম্ভবতঃ এখনকার মতই ছিল। পৃথিবী যত দিনে বর্ত্তমান আকারে গড়ে উঠেছে, সেই সময়টার যে অংশে পৃথিবীর নিজের ভিতরের তাপ বাইরের আবহাওয়ার তাপের কমবেশী ঘটাতে পারত, সে সময়টা ভূপঞ্জরের যুগের আগেই কেটে গিয়েছিল বলে মনে হয়; অন্ততঃ, ভূপঞ্জরের যতদিনের বিবরণ সংগ্রহ করা হয়েছে, তার আগে ত বটেই। সেই সময়ে যে-সব পাথর গড়ে উঠেছিল, এখন আর তার কোন চিহ্নই দেখতে পাওয়া যায় না,—সে সমস্তই নষ্ট হয়ে গেছে। তা' যখন নেই, তখন তার বিবরণ আর আমরা কেমন করে জানতে পারব? তখনকার পৃথিবীর বিবরণ জানতে হলে, অতি অস্পষ্ট ছাড়া-ছাড়া প্রমাণ-গুলো একত্র করে সামান্য কিছু জানা যায় মাত্র।

এইসকল বিষয় বিবেচনা করে,—এক বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যাওয়া সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত না হলেও,—অধ্যাপক মহাশয় ধোঁয়াটে ভাব ছেড়ে দিয়ে, উল্কাগুলোকেই পৃথিবীর গঠনের উপাদান বলে মেনে নিতে বল্‌ছেন; কিরণ-বিকীরণের কথা ভুলে গিয়ে, পৃথিবীর ভারের কথাটা মনে রাখ্‌তে পরামর্শ দিচ্ছেন; আরও, ভূমিকম্প এবং আগেকার আবহাওয়ার ইঙ্গিতটা বিবেচনা করে দেখ্‌তে অনুরোধ করছেন। তিনি দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, এই সব সাক্ষী যে সব প্রমাণ দিচ্ছে, সেগুলা পরস্পর-বিরোধী ত নয়ই, বরং তাদের মধ্যে বেশ সামঞ্জস্য আছে; আর সেই সকল প্রমাণ থেকে নিঃসন্দেহ স্থির করা যেতে পারে যে, পৃথিবী অসংখ্য ঠাণ্ডা উল্কা দিয়ে তৈরী—ধোঁয়া দিয়ে নয়; সেই সকল উল্কার পরস্পরের ঘর্ষণে একটা ধোঁয়ার উৎপত্তি হয়েছিল বটে, কিন্তু সেটা লাপ্‌লাসের কথিত ধোঁয়া নয়,—এ অন্য রকম জিনিস। এ জিনিসটা উল্কাপিণ্ডগুলির পরস্পরের ঘর্ষণে উৎপন্ন, এদের প্রকৃতিও আলাদা, আর এই ধোঁয়া জড়-পদার্থের আকারে দেখা যেত।

জাতকের ইতিহাস

[অধ্যাপক শ্রীহিরণকুমার রায় চৌধুরী, বি-এ]

সে আজ কত দিনের কথা। উদীচ্য শৈলাঞ্চলে পুণ্যভূমি কপিলাবস্তু নগরীতে অবাধ ভোগবিলাসের মধ্যে সর্ব্বস্বত্যাগী, নিখিল-মানব-দুঃখ-কাতর, সদয়-হৃদয় শাক্যসিংহ গৌতম, রাজা শুদ্ধোদন ও সমগ্র প্রজাপুঞ্জের শত সাধ ও আশা মুঞ্জরিত করিয়া যে দিন জন্মগ্রহণ করেন, সে দিন দিকে-দিকে কি হর্ষোচ্ছ্বাসই না ছুটিয়াছিল! কে জানিত তখন, এই অপূর্ব্ব স্বর্গীয় শিশুর পুণ্য-জ্যোতি-প্রভায় একদিন অর্দ্ধ পৃথিবী সমুদ্ভাসিত হইবে। কে জানিত তখন, এই ধূলিময়ী ধরণীর কঠোর কুলিশ-প্রহার-ব্যথিত, তাপদিগ্ধ হতভাগ্য নর-নারীকে শান্তির অমৃতধারা বিতরণের নিমিত্ত নর-নারায়ণের আবির্ভাব হইয়াছে। কে জানিত তখন, অদূর ভবিষ্যে জ্ঞানের বিমল আলোকে সার্ব্বভৌম নরপতি ও দীন সাধারণ প্রকৃতিপুঞ্জ পরস্পর বাহু-বন্ধনে সদ্ধর্ম্মের হৈম-বেদীপরি দণ্ডায়মান হইয়া এক মহা ভারতের সৃষ্টি-বিধান করিবে।

গৌতম বুদ্ধের তিরোধান-কাল পর্য্যন্ত তৎপ্রচারিত ধর্ম্ম বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হয় নাই। সদ্ধর্ম্মের একনিষ্ঠ সেবক প্রিয়দর্শী মহারাজ অশোকের রাজত্বকালে বুদ্ধ মহিমা সমুদ্র-পরপারে এবং ভারতের প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে অপ্রতিহত মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

বুদ্ধ-বিভূতি সম্যক্ প্রচারের নিমিত্ত বৌদ্ধগণ যে সকল পন্থার অনুসরণ করেন, জাতক-কাহিনী তন্মধ্যে অন্যতম বলিয়া পরিগণনা করা যাইতে পারে। বৌদ্ধ-সাহিত্যে ভগবান বুদ্ধের অতীত জন্ম-কাহিনী বৃত্তান্তের নাম জাতক।

এই জাতকের সংখ্যা ৫৪৭। বিশ্ব-সাহিত্যে জাতকাবলী সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন কাহিনী এবং ইহাদের সংগ্রহও সম্পূর্ণ।

বৌদ্ধগণ জন্মান্তরবাদী। জন্মান্তরীণ সুকৃতিবলে মানসিক শক্তির অভিব্যক্তি হয়। বিভিন্ন যোনিতে উদয় ও ব্যয় যখন চরিত্রের সম্যক্ বিকাশ সাধন করে, তখন বোধিসত্ত্ব অর্থাৎ "বুদ্ধাঙ্কুর" বিভিন্ন মার্গ প্রবিষ্ট হইয়া অবশেষে অনাগামিত্ব ও পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন। বুদ্ধগণ প্রতি জন্ম স্মরণ সক্ষম। সঙ্ঘমধ্যে উপদেশ প্রদান সময়ে গৌতম স্বীয় "অতীত আহরণ" করিয়া প্রতিপদে শিষ্যবর্গের জ্ঞান ও ভক্তি দৃঢ়ীভূত করিয়াছেন।

কুসুম-পেলব শিশু-হৃদয় অথবা জন্মান্তরীণ-বাদে অটুট-বিশ্বাসী নর-নারী সকলেরই নিকট পরিকথা সর্ব্বকালে মনোহারিণী ও সমাদৃত। এ নিমিত্ত বুদ্ধদেবকে ইহার নায়কত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেবকমণ্ডলী তাঁহার প্রোজ্জ্বল মহিমা পরিস্ফুটনের প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের এই অখণ্ড প্রয়াস বিনয়, অভিধর্ম্ম ও পিটকাদির ন্যায় এ বিষয়েও পূর্ণ সফলতা লাভ করিয়াছিল। প্রচলিত অথবা রচিত সমস্ত কাহিনীই তাঁহারা ভগবান তথাগতের অপূর্ব্ব মহিমা-কিরণে বিজড়িত করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধগণ স্তূপাদিতে জাতকের বহু ঘটনা ঈষদুচ্ছিন্ন ভাস্কর্য্যে অঙ্কিত করিয়াছেন। ভারুট স্তূপ-বেষ্টনীতে বহু জাতকের ঘটনাবলী চিত্রিত রহিয়াছে। সুবিখ্যাত নিগ্রোধ মৃগ জাতক তন্মধ্যে অন্যতম। দুঃখ শোক নিপীড়িত, শান্তি-তৃপ্তিবিহীন মানব যাহাতে জরা-শোক-বিগত অমিতাভের চরণে শরণ গ্রহণ করে, এই অভিপ্রায়ে উক্ত চিত্রাবলী পাষাণে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

জাতক-কাহিনীগুলির বিশেষত্ব এই যে, ইহারা সম্পূর্ণ রূপে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা পরিবর্জ্জিত এবং প্রতি দেশ ও ধর্ম্মের উপযোগী। আব্রহ্মস্তম্ব অণু পরিমিত জীবের প্রতি উন্মুক্ত করুণা, অতুল দানশীলতা, একান্ত পবিত্রতা প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলীর পরিচয় আমরা জাতক গ্রন্থ হইতে প্রাপ্ত হই এবং দূর ভারতের একখানি নিখুঁৎ মনোরম চিত্র আমাদের মানস-চক্ষে প্রতিভাত হইয়া উঠে। জীব, সে যতই ক্ষুদ্র বা মহৎ হউক, অথবা তর বা তম শ্রেণীভুক্ত হউক, বৌদ্ধগণের পক্ষে সকলেই তুল্য-মূল্য। বাস্তবিক জীবের প্রতি কারুণ্য বোধ হয় আর কোন ধর্ম্মেই এতদূর প্রসার লাভ করে নাই। এই কারণেই মনে হয়, বুদ্ধ প্রতি জন্মে বিভিন্ন

যোনিতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং আত্মোৎসর্গ দ্বারা ক্রমশঃ বোধিসত্ত্ব লাভ করেন।

সেই অতীত যুগে ভারতীয় বণিক পণ্য-ভার-সমৃদ্ধ নৌ-শ্রেণী লইয়া ফেনিল জলধি অতিক্রম করিয়া দূর দূরান্তর পত্তন গ্রামে নিঃশঙ্ক-হৃদয়ে প্রয়াণ করিতেন। প্রতি সমুদ্র, তাহার গভীরত্ব ও বিশিষ্ট জলচারী জীব, এ সমুদায় তাঁহাদিগের নিকট স্বচ্ছমুকুর প্রতিবিম্বিত বস্তুর ন্যায় স্পষ্টীকৃত ছিল। সুদীর্ঘ, বিস্তৃত রাজমার্গগুলি সার্থবাহ ও পণ্যবাহী উষ্ট্র-অশ্বাদির দ্বারা সতত মুখরিত থাকিত।

জাতকের সমাজ-বন্ধন ঠিক বর্ত্তমান সমাজের অনুরূপ ছিল না। রাজা বিশেষজ্ঞের সহায়তায় রাজ্য-শাসন করিতেন। কুসংস্কার ও প্রেত-যোনিতে বিশ্বাস জনসাধারণের মধ্যে বদ্ধমূল ছিল। তৎকালে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত ছিল না এবং স্ত্রী-শিক্ষার বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হইত। বিধবার পত্যন্তর গ্রহণ দোষণীয় বিবেচিত হইত না। আমরা "উচ্চাদ জাতকে" দেখিতে পাই, রাজদ্বারে করুণা-প্রার্থিনী, রোরুদ্যমানা নারী স্বামীর প্রাণ-ভিক্ষার পরিবর্ত্তে "পথে ধাবন্তিয়া পতি" বলিয়া ভ্রাতার দণ্ড-মুক্তি কামনা করিতেছে। স্বামীর জীবিতাবস্থায় অন্য স্বামী গ্রহণের উদাহরণও বিরল নহে।

মল্লরাজ্য-মধ্যবর্ত্তী কুশাবতী নগরীর (বর্ত্তমান কুশীনার) নরপতি ওক্কাকের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুশ দেবরাজ শক্রের অর্থাৎ ইন্দ্রের বর-প্রভাবে জ্ঞানসম্পন্ন ও কুৎসিৎ-দর্শন হইয়া জন্ম লাভ করেন। বয়প্রাপ্ত হইলে মদ্রদেশতনয়া, অপূর্ব্বরূপ-লাবণ্যময়ী প্রভাবতীর সহিত তাঁহার পরিণয়ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। রূপ-যৌবন-গর্ব্বিতা প্রভাবতী রাজপুত্রকে বিকলাঙ্গ দেখিয়া ঘৃণা ও রোষভরে "অন্য স্বামী গ্রহণ করিব" এই সঙ্কল্প করিয়া পিতৃ-গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। দেবরাজ প্রভাবতীর পুনর্বিবাহবার্ত্তা ঘোষণা করিয়া একাদিক্রমে সাতটী রাজাকে বিবাহের জন্য আমন্ত্রণ করেন।

ইসিদাসী নামক থেরীর জীবনীতে দেখিতে পাই, উজ্জয়িনী পুরীর শ্রেষ্ঠী-কন্যা ইসিদাসীর প্রথমতঃ এক বণিকের সহিত উদ্বাহবন্ধন হয়। এই গৃহকর্ম্মনিপুণা লক্ষ্মী-স্বরূপিণী রমণী অকারণে স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া পতির ইচ্ছায় পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রেষ্ঠী পুনরায় অর্দ্ধ শুল্ক গ্রহণ করিয়া এক ধনাঢ্য ব্যক্তির হস্তে ইসিদাসীকে সম্প্রদান করেন। হতভাগিনী বিনা দোষে দ্বিতীয় বারও স্বামী-সুখে বঞ্চিতা হয়। অবশেষে এক দীন-হীন সংযত ভিক্ষুর হস্তে তাহার পিতা-মাতা তাহাকে দান করেন। নিয়তির নিষ্ঠুর বিধানে এ যুবকও বিনা অপরাধে ইসিদাসীকে পরিত্যাগ করেন। সংসার-সংগ্রামে বিধ্বস্ত হইয়া এই নারী শ্রমণী-জীবন লাভ করেন এবং বুদ্ধ-আরাধনে পূর্ণ-ব্রত হইয়া পরিশেষে নির্ব্বাণ লাভ করেন।

এই সকল জাতক পাঠে স্বতঃই মনে হয়, গল্প বা কথা-সাহিত্যেই সমাজের প্রকৃত ছবি অঙ্কিত এবং উহারাই যেন জাতীয় জীবনে ক্রম-বিকাশের স্মরণ-স্তম্ভ।

জাতকাবলী পালি ভাষায় রচিত। পালি ভাষার কাল-নির্ণয় সম্বন্ধে বহু মত প্রচলিত আছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধ ইহার আলোচনার স্থল নহে। তবে অসঙ্কোচে ইহা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে, গৌতমের প্রাদুর্ভাব-কালে ইহা জনসাধারণের কথিত ভাষা রূপে ব্যবহৃত ছিল এবং এক বিশাল বৌদ্ধ-সঙ্ঘ গঠনে অনুপ্রাণিত হইয়া ভগবান বুদ্ধদেব মুক্তির নব বারতা প্রচলিত ভাষাতেই ঘোষণা করেন। সমভাষাভাষী, মহতী জন-মণ্ডলীকে ধর্ম্মের মহিমময় বৈজয়ন্তী মূলে একীভূত করিবার ইহা একটী অনন্য-সাধারণ ও সহজসাধ্য উপায়। গৌতম এই মাগধী ভাষায় ধর্ম্ম দান না করিলে হয় ত আজ ইহার এতাদৃশী পরিপুষ্টি সাধন হইত না, অথবা বহু প্রাচীন সাহিত্য বলিয়া স্বদেশে ও বিদেশে পরিপূজিত হইত না; এমন কি অন্যান্য প্রাকৃত ভাষার সহিত সংমিশ্রিত হইয়াও যাইত।

অধিকাংশ জাতকীয় ঘটনা বারাণসী-রাজ ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে সম্পন্ন হয়। এই ব্রহ্মদত্ত রাজের কোন ঐতিহাসিক অস্তিত্ব অনুমান হয় না; আমাদের দেশে প্রচলিত দুয়ো ও সুয়ো রাণীর মত কল্পিত ও প্রাস্তাবিক নাম বলিয়াই ধারণা হয়। তখনকার দিনে বৃদ্ধেরা সন্ধ্যা-দীপালোকিত কুটীরে বা কক্ষে শিশুর নিকট এই সকল কাহিনীর বর্ণনা করিতেন।

জাতকে রামায়ণের গল্প বিভিন্ন রূপে বর্ণিত দেখিতে পাই। যদি স্বীকার করা যায়, জাতক-কাহিনী রামায়ণা-পেক্ষা পুরাতন, তাহা হইলে রামায়ণের গল্প লিপিবদ্ধ হইবার সময় কাহিনীগুলি যে পরিমার্জ্জিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। দশরথ ও ঋষ্যশৃঙ্গ জাতক পাঠ করিলে

মনে হয়, রামায়ণ রচিত হইবার সময় কাহিনীগুলি সুসংস্কৃত ও আখ্যানোপযোগী করিয়া পুস্তকমধ্যে গ্রহণ করা হইয়াছে।

খ্রীষ্ট-প্রচারিত ধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সম্বন্ধ বিশেষ রূপে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই দুই ধর্ম্মের গ্রন্থাবলী ও কাহিনীগুলি পাঠ করিলে খ্রীষ্ট-প্রচারিত ধর্ম্মে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রভাব সম্যকরূপে উপলব্ধি হয়।

ইংরাজীতে "বারলাম ও যোসাফট" নামক একখানি গল্প-পুস্তিকা আছে। ভারতীয় রাজপুত্র যোসাফট বারলামের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। অষ্টম শতাব্দীতে ডামাস্কাস নগরে সেণ্টজন এই পুস্তিকাখানি গ্রীক ভাষান্তরিত করেন। প্রাচ্য দেশে অনূদিত গ্রন্থখানি সবিশেষ জনপ্রিয় হয় এবং ক্রমশঃ ল্যাটীন প্রভৃতি ভাষার ইহার অনুবাদ সম্পন্ন হয়। আইসল্যাণ্ড ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে ইহা স্থানীয় ভাষায় লিখিত হয় এবং ইহার নায়ক যোসাফট খ্রীষ্টিয় মহাত্মা রূপে ২৭শে নম্বেবর মহা-সমারোহে প্রকাশ্যভাবে পূজিত হইতে থাকেন। এই "যোসাফট" গৌতম বুদ্ধ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছেন। 'যোসাফট' নামটা ভাষা হইতে ভাষান্তরিত হওয়াতে, এবং উচ্চারণ বিভেদে প্রদত্ত হইয়াছে মাত্র।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বাণিজ্য-সম্বন্ধ আবহমানকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং ভারতের মনোহর পরিকথাগুলি লোকমুখে এবং তৎপরে অনূদিত হইয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে, ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই।

সে সময়ে ভারতবর্ষ অসংখ্য ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল বলিয়া এই সকল কাহিনী দ্রুত পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল এবং একই উপাখ্যান বিভিন্ন রূপে প্রচলিত ছিল। তখনকার দিনে তক্ষশিলা নগরীতে ব্রাহ্মণেতর জাতি জ্ঞান-লাভের জন্য সমবেত হইতেন এবং পুণ্যক্ষেত্র বারাণসী উত্তর-ভারতের একটী কেন্দ্রস্থান বলিয়া পরিগণিত হইত।

প্রাচীন ভারতে লিপি-প্রণালী প্রচলিত ছিল না। সে সময়কার ঘটনাবলী অক্ষর-বিন্যাসের পূর্ব্বে খণ্ডকথা রূপে লোকপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছিল। হয় ত এ নিমিত্ত সর্ব্বত্র সত্যের মর্য্যাদা অটুট রহে নাই। তথাপি ইহারা অতীত ও বর্ত্তমানের দুর্ভেদ্য ব্যবধান এক পুণ্য-স্মৃতির সেতু রচনা পূর্ব্বক বন্ধন করিয়াছেন। এজন্য অতীত ভারতের ইতিহাস গঠনে ইহারা অমূল্য উপাদান। আমাদিগের দেশে আজিও পালি ভাষার আলোচনা জনসাধারণের মধ্যে বহুল প্রচারিত হয় নাই। ইহার উৎকর্ষ সাধন হইলে অন্ধকারাচ্ছন্ন অতীত ভারতের ইতিহাস-পত্রাঙ্ক বহু সমস্যার সমাধান করিয়া নবীন তথ্যে পরিপূর্ণ হইবে।

মধুমক্ষিকা-সমবায়

[শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্-এ, বি-এল]

(১)

দীন-হীন নগণ্য পদার্থ দল বাঁধিলে সে দল শক্তির কেন্দ্র হয়। কবি তাহার উদাহরণও দিয়াছেন—"তৃণৈর্গুণত্বমাপন্ন বধ্যন্তে মত্ত দন্তিনঃ।" জড়-প্রকৃতি জোট বাঁধিলে অসাধ্য-সাধন করিতে পারে,—প্রকৃতির নাট্যশালায় এ দৃষ্টান্ত প্রচুর। সে সংহতির কার্য্যে বদান্যতাও আছে, নিমক-হারামীও আছে; সেরূপ দল-বাঁধার ফলে ধরিত্রীর আকৃতি পরিবর্ত্তিত হইতেছে; কোথাও সে কুৎসিৎ হইতেছে, কোথাও তাহার বরবপু রত্নালঙ্কারে সুশোভিত হইতেছে। স্রোতস্বতীর সুখস্রোতে কোটী-কোটী ক্ষীণ নগণ্য ধূলিকণা ভাসিয়া যায়; নদীর মোহনায় আসিয়া হঠাৎ তাহারা জোট বাঁধে; একটী-একটী করিয়া কৃতঘ্ন বালুকণা মগ্ন হয়—ক্ষীণের সঙ্গে ক্ষীণ দেহ মিলাইয়া দেয়। শেষে বিরাটায়তন হইয়া বালুকণা নিমকহারামী করে—মত্ত নদীর খর স্রোতের সম্মুখে রুখিয়া দাঁড়ায়—তাহার গতির বিরুদ্ধে একটা বিরাট

প্রতিকূল শক্তি গড়িয়া তুলে। তখন নদীর গর্ব্ব খর্ব্ব হয় —নদীর মোহনায় চড়া পড়ে—ভরা নদী মজিয়া যায়। সেখানে ধরণীর ঢল-ঢল তরল লাবণ্য ম্লান হইয়া যায়।

কিন্তু এই কৃতঘ্ন বালুকণার সংহত অঙ্গের একজোট, জ্ঞানহীনের অন্ধ-শক্তি। প্রাণময় জগতেও তেমনি দীন-হীন ক্ষুদ্রের দ্বারা প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে,—এক স্থানের পদার্থ অন্য স্থানে মিলিতেছে—লঘু মিলিয়া গুরু হইতেছে, গুরু ভাঙ্গিয়া ঋজু হইতেছে। আমার মনে হয়, বিধির বিধানে সৃষ্ট জীবের মধ্যে যাহারা ঐ শক্তির অধিকারী, তাহারাই ঐশ-শক্তি-ভূষিত সৃষ্টিরক্ষক প্রজাপতি;—তা' হউক তাহারা গাছের পাতার সবুজ কোষ ক্লোরোফিল, আর হউক তাহারা ভ্যানভেনে মৌমাছি বা ঢ্যাবঢেবে লাক্ষা-কীট। গাছপালার প্রাণ আছে এ কথা এখন সিদ্ধ;—তবে তাহাদের জ্ঞানের মাত্রা কতটুকু, তর্ক সেই খানে। এখন তাহারা শারীরিক সুখ দুঃখ, সুবিধা-অসুবিধার কথা আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের খাতায় লিখিয়া দিতেছে। সে হিসাবে গাছের সবুজ কোষের প্রাণ আছে,—সে বালুকণার মত জড় নয়,—সে জীবদেহের অঙ্গ। এই ক্লোরোফিল সৃষ্টিরক্ষক প্রজাপতির প্রধান কর্ম্মচারী—তাঁহার পৃথিবী-পরগণার নায়েব, মনিব, গোমস্তা। সূর্য্যালোকে দাঁড়াইয়া বাড়ীর কর্ম্মকর্ত্তা মুরুব্বির মত কার্ব্বন বা কয়লার সঙ্গে জলজানকে ওতপ্রোত ভাবে মিলাইয়া দেয়, বদ্ধ অম্লজানকে অব্যাহতি দেয়। এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র তুচ্ছ ক্লোরোফিলের দানা যদি hydrocarbon বা উদঙ্গার নির্ম্মাণ করিয়া না দিত, তাহা হইলে পৃথিবীতে কোনও প্রাণী বসবাস করিবার অধিকার পাইত না। যেহেতু এ কথাটা এখন উত্তমরূপে প্রমাণ হইয়া গিয়াছে যে, প্রকৃতির অশরীরি শক্তিকে শরীর দিতে পারে এক ক্লোরোফিল; আর সেই শরীরী উদ্ভিদ বা উদ্ভিদ-ভোজী জীব না থাইলে কেহ বাঁচিতে পারে না। এই জীব-পরিপোষক উদঙ্গার রচনার কায়দা-করণ কেবল উদ্ভিদের করায়ত্ব—আমাদের মধ্যে কোনও হোমরা-চোমরা পণ্ডিত এথনও সে শক্তি নিজস্ব করিতে পারেন নাই। আমি দৃষ্টান্ত বাড়াইয়া আপনাদের ধৈর্য্য পরীক্ষা করিতে চাহি না। আমার বক্তব্য বিষয়ে এই ক্লোরোফিলের কথাটা "শিব-সঙ্গতী" নয়। প্রাণ-পরিপোষক উদ্ভিদ-জগতের বংশের ধারা অপ্রতিহত থাকে, তাহার ফুলের রেণু তাহার ফুলের বীজ-কোষের মধ্যে মিশিলে। মৌমাছি-প্রমুখ কীট পতঙ্গ এই মিলনে বিশেষ ভাবে সহায়তা করে। কিন্তু সে সাহায্য উদ্ভিদ পায় না, তাহার কাজের মজুরি না দিলে। উদ্ভিদ ফুলের চুঙ্গির ভিতর মধু জমাইয়া রাখে, মৌমাছি সেই সুধার লোভে অঙ্গে ফুলের রেণু মাখে, সেই রেণু অপর ফুলের পক্ক বীজ-কোষে মিলাইয়া দেয়, তথন ফুল তাহার মজুরি দেয় অতি অল্প একটু সুধা। এই সুধা থাকে বটে ফুলের বুকের মাঝে; কিন্তু ভাবিবেন না, এই বুকের ধন দিয়া ফুল বড় বদান্যতার পরিচয় দেয়। মৌমাছির পেয় হইলেও, ফুলের সুধা ফুলের পক্ষে জঞ্জাল। উদ্ভিদের দেহের মধ্যে রাসায়নিক কারখানা আছে। সেখানে উদ্ভিদের পুষ্টির জন্য নানাপ্রকার পদার্থ নির্ম্মিত হয়। শর্করা বা চিনি সেইরূপ একটী পদার্থ। যে শর্করাটুকু তাহার দেহের মঙ্গলের জন্য আবশ্যক হয় না, উদ্ভিদ সেই চিনিটুকু ফুলের মাঝে ফেলিয়া রাখে। প্রকৃতি আদৌ অপচয় দেখিতে পারে না। সে জঞ্জালটুকু সে রাখিয়া দেয়; কারণ, সে জানে, যাহা উদ্ভিদের পক্ষে আবর্জ্জনা, তাহা অনেক জীবের পক্ষে সুধা। তাহার বীজ-গঠনে সহায়তা লইয়া ফুল মৌমাছিকে দেয় এক বিন্দুর তিন শতাংশের এক অংশ সুধা! কি বদান্যতা!

এই এত অল্প মাত্রায় কেন সুধাদান করিয়া প্রকৃতি উদ্ভিদ-জগতের বংশধারা অক্ষুণ্ণ রাখে, তাহারও একটা কারণ আছে। এই কার্পণ্যের মূলে প্রকৃতির সকল অনুষ্ঠানের মত দোকানদারী আছে। একই ফুলের রেণুর দ্বারা বীজ উর্ব্বর হইলে তেজাল গাছ জন্মে না। ভিন্ন ফুলের রেণু পাইবার জন্য প্রকৃতি নানা কৌশল করিয়াছে। 'অর্চনা'য় আমি সে কথা বলিয়াছি। আমার মনে হয়, এই ভিন্ন ফুলের রেণু লাভের জন্যই ফুলের দান অত তুচ্ছ—প্রকৃতি এত কৃপণ। একশত ফুলে ঘুরিলে তবে মৌমাছি এক পেট সুধা পায়; আর তাহার ক্ষুদ্র দেহের এক পেট সুধা এক বিন্দুর এক-তৃতীয় অংশ মাত্র। এক টানে এক শত ফুলে ঘুরিবার সময় একের রেণু অন্যের বীজে মিলাইয়া মৌমাছি তাহাদের উর্ব্বর করে। সুতরাং আমরা যথন মৌচাকের মধু লুটিবার সময় মনকে আঁখি ঠারিয়া বলি যে, চোরের উপর

বাটপাড়ি করিতেছি, সে কথাটা অলীক। আমরা বাটপাড় নই, কারণ মৌমাছি বেচারা চোর নয়।

সমবায় গড়িয়া, সঙ্ঘ রচিয়া তবে ক্ষীণ-দেহ মৌমাছি প্রকৃতির এত বড় একটা কার্য্য সাধিতে পারে,—আমাদের মত রসগ্রাহী জীবকে মধুদান করিতে পারে। প্রকৃতির একটা আবর্জ্জনাকে সংগ্রহ করিয়া অন্য জীবের মঙ্গল সাধিতে পারে বলিয়াই তুচ্ছ মৌমাছি বরেণ্য। আমরা ভূমিষ্ঠ হইয়াই তাহার পরিশ্রম-লব্ধ মধু পান করি; মধু দিয়া যাগ-যজ্ঞ করি, দেবতার প্রসাদ পাইবার জন্য; আর তাহার ঘর ভাঙ্গিয়া মোম লই দেবতার সন্তোষের জন্য; কারণ, কেবল হিন্দু নয়, মুসলমান, ক্যাথলিক, য়ুহুদি সকলের দেবালয় আলোকিত হয় চাক-ভাঙ্গা খাঁটি মোমের দীপের আলোকে। নানা লোকে নানা কারণে মৌমাছির কার্য্য-কলাপ পর্য্যবেক্ষণ করে, তাহার সমবায়ের গুণ গান করে। আমার কিন্তু মনে হয় যে, মৌমাছি মানুষের প্রিয় একটা কারণে—সে তাহার সঙ্ঘের ভাণ্ডার হইতে আমাদের মধুদান করে বলিয়া। যে দেয়, সেই বড়,—সেই বন্ধু। মৌমাছি মধুদান করে, তাই সে বরেণ্য। অবশ্য কথাটা নিষ্ঠুর ও উচ্চনীতির পরিপন্থী বটে; কিন্তু ইহার একটা গুণ আছে যে, ইহা শতকরা ৯৯ জনের প্রাণের স্বরের প্রতিধ্বনি।

এ হেন মক্ষি-সঙ্ঘ দেখিবার, বুঝিবার—দেখিয়া, বুঝিয়া তাহাতে মজিবার সামগ্রী। চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট হাজার জীব একত্র বাস করে;—এক উদ্দেশ্যে, এক সাধনায় প্রাণপাত করে;—অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করে; -পরস্পরে মারামারি-কাটাকাটি করে না, খেয়োখেয়ি দলাদলি করে না;—তথাকথিত ইতর জীবের এ হেন কার্য্য-কলাপ দেখিয়া জীব-শ্রেষ্ঠ মনুষ্য অক্লেশে লজ্জায় নতশির হইতে পারে। মক্ষি-সমবায়ের দৈনন্দিন কাজ করিবার, চলা-ফেরার প্রভৃতি পদে-পদে যে সব আইন-কানুন বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিতে হয়, সেগুলার মধ্যে বিচার-বুদ্ধির জাজ্বল্য প্রমাণ আছে। সে বুদ্ধির জন্য মৌমাছি স্বয়ং কতটুকু স্তুতির দাবী করিতে পারে, সে কূট তর্ক পরে তুলিব।

মৌচাক মৌমাছির জন্মভূমি, কর্ম্মভূমি, বাসস্থান। চাক্ তাহার নিজের গড়া। চাক-নির্ম্মাণের মাল-মসলাটুকু তাহার নিজের দেহ-নিঃসৃত যত্নের সামগ্রী। তাই মানুষের পূর্ত্ত-বিভাগের কার্য্যের মত ইহাদের পূর্ত্ত-বিভাগে অপচয় নাই;—'কোম্পানীকা মাল দরিয়ামে ডাল'—এ নীতির প্রচলন নাই।

মধুচক্র দেখে নাই কে? পুরাণ-বাড়ীর ঠাকুর-দালানের কড়ি-কাঠে, বৃদ্ধ-পিতামহের পিতামহীর প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ অশ্বত্থ-বটের কোটরে, গোশালার ছাঁচতলায়,—যে স্থানই একটু ঝড়-ঝাপটা, দুর্গন্ধ হইতে নিরাপদ, মৌমাছির দল সেই স্থলেই বাসা করে। আমার নিকটে একটী শূন্য মধুচক্র আছে, সেটি বড় আমগাছের আওতায় প্রোথিত একটী তরুণ কামিনী গাছের মোটা ডালে রচিত হইয়াছিল। ইহার উপরের ভিত্তি ছিল কামিনী গাছে, পার্শ্বের বাঁধন ছিল বাগানের কাঠের রেলে। স্থানটি বেশ নিরিবিলি—ঝড়ঝাপ্টা হইতে অনেকটা নিরাপদ, অথচ ভূমি হইতে মাত্র ৪৷৫ ফুট উচ্চে। আমাদের দেশে মৌমাছির চাষ নাই; তাই আমি এই প্রকৃতিজাত মধুচক্রের কথা বলিলাম। বিলাতে মৌমাছির চাষ হয়, তাই বিলাতী পুস্তকের বর্ণনা তাহাদের মক্ষি-শালা, bee-house, apiaryর বর্ণনা। মোটের উপর উভয় সম্প্রদায় মৌমাছির গুণপণা, কৃতিত্ব, শিল্প-কলা সমান। আমি সংক্ষেপে বিলাতী মক্ষি-শালারও বর্ণনা দিব।

বলিয়াছি মৌচাক মোম-রচিত। মক্ষিকারা কিরূপ উপায়ে চাক নির্ম্মাণ করে, সে কথা পরে বলিব। এখন বলিব চাকের কথা। মক্ষিকা-হীন মধুচক্র দেখিতে বড় সুন্দর। চক্রে মক্ষিকা থাকিলে তাহার সান্নিধ্য বড় নিরাপদ নহে এবং ঝাঁক-ঝাঁক মৌমাছি চাকে বসিয়া ভ্যানভ্যান করিতেছে, নিজের মনে ছুটাছুটি করিতেছে,—আর্ট হিসাবে সে চিত্রও বড় মনোরম নহে। নীচে ভিত্তি করিয়া আমরা যেমন অট্টালিকা উপরদিকে গাঁথিয়া তুলি, মৌমাছি তেমনি উপরে গাছের ডালে, বা কড়িকাঠে, বিলাতী মক্ষিশালায় ফ্রেমের উপরের কাঠে ভিত গাঁথিয়া ক্রমশঃ নীচের দিকে ঘর বাড়াইয়া যায়। চাকের দুইদিকেই ঘর থাকে; অর্থাৎ যদি এক সারি ঘর হয় পূর্ব্বমুখ, অপর সারি হইবে পশ্চিম মুখ। এই ঘরগুলি প্রত্যেকটি ছয়-কোণা—কিন্তু প্রত্যেক ঘর সমান নয়, কতকগুলি বড় কতকগুলি ছোট; কতকগুলি ঠিক সোজা horizontal নয়, বাহিরের মুখটা একটু উঁচু। ভবিষ্যতে যাহারা মক্ষি-রাণী হইয়া অন্য

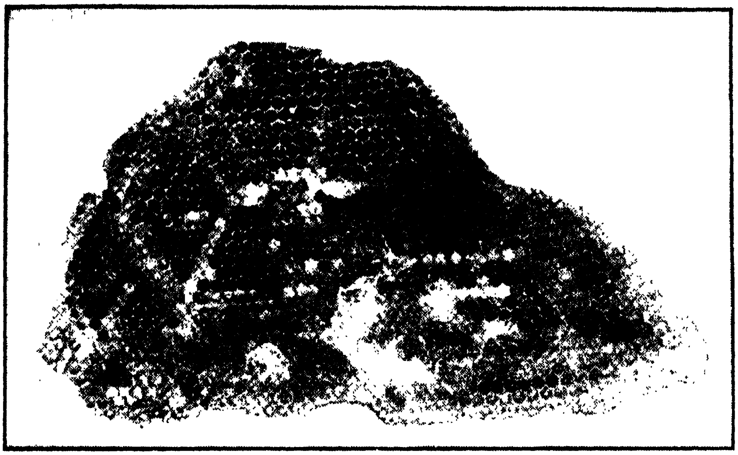

মৌচাকে বহিরাক্রমণ
(এই মৌচাকটি শোঁয়াপোকা জাতীয় প্রজাপতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে)

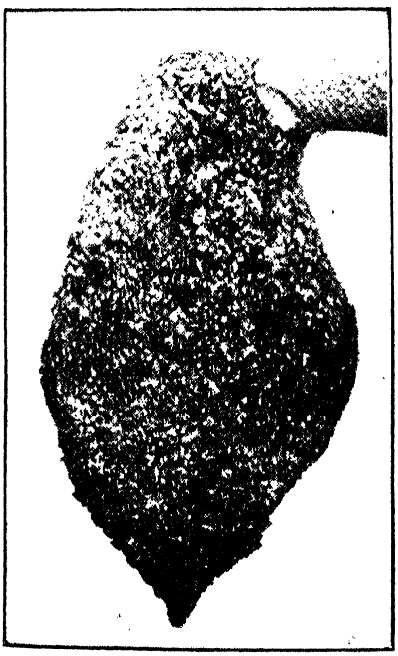

চাকের উপর মৌমাছি

খালি মৌচাক

ঝোপের ভিতর মৌচাক

ঝোপের মৌচাক হইতে
মৌমাছিদের তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে

চক্রে গৃহিণী-পণা করিবেন, তাঁহারা বড় প্রশস্ত কক্ষগুলায় পালিতা হন। যে ঘরগুলার ভিতর দিকে ঈষৎ ঢালু সামান্য গড়ানে, সেগুলি ভাণ্ডার-গৃহ,—তাহারই ভিতর মধু থাকে। মধু গড়াইয়া আসিবে না বলিয়া ঐরূপ গৃহ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা।*

* এই প্রবন্ধের ছবি কয়েকখানি 'পুসা রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে'র 'Bee-Keeping' পুস্তিকা হইতে গৃহীত হইয়াছে; তজ্জন্য আমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

৺কুমার নগেন্দ্র মল্লিক

শিল্পী—শ্রীসারদাচরণ উকিল
(ইঁহার অঙ্কিত ত্রিবর্ণ-চিত্র 'মেনকা ও উমা' এই মাসে প্রকাশিত হইয়াছে)

রঙ্গ-চিত্র

[শ্রীচঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায়]

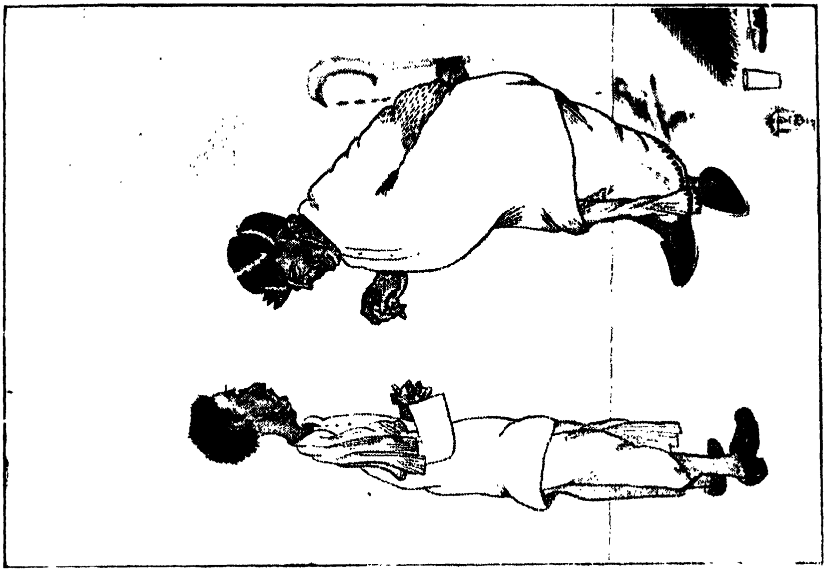

বরের বাপ

বরের চাঞ্চল্য

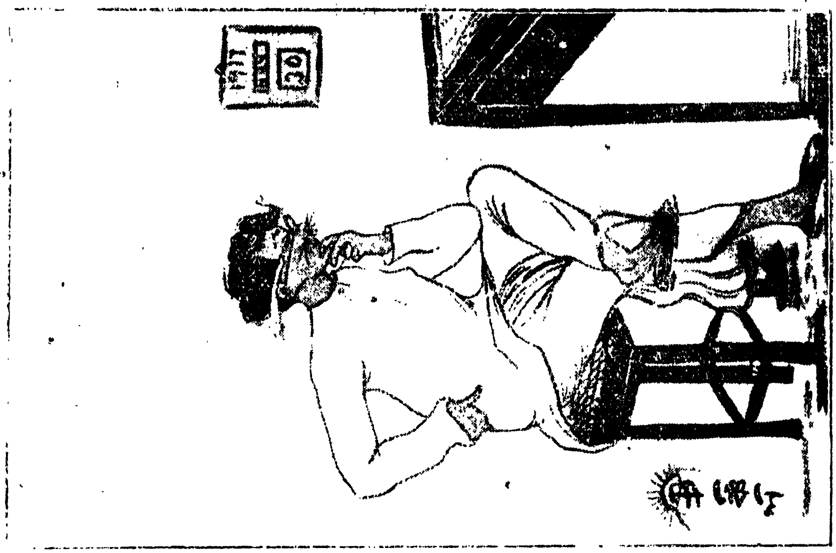

কেরাণী

ওস্তাদ

কোষ্ঠির ফল

আহ্বান

[শ্রীরমণীমোহন ঘোষ বি-এল্]

কুঞ্জে আমার উঠেছিল যত
কুসুম ফুটি,
একে একে আজি ঝরিয়া ভূতলে
পড়িছে লুটি'।
ওগো প্রিয়তম, তুমি কোথা আজি
কোথায় আমি,
শূন্য ভবনে কেমনে কাটিবে
দিবস যামী।
দীপখানি মোর জ্বালিয়া বিজন
কুটীর মাঝে,
পথ-পানে চাহি বসে আছি দ্বারে
নীরব সাঁঝে।

কাঁপে দীপশিখা— নিশীথ আঁধার
আসিছে ঘিরে,
ওগো বাঞ্ছিত, ফিরে এস তুমি,
এস গো ফিরে।
নয়নে আমার নিখিল ভুবন
মাধুরী-হারা।
শশি তারা নাহি করে বরিষণ
কিরণ-ধারা;
তৃপ্তি-বিহীন তৃষায় দহিছে
হৃদয় মম,
এস, ফিরে এস, দেবতা আমার,
হে প্রিয়তম!

ত্রিচিনাপল্লীর পাহাড়

ছুটী

[শ্রীসরসীবালা বসু]

"রাণু! মা!" "কি বাবা?" "আজ মা, তোমার জননীর ফটোখানির বাসি মালা এখনও বদ্‌লে দাও নি কেন?" "এই যে এখুনি দিচ্চি বাবা! অমূল্য এতক্ষণ যে আমায় নাকাল করছিল" বলিয়া রাণী ক্ষিপ্র-পদে অন্য গৃহ হইতে সযত্ন-গ্রথিত একটী কুন্দ ফুলের মালা লইয়া আসিয়া, টুলের উপর দাঁড়াইয়া, স্বর্গীয়া জননীর ফটোখানিকে বেষ্টন করিয়া ঝুলাইয়া দিল। বাসী মালাটি নামাইয়া লইয়া, সম্মুখের পুষ্করিণীতে ভাসাইয়া দিতে গেল,—মাতৃ-পূজার ফুল যদি কারও পায়ে লাগে, তাহারই যে পাপ হইবে! প্রায় বৎসরাধিক কাল হইল, হেমন্তবাবুর পত্নী-বিয়োগ হইয়াছে। তাঁহার বয়স চল্লিশ; শরীর বেশ সুস্থ ও সবল; কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত আত্মীয়-বন্ধুর অনুরোধেও তিনি দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করেন নাই; তাহার কারণ, তিনি অত্যন্ত পত্নীবৎসল ছিলেন। তিনটি পুত্রকন্যা রাখিয়া সাধ্বী সতী লক্ষ্মী, স্বামীর পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া, সতীলোকে গমন করিয়াছেন। তাঁর মৃত্যু-শয্যার শেষ অনুরোধ,—"ছেলে মেয়েগুলোকে এই রকমেই চিরদিন ভালোবেসো" দিনরাত্রি হেমন্তবাবুর কাণে বাজিতেছে। হায় নারি, এ কি কারও অনুরোধে বা দায়ে পড়ে ভালবাসা, যে, তোমার অবর্ত্তমানে পিতৃ-হৃদয়ের স্বভাবজ নির্ম্মল স্নেহ-উৎস শুকাইয়া যাইবে? সে যে অসম্ভব! এরা যে তোমারই আত্মার স্মৃতি! ইহাদের অযত্ন! স্মরণ করিলেও যে প্রাণ শিহরিয়া উঠে!

বড় মেয়ে রাণীর বয়স বছর বার;—মেঝ মেয়ে টুনুর বয়স বছর নয়;—খোকা অমূল্যধন তিন বৎসরের শিশু মাত্র। ইহারা পিতার নয়নের মণি, হৃদয়ের আনন্দ। হেমন্ত বাবু ছেলেমেয়েদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল। তাঁহার স্বভাব খুব অমায়িক; বাটীর দাস-দাসী, গৃহপালিত জীবজন্তু পর্য্যন্ত তাঁহার এ স্নেহের অংশে বঞ্চিত ছিল না। হেমন্তবাবুর বন্ধু-মহলেও সকলে তাঁহাকে বন্ধুবৎসল বলিয়া জানিত। কেবল চারুমোহনবাবু বলিতেন, "হেমন্তের স্বভাব চিরকালই মোলায়েম গোছের; তবে ওর স্ত্রীর স্বভাব-মাধুর্য্যে ওর স্বভাব এত উদার, এত মধুর হয়ে গেছে। ওর নিজের প্রকৃতির তেমন কিছু বিশেষত্ব নেই। বরং ও একটু দুর্ব্বলচিত্ত"। বন্ধু-বান্ধবরা এ কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। হেমন্তবাবুর বিদুষী ও মধুরস্বভাবা পত্নী অনিলার রূপ-গুণের খ্যাতি বিশেষরূপে অবগত হইলেও, স্ত্রীর স্বভাবের ছায়াপাতে স্বামীর স্বভাব ও কার্য্যপ্রণালী পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হয়, এ অসম্ভব কথাতে কেহ আমল দিতে চাহিতেন না। এ বাজে কথা কেই বা বিশ্বাস করে? আর কল্পনাজীবী চারুমোহনবাবু ছাড়া কেই বা বলিতে সাহস করে? তবে এ কথা সত্য যে, চারুমোহনবাবুর সহিত হেমন্তবাবুর কর্ম্মস্থানে আসিয়া বন্ধুত্ব স্থাপিত হয় নাই; তাঁহারা আবাল্য বন্ধু,—স্কুল-কলেজের সহপাঠী; সুতরাং হেমন্তবাবুর প্রকৃত স্বভাবের কথা তাঁহার অপেক্ষা কেহই বিশেষ অবগত নহেন।

হেমন্তবাবুর সংসারে তাঁহার এক বিধবা ভ্রাতৃবধূ ছাড়া আর কেহ ছিল না,—অমূল্যধনকে সে-ই বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছিল। যৌবনে পদার্পণ করিতে না করিতেই তার নারী-জীবনের একমাত্র অবলম্বন, কালের নিষ্ঠুর আঘাতে ভাঙ্গিয়া গেল। সে আঘাতের গুরুত্ব বোধ করিবার শক্তি তখনও বালিকার তরুণ হৃদয়ে পূর্ণভাবে উন্মেষিত হয় নাই। কিন্তু দিনের পর দিন যতই সে ঘনিষ্ঠভাবে সংসারের সহিত পরিচিত হইতে লাগিল, ততই সে বুঝিতে পারিল, তাহার জীবন একটা বিড়ম্বনা মাত্র,—একটা দুর্ব্বিষহ বোঝা বই আর যেন কিছু নয়। সাধ নাই, লক্ষ্য নাই, কামনা-নাই, আনন্দ নাই,—এমন রসহীন, বিশুষ্ক মরুভূমির তুল্য জীবনের দিনগুলি একটীর পর একটি কাটে কেমন করিয়া?

মোহিনী অল্পস্বল্প লেখাপড়া শিখিয়াছিল, অবসর মত দু-একখানা গল্প ও উপন্যাসের বই পড়িত। সেই সব বইএর নায়ক-নায়িকার বিচিত্র জীবন-কাহিনী পড়িয়া তাহার মাথা যেন আরও কেমন হইয়া যাইত। সে কিছুই বুঝিত না,

কিছুই ভাবিত না,—শুধু কিসের একটা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, বুভুক্ষু বাসনা চিত্তের মধ্যে হা হা করিয়া ফিরিত।

অনিলা স্বামীকে একদিন ধরিয়া বসিল, "ছোট বৌ কি চিরকাল বাপের বাড়ীই পড়ে থাকবে? ঠাকুরপো গেছে বলেই কি এ বাড়ীর সঙ্গে তার আর সম্পর্ক নেই? আমরা যখন রয়েছি, তখন আমাদের তো তাকে আনা উচিত।" হেমন্তবাবুর অমত করিবার কিছু ছিল না; কিন্তু মোহিনী প্রথমে শ্বশুর-বাড়ী আসিতে রাজী হয় নাই। স্বামী-শূন্য শ্বশুরবাড়ী,—সে আবার কি অদ্ভুত জিনিস! কিন্তু মোহিনীর মাতা বুদ্ধিমতী ছিলেন। তাঁহার দুইটী পুত্র ছিল। সম্প্রতি তিনি তাহাদের বিবাহ দিয়াছিলেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে ভবিষ্যতে যদি তাহারা মোহিনীকে না দেখিতে পারে, তাহা হইলে একমুঠা ভাতের জন্য অভাগীকে কার দুয়ারে দাঁড়াইতে হইবে ঠিক্ নাই। তার চাইতে ভাসুর ও জায়ের সংসারে যদি বনাইয়া চলিতে পারে, তো সম্মানের সহিত দিন কাটাইতে পারিবে; সুতরাং কন্যাকে তিনি বুঝাইয়া-শুঝাইয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। মোহিনী কিন্তু অল্প দিনেই অনিলার স্নেহ যত্নে এমন বশীভূত হইয়া গেল যে, আর তাহার বাপের বাড়ী যাওয়া হইল না। পাঁচ বছরের টুনিকে স্নেহ-যত্ন করিতে-করিতে শেষে যখন অমূল্যধন আসিয়া সংসারে দেখা দিল, বালবিধবা তার হৃদয়ের সমস্ত সঞ্চিত স্নেহরাশি একেবারে নিঃশেষে উজাড় করিয়া সেই ক্ষুদ্র অতিথিটিকে বরণ করিয়া লইল। দিনের পর দিন, প্রাণের অমৃতরসে অভিষিক্ত করিয়া বড় আদরে, বড় যত্নে মোহিনী অমূল্যকে মানুষ করিতে লাগিল। অনিলা ইহাতে খুব খুসী হইল। অনিলা অমূল্যকে মোহিনীর খোকা বলিত। শিশুও তার ছোট-মাকে এমন করিয়া চিনিল যে, রাত্রিতে সে ছোট-মার কাছেই শুইত। শিশুর ভালবাসার এর চাইতে বড় নজীর দুনিয়ায় আর কিছু নাই। মোহিনী নিজের জীবনের আস্বাদনে আজ নূতন করিয়া তৃপ্ত হইল। স্নেহের সোণার কাঠির স্পর্শে তার অন্তরের সুপ্ত নারী-মহিমা এতদিনে কল্যাণময়ী মূর্ত্তিতে জাগরিত হইয়া, জগতের এক অভিনব-সৌন্দর্য্য শোভার দৃশ্য তাহাকে দেখাইয়া, তাহার জন্ম সার্থক করিয়া দিল।

২

"কাকীমা!" "কি মা?" রাণীর স্বর অভিমান-ভরে কাঁপিতেছিল। "আজ মার ফটোতে মালা দিতে গিয়ে দেখলুম, ফটো সেখানে নেই। বউকে জিজ্ঞেস করতে বল্লে, 'সে ফটো তোমার কাকীমার ঘরে রেখে এসেছি, সেই ঘরে মালা দাও গে।'

হেমন্তবাবু ছয়মাস হইল পঞ্চদশী সুন্দরী শান্তিলতাকে বিবাহ করিয়া গৃহে আনিয়াছেন। মোহিনী ইহাতে সোয়াস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে। রাণী বিবাহের পর একবার-মাত্র শ্বশুরবাড়ী গিয়াছিল। তাহার স্বামী এতদিন পড়াশুনা করিতেছিল বলিয়াও বটে, বৈবাহিকের গৃহশূন্য হইয়াছে বলিয়াও বটে,—রাণীর শ্বশুর এতদিন বধূকে লইয়া যান নাই। তিনিও আবার বিপত্নীক। তবে তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী বালবিধবা জ্ঞানদা চিরকাল ভায়ের সংসারেই আছেন, এবং গৃহস্থালী চালাইতেছেন। সেজন্য তাঁহাকে কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। ছোট মেয়ে শ্বশুরবাড়ী আসিয়া তিনসন্ধ্যা বাপের বাড়ীর জন্য মন কেমন করিতেছে বলিয়া নাকে কাঁদিবে, সে সব তিনি দুচক্ষে দেখিতে পারেন না। তবে এতদিনে ক্ষিতীশ ওকালতী পাশ করিয়া প্রাক্টীস সুরু করিয়াছে,—বউও এত দিনে বড়-সড় হইয়াছে,—এইবার আর না আনিলে ঘর চলে না; সুতরাং রাণীর আর বাপের বাড়ী থাকা হইতে পারে না। অথচ রাণী চলিয়া গেলে, যুবতী বিধবা, পত্নীহীন ভাসুরের ঘরকন্না চালায় কি করিয়া? সেটা দেখিতে শুনিতেই বা কেমন লাগে? তার উপর পল্লীগ্রামের নরনারী সকলেরই চক্ষু ও রসনা সর্ব্বদা সজাগ থাকিয়া কেবল নূতন-নূতন ছিদ্র খুঁজিতে তৎপর;—অবসর-যাপনের এমন শ্রুতিসুখকর, ব্যাপার আর কি আছে? তা, মা কালীর দয়ায় বড়-ঠাকুরের এতদিনে সুমতি হওয়ায়, তিনি শান্তিকে বিবাহ করাতে, মোহিনী তবু নিশ্চিন্ত হইয়া বাঁচিল। তাহার যে ভাবনা হইয়াছিল!

অবশ্য দিদির কথা স্মরণ করিয়া মোহিনীর বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। কিন্তু সবই পোড়া কপালের দোষ; নহিলে, সে রাজরাণী এই বয়সে সোণার ঘর-সংসার ফেলিয়া, চাঁদের হাট রাখিয়া চলিয়া গেল কেন? সে অবশ্য ভাগ্যিমানী, এয়োরাণী—স্বর্গে গিয়াছে। মোহিনীর পোড়া অদৃষ্টে তো মৃত্যু নাই! সে মরিলেই তো সবদিকে ভাল হইত! বিধাতার উল্টা বিচার বোঝা দায়!

যাহা হউক, শান্তি বেশ চালাক-চতুর মেয়ে। লেখা-

পড়া, উল-বোনা, রান্না-বান্না সবেতেই সে বেশ নিপুণা। দোজবরে বরের সঙ্গে এমন বড়-সড় মেয়ে না হইলে সাজন্তই বা হইবে কেন? বউ দেখিয়া সকলেই একবাক্যে হেমন্তবাবুর পত্নী-ভাগ্যের প্রশংসা করিলেন। সেবারের চাইতে এবারেরটিও কোন অংশে নীচু নয়,—জোর কপাল না হইলে কি এমনটি জোটে?

তবে চারুমোহনবাবু লোকটা কিছু খুঁৎ-খুঁতে; তিনি বন্ধুসমাজে বলিয়া বসিলেন, "অনিলার মত স্বভাবের মধুরতা,—আর, নামটি শান্তিলতা হ'লেও—তেমন শান্ত ভাব কখনও এঁর হবে না।" অন্যায় কথা কহিলেই পাল্টা জবাব শুনিতে হয়। ধরণীবাবু উত্তর দিলেন, "কেন হে? তুমি সে খবর জান্‌লে কি করে? তোমার সঙ্গে কি কণের কিছু শ্রুতিমধুর সম্পর্ক আছে?" চারুমোহনবাবু উত্তর দেন নাই। এবারের কন্যাও তিনিই দেখিতে গিয়াছিলেন; এবং দেখিতে গিয়া, পনের বৎসর পূর্ব্বেকার কন্যা দেখার কথা তাঁহার মনে পড়িয়াছিল। তখন তাঁহারা ফোর্থ ইয়ারে পড়িতেছেন,—ইংরাজী ও সংস্কৃত সাহিত্যের আস্বাদনে মন-প্রাণে অপূর্ব্ব ভাবের নেশা ধরিয়াছে,—চোখেও সে নেশার রঙ্গ লাগিয়াছে। দুই বন্ধুতে একদিন ঘটকের সহিত পরামর্শ করিয়া (অবশ্য অভিভাবকের অজ্ঞাতে) হঠাৎ কন্যা দেখিতে গিয়াছিলেন। বৈশাখের শান্তোজ্জ্বল প্রভাতে বিস্তৃত উদ্যানে শিবপূজার জন্য ছোট-ছোট মেয়ের দল ফুল তুলিয়া, দুর্ব্বা খুঁটিয়া ফিরিতেছিল। তাহাদের কলহাস্য-ধ্বনিতে ও মলের রুণুঝুণু শব্দে প্রভাত-বায়ু মুখর হইয়া উঠিতেছিল। হঠাৎ পাড়ার ঘটক-দাদার সহিত দুইজন সুকান্তি, সুবেশ, তরুণ যুবককে দেখিয়া, বয়স্কা মেয়ের দল ছুটিয়া পলাইয়া গেল। ঘটক-দাদা অনিলার নাম ধরিয়া ডাকিতে, সে ফিরিয়া দাঁড়াইল,—ফুলে-ফুলে পরিপূর্ণ সাজিটি হাতে লইয়া বালিকা নতমুখে ঘটক-দাদার কথা শুনিবার জন্য দাঁড়াইয়া রহিল। সদ্যস্নাতার ভ্রমরকৃষ্ণ চুলের রাশি পিঠ ছাইয়া পড়িয়াছে। নিরাভরণা তরুণ দেহের শোভা সাজির মধ্যেকার ফুটন্ত ফুলের ন্যায়ই অতি সুন্দর। গাল-দুটিতে ব্রীড়ার রক্তিম আভা গোলাপের রঙ্গের অনুকরণ করিতেছে। বেগুনে রঙের তসরের কাপড়খানির মধ্য দিয়া সর্ব্বাঙ্গের লাবণ্য যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। ইতঃপূর্ব্বে একদিন দুই বন্ধু পিতার সহিত আসিয়া, গহনায় আপাদ-মস্তক-মোড়া, পাতা-কাটিয়া-চুল-বাঁধা, বড় রকমের টিপ্‌-পরা কনেটিকে দেখিয়া গিয়াছিলেন। সেদিন গহনার জলুস, কাপড়-চোপড়ের পারিপাট্য, মাথার উপরে জরি ও সোনার চিরুণী, ফুল প্রভৃতি দিয়া সাজান,—ছোট সাইজের একটা চুবড়ী ছাড়া মানুষটিকে ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ তাঁরা পান নাই। আজ মুক্তকেশী, সাজসজ্জার আড়ম্বর-শূন্য-দেহা বালিকার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া উভয়ে মুগ্ধ হইলেন। ঘটক দাদা বালিকার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিয়াছিল, "চেয়ে দেখুন মশাই, একেবারে হিমাচল-কন্যে গৌরী মার মতন রূপ। নাৎনি তোর বর এনেছি; তুইও পছন্দ করে নে। ওঁদেরই শুধু চোখ থাকবে কেন? আমার নাৎনিরও তো পছন্দ চাই।" অনিলা 'ধ্যেৎ' বলিয়া তখন ঘটক-দাদার হস্ত এড়াইয়া ক্ষিপ্রপদে চলিয়া গিয়াছিল। অদূরে পলাতকা সঙ্গিনীর দল অন্তরালে থাকিয়া এ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতেছিল। অনিলাকে দেখিয়া তাহারা হাততালি দিয়া হাসিয়া উঠিল। রহস্য করিয়া কে কি বলিল, অবশ্য সেগুলা আর ইঁহাদের শুনিবার সৌভাগ্য হয় নাই।

এবারের কনে দেখিতে গিয়া সকলেই পছন্দ করিলেন; কিন্তু চারুমোহনবাবুর মনে হইতেছিল, কিশোরীর নয়নে ও অধরে সলাজ নম্রতার পরিবর্ত্তে যেন কেমন একটা উগ্র ভাব ফুটিয়া রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহার বাজে কথায় কাণ দিবার অবসর তখন কোথায়? পাঁচজনের সাধ্য-সাধনায় যদি এত-দিনের পর হেমন্তবাবু বিবাহ করিতে রাজী হইলেন, আর এমন একটী সুন্দরী, বয়স্কা মেয়েও পাওয়া গেল,—তখন শুভস্য শীঘ্রম্। পুরুষ মানুষের চল্লিশ বছর বয়সে কি গৃহলক্ষ্মীশূন্য হইয়া থাকা পোষায়, না ভাল দেখায়? কথায় বলে, 'হতভাগার ঘোঁড়া মরে, ভাগ্যবানের স্ত্রী মরে'। আর স্ত্রী না হইলে পুরুষ মানুষের সময়ে খাওয়া-পরার পর্য্যন্ত কত অসুবিধা। উপযুক্ত সেবা-যত্ন না পাইলে শরীর টেঁকেই বা কেমন করিয়া?

বিবাহের পরই শান্তিকে স্বামি-গৃহে আসিয়া গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিতা হইতে হইল। রাণী কিন্তু মেয়ে ভাল নয়। পাড়ার পাঁচজনে আসিয়া যখন বর-বধূকে বরণ করিয়া, ঘন-ঘন শাঁখ বাজাইয়া উলু দিতে লাগিল, তখন রাণী, "আমার মা কোথায় গেলে গো" বলিয়া এমন কান্না জুড়িয়া দিল যে, পুরাতন দাস-দাসী সকলেই মৃতা গৃহকর্ত্রীর জন্য হায় হায়

করিতে লাগিল। শান্তির এসব ভাল লাগিবে কেন? রাণী আবার বড় একগুঁয়ে মেয়ে—সমবয়স্কা নব-বধূকে সে 'মা' বলিতে রাজী হইল না। মোটকথা তার চালচলন, বাপের কাছে আদুরে ভাব শান্তির চোখে মোটেই ভাল লাগিল না। গায়ে এক গা গহনা পরিয়া মেয়ে যেন দেমাকে ফাটিয়া পড়িতেছে! মেয়েছেলের এসব ধরণ-ধারণ কি ভাল কথা? শান্তির বাপ-মার অবস্থা ভাল নয়,—এমন দামী-দামী গহনা সে কখনও চোখেও দেখে নাই। হেমন্তবাবু স্ত্রীকে শীঘ্রই অনেক গহনা গড়াইয়া দিলেন। শান্তি খুব শীঘ্রই ঘর-কন্নার জিনিস-পত্র বুঝিয়া লইল। শয়ন-গৃহের বড় আলমারীতে কি আছে জিজ্ঞাসা করায়, মোহিনী কহিল, "দিদির জামা-কাপড়, গহনাপত্তর সব আছে।"

"বটে? চাবী কার কাছে?

"রাণীর কাছে। ঐ মাঝে-মাঝে খোলে, রোদ্দুরে দেয়, ঝেড়ে-ঝুড়ে রাখে।"

মনে-মনে হুঁ বলিয়া শান্তি জিজ্ঞাসা করিল, "ওর মার জিনিস বুঝি ঐ নেবে?"

মোহিনী ব্যাপার বুঝিয়া কহিল "না, ও নেবে কেন? ওর শ্বশুররা খুব বড়লোক, আর বড়বাবুও ওর বিয়েতে অনেক জিনিষ দিয়েছেন। অমূল্যধন বেঁচে থাকুক, তার বউ এসে একদিন ভাগ্যিমানী-শাশুড়ীর জিনিসপত্তর পরবে। টুনির বিয়েতে টুনিকেও কিছু দেওয়া হবে। রাণীর বিয়েতে দিদি নিজের হাতের মুক্তোর ব্রেসলেট্ আর কাণের মুক্তোর দুল জোড়া দিয়েছিলেন,—তখন টুনিরও কিছু পাওনা বটে।" শান্তির গা মাথা ঝিম্-ঝিম্ করিতে লাগিল,—কাণ ভোঁ-ভোঁ করিয়া উঠিল। এক মেয়েকে কোন্ না তিন-চার হাজার টাকার গয়নাপত্তর দেওয়া হয়েছে—এখনও এক মেয়ের বিয়ে বাকী। এরাই যদি সব দুয়ে নেয় তো আমার পেটে যারা জন্মাবে তারা কি এসে ফ্যান্ চাট্‌বে?

(৩)

"বাবা, মার ফটো এ ঘর থেকে বউ সরিয়ে দিলে কেন? তুমি বলেছ কি?" হেমন্তবাবু ঝগড়া-ঝাঁটি, বাগ্-বিতণ্ডা মোটেই পছন্দ করিতেন না। কাচারী হইতে বাড়ী আসিয়া, সম্মুখের দেওয়ালে ফটো না দেখিয়া শান্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফটোটা কি হইল" "সেখানা ছোট-দির ঘরে রেখে এসেছি।" বয়সে বড় বলিয়া মোহিনীকে শান্তি ছোট-দিদি বলিয়া ডাকিত,—সে শান্তিকে নূতন-দিদি বলিয়া সম্বোধন করিত।

শান্তির স্বরটা বেশ গম্ভীর। অনিলার ঐ তৈলচিত্র-খানি আজ দশবৎসর যাবৎ ঐখানে টাঙান ছিল। সজীব, নির্জীব দুই মূর্ত্তিকে সম্মুখে রাখিয়া এক সময়ে হেমন্তবাবু কত আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন। ছবির প্রতি অত্যধিক যত্ন দেখিয়া অনিলা এক-এক সময় আসিয়া বলিত, "আমি মলে তোমার দুঃখকষ্ট ঐ ছবি দেখেই ভুলিতে পারিবে।" অনিলার সে কথা বড় মিথ্যা হয় নাই,—পত্নীর মৃত্যুর পর দুই বৎসর হেমন্তবাবু সত্যই সেই প্রতিকৃতি দেখিয়া অনেকটা সান্ত্বনালাভ করিতেন। ফটোতেও অনিলার মুখের সেই হাসিটুকু যেন সুধার ধারা বর্ষণ করিতেছে। চোখের দৃষ্টি কি সুন্দর সরলভাবপূর্ণ! যাক সে কথা। পত্নীর ভাব দেখিয়া হেমন্তবাবু বুঝিলেন, কথা কহিলেই ব্যাপার অপ্রীতিকর দাঁড়াইবে; কাজেই,এ ক্ষেত্রে চুপ করিয়া থাকাই ভাল। তা'ছাড়া তিনি যখন দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করিয়াছেন, তখন মৃতা পত্নীর প্রতি সে সম্মান আর দেখাইবার উপযুক্ত ন'ন্। এখন কন্যার অনুযোগ শুনিয়া কহিলেন, "তাতে আর দোষ কি মা? সেও'তো ঘর বটে,—সেই-খানে তুমি মালা দিও।" রাণীর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। সে কহিল, "কিন্তু এইটেই তো আমার মায়ের ঘর,—এই ঘরেই আমার মার ছবি বরাবর ছিল।" হেমন্তবাবু উত্তর দিলেন না। কন্যার সহিত কথা-কাটাকাটি করিতে তাঁহার লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। তিনি নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলেন, "হায় অনিলা, সত্যই তো এ তোমারই ঘর; কিন্তু তুমি যে সাধ করে সব পায়ে ঠেলে চলে গেছো,—আমার কি দোষ?"

রাণী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "বাবা, বড় আলমারীর চাবী আমি কাকীমার কাছে রেখে যাব। আমি আলমারীর সব জিনিস রোদ্দুরে দিয়ে গুছিয়ে রেখে যাচ্ছি। আবার তো শীগ্‌গীর আস্‌ব, তখন আলমারী খুলে ঝাড়া-ঝোড়া কর্‌ব। এর মধ্যে ও-আলমারী খোলবার আর দরকার হবে না।"

হেমন্তবাবু কোন উত্তর দিলেন না, রাণীর কথার মর্ম্ম তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ছেলেমেয়েদের তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, কিন্তু তিনি এ কথা বেশ বুঝিতে

পারিয়াছিলেন যে,রাণী ও শান্তির মধ্যে যে ধূঁয়ার মত একটা আবছায়া জাগিয়া উঠিয়াছে, অচিরে উহা কাল মেঘের আকারে সমস্ত সংসার ছাইয়া ফেলিবে; এ অবস্থায় রাণীর শ্বশুরবাড়ী যাওয়াই মঙ্গল। হায়, এ যে বেশী দিনের কথা নয়,—হেমন্তবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিলেন, "আমার রাণু মা শ্বশুরবাড়ী চলে গেলে, বাড়ী-ঘর অন্ধকার হয়ে যাবে, আমি কেমন করে থাক্‌ব তখন? আমার ভাত খাবার সময় কে আমার পাতের কাছে বসে পাখার হাওয়া করতে-করতে এটি খাও, ওটি খাও, বলে হুকুম চালাবে?"

পিতা পুনরায় বিবাহ করিবার পর তাঁহাদের প্রতি আর যেন তাঁহার আগেকার সে ভাব নাই, রাণী ইহা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতেছিল, আর সঙ্গে-সঙ্গে তাহার মাতৃ-বিয়োগ-বেদনা দ্বিগুণ হইয়া বুকে বাজিতেছিল। শান্তি আজকাল স্বামীর আহারের সময় নিজেই উপস্থিত থাকে; সুতরাং, রাণী মন খুলিয়া বাপের সহিত কথা কহিতে পায় না। ক্রমে-ক্রমে সে পিতার আহারের সময় উপস্থিত থাকা বন্ধ করিয়া দিল,—শান্তি সে স্থান পুরামাত্রায় দখল করিল। হেমন্ত বাবু প্রথম-প্রথম একটু কিন্তু বোধ করিলেও, তার পর তাঁহারও অভ্যাস হইয়া গেল; এবং নববধূর হাতের পাখা নাড়িবার সময় চুড়িগুলির মিঠাঁ আওয়াজ তাঁহার কাণে ভালই লাগিতে লাগিল। খুব সম্ভব তাঁহার আর সে কথাও স্মরণ হইল না, যখন তিনি অনিলাকে বলিয়াছিলেন, "তুমি যাও, অন্য কাজ দেখ গে। আমার রাণু-মা থাকতে তোমার আর পাখা নাড়তে হবে না। এখন তোমায় কেয়ার করে কে? কি বল্‌ রাণু?" রাণী বিজয়-গর্ব্বে হাসিয়া পিতার কথায় সায় দিয়াছিল।

রাণী কতক্ষণ ম্লান মুখে, স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। কন্যার বিষন্ন মুখ দেখিয়া হেমন্তবাবুও একটা অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন, কিন্তু কি বলিবেন খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। এই সময়ে চঞ্চল-চরণে টুনি আসিয়া কহিল, "দিদি, নাপ্তিনী এসেছে। বৌমা আল্‌তা পর্‌ছে, তুই পর্‌বি তো শীগ্‌গীর আয়। আমি পর্‌ছি।" টুনি চলিয়া গেলে, রাণীও যাইতেছে, এই সময় হেমন্ত বাবু কহিলেন, "রাণু মা, তুমি কেন শুধু বৌ না বলে, টুনির মতন বৌমা বল না? এও তো তোমাদের—"

রাণী যেন চাবুক খাইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, রুক্ষ কণ্ঠে কহিল, "বাবা, বউকে আমি মা কিছুতে বল্‌তে পার্‌বো না। মা বল্‌তে গেলে, আমার মায়ের কথা মনে পড়ে—বুক ফেটে যায়। আমার মা বেঁচে থাক্‌লে কার সাধ্যি এ ঘর-দোর আগ্‌লে বস্‌ত। মায়ের ছবি এ ঘর থেকে সরাবার কার ক্ষমতা হ'ত? আজ মা নেই বলেই না আমরা নিজের বাড়ীতে ভয়ে-ভয়ে রয়েছি!"

রাণী বরাবরই বাপ-মার আদরিণী মেয়ে। তার অভিমান বড় বেশী, রাগিলে মুখ ফোটেও বেশ।

চারুমোহন বাবু দরজা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিলেন। কথাগুলা তাঁহারও কাণে গিয়াছিল। তিনি ডাকিলেন, "ও ক্ষেপি মা, বলি রেগেছিস্‌ কেন? শোন্‌ শোন্‌, শুনে যা বেটি।" রাণী কি আর এক দণ্ড সে স্থানে দাঁড়ায়? সে থর্‌-থর্‌ করিয়া চলিয়া গেল। হেমন্তবাবু মুখ কাল করিয়া স্তম্ভিত ভাবে বসিয়া রহিলেন। কথাগুলা যদি শান্তি শুনিয়া থাকে, তাহা হইলে আজ এক পর্ব্ব না হইয়া যায় না।

দু'-চার দিনের মধ্যেই রাণীকে শ্বশুরবাড়ী যাইতে হইল। যাইবার সময়ে মৃতা জননীর উদ্দেশে মাটীতে লুটাইয়া পড়িয়া সে এমন করুণ স্বরে কান্না জুড়িয়া দিল যে, অমূল্য, টুনি, মার আমলের ছোঁড়া চাকর ভীখু পর্য্যন্ত সে কান্নায় যোগ দিল। মোহিনী অশ্রু মুছিতে-মুছিতে কত প্রবোধ দিতে লাগিল,—শ্বশুরবাড়ী যাইবার সময় এ রকম কাঁদিলে অকল্যাণ হইবে, ইত্যাদি। পাশের ঘরে, হেমন্ত বাবুরও চক্ষু দিয়া বাধা না মানিয়া তপ্ত অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। অনর্থক এই মড়া-কান্না শান্তির হাড়ে-হাড়ে ছুঁচের মতন বিঁধিয়া দেহের রক্ত পর্য্যন্ত যেন বিষাইয়া তুলিল।

৩

চারুমোহন বাবুর স্ত্রী সরলা হেমন্তবাবুর বিবাহের সময় উপস্থিত ছিল না, পিত্রালয়ে প্রসব হইতে গিয়াছিল। অনিলার সহিত তাহার সখিত্ব ছিল; সুতরাং হেমন্ত বাবুর বিবাহ-সংবাদে সে মোটেই খুসী হয় নাই। বরং—বুড়া বয়সে আবার ভীমরতি ধরিল কেন? সে মেয়ের সাধে মেয়ে, সোণার চাঁদ ছেলে, সবই দিয়ে গেছে, তবে কেন মিন্সের আবার বিয়ের সখ চাপ্‌ল? অনিলাকে যে দণ্ডে-দণ্ডে চোখে হারাত, সে সব বুঝি ভুয়া ভালবাসা......ইত্যাদি মন্তব্যগুলি তীব্র ভাবে প্রকাশ করিল।

বাড়ী ফিরিয়া সরলা হেমন্তবাবুর পরিবর্ত্তে, চারুমোহন বাবুকেই কয়েকটা চোখা-চোখা বাক্যবাণে বিদ্ধ করিয়া নাকাল করিতে চেষ্টা করিল। তার পর উদ্যোগ করিয়া অনিলার পদাভিষিক্তাকে দেখিতে গেল। শান্তি বাক্‌চতুরা, প্রিয়ভাষিণী ছিল; সহজেই সে মিষ্টালাপে লোকের মন বশ করিতে পারিত। সুতরাং সরলার তাহাকে মন্দ লাগিল না। ক্রমে দুইজনে একরকম বনিয়া গেল। পাশাপাশি বাড়ী; কাজেই ঘনিষ্ঠতা না হইয়া যায় কোথা? সেদিন সরলা কোলের খুকীকে লইয়া বেড়াইতে আসিয়া দেখিল, মোহিনী পূজা সাঙ্গ করিয়া তুলসী-মূলে প্রণাম করিতেছে। সরলা কহিল, "এ কি ছোট বউ, এখনো তোমার খাওয়া হয় নি? বেলা যে দুটো বেজে গেছে!" মোহিনী হাসিয়া কহিল, "গেরস্ত-ঘরে কাজের কি কম আছে দিদি? আঁশ, নিরিমিষ রান্না শেষ করে,ঠাকুরের ভোগের পায়েস রেঁধে, সবাইকে খাইয়ে দাইয়ে তবে ত জপে বস্‌বো।"

"কেন? তোমাদের ঠাকুর কোথায়? গেরস্তর রান্না সেই ত রাঁধত, তুমি ত কেবল ঠাকুর-ঘরের কাজ-কর্ম্ম আর ভোগ রাঁধা নিয়ে থাক্‌তে। এক অমূল্যর ঝোঁক্‌ সামলাতেই তোমায় অস্থির হতে হয়,—তা আজকাল এ আবার নতুন বিধি হ'লো কবে থেকে?"

"ঠাকুর যে বাড়ী গেছে।"

"তা নতুন বৌ বুঝি হেঁসেলে ঢোকে না? তবে যে শুন্‌ছিলুম, নতুন বোয়ের খুব রান্নার যশ বেরিয়েছে?" "আর সে কথা কি বল্‌বো দিদি! বাবুরা বুঝি বিয়ের সময় শুনে-ছিলেন, নতুন-দিদির হাতের রান্না খুব ভাল। একদিন সবাই খেতে চাইলেন। তা' নতুন-দিদি জোগাড় করে পাঁচরকম রাঁধলে। কিন্তু সন্ধ্যার পর সে যে ফিট্‌ আরম্ভ হ'ল। ডাক্তার এলো; বললে, যেন কিছুদিন আগুন-তাতের ত্রিসীমায় না যেতে দেওয়া হয়। সে যে সর্ব্বনেশে হাত-পা ছোঁড়া,—আমি ত দেখে ভয়েই অস্থির।"

"ভাল" বলিয়া সরলা শান্তির ঘরে আসিল। শান্তি সরলাকে দেখিয়া কহিল, "এই যে দিদি এসেছ। আমাদের ফটো আজ বাঁধিয়ে এসেছে। দেখ দেখি, কি রকম হয়েছে?"

শান্তি কয়দিন হইতে স্বামীকে বলিয়া-কহিয়া নিজের ও হেমন্তবাবুর একখানি ফটো তুলাইয়াছিল। আজ সেখানি চওড়া সোণালী কাজ-করা ফ্রেমে বাঁধাইয়া আসিবামাত্র, যেখানে অনিলার ফটো ছিল, সেইখানে টাঙাইয়া দিয়াছে। সরলা দেখিয়া কহিল "হয়েছে বেশ; কিন্তু অনিলাদেরও যে একখানা এই রকম যুগল রূপের ফটো ছিল, সেখানা বড় চমৎকার হয়েছিল। তখন হেমন্তবাবুর জোয়ান বয়েস কি না।"

এই তো রসভঙ্গ হইয়া গেল। মুখ কাল করিয়া শান্তি কহিল, "সে ফটো কোথায়? আমি তো কই দেখিনি!" "দেখনি? সে বেশ ফুল পেলেটের ছবি—বড় আলমারীতে আছে বোধ হয়।" "আচ্ছা, আমি চাবিটা চেয়ে আন্‌ছি।"

রাণীর বারবার নিষেধ সত্ত্বেও শান্তির হুকুম মোহিনী অমান্য করিতে পারিল না, চাহিবামাত্র চাবিটি শান্তির হাতে দিল।

বাস্ রে! আলমারী-ভরা কত জিনিস, কত বিচিত্র পাড়ের, বিচিত্র রঙ্গের শাড়ী ও জামা। ভাল-ভাল রেশমী শাড়ী, জরির শাড়ী, কারুকার্য্য করা শালের যোড়া,—রূপার এক সেট, হাতীর দাঁতের এক সেট খেলনা,—কি তার নক্সা, কি তার কারুকার্য্য! রূপার বড়-বড় বাটী, রেকাবী, পানের ডিবা, ফুলদান,—শান্তি অবাক হইয়া দেখিতে লাগিল। আলমারীতে যে এত ভাল-ভাল জিনিস আছে, তাহা সে কখনও কল্পনাও করিতে পারে নাই।

সরলা শান্তির বিস্ময়-বিমুগ্ধ ভাব লক্ষ্য করিয়া কহিল, "এ তো সব জামা কাপড়। অনিলার গায়ের গয়না বুঝি তুমি দেখ নি?" শান্তি মাথা নাড়িল মাত্র।

সরলা কহিল, "সে সব এক-একখানা গয়নার ওজন কি, আর নক্সাই বা কি! সব ঢাকার গড়ন।"

একখানি পাতলা আচ্ছাদনীতে ঢাকা ফটোখানি সরলা টানিয়া লইয়া কহিল, "এই সেই ফটো।" ফটো তুলাইবার ভঙ্গিটি সম্পূর্ণ নূতন। চেয়ারের উপর হেমন্তবাবু বসিয়া আছেন; পাশে সুন্দরী অনিলা সুসজ্জিতা বেশে দাঁড়াইয়া। অনিলার পিঠ ছাইয়া চুলের গোছা হেমন্তবাবুর কাঁধে ও হাতে আসিয়া পড়িয়াছে। গলায় একছড়া মোটা ফুলের গোড়ে। একছড়া সরু ফুলের মালা কপাল বেড়িয়া রহিয়াছে। হেমন্তবাবু একহাতে স্ত্রীর কটিদেশ বেষ্টন করিয়া, আর একহাতে অনিলার একখানি হাত ধরিয়া হাসিমুখে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। সে চাহনিতে

কি সোহাগ, কি আদরের ভাব! অনিলার চক্ষু দুটিতে লজ্জা ও সঙ্কোচের ছায়া। ঠোঁট দুখানিতে ঈষৎ হাসির আভাস,—সমস্ত দেহে একটু জড়সড় ভাব। লজ্জার লালিমা যেন গাল দুটিকে রাঙাইয়া তুলিয়াছে। ফটোতে সে সব বর্ণ-বৈচিত্র্য ধরা না পড়িলেও ফটো দেখিবামাত্র দর্শকের এমনিই মনে হয়।

শান্তির চোখ দুটা যেন জ্বালা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে সে ঠোঁট উল্‌টাইয়া কহিল, "কিন্তু কি বেহায়াপনা বাপু! আমি ত সে-দিন লজ্জায় ভাল করে তাকাতেই পারছিলুম না! পরপুরুষের সামনে এমনি রঙ্গভঙ্গী করে দাঁড়িয়ে ফটো তোলানো,—সেই ছবি আবার পাঁচজন দেখ্‌বে! কি ঘেন্না মা!"

সরলা কহিল "পর-পুরুষ আবার কে? অনিলার এক দিদি বেশ ছবি তুল্‌তে পারে। সে তার স্বামীর কাছে শিখেছিল,—তিনি একজন ফটোগ্রাফার কি না। সেই দিদিই সাধ করে বোন্‌-ভগ্নিপতির ফটো তুলে দিয়েছিল। তা' অনিলা এখানা বাইরে রাখ্‌তো না। হেমন্তবাবুর আগে-আগে বেশ চুলের বাহার ছিল,—এদানী মাথার চুল উঠে গিয়ে গড়ের মাঠ বেড়িয়ে পড়েছে।"

সরলার দাসী হিমি আসিয়া ডাকিল, "মায়ের গল্প করতে বস্‌লে হুঁস্‌ থাকে না। সুধা-দিদি, ঘুম থেকে উঠ্‌তেই যে কান্না জুড়েছে, ঘরকে এস বাছা।" সরলা চলিয়া গেল। শান্তি ফটো-খানা আবার হাতে করিয়া দেখিতে লাগিল। দেখিতে-দেখিতে তার দেহ মন জ্বালা করিতে লাগিল। রূপ, রস, যৌবনের সব সত্বটুকু নিঙ্গাড়িয়া উপভোগ করিয়া, তাহার জন্য শুধু উচ্ছিষ্ট খোলাটুকু ফেলিয়া রাখিয়া গেছে,—সতীনগুলা এমনি রাক্ষসীই বটে। সেই মানুষ, সেই দেহ, কিন্তু সে কান্তি, সে লাবণ্য নাই। সেই প্রাণ, কিন্তু আজ রসশূন্য, প্রেমোচ্ছ্বাসহীন। এ কি বিড়ম্বনা। সে যেমন ঠকাইয়াছে, তাহার শোধ লইবার ত আর কোন উপায় নাই। নিষ্ফল আক্রোশে শান্তির অন্তরাত্মা ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। একবার অনিলার ফটোর দিকে চায়, আর একবার নিজেদের ফটোর দিকে চাহিয়া ভাবে, "ও ফটোখানাতে চোখে-মুখে হাসি-ভালবাসা যেন ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে,—এতে তার নাম-গন্ধ নেই। তোলাতেই তো চায় নি,—আমি জোর করে ধরে-বেঁধে তুলিয়েছি বই ত নয়। পরের জেদে ত' আর ভেতরের ভালবাসা ফুটিয়ে তোলা যায় না,—সবই আমার পোড়া অদৃষ্ট।"

(৪)

কাছারী হইতে ফিরিয়া হেমন্তবাবু চা খাইতে বসিলে, অমূল্য ও মণি কাছে গিয়া বসিত, বাপের সঙ্গে গল্প করিত; চা, জলখাবারের অংশ হইতে প্রসাদও পাইত। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে লইয়া না খাইলে হেমন্তবাবুর তৃপ্তি হইত না। এ অভ্যাসের জন্য অনিলার কাছে তিনি অনেক সময় তিরস্কৃত হইতেন,—"এই ওরা খেয়েছে, আবার খেতে দিচ্ছ কেন? নিজে খাও না।"

হেমন্তবাবু বলিতেন, "তোমার নজর দেবার দরকার নেই। একটু-আধটু মুখে দিয়ে দিচ্ছি বই ত নয়। ওরা আমার সঙ্গে খেতে ভালবাসে, জানই ত।"

শান্তি গৃহিনী-পদে অধিষ্ঠিতা হইবার পরও কিছুদিন পর্য্যন্ত এ ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণই ছিল। বুদ্ধিমতী মোহিনী শান্তির বিরাগ আশঙ্কা করিয়া, হেমন্তবাবুর চা খাইবার সময়, টুনি ও অমূল্যকে সাবধানে আগুলিয়া রাখিতেন। টুনি অল্প দিনেই বুঝিতে পারিল, পিতার সহিত আর তাহার খাইবার বয়স নাই,—যেহেতু, দু-চারি বৎসর পরেই তাহাকেও দিদির ন্যায় শ্বশুরঘর যাইতে হইবে; যদিচ সে বুঝিতে পারিল না, পিতার সহিত চা-জলখাবার খাওয়ার সহিত উহার সম্পর্ক কি? কিন্তু অমূল্যর ত সে সব বালাই নাই। যাহা হউক, মোহিনী তাহাকেও নানা ছলে আগুলিয়া রাখিত।

এখানে আসিয়া শান্তিরও চা-পানের অভ্যাস দাঁড়াইয়াছিল। স্বামীর সহিত সেও বসিয়া চা খাইত; কাজেই ছেলে-মেয়ে দুটো আসিয়া পড়িলে, হাসি গল্প কিছুই আর তেমন জমিত না। সুতরাং মনটার মধ্যে ছ্যাঁৎ-ছ্যাঁৎ করিলেও, ইদানীং হেমন্তবাবুও আর উহাদের ডাকিতে পারিতেন না।

সেদিন উভয়ে গল্প করিতে-করিতে চায়ে চুমুক দিতে-ছেন, অমূল্য অকস্মাৎ কোথা হইতে বন্ধন-মুক্ত মৃগশিশুর ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া কহিল—"আমি চা খাব বাবা! ছোট-মা ভারী দুষ্টু হয়েছে। আজকাল চা খেতে আসতে দেয় না। বলে, তোর পেট গরম হয়েছে। সব মিথ্যে কথা বাবা। তুমি পেটে হাত দিয়ে দেখ না, কত ঠাণ্ডা, একটুও গরম নেই।"

"আয়, খাবি আয়" বলিয়া হেমন্তবাবু যেমন পেয়ালাটি

অমূল্যর মুখে দিতে গেলেন, দুরন্ত বালক তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া আসিতে, ঠেলা লাগিয়া শান্তির হাত হইতে গরম চায়ের পেয়ালা টপ্ করিয়া ভূমিতে পড়িয়া চূর্ণ হইয়া গেল। গরম চা শান্তির হাতে পড়ায় "উঃ বাপ্‌রে, পুড়ে মলাম" বলিয়া শান্তি আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। অমূল্য ত হতভম্ব। হেমন্তবাবু ক্রুদ্ধ হইয়া অশান্ত বালকের গালে এক চড় বসাইয়া দিবামাত্র, সে দ্বিগুণ আর্ত্তনাদ করিতে-করিতে ছোটমার কাছে ছুটিল। শান্তি গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। হেমন্তবাবু শান্তির জন্য খানিকটা ভেস্‌লীন লইয়া শান্তির হাতে লাগাইয়া দিতে গেলেন। শান্তি হাত ঠেলিয়া দিয়া কহিল, "আর আত্তিতে কাজ নেই, আমি ত সকলেরই আপদ!" কথাটার অর্থ হেমন্তবাবু বুঝিতে পারিলেন না; তবে এইটুকু মাত্র বুঝিলেন, বাদ-বিসম্বাদগুলাকে যতই তিনি অপছন্দ করেন, তাহারা তেমনি তাঁহাকে আশ্রয় করিবার জন্য সুযোগ খুঁজিয়া ফিরিতেছে।

হেমন্তবাবু কহিলেন, "জ্বালাটা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে,—একটু লাগিয়ে দিই,—লক্ষীটি, অমন কোরো না। ইস্, বড্ড রাঙা হয়ে উঠেছে যে!"

শান্তি আর প্রতিবাদ করিল না। হেমন্তবাবু ভেস্‌লীন লাগাইয়া দিয়া পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে কহিলেন, "আল্‌মারী পছন্দ হয়েছে শান্তি?"

"না হ'লে আর উপায় কি?" হেমন্তবাবু আদর করিয়া শান্তির চিবুক ধরিয়া কহিলেন, "তোমার পছন্দ হয়েছে শুনলে মনটা আমার কত খুসী হয় বল দেখি। তুমি সেদিন আলমারী চেয়ে পর্য্যন্ত আমার এ কথাটি মনে ছিল, কাল বড় সাহেব আলমারী বেচ্‌বেন শুনেই, আমি পাঁচটাকা বেশী দিয়ে ওটা কিনে ফেল্‌লাম। অনেকেই কেন্‌বার জন্য ঝুঁকেছিল।" শান্তি স্বামীর অনুরাগের এতখানি প্রমাণ অগ্রাহ্য করিয়া, মুখ ফিরাইয়া কহিল—"তুমি ত আর আমায় ভালবাস না!" এ কি কঠিন অভিযোগ! হেমন্তবাবুর মাথা ঘুরিয়া গেল। তাঁহার শরীরের শিরা-উপশিরায় আজ আবার যৌবনের চঞ্চল শোণিতধারা সবেগে বহিল। অভিমানিনীকে কোলের উপর টানিয়া লইয়া কহিলেন, "তুমি এত নিষ্ঠুর কেন শান্তি? কেন আমার মনে ব্যথা দাও? বল, আমার ভালবাসার কি প্রমাণ পেলে তুমি সন্তুষ্ট হও?" এই ঘর, এই পালঙ্ক,—এই শয্যার উপর বসিয়া, বার বৎসর পূর্ব্বে আর একজন অভিমানিনীকে বুকে টানিয়া, তিনি ঠিক এই কথাগুলিই উচ্চারণ করিয়াছিলেন। সুতরাং কথাগুলি বলিয়াই তাঁহার সে অতীত স্মৃতি মনে পড়িল। এ কিন্তু কই তাহার মত চোখে জল, মুখে হাসি লইয়া, স্বামীর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া, সূর্য্যমুখী প্রভাতে যেমন করিয়া ঊর্দ্ধমুখী হইয়া রবি-কিরণ-প্রার্থনায় আকাশের দিকে তাকায়, সেই রকম করিয়া নিজের পুষ্পপেলব অধরখানি চুম্বনের আশায় বাড়াইয়া দিল না,—বরং উহার পরিবর্ত্তে তাহার দুই গণ্ড বাহিয়া ধারা নামিল। সুন্দরী, যুবতী, মানিনী প্রেয়সীর নয়নে তপ্ত অশ্রুধারা বহিতেছে,—এ দৃশ্যে বড়-বড় বীর-পুরুষের হৃদ্‌কম্প হয়,—এ ত সামান্য হেমন্তবাবু!

ভাবুক পাঠকগণ, তাঁহার মনের অবস্থা আপনারা কল্পনা করিয়া লউন। আমরা এ বিষয়ে অক্ষম। কিছুক্ষণ পরে হেমন্তবাবু শান্তির চক্ষু মুছাইয়া দিয়া কাতর কণ্ঠে কহিলেন, "শান্তি! বড় জ্বালায় সান্ত্বনা লাভ করবার জন্যে তোমায় বিয়ে করেছি। তুমি আমার বড় আদরের, বড় ভালবাসার জিনিস। আমার ভালবাসার যদি কিছু ত্রুটি তুমি পেয়ে থাক, আমায় তা বুঝিয়ে দাও,—কিন্তু এমন করে আমার প্রাণে ব্যথা দিও না। আমি বড় হতভাগা শান্তি! তুমি ছেলেমানুষ, তুমি জান না,—তোমার সুখসাচ্ছন্দ্যের জন্যে আমি কতখানি দিয়েছি, আর কত দিতে পারি।" কথাগুলা যেন বেসুরা বাজিল। কেহ সমজ্‌দার থাকিলে বুঝিতে পারিতেন, ইহা ত ঠিক যুবতীর প্রতি যুবকের প্রেমোচ্ছ্বাস নয়! শান্তি কিন্তু মনে-মনে অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া কহিল—"তোমার মেয়ে বড় আলমারীর চাবী বিশ্বাস করে আমার কাছে রেখে যায় নি; কেন, আমি কি বাড়ীর কেউ নই? আমি কি সেগুলো খেয়ে ফেলতাম? তোমার সে স্ত্রীর কত গয়না, কত দামী-দামী জিনিস আছে, আমায় ত এক দিন চোখে দেখ্‌তে দাও না,—কেন? আমি কি সেগুলো বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিতাম? আমি সব কিন্তু দেখ্‌ছি, মনে রাখ্‌ছি, মুখ ফুটে কিছু বলি না তাই। অন্য মেয়ে হলে ইত্যাদি ইত্যাদি—"

মুহূর্ত্তে সব বিপর্য্যয় হইয়া গেল। হেমন্তবাবু নিজের হৃদয়াবেগ সংযত করিয়া ধীর কণ্ঠে কহিলেন, "শান্তি, বড় আলমারীর চাবীতে তোমার আবশ্যক কি? ওতে যে-সব জিনিস আছে, তার বেশীর ভাগই আমার শাশুড়ী তাঁর

মেয়েকে দিয়েছিলেন। সে বড়লোকের বাড়ীর একটীমাত্র আদরের মেয়ে ছিল,—অনেক দামী জিনিস সে প্রায়ই উপহার পেতো। সেগুলোতে আমার কোন দাবী-দাওয়া নেই। তা ছাড়া, তাকে আমি যা কিছু একদিন দিয়েছিলাম, সে সকল দত্ত ধনে আমারও আর কোন অধিকার নেই,—তার ছেলে-মেয়েরাই এখন সে-সব পাবে। তোমারও ত কোন অভাব নেই, শান্তি! গহনা, কাপড়, যখন যা দরকার, আমিই দিচ্চি, দোবোও। আলমারী চাইবামাত্র এনে দিলুম। আর কি চাই বল, শুধু তোমার হাসিমুখ—" আর হাসিমুখ! বর্ষার ঘন কাদম্বিনী শান্তির মুখ অন্ধকার করিয়া জুড়িয়া বসিল। শান্তি বোকা মেয়ে নয়। প্যানপ্যান করিয়া না কাঁদিয়া, সে উঠিয়া বসিয়া গম্ভীরভাবে কহিল, "দত্ত ধনে যদি অধিকার না থাকে, তা'হলে মনটাও ত একদিন তাকেই দিয়েছিলে,—এখন আবার ঢঙ করে' সেই ভালবাসা কি কোরে আমায় দিতে এসেছ? ও ঝাঁজরা ফুটো প্রাণ নিয়ে আমার সঙ্গে কারবার চল্‌বে না বল্‌ছি।" শান্তি সেদিন উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম পড়িয়াছে, 'প্রাণ নিবিগো' পাতাখানা সে প্রায় কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছে। কথাগুলা বেশ সরল হইলেও, শুনিয়াই ত হেমন্তবাবুর মাথার ভিতর তুমুল গোলযোগ বাধিয়া গেল। শান্তি ত আজ বড় জবর কথাই বলিয়া বসিয়াছে,—এটা ত নিতান্ত উড়াইয়া দিবার মতন কথা নয়! কিন্তু কোন্ যুক্তি ও তর্কের দ্বারা বালিকাকে এখন বুঝান যায় যে, 'ওগো, জড় ও চেতন দুটা জিনিসের উপর স্বত্ব বা দাবী সমানভাবে চলিতে পারে না; চেতন পরিবর্ত্তনশীল, জড়ের রূপান্তর নাই।' তা ছাড়া, শান্তি কি বুঝিতে চাহিবে, যে, হেমন্তবাবু তাহারই মধ্য দিয়া সেই অনিলাকেই ভালবাসিতে চাহিতেছেন,—কায়াকে হারাইয়া শান্তির মধ্যে তিনি অনিলাকে পাইতে চাহেন? (এগুলি হেমন্তর নিজস্ব যুক্তি!) যখন স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে এই প্রেমাভিমানসূচক ক্ষুদ্র অভিনয়-লীলা চলিতেছিল, সেই সময় পাশের ঘরে, পিতার চড় খাইতে অনভ্যস্ত অমূল্য ছোট-মার কোলে মুখ গুঁজিয়া, ফুলিয়া-ফুলিয়া এমন অভিমানের কান্না কাঁদিতেছিল যে, মোহিনীরও দুই চক্ষু হইতে বড়-বড় ফোঁটা, বাধা না মানিয়া গড়াইয়া পড়িতেছিল।

৫

চারুমোহনবাবুর বড় ছেলে খগেন্দ্র রাণীর সমবয়স্ক। চার বছরের বোন্ সুধা যখন মহা উৎসাহের সহিত তাহাকে বলিল—"দাদা, আজ তুমি কিছু যেন আক্কসের মতন খেয়ে বোসো না, আজ ভাইফোঁটা দোবো" খগেন্দ্র হাসিয়া কহিল, "সকাল না হতে-হতেই আক্কসের মতন্ কে খেতে বসে,—তুই, না আমি? তুই আজ কি খেয়েছিস্ বল্ ত?" সুধা সবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, "আজ আমি উপুস্ কর্‌ছি—কিচ্ছু খাই নি,—দুধ না, মুড়ি না, শুধু একটা ছন্দেশ খেয়েছি।" খগেন্দ্র হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "খুব উপুস করিছিস্ ত! আমিও তোর মতন উপুস কর্‌ব, কি বল্?" সুধা আপত্তি করিল, "না, না, মা বল্‌লে আমি যে ছেলেমানুষ!" খগেন্দ্র বলিল, "অমূল্যকে নেমতন্ন করেছিস্ ত?" সুধা বেচারীর অতশত জানা ছিল না। সে তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া অমূল্যদের বাড়ী গিয়া, অমূল্যকে নিমন্ত্রণ করিবার পূর্ব্বে, অমূল্যর পিতাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল,—অবশ্য অমূল্যকেও বাদ দিল না। কিছুক্ষণ পরে হেমন্ত-বাবু অমূল্যর হাত ধরিয়া বন্ধুর বাহিরের ঘরে আসিয়া দেখা দিলেন। চারুমোহনবাবু বন্ধুকে দেখিয়া চশমা খুলিয়া, কোঁচার খুঁটে ভাল করিয়া মুছিয়া আবার চোখে দিলেন। হেমন্তবাবু মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "অবাক্ হয়ে দেখ্‌ছ কি? চিন্‌তে পারছ না?"

"চিন্‌তে পারছি বৈ কি। তবে মনটা বড় খুঁৎখুঁতে,—চোখ্‌কে ধমক দিয়ে বলে, কি দেখ্‌তে কি দেখ্‌ছিস্,—ভাল কোরে নিরিখ করে দেখ্।" এ পরিহাস হেমন্তবাবুকে মিঠে-কড়া রকমের আঘাত করিল। যে চারুমোহনবাবুর সঙ্গ তিনি শৈশবে, যৌবনে, প্রৌঢ়াবস্থায়, ছাত্রজীবনে, কর্ম্মক্ষেত্রে সবদিন সমান ভাবে ভোগ করিয়া আসিতেছেন,—গত কয় মাস হইতে সে একটানা গতির রোধ হইয়াছে। সন্ধ্যার পর শান্তির একা থাকিতে ভয় করে বলিয়া, তাহাকে ছাড়িয়া তিনি আর চারুমোহনবাবুর বাড়ী আসিয়া তাঁহাদের প্রাত্যহিক সান্ধ্য-সভায় যোগ দিতে পারেন না। উভয়ের বাড়ী খুব কাছাকাছি হইলেও, চিরকাল চারুমোহনবাবুর বাড়ীতেই বন্ধুগণ সমবেত হন; তাস্, দাবা প্রভৃতি খেলা-গুলিও চলিতে থাকে। হেমন্তবাবু পূর্ব্বে কখনও এ সভায় অনুপস্থিত হইতেন না। সুতরাং তাঁহার অনুপস্থিতি সকলের

চমকপ্রদ হইলেও, উহার কারণ বুঝিয়া কেহ আর তাঁহাকে ডাকিতে ব্যস্ত হন নাই। বরং তাঁহাকে উপলক্ষ করিয়া যে আলোচনাটুকু সভায় চলিত, তাহাতে খোস-গল্প জমিত ভাল। কোন-কোন রসজ্ঞ ব্যক্তি পত্নীতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্বের মীমাংসায় সভা মজগুল করিয়া তুলিতেন,—শ্রোতারা উপভোগ করিয়া খুসী হইত। হেমন্তবাবুকে অপ্রতিভ দেখিয়া চারুমোহনবাবু কহিলেন, "তার পর? নতুন খবর কিছু আছে? নতুন গৃহিণীর গৃহস্থালী চল্‌ছে কেমন্? শাসনটা সম্ভবতঃ কিছু মিঠে-কড়া?"

"আর ভাই,—তোমরাই পাঁচজনে হুজুক করে ধরে বেঁধে এ গ্রহ ঘটালে। এ যেন কিছুতেই খাপ খাচ্ছে না। বুড়ো বয়সে কত আর একটা ছেটে মেয়ের মন যোগাব? যা সব শেখা ছিল, সে ত কোন্ দিন ভুলে বসে আছি।"

"বেশ ত, নতুন গিন্নীর পাল্লায় পড়ে আবার সেগুলো নতুন করে মুখস্থ কর, তাতে আর ভাবনা কি? তোমার ত দেখ্‌ছি সামনের মাথায় আবার চুল গজিয়ে উঠছে। গিন্নীর হাতের গুণ আছে বল্‌তে হবে। যে চুলগুলোয় পাক ধরেছিল, সেগুলোও প্রায় কাল হয়ে আস্‌ছে! নবীনার সংসর্গে যৌবন ফিরে পাচ্ছ দেখ্‌ছি। আমাদের ভাই অদৃষ্ট মন্দ, সামনের দিকেই পা এগিয়ে চলেছে, পিছন দিকে ফেরবার সাধ্য কি?" হেমন্তবাবু সলজ্জ ভাবে কহিলেন, "আর ভাই, শান্তি বড় ছেলেমান্‌ষী করে। জান ত, কেমন একজিদে মেয়ে! আমারও কপালের ভোগ ছিল,—নইলে এ বয়েসে কি আর সাজগোজ পোষায়?"

চারুমোহনবাবু উৎসাহের সহিত কহিলেন, "তা বল্‌তে দোষ কি,—এই মেয়েদের জ্বালায়ই ত আমাদের অকালে বার্দ্ধক্য ঘটে! একটু আস্তে-আস্তেই বলি,—ওঁদের আবার আঁড়পাতা গুণটুকুও আছে,—জানালার আড়াল থেকে শুন্‌তে পেলে হয় ত ইঁট ছুঁড়ে মাথায় মারবে,—বছর না ফির্‌তে-ফির্‌তে একটা করে ছেলে, নয় ত মেয়ে আম্‌দানী করবে। বার বছর না হতেই দাও সেই মেয়ের বিয়ে! তার পর চল্লিশ না পেরুতেই নাতি-নাতনীর ঠাকুদ্দা সাজ! সেদিন ভাই, তাড়াতাড়ি বেড়াতে যাচ্ছি, আল্‌না থেকে একটা পাঞ্জাবী টেনে গায়ে দিতে, গিন্নী কোত্থেকে এসে টান দিয়ে কেড়ে নিয়ে বল্‌লে "দেখ্‌তে পাচ্ছ না, এটা চুড়িদার, তোমার সেই আগেকার পাঞ্জাবী! ছেলের সাম্‌নে এটা পর্‌বে কোন্ লজ্জায়?"

টুনি কিছুক্ষণ পূর্ব্বে খগেনকে ফোঁটা দিতে আসিয়াছিল, পিতার গলার সাড়া পাইয়া, ছুটিয়া চারুমোহনবাবুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া, কাণে-কাণে কহিল, "বাবা ত এসেছে জ্যেঠামণি, সেই কথাটা বল এইবার।" বলিয়াই টুনি ছুটিয়া পলাইয়া গেল। কিছুদিন পূর্ব্বে সে যখন-তখন পিতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া অমূল্য ও রাণীর বিরুদ্ধে কত কি গোপনীয় কথা ফিস্‌ফাস করিয়া বলিত। কিন্তু আজকাল আর সে বাবার কাছে ঘেসে না। দেখিতে-দেখিতে চারি মাস হইল রাণী শ্বশুরবাড়ী গিয়াছে,—টুনি ত অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছে। অথচ সে পিতার কাছে দিদিকে আনিবার প্রস্তাব করিতে সাহস না পাইয়া, সরলা ও চারুমোহনবাবুকে তিনসন্ধ্যা তাগাদা করিতেছে। সরলা বলিয়াছিল, "তুই তোর বাবাকে বল্ না গিয়ে।" টুনি উত্তর দিয়াছিল, "নতুন-মা রয়েছে যে!" "তা থাক্‌লেই বা, তোকে কি ধরে খেয়ে নেবে?" "আমার লজ্জা করে।"

এর আর উত্তর নাই। লজ্জা যে কেন করে, তা সে নিজেই বুঝিতে পারে না,—তা অপরকে কি কৈফিয়ৎ দিবে? চারুমোহনবাবু টুনির সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া বলিয়াছিলেন, হেমন্তবাবুর সহিত দেখা হইলেই রাণীকে আনিবার কথা বলিবেন; কিন্তু সে অনুরোধ প্রকৃত-পক্ষে তিনি রক্ষা করেন নাই। এখন টুনি পিতার সামনেই যখন আর্জ্জি পেশ করিল, তখন আর উহা মুলতুবী রাখা চলে না। অগত্যা তিনি কহিলেন, "ওহে, রাণীকে এইবার আন। টুনি ত আজ ক'দিন ধরে যে তাগাদা লাগিয়েছে,—আর সেও ত এই প্রথম গেছে, একবার আসুক। আবার দু-এক মাস রেখে পাঠিয়ে দিয়ো। তার পিস্-শাশুড়ীটি শুন্‌তে পাই, সাক্ষাৎ রুদ্রাণী,—মেয়েটা কেমন আছে কে জানে! তবু শ্বশুর বড় ভালমানুষ।"

হেমন্তবাবুর মনটা ভার হইয়া উঠিল। তিনি কি এমন গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন যে, ছেলে-মেয়েগুলা পর্য্যন্ত তাঁহাকে পর ভাবিতে সুরু করিয়াছে! দেহের রক্ত জল করিয়া যাহাদিগকে মানুষ করিয়াছেন, তাহাদের এই ব্যবহার! হায় রে সংসার! টুনি কি বাবাকে তাগাদা করিতে পারিত না? জ্যেঠা কি তার এত আপনার?

আর রাণী, সেও ত কই আসিবার নাম করে না! আগে-আগে দুখানা চিঠি লিখিয়াছিল বটে। একখানার উত্তর বুঝি দেওয়া হয় নাই,—অমনি মেয়ে অভিমান করিয়া চিঠি লেখা বন্ধ করিয়াছে! পূজার পর বিজয়ার একখানি প্রণামী পত্র লিখিয়াছে মাত্র। তাঁর যে কত কাজ, কত দিকের কত ভাবনা,—সে ত বোঝে না,—মেয়েরা এমনি স্বার্থপর হয় বটে। চারুমোহনবাবুও যে ঠাট্টাগুলি করিলেন, উহার মধ্যেও তো খোঁচা রহিয়াছে! কেন বাপু, যত দোষ কি সব হেমন্তবাবুরই? সবারই মনে ঐ এক কথা,—যদি আজ ঘরের গিন্নী বাঁচিয়া থাকিত, তাহা হইলে সংসারের অবস্থা অন্যরূপ দেখা যাইত। আরে বাপু, সে ত ভালই হইত। সেই বা এই অসময়ে, তার সাজানো ঘরকন্না ফেলিয়া, তাঁহাকে জব্দ করিয়া, সংসারের খিচিখিচিতে হাড়েনাড়ে জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরিবার জন্য রাখিয়া নিজে পলাইয়া গেল কেন? তা হইলে এ বিপর্যায় ঘটিত কি জন্য,—একটা বালিকাকে ধরিয়া আনিয়া তাহার পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবেই বা কেন? শান্তির কি এখন সংসারের সাত-সতের হাঙ্গামা পোহাইবার বয়স? সে তো প্রৌঢ়ের স্ত্রী না হইয়া সহজেই সুকান্তিসম্পন্ন কোন শিক্ষিত যুবকের প্রেয়সী হইতে পারিত! তাহার এ নব-যৌবনে কত সাধ, কত আহ্লাদ, কত বাসনা,—সেগুলা কি অসময়ে সংসারের পাঁচ ঝঞ্ঝাটের তপ্ত নিশ্বাসে ঝলসিয়া যাইবার জন্য ভগবান সৃষ্টি করিয়াছেন?

হেমন্তবাবুর মনের মধ্যে অনেক কথার উদয় হইতে লাগিল। এমন কি, যে বন্ধুকে তিনি চিরজীবন অন্তরঙ্গ ও শুভানুধ্যায়ী জ্ঞানে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন, আজ সুযোগ বুঝিয়া তিনিও বিদ্রোহী হইয়াছেন—এই ভাবিয়া তাঁহার মন তিক্ত হইয়া উঠিল।

চারুমোহনবাবু বন্ধুর মুখের অপ্রসন্ন ভাব দেখিয়া, ব্যাপারটা কতক অনুমান করিয়া লইলেন। অন্দরের দিকের দরজায় মুখ বাড়াইয়া কহিলেন, "ও হিমি, তোদের গিন্নীকে বল্ না জল-খাবার দিতে,—ভদ্রলোক কদ্দূর থেকে এসে তখন থেকে বসে রয়েছে!" তার পর বন্ধুর দিকে চাহিয়া হাসিয়া কহিলেন, "বলি, ঘাড় গুঁজে বসে রইলে যে? কি দু'কথা ঠাট্টা করলুম, অমনি বুঝি রাগ হ'ল? স্কুলের ছেলেমানুষীটা আজও যায়নি দেখ্ছি। আমাকে না জিগ্‌গেস্ করে ত কোন দিন কোন কাজ কর না,—তাতেই রাণীকে এইবার আন্‌তে বললাম। অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমে তাকে আন্‌লেই হবে। এখন চল, সুধার নেমন্তন্নটা খাবে।"

হেমন্তবাবুর মনের মেঘ কাটিয়া গেল। সত্যই ত, আজ পর্য্যন্ত চারুমোহনবাবুর পরামর্শ না লইয়া কোন কিছু কাজই তিনি করেন না! সুতরাং ছেলেমেয়েরাও তাঁহারই দিকে একটু বেশী ঝুঁকিয়া থাকে,—তাহাতে দোষই বা কি?

(৬)

অগ্রহায়ণ মাসে নবান্নের দিন সরলা হেমন্তবাবুকে সপরিবারে খাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছে। হেমন্তবাবু চারুমোহনবাবুর সহিত আহার করিয়া কাছারী গিয়াছেন। শান্তি রান্নাঘরের দালানে বসিয়া গল্প জুড়িয়াছে। মোহিনী যথাসাধ্য কাজকর্ম্মে সরলাকে সাহায্য করিতেছে। রাণীও আসিয়াছে,—সে বাহিরের ঘরে বসিয়া টুনির সহিত ঘুটিং খেলা সুরু করিয়াছে। শ্বশুরবাড়ী হইতে আসিয়াই সে প্রথমে যখন কাকীমার কাছে আলমারীর চাবির খোঁজ করিয়া জানিল, শান্তি উহা চাহিয়া লইয়াছে,—তখন দপ্ করিয়া তাহার মাথার ভিতর আগুণ জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু এই কয় মাসেই তাহার স্বভাবের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সে নিজেকে সামলাইয়া লইল। পরদিন শান্ত ভাবে গিয়া শান্তির নিকট হইতে চাবির গোছা চাহিল; শান্তি তৎক্ষণাৎ উহা ফেলিয়া দিল। রাণী যখন চাবিটি কুড়াইয়া লইতেছে, তখন সে শুধু বলিল, কাজ হয়ে গেলে আবার আমায় ফিরিয়ে দিও। রাণীর সমস্ত মন বিদ্রোহী হইয়া কি একটা কড়া রকমের উত্তর দিতে যাইতেছিল। কিন্তু তাহার মনে পড়িল, স্বামী ক্ষিতীশ বার-বার করিয়া তাহাকে অনুরোধ করিয়াছে, তাহাকে মোটে দুই মাসের জন্য বাপের বাড়ী পাঠান হইতেছে,—এই অল্প সময়ের জন্য সেখানে গিয়া সে যেন বিমাতার সহিত কোন কিছু খুঁটিনাটি লইয়া ঝগড়া-ঝাঁটি না বাধায়। তাহা হইলে সে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইবে। বাপের ঘর তাহার চিরদিনের ঘর নয়। আর মা যখন নাই, তখন বিমাতাই এখন সে গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। সুতরাং তাহার কাজকর্ম্মের বা কথার প্রতিবাদ করিয়া সংসারে অশান্তি জন্মান কিছুতেই উচিত নয়। সে এখন এত বড়

বৃহৎ বাড়ী ও সংসারের লক্ষ্মী ও গৃহিণী (যদিও পিসিমার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে স্বয়ং গৃহকর্ত্তারও প্রভাব নিষ্প্রভ)। তাহার কি আর ছেলেমানুষী ভাল দেখায় ? ক্ষিতীশের উপদেশ যে অনেকটা কাজে লাগিয়াছিল, তাহা রাণীকে যাহারা ভাল রকম জানে, তাহারা বেশ বুঝিতে পারিবে। কিন্তু তবু তার মনের আগুণ সম্পূর্ণ রূপে নিভিল না। সে ফিরিয়া আসিয়া গৃহস্থালীর সকল রকম পরিবর্ত্তন দেখিয়া অবাক্ হইল। শান্তির আধিপত্য চারিদিকে সুন্দর রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আগেকার ঘর সাজান হইতে পান সাজা, আহার প্রস্তুত, দাস-দাসীর কাজকর্ম্ম, গোয়াল-ঘরের বিধিব্যবস্থা—সবেতেই কিছু-কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া, যেন নূতন হাতের ছাপ দেওয়া হইয়াছে।

ঠাকুর সেই যে বাড়ী গিয়াছে, আর আসে নাই। রান্নার ভার মোহিনীর উপর। যে সুঁদরী ঝির অবাধ্যতার জন্য অনিলা তাহাকে বরখাস্ত করিয়াছিল, সে এখন শান্তির খাস ঝির পদে বাহাল হইয়াছে। অমূল্য বড় হইয়াছে,—তাহার জন্য একটী স্বতন্ত্র চাকরের অনাবশ্যকতা বুঝিয়া, ভীখু গরু চরাইবার ভার পাইয়াছে,—বৈকালে অমূল্যকে লইয়া বেড়াইবে। ভাঁড়ারের চাবি আর মোহিনীর হাতে নাই। শান্তি নিজেই সব জিনিস যথা সময়ে বাহির করিয়া দেয়। বৈকালে জলখাবার, সন্দেশ, রসগোল্লা, নিমকি ইত্যাদি শান্তি নিজের হাতেই প্রস্তুত করে,—যে হেতু শান্তির হাতের খাবার খাইয়া হেমন্ত বাবু অত্যন্ত প্রশংসা করেন ; এবং মাঝে-মাঝে বন্ধুমহলেও মিষ্ট মুখ করাইয়া সার্টিফিকেট পাওয়া যায়। অমূল্য ও টুনির যখন-তখন ছোট-মার কাছ হইতে বাহানা করিয়া সন্দেশ আদায় করার পথ একেবারে বন্ধ। মোহিনী কিন্তু এজন্য রান্নাঘরে বসিয়া এক-এক সময় নিঃশ্বাস ফেলে। নিজের চারিদিকে সে নিজের জন্য যে বাঁধন তৈয়ারী করিয়া লইয়াছে, এখন ত আর তাহা হইতে মুক্তি পাইবার উপায় নাই ! আহা, প্রাণটা যেন থাকে-থাকে হাঁপাইয়া উঠে।

রাণী এবার নিজের মনকে এমন ভাবে প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিল যে, সত্যই সে আর কোন কিছুতে চোখ-কাণ দিবে না,—ছোট ভাই-বোন দুটিকে কাছে পাইয়া স্নেহময়ী কাকীমার স্নেহ-যত্নে সে এক রকম বেশ থাকিবে। যে বাড়ীতে সে দিনের পর দিন ধরিয়া এত বড়টি হইয়াছে, যে বাড়ীতে তার স্বর্গীয়া জননীর গায়ের বাতাস, চুলের গন্ধ, অমৃত-মাখা নিঃশ্বাস এখনো মিশিয়া আছে,—আর সেই সুবৃহৎ তৈল-চিত্রে সেই যে করুণাবর্ষী চক্ষু দুটির প্রশান্ত দৃষ্টি, যাহা হইতে আশীর্ব্বাদের পবিত্র ধারা প্রভাতের আলোকধারারই মতন প্রাণে নব উদ্দীপনা জাগাইয়া তোলে, সেই বাড়ীর প্রত্যেক আস্‌বাবপত্রে তাঁরই স্পর্শ লাগিয়া আছে ;—সুতরাং এ সকলের মধ্যে থাকিয়া সে সেই স্নেহময়ীর সান্নিধ্য অনুভব করিয়া তৃপ্তি পাইবে। কিন্তু তবু—তবু রাণীর মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। ঘর-সংসারের আমূল পরিবর্ত্তন, বিশেষ করিয়া পিতার অন্য ভাব তাহাকে বড় বেশী বাজিল। আগে পিতা ও তাহাদের মধ্যে যেন কোন কিছু ব্যবধান ছিল না। কিন্তু এখন এই যে একটা আড়াল মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহাকে যেন কিছুতেই সে অন্তরের সহিত স্বীকার করিতে পারিল না।

নব-বিবাহিতা রাণী যখন শ্বশুড়বাড়ীতে এক সপ্তাহ কাটাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল, তখন হেমন্ত বাবু রাণীর শ্বশুর বাড়ীর কত খুঁটিনাটি খবর জিজ্ঞাসা করিতেন,—পিসিমার গৃহস্থালীর কড়া আইনের কথা, প্রিয় বাবুর মাথার কতগুলি চুল পাকিয়াছে,—মাছের মুড়া চিবাইতে পারেন কি না—সব খবর তিনি লইতেন। এবারে 'রাণু মা কেমন ছিলে ?' ছাড়া তার এ কয়মাস শ্বশুরবাড়ী যাপনের কাহিনী একবারও তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন না। অথচ সেবারের প্রশ্নোত্তরে বিরক্ত হইয়া অনিলা ধমক দিয়াছিল,—'তোমাদের খবর দেওয়া-নেওয়া আর ফুরুলো না ! অত যদি জানতে সাধ, তা হ'লে এবারে মেয়ের সঙ্গে তুমিও মেয়ের শ্বশুরবাড়ী যেয়ো,—মেয়ের পিস্‌শাশুড়ীর সঙ্গে আলাপ করে এসো। তবে একটা কম্বলের কোট গায়ে দিয়ে যেয়ো।'

এক-একবার রাণীর চোখ ফাটিয়া জল আসিত,—তাহাদের মা যদিই বা গেল, বাবা কেন তাহাদের রহিলেন না ? তিনি কেন এমন করিয়া দূরে চলিয়া গেলেন ? তার পর রাণী বেশীর ভাগ সময় সরলার বাড়ীতেই কাটাইতে লাগিল। প্রথম-প্রথম মনে বড় কষ্ট হইলেও, দু'চার দিনে কতক গা-সহা হইয়া গেল। পিতার পরিবর্ত্তে জ্যেঠামশাই তার শ্বশুর-বাড়ীর সমস্ত সাংসারিক খবর লইয়া, তাহাতে রঙ দিয়া এমন সব গল্প করিতেন, যাহাতে সকলেই বেশ কৌতুক অনুভব করিত। টুনিও বিবাহের যোগ্য হইয়া উঠিতেছে ; সুতরাং

ভাবী শ্বশুরবাড়ী সম্বন্ধে তাহারও কিছু-কিছু কাল্পনিক জ্ঞান সঞ্চয় হইত।

রাণী ও টুনী যখন ব্যস্তভাবে ঘুটিং খেলায় নিযুক্ত, সুধা সেখানে আমল না পাইয়া, টুল টানিয়া লইয়া উহার উপরে দাঁড়াইয়া যেমন আলমারীর মাথা হইতে পুঁতুল নামাইতে যাইবে, সরলা দেখিতে পাইয়া ধমক দিল,—"কাঁচের গেলাস আছে ওখানে, খবরদার, হাত দিস্‌নি—এখুনি পড়ে ভেঙ্গে চুর হয়ে যাবে" বলিতে-বলিতেই সুধার হাত লাগিয়া তিনটি কাঁচের গেলাস ভূমিতে পড়িয়া চূর্ণ হইয়া গেল। সরলা আসিয়া ঘা-কতক দুমদাম করিয়া সুধার পিঠে চড় বসাইয়া দিয়া কহিল, "যা ভয় করলুম তাই! আপোদগুলোর জ্বালায় যেন অস্থির। হাড়-মাস কালি করে খেলে!" হিমি ঝি ছুটিয়া আসিয়া চীৎকারপরায়ণা সুধার হাত ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া টানিয়া বাহিরে লইয়া গেল। যাইবার সময় সরলার উদ্দেশে অজস্র কটুকথা বর্ষণ করিতে ছাড়িল না। সরলা এ সব শুনিতে অভ্যস্ত,—সে ও সব কাণে তুলিল না।

মোহিনী কহিল, "সত্যি দিদি, তুমি সুধাকে যে মারটা মারলে,—পিঠ ভেঙ্গে দিয়েছ। মারলে কি আর কাঁচের গেলাস ফিরে পাবে?" সরলা কহিল, "ওরা আমায় ঐ রকম জ্বালাতন করে। পাঁচবার সয়ে একবার দু ঘা না দিয়ে পারি না।"

হিমি সুধাকে কোলে লইয়া তখন ঘরের মেঝেয় ছড়ান কাঁচের টুকরাগুলা কুড়াইতেছিল; মুখনাড়া দিয়া কহিল, "ঘরে শাশুড়ী-নমদ না থাক্‌লে বৌ-ঝিদের হাত-মুখ দুইই খুব চলে। আমি যাই তাই কত মার পিঠ্‌ পেতে নেই,—নইলে এমন রাক্কুসী মায়েদের হাতে কোন দিন বাছারা মরেই বা যেতো! যে সব অলুক্ষণে রাগ!" শান্তি ঝিয়ের কথার তেজ দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল। কলিকাতায় তাদের ঠিকা ঝির সহিত দুই বেলা শুধু বাসন মাজা, বাজার করার সম্পর্ক;—সুতরাং ঝিরা যে আবার দু' পাঁচ বৎসর থাকিতে-থাকিতে গৃহস্থেরই একজন হইয়া গিয়া, অবশেষে গৃহিনীর উপরও এ রকম কড়া-কড়া কথা কহিতে পারে, তাহা তাহার ধারণা ছিল না। সুতরাং সে অসহিষ্ণু ভাবে কহিল, "মা-বাপের ছেলে, তারা শাসন করলেই পাঁচজনের এত কথা! পর হ'লে ত না জানি কি ব্যাপার ঘটুতো। সে দিন অমূল্য একটা বাটি আছড়ে ফাটিয়ে দিলে বলে' একটু ধম্‌কেছিলুম, তাতেই পাড়ার কে কি বলেছে,—সৎমা, তাই দরদ নেই! সুঁদরী আবার আমায় এসে বল্‌লে।"

মুখরা হিমি জবাব দিল, "তোমার অই সুঁদরী ঝির পায়ে গড় করি মা,—ওর কথা কাণে তুলো না, বড় লাগ-লাগানী, ঘর-জ্বালানী—কারু বাড়ী দু' মাস টিক্‌তে পারে না। মুখুজ্যেদের বাড়ী এক মাস কাজ করতে গিয়ে, এমন ঝগড়া বাধিয়ে দিলে যে, বাবুরা ওকে বিদেয় করে তবে বাঁচলো। বড়মা ওকে ওই জন্যেই দূর করে দেছ্‌লো—তুমি তাই ওকে ঠাঁই দিয়েছ!"

শান্তির আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। অনিলার পরিত্যক্ত জানিয়াই সে সাধ করিয়া সুঁদরীকে আশ্রয় দিয়াছিল। সুঁদরীর আর যাহাই দোষ থাকুক, শান্তির মনোরঞ্জনে সে বেশ পটু ছিল। তা' ছাড়া, হিমির এত দূর স্পর্দ্ধা যে, শান্তির মুখের উপর কথা বলে? হউক না তাহার পঞ্চাশ বছর বয়স,—বাড়ীর ঝি ত সে! বাবুদের ছোট বেলা হইতে দেখিতেছে বলিয়াই কি তাহার মান এত কিছু বাড়িয়া গেছে? শান্তি পরুষ কণ্ঠে কহিল, "খবরদার ঝি, আমার ঝিকে টেনে বল্‌বার তুমি কেউ নও। আমার যাকে খুসী রাখ্‌তে কি ছাড়াতে আমি পারি,—তুমি কথা কইবার কে? তোমার মনিব তোমার চ্যাটাং-চ্যাটাং কথা সইবে বলে আমি সইব না। আমার সুঁদরীর এত ক্ষমতা নেই যে, আমার মুখের উপর সে কথা বলে। ঝি-চাকরদের এত বেয়াড়াপনা আমি ভালবাসি না।" সরলা হিমিকে ধমক দিয়া কহিল, "তোমার কথা বলার স্বভাব গেল না? বিন্দুর মাসী তার ছেলে-মেয়েকে মার্‌বে, তা তোমার অত গায়ের জ্বালা ধরে কেন? তোমায় দিনকতক দেশে পাঠিয়ে দিচ্ছি দাঁড়াও,—বুড়ো হয়ে দিন-দিন ভীমরতি হচ্ছে।"

হিমি ঝগড়ায় পেছ্‌পাও হবার নয়; চারুমোহন্‌কেই সে ভয় করে না, তা সরলা! বিশেষ, শান্তির কথার জবাব ত সরলার উপর দিয়াই চালাইতে হইবে। কাজেই সে কহিল, "আমার গায়ের জ্বালা কি সাধে ধরে? পেট থেকে কাঁটা ফেলেই যে তুমি খালাস! তার পর বুকের রক্ত জল করে' এতগুলোকে মানুষ করলে কে? আচ্ছা সব আজকালকার মেয়ে বাবু;—নিজের পেটের ছেলে-মেয়েদের ওপর এত ঝাল! সতা-সতীনের হ'লে ত গলা

টিপেই মার্‌তে পার,—তোমাদের উদ্দিশে নমস্কার।" হিমি সত্য-সত্যই মাটিতে মাথা ঠেকাইল। সরলা কথার অর্থ বুঝিয়া, হাসি চাপিয়া কহিল, "নিজের ছেলে বলেই গায়ে হাত তুলি, পরের হ'লে তুল্‌ব কেন? এই অমূল্যের গায়ে কি কোন দিন শাস্তি হাত তোলে? পেটের সন্তানের ওপর রাগও হয়,—আবার কোলে নিলে সব দুঃখু ভুলেও যেতে হয়। তুমি বাঁজা মানুষ,—ও-সবের মর্ম্ম বুঝতে পারবে না, চুপ ক'রে যাও।" হিমি আর কথা কাটাকাটি করিল না। শাস্তির মুখে অপ্রসন্নতার ছায়া ঘনাইয়া আসিল।

(ক্রমশঃ)

প্রবাসী

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ]

বনবাস মোর শেষ হ'বে কবে
জান যদি কেহ কহয়ে?
চৌদ্দবরষ রয়েছি যে আমি
পাড়াগ্রাম ছাড়ি সহরে।
কাননে রামের বহু সুখ ছিল
ছিল ফুল তরু লতা হে;
স্বচ্ছ সলিলা ছিল গোদাবরী
ভুলাতে পারিত ব্যথা হে।
এখানে নাহিক বন-মর্ম্মর
বন-বিহগের সাড়াটী,—
অগাধ জলের বদলে পেয়েছি
ক্ষীণ কল জলধারাটী।
কোথা আম গাছে ঝুল ঝাপ্পুর
কোথা বট্ গাছে দুলবো
কোথা অজয়ের সেই শ্যাম কুল
যেথা বুনো ফুল তুলবো।

কোথা কস্‌কসে, কাঁকুড়ের ক্ষেত
ছোলা মটরের ভূঁই গো
রাজা হব কোথা বিমাতার মত
বনে পাঠাইলি তুই গো।
যাব মিথিলায় মহা সমারোহে
কোথা হরধনু টুট্‌তে,
তুই মা আমারে বনে পাঠাইলি
মারীচের পিছু ছুট্‌তে।
হাঁফ ছাড়িবার সময় নাহি মা
পেটেতে নাহি মা অন্ন,
দিশেহারা হ'য়ে ছুটেছি কেবল
স্বর্ণ-মৃগের জন্য।
আর কি তোমার কোমল কোলে মা
পাব না ক আমি ফিরতে,
শৈশব-সুখ-স্বর্গ আমার
সরযূর তীর্থে।

উৎকল-সাহিত্য

[শ্রীরমেশচন্দ্র দাস]

মুকুর—মার্গশির, ১৩২৬

"প্রাচীন উৎকল" (জগন্নাথ মন্দির)—লেখক—শ্রীজগবন্ধু সিংহ

উৎকলের সবই গিয়াছে, তথাপি সবই আছে। প্রাচীন উৎকলের শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি সমস্ত লুপ্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু দেবাদিদেব জগন্নাথ অদ্যাপি উৎকলে বিরাজিত। আজ শত-শত, সহস্র-সহস্র, লক্ষ-লক্ষ পাপী-তাপী উৎকলের দিকে ধাবিত। উৎকলের সেই পবিত্রতা এখনও কাহার জন্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে? জগন্নাথ মহাপ্রভুর নিমিত্ত নয় কি? নিশ্চয়, ত্রিবার সত্য। সুতরাং জগন্নাথ, জগন্নাথ-মন্দির, মন্দিরের শাসন-প্রণালী প্রভৃতি আজ আমাদের প্রধান আলোচনার বিষয়। মাদলা পঞ্জিকাই এ বিষয়ে আমাদের প্রধান আশ্রয়।

জগন্নাথের আবির্ভাব—কবে? কোথায়?—ব্রহ্মার প্রথম পরার্দ্ধে পরমেশ্বর ভূলোকে জম্বুদ্বীপের ভরতখণ্ডের উত্তর দেশে দক্ষিণ মহোদধির উত্তরতীরে শ্রীপুরুষোত্তম বৈকুণ্ঠের দশযোজন মধ্যে দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খের পঞ্চ ক্রোশ ভিতরে নাভিমণ্ডলস্থ নীল-কন্দর পর্ব্বতে নীলমণি-গঠিত শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ নীলমাধব মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবতাররূপে অবতীর্ণ হইলে, দেবগণ পূজা করিতে লাগিলেন। পরম বৈষ্ণব বিশ্বাবসু সবরদ্বীপ হইতে গমন করিয়া পূজা করিলেন। এইরূপে প্রথম পরার্দ্ধ শেষ হইলে, দ্বিতীয় পরার্দ্ধের একপঞ্চাশত্তম বর্ষের প্রথম দিবসে ব্রহ্মা নিদ্রালস ত্যাগ করিয়া দেখিলেন, চতুর্দ্দিক জলে পরিপূর্ণ। তাঁহার সৃষ্টির ইচ্ছা হইল। দ্বাদশ সূর্য্য উদিত হইলেন। অর্দ্ধাশনী দেবী অর্দ্ধেক জল পান করিলেন। পাতালে শঙ্কর্ষণের নিকটে প্রচণ্ড অগ্নি তেজ লাগিয়া জল শুষ্ক করিল।

বিষ্ণুভক্ত মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন কোথায় বিষ্ণুর দর্শন পাইবেন, ভাবিতে লাগিলেন। দৈববশতঃ জটান নামে এক বৈষ্ণব ইন্দ্রদ্যুম্নের রাজ-সভায় প্রবেশপূর্ব্বক নীলমাধবের সংবাদ জ্ঞাপন করিলে, মহারাজ রাজ-পুরোহিত বিদ্যাপতিকে পথাদির তত্ত্বানুসন্ধানে প্রেরণ করিলেন। বিদ্যাপতি বহুস্থান পরিভ্রমণ করিয়া বিশ্বাবসুর গৃহে উত্তীর্ণ হইলেন ও তাহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন। শবরকন্যার সহিত বিদ্যা-পতির বিবাহ হইল। নব-বিবাহিতা পত্নীর সাহায্যে নীলমাধব মূর্ত্তি দর্শন করিয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ইন্দ্রদ্যুম্নকে সমস্ত বৃত্তান্ত প্রদান করিলেন।

ইন্দ্রদ্যুম্ন দেব-দর্শনের আশায় যাত্রা করিলেন; কিন্তু পথিমধ্যে নারদের মুখে নীলমাধবের অন্তর্ধান-সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন, এবং আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। এমন সময়ে আকাশবাণী হইল—"তুমি আর এ মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে না। পঞ্চ শত বর্ষ মধ্যে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে, আমি দারুব্রহ্ম রূপে বলভদ্র, জগন্নাথ, সুভদ্রা ও সুদর্শন—চারি মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইব।"

মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। এদিকে দারুব্রহ্ম সমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে বাঁকি মোহানার সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। সে স্থান হইতে দারু আনীত হইয়া গুণ্ডিচা মন্দিরে মূর্ত্তি গঠিত হইল। ইন্দ্রদ্যুম্নের পত্নীর নাম গুণ্ডিচা। 'গুণ্ডিচা মন্দির' ও 'গুণ্ডিচা যাত্রা' তাঁহার নামানুসারে রক্ষিত হইয়াছে। ইন্দ্রদ্যুম্ন মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করিলেন। সুউচ্চ বিশাল মন্দির নির্ম্মিত হইলে, প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন; কিন্তু ব্রহ্মার সহিত প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন, রাজা গানমাধব তখন মন্দির অধিকার করিয়া পূজার্চ্চনা করিতেছেন। গানমাধবের সহিত ইন্দ্রদ্যুম্নের যুদ্ধ হইল। গানমাধব পরাজিত হইলেন। ব্রহ্মার আজ্ঞানুসারে ভরদ্বাজ ঋষি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন বহুকাল ভক্তিভরে পূজা করিলে, জগন্নাথ সন্তুষ্ট হইয়া বর প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রার্থনা করিলেন—"প্রভু! আমার বংশে যেন কেহ 'এ মন্দির আমার' বলিতে না থাকে।" ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ হইল। জগন্নাথ মহাপ্রভু ঈপ্সিত বর প্রদান করিলেন। তাহার ফলে ইন্দ্রদ্যুম্নের বংশে আর কেহই রহিল না। জগন্নাথ দেব সেই জন্য বৎসরে এক দিবস তাঁহার বার্ষিক শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। মন্দিরে এ প্রথা অদ্যাবধি প্রচলিত আছে।

ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ অনেককাল পূজা করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। তাঁহার পরে শ্বেতমুখ রাজা হইয়া সেবা-পূজা সম্পন্ন করিলেন। ক্রমে কলি উপস্থিত হইল। অনেক রাজা ভগবানের পূজা করিয়া কাল অতিবাহিত করিলেন।

রাজগণের দান দ্বারা জগন্নাথ দেবের সম্পত্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। যিনি রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন, তিনি মহাপ্রভুর পূজা-পার্ব্বণের নিমিত্ত প্রভূত পরিমাণে ভূ-সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। অনঙ্গ ভীম দেবের "মুদল" বা মূলমন্ত্র ছিল—"স্বদত্তং পরদত্তং বা যে হরন্তি বসুন্ধরা। বর্ষষষ্ঠী সহস্রাণি বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমী॥" ইঁহার রাজত্বকালে জমির যে পরিমাপ হইয়াছিল, তাহার কাগজ-পত্র হইতে মন্দিরাদির উদ্দেশে দত্ত সম্পত্তির বিস্তৃত বিবরণ জানিতে পারা যায়।

২। "উড়িষ্যায় 'চাটশালী' বা পাঠশালা"—

লেখক—শ্রীজয়কৃষ্ণ নায়ক।

প্রাচীন ভারতের সকল কার্য্য প্রায় ধর্ম্মমূলক ছিল। সেইজন্য শিক্ষকগণ শিক্ষা দান ধর্ম্মকার্য্যের অন্তর্গত বলিয়া মনে করিতেন। গুরু-শিষ্যের জ্ঞানোন্নতির পথ সুগম করিবার নিমিত্ত সম্ভবতঃ সংস্কৃত বিদ্যালয় বা চতুষ্পাঠী এবং প্রাকৃত বিদ্যালয় বা "চাটশালী" নামে দুই প্রকার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পাঠশালা সৃষ্টির বহুপূর্ব্বে অর্থাৎ বৈদিক যুগে চতুষ্পাঠীর জন্ম এবং দেবোপম ঋষিবৃন্দ তাহার শিক্ষক। আর উন্নত বৌদ্ধযুগে বা প্রাদেশিক ভাষার উন্নতিযুগে এই পাঠশালাগুলি স্থাপিত হয়। "চাটশালী" শব্দটী চর্চ্চশালা হইতে উৎপন্ন। প্রাকৃত বা পালিভাষায় চর্চ্চশালার অর্থ ছাত্রশালা বা ছাত্রগণের কার্য্যক্ষেত্র।

অধুনা ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সুদৃষ্টিতে পাঠশালা পরিমার্জ্জিত হইয়া উড়িয়া বিদ্যালয় রূপে পরিচালিত হইতেছে। মারাহাট্টাদিগের সময়ে পাঠশালার শিক্ষা অতি মৃদুভাবে চলিতেছিল এবং মুসলমান রাজত্বে শিক্ষার অবস্থা ম্রিয়মাণ হইলেও মোগলগণের সময়ে কয়েকজন কবি প্রাদেশিক ভাষায় কবিতা রচনা করিয়া স্ব-স্ব ভাষার উন্নতি করিয়াছিলেন। সেই কবিতার কতক অংশ পাঠশালা-শিক্ষার অন্তর্গত হইয়াছিল। কেহ-কেহ বলিয়া থাকেন, "মাটিবংশ ওঝা" জাতির সৃষ্টি না হইয়া থাকিলে, মুসলমান যুগে উড়িয়া শিক্ষার পথ লুপ্ত হইয়া যাইত।

আচার্য্য মহোদয়ের ইতিহাস হইতে প্রমাণ পাওয়া যায়, গঙ্গাবংশের রাজত্বকালে উড়িষ্যার নানারূপ উন্নতিকর কার্য্য হইয়াছিল। পাঠশালার উন্নতিও তাহা হইতে বঞ্চিত হয় নাই। সেই জন্য অনেকে মনে করেন, গঙ্গাবংশের সময়ে পাঠশালার সৃষ্টি। কিন্তু তাহা সম্ভবপর নয়। তবে গঙ্গাবংশীয় রাজগণ উড়িয়া ভাষার সমাদর করায়, পাঠশালাও অপেক্ষাকৃত উন্নত হইয়াছিল।

বৌদ্ধযুগে শ্রমণগণ স্থানে-স্থানে কতিপয় ছাত্র লইয়া লিখন-পঠনের সহিত নীতিশিক্ষা প্রদান করিতেন। ঐ শ্রমণেরা ধর্ম্মাঙ্কুর বলিয়া অভিহিত হইতেন। তাঁহাদের বিদ্যালয়গুলি "চাটশালী" নামে পরিচিত হওয়া বিচিত্র নয়। আজও ব্রহ্মদেশে এইরূপ ধর্ম্মাঙ্কুর দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষা আরব্ধ হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে প্রতি গ্রামে এ প্রকার পাঠশালা দুই তিনটী করিয়া ছিল। শ্রমণগণ গৃহের আঙ্গিনায়, বৃক্ষমূলে বা কোন সাধারণ গৃহে এই কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। ঐ যুগে সাধারণ পাঠশালা ব্যতীত উচ্চ বিদ্যালয়ও প্রচলিত ছিল। শ্রাবস্তি, কপিলবাস্তু, বৈশালী, রাজগৃহ, পাটুলীপুত্র প্রভৃতি বিদ্যানুশীলন এবং ধর্ম্মাচরণের প্রধান পীঠস্থান ছিল। আর নালন্দা, তক্ষশীলা, দন্তপুরী বা পুরী, বিক্রমশীলা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে সহস্র-সহস্র বিদ্যার্থী অবস্থান করিতেন।

উপসংহারে বলিতে পারা যায় যে, উড়িষ্যার "চাটশালী"—বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা এক শাসনাধীনে থাকার সময়ে—বৌদ্ধযুগে বৌদ্ধ-রাজগণের সাহায্যে সংস্কৃত চতুষ্পাঠীর আদর্শে বৌদ্ধ শ্রমণ কর্ত্তৃক প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অদ্যাবধি চলিয়া আসিতেছে।

ধাঁধা

[শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী]

অমর ও সতীশ দুজনে ছেলেবেলাকার বন্ধু। কবে থেকে তাদের এই বন্ধুত্ব আরম্ভ হয়েছে, তা' তারা দুজনেই প্রায় ভুলে গিয়েছে। ছেলেবেলাতে তারা এক স্কুলেই পড়ত; তার পর, স্কুলের পড়া শেষ হয়ে গেলে, এক কলেজেই পড়ে' তারা বি-এ অবধি পাশ করেচে। দীর্ঘকাল পরে, এই জায়গাটাতে এসে, তাদের সহবাসের মধ্যিখানে একটা যতি পড়্‌ল।

ছেলেবেলায় স্কুলের একটু উঁচু ক্লাশে উঠেই তারা মনে-মনে একটা সঙ্কল্প করেছিল যে, বি-এ পাশ করে' বিলেতে যেতে হবে। সেখানে গিয়ে কি পড়্‌তে হবে, কোথায় থাকা যাবে, পাশটাশ করে দেশে ফিরে এসে কি-কি কাজ করতে হবে,—এই সব জল্পনায় কত সন্ধ্যা তাদের আনন্দে কেটে গিয়েছে,—সেই ভাবনায় কত বিনিদ্র সুখের রাত্রি দেখ্‌তে-দেখ্‌তে অবসান হয়ে গিয়েছে, তার ঠিকানা নেই।

বিলেতে যাওয়া সম্বন্ধে অমরের কোনই বাধা ছিল না, বাধা ছিল একটু সতীশের। সতীশের বাবা অত্যন্ত নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন;—তিনি বিলেতে যাওয়া ইত্যাদির ঘোর বিরোধী ছিলেন। ছেলেবেলা থেকেই সতীশের মনে একটা সন্দেহ ছিল যে, হয় ত তার বাবা তাকে বিলেতে যেতে দিতে ভয়ানক আপত্তি তুলবেন। তাই সময়ে-অসময়ে সে তার মাকে এই কথাটা বারবার করে জানিয়ে রাখ্‌ত। প্রবেশিকা পরীক্ষায় সে যখন বেশ ভাল হয়ে' পাশ করে' বেরুল, তখনি সে তার মার কাছে এ বিষয়ের একটা পাকা রকমের নিষ্পত্তি

করে রেখেছিল। সতীশের মা ছেলের কাছে প্রতিজ্ঞা করে-ছিলেন যে, তিনি যেমন করেই পারেন, বিলেতে যাওয়ার হুকুমটা কর্ত্তার কাছ থেকে আদায় করবেন। কিন্তু মানুষের ইচ্ছাই সব সময়ে শেষ নয়; সতীশের আরজি পেশ হবার আগেই ও-পারের ঘাটোয়াল তার মাকে টেনে নিয়ে গেল।

স্ত্রীর মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে সতীশের বাবার ধর্ম্মের উপর আসক্তি একটু বেশী মাত্রায় বেড়ে উঠ্‌ল। রাত্রি-দিন যজন-যাজন, ক্রিয়া-কর্ম্ম—এই সব দিয়ে তিনি স্ত্রীর শোকটা চাপা দিতে চেষ্টা করতে লাগলেন। সতীশকেও এই সবের মধ্যে টেনে নেবার আন্তরিক ইচ্ছা সত্ত্বেও সেটা কাজে পরিণত হয়ে উঠেনি; কারণ, তার পরীক্ষা তখন সম্মুখে।

পরীক্ষার ফল বেরোবার পর দেখা গেল, সতীশ বেশ ভাল করে পাশ করেছে। এতে তার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন যতটা আনন্দিত হোক্ আর না হোক্, সে কিন্তু ভারি আশ্চর্য্য হয়ে গেল। তার মনে-মনে ধারণা ছিল, এবার বোধ হয় পরীক্ষকদের আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে গলে' বেরোন তার পক্ষে বড়ই কষ্টকর হয়ে উঠ্‌বে। কিন্তু তার ধারণা যাই থাক্ না কেন, সেবার সে পাশ হয়ে গেল।

পরীক্ষা পাশের আনন্দটা ভাল করে উপভোগ কর্ব্বার আগেই, একটা বিষম উৎকণ্ঠা এসে সতীশের মনের উপর সওয়ার হয়ে বস্‌ল। তার কারণ, বিলেতে যাওয়ার কথাটা তার মা ছাড়া বাড়ীর আর কাউকে সে ঘুণাক্ষরে জানতে দেয় নি। সে জান্‌ত তার মাও কথাটা বাবার কাছে পাড়বার অবসর পান নি; তা'হলে এতদিনে সে বাবার মুখ থেকে একটা "হাঁ কিংবা না" যা হোক কিছু শুনতে পেত। অমরের সঙ্গে তার রোজ পরামর্শ চলতে লাগ্‌ল, কি কোরে বাবার কাছে কথাটা উত্থাপন করা যায়। রোজই সন্ধ্যার সময় দুজনে বসে' এই নিয়ে পরামর্শ চলত। আর নতুন-নতুন পন্থা উদ্ভাবন করা হত বটে; কিন্তু পরদিন সকালে বাপের সেই শ্মশ্রু-গুম্ফ-মুণ্ডিত গম্ভীর মুখ দেখলেই আর একটা কথাও সতীশের মনে থাক্‌ত না।

মাস-দুয়েক এই ভাবে কাটবার পর, একদিন সন্ধ্যার সময় মরিয়া হয়ে সতীশ তার বাবার ঘরে ঢুকে পড়ল। বৃদ্ধ গোবিন্দচরণ তখন গীতার মধ্যে জীবন-মৃত্যুর নিগূঢ় তত্ত্বের রসাস্বাদনে ব্যস্ত ছিলেন। সতীশ ঘরে ঢুকতেই তিনি চোখ থেকে চশমাটা নামিয়ে বইয়ের উপর রেখে, তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—"কি বাবাজি, কি মনে করে?" সতীশ যে কথাটা তাঁকে বলতে এসেছিল, একেবারে সেটা না পেড়ে, অন্য কথা আরম্ভ করলে।

গোবিন্দচরণ জিজ্ঞাসা করলেন, "তার পর? এম-এ পড়বে না কি?" কথা আপনিই অনেকটা এগিয়ে এসেছে মনে করে, উৎসাহের সঙ্গে সতীশ বলে ফেল্লে,—"আজ্ঞে, এখানে আর পড়বার ইচ্ছা নেই—"

"তবে? বিদেশে যাবার মতলব আছে? আর পড়ে' কি হবে? এবার নিজেদের কাজকর্ম্ম দেখ। আমি আর ক'দিন আছি,—এই বেলা ভাল করে সব বুঝে-শুঝে নাও।"

কথাটা ধার ঘেঁসে এসেই যে এতদূর চলে যাবে, তা' সে মনে করতেই পারে নি। কিন্তু আজকেই বলা চাই, আর বেশী দেরী নয়। তার জন্য অমরও যাবার কোন রকম বন্দোবস্ত করতে পাচ্ছে না। সে চোখ-কাণ বুঁজে সোজাসুজি বিলেত যাওয়ার সংকল্পটা তার বাপের কাছে প্রকাশ করে ফেল্লে।

তার পরে যে পালার অভিনয় হয়েছিল, তার বেশী বিবরণ অনাবশ্যক। রাগে উন্মত্ত-প্রায় গোবিন্দচরণ তাঁর একমাত্র সন্তানকে জানিয়ে দিলেন যে, এই সঙ্কল্প যদি সে ত্যাগ না করে, তবে সে তাঁর সন্তানই নয়;—তিনি পোষ্য-পুত্র গ্রহণ করে, তাকে বিষয় থেকে বঞ্চিত করে যাবেন। বৃদ্ধ ভেবেই ঠিক করতে পারলেন না যে, তাঁর ছেলের মতিগতি এ রকম হল কেন।

সতীশ একবার বন্ধুমহলে টাকা ধার করবার চেষ্টা দেখলে; কিন্তু সেখানে কোন রকম সুবিধা হয়ে উঠল না। বিলেতে গিয়ে পড়াশুনা করবার মতন টাকা ধার দিতে পারে,—শুনতে পাওয়া যায়, এমন বন্ধু অনেকের ভাগ্যে জুটেছে; কিন্তু তার কপালে জুট্‌ল না।

সতীশ ছেলেবেলা থেকে কল্পনায় ভবিষ্যতের জন্য যে নন্দন-কাননের সৃষ্টি করেছিল, বাপের এক তাড়ায় দেখতে পেলে, সেখানে গুচ্ছে-গুচ্ছে সরিষার ফুল সূর্য্যের আলোয় ঝক্‌মক্ করছে।

সতীশের না যাওয়া, আর অমরের যাওয়া—এই ঘটনাটা সতীশকে অমরদের পরিবারের সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ সহানু-ভূতির সম্পর্কে বেঁধে ফেল্লে। অমরের বাবা ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী

ছিলেন। তিনি হাইকোর্টে ওকালতি করতেন। এক ছেলে, একমেয়ে ও স্ত্রী—এই নিয়ে তাঁর সংসার। ছেলে অমরনাথ সম্প্রতি বি-এ পাশ করেছে,—মাসখানেকের ভেতরই আইন পড়তে বিলেতে যাবে। মেয়ে সুরমা এইবার প্রবেশিকা পাশ করে' বাড়ীতেই পড়ে। সতীশের নিতান্ত পীড়িত অন্তরটা এই পরিবারের সহানুভূতি পেয়ে একটু তৃপ্তি পেলে। মাতৃহীন সতীশকে অমরের মা জননী-স্নেহে অল্প দিনের মধ্যেই একান্ত আপনার করে নিলেন।

মাসখানেক পরেই, শীতের একটা ঘন কুয়াসা-ভরা সকালে, দুই বন্ধু চোখের জলে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বিচ্ছিন্ন হ'ল। সে-দিন সমস্ত দিন সতীশ বাড়ী ফিরল না—সকাল থেকে আপনার খেয়ালে রাস্তায় ঘুরে-ঘুরে, সন্ধ্যা-বেলা অবসন্ন দেহে আপনার নির্জ্জন ঘরটিতে এসে শুয়ে পড়্‌ল।

এই ঘটনার পরে সতীশের মনটা তার নিজের পরিবারের উপর অত্যন্ত বিদ্বেষী হয়ে উঠ্‌ল। তার বাবা একেই গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন; এই গোলমালের পর তিনি যেন আরো বেশী রকমের গম্ভীর হয়ে উঠ্‌লেন। বাপে-ছেলেতে আগেই কথাবার্ত্তা খুব কমই হোত; এখন থেকে একরকম মুখ-দেখাদেখিই প্রায় বন্ধ হয়ে এল।

সতীশের অশান্ত মনটা একটুমাত্র সান্ত্বনা পেত অমরের মার কাছে। এখন সে প্রত্যহ নিয়ম করে' তাদের বাড়ী যেতে আরম্ভ করলে। নিজেদের প্রতি বিদ্বেষী তার চোখ দুটো এই পরিবারের ধরণ-ধারণ, চাল-চলন সবই যেন সুন্দর দেখতে লাগ্‌ল। নিজেদের সঙ্গে তুলনা করে, তার মনে হ'ত—আমাদের চেয়ে এরা কত বেশী উদার! তার চোখে সব থেকে সুন্দর লাগ্‌ল সুরমার সরল ব্যবহার। তার বয়সের অন্য মেয়েদের সঙ্গে তুলনা করে সে দেখত, একদিকে সে তাদের চেয়ে কত বেশী জানে, আবার অন্য দিকে কত কম তার অভিজ্ঞতা! এত বেশী আর এত কম জানার এই সুন্দর সমাবেশটী তার কাছে বড় মধুর ঠেক্‌তে লাগ্‌ল। এর আগে সে বয়স্কা অবিবাহিতা মেয়েদের সঙ্গে এমন স্বাধীন ভাবে কখনো মেশেনি। তাই প্রথম-প্রথম সুরমার সঙ্গে কথাবার্ত্তায় তার কেমন যেন একটু সঙ্কোচ বোধ হত। কিন্তু এ বিষয়ে বেশী দিন তাকে শিক্ষানবিশী কর্‌তে হয় নি,—খুব অল্পদিনের মধ্যেই তার এই সঙ্কোচটু কেটে গেল।

এখন থেকে সে নিয়ম করে' রোজ তাদের বাড়ী যেতে আরম্ভ করলে। সুরমাদের সন্ধ্যেবেলাকার ছোট্ট চায়ের বৈঠকটীর উপর ক্রমে সতীশের এমন মৌতাত জমে গেল যে, সন্ধ্যার সময় একবার সেখানে হাজিরা না দিলে, তার দিনটাই যেন বিফলে যেত।

সতীশের অলক্ষ্যে তার মনের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড ব্যাপারের আয়োজন চলছিল। সেটার আভাস সময়ে অসময়ে তাকে নাড়া দিলেও, সে ভাল করে ব্যাপারটাকে ধরতে পাচ্ছিল না। সুরমার সহজ, সুন্দর ব্যবহার, তার সরল কথাবার্ত্তা গোপনে তার প্রাণের মধ্যে ধীরে-ধীরে যে নিজের আসন বিস্তার কর্‌ছিল, তার সন্ধান সে পায় নি।

সতীশ সন্ধান না পেলেও, দেবতার সন্ধান কিন্তু ব্যর্থ হোল না। যে পৃথিবীটার সঙ্গে এতদিন ধরে কিছুতেই তার বনিবনাও হচ্ছিল না, হঠাৎ তারই মেঘের মেলা,—ফুলের পাতায় রংয়ের খেলা—সতীশের হৃদয়ের মরচে-ধরা তার-গুলোতে কিসের একটা ঝঙ্কার লাগিয়ে দিয়ে চলে গেল। কোন্ এক অজ্ঞাত যাদুকরের সোণার কাঠির স্পর্শে সতীশের যেন দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটল,—জগতকে সে নতুন চোখে দেখতে লাগ্‌ল। সে দেখ্‌লে, চারিদিক যেন উদ্বোধনের উৎসবে মেতে উঠেছে,—সমস্ত পৃথিবীটা যেন প্রাণ খুলে প্রেমের গান গাইতে আরম্ভ করেছে। মুগ্ধ সতীশ সে সঙ্গীতে আত্মহারা হয়ে' চেয়ে দেখল, তার হৃদয় দ্বারে দেবী দাঁড়িয়ে;—নীরবে বরণ করে' প্রাণের গোপন পুরে তাকে অভিষেক করে তুলে নিলে।

সুরমার হাসি, তার গান, তার কথা শোনবার জন্য সমস্ত দিন তার প্রাণটা ছটফট কর্‌তে থাক্‌ত। ভোর থেকে বিকেল পর্য্যন্ত সমস্ত দিনটা সে এই সময়টার জন্য উন্মুখ হয়ে বসে-বসে, পাঁচটা বাজতেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ত। সুরমাদের বাড়ী যতক্ষণ সে থাকত,—সময়টা যে কোথা দিয়ে কেটে যেত, তা সে বুঝতে পারত না। রাত্রে সহরের গোলমাল থেমে গেলে, নির্জ্জনে আপনার মনটাকে কুড়িয়ে নিয়ে সে ভাবতে বস্‌ত। মনে-মনে কখনো তার মাথায় ফুলের মুকুট পরিয়ে, কখনো বা তার গলায় ফুলের মালা দিয়ে, আপনার খেয়ালে তাকে সাজাত। ঘুমের ঘোরে সে

দেখত, আকাশ থেকে স্বপ্ন-সুন্দরীরা নেমে এসে, তাদের চারপাশে দাঁড়িয়ে যুগ-যুগান্তরের মিলনের গান গাইচে। আবার কখনো বা ব্যর্থ-প্রেমিক-প্রেমিকাদের করুণ বিরহ-গাথার উৎকণ্ঠিত তান এসে তার চমক ভাঙিয়ে দিয়ে যেত। চমকে উঠে সে দেখত যে, সকাল হয়ে গিয়েছে।

এই নেশায় মস্‌গুল হয়ে সতীশ বেশ দিনকতক কাটিয়ে দিলে। কিন্তু এই রকম এক-তরফা প্রেমে তার মনটা সুস্থির হতে পাচ্ছিল না। মাঝে-মাঝে তার মনে হতে লাগল, সুরমার চোখ দুটো যেন কি বলতে চাইচে—অথচ মুখ ফুটে বলতে পাচ্ছে না। হঠাৎ যেন তার ভাসা-ভাসা চোখ দুটোর কোণে একটা কটাক্ষের বিদ্যুৎ খেলে গেল,—তার মুখখানা লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল।

সতীশ ভাবত, কি সে বলতে চায়? কি যে বলতে চায়, সে কথাগুলো তার কল্পনার জালে আটকা পড়ে' তখুনি তার চোখের সামনে জ্বল-জ্বল করে ফুটে উঠত; আর মনে হত, মেয়েদের শ্রেষ্ঠ ভূষণ হচ্ছে লজ্জা। এই কাল্পনিক লজ্জায় ঢাকা অকথিত কথাগুলো রাত্রি-দিন তার কাণে গুণ্‌-গুণ্‌ সুরে বাজ্‌তে থাকৃত।

সতীশ মুখে কিছু না বল্‌লেও, তার কথাবার্ত্তা, ভাব-ভঙ্গীর ফাঁক দিয়ে মাঝে-মাঝে তার মনের ভাবটা সুরমার কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে' তার প্রাণ একটা আশার উৎপীড়নে অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠত; কিন্তু সুরমা তার সেই ব্যবহার-গুলোকে খুব সহজ ভাবে গ্রহণ করে' তাকে সংশয়ের আর একটা ঘুর্ণিপাকের মধ্যে ফেলে দিত;—নিরাশা ও উৎসাহের একটা বেদনা বুকে করে নিয়ে সে বাড়ী ফিরে আস্‌ত।

এই রকম ভাবে দিন কাটানো ক্রমেই সতীশের পক্ষে অসহ্য হয়ে দাঁড়াতে লাগ্‌ল। সে ঠিক করলে, একদিন সে সুরমাকে তার প্রাণের কথাটা খুলে বলবে। কিন্তু কেমন করে কথাগুলোকে গুছিয়ে বল্‌তে হবে, সমস্ত দিন-রাত্রি ভেবেও সে তার একটা কিনারা করে উঠতে পাচ্ছিল না। সুরমার নির্ব্বিকার সহজ ভাবটা তার মনে একটা সন্দেহের ছাপ লাগিয়ে দিয়েছিল। তার মনে হত, যদি সে প্রত্যাখ্যাত হয়। সুরমার মুখের সেই কথাটুকুর উপর তার বর্ত্তমানের এই ব্যর্থ জীবনটার সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। তার মনে হত,—না-না থাক্‌,—এই ভাল, এই ভাল।

রোজই সে মনে-মনে সঙ্কল্প নিয়ে বেরুত—আজকে যেমন করেই হোক কথাটা সুরমাকে বলতেই হবে; কিন্তু তার কাছে গেলেই তার সমস্ত উদ্যম চুপসে যেত। হাজার চেষ্টা করে অনেক সময় কথাটা ঠোঁটের কাছে এসেই মিলিয়ে যেত; সে ভাবত, আচ্ছা, আজ থাক্—কাল নিশ্চয়ই।

সতীশ ভাবত, আচ্ছা, সুরমা যদি সত্যিই তাকে ফিরিয়ে দেয়, তবে কি তাকে পাবার আশা সে ত্যাগ করতে পারবে? তার সমস্ত বৃত্তিগুলো খোঁচা খেয়ে একসঙ্গে বলে উঠত, না—না। বিছানায় শুয়ে-শুয়ে সে ভাবত, কালকে কি করে কথাটা পাড়া যাবে? কেমন করে, কোন্ কথার ভেতর দিয়ে অগ্রসর হতে হবে; ভাবতে-ভাবতে ভবিষ্যতের একখানা ছবি বর্ত্তমানের এই ভাবনার ভিড়-গুলোকে ঠেলে-ঠুলে, তার মনের সামনে ফুটে উঠত। নানারকম রঙ্গিন কল্পনায় আসল কথাটা কোথায় হারিয়ে যেত। অসহায় শিশুর মতন সে মনের ভেতরকার সেই কথাটা খুঁজতে-খুঁজতে ঘুমিয়ে পড়ত।

তার মনের ভেতর আশা ও নিরাশার যে যুদ্ধ চলছিল, সেইটেই তার সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে দাঁড়াল। এই দ্বিধাটা তাকে বারবার খোঁচা দিয়ে বলতে থাকত, এই তবে শেষ —এই তবে শেষ কথা। এইটে বলা হয়ে গেলেই, চোখের এই অঞ্জন মুছে গিয়ে, আবার পৃথিবীর সেই কঙ্কালসার মূর্ত্তিটা তার সামনে ফুটে উঠ্‌বে,—প্রাণের ভেতরকার এই অশ্রান্ত রাগিণীর অবিরাম ঝঙ্কার চিরদিনের জন্য থেমে যাবে।

মনটা কিন্তু তার এই শেষ কথাটারই চারিধারে গুমরে-গুমরে মাথা খুঁড়তে লাগল।

নিজের মনকে সে আশ্বাস দিত, হয় ত সুরমা তাকে গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু যদি না করে—তবে আবার সেই কর্ম্মহীন ক্লান্ত দেহ, সেই ভাবনাহীন অবসন্ন মনটার বিষম বোঝা বহন করে তাকে ঘুরে বেড়াতে হবে! কোথায় সে বোঝা নামাবে!

সুরমার সঙ্গ নেশার মতন তার দেহ-মনকে আবিষ্ট করে ফেলছিল। দিনরাত তার ভাবনা ভূতের মতন তার কাঁধে চেপে তাকে যে দিকে ইচ্ছা চালিয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগল। এই নেশার ঘোরে কখন সে দেখত, সুরমাকে

তার প্রাণের কথাটা বলে ফেলেছে;—সরল সেই চোখ দুটো যেন আবেশে এলিয়ে গেল, গোলাপের মতন সুন্দর তার মুখখানা যেন বাতাসে হেলা ফুলের মত ঢলে পড়ল। আবার কখনো বা দেখত, পৃথিবীর বুকখানা ফেটে গিয়ে, একটা বিরাট আঁধিয়া উঠে, যেন সমস্ত আচ্ছন্ন করে ফেল্লে। পরিষ্কার হয়ে গেলে দেখতে পেত, যেন একটা বিরাট জনহীন ভগ্ন স্তূপের উপর প্রেতের মতন সে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রাণের মধ্যে ভাবের ঘরটা তার যেমন একদিকে ফুলে-ফুলে সেজে উঠতে লাগল, অভাবের দারুণ শূন্যতার একটা হাহাকার সঙ্গে-সঙ্গে বেড়ে চল্‌তে লাগল্। চতুর্দ্দিকে আনন্দের উৎস, পরিপূর্ণতার প্রাচুর্য্যের মধ্যে সে একা উপবাসী,—বুকফাটা তৃষ্ণায় তার অন্তরটা শুকিয়ে উঠেছে। সামনে জল, কিন্তু ভিক্ষে কর্‌বার সাহস নেই। তার নিজের উপরই একটা বিতৃষ্ণা জন্মাতে লাগল্। এক-একবার মনে হ'ত, দূর ছাই আর ভাব্‌ব না; কিন্তু কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই, সুরমার ভাবনা আবার দ্বিগুণ জোরে তার মনটাকে আঁকড়ে ধর্‌ত।

এমনি করে সতীশের দিন কাট্‌তে লাগল্।

দেখতে-দেখতে পাঁচটা বছর,—পাঁচটা বছর কোন্‌খান দিয়ে পার হয়ে চলে গেল,—অমরনাথ আইন পাশ করে দেশে ফিরে এল। কয়েকদিন তাদের বাড়ী পার্টি, ডিনার ইত্যাদিতে একেবারে সরগরম হয়ে উঠল। এই সূত্রে অনেক নতুন পরিবারের সঙ্গে সতীশের আলাপ হ'ল। আজ এখানে, কাল সেখানে নিমন্ত্রণ। পার্টিতে যেতে-আসতে সতীশ ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল। এই কটা বছর জীবনটা একরকম নিরিবিলি কাটানোর পর সে দেখলে, হঠাৎ যেন পৃথিবীটা ভয়ানক তাড়াতাড়ি চলতে আরম্ভ করেছে,—নিজে হাতে সাজানো জিনিসগুলো যেন সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। অমরদের বাড়ী গিয়ে কোন দিন দেখত, ড্রইংরুমটী চেনা-অচেনা নানারকম মূর্ত্তিতে ভর্ত্তি; আবার কোনদিন বা দেখত, সুরমা বাড়ী নেই—অমর ও তার নতুন বন্ধুরা বসে গল্প করছে। তাদের কথায়, তাদের হাসিতে প্রাণ খুলে যোগ দিতে সতীশ যেন একটু সঙ্কুচিত হয়ে পড়ত। তার মনে হ'তে লাগল্, এত দিন ধরে বসে-বসে সে দাবা-খেলার ঘুটিগুলো সাজিয়ে রাখছিল,—হঠাৎ সেগুলো আপনার খেয়ালে চল্‌তে-ফির্‌তে আরম্ভ করেছে। সুরমাদের ছোট্ট সংসারটীর একটানা রীতি-নীতিগুলো অমরের আগমনে এত তাড়াতাড়ি বদলে যেতে আরম্ভ কর্‌লে যে, তার সঙ্গে সমানে পা রেখে চলা সতীশের পক্ষে অসম্ভব বলে মনে হ'তে লাগল্।

হাইকোর্ট খুলতে, অমর বারে ভর্ত্তি হ'বার পর, তাদের বাড়ীর গোলমালটা একটু কমে এল। সতীশের মনে হ'ল, এতদিন যা হবার হয়ে গিয়েছে,—এইবার সুরমার কাছে সে প্রস্তাব কর্‌বেই,—আর দেরী নয়। একদিন বিকেলে সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল।

অমরদের বাড়ী পৌঁছে সে দেখ্‌লে, সুরমা বাড়ী নেই। অমর ও তার মা দুজনে ড্রইংরুমে বসে আছেন। সে ঘরে ঢুকতেই অমর বল্লে—"তোমার জন্য বসে আছি,—একটু বাজার করবার দরকার আছে,—চল না, তোমার ত কোন কাজ নেই, একটু ঘুরে আসবে।"

অমরের মা বল্লেন—"সতীশ, চা না খেয়ে যেও না।"

কিন্তু যার জন্যে এই চায়ের বৈঠক সতীশের কাছে এত মধুময় হয়ে উঠেছিল, আজকের এই বিশেষ দিনে তার অনুপস্থিতিতে তার বুকের ভেতরটা বেদনায় টন্‌টন্ করতে লাগল্। সে অমরকে জিজ্ঞাসা করলে—"সুরমা কোথায়?"

অমরের মা বল্লেন—"সে আর তার বাবা এক জায়গায় বেড়াতে গেছেন।"

অমর তার মাকে বল্লে—"সতীশকে বল্‌তে ক্ষতি কি মা? ও ত ঘরের ছেলে।" বলেই যেন সে একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলে ফেল্লে—"ওঁরা নগেনদের ওখানে গিয়েছেন।" আর এক ঢোক চা খেয়ে, সে একবার তার মা'র মুখের দিকে চেয়ে সতীশকে বল্লে,—"জান সতীশ, নগেনের সঙ্গে আমরা সুরমার বিয়ে দিচ্ছি! অবিশ্যি ওরা নিজেরাই নিজেদের বিয়ে ঠিক করেছে—" অমর আরো কি বল্‌তে যাচ্ছিল, কিন্তু বলা হোলো না,—চা খেতে-খেতে হঠাৎ একটা মারাত্মক রকমের বিষম লেগে, পেয়ালা পিরীচ মাটিতে পড়ে চুরমার হ'য়ে গেল।

বেরোবার মুখে অমরের মা সতীশকে বলে দিলেন—"পরশু সুরমার এন্‌গেজমেণ্ট—সন্ধ্যেবেলা তোমার নেমন্তন্ন রইল। সন্ধ্যে বল্লুম বলে সন্ধ্যে করেই এসো না যেন;—একটু তাড়াতাড়ি এসো,—তোমায় খাটতে হবে কিন্তু।"

সেদিন সন্ধ্যার আগেই সতীশ বাড়ী ফিরে এল।

অন্ধকার ঘরে বসে-বসে সে ভাবতে লাগল, কি করি? ভেবে দেখলে, করবার আর বিশেষ কিছুই নেই। নিজের প্রতি একটা বিতৃষ্ণার জ্বালা তার সমস্ত দেহ-মনকে পুড়িয়ে ফেলছিল। যে কথাটা সে এই পাঁচ বছর ধরে নিজের মনে গুঁজে রেখেছিল,—একদিনও মুখ ফুটে বলবার সাহস হয়নি,—আজ একজন অপরিচিত এসে যে তার গ্রাস এমনি করে কেড়ে নেবে, সে ধারণা সে স্বপ্নেও করতে পারে নি। তার কল্পনায় সে দেখত, শুধু সে আর সুরমা। সেখানে যদি কোন তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাব হ'ত, তা হলে হয় ত এরি মধ্যে একটা যা হয় কিছু সে করে ফেল্‌ত। সে ঠিক কর্‌লে, নিমন্ত্রণে যাবে না। যে ছবি কল্পনাতে মনের সামনে এসে পড়লে, সে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে,—যে আবছায়াটা এতকাল দিনরাত্রি ধরে তার আশেপাশে উঁকি মারত,—এত অকস্মাৎ সেটা যে মূর্ত্তিমান হয়ে উঠবে, তা সে বুঝতে পারে নি। সুরমাকে না পাওয়া সে সহ্য কর্‌তে পারে; কিন্তু তার সামনে যে অন্য কেউ তার প্রণয়ভাগী হবে, তা সে সহ্য কর্‌তে পারবে না। সে ঠিক কর্‌লে, দেশ ছেড়ে চলে যাবে। কোথায় যাবে?- যেখানেই হোক্, কিন্তু এখানে আর না—

সন্ধ্যা হবার আগেই একটা অজ্ঞাত শক্তি সতীশকে সুরমাদের বাড়ীর দিকে টানতে লাগল। নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে' তার মনটা এত বেশী নির্জ্জীব হয়ে পড়েছিল যে, সে আকর্ষণের বিরুদ্ধে বেশীক্ষণ সে যুঝ্‌তে পাচ্ছিল না। সন্ধ্যার অন্ধকারে ক্লান্ত হৃদয়ে সে রাস্তায় বেরিয়ে পড়্‌ল।

সতীশ যখন সুরমাদের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হ'ল, তখন রাত্রি হয়ে গিয়েছে। নিমন্ত্রিতেরা প্রায় সকলেই এসেছেন। ড্রইংরুমে হাসি, গান, আনন্দের ফোয়ারা ছুটছিল। সুরমার সঙ্গে দেখা হতেই, সে একটু অভিমানের সুরে তাকে বল্লে,—"এই বুঝি আপনার তাড়াতাড়ি আসা হ'ল? মা আপনার উপর ভারি রাগ করছিলেন।" তার কথার উত্তরে সতীশ যে কি বল্লে, সুরমা বুঝতে পারলে না। অমর কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল, সে তাকে বল্লে—"কি হে, অসুখ করেছে না কি? তোমার চেহারাটা বড় খারাপ দেখাচ্ছে।" নিজেকে একটু সামলে নিয়ে সতীশ বল্লে—"হ্যাঁ ভাই, শরীরটা ভাল নেই।"

অমর তাড়াতাড়ি ঘরের পেছনে, বাগানের দিকের বারান্দায় একটা গদি-দেওয়া চেয়ার টেনে নিয়ে, সতীশকে সেইখানে বসিয়ে দিলে। তার ভয় হচ্ছিল, মার সঙ্গে সতীশের দেখা হ'লেই, মা হয় ত তাকে একটা কাজের ভার চাপিয়ে দেবেন। তার চেয়ে এই অন্ধকারে একটু নিরিবিলি বসতে পেলে বোধ হয় তার শরীরটা একটু ভাল হবে।

সতীশ ছোট ছেলের মত চুপ করে সেই চেয়ারখানাতে গিয়ে বসে পড়ল। নির্জ্জন জায়গাটায় বসতে পেয়ে ঘরের ভেতরকার চেয়ে অনেকটা সুস্থ বোধ করতে লাগল্। ঘরের ভেতর থেকে হাসির আওয়াজগুলো বাজের মতন তার কাণে এসে পড়তে লাগল্। অনেক চেষ্টা করেও সে মনটাকে শক্ত কর্‌তে পাচ্ছিল না। সুরমার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত প্রত্যেক নিমেষের কাহিনীগুলোকে গেঁথে গেঁথে সে মনের মধ্যে সাজিয়ে রেখেছিল; সুতো-ছেঁড়া মালার মতন সে স্মৃতিগুলো এলিয়ে পড়তে লাগ্‌ল। প্রথম যেদিন সে এখানে এসেছিল, সে দিন তার ব্যথিত চিত্তকে সেই দুটো সহানুভূতি-মাখা চোখ কেমন করে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছিল। তার পর কতদিন কত রকম ভাবে সেই চোখ দুটোর মধ্যে কত কথা কত ভাব সে দেখ্‌তে পেয়েছে। নিজের উপর তার ভয়ানক রাগ হতে লাগ্‌ল। কেন সে মনের মধ্যে এই কথাটাকে এতদিন ধরে পুষে রেখেছিল? কেন তার কাছে সে প্রকাশ করে নি,—তা হলে কি যন্ত্রণা এর থেকে বেশী হত?

তবে থাক এ দুঃখ—যা কাউকে সে বল্‌তে পারচে না,—যাতে কারো কোন লাভ কিম্বা ক্ষতি নেই। নিজের এই যন্ত্রণাকে সে ঝেড়ে ফেল্‌বার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌ল। এত দিন যে চিন্তার শতপাকে তার মনটা বাঁধা পড়েছিল, সেগুলোকে সে আল্‌গা করে দেবার চেষ্টা করতে লাগ্‌ল। নিজের জীবনের অতীতের দিকে সে একবার ফিরে দেখ্‌লে—সেখানে বিফলতার মরুভূমির তপ্ত দীর্ঘশ্বাস। সমস্ত জীবন-ব্যাপী এই বিফলতার শ্মশানের উপর আশার কল্পনা দিয়ে যে সিংহাসন সে সাজিয়েছিল, অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসে তা ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। ভবিষ্যতের ভাবনায় সে একবার ফিরে দেখ্‌লে—সেখানে গাঢ় অন্ধকার! সে অন্ধকার ভেদ করে দৃষ্টি চলে না। ঘরের ভেতর তখন গান চলছিল—

তোমার গোপন কথাটি সখি,
আমারে বোলো,
ওগো ধীর-মধুর-হাসিনী বোলো
ধীর-মধুর হাসে,
আমি কাণে না শুনিব গো
শুনিব প্রাণের শ্রবণে—

সতীশ মনে-মনে ঠিক করছিল, জীবনে শুধু যদি বিফলতাই এসে থাকে, তবে তাকেই বিজয়ীর মত জয়মালা পরিয়ে বরণ করে নিতে হবে। কিন্তু সুরমা—! আর সে ভাব্‌তে পাচ্ছিল না,—তার সর্ব্বাঙ্গ ঝিম্‌-ঝিম্‌ করতে লাগ্‌ল। মাথাটা একপাশে হেলিয়ে দিয়ে সে চোখ বুঁজিয়ে ফেল্লে,—চিন্তার উদ্দাম গতির মুখে আপনাকে ভাসিয়ে দিলে।

হঠাৎ তার সর্ব্বাঙ্গ শীতল করে দিয়ে পেছন থেকে দুখানা নরম হাত তার গলাটা জড়িয়ে ধরলে,—ঘাড়ের কাছে একটু গরম নিঃশ্বাস;—তার পরেই দুটো ব্যগ্র অধরোষ্ঠের আলিঙ্গন—

নিমেষের মধ্যে আত্মহারা সতীশ বুঝ্‌তে পারলে, এত দিন যে স্পর্শের জন্ত তার সর্ব্বাঙ্গ উন্মুখ হয়ে আছে—এই সেই!—তবে কি—। তার বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ, অতীত সব এক হয়ে মিশে গেল? অশ্রুপূর্ণ কণ্ঠে সে বলে উঠ্‌ল—"সুরমা, তবে—"

"এঁ্যা"—বিরক্তি ও যন্ত্রণার একটা অস্ফুট শব্দ করে, টল্‌তে-টল্‌তে সুরমা যেন সেখান থেকে পালিয়ে গেল। সুরমার অধর-স্পর্শে সতীশের সর্ব্বাঙ্গে একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহ খেলে গিয়ে তার নির্জ্জীব মনটাকে খাড়া করে তুল্লে। এ কি ভুল! না, এ বিদায়ের অভিশাপ! এ কি শাস্তি! সমস্ত জীবন কি তবে এই সন্দেহের গোলোক-ধাঁধায় পড়ে হাবুডুবু খেতে হবে! সতীশ একবার উঠ্‌তে চেষ্টা করলে। কিন্তু তখুনি আবার মাথা ঘুরে চেয়ারের উপর বসে পড়ল। ঘরের ভেতর থেকে নগেনের একটা প্রাণ-খোলা হাসির আওয়াজ বাইরের সেই জমাট অন্ধকার চিরে দিয়ে তীরের মতন, ছুটে এসে তার সর্ব্বাঙ্গে একটা বিষের দাহন ছড়িয়ে দিলে।

পরদেশী বঁধু

[শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী]

(১)

ওগো পরদেশী বঁধু, এস এস, এস ঘরে মোর,
এস প্রাণ, এস মন-চোর!
এ কি স্বপ্ন? এ কি ভোজ-বাজী?
লহমার পরিচয়ে আজি
পরাইলে কলঙ্কের ফাঁসি,
খল, তোর ছল-ভরা হাসি
কলিজাটি কখন উঘারি'
মেরে গেল মোহন কাটারি!
একি জ্বালা, সর্ব্বাঙ্গ জুড়ায়!
একি বিষ,—অমৃত গড়ায়!
ফাগুয়ায় লাল হয়ে ডাকে বুকে পীরিতি-ফোয়ারা,—
লুহু লিয়া দিল মেরি দিলকো পিয়ারা!

(২)

হোরি আজ হোরি! আয়, দুইজনে খেলি পিচকারী,
মেরি জান, কলিজা হামারি!
দিবানিশি হিয়া-মধু ঢালি'
রাখিয়াছি রূপ-শিখা-জ্বালি',
স্বপনের মোহ বুকে ভ'রে
যৌবনটি রাখিয়াছি ধ'রে,
সে অজানা বঁধুয়া কখন
চাবে এসে জীবন যৌবন.
আজ যেন আমার সকলি
মনে হয়, পূজার অঞ্জলী!
ফাগুয়ায় লাল হয়ে ডাকে বুকে পীরিতি ফোয়ারা,—
লুহু লিয়া দিল মেরি দিলকো পিয়ারা!

(৩)

আজি মোর মত্ত হিয়া সাজিয়াছে উন্মাদিনী রাই,
তুই যেন নিঠুর কানাই!
ঘরে ঘরে হেরি বৃন্দাবন,
বাঁশী শুনি—বিহগ-কূজন!
দিগন্তের স্বচ্ছ নীলিমায়
কালিন্দীর তরঙ্গ-খেলায়।
শৈল-শৃঙ্গ-চূড়া মনোলোভা,
শস্য-হাস্যে পীতধড়া-শোভা!
'সখা বলি' আলিঙ্গিতে ধাই—
সারা বিশ্ব আমারি কানাই!
ফাগুয়ায় লাল হয়ে ডাকে বুকে পীরিতি-ফোয়ারা,—
লুঠ্ লিয়া দিল মেরি দিলকো পিয়ারা!

(৪)

কোথা হ'তে এলে বঁধু?—সুধাইলে মুখ পানে চাও,
আশা দিয়ে ভাষাটি লুকাও!
কোথা—কতদূরে সে বিদেশ?
কোথায় আরম্ভ, তার শেষ?
বল সে কি আলো, না আঁধার?
শ্মশান, না সূতিকা-আগার?
কেন যাওয়া-আসা ফিরে-ফিরে,
যে ঘোরায়, সেও ঘোরে ফিরে?—
ও হাসিতে এ যে তরঙ্গিত
জীবনের বিজয়-সঙ্গীত!
ফাগুয়ায় লাল হয়ে ডাকে বুকে পীরিতি-ফোয়ারা,—
লুঠ্ লিয়া দিল মেরি দিলকো পিয়ারা!

(৫)

এ মোহিনী কোথা হ'তে শিখে এলে, ও বিদেশী বঁধু,
ঢেলে দিলে প্রাণে কোন্ মধু!
কোথা গেছি বৃথা অভিসারে!
ধ্যানের দেবতা মোর দ্বারে!
পৌর্ণমাসী চন্দ্রাতপ ধরে,
মলয় চামর আজ করে,
মধুকর মুরলী বাজায়,
মঞ্জু কুঞ্জ বাসর সাজায়,
এস প্রাণে, পরাণের ধন,
লাজে সরে' থাক্ ত্রিভুবন!
ফাগুয়ায় লাল হয়ে ডাকে বুকে পীরিতি-ফোয়ারা,—
লুঠ্ লিয়া দিল মেরি দিলকো পিয়ারা!

দৃশ্য-কাব্যের উৎপত্তি এবং বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্যে তাহার রূপ

[শ্রীসত্যজীবন মুখোপাধ্যায়]

দৃশ্য-কাব্য বলিলেই, উহা কি, এবং কিরূপেই বা উৎপন্ন হইল, তাহা জানিবার জন্য স্বতঃই মনের মধ্যে এক কৌতূহল জন্মে; এবং সেই কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া মানব উহার বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গার্থের অনুসন্ধিৎসু হইয়া উঠে। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে মনোবিজ্ঞান-সম্মত দৃশ্য-কাব্যের উৎপত্তি দেখাইয়া প্রথমেই উহার ব্যঙ্গার্থ প্রকাশিত করিব; পরে কিরূপে বঙ্গ-সাহিত্যে তাহার রূপ-বিকাশ হইয়াছে, তাহারই আলোচনার প্রসঙ্গে উহার বাচ্যার্থেরও প্রতিপাদন করিতেছে।

মানবের হৃদয়-নিহিত বৃত্তি-নিচয়ের মধ্যে নাট্য-বৃত্তি ও অনুকরণ-বৃত্তি নামে দুইটী বৃত্তি আছে। বৃত্তিগুলির ধর্ম্ম এই যে, ইহারা অজ্ঞাতসারে মানব-হৃদয়ে আপনাদিগের আধিপত্য বিস্তার করে; এবং মানবও মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাহাদিগের দাস হইয়া যায়। নৃত্য, গীত ও বাদ্য, এই

তিনের সমবায়কে নাট্য কহে। নৃত্য দেখিবার, এবং গীত ও বাদ্য শুনিবার যে স্বাভাবিক অভিলাষ, তাহাই নাট্য বৃত্তি; এবং এই নাট্য-বৃত্তির প্রেরণায় নৃত্য, গীত ও বাদ্য—যাহা দেখা বা শুনা হইল, মানস-মন্দিরে তাহাদিগের চিত্রাঙ্কন করিয়া তাহাদের পুনরভিনয়ের চেষ্টাই অনুকরণ-বৃত্তি। এই দুই বৃত্তি কার্য্যকারণ-সম্বন্ধে এত ঘন-সম্পৃক্ত যে, স্থূলদৃষ্টিতে অনেক সময়ে ইহাদিগকে অভিন্ন মনে হয়; কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে, ইহাদিগের পার্থক্য স্পষ্টই প্রতীত হয়। কিরূপে এই বৃত্তিদ্বয় দৃশ্য-কাব্যের উৎপত্তিমূলক হইয়াছে, আমরা তাহাই দেখাইতেছি।

জীব-প্রকৃতির পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শৈশব হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত সকল অবস্থাতেই জীবকুল নাট্য-বৃত্তির সেবায় তৎপর। এই বৃত্তির মোহিনী শক্তি যে কেবল মনুষ্য-জগতে পরিব্যাপ্ত তাহা নহে, মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যেও ইহার অভিব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হয়। দেখা গিয়াছে যে, গীত ও বাদ্যের শক্তিতে মোহিত হইয়া সর্প বা মৃগ সর্প-বৈদ্যের অথবা কিরাতের ক্রীড়নক হইয়াছে। সুতরাং নাট্যবৃত্তি যে ওতপ্রোত ভাবে জীব-জগতে পরিব্যাপ্ত, তাহার আর প্রমাণের আবশ্যকতা নাই। পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধ নিবন্ধন অনুকরণ-বৃত্তিও নাট্য-বৃত্তির অনুসারিণী। অনুকরণ-বৃত্তির ধর্ম্ম এই যে, জীবের চক্ষে যাহা কিছু সুন্দর ও আনন্দপ্রদ, তাহার অনুকরণে জীব স্বতঃপ্রণোদিত হয়, অপরের প্ররোচনার অপেক্ষা রাখে না। অ্যারিষ্টট্‌ল এই বৃত্তির সার্ব্বজনীনতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "মানব-হৃদয়ে অনুকরণ-প্রবৃত্তি স্বভাবজ এবং শৈশব হইতেই স্ফূরিত। অনুকরণলব্ধ আনন্দ সর্ব্বজাতি সর্ব্বকালে সমভাবে অনুভব করে।" * শিশু মাতৃক্রোড়ে শায়িত থাকিয়াই মাতার হর্ষোৎফুল্ল অঙ্গভঙ্গি-সহকারে স্নেহ-সম্ভাষণ, ভ্রাতা-ভগিনীর আদর-আপ্যায়ন এবং কোন উদ্দিষ্ট বস্তু নিকটবর্ত্তী করিবার আঙ্গিক কৌশলাদি প্রতিনিয়ত লক্ষ্য করিয়া, শিশু-শয্যা হইতেই সেই সকল প্রদর্শিত বাচনিক ও আঙ্গিক অনুকরণে আপনার ক্ষুদ্র শক্তিকে নিয়োজিত করে, এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর দিয়া আপনার নয়ন ও মনের প্রীতিপ্রদ যাহা কিছু দেখে ও শুনে, তাহারই অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়। নাট্য-বৃত্তির মত অনুকরণ-বৃত্তিরও প্রভাব মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। পক্ষীশাবকের উড্ডয়ন-চেষ্টা ও তাহার অস্ফুট মধুর কাকলি যে তাহার মাতাপিতার উড্ডয়ন-নিরতি ও শব্দশীলতার অনুকরণে সংসাধিত হয়, এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে।

মানবের এই অনুকরণ-প্রবৃত্তি সময়ে-সময়ে এরূপ প্রবল হইয়া উঠে যে, যখন সেই মানব অপর কোন মানবের ভাব বা অবস্থার সংঘর্ষে আসিয়া তন্ময়চিত্তে তাহার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকে, তখন মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সেই পর্য্যবেক্ষিত ব্যক্তির ভাব বা অবস্থার অনুযায়ী ভাবভঙ্গী নিজের অজ্ঞাতসারে তাহার দেহ-মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে। কখনও বা এরূপ হয় যে, ভাবপ্রবণ মানব আপনার পারি-পার্শ্বিক সমাজের কোন এক উন্নত ভাবাদর্শে আকৃষ্ট হইয়া, সেই আদর্শানুযায়ী ভাবের অনুকরণ করিয়া, আপনার মনোরাজ্যে তাহার চিত্র চিত্রিত করেন; এবং সেই অনুকরণ-সৃষ্ট মানসী প্রতিমাই ক্রিয়াযুক্ত হইয়া ক্রমশঃ প্রাণময়ী হইয়া উঠে। পরে এই প্রাণময়ী প্রতিমা বহুবিধ ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে চরিত্রবহুল হইয়া উপাখ্যান-বস্তুর সৃষ্টি করে; এবং কালে সেই ঘটনাসম্বলিত উপাখ্যানভাগই বহিরবয়ব প্রাপ্ত হইয়া দৃশ্যকাব্য আখ্যা পাইয়া থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাকেই দৃশ্যকাব্যের মনোবিজ্ঞানসম্মত উৎপত্তির কারণ (Psychological origin) বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বিধাতৃ-বিধানে দৃশ্যকাব্যের জন্মসম্বন্ধীয় এই চিরন্তন প্রথার রূপান্তর নাই। সৃষ্টির প্রথম দিন হইতে এ পর্য্যন্ত দৃশ্যকাব্যের জন্ম এই ভাবে নিয়মিত হইতেছে। সৃষ্টি-বৈচিত্র্যে অবয়বের বিচিত্রতা থাকিতে পারে; কিন্তু জন্মবীজের বৈলক্ষণ্য নাই। নাট্য-অবয়বের বিচিত্রতা আলোচনার তারতম্যানুসারে সূচিত হয়। যে জাতির মধ্যে দৃশ্যকাব্য যত বেশী উৎকর্ষলাভ করিয়াছে, তথায় ইহা যত্ন-সেবিত বনস্পতির ন্যায় নানা শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃতি লাভ করিয়া আপনার সুশীতল ছায়াতলে ও সুগন্ধি কুসুম-বিলাসে আশ্রিত পান্থের পথশ্রম অপনোদন করিতেছে; এবং যেখানে ইহা সম্যক্‌রূপে আলোচিত হয় নাই, সেখানে উষর ক্ষেত্রোৎপন্ন অযত্নবর্দ্ধিত

* "Imitation is instinctive in man from his infancy; and no pleasure is more universal than that which is given by imitation."

তৃণ-গুল্মের ন্যায় কঙ্কালসার হইয়া কাব্যকুসুমসুরভি-পরিম্লাত সাহিত্য-কাননের শোভার অন্তরায় হইয়াছে।

সুপ্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ নটসূত্রকার শ্লিগেল (Sclegel) সাহেব দৃশ্যকাব্যের উৎপত্তির অনুসন্ধান বিষয়ে অনুকরণ-প্রবৃত্তি হইতে আরও এক পদ অগ্রসর হইতে বলিয়াছেন। তাঁহার মন্তব্যের তাৎপর্য্য এইরূপ—"মানবের পৃথক পৃথক সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় জীবন হইতে অনুকরণীয় অংশগুলি বিভাগ করিয়া লইয়া, সেইগুলিকে চুম্বকভাবে একটী ঘটনার অঙ্গীভূত করিয়া, সমাজ-চক্ষে তাহাদের এককালীন পুনঃ-প্রদর্শনই দৃশ্যকাব্যোৎপত্তির প্রাথমিক অবস্থা।" *

পূর্ব্ববর্ণিত বিশ্লেষণের মধ্যে আমরা দৃশ্যকাব্যের ব্যঙ্গার্থ পরিস্ফুট দেখিয়াছি। এক্ষণে উহার আভিধানিক এবং আলঙ্কারিক ব্যুৎপত্তির দ্বারা উহার বাচ্যার্থ প্রতিপন্ন করিয়া বাঙ্গালা দৃশ্যকাব্যের রূপ-বিকাশ প্রত্যক্ষ করিব।

কাব্যকলাপ্রসূত সেই গ্রন্থ-বিশেষকেই দৃশ্যকাব্য বলে, যে গ্রন্থাবলম্বিত ক্রিয়ার পাত্র-পাত্রিগণ ক্রিয়ানুমোদিত হইয়া সত্যরূপে প্রতীয়মান হয়। প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা কাব্যকে শ্রব্য ও দৃশ্যভেদে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। যাহা শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য তাহাই শ্রব্য-কাব্য; যথা—মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, কোষকাব্য ইত্যাদি। পুরাকালে যখন লিখন-প্রণালী আবিষ্কৃত হয় নাই, তখন প্রাচীন রীত্যানুসারে উল্লিখিত কাব্যাদির অধ্যয়ন প্রধানতঃ শ্রুতি সাহায্যে নিষ্পন্ন হইত। যদিও মুদ্রাযন্ত্র প্রচলনের পরও পূর্ব্বোক্ত কাব্যাদির পঠন-ক্রিয়াও সম্পাদিত হইতেছে, তথাপি উহারা আজ পর্য্যন্ত তাহাদের প্রাচীন শ্রব্য নামে অভিহিত আছে। কিন্তু যে কাব্যের শ্রবণ বা পঠন ব্যতীত দর্শনেরও প্রয়োজন হয়, তাহাই বাচ্যার্থগত দৃশ্যকাব্য। প্রাচ্য বা প্রতীচ্য আলঙ্কারিকগণ দৃশ্যকাব্যের বিবিধ রূপ কল্পিত করিয়াছিলেন, কিন্তু ইদানীং, উহাদের অধিকাংশই অপ্রচলিত; এবং প্রবন্ধ-প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট না থাকায় পাদটীকায় কেবল উহাদিগের নামোল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম। † অবলম্বিত ক্রিয়া এবং সেই ক্রিয়ার অনুকূল কার্য্যাবলীর সম্পাদন-পদ্ধতি অনুসারে রূপের পার্থক্য সূচিত হয়। আকারগত পার্থক্য বিদ্যমান থাকিলেও নাট্যধর্ম্ম গত পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। অর্থাৎ ক্রিয়ানুমোদিত বিষয়ের সম্পাদনরূপ মূল সূত্র এবং সাধারণতঃ সেই মূল সূত্র কি-কি উপায়ে এবং কি-কি পদ্ধতিতে রক্ষিত হয়, তাহা সকল দৃশ্য কাব্যেই একরূপ।

সংস্কৃত দৃশ্য-কাব্যের বিবিধ প্রকারভেদ ও রচনা-রীতি বাঙ্গালা দৃশ্য-কাব্যে নাই। উপাদানের নিকৃষ্টতা প্রযুক্ত বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতি-চিকীর্ষুদিগের সহানুভূতির অভাব ঐরূপ ত্রুটীর কারণ নহে। বরং দুইচারিজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের সংস্কৃত দৃশ্য-কাব্য ব্যতীত, তজ্জাতীয় অধিকাংশ দৃশ্য-কাব্যই অধুনাতন উচ্চ প্রকৃতির বাঙ্গালা দৃশ্যকাব্য অপেক্ষা অনেকাংশে শোভাহীন। ঐ ত্রুটীর কারণ অন্যরূপ; এবং তাহা শৈশব সাহিত্যের ইতিহাসের চিরন্তন প্রথার হেতুভূত। যদিও বাঙ্গালা দৃশ্য-কাব্য এখন নানা রত্নসম্ভারে সমৃদ্ধ হইয়া বুধমণ্ডলীর আদরের সামগ্রী হইতে চলিয়াছে,—তথাপি ইহা সবেমাত্র কৈশোরের সীমা অতিক্রম করিয়াছে। অনুসন্ধিৎসার বশবর্ত্তী হইয়া স্বাধীনচেতা বালক যেমন নানরূপ ঘটনা-সংঘাতে আপনার জ্ঞান সঞ্চয় করে, বাঙ্গালার দৃশ্য-কাব্যও সেইরূপ প্রাচীন কালের সংস্কৃত নাটক এবং বর্ত্তমান কালের ইংরাজি নাটক এতদুভয়ের সংঘর্ষে আসিয়া জ্ঞান-গরিমায় বিভূষিত হইতেছে। এই অবস্থায় যদি কোন বাঙ্গালা নাট্যকার প্রাচীন আলঙ্কারিকদিগের সহানুভূতি হারাইবার আশঙ্কায় আপনার দিগন্তপ্রসারী স্বাধীন কল্পনাকে নিয়ম বেষ্টনীর বিবরীভূত করেন, তাহা হইলে বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডার চিরতরে বৈভবহীন হইবে। বাল্য-কালই জ্ঞানার্জ্জনের প্রকৃষ্ট সময়। বাল্যের উপ্ত বীজ যৌবনে অঙ্কুরিত হইয়া প্রৌঢ়ে বিশাল বনস্পতির আকার

* "One step more was requisite for the invention of the Drama, namely, to separate and extract the imitative elements from the separate parts of social life and to present them to itself again collectively in one mass."

† সংস্কৃত:—নাটক, প্রকরণ, ভাণ, ব্যায়োগ, সমবকার, ডিম, ঈহামৃগ, অঙ্ক, প্রহসন, বীথী, নাটিকা, ত্রোটক, গোষ্ঠী, সট্টক, নাট্যরাসক, প্রস্থান, উল্লাপ্য, কাব্য, প্রেঙ্খণ, রাসক, সংলাপক, শ্রীগদিত, শিল্পক, বিলাসিকা, দুর্ম্মল্লিকা, প্রকরণী, হল্লিস, ভাণিক।

ইংরাজি—Mystry, Miracle, Morality, Interlude, Tragedy, Comedy, History, Pastoral, Melodrama, Farce, Barlesque, Pantomime, Opera, Burletta etc.

ধারণ করে। কিন্তু বাল্যে অর্জ্জিত জ্ঞানরাশি পাছে যৌবনের উদ্দাম বৃত্তিনিচয়ের বশীভূত হইয়া বিপথগামী হয়, সেইজন্য কাব্য-শাসন সৃষ্ট হইয়াছিল। বাঙ্গলা নাট্য-কারগণ যে কাব্য-শাসন একেবারেই মানিবেন না, তাহা নহে; তবে দৃশ্য-কাব্যের বাল্যাবস্থায় জ্ঞানার্জ্জনের ব্যাঘাত হইবার ভয়েই ঐ বিষয়ে ততটা মনোযোগী নহেন।

বাঙ্গালা দৃশ্য-কাব্যের এই শৈশবকালে, কাব্যাঙ্গের সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টি সাধিত হইবার সময়ে, উহার প্রকারভেদ সম্ভবপর নহে। অধিকন্তু, বৈদেশিক নাট্য-প্রভাব-জনিত রুচির পরিবর্ত্তনও বর্ত্তমান কালের বাঙ্গালা দৃশ্য-কাব্যগুলিকে প্রাচীন আলঙ্কারিকদিগের অননুমোদিত পথে কতকটা পরিচালিত করিয়াছে। বহু শতাব্দী ধরিয়া বঙ্গ-সাহিত্য-ক্ষেত্রে আদিরসের যে স্রোত প্রবাহিত ছিল, কাল সহকারে সেই স্রোত ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া, অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের দৃশ্য-কাব্যগুলিকে ক্রমে-ক্রমে পঙ্কিল করিয়া তুলিতেছিল। তৎকালীন বৈদেশিক নাটকের নূতন-নূতন রসের অপূর্ব্ব প্রভাবে বিমোহিত হইয়া, তাহাদিগের রচনারীতি অবলম্বনপূর্ব্বক, প্রাচীন অষ্টাবিংশতি প্রকার দৃশ্য-কাব্য সমুদ্র মথিত করিয়া, উহার সারাংশলব্ধ উপাদানে যে নাট্য-মন্দির গঠিত হইয়াছিল, তাহাই বাঙ্গালা দৃশ্য-কাব্যের বর্ত্তমান রূপ। রসাধিকারের তারতম্যে, এবং রসানুগম্য উপাখ্যান-বস্তুর বৈচিত্র্যে, বাঙ্গালা দৃশ্য-কাব্য নাটক, নাটিকা ও প্রহসন এই মূর্ত্তিত্রয়ে দৃশ্য-কাব্য-মন্দিরে বিগ্রহ রূপে বিরাজ করিতেছে। অবয়বের পার্থক্য থাকিলেও মূলে পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তিত্রয় এক।

অধুনা বাঙ্গালা সাহিত্যের যাবতীয় উচ্চাঙ্গের দৃশ্যকাব্য, যাহার ভাবস্রোত মানব-হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে পৌঁছাইয়া মানবকে তাহারা বর্ত্তমান অবস্থা ভুলাইয়া দেয়, তাহাই নাটক-পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। যে দৃশ্য-কাব্যগুলি অপেক্ষাকৃত লঘু ভাব লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, অথবা যাহারা নৃত্যগীতবহুল এবং কৌশিকী-বৃত্তি-সম্পন্ন, তাহাই নাটিকা-পদবাচ্য; এবং যেগুলির উপাদান হাস্য, পরিহাস, ও ব্যঙ্গ, অথবা যাহারা কোন সমাজ বা ব্যক্তিবিশেষের অনুকৃতি (parody) তাহাই প্রহসন-পর্য্যায়ভুক্ত দৃশ্য কাব্য। কিন্তু নাটকে সর্ব্ববিধ উৎকর্ষ অধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকায়, নাটকই দৃশ্য-কাব্য-জগতের চক্রবর্ত্তী-সম্রাট। উপরিউক্ত মূর্ত্তিই বাঙ্গালা দৃশ্য-কাব্যের বর্ত্তমান রূপ।

ছবি

[শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ]

পটের রঙ্গীন ছবি ডুবেছে কালের কোলে,
খুঁজে তারে পাবে না ধরায়;—
প্রাণের পিয়াসা দিয়ে এঁকেছি হৃদে যে ছবি—
কেমনে ভুলিব বল তায়?

পটের সে ছবিখানি হাতের আঁকা যে ওগো—
প্রেম বিনে প্রাণহীন হায়,
অমর প্রেমের তুলি এঁকেছে হৃদে যে ছবি—
হরিতে পারে না কাল তায়।

দুইখানি বই

মার্কিন যাত্রা

ও

America through Hindu Eyes

[শ্রীজলধর সেন]

বই দুইখানির একখানি যে বাঙ্গালা ভাষায় এবং অপরখানি যে ইংরাজী ভাষায় লিখিত, তাহা নাম দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়। দুইখানি বই-ই একজনের লেখা ;—তিনি শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দে মজুমদার মহাশয়। শেষোক্ত বইখানি লেখক মহাশয় কেন বাঙ্গালায় লেখেন নাই, তাহার কৈফিয়ৎ তিনি দেন নাই, দেওয়া বোধ হয় আবশ্যক মনে করেন নাই। আমরা সেই কৈফিয়ৎ দিতেছি। আমেরিকা মহাদেশ ভ্রমণ করিয়া একজন হিন্দু-সন্তান উক্ত দেশ সম্বন্ধে কি মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহা সেই দেশের লোকদিগকেই সর্ব্বাগ্রে শোনান কর্ত্তব্য ; তাই তিনি শেষোক্ত বইখানি ইংরাজী ভাষায় লিখিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে সিদ্ধ হইয়াছে ; আমেরিকার লোকে তাঁহার পুস্তকখানি সকলে পড়িয়াছেন কি না, তাহা ঠিক বলিতে পারি না ; কিন্তু তাঁহার জাতি-ভায়েরা অর্থাৎ সাহেবেরা—অন্ততঃ এ দেশের সাহেবেরা অনেকেই যে পড়িয়াছেন, তাহা আমরা বলিতে পারি ; কারণ কলিকাতার ইংরেজ-সম্পাদক-পরিচালিত, লব্ধপ্রতিষ্ঠ দৈনিক-পত্র 'The Indian Daily News' এই ইংরেজী বইখানি আদ্যন্ত তাঁহাদের পত্রে ক্রমশঃ ছাপাইয়া দিয়াছেন এবং উক্ত পত্রের সম্পাদক ও অন্যান্য ইংরেজী পত্রের সম্পাদকগণ এই বইখানির প্রতি পাঠক সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য যথোচিত চেষ্টা করিয়াছেন। অতএব, শ্রীযুক্ত দে মজুমদার মহাশয়ের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। অতঃপর তিনি 'America through Hindu Eyes' বইখানি বাঙ্গালা ভাষায় অনুদিত করিয়া প্রচার করিতে লোকতঃ, ধর্ম্মতঃ বাধ্য। বিশেষতঃ তিনি যখন 'মার্কিন-যাত্রা' বাঙ্গালায় লিখিয়া গোড়া-পত্তন করিয়াছেন, তখন বাকীটুকু বাঙ্গালায় না বলিলে, আমরা বাঙ্গালানবীশদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে সহজে অব্যাহতি লাভ করিতে দিব কেন ?

এখন বই দুইখানির কথা বলি। শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ বাবু আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন, আমরা এই দুইখানি বই তুলনায় সমালোচনা করিয়া দেখিলাম, বাঙ্গালা অপেক্ষা ইংরেজীতেই তাঁহার কলম চলিয়াছে ভাল। ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিবারও একটা 'আর্ট' আছে ; সে 'আর্ট' ইন্দুবাবুর ইংরেজী পুস্তকখানিতে খুব খুলিয়াছে। বাঙ্গালাখানি আর দশখানি বাঙ্গালা ভ্রমণ-বৃত্তান্তের মতই হইয়াছে ; অর্থাৎ অনেক বিবরণ আছে। তবে মার্কিন-যাত্রা বলিয়া তাহা আগ্রহের সহিত পড়িতে হইয়াছে। কিন্তু 'America through Hindu Eyes'—সে এক আশ্চর্য্য বই,—একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভ্রমণ-কাহিনী !

এমন কথা কেন বলিলাম, তাহার কারণ বলিতেছি। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাঁহারা কোন স্থানের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিয়া থাকেন, তাঁহারা সেই স্থানের নাড়ী-নক্ষত্রের পরিচয় দিবার জন্য বিশেষ ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন। এই মার্কিন-ভ্রমণ বা America through Hindu Eyes বইখানিই ধরুন। সাধারণ কোন লেখক আমেরিকার কথা লিখিতে বসিলে, প্রথমেই তিনি লিখিতেন আমেরিকা আবিষ্কারের বিরাট ইতিহাস ; তাহার পর লিখিতেন, আমেরিকার 'আদিম' অধিবাসীদিগের বিবরণ—তাহাদের কুলুজী, তাহাদের অন্তর্ধানের গবেষণা ; তাহার পরই লিখিতেন ইংরাজ-যাত্রীদিগের আমেরিকায় শুভাগমনের কাহিনী এবং তাঁহাদের উপনিবেশের বিস্তৃত বিবরণ ; সর্ব্বশেষে লিখিতেন আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যের স্বাধীনতার যুদ্ধের ইতিহাস। এই কথাগুলি লিখিতেই একখানি সাত-কাণ্ড রামায়ণ হইয়া পড়িত। লোকেও বলিত, হাঁ খুব ভাল বই হইয়াছে। ইহাতে আমেরিকার ইতিহাসের কোন তথ্যই বাদ পড়ে নাই। কিন্তু, তাঁহারা একেবারেই ভুলিয়া যান যে, ইতিহাস ও ভ্রমণ-বৃত্তান্ত এক জিনিস নহে ; ইতিহাসে যাহা চাই, ভ্রমণবৃত্তান্তে তাহা চাই না। ভ্রমণ-বৃত্তান্ত এমন ভাবে লিখিত হইবে যে, তাহাতে গভীর গবেষণা থাকিবে না, অকারণ পাণ্ডিত্য প্রকাশ থাকিবে না, অনাবশ্যক বাগাড়ম্বর থাকিবে না ;—অথচ যে দেশের কথা বলা হইতেছে, তাহার সর্ব্ববিষয়ের একটা সম্পূর্ণ ছবি পাঠকের দৃষ্টির সম্মুখে ঝলমল করিবে। শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ বাবুর পুস্তকে আমরা তাহাই দেখিতে পাইলাম। কোন ইতিহাস নাই, কোন পুরাকাহিনী নাই, কোন গবেষণা নাই। লেখক মহাশয় কয়েকটি প্রত্যক্ষ ব্যাপার—অতি সামান্য কথা হাসিতে-হাসিতে সোজা ভাবে বলিয়া গিয়াছেন, আর তাহাতেই সমগ্র বিবরণ ফুটিয়া উঠিয়াছে ;—আমেরিকা দেশ এবং সেই দেশের অধিবাসীদিগকে চিনিবার, জানিবার, বুঝিবার কিছুই বাকী থাকে নাই। ইহারই নাম মুন্সীগিরি। সেইজন্যই বলিতেছিলাম যে, ইন্দুবাবুর বই সত্য-সত্যই অতি উপাদেয় ভ্রমণ-কাহিনী হইয়াছে। উপরে যে কথাগুলি বলিলাম, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত এই বইখানি হইতে দিতে পারা যায় ; কিন্তু তাহা বলিতে

গেলে সমগ্র বইখানিই অনুবাদ করিয়া দিতে হয়। সে ভার গ্রন্থকার মহাশয়ের উপর ন্যস্ত করিয়া আমরা দুই একটীমাত্র দৃষ্টান্ত দিব।

আমেরিকায় যাইবার সময় জাহাজের টিকিট কিনিবার সময় যাত্রীদিগকে একখানি ছাপান কাগজে নিম্নলিখিত ঘরগুলি পূরণ করিয়া দিতে হয়; যথা—(১) ক্রমিক নম্বর, (২) সম্পূর্ণ নাম, (৩) বয়স, (৪) পুরুষ কিম্বা স্ত্রী, (৫) বিবাহিত কি অবিবাহিত, (৬) জীবিকা, (৭) লিখিতে পড়িতে পারে কি না, (৮) যে রাজ্যের প্রজা, (৯) জাতি, (ক) যুক্তরাজ্যের প্রজা কি না (১০) শেষ বাসস্থান (১১) গন্তব্য স্থান (১২) গন্তব্য স্থানে যাইবার টিকিট আছে কি না, (১২ক) কানাডা বা যুক্তরাজ্য ব্যতিরেকে অন্য কোন দেশের যাত্রী কি না, (১২খ) নিউ-ইয়র্কে পৌঁছামাত্রই গন্তব্যস্থানে যাইবে কি না, (১৩) যাত্রী তাহার টিকিট নিজের অর্থে কিনিয়াছে কি না, তাহা না হইলে যে ব্যক্তি ও সমিতির, মিউনিসিপালিটীর বা গবর্ণমেণ্টের অর্থে টিকিট ক্রীত হইয়াছে, তাহার নাম, (১৪) যাত্রীর সঙ্গে ৫০ ডলার অর্থাৎ দেড় শত টাকা আছে কি না; কম থাকিলে সর্ব্বশুদ্ধ কত মুদ্রা সঙ্গে আছে, (১৫) পূর্ব্বে কোন দিন যুক্ত রাজ্যে আসিয়াছে কি না; আসিয়া থাকিলে কবে আসিয়াছিল, এবং কোথায় অবস্থান করিয়াছিল; (১৬) কোন আত্মীয় বা বন্ধুর নিকট যাওয়ার কথা থাকিলে, তাহার নাম ও ঠিকানা; (১৭) কখনও কারাগারে, দরিদ্রাবাসে, অথবা পাগলা গারদে বাস করিয়া থাকিলে, কোথায় বাস করিয়াছে; অথবা অপরের দানে জীবিকা নির্ব্বাহ করিলে তাহা লিখিতে হইবে, (১৮) বহু-বিবাহের পক্ষপাতী কিম্বা বহুপত্নীক কি না, (১৯) অরাজকতার পক্ষপাতী কি না, (২০) কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইবার প্রস্তাব আছে কি না, (২১) স্বাস্থ্যের অবস্থা, (২২) অঙ্গহীন বা খঞ্জ কি না; হইলে তাহার কারণ কি। এতগুলি প্রশ্নের উত্তর সকলকেই দিতে হইবে,—ইন্দুবাবুকেও দিতে হইয়াছিল। শুধু ইন্দুবাবু কেন, তাঁহার দ্বিতীয় বারের সহযাত্রী কুচবিহারের শ্রীযুক্ত মহারাজকুমার ভিক্টর নিত্যেন্দ্র নারায়ণ বাহাদুরকেও লিখিয়া দিতে হইয়াছিল যে, তাঁহার তহবিলে দেড়শত টাকা আছে! এই সমস্ত প্রশ্ন হইতে আমেরিকা সম্বন্ধে যাহা বুঝিতে পারা যায়, দশটা সুদীর্ঘ পরিচ্ছেদেও তাহার অধিক জানিবার সম্ভাবনা নাই। ইন্দুবাবু এই রকম কতকগুলি কথা বলিয়াই আমেরিকার সুন্দর পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

আর একটী ছোট দৃষ্টান্ত দিই। আমেরিকার মহিলাদিগের কথা হইতেছে। ইন্দুবাবু কেমন সুন্দর ভাবে একটা সোজা কথাতেই পৃথিবীর মহিলাদিগের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—"In Asia, the wife follows the husband; in Europe they go together; in America she goes ahead." অর্থাৎ—এসিয়ায় স্ত্রী স্বামীর পশ্চাদ্‌বর্ত্তিনী হন; য়ুরোপে সঙ্গে চলেন; আর আমেরিকায় অগ্রবর্ত্তিনী হন।" সেই জন্য রসিক লেখক ম্যাক্স ওরেল (Max O'rell) বলিয়াছেন—"It I had to be born again, and might choose my sex and my birth-place, I would shout to the Almighty at the top of my voice 'Oh, please make me an American Woman." অর্থাৎ—আবার যদি আমাকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, এবং সে সময় পুরুষ বা নারী হইব এবং কোন্ দেশে জন্মগ্রহণ করিব, এ সম্বন্ধে মত দিবার অধিকার পাই, তাহা হইলে ভগবানের নিকট প্রাণপণ চীৎকার করিয়া বলিব 'হে ভগবান, আমাকে আমেরিকার স্ত্রীলোক করিয়া সৃষ্টি করিও প্রভু!"

বই দুইখানির আর অধিক পরিচয় দিতে হইবে না, পাঠকগণ বাঙ্গালা বইখানি একটাকা মূল্যে এবং ইংরাজীখানি সাড়েচারি টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়া সম্পূর্ণ পরিচয় গ্রহণ করিবেন। এখন লেখক ও সম্পাদক মহাশয়দ্বয়ের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিই। লেখক শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দে মজুমদার মহাশয় প্রথমবার আমেরিকায় যান কলিকাতার শিল্প বিজ্ঞান সমিতির বৃত্তি পাইয়া, কৃষি-বিদ্যা শিখিবার জন্য। তিনি আমেরিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃষি বিদ্যালয় 'কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ে' শিক্ষালাভ করেন, এবং বিশেষ কৃতীত্ব প্রদর্শন করিয়া উচ্চ উপাধিলাভ করেন। তিনি দ্বিতীয় বার আমেরিকা ও অন্যান্য উপনিবেশে গমন করেন কুচবিহারের মহারাজ-কুমার শ্রীযুক্ত ভিক্টর নিত্যেন্দ্রনারায়ণ বাহাদুরের সহযাত্রী হইয়া। এই মহারাজকুমারই ইন্দু বাবুর সুন্দর পুস্তকের সম্পাদক। শ্রীযুক্ত মহারাজ কুমার বাহাদুর শুধু দেশ-ভ্রমণ করিতেই যান নাই,—ভ্রমণ তিনি অনেক করিয়াছেন। তিনি তামাকের সম্বন্ধে শিক্ষালাভ ও অনুসন্ধানের জন্য যান। কুচবিহার তামাকের জন্য প্রসিদ্ধ; কিন্তু কুচবিহারের তামাক আমেরিকার তামাক অপেক্ষা ভাল নহে এবং ফলনও কম। সেই জন্য স্বর্গীয় মহারাজ বাহাদুর তাঁহার এই পুত্রকে তামাকের চাষ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিবার জন্য আমেরিকায় প্রেরণ করেন;—সঙ্গী হন কৃষি-বিদ্যাবিশারদ ইন্দুবাবু। তাঁহারা দুইজনেই তামাকের সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান নিশ্চয়ই করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার বিবরণ বইতে নাই এবং কুচবিহার রাজ্যে তামাকের চাষের কতদূর উন্নতি হইয়াছে, সে সংবাদও আমরা জানি না। তামাকের অদৃষ্টে যাহা হইবার হউক, আমরা কিন্তু এই তাম্রকূট অনুসন্ধানের ফলে ইন্দু বাবুর ও মহারাজ-কুমারের লিখিত ভ্রমণ-কাহিনী পাঠ করিয়াই পরিতৃপ্ত হইয়াছি।

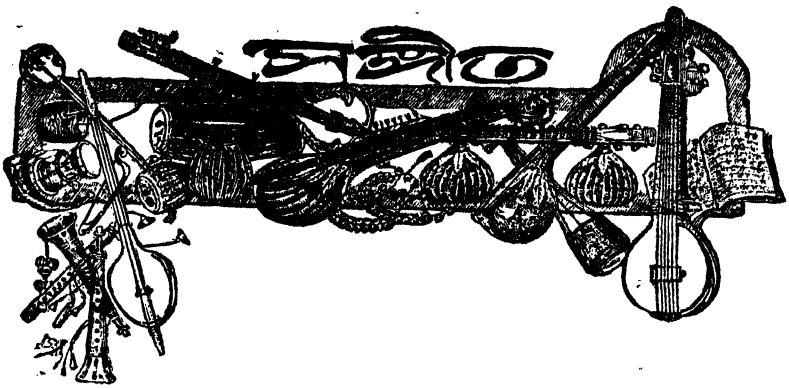

স্বরলিপি

কথা ও সুর—শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী]

[স্বরলিপি—শ্রীব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী

মিশ্র কুকভ—দাদ্‌রা।

আমি কি চাহি ?
সে আমার আমি তার, আমার কি নাহি !
আনন্দ সাগর তার খেলে পদতলে,
কোটি চন্দ্র তারা শিরোপরি জ্বলে,
বিশ্ব ভুবনের রূপ রত্নমণি,
তাহাতে বিরাজে সে মোর তরণী !
আমি তাহারে বাহি, আর কি চাহি !
সে আমার আমি তার, আমার কি নাহি !
দূরে থেকে দেখে ভাবে লোকে সবে,
দীন হীন নেয়ে আমি এই ভবে,
তরী বাহি আর হাসি মনে মনে,
তাহারা এ সুখ বুঝিবে কেমনে,
জগতে সবাই দুঃখের প্রবাসী,
আমি শুধু সুখে দিবানিশি ভাসি,
কালাকাল হেথা নাহি, আমি কি চাহি !
সে আমার আমি তার, আমার কি নাহি !
আমার মতন ধনী কেহ নাই,
অনন্ত উল্লাস বাঁধা মোর ঠাঁই,
রূপের তরণী প্রেমেতে চালাই আনন্দ সঙ্গীত গাহি !
আর কি চাহি ?
সে আমার আমি তার, আমার কি নাহি।

১´ . ১´ . ১´ .
II গা গমপমা - গরগা | - মা মা মা I পা - ১ - ১ | - ১ না না I র্সা - ১ - ১ | - নধপা ধা র্সা I
আ মি••• ••• • কি চা হি • • • সে আ মার্ • • ••• আ মি

১´ . ১´ . ১´ .
নধা - পধা - ণা | - ১ - ১ ধা I মপা - ধপা - মগরগা | মা - পা মা I পা - ১ - ১ | - - ১ - ১ II
তার্ • • • • • আ মার্ • •••• কি • না হি • • • • •

১´ . . ১´ . ১´ .
II পা পা - ১ | নধা - না র্সা I র্সা র্সা - ১ | র্সা - ১ - ১ I - ১ - ১ - র্রা | র্সা নর্সা নর্সা I
আ ন • ন্দ • সা গ র • তার্ • • • • খে লে প দ

১´ . ১´ . ১´ .
নর্সা নর্সা - ১ | - ১ - ১ - ১ I র্সা র্রা র্রগা | র্গা র্গা র্মগা I র্রা - র্সা র্সা | র্রা র্সা র্সা I
ত লে • • • • কো টি চ • ন্দ্র তা রা • • শি রো প রি

১´ . ১´ . ১´ .
না না - র্সনা | - ধণা - ধণা - পা I মা মা গমা | গমা গমা গমপা I পা পা ধা | ধা ধা ধনা I
জ লে • • • • • • বি শ্ব ভু ব নে র•• রূ প র ত্ন ম ণি•

১´ . ১´ . ১´ .
র্সা র্রা র্সা | নর্সা নর্সা নর্সা I না না - র্সা | ধা ধা ধণা I - ধপা - ১ - ১ | - ১ মা মগরা I
তা হা তে বি রা জে সে মোর্ • ত র ণী • • • • • • আ মি••

১ . ১´ . ১´ .
সা সা - ১ | রগা - মা গা I রা - ১ - ১ | - ১ - ১ - ১ | মা - ১ - গরসা | রগা - মপা মা I
তা হা • রে • • বা হি • • • • • আর্ • ••• কি• • • চা

১´ . ১´ . ১´ .
পা - ১ - ১ | - ১ না না | র্সা - ১ - ১ | - ১ ধা র্সা | নধা - পধা - ণা | - ১ - ১ ধা I
হি • • • সে আ মার্ • • • আ মি তার্ • • • • • আ

১´ . ১´ .
মপা - ধপা - মগরগা | মা - পা মা I পা - ১ - ১ | - ১ - ১ - ১ II
মার্ • • •••• কি • না হি • • • • •

১´ . ১´ . ১´ .
II সা রা রা | রা রা রা I রা পা মা | মগা রা - ১ I গা গা - রসা | - ১ - ১ - ১ I
দূ রে থে কে দে খে ভা বে লো কে• • • স বে • • • •• •

১´ . ১´ . ১´ .
- ১ - ১ রা | গা মা পা I ধা ধণা - র্সণা | ধপা - ১ - ১ I - ১ পা ধা | পা - ধা র্মা I
• • দী ন হী ন নে য়ে • • • • • • • আ মি এই • ভ

১´ . ১´ . ১´ .
পা - ১ - ১ | - ১ - ১ - ১ I রা পা মা | পা পা - ১ I ধা র্সা ধা | ধণা ধা ণধপা I
বে • • • • • ত রী বা হি আর্ • হা সি ম নে ম নে •

১´ • ১´ • ১´ •
মা মা মা | মা গা পমা | গা গা গা | মগা রা জ্ঞরসা I রা রা মা | মা মা - পা I
তা হা রা এ সু খ বু ঝি বে কে ম নে॰ জ গ তে স বাই •

১´ • ১´ • ১´ •
পা পা ধা | ধা ধা ধনা I র্সা র্রা র্সা | র্সা র্সা র্সা I না না না | র্সা ধা ধণধপ I
দুঃ খে র প্র বা সী॰ আ মি শু ধু সু খে দি বা নি শি ভা সি॰॰॰

১ • ১´ • ১´ •
মা মা মা | -গরসা রা রগমা I গা রা - া | - া - া - া I মা মগা - রসা | রগা - মপা মা I
কা লা কাল ॰॰॰ হে থা॰॰ না হি • • • • আ মি॰ ॰॰ কি॰ ॰॰ চা

১´ • ১´
পা - া - া | - া না না I র্সা - া - া | - া ধা র্সা | নধা পধা ণা | - া - া ধা I
হি • • • সে আ মার্ • • • আ মি তার্ • • • • • আ

১ • ১´ •
মপা - ধপা - মগরগা | মা - পা মা I পা - া - া | - া - া - া II
মার্ ॰॰ ॰॰॰॰ কি ॰ না হি • • • • •

১´ • ১´ • ১´ •
II পা পা নধনা | র্সা র্সা র্সা I র্রা র্সা র্সা | সা র্সা - া I র্সা র্রা র্গা | গা র্মর্গর্রা র্সা I
আ মা র॰॰ • ম ত ন ধ নী কে হ নাই ॰ অ ন ন্ত উ ল্লাস্ •

১´ • ১´ • ১´ •
র্সা র্সা না | -র্সা ধণা -পা I মা মা মা | মা মা গমপা | পা পা ধা | ধা ধা না I
বাঁ ধা মোর • ঠাঁই • রূ পে র ত র ণী॰॰ প্রে মে তে চা লা ই

১´ • ১´ • ১´ •
র্সা র্রা র্সা | র্সা না নর্সা I ধা - ধণা - ধণা | পা - া - া I মা - া - গরসা | রগা - মা গা I
আ ন ন্দ স ঙ্গী ত॰ গা • • • • হি • • আর্ ॰ ॰॰ কি • • চা

১´ • ১´ • ১´ •
রা - া - া | - া না না I র্সা - া - া | নধপা ধা র্সা I নধা - পধা - ণা | - া - া ধা I
হি ॰ ॰ • সে আ মার্ • ॰ ॰॰॰ আ মি তার্ ॰॰ • • • আ

১´ • ১´ •
মপা - ধপা - মগরগা | মা পা মা | পা - া - া | - া - া - া II
মার্ ॰॰ ॰॰॰॰ কি ॰ না হি • ॰ • • •

গৃহদাহ

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সেই ঘরের সম্মুখে তোরঙ্গর উপরে বসিয়া আশা ও আশ্বাসের স্বপ্ন দেখিয়া অচলার কোথায় দিয়া যে ঘণ্টা দুই অতিবাহিত হইয়া গেল, তাহা সে জানিতেও পারিল না। কিছুক্ষণ সূর্য্য উঠিয়াছে। শীতের দিনের ধূলি ধূসরিত তরুশ্রেণী কল্যকার ঝড়-জলে স্নাত ও নির্ম্মল হইয়া প্রভাত-সূর্য্যকিরণে ঝল্‌মল্‌ করিতেছে। সিক্ত স্নিগ্ধ রাজপথের উপর দিয়া বিগত-ক্লেশ পান্থ প্রফুল্ল মুখে পথ চলিতে সুরু করিয়াছে; কদাচিৎ দুই একটা এক্কাগাড়ী ছোট ছোট ঘণ্টার শব্দে চারিদিক মুখরিত করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে; মাঝে মাঝে রাখাল-বালকেরা গো-মহিষের দল লইয়া অদ্ভুত ও অসম্ভব আত্মীয় সম্বন্ধের অস্তিত্ব উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া কোথায় কোন্ গ্রাম-প্রান্তে যাত্রা করিয়াছে; অদূরবর্ত্তী কোন এক কুটীর হইতে গম-ভাঙা যাঁতার শব্দের সঙ্গে মিশিয়া হিন্দুস্থানী গৃহস্থ-বধূর অশ্রান্ত অপরিচিত সুর ভাসিয়া আসিতেছে। সবশুদ্ধ লইয়া এই যে একটি নূতন দিনের কর্ম্ম-স্রোত তাহার চেতনায় ধীরে ধীরে গতি-শীল হইয়া উঠিতেছিল, ইহারই বিচিত্র প্রবাহে তাহার দুঃখ, তাহার দুর্ভাগ্য, তাহার দুশ্চিন্তা কিছুক্ষণের নিমিত্ত কোথায় যেন ভাসিয়া গিয়াছিল। ঠিক কিসের জন্য, কেন সে এখানে এ ভাবে বসিয়া, তাহার স্মরণ ছিল না। অকস্মাৎ মনে পড়িল জন দুই পল্লীবালকের বিস্মিত দৃষ্টিপাতে! তাহারা আঙ্গিনার একপ্রান্ত হইতে শুধু বিস্ফারিত চক্ষে নিঃশব্দে চাহিয়া ছিল। এই জীর্ণ মলিন পান্থশালার প্রাচীন দিনের গৌরবের ইতিহাস ছেলে দুটার জানা ছিল না; কিন্তু তাহাদের জ্ঞান হওয়া অবধি এরূপ বিশিষ্ট অতিথির সমাগম যে এ গৃহে কখনো ঘটে নাই, তাহাদের নীরব চোখের চাহনি সে কথা স্পষ্ট করিয়া অচলাকে জানাইয়া দিল। ঘুম ভাঙিয়া নিত্যনিয়মিত খেলা করিতে আসিয়া আজ সহসা এই আশ্চর্য্য ব্যাপার তাহাদের চোখে পড়িয়া গেছে।

অচলা চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বোধ হয় কিছু প্রশ্ন করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু ছেলে দুটা নিমিষে অন্তর্ধান হইয়া গেল। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই তাহার মনে পড়িল, প্রায় ঘণ্টা দুই পূর্ব্বে সেই যে সুরেশ কাপড় ছাড়িবার নাম করিয়া পাশের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিয়াছে আর দেখা দেয় নাই। এতক্ষণ ধরিয়া সে একাকী কি করিতেছে, জানিবার জন্য সে তখন ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া সেই কক্ষের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল। এবং অবরুদ্ধ কবাটের ভিতর হইতে কোন প্রকার সাড়া-শব্দ না পাইয়া সে মিনিট দুই চুপ করিয়া থাকিয়া তখন আস্তে আস্তে দ্বার ঠেলিয়া সামনেই যাহা দেখিতে পাইল, তাহাতে একই কালে মুক্তির তীব্র আবেগে ও বিকট ভয়ে ক্ষণকালের নিমিত্ত তাহার সমস্ত দেহ-মন যেন পাষাণ হইয়া গেল। ঘরটা অন্ধকার, শুধু ওদিকের একটা ভাঙা জানালা দিয়া খানিকটা আলো ঢুকিয়া মেঝের উপর পড়িয়াছে। সেইখানে সেই আলোআঁধারের মধ্যে একান্ত অপরিচ্ছিন্ন ধূলা-বালির উপরে সুরেশ চিৎ হইয়া শুইয়া আছে। তাহার গায়ে তখনও সেই সব জামা-কাপড়, শুধু কেবল খোলা ব্যাগটার ভিতর হইতে কতকগুলা জিনিস-পত্র ইতস্ততঃ ছড়ানো।

চক্ষের পলকে তাহার শেষ কথাগুলা অচলার মনে পড়িল। মনে পড়িল, যে ডাক্তার, সে শুধু মানুষের জীবনটা ধরিয়া রাখিবার বিদ্যাই শিখিয়াছিল তাহা নয়, তাহাকে নিঃশব্দে বাহির করিয়া দিবার কৌশলও তাহার অবিদিত ছিল না। মনে পড়িল, নিদারুণ ভুলের জন্য তাহার সেই উৎকট আত্মগ্লানি; মনে পড়িল, তাহার সেই বিদায় চাওয়া, সেই আশ্বাস দেওয়া,—সর্ব্বোপরি তাহার সেই বারম্বার প্রায়শ্চিত্ত করার নিষ্ঠুর ইঙ্গিত;—সমস্তই এক সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে যেন ওই অবলুণ্ঠিত দেহটার কেবল একটি মাত্র পরিণামের কথাই তাহার কাণে-কাণে কহিয়া দিল। সেই খানে

সেই দ্বার ধরিয়া সে ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল,—তাহার এমন সাহস হইল না যে আর ঘরে প্রবেশ করে।

কিন্তু এইবার ওই অচেতন দেহটার প্রতি চাহিয়া তাহার দুই চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইয়া পড়িল। যে তাহারই জন্য এতবড় দুর্নামের বোঝা মাথায় লইয়া হতাশ্বাসে এমন করিয়া এই পৃথিবী হইতে চিরদিনের তরে বিদায় লইয়া গেল, অপরাধ তাহার যত গুরুতরই হোক, তাহাকে মার্জ্জনা করিতে পারে না এতবড় কঠিন হৃদয় সংসারে অল্পই আছে।

এবং আজই প্রথম তাহার কাছে তাহার নিজের অপরাধও সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দিল। সুরেশের সহিত সেই প্রথম দিনের পরিচয় হইতে সেদিন পর্য্যন্ত যত কিছু কামনা বাসনা, যত ভুল-ভ্রান্তি, যত মোহ, যত ছলনা, যত আগ্রহ-আবেগ উভয়ের মধ্যে দিয়া বহিয়া গেছে, সমস্ত একে একে ফিরিয়া ফিরিয়া দেখা দিতে লাগিল। তাহার নিজের আচরণ, তাহার পিতার আচরণ—অকস্মাৎ সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া মনে হইল শুধু কেবল নিজেও নয়, অনেকের অনেক পাতকের গুরু-ভার বহন করিয়াই আজ সুরেশ যে বিচারকের পদপ্রান্তে গিয়া উপনীত হইয়াছে, সেখানে সে নিঃশব্দ মুখ বুজিয়া সমস্ত শাস্তি স্বীকার করিয়া লইবে, কিম্বা একটি একটি করিয়া সকল দুঃখ সকল অভিযোগ ব্যক্ত করিয়া তাঁহার ক্ষমা ভিক্ষা চাহিবে!

ওই লোকটির সংসার উপভোগ করিবার অনেক সাজ-সরঞ্জাম, অনেক উপকরণই সঞ্চিত ছিল, তথাপি এই যে নীরবে, লেশমাত্র আড়ম্বর না করিয়া সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, ইহার গভীর বেদনা অচলাকে আজ ফিরিয়া ফিরিয়া বিদ্ধ করিতে লাগিল সে যে যথার্থই প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছিল, সে কথা আজ ওই মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিবার, অবিশ্বাস করিবার আর এতটুকু অবকাশ রহিল না!

আবার তাহার দুই গণ্ড বাহিয়া দরদর ধারে অশ্রু বহিতে লাগিল। গত রাত্রে গাড়ীর মধ্যে তাহাদের বিস্তর কঠিন-কটু কথা, বিস্তর ধর্ম্মাধর্ম্ম ন্যায়-অন্যায়ের বিতর্ক হইয়া গেছে। কিন্তু সে সকল যে কত বড় অর্থহীন প্রলাপ, অচলা তখন তাহার কি জানিত! ভালবাসার যে জাতি নাই, ধর্ম্ম নাই, বিচার-বিবেক ভাল মন্দ বোধ কিছুই নাই, যে এমন করিয়া মরিতে পারে সে যে এই সব সমাজের হাতে-গড়া আইন-কানুনের অনেক উপরে, এ সকল বিধি-নিষেধ যে তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, এই মরণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আজ এ কথা সে অস্বীকার করিবে কেমন করিয়া?

অচলা আঁচল দিয়া চোখ মুছিতেছিল, সহসা তাহার বুকের ভিতরটা ছাঁৎ করিয়া মনে হইল, মৃতদেহটা যেন একটু-খানি নাড়িয়া উঠিল, এবং পরক্ষণেই একটা অস্ফুট আর্ত্তস্বরের সঙ্গে সুরেশ পাশ ফিরিয়া শুইল। সে মরে নাই,—জীবিত আছে;—একটা প্রচণ্ড আগ্রহ-বেগে অচলা ছুটিয়া গিয়া তাহার কাছে পড়িল এবং ভগ্ন-কণ্ঠে ডাকিয়া কহিল, সুরেশ বাবু?

আহ্বান শুনিয়া সুরেশ দুই আরক্ত চক্ষু মেলিয়া চাহিল, কিন্তু কথা কহিল না।

অচলাও আর কোন কথা বলিতে পারিল না, শুধু অদম্য বাষ্পোচ্ছ্বাস তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া অশ্রু-আকারে দুই চক্ষু দিয়া নিরন্তর ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের অশ্রুর সহিত এ অশ্রুর কতই না প্রভেদ!

অথচ তাহার সকল চিন্তার মধ্যে যে চিন্তাটা ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত সঙ্গোপনে পীড়া দিতেছিল, তাহা ইহার বাস্তব দিকটা। এই অজানা অপরিচিত স্থানে সুরেশের মৃতদেহ লইয়া সে কি উপায় করিবে, কাহাকে ডাকিবে, কাহাকে বলিবে—হয় ত অনেক অপ্রীতিকর আলোচনা, অনেক কুৎসিত প্রশ্ন উঠিবে,—সে তাহার কাহাকে কি জবাব দিবে, হয় ত পুলিশে টানাটানি করিয়া সকল কথা বাহির করিয়া আনিবে,—সেই সকল অনাবৃত প্রকাশ্যতার লজ্জায় তাহার সমস্ত দেহ-মন যে অন্তরে অন্তরে কিরূপ পীড়িত, কিরূপ ক্লিষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার সমস্তটা বোধ করি সে নিজেও সম্পূর্ণ উপলব্ধি করে নাই। এখন সেই বিপদের অপরিমেয় লাঞ্ছনা হইতে অকস্মাৎ অব্যাহতি পাইয়া তাহার কান্না যেন আর থামিতে চাহিল না, এবং সে যে মরে নাই, শুধু ইহাতেই তাহার প্রতি অচলার সমস্ত হৃদয় কানায় কানায় কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ এই ভাবে কাটিলে সুরেশ ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, কাঁদ্‌ছ কেন অচলা?

অচলা ভগ্ন-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, কেন তুমি এমন করে শুয়ে রইলে? কেন গেলে না? কেন আমাকে এত ভয় দেখালে?

তাহার কণ্ঠস্বরে যে স্নেহ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, তাহা এমনই করুণ এমনই মধুর যে শুধু সুরেশের নয়, অচলার নিজের মধ্যেও কেমন এক প্রকার মোহের সঞ্চার করিল; সে পুনরায় কহিল, তোমার যদি এতই ঘুম পেয়েছিল, আমাকে বললে না কেন? আমি ত ওদিকের বড় ঘরটা পরিষ্কার করে যাহোক কিছু পেতে তোমার একটা বিছানা তৈরি করে দিতে পারতুম। ট্রেনের সময় হতে ত ঢের দেরি ছিল।

সুরেশ কোন জবাব দিল না, শুধু বিগলিত স্নেহে স্থির হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে হাত বাড়াইয়া অচলার ডান হাতখানি তুলিয়া লইয়া নিজের উত্তপ্ত ললাটের উপর রাখিয়া কেবল একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল।

অচলা চকিত হইয়া কহিল, এ যে ভয়ানক গরম। তোমার কি জ্বর হয়েছে না কি?

সুরেশ কহিল, হুঁ। তা' ছাড়া এ জ্বর সহজে সারবে বলেও আমার মনে হয় না। বোধ হয় টাই—

অচলা হাতখানি আস্তে আস্তে টানিয়া লইল, এবং প্রত্যুত্তরে তাহার মুখ দিয়াও এবার কেবল একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাসই পড়িল। তাহার উদ্বেলিত সমস্ত স্নেহ-মমতা এক মুহূর্ত্তে জমিয়া যেন পাথর হইয়া গেল। সহ্য করিবার ধৈর্য্য ধরিবার তাহার যা কিছু শক্তি ছিল, সমস্ত একত্র করিয়া সে স্থির হইয়া আজিকার বেলাটুকু গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিবে, ইহাই সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল; কিন্তু এই অচিন্তনীয় ও অভাবিত-পূর্ব্ব বিপদের মেঘে তাহার আশার ক্ষীণ রশ্মি-রেখাটুকু যখন নিমিষে অন্তর্হিত হইয়া গেল, তখন মৃত্যু ভিন্ন জগতে আর প্রার্থনার বস্তু:তাহার দ্বিতীয় রহিল না।

ইহাকে এই ভাবে এখানে একাকী ফেলিয়া যাওয়ার কথা সে কল্পনা করিতেও পারিল না; কিন্তু এই বাহার পীড়ার সর্ব্ব প্রকার দায়িত্ব, সমস্ত গুরুভার তাহার মাথায় পড়িল, তাহাকে লইয়া এই অপরিচিত স্থানে সে কি করিবে, কোথায় কাহার কাছে কি সাহায্য ভিক্ষা চাহিবে, কি পরিচয়ে মানুষের সহানুভূতি আকর্ষণ করিবে, অহর্নিশি কি অভিনয় করিবে,—এই সকল চিন্তা বিদ্যুদ্বেগে তাহার মাথায় প্রবাহিত হওয়ায় সে ছুটিয়া পলাইবে, না ডাক ছাড়িয়া কাঁদিবে, না সজোরে মাথা কুটিয়া এই অভিশপ্ত জীবনের পালাটা হাতে-হাতে চুকাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইবে, ইহার কোনটারই যেন কূল-কিনারা পাইল না।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সেদিন ষ্টেসন হইতে ফিরিবার পথে কিছু কিছু জলে ভিজিয়া কেদারবাবু ৭।৮ দিন গাঁঠের বাত ও শর্দ্দিজ্বরে শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কন্যা-জামাতার কুশল সম্বাদের অভাবে সাতিশয় চিন্তিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি জব্বলপুরের বন্ধুকে একখানা পোষ্টকার্ড লেখা ভিন্ন বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। আজ তাহার জবাব আসিয়াছে। কেহই আসে নাই, এবং তিনি কাহারও কোন খবর জানেন না এইটুকুমাত্র খবর দিয়াছেন। ছত্র কয়টি কেদারবাবু বার-বার পাঠ করিয়া বিবর্ণ মুখে শূন্য-দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া শুধু চস্‌মার কাঁচদুটা ঘন-ঘন মুছিতে লাগিলেন। তাহাদের কি হইল, কোথায় গেল, সম্বাদের জন্য তিনি কাহাকে ডাকিবেন, কোথায় চিঠি লিখিবেন, কাহার কাছে জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহার কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না। তাঁহার সকল আপদে-বিপদে যে ব্যক্তি কায়-মন দিয়া সাহায্য করিত, সেই সুরেশও নাই, সেও সঙ্গে গিয়াছে!

ঠিক এম্‌নি সময়ে বেহারা আসিয়া আর একখানি পত্র তাঁহার সুমুখে রাখিয়া দিল। কেদারবাবু কোনমতে নাকের উপর চশমা-খানা তুলিয়া দিয়া ব্যগ্র হস্তে চিঠিখানি তুলিয়া লইয়া দেখিলেন, চিঠি তাঁহার কন্যা অচলার নামে। মেয়েলি হাতের চমৎকার স্পষ্ট লেখা। এ পত্র কে লিখিল, কোথা হইতে আসিল, জানিবার আগ্রহে পরের চিঠি খোলা-না-খোলার প্রশ্নও তাঁহার মনে আসিল না, তাড়াতাড়ি খামখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া প্রথমেই লেখিকার নাম পড়িয়া দেখিলেন লেখা আছে, 'তোমার মৃণাল।' তাহার পরে এখানিও তিনি আদ্যোপান্ত বার-বার পাঠ করিয়া বাহিরের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া চস্‌মা

মোছার কাজে লাগিলেন। তাঁহার মনের মধ্যে যে কি করিতে লাগিল তাহা জগদীশ্বর জানিলেন। বহুক্ষণে চস্‌মা পরিষ্কারের কাজটা স্থগিত রাখিয়া পুনরায় তাহা যথাস্থানে স্থাপিত করিয়া আর একবার চিঠিখানি আগাগোড়া পড়িতে প্রবৃত্ত হইলেন। মৃণাল স্ত্রীর সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, ধৈর্য্য প্রভৃতি সম্বন্ধে তীব্র-মধুর বহুপ্রকার উপদেশ দিয়া শেষের দিকে লিখিয়াছে—

সেজ্‌দা তোমার সম্বন্ধে কিছুই বলেন না সত্য, এবং জিজ্ঞাসা করিলেও ভয়ানক গম্ভীর হইয়া উঠেন বটে, কিন্তু আমি ত মেয়েমানুষ, আমি ত সব বুঝিতে পারি! আচ্ছা সেজ্‌দি, ঝগড়া-বিবাদ কাহার না হয় ভাই? কিন্তু তাই বলিয়া এত অভিমান! তোমার স্বামী তাঁহার শরীর-মনের বর্ত্তমান অবস্থায় না বুঝিয়া রাগ করিতেও পারেন, অধীর হইয়া অন্যায় করিয়া চলিয়া আসিতেও পারেন, কিন্তু তুমি ত এখনো পাগল হও নাই যে, তিনি যাই বলিতেই তুমি সচ্ছন্দে সায় দিয়া বলিলে আচ্ছা তাই হোক্, যাও তোমার সেই বনবাসে। তাই আমি কেবলই ভাবি, সেজদি, কি করিয়া প্রাণ ধরিয়া তোমার এই মৃত-কল্প স্বামীটিকে এত সহজে এই বনের মধ্যে বিসর্জ্জন দিলে, এবং দিয়া স্থির হইয়া এই সাত-আট দিন বলি কেন, সাত-আট বৎসর নিশ্চিন্ত মনে বাপের বাড়ী বসিয়া রহিলে! সত্য বলিতেছি, সেদিন যখন তিনি জিনিস-পত্র লইয়া বাড়ী ঢুকিলেন, আমি হঠাৎ চিনিতে পারি নাই! তোমাদের কেন ঝগড়া হইল, কবে হইল, কিসের জন্য পশ্চিমে যাওয়ার বদলে তিনি দেশে চলিয়া আসিলেন, এ সকল আমি কিছুই জানি না এবং জানিতেও চাই না। কিন্তু আমার মাথার দিব্য রহিল, তুমি পত্র পাঠমাত্র চলিয়া আসিবে। জানই ত ভাই, আমার খাশুড়ীকে ছাড়িয়া কোথাও যাইবার যো নাই। তবুও হয় ত আমি নিজেই গিয়া তোমার পা ধরিয়া টানিয়া আনিতাম, যদি না সেজদা এতটা অসুস্থ হইয়া পড়িতেন। একবার এস, একবার নিজের চোখে তাঁকে দেখ, তখন বুঝিবে এই অসঙ্গত মান করিয়া কতদূর অন্যায় করিয়াছ! এ বাড়ীও তোমার, আমিও তোমার, সেই জন্য এ বাড়ীতে আসিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিবে না। তোমার পথ চাহিয়া রহিলাম। শ্রীচরণে শত কোটী প্রণাম। আর একটা কথা। আমার এই পত্র লেখার কথা সেজ্‌দা যেন শুনিতে না পান, আমি লুকাইয়া লিখিলাম। ইতি, তোমার মৃণাল।

পত্র শেষ করিয়া মৃণাল একটা পুনশ্চ দিয়া কৈফিয়ৎ দিয়াছে যে, যে হেতু স্বামীর অনুপস্থিতে তুমি একটা বেলাও সুরেশবাবুর বাটীর থাকিবে না জানি, তাই তোমার বাপের বাটীর ঠিকানাতেই লিখিলাম।" ভরসা করি এ পত্র তোমার হাতে পড়িতে বিলম্ব হইবে না।

কেদারবাবুর হাত হইতে চিঠিখানা স্খলিত হইয়া পড়িয়া গেল, তিনি আর একবার শূন্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তাঁহার চসমা মোছার কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। এটুকু বুঝা গেছে মহিম জব্বলপুরের পরিবর্ত্তে এখন তাহার গ্রামে রহিয়াছে, এবং অচলা তথায় নাই। সে কোথায়, তাহার কি হইল, এ সকল কথা হয় মহিম জানে না, না হয় জানিয়াও প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করে না!

হঠাৎ মনে হইল সুরেশই বা কোথায়? সে যে তাহাদের অতিথি হইবে বলিয়া সঙ্গ লইয়াছিল! সে নিশ্চয়ই বাটীতে ফিরে নাই, তাহা হইলে একবার দেখা করিতই। তাহার পরে পিতার বুকের মধ্যে যে আশঙ্কা অকস্মাৎ শূলের মত আসিয়া পড়িল; সে আঘাতে আর তিনি সোজা থাকিতে পারিলেন না, সেই আরাম-কেদারাটায় হেলান দিয়া পড়িয়া দুইচক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

দুপুরবেলা দাসী সুরেশের বাটী হইতে সম্বাদ লইয়া ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, তাঁহার পিসিমা কিছুই জানেন না। কোন চিঠি-পত্র না পাইয়া তিনিও অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া আছেন।

রাত্রে নিভৃত শয়ন কক্ষে কেদারবাবু প্রদীপের আলোকে আর একবার মৃণালের পত্রখানি লইয়া বসিলেন। ইহার প্রতি অক্ষর তন্ন-তন্ন করিয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন, যদি দাঁড়াইবার মত কোথাও এতটুকু যায়গা পাওয়া যায়। না হইলে যে তিনি কোথায় গিয়া কি করিয়া মুখ লুকাইবেন ইহা জানিতেন না। চিরদিন পুরুষানুক্রমে কলিকাতাবাসী; কলিকাতার বাহিরে কোথাও যে কোন ভদ্রলোক বাঁচিতে পারে এ কথা তিনি ভাবিতেও পারিতেন না। সেই আজন্ম-পরিচিত স্থান, সমাজ, চিরদিনের বন্ধুবান্ধব সমস্ত হইতে বিচ্যুত হইয়া কোথাও অজ্ঞাতবাসে যদি শেষ জীবনটা অতিবাহিত করিতেই হয়, তবে সেই দুঃসহ

দুর্ভর দিন কয়টা যে কি করিয়া কাটিবে, সে তাঁহার চিন্তার অতীত। এবং কন্যা হইয়া যে দুর্ভাগিনী এই শাস্তির বোঝা তাহার রুগ্ন, বৃদ্ধ পিতার অশক্ত শিরে তুলিয়া দিল, তাহাকে যে তিনি কি বলিয়া অভিশাপ দিবেন, তাহাও তাঁহার চিন্তার অতীত।

সারা রাত্রির মধ্যে একবার তিনি চোখে-পাতায় করিতে পারিলেন না; এবং ভোর নাগাদ তাঁহার অম্বলের ব্যথাটা আবার দেখা দিল; কিন্তু আজ যখন নিজের বলিয়া মুখ চাহিতে দুনিয়ায় আর কাহাকেও খুঁজিয়া পাইলেন না, তখন নির্জ্জীবের মত শয্যাশ্রয় করিয়া পড়িয়া থাকিতেও তাঁহার ঘৃণা বোধ হইল। এতবড় বেদনাকেও আজ তিনি শান্তমুখে বুকে লুকাইয়া অন্যদিনের মত বাহিরে আসিলেন, এবং রেলওয়ে ষ্টেসনের জন্য গাড়ী ডাকিতে পাঠাইয়া তাড়াতাড়ি জামা-কাপড় গুছাইয়া লইতে বেহারাকে আদেশ করিলেন।

আলোচনা

[শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ]

সে দিন সরকারী কমার্শিয়াল ইন্‌ষ্টিটিউটের বার্ষিক অধিবেশনে, পুরস্কার-বিতরণ-সভায় সার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সি আই-ই মহাশয় যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহা 'ভারতবর্ষে'র পাঠক-পাঠিকাগণের জানিয়া রাখা উচিত বলিয়া মনে করি; সেই জন্য এবার প্রথমেই সংক্ষেপে তাঁহার বক্তৃতার আলোচনার প্রবৃত্ত হইলাম।

স্কুলটির অবস্থা বেশ ভাল। ছেলেরা এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। স্কুলটি যে খুব জনপ্রিয় হইয়াছে, তাহার একটা পরিচয় এই যে গত সেসনের আরম্ভের সময় ২০০ ছাত্র এই স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, স্কুলের রিপোর্টেই প্রকাশ, বিশেষ বিশেষ বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত গুণসম্পন্ন শিক্ষক ও অধ্যাপক পাওয়া যাইতেছে না। সেইজন্য বোধ হয় আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইতেছে না। সম্প্রতি স্কুল-বোর্ডের পরামর্শে গবর্ণমেণ্ট ভারত-সচিব মহোদয়কে এই বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপ্যালের কার্য্যসাধনের জন্য ইণ্ডিয়ান এডুকেশনাল সার্ব্বিসে একটী পদ গঠন করিতে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। এইটী হইলে স্কুলের অবস্থা আরও ভাল হইতে পারে।

পুরস্কার বিতরণ করিবার পর মুখোপাধ্যায় মহাশয় ছাত্রগণকে সম্বোধন করিয়া যে সুন্দর সারগর্ভ বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি বলেন যে, বাজারে এই স্কুলে শিক্ষা-প্রাপ্ত ছেলেদের বেশ আদর আছে; কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, ছেলেরা দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যভার গ্রহণের যোগ্যতা তেমন দেখাইতে পারিতেছে না।' সার রাজেন্দ্রনাথের বিশ্বাস, লোকে মনে করে যে, সাহেবেরা তাঁহাদের আপিসে কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে সহজে ভারতবাসীকে নিযুক্ত করিতে চাহেন না। অধিকাংশ ভারতবাসী এই মত পোষণ করেন যে, বাণিজ্য-ব্যবসায়ে লিপ্ত য়ুরোপীয়েরা রাজনীতিক ব্যাপারে গোঁড়ামির পরিচয় দিয়া থাকেন; সামাজিক ভাবে তাঁহারা এদেশবাসীর সঙ্গে সহজে মিশিতে চান না; সার রাজেন্দ্রনাথও এ কথা স্বীকার করেন। কিন্তু ব্যবসায়-বাণিজ্য ক্ষেত্রে সাহেবেরা ততটা গোঁড়া নন, ইহাই মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দৃঢ় ধারণা। কেন না, তীক্ষ্ণ ব্যবসায়-বুদ্ধির প্রভাবে তাঁহারা এটুকু বেশ বুঝেন যে, উপযুক্ত ভারতবাসী পাওয়া গেলে, যাতায়াতের জাহাজ ভাড়া দিয়া উচ্চ বেতনে য়ুরোপ হইতে কর্ম্মচারী আনা অর্থের অপব্যয় ছাড়া আর কিছুই নয়। য়ুরোপ হইতে যে সকল কর্ম্মচারী এ দেশের বেসরকারী সাহেবদের বাণিজ্যের আপিসে আমদানী করা হয়, তাঁহারা ১৮ বছর বয়সে স্কুলের লেখাপড়া শেষ করিয়া ইংলণ্ডেরই কোন বড় সওদাগরী আপিসে তিন-

চার বৎসর শিক্ষানবীশী করেন। তার পর তাঁহারা ২১-২২ বৎসর বয়সে এদেশে আসিয়া দায়িত্বপূর্ণ পদের ভার লইবার যোগ্য হইয়া উঠেন।

ব্যবসায়-বাণিজ্য ক্ষেত্রে ভারতবাসীরা কেন যে তেমন যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারে না, অথচ, য়ুরোপীয়েরা যেন জন্মগত সংস্কার বশে বাণিজ্য কার্য্যে প্রবীণ হয়ে উঠে,—এই ধরণের সমস্যার কথা আমরা অন্যত্র সামান্য ভাবে আলোচনা করিয়াছি। গত পূজার পূর্ব্বে একখানি কথা-সাহিত্য বিষয়ক ক্ষুদ্র পুস্তকে গ্রন্থের নায়কের জননী—গোঁড়া হিন্দু বাঙ্গালী গৃহিণীর মুখ দিয়া ঠিক এই ধরণের কথাগুলিই বলাইয়াছি। আজ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কথাগুলি শুনিয়া আমরা পরম প্রীতি লাভ করিলাম; বুঝিলাম, আমাদের ধারণা নিতান্ত ভ্রান্ত ছিল না।

য়ুরোপীয়দের যোগ্যতার পরিচয় দিবার পর সার রাজেন্দ্রনাথ আমাদের অযোগ্যতার কারণ উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, আমাদের ছেলেদের অযোগ্যতার প্রথম ও প্রধান কারণ বাল্য-বিবাহ; এবং দ্বিতীয় কারণ, শিক্ষার ব্যবস্থার ত্রুটি। কথাগুলা ঠিক। কিন্তু এজন্য আমরা ছেলেদের ততটা দোষী মনে করি না, যতটা করি তাহাদের অভিভাবকদের—তাদের বাপ, মা, খুড়া, জ্যেঠ, মামা প্রভৃতির। কারণ, ছেলেরা নিজেরা উপযাচক হইয়া বিবাহ করে না। আমাদের সামাজিক গঠন অনুসারে তাহা করিবার যো-ই নাই। বরং আজকালকার ছেলেরা বাল্য-বিবাহে রাজী নহে; অনেক স্থলেই অর্থ গৃধ্নু পিতার তাড়নায় এবং মাতার অশ্রু-ধারায় বাধ্য হইয়া তাহারা বিবাহে সম্মতি দিয়া থাকে।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই দুইটী বিষয়ের একটু বিস্তৃত ভাবেই আলোচনা করিয়াছেন। আমাদের ছেলেদের সাধারণ শিক্ষা শেষ করিতে তাহাদের বয়স ২১।২২ বৎসর উত্তীর্ণ হয়। তার পর সে কমার্শিয়াল ইনষ্টিটিউটে অন্ততঃ এক বৎসরও উচ্চ বাণিজ্য-শিক্ষা লাভ করিতে গেলেও তাহার বয়স ২৩ বৎসর হইয়া যায়; ততদিনে তাহার দুই একটী ছেলে মেয়ে হয় এবং সে রীতিমত সংসারে প্রবেশ করে। তখন আর তাহার কোন সওদাগরী আপিসে বিনা বেতনে বা কেবল সামান্য পকেট-খরচা লইয়া দুই বৎসর শিক্ষানবীশী করিবার অবসর থাকে না। এ দিকে বাণিজ্য-ক্ষেত্রে, যে যেমন যোগ্য লোক তাহাকে তেমনি বেতন দিতে হয়,—যোগ্যতার অতিরিক্ত বেতন দিতে গেলে ব্যবসা চলে না। বাণিজ্যালয়ে উচ্চ-শিক্ষার মূল্য তেমন নাই। সুতরাং উচ্চ শিক্ষা পাইয়াও বাণিজ্যাগারে মোটা মাহিনার দাবী করা চলে না। বাণিজ্যক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করিতে হইলে, সেখানেও রীতিমত হাতে-খড়ি দিয়া কিছুকাল শিক্ষানবীশী করিয়া বাণিজ্য কার্য্য পরিচালনা শিখিতে হইবে। বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত যুবকের পক্ষেও অন্ততঃ দুই বৎসরের কমে এই শিক্ষা লাভ করা যায় না। এইরূপে বাণিজ্য-বিদ্যা শিখিয়া মনিবের বিশ্বাস অর্জ্জন করিতে পারিলে, তবে লোকে উচ্চ বেতনে দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হইবার আশা করিতে পারে।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বয়ং চল্লিশ বৎসর ধরিয়া বাণিজ্য-কার্য্যে লিপ্ত আছেন। তিনি বড় দুঃখ করিয়াই বলিয়াছেন, এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে তাঁহার ছোট আপিসটিতেই বহু সংখ্যক কর্ম্মপ্রার্থী উমেদার যুবক চাকুরীর জন্য দরখাস্ত করিয়াছে। ইহারা সকলেই প্রায় এই একইরূপ দাবী করিয়াছে যে, তাহারা বৃহৎ পরিবারের ভারাক্রান্ত; অতএব তাহাদিগকে চাকুরী দিতেই হইবে এবং বেতনটাও যেন খুব মোটা হয়; নচেৎ তাহাদের পরিবার পালন করা কঠিন হইবে। ইহার সহিত, মুখোপাধ্যায় মহাশয় য়ুরোপীয় এসিষ্টাণ্টের তুলনা করিয়া বলিয়াছেন, তাহারা এক একটা বড় বাণিজ্যাগারে ৩৪ বৎসর শিক্ষানবীশী করিয়া একেবারে কাযের লোক হইয়া আসে এবং স্বচ্ছন্দে ৪৫ শত টাকা বেতনের দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হইতে পারে। পরিবার পালনের উপযুক্ত স্থায়ী আয়ের যোগাড় না করিয়া তাহারা বিবাহের কল্পনাও করে না। তাহারা প্রায় ৫ বৎসর কার্য্য করিবার পর মাসে ১০০০ টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকে। সার রাজেন্দ্রনাথ বিবেচনা করেন, ভারত-বাসীরাও এইরূপ যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারিলে, এইরূপ উপার্জ্জনের দাবী স্বচ্ছন্দে করিতে পারে। এই কারণে তিনি, যুবকগণকে যথেষ্ট অর্থ-উপার্জ্জন করিবার সামর্থ্য

লাভের পূর্ব্বে বিবাহ না করিতেই পরামর্শ দিয়াছেন। বাল্য-বিবাহই তাঁহার মতে আমাদের চির-দারিদ্র্যের মূল কারণ। বিবাহ করিলে, ছেলেপুলে হইলে, মোটা টাকা উপার্জ্জনের সামর্থ্য ও যোগ্যতা অর্জ্জনের অবসর ত থাকেই না; বরং পরিবার রূপ পেয়াদার পীড়নে—যা' পাই তাতেই রাজী ভাবে—যে-কোন একটা যেমন-তেমন চাকুরীর যোগাড় করিয়া লইয়া জীবনটা মাটি করিয়া ফেলিতে হয়।

স্কুলটির কার্য্যকারিতা বৃদ্ধির সম্বন্ধে দুই একটী পরামর্শ দিয়া সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ছাত্রগণের উদ্দেশে যে চৌদ্দটি উপদেশ দিয়াছেন, তাহা কেবল বাণিজ্যশিক্ষার্থী নহে, চাকুরীগত-প্রাণ বাঙ্গালী যুবকমাত্রেরই পক্ষে প্রয়োগ করা যাইতে পারে, এবং সকলেরই তাহা যথাসাধ্য পালন করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। উপদেশগুলির মর্ম্ম এই-রূপ :—(১) শিক্ষানবীশরূপে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে ইতস্ততঃ করিও না; এবং তোমার ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী নহে এমন লোকের অধীনতায় কাজ করিতেও কুণ্ঠিত হইও না। (২) শিক্ষানবীশীর কালে নিজেকে ছাত্র বলিয়া মনে করিবে; শিখিবার জন্য আন্তরিক আগ্রহ থাকা চাই; কাজের লোক হইবার জন্য যত্ন করিবে। আফিসের শৃঙ্খলা পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিয়া চলিবে। (৩) অভিমান বর্জ্জন করিতে চেষ্টা করিবে। তোমার উপরের কর্ম্মচারী তোমার ভুল দেখিলে যদি তিরস্কার করেন, তবে তাহাতে রাগ করিও না, কিম্বা তাহার প্রতিবাদ করিও না। (৪) ঠিক সময়ে আপিসে যাইবে; বেশ-ভূষার উপর লক্ষ্য রাখিবে; সর্ব্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিবে। (৫) বন্ধুবান্ধবের সহিত আলাপ কালে ব্যবসায় সংক্রান্ত গুপ্ত কথা প্রকাশ করিও না। (৬) আপিসে তোমার নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীদের সহিত বেশী ঘনিষ্ঠতা করিও না; সকলে যাহাতে আপিসের শৃঙ্খলা বজায় রাখিয়া চলে; তাহা করিতে তাহাদিগকে বাধ্য করিবে। (৭) কার্য্যে আন্তরিকতা থাকা চাই; পরিশ্রমে কাতর হইও না; খুঁটিনাটি বিষয়গুলিও অগ্রাহ্য করিও না। (৮) তোমার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীরা যখন তোমাকে কোন উপদেশ দিবেন, তখন তাঁহাদের ভুল হইলেও মুখের উপর তাহার প্রতিবাদ করিও না। (৯) ক্রমাগত বেতন বৃদ্ধির তাগাদা করিয়া তোমার মনিবকে বিরক্ত করিও না; উপযুক্ত সময়ের ও অবসরের প্রতীক্ষা করিবে। দারিদ্র্য বা পরিবার পালনের গুরুভারের ওজর করিয়া বেতন বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করিবে না। নিয়মিত ভাবে সুশৃঙ্খলে কাজ করিয়া গেলে তাহা মনিবের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া যায় না। (১০) সর্ব্বদা সত্য কথা বলিতে চেষ্টা করিবে; ভুল হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা স্বীকার করিবে; দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টা করিবে না, কিম্বা তোমার ভুলের দোষ অপরের ঘাড়ে চাপাইবার চেষ্টা করিবে না। উপরওয়ালাকে সম্ভ্রম করিবে; বেয়াদবী করিবে না। বেয়াদবী না করিয়াও তোমার অভাব-অভিযোগের কথা জ্ঞাপন করা কঠিন হইবে না। (১১) তুচ্ছ অজুহাতে কাজে কামাই করিও না। (১২) কথা কহিবার সময় বাচালতা পরিহার করিবে। অল্প কথায় আসল মনের ভাব প্রকা-শের চেষ্টা করিবে। (১৩) ব্যবহারে সততা রক্ষা করিয়া চলিবে; মনিবের বিশ্বাস যাহাতে হারাইতে না হয়, ইহাই যেন তোমার জীবনের প্রধান লক্ষ্য হয়। সর্ব্বদা এই কথা স্মরণ রাখিবে যে, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের প্রতি আনুগত্য নিশ্চয়ই পুরস্কৃত হইয়া থাকে। (১৪) সর্ব্ব শেষে—রাজনীতির সহিত বাণিজ্য মিশাইয়া ফেলিও না। সার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাঙ্গালীদের মধ্যে বাণিজ্য-ক্ষেত্রে অনন্যসাধারণ সফলতা লাভ করিয়া-ছেন। এ সকল উপদেশ তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-জনিত; সুতরাং এগুলি কখনই উপেক্ষণীয় নহে।

আমাদের বাঙ্গলা বৎসরের শেষাশেষি প্রায় সরকারী বৎসর শেষ হইয়া থাকে। তদনুসারে আগামী ৩১শে মার্চ্চ একটী সরকারী বৎসর শেষ হইয়া ১লা এপ্রেল নূতন বৎসর আরম্ভ হইবে। প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও আগামী বৎসরের জন্য আয়-ব্যয়ের হিসাব ভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহে পেশ হইয়াছে। আমরা ভারতীয় ও বাঙ্গলার বাজেটের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

ভারতীয় আয়-ব্যয়ের সম্বন্ধে আমাদের আলোচ্য বিষয় বড় বেশী নহে। পূর্ব্ব বৎসর এই সময়ে যে খস্‌ড়া আয়-ব্যয়ের তালিকা প্রস্তুত হইয়াছিল, বৎসরের শেষে প্রকৃত আয়-ব্যয়ের সহিত তাহার তুলনা করিবার সুবিধা হইয়াছে।

এই তুলনার ফলে দেখা যাইতেছে, খস্‌ড়া হিসাবে বৎসরের শেষে আয় হইতে ব্যয় বাদ দিয়া প্রায় পৌণে চারি কোটী টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল; কিন্তু প্রকৃত হিসাবে আয় অপেক্ষা ব্যয় প্রায় পৌণে সাত কোটী টাকা অধিক দাঁড়াইয়াছে। ইহার কারণ এই যে,যুদ্ধের দরুণ সমর-বিভাগে ব্যয় স্বভাবতঃই কিছু বেশী হইয়াছে; এবং জমির খাজনা যত টাকা আদায় হইবে বলিয়া মনে করা হইয়াছিল, ততটা হয় নাই। তবে অনাদায়ী টাকার কিছু এবার আদায় হইবার সম্ভাবনা আছে এবং সে কথা আলোচ্য খস্‌ড়া হিসাবে অনুমানও করা হইয়াছে। তবে ঠিক করিয়া কিছু বলাও যায় না; হয় ত আদায় না হইতেও পারে; কারণ, দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের যে সূচনা দেখা যাইতেছে, তাহাতে সরকার বাহাদুরকে হয়ত অনেক স্থলে খাজনা আদায় এবারও স্থগিত রাখিতে হইবে।

১লা মার্চ্চ যে বাজেট ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করা হইয়াছে, তাহাতে অনুমান করা হইয়াছে যে, বর্ষ শেষে দেড় কোটী টাকা উদ্বৃত্ত হইতে পারে। তবে এই অনুমান বর্ষ-শেষে প্রকৃত হিসাবে কার্য্যে পরিণত হওয়া সাময়িক ও স্থানীয় অবস্থার উপর অনেকটা নির্ভর করে। এবারকার বাজেটে একটী ছাড়া আর কোন নূতন কর স্থাপনের প্রসঙ্গ নাই। যুদ্ধের সুযোগে যে সকল ব্যবসায়ী সাধারণ সময়ের অপেক্ষা অনেক বেশী অতিরিক্ত লাভ করিয়াছেন, কেবল তাঁহাদের সেই অতিরিক্ত লাভের উপর একটা অস্থায়ী কর (Excess Profits Tax) স্থাপিত হইবে এইরূপ প্রস্তাব হইয়াছে। তবে যাঁহারা এই কর দিবেন, তাঁহাদিগকে আর স্বতন্ত্র আয়কর দিতে হইবে না। অর্থাৎ অন্যান্য লোকের অপেক্ষা তাঁহাদিগকে যেমন আয়করটা কিছু বেশী পরিমাণে দিতে হইবে, তাঁহারা তেমনি অতিরিক্ত লাভও অনেক টাকা করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের দুঃখের এবং আপত্তির বিশেষ কোন কারণ দেখি না।

বাজেটে এবার একটা সুবিধার কথা আছে। পূর্ব্বে জানিতাম, যাঁহাদের মাসিক আয় ৪২ টাকার বা বার্ষিক ৫০০ টাকার বেশী, তাঁহাদিগকে আয়কর দিতে হইত। তার পরে, কয়েক বৎসর হইল, ব্যবস্থা হয় যে, যাঁহাদের বার্ষিক আয় ১০০০ টাকার বেশী, কেবল তাঁহাদিগকেই আয়কর দিতে হইবে। ইহাতে সামান্য আয়ের অনেক মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের বিশেষ সুবিধা হয়। এবার ভারত গবর্ণমেণ্ট মধ্যবিত্ত অবস্থার ভদ্রলোকদিগের প্রতি আরও কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন,—যাঁহাদের বার্ষিক আয় ২০০০ টাকা বা তদপেক্ষা অল্প তাঁহাদিগকে আয়কর হইতে অব্যাহতি দিবেন বলিয়া ভরসা দিয়াছেন। লোকের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করা দিন-দিন যেরূপ ব্যয়সাধ্য ও কঠিন হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে, এই ব্যবস্থায় ভদ্রলোকেরা যে অনেকটা উপকৃত হইবেন, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

এইবার বাঙ্গলার বাজেটের কথা কহিব। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের অর্থসচিব মাননীয় সার্ হেন্‌রী হুইলার মহাশয় আগামী বর্ষের বাজেট ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করিবার সময় বলিয়াছেন যে,গত বৎসর এমনই সময়ে চলতি বৎসরের জন্য যে বাজেট প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাতে বর্ষশেষে যে টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল, প্রকৃত হিসাবে তদপেক্ষা ২৮৭০০০০ টাকা বেশী আয় হইয়াছে। বিষয়-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের পক্ষে এই তথ্যটি নিশ্চয়ই শ্রুতি-সুখকর হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিরূপে এই আয়-বৃদ্ধি ঘটিল, সচিব মহাশয় তাহারও আভাষ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আবগারী বিভাগ হইতে খুব বেশী টাকা পাওয়া গিয়াছে (We have gained heavily under the head of Excise), আর ষ্টাম্প, আয়কর, জঙ্গল, বন্দর ও 'পাইলটেজ' এবং বিবিধ খাতে মাঝামাঝি (to a fair extent) রকমের (অবশ্য অনুমানের অপেক্ষা বেশী) আয় হইয়াছে। কেবল আদায় বেশী নহে, ব্যয়-সঙ্কোচের ফলেও এবারকার আয় বৃদ্ধি ঘটিয়াছে; অর্থাৎ এবার শিক্ষা-বিভাগে ব্যয় খুব কম হইয়াছে (large decrease under the head of Education)। সুতরাং সরকারের তহবিলে প্রচুর মজুত অর্থ দেখিয়া আমরা উল্লসিত হইব, কিম্বা অশ্রু মোচন করিব, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। শিক্ষার ব্যাপারে খরচ কম কেন হইল, তাহার কারণ এই দেখা যাইতেছে যে, "The savings

in that respect are also due to the non-utilisation of grants" অর্থাৎ যে যে বাবদে সাহায্য মঞ্জুর করা হইয়াছিল, তাহার অনেকগুলিতে সে সাহায্য লওয়া হয় নাই।

সরকারের আয়বৃদ্ধির যে দুইটী মুখ্য ও প্রত্যক্ষ কারণ দেখা যাইতেছে,—আবগারী বিভাগে অধিক টাকা আদায় এবং শিক্ষাবিভাগে ব্যয় হ্রাস—এ দুইটী আমাদের পক্ষে আনন্দের কারণ নহে। আবগারী বিভাগে আয়বৃদ্ধির মানে এই যে, দেশের লোকে বেশী পরিমাণে মাদক দ্রব্য সেবন করিতেছে। যুদ্ধ উপলক্ষে অসভ্য রুসিয়া সর্ব্বপ্রথমে মদ্যপানে বিরত হইল; ফ্রান্স, ইংলণ্ড মদ্যের ব্যবহার সংযত করিল, ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ আইন গড়িয়া মদ খাওয়া এবং মদ তৈয়ারী করা বন্ধ করিল; আর এই সুযোগে আমরা কি মাতাল হইয়া পড়িতেছি! দেশের কি দুর্ভাগ্য!

আর, সরকারের শিক্ষা বিভাগে ব্যয় হ্রাস আমাদের পক্ষে কম দুর্ভাগ্যের কারণ নহে। সংবাদপত্রে দেখিতে পাই, প্রায় অনুযোগ করা হয় যে, সরকার এদেশে শিক্ষা-বিস্তারে সমুচিত অর্থ ব্যয় করিতে ইচ্ছুক নহেন; অথচ, কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে, সরকার যে সাহায্য মঞ্জুর করিতেছেন, তাহারও সদ্ব্যবহার করিবার পাত্র নাই। শিক্ষায় কি আমাদের অরুচি ধরিয়া গেল? অথবা, শিক্ষা লাভে আগ্রহ কি আমাদের আন্তরিক নহে?

রাজস্ব সচিব মহাশয় আগামী বর্ষের বজেটে আবগারী, ষ্ট্যাম্প ও ইন্‌কম্-ট্যাক্স খাতে আরও আয়-বৃদ্ধির আশা করিতেছেন। তবে আগামী বর্ষে সরকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পূর্ত্ত-বিভাগে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

বঙ্গের স্বাস্থ্যোন্নতিকল্পে যে ব্যয় হইবে, তন্মধ্যে বর্দ্ধমানে একটী মেডিক্যাল স্কুল স্থাপনের জন্য এক লক্ষ টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছে দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। বঙ্গের পল্লী অঞ্চলে সুচিকিৎসকের যেরূপ অভাব, তাহাতে মফস্বলের সহরসমূহে মেডিক্যাল স্কুল স্থাপন করিয়া চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যবস্থা হইতে দেখিলে, আনন্দিত না হইয়া থাকা যায় না।

বর্ত্তমান বর্ষের জন্য যে বাজেট প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাতে দেশের স্বাস্থ্যোন্নতিকল্পে ১১৭১০০০ টাকা ব্যয় করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল; কিন্তু প্রকৃত ব্যয় হইয়াছে ৯০৪০০০ টাকা। এই দুইটী অঙ্কের মধ্যে যে পার্থক্য ঘটিতেছে, তন্মধ্যে ১৯০০০০ খাল বিভাগের হাত দিয়া, ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধকল্পে খাল খনন পূর্ব্বক জলের সংস্থানের জন্য, ব্যয় করা হইয়াছে। সুতরাং হিসাবমত উক্ত স্বাস্থ্যোন্নতির উদ্দেশ্যেই ব্যয় হইয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে। আগামী বর্ষের জন্য যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা আরও আশাপ্রদ। বাজেটে এবার রোগ প্রতিষেধকল্পে ১৮৬৬০০০ টাকা ব্যয় করিবার কল্পনা হইয়াছে।

আগামী বর্ষের বাজেটে শিক্ষা-বিভাগে সরকারী স্কুল-কলেজে ছাত্রদত্ত বেতন হইতে ১০২৯০০০ টাকা আয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে এবং শিক্ষা বাবদে ৯৭৮৬০০০ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষের বাজেটে ধরা হইয়াছিল ১০৩০১০০০ টাকা। কিন্তু এবার প্রকৃত খরচ তদপেক্ষা অনেক কম হইয়াছে। ফলে, আগামী বর্ষের এষ্টিমেটে যে ব্যয় ধরা হইল, তাহা বর্ত্তমান বর্ষের প্রকৃত খরচের অপেক্ষা ১২৮৬০০০ টাকা বেশী হইতেছে। অবশ্য কার্য্যক্ষেত্রে যাহা খরচ হইবে, তাহা বৎসরের শেষে জানা যাইবে। তবে আগামী বর্ষে শিক্ষা-সংক্রান্ত অনেক নূতন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার কল্পনা হইয়াছে। অতএব সব টাকাই বোধ হয় খরচ হইতে পারে।

গদাধর

[শ্রীযতীশচন্দ্র বাগচী]

(১)

"কি খাব, দে না মা! ক্ষিদে পেয়েছে যে!"

রসুলপুরের গদাধর মাঝি আজ প্রায় মাসাধিককাল অসুস্থ। কোন উপার্জ্জন নাই। পীড়া সারিয়াছে বটে, কিন্তু দৌর্ব্বল্য এ পর্য্যন্ত দূর হয় নাই।

ক্ষুদ্র খড়ো ঘর। ঘরের বেড়া ও উপরের চাল—উভয়ের মধ্য দিয়াই বিধাতা এই দরিদ্র মৎস্যজীবীর দীন অবস্থা দর্শন করিয়া চন্দ্রকিরণ ঢালিয়া বিদ্রূপের হাসি বর্ষণ করিতেছিলেন। ভাঙ্গা ঘর, বাঁশের মাচা, ছেঁড়া কাঁথা, অকাল-জরাজীর্ণ গদাধরের অস্থিচর্ম্মসার দেহ, আর তাহাকে বেড়িয়া কয়েকটী বুভুক্ষু প্রাণীর আর্ত্ত লোলুপ দৃষ্টি—তাহার মধ্যে চন্দ্রকিরণ। ইহাকে বিধাতার বিদ্রূপ-হাসি বই আর কি বলিব?

পীড়িত শরীর লইয়াই গদাধর কয়েকদিন গাঙ্গে যাইতে চাহিয়াছিল। কিন্তু তাহার শরীর অসুস্থ বলিয়া তাহার স্ত্রী সদু এখন পর্য্যন্ত তাহাকে যাইতে দেয় নাই। এতদিন কোন রকমে চলিয়াছে, আজ আর চলে না। এতদিন ধরিয়া সৌদামিনী স্বামীকে যে বুঝ দিয়া আসিয়াছে, সাত বৎসরের অবোধ শিশু আজ তাহা প্রকাশ করিয়া দিল। বালক নিতাই অনাহারে আর থাকিতে না পারিয়া বলিল,—"কি খাব, দে না মা! ক্ষিদে পেয়েচে যে!"

অভাগিনীর চোখ ফাটিয়া টস্‌টস্ করিয়া কয়েক বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। বলিল, "চুপ কর বাবা! অমন কল্লে কাল্‌কে তো রাঙ্গা গামছা কিনে দেব না!"

হা রে হতভাগিনী! সকালে কয়েক মুঠা মুড়ি খাওয়াইয়া এই রাত্রি পর্য্যন্ত হৃদয়ের ধনকে একখানি রাঙা গামছা কিনিয়া দেওয়ার মিথ্যা প্রলোভনে ভুলাইয়া রাখিয়াছে। মায়ের প্রাণ—এখনও ফাটিয়া যায় নাই! সৌদামিনী দুই হাতে সন্তানকে বুকে জড়াইয়া ধরিল। তার পর তার মাথার উপর মুখ রাখিয়া নীরবে চোখের জল ছাড়িয়া দিল।

নিতাই প্রথমে খানিকক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। তার পর ক্ষুধার তাড়না সহ্য করিতে না পারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। শয্যা হইতে গদাধর স্ত্রীকে বলিল, "কি খেতে দিবি, দে না! ক্ষিদে পেয়েচে, কেন কাঁদাচ্চিস এখন!"

সৌদামিনী উঠিয়া গেল। একটু পরে একখানা ভাঙ্গা পাথরের পাত্রে একটু লবণ এবং খানিকটা কল্‌মীশাক ও পদ্মের মূল সিদ্ধ আনিয়া ছেলের সম্মুখে রাখিল। তার পর সেই উচ্ছিষ্ট হস্তে স্বামীর পা দুইখানির মধ্যে মুখ গুঁজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বিস্মিত গদাধর উঠিয়া বসিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যেই সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়া লইল। স্ত্রীর প্রতি চাহিয়া কহিল, "এই করে বুঝি এত দিন আমার সাবু-মিছরি জোগাচ্চিস? নিজে কদিন খাস না?"

সৌদামিনী আর পারিল না।—স্বামীর পা দুইখানি আরও জোরে ধরিয়া বলিল, "ওগো, না খেয়ে-খেয়ে বুকের দুধ শুকিয়ে গেছে! ছমাসের মেয়েটা তোমার পাতের সাবুর জল খেয়ে-খেয়ে একেবারে মরার হাল হয়েছে!"

গদাধর চাহিয়া দেখিল। তাহার পদতলে তাহার সুদীর্ঘ চতুর্দ্দশ বর্ষের সুখ-দুঃখের সঙ্গিনী, তাহার বড় আদরিণী সৌদামিনী—অনশন-ক্লিষ্ট-দেহা, ম্লান-বদনা—রৌদ্রদগ্ধা অনাদৃতা ব্রততীর মত পড়িয়া রহিয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী মাচায় ছিন্ন মাদুরের উপর তাহার বুকচেরা ধন ছয় মাসের কন্যাটী নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়া আছে—কে জানে, আছে কি নাই! নিম্নে তাহার নয়নের আনন্দ, বংশের প্রদীপ, ভবিষ্যতের আশা শিশুপুত্র বুভুক্ষু কুকুরের মত ব্যগ্রহস্তে গোগ্রাসে কতকগুলি অখাদ্য তুলিয়া খাইতেছে।

কম্পিত পদে গদাধর উঠিয়া দাঁড়াইল। স্ত্রীকে কহিল, "নাও কি তলানো আছে?" সৌদামিনী উত্তর করিল, "না। বড় হালদার মশাই আট আনা ভাড়া দিয়ে পরশু একবার উঠিয়ে নিয়েছিল। ঘাটের ধারে খেজুর গাছে

বেঁধে রেখেছে।" "জালখানা পেড়ে দে!" ব্যগ্রস্বরে সৌদামিনী বলিল, "জাল দিয়ে কি করবে এই রাতে?" ছুই হাতে খুঁটি জড়াইয়া ধরিয়া, তাহার গায়ে মাথা রাখিয়া গদাধর কহিল, "জাল দে বল্‌চি!" স্বামীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া সৌদামিনীর আর দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করিতে সাহস হইল না; ধীরে ধীরে জালখানি পাড়িয়া দিল। স্খলিত চরণে গদাধর ঘাটের দিকে অগ্রসর হইল। তার পর নৌকায় উঠিয়া লগি দিয়া ছুই তিনটী ঠেলা লাগাইয়া গলুয়ের উপর হাল ধরিয়া বসিয়া পড়িল। বৈঠা মারিবার শক্তি তখন তাহার ছিল না। অনুকূল পবনে নৌকা ধীরে-ধীরে চলিতে লাগিল। এদিকে সৌদামিনী ঘরের দাওয়ায় উপুড় হইয়া পড়িয়া অঝোরে কাঁদিতে লাগিল। নিতাই তখন ভাঙ্গা পাথরের থালাখানি উভয় হস্তে প্রাণপণে তুলিয়া ধরিয়া মহা আগ্রহে চাটিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

(২)

গ্রামের জমীদার রুদ্রকান্ত খাস্তগীর মহাশয় তাঁহার যুক্তাক্ষরবহুল নামের মতই দোর্দ্দান্ত-প্রতাপ লোক। গ্রামের ছেলে-বুড়ো সকলেই হলফ করিয়া বলিতে পারে যে, তাঁহার ছয় বৎসরের আদরিণী কন্যা রাণী ছাড়া আর কাহারও সম্মুখে কেহ তাঁহাকে কখনও হাসিতে দেখে নাই। রুদ্র-কান্ত কখনও কাহারও সহিত মিশিতেন না। তাঁহার বন্ধুর মধ্যে কেবল মাত্র ছিলেন তাঁহাদিগের কুল-পুরোহিত, তাঁহার সমবয়সী কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়।

সকালবেলা রুদ্রকান্ত কাছারী করিতে বসিয়াছেন—সম্মুখে বিস্তৃত প্রাঙ্গণে লোকজন। দেওয়ান রামরাম বসু মহাশয় সূতা-বাঁধা চসমা মাথায় জড়াইয়া প্রকাণ্ড লাল-খেরের একখানি খাতা বাবুর নাসিকা-বরাবর উঠাইয়া ধরিয়াছেন। বাবু কুঞ্চিত-ভ্রূ ও বিস্ফারিত-নাসা হইয়া গম্ভীর ভাবে গোঁফে তা দিতেছেন। চারিপাশে কালো-ধলো, রোগা-মোটা নানা জাতীয় আমলাবর্গ অচলায়তন খাতাস্তূপ "বিতারিখ" ও "জের জমা" লিখিয়া ভরাইয়া ফেলিতেছে। বাবুর হাঁটু জড়াইয়া তাঁহার আদরিণী রাণী-সুন্দরী নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী ও ছড়া আবৃত্তি করিতেছে। বারান্দায় একখানি ভগ্নপদ টুলে অতি সন্তর্পণে উপবেশন করিয়া কেদার ভট্টাচার্য্য মহাশয় কৃষ্ণের শত নাম বকিতে-ছেন। পাশের কুঠুরিতে মহকুমার মোক্তার ব্রজদুলাল নন্দী মহাশয় একটী মিথ্যা মোকর্দ্দমার সাক্ষী তালিম করিতেছেন। মধ্য-উঠানে ছলিম সেখ মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় এক পায়ে দাঁড়াইয়া আছে, আর পীর-মহম্মদ বরকন্দাজ ভৃত্য রামছিতোয়ার সহায়তায় তাহার মস্তকের উপর একটী এক মণ ভারী বোঝাই তুলিয়া দিতে চেষ্টা করিতেছে। এমন সময় বয়ড়াহাটীর একজন মাতব্বর প্রকাণ্ড এক রোহিত মৎস্য উঠানে রাখিয়া প্রণাম করিয়া যুক্ত-করে দাঁড়াইল। মৎস্য দেখিয়া রুদ্রকান্ত বলিলেন, "বেশ, বেশ, মোড়ল! বড় খুসী হলাম, বড় খুসী হলাম!" আনন্দে অধীর হইয়া মণ্ডল মহাশয় দশনপংক্তি বিস্তার করিয়া চক্ষু মুদিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় কৃষ্ণের শতনাম ভুলিয়া গেলেন। আস্তে-আস্তে টুল হইতে উঠিয়া লুব্ধ-নেত্রে কহিলেন, "উত্তম মৎস্য। অধুনা হাটে এরূপ মৎস্য সচরাচর প্রাপ্ত হওয়া ঘটে না।" রাণী ইতিমধ্যে পিতার হাঁটু ছাড়িয়া মাছ টিপিতে বসিয়াছিল। একটু পরে বলিল, "বাবা, আমি কিন্তু সব ডিমটাই খাব।" বাবা বলিলেন, "ও মাছের কি ডিম আছে মা!" মেয়ে ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "আমি ডিম খাব।" ক্রমে আওয়াজ বাহির হইল—তার পরে সুর একেবারে সপ্তমে চড়িল। রুদ্রকান্ত হাঁকিলেন, "দেওয়ানজী! এক্ষণি বাজারে লোক পাঠিয়ে দিন। ঘাটে খোঁজ করান। যে রকম করে হোক্, রুই মাছের ডিম জোগাড় করা চাই।" কম্পিতস্বরে দেওয়ানজী বলিলেন, "এটা তো ডিমেরই সময়। ডিম পাওয়া তো শক্ত নয়,—তবে এখন এত বেলায় বাজারে মাছ পেলে হয়।" রক্ত লোচনে রুদ্রকান্ত গর্জ্জিলেন, "যে রকম করে হোক্ চাই-ই!"

কাছারী ভাঙ্গিয়া গেল। লোকজনেরা সে দিনের মত চলিয়া গেল। চাকর—বাকর, আমলা—পাইক, মায় দেওয়ানজী হৈ রৈ শব্দে মাছের ডিমের সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িলেন। এই গোলমালের মধ্যে মৎস্যলাভে অকৃতকার্য্য হওয়ার আশঙ্কায় ভট্টাচার্য্য মহাশয় মনে-মনে এই চক্ষুখাদিকা, আদরিণী, বানরী জমীদার-কন্যাকে গালি দিতে-দিতে গৃহগামী হইলেন।

(৩)

আশেপাশের পাঁচ-সাতখানি বাজার ঘুরিয়া আসিয়া সকলে হতাশ্বাস হইয়া বলিল, "বাজারে ডিমওলা রুই মাছ

আসে নি।” সর্ব্বনাশ! দেওয়ানজীর মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। দেওয়ানজী নিজে ছুটিলেন। নদীর তীরে তীরে ঘুরিতে ঘুরিতে দেখিলেন, ধীর-পবনে ভর করিয়া একখানা জেলে-ডিঙ্গী ভাসিয়া আসিতেছে। ঊর্দ্ধশ্বাসে দেওয়ানজী সেইদিকে ছুটিলেন। নিকটে গিয়া দেখিলেন, নৌকার পাটাতনে কনুয়ের উপর মাথা রাখিয়া গদাধর মাঝি শুইয়া আছে। হাঁকিয়া বলিলেন, “কি রে গদাই, কি মাছ ধরলি?” ক্ষীণকণ্ঠে গদাধর উত্তর করিল, “আজ্ঞে, ছোট খাটো একটা রুই পেয়েছিলুম।” “গেছলি কোথায়?” “আজ্ঞে, এই বাঁওড়ের দিকে।” “দেখি, দেখি মাছটা।”—গদাধর তুলিয়া ধরিল। দেওয়ানজী কহিলেন, “ডিম আছে বোধ হচ্ছে না?” গদাধর উত্তর করিল, “আজ্ঞে ডিম অল্পস্বল্প আছে বই কি।” দেওয়ানজী কহিলেন, “তবে দে, চট্‌পট্ করে দে! কর্ত্তার হুকুম!” যুক্ত-করে গদাধর বলিল, “হুজুর দামটা”—“দামটা? বলি, দামটা কি রকম? হ্যাঁ হে ও গদাধরচন্দ্র! বলি, দামটা কি রকম? কার এলাকায় মাছ মেরে এলে? চক্‌দীঘির বাঁওড় যে জমীদার রুদ্রকান্ত খাস্তগীর মহাশয়ের এলাকায়, তা কি হুজুরের জ্ঞান ছিল না? ক'বছরের খাজনা বাকি, তার হিসেব আছে? নালিশ কল্লে ভিটেমাটী চাটী করে আনব, তা জানো? হারামজাদা বেটা, আবার দাম?”

স্ত্রী-পুত্র-কন্যার অনাহার-ক্লিষ্ট মুখচ্ছবি গদাধরের মনে বিদ্যুতের মত খেলিয়া গেল। দুই হাতে মাছটী চাপিয়া ধরিয়া গদাধর বলিল, “দাম না পেলে মাছ ছাড়চি নে হুজুর! বাড়ীতে ছেলে-পিলে মরে”—

সিংহের মত গর্জ্জন করিয়া দেওয়ানজী বলিলেন, “রেখে দে তোর ছেলে-পিলে!—মাছ ক্যাল শীগ্‌গীর!”—গদাধর দুই হাতে মাছটী জড়াইয়া ধরিয়া শুইয়া পড়িল। উন্মত্তের মত উচ্চ রবে দেওয়ানজী হাঁকিলেন, “কোই হ্যায়!”—ইনাম সিং দরওয়ান এতক্ষণ একটু তফাতে দাঁড়াইয়া ছিল,—ছুটিয়া আসিয়া সেলাম করিল। দেওয়ানজী হুকুম দিলেন, “হারামজাদা বেটার কাণ পাকড়কে মাছটো কাড় লেও তো!” ইনাম সিং বিনা বাক্যব্যয়ে নৌকার উপর লাফাইয়া উঠিল। তার পর মাছটী কাড়িয়া লইয়া গদাধরের কর্ণমূলে প্রচণ্ড এক চপেটাঘাত করিয়া নামিয়া আসিল। ক্ষীণ স্বরে একবার “মাগো” বলিয়া গদাধর উত্তর হস্তে কপাল ধরিয়া পড়িয়া গেল। বীরপদভরে স-দ্বারবান দেওয়ানজী বাড়ী ফিরিলেন।

কোন রকমে বাড়ী ফিরিয়া গদাধর ঘরের দাওয়ার উপর শুইয়া পড়িল। সৌদামিনী তাড়াতাড়ি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “অমন করে শুয়ে পড়লে যে?” অপলক, স্থির নেত্রে স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কিছুক্ষণ পরে গদাধর উত্তর করিল, “আজ কিছু খাস্‌নি তো?” সৌদামিনী বলিল, “তা নাই বা খেলুম, তুমি অমন করছ কেন?” কম্পিত কণ্ঠে গদাধর কহিল, “মেরেছে সদু, মেরেছে! তোদের জন্যে মাছের দাম চেয়েছিলুম, তাই মেরেছে। তা মারুক, তাতে দুঃখ নেই। কিন্তু দাম যে দিলে না। তুই খাবি কি? নিতে খাবে কি?”—গদাধর বালকের মত হা-হা করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। ঠিক সেই সময়ে দেওয়ানজী মহাশয় বাবুর নিকট দুর্ব্বৃত্ত, ছোটলোক গদাধর মাঝির স্পর্দ্ধার বিষয় বর্ণনা পূর্ব্বক তাঁহার বাটীতে মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ লাভ করিয়া আনন্দে কেশবিরল মস্তকে হস্তাবমর্ষণ করিতেছিলেন।

সমস্ত দিন অনাহারে, দুশ্চিন্তায় এক রকম করিয়া কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় সৌদামিনী চীৎকার করিয়া উঠিল, “ওগো দেখ, খুকী কেমন করচে!”—স্থির ভাবে শয্যাপার্শ্বে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া গদাধর বুকের ভিতরের ঝাঁকুনিটা সামলাইয়া লইল। তার পর অস্থির হস্তে মেয়েটিকে বার-কয়েক নাড়িয়া-চাড়িয়া বুঝিল, সব শেষ হইয়া গিয়াছে। অনাহারের অত্যাচার আর সহিতে না পারিয়া অভিমানিনী ছোট মা-টী তাহার চিরদিনের মত তাহাকে ছাড়িয়া গিয়াছে। একটু বসিয়া সমস্ত ব্যাপার সে নানা রূপে তলাইয়া বুঝিয়া লইল। তার পর শীর্ণ, শিশু পুত্রকে বুকে সজোরে জড়াইয়া ধরিয়া খানিক কাঁদিল। অনেক ক্ষণ পরে একটু প্রকৃতিস্থ হইলে কর্কশ, কঠিন করতলে চক্ষুর্দ্বয় মুছিয়া লইয়া, পদতলে পতিতা অশ্রুমুখী পত্নীর মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিল। তার পরে কোন কথা না বলিয়া, ছেঁড়া কাঁথায় মেয়েটীকে জড়াইয়া লইয়া, নদীর জলে ভাসাইয়া দিতে বাহির হইয়া গেল। সৌদামিনী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। ভীতিস্তব্ধ পুত্রটী মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া, শেষে চীৎকার করিয়া উঠিল। রুদ্রকান্ত তখন মাছের মুড়ার ঘণ্ট রাঁধাইবার

বন্দোবস্ত করিতে হুকুম দিতেছিলেন। আদরিণী কন্যা কোলে বসিয়া, গম্ভীর মুখে, মাছের ডিমের অংশ যে পিতাকে কিছুমাত্রই দিবে না, তাহা তারস্বরে পুনঃ-পুনঃ জানাইতেছিল।

চিরদুঃখী গদাধরের সে কালরাত্রি প্রভাত হইয়াছে। কিন্তু যাহার বক্ষে সে সেই অনাহার-বিগত-জীবনা শিশু কন্যাটীকে জন্মের মত রাখিয়া আসিয়াছে, তাহার বক্ষ হইতে গদাধর আর ফিরিতে পারিতেছিল না। নদীর অতল গহ্বরে হৃদ্‌রত্নকে চিরদিনের মত ডুবাইয়া রাখিয়া, গদাধর উন্মত্তের মত নৌকা লইয়া ঘুরিতে লাগিল। তাহার রোগজীর্ণ শরীরে তখন অসুরের বল আসিয়াছে। ঘুরিয়া-ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া, অবশেষে সে নদীর তীরে, যেখানে খেজুরগাছটী জলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া স্থিরদৃষ্টিতে দীর্ঘ কাল হইতে জলস্রোতের আনাগোনা দেখিতেছে, সেইখানে নৌকা বাঁধিল। সুন্দর প্রভাত। অরুণ-কিরণে সমস্ত আকাশ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। স্তরে-স্তরে নবীন শুভ্র সূর্য্য-কিরণে অনুরঞ্জিত হইয়া বিচিত্র নীলাম্বরের বৈচিত্র্য আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে। ঝাঁকে-ঝাঁকে শালিক, বাবুই প্রভৃতি বিহঙ্গদল আনন্দ-কল-গুঞ্জনে ব্যোমপথ মুখরিত করিয়া উড়িতেছে। সদ্যঃ-সুপ্তোত্থিত মলয় মারুত যেন আবেশ-বিহ্বলতায় গাছের গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে। পাতায়-পাতায় অমনি ঝিরঝির করিয়া একটা পুলক-স্পন্দন খেলিয়া উঠিতেছে। আনন্দ-মদির শ্যামল শষ্পশ্রেণী সেই খেলায় যোগদান করিতে চাহিয়া নাচিয়া উঠিতেছে। চঞ্চল নদীজল সে সুযোগ ছাড়িবে কেন? হিল্লোলের পর হিল্লোল তুলিয়া নদী আপনি নাচিতেছে, গদাধরের জীর্ণ তরীখানিও নাচাইতেছে। সকলের চোখে যখন পৃথিবী এত সুন্দর, তখন একরাশি জলে বুক ভাসাইয়া, গদাধর তাহার ছত্রিশ বৎসরের পুরাতন বন্ধু, তাহার ঘোর দুর্দ্দিনের চিরসাথী নৌকাখানির বুকে লুটাইয়া পড়িয়া, দিকে-দিকে একটা করুণ বেদনার আর্ত্ত চীৎকার জাগাইয়া গাইয়া উঠিল,

"মন মাঝি তোর বৈঠা নে রে!—
আমি আর বাইতি পারলাম না।
সকাল বেলা ছাড়লাম নৌকা রে,—
নদীর কূল-কিনারা পালাম না"—

কে তুমি অশিক্ষিত পল্লী-কবি! কবে, কোন্ দিন এমনি এক শান্ত, মৌন, করুণ প্রভাতে নিজের দুঃখ-সুখের চিরসঙ্গী ক্ষুদ্র ডিঙ্গীখানির উপর বসিয়া, সারানিশি-কর্ম্ম-ক্লান্ত দেহ এলাইয়া দিয়া,হতাশার ক্ষীণ-মুমূর্ষু স্বরে হাহাকারে কাঁদিয়া গিয়াছ! আজও দুঃখিনী বঙ্গমাতার শত গদাধর তোমার সুরে সুর মিলাইয়া কাঁদিয়া বাঁচিতেছে!

"গদাই, ও গদাই, আমাকে নৌকায় চড়াবি?" গদাধর উঠিয়া বসিল। দেখিল, জমাদারের আদরিণী কন্যা এক কোঁচড় শিউলি ফুল লইয়া, একগাল বঁইচি চিবাইতে-চিবাইতে, এক পায়ে ঘুরিতে-ঘুরিতে বিকৃত মুখে কহিতেছে, "গদাই, ও গদাই, আমাকে নৌকায় চড়াবি।" গদাই বলিল, "এত সকালে নৌকায় চড়লে ঠাণ্ডা লাগবে যে দিদি!" "না, লাগবে না। তুই নে না আমায় তুলে!" নাছোড়বান্দা মেয়ে,—না তুলিলে ছাড়িবে না। অগত্যা গদাধর দুই বাহু প্রসারিত করিয়া তাহাকে তুলিয়া লইল। 'ও পারে চল্ না!" "ওপারে কোথায় যাবে, দিদি!" "ঐ যে পেয়ারা-বাগানের ধারে। সেখানে অনেক বঁইচি-গাছ আছে।" "বঁইচি খেলে পেটের অসুখ করবে।" ঠোঁট ফুলাইয়া আদরিণী বলিল, "না, করবে না, তুই চল।" গদাধর জানিত, এই মেয়ে যদি কাহারও কথায় একটু কাঁদে, তাহা হইলে রুদ্রকান্ত সেই "কাহারও"র ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন চতুর্দ্দশ পুরুষকে কাঁদাইয়া ছাড়েন। কাজে-কাজেই বাধ্য হইয়া গদাধর নৌকা ছাড়িল।

গদাধর ধীরে-ধীরে বৈঠা মারিতে লাগিল; নৌকা ধীরে-ধীরে চলিতে লাগিল। জমীদার-কন্যার মুখের দিকে চাহিতে-চাহিতে গদাধরের সদ্য-মৃতা কন্যার কথা মনে পড়িল। বাঁচিয়া থাকিলে সেও কালে এত বড় হইতে পারিত। তাহার চুলও ত ওই রকমই কোঁকড়ান ছিল! কালে তাহার বিবাহ দিত,—তাহার শিশু সন্তান হইয়া ঘর ভরিয়া যাইত। সে কি সুখ! সে কি আনন্দ! বিধাতার বুঝি তাহা সহিল না,—তাই তিনি এত সুখের মাঝে বজ্র হানিলেন। এ বজ্র কে হানিল? কে তাহার সোণার পুত্তলীকে অনাহারে মারিল? জমীদারের দেওয়ান! সে যদি মাছের মূল্য দিত, তাহা হইলেই ত সে-দিন তাহারা পেট ভরিয়া খাইতে পারিত! তাহার হৃদয়ের ধন ত অনাহারে শুকাইয়া মরিত না! কিন্তু দেওয়ানজী এ কার্য্য করিয়াছে

কাহার জন্য? জমীদারের জন্য! তাহা হইলে জমীদারই দায়ী! জমীদারের প্রাণে কি বিন্দুমাত্র মায়া নাই? এই ত তাহার কন্যা বসিয়া আছে,—আমি যদি উহাকে না খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলি! তাহাতে কি জমীদারের কষ্ট হইবে না? হইবে বই কি! তবে,—তবে এই নিস্তব্ধ প্রভাতে, এই নির্জ্জন নদীবক্ষে এই মেয়েটাকে যদি ডুবাইয়া দিই! কে দেখিবে! উত্তম সুযোগ! প্রতিশোধ! প্রতিশোধ! গদাধর মুষ্টিবদ্ধ হস্তে এবার বৈঠাখানি বড় জোরে ফেলিল। তাহার কোটরগত, পাণ্ডুর চক্ষুদ্বয় ধ্বক্ ধ্বক্ জ্বলিয়া উঠিল।

রাণী এতক্ষণ নৌকার পাটাতনের উপর ফুল ছড়াইতে-ছড়াইতে "পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল" আবৃত্তি করিতেছিল। হঠাৎ গদাধরের ঐরূপ আকার-ব্যবহার দেখিয়া ভীতি-কম্পিত স্বরে বলিল, "অমন করিস নি গদাই, আমার ভয় করছে যে!" শিশুর মিনতিপূর্ণ কোমল, ব্যথিত কণ্ঠস্বর! যাদুকরীর কোন্ মোহিনী মায়ায় উদ্যত-ফণ অহিরাজ নিস্তেজ হইয়া গেল। গদাধর মস্তক অবনত করিল।

কিছুক্ষণ পরে রাণী জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁারে গদাই, তোর কাপড় ছেঁড়া কেন?" এ প্রশ্নের উত্তর কে দিবে? এ অদ্ভুত প্রশ্ন ত এই সুদীর্ঘ ছত্রিশ বৎসর কেহ তাহাকে করে নাই! এমন কি, সে নিজেও না! ও গো রাজার দুলালি, এ কি প্রশ্ন! গদাধর কথা কহিল না। খানিক পরে রাণী আবার বলিল, "গদাই, তুই অত রোগা কেন? তোর মা বুঝি তোকে পেট ভরে খাইয়ে দেয় না!" আবার, আবার! সেই মায়ের কথা,—সেই অনাহারের কথা! সুপ্ত দৈত্য আবার জাগিয়া উঠিল। চীৎকার করিয়া গদাধর কহিল, "সে শুধু তোদের জন্যে,—সে তোদের জন্যে! আজ এই গাঙের জলে তার শোধ নেব!"—উত্তেজিত গদাধরের হস্ত হইতে বৈঠা খসিয়া পড়িল। দুই বাহু প্রসারিত করিয়া গদাধর মেয়েটীকে আঁকড়াইয়া ধরিতে গেল। ভয়ে বিস্ময়ে একটু পিছাইয়া যাইতেই সে ঝুপ করিয়া জলে পড়িল। গদাধর ধরিয়া ফেলিল। বুঝি স্বহস্তে ডুবাইতে না পারিলে তাহার তৃপ্তি হইতেছে না। গদাধর বজ্রমুষ্টিতে তাহার একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া, সজোরে তাহাকে একবার ঝাঁকাইয়া দিল। বাহুর যন্ত্রণা না বুঝিলেও, আসন্ন মৃত্যুর বিভীষিকাময় চিত্র দেখিয়া হতভাগিনী ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিল, "বাবা!"—গদাধর চমকিয়া উঠিল। চকিতে মনে পড়িল, বাঁচিলে তাহার খুকীও ত এত বড় হইত, শোকে-সুখে এমনি কণ্ঠে তাহার নাম করিত। বড় বিপদের সময় সকলের কথা ভুলিয়া তাহাকেই ডাকিত, "বাবা!"—মুহূর্ত্তে পাষাণ দ্রবীভূত হইল। বিপুল বলে টানিয়া তুলিয়া, তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া, গদাধর হাহাকার করিয়া ডাকিল, "মা—মা!"—

শোক-সংবাদ

পরলোকগতা কৃষ্ণভাবিনী দাস

বহুবাজারের স্বনামধন্য পরলোকগত শ্রীনাথ দাস মহাশয়ের পুত্রবধূ, স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের বিধবা পত্নী পবিত্রহৃদয়া, নারীহিতব্রতা কৃষ্ণভাবিনী দাস মহাশয়ার পরলোকগমন সংবাদে আমরা শোকসন্তপ্ত হইয়াছি। স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ দাস মহাশয় যখন বিলাত গমন করেন, তখন কৃষ্ণভাবিনী তাঁহার সঙ্গে যান। দেশে আসিয়া দাস মহাশয় যে সমস্ত কার্য্যে যোগদান করেন, তাহাতেই কৃষ্ণভাবিনী প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর ন্যায় তাঁহার পার্শ্বচারিণী ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর কৃষ্ণভাবিনী নারীহিতব্রতে সত্যসত্যই জীবন উৎসর্গ করেন; স্ত্রী-মহামণ্ডলীর কলিকাতা শাখার তিনি প্রাণস্বরূপিনী ছিলেন; অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি দিনরাত খাটিয়াছেন। তাঁহার য়ুরোপ-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ও কবিতাবলী যাঁহারাই পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভার প্রশংসা করিয়াছেন; অনেক মাসিক পত্রে তাঁহার লিখিত সুচিন্তিত প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার অকাল-মৃত্যুর জন্য আমরা শোকপ্রকাশ করিতেছি।

৺হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

দাঁইহাট নিবাসী জমিদার, সুপ্রসিদ্ধ "নায়ক" সংবাদ পত্রের সত্বাধিকারী, লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ী হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোক গমন সংবাদ শুনিয়া আমাদের পাঠক পাঠিকাগণ নিশ্চয়ই অত্যন্ত দুঃখিত হইবেন। হরিনারায়ণ বাবু পিতল কাঁসার ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন।

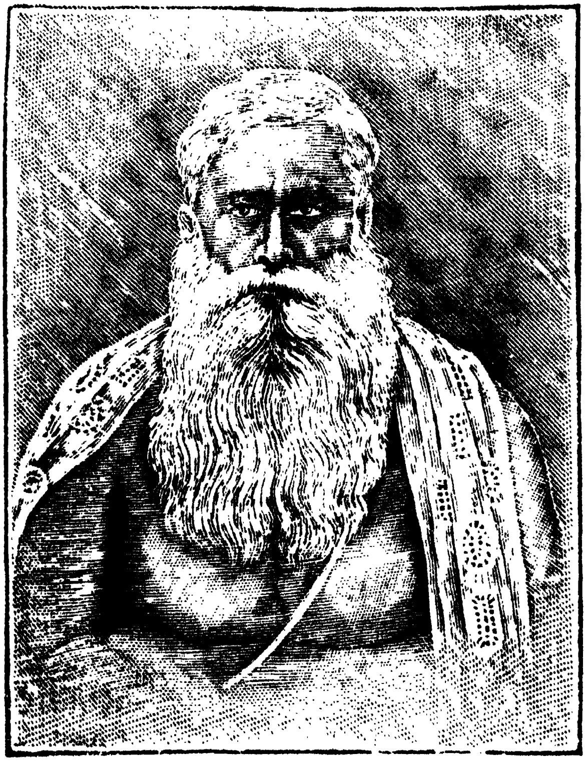

হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

অর্থোপার্জ্জন অনেকেই করেন বটে, কিন্তু তাহার সদ্ব্যবহার করিতে বড় বেশী লোককে দেখা যায় না। কিন্তু এ এ বিষয়ে হরিনারায়ণ বাবু আদর্শ স্থানীয় ছিলেন। স্বোপার্জ্জিত অর্থের কিরূপে সদ্ব্যয় করিতে হয়, তাহা তিনি যেমন জানিতেন, এমন বড় বেশী দেখি না। বহু লোক-হিতকর কার্য্যে তিনি প্রচুর অর্থ দান ও ব্যয় করিয়া অর্থোপার্জ্জনের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃত কুলীনের লক্ষণ তাঁহাতে যেমন প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এমন আজ কাল বড় একটা দেখা যায় না। তাঁহার ন্যায় সদাচারী, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, দানশীল ব্যক্তি ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। বীরভূম, চক্রেশ্বর তীর্থে ৺কালী মন্দির ও ৺কালীমাতার প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে তিনি যেরূপ সমারোহ ও দান ধ্যান করিয়াছিলেন তাহা দেখিয়া আমাদের যে কি পর্য্যন্ত আনন্দ হইয়াছিল, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারি না। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

৺কুমার নগেন্দ্র মল্লিক

বিগত ১২ই মাঘ চোরবাগানের পরলোকগত রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের পুত্র কুমার নগেন্দ্র মল্লিক মহাশয় পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি অত্যন্ত স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ও দয়াবান ছিলেন; চোরবাগানের মল্লিক বাড়ীর সর্ব্বজন-পরিজ্ঞাত সদাব্রতের প্রতিষ্ঠা তিনি অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন। দুস্থ আত্মীয়-স্বজন ও দায়গ্রস্তগণ তাঁহার সাহায্য হইতে কখনও বঞ্চিত হন নাই। তাঁহার পরলোকগমনে আমরা শোক প্রকাশ করিতেছি এবং তাঁহার পুত্রের ও আত্মীয়গণের শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

চিত্র-পরিচয়

উমা শিবের আরাধনায় যাইবার সঙ্কল্প করায় মেনকা তাহাকে সঙ্কল্প হইতে নিরস্ত করিবার উদ্দেশ্য পর্ব্বতের নানাপ্রকার ভীতপ্রদ ঘটনার উল্লেখ করেন ও কন্যাকে ঐ সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে বলেন। উমা তখন নিজের পরিচয় দিয়াই মেনকাকে নিশ্চিন্ত হইতে বলিতেছেন। এই সংখ্যায় যে চিত্র প্রকাশিত হইল, তাহাতে উমা যে মেনকাকে সান্ত্বনা দিতেছেন, সেই ভাবটিই চিত্রশিল্পী ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

পুস্তক-পরিচয়

তপস্যার ফল

শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ; মূল্য দেড় টাকা।

অনেক দিন পরে সুলেখক ফকির বাবুর নূতন বই প'ড়লাম। বোধ হয় দীর্ঘকাল তপস্যার পর বইখানি লিখিয়াছেন বলিয়াই গ্রন্থকার পুস্তকের এই নামকরণ করিয়াছেন। তাঁহার তপস্যার ফল ফলিয়াছে ; বইখানি বেশ হইয়াছে বইখানি পড়িতে-পড়িতে আমাদের ভয় হইয়াছিল, লেখক ললিতাকে না জানি কি করিয়া বসেন,—হয় ত হরসুন্দরের সহিত তাহার বিবাহ দিয়া ফেলেন। কিন্তু দেখিলাম, ফকির হইলেও তিনি ক্ষণিক মোহে অভিভূত হন নাই,—ললিতাকে ঠিক পথে, একবারে শেষ মুহূর্ত্তে, লইয়া ফেলিয়াছেন। ইহা সত্য সত্যই তপস্যার ফল।

আলেয়ার আলো

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় লিখিত ; দাম এক টাকা ছয় আনা।

'আলেয়ার আলো' যখন 'ভারতী' পত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশিত হইত, তখনই আমরা উহা পড়িয়াছিলাম। এখন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ায় পুনরায় পড়িলাম। পূর্ব্বেও যাহা মনে হইয়াছিল, এখন একসঙ্গে পড়িয়াও তাহাই মনে হইল—হেমেন্দ্র বাবুর গল্প লিখিবার শক্তি বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। তিনি কেমন বিনা আড়ম্বরে তন্ন-তন্ন করিয়া কথাগুলি বলিয়া যান এবং সে কথাগুলি কেমন সুসঙ্গত ও আখ্যানভাগের উপর তাহাদের কেমন প্রভাব, তাহা এই বইখানি পড়িলেই সকলে বেশ বুঝিতে পারিবেন। সরমার চরিত্র-চিত্রণে লেখক বিশেষ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন। হরেন্দ্রের চরিত্রও অতি সুন্দর ভাবে ফুটিয়াছে।

ব্যবহারিক-মনোবিজ্ঞান

শ্রীশরচ্চন্দ্র ব্রহ্মচারী এম-এ, বি টি প্রণীত ; মূল্য তিন টাকা।

মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় আর কোন পুস্তক ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না ; আমাদের মনে হয়, এইখানিই এ সম্বন্ধে প্রথম গ্রন্থ। তাই আমরা ব্রহ্মচারী মহাশয়কে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি। বইখানির আদ্যন্ত পাঠ করিয়া যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে মনে হয়, মনস্তত্ত্ব বিষয়ে এখন পর্য্যন্ত যাহা আলোচিত হইয়াছে সে সমস্ত তথ্যই এই পুস্তকে নিবদ্ধ হইয়াছে। মনোবিজ্ঞানের তথ্য নির্দ্ধারণের দুইটি পথ,—প্রথম, অনুসন্ধান দ্বারা নিজের মানসিক ক্রিয়ার সম্যক্ পর্য্যবেক্ষণ ; দ্বিতীয়, বাহ্য অভিব্যক্তির সাহায্যে অপরের মানসিক ক্রিয়ার পরীক্ষা এবং অনুমানের সাহায্যে তদীয় মনস্তত্ত্বাবধারণ। অর্থাৎ প্রথমটি অন্তর্দৃষ্টি, দ্বিতীয়টি পদার্থ-অনুমান-প্রণালী। ব্রহ্মচারী মহাশয় মহাজন-অনুসৃত এই দুইটী পন্থা অবলম্বন করিয়া এই পুস্তকখানি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। লেখক মহাশয় এই পুস্তকে কেবল প্রতীচ্য মনীষিগণের গবেষণার কথাই বলেন নাই, প্রাচ্য মনোবিজ্ঞানের তত্ত্বসমূহও গ্রহণ করিয়াছেন এবং স্বাধীন ভাবে তাহার আলোচনা করিয়াছেন ; সেই জন্য পুস্তকখানি আরও উপাদেয় হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সকল ছাত্র মনোবিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন, এই পুস্তকখানি তাঁহাদের কাজে ত লাগিবেই ; যাঁহারা সারবান গ্রন্থপাঠ করিতে ভালবাসেন, তাঁহারাও এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিবেন। ইহাকে আমরা বাঙ্গালা ভাষার একখানি সুন্দর অলঙ্কার বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করিতেছি।

ভক্ত-চরিতমালা

শ্রীশশিভূষণ বসু প্রণীত ; মূল্য দুই টাকা।

রাজা রামমোহন রায়, শ্রীগৌরাঙ্গচরিত প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু মহাশয়ের ন্যায় সাধু ভক্তের নিকট ভক্ত-চরিতমালার মত গ্রন্থই আমরা আশা করি। তিনি আমাদের আশা পূর্ণ করিয়াছেন। প্রথমভাগে দশটী ভক্তের ও দ্বিতীয় ভাগে সাতটী ভক্তের চরিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। চরিত-কথা লেখা বড়ই কঠিন ; কারণ, তাহার জন্য অনেক আয়াস স্বীকার করিতে হয়। আবার, ভক্ত চরিত-কথা লেখা আরও কঠিন ; কারণ তাহার জন্য সাধনার প্রয়োজন,—অকৃত্রিম ভক্তির প্রয়োজন। ভক্ত না হইলে ভক্তের জীবন-কথা যথাযথ ভাবে লিপিবদ্ধ করা যায় না। শ্রীযুক্ত শশীবাবু সাধক ও ভক্ত, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই ভক্ত-চরিতমালা। যেমন করিয়া বলিলে ভক্তের কথা বলা ঠিক হয়, শ্রদ্ধেয় লেখক মহাশয় তেমন করিয়াই বলিয়াছেন, তেমনই সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন। আমরা বাঙ্গলা সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকাগণকে এই পুস্তকখানি পাঠ করিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি।

ব্রাহ্মণ-পরিবার

শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত ; মূল্য আট আনা।

এখানি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-প্রকাশিত আট-আনা-সংস্করণ গ্রন্থমালার পঞ্চত্রিংশ গ্রন্থ। ইহাতে ব্রাহ্মণ-পরিবার, উৎসর্গ, গৃহপ্রবেশ, আত্মসম্পাত ও আদর্শ এই পাঁচটী ছোট গল্প আছে ; ইহার মধ্যে তিনটি ইতঃপূর্ব্বে 'ভারতবর্ষে', প্রকাশিত হইয়াছিল এবং সে সময়ে পাঠকগণ গল্প কয়েকটির প্রশংসাও করিয়াছিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় গল্প কয়েকটিতেই নিষ্ঠাবান হিন্দু গৃহস্থের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন এবং চিত্রগুলি বেশ সুন্দর হইয়াছে। নূতন লেখক হইলেও তাঁহার বর্ণনায় আতিশয্য নাই,—যেখানে যেটুকু দরকার, তাহাই তিনি বলিয়াছেন। গল্পগুলির ভাষাও সরল ও মনোজ্ঞ। এই গ্রন্থমালার অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় এখানিও সমাদর লাভ করিবে বলিয়া আমাদের আশা আছে।

পিতৃ-বিলাপ কাব্য

শ্রীহৃষীকেশ দত্ত প্রণীত ; মূল্য এক টাকা ; বাঁধাই ১৷৹

এখানি কতকগুলি খণ্ড কবিতার সমষ্টি, সুতরাং এখানিকে কাব্য নামে অভিহিত না করিলেই ভাল হইত। সুধী, সুলেখক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় এই পুস্তকের একটী বিস্তৃত ভূমিকা লিখিয়াছেন। ভূমিকা-লেখক সত্যই বলিয়াছেন যে, গ্রন্থকার কতকগুলি খণ্ড-কবিতার সাহায্যে একটা মর্ম্মস্পর্শিনী গাথা রচনা করিয়াছেন। আমরা এই পুস্তকের কয়েকটী কবিতা পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছি ; গ্রন্থকারের কবিত্বশক্তি আছে। তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রাণের কথা। সেইজন্যই কবিতাগুলি আমাদের এত ভাল লাগিয়াছে।

সাহিত্য-সংবাদ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম-এ প্রণীত 'কপালকুণ্ডলা-তত্ত্বের' দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই সংস্করণে গল্পের গঠন—নামক একটী নূতন অংশ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে ও একটি বিষয় সূচি প্রদত্ত হইয়াছে।

আগামী গুড্ ফ্রাইডের ছুটিতে, ১৩২৬ সালের ৬ই ও ৭ই বৈশাখ হাওড়া সহরে "বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে"র দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশন হইবে। সেই সঙ্গে সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ক একটি প্রদর্শনী (Exhibition) হইবে। যাঁহারা সম্মিলনে পাঠের জন্য প্রবন্ধ লিখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অনুগ্রহ-পূর্ব্বক প্রথমে, প্রবন্ধের বিষয়টি শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়কে (সম্পাদক—অভ্যর্থনা সমিতি। "বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন," হাওড়া) জানাইবেন, এবং ১৫ই চৈত্রের মধ্যে প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি তাঁহাকে পাঠাইয়া দিবেন। যাঁহারা প্রদর্শনীর জন্য দ্রষ্টব্য সামগ্রী পাঠাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারাও অনুগ্রহ করিয়া তদ্বিবরণ সত্বর তাঁহাকে জানাইবেন এবং নির্দ্দিষ্ট দিবসের পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য-সামগ্রী পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন। যাঁহারা প্রতিনিধিরূপে সম্মিলনের কার্য্যে যোগদান করিতে চাহেন, তাঁহারাও যত সত্বর সম্ভব, পত্রদ্বারা আপনাপন অভিমত জানাইবেন। বিদুষী মহিলাগণের জন্যও এই সম্মিলনে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হইতেছে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শাখা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় লিখিয়াছেন, "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি কর্ত্তৃক স্থির হইয়াছে যে, বর্ত্তমান বর্ষের চৈত্র মাসে বাঙ্গালা সংবাদপত্রের শত-বার্ষিক জন্মোৎসব হইবে। এই উৎসবের আয়োজনাদি করিবার জন্য উক্ত কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি কর্ত্তৃক এক শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে। এই শাখা-সমিতির এক অধিবেশনে স্থির হইয়াছে যে, কলিকাতা ও মফঃস্বলের সমস্ত বাঙ্গালা সংবাদপত্র ও অন্যান্য সাময়িক পত্রিকার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সংগ্রহ করিতে হইবে। তদনুসারে আপনাকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে অনুরোধ করিতেছি যে, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনার সম্পাদিত পত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও আপনার বিদিত এবং আধুনালুপ্ত অন্যান্য বাঙ্গালা সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিয়া আমাদের নিকট পাঠাইবেন। এই উপায়ে আপনাদের সাহায্যে বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র ও অন্যান্য সাময়িক পত্রিকাসমূহের একটি সম্বদ্ধ ধারাবাহিক ইতিহাস সঙ্কলিত হইলে, এই শত-বার্ষিক উৎসবের উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে সফল হইবে। এই প্রসঙ্গে আরও জানাইতেছি যে, উক্ত উৎসবে একটি প্রদর্শনী খোলা হইবে। সেই প্রদর্শনীতে সকল বাঙ্গালা সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা কিম্বা সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন যে সংখ্যা পাওয়া যাইবে তাহা প্রদর্শিত হইবে এবং তাহা সযত্নে পরিষদে রক্ষার ব্যবস্থা হইবে। আশা করি, আপনি আমাদিগকে অনুগ্রহ-পূর্ব্বক এ বিষয়ে সাহায্য করিবেন। আগামী ৩০শে ফাল্গুনের মধ্যে উক্ত বিবরণী প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া দিলে বিশেষ বাধিত হইব।"

সুলেখক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক অনূদিত মহাকবি সেক্সপীয়রের 'ওথেলো' নাটক ষ্টার-রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতেছে। নাটকখানি শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত ব্রজমাধব দাস প্রণীত সচিত্র 'বিয়ের ক'নে' প্রকাশিত হইয়াছে; উৎকৃষ্ট বাঁধাই, মূল্য পাঁচ সিকা।

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত বিদ্যাধরী প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ।৵০

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত সচিত্র সারনাথের ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ১।০

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র গুপ্ত কবিরাজ সঙ্কলিত অশ্ব-বৈদ্যক প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ৩৲

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত মতিভ্রম প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ১।০

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works,
9, Nanda K. Chaudhuri's 2nd Lane, CALCUTTA.

বৈশাখ, ১৩২৬

দ্বিতীয় খণ্ড]   ষষ্ঠ বর্ষ   [পঞ্চম সংখ্যা

ভারতবর্ষে নববর্ষ

[শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী]

(১)

হে ভারত, এল এ নববর্ষ   নিয়ে পুরাতন তব আদর্শ,
এ-পারে, ও-পারে, স্বজাতি, বিজাতি, সকলেই ভাই-ভাই !
কি গভীর ভাব, কি উদার ভাষা,   বিরাট মনন, বিশাল পিপাসা,
এ কল্পনা-পায়ে আপনা বিকায়ে দুরাশা লুটায় তাই !

দেশহিত ছলে পরস্ব-হরণে   বলের উষ্মায় দুর্ব্বল পীড়নে
বিপ্লব-বিকারে মানুষ-শিকারে পারিবে না যেতে কেহ !
জয়-তাণ্ডব কে বিদেশী নাশে,   ভারত-ভারতী জগতে বিকাশে,
মানুষ ত নয় একেলার লাগি,— হৃদয় সবার গেহ !

ধর্ম্মের গ্লানি হেরি' সকাতরে নামিল ভারত জগৎ-সমরে,
মোহিয়া প্রতীচী দধিচীর তেজ শত-শত প্রাণে জ্বালি !
হিমাদ্রি হইতে কুমারী অবধি দেশদেশান্তরে গাহিল জলধি,
ভারত জিনিল জগতের রণ বুকের শোণিত ঢালি'।

শান্তি-প্রভাতে শক্তি-সভাতে ঘোষিল গরবে নূতন বর্ষ,
সকলের সাথে জয়-ফল নিতে আসিছে বিজয়ী ভারতবর্ষ !

(২)

সুরা-অংশ নিয়ে এ যেন অন্ধ মাতালে-মাতালে নিদয় দ্বন্দ্ব,
সকলেই কয়,—মোরে দয়াময়, দাও জয়-পুরস্কার !
চূর্ণ ধর্ম্ম-মঠ, কীর্ত্তি-সৌধ যত কলা, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ব্যাহত,
নরঘাতী যন্ত্রে শুধু রসায়ন-বিজ্ঞানের আবিষ্কার।

স্বাধীনতা ম্লান, সভ্যতা বিলীন, ব্যাধি অনশনে নগর বিপিন,
মানব দানব অট্ট হাসিয়া যুগের শ্মশানে নাচে !
মানবী দানবী ! মাতৃত্বের লয় ! কাঁদিল বিদেশী সাধুর হৃদয়,
জগতের নাশে ভারতের ভাষে মুঢ়পাশে শান্তি যাচে।

বলে,—এ ধরণী জননী সবার, বিশ্ব-মানব এক পরিবার,
দাস কেহ নাই, এসেছে সবাই সম-অধিকার নিয়ে।
হিমাদ্রি হইতে কুমারী অবধি দেশদেশান্তরে গাহিল জলধি,
ভারত জিনিল জগতের রণ দেহের অস্থি দিয়ে !

শান্তি-প্রভাতে শক্তি-সভাতে ঘোষিল গরবে নূতন বর্ষ,—
সকলের সাথে জয়-ফল নিতে আসিছে বিজয়ী ভারতবর্ষ !

(৩)

হেরি রক্ত-গঙ্গা কুরুক্ষেত্রে কবি কৃষ্ণবর্ণ সজল নেত্রে
শান্তি-মন্ত্রে রণ-তন্ত্রের ভ্রান্তি করিল শেষ !
শ্বেত-জনপতি সেই সুরে গায়, বধিরের সভা হাসিয়া উড়ায়,-
আদর্শের তরে সে যে অস্ত্র ধরে তাই ছাড়ি উপদেশ !

জলে-স্থলে যুদ্ধ, কামানে-কামানে,		শূন্যে রণ ক্রুদ্ধ বিমানে-বিমানে,
নিবারিল বীর বিশ্ব-অরাতির জগৎ-জিগীষা ঘোরা !
অসি কেড়ে ধ্বনে,—মনে মন জিনে,		বন্দী কে হয় প্রেম-ফাঁদ বিনে !
করুণার সিন্ধু জগতের বন্ধু এ কোন্ পাগল গোরা !

জয়ীর নিঠুর ধর্ম্ম উড়ায়ে,		জিতের বিধুর মর্ম্ম জুড়ায়ে,
সফল করিল গীতার স্বপন,—প্রতীচীর ঋষি কে এ !
হিমাদ্রি হইতে কুমারী অবধি		দেশদেশান্তরে গাহিল জলধি,—
ভারত জিনিল জগতের রণ দেহের অস্থি দিয়ে।

শান্তি-প্রভাতে শক্তি-সভাতে		ঘোষিল গরবে নূতন বর্ষ,—
সকলের সাথে জয়-ফল নিতে আসিছে বিজয়ী ভারতবর্ষ !

(৪)

বরি, ডরি তোমা, হে জনসঙ্ঘ,		অনাদি অনন্ত প্রাণ-তরঙ্গ,
তুমিই সাধনা, তুমিই সাধক, জগতের কর্ণধার।
ভস্ম-নিপাতি ও পূত-রুধির,		'কৈসর', 'জার', 'নীরো', ও 'নাদির'
বুদ্ধ, নানক, ঈশা, মহম্মদ তোমা সেবি' অবতার !

জন-নারায়ণে করিয়া সারথী		ক্রমোন্নতি-পথে জগতের গতি,
ধরার স্বামিত্ব কারও নিজ বিত্ত এ যুগে কি হ'তে পারে ?
মাধব মাসের প্রথম দিবস		শুভ বরষের যাত্রা-কলস
অভয়ে বরিয়া বিজয়ে ভরিয়া সাজায় ভারত-দ্বারে !

হে ভূ-স্বর্গ, ওগো দেবোপম জাতি,		পাশব বলের দম্ভে আঘাতি
এ প্রলয় তাঁর, খুলিতে তোমার মুক্তি-দুয়ার খালি।
হিমাদ্রি হইতে কুমারী অবধি		দেশ-দেশান্তরে গাহিল জলধি,
ভারত জিনিল জগতের রণ বুকের শোণিত ঢালি !

শান্তি-প্রভাতে শক্তি-সভাতে		ঘোষিল গরবে নূতন বর্ষ,
সকলের সাথে জয়-ফল নিতে আসিছে বিজয়ী ভারতবর্ষ !

পুরাতন ও নূতন বাঙ্গালা সাহিত্য

[অধ্যাপক শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়, এম-এ]

পুরাতন মন্ত্য, পুরাতন বন্ধু, পুরাতন পাদুকা—এ সব বড় আদরের জিনিস। প্রথমটির সম্বন্ধে আমার কিছুই বলিবার ক্ষমতা নাই। শেষোক্ত দুইটীর সম্বন্ধেই বা আপনাদিগকে কি বলিব? জলের সঙ্গে জল যেমন অনায়াসে স্ব-স্ব অস্তিত্ব লোপ করিয়া মিশিয়া যায়, পুরাতন বন্ধু-সমাগমে তেমনি করিয়া আমরা আত্ম-সত্ত্বা হারাইয়া ফেলি। আর পুরাতন পাদুকা—আমাদের অধমাঙ্গের সঙ্গে কেমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত, তাহা সহসা পরের পাদুকা-সংস্পর্শেই স্ফুটতর হইয়া উঠে।

সভ্যতার লক্ষণই এই যে, পুরাতনে ফিরিয়া যাওয়া। ইহার অর্থ এ নয় যে, কেবলই পিছাইয়া পড়া। পুরাতনের সংস্পর্শে নূতন ও বর্ত্তমান সজীব, প্রাণময় ও প্রকট হইয়া উঠে। পুরাতন আমাদের নজীর। যৌবনান্তে যখন 'অঙ্গং গলিতং ষাতং তুণ্ডং' হইয়া পড়ে, তখন কঠোর যষ্টি-মধুর মত, আপাত-নীরস হরিতকী বা ইক্ষুগ্রন্থির মধুর রসের মত—সেই পুরাতন বার্দ্ধক্য আসন্ন-মরণের আগমন-প্রতীক্ষায় মধুর, রাগোজ্জ্বল ও মনোহারী হয়। পুরাতন গুড়, পুরাতন ঘৃত, পুরাতন চাউল, পুরাতন ভৃত্য, পুরাতন স্মৃতি, পুরাতন বাস্তুভিটা, পুরাতন বই, পুরাতন কাহিনী—হিন্দু-জীবনে এ সকলের মহিমা, শক্তি, আকর্ষণ ও মূল্যের বিষয় আপনারা বিশেষ অবগত আছেন। কিন্তু তথাপি কোন্ সাহসে ও কোন্ শক্তিবলে আপনাদের সমক্ষে আজ আমি গোটাকয়েক পুরাতন কথা শুনাইতে দণ্ডায়মান হইয়াছি, তাহা আমি নিজেই বুঝিতে পারিতেছি না। আপনাদের বক্ষে মহাপ্রাণ; চক্ষে মহতী বিভা; সর্ব্বাঙ্গে সুবর্ণ-জ্যোতিঃ; আপনারা অমৃত;—আপনাদের সকলের মধ্যে পুঞ্জীভূত দেবশক্তি আমার সহায় হউক; সমিতির সারস্বত দেবতা আমার সহায় হউন; আমি আজ কয়েকটী পুরাতন কথা যেন আপনাদিগকে শুনাইতে পারি।

আমরা প্রত্যহ খবরের কাগজে পড়ি যে, সমগ্র য়ুরোপে একটা প্রবল বন্যা সম্প্রতি ছুটিয়া আসিতেছে। তাহার উদ্ভব রাশিয়ার কোনও বিজন প্রান্তরে—সেখান হইতে সেই স্রোত নানা নদ-নদী, সাগর-মহাসাগরের সঙ্গে মিলিত হইয়া এমন এক ভীষণ momentum ধারণ করিয়াছে যে, তাহার তাড়নায় সমগ্র রাজশক্তি বিপর্য্যস্ত ও পর্য্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে। এই স্রোতের নাম Bolshevism;—ইহার ভগীরথ রাশিয়ার জন-নেতা Lenin ও Trotzky। ইহাদের আবাহন-মন্ত্র এই;—'পুরাতন বন্ধন ঘুচাইয়া দাও,—পথের ভিখারীর সঙ্গে রাজকুমারীর বিবাহ দাও,—আভিজাত্য-গৌরব মুছিয়া ফেল। যাহারা জমি চাষ করিয়া খায়, তাহারা কোন অংশেই সম্রাটগণের অপেক্ষা হীন নহে। সমাজ-শক্তি, রাষ্ট্র-শক্তি—কোনটীই রাজ্যের উন্নতিকল্পে সমীচীন ও প্রকৃষ্ট পন্থা নহে। জাতীয়তার মূলে নির্ব্বাচন-প্রথা ও লোকমত-সংগ্রহ। এই নির্ব্বাচন-প্রথা ও লোকমত-সংগ্রহে রাজা-প্রজার সম্বন্ধ নিশ্চিহ্ন করিয়া মুছিয়া দাও। সমগ্র পৃথিবীর ললাটে এই মহাবাণী রক্তের অক্ষরে লিখিয়া দাও—'শিবোঽহং। নান্যঃ কোঽপি সমান-ধর্ম্মা।' 'আমি শিব—আমার সমানধর্ম্মা কেহ নাই।'

এই রাজনৈতিক মতের সঙ্গে আমার বক্তব্য বিষয়ের একটু বিশেষ সম্বন্ধ আছে। পৃথিবীর বড়-বড় রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রতত্ত্ববিশারদ যাঁরা—তাঁরা বলেন যে, এই বলশেভিজিমের স্রোত কালক্রমে সমগ্র ভূমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হইবে। ব্যাপারটী ঠিক পুরাণ-কথিত আসন্ন প্রলয়ের মত, কিংবা বাইবেল-বর্ণিত মহাপ্লাবনের মত। কিন্তু এই রাজনৈতিক মন্ত্রের যে একটুও সার্থকতা নাই, এমন কথা বলিতে পারি না। সকল উচ্ছ্বাসের মূলেই একটী নীতি আছে;—বলশেভিষ্টদের নীতি ঢালিয়া-সাজা বা ভাঙ্গিয়া-গড়া। পুরাতনের ধ্যান, ধারণা ও সমাধির ফলে জাতীয়তা অহল্যার মত পাষাণ হইয়া পড়িয়াছে। লেনীন্ ও ট্রট্স্কী শ্রীরামচন্দ্রের মত এই জড়ীভূত জাতীয়তাকে সজীব করিয়া, পুরাতন ও নূতনের মাঝখানে একটী প্রকাণ্ড প্রণালী খনন করিতে চাহেন।

ধীরে-ধীরে, অলক্ষিতে জগতের সাহিত্যে এই ভাবের প্রেরণা ফুটিয়া উঠিতেছে। সাহিত্যের কার্য্য সৃষ্টি করা, কি

আনন্দ দেওয়া,—ইবসেনিজম্, কি শা-ভিজম্, বস্তুতান্ত্রিক হওয়া, কি হাওয়াই প্রাসাদ গড়া,—সত্য, শিব, সুন্দরের খবর দেওয়া, কি ভাষার গোলক লইয়া লোফালুফি করা—আমি এ সব আলোচনা করিব না। আমরা পুরাতন সাহিত্যের সঙ্গে নূতন সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইব, তাহাই দ্রষ্টব্য। কারণ, সাহিত্য কখনও সমালোচকের আদেশে গঠিত হয় না। ইহার স্বৈর-গতি,—দাবার চালের মত। বঙ্কিমচন্দ্রকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা-নীতির দ্বারা, বা রবীন্দ্রনাথকে লেকচারের দ্বারা ঠেকাইয়া রাখা যায় না। এই পুরাতন ও নূতন সাহিত্যের আলোচনায় আমরা যে ধ্বংসবাদী নীতি দেখিতে পাইব, তাহারই নাম দিব—সাহিত্যে বল্‌শেভিজ্‌ম্।

পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যের লক্ষণ ছিল—একটা প্রচলিত convention বা প্রথার চারিদিকে কেন্দ্র করিয়া ঘোরা। ইহাতে পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিসর সহজেই সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তাই সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্যে, এমন কি, পুরাণ-সাহিত্যেও 'কানু ছাড়া গীত নাই।'—সেইখানেই আদি, সেইখানেই অন্ত। ধর্ম্মই সমাজের ও সাহিত্যের একমাত্র বন্ধন-রজ্জু ছিল। এই হিসাবে পুরাতন বঙ্গ-সাহিত্যে বড় বেশী বৈচিত্র্য নাই। সকল দেশের সাহিত্যেই একটা বিশেষ লক্ষণ আছে। তাহা এই যে, সাহিত্য বর্দ্ধন-শীল, progressive—ইহা ঠিক পৃথিবীর আহ্নিক-গতির মত অলক্ষিতে অগ্রসর হয়। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতচন্দ্রের যুগ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যে জ্ঞাতব্য ও পঠিতব্য বিষয় যথেষ্টই আছে; কিন্তু ইহাতে যে আধুনিক যুগের বিরাট প্রশ্ননিচয় ও তাহার সমাধান-চেষ্টা নাই, তাহার জন্যও আক্ষেপ করিবার বড় বেশী অবকাশ দেখি না। কারণ, সাহিত্যের গতি পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপরও নির্ভর করে। ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের ফলে সমাজ-বন্ধন ক্রমে শিথিল হইয়া আসিল। ভারতচন্দ্রের পরবর্ত্তী রামমোহন রায়ের যুগকে আমি 'পরিবর্ত্তনের যুগ'—age of transition বলিব। এই যুগ মাইকেল মধুসূদনের যুগে আসিয়া পড়িয়াছে। ভারত-চন্দ্র, রামপ্রসাদ, মদনমোহন, অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি ক্রমে ভাষা ও ভাবের মধ্যে একটা প্রকাশের ক্ষমতা—power of expression—আনয়ন করিলেন। মধু-সূদন কাব্য-জগতে League of Nations স্থাপন করিয়া প্রেসিডেন্ট্ উইলসনের মত দেখাইলেন যে, সাহিত্য স্বকীয় রূপ বজায় রাখিয়াও ডিমোক্রাটিক হইতে পারে। এ ক্ষেত্রে নানাবিধ ভাষার সহিত তাঁহার নিগূঢ় পরিচয় যথেষ্ট কার্য্যকর হইয়াছিল। এই আন্তর্জাতিক ভাবের অবাধ আমদানি (internationalisation) বঙ্গভাষাকে নমস্য ও বরেণ্য করিয়া দিল। তখন 'বঙ্গদর্শনের' উদীয়-মান আলোকরেখা-পাতে দেশের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও চিন্তা-শক্তি নূতন প্রাণ লাভ করিল। বঙ্কিমচন্দ্রের সময় হইতে রবীন্দ্রনাথের যুগই বাঙ্গালা সাহিত্যের বর্ত্তমান যুগ।

এই যুগের প্রধান লক্ষণ এই যে, সাহিত্যের বস্তু আর সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে নিবদ্ধ নাই। সঙ্গীতে, কাব্যে, নাটকে, আখ্যানে—এখন সেই পূর্ব্ব-প্রচারিত ধর্ম্মমতের প্রকাশই সাহিত্যের একমাত্র উপজীব্য নহে; সাহিত্যের গতি এখন বহুমুখী। বিগত পঞ্চাশৎ বৎসরে আমাদের বঙ্গ-সাহিত্য সর্ব্ব বিষয়ে সমৃদ্ধ, তরুণ ও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। সাহিত্যকে যদি একটা living organism বা প্রাণময় পদার্থ বলা যায়, তবে বলিব—আমাদের বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্য সর্ব্বরূপে পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়া যে অপরূপ, বিচিত্র ভূষায় সজ্জিত হইয়াছে, তাহা যে কোন্ দেশীয় পরিচ্ছদ, তাহা বুঝিবার উপায় নাই।—ইহা বর্ত্তমান internation-alisationএর ফল। গল্পে কথিত এক ব্রাহ্মণ-যুবক একবার এইরূপ বিচিত্র পরিচ্ছদে শোভিত হইয়া উৎসব-গৃহে নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদের অশেষ বিস্ময় উৎপাদন করিয়া-ছিল। যখন কোনও অপরিচিত ভদ্রলোক তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিল, তখন সে বলিল, 'মহাশয়গণ, আমার নাম ইব্রাহিম—আমি না ইংরেজ, না ব্রাহ্মণ, না হিন্দু, না মছল-মান,—অথচ এই চারি জাতির সমন্বয়েই আমি ই—ব্রা—হি—ম। গল্পে কথিত এই ভদ্র যুবকটীর মত, আমাদের বর্ত্তমান বঙ্গ-ভাষাকে যদি আমি 'ইব্রাহিম ভাষা' বলি,—আশা করি, তাহা হইলে আপনারা ক্রুদ্ধ হইবেন না। বায়োস্কোপের ছায়াবাজির মত, গানের সুরের মত, নদীর বীচিমালার মত, এই জীবন ক্রমাগতই অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। ইহার যতি নাই, শেষ নাই। জীবনের ধর্ম্মই এই যে, ইহা dynamic বা গতিশীল। জীবনের এই dynamic ভাব—জীবন-মুকুর সাহিত্যেও প্রতিফলিত

হইয়াছে। আমাদের সাহিত্য dynamic বলিয়াই আজ তাহা 'ইব্রাহিম'—সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের আক্ষেপের কারণ কি আছে?

কিন্তু সম্প্রতি—শুধু সম্প্রতি কেন, ক্রমাগতই—আমাদের পিতৃপিতামহগণ আমাদিগকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিতেছেন, 'বাপু হে, বিলাতী লেখাপড়া ত' শিখিলে, কিন্তু এদিকে জাতি, ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য—সব যে Patel's Billএ ভাসিয়া যায়! সদর দুয়ারে আগড় দিয়া 'বাঙ্গালা সাহিত্য' বলিয়া গগনবিদারী চীৎকার করিলে কি হইবে—ওদিকে যে খিড়কীর দিকে সর্ব্বনাশ! 'ত্রিসন্ধ্যা যাজন, ভজন-সাধন ত' অনেক দিন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমুখের পুকুরে ভাসাইয়া দিয়াছ,—এখন জাতির কৌলিন্য-মর্য্যাদা যে যায়! তার উপায় কি?'

বংশানুক্রম মানিয়া লইলেও, কোনও অংশে আমরা আমাদের পিতৃপিতামহগণের অপেক্ষা অধিক সত্যদর্শী, এমন কথা আপনারা কেহই মানিবেন না। সুতরাং তাঁহাদের এই আক্ষেপের মূলে কিছু সত্য আছে কি না, তাহা দেখিতে হইবে। জাতি, ধর্ম্ম ও সমাজের কথা তুলিব না—কেবল সাহিত্য-ক্ষেত্রে বর্ত্তমান বিপ্লবের ভাবটুকু হৃদয়ঙ্গম করিলেই চলিবে।

বর্ত্তমান যুগের বাঙ্গালা সাহিত্যে একটা অবসাদ আসিয়া পড়িয়াছে। এটাকে 'চর্ব্বিত-চর্ব্বণের' যুগ বলা যায়। মাসান্তে পত্রিকাগুলি তাহাদের পরিচিত রূপ লইয়া প্রায়ই যথা-সময়ে হাজির হয়,—তাহাতে যথার্থ কবিতার বড় একটা সন্ধান মেলে না। কবিতা লিখিবার ও পড়িবার সামর্থ্য ও সুবিধা আমাদের বর্ত্তমান দৈনন্দিন জীবনে বড়ই অল্প। যাহা আছে, তাহা সনেট, ব্যঙ্গ-কবিতা, ছোট গল্প, ভ্রমণ-কাহিনী ও সমালোচনা পাঠেই ব্যয়িত হয়। অধুনা প্রত্নতত্ত্বে ও ভাষাতত্ত্বে বাঙ্গালীর মন মজিয়াছে। কিন্তু আর বাঙ্গালীকে সমালোচনায় ঠেকাইতে পারা যায় না। লিখিলেই ছাপানো যায়, চেষ্টা করিলে পকেটেও কিছু আসিতে পারে।—এমত অবস্থায় আমাদের শুভার্থিগণের আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ আছে। আমরা বাঙ্গালা সাহিত্যে নিরীশ্বরবাদী,—আমাদের standard বা মান নাই; আমাদের ভাষার ও জীবনের যথার্থ ইতিহাস নাই,—পুরাতনের উপর সে ভক্তিশ্রদ্ধা, সে অনুরাগ নাই। সত্যই সাহিত্যে বল্‌শেভিজিমের জোয়ার আসিয়াছে। আমাদের পোষাক ও ভাষা ইংরেজী, ভাব ও রং বাঙ্গালা, ধর্ম্মমত বৌদ্ধ বা ব্রাহ্ম, আচার মুসলমানী। সুতরাং এ ক্ষেত্রে ভয়ের কারণ যথেষ্টই আছে।

একদল বলেন, 'সাহিত্য কি চিরকালই 'রমাকান্ত কামার' উচ্চারণ করিবে? জীর্ণ অট্টালিকায় বাস করিলে জীবন-নাশের সম্ভাবনা; সুতরাং 'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়' ঐ পুরাতন আবাস ত্যাগ কর।' আর একদল বলেন, 'জাতীয়তার উন্মেষ-সাধনে যেটুকু নূতনত্বের প্রয়োজন, তাহা ছাড়া সব বাতিল ও নামঞ্জুর। পুরানো কাঠামোয় তালি দাও ও আল্‌কাৎরা মাখাও।'

কোন দলেরই কোন সামঞ্জস্য বা আপোষ সহজে করিতে পারা যায় না। ইহার উপর বর্ত্তমান যুগের কয়েকটী গুরুতর প্রশ্ন আসিয়া সাহিত্যের ব্যাপার আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছে। তাহার মধ্যে একটী প্রশ্ন এই যে, লিখিত ভাষাকে কথিত ভাষা করিবে, না, শুদ্ধ বিদ্যা-সাগরী বা বঙ্কিমী ভাষা করিবে? ভাষার জড়তা ত' এক দিনে ঘুচিবার নহে। ভাব-প্রকাশের দাবী মানুষকে ক্রমাগতই ব্যাকরণ ভুলিতে বলিতেছে। ইহারই ফলে বিদ্যাসাগরী সংস্কৃত ভাষা সবুজ ও নীল হইয়া পড়িতেছে—ঠিক পেঁচোয় পাওয়া শিশুর মত।—গঙ্গার প্রবল প্রবাহে ঐরাবত ভাসিয়া চলিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সভ্যতার লক্ষণই পুরাতনে ফিরিয়া যাওয়া। যে পুরাতন মানে না, যে ফ্যাশানের দাস, সে নাস্তিক। ফ্যাশানে বা ক্ষণিক উত্তেজনায় সাহিত্য গড়িয়া উঠে না। অধুনা বাঙ্গালা সাহিত্যে বিলাতী আব্‌হাওয়ার ফলে ফ্যাশান ঢুকিয়াছে। মনুষ্য-হৃদয়ের বিশ্বজনীন ভাব-সমূহ যাঁরা অপূর্ব্ব ছন্দে সাহিত্যের ভিতর দিয়া প্রকাশ করেন, তাঁরাই সাহিত্য-জগতে অমর হইয়া থাকেন। যুগধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে, দেশাচার-নির্ব্বিশেষে আমাদের মনে যে ভাবরাজির সমান দাবী, সেই ভাবরাজির প্রকাশেই প্রতিভা। ক্ষণিক উত্তেজনায় ফেনিলোচ্ছল সুরার মত যে ভাব আত্মবিস্তার করে, মুহূর্ত্ত অন্তে আবার তাহা বাতাসে মিশিয়া যায়। বর্ত্তমান যুগের সাহিত্য অলঙ্কারে ও ভাবে সমৃদ্ধ হইলেও, তাহা জাতিত্বের মহিমা ও গৌরব বিস্মৃত হইতেছে। স্বীকার করি, শিক্ষা-বিস্তৃতির সঙ্গে-সঙ্গে

সাহিত্যেরও বিস্তৃতি অবশ্যম্ভাবী। এ হিসাবে অধুনাতন সাহিত্যের প্রভাব পূর্ব্বতন সাহিত্য অপেক্ষা অনেক বেশী। এই বিস্তৃতির ফলে বঙ্গ-সাহিত্যের বাহির হইতে গ্রহণের ক্ষমতাও ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। এ হেন যুগে সাহিত্যে সৃষ্টিকৌশল অসম্ভব। পরের গুণাগুণ দেখিতে গেলে সৃষ্টি করা চলে না। তাই ইহা সমালোচনার যুগ,--সৃষ্টির যুগ নহে।

সমাজেও যেমন আচার-রক্ষার প্রয়োজন, সাহিত্যেও তেমনি চাই—কারণ, সাহিত্যকে আমি প্রাণময় পদার্থ বা living organism বলিয়াছি। সেই আচারের নাম Standard ও জাতীয়তা বজায় রাখা। এই জাতীয়তা-রক্ষার মূলেই পুরাতন ও নূতনের সমন্বয়-নীতি বর্ত্তমান। এক দিকে বাঙ্গালা সাহিত্যের যেমন প্রচার ও সমাদর, অন্য দিকে তেমনি বিজাতীয় ভাব গুপ্ত ফল্গুধারার মত সাহিত্যে ও সমাজে অনুস্যূত হইতেছে। রাজা-মহারাজা, উকীল-ব্যারিষ্টার, অধ্যাপক-সিভিলিয়ান, এমন কি, বিদেশী ইংরেজের নিকট আজ-কাল বাঙ্গালা ভাষার যে সমাদর দেখি, তাহাতে মনে হয়, আমরা একটা মৌসুমী বাতাসের ভিতর দিয়া যাইতেছি।

আমাদের সমাজ-সমস্যা, রাষ্ট্র-সমস্যা, জীবন-সমস্যা যেমন সর্ব্বরূপে জটিল, গ্রন্থিল ও কুটিল হইয়াছে,—আমাদের সাহিত্য-সমস্যাও তেমনি। আমরা 'সবুজ পত্র' না 'সাহিত্যে'র দলে? আমরা পুরাতন সাহিত্যের কোন্ অংশটী জাতীয় জীবনে আবার ফিরিয়া পাইতে চাই? আমাদের Standard বা মান কি? সাহিত্যের নামে যে-সব ব্যভিচার মাসিকপত্রে, নাটকে ও উপন্যাসে নিত্য অভিনীত হইতেছে, সেগুলি স্যাভেঞ্জারে তুলিবে, না, ত্রিপত্রের মত গৃহদেবতার মস্তকে অর্পণ করিবে? আজ যে ধূয়া উঠিয়াছে—আমরা কোন বাধা মানিব না,—আমরা পূর্ব্বতন বংশধারা হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইব এবং সমাজ ও সাহিত্যকে সর্ব্বপ্রকারে নূতন আকার দান করিব,—সাহিত্যে এই যথেচ্ছাচার কতদূর সম্ভব? আমরা কোন্ পথের পথিক—এ যাত্রার শেষ কোথায়? বর্ত্তমানে আমাদের কর্ত্তব্য কি?

জগতে নূতন দৈবতার আবাহন-গান উদ্গীত হইতেছে—"পুরানো যা কিছু, ফেল তা মুছিয়ে।" ঐই গান সাত সমুদ্র তের নদীর পারে আসিয়া আমাদের কাণে পৌঁছিতেছে। আমাদের সাহিত্যে কি-ই বা ছিল, আর এখনই বা কথানা ভাল বই, ক'জন নামজাদা লেখক? বাঙ্গালা সাহিত্যের ত' পারম্পর্য্য নাই,—এটা প্রকৃতির বিকৃতি—amorphous growth—ইহার জন্য এত মাথাব্যথা কেন?—আমাদের সমাজে এমনতর indifferentist বা "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্ন-মনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ" একদল মুনিরও আবির্ভাব হইয়াছে। ভগবান আমাদিগকে এই অস্থিরধী মুনিগণের কবল হইতে রক্ষা করুন!

বর্ত্তমান সাহিত্য-প্রশ্ননিচয় কিরূপ জটিল, তাহা আপনাদিগকে বলিলাম। আপনারা ভাবিবেন ও বিচার করিবেন। "দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী, দীর্ঘ বরষ মাস"—আমার এই বিরাট্ প্রশ্নসমূহ নিরন্তর প্রপীড়িত করিয়া তুলিয়াছে; তাই এই প্রশ্নগুলি আপনাদিগকে জানাইবার জন্য আজ আমি ছুটিয়া আসিয়াছি।

বাঙ্গালা সাহিত্যের এখন বিচিত্র জীবন, গতি ও অভিব্যক্তি। তরুণ সাহিত্যের এই বৃদ্ধির যুগে শাসনের প্রয়োজন হইয়াছে। সেই শাসন-শক্তি প্রয়োগ করিতে হইলে, সেই ধর্ম্মশক্তিটীকে আবার ফিরাইয়া আনিতে হইবে। ধর্ম্মশক্তিই আমাদের চিরন্তন শক্তি। পাশ্চাত্য-জীবনের মোহে পড়িয়া আমাদের সাহিত্য-দেবতার অঙ্গে আমরা যেন কখনও পেটিকোট ও গাউন তুলিয়া না দিই—ইহাই আমাদের সাহিত্যের বর্ত্তমান নীতি হউক। পুরাতনের সঙ্গে এই পারম্পর্য্য, এই ধারা, এই ছন্দ রক্ষা করিতে পারিলে, সাহিত্যে আর বল্‌শেভিজিমের ভয় থাকিবে না,—সিন্ধু মধুক্ষরণ করিবে, বাতাস মধুবর্ষী হইবে, জীবন মধুময় হইবে, আমাদের পন্থা শিব হইবে।

এ ক্ষেত্রে সঙ্কীর্ণ নীতির কথা উঠিলে বলিব, internationalisation সাহিত্যের উদ্দেশ্য হইলেও, পরের ধনে কোন জাতি বা কোনও সাহিত্য কখনও পুষ্ট হইতে পারে না। আমরা অধমের নিকট কৃতার্থ হইতে চাই না। 'যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামাঃ।' আন্তর্জাতিক প্রভাব-লব্ধ ভাবরাজি সাহিত্য পরিপাক করিয়া লয়। ইংরেজী সাহিত্যের পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ আলোচনা করিলে, এই ব্যাপারটী হৃদয়ঙ্গম হয়। নানা ভাষা ও নানা ভাবের সংমিশ্রণে এই বিশাল ইংরেজী সাহিত্য খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী

হইতে বিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সর্ব্বতোভাবে পূর্ণাবয়ব ও সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু ইংরেজ জাতি ও ইংরেজ চরিত্রের বিশেষত্বব্যঞ্জক ভাবগুলি যুগে-যুগে ইংরেজী সাহিত্যের ভিতর দিয়া ফুলের গন্ধের মত অজ্ঞেয় অথচ অব্যর্থ ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বাঙ্গালায় নাটক, নভেল, সমালোচনা, দর্শন, সমাজ তত্ত্ব, সাহিত্য-তত্ত্বে যে প্রভাব পরিস্ফুট, তাহা দেশী নহে—বিদেশী। কালধর্ম্মে ইহা হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু সাহিত্যে জাতীয়তা-বর্জ্জনও কোনরূপে সুষ্ঠু নহে। সেই জন্য পুরাতন আদর্শকে আবার গৃহে বরণ করিয়া আনিতে হইবে।

সুদূরের যাত্রী আমরা 'রজনী শাঙন ঘন, ঘন দেয়া ধরিষণ',—কিন্তু আমাদের হৃদয়ে শ্রদ্ধা; আমাদের কণ্টক-ক্ষত চরণ,—কিন্তু তবুও আমরা স্থির-নেত্র, কঠোর-ব্রত, দৃঢ়-মুষ্টি; নূতনের মোহন কুহকে আমরা পথহারা; আমাদের চারিদিকে ফুলের বাগান; দূরে পশ্চিম-সমুদ্রের শ্রবণারাম অস্ফুট কলরোল; আমাদের ক্ষীণ কণ্ঠে ছদ্মবেশী ধর্ম্মদেবের সেই চিরন্তন প্রশ্ন—'কঃ পন্থাঃ কা গতিঃ কা বার্ত্তেতি।' এ দুর্দ্দিনে সাহিত্যে, জীবনে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে প্রাচীর সাধন-যুগের সেই অমর-লোক আমাদের চরম লক্ষ্য হউক, —প্রথম জাগরণ-জড়িমা-লব্ধ হিন্দু-জীবনের উপনিষদুক্ত সেই পরম জ্ঞান আমাদের বক্ষোলগ্ন অমল স্যমন্তক মণি হউক—কঠোপনিষদের সেই শ্লোকটী আমাদের সেই রাজ্যের বার্ত্তা বলিয়া দেয়—

'ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বম্
তস্য ভাষা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥ *

* বেহালা সারস্বত সমিতির অধিবেশনে পঠিত।

মা

[শ্রীঅনুরূপা দেবী]

১৩

কলিকাতা ঈডেন হিন্দু হোষ্টেলের ত্রিতলের একটী ঘরে অরবিন্দ পূর্ব্বে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্ররূপে কয়েক বৎসর বাস করিয়াছিল; এক্ষণেও রিপণ কলেজের ল-ক্লাসে আইন অধ্যয়ন উপলক্ষে তথায় বাস করিতেছে। এ বৎসর ফেল করায় সে মনে-মনে বড় লজ্জা পাইয়াছিল। পিতার মনের মধ্যে যে এ ঘটনা তাঁহার সুমহৎ পুত্র-গৌরবে একান্তই আঘাত করিয়াছে, এবং তাহারই ফলে তিনি এ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে একমাত্র অপরাধিনী বধূর প্রতিই সমধিক অপ্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছেন, এ সংবাদ তাহার ভাল করিয়াই জানা আছে। এবার একসঙ্গে পিতার সন্তোষ-উৎপাদন এবং বধূর কলঙ্ক-বিমোচন—এই দুইটি সুমহৎ কার্য্যের ভার মাথায় তুলিয়া লইয়া, প্রাণপণ যত্নে সে বধূ-সায়রের তলদেশে তলাইত চিত্তটিকে টানিয়া তুলিয়া, আইন-অধ্যয়নে নিযুক্ত রাখিতে চেষ্টিত হইয়াছিল। তবু সে অবাধ্য মন কি উপদেশের চোখ-রাঙানি মানিতে চায়? বিষম বিদ্রোহে সোরগোল করিয়া স্বাধ্যায় নিরত তপস্বীর ধ্যান-ভঙ্গের চেষ্টাতেই সে যেন সদা-সর্ব্বদা লাগিয়াই থাকে। লোহময়, স্প্রিংয়ের-গদি-আঁটা খাটের উপর চিৎপাত হইয়া পড়িয়া-পড়িয়া, মুদিত দুটি চোখের সাম্‌নে খাড়া নাকের মাঝখানে দোদুল্যমান শুভ্র স্থূল নোলকটি, সরু-সরু জোড়া ভুরুর মধ্যস্থলে পাথুরে পোকার কালো টিপখানি, তাম্বুলরাগে পক্কবিম্বের মত আরক্ত, আবার গোলাপের পাপ্‌ড়িখানির মতই সূক্ষ্ম হাসিমাখা অধরোষ্ঠ—এ সব যত সহজে শরৎকালের স্বচ্ছ,

নির্ম্মল আকাশে বিচিত্র, সুন্দর, খণ্ড-মেঘের মত অনায়াস-লঘু গতিতে ভাসিয়া বেড়ায়, খোলা চোখে আইনের বইয়ের মধ্যে নিহিত আইনের ধারাগুলি ঠিক তেমনটি হইতেই পারে না। কথন-কথনও পাশের ঘরের নিষ্কর্ম্মা ছাত্রেরা একান্ত মনোযোগী ভাল ছেলেটির একটানা পঠন-শব্দ অকস্মাৎ থামিয়া যাইতে শুনিতে পায়; এবং একটুখানি খুটখাট শব্দ হয় ত কখনও শোনা যায়, নয় ত যায়ও না। তার পর যদি কেহ একটু সন্দিগ্ধ চিত্তে উঠিয়া আসিয়া উঁকি দিয়া দেখিতে চেষ্টা করিত, হয় ত তাহার পক্ষে এমনও দেখিতে পাওয়া সম্ভব হইলেও হইতে পারিত যে, সেই বিশাল-বপুশালী ল-বুকখানির সেই খোলা পাতাখানারই উপরে টেবিলের উপরকার ক্যাবিনেট সাইজের একখানি ফটোগ্রাফ পড়িয়া আছে; আর রিপণ কলেজের এই ছাত্রটির মুগ্ধ দুটি চোখের তারা সেই কার্ডে আঁটা ছবিটুকুর ফুটফুটে মুখখানির উপরে অনড় হইয়া বসিয়া গিয়াছে। তা কখন-কখনও যে ঐ সহস্রবার পর্য্যবেক্ষিত আলোকচিত্রখানির গৌরব-সিংহাসন একখানি এসেন্স-গন্ধী রঙ্গীন চিঠির কাগজের অধিকৃত না হইয়া যাইত, এমন কথা হলপ করিয়া অস্বীকার করিবারও সাহস আমাদের নাই;—তা সে রঙ্গীন কাগজের চিঠিখানায় যতই কেন বানান্ ভুল থাক, যতই কেন তার অক্ষরগুলির ছাঁদ কুশ্রী, লাইন বাঁকা এবং কালির ছাপে অপাঠ্য হোক, ঐ সংস্কৃতে অনার্সে এম্-এ পাশ ল-কলেজের ছাত্রটির নিকটে ইহা বি-এ ক্লাসে পঠিত কালিদাসের বিশ্ববিখ্যাত মহা-বিরহ-কাব্য মেঘদূতের চেয়ে এতটুকুও নীচে নয়;—যেহেতু ইহাতেও তাহার রূপসী, তরুণী প্রিয়া—সেই যক্ষ-বনিতা তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী,—মধ্যে ক্ষামা চকিত হরিণী প্রেক্ষণা...ইত্যাদি স্বরূপা—হয় ত ঠিক তেমনি করিয়াই পতি-বিরহে 'শিশির-মথিতা পদ্মিনী' এবং মেঘাবরণ হেতু মলিন-কান্তি ইন্দুর ন্যায় অবস্থাপন্না হইয়া এতক্ষণ—ঠিক তেমন—আষাঢ়ের প্রথম দিবসোদিত বপ্রক্রীড়াসক্ত গজের ন্যায় কৃষ্ণমেঘের দর্শন-সুযোগ না পাওয়ায় শুধুই এই শেষের স্বল্প-উপভোগ্য ঝলমল-রৌদ্র-বিভাসিত নির্মেঘ নীলাকাশে প্রবলক্রন্দিতোচ্ছল নেত্র-তারকা দুইটি সুধীরে সংস্থাপন পূর্ব্বক দূরাপগত প্রিয়জনের ধ্যান করিতেছেন। সেই ধ্যানমগ্নাবস্থায় যদিচ তাঁহার উরসোচ্যুত হইয়া সুর-বাঁধা বীণ হতাদরে ভূমি-লুণ্ঠিত হয় নাই; কিন্তু হয় ত শরতের খোকার অর্দ্ধ-প্রস্তুত পশমের টুপিটা কাঁটা খুলিয়া কোন্ সময় হাত হইতে পড়িয়া গিয়াছে,—গভীর অন্যমনস্কতাপ্রযুক্ত সেদিকে লক্ষ্য পর্য্যন্ত হয় নাই। চোখের জলে বীণাতন্ত্রি আর্দ্র না হইলেও, গোপন-রোদনে বৃত্তাকারে তাহাতে দুইটি কালির রেখা দেখা দিয়াছে;—এমনি কত কি চিন্তাই সেই নবীন বিরহীর তরুণ চিত্তকে রামগিরি নির্ব্বাসিত হতভাগ্য যক্ষের মতই সময়ে-অসময়ে বিক্ষিপ্ত করিতে থাকিত। তবে সুখের বিষয় এই যে, এই স্থানটা রমণীয় রামগিরির নির্জ্জন প্রদেশ নহে, জনাকীর্ণ কলিকাতা সহরের শত-শত চাঞ্চল্যপূর্ণ, তরুণ-যুবক-অধ্যুসিত হিন্দু হোষ্টেল এবং নিরভি-ভাবক, নিষ্কর্ম্মা যক্ষের মত এই অরবিন্দ বেচারীর নির্ভয় ও কর্ম্মহীন অবস্থা নয়। মাথার উপর দুর্দ্দান্ত পিতার তীব্র ভৎর্সনার আতঙ্ক-লজ্জা ও রাশিকৃত আইনের বই পড়ার দায়িত্ব—এই দুইটা বড়-বড় দায় ঠেলিয়া ফেলিয়া সেই 'চকিত হরিণী প্রেক্ষণার' চিন্তা যতটুকু করিয়া উঠিতে পারে, সেইটুকুই তাহার বাহাদুরী। এবার যেমন করিয়া হোক, পাশ করিয়া ফেলিয়া প্রিয়-বিরহরূপ অভিশাপ দূর করিতেই হইবে। পাশ হইলে ত আবার এমন করিয়া এই নির্ব্বাসনে ফিরিয়া আসিতে হইত না! দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া অনুতাপী মনে-মনে বলিত, পাপের প্রায়শ্চিত্ত! একটু যদি মন দিতাম, তাকেও কারও কাছে কথা শুনিতে হইত না, আর আমাকেও;—যাক্, যা ভাগ্যে ছিল হইয়াছে—এবার আর ঠকা হইবে না। তদ্‌ভিন্ন, কালধর্ম্মে আধুনিক বিরহীদের আরও একটা মহা সুযোগ ঘটিয়াছে,—দূতের সাহায্য ব্যতীত এখনকার বিরহী-বিরহিনীগণ অনায়াসেই নিজ-নিজ বিরহ-বেদনা প্রিয়জনের গোচরীভূত করণে অনায়াস-সমর্থ। এই বিরহ-লিপি ডাকযোগে প্রেরণ-সামর্থ্য থাকিলে কি আর নির্ব্বোধ যক্ষ একখানা দু' চারি পয়সার টিকিট আঁটা লেফাফায় ভরিয়া খান-দুচ্চার চিঠির কাগজ সরাসরি প্রিয়ার পদ্মহস্তের উদ্দেশে না পাঠাইয়া মেঘের উদ্দেশে বকিয়া মরিত?

হঠাৎ একদিন সকালবেলায় প্রথম ডাকেই অরবিন্দের নিজের হাতে শিরোনামা দেওয়া, একটু কালি-মাখা—ঈষৎ দোমড়ানো চিঠিখানি আত্মপ্রকাশ করিয়া তাহাকে যেমনি প্রীত, তেমনি বিস্মিত করিল। লুপ-লাইনের মেল

বেলায় আসে কি না ; সেইজন্য উৎপ্রেক্ষার পূর্ব্বেই আশাতীত রূপে সে ইহাকে লাভ করিয়া আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিল, হয় ত কালই মনুয়াটা দুখানা চিঠি লিখেছিল,—ডাকঘরের ওরা অত দেখেনি,—কাল একখানা দিয়ে গ্যাছে, আজ আবার এখানা দিলে। তা একসঙ্গে দুখানা পাওয়ার চেয়ে এই বেশ হলো কিন্তু! খাসা ভুলটি করেছে! আর মনোটাও কত লক্ষ্মী! কেমন মজা করে চিঠিখানি লিখে আমায় আশ্চর্য্য করে দিলে! উঃ, ঐটুকু মেয়ে কত ভাল! দেখি কি লিখেছে!—নিজের ঘরে পা দিয়াই খামখানার উপর চোখ দিতে-না-দিতেই বলিয়া উঠিল—"এ যে বর্দ্ধমানের ছাপ! কবে এলো? ও হরি, তাই এমন সময় চিঠি এসেছে!"

যেটি মনে করিয়াছিল, ঠিক সেটি নহে দেখিয়া, মন ঈষৎ ক্ষোভানুভব করিতে যাইতেই, সহসা স্মরণে আসিল যে, চিঠিখানা একদিনের মধ্যে দুইখানি লেখা পত্রের একতম না হইলেও, এক্ষেত্রে ক্ষুণ্ণ হওনের কোন কারণ নাই; এবং এমনি কি বরং কিছু খুসী হইলেও হওয়া যায়। কলিকাতা হইতে বর্দ্ধমান খুব বেশী দূর নয়—ইচ্ছা করিলেই একদিন—একদিন আর কেন, আজই কলেজ-ফেরতা সেখান হইতে ঘুরিয়া আসা যায়। কাল রবিবারটাও সেখানে কাটাইয়া চাই কি সোমবার ভোরের কোন গাড়ীতে চাপিয়া বসিলে, যথাসময়ে সে সেদিনের কলেজ করিতে পারে। চিন্তার সঙ্গে-সঙ্গেই কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিয়া, কৃতসঙ্কল্প অরবিন্দ চিঠিখানি খুলিয়া পাঠে মন দিল। পত্রে বেশী কথা কিছুই ছিল না; অতি সংক্ষেপে কেবল এইটুকু অনুরোধ,—

"প্রিয়তম!

আমি আজ এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। কলিকাতা তো দূর নয়—একবারটি আসিবে না কি? মার বড় অসুখ,—বড় ভয় করিতেছে। কেমন আছ? আমি ভাল আছি। কবে আসিবে লিখ। তোমার—মনু।"

অরবিন্দের পরিপূর্ণ চিত্ত এই ক্ষুদ্র পত্রটুকুর ক্ষুদ্রত্ব অগ্রাহ্য করিয়াই তখন সহসা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে,—সে আনন্দস্ফীতি তাহার রুদ্ধ হইল না। ইতঃপূর্ব্বে ইহার চতুর্গুণ পত্রকেও সে ক্ষুদ্রত্ব-দোষারোপে অভিমানে গুমরিয়া কলেজের পড়া মাটি করিয়াছে। লেখিকাকে এই অপরাধের সাজা স্বরূপে নানারূপ মান-অভিমানে পরিপূর্ণ গন্থ-পন্থে ভরা পাঁচ-সাতখানা কাগজের চারি-চারি পৃষ্ঠাব্যাপী প্রকাণ্ড পত্র পড়াইয়া, তাহার যথাসাধ্য বড় উত্তর লেখাইয়া তবে শান্তি পাইয়াছে। আজ কিন্তু কিছু না। নেহাৎ সুবোধ বালকের শান্ত মূর্ত্তিতে চিঠিখানি যথাস্থানে রাখিয়া সাবান গামছা হাতে সকলের পূর্ব্বে স্নান করিতে গেল। বারে-বারে সাবান ঘষিয়া পরিপাটী স্নানশেষে কেশ-বিন্যাস ও আহার সমাধার পরও যখন ঘড়িতে কলেজের বেলা ঘোষণা করিল না,—তখন অগত্যাই শীঘ্র-শীঘ্র কাজ চুকাইয়া নিশ্চিন্ত মনে ওদিকের উদ্যোগ করিতে বসার সাধে ইতি করিয়া, একটা চামড়ার হাত-ব্যাগে জামা, কাপড়, সাবান, এসেন্স, দু' এক জোড়া বাড়তি জুতা, আরও সব কি—কি গুছাইয়া ফেলিয়া গোটাকয়েক টাকা পকেটে লইয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল।

অরবিন্দ যখন দুই পকেট ভর্ত্তি করিয়া এবং রুমালে-বাঁধা কাগজ-মোড়া কতকগুলি সুদৃশ্য প্যাকেট, বই, খাতা আরও কত কি দিয়া দুইহাত ভারি করিয়া, হাসি-ভরা প্রসন্নমুখে হোষ্টেলে ফিরিল, তখন বেলা তিনটা। তিনটা চল্লিশ মিনিটের যে ট্রেণখানায় সচরাচর সে ভাগলপুরের জন্য রওনা হয়, সেইখানাতেই এবার ততদূর না গিয়া বর্দ্ধমানে নামিয়া পড়িবে, এই ইচ্ছা। জলখাবারের প্রয়োজন নাই—বলিয়া দিয়া, দুইটা করিয়া সিঁড়ি টপকাইয়া, সুদীর্ঘ সোপানশ্রেণী অতিক্রম পূর্ব্বক নিজের ঘরটায় ঢুকিয়া পড়িল। পথে দু' একটা প্রশ্ন আসিলেও, উত্তর দিবার আবশ্যকতা-বোধ ছিল না,—তাই প্রশ্ন-কয়টা ব্যর্থ ই হইয়া গেল। প্রশ্নকর্ত্তাদের মধ্যে দু' একজন হাতের জিনিসগুলার মধ্যে কি-কি, এবং কাহার জন্য ইহাদের আকস্মিক এই আগমন, এই সকল বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানার্থ অগ্রসর হইতেই, অরবিন্দ স্বেচ্ছায় আততায়ীদের হস্তে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক বিশেষ অনুনয়ের সহিত মিনতি করিয়া কহিল, "মোটে সময় নেই ভাই,—কাল না তো পরশু ফিরে এসে সব তোমাদের বলবো।" "ইঃ! কাল না'তো পরশু,—কোথায় গমন হবে, আজ অন্ততঃ সেইটেও শুনে রাখি। ভাগলপুর নিশ্চয়ই নয়! গৃহিণীটি তো সেই কংস-কারাগারে,—নতুন কিছু হয়েছে না কি? নিদেন পক্ষে সেইটুকুখানিও খবর রাখতে চাই। আমাদের চোখের সামনে যে দিনে ডাকাতি করবে,

সেটি হচ্চে না।" কোন মতে ইহারও সদুত্তর দান করিয়া ইহাদের হাত এড়াইল।

তার পরে নিজের বেশভূষা তাড়াতাড়ির মধ্যে যতদূর সম্ভব পরিপাটীরূপে সমাধা করিয়া ফেলিয়া, সেই হাত-ব্যাগটায় নতুন-কেনা জিনিস-পত্রগুলা ভরিয়া লইল। এইবার একেবার বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়া।

সূর্য্যপ্রসাদ তেওয়ারি হাত-ভর্ত্তি করিয়া পোষ্টকার্ড, লেফাফা ও প্যাকেট বিলি করিতেছিল। অরবিন্দ দ্বিতলের সিঁড়ির সব-শেষ-ধাপে তাহার দর্শন পাইয়াও, নিজের কোন চিঠি আছে কি না, খবর পর্য্যন্ত লইল না; পরন্তু পাশ-কাটাইবার দিকেই মনোযোগ রাখিল। ঈপ্সিত পত্র আজ সকালের ডাকে অপ্রত্যাশিত রূপেই পাইয়াছে। পিতার পত্র গতকল্য আসিয়াছিল। আর কিছু না থাকিলেও, আজ তাহার মনের একটি কোণেও কিছুমাত্রই ক্ষোভ জন্মিবে না। সূর্য্যপ্রসাদ খানদুই লেফাপা হাতে লইয়া হাত বাড়াইল, "আপকা দো চিট্‌ঠি আয়া।"

"আমার চিঠি?" এই কথায় বিস্ময় প্রকাশ করিয়া অরবিন্দ পত্র লইবার জন্য হাত বাড়াইল।

"কাল দো চিট্‌ঠি দিয়া; ফিন্ আজ দো;—জরুর কুছ্ খুসী কো খবর হোয়া,—বখ্‌শিষ মিল্‌না চাহি।"

ডাকের ছাপে ভাগলপুরের নাম ও লেফাপার উপর পিতার হস্তাক্ষর দেখিতে পাইয়া, সেইখানার উপরেই প্রথমে মনোযোগী হইয়া পড়িয়া, অরু ঈষৎ হাস্যের সহিত জবাব দিল, "হাঁ সুরয, খবর খুসীকোই হ্যায়,—লেকেন আভি ফুরসৎ কম,—কাল তোম্‌কো খুসী কর দেগা।"

"জী আচ্ছা।"

সূর্য্যপ্রসাদ চিঠি-বিলি করিতে চলিয়া গেল। অরবিন্দ পত্র খুলিয়া মনে-মনে পাঠ করিল।

ভাগলপুর—শুক্রবার

শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপন—

অরবিন্দ, তোমার পত্নীর সহিত আমি আমার সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়াছি। যদি তুমি আমার পুত্র হও, তুমিও আমার আদেশে অদ্যাবধি তাহার সহিত নিজ সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইবে। অন্যথা হইলে বুঝিব তোমার জননী পবিত্রা নহেন,—তোমার জন্মগত কোন দোষ আছে। যদি পিতৃ-আদেশ লঙ্ঘন কর, তবে একমাত্র সন্তান হইলেও তুমি আমার ত্যজ্য-পুত্র।

আশীর্ব্বাদক

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বসু।

অরবিন্দর হাত হইতে পঠিত এবং অপঠিত দুইখানি পত্রই এক-সঙ্গে স্খলিত হইয়া মাটীতে পড়িয়া গেল। সে নিজেও এই মধ্যাহ্ন-শেষের পরিপূর্ণ আলোর মধ্যেও গাঢ় অন্ধকার লইয়া পাশের প্রাচীরটা ধরিয়া ফেলিয়া কোন মতে পতন নিবারণ করিল।

বাহিরে তখন উৎসাহ-উদ্যমে পরিপূর্ণ-চিত্ত সংসার-পথের নবীন পথিক যুবার দল দল-বাঁধিয়া কলেজ হইতে ফিরিতেছে বা ক্রীড়াক্ষেত্রে চলিয়াছে। যৌবনের দীপ্ত-সূর্য্য সকলেরই মুখে পূর্ণ-জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া জ্বলিতেছে। অন্তর-উৎস হইতে আনন্দের সহস্র ধারা উৎসারিত হইয়া উঠিয়া ইহাদের চতুর্দ্দিকও আনন্দময় করিয়া তুলিতেছিল। তাহাদের গানের সুর, হাসির তরঙ্গ চারিদিকের বাতাসে লহর তুলিয়া ভাসিতেছে।

অরবিন্দর কর্ণে সে সবের কিছুই প্রবেশ করিল না। অকস্মাৎ তাহার মনে হইল, এই যে পিতার হস্তাক্ষরে লেখা পত্র এইমাত্র সে পাঠ করিল, ইহাতে তাহার নিজেরই মৃত্যু-সংবাদ সে পাইয়াছে।

অমরকোট

[শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ]

সিন্ধুদেশের পূর্ব্বদিকে শত-শত-ক্রোশ বিস্তৃত মরুভূমি। এই বালুকাময় প্রদেশের উত্তরে পঞ্চনদ-সিক্ত সমতল-ভূমি, পূর্ব্বে মালবের উর্ব্বর উপত্যকা, দক্ষিণে গুর্জ্জরত্রার বন্ধুর মরুসম সীমা এবং পশ্চিমে সিন্ধুসম বিশাল সিন্ধুনদ-সিক্ত সমতল-ভূমি। কচ্ছদেশের উত্তর সীমান্তে এই মরুময় প্রদেশ শেষ হইয়াছে। যেখানে বারিহীনা লবণী নদী কচ্ছের উত্তরপূর্ব্ব সীমার লবণময় হ্রদে মিশিয়া গিয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ উত্তরে মরুভূমির পশ্চিম প্রান্তে অমরকোট নগর ও দুর্গ অবস্থিত।

ভারতের মরুভূমি আফ্রিকার মরুভূমির ন্যায় নহে। বর্ষাকালে যেথানে বৃষ্টির জল পড়ে, সেথানে নীরস বালুকাময় সমুদ্রের পরিবর্ত্তে বহুবর্ণের পুষ্প-সুশোভিত শ্যামল তৃণমণ্ডিত প্রান্তর দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ষান্তে তৃণক্ষেত্র ও পুষ্পবীথি সপ্তাহের মধ্যে মরুভূমির ধূলিকণায় পরিণত হয়। এই মরুময় বিশাল প্রান্তরের পূর্ব্বপ্রান্ত অবলম্বন করিয়া সিন্ধুনদের দিকে অগ্রসর হইলে, ক্রমশঃ দৃশ্যের পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রমে বৃক্ষলতাহীন অনন্ত বালুকা-তরঙ্গের পরিবর্ত্তে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র দেবজটা দেখিতে পাওয়া যায়। দেবজটা পত্রহীন বৃক্ষ; স্থানবিশেষে ইহা অতি উচ্চ বৃক্ষ; কিন্তু মরুভূমিতে ইহা হস্তদ্বয়ের অধিক উর্দ্ধতা লাভ করে না। দেবজটার পরে দুই-একটা বাব্‌লা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও আকারে অতি ক্ষুদ্র। সিন্ধুনদের পঞ্চাশ ক্রোশের সীমার মধ্যে আসিলে, বন-ঝাউ ও অন্যান্য বাংলাদেশের নদীর চড়া ও দিয়াড়া জমির গাছ দেখিতে পাওয়া যায়,—যেমন, কাশ, কশাড় ইত্যাদি। এখন সিন্ধুনদ হইতে পঞ্চাশ ক্রোশ দূরে নহর কাটিয়া জল আনা হয়। সুতরাং মরুভূমির সীমাতেই শ্যামল তৃণক্ষেত্র দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু পূর্ব্বে নৈসর্গিক দৃশ্য অতি ধীরে পরিবর্ত্তিত হইত।

এককালে অমরকোট বা ওমরকোট মরুভূমির মধ্যে অবস্থিত ছিল; কিন্তু এখন উহা দেখিলে, সিন্ধুদেশের ধূলিধূসর একটী ক্ষুদ্র গ্রামের পরিবর্ত্তে, তরুশ্যামল বঙ্গদেশীয় পল্লী বলিয়া মনে হয়।

অমরকোটের পূর্ব্বদিকে ধূসরবর্ণ দেবজটা, বন-ঝাউ ও বাব্‌লা-মণ্ডিত বালুকা-স্তূপের পর বালুকা-স্তূপ; কিন্তু পশ্চিমদিকে দিগন্ত-বিস্তৃত শ্যামল ক্ষেত্রসমূহ। বর্ত্তমান সময়ে অমরকোটে মরুভূমির শেষ হইয়াছে এবং তথা হইতে সিন্ধুদেশ আরম্ভ হইয়াছে।

অতি প্রাচীনকালে অমরকোট মরুভূমির মধ্যে একটী oasis মাত্র ছিল। মরুভূমি হইতে শ্যামল সিন্ধুদেশে প্রবেশ করিতে হইলে যে কয়টী পথ অবলম্বন করিতে হইত, তাহার মধ্যে একটী প্রধান পথ অমরকোট দিয়া গিয়াছে। মরুভূমির সিন্ধুদেশীয় ভাষায় নাম 'থর'। থরের পথগুলি oasis অবলম্বন করিয়া গিয়াছে। এই সমস্ত পথ আঁকা-বাঁকা। আজ এথান হইতে দশ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে গেলে পানীয় জল পাওয়া যাইবে,—কাল সেথান হইতে আট ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বে গেলে আর একটী কূপ পাওয়া যাইবে,—এইরূপে কোন দিন পূর্ব্ব বা কোন দিন পশ্চিম মুখে চলিয়া, মরুদেশের যাত্রী উত্তর হইতে দক্ষিণে চলিয়া থাকে। থরে যে সমস্ত কূপ আছে, তাহার জল অত্যন্ত বিস্বাদ,—দেশের কথায় 'বোদা' (Brackish); তাহাও আবার পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় না। জয়শালমের (Joisalmer) বা যোধপুর হইতে সিন্ধুদেশে আসিতে হইলে, অমরকোটের পথই প্রশস্ত; কারণ, এই পথে অধিক সংখ্যক কূপ আছে। এই জন্য প্রাচীন কালে অমরকোট একটী প্রসিদ্ধ স্থান ছিল; এবং অতি প্রাচীন কালেই এইখানে একটী দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। সিন্ধু দেশের রাজারা যথন বলবান হইয়া উঠিতেন, তথন তাঁহারা, অমরকোট দুর্গ সিন্ধুদেশের প্রবেশের দ্বার বলিয়া, সৈন্য দ্বারা রক্ষা করিতেন; কিন্তু তাঁহারা দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে, মরুবাসী রাজপুতগণ উহা অধিকার করিত। সিন্ধুদেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ রাজশক্তির প্রাবল্য কথনো অধিকদিন স্থায়ী হয় নাই; সেই

জন্য অধিকাংশ সময়ই অমরকোট রাজপুত রাজাদের অধিকার-ভুক্ত ছিল।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাণা প্রসাদ নামক একজন রাজা অমরকোটের অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহার রাজত্ব কালে ১৫৪২ খৃঃ অব্দে হিন্দুস্থানের চোগতাই বা মোঙ্গোল-বংশীয় দ্বিতীয় বাদশাহ নাসীরুদ্দীন হুমায়ুন শের খাঁ বা শের শাহ কর্তৃক পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হইয়া মরুভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। মারবাড়ের রাজা মালদেব হুমায়ুনকে শেরশাহের বিরুদ্ধে সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলে, তিনি সিন্ধুদেশ পরিত্যাগ করিয়া যোধপুর রাজ্যে গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি গুপ্তচরের মুখে শুনিতে পান যে, মালদেব তাঁহাকে সাহায্য করিবার ছলে বন্দী করিয়া, তাঁহার চিরশত্রু শেরসাহের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য, তাঁহাকে নিজ রাজ্যে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়াছেন। এই কথা শুনিয়া হুমায়ুন তৎক্ষণাৎ যোধপুর রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া, জয়শালমের রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। জয়শালমেরের রাজা রাও শঙ্করণ তাঁহাকে আশ্রয় দেন নাই। এমন কি, যাহাতে হুমায়ুন অনুচরবর্গের সহিত জলাভাবে বিনষ্ট হন, এই উদ্দেশ্যে তিনি মোঙ্গোলদিগকে কূপ হইতে জল লইতে দেন নাই। জয়শালমেরে আশ্রয় না পাইয়া হুমায়ুন সসৈন্যে মরুভূমি পার হইয়া সিন্ধুদেশাভিমুখে যাত্রা করেন। মরুমধ্যে হুমায়ুন ও তাঁহার অনুচরবর্গ অন্নাভাবে ও জলাভাবে যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা পাইয়া, অবশেষে অমরকোটে উপস্থিত হইয়াছিলেন। হিন্দুস্থানের ভূতপূর্ব্ব বাদশাহ হুমায়ুন মাত্র সাতজন অনুচরের সহিত অমরকোট দুর্গে উপস্থিত হইলে, সোঢা-বংশীয় রাজপুত রাণা প্রসাদ তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া আশ্রয় দিয়াছিলেন।

আকবর-নামার মতে অমরকোটের তৎকালীন রাজার নাম প্রসাদ। মহম্মদ মাসুম-প্রণীত তারিখ-ই-সিন্ধু অনুসারে অমরকোটের রাণার নাম বীর শাল। (১) তারিখ-ই-মাসুমী, (২) সিন্ধুদেশের গেজেটীয়ার (৩) প্রভৃতি গ্রন্থে এই নাম দেখিতে পাওয়া যায়। রাণা প্রসাদ বা বীরশাহ সোঢা-জাতীয় রাজপুত। তিনি স্বাধীন রাজা ছিলেন, এবং সিন্ধুদেশের মুসলমান অধিপতি শা হোসেন আরগণের অধীনতা স্বীকার করিতেন না। সোঢা ও জাড়েজা রাজপুতগণ এখনো পর্য্যন্ত মরুদেশের প্রকৃত ভূস্বামী। প্রবাদ আছে যে, সোঢাগণ ১২২৬ খৃঃ অব্দে উজ্জয়িনী হইতে নূতন রাজ্য স্থাপনের জন্য সিন্ধুদেশে আসিয়াছিল। এই সময়ে তাহাদের নায়ক পরমার সোঢা অমরকোট ও রত্নকোট নামক দুর্গদ্বয় অধিকার করিয়া রাণা উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইংরেজ অধিকারের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত সোঢা রাণাগণ প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন ছিলেন। সোঢা কুলমহিলাগণ পরমাসুন্দরী,—তাহাদিগের সৌন্দর্য্যের জন্য পূর্ব্বকালে শত-শত রাজপুত আত্ম-বিসর্জ্জন দিয়াছে; কারণ, সিন্ধুদেশের পরাক্রান্ত মুসলমান অধিবাসিগণ সুন্দরী সোঢা ললনা সংগ্রহের জন্য অন্নহীন জলহীন মরুপ্রদেশ আক্রমণ করিত। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগেও বলোচ্ আফগান সর্দ্দারগণ দরিদ্র সোঢাগণের নিকট হইতে সুন্দরী কন্যা ক্রয় করিতেন।

রাণা প্রসাদ রাজ্যহীন হুমায়ুনকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া, তাঁহার পরিবারবর্গকে মৃণ্ময় দুর্গে আশ্রয় প্রদান করিয়া, তাঁহাদিগের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। এই বেষ্টিত ক্ষুদ্রায়তন মৃণ্ময় দুর্গে চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা হামিদা বানু বেগম হিন্দুস্থানের ভবিষ্যৎ অধীশ্বর আকবরকে প্রসব করিয়াছিলেন। মরুদেশের সীমান্তে অবস্থিত ক্ষুদ্র রাজপুত-ভূস্বামীর ক্ষুদ্র দুর্গ অমরকোট এই জন্য ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। পরবর্ত্তী কালে সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর হইয়া আকবর নানাস্থানে নানাবিধ সৌধমালা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার জন্মস্থান কখনো তাঁহার অধিকারভুক্ত হয় নাই। যেস্থানে বৈরাম খাঁ চতুর্দ্দশবর্ষীয় অনাথ বালককে চোগ্‌তাই-বংশীয় সম্রাট বলিয়া অভিবাদন করিয়াছিলেন, সেই কানানুর উদ্যানে প্রশস্ত বেদী নির্ম্মিত হইয়াছিল। আকবরের রাজত্বকালে নির্ম্মিত হুমায়ুনের সমাধি এখনো দিল্লীর প্রাচীনতম সৌধমালার মধ্যে অন্যতম। মরুমধ্যে আকবরের নূতন রাজধানী ফতেপুর শিকরী এখনো ভারতের রমণীয়

(১) তারিখ-ই-সিন্ধু—মেজর মালেটের অনুবাদ, পৃঃ ১১৭।

(২) তারিখ-ই-মাসুমী—History of Sindh, Vol. II, translated by Mirza Kalichbeg Faridunbeg, Karachi, 1902.

(৩) Gazetteer of the Province of Sindh, by E. H. Aitkin, Karachi, 1907, page 102.

প্রাসাদমালার শীর্ষস্থানীয়; কিন্তু আকবরের জন্মস্থানে মোগল বাদশাহের স্থাপিত একখানি ইষ্টক বা প্রস্তর নাই।

অমরকোটের বর্ত্তমান নাম ওমরকোট বা উমরকোট। ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথ্ বলেন যে, উমরকোট সুম্‌রা জাতীয় উমর নামক জনৈক প্রধানের রাজধানী; এবং তাঁহার মতে অমরকোট নাম ভুল। কিন্তু যে সময়ে পরমার সোঢা উমর-কোট অধিকার করিয়াছিলেন, সে সময়ে মরুদেশে মুসলমানের অধিকার ছিল কি না, তাহা নিশ্চিত বলিতে পারা যায় না। বস্তুতঃ ভারতীয় মরুর দক্ষিণাংশ কখনো মুসলমানগণের অধিকারভুক্ত হয় নাই। ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে রাণা প্রসাদ অমরকোটের অধিপতি ছিলেন। ১৫৬৩ বিক্রমাব্দে (১৫০৬ খৃষ্টাব্দে) ক্ষেত সিংহ নামে একজন রাজপুত অমরকোট পুনর্নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এমন কি, নুর মহম্মদ, গোলম শাহ, সরফরাজ খাঁ প্রভৃতি কাল্‌হোরা-বংশীয় আমীরগণ অমরকোটের রাণাগণকে স্বাধীন নরপতির ন্যায় দেখিতেন। আমীর আব্দুল নবী কাল্‌হোরার রাজত্ব-কালে যোধপুরের মহারাজা অমরকোট প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। সুতরাং আকবরের জন্মস্থানের নাম উমরকোট না হইয়া অমরকোট হওয়াই অধিকতর সম্ভব। সিন্ধুনদীর বদ্বীপ সম্বন্ধে যে সমস্ত ভূগোল-বেত্তা আধুনিক সময়ে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে মেজর হেগের (M. R. Haig) নাম সুপরিচিত। মেজর হেগ্ তাঁহার গ্রন্থে একখানি মানচিত্রে স্পষ্ট লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, আকবরের জন্মস্থানের নাম উমরকোট; কিন্তু ইহার প্রাচীন নাম অমরকোট। (৪) ফেরেস্তা প্রভৃতি প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ উমরকোট না লিখিয়া অমরকোট লিখিয়া গিয়াছেন। ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথ্ উমর নামক মুসলমান-প্রধানের নাম অনুসারে উমরকোটের নামকরণ কোথায় পাইয়াছেন, বলিতে পারা যায় না। উমরকোট এখন আর থর ও পারকর জেলার প্রধান নগর নহে, উহা একটী তালুকের প্রধান নগর মাত্র।

বর্ত্তমান সময়ে অমরকোটে যাইতে হইলে, যোধপুর-বিকানের রেলের ছোর ষ্টেসনে নামিয়া ছয় ক্রোশ উটে চড়িয়া অথবা গরুর গাড়ীতে যাইতে হয়। ছোর একটী ক্ষুদ্র গ্রাম; রেল হইবার পূর্ব্বে এখানে অধিক বসতি ছিল বলিয়া বোধ হয় না। এখন দুই-চারিখানি দোকান হইয়াছে এবং অমরকোটের পথ বলিয়া ডাকগাড়ী এইখানে থামে। ছোর হইতে অমরকোটে যাইতে হইলে উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহণ করাই বিধেয়; কারণ, রাস্তা তেমন ভাল নহে। সিন্ধুদেশে তেমন ভাল রাস্তা নাই বলিলেই চলে। গরুর গাড়ী চলিয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহাতে সচরাচর মালপত্রই চালান হইয়া থাকে। ছোর ষ্টেশন হইতে যে রাস্তা অমরকোট পর্য্যন্ত গিয়াছে, তাহার দুইধারে সারি সারি বাব্‌লা গাছ। যে সমস্ত জমি নীচু, সিন্ধু নদী হইতে নহর কাটিয়া জল আনিয়া তাহাতে আবাদ হইতেছে। এখানে ধান, গম, তুলা প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। উঁচু জমি এখনো পর্য্যন্ত মরুভূমিই আছে; কারণ, তাহাতে নহরের জল উঠে না। থর ও পারকর জেলায় বড় গাছ বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না; সিন্ধুদেশে বড় গাছ দেখিতে হইলে সিন্ধু নদের ধারে যাইতে হয়। এই বিষয়ে অমরকোটের একটু বিশেষত্ব আছে। অনেক দিন জেলার প্রধান নগর ছিল বলিয়া অমরকোটে দুই-একটী সরকারী এবং অনেকগুলি বে-সরকারী বাগান আছে। দূর হইতে ধূসর-বর্ণ বালুকাস্তূপ-বেষ্টিত শ্যামল বৃক্ষলতামণ্ডিত অমরকোট নগর বড়ই সুন্দর দেখায়।

অমরকোটে একমাত্র দ্রষ্টব্য স্থল অমরকোট দুর্গ। সিন্ধু দেশের ঘর-বাড়ীর মত সিন্ধুদেশের দুর্গগুলিও কাঁচা ইঁট দিয়া তৈয়ারী। অমরকোট দুর্গটী চতুষ্কোণ, ইহার চারিদিকের প্রাকার এখনো বিদ্যমান আছে! দুর্গের একটী-মাত্র প্রবেশ-দ্বার ছিল; কিন্তু এখন প্রাচীর ভাঙ্গিয়া আরো দুইটী দ্বার নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রাচীন দুর্গদ্বারের দুই-দিকের প্রাচীর পাথরের তৈয়ারী। এইখানে একখানি সংস্কৃত শিলালিপির পাঁচ-ছয়টী টুক্‌রা দেওয়ালে গাঁথা আছে। সমস্ত টুক্‌রাগুলি যে একখানি শিলালিপির অংশ, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না; কারণ, শিলা-লিপির ধারে যে নক্সার কাজ ছিল, তাহার চিহ্ন প্রত্যেক টুক্‌রার পার্শ্বেই আছে। এই শিলালিপির একখানি

(৪) The Indus Delta Country, by Major M. R. Haig, Kagan Paul, Trench, Turner & Co. Ltd, London, 1894, Map facing page 30.

টুকুরায় ঠকুর শ্রী ষেত সি-হ (শ্রীক্ষেত্র সিংহ), ১৫৬৩ বিক্রমাব্দ অর্থাৎ ১৫০৬ খৃষ্টাব্দ ও তীর্থঙ্কর অজিতনাথের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বোধ হয় ঠকুর শ্রীক্ষেত্র সিংহের রাজত্বকালে অমরকোট মহাদুর্গের মধ্যে কোন জৈন সাধু অর্থাৎ বণিক তীর্থঙ্কর শ্রী অজিতনাথ দেবের একটী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

দুর্গদ্বারের কবাট এখন মাটীতে পড়িয়া আছে। শোনা গেল, উহা তেমন পুরাতন নহে। দুর্গমধ্যে একটী অতি প্রাচীন মূর্চ্চা ব্যতীত প্রাচীনকালের ঘরবাড়ী কিছুই নাই। সমস্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া কালেক্টর সাহেবের বাড়ী ও কাছারী তৈয়ারী হইয়াছে। মূর্চ্চাটী অতি উচ্চ, এবং এখনো পর্য্যন্ত ইহার কোনও অংশ ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। ইহার উপরে আট-দশটী পুরাতন তোপ সাজান আছে। এই সমস্ত তোপের মধ্যে একটী মোগল বাদশাহদিগের আমলের। ইহার উপরে পার্সিতে লিখিত আছে যে, এই তোপটী ১১২১ হিজরায় খোদা ইয়ার খাঁ বাহাদুর কর্ত্তৃক তাঁহার নিজের কারখানায় তৈয়ারী হইয়াছিল। এই দুর্গমধ্যে ১৫৪২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর তারিখে (আকবরনামা অনুসারে ১৪ই শাবান ৯৪৯ হিজরী, কিন্তু ফেরেস্তা অনুসারে ৫ই রজব) জলালুদ্দীন মুহম্মদ আকবর বাদশাহ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

সম্রাট্ আকবর বাদশাহ

আকবর বাদশাহের জন্মস্থান সম্বন্ধে মতভেদ আছে। স্থানীয় প্রবাদ অনুসারে, আকবর অমরকোট দুর্গের বাহিরে দুর্গ হইতে প্রায় এক মাইল দূরে এক পুষ্করিণীর ধারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই স্থানে একখানি সাদা পাথরে সিন্ধি ভাষায় লেখা আছে যে, এই স্থানে আকবর বাদশাহ জন্মিয়াছিলেন। এখন এই পাথরটীর উপরে একজন সিন্ধুদেশীয় মুসলমান ভদ্রলোক একটী ছোট পাকা ঘর তৈয়ারী করিয়া দিয়াছেন। থর ও পারকর জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ কাপ্তেন রাইক্স্ ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে এই মত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তারিখ-ই-মাসুমী অনুসারে আকবর অমরকোট দুর্গমধ্যে জন্মিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথ্ এই মতের পোষকতা করেন। দুর্গের বাহিরে দুর্গ হইতে এক মাইল দূরে আকবর জন্মিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না; কারণ, হুমায়ুন অমরকোটে আসিলে, রাণা প্রসাদ বা বীরশাল তাঁহাকে অমরকোট দুর্গ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন; এবং গর্ভবতী হামিদা বানু বেগম দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইয়াছিলেন। যে সময়ে আকবরের জন্ম হয়, তখন হুমায়ুন অমরকোটে ছিলেন না; তিনি সৈন্য-সামন্ত লইয়া সিন্ধুদেশের মুসলমান রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। হুমায়ুনের অনুপস্থিতিকালে হামিদাবানু বেগম অসহায় অবস্থায় অমরকোট দুর্গের বাহিরে বাস করিতেন, ইহা বিশ্বাস করা যায় না।

সিন্ধুদেশের গেজেটীয়ারে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দুর্গমধ্যে পুলিস লাইনের নিকটে আকবরের জন্ম হইয়াছিল। অমরকোট দুর্গমধ্যে যে পুলিস লাইন্ ছিল তাহা কিছুদিন পূর্ব্বে ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে; সুতরাং কিছুদিন পরে পুলিস লাইন্ কোথায় ছিল, তাহাও নির্ণয় করা কঠিন হইয়া উঠিবে। এখন অমরকোট দুর্গে মুখতিয়ার করের কাছারী, কালেক্টর সাহেবের বাঙ্গালা ও সুদৃশ্য উদ্যান ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। আকবরের জন্মস্থানে একটী স্মৃতি-চিহ্ন নির্ম্মাণ করা নিতান্ত আবশ্যক। আমাদের দেশে বর্দ্ধমানের মহারাজ স্যার বিজয়চাঁদ মহতাব্ বাহাদুর বহু অর্থ ব্যয় করিয়া আকবরের সমাধির আস্তরণ তৈয়ার করাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হইলে স্মৃতিচিহ্ন-নির্ম্মাণের আশা করা যাইতে পারে। সিন্ধুদেশবাসী এই সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন।

ছুটী

[শ্রীসরসীবালা বসু]

(৭)

দেখিতে-দেখিতে দুই বৎসর অতীত হইয়াছে,—শান্তি এক্ষণে পুত্রের জননী; সুতরাং নারীর শ্রেষ্ঠ সম্মানে সে এখন সম্মানিত। 'শান্তির খোকা রাজেন্দ্রও এক বৎসরের হৃষ্ট-পুষ্ট, নধরকায়, প্রিয়-দর্শন শিশু। অমূল্যর বয়স এখন সাত বৎসর। তার বয়সের বালকেরা প্রায় যতটা দুরন্ত হয়, সে তাহা হয় নাই। ছোটবেলায় সে যেমন বাহানা-আব্দার করিয়া সকলকে, বিশেষ করিয়া মোহিনীকে জ্বালাতন করিত, তাহাতে তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মোহিনীর অত্যন্ত আশঙ্কা হইত,—মাতৃহীনের এ সব দুরন্তপনা এর পর কে সহ্য করিবে? কিন্তু অমূল্য তেমন দুরন্ত হয় নাই,—শান্ত, শিষ্ট হইয়া পড়ায় মন দিয়াছে। বেলা ন'টার সময় খাইয়া-দাইয়া নিয়মিত ভাবে স্কুলে যায়; স্কুল হইতে ফিরিয়া জল খাইয়া ভীখুর সহিত ঘুড়ি কি গুলি খেলিবার জন্য বাহির হয়। রাজেনকে সে বড় ভালবাসে; কিন্তু শান্তির ভয়ে রাজেনকে সে বড় একটা ঘাঁটাঘাঁটি করে না। মোহিনী সংসারের একমাত্র বন্ধন অমূল্যটির দিকে চাহিয়া উদয়াস্ত পর্য্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে। শান্তির সহিত তাহার অবনিবনাও নাই। রাজেনকেও সে যথাসাধ্য আদর-যত্ন করে। মনির সম্প্রতি বিবাহ হইয়াছে। তাহার দিদি-খাশুড়ী যোল বছরের নাতিটির সাধ করিয়া বিবাহ দিয়া, ছোট নাৎবৌটিকে কাছেই রাখিয়াছেন। রাণীও আর বাপের বাড়ী আসে নাই। তারও একটী মেয়ে হইয়াছে। পিসিমা আদরের নাৎনীকে চোখের আড়াল করিতে নারাজ।

রাজেন্দ্রকে পাইয়া শান্তি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়াছে। তাহার সর্ব্বদাই মনে হইত, স্বামীকে এখনো সে পুরাপুরি দখল করিতে পারিতেছে না। সে যতই চেষ্টা করিত, তবু তাহার মনে হইত, তার ক্ষমতায় যেন আর কুলাইতেছে না। হেমন্তবাবুকে এক-একদিন বড় বিষণ্ণ দেখাইত,—যেন কিসের দুশ্চিন্তায় তিনি ম্লান হইয়া পড়িতেন। তিনি স্ত্রীর নিকট সে ভাব গোপন করিলেও, নারীর সতর্ক চক্ষুকে ফাঁকি দেওয়া বড় কঠিন। হঠাৎ এক-এক দিন অমূল্যকে ডাকিয়া অকারণে তাহার পিঠ চাপড়াইয়া, সস্নেহে গায় হাত বুলাইয়া পড়ার কথা জিজ্ঞাসা করিতেন, স্কুলের খোঁজ-খবর লইতেন। বালক পিতার নিকট হইতে অপ্রত্যাশিত সমাদরে যেন কিছু বিব্রত হইয়া পড়িত; অথচ চারুমোহন বাবুর নিকট তাহার আব্দারের অন্ত ছিল না,—খগেন্দ্রর নিকট সে দুই বেলা পাঠাভ্যাস করিতে যাইত। শান্তি মনে-মনে ভাবিত, আমার যদি একটা ছেলে কি মেয়ে হয়, তখন তাদের টানে আমার ওপর আরও টান্ পড়্বে। হে মা কালী, তোমায় আমি সোণার নৎ গড়িয়ে দেবো, আমায় একটী ছেলে দাও মা!

মধ্যে শান্তি দু'তিন মাসের জন্য বাপের বাড়ী গিয়াছিল। পূজার ছুটিতে হেমন্তবাবুও সেখানে গিয়া একমাস ছিলেন। তার পর তিনি বাড়ী চলিয়া আসিলেন। শান্তি স্বামীর নিকট হইতে পত্র পাইবার জন্য হাঁ করিয়া থাকিত। তার পর সে যখন চিঠি পাইল, তখন তাহার যৌবনের প্রেম-পিপাসা সে পত্রের সুধাপানে পরিতৃপ্ত হইল না। বিশেষ, শান্তির বাল্যসখী বিনোদিনী সে চিঠি পড়িয়া যখন সখীর গায়ে হাসিয়া ঢলিয়া পড়িল, তখন শান্তির মন ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। বিনোদিনীর স্বামী কলেজের ছেলে। তাহার চিঠি শান্তি অনেকবার দেখিয়াছে। তাহাতে আদর সোহাগের কথা রাশিরাশি, প্রেয়সী, প্রাণেশ্বরী, প্রিয়তমা প্রভৃতি সম্বোধনের ছড়াছড়ি। আর হেমন্তবাবু লিখিয়াছেন, "কল্যাণীয়াসু, এ বাটির সকল মঙ্গল, ইত্যাদি ইত্যাদি; নীচে আশীর্ব্বাদক লিখিয়া নাম সহি করিয়াছেন। বিনোদিনী সখীর গালে টোকা মারিয়া কহিল, "মিন্সের না হয়, প্রথম বারে সাধ-আহ্লাদ সব মিটেছে,—তার জোয়ান বয়েসও পেরিয়েছে; কিন্তু তোর তো আর বুড়োবয়সও হয় নি, সাধ-আহ্লাদও মেটে নি। এ গুরু ঠাকুরের মতন আশীর্ব্বাদী চিঠি লিখ্‌লে কোন্ লজ্জায়। আচ্ছা বেরসিক বটে তো? সে বউকেও বোধ হয় এই রকম লিখ্‌ত।"

শান্তি খেলো হইবার মেয়ে নয়; সে কহিল "আমি তাই

সাদাসিধে চিঠিই ভালবাসি। কে জানে, কখন কার চোখে পড়বে। অতো রঙ-চঙের চিঠি লিখলে আমার লজ্জা করে। স্বামী তো গুরুজন বটেই; স্ত্রীকে আশীর্ব্বাদ করলে তো কি হোলো।" কিন্তু আমরা জানি, শান্তি সে চিঠির উত্তরে অভিমান-ভরে হেমন্তবাবুকে চার পৃষ্ঠা ভরিয়া অনেক কথা লিখিয়াছিল। উত্তরে হেমন্তবাবু কি লিখিয়াছিলেন, সেটা অবশ্য জানিতে পারি নাই।

কার্ত্তিক পূজা করিলে ছেলে হয়,—শান্তির কার্ত্তিক পূজা করিতে ইচ্ছা হইত। কিন্তু সে তো আর এ জন্মে হইবে না। পরজন্মের আশা ছাড়িয়া দিয়া, এ জন্মের বন্ধ্যাত্ব কোন্ ঠাকুরের পূজায় ঘুচিতে পারে, এ প্রশ্ন শান্তির মনে এত প্রবল হইয়া উঠিল যে, একদিন সে সরলাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিল। সরলা তো হাসিয়া লুটোপুটি। সে কহিল, "বেশ আছ বোন্, দিব্যি নির্ঝঞ্ঝাটে আছ। খাচ্ছ-দাচ্ছ, আমোদ-আহ্লাদ কর, গায়ে বাতাস্ লাগ্‌ছে,—ছেলে-মেয়ের সাধ কোরো না। না হলে এক জ্বালা, হলে পরে শতেক জ্বালা। তোমার ছেলের সাধে ছেলে, মেয়ের সাধে মেয়ে—কিছুরই তো অভাব নেই। এক অমূল্য বেঁচে থাক্, বংশ রক্ষা করুক; ঐ হোতেই সাতপুরুষ জলপিণ্ডি পাবে।" শান্তি বেশী কথা বলিয়া কথা-কাটাকাটি ভালবাসিত না; কিন্তু পাঁচজনেই বিচার করিয়া উচিত কথা বলুক দেখি,—অমূল্যর দ্বারা অমূল্যর পিতৃ-মাতৃকুল পরকালের আহার—পানীয় পাইতে পারে,—কিন্তু শান্তির বাপ-পিতামহ কি উপবাসী থাকিবে?

যাহা হউক, ভগবানের তো বিচার আছে,—তিনি শান্তির সাধ শীঘ্রই পূর্ণ করিলেন,—শান্তি পুত্রের মাতা হইল, তাহার রমণী-হৃদয় সৌভাগ্য-গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠিল। হেমন্ত বাবুও নব শিশু পাইয়া খুব খুসী হইলেন। তাঁহার চিত্তে যে একটা অবসাদের ছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছিল, তাহা সরিয়া গেল,—শান্তিও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। সরলাও শান্তিকে খুসী মনে নূতন শিশুর সেবা-শুশ্রূষা শিক্ষা দিতে লাগিল। চারুমোহন বাবুর অবস্থা সে সময় বড় খারাপ যাইতেছিল,—একটা মোকদ্দমায় হারিয়া কিছু ঋণ দাঁড়াইয়াছিল। সুমুখে শারদীয়া পূজা আগত-প্রায়। ছেলে-মেয়েদের জামা-কাপড় দোকানে ধার করিয়া কিনিতে চাহিয়াছিলেন,—সরলা কিনিতে চায় নাই। কিন্তু হিমিকে আঁটিয়া ওঠা ভার। সে সুধা ও খোকার জন্ত নূতন জামা-কাপড় কিনিয়া আনিয়াছে। সরলা বকাবকি করায়, সে ঝঙ্কার করিয়া কহিল, "আমার ভাই-বোনের নেগে আমি যদি কিছু কিনি, তোমার চোখ টাটায় কেন বাছা?"

হিমির ত্রিসংসারে কেহ ছিল না। সে মাসে তিন টাকা করিয়া যে মাহিনা পাইত, তাহা জমাইয়া পাড়ায় সুদে খাটাইত,—সুতরাং তার হাতে দু'পয়সা ছিল। কলিকাতা হইতে কাপড়ওয়ালা প্রতি বৎসর বাবুদের বাড়ী-বাড়ী অনেক টাকার কাপড় বেচিয়া যাইত,—এবারেও সে আসিয়াছিল। সরলা তাহাকে মিষ্ট-মুখে বিদায় দিল। শান্তি অবশ্য অনেক জামা-কাপড়ই কিনিল,—সরলাকে ডাকিয়া পছন্দ করাইয়া লইল।

চারুমোহন বাবু স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাণুর মেয়ের জন্যে কি রকম জামা কিনেছে দেখ্‌লে? সে আমায় লিখেছে, তার মেয়েকে এই প্রথম জামা-জুতো দেওয়া হবে,—যেন সব ভাল জিনিস দেওয়া হয়। মেয়ে যে অভিমানী,—শ্বশুর-বাড়ীর খোঁটা সইতে পারবে না। যে তার খাণ্ডাৎ শাশুড়ী। তাদের কাছে বাপের বাড়ীর মান রাখ্‌বার জন্যে তার ভারী ব্যস্ততা। এই বাঙ্গলা দেশের মেয়েগুলোর জ্বালায় আরও বাপ-মারা ডুব্‌লো।"

কথাটা সরলার গায়ে বিঁধিল। সে কহিল, "মেয়ে-গুলোরই বড় দোষ। বাপ-মাকে টেনে দু'কথা বল্‌লে মেয়েরা সইতে পারে না বটে,—ঐটে তাদের মস্ত দোষ। রাণীর বাপ তো অক্ষমও নয় যে, পূজোয় নাৎনীকে একটা সাজ-পোষাক কিনে দিতে পারবে না? অনিলা থাক্‌লে যে আজ নাৎনীর কত আদর হোতো।"

"সে তো হোতোই। যখন নেই, তখন আর কি? অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা হবে তো।"

"তা তো বটেই। রাণী যে বড় অবুঝ মেয়ে। সে মনে করে, তার বাপ্‌কে তুমি বল্‌লেই সে কিনে দেবে। সে যে এখন অন্য রকম হয়ে গেছে, তা জেনেও জান্‌ছে না। শান্তি তো একটা ফ্রক তবু নাৎনীর জন্যে কিনেছে দেখলুম। সৎমা যে মনে কোরে কিনেছে, ঐ ঢের।"

"তা বৈ কি? সতীন-বেচারীর ওপর যে রাগ, ঝাল, হিংসেগুলো হয়, সেগুলো, তার নাগাল না পেয়ে, তার বাচ্ছা-কাচ্ছাদের ওপর দিয়ে মেটান চাই তো। যতটুকু

করছে, তাতেই সবাই মনে করছে, 'আহা সৎমা যে অতো করছে, ঐ ঢের!' হায় নারী, ঘর ভাঙ্গবার গোড়াই তোমরা! কি কাণ-ভাঙ্গান মন্ত্র যে কাণের কাছে পড়,—পুরুষের সাধ্য কি তার প্রভাব এড়িয়ে থাক্‌বে! সেই হেমন্ত একেবারে বদ্‌লে গেছে।"

ঢিলটি মারিলেই পাটকেলটি খাইতে হয়,—ইহা সংসারের সনাতন ব্যবস্থা; নহিলে, সরলা-বেচারী পাঁচ কথা কহিবার-মানুষ নয়। সে জবাব দিল, "আমরাই কাণ-ভাঙ্গানী মন্ত্র পড়ি? তাই না হয় পড়লুমই;—মূর্খ মেয়েমানুষ, আমাদের কি অতো হিতাহিত বুদ্ধি-শুদ্ধি আছে? তোমরা তিনটে-চারটে পাশ করে, বিদ্বান্‌ হয়েছ,—আদালতে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা ও তর্ক কোরে, হয় কে নয়, নয় কে হয় কোরছো,—জ্ঞানের সীমে নেই, বুদ্ধির সীমে নেই। কোনও কিছু কথায় কথা বল্‌তে গেলে, 'মেয়েমানুষের দশ হাত কাপড়ে কাছা নেই, তাদের আবার বুদ্ধি-বিবেচনা আছে' বলে হাঁকিয়ে দাও,—কথায়-কথায় বল, 'এ সব তোমরা কিছু বুঝবে না'—তবে আবার কাণ-ভাঙ্গানীদের মন্তরেই বা কাণ দিতে যাও কেন? যারা কাণ-ভাঙ্গানীদের পরামর্শ শুনে মা-বাপকে, মার পেটের ভাই-বোন্‌কে পর করে, নিজের সন্তানের মায়া ভোলে, তারা মানুষ, না পিশাচ? তারা আবার বিদ্যে-বুদ্ধির বড়াই কোরে বেড়ায় কোন্‌ লজ্জায়? যত দোষ এই মেয়ে-মানুষগুলোর! নিজেদের কি একটুকু ভাল-মন্দ জ্ঞান নেই?" সরলা থর-থর করিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল। চারুমোহন বাবু এমন মুখের মতন জবাব কোনো দিন পান নাই।

বন্ধুমহলে পুরুষের মনের দুর্ব্বলতার প্রসঙ্গ উঠিলে,—স্ত্রীলোকের কুপরামর্শই যে উহার মূল, তাহারা যে ঘোর মায়াবিনী, অবিদ্যার প্রতিমূর্ত্তি, তাহা প্রচলিত ব্যাপারের দৃষ্টান্তে ও শাস্ত্রোল্লিখিত বাক্যসকলের উল্লেখ করিয়া, সকলেই সে সত্যটিতে নিসংশয়ে নিষ্পন্ন করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হ'ন। সংসারে যত কিছু অশান্তির মূলই তো ঐ নারী! নারীর মায়া-ফাঁদে মুগ্ধ হইয়াই পুরুষের সদ্‌বুদ্ধি বিনষ্ট হয়; নহিলে আর কি!

কিন্তু সরলার কথাগুলা আজ চারুমোহনের চিন্তা-শক্তিকে বেশ একটু সজাগ করিয়া তুলিল। বিশেষ করিয়া হিন্দু সমাজের মেয়েদের যদি কিছু স্বভাবের দোষ-ত্রুটি ধরিতে যাওয়া যায়, উহার গোড়া তাহা হইলে পুরুষেই। বিবাহ হইবার পরই তাঁহারা পিত্রালয়বাসিনী বালিকা বধূর নিকট হইতে বিরহের বা শুভাশংসূচক পত্র পাইবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া যান; স্ত্রীকে সুশিক্ষা দিয়া তাহার মানসিক উন্নতি সাধনের কথা তাঁহাদের মনেও আসে না। এদিকে বালিকা বধূ কালেজে-পড়া স্বামীর লম্বা-চওড়া, নানা ছন্দোবন্ধে প্রেমাভিব্যক্তিপূর্ণ পত্রখানির আদৌ রস গ্রহণ করিতে সমর্থ না হইয়া, এইটুকু মাত্র মর্ম্ম-গ্রহণ করিতে পারে যে, তাহার স্বামী তাহার বিরহে 'জর-জর দেহ, তনু অতি ক্ষীণ'। তখন বধূর হইয়া বধূর দিদি, বৌদিদি, অভাবে ঠাকুর মা, কাকীমা, মাসিমা পর্য্যন্ত নানা ছন্দে ও ভাবে সে লম্বা চিঠির জবাব দেন। বালিকার এইরূপে শিক্ষানবীশি চলিতে থাকে। স্বামী-বেচারী সে প্রেমপত্রখানি কালেজে ও মেসে বন্ধুমহলে দেখাইয়া বাহবা লয়। (আর সে বেচারী নিতান্তই দুর্ভাগা, যাহার শ্বশুরবাড়ীতে শ্যালি-শ্যালাজ প্রভৃতি, অন্ততঃ বধূর পক্ষে ওকালতী করে, এমন কোন সঙ্গিনী নাই।) স্ত্রীর কাঁচা মনটি হাতে পাইয়াও, বাপ, মা, ভাই, বোনের সংসারে খাপ খাইবার মত না গড়িয়া, তাহাকে ইঁচড়ে পাকিতে ও ক্ষুদ্র-বুদ্ধি হইয়া থাকিতে লম্বা অবসর দেওয়া হয়। তার পর যথাকালে যৌবনের স্বপ্ন চক্ষু হইতে মুছিয়া গেলে, সংসারে যখনই নিজের কর্ত্তব্যের ত্রুটি ধরা পড়িতে থাকে, তখনই প্রতি পদে স্ত্রীকেই উহার কারণ বলিয়া, নিজের বিবেকের নিকটে, জীবনসঙ্গিনীরই ক্ষুদ্র বুদ্ধির দোহাই দিয়া, রেহাই পান্‌,—হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচেন।

৮

চারুমোহন বাবু বরাবর কাল ফিতা-পাড়ের কাপড়টাই বেশীর ভাগ পছন্দ করেন ও পরিয়া থাকেন। বিজয়া-দশমীর দিন বৈকালে আল্‌নায় নরুন-পেড়ে ধুতি দেখিয়া সরলাকে কহিলেন, "এ ধুতি কবে আনালে? আমি তো কালাপেড়ে জোড়াই পছন্দ করেছিলুম,—সেটা কি ফেরৎ দিয়েছ?"

সরলা কহিল, "ফেরৎ কেন দেবো? খগেনের ঐ জোড়া পছন্দ হয়েছে। তুমি আর খগেন এক-পেড়ে কাপড় পরা কি ভাল দেখায়? আমি তোমার জন্যে নরুন-পেড়ে

ধুতি রেখেছি, ঐ বেশ হবে এখন। বুড়ো বয়সে যা হোক একখানা পড়লেই হোলো।"

চারুমোহন বাবু হাসিয়া কহিলেন, "তুমিই আমাকে বুড়ো করে তুলছ। তোমার শান্তি হেমন্তকে মনে পর্য্যন্ত করবার ফাঁক দেয় না যে, তার বয়স দিন-দিন বাড়ছে বই কমছে না। আর তুমি কেবল আমাকে সব রকমে বুড়ো করবার চেষ্টায় আছ।"

সরলা কহিল, "তোমারও দেখছি ভীমরতি ধরেছে, ঠাকুর-পোর মতন ছোকরা সাজবার ইচ্ছে হয়েছে। খগেন যদি মেয়ে হোতো, তোমারও যে আজ নাতি হোতো! ঠাকুরপোর জন্যে শান্তি সে দিন কাল-কন্কার ধাক্কা দেওয়া চকচকে জরীপাড় ধুতি কিনলে। আমি মনে করেছিলুম, জামাইদের জন্যে বুঝি কিনেছে,—তা নয়। আমাকে বললে, 'হাঁ দিদি, উনি কি এত বুড়ো হয়েছেন যে এ-সব কাপড় পরতে পারেন না? থান্ পরা আমি কিন্তু পছন্দ করি না।' আমি বললাম, 'এত কি আর বুড়ো হয়েছে! আমাদের ওঁর চাইতে দু' বছরের ছোট বই তো নয়'।"

চারুমোহন বাবু কহিলেন, "তা তোমার শান্তির হাতের গুণ আছে। হেমন্তকে বয়েসের চাইতে অনেকটা ছোট দেখাচ্ছে। রোজ দাড়ি কামায়,—পাছে পাকা চুলগুলো গজিয়ে বয়সটা ধরিয়ে দেয়। আমার তো মুখখানা জঙ্গল না হলে কামাবার অবসর হয় না। তোমার তো এদিকে নজর দেবারও ফুরসৎ নেই।"

সরলা হাসিয়া কহিল "তা বটে। তবে কথা হচ্ছে কি না, যে, শান্তির এখন তহবিল ভরা আছে,—কাজেই ঠাকুরপোর খরচগুলো সে নিজের তহবিল থেকে পুরিয়ে রাখছে। আর আমার তহবিল তো তোমার ঐ সঙ্গে ভেঙ্গে চলেছে,—আমি আর কি দিয়ে পুরুই বল? তবে অনিলার মতন যদি তোমায় ছুটি দিয়ে যেতে পারি, তুমি না হয় তা হোলে একটা ভরা-তহবিলের মালিক জোগাড় করে আন।"

চারুমোহন গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "না সরলা, আমার ও-সব আর দরকার নেই। তুমি ঘরের লক্ষ্মী, বাচ্ছা-কাচ্ছাদের মা হোয়ে আমার ঘর আলো কোরে বেঁচে থাক। আমাদের মনকে বিশ্বাস নেই। দেখে-শুনে এখন সন্দেহ হয়, ছেলে-মেয়েদের প্রতি আমাদের যে এই স্নেহ-ভালবাসা,—সেটা ঠিক ওদেরই টানে, কি স্ত্রীর টানে।"

সন্ধ্যার পর শান্তিদের ছাদে উঠিয়া বারোয়ারী প্রতিমা দেখিবার জন্য সরলা উহাদের বাড়ী আসিল। ঢাক-ঢোল বাজাইয়া, ছেলে-বুড়া, ইতর-ভদ্র অনেকেই সমারোহ করিয়া প্রতিমা বিসর্জ্জন দিতে চলিয়াছে। চাষা ও বাগ্দীদের ছেলেরা কয়েকটা মশাল ও অ্যাসিটিলিন গ্যাস জ্বালিয়া প্রতিমার সঙ্গে-সঙ্গে যাইতেছে। উজ্জ্বল আলোকোদ্ভাসিতা দেবী-প্রতিমার রাঙতার সাজ যেন ঝলমল করিতেছে। মেয়েরা জানালায়, ছাদে—যে যেখানে দাঁড়াইয়া দেখিবার সুবিধা পাইতেছে, সেইখান হইতে প্রতিমার উদ্দেশে যোড়-হাত করিয়া প্রণিপাত করিতেছে। মোহিনী গলায় কাপড় দিয়া ভক্তি-ভরে এক দৃষ্টে দেবী-প্রতিমার দিকে চাহিয়া মনে-মনে বলিতেছিল, "মা জগদম্বা, তুমি জগতের ছোট-বড় সবারই মা। তোমার পায়ে আমার শুধু এই ভিক্ষা মা, অমূল্যকে যেন ভালয়-ভালয় রেখে আমি তোমার চরণে ঠাঁই পাই।"

প্রতিমা দৃষ্টিপথ হইতে চলিয়া গেলে, শান্তি সরলার পায়ের ধুলা লইল। সরলা শান্তির চিবুক স্পর্শ করিয়া কহিল, "বেঁচে থাক্ বোন্; রাজেন ভাল থাক; পাকা চুলে সিঁদুর পর।" মোহিনীও সরলাকে প্রণাম করিল। সরলা কহিল, "থাক্—থাক্, আর পেন্নাম করতে হবে না। তোমার অমূল্য তোমার কোল্ জোড়া কোরে বেঁচে থাক। বিধবাকে আশীর্ব্বাদ করিবার আর কি—আছে?" সরলা কিন্তু জানিত, অমূল্য মোহিনীর কতখানি বুক জুড়িয়া আছে। শান্তি কিন্তু বুঝিতে পারিত না,—পরের ছেলেকে এতখানি ভালবাসা যায় কেমন করিয়া? নীচে নামিয়া আসিয়া মোহিনী সরলার জন্য জলখাবার গুছাইতে গেল। সরলা আসিয়াছে জানিয়া, হেমন্তবাবু নেপথ্য হইতে কহিলেন, "বছরের মধ্যে তোমার একটা প্রণাম পাওনা বৌ-দি! তা এই শোধ দিচ্ছি।" সরলা হেমন্ত-বাবুর সহিত সামনাসাম্নি কথা না কহিলেও, আড়াল হইতে শুনাইয়া-শুনাইয়া বলিতে ছাড়িত না। সুতরাং শান্তিকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "বার বা শোধ দেবার থাক্‌বে, বাড়ী বয়ে যেন দিয়ে আসে! আমি কিছু বেচে আদায় নিতে আসি নি।" হেমন্তবাবু কহিলেন, "তা সত্যি,—দেখা হোলো

বোলে হাতে-হাতে শোধ দিচ্ছিলুম। তা থাক্, বাড়ী বয়েই দিয়ে আস্‌বো।" শান্তি ঘরে ক্ষীরের ছাঁচ, নারিকেল-সন্দেশ, নিম্‌কী প্রভৃতি তৈয়ার করিয়াছিল। সরলাকে জল খাইতে বসাইয়া গল্প সুরু করিয়াছে, এমন সময়ে সুন্দরীর কোলে চাপিয়া, বিসর্জ্জন দেখিয়া খোকা বাড়ী ফিরিল। তাহার হাঁকডাকে শান্তিকে উঠিয়া যাইতে হইল। অমূল্যও ভাসান দেখিয়া ফিরিল। সরলা অমূল্যকে কোলে টানিয়া খাওয়াইতে লাগিল। মোহিনী কহিল, "জ্যেঠাইমাকে একটা বিজয়ার পেন্নাম করলি না, খেতে বস্‌লি ?" অমূল্য অম্লান বদনে কহিল, "কাল কর্‌ব এখন,—কেমন জ্যেঠাইমা ?" সরলা কহিল, "তাই করিস্ বাবা, বাপ্-বেটা দু'জনেই যাস্।"

হঠাৎ দেওয়ালের গায়ে অনিলার সেই বড় ছবিখানির দিকে সরলার দৃষ্টি পড়িল,—সব গোলমাল হইয়া গেল। সরলার মনের মধ্যে একটা অশান্তির হাহাকার মাথা নাড়া দিয়া জাগিয়া উঠিল। ঐ যে সুন্দরী দেবী-প্রতিমার মত নারীমূর্ত্তি,—আজ কোথায়, কোন দূর-দেশে সে ভাগ্যবতী! গৃহের গৃহিণী, স্বামীর স্ত্রী, পুত্র-কন্যার জননী! একদিন সংসার ছাড়িয়া অন্যত্র গেলে, অমনি চারিদিকে কি বিশৃঙ্খলাই না ঘটে! আর আজ কয় বৎসর হইতে কোথায় সে চলিয়া গেছে!

বড় যত্নের, বড় সাধের এই অমূল্যধন। উপর্য্যুপরি দুইটি শিশু নষ্ট হইয়া অমূল্য জন্মিলে পর, বড় স্নেহে নাম-করণ হইয়াছিল অমূল্য। একবার যাহাকে চোখের আড় করা হইত না, আজ তাহাকে ফেলিয়া কোথায় গেছ পাষাণি! একবার কি তোমার প্রাণ কাঁদিল না! সরলার চক্ষে জল আসিল। তাহার মনে পড়িল, বিজয়া-উৎসবের দিন দুই সখীতে এই গৃহে গলাগলি করিয়া কত আমোদ করিয়াছে,—একত্র আহারে বসিয়া কত অফুরন্ত হাসি-তামাসা চলিয়াছে! একবার সরলার মনে হইল,—এই গৃহে অনিলা বুঝি সেই রকমই গৃহলক্ষ্মী হইয়া আছে,—শান্তির ব্যাপারটা বুঝি স্বপ্নমাত্র। কিন্তু হায়, তা তো হইতেই পারে না! নিঃশ্বাস ফেলিয়া সরলা কহিল, "ছবিখানা দেখে মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। সব যেন চোখের ওপর নাচ্‌ছে,—কালকের মতন বলে মনে হচ্ছে।" অমূল্য সাগ্রহে কহিল, "জ্যেঠাই মা, ছোট-মা বলে, ঐ খানা আমার বড়-মার ছবি, বড়-মা এখন স্বর্গের ভাল বাড়ীতে আছে। আমার বড়-মাকে তুমি দেখেছিলে জ্যেঠাইমা ?"

হায় বালক, তুই কি বুঝিবি—সে বড়-মা তোর জ্যেঠাই-মার কতখানি অন্তরঙ্গ ছিল! মানুষের সহিত মানুষের সৌহার্দ্দের বন্ধন চিরদিন, চিরকালই ঘটিতে পারে; কিন্তু প্রথম বয়সে যেমন করিয়া বন্ধু-বান্ধবদের সহিত হৃদয়ের যোগ ঘটে, তেমন সঙ্কোচহীন প্রেম-বন্ধন বুঝি আর কখনও হয় না, হইতে পারে না।

মোহিনী সাশ্রু নয়নে কহিল, "ও ছবি কোথায় লুকোব দিদি,—তা হ'লে যে বাড়ী অন্ধকার হয়ে যাবে। যখন দেহ-মন নিতান্ত এলিয়ে পড়ে, যখন বড় অসহ্য বোধ হয়, তখনই ছবির দিকে চাইলেই মনে হয় দিদি যেন বলছেন, 'অমন কর্‌লে তো চল্‌বে না বোন! আমার অমূল্যকে যে তোমার হাতেই দিয়ে এসেছি। ওকে না মানুষ কর্‌লে তোমার ছুটি নেই।'" মোহিনী অঞ্চলে চক্ষু মুছিল। সরলাও অতি কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিল। শান্তি আসিয়া পড়িলে আজিকার শুভ দিনে এখনি একটা অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটিতে কতক্ষণ? অমূল্য হতবুদ্ধি হইয়া ত্রস্তে ছোট-মার কোলে মুখ লুকাইয়া কাতর কণ্ঠে কহিল, "আমার ঘুম পাচ্ছে যে!"

৯

প্রিয়বাবু আহারে বসিয়া, বধূকে না দেখিয়া কহিলেন, "দিদি, বৌমা কই ?"

প্রিয়বাবুর দুইটি মাত্র পুত্র। বড় ক্ষিতীশ, ওকালতী পাশ করিয়া প্র্যাক্‌টীশ করিতেছে; ছোটটি কলিকাতায় মেডিকেল কলেজে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছে। পুত্র-বধূ রাণীকে পাইয়া তাঁহার কন্যার সাধ মিটিতেছে। রাণী শ্বশুরের অত্যন্ত প্রিয়পাত্রী। প্রিয়বাবুর আহারের সময় সে নিয়মিত ভাবে উপস্থিত থাকে। পৌত্রী কমলা প্রিয়বাবুর চক্ষের মণি। নাতিনীর কচি, রাঙা টুকটুকে মুখ দেখিয়া বুড়ার মন নিতান্তই মজিয়া গিয়াছে সন্দেহ নাই। সেই জন্য সাধ করিয়া তাহার ডাক-নাম রাখিয়াছেন 'কনে'।

'কনে' জ্ঞানদার মতন কড়া-মেজাজের লোককেও বশীভূত করিয়াছে। জ্ঞানদা দাস-দাসী হইতে পাড়া-প্রতি-বাসী সকলেরই নিকট পিসি-মা নামে পরিচিত। পিসিমার

ধারণা, রাশভারী না হইলে দাস-দাসী হইতে বাড়ীর বউ-ঝি পর্য্যন্ত কাহাকেও ঠিক্-মত বশে রাখা যায় না। সেই কারণে সকলের বেয়াদবী দমন করিবার জন্ম নিজের মেজাজটি চড়া রাখিতে-রাখিতে, কোন্ ফাঁকে যে উহা মাত্রা ছাড়িয়া আরও উর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছে, তাহা বুঝিবার অবসর নিজে তিনি কোনও দিন না পাইলেও, উহার উগ্রতা স্বয়ং গৃহস্বামী হইতে দাস-দাসী, পাড়া-প্রতিবেশী সকলেরই নিকট নিত্য পরিচিত হইতে হইতে ক্রমে কতকটা সহিয়া গিয়াছে।

এ হেন পিসি-মা যে কনেকে এতখানি ভালবাসিয়া সে স্নেহের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছেন, দেখিয়া সংসারের পুরাতন দাসী জানকীয়ার তাক্ লাগিয়া গিয়াছে।

পিসি-মাও প্রত্যহ ভাইয়ের খাইবার সময় উপস্থিত থাকেন। অবশ্য তাঁহার বহুমূল সময় তিনি এক দণ্ড নষ্ট করিয়া বে-হিসাবীর পরিচয় দেন্ না,—হরিনামের মালা তাঁহার হাতে থাকেই। প্রিয়বাবুর প্রশ্ন শুনিয়া তিনি মালা ঘুরাইতে-ঘুরাইতে কহিলেন, "কে জানে বাপু! তোমার ছিঁচকাঁদুনে বৌটির তো অন্ত পাওয়া ভার! বাপের বাড়ী থেকে চিঠি পেয়ে পা ছড়িয়ে কাঁদ্‌তে বসেছে,—ভেয়ের বুঝি অসুখ করেছে।"

প্রিয়বাবু বধূকে অত্যন্ত স্নেহ করিলেও, তাহার পিত্রালয়-পক্ষপাতিত্বটা পছন্দ করিতেন না। বাপের বাড়ী হইতে চিঠিপত্র আসিতে বিলম্ব হইলেই রাণী বড় বেশী উতলা হইয়া পড়ে। অথচ প্রিয়বাবুর নিকট এটা কিছু অবিদিত নাই যে, বধূর পিতা কন্যার জন্য আদৌ ব্যস্ত নহেন।

যাহা হউক, রাণীর একটীমাত্র ভাই অমূল্যর অসুখ শুনিয়া কাতর হইবারই কথা।

কিছুক্ষণ মালা ঘুরাইয়া ঝুলিটি মাথায় ঠেকাইয়া পিসি-মা কহিলেন "আদিখ্যেতা বাপু ভাল লাগে না আর। বাপের বাড়ী তো আর কারুর নেই! ভায়ের একটু জর হয়েছে শুনে অম্‌নি কেঁদে ভাসাচ্ছে! এত নাকে-কাঁদনও বেরোয়! হাড় যেন ঝালাপালা হলো।" কান্নাটায় প্রিয়বাবুও পছন্দ করেন না; কহিলেন, "তা কেঁদে কি হবে? এখুনি চিঠি লিখে খবর আনিয়ে দিচ্ছি। যা তো জানকীয়া, বৌমাকে ডেকে আন্ তো?" শ্বশুরের আহ্বান শুনিয়া তৎক্ষণাৎ রাণী নামিয়া আসিল। প্রিয়বাবু কহিলেন "কাঁদছ কেন মা, অসুক-বিসুক সব সংসারেই আছে। এই তো সবে সংসারে ঢুকেছ মা,—এখনও কত দেখবে, কত সইতে হবে।"

হায়—হায়, রাণীর প্রাণের ভিতর যে কি করিতেছে, তাহা কে বুঝিবে? তার মাতৃহীন ভাইটাকে যে সে জীবনের চাইতে ভালবাসে! তার মাথা ধরার সংবাদে যে তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে! স্বর্গগতা জননীর গচ্ছিত ধন যে অমূল্য!

পিসি-মা কহিলেন, "সত্যি-মিথ্যে তাই বা কে জানে? বাপ তো একখানা পত্তর লিখে উদ্দিশ করে না! সেই পাতানো জ্যেঠা লিখেছে বই তো নয়।"

পিসিমার কথাগুলা আজ এতদিন ধরিয়া শুনিয়া-শুনিয়াও রাণীর কিন্তু গা-সহা হইয়া যায় নাই। ক্ষিতীশ কত বুঝাইয়াছে,—স্নেহের শ্বশুর দিবারাত্রি রাণীকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিতেছেন; কিন্তু একটুখানি লবণ সংযোগে যেমন সমুদায় মিষ্ট জিনিসটি বিস্বাদ হইয়া যায়, তেমনি এই পিসি-মার কথার জ্বালায় রাণীর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিয়া মুহূর্ত্তে এমন সুখময় শ্বশুরালয় তাহার নিকট অসহ্য বোধ হইত। মুখ লাল করিয়া রাণী জবাব দিল, "আমার জ্যেঠামশাই মিছে কথা লেখেন না বাবা। আপনার জ্যেঠা কেমন হয় জানি না, কিন্তু এ জ্যেঠার চাইতেও যে তাঁদের স্নেহ বেশী হয়, তা আমার মনে হয় না। রাজেনের জর হয়েছে, তার পর অমূল্যও জরে পড়েছে। আজকাল ওখানে বসন্ত হচ্ছে। রাজেনের গায়ে গুটি দেখা দিয়েছে, অমূল্যরও গায়ে খুব ব্যথা। ডাক্তার বলেছে, ওরও না বেরিয়ে যাবে না।"

প্রিয়বাবু কহিলেন, "তা হোলে তো ভয়ের কথাই মা, কিন্তু কি করবে বল, ভগবানের কাছে প্রার্থনা ভিন্ন মানুষের আর হাত কি?"

এদিকে প্রায়ই যেমন ঘটিয়া থাকে, পিসি-মা চোখ-মুখ ঘুরাইয়া কহিলেন—"হ্যাঁ দেখ প্রিয়, তোমার সংসার এতদিন মাথায় কোরে ছিলুম,—এইবার আমায় খালাস দাও। এক কথা বল্‌তে পাঁচ কথা শুনিয়ে দিলে। আমি কোন ছোট-লোকের বেটীর তাঁবেদারে হয়ে থাক্‌তে পারব না। আমায় এইবার কাশী পাঠিয়ে দাও।" এ প্রস্তাব কিছু নূতন নয়। অথচ রাগের বা ঝোঁকের মাথায় এ প্রস্তাবের যতখানি জোর থাকে, অন্য সময়ে তাহার সিকি থাকিলেও হয় তো পিসি-মা সত্যই এতদিনে বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণার পদপ্রান্তে স্থান পাইতেন।

প্রিয়বাবু কহিলেন, "থামকা দুপুর-বেলা চেঁচিয়ে বাড়ী মাথায় কর কেন দিদি ? তাই না হয় যেয়ো ।"

পিসি-মা তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া কহিলেন, "তা বলবে বৈ কি ! আমায় বিদেয় করে নিশ্চিন্দি হবার ফন্দী ! বলি, এতদিন সোহাগের বউ কোথায় ছিল ? সংসারটা এতদিন মাথায় করে রাখ্‌লে কে ? বোয়ের বাপের বাড়ীর নাম কর্‌বার জোটি নেই ! কেন বল্‌ব না, একশ-বার বোলবো। এই পুজোর সময়ে নাতনিকে পের্‌থম একটা পোষাক দিতে পারেনি,—ছোটলোকরা যেমন ছেলে-মেয়েদের জামা দেয়, তাই একটা কিনে দিয়েছে। বলি, মা না হয় নেই, সে না হয় সৎমা, তার অতো ছেদ্দা হবে কেন ? বাপ নিজে তো রয়েছে—তার কি একটু লাজ-লজ্জা নেই ? একটা হাকিমের ঘরে তুই অই রকম কোরে তত্ত্ব-তাপাস করিস, সরম লাগে না ? ছি, ছি ! এমন চামারের ঘরে কাজ করেছিলুম যে, কুটুমবাড়ীর তত্ত্ব লোককে দেখাতে লজ্জা বোধ হয়। পুজোর তত্ত্বর সন্দেশ পাঁচ ঘরে বিলিয়ে খেতে পাই না। কোনও সাধ মিটল না গা ! কুটুমে ঘেন্না ধরিয়ে দিলে !"

জানকীয়া কহিল, "পিসি-মা, ছোট দাদাবাবুর এমন ঘরে সাদী দিও হাম্‌সা যেন—"

পিসি-মা মুখ-নাড়া দিয়া কহিলেন "যা, যা,- তোদের আর সাউথুড়ী কর্‌তে হবে না। এর বৌ এসেই থ্যাংরা ধরেছে,—আর একজনা বঁটি উঁচিয়ে আসুক ! বিয়ে আর কারু আমি দিচ্ছি নে—নাকে খৎ।"

"সেই ভাল,—তা হোলে পুলিশের হাতে থেকে আমিও রেহাই পাই।" বলিয়া প্রিয়বাবু হাত-মুখ ধুইতে উঠিয়া পড়িলেন। দিদির এ-সব কথা তিনি আদৌ গায়ে মাখিতেন না। রাণী অবাক্ হইয়া ভাবিত, পিতা-পুত্রের এ পরিপাক-শক্তি আসিল কোথা হইতে ?

(১০)

ক্ষিতীশ কহিল, "বাবা, তা হোলে আপনি কি বলছেন ?" প্রিয়বাবু খবরের কাগজে ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিলেন, "আমার বলাবলির কি অপেক্ষা রাখছ তোমরা ? যা ভাল বোঝ তাই কর গে। হাজার হোক্ এক গাছের ছাল আর এক গাছে লাগ্‌তে পারে না। এত আদর-যত্ন করেও বৌ-মা আমাদের বশ হোলো না,—সবই আমার অদৃষ্ট !" ক্ষিতীশ উত্তর দিল না। পিতার এতটুকু অসন্তোষ বা মনোবেদনা যে তাহাকে কতখানি বাজিত, তাহা অন্তর্যামী ভিন্ন কে জানিবে ?

বাল্যকালে মাতৃহীন হইয়াও এই স্নেহময় পিতার অপার স্নেহ-যত্নে পালিত হইয়া তাহারা দুই ভাই যে একদিনও বুঝিতে পারে নাই,—সংসার তাহাদিগকে প্রথম বয়সেই কি অমূল্য সম্পদে বঞ্চিত করিয়াছে ! আর পিসিমা !—তিনি অন্যের পক্ষে অপ্রিয়ভাষিণী, মুখরা হইলেও, তাঁহার প্রাণস্পর্শী স্নেহধারা যে তাঁহাদের জীবন-তরুর মূলে এতদিন ধরিয়া রস-নিষেক করিয়া আসিতেছে, অকৃতজ্ঞের মত তাহাই বা সে কেমন করিয়া অস্বীকার করিবে ?

রাণী বড় অভিমানিনী। পিসিমার বাক্য-জ্বালা অসহ্য হইলেও, প্রথম-প্রথম সে চুপ করিয়া থাকিত, —নীরবে অশ্রু-বর্ষণ করিত। কিন্তু নববধূর সঙ্কোচ কাটিয়া গেলে পর, সেও সময়ে-সময়ে দু'একটা কথার জবাব না দিয়া থাকিতে পারিত না। তাহার ফলে ব্যাপার এমন হয় যে, বাড়ীতে টেঁকা দায় হইয়া উঠে।

ক্ষিতীশ রাণীকে সাধ্যমত অনেক রকমে বুঝাইতে চেষ্টা করে। রাণীও যে না বুঝে, তাও নয়। কিন্তু মানুষের মনের অবস্থা সব সময়ে সমান থাকে না। সুতরাং অনেক সময়েই অনিচ্ছাসত্ত্বেও সংসারে অপ্রিয় ব্যাপার ঘটিয়া বসে।

ক্ষিতীশ এক-একবার মনে করিত, যাহার যাহা ইচ্ছা করুক,—সে কোন দিকে চোখ-কাণ দিবে না। কিন্তু সে কল্পনা কোন দিন কাজে পরিণত হইত না। একবার পিসি-মাকে বোঝান, আবার রাণীকে সান্ত্বনা দান—এই নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপারে সংসার ক্রমেই তাহার নিকটে অশান্তিকর হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার মধ্যে যা-কিছু বৈচিত্র্য দান করিত 'কমলা'। ক্ষিতীশ স্নেহভরে তাহার ডাক-নাম দিয়াছিল 'মানী মা'। তাহার চিরবুভুক্ষু, মাতৃস্নেহপিপাসু হৃদয় এ ক্ষুদ্র বালিকাকে 'মা' বলিয়া ডাকিয়া বুঝি তৃপ্ত হইতে চাহিত।

চারুমোহনবাবুর পত্রে ক্ষিতীশ আজ জানিয়াছিল, রাণীর যাওয়াটা সম্ভব হইলে ভাল হইত ; যে হেতু, রাজেনকে লইয়া সকলেই বিব্রত হইয়াছে : রোগের যন্ত্রণায়, আর্ত্তনাদে বালক দিনরাত চোখ বুজিতে পারে না, অকুল্য

জ্বরে বেহুঁস;—খুড়ীমা তাহাকে লইয়া অত্যন্ত বিপন্ন হইয়াছেন। রাণী শুনিয়াই ভূমি-শয্যা গ্রহণ করিয়াছে,—ক্ষিতীশ কিছুতেই তাহাকে সান্ত্বনা দিতে পারিতেছে না। পিসিমার তর্জ্জন-গর্জ্জনেও সে আজ উঠিয়া খুকীকে কোলে নেয় নাই,—স্তন পান করায় নাই। পিসিমা রাগিয়া বাড়ী সরগরম করিয়া তুলিয়াছেন। রাণী উচ্চ-বাচ্য না করিয়া, অন্ন-জল ত্যাগ করিয়া মাটিতে লুটাইতেছে। প্রিয়বাবুরও ইচ্ছা নয় যে, এই মহামারীর সময়ে বধূ শিশু-কন্যা লইয়া সেখানে যায়; অথচ রাণীকে না পাঠানও আর যুক্তিসঙ্গত নয়। কিন্তু পিতার অমতে ক্ষিতীশ তাহাকে পাঠায় কিরূপে? সকাল হইতে রাণীকে একবিন্দু জল পর্য্যন্ত খাওয়াইতে না পারিয়া, অবশেষে সে রাণীর পিত্রালয়ে গমনের প্রস্তাব লইয়া পিতার নিকট উপস্থিত হইয়াছে। পিতার অমতে আজ পর্য্যন্ত সে কোন কাজ করে নাই। কিন্তু আর বুঝি সে নিয়ম চলে না; যে হেতু, ক্ষিতীশ জানিত, ভ্রাতৃগতপ্রাণা রাণী ভাইএর পীড়ার সংবাদে না যাইয়া থাকিবে না, অনাহারে শুকাইয়া মরিবে; তখন বাড়ীর লোক তাহাকে পাঠাইতে বাধ্য হইবেই।

ক্ষিতীশ মনে-মনে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল, বিবাহ করিয়া সে অন্যায় করিয়াছে। বেশ নিশ্চিন্ত জীবন ছিল। আজকাল সকলেরই মনোরঞ্জন করা যেন তাহার একটা ব্যবসা হইয়াছে। যাহার কাছে একটু অনুষ্ঠানের ত্রুটি হইবে, সেই ছুতা ধরিয়া মুখ ভার করিবে। ভাল জ্বালায় পড়িতে হইয়াছে বটে। আগে জানিলে সাধ করিয়া কে বিবাহ করিত!

যদি বা বিবাহ করিতে হইল,—যাহাকে নিজের বলিয়া পাওয়া গেল, তার আবার বাপের বাড়ীর উপসর্গটাই বা থাকে কেন? ও জিনিসটা না থাকিলে তাহাদেরও পাছু-চাল থাকে না। তিন দিন অন্তর বাপ, ভাই, মায়ের অসুখের খবরে স্বামীর সংসারের প্রতি উদাসীন হইয়া, মন উড়ু উড়ু করিয়া চোখের জলে বন্যার সৃষ্টি করে না। কিন্তু পরক্ষণেই এ উদ্ভট কল্পনার অসারত্ব স্মরণ করিয়া এত দুঃখের সময়েও ক্ষিতীশ মনে-মনে হাসিয়া ফেলিল; সঙ্গে-সঙ্গে রাণীর প্রতি সমবেদনায় তাহার মন ভরিয়া উঠিল। দু'পাঁচদিন পরের সংসারে আসিয়া যাহারা উহাকে ঠিক আপনার করিয়া লইতে পারে, একরক্তের জিনিস তাহাদের নিকট তাহা হইলে কত প্রিয়, কত আপনার!

পাছে ইহাদের কষ্ট হয় বলিয়া রাণী আজকাল আর বাপের বাড়ী যাইবার নামটিও করিত না;—ভাইটির অসুখ শুনিয়াই না এত অধীরা হইয়াছে! এইবার সে শেষ চেষ্টা করিবার জন্য অনুনয়ের স্বরে কহিল, "বাবা, আমার মনে হয় ওকে পাঠিয়ে দেওয়াই ভাল। যে রকম ভাই-অন্ত প্রাণ,—কাল রাত্রি থেকে জল-গণ্ডুষ মুখে দেয় নি। যদি সেখানে কোন ভাল-মন্দ হয়ে যায়,—চিরদিনের জন্যে একটা খোঁটা থেকে যাবে।" প্রিয়বাবু পাষাণ নহেন,—এ কথা তাঁহার প্রাণে বাজিল। তিনি কহিলেন "ক্ষিতীশ, বৌমা তবে যাক্; কিন্তু 'কনে'কে আমি পাঠাতে পারবো না। তুমি বৌমাকে পৌঁছে দিয়েই চলে এসো; কিন্তু সাবধান, সেখানে জলস্পর্শ কোরো না। সংক্রামক রোগকে বড় ভয়!" যাহা হউক, অবশেষে পিতা যে অনুমতি দিলেন, ইহাই যথেষ্ট। দুশ্চিন্তা হইতে পরিত্রাণ পাইয়া ক্ষিতীশ যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

১১

রাণী যখন কমলার জামা-জোড়া, মোজা, টুপী প্রভৃতি জানকীয়াকে দেখাইয়া আলাদা একটা ট্রাঙ্কে গুছাইয়া দিতেছিল, এবং ক্ষিতীশ চেয়ারে বসিয়া অন্যমনস্ক ভাবে নিঃশব্দে সে দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল, সেই সময় হঠাৎ সজোরে দরজা ঠেলিয়া উগ্রমূর্ত্তিতে পিসিমা প্রবেশ করিয়া, ঘর কাঁপাইয়া কহিলেন, "বলি, হ্যাঁরে ক্ষিতে, তুইও যে কচি খোকা হয়ে খুকীর সঙ্গে নাচতে লাগলি। বড়মানুষের বেটী বাপের বাড়ী চল্লেন,—এখানে আমার কনেকে মাই দেবে কে? বাছা যে গলা শুকিয়ে মরবে! তোদের দাসীপনা-বাঁদীপনা যতদূর পারি করছি,—আবার ঐ মেয়ে গলায় গেঁথে কি মরবো?"

ক্ষিতীশ এতক্ষণ ধরিয়া এই রকম একটা কিছু প্রবল ঝড়ের আশঙ্কাই করিতেছিল। পিতার সম্মতি পাইবার সময় পিসিমার দিকের কথাটা তাহার স্মরণ ছিল না; পরক্ষণেই সে কথা মনে উদয় হওয়ায়, সে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। যাহা হউক, তাহার আশঙ্কা মূর্ত্তি গ্রহণ করিতে, সেও যেন যুঝিবার বল পাইল; সহজ গলায় কহিল, "ও তো তোমার

আর জানকীয়ারই খুব বেশী ন্যাওটা,—মাই খাবার জন্যে দু'এক দিন কাঁদবে বটে,—তা না হয়, খুকীকেও ওর মার সঙ্গে পাঠিয়ে দাও ;—কাজ কি ঝঞ্ঝাট রেখে ?" পিসিমা এমন অপ্রত্যাশিত উত্তরে কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণতর করিয়া কহিলেন, "ওরে বেহায়া, তোর শুদ্ধ আজ হোলো কি ? আমায় এমন কথা বলিস্ ? যেচে মান্ কেঁদে সোহাগ কাড়্তে তাদের বেটী তাদের ঘরে যাচ্ছে বলে, আমার ঘরের মেয়ে কেন সেখানে যেচে যাবে ? এত কি অভাগ্যি তার ?" পিসিমা এইখানে একটু থামিয়া আবার কহিলেন, "রোগ-মরণের ঘরে, আমার ষেটের বাছাকে আমি কেন পাঠাতে যাবো ? আমি তো তোদের মতন ক্ষেপিনি !" তার পর পিসিমা যেমন পদভরে ভূমি কম্পমান করিয়া আসিয়াছিলেন, সেই ভাবেই ফিরিয়া গেলেন। জানকীয়াও সভয়ে অনুসরণ করিল,—যে হেতু আগ্নেয়-গিরির অগ্নিজ্বালা থাকিয়া-থাকিয়া কাহার প্রতি বর্ষণ হইবে, তা কেই বা জানে ! কিন্তু কিছুক্ষণ যে বর্ষণ না হইয়া ক্ষান্ত হইবে না, ইহা নিশ্চিত।

পিসীমার শেষ কথা রাণীর কাণে অত্যন্ত কঠিন বাজিয়াছিল। তাহাকে অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিতে দেখিয়া, ক্ষিতীশ অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "কেঁদো না রাণি, পিসিমার মুখের কথাই অম্নি ;—তিরিশ দিনই শুন্‌ছ ত ? এখন তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নাও, দু'ঘণ্টা মাত্র আর গাড়ীর সময় আছে।"

জানকীয়া খুকীকে লইয়া আসিয়া কহিল, "পেট ভর্কে দুধ পিনা দে বহু-মা, ভাবনা কুচ্ছু না। খোঁকী হমার পাশ খুব থাক্‌বে, ওক্‌য়া থাতির শোচ্ তু করিস্ না—"

জানকীয়া বাহির হইয়া গেলে, রাণী চক্ষু মুছিয়া খুকীকে স্তন পান করাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পান করিয়া খুকী খুসী হইয়া মায়ের কোলে উঠিয়া বসিয়া, মায়ের চুড়িগুলি নাড়িতে-নাড়িতে খেলা সুরু করিল। ক্ষিতীশ স্নেহভরে ডাকিল, "মানু, ছোটমা আমার !" খুকী পিতার দিকে ফিরিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিল। রাণী মেয়ের মুখে চুমা খাইয়া বুকে চাপিয়া ধরিল। ক্ষিতীশ কহিল, "খুকীকে ছেড়ে তুমি থাক্‌তে পার্‌বে তো রাণী! ওর জন্যে ভাবনা অবশ্য নেই,—পিসীমা ওকে ঠিক রাখবে। তবে তোমার—" রাণী খুকীকে ক্ষিতীশের কোলে দিয়া কহিল, "তোমরা তোমাদের খুকীর কথাই ভাব গো, আমার জন্যে ভেবে মিছে কষ্ট পেতে হবে না !"

"কেন রাণি, তোমার দুঃখ-কষ্ট ভাববার কি আমার অধিকার নেই ?"

স্বামীর প্রশ্নে অভিমানপূর্ণ কণ্ঠস্বরে ব্যথিত হইয়া রাণী কহিল, "দেখ, খুকীর জন্যে আমার কষ্ট হলেও, আমার অমূল্যর সেবার জন্যে সেটুকু ত্যাগ-স্বীকার কি আমি করতে পারবো না ? মা মরবার সময় তাকে আমার হাতে-হাতে দিয়ে বলেছিলেন, 'মা, তুমি সব চাইতে বড়, তোমার খুড়ীমার হাতে অমূল্যকে দিয়ে চল্লুম, তুমিও ছোট ভাইটির সেবা-যত্ন কোরো।' অল্প বয়সেই মাকে হারিয়েছি,—কিন্তু মায়ের সেই শেষ কথাগুলি দিনরাত্রি বুকের মধ্যে জপ করি। অমূল্যের এই কঠিন ব্যারামের সময় আমি যদি না যাই, তা'হলে আমার মহা-পাপ হবে। সে একটু সারলেই আমি চলে আস্‌ব। খুকীর এখানে কোন অভাব বা কষ্ট হবে না তাও আমি জানি। কাজেই মন কেমন করলেও, তার বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত।" ভ্রাতৃগতপ্রাণা, ভগিনীর স্নেহ-মমতাপূর্ণ হৃদয়ের পরিচয়ে ক্ষিতীশ মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল। তাহারও যদি এমন একটী ভগিনী থাকিত ! ভগিনী-স্নেহ কি অমৃতমাখা জিনিস ! স্ত্রীর পিত্রালয়-আনুগত্যে তাহারও মনে যে ক্ষোভের আভাস ছিল, তাহা দূর হইয়া গেল।

যাইবার সময় রাণী যখন স্বামীকে প্রণাম করিল, ক্ষিতীশ স্ত্রীকে সস্নেহে চুম্বন করিয়া কহিল, "সেখানে বেশ ঠাণ্ডা হোয়ে থাক্‌বে। তোমার দুটি ভাই-ই সমান,—দুজনকেই দেখা-শোনা কোরো। নতুন মা হয় তো কচি ছেলে নিয়ে অমূল্যের তদারক করতে পারছেন না ; সেজন্য ক্ষুণ্ণ হোয়ো না। তার পর অমূল্য ভাল হলেই আমার ঘরের লক্ষ্মী ঘরে ফিরে আসবে, কেমন ?" রাণী মনে-মনে হৃদয়ের সহিত স্বামীর শেষ বাক্যটিকে অভিনন্দন করিল।

১২

শান্তি বেদানার রস চামচে করিয়া খোকার মুখে ঢালিয়া দিয়া স্বামীকে কহিল, "রাত অনেক হলো,—তুমি একটু ঘুমোও। আমি এখন জেগে থাকি, সুন্দরীও বসুক।"

হেমন্তবাবু কহিলেন, "আমি তবে একবার অমূল্যকে দেখে আসি।"

শান্তি কহিল, "এই তো একবার দেখে এলে। এখন তো ও-ঘরে অনেকেই রয়েছে। তুমি একটু এইবেলা চোখ বুজে নাও না।"

হেমন্তবাবু সে কথার উত্তর না দিয়া বাহির হইয়া গেলেন। সুন্দরী মেঝেতে বসিয়া ছিল; কহিল, "হিমি মাগীর আবার আদিখ্যেতা আছে বাপু। কত দরদ দেখান হয়, যেন মা না মাসী। ও-সব কি আমরা বুঝি না? কথায় বলে 'মা চেয়ে ব্যথা যার, তারে বলে ডান্'। রাণী দিদিরও আক্কেল বেশ। কাল থেকে যে এসেছে, তা এদিকে কই উঁকি দেবার নামটি নেই। কেন, এও তো সেই ভাই বটে,—এক বাপের সন্তান।" শান্তির মন রাণীর প্রতি কোন দিন প্রসন্ন ছিল না। অমূল্য ও মণির প্রতি তাহার মন ততদূর বিমুখ না হইলেও, তাহারই সমবয়স্কা সতীন-ঝিকে দেখিলেই, তাহার মনের মধ্যে একটা বিদ্রোহের আগুণ দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিত। ইহার কারণ কিন্তু সে নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। এবারে যেন রাণীর প্রতি সে অপ্রসন্ন ভাব বাড়িয়া উঠিয়াছে। রাণী আসিয়া প্রথমে শান্তির সহিত বেশ কথাবার্ত্তা কহিয়াছিল। রাজেনকে দেখিয়া, অসুখের খুঁটিনাটি সংবাদও লইয়াছিল। তার পর হঠাৎ কি হইল,—আর সে এ-ঘরে আসেও নাই, বা শান্তির সহিত কথাবার্ত্তাও বলে নাই। যদি বল, শান্তিই কি ও-ঘরে গিয়া অমূল্যের খোঁজ খবর করিয়াছিল? কিন্তু সে রোগী ফেলিয়া কখন যায়? সে তো একা, অথচ উহারা এক ঘরে তিন চারিজন রহিয়াছে।

সুন্দরীর কথা শুনিয়া শান্তি কহিল, "বোধ হয় লাগা-ভাঙ্গা কথা কিছু শুনেছে। শুন্‌লে তো বয়ে গেল। কারুর আটচালায় বাস করি না যে ভয় কোরে চল্‌বো।" সুন্দরী উৎসাহিত হইয়া কহিল, "খুড়ীমাকে চেনো না মা। ও মিটমিটে ডান্—কেবল অমূল্য, অমূল্য। কেন বাপু, আমাদের ছোট খোকা কি কেউ নয়? আমি ও-সব একচোখোপানা মোটে দেখতে পারি না।"

এ ধরণের নানারূপ কথা প্রত্যহ শান্তির কর্ণগোচর করা সুন্দরীর দৈনন্দিন কার্য্যেরই তালিকাভুক্ত ছিল। শান্তি কিছু হুঁ, হাঁ, না করিলেও, শ্রোত্রীর শুনিবার ধৈর্য্যে, বক্ত্রীর বলিবার আগ্রহ কমিবার অবসর পায় নাই। অমূল্যর যখন জ্বর হয়, তখন প্রথমে কেহই গ্রাহ্য করে নাই। রাজেনের জ্বর খুব বেশী হওয়ায়, তাহারই সেবা-শুশ্রূষায় পিতা-মাতা উভয়েই খুব ব্যস্ত; মোহিনীও মনে করিয়াছিল, দু' একদিনে সারিয়া যাইবে। তার পর তিন দিনের দিন জ্বর প্রবল হইলে সে শান্তিকে বলিয়াছিল, "অমূল্যর জ্বর বড় বেড়েছে দিদি! দিন-কাল ভাল নয়,—তুমি বড়-ঠাকুরকে একবার দেখতে বল।" শান্তির মন ভাল ছিল না। সম্ভবতঃ সে কথা তাহার কাণে পঁহুচায় নাই। বেগতিক দেখিয়া ভিখুকে দিয়া মোহিনী সরলাকে সংবাদ দিল।

আজকাল খবর আনা, ডাক্তারকে খবর দেওয়া প্রভৃতি কাজে ভিখুরও একদণ্ড অবসর নাই। সন্ধ্যার পর সরলা যখন অমূল্যকে দেখিতে আসিল, সে তখন যাতনায় ছটফট করিতে-করিতে ক্ষীণকণ্ঠে জল চাহিতেছে। রান্না-ঘরে মোহিনী ছ্যাঁক ছ্যাঁক করিয়া লুচি ভাজিতে ব্যস্ত। অমূল্যের ডাক শুনিবার জন্য সে কাণ খাড়া করিয়া থাকিলেও, লুচি ভাজার শব্দে সে ক্ষীণ আহ্বান ডুবিয়া যাইতেছিল। সরলা ব্যস্তভাবে অমূল্যকে জল পান করাইয়া কহিল, "কি কষ্ট হচ্ছে অমূল্য?"

অমূল্য কহিল, "বড় ব্যথা কর্‌ছে। মা কই? মা, মাগো।" সরলা কহিল, "মাকে ডেকে দিচ্ছি এখুনি।" রান্নাঘরে গিয়া সরলা মোহিনীকে কহিল, "বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে ঠাকুরের ভোগ সাজাচ্ছ; ছেলেটা যদি জল-জল করে চেঁচিয়ে জল না পায়,—ভিরমী যাবে যে! কাউকে তো কাছে বসতে হয়! চাকর, ঝি, ভিখু—কেউ এ তল্লাটে নেই।" মোহিনী কড়া নামাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; কপালে করাঘাত করিয়া কহিল, "ক'দিনে জ্বর বাড়্‌লো বই কম্‌ল না। আমি এখন রোগা ছেলে দেখি, না গেরস্তর সংসার চালাই! আমার পোড়া কপালে কি মরণ নেই দিদি! ওঁরা সবাই রাজেনকে নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন,—তার গায়ে বসন্ত দেখা দিয়েছে,—সে ছেলেও যাতনায় বেহুঁস্।"

সরলা আজ বড় চটিয়া গিয়াছিল; কহিল, "তা কর্ত্তা-গিন্নীর একবেলা ভাতে-ভাত, একবেলা দুটো মুড়ি-চিঁড়ে খেলে কি চলে না? দু'দুটো রুগী যখন ঘরে, তখন খাবার অত তরীবৎ নাই বা হোলো! তোমারও যেমন ঘাড়ে ভূত

চেপেছে—"মোহিনী কহিল, "চুপ কর দিদি। অমূল্য ভাল থেকে হেসে-খেলে বেড়ালে আমার বুক দশ হাত হয়ে থাকে,—আমি দশটা হয়ে গতর খাটাতে পারি। অমূল্য বিছানায় পড়ে আমার কোমরে লাঠির ঘা পড়েছে। ওঁদেরও বড় দোষ দিই না, ছেলে নিয়ে ব্যস্ত, কি করে বল। তুমি দিদি, এখন একটা ব্যবস্থা কর। নতুন দিদি ছেলে-মানুষ, —প্রথম পোয়াতী,—ছেলের অসুখ দেখে ঘাব্‌ড়ে গিয়েছে, —কোন কথা বল্‌লে কাণ পাত্‌ছে না।" সরলা তৎক্ষণাৎ গিয়া চারুমোহনবাবুকে সকল কথা বলিল। চারুমোহন-বাবু কহিলেন, "গায়ে ব্যথা যখন বলছ, তখন তো ভাল কথা নয়! টেম্প্যারেচারটা দেখা হয়েছে? জ্বর কত?" সরলা কহিল, "সে সব কে দেখেছে? আমি তো বিকেলে শুনলুম। গিয়ে দেখি, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে,—ছোট বৌ ভেবে অস্থির। সে হতভাগীর ঐটুকুই তো সম্বল,—নইলে সে এখানে পড়ে আছে কেন? তুমি একবার যাও, দেখে এসো।" চারুমোহনবাবু অমূল্যকে দেখিতে গিয়া হেমন্ত-বাবুকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "অমূল্য কেমন আছে? জ্বর না কি খুব বেড়েছে?" হেমন্তবাবু অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "কই? আমি তো কিছু জানি না—" বলিয়া জিজ্ঞাসু নেত্রে পত্নীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "অমূল্যর কি জ্বর হয়েছে না কি?" শান্তির তখন চমক হইল, মোহিনীর অনুরোধ তাহার মনে পড়িল। চারু-মোহনবাবু বিরক্ত ভাবে কহিলেন, "নিজেই ঘরের খোঁজ রাখ না বাড়ীর কর্ত্তা হয়ে, তা আবার বউকে জিজ্ঞেস কর্‌ছ? ও ছেলেমানুষ,—নিজেই ভয়ে আধখানা হয়ে গেছে, তোমায় তো সব দিকের খবর রাখ্‌তে হয়!" কথার ভিতরে যথেষ্ট খোঁচা ছিল, হেমন্তবাবুকে তাহা বিঁধিল। দুই বন্ধুতে অমূল্যকে দেখিতে গেলেন। অমূল্য তখন জ্বরের যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। চারুমোহনবাবু দেহের উত্তাপ দেখিয়া ভয় পাইলেন; উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "তুমি এখুনি ডাক্তারবাবুকে ডেকে আন। বেশ আক্কেল তোমার! ছোটটাকে নিয়ে দুজনে পড়ে আছ,—অথচ এ ছেলেটা তিন দিন থেকে জ্বরে পড়ে আছে! আমার স্ত্রী যদি না আসতো, আমিও তো খবর পেতুম না! হেমন্ত, আজ যদি অমূল্যর মা বেঁচে থাক্‌ত!" কথাটা বলিয়াই চারুমোহনবাবু থমকিয়া গেলেন;—বন্ধুকে এ কথা বলিতে আদৌ তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু মুখের বলা কথা আর ফেরে না। যে কথাগুলা মনের মধ্যে সদাসর্ব্বদা চলিয়া ফিরিয়া বেড়ায়, অথচ প্রকাশ-যোগ্য নয়,—কোনও ফাঁকে বাহির হইবার সুযোগ পাইলে তারা ছাড়া না পাইয়া কি থাকে? পত্নী-বিয়োগের পর বন্ধুর নিকট হইতে হেমন্তবাবু এরূপ তীব্র শ্লেষবাণী আর একদিনও শোনেন নাই। আজ শুনিয়া তিনি যুগপৎ চমকিত ও ব্যথিত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ ঘরের বাহিরে আসিয়া চাকর ও ভিখুকে ডাকিয়া কহিলেন "তোরা আমায় বলিস্‌ নি কেন যে অমূল্যর জ্বর হয়েছে?" কেহই জবাব দিল না। অমূল্যর জ্বরের সংবাদ অবিলম্বে বাবুর কর্ণগোচর করা দরকার, তাহা কেহই বুঝিতে পারে নাই। ভীখু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "ডাক্তারবাবুকে আজ সকালে বলেছিলাম।" আগুণে ঘৃত পড়িল; হেমন্তবাবু জ্বলিয়া উঠিয়া কহিলেন, "সে কোথাকার কে? আমায় না বলে বাইরের লোককে খবর দেবার তোরা কে? বড় বাড়্‌ সব বেড়েছিস্‌ নয়,—আমায় বলতে কি হয়েছিল?" চারুমোহন বাবু ভাবিলেন, বাইরের লোক অর্থে তাঁহাকেও উল্লেখ করা হইতেছে। কিন্তু আগুণে তৎক্ষণাৎ জল পড়িল। মনিবের রক্ত চক্ষুকে ভয় না করিয়া ভীখু কহিল, "সকালে তো খুড়ীমা নতুন-মাকে বল্লেন আপনাকে বল্‌তে যে, দাদাবাবুর জ্বর খুব বেড়েছে।" হেমন্তবাবু উত্তর না দিয়া তৎক্ষণাৎ ডাক্তার ডাকিতে চলিলেন। পথে চলিতে-চলিতে তাঁহার মনে হইতে লাগিল, ত্রুটি তো সবারই দেখ্‌ছি। তবে কি আমারও ত্রুটি হয় নি? রাজেন এখন আমার যতটুকু বুক জুড়ে বসেছে, আগে সেটুকু অমূল্যরই ঠাঁই ছিল না কি? কিন্তু সে যেন কত দূরে চলে গেছে,—নাগালই পাই না। কেন গেল? হেমন্তবাবু দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। আজ বহুদিনের পর অনিলার অন্তিম স্মৃতি তাঁহার চিত্তপটে জাগিয়া উঠিল। চিরবিদায়-মুহূর্ত্তে তাঁহার পায়ের উপর হাত রাখিয়া অনিলা বলিয়াছিল, "আমি চল্লুম, কিন্তু আমার স্মৃতি-চিহ্নস্বরূপ তিনটি জিনিস তোমায় দিয়ে গেলুম। এদের বুকে নিয়ে তুমি সান্ত্বনা পাবে। তোমার অমূল্যধন রইল, ভাবনা কি? অমূল্যকে যত্ন করে মানুষ কোরো, ঐ হোতে আবার সব পাবে।" হেমন্তবাবুর চক্ষু বাষ্পপূর্ণ হইয়া আসিল। মৃতার

সে শেষ বাণী কি তিনি অক্ষরে-অক্ষরে পালন করিতে সমর্থ হইয়াছেন ?

সেই সময়ে শান্তির পায়ের কাছে বসিয়া সুন্দরী বলিতেছিল, "দেখ্‌লে মা, খুড়ীমার কাণ্ডখানা, বাবুকে খবর না দিয়ে পাড়ায় খবর দেওয়া হয়েছে! তাদের দরদ কি বাপের চাইতে বেশী? তারা কই কেউ তো ডাক্‌তার ডাক্‌তে যেতে ত পাল্লে না। তারা কেউ ট্যাঁকের কড়ি খরচ কোরে উপ্‌গার কত্তে আস্‌বে? আমাকেও তো একবার বল্‌লে পার্‌তো। সব খোলোমী, মা, সব খোলোমী।"

(ক্রমশঃ)

সখী

(বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাবলি-অবলম্বনে)

[অধ্যাপক শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম-এ]

(প্রথম শ্রেণী)

পূর্ব্বানুবৃত্তি

(৯) রাধারাণী ও বসন্তকুমারী

রসমঞ্জরীতে দূতীর লক্ষণনির্দ্দেশে 'তস্যাঃ সংঘট্টন-বিরহ-নিবেদনাদীনি কর্ম্মাণি' এইরূপ বলা হইয়াছে, কিন্তু ধরিতে গেলে 'সংঘট্টন' অর্থাৎ নায়কের সহিত নায়িকার মিলন ঘটাইয়া দেওয়া সখীরও একটি কার্য্য। রাধারাণীর সহিত বসন্তকুমারীর সখিত্বে এই তত্ত্ব স্ফুটীকৃত। (রসিক পাঠক হয় ত বলিবেন, মদনের সহায় বসন্ত!)

রাধারাণীর দারিদ্র্যের দিনে মাতা ও কন্যা পরস্পরের ভালবাসা ও সমবেদনার চিত্র আছে, কিন্তু তখন তাঁহার সখীর ব্যবস্থা নাই। তাহার পর কামাখ্যা বাবুর গৃহে রাধারাণীর মাতার মৃত্যু হইয়াছিল; তখন অবশ্যই কামাখ্যাবাবুর কন্যা বসন্তকুমারী (কুন্দর বেলায় চাঁপা অপেক্ষাও) সহৃদয়তার সহিত রাধারাণীকে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন, কিন্তু কবি সে প্রসঙ্গ তোলেন নাই। রাধারাণীর পূর্ব্বরাগের সূত্রপাতেও সখীর নিকট সাহায্য ও সান্ত্বনা পান নাই (চঞ্চলকুমারীর মত সৌভাগ্য তাঁহার ঘটে নাই), কেননা তখনও তিনি কামাখ্যাবাবুর গৃহে বাস করিতে আরম্ভ করেন নাই। তাহার পর, রাধারাণী যখন 'পরম সুন্দরী ষোড়শবর্ষীয়া কুমারী,' তখন বাল্যবিবাহ-দ্বেষী 'নব্যতন্ত্রের লোক' কামাখ্যাবাবু রাধারাণীর সম্বন্ধ করিবার জন্য উদ্‌যোগী হইলেন ও তাহার 'মনের কথা জানিবার জন্য আপনার কন্যা বসন্তকুমারীকে ডাকিলেন।' (৩য় পরিচ্ছেদ)। এই প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্যই যথাসময়ে (তাহার একটুও পূর্ব্বে নহে) বসন্তকুমারীর সখিত্বের অবতারণা। বালিকা-বয়সেই পূর্ব্বরাগের সূত্রপাত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা এতদিন পাঠকের নিকট প্রকাশ পায় নাই, এই পিতাপুত্রীর কথোপকথন উপলক্ষে পাইল। অবশ্য পূর্ব্বেই রাধারাণী মনের কথা প্রাণের ব্যথা ব্যথার ব্যথী সখীকে জানাইয়াছিলেন। কিন্তু পাঠক সে বিশ্রম্ভালাপ আড়ি পাতিয়া শুনিবার অবকাশ তখন পান নাই, এখন পাইলেন। ছোটগল্প বলিয়া গ্রন্থকার সখিত্বের ইতিহাস ফলাও করিয়া বর্ণনা করেন নাই। এইজন্যই রুক্মিণী-কুমারের সন্ধানে যখন কোন ফল হইল না, তখনও নির্ম্মল-কুমারীর ন্যায় বসন্তকুমারী কি ভাবে নায়িকাকে সান্ত্বনা দিলেন, চঞ্চলকুমারীর ন্যায় রাধারাণী কি ভাবে সখীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিলেন, সে সকল বাহুল্য-বর্ণনা নাই।

অবতরণিকায় (ভারতবর্ষ, আষাঢ়, ১৩২৫, পৃঃ ২৬) বলিয়াছি, সখীর নিজস্ব সুখদুঃখের কথা কাব্যে স্থান পায় না, ইহাই সাধারণ নিয়ম। এক্ষেত্রে বসন্ত বিবাহিতা কি

কুমারী, সধবা কি বিধবা, তাহা পর্য্যন্ত পাঠককে জানান কবি আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। যাক্, এক্ষণে প্রকৃত অনুসরণ করি।

'বসন্তের সহিত রাধারাণীর সখীত্ব। উভয়ে সমবয়স্কা। এবং উভয়ে অত্যন্ত প্রণয়।' 'বসন্ত সলজ্জভাবে, অথচ অল্প হাসিতে হাসিতে' রুক্মিণীকুমার-ঘটিত বিবরণ...'পিতার সাক্ষাতে সকল বিবৃত করিল' এবং বলিল "রাধারাণী রুক্মিণীকুমার ভিন্ন আর কাহাকেও বিবাহ করিবে না। সেই রাত্রি অবধি, রুক্মিণীকুমারের একটি মানসিক প্রতিমা গড়িয়া, আপনার মনে তাহা স্থাপিত করিয়াছে। এই পাঁচ বৎসর রাধারাণী আমাদিগের বাড়ী আসিয়াছে, এই পাঁচ বৎসরে এমন দিন প্রায় যায় নাই, যেদিন রাধারাণী রুক্মিণী-কুমারের কথা আমার সাক্ষাতে একবারও বলে নাই।" (৩য় পরিচ্ছেদ।) এই শেষ বাক্যটী লক্ষ্য করিয়াই বলিতে-ছিলাম, রাধারাণী পূর্ব্বেই 'বিশ্বাসবিশ্রামকারিণী পার্শ্বচারিণী' সখী বসন্তকুমারীকে মনের কথা, প্রাণের ব্যথা জানাইয়া-ছিল, কিন্তু কবি তখন সে বিশ্রব্ধালাপ পাঠকের গোচর করা আবশ্যক মনে করেন নাই। রাধারাণী প্রথম দর্শনেই সাবিত্রীর ন্যায় (!) রুক্মিণীকুমারকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে পাইবার 'সম্ভাবনা কিছুই নাই' তাহা বিলক্ষণ বুঝিয়াও তদ্গতচিত্তা। এই বিরহোৎকণ্ঠিতা অবস্থায়ই সখীর সাহচর্য্যের অধিক প্রয়োজন, বসন্তকুমারীর অবতারণায় সে প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে। যাহাতে নায়িকা অভীষ্ট নায়ককে পাইতে পারেন, তজ্জন্য সখী বিধিমত চেষ্টার ত্রুটি করিলেন না, তাহার জন্য পিতার নিকট একটু প্রগল্ভতা প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। এ নির্লজ্জতা যে রাধারাণীর উপকারার্থ। পিতাপুত্রীর এ বিষয়ে এমনভাবে আলোচনা আমাদের মত পাড়াগেঁয়ের একটু কেমন কেমন ঠেকে; কিন্তু অনুমান হয়, বসন্ত-কুমারী মাতৃহীনা, সুতরাং এ সব কথা মাতার মারফত পিতাকে জানাইবার উপায় ছিল না। আর কামাখ্যাবাবু 'নব্যতন্ত্রের লোক', রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'নব্যসমাজের খোলাখুলি মন্ত্রে দীক্ষিত,' সুতরাং তিনি কন্যার সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিতে দ্বিধাবোধ করিলেন না। *

* ইংরেজী নভেলে কন্যা নিজের প্রণয়ের কথাই অনেক সময় পিতার নিকট বলিতে দ্বিধা বোধ করেন না।

যাহা হউক, কন্যার প্ররোচনায় কামাখ্যাবাবু সংবাদ-পত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া প্রভৃতির ব্যবস্থা করিলেও তাঁহার জীবদ্দশায় রুক্মিণীকুমারের কোন হদিস মিলিল না। তবে তিনি যে সূত্র ধরিয়া সন্ধান আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহারই পরিণামে 'কামাখ্যাবাবুর শ্রাদ্ধাদির পর' যখন রাধারাণী আপন বাটীতে চলিয়া গেলেন, তাহারও 'দুই এক বৎসর পরে' সখা বসন্তকুমারীর নিকট পত্র লইয়া একজন ভদ্র-লোক (ইনিই রাধারাণীর আকাঙ্ক্ষিত ও প্রতীক্ষিত 'রুক্মিণীকুমার' ছদ্মনামধারী) রাধারাণীর হুজুরে হাজির হইলেন। (৫ম পরিচ্ছেদ।) উভয় সখী এখন আর একত্র বাস করেন না, কিন্তু 'পার্শ্বচারিণী' না হইলেও বসন্তকুমারীর সখীপ্রীতির কিঞ্চিন্মাত্রও হ্রাস হয় নাই, দূরে থাকিয়াও তিনি সখীর ইষ্টসাধনে নিরত। এই চিঠি পাঠানোর ব্যাপারে একটু রকমফের আছে। সাধারণতঃ নায়ক বা নায়িকা প্রণয়লিপি লেখেন, সখী বা দূতী তাহা বহন করিয়া যথাস্থানে পৌছাইয়া দেন, ইহাই মামুলি ব্যবস্থা। এখানে সখী নায়কের হইয়া চিঠি লিখিলেন, নায়ক এই সুপারিশ-চিঠির জোরে স্বয়ং দৌত্যে গেলেন। এই এক চিঠিতেই সব কাজ হাসিল। আসামী এই চিঠি দ্বারা ও আপন একরারে সেনাক্ত হইল। এবং এই চিঠির সূত্রে মামলা তদ্বিরের সমস্ত ভার হাকিম স্বহস্তে লইলেন। উকীল-মোক্তারের প্রয়োজন হইল না। অর্থাৎ এমন সন্ধিক্ষণে সখী বসন্তকুমারী ললিতা-বিশাখাদি সখীর ন্যায় বা বৃন্দাদূতীর ন্যায় পার্শ্বে থাকিলে ভাল হইত। এজন্য রাধারাণীর মুখ দিয়া কবি দুই একবার বলাইয়াছেন, 'বসন্তকে যদি আনাইতাম', কিন্তু লজ্জা করিলে চিরজন্মের মত বাঞ্ছিতকে হারাইতে হইবে বুঝিয়া নায়িকা বেশ একটু প্রগল্ভতা প্রকাশ করিয়া কার্য্যসিদ্ধি করিলেন। ইন্দিরাও এমন অবস্থায় আত্মদোষ-ক্ষালনের জন্য বলিয়াছে, 'তখন আমার কি দায়, মনে করিয়া দেখ।' (ইন্দিরা, ১২শ পরিচ্ছেদ।) 'ইন্দিরা'র বিবাহিতার পতি-উদ্ধার, এক্ষেত্রে কুমারীর অভীষ্টবর-উদ্ধার। প্রণালীও স্বতন্ত্র। সুভাষিণীর সাহায্য ও বসন্তকুমারীর সাহায্য, হারাণীর দৌত্য ও চিত্রার শাঁক-বাজান, ইন্দিরার কীর্ত্তি ও রাধা-রাণীর কীর্ত্তি, প্রভৃতির তুলনায় সমালোচনা করিলে প্রণালীর এই প্রভেদ ধরিতে পারা যায়। শেক্স্পীয়ারের

ন্যায় বঙ্কিমচন্দ্রও এক ধরণের দুইটী জিনিসে ঠিক একই প্রণালী অবলম্বন করেন না। বলা বাহুল্য যে, সুভাষিণীর সাহায্য বসন্তকুমারীর অপেক্ষাও অনেক বেশী। বসন্তকুমারী উকীল-কন্যা, সুভাষিণী উকীল-পত্নী, উকিলের বাড়ীতেই এরূপ তদ্বিরকারিণী সাজে, যাহার-তাহার বাড়ী সাজে না!

যাক্, এ সব বাজে কথায় আর কায নাই। প্রেমিক-যুগলের মালাবদল হইল, মঙ্গল-শঙ্খ বাজিল, 'শুভ লগ্নে সুতহিবুক যোগে' বিবাহের দিন স্থির হইল। তখন বসন্ত আসিল।' (৮ম পরিচ্ছেদ।) উভয় সখীতে নর্ম্মালাপ হইল ('অন্যাঃ পরিহাস-প্রভৃতীনি কর্ম্মাণি'—রসমঞ্জরীর বচন স্মর্ত্তব্য)। 'বসন্ত আসিলে রাধারাণী বলিল, "তোমার কি আক্কেল, ভাই বসন্ত?" বসন্ত বলিল, "কি আক্কেল, ভাই রাধারাণী?" রা। যাকে-তাকে তুমি পত্র দিয়া পাঠাইয়া দাও কেন?...বসন্ত বলিল, "রাগের কথা ত বটে। সুদ শুদ্ধ দেনা পাওনা বুঝিয়া নেয়, অমন মহা-জনকে যে বাড়ী চিনাইয়া দেয়, তার উপর রাগের কথাটা বটে।" রাধারাণী বলিল, "তাই আজ আমি তোর গলায় দড়ি দিব।" এই বলিয়া রাধারাণী যে হীরকহার' ইত্যাদি। সঙ্গে-সঙ্গে ঘটকীবিদায়ও বাকী রহিল না! হাতে হাতে মিলিল। 'রাধারাণী যে হীরকহার রুক্মিণীকুমারকে পরাইতে গিয়াছিলেন, তাহা আনিয়া বসন্তের গলায় পরাইয়া দিলেন।' এমন গুণের সখী প্রিয়তমের জন্য রক্ষিত বহুমূল্য হারেরই উপযুক্ত। এই নর্ম্মালাপ হইতে উভয় সখীর স্নেহ-প্রীতির গভীরতা ও মধুরতা বুঝা যায়। মধুর-মিলন—দর্শনে ললিতা সখীর ন্যায় বসন্তকুমারীর কি আনন্দ হইল, সখীকে সুখের কথা বলিয়া রাধারাণীর কি আনন্দ হইল, তাহা অনুভবের ভার সহৃদয় পাঠকের উপর দিয়া কবি বিদায় লইয়াছেন, আমরাও লইলাম।

(১০) 'ইন্দিরা'য় অমলা-নির্ম্মলা

অবতরণিকায় 'পুনর্লিখিত ও পরিবর্দ্ধিত'—'ইন্দিরা' সম্বন্ধে বলিয়াছি, 'সুভাষিণীর সখিত্ব এই আখ্যায়িকায় উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত। তাহারই (prelude) সূচনা-স্বরূপ অমলা-নির্ম্মলা বালিকাদ্বয়ের সখিত্বের ক্ষুদ্র চিত্র (৫ম পরিচ্ছেদ) গ্রন্থের প্রথম ভাগে সন্নিবেশিত হইয়াছে।' (ভারতবর্ষ, আষাঢ়, ১৩২৫, পৃঃ ৩২)। যেন সুভাষিণীর অনুপম সখিত্ব এই দুইটী মেয়ের বিমল সখিত্বের সুরের সহিত সুরবাঁধা। (মেয়ে দুইটীর নির্দ্দোষ সখিত্বের ইঙ্গিত অমলা-নির্ম্মলা নাম দুইটীতে লক্ষণীয়।) 'সেইদিন সেই স্থানে দুইটী মেয়ে দেখিয়াছিলাম, তাহাদের কখনও ভুলিব না।* মেয়ে দুইটীর বয়স সাত আট বৎসর। দেখিতে বেশ, তবে পরম সুন্দরীও নয়। কিন্তু সাজিয়া-ছিল ভাল। কাণে দুল, আর হাতে গলায় এক একখানা গহনা। ফুল দিয়া খোঁপা বেড়িয়াছে। রঙ্ করা, শিউলী ফুলে ছোবান, দুইখানি কালাপেড়ে কাপড় পরিয়াছে। পায়ে চারিগাছি করিয়া মল আছে। কাঁকালে ছোট ছোট দুইটী কলসী আছে। তাহারা ঘাটের রাণায় নামিবার সময়ে জোয়ারের জলের একটা গান† গায়িতে গায়িতে নামিল। গানটী মনে আছে, মিষ্ট লাগিয়াছিল তাই এখানে লিখিলাম। একজন এক এক পদ গায়, আর একজন দ্বিতীয় পদ গায়। তাহাদের নাম শুনিলাম, অমলা আর নির্ম্মলা।' ছোট্ট ঝরঝরে ছিমছাম সুন্দর ছবিখানির আঁকায় পটুয়ার কৃতিত্ব দেখাইবার জন্য এইটুকু উদ্ধৃত করিলাম। আশা করি, পাঠকবর্গ মানসনয়নে ছবিখানি প্রত্যক্ষ (Visualise) করিতে পারিয়াছেন। মল বাজানর গানটা ইন্দিরার মিষ্ট লাগিলেও উদ্ধৃত করিব না, কেন না অনেক পাঠক হয় ত বসুজপত্নীর মত বিরক্ত হইয়া বলিয়া বসিবেন, 'মরণ আর কি? মল বাজানর আবার গান!' এই অবস্থাভেদে ভালমন্দ লাগার কথা আবার ইন্দিরা আপাত-দৃষ্টিতে দূষণীয় ব্যবহারের নিজের বেলায় ভুলিয়াছেন। 'যদি কখন মল বাজিয়ে যেতে হয়, তবে সে এখন।' (১৫শ পরিচ্ছেদ)।

(১১) ইন্দিরা ও সুভাষিণী

সখিত্বের (prelude) সূচনা-স্বরূপ এই পরিচ্ছেদের ঠিক পর-পরিচ্ছেদেই ইন্দিরার সহিত সুভাষিণীর সখিত্বের

* এই সুরে সুর মিলাইয়া ইন্দিরা শেষ কথা বলিয়াছেন, 'আমি সুভাষিণীকে ভুলি নাই, ইহ জন্মে ভুলিব না। সুভাষিণীর মত এ সংসারে আর কিছু দেখিলাম না।' আমরাই কি ভুলিব?

† ইন্দিরার তখন জোয়ারের মত ভরা যৌবন, এ ইঙ্গিতটুকু প্রণিধান-যোগ্য। 'মল বাজানর ইঙ্গিত (symbolism) ১৫শ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

বনিয়াদ-পত্তন। অবশ্য বড় 'ইন্দিরা'র কথা বলিতেছি, ছোট 'ইন্দিরা'য় অমলা-নির্ম্মলাও নাই, সুভাষিণীও নাই। আমরা বহু কাব্য-নাটকে নায়ক-নায়িকার প্রথম-দর্শনে প্রেমে পড়ার (love at first sight) রোম্যান্টিক ঘটনা দেখিয়াছি, এ ক্ষেত্রে নারীতে নারীতে প্রথম-দর্শনে সখিত্ব-সংঘটনের ব্যাপার। প্রথম-দর্শনে প্রেমে পড়ার ব্যাপারে যেমন (প্রেমসঞ্চারের আদিকারণ-স্বরূপ) রূপগুণের চিত্র কবিগণ অঙ্কিত করেন, এ ক্ষেত্রেও সেই কারণে সুভাষিণীর রূপবর্ণনার প্রয়োজন ঘটিয়াছে। যাক্ একবার অমলা-নির্ম্মলার রূপবর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছি, আর সেই সুরে সুরবাঁধা সুভাষিণীর রূপবর্ণনা উদ্ধৃত করিব না। প্রেমের ব্যাপারে যেমন 'অনিমিষে বিনোদিনী দেখিছে বিনোদ', সখিত্ব-ব্যাপারেও সেইরূপ ইন্দিরা 'অনিমেষ-লোচনে' 'সুভো'কে দেখিতে লাগিলেন, ('তার মুখে কি একটা যেন মাখান ছিল, তাহাতে আমাকে যাদু করিয়া ফেলিল') 'সুবো'র মিষ্ট কথা শুনিয়া একেবারে গলিয়া গেলেন। ('সুভাষিণী' নামের সার্থকতা লক্ষণীয়।) সুভাষিণীও ইন্দিরার 'আঙ্গা হাত' লক্ষ্য করিলেন, 'চোখে জল' ও মুখে হাসি'ও দেখিলেন, প্রাণ খুলিয়া অপরিচিতার সহিত আলাপ করিলেন। কর্কশ-ভাষিণী মাসী মার কথার আঁচ তাঁহার গায়ে লাগিতে দিলেন না, হৃদ্যতা ও কোমলতার প্রভাবে তাঁহাকে দাসীবৃত্তি নহে, লোক-দেখান পাচিকাবৃত্তি গ্রহণ করিতে রাজী করিলেন, খাশুড়ীকে 'বশ করিয়া লইতে' একটু বেগ পাইতে হইবে তাহাও বলিলেন। একদিন সুভাষিণী ইন্দিরার পরমোপকার করিবেন, হারানিধি মিলাইবেন, আজ কেবল তাহার সূচনাস্বরূপ উপস্থিত অস্থিতপঙ্ক হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিলেন, আপাততঃ তাঁহার একটা কিনারা করিয়া দিলেন। পাঠকবর্গ সমগ্র পরিচ্ছেদটি পাঠ করিলে বুঝিবেন, কেমন সরস-মধুর ভাবে উভয়ের সখিত্বের'সূত্রপাত হইল।

বাটী পৌঁছিয়া সুভাষিণী চাতুরী খেলিয়া খাশুড়ীকে বুঝাইলেন বামুনের মেয়ে অপেক্ষা কায়েতের মেয়ে রাঁধুনীই ভাল, 'কুমুদিনী' যুবতী বলিয়া খাশুড়ী তাহাকে রাখিতে একেবারে অস্বীকার করিলেন, তখন হারাণী দ্বারা স্বামীকে ডাকাইয়া তাঁহাকে হুকুম করিলেন ইহাকে রাখাইয়া দিতে হইবে, স্বামীর একবেলা খাওয়া হইল না তাহাতে সুভাষিণী যে কষ্ট পাইলেন, তদপেক্ষা স্বামীর কৌশলে এই রাঁধুনী রাখা হইল তাহাতে বেশী সুখ পাইলেন, আবার এদিকে খাশুড়ীর দুর্ব্বাক্যে 'কুমুদিনী' যখন মর্ম্মে ব্যথা পাইয়া কাঁদিতে লাগিল তখন তাহার সহিত তিনিও কাঁদিলেন,—ইত্যাদি ব্যাপারে (৭ম পরিচ্ছেদে বর্ণিত) বুঝা যায় ইহার মধ্যেই নব পরিচিতার প্রতি তাঁহার কতটা প্রাণের টান হইয়াছে। তাহার পর বুড়ী বামুনী ঈর্ষ্যা-বশতঃ 'কুমুদিনী'কে গালি দিলে তজ্জন্য সুভাষিণীর তাহাকে তিরস্কার, খাশুড়ীর পাকা চুল তোলা লইয়া রঙ্গ, সুভাষিণীর ছেলের কল্যাণে 'কুমুদিনী'র সহিত বেহান পাতান, কুমুদিনীর রান্নার কায হাল্কা করিয়া দেওয়া, ইত্যাদি হইতে (৮ম ও ৯ম পরিচ্ছেদ) বুঝা যায় সুভাষিণীর সখীপ্রীতি কত গভীর হইয়াছে। বিস্তৃতিভয়ে এ সকলের পূরা বিবরণ দিলাম না। নায়িকা নিজেই বলিয়াছেন, 'একটী অমূল্য রত্ন পাইলাম—একটী হিতৈষিণী সখী। দেখিতে লাগিলাম যে সুভাষিণী আমাকে আন্তরিক ভাল-বাসিতে লাগিল—আপনার ভগিনীর* সঙ্গে যেমন ব্যবহার করিতে হয়, আমার সঙ্গে তেমনই, ব্যবহার করিত। 'এমন বন্ধু পাইয়া আমার এ দুঃখের দিনে একটু সুখ হইল।' (৯ম পরিচ্ছেদ।) যাক্, এ সমস্তই গেল গোড়া-পত্তন, সখিত্ব-সৌধের প্রথম ধাপ। প্রোষিতভর্ত্তৃকা বিরহোৎকণ্ঠিতা 'রাই-উন্মাদিনী' স্বামি-পাগলিনী নায়িকার পতি-উদ্ধারের জন্য সুভাষিণী কতটা করিলেন, তাহার বিবরণ এইবার আরম্ভ হইবে; ইহাতেই সখিত্বের পূরা পরিচয় পাওয়া যাইবে। পূর্ব্বের এ সমস্ত ব্যাপার তাহারই preparation বা সূত্রপাত।

একদিন 'কুমুদিনী' মুখ ফস্কাইয়া 'কালাদিঘীর ডাকাতী' কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছিল (৯ম পরিচ্ছেদ) কিন্তু তখন কথাটা চাপা দিয়াছিল। পরে সুভাষিণী চাপিয়া ধরিল, 'সেই গল্পটা বলিতে হইবে।' (১০ম পরিচ্ছেদ।) এই কৌশলে গ্রন্থকার নায়িকার প্রমুখাৎ ইন্দিরার জীবনের ইতিহাস সুভাষিণীর—হিতৈষিণী সখীর গোচর

* ভগিনীর সহিত তুলনার একটা তাৎপর্য্য আছে। পুস্তকের প্রথম ও শেষ অংশে ইন্দিরার কনিষ্ঠা ভগিনীর সমবেদনার বর্ণনা আছে। ইন্দিরা যখন পিতৃগৃহচ্যুতা প্রবাসিনী, তখন সুভাষিণীই যেন ভগিনী-স্থলাভিষিক্তা।

করিয়াছেন।' সকল শুনিয়া সুভাষিণী স্বামীর সহিত পরামর্শ করিয়া ইন্দিরার পতি-উদ্ধারের রীতিমত তদ্বির লাগাইলেন। প্রথমে পত্র লেখা হইল, ডাকঘরের নাম না থাকাতে কোনও ফল হইল না। সুভাষিণী স্বামী দ্বারা যাহা যাহা করাইয়াছিলেন সবই ইন্দিরাকে বলিলেন। (১ শ পরিচ্ছেদ।) তাহার পর 'আকাশে ফাঁদ পাতিয়া' ইন্দিরার সোণার চাঁদ ধরা পড়িল,—সুভাষিণী তথা রমণবাবুর কৌশলে। (১১শ পরিচ্ছেদ।) এইবার ইন্দিরা 'অভিসারিকা' হইবার জন্য উন্মুখ হইলেন—কিন্তু এ স্বাধীন-যৌবনার লীলা নহে, নিজের পতির নিকট অভিসার। তিনি হারাণীর সাহায্য চাহিলেন, পাইলেন না, অগত্যা সখী সুভাষিণীর শরণ লইলেন; তাঁহার সহিত কথা কহিতে গিয়া বুঝিলেন, এ সব যোগাযোগ সুভাষিণী তথা রমণবাবুর কীর্ত্তি। সুভাষিণী ইন্দিরার অনুরোধে রমণবাবুর মারফত উপেন্দ্রবাবুকে রাত্রিটার জন্য তথায় থাকিতে বলাইলেন। এবং ইন্দিরার উপকারের জন্য হারাণীকে দূতীয়ালি করিতে দিতেও রাজী হইলেন। (১২শ পরিচ্ছেদ।) অন্যত্র সখী প্রয়োজন হইলে দূতীর কার্য্য করেন, এ ক্ষেত্রে পর্দ্দানসীন ভদ্রমহিলার পক্ষে তাহা অবশ্য অসম্ভব, হারাণীকে ইঙ্গিত করিয়াই হিতৈষিণী সখী সুভাষিণীকে ক্ষান্ত থাকিতে হইল। ইহাও দোষের কিনা তাহা বিবেচনা করিবার জন্য 'সুভাষিণী অনেকক্ষণ ভাবিল।' এইরূপে কবি এই রোম্যাণ্টিক ব্যাপারে সুভাষিণীর দোষক্ষালনের জন্য আট-ঘাট বাঁধিয়া কায করিয়াছেন।* পর-পরিচ্ছেদে (১৩শ পরিচ্ছেদে) দেখা যায়, সুভাষিণী কৌশলে হারাণীকে ইঙ্গিত করিলেন।

সুভাষিণী এই পর্য্যন্ত করিয়া ক্ষান্ত হইলেই যথেষ্ট হইত, কিন্তু এই ১৩শ পরিচ্ছেদে কবি ইহার উপর এমন একটা সরেস জিনিস দিয়াছেন, যাহাতে এই সখিত্বের, প্রীতিস্নেহের নিবিড়তা গভীরতা স্ফুটতর হইয়াছে, চিত্র উজ্জ্বলতর হইয়াছে। সুভাষিণীর ঘরে কবাট দিয়া ইন্দিরাকে সাজান (বাসক-সজ্জা).† আপনার অলঙ্কার-রাশি উপহার দেওয়া, ইন্দিরা কিছুতেই রাজি না হইলে তাহাকে ফুলের সাজে সাজান, 'কি জানি ভাই আজ বৈ তোমার সঙ্গে যদি দেখা না হয়, ভগবান্ তাই করুন,—তাই তোমাকে আজ এ ইয়ার-রিং পরাইব। তুমি যেখানে যখন থাক, এ পরিলে আমাকে তুমি মনে করিবে।' এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আসন্নসখী-বিরহাকুলা অথচ সখীর প্রাণপতির সহিত আসন্নমিলনের সম্ভাবনায় আনন্দোৎফুল্লা সুভাষিণীর ইন্দিরাকে ইয়ার-রিং পরান, উভয় সখীর কাঁদিতে কাঁদিতে হাসিতে হাসিতে মিঠে ইয়ারকি,* আলিঙ্গন, মুখচুম্বন ইত্যাদি মধুর সুন্দর ব্যাপারের চুম্বক বর্ণনা দিয়া এই অনুপম চিত্রের অঙ্গহানি করিব না, পাঠকবর্গকে ১৩শ পরিচ্ছেদের শেষার্দ্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। তথাপি একটু উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। 'সখীভাবেই কথা কহিতে লাগিল। আমি যে চলিয়া যাইব, সে কথা পাড়িল। চক্ষুতে তার একবিন্দু জল চক চক করিতে লাগিল। এক ফোটা চোখের জল আমার গালে পড়িল। ঢোক গিলিয়া আমার চোখের জল চাপিয়া, আমি বলিলাম্।...তখন সুভাষিণী আমার গলা ধরিল, আমি তার গলা ধরিলাম। গাঢ় আলিঙ্গনপূর্ব্বক পরস্পরে মুখচুম্বন করিয়া গলা ধরাধরি করিয়া, দুইজনে অনেকক্ষণ কাঁদিলাম। এমন ভালবাসা কি আর হয়? সুভাষিণীর মত আর কি কেহ ভাল বাসিতে জানে? মরিব, কিন্তু সুভাষিণীকে ভুলিব না।' ইহার উপর টীকা-টিপ্পনী অনাবশ্যক (impertinence) বেআদবি হইবে।

* হারাণীর দোষক্ষালনের জন্য গ্রন্থকার 'পরিবর্দ্ধিত ও পুনর্লিখিত' 'ইন্দিরা'য় কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা হারাণীর সঙ্গে বুঝাইয়াছি। (ভারতবর্ষ, আশ্বিন, ১৩২৫।)

† নিমাইএর শাস্তিকে স্বামীর সহিত দেখা করাইবার সময় সাজানর চেষ্টা ইহার কাছে হার মানে। কমলমণিও এমন করিয়া সূর্য্যমুখীকে সাজাইতে যত্ন করিতে পারেন নাই। অতএব এ ক্ষেত্রে ননদ-ভাজ সম্পর্কের উপরও টেক্কা দিয়াছে।

* যে সকল পাঠক ইহাতে রসাধিক্য দেখিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন, তাঁহাদিগকে পুস্তকের শেষে উদ্ধৃত শেলীর কবিতা 'Rarely, rarely, comest thou; spirit of delight' স্মরণ করিতে অনুরোধ করি। শেষ বয়সে বড় আনন্দের উচ্ছ্বাসেই বড় স্ফূর্ত্তিতেই গ্রন্থকার আখ্যায়িকাটি 'পুনর্লিখিত' করিয়াছিলেন।

ইহার পরে, ইন্দিরা স্বহস্তে তদ্বিরের ভার লইলেও সুভাষিণী একেবারে হাল ছাড়িয়া দেন নাই—রমণবাবুর উপেন্দ্রবাবুর বাটী যাতায়াতই তাহার প্রমাণ। (১৭শ ও ১৯শ পরিচ্ছেদ।) ইন্দিরার পতি-উদ্ধারে সুভাষিণীর সখীর কার্য্য ফুরাইল। 'উপসংহারে' ইন্দিরা আবার সুভাষিণীর কথা তুলিয়াছেন, সুভাষিণীর সহিত পত্র-বিনিময় করিয়াছেন, আর বলিয়াছেন, 'সুভাষিণীর জন্য সর্ব্বদা আমার প্রাণ কাঁদিত।' আর একবার মাত্র দুই সখীর দেখা হইয়াছিল—সুভাষিণীর কন্যার বিবাহ-উপলক্ষে। ইন্দিরার শেষ কথা—'আমি সুভাষিণীকে ভুলি নাই। ইহজন্মে ভুলিব না। সুভাষিণীর মত এ সংসারে আর কিছু দেখিলাম না।' সহৃদয় পাঠকেরও বোধ হয় এই রায়। এক হিসাবে সুভাষিণীর সখিত্ব কমলমণির সখিত্ব অপেক্ষাও বড়, কেননা কমলমণির সখিত্ব নিজের ভাজের সঙ্গে, আর সুভাষিণীর সখিত্ব নিতান্ত নিস্পরের সঙ্গে, নব-পরিচিতার (অজ্ঞাতকুলশীলা বলিলেও চলে) সঙ্গে। এই তুলনার কথা ছাড়িয়া দিলেও সুভাষিণী প্রথম শ্রেণীর সখীদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, তাহা নিঃসন্দেহ। আখ্যানটি মামুলি আদিরসের ব্যাপার হইলেও, সুভাষিণীর আচরণ ও কার্য্য ঠিক বাঁধাধরা (Conventional) প্রণালীতে নহে, সখিত্বের এই রমণীয় আদর্শে কবির যথেষ্ট মৌলিকতা আছে

বারান্তরে সম্পূর্ণ নূতন ধরণের সখিত্বের দুইটি চিত্রের (প্রফুল্ল ও দিবা-নিশি, শ্রী ও জয়ন্তী) পরিচয় দিয়া প্রথম শ্রেণীর সখীর বিবরণ শেষ করিব।

দেবী ও দানব

[শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম্-এ, বি-এল্]

(১)

ধন্তপুরের সর্ব্বেশ্বর বসুর সুন্দরী কন্যা গৌরীরাণীকে যখন জামনগরের চৌধুরী বাবুরা মণি-মুক্তার অলঙ্কারে মুড়িয়া বধূরূপে লইয়া গেলেন, তখন গ্রামের মধ্যে একটা ভীষণ আন্দোলনের সৃষ্টি হইল। একই ঝাড়ের বাঁশ ভিন্ন প্রকৃতির মনুষ্যের প্রবৃত্তির বশে নানা কর্ত্তব্য সাধন করে—কেহ দুর্ব্বৃত্তের হস্তে তৈলপক্ক ও ধূমপক্ক হইয়া সজ্জনের মাথার খুলি ফাটাইয়া দেয়, আবার কেহ বা কার্ত্তিক মাসে প্রাসাদ-শিখরে দাঁড়াইয়া গৃহস্থের পূর্ব্বপুরুষের প্রেতলোকের রাজপথ উদ্ভাসিত করিবার জন্য আকাশ-প্রদীপের অবলম্বন হয়। গৌরী-রাণীর বিবাহের উৎসবের তরঙ্গগুলা তেমনি ভিন্ন ভিন্ন মানব-প্রকৃতির আশ্রয়ে গিয়া বিভিন্ন চিন্তার লহর তুলিল। ঈর্ষায় কাহারও বুক ফাটিয়া গেল, আনন্দে কেহ অধীর হইল, জামনগরের চৌধুরী বাবুর সহিত অবসরে আলাপ পরিচয় করিয়া লইয়া, কেহ বা আশা করিল, ভবিষ্যতে যা হোক একটা কিছু সুবিধার পথ খুলিয়া লইবে। সর্ব্বেশ্বর বসুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা উকীল, পরমেশ্বর কেবল প্রজাপতির শুভাগমনের সূত্রপাতের সময় হইতে নাসিকা কুঞ্চন করিয়াছিলেন এবং বিজ্ঞের মত জ্যেষ্ঠের নিকট গিয়া বলিয়াছিলেন—দাদা, কাজটায় কি সুবিধা হবে? বড়লোকের ছেলে, লেখাপড়া কখন শেখেনি—ওর নামটা কি—টাকাই কি সর্ব্বস্ব? মেয়েটার ভবিষ্যৎ সুখ-শান্তি—

দাদা বাধা দিয়া বলিয়াছিলেন—বল কি ভাই? ছেলের স্বভাব-চরিত্র খুব ভাল।

রাত্রে সর্ব্বেশ্বর-গৃহিণী বলিলেন—জানি গো জানি। হিংসে জিনিসটা বড় সর্ব্বনেশে। দেখব ওঁর মেয়ের—

সর্ব্বেশ্বর বাধা দিয়া বলিলেন—ছিঃ, ছিঃ—অমন কথা মুখে এনো না।

কিন্তু সেই পরমেশ্বর উকীলের আশঙ্কার ভিতর যে বর-বধূর ভবিষ্যৎ-জীবনের ইতিহাসের একটা শোক-প্লাবন অধ্যায়ের দূরদৃষ্টি ছিল তাহা প্রকাশ পাইল বিবাহের সাত বৎসর পরে। যখন নবনী-কোমল গৌরীর-রাণী ইন্দু-কান্তি লইয়া কৈশোর ও যৌবনের ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল,

যখন "চরণ চপলতা লোচন নেল,"—ইত্যাদি, ইত্যাদি, তখন যুবক অনিলকুমারের "যৌবন-নিকুঞ্জে গাহে পাখি," ইত্যাদি, ইত্যাদি। সুতরাং সে প্রাণ ভরিয়া গৌরী-রাণীকে ভালবাসিল। নিজের হাতের মারা বাঘ ও বনবরাহের ভীম-দেহ গৌরীর কক্ষের গবাক্ষের নীচে রাখিয়া অনিলকুমার বিশ্বস্ত পরিচারক টক্করলালের দ্বারা বৌ-রাণীর নিকটে সংবাদ পাঠাইত। যখন তাঁহার আরবী ঘোড়া তিলক-চাঁদ ঘাড় বাঁকাইয়া দুষ্টের মত পিছনে চাহিয়া "শিরপা" করিত, তখন অনিলকুমার কোনও প্রকারে, অন্দর-মহল হইতে দেখিতে পাওয়া যায় এমন একটা স্থানে তাহাকে লইয়া গিয়া, টক্করলালের উপর উক্তরূপ আজ্ঞা জারি করিত। উড্ডনশীল চকাচকি মারিয়া তাহার পূর্ণ আনন্দ হইত না; কারণ নদীর ধারে বালির চরায় তো আর বৌ-রাণী আসিয়া তাহার অদ্ভুত লক্ষ্য-বেধ-শক্তি দেখিতে পাইবে না। সে নিজের হাতে গোলাপ ফুল তুলিয়া গৌরীকে উপহার দিত, আর গৌরী যখন তাহার সোহাগে গলিয়া যাইত, তখন সে বড় শান্তি পাইত।

কিন্তু এ আদর তো চিরকাল চলিতে পারে না—বিশেষ যখন পিতৃ-বিয়োগের পর তাহাকে ঘন-ঘন সহরে যাইতে হইল। সহরে চৌধুরীদের বড় বাড়ী ছিল—কাজেই পাঁচ জন বন্ধু জুটিল। জমিদারের পক্ষে স্ত্রৈণ হওয়া যে একেবারে বাতুলতা,—জীবনটা, বিশেষ যৌবনটা, যে অশেষ প্রকারে উপভোগ্য,—"যৌবন সায়রের" জোয়ার যে গঙ্গার জোয়ারের মত নয়,—তাহা যাইলে আর ফিরে না—ইত্যাদি—ছোট-ছোট সরল সত্যগুলা কেন সে এতকাল আবিষ্কার করে নাই, ইহা ভাবিয়া নবীন জমিদার আপনাকে তিরস্কার করিল, একটু ধিক্কার দিল। সহরের জজ-আদালতের একজন নব্য উকীল তাহাকে বুঝাইল যে, সঙ্গীত-চর্চ্চার উৎসাহ দিবার মালিক দেশের জমিদার-কুল। কিন্তু যতদিন অনিলকুমার নিজের সহরের কলা-কুশলতার শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে যত্নবান হইল, ততদিন গৌরী-রাণীর ভাগ্য-রবি অস্তাচলের পথে চলিলেও একেবারে মুখ লুকান নাই। যে দিন অনিলকুমার কলিকাতা হইতে এক থিয়েটারের নর্ত্তকী আনিয়া নিজের সহরে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করিল, সেদিন দ্বিপ্রহরে গৌরী-রাণী জামনগরের অন্দরের বাগানে হঠাৎ শিবা-ক্রন্দন শুনিয়া সভয়ে শয্যার উপর উঠিতে গিয়া একটা কাঁচের ফুলদান, একটা জাপানী পেয়ালা এবং অনিলকুমারের ফটোচিত্রের কাঁচ ভাঙ্গিয়া ফেলিল।

(২)

সকল ব্যাপারই 'তনি বলত বলত বন যাই'—তা হউক সে প্রেম, আর হউক সে অধঃপতন। প্রথম যেমন একটু-একটু করিয়া অনিল ও গৌরীর দুইটি হৃদয় মিলিয়া-মিলিয়া এক হইয়া যাইতেছিল, এখন তেমনিই একটু-একটু করিয়া অনিলকুমার গড়াইতেছিল—অধঃপতনের গড়ানে পথে। সে পথের নিয়মে বিশিষ্টতা আছে,—একটু অগ্রসর হইলে আর পথভ্রম হয় না; আরও অগ্রসর হইবার জন্য কষ্ট করিতে হয় না, হাঁফাইতে হয় না, কপালের ঘাম মুছিতে হয় না। অনিলকুমারের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ; সে চিরদিন একরোখা ছেলে। পুরাতন কর্ম্মচারীবৃন্দ সকল কথা বুঝিতে পারিলেও সাহস করিয়া কেহ তাহাকে কিছু বলিতে পারিল না। কলিকাতার সেই অভিনেত্রীটার নাম নেন্টি;—সে এখন ধনীর আশ্রয়ে আসিয়া নিজের নামকরণ করিয়াছিল—জড়োয়াকুমারী। দুই-একজন নবীন কর্ম্ম-চারীকেও কাগজপত্র স্বাক্ষর করাইবার জন্য সহরে বাবুর নিকট জড়োয়াকুমারীর গৃহে যাইতে হইত। গৌরী জামনগর গ্রামে থাকিতে প্রথম-প্রথম বিশ্বাস করিত, কালেক্টর সাহেবের মনস্তুষ্টির জন্য স্বামীকে সহরে থাকিতে হয়। কুসংবাদের স্বধর্ম্ম, সম্প্রসারণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা,—বিশেষ যে তাহাকে চাহে না, তাহার নিকট। কু-সংবাদ প্রথমে কানাঘুষা রূপে, শেষে প্রকাশ্য ভাবে অতিরঞ্জনের মুখোস পরিয়া গৌরী-রাণীর নিকট আত্ম-সমর্পণ করিল। গৌরী মূর্চ্ছিতা হইল,—মূর্চ্ছাভঙ্গের পর আপনাকে ধিক্কার দিল—"ছিঃ ছিঃ স্বামী-নিন্দা শুনতে আছে!" যে স্ত্রীলোকটি তোষামোদ করিবার জন্য এ সংবাদ লইয়া বৌ-রাণীর নিকট পৌঁছিয়াছিল—তাহাকে সকলে তিরস্কার করিল। শেষে যখন সে বুঝিল, বাবু শুনিলে তাহার ভিটায় ঘুঘু চরিবে, কলাগাছে হরিয়াল বসিবে, তখন সে কিছুদিনের জন্য ভিন্ন গ্রামে কুটুম্ব-বাড়ীতে বাস করিতে গেল। এমন চৌধুরী বাবুরা ন'ন! তাঁদের নামে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল পান করে।

গৌরীর মন কিন্তু একেবারে নিঃসন্দেহ হইল না।

তাহার মন-ক্ষেত্রটি "হ্যাঁ," "না," "উঁহু," এবং "তা হ'বেও বা"র কুরুক্ষেত্র হইয়া উঠিল। তাহাতে সে অবসন্ন হইতে লাগিল। অথচ আত্ম-মর্য্যাদা তাহাকে পুনঃপুনঃ নিষেধ করিতে লাগিল—এ কথার সত্য-মিথ্যা অপরের সহিত আলোচনা করিতে। স্বামীকে জিজ্ঞাসা করাও অসম্ভব। যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলেই তো প্রতিপন্ন হইবে যে, সে তাহার জীবন-সর্ব্বস্ব অনিলকুমারের বিমল চরিত্রে সন্দেহ করিয়াছে।

এইরূপ সংগ্রামে বরষা কাটিল। যখন চারিদিক ঘন-ঘটাচ্ছন্ন হয়, বৌ-রাণীকে কুচিন্তা আসিয়া উৎপীড়ন করে। যখন পুকুরের উপর জল পড়ে, পুকুরের গায়ের ফোস্কাগুলা ঊর্দ্ধমুখ হইয়া বৃষ্টির জলকে ধরিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়, তখন তাহার মনের ব্রণগুলাও কুচিন্তাকে সাদরে ঘরের মধ্যে বরণ করিয়া তুলে। কিন্তু সপ্তাহে যখন একবার করিয়া অনিলকুমার আসিয়া তাহাকে কোমল স্নেহের শীতল উৎসে স্নাত করে, তখন মনের ময়লা ধুইয়া যায়, সে আপনাকে ধিক্কার দেয়; ইচ্ছা করে মনের কথাটা অনিলকুমারের নিকট প্রকাশ করিয়া ফেলে—কিন্তু সরমে মরমের কথা মরমেই লুকাইয়া থাকে। পূজার সময় তাহার পিত্রালয়ে যাইবার কথা হইল। শেষ ভাদ্রের ভীষণ গুমোটে সহর হইতে আট ক্রোশ অশ্বারোহণে আসিয়া যখন অনিলকুমার শয্যায় ক্লান্ত হইয়া শয়ন করিল, তখন তাহার শ্রম অপনোদন করিবার জন্য ঘামাচি মারিতে-মারিতে বৌ-রাণী বলিল—"আজ এত কষ্ট ক'রে না এলেই হ'ত।"

অনিল অল্পকাল পরে বলিল—"হেঁ! ঠিক বলেছ।"

গৌরী ম্রিয়মাণ হইল। সে আশা করিয়াছিল যে, একটু গদগদ কণ্ঠে অনিল বলিবে—"তোমাকে দেখবার সুখের কাছে এ কি আর কষ্ট গৌরী!" কিন্তু নিষ্ঠুর তাহা বলিল না। তখন গৌরী বলিল—"তা' না এলেই পারতে।"

অনিল তাহার অভিমানের সুরটুকু ধরিল। কিন্তু সমরের দেবতা তাহাকেও আশ্রয় করিয়াছিলেন। সে বলিল—"হ্যাঁ, সত্যি কথা।"

গৌরী একটু আদর ও শ্লেষ-বিজড়িত স্বরে বলিল—"বিশেষ, যা' শুনছি, তা যদি—"

অনিল শয্যায় উঠিয়া বসিল। তাহার চোখের উপর স্থির দৃষ্টিতে চাহিল; গৌরীর বক্ষ স্পন্দিত হইতেছিল, চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছিল। এ কয়েক মাসের উৎপীড়ক সন্দেহটুকু যেন একটা মীমাংসার দিকে ধাবিত হইতেছিল। অনিল দৃঢ় স্বরে বলিল, "কি শুনেছ? কার কাছে—"

তাহার নিঃশ্বাসে কি যেন একটা দুর্গন্ধ, চক্ষুটা যেন ঈষৎ লোহিত-বর্ণ। সে কথা কহিতে পারিল না। অনিলকুমার এবার অধীর হইয়া বলিল, "কথা কও না।"

বাস্তবিক আশ্বারোহণের পরিশ্রম লাঘব করিবার জন্য সে প্রথমে এক বোতল বীয়ার পান করিয়াছিল—লাইমেডের সহিত মিলাইয়া। শেষে মিঞার চকের নিকট আসিয়া পকেট-ফ্লাস্ক হইতে একটু হুইস্কি পান করিয়াছিল—নেশার জন্য নয়, শ্রম অপনোদনের জন্য। ইহার পূর্ব্বে কয়েক দিন তাহার বন্ধুবান্ধব ইঙ্গিত করিয়াছিল, যে তাহার দুই একটা দুঃশীল কর্ম্মচারী তাহার বিমল এবং নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদ সম্বন্ধে দুর্বিনীত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছে। তাহার বংশের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য, সেই দুঃশীল বেতন-ভোগীগুলাকে ধরিতে সে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছিল। আজ "রংয়ের মুখে" এ বিষয়ের কেবল সেই দিকটাই সে লক্ষ্য করিল,—স্ত্রীর কথা, প্রণয়ের কথা, সমীচীনতার কথা ভাবিল না। সহধর্ম্মিণীকে স্থির থাকিতে দেখিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চ কণ্ঠে বলিল, "বল না কে বলে?"

বহুকষ্টে অশ্রুবেগ সম্বরণ করিয়া গৌরী-রাণী বলিল, "কেউ না।"

"কেউ না?" এবার সে একটু গর্জ্জিয়া বলিল, "কেউ না? বুঝি নি? তুমিও ওদের আস্কারা দিচ্ছ।"

স্বামীর এ মূর্ত্তি গৌরীরাণী নিজের চক্ষে দেখে নাই। সে বড় বিরক্ত হইল, বলিল, "আমি কাকে আস্কারা দিচ্ছি?"

সে বলিল, "তা হ'লে ওদের মাথার ওপর ক'টা মাথা আছে, শুনি। আমি জমিদার, জামনগরের চৌধুরী—আমি যদি কলকাতা থেকে একটা একট্রেস্ এনে রাখি—"

গৌরীর বুক ফাটিতেছিল। তবে কি সত্য না কি? হে মা কালী! হে বাবা বিশ্বনাথ! সে শশব্যস্তে বলিল, "না না, আমি ও সব মিথ্যে কথা বিশ্বাস করি না। স্থির হও।"

স্কটলণ্ডের লোকেরা নাকি খুব সাহসী। তাহাদের

দেশের মিশ্রিত সুধা না কি বাঙ্গালীকেও নির্ভীক করে। তখন ফ্লাস্কের হুইস্কি বাষ্পাকারে অনিলকুমারের মস্তিষ্কটাকে অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। সে বলিল, "মিথ্যা কেন? ভয় করব না কি? কেন বাবা, কারও তো বাপ্ খুড়ার পয়সা কর্জ্জ নিয়ে জড়োয়ার ঘরে থরচ করি নি। হাঁ—রেখেছি—বেশ করেছি।"

গভীর শোকে বা ভীষণ ত্রাসে জীবকে সংজ্ঞাহীন করিবার ব্যবস্থা যদি ভগবান না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার সৃষ্টি রক্ষা হইত না। পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কাটিয়া রক্তস্রাব দেখিয়া লোকে মূর্চ্ছিত হয় বলিয়া তাহার হৃদ্‌যন্ত্র তাড়াতাড়ি স্পন্দিত হয় না; তাই সে রক্তের প্রবাহ ক্ষত-স্থানে অত জোরে পাঠায় না,—মানুষ বাঁচিয়া যায়। সিংহের ভয়ে ছুটিতে ছুটিতে ভয়ে সংজ্ঞাহীন হয় বলিয়া মৃগের প্রাণ বাঁচিয়া যায়, কারণ সিংহ মৃতদেহে উদর পূর্ণ করে না; সে প্রাণহীন ভাবিয়া ঘৃণায় মৃগের প্রাণদান করে। এ ক্ষেত্রে গৌরীরাণী মূর্চ্ছিতা হইয়াছিল বলিয়াই তাহাকে প্রথমতঃ, কতকগুলি কুৎসিত ভাষা শুনিতে হয় নাই এবং দ্বিতীয়তঃ, তাহার অবস্থা দেখিয়া অনিলের চমক ভাঙ্গিল। তাড়াতাড়ি কার্ফা হইতে গোলাপজল ঢালিয়া সংজ্ঞাহীনার মূর্চ্ছাভঙ্গ করিতে করিতে অনিলকুমার বুঝিল যে, গুপ্ত কথাটা ব্যক্ত করিয়া সে বুদ্ধিমানের মত কার্য্য করে নাই।

(৩)

দারুণ শীত। যথানিয়ম পূর্ব্বদিক রাঙ্গাইয়া সোণার থালের মত আকার ধারণ করিয়া অরুণদেব উদিত হন, ক্রমে ক্রমে মাথার উপর উঠিয়া কিরণ বর্ষণ করেন, আবার গোধূলি-লগ্নে অস্তাচলে গমন করেন। কিন্তু তিনি পথ ঘাট নদীর জল মোটেই তাতাইতে পারেন না। সরিষার ফুলে মাঠগুলি ভরিয়া গিয়াছে, ছোলার গাছে ফল ধরিয়াছে, মুগ, মুশুর কলাই, মটরের চারা-গাছে ফলোদ্গম হইয়াছে। হিমালয়ের ওপার হইতে ঝাঁকে-ঝাঁকে চকাচকী, সরাল, মরাল, হাঁস আসিয়া বাঙ্গালা দেশের নদীর চরে, ঝিলের ধারে আশ্রয় লইয়াছে। পল্লী-জননীর জড় প্রকৃতি পরিবর্ত্তনশীল, সদাই হাস্যময়ী। কিন্তু চেতন পদার্থের দুর্দ্দিন তো অচল, স্থির; গ্রীষ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া বসন্ত অবধি একই ভাবে চলে। কৃষাণের অঙ্গে বস্ত্র নাই, ঘরে অন্ন নাই, বুকে বল নাই, আছে পেট-জোড়া প্লীহা, আর শীতের কম্পনের উপর ম্যালেরিয়ার কাঁপুনি।

উক্তরূপ চিন্তা করিতে-করিতে অনিলবাবুর এণ্ট্রান্স পাশ-করা মুহুরি ফণীন্দ্র চক্রবর্ত্তী নিমচের মাঠ পার হইয়া গড়গড়ি নদীর ধারে-ধারে নিজ গ্রামাভিমুখে গমন করিতেছিল। তাহার পিতা চৌধুরী-সরকারে নায়েবী করিয়া জামনগরের সন্নিকটে সরিষাবাদে একখানি ছোট পাকা বাড়ী তৈয়ারী করিয়াছিল। ফণীন্দ্র অনিলের সমবয়স্ক—জামনগরের বিদ্যালয়ে সতীর্থ। কিন্তু এখন তাহাদের মধ্যে প্রভু ও ভৃত্যের সম্বন্ধ;—ফণীন্দ্রও বাল্য-মিত্রতার দাবী করে না, অনিলকুমারও তাহাকে বাল্য-সহচরের পাওনা-গণ্ডা দিবার কথা মুখে আনে না।

যখন সে গ্রামের বাহিরে আসিল, তখন কতকগুলা নগ্ন, অর্দ্ধনগ্ন, ম্যালেরিয়াগ্রস্ত বালক তাহাকে অভিবাদন করিল। গোয়ালাদের নিঃস্ব বিধবা কলসী লইয়া জল আনিতে যাইতেছিল; তাহাকে দেখিয়া সঙ্কল্প করিল যে, আজ কিছু চাহিয়া লইবে। সে সরিষাবাদের সকলের প্রিয়, সদাই হাস্য-মুখ, সদাই প্রসন্ন। এক একটা প্রকৃতি আছে, যেখানে অভাব পরাজিত হয়, দৈন্য অশান্তি আনিতে পারে না। ফণীন্দ্র সেই প্রকৃতির।

ফণীন্দ্রের সহধর্ম্মিণী তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল। প্রভাতের শীতে এক-টুকরা ছিন্ন ধপ্‌ধপে বিছানার চাদর গাত্রে জড়াইয়া সে নিজ-হস্তে সমস্ত গৃহটি পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছিল। এমন কি গোয়াল-ঘরে অবধি একটু দুর্গন্ধ, একটু আবর্জ্জনা ছিল না। ফণি তাহার চিবুক ধরিয়া হাসিয়া বলিল, "আজ বুঝি জ্বর আসে নি।"

নলিনী বলিল, "তোমার ভয়ে; এই পোষ মাসের কটা দিন কেটে গেলে আর জ্বর আসবে না।"

স্ত্রীর পাংশু অধরের হাসিটুকু ফণীন্দ্রের হৃদয়ে শেল-সম আঘাত করিল। দারুণ শীতে একখানি শীতবস্ত্র নাই, ম্যালেরিয়ার সহিত যুঝিবার উপযুক্ত ঔষধ নাই, তাহার সুন্দর দেহ সজ্জিত করিবার দুই-টুকরা অলঙ্কার নাই। সে বাল্যেই সঙ্কল্প করিয়াছিল যে, অন্য নায়েব-গোমস্তার মত চুরি করিবে না। তাহার এ চরিত্র লম্পট অনিলকুমারও জানিত, কিন্তু সে বেতনের সম্বন্ধে তাহার সহিত অপর গোমস্তার পার্থক্য করিত না।

ফণীন্দ্র স্ত্রীকে গৃহে আসিবার কারণ বলিল। সে সহর হইয়া রাজবাটী যাইবে। চৌধুরীরা তাঁহাদের কতক জমির পত্তনিদার। পত্তনির হিসাব লইয়া রাজ-সরকারের সহিত গোল বাধিয়াছে। সে হিসাব মিলাইয়া আবার জামনগরে ফিরিবে। নলিনী ফণীন্দ্রকে গরম দুগ্ধ দিল, ভাল নূতন গুড়ের মুড়কী দিল। তখনও খোকা-বাবুর ঘুম ভাঙ্গে নাই। তাহারা দূরে বসিয়া তাহার ঘুমন্ত মুখের দিকে চাহিয়া সুখ-দুঃখের কথা কহিতে লাগিল, আর সেই কমল-কোরকের মত সংজ্ঞাহীন ক্ষুদ্র বদন দর্শনে অপার আনন্দ লাভ করিতে লাগিল।

পাঁচ কথার পর নলিনী বলিল, "হ্যাঁ গা সত্যি? বাবু না কি খুব বাড়াবাড়ী করেছেন?"

ফণি বলিল—"চুলোয় যাক্। আমারও টাকা থাক্‌লে আমিও করতাম।"

নলিনী মুড়কীর থালা সরাইয়া নিল। বলিল—"মাপ চাও। অমন কথা আর মুখে আনবে না বল।"

ফণি বলিল—"না, আর কিছুর জন্মে দুঃখ হয় না। দুঃখ হয় বৌরাণীর জন্মে। সত্যি নলিনী, দিন-দিন তাঁর যে কি চেহারা হ'চ্চে, কি বলব।"

নলিনী বলিল—"হ্যাঁ তাই শুনেছি। আহা! সোণার কমল! হ্যাঁ গা তুমি তো ছেলেবেলায় ওঁর সঙ্গে খেলা করেছিলে, বলতে পার না।"

ফণি বলিল—"এ তো ঘরে বসে পরমান্ন রাঁধা নয়। বাবা! দিন-দিন যা মেজাজ হ'চ্চে। যদি অন্যত্র একটু চাকুরী পাই—"

খোকাবাবু উঠিল। আর পরচর্চ্চারূপ বিমল আনন্দ উপভোগ করা হইল না। যাক্ অনিলের সৃষ্টি রসাতলে, হউক গৌরীরাণীর মজ্জাগত জ্বর;—আহা কি নধর ননীর হাত পা—শ্রীমুখের কি মধুর হাসি—কি স্বর্গের সুষমা! পিতা ছুটিয়া গিয়া তাহাকে বক্ষে চাপিয়া বারম্বার তাহার মুখ চুম্বন করিতে লাগিল। আর সেই দৃশ্য উপভোগ করিবার সময় আনন্দে নলিনীর বুক দুর্ দুর্ কাঁপিতেছিল। তাহার সফরী নেত্র মুদিয়া আসিতেছিল। অধরোষ্ঠ যতদূর বিস্তৃত হইতে পারে, ততদূর বিস্ফারিত হইতেছিল। আহা! কি পুলক! এই সুখেই তো সে দারিদ্র্যকে শাসন করিত, ম্যালেরিয়া-রাক্ষসীর দাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। শিশু ছোট-ছোট হাত দুইখানিতে পিতার গলা জড়াইয়া বিজয়-গর্ব্বে একটু উপেক্ষার ভাণ করিয়া মাতার দিকে চাহিতেছিল। তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিবার একটা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে দমন করিয়া জননী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল—"খোক্‌না, বদ্‌মায়েস।"

(৪)

রাজ-কাছারিতে হিসাব মিলাইয়া সন্তুষ্ট মনে গো-শকটে সহরের পথে আসিতে আসিতে ফণীন্দ্র অনেকগুলি সুখের স্বপ্ন দেখিতেছিল। প্রত্যেক চিত্রের মাঝখানে বৃহৎ মূর্ত্তি—ক্ষুদ্র খোকাবাবুর। সহরের বাহিরে একটা টেলিগ্রাফ-স্তম্ভের তারের উপর দুইটি স্মিতমুখ নধর-দেহ শিশুকে বসাইয়া জনকয়েক ভদ্রলোক আনন্দ করিতে-ছিলেন। তাহার খোকাবাবু বড় হইলে সেও তাহাকে লইয়া এমনি রহস্য করিবে—এ আশাটুকুও বৈশাখী আকাশে চপলার মত তাহার হৃদাকাশে খেলিয়া গেল। সে এবার তিন দিন গৃহে থাকিবার অনুমতি পাইয়াছিল। তাহার উপর একদিন বিনা অনুমতিতে ঘরে থাকিলে সদর-নায়েব কিছু বলিবে না। সে সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে যখন সহরে বাবুর বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন পাইক জানিফ সেখ সেলাম করিয়া তাহার হস্তে একখানি পত্র দিল। বলিল—"ভোরের বেলায় এ পত্র জামনগরের কাছারিতে আপনাদের গাঁয়ের আইনুদ্দিন এনেছিল—জরুরি ব'লে নায়েব মশায় আমার হাতদিয়ে পাঠায়ে দিলেন।" জানিফ পত্রের মর্ম্ম জানিত, কিন্তু কুসংবাদ মুখে বলিতে তাহার সংকোচ হইতেছিল। পত্র পাঠ করিয়া ফণীন্দ্রের হাত পা কাঁপিতে লাগিল—চক্ষু ঘোলা হইয়া গেল। সে বলিল—"বাবু কোথায়?"

"আজ্ঞা, বোধ হয় ও কুঠিতে।"

তিলার্দ্ধ বিশ্রাম না করিয়া ফণি "ও-কুঠিতে" ছুটিল। এখন লজ্জা বা সংকোচের সময় নয়। বাবু এত অর্থ বিলাস-ব্যসনে, পাপের পথে ব্যয় করিতেছেন; আজ তাহার হৃদয়ের ধন খোকামণি কলেরা রোগে আক্রান্ত,—বাবু তাহার চিকিৎসার ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন না? সে না হয় পরিশ্রম করিয়া ঋণ পরিশোধ করিবে। আজ তাহার সহিত সাহেব ডাক্তারকে পাঠাইতেই হইবে। যিনি এত অর্থ অপব্যয়

করেন, সদ্ব্যয়ে অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হওয়া তাঁহার পক্ষে অন্যায়।

সেদিন অনিলকুমারের সহিত স্ত্রীলোকটার বাচনিক কলহ হইয়াছিল;—ফণীন্দ্র তাহার বিলাস-হর্ম্মে পৌঁছিবার অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বেই প্রেম-দ্বন্দ্ব করিয়া অনিল বন্ধুগৃহে গিয়াছিল। ফণীন্দ্রকে কাগজপত্রাদি স্বাক্ষর করাইবার জন্য অভিনেত্রীর গৃহে মধ্যে মধ্যে যাইতে হইত। সে আজ বাবুকে দেখিতে পাইল না। একটু ভিতর দিকে গিয়া অপর একটি কক্ষে দেখিল—অভিনেত্রী ও বাবুর উকীল বন্ধু! সর্ব্বনাশ! বাবুর এত অর্থ শোষণ করিয়া, এমন বিলাসের মধ্যে বাস করিয়াও ভুজঙ্গিনী বিশ্বাসঘাতিনী! মন্ত্রমুগ্ধের মত সে তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিল। উকীল বলিল—"ঝাঁটা মার ও-রাগের মুখে। এসে পড়ে ব'লে।"

স্ত্রীলোক বলিল—"এবার এলে ঐ দরজায় নাক-খত দেওয়াব, তবে ছাড়ব। আমার কাছে জমিদারী চাল! আমার চরিত্রে সন্দেহ!"

উকীল বলিল—"মূর্খ কি না!"

বাস্তবিক! মূর্খ কি না! উকীল পণ্ডিত! তাই বন্ধুর বক্ষে ছুরি দিতে উদ্যত! সে বলিল—"ভাই নেলি! শোন্! এবার সই করিয়ে নেওয়াই চাই! আমার ঐ বাগানটা না হ'লে চল্‌বে না। মাইরি!"

নেলি বলিল—"তোমার জন্যে সব কর্‌তে পারি—"

শেষটুকু ফণি শুনিল না। তাহার মাথা ঘুরিতেছিল। বাবু নাই, অর্থ নাই,—পুত্রের এতক্ষণ কি অবস্থা হইয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? সে বারান্দা হইতে সরিয়া গিয়া বাহিরের কক্ষে প্রবেশ করিল। একটা পাথরের গোল মেজের উপর কি একটা চক্‌চক্ করিতেছিল। সে অন্যমনস্কভাবে সেটা তুলিয়া লইল—জড়োয়া ঝাপ্টা! শোকে ও ঘৃণায় তাহার নিকট বিশ্ব-প্রকৃতি যেন ছায়ার মত বোধ হইতেছিল।

সে দিন-রাত ভূতের বেগার খাটিয়া মরে, বাবুর একটা পয়সা যাহাতে নষ্ট না হয় ধর্ম্ম-ভয়ে তাহা রক্ষা করে, তাহার পরিবর্ত্তে প্রাপ্য দুই বেলা দুই মুষ্টি অন্ন, আর মাসিক নগদ পনের টাকা। আর এই পথের ধূলা, নরকের কীট নির্লজ্জা বিশ্বাসঘাতিনীটার জন্য বাবু পৈত্রিক ধন নষ্ট করিতেছেন—কি বিড়ম্বনা! তাহার সুকুমার! আহা! বাছা কি এতক্ষণ আছে! পয়সার অভাবে, চিকিৎসার অভাবে—ওঃ! মা গো! আর নলিনী, সতী, সাধ্বী, হাস্যময়ী, লীলাময়ী একেলা সেই রোগী লইয়া—

হঠাৎ একটা কুৎসিত চিন্তায় সে চমকিত হইল। মানুষ যে কেবল এক মুহূর্ত্তে প্রেমে পড়ে তাহা নয়, তাহার জীবনের প্রায় সকল বড় বড় ঘটনা এক মুহূর্ত্তেই ঘটিয়া থাকে। তাহার পূর্ব্বে খানিকটা জমি তৈয়ারী হয় বটে, কিন্তু যাদুকরের তরুর মত হঠাৎ পল্লবিত পুষ্পিত সুন্দর মহীরুহ সেই জমির উপর উদ্গত হয়,—কোথা হইতে আসে তাহা কেহ জানে না। পৃথিবীতে শতকরা নিরানব্বইটা খুন এই রকমেই হইয়া থাকে। ঘৃণায়, শোকে, অভাবে ফণীন্দ্রের মনে যে জমির আবাদ হইয়াছিল, অকস্মাৎ সেখানে এক গাছ লাফাইয়া উঠিল। সত্যই তো ইহাতে পাপ পুণ্য কোথায়? ইহাতে শাস্তি হইবে, তাহার পুত্রের চিকিৎসা হইবে—ইহা বিধির বিধান! সে একবার ঝাপ্টাটিকে উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিল। সেটা তাহার হস্ত ছাড়িয়া পাথরের মেজেতে নামিতে চাহিল না। একটু ভয় হইল, একটু গা ছম্ ছম্ করিল, একটু ওষ্ঠ শুকাইল, একবার হাত কাঁপিল; কিন্তু উপায় নাই। সারাজীবনের সাধনা ভাসিয়া যাইতেছিল;—কি করিবে,জীবনে একবার চুরি করিলে যদি খোকা বাবু বাঁচিয়া উঠে, নলিনীর মুখে হাসি ফুটে;—নিজের পরকালের ব্যবস্থা পরে হইবে। চিরকাল খাটিয়া সে বাবুকে শোধ দিবে—বাবুর নিকটে দোষ স্বীকার করিবে প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ক্ষমা চাহিবে—কিন্তু এখন? এখন প্রত্যাবর্ত্তন অসম্ভব—খোকাকে খুন করা—পিতা হইয়া!

অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে পোদ্দারের নিকট অলঙ্কার বন্ধক রাখিয়া সে টাকা লইল। ডাক্তার সাহেবের সহিত মোটর গাড়িতে বসিয়া সে সারিযাবাদের দিকে ছুটিতেছিল। পাপ-পুণ্য, চুরি-চামারী সকল চিন্তাকে দূরে ফেলিয়া, সে একমাত্র শিশুর কথা ভাবিতেছিল—আপনার আত্মার জন্য পরমাত্মার নিকট ক্ষমা চাহিল না, প্রার্থনা করিল না; একমনে, একপ্রাণে, কেবল মহাশক্তি মহাকালীকে ডাকিতে লাগিল—মা গো! বল্ দে মা! শক্তি দে মা! সেই ক্ষুদ্র প্রাণের মিট্‌মিটে দীপশিখাটুকু জ্বালাইয়া রাখ মা!

(৫)

দুই-একজন বন্ধুর বাড়ী ঘুরিয়া, সহরের ময়দানে অলস শিথিলভাবে একটু পদচারণা করিয়া অনিলচন্দ্র বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল। জীবনে বিষম অবসাদ আসিয়াছিল,—একটা পাহাড়ের মত বোঝা হৃদয়টাকে যেন চাপিয়া ধরিতেছিল ;—কেবল অবসাদ, কেবল বিরক্তি, কেবল ঘৃণা। কিন্তু অবসাদের চাপে ঘৃণারও তীব্রতা ছিল না। হৃদয় জুড়িয়া কেবল—"দূর ছাই" ভাব। জড়োয়াকুমারী ও উকীল বন্ধু যে তাহার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছিল, তাহার অর্থে পুষ্ট হইয়া যে স্ত্রীলোকটা উকীল বন্ধুর প্রতি অনুরাগ দেখাইতেছিল,—বুদ্ধিমান জমিদার তাহা এক রকম বুঝিয়াছিল। কিন্তু কি একটা দুর্দ্দমনীয় আসক্তি তাহার সকল ভাবকে পরাজিত করিয়া, সমস্ত বিজ্ঞতা, সমস্ত সুপ্রবৃত্তিকে দখল করিয়া, তাহাকে সেই স্ত্রীলোকটার দিকে, তাহার গৃহের সেই আমোদ-প্রমোদের দিকে আকর্ষণ করিতেছিল। আজ এই অবসাদের প্রভাবে সে টানটাও যেন শিথিল হইয়াছিল,—যেন কোনও বিষয়েই তাহার আসক্তি নাই, যেন কোনও জীবের, কোনও পদার্থের প্রাণ নাই। মাথার উপর পূর্ণিমার চাঁদ হাসিতেছিল, মাঠের উপর বড় শোভা হইয়াছিল,—জ্যোৎস্নার আলোকে উদ্ভাসিত শষ্প-সবুজ-ক্ষেত্র, কিন্তু বড় বড় গাছগুলার নীচে কালো ছায়া। তাহার অবসন্ন হৃদয়ে একটা প্রবৃত্তি যেন মাথা তুলিতেছিল। তাহার স্বগ্রামের, তাহার গ্রামে যাইবার আট ক্রোশ পথের এই রকম আলো ও ছায়া যেন তাহাকে লইয়া রঙ্গরস করিবার জন্য তাহাকে ডাকিতেছিল। একটু পূর্ব্বস্মৃতিও তাহার অবসাদের জড়তাটার যেন গলা টিপিল ;—অমনি আলো ও ছায়ায় কত সুখে, বাটীর উপবনে বসিয়া গৌরীরাণী ;—গৌরীর কথা সে ভাবিতে পারিল না। তাহার পাংশু অধর, শুষ্কদেহ, লাবণ্যভরা বড় বড় চোখ দুটার স্মৃতি তাহাকে ধিক্কার দিল। কিন্তু চন্দ্রের প্রভাব তাহাকে একটু অনুপ্রাণিত করিল। যাহা বাকি ছিল, তাহা সম্পাদন করিল তাহার আদরের তুরঙ্গম—তিলকচাঁদ। জ্যোৎস্নার আলো ও ছায়া তিলকচাঁদকেও আজ অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। সে অনেকক্ষণ ছট্‌ফট্ করিতেছিল। প্রভুকে দেখিয়া আর সে স্থির থাকিতে পারিল না। কাণ শক্ত করিয়া, নয়ন বিস্ফারিত করিয়া সে হ্রেষারব করিল,—অশ্বশালার শক্ত জমির উপর সম্মুখের পদ ঠুকিয়া উত্তেজক খটখট শব্দ করিতে লাগিল। দড়ি ছিঁড়িয়া প্রভুর নিকট আসিবার জন্য অত্যন্ত অধীর হইল। অনিলকুমারের জড়তা কাটিল। সে পোষাক পরিতে গেল। সহিস তিলকচাঁদের পৃষ্ঠে জিন কষিতে লাগিল।

(৬)

পৌষ মাসের শীতে জ্যোৎস্নাস্নাত পথের উপর দিয়া তিলক ছুটিতেছিল বলিলে তাহার গতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয় না—সে উড়িতেছিল। অনিলবাবু খুব মোটা আলষ্টারে সর্ব্বশরীর মুড়িয়া, বালাক্লাভা টুপিতে মুখ ঢাকিয়া কেবল নাসিকা ও চক্ষু দুইটী বাহির করিয়া, দুই পার্শ্বের মাঠের উপর জ্যোৎস্নার খেলা দেখিতেছিল এবং উষ্ণ রক্তের সঞ্জীবনী শক্তিতে মনে ও শরীরে বল লাভ করিতেছিল। বাটীতে পৌঁছিবার পর বাবুর বাটী প্রত্যাগমনজনিত সোরগোলের মধ্যে সে একটু বিপদে পড়িল। অন্দরে গিয়া আপনার কক্ষে শয়ন না করিলে ভৃত্যদিগের মধ্যে কথা জন্মিবে। অথচ গৌরীর সম্মুখীন হইতেও সে ইতস্তত: করিতেছিল। এমন সময় টক্করলাল আসিয়া বলিল—"রাণীমা সেলাম দিয়েছেন।" ইতস্তত: না করিয়া সপ্রতিভভাবে সে বৌ রাণীর কক্ষে প্রবেশ করিল।

গৃহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, কিন্তু গৃহে শ্রী নাই। কোনও পদার্থে যত্নের চিহ্ন নাই। ফুলদানগুলা প্রাণহীন—ফুল নাই। কেবল তাহার ফটোর নিচে চন্দনসিক্ত কয়টা শেফালী। একটা বৈদ্যুতিক প্রবাহ অনিলের সমস্ত শরীরের ভিতর দিয়া বহিয়া গেল। সে তাড়িত-ভাবটার অর্থ অস্পষ্ট—কি যেন একটা বহুমূল্য রত্ন ও কাচের তুলনা। তাহার প্রাণের ভিতর হইতে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস উঠিল। সে আবার ফটোর দিকে চাহিল। গৌরী ক্ষিপ্রহস্তে ফুলগুলা সরাইয়া লইয়াছিল। সে তাহার কৃশ পাণ্ডুর মুখের দিকে চাহিয়া বড় কাতর হইল। সস্নেহে গৌরীকে বক্ষে ধরিয়া সে বলিল—"গৌরী, তোমার শরীর যেন একটু বেশী খারাপ দেখছি। এ কি, গা গরম—"

সে বলিল—"না। শীতে শুকিয়ে গেছে। এ সময় জ্বর একটু-আধটু সবারই হয়।

জমিদার কিছু বলিল না, কিন্তু কথাটায় তৃপ্ত হইল না।

গৌরী বলিল—"একটু বোস আমি চট্ করে খাবারটা নিয়ে আসি।"

অনিল ছাড়িল না, সে ভোজন করিয়া গৃহে আসিয়াছে। গৌরীও ছাড়িবে না। শেষে স্থির হইল গৌরী ঘরে বসিয়া স্পিরিটের চুল্লিতে তাহাকে চা তৈয়ারি করিয়া দিবে।

চা পান করিতে-করিতে অনিল এক দীর্ঘ বক্তৃতা দিবার সূচনা করিল। সে বলিল—"গৌরী আমি পশু—আমি পামর, আমার মরণ ভাল—"

"গৌরী তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। বলিল—"ছিঃ স্বামী-নিন্দা শুনতে নাই। জান না দক্ষের ঘরে—"

অনিল বলিল—"ওঃ, একটু একটু শাস্ত্রও পড়া হচ্চে। গৌরী—গৌরী-রাণী, আমাকে কি ক্ষমা করবে না?"

গৌরীর রুদ্ধ অশ্রু বাধা মানিল না। অনিলও কাঁদিল।

তৃতীয় দিবসে বেলা দশটা অবধি মনের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ চলিল। যুদ্ধে বিরক্ত হইয়া সে অশ্বারোহণে সহরে যাত্রা করিল। অন্দরের বারান্দা হইতে কম্পিতদেহে গৌরী দেখিল—চক্ষে জল পড়িতেছিল—বুকের মধ্যে কে একটা মুগুর পিটিতেছিল—ভিতর হইতে কে গলা টিপিতেছিল। অশ্বারোহী দৃষ্টির বাহিরে গেল। গৌরী আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল—"মা গো! মা! বেশ ছিলাম! আবার কেন এ যন্ত্রণা দিলে মা! হাঃ! হরি!"

(৭)

অনিল দেশে গিয়াছে শুনিয়া জড়োয়া ও উকীল খুব হাসিল,—আনন্দে সারারাত সুরা পান করিল—নানাপ্রকার মাংসের তরকারী রন্ধন করিল, কিন্তু নেশার ঝোঁকে আহার করিবার অবসর পাইল না। প্রভাতে উঠিয়া যখন তাহারা ঝাপ্টাটা হারাইয়াছে বুঝিতে পারিল, তখন দাস-দাসীর উপর অনেক জুলুম করিল, কিন্তু পুলিসে সংবাদ দিতে পারিল না—অনিলের ও উকীলের মান যাইবার ভয়ে। দুইটার সময় সমস্ত কাছারীর কার্য্য সারিয়া উকীল পোদ্দারদের ঘরে-ঘরে ঘুরিয়া রজনী পোদ্দারের গৃহে তস্করের সন্ধান পাইল। ফণীন্দ্র একটা আকস্মিক অভাবের তাড়নায় চুরি করিয়াছিল—সে ব্যবসায়ী চোরের কোনও কায়দা-করণ জানিত না। তাই পোদ্দারের বহিতে নিজের নাম ধাম লিখাইয়া, নিজের হস্তে স্বাক্ষর করিয়া, ঝাপ্টা বন্ধক রাখিয়াছিল। উকীল ও জড়োয়া অত্যন্ত আস্ফালন করিতে লাগিল। অনিল নিজে চুরি করিয়া, ভৃত্যের দ্বারা বন্ধক দিয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিল। আরও সিদ্ধান্ত করিল যে, ইহার দ্বিগুণ দামের অলঙ্কার যদি অনিল দিতে পারে, তাহা হইলে জড়োয়া তাহার আশ্রয়ে থাকিবে, নতুবা উকীলবাবু কাঁচকলা গ্রামের জমীদারকে আনিয়া তাহার স্কন্ধে জড়োয়ার সদ্গতি করিবে।

তৃতীয় দিবসে অনিল সহরে আসিবার পর উকীল তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। সে বড় বিমর্ষ। জড়োয়া তাহার আশ্রিতা, তাহার চরণের রেণু, তাহার প্রসাদের ভিখারী; তাহার উপর কি অত শক্তাশক্তি অভিমান সমীচীন। কাতলা-মাছ টোপ গিলিয়াছে, তাহা চতুর যুবক, শিক্ষিত যুবক বুঝিল। সে এবার সূতা ছাড়িয়া তাহাকে খেলাইতে লাগিল। আহা! অবলা সরলা দুইদিন জল-স্পর্শ করে নাই। এমন কি ঝাপ্টার শোক অবধি মনে—

"ঝাপ্টার শোক?"

"সেই যে ওর জড়োয়া ঝাপ্টাটা, যেটা ফণি—"

"কি বলছ?" অধীর হইয়া অনিল বলিল—"কি বলছ! হেঁয়ালী ছাড় না। ওকালতী কি সর্ব্বত্র?"

উকীল বড় মোলায়েম। সে বলিল—"কি করব ভাই, আমার খাবার-পরবার সংস্থান থাকলে আর—"

বাবু অধীর হইল। বলিল—"আঃ! আবার বাক্য-ব্যয়।"

উকীল কাসিয়া বলিল—"সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ। বেশ ভাই, একট্রেসের সঙ্গ ক'রে বেশ এক্‌টিং ক'রতে শিখেছ।"

অনিল বলিল—"মোটে বুঝতে পারছি না। কি বলছ?"

"তোমার সেই রসিকতার কথা। তুমি সেই ঝাপ্টাটা নিয়ে চলে গিয়েছিলে কি না।"

এবার জমিদার ক্রুদ্ধ হইল। কি স্পর্দ্ধার কথা! সে রসিকতা করিয়া বারাঙ্গনার অলঙ্কার লইয়া চলিয়া গিয়াছে! এ নিশ্চয় একটা অপবাদ দিবার ষড়যন্ত্র। সে বলিল—"মূর্খের মত কথা ব'ল না।"

এবার উকীল একটু বিস্মিত হইল। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে, জমিদার অভিমান করিয়া চলিয়া যাইবার সময় অলঙ্কারটা লইয়া গিয়াছিল। অকস্মাৎ অর্থের অনাটন হওয়ায় ফণির দ্বারা তাহা বন্ধক দিয়াছিল। তাই সে তাড়াতাড়ি রাত্রে দেশে গিয়াছিল—অর্থ আনিবার জন্য। কিন্তু তাহার ভাবে ও ভাষায় উকীল বিস্মিত হইল। সে যে অজ্ঞের ভূমিকা অভিনয় করিতেছে মাত্র—ঠিক তাহাও বোধ হইল না। ব্যাপারটায় আরও রহস্য আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

তাহাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া অনিল অধীর হইল। বলিল—"কি, ব্যাপার কি? সমস্ত কথা ভেঙ্গেচুরেই বল না।"

উকিল সকল কথা যথাযথ প্রকাশ করিল। বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে সে তাহার কথাগুলি যেন গিলিতেছিল। ফণীন্দ্র চক্রবর্ত্তী বেশ্যার অলঙ্কার চুরি করিয়া তাহা বন্ধক দিয়াছে! ইহা অপেক্ষা রহস্যের কথা সে জীবনে শুনে নাই। সে উপেক্ষার হাসি হাসিল। বলিল—"এ সকল ষড়যন্ত্র। যে আমার লক্ষ টাকা নিয়ে নাড়াচাড়া করে, যে কোন দিন একটা প্রজার কাছে এক পয়সা পেলে তা' সরকারে জমা দেয়, আমার চাকর হলেও যাকে আমি মনে মনে শ্রদ্ধা করি, সম্মান করি—তার দ্বারা চুরি হ'য়েছে? পাগলামির কথা!"

কিন্তু পোদ্দারের নিকট ফণীন্দ্রের হস্তাক্ষর দেখিয়া তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। উকীলের দুই একটা শ্লেষে তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। সে বুঝিল যে স্ত্রীলোকটার দৃঢ় ধারণা যে, এ রহস্যের মূলে অনিলকুমারের সম্মতি আছে। ইহাতে তাহার ক্রোধানল জ্বলিয়া উঠিল। পৃথিবীর সকলের উপর তাহার একটা ঘোর অবিশ্বাস জন্মিল। কিন্তু প্রধান চিন্তা হইল আত্মরক্ষার,—বারাঙ্গনার নিকট আপনার সম্মান রক্ষা করিবার। ফণিকে গলা টিপিয়া ধরিয়া আনিয়া, তাহাকে জেলে পাঠাইয়া অবলার নিকট আপনার নির্দ্দোষিতার প্রমাণ দিবার জন্য সে কৃতসঙ্কল্প হইল। সে উকীলের অনুরোধ উপেক্ষা করিল। ফণীন্দ্রকে ধরিয়া লইয়া একেবারে সে জড়োয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিল।

(৮)

আজ লক্ষ্মীপূজা। দরিদ্রের ঘরের লক্ষ্মী-পূজা; তাহাতে এক ভক্তি ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। নূতন ধান দিয়া লক্ষ্মীর আবাহন হইয়াছিল—ঘরদ্বার সমস্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া নলিনী সুচারুরূপে আল্‌পনা চিত্রিত করিয়াছিল। সু-চিকিৎসায় কালের কবল হইতে খোকাবাবু রক্ষা পাইয়াছিল,—তাহার মনে পূর্ণশান্তি বিরাজ করিতেছিল। স্বামী দিন-রাত রুগ্ন-শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া ছিল—তাহার সহিত কথা কহিতেছিল, সে আহার করিতে চাহিলে তাহাকে স্তোক-বাক্যে তুষ্ট করিতেছিল—ললনার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট—নাই বা রহিল ঐশ্বর্য্যের ভোগ-বিলাস আর নাই বা রহিল কতকগুলা বস্ত্রালঙ্কার।

ফণীন্দ্রের কিন্তু মনে শান্তি ছিল না। পুত্রের নিরাময়তাও তাহার প্রাণে সুখ আনিতে পারে নাই। সে তর্ক করিয়া, সংগ্রাম করিয়া, নিজের কার্য্যকে নিষ্পাপ বলিয়া যতই সিদ্ধান্ত করিতে লাগিল, ততই যেন প্রাণের খুব গভীরতম একটা নিভৃত গুহার মধ্যে একটা অসম্মতির স্বর উঠিতে লাগিল,—ক্রমে সেই ক্ষীণ কণ্ঠ সবল হইতে লাগিল,—সব তর্ক সব সিদ্ধান্ত নিমজ্জিত করিয়া সেই স্বর আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিয়া বলিতে লাগিল—"করিলে কি? হাঁ! কি! কি! করিলে কি?" এই ভর্ৎসনায় তাহার ক্ষুধা যায়, তৃষ্ণা যায়, পুত্রের নিরাময় বদন-কমল দর্শনের সুখ যায়, প্রাণের মধ্যে স্ত্রীর হাসিমুখের ছায়া ম্লান হইয়া যায়। এ কথাটা কাহাকেও বলিতে পারিলে, বাবুর নিকট দোষ স্বীকার করিলে যেন প্রাণের আগুনের লক্‌লকে জিহ্বাগুলো নিভিয়া যায়। কিন্তু চৌধুরী-বংশের কুলপ্রদীপ তো তাহাকে মার্জ্জনা করিবার পাত্র নন। হয় তো এই স্ত্রীপুত্র, শান্তির সংসার ছাড়িয়া তাহাকে কারাগারে বাস করিতে হইবে। উঃ! কি বিড়ম্বনা। যুবক শিহরিয়া উঠিল। তাহার দুই চক্ষে জলধারা বহিল।

সন্ধ্যার ছায়া নামিয়াছে। গ্রাম্য-মন্দিরে আরতির শঙ্খ বাজিয়া উঠিয়াছে। সন্নিবাবাদের গৃহস্থদের ঘরে-ঘরে মঙ্গল-শঙ্খ ফুৎকারিতেছে। নলিনী এক হাতে দীপ লইয়া, অপর হস্তে শঙ্খ লইয়া তুলসীতলায় প্রদীপ দিতে যাইতেছে—অকস্মাৎ বাহিরে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ হইল। সে

জলাশয় তীরে

পল্লী-দৃশ্য

একটু স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। একজন সুপুরুষ অধীর হইয়া তাহাদের প্রাঙ্গণে আসিল—উভয়ের চক্ষে চক্ষে মিলিল, উভয়েই পিছাইল—শঙ্খ দীপ হস্তে চীর-বাসিনী দেবী মূর্ত্তি যেন অনিলের উন্মত্ত ভাবগুলার তাণ্ডব নৃত্যকে শাসন করিয়া কক্ষের মধ্যে চলিয়া গেল। অনিলও ফিরিল—মৃত্তিকার অলিপনা দেখিল; চারিদিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—পৌষমাসের শীতল বায়ুর বক্ষে যেন শান্তি লুকান রহিয়াছে। সন্ধ্যার পাখীর কিলিবিলির সহিত গৃহস্থদের শঙ্খরোল মিশিয়া একটা অভিনব শব্দের সৃষ্টি করিতেছিল;—তাহার লাম্পট্য, তাহার আত্মম্ভরিতা, তাহার অধৈর্য্যও তাহার নিকট নতশির হইল। সুতরাং সে আর বজ্র-নিনাদে ফণীন্দ্রকে ডাকিতে পারিল না; মৃদুস্বরে ডাকিল—"ফণি"। কিন্তু সেই মৃদু স্বরই ফণীন্দ্রের বক্ষে শেলসম বিঁধিল। খোকাকে স্ত্রীর ক্রোড়ে দিয়া সে তাড়াতাড়ি

শিশুদ্বয়

বাহিরে আসিল। কম্পিত-করে বাবুর জন্য দাওয়ায় একখানা আসন বিছাইয়া দিল। উভয়েই ক্ষণকাল নির্ব্বাক রহিল। শেষে ফণীন্দ্র কথা কহিল। বলিল—"বাবু আমার ছেলের কলেরা হ'য়েছিল। সেরেছে, ডাক্তার সাহেব দু'দিন এসেছিলেন। শিশু—"

অনিল সূত্র পাইল; বলিল--"ডাক্তার সাহেব! ডাক্তারের খরচ পেলে কোথা? বাঘের মুখে হাত দিয়েছ জান? এখন জেলে—"

ফণীন্দ্র বাধা দিয়া বলিল—"বাবু, বাহিরে চলুন। লক্ষ্মীপূজা। বাবু যাদের জন্তে জেলে যাব, যাদের জন্তে নরকে যাব, তারা না ঘৃণা করে। বাবু, দোহাই আপনার —এখানে কিছু বলবেন না—এই ভিক্ষা—"

বাবু নিঃশব্দে বাহিরে গেলেন, ফণীন্দ্রও চলিল। একটা বড় পাকুরগাছের তলায় টম্‌টম ছিল। উহারা তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইল। ফণী বলিল—"বাবু পেটের দায়ে আপনার এক পয়সা ছুঁই নাই। বাবু ছেলের প্রাণ-রক্ষার জন্য আপনার সেই কৃতঘ্ন মাগীর গয়না চুরি করেছি। বাবু! আমি একখানা গায়ের কাপড় আনব?"

"যাও।" অন্যমনে বাবু আজ্ঞা দিল; কিন্তু যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত তাহার পিছু পিছু গিয়া আঁধারে দাঁড়াইল। ফণীন্দ্র খোকাকে বক্ষে ধরিয়া বারবার তাহার মুখ-চুম্বন করিল। নলিনীর স্কন্ধে হস্ত দিয়া বলিল—"নলু, বাবুর কাজে এখনি মফস্বল যাব। হয় ত তিন চার মাস বাদে দেখা হবে।"

নলিনী কাতর ভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিল। স্বামীর কথায় সে তুষ্ট হইল না—তাহার কটাক্ষে সে মিথ্যা স্তোকের চিহ্ন দেখিল। যেন চারিদিকে অমঙ্গল! অকল্যাণ! অথচ সে কিছু বলিল না, বলিবার শক্তি তাহার ছিল না। কৌশিক বস্ত্রের অঞ্চলে সে চক্ষু মুছিল। ফণীন্দ্র সস্নেহে তাহাকে চুম্বন করিল। উভয়ের নয়ন-জল মিলিত হইয়া এক স্রোতে বহিতে লাগিল।

এ সমস্তই অনিল দেখিল। তাহার ঐশ্বর্য্য আছে, বন্ধু আছে, স্ত্রী আছে, বারাঙ্গনা আছে, কিন্তু এ সুখ তো তাহার নাই। তাহার মন ছুটিয়া সেই কৃশা, রুগ্না, গৌরীর কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহার ফটোর সম্মুখের চন্দনসিক্ত শেফালি কয়টা তাহার স্মৃতিতে বড় উজ্জ্বল ভাবে ভাসিতে লাগিল। তাহার নৃশংসতায় তাহার স্ত্রী—সাধ্বী সতী, মায়াময়ী, ভক্তিমতী গৌরী-রাণী দিন দিন মলিন হইতেছিল, রোগ ভোগ করিতেছিল, এ কথা তাহার স্মরণ হইল। সে আবার সেই ব্রাহ্মণ-যুবতীর দিকে চাহিল, বস্ত্রাঞ্চলে সে মুখ মুছিতেছিল। দুইটি দেবী-মূর্ত্তির পশ্চাতে যেন একটা পিশাচিনীর মুখ দেখিল। এই দুইজনকে রাক্ষসীটা গিলিতে যাইতেছিল। ওঃ! কি সর্ব্বনাশ—একটা রাক্ষসী দুই দেবীর বিরল শান্তি অপহরণ করিবার জন্য অট্ট-হাস্য করিতেছিল। সে আর এ চিত্র দেখিতে পারিল না।

ফণীন্দ্র আসিল। বলিল—"চলুন।"

অনিল স্থির হইয়া রহিল। বলিল—"কেন নিয়েছিলে তা ত বললে। কি ক'রে নিলে?"

ফণীন্দ্র একটু ইতস্ততঃ করিল। ভাবিল, ভয় কি?

সত্য কথা বলিব। বলিল—"যখন জেলে যাচ্ছি, বলতে কি! বাবু পুরাণো চাকরের একটা কথা শুনুন। বাবু ও মাগিটাকে ত্যাগ করুন। ও কৃতঘ্ন বিশ্বাসঘাতিনী, আর ঐ উকীলটা।"

অনিল গাড়িতে উঠিল। ফনীন্দ্র তাহার পার্শ্বে বসিল। অনিল বলিল—"ফণি তাদের সামনে বল্‌তে পারবে ?"

"কেন পারব না বাবু ?"

অনিল লাগাম ধরিল। অশ্ব চালাইল না। কি ভাবিল। বলিল—"নামো।"

বিস্মিত ব্রাহ্মণ তাহার মুখের দিকে চহিল। প্রভু লাগাম ছাড়িয়া তাহার হাত ধরিল। ব্রাহ্মণের বলটুকু যাইতেছিল, জ্ঞানটুকু লোপ পাইতেছিল। সে ঠিক যেন বুঝিল না—একটু আত্ম-বিস্মৃত হইল; যেন স্বপ্নের ঝোঁকে বলিল—"অনিল ভাই! ভাই! তোমাদের অন্ন খেয়েছি হ'পুরুষ। কিন্তু শেষে চুরি করিলাম তোমার জিনিস। ছেলের জন্যে। দোহাই ধর্ম্ম—খোকার জন্যে—কিন্তু বড় ভুগছি ভাই, বড় ভুগছি। আজ আমরা মনিব চাকর নই—আসামী ফরিয়াদী—ওঃ।"

অনিলও নিজের মনে ভাবিতেছিল—সেও আত্মহারা। শেষের কথা কয়টা তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। সে বলিল—"ফণি, তুমি আমার শৈশবের খেলার সাথী। আজ তুমি আমার গুরু। আর কোথাও যাব না। তোমাদের বৌ-রাণীকে নিয়ে তোমারি মত বাসা বাঁধব। ফণি, তোমার ঘরে যে দেবী দেখলাম আমারও ঘরে তেমনি আছে;—কেবল আমি দানব, তাই তার পূজা করতে পারি নাই। ফণি, আজ আমার চোখ ফুটেছে।"

বাবু তাহাকে ক্ষমা করিতেছে এ কথাটা বুঝিতেও তাহার বিলম্ব হইল। শেষে আপনার অবস্থা উপলব্ধি করিয়া ফনীন্দ্র চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল—"বাবু ভয়ে বলিনি। কবিরাজ মশায় বলছিলেন—যদি এখনো বৌ-রাণী মনে না শান্তি পান তো শীঘ্রই যক্ষা—"

"অ্যাঁ"—অনিল চমকিয়া উঠিল।

ফনীন্দ্র বলিল—"বাবু এখনও উপায় আছে।"

অনিল তাহাকে এক রকম গাড়ি হইতে ঠেলিয়া ফেলিল। বলিল—"ফণি, দানবীর দাসত্ব করেছি—এবার পূজা করিতে দেবীর মন্দিরে ছুটি। তুমি বাড়ী যাও।"

সে কাল-বিলম্ব করিতে সম্মত হইল না। লক্ষ্মীর প্রাসাদের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিল। একদিন আসিয়া নলিনীর হাতের অন্ন-ব্যঞ্জন খাইতে প্রতিশ্রুত হইল—কিন্তু এখন সে আর কাল-বিলম্ব করিতে পারে না। চাবুক মারিয়া সে জামনগরের দিকে ঘোড়া ছুটাইল।

বাঙ্গালায় শঙ্কর-মঠ

বর্ত্তমান মঠ (এখনও নির্ম্মাণ শেষ হয় নাই)

৺স্বর্গত দ্বারবঙ্গের মহারাজা বাহাদুর,
তাঁহার পার্শ্বে স্বামী পূর্ণানন্দ গিরি, সম্মুখে উপবিষ্ট মঠ-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ শেঠ

হাবড়া রাজারামতলায় মঠের প্রথম সূচনা—পর্ণকুটীর

হিমাচল-পথে

[শ্রীজলধর সেন]

হিমাচল-পথে—মহানদী-সেতু

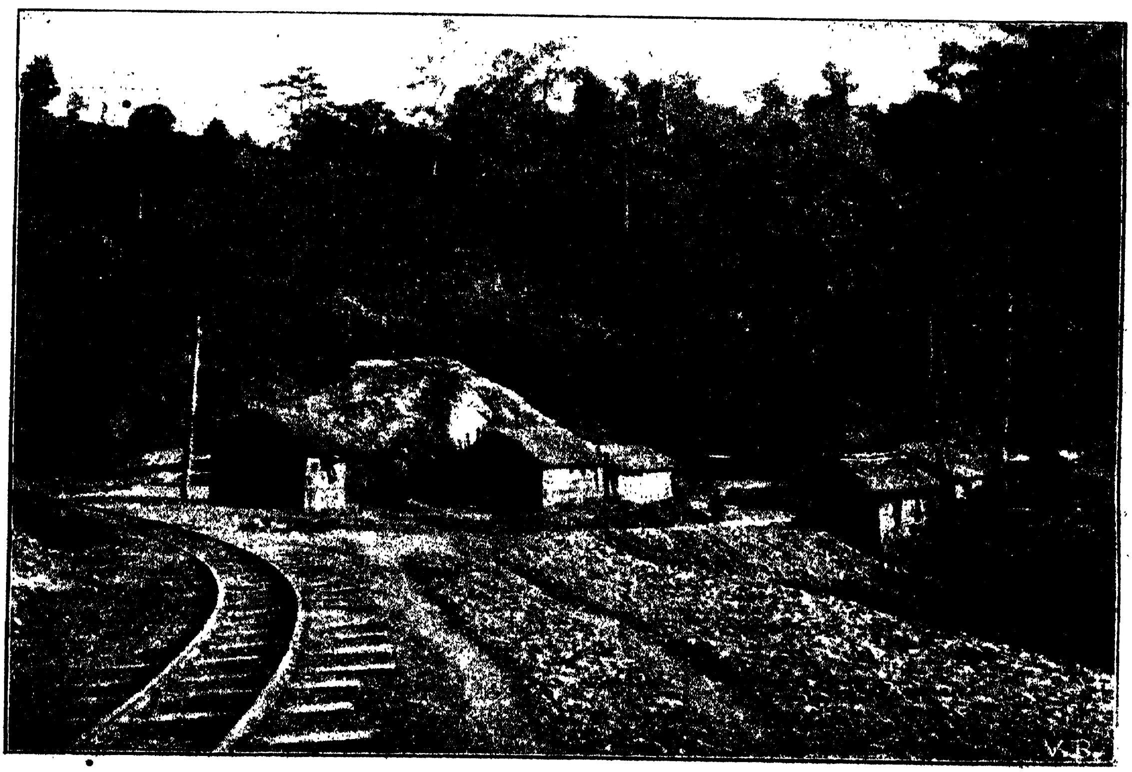

হিমাচল-পথে—রংটং ষ্টেসন

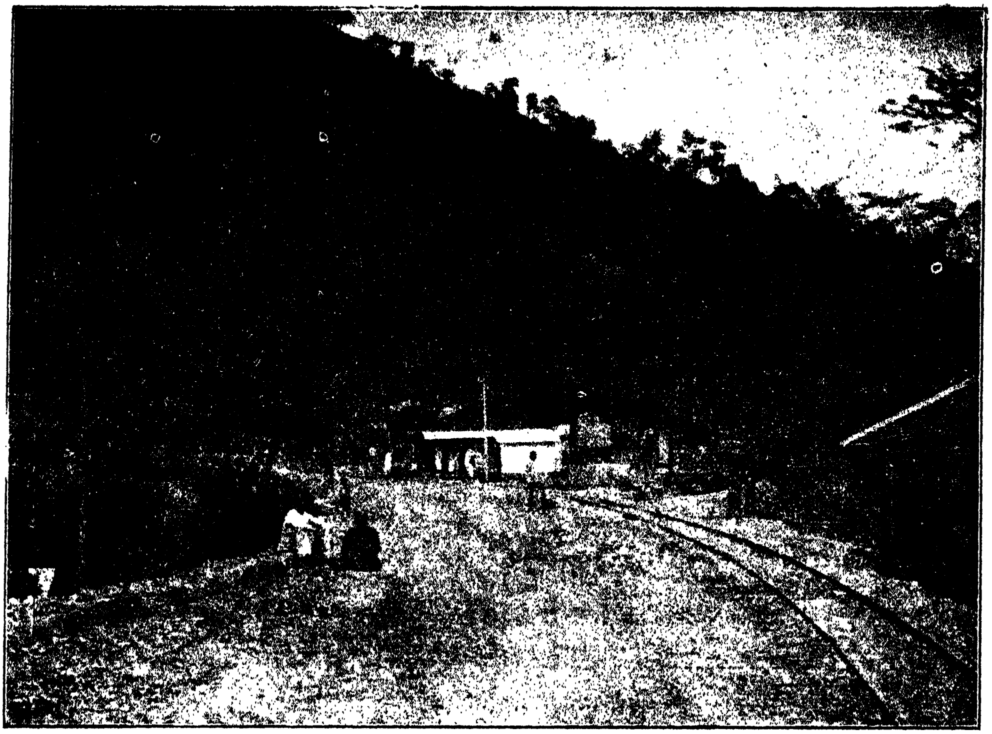

হিমাচল-পথে—তিনধরিয়া ষ্টেশন

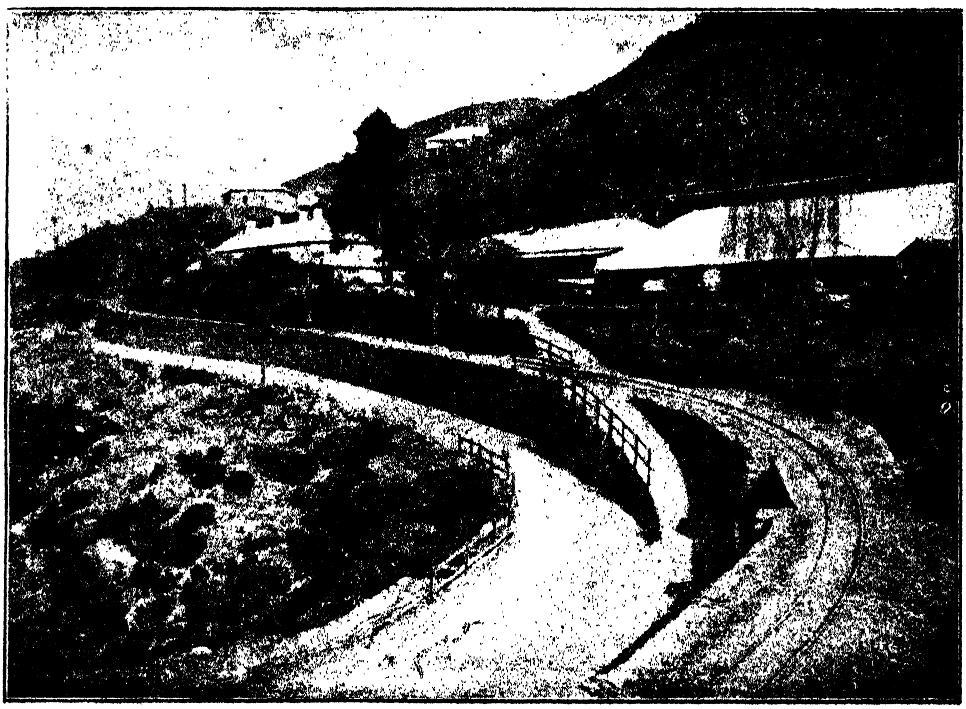

হিমাচল-পথে—কার্সিয়ং ষ্টেসন

হিমাচল-পথে—রঙ্গীত ও তিস্তা নদীসঙ্গম

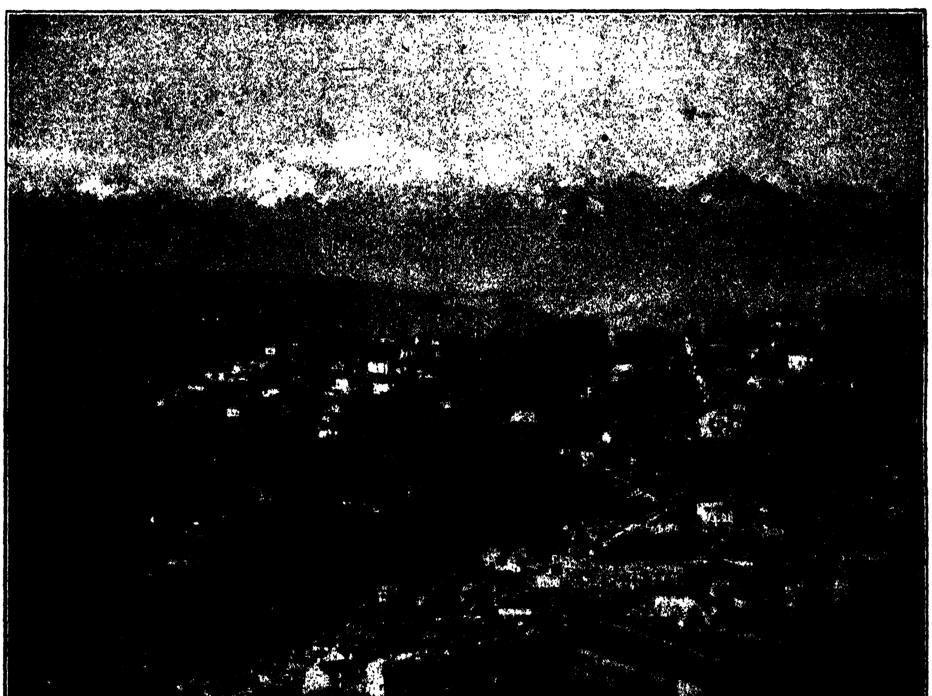

হিমাচল-পথে— সূর্য্যাস্ত দৃশ্য

হিমাচল-পথে—তরাই প্রদেশ

পাহাড়ী-রমণী

নেপালী মহিলামণ্ডলী

ারা বৎসরের মধ্যে কেবল একবার—একটিবারের ন্য কাজ-কর্ম্মের বোঝা যথাসম্ভব, মস্তক হইতে নামাইয়া, কসঙ্গে কয়েক দিনের অবকাশের ব্যবস্থা করিতে পারি; —সে আমাদের সর্ব্বপ্রধান পর্ব্ব দুর্গোৎসবের সময়। সে ময় যাঁহারা দীর্ঘ অবকাশ পান, তাঁহারা দিল্লী, লাহোর, বাম্বাই, সিংহলে যান; আর যাঁহারা অল্প কয়েকদিনের টী পান, তাঁহারা হাতের কাছে পুরী, বৈদ্যনাথ, মধুপুর । দারজিলিংয়ে যান। যাঁহাদের এখনও পল্লী-বাস আছে, খনও যাঁহাদের পল্লী-জন্মনিকেতনে দিনান্তে ক্ষুদ্র প্রদীপটি লে, তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্প লোকেই,—বোধ হয় জারে দশ জন—পূজার সময় দেশে যান কি না সন্দেহ। যাঁহাদের আয় সঙ্কীর্ণ, তাঁহারা সংসার-প্রতিপালনের জন্যই এই দুর্ম্মূল্যের দিনে ঋণগ্রস্ত; তাঁহাদের মনে ইচ্ছা থাকিলেও প্রবাস-বাস ঘোচে না—দরিদ্রের মনোরথ হৃদয়েই বিলীন হয়; দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া তাঁহারা প্রবাসেই অবকাশ-কাল যাপন করিতে বাধ্য হন। বলা বাহুল্য, আমিও এই দলেরই একজন। সুতরাং বিগত পূজার অবকাশে যখন বন্ধুগণের মধ্যে নানা জনে নানা স্থানে যাইবার সুদীর্ঘ 'প্রোগ্রাম' করিতে লাগিলেন, আমি তখন ঝাড়া জবাব দিলাম—এবার কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া 'পাদমেকম্ ন গচ্ছামি'।

আমি 'ন গচ্ছামি' বলিয়া বসিয়া থাকিলে যদি তাহা

কার্য্যে পরিণত হইত, তাহা হইলে জীবনের অনেক সঙ্কল্প এমন করিয়া বিফল হইত না। বিগত পূজার সময় আমি তাহার বেশ প্রমাণ পাইয়াছিলাম। বন্ধুগণের মধ্যে অনেকে অনেক স্থানে চলিয়া গেলেন, আমি পঞ্চমীর দিন পর্য্যন্ত সেই 'ন গচ্ছামি' ধরিয়াই বসিয়া আছি। পঞ্চমীর রাত্রি যখন এগারটা, তখন আমার প্রবাস-গৃহের সদরদ্বারের কড়া কে সজোরে নাড়া দিল এবং পরক্ষণেই তীক্ষ্ণ স্বরে 'বাবু, তার আয়া' শব্দ আসিল।

তার! রাত্রি এগারটার সময় আমার মত গরিবের নামে 'তার!' আমাদের কালে-ভদ্রে 'তার' আসে, আর সে তারের সংবাদ সকল বারেই অশুভ। সুতরাং 'তার' শুনিয়া বুক কাঁপিয়া উঠিল,—এখনই শুনিব, কে হয় ত মৃত্যু-শয্যায়! আমি আর 'তার' লইতে গেলাম না; আমার এক পুত্র তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া যথারীতি সহি দিয়া 'তার' লইলেন, এবং আমার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই কম্পিত-হস্তে তারের লেফাফা খুলিয়া পাঠ করিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "খবর ভাল—দারজিলিংয়ের তার।"

দারজিলিংয়ে তখন বর্দ্ধমানের শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বাহাদুর অবস্থিতি করিতেছিলেন। এ 'তার' নিশ্চয়ই তিনিই করিয়াছেন বুঝিতে পারিয়া আমার কাঁপুনি থামিল। পুত্র বলিলেন "মহারাজ আপনাকে সপ্তমীর দিন দারজিলিং পৌছিবার জন্য আরজেণ্ট তার করিয়াছেন।" ব্যস্ এ আদেশ অমান্য করিবার যো আমার ছিল না; সুতরাং আমার 'ন গচ্ছামি' সঙ্কল্প ধূলায় লুণ্ঠিত হইলেন।

পরদিন ষষ্ঠী। সেই দিনই যাত্রা করিতে হইবে। প্রাতঃকালে ষ্টেশনে লোক পাঠাইলাম, যদি একটু স্থান রিজার্ভ করিতে পারি। তাহা হইল না; শুনিলাম, সে দিন দারজিলিং মেলে যত লোক যাইতে পারে, তাহার অনেক অধিক লোক—সবই সাহেব-বিবি, পূর্ব্বাহ্লেই আসন রিজার্ভ করিয়াছেন; তাঁহাদেরই স্থান হইবে না। শয়নের স্থান না হয়, বসিবার, অন্ততঃ দাঁড়াইবার স্থান নিশ্চয়ই করিয়া লইতে পারিব, ভাবিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। আয়োজন আবার কি করিব? একটা ছোট ব্যাগের মধ্যে খানচার কাপড়, গুটিতিনেক সাদা জামা, আর একটা গরম কোট লইলাম। ব্যাগে আর স্থান হইল না; গাত্রবস্ত্র একখানি বালাপোষ ও একটা ছোট বালিস একখানি ক্ষুদ্র বিলাতী কম্বলে জড়াইয়া লইলাম। ইহার অধিক আয়োজনের প্রয়োজনই বোধ হইল না। আমার এক বন্ধু কিন্তু পূর্ব্ব বৎসর দারজিলিং ভ্রমণে যাইবার সময় পাঁচশত টাকা কাপড়-চোপড় ইত্যাদিতেই ব্যয় করিয়া বসিয়াছিলেন।

দারজিলিং মেল ছাড়িবার ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বেই ষ্টেশনে যাইয়া হাজির! জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জানিলাম যে, উপরের দুই শ্রেণীতে একটুও স্থান নাই; দেখিলামও তাই। শিলিগুড়ি পর্য্যন্ত একখানি মধ্য-শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া তাড়াতাড়ি গাড়ী ছাড়িবার প্রায় তিন কোয়াটার পূর্ব্বেই মধ্য-শ্রেণীর একটা আসন অধিকার করিয়া বসিলাম। আমার পূর্ব্বেও অনেকে আসিয়াছিলেন; তবে তাঁহাদের মধ্যে দারজিলিং-যাত্রী বেশী ছিলেন না—দুই তিন জন মাত্র; অনেকেই পথে নামিয়া যাইবেন।

গাড়ীর মধ্যে বসিয়া একেবারে ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম; বড়ই বিরক্ত বোধ হইতে লাগিল; কিন্তু উপায় নাই। বিলম্বে আসিলে মধ্য-শ্রেণীতেও স্থান পাইতাম না। গাড়ী ছাড়িবার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্তও লোক আসিতে লাগিল; শেষে যাঁহাদের শুভাগমন হইল, তাঁহাদিগকে দাঁড়াইয়াই যাইতে হইল। এক এক কামরায় বার জন বসিয়াও আগন্তুকগণের স্থান দেওয়া অসাধ্য হইয়া উঠিল। ভ্রমণের আরম্ভ অনির্ব্বচনীয় সুখকর হইল, তাহা আর বর্ণনা করিয়া বুঝাইতে হইবে না!

গাড়ী ছাড়িল;—আমার 'হিমাচল-পথে' ভ্রমণ আরম্ভ হইল। এ ভ্রমণ-কাহিনীর নাম যদি 'দারজিলিং ভ্রমণ' লিখিতাম, তাহা হইলেই ঠিক হইত; কিন্তু দারজিলিং-ভ্রমণ সম্বন্ধে এত বই ছাপা হইয়াছে, এত প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে যে অমন সোজাসুজি নামটা করিতে কেমন বাধ-বাধ ঠেকিল। তাই নামটা একটু ঘোরাল করিয়াছি; পাঠক-পাঠিকাগণ আমার এই ইচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। এখন ত আর কোনখানে যাওয়া হয় না যে, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিব। সৌভাগ্যক্রমে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের কৃপায় যদি নগাধিরাজ দর্শনের সুযোগ হইল, তখন সে ভ্রমণ কাহিনী লিখিবার প্রলোভন সংবরণ করা আমার মত কাঙ্গালের পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব। এ দুর্ব্বলতা গোপন করিয়াও লাভ নাই। অতএব আপনারা যদি দারজিলিং-ভ্রমণ শুনিয়া ও পড়িয়া থাকেন, তাহা হইলেও

া হয় ফাউ-স্বরূপ আর একবারও পড়ুন। এই স্থানে আমি একটা প্রতিজ্ঞা করিতে পারি; তাহা এই যে, আমি ারজিলিংয়ের সম্বন্ধে একটী কথাও বলিব না,—আমার প্রবন্ধের নাম যে 'হিমাচল-পথে'—আমি পথের কথাই বলিব।

দারজিলিং মেল শিয়ালদহ ছাড়িয়া, পদ্মার এ-পারে মাত্র ্ইটী স্থানে দাঁড়ায়; এক রাণাঘাটে আর পোড়াদহে; ্তরাং এ পথটার মধ্যে আর বলিবার ঘটনা উপস্থিত ্ইবার সম্ভাবনা ছিল না। রাণাঘাটে আমাদের গাড়ী হইতে ার পাঁচজন নামিয়া গেলেন, নূতন আর কেহ উঠিলেন না। য কয়জন নামিলেন, তাঁহারা এই একঘণ্টা, স্কুলের পাঠে ্মনোযোগী ছাত্রের মত দাঁড়াইয়াই ছিলেন; তাঁহাদের তরোভাবে আমাদের বিশেষ ক্ষতি-বৃদ্ধি হইল না,—আমরা ্মন বস্তাবন্দী ছিলাম, তেমনই থাকিলাম। পোড়াদহে াচ-সাতটী সাহেব-বিবিকে জিনিসপত্র লইয়া দোড়াদৌড়ি ্রিতে দেখিলাম; তাঁহাদের কি গতি হইল তাহা বলিতে ারি না। তারপরই সারা সেতু পার হইয়া একেবারে শ্বরদি। এখানে সাহেবেরা 'ডিনার' করিয়া থাকেন। াহারা ডিনার করিতে নামিলেন, আর হতভাগ্য আমরা াসন বেদখল হইবার ভয়ে আড়ষ্টভাবে বসিয়া তাঁহাদের ভাজনের অযথা বিলম্বের কথা লইয়া নিতান্ত অপ্রীতিকর ালোচনা করিয়া সময় কাটাইতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণ পরেই গাড়ী ছাড়িল, আমরাও হাঁফ ছাড়িয়া ্চিলাম; এবং একটু পরেই আবার নামিয়া দৌড়াদৌড়ি ্রিতে হইবে; সান্তাহারে যে গাড়ীতে উঠিতে হইবে, ্হাতে বসিবার স্থানটুকুও মিলিবে কি না; এই সকল কথা ্বিতে লাগিলাম। সান্তাহার হইতে যে ট্রেণ শিলিগুড়ি ্য, তাহার গাড়ীগুলি ছোট, এ দিকে আমরাও দলে কম ্ই; এবং ইতঃপূর্ব্বেই আর একখানি ট্রেণ কলিকাতা হইতে াসিয়া সান্তাহারে পৌছিয়াছে। সেই ট্রেণের আরোহীরা ্বাল্লেই গাড়ী দখল করিয়া বসিয়া আছেন; সুতরাং ্চন্তা হইবারই কথা।

সান্তাহারে আমাদের গাড়ী পৌছিলে অন্য যাত্রীরা যখন ্লী, কুলী' করিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন, আমি ্ন বাবুর মত আমার ক্ষুদ্র ব্যাগ ও ততোধিক ক্ষুদ্র তথা- ্থিত বিছানা নিজেই অনায়াসে বহিয়া লইয়া সকলের আগে যাইয়া একখানি মধ্য-শ্রেণীর গাড়ীতে চাপিয়া বসিলাম। একটু পরেই আমাদের পরিত্যক্ত গাড়ীর আরোহী, তিনটী ভদ্রলোক তাঁহাদের পাঁচ-সাত-গণ্ডা বাক্স বিছানা মায় হারিকেন লণ্ঠন লইয়া ছুটিয়া আসিলেন। আমাদের গাড়ীতে তখনও বসিবার স্থান আছে দেখিয়া আমি তাঁহাদিগকে সাদর আহ্বান করিলাম। আমাদের গাড়ীতে উপবিষ্ট একজন লোক—ভাল কাপড়-চোপড় পরা সুতরাং ভদ্রলোকই—বলিয়া উঠিলেন, "আপনি ত আচ্ছা লোক মশাই, এ গাড়ীতে স্থান কৈ? আপনি পান না শোবার ঠাঁই, শঙ্করাকে ডাকেন পাশে শুতে।" এ কথার জবাব দিবার বয়স আমার অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে; তাই কোন কথা না বলিয়া ভদ্রলোক তিনটীর দ্রব্যাদি গাড়ীর মধ্যে তুলিবার সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। তাহার পর কোন রকমে তাঁহাদের বসিবার স্থান হইল। তাঁহারা দারজিলিংয়ে বেড়াইতে যাইতেছেন। কোন আশ্রমে না উঠিয়া বাসা করিয়া স্বতন্ত্র থাকিবেন; তাই তাঁহাদের সঙ্গে এত লটবহর। কথায় কথায় তাঁহাদের সহিত পরিচয় হইল। তাঁহাদের বাড়ী বাগবাজারে।

ভাল কাজ করিলে যে তাহার পুরস্কার হাতে-হাতে পাওয়া যায়, আজ তাহার প্রমাণ পাইলাম। সান্তাহার হইতে গাড়ী ছাড়িবার পর ভদ্রলোক তিনটী তাঁহাদের গাঁটরী খুলিয়া খাদ্য-দ্রব্য বাহির করিতে লাগিলেন। আমি সঙ্গে কিছুই আনি নাই; রাত্রিটা অনাহারে কাটাইব বলিয়াই স্থির করিয়াছিলাম। এখন দেখি, ভদ্রলোকেরা তাঁহাদের খাদ্য-দ্রব্যের অংশ গ্রহণ করিবার জন্য আমাকে চাপিয়া ধরিলেন! ইহারই নাম ভাল কাজের পুরস্কার! তাঁহারা যদি বিমুখ হইয়া অন্য গাড়ীতে যাইতেন, তাহা হইলে কি এই গভীর রাত্রিতে লুচী, তরকারী, ভাজা, এবং বাগবাজারের বিখ্যাত নবীন ময়রার উৎকৃষ্ট রসগোল্লা আমার ভোগে লাগিত! অপর বেঞ্চে উপবিষ্ট ভদ্রলোকের উপদেশ গ্রহণ করিয়া এই বন্ধুদিগকে বিমুখ করিলে কি লোক্‌সানই হইত, বলুন দেখি! বুঝিলাম, হিমাচল-নন্দিনী আজ হিমাচল-যাত্রী এই কাঙ্গাল সন্তানকে ভোলেন নাই। আজ বঙ্গে তাঁহার আগমনী গীত হইতেছে; আজ কি অন্নপূর্ণা দরিদ্র সন্তানকে অভুক্ত রাখিতে পারেন! যাক্, 'পেটে খেলে পিঠে সয়'—মহানন্দে

গল্পগুজবে, বসিয়া-বসিয়া রাত্রি কাটান গেল,—একটুও কষ্ট বোধ হইল না।

এইবার শিলিগুড়ি। সঙ্গী বন্ধুত্রয়—তাঁহাদিগকে আর 'ভদ্রলোক' বলিয়া অভিহিত করিলে রসগোল্লা-হারাম হইতে হয়, তাঁহারা নিশ্চয়ই বন্ধু—তাঁহারা একেবারে কলিকাতা হইতে দারজিলিংয়ের টিকিট করিয়াছিলেন। দারজিলিংয়ের রেলে ত আর মধ্য-শ্রেণী নাই, তাঁহাদিগকে তৃতীয় শ্রেণীতেই যাইতে হইবে। শিলিগুড়িতে টিকিট কিনিবার গোল মিটাইবার জন্যই তাঁহারা এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শিলিগুড়ি নামিয়া তাঁহারা তাঁহাদের লগেজাদির ব্যবস্থা করিতে গেলেন। আমি হিমাচলের রেলের অবস্থা কি, তাহাই দেখিতে গেলাম। দেখি সাহেব-বিবিতে প্ল্যাটফরম ভরিয়া গিয়াছে। একখানি দূরে থাকুক, তিনখানি ট্রেণেও তাঁহাদেরই কুলাইবে না—আমাদের কথা ত বহু দূর!

এমন সময় একটী যুবক আসিয়া "দাদাবাবু যে! দারজিলিং যাচ্ছেন বুঝি?" বলিয়া প্রণাম করিল। যুবকটী আমার বড়দাদার দৌহিত্র, রেলওয়ে মেল-সার্ব্বিশে কাজ করেন। তাঁহাতে দেখিয়া আমি এই সাহেব-সমুদ্রে কূল পাইলাম। তাঁহাকে বলিলাম "দাদা, আমার একখানি দারজিলিংয়ের টিকিট কিনে দাও ত।" এই বলিয়া তাঁহার হাতে একখানি দশটাকার নোট দিলাম। তিনি তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন, এবং একটু পরেই একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট লইয়া আসিলেন। ইতঃপূর্ব্বে যখন দারজিলিং গিয়াছিলাম, তখন দৌহিত্র-প্রবর আমাকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাইতে দেখিয়াছিলেন; সেই জন্যই বোধ হয় এবার দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া আনিলেন। আমি তখন বলিলাম, "দাদা, টিকিট ত দ্বিতীয় শ্রেণীর করিলে, এখন চতুর্থ শ্রেণীতে একটু স্থান করিয়া দিতে পার কি না, দেখ।" তিনি আমাকে অনেক আশা-ভরসা দিয়া দারজিলিং গাড়ীর দিকে গেলেন এবং এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিয়া আসিয়া বলিলেন, "তাই ত দাদাবাবু, তিনখানি ট্রেণ দিয়াছে, তার সবগুলিরই ফার্ষ্ট সেকেণ্ড ক্লাস রিজার্ভ, আর থার্ড ক্লাসগুলি সাহেবদের খানসামা আরদালীতে ভর্ত্তি।" আমি বলিলাম "তুমি আমার এই ব্যাগ ও বিছানার কাছে দাঁড়াও, আমি একবার দেখে আসি।" গাড়ীগুলির নিকট যাইয়া একে-একে তিনখানি গাড়ী অভিনিবেশ সহকারে অনুসন্ধান করিয়া কোথাও স্থান পাইলাম না। শেষে দেখিলাম, থার্ড ক্লাসের একখানি গাড়ীতে দুইজন পাহাড়ী পুলিস কনষ্টেবল, একজন সবইন্স্পেক্টর ও একটী বাবু বসিয়া আছেন। ছয়জনের স্থানে চারিজন আছেন দেখিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইলাম; কিন্তু গোড়ায় সাহস করিয়া বলিতে পারিলাম না—পুলিস যে! কিন্তু আর ত উপায় নাই। কাজেই অতি বিনীত ভাবে সেই পুলিস-হাকিমের কাছে আমার আরজী পেশ করিলাম। তিনি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া হাকিমী মেজাজে বলিলেন "সঙ্গে বেশী জিনিসপত্র থাকলে স্থান হবে না।" আমি সবিনয় নিবেদন করিলাম যে, জিনিস বিশেষ কিছুই নাই। তখন তাঁহার সম্মতি পাইয়া আমি আমার ব্যাগ ও বিছানা লইয়া সেই গাড়ীতে আশ্রয় পাইলাম। গাড়ীতে উঠিয়া চাহিয়া দেখি, সেই গাড়ীরই অদূরবর্ত্তী দুইখানি বেঞ্চে আমার বন্ধুত্রয়ও স্থান লাভ করিয়াছেন।

সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, গাড়ী আর ছাড়ে না। প্রায় একঘণ্টা লেট করিয়া দারজিলিংগামী তিনখানি মেল ট্রেণ একে একে ছাড়িল; আমরা তৃতীয় গাড়ীর আরোহী। এইবার সত্যসত্যই হিমাচলের পথ আরম্ভ হইল।

শিলিগুড়ি হইতে দারজিলিং যাইতে হইলে নিম্নলিখিত ষ্টেসনগুলি অতিক্রম করিতে হয়; যথা, শুকনা, রংটং, তিনধরিয়া, গয়াবাড়ী, মহানদী, করসিয়ং, টুং, সোণাদা, ঘুম। তাহার পরই দারজিলিং। শিলিগুড়ি হইতে শুকনা পর্য্যন্ত সমতল-ভূমি; দেখিবার মধ্যে চা-বাগান। পর্ব্বত তখনও দূরে। বহুদূর-বিস্তৃত ক্ষেত্রে ছোট ছোট চায়ের গাছগুলি দেখিতে বেশ। বাগানগুলিও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দেখিলাম কুলী-রমণী ও বালক-বালিকাগণ চায়ের পাতা তুলিতেছে; কেহ বা হাঁ করিয়া আমাদের গাড়ীর দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দূরে হিমালয় গায়ে ধোঁয়া মাখিয়া গম্ভীর ভাবে বসিয়া আছেন।

'শুকনা' নামের ইতিহাস আছে কি না বলিতে পারি না; তবে স্থানটি যে ভিজা নহে, একেবারে শুকনা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শুকনা হইতে গাড়ী ক্রমে চড়াই উঠিতে লাগিল; জঙ্গল ক্রমেই গম্ভীর হইতে লাগিল; গাড়ীর এঞ্জিনের ফোঁসফোঁসানি ক্রমেই বাড়িতে লাগিল।

বেচারী যেন সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া এই চড়াই উঠিতে লাগিল। রাস্তার দুই পার্শ্বে বড়-বড় গাছের দেহ হইতে লম্বমান বিবিধ মনোহর লতাপুষ্প ও অর্কিড। একেবারে প্রকৃতির ইজারা-মহল! দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। আমার ত মনে হয়, দারজিলিংয়ের এই রেলপথ, আর চারিদিকের এই নয়নাভিরাম দৃশ্যই ভ্রমণকারীর পক্ষে যথেষ্ট;—দারজিলিং সহর না দেখিলেও ইহাতেই খরচা ও পথশ্রম পোষাইয়া যায়। গাড়ী এই সোজা উপরের দিকে চলিতেছে—অমনি একস্থানে অতি কৌশলে এমন এক চক্র দিল যে, চাহিয়া দেখি, যে লাইন দিয়া আসিতেছিলাম, তাহা একেবারে পদতলে গিয়া পড়িয়াছেন। এই চক্র-গুলিকে 'লুপ' বলে। ইঞ্জিনিয়ার বাহাদুর-পুরুষ বটে! এমন করিয়া একটী চক্র দিয়া অনেকটা রাস্তা উপরে না উঠিতে পারিলে এক দিনের পথ তিন দিনে অতিক্রম করিতে হইত। সমস্ত রেলপথে এই রকম চারিটী 'লুপ' আছে।

আমাদের গাড়ী সে দিন রংটং ষ্টেসনে থামিল না; কিন্তু তাহার অনতিদূরে একটা স্থানে জল লইবার জন্য একটু অপেক্ষা করিল। পথের মধ্যে অনেক স্থানে এই রকম জল লইবার আড্ডা আছে। রংটংয়ের পরই তিন-ধরিয়া। রংটং হইতে গাড়ী ছাড়িয়া তিনধরিয়া পৌছিবার পূর্ব্বে যে পথখানি অতিক্রম করিতে হয়, আমার মনে হয়, দৃশ্য শোভায় এই পথটুকুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমি কবিও নহি, চিত্রকরও নহি; সুতরাং বাক্যে বা তুলিকাদ্বারা এ দৃশ্যের মহিমা কীর্ত্তন করিতে পারিলাম না। দূরে তিস্তা নদী অলস মন্থর গমনে কোথায় চলিয়াছেন; পার্শ্বে অসংখ্য তরুরাজি ধ্যান-মগ্ন; অগণিত জলধারা কুলকুল রবে কাহার নাম গান করিতেছে; আর যোগনিমগ্ন তাপস-প্রবর হিমালয় মস্তক উন্নত করিয়া আপনাহারা হইয়া—কি করিতেছেন, তাহা তিনিই জানেন। শুধু গোল বাধাইতেছে এই আমাদের ইঞ্জিনের বিকট গর্জ্জন!

তিনধরিয়া বেশ বড় ষ্টেসন। এখানে এই রেলের কারখানা আছে। অনেক লোকজন খাটে। সাহেবদের জন্য খানা না হউক পিনার যথেষ্ট ব্যবস্থা আছে; আমাদের জন্য অশ্বডিম্ব!

তিনধরিয়ার পর গয়াবাড়ী। ইহার পরেই সেই পাগলাঝোরা! এই ঝোরা বা ঝরণা সত্যসত্যই পাগলা। ইহার মতিগতি বোঝা যায় না। কখন অবিরল ধারায় বারিরাশি ছাড়িয়া দিতেছেন; কখনও বা প্রলয় মূর্ত্তি ধরিয়া একেবারে লম্ফঝম্ফ। তখন ইহার পাগলামি দেখে কে! একেবারে পথ-ঘাট সব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একাকার করিয়া ফেলে। পাগলের যাহা দস্তুর!

তাহার পরই মহানদী। মহানদী পার হইয়াই করসিয়ং। প্রকাণ্ড সহর। দারজিলিং আর করসিয়ং যমজ-ভ্রাতা। দুইটিই বিলাস-নিকেতন; দুইটীরই শোভা-সৌন্দর্য্য বর্দ্ধ-নের জন্য যথেষ্ট কৃত্রিম আয়োজন। এখানে গাড়ী অনেক-ক্ষণ থাকে; কারণ সাহেবলোক এখানে আহার করিয়া থাকেন, আর আমরা এখানে অনাহারে বসিয়া থাকি; আমাদের জন্য কোন বন্দোবস্তই এখানে নাই। বোধ হয় কোম্পানী মনে করিয়াছেন, যাহাদের নিত্য একবেলা আহার জোটে, তাহাদের জন্য আবার কিসের ব্যবস্থা। সে যাহাই হউক, আমার জন্য কিন্তু এখানে ব্যবস্থা ছিল। আমি যে এই সপ্তমীর দিন দারজিলিং যাইব, সে সংবাদ পূজনীয় শ্রীযুক্ত রাজা বনবিহারী কাপুর বাহাদুর পাইয়া-দিলেন। তিনি তখন করসিয়ংয়ে অবস্থিতি করিতেছিলেন। শ্রীযুক্ত রাজা সাহেব আমাকে নামাইয়া লইবার জন্য তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী মহাশয়কে ষ্টেসনে পাঠাইয়াছিলেন। সে ভদ্রলোক পর-পর দুইখানি মেল ট্রেণে আমাকে না দেখিয়া নিরাশ হইয়াছিলেন। তৃতীয় ট্রেণখানি যখন ষ্টেসনে পৌছিল, তখন তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীগুলির মধ্যে আমাকে অন্বেষণ করিয়াছিলেন। আমি তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে বসিয়া আছি, তাহা তিনি মনে করিতে পারেন নাই। অবশেষে গাড়ী ছাড়িবার একটু পূর্ব্বে যখন তিনি আমাদের গাড়ীর সম্মুখ দিয়া বাসায় ফিরিয়া যাইতেছিলেন, তখন আমাকে দেখিতে পাইলেন। তখন আর সময় ছিল না; কাজেই শ্রীযুক্ত রাজা সাহেবকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়াই আমি শুষ্কমুখে বিদায় গ্রহণ করিলাম। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। পাহাড়ী মেয়েছেলেরা কেহ বা কোলাহল করিতে-করিতে গাড়ীর সঙ্গে-সঙ্গে দৌড়িতে লাগিল, কেহ বা দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল।

এখন আমরা একেবারে মেঘের রাজ্যে উপস্থিত হই-লাম। উপযুক্ত সময় বুঝিয়া মেঘ আকাশ ছাইয়া ফেলিল।

তার পর বৃষ্টি! যাত্রীরা গাড়ীর পর্দা ফেলিয়া দিয়া শীত-বস্ত্র গায়ে জড়াইয়া হি হি করিতে আরম্ভ করিলেন। বৃষ্টির মধ্যেই টুং, সোনাদা পার হইয়া গেলাম। তাহার পরই ঘুম। এখানে যখন গাড়ী পৌঁছিল, তখন আড়াইটা বাজিয়া গিয়াছে—মেলের কিন্তু একটার সময় দারজিলিংয়ে পৌঁছিবার কথা। ঘুম ষ্টেসনে মেল আর ঘুমাইবার অবকাশ পাইলেন না; একটু দাঁড়াইয়াই একেবারে নিম্নাভিমুখী হইলেন; ঘুম হইতে দারজিলিং নীচে। কিছুক্ষণ পরেই আমাদের গাড়ী দারজিলিং পৌঁছিল। তখন প্রকৃতির মেঘাবগুণ্ঠন উন্মোচিত হইয়াছে, রৌদ্র দেখা দিয়াছে। আমরা গাড়ী হইতে নামিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। আমার 'হিমাচল-পথে'র কথা শেষ হইল; আপনারাও বলুন, রাম বাঁচা গেল!

অভিভাষণ *

[মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ]

মেদিনীপুর সাহিত্য-সম্মিলনে সভাপতির গৌরব-মণ্ডিত আসনে উপবেশন করিবার অধিকার প্রদান করিয়া আপনারা আমার প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, সেজন্য আমার কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদ আপনাদের নিকট বিনীত ভাবে নিবেদন করিতেছি। এই অযাচিত মহনীয় সম্মান লাভে আমি যে গৌরব অনুভব করিতেছি, তাহা আমার জীবনে অতুলনীয় ও চিরস্মরণীয়।

যাঁহার ত্রিতাপহর চরণ-কমলে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি দিবার জন্য আমরা এই পবিত্র মণ্ডপে অদ্য সমবেত হইয়াছি, সেই মহীয়সী প্রত্যক্ষ দেবতা—জননী বঙ্গভাষার প্রভাবে অদূর-ভবিষ্যতে বাঙ্গালী জাতি পৃথিবীর সমুন্নত মানবজাতিগণের মধ্যে বরণীয় আসন লাভে সমর্থ হইবে, এই আশাই আজ প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীর হৃদয়ে সমুদ্ভাসিত হইতেছে,—এই আশাই আজ ধ্রুবতারার ন্যায় বাঙ্গালীর গন্তব্য শ্রেয়ঃ ও প্রেয়োরাজ্যের দিক্‌প্রদর্শন করিতেছে। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, এই আশাই আজ বাঙ্গালীর বহুদিনের লক্ষ্যভ্রষ্ট সমাজ-শরীরে আবার নূতন জীবনী-শক্তির সঞ্চার করিতেছে।

আমাদের মাতৃভাষার কমনীয় অঙ্গে নানাপ্রকারের সাহিত্য-রত্নাভরণ বিন্যাস করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহাদের পাণ্ডিত্যে ও কৃতিত্বে বঙ্গভূমি ও বঙ্গভাষা ধন্য ও গৌরবিত হইয়াছেন, সেই কৃত্তিবাস, কাশীদাস, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, মুকুন্দরাম, বৃন্দাবনদাস, লোচনদাস, কবিরাজ কৃষ্ণদাস, গোবিন্দদাস, ভারতচন্দ্র, রাজা রামমোহন, ঈশ্বরগুপ্ত, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, দীনবন্ধু, নবীনচন্দ্র, রাম-নারায়ণপ্রমুখ অনন্তকীর্ত্তিমণ্ডিত ভারতীর বরপুত্রগণের পুণ্যময়ী স্মৃতির উদ্দেশে অকপট ভক্তি, প্রীতি ও শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি উপহার দিয়া, আমি আপনাদের নিকটে আমাদের সকলের বরণীয় মাতৃভাষার প্রকৃতি, রীতি ও ভবিষ্যৎ গতি বিষয়ে কিছু নিবেদন করিতেছি।

কিছুকাল হইতে আমাদের মধ্যে বঙ্গভাষার প্রকৃতি সম্বন্ধে দুইটী পরস্পর-বিরুদ্ধ মতের উদয় হইয়াছে। একটী মত এই যে, বঙ্গভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার সম্বন্ধ যতই ঘনিষ্টতর হইবে, ততই ইহার শক্তি ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইবে। দ্বিতীয় মতটী এই যে, সংস্কৃত ভাষার সহিত ইহার সম্বন্ধ যতই ব্যবহিত হইবে, ততই ইহার কার্য্যকারিণী শক্তি ও মনোহারিতা বৃদ্ধি পাইবে। এই দুইটী মতের সমর্থক বিবুধগণের অবতারিত দুর্ভেদ্য যুক্তি-জালের অবতারণা করিয়া এই সুখের সম্মিলনে আপনাদিগকে বিব্রত করিবার অভিলাষ আমার একেবারেই নাই; কিন্তু এই দুইটী মতের মধ্যে কিরূপভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারা যায়, আমি তাহারই সংক্ষেপে প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিব। সংস্কৃত ভাষা কি বঙ্গভাষার মাতা বা মাতামহী, না প্রমাতামহী—সে বিষয়ে সূক্ষ্ম বিচার করিবার ভার অভিজ্ঞতর ভাষাতত্ত্ববিদ্ মনীষিগণের উপর সমর্পণ

* মেদিনীপুর বঙ্গ বার্ষিক সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত।

করাই শ্রেয়ঃ। তাঁহাদের মধ্যে এই বিষয়ে নানা বিরুদ্ধ মত থাকিলেও সংস্কৃত শব্দ যে বাঙ্গলাভাষার মুখ্য উপাদান —এ বিষয়ে কোন প্রকার মতভেদ হইতে পারে না। সংস্কৃত ক্রিয়াপদ ও সংস্কৃত নাম-বিভক্তিগুলির অবিকল প্রয়োগ বা ব্যবহার বাঙ্গলা ভাষায় কোন দিন ছিল না, এখনও নাই এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে না—ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। কিন্তু, সংস্কৃত অবিকল ধাতু ও বিভক্তি ব্যতিরিক্ত সংস্কৃত শব্দ অর্থাৎ প্রাতিপদিকগুলিকে পরিত্যাগ করিলে বঙ্গভাষার অস্তিত্ব যে একেবারেই থাকে না—ইহা কে অস্বীকার করিবে? সেই প্রাতিপদিকগুলির অবিকৃতভাবে ও বিশুদ্ধভাবে ব্যবহার বাঙ্গলা ভাষায় যত বেশী ভাবে হইয়া থাকে, ভারতের সংস্কৃত-ঘনিষ্ট অন্য কোন দেশীয় ভাষায় তত হয় না, ইহা সকলেই বিদিত আছেন। এইরূপ অবস্থায় বাঙ্গালা ভাষাকে সংস্কৃত প্রাতিপদিকের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ হইতে দূরে রাখিবার চেষ্টা—আর নলিচা ও খোল উভয়ই বদলাইয়া হুঁকাকে সেই হুঁকা বলিয়া পরিচয় দিবার চেষ্টা যে একই প্রকারের হইবে, তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই বিশেষভাবে বুঝেন।

সুতরাং যে সকল সংস্কৃত শব্দ শত-শত বৎসর ব্যাপিয়া বাঙ্গালা ভাষার ভিত্তিরূপে পরিণত হইয়াছে, সেই ভিত্তিকে ভাঙ্গিয়া অন্য একটী নূতন ভিত্তির উপর বাঙ্গালা ভাষাকে যাঁহারা প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন, তাঁহাদের কল্পনাকুশলতা নূতন হইলেও, তদনুসারে যে বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি নূতন ভাবে গঠিত হইতে পারে, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে।

বিশাল বঙ্গভূমির ভিন্ন-ভিন্ন প্রদেশে কথোপকথনকালে ঐ সকল সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণগত বৈষম্য চিরদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং চলিবে। এ হিসাবে প্রাদেশিকতা অবর্জ্জনীয় হইলেও, লিখিত সাহিত্যের ভাষার উপর প্রাদেশিকতার প্রভাবকে যাঁহারা এখনও জাগাইয়া রাখিতে চাহেন, তাঁহারা প্রতিভা ও শক্তিশালী হইতে পারেন; কিন্তু, তাঁহাদের প্রতিভা বা শক্তি—চট্টগ্রাম হইতে মানভূম, মেদিনীপুর, ময়মনসিংহ ও ত্রিপুরা পর্য্যন্ত সমগ্র বাঙ্গালার শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যের ভাষার অনিবার্য্য গতির অণুমাত্রও বক্রতা যে সম্পাদন করিতে পারিবে না, ইহা ধ্রুবসত্য।

চট্টগ্রাম, ঢাকা, ময়মনসিংহ, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, যশোহর ও বরিশালের বাঙ্গালা উচ্চারণে পরস্পর প্রভূত পার্থক্য আছে ও চিরদিনই থাকিবে। এক জেলার বাঙ্গালীর কথোপকথনজনিত রসাস্বাদে অন্য জেলার বাঙ্গালীর অল্প বা বিস্তর অনধিকার স্বাভাবিক হইলেও, সংস্কৃত-শব্দ-বহুল সাহিত্যিক ভাষার অনুগ্রহে আজ আমাদের পরস্পরের ভাব-বিনিময় অনায়াসেই সম্পাদিত হইতেছে। আপনার মুখের কথা আমার বুঝিতে ক্লেশ হইলেও, আমার মুখের কথা আপনার বোধগম্য না হইলেও,—আপনার লিখিত সাহিত্যিক ভাষা আমার অবোধ্য নহে, বা আমার লিখিত সাহিত্যিক ভাষা আপনারও অবোধ্য নহে,—এই ভাবে সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে এক করিবার জন্য যে মহাশক্তিশালিনী সাহিত্যিক ভাষা, নবোদিত অরুণকিরণচ্ছটার ন্যায় বহুকালের ভেদনিদ্রাবসন্ন জাতীয় জীবনে নব-নব অভ্যুদয়ের আশা ও উৎসাহ জাগাইয়া দিতেছে, সেই সাহিত্যিক ভাষার জীবনীশক্তি যে বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দরাশি হইতেই সমুদ্ভূত এবং সেই শব্দগুলির সহিত ইহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে, ইহার জীবনী শক্তিই যে বিলুপ্তপ্রায় হইবে—এই ধ্রুবসত্যের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার জন্যই আমার এই নিবেদন। আশা করি ইহা উপেক্ষিত হইবে না।

এইবার আমাদের সাহিত্যের কথা বলিব। সাহিত্য শব্দটী সংস্কৃত ভাষায় নিতান্ত সীমাবদ্ধ ভাবে ব্যবহৃত হইলেও, আমাদের নিকট ইহা অর্থ-বিষয়ে আর সেইরূপ সীমাবদ্ধ নহে। বাঙ্গলার কাব্য ও অলঙ্কারই ইহার প্রতিপাদ্য নহে। আজ শিক্ষিত বাঙ্গালীর সাহিত্যের রাজ্য—বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, কৃষি, শিল্প, কলা, বাণিজ্য, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ও অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান প্রভৃতি তাবৎ বিষয়ের উপরই প্রভাব বিস্তার করিতে উদ্যত হইয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, সাহিত্য শব্দটী বাঙ্গালা ভাষায় প্রবিষ্ট হইয়া, নিজের প্রাচীন সীমাবদ্ধ শক্তি পরিহারপূর্ব্বক অসীম পারিভাষিকী শক্তির প্রভাবে, বাঙ্গালী শিক্ষিত ব্যক্তিবৃন্দের বিশ্বতোমুখী চিন্তাশক্তির ক্রীড়াকেন্দ্র রূপে অদ্য পরিণত হইয়াছে। সেই জন্য এই সাহিত্যের গতির প্রতি শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া একান্ত আবশ্যক।

প্রত্যেক সাহিত্যসেবীরই মনে রাখিতে হইবে যে, সাহিত্যের বিশুদ্ধি ও উন্নতির উপর জাতীয় জীবনের বিশুদ্ধি

ও উন্নতি নির্ভর করিয়া থাকে। বিজ্ঞান, জ্যোতিষ ও দর্শন প্রভৃতিকে উপেক্ষা করিয়া, কেবল রসের পরিপুষ্টি দ্বারা কোন ভাষার সাহিত্য সম্পূর্ণ হইতে পারে না। আমাদের ভাষার সাহিত্যের গতি কিন্তু এখনও বহুলভাবে সেই রস-সৃষ্টিরই দিকে। উপন্যাস, নাটক ও কাব্য রচনার দিকেই বর্ত্তমান সময়ে আমাদের সাহিত্যিকগণের ঝোঁক অত্যধিক। দেশের অধিকাংশ লোকই এখনও উপন্যাস বা নাটক পড়িতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। দর্শন, বিজ্ঞান, কৃষি, লোকনীতি, শিল্প ও বাণিজ্যের কথা সাহিত্যের হাটে অতি অল্পই বিকাইয়া থাকে। ইহা কিন্তু শুভ লক্ষণ নহে। ইহার প্রতীকার কিরূপে হইতে পারে, তাহাও বিশেষরূপে এখন ভাবিবার বিষয়।

সকলেই বলে বাঙ্গালী বড়ই বুদ্ধিজীবী,—বাঙ্গালীর প্রতিভা বর্ত্তমান সময়ে সমগ্র ভারতের জাতীয় অভ্যুদয়ের গতি নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে। বাঙ্গালীর কর্ণে ইহার অপেক্ষা তৃপ্তিকর প্রশংসা আর কিছুই হইতে পারে না—ইহা কে না স্বীকার করিবে? কিন্তু, এই প্রশংসা যাহাতে চিরস্থায়িনী হয়, তাহার জন্য আমরা কি করিতেছি? কেবল উপন্যাস বা কাব্য লইয়া থাকিলে এই দুরন্ত জীবন-সংগ্রামের দিনে চলিবে কি করিয়া? বাঙ্গালার গ্রামগুলি ম্যালেরিয়ার প্রভাবে বাসের অযোগ্যপ্রায় হইতে চলিল,—বাঙ্গালার ক্ষেত্র সকল বাঙ্গালী কৃষকের অকর্ম্মণ্যতায় বা অভাবে আর পূর্ব্বের ন্যায় শস্যসমৃদ্ধিপূর্ণ হইতেছে না,—চাকরী ছাড়া অন্য কোন জীবিকাই শতকরা নিরানব্বইটী গৃহস্থ-পরিবারের নিকট অন্ন-সংস্থানের উপায় বলিয়া প্রতীত হইতেছে না। ব্যবসায়-বাণিজ্য কেমন করিয়া চালাইতে হয়, বাঙ্গালী তাহা বুঝে না, বুঝিবার ইচ্ছাও নাই। কদাচ বুঝিলেও তাহাতে উৎসাহ নাই। কাজেই দারিদ্র্য এবং দারিদ্র্যের নিত্য-সহচর রোগ ও অকাল-মৃত্যু আসিয়া নন্দন-কানন-তুল্য বঙ্গের পল্লীগুলিকে শ্মশানে পরিণত করিতে চলিয়াছে। তাহার উপর দেশের সর্ব্বত্রই পরস্পর ঈর্ষ্যা, বিদ্বেষ ও আত্মাভিমানজনিত কলহের ভীষণ হলাহল তীব্রবেগে সমাজ-শরীরের প্রত্যেক অঙ্গকে অবসন্ন করিয়া দিতেছে। এই ঘোর দুর্দ্দিনে বাঙ্গালী-জাতিকে ধ্বংসের করাল গ্রাস হইতে যে সাহিত্য রক্ষা করিতে পারে, তাহার সৃষ্টির জন্য সমবেত চেষ্টা যে একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, তাহা যেন আমরা বিস্মৃত না হই।

বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তি অধ্যাত্মবিজ্ঞান ও ধর্ম্ম, ইহা আর ভুলিলে চলিবে না। অধ্যাত্মবিজ্ঞানের জন্মভূমি এই ভারতবর্ষে অধ্যাত্মবিজ্ঞানের জন্য বিদেশের সাহায্য গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে, ভারতের অধ্যাত্মবিজ্ঞানের তত্ত্ব কি—তাহা প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীর ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। সেই ভারতের অধ্যাত্মবিজ্ঞান এখনও সংস্কৃত ভাষারই অন্তর্নিহিত। বড়ই দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালা ভাষায় এখনও সেই অধ্যাত্মবিজ্ঞানপূর্ণ সংস্কৃতগ্রন্থনিবহের যথাযথ অনুবাদ অতি বিরল। দার্শনিক পরিভাষার ঐকান্তিক অভাবে, বাঙ্গালায় দার্শনিক গভীর তত্ত্বগুলির আলোচনা এখনও এক প্রকার অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার প্রতীকারও সত্বর আবশ্যক।

ইংরেজি শিক্ষার প্রচার যতই বাড়িতেছে, ততই শিক্ষিত সমাজে পাশ্চাত্য রীতির অনুসারে ভাবের আদান ও প্রদানের উপর রুচি বাড়িয়া যাইতেছে;—প্রাচীন চতুষ্পাঠী-প্রচলিত রীতির অনুসারে ভাবের আদান-প্রদানের প্রতি লোকে ক্রমশই অনাস্থাসম্পন্ন হইতেছে। এরূপ অবস্থায় চতুষ্পাঠীর অধ্যাত্মশাস্ত্রাধ্যায়ী পণ্ডিতগণের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত মনীষিগণের-তত্ত্বব্যাখ্যান-রীতি-বিষয়ে ঐকমত্য ঘটিয়া উঠিতেছে না। অধিকাংশ স্থলেই পাশ্চাত্য প্রণালীতে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ইংরেজী ভাষার সাহায্যে যে অধ্যাত্মতত্ত্ব বুঝিয়াছেন, তাহাই ভারতের অধ্যাত্মতত্ত্ব—ইহা বুঝাইবার জন্য নানাবিধ গ্রন্থ রচনা করিতেছেন। অপর দিকে, সংস্কৃতাধ্যায়ী চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকগণ সংস্কৃত অধ্যাত্মশাস্ত্রের বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিতে প্রযত্নপর হইলেও তাঁহাদের কৃত ব্যাখ্যা পাশ্চাত্য রীতি অনুসারে না হওয়া প্রযুক্ত, জন-সাধারণের রুচিকর হইয়া উঠিতেছে না। এই অসামঞ্জস্যের ফলে বাঙ্গালার দার্শনিক ও ধর্ম্মসংক্রান্ত সাহিত্য পুষ্টিলাভ করিতেছে না। এই অসামঞ্জস্যের পরিহার করিতে হইলে, এক দিকে যেমন চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকগণের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার একান্ত আবশ্যকতা হইয়াছে, অপর দিকে পাশ্চাত্য ভাবে শিক্ষিত অধ্যাত্মশাস্ত্রব্যবসায়ী বা দার্শনিকগণের মধ্যে যথাযথভাবে সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি

ও সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলনও তেমনই প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। এইভাবে চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকগণের সহিত, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পাশ্চাত্য ভাবে শিক্ষিত মনীষিগণের মতের ও চিন্তার সামঞ্জস্য যে পর্য্যন্ত না হইতেছে, সে পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় দার্শনিক ও ধর্ম্মসংক্রান্ত সাহিত্যের সৃষ্টি অসম্ভব। এই বিষয়টীর প্রতি আমি নির্ব্বন্ধসহকারে বঙ্গভাষায় দার্শনিক-সাহিত্য-রচনায় উদ্যত ও উৎসাহপ্রদ মনীষিবৃন্দের দৃষ্টিপাতের প্রার্থনা জানাইতেছি।

সাহিত্যের বিশুদ্ধিই সামাজিক বিশুদ্ধির মুখ্য কারণ। সাহিত্যের মধ্যে আবার উপন্যাস বা কাব্যভাগের বিশুদ্ধি-সম্পাদন বর্ত্তমান সময়ে একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের মধ্যে এ সময়ে কাব্য ও উপন্যাসের পাঠকশ্রেণীর মধ্যে অধিকাংশ হইতেছে ছাত্র বা কুলললনা। উপন্যাস ও কাব্য পাঠে তাঁহাদের যেরূপ উৎসাহ ও আনন্দ হইয়া থাকে, অন্য গ্রন্থ পাঠে তাহার শতাংশেরও একাংশ হয় কি না সন্দেহ। এরূপ অবস্থায় কাব্য ও উপন্যাস-গ্রন্থগুলি এরূপ ভাবে রচিত হওয়া আবশ্যক, যাহাতে তাঁহাদের ভবিষ্যৎ জীবন ধর্ম্মপ্রবণ হয় এবং তাঁহাদের চরিত্র সুরক্ষিত হয়। মনের মধ্যে পাশব বৃত্তিগুলি যাহাতে উত্তেজিত না হয়, প্রত্যুত প্রশমিত হয়, সেইরূপ উচ্চ আদর্শের সরল চিত্র প্রচুরভাবে সাহিত্য-সৃষ্টির প্রধান উপকরণ হওয়া একান্ত আবশ্যক। পবিত্র চরিত্রের উৎকর্ষ দেখাইবার জন্য কলুষিত চরিত্রের যথাযথ চিত্রণও আবশ্যক বটে; কিন্তু, তাই বলিয়া কলুষিত চরিত্রের এরূপ অঙ্কন হওয়া কিছুতেই উচিত নহে, যাহার ফলে সেই সকল চরিত্রের উপর তরলমতি, অগঠিতচরিত্র বালক বা বালিকা-গণের সহানুভূতি উৎপন্ন হইতে পারে।

বিশ্ব-মানবের এই ভয়ঙ্কর জীবন-সংগ্রামের মধ্যে অসহায়-ভাবে প্রবিষ্ট হইয়া, সমগ্র বাঙ্গালী জাতি আজ যেরূপ কঠোর পরীক্ষার ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছে, সেই পরীক্ষার ফলের উপরই আমাদের ভবিষ্যৎ জাতীয় জীবন-গঠন যে একান্ত নির্ভর করিতেছে, তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই বিশেষরূপে বুঝিতে পারিতেছেন। যে ধর্ম্ম-বিশ্বাসের ভিত্তির অবলম্বনে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সুখে ও শান্তিতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবল আঘাতে সে ভিত্তি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। ব্যক্তিগত বিবেক ও স্বাতন্ত্র্যের বিজয়-ভেরীর বজ্র-গম্ভীর নিনাদে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত হইতেছে। আমরা সমষ্টি-শক্তি হারাইয়াছি! অথচ, আবশ্যক শিক্ষার অভাবে, বাত্যা-বিক্ষুব্ধ উত্তাল তরঙ্গমালা-মুখরিত অপার জলধির মধ্যে ভাসমান নাবিকহীন পোতের ন্যায় আমাদের জাতি এখনও ধ্বংসের দিকেই অগ্রসর হইতেছে। এই বিপদ্ হইতে জাতিকে রক্ষা করিবার একমাত্র মুখ্য উপায় আমাদের সাহিত্য,—এ কথা প্রত্যেক সাহিত্যিককে মনে রাখিয়া কাজ করিতে হইবে। যে পথে যাইলে এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে, সে পথের সুসমাচার সাহিত্যের দ্বারাই সর্ব্ব প্রথমে উদ্ঘোষিত হইবে। সে ঘোষণার মধুর আহ্বানধ্বনি শুনিবার জন্য অদ্য সমগ্র বাঙ্গালী-জাতি উৎকর্ণ হইয়া রহিয়াছে। জানি না, এ জীবনে সে আহ্বানবাণী শুনিতে পাইয়া কৃতার্থ হইব কি না। সুখের বিষয়, তাহার শুনিবার আশা কিন্তু প্রাবৃটের ঘোর অমানিশার পর মেঘনির্ম্মুক্ত পূর্ব্বাকাশে সমুদিত শুকতারার ন্যায় আজ বাঙ্গালীর হৃদয়াকাশে উদিত হইয়াছে। বঙ্গ-জননীর অসাধারণ গৌরবের হেতু, সুসন্তান স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহাশয় নিজের অলোক সামান্য অধ্যবসায় ও কৃতিত্বের প্রভাবে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম্-এ পরীক্ষায় আমাদের দীনা উপেক্ষিতা বঙ্গভাষাকে গৌরবোজ্জ্বল রত্ন-সিংহাসনে উপবেশন করাইবার জন্য তাঁহার জীবনব্যাপী পরিশ্রমের ফল অদ্য লাভ করিয়াছেন। এ কথা বোধ হয় আপনাদের কাহারও অবিদিত নাই যে, সমুন্নত-হৃদয় ভারত-গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতম পরীক্ষায় বাঙ্গলা-ভাষার প্রবেশ-বিষয়ে অনুমতি প্রদান করিয়া আজ বাঙ্গালী-জাতির প্রকৃত অভ্যুদয়ের পথ খুলিয়া দিয়াছেন। এ জন্য ভারত-গবর্ণমেণ্ট আজ প্রত্যেক বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন। আর যে নিঃস্বার্থ, দেশহিতব্রত মহাপুরুষের কঠোর তপস্যায় এই অঘটন সংঘটিত হইয়াছে, সেই স্বনামধন্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহাশয়কে আমরা যে কি বলিয়া আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিব, তাহার ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না। তিনি নিরাময়, নিরাপদ ও সুদীর্ঘজীবী হইয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত বঙ্গ-ভারতী-মাতার, তাঁহারই মনের মত ষট্‌ত্রিংশ-উপচার দ্বারা পূজা করিয়া, বাঙ্গালীর অভ্যুদয়ময়, নব জাতীয় জীবনের সুপ্রতিষ্ঠা সম্পাদন করিতে সমর্থ হউন—ইহাই ভগবৎ-পাদপদ্মে আজ সমগ্র বাঙ্গালী-জাতির আন্তরিক প্রার্থনা।

রঘুনাথ শিরোমণি যে জাতির তর্কশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন,—শ্রীগৌরাঙ্গদেব যে জাতির অন্তর্নিহিত প্রেমনির্ঝরকে বিশ্ববিপ্লাবী বন্যায় পরিণত করিয়া সমগ্র মানবজাতির উদ্ধারের পথ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন,—যে জাতির মধ্যে প্রথমে রাজা রামমোহন রায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমন্বয়ের দিক্ উদ্‌ভাবন করিয়া দিয়াছেন,—বাঙ্গালার কালিদাস অমর কবিসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র যে জাতির জীবনাদর্শের উদ্‌ভাবয়িতা,—মধুময় মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র যে জাতির নবজীবনের উদ্‌বোধয়িতা,—আচার্য্য স্যার জগদীশচন্দ্র ও স্যার প্রফুল্লচন্দ্র যে জাতির জড়বিজ্ঞান-মন্ত্রের দ্রষ্টা, মহর্ষি,—বিশ্বমানবের উপাসনার গায়ত্রীস্রষ্টা বিশ্বকবি কবীন্দ্র স্যার রবীন্দ্রনাথ যে জাতির সৌন্দর্য্যের ও মাধুর্য্যের আদর্শ-রচয়িতা,—সে জাতির সাহিত্য যে জগতের সম্মিলিত সাহিত্য-রত্নভাণ্ডারে অসাধারণ ও অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বিকীরণ করিবে, তাহা অবিসম্বাদিত ও অভ্রান্ত সত্য।

সেই বিশ্ব-বিমোহন সাহিত্য-সৃষ্টির উপকরণেরও অভাব নাই। সমগ্র মানবজাতির মধ্যে স্বাধীনতা-মন্ত্রের অদ্বিতীয় সাধক বিশ্ববিজয়ী ইংরেজজাতির বিরাট সাহিত্য-রত্নভাণ্ডারের দ্বার সৌভাগ্যবশতঃ আমাদের প্রবেশের জন্য উন্মুক্ত হইয়াছে। ভারতেশ্বর, পুণ্যশ্লোক, ভারতের ভাগ্যবিধাতা, প্রজাবৎসল, রাজরাজেশ্বর পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয়ের মুখকমল-বিনিঃসৃত আশ্বাস ও আশার ঘোষণাবাণী এখনও প্রত্যেক স্বদেশ-প্রেমিক ভারতবাসীর হৃদয়-তন্ত্রীতে প্রতিধ্বনিত হইয়া, ধমনীতে-ধমনীতে চিরবিলুপ্ত উৎসাহ-শক্তিকে নূতনভাবে জাগাইয়া দিতেছে। এই শুভ অবসরে প্রতীচ্য সাহিত্য-ভাণ্ডারে প্রবেশ করিয়া, আমরা যদি শিল্প, বিজ্ঞান, কৃষি, বাণিজ্য ও নীতিরূপ রত্নরাজির সংগ্রহ করিয়া আমাদের জাতীয় সাহিত্যের অত্যন্ত অপেক্ষিত পুষ্টিসাধন না করিতে পারি, তাহা হইলে, আমাদের অকর্ম্মণ্যতা ও নির্ব্বুদ্ধিতার কলঙ্কে বঙ্গমাতার মুখ কালিমাবৃত হইবে, ইহা কে অস্বীকার করিবে? অপরদিকে ভারতের আধ্যাত্মিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অক্ষয় ভাণ্ডার সংস্কৃত সাহিত্যও এখনও,—আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তির উপকরণ কি, তাহা অসন্দিগ্ধভাবে নির্দ্দেশ করিতেছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সাহিত্যরূপ গঙ্গা ও যমুনার এই মধুর সম্মিলনে সমুদ্ভূত এই নবীন তীর্থে অবগাহনের ফলে যে চতুর্ব্বর্গ লাভ অবশ্যম্ভাবী, আমি জিজ্ঞাসা করি, আর কতদিন আমরা তাহা হইতে বঞ্চিত থাকিব? এই অপূর্ব্ব শ্রেয়স্কর মিলনে যে বিশুদ্ধ সাহিত্য উদ্‌ভূত হইয়া সমগ্র মানবজাতির ঐহিক ও পারত্রিক সুখ ও শান্তির বিজয়-স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিবে, সেই সাহিত্য-সৃষ্টির ভার আজ সমবেত বঙ্গভাষার লেখকগণের উপর বিধাতার করুণায় অর্পিত হইয়াছে। যাঁহাদের উপর এই ভার অর্পিত, তাঁহাদের মধ্যে এ সময় পরস্পর ঈর্ষ্যা, বিদ্বেষমূলক কলহ ও তুচ্ছ স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্রতা যাহাতে ক্ষণকালের জন্যও স্থান প্রাপ্ত না হয়, সে বিষয়ে প্রত্যেক সাহিত্যিকের আত্যন্তিক সাবধানতা যে বর্ত্তমান সময়ে একান্ত অপেক্ষণীয়, এবং কিছুতেই উপেক্ষণীয় নহে, তাহাই আমি বিনীত ভাবে আপনাদের সমক্ষে নিবেদন করিতেছি।

বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতির প্রধান উপায় যে বৈদিক সাহিত্যের সম্যগনুশীলন, তাহা এখনও আমাদের মধ্যে অনেকের চিন্তাপথে উদিত হইতেছে না, ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়। বাঙ্গালী জাতির নবজীবন-প্রতিষ্ঠার এই পুণ্য মুহূর্ত্তে আর্য্য সভ্যতার প্রকৃত উপকরণ কি, তাহা বিশেষ ভাবে জানিতে হইবে। সেই বৈদিক সাহিত্যের মধ্যেই আর্য্য সভ্যতার প্রকৃত ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই ইতিহাস যতদিন পর্য্যন্ত আমরা ভাল করিয়া অনুশীলন না করিব, ততদিন সাহিত্যের সাহায্যে আমাদের জাতীয় নবজীবন প্রতিষ্ঠার সৌকর্য্য সাধিত হইতে পারিবে না। এই ধ্রুব সত্যের প্রতি উপেক্ষা করা শিক্ষিত বঙ্গসন্তানের পক্ষে আর কিছুতেই শোভা পাইতেছে না।

যে প্রাচীনতম বৈদিক সাহিত্য আমাদিগকে, শুধু আমাদিগকে কেন, জগতের সমগ্র সভ্য মানবজাতিকে "একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি" এই মহাবাক্যে, বৈষম্যময়ী প্রপঞ্চ-সৃষ্টির মূলে সাম্যের বিরাট ও সর্ব্বানুস্যূত সত্তার প্রশান্ত মহিমা সর্ব্বপ্রথমে জলদগম্ভীরস্বরে উদ্‌ঘোষিত করিয়াছে, যে সাহিত্য অমর ভাষায় দ্বন্দ্বনিবহের ঘাত-প্রতিঘাত-জনিত বৈষম্যের তাড়নায় বিড়ম্বিত ত্রিতাপক্লিষ্ট মানবের উত্তপ্ত কর্ণকুহরে আনন্দের অমৃত-ধারা বর্ষণ করিতে করিতে সকলের পূর্ব্বে গাহিয়াছে—"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দেন প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি" অর্থাৎ আনন্দ হইতেই এই জীবনিবহ উৎপন্ন, ইহারা আনন্দেই প্রতিষ্ঠিত এবং

প্রলয়কালেও ইহারা সেই প্রকাশময় আনন্দেই বিলীন হইবে";—যে সাহিত্য দেহাত্মাভিমানের বিষে জর্জ্জরিত, বিষয়াসক্তির প্রচণ্ড কষাঘাতে বিমুহ্যমান অশান্ত মানবজাতিকে সনাতন শান্তির সিংহাসন কোথায় প্রতিষ্ঠিত, তাহাই দেখাইবার জন্য নির্ভীকভাবে ঘোষণা করিয়াছে—"ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ন ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ" অর্থাৎ আসক্তিমূলক কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠানে স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রজাসৃষ্টির দ্বারা অপরিমিত বলসংগ্রহে বা অবিশ্রান্ত ধনসঞ্চয়ে মানব মরণের ভীতি হইতে নির্মুক্ত হইতে পারে না, ত্যাগই মরণের ভয় হইতে বিমুক্তির একমাত্র উপায়—জগতের সেই প্রধানতম সাহিত্যের সুশীতল ছায়ার আশ্রয় ব্যতিরেকে শান্তিপ্রয়াসী বিশ্ব-মানবের জাতীয় জীবন-গঠন-কার্য্য যে কখনই সুসম্পাদিত হইতে পারে না—এই অবিসম্বাদিত অভ্রান্ত সত্যের নির্ম্মল স্বরূপই বাঙ্গালা সাহিত্যের মুকুরে বিশদভাবে যাহাতে প্রতিবিম্বিত হইয়া, প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীর কি ব্যক্তিগত, কি সমষ্টিগত জীবনে সমুজ্জ্বল স্থির ধ্রুবতারার ন্যায় চিরদিনের জন্য গন্তব্য পথ নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হয়—এ বিষয়ে বোধ করি কোন শিক্ষিত বাঙ্গালীরই মতদ্বৈধ হইতে পারে না। কিন্তু, বড়ই দুঃখের বিষয় বেদের সেই অমূল্য গ্রন্থগুলি এখনও বাঙ্গালীর নিকট সাধারণতঃ একপ্রকার অপরিচিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বহুদিন পূর্ব্বে স্বর্গত স্মরণীয়-চরিত ৺রমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয় ঋগ্‌বেদ-সংহিতার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যের এই বিষয়ে অগ্রসর হইবার পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। এইজন্য বাঙ্গালী চিরদিন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিবে। কিন্তু, তাঁহার প্রকাশিত অনুবাদ নিতান্ত সংক্ষিপ্ত এবং অধিকাংশ স্থলে পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের মতানুসারে করা হইয়াছিল বলিয়া, আস্তিক হিন্দু সমাজে ঐ অনুবাদ তেমন আদরের সহিত গৃহীত হয় নাই।

ভারতীয় জ্ঞান ও সভ্যতার স্তম্ভস্বরূপ বেদব্যাখ্যাতা ব্যাস ও জৈমিনি প্রভৃতি মহর্ষিগণের অঙ্গীকৃত মীমাংসা-দর্শনের সাহায্যে বৈদিক সাহিত্যের বিষদ ব্যাখ্যা বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হওয়া বর্ত্তমান সময়ে নিতান্ত প্রয়োজনীয় মনে হয়।' একখানি বৈদিক গ্রন্থের সেই ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিবার জন্য এ পর্য্যন্ত কোন বৈধ চেষ্টা হইয়াছে—এরূপ আমার মনে হয় না। ঋগ্‌বেদ-সংহিতার ঐরূপ অনুবাদ যত শীঘ্র সম্ভব প্রকাশিত হওয়া যে একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, আমার আশা হয়, সে বিষয়ে কোন শিক্ষিত বাঙ্গালীই মতদ্বৈধ করিবেন না। তাহার পর তৈত্তিরীয়-সংহিতা, তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণ, বাজসনেয়-সংহিতা, শতপথ-ব্রাহ্মণ, ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ প্রভৃতি শ্রুতিগুলিরও বিশদ ব্যাখ্যাসমন্বিত অনুবাদ এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত হইল না, ইহা আক্ষেপের বিষয়। এই প্রসঙ্গে অথর্ব্ববেদের সম্বন্ধে দুই-একটী কথা বলিবার আছে। ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতার সর্ব্বাঙ্গীণ পুষ্টির পরিচয় যেমন অথর্ব্ববেদে পাওয়া যায়, সেরূপ অন্যত্র পাওয়া যায় না। প্রাচীনতম ভারতের কৃষি, বাণিজ্য, সমুদ্রযানবিধি, রাজনীতি, শিল্প, দর্শন ও অধ্যাত্মবিদ্যার প্রভৃত জ্ঞাতব্য তত্ত্ব এই অথর্ব্ববেদের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। ঐ সকল রত্নরাজির উদ্ধার সাধন করিয়া যোগ্য সাহিত্যিক-শিল্পী কত জ্যোতির্ম্ময় রত্নহার গড়িয়া মাতৃভাষারূপ জননীর কমনীয় কণ্ঠে অর্পণ-পূর্ব্বক জন্ম সার্থক করিতে পারেন। উৎসাহের অভাবে এই পথে কোন কৃতি সাহিত্যিক এখনও অগ্রসর হইতেছেন না—ইহাও কম দুঃখের বিষয় নহে।

বৈদিক সাহিত্য-প্রসঙ্গে এতক্ষণ ধরিয়া কেবল দুঃখেরই বিষয় আপনাদের সমক্ষে নিবেদন করিয়াছি। কিন্তু এই সম্বন্ধে সুখের এবং আশার সমাচার এই যে, বৈদিক সাহিত্যের চিরসমুজ্জ্বল রত্নমুকুট স্বরূপ উপনিষদ্ গ্রন্থগুলির প্রতি বঙ্গীয় পাঠকগণের শ্রদ্ধা পড়িবার উপযুক্ত সময় আমাদের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। শাঙ্কর ভাষ্যের সহিত ঈশ, কেন, কঠ ও মুণ্ডক প্রভৃতি প্রসিদ্ধ উপনিষদের বিশদ তাৎপর্য্য-সমন্বিত সরল অনুবাদ প্রকাশিত হইয়া বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছে, ভামতী, রত্নপ্রভা প্রভৃতি টীকাসম্বলিত শাঙ্করভাষ্যসমেত ব্রহ্মসূত্রের বিশদ ও বিস্তৃত তাৎপর্য্য-সমন্বিত মূলানুযায়ী সরল বঙ্গানুবাদের প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে। অদ্বৈতসিদ্ধি, খণ্ডনখণ্ডখাদ্য, চিৎসুখী ও সিদ্ধান্তলেশ প্রভৃতি গ্রন্থেরও বিশদ অনুবাদ আরম্ভ হইয়াছে। এই প্রকার তাৎপর্য্য ও বিবরণসম্বলিত সরল অনুবাদের দ্বারা আমাদের দেশে মহর্ষিগণের হৃদয়ের

ধন ব্রহ্মাত্মবিদ্যার প্রভৃত প্রচারের পক্ষে যুগান্তর সাধিত হইতেছে।

এই ব্রহ্মাত্মবিদ্যা বা অদ্বৈতবিজ্ঞানই ভারতীয় সভ্যতার মূলভিত্তি। ইহা ত্যাগ ও সংযমের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় সভ্যতাকে প্রকৃত উদ্দেশ্যের দিকে পরিচালিত করিতে হইলে, ত্যাগ ও সংযমের মহামন্ত্রের সাধনা করিতে হইবে—ইহা যেন সর্ব্বদা আমাদের মনে থাকে। ত্যাগ ও সংযম বিরহিত সভ্যতা জড়বিজ্ঞানের প্রভাবে তীব্র গতিতে অগ্রসর হইলেও, মানব-জাতির অভীপ্সিত শান্তিরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হয় না—এই অনুপেক্ষণীয় অত্যুদার সত্যসিদ্ধান্তের প্রতি আর অবহেলা করা কিছুতেই সঙ্গত নহে। তাহা বুঝাইবার জন্য অন্য প্রমাণ, যুক্তি বা তর্কের অবতারণা অপেক্ষিত নহে। গত বর্ষচতুষ্টয়ব্যাপী য়ুরোপীয় মহাসমরই তাহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ। সমগ্র মানবজাতির অন্তরের অন্তস্তল হইতে সমুদ্ভূত, সমগ্র মানব-জাতির মধ্যে চিরস্থায়িনী শান্তির প্রতিষ্ঠার বিরাট আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি আজ পৃথিবীর চারিদিকেই শ্রুত হইতেছে। এই শুভ শান্তি-প্রতিষ্ঠার মঙ্গল-মুহূর্ত্তে আমাদের মাতৃভাষার সুপ্রশস্ত উর্ব্বর ক্ষেত্রে, বেদান্তের অদ্বৈতবাদরূপ কল্পতরুর মূলে জাতীয় চিন্তার অমৃতপ্রবাহ সেচন অপেক্ষা সাহিত্যিকের পক্ষে গুরুতর আবশ্যকীয় অন্য কোন কার্য্য নাই, ইহা কে অস্বীকার করিবে?

সুধী মহোদয়গণ! আমার অদ্যকার বক্তব্য আর বেশী কিছুই নাই। মেদিনীপুরের কথা মনে হইলে আমার সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে, সেই বাঙ্গালার চিরগৌরবের, চির-আদরের বৈষ্ণব-সাহিত্যের কথা। কেন যে তাহা মনে পড়ে, তাহাই বলিতেছি—

মেদিনীপুরেরর সহিত বঙ্গের বৈষ্ণব-সাহিত্যের একটু বিশেষ সম্বন্ধ আছে। প্রেম-ধর্ম্মের অবতার শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অন্তর্দ্ধানের পর বৃন্দাবনে গোস্বামিগণ-বিরচিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-মতের গ্রন্থগুলিকে বঙ্গে আনয়ন করিবার সময়, এই মেদিনীপুর অঞ্চলের নিবিড় অরণ্যে সেই গ্রন্থগুলি অপহৃত হয়। এই মেদিনীপুরেরই সুপ্রসিদ্ধ বিষ্ণুপুর রাজধানীর পরাক্রান্ত স্বাধীন বীরহাম্বির নরপতির সাহায্যেই আবার তাহা বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীনিবাস প্রভুর হস্তে ভক্তিভরে প্রত্যর্পিত হয়। শুধু তাহাই নহে, বীরহাম্বির, আচার্য্য শ্রীনিবাসের নিকট বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরে তাঁহারই দ্বারা সেই সকল অমূল্য বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রচার-কার্য্য বিশেষ উৎসাহের সহিত প্রথমেই আরব্ধ হইয়াছিল। সুতরাং বঙ্গসাহিত্যের প্রধান অঙ্গ বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রচার-কার্য্যে মেদিনীপুর ইতিহাসে বিশেষভাবে গৌরবিত। এই কারণে, মেদিনীপুরের এই স্মরণীয় সাহিত্য-সম্মিলনে সেই বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা আমার কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। এই বৈষ্ণব-সাহিত্যগুলির মধ্যেই চারিশত বৎসরের পূর্ব্বকালীন বাঙ্গালীর যথার্থ জাতীয় ইতিহাস অতি পরিস্ফুটভাবে নিহিত আছে। চারিশত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালীর ধর্ম্মজীবন, বাঙ্গালীর দৈনন্দিন গার্হস্থ্য চিত্র, বাঙ্গালী সমাজের নৈতিক চরিত্র ও বাঙ্গালীর অত্যুদার বিশ্বজনীন প্রেম-প্রবণতার প্রকৃষ্ট ও যথার্থ পরিচয় পাইতে হইলে, এই বৈষ্ণব-সাহিত্যের পর্য্যালোচনা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু যে ভাবে সেই পর্য্যালোচনা হওয়া উচিত, তাহা এখনও হইতেছে না। এখনও বৈষ্ণব সাহিত্যের গ্রন্থগুলির অধিকাংশই বিশুদ্ধভাবে অমুদ্রিত রহিয়াছে। বিশুদ্ধভাবে উহাদের মুদ্রণ ও প্রকাশের অভাবে সাধারণের নিকট ঐ সকল ঐতিহাসিক তত্ত্বরূপ অমূল্য রত্নরাজি, অপেক্ষিত জ্ঞানজ্যোৎস্না-বিতরণে সমর্থ হইতেছে না—ইহার জন্য সাধারণের পক্ষ হইতে বিশিষ্ট চেষ্টা ও আয়োজন আবশ্যক। আশা করি, মেদিনীপুরের এই পবিত্র সাহিত্য-সম্মিলনে সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ, এই বিষয়ে সময়োপযোগী কি প্রকার আয়োজন হওয়া উচিত, তাহার নির্দ্ধারণ করিতে সচেষ্ট হইবেন।

পরিশেষে, আমার প্রতি এই সম্মান ও আদর প্রদর্শনের জন্য আবার আপনাদের নিকট আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। সত্বরতার সহিত লিখিত অভিভাষণে অনেক ত্রুটি ও ভ্রান্তি প্রকাশ পাইয়াছে; নিবেদন এই যে, আপনারা নিজগুণে তাহার মার্জ্জনা করিবেন। বলা বাহুল্য, ইহার মধ্যে কোন একটী বিষয়ও যদি আপনাদের অনুমোদিত বলিয়া গৃহীত হয়, তাহা হইলে আমি আমার শ্রম সার্থক বলিয়া বোধ করিব।

পাখী-পোষা

(৩)

(যৌননির্ব্বাচন ও পরভৃৎ-রহস্য)

[শ্রীসত্যচরণ লাহা এম্-এ, বি-এল্]

(মেম্বর, ন্যাচারেল্ হিষ্ট্রী সোসাইটি—বোম্বাই)

অনেক যত্ন করিয়া পাখীর ঘরকন্না সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু তাহাদের মিলনের কথা আলোচনা করিতে বসিলে যে সকল সমস্যা আসিয়া পড়ে তাহাদিগের সমাধান কেহই সম্যকরূপে এখনও পর্য্যন্ত করিতে পারেন নাই। এই মিলনকালকে যদি তিন ভাগে বিভক্ত করা যায় তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, প্রথম অঙ্কে—প্রাঙ্-মিথুন-লীলায় (period of courtship)—পক্ষিণীর মনোরঞ্জন করিবার জন্য পুংপক্ষিগণের কত ভাবভঙ্গী, কত বিচিত্রবর্ণচ্ছটা প্রচার, কত রেষারেষি দ্বেষাদ্বেষি, কত সঙ্গীতোচ্ছ্বাস পক্ষিগৃহমধ্যে মর্ম্মরিত, হিল্লোলিত, তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে। বিস্মিত ও পুলকিত পালক অনেক সময়ে বুঝিয়া উঠিতে পারেন্ না যে, পক্ষিণী কিসে মুগ্ধ হয়?—পৌরুষে, না সৌন্দর্য্যে? প্রকৃতির অনুকরণে নির্ম্মিত ও সজ্জিত নিকুঞ্জে মানুষ দেখিতেছেন যে—নেয়ম্ পক্ষিণী বলহীনের লভ্যা, এই পক্ষিণীটিকে বলহীন পক্ষী লাভ করিতে সমর্থ হয় না। আবার তিনি দেখিতে পান যে, পাখীর বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় মুগ্ধ হইয়া পক্ষিণী পুংপক্ষীর নিকট আত্মসমর্পণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে। রূপের মোহ পিঞ্জরাবদ্ধ পাক্ষিণীকে কত চঞ্চল করিয়া তুলে তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য পাশ্চাত্য কোনও কোনও বিহঙ্গতত্ত্ববিৎ একপ্রকার বৃহৎ খাঁচার মধ্যে পাশাপাশি তিনটি কামরার দুইটীতে এক একটি করিয়া পুংপক্ষী এবং অবশিষ্ট কামরায় সেই জাতীয় একটি পক্ষিণীকে রাখিয়া উহাকে স্বয়ম্বরা হইবার সুযোগ দিয়া এই সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহারা খাঁচাটি এরূপভাবে বিভক্ত করিলেন যে, অভ্যন্তরস্থ দুইটী প্রাচীর ছাদ পর্য্যন্ত না পঁহুছাইয়া মধ্যপথে শেষ হইয়া গেল। ছাদের নিয়ে সমস্ত খাঁচাটার মধ্যে একটা পাখীর চলাফেরার সুবিধামত অবারিত মুক্ত পথ থাকিয়া গেল। দুই পার্শ্বের কামরা দুটীতে একজাতীয় দুইটী পুংপক্ষীকে রাখা হইল। যাহাতে তাহারা সমস্ত খাঁচার মধ্যে ইচ্ছামত উড়িতে না পারে, এবং তাহাদের কামরার প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া কোটর হইতে কোটরান্তরে যাতায়াত করিতে না পারে, সেইজন্য তাহাদিগের পক্ষচ্ছেদন করা হয়;—এক পার্শ্বের ডানার কতকগুলি পতত্র ছেদন করিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। সাধারণতঃ মাঝের কামরায় স্বচ্ছন্দ বিচরণশীল পক্ষিণী রক্ষিত হয়। এস্থলে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, তিনটী পাখীই একজাতীয়। পুরুষ দুইটীর বর্ণের অল্পবিস্তর তারতম্য আছে। কিয়ৎকাল অবস্থানের পর প্রায়ই দেখা যায় যে, পাক্ষিণী নিজের কামরা পরিত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক রূপবান্ পক্ষীটীর সহিত মিলিত হইবার জন্য স্বেচ্ছায় তাহার কামরায় প্রবেশ করে। এক্ষেত্রে অবশ্যই পক্ষিণীকে পাইবার জন্য পুংপক্ষিদ্বয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও জয়-পরাজয়ের কোনও অবকাশ দেওয়া হয় নাই। এইরূপে একশ্রেণীর পক্ষিপালক ornithologyর দিক্ হইতে ডারউইনীয় নৈসর্গিক নির্ব্বাচন-তত্ত্বের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু এখনকার পক্ষিবিজ্ঞানে নিঃসংশয়রূপে কেহই জোর করিয়া বলিতে পারেন না যে, পুংপক্ষীর শারীরিক সৌন্দর্য্য ও যৌনানির্ব্বাচনের মধ্যে এতটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। পক্ষিণীর এমন সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যবোধ থাকিতে পারে কি না সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মতদ্বৈধ রহিয়াছে। (১) পক্ষিণীকে

১। "Many writers seem to find a difficulty in imagining that the female sex among birds is sufficiently endowed mentally to possess the requisite

পাইবার জন্ত পুংপক্ষিদ্বয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও জয়-পরাজয়ের অবকাশ দেওয়া হইলে সাধারণতঃ কি ফল পাওয়া যায় তাহা পূর্ব্ব প্রবন্ধে (২) কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। বিজেতার সহিত পক্ষিণী ঘরকন্না পাতিয়া বসে। সে যে বিজেতাকে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছে এমন কথা বলা যায় না। আশা করা যায় ভবিষ্যতে আরও অধিক পর্য্যবেক্ষণের ফলে এই biological বা জীবতত্ত্বসম্বন্ধীয় এবং psychological বা মনস্তত্ত্বসম্বন্ধীয় কূট সমস্যার সম্যক্ সমাধান হইবে।

প্রাঙ্ মিথুনলীলা সমাপ্ত হইতে না হইতেই পক্ষি-দম্পতীর বাসা-নির্ম্মাণের ধূম পড়িয়া যায়। পুংপক্ষী এত উদ্যম সহকারে এই কার্য্যে ব্রতী হয় যে, অনেক সময়ে খড়কুটা সংগ্রহের আতিশয্যে নীড়টী পক্ষিণীর মনোমত হয় না;—পক্ষিণী হয় নীড়টী নষ্ট করিয়া ফেলে, না হয় অপর নীড় নির্ম্মাণে ব্যাপৃত হয়। এমনও প্রায় দেখা যায় যে, নীড় রচনা অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু যে কোনও কারণে হউক উহা পক্ষিণীর ভাল লাগিতেছে না; উহাদিগের ব্যর্থ পরিশ্রমের নিদর্শনস্বরূপ অর্দ্ধরচিত নীড়টী অসম্পূর্ণ অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া বিহগমিথুন অপর স্থানে অন্য মাল-মসলার সাহায্যে আবার নূতন করিয়া বাসা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে। এই রহস্যময় ও কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার প্রায়ই আমাদের কৃত্রিম পক্ষিগৃহ মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়; বনে জঙ্গলেও এই প্রকার অসম্পূর্ণ পরিত্যক্ত নীড় ইতস্ততঃ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় পক্ষিপালক নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে না; পক্ষিপ্রকৃতির ভ্রমসংশোধনের ও ত্রুটিপরিমার্জ্জনের ভার কতকটা তাঁহাকে লইতে হইবে। কৃত্রিম গৃহমধ্যে খড়কুটা যোগাইয়া দিয়া, বাসা-নির্ম্মাণের উপযোগী আধার যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া, এমন কি সময়ে সময়ে পক্ষিদম্পতীর কুলায় নির্ম্মাণের অপটুত্বের সংশোধন করিয়া দিয়া অর্থাৎ অনভিজ্ঞ পক্ষিযুগলের বাসা-রচনার ত্রুটি মার্জ্জিত করিয়া তাঁহাকে সদাই সচেষ্ট থাকিতে হইবে, যেন অত্যাবশ্যক উপকরণগুলির অভাবে অথবা পক্ষিদ্বয়ের নির্বুদ্ধিতাবশতঃ উপকরণ দ্রব্যাদির অযথা-বিন্যাসে ভবিষ্যতে নীড় মধ্যে ডিম্ব সংরক্ষণের ব্যাঘাতের আশঙ্কা না থাকে, পক্ষিগৃহে রোপিত বৃক্ষগুলির শাখান্তরালে পাখীরা বাসা প্রস্তুত করিবার উপযুক্ত স্থান পায়। যে সকল পক্ষী গর্ত্ত মধ্যে অণ্ড প্রসব করে, তাহাদিগের নিমিত্ত তরুকোটরই উপযুক্ত স্থান; ইহার অভাবে প্রাচীরগাত্রে গর্ত্ত করিয়া দিতে হইবে অথবা গর্ত্তের অনুরূপ কাঠের বা নারিকেলের মালার আধার প্রাচীরগাত্রে সংলগ্ন রাখা আবশ্যক। শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত মেজের একপার্শ্বে কৃত্রিম ঝোপের মধ্যে ভূমিতে বিচরণশীল পাখীরা বাসা-নির্ম্মাণে তৎপর হইবে।

এইরূপে বিভিন্ন প্রকৃতির পাখী ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কুলায় নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিল; ক্রমশঃ তাহাদের নীড়-রচনা প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিল; আমি পূর্ব্বে পক্ষিজীবনের নীড় রচনারূপ যে দ্বিতীয় পর্ব্বের উল্লেখ করিয়াছিলাম সেই পর্ব্ব প্রায় সমাপ্ত হইয়া আসিল; এখন বিহগমিথুনলীলার তৃতীয় পর্ব্বে আমরা উপনীত হইলাম। পক্ষিজীবনের এই পর্ব্বটি অত্যন্ত বিচিত্র ও রহস্যময়। যথেষ্ট শ্রমস্বীকার করিয়া এতদিন পরে তাহাদের নীড়রচনা কার্য্য শেষ হইল বটে, কিন্তু এখনও তাহাদের পরিশ্রমের লাঘব হইতেছে মনে করিলে চলিবে না। যথাকালে ডিম্বগুলি প্রসব করিয়াও পক্ষিণী নিষ্কৃতি লাভ করে না; প্রসবের পর হইতেই একাগ্রমনে দিবারাত্র সেই ডিম্বগুলির উপর তাহাকে সন্তর্পণে বসিয়া থাকিতে হইবে। যতদিন না ডিম ফুটিয়া শাবক বাহির হয়, ততদিন সে কোনও দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া আপন মনে তা দিতে থাকিবে। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ অতিবাহিত হইয়া যায়, তথাপি সে অবিচলিত চিত্তে তাহার ব্রত উদ্‌যাপন না হওয়া পর্য্যন্ত একভাবে বসিয়া থাকে। এ ত মর্ম্ম রহস্য নয়। যে পক্ষিণী চিরদিন অত্যন্ত চঞ্চল-প্রকৃতি বলিয়া আমাদের

æsthetic sense, and, indeed, evidence that female birds do consistently prefer the more beautiful males, or even that they are pleased by the display of the latter, is not very abundant."

—Ornithological and other Oddities,
by F. Finn, p. 7.

"We are not justified in saying positively that the *raison d' etre* of these decorations is the attraction of a wife, though a *priori* reasoning certainly leads to this conclusion."—Ibid, p. 12.

২। ভারতবর্ষ, আশ্বিন ১৩২৫।

নিকট পরিচিত; সারাদিন পক্ষ-বিস্তার করিয়া আকাশ-মার্গে উড্ডীয়মান হইতে ভালবাসিত; আজ কোন্ মায়া-মন্ত্রবলে তাহার স্বভাবের এত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল? হঠাৎ সে কেমন করিয়া এমন স্থাণুত্ব প্রাপ্ত হইল। একেবারে নিশ্চল হইয়া এতক্ষণ একই ভাবে তাহার বাসাটির উপরে সে বসিয়া রহিল! হয় ত সে হিংস্রস্বভাব; অসহায় কীটপতঙ্গকে ও বিজাতীয় পক্ষিশাবককে সে চিরদিন নিজ ভক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করিয়া আপনার উদরপূর্ত্তি করিতে ভালবাসিত; আজ সে অত্যন্ত স্নেহপরবশ হইয়া তাহার গলাধঃকৃত আহার্য্য স্বেচ্ছায় উদ্গীরিত করিয়া শাবকের মুখে তুলিয়া দিতেছে। হয় ত সে ভীরুস্বভাবা; সাধারণতঃ আত্মরক্ষার জন্য সভয়ে মানুষের নিকট হইতে বহুদূরে বিচরণ করে; আজ সে একেবারে নির্ভীক। তাহার আচরণ দেখিয়া কিছুতেই মনে করা যায় না যে, সে স্বভাবতঃ মানবভয়-ভীতা; এখন মানুষ তাহার কাছে আসিতেছে; তাহার গায়ে হাত দিতেছে, হয় ত তাহাকে তাহার বাসা হইতে ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিতেছে (৩); কিন্তু কিছুতেই তাহাকে বিচলিত করিতে পারিতেছে না। পুংপক্ষী সাধ্যমত তাহাকে চঞ্চুপুটের সাহায্যে আহার যোগাইতেছে; সর্ব্বদাই গান গাহিয়া তাহার মনোরঞ্জন করিতে প্রয়াসী রহিয়াছে। উভয়ের এই যে সাধনা, ইহাতে বিশ্বপ্রকৃতির উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া থাকে বটে; কিন্তু ইহার পশ্চাতে যে নিগূঢ় শক্তি যবনিকার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া বিহগযুগলের দাম্পত্যলীলায় এইভাবে ক্রিয়া করিতে থাকে, তাহাকে Instinct বলিতে হয় বলুন;—হয় ত Instinct বলিয়া তাহার পরিচয় দিবার যথেষ্ট কারণ এক্ষেত্রে বিদ্যমান রহিয়াছে। বোধ হয় এই Instinct-তত্ত্ব কতকটা মানিয়া লইলে পক্ষিজীবনের এই ডিম্বঘটিত আর একটি কূট সমস্যার সমাধানের কিছু সুবিধা হইতে পারে;—সেই parasitism বা পরভৃৎ-রহস্যের কথা এইখানে স্বতঃই আসিয়া পড়িতেছে। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে আমি পাখীর এই তথাকথিত Instinct সম্বন্ধে পূর্ব্বে (৪) কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। নূতন করিয়া সে বিষয়ে এখন বিশেষ কিছু বলিবার পূর্ব্বে নূতন পরিবেষ্টনীর মধ্যে পক্ষিজীবনের এই অভিনব রহস্য সম্বন্ধে সাধারণতঃ যে সকল ঘটনা অবলম্বন করিয়া পক্ষিতত্ত্ববিদ্‌গণ কার্য্যকারণ নির্ণয়ে প্রায় একমত হইয়াছেন, সেইগুলির কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক।

আলোচনার বিষয় এই যে ডিম্ব প্রসবের পর পক্ষিণী বিচারশক্তিহীন কলের পুতুলের মত, ইচ্ছাশক্তিবিরহিত automatonএর মত কাজ করে কি না? এ সম্বন্ধে পক্ষিতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। তাঁহারা সকলেই হয় ত পাখীর instinct গোড়া হইতেই স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত আছেন; কিন্তু অবস্থা-বিশেষে পাখী যে কেবলমাত্র একটা যন্ত্র-বিশেষে পর্য্যবসিত হইয়া শুধু automatonএর মত ক্রিয়া করিয়া থাকে, ইহা ভারতীয় সিভিল সার্ব্বিসের স্বনামখ্যাত ডগ্‌লাস্ ডেওয়ার (Douglas Dewar) প্রমুখ বিহঙ্গতত্ত্বজ্ঞেরা জোর করিয়া প্রচার করিলেও, তাহার বিচারশক্তি অথবা Reasonএর একান্ত অভাব সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার প্রচুর কারণ বিদ্যমান আছে। সকলেই জানেন যে, কাকের বাসায় কোকিল ডিম রাখিয়া যায়; কোকিলের ডিমটি আয়তনে এত ছোট যে তাহা কখনই কাকের ডিম বলিয়া ভ্রম জন্মাইতে পারে না। উভয়ের বর্ণ-বৈষম্যও (৫) অত্যন্ত প্রকট। ভূমিতলে

৩। আমাদের পক্ষিগৃহ মধ্যে পাখীর ডিম লইয়া এই অবস্থায় অনেক প্রকার নাড়াচাড়া করা হইয়াছে। আমি নিজে লক্ষ্য করিয়াছি যে কেনেরি (Canary) পাখী যখন তাহার ডিমে তা দিতে থাকে, তখন তাহার গাত্র স্পর্শ করিলেও সে সঙ্কুচিত হয় না; এমন কি তাহাকে হাতে করিয়া ধরিয়া তুলিয়া লইবার উপক্রম করিলেও সে সেই ডিম্ব পরিত্যাগ করিয়া পলায়নের চেষ্টা করে না। এতদ্ব্যতীত তাহার আসল ডিম্বটী সরাইয়া লইবার জন্য তাহাকে উঠাইয়া একটা নকল ডিম্ব তথায় স্থাপিত করিয়া পাখীটাকে ছাড়িয়া দিয়া দেখিয়াছি যে সে সেই জাল ডিম্বটাকে সবলে আঁকড়াইয়া ধরিয়া তদুপরি উপবেশন করতঃ তা দিতে থাকে।

৪। ভারতবর্ষ, আশ্বিন ১৩২৫।

৫। কাক এবং কোকিল উভয়েরই ডিম্বে পিঙ্গলবর্ণের আভা বিদ্যমান থাকিলেও দেখিতে বায়সডিম্বটী ঈষৎ নীলবর্ণ এবং কোকিলের ডিম্ব সবুজ বর্ণ। কাকের ডিম অপেক্ষা কোকিলের ডিম আয়তনে যথেষ্ট ছোট। সাধারণতঃ উভয়ের ডিম্বে এই বর্ণবৈষম্য থাকিলেও প্রথম প্রথম পক্ষিতত্ত্বজ্ঞেরা একরূপ সাব্যস্ত করিয়াছিলেন যে, যে পক্ষীর কুলায়কে কোকিল আপনার ডিম্ব সংস্থাপনের উপযোগী মনে করে, সেই পক্ষীর ডিমের বর্ণের অনুরূপ ডিম প্রসবের ক্ষমতা তাহার

অণ্ড প্রসব করিয়া সেই সন্তঃপ্রসূত ক্ষুদ্র অণ্ডটিকে চঞ্চুপুটে (৬) ধারণ করতঃ পক্ষিণী বায়সকুলায় সমীপে উপস্থিত হয়; পুংপক্ষীটীও তাহার সহগামী হইয়া থাকে। উভয়েই জানে যে, কাকের বাসায় কোকিলের ডিম রাখা সম্বন্ধে বায়স-প্রবরের ঘোরতর আপত্তি আছে; কাক কখনও সজ্ঞানে কোকিলকে তাহার নীড়ের মধ্যে ডিম্বটিকে রাখিতে দিবে না। কোকিল তাহার বাসার সম্মুখে আসিয়াছে দেখিলেই সে তাড়া করিয়া যায়। মদ্দা কোকিল অগ্রসর হইয়া নীড়-রক্ষক বায়সের সম্মুখীন হয়; ক্রুদ্ধ কাক তাহার পশ্চাদ্ধাবন করে; এই অবসরে মাদী কোকিল সেই নীড়ের মধ্যে কাকের ডিমের পাশে নিজের ডিম্বটী সযত্নে রাখিয়া দিয়া চলিয়া যায়। খানিক পরে কাক ফিরিয়া আসিয়া নীড়স্থ সমস্ত ডিমগুলিতেই তা দিতে থাকে,—একটা ডিম্ব যে বাড়িয়া গেল এবং সেটা যে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয়, সে সম্বন্ধে তাহার মনে কোনও ধোঁকা লাগে না। প্রকৃতির লীলাকুঞ্জে এই যে পাখীর লুকোচুরি খেলা, বংশ-রক্ষার জন্য বৈরীর আলয়ে কোকিল-দম্পতীর কাককে ফাঁকি দিয়া এই যে ডিম্বটি রাখিয়া আসা, এই প্রকাণ্ড রহস্য-ময় ব্যাপারটি পর্য্যালোচনা করিলে কি কেবলমাত্র অন্ধ instinct-এর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ব্যতীত আর কিছুই আমরা উপলব্ধি করি না? শুধু অর্দ্ধসুপ্ত অর্দ্ধ-জাগ্রত অন্ধ instinct বহুযুগ ধরিয়া একটা বিহঙ্গ-জাতিকে রক্ষা করিয়া আসিতেছে? অনেক গবেষণার পর instinct-পক্ষপাতী ডেওয়ারকেও স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে যে, পাখীর এই সহজ-বুদ্ধিও সীমাবদ্ধ; তাহাকে অতিক্রম করিয়া তাহার বিচারশক্তি (intelligence) অনেক সময়ে কাজ করিয়া থাকে;—there is apparently a limit to the extent to which intelligence is subservient to blind instinct (৭)।

পরভৃৎ-রহস্যের প্রথম ঘটনার উল্লেখ করিয়াছি,—ফাঁকি দিয়া পরের বাসায়, শত্রুর বাসায় ডিমটিকে রাখিয়া আসা। মাঝে মাঝে কোকিল আসিয়া কাকের ডিম-গুলিকে নীড় হইতে ফেলিয়া দেয়, হয় ত সেইস্থানে আরও দুটো একটা নিজের ডিম রাখিয়া যায় (তাহার পূর্ব্ব রক্ষিত ডিমটিকে অবশ্যই সে স্থানচ্যুত করে না); অনেক সময়ে মানুষেও কাকের ও কোকিলের ডিম লইয়া অদল বদল করিয়া কাকের স্বভাব-বৈচিত্র্য পরীক্ষা করিয়া থাকে; এমন কি ডিম্বের পরিবর্ত্তে golf ball রাখিয়া আসে (৮); পাখী নির্ব্বিকার চিত্তে কোনও সন্দেহ না করিয়া সেই কন্দুকের উপর উপবেশন করিয়া তা দিতে থাকে। ডগ্‌লাস্ ডেওয়ার এই সমস্ত ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়া পাখীর বিচার-বিমূঢ়তা

আছে। এই ধারণা যে একেবারে ভ্রান্ত এবং সম্পূর্ণ অমূলক, তাহা আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিকগণ কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত হইয়াছে। কোকিল পাখী কাক অপেক্ষা অধিকতর ক্ষুদ্রাবয়ব পক্ষীর নীড়েও সুবিধামত ডিম রাখিয়া আসে; বর্ণ বা আকার-বৈষম্যে কিছু আসে যায় না, তাহা সে বেশ জানে।

৬। It is now proved up to the hilt that the female Cuckoo first lays her egg upon the ground, and carries it in her bill (not in her zygodactyle foot, as was for so long supposed) to the selected nest. * * * Cuckoos have been shot carrying their own eggs in their bills.

—W. Percival Westell's
The Young Ornithologist, p. 185.

৭। Birds of the Plains by Douglas Dewar, p. 116.

৮। ডিম্বপ্রসবের পরক্ষণ হইতে পাখী বিচারশক্তিহীন কলের পুতুলের ন্যায় কার্য্য করে, এই মতের পোষকতার প্রমাণস্বরূপ D. Dewar স্বেচ্ছায় কাকের সহিত কোকিলের খেলা খেলিয়াছিলেন। বিহঙ্গ জাতির মধ্যে কাক যে অত্যন্ত বুদ্ধিশালী, তাহা বৈজ্ঞানিকগণ সাব্যস্ত করিয়াছেন। এই তীক্ষ্ণবুদ্ধি কাকের বুদ্ধির দৌড় কতদূর, তাহা পরখ করিবার নিমিত্ত কাকের বাসায় ডিম্বসদৃশ নানা দ্রব্য স্থাপন করিয়া, তাহার পরীক্ষার ফল এইরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, "In all I have placed six Koel's eggs in four different crow's nests and............in no single instance did the trick appear to be detected." আর একটী কঠিন পরীক্ষার ফল তিনি এইরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একটী বৃহৎ মুরগীর ডিম্ব তিনি বায়সনীড়ে সংস্থাপন করিলেন। বায়সকে সর্ব্বসমেত এই বৃহৎ ডিম্বটী লইয়া ছয়টী ডিম্বের উপর তা দিতে হইয়াছিল। নিরুদ্বিগ্নচিত্তে বায়সপত্নী তা দিতে লাগিল। বৃহৎ ডিম্ব হইতে যখন বাচ্ছাটী বাহির হইল, তখন বায়সদম্পতীর ক্রোধের সীমা রহিল না। Dewar লিখিতেছেন, "With angry squawks, the scandalised birds attacked the unfortunate chick, and so viciously did they peck at it that it was in a dying state by the time my climber reached the nest." অতঃপর তিনি একটী

সম্বন্ধে স্থির-নিশ্চয় করিয়া বসিয়া আছেন বটে ; কিন্তু তিনি ইহাও লক্ষ্য করিয়াছেন, যে পাখীকে যতটা মূঢ় বলিয়া মনে হয়, ঠিক সে ততটা নহে ;—অনেক সময়ে সে জুয়াচুরি ধরিয়া ফেলে ; জাল-ডিম্বের উপর হয় বসিতে রাজি হয় না, নয় ত ডিম ফুটাইয়া বিজাতীয় পক্ষিশাবককে সংহার করিয়া ফেলে। এই সমস্ত রহস্যময় ঘটনার সমাবেশ দেখিয়া ঠিক করিয়া বলা কঠিন যে পাখীর সহজ-বুদ্ধির দৌড় কতদূর ; আর কোথায় এবং কখন তাহার বিচারশক্তি জাগ্রতভাবে ক্রিয়া করিতে আরম্ভ করিল।

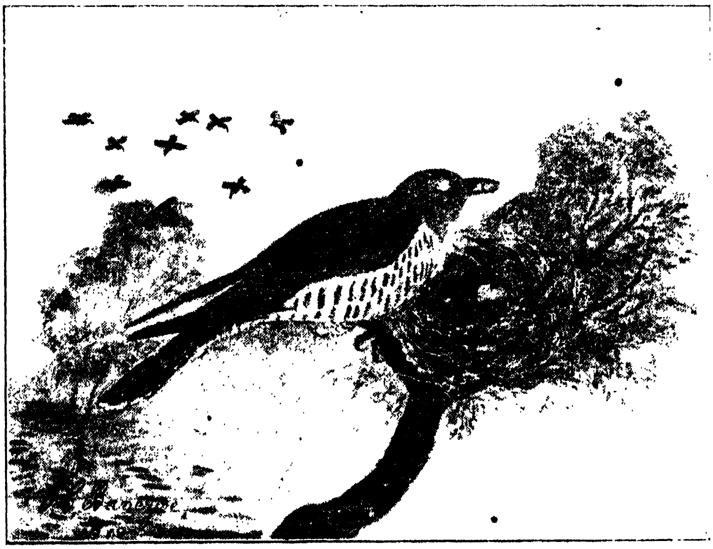

ফাঁকি দিয়া পরের বাসায়—শত্রুর বাসায়—ডিমটিকে রাখিয়া আসা

কোন্ দূর অতীতে কোন্ এক অখ্যাত দিবসে বিহঙ্গ-জীবনে এই পরভৃৎ-রহস্যের প্রথম সূচনা হইয়াছিল, প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চে সেই বিচিত্র রহস্য-যবনিকা আজ পর্য্যন্ত উত্তোলিত হয় নাই। একটা পাখীকে বাঁচাইবার জন্য লীলাময়ী প্রকৃতি কেন এই খেলা খেলিলেন, এবং কবে ইহার আরম্ভ, ইহার তত্ত্ব এখনও নিহিতং গুহায়াং। নিশ্চয়ই বহু যুগ ধরিয়া বংশ-পরম্পরায় কোকিল এইরূপে আপনাকে বাঁচাইয়া আসিতেছে ; এই অভ্যাসটা যে ইহাদের মজ্জাগত, ইহা স্বীকার করিয়া লইয়াও ঠিক করিয়া বলা কঠিন, কি অবস্থায় এই অভ্যাসের সূত্রপাত হইল। অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে যে, এক জোড়া পাখী তরুকোটরে অথবা বৃক্ষ-শাখার পত্রান্তরালে যথারীতি নীড় নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে সন্তর্পনে নিজেদের সদ্যঃপ্রসূত ডিম্বগুলি রক্ষণ করিতেছে এমন সময়ে আর এক জোড়া অপর জাতীয় অধিক বলশালী পাখী আপনাদিগের নীড়োপযোগী স্থানের অন্বেষণে তথায় উপস্থিত হইয়া নীড়স্থ বিহঙ্গযুগলকে তাড়াইয়া দিয়া সডিম্ব সেই নীড়টি অধিকার করিয়া বসে। আমার পক্ষী গৃহ মধ্যে পক্ষি জীবনের এই বিচিত্রলীলা অনেকবার দেখিয়াছি। এক জোড়া ফিঞ্চ (Ribbon Finch) একটা নারিকেল মালার মধ্যে বাসা তৈয়ার করিয়া ঘরকন্না করিতে লাগিল, যথা সময়ে স্ত্রী পক্ষীটি ডিম্ব প্রসবও করিল। এমন সময়ে সেই পক্ষিগৃহের অভ্যন্তরস্থ একত্র সংরক্ষিত নানা পক্ষীর মধ্যে এক জোড়া সাদা রামগোড়া (Java sparrow) সহসা সেই নারিকেল মালাটির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া ফিঞ্চ-মিথুনকে নীড়-চ্যুত করিল। সেই মালাটির মধ্যে এখন তাহারা গৃহস্থালী আরম্ভ করিয়া দিল। প্রত্যহই আমি তাহাদের জীবন-

golf-ball লইয়া অপর একটী নীড়ে স্থাপনপূর্ব্বক পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন যে বায়স-স্ত্রী তাহার অপর ডিম্বগুলির সহিত golf-ballটীও তা দিতে লাগিল। কিন্তু আর এক স্থলে তাহার উক্তরূপ ফন্দী পাখিটী ধুরিয়া ফেলিল এবং উহাতে তা দিতে রাজী হইল না।

—Playing Cuckoo by D. Dewar,

(Birds of the Plains, pp. 111—115).

এদেশে অমরত্ব লাভের পথে অগ্রসর হইতেছে। চিকিৎসা-শাস্ত্রে ম্যালেরিয়া, বিসূচিকা, বসন্ত, যক্ষ্মা ও উপদংশ—এই সকল ব্যাধিই অনায়াসে নিবার্য্য হইলেও, আমাদিগের দুরদৃষ্ট বশতঃ, উহাদিগকে নিবারণ করা অসম্ভব,—অন্ততঃ এইটুকু ধারণা আমাদিগকে বাধ্য হইয়া করিতেই হইতেছে। আজ ইতালীতে ম্যালেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হওয়া নির্ব্বোধের কায বলিয়া বিবেচিত; যেমন পেন্‌সিল কাটিতে-কাটিতে নিজ অঙ্গুলি কাটিয়া যাওয়া দুর্ঘটনা হইলেও অসাবধানতা-সূচক, তেমনি ইতালীতে যে কোম্পানীর অধীন শ্রমজীবীরা ম্যালেরিয়াগ্রস্ত হয়, আইনানুসারে সেই অসাবধান কোম্পানীকে অসাবধানতার দণ্ড স্বরূপ নিজ পয়সা ব্যয় করিয়া পীড়িত শ্রমজীবীদিগের চিকিৎসা ও খেসারতের জন্য বাধ্য করা হয়। এই ইতালীর ক্যাম্প্যানা নামক ভূখণ্ড অনেকাংশে বাঙ্গালাদেশের ন্যায়। সে দেশে ম্যালেরিয়া হওয়া লজ্জার কথা, আর আমাদের দেশে ম্যালেরিয়া হওয়া একটা অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার। জার্ম্মাণরাজ্যে গো-বীজের টীকা লওয়া বাধ্যতামূলক বলিয়া, পৃথিবীর মধ্যে জার্ম্মাণ রাজ্যই বসন্ত-ব্যাধি-বিমুক্ত। সমগ্র য়ুরোপময় যক্ষ্মা নিবারণের জন্য কি উদ্যমে কাজ চলিতেছে! এবং তাহার ফলে আজ যক্ষ্মা য়ুরোপ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত না হইলেও অনেকটা প্রশমিত হইয়াছে। ভোগভূমি য়ুরোপে উপদংশের বহুবিস্তৃতি সত্ত্বেও উহাকে আয়ত্তাধীন করিবার জন্য কত উপায়ই উদ্ভাবিত হইতেছে। আর, আজ উপন্যাস পাঠ শ্রবণের ন্যায়, আমরা, বঙ্গদেশের চিকিৎসককুল, তাহা শুনিয়া যাইতেছি মাত্র !!!

অসাধ্য-সাধন

আমরাও চিকিৎসক, অপর দেশের লোকেরাও চিকিৎসক; আমরাও মানুষ, তাহারাও মানুষ;—তবে কেন সুধু আমরাই রোগ ও জরা ভোগ করি? তাহার কারণ অনেকগুলি। সেগুলি প্রণিধান করিবার উপযুক্ত। (১) এ দেশের প্রাচীন ব্যবস্থা এই ছিল যে, চিকিৎসকগণ দাতব্য ভাবেই রোগীর চিকিৎসা করিতেন—ধনীরা এবং দেশের রাজাই চিকিৎসকের প্রতিপালনে অর্থব্যয় করিতেন। টোলের অধ্যাপকগণও অবৈতনিক-ভাবে শিক্ষাদান করিয়া যাইতেন;—এ কারণে, সমাজ নানারূপে অধ্যাপকগণকে বৃত্তি বা সম্মান দান করিয়া অর্থ যোগাইতেন। ফল কথা, চিকিৎসা-ব্যবসায় অর্থকরী-ব্যবসায় ছিল না, এবং চিকিৎসককুল আপামরসাধারণের উপকারে নিযুক্ত থাকিলেও, তাহাদিগের নিত্য-আলাপের বিষয় ছিলেন না। আমাদের বর্ত্তমান কালে, চিকিৎসা একটা ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে—আদান-প্রদানের গণ্ডীর মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে—কাযেই সাধারণের চক্ষে উহার মর্য্যাদার হানি ত হইয়াছেই, পরন্তু চিকিৎসককুলের শ্রীবৃদ্ধি আর এখন সাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ করে না। কাযেই, কতকটা ব্যবসায় বলিয়া, কতকটা চিকিৎসার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বশতঃও বটে,—সাধারণে উহার "ভালয়-মন্দে", সম্পদে-বিপদে সম্পৃক্ত হইতে চাহে না। সাধারণে উহার বৈচিত্র্যে মুগ্ধ না হইয়া, উহার বৈশিষ্ট্যে আকৃষ্ট না হইয়া, বরং ঐ দুই কারণেই চিকিৎসা-ব্যবসায়কে দূরে পরিহার করে এবং চিকিৎসকগণকে জীবনের নিত্য ঘটনার গণ্ডীর মধ্যে আনিতে চাহে না। চিকিৎসকের পক্ষেও ব্যবসা-হিসাবে ব্যারাম "আরোগ্য" করাটাই লাভজনক বলিয়া, তাঁহারা ব্যারাম-"নিবারণের" জন্য আদৌ ব্যস্ত হ'ন না। (২) ঈষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে যেমন কোম্পানীর নিশান তুলিয়া দিয়া যে-কোনও য়ুরোপীয় বিনা-শুল্কে লবণের বাণিজ্য করিতেন এবং তজ্জন্য এদেশবাসী ব্যবসায়ীরা প্রতিযোগিতায় ক্ষতিগ্রস্থ হইতেন, বর্ত্তমান কালে, বে-সরকারী-চিকিৎসা-ব্যবসায়ীরাও ঠিক অনুরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন। মোটা বেতন দিয়া সিভিলসার্জ্জন, ও ন্যূন বেতনে আসিষ্টাণ্ট-সার্জ্জন ও হস্পিটাল-অ্যাসিষ্টাণ্ট রাখিয়া এবং তাহাদিগকে অবাধ প্র্যাকটিশ করিবার সুযোগ দেওয়ায় বেসরকারী চিকিৎসকবৃন্দ প্রতিযোগিতায় অনেক স্থলে সফল হইতে পারেন না। কাযেই, যাহারা সরকারী কায করে, তাহাদের সময় ও সহানুভূতির অভাব বশতঃ, এবং, যাহারা বেসরকারী চিকিৎসক, তাহাদিগের নিত্য অর্থের অভাব বশতঃ, সাধারণের-উপকার হয়, এমন কার্য্যে উভয়ের কেহই মন দিতে পারেন না। কাযেই, বাধ্য হইয়া, স্বাস্থ্য-পরিদর্শক (হেল্‌থ্ অফিসার ও স্যানিটারী ইন্‌স্পেক্টর) নিযুক্ত করিয়া, অর্থব্যয়ে ও অনেক সময়ে অমানুষিক উপায়ে, স্বাস্থ্যানুকূলবিধি প্রবর্ত্তিত করিয়া লইতে হয়। যদি দেশের মধ্যে স্বচ্ছন্দভাবে চিকিৎসা-

প্রসাধন

শ্রীযুক্ত আদ্যকুমার চৌধুরির আলোক চিত্র হইতে] [শ্রীশিবকুমার চৌধুরির অনুগ্রহে

BLOCKS BY BHARATVARSA HALFTONE WORKS

The Emerald Printing Works
CALCUTTA

ব্যবসায় চালান সম্ভবপর হইত, যদি হাঁসপাতালগুলিতে স্থানীয় চিকিৎসকবৃন্দ মিলিয়া-মিশিয়া কায করিবার সুযোগ পাইতেন, তাহা হইলে, পল্লীগ্রামে চিকিৎসকগণের বাহুল্য ও তাঁহাদের বিত্তার ও বহুদর্শিতার বৃদ্ধি ঘটিত এবং সেই সঙ্গে সহৃদয়তার ফলে, দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটিত এবং বেতনভুক্ স্বাস্থ্যপরিদর্শকের নিয়োগের প্রয়োজন থাকিলেও, তাঁহার কার্য্যের উপরে তাবৎ দেশবাসীরই খরদৃষ্টি থাকিতে পাইত। (৩) পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, চিকিৎসা-শাস্ত্রের বৈশিষ্ট্যবশতঃ, সাধারণে স্বাস্থ্যসম্বন্ধে কথা কহিতে চাহেন না। বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যপাঠ ধরান, সাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি পঠন ও ছায়া-চিত্রালোকের সাহায্যে প্রচারকরণ, বালিকা-বিদ্যালয়ে রীতিমত-ভাবে স্বাস্থ্যপাঠ ধরান, স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় মোটামুটি জ্ঞানের জন্য উপাধি সৃষ্টি-করণ—প্রভৃতি নানা উপায়ে চিকিৎসা-শাস্ত্র সম্বন্ধীয় সাধারণের মধ্যে অন্যায় "জুজুর" ভয় ভাঙাইতেই হইবে—নতুবা আমাদিগের ভদ্রস্থতা নাই। বিদ্যালয় বলিতে ইংরাজী বিদ্যালয়ের (হাইস্কুলের) নিম্নশ্রেণী হইতে কলেজের উচ্চতম শ্রেণী পর্য্যন্ত আমার লক্ষ্য এবং বালিকা বিদ্যালয়ে এম্-এ, বি-এ, প্রভৃতি উপাধির বিড়ম্বনা না রাখিয়া, ধাত্রী-বিদ্যা, শুশ্রূষাকারিণী-বিদ্যা, স্বাস্থ্য বিদ্যা, রন্ধনবিদ্যা, গৃহস্থালী প্রভৃতি বিদ্যার সমাদর হওয়া বাঞ্ছনীয়। (৪) নারীশিক্ষা সম্বন্ধে আমাদিগের ঔদাসীন্য অমার্জ্জনীয়। আমি চাহি না যে, ঘরে-ঘরে রমণীরা বীজগণিতের কূট অঙ্ক সমাধান করুন; আমি চাহি যে, ঘরে-ঘরে পুরুষেরা রমণীগণকে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শিক্ষা দিন। মাটিতে লবণ বা ফল রাখিয়া খাওয়া, ঋতুবন্ধ না হইতেই চতুর্থ দিবসে স্নান করা, আঁতুড় ঘরে যত ময়লা ও পরিত্যক্ত জিনিস ব্যবহার করা, একই পুষ্করিণীতে শৌচ প্রস্রাব ত্যাগ করা ও তাহার জল পানার্থ ব্যবহার করা, জঘন্য ময়লা কাপড় দশবার ত্যাগ করিয়া শুচিতা রক্ষা করা, পাতের এঁটো খাওয়া, মাথা মুড়ি দিয়া শয়ন করা, শয়নাগারের সমস্ত রন্ধ্র বন্ধ করা, ময়লা "ন্যাতা" দ্বারা ভোজনপাত্রগুলির মার্জ্জনা করা, প্রভৃতি কত রকমের যে অস্বাস্থ্যকর অভ্যাস-গুলি আমাদের রমণীকুলের মজ্জাগত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই অভ্যাসগুলির দোষ একে একে বুঝাইয়া ইহাদিগকে পুরুষেরা নিরাকৃত না করিবেন ত কে করিবেন? (৫) বার রাজপুতের তের হাঁড়ি—এই প্রবাদ-বচনটি হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, আমাদের জাতীয় একতার অভাব আছে। এই জাতীয় একতার অভাব একটী প্রধান অভাব। আমি বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের উপযোগিতা বা অনুপযোগিতা সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহি না, কিন্তু জাতিবিভাগের ত্রুটী সহজেই উপলব্ধি করিতে পারি। তবে এটা বেশ মনে হয় যে, যদি ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পশ্চাতে ক্ষাত্রধর্ম্ম সমানে সজীব ও প্রবল থাকে, তবেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের মর্য্যাদা থাকে—নতুবা দলভ্রষ্ট সেনা, ভাবহীন ভাষার মত জাতিবিচারের "কচকচি" লইয়াই দলাদলি করা সার হয়। জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে, এখন সকলে মিলিয়া একত্রে কায করিতে হইবে। হীন স্বার্থ বা তুচ্ছ আত্মাভিমান লইয়া দলাদলি করিবার আর সময় নহে—সে দিন চলিয়া গিয়াছে। এখানে-ওখানে করধৃত-সূত্র-পরিচালিত বাজীকরের পুত্তলিকার ন্যায় নর্ত্তন-কুর্দ্দন করিয়া, পলিটিক্যাল থিয়েটার (বা রাজনীতির বৃথা অভিনয়) করিয়া আত্মাভিমান পুষ্ট বা স্বার্থ সংগ্রহ করিবার সময় আর নাই। জগতের সর্ব্বত্রই প্রজার জাগরণ হইয়াছে। আমাদিগকেও জাগিতে হইবে। কুম্ভকর্ণের কথা ভুলিতে হইবে, বিভীষণ যে অমর সে কথাও ভুলিতে হইবে। দেশের লোক লইয়া, লোকমত প্রবল করিতে হইবে। লোকমত প্রবল হইলে, রাজার পক্ষে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা কঠিন হইবে না। লোকমত প্রবল হইলে, দেশমধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের ও স্বাস্থ্যোন্নতির অভাব হইবে না। লোকমত প্রবল হইলে দেশের লোকে অহর্নিশ দেশের প্রাণের অস্থিমজ্জার সাড়া পাইবে। তখন ছেলেদের কি রকমে মানুষ করিয়া তুলিতে হয়, তাহার পরিচয় হাতে-কলমে পাইব।

যদি দেশের সকলেই বুঝিতে পারে যে, আমাদের প্রধান অভাব দুইটী—শিক্ষার বিস্তৃতি ও স্বাস্থ্যলাভ,—তবে উঠিয়া পড়িয়া সকলেই সেই অভাব দূর করিবার জন্য প্রয়াসী হয়। দুঃখের বিষয়, আমাদিগের দেশের অবস্থা ঠিক উল্টা—অর্থাৎ আমাদিগের দেশের লোকে আদৌ জানে না যে, তাহাদিগের অভাব কি। আর তাহার উপরে এত বেশী করিয়া এবং এত জোরের সহিত তাহাদিগকে অনবরত শুনান হইয়াছে যে, তাহারা অকর্ম্মণ্য ও তাহাদিগের দেশে মানুষ নাই এবং তাহাদের দেশে দেখিবার বা শুনিবার

উপযুক্তও কিছু নাই, যে তাহারা এখন সেই ভুলই ধারণা করিয়া রাখিয়াছে। অবস্থা ও ধারণা বিপরীত হওয়ার সঙ্গে, ব্যবস্থাও বিপরীত রকমের হইতেছে। অর্থাৎ, কোথায় দেশের লোকের কথায়, দেশের লোকের সাহচর্য্যে, দেশের লোকের দ্বারা, দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা হইবে, তাহা না হইয়া—সুদূর সিমলা বা দার্জ্জিলিং শৈলে বসিয়া, স্বাস্থ্যবিভাগের কর্ত্তার ইচ্ছামত, এখানে-ওখানে বাধ্যতা-মূলক স্বাস্থ্যবিধি প্রবর্ত্তিত হইতেছে—আর দেশের লোকরা কতকটা অদৃষ্টের প্রহারের মত, কতকটা "বোঝার উপরে শাকের আঁটির" মত তাহা গায়ে মাখিয়া লইতেছে। এক পক্ষের ধার করা পিতৃত্বের কর্ত্তব্য-প্রয়োগ, অপর পক্ষে সাংখ্যের পুরুষের ন্যায় ব্যবহার;—ইহার ফলে অর্থ-নষ্ট, মনঃকষ্ট হয় বটে, কিন্তু ফল অতি সামান্যই।

সত্য বটে, ইংরাজ আমাদিগের মা-বাপ হইয়া বসিয়াছেন, সত্য বটে তাঁহারা মমতাধিক্যবশতঃ আমাদিগকে চিরকালই দুগ্ধপোষ্য শিশু করিয়া রাখিতে চাহেন; কিন্তু আমাদিগের নিজেরও ত কর্ত্তব্য আছে—আমরা কি কৈশোর উত্তীর্ণ হইয়া যৌবনে পদার্পণ করি নাই? অগ্রসর হইয়া, পিতামাতার কাযের লঘুতা সম্পাদন করা আমাদিগের উচিত।

রাষ্ট্রশক্তি যাহাতে প্রজার হস্তে সম্পূর্ণই না হউক, অন্ততঃ কতক পরিমাণে ন্যস্ত হয়, দেশময় সেই আন্দোলন চলিতেছে বটে; কিন্তু তাহার সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত দেশময় শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিস্তারকল্পে সভা-সমিতি কই? যাহার যতটুকু সামর্থ্য, যাহার যতটুকু অবকাশ—সে সমস্তই দেশের হিতকল্পে নিযুক্ত করিতে হইবে। আগে দেশের লোককে খাইতে ও বাঁচিতে দিতে হইবে, তবে ত রাষ্ট্রশক্তির উপভোগ করিবার সুযোগ হইবে? যে চেষ্টায় কংগ্রেস হইতেছে, সেই চেষ্টাকে সমস্ত বর্ষব্যাপী ও ক্রমানুযায়িক করিতে পারিলে এবং তাহাতে প্রাণের সংযোগ থাকিলে, কত কায করা যাইতে পারে। দেশের লোককে জানাইতে হইবে, ম্যালেরিয়া, কলেরা প্রভৃতি নিবার্য্য ব্যাধিগুলি কি-কি কারণে হয়; সেই সঙ্গে তাহাদিগকে নিবারণ করিবার উপায়গুলিও জানাইয়া দিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে দেশের লোকের কর্ণে ও মর্ম্মে বেশ করিয়া এই কথাগুলি প্রবেশ করিয়া দিতে হইবে যে, পৃথিবীতে অপর কোথাও এই সকল ব্যাধির তাদৃশ উৎপাত নাই, অতএব আমাদিগের দেশেও উহারা থাকিতে পাইবে না। ইহার জন্য যদি সমস্ত দেশবাসীকে একবেলা না খাইয়াও থাকিতে হয়, তাহাও স্বীকার করিয়া ম্যালেরিয়াকে সবংশে নিধন করিতেই হইবে। সভা করিয়া, সমিতি করিয়া, দলগঠন করিয়া, গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বে হউক, গভর্ণমেণ্টের সাহচর্য্যে হউক, অথবা স্ব-স্ব চেষ্টায় হউক, যেমন করিয়া হউক, ম্যালেরিয়াকে দেশ হইতে বিসর্জ্জন দিতেই হইবে। যেমন এক দারিদ্র্যদোষ গুণরাশি নষ্ট করে, তেমনি একা ম্যালেরিয়াই সমস্ত বাঙ্গালার সকল সুখ, সকল স্বাস্থ্য, সকল উন্নতির অন্তরায়। গবর্ণমেণ্ট কবে দয়া করিয়া আমাদিগের কথায় কর্ণপাত করিয়া রাষ্ট্রীয় সুবিধা দান করিবেন, কত যুগ পরে আমাদের শিক্ষা জাতীয়-শিক্ষায় পরিণত হইবে, কোন্ সুদূর ভবিষ্যতে দেশেরই লোকে দেশের স্বাস্থ্যবিভাগের কর্ণধার হইবেন—এই সকল আকাশকুসুমের আশায় বসিয়া না থাকিয়া আজই, এই দণ্ডেই, গ্রামে-গ্রামে, পল্লীতে-পল্লীতে, যাহার যেমন সামার্থ্য ও যাহার যেমন অবসর ও সুযোগ—সে সেই ভাবেই দেশের লোককে দেশের কার্য্যে উদ্বুদ্ধ করুক। স্বামী বিবেকানন্দের অনুগ্রহে আজ দরিদ্রনারায়ণের সেবার মর্য্যাদা অনেকে; কবে এই জরাব্যাধির ক্রীড়াভূমি আমাদের দেশে পীড়িত, নিরক্ষর ও সামাজিক "নিম্নশ্রেণী"ভুক্ত নারায়ণের সেবা ঘরে-ঘরে অনুষ্ঠিত হইবে? এই আপাততঃ অসাধ্যসাধন না করিতে পারিলে, শিশু-স্বাস্থ্য লইয়া বিচার করিয়া কি করিব?

যদি ম্যালেরিয়ার কথা ছাড়িয়া দিতে পারি, তবে শিশুস্বাস্থ্যের অনুন্নতির কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারি। কিন্তু যে দিক দিয়াই দেখি, ম্যালেরিয়াই ওতঃপ্রোত ভাবে শিশু-স্বাস্থ্যহানির কারণ বলিয়া প্রকটিত হইয়া পড়ে। কিন্তু, যখন ম্যালেরিয়াকে এখন "ধামাচাপা" দিয়া রাখিতেই হইবে, তখন ম্যালেরিয়ার কথা ছাড়িয়া, অপর কারণগুলি নির্দ্দেশ করিব।

পিতামাতার অজ্ঞতা

পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব দায়িত্বপূর্ণ অবস্থা—ছেলেখেলা নহে। ইংরাজের অনুকরণে আমরা পত্নীকে আর সহধর্ম্মিণী

ভাবি না, বিলাস-ভোগ-সাধনের সামগ্রী মনে করি। কি নিজ-নিজ জীবনে, কি সন্তান-প্রতিপালনে, সংযম-শিক্ষার দিকও মাড়াই না—নিজেও নিত্য অভাব সৃজন করিয়া, নিত্য-সুখ-আশায় ঘুরিয়া মরি, ছেলেকেও বিলাসিতা, ভোগৈশ্বর্য্যের পথে ঠেলিয়া অগ্রসর করিয়া দিই। ইহা অপেক্ষা আর মূঢ়তা কি বেশী হইতে পারে? আমরা বাল্যবিবাহের দোষ দিই,—আমরা অমন অনেক বিলাতী ধুয়া ধরিয়া, কর্ণবাহী কল্পিত বায়সের পশ্চাতে ধাবিত হই; কিন্তু বাল্যবিবাহ বলিলেই কাম-পরিতৃপ্তির কথা মনে কর কেন? ছেলেকে সংযম শিক্ষা দাও নাই কেন? আমাদিগের প্রথম অজ্ঞতা এইখানেই। আমরা বিলাতী কাচ লইয়া অঞ্চলে গিরা দিবার জন্য অতীব উদ্‌গ্রীব। আমরা সহধর্ম্মিণীকে রমণী মনে করি, প্রমোদা জ্ঞান করি, আমরা বিবাহকে "বিশিষ্টরূপে পত্নীর ভার বহন করা" মনে না করিয়া ভোগোৎসব মনে করি। আমরা নিজ-নিজ সন্তানদিগকে সমাজের ভাবী নিয়ন্তা ও স্ববংশের কীর্ত্তিস্থল বংশধর মনে না করিয়া, কামনার লীলাক্ষেত্র, ও অর্থবাহী বলদরূপে কল্পনা করি; এবং পুত্র সম্বন্ধে আমাদের বর্ত্তমান চরম আদর্শ—"বাবা, তুমি দারোগা হও"। এইখানেই আমাদিগের প্রথম অজ্ঞতা—সংযমের অভাব।

আমাদিগের দ্বিতীয় অজ্ঞতা—স্বাস্থ্যতত্ত্বজ্ঞানহীনতা। রমণীরা গৃহিণী হইতে স্পর্দ্ধা রাখেন, সুপাচিকা হইতেও স্পর্দ্ধা করিতে পারেন, কিন্তু সুমাতা হইবার স্পর্দ্ধা কোথায়? যে গৃহিণী রন্ধনপটু, তিনি রন্ধনের প্রত্যেক উপকরণের দোষ-গুণ বেশ করিয়া আয়ত্ত করিয়া, তবে রন্ধনকার্য্যে দক্ষতা লাভ করেন। কিন্তু, কি খাইলে শিশু ভাল থাকে, কি পরিলে শিশু ভাল থাকে, এ সম্বন্ধে অতীব স্থূলজ্ঞান মাত্র তাঁহারা কেহ কেহ নিজ অভিজ্ঞতার ফলে সংগ্রহ করিতে পারেন। মোটামুটি স্বাস্থ্যতত্ত্ব কি পুরুষ, কি রমণী,—এ দেশে কেহই জানেন না, জানিবার স্পৃহাও প্রকাশ করেন না। প্রত্যেক বিদ্যালয়েও স্বাস্থ্যসম্বন্ধে পাঠ্য পড়ান হয় না। যে অভিভাবকের সন্তানেরা বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পাঠ্য পুস্তক পড়ে, সে অভিভাবকেরা ভ্রমক্রমেও সেই সামান্য স্বাস্থ্যশিক্ষাটুকুও কষ্ট করিয়া পাঠ করেন না। পরন্তু, এ দেশে স্বাস্থ্যশিক্ষাকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখা, স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে বিরুদ্ধ-মত দম্ভের সহিত প্রকাশ করাই পৌরুষ-জ্ঞাপক। আমাদের দেশে কাহারো কোন ব্যারাম হইলে, বন্ধুবান্ধবের মুখ হইতে—এমন কি সুচিকিৎসকেরই সম্মুখে—কত রকমের যে ব্যবস্থা আত্ম-প্রকাশ করে, তাহা ভুক্তভোগীরই জানা আছে। বোধ হয় আমাদের দেশে যত লোক আছে ততজনই "হাকিম"—অথচ, আমাদিগের দেশের ন্যায় রোগের আকর অপর কোনও দেশ নহে। শ্রদ্ধাবান্ না হইলে, কখনো জ্ঞান লাভ হয় না। অশ্রদ্ধাবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া আমাদিগকে স্থূল স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিখিতেই হইবে,—নতুবা নিজ নিজ শিশু-দিগের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমাদিগের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব ব্যাপার হইবে।

আমাদিগের তৃতীয় অজ্ঞতার ফল—দেশকালপাত্র সম্বন্ধে অবিবেকতা। আমরা ভুলিয়া যাই যে, শিশু যখন গর্ভে বাস করে, তখন উষ্ণজলে নিমজ্জিত থাকে। জন্মের পরে সেই শিশুর যে কত দুর্গতি আমরা করি, তাহার ইয়ত্তা নাই। কখনো ফ্লানেলে বা পশমে আপাদমস্তক মুড়িয়া তাহার চর্ম্মের উগ্রতা সাধন করি, আবার কখনো তাহার দেহের উপরার্দ্ধে পরিচ্ছদাধিক্য করিয়া, শরীরের নিম্নার্দ্ধ নগ্ন রাখি। কখনো আমরা সাবান ব্যবহার করিয়া তাহার কোমল ত্বককে কর্কশ করি, আবার কখনো স্নান বন্ধ রাখিয়া তাহার স্নায়ুগুলির উত্তেজনা বৃদ্ধি করি। ফল কথা, এটি আমরা কেহই স্মরণ রাখি না যে, আকৃতির তুলনায় শিশুর চর্ম্মবিস্তৃতি বেশী বিধায়ে, অতি সামান্য কারণেই শিশুর ঠাণ্ডা লাগে এবং যথাসম্ভব একই উত্তাপে তাহাকে রক্ষা করাই সর্ব্বথা উচিত। তোমার অর্থাধিক্য ও মমতাধিক্য বশতঃ, অকারণে শিশুকে শতভূষায় ভারাক্রান্ত করিও না। শিশুদিগকে যে কাপড়-চোপড় পরান হয়, তাহাতে অধিকাংশ সময়েই তাহারা বিব্রত হইয়া পড়ে,—আবার অনেক সময়ে এমন জামাজোড়া পরান হয় যে, ছেলেকে যতবার কোলে তোলা হয়, ততবারই তাহার বুকপিঠ আদুড় হইয়া পড়ে। কাপড়-চোপড় পরান সম্বন্ধে যতটা অবিবেচনা প্রকাশ করা হয়, ছেলেদিগকে খাওয়ান সম্বন্ধে তদপেক্ষা অধিক অবিবেচনার কায করা হইয়া থাকে। খুব অল্প সংখ্যক রমণীই জ্ঞাত

আছেন যে, শিশুর ছয় মাস বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত নিজ মাতৃস্তন্যই তাহার যথার্থ ও যথেষ্ট আহার্য্য। এ কথা জানা থাকিলেও, সকল জননীর স্তনে এত দুগ্ধ আসে না যাহা তদীয় শিশুর পক্ষে যথেষ্ট হইতে পারে। আবার, যে জননীর স্তন্য যথেষ্ট থাকে, তিনিও মমতাধিক্য বশতঃ হয় ত দেড়, দুই, এমন কি তিন বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্তও স্তন্য দিতে কুণ্ঠিত হন না। আজকাল ছেলে জন্মিলেই তাহাকে "বিলাতী গাঢ় দুগ্ধ" (condensed milk) অথবা একটা না একটা "ফুড্" (malted milk food)—অন্ততঃ সাগু বার্লিও খাওয়াইতেই হইবে। এইরূপ খাওয়ানর হেতু, প্রথমতঃ, ঐ খাদ্য তদীয় জননীর বা অপর আত্মীয়ার অভিপ্রেত। দ্বিতীয়তঃ, চিকিৎসককুলের নির্ব্বোধিতা বা অবিবেকিতা। তৃতীয়তঃ, সাহেবদিগের বা সাহেবীয়ানা-গ্রস্ত বাঙ্গালী বাবুদিগের অনুচিকীর্ষা। এই "ফুড্" খাওয়ান-প্রথা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। নিতান্ত ব্যারাম-সময়ে, অস্থায়ীভাবে ব্যবহার করা ভিন্ন অন্য কোনও অবস্থায় ইহাদিগকে ব্যবহার করা উচিত নহে; তাহার কারণ, ঐ বিলাতী খাদ্যগুলি বাসি; উহাতে ভাইটামীন না থাকায়, উহা খাইয়া দেহের বাহ্যিক পুষ্টি হয় বটে, কিন্তু শিশুরা রোগপ্রবণ ও অন্তঃসারহীন হইয়া পড়ে; এবং উহার ব্যবহারে দেশের ধন অনর্থক বিদেশের কবলিত হয়। খাদ্য-সম্বন্ধে বিচার করিতে বসিয়া আর একটী প্রধান দোষের উল্লেখ করিব। সেটিও অত্যন্ত অবিবেচনামূলক। খুব অল্প স্ত্রীলোকেই জানেন কতক্ষণ অন্তর শিশুকে খাওয়াইতে হয়। তাহার ফলে নিতান্ত এলোমেলো রকমে শিশুরা খাদ্য পাইয়া থাকে এবং সেই হেতু বশতঃ ব্যারামেও বিস্তর ভোগে। তাহা ছাড়া, অনেক গৃহস্থের এমন অভ্যাস আছে যে, কচি ছেলে ভোজনের সময়ে নিকটে আসিলেই তাঁহারা তাহাকে কিছু কিছু ভোজ্য দিয়া থাকেন। এই ভাবেও শিশুর দেহের পক্ষে অনুপযুক্ত বহু খাদ্য অনুপযুক্ত সময়ে তাহার পাকস্থলীতে যাইয়া পীড়ার হেতু হইয়া পড়ে। তাহা ছাড়া, ধনীর গৃহে শিশুরা অতি অল্প বয়স হইতেই গুরুপাক খাদ্য ভোজনে অভ্যস্ত হয় এবং দরিদ্রের সংসারে অনেক দুষ্পাচ্য, জঘন্য দোকানের খাবার খাইতে বাধ্য হয়।

স্বভাববিরুদ্ধ কায

পূর্ব্বে যে যে কথাগুলি বলিয়াছি, তাহার অধিকাংশই স্বভাববিরুদ্ধ কাযের বিরুদ্ধে; কিন্তু স্বভাবের প্রেরণায় ছেলেরা এমন কতকগুলি কায করিতে চাহে, যাহা করিতে না পারিলে তাহারা অসুখী হয়। সেরূপ কায ছয়টি। প্রথমতঃ, ছেলেরা মিষ্ট খাইতে ভালবাসে ও টক রস পাইলে সুখী হয়। অথচ, সাধারণের মনে ঐ দুইটি জিনিসের বিরুদ্ধে নানা রকমের কুসংস্কার আছে। মিষ্ট খাইলে ক্রিমি বাড়ে, দাঁতে পোকা জন্মে, এবং টক খাইলে সর্দ্দি হয়,—এই ভয় সর্ব্বদাই গৃহীর মনে জাগরূক আছে। কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বত্রই শিশুদিগের ঐ দুটি জিনিস প্রিয়। তাহার কারণ, প্রথমতঃ, মিষ্টির মত আশু-শ্রমহারী-খাদ্য খুব অল্পই আছে; এবং দ্বিতীয়তঃ, মিষ্ট ভোজনে শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি ও উত্তাপ রক্ষণ অতি সুন্দর রূপেই হইয়া থাকে। তাই প্রকৃতির প্রেরণায় শিশুমাত্রেই মিষ্টের অনুরাগী। টক খাইলে সর্দ্দি হয়, এ কথা চিকিৎসা-শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। অথচ টক খাইলে প্রস্রাব ও কোষ্ঠশুদ্ধি হয়, বোধ হয় এই প্রাকৃতিক প্রেরণায় ছেলেরা কাঁচা ও টক ফল ভালবাসে. আমার মনে হয়, শিশুদিগকে এই দুইটি রস হইতে বঞ্চিত করা অন্যায়—তাহার ফলে শিশুদিগের অনিষ্ট হয়। তবে একথা সর্ব্বথা সত্য যে—"সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতং।" দ্বিতীয়তঃ, শিশুরা নগ্ন থাকিতে ভালবাসে। আমাদের দেশে অন্ততঃ আট-মাসকাল গ্রীষ্ম, চারিমাস মাত্র শীত। অথচ, অনেক স্থলে দেখা যায় যে, সকল ঋতুতেই পিতামাতার খেয়াল ও অহঙ্কার পরিতৃপ্ত করিবার জন্য, নানা রকমের জামা-কাপড় শিশুগণকে পরাইয়া দেওয়া হয়। আজ-কাল এমন কি দুই-তিন মাসের শিশুকেও লজ্জানিবারক কৌপীন বা পা-জামা ব্যতীত সহরে দেখা যায় না। আমার মনে হয় যে, এই কাযটি অন্যায়। শীতে, বর্ষায় বা যে কোনও দিন ঠাণ্ডা থাকিলে অতি অবশ্য শিশুকে জামা-জোড়া দিয়া আবৃত করা উচিত। তদ্ব্যতীত বারোমাসে প্রত্যহই শিশুকে রীতিমত ভাবে তৈলমর্দ্দন করা উচিত;—তৈলাক্ত চর্ম্ম মসৃণ থাকে এবং শীতাতপ হইতে শিশুকে রক্ষা করে। কিন্তু অযথা শিশুকে জামা-জোড়া পরাইয়া রাখা অনুচিত—বিশেষতঃ যে সকল পরিধেয়ে বন্ধন, ফিতা সেফ্‌টি পিন্ লাগানর প্রয়োজন হয়, তাহা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। তৃতীয়তঃ

শিশুরা স্বতঃই জল ঘাঁটিতে ভালবাসে এবং নগ্ন পদে জলে-জলে বেড়াইতে পাইলে সুখী হয়। এই অভ্যাসটির অর্থ ঠিক্ বুঝিতে পারি নাই। এবং ছেলেরা অনবরত জল ঘাঁটে বা জলে বেড়ায়, ইহার সমর্থন করিতে পারিলাম না। পরন্তু যে সকল অবিবেকী জনক-জননী শিশুগণকে "শক্ত" করিবার আশায় ঐ দিকে শিশুগণকে প্রশ্রয় দেন, তাঁহারা জানেন না যে, "শক্ত" করিবার চেষ্টার ফলে, কত শিশু অকালে ইহলীলা সম্বরণ করিয়া বসে! আমার মনে হয় যে, যে সকল শিশু প্রত্যহ রীতিমত স্নান করিতে পায়, তাহারাই সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যবান্ হয়। চতুর্থতঃ, শিশুরা চীৎকার করিতে ভালবাসে। অনেক বাটীর লোকেরা ইহাতে বিরক্ত হন এবং শিশুরা সামান্য চীৎকার করিলেই, তাহাদিগকে শাসন করেন। চীৎকার করিলে বুকের জোর বাড়ে, এই জন্যই শিশুরা চীৎকার করে; তাহাদিগকে নিষেধ করিলে শিশুরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বস্তুতঃ অত্যধিক শাসন ও ভদ্রলোক তৈয়ারি করিবার অত্যধিক চেষ্টার ফলে, আমাদের ছেলেরা প্রাণ ভরিয়া হাসিতেও ভুলিয়া গিয়াছে, এবং তাহারা পেচক-নীতি অবলম্বন করিতে শিখিয়াছে। পঞ্চমতঃ, ছেলেরা স্বভাবতঃই দৌড়াদৌড়ি ও ছুটোপাটি করিতে ভালবাসে। কিন্তু অল্পপরিসর স্থানে বাস করা ও চতুর্দ্দিকে বিলাতী মাটি দিয়া বাঁধান হওয়ার ফলে, এবং কতকটা মমতাধিক্য বশতঃ, আমরা শিশুগণকে স্থির হইয়া বসিতে থাকিতে বাধ্য করি—স্বাভাবিক উপায়ে তাহাদিগকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিচালনা করিতে দিই না। এক দিকে তাহাদিগকে জামাজোড়ার বাঁধনে বাঁধি, অপর দিকে তাহাদিগকে সরাসরি ভদ্র বানাইয়া ফেলি; কাযেই ছেলেরা স্ফুর্ত্তিহীন, দুর্ব্বল-পেশী, জড়ভরত হইয়া থাকে। ছোট পুষ্করিণীতে তাড়া না খাইয়া যে মাছেরা বাস করে, তাহারা ক্ষুদ্রকায় হইয়া থাকে; বড় পুষ্করিণীতে সর্ব্বদাই তাড়া খাইয়া যে মাছেরা বাড়ে, তাহারা বৃহদায়তন হইয়া থাকে। মিঃ লয়েড্ জর্জ্জ ঠিকই বলিয়াছেন—"You cannot have an A1 empire with C3 population" অর্থাৎ মন্দস্বাস্থ্য লোক লইয়া উৎকৃষ্ট সাম্রাজ্য স্থাপন করা যায় না। ষষ্ঠতঃ, ছেলেরা অনুকরণ করিতে ভালবাসে এবং চাঞ্চল্যের ভিতর দিয়া মনোবৃত্তিকে ফুটাইতে চেষ্টা করে। আমরা সেই নিয়তচঞ্চল ও নিত্য-অনুকরণশীল শিশুকে পাঁচ বৎসর বয়স হইতে না হইতেই, পাঠ কণ্ঠস্থ করাইতে আরম্ভ করি, জোর করিয়া তাহার অসংযত অঙ্গুলিগুলিকে নানা ছাঁদের অক্ষর লিখিতে অভ্যস্ত করাই এবং সামান্য ভুল হইলেই ভীতি প্রদর্শন করাই! পাঠক মহাশয়, কখনো কি স্থির দৃষ্টিতে শিশুকে হস্তাক্ষর লিখিতে দেখিয়াছেন? কখনো মনোনিবেশ পূর্ব্বক দেখিয়াছেন কি, যে, শিশু কত জোরে কলমটিকে আঁকড়াইয়া ধরে এবং প্রত্যেক অক্ষর-পাতের সঙ্গে সঙ্গে তাহার কোমল ললাটে কত কঠিন রেখাগুলি ফুটিয়া উঠে? আপনার-আমার পক্ষে দুই ছত্র লেখা কিছুই নহে, যে হেতু এতদিন উহা অভ্যাসগত হইয়া গিয়াছে;—কিন্তু একটা সামান্য অক্ষর লিখিতে হইলে শিশুকে কি প্রচণ্ড মানসিক শক্তির প্রয়োগ করিতে হয়, এবং সেই শক্তি সেই সুকুমার দেহের অনুপাতে কতটা, তাহা কি কখনো প্রণিধান করিয়াছেন? ভাষা-শিক্ষা কর্ণের সাহায্যে যত সহজে হয়, চক্ষুর সাহায্যে তত শীঘ্র ও স্থায়ী ভাবে হয় না। শিশুরা নিত্যই নূতন জিনিস দেখিয়া কত কুতূহলী হয়, কতই তাহাদের মানসিক বৃত্তিগুলির উন্মেষ ঘটিয়া থাকে—কিন্তু আমরা জবরদস্তি দুই সন্ধ্যা জোর করিয়া তাহাদিগকে অকষ্টবদ্ধ করিয়া, বিস্তার রাশি তাহার কণ্ঠের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিই। এরূপ করার ফলে, তাহার মন সঙ্কুচিত হয় এবং মনের সঙ্গে তাহার তাবৎ দেহই জব্দ হইয়া পড়ে। আমরা কি কখনো এ সকল কথা ভাবিয়া দেখি?

অপরাপর কারণ

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমরা স্ব-স্ব কর্ত্তব্য উপলব্ধি করিবার পূর্ব্বেই জনক-জননী হইয়া বসি। এ কথায় কেহ যেন মনে করিবেন না যে, আমি "বাল্য"-বিবাহের প্রতিকূলে মত দিতেছি। "বাল্য"-বিবাহ ভাল কি মন্দ, সে বিচার এখানে করিব না। আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, আমরা নিজ-নিজ কর্ত্তব্য উপলব্ধি করিবার সুযোগ না পাইয়াই, পুত্রোৎপাদন করিয়া থাকি। বয়সের ন্যূনতা-বশতঃ যে সেই কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে অসমর্থ হই, তাহা নহে—"শিক্ষার" কল্যাণেই তাহা জানিতে পাই না, বিজাতীয়-ভাষা-শিক্ষার জাঁতা-কলে পেষিত হইয়া সে ভাষাও ভাল করিয়া শিখি না, নিজের চিত্তবৃত্তির উন্মেষও হয় না।

অঙ্কশাস্ত্রের অনুশীলনে মস্তিষ্কটাকে উষ্ণ করিয়া আমরা মানসিক সংযম শিক্ষা করিবার আশা রাখি; কিন্তু দুর্ব্বল-দেহে জীবনে প্রতিদিনই অসংযমের পরিচয় দিয়া থাকি। আমরা যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাস চর্চ্চা করি, কিন্তু জীবনে একদিনও নিজেদের প্রকৃত সমাজের ও দেশের সংবাদ পাই না। শিক্ষার নামে এইরূপ বিরাট ভণ্ডামির মধ্যে ভারবাহী "গাধা" হইয়া, মনুষ্য সমাজে ধার-করা লম্ব-কর্ণের বাহারই দিতে শিখি। মানুষের মনুষ্যত্বের সন্ধান পাই না, সমাজের মজ্জার সন্ধান পাই না, দেশের প্রাণের স্পন্দন অনুভব করি না—নিজের ঠাকুর না হইয়া পরের কুকুর হইয়া সমাজে বিচরণ করি। দেহতত্ত্ব, স্বাস্থ্য-তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, এ সকল শিক্ষা না করার ফলে আমরা, সংসারে সকল সুখই আয়ত্ত করিয়া বসি, যা কষ্ট রহে সুধু অন্ন-বস্ত্রের। তাই বলিতেছিলাম যে, আমরা কর্ত্তব্য কিছুই জানিতে-না-জানিতে, পিতৃত্বে উন্নীত হই এবং অজ্ঞানতার মাসুল স্বরূপ অকালে কতকগুলি শিশু হারাইয়া, পত্নীকে চিররুগ্না করিয়া ও স্বয়ং মূর্ত্তিমান অস্বাস্থ্য হইয়া সংসারে জীবন্মৃত হইয়া বেড়াই। পূর্ব্বে "অষ্টোত্তরী" ও "বিংশোত্তরী" মতে আয়ুর্গণনা করা হইত বলিয়া, মনে হয় সুদূর অতীতে, ভারতবর্ষে সাধারণের আয়ুষ্কাল ১০৮ বা ১২০ বৎসর ছিল। তখন দেশের আবহাওয়াও বোধ হয় ভাল ছিল এবং লোকের স্বাস্থ্যও ভাল ছিল। এখন দেশের আবহাওয়া অতি মন্দ, খাদ্যে পর্ব্বত-প্রমাণ ভেজাল, ম্যালেরিয়া সর্ব্বত্র, দৈন্য ও অভাব প্রচণ্ড, কাযেই লোকের আয়ুঃ স্বল্প। অথচ আমরা কেহই এই আয়ুস্তত্ত্ব আলোচনা করি না, এবং আমাদের দেশে রমণীরা এই দুর্লভ মানব জীবনটাকে যত্ন করিবার সামগ্রী মনে করেন না—আমরাও অন্দরমহলের তত্ত্ব লওয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম বোধ করি না। কাযেই আমাদিগের দেহ হইতে জাত সন্তান-সন্ততি যে রোগের আকর হইবে, তাহার বিচিত্রতা কোথায়? মাসিক পত্রে যে উপন্যাসের চর্চ্চা অনবরত চলিয়াছে, তাহার একদশমাংশও যদি স্বাস্থ্য-চর্চ্চায় নিয়োজিত হয়, তাহা হইলেও অনেক কায হয়। এবং বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যতত্ত্ব, শারীরবিধানতত্ত্ব (physiology) ও মোটামুটি দেহতত্ত্ব (anatomy) শিক্ষার প্রচলন হওয়া চাই।

দৈন্য আমাদের দুর্দ্দশার একটী প্রধান কারণ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাহার সংসারে নিত্যই অভাব, তাহারই সংসারে মা-ষষ্ঠীর কৃপা বেশী হয়। কাযেই সকল ছেলের প্রতি সমান যত্ন করা সম্ভবপর হয় না। কিন্তু অপরাপর দেশে দৈন্য ও পুত্রবাহুল্য থাকিয়াও অসুবিধা নাই। তাহার কারণ, প্রথমতঃ আমরা অলস, শ্রমবিমুখ ও কষ্ট-অসহিষ্ণু বলিয়া, সকল রকম কাযে হাত দিতে পারি না। আমরা অত্যন্ত সন্তানবৎসল বিধায়, গৃহ ছাড়িয়া বেশী দূরে যাইতে চাহি না। আমরা অদৃষ্ট-বাদী ও স্বল্পতোষ বলিয়া, সকল কষ্ট নীরবে সহ্য করিয়া, যেনতেন প্রকারেণ অল্প বেতনেই সংসার চালাইয়া দিই। দ্বিতীয়তঃ, দেশের মালিক আমরা নহি বলিয়া, আমাদের যোগ্যতার পুরস্কার কখনো পাই না এবং যে সকল কায আমাদিগের হাতে থাকা উচিত ছিল, এমন সকল কায আমাদের করায়ত্ত নহে; কাযেই দৈন্যের বিকট মূর্ত্তি সর্ব্বদাই প্রকট। ১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের (১৩২৫, মাঘের শেষ) প্রাকালে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার উদ্বোধন কালে সম্রাট জর্জ যে আশ্বাসবাণী তাঁহার স্বজাতীয়দিগকে শুনাইয়াছেন, সে আশ্বাসবাণী কবে আমরা শুনিতে পাইব? সে দেশে, শ্রমজীবিদিগের বেতনের ন্যূন নিরিখ বাঁধিয়া দেওয়া হইবে, ভগ্নস্বাস্থ্যদিগকে নিরাময় করা হইবে। আমরা কবে সেই সকল আশ্বাসবাণী শুনিতে পাইব?

ইংরাজী শিক্ষার ফলে আমরা একান্ত স্বার্থপর হইয়া, একান্নবর্ত্তিতা ও সৌভ্রাত্র ভুলিয়া গিয়াছি; অথচ ঐ দুইটির উপরে ভরসা করিয়া আমরা অনেক কায করিতে পারিতাম। এখন মাত্র গৃহিনী-সম্বল হইয়া, তাহার উপরে বিলাসিতার কঠিন শৃঙ্খল পরিয়া, আমরা ক্রমশঃই দেহে ও মনে, অর্থে ও সামর্থ্যে, দীনতার চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছি। আজ তাই যতদিন খাটিতে পারি, ততদিন পরিবার খাইতে পায়, এবং এখন এমন কাহাকেও আত্মীয় রাখি নাই, যাহার ভরসায় দুদিন সংসার ছাড়িয়া স্থানান্তরে অদৃষ্ট পরীক্ষা করিতে যাইতে পারি।

উপসংহার

বাঙ্গালাদেশের আবহাওয়ার অবস্থা ক্রমশঃই মন্দ হইতেছে। বাঙ্গালীরা নিতান্তই দীন হইতে দীনতর হইতেছে;—কাযেই অর্থ ও শারীরিক সামর্থ্য, উভয়ই

কমিয়া যাইতেছে। সামাজিক বিপ্লবের ফলে, বাঙ্গালীর জীবনের মেরুদণ্ড—একান্নবর্ত্তিতা ও সৌভ্রাত্র—শিথিল হওয়ায়, বাঙ্গালীর দুশ্চিন্তার সহিত বিলাসিতার বলক্ষয়কারী শক্তির যোগ হইয়াছে ; এবং উভয়ের ফলে, শক্তি সঞ্চয় করা দূরে থাকুক বাঙ্গালী শক্তি রক্ষা করিতেও পারিতেছে না। বিলাতী ভাষা ও অনাবশ্যক কতকগুলা বিদ্যা কণ্ঠস্থ করিয়া নিত্য-প্রয়োজনীয় শিক্ষার বিষয়গুলি ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালী চিরতিমিরে বাস করিতেছে। বাঙ্গালী রমণীরা যতই পাশ করুন না কেন, যতই বিদ্যাশিক্ষা করুন না কেন, কবিতা ও নভেলেই মুগ্ধা আছেন—গৃহস্থালীর কিসে উন্নতি হয় বা শারীরতত্ত্ব কি, জানেন:না। কাযেই বাঙ্গালীর ছেলেরা নিত্যই দুর্ব্বল, নিত্যই রুগ্ন, নিত্যই স্বল্পায়ুঃ হইয়া পড়িতেছে।

এই দোষ অপনোদনের জন্য আমাদিগের কর্ত্তব্য কি ? কর্ত্তব্য অনেক। সেগুলির শুধু উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইব। (১) প্রত্যেক বাঙ্গালীকে মর্ম্মে-মর্ম্মে বুঝিতে হইবে যে, ধাপে-ধাপে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য খারাপ হইতেছে। (২) আমাদিগকে অহর্নিশই মনে রাখিতে হইবে, আমরা কতটা অজ্ঞান এবং আমাদিগের শিখিবার ও জানিবার কত আছে। স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে বারম্বার ও রীতিমত ভাবে দেহতত্ত্ব, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, শারীর-বিধানতত্ত্ব শিক্ষা দিতে হইবে। শিক্ষা জাতীয়-শিক্ষায় পরিণত হওয়া উচিত। (৩) দেশ হইতে ম্যালেরিয়াকে সমূলে উৎপাটিত করিতেই হইবে। (৪) দেহ ও মন পেষণকারী বর্ত্তমানকালের শিক্ষাপদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন করাইতে হইবে। (৫) সম্ভবমত পল্লীজীবনকে পুনরায় ফিরাইয়া আনিতে হইবে। (৬) রীতিমত খেলা ও ব্যায়ামের বন্দোবস্ত না রাখিলে কোনও বিদ্যালয় থাকিতে দেওয়া হইবে না, এরূপ সর্ত্তে বিদ্যালয়গুলিকে বাধ্য করিতে হইবে। (৭) ভেজাল খাদ্যদ্রব্যের বিরুদ্ধে সমাজকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। "বাদাম তৈলে ভাজা খাবার", "জলমিশান দুগ্ধ" প্রভৃতির সমূলে উচ্ছেদ সাধন করিতে হইবে। খাদ্যের বিশুদ্ধতা সর্ব্বথা রক্ষণীয়, বিকৃত খাদ্য একেবারে বর্জ্জনীয়। উভয়ের মধ্যে রফা করা চলিবে না। (৮) গো-চারণের মাঠ রাখিয়া, গোজাতির উন্নতি সাধন করিয়া, দেশে ঘৃত ও গো-দুগ্ধ সুলভ করিতেই হইবে। (৯) গ্রামে-গ্রামে বিদ্যালয় ও বেসরকারী আতুরাশ্রম থাকিবে, ব্যায়াম-চর্চ্চার স্থান, কৃষি বা শিল্পশিক্ষার স্থান থাকিবে। (১০) জনসাধারণে যাহাতে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে অবহিত হন, সেই উদ্দেশ্যে ও যাহাতে চিকিৎসকগণ অবাধে সমাজে নানারূপ স্বাস্থ্যহিতকর কার্য্যে সর্ব্বত্রই নিযুক্ত থাকেন, এরূপ করিতে হইবে। (১১) সমবায় (Co-Operative) প্রথানুসারে নানারকমের শিল্প, ব্যবসায় বাণিজ্যের যৌথ-সমিতি স্থাপিত করিয়া, গ্রামে-গ্রামে নিরন্নকে, দুঃস্থকে ও দরিদ্রকে সাহায্য করিতে হইবে। এতগুলি করিলে তবে বাঙ্গালীর ছেলেরা পুনরায় স্বাস্থ্যবান্ হইবে। কায অনেক বলিয়া ভয় পাইলে চলিবে না। সকল কাযই আমাদিগের একার চেষ্টায় হইবে না, এরূপ কল্পনা করিলেও চলিবে না। আমরা আগে যেমন সাদা-সিধা চালে থাকিয়া মহৎ অনুষ্ঠান নীরবে করিয়া যাইতাম, এখন তেমনিই আড়ম্বরবাগীশ হইয়া উঠিয়াছি। গরীবের দেশে সে চাল ভাল নহে, পুরা সাদাসিধা মানুষ হইয়া, আড়ম্বর ভুলিয়া গিয়া প্রত্যেককেই নিজ-নিজ সময়, অর্থ ও সামর্থ্য নিয়োগ করিয়া, কায করিয়া যাইতে হইবে—তবেই সুবর্ণ সুযোগ আসিবে, নতুবা নহে। "উদ্‌যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীর্দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।"

কৃতজ্ঞতা

[শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য]

তরু কহে—"লো প্রেয়সী ছায়া, ধন্য মানি ও' তনু সুন্দর,
পথিকের বিশ্রামের তরে বিছায়ে রেখেছ অকাতর।"

কৃতজ্ঞতা ভরা রুদ্ধকণ্ঠে তরুরে কহিল কাঁপি' ছায়া,
তুমিই ত নিজে পুড়ি নাথ রচেছ আমার এই কায়া

বিবিধ প্রসঙ্গ

বাৎস্যায়নের কামসূত্র

[শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী, বি-এ]

বাৎস্যায়ন-প্রণীত কামসূত্র নামক পুস্তকখানি প্রাচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া বিদ্বৎ-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন কাব্য-গ্রন্থাদির টীকাকারগণ অনেক সময়ে এই কামসূত্রের প্রমাণাবলী উদ্ধৃত করিয়া স্বমত সমর্থন বা কাব্যলিখিত বিষয় স্পষ্টীকৃত করিয়াছেন দেখা যায়।

গ্রন্থকর্ত্তা কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা নিঃসংশয়ে বলা দুরূহ। তবে সংস্কৃত-ভাষা-বিশারদ পণ্ডিতগণের অনেকের মতে বাৎস্যায়ন খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক। পাশ্চাত্য সংস্কৃত পণ্ডিত জেকবি সাহেবেরও মত এইরূপ। শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্-এ, Ph. D. মহোদয়ও এই মতেরই সমর্থন করেন। কাশীধামস্থ দুই-চারিজন পণ্ডিতও ইঁহাকে দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক বলিয়াই মত প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং আমরা তাহাই মানিয়া লইতে বাধ্য। তবে এ কথা বলিয়া রাখা ভাল যে, ইঁহার কাল-নির্ণয় সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থাদির অনুসন্ধান যেরূপভাবে করা প্রয়োজন, আমার বর্ত্তমান অবস্থায় সে সুযোগ ও সুবিধা কিছুই নাই। সুতরাং যদি কেহ এ বিষয়ের অন্যরূপ প্রমাণ উপস্থিত করেন, তবে সাগ্রহে তাহা জ্ঞাত হইয়া সুখী হইব।

সংস্কৃত সাহিত্যাদির আলোচনা কালে যখন এই পুস্তকখানির বিষয় অবগত হই, তখন হইতেই বহুকাল পর্য্যন্ত পুস্তকখানি দেখিবার জন্য বড়ই আগ্রহ ছিল। কিন্তু তাহা পূরণ করিবার সুযোগ পাই নাই। কারণ, আমার পরিচিত বন্ধু-বান্ধবগণের মধ্যে অনেকেরই নিকটে ঐ পুস্তকের বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া ব্যর্থ-মনোরথ হইয়াছি। তৎপরে প্রায় এক বৎসর হইল আমার হিন্দুস্থানী সংস্কৃতজ্ঞ এক বন্ধুর নিকট হইতে একখানি পুস্তক প্রাপ্ত হইয়া সাগ্রহে তাহা পাঠ করিয়াছি। পুস্তকখানি বারাণসী-ধামস্থ চৌখাম্বা সংস্কৃত পুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত,—জয়মঙ্গল-কৃত সম্পূর্ণ টীকা-সমন্বিত।

যেমন চিকিৎসা-শাস্ত্র-ব্যবসায়িগণকে প্রমেহ, উপদংশ, পুরুষত্বহীনতা প্রভৃতি রোগাবলীর বিষয়ে পুস্তক প্রণয়ন করিতে হইলে, অনেক গুহ্য বিষয়েরই আলোচনা স্পষ্টভাবেই করিতে হয়, প্রজননবিদ্যার অনুশীলনকারিগণকে জনন-সংক্রান্ত গবেষণা করিতে গিয়া সর্ব্বপ্রকার অবস্থারই বিবরণ প্রদান করিতে হয়; বাৎস্যায়ন মুনিপ্রবরও এই শাস্ত্রের আলোচনাতে প্রবৃত্ত হইয়া ইহার বিষয় সেইরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবেই বিবৃত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে তিনি দার্শনিক বিচার করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই; মোক্ষ-সাধন সম্বন্ধে আলোচনা করিতেও ছাড়েন নাই; আবার কামুকের নানাপ্রকার ভাব ও অবস্থাদির বিবরণ প্রদান করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই। আমি অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি, সংস্কৃত-জ্ঞানও আমার অতি সামান্য; কিন্তু যৎকিঞ্চিৎ মাত্র যাহা বুঝিতে পারি, তাহাতে আমার বোধ হয় যে, যিনি নিরপেক্ষভাবে ইহার অধিকরণাবলীর অন্তর্গত অধ্যায় ও প্রকরণসমূহ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিবেন, তিনিই গ্রন্থকর্ত্তার বিদ্যাবত্তা, পর্য্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ-ক্ষমতা এবং ভূয়োদর্শন প্রভৃতির পরিচয় পাইয়া চমৎকৃত হইবেন। মানব-মনোবৃত্তি নিচয়ের নানা ভাবে নানা রূপ বিকাশের সহিত বিশিষ্টরূপে পরিচিত না হইলে, এইরূপ সূত্র-গ্রন্থ প্রণয়ন করা সহজ নহে, ইহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন।

বলা বাহুল্য যে, বর্ত্তমান কালের রুচির সহিত তাৎকালিক রুচির যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। তাৎকালিক গ্রন্থের আলোচনা বর্ত্তমান কালের রুচি অনুসারে করা কর্ত্তব্য নহে এবং সমালোচনার পদ্ধতিও তাহ নহে বোধ হয়।

ইহার অনেক অধ্যায় বা প্রকরণ বর্ত্তমান কালের রুচিগ্রস্তগণের নিকট অতীব ধিক্কারজনক বলিয়াই বোধ হইবে সন্দেহ নাই। আমাদের নিকটও স্থানে-স্থানে কতকটা সেরূপ বোধ যে না হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু তাহা হইলেও, গ্রন্থকর্ত্তার মানব-মনোমন্দিরের প্রত্যেক কুট্টিমের সহিত এরূপ পরিচয়ের প্রশংসা না করিয়া থাক যায় না।

আমরা যে পুত্র-কন্যাগণকে কাম প্রবৃত্তি বিষয়ে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখি, ইহার সমীচীনতা সম্বন্ধেও অনেক পাশ্চাত্য মনীষী, বৈজ্ঞানিক ধর্ম্মাচার্য্যগণ পর্য্যন্ত সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে উপযুক্ত বয়সে এ বিষয়ের শিক্ষাও অতি সাবধানে কিছু-কিছু প্রদান করিলে, সন্তানগণের বিপথে যাইয়া নানারূপ দুঃখ-কষ্ট ও রোগের হাতে পড়িবার আশঙ্কা কম হইতে পারে। তাহারা উপযুক্ত পাত্রের নিকট হইতে উপযুক্ত ভাবে প্রকৃত শিক্ষা না পাওয়ায়, অনুপযুক্ত স্থল হইতে বিকৃত শিক্ষা পাইয়া কষ্ট পায়। তাহাদের এই কষ্ট ভোগের জন্য তাহাদের পিতামাতাই দায়ী।

কাম একটী স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। সংসার-স্থিতির জন্য ইহা প্রয়োজনীয়তা। ইহার অভাবে সংসার জীবশূন্য মরুময় হইয়া পড়ে। সুতরাং ইহার সেবা যে অন্যায়, অধর্ম্ম, ইহা কেহই বলিতে পারেন না। ধর্ম্ম, অর্থ, মোক্ষ যাহাই হউক, প্রথমে কাম না হইলে তাহার প্রয়োজনীয়তাই লুপ্ত হয়। কারণ, কাম না থাকিলে প্রজা থাকি

না; প্রজাই যদি না থাকিল, তবে ধর্ম্ম, অর্থ এবং মোক্ষের সেবা কে করিবে? অতএব কাম অবহেলার বস্তু নহে।

উপযুক্ত ভাবে ইহার সেবা দ্বারাই সংসারের স্থিতি। সুতরাং ইহার উপযুক্ত সেবার উপদেশ যদি গৃহস্থধর্ম্মসাধনেচ্ছুগণকে আগে হইতেই প্রদান করা যায়, তবে অপব্যবহারের আশঙ্কা কম হয় বৈ কি! কিন্তু আমরা নিজে এ বিষয়ে উপদেশ দিবার উপযুক্ত পাত্র নহি মনে করিয়াই সেরূপ উপদেশ দিতে আশঙ্কিত হই, পাছে শিব গড়িতে বানর গড়িয়া ফেলি, পাছে উপদেশ করিতে গিয়া সন্তানের বিপথ-গমনের পথই আরও সরল ও প্রশস্ত করিয়া দিই!

এ আশঙ্কার হেতু নিশ্চয়ই আছে। কারণ "স্বয়মাঙ্গথ্যকথং পরান্ সাধয়েৎ।" তবে এ বিষয়ে ধীরভাবে বিবেচনা করিবার সময় দেশে আসিয়াছে। সন্তানগণকে কি উপায়ে কি পদ্ধতিতে এই সব গুহ্য শিক্ষাও দেওয়া যাইতে পারে, তাহা গভীরভাবে প্রণিধান করা দেশের মঙ্গলের জন্য কর্ত্তব্য বোধ করি। কারণ, স্বীয়-স্বীয় অভিজ্ঞতার ফল হইতে বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, ইন্দ্রিয় চালনার অপব্যবহারে বালক ও কিশোরদিগের মধ্যে কতরূপ অনিষ্ট হইতেছে! আমাদের দেশে বালিকাগণ বড় বেশী দিন অবিবাহিতা থাকে না; সুতরাং তাহাদের মধ্যে এরূপ দোষের প্রসার একরূপ নাই বলিলেই চলে। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিতা থাকার জন্য অনেক সময় কুমারীগণের মধ্যেও নানারূপ দোষের প্রসার হইয়া থাকে বলিয়া পাশ্চাত্য অনেক বিদ্বান্ ব্যক্তিও আক্ষেপ করিয়াছেন দেখিতে পাই। আমাদের দেশের বাঙ্গালা সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্র-পত্রিকাগুলির বিজ্ঞাপন-স্তম্ভ এবং পঞ্জিকার বিজ্ঞাপন-পত্রগুলি যাঁহারা মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই দেখিতে পাইবেন যে, আজকাল ইন্দ্রিয়-ঘটিত রোগাদি এবং শক্তিবৃদ্ধির ঔষধের কত প্রকারে প্রচার হইতেছে; আর ইহাও অনুসন্ধানে জানিতে পারিবেন যে, ঐ সমস্ত ঔষধাবলীর গ্রাহকগণের মধ্যে অর্দ্ধেকেরও বেশীই কিশোর ও যুবকগণ। অন্ততঃ আমি এ বিষয়ের অনুসন্ধানে যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে আমার ঐ ধারণা দৃঢ় হইয়াছে।

ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, এই বিষয়েরও উপযুক্ত শিক্ষা যৌবনাবস্থাতে প্রবেশোন্মুখগণকে সাবধানে দিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে, বোধ হয় দেশের প্রকৃত মঙ্গলের একটা প্রধান পথ পরিষ্কার করা হয়।

কামসূত্রের আলোচনা করিতে আসিয়া প্রসঙ্গতঃ এই সব কথার অবতারণা অপ্রাসঙ্গিক মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু একটু ধীর ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে ঠিক তাহা নহে।

কামশাস্ত্রটা যে অবহেলার জিনিস নহে, ইহার আলোচনামাত্রই যে দোষযুক্ত নহে, ইহারই প্রসঙ্গে ঐ সব কথা বলিতে হইয়াছে।

প্রাচীন মুনি-ঋষিগণ কামের বৈধ ব্যবহার প্রয়োজনীয়ই মনে করিতেন; এ জন্য এ শাস্ত্রের চর্চ্চা দূষণীয় মনে করেন নাই। বয়োধর্ম্মে বিলাস-বাসনাও সাধারণতঃ লোকের মনে উপস্থিত হয়। সকলকেই মোহমুদ্গর পড়াইয়া বৈরাগী করিতে চাহিলে, তাহাতে সাফল্য লাভের আশা আকাশকুসুমে পর্য্যবসিত হয়। আর এই সৌন্দর্য্যাধার পৃথিবীর অসংখ্য সুন্দর বস্তুও জীবের ভোগের জন্যই হইয়াছে। তবে সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতম্। কিছুই অত্যধিক ভাল নহে। 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা', এই শাস্ত্রের আদর্শ। কেবল কামোপভোগের জন্য দার-সংগ্রহ নহে, গৃহস্থ সংসার-স্থিতির জন্যই বিবাহ করিয়া আশ্রম-ধর্ম্মাচরণ করিবেন, ইহাই শাস্ত্রকারের অভিপ্রায়।

তবে বিলাসী কি নাই? প্রাচীনগণ ইহাও বুঝিতেন যে ভিন্নরুচির্হিলোকঃ। সংসারে একই প্রকৃতির লোক সকলে হইতে পারে না। পূর্ব্ব-সংস্কার-বশতঃ লোকের প্রকৃতি ভিন্ন-ভিন্ন; বিভিন্ন মুখে প্রবহমান এই প্রবৃত্তির স্রোত রুদ্ধ করা তাঁহারা অস্বাভাবিক ও অসম্ভব মনে করিতেন। তাই তাঁহাদের এই বাণী "প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।"

এই জন্যই তাঁহারা ধর্ম্মজগতেও যেমন কাহারও জন্য নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনা, কাহারও জন্য সাকার, কাহারও জন্য শৈব, কাহারও জন্য শাক্ত, এমন কি নরহত্যাকারী দস্যুর জন্য পর্য্যন্ত তদীয় প্রকৃতিরই উপযোগী পূজা-পদ্ধতির ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেইরূপ অন্যান্য দিকেও বিভিন্ন অধিকারীর জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা করিয়াছেন।

কামশাস্ত্র বলিতে কাম সম্বন্ধীয় সর্ব্বশ্রেণীর লোকের সর্ব্বপ্রকার ভাব সমষ্টিকেই বুঝাইবে সুতরাং যিনি কামশাস্ত্রের আলোচনা করিবেন, অথবা কামসূত্র প্রণয়ন করিবেন, তাঁহাকে কামের সর্ব্বপ্রকার বিকাশেরই সহিত পরিচিত হইতে হইবে এবং তাহাদের নানা ভাবেরই আভাস দিতে হইবে। তির্য্যক্ যোনী হইতে আরম্ভ করিয়া সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানব পর্য্যন্ত তাঁহাকে আসিতে হইবে এবং মানবের মধ্যে নানা প্রকৃতির লোক থাকার কারণে তাঁহাকেও প্রত্যেক প্রকৃতির মধ্যে কামের বিকাশ ও প্রসারের ধারা ও গতি লক্ষ্য করিয়া তাহার পরিচয় প্রদান করিতে হইবে। তাহাতে সঙ্কুচিত হইলে চলিবে না, লজ্জা করিলে চলিবে না।

বাৎস্যায়ন মুনি; তিনি স্থিরধী, নির্ব্বিকার-চিত্ত; সুতরাং নির্ব্বিকার ভাবেই তিনি কুলটার কুটিল কটাক্ষ বিশ্লেষণ হইতে আরম্ভ করিয়া একচারিণী সতীর ব্রত-পালনের কথা পর্য্যন্ত আমাদিগকে শুনাইয়াছেন; নানারূপ প্রকৃতির নায়কের নানারূপ পরিচয় আমাদিগকে দিয়াছেন। ইহার আলোচনার ফলে তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি লোক চিনিবার অনেক সুযোগ লাভ করিতে পারিবেন।

আর, এই পুস্তকের আলোচনা দ্বারা আমরা তাৎকালিক ভারতীয় সমাজের অনেক প্রকার তথ্য অবগত হইতে পারি; সেকালের সংসার-যাত্রা-নির্ব্বাহের একখানি সুন্দর চিত্র আমরা দেখিতে পাই; অনেক আচার-ব্যবহারের পরিচয় পাইতে পারি। সাহিত্যের হিসাবেও এগুলির মূল্য কম নহে। এই সব কথা বিবেচনা করিয়া আমি এই পুস্তকখানির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বর্ত্তমান কালের রুচির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া

ইহার সকল প্রকরণের বিস্তৃত আলোচনা মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় করা সম্ভবপর নহে; আমরা তাহা করিতেও চাহি না; তবে যে সমুদায় বিষয়ের আলোচনা অনায়াসেই করা যাইতে পারে, তাহা দ্বারাই আমরা তাৎকালিক সামাজিক আচার-ব্যবহার, নিয়ম-পদ্ধতি প্রভৃতির এক একটা ছায়া পাঠক বর্গের গোচরে আনিতে চেষ্টা করিব।

এবার উপক্রমণিকাতেই অনেক স্থান আবশ্যক হইয়াছে বলিয়া আর বেশীদূর অগ্রসর হইতে সাহস করি না। বাৎস্যায়ন মুনিবর তাঁহার এই শাস্ত্রের মূল সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার একটা বিবরণ মাত্র দিতেছি।

এস্থলে বলিয়া রাখা ভাল যে, ন্যায়সূত্রের টীকা-ভাষ্যকারগণের মধ্যে যে একজন বাৎস্যায়নের নাম পাওয়া যায় তিনি, এবং আমাদের বাৎস্যায়ন অভিন্ন ব্যক্তি নহেন। দুইজনেই স্বতন্ত্র ব্যক্তি, এ কথা পণ্ডিতগণ নিঃসংশয়ে স্থির করিয়াছেন।

গ্রন্থকর্ত্তা প্রথমে ধর্ম্মার্থ কামকে নমস্কার করিয়া ঐ উপলক্ষে ইহাদের অন্যোন্য প্রাধান্যাদির বিচার পূর্ব্বক বলিতেছেন যে, প্রজাপতি প্রজাগণকে সৃষ্টি করিয়া তাহাদের স্থিতির জন্য ত্রিবর্গ-সাধন উপদেশ-শাস্ত্র শত-সহস্র শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছিলেন; স্বায়ংভুব মনু তাহারই ধর্ম্মাধিকারিক অংশ পৃথক করিয়া প্রচার করেন। অর্থাধিকারির অংশ বৃহস্পতি প্রচার করেন। আর শিবানুচর নন্দী সহস্র অধ্যায়ে কামসূত্র প্রচার করেন। উদ্দালক-পুত্র শ্বেতকেতু আবার তাহাই পাঁচ শত অধ্যায়ে প্রচার করেন। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, এই শ্বেতকেতুই স্ত্রীগণকে সাধারণ ভোগ্যভাব হইতে মুক্ত করিয়া গম্যাগম্যাদি বিচার-পূর্ব্বক নিয়ম-বন্ধন করিয়াছেন।

তার পর পাঞ্চালদেশীয় বাভ্রব্য এই শাস্ত্র সাধারণ, সাংপ্রযোগিক কন্যা সংপ্রযুক্তক, ভার্য্যাধিকারিক, পারদারিক, বৈশিকী, পনিষদিক, এই সপ্তাধিকরণে সংক্ষেপ করেন।

দত্তক নামক এক ব্রাহ্মণ আবার পাটলিপুত্রনগরবাসিনী গণিকাগণের অনুরোধে উহার বৈশিক নামক অধিকরণটি পৃথক করেন।

তাঁর দেখাদেখি চারায়ণ সাধারণ, সুবর্ণনাভ সাংপ্রযোগিক, ঘোটকমুখ কন্যা সংপ্রযুক্তক, গোনর্দীয় ভার্য্যাধিকারিক, গোণিকাপুত্র পারদারিক, এবং কুচুমার ঔপনিষদিক প্রকরণ যথাক্রমে পৃথক করিয়া প্রচার করেন।

এইরূপে নানা আচার্য্যের দ্বারা এই শাস্ত্র খণ্ডে খণ্ডে প্রণীত হইয়া প্রায় বিনষ্ট হইয়া যাইবার উপক্রম হয়।

ইহা দেখিয়া মুনিপ্রবর বাৎস্যায়ন বাভ্রব্য-প্রণীত গ্রন্থ অতি বৃহৎ বলিয়া লোকের পক্ষে দুরধ্যেয় বিধায় এবং দত্তকাদি প্রণীত শাস্ত্র একদেশ অর্থাৎ এক-একটা বিষয় অবলম্বনে লিখিত বলিয়া, তাহা হইতে কাম-শাস্ত্রের সমস্ত জ্ঞান হওয়া অসম্ভব মনে করিয়া, সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ই সংক্ষেপ করিয়া বাভ্রব্যোক্ত সপ্তাধিকরণ-সমন্বিত ছত্রিশ অধ্যায় এবং চৌষট্টি প্রকরণ বিশিষ্ট সম্পূর্ণ এই কামসূত্র নামক গ্রন্থ প্রণয় করিয়াছেন। সাধারণ অধিকরণে শাস্ত্র সংগ্রহ ত্রিবর্গ প্রতিপত্তি বিদ্যাসমুদ্দেশ, নাগরিকবৃত্ত, নায়কসহায় দূতীকর্ম্ম বিমর্শ এই পাঁচ প্রকরণ আছে।

সাংপ্রযোগিক নামক দ্বিতীয় অধিকরণে ১৭টি প্রকরণ আছে অধ্যায় দশটি।

কন্যাসংপ্রযুক্তক নামক তৃতীয় অধিকরণে বরণ বিধান, সম্ব নির্ণয় ইত্যাদি নয়টি প্রকরণ আছে; অধ্যায় পাঁচটি।

ভার্য্যাধিকারিক নামক চতুর্থ অধিকরণে একচারিণী বৃত্ত-প্রবা চর্চ্চা, সপত্নীদের সঙ্গে ব্যবহার ইত্যাদি ছয়টি প্রকরণ এবং দুই অধ্যায়।

পারদারিকাখ্য পঞ্চমাধিকরণে স্ত্রী-পুরুষ শীলাবস্থান, ব্যাবর্ত্ত কারণ প্রভৃতি দশটি প্রকরণ ও ছয়টি অধ্যায়।

বৈশিক নামক ষষ্ঠাধিকরণে দ্বাদশটি প্রকরণ এবং ছয়টি অধ্যায়

উপনিষদিক নামক সপ্তমাধিকরণে সুভগকরণ, বশীকরণ, বৃয় যোগ" প্রভৃতি ছয়টি প্রকরণ এবং দুইটি অধ্যায়।

কালিদাস ও ভবভূতির নাটকে নারীচরিত্র

[অধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্রদাস চৌধুরী এম-এ]

(২)

বিক্রমোর্বশী

সংক্ষিপ্ত বিবরণ :—পুরূরবা নামক চন্দ্রবংশীয় রাজা প্রতিষ্ঠা নগরে রাজত্ব করিতেন। কাশীরাজ্যের কন্যা ঔশীনরী তাঁহার প্রধা মহিষী ছিলেন। একদিন পুরূরবা বিমানচারী রথে ভ্রমণ কা দেখিতে পাইলেন, কেশীদানব আকাশ-পথে উর্ব্বশীকে হরণ করি লইয়া যাইতেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ দানবকে দমন করিয়া উর্ব্বশীকে মু করিলেন। উভয়ের চারি চক্ষুর মিলন হইল। সেইদিন হইতে রাজা মু হইলেন,—পুরূরবার রূপ দর্শনে উর্ব্বশীও মজিল। তাহার মনে আ শান্তি নাই, স্বর্গের প্রত্যেক দৃশ্যই অমৃতালোকের পরিবর্ত্তে যেন তাহা চক্ষে বিষকণা বর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্নরীর কলতান, গন্ধর্ব্বে মৃদঙ্গনাদ ও মন্দারের মালা তাহার আনন্দ সাধন করিতে পারিল না "লক্ষ্মীর স্বয়ম্বর" অভিনয়ে "পুরুষোত্তম" স্থলে উন্মনা উর্ব্বশী অকস্মা পুরূরবা শব্দ উচ্চারণ করিয়া দেবেন্দ্রের রোষপূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করিল তিনি অভিশাপ দিলেন—"যতদিন না পুরূরবা পুত্রমুখ দর্শন করে ততদিন তুমি স্বর্গভ্রষ্টা হইয়া তাঁহার নিকট অবস্থান করিবে।" উর্ব্বশী শাপে বর হইল, মহানন্দে সে প্রতিষ্ঠান নগরে উপস্থিত হইল।

এদিকে রাণী ঔশীনরী রাজার বিমর্ষাবস্থা হইতে সমস্ত অনুমা করিয়া লইলেন, "প্রিয়প্রসাদন" নামক কঠোর ব্রত ধারণ করি প্রতিজ্ঞা করিলেন, উর্ব্বশীর প্রণয়ে তিনি কোনও বাধা জন্মাইবে না। উভয়ের মিলন হইল। উর্ব্বশী ও রাজা হিমালয়ে বিহার করি

গমন করিলেন। একদিন পুরূরবা একটী গন্ধর্ব্ব-বালিকার প্রতি কুৎসিত ভাবে দৃষ্টিপাত করেন ; তাহা দেখিয়া উর্ব্বশী ক্রুদ্ধা ফণিনীর মত গর্জ্জিয়া উঠে, এবং অভিমান ভরে 'কুমারবনে' প্রবেশ করিয়া লতায় পরিণত হয়। রাজা তাহার বিরহে উন্মাদপ্রায় হইয়া বনে-বনে বৃথা পরিচারণ করেন। বহুদিন পরে দৈবচক্রে আবার উর্ব্বশীর সঙ্গে তাঁহার মিলন হয় এবং তিনি রাজ্যে প্রত্যাগমন করেন। উর্ব্বশীর গর্ভে পুরূরবার 'আয়ু'নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। হতভাগিনী এতদিন শাপমুক্তি ভয়ে তাহাকে রাজার দৃষ্টি হইতে লুকাইয়া রাখে; কিন্তু একদিন অকস্মাৎ পুত্র আসিয়া পিতার সহিত মিলিত হয়। উর্ব্বশী আবার ইন্দ্রের নূতন আদেশে পুরূরবার মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে সুখে বাস করিতে থাকে।

ঔশীনরী :—

যে ভারতে পতির মৃত্যুতে রমণী নিজের সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পার্শ্বে চিতায় উঠিয়া বসিতে পারে,—সেই ভারতেরই কবি কালিদাস! নারী-হৃদয়ের এত বল, নারী-চরিত্রের এত উৎকর্ষ কেবল ভারতেই সম্ভবে। পতির প্রীত্যর্থ পত্নী কতদূর আত্মত্যাগ করিতে পারে, ইহা দেখাইতেই কালিদাসের ঔশীনরীর সৃষ্টি! স্বামীর সঙ্গে চিতানলে প্রাণ বিসর্জ্জন করা বরং সহজ, কারণ উহাতে চক্ষু মুদিত করিলেই কষ্টের অবসান হয়। কিন্তু হিন্দু সতী স্বামীর সন্তোষের জন্য উহা হইতেও ভয়ঙ্কর আত্মত্যাগ করিতে পারে। ঔশীনরী তাহা করিয়াছিলেন। অনেক সময়ে আমরা উপলব্ধি করিয়া থাকি যে, মানব-জীবনের কতকগুলি মানসিক কষ্ট মৃত্যুর চেয়েও অধিক যন্ত্রণাপ্রদ হইয়া দাঁড়ায়। মৃত্যুর অনল একদিন পুড়িয়া নিবিয়া যায়, কিন্তু মনের অশান্তি তুষানলের মত আজীবন জ্বালাইয়া মারে। সেই জীবন্মৃত অবস্থা বড়ই ভয়ানক! রমণীর সপত্নীবিদ্বেষ উক্ত ক্লেশ-নিচয়ের মধ্যে একটী। সপত্নীবিদ্বেষ কত যন্ত্রণাপ্রদ, কত অপ্রীতিকর, কত ভীষণ, তাহা রমণীই জানে, পুরুষ তাহা বুঝিতে পারে না। আমরা সীতা, দ্রৌপদী, সাবিত্রী ইত্যাদি সাধ্বীর চরিত্র পড়িয়াছি,—সকলেই নিজে অনন্ত শারীরিক কষ্ট স্বীকার করিয়াও বনগহনে পতির মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন,—কিন্তু কামপরায়ণ স্বামীর চিত্ত-তর্পণের জন্য একটী বারবণিতাকে নিজের অধিকার অকাতরে ছাড়িয়া দিয়া,—নীরবে সেই অত্যাচার সহ্য করিতে আমরা কয়জনকে দেখিয়াছি? উহা যে বড় ভয়ঙ্কর অবস্থা! উহার প্রতীকার করিতে না পারিয়া, নারী আত্মহত্যা করিয়া মরে,—কিন্তু বাঁচিয়া থাকিয়া নীরবে, অকাতরে এই জ্বালা সহ্য করিতে পারে না। যদি কেহ পারে, তবে সে মানবী নহে, দেবী; এবং ঔশীনরী তাহারই একজন!

ঔশীনরী বুঝিলেন যে, পুরূরবার অধঃপতন হইতেছে। ঔশীনরীর ক্ষমতা অতুল। তিনি ইচ্ছা করিলে রাজার উর্ব্বশী-প্রণয়ে বাধা জন্মাইতে পারিতেন,—কিন্তু বুঝিয়া দেখিলেন যে, রাজা এত বেগে নামিয়া যাইতেছে, যে উহার মধ্যে যদি একটা কঠোর প্রাচীর আসিয়া দাঁড়ায়, তবে সে পতন নিবারণ করিতে গিয়া পতনপর হৃদয়ের গুরুতর অনিষ্ট করিতে হইবে। হৃদয় সংশোধিত হইবে না, পরন্তু, সেই কঠিন সংঘর্ষণে, উহা চূর্ণ্যমান স্ফটিক-ডিম্বের মত, সহস্রখণ্ডে বিধ্বস্ত হইয়া পড়িবে। তাই ঔশীনরী পথ ছাড়িয়া দাঁড়াইলেন। তিনি সাধ্বী, পতিপরায়ণা নারী। সহৃতা গুণ নারী-হৃদয়েই যথেষ্ট। তিনি তাহার সজীব আদর্শ। রমণী পুরুষের সব অত্যাচার সহ্য করিতে পারে, করিয়াও থাকে। ঔশীনরী প্রাণ ভরিয়া পুরূরবাকে ভালবাসিতেন,—তিনি তাঁহার অন্তরে শেলবিদ্ধ করিতে পারেন না। যদি নিজের হৃৎপিণ্ড উৎপাটিত করিয়া উপহার দিতে হয়, তাহাতেও ঔশীনরী কাতরা নহেন। কিন্তু স্বামীর মনে কষ্ট দেওয়া অসম্ভব!

শুভ্র জ্যোৎস্নাময়ী রজনী। নীরব উল্লাসে শশধর পৃথিবীর পানে চাহিয়া ছিল। মধ্যনিশি অতীত হইয়াছে। প্রতিষ্ঠান নগরের সর্ব্বত্র গভীর শান্তি বিরাজমান। হর্ম্ম্য-শিখরে বিদূষকসহ পুরূরবা বসিয়া উর্ব্বশীর চিন্তায় নিমগ্ন। উর্ব্বশী আসিয়া অলক্ষ্যে দাঁড়াইয়াছে। এমন সময়ে ঔশীনরী রক্তবসন পরিধান করিয়া মঙ্গলময়ীরূপে রাজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রাজা দেখিয়াই শিহরিলেন! এ কি বেশ! বুঝিলেন, রাণীর মনে কোনও একটী গুরুতর পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। সেদিন ঔশীনরী সতীর তেজে বজ্র-গম্ভীর স্বরে রাজাকে সাবধান করিয়া বলিয়াছেন—"এখনও যদি পারেন ফিরিয়া আসুন। আমি জানি, আমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে; কিন্তু তজ্জন্য আমি দুঃখিতা নহি। আপনার সুখেই আমার সুখ। কিন্তু উর্ব্বশীর প্রেমে আপনার সুখ হইবে না,—আমার ভয় হইতেছে,—আপনার পরিণাম ভয়ঙ্কর! রাক্ষসী আমার বক্ষ হইতে একটী উজ্জ্বল রত্ন অপহরণ করিল; তজ্জন্য আমি দুঃখিত নহি। কিন্তু আমার আশঙ্কা, সে এই রত্নের যথোচিত যত্ন করিবে না। সে এই রত্নের অমঙ্গল সাধন করিবে। অতএব রাজন্, আবার বলি সাবধান!" সতীর এই মৃদুমধুর তিরস্কারে পুরূরবা একটু রাগ করিয়াছিলেন; কিন্তু আজ হঠাৎ ঔশীনরী আসিয়া সংসারত্যাগিনী ব্রহ্মচারিণীর বেশে গম্ভীর অথচ আনন্দিত বদনে দাঁড়াইলেন; তাই রাজা ভীত হইলেন। ঔশীনরী, উর্দ্ধে নীরব আকাশ, আকাশে চন্দ্রমা, নিম্নে সুপ্ত জগৎ ও সম্মুখে প্রিয় পতিকে সাক্ষী করিয়া বলিলেন—"আজ আমি প্রিয়-প্রসাধন ব্রত করিব। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আজ হইতে আর্য্যপুত্র যে রমণীকেই কামনা করুন না কেন, আমি তাহাতে বিন্দুমাত্রও বাধা দিব না। আমি নীরবে সরিয়া দাঁড়াইব! আমি তজ্জন্য দুঃখিত নহি। আমি নিজের সুখ চাহি না; বরং নিজের সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিয়া আমার প্রিয়তমকে সন্তুষ্ট করিতে চাহি। ইহাই আমার প্রার্থনা ও স্থির সঙ্কল্প!"—"এষা দেবতামিথুনং রোহিণী মৃগলাঞ্ছনং সাক্ষীকৃত্য আর্য্যপুত্রং প্রসাদয়ামি। অদ্য প্রভৃতি আর্য্যপুত্রঃ যাং স্ত্রিয়ং কাময়তে, যা চ আর্য্যপুত্রস্য সমাগমপ্রার্থিনী তয়া সহ মে অপ্রতিবন্ধেন বর্ত্তিতব্যম্।" "...অহং খলু আত্মনঃ সুখাবসানেন আর্য্যপুত্রস্য সুখমিচ্ছামি!" এই বলিয়া ঔশীনরী দাঁড়াইলেন। রাজা চমকিয়া বলিলেন, "এ কি! এ কি করিলে রাজ্ঞি!" আকাশ স্তব্ধ হইয়া এ দৃশ্য দেখিল, মাথার

উপর চকোর ডাকিয়া গেল। এই অদ্ভুত আত্মত্যাগ দেখিয়া চন্দ্রও যেন আকাশে কতক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। স্বর্গের অপ্সরা উর্ব্বশী মর্ত্ত্য-নারীর এই আত্মত্যাগ দর্শন করিয়া শিহরিল। নির্ব্বাক বিস্ময়ে সেই পবিত্র বদনটি একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। ধীরে-ধীরে ঔশীনরী রজনীর অন্ধকারে মিশিলেন। তার পর আমরা আর তাঁহাকে দেখি নাই।

উর্ব্বশী

হৃদয়ে কামনা জন্মিলেই যে,—মানবের কেন,—দেবতারও অধোগতি হয়,—ভোগের পরিণাম যে জ্বালাময়,—বাসনার সঙ্গে-সঙ্গে যে কঠোর বন্ধন ঘটে,—ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্যই কবির উর্ব্বশী-সৃষ্টি।—উর্ব্বশী স্বর্গের জিনিস। স্বর্গের বিলাস, স্বর্গের রূপ ও ঐশ্বর্য্য তাহার ভোগপ্রবণ হৃদয়ে শান্তি দিতে পারিল না। তাই স্বর্গ-বিলাসিনী হইয়াও তাহার মর্ত্ত্যে পতন ঘটিল। বাসনায় তাহার মর্ত্ত্যে আজীবন বন্ধন ঘটিল।

উর্ব্বশী পরমা সুন্দরী,—সে সৌন্দর্য্যে ত্রিদিবধাম মোহিত। যে সৌন্দর্য্যের পানে চন্দ্র একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে, স্বয়ং মদন ইন্দ্রসভায় বসিয়া যে রূপ দর্শনে মুগ্ধ হয়, তাহা যে কত তীব্র, কত উজ্জ্বল, কত প্রদাহী তাহা অনুমেয়। তাই মুগ্ধ হইয়া কবি গাইয়াছেন—

"অস্যাঃ সর্গবিধৌ প্রজাপতিরভূচ্চন্দ্রোনুকান্তিপ্রদঃ।
শৃঙ্গারৈকরসঃ স্বয়ং নু মদনো মাসো নু পুষ্পাকরঃ॥
বেদাভ্যাসজড়ঃ কথং নু বিষয়ব্যাবৃত্ত কৌতূহলঃ।
নির্মাতুং প্রভবেন্ মনোহরমিদং রূপং পুরাণো মুনিঃ॥"

ইহা বিচিত্র কি যে, সেই জ্বালাময়ী সুষমা নারীপ্রিয় পুরূরবাকে উন্মাদ করিয়া তুলিবে? কিন্তু যে সৌন্দর্য্য পরকে মুগ্ধ করে, তাহা আবার নিজের তৃপ্তিও চায়। প্রদীপ-শিখা কেবল আলোক বিস্তার করিয়া তৃপ্ত নহে, মুগ্ধ শলভের প্রাণ-বলিও চায়! ঐ কামনার অবসান নাই, উহা মুহুর্মুহুঃ উত্তেজিত হয়। তাই কবি বলেন—

"ন জাতু কাম কামিনাং উপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥"

তাই আজীবন স্বর্গ-বিলাস উপভোগ করিয়াও উর্ব্বশীর তৃপ্তি হইল না। সে আবার পুরূরবাকে দেখিয়া ভুলিল। বাসনাগ্নির কৃষ্ণ ধূম যখন অন্তরে প্রসার পায়, তখন মানব অন্ধ হয়, হিতাহিত বুঝে না, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান দেখিতে পায় না। তাই উর্ব্বশী স্বর্গের সমস্ত দ্রব্য ভুলিয়া পুরূরবাতে লীন হইল। দেবসভায় উন্মনা হইয়া পুরূরবার নাম উচ্চারণ করিয়া অভিশপ্তা হইল। প্রেমের জন্য বারাঙ্গনাও যে অতুল ঐশ্বর্য্য ও স্বর্গসম্পৎ পরিত্যাগ করিতে পারে, তাহা উর্ব্বশীর চরিত্রেই নূতন বটে। মহাকবি ভাস কিংবা শূদ্রকের 'বসন্তসেনা'ও ঐশ্বর্য্যের মস্তকে পদাঘাত করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার প্রেম মর্ত্ত্যস্থ হইলেও স্বর্গীয়। উহাতে স্বার্থ ছিল না—কীট ছিল না। তাহা ক্রমে বর্জিত।

উর্ব্বশী রমণী হইলেও বারনারী। তাহার কলুষিত হৃদয়ে নারী-সুলভ কোমল পদার্থটুকু লুপ্ত হইয়াছিল। তাহারি সম্মুখে দেবী ঔশীনরী রাজার পায়ে আত্মবলি দিয়া প্রস্থান করিল,—তাহাতে সে চমকিল বটে, কিন্তু দুঃখিতা হইল না। উর্ব্বশীর মুখে সারা নাটকে ঔশীনরী সম্বন্ধে একটী সহানুভূতির কথাও শুনি নাই। উর্ব্বশী জানিত, সে মর্ত্ত্যে মাত্র রাজাকে চিনে,—কয়েক দিন রাজাকে লইয়া ভোগ করিবে, তাই মর্ত্ত্যে আসিয়াছে। রাজ্যের কিংবা রাজ-পরিবারের তাহাতে কি ক্ষতি-বৃদ্ধি হইল, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিবারও তাহার অবসর নাই। সে তাই, পশুভূত উন্মাদ রাজাকে লইয়া হিমাচলে চলিল। দানবীর ভোগ পবিত্র রাজসংসারে সম্পূর্ণ হইতে পারে না; তার জন্য নূতন রাজ্য চাই! কিন্তু তাহাতে রাজ্যের কি দুর্দ্দশা ঘটিবে, তদ্বিষয়ে সে একটীবারও চিন্তা করিল না। মর্ত্ত্যের রাজ্যের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ কি?

উর্ব্বশীর প্রেম আবার ঈর্ষ্যাময়। উহাতে সামান্য আঘাত লাগিলে সেই হিংসা লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া জ্বলিয়া উঠে। হিমালয়ে একটী গন্ধর্ব্ব-কন্যকার প্রতি রাজা একটু কটাক্ষে চাহিলেন,—ইহাতেই উর্ব্বশী দৃপ্তা ফণিনীর মত গর্জ্জিয়া উঠিল; রাজাকে কত তিরস্কার করিল এবং অবশেষে বিষম ক্রোধে 'কুমার বনে' প্রবেশ করিয়া লতায় পরিণত হইল। আর ঔশীনরী! কত উচ্চে! রাজা উভয়ের পার্থক্য বুঝিলেন বুঝিলেন কি, সাধ্বী মর্ত্ত্য নারীর নির্ম্মল প্রেম মধুর, না সুন্দরী স্বর্গবেশ্যার জ্বালাময় প্রণয় মনোরম? কবি একটী চিত্রেই অনন্ত কথা বলিয়া গেলেন।

কবি অন্য স্থলে একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে দেখাইয়াছেন—সাধ্বী আর বারনারীর হৃদয়ের পার্থক্য কত! দেবতার আদেশ ছিল,—যখন পুরূরবা পুত্রের মুখ দেখিবেন, তখনই উর্ব্বশীকে স্বর্গে ফিরিতে হইবে। উর্ব্বশী ইহা জানিত, ও বেশ করিয়া মনে রাখিয়াছিল। পুত্র 'আয়ুর' জন্ম হইল, কিন্তু হতভাগিনী রাজাকে এই কথা জানিতেও দিল না। গোপনে মহর্ষি চ্যবনের আশ্রমে লইয়া গিয়া জনৈক তপস্বিনীর হস্তে ঐ পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণ-ভার অর্পণ করিল। কিন্তু দৈবচক্রে যখন সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রাজার সম্মুখে উপনীত হইল, তখন এক অদ্ভুত দৃশ্য! কোথায় হতভাগিনী জননী বহু বৎসর পরে পুত্রমুখ দর্শন করিয়া আনন্দে অধীর হইয়া পুত্রকে আলিঙ্গন করিবে,—না, সে তাহাকে দেখিবামাত্রই রাজসভার এককোণে গিয়া দাঁড়াইল ও বিষাদে ক্রন্দন করিতে লাগিল। কেন না, দেবতার আদেশ—সেই মুহূর্ত্তেই তাহাকে স্বর্গমুখিনী হইতে হইবে। কি আশ্চর্য্য! এত কাল ভোগ করিয়াও তাহার বাসনার তৃপ্তি হইল না—আরও চাই! বর্ষীয়সী জননী ভোগ-পথে প্রতিহত হইয়া বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রের সম্মুখে ক্রন্দন করিল। কি ঘৃণিত দৃশ্য! কুমার 'আয়ু' সে দৃশ্য দর্শনে বিষম লজ্জিত হইল। রাজা ও সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

আবার বলিতে হয়—কোথায় উর্ব্বশী, আর কোথায় ঔশীনরী! কোথায় স্বর্গের ভোগপরায়ণা নারী, আর কোথায় মর্ত্ত্যের সাধ্বী গৃহ-

লক্ষ্মী! ভোগে পতন, ভোগে বন্ধন! উর্ব্বশী কেবল যে স্বর্গভ্রষ্টা হইল তাহা নহে, মর্ত্ত্যে আজীবন বদ্ধ রহিল! আর ভোগ-নিবৃত্তিতে ঔশীনরীর উর্দ্ধ-গমন ও মুক্তি! ইহাই সংসারের নিয়ম! মানুষ ইহা বুঝে বটে, কিন্তু চক্ষুর সম্মুখে কার্য্যে দেখিতে পায় না। বক্তা ইহা বক্তৃতায় প্রকাশ করেন বটে, কিন্তু সজীব করিয়া দেখাইতে পারেন না। কিন্তু কবি কল্পনার দ্রব্যে শুধু সৌন্দর্য্য দেন না,—প্রাণ দেন, শক্তি দেন, ভাষা দেন। তাই Shakespeare বলিয়াছেন—

The lunatic, the lover and the poet,
Are of imagination all compact :......
The poet's eye, in a fine frenzy rolling,
Doth glance from heaven to earth and
earth to heaven.

জাপানের শিক্ষা-ব্যবস্থা ভারতের উপযোগী কি না

[অধ্যাপক শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত, এম্-এ বি-টি]

শিল্প-বিদ্যালয়

আমরা পূর্ব্বে এক প্রবন্ধে জাপানের কৃষিশিক্ষার বিবরণ প্রদান করিয়াছি; এই প্রবন্ধে শিল্প ও বাণিজ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

জাপানে শিল্পশিক্ষা, কৃষি ও বাণিজ্য-শিক্ষার ন্যায়, চারি শ্রেণীর বিদ্যালয়ে প্রদত্ত হয়,—'পরিপূরক' শিল্প-বিদ্যালয়, শিক্ষানবিশের বিদ্যালয় (Apprentices' School), প্রকৃত শিল্প-বিদ্যালয়, উচ্চ-শিল্প-বিদ্যালয় ও কলেজ।

'পরিপূরক' শিল্প-শিক্ষালয়

(Supplementary Technical School)

এ স্থানে সাধারণতঃ দশ বৎসরের অধিক বয়স্ক বালক গৃহীত হয়। তাহাদিগকে নিম্ন-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করিয়া আসিতে হয়। কিন্তু এই নিয়ম সকল সময়ে পালন করা হয় না। অনেক সময়ে পূর্ণবয়স্ক যুবকও এই বিদ্যালয়ে স্থান পায়। এ স্থানে অধ্যয়ন-কাল সকলের পক্ষে সমান নয়। কেহ এক মাস পড়িয়াই চলিয়া যায়, আবার কেহ বা এক বৎসরও পড়ে। কিন্তু যাহারা পূর্ণ এক বৎসর থাকিয়া সন্তোষজনকরূপে পাঠ্যবিষয়গুলি অধ্যয়ন করে না, তাহাদিগকে সার্টিফিকেট দেওয়া হয় না। বিদ্যালয় সাধারণতঃ সন্ধ্যাকালে বসে। সুতরাং এই বিদ্যালয়কে নৈশ-বিদ্যালয় বলিলেও চলে। এই স্থানে দশ বৎসরের উর্দ্ধবয়স্ক যে কোনও বালক বা যুবক নিজ-নিজ সুবিধামত এক মাস হইতে এক বৎসর কাল অধ্যয়ন করিতে পারে। অধ্যয়নের বিষয়গুলি এই—

(১) সাধারণ শিক্ষার বিষয়—নীতিশিক্ষা, জাপানী ভাষা ও গণিত।

(২) বিশেষ শিক্ষার বিষয়—পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, ব্যবহারিক জ্যামিতি, শুধু হাতে চিত্রাঙ্কন (Free-hand Drawing), যন্ত্রের সাহায্যে চিত্রাঙ্কন (Instrumental Drawing), কাঠের কাজের উপাদান ও যন্ত্রপাতি, গৃহনির্ম্মাণ (Building Construction), মাপজোক (Measurement), নক্সা প্রস্তুত করণ (Architectural Drawing), ধাতুর কাজের উপাদান ও সাজ-সরঞ্জাম (Materials and tools for metal work), যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণ-কৌশল (Machine Mechanics), গতিবিদ্যা (Dynamics), যন্ত্রাদির চিত্রাঙ্কন (Machine Drawing) রঞ্জনশিল্প (Dyeing), বয়নবিদ্যা, ব্যবহারিক রসায়ন (Applied Chemistry), শিল্প-বিষয়ক নক্সা (Industrial Design)। উল্লিখিত বিশেষ বিষয়গুলির মধ্যে যে কোনও পাঁচটী এক সময়ে এক স্কুলে পাঠ্য বিষয় রূপে নির্ব্বাচিত হইতে পারে। আবার এই পাঁচটি বিষয় হইতে শিক্ষার্থী নিজের ইচ্ছামত এক বা ততোধিক বিষয় গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু তাহাকে সমস্ত সাধারণ বিষয়গুলি পড়িতে হয়।

শিক্ষানবিশের বিদ্যালয়

(Apprentices' School)

এই বিদ্যালয়ে প্রবেশার্থীর বয়স ১২'র উপরে হইবে, এবং তাহাকে অন্ততঃ পক্ষে নিম্ন-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করিতে হইবে। কিন্তু বিশেষ-বিশেষ স্থলে এই নিয়ম ভঙ্গ হইতে পারে, এবং শিক্ষার্থী এ স্থানে প্রবেশ করিয়া বিদ্যালয়ের নিয়মিত পাঠ্য-বিষয়ের সঙ্গে-সঙ্গে লিখন ও পঠন প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে পারে। 'পরিপূরক' বিদ্যালয়ের সঙ্গে ইহার পার্থক্য এই যে, এ স্থানে শিক্ষা-নবিশগণকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয়গুলি পুনরায় অধ্যয়ন করিতে হয় না। কিন্তু যাহারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন না করিয়া এ স্থানে প্রবেশ করে, তাহাদিগকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠও এই বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গে-সঙ্গে শেষ করিতে হয়।

এই বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয়:—নীতিশিক্ষা, গণিত, জ্যামিতি, রসায়ন ও চিত্রাঙ্কন এবং শিল্প-সংক্রান্ত বিষয়গুলি। শেষোক্ত বিষয়-গুলির মধ্যে সাধারণতঃ কাঠের কাজ, রঞ্জনবিদ্যা, বয়নবিদ্যা, লাক্ষার কাজ (lacquer work), জাহাজ-নির্ম্মাণ (Ship-building), হাপরের কাজ (Furnace work)—এই বিষয়গুলি শিখান হয়। শিক্ষাকাল সর্ব্বত্র সমান নয়—৬ মাস হইতে ৪ বৎসর। শিক্ষার্থিগণ নিজ নিজ সুবিধামত অধিক কাল বা অল্প কাল পড়িয়া চলিয়া যাইতে পারে। অবশ্য অধ্যয়ন-কালের তারতম্যানুসারে তাহাদের শিক্ষালব্ধ গুণের এবং তদনুপাতে আদরেরও তারতম্য হয়।

টোকিও নগরে যে গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় আছে, তাহাতে তিন বৎসর পড়িতে হয়। এখানে শিল্প সংক্রান্ত বিষয়গুলি দুই প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত—কাঠের কাজ এবং ধাতুর কাজ (Metal work), সূত্রধরের কাজ (Carpentry), এবং নকসা প্রস্তুত

করণ (Architectural Drawing) প্রথম বিভাগের অন্তর্গত। দ্বিতীয় বিভাগ ধাতু গলান (Forging), পাত প্রস্তুত করণ, সীসার কাজ, এবং যন্ত্রাদির সাহায্যে চিত্রাঙ্কন (Mechanical Drawing) প্রভৃতি শিক্ষা প্রদত্ত হয়। বিদ্যালয়ের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে দুই বিভাগের ছাত্রই একত্র অধ্যয়ন করে। সাধারণ বিষয়গুলি সকলের জন্যই এক প্রকার—নীতিশিক্ষা, গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, যন্ত্রপাতি (Tools), কার্য্যপ্রণালী (Methods of work), চিত্রাঙ্কন ও ড্রিল। প্রথম বর্ষের অন্তে ছাত্রগণ দুই বৎসরের জন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে, কারখানায় শিক্ষানবিশের কাজ করে।

অধ্যয়নার্থী ছাত্রগণের বয়স সাধারণতঃ ১২ হইতে ১৬র মধ্যে হওয়া চাই। তাহাদিগকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ বা তত্তুল্য পাঠ সমাপন করিয়া আসিতে হয়। শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ছাত্রগণ একখানি সার্টিফিকেট (Certificate) পায়। এই সার্টিফিকেট পাওয়ার পরও শিক্ষার্থী ইচ্ছা করিলে আরও এক বৎসর পড়িতে পারে। ইহার জন্য তাহাকে একখানা স্বতন্ত্র সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। তার পর কোনও কারখানায় দুই বৎসর ব্যবহারিক কর্ম্ম (Practical Works) করার পর, সে সুনিপুণ কারিকর (Competent Craftsman) বলিয়া একখানি প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হয়।

মধ্য শিল্প-বিদ্যালয়

(Industrial School)

পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকার বিদ্যালয়ে শিল্পবিষয়ক সামান্য শিক্ষামাত্র প্রদত্ত হয়। সুতরাং ইহাদিগের নামকরণ-কালে ইহাদিগকে শিল্প-বিদ্যালয় বলা হয় নাই—'পরিপূরক' বিদ্যালয় বা শিক্ষানবিশের বিদ্যালয় বলা হইয়াছে। শিল্পবিষয়ে মধ্যবিদ্যালয়ে যে শিক্ষা প্রদত্ত হয়, তাহাকেই প্রকৃত পক্ষে শিল্পশিক্ষা বলা যাইতে পারে। সেই অনুসারে এই বিদ্যালয়গুলিকে শিল্পবিদ্যালয় বলা হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণই পরে কারখানার তত্ত্বাবধায়ক বা পরিচালকের পদে (Foreman or Manager) নিযুক্ত হয়।

প্রবেশার্থী উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করিয়া আসিবে। তাহার বয়স ১৪র উপরে হইবে। তাহাদিগকে সাধারণতঃ তিন বৎসর অধ্যয়ন করিতে হইবে। কিন্তু যাহারা ১২ বৎসর বয়সে প্রবেশ করিতে চায়, তাহাদিগকে দুই বৎসর শাখা-বিভাগে (Preparatory Course), অধ্যয়ন করিয়া প্রধান বিভাগের উপযুক্ত হইতে হইবে।

শাখাবিভাগের শিক্ষার বিষয়—নীতিশিক্ষা, জাপানী ভাষা, গণিত, ভূগোল, ইতিহাস, প্রাথমিক পদার্থ ও রসায়ন-বিজ্ঞান (Elementary Physics and Chemistry), চিত্রাঙ্কন এবং ড্রিল। ইহার সঙ্গে একটী বৈদেশিক ভাষাও পড়িতে পারে।

প্রধান বিভাগে শিক্ষার বিষয়—নীতিশিক্ষা, গণিত, পদার্থবিদ্যা রসায়নবিদ্যা, চিত্রাঙ্কন, এবং ড্রিল। এই সকল সাধারণ বিষয়ের সঙ্গে শিল্প-সংক্রান্ত বিষয় অধ্যয়ন করিতে হয়।

সেইগুলি এই—

ইঞ্জিনিয়ারিং (Engineering), জাহাজ-নির্ম্মাণ (Ship-building), তাড়িত-বিজ্ঞান Electricity), কাঠের কাজ (Wood work), খনিজ বিদ্যা (Mining), বয়ন-বিদ্যা (Weaving) এবং রঞ্জনবিদ্যা (Dyeing), লাক্ষার কাজ (Laquer work), নক্সা অঙ্কন (Designing) এবং চিত্রাঙ্কন Painting)।

(একই বিদ্যালয়ে এই সকল বিষয় অধ্যয়ন করিবার বন্দোবস্ত নাই। স্থানীয় প্রয়োজনীয়তা অনুসারে এই বিষয়গুলি হইতে সাধারণতঃ এক বা ততোঽধিক বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদত্ত হয়।)

উচ্চ শিল্প-বিদ্যালয়

শিল্প বিষয়ে উন্নততর শিক্ষা উচ্চ শিল্প-বিদ্যালয় ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রদত্ত হয়। এই শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলি (Practical work) কার্য্যকরী শিক্ষা প্রদানের জন্য অধিকতর ব্যগ্রতা প্রদর্শন করে। সুতরাং এই সকল বিদ্যালয়ের সংলগ্ন এক বা ততোঽধিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই বিদ্যালয়গুলির যন্ত্রাগার নানা প্রকার নবোদ্ভাবিত যন্ত্রে পরিশোভিত থাকে, এবং পুস্তকাগারে নব-প্রকাশিত যাবতীয় গ্রন্থ সংগৃহীত হয়।

প্রবেশার্থী যুবককে সাধারণ বিভাগের মধ্যবিদ্যালয়ের পাঠ অথবা মধ্যশিল্পবিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করিয়া আসিতে হয়। এখানে প্রধান বিভাগে তিন বৎসর পড়িতে হয়। বিদ্যালয়গুলি জাপানের তিনটী প্রধান শিল্পকেন্দ্রে স্থাপিত। স্থানীয় অবস্থানুসারে ও উপযোগিতানুসারে বিদ্যালয়গুলির মধ্যে শিক্ষাবিষয়ে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। ওসাকায় (Osaka) যে উচ্চ শিল্প-বিদ্যালয় আছে, তাহার পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে—মদ প্রস্তুত করণের প্রণালী (Brewing), জাহাজ-নির্ম্মাণ (Ship-building), সামুদ্রিক ইনজিনিয়ারিং (Marine Engineering)। এই সকল বিষয় সেই স্থানের পক্ষে বিশেষ উপযোগী ও প্রয়োজনীয় বলিয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছে।

টোকিও নগরে যে বিদ্যালয় আছে, তাহাতে পশমের কাপড় বুনন ও রং করণ বিষয়ে বিশেষ ভাবে শিক্ষা প্রদত্ত হয় (Weaving and Dyeing of Wool)। কীওটো (Kyoto) বিদ্যালয়ে রেশম সংক্রান্ত শিল্প পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে।

টোকিও উচ্চ শিল্পবিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয়ের বিশেষ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

এই বিদ্যালয়টি সাত বিভাগে বিভক্ত।—

(১) বয়ন ও রঞ্জন বিভাগ (Weaving and Dyeing),

(২) চীনা-বাসন প্রস্তুত করণ (Keramics),

(৩) ব্যবহারিক রসায়ন (Applied Chemistry),

(৪) যন্ত্র বিদ্যাবিষয়ক পারিভাষিক শব্দের ও সূত্রের ব্যাখ্যা (Mechanical Technology),

(৫) তড়িৎ-বিদ্যাবিষয়ক পারিভাষিক শব্দের ও সূত্রের ব্যাখ্যা (Electrical Technology sub-divided into Electrical Engineering and Electrical Chemistry),

(৬) শিল্প বিষয়ক নক্সা (Industrial Designing),

(৭) স্থপতি-বিদ্যা (Architecture) ।

নীতিশিক্ষা, অঙ্ক, পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন-বিজ্ঞান, ব্যবহারিক যন্ত্রবিদ্যা (Applied Mechanics), চিত্রাঙ্কন, যন্ত্রাদির নক্সা (Machine Designing), পরীক্ষামূলক পদার্থ-বিজ্ঞান, রাসায়নিক বিশ্লেষণ, শিল্প সংক্রান্ত অর্থ-বিজ্ঞান (Industrial Economy), স্বাস্থ্যবিজ্ঞান (Hygiene), হিসাব রক্ষণ (Book-keeping), কারখানা স্থাপন (Workshop Building) ইংরেজী এবং ড্রিল—এই বিষয়গুলি সাধারণ বিষয়ের অন্তর্গত, এবং অল্লাধিক পরিমাণে সকল বিভাগেই পঠিত হয়। ইহা ব্যতীত প্রতি সপ্তাহে সাত হইতে আটাশ ঘণ্টা পর্য্যন্ত কারখানায় কাজ করিতে হয় (practical works) ।

বাণিজ্য-বিদ্যালয়

(Commercial School)

কৃষি-বিদ্যালয়গুলির ন্যায় বাণিজ্য-বিদ্যালয়গুলিও চারি শ্রেণীতে বিভক্ত—আদ্য মধ্য ও উচ্চ-বাণিজ্য বিদ্যালয় এবং বাণিজ্য কলেজ। এই সকল বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন-কাল, প্রবেশ-কাল এবং প্রবেশোপযোগী শিক্ষা মোটামুটি কৃষিবিদ্যালয়েরই অনুরূপ ।

'পরিপূরক' বাণিজ্য-বিদ্যালয়

(Supplementary Commercial School)

ছাত্রগণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাধ্যতা-মূলক শিক্ষা সমাপন করিয়া এই বাণিজ্য-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। এখানে তাহারা সাধারণতঃ তিন বৎসর কাল বাণিজ্য বিষয়ে শিক্ষালাভ করে, এবং ইহার সঙ্গে-সঙ্গে একটু-একটু ইংরেজিও পড়িতে আরম্ভ করে। পাঠ্য বিষয়গুলির সবিশেষ বিবরণ পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে, পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

"খ" মিতির বাণিজ্য-বিদ্যালয়

(Commercial School of Class "B")

সাধারণ বিভাগের উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুই বৎসর কাল পাঠ করিবার পর এই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে হয়। এখানেও তিন বৎসর অধ্যয়ন করিতে হয়। নীতিশিক্ষা, জাপানী ভাষা, পাটীগণিত, ভূগোল, হিসাবপত্র (Book-keeping) ব্যবসা সংক্রান্ত অন্যান্য শিক্ষা, বাণিজ্য-বিষয়ক সাধারণ জ্ঞান, এবং ড্রিল শিক্ষাবিষয়ের অন্তর্গত। এইগুলি ব্যতীত প্রয়োজনানুসারে অন্যান্য বিষয়েও পাঠ প্রদত্ত হইতে পারে। জাপানে এইরূপ বিদ্যালয়ের সংখ্যা দিন-দিনই হ্রাস পাইতেছে। এই বিদ্যালয়গুলিকে বাণিজ্য বিষয়ক মধ্য-বিদ্যালয়ে উন্নীত করিতে সমস্ত দেশ যেন ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে।

"ক" মিতির বাণিজ্য বিদ্যালয়

(Commercial School of Class "A")

এই বিদ্যালয়গুলিকেই প্রকৃত পক্ষে বাণিজ্য-বিদ্যালয় বলা যাইতে পারে; কারণ, বাণিজ্য সংক্রান্ত জ্ঞান 'পরিপূরক' ও "খ" মিতির বাণিজ্য-বিদ্যালয়ে প্রদত্ত হইলেও, প্রাথমিক বিদ্যালয়-লব্ধ সাধারণ-শিক্ষার পূর্ণতা সম্পাদনই ঐ বিদ্যালয়গুলির প্রধানতম উদ্দেশ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

"ক" মিতির বাণিজ্য-বিদ্যালয়ে প্রবেশার্থী বালককে সাধারণতঃ উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চার বৎসর পাঠ অভ্যাস করিতে হয়। বয়স ১৪এর উপরে না হইলে ভর্ত্তি করা হয় না। যে সকল বালক উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষের পাঠ শেষ করিয়াছে, তাহাদিগকেও এই বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করা হয়; কিন্তু উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান বিভাগে (Main Course) পাঠ গ্রহণের উপযুক্ত হইবার জন্য, এক বৎসর কাল শাখা-বিভাগে (Preparatory Course) পাঠ করিতে হয়। এই শ্রেণীর সকল বিদ্যালয়ের অধ্যয়ন কাল সমান নহে। নিম্নে একটী আদর্শ বিদ্যালয়ের অধ্যয়ন-কাল ও পঠনীয় বিষয়গুলি প্রদত্ত হইল।

শিক্ষার বিষয়।

শাখাবিভাগ (Preparatory Course)—নীতিশিক্ষা, জাপানী ভাষা, গণিত, ভূগোল, ইতিহাস, চিত্রাঙ্কন, ইংরেজি এবং ড্রিল।

প্রধান বিভাগ (Main Course).

প্রথম বর্ষ—নীতিশিক্ষা, জাপানী ভাষা, বাণিজ্য-বিষয়ক গণিত ও মানসাঙ্ক, বীজগণিত, বাণিজ্য-সংক্রান্ত ভূগোল ও ইতিহাস, হিসাব-রক্ষণ (Book-keeping), বাণিজ্যের সাধারণ জ্ঞান (General principles of Commerce), ইংরেজি এবং ড্রিল।

দ্বিতীয় বর্ষ—নীতিশিক্ষা, জাপানী ভাষা, বীজগণিত, ক্ষেত্রতত্ত্ব, মানসাঙ্ক, পদার্থ-বিদ্যা ও রসায়ন-শাস্ত্র, ব্যাঙ্কের হিসাবপত্র (Bank book-keeping), অর্থশাস্ত্র, বাণিজ্য সংক্রান্ত সাধারণ সূত্র (General principles of Commerce), ইংরেজি এবং ড্রিল।

তৃতীয় বর্ষ—সরকারী অফিসের হিসাবপত্র রাখার জ্ঞান (Book-keeping as in Goverment offices and work-shops), অর্থশাস্ত্র, বাণিজ্য-দ্রব্য (Commercial products), বাণিজ্য সংক্রান্ত সূত্রা-বলীর প্রয়োগ-বিধান (General principles of Commerce —practical application), বাণিজ্যবিষয়ক আইন (Commercial law), ইংরেজি এবং ড্রিল।

কোন-কোন বিদ্যালয়ে তৃতীয় বর্ষের পাঠান্তে আরও এক বৎসর অতিরিক্ত শিক্ষা প্রদত্ত হয়। এই অতিরিক্ত ক্লাসে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পঠিত হয়—অর্থশাস্ত্র (Political Economy), স্থিতিবিদ্যা (Statics), বাণিজ্য-সংক্রান্ত বৈদেশিক রীতিনীতি (Foreign practice and Commercial usages), ইংরেজি, ড্রিল।

উচ্চ বাণিজ্য-বিদ্যালয়।

(Higher Commercial School.)

নিম্নে জাপানের একটী আদর্শ উচ্চ বাণিজ্য-বিদ্যালয়ের বিবরণ প্রদত্ত হইল। ইহা হইতে জাপানের উচ্চ বাণিজ্য-বিদ্যালয়ের অধ্যয়ন-কাল ও অধ্যয়নের বিষয় সম্বন্ধে একটা আভাস পাওয়া যাইবে। এই বিদ্যালয়টি টোকিও নগরে স্থাপিত। ইহা গবরমেণ্ট কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে।

এই বিদ্যালয়ে দুইটি বিভাগ আছে। শাখা বিভাগে (Preparatory Course) এক বৎসর কাল পাঠ করিতে হয়। আর প্রধান বিভাগের (Main Course) অধ্যয়ন-কাল তিন বৎসর। সাধারণ বিভাগের মধ্যবিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যুবকগণ উক্ত শাখা-বিভাগে (Preparatory Course) গৃহীত হয়। আর, উচ্চ বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যুবকগণ শাখা-বিভাগে পাঠ না করিয়াই প্রধান বিভাগে (Main Course) ভর্ত্তি হইতে পারে।

এই দুই বিভাগ ছাড়া আরও একটী বিভাগ আছে। (Post raduate or professional course) সেখানে যাহারা উচ্চ পদ-প্রার্থী (Consular service) তাহাদিগকে আরও দুই বৎসর কতকগুলি অতিরিক্ত বিষয় অধ্যয়ন করিতে হয়।

শাখাবিভাগের অধ্যয়ন-বিষয়—বাণিজ্য-নীতি, নকলনবিশী, জাপানী ভাষায় প্রবন্ধ-রচনা (Japanese composition) গণিত ও বীজগণিত, হিসাবপত্র, ব্যবহারিক রসায়ন (Applied Chemistry), ব্যবহারিক পদার্থ-বিদ্যা (Applied Physics) ব্যবস্থা-বিজ্ঞান (Jurisprudence), ইংরেজি, অপর একটী বৈদেশিক ভাষা ও ড্রিল।

প্রধান বিভাগ—(Main Course)

প্রথম বর্ষ—বাণিজ্য সংক্রান্ত নীতি (Commercial Morality), বাণিজ্যবিষয়ক চিঠিপত্র. বাণিজ্য সংক্রান্ত গণিত ও ভূগোল, হিসাব-পত্র (Book-keeping), যন্ত্রবিদ্যা (Mechanical Engineering), পণ্যদ্রব্য (Commercial products), অর্থশাস্ত্র (Political Economy), দেওয়ানী বিধি (Civil law), ইংরেজী, অপর একটী বৈদেশিক ভাষা, বাণিজ্য-বিজ্ঞান (Science of Commerce), ড্রিল।

দ্বিতীয় বর্ষ—বাণিজ্য সংক্রান্ত চিঠিপত্র, বাণিজ্য সংক্রান্ত গণিত ও ভূগোল, হিসাবপত্র, পণ্যদ্রব্য, অর্থশাস্ত্র, দেওয়ানী বিধি, ইংরেজি, কোন একটী বৈদেশিক ভাষা, বাণিজ্য বিজ্ঞান এবং ড্রিল।

তৃতীয় বর্ষ—বাণিজ্য সংক্রান্ত ইতিহাস, হিসাবপত্র, অর্থশাস্ত্র, আয়-ব্যয় সংক্রান্ত শিক্ষা (Finance), স্থিতিবিদ্যা (Statics), দেওয়ানী বিধি, বাণিজ্য সংক্রান্ত আইন, আন্তর্জাতিক আইন (International law), ইংরেজি, অপর একটী বৈদেশিক ভাষা এবং ড্রিল।

জাপানের কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য-শিক্ষা-ব্যবস্থা হইতে ভারত অনেক কথা শিখিতে পারে। জাপানের স্থায় ভারত কৃষিপ্রধান দেশ, এবং ভারতের অধিকাংশ লোক কৃষিকার্য্য করিয়া জীবন-ধারণ করে। সুতরাং এদেশে কৃষিশিক্ষার একটা সুবন্দোবস্ত হওয়া উচিত। আমাদের দেশে নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করিয়া যাহাতে কৃষক-সন্তান কৃষি-বিষয়ক সাধারণ শিক্ষা লাভ করিয়া তাহার পিতাকে সাহায্য করিতে পারে, তদুদ্দেশ্যে, জাপানের স্থায় গ্রামে-গ্রামে বহু পরিমাণে আদ্য কৃষিবিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আদ্য বিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষা প্রদানের উপযুক্ত একদল শিক্ষকের প্রয়োজন। সুতরাং মধ্য কৃষি-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া পূর্ব্বেই এইরূপ শিক্ষক প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। শুধু শিক্ষক প্রস্তুত করাই মধ্য কৃষি-বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হইবে না ; যাহাতে মধ্য কৃষি-বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া যুবকগণ উন্নত প্রণালীতে, আমেরিকার স্থায় দেশের স্থানে-স্থানে কৃষি ব্যবসায় খুলিয়া জীবিকার্জ্জনের এক নূতন পথ লাভ করিতে পারে, তাহারও চেষ্টা করিতে হইবে। কৃষি-কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে, এবং প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে সেই কলেজে অধ্যয়নের অধিকার দিতে হইবে। এই সকল কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি না করিলে, মধ্য কৃষি-বিদ্যালয়ের পরিচালনার জন্ম উপযুক্ত লোকের সংস্থান হইতে পারে না। আবার মধ্য-বিদ্যালয় স্থাপিত না হইলে আদ্য কৃষি-বিদ্যালয় পরিচালিত হইতে পারে না। সুতরাং সর্ব্বপ্রথমে দেশে উচ্চ কৃষিশিক্ষা বিস্তারের পথ সুগম ও সুলভ করিতে হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নব-প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের আজীবন সাধক, উচ্চ শিক্ষার একনিষ্ঠ সেবক, অক্লান্ত-কর্ম্মী সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বার্ষিক সম্মিলন (Convocation) উপলক্ষে ঠিকই বলিয়াছেন যে, উচ্চ-শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিলে দেশে নিম্নশিক্ষা আপনা-আপনি বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। আর উচ্চ-শিক্ষাবিস্তার না করিয়া শুধু নিম্নশিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করিলে, তাহা বিফল হইবে, এ কথা কৃষিবিষয়ক শিক্ষা সম্বন্ধেও বেশ খাটে। সুতরাং কৃষিশিক্ষা বিস্তারের প্রকৃষ্ট ভাষায়,—দেশে প্রথমতঃ উপযুক্ত সংখ্যক কৃষি-কলেজ ও উচ্চ কৃষি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা, এবং অবশেষে ধীরে-ধীরে নিম্ন কৃষিবিদ্যালয় স্থাপন করা।

শিল্প শিক্ষা বিস্তারের উপর ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নতি ও সুখ-শান্তি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। কেহ-কেহ মনে করেন যে, ভারতের পক্ষে রাজনৈতিক সংস্কার অপেক্ষাও ইহা অধিকতর প্রয়োজনীয়। বস্তুতঃ,ভারতবাসীর মধ্যে অন্ন-সংস্থান-চিন্তা এত প্রবল হইয়া পড়িয়াছে, এবং জীবন-সংগ্রাম দিন-দিন এত কঠোর হইয়া পড়িয়াছে যে, উচ্চ-

শিক্ষিত লোকদের মধ্যে একটা অসন্তোষের লক্ষণ প্রকটিত হইতেছে। এই অসন্তোষের কারণ দূরীভূত না হইলে, কি রাজনৈতিক হিসাবে, কি অর্থনৈতিক হিসাবে, কি শিক্ষার হিসাবে, যে কোন দিক দিয়া দেখি না কেন, শিল্প-শিক্ষা ভারতে সঙ্কুচিতক্ষেত্রে আবদ্ধ না থাকিয়া যাহাতে ক্রমশঃ বিস্তৃত আকার ধারণ করে, সকলকে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। ভারতীয় শিল্প-কমিশনও দেশমধ্যে শিল্প-শিক্ষা বিস্তারের জন্ত কতকগুলি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন।

(১) কুটীর-শিল্পের উন্নতি সাধনার্থ দেশে এক প্রকার শিল্প-বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। সেখানে বিভিন্ন স্থানোপযোগী হস্ত-শিল্প শিক্ষা দিয়া শিল্পীকুলের স্বাধীন ভাবে জীবিকার্জ্জনের পথ উন্মুক্ত করিতে হইবে। এইরূপে মৃত শিল্পের পুনরুদ্ধার সাধিত হইবে।

(২) যন্ত্র-পরিচালিত কলকারখানার সংশ্রবে শ্রমশিল্প-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া, শ্রমজীবিগণের মধ্যে শিল্প-শিক্ষার প্রচার করিতে হইবে। কারখানায় তাহারা শিল্প-বিষয়ক কার্য্যকরী শিক্ষা লাভ করিবে এবং কারখানা-সংলগ্ন বিদ্যালয়ে শিল্প বিষয়ক উপদেশ প্রাপ্ত হইবে। এইরূপে দেশে ধীরে-ধীরে একদল নিপুণ শিল্পীর সৃষ্টি হইবে।

(৩) যেখানে উপযুক্ত কলকারখানা নাই, সেখানে শ্রমশিল্প-বিদ্যালয়ের সংশ্রবে বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে একটা কারখানা স্থাপন করিতে হইবে। শ্রমশিল্পিগণকে কার্য্যকরী শিক্ষা প্রদান করাই এই কারখানার একমাত্র উদ্দেশ্য হইবে।

(৪) কতকগুলি শিল্প আছে, যাহা কারখানায় হাতে-কলমে না শিখিয়াও, বিদ্যালয়ে পড়িয়াই শিক্ষা করা যায়,—যথা, চিনি প্রস্তুত করণ প্রণালী, ঔষধপত্র প্রস্তুত করণ প্রণালী, তৈলের বা চাউলের কল পরিচালন-প্রণালী। এই সকল শিল্পসম্বন্ধে উপদেশ কারখানাবিহীন শিল্প-বিদ্যালয়েও প্রদত্ত হইতে পারে, যদি বিদ্যালয়-সংলগ্ন বিজ্ঞানাগারে (Laboratory) উক্ত শিল্প সম্বন্ধীয় তত্ত্বের পরীক্ষামূলক জ্ঞানলাভ করিবার বন্দোবস্ত থাকে।

এইরূপে শিল্প-শিক্ষাকে ভারতীয় শিল্পকমিশন চারি প্রধান ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়,—(১) কুটীর-শিল্পীর শিক্ষা, (২) কলকারখানায় কার্য্যলাভ-প্রয়াসী শ্রমজীবীর শিক্ষা, (৩) শ্রমজীবিকুলের কর্ম্মের তত্ত্বাবধারনের উপযোগী শিক্ষা, এবং (৪) ইঞ্জিনিয়ারদের শিক্ষা। এই ভাবে দেখিতে গেলে, শিল্পকমিশন প্রকারান্তরে জাপানের ন্যায়, দেশমধ্যে আদ্য-শিল্প-বিদ্যালয়, মধ্য শিল্প-বিদ্যালয়, উচ্চ-শিল্প-বিদ্যালয় ও শিল্প-কলেজ প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী বলিয়া মনে হয়। অবশ্য এ কথা সত্য যে, জাপানের শিল্পশিক্ষা-ব্যবস্থা এই স্বাধীন চিন্তার যুগে এ দেশে অবিকল নকল করিবার চেষ্টা করা বাতুলতা মাত্র। কিন্তু জাপানের শিল্প-শিক্ষা প্রদানের মূল নীতি-গুলি (Main principles) যে এদেশে গৃহীত হইতে পারে, এই বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

ভূত

[শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়]

আমাদের এই স্থূল শরীরের ভিতর যে সূক্ষ্ম শরীর আছে, মৃত্যু হইলে আমাদের জীবাত্মা সেই সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করতঃ পরলোকে যাইয়া বাস করিয়া থাকে। এই সূক্ষ্ম-শরীরী জীবাত্মাগণের মধ্যে কেহ-কেহ কর্ম্মদোষে ভূত-প্রেত হয়; এবং ভূত-প্রেতের নামে জন-সাধারণের প্রাণে কেমন একটা আতঙ্ক উপস্থিত হয়।

অতি প্রাচীন কাল হইতে পৃথিবীর সকল দেশে সভ্য অসভ্য সকল জাতির লোকই ভূত বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে।

আমাদের দেশে তান্ত্রিক ও পৌরাণিক যুগে লোক ভূত বিশ্বাস করিত; তন্ত্রে এবং পুরাণাদি গ্রন্থে ভূতযোনি প্রাপ্ত হওয়ার কারণ, তাহাদের আকৃতি, প্রকৃতি ও অন্য নানাপ্রকার বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

যাহারা সর্ব্বদা পাপ কার্য্যে রত থাকিয়া ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করে,—উদ্বন্ধনে, বিষপানে, শস্ত্রাদির আঘাতে, দস্যুগণের হস্তে, বজ্রাঘাতে, সর্পাঘাতে এবং অসংস্কৃত অবস্থায় যাহাদের মৃত্যু হয়,—তাহারা প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়া "বায়ুভূত ক্ষুধাবিষ্ট কর্ম্মজং দেহমাশ্রয়েৎ"; অর্থাৎ আপন কর্ম্মানুসারে বায়ুরূপ দেহযুক্ত ও ক্ষুধাতুর হইয়া থাকে। (গরুড়পুরাণ ৯।১)

এই সকল প্রেত "আকাশস্থো নিরালম্বো বায়ুভূত নিরাশ্রয়" হইয়া শত-সহস্র বৎসর কি তদূর্দ্ধ কাল এই পৃথিবীতে মহা কষ্টে বিচরণ করিয়া থাকে। (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ)

সপ্তবিংশতি যুগ দারুণ নরক-যন্ত্রণা ভোগের পর প্রেত পিশাচ হইয়া থাকে; পিশাচদিগের রূপ অতি বিকট, করাল অথচ ক্ষীণ ভাবাপন্ন ও ভীতিপ্রদ; চক্ষু কোটর-প্রবিষ্ট ও পিঙ্গলবর্ণ; কেশ সকল ঊর্দ্ধমুখী, অঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ, লকলক জিহ্বা, ওষ্ঠ লম্বা, দীর্ঘ জঙ্ঘা, দেহ অতিশয় বিশাল, হস্ত দীর্ঘ, মুখ শুষ্ক ও আকৃতি ভীষণ-দর্শন। (পদ্মোত্তর পুরাণ)

পিশাচরা অতৃপ্ত ভোগলালসা চরিতার্থ করিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত হইয়া থাকে; এবং নিজগৃহে আসিয়া মলমূত্র ত্যাগের স্থানে অবস্থান করে; এবং উচ্ছিষ্টাদি পান-ভোজন করিয়া পুত্রাদির ছল খুঁজিতে থাকে। প্রেতগণ নিজ কুলকেই বেশী পীড়িত করে এবং ছিদ্র পাইলে অপরকেও পীড়ন করিয়া থাকে। জীবিতকালে যে যত স্নেহ করিয়া থাকে, প্রেত তাহারই তত অনিষ্ট করিতে চেষ্টা পায়। (গরুড় পুরাণ—প্রেতকল্প)

হিন্দুদের মত তিব্বতবাসীরাও মৃত্যুর পর মানবের প্রেতত্ব-প্রাপ্তি স্বীকার করেন এবং তিব্বত ও চীনদেশীয় লোকে ভূত-প্রেতকে অত্যন্ত ভয় করিয়া থাকেন। তাঁহাদের শাস্ত্রে ৩৬ প্রকার ভূত-প্রেতের উল্লেখ আছে।

এদেশে যেমন ভূতের রোজা আছে, তিব্বতেও ঙ্‌ঠচেন নামে এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহারা পিশাচসিদ্ধ—প্রেতগণের সহিত তাহাদের বিশেষ সম্বন্ধ আছে মনে করিয়া লোকে তাহাদের অত্যন্ত ভয় করিয়া থাকে।

মুসলমানেরাও আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতেও স্বর্গ ও নরক আছে এবং দেহান্তে কর্ম্মফল ভোগ করিবার কথা তাঁহাদের শাস্ত্রও উল্লিখিত আছে।

পূর্ব্বকালে য়ুরোপীয় সকল জাতিই ভূত বিশ্বাস করিত; এবং কাহারও উপর ভূতের আবির্ভাব হইলে উপযুক্ত লোকের দ্বারা ভূত তাড়াইত। রোমক ও গ্রীক সমাজভুক্ত খৃষ্টীয় যাজকদিগের মধ্যে ভূত ঝাড়ান প্রথা অদ্যাপি প্রচলিত আছে। তাহাদের সমাজে এখনও রোজা দেখা যায়;—এই সকল রোজা রোমক ধর্ম্মাচার্য্যের নিকট নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট বিধি অনুসারে দীক্ষিত হইয়া স্ব-স্ব ধর্ম্ম সমাজের একজন পদস্থ কর্ম্মচারী বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন।

খৃষ্টধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হওয়ার বহু পূর্ব্ব হইতে য়িহুদিরা পরলোকগত ব্যক্তিগণের মঙ্গলের জন্ম উপাসনাদি করিত এবং পরলোকবাসীদের সহিত মর্ত্ত্যলোকবাসীদের যে সময়ে-সময়ে দেখা সাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তা হয়, ইহাও বিশ্বাস করিত।

বাইবেল প্রভৃতি ধর্ম্মপুস্তকে যে সকল অলৌকিক ঘটনা পাঠ করা যায়, তাহা রূপক বলিয়া উড়াইয়া না দিলে, অথবা তাহার কোন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা না করিলে, অতি প্রাচীনকালে খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বীগণের ভৌতিক তত্ত্বে কি রকম বিশ্বাস ছিল, তাহা এই সকল ঘটনা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

পৃথিবীর আদিম অবস্থায় লোক যখন পর্ব্বত-গুহায় বা মাটির তলায় গর্ত্ত খনন করিয়া উলঙ্গ অবস্থায় বাস করিত, যখন গাছের ছাল বা গাছের পাতার দ্বারা অঙ্গ আচ্ছাদন পূর্ব্বক লজ্জা নিবারণ করিত, সেই সময় হইতে লোকে ভূত-প্রেতাদির অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে। প্রাচীন কালে অনেক অসভ্য জাতির মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে, তাহার মৃতদেহ কবরস্থ করার সময়, তাহার প্রেতাত্মা পরলোকে যাইয়া পশু শিকার করিবে বলিয়া, কবর মধ্যে অস্ত্র-শস্ত্রাদি দেওয়া হইত। গ্রীক এবং রোমানদের মধ্যে পিতৃলোকের তৃপ্তি-সাধন জন্য নানাপ্রকার ক্রিয়া-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। চীনেরা পিতৃলোকের পূজা করিত এবং তাঁহারা কোন কারণে অসন্তুষ্ট না হন, এজন্য সে দেশের লোক সর্ব্বদা ভীত ও সশঙ্কিত হইয়া থাকিত; হিন্দুরা আজ পর্য্যন্ত পিতৃলোকের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি করিতেছে এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায়, প্রাচীন কাল হইতে সভ্য-অসভ্য সকল জাতির লোকেই প্রেততত্ত্বে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে।

ভূতের আর এক নাম অপদেবতা। কর্ম্মদোষে যে সকল জীবাত্মা ভূতযোনি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের যদি অপদেবতা বলা যায়, তাহা হইলে, সৎকর্ম্মান্বিত জীবাত্মাগণকে দেবতা জ্ঞান করা ও দেবতা-জ্ঞানে তাহাদের পূজা করা কিছুই অন্যায় হয় না; বাস্তবিক তাঁহারা সকল দেশেই দেবতা-জ্ঞানে পূজা পাইয়াছেন।

অপদেবতাগণের আবাহন ও তাহাদের পূজা করিবার রীতি-প্রণালী আমাদের দেশে অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। বেবিলনে (Babylon) খৃষ্টজন্মের ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বের যে সকল প্রস্তরফলক পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে সেই অতি প্রাচীনকালে সে দেশের লোকে যে ভূত বিশ্বাস করিত এবং (Ghost-God) ভূত-অপদেবতার পূজা করিত, তাহার উল্লেখ আছে।

Universal Spiritualism p. 297.

গ্রীসের আদিপুরুষগণ খৃষ্টের জন্মের ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে বলিয়া গিয়াছেন, এই পৃথিবী ভূত-প্রেতে পরিপূর্ণ হইয়া আছে; মর্ত্ত্যবাসিগণ যাহাই কিছু ভাবুক বা করুক, ভূত-প্রেতগণ অদৃশ্য সাক্ষীস্বরূপ তাহা লক্ষ্য করিয়া থাকে, এবং অদৃশ্যভাবে মর্ত্ত্যবাসিগণকে চালনা করিয়া থাকে।

The master minds of Greece, such as Thales, who lived some six hundred years B. C., thought that the universe was replete with demons, who were the spiritual guides of human beings and the invisible witnesses of all their thoughts and actions.

—Universal Spiritualism, pp. 299.

সোলনের (Solon) সমসাময়িক এপিমিনাইডিস্ (Epimenides) অশরীরী মৃত পুরুষগণের নিকট হইতে স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ পাইতেন; এবং (Zeno) জুনু বলিতেন, কোন-কোন অদৃশ্য-সহায় আত্মিক প্রত্যেক কায ও কথায় তাঁহাকে চালনা করিতেন।

সক্রেটিসের একটী প্রেত সহায় ছিল; উক্ত প্রেত সর্ব্বদা সক্রেটিসের সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাকে যে উপদেশ দিত বা আদেশ করিত, সক্রেটিস তদনুসারে কাজ করিতেন। সক্রেটিসের সহিত প্রেতের কথা হইত।

রোমের বিখ্যাত ঐতিহাসিক পণ্ডিত Apulieus (এপুলিয়স্) বলিয়া গিয়াছেন, দেহান্তে সদনুষ্ঠানশীল প্রেতাত্মাগণ ব্যক্তিবিশেষের, পরিবারবিশেষের এবং নগরবিশেষের রক্ষা কার্য্য করিয়া থাকেন।

সিসিরো (Cicero), পিথাগোরাস (Pythagoras), প্লেটো (Plato) প্রভৃতি আদিম যুগের স্বনামখ্যাত মনীষিগণ ভূত-প্রেত মানিতেন এবং মর্ত্ত্যবাসিগণের সহিত তাহাদের দেখা-সাক্ষাৎ হয় ও কথাবার্ত্তা হয়, ইহাও বিশ্বাস করিতেন। প্লেটো বলিতেন, Each human being has a particular spirit with him to be his guiding genius during his mortal life-time; and when the physical life is ended, the spirit receives and accompanies the enfranchised one to its future destiny. ব্যক্তি মাত্রেরই সঙ্গে তাহার চালক-স্বরূপ একজন প্রেত থাকে;

আমরণ উক্ত প্রেত সঙ্গে-সঙ্গে থাকিয়া দেহান্তে তাহাকে তাহার গন্তব্য স্থানে লইয়া গিয়া থাকে।

উপরিউক্ত মনীষিগণ জন্মগ্রহণ করার বহু পূর্ব্বে (Pegan) পেগ্যানদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে, তিনি চিরদিনের মত বিদায় হইয়াছেন, ইহা তাহারা মনে করিত না। ভৌতিক তত্ত্বে তাহাদের এত প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল যে, মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মা যে সর্ব্বদা সঙ্গেই তাহাদের নিকট আছে, ইহা ভাবিয়া তাহাদের প্রতি ভক্তি ভালবাসা দেখাইতে কখন পরাঙ্মুখ হইত না।

প্রেতাত্মাগণের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ হওয়ার কথা আমাদের মহাভারতে আছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যাহারা প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, তাহাদের আত্মীয় স্বজনেরা অত্যন্ত শোক-সন্তপ্ত হইলে, তাহাদের শোক অপনোদন করিবার জন্য ব্যাসদেব সেই মৃত ব্যক্তিদের প্রেতাত্মার সহিত আত্মীয় স্বজনদের দেখা-সাক্ষাৎ করাইয়া দিয়াছিলেন।

হোমর তাঁহার ইলিয়ড কাব্যের ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়ে (Achilies) একিলিসের সহিত পেট্রকলসের প্রেতাত্মার দেখা করাইয়াছেন। মানুষ ইচ্ছা করিলে প্রেতাত্মাগণকে পরলোক হইতে এই মর্ত্ত্যলোকে ডাকিয়া আনিতে পারে, এ বিষয়ে গ্রীস দেশের অতি প্রাচীনকালের কবি (Hesiod) হিসিয়ড্ তাঁহার কাব্যে অতি সুন্দর বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

মানুষ মরিয়া ভূত হয় এবং ভূতের সহিত আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ হয়, এ কথা অনেকেই স্বীকার ও বিশ্বাস করেন না; তাঁহারা বলেন, মানুষ মরিলে আবার থাকে কি? কিছুই না। বাস্তবিক, যদি ভূতের অস্তিত্ব থাকিত, তাহা হইলে জনসাধারণে কেন তাহাদের দেখিতে পায় না?

জনসাধারণে যাহা দেখিতে পায় না, তাহার অস্তিত্ব নাই, এ কথা কখনও বলা যায় না। আকাশে কত গ্রহ-নক্ষত্র আছে, তাহা আমরা দেখিতে পাই না; আমাদের করতলে কত কীটাণু বাস করিতেছে, তাহা আমাদের নয়নগোচর হয় না; কিন্তু দূরবীক্ষণ ও অনুবীক্ষণ তাহাদের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিতেছে।

প্রেতাত্মাগণের সহিত তোমার কখন দেখা-সাক্ষাৎ না হইয়া থাকিতে পারে; কিন্তু অতীন্দ্রিয় দর্শন-শক্তি-সম্পন্ন লোকের সহিত সর্ব্বদাই তাহাদের দেখা-সাক্ষাৎ হইতেছে; এতদ্ভিন্ন জনসাধারণের মধ্যে অনেকেই ভূত-প্রেত দেখিয়াছে, এবং তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা হইয়াছে।

নিম্নে আমরা কয়েকটী ঐতিহাসিক ভৌতিক ঘটনার কথা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:—

(১) ফ্রান্সের রাজা চতুর্থ হেনরী ঘাতকের হস্তে প্রাণত্যাগ করেন। এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার পূর্ব্বে কোন প্রেতাত্মা একদিন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার মৃত্যু দিন যে অতি নিকট, তদ্বিষয়ে তাঁহাকে জানাইয়া দিয়াছিল।

(২) স্কটলণ্ডের রাজা চতুর্থ জেম্‌সকে কোন প্রেতাত্মা ইংলণ্ডে যুদ্ধ-যাত্রা করিতে বারবার নিষেধ করিয়াছিল। রাজা তাহার নিষেধ না মানিয়া যুদ্ধ-যাত্রা করেন। ফলে আর তাঁহাকে দেশে ফিরিয়া আসিতে হয় নাই,—তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

(৩) ইংলণ্ডের রাজা প্রথম চার্লস নেস্‌বি যুদ্ধের পর যখন বিশ্রাম করিতেছিলেন, সেই সময়ে ষ্ট্রাফর্ডের প্রেতাত্মা দুইবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নর্দামটনে পার্লামেণ্টের সৈন্যদলের সহিত মিলিত হইতে নিষেধ করেন; কিন্তু রাজকুমার রিউপার্টের কথা-মত রাজা সে আদেশ অবহেলা করিয়া যুদ্ধ-যাত্রা করিলে,পথিমধ্যেই তাঁহাকে পরাজিত হইতে হইয়াছিল।

(৪) জোয়ান অব আর্কের সহিত ধার্ম্মিক আত্মিক-জনের সদা-সর্ব্বদা দেখা হইত।

(৫) নেপোলিয়ন যখন সেণ্ট হেলেনায়,সেই সময়ে কোন প্রেতাত্মার সহিত তাঁহার দেখা-সাক্ষাৎ এবং কথাবার্ত্তা হয়। প্রেত নেপোলিয়নকে তাঁহার আসন্ন মৃত্যুর কথা বলিয়া যায়।

(৬) সার ট্রিস্‌টাম (Sir Tristam) পত্নী লেডি বেরেস্‌ফোর্ড (Lady Beresford) এবং লর্ড টাইরোণ (Lord Tyrone) দুজনে পরস্পর অঙ্গীকার করেন যে, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহার আগে মৃত্যু হইবে, তিনি আসিয়া অপরের সহিত দেখা করিবেন। ১৬৯৩ খৃঃ অব্দের ১৫ই অক্টোবর তারিখে লর্ড টাইরোণ তাঁহার প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন; তাঁহার প্রেতাত্মা আসিয়া লেডি বেরেস্‌ফোর্ডের সহিত দেখা করিয়া বলিয়া গেলেন, যে দিন তিনি ৪৮ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিবেন, সেই দিন তাঁহার মৃত্যু হইবে। লেডি বেরেস্‌ফোর্ড এ কথা মনেই চাপিয়া রাখিলেন, কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন না।

লেডি বেরেসফোর্ড সহজ শরীরে এবং সুস্থ মনে তাঁহার ৪৮ বৎসরের জন্মতিথি-পূজা শেষ করিয়া যমকে ফাঁকি দিয়াছেন ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন; এবং কিছুদিন পরে আবার বিবাহ করিয়া জীবনের একখানি নূতন পাটা গ্রহণ করিলেন।

এই ঘটনার দুই বৎসর পরে লেডি বেরেস্‌ফোর্ড তাঁহার আর এক জন্ম-দিনে হঠাৎ জানিতে পারিলেন, তিনি তাঁহার বয়সের যে হিসাব করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা ভুল হইয়াছে; সেইদিন তিনি ৪৮ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিলেন।

জন্মতিথি পূজা উপলক্ষে আনন্দ-উৎসব হইতেছিল, এমন সময়ে লেডি বেরেসফোর্ডের জীবাত্মা তাঁহার নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গেল; এবং তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে লর্ড টাইরোণের প্রেতাত্মা যে কথা বলিয়া গিয়াছিল, তাহা সফল হইল।

—Real Short stories; Chapter—Historical Ghosts.

(৭) "তের পেন্স ঋণ-শোধ"

Rev. Charles M' Kay নামক কোন রোমান-ক্যাথলিক ধর্ম্ম-যাজক ১৮৩৮ খৃঃ অব্দের জুলাই মাসে কোন কার্য্যোপলক্ষে Perth নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলে এণি সিম্‌সন নাম্নী একটী স্ত্রীলোক

তাঁহার নিকটে আসিয়া বলে যে, প্রতি রাত্রিতে এক প্রেতিনী আসিয়া তাহাকে বড় বিরক্ত করিতেছে; তাই সপ্তাহ কাল ধরিয়া সে একজন পুরোহিতের সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে।

ধর্ম্মযাজক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি রোমান-ক্যাথলিক?" স্ত্রীলোকটী উত্তর করিল, "না—আমি প্রেসবিটেরিয়ান।"

ধর্ম্মযাজক। তবে আমার নিকট কেন আসিয়াছ? আমি ক্যাথলিক।

স্ত্রীলোক। সে সকল কথা আমি কিছু জানি না, বুঝিও না; প্রেতিনী আমাকে একজন পুরোহিতের নিকট যাইতে বলিয়াছে, তাই আপনার নিকট আসিয়াছি।

ধর্ম্মযাজক। কেন যে তোমাকে পুরোহিতের নিকট যাইতে বলে, তাহার কোন কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছ?

স্ত্রীলোক। প্রেতিনী প্রতি রাত্রেই আসিয়া বলে, তাহার কিছু ঋণ আছে, এজন্য সে বড় অশান্তি ভোগ করিতেছে। পুরোহিত দয়া করিয়া তাহার সেই ঋণ শোধ করিয়া যদি তাহাকে উদ্ধার করেন—

ধর্ম্মযাজক। তাহার কত টাকা ঋণ আছে, তাহা সে কিছু বলিয়াছে?

স্ত্রীলোক। টাকা নয়, তের পেন্স মাত্র।

ধর্ম্মযাজক। কাহার নিকট সে এই ঋণ করিয়া গিয়াছে?

স্ত্রীলোক। তাহা বলিতে পারিব না; আমার নিকট তাহার মহাজনের নাম করে নাই।

ধর্ম্মযাজক। তুমি স্বপ্ন দেখ নাই তো?

স্ত্রীলোক। হে ভগবন! রাত্রি হইলে আমি কি ঘুমাইতে পারি, যে স্বপ্ন দেখিব? এই প্রেতিনীর অত্যাচারে আমি অস্থির হইয়াছি। সে প্রতি রাত্রেই আসিয়া এই ঋণ শোধ করার জন্য আমাকে বিরক্ত করিতেছে। কিন্তু আমি বড় গরীব, তার এ ঋণ আমি কোথা হইতে শোধ করিব?

ধর্ম্মযাজক। যে প্রেতিনী হইয়াছে, জীবিত থাকিতে কি তাহার সহিত তোমার পরিচয় ছিল?

স্ত্রীলোক। হ্যাঁ—ছিল না তো কি? সে বেঁচে থাকিতে আমার ঘরের পাশ দিয়া প্রতিদিনই যাতায়াত করিত। তাহার নাম মলি। আমার সহিত তাহার কত কথা হইত।

এই ঘটনার পর ধর্ম্মযাজক অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছিলেন, নিকটবর্ত্তী ব্যারাকে মলি নাম্নী একজন ধোপানী সৈন্যদের কাপড় ধোলাই করিত,—সংপ্রতি তাহার মৃত্যু হইয়াছে। একজন দোকানদারের দোকান হইতে সে ধারে জিনিস খরিদ করিত। উক্ত দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিলে, সে খাতা খুলিয়া বলে, তাহার নিকট মলির ১৩ পেন্স দেনা আছে। দোকানদার তখন পর্য্যন্ত জানিতে পারে নাই যে, মলির মৃত্যু হইয়াছে।

ধর্ম্মযাজক দোকানদারের দেনা শোধ করিয়া দিয়াছিলেন। কিছু দিন পরে ধর্ম্মযাজকের সহিত সেই প্রেসবিটারিয়ান ধর্ম্মাবলম্বিনী স্ত্রীলোকের দেখা হইলে সে বলিয়াছিল, প্রেতিনীর সহিত আর তাহার দেখা-সাক্ষাৎ হয় নাই।

"Anatomy of Sleep" by Edward Binns M. D. p. 462

(৮) "অপহৃত ধন প্রত্যর্পণ"

জারমানি দেশের অন্তর্গত—নগরে একটী অনাথ-আশ্রম ছিল। উক্ত আশ্রমের অধ্যক্ষতার ভার যাঁহার উপর সমর্পিত ছিল, লোকে তাঁহাকে পরম ধার্ম্মিক ও পরোপকারী বলিয়া জানিত। অধ্যক্ষ মহাশয় বিপুল সম্পত্তি ও নিজের চরিত্র সম্বন্ধে সুযশ ও সুখ্যাতি রাখিয়া পরলোকে গমন করেন।

অধ্যক্ষ জীবিত থাকিতে তাঁহার একজন বৃদ্ধা পরিচারিকাকে বড় ভালবাসিতেন ও বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র উক্ত পরিচারিকার গ্রাসাচ্ছাদনের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়া তাহাকে নিজের সংসারে রাখিয়া দিলেন।

অধ্যক্ষের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রেতাত্মা আসিয়া এই পরিচারিকার সহিত দেখা করিতে লাগিলেন। পরিচারিকা এই বিষয় তাঁহার পুত্রকে জানাইল; কিন্তু তিনি তাহা বিশ্বাস করিলেন না,—তাহার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন।

উপর্য্যুপরি কয়েক রাত্রি প্রেতাত্মার সহিত পরিচারিকার দেখা-সাক্ষাৎ হওয়ার পর, পরিচারিকা ভগবানের নাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি উদ্দেশ্যে আপনি আবার এই মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন?"

প্রেত ইঙ্গিত করিয়া তাহাকে ডাকিলেন। পরিচারিকা কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া, অবশেষে ভয়ে-ভয়ে তাঁহার অনুসরণ করিল।

প্রেত পরিচারিকাকে কোন একটী নিভৃত কক্ষে লইয়া গেল; এবং সেখানে একটী বাক্স ছিল, সেই বাক্সটী তাহাকে খুলিতে বলিল। কিন্তু বাক্স চাবি বন্ধ থাকায় পরিচারিকা তাহা খুলিতে না পারিয়া বলিল, "বাক্সর চাবি কোথায় তাহা তো আমি জানি না, কি করিয়া খুলিব?"

বাক্সর চাবি যেখানে ছিল, প্রেত তাহা বলিয়া দিলে, পরিচারিকা চাবি আনিয়া বাক্স খুলিল।

বাক্সর ভিতর একটী পার্সেল ছিল। সেই পার্সেলটী উক্ত অনাথ-আশ্রমের বর্ত্তমান অধ্যক্ষকে দেওয়ার জন্য প্রেত তাহার পরিচারিকাকে অনুরোধ করিয়া বলিল, পরলোকে আসিয়া তাঁহার অসুখ ও অশান্তির সীমা নাই—বড় কষ্টে তাঁহাকে কাল যাপন করিতে হইতেছে। এই পার্সেলটী অনাথ-আশ্রমের অধ্যক্ষকে দিলে, এবং উক্ত পার্সেলের ভিতর যাহা আছে, তাহা আশ্রমের দীন-দুঃখীগণের হিতার্থ নিয়োগ করিলে, যদি তাঁহার মুক্তি হয়। তদ্ভিন্ন তাঁহার উদ্ধারের কোন আশা নাই; এই বলিয়া প্রেত অদৃশ্য হইয়া গেল।

পরিচারিকা এই সকল বিষয় তাহার বর্ত্তমান মনিবকে জানাইলে নি প্রেতের আদেশ পালন করিতে বলিলেন। তদনুসারে পরিরিকা পার্সেলটী লইয়া আশ্রমাধ্যক্ষের নিকট পৌঁছাইয়া দিল।

পরিচারিকার নাম-ধাম লিখিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দেওয়ার , আশ্রমাধ্যক্ষ পার্সেল খুলিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তিনি এবং শ্রমের অন্যান্য কর্ত্তৃপক্ষগণ সকলেই এককালে অবাক্ হইয়া গেলেন। তাত্মা পার্থিব কলেবর পরিত্যাগ করার পূর্ব্বে, এই অনাথশ্রমের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত থাকার সময়ে উক্ত আশ্রমের ধনগুার হইতে ক্রমে-ক্রমে ত্রিশ হাজার ফোরিণ (florin) চুরি করিয়া ত্মসাৎ করিয়াছেন স্বীকার পূর্ব্বক উক্ত টাকা অনাথ আশ্রমের র্ত্তৃপক্ষগণকে প্রত্যর্পণ করার জন্য তাঁহার পুত্রের প্রতি আদেশ য়িয়াছেন।

কর্ত্তৃপক্ষগণ পুত্রকে এই আদেশ-পত্র দেখাইয়া তাঁহার নিকট টাকা রত চাহিলে, তিনি টাকা দিতে অস্বীকার করেন এবং তজ্জন্য তাঁহার মে নালিশ হয়।

বিচার-কালে, পরিচারিকা যে অবস্থায় এই আদেশ-পত্র প্রাপ্ত ইয়াছিল, তাহা প্রকাশ করিল। কিন্তু ভূতে তাহাকে ডাকিয়া লইয়া য়া পার্সেল দেখাইয়া দিয়াছে, এ কথা প্রতিপন্ন করা তাহার পক্ষে ঠিন হইয়া উঠিল। এদিকে পুত্রের পক্ষ হইতে তাহার পিতার সুনাম ষ্ট করিবার দুরভিসন্ধিতে এক জাল আদেশ-পত্র প্রস্তুত করা হইয়াছে লিয়া পরিচারিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইল। উভয় পক্ষ ইতে বাক্-বিতণ্ডা চলিতেছে, এই সময় পুত্রের পৃষ্ঠে গুম করিয়া একটা কিল পড়িল। কিল পড়ার শব্দ সকলেই শুনিতে পাইল এবং সঙ্গেঙ্গে পুত্রের পিঠ বাঁকা হইয়া গেল, তাহাও সকলেই দেখিতে পাইল। কন্তু কে কোথা হইতে কিল মারিল? কাহারও মুখে কথা নাই। পুত্র পিঠে হাত বুলাইতেছে, আর চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছে,—ইতিমধ্যে পরিচারিকা বলিয়া উঠিল, "ঐ যে সেই প্রেতাত্মা আসিয়া উপস্থিত ইয়াছে।" পরিচারিকার চাহনি লক্ষ্য করিয়া সকলেই সেই দিকে াহিল; পুত্র দেখিল, তাহার পিতা প্রকৃতই প্রেত-শরীরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

পুত্র ও পরিচারিকা ভিন্ন সে প্রেত-মূর্ত্তি আর কাহারও দৃষ্টিগোচর হইল না। কিন্তু এই সময়ে উপস্থিত সকলেই শুনিতে পাইল, কে যেন অলক্ষ্যে পুত্রের নাম ধরিয়া ডাকিয়া বলিল—"বাছা—আমি প্রকৃতই এই টাকা অপহরণ করিয়াছি। তজ্জন্য আমি অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি; তুমি টাকাগুলি ফেরত দিয়া আমাকে উদ্ধার কর।"

পুত্রের মুখে আর কথা সরিল না। টাকাগুলি তিনি ফেরত দিলেন, এবং এই ব্যাপার যাহাতে প্রকাশ না হয় তজ্জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন। কিন্তু বহু লোকের সমক্ষে বিচারকালে যে ঘটনা প্রকাশ হইয়াছিল, তাহা আর ঢাকা থাকিল না। "Night side of Nature." pp. 281—283.

(৯) লৌহ উনন

Count de Falkesheim তাঁহার গুরুর নিকট হইতে ধর্ম্ম-উপদেশ গ্রহণ করার কালে গুরু প্রকাশ করেন যে, আত্মার অস্তিত্ব এবং পরলোক সম্বন্ধে তিনি কোন মতামত জানাইবেন না; গুরুর কথায় কাউণ্ট কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া গুরুকে কারণ জিজ্ঞাসা করিল। গুরু প্রথমতঃ এ বিষয়ে কোন কথা বলিতে স্বীকৃত হন নাই; অবশেষে কাউণ্ট অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করায় গুরু বলেন :—

প্রথম বয়সে তিনি ধর্ম্মাচার্য্য হইবেন এই উদ্দেশ্যে শিক্ষা এবং দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দর্শন-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আত্মার অস্তিত্বে তাহার সন্দেহ জন্মে; এই সময় প্রুসিয়ার রাজা প্রথম ফ্রেডরিক উইলিয়মের অনুরোধে তিনি কোন গির্জ্জার অধ্যক্ষ অর্থাৎ প্রধান পাদ্রির পদে নিযুক্ত হইয়া যান।

গির্জ্জার নিকটেই পাদ্রির বাসা। গুরু প্রথম যে দিন তাঁহার কর্ম্মস্থানে উপস্থিত হইলেন, সেই দিন তাঁহার বাসায় শয়ন করিয়া আছেন,—এমন সময়ে শেষ রাত্রে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বিছানায় শয়ন করিয়া তিনি কত কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হওয়ায় ঘরের মধ্যে আলোক প্রবেশ করিল। এমন সময়ে তিনি দেখিতে পাইলেন, গাউনপরা পাদ্রিবেশধারী একজন অপরিচিত পুরুষ ঘরের একটী ডেক্সের সম্মুখে দাঁড়াইয়া একখানি পুস্তকের পাতা উল্টাইতেছে। তাহার দুই পার্শ্বে দুইটী বালক দাঁড়াইয়া আছে। আগন্তুক মধ্যে-মধ্যে সেই বালক দুইটীর মুখের দিকে চাহিতেছে ও যেন দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে—তাহার মুখে যেন দারুণ একটী বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে।

পাদ্রি-গুরু ভূত বিশ্বাস করিতেন, না কিন্তু তাঁহার ঘরের দ্বার রুদ্ধ থাকা অবস্থায় এই আগন্তুক ছেলে দুটী সঙ্গে করিয়া কোন্ পথে কি করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল, ভাবিয়া ভয়ে তাঁহার শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। আগন্তুককে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেও তাঁহার সাহস হইল না।

আগন্তুক অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ডেক্সের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অবশেষে পুস্তকখানি বন্ধ করিয়া ছেলে দুইটীর হাত ধরিয়া চলিয়া গেল; এবং ঘরের এক পার্শ্বে শীতকালে আগুন জালিবার জন্য যে একটী লৌহ-নির্ম্মিত উনন ছিল, সেই উননের পার্শ্বে যাইয়া হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গেল।

তাহাদের অদৃশ্য হইতে দেখিয়া গুরু একবারে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন; এবং আর সে ঘরে অপেক্ষা না করিয়া, তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া, একবারে উর্দ্ধশ্বাসে গির্জ্জায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

পাদ্রি-গুরু গির্জ্জার মধ্যে এ-ঘরে সে-ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতে-বেড়াইতে শেষে একটী ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে ঘরে সারি-সারি অনেকগুলি ছবি টাঙ্গান ছিল। পূর্ব্বে যাঁহারা এই গির্জ্জার পাদ্রীর পদে অভিষিক্ত ছিলেন, এ সকল তাঁহাদের ছবি। পাদ্রি-গুরু একে-একে ছবি দেখিতে লাগিলেন, এবং কে কোন্ সময় হইতে কোন্ সময় পর্য্যন্ত পাদ্রি-

পদে নিযুক্ত ছিলেন, তাহা পাঠ করিতে লগিলেন; তিনি যে বিভীষিকা দেখিয়া ভয় পাইয়াছিলেন, তাহা ক্ষণেকের জন্ম ভুলিয়া গেলেন! ছবি দেখিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে অবশেষে শেষ ছবির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইবামাত্র আবার তাঁহার শরীর শিহরিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তাঁহার শয়ন-কক্ষে যে ভৌতিক মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন, এ যে সেই মূর্ত্তি,—সেই গাউন-পরা, সেই চেহারা!!!

এই সময়ে গির্জ্জার একজন অতি প্রাচীন কর্ম্মচারী আসিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। পাদ্রি-গুরু তাঁহাকে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব অধ্যক্ষদের সম্বন্ধে দুই-এক কথা জিজ্ঞাসা করিয়া, অবশেষে শেষ অধ্যক্ষ, যাঁহার পদে তিনি নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছেন, তাঁহার কথা পাড়িলেন, এবং কথায়-কথায় জানিতে পারিলেন, তিনি এই গির্জ্জার পাদ্রি-পদে নিযুক্ত থাকিলেও তাঁহার চরিত্র ভাল ছিল না; পাড়ার কোন একটী যুবতী ভদ্রমহিলার সহিত তিনি অবৈধ প্রণয়-পাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন; এবং তাঁহার ঔরসে এই যুবতীর গর্ভে দুইটী পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সন্তান দুইটী ৪।৫ বৎসরের হইলে কলঙ্কের ভয়ে তাহাদের স্থানান্তর করা হয়। সন্তান দুইটী কোথায়, তাহা আজ পর্য্যন্ত কেহ জানে না। কিন্তু ইহাতে তাঁহার কলঙ্ক আরও ছড়াইয়া পড়িল,—তাহাদের হত্যা করা হইয়াছে বলিয়া নানা জনে নানা কথা বলাবলি করিতে লাগিল; এবং লোকের নিকট পাদ্রির মুখ দেখান ভার হইয়া উঠিল। এই ঘটনার অতি অল্প দিন পরেই, যে ঘরে আপনি কাল রাত্রে শয়ন করিয়াছিলেন, সেই ঘরে পাদ্রির মৃত-দেহ পাওয়া গেল। পাদ্রি কলঙ্কের ভয়ে আত্মহত্যা করিয়াছিলেন।

পাদ্রি-গুরু যখন এই গির্জ্জার অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইয়া আসেন, তখন গ্রীষ্মকাল। এজন্ম ঘরের মধ্যে যে লৌহ-নির্ম্মিত উনন ছিল, এবং যে উনন-পার্শ্বে ভৌতিক মূর্ত্তিত্রয় অদৃশ্য হইয়াছিল, তাহা জ্বালিবার প্রয়োজন হয় নাই। শীতকাল আসিলে উক্ত উনন কোন রাত্রিতে জ্বালিবার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু ভাল জ্বলে না; উপরন্ত ভয়ঙ্কর একটা দুর্গন্ধ বাহির হওয়ায়, সে ঘরে বাস করা দুঃসাধ্য হয়। উননটীর কল নষ্ট হইয়াছে ভাবিয়া, পরদিন কামার ডাকিয়া আনা হয়। কামার উননের কল খুলিয়া দেখে, তলায় ছোট-ছোট বালকের দুটী মাথার খুলি এবং হাড় পড়িয়া আছে।

আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে অপমৃত্যু হইলে প্রেতযোনি প্রাপ্ত হওয়ার কথা দেখিতে পাওয়া যায়—কথাটা নিতান্ত মিথ্যা নয়। পাদ্রি বালক দুইটীকে হত্যা করিয়া উননের তলায় ফেলিয়া দিয়া নিজে আত্মহত্যা করায়, তাহারা তিন জনেই ভূত হইয়া এই ঘরে বাস করিতেছিল।

পাদ্রি-গুরু আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না; কিন্তু এই ঘটনার পর তাঁহার বিশ্বাস অন্য রকম হইয়াছিল।

Footfall on the Boundaries of another World. page 217—289.

(১০) পাওনা আদায়

বিখ্যাত লর্ড চ্যানসেলার আর্সকিন্ (Erskin) সাহেবের যৌবনাবস্থায় একবার দীর্ঘকাল ধরিয়া তিনি স্কটলণ্ড হইতে অনুপস্থিত থাকার পর যেদিন প্রথম এডিনবরা সহরে ফিরিয়া আসেন, সেই দিন প্রাতঃকালে কোন পুস্তকের দোকানের সম্মুখে তাঁহাদের (butler) ভাণ্ডারীর সহিত হঠাৎ তাঁহার দেখা হয়। ভাণ্ডারীর দেহ অস্থি-কঙ্কাল-সার হইয়াছে; তাহার চেহারা দেখিলে যেন ভয় হয়। আর্সকিন সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি এখানে?"

ভাণ্ডারী উত্তর করিল, "আমি হুজুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। আমার কিছু টাকা পাওনা আছে। (steward) দেওয়ানজী মহাশয় অন্যায় করিয়া আমাকে টাকা দিলেন না। কর্ত্তাকে বলিয়া, আমি টাকা কয়টা যাহাতে পাই, তাহার ব্যবস্থা আপনাকে করিয়া দিতে হইবে।"

ভাণ্ডারীর চেহারা ও তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া আর্সকিন সাহেব বিস্মিত হইয়া তাহাকে সঙ্গে আসিতে বলিয়া সম্মুখস্থ দোকানে প্রবেশ করিবেন, এমন সময় পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন ভাণ্ডারী নাই, অদৃশ্য হইয়াছে।

সেই সহরে ভাণ্ডারীর স্ত্রীর একখানি দোকান ছিল। আর্সকিন সাহেব সন্ধানে সন্ধানে সেই দোকানে যাইয়া জানিতে পারিলেন, কয়েক মাস হইল ভাণ্ডারীর মৃত্যু হইয়াছে।

ভাণ্ডারীর স্ত্রী অন্যান্য কথার পর বলিল, তাহার স্বামী মৃত্যুকালে বলিয়া গিয়াছে যে, তাহার কিছু টাকা মাহিয়ানা পাওনা আছে,—আপনি বাড়ী থাকিলে তাহার টাকা কখন কাটা যাইত না।

তাহার যে কিছু টাকা পাওনা থাকে, তাহা তিনি পাঠাইয়া দিবেন বলিয়া আর্সকিন বিদায় হইলেন; এবং বাড়ী আসিয়া টাকা পাঠাইয়া দিলেন।

আর্সকিন যখন (Lord Chanceller) লর্ড চ্যানসেলার হইয়াছিলেন, তখনও তাঁহার এই ঘটনার কথা ভুল হয় নাই।

Life's Borderland and Beyond. p. 202.

(১১) অনুরোধ-রক্ষা

ইংলণ্ডের রাজা প্রথম চার্লসের পাশব অত্যাচারে ও উৎপীড়নে রাজ্যের যাবতীয় প্রজা বিদ্রোহী হইয়াছিল। রাজার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন Duke of Buckingham; ডিউকের মন্ত্রণায় রাজা প্রজা নির্য্যাতন করিতেছেন ভাবিয়া, তাঁহার উপর প্রজাদের ভয়ঙ্কর আক্রোশ জন্মিয়াছিল।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন উক্ত ডিউকের পিতা (George Villiers) জর্জ্জ ভিলিয়ার্স পরলোকে; তাঁহার প্রেতাত্মা আসিয়া একদিন তাঁহার কোন বাল্য বন্ধুর সহিত দেখা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে চিনিতে পার কি?"

রাত্রি দ্বিপ্রহর সময় রুদ্ধ-দ্বার ঘরের মধ্যে হঠাৎ এই প্রেতমূর্ত্তিকে

স্থিত হইতে দেখিয়া, ভয়ে বন্ধুর প্রাণ জড়সড় হইয়া গিয়াছিল। হার মুখ দিয়া কথা সরিল না।

প্রেত আবার বলিল "আমাকে কখনও কোথাও দেখিয়াছ বলিয়া মার মনে হয় না কি?"

প্রেতের আকৃতি দেখিয়া বন্ধু ভয়ে ভয়ে উত্তর করিলেন "আপনি জর্জ্জ ভিলিয়ার্স?"

প্রেত। হ্যাঁ আমি তোমার সেই বাল্য বন্ধু ভিলিয়ার্স। তোমাকে মি একটী অনুরোধ করিতে আসিয়াছি। আমার অনুরোধ তোমাকে ক্ষা করিতে হইবে।

বন্ধু। আমাকে কি করিতে হইবে বলুন।

প্রেত। তুমি আমার পুত্র ডিউকের নিকট যাও। তাহাকে আমার ম করিয়া বল, যদি তিনি প্রজার উপর অত্যাচার করিতে ক্ষান্ত না ন এবং রাজাকে নিরস্ত না করেন, তাহা হইলে তাঁহার জীবন কখনই ক্ষা পাইবে না।

এই কথা বলিয়া প্রেত অদৃশ্য হইল।

আমরা যে বন্ধুর কথা বলিতেছি, তাঁহার বয়স তখন ৫০ বৎসর। তনিও রাজ-সরকারে চাকরী করিতেন; এবং স্থির, ধীর ও জ্ঞানবান লিয়া তাঁহার যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল।

প্রেত অদৃশ্য হওয়ার পর, তিনি এই সম্বন্ধে চিন্তা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে, পূর্ব্ব রাত্রের ঘটনার কথা তাঁহার স্বপ্ন বলিয়া মনে হইল; এবং এ সম্বন্ধে তিনি আর কোন চিন্তা করিলেন না।

কয়েক দিন পরে প্রেত আসিয়া আবার তাঁহার সহিত দেখা করিল, এবং রাগভরে জিজ্ঞাসা করিল, "যাহা বলিয়া গিয়াছিলাম, তাহা করিয়াছ কি?" প্রেত জানিত তাহার কথামত কার্য্য করা হয় নাই; এজন্য এই নিরীহ প্রকৃতির রাজকর্ম্মচারীকে প্রেত যথোচিত তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করিয়া বলিয়া গেল, যদি তাহার অনুরোধ রক্ষা করা না হয়, তাহা হইলে সে এই প্রেতমূর্ত্তিতে সর্ব্বক্ষণ তাঁহার পিছনে লাগিয়া থাকিবে ও তাঁহার জীবনের সুখ-শান্তি নষ্ট করিয়া দিবে।

রাজকর্ম্মচারী দ্বিতীয়বার যাহা দেখিলেন ও শুনিলেন, তাহা আর তিনি স্বপ্ন বলিয়া মন হইতে দূর করিতে পারিলেন না। কিন্তু কোথায় কি করিয়া ডিউকের সাক্ষাৎ পাইবেন এবং তাহার কথায় কি করিয়াই বা ডিউকের প্রত্যয় জন্মাইবেন, এই চিন্তায় তাঁহার দিনের পর দিন কাটিয়া গেল। এমন সময়ে প্রেত আসিয়া আবার তাঁহার সহিত অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে দেখা করিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিতে উদ্যত হইল। রাজকর্ম্মচারী অতি বিনয়ের সহিত বলিলেন, "আপনার আদেশ পালন করিতে আমার কোন আপত্তি নাই; কিন্তু আমি একজন অতি সামান্য ব্যক্তি। কি করিয়া ডিউকের সহিত দেখা করিব এবং যে কথা তাঁহাকে জানাইবার জন্য আপনি আমাকে আদেশ করিয়াছেন, সে কথায় আমি তাঁহার কি করিয়া প্রত্যয় জন্মাইব? আমার কথা তিনি কখনই বিশ্বাস করিবেন না। হয় আমাকে তিনি পাগল বলিয়া তাড়াইয়া দিবেন, না হয় আমি কোন দুষ্ট অভিপ্রায়ে তাঁহার নিকট এই কথা বলিতে উপস্থিত হইয়াছি ভাবিয়া, আমার প্রতি কঠোর শাস্তি-বিধান করিবেন —এই ভাবিয়া তাঁহার নিকট অগ্রসর হইতে আমি সাহস করি নাই।"

প্রেত উত্তর করিল, "ডিউকের সহিত সাক্ষাৎ করা তোমার পক্ষে বিশেষ কষ্টকর হইবে না এবং তোমার কথায় তাঁহার যাহাতে প্রত্যয় জন্মে সে জন্য তোমাকে আজ কয়েকটী অতি গোপনীয় কথা বলিয়া যাইতেছি। ডিউক ভিন্ন অপর কাহারও নিকট যদি তুমি এই কথা প্রকাশ কর, তাহা হইলে জানিও তোমার সর্ব্বনাশ হইবে। ডিউককে তুমি এই কথা কয়টি জানাইবে; এবং যে অবস্থায় তুমি আমার নিকট এই কথা জানিতে পারিয়াছ, তাহা প্রকাশ করিলে, আমার সহিত তোমার দেখা সাক্ষাৎ হওয়া ও আমি তোমাকে যে বিষয় তাঁহাকে জানাইবার জন্য আদেশ করিয়াছি, তাহা আর তিনি অবিশ্বাস করিতে পারিবেন না।"

এই ঘটনার পর উক্ত কর্ম্মচারী ডিউকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে তাঁহার পিতার আদেশ ও অভিপ্রায় জানাইলে, তিনি সে সকল কথার কিছুই বিশ্বাস করিলেন না। কিন্তু প্রেত তাঁহার প্রত্যয় জন্মাইবার জন্য যে কয়েকটী গোপনীয় কথা বলিয়া গিয়াছিল, সেই কথা কয়টী প্রকাশ করিলে, ডিউকের মুখ অন্ধকার হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, এই সকল অতি গুহ্য কথা—সেই প্রেত, তাঁহার মাতা এবং তিনি ভিন্ন আর কেহই জানে না।

ডিউক তাঁহার মাতাকে বড় ভালবাসিতেন ও ভক্তি করিতেন। তাঁহার মাতা কর্ত্তৃক এই সকল কথা প্রকাশিত হইয়াছে ভাবিয়া, সেই দিন তিনি তাঁহার সহিত দেখা করিলেন, এবং দুজনে অনেকক্ষণ ধরিয়া ঝগড়া-বিবাদ করিলেন। তাহাদের মধ্যে কি কথা হইয়াছিল তাহা আমরা বলিতে পারিব না, তবে প্রেতের কথামত প্রজার উপর অত্যাচার করিতে নিজে নিরস্ত হইলেন না, রাজাকেও ক্ষান্ত করিলেন না বলে Lieuteuant Felton এই ঘটনা অনতিকাল মধ্যে অতি নৃশংস ভাবে ডিউককে হত্যা করিয়াছিল।

শব্দতত্ত্ব *

[শ্রীহরিহর শাস্ত্রী]

জাগতিক বিবিধ ব্যবহারে শব্দের যত উপযোগিতা, অন্য কোনও পদার্থের বোধ হয় এত উপযোগিতা নাই। শব্দোচ্চারণ ব্যতীত আমরা কোন্ কার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন করিতে পারি? শিশু পিপাসায়

---

* মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের সভাপতিত্বে "বারাণসী শাখা সাহিত্য-পরিষদে"র সাধারণ অধিবেশনে পঠিত।

শুষ্ককণ্ঠ,—কিন্তু তাঁহার ক্রন্দন-শব্দ উত্থিত না হইলে, মাতা তাহাকে স্তন্য-পানে তৃপ্ত করিতে আসেন না। দেবকার্য্য, পিতৃকার্য্য —সর্ব্বত্রই শব্দের প্রয়োজন। স্তোত্র পাঠ করিয়া আমরা দেবতার সন্তুষ্টি বিধানের চেষ্টা করি; মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া পিতৃলোকের তর্পণ করি। রাজার অধিকাংশ রাজকার্য্যই শব্দ-প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। আমাদের বেদ, পুরাণ, দর্শনাদি সমস্ত শাস্ত্র-গ্রন্থই শব্দাত্মক। শব্দের সাহায্যেই নানাপ্রকার কাব্য-নাটক রচনা করিয়া কবিগণ অভ্রংলিহ কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ভগবান্ যে গীতোপদেশের প্রভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে অশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণ অবসন্ন অর্জ্জুনের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা কতিপয় শব্দ-সমষ্টি মাত্র। প্রেমের প্রশান্ত মূর্ত্তি গৌরাঙ্গদেব, যে ভগবন্নামের মাহাত্ম্যে জগৎ মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা শব্দ ভিন্ন আর কিছুই নহে। আর সেই অতীতের বৃন্দাবনে, শ্রীকৃষ্ণ যমুনা-পুলিনে কদম্ব-তরুর তলে দাঁড়াইয়া, বায়ুতরঙ্গে মুরলীরবে মধুর স্বর-লহরী ভাসাইয়া দিয়া গোপ-বধূদিগের শ্রবণ-মন অপহরণ করিয়াছিলেন, তাহাও শব্দ। আজও গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার ন্যায় শব্দের সাহায্যেই আপনাদিগকে শব্দতত্ত্ব বুঝাইতে উদ্যোগী হইয়াছি।

আমরা নৈয়ায়িক মতানুসারেই শব্দতত্ত্ব বুঝাইবার চেষ্টা করিব। শব্দ আকাশের একটী গুণ। শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দ যে আকাশের গুণ, তাহা মহাকবি কালিদাসও 'অভিজ্ঞান শাকুন্তলে'র নান্দীতে লিখিয়াছেন,—"শ্রুতিবিষয়গুণা যা স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বম্।" এই শব্দ দ্বিবিধ;—ধ্বনি ও বর্ণ। মৃদঙ্গাদি হইতে উৎপন্ন শব্দের নাম ধ্বনি, আর কণ্ঠসংযোগাদি-জন্য শব্দের নাম বর্ণ। কর্ণবিবরাবচ্ছিন্ন আকাশ, শব্দ-গ্রাহক ইন্দ্রিয়। আকাশ এক হইলেও, এই জন্য অতিদূরস্থ শব্দ শ্রুতিগোচর হয় না। নিকটবর্ত্তী শব্দের সহিতই বা কেমন করিয়া কর্ণেন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হয়? শব্দ ত আর কর্ণবিবরের মধ্যে উৎপন্ন হয় না। সুতরাং বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের যদি সম্বন্ধই না হইল, তবে শব্দের প্রত্যক্ষ হয় কেমন করিয়া? ঘটের সহিত চক্ষুঃ সংযোগ না হইলে যেমন ঘটের চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, সেইরূপ শব্দের সহিত যদি কর্ণেন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ না হয়, তাহা হইলে শব্দের প্রত্যক্ষ ত অসম্ভব হইয়া পড়ে। এ সম্বন্ধে তার্কিকেরা বলিয়াছেন, প্রথম শব্দ হইতে 'বীচীতরঙ্গ'-ন্যায়ে দশ দিকে আর একটী শব্দ উৎপন্ন হয়; তাহা হইতে আবার শব্দান্তর হয়;—এইরূপে শব্দ-সন্তানের সৃষ্টি হইতে-হইতে কর্ণেন্দ্রিয়ে শব্দ উৎপন্ন হইলে, তাহারই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। যেমন জল-মধ্যে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে, ক্ষুদ্র তরঙ্গ হইতে ক্রমশঃ বৃহত্তর তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, এবং দূরে গিয়া তাহা আহত হয়,—কর্ণমধ্যে শব্দ-সন্তানোৎপত্তিও ঠিক এই ভাবে হইয়া থাকে। কেহ-কেহ বলেন, প্রথম শব্দ হইতে 'কদম্বগোলক'-ন্যায়ে দশ দিকে দশটী শব্দ উৎপন্ন হয়; তাহা হইতে আবার দশটী শব্দ—এই ভাবে কর্ণেন্দ্রিয়ের সহিত শব্দের সম্বন্ধ হইয়া থাকে। 'ন্যায়বার্ত্তিক'কার উদ্দ্যোতকর এই মতাবলম্বী। তিনি লিখিয়াছেন—

"তত্রাদ্যঃ শব্দঃ সংযোগবিভাগহেতুকঃ তস্মাচ্ছব্দান্তরাণি কদম্ব-গোলকন্যায়েন সর্ব্বদিক্কানি তেভ্যঃ প্রত্যেকমেকৈকঃ শব্দো মন্দতর-তমাদিন্যায়েনাশ্রয়া প্রতিবন্ধমনুবিধীয়মানঃ প্রাদুরস্তি।"—(ন্যায়-বার্ত্তিক, ২৮৯ পৃঃ Bib. End. Ed.)

বৈশেষিক দর্শনের ভাষ্যকার প্রশস্তপাদাচার্য্য, পূর্ব্বোপদর্শিত বীচীতরঙ্গ-ন্যায়ে শব্দোৎপত্তি-প্রক্রিয়ার কথা বলিয়াছেন। (১)

এই উভয় মতের মধ্যে কদম্বগোলক-ন্যায়ে শব্দোৎপত্তিকল্পে গৌরব হয়। কারণ, এই মতে দশ দিকে দশ শব্দের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়; আর বীচীতরঙ্গ-ন্যায়ে শব্দোৎপত্তি পক্ষে একই শব্দ দশ দিকে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কদম্বগোলক-ন্যায়ে দশ দিকে দশ শব্দের উৎপত্তি স্বীকার করিলে, আরও একটা দোষ হয় যে, 'তুমি যে বীণাধ্বনি শুনিলে, আমিও তাহাই শুনিলাম'—এই প্রত্যভিজ্ঞার অনুপপত্তি হইয়া পড়ে। "কণাদ-রহস্যে" শঙ্কর মিশ্র এই দোষের উল্লেখ করিয়াছেন (২)।

প্রথম শব্দের প্রতি সংযোগ অথবা বিভাগ কারণ। কণ্ঠতালু-সংযোগে কিংবা ভেরী প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের সহিত দণ্ডাদির সংযোগ হইলে শব্দের উৎপত্তি হয়। আবার বংশখণ্ড চিরিয়া ফেলিবার সময়ে উভয় অংশের বিভাগ হইতেও শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে। দ্বিতীয়াদি শব্দের প্রতিশব্দই হেতু। তাই মহর্ষি কণাদ সূত্র করিয়াছেন,—

"সংযোগাদ্ বিভাগাচ্চ শব্দাচ্চ শব্দনিষ্পত্তিঃ। (২।২।৩১)

শব্দের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে বেদান্তীরা বলেন যে, প্রথম শব্দ হইতে বীচীতরঙ্গাদি-ন্যায়ে শব্দ-সন্তানের উৎপত্তি স্বীকার করিলে, এক ত গৌরব হয়, দ্বিতীয়তঃ 'ভেরীশব্দো ময়া শ্রুতঃ'—'আমি ভেরীর শব্দ শুনিলাম' এই জ্ঞানকে ভ্রমাত্মক বলিতে হয়। কারণ, ভেরীর সহিত দণ্ডাঘাতে প্রথম যে শব্দ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা ত তুমি শুনিতে পাইলে না—তুমি শুনিলে সেই প্রথম শব্দ হইতে যে শব্দ-সন্তান ক্রমশঃ উৎপন্ন হইল, তাহারই কোনও এক শব্দ। সুতরাং এই ভাবে শব্দ জন্য শব্দান্তরের কল্পনা যুক্তিসঙ্গত নহে। কাজেই বলিতে হয়, শ্রোত্র বিষয়দেশে গমন করিয়াই শ্রাবণ-প্রত্যক্ষের হেতু হইয়া থাকে। শব্দের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে সাংখ্যাচার্য্যেরাও বেদান্তীদিগের সহিত প্রায় একমত। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত বিচারসহ নহে। ন্যায়বার্ত্তিক, ন্যায়-বার্ত্তিক-তাৎপর্য্য, ন্যায়মঞ্জরী প্রভৃতি গ্রন্থে এই সিদ্ধান্ত খণ্ডিত হইয়াছে। [অনুসন্ধিৎসুগণ, বার্ত্তিকের ২৮৭—৮৮, তাৎপর্য্যের ৩০৯—১০ এবং মঞ্জরীর ২১৫ পৃষ্ঠা অবলোকন করিবেন।] এই খণ্ডন-রীতির সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, কর্ণবিবরাবচ্ছিন্ন আকাশরূপ শ্রোত্র, কদাপি শব্দোৎপত্তি-

(১) "বেণুপর্ব্ববিভাগাদ্ বেণ্বাকাশবিভাগাচ্চ শব্দাচ্চ সংযোগ-বিভাগনিষ্পন্নাদ্ বীচীসন্তানবচ্ছব্দসন্তান ইত্যেবংসন্তানেন শ্রোত্র প্রদেশমাগতস্য গ্রহণম্।"—প্রশস্তপাদ-ভাষ্য, ২৮৮ পৃঃ।

(২) "য এব বীণাশব্দঃ ত্বয়া শ্রুতঃ স এব ময়াপীতি কথং প্রত্যভিজ্ঞা—।"—কণাদ-রহস্য, ২৮ পৃঃ।

শব্দদেশে গমন করিয়া শব্দের সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে না। কারণ, আকাশ অমূর্ত্ত অর্থাৎ অবচ্ছিন্নপরিমাণরহিত। যাহার অবচ্ছিন্ন পরিমাণ নাই, সে নিষ্ক্রিয়; যথা রূপাদি। যদি বল, ক্রিয়ার কারণ সংযোগ-বিভাগ যখন আকাশে আছে, তখন আকাশে ক্রিয়া হইবে না কেন? ইহার উত্তর এই যে, সংযোগ-বিভাগ থাকিলেই ক্রিয়া উৎপন্ন হয় না,—আত্মাতে সংযোগ-বিভাগ থাকিলেও আত্মা নিষ্ক্রিয়। সুতরাং বলিতে হইবে, ক্রিয়ার প্রতি পরমমহৎপরিমাণ প্রতিবন্ধক। আকাশে পরমমহৎপরিমাণ আছে বলিয়াই তাহাতে ক্রিয়া হইতে পারে না। কাজে কাজেই আকাশরূপ শ্রোত্র, শব্দদেশে গমন করিয়া যে বিষয়গ্রাহক হইবে, ইহা সম্ভবপর নহে। তার পর যদি 'তুষ্যতু দুর্জ্জনঃ'-ন্যায়ে শ্রোত্রের ক্রিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে শব্দানুকূল বায়ুস্থলেও শব্দের অপ্রত্যক্ষের আপত্তি হয়। কেন না, শব্দোৎপত্তি-প্রদেশ হইতে যে বায়ু আসিবে, তাহা গমনশীল শ্রোত্রের প্রতিকূলতা করিবে। বায়ু শব্দানুকূল হইলে অনতিদূরবর্ত্তী শব্দও শুনা যায়; আর বায়ু প্রতিকূল হইলে নিকটবর্ত্তী শব্দও শুনা যায় না। কিন্তু শ্রোত্রের গতি স্বীকার করিলে, ইহার বিপরীত হওয়া উচিত। জয়ন্তভট্ট লিখিয়াছেন,—

"বায়ৌ শব্দানুকূলে চ ন তস্য শ্রবণং ভবেৎ।
গচ্ছন্ত্যাঃ প্রতিকূলো হি শ্রোত্রবৃত্তেঃ স মারুতঃ॥"

—(ন্যায়মঞ্জরী, ২১৫ পৃঃ)।

আর বাস্তবিক পক্ষে শব্দোৎপত্তি প্রদেশে শ্রোত্রের গমনই অসম্ভব। কেবল আকাশই ত শ্রোত্র নহে,—কর্ণশস্কুল্যবচ্ছিন্ন আকাশের নামই শ্রোত্র। শব্দোৎপত্তিপ্রদেশে কর্ণশস্কুলী যে যায় না, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কাজেই কেবল আকাশ যদি শব্দোৎপত্তি প্রদেশে যায়ও, তাহা হইলে শ্রোত্রের গমন সিদ্ধ হইতে পারে না। কর্ণবিবরানবচ্ছিন্ন আকাশের সহিত সম্বন্ধ হইলেও যদি শব্দের প্রত্যক্ষ স্বীকার কর, তাহা হইলে কলিকাতার কোলাহল বারাণসীতে থাকিয়া শুনা যায় না কেন? সে কোলাহলের সহিতও ত আকাশের সম্বন্ধ আছে। সুতরাং অনন্যগত্যা বীচীতরঙ্গ-ন্যায়ে কর্ণমধ্যে শব্দোৎপত্তি স্বীকার করিতে হইবে। 'আমি ভেরীর শব্দ শুনিলাম' এ স্থলে ভেরীশব্দের সজাতীয় শব্দেই তাৎপর্য্য।

জৈন দার্শনিকেরা বলেন যে, সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম শব্দপুদ্গলসমূহ হইতে সাবয়ব শব্দ উৎপন্ন হয় (৩), এবং তাহা নিজের উৎপত্তিস্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করে। এই জৈনমত খণ্ডনার্থ জরন্নৈয়ায়িক জয়ন্তভট্ট স্বকৃত "ন্যায়মঞ্জরী"তে বলিয়াছেন যে, "পুদ্গলসমূহ বর্ণের অবয়ব, তাহা হইতে আবার অবয়বী বর্ণান্তর উৎপন্ন হয়, ইহা এক কৌতুক বটে! আচ্ছা, এই সাবয়ব বর্ণ কর্ণরন্ধ্রে যাইবার সময়ে পথিমধ্যে বায়ুদ্বারা বিক্ষিপ্ত হয় না কেন, বৃক্ষাদিতে প্রতিহত হইয়া তাহার অঙ্গভঙ্গই বা কেন না হয়? আর শব্দ বেচারীর যাইবার সীমাই বা কত দূর? তার পর সেই সাবয়ব শব্দ, একজনের কর্ণবিবরে যখন প্রবিষ্ট হয়, তখন অন্য লোকে কেমন করিয়া সেই শব্দ শুনিতে পায়? যদি বল, একজনের কর্ণ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সেই শব্দ অপর কর্ণে প্রবেশ করে, তাহা হইলে একই সময়ে কিরূপে যুগপৎ সহস্র-সহস্র লোকের শ্রুতিগোচর হয়? শ্রোতার সংখ্যানুসারে নানা বর্ণ উৎপন্ন হয়, এরূপ কল্পনা করাও সঙ্গত নহে। শ্রোতা অধিক থাকুক, আর অল্পই থাকুক, বক্তা তুল্য প্রযত্নেই শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকে (৪)।

বৌদ্ধ দার্শনিকেরা বলেন যে, শব্দের সহিত কর্ণেন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ না হইলেও, ইন্দ্রিয়ের শক্তি বস্তুতঃই শব্দ প্রত্যক্ষ হয়। এই মত একেবারেই বিচারসহ নহে। শব্দের সহিত কর্ণেন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ না হইলেও যদি শব্দ প্রত্যক্ষ হয়, তবে দূরস্থ বা ব্যবহিত শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না কেন?

অন্যান্য দার্শনিকদিগের এই সকল মত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, নৈয়ায়িকেরা বীচীতরঙ্গ-ন্যায়ে যে শব্দসৃষ্টি কল্পনা করিয়াছেন, তাহাই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু এই নৈয়ায়িক মতে দোষোদ্ভাবন করিবার জন্য বিরুদ্ধবাদীরা শঙ্কা করিয়া থাকেন,—

"শব্দঃ শব্দান্তরং সূতে ইতি তাবদলৌকিকম্
কার্য্যকারণভাবো হি ন দৃষ্টস্তেষু বুদ্ধিবৎ॥
জন্যন্তেঽনন্তরে দেশে শব্দৈঃ স্বসদৃশাশ্চ তে।
তির্য্যগূর্দ্ধমধশ্চেতি কেয়ং বা শ্রদ্দধানতা॥
শব্দান্তরাণি কুর্ব্বন্তঃ কথঞ্চ বিরমন্তি তে।
ন হি বেগক্ষয়স্তেষাং মরুতামিব কল্প্যতে॥
কুড্যাদি ব্যবধানে চ শব্দস্যাবরণং কথম্।
ব্যোম্নঃ সর্ব্বগতত্বাদ্ধি কুড্যমধ্যে ব্যবস্থিতিঃ॥

(৩) "যদস্মাভিঃ শ্রাবণস্বভাববিনাশোৎপত্তিমৎ পুদ্গলদ্রব্যমিত্যভিধীয়তে, তদ্ যুষ্মাভির্বর্ণ ইত্যাখ্যায়তে।"

—প্রমেয়কমলমার্ত্তণ্ড, ১২১ পৃঃ।

"পৌদ্গলিকঃ শব্দ অস্মদাদি প্রত্যক্ষত্বেঽচেতনত্বে চ সতি ক্রিয়াবত্ত্বাদ্ বাণাদিবৎ।"—প্রমেয়কমলমার্ত্তণ্ড, ১৬৮ পৃঃ।

(৪) "বর্ণস্যাবয়বাঃ সূক্ষ্মাঃ সন্তি কেচন পুদ্গলাঃ।
তৈর্বর্ণোঽবয়বী নাম জন্যতে পশ্য কৌতুকম্॥
কৃশশ্চ গচ্ছন্ স কথং ন বিক্ষিপ্যেত মারুতৈঃ।
দলশো বা ন ভজ্যেত বৃক্ষস্তভিহতঃ কথম্॥
প্রয়াণকাবধিঃ কশ্চ গচ্ছতোঽস্য তপস্বিনঃ।
একশ্রোত্রপ্রবিষ্টো বা স শ্রূয়েতাপরৈঃ কথম্॥
নিষ্ক্রম্য কর্ণাদেকস্মাৎ প্রবেশঃ শ্রবণান্তরে।
যদীষ্যেত কথং তস্য যুগপদ্ বহুভিঃ শ্রুতিঃ॥
শ্রোতৃসংখ্যানুসারেণ ন নানাবর্ণসম্ভবঃ।
বক্তুস্তুল্যপ্রযত্নত্বাচ্ছ্রোতৃভেদে ভবত্যয়ে॥"—

ন্যায়মঞ্জরী, ২১৬ পৃঃ।

তুল্যারম্ভে চ তীব্রেণ মন্দস্য জননং কথম্।
শ্রূয়তে চান্তিকাৎ তীব্রঃ শব্দো মন্দস্তু দূরতঃ॥
বীচীসন্তানতুল্যত্বমাপি শব্দেষু দুর্ব্বচম্।
মূর্ত্তিমত্ত্বক্রিয়াযোগ বেগাদিরহিতাত্মসু॥"

—ন্যায়মঞ্জরী, ২১৪ পৃঃ।

"শব্দ হইতে যে আবার শব্দান্তর উৎপন্ন হয়, ইহা এক অলৌকিক কল্পনা। জ্ঞানদ্বয়ের মতন শব্দসন্তানের কার্য্যকারণভাব স্বীকার করা অনুভব-বিরুদ্ধ। এক শব্দ হইতে দূরবর্ত্তী দশ দিকে তৎসজাতীয় শব্দান্তর জন্মগ্রহণ করে, এ মতকে শ্রদ্ধা করিতে ইচ্ছা হয় না। আচ্ছা, যদি শব্দ হইতেই শব্দান্তর জন্মে, তবে তাহার বিরাম হয় কেন?—ক্রমশঃই শব্দ হইতে থাকুক। বায়ুর মতন শব্দের ত আর বেগক্ষয় কল্পনা করিতে পার না। তোমাদের মতে শব্দের সমবায়ী কারণ আকাশ; সেই সর্ব্বব্যাপী আকাশ ত প্রাচীরের অন্তরালেও আছে; কিন্তু প্রাচীরাদি ব্যবধান থাকিলে শব্দের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হয় না কেন? তুল্য ভাবে শব্দের আরম্ভ হইলেও, তীব্র শব্দ হইতে অতীব্র শব্দের উৎপত্তি কেমন করিয়া হয়? নিকটে থাকিলে তীব্রভাবে ও দূরে থাকিলে অস্ফুটভাবে শব্দ শুনা যায়, ইহার কারণ কি? আর বীচীতরঙ্গ-ন্যায়ে শব্দ-সন্তানোৎপত্তির যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছ, তাহাও অসম্ভব। শব্দের ত আর জলের ন্যায় অবচ্ছিন্ন পরিমাণ, ক্রিয়া ও বেগাদি নাই।"

তার্কিকেরা এই আশঙ্কার সুন্দর সমাধান করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, গুণের মধ্যে কেবল জ্ঞানই যে জ্ঞানান্তরের কারণ, তাহা নহে। রূপাদি গুণ হইতেও তৎসজাতীয় গুণান্তর উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঘটাদি অবয়বীর রূপের প্রতি কপালাদি অবয়বের রূপ হেতু। সুতরাং শব্দ হইতে যে শব্দান্তর উৎপন্ন হইবে, ইহাতে বিস্ময়ের কোনই কারণ নাই। তার পর যে বলিয়াছ, শব্দ হইতে যদি শব্দান্তর জন্মে, তবে তাহার বিরাম হয় কেন? ইহার উত্তর এই যে, কণ্ঠতাল্বাদির সংযোগ হইতে কোষ্ঠ-বায়ুতে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। এই সক্রিয় বায়ু শব্দের প্রতি নিমিত্ত কারণ। বেগের সদ্ভাব পর্য্যন্ত এই বায়ু প্রস্থান করিতে থাকে। কোনও কারণবশতঃ এই বায়ুর গতিরোধ হইলে, বা তাহার বিনাশ হইলে, নিমিত্ত কারণের অভাবে শব্দান্তরের উৎপত্তি হইতে পারে না। কাজেই শব্দ-সন্তানের বিরাম হয়। শ্রীধরাচার্য্য বলিয়াছেন,—

"ন চানবস্থা যাবদ্দূরং নিমিত্তকারণভূতঃ কৌষ্ঠ্যবায়ুরনুবর্ত্ততে তাবদ্দূরং শব্দ-সন্তানানুবৃত্তিঃ। অতএব প্রতিবাতং শব্দানুপলম্ভঃ কৌষ্ঠ্যবায়ু প্রতীঘাতাৎ।"—(ন্যায়কন্দলী, ৬৮৯ পৃঃ)।

কোষ্ঠোদ্গত বায়ু, শব্দের নিমিত্ত কারণ বলিয়াই, প্রতিকূল প্রবল বায়ু প্রবাহিত হইলে শব্দের উপলব্ধি হয় না। কেন না, এই বায়ু কোষ্ঠোদ্গত বায়ুকে প্রতিহত করে। "ন্যায়মঞ্জরী"তে জয়ন্তভট্ট ও "কণাদরহস্যে" শঙ্করমিশ্র শব্দ-সন্তানের বিরাম পক্ষে পূর্ব্বোক্ত রূপই যুক্তি দেখাইয়াছেন (৫)।

প্রাচীরাদি ব্যবধান থাকিলে শব্দ যে শুনা যায় না, তাহার হেতুও কোষ্ঠ-বায়ুর গতিরোধ। সহকারী কারণের তারতম্য প্রযুক্তই শব্দের তারতম্য হইয়া থাকে। কিছু সাদৃশ্য আছে বলিয়াই বীচী-তরঙ্গের দৃষ্টান্ত দেখান হইয়াছে। নতুবা জলের ন্যায় শব্দের যে বেগাদি নাই, ইহা আর কে না জানে?

"বীচীসন্তান দৃষ্টান্তঃ কিঞ্চিৎসাম্যাদুদাহৃতঃ।
ন তু বেগাদি সামর্থ্যং শব্দানামস্ত্যপামিব॥"

এই ভাবে তার্কিকেরা বিপক্ষের উদ্ভাবিত সকল আশঙ্কারই সমাধান করিয়াছেন।

'সূক্ষ্ম শব্দ', 'মহান্ শব্দ' ইত্যাদির ব্যবহার হয় বলিয়া কেহ কেহ শব্দকে দ্রব্য বলেন। কিন্তু তার্কিক-মতে শব্দ আকাশের বিশেষ গুণ;—"আকাশস্য তু বিজ্ঞেয়ঃ শব্দো বৈশেষিকো গুণঃ।" তাই বৈশেষিক সূত্রে শব্দের দ্রব্যত্ব খণ্ডিত হইয়াছে। সূত্র যথা,—

"শ্রোত্রগ্রহণো যোঽর্থঃ স শব্দঃ।"—(২।২।২১)
"এক দ্রব্যত্বান্ন দ্রব্যম্"—(২।২।২৩)

শব্দ একমাত্র দ্রব্য আকাশে থাকে, সুতরাং তাহা দ্রব্য হইতে পারে না। এমন কোনও দ্রব্য নাই, যাহা একমাত্র দ্রব্যে থাকে। এখন শঙ্কা হইতে পারে, শব্দ যদি একমাত্র দ্রব্যে আকাশে থাকে, তবেই "একদ্রব্যত্বান্ন দ্রব্যম্" বলিয়া শব্দের দ্রব্যত্ব খণ্ডন করা যায়; কিন্তু শব্দ যে আকাশে থাকে, তাহার প্রমাণ কি? ইহার উত্তরে জয়ন্তভট্ট বলিয়াছেন,—শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য, এই জন্যই তাহা যে আকাশাশ্রিত, ইহা সিদ্ধ হয়। কারণ, কর্ণবিবরাবচ্ছিন্ন আকাশই শ্রবণেন্দ্রিয়, ইহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। এখন ইন্দ্রিয়মাত্রই প্রাপ্যকারী; অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ না হইলে প্রত্যক্ষ হয় না। সুতরাং শব্দ আকাশে না থাকিলে, শব্দের সহিত আকাশের সন্নিকর্ষ হইতে পারে না এবং তাহা না হইলে শব্দের প্রত্যক্ষ অসম্ভব—এই জন্যই শব্দ যে আকাশাশ্রিত, ইহা প্রমাণিত হয় (৬)। তার

(৫) "শব্দসন্তানবিরতিরপি ভবতি অদৃষ্টবিশেষসংসর্গাণাং সহকারিণামনবস্থানাৎ।" ন্যায়মঞ্জরী, ২২৮ পৃঃ।

"কণ্ঠতাল্বাদ্যভিঘাতজনিতকর্ম্মণো বায়োঃ শব্দনিমিত্তকারণতামাপন্নস্য যাবদ্বেগমভিপ্রতিষ্ঠমানস্য কচিদ্ গতিপ্রতিবন্ধাৎ কচিদ্ বিনাশাদ্ বা শব্দান্তরানুৎপত্তেঃ শব্দসন্তানবিনাশাৎ।"

—কণাদরহস্য, ১৪৬ পৃঃ।

(৬) শ্রোত্রগ্রাহ্যত্বাদেব শব্দস্যাকাশাশ্রিতত্বং কল্প্যতে। * * * আকাশৈকদেশো হি শ্রোত্রমিতি প্রসাধিতমেতৎ। প্রাপ্যকারিত্বঞ্চেন্দ্রিয়াণাং বক্ষ্যতে। ন চাকাশানাশ্রিতত্বে শব্দস্য শ্রোত্রেণ প্রাপ্তির্ভবতি ন চাপ্রাপ্তস্য গ্রহণমিতি তদাশ্রিতত্বং কল্প্যতে।"

—ন্যায়মঞ্জরী, ২৩০ পৃঃ।

ার, শব্দ যে গুণ, এ পক্ষে অনুমানই প্রমাণ। "ন্যায়লীলাবতী"তে বল্লভাচার্য্য বলিয়াছেন,—শব্দোগুণো, জাতিমত্ত্বে সতি অস্মদাদি বাহ্যা-াক্ষুষপ্রত্যক্ষত্বাৎ গন্ধবৎ" (২৫ পৃঃ, বোম্বাই সং)—শব্দ গুণ, যে হেতু তাহা জাতিমান্ এবং আমাদিগের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় না হইয়াও বহিরিন্দ্রিয়-জন্য প্রত্যেক্ষের বিষয় হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত গন্ধ। এখন শঙ্কা হইতে পারে, শব্দ যদি গুণ হয়, তবে—"কথং তত্র মহত্ত্বাদিযোগো নির্গুণা গুণা ইতি কাণাদাঃ। অস্তি হি প্রতীতির্মহান্ শব্দ ইতি।" (ন্যায়মঞ্জরী, ২৩০ পৃঃ)—কেমন করিয়া তাহাতে মহত্ত্বাদি গুণ থাকে? কারণ, গুণে গুণ থাকে না, ইহাই কণাদ-দর্শনের সিদ্ধান্ত। কিন্তু 'মহান্ শব্দ' এইরূপ প্রতীতি সর্ব্বজনসিদ্ধ। এই শঙ্কার উত্তরে জয়ন্তভট্ট বলিয়াছেন,—"সমান জাতীয় গুণাভিপ্রায়ং তৎ কণাদবচনমিতি ন দোষঃ।"—গুণে যে গুণ থাকে না, তাহার অর্থ, সজাতীয় গুণে সজাতীয় গুণ থাকে না; রূপে রূপ থাকে না, শব্দে শব্দ থাকে না, ইহাই 'নির্গুণা গুণাঃ'—এই কাণাদ সিদ্ধান্তের মর্ম্ম। সুতরাং শব্দে মহত্ত্বাদি গুণ থাকিবার কোনও বাধা নাই। কেন না, মহত্ত্ব পরিমাণ, শব্দের সজাতীয় গুণ নহে।

ন্যায়বৈশেষিক মতে শব্দ অনিত্য—তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। মহর্ষি গৌতম সূত্র করিয়াছেন,—

"আদিমত্ত্বাদৈন্দ্রিয়কত্বাৎ কৃতকবদুপচারাচ্চ।" (২।২।১৪)

ন্যায়বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর, 'আদি' শব্দের অর্থ করিয়াছেন, 'কারণ'—"আদিমত্ত্বাদাদিঃ যোনিঃ কারণমিতি।" শব্দের যখন ভেরী-দণ্ডাদিসংযোগ বা কণ্ঠতাল্বাদিসংযোগ প্রভৃতি কারণ আছে, তখন তাহা অনিত্য। যে বস্তুর কারণ থাকে, তাহা কদাপি নিত্য হইতে পারে না, যেমন ঘটাদি। সুতরাং 'শব্দঃ অনিত্যঃ সকারণকত্বাৎ ঘটবৎ'—এই অনুমানরূপ প্রমাণবলে শব্দের অনিত্যত্ব সিদ্ধ হইবে। যদি বল, শব্দের কারণ নাই—কণ্ঠতাল্বাদিসংযোগ প্রভৃতি শব্দের ব্যঞ্জকমাত্র, কাজেই 'সকারণত্ব'রূপ হেতু শব্দে না থাকায়, তাহার অনিত্যতা সিদ্ধ হইবে না। তাই মহর্ষি দ্বিতীয় হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন,—'ঐন্দ্রিয়কত্বাৎ'। 'ঐন্দ্রিয়কত্বে'র অর্থ—'জাতিমত্ত্বে সতি বহিরিন্দ্রিয়জন্য লৌকিক প্রত্যক্ষবিষয়ত্ব'। যাহা জাতিমান্ হইয়া বহিরিন্দ্রিয়জন্য লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয়, তাহা অনিত্য; দৃষ্টান্ত ঘটাদি। শব্দের উপর শব্দত্ব, গুণত্ব প্রভৃতি জাতি আছে, এবং শ্রোত্ররূপ বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহার প্রত্যক্ষ হয়, সুতরাং শব্দ অনিত্য। 'জাতিমত্ত্বে সতি' না বলিলে হেতু ব্যভিচারী হইয়া পড়ে। কেন না, কেবল বহিরিন্দ্রিয়জন্য লৌকিক প্রত্যক্ষবিষয়ত্ব, শব্দত্বে আছে, শব্দের অত্যন্তাভাবে আছে, আরও অনেক নিত্য বস্তুতে আছে, তাহাতে সাধ্য অনিত্যত্ব থাকে না। এইজন্য 'জাতি-মত্ত্বে সতি' বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। শব্দত্ব বা শব্দের অত্যন্তাভাবে জাতি নাই—"সামান্যপরিহীনাস্তু সর্ব্বে জাত্যাদয়ো মতাঃ।" মানস-প্রত্যক্ষবিষয়ত্ব ও জাতিমত্ত্ব উভয়ই আত্মাতে আছে, কিন্তু তাহাতে সাধ্য অনিত্যত্ব নাই; এই জন্য 'বহিঃ' পদ দেওয়া হইয়াছে। আত্মা বহিরিন্দ্রিয় লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না। যোগীরা আত্মাদি পদার্থও চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, সুতরাং 'বহিঃ'পদ দিলেও ব্যভিচার বারণ হয় না, তাই 'লৌকিক' বলা হইয়াছে। যোগীদিগের উক্ত প্রত্যক্ষ, অলৌকিক। অনিত্যত্ব সিদ্ধির দৃঢ়তা-সম্পাদনের জন্য তৃতীয় হেতু করা হইয়াছে—'কৃতকবদুপচারাৎ'। [শাস্ত্রে আছে, "মন্তব্য শ্চোপপত্তিভিঃ"। বহু হেতু প্রয়োগ করিয়া মনন অর্থাৎ অনুমিতি করিতে হয়।] 'কৃতকবৎ' অর্থাৎ কার্য্য ঘটাদিতে যেরূপ 'উপচার' অর্থাৎ জ্ঞান হইয়া থাকে, শব্দেও সেইরূপ হয়, সুতরাং শব্দ অনিত্য। অনুমানের আকার এই,—'শব্দ অনিতঃ কার্য্যত্ব প্রকারক প্রত্যক্ষ বিষয়ত্বাৎ, 'ঘটবৎ'। 'উৎপন্নো গকারঃ'—এইভাবে কার্য্যত্বরূপে শব্দের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। মহর্ষি কণাদও শব্দের অনিত্যত্ব সাধনের জন্য সূত্র করিয়াছেন,—

"অনিত্যশ্চায়ং কারণতঃ।"—(২।২।২৮)

শব্দের যখন কারণ আছে, তখন তাহা অনিত্য।

মীমাংসকেরা বলেন, শব্দ নিত্য—তাহার উৎপত্তি বিনাশ নাই। শব্দ নিত্য হইলে সর্ব্বদা তাহার প্রত্যক্ষ হয় না কেন? শ্রবণেন্দ্রিয় নিত্য; এখন শব্দও যদি নিত্য হয়, তবে সর্ব্বদাই ত বিষয়েন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে। ইহার উত্তরে শব্দের নিত্যত্ববাদীরা বলেন, অন্ধকারময় গৃহে ঘট থাকিলে তাহা দেখা যায় না কেন? সেখানেও ঘটের সহিত চক্ষুঃ সংযোগ আছে। সুতরাং বলিতে হইবে, প্রদীপাদি তেজঃ পদার্থ, ঘটের ব্যঞ্জক অর্থাৎ ঘটাভিব্যক্তির হেতু। সেইরূপ নিত্য শব্দ সর্ব্বদা সর্ব্বত্র থাকিলেও ব্যঞ্জকের অভাব নিবন্ধনই তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। বিজাতীয় বায়ুসংযোগাদিই শব্দের ব্যঞ্জক। শব্দের নিত্যত্বপক্ষে অনুমানও প্রমাণ। অনুমানের আকার এই,—"শব্দো নিত্যঃ আকাশৈকগুণত্বাৎ, তদ্গত পরমমহৎপরিমাণবৎ, অথবা শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্যত্বাৎ, শব্দত্ববৎ" ইত্যাদি।

ন্যায় বৈশেষিকের নানা গ্রন্থে এই সিদ্ধান্ত খণ্ডিত হইয়াছে। এই খণ্ডন-রীতির সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, শব্দকে নিত্য মানিয়া বায়ু সংযোগাদিকে যদি তাহার অভিব্যঞ্জক বলা যায়, তবে যখন ককারের অভিব্যক্তি হয়, তখন খকারাদি যাবতীয় বর্ণের অভিব্যক্তির আপত্তি হইয়া উঠে। প্রত্যেক বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন ব্যঞ্জক, এ কথা বলা যায় না। যাহারা সমনিয়ত, অর্থাৎ কেহ কাহারও অপেক্ষা অধিক বা অল্প স্থানে থাকে না, এবং একই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, তাহাদের ব্যঞ্জকের ভেদ হইতে পারে না—তাহারা সকলেই একব্যঞ্জক-ব্যঙ্গ্য। প্রদীপরূপ ব্যঞ্জকের সমবধান হইলে ঘটগত সংখ্যা, পরিমাণ প্রভৃতি চক্ষুর্গ্রাহ্য সকল গুণেরই অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। ইহা কেহই স্বীকার করে না যে, প্রদীপ ঘটগত সংখ্যারই ব্যঞ্জক, কিন্তু তাহার পরিমাণের ব্যঞ্জক নহে। সমস্ত শব্দই একমাত্র আকাশে থাকে, সুতরাং তাহারা সমনিয়ত, এবং এক শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারাই তাহাদের প্রত্যক্ষ হয়। কাজেই তাহাদের প্রত্যেকের ব্যঞ্জক যে ভিন্ন ভিন্ন হইবে, ইহা কিছুতেই বলা যায় না। শব্দকে সকারণক না বলিয়া তাহার

অভিব্যক্তি স্বীকার করিলে এই দোষ হয়। তাই মহর্ষি কণাদ, সূত্র করিয়াছেন,—

"অভিব্যক্তৌ দোষাৎ।"—(২।২।৩০)

তারপর, শব্দের নিত্যত্বসিদ্ধির জন্য যে অনুমান করা হইয়াছে, তাহাও ঠিক নহে। কেন না, উক্ত অনুমানে 'উপাধি' আছে। "ন্যায়কুসুমাঞ্জলি"তে উদয়নাচার্য্য লিখিয়াছেন,—"অকার্য্যত্ব-স্যোপাধের্বিদ্যমানত্বাৎ" (২৮১ পৃঃ Bib. End. Ed.)। "শব্দঃ অনিত্যঃ আকাশৈকগুণত্বাৎ বা শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্যত্বাৎ"—উভয়ত্রই অকার্য্যত্ব 'উপাধি'। যাহা সাধ্যের ব্যাপক ও হেতুর অব্যাপক, তাহাই উপাধি। সাধ্য নিত্যত্ব, যেখানে যেখানে আছে, সেখানে সেখানেই অকার্য্যত্ব আছে. কিন্তু আকাশৈকগুণত্ব বা শ্রবণেন্দ্রিগ্রাহ্যত্ব শব্দেও আছে, সেখানে অকার্য্যত্ব নাই। কাজেই উপাধি অকার্য্যত্ব, সাধ্যের ব্যাপক ও হেতুর অব্যাপক হইয়াছে। উপাধি থাকিলে দোষ কি?—"ব্যভিচারস্যানুমানমুপাধেস্তু প্রয়োজনম্।" "আকাশৈকগুণত্বং শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্যত্বং বা নিত্যত্ব ব্যভিচারি অকার্য্যত্ব ব্যভিচারিত্বাৎ"—এই অনুমানের দ্বারা হেতু যে সাধ্যের ব্যভিচারী, তাহাই সিদ্ধ হইয়া যায়। ব্যভিচারী হেতুতে, সাধ্যের 'ব্যাপ্তি' থাকে না বলিয়া তাহা অসাধক। যেখানে যেখানে হেতু থাকে, সেই প্রত্যেক স্থানে যদি সাধ্য থাকে, তবেই সেই হেতু অব্যভিচারী হয়। অব্যভিচারী হেতুই অনুমাপক। সুতরাং শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্যত্বাদি হেতু করিয়া শব্দে নিত্যত্ব সিদ্ধ করা যায় না। এই দোষের জন্য এতাদৃশ অনুমান প্রমাণই নহে। তাই উদয়নাচার্য্য, পূর্ব্বোপদর্শিত অনুমানে 'উপাধি' দেখাইয়া বলিয়াছেন,—

"অন্যথা আত্মবিশেষগুণা নিত্যাঃ তদেকগুণত্বাৎ তদ্‌গতপরমমহত্ত্বদিত্যপি স্যাৎ। * * *

"অন্যথা গন্ধরূপরসস্পর্শা অপি নিত্যাঃ প্রসজ্যেরন্, ঘ্রাণাদ্যেকৈকেন্দ্রিয় গ্রাহ্যত্বাৎ গন্ধত্বাদিবদিত্যপি প্রয়োগ সৌকর্য্যাৎ।"

(কুসুমাঞ্জলি, ২৮১—৮২ পৃঃ, Bid. End. Ed.)

শব্দের নিত্যত্ব সাধনের জন্য যে অনুমান করা হইয়াছে, তাহাতে উপাধি আছে বলিয়া উক্ত অনুমান অপ্রয়োজক। অনুকূলতর্করহিত অনুমানেরও যদি প্রামাণ্য স্বীকার কর, তাহা হইলে আত্মগত পরমমহত্ত্বের দৃষ্টান্তে আত্মার জ্ঞানাদি গুণেরও নিত্যত্ব সিদ্ধ হউক। কারণ, জ্ঞানাদি গুণও কেবল আত্মাতেই থাকে। শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্যত্বকে হেতু করিয়া শব্দত্বের দৃষ্টান্তে যদি শব্দের নিত্যত্ব সিদ্ধি করিতে চাও, তবে—'গন্ধঃ নিত্যঃ ঘ্রাণজপ্রত্যক্ষবিষয়ত্বাৎ, গন্ধত্ববৎ', 'রূপং নিত্যং চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ বিষয়ত্বাৎ, রূপত্ববৎ'—এই ভাবে গন্ধাদিরও নিত্যত্ব সিদ্ধির আপত্তি হয়। সুতরাং শব্দ যে নিত্য, এ পক্ষে কোনও যুক্তিতর্ক নাই। প্রত্যুত, 'ইদানীং শ্রুতপূর্ব্বো গকারো নাস্তি', 'বিনষ্টঃ কোলাহলঃ' ইত্যাদি প্রতীতিবলতঃ শব্দধ্বংসের প্রত্যক্ষই হইয়া থাকে। কাজেই শব্দ অনিত্য। যদি বল, যাহার উৎপত্তি আছে, তাহাই ত অনিত্য, সুতরাং শব্দধ্বংসের প্রত্যক্ষ হইলেও শব্দের যে উৎপত্তি আছে, তাহা কেমন করিয়া সিদ্ধ হইল? ইহার উত্তর এই যে, যে ভাব পদার্থের ধ্বংস আছে, তাহার উৎপত্তিমত্তা, অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হয়। অনুমানের আকার এই,—'শব্দঃ উৎপত্তিমান্, বিনাশিভাবত্বাৎ, ঘটবৎ'। "শব্দানিত্যতাবাদে" গঙ্গেশোপাধ্যায় স্পষ্টই লিখিয়াছেন,—"বিনাশিভাবত্বে নোৎপত্তিমত্ত্বানুমানাদ্ বা"—(তত্ত্বচিন্তামণি, শব্দখণ্ড, ৩৯৪ পৃঃ)

এখন শঙ্কা হইতে পারে, শব্দ যদি নিত্য নহে—প্রত্যেকবারেই যদি ভিন্ন ভিন্ন শব্দ উৎপন্ন হয়, তবে 'সোঽয়ং গকারঃ'—'এই সেই গকার' এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা, কিরূপে সম্ভবপর? পূর্ব্বের গকারের ত ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। ইহার উত্তরে গঙ্গেশোপাধ্যায় বলিয়াছেন, 'এই গকার, সেই গকারের সজাতীয়', ইহাই 'এই সেই গকার' এই প্রত্যভিজ্ঞার বিষয়। সজাতীয় স্থলেও 'এই সেই' এইরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে; যেমন 'এই সেই বহুলোকের কৃত ঔষধ, আমিও করিতেছি (৭)।

এই ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, শব্দের নিত্যত্বপক্ষে মীমাংসকেরা যে যুক্তিতর্ক প্রদর্শন করেন, তাহা দুর্ব্বল। সুতরাং শব্দ যে অনিত্য, ইহাই প্রমাণসিদ্ধ। জয়ন্তভট্ট বলিয়াছেন,—"এবং নিত্যত্বে দুর্ব্বলো যুক্তিমার্গস্তস্মান্নস্তব্যঃ কার্য্য এবেতি শব্দঃ।"—(ন্যায়মঞ্জরী, ২৩৫ পৃঃ)

শব্দ সম্বন্ধে আরও অনেক আলোচনা করিবার আছে। কিন্তু ইহার মধ্যেই প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। অতএব এই নীরস বিষয় লইয়া আপনাদের আর ধৈর্য্যের পরীক্ষা করিব না। নতুবা এই শব্দতত্ত্বের প্রসঙ্গেই শব্দবোধের উপায়, বেদ যখন শব্দাত্মক, তখন তাহা অনিত্য হইলেও কিরূপে তাহার প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়, ইত্যাদি বিষয়ে অনেক বলা যাইত। যদি স্বাস্থ্য ও সময় থাকে, তবে বারান্তরে তাহা বলিবার ইচ্ছা রহিল।

---

(৭) "এবঞ্চ ভেদে ভাসমানে প্রত্যভিজ্ঞায়াঃ সজাতীয়ত্বং বিষয়ো ন ব্যক্ত্যভেদঃ। ন চৈবং তজ্জাতীয়োঽয়মিতিস্যাৎ ন তু সোঽয়মিতি বাচ্যং। তজ্জাতীয়ত্ব প্রতীতেরপি সোঽয়মিত্যাকারদর্শনাৎ যথা সৈবেয়ং গাথা তদেবেদমৌষধং বহুভিঃ কৃতং ময়াপি প্রত্যহং ক্রিয়মাণমস্তীত্যাদৌ।"

তত্ত্বচিন্তামণি, শব্দখণ্ড, ৪৪৭ পৃঃ।

গণৎকার

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ]

(১)

"ও গণক! চা'ল দিব দেখে যাও আমাদের হাত!"
ডাকিল গোয়ালা-বধূ, দ্বারে দাঁড়াইয়া স্বামী-সাথ।
চেন না ওদিগে তুমি? ও পাড়ায় উহাদের ঘর;
ওই দেখ, দেখা যায় তরুলতা চালের উপর।
উহাদেরি আছে সেই পোষ মানা কোকিলটী খাসা,—
ছোট খাঁচা, খোলা দ্বার, তবু রয়—এ কি ভালবাসা!
ওদেরি কুকুর 'ভরো' ও-পাখীরে আগলায় ভাই,—
বিড়াল কুকুর কারও সাধ্য নাই ও-বাড়ীতে যাই।
ওই কোকিলারে বধূ খেতে দেয় নিজে দুধ-ভাত,
কুকুর পাহারা দেয়,—কোকিলটা ডাকে দিন রাত। *
চল যাই দুইজনে একবার আসি গিয়ে শুনে,
গণক কি বলে যায় উহাদের হাত দেখে গুণে।

(২)

গণক বধূর হাত একদৃষ্টে নিরখি আবার,
ডাকিল বারেক কাছে কর্ম্ম-রত স্বামীরে তাহার।
হাতখানি লয়ে তার পাখী-পানে পড়িল নয়ন;
কুকুর ধুঁকিছে কাছে, খাঁচা-তলে করিয়া শয়ন।
গণক বিষণ্ণ হয়ে বহুক্ষণ পরে বলে তবে,—
"মা লক্ষ্মী, আজিকে থাক্ বলিতে অনেক দের্ হবে।"
বিপদ-শঙ্কিতা বধূ ম্লান মুখে আগ্রহে সুধান
"হ্যাগা বাপু বল, বল, হবে না ত ওঁর অকল্যাণ?
থাকুক হাতের লোহা, হে ঠাকুর, কর বর দান—
অসম্মান করিব না, এনে দিই চাল্ গুয়া পান।"
গণক ঈষৎ হাসি বলে, "মা, নাহিক কোনও ভয়;
সিঁদুর উজ্জল তোর, শাঁখা তোর হইবে অক্ষয়।

* উজানিতে ওই গোয়ালার বাড়ীতে এখনো সে কোকিল ও কুকুরটী আছে।

(৩)

"শোন মন দিয়া, আমি গত-জন্ম-কথা বলি আজ;
তুমি ছিলে রাজরাণী, ওই গোপ ছিল মহারাজ।
রূপ-বৈভবের মোহে বুক ভরি ছিল অহঙ্কার;
বোঝনি দীনের ব্যথা, ব্যথিতের বেদনা অপার।
প্রিয় সে গায়িকা তব পিঞ্জরের মাঝে হের ওই,—
বিমূঢ় প্রণয়ী তার ও কুকুর,—সে বিলাস কই!
আমি সে ভিখারী অন্ধ, কুৎসিৎ,—পাতিনু দুটী কর;
হেলায় তাড়ায়ে দিল তোমাদের দারুণ কিঙ্কর।
গায়িকা ঘৃণার ভরে হাসিয়া মারিল ফুল ছুড়ি'—
রোষে, অভিমানে আমি অভিশাপ দিনু কর যুড়ি'।
ঝুলি হতে পড়ে গেল কেমনে যে ভিক্ষা-লব্ধ চাল,
কাঁদিলাম ধিক্কারিয়া, ধিক্ বিধি, ধিক এ কপাল!

(৪)

"তার পর এই জন্ম,—সহিবারে দৈন্যের পীড়ন,
দরিদ্রের গৃহে আসি পল্লীগ্রামে জন্মেছ দুজন।
ভুলিতে পারে নি মায়া,—গায়িকা এসেছে হয়ে পিক্;
অবোধ প্রণয়ী তার এই সেই সারমেয় ঠিক্।
আমি দিয়া অভিশাপ হারালেম সব পুণ্য-ফল;
গণক হইয়া ফিরি ভিক্ষাবৃত্তি করিয়া সম্বল।
হারা চা'ল্ নিতে হায় কর্ম্মফলে ঘুরিতেছি দেশ;
আজ হেতা দেখা হলো, একত্র সবার সমাবেশ।
দাও মা চাউল দাও, হও মুক্ত, কর মা উদ্ধার—
বার-বার ধরা মাঝে আসিতে হয় না যেন আর।"
কথা শুনি' চা'ল দিয়া ফেলে বালা নয়নের লোর
আমরা ভাবিনু হাসি, এ গণক পাকা জুয়াচোর!

বউ-মা

[শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী]

একমাত্র পিতৃহীন পুত্র—মাতৃভক্ত স্নেহের বিপিনের বিবাহ দিয়া পুত্রবধূর মুখ দেখিবার আশায় মহামায়া এমন কোন দেবতা বাকী রাখে নাই, যাঁহার উদ্দেশে তিনি দিনে সহস্রবার প্রণাম না করিয়াছেন। কারণ আর বিশেষ কিছু নহে—বিপিন কাণা-খোড়া ত নহেই, তা'ছাড়া তাহাকে দেখিতেও যে নেহাত কুৎসিৎ এমন কথাও বলা যায় না। তবে, বিপিন কায়স্থের ছেলে, কিন্তু একটীও পাশ করিতে পারে নাই; ইহা ভিন্ন বিধবার তেমন সঙ্গতিও নাই,—কাজেই যাহাতে পুত্রের বিবাহ দিয়া তাহাকে সুখী করিয়া যাইতে পারেন, যাহাতে তাঁহার মৃত্যুর পর বিপিন ভাসিয়া না যায়, এই সকল কারণেই তিনি পুত্রের শীঘ্র-শীঘ্র বিবাহ দিবার জন্য এত ব্যস্ত হইয়াছিলেন। রাস্তা দিয়া কোন বর যাইতে দেখিলেই, তিনি নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিয়াছেন—আহা! তাহার মায়ের সেদিন কি আনন্দ! এমন দিন তাঁহার কবে আসিবে!

'দিন' আসিল, আর, না আসিবেই বা কেন? সংসারে কেবল যে তিনিই গরিব, তাঁহার বিপিনই যে মূর্খ, তাহা ত নহে! তা' ভিন্ন, তিনি ত আর কোন রাজকন্যাকে ঘরে আনিবার আশা করেন নাই! সুতরাং 'দিন' আসিল,—শুভদিনে শুভক্ষণে বিবাহও হইয়া গেল। যিনি বিপিনের শ্বশুর হইলেন, তিনি ছা-পোষা গৃহস্থ হইলেও এই বিবাহে তিনি সাধ্যমত "দান" দিতে ত্রুটি করিলেন না। মহামায়াও নিজের ভাঙ্গা অনন্ত ভাঙ্গিয়া সাধের বৌমার দু'-একখানি গহনা গড়াইয়া দিলেন। এ বিবাহে উভয় পক্ষই আনন্দিত হইয়াছিলেন।—বিপিন্ ব্যবসায় দিন-দিন উন্নতি করিতেছিলেন বলিয়া শ্বশুর মহাশয় খুবই আনন্দিত হইয়াছিলেন। মেয়েকেও গৃহস্থের ঘরের "রূপের ডালি" বলিলেই হয়; সুতরাং, মহামায়ারও বধূ পাইয়া যে কি আনন্দ হইয়াছিল, তাহা মুখে বলিয়া বুঝান কঠিন। তাঁহার আরও আনন্দের কারণ এই যে, তিনি দেখিয়াছিলেন, বৌ-মা যে পরিমাণে 'রূপ' লইয়া আসিয়াছিল, সেই পরিমাণে গুণও আনিয়াছিল।

(২)

মহামায়ার বাড়ীখানি ছোট হইলে কি হয়, সেখানি বেশ পরিস্কার, ঝর্‌ঝরে, একতলা বাড়ী। ছাতে কাপড়-জামা রৌদ্রে দিবারও বেশ সুবিধা। বৌ-মা প্রতিদিন দুপুরবেলা শ্বাশুড়ীর গঙ্গা-নাওয়া কাপড় জলে কাচিয়া লইয়া ছাতে রৌদ্রে দিয়া আসিত। এই সময় পাশের বাড়ীর একটি তাহার সমবয়স্কা বৌ শান্তও ছাতে আসিত। কিছুদিনের মধ্যেই তাহাদের দু'জনের বেশ আলাপ হইয়া, ক্রমে সেই আলাপ ভালবাসায় পরিণত হয়। তার পর, ও এর বাড়ী, এ ওর বাড়ী যাওয়া-আসা করিতে সুরু করিয়া দেয়।

বৌ-মা আজ দুপুরবেলা এ-বাড়ী বেড়াইতে আসিল। ইহার পূর্ব্বে সে শান্তর বাড়ী আর দুই দিন মাত্র আসিয়াছিল। আজ আসিয়া বাড়ীতে পা দিবামাত্র শান্তর শ্বাশুড়ী বলিলেন—"এস মা এস, বস'।" বৌ-মা তাহাই করিল, তাঁহার আদেশ মত তাঁহার পাশে গিয়া বসিয়া মুখখানি হেঁট করিয়া রহিল। শান্তর শ্বাশুড়ী বিনোদিনী বৌমা'র মুখপানে চাহিয়া বলিলেন—"আহা, তোমার মুখখানি এত শুকিয়ে গেছে কেন গা? কোন অসুখ-বিসুখ ক'রেচে না কি?"

বৌ-মা কিছু বিস্মিত হইয়া বলিল—"কৈ, কিছু হয়নি ত।"

এই কথায় বিনোদিনী বলিলেন—"হয়নি কি গো—এমন স্পষ্ট দেখা যাচ্চে,—তোমার মুখখানি এতটুকু হ'য়ে গেছে,—আর বল্‌চ কিছু হয়নি। তা' আমাদের কাছে লুকিয়ে আর কি কর্‌বে বাছা,—কি হয়েচে তা' বুঝ্‌তে কি আর আমার বাকী আছে? তোমার শ্বাশুড়ীর গুণ ত আর

আমাদের কাছে চাপা নেই। তা' বেশ বৌ তুমি বাছা—এত খাবার-পরবার কষ্ট দেয়, তবুও বোধ করি বিপিনকে কোন কথা বল না, না ?"

এই ভাবে আরও কত কথা বলিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু বৌ-মা আর চুপ করিয়া স্নেহময়ী শ্বাশুড়ীর নিন্দা শুনিয়া যাইতে পারিল না। তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিল—"ও কি বল্‌চেন আপনি ? মা ত আমায় কত ভালবাসেন—লোকের নিজের মাও বোধ করি এত ভালবাসতে পারে না—ও আপনি ভুল বল্‌চেন।"

বিনোদিনী অল্প তাচ্ছিল্য ভাবে কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিলেন—"দূর পাগ্‌লী! সেই কথায় বলে না—'মা'র চেয়ে যে ভালবাসে, তা'রে বলে ডা'ন'—ঐ মুখে আত্তি ক'রে-ক'রেই ত তোমার মাথা খাচ্চে—তুমি ওকে এখনও ঠিক বুঝ্‌তে পার নি মা, তবে বলি শোন' তোমার শ্বাশুড়ীর কাণ্ডগুলো—" এই বলিয়া তাহার শ্বাশুড়ীর এক সুদীর্ঘ কাল্পনিক কাণ্ড শুনাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া, উপর দিকে দুই হাত তুলিয়া, হাই তুলিতে-তুলিতে আলস্য ভাঙ্গিয়া লইতে লাগিলেন। এই অবসরে বৌ-মা বলিয়া উঠিল—"আচ্ছা, আজ আর তা' হ'লে শোনা হ'বে না—কাল শুন্‌বো। আজ আমায় এখুনি যেতে হ'বে, বাড়ীতে কাজ আছে—"

সেই দিন হইতে বিনোদিনী বৌ-মার উপর জাতক্রোধ হইলেন; তাহাকে জব্দ করিবার অবসর খুঁজিতে লাগিলেন। ক্রমে এ বিষয়ে তাঁহার দুই চারিজন সহযোগিনীও আসিয়া জুটিল।

(৩)

তিন চার মাস কাটিয়া গেল। এই সময়ের ভিতর বিনোদিনী এবং আরও দুই চারিজন স্ত্রীলোক মহামায়াকে বৌমা'র নামে কত কি বলিয়াছেন, তথাপি তিনি বৌমা'র প্রতি কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট হন নাই; বরং বৌ-মা ভাল বলিয়াই যে পাড়ার পাঁচজনে হিংসা করিয়া তাহার নামে ঐ ভাবে দোষারোপ করে, ইহাতে তাঁহার কোনই সন্দেহ নাই। সুতরাং, তাঁহারা তাঁহাকে যতই বলেন, তিনি তাঁহাদের মুখের উপর বিশেষ কিছু না বলিলেও, মনে-মনে বৌমা'কে ততই অধিক ভালবাসেন।

কিন্তু বৌমার ভাগ্য নিতান্তই মন্দ বলিয়া, তাহার ভাগ্যে এ সুখ বেশী দিন স্থায়ী হইল না। এখানে একটী কথা বলিয়া রাখি। মহামায়া এদিকে যেমন মানুষই হউন, তাঁহার কিন্তু একটী মহৎ দোষ এই ছিল যে, তিনি প্রাণান্তেও বৌমা'কে বাপের বাড়ী পাঠাইতেন না। তাহার পিতা তাহাকে লইতে আসিলে তিনি বলেন—"না, ওকে পাঠিয়ে আমি একদণ্ডও টিক্‌তে পার্‌ব না। আর নিয়ে যাবার জন্যে এত তাড়াতাড়ি কেন ?—দু'চার বছর যাক্‌ না, ছেলেপিলে হোক্‌, তখন ছেলে দেখাতে যাবে।" ইহাতে তিনি আর কিছু বলিতে পারেন না;—"আচ্ছা, আপনার যা বিবেচনা হয় তাই করুন" বলিয়া ক্ষুণ্ন মনে ফিরিয়া যান। বলা বাহুল্য যে, বৃদ্ধা শ্বাশুড়ীকে একা রাখিয়া যাইতে বৌমা'রও মন সরে না। কিন্তু হইলে কি হয়, তাহার ভাগ্য যে নিতান্তই মন্দ। তাই তাহার ভাগ্যে শ্বাশুড়ীর এমন স্নেহও বেশী দিন ভোগ হইল না।

যে বিপিন শ্বশুর-বাড়ী যাইবার নামে মুখ বেঁকাইত, সেই বিপিন আজ একমাসের ভিতর প্রায় ৩।৪ বার শ্বশুর-বাড়ী ঘুরিয়া আসিয়াছে। মহামায়া বৌ-মা'কে পাঠাইতে না চাহিলেও, বিপিনকে কিন্তু মাঝে-মাঝে শ্বশুর-বাড়ী পাঠাইয়া, কে কেমন আছে জানিয়া আসিতে বলিতেন। তাই প্রথমবার মহামায়া তাহাকে কত সাধ্য-সাধনা করিয়া শ্বশুর-বাড়ী পাঠান; কিন্তু দ্বিতীয়বারে তাহাকে একটীও কথা বলিতে হয় নাই—সে নিজের ইচ্ছায় গিয়াছিল। তাহার পর হইতেই সে যেন কি রকম হইয়া গিয়াছিল। তার পর আবার গেল; এবার আরও যেন কেমন হইয়া গেল। তার পর পাঁচদিন না যাইতে-যাইতেই একদিন সে যখন শ্বশুর-বাড়ী যাইবার জন্য বেশ-পরিবর্ত্তন করিতেছে, তখন মহামায়া বলিলেন—"বিপিন, এত ঘন-ঘন শ্বশুর-বাড়ী যাওয়া কি ভাল বাবা! ছিঃ! মান থাক্‌বে কেন ?" এই কথার উত্তরে তিনি যাহা শুনিলেন, তাহাতেই তাঁহার মন দমিয়া গেল। বুঝিলেন, বিপিন এখন আর সে বিপিন নাই;—অধিকাংশ লোকের ভাগ্যে যাহা ঘটে, ছেলের বিবাহ দিয়া তাঁহার ভাগ্যেও তাহাই ঘটিয়াছে—ছেলে পর হইয়াছে। শ্বশুর-বাড়ীর পাঁচজনের পাঁচ কথা শুনিয়া-শুনিয়া এখন সেখানকার টিকটিকিটি পর্য্যন্ত তাহার প্রিয় হইয়াছে।—আর মা ? যে মা আপনার প্রাণ ঢালিয়া, স্বামীর মৃত্যুর পর তাহাকে বুকে করিয়া

মানুষ করিলেন, সেই মা-ই এখন মরিলে বোধ করি তাহার ভাল হয়। হায়! কেন তিনি ছেলের বিবাহ দিয়াছিলেন!

কি জানি বিপিনের কি দুর্ম্মতি হইল! আজকাল সে প্রায়ই এটা-ওটা লইয়া কখন বা 'দু'চার দিনের জন্যে পাঠালে ক্ষতি কি?' ইত্যাদি বলিয়া মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করিতে লাগিল। ইহার ফলে, যুগপৎ মহামায়ার মনে অশান্তি, বৌ-মা'র মনে ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কা এবং শত্রুদের মনে এক অপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হইতে লাগিল।

এক দিন মহামায়া আহারান্তে সেই পূর্ব্বোক্ত বামুন-বাড়ী আসিয়া, বিমর্ষ ভাবে একখানি পিঁড়াও না পাতিয়া মাটির উপরেই বসিয়া পড়িলেন। একজন তাঁহার অশান্তি-কাতর মুখপানে চাহিয়া সমবেদনা প্রকাশ করিয়া বলিল—"আহা, দিদির মুখ দেখ্‌লে আর দিদিকে চেনা যায় না গো! তা হ'বে না? ঐ ছেলেকে কি কম কষ্টে মানুষ ক'রেচে গা—আমরা ত সবই জানি।—সেই ছেলে এখন কি না দিন পেয়ে এম্‌নি ক'চ্চে! তুমি যা-ই বল দিদি, তোমার ঐ সোহাগের বৌ-মাটী হ'তেই এই কাণ্ড ঘটল কিন্তু। মেয়ে দেখেই শান্তর মা যখন সেই কথা বলেছিল, তখন আমরা সকলে তার উপর রেগে গিছ্‌লুম বটে,—কিন্তু এখন দেখ্‌চি তার কথা একটী-একটী ক'রে মিলে যাচ্চে।" আর একজন বলিল—"মিল্‌বে না! বলে কাণ-ভাঙ্গানিতে দেবতারা শুদ্ধ বশ হ'য়ে যায়,—ত বিপিন ত কোন্ ছার্!"

"তা' হোক্ বাবু—বল্‌লে দিদি রাগ কর্‌বে, অমন বৌ-বেটা—"

মহামায়া আর নিজেকে সাম্‌লাইতে পারিলেন না। তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন—"ওগো, অমন কথা ব'ল না গো—ওরা আমার পর হোক্ আর যা-ই হোক্, তবু বেঁচে থাক, সুখে থাক্—আমি আর কদ্দিন দিদি—" বলিতে বলিতে হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

তাঁহাকে কাঁদিতে দেখিয়া বাড়ীশুদ্ধ প্রায় সকলেরই যত রাগ পড়িল বেচারা বৌ-মা'র উপর! একজন জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল—"চল ত একবার দেখি, কেমন ঘরের মেয়ে সে—তার বাবার বিয়ে দেখিয়ে ছাড়ব' না!" এইরূপে আরও কত কথা বলিতে-বলিতে তাঁহার হাত ধরিয়া উঠাইবার চেষ্টা করিল। তিনি বিরক্ত ভাবে বলিলেন—"তোমাদের এখানে এসেও যদি একটু সুস্থ না হই, তা হ'লে আমি আর যাই কোথা গা?"

বৌ-মার উপর এখনও তাঁহার অচল বিশ্বাস দেখিয়া, দু'-একজন মাত্র মনে-মনে বুড়ীকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল; আর বাকী সকলেই তাঁহার উপর হাড়ে-হাড়ে জ্বলিয়া গিয়া বলিল—"ঐ আস্তিতেই ত ম'রেছ তুমি!"

(৪)

কে জানিত সত্য-সত্যই মহামায়া বৌ-মা'র প্রতি এতই নির্দ্দয় হইবেন? যে বৌ-মা'র হাতে জল না খাইলে, মহামায়ার পিপাসা মিটিত না,—কে জানিত, সেই বৌ-মা'র ছোঁয়া জলও আর তিনি স্পর্শ করিবেন না—সে জল দিয়া কাজ করা ত দূরের কথা!

তাঁহার এইরূপ ভাবান্তরের কারণটি বুঝিতে বৌ-মা'র কিছুমাত্র বাকী ছিল না। সে নিজের মনে বেশ বুঝিয়াছিল যে, তাহার স্বামী যদি ঐরূপ না হইত, তাহা হইলে কেহই তাহার শাশুড়ীকে তাহার প্রতি এত কঠোর করিয়া তুলিতে পারিত না; কেন না, এতদিনও ত তাহারা এই সর্ব্বনাশ ঘটাইবার জন্য কত চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু পারিয়াছিল কি? যাহা হউক, এখন আর সে কি করিতে পারে? ঈশ্বর মুখ তুলিয়া না চাহিলে, তাহার ত কোনই উপায় নাই! কেন, এক কাজ করিলে হয় না? স্বামীকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিয়া, তাহার পা দু'টি জড়াইয়া ধরিয়া, তাহাকে পূর্ব্বের মত ভাল হইতে বলিলে হয় না? না—না, তাহা হইতেই পারে না। প্রথমতঃ, তাহাতে কোন ফল হইবে কি না, ঠিক করিয়া বলা যায় না; তা ছাড়া, এ কথা সে-ই বা স্বামীকে বলিবে কেমন করিয়া? হায়, হায়! সে এখন কি করিবে? কি করিলে শাশুড়ীর নিকট সে আবার পূর্ব্বের মত বিশ্বাসী হইতে পারিবে,—তাঁহার ভালবাসা পাইবে? হায়! কে তাহাকে বলিয়া দিবে, সে এখন কি করিবে?

এইরূপ ভাবিয়া-চিন্তিয়া বৌ-মাও আর কিছু না বলিয়া, ভারাক্রান্ত হৃদয় লইয়া মৌনভাবে দিন কাটাইতে লাগিল।

* * * * *

সংসারের উপর মহামায়ার ঘৃণা জন্মিয়া গেল। তিনি যখন,—কি দেখিয়া জানি না—বেশ বুঝিতে পারিলেন যে,

তিনি সংসারে থাকিলে, লোক-লজ্জার ভয়ে কিছু বলিতে না পারিলেও, বিপিন মনে-মনে অসন্তুষ্ট হইতেছে, তাহার মনে কিছুমাত্র শান্তি নাই, তখন এ সংসারে থাকিয়া তাঁহার ফল কি? কোন তীর্থে যাইয়া ভিক্ষা করিয়া খাইয়াও অবশিষ্ট জীবনটুকু কাটাইয়া দেওয়া ত ইহা অপেক্ষা খুবই ভাল। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি তাহাই করিতে মনস্থ করিলেন সঙ্গে-সঙ্গে বেশ সুযোগও জুটিয়া গেল।

শুনিলেন, পূর্ব্ব হইতেই ও-পাড়ার পাঁচ-ছয়জন বৃদ্ধা একত্র হইয়া বৃন্দাবন যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। তিনি বলিলেন, "আমিও যাব' গো।" (অবশ্য তাহারা জানিত না যে, তিনিও যাইতে চাহিবেন।) মহামায়া তাহাদের নিকট যাইব বলিয়া কথা দিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত মনোভাব কাহাকেও প্রকাশ করিলেন না;—কি জানি, যদি কোন বাধা পান!

সন্ধ্যার পর কিছু টাকার জন্য পুত্রকে বলিলেন, "বাবা বিপিন, ওরা সব বিন্দাবন যাচ্ছে,—আমি বলিচি, আমিও যাব; তা আমার কাছে ত কিছু নেই; যা' ছিল সবই ত তোকে কারবার করবার জন্যে বার ক'রে দিয়িচি—এখন কিছু টাকা দে না আমাকে—তোর পুণ্যি হ'বে।"

বিপিন বলিল, "কোথায় পাব টাকা—আমারি বলে মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল—ক'মাস ধরে একটা পয়সার মুখ দেখ্‌তে পাচ্ছিনে। আবার বিন্দাবন যাবার সাধ কেন?"

বৃদ্ধা মর্ম্মাহত হইয়া বলিলেন, "তা' আর পারবি কেন বাবা!"

কিছুদিন হইল, বিপিন স্ত্রীর জন্য একজোড়া অনন্ত গড়াইতে দিয়াছিল। এখনও তাহার 'বানি' দেওয়া হয় নাই, 'বানি'র টাকা ঘরেই আছে। এখন মায়ের ঐ উত্তরে সে মনে করিল, মা বুঝি সেই টাকার কথা ভাবিয়াই ঐ ভাবে টিট্‌কারি দিলেন। রাগে জ্বলিয়া উঠিয়া সে বলিল, "হ্যাঁ,—হ্যাঁ, না থাক্‌লে কি তোমার জন্যে চুরি কর্‌তে যাব না কি?"

মহামায়া বুঝিলেন, ইহার উপর আর একটী কথা কহিলেই, মহামারি কাণ্ড বাধিয়া যাইবে। কাজেই শেষ সময় আর ঝগড়া বাড়াইয়া কোনই ফল নাই ভাবিয়া মহামায়া চুপ করিলেন। তার পর তাঁহার যে 'হার' তোলা ছিল, সেই 'হার' গোপনে বিক্রয় করিয়া সেই টাকা লইয়াই এ সংসার ত্যাগ করিবার বাসনা করিলেন। কিন্তু আর দিন নাই—কাল-ই তাহারা রওনা হইবে। শেষে ভাবিলেন—দেখা যাউক কতদূর কি করিতে পারেন। আজ রাতটা ত আগে কাটিয়া যাউক; তার পর কাল যা' হয় হইবে।

আজ আর মহামায়ার চক্ষে নিদ্রা আসিল না। আজ তাঁহার মনের মধ্যে নানা চিন্তার উদয় হইতে লাগিল। কাল তাহাদের সহিতই তাঁহাকে যাইতে হইবে। তাহা না হইলে, পরে তিনি একা যাইতে চাহিলে, পুত্রই বা ছাড়িবে কেন? আর ছাড়িলেও তিনি যাইবেন কেমন করিয়া? কি করিয়া কি যে করিতে হয়, তিনি ত কিছুই জানেন না। সুতরাং যেমন করিয়াই হউক, কাল তাঁহাকে তাহাদের সহিত যাইতেই হইবে। যাহা হউক, টাকার চিন্তা ত যা হয় একরূপ হইয়াছে; এখন বাজে আর কি কি সঙ্গে লইতে হইবে, তাহার ত কিছুই ঠিক হইল না! বিশেষ কিছু লইবার আবশ্যক না হইলেও, দু'একখানি কাপড় ত সঙ্গে করিয়া লইতেই হইবে।

এইরূপ ভাবিতে-ভাবিতে সহসা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল, একখানি কাপড় রান্না-ঘরে শুকাইতেছে। সকালে এ সব বাজে কাজ করিবার সময় পাইবেন না ভাবিয়া, এখুনি এগুলি গুছাইয়া লইবার ইচ্ছা করিলেন। রাত্রিও অনেক হইয়াছে;—বিপিন, বৌ-মা নিশ্চয়ই নিদ্রিত; সুতরাং এ সব বাজে কাজ সারিয়া লইবার পক্ষে ইহাই উপযুক্ত অবসর। তা ছাড়া, 'হার'টীও ত বাহির করিয়া রাখিতে হইবে; তাহাও করিবার পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর ভাল সময় কি হইতে পারে? এই ভাবিয়া তিনি শয্যা ত্যাগ করিয়া ধীরে-ধীরে দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিলেন। জ্যোৎস্নালোকে ক্ষুদ্র বাড়ীখানি ধপ-ধপ করিতেছিল। তার পর তিনি যখন রান্নাঘরের দরজার সাম্‌নে আসিলেন, তখন—এ কি! স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন, বৌ-মা ক্রুদ্ধভাবে বলিতেছে—"* * ঘুমোব না। তোমার জন্যেই ত এই সর্ব্বনাশ বাধ্‌চে। সমস্ত দিন যখন কেঁদে-কেঁদে মরি, তখন ত কৈ দেখ্‌তে আস না?"

ইহার পর কি কথা হয় শুনিবার জন্য তিনি স্পন্দিত

হৃদয়ে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। স্ত্রীর মুখে ঐ কথা শুনিয়াই বিপিন উত্তেজিতভাবে বলিয়া উঠিল, "কেন—কেন, বুড়ী বুঝি তোমার সঙ্গে ঝগ্ড়া ক'রে—তোমাকে গালাগাল দেয়?"

বৌ-মা জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, "মা'র সঙ্গে তুমি এম্নি ক'রে-ক'রেই ত আমার সর্ব্বনাশ ক'রেচ। এতদিন তোমায় কিছু বলিনি, কিন্তু আর ত চুপ ক'রে থাকাও চলে না!"

বিপিন বোধ করি এখনও তাহার মনের প্রকৃত ভাব বুঝিতে পারিল না। বলিল, "কেন, আমার সঙ্গে ঝগ্ড়া হয় ব'লে, তোমাকে বকে বুঝি?

বৌ-মা বুঝিল, স্বামীর চোখে আঙুল দিয়া না বলিলে, সে বুঝিবে না। বলিল, "আজ আমি রক্ত-গঙ্গা হ'য়ে মর্‌বো—তুমি উল্টো বুঝ্চ কেন? আগে মা আমায় মনে-মনে কত ভালবাস্তেন,—আজকাল তোমার জন্যেই ত আর আমার সঙ্গে ভাল ক'রে কথাও কন না।" বৌ-মা জানিত, স্বামী মনে-মনে মা'র প্রতি যতই ক্রুদ্ধ হউক না কেন, কিন্তু লোক-লজ্জার ভয়ে সে বড়-একটা কিছু নিজের ইচ্ছায় করিত না। তাই বলিল, "আমিই ত মা'কে বলিচি, বাপের বাড়ী যাব না,—তাই ত মা আমায় পাঠান না! তা'র জন্যে তুমি কেন মার সঙ্গে ঝগ্ড়া কর? এত যদি তোমার পাঠাবার দরকার হয়, ত তুমি নিজের ইচ্ছেয় কেন পাঠাও না? আজকাল মায়ের চেহারা কি রকম হ'য়ে গেছে দেখ্তে পাও না? এম্নি ক'রে চুপ ক'রে-ক'রে আর কিছুদিন থাক্‌লেই মা যে মারা পড়্বেন! তুমি অমন করে' মায়ের সঙ্গে আজকাল ঝগ্ড়া কর কেন বল ত? আগে ত এমন ছিলে না! আমার পিসী বুঝি তোমাকে এই সব ক'র্‌তে ব'লেচে? আমাকে অবিশ্বাস করায় মায়ের ত কোনই দোষ নেই,—তুমি এম্নি কর ব'লেই ত উনি মনে ক'রেচেন, আমি তোমায় এই সব ক'র্‌তে বলিচি—উনি ত আর জানেন না, তুমি পিস্‌শাশুড়ীর কথায় এম্নি ক'চ্ছ?" বলিতে-বলিতে সে ফোঁস্-ফোঁস্ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

এতক্ষণে বিপিনের ভুল ভাঙ্গিল। যে স্ত্রীর মুখে এতদিন সে এ ভাবের একটা কথাও শুনে নাই, আজ সেই স্ত্রীর মুখে সহসা এতগুলি কথা শুনিয়া, সে অতিশয় বিস্মিত হইয়া বলিল, "বেশ, তার জন্যে এতদিন ত কিছু বলনি, আজ হঠাৎ এত ক'রে বল্‌ছ—তার কারণ কি?"

"কারণ কি! আজ মা কিছু টাকা চাইতে, তুমি অমন ক'রে উঠ্‌লে কেন? টাকা নেই তোমার? কাল ভোরবেলা যদি মাকে টাকা না দাও ত দেখ্‌বো কেমন সেই ছাইয়ের অনন্ত আমায় পরাতে পার। মেরে ফেল্লেও অনন্ত আর জীবনেও ছোঁব না।"

বিপিন মহামুস্কিলে পড়িল। সত্য-সত্যই 'বানির' টাকা ভিন্ন আর তাহার হাতে টাকা নাই। দু'একদিনের মধ্যেই অনন্ত লইয়া সেক্‌রা আসিবে। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া সে বলিল, "না—না, সত্য বল্‌চি, আমার কাছে টাকা নেই,—আমার কথা বিশ্বাস কর না?—"

স্বামীর এই কথায় বোধ করি তাহার চক্ষে জল আসিল। বলিল, "ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, আর তুমি মা'র সঙ্গে অমন ব্যাভার ক'রো না—আমি তা হ'লে মরে যাব। বেশ, টাকা নেই বল্‌ছ ত, এক কাজ কর না!"

"কি কাজ?"

"আমার বাক্সয় যে বিয়ের 'কাণ' তোলা আছে, তাই বাঁধা রেখে কাল মাকে টাকা দাও না—মা কিছুই জান্তে পার্‌বেন না।"

"না—না, তা কি হয়—আচ্ছা সে কাল যা' হয় হ'বে এখন। তুমি ঘুমোও, অনেক রাত হ'য়েচে—আমার হঠাৎ ঘুমটা না ভেঙ্গে গেলে, তুমি বোধ হয় সমস্ত রাতটাই অমনি ক'রে ব'সে ব'সে কাঁদ্‌তে?"

ইহার পর আর কিছু শোনা গেল না। মহামায়ার চক্ষু হইতে টপ্ টপ্ করিয়া কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। আর রান্না-ঘরে না ঢুকিয়া আস্তে-আস্তে নিজের ঘরে আসিয়া নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করিলেন।

* * * *

পর দিন ভোরবেলা বিপিন কোথা হইতে কিছু টাকা আনিয়া মায়ের হাতে দিল। মা সে টাকা লইতে কিছুমাত্র অস্বীকার করিলেন না। তার পর বেলা হইলে প্রায় ৬।৭ জন বৃদ্ধা বৃন্দাবন যাইবার জন্যে প্রস্তুত হইয়া এ বাড়ী আসিল। বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়াই বলিল, "কি গো বিপিনের মা, যাবে যে, না কি খালি মুখেই—"

কাল রাত হইতেই বৃন্দাবন যাইবার বাসনা তিনি মন হইতে একেবারেই ত্যাগ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু এখন কি করিবেন? যাইবার ইচ্ছা না থাকিলেও, যখন কথা দিয়াছেন, তখন তাঁহাকে যাইতেই হইবে। তাই বলিলেন, "হ্যাঁ ভাই, যাব বৈ কি—একটু দাঁড়াও।" তার পর বৌ-মাকে ডাকিয়া বলিলেন, "তবে এখন আসি মা—সব রৈল, দেখো শুনো; শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে তুমি ত নেহাত ছেলেমানুষটী নয়। তবে আসি—দেখো আমার বিপিনের যেন কোন কষ্ট না হয়।"

বৌ-মা'র চক্ষু ছল্-ছল্ করিয়া উঠিল। কি জানি কেন, তাহার মন হু হু করিয়া উঠিল। অতি কষ্টেও সে উদ্বেল অশ্রু গোপন করিতে পারিল না। চক্ষু মুছিয়া বলিল, "কবে আসবেন মা?"

মহামায়া জানিতেন না, কবে আসা হইবে। তাই তাহাদের মুখপানে চাহিলেন। তাহারা বলিল, "কদ্দিন আর—খুব জোর দিন পনের।"

তার পর তিনি বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময়, বৌ-মা যখন হেঁট হইয়া শ্বাশুড়ীর পায়ের ধূলা মাথায় দিতে গেল, তখন দুই ফোঁটা তপ্ত অশ্রু মহামায়ার পায়ে পড়িল। তিনি বলিলেন, "কাঁদ্‌চ কেন মা—ছিঃ! আমি ত আবার আস্‌বো।" এই বলিতে-বলিতে দুর্গা নাম স্মরণ করিয়া বাড়ীর বাহির হইলেন। হায়! যাইবার সময়—মহামায়া বৌ মাকে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও যে কত অধিক পরিমাণে ভালবাসিয়াছিলেন, আপনার অপেক্ষা তাহাকে অধিক বিশ্বাস করিয়াছেন—এ কথা তাহাকে বলিয়া যাইবারও সময় পাইলেন না।

(৫)

বৃন্দাবনে আসিয়া ছয় সাত দিন মহামায়া যে কি করিয়া কাটাইলেন, তাহা আর কি বলিব। বৌ-মা সদাসর্ব্বদাই তাঁহার চোখে-চোখে ফিরিতেছে। কেন তিনি আসিবার সময় তাহাকে কিছু বলিয়া আসিলেন না? তাহা হইলে হয় ত এখানে আসিয়া তাঁহার মন এত খারাপ হইত না। হায়! এত দিন তাহার প্রতি তিনি কতই না নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়াছেন। সেই একদিন, যে দিন বৌ-মা তাঁহার পা ধুইয়া দিতে আসিলে, তিনি যখন বলেন, "না মা, অত কষ্ট ক'রে কাজ নেই—আমার পা ধুয়ে দিতে হ'বে না।" তখন সে তাহা করিবার জন্য কতই কাকুতি-মিনতি করিয়াও যখন কোন ফল হইল না, তখন সে কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিল, "আমার এমন সর্ব্বনাশ কে কর্‌লে মা?" হায়, তাহার মুখে এমন কথা শুনিয়াও কি করিয়া তিনি ধৈর্য্য ধরিয়া ছিলেন।

এইরূপ ভাবিয়া-ভাবিয়া তিনি শুকাইয়া যাইতে লাগিলেন। ক্রমেই তাঁহার "এ কারাবাস" অসহ্য বোধ হইতে লাগিল।

আট দিনের দিন রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, তিনি যেন বাড়ী আসিয়াছেন। বৌ-মা যেন ছল-ছল নেত্রে বলিল—"এত দেরী ক'রে এলেন কেন মা—আমার যে বড় ভাবনা হ'চ্ছিল।" বৌ-মা'র কথা শুনিয়া তিনি যেন সস্নেহে তাহার চাঁদ মুখে চুম্বন করিয়া, তিনি যে তাহাকে আবার ভালবাসিয়াছেন তাহাই একটী-একটী করিয়া বলিলেন। তারপর তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন—"এত দিন যা ক'রেছিলুম, তার জন্যে মনে কিছু করিস্‌নে মা।" তাঁহার কথায় সে চক্ষুজলে বুক ভাসাইয়া তাঁহার কোলে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। তিনি তাহাকে সান্ত্বনা দিতে যাইবেন, এমন সময় তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। আর নিদ্রা আসিল না। সমস্ত রাত ছট্-ফট্ করিতে লাগিলেন।

সকালে উঠিয়া কোন মতেই এই শ্রীধাম বৃন্দাবনে আর একদণ্ডও থাকিতে তাঁহার ভাল লাগিল না। তাঁহার চোখে সমস্তই যেন শ্মশানের ন্যায় খাঁ খাঁ করিতে লাগিল। সঙ্গিনীদের কত করিয়া বাড়ী ফিরিবার জন্য বলিলেন। প্রথমটা সকলেই—"ভাল লোককে সঙ্গে ক'রে এনেছিলুম বাবু" বলিয়া তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইতে লাগিল। অবশেষে তাঁহার কাকুতি-মিনতিতে দুই জন তাঁহার সহিত বাড়ী ফিরিতে রাজী হইল।

*　　　*　　　*　　　*

ষ্টেশনে নামিয়া অপর দুই জন পায়ে হাঁটিয়াই বাড়ী যাইতে চাহিল। উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে, যাহাতে ঘোড়ার গাড়ীর ভাড়াটা মহামায়া একাই বহন করেন। তাহাই হইল। মহামায়া বলিলেন—"না বাবু, আমি গাড়ী কচ্চি—আমি বাড়ী পৌঁছুতে পাল্লে বাঁচি।" গাড়ী করা হইল। হু হু শব্দে গাড়ী আসিয়া বাড়ীর গলির মোড়ে থামিল।

গাড়ী হইতে নামিয়া কাপড়ের খুট্ হইতে বার আনা পয়সা গাড়োয়ান্‌কে দিয়া মহামায়া অতি দ্রুতগতিতে বাড়ীর দিকে আসিতে লাগিলেন। দূর হইতে দেখিলেন, তাঁহার বাড়ীর সুমুখে ছয় সাত জন পুরুষ জমা হইয়া রহিয়াছে। দেখিয়াই তাঁহার বুক ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। অবশিষ্ট রাস্তাটুকু আরও অধিক দ্রুতগতিতে আসিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়াই দেখিলেন, বৌ-মা চক্ষু বুজিয়া শুইয়া আছে, আর বিপিন তাহার মাথার কাছে বিষণ্ণ বদনে বসিয়া আছে;—একটী ডাক্তার বৌ-মা'র পাশে বসিয়া তাহার দেহ পরীক্ষা করিতেছেন। মা'কে দেখিবামাত্র বিপিন—"মা গো, তুমি এতক্ষণ কোথা ছিলে মা, আর একটু আগে এলে বোধ করি তোমায় সজ্ঞানে দেখ্‌তে পেতো" বলিয়া ফুকারিয়া কাঁদিতে লাগিল। তবে কি এখন শেষ সময়, এই ভাবিয়া মহামায়া -"বৌ মা গো, আমি যে ছুটে ছুটে আস্‌ছি—"বলিয়া দুম করিয়া আছড়াইয়া পড়িয়া বোধ করি মূর্চ্ছা গেলেন।

ডাক্তার বাবু এই পাড়ার অনেকদিনের চেনা ডাক্তার। তিনি বিপিনকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন—"তোমার কি ছেলে-মানুষী গেল না এখনও? বুড়ো মানুষকে কি এম্‌নি ক'রে বলে?—আর এতে ভয়ের কারণ কি আছে? এখন ওঠ, ওঁর মুখে-চোখে জল দাও।" বিপিনকে আর উঠিতে হইল না। মহামায়া কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিয়া উঠিলেন—"না গো, আর যেন আমাকে উঠ্‌তে না হয়"—বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। ডাক্তারবাবু তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—"না কোন ভয় নেই—আমি রোগ ধর্‌তে পেরেচি, অল্প দিনের মধ্যেই ভাল ক'রে দোব।"

শিশুপুত্র হারাইয়া যাইবার দশ দিন পরে, সে ছেলে জীবিত অবস্থায় রহিয়াছে—কোন লোক এই সংবাদ লইয়া আসিলে জননী যেমন আশ্বস্ত হয়, ডাক্তারের এই কথায় মহামায়াও তেম্‌নি আশ্বস্ত হইয়া করুণ ভাবে তাঁহার মুখ পানে চাহিয়া বলিলেন,—"বৌ মা আমার বাঁচবে ত?" এই সময় বৌ-মা পাশ ফিরিয়া চক্ষু মেলিয়া আপন মনে বলিল—"মা গো—" মহামায়া উন্মাদিনীর ন্যায় তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া—"এই যে মা, আমি এসিচি—" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। অসুখ বাড়িবার ভয় দেখাইয়া ডাক্তার বাবু তাঁহাকে কাঁদিতে নিষেধ করিলেন। মহামায়া চুপ করিলেন। তারপর ডাক্তার যাহা বলিয়া গেলেন তাহার সার মর্ম্ম এইরূপ;—

ভয়ের কোনই কারণ নাই—অসুখ অন্য কিছু নয়, দুশ্চিন্তায় মনে মনে পুড়িয়া পুড়িয়া অনেকটা হিষ্টিরিয়ার মত হইয়াছে। দু'চার দিনের মধ্যেই সারিয়া উঠিবে—সন্দেহ নাই। এখন তাহাকে বেশী বকান কিম্বা তাহার সুমুখে কাঁদা কোন মতেই উচিত নয়। এখন একশ তিন ডিক্রী জ্বর—এই জ্বরের সঙ্গে-সঙ্গে সব অসুখ ভাল হইয়া যাইবে। ইত্যাদি ইত্যাদি—

* * * *

ডাক্তার বাবু বোধ করি মিথ্যা বলিয়াছিলেন। কেন না, বৌ-মার সারিয়া উঠিতে ১৫।১৬ দিন সময় লাগিল। এই সময়ের মধ্যে বৌ মাকে এ যাত্রা বাঁচাইয়া দিবার জন্য কালীঘাটের "মা কালীকে" জোড়া পাঁঠা দিবার মানসিক করা হইতে আরম্ভ করিয়া রাস্তার মাটীর ঢিপিটীকে পর্য্যন্ত গড় হইয়া প্রণাম করিয়া বলিয়াছেন—"ঠাকুর, বৌ-মাকে আমার বাঁচাও ঠাকুর—আমি ত জ্ঞান হয়ে অবধি কোন পাপ করি নি, তবে কেন আমার ভাগ্যে এমন হবে। ইত্যাদি ইত্যাদি—

আজ মহামায়ার মনে আনন্দ ধরে না। আজ বৌমা পথ্য পাইবে। অনেক দিনের পর আজ তিনি মহা উৎসাহে রাঁধিতে বসিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বেই তিনি বৌমাকে সকল কথা খুলিয়া বলিয়াছিলেন। বেলা দশটার মধ্যেই তাঁহার রান্না শেষ হইয়া গেল। বৌমা খাইতে বসিল। দু'চার গ্রাস মুখে তুলিয়াই বৌমা খাশুড়ীর মুখপানে করুণ ভাবে চাহিয়া বলিল—"এই বার আমি বাপের বাড়ী যাব মা!" বৌমা কেন যে এ কথা বলিল, তিনি তাহা বেশ বুঝিতে পারিলেন। তিনি বলিলেন—"হ্যাঁ মা, সে কথা আর আমায় বলে দিতে হবে না, আর দু'চারদিন যাক্, পাঠিয়ে দোব, তাতে আমি মরি আর বাঁচি—ঐ পোড়ারমুখো বিপিন যদি তেমন না হ'ত তা হ'লে কি সে সময় আমার তেমন মতিচ্ছন্ন হ'ত মা। পাঁচজনের কথায় আমি তোমার ওপর অমন হ'য়ে পড়্‌লুম—লোকের কি বল মা—পরের সর্ব্বনাশ দেখ্‌তেই লোকে ভালবাসে।" বলিতে-বলিতে তাঁহার কোটরগত চক্ষু হইতে টপ-টপ করিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল।

রঙ্গ-চিত্র

[শ্রীচঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায়]

জমিদার

পিতা ও পুত্র

"টাইপ"—বাবু

কবি

ভাবের অভিব্যক্তি

বিরক্তি

আবদার

ভাবনা

নিরাশা

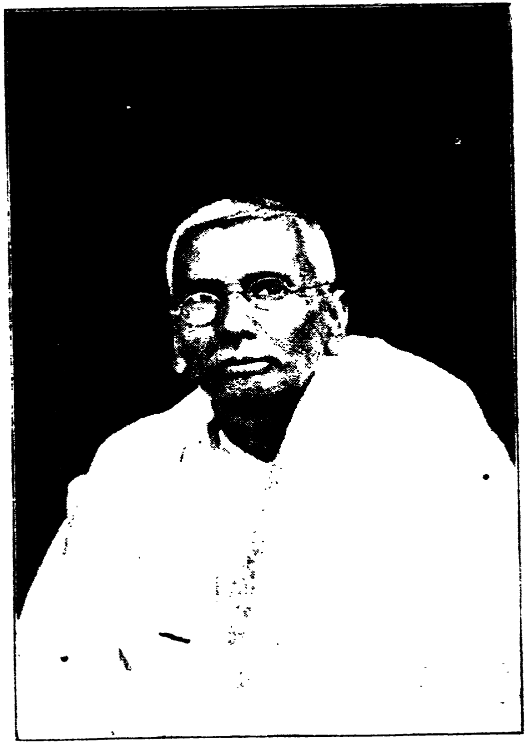

মেদিনীপুর সাহিত্য-সভার সপ্তম বার্ষিক উৎসবের

সভাপতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ

বাঙ্গালী াম্বুল্যান্স কোরের সেনাগণ।

এই ছয়জন সৈনিক কুত-অল-আমা তে জেনারেল টাউনসেণ্ডের সঙ্গে তুর্কীদের হাতে বন্দী হইয়াছিলেন ; যুদ্ধ-বির‍্তি উপ ক্ষ মুক্তিলাভ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

পিছনের সারিতে, বামদিক হইতে— ইভেট পি, বি, ঘোষ, প্রাইভেট এস. পি, সর্ব্বাধিকারী, প্রাইভেট এম, এল, দেব, ইনি যুদ্ধে আহত হইয়াছিলেন ;

সম্মুখে, বামদিক হইতে—প্রাইভেট ডোঃ। মুখার্জ্জি, প্রাইভেট শচীন বোস, প্রাইভেট জে, সি, মিত্র

৺ উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

'বসুমতী'র স্বত্বাধিকারী, অক্লান্তকর্ম্মী, বন্ধুবৎসল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আর ইহজগতে নাই; পঞ্চাশ বৎসরের অধিক কাল ভগবদ্‌নির্দ্দিষ্ট কার্য্য উদ্‌যাপন

৺উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

করিয়া বন্ধুবর উপেন্দ্রনাথ সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন। 'বসুমতী' পত্রিকা প্রকাশের অব্যবহিত পর হইতে আমরা উপেন্দ্রনাথের সহিত সুদীর্ঘকাল কার্য্যক্ষে[ত্রে] সংস্পৃষ্ট ছিলাম; তাঁহার সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার সহি[ত] পরিচিত ছিলাম। সামান্য অবস্থা হইতে অধ্যবসায় একাগ্রতা প্রভাবে উপেন্দ্রনাথ যে যশঃ অর্জ্জন করি[য়া] গিয়াছেন, তাহা সকলেরই অনুকরণীয়। সুলভ-সাহিত[্য] প্রচারে তিনি 'বঙ্গবাসী'র যোগেন্দ্রনাথের সমকক্ষ ছিলেন তাঁহারা চেষ্টা, যত্ন ও অর্থব্যয়ে বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকে[ল] গিরীশচন্দ্র, রঙ্গলাল, দীনবন্ধু, প্রভৃতি সাহিত্য-রথীদিগে[র] গ্রন্থাবলী বাঙ্গালার পল্লীতে-পল্লীতে ঘরে-ঘরে বিরা[জ] করিতেছে। তাঁহার 'রাজভাষা'র প্রতিষ্ঠার কথা কে [না] জানেন? তিনি বুকের রক্ত দিয়া 'বসুমতী'র সেবা করিয়[া] গিয়াছেন। কত ঝড়-ঝঞ্ঝা উপেন্দ্রনাথের মস্তকের উপ[র] দিয়া বহিয়া গিয়াছে; কিন্তু উপেন্দ্রনাথের অটল একাগ্রত[া] সমস্ত অতিক্রম করিয়া তাঁহার কার্য্যকে জয়যুক্ত করিয়াছে উপেন্দ্রনাথ বড়ই বন্ধুবৎসল ছিলেন; পরের দুঃখ-ক[ষ্ট] দেখিলে তিনি স্থির থাকিতে পারিতেন না; তিনি প্রাণ পণে লোকের উপকার করিয়াছেন। উপেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে আমরা একজন প্রকৃত বন্ধু হারাইয়াছি। তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীমান সতীশচন্দ্র দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া পিতা[র] পবিত্র অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান উন্নত করুন, ইহাই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি; তাঁহার শোকে আমরা সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

সঞ্চয়

[শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়]

সাহিত্য

হ্যাভেলক্ ইলিস্।—এখনকার ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে যাঁহাদের অল্প-একটুও সম্পর্ক আছে, হ্যাভেলক্ ইলিসের নাম তাঁহাদের কাছে নিশ্চয়ই অচেনা বলিয়া মনে হইবে না। যাঁহারা শুধু সৌন্দর্য্য-সন্ধানী, হ্যাভেলক্ ইলিসের লেখা পড়িয়া তাঁহাদের মনের আশা অবশ্য মিটিতে পারে না; কারণ হ্যাভেলক্ ইলিসের রচনায় মিষ্ট রস বা কাব্যের গন্ধ বড়-একটা নাই। কিন্তু আর-আর নানান্ দিক দিয়া হ্যাভেলক্ ইলিসের রচনায় এত-বেশী সার্থকতা দেখা যায় যে, যাঁহারা তাঁহার লেখার সঙ্গে পরিচয় রাখিবেন না, তাঁহারা নিজেরাই সকল-রকমে ঠকিয়া যাইবেন।

পান্থারের সঙ্গে লড়াই

(ডেনিস্ ভাস্কর Adolf Ferichan)

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে হ্যাভেলক্ ইলিস The New Spirit নামে একখানি সাহিত্য-সম্পর্কীয় পুস্তক প্রকাশ করেন। তখন তাঁহার বয়স ছিল একত্রিশ বৎসর। এখন তিনি ষাট বৎসরের বৃদ্ধ। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তাঁহার অশ্রান্ত লেখনী নানা বিষয়ে নানা গ্রন্থ প্রসব করিয়াছে,—কিন্তু তাঁহার লেখার ছাঁদ একরকম বদ্লায় নাই বলিলেও চলে,—তিনি সমান ভাবে সমান জোরে সমান তালে বরাবর একটানা সমান কলম চালাইয়া আসিতেছেন। A Dialogue in Utopia, A Study of British Genius, The Soul of Spain, The World of

বীরবালা জোয়ান অব্ আর্ক

(ফরাসী ভাস্কর Henri Chapue)

Dreams, The Task of Social Hygiene, The Criminal ও Impressions and Comments নামে পুস্তকগুলি, ইংরেজী সাহিত্যে হ্যাভেলক্ ইলিস্‌কে একজন শক্তিধর লেখকরূপে পরিচিত করিয়াছে। ১৮৮৭ হইতে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি Mermaid Seriesএ প্রকাশিত

নাটকগুলিও সম্পাদন করিয়াছিলেন। কিন্তু কেবল এই সকল পুস্তক রচনা ও সম্পাদন করিয়াই তিনি বিখ্যাত নন;—Studies in the Psychology of Sex নামক বিরাট গ্রন্থখানির জন্যই তাঁহার নাম সুধু ইংলণ্ডে নয়—পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মিথুন-শাস্ত্র সম্বন্ধে এত-বড় প্রামাণিক ও বৈজ্ঞানিক পুস্তক আর-কোন ভাষায় যাইতেছে, এই অদ্ভুত গ্রন্থে তাহার অগুন্তি উদাহরণ পাওয়া যায়। মানুষের ভিতরে-ভিতরে যে কতটা পশুত্ব, তাহার কাম-পিপাসা যে কতটা জঘন্য, হ্যাভেলক্ ইলিস সকলের চোখে আঙুল দিয়া সেটা দেখাইয়া দিয়াছেন। সুধু উদাহরণ দেখাইয়াই তিনি চুপ করেন নাই, এমন বিকৃত কাম-প্রবৃত্তির কারণ এবং কামুকের মনোবিজ্ঞান লইয়াও

দাদার গালে চুমু

(সুইডিস্ ভাস্কর Madrassi)

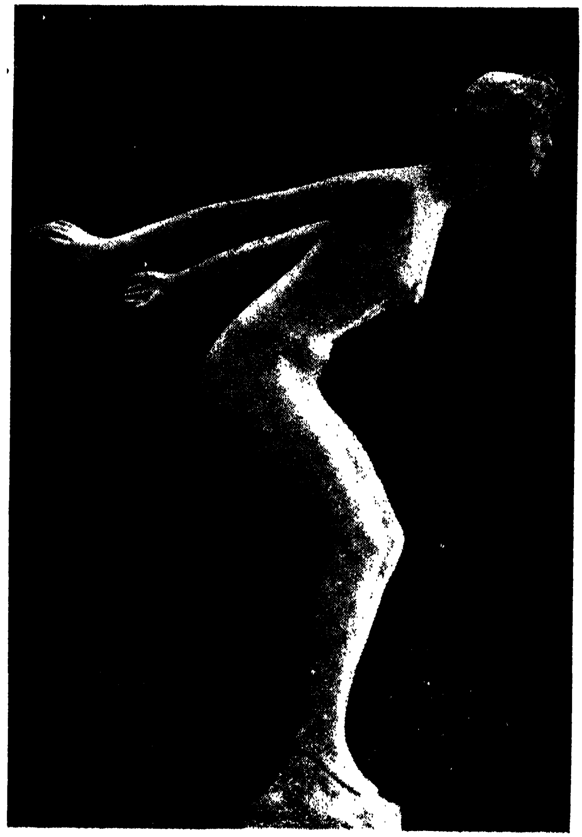

ষোড়শী

(সুইডিস্ ভাস্কর Axel Ebbe)

আর কোন লেখক আজ-পর্য্যন্ত লিখিতে পারেন নাই। এই অপূর্ব্ব পুস্তক যিনি পাঠ করিয়াছেন, তিনিই জানেন, ইহার পত্রে-পত্রে ছত্রে-ছত্রে লেখকের কি গভীর গবেষণা, কি অতুল ক্ষমতা, কি অসামান্য পাণ্ডিত্যের আশ্চর্য্য প্রকাশ আছে! প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সভ্য ও অসভ্য এবং প্রাচীন ও আধুনিক সমস্ত জাতির মধ্যে কামোন্মত্ত স্ত্রী-পুরুষরা কত গোপন ও কুৎসিত অনাচারে অভ্যস্ত হইয়া অধঃপাতে তিনি বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। আবার, কেবল মানব-সমাজে নয়,—পশু-রাজ্যেও ঐ একই প্রবৃত্তির একই ধারা কেমনভাবে বহিয়া চলিয়াছে, সেটাও তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টির আড়ালে যায় নাই! হ্যাভেলক্ ইলিসের গ্রন্থ যে-বিষয়ের জন্য সর্ব্বত্র সমাদৃত, সে-বিষয় লইয়া কোন বিশেষজ্ঞ বাঙালী বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বাৎস্যায়ন বা

কৌটিল্যের রচনাই এ-বিভাগে ভারতবর্ষের মধ্যে প্রসিদ্ধ। বাঙ্গলা ভাষায় তাহার অনুবাদ আছে।

হ্যাভেলক্ ইলিস প্রথমে কিছুদিন শিক্ষকের কাজ এবং চিকিৎসা-ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণীও বিদুষী মহিলা। Man and Woman নামক প্রসিদ্ধ পুস্তক রচনা-কালে তাঁহার স্ত্রীও তাঁহার সঙ্গে কলম

যেমন আসা-যাওয়া করেন, তেমনি ভাবে কখনো স্ত্রীর বাড়ীতে গিয়া স্বামী দেখা করিয়া আসিতেন স্ত্রীর সঙ্গে, আবার কখনো-বা স্বামীর বাড়ীতে আসিয়া স্ত্রী দেখা করিয়া যাইতেন স্বামীর সঙ্গে! পাছে দিন-রাতের মেলা-মেশায় ও বেশী ঘনিষ্ঠতায় বিবাহিত জীবন হইতে রোম্যান্সের মাত্রা কমিয়া যায়, সেই ভয়েই তাঁহারা একসঙ্গে এক-বাড়ীতে

নদী পার হওয়া
(ইতালীয় ভাস্কর Orazio Andreoni)

রুষ নর্ত্তকী ক্যারসাভিনার ভাবাত্মক নৃত্য

মকম্যানের আনন্দের নাচ

ধরিয়াছিলেন। এই পুস্তকে Sex-problemগুলির একটা বিজ্ঞান-সম্মত বিশদ আলোচনা আছে। তাঁহার স্ত্রী উপন্যাস ও নাটক লিখিয়াও নাম কিনিয়াছেন।

হ্যাভেলক্ ইলিস সেদিন-পর্য্যন্তও স্ত্রীর সঙ্গে এক-বাড়ীতে বাস করিতেন না! স্বামী থাকিতেন এক জায়গায়, আর স্ত্রী থাকিতেন আর-এক জায়গায়। বন্ধুবান্ধবরা

বাস করিতেন না!—কথাটা কাণে শুনিতে যতই অদ্ভুত ঠেকুক্—কিন্তু পুরাণো প্রেমকে নিতুই-নব করিয়া জিয়াইয়া রাখিবার এ যে একটা সেরা উপায়, তাতে আর এতটুকু সন্দেহ নাই!

* * *

ভবিষ্যতের সংবাদ-পত্র।—বিলাতের Daily Chro-

nicleএর সম্পাদক মিঃ রবার্ট ডোনাল্ড্‌, ভবিষ্যতের সংবাদ-পত্র সম্বন্ধে একটি আলোচনা করিয়াছেন। Standardএ প্রকাশিত তাঁহার ঐ আলোচনার সার-অংশ ও সম্পাদকীয় মন্তব্য হইতে আমরা কিছু-কিছু তুলিয়া দিলাম।

"কাগজ বিলি করিবার জন্য নূতন পথ তৈয়ারি করিয়া বৈদ্যুতিক ট্রেণ চালানো হইবে। দূরদেশের জ. বায়ু-পোত ব্যবহৃত হইবে। সান্ধ্য বা প্রভাতের সংস্করণ বলিয়া কোন-কিছু থাকিবে না—দিন-রাতের চব্বিশ ঘণ্টায় কাগজের প্রায় চব্বিশখানি করিয়া সংস্করণ বাহির হইবে। খবর জোগাড় করা হইবে তারহীন টেলিফোনের দ্বারা, এবং প্রত্যেক রিপোর্টারের পকেটে তারহীন টেলিফোনের একটি করিয়া যন্ত্র থাকিবে। খালি এইটুকু নয়,—আরো কিছুদিন পরে, লোকে আর কাগজ পড়িতেও চাহিবে না! কাগজের খবর তখন গ্রামোফোনের রেকর্ডের মধ্যে পুরিয়া বাড়ীতে-বাড়ীতে পাঠানো হইবে এবং রেকর্ডের গান যেমন করিয়া শোনা হইয়া থাকে, রেকর্ডের খবরও শোনা হইবে ঠিক তেম্‌নি করিয়াই!... ...কিন্তু ভবিষ্যতের এই

নর্ত্তকী ফিলিস মন্ক্ম্যান

শত্রুর হাতে বন্দিনী
(M. Fokin ও Mlle Fokinএর রুশীয় যুদ্ধ নৃত্য)

ফনোগ্রাফ-সংবাদেও যে সকল শ্রেণীর পাঠকই তুষ্ট হইবেন, তা বলা যায় না। জন-সাধারণের মধ্যে তখনও এমন লোক যথেষ্ট থাকিবেন, যাঁহারা এখনকার খবরের কাগজকে সেকেলে বলিয়া ফেলিয়া না-দিয়া বরং বেশী আদর করিয়াই পড়িবেন!"

ললিত কলা

ভাস্করের কথা।—চিত্রকলা যেমন জনপ্রিয় হইতে পারিয়াছে, ভাস্কর্য্য-কলার তেমন সৌভাগ্য হয় নাই। ভাস্কর্য্যের আদর ছিল সেকালে,—একালে তাকে কেউ বড়-একটা আমোল দেয় না। ভাস্কর্য্য বলিতে সাধারণত আমাদের মনে হয়, ধনীর বাগান-সাজানো ভাবহীন ও কুৎসিত পুতুলগুলোর কথা;—বাড়ীর ছোট-ছোট মেয়েরা যেমন আল্‌মারিতে খেল্‌না সাজাইয়া রাখে, ঐ পুতুলগুলোর সার্থকতাও ঠিক তেম্‌নিধারাই। ভাস্কর্য্যের সৌন্দর্য্য বাড়াইবার জন্যই যে বাগানের প্রয়োজন এবং বাগান সাজাইবার জন্য যে ভাস্কর্য্য নয়—এ-কথা বোঝে খুব কম-লোকেই।

ভাস্কর্য্যের এই অনাদরের দিনে, একটি শিল্পরসিক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বিলাতের এক রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন। সেই রাস্তায় তখন একটি নূতন প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ভদ্রলোকটি দেখিলেন, ছুটি বালক সেই প্রতিমূর্ত্তির দিকে অবাক্ হইয়া চাহিয়া চুপ-করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দেখিয়া তিনি ভারি খুসি হইলেন—'অ্যাঃ! আর্টের এই দুর্দ্দিনে, ছেলে-দুটির এই-বয়সেই ভাস্কর্য্যের উপরে এতটা ভক্তি!' এই আশ্চর্য্য শিল্প-অনুরাগ দেখিয়া ভদ্রলোকটি বালক-দুটিকে বাহবা দিয়া উৎসাহিত করিবার জন্য তাড়াতাড়ি তাহাদের কাছে গেলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই ছেলেদুটি বলিয়া উঠিল, "মশাই, আপনার পকেটে ছুরি থাকে ত দয়া করে' একবার দিন না!" ভদ্রলোকটি তখন বুঝিলেন, ছেলেদুটি মোটেই শিল্পরসিক নয়—প্রতিমূর্ত্তির অমল ধবল মর্ম্মর দেখিয়া তাহার উপরে এদের নাম-খোদাই করিতে সাধ হইয়াছে—কি সর্ব্বনাশ! ভদ্রলোকটি তখন হতাশ হইয়া তাড়াতাড়ি পলায়ন করিলেন!

শিল্পীর পাথরের উপরে নাম-খোদাই করিবারও যেটুকু আগ্রহ, একালের সাড়ে-পনেরো আনা লোকের মনে কিন্তু সেটুকু আগ্রহও নাই,—তাহারা পাথরের মূর্ত্তির দিকে ফিরিয়াও তাকায় না, তাহারা ভাস্কর্য্যকে একেবারেই উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যায়।

ভাস্কর্য্যের মধ্যে যে কালোপযোগী গভীর সত্য নিহিত আছে, একালের অধিকাংশ শিল্পীও তাহা অনুভব করিতে পারেন নাই। সে সত্য অনুভব করিয়াছিলেন, অতীতের সেই মহা-প্রতিভার অধিকারী ভাস্করগণ, যাঁহাদের অনুভূত সত্য পার্থেননের ভিত্তিতে-ভিত্তিতে শত-শত মূর্ত্তির মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। একালের ভাস্করগণ সত্যের সেই প্রকাশ দেখিয়া অভিভূত হন বটে, কিন্তু তেমন করিয়া সত্যের আধার সকলে আর গড়িতে পারেন না। তাহার কারণ, তাঁহারা নিজেদের জন্য নূতন পথ বাছিয়া না-লইয়া, প্রতি পদেই অতীতের শিল্পিগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলেন; ফলে সত্যের কোন নূতন বিকাশ-বৈচিত্র্যও দেখানো হয় না এবং সাত-নকলে আসলও খাস্তা হইয়া যায়।

অথচ, একালের অল্প যে-কয়েকজন ভাস্কর আপনাদের স্বাধীনতাকে শিলা-পটের রেখায়-রেখায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাঁহাদের কার্য্যে ভাবের এবং সত্যের কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখা যায়! কেবল রূপ-রসের সাধনায় নয়,—তাঁহারা সাধারণের সাগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণেও সক্ষম হইয়াছেন। ফরাসী ভাস্কর ওগস্ত্ রোদাঁ ও স্লাভ ভাস্কর মেষ্ট্রোভিকের নাম ঘাটে-মাঠে-পথে সকল শ্রেণীর সকল লোকের মুখেই শোনা যায়—তাঁহাদের সমাদর সর্ব্বত্র, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে। সুতরাং এ-কথাও বোঝা শক্ত নয় যে, একালে সবাই যে ভাস্করকে আদর করে না, তাহার জন্য বেশী দায়ী প্রধানত ভাস্করগণই। তাঁহারা ভাস্কর্য্যের মধ্যে নবযুগের নূতন বাণী, নূতন আশা-আকাঙ্ক্ষা, নূতন ভাবের ছবি দেখাইতে পারিতেছেন না। তাঁহারা যাহা করিতেছেন, সেটা অতীতের জাবর-কাটা বৈ অন্য-কিছু নয়। কাজেই জন-সাধারণও তাঁহাদের প্রতি বিমুখ।

আমরা এখানে একালের পাঁচজন বিখ্যাত প্রতিভাবান ভাস্করের গঠিত মূর্ত্তির এক-একটি নমুনা দিলাম।

রঙ্গালয়

ভাবাত্মক নৃত্য।—বিলাতের বিখ্যাত নৃত্য-কুশলী মিস্ ফিলিস্ মক্ম্যান, নৃত্য-কলার গুপ্ত ইঙ্গিত সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, "নৃত্য হচ্ছে আর্টের একটি উচ্চ অঙ্গ। এবং যে জন্ম-নর্ত্তক নয়, সে কখনো উঁচুদরের আর্টিষ্ট হইতে পারে না। অবশ্য, নাচিতে হইলে প্রথমটা

যথেষ্ট সাধনা এবং শিক্ষার আবশ্যক। কিন্তু যতই শিক্ষা দাও, কি আর-যাহাই কর, যে লোক খাঁটি ভাবুক নয়—নৃত্যকলায় সে কখনো প্রাণের আবেগ প্রকাশ করিতে পারে না। 'অমুক ভাবে হাত নাড়িলে এবং অমুক ভাবে চোখ পাকাইলে রাগের ভাব দেখানো যায়' বলিয়া তুমি হয় ত কাহাকেও শিক্ষা দিলে। সে হয় ত ঠিক তোমার শিক্ষা মতই কাজ করিয়া গেল। কিন্তু তবু রাগের আসল ভাবটি ফুটাইতে পারিল না। কারণ, সে প্রাণের ভিতরে ক্রোধের আবেগ অনুভব করে নাই—সে যাহা করিতেছে, তাহা তোমারই অবিকল নকল মাত্র।

নাচের ভাবের ভিতরে নাচিয়েকে মস্‌গুল হইয়া থাকিতে হইবে। ধর, আমার নাচের বিষয় হইতেছে, 'একটি ভিখারীর মেয়ে ফুল কুড়াইতেছে'। এখানে আমাকেও মনে করিতে হইবে, সত্যসত্যই আমি ভিখারীর মেয়ে, ক্ষুধা ও দুর্ভাগ্যের তাড়নায় আমি ভিতরে-বাহিরে অস্থির, আমার দেহ আর যাতনার ভার বহিতে পারিতেছে না, পা আর চলিতে চাহিতেছে না! তারপর, কল্পনায় আমাকে দেখিতে হইবে, আমি যেন নিভৃত পল্লীর বন-লতার শ্যামলতার মধ্যে গিয়া পড়িয়াছি;—মাথার উপরে উদার আকাশ, চারিদিকে মধুর বাতাস, পদতলে নধর দূর্ব্বাঘাস! বসন্তের আহ্বানে ভিখারিণী আমি,—আমারও শ্রান্ত প্রাণ আনন্দে বিভোর হইয়া উঠিল, সাম্‌নে ঐ ফুলের বাগান,—ধরণীর উপরে রাঙা-রাঙা ফুলগুলি হাসির মত ছড়াইয়া রহিয়াছে! দুর্ভাগ্যের তাড়না ও ক্ষুধার যাতনা ভুলিয়া নাচিতে-নাচিতে আমি ফুল কুড়াইতে ছুটিলাম! ... ... এম্‌নি ভাবে অভিভূত হইতে না-পারিলে নাচে কখনো ভাব বা আবেগ ফোটানো যায় না।

নর্ত্তকী তার দেহ দিয়া ছবি আঁকে, কবিতা লেখে। কেমন-করিয়া সে তা করে, নর্ত্তকী তা বলিতে পারে না। চিত্রকর কি-করিয়া ছবি আঁকেন, কবি কি-করিয়া কবিতা লেখেন, সে কথা কি তাঁহারা বুঝাইয়া বলিতে পারেন? চিত্রকরকে গোড়ায় খালি শিখিতে হয় ড্রয়িংএর কায়দা, কবিকেও শিখিতে হয় লেখার প্রাথমিক গোটাকতক পদ্ধতি; তারপর তাঁহাদের যাহা কর্ত্তব্য, সেটা শিক্ষার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করে না, সেটা নির্ভর করে তাঁহাদের শক্তি, প্রতিভা ও কল্পনার উপরে। নৃত্যকলা-সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই খাটে।"

আমাদের দেশে রঙ্গালয়ে যে নাচ হয়, তাহার ভিতর হইতে ভাবের ও আবেগের দিকটা একরকম চলিয়া গিয়াছে বলিলেও হয়। কিন্তু য়ুরোপের সকল দেশেই নৃত্য-কলায় ভাবাবেগের রূপ ক্রমেই বেশী-করিয়া জাগিয়া উঠিতেছে। সেখানে এখন কেবল হাত-পা ছোঁড়াকেই নাচ বলে না; প্রতি নৃত্যে যিনি এক-একটি বিশেষ ভাবের ইঙ্গিত দিতে পারেন, সমঝদারের আসরে এখন তাঁহারই আদর হয় অধিক। হাত-পা অঙ্গভঙ্গির ছন্দে, মুখ-চোখের বিচিত্র ভাবে নর্ত্তকীরা সেখানে কখনো দুঃখের ও কখনো সুখের ছবি জাগাইয়া তুলেন এবং নাচের সঙ্গে অভিনয়ের যে কতটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, দর্শককে সেটা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দেন।

আমাদের দেশেও খাঁটি দেশী ভাবাত্মক নৃত্য আছে, কিন্তু তেমন নাচ দেখা যায় খুব কম। বাঙ্‌লা দেশে সেটা একরকম নাই বলিলেও চলে; কেবল দাক্ষিণাত্যে এবং ভারতের অন্যান্য দু-একটি জায়গায় ভাবাত্মক নৃত্য এখনো সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইয়া যায় নাই।

বিবিধ

আলোক ও দৃষ্টি।—কি-রকম আলোকে ঘর আলোকিত করা উচিত এবং দৃষ্টির পক্ষে কি-রকম আলোক উপকারী, তাহা লইয়া অনেক তর্ক-বিতর্ক চলিতেছে। সংপ্রতি ইহাই স্থির হইয়াছে যে, মানুষের দৃষ্টি যে-শ্রেণীর কাজে খাটানো হয়, সেই-শ্রেণীর কাজের উপরেই আলোকের বিভিন্নতা নির্ভর করে। যেখানে কোন জিনিষ চোখের কাছে রাখিয়া সমস্ত খুঁটিনাটি দেখার দরকার, সেখানকার আলোকও উজ্জ্বল হওয়া চাই। কিন্তু সেইসঙ্গে এটাও জানিয়া রাখা ভালো যে, উজ্জ্বল আলোক শ্রান্তিকর। দৃষ্টিকে যেখানে একটানা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিতে হইবে, আলোকের উজ্জ্বলতা সেখানে সচরাচর যতটা দরকার মনে হয়, তার চেয়েও কমাইয়া ফেলা উচিত।

এইসঙ্গে এখানে আর-একটি কথা জানা দরকার। চোখকে যাঁরা উজ্জ্বল ও পরিষ্কার রাখিতে চান, দৃষ্টিকে তাঁরা যেন মিছামিছি হয়রাণ না-করেন। মিট্‌মিটে আলোতে

লেখাপড়া করার মানে হচ্ছে চোখের মাথা খাওয়া। পড়াশুনা করিবার সময় এমনভাবে বসিতে হইবে, আলো যাহাতে পিছন হইতে বইয়ের উপরে আসিয়া পড়ে। খুব প্রখর আলো, আর রোদের দিকে সাধ্যমত না-চাওয়াই উচিত। অনেকেই চোখের প্রদাহে কষ্ট পান এবং বিনা চিকিৎসায় অনর্থক সে কষ্ট সহিয়া থাকিয়া তাঁরা চোখের সৌন্দর্য্য নষ্ট করেন। এ অবস্থায় দশ গ্রেণ বোর‍্যাক্স (borax) এক আউন্স ক্যাম্ফর ওয়াটারে (Spirits of camphor নয়) মিশাইয়া, চোখকে ধুইয়া ফেলা ভালো। মাঝে-মাঝে চোখে জলের ঝাপ্‌টা দেওয়া সকলের পক্ষেই দরকার। ঠাণ্ডা ও পাত্‌লা চায়ের জল শ্রান্ত ও দুর্ব্বল চক্ষু ধুইবার পক্ষে যেমন উপকারী, তেম্‌নি নির্দ্দোষ।

* * *

দৈনিক মানসিক ব্যায়াম।—কুঁড়ের দেহ নানান্ রোগের বাসা। আজকাল অনেকেই তাই নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম করেন। কিন্তু দেহের ব্যায়াম লইয়া যাঁরা রোজ আধঘণ্টা হইতে একঘণ্টা পর্য্যন্ত মাতিয়া থাকেন, মনের ব্যায়ামের জন্ম দিনে পাঁচ-দশ মিনিট সময় খরচ করিতেও তাঁরা যেন নেহাৎ নারাজ। দেহ ও মন, কারুকেই অবহেলা করা ঠিক নয়,—অবহেলা করিলেই সাজা পাইতে হইবে। অনেক বিখ্যাত পণ্ডিত যেমন দেহের দিকে না-চাহিয়া সুধু মনের চর্চ্চায় মাতিয়া অকাল-বুড়ো হইয়াছেন বা পরমায়ু থাকিতে মরিয়াছেন, অনেক ব্যায়াম-করিয়া-জোয়ালো লোকও তেম্‌নি মনকে অকেজো রাখিয়া বয়সে বৃদ্ধ ও বুদ্ধিতে বালক হইয়া থাকিয়াছেন। বড় বড় পালোয়ান এর সাক্ষী। পালোয়ানরা প্রায়ই পণ্ডিত হয় না কেন?—মানসিক ব্যায়ামের অভাবে। বিলাতের 'ডেলি মেলে' Mr. Archibald Marshall তাই বলিতেছেন, প্রত্যেক ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য প্রতিদিন অন্তত যৎকিঞ্চিৎ মানসিক ব্যায়ামে নিযুক্ত থাকা। মারস্তাল সাহেব নিজে প্রত্যহ মানসিক ব্যায়াম করেন। তার ফলে "Odes of Horace"এর চারি অংশই তাঁহার মুখস্থ। এই চার অংশে লাইন আছে তিন হাজার বাশটিটি। তিনি বলেন, "এটা কিছুই শক্ত নয়। যে-সময়টায় আমি Horace কণ্ঠস্থ করেছি, সে-সময়টা আমি আর-কোন-রকমেই কাটাতে পারতুম না। আমি মুখস্থ করেছি দিনে-দিনে, দাড়ী কামাতে-কামাতে বা পোষাক পর্‌তে-পর্‌তে বা স্নান কর্‌তে-কর্‌তে, প্রতিদিন দশ বা কুড়ি লাইন করে'। আর এই মুখস্থ-করার কাজটা অন্য সময়ের চেয়ে সকালেই হয় বেশী সহজে। সর্ব্বপ্রথমে আমি ওমর খৈয়ামের রুবায়ত কণ্ঠস্থ করি। এতে আমার সময় লেগেছিল একমাস। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের "Ode on the Intimations of Immortality in Early Childhood" নামে কবিতাটি একসপ্তাহের মধ্যেই আমার কণ্ঠস্থ হয়ে যায়। যাঁর যে লেখা পড়্‌তে ভালো লাগে, তাঁর পক্ষে সেই লেখাই মুখস্থ করা সহজ ও প্রশস্ত।" মারস্তাল সাহেবের দৃষ্টান্ত সকলেই অনুসরণ করিতে পারেন। যাঁহারা মনকে পঙ্গু রাখিয়া দেহকে বলিষ্ঠ করিতে ব্যতিব্যস্ত হন, তাঁহারা যদি এদিকে একটু দৃষ্টি দেন, তবে মনের চর্চ্চা ত হইবেই, বেশীর ভাগ বাজে সময় খর্চ্চাও বাঁচিয়া যাইবে।

* * *

সমুজ্জ্বল বিহঙ্গ।—এমন ঢের পাখী আছে, রাতে যাহাদের দেহ চক্‌চক্ করে বা জ্বলিতে থাকে,—এ-কথাটা আদ্দিকালের কথা এবং অনেক স্থলেই বাড়ানো কথা বা মিছে কথা। রোমের প্লিনি ও ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে কনরাড গেস্‌নার এবং আরো নানাসময়ে নানা লোক সমুজ্জ্বল বিহঙ্গের কথা বলিয়াছেন। আজকাল অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে যে, সমুজ্জ্বল বিহঙ্গের কাহিনী একেবারে গাঁজাখুরি নয়। Knowledge নামে ইংরেজী সাময়িক পত্রে এ-সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। প্রবন্ধ-লেখক বলেন, "১৯০৭ খৃষ্টাব্দে কেম্ব্রিজে সমুজ্জ্বল বিহঙ্গ দেখা গিয়াছিল। স্যার ডিগ্‌বি পিগট্ সেদিকে বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। এখানেই আগেও আর একবার 'চলন্ত আলো' দেখা গিয়াছিল, কিন্তু সে ব্যাপারটাকে তখন গেঁয়ো লোকের আজগুবি কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এবার এ বিষয় লইয়া রীতিমত খোঁজখবর সুরু হয়। ফলে জানা যায়, ফ্রান্সের Vosges ও Pyreneesএও অম্‌নি সমুজ্জ্বল বিহঙ্গ দেখা গিয়াছে। কেম্ব্রিজে একব্যক্তি গুলি করিয়া একটি সমুজ্জ্বল বিহঙ্গ মারিয়াছিল। তাহার মুখে প্রকাশ, পাখীটি প্যাঁচা

বৈ আর-কিছু নয়।"—তারপরে অনুসন্ধান ও আলোচনায় প্রকাশ পাইয়াছে, শুধু প্যাঁচা নয়, আরো অনেক পাখী—এমন-কি পোষা পায়রারা পর্য্যন্ত মাঝেমাঝে এম্‌নি সমুজ্জ্বল হইয়া ওঠে। এই আলোর অংশটা থাকে পাখীদের বুকের দিকে। এবং যখন তারা উড়িতে থাকে আলোর উজ্জ্বলতা তখনি বেশী হয়। এখন স্থির হইয়াছে যে, ফস্‌ফোরাসের মত কোন একটা পদার্থ, পাখীদের বুকের অপরিষ্কৃত পালকের মধ্যে জন্মায় বলিয়াই সময়ে-সময়ে তাহারা সমুজ্জ্বল হইবার সুবিধা পায়।

সহযোগী-সাহিত্য

[শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ]

মানুষের জন্মকথা

কয়েক দিন হইল, বাঙ্গলার এসিয়াটিক সোসাইটীর বার্ষিক অধিবেশন হ'য়ে গেছে। এই সভায় সভাপতির আসনে বসে' ডাক্তার এইচ, এইচ, হেডেন মানুষের জন্মকথা বলেছিলেন। আমরা পাঠক-পাঠিকাগণকে তার মর্ম্মটুকু শুনিয়ে রাখতে চাই।

সম্প্রতি ভূপঞ্জরের কাল সম্বন্ধে কতকগুলি গবেষণা-মূলক অনুসন্ধান হ'য়ে গেছে; এই সঙ্গে মানুষের জন্ম-কথারও আলোচনা হয়েছিল। তারই উপর নির্ভর করে' ডাক্তার হেডেন বক্তৃতা করেছিলেন। তিনি বলেন,—

পঞ্চাশ বছর আগে লায়েল অনুমান করেছিলেন, পৃথিবীর বয়স ২৫০০০০০০০ বছর। অন্য কেউ-কেউ হিসেব করে দেখেছেন, পৃথিবীর বয়স ১০০০০০০০ কি ১২০০০০০০ বছরের, বেশী হবে না। এই শেষের পণ্ডিতরা সূর্য্যের বর্ত্তমান তাপ থেকে তার বয়সের হিসাব করে' তাই থেকে যুক্তি-তর্ক ধরে' পৃথিবীর বয়স অনুমান করেছেন। আবার উনিশ শতাব্দীর শেষাশেষি লর্ড কেলভিন হিসেব করেছিলেন যে, পৃথিবীর বয়স ৪০০০০০০০ বছর হতে পারে। অনেকে লর্ড কেলভিনের মত অনেকটা ঠিক বলে মেনে নিয়েছেন। আবার কেউ-কেউ আর এক রকমে পৃথিবীর বয়স স্থির করবার চেষ্টা করেছেন। এখনকার বড়-বড় নদীতে জলের স্রোতের সঙ্গে যে সব মলামাটী, কাদা, বালি ভেসে আসে, সেগুলা ক্রমে থিতিয়ে গিয়ে নদীর গর্ভে পলি পড়ে। সেই পলি ক্রমে-ক্রমে জমে-জমে ডাঙ্গা গড়ে ওঠে। কোন্ নদী দিয়ে কত সময়ে কি পরিমাণে মাটী-কাদা ভেসে এসে, কত দিনের পলি জমে' কতখানি ডাঙ্গা গড়ে ওঠে, সে সমস্ত হিসেব করে দেখা হয়েছে। এই হিসেব ধরে' অন্য যায়গার ডাঙ্গা পরীক্ষা করে' অধ্যাপক সোলাস স্থির করেছেন, পৃথিবীর বয়স ৮০০০০০০০ বছর হতে পারে। ঐ সব থিতিয়ে-পড়া পলিমাটী জমতে-জমতে তাদের উপর চাপের উপর চাপ পড়ে' সেগুলা এখন পাথর হয়ে গেছে। যে সব যায়গায় এই ভাবে পৃথিবীর ডাঙ্গা গড়ে উঠেছে, অধ্যাপক সোলাস সেই সব ডাঙ্গা মেপে দেখেছেন, ৩৩৬০০০ ফিট হয়েছে। তার পর তিনি হিসেব করে দেখেছেন, ঐ ৩৩৬০০০ ফিট পাতুরে ডাঙ্গা গড়ে উঠতে পৃথিবীর ৮০০০০০০০ বছর লেগেছে। অধ্যাপক জলি আবার আর এক দিক থেকে এই সমস্যার মীমাংসা করলেন। তিনি দেখলেন, আগ্নেয় পর্ব্বতের গায়ে যে সোডিয়ম ধাতু জমে' আছে, তা' বৃষ্টির জলে ধুয়ে-ধুয়ে নদীপথে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। এই রকমে, যে সব নদী দিয়ে সোডিয়ম সমুদ্রে গিয়ে পড়ে, অধ্যাপক জলি তার এক বছরের হিসেব নিয়ে কতটা সোডিয়ম এক-এক বছরে সমুদ্রে গিয়ে পড়া সম্ভব, তা' স্থির করলেন। তার পর সমস্ত সমুদ্র-গুলার সঞ্চিত লবণের পরিমাণ স্থির করে, যত বছরে ঐ পরিমাণ লবণের সমুদ্রে গিয়ে পড়া সম্ভব তার একটা আন্দাজী হিসেব খাড়া করলেন। তাতে পৃথিবীর বয়স দাঁড়াল ৯৬০০০০০০ বছর। কিন্তু আর এক শ্রেণীর পণ্ডিত (physicists) এ সব হিসেব আমলে' আনতে চান না, একেবারে উড়িয়ে দিতে চান। তাঁরা বলেন, পৃথিবীর বয়স

এত হতে পারে না ; ঐ সব হিসেবে পৃথিবীর বয়স প্রকৃত বয়সের চেয়ে অনেক বেশী দাঁড়াচ্ছে। তাঁদের মতে, ভূ-পঞ্জরের দিক থেকে যে হিসেব করা হয়েছে, সেটাও নির্ভুল হয় নি ; আর সূর্য্য ও পৃথিবীর তাপ ক্রমশঃ কমে আসছে, এই তত্ত্বের উপর নির্ভর করে আবহাওয়ার দিক থেকে যে হিসেব হয়েছে, তাও ঠিক হয়নি। এই শেষের হিসেবটার গোড়ায় গলদ্ ঘটে গেছে। কারণ, radio-activity বলে' যে নূতন একটা জিনিসের খোঁজ পাওয়া গেছে, তা' থেকেও কিছু তাপ পাওয়া যায় ; সূর্য্য ও পৃথিবীর তাপের কম-বেশীর উপর নির্ভর করে' পৃথিবীর বয়স স্থির করবার সময় এই radio-activity'র তাপটা ধরা হয়নি। এই সব কথা বিবেচনা করে' physicistরা পৃথিবীর যে কোষ্ঠি তৈরী করলেন, তাতে, তাঁদের মতে পৃথিবীর বয়স ১০০০০০০০০ ও ২০০০০০০০০ বছরের মাঝামাঝি কোথাও ধরলে খুব বেশী ভুল হবে না। এদিকে radio-activity সম্বন্ধে যতই নূতন-নূতন পরীক্ষা হতে লাগল, ততই দেখা গেল যে, ভূ-পঞ্জরের উপাদান-স্বরূপ পাথর-গুলার বয়স স্থির করবার মত নূতন-নূতন কোষ্ঠি পাওয়া যাচ্ছে। এখন এই physicists দলের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত-দের মনে বিশ্বাস জন্মেছে যে, এইবার তাঁরা নিখুঁত ভাবে পৃথিবীর বয়স ঠিক করতে পারবেন ;—এমন কি শুধু মোটামুটী দুই-এক শো কোটী বছরের গরমিল দেখিয়েই তাঁরা ক্ষান্ত হবেন না,—কোন্ শুভ দিনে কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে পৃথিবীর জন্ম হয়েছে, সেই দিনক্ষণ, ঘণ্টা, মিনিট, সেকেণ্ড পর্য্যন্ত নির্ভুল করে গণনা করবার ভরসা তাঁরা করছেন। ইউরেনিয়ম নামক একপ্রকার নূতন আবিষ্কৃত মূল পদার্থের এমন একটা ধর্ম্ম প্রকাশ পেয়েছে, যাতে করে এটা সম্ভব হতে পেরেছে। সেই ধর্ম্মটা এই যে, ইউরেনিয়াম ভেঙ্গে-ভেঙ্গে হেলিয়াম ও র‍্যাডিয়াম নামক কয়েকটি মূল পদার্থে পরিণত হয়। এই শ্রেণীর পদার্থগুলির ভিতর সীসাই বোধ হয় সর্ব্বশেষ পদার্থ। ইউরেনিয়ম যে সকল খনিজ পদার্থ থেকে উৎপন্ন হতে পারে, তাদের মধ্যে হেলিয়াম, র‍্যাডিয়াম ও সীসা প্রভৃতি যে সব পদার্থ পাওয়া যায়, তার পরিমাণ ত ঠিক করা যায়ই ; তার উপর প্রধান মূল পদার্থ এবং তা' থেকে উৎপন্ন অন্য-অন্য মূল-পদার্থ কি পরিমাণে ক্ষয় হয়ে যায়, তাও ঠিক করা অসম্ভব নয়। এই সব উপকরণ থেকে, যে সময়ে ক্ষয়-কার্য্য আরম্ভ হয়েছে, অর্থাৎ ইউরে-নিয়ম-উৎপাদক খনিজ তৈরী হতে যতটা সময় লেগেছে, তারও হিসেব করা যায়। এই রকম উপায়ে ভূ-পঞ্জরের ভিন্ন-ভিন্ন অংশে যে সব radio-active খনিজ পদার্থ পাওয়া গেছে,—যত কম সময়ের মধ্যে তারা উৎপন্ন হয়ে থাকতে পারে, তা একরকম স্থির হয়ে গেছে। তার ফলে এই জানা গেছে যে, ভিসুভিয়স পর্ব্বত থেকে যে সকল তরল খনিজ পদার্থ বেরিয়ে এসেছে, সে-গুলার বয়স এক লক্ষ বৎসর হতে পারে ; আর পৃথিবীর খোসার মধ্যে সব-চেয়ে পুরোনো যে পাথর—সেই কানাডার আর্চ্চিয়ান পাহাড় থেকে পাওয়া, ঐ ধরণের খনিজ পদার্থগুলার বয়স ১৪০০০০০০০০ বছরের কম নয়। এই রকম হিসেব করে স্থির হয়েছে যে, 'সেকেলে' চিংড়ী ও কাঁকড়া-শ্রেণীর জীব ৫৫০০০০০০০ থেকে ৭০০০০০০০০ বছর পূর্ব্বে পৃথিবীতে দেখা দিয়েছিল। প্রথম মাছের বয়স এত দিনে ৩৫০০০০০০০ থেকে ৪০০০০০০০০ বছরের মধ্যে থাকবার কথা। আর পক্ষীজাতির বয়স বেশী নয়,—মোটে ১৫০০০০০০০ বছর। কোন-কোন স্তন্যপায়ী জীব (mammals) পাখীদের সঙ্গে সঙ্গে কিম্বা তার কিছুদিন (অর্থাৎ দু'দশ লক্ষ বৎসর) আগে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু সাধারণ ভাবে স্তন্যপায়ী জীবের শ্রেণীর (mammalia) পূর্ণ পরিণতি ঘটেছিল জীব-সৃষ্টির তৃতীয় স্তরে (Tertiary epoch) ; আর একটু নিখুত ভাবে বলতে গেলে বলা যায়—Miocene ও Pliocene periodএ ; কিন্তু সে বেশী দিনের কথা নয়,—মাত্র ৫০ লক্ষ কি এক কোটী বছর। এই স্তন্যপায়ী জীব-শ্রেণীর মধ্যে যাদের আকার খুব বড় ছিল, তাদের কঙ্কাল এখনও হিমালয়ের শিবালিক পাহাড়ে ও পঞ্জাবে পাওয়া যায়।

এই সব সূক্ষ্ম ও নিখুঁত গণনা থেকে, পাঠকেরা পৃথিবীর বয়স, আর কয়েক-শ্রেণীর জীবের আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা নিশ্চয়ই করে নিতে পেরেছেন। এইবার খোদ মানুষের কথা আসছে। মানুষ হচ্ছে স্তন্যপায়ী জীব-শ্রেণীর মধ্যে সর্ব্বশেষের পর্য্যায়ভুক্ত ; অর্থাৎ মানুষেতেই এই শ্রেণীর জীবের চরম পরিণতি ঘটেছে। এই মানুষের প্রথম সৃষ্টি থেকে আজ পর্য্যন্ত কত বছর

কেটে গেছে, তা' জানতে মানুষের মনে নিশ্চয়ই খুব কৌতূহল জন্মাতে পারে। অতএব এর খোঁজটা এইবার নেওয়া যাক্।

ভূ-পঞ্জরের ভেতরে অন্যান্য জীব যেমন তাদের একটা চিহ্ন কি ইতিহাস লিখে রেখেছে, মানুষেরও সেই রকম একটা ইতিহাস সেখানে খুঁজলে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু অন্যান্য জীবের ইতিহাসের সঙ্গে মানুষের ইতিহাসের ঢের তফাৎ দেখা যায়। কারণ, কোন একটা বিশেষ সময়ে কোন এক বিশেষ শ্রেণীর জীব যে বর্ত্তমান ছিল, তা' কেবল তাদের দেহের কঙ্কাল বা ধ্বংসাবশেষ দেখেই জানতে পারা যায়; কিম্বা কোন যায়গায় বড় জোর তাদের স্বাভাবিক পদচিহ্ন মুছে না গিয়ে থেকে গেছে। কিন্তু মানুষের বেলায় তা নয়। মানুষের কঙ্কাল তত থাক আর নাই থাক, তার হাতের কারিগরি অনেক যায়গাতেই দেখতে পাওয়া গেছে। বরং বেশীর ভাগ স্থলেই মানুষের হাতের কারিগরি থেকেই সেখানে তার অস্তিত্ব জানা গেছে। এই সব কারিগরির মধ্যে খুব সাধারণ হচ্ছে, তাদের নানা রকম যন্ত্রপাতি। সকলের আগে তারা যে সকল যন্ত্র ব্যবহার করেছিল, সেগুলা পাথর দিয়ে তৈরী। তার পরের যন্ত্রগুলা হাড়ের; এবং সব শেষেরগুলা কাঁসা ও লোহার। প্রাচীন মানবের হাতের তৈরী এই সব যন্ত্রের ইতিহাস,—বৈজ্ঞানিক ভাষায় যার নাম "artifacts,"—তিনটী স্তরে ভাগ করা যায়। এই তিন স্তরের নাম—stone age বা পাথরের যুগ; Bronze age বা কাঁসার যুগ, আর Iron age বা লোহার যুগ। সুতরাং সর্ব্বপ্রথম যুগ—পাথরের যুগের কাল-নির্ণয় করতে পারলেই, মানুষেরও বয়স স্থির করতে পারা গেল।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা বিবেচনা করেন যে, যতদিনের মানুষ ইতিহাসে স্থান পেয়েছে, তারও আগে মানুষের দশটা অনুশীলনের অবস্থা কেটে গেছে। এই দশটা অবস্থার প্রত্যেকটাই মানুষের হাতের কাজের এক-এক রকম স্বতন্ত্র, স্পষ্ট ও বিশেষ নিদর্শনের দ্বারা বিশিষ্টতা পেয়েছে। আবার এদের মধ্যে অনেকগুলা অবস্থাতে মানুষের কঙ্কালও পাওয়া গেছে। তার মধ্যে আবার সকলের শেষের অনুশীলনের অবস্থা যতদিন ধরে চলেছিল, সেই সময়টা-বরাবরই নরকঙ্কাল বেশী পরিমাণে দেখা যায়। তবে পাথরের যুগ ধরে যতই এগিয়ে যাওয়া যায়, ততই নর-কঙ্কালের পরিমাণ কমে আসে; এমন কি স্থল-বিশেষে দুই-একটীর বেশী পাওয়া যায় না।

বেশী দিনের কথা নয়,—মানুষের সবচেয়ে পুরাতন জাতি Neanderltal নামে পরিচিত ছিল। (Neanderltel বোধ হয় একটা যায়গার পুরাতন নাম; কারণ) প্রথমে এইখানে, পরে অন্য যায়গাতেও Mousterian বলে কোন সঞ্চিত পদার্থের ভেতরে এই জাতের মানুষের অনেক-গুলা কঙ্কাল পাওয়া গেল। যে জাতের মানুষ এখন পৃথিবীতে বাস করছে, তার বৈজ্ঞানিক নাম হচ্চে sapieusl। যে জাতের মানুষের কথা এইমাত্র বলা হল, তাদের বৈজ্ঞানিক নাম H. neanderthalensis। এরা বর্ত্তমান জাতের মানুষ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাত; এই দুটো জাতের প্রভেদ খুব স্পষ্ট ভাবে বোঝা গেছে। Neanderthal জাতের মানুষের কঙ্কাল আবিষ্কার হবার কিছু কাল পরে Heidelberg নামক একটা যায়গায় একটা মানুষের চোয়াল পাওয়া যায়; এই চোয়াল যে জাতের মানুষের, সে জাতটা আবার আরো আগেকার মানুষ। ইংলণ্ডের সাসেক্স জেলার পিল্টডাউন নামক একটা যায়গায় একটা মানুষের মাথার খুলি পাওয়া গেছে; সেটার গড়ন পরীক্ষা করেও স্থির হয়েছে, এই মাথার খুলি যে জাতের মানুষের, তারাও Neanderthal জাতের মানুষের আগেকার লোক।

চোয়ালটা যে জাতের মানুষের, তাকে একটা আলাদা জাত বলে ধরে নিয়ে, তাদের নাম দেওয়া হয়েছে H. heidelbergensis; আর খুলির অধিকারী মানুষটা Eoanthropus নাম পেয়ে একটা নূতন জাত বলে গণ্য হয়েছে। কিন্তু যাদের Eoanthropus বলা হচ্চে, তারা একটা স্বতন্ত্র জাত কি না, এ বিষয়ে ডবলিউ, কে, গ্রেগরী নামক একজন পণ্ডিত সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তিনি ১৯১৬ অব্দের American Museum of Natural Historyর Bulletinএ একটা প্রবন্ধ ছাপিয়েছেন। তাতে তিনি প্রাচীন কালের মানুষদের 'ক্রম-পরিণতির ইতিহাস তন্ন-তন্ন করে আলোচনা করে' এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, Piltdownএ প্রাপ্ত মাথার খুলি যে জাতের মানুষের, সেই Eoanthropus dowsoniদের Homoর কোটায় ফেলা

উচিত; এমন কি, Heidenberg জাতের মানুষদের অন্তর্গত বলেও তাদের ধরা যেতে পারে।

আগে যে দশটা অনুশীলনের অবস্থার কথা বলা হয়েছে, তারই একটা ধাপের নাম দেওয়া হয়েছে Mousterian stage। Neanderthal মানুষ এই ষ্টেজেরই লোক। এই ষ্টেজের যে মানুষের অস্থি, কঙ্কাল আর খুলি পাওয়া গেছে, এর আগেকার কোন ধাপের মানুষের কোন রকম ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায় নি। এই ধাপটা যে সময়কার বলে মনে করা হচ্চে, সেই সময়-বরাবরই পৃথিবীতে তৃতীয় glacial pereod বা বরফের যুগ চলছিল। তার আগেকার যুগ, যেটা গণনায় দ্বিতীয় এবং যার নাম inter-glacial epoch, সেই যুগে মানুষের দুটো অবস্থা কেটে গেছে। তাদের একটার নাম Chellean stage, আর অপরটার নাম Achealian stage। ঐ সময় ভূপঞ্জরের যে অংশ গড়ে উঠেছিল, তার ভেতরে মানুষের হাতের তৈরী কিছু-কিছু যন্ত্র-তন্ত্র পাওয়া গেছে; কিন্তু এ সময়কার মানুষের দেহের কোন অংশই এখনও মিলে নাই। আবার হীডেলবার্গ ও পিণ্টডাউনে মানুষের যে ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে, তাদের অধিকারীরা যে সময়ে বর্ত্তমান ছিল, সে সময়ের সীমা এখনও স্থির হয় নি; এই দুটো অবস্থার এক-একটা কোন্ সময়ে আরম্ভ হয়ে কোন্ সময়ে শেষ হয়েছিল, সে সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা নানা মত প্রকাশ করছেন,—সকলে একমত হতে পারছেন না। কেউ-কেউ বলছেন, ভূপঞ্জরের যে স্তরের ভেতর ঐ দেহাবশেষগুলা পাওয়া গেছে, ঐ স্তর যদি প্রথম interglacial epochএ গড়ে উঠে থাকে, তা'হলে সেগুলার অধিকারী মানুষেরা যে Neanderthal-এর Mousterian stageএর মানুষের চেয়ে প্রাচীন, তা' স্পষ্টই প্রমাণ হয়ে যায়। এ থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, যে সময় Pleistocene যুগ আরম্ভ হয়েছিল, সেই সময় থেকেই মানুষেরও সৃষ্টি হয়েছিল। কেউ-কেউ আবার বলেন, Tertiary যুগেও মানুষ বর্ত্তমান ছিল, কিন্তু এখনও তার কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। যাঁরা এই কথা বলেন, তাঁদের যুক্তি এই যে, ঐ Tertiary যুগের মানুষের হাতে গড়া যন্ত্র-তন্ত্র, (eoliths) এমন কি, ঠিক মানুষের মত, অন্ততঃ মানুষের সঙ্গে খুব সাদৃশ্য আছে এমন জীবের কঙ্কাল পর্য্যন্ত পাওয়া গেছে। কিন্তু এ সমস্তই অনুমান মাত্র, এর একটাও খাঁটি নিখুঁত প্রমাণ নয়। Eoliths নামে যে যন্ত্র-তন্ত্রের কথা হচ্চে, সেগুলা যে মানুষের হাতের তৈয়ারী যন্ত্র, এ কথা অনেকে বিশ্বাস করছেন না। আর, ঐ যে মানুষের, কি মানুষের মতন জীবের অস্থি, কঙ্কাল পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলা আর কিছুই নয়,—জাভা দ্বীপে Duboisএর আবিষ্কৃত Pithecanthropus erectus নামক জীবের কঙ্কাল—Upper Tertiary যুগের স্তরের ভিতর পাওয়া গিছল; আর ভারতবর্ষে শিবালিকের পাথরের মধ্যে পাওয়া Sivapitheous indicus নামক জীবের কঙ্কাল; এগুলো মানুষের, কি মানুষের মতন কোন জীবের নয়। W. K. Gregory নামক একজন পণ্ডিত অনুমান করেন যে, প্রথম হাড়গুলা যেমন মানুষের হতে পারে, তেমনি এক জাতীয় বানরেরও (anthropoid apes) হতে পারে। পঞ্জাবে শিবালিক পাহাড়ের নিম্ন দিকের স্তরের ভিতর যে কতকগুলা দাঁত আর নিচু-দিককার চোয়ালের খানিকটা পাওয়া গেছে, ডাক্তার পিলগ্রিম (Dr. Pilgrim) সেই Sivapitheus indicus নামক হাড়গুলাকেই মানুষের বলে ধরে নিয়েছেন। কিন্তু ডবলিউ, কে, গ্রেগরী বলেন, ওগুলা মানুষের হাড় নয়, অন্য কিছু। এই মতভেদের এখনও কোন মীমাংসা হয় নি। সুতরাং Miocene যুগের যে মানুষ ছিল, এটা এখনও সপ্রমাণ হ'ল না। জাভাতে পাওয়া pliocene যুগের Pithecanthropus হাড়গুলা বানর আর মানুষের মাঝখানকার কোন জীবের হাড় হলেও হতে পারে বটে, কিন্তু সেগুলাও আসল খাঁটি মানুষের হাড় নয়। এ থেকে স্থির হচ্চে যে, আপাততঃ Pleistocene যুগেই প্রথম মানুষের সৃষ্টি হয়েছিল বলে ধরে নিতে হবে। এ সম্বন্ধে কারও মনে কোনরূপ সন্দেহ নেই,—এ নিয়ে কোন মতভেদও ঘটছে না। জে, ব্যারেল (J. Barrell) নামক একজন পণ্ডিত ভূপঞ্জরের ভিতর থেকে পাওয়া প্রমাণগুলো বিশ্লেষণ করে স্থির করেছেন, Pleistocene যুগের গোড়া থেকে এ পর্য্যন্ত ১০ লক্ষ কি ১৫ লক্ষ বছর কেটে গেছে। তা' হলে আমরা মনে করতে পারি, Neanderthal মানুষের বয়স এখন ৫ লক্ষ কি ৭৫০০০০ বছর হবে।

এ কথাটা সকলেই মেনে নিয়েছেন যে, বর্ত্তমান যুগের মানুষ সরাসরি Neanderthal জাতের মানুষের বংশধর

নয়; তবে এরা Neanderthal জাতের সমসাময়িক অন্য কোন জাতি থেকে উৎপন্ন হয়েছে। W. K. Gregory বিবেচনা করেন যে, Neanderthal জাত যে বংশে উৎপন্ন হয়েছে, বর্ত্তমান যুগের (H. Sapiens) সেই Heidelburg জাত থেকে উৎপন্ন। কিন্তু এই H. heidelbergensis জাতের সম্বন্ধে এত অল্পই জানা গিয়াছে যে, তা থেকে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করবার যো নেই। তার পর যদি আরও এগিয়ে যাওয়া যায়,—জাভাদ্বীপে পাওয়া Pithecanthropus হাড়টাকে মানুষের মনে করে, Pliocene যুগে তারা বর্ত্তমান ছিল বলে ধরে নেওয়া যায়, তা'হলে তারাও মূল মানব জাতির একটা পাশের শাখা হতে পারে মাত্র,—তারাও মূল মানব-পরিবার নয়। এখন সকলে মনে করেছেন যে, anthropoid apes আর মানুষের পূর্ব্বপুরুষ একই; তবে, মানুষ শাখাটা (Hominidae) বানর ও মানুষের সাধারণ পূর্ব্বপুরুষ simian থেকে Tertiary যুগে অর্থাৎ Miocene যুগের মাঝা-মাঝি কিম্বা বৎসরের গণনায় এখন থেকে ১৩০০০০০০ কি ১৬০০০০০০ বৎসর পূর্ব্বে, শাখা রূপে পৃথক হয়ে পড়েছে। মোট কথা, মানুষের বয়সের এখন থেকে ৭৫০০০০ বছরের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে। তবে, কেউ-কেউ যা' বলেছেন, Piltdownএর খুলিটা যে স্তরে পাওয়া গেছে, সেটা যদি সত্য-সত্যই Pleistocene যুগে গড়া হয়ে থাকে, তা'হলে মানুষের বয়স আরও ৫০০০০০ বছর বেড়ে যেতে পারে। কিন্তু তা' হলেও, আদি মানুষের,—আমাদের আদি পূর্ব্বপুরুষের বয়স ঠিক করতে এখনও অনেকটা বাকী রয়ে গেল।

বর্ষ-আহ্বান

[কথা ও সুর—শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী]

ভৈঁরো—সুরফাঁকতাল

নমস্তে সতে তে সনাতন নূতন,
অরূপ কাল-রূপ হে, অণীয়ান মহীয়ান্।
হেরি ভিন্ন মূর্ত্তি তব পল' পল' ক্ষণ' ক্ষণ'
কভু প্রেম-জ্যোতি কভু রুদ্র তিমির ঘন;
এস ধরণী পর ধরণীধর আজি হে
কৃপা-বারি করি দান;—
মিলিত প্রাণে শরণ গানে করি আহ্বান।
বিতর মঙ্গল হে বিতর কল্যাণ।
আজি হে মহাকাল, নিখিল বিশ্বভূপ;
দুঃখদাহনে পাবন, ধর শান্তিরূপ;
শোক শাপ নাশি, মরণ-মাঝে আন প্রাণ;
বিতর মঙ্গল হে, বিতর কল্যাণ।

১ ০ ২ ৩ ০ ১ ০ ২ ৩ ০
II সা মা | -া মা | -গা মা | পা দা | পা মা I মা গা | -া ঋা | সা -া | সা -া | সা সা I
ন ম ০ স্তে ০ স তে ০ তে ০ স না ০ ত ন ০ নূ ০ ত ন

১ ০ ২ ৩ ০ ১ ০ ২ ৩ ০
সঋা ঋা | ঋা সা | -া সা | না সা | ঋা -সা I মা মা | -া গা | -া গা I ঋা ঋা | সা -া II
অ রূ প কা ০ ল রূ প হে ০ অ নী ০ য়া ০ ন ম হী য়া ন্ ০

০ ১ ০ ২ ৩ ০ ১ ০ ২ ৩ ০
II দা দা | মা -দা | দা না | -া র্সা | র্সা র্সা | র্ঋা র্ঋা | র্ঋা র্ঋা | র্সা না | -া র্সা | র্সা -া I
হে রি ভি ০ ন্ন মূ ০ র্ত্তি ত ব প ল প ল ক্ষ ণ ০ ক্ষ ণ ০

১ ০ ২ ৩ ০ ১ ০ ২ ৩ ০
র্সা র্ঋা | -র্গা র্মর্গা | -া র্ঋা | র্সা -া | র্সা -া I না র্সা | | র্ঋা র্সা | -না না | দা পমা II
ক ভু ০ প্রে ০ ম জ্যো ০ তি ০ ক ভু রু ০ দ্র তি মি র ঘ ন০

১ ০ ২ ৩ ০ ১ ০ ২ ৩ ০
II সা সা | সা ঋা | মা -া | -া -া | মা মা I দা দা | দা -া | পা পা | মা পা | মা -গা I
এ স ধ র ণী ০ ০ ০ প র ধ র ণী ০ ধ র আ জি হে ০

১ ০ ২ ৩ ১ ০ ২ ৩ ০
মা দা | -া দা | পা দা | পা মা | গঋা সা I দা দা | মা দা | না র্সা | র্ঋা র্ঋা | র্ঋা -া
কৃ পা ০ বা ০ রি ক রি দা ন্ ০ মি লি ত প্রা ০ ণে শ র ণ ০

১ ০ ২ ৩ ০ ১ ০ ২ ৩ ০
র্সা -া | -া র্সা | র্ঋা র্সা | না -া | র্সা -া I র্সা র্ঋা | র্গা র্মর্গা | র্ঋা -া | র্সা র্সা | নর্সা -া
গা ০ ০ নে ক রি আ ০ হ্বা ন্ ০ বি ত র ০ ম ০ ঙ্গ ল হে ০

১ ০ ২ ৩ ০
না র্সা | নর্সা র্ঋা | র্সা -া | না দা | পা মা II
বি ত র ০ ক ০ ল্যা ণ্ ০ ০ ০

১ ০ ২ ৩ ০ ১ ০ ২ ৩ ০
II সা ঋা | মা -া | মা মা | -া মা | -া মা I দা দা | দা পা | দা পা | মা পা | মা গা I
আ জি হে ০ ম হা ০ কা ০ ল নি খি ল বি ০ শ্ব ভূ ০ প ০

১ ০ ২ ৩ ০ ১ ০ ২ ৩ ০
মা দা | দা -া | দা দা I পা দা | পা পা I মা গা | -া ঋা | সা মা | গঋা -া | সা -া I
দুঃ খ দা ০ হ নে পা ০ ব ন ধ র ০ শা ০ স্তি রূ ২ পী ০

১ ০ ২ ৩ ০ ১ ০ ২ ৩ ০
দা -া I মা দা | -া দা | না -া | র্সা -া I র্ঋা র্ঋা | র্ঋা র্সা | -া র্সা | না না | র্সা -া I
শো ০ ক শা ০ প না ০ শি ০ ম র ণ মা ০ ঝে আ ন প্রা ণ্ ০

১ ০ ২ ৩ ০ ১ ০ ২ ৩ ০
র্সা র্ঋা | র্গা র্মর্গা | র্গা র্ঋা I র্ঋা র্ঋা | র্সা -া I না র্সা | র্ঋা -া | র্সা না | দা পা | মা -া II
বি ত ০ র ০ ম ০ ঙ্গ ল হে ০ বি ত র ০ ক ০ ল্যা ণ্ ০ ০ ০

খেয়া

[শ্রীনিশিকান্ত সেন]

আর না-হলেও তিরিশ বছর আমি এই তুলসীঘাটায় খেয়া বাই। কেবল এপার আর ওপার। এপারের এই অশথ্‌গাছ, আর ওপারের ঐ বাঁশের ঝাড়—নায়ের গলুই সিধে দেখচ বাবু, এইটুকু আমার পিরথিমী। আমার নায়ে যারা ওঠে, তারা মোটে আধ-ঘড়ীর চড়নদার,—ওঠে শুধু এই গাঙ পেরিয়ে যাবার জন্যে। যদি সাঁকো থাকত, নিদেন এখানকার জলটা এমন অথাই, আর গাঙের বুকটা এমন চ্যাটাল না-হত, আমি গাঙের জল ছুঁয়ে দিলেসা করে বল্‌তে পারি বাবু, এই ছিদাম পাট্‌নীর নায়ে কোনো গোসাঞরই পায়ের ধুলো পড়্‌ত না।

গল্প হয়;—যারা পারে যাবার জন্যে নায়ে ওঠে, তারা বারো গাঁয়ের তেরো গল্প সঙ্গে নিয়ে আসে;—সে যে কত রকমের, বলে শেষ কর্‌তে পারিনে। কিন্তু ডাঙ্গায় উঠতে না উঠতেই খতম্‌—আমার কথা ফুরলো, নটেগাছটি মুড়লো। আমার না' ভেড়ে ঘাটে, আর তাদের গল্প ডোবে মধ্যিগাঙ্গে। চড়নদাররা সবাই ঝুপ্‌ঝাপ্‌ নেমে পড়ে।

আপনি বেজার হবে না তো বাবু? এই গরিব খেয়ার মাঝীর দুঃখু বোঝে, কি কাণ দিয়ে তার দুটো দুঃখের কথা শোনে, এমন বান্দা কেউ নেই। আজকের এ ক্ষেপে খালি একলা তুমি; যদি বেজার না ধরে, খানিকটা বক্‌-বক্‌ করে বুকের বোঝা হাল্কি কর্‌তে চাই। বেশি দেরি হবে না বাবু, খেয়া ওপারে লাগ্‌বার আগেই আমার কথা আমি শেষ করে ফ্যাল্‌ব।

আচ্ছা বাবু, আমার নাও-খানা যেন না-ই, কিন্তু আমার গেরস্তালীটা তো আর পার-ঘাটার নাও নয়। সেখানে এসে যে উঠ্‌ল, তার কেন অমন তাড়াতাড়ি চলে যাবার গা হল? তার যে চলে যাবায় অত গরজ, সে কিন্তু তার ভাব দেখে কোনো মতেই বুঝে উঠ্‌বার জো ছিল না। আমি তার বেশ দিব্যি নিশ্চিন্তি ভাবই দেখেছিলাম, বাবু। থেকে-থেকে চোরা-হাসি হাস্‌ত, মুখের দিকে চাইত, আর দুহাতে গেরস্তালী গোছাত। দেখে মনে হয়েছিল, এতো বেশ খাসা—বেশ মজার মানুষ যা-হোক।

এই ছিদাম পাটনীর, সঙ্গে ছিদাম পাটনীর নায়ের কি ভাব, সে আপনি জান না বাবু! কেমন করে জান্‌বে? —আপনি হলে বিদেশী লোক; কিন্তু এখানকার যারা বাসেন্দা, তাদের তা অজানা নেই। খালি একটা কথা আপনাকে বলি,—পারঘাটায় এসে, কাকেও কখনো হা-পিত্তেশে বসে থাক্‌তে হয়েছে, এমন কথা কারুর বল্‌বার জো ছিল না। যখনি যে এসেছে, দেখেছে, বান্দা বৈঠা-হাতে নায়ে হাজির।—"বলি ও ছিদাম, তোর কি নাওয়া-খাওয়াও নেই!"

"না বাবু,"—হেসে বল্‌তাম, "পাকা হরতুকী খেয়েছি।"

কিন্তু বিয়ের পর, শুনে তুমি আশ্চয্যি হবেন বাবু, এক নাগাড়ে একটি বছর, পাঠশালা-পালানো পড়ুয়ার মতো ধর-কাট করে ধরে না আনলে, আমাকে কেউ নায়ে এনে হাজির কর্‌তে পারে নি। পারে যাবার লোকেরা যখন ব্যস্ত হয়ে উঠানে এসে, হাঁকাহাঁকি করে গলা ভাঙ্গছে, ছিদাম হয় তো তখন তার রান্নাঘরের কোণ্‌টিতে বসে, ঢেউএর তাল আর নৌকোর নাচ ভুলে, পাটনী-বৌয়ের বাঁট্‌না-বাঁটা আর তার দেহের দোলন দেখছে, নয় তো ডেলের হাঁড়িতে কাঠী দেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে, তার হাত থেকে কাঠীটা কেড়ে নেবার জন্যে মিছে চেষ্টা করছে। তার কি তখন বাইরের লোকেদের চীৎকার শোনবার ফুরসৎ ছিল? আপনি হয় তো শুনে ভাবছ বাবু, যে, ছিদামটা কি পাগল! তা আপনার দোষ দেই নে, মানুষে অম্নি-ধারাই ভাবে। কিন্তু আমার তো মনে হয়, জীবনে নিদেন একটিবারও যে অমন পাগল না হল, তার এ দুনিয়ার হাটে আসা—কেবল মিছে আসা।

দুঃখের কথা বল্‌ব কি বাবু!—আপনাদের সেই পাটনী-বৌয়ের ছলায় ভুলে ছিদাম যখন তার বড় সাধের পারঘাটা,

, আর বৈঠাখানাকে বিষের নজরে দেখছে, ঠিক সেই
একদিন বলা নেই কওয়া নেই, ঘুপ করে সে আমার
র থেকে নেমে পড়্ল। অতিসার হয়েছিল, বাবু!
পারে যাবার লোকেরা, তবু মনে হয়, নায়ে উঠে
ক্ষণ বসে, গল্পও যা-হয় খানিকক্ষণ ধ'রে করে; কিন্তু
করলে তাই বলুন তো? বিয়ের পরের একটি বছর
াধঘড়ীর মতও লম্বা? আমার তো মনে হয়, তার
ত ঢের ছোট; চোখ বুঝ্লাম আর স্বপন দেখলাম,
কতক্ষণ? কিন্তু আশ্চয্যি, সে আধঘড়ীর স্বপন
আমি এ জীবনে ভুল্তে পারলাম না— যেন চোখের
বাসা বেঁধে রয়ে গেল।

ায়ের পেছনদিকে চেয়ে দেখো, ঐ যে ঘাটের কিছু
পাতা-নেই একটা মস্ত বড় বাদাম গাছ, তার শুক্নো
ালা নিয়ে হাড়গোড়-বা'র-করা ভূতের মত ঠায় খাড়া
দাঁড়িয়ে,—ওর তখন অমন হাল ছিল না; ওরি
আমি তাকে নিজের হাতে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলে-
ম। তার সেই চিতার আগুনের তাতে বোধ করি,
র এই কল্জেটাও বেশ-একটু ঝল্সে এসেছিল!
নইলে গাঙ তো শুকায় নি বাবু,—জলও দেখ্ছি,
ধারও দেখ্ছি, কিন্তু জলের সে ছিরি, সে নাচ, সে
কোথায় গেল?

আচ্ছা বাবু, তোমরা তো ঢের ঢের নেকাপড়া শিকেছ।
ছি নেকাপড়া শিক্লে ওপরের ঐ আশমান আর
তলের এই পাতালের খবর ঠিক-ঠিক বল্তে পারা
বল্তে পারো, মানুষ মর্লে কি হয়? পারো না!
উ পারে না বল্ছ! কিন্তু কেন পারে না বাবু?
লে আশমানের খবর, আর পাতালের যাত্রা জেনে
?

স চলে গেল; আর আমি রইলাম। রইলাম,—
হয়ে এই গাঙের খেয়া পারাপার কর্তে। কিন্তু
, মানুষ কি পাগল! যে গাঙের জল নেই, আছে
তাজ্না খোলার বালি, মানুষ সেই গাঙের জলও
া করে খেতে চায়, তারি জলে সাঁতার কেটে নাইতে
চোখের ওপর মর্ল, নিজের হাতে পুড়িয়ে ধোঁয়া
আশমানে উড়িয়ে দিলাম। তবু কি তার আশা
তে পেরেছি? খেয়া বেয়েছি, আর বাদাম-তলার
দিকে চেয়েছি। এ যদি পাগলামী না হয়, আর পাগলামী কাকে বলে, আপনি বল্তে পারো বাবু? কিন্তু এমন পাগল কি আর কেউ নেই? আমার তো মনে হয়, ঢের-ঢের আছে; তবে কেউ কবুল করে, কেউ করে না।

যখন ঘাটে পারাপারের লোক না-থাক্ত, মরা বাদাম-গাছের ওপরকার ক্ষিধেয়-কাতর চিলের ডাক, আর অনেক দিনের ঘর-ছাড়া নায়ের মাঝীর ভেটেল সুরের গান কাণে এসে ক্ষ্যাপা মনটাকে আমার আরো ক্ষেপিয়ে তুল্ত। তখন বৈঠা-হাতে নায়ের ওপর চোখ বুজে বসে-বসে ভাব্তাম—কি যে ভাব্তাম মাথা-মুণ্ডু, তার ঠিক নেই। মনে হত, যেন এক সন্ন্যাসী-ঠকুির,— তার মাথার জটা ছেড়ে দিলে, ভুঁয়ের ওপর ভিড় পাকিয়ে পড়ে, গায়ের জোনাক কালো ফানুসের ভেতরের আলোর মত জ্বল্ জ্বল্ করে ফুটে বেরয়,—এই গাঙের ধার দিয়ে কোথায় কোন্ পাহাড়ের দেশে চলে যেতে-যেতে, হঠাৎ ঐ চিতার কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। তার পর তার কমণ্ডলুর জল খানিকটা হাতে ঢেলে নিয়ে, বিড়্ বিড়্ করে মন্তর পড়ে চিতার ওপর ছড়িয়ে দিতেই, যেন সে মাটি থেকে চাঁপা-ফুলের মত ফুটে উঠল।

আরো কি মনে হত জানো বাবু?—জীইয়ে উঠে ঐ যে বাদামগাছ, হয় ত ওরি আড়ালে, নয় ত ওর পাশে যে আশ্যাওড়া ঝোপ, ওরি মধ্যে সে চুপটি করে দাঁড়িয়ে। যাতে আমি উতলা হয়ে তাকে খুঁজে বা'র করি, তাইজন্যে সে যেন, একবার উঁকি মেরে, অমনি আবার গা-ঢাকা দেবে। মন আমার উতলা হয়ে উঠ্ত; নায়ের ওপর খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে, ঐ গাছ, আর ঐ ঝোপের দিকে চাইতাম।—কোথায়, কোথায় সে? হুহু করে বাতাস বইত, ঝোপের গাছগুলো মাথা নেড়ে-নেড়ে বল্ত, নেই—নেই,—সে নেই। নেড়া বাদামগাছের ডালার আঙুল, মাথার ওপরকার ফাঁকা আকাশ দেখিয়ে দিয়ে বল্ত,—যদি থাকে ত ঐখেনে।

বাবু ও কি! তুমি যে চোখ মুচ্ছ! কথা শুনে বুঝি তোমার চোখে জল এসেছে? তোমার প্রাণটা খুব নরম—বড্ড দরদের শরীর তোমার,—না বাবু? কিন্তু দেখো এ দুঃখু—দুঃখুর সেরা দুঃখু হলেও, ছিদাম, বুকের পুরানো দরদের মতো, চোখ বুজে বরদাস্ত করতে পার্ত। না

করে চারা কি বাবু? মানুষের বড় সাধের দামী জিনিস হারালে, কি নষ্ট হলে সে কি করে? কাঁদে-কাটে, তার পর চুপ করে তার অভাবের দুঃখু বয়। কিন্তু যদি দেখে, তার সেই সাধের জিনিস আর কেউ পেয়েছে, মনের সুখে ব্যবহার করছে, তা হলে তার কি হয়—তার কলজেটার মধ্যি কেমন করে, একটু সমঝে দেখো ত বাবু!

বড় বেশি দিনের কথা নয়,—সে দিনও আজকের মতোই ঘাটে পারে যাবার লোক ছিল না। এতক্ষণ আমরা যতখানি পেরিয়ে এলাম—গাঙের প্রায় আট-আনী হবে না বাবু? আমার পষ্ট মনে পড়ে, আশমানের জ্যোচ্ছনা, সামনের পাড়ের গাছপালাগুলো, আর গাঙের এই বাকি আধখানায় রূপোলী ধরিয়ে, আমাদের পেছনের দিকে, আস্তে আস্তে এগোচ্ছে। আমি নায়ের উপর চুপটি করে বসে, জ্যোচ্ছনার দিকে চেয়ে-চেয়ে, গেল রাত্তিরের একটা ভাঙ্গা-চোরা স্বপন জোড়াতাড়া দিয়ে দেখবার চেষ্টা করছি। নাও-খানা ঘাটেই বাঁধা, আচমকা নড়ে উঠতেই, মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখি, কে একজন নায়ে উঠছে!—"কে গো, কে?"—হেঁকে বললাম। জবাব নেই। বুঝলাম, টেঁকে কড়ি নেই, অমনি পার হবার চেষ্টা, মুখে তাই বোল্ ফুটছে না। কিন্তু—উহুঁ, সেটি হতে দিচ্ছিনে কোনো মতেই। দয়া? আমাকে কে দয়া করে বল? মনিব—যার জলায় আমি খেয়া বাই, সে দয়া করে, কোনো কিস্তি আমার খাজনা রেহাই করেছে বলতে পারো? তার পর তোমরা যাকে দয়াল বল, কাঙালের ঠাকুর বল, সেই বড় গাঙের বড় পাটনী—পেটে যার খিদে নেই, যার উপরে মনিব নেই, সে আমায় বিনি পয়সায় তার গাঙটা পার করে দেবে কি?—কথনো না। ঐ যে গানে আছে,—

"ওগো, কড়ি নেই যার
তুমি তারে কর হে পার"

ও মিছে কথা। আমি চীচ্কার করে বললাম, "নামো, আমার না' থেকে, নামো বলছি।" ছিদাম ঢের-ঢের লোককে দয়া করে ঠকেছে; যার নাম দয়া, তার নাম ঠকা, সে ঠকা ছিদাম আর ঠক্‌ছে না। কিন্তু লোকটা নড়েও না, কথাও কয় না! সুরটা আরো উঁচু, আরো কড়া করে বললাম, "শীগ্‌গির—শীগ্‌গির করে নামো বলছি, ভালয়-ভালয় যদি না নামো, ভাল হবে না কিন্তু।" গাছকে বলি না পাথরকে বলি!—রামও বলে না, রোহিমও বলে না, একেবারে চুপ! বড্ড রাগ হল।—"রোসো, তা হলে তোমাকে বেশ ভাল করেই পার করাচ্ছি"—বলে এক লাফে তার ঘাড়ের উপর পড়ব; এমন সময় সে যেন কি বলে উঠল। আমি চমকে উঠলাম—স্বরটা যেন চেনা-চেনা। কিন্তু চিনি-চিনি করেও কিছুতেই চিনে উঠতে পারিলাম না। কাছাকাছি এগিয়ে গেলাম। জ্যোছনা যেটুকু ছিল, তাতে মানুষ চেনা না গেলেও আকার চেনা যায়। ঠাউরে দেখে বুঝলাম, পুরুষ নয়—এ মেয়ে-মানুষ!

"হ্যাঁগা কে! কে তুমি?"

"আমি।"

"আমি!" নাম বলে না, ধামও বলে না, বলে কি না—"আমি!" খুব মজার লোক ত যা-হোক! দেশলাইয়ের কাঠিগুলোও আবার তেমনি!—ঠক্-ঠক্, ঠকাঠক্ কেবল ঠকেই যাচ্ছি। কোনোটা বা ফস্, কোনোটা বা ফুস্, কোনোটা বা মচ্!—সিকি-ঘড়ীটাক্ ঠোকাঠুকির পর, যখন বাক্স প্রায় কাবার, তখন কি ভাগ্যিস, একটা কাঠী ফস্ করে জ্বলে উঠল। সাবধানে তার পর লম্পটা জ্বেলে নিয়ে, তার মুখের গোড়ায় ধরে দেখি, বললে পেত্তয় যাবে না বাবু,—সেই, আর কেউ নয়—সেই! যাকে ঐ বাদাম-তলায় পুড়িয়ে ছাই করে ফেলেছিলাম—সেই!

আর কেউ হলে নিশ্চয়ই ভয় পেয়ে আঁৎকে উঠত; মনে করত, সে ভূত হয়ে ঘাড় মটকাতে এসেছে! কিন্তু আমি,—আমি যে তার দেখা পাবার জন্যে পাগল! আমার কি ডর-ভয় কিছু ছিল? কতদিন নিশুতি রেতে একলা আমি নাও নিয়ে ঐ বাদামতলায় গেছি, যদি দেখা পাই—যদি ভূত হয়েও সে একবার আমায় দেখা দেয়। কিন্তু দেখা ত পাই নি! এতকাল পরে যদি সে আমায় যেচে দেখা দিতে এল,—যে বেশেই আসুক, আমি ভয় পাব? খুসী হয়ে, আশ্চয্যি হয়ে, আমি বলে উঠলাম, "তুমি!—এ্যাঁ তুমি!"

প্রথমটা সে যেন কেমন জড়সড় হয়ে পড়ছিল; তার পর আমাকে একটুখানি ঠাহর করে দেখে, বললে, "আমায় তুমি চেন?"

সেই মুখ, সেই চোখ, সেই গলা!—ও কি আর ভুল হবার জো আছে? বল্‌লাম, "তোমায় আর চিনিনে! তুমি যে আমার—।" সে তার ডাগর-ডাগর চোখ দুটো যদ্দূর সাধ্যি টান করে মেলে, আমার মুখখানি দেখ্‌তে-দেখ্‌তে বল্‌লে, "মিছে কথা, তুমি নিশ্চয় ঠাট্টা করছ আমাকে। তুমি ত পাটনী, এখানকার খেয়া বাও, আর আমরা হলাম গয়লা।"

গয়লা! না ভেবে-চিন্তে তক্ষুণই আমি বলে উঠ্‌লাম, "কখনো না, তুমি পাটনী।"

হেসে ফেল্‌লে,—সেই হাসি, যে হাসি দেখে ছিদাম পাটনী একদিন তার পাটনীগিরি ভুলেছিল। কিন্তু একটু পরেই মুখখানা আঁধার করে বল্‌লে, "ঠাট্টার সময় নয়, আমার সোয়ামীর বড্ড অসুখ। তোমার দুটি পায়ে পড়ি আমায় পার করে দাও।"

সোয়ামীর অসুখ! বলে কি ও! আমার বুকের ভেতরে যেন একটা মস্তবড় লগীর ঘা পড়্‌ল। মনের ধাঁধাঁও অমনি আমার চট্ করে কেটে গেল। আমি বুঝ্‌লাম, এ ভূতও নয়, সন্ন্যাসী-ঠাকুরের বরে হাড়ে-মাসে জীইয়ে উঠেও আমায় দেখা দিতে আসে নি,—এ সত্যি-সত্যিই গয়লানী, কোন্ এক গয়লার ঘরে ওর বে হয়েছে। এবারে গয়লানী, কিন্তু আর জন্মে পাটনী-বৌ হয়ে এ-ই যে আমার ঘরে এসেছিল, তার আর ভুল নেই।

বাবু, আপনি হাস্‌ছ!—আমার কথা বোধ হয় তোমার পেত্যয় হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না বাবু? সেই মুখ, সেই চোখ—সেই সব, তবু সে নয়? আচ্ছা চেহারার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু কথা? কথা, গলার সুরকে তো আর বাইরের জিনিস বলে আপনি উড়িয়ে দিতে পারবে না,—সে তো ভেতরেরই। তবে?

লম্প নিবে গেল,—বাতাস ছিল না; পিরথিমী আশ্‌মান, পাড়ের গাছপালা, গাঙ্গের জল সবই যেন অবাক হয়ে, দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে, কি ভাবছিল,—কিন্তু আমার হাতের লম্প নিব্‌ল, বোধ করি আমার কল্‌জের ভেতরে যে তুফান উঠে গিয়েছিল, তারই ঝাপটা খেয়ে। আমি তার সামনেই ভূতের মতো থম্‌কে দাঁড়িয়ে ছিলুম; কিন্তু আমার অবস্থা তার বুঝ্‌বার উপায় ছিল না। সে ব্যস্ত হয়ে উঠে আমায় বল্‌লে, "দোহাই তোমার মাঝী, আমায় পার করে দাও, গোসাঞ তোমার ভাল করবে।"

মনে-মনে বল্‌লাম, ভাল যা কর্‌বার, তা গোসাঞ ভাল মতেই করেছেন, আর ভালয় আমার কাজ নেই। সে যাই হোক, কিন্তু তোমাকে আমি পার করে দেব গয়লানী। বৈঠা ধর্‌লাম। পাড়ের গাছপালা ছাড়িয়ে চাঁদ উঠেছে। আঁধারের খোঁজখাঁজ আর কোথাও কিছু নেই। মনটাকে বলে-কয়ে অনেকটা ঠাণ্ডা করে, তার পর আবার তার সঙ্গে আলাপ সুরু কর্‌লাম, "আচ্ছা, ওগো গয়লানি, তোমার ঘর কোথায়, বাপের নাম কি? তোমায় দেখ্‌ছি, খুব কাঁচা বয়েস, কাকেও সঙ্গে দেখ্‌ছি না যে!"

গয়লানী দুহাতে তার আঁচলের খোঁট পাকাতে-পাকাতে বল্‌লে, "সঙ্গে আর কে থাক্‌বে! আমি যে পালিয়ে যাচ্ছি!"

"পালিয়ে! কেন গা, কিসের জন্যে?"

"কিসের জন্যে আর? বলেছি ত আমার সোয়ামীর অসুখ। বাপের বাড়ী আস্‌বার পর, সোয়ামীর সঙ্গে আমার বাপ-ভাইদের ঝগড়া হয়। তার পরেই তার অসুখ,—অসুখ শুনেছি, খুবই বাড়াবাড়ি। আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে সেখান থেকে লোক এসেছিল, এরা পাঠায় নি। আমাকে ছেড়ে দেবে না, এই এদের ইচ্ছে।"

পালিয়ে যাবার কারণ বুঝ্‌লাম, কিন্তু সোয়ামীর সঙ্গে এর বাপ-ভাইদের বিবাদের কারণ বুঝ্‌লাম না। তা বুঝবার আমার দরকারও ছিল না। কিন্তু এর পরিচয়টা? যাকে এত ভলবাস্‌তাম, এত ভালবাসি; যার ধোঁয়াপোচা চিতার দিকেও নিদেন একবার না চাইলে আমার দিন কাটে না, সে আমায় দেখা দিয়ে অমনি চলে যাবে?—তার পরিচয়টা নেব না? ভালবাসা না পাই, ভালবাসা দেবার, এমন কি চোখের দেখা দেখে আস্‌বার পথটুকুও কি খোলসা রাখ্‌ব না? জিজ্ঞেস কর্‌লাম, "হাঁগা, তোমার ঘর কোথা?"

মুখ নীচু করে কি ভাব্‌তে লাগ্‌ল, আমার কথার জবাব দিল না। হয় ত আর কি ভাবছে, আমার কথা শুন্‌তেই পায় নি, এই ভেবে কথাটা আবার আমি পাল্‌টিয়ে জিজ্ঞেস কর্‌লাম।

খুব নরম সুরে, মুখটি না তুলেই সে বল্‌লে, "সে কথা কেন ?—সে কথা শুনে কি হবে তোমার ?"

গয়লানী যদি তার হাতের নো গাছটি দিয়ে খুব জোরে আমার কপালে একটা ঘা মারত, বোধ করি, কিছুই করে উঠ্‌তে পারত না। কিন্তু তার নরম কথার চোট খেয়ে চৌকি-বেঁধা মাছের মতো আমার পরাণটা যেন খালি ছটফট্ করতে লাগ্‌ল।

গয়লানীর নরম কথার ভাব কি জানো বাবু ? ভাব এই যে, সে গেরস্তর বৌ, পালিয়ে পায়ে হেঁটে সোয়ামীর কাছে চলেছে। পরিচয় দিলে, ওর, ওর বাপের, আর ওর সোয়ামীর সকলেরই মাথা আমার কাছে হেঁট হয়। তাই আমাকে বলা হল, "সে কথা শুনে কি হবে তোমার ?" এতক্ষণ যে জিজ্ঞেস করে-করেও পরিচয় পাই নি, তাতেই ওর মনের গতি আমার বুঝে নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমি তখন যেন কেমন বোকা বনে গিয়েছিলাম।

চুপ করে বৈঠা বাইতে লাগ্‌লাম। কিছুক্ষণ পরে বুকের কাৎরানীটা একটু কম হয়ে এলে, আমার মনে হল, কিন্তু ওর দোষ কি ?—আমিই না হয় ওকে পাটনী-বৌ বলে চিন্‌তে পেরেছি, ও ত আর আমাকে আপন বলে, সোয়ামী বলে চিন্‌তে পারে নি। কেন ও আমার কাছে ঘরের পরিচয় দিতে বস্‌বে ? আলাপ কর্‌বার ইচ্ছে আবার একটু-একটু করে গাঙের জোয়ারের মত আমার বুক ছাপিয়ে ফুলে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। চলে ত যাবেই—পরিচয়টা না দিয়েই হয় ত চলে যাবে; কতক্ষণই বা, দুটো কথা কয়ে, দুটো কথা শুনে মনটাকে আমার একটু ঠাণ্ডা করে নেব না ? কথা কইতে সুরু কর্‌লাম, "তোমার সোয়ামীর অসুখের কথা যে সত্যি, তা তোমায় কে বল্‌লে ? তোমাকে বাপের বাড়ী থেকে নিয়ে যাবার জন্যে এ তো মিথ্যে ছলও হতে পারে।"

ভেবেছিলাম, আমার কথায় সে কতকটা সোয়াস্তি পাবে—মনটা তার আমার দিকে একটু নুইয়ে আস্‌বে। কিন্তু সে আমার ভুল। গয়লানী যেন দুহাতে আমার কথাটিকে ঠেলে ফেলে দিয়ে বল্‌লে, "না—না, মিথ্যে ছল হকণো না,—মিথ্যে ছল হলে কখনো তার জন্যে আমার মন এমন উতলা হয়ে ওঠে ? তার বড্ড অসুখ ;—কে জানে সে কেমন আছে।" বলেই থেমে গেল। গলা ভারি হয়ে উঠেছিল, বুঝলাম চোখে জল এসেছে।

দেখ্‌লে বাবু, টান! তার সোয়ামীর অসুখ হয় ত মিথ্যাই, কিন্তু সে তা মিথ্যে বলে মান্‌তে পারছে কি ?—তারি জন্যে বাউরী হয়ে ছুটে চলেছে! এই কাঁচা বয়সে ঘর থেকে একলা বেরোবার বালাই কি কম! কিন্তু সে কথা যেন তার মনেই নেই। সোয়ামীর জন্যে ডর-ভয়ের মাথা খেয়ে বাউরী হয়ে ছুটে চলা—কথাটা অবশ্য ভাল, খুবই ভাল সন্দ নেই; কিন্তু আমার পক্ষে কেমন ভাল, সে কথাটা আপনি একটু ভাব্‌ছ কি বাবু ? এই যে টান, এই যে চোখের জল নিয়ে সে আর একজনের জন্যে ছুটে চলেছে,—সে কে ? দুদিন আগে পাটনী-বৌ হয়ে যখন সে আমার ঘরে এসেছিল, তখন আমিই কি ছিলাম না তার সব ? সামান্য একটু মাথা ধর্‌লে, গাটা একটু গরম হলে আমারি জন্যে সে অস্থি-ধারা ভেবে-ভেবে সারা হত!

যাক্ সে কথা। তার পর যা বলছিলাম, তাই শোনো। গাঙের একদিকে মুখ করে সে বসেছিল। ফুটফুটে জোচ্ছনা তার সমস্ত গায়। মাথাটার পেছন দিক আঁচল দিয়ে অল্প একটু ঢাকা, মুখের একটা দিক—নরম কোমল ভরাভর্ত্তি গালটি, কাণের পাশ, ভুরুর নীচের চোখের খাঁজ, থুৎনীর গোল খাঁজটি আমি যেন পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি। পা দুটি ছড়িয়ে হাঁটুর উপরে হাঁটুটি দিয়ে, বাঁ হাতে দেহের ভরটি রেখে, একটুখানি কাত হয়ে ঘরের মেজেয় বসে পাটনী-বৌ যেমন করে আমার সঙ্গে গল্প কর্‌ত, একেবারে অবয়ব সেই ভাবটি। এ যে আর কেউ নয়—সেই—আমারই সেই, তাতে আর একটুও ভুল নেই। দেখ্‌তে-দেখ্‌তে আমার যেন কেমন বিব্‌ভুল হয়ে গেল; আমি ব্যাগ্‌গাতা করে জিজ্ঞেস কর্‌লাম, "হ্যাঁ গা, সত্যিই তুমি আমায় চেনো না, সত্যি ?"

সে অবাক্ হয়ে আমার মুখের দিকে মুখ ফিরিয়ে চেয়ে রইল। পাটনী-বৌয়ের সেই সাদা চোখের কালো ভাসা-ভাসা দুটো চোখের তারা আমিও অবাক্ হয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম। মনে হল, যেন সে আমায় চিন্‌ছে, এখনি হয় তো আমারই মতো বলে উঠ্‌বে—হ্যাঁ গা, হ্যাঁ, চিনেছি, ওগো চিনেছি, তোমায় আর চিন্‌ব না!—তুমি যে আমারই। কিন্তু সে আমার মিছে আশা, সে তা বল্‌লে না; বল্‌লে,—"তোমাকে আমি কেমন করে চিন্‌ব ? আমি ত আর

কখনো পায়ে হেঁটে আসিনি, তোমার নায়ে উঠেও পার হইনি!"—বাস্!

যে লোক পায়ের সাড়া পেলেই বল্‌তে পার্‌ত, আমি, কে, আমি কি না, সেই লোক আমারই সাম্‌নে বসে, আমারই মুখের দিকে চেয়ে বল্‌ছে—তোমায় চিনিনে, তুমি পাট্‌নী, আর আমি গয়লা। যদি আর কিছু না-বলে এও বল্‌ত যে, তোমাকে যেন চিনি-চিনি বলেই ঠেক্‌ছে, কিন্তু কিছুতেই চিনে উঠ্‌তে পার্‌ছি না, তা হলেও যে কতক ভরসার কথা ছিল। বলে কি-না, কেমন করে চিন্‌ব! হারে, যদি চিন্‌তেই না পার্‌বি, তা হ'লে এক দিন তুই কেন আমাকে চোখের আড় হতে দিতিস নে, কেন তুই আমাকে অত ভালবেসে মাথায় করে রেখেছিলি? তার পর, কখন চোখ বুজে ঘুমোলি, ঘুম থেকে জেগে উঠেই বল্‌ছিস, তোমায় আমি চিনিনে—তুমি কোথাকার কে, এক নায়ের মাঝী!

দেখ, আমি পাগলের মতো কি আবোল-তাবোল বক্‌ছি! তার কি দোষ, যে তাকে আমি এত দুষি? সে ত আর ইচ্ছে করে আমাকে ভোলেনি, আর ইচ্ছে করেও আর একজনের ঘরে যায় নি। কোন্ এক খাম-খেয়ালী বাজীকর তাকে নিয়ে এই জবরদস্তি ভোজবাজীর খেলা খেলছে। দোষ যদি কারো থাকে ত সে তারই, না বাবু? আচ্ছা, যে পাষাণে-গড়া বাজীকর আড়ালে বসে-বসে তার এই সখের খেলাটা খেলছে, তাকে একবার চোখে দেখা যায় না? দেখ্‌লে কি কর্‌তাম? কি আর কর্‌তাম, আমার হাতের এই বৈঠাটা দিয়ে তার মাথায় খুব ক'সে মনের মত একটা ঘা মেরে দেখ্‌তাম মাথাটা তার কত শক্ত।

গয়লানীর কথার আমি কি জবাব দেব? চুপ করে আমার যা কাজ তাই আমি কর্‌তে লাগ্‌লাম—বৈঠা বেয়ে চল্‌লাম। কিছুক্ষণ পরে সে আবার বল্‌লে, "তুমি যে এত ব্যাগ্‌গাতা করে জিজ্ঞেস কর্‌ছ, আমায় চেন কি-না, চেন কি-না—কেন বল দেখি?"

কেন! আবার বলল, কেন!. বলি, এতদিন আমি সংসার পেতে ঘর করিনি কেন? বাদাম-তলার ঐ শ্মশানের দিকে চেয়ে-চেয়ে আমার সমস্ত সংসারকে আমি শ্মশানঘাট করে তুলেছি কেন? এরও যে জবাব, ওরও সেই জবাব।

কিন্তু এতক্ষণে আমার না-খানা ঘাটে গিয়ে লেগেছিল। আমার জবাব শোন্‌বার জন্য তার আর এতটুকুও তর সইল না, টপ্ করে আমার না থেকে নেমে পড়্‌ল। কিন্তু খালি নামতেই দেখ্‌লাম, তার পর কোন্ পথ ধরে কোন্ দিক দিয়ে যে কোথায় গেল, সে যেন আমি দেখ্‌তেই পেলাম না।

কবি নবীনচন্দ্র*

[মাননীয় বিচারপতি শ্রীস্যার আশুতোষ চৌধুরী কে-টি]

কবি নবীনচন্দ্র বলিয়াছেন যে, আমরা এই অনন্ত অভিনয়-ক্ষেত্রে, অনন্ত অভিনয়ের এক-একজন অনন্ত অভিনেতা। যখন তাঁহার সেই কথা মনে হইত, তখন তাঁহার হৃদয় আত্ম-গরিমা-পূর্ণ হইত। নবীনচন্দ্র তাঁহার কবি-জীবনের মধ্য ও শেষ ভাগে সেই অনন্তের অজানা ভাষা ছন্দের সাহায্যে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। চারিদিকের নিত্য নূতনের মধ্যে চিরস্থায়ী পুরাতন যাহা, অনন্তের যাহা, যাহা অমৃত—তাহাই কবি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সব বড় কবিই আধুনিক হইলেও বহু পুরাতন। ইতিহাসে জীবনের এক-একটী কণামাত্র থাকে। কাব্য জীবনের সবটার মধ্যগত প্রাণ। তাহা বহু প্রাচীন। প্রকৃতির হৃদয় চির-ছন্দোময়। সেই জন্য বেদের ভাষা ছান্দোগ্য। কবি কাণ পাতিয়া যখন সেই ছন্দ শুনিতে পান, তখন তাঁহার ভাব ও ভাষা ছান্দস হয়। রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস ভগবানের আদি মধ্য ও অন্তিম লীলায় চিত্র। কবি যখন দেখিলেন যে,

* কলিকাতা সাহিত্য-পরিষদে কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের মর্ম্মর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সভাপতির অভিভাষণ।

তাঁর সাম্রাজ্য ক্ষুদ্র দ্বারবতী, ক্ষুদ্র বৃন্দাবন নয়, তখন কবি প্রচারক ভাবে আমাদের এই শিক্ষা দিলেন—

তাঁর রাজ্য লীলাস্থল মানব-হৃদয়
তাঁর রাজ্য বিশ্বরাজ্য, তিনি নারায়ণ,
তাঁর রাজ্য ধর্ম্মরাজ্য, করিতে প্লাবিত
নাহি সাধ্য সমুদ্রের। কাল পারাবার
চুম্বিয়া চরণতট হবে প্রবাহিত
লইয়া চরণ-রেণু মস্তকে তাহার।

তিনি আশাপূর্ণ হৃদয়ে গাহিয়াছিলেন :—

উন্নতির পথ ছায়াপথের মতন
প্রীতিময় সুখময় পবিত্রতাময়,
রহিয়াছে প্রসারিত, সেই পথে প্রভো
জাতীয় জীবন-তরী লব ভাসাইয়া।

এবং তিনিই ভবিষ্যৎ-বক্তার মত এই কথা বলিয়া গিয়াছেন—

কিছু দিন পরে হবে কি শান্তি স্থাপিত
ধর্ম্ম-রাজ্য-ছায়া-তলে! আলোকি জগৎ
দর্শনের বিজ্ঞানের নক্ষত্র অমর
শান্তির আকাশে কত উঠিবে ভাসিয়া!
শিল্প বাণিজ্যের কুঞ্জে পিক মধুকর
সাহিত্যের সঙ্গীতের, উঠিবে গাহিয়া।
আর্য্য অনার্যের রক্ত হইয়া মিশ্রিত
কত নব জাতি, কত সাম্রাজ্য মহান্
করিবে সৃজন পার্থ! যুগ যুগান্তর।
ভারতের মরুস্থান হবে রাজস্থান।

কবিই আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন

"এক জাতি মানব সকল
এক বেদ মহা বিশ্ব অনন্ত অসীম ;
একই ব্রাহ্মণ তার মানব হৃদয়
একমাত্র মহাযজ্ঞ স্বধর্ম্ম-সাধন।"

কিন্তু আমাদের হৃদয় কি ভাবে এখন চঞ্চল, কি আশায় আমরা উত্তেজিত, তাহা ঠিক বুঝিতে পারি না। কিন্তু সে সব বিষয় আজ বলিবার উপযুক্ত দিন নহে। আমার একেবারেই মনে হয় না যে, কবিবরের স্মৃতি-সম্মানার্থ সভার উপযুক্ত সভাপতি আমি। তবে বাল্যকালে তাঁহাকে দেখিয়াছি,—তিনি আমাকে ছোট ভাইয়ের মত স্নেহ করিতেন। তিনি আমার পিতাঠাকুরকে বড়ই শ্রদ্ধা করিতেন ; এমন কি তাঁহার আত্ম-জীবনীতে তাঁহার ও অন্ত কোন বন্ধুর বিষয়ে তিনি এই কথাটি লিখিয়াছেন—"ইঁহারা দুজনেই নরদেব। ইঁহাদিগের চরণারবিন্দ-সমীপস্থ হইবার যোগ্য লোকও আর আমি দেখি নাই।" আমার বিষয়ও একস্থানে "আ" ইত্যাদি বলিয়া উল্লেখ আছে। তিনি আমার দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করিয়াছেন। জজিয়তি করিতে হইতেছে জানিলে, বোধ হয় আর সে প্রার্থনা করিতেন না। আমি তাঁহাকে চিনিতাম, তিনি আমাকে স্নেহ করিতেন,—সেই সাহসে আপনাদের আজ্ঞা আজ পালন করিতে উপস্থিত হইয়াছি। তাঁহার জীবনের দুই-এক কথা আমি জানি; তাহা তাঁহার আত্ম-জীবনীতে নাই। আমার মনে পড়ে, যখন তিনি 'অবকাশরঞ্জিনী' লিখিতে আরম্ভ করেন, তখন মধ্যে-মধ্যে আমাকে তাহা পড়াইয়া শুনাইতেন। যশোহরে তখন উমাচরণ দাস মহাশয় হেডমাষ্টার। জগবন্ধু ভদ্র (ছুছুন্দরী-বধ কাব্য লেখক), শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, শিশিরকুমার ঘোষ, দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়দিগকে—আমার মনে পড়ে। সে আসরে অনেকেই স্থান পাইতেন না। কিন্তু তাহাতে কবি নবীনচন্দ্রের স্থান ছিল। তিনি ফ্লুট (flute) বাজাইতেন; ছোট-ছোট কবিতা লিখিতেন, ও পড়িয়া শুনাইতেন। উমাচরণ বাবুও Captain Richardsonএর ছাত্র। আমার পিতা Shakespeare recite করিতেন, এবং নবীন বাবু মধ্যে-মধ্যে Byron আওড়াইতেন। পলাশির যুদ্ধও সেই সময় লেখা আরম্ভ হয়। ………Shakespeare ও Millon-সেবকদিগের নিকট Byron স্থান পাইত না। তখন আমার স্মরণ-শক্তি বড়ই প্রখর ছিল। কবিতা শুনিলে ভুলিতাম না। সেইজন্য আমাকে মধ্যে-মধ্যে ইংরাজি কবিতা আওড়াইবার জন্য তলব হইত। আমি একদিন Scottএর Lady of the Lake হইতে কিছু আওড়াই। তাঁহাদিগের সকলের কাছে তাহা বড়ই নূতন লাগিল। Scottএর উপন্যাস তাঁহারা পাঠ করিতেন ; কিন্তু তাঁহার কবিতা যে পাঠ্য, তাহা তাঁহারা মনে করিতেন না। সেই দিন হইতে নবীন বাবু ইংরাজি কবিতা পাঠে আমার সহপাঠী হন। Scottএর ছন্দ তাঁহার কাছে বড়ই ভাল লাগিত ; এবং মধ্যে-মধ্যে তিনি বাঙ্গালায় তাহার অনুকরণের চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তিনি ভুলক্রমেও কখনও ইংরাজিতে কবিতা

লিখেন নাই। হৃদয়ের ভাষা যে আপনার মার ভাষা, তাহা তিনি জানিতেন। সংস্কৃত তিনি বোধ হয় তখন একেবারেই জানিতেন না। তবে উমাচরণ বাবু যে তাঁহাকে সে বিষয়ে তাড়না করিতেন, তাহা আমার বেশ মনে আছে। এত অধিক Milton ও Shakespeare-অনুরাগীদিগের মধ্যে পড়িয়া তিনিও Milton ভাল করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু Shakespeareএর নাটক তাঁহার ভাল লাগিত না। মধ্যে মধ্যে দুই-একটী গান ও sonnet তাঁহার ভাল লাগিত। তান্ত্রিক ছিলেন বটে কিন্তু beef-steak তাঁহার পক্ষে অচল ছিল। সত্য কথা বলিতে কি, Mabeth প্রভৃতি আমাদের প্রকৃতির সহিত খাপ খায় না।

কয়েক বৎসর পরে আমি যখন Second Year classএ পড়ি, তখন আবার নবীন বাবুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। ভবানীপুরে দিন-কতক তাঁহার সহিত একত্র বাস করি। সেই সময়ে একদিন কবিতার আলোচনা করিতে-করিতে তিনি বলেন, Paradise Lostএ

"As I bent down to look, just opposite
A shape within the watery gleam appeared
Bending to look on me : I started back
It started back ; but pleased I soon returned
Pleased it returned as soon with answering look
Of sympathy and love."

P. L. IV.

Eveএর এই চিত্রের মত সুন্দর চিত্র তিনি কখনও কোন কবিতাতে পড়েন নাই। হেম বাবুর বৃত্রসংহারে "পর্ব্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ" তুলনায় স্থান পায় না বলিলেন। আমি তখন 'কুমার-সম্ভব' নূতন পড়িয়াছি। আমি বলিলাম এই চিত্রটী কেমন,—

"মার্গাচলব্যতিকরাকুলিতেব সিন্ধুঃ
শৈলাধিরাজতনয় ত যযৌ ন তস্থৌ ॥"

এবং শিবের যোগমুগ্ধ চিত্র—"নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্" চিত্র হিসাবে কেমন জিজ্ঞাসা করিলাম। তাঁহার মুখ গম্ভীর হইয়া গেল। বলিলেন "চমৎকার! Milton তুলনায় স্থান পায় না।" তাহার পর কবির রৈবতক প্রভৃতি লিখিত হয়।

এই সময়ে ঈশান বাবুর সহিত আমার আলাপ হয়। নবীন বাবুর সব কবিতাই তিনি আগে পড়িতে পাইতেন। এই দু'জন কবি-বন্ধুর মনের ভাব যে তাঁহাদিগের পরস্পরের কবিতাতে প্রতিবিম্বিত হয় নাই, তাহা বলা যায় না। নবীন বাবু লিখিয়াছেন যে ঈশান বাবু একজন বিখ্যাত কবির সমালোচনা করিতে গিয়া "গঙ্গার জলে গঙ্গা পূজা করিয়াছিলেন।"

"ওগো ছুঁয়ে গেল, নুয়ে গেল না ;
ওগো বয়ে গেল, কয়ে গেল না।"

ঈশান বাবু এই কবিতাটী আওড়াইয়া বলিয়াছিলেন, এখনকার ছায়াময়ী কবিতা ছুঁয়ে যায় নুয়ে যায় না, বয়ে ত যায়ই, কিন্তু কিছু মাত্রই কয়ে যায় না।

এ কথা কয়েকটি এখনকার অনেক কবিতা সম্বন্ধে ঠিক ; কিন্তু কবি নবীনচন্দ্রের সম্বন্ধে এ কথা কেহই বলিতে পারিবেন না। তাঁহার কবিতায় ভারতবর্ষের পুরাতন গৌরবের চিত্র দেখিতে পাই—পুরাতন ধর্ম্ম-ভাব হৃদয়কে অধিকার করে। Emerson বলিয়াছেন, "Poetry is faith : It is inestimable as a lonely faith, a lonely protest in the uproar of atheism। আশা হয়, আমাদের মধ্যে পুনরায় সেই পুরাতন ধর্ম্মভাব আমাদের কবিরাই আনিয়া দিবেন। নবীনচন্দ্র তাহারই চেষ্টা করিয়াছেন। মেঘান্তরিত প্রাবৃট-চন্দ্রমার ন্যায় যে সুখের, শান্তির ও স্নেহের মুখ তিনি দেখিয়াছিলেন, তাহাই তিনি আমাদিগকে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। শেষ জীবনে তিনি কষ্ট পাইয়াছিলেন। তিনি মনে করিতেন তাহা আত্ম-শিক্ষার জন্য। দেব-ভক্তিতে তিনি শেষ জীবনে সান্ত্বনা পাইয়াছিলেন। আমরাও সেই সান্ত্বনার পথ তাঁহার কবিতা হইতে দেখিতে পাই। আমাদের নূতন কবিদিগকে তাঁহার পথ অনুসরণ করিতে অনুরোধ করি। আমরা যাহা হারাইয়াছি, তাঁহারা আমাদিগের জন্য তাহা সংগ্রহ করিয়া দিন, তাঁহা-দিগের নিকটে ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা। আমাদিগের জীবন, জন্ম, দাসত্ব ও মৃত্যু বলিলে সবই বলা হইল, তিনি এই কথা বলিতেন। এ কথা ঠিক। তবে যে মৃত্যুর মধ্যে আমাদের কবিরাই আমাদিগকে অমৃত আনিয়া দিতে পারিবেন, ইহা যে দুরাশা, তাহা আমার মনে হয় না।

ইমানদার

(উপন্যাস)

[শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া]

মাঘ মাসের প্রথম। বৈকালে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। শীতের ঠাণ্ডা হাওয়া অধিকতর ঠাণ্ডা হইয়া তীব্র বেগে বহিতেছে। ঘরের বাহিরে যাওয়া মানুষের অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। নব-প্রতিষ্ঠিত বাঁকুড়া-দামোদর লাইনের অন্তর্ব্বর্ত্তী ক্ষুদ্র—ষ্টেসনটী সত্যকার তেপান্তর মাঠের মধ্যেই অবস্থিত বটে। চারিদিকে আড়াই মাইলের মধ্যে জন-মানবের সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় না। সদ্যঃ-ধান-কাটা, লাঙ্গল-চষা, শূন্য-হৃদয় মাঠগুলা শ্রীহীন মূর্ত্তিতে পড়িয়া আছে। দূর জঙ্গলে শৃগালের হুক্কি-হুয়া, আর পেচকের কর্কশ কণ্ঠস্বর ছাড়া কোন শব্দ নাই। রাত্রি সাড়ে বারটার শেষ ট্রেণখানির প্রতীক্ষায় রেল কোম্পানীর বেতনভোগী চাকর-কয়টী ষ্টেসনের ঘরে জাগিয়া বসিয়া ছিল। যথাসময়ে ট্রেণ আসিয়া ষ্টেসনে দাঁড়াইল। গুটি-দুই যাত্রী নামিল। তার পর ট্রেণ সশব্দে বাঁশী বাজাইয়া পশ্চিমাভিমুখে ছুটিয়া গেল। ট্রেণ পাশ করাইয়া ষ্টেসন-মাষ্টার, রেল কোম্পানীর নামের ছাপ-মারা পিতলের বোতাম-আঁটা, মোটা কাল রঙের কোট গায়ে, লণ্ঠন হাতে করিয়া, মদিরামত্ত চরণে টলিতে-টলিতে যাত্রী দুটির নিকটে আসিলেন। জড়িত কণ্ঠে বলিলেন, টিকেট। যাত্রী দুইজন তখন আপনাদের মধ্যে কি কথা কহিতেছিল। তাহাদের একজনের আকৃতির সৌন্দর্য্য ও পরিচ্ছদের মহার্ঘ্যতা দেখিলেই, সম্ভ্রান্ত গৃহের সন্তান বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। অন্য ব্যক্তির ভৃত্যের পরিচ্ছদ ও হাতে দ্বারবানের মামুলী মোটা লাঠি দেখিয়া ভৃত্য বলিয়া চিনিতে বিলম্ব হয় না। প্রভুটি তরুণ, বয়স বছর আঠার-উনিশের বেশী নয়, চেহারা হৃষ্ট-পুষ্ট, রঙটি ধবধবে সুন্দর, মুখখানি প্রসন্ন হাস্যময়। অন্য ব্যক্তি দৈহিক গঠনে ও বয়সে তাহার অপেক্ষা বছর পাঁচ-ছয়ের বড়। তাহার গায়ের রঙ অপেক্ষাকৃত মলিন,—সাধারণতঃ যাহাকে রোদে-পোড়া রং বলে তাহাই। চক্ষু দুইটি বিশাল, আয়ত, মুখশ্রী সুন্দর। দৃষ্টিতে পবিত্রতা, এবং শিশুর সরলতার সহিত, সদানন্দ-প্রফুল্লতা চিরবিরাজমান।

টিকেট-মাষ্টার টিকেট চাহিতেই, ভদ্র-পরিচ্ছদধারী তরুণ ব্যক্তি তাঁহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল,—বুকপকেট হাতড়াইয়া, মণিব্যাগ, রুমাল, চিঠির গোছা টানিয়া বাহির করিয়া, অবশেষে টিকেট দুইখানির উদ্ধার সাধন করিল। ষ্টেসন-মাষ্টার ওরফে টিকেট-মাষ্টার লণ্ঠন তুলিয়া টিকেট দুখানা পরীক্ষা করিলেন। তারপর ভদ্রলোকের হাত হইতে সে দুখানা লইয়া, লণ্ঠনের আলোটা ঘুরাইয়া তাহার মুখখানা দেখিবার চেষ্টা করিলেন। তাঁহার চেষ্টা সফল হইল কি না, তিনিই জানেন। সহসা অদূরে ফুলকপির ঝুড়িটার উপর দৃষ্টি পড়িতেই, একটু সচেতন হইয়া লুব্ধ-চঞ্চল দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক চাহিয়া, খুব মোলায়েম সুরে বলিলেন, "কলকেতা থেকে আসা হচ্ছে,—ফুল-কপি—ঝুড়ি-ভরা খাসা কপি কিনেছেন মশায়,--মোদ্দা লগেজটা ভারী হয়ে হয়ে—"

যুবকের সমভিব্যাহারী ভৃত্যটি এতক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া ষ্টেসন-মাষ্টারের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল;—এইবার সে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "জী হাঁ, কসুর মাপ করুন;—মোদ্দা আমাদেরও ইণ্টার ক্লাসের টিকিট ছিল, ভাল করে দেখুন।" লোকটার এই অনাবশ্যক মধ্যস্থতায় ষ্টেসন-মাষ্টারের অন্তঃকরণ ভয়ঙ্কর চটিয়া গেল। একটু রুষ্ট ভাবে তাহার দিকে একবার কটাক্ষ-ক্ষেপ করিয়া তাহার প্রভুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এটি কি মশাইয়ের 'মিনেজার'?" নিরপরাধ অল্পবয়স্ক প্রভুটি এই বিদ্রূপে একটু যেন বিব্রত হইয়া উঠিলেন; কিন্তু বিশেষ কিছু উত্তর দিতে পারিলেন না, বিপন্ন ভাবে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ভৃত্য প্রভুর অবস্থা বুঝিয়া, এক মুহূর্ত্তে অগ্রসর হইয়া সবিনয়ে বলিল—"আজ্ঞে না, আমি ওঁর ম্যানেজার নই, ম্যানেজারের তাঁবেদার। ওঁর ম্যানেজার সেই তিনি,—সেই গেল মাসে যাঁর কাছ থেকে জোর করে তিনসের বিষ্ণুপুরের তামাক কেড়ে নিয়েছিলেন,—আপনার মনে আছে বোধ হয়,—সেই ভদ্দর লোকটিই ওঁর ম্যানেজার।" ষ্টেসন-মাষ্টারের

নেশা ছুটিয়া গেল! হতবুদ্ধির মত নির্ব্বাক হইয়া সেই অদ্ভুত স্পর্দ্ধাশীল, দুঃসাহসী লোকটার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।—জড়িত কণ্ঠে বলিলেন "তুমি, তুমি তার কে হও—"

অসঙ্কোচে প্রশ্নোৎসুক দৃষ্টি তুলিয়া অম্লান বদনে ভৃত্য বলিল, "কার? সেই যাঁর তামাক কেড়ে নিয়েছিলেন? ওঃ—তিনি আমার বাবার ওপরওলা!—আচ্ছা মাষ্টার বাবু, ষ্টেসনে গরুর গাড়ী ত পাব না, কুলিও কি দু'-একটা মিলবে না?"

বিয়োগান্ত নাটকের, হৃদয়-স্তম্ভনকারী শোকাবহ অভিনয়ের মাঝে, অকস্মাৎ রসভঙ্গ করিয়া কোন সুচতুর বিদূষক নিষ্করুণ ভাবে বিদ্রূপ-রহস্যের অবতারণা করিলে, উৎকণ্ঠিত দর্শকের মনটা যেমন বিক্ষিপ্ত, বিচলিত হইয়া পড়ে, ষ্টেসন-মাষ্টার মহাশয়ের অবস্থাও বোধ হয় তদ্রূপ হইয়া দাঁড়াইল। ক্ষণকাল অবাক্ হইয়া হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া, ভদ্র-সন্তানটির ধীরে-ধীরে সংজ্ঞা ফিরিল। কি-একটু ভাবিয়া হঠাৎ তিনি ভীষণ গম্ভীর হইয়া উঠিলেন; অবজ্ঞা-ভরে মুখ বাঁকাইয়া প্রস্থানোদ্যত হইয়া, প্রচণ্ড তাচ্ছল্যের স্বরে বলিলেন, "জানি না,—দেখে নাও গে।"

ষ্টেসন-মাষ্টার মহাশয় বল-দর্পিত পদক্ষেপে তাঁহার টিনের ছাউনি-ঘেরা আরাম-নিকেতনের দিকে অগ্রসর হইলেন। পিছনের লোক দুইটি হাঁ করিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। ক্ষণকাল পরে প্রভু মুখ ফিরাইয়া ভৃত্যের দিকে চাহিয়া একটু অর্থসূচক হাস্য করিয়া বলিলেন "তুমি সব কাঁচালে ফৈজু! একটা কপির মায়া ছাড়্‌লে, ভদ্রলোকের কাছে অনেকটা উপকার পাওয়া যেত!"

ফৈজু মুহূর্ত্তের জন্য একটু মাথা চুলকাইয়া ইতস্ততঃ করিল; তার পর স্মিতহাস্যে মুখ তুলিয়া উত্তর দিল, "দিদিমণির বরাতি কপি, বাবু—সবই যদি রাস্তায় খয়রাৎ করে যাই, তা'হলে চল্‌বে কেন? আর, তা ছাড়া, নিরুপায় ভিক্ষুক হলে, না-হয় খুসী হয়ে একটা-দুটো দান করতুম্; কিন্তু ওই দাগাবাজ রেলের চাকরগুলাকে—না বাবু, না,—ওদের ভক্তি করে আধখানা জিনিস দিতেও আমার মন একদম্ নারাজ হয়ে যায়!" সহাস্যে প্রভু সুনীলকৃষ্ণ উত্তর দিল, "ছাই-ভস্ম,—না হয় অভক্তি করেই একটা দিতে!—গরজ বড় বালাই যে!" প্রভু পরিহাস করিয়া কথাটা বলিলেন বটে; ভৃত্য কিন্তু সেটা ঠিক সে ভাবে গ্রহণ করিল না। লাঠি-গাছটার উপর ভর দিয়া সে মুহূর্ত্তের জন্য গুম্ হইয়া কি ভাবিল; তার পর সহসা মৌনতা-ভঙ্গ করিয়া, তাচ্ছল্য-ব্যঞ্জক দৃঢ়তার সহিত বলিয়া উঠিল, "চুলোয় যাক্ বাবু, অমন গরজ মাথায় থাক। এই বয়েসে ফৈজু মিঞা খোদার মেহেরবাণীতে অমন বহুৎ গরজের"—পরক্ষণে কথাটা সামলাইয়া লইয়া, ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "মোদ্দা, ঐ বাবুটি যখন আমার সত্যি কথা শুনে একবার চটেছেন, তখন ভদ্দর লোক চটেই থাকুন,—আমি কিন্তু গরজের ঠেলায় মিছে কথা বলে ওঁর পায়ে তেল মালিশ করতে আর যাচ্ছিনে!"

ইহজগতের মধ্যে সুপ্রচুর অভাব-অসুবিধাপূর্ণ হীনতম অবস্থায় বাস করিতে বাধ্য হইলেও—এই সামান্য মানুষটি যে নিজের একান্ত-নিজস্ব ঐহিক গরজগুলির জন্য ইহজগতের মানুষের কাছে কথায়-কথায় মেহেরবাণী ভিক্ষা করাটা নিতান্ত ঔদাসীন্যের চক্ষে দেখে,—এমন কি স্থানবিশেষে, ঘৃণার চক্ষে দেখিতেও কুণ্ঠিত হয় না, সেটা সুনীল ভাল করিয়াই জানিত। সেই জন্য ফৈজুকে সে শুধু তাহাদের 'পয়সার গোলাম' বলিয়া মনে করিতে পারিত না,—তদপেক্ষা উচ্চতর আরও কিছু মনে করিত। ফৈজুর কথার উত্তরে আধখানিও প্রতিবাদসূচক বাক্য উচ্চারণ না করিয়া, সুনীল ষ্টেসনের বাহিরে মেঠো পথের দিকে চাহিয়া, কি যেন ভাবিতে-ভাবিতে দুশ্চিন্তা-গম্ভীর-মুখে শুধু বলিল "এই ঝমঝম নিশুতি রাত ফৈজু, কি করবে বল দেখি"? ফৈজু ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া, সেই দিকে চাহিয়া, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কি দেখিতে-দেখিতে বলিল, "আকাশে মেঘ আছে, বিদ্যুৎও চমকাচ্ছে বটে, কিন্তু জল এখন হবে না—কেন না জোর হাওয়া বইছে।" একটু থামিয়া, কি যেন ভাবিয়া, সহসা হাসিমুখে অত্যন্ত উৎসাহের স্বরে বলিল, "চলুন, চলুন,—দুজনেই কুইক্ মার্চ্চ করা যাক। আমার লাঠিগাছটা আপনি হাতে নেন,—আমি এই কপির ঝুড়ি আর আপনার ব্যাগটা কাঁধে করে নিচ্ছি।" বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিয়া সুনীল বলিল, "পাগল ফৈজু!—এই বিশমণি ভার কাঁধে নিয়ে তুমি অন্ধকার রাত্রে ঐ পিছল পথে চল্‌বে?" ফৈজু কপির

ঝুড়ির মাঝে কি একটা জিনিস অন্বেষণ করিতে-করিতে হেঁট হইয়া উত্তর দিল, "চল্‌তেই হবে! না হলে এই খোলা ষ্টেসনের মাঝে, এমন হিমের রাতে আপনাকে রাখবো কোথা বাবু?" কপির ঝুড়ির ভিতর হইতে, কাগজের বাক্স-মোড়া, সদ্য কেনা ডিট্‌জ্‌ লণ্ঠনটা বাহির করিয়া, সজোরে ঝাকানি দিয়া সেটাকে পরীক্ষা করিয়া, উৎফুল্ল মুখে বলিল, "চলবে, খুব চলবে; রাস্তাটুকু পার হওয়া নিয়ে কায, এই তেলেই বহুৎ হবে!" সুনীল সবিস্ময়ে বলিল, "কিনেই ওতে তেল দিয়েছ; বাহা রে ফৈজু! তবে আর ভাবনা কি?"—ফৈজু মাথা নাড়িয়া বলিল, "বাহা রে ফৈজু নয় বাবু, এখানে গাধা ফৈজু বলুন—ঠিক হবে!—ফুটো-টুটো আছে কি না দেখবার জন্যে এটায় যখন এক পয়সার তেল পূরে নিলুম, তখন আর একটা পয়সা খরচ করাও যে উচিত ছিল, সেটা বুদ্ধিতে আসে নি কেন!—যাক্‌, এখন ম্যাচ বাক্সটা বার করুন।"

পকেট হাতড়াইয়া দেশলাই বাহির করিয়া সুনীল বলিল, "ওহে, আমার এতে কাটী যে অল্পই আছে,—দেখো বেশী খরচ-পত্তর কোর না।" "না।"—বলিয়া দেশলাই ও লণ্ঠন হাতে লইয়া ফৈজু নিকটস্থ টিকিট ঘরের আড়ালে, হাওয়ার পাল্লা এড়াইয়া লণ্ঠন জ্বালিবার জন্য গেল। ফশ্‌ করিয়া দেশলাই জ্বালিয়া বাতি ধরাইয়া ক্ষিপ্র-হস্তে চিমনি পরাইয়া লণ্ঠন ঠিক করিয়া লইল। শব্দ পাইয়া খট্‌ করিয়া ঘরের দুয়ার খুলিয়া মুখ বাড়াইয়া পূর্ব্বোক্ত টিকিট-বাবু বলিলেন "কে?"—ফৈজু সহজ ভাবেই উত্তর দিল "আজ্ঞে আমি"—টিকিট-বাবু কঠোর ভ্রূ-কুঞ্চন সহকারে রূঢ় দৃষ্টিতে একবার তাহার মুখখানা ভাল করিয়া দেখিলেন—তার পর বিনা বাক্যে, অকস্মাৎ অত্যন্ত জোরের সহিত, সশব্দে দুয়ার বন্ধ করিয়া দিলেন। ফৈজু হাসিমুখে ফিরিয়া চলিল। সুনীল অদূরে দাঁড়াইয়া ব্যাপারটা দেখিয়া নিঃশব্দে হাসিতেছিল। ফৈজু নিকটে আসিতেই, মৃদুস্বরে বলিল, "ওহে, ভদ্রলোক ভয় পেয়েছেন,—নিশ্চয় তোমায় লেঠেল ঠাউরেছেন!" প্রসন্ন, উজ্জ্বল বদনে, স্নিগ্ধ কণ্ঠে ফৈজু উত্তর দিল, "কাযটায় হাত পাকাতে পারলে বড় সুবিধে হোত বাবু—তবে খামকা যার-তার সঙ্গে অশিষ্ট পরিহাস করতে যেতুম না,—স্রেফ মাথা বেছে, সোজা লাঠি চালিয়ে যাওয়াই আমার কায হোত!"

ফৈজু কপির ঝুড়িটা মাথায় তুলিয়া, ব্যাগটা হাতে ঝুলাইয়া লইবার উপক্রম করিতেই, সুনীল জোর করিয়া সেটা কাড়িয়া লইল। ফৈজু অনেক আপত্তি করিল, কিন্তু সুনীল শুনিল না। অগত্যা ক্ষুণ্ণ চিত্তে লণ্ঠনটা হাতে তুলিয়া ফৈজু ব্যগ্রভাবে বলিল "শালটা মাথায় জড়িয়ে নেন বাবু, দেখবেন,—ঠাণ্ডা লাগিয়ে কাল যেন অসুখে পড়বেন না,—তা হলে বাবা আমার মাথা নেবে!" হাসিমুখে মাথায় শাল জড়াইতে জড়াইতে সুনীল বলিল, "বাপকে তুমি খুব ভয় কর, না ফৈজু?" "ভয়!" ফৈজু মুহূর্ত্তের জন্য চুপ করিয়া রহিল; তার পর ঈষৎ বিচলিত স্বরে বলিল, "না বাবু, না,—ফৈজু মিছে কথাটি বল্‌তে পার্‌বে না! সত্যিই বলছি, ভয় তো বাপ্‌কে করিই না, তবে,—তার অনেক কথা যে রাখ্‌তে পারি না, সেজন্যে আমার সময়-সময় বড় দুঃখ হয়!—আমার বাপ তো বলেই, আর আমি নিজেও বল্‌ছি,—আমার মত কুপুত্র দুনিয়ায় কোন বাপের যেন কখনো না হয়!"—তাহার কণ্ঠস্বরে একটা তীব্র বেদনার আভাস সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিল। সামান্য রহস্যাত্মক প্রশ্নের উত্তরে ফৈজু যে এমন সরল ভাবে অকস্মাৎ তাহার প্রচ্ছন্ন অনুতপ্ত মনটির আবরণ উন্মোচন করিয়া দিবে,—সেটা সুনীল ভাবিয়া উঠিতে পারে নাই। তাই ফৈজুর উত্তর শুনিয়া সে ক্ষুণ্ণ-লজ্জিত অন্তরে একেবারেই নিরুত্তর হইয়া গেল, আর দ্বিতীয় বাক্য উচ্চারণে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। উভয়ে নিঃশব্দে ষ্টেশন পার হইয়া মাঠের আল-পথ ধরিয়া যাত্রা আরম্ভ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তিন মাইল পথ হাঁটিয়া, রাত্রি প্রায় দুইটার সময়, উভয়ে জগৎপুর গ্রামের সুপ্রাচীন জমিদার-বাড়ীর সদর-দেউড়ীর সামনে আসিয়া পৌঁছিল। দেউড়ীর কড়া নাড়িয়া, উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া ফৈজু ডাকিল "রামটহল, রাম টহল,—এ দুবে, এই শ্যামলচাঁদ, কপাট-টা খোল রে—"

দারুণ শীতে আট-ঘাট বন্ধ করিয়া, গরম বিছানার মধ্যে সকলেই নিদ্রায় অচেতন। ফৈজুর চীৎকার ও সুনীলের বিস্তর ডাকাডাকিতেও কাহারও ঘুম ভাঙ্গিল না। এতটা পথ ঠাণ্ডায় খোলা মাঠের ভিতর দিয়া হাঁটিয়া আসিয়া, শীত-কাতর সুনীল শ্রান্ত অবসন্ন দেহে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে

পারিল না, বসিয়া পড়িল। ফৈজু অধৈর্য্য ভাবে ঝুপ্ করিয়া কপির ঝুড়িটা দুয়ারের পাশে নামাইয়া ফেলিয়া, এক লম্ফে পাঁচিলে উঠিয়া, ধপ্ করিয়া ভিতরে লাফাইয়া পড়িল। সুনীল ব্যস্ত হইয়া বলিল, "সাবধান ফৈজু, লাগে না যেন—" "কিছু না বাবু" বলিয়া, আশ্বাস দিয়া ফৈজু উঠান পার হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গিয়া চাকরদের বারেণ্ডায় উঠিল। মাঝের ঘরের দুয়ারে লাথি মারিয়া উচ্চকণ্ঠে হাঁকিল, "রামটহল, এ রামটহল, ওঠ—ওঠ, ছোটবাবু বাহিরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। শীগ্রী ওঠ, দেউড়ীর চাবি বার কর—"

সদ্যঃ-সুপ্তোত্থিত রামটহল দ্বারবান ভিতর হইতে সাড়া দিয়া, 'ভারিখো' আওয়াজে ফৈজুর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। অসহিষ্ণু ফৈজু ব্যস্ত ভাবে তাড়া দিয়া বলিল, "জল্‌দি ওঠ বেকুব, ঘরের ভেতর খিল্ দিয়ে বসে হুঁসিয়ারীর দৌড় দেখাতে হবে না আর, খুব হয়েছে, নে!—"

রামটহলের সংশয় ঘুচিল। এত রাত্রে ডাকাডাকি শুনিয়া স্বভাবসিদ্ধ অভ্যাস-মাহাত্ম্যে আগেই ডাকাতের ভয়টা তাহার মনে উদয় হইয়াছিল। কিন্তু এমন জোর গলায় ধমক দেওয়া যে পুরানো বন্ধু ফৈজু ছাড়া আর কাহারও কর্ম্ম নয়, এবার তাহা নিশ্চয় বুঝিল। এক মুহূর্ত্তে চাবি লইয়া, দুয়ার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া, এক গাল হাসিয়া বলিল, "দাদা যে রে—"

ফৈজু তাহার টুঁটি টিপিয়া, মিঠেকড়া গোছের একটু ঝাঁকানি দিয়া বলিল, "দাদা তোমার পিত্তি চট্‌কাচ্ছে কাল, দাঁড়াও বেয়াদব!—তোদের ঘুম যে মোষের ঠাকুর্দ্দার সাতায় পুরুষ উঁচুতে! এ্যাঁ! তোরা হলি কি রে! ডাকাতি হাঁক হাঁকছি, তবু ঘুম ভাঙ্গে না? জাহান্নামে যা উল্লুক!" অপ্রস্তুত রামটহল মাথা চুলকাইয়া বলিল, "তা যাচ্ছি ভাই, আর গলা-ধাক্কা দিস্ নি, ছোটবাবু কই?"

"দেউড়ীর বাহিরে—চল জল্‌দি—" রামটহলকে টানিয়া বাহিরে দেউড়ীর কাছে আসিয়া চাবি খোলাইয়া ফৈজু বাহিরে আসিল। রামটহল প্রভুকে অভিবাদন করিয়া, তাড়াতাড়ি ব্যাগটা লইতে গেল।—কিন্তু ফৈজুর মাথায় এখন দুষ্টামীর ঝোঁক চাপিয়াছে,—সে কি তাহাকে এত সহজে আজ নিষ্কৃতি দিতে পারে? ব্যাগটা তাহার হাত হইতে টানিয়া লইয়া, বিনা বাক্যে ফুলকপির ঝুড়িটা তাহার মাথার উপর চড়াইয়া দিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "চল তো দোস্ত!" মাঝ-রাত্রে গভীর নিদ্রার মাঝে অকস্মাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় একেই রামটহলের মাথাটা টল্ টল্ করিতেছিল,—তার উপর শীতে জড়-সড় হইয়া বাহিরে আসিতে, গরীবের অন্তরাত্মাটা অত্যন্ত ক্লেশ-কাতর হইয়া উঠিয়াছিল। তদুপরি এই ভারী কপির ঝুড়িটার অপ্রত্যাশিত আক্রমণে সে একেবারেই কাবু হইয়া চেঁচাইয়া উঠিল, "আরে বাপ্! কেয়া জবর্!"

ফৈজু বিদ্রূপের স্বরে বলিল, "হুঁ, বোঝ চাঁদ!—নবাবের মত ঘরে পড়ে-পড়ে ঘুম দেওয়া হচ্ছিল, দুশো ডাকে সাড়া নেই! এখন কেমন আয়েস্?—চল বাড়ীর মধ্যে, ভাল-মানুষের মত এগিয়ে পড়, আমি ওকে আর নামাচ্ছি নে।"

ব্যাগ ও লণ্ঠন লইয়া ভিতরে ঢুকিয়া, ফটকে যথারীতি চাবি লাগাইয়া, তিনজনে ভিতর-মহলের দিকে চলিল। সকাতর রামটহলের বিপন্ন অবস্থা দেখিয়া সুনীল মুখ টিপিয়া নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল। কিন্তু তাহার এই আলস্য-প্রিয় ভৃত্যটিকে ফৈজু ছাড়া আর কেহই যে জব্দ করিয়া সংশোধনের পথে আনিতে পারে না, সেটাও মনে পড়িল। সুতরাং তাহার দুঃখে বিশেষ কিছু সহানুভূতি প্রকাশ না করিয়া, সুনীল একটু উদাসীন ভাবে পাশ কাটাইয়া চলিল।

ভিতর-মহলের দোতলায় সুনীলের বিধবা বুড়ী পিসিমা, বিধবা দিদি সুমতি দেবী ও ঝি ঘুমাইতেছিল। ডাকাডাকি শুনিয়া দিদির ঘুম শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া গেল। ঝিকে উঠাইয়া তাড়াতাড়ি তিনি নিজেই দুয়ার খুলিয়া দিবার জন্য নীচে আসিলেন। ইত্যবসরে, কপির ভার-ক্লিষ্ট রামটহল সকরুণ কণ্ঠে বলিল, "উঃ কি জবর ভারী রে ফৈজু—টিসন্ থেকে কে এটা আন্‌লে ভাই?"

ফৈজু নির্দ্দয়-কৌতুক-হাস্য-বিকশিত দৃষ্টিতে একবার রামটহলের মুখভঙ্গিমাটা ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। তার পর সুনীলের দিকে চাহিয়া সবিনয়ে বলিল, "বেয়াদবি মাফ্ করুন ছোটবাবু, আপনি দাঁড়িয়ে আছেন, কি কর্‌ব,—আমার কিন্তু একবার বস্‌তে হবেই! আহা, দোস্ত আমার বেজায় জব্দে পড়েছে, আমি জাঁকিয়ে বসে একটু রঙ্গ দেখি!"—ফৈজু সত্য-সত্যই দুয়ারের চৌকাঠের পাশে পা ছড়াইয়া বসিয়া পড়িল। রামটহলের দিকে চাহিয়া বলিল, "হ্যাঁ, তার পর,—কি বলছিলি,—কপির ঝুড়িটা কে আন্‌লে? অ!—তোর কি মালুম হয় বল দেখি?"

বিপন্ন রামটহল কোন দিক হইতে প্রতিদ্বন্দ্বীকে আক্রমণের কোন সুযোগ না পাইয়া,—অগত্যা দুই হাতে ঝাঁকানি দিয়া কপির ঝুড়িটাকে ভাল করিয়া চাপিয়া, মাথায় বসাইল। ফৈজু সেটুকু লক্ষ্য করিয়া, সহানুভূতি-আর্দ্র, সুকোমল কণ্ঠে বলিল, "ভারটা তেমন কিছু হয় নি, কি বল? তা, এই ব্যাগটাও ওর ওপর চাপিয়ে দেওয়া চলে, দেব ভাই?"—"না" বলিয়া সন্ত্রস্ত ভাবে পিছু হটিয়া, রামটহল কৃত্রিম কোপ সহকারে বলিল, "এখানে বসে-বসে কি করছিস্ হতভাগা;—বেরো, দূর হ', বাড়ী যা!" পরক্ষণেই কি একটা কথা মনে পড়াতে সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, "শুনছিস্, বাড়ী যা, বাড়ী যা,—দেখগে যা, কে এসেছে!" ফৈজু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে একবার রামটহলের মুখ পানে চাহিল। তার পর তাড়াতাড়ি কথাটা ঘুরাইয়া লইবার জন্য বলিল, "হুঁ, তুমি থাম তো,—কপির ঝুড়িটা ক' মণ হবে বল দেখি?"

রামটহল রাগতঃ স্বরে বলিল, "কপির ঝুড়ি য' মণই হোক, তুই বাড়ী যা, তোর বিবি এসেছে"—এবার ফৈজু মাথা নীচু করিয়া চুপ! সুনীল সবিস্ময়ে বলিল, "তাই না কি, ফৈজুর বিবি সত্যি এসেছে? ও! ভাল আছে বেশ!"

রামটহল বক্র কটাক্ষে ফৈজুর দিকে চাহিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল, "হাঁ হুজুর,—খুব ভাল আছে। সর্দ্দার নিজে বল্লে, হাকিমরা বলে দিয়েছে, আর বেমারের ভয় নাই, এবার শ্বশুর বাড়ী গিয়ে থাক।" সরিয়া আসিয়া, ফৈজুর কাঁধে মৃদু-মন্দ বেগে হাঁটুর গুঁতা দিয়া, কড়া আওয়াজে বলিল, "শুন্‌তে পাচ্ছিস না, নয়? কালা হয়ে গেলি না কি?" "না" বলিয়া হাসি-মুখে গা-ঝাড়া দিয়া, তড়াক্ করিয়া ফৈজু উঠিয়া দাঁড়াইল। রামটহল চক্ষের নিমেষে সভয়ে পিছাইয়া গেল। কিন্তু এ অঙ্ক আর বেশী দূর অগ্রসর হইতে পাইল না; কারণ তথনই দুয়ার খুলিয়া, দাসীর সঙ্গে সুমতি দেবী সামনে দেখা দিলেন।

ফৈজু সংযত হইয়া সসম্ভ্রমে দূর হইতে অভিবাদন করিল। সুনীল আগাইয়া গিয়া দিদির পায়ের উপর মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল। সুমতিদেবী সস্নেহে ভ্রাতার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া, উভয়ের শারীরিক কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাদের সঙ্গে লইয়া বরাবর দ্বিতলে উঠিলেন। রামটহল ও ফৈজু সঙ্গে-সঙ্গে গেল। কপির ঝুড়ি এবার বিনা বাক্যেই ফৈজুর সাহায্যে রামটহলের মাথা হইতে নামিল। "আঃ!" বলিয়া রামটহল মাথা তুলিয়া, বুক চিতাইয়া, সোজা হইয়া দাঁড়াইল। তার পর ফৈজুর দিকে চাহিয়া, একটু জোর গলায়—যেন গৃহস্থ সকলে ভাল করিয়া শুনিতে পায়, এমনি ভাবে বলিল, "তুই আর এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কি করবি ফৈজু, বাড়ী যা—"

কিন্তু রামটহলের দুর্ভাগ্য! কথাটা যাঁহাদের কাণে পৌছাইবার জন্য সে অত জোর গলায় চেঁচাইল, তাঁহাদের কেহই তখন কথাটায় কাণ দিলেন না। বুড়ী পিসিমা বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া আসিয়া, জড়-সড় হইয়া চৌকাঠের পাশে বসিয়া, স্তিমিত নিষ্প্রভ দৃষ্টি মেলিয়া সুনীলকে তখন খুব বকিতে সুরু করিয়াছেন! এই ঝম্‌ঝমে নিশুতি রাত,—গাঁয়ে ডাকাত পড়িলে কোন চীৎকার শুনিতে পাওয়া যায় না এমন সময় তেপান্তর মাঠ পার হইয়া, এই দুঃসাহসী ছেলে দুইটা আসিল কেমন করিয়া? ইহারা এমনি করিয়া কোন্ দিন কি সর্ব্বনেশে কাণ্ড ঘটাইয়া বসিবে!—সঙ্গে সঙ্গে দিদি অর্থাৎ সুমতিদেবীও ভৎর্সনা আরম্ভ করিলেন, এত রাত্রে নাই-বা আজ আসা হইত! আর তাই যদি আসিল,—কোন্ পূর্ব্বাহ্নে সংবাদ দিয়া রাখিল যে, ষ্টেসনে রামটহল গরুর গাড়ী লইয়া থাকিত?

পিসিমা চোখ রগড়াইয়া হাই তুলিয়া বলিলেন, "আর বলিস্ নি বাছা,—এখনকার ছেলেরাই সব ওম্নি এক ধরণের হয়েছে,—ওরা কি কারুর কথা মানে!" উপর্য্যুপরি তিরস্কার, ভৎর্সনায় বিব্রত হইয়া সুনীল বলিল, "ত্যাখো পিসিমা, আমায় বাপু তোমরা বোকো না,—যা বল্‌তে-কইতে হয়, বল ওই তোমার আদুরে ভাইপো ফৈজুকে। ওরই দোষে ত আজ চারটের ট্রেণ ফেল্ হোল! নইলে আসতুম সন্ধ্যে সাড়ে ছটায়! কর্ত্তা আজ আর একটু হ'লে হাতকড়ি পরে জেলে গিয়ে হাজির হতেন, জানো? উনি আজকাল এম্নি জোর তালে পরহিতৈষিণা বৃত্তিতে মেতে উঠেছেন, যে, আত্ম-হিতৈষিণা বৃত্তির মাথায় যে বজ্জর ভেঙ্গে পড়্‌ছে, সে খোঁজই রাখেন না।"

পিসিমা ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "জেলে কি রে, এঁ্যা, জেলে কি?"

সুমতি ষ্টোভ জ্বালিয়া চায়ের জল চড়াইয়া দিতে-দিতে

ফিরিয়া চাহিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "সে আবার কি, হ্যাঁ ফৈজু, সত্যি কিছু করেছ ?"

ফৈজু ঝুড়ির উপর হইতে কপিগুলা নামাইয়া একে-একে মেঝের উপর রাখিতে-রাখিতে, ঘাড় নীচু করিয়া সলজ্জ স্মিত মুখে সবিনয়ে বলিল, "না—না দিদিমণি, শোনেন কেন ছোট বাবুর কথা !" সুনীল বাধা দিয়া বলিল, "ছোট বাবুর কথা শোনেন কেন ? বলব তবে ? স্থাখো দিদি, তোমার কপি কেনবার জন্যে নতুনবাজারে গিয়ে, কর্ত্তা এক গুণ্ডাকে ধরে এমনি রদ্দা দিয়েছেন সে বেচারা কিছু-দিনের মত এখন ব্যবসা ছেড়ে গা ঢাকা দিতে বাধ্য হবে।" সুমতি দেবী উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, "কি করেছিল সে, হ্যাঁ ফৈজু ?"

ফৈজু সে প্রশ্নের উত্তর দিতে একান্তই অনিচ্ছুক ! ঘাড় চুলকাইয়া ইতস্ততঃ করিয়া সংক্ষেপে বলিল, "আমার কিছু করে নি। যাক সে, বাজে কথা থাক,—আপনার কপিগুলো ভাল করে দেখে নিন দিদিমণি"—দিদিমণি ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "থাক,—থাক, তোমার কেনা জিনিস —ও আর দেখ্‌তে হবে না,—তোমার ছোটবাবুর কেনা জিনিস হলে কথা ছিল বটে। থাক, এখন গুণ্ডাটা কি করেছিল শুনি না !"

ফৈজু চুপ !

ফৈজুকে অপ্রস্তুতে ফেলিয়া কৌতুক দেখা সুনীলের চিরদিনের অভ্যস্ত আমোদ ! ফৈজু যখন তিন বৎসরের বালক, তখন তাহার পিতা ওয়াহেদ সর্দ্দার এই বাড়ীতে চাকরী করিতে ঢুকিয়াছেন,—তখন হইতে ফৈজু এই বাড়ীর নিতান্ত আপনার জন "ঘরের ছেলে" বলিয়াই সকলের কাছে পরিচিত। কেহই তাহাকে 'পর' বলিয়া সঙ্কোচ করে না। সুশীল ত একেবারেই না ! বরং ফৈজুর পিতা—পুরানো আমলের বুড়া লোক বলিয়া এবং স্বর্গগত পিতৃদেবের প্রিয়তম বিশ্বাসী ভৃত্য বলিয়া, সুনীল ও সুমতি তাঁহাকে যথেষ্ট সমীহ করিয়া চলে। এমন কি গোমস্তা ও নায়েব মহাশয় পর্য্যন্ত বুড়া সর্দ্দারকে অবহেলা করিয়া চলিতে পারেন না। কিন্তু ফৈজুর সম্বন্ধে সে বালাই কাহারো নাই ! ফৈজু সকলের কাছেই, স্নেহাস্পদ 'ঘরের ছেলেটি !'—বুড়ী পিসিমা তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। ফৈজুরও অবশ্য সে গুণে ঘাট নাই। শুনা যায়, ছেলেবেলায় পিসিমার জন্য কল্‌মী শাক তুলিতে গিয়া ফৈজু তিনবার পুকুরে ডুবিয়াছিল। আজও সুনীল সেই কথা উল্লেখ করিয়া পিসিমাকে রাগাইয়া দেয়, এবং ফৈজুকে বিদ্রূপ করে। সুতরাং দিদির উৎসুক প্রশ্নের উত্তরে ফৈজুকে ইতস্ততঃপরায়ণ দেখিয়া সুনীল যো পাইয়া বসিল ! জুতা, মোজা, জামা প্রভৃতি খুলিয়া, চায়ের ষ্টোভের পাশে বসিয়া গরম আঁচে হাত তাতাইতে-তাতাইতে সুনীল ফৈজুর দিকে ব্যঙ্গ দৃষ্টি হানিয়া বলিল, "বল না ফৈজু, তোমার গুণ্ডা মশাই কি করেছিল !" রামটহল টুক্‌টুক্‌ করিয়া ঘাড় নাড়িয়া, অত্যন্ত সুকোমল ভাবে একটু মোলায়েম হাসি হাসিয়া মিহিসুরে বলিল, "বল্ না ফৈজু, তাতে আর লজ্জা কি ? তুই ত মেরে ধোরে এখন ঘরের ছেলে ঘরে এসে ঢুকেছিস,—তোর আর ভয় ভাবনা কিসের ? বল না কি হয়েছিল, কথাটা শুনে যাই—"কপির তদ্বির রাখিয়া, ফৈজু ঝাড়া-ঝুড়ি দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া, রামটহলের কাঁধ ধরিয়া পিছনে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "শোনাচ্ছি তোমায়, থাম ; চল দেখি, আগে ছোটবাবুর বিছানাটা ঠিক করে দেবে চল,—অনেকটা রাত্রি হয়েছে, একবার ঘুমোতে হবে তো—" অর্থব্যঞ্জক বিদ্রূপের দৃষ্টিতে চাহিয়া রামটহল ঘাড়-মুখ নাড়িয়া কি একটা পরিহাস করিতে যাইতেছিল ; ফৈজু তাহার ঘাড় ধরিয়া ঝাঁকানি দিয়া থামাইল। তার পর শশব্যস্তে একটা আলো ও ঝাঁটা সংগ্রহ করিয়া রামটহলকে টানিয়া লইয়া সুনীলের পড়িবার ঘরের ভিতর দিয়া শয়ন কক্ষে চলিয়া গেল।

পিছন হইতে সুনীল সহাস্য মুখে বলিল, "পালাচ্ছ কেন, গল্পটা দিদিকে বলে যাও ফৈজু !" ফৈজু চৌকাঠের অন্তরাল হইতে বলিল, "বড় ক্ষিদে পেয়েছে দিদিমণি,—ঘরে চিঁড়ে-মুড়ি কিছু থাকে ত বার করুন,—আমি এসে খাচ্ছি। ছোট বাবুকে চা ছাড়া আর কিছু খেতে দেবেন না,—ওঁকে হাওড়া ষ্টেসনে অনেক জিনিস খাইয়ে এনেছি !" (ক্রমশঃ)

সাময়িকী

এবার বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন গুড্-ফ্রাইডের অবকাশ সময়ে (৬ই ও ৭ই বৈশাখ) হাবড়ায় হইবে। এবারে মাননীয় শ্রীযুক্ত সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহোদয় প্রধান সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন; এবং সাহিত্য-শাখার সভাপতি হইবেন রায় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র-চন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর; ইতিহাস-শাখার সভাপতি হইবেন শ্রীযুক্ত ডক্টর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়; বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিরিশ-চন্দ্র বসু মহাশয়, এবং দর্শন-শাখার সভাপতি হইবেন শ্রীযুক্ত রায় যদুনাথ মজুমদার বেদান্ত-বাচস্পতি বাহাদুর মহাশয়। সর্ব্বাংশে উপযুক্ত ব্যক্তিগণই সভাপতি পদে বৃত হইয়াছেন দেখিয়া আমরা বড়ই আনন্দিত হইয়াছি; অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছেন মাননীয় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়; ইনি হাবড়া মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান। হাবড়ার বর্ত্তমান ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর সম্মিলনের উদ্বোধন করিবেন। সম্পাদক হইয়াছেন আমাদের বন্ধুবর অক্লান্তকর্ম্মা শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়। উদ্যোগ-আয়োজন যে ভাবে চলিতেছে, তাহাতে এবারের সম্মিলন যে খুব ভাল হইবে, তাহা আমরা আগে থাকিতেই অনুমান করিতে পারি।

এই সম্মিলনে পাঠ করিবার জন্য এবারও সকলের নিকট প্রবন্ধ প্রার্থনা করা হইয়াছে। আমরা বরাবরই এইটীর বিরোধী; এমন ভাবে নারদের নিমন্ত্রণ করিয়া প্রবন্ধ সংগ্রহ করা কিছুতেই কর্ত্তব্য নহে। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, এ ভাবে কর্ম্মিগণের কার্য্য-পরিচালন করিয়া কোনই লাভ নাই। যত লেখককে প্রবন্ধের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই অবশ্য লিখিবেন না; কিন্তু যাঁহারা লিখিয়া পাঠাইবেন, তাঁহাদের সংখ্যাও নিতান্ত কম হইবে না। তাহার পর এত বড় একটা সম্মিলনে পাঠ করিবার জন্য যা' তা' লিখিলেও হয় না, এবং যেমন-তেমন করিয়া লিখিলেও চলে না; সুতরাং লেখকগণ বক্তব্য বিষয় সংক্ষেপে লিখিতে পারেন না। মনে করুন, চারিটী শাখার প্রত্যেকটীতে পাঠ করিবার জন্য যদি ২৫টী করিয়া প্রবন্ধ আসে, তাহা হইলে সম্মিলন কি করিবেন? তাঁহাদের সময় কৈ? সুতরাং তাঁহারা কতকগুলি প্রবন্ধ ভাল হইলেও বর্জ্জন করিবেন, কতকগুলিকে পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল বলিবেন। আর বড় জোর পাঁচ-সাতটী প্রবন্ধকে কবন্ধ করিয়া পাঠ করিবার আদেশ করিবেন। যাঁহারা প্রবন্ধ পাঠ করিবার অধিকার লাভ করিবেন, তাঁহাদের কাহাকেও হয় ত দশ মিনিট, কাহাকেও বা পনর মিনিট সময় দেওয়া হইবে; এ দিকে তাঁহাদের প্রবন্ধ অন্ততঃ তিন কোয়াটারের কমে পড়াই যাইতে পারে না। প্রতি বৎসরই আমরা এই কর্ম্মভোগ দেখিয়া আসিতেছি।

এ সম্বন্ধে আমাদের প্রস্তাব এই যে, প্রত্যেক বিষয়ে অভিজ্ঞ দুই কি তিনজন লেখককে প্রবন্ধ লিখিবার ভার দেওয়া হউক। তাঁহারা যে যে বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিবার ভার লইবেন, তাহা সংবাদ-পত্রে বিজ্ঞাপিত করা হউক। ইহাতে এই লাভ হইবে যে, সভাপতি মহাশয়গণ ও প্রতিনিধিগণ সেই-সেই বিষয়ের আলোচনা করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইয়া সম্মিলন-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারিবেন; এবং প্রবন্ধ পাঠের পর তৎসম্বন্ধে আলোচনা হইতে পারিবে। ইহাতে প্রবন্ধ পাঠের সার্থকতা এবং সম্মিলনেরও সার্থকতা। নতুবা, এখন যেমন হইতেছে, তাহাতে প্রবন্ধ পাঠে কোন ফলই হয় না। তাহার পর, একই সময়ে চারিস্থানে চারিটি শাখার অধিবেশন হয়; ইহাতেও বড়ই অসুবিধা হয়। যিনি সাহিত্য-শাখার আশ্রয় লইয়াছেন, তাঁহার কি ইতিহাস বা দর্শন-শাখার প্রবন্ধ শুনিবার ইচ্ছা হইতে পারে না? কিন্তু তাহা হইয়া উঠে না। ফল এই হয় যে, 'নানা শাখায় বিচরণ করিতে গিয়া প্রতিনিধি মহাশয়দের কোন দিকই রক্ষা হয় না। ভিন্ন-ভিন্ন সময়ে ভিন্ন-ভিন্ন শাখার অধিবেশন করা কি সম্ভবপর নহে?

বিগত শিবরাত্রির সময় মেদিনীপুর সাহিত্য-সভার সপ্তম বার্ষিক উৎসব অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সুচিন্তিত, সুন্দর অভিভাষণ স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের অভিভাষণও অতি সুন্দর হইয়াছিল। সভার সম্পাদক সুকবি শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় সমাগত সাহিত্যিকগণের অভ্যর্থনা করিয়া যে সুললিত কবিতা পাঠ করেন, স্থানাভাব বশতঃ আমরা তাহা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। মেদিনীপুরের সহৃদয় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সভার উদ্বোধন উপলক্ষে অনেকগুলি সারগর্ভ কথা বলেন এবং সভার কার্য্যে বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করেন।

এবার সাময়িকীতে সভার কথাই বেশী বলিতে হইতেছে। দুইটী সভার কথা বলিলাম; এখনও তিনটীর কথা বলা বাকী। নদীয়া জেলার রাণাঘাট সবডিভিসনের অন্তর্গত ফুলিয়া গ্রাম মহাকবি কৃত্তিবাসের জন্মভূমি। এই ফুলিয়ায় কৃত্তিবাসের ভিটা বহুকাল জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। বহুদিন পূর্ব্বে কবিবর নবীনচন্দ্র সেন যখন রাণাঘাটের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তখন তিনি কৃত্তিবাসের স্মৃতি-রক্ষার জন্য চেষ্টা করেন; কিন্তু সে চেষ্টা কার্য্যে পরিণত হয় না। তাহার পর অনেক দিন চলিয়া গেলে, কবিবর শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষ যখন নদীয়ার পোষ্ট আফিসের সুপারিণটেন্‌ডেণ্ট হন, সেই সময় তাঁহার দৃষ্টি এতদ্বিষয়ে আকৃষ্ট হয়। তখন সদাশয় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (Mr. S. C. Mukherjee, I. C. S,) মহাশয় নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট-কলেক্টর। শ্রীযুক্ত রমণীবাবু ও রাণাঘাটের উৎসাহী উকীল শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় ও রাণাঘাটের সেই সময়ের ডেপুটী শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের উৎসাহে শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় কৃত্তিবাসের স্মৃতি-রক্ষার জন্য অগ্রসর হন। তাঁহাদের সমবেত চেষ্টার ফলে তিন বৎসর পূর্ব্বে কৃত্তিবাসের ভিটার উপর একটি বাঙ্গালা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, একটী স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত হয় এবং একটী বৃহদায়তন কূপ খনিত হয়। এই স্মৃতি-মন্দিরাদির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে কলিকাতা ও নানাস্থান হইতে অনেক সাহিত্য-সেবী কৃত্তিবাসের ভিটায় উপস্থিত হন; মাননীয় বিচার-পতি শ্রীযুক্ত সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহোদয় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া প্রতিষ্ঠা-কার্য্য শেষ করেন। মহা-সমারোহে উৎসব-কার্য্য শেষ হয়। তাহার বিবরণ আমরা 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত করি।

তার পর এই তিন বৎসরের মধ্যে আর কোন উৎসবেরই আয়োজন হয় নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় নদীয়াতে থাকিলে বোধ হয় এমন হইত না; কিন্তু তিনি চলিয়া যাওয়ায় কৃত্তিবাস-উৎসব বন্ধ থাকে। এবার সৌভাগ্যক্রমে প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয় কৃষ্ণনগরের ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং স্বর্গীয় রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর বাহাদুরের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় রাণাঘাটের ডিপুটী। এই দুই-জন সাহিত্যিকের উৎসাহে উকীল নগেন্দ্রবাবু আবার উৎ-সাহিত হইয়া উঠেন; এবং অক্লান্তকর্ম্মা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় উৎসব সম্পাদনের সমস্ত ভার গ্রহণ করেন। তাই বিগত ২৯শে মার্চ্চ তারিখে কৃত্তিবাস অঙ্গনে উৎসবের আয়োজন হয়। কৃষ্ণনগর, রাণাঘাট, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক ভদ্রলোকের সমাগম হয়। এই উপলক্ষে যে সভার অধিবেশন হয়, তাহাতে অবসর-প্রাপ্ত সিবিল সার্জ্জন, বিখ্যাত সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত রায় দীননাথ সান্যাল বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। আমরাও এই সভায় উপস্থিত ছিলাম।

এবার ত কৃত্তিবাস-স্মৃতি-উৎসব হইয়া গেল। কিন্তু এ ভাবে সভা করিয়া উৎসব করা আমাদের আর ভাল বোধ হয় না। আমরা সভাস্থলেই প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে, প্রতি বৎসর মাঘ মাসের কোন এক দিনে সভা হয় হউক, তাহাতে আপত্তি নাই; কিন্তু উৎসবের স্থায়িত্ব-বিধান করিতে হইলে, এই স্থানে বর্ষে-বর্ষে একটী মেলা করা কর্ত্তব্য। প্রথম দুই-তিন বৎসর মেলা বসাইতে কিছু-কিছু ব্যয় হইবে; তাহার পর আর কিছুই করিতে হইবে না,—নির্দ্দিষ্ট দিনে বিনা বিজ্ঞাপনে, বিনা নিমন্ত্রণেই মেলা বসিবে। মহাকবি কৃত্তিবাসের স্মৃতি এই ভাবেই রক্ষিত হওয়া শোভন বলিয়া

আমরা মনে করি। সুখের বিষয় এই যে, সকলেই এ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। আগামী বৎসরে মেলার আয়োজন হইবে বলিয়া আমরা আশা করিতে পারি। রাণাঘাটের নগেন্দ্র-সুরেন্দ্র-প্রমুখ মহোদয়গণ চেষ্টা করিলেই এ কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারিবে।

এত দিন পরে কলিকাতা সাহিত্য-পরিষৎ-ভবনে কবিবর নবীনচন্দ্রের মর্ম্মর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। সে দিন এই প্রতিষ্ঠা-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত স্যার আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় মূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করেন। এই উপলক্ষে তিনি যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহা স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। আমরা অনেকের স্মৃতি-রক্ষার জন্য সভা সমিতি করিয়া থাকি, কার্য্য-নির্ব্বাহক কমিটীও গঠিত হয়; প্রথম দুই-চারি দিন একটু চেষ্টা-চরিত্রও হয়, কিছু অর্থও সংগৃহীত হয়। তাহার পর আমাদের যেমন দস্তুর, আর কোন সাড়া-শব্দ বড়-একটা পাওয়া যায় না। নবীনচন্দ্রের স্মৃতি-প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধেও আমাদের সেই আশঙ্কাই হইয়াছিল। ভগবানের কৃপায় কবিবরের মর্ম্মর-মূর্ত্তি সে দিন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আমরা আনন্দিত হইয়াছি। কিন্তু এখনও আরও কয়েকটী প্রতিশ্রুতি কার্য্যে পরিণত করিতে বাকী আছে। তাহার মধ্যে রমেশচন্দ্র-স্মৃতি-মন্দির ও বঙ্কিমচন্দ্রের মর্ম্মর-মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠাই প্রধান। এ বিষয়ে সকলকে চেষ্টা করিবার জন্য আমরা অনুরোধ করিতেছি। গিরিশচন্দ্রের মর্ম্মর-মূর্ত্তি নির্ম্মাণের জন্য ভাস্করকে আগাম টাকা দেওয়া হইয়াছে, এ কথা পর্য্যন্ত আমরা শুনিয়াছি। কিন্তু অনেক দিন চলিয়া গেল, আর ত কোন সাড়া-শব্দ নাই।

আর একটা সংবাদ দিলেই সভার কথা শেষ হয়। পরলোক-গমনের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমাদের কবি দ্বিজেন্দ্রলাল এক দোল-পূর্ণিমায় তাঁহার ভবনে পূর্ণিমা-সম্মিলন করেন। তাহার পর কিছুদিন প্রতি পূর্ণিমায় নানা স্থানে, নানা সাহিত্যিকের ভবনে পূর্ণিমা-সম্মিলন হয়; কলিকাতার সাহিত্যিকগণ প্রত্যেক পূর্ণিমা-সম্মিলনে উপস্থিত হইয়া আমোদ-আনন্দ উপভোগ করেন। কিন্তু ধীরে-ধীরে কি জন্য বলিতে পারি না, পূর্ণিমা-সম্মিলন উঠিয়া গেল। একা শুধু অমর "নাট্যরথী দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয় বৎসরান্তে এক পূর্ণিমায় তাঁহার জনকের স্মৃতি-উদ্দেশ্যে সম্মিলনের আয়োজন করেন। আর কোন পূর্ণিমায় দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিষ্ঠিত সেই উৎসবের আয়োজন হয় না। আমরা বড়ই আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, কলিকাতা হইতে যে অনুষ্ঠান অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে, গঙ্গার অপর-পারস্থিত শালিখার উৎসাহী যুবকবৃন্দ তাঁহাদের গুরুস্থানীয় দ্বিজেন্দ্রলালের কীর্ত্তি রক্ষার জন্য বিগত দোল-পূর্ণিমার দিন শালিখায় সেই পূর্ণিমা-সম্মিলনের আয়োজন করিয়াছিলেন; এবং অতঃপর প্রতি পূর্ণিমাতেই তাঁহারা সম্মিলিত হইবেন স্থির করিয়াছেন। শালিখার উৎসাহী যুবকগণের এই চেষ্টা সফল হউক, ইহাই ভগবানের নিকট আমাদের প্রার্থনা। শালিখার যুবকগণ এই উপলক্ষে কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠ, গান-বাজনা এবং জলযোগের প্রচুর আয়োজন করিয়াছিলেন এবং দোল-পূর্ণিমার জন্য আবীরেরও ছড়া-ছড়ি হইয়াছিল। এই পূর্ণিমা-সম্মিলন দেখিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের গৃহে দোল-পূর্ণিমার প্রথম উৎসবের কথাই আমাদের মনে হইয়াছিল, এবং সর্ব্বশেষে যখন একজন সুগায়ক দ্বিজেন্দ্রলালের সেই অমর গীতি 'মহাসিন্ধুর ও-পার হতে' মধুর স্বরে গান করিলেন, তখন দ্বিজেন্দ্রলালের আবির্ভাব যেন সকলেই অনুভব করিতে লাগিলেন।

গত ১লা মার্চ্চ তারিখে "ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী"র পুরস্কার-বিতরণ-সভায় সভাপতির আসনে বসিয়া কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি শ্রীযুক্ত সার জন উডরফ কতকগুলি বড় সুন্দর কথা বলিয়াছেন। তাহার মধ্যে তিনি আমাদিগকে আমাদের অতীত কথা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন, এবং সেগুলি মনে রাখিতে বলিয়াছেন। তাঁহার উক্তির সার মর্ম্ম এই যে, "They (স্কুল-কলেজের ছেলেরা) come out of their schools and colleges without knowing anything of their past" (তাহারা তাহাদের অতীত কালের কোন কথা না জানিয়াই, না শিখিয়াই স্কুল-কলেজ হইতে বাহির হয়); যাহারা সংস্কৃত পড়ে না, তাহারা ভারতের সাহিত্যের কোন খবর রাখে না; মুসলমানদের

তারতে আগমনের সঙ্গে-সঙ্গে ভারতের ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে। "পাইওনীয়ারে"র কথা উদ্ধৃত করিয়া তিনি বলিয়াছেন, ভারতীয় ছাত্রেরা সাধারণতঃ তাহাদের নিজের মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভ করিয়া বি-এ উপাধি লাভ করিতে পারে না—সে সুযোগই তাহাদের নাই। ভারতবর্ষ সুদূর অতীতে যে জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিল, আধুনিক শিক্ষা-প্রণালীর মধ্যে তাহার একটা স্থান থাকে, বক্তা মহোদয় ইহাই দেখিতে চান।

———

অতঃপর সভাপতি মহাশয় স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষকে স্কুল-বাড়ীর দেওয়ালগুলিতে বালি ধরাইয়া তাহার উপর ভারতীয় শিল্পীদের দ্বারা ভারতের অতীত ইতিহাস হইতে পার্থিব ও ধর্ম্ম-সংক্রান্ত ঘটনাবলীর দৃশ্যগুলি চিত্রিত করাইয়া লইতে পরামর্শ দিয়াছেন। তার পর তিনি বলিতেছেন, "Your students will then both live in the atmosphere of beauty, that is, beauty in a form which will be a constant suggestion to themselves of their Indian past and a stimulus to faith in their Indian future." অর্থাৎ আপনাদের ছাত্রেরা তখন এমন একটা সৌন্দর্য্যময় আব-হাওয়ার মধ্যে বাস করিবে যাহা তাহাদিগকে সর্ব্বদা ভারতের অতীত কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া ভারতের ভবিষ্যৎ গঠনে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবে।

———

সর্ব্বশেষে তিনি বলিয়াছেন, "There is much more in such things than some imagine. Suggestion occupies a great part in education. Up to now, the suggestion which has been almost uniformly made to your young is, that they belong to a people who have done nothing in the past, or at any rate nothing to compare with the magnificent achievement of Western nations—that their civilisation is an inferior one and so forth. This has been so dinned into their ears that many have come in time to believe in it. Such think that their only hope of salvation is to give up an inheritance which is worthless, and to sit at the foot of some Western Guru or other, and to receive from them the Mantra of his civilisation. Well, if suggestion can be made, it is possible to make a counter suggestion. Show to your youth what their forefathers have done, and you will give them faith in themselves; for, you put before them a warrant for such faith. What has been done, it is within the bounds of possibility to do. They will then themselves be in a position to break the spell which has been cast upon them. For this purpose Art is perhaps a more valuable ally than any others." অর্থাৎ, ঐরূপ বিষয়ের (পূর্ব্বোক্ত চিত্রাবলীর) প্রভাব খুব বেশী; এত বেশী যে অনেকের কল্পনারও অতীত। শিক্ষার ব্যাপারে এইরূপ ইঙ্গিত (suggestion) খুব বেশী কাজ করিয়া থাকে। এ পর্য্যন্ত তোমাদের যুবকগণকে ক্রমাগত একইভাবে এইরূপ ভাবের ইঙ্গিত করা হইতেছে যে, তাহারা যে জাতির অন্তর্ভুক্ত, সেই জাতি অতীত কালে কিছুই করিয়া যাইতে পারে নাই; অন্ততঃ এমন কিছুই করে নাই,—পাশ্চাত্য জাতিসমূহের কৃত গৌরবময় কার্য্যের সহিত যাহার তুলনা হইতে পারে। তাহাদের সভ্যতা অতি নীচুদরের; এবং এই রকম সব ইঙ্গিত। তাহাদের কাণের কাছে এই ধরণের কথা এতবার ঢাক বাজাইয়া বলা হইয়াছে, যে, এখন অনেকেই সে সব কথা বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা মনে করে যে, তাহারা তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের নিকট হইতে উত্তরাধিকার-সূত্রে যাহা পাইয়াছে, তাহা অতি অকিঞ্চিৎ-কর; তাহা ত্যাগ করিয়া কোন পাশ্চাত্য গুরুর কিম্বা অপর কাহারও পদতলে বসিয়া তাহাদের নিকট হইতে সভ্যতার মন্ত্র গ্রহণ ছাড়া তাহাদের মুক্তি লাভের উপায়ান্তর নাই। আচ্ছা, যদি ইঙ্গিত করা চলে, তা' হইলে ত পাল্টা রকমেরও একটা ইঙ্গিত করা যায়! তোমাদের যুবকদের দেখাইয়া দাও, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কি

করিয়া গিয়াছেন। তাহা হইলে তোমরা তাহাদের হৃদয়ে তাহাদের নিজেদের প্রতি বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারিবে; কেন না, এরূপ বিশ্বাস উৎপাদনের উপযোগী উপাদান তোমরা তাহাদের সামনে ধরিয়া দিতেছ। পূর্ব্বে যাহা করা হইয়াছে এখনও তাহা করা অসম্ভব নয়। তখন, তাহারা যে মন্ত্র-শক্তির মোহে অভিভূত হইয়া রহিয়াছে, তাহা তাহারা নিজেরাই ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারিবে। এই উদ্দেশ্যে অন্য সকল বিষয়ের অপেক্ষা (Art) কলা-শিল্পই সমধিক উপযোগী।

—·—

অধুনা য়ুরোপে যুদ্ধে লিপ্ত জাতিসমূহের মধ্যে এবং ভারতবর্ষে আমাদের এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে যে self-determinationএর ধূয়া উঠিয়াছে, ইহা কি তাহাই? জানি না। কিন্তু সে যাহাই হউক, এই পূর্ব্ব পুরুষের গৌরবের অনুভূতি যে সকল দেশে সকল সমাজের লোককে আত্ম-প্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত করে, ইহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে "ধ্রুব" নামক অধুনা-লুপ্ত একখানি ছেলেদের মাসিক পত্রের শিশু পাঠক-পাঠিকাগণকে গল্পচ্ছলে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। 'কিশোর' নামক পুস্তকে সে সকল কথা প্রকাশিত হইয়াছে। আরও অনেক স্থলে অনেকে এরূপ চেষ্টা করিয়াছেন—আমাদের মধ্যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষের গৌরবময় স্মৃতি জাগরিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে যে কোন ফল হইতেছে, এমন কোন লক্ষণ ত দেখিতে পাইতেছি না। পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহে আমরা এখনও এমন আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছি যে, আমরা কোন কালে যে আমাদের নিজেদের বুঝিতে পারিব, এরূপ আশা পর্য্যন্ত করিতে সাহস হয় না। সার জন উডরফ মহাশয়ের এই উপদেশে কোন ফল ফলিবে কি না, তাহা ভবিতব্যতাই বলিতে পারেন।

পুস্তক-পরিচয়

ঠাকুরের কথা

শ্রীমৎস্বামী যোগবিনোদ মহারাজের শ্রীমুখকমল-নিঃসৃত, বিনা মূল্যে বিতরিত।

নামেই প্রকাশ, এখানি পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের কথা। তাঁহার অমৃতময়ী বাণী যত অধিক প্রচারিত হয়, জীবের পক্ষে ততই মঙ্গল। সিমুলতলার শ্রীযোগবিনোদ আশ্রম হইতে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রকাশিত হইয়া বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে। কলিকাতা আহীরীটোলার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ধর মহাশয় যাবজ্জীবন এই পুস্তকখানি বিনামূল্যে বিতরণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ভক্তের উপযুক্ত কাজই হইয়াছে। অল্প সময়ের মধ্যে ইহার তৃতীয় সংস্করণ হইয়া গিয়াছে। ঠাকুরের কথা সকলেরই পাঠ করা উচিত। আর ঠাকুরের যে সকল ভক্ত সিমুলতলায় বিহার-প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিয়াছেন এবং বিনা-মূল্যে এমন বাণী বিতরণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেই বিহার-প্রতিষ্ঠার জন্য সকলেরই যথাসাধ্য সাহায্য করা কর্ত্তব্য। পুস্তকের প্রাপ্তিস্থান সিমুলতলা আশ্রম, ই, আই, আর।

কৃষ্ণাবতার-রহস্য

শ্রীভুবনেশ্বর মিত্র কৃত, মূল্য আট আনা।

আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। শ্রীযুক্ত মিত্র মহাশয় বহুদর্শী প্রবীণ লেখক। আমরা বহুকাল হইতে তাঁহার লেখা পাঠ করিয়া আসিতেছি। বর্ত্তমান পুস্তকে তিনি কৃষ্ণাবতার রহস্যের আলোচনা করিয়াছেন। সমাজের অজ্ঞ ও গতানুগতিক প্রকৃতির লোকদিগের মধ্যে পূর্ব্ব-প্রচলিত এবং বংশানুক্রমে আচরিত বৈদিক ও স্মার্ত্তিক ধর্ম্মকর্ম্মের পরিবর্ত্তে অধুনা কৃষ্ণের নামে যে সকল সহজসাধ্য উপধর্ম্ম ও সাধন প্রণালী প্রচারিত হইয়াছে, তাহার যাজন করিতে গিয়া সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা, অনিষ্ট ও পাপের স্রোত অবাধে প্রবাহিত হইতেছে দেখা যায়, তাহার প্রতিরোধ বা প্রশমনের জন্য মিত্র মহাশয় নানা শাস্ত্রালোচনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অবতার-রহস্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। লেখক মহাশয়ের ধর্ম্মানুরাগ, অনুসন্ধিৎসা ও বিচার-প্রণালী সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে শ্রীকৃষ্ণের অবতারবাদ সম্বন্ধে সমস্ত বিবরণ বিশদভাবে হৃদয়ঙ্গম হইবে। আমরা এই পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

ওথেলো

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু-অনূদিত, মূল্য এক টাকা।

মহাকবি সেক্‌স্‌পীয়রের ম্যাকবেথ নাটক বহু পূর্ব্বে নটরাজ গিরিশচন্দ্র অনুবাদ করিয়াছিলেন, এবং স্বয়ং রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া তাহার অভিনয় করিয়াছিলেন। সে অনুবাদ পাঠ করিয়া লোকে ধন্য-ধন্য করিয়াছিল; এমন সুন্দর অনুবাদ তাঁহারই পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছিল। তাহার পর এতদিন আর কেহ সেকস্‌পীয়রের কোন নাটকের অনুবাদ করিতে প্রয়াস করেন নাই। এবার গিরিশচন্দ্রের উপযুক্ত সহযোগী, বঙ্গ-সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রথিতযশাঃ প্রবীণ লেখক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র বাবু 'ওথেলো' নাটকের অনুবাদ করিলেন। ষ্টার রঙ্গমঞ্চে এই নাটকখানি অভিনীতও হইতেছে। আমরা নাটকখানির আদ্যন্ত পাঠ করিয়াছি,—অনেক সুন্দর স্থল মূল গ্রন্থের সহিত মিলাইয়াও পাঠ করিয়াছি। আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি, অনুবাদ মূলানুগত হইয়াছে; এবং ঠিক ঠিক অনুবাদ করিয়াও মূলের সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া প্রবীণ লেখক মহাশয় যে কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা অনন্যসাধারণ। পুস্তকখানি বাঙ্গালী পাঠকগণের নিকট যে যথেষ্ট আদর লাভ করিবে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র বাবুর চেষ্টা, যত্ন ও অর্থব্যয় সার্থক হইয়াছে।

পথে-বিপথে

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি-আই-ই প্রণীত, মূল্য আট আনা।

এখানি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স প্রকাশিত আট আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার ষট্‌ত্রিংশ গ্রন্থ; সুপ্রসিদ্ধ লেখক ও স্বনামধন্য শিল্পী শ্রীযুক্ত ঠাকুর মহাশয় সর্ব্বজন-পরিচিত; তাঁহার শিল্পকলার প্রতিষ্ঠা যেমন জগদ্ব্যাপী, তাঁহার সাহিত্য-লিপি-কুশলতাও তেমনি বাঙ্গালী পাঠক-সমাজে আদৃত। সুতরাং এই 'পথে-বিপথে' যে ভাল হইয়াছে, সুধু ভাল নহে, বাঙ্গালা গল্প-সাহিত্যে একখানি অমূল্য রত্ন, তাহা আর বলিতে হইবে না। সবগুলি গল্পই মনোরম, সবগুলিই একেবারে নূতন সৌন্দর্য্যে ভূষিত। এমন বর্ণনা-কৌশল, এমন রহস্য-পটুতা, আর এমন সূক্ষ্ম-দৃষ্টি কমই দেখিতে পাওয়া যায়। কোন্‌টী রাখিয়া কোন্‌টীর নাম করিব—সবগুলিই উৎকৃষ্ট।

জীবনের পথে

শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল প্রণীত, মূল্য দেড় টাকা।

এখানি উপন্যাস। লেখক শ্রীযুক্ত অনিলবাবু এক্ষেত্রে নূতন নহেন; তাঁহার 'পৈতৃক সম্পত্তি' 'শুকতারা' প্রভৃতি উপন্যাস তাঁহাকে সাহিত্য-ক্ষেত্রে পরিচিত করিয়াছে। 'জীবনের পথে' উপন্যাসখানির আখ্যানভাগ যেমন মনোরম, অনিলবাবুর রচনা-প্রণালীও তেমনই প্রশংসার্হ। তিনি কোথাও অনাবশ্যক কথার অবতারণা করেন নাই। সেই জন্যই এই উপন্যাসখানি পড়িতে আনন্দ বোধ হয়। চরিত্র-চিত্রনও বেশ হইয়াছে। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া সকলেই আনন্দিত হইবেন।

মনাক্কা

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত, মূল্য পাঁচ সিকা।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় সুলেখক; তাঁহার পুস্তকাবলী বঙ্গীয় পাঠক-সমাজ যথেষ্ট আদর লাভ করিয়াছে। এই 'মনাক্কা' তাঁহার প্রথম গল্প-পুস্তক; তাই আমরা বিশেষ আগ্রহের সহিত পুস্তকখানি পাঠ করিয়াছি। আমরা বলিতে পারি, এই উপন্যাসখানি সাধারণ উপন্যাসশ্রেণী হইতে অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। উপন্যাসের ঘটনা-সংস্থান সুন্দর; চরিত্র-বিশ্লেষণও বেশ হইয়াছে; ভাষা ঝরঝরে, কোন প্রকার আড়ম্বর নাই। পুস্তকখানির ছাপা, কাগজ ও বাঁধাইও উৎকৃষ্ট। উপন্যাস-পাঠকগণ এই 'মনাক্কা'র রসাস্বাদন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিবেন।

শিবচন্দ্র দেব ও তৎ-সহধর্ম্মিণীর আদর্শ জীবনালেখ্য

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ এম-এ, বি-এল সঙ্কলিত; মূল্য আড়াই টাকা।

মহাত্মা শিবচন্দ্র দেবের নাম শিক্ষিত বাঙ্গালীর পরিচিত। তিনি রাজকার্য্যে যেমন যশস্বী হইয়াছিলেন, দেশের কার্য্যেও তেমনি একাগ্র চিত্তে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন। কেবল যে ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিকল্পেই তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তির নিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা নহে; তাঁহার জন্মস্থান কোন্নগরের সমস্ত সদনুষ্ঠান, সমস্ত উন্নতির মূলেই তিনি ছিলেন। তাঁহার একাগ্রতা, তাঁহার অধ্যবসায়, তাঁহার ধর্ম্মপিপাসা অনুকরণীয়। এমন মহাত্মার ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর জীবন কথা পাঠ করিলে উপকৃত হওয়া যায়।

সাহিত্য-সংবাদ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম-এ প্রণীত "ছড়া ও গল্প" নামক শিশুপাঠ্য পুস্তকের চতুর্থ সংস্করণ বাহির হইল; মূল্য ছয় আনা।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দরবেশ প্রণীত "সামসন্ধ্যা গাথা" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য চারি আনা।

শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "বারিবাহিনী" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য দেড় টাকা।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় প্রণীত ঐতিহাসিক রচনা "চুনার" প্রকাশিত হইল; মূল্য দশ আনা।

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকারের "জ্যোতিষ ও যোগতত্ত্ব" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য দেড় টাকা।

শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস প্রণীত "মায়ের আশীর্ব্বাদ" বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হইবে।

মল্লিদার সম্পাদিত "রহস্য পিরামিড সিরিজের" ষষ্ঠ ও সপ্তম গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। উহার নাম যথাক্রমে "রহস্য-কণিকা" ও "একসপ্তাহ"। মূল্য প্রতি গ্রন্থ সিল্কের বাঁধাই ১।০ ও কাগজের মলাট—১্।

শ্রীযুক্ত নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত ষ্টারে অভিনীত "মুখের মত" প্রহসন প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ছয় আনা।

শ্রীযুক্ত কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "ভিখারিণী শৈল" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য বারো আনা।

শ্রীযুক্ত প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত "শ্রীবৃন্দাবন শতক" দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল; মূল্য আট আনা।

শ্রীযুক্ত জলধর সেন প্রণীত "বড় বাড়ী"র তৃতীয় সংস্করণ, "পথিকে"র তৃতীয় সংস্করণ ও "হিমালয়ে"র ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

ডাক্তার স্যার শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার মহাশয় এবার কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলারের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই বেসরকারী নিয়োগে বাঙ্গালার সর্ব্বসাধারণ সন্তোষ লাভ করিয়াছেন।

আর একটী আনন্দের সংবাদ এই যে, ডাক্তার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের মহীশূর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলারের পদে নিযুক্ত হইবার খুবই সম্ভাবনা আছে; এবং বাঙ্গালোর হইতে এই মর্ম্মের একটী সংবাদও কলিকাতায় আসিয়াছে।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "বিরাজ বৌ" এবং "বিন্দুর ছেলে"র হিন্দী সংস্করণ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্তৃক শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

চিত্র-পরিচয়।

শিল্পি শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্রে শ্রীরাধার পটে 'প্রথম' শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন চিত্রিত হইয়াছে; ঐ চিত্র এবার 'চিত্রদর্শন' নামে প্রকাশিত হইল। সুনিপুণা বিশাখা নিজে মদনমোহন রূপ আঁকিয়া কৌতূহল-পরায়ণা রাধাকে দেখাইতেছেন। শিল্পির চারু তুলিকায় মুগ্ধা রাধার স্থির নেত্রে প্রণয়ের প্রথম উচ্ছ্বাস অবিকল অঙ্কিত হইয়াছে। রাধা সাজিয়া চণ্ডিদাস গায়িয়াছিলেন—

"হায় সে অবলা হৃদয় অবলা
ভালমন্দ নাহি জানি,
বিরলে বসিয়া পটেতে লিখিয়া
বিশাখা দেখাল আনি।"

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works,
9, Nanda K. Chaudhuri's 2nd Lane, CALCUTTA.

অর্ঘ্য

[শিল্পী—শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহা

(Engraved at the Bharatvarsha Office).

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬

দ্বিতীয় খণ্ড] ষষ্ঠ বর্ষ [ষষ্ঠ সংখ্যা

বেদমাতা

[শ্রীদ্বিজদাস দত্ত এম-এ]

বেদমাতা সন্তানের নিকটে সুবিচার আশা করেন।

সায়ণ, যাস্কের বাক্যের উল্লেখ করিয়া, তাঁহার ঋগ্বেদ-ভাষ্যের উপোদ্ঘাতে বলিতেছেন, "বিদ্যা হবৈ ব্রাহ্মণমাজগাম, গোপায় মা শেবধিষ্টেঽহমস্মি"—বিদ্যা বা বেদ ব্রাহ্মণের নিকটে আসিয়া বলিয়াছিল—'আমাকে রক্ষা কর, আমি তোমার পক্ষে অমূল্য রত্নস্বরূপ।' ব্রাহ্মণগণ বেদমাতার প্রতি কিরূপ সুবিচার করিয়াছিলেন, কিরূপ যত্ন সহকারে বেদমাতার রক্ষা সাধন করিয়াছিলেন,—দেশে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে, বেদের লোপই তাহার প্রমাণ। আজ এই বিংশ শতাব্দীতেও বেদমাতা কি তাঁহার সন্তানদিগের নিকটে সুবিচার আশা করিতে পারেন না? পারেন। তবে একটু অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে। সে কি? তাহাই একটু বিস্তারিত করিয়া বর্ণন করিতেছি।

পুরাতন ক্রমবিকাশবাদ (Darwinism) জগতের অতীত সম্বন্ধে, মানবজাতির পূর্ব্ববস্থা সম্বন্ধে, এক প্রকার আতঙ্ক উপস্থিত করিয়াছিল। বিলাতে শুনিয়াছিলাম যে, দারউইন (Darwin) একদিন পথে বেড়াইতেছিলেন; তখন কারলাইলও (Carlyle) আর একজন বন্ধুর সঙ্গে সেই পথে বেড়াইতেছিলেন। কারলাইলের সঙ্গে দারউইনের কোন পরিচয় ছিল না। কারলাইলের বন্ধু দূর হইতে অঙ্গুলী সঙ্কেত দ্বারা দারউইনকে দেখাইয়া কারলাইলকে বলিলেন, 'ঐ লোকটী দারউইন, তিনি বলেন বানর পিতা হইতে আদিম মানুষের জন্ম।' ঐ কথা শুনিবামাত্র কারলাইল আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিলেন না; তিনি দৌড়িয়া দারউইনের নিকটে গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি না কি বলিয়া থাকেন, বানর

হইতে মানুষ জন্মিয়াছে ?" দারউইন বলিলেন "হাঁ।" কারলাইল অমনি বিরক্তিসূচক ভ্রূকুটী করিয়া চলিয়া গেলেন।

প্রাকৃতিক মনোনয়ন এবং শিক্ষার প্রভাবে (Natural selection and training) বানর পিতা হইতে মানুষ জন্মিতে পারে, কারলাইলের মত মনীষীও এ কল্পনা মনে স্থান দিতে পারেন নাই। কিন্তু পাশ্চাত্য জগৎ তখন দারউইনের মোহে পড়িয়াছিল। বন্যার মুখে ডিঙ্গি নৌকার ন্যায় কারলাইলের মত মনীষীদিগেরও মত ভাসিয়া গিয়াছিল।

অজ্ঞাতসারে হউক, অথবা জ্ঞাতসারে হউক, দারউইনের ক্রমবিকাশবাদ এই বিংশ শতাব্দীতেও আমাদের বেদমাতার পক্ষে তাঁহার সন্তানদিগের নিকটে সুবিচার লাভের কিরূপ অন্তরায় হইয়াছে, তাহা ভাবিলেও হৃদয় ব্যথিত হয়।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী অতীত হইল, মোক্ষমূলারের সঙ্গেও দারউইনের একটু সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। তখন আমরা কলেজের ছাত্র। সেই সংঘর্ষের নিদর্শন মোক্ষমূলারের গ্রন্থেই আমরা পাইয়াছিলাম। বেদের মার্জ্জিত সুললিত ভাষার প্রতি, এবং বৈদিক ঋষিদিগের হৃদয়োন্মাদকারী তত্ত্বজ্ঞানোদ্দীপক কবিত্বের প্রতি দৃষ্টি করিয়া, এবং সেই সঙ্গে অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক ধাতু (পাণিনির মতে প্রায় দুই হাজার) হইতে আর্য্য জাতীয় পৃথিবীময়-ব্যাপ্ত ভাষা সকলের শব্দরাশির উৎপত্তির প্রতি দৃষ্টি করিয়া, মোক্ষমূলার স্বীকার করিতে পারিলেন না যে, বানর হইতে প্রাকৃতিক মনোনয়ন দ্বারা (Natural Selection) বাহ্য অবস্থা (Environments) এবং শিক্ষার প্রভাবে মানুষ উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু সেই প্রবল বন্যার মুখে মোক্ষমূলারের আপত্তি অতি অকিঞ্চিৎকর বিবেচিত হইয়াছিল। এমন কি, আমরা নিজেরাও বিদ্যার অভিমানে স্ফীত হইয়া দারউইন প্রকাশিত খদ্যোতালোকে তখন ভাবিতাম যে, বৈদিক সময়ের লোক যখন আমাদের তুলনায় বানরত্বের বহু সহস্র বৎসর অধিক নিকটবর্ত্তী, তখন তাঁহারা আমাদের মত প্রতিভাশালী অথবা তত্ত্বদর্শী কিরূপে হইবেন ? তাঁহাদের রচিত বেদের, আমাদের মত গুণধরদিগের নিকটে, কি মূল্য হইতে পারে ! এই হেতুবাদের উপরে দাঁড়াইয়া আমরাও সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম যে, বৈদিক ঋষিগণ তত্ত্বজ্ঞান অথবা সূক্ষ্মজ্ঞান লাভের অনধিকারী ছিলেন। আমরাও তখন মনে-মনে মোক্ষমূলারের বিরুদ্ধে দারউইনের পক্ষে মত দিয়াছিলাম। এইরূপে বেদ সম্বন্ধে আমাদের রজ্জুতে সর্পভ্রম হইয়াছিল। এখন ভ্রম বুঝিয়াছি। কিন্তু এখনও কি সে পূর্ব্বের নেশা ছুটিয়াছে, পূর্ব্বের সর্পভ্রম দূর হইয়াছে ? আমাদের নেশা ছুটিয়া থাকুক আর নাই থাকুক, এখন আর পূর্ব্বের মত আতঙ্কের কোন প্রকৃত কারণ নাই।

মেণ্ডেল (Mendel), ডিব্রাইজ্ (Devries), বার্বেঙ্ক্ (Berbank) প্রভৃতি মনীষিগণ তাঁহাদের বীজ-বিদ্যার (Embryology) অনুশীলন দ্বারা যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে আতঙ্কের আর কোন প্রকৃত কারণ নাই। মানুষ আর আপনাকে বানর পিতার সন্তান কখনো মনে করিতে পারিবে না,—প্রাকৃতিক মনোনয়ন দ্বারা বানর-সন্তান মানব-সন্তান হইতে পারে, এরূপ আর কখনো মনে করিতে পারিবে না। বৈদিক ঋষিগণ বীজের বিকাশে "ত্বষ্টা"র অথবা "অগ্নির" লীলা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া বলিতেছেন,—"ত্বষ্টারূপানিহি প্রভুঃ পশুন্ বিশ্বান্ সমানজে" (১-১৮৮-১); রূপনির্ম্মাণকর্ত্তা ত্বষ্টা রূপের প্রভু। তিনিই বীজের ভিতরে বসিয়া সকল প্রাণীর রূপ ব্যক্ত করেন। "ত্বং গর্ভো বীরুধাং জজ্ঞিষে-শুচিঃ (২-১-১৪)—হে জগৎ-প্রকাশক অগ্নি, তুমি শুচি বা বা রূপরহিত, আবার তুমিই লতাদির গর্ভস্থানীয় হইয়া জন্মগ্রহণ কর। "ত্বষ্টারূপানি পিংশতু" (১০-১৮৪-১); রূপনির্ম্মাণকর্ত্তা ত্বষ্টা বীজের ভিতরে বসিয়া রূপাবয়ব সকল বিকাশ করুন। মেণ্ডেল প্রভৃতি আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও সৃষ্টি-বিকাশের ভিতরে (Germ plasm) বীজের মাহাত্ম্য (১) দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছেন।

---

(১) "It is a universal tendency in all living protoplasm to exhibit variations. The germ-plasm is spontaneously variable. No parent ever produces a a germ cell."

"The individual is practically the trustee of the germ cells but not the maker." Adaptation (i.e., Evolution) depends almost exclusively on sponta-

প্রাকৃতিক মনোনয়ন-বলে এবং শিক্ষার ব্যবস্থা এবং বাহ্যাবস্থার আনুকূল্যে বানর মাতা-পিতা হইতে মানবের পিতৃপুরুষের উৎপত্তি হইয়াছিল, এই ভ্রান্ত সংস্কার আধুনিক বীজবিজ্ঞান (Embryology) দূর করিতেছে। কিন্তু সাধারণের মন হইতে ঐ ভ্রান্ত সংস্কারের মূল এবং পুরাতন আতঙ্ক এখনও সম্যক্‌রূপে দূর হয় নাই। এই ভ্রান্ত সংস্কার একবার যাহার মনকে অধিকার করিয়াছে, এ কথাও তাহার মনে সহজেই স্থান পাইবে যে, অন্ততঃ চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বের বৈদিক ঋষি—যিনি আমাদের অপেক্ষা বানর জীবনের এত অধিক নিকটবর্ত্তী,—তিনি জ্ঞান বিষয়ে কখনও বিংশ শতাব্দীর লোকের সমান হইতে পারেন না,—শিক্ষা এবং বাহ্যাবস্থাজনিত (Training and environment) পরম্পরাগত (Cumulative) উন্নতির সম্বন্ধে ত নিশ্চয়ই নয়, স্বভাবসিদ্ধ প্রতিভা এবং আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ "সাক্ষাদ-পরোক্ষাৎ" (Immediate or Intuitive) জ্ঞান লাভেও বৈদিক ঋষিগণ বিংশ শতাব্দীর সভ্যতাভিমানী নরপুঙ্গবদিগের বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তির পাত্র হইতে পারে না। আধুনিক সভ্য জগৎ এই ভ্রান্ত এবং অন্ধ সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া, আজও বৈদিক ঋষিদিগকে তাঁহাদের ন্যায়তঃ প্রাপ্য শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদান করিতে পারিতেছেন না। তাহারই একটী দৃষ্টান্ত আমরা পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি।

পৌরাণিক 'অদিতি' একজন স্ত্রীলোক,—কশ্যপের দুই স্ত্রীর এক স্ত্রী। হয় ত কশ্যপের অদিতি নামে একজন স্ত্রী ছিল। কিন্তু বৈদিক অদিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন—অনন্ত অনির্ব্বাচ্যস্বরূপ ঈশ্বরের নাম—পিতা এবং মাতা উভয় নামে অভিহিত। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলেই আমরা দেখিতে পাইতেছি, ঋষি গৌতম বলিতেছেন, "অদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরীক্ষমদিতির্মাতা স পিতা সপুত্রঃ বিশ্বে দেবা অদিতিঃ, পঞ্চজনাঃ অদিতির্জাতমদিতির্জানিত্বং।" (১-৮৯-১০) "অদিতি দ্যুলোক, অদিতিই অন্তরীক্ষলোক, অদিতিই মাতা বা নির্ম্মাণকর্ত্তা, অদিতিই পিতা বা পালনকর্ত্তা, অদিতিই পুত্র বা রক্ষাকর্ত্তা, অদিতিই বিশ্বদেবগণ, অদিতিই পঞ্চপ্রদেশীয় গন্ধর্ব্বাদি পঞ্চজনগণ, যাহা কিছু জন্মলাভ করিয়াছে, তাহা অদিতি এবং জন্ম-ব্যাপারও অদিতি। আবার ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলে ঋষি ত্রিতআপ্ত্য (যাহার নাম জেন্দাবেস্তাতেও পাওয়া যায়) বলিতেছেন,—"অদিতির্ন উরুষ্যত্বদিতিঃ শর্ম্ম যচ্ছতু। মাতামিত্রস্য রেবতোর্য্যম্ণো বরুণস্য চানেহসো ব উতয় স্থ উতয়ো ব উতয়ঃ"। (৮-৪-৯)—অনন্ত অনির্ব্বাচ্য অদিতি আমাদিগকে রক্ষা করুন, অদিতি আমাদিগকে কল্যাণ দান করুন। তিনি আলোকের অধিষ্ঠাতা, মিত্রের নির্ম্মাণকর্ত্তা—তিনি কল্যাণের আকর, অর্য্যমার নির্ম্মাণকর্ত্তা, তিনি অন্ধকারের অধিষ্ঠাতা, বরুণেরও নির্ম্মাণকর্ত্তা। তাঁহা হইতে তোমরা পাপরহিত রক্ষা সকল প্রাপ্ত হও! তোমাদের রক্ষা সকল সুন্দর হউক, তোমাদের রক্ষা সেরূপই হউক! ইহা কি একেশ্বরবাদের পরাকাষ্ঠা নয়? যাস্ক মতে অদিতি শব্দ দীঙ্‌ ধাতু হইতে, সায়ন মতে দো ধাতু হইতে; পাণিনি বলেন, 'দীঙ্‌'—ক্ষয়ে, এবং 'দো' অবখণ্ডনে। যাস্ক বলেন:—

"অদিতিঃ সকল প্রপঞ্চ ধার নেষদীনা ন খিদ্যতে।"—সকল প্রপঞ্চ ধারণ করিয়াও অদিতি খিন্ন হইতেছেন না।—তিনি আমাদিগকে উপদেশ করিতেছেন যে, বেদের অর্থ গ্রহণ করিতে হইলে 'ন সংস্কারমাদ্রিয়েত অর্থোনিত্যঃ-পরীক্ষেতঃ', শুধু পূর্ব্ব-সংস্কারের উপর নির্ভর করিবে না, নিত্য অর্থ পরীক্ষা করিবে। 'দো' ধাতু হইতে সায়ন অর্থ করিতেছেন, "অখণ্ডনীয়" বা অপরিচ্ছেদ্য বা অনন্ত। মোক্ষমূলার তাহার ঋগ্বেদের অনুবাদে (P. II, 242 to 245) এই অদিতি সম্বন্ধে বলিতেছেন যে, "অদিতিই (২) জগতে অনন্ত এবং অনির্ব্বাচ্যের (The Infinite and "The

---

neous variations. No embryo and no individual ever made germ cells The latter existed first. The individual inherits nothing from his parents. It is impossible to alter germ plasm."

—Dr. Leighton's Embryolgy.

(২) Aditi is in reality the earliest name invented to express the Infinite; not the Infinite as the result of the long process of abstract reasoning. But the visible Infinite visible as it were to the naked eye beyond the clouds, beyond the sky, one might almost say but for fear of misunderstanding the Absolute. For it is derived from Diti bond, and the negative particle, and meant therefore originally what

Absolute") প্রথম নামকরণ। এ সাক্ষ্য অতি মূল্যবান্। তাঁহার মত একজন খৃষ্টবাদীর পক্ষে এইরূপ সাক্ষ্যদান বেদ-মাতার পক্ষে সামান্য গৌরবের কথা নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সেই সাক্ষ্যের সঙ্গে-সঙ্গেই পণ্ডিতবর একটু দুর্ব্বলতার অথবা ভয়েরও পরিচয় দিয়াছেন। "For fear of misunderstanding"! কি জানি পাছে লোকে ভুল বুঝে এই ভয়ে! এই কথা বলাতে আমা-দিগকে দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে যে, মোক্ষ-মূলারও যেন বেদমাতার ন্যায়তঃ প্রাপ্য সম্মান দিতে সাহসী হইতেছেন না! কেন সাহসী হইতেছেন না? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি নিজেই বলিতেছেন, "এই 'অদিতি' নাম এবং অনন্ত, অনির্ব্বাচ্যের এই ধারণা একেবারে আধুনিক (decidedly modern) মনে হয়। তিনি বলিতেছেন, বেদ সেই অখণ্ডস্বরূপ অদিতিকে দেবগণের মাতা রূপে উল্লেখ করিতেছে দেখিলে, অত্যন্ত বিস্মিত হইতে হয়।(৩)

এ উল্লেখে ভয়ের অথবা বিস্ময়ের কি কারণ হইতে পারে? এত আদিম কালের লোক আমাদের তুলনায় বানরত্বের এত অধিক নিকটবর্ত্তী লোক,—এত আধুনিক সত্য লাভ করিতে পারে, মোক্ষমূলারও ইহা বিশ্বাস করিতে কুণ্ঠিত! ইহা কি দারুইনিজমের বিষময় ফল নয়? এমন কি, মোক্ষমূলারের কথাতেই মনে হয় যে, তিনি বেদমাতাকে একেশ্বরবাদী বলিতে ইচ্ছুক, কিন্তু লোক-ভয়ে তাহা করিতে সাহসী হইতেছেন না (৪)। বিস্ময়েই হউক, অথবা ভয়েই হউক, স্থানান্তরে তিনি বেদে অর্দ্ধ-একেশ্বরবাদের (Henotheism) কলঙ্ক আরোপ করিয়া বেদমাতার প্রতি অবিচার করিয়াছেন। হায়, মোক্ষমূলারের মত উদারচেতা তত্ত্বদর্শী মনীষীর নিকটেও বেদমাতা তাঁহার ন্যায়তঃ প্রাপ্য মর্য্যাদা পাইলেন না! সে যাহা হউক, তিনি যে এইটুকু স্বীকার করিয়াছেন যে, বৈদিক 'অদিতি'ই জগতে অনন্তের (Infinite) বুদ্ধি-মনের অগোচরের (Absolute),—কোরাণ যাহাকে বলে "আল্লা", হোসমদ্" —প্রথম নামকরণ, এবং তিনি যে এ কথাও স্বীকার করিতেছেন যে, যে গোতম ঋষির অন্তরে এই 'অদিতি' নামের মহিমা প্রথমে প্রকাশিত হইয়াছিল, তিনিই জগতের প্রথম একেশ্বরবাদী, এজন্যও আমরা প্রাণের সহিত তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছি।

অনন্ত এবং অনির্ব্বাচ্যের (The Infinite and the Absolute) ধারণা সম্বন্ধেই বেদমাতা জগতের ধর্ম্মগুরু, শুধু এ কথা স্বীকার করিয়াও মোক্ষমূলার নিরস্ত হন নাই। অতীন্দ্রিয় শক্তির (Force বা Energy) এবং শক্তিমানের ধারণা সম্বন্ধেও মোক্ষমূলার বেদমাতাকে জগতের আদি গুরু বলিয়া স্বীকার করিতেছেন,—

"অসচ্চ সচ্চ পরমে ব্যোমন্ দক্ষস্য জন্মন্নদিতেরুপস্থে।"

ঋ ১০-৫-৭

বেদমাতা বলিয়াছেন,—"সদসদাত্মক এই জগৎ পরম বা সর্ব্বোত্তম চিদাকাশে অবস্থিত, যেথানে অনন্ত স্বরূপ অদিতির ক্রোড়ে দক্ষ বা বলের (Creative energy) জন্ম। দক্ষ অর্থে যাস্ক বলিতেছেন—'বলং'—'দক্ষ ইতি মকারন্তং বল নাম।' পাণিনি বলিতেছেন—'দক্ষ বৃদ্ধৌ শীঘ্রার্থেচ।'

এই 'দক্ষ' বা অব্যক্ত শক্তি বা অতীন্দ্রিয় শক্তিমান্ সম্বন্ধে মোক্ষমূলার বলিতেছেন—"বৈদিক ঋষিগণ 'অদিতি' নামে অনন্তের ধারণা করিয়াও দেখিলেন, তাহারও পরে আরও কিছু রহিয়াছে, এবং তাহাকে তাঁহারা 'দক্ষ' নাম প্রদান করিলেন, যাহার অর্থ শক্তি বা শক্তিমৎ। এ সকল এত আধুনিক বোধ হয় যে, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। *

is free from bonds of any kind, whether of space or time, free from physical weakness, free from moral guilt.

(৩) To us such a name and such a conception seem decidedly modern, and to find in the Veda Aditi, the Infinite as the mother of the principal gods, is certainly, at first sight startling.

(৪) We may not be justified in saying that there ever was a period in the history of the religious thought of India, a period preceding the worship of the *Adityas*, when Aditi, the Infinite, was worshipped, though to the sage who first coined the name, it expressed, no doubt, for a time the principal, if not the only object of his faith and worship.

* * সৎ এবং অসতের ধারণা হিন্দুদিগের অতি প্রাচীন সময় হইতেই সুপরিচিত, এবং তাহা তাহাদের নির্ব্বিশেষের চিন্তার বিকাশের ফল ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। অতএব শক্তি (Power or Potentia) অর্থে এই দক্ষের ধারণাও তাহাদিগের নির্ব্বিকারের চিন্তার বিকাশের ফল হওয়াই সম্ভব" (৫) ইত্যাদি। 'সৎ' এবং 'অসতের' ভেদবুদ্ধি 'পরম ব্যোম' বা বিশ্বাতীত চিদাকাশের ধারণা, অনন্ত, অনির্ব্বাচ্যের ধারণা, এবং পরিশেষে 'দক্ষ' বা বলের (Potential Energy) ধারণা, এ সকলই বেদমাতার সুপরিচিত। ইহা অপেক্ষা উচ্চতর একেশ্বরবাদ কি হইতে পারে? পাশ্চাত্য সংশয়বাদীদিগের, হৈতুকদিগের (Deist) অথবা কুবেরের উপাসকদিগের (Mammon-worshippers) একেশ্বরবাদ ইহার তুলনায় জল্পনা-কল্পনার খেলা মাত্র, মানস-পৌত্তলিকতামাত্র, প্রকৃত একেশ্বরবাদের ছায়ামাত্র।

"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।" (১-২২-২০) বৈদিক ঋষিদিগের এই সাক্ষাৎ অপরোক্ষ দর্শন-জনিত একেশ্বরবাদের তুলনায় পাশ্চাত্যদিগের জল্পনার একেশ্বরবাদ অর্দ্ধ-একেশ্বরবাদ (Hœnotheism) আখ্যা পাইবারও অযোগ্য। কিন্তু মোক্ষমূলারের সিদ্ধান্ত তাহার বিপরীত! তিনি আসলকে নকল, সাচ্চাকে ঝুটা এবং নকলকে আসল, ঝুটাকে সাচ্চা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া বৈদিক ঋষিদিগের অপরোক্ষানুভূতিমূলক একেশ্বরবাদের উপরেই অর্দ্ধ-একেশ্বরবাদের কলঙ্ক আরোপ করিয়াছেন। আমরা প্রকৃত অবস্থা সাধারণের সমক্ষে, জগতের সকল ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সমক্ষে উপস্থিত করিয়া, বিনীত ভাবে নিবেদন করিতেছি, যে, তাঁহারা মুসলমান হউন, খৃষ্টান হউন, অথবা বৌদ্ধ হউন, অন্ততঃ মোক্ষমূলারের সাক্ষ্যের উপরে নির্ভর করিয়া, যেন বিনা বিচারে কেহ বেদমাতার উপরে বহু-ঈশ্বরবাদের অথবা অর্দ্ধ-একেশ্বরবাদের কলঙ্ক আরোপ না করেন। যদি মোক্ষমূলারের কথাই সত্য হয়, অদিতি যদি সত্য-সত্যই জগতে অনন্ত এবং অনির্ব্বাচ্যের (The Infinite and the Absolute) প্রথম নামকরণ হয়, এবং বৈদিক 'দক্ষ'ই যদি নির্ব্বিশেষ বা অব্যক্ত শক্তির (Force) প্রথম নামকরণ হয়, তবে খৃষ্টান, মুসলমান অথবা বৌদ্ধ, কেহই যেন আমাদের সঙ্গে একপ্রাণ হইয়া, "বেদোঽখিলো ধর্ম্ম মূলং হি" বলিতে লজ্জা বোধ না করেন।

(৫) "There was something beyond that Infinite which the Vedic poets called Daksha, literally power or the powerful. All this, no doubt, sounds strikingly modern.........The ideas of being and not-being are familiar to the Hindus from a very early time in their intellectual growth and they can only have been the result of abstract speculation. Therefore *daksha*, too, in the sense of Power or Potentia, may have been a metaphysical conception. But it may also have been suggested by mere accident of language, a never-failing source of ancient thoughts."

—M. M. Vedic Hymns, 1—246 to 247.

গুপ্ত ব্যথা

[শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল্,]

(কবিবর রবীন্দ্রনাথের বিদায় অভিশাপ অনুসরণে)

যখন আসিলে কচ 'ফিরি' দেবলোকে
মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা করি' অধ্যয়ন,
স্বর্গ-জ্যোতির্ম্ময় হ'ল তোমারি আলোকে,
তবু তুমি অশ্রুজলে ভরিলে নয়ন;
দেবরাজ সমাদরে বসাইলা পাশে,
উর্ব্বশী-উল্লাসে আসি' পরাইল মালা,
সকলে সম্ভ্রমভরে তোমারে সম্ভাষে;
তবু না নিবিল তব হৃদয়ের জ্বালা,
এ মহা আনন্দ দিনে রহিলে নীরব,
হাসি-বাঁশী-গান কিছু পশিল না প্রাণে,
ব্যর্থ বলি' মনে হ'ল সকল উৎসব,
চিত্তে তব জাগে শুধু এ কথা কে জানে
দূরে বেন্দুমতী তীরে সে কুটীরখানি
ম্লান মুখে বসি' যথা আছে দেবযানী।

ইমানদার

[শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রামটহলকে ঘরের মধ্যে পাঠাইয়া, ফৈজু নিজে চৌকাঠের কাছে দাঁড়াইয়া থাকিয়া—কেমন করিয়া চাদর প্রভৃতি বদলাইয়া খাটের বিছানা ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া ঠিক করিয়া দিতে হইবে, সে সব দেখাইয়া দিতে লাগিল। রামটহল এ সব বিদ্যায় তেমন পটু নয়;—তবে ছোটবাবু বাড়ীতে থাকিলে, তাহাকেই এ সব কায করিতে হয়। কিন্তু, হইলে কি হইবে,—সতর্কতা ও মনোযোগের অভাবে তাহার কায কোনকালেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইত না। তাই ফৈজু তাহার ভুল সংশোধন করিতে লাগিল।

বিছানা গুছাইতে রামটহল অনেক গলদ ঘটাইল। গদী ও তোষক সোজা করিয়া পাতা হইল, ত—চাদরখানা বাঁকিয়া কুঁচ্‌কাইয়া রহিয়া গেল। ফৈজু বকিয়া-ঝকিয়া অনেক কষ্টে সেটাও সোজা করাইল। তার পর ফৈজুর নির্দ্দেশ-মত বালিশ সাজাইয়া দিয়া, সে হাঁপ ছাড়িয়া ঘর ঝাঁট দিতে আরম্ভ করিল।

ফৈজু নিশ্চিন্ত হইয়া পিছন দিকে একবার চাহিয়া দেখিল কেহ আসিতেছে কি না;—তার পর নিম্নস্বরে ডাকিল, "রামটহল!"

রামটহল ঝাঁট দিতে-দিতে, মুখ তুলিয়া বলিল,—"কি রে?"

ফৈজু একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—"সত্যি এসেছে?"

দাঁত বাহির করিয়া এক গাল হাসিয়া রামটহল বলিল, "গঙ্গা-মাই কিরিয়া—হামি মিছে বল্‌বে কেন?—আজ পাঁচ-সাত রোজ হোল তোর বিবি এসেছে,—তোর শ্বশুর বি এসেছিল, আবার চলে গেল। তাই তো তোর বাপ গোমিস্তাবাবুকে বল্লে যে, ছোটবাবুর সাৎ ফৈজুকে জরুর্ আনে লিখ্ দাও—বুঝ্‌লি!—জরুর্।" রামটহল আবার হাসিয়া উঠিল!

সলজ্জ হাস্যে একটু তাড়া দিয়া ফৈজু বলিল, "নে—নে, দিল্‌লাগী রাখ্।—ঝাঁট দিয়ে নে। একটু চটপট্ নে,—তুই বড়া সুস্‌ত আদ্‌মী টহল!"

দন্ত-বিকাশ করিয়া বিদ্রূপের স্বরে রামটহল বলিল, "হঃ! হামি সুস্‌ত হোবে বৈ কি, তুহার আজ জরুরী তলব্‌কা দিন আছে, না? তিনো বরষ্—"

সহাস্য অধর-প্রান্ত দাঁতে চাপিয়া, ফৈজু একটু অগ্রসর হইয়া বলিল, "তোমার মরণ বাড় হয়েছে—না? এবার চুপ্—নয় তো মজা দেখাব।"—সঙ্গে-সঙ্গে ঘুসী দেখাইল।

সভয়ে পিছু হটিয়া বসিয়া রামটহল বলিল, "না ভাই, না, তামাসা করব না, থাম্। কিন্তু সাচ্চা বল্‌ছি ফৈজু, তুই যেমন কপাল ঠুকে বেরিয়েছিলি, তেম্নি রঘুনাথজী তোর মুখ রেখেছেন,—বেচারা খুব আরাম হয়ে গেছে।"

পিছনের অন্ধকারের পানে চাহিয়া, একটু ম্লান হাসি হাসিয়া ফৈজু বলিল, "হুঁ, কপাল ঠুকেই বটে,—মোদ্দা ঠোক্কর লেগে কপালটা জখম্ হয়ে গেছেও বড় জবর্ রে!"

রামটহল ঝাঁটা রাখিয়া, ফৈজুর মুখ পানে চাহিয়া বলিল, "তোর বাপজীর গোসার কথা বল্‌ছিস্? আরে রাখ্—ও বুড়ো দুনীয়ার বাজারে তো গোসা ছাড়া আর কিছুই শেখেনি! নিজের আওরাতের বেমার, তার দাওয়াই, হাকিমের খরচ যোটাবার জন্যে তুই মিরাট যাস্, মক্কা যাস্, আর কাবুল যাস্, তাতে তোর বাপজীর অত গোসা কেন? এই তো, ভাগ্যে দু' বছরের জন্যে চাকরী করতে গিয়েছিলি, তাই তো—"

অসহিষ্ণু ভাবে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ফৈজু বলিল, "থাম, থাম, রামটহল, ওখানে আমাদের কোন কথা কইবার নাই, চুপ কর।"

রামটহল চুপ করিল, কিন্তু একেবারে নয়। একটু থামিয়া বলিল, "তোর বাপ এখন তোর উপর ততটা নারাজ্ নাই, এখন অনেকটা সিধে হয়ে গেছে, বুঝ্‌লি—"

নিঃশব্দে একটা ব্যথিত নিঃশ্বাস ফেলিয়া ফৈজু বলিল, "হুঁ বুঝেছি।" তার পর একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল, "তুই বেরিয়ে আয়।"

ঝাঁট সমাপ্ত করিয়া, ঝাঁটা লইয়া রামটহল বাহির হইল। ফৈজু আলো লইয়া আগে-আগে চলিল।

বারেণ্ডায় আসিয়া দেখিল, সুনীল তখন চা লইয়া বসিয়াছে। ফৈজুকে দেখিয়া কৌতুক-স্মিত মুখে সুনীল বলিল, "নাও, গুণ্ডার ঘাড় ভেঙ্গে খুব বীরত্ব করে নিয়েছ, এবার ফলারে বস।"

সুমতি পিছন ফিরিয়া বসিয়া চিঁড়ে ধুইতেছিলেন; সুনীলের কথা শুনিয়া ফৈজুর দিকে চাহিয়া স্নেহময় ভর্ৎসনায় স্বরে বলিলেন, "বীরত্ব তো নয়, আকাট গোঁয়ার্ত্তুমী! আচ্ছা ফৈজু, তোমার ঐ মারামারি-পেটাপেটি করবার ঝোঁক্‌টা কত দিনে যাবে বল দেখি" ?—

ফৈজু চোখ নীচু করিয়া অপ্রস্তুত ভাবে একটু হাসিল, কোন উত্তর দিল না। সুনীল এক ঢোঁক চা গিলিয়া কাপ্‌টা নামাইয়া বলিল, "ফৈজু তো ও কথার সোজ-সুজি জবাব দিতে পারবে না, আমি দিচ্ছি শোন, ফৈজু বলেছে যে—"

ব্যস্ত হইয়া ফৈজু বলিল, "হ্যাঁ, ফৈজু বলেছে যে,—দেখুন ছোটবাবু, দোহাই আপনার, অমন করে যা-তা বলে আমার ঘাড়ে বদ্‌নামের বোঝাটি চাপাবেন না।"

বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া সুনীল বলিল,—"এঃ এইটে বদ্‌নামের বোঝা! তুমি সে দিন বল্লে না বাপু আমায়, যে যদি ফকীর-সন্নিসী হয়ে সংসার ছাড়্‌তে পারি, তাহলে সংসার সম্বন্ধে উদাসীন হব; আর না হলে, যে দিন কবরের নীচে যাব, সেই দিন সংসারের মানুষের জবরদস্তির অন্যায়কে চোখ মেলে দেখা, আর হাত তুলে বাধা দেওয়া ছেড়ে দেব? তুমি বলেছ কি না বল?"

ফৈজু যেন সে কথা শুনিতেই পাইল না এমনি ভাবে পিছন ফিরিয়া অকস্মাৎ সুগভীর বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, "ঐ, দিদি আপনি বসে-বসে কচ্ছেন কি? আরে বাস্, অত চিঁড়ের ওপর অত মুড়ি! তুলুন, তুলুন,—সমস্ত মুড়ি সরিয়ে নেন, ঐ চিঁড়েতেই ঢের হবে, ঐ আমার তিন দিনের খোরাক। এই টহল, চিঁড়েটা নীচে নিয়ে আয়।" বলিয়াই চৌকাঠ ডিঙ্গাইয়া তড়্‌-তড়্ করিয়া সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া সটান নীচে চলিল,—পিছনের ব্যস্ত আহ্বানে কাণ দিল না।

একটু পরে রামটহল আলো ও খাদ্যসামগ্রী লইয়া নীচে বারেণ্ডায় আসিয়া দেখিল, ফৈজু অন্ধকারে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। রামটহল একটু রাগত ভাবে বলিল, "আবার আমায় দিয়েই খাবার বয়ে আনালি? আমায় না কষ্ট দিলে তোর সুখ হয় না, না?"

ফৈজু হাসি-হাসি মুখে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না—" তার পর সেইখানেই বসিয়া পড়িয়া বলিল, "দে, খেয়ে নিই!"

রামটহল বলিল, "আর এখানে বসে খেয়ে কি হবে? যাও,—বাড়ী গিয়ে একেবারে খেয়ে-দেয়ে নিশ্চিন্তি হয়ে ঘুমোও গে!"

ফৈজু একটু হাসিয়া বলিল, "দাঁড়া, আগে খাওয়া তো হোক্; তারপর—" খাদ্যসামগ্রী লইয়া ফৈজু ক্ষিপ্র-হস্তে খাওয়া সুরু করিল।

অগত্যা রামটহলও এক ছিলিম তামাকুল্ সাজিতে বসিল। এবং সঙ্গে-সঙ্গে গ্রামের ছোট-খাটো অনেক খবর একটানা ছন্দে উদ্গীর্ণ করিয়া চলিল। কোন নবাগত মানুষকে পাইলেই রামটহল আগে গাঁয়ের খবর পাড়িত।

যথাসম্ভব শীঘ্র খাওয়া শেষ করিয়া আঁচাইয়া আসিয়া, ফৈজু জামার পকেট হইতে দুই কুচি সুপারী বাহির করিয়া মুখে দিয়া, রামটহলের দিকে চাহিয়া বলিল, "এখন তুই কি সারারাত বসে-বসে তামাকই ফুঁক্‌বি না কি?"

রামটহল একটু পরিহাসের সুরে উত্তর দিল, "তা আর কি করব বল,—আমার তো আর কোথাও জরুরী তলব নেই যে, লাঠি ঘাড়ে নিয়ে ছুটতে হবে—কাজেই—"

ফৈজু বলিল, "বেশ, বসে-বসে রাত-ভোর তামাক টানো, আমি ততক্ষণ একটু ঘুমিয়ে নিই—" বলিয়াই রাম-টহলের বিছানার অর্দ্ধেকটুকু দখল করিয়া, নিজের গায়ের কাপড়খানি খুলিয়া আপাদ-মস্তক মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল।

রামটহল মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "ওতে আমার কোনই লোকসান নেই মিঞা সাহেব,—কিন্তু নিজের হিসাব বুঝে—"

ফৈজু কোন উত্তর দিল না। মিনিট দশেক পরে

রামটহল হুঁকা নামাইয়া রাখিয়া আসিয়া বলিল, "ওঠ! তোকে বিদেয় করে ফটকে চাবি দিয়ে আসি।"

ফৈজু গায়ের কাপড়ের ভিতর হইতেই উত্তর দিল, "তুই শুয়ে পড়, আমার ভারী ঘুম পেয়েছে—এখন আর বাড়ী যেতে পারি না।"

রামটহল একটু ধমক দিয়া বলিল, "ওঠ্‌—ওঠ্‌, বাড়ী যা,—ভারী ঘুম শিখেছে ছোক্‌রা! যা, বাপের সঙ্গে দেখা করগে—" সে ফৈজুকে উঠাইবার জন্য টানাটানি জুড়িয়া দিল।

মুখের উপর হইতে কাপড় সরাইয়া, ফৈজু একটু হাসিয়া বলিল—"কেন মিছে হাঙ্গামা করছিস্‌! এই তিন পহর রাত্রে বাড়ী গিয়ে বাড়ীশুদ্ধ ঘুমন্ত মানুষগুলোকে জাগিয়ে একটা হৈ চৈ করা—সে আমার দ্বারা হবে না। তুই শুয়ে পড়—সত্যি আমি যাব না।"

রামটহল সবিস্ময়ে বলিল, "সত্যি যাবি না? দ্যাখ ফৈজু, তোর বাপ রাগ করবে কিন্তু—"

"সে কাল শুনব তখন—" বলিয়া ফৈজু পাশ ফিরিয়া ঘুমের উদ্যোগ করিল। রামটহল আরও কিছুক্ষণ চেষ্টা করিয়া, পরাস্ত হইয়া শেষে নিজেও নিদ্রা-চেষ্টিত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঠিক তখন ছটা বাজিয়াছে। ফৈজু বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া, রামটহলকে টানিয়া তুলিল। ফৈজুর ভয়ে রামটহল শীতের জন্য কোন আপত্তি করিতে সাহসী হইল না,—'আহা উহু' শব্দে কিছু-কিছু কাতরোক্তি করিয়া, বিছানা গুটাইয়া, ঘর ঝাঁট দিয়া, পূর্ব্ব-সংগৃহীত নিম-কাঠির দাঁতন বাহির করিয়া ফৈজুকে একটা দিল, নিজে একটা লইল। তার পর দুজনে দাঁত মাজিতে-মাজিতে বাহিরে চলিল।

ফটক খুলিয়া রাস্তায় বাহির হইতেই ফৈজু দেখিল, লাঠি-ঘাড়ে, পাগড়ী-মাথায়, তাহার বৃদ্ধ পিতা গায়ে কম্বল জড়াইয়া, সুস্থূল নাগরা পায়ে খট্‌-খট্‌ করিয়া আসিতেছেন। বৃদ্ধের বয়স পঞ্চাশের উপর; কিন্তু শরীরের বাঁধন খুব শক্ত, সুদৃঢ়। বৃদ্ধের সে দৃঢ়তার কাছে অনেক ব্যায়ামকুশলী যুবকের বলিষ্ঠতাও পরাভব মানে। রং টুকু উজ্জ্বল গৌর,—ফৈজুর অপেক্ষা ফর্সা। মুখশ্রীতে পিতা-পুত্রের যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। তবে বৃদ্ধের সুপক্ক ভ্রূ, খরোজ্জ্বল দৃষ্টি এবং দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠাধরে বেশ একটা অন্যায়-অসহিষ্ণু, কঠোর রুক্ষতার ভাব পরিব্যক্ত। মুখে ধব্‌ধবে শাদা চাপ-দাড়ি,—মাথায় পাগড়ীর নীচে বিশাল টাক। বৃদ্ধের মুখে-চোখে যদিও একটা স্তব্ধ নিষ্ঠুরতার ভাব নিঃশব্দ-গাম্ভীর্য্যে বিরাজমান বটে, কিন্তু তবুও তাঁহার চাল-চলনে বেশ সুন্দর, সরল, শিষ্টতা-সম্ভ্রমপূর্ণ—সেই পুরাতন যুগের আদব-কায়দা-দুরুস্ত ব্যবহারের পরিচয় প্রকাশ পাইত।

পুত্রকে দেখিয়া, অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া বৃদ্ধ স্নেহ-কোমল কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "বাপ্‌জান যে! কখন এলি রে?"

ফৈজু সসম্ভ্রমে নত হইয়া পিতাকে যথোচিত অভিবাদন করিয়া বলিল, "কাল রাত দুটোর সময় এখানে এসে পৌঁছেছি—ছোটবাবুও এসেছেন, উপরে ঘুমুচ্ছেন।"

বৃদ্ধ বলিলেন "তবিয়ত ভাল আছে বাবুর?"

ফৈজু বলিল "হাঁ—"

বৃদ্ধ বলিলেন, "তা, তোদের বাড়ী পৌঁছাতে এত রাত হোল কেন? গাড়ী ধর্‌তে পারিস নি বুঝি? দু—টা—য় এসে বাড়ী পৌঁছালি! উঃ! রাত্রে তুই বাড়ী গেলি না কেন?" প্রশ্নটার সঙ্গে-সঙ্গে বৃদ্ধ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া পুত্রের মুখপানে চাহিলেন।

ফৈজু একটু কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, "খাওয়া-দাওয়া কর্‌তে রাত তিনটে বেজে গেল! তার পর তত রাত্রে—"

তাড়াতাড়ি মুখ হইতে দাঁতন সরাইয়া রামটহল উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিল, "পঞ্চাশবার বলেছি সর্দ্দারজী, পঞ্চাশবার বলেছি, মগর্‌, তোমার ছেলে—" বিস্তর যুক্তি-তর্ক খরচ করিয়া, মুখে-মুখেই একটা ফর্দ্দ প্রস্তুত করিয়া রামটহল বিজ্ঞতার সহিত প্রমাণসহ মন্তব্য প্রকাশ করিল যে, ফৈজুর মত এমন অবাধ্য পুত্র, কস্মিন কালে কোন পিতার কখনও হয় নাই—হইতেও রামটহল শুনে নাই! এই প্রথম সে দেখিল ও শুনিল!

ফৈজু নতমুখে নীরবে হাসিল।—রসিকটহলের কথাটা যে নিছক পরিহাস ছাড়া আর কিছুই নয়, সেটা বুঝিতে অবশ্য বৃদ্ধের বাকী রহিল না। কিন্তু তবুও তাঁহার অপ্রসন্ন, গম্ভীর মুখের ভাবটা দেখিয়া স্পষ্টই বোঝা গেল, পুত্রের ঐ আচরণটা তাঁহার মোটেই ভাল লাগে নাই। ক্ষণকাল গুম্‌ হইয়া কি ভাবিয়া—হঠাৎ বৃদ্ধ মুখ তুলিয়া চাহিয়া

বলিলেন, "তোর পুরোনো মনীব আগা সাহেব এখন কলকাতায় আছেন না কি ?"

প্রশ্নটার মধ্যে এমন কিছু ছিল, যাহা ফৈজুকে বেশ একটু পীড়া দিল। বিপন্নভাবে একটু ইতস্ততঃ করিয়া সে বলিল, "না, এখন তিনি জলন্ধরে গেছেন।"

বৃদ্ধ আর একটু বেশীমাত্রায় ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "তোর সঙ্গে দেখা হয়েছিল কল্‌কাতায় ?"

ফৈজু মুহূর্ত্তের জন্য একটু বিচলিত হইল; তার পর আত্মসংযম করিয়া বলিল,—"হাঁ হয়েছিল,—গড়ের মাঠে। ছোটবাবুও তথন সেথানে বেড়াতে গেছলেন্।"

অলক্ষিতে একটু ভ্রূকুটি করিয়া, ঈষৎ তীব্র স্বরে বৃদ্ধ বলিলেন, "মনীব কি বল্লে ? ফের চাকরী নেবার জন্যে ?"

এবার বেশ ধীর ভাবেই ফৈজু উত্তর দিল, "হাঁ বল্লেন; কিন্তু আমি জবাব দিলাম যে, আমার বাপজীর মত নাই,—মাপ করবেন।"

"বহুৎ আচ্ছা" বলিয়াই বৃদ্ধ সে প্রসঙ্গ ছাড়িয়া দিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "গোমস্তা বাবুরা তো কেউই এখনো আসেন নি দেখছি। আজ ফকীরপুরে বাকী খাজনা আদায়ে যেতে হবে,—ছোট গোমস্তা বাবু শুদ্ধ সঙ্গে যাবেন বলে রেখেছেন। যাই, তাঁর বাড়ীতে একটা হাঁক দিয়ে যাই,—আর অম্নি বলে যাই, মা'জীকে তোর জন্যে চাল নিতে।"

বৃদ্ধ যে পথে আসিতেছিলেন, সেই পথেই ফিরিয়া গেলেন। বৃদ্ধ দৃষ্টি-পথাতীত হইলে, রামটহল একটু মিহিসুরে বলিল—"হ্যারে ফৈজু, তা দুটি ভাতের জন্যে তুই কেন আর আজ কষ্ট করে বাড়ী যাবি,—আমিই না হয় দুটি ভাত দেব,—তুই আমার কাছেই থাক। রাজি ?"

চলিতে-চলিতেই রামটহলের ঘাড়ে এক মুষ্ট্যাঘাত বসাইয়া হাসিমুখে ফৈজু বলিল, "বহুৎ খুব!—যেথানে হোক একমুঠা দানা জুটলেই হোল—আমি খুব—খুব রাজি!"

সকরুণ মুখে ঘাড়ে হাত বুলাইয়া কপট কোপে রামটহল বলিল, "উঃ! কেয়া কড়া জান্ বাপ! তুই জাহান্নামে যা!"

হাসিয়া ফৈজু বলিল, "খাসা জায়গা! তবে তোর মত এমন ঘুম-কাতুরে, আল্‌সে-কুঁড়ে, স্ফূর্ত্তিবাজ বন্ধুটিকে ছেড়ে একলা তো যেতে পারবো না,—তোকে শুদ্ধ নিয়ে যাব দোস্ত!"

রামটহল কি একটা উচিত-মত সদুত্তর দিতে যাইতেছিল, এমন সময় সামনেই তাহাদের ছোট গোমস্তা মশাই—ছিপ্‌ছিপে লম্বা সুচিক্কণ-কান্তি যুবক রমণী মণ্ডলকে আসিতে দেখিয়া থামিল। রমণী মণ্ডল ফৈজুকে দেখিয়া উৎফুল্ল মুখে বলিল, "আরে, আরে,—এ কি দেখি! ভাই সাহেব আমার, পথ ভুলে এ কোথায় এসে পড়েছেন, এ্যাঁ!"

রমণী মণ্ডল পাঠশালা হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলা মাইনার স্কুলের কয় ক্লাশ পর্য্যন্ত ফৈজুর সঙ্গে একত্র পড়িয়াছিল। যৌবনেও সথ করিয়া কতদিন তাহার সহিত লাঠি খেলিয়াছে। এখন সে এই এষ্টেটের ছোট গোমস্তা—ফৈজুর পিতার উর্দ্ধতন স্থানীয় কর্ম্মচারী। ফৈজু তাঁহাকে সমীহ করিয়া চলিতে চায়, কিন্তু মণ্ডল মশাই সেই বাল্য সখ্যের জেরটা এখনও মিটিতে দেন নাই। কাযেই দুজনের মধ্যে বেশ একটু অন্তরঙ্গতা ছিল।

বন্ধুর কথা শুনিয়া ফৈজু রহস্যভরে উত্তর দিল—"তাই তো বটে! আমারো তাই সন্দেহ হচ্ছে! পথটা ভুল করে ফেলেছি, না মোড়ল মশাই?—যাক, বাড়ীর খবর বল, সব ভাল তো ?"

"ভাল—"বলিয়া একটু অর্থসূচক হাস্য করিয়া মণ্ডল মশাই বলিল, "এখন তুমি মহাপুরুষ, কি মনে করে গাঁয়ে এলে বল দেখি ?"

ফৈজু তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, "তোমার খোকা হয়েছে শুনলাম যে, তাই মিঠাই খেতে এলুম—নিয়ে এস মিষ্টি।"

মণ্ডল হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা শয়তান বটে! জবাবটি ঠোঁটের গোড়ায় যোগানই আছে ঠিক! আচ্ছা, খাওয়াব মিষ্টি,—এখন চল দেখি, ফকীরপুরের সামন্ত গোষ্ঠির সঙ্গে একবার মুলাখাৎ করে আসি! ওরা বড়ই দিক্‌দারি ধরিয়ে দিয়েছে ভাই,—চল তো আজ দুজনে গিয়ে একটা মোকাবিলা করে আসি!"

ফৈজু উৎসাহের সহিত বলিল, "চল—চল, আমি তৈরীই আছি,—তুমি চটপট্ চেক-দাখিলা, হিসেবপত্র বার কর,—আমি এখনই ঘাট থেকে ফিরে আস্‌ছি!"

আরও দু'-একটা কথার পর, প্রভু সুনীলকৃষ্ণের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া মণ্ডল চলিয়া গেল। রামটহল একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, "তোর বাপ যে ফকীরপুর যাবে বলে সেজে-গুজে বেরিয়েছে রে,—আবার তুইও চল্লি ?"

দাঁত মাজিতে-মাজিতে ফৈজু বলিল, "বাবা বুড়ো মানুষ, কোথায় কষ্ট করে যাবে,—তুই বলিস, ফৈজু গেছে গোমস্তা মশাইয়ের সঙ্গে,—তোমায় আর যেতে হবে না।"

রামটহল ক্ষণেকের জন্য নীরব রহিল; তার পর একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তোর বাপ এখানকার নগদীগিরি না ছাড়লে, তুই তো এখানে গোমস্তাগিরি করবি না! কিন্তু তোর বাপ যে বেঁচে থাকতে পুরোনো মনীবের চাকরী ছাড়বে না বলে কোট করে বসে আছে, এও তো বড় মুস্কিল! তোর বাপের উচিত এবার কাষ ছেড়ে দেওয়া—হাজার হোক ব্যাটা এখন লায়েক হয়েছে, কেন আর—"

ফৈজু একটু অসহিষ্ণু ভাবে বাধা দিয়া বলিল, "চুপ—চুপ রামটহল, তুই সব দেবতার নৈবিদ্যিতে ঠোকর দিয়ে বেড়াস নি ভাই, থাম!—নিমকহালাল চাকরই, পুরোনো মনীবের চাকরীর মান রাখে রে, নিমকহারামে রাখে না!—আমার বাবার কাযের উচিত-অনুচিত বাবা বুঝবে, আমি তার হিসাব খতাবার কে ভাই?"

রামটহল অপ্রস্তুত ভাবে নীরব রহিল। এ প্রসঙ্গের আর কোন উচ্চ-বাচ্য হইল না।

অল্পক্ষণ পরেই পুকুর-ঘাট হইতে হাত-মুখ ধুইয়া আসিয়া, লাঠি-পাগড়ীতে সসজ্জ হইয়া ফৈজু মণ্ডল মশাইয়ের সহিত ফকীরপুর যাত্রা করিল। তাহার পিতা তখনও ফিরিয়া আসেন নাই। ফৈজু রামটহলকে বলিয়া গেল, যেন ছোট বাবুকে ও তাহার পিতাকে তাহাদের ফকীরপুর যাত্রার কথা বলা হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ফকীরপুর হইতে ফিরিতে বেলা এগারটা বাজিয়া গেল। মণ্ডল মশাই কতকগুলা বাকী-খাজনার নালিশের আর্জ্জির নকল লিখিবার জন্য ফৈজুকে রাশিকৃত কাগজ গছাইয়া দিয়া পথ হইতেই বিদায় করিলেন; এবং নিজে কাছারী-বাড়ীতে বড় গোমস্তা হারাধন মিত্রের সঙ্গে দেখা করিতে চলিলেন। ফৈজু কাগজের তাড়া বগলে লইয়া নিজেদের বাড়ীর দিকে চলিল। জমিদারী-সেরেস্তার কায চলনসই রকম ফৈজু জানিত, বাঙ্গালা হস্তাক্ষরও তাহার পরিষ্কার ছিল, বাড়ীতে থাকিলে মামলা-মোকদ্দমার দলিল দস্তাবেজের অধিকাংশ লেখা নকলের ভারটা গোমস্তা বাবুদের অনুগ্রহে তাহার হাতে পড়িত। ইহার জন্য তাহার নির্দ্দিষ্ট পাওনাও অবশ্য একটা ছিল।

উঁচু-পাঁচিল-ঘেরা বাড়ীর দুয়ারের সামনে আসিয়া ফৈজু দুয়ারে ধাক্কা দিতে গেল; কিন্তু ভিতরে অর্গল ছিল না, দুয়ার তৎক্ষণাৎ খুলিয়া গেল।—বাড়ীর ভিতর পা দিয়াই ফৈজু দেখিল, পাশেই উঠানের কূয়া হইতে দড়ি টানিয়া একজন তরুণী জল তুলিতেছে। দুয়ার খোলার শব্দ পাইয়া সে চমকিয়া পিছন ফিরিয়া চাহিল। আগন্তুকের সহিত চোখোচোখি হইতেই সে ত্রস্তে মাথায় কাপড় টানিয়া, আরক্ত মুখে, সলজ্জ ভাবে দৃষ্টি ফিরাইল! অজ্ঞাতে একটু স্নিগ্ধ-কোমল হাসির রেখা আগন্তুকের অধর-প্রান্তে নিঃশব্দে ফুটিয়া উঠিল। নিঃশব্দে দুয়ার ভেজাইয়া দিয়া, কাগজের তাড়াটা নিকটস্থ রোয়াকের উপর নামাইয়া রাখিয়া, বিনাবাক্যে কুয়ার পাশে আসিয়া তরুণীর হাতের দড়িটা ধরিয়া সে বলিল, "তুমি সর,—আমি জল তুলে দিচ্ছি।"

প্রাণপণে চোখ দুটিকে নীচু করিয়া, মাথা নাড়িয়া, অস্ফুট স্বরে তরুণী বলিল, "না, আমি তুলতে পারি।"

হাসি-মুখেই স্নিগ্ধস্বরে ফৈজু বলিল, "সে আমিও দেখতে পেয়েছি। এখন সর দেখি, আমি তুলে নিই।"

আর কেহ হইলে কি হইত বলা যায় না; কিন্তু এ ক্ষেত্রে, এ সময়, ঐ মানুষটির এই অসঙ্গত অনুরোধের উত্তরে বেশী কিছু বাদানুবাদ করিবার মত অবিচলিত ধৈর্য্য বেচারী তরুণীর ছিল না। কাযেই বিপন্ন হইয়া এবার সে বিনাবাক্যেই দড়ি ছাড়িয়া, আর একটু ঘোমটা টানিয়া নিঃশব্দে প্রস্থানোদ্যত হইল। ফৈজু চকিত-নেত্রে একবার এদিক-ওদিক চাহিয়া, নিম্নস্বরে বলিল, "কেমন আছ এখন টিয়া?"

অত্যন্ত লজ্জা-কুণ্ঠিত হইয়া, তাড়াতাড়ি আরও একটু বেশী করিয়া ঘোমটা টানিয়া, স্খলিত চরণে গিয়া সে রান্না ঘরে ঢুকিয়া পড়িল,—ফৈজুর কথার কোন উত্তর দিল না।

বলিষ্ঠ বাহুর ক্ষিপ্র সঞ্চালন-কৌশলে তাড়াতাড়ি বালতী-কতক জল তুলিয়া বড় টব-তিনটা ভর্ত্তি করিয়া, বালতী ছাড়িয়া ফৈজু এক লাফে রোয়াকে উঠিয়া, কাগজের তাড়াটা বগলে তুলিয়া, উচ্চ কণ্ঠে ডাকিল "খলিফা—"

কেহ উত্তর দিল না। ফৈজু আবার ডাকিল, তবুও উত্তর পাওয়া গেল না। এবার সে আপন মনেই অনুচ্চ কণ্ঠে বলিল, "বাড়ীতে নাই বুঝি?"

ঘরে ঢুকিয়া কাগজের তাড়াটা খাটের উপর ফেলিয়া, রোয়াকের উপর হইতে নামিয়া সে রান্নাঘরে গেল। বাড়ীর দুয়ারের দিকে একবার চাহিয়া, রান্নাঘরে ঢুকিয়া বলিল, "খলিফা গেল কোথায়?"

তরুণী হাঁটুর ভিতর মাথা গুঁজিয়া চুপ করিয়া বসিয়া ছিল,—সেই অবস্থাতেই সে মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "নানীর বাড়ী।"

ফৈজু তাহার দিকে চাহিয়া ক্ষণেকের জন্য স্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "তোমার শরীর খারাপ হয়েছে না কি?"

সে তেমনি ভাবেই উত্তর দিল, "না।"

ফৈজু বলিল, "অমন করে বসে আছ কেন?"

এবার বেশ একটু জোরের সঙ্গেই উত্তর হইল, "খুসী!"

ফৈজু পরাভব মানিয়া হাসিল! স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, "খবর ভাল! এখন আমায় মাখবার জন্যে একটু তেল দেবে?"

মৃদুস্বরে উত্তর হইল, "দিচ্ছি।"

"নিয়ে এস তবে—" বলিয়া ফৈজু জামা খুলিতে-খুলিতে রোয়াক পার হইয়া বারেণ্ডায় গিয়া বসিল।

একটু পরে ছোট একটী বাটিতে তেল লইয়া গিয়া তরুণী বারেণ্ডায় ঢুকিল। ফৈজুর দিকে না চাহিয়াই, তাহার পায়ের কাছে হেঁট হইয়া তেলের বাটি নামাইয়া দিয়া, নিঃশব্দেই সে পুনরায় প্রস্থানোদ্যত হইল। ফৈজু খপ্ করিয়া তাহার হাত ধরিয়া একটু টান দিয়া, প্রসন্নোজ্জল দৃষ্টিতে তাহার মুখ পানে চাহিয়া স্মিত-হাস্যে বলিল—"কথাটার জবাব দিলে না? বল্লে না তুমি কেমন আছ?"

টান সামলাইতে না পারিয়া তরুণী বসিয়া পড়িল। দেয়ালের পিঠে ঠেস্ দিয়া, মুহূর্ত্তের জন্য নীরব থাকিয়া,—অকস্মাৎ কিশোর-তারুণ্যের লাবণ্য-শ্রী-মাখান, শ্যামোজ্জল সুন্দর মুখখানি তুলিয়া, প্রশ্নকর্ত্তার মুখের উপর অভিমান-সজল দৃষ্টি স্থাপন করিয়া, একটু বেগের সহিত উত্তর দিল, "খুব ভাল!"

ফৈজু হাসি-হাসি মুখে তরুণীর পানে চাহিয়া নীরবে গোঁফে তা দিতে সুরু করিল,—আর কোন কথা বলিল না। যেন তাহার প্রশ্নের পালা এইখানেই সমাপ্ত হইয়া গেল!

ঘন স্পন্দিত বুকে, সুগভীর ভর্ৎসনা-গঞ্জিত স্বরে তরুণী পুনশ্চ বলিল, "কি এমন মস্তবড় মর্‌বার্ অসুখটা আমার হয়েছিল শুনি, যার জন্যে এত কাণ্ড, এত কার-খানা! কই, মরে তো যাই নি!"

ফৈজু তেমনি হাসি-হাসি মুখেই সংযত স্বরে উত্তর দিল "তার জন্যে দায়ী আমার কিসমৎ, আর হাকিম সাহেবদের চেষ্টা—"

একটু উত্তেজনার সহিত তরুণী বলিল, "মুখ্থে আগুন হাকিম সাহেবদের চেষ্টায়! তোমায় যেমন পেয়েছিল ভাল মানুষ, তেম্নি ঘাড় ভেঙ্গে কতকগুলো টাকার শ্রাদ্ধ করে নিয়েছে!—না হয়, মরে যেতুম, যেতুমই! তার জন্যে তোমার অত দূরে যাবার কি দরকার ছিল?" একটু থামিয়া রুদ্ধ-কণ্ঠে বলিল "যদি সত্যি মরেই যেঁতুম, তাহলে তো তোমার সঙ্গে আর দেখাই হোত না!" কথাটার সঙ্গে-সঙ্গে তাহার চোখ আবার উচ্ছলিত অশ্রুতে ভরিয়া গেল!

এবার ফৈজুর হাসি বন্ধ হইল। ঈষৎ বিচলিত ভাবে স্ত্রীকে কাছে টানিয়া লইয়া, নিজের পেশীপুষ্ট সুবিস্তৃত অনাবৃত গৌর বুকের উপর স্ত্রীর মাথাটি টানিয়া ধরিয়া, সস্নেহে তাহার কপালে হাত বুলাইতে-বুলাইতে শান্ত-কোমল কণ্ঠে বলিল, "আঃ, কি মিছে রাগারাগি কর্‌ছ,—তুমি আসলে তোমার রোগটা কি, তাই বুঝ্‌তে ভুল করেছ; যারা তোমার রোগটাকে চিনেছিল, তারা আমায় কি বলেছিল জানো?"

বাধা দিয়া তরুণী বলিল "আমি সে সব কিছু জানতে চাই না।"

ফৈজু আবার হাসিল, বলিল, "অথচ চোখ বুজে রাগ কর্‌বে আমারই ওপর! আর রাগের ঝালটুকুও ঝাড়্‌বে আমারই ঘাড়ে! বন্দোবস্ত মন্দ নয়!"

সহসা সজোরে মাথা টানিয়া লইয়া, সুগভীর অভিমান-ভরা দৃষ্টি তুলিয়া স্বামীর মুখ পানে চাহিয়া, বেদনা-মথিত কণ্ঠে তরুণী বলিল, "তবে কার ওপর রাগ কর্‌ব? তোমার ওপরও নয়? তবে?" তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল! চোখ-দুটি জলে ভরিয়া উঠিল!

ফৈজু নিরুত্তর। এমন সুকোমল, অথচ এত-বড় মর্ম্ম-

স্পর্শী তীব্র তিরস্কার সে বোধ হয় জীবনে কখনো শোনে নাই! ক্ষণকাল নির্ব্বাক থাকিয়া সে ধীরে-ধীরে আত্ম-সম্বরণ করিয়া লইল। কথাটা উল্টাইয়া দিবার জন্য পরিহাস-কোমল স্বরে বলিল "আচ্ছা নাও, লোকের অভাব হয়ে থাকে, আমি না হয় ওটা চোখ বুজে সয়ে যেতে রাজী হলুম। কিন্তু তোমার কি উচিত নয়, আমার ওপর রাগ করবার আগে আমি সত্যিই দোষী কি না, সেটা বিবেচনা করে দেখা?"

তরুণী প্রতিবাদের স্বরে বলিল, "হ্যাঁ, করবে বিবেচনা! তোমার কাণ্ড-কারখানায় আমার যে বুদ্ধি-সুদ্ধি সব লোপ হয়ে গেছে।"

ফৈজু হাসি মুখে বলিল, "তবে আপাততঃ কিছুক্ষণের জন্য থাম, বুদ্ধিটা থিতিয়ে ঠিক ঠাণ্ডা হোক, তার পর ভেবে-চিন্তে পাগলামী কোরো।"

তরুণী এবার একটু অপ্রস্তুত হইল। আত্ম-গোপনের জন্য মুখ হেঁট করিয়া, আঁচলটা তুলিয়া চোখের জল মুছিতে-মুছিতে সলজ্জ হাস্যে বলিল, "হ্যাঁ, পাগলামীই বটে! এততেও আমি যে সত্যি পাগল হয়ে যাইনি এখনো, এইটেই আশ্চর্য্য! তোমার কি বল না, বাইরে-বাইরে ঘুরে বেড়াও—কিছুতে তো কাণ দাও না। আর এদিকে আমার যে, তোমার সম্বন্ধে হরেক-রকম গুজব শুনতে-শুনতে কাণ ঝালাপালা হয়ে গেল—" বলিয়াই ত্রস্তে ঢোক গিলিয়া কথাটা সামলাইয়া লইয়া, মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "যাও, অনেক বেলা হয়েছে, আগে নাওয়া-খাওয়া সেরে নাও। বাড়ীতেই স্নান কর না।"

"না, আমি পুকুরে যাব।" বলিয়া হাতে তেল ঢালিয়া ফৈজু কৌতূহলী দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখ পানে চাহিয়া বলিল, "আমার সম্বন্ধে তুমি কি গুজব শুনেছ, বল তো টিয়া।"

টিয়া—ওরফে মতিয়া এবার একটু বিশেষ রকম ব্যতিব্যস্ত হইয়া বলিল, "সে গুলিখোরী গুজব শোনবার সময় এখন নয়, ওঠো আগে।"

ফৈজু বলিল, "আঃ! এত তাড়াতাড়ি কিসের? কি এমন বেশী বেলা হয়েছে? ওঃ! তার মধ্যে, তুমি স্নান করবে, নয়? আচ্ছা, আমি বেরিয়ে যাচ্ছি।"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বাহিরের দুয়ার ঠেলিয়া বাড়ী ঢুকিয়া এক মধ্যবয়স্কা নারী পরিহাস-গঞ্জিত কণ্ঠে হাঁকিলেন, "কই গো, বাড়ীর মানুষ সব কোথায়? কারুর যে সাড়া পাচ্ছিনে!"

টিয়া ত্রস্তে মাথায় কাপড় টানিয়া, নিঃশব্দে উঠিয়া গিয়া ঘরের মধ্যে অদৃশ্য হইল। ফৈজু তেলের বাটি হাতে লইয়া, বাহিরে রোয়াকে আসিয়া, হাসি মুখে বলিল, "আদাব,—বাইরের মানুষ মহাশয়ের মেজাজ সরিফ?"

রমণী, ফৈজুর বিধবা ভ্রাতৃজায়া রহিমা বিবি। রহিমা অল্প বয়সেই একটি পুত্র লইয়া বিধবা হইয়াছিল। ছেলেটি বাঁচিয়া থাকিলে আজ পনের বছরের বালক হইত; কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে আট বছরে পড়িয়াই সে মারা গিয়াছে। ভাগ্যহীনা রহিমা, সংসারের সর্ব্বহারা ক্ষতির বিষাদ-শোক বুকে বহিয়া,—আজ ত্যাগ-বৈরাগ্যের মধ্যে উদাস-আনন্দময় হৃদয় লইয়া বাস করিতেছে। এই দুর্ভাগিনী পুত্রবধূর উপর শ্বশুরের স্নেহ-যত্নের সীমা ছিল না। "মাজী" বলিয়া ডাকিতে তিনি অজ্ঞান হইতেন! শৈশবে মাতৃহারা দেবর ফৈজুর উপর রহিমা একাধারে জননী ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই ভ্রাতৃজায়ার মত এমন স্নেহময় নির্ভয় আশ্রয় সংসারে ফৈজুর আর কোথাও ছিল না। ফৈজু পিতাকে চিরদিনই একটু বেশী মাত্রায় সঙ্কোচ করিয়া চলিত; কিন্তু ভ্রাতৃজায়ার কাছে তাহার আবদার উৎপাতের সীমা ছিল না। ছেলেবেলায় ফৈজুর উপদ্রবে রহিমা অষ্ট প্রহর ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকিত। এখন বড় হইয়া ফৈজু সম্পূর্ণ রূপে বদলাইয়া গিয়াছে। ভ্রাতৃজায়াকে এখন সে মনে-মনে বেশ একটু সম্ভ্রমের সহিত সম্মান করিয়া চলে। উপদ্রব তো একেবারেই বন্ধ!

ফৈজু রহস্যভরে আদাব জ্ঞাপন করিতেই, রহিমা কপট বিস্ময়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তিরস্কারের স্বরে বলিল, "কে তুমি, বল দেখি? বলা নাই, কওয়া নাই—নিজের ইচ্ছেয় বাড়ী ঢুকে বসলে কার হুকুমে? কচি বৌটিকে আমি একলা বাড়ীতে রেখে গেছি,—তোমার সাহস তো খুব! শরীরে কি একটুও আক্কেলের গন্ধ নাই?"

ফৈজু সলজ্জ হাস্যে নিজের গায়ে তেল রগড়াইতে মনোযোগী হইল,—রহিমার কথার কোন উত্তর দিল না।

কুয়াতলা হইতে পা ধুইয়া আসিয়া, রহিমা হাতের ঘুনসী-বিনানোর রেশমের গুটি কুলুঙ্গিতে রাখিয়া ফৈজুর সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। তার পর সত্য-সত্যই স্নেহময়

ভৎর্সনার স্বরে বলিল,—"বাড়ীর কথা তো একেবারেই ভুলে গেছ। তা বেশ করেছ! আর কিই বা মনে কর্‌বে! বাড়ীতে থাকবার মধ্যে আছে এক হতভাগী বুড়ি,—তা সে কবরে গেল, আর রইল,—তার আর কি খোঁজ নেবে? তা বেশ! কিন্তু তা হলেও, মানুষের দয়া-ধর্ম্ম বলে একটা কথা আছে! কাল রাত্রে যে গাঁয়ে এলে, তা একবার কি ছাই বাড়ীতে এসে দেখাটা করে যেতে নেই? তাই এতক্ষণ সুমতি দিদির কাছে বসে বসে, কেঁদে মরছিলুম, যে ফৈজুকে আমি পেটের ছেলের চেয়ে ভালবাসি দিদি, কিন্তু আমার নসীবের গুণে ফৈজু এম্নি হয়ে দাঁড়িয়েছে যে বলবার কথা নয়! এ শুধু আমার ভাগ্যের দোষ ফৈজু, তোমাদের নয়! বলিতে-বলিতে রহিমা আঁচলের খুঁটে চোখ মুছিল।"

ফৈজু বেশ ধৈর্য্য-সংহত নির্ব্বিকার চিত্তেই সমস্ত অনুযোগটা শুনিল। তার পর একটু হাসিয়া বলিল, "এর মধ্যেই দিদির কাছে শুদ্ধ নালিশ রুজু হয়ে গেছে? বেশ! —দিদি কি বল্লেন?"

রহিমা রাগ করিয়া বলিল, "কি আর বলবেন? তোমার জন্যে রসগোল্লার ফরমাস্ দিলেন!"

ফৈজু তৎক্ষণাৎ সপ্রতিভ হাস্যে বলিল, "বহুৎ আচ্ছা! তোমায় আগে তার ভাগ দিয়ে যাব! আচ্ছা খলিফা, বাবা কোথায়?"

ফৈজু ছেলেবেলায় রহিমাকে আদর করিয়া "খলিফা" বলিয়া ডাকিত। সেইজন্য আজও তাহার সেই সম্বোধন বহাল আছে।

ফৈজুর কথা শুনিয়া রহিমা একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তুমিও ফকীরপুর চলে গেছ,—আর সঙ্গে-সঙ্গে সঙ্কটপুর থেকে লোক এল,—দিদির ভাসুর না দেওর কে হন, সেই সেজবাবু আছেন একজন,—তিনি বাকী-খাজনা ফেলে রেখে, দিদির মহল নীলেমে চড়িয়ে দেবার যোগাড় করেছেন বুঝি! তাই কি-সব হাঙ্গামা হয়েছে। সেই নিয়ে গোল বেধেছে, তখনি বড়গোমস্তা বাবু বাপজীকে নিয়ে সঙ্কটপুরে ছুটে গেলেন। আজ আর তাঁরা ফিরবেন না।"

ফৈজু তেল মাখা বন্ধ রাখিয়া, উৎকণ্ঠিত বিস্ময়ে নিঃশব্দ হইয়া রহিমার কথাগুলা সব শুনিল। তার'পর ভ্রূকুটি করিয়া বলিল, "বাঃ! এর মধ্যে এত কাণ্ড হয়ে গেছে? আমি তো ফকীরপুর গিয়ে ভাল করি নি! বাপজী সেখানে একা গেল?"

ফৈজুর উৎকণ্ঠা দেখিয়া রহিমাও ভিতরে-ভিতরে বেশ একটু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। শুষ্ক মুখে বলিল, "হ্যাঁ! দিদিও তাই বারণ করে দিলেন যে, রাত্রে যেন সঙ্কটপুরে বাবুদের বাড়ীতে থেক না—অন্য জায়গায় থেকো।"

বুকের উপর দুই বাহু ছাঁদিয়া, সটান সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া, ফৈজু কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে কি ভাবিল। তার পর বলিল, "আচ্ছা, আমি ছোট বাবুর কাছে খবর নিয়ে তবে পুকুরে যাব। তোমরা আমার ভাত বেড়ে রেখে খেতে বোসো।"

রহিমা ব্যগ্র ভাবে বলিল, "না—না, তুমি একটু শীগ্রী এস। তুমি এলে তবে আমরা খাবো।"

ফৈজু গামছা লইয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। রহিমা পিছন হইতে ডাকিয়া বলিল, "শীগ্রী ফিরো, আমি ভাত বাড়বো তুমি এলে।" (ক্রমশঃ)

সাহিত্য ও সমালোচনা*

[অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামপদ মজুমদার এম্-এ]

(১)

প্রাণের রহস্য সৃষ্টির অন্ধকারে লুকান আছে; কোথা হইতে কেমন করিয়া যে ইহা আসিল, মানুষ তাহা বুঝিতে পারে না। আমাদের মনে হয়, 'রূপকথা'র রাজকন্যার মত জড়ের মধ্যে চৈতন্য সুপ্ত ছিল; কবে কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে হঠাৎ কে যেন সোণার কাঠি ছোঁয়াইয়া দিল; অমনি ঘুম ভাঙ্গিল্ল চেতনার জাগরণ। সেই জাগরণ হইতেই কর্ম্ম-জগতের সৃষ্টি এবং জ্ঞানের প্রথম উন্মেষ। তাহার পর জড় ও চৈতন্যের ঘাত-প্রতিঘাতে সৃষ্টির যে বিচিত্র লীলা প্রকটিত হইয়াছে, তাহার অল্পমাত্রই মনুষ্য-জ্ঞানের অধিগম্য।

* নদীয়ার শাখা সাহিত্য-পরিষদে পঠিত।

জড় চেতনা হইতে পৃথক থাকিতে চায়,—চেতনা তাহাকে আঁকড়িয়া ধরিয়া আপন করিবার চেষ্টা করে। জীব-জগতের কত অজ্ঞাত রহস্যের ভিতর দিয়া, কত বিবর্ত্তন-আবর্ত্তনের সাহায্যে সেই একই চেষ্টার বিরাম নাই,—কেমন করিয়া জড় ও চৈতন্যের সম্বন্ধ নিগূঢ় হইতে নিগূঢ়তর হইতে পারে। আমাদের যত কিছু কর্ম্ম, যত কিছু জ্ঞান, এই চেষ্টা হইতে প্রসূত। কারণ, আমরা যাহাকে জ্ঞান বলি, তাহা কর্ম্ম-জগতের অন্তর্গত,—চৈতন্যের বহিঃপ্রকাশ; এবং এক হিসাবে আমাদের সত্তার বাহিরে, বাহ্য প্রকৃতির মত জড়। নিজের ক্ষুদ্র কোণে মানুষ নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে পারে না; সে তাহার উদ্বুদ্ধ চেতনাকে চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করিয়া চরিতার্থ হয়। এই প্রকাশ যে কত রকমেই হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই;—সমাজ, ধর্ম্ম, নীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান—কত ভাঙ্গাগড়া, কত সৃষ্টি-প্রলয়;—তবুও আমাদের অন্তরাত্মার তৃপ্তি নাই,—চিরবুভুক্ষা লইয়া সে সমস্ত জগৎ গ্রাস করিতে উদ্যত। ক্রীড়ারত বালকের ন্যায় যাহা একবার গড়িয়া তুলিতেছি, তাহাই আবার ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়িতেছি—কিছুতেই যেন বাহিরটাকে অন্তরের স্বরূপ করিয়া তুলিতে পারিতেছি না।

আমাদের মধ্যে এমন একটা প্রেরণা আছে, যাহার দরুণ আমরা আপনাকে বাহিরে প্রকাশ করিয়া, মূর্ত্ত করিয়া, পর করিয়া দিতেছি,—আবার স্বহস্ত-রচিত মূর্ত্তিগুলিকে হৃদয়ের রক্তে রঞ্জিত করিয়া আপন করিয়া লইতেছি। একদিকে আমাদের মানসিক সত্তা জ্ঞান-বিজ্ঞানের জড়ত্বে পরিণত হইতেছে,—গতির মুক্তি হারাইয়া স্থিতির বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়িতেছে; অন্যদিকে তাহারাই আবার সত্তার সহিত মিলিত হইয়া, তাহাকে প্রসারিত করিয়া মুক্ত করিয়া দিতেছে। এই দুইয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে সভ্যতা নিজেকে নিজে ছাড়াইয়া চলিয়াছে; এবং মানব-হৃদয়ের সঙ্কোচ ও প্রসারণ দ্বারা জগতের শিরায়-শিরায় একটা ভাব-প্রবাহ সঞ্চারিত করিয়াছে।

কাজে-কাজেই প্রত্যেক জিনিসেরই দুইটী দিক আছে,—একটী বাহিরের আর একটী অন্তরের দিক। বাহিরের দিকে বাহ্য-জগৎ ও জ্ঞান তাহাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে; এবং মানুষ একটার সঙ্গে আর একটার সম্বন্ধ যুক্তি, বিচার ও প্রমাণ দ্বারা নির্ণয় করিয়া দেয়। অন্তরের দিকে তাহাদের কোনও ভিন্ন সত্তা নাই,—চৈতন্যের স্রোতে দ্রবীভূত হইয়া এক হইয়া গিয়াছে। এইরূপ করিয়া একখানার উপর আর একখানা প্রস্তর দিয়া, আমরা বিজ্ঞান ও দর্শনের হর্ম্ম্য রচিত করিয়া তুলিতেছি; কিন্তু এই সৌধ যতদিন পর্য্যন্ত স্বীয় বাসস্থানে পরিণত করিতে না পারি, ততদিন আমাদের সোয়াস্তি নাই। সত্য অথবা তথ্যের পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের নামই বিজ্ঞান; অথবা বাস্তব তত্ত্ব এবং তাহাদের অন্তরের সহিত সংযোগই সাহিত্য। দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস এবং অন্যান্য মানব-শাস্ত্র আমাদের নিকট যে-সব নূতন তত্ত্ব উদ্ঘাটিত করিতেছে, এইগুলিকে শুধু জ্ঞানের বলিয়া উপলব্ধি করিলে, ইহারা যেন অনেকটা বাহিরের বস্তু থাকিয়া যায়,—আমাদের অন্তরের সহিত সম্পূর্ণ ভাবে মিলিত হয় না; এবং মানুষের সর্ব্বদাই চেষ্টা,—কি করিয়া এই মিলন নিবিড় হইতে পারে। বাহিরের তথ্য অথবা সত্যের সহিত অন্তরের সম্পর্ক যখন আমরা ভাষায় লিপিবদ্ধ করি, তখনই তাহা সাহিত্য; এবং এই সম্পর্ক যতই গাঢ়তর হইতে থাকে, সাহিত্য ততই কলায় অথবা সুকুমার সাহিত্যে পরিণত হয়।

ইতিহাস যখন পূর্ব্বতন রাজারাজড়ার কথার নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করেন, কিম্বা পুরাতন সমাজের কঙ্কাল-জীর্ণ পুঁথি ও প্রস্তর হইতে বাহির করিয়া আলোচনা করিতে বসেন, ইতিহাস তখন বিজ্ঞানের সমশ্রেণীভুক্ত। কিন্তু লেখক যখন এই তত্ত্বগুলি হৃদয়ঙ্গম করিয়া অতীতের ভিতর জীবনী-রস সঞ্চারিত করেন, মৃতকে উজ্জীবিত করেন, ইতিহাস তখন সাহিত্যের কোঠায় আসিয়া পড়ে। মানুষের মনের ভাব ও চিন্তা যখন বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের স্বরূপ অনুধাবন করিবার চেষ্টা করি, তখন তাহা বিজ্ঞান; আবার যখন এইগুলিকে চলৎশক্তি দিয়া, সজীব করিয়া, মূর্ত্তিমান করিয়া সৃষ্টি করি, তখন তাহা সাহিত্য। বাস্তব তত্ত্বের আলোচনা সাহিত্য নহে; কারণ, ইহাতে লেখকের ব্যক্তিত্বের কোনও স্থান নাই—শুধু জ্ঞানের প্রকাশ; এবং জ্ঞান ব্যক্তিগত নহে,—মানব-মনের সাধারণ সম্পত্তি। বৈজ্ঞানিক বিষয়টী জ্ঞানশক্তির পরিচালন দ্বারা নির্লিপ্ত ভাবে দেখিতে চায়, প্রাণের সহিত যোগ স্থাপন করে না। সেই জন্য বৈজ্ঞানিক সত্য একবার প্রকাশিত হইলে তাহার মৌলিকতা থাকে না; এবং জগৎ সহজেই আবিষ্কর্ত্তার

নাম বিলুপ্ত হয়। কিন্তু সাহিত্যের সত্য চিরকালই অক্ষুণ্ণ থাকে; কারণ, ইহার সহিত প্রাণের যোগ আছে। বিজ্ঞানের সমাপ্তি কর্ম্মে, সাহিত্যের পরিণতি ধর্ম্মে। বিজ্ঞান যে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়া দেয়, তাহাতে কর্ম্মের জটিলতা বৃদ্ধি পায়; সাহিত্য চিত্তকে প্রসাদ-গুণে বিভূষিত করিয়া ধর্ম্মের পথে লইয়া যায়। লৌকিক ধর্ম্ম জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইতে পারে; কিন্তু যতদিন সাহিত্য-চর্চ্চা থাকিবে, ততদিন ধর্ম্মের মূল ভাবগুলি মনুষ্য-হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইবে। বিজ্ঞানের যে সমস্ত সত্য আমাদিগকে বিস্ময়ে ও আনন্দে আপ্লুত করে,—ভক্তিতে হৃদয় নমিয়া পড়ে,—সেগুলি সাহিত্যে স্থানলাভ করিবেই। এইরূপ করিয়া সাহিত্য বিজ্ঞানকে ধর্ম্মের পথে সঞ্চালিত করে।

বাস্তবিক সাহিত্যে যেমন সৃষ্টির বৈচিত্র্য রক্ষা পায়, বিজ্ঞানে তেমন পায় না; কারণ, বিজ্ঞান জ্ঞানের মানদণ্ডে তুলিয়া সমস্ত মাপিয়া এক করিতে চায়। বৈজ্ঞানিকের এমন আত্ম-সংযম আছে, যাহাতে তিনি নিজেকে কেন্দ্র করিয়া সংসারের গতি নিরূপিত করিতে পারেন, আত্মস্থ হইয়া প্রত্যেক তথ্য এবং সত্যের স্বরূপ পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করেন। বিজ্ঞানের প্রবৃত্তি বিশ্লেষণের দিকে,—সাহিত্যের চেষ্টা সৃষ্টির দিকে। সাহিত্যিক বাহিরের তথ্য অথবা সত্যের সংযোগে মানসিক মূর্ত্তি গড়িয়া তুলেন। একই সত্য সাহিত্যে কত বিভিন্ন আকার ধারণ করে বলা যায় না। মানব-প্রকৃতির বিভিন্নতা সত্যে প্রতিফলিত হইয়া তাহাকে নব-নব অনুরাগে রঞ্জিত করিয়া তুলে। সাহিত্যিকের আত্মা বিশ্বের তথ্য এবং সত্যের সহিত মিলনের জন্য উন্মুখ হইয়া অভিসারিকার বেশে সর্ব্বদাই সাজিয়া বসিয়া আছে। এই মিলন সম্ভবপর করিতে হইলে, বিষয়ের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতে হইবে, দ্বৈতকে অদ্বৈত করিতে হইবে। কবি যিনি, তিনি তাঁহার বিষয়ের সহিত এই একপ্রাণতা যত অনুভব করেন, আর কেহই তত করেন না; সেই জন্য কাব্য সাহিত্যের চরম প্রকাশ। মাটীর মধ্যে বীজ রোপিত হইলে তাহার অন্তর্নিহিত শক্তির উন্মেষ হয়,—সে নিজেকে প্রকাশ করে, সৃষ্টি করে। তেমনই কবির মনের মধ্যে সত্যের বীজ নীত হইলে, তাহাতে প্রাণ-সঞ্চার হয়; এবং সে আপনিই নিজের স্বরূপ সৌন্দর্য্যে প্রস্ফুটিত করে। এই জন্য কবির প্রাণ বিষয়ের সঙ্গে এমনই লিপ্ত হইয়া যায় যে, তাহাকে আর পৃথক করিয়া দেখা যায় না,—কবি তাঁহার মানসিক সত্তা বিষয়ের মধ্যে হারাইয়া ফেলেন।

সাহিত্যিক নূতন তথ্য অথবা সত্যের অবতারণার জন্য ব্যস্ত নহেন। পরিচিতের সহিত নূতন পরিচয়, ঘনিষ্টতর সম্বন্ধ স্থাপন করানই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। সাহিত্য আমাদের হৃদয়কে সরস করে, অনুর্ব্বর চিত্ত-ভূমিকে শস্য-শ্যামলা করিয়া দেয়; এবং জ্ঞানের কাঠিন্য আনন্দে পরিণত করিয়া, জীবন কমনীয় করিয়া তুলে। জ্ঞানের পরিধি যতদূর, সাহিত্যের ব্যাপ্তিও ততদূর; এবং হৃদয়ের গভীরতার তারতম্য অনুসারে সাহিত্যের গভীরতা। কিন্তু যে জ্ঞান সাঙ্কেতিক চিহ্নমাত্র, যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে,—অথবা যাহা কর্ম্মজগতের সঙ্কীর্ণতায় ও জড়ত্বে আবদ্ধ, যাহার ভিতর দিয়া আদর্শের জ্যোতিঃ স্ফূর্ত্তি হইতে পারে না,—সে জ্ঞান সাহিত্যের বিষয়ীভূত নহে।

কাজে-কাজেই সাহিত্যের আলোচনা করিতে হইলে, তিন দিক হইতে দেখিতে হইবে; ১ম, সত্য অথবা তথ্য; ২য়, সাহিত্যিকের একপ্রাণতা; ৩য়, এই দুইয়ের সংযোগে অভিনব সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি। কিন্তু শেষ দুইটী এত ওতপ্রোত ভাবে সংলিপ্ত যে, তাহাদিগকে বিশ্লিষ্ট না করিয়া আমি একত্র দেখিবার চেষ্টা করিব। ১ম, সত্য অথবা তথ্য। এ সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যদ্দ্বারা জীবনের প্রসার না হয়, যাহা দিয়া আমরা আমাদিগের সত্তাকে চারিদিকে ছড়াইয়া দিতে না পারি, তাহা আমাদের স্থায়ী আনন্দ দান করিতে পারে না। মানুষের প্রাণ যেন কোন অজ্ঞাত আকর্ষণে তাহার অন্তরতম তল হইতে উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে, কিছুতেই তাহাকে ধরিয়া রাখা যায় না। আচার, নীতি, অনুষ্ঠানের অনুশাসন দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলে, সে প্রতিমুহূর্ত্তেই নিজেকে প্রতিহত মনে করে; এবং তাহার আন্তরিক ইচ্ছা এই যে, সে সমস্ত বন্ধন ছিঁড়িয়া গাঢ়তর বেগের সহিত যুক্ত হয়। চাই জীবনের ব্যাপ্তি,—যে ব্যাপ্তির দ্বারা ভূমার আনন্দ আমরা পাইতে পারি;—যাহার দ্বারা জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর অসীমের ক্ষীণ স্পন্দন অনুভূত হয়,—তুচ্ছ ধূলি-মুষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া অনন্ত সৌর-জগতের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করি।

যে সাহিত্য আমাদিগকে যতটা এই ব্যাপ্তির দিকে

লইয়া যায়, তাহার সার্থকতা তত বেশী। একাল ও সেকালের মধ্যে মস্ত প্রভেদ এই যে, সেকালে প্রত্যেক দেশ ও সমাজ সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল,—বৃহৎ মানব-মনের সাড়া স্পষ্ট ভাবে অনুভব করিতে পারে নাই। দেশের সহিত দেশের ব্যবধান এখন কমিয়া আসিতেছে,—পরস্পরের সহিত ভাব ও চিন্তার আদান-প্রদান সম্ভবপর হইয়াছে। এরূপ স্থলে যদি কোনও সাহিত্য অতীতের পুনরাবৃত্তিতে ব্যস্ত থাকে, অথবা জগতের চঞ্চল ভাব-গতি, আধুনিক চিন্তা-স্রোত ও অনুভূত সত্যগুলির প্রতি লক্ষ্য না করে, তবে সে সাহিত্য বর্ত্তমান কালের উপযোগী হইতে পারে না। আমরা যাহাকে উচ্চ সাহিত্য বলি, তাহা শুধু ভাবের প্রকাশ নহে,—তাহা ভাবের সহিত সত্যের সংমিশ্রণ; এবং যে সত্য সাধারণ্যে সঞ্চারিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, সাহিত্য তাহার নিম্নে পড়িয়া গেলে, নিজেকে ব্যর্থ করে। বৈজ্ঞানিক-জগতে দেশ ও কালের ভেদাভেদ থাকিতে পারে না; কারণ, সত্য-চর্চ্চাই বিজ্ঞানের মূল। সৌন্দর্য্যের স্বরূপ জাতীয় প্রকৃতি-ভেদে ভিন্ন হইলেও, যে সত্যের আশ্রয়ে সৌন্দর্য্যের স্ফূর্ত্তি, তাহা জাতিগত অথবা ব্যক্তিগত নহে; এবং যে সাহিত্যের সত্যের সহিত যত ঘনিষ্টতর সম্বন্ধ, তাহা তত সার্ব্বজনীন হইয়া যায়। ইহা না হইলে, এক জাতির সাহিত্য অন্য জাতিকে তৃপ্তি প্রদান করিতে পারিত না; এবং ভাষা ও ভাবের ব্যবধান সত্ত্বেও, সাহিত্যের উচ্চ-উচ্চ স্তরে দেশ ও-কালের ভেদ অস্পষ্ট।

আমি এ কথা বলিতেছি না যে, মানুষ জাতীয় ভাব ও চিন্তা বিসর্জ্জন দিয়া অজ্ঞাত বিশ্ব-সত্যের সন্ধানে নিযুক্ত থাকিবে; কারণ, সত্যের রূপ জাতীয় বিশিষ্টতার মধ্য দিয়াই পরিস্ফুট হয়। আমরা যাহাকে বিশ্ব-সত্য বলি, তাহা অনেক সময়েই কোন দেশের সত্যই নহে। তাহা মূর্ত্তিবিহীন প্রজ্ঞা, ধ্যানে অধিগম্য,—ভাব-রাজ্যে তাহার স্থান নাই। যখনই ইহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়, তখনই এ সত্য প্রীতির পুষ্প-চন্দনে চর্চ্চিত হইয়া বিশেষ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে; এবং তাহা না করিলে জাতীয় জীবনে এ বিগ্রহের স্থাপনা হইতে পারে না। কিন্তু মূলে মানব-প্রকৃতি ত ভিন্ন নহে। যে বিশ্ব-শক্তি সহস্র বৈচিত্র্যে প্রকাশিত, তাহা বিচিত্র হইলেও এক। আবার এই বিচিত্রতাই সপ্রমাণ করে যে, ইহা এক হইলেও ভিন্ন। প্রত্যেক জিনিসের সত্তার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে, যাহা এক হইতে অন্যকে পৃথক করে, বিশিষ্টতা দেয়। মানব-সভ্যতার মূল প্রস্রবণ এক হইতে পারে; কিন্তু তাহার ধারা ও গতি ভিন্ন। সেই মূলের দিকে না তাকাইয়া যখন এই বিশিষ্টতার প্রতিই বিশেষ লক্ষ্য থাকে, তখনই সাম্প্রদায়িক অথবা জাতীয় ভাব সাহিত্যে এত প্রাধান্য লাভ করে যে, বিশ্ব-মানব-মনের সহিত তাহার যোগ সম্যকরূপে উপলব্ধ হয় না।

প্রত্যেক জাতি ও সম্প্রদায়ের ভিতর এক দিকে যেমন কতকগুলি সত্যের আভাষ পাওয়া যায়,—যাহা সনাতন, যাহাদের স্থিতি দেশ ও কালের উপর নির্ভর করে না; আর এক দিকে তেমনি কতকগুলি সত্য আছে, যাহা বিশেষ ভাবে তাহাদের নিজস্ব। সর্ব্বদেশের সাহিত্যের প্রকৃতিই এই যে, সে এই "নিজস্বের" ভিতর দিয়া যাহা সনাতন তাহার দিকে যাইতে চেষ্টা করে;—কোথাও বা কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তাহার গতির হ্রাস হইয়া যায়, কোথাও বা সমস্ত জাতীয় ও সাম্প্রদায়িক ভাব ভেদ করিয়া সে নিত্য সত্যে ও সৌন্দর্য্যে পৌঁছিতে পারে। মহাকবি দান্তে ক্যাথলিক খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের কবি; ক্যাথলিক ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক ভাব তাঁহার কাব্যে যেমন ফুটিয়াছে, আর কোথাও তেমন নহে। কিন্তু আজ তাঁহার কাব্যের উৎকর্ষ এই সাম্প্রদায়িক ভাবের উপর নির্ভর করিতেছে না। ক্যাথলিক ধর্ম্মে মানব-মনের যে অধ্যাত্ম-সম্পদ লুক্কায়িত আছে, তাঁহার কবিতা তাহারই মহান প্রকাশ; এবং ইহা নিত্য, ইহার স্বরূপ বদলাইতে পারে না। সাহিত্যে যাহা স্থায়ী, তাহা নিত্য সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত; বিশেষ ভাবে কোনও জাতীয়, হইলেও, তাহা সমস্ত মানবের; এবং বিশেষ ভাবে ব্যক্তিগত হইয়াও তাহা সমস্ত জাতির। সেই জন্য সাহিত্য-ক্ষেত্রে, ধর্ম্ম, রাষ্ট্র ও সমাজের সংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া মানুষ মানুষের সহিত সখ্যভাবে মিলিত হইতে পারে। সর্ব্বদেশের সর্ব্ব-কালের সাহিত্য পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীতি জন্মে যে, যে সাহিত্য এই মুক্তির স্বাদ যত দিতে পারে, তাহার স্থায়িত্ব তত বেশী। সাম্প্রদায়িক হইলেই যে সাহিত্য অনিত্য হইবে, তাহার কোনও মানে নাই; কারণ, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ভিতর দিয়া নিত্য-সৌন্দর্য্যের সন্ধান পাওয়া যায়, এবং মেঘমুক্ত রাজ্যে বিচরণ করা যাইতে পারে; কিন্তু এই

অত্যুচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করিলে, জাতীয় এবং সাম্প্রদায়িক বিভিন্নতা সুদূর অধিত্যকার নদী, বন, প্রান্তরের ন্যায় এক মহা সাম্যের মধ্যে লয় পায়,—তাহাদের পার্থক্য হৃদয় ব্যথিত না করিয়া অখণ্ড সৌন্দর্য্যের উপাদান স্বরূপ প্রতীয়মান হয়।

সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সাহিত্যের এই গতি স্ফুটতর হইয়া উঠিতেছে; এবং তাহার সাম্প্রদায়িক ভাব ও প্রাদেশিকত্ব ঘুচিয়া যাইতেছে। সাধারণ মানুষের মনের সহিত উচ্চ সাহিত্যের যোগ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। এক দিকে যেমন সাধারণ তন্ত্র সাধারণের স্বার্থের সংরক্ষণে নিয়োজিত, মানুষের সহিত মানুষের পার্থক্য-লোপে ব্যস্ত, আর এক দিকে তেমনই সাহিত্য-ক্ষেত্রে আভিজাত্যের সৃষ্টি, যাহা সত্যের সন্ধানে দেশ ও কালের বন্ধনের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে! এইরূপ করিয়া প্রত্যেক জাতির সাহিত্যের ভিতর দিয়া এক মহামিলনের পথ উন্মুক্ত হইতেছে। যে সাহিত্যিক এখন পর্য্যন্ত ইহা দেখিতে পান নাই, তিনি "কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত" অন্ধ ভাবে ঘুরিয়া মরিতেছেন। এখন যদি আমরা অচলায়তনের প্রাকার দিয়া আমাদের সাহিত্যকে বেষ্টন করিয়া রাখিতে চাই, তাহা হইলে আমাদের চেষ্টা ত সফল হইবেই না; পরন্তু আমরা দেখিতে পাইব যে, কালের অমোঘ নিয়মে জীবনের সচল ধারা হইতে আমরা অনেক দূরে সরিয়া পড়িয়াছি।

শিশু যেমন ভূমিষ্ঠ হইলেও মাতার সহিত তাহার নাড়ীর যোগ থাকে, তেমনই প্রত্যেক সাহিত্যের তৎসাময়িক মনোজগতের সঙ্গে প্রাণের যোগ আছে; সমাজে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত চিন্তারাশি যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া জন্মিয়াছে; এবং এইজন্যই ইতিহাসের যুগ-চরিত্র সাহিত্যে ধরা পড়ে। যে অখণ্ড গতিতে মানব-সভ্যতা ক্রমশঃ পরিণতি প্রাপ্ত হইতেছে, সেই গতির খণ্ড-খণ্ড, অচঞ্চল প্রতিকৃতি বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন যুগের সাহিত্য। এই গতির দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া যুগ-সাহিত্যের বিচার করা, আর শব-ব্যবচ্ছেদ করিয়া প্রাণের রহস্য উদ্ঘাটন করিবার চেষ্টা করা একই প্রকার।

শুধু সাহিত্য কেন, মানব-সৃষ্ট যে কোন ব্যবস্থা,—ধর্ম্মই হউক, সমাজই হউক, আর রাষ্ট্রই হউক—সমস্তই মানব-প্রকৃতির বাহ্য-প্রকাশ। মানবের অন্তরাত্মা যখন নূতন ভাবের সাড়া পাইয়া জাগিয়া উঠে, তখন সে স্পন্দন আমাদের সমস্ত সম্বন্ধের মধ্য দিয়া নিজেকে ব্যক্ত করে। যদি সমাজ, রাষ্ট্র অথবা ধর্ম্ম-ব্যবস্থার মধ্যে এই স্পন্দন অনুভূত না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তৎসাময়িক সাহিত্য স্থিতিমান,—ইহা মানব-মনের স্পষ্টানুভূত ভাব লইয়া ব্যস্ত, কিম্বা সমাজে সংহত সত্যগুলিরই প্রকাশ। সেই হিসাবে এ সাহিত্য মেকী,—ইহা খাঁটির সহিত এক পংক্তিতে বসিতে পারে না। আদর্শের প্রেরণা ইহাতে নাই। চিত্তের প্রসার এইরূপ সাহিত্যে হয় না; এবং ইহা জীবন সঙ্কীর্ণ করিয়া দেয়। কারণ, কর্ম্মজীবন ভাবেরই অনুসরণ করে। যদি আমরা দেখিতে পাই, কোনও জাতির সাহিত্যের দরুণ জাতীয় অথবা সামাজিক ব্যবস্থার কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, তাহা হইলে মনে করিব যে, হয় নূতন ভাব বা চিন্তা সে সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করে নাই; কিম্বা অন্য কোনও কারণে সে সাহিত্য সাধারণ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই।

বাস্তবিক, এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে, সাহিত্য বিপ্লববাদী। যাহা সনাতন, যাহা মানব-মনের নিত্য সামগ্রী, যে আচার, নীতি, ব্যবস্থা লইয়া মানুষ সুস্থ ও শান্ত থাকে,—সাহিত্য অনবরতই তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। প্রত্যেক দেশের সাহিত্য সমালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিপ্লবের সমসাময়িক কিম্বা তৎ-পূর্ব্ববর্ত্তী যুগেই সাহিত্যের সমধিক স্ফূর্ত্তি হয়। বাস্তবের সহিত আদর্শের সংঘর্ষে যখন শান্তি চূর্ণ করিয়া অসন্তোষের সৃষ্টি করে, তখন বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। ভাবের উন্মাদনায় মানুষের প্রকৃতিগত জড়তা যখনি লোপ পায়, তখনই তাহার চলিবার ইচ্ছার প্রকাশ। নির্জ্জন গিরি-গহ্বরে সমাধি স্বাভাবিক; কারণ, সেখানে চৈতন্যকে উদ্বুদ্ধ করিবার কোনও প্রেরণা নাই। সমাজ এইরূপ সমাধি-অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, বাহিরের আলোক আসিলে তবে তাহার যোগ-নিদ্রা ভঙ্গ হয়; নতুবা সে নিজেকে নিজে জাগাইতে পারে না। চৈতন্যদেব যখন তাঁহার প্রেম ও ভক্তিতে এক নূতন ভাবের বন্যা এদেশে আনিয়াছিলেন, তাহারই বিস্তৃতি বৈষ্ণব-সাহিত্যে। আবার পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে রাজা রামমোহন রায় যে নূতন ধর্ম্ম ও সমাজ-ব্যবস্থার আভাষ পাইয়াছিলেন, বর্ত্তমান বাঙ্গালা-সাহিত্যের সেই বিপ্লবেই জন্ম।

নূতন ভাব ও চিন্তা বাহির হইতে সাহিত্যে দুই প্রকারে আসিতে পারে। কখন দেখা যায়, নূতন তাহার বৈচিত্র্য বজায় রাখিয়া অন্য দেশের সাহিত্যে স্থান লাভ করে। প্রায়শঃই এরূপ সত্য সার্ব্বজনীন; তাহারা ঠিক কোনও দেশ ও কালে আবদ্ধ নহে—বিদেশী হইলেও স্বদেশী। আর অনেক সময়ে নূতনের সংস্পর্শে পুরাতন নূতন বেশ ধারণ করে। তখন মানুষের বোধ হয়, যেন পুরাতনেরই পুনঃ স্থাপন হইতেছে; কিন্তু তাহা সনাতন নহে,—স্বদেশী হইলেও বিদেশী। এইরূপ করিয়া যাঁহারা সনাতনপন্থী, তাঁহারাও নিজেদের অজ্ঞাতসারে নূতনেরই উদ্বোধন করিতেছেন; কারণ, অতীত মৃত, কালপ্রবাহে নিমজ্জিত,—বর্ত্তমানের আদর্শ দিয়াই তাহার প্রাণদান সম্ভব। এই দুই প্রকারেই আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যে আমরা ভাবের উন্মেষ দেখিতে পাই। উভয় স্থলেই মূল প্রেরণা বিদেশী, স্বদেশী নহে; এবং ইহার জন্য লজ্জিত হইবারও আমি কোন কারণ দেখি না। ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, নূতন ভাবের উন্মাদনা অনেক স্থলেই বিদেশ হইতে আইসে। তাহা বলিয়া তাহাকে বিদেশী ভাবের নকল বলা যায় না এবং জাতীয় চরিত্রের বিশিষ্টতাও ইহাতে নষ্ট হয় না। প্রাণ দিয়া সত্য গ্রহণ করিতে পারিলে, তাহা স্বদেশী হইয়া যায়; আর যাহার প্রাণের সহিত যোগ নাই, যাহা আচার-অনুষ্ঠানের জড়ত্বের মধ্যে রহিয়া গিয়াছে, প্রকৃতপক্ষে তাহাই বিদেশী। য়ুরোপে নূতন জ্ঞানের যুগে প্রাচীন গ্রীস ও রোমীয় সাহিত্য হইতে প্রেরণা আসিয়াছিল; এবং তাহারই ফলে য়ুরোপের বর্ত্তমান সাহিত্যের অভ্যুদয়। বহু শতাব্দী ধরিয়া য়ুরোপ ঐ সাহিত্যের চর্চ্চা করিয়াছে; কিন্তু তাহার জাতীয় বিশিষ্টতা নষ্ট হয় নাই; বরং পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। প্রাণের গভীরতা থাকিলে, বিদেশী সত্যের সংঘাতে তাহা নষ্ট হয় না,—গভীরতর হইয়া যায়। বাস্তবিক, যাহাকে আমরা বিপ্লব বলি, তাহা পুরাতনের সংহার নহে, অনেক স্থলেই তাহার নূতন প্রকাশ।

আর এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে, সাহিত্য শান্তির প্রয়াসী। পরস্পর-বিরোধী সত্য মানসিক বিক্ষিপ্ততা উপস্থিত করিয়া যখন অশান্তি ও অসন্তোষের সৃষ্টি করে, তখন সাহিত্য তাহাদের সমন্বয় করিয়া তাহাদিগকে ঐক্যের দিকে লইয়া যায়; বিরোধের মধ্যে সাম্য স্থাপন করে; কর্ম্মজীবনের চঞ্চল, ক্ষণিক প্রকাশের মধ্যে নিত্য-অচঞ্চল সত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে চায়; —বাস্তবের রূঢ়তা ভাবে মণ্ডিত করিয়া এমন রাজ্যে আমাদিগকে লইয়া যায়, যেখানে দারিদ্র্যের দুঃখ নাই, লাঞ্ছনার অপমান নাই, পরাধীনতার ক্ষোভ নাই, পাপের শাস্তি নাই, এবং মৃত্যুর শোক নাই। জীবনের অসামঞ্জস্যে হৃদয় পীড়িত ও ব্যথিত হইলে তাহার সমাধান পাই সাহিত্যে। যে সত্য ও সৌন্দর্য্যে হৃদয় ভরিয়া উঠে, তাহা স্বর্গ হইতে উচ্ছ্বসিত; মর্ত্ত্যের দীনতা ও জীর্ণতা ইহাতে নাই। তাই সাহিত্য আনন্দরূপ—সত্য ও মঙ্গলের নির্ম্মল প্রকাশ। হৃদয়ের অভ্যন্তরে যে সৃষ্টির আনন্দ স্বতঃ প্রবাহিত, সাহিত্য তাহারই ধারা বহন করে। যতদিন মানসিক জড়তা থাকে, ততদিন সাহিত্যে সৃষ্টি সম্ভবপর হয় না; এই জড়তা কাটিয়া গেলে, সাহিত্য অপূর্ব্ব বৈচিত্র্যে শোভিত হইয়া উঠে। যে জাতি সাহিত্য-সৃষ্টি করিয়াছে, সে সে জাতি হেয় নহে, অবজ্ঞেয় নহে, সে জাতি পরাধীন হইতে পারে না,—সৃষ্টির লীলাই তাহার মনকে স্বাধীন করিয়া দিয়াছে,—তাহার প্রাণের জ্যোতিঃ পরাধীনতার ম্লানতায় কখনই নির্ব্বাপিত হইবে না। ইতিহাসের দিকে চাহিয়া দেখ, ইহার দৃষ্টান্ত জ্বলন্ত অক্ষরে মুদ্রিত রহিয়াছে;—এবং ইতিহাস ত মিথ্যা কহে না। কিন্তু সাহিত্যে চাই সত্যের প্রতিষ্ঠা,—যে সত্য দেশ ও কালের অপেক্ষা করে না,—সাধারণের অনুমোদন ও প্রশংসার ধার ধারে না,—নিজের পায়ের উপর নিঃসঙ্কোচে দাঁড়াইয়া সমস্ত জগৎকে নিকটে আহ্বান করিয়া লয়।

[শ্রীসরসীবালা বসু]

(১৩)

সেই ঘটনার পরদিন গভীর রাত্রিতে মোহিনী আসিয়া হঠাৎ যখন শান্তির ঘরের শিকলটা নাড়া দিল, তখন তাহার ঠন্‌ঠন্‌ শব্দে নিদ্রিত রাজেন চমকিয়া জাগিয়া উঠিল। আগের দিন হইতে সমস্ত দিন, সমস্ত রাত্রি যাতনায় শিশু ঘুমাইতে পারে নাই,—পিতা-মাতাও চক্ষে-পাতায় করিবার অবসর পায় নাই। মাত্র কিছুক্ষণ পূর্ব্বে হঠাৎ রাজেনের কান্না কমিয়া আসিল; সে শান্তভাবে ঘুমাইয়া পড়িল। খোকাকে ঘুমাইতে দেখিয়া ক্লান্তদেহে শান্তি ও হেমন্তবাবুও বিছানায় শুইয়া পড়িলেন; এবং শুইবামাত্র গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইলেন। এমন সময় শিকল-নাড়ার শব্দে সকলেরই ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। শান্তি সচকিতে বাহিরে আসিয়া দেখিল, মোহিনী দাঁড়াইয়া আছে। মোহিনী শান্তিকে দেখিয়া কহিল, "নতুন দি', অমূল্য বড় যেন কেমন করছে,—আমার ভয় হচ্চে।" রাজেন তখন জাগিয়া উঠিয়া পুনরায় আর্ত্তস্বরে কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছিল। শান্তি বিরক্ত হইয়া কহিল, "যে কোরে তুমি শেকল নেড়েছ,—আমি মনে করলুম, বুঝি কি যেন ব্যাপার হয়েছে!—বাড়ীতে আগুণই লেগেছে, কি ডাকাতই পড়েছে! ছট্‌ফট্‌ করলে তার আর অষুধ কি? খোকা যে ক'দিন ক'রাত চক্ষে-পাতায় করে নি,—আজ কি ভাগ্যে সবে বাছা চোখটি বুজেছিল,—আর তুমি এসে তুলে দিলে!"

শান্তি ঘরে আসিয়া খোকাকে কোলে লইয়া সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। হেমন্তবাবু চটি পায়ে দিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিতেছেন দেখিয়া, শান্তি বলিয়া ফেলিল, 'সে ঘুমোয় নি তো একেও ঘুমুতে দেওয়া হবে না। শত্রুতা করে বাদ সাধা আর কি! আমি কি ও-সব কিছু বুঝতে পারি না?" শান্তি অনিচ্ছা-সত্ত্বেও এতখানি বিষ উদ্গীরণ করিয়া ফেলিল, যাহার জ্বালা মোহিনীর সর্ব্বাঙ্গে যেন ভীষণ দাহের সৃষ্টি করিল। শান্তি ঠারে-ঠোরে যাহাই প্রকাশ করুক, মুখ ফুটিয়া এতখানি কটু কথা সে কোনও দিন বলে নাই। মোহিনী স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, কেই বা তাহার শত্রু, আর শত্রুতাই বা সে কি করিল! বেচারী বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই, একটুখানি শিকল নাড়ায় এতখানি উল্টা উৎপত্তি হইয়া দাঁড়াইবে! মোট কথা, স্তব্ধ রজনীর নীরবতার মধ্যে হঠাৎ একটুখানি তীক্ষ্ণ শব্দই যে অত্যন্ত কর্কশ ও ভয়ানক শোনায়, সে কথা কেহই ভাবিয়া না দেখিয়া, উভয়ে উভয়ের ত্রুটি ধরিয়া মনে-মনে অশান্তি অনুভব করিতে লাগিল। মোহিনী প্রতিজ্ঞা করিল, এবার হইতে সে খুব সাবধানে চলিবে,—পারত-পক্ষে আর কখনও শান্তিকে বিরক্ত করিবে না। কিন্তু হায় হায়, অমূল্যর জন্য সে আজ করে কি? অমূল্যকে সে ছোট-বেলা হইতে বুকে করিয়া মানুষ করিতেছে,—এমন কঠিন পীড়া তাহার কখনও সে দেখে নাই। তাহার তরুণ হৃদয় নবীন বয়সেই গুরুতর আঘাত-সহনশীল হইলেও, সংসারের আধিব্যাধি প্রভৃতির উৎপীড়নের অভিজ্ঞতায় এখনও পাকিয়া উঠিবার অবসর পায় নাই। সুতরাং রোগীর যাতনাজনিত চীৎকারে তাহার জাগরণ ও অনশন-ক্লিষ্ট মনে এমন আতঙ্ক উপস্থিত হইতেছিল, যাহাতে সে একা আর থাকিতে না পারিয়া ভয়-বিহ্বল চিত্তে শান্তিকে খবর দিতে গিয়াছিল।

মোহিনী ফিরিয়া আসিয়া অমূল্যর মাথার কাছে বসিতেই হেমন্তবাবুও আসিয়া অমূল্যর দেহের উত্তাপ পরীক্ষা করিলেন। অমূল্য তখন প্রলাপ বকিতে সুরু করিয়াছে। হেমন্তবাবু অমূল্যর মাথায় জলপটি দিতে-দিতে কহিলেন, "ভয় নেই; রাজেনেরও ঠিক্‌ এম্‌নি হয়েছিল। এখন বাড়বার মুখ কি না। দুটো-দুটো ছেলে এক সঙ্গে শুয়্‌তে লাগ্‌লো,—এমনও বিপদে পড়্‌লাম! চাকরটাও আজ শোয়নি, বাড়ী গেছে। ভীখুকে একবার ডাকি,—সেই বা ছেলেমানুষ কত আর রাত্‌ জাগ্‌বে!"

এই সময় শান্তি আসিয়া পড়িল;—ঘরে ঢুকিয়াই

তীব্র-কণ্ঠে কহিল, "বলি, হ্যাঁগো, তোমার কি ভীমরতি হয়েছে? ভাদ্র-বৌএর ছায়া মাড়াতে নেই,—আর এক বিছানায় তোমরা দু'জনে বসেছ! দিদিরও তো আক্কেল বেশ! হিঁদুর মেয়ে হয়ে এটা জান না?"

হেমন্তবাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "বিপদে-আপদে অত বাছ-বিচার চলে না। এতে কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।"

"তা বৈ কি! ছেলের অসুখ বলে পাপ-পুণ্যি বজায় রেখে চল্‌তে হবে তো! ও-সব বাহানা আমার ভাল লাগে না।"

"চল—বল,—কি খকুছ পাগলের মতন! ছেলের অসুখে তোমারও মাথা খারাপ হয়ে গেছে দেখ্‌ছি! রোগা ছেলেকে একলা ফেলে এখানে কি করতে এলে।" বলিয়া হেমন্তবাবু শান্তিকে লইয়া চলিয়া গেলেন। মোহিনী মুখের ঘোমটা সরাইয়া আঁচলে চক্ষু মুছিল। সত্যই সে আজ অন্যায় করিয়াছে! ভাসুর আসিয়া বিছানায় বসিলে, সে অমূল্যর মাথার কাছ হইতে উঠিয়া যায় নাই। ভগবানের চক্ষে এ ক্ষুদ্র ব্যাপার মার্জ্জনীয় হইলেও, শান্তির চক্ষে এ ত্রুটি অপরাধ বলিয়া গণ্য, সুতরাং অমার্জ্জনীয়। তার পর শেষ কথাটিতে শান্তি কি ইঙ্গিত করিয়াছে? মোহিনী মনে-মনে শিহরিয়া উঠিয়া কহিল, 'হে ঠাকুর, আর জন্মে কত পাপ করেছিলুম,—তার কি মাপ্ আর হবে না কোন দিন? ছি,—ছি! এত অপমান সয়ে এইখানে পড়ে থাক্‌বো! না, আর নয়,—অমূল্য ভালয়-ভালয় সেরে উঠুক্, তাকে রেখে—' অমূল্যর মাথার উপরে অনিলার সেই ছবি,—মোহিনীর দৃষ্টি সে দিকে পড়িবামাত্র, মোহিনীর দুই চক্ষে শতধারা বহিল। সে মনে মনে কহিল, 'দিদি, এ কি বাঁধনে আমায় বেঁধেছ! আমার তো বাঁধন কেটে পালাবার পথ রাখনি! তোমার গচ্ছিত ধন কার কাছে রেখে যাব আমি? এ যখের ধন যে! আমায় বুক দিয়ে আগ্‌লে রেখে মানুষ করতে হবে। যত খোয়ার, যত লাঞ্ছনা—সব পাথর হয়ে সইতে হবে। যদি কখন মানুষ করে তুলতে পারি, তখনি ছুটী পাব। অমূল্য এই সময় উচ্চকণ্ঠে কহিল, "জ্বলে গেল মা, জ্বলে গেল,—জ্বলে মলুম, ঠাণ্ডা কোরে দে মা, তোর পায়ে পড়ি, ঠাণ্ডা করে দে।"

অভাগিনী নারী বেদনা-ক্লিষ্ট বালকের ললাটে চুম্বন করিয়া কহিল, "সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে বাপ্, ভয় কি? তোর মুখ দেখে যেমন আমার বুকের যত জ্বলুনী জুড়িয়ে জল হয়ে যাচ্ছে, তেমনি মা শেতলার দয়ায় তোরও সব জ্বালা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।"

পরদিন সরলা অমূল্যকে দেখিতে আসিলে, মোহিনী কাঁদিতে-কাঁদিতে সকলই বলিয়া ফেলিল। সরলা কহিল, "বল্‌বার ত কিছু নেই বোন্, যে বল্‌বো। শুধু চোখ মেলে দেখবো, আর কাণ পেতে শুনবো।' এমন যে হবে, সে ত জানা কথা। শান্তির কোন দোষ দিই না,—সে ছেলেমানুষ, তার অত বুদ্ধি-বিবেচনা নেই। দোষ যে কার, তাও জানি না। সবই আমাদের অদৃষ্টেরই দোষ। হিমি আজ থেকে তোমার কাছে থাক্‌বে এখন,—তবু অনেকটা সাহস পাবে। কাজ ফেলে আস্‌বার জো নেই,—নইলে আমিও থাক্‌তে পারতুম। রাণীকে তো লিখেছি,—সে যে এসে পড়্‌লে হয়! ছেলেটা তো জ্বরের ঝোঁকে কেবল দিদি-দিদি করছে!"

পরদিনই রাণী আসিয়া পৌছিল। খুড়ীমার নিকটে কিছু না শুনিলেও, হিমির নিকটে সবিস্তারে এ-সব কথা শুনিয়া, তাহার মন এমন তিক্ত হইয়া উঠিল যে, সে তার মাতৃসমা, অপার স্নেহশালী, চির-দুঃখিনী খুড়ীমার প্রতি বিমাতার এ রূঢ় আচরণকে কিছুতেই মার্জ্জনার চক্ষে দেখিতে পারিল না। যাহা হউক, সকলের ঐকান্তিক যত্নে ও দেবতার আশীর্ব্বাদে অমূল্য ও রাজেন এ-যাত্রা রক্ষা পাইল; তবে তাহাদের সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে প্রায় দুই মাস লাগিল। এ দিকে সকল বিষয়ের খুঁটি-নাটি ব্যাপার লইয়া মেয়েদের মনের মধ্যে এমন একটা অশান্তির ধূম পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছিল, যাহার কাল ছায়া সংসারের সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপর একটা আশঙ্কার ছায়াপাত করিয়া যাইতে লাগিল।

(১৪)

পৌষ মাসের প্রথমে কন্‌কনে শীত পড়িয়াছে। গত-রাত্রিতে এক-পসলা বৃষ্টি হওয়ায় শীতের মাত্রা যেন বাড়িয়া গিয়াছে। দুপুরবেলা স্কুলের টিফিনের ছুটির সময় ছেলের দল সামনের খোলা মাঠে হুড়াহুড়ি বাধাইয়াছে,—অল-যোগের পরিবর্তে গোলযোগের খুবই বাড়াবাড়ি। স্কুলের পাশেই ছোট-ছোট ছেলেদের জন্য গুরুমহাশয়ের খোড়ো পাঠশালা। গুরুমহাশয় চালায় বসিয়া তামাক খাইতে-খাইতে,

সুখকর রৌদ্র-স্পর্শে নিদ্রাকর্ষণ হওয়ায়, ছেলেদের বইগুলি একত্র করিয়া উপাধান করিয়া মাথায় দিয়াছেন, এবং আরামে নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছেন। পড়ুয়ার দল সোল্লাসে মাঠে গিয়া গুলিডাণ্ডা খেলা সুরু করিয়াছে। কেহ-কেহ রাখাল বালকদিগের সহিত ভাব জমাইয়া, কড়াই-শুঁটির ক্ষেত হইতে কড়াইশুঁটি সংগ্রহ করিয়া সেগুলির সদ্ব্যবহার করিতে নিযুক্ত। এমন সময়ে সে গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার পরিচিতা সিধু-বোষ্টুমী সেই পথ দিয়া ঘরে ফিরিতেছিল;—ছেলের দল তাহাকে পাকড়াও করিয়া গানের ফরমাস করিল।

বোষ্টুমী আপত্তি করিল। সকাল হইতে সারা গাঁয়ে ভিক্ষা সাধিয়া এতক্ষণে সে বাড়ী ফিরিতেছে—বেলা এক প্রহর বাজিয়া গিয়াছে,—এখন সে স্নান করিয়া রান্না চড়াইবে,—তবে দুটা কিছু মুখে দিতে পাইবে।' আজ থাকুক, আর একদিন সে তখন ভাল-ভাল নূতন-বাঁধা গান শুনাইয়া যাইবে।

ছেলের দল নাছোড়বান্দা। একজন গিয়া সিধুর একতারাটি কাড়িয়া লইল। বোষ্টুমী ফাঁপরে পড়িয়া কহিল, "যাদুরা, তোমরা ত যখন-তখনই গান শোন,—আমায় খেতে ত কিছু দাও না। পাওনা আমার ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে,—এবারে তোমরা সবাই মিলে আমায় একখানা শীতের গায়ের কাপড় কিনে দাও। যুদ্ধের জন্যে কাপড় যে মাগ্‌গী হয়েছে! আমার ত কেন্‌বার সামর্থ্য নেই,—তোমরা কিনে দাও।"

অমূল্যর বয়স এখন বছর বার; সে স্কুলে ফিপ্‌থ্‌ ক্লাশে পড়ে। রাজেনও হাতে-খড়ি দিয়া পাঠশালায় প্রথমভাগ আরম্ভ করিয়াছে। অমূল্য কহিল, "আচ্ছা, তুমি আমাদের একটা গান শোনাও আগে,—ভাল গান, নতুন গান।" বোষ্টুমি আর পরিত্রাণের আশা নাই দেখিয়া, একতারায় ঘা মারিয়া গান আরম্ভ করিল।

জার্ম্মাণি আর ইংরেজেতে লড়াই বেঁধেছে,
মরণ-বাঁচন পণে দুয়ে পাল্লা দিয়েছে।
হ্যা দেখ ঐ নয়ন মেলে,
মায়ের, বোয়ের আঁচল ফেলে,
বাঙ্গলা দেশের ছেলেরা সব সেপাই সেজেছে,—
প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে যুদ্ধে চলেছে।

এ দিকে এক বিষম দায়,
কাপড় বিনে কি হায় হায়!
বস্ত্র বিনে কতই জনা পরাণ ত্যেজেছে,
কাপড়ওলা মহাজনের কপাল ফিরেছে।
দেশের লোকের রক্ত শুষে
ভুঁড়ির বহর বাড়ছে যে সে,
আগুণ দামে কাপড় বেচে কেল্লা মেরেছে,—
মা লক্ষ্মীর হাঁড়ী তারা লুটে নিয়েছে।
কারু হোলো পৌষ মাস,
কারু হায় সর্ব্বনাশ,
বিহিত বিধান কে, কার করে, কি কাল পড়েছে,—
হায় রে হায় কি কাল পড়েছে।
সুদন বলে সাম্‌লে চল্‌ ভাই গুঁতো এসেছে,
কত দূরে ঠেল্‌বে কারে কেই বা জেনেছে।

লড়ায়ের নূতন গান শুনিয়া ছেলেরা আনন্দে হাততালি দিয়া উঠিল, গানের মধ্যে বস্ত্রাভাবের জন্য যে হাহাকার ছিল, তাহারা অত তলাইয়া বুঝিল না। কয়েকজন চাষী দুপুর রৌদ্রে একটু বিশ্রাম করিবার জন্য একদিকে বসিয়া তামাকু খাইতেছিল, তাহারা গান শুনিয়া হায় হায় করিয়া বস্ত্রাভাবের জন্য নিজ নিজ সাংসারিক কষ্টের কথা উল্লেখ করিতে লাগিল। রাজেন আসিয়া দাদার পাশে দাঁড়াইয়া গান শুনিতেছিল; সে কহিল "দাদা সেই গুরুমশায়ের গানটা গাহিতে বল না।" সিধু কহিল, "আজ থাক্‌ বাবা, আবার এক দিন শুনো।" ইতোমধ্যে লাফাইতে-লাফাইতে, হাঁপাইতে-হাঁপাইতে তিনটি ছেলে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। একজন কহিল, "ওরে ভবা, ওরে অমূল্য, আজ ভারী মজা হয়েছে। গাধা যে সত্যি-সত্যিই গাধা, আজ তার প্রমাণ পেয়েছি।"

গাধার গর্দ্দভবুদ্ধি আবিষ্কার করার কথা শুনিয়া শ্রোতৃ-বর্গ অধীর আগ্রহে চারিদিক হইতে "কি—কি, কি-রকম ভাই" প্রশ্ন করিয়া উঠিল। বক্তা উৎসাহের সহিত কহিল, "ফুল-গাছের চারা রোজ-রোজ খেয়ে যায় বলে, কাল ইস্কুলের মালী গাধাটাকে বেঁধে রেখেছিল। রাত্তিরে সারা-রাত টুপটাপ বৃষ্টি পড়েছিল। এই ঠাণ্ডা বাতাস,—কনকনে শীত। গাধাটা চালায় বাঁধা ছিল,—তার পেছন-দিকটা চালার বাইরে ছিল। গরু-বাছুর-ছাগলগুলো দেখেছিস, ত,

—গায়ে একটু বৃষ্টির ছাঁট লাগলে কেমন সুবিধে-মত সরে দাঁড়ায়, তা' গাধাটা এমন নির্ব্বুদ্ধি,—সে একটুও সরে দাঁড়ায় নি। তার পেছন দিকটায় সমস্ত রাত্তির জল পড়েছে,—শীতে কেঁপেছে,—তবু সেই ভাবেই দাঁড়িয়ে ছিল। তাতেই বলে গাধার বুদ্ধি। এমন না হোলে গাধা! মালী আমাদের ডেকে বলছিল।"

ছেলেদের হাহা-হোহো আনন্দধ্বনিতে সমস্ত মাঠ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। উহাদের অন্যমনস্ক দেখিয়া বোষ্টুমি সরিয়া পড়িতেছিল;—অমূল্য গিয়া আবার পাকড়াও করিয়া কহিল, "বেশী না, আর একটা গান গেয়ে যাও।" বোষ্টুমী অগত্যা ছেলেদের অতি প্রিয় সেই গানটি গাহিতে লাগিল।

গুরুমশাই তোমার খুরে করি দণ্ডবৎ,
দুর থেকে এই সাত হাত মেপে দিচ্ছি নাকে খৎ।
বিদ্যে থাকছে সিকেয় তোলা,
সিধের যোগাড় আতপ কলা,
অষ্টপ্রহর তামাক মলা, পাঠশালার এই সত্ত্বৎ।
না পারলেই ঠেঙার বাড়ী দেখাও হাতের কসরৎ।
ঘরের ছেলে ঘরের খেয়ে
কাজ কি বনের মোষ তাড়িয়ে,
শিষ্য দমন, সাক্ষাৎ শমন কাজ কি তোমার মহবৎ!
ভালয় ভালয় বিদেয় হই গো, দুর থেকে এই দণ্ডবৎ।

বোষ্টুমীর মিঠা সুর খোলা মাঠে অনেক দুর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল। রাখাল-বালকেরা গরু ফেলিয়া, কড়ি খেলা ছাড়িয়া পাচনী হাতে গান শুনিতে আসিয়া দাঁড়াইল। পাঠশালার ছোট-ছোট ছেলের দল পরম কৌতুকের সহিত গানটি উপভোগ করিতে লাগিল। এ গানটি তাদের ভারী প্রিয়। গ্রাম্য-কবি সরল ভাষায় তাহাদেরই প্রাণের কথা দিয়া যেন গানটি বাঁধিয়াছে। রাজেন ত এ গানটির একজন সমজদার শ্রোতা। সে তন্ময় হইয়া গানের প্রত্যেক শব্দ যেন হাঁ করিয়া গিলিতেছিল। বোষ্টুমী গান শেষ করিয়া রাজেনের দিকে চাহিয়া কহিল, "খোকাবাবু, কি দিচ্ছ, দাও,—বাড়ী যাই।" রাজেন অমূল্যর দিকে চাহিতেই, অমূল্য কহিল, "যা, দৌড়ে গিয়ে তোর মায়ের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে আয়। আমার নাম যেন করিস্ নি, খবরদার! তা হোলে মেরে হাড় গুঁড়ো কোরবো। খাবার-টাবারের নাম কোরে চাস্, বুঝলি?" রাজেন তৎক্ষণাৎ দৌড় দিয়া বাড়ী পৌঁছিল। গিয়া দেখিল, মা অঘোরে ঘুমাইতেছে। টেবিলের উপর একটা টাকা ও দুটা আধুলি পড়িয়া রহিয়াছে। রাজেন স্বচ্ছন্দে একটি আধুলি লইয়া আসিয়া বোষ্টুমীর হাতে দিল। অমূল্য জানিত, রাজেন বাহানা করিলে শান্তি তাহাকে কিছু না দিয়া পারিবে না। তাই রাজেনকে আধুলি আনিতে দেখিয়া সে মনে করিল, রাজেনের মা তাহাকে ঐ আধুলি দিয়াছে। সে তাই কোন প্রশ্ন করিল না। বোষ্টুমী খুসী হইয়া রাজেনকে রাজ-পদে অভিষিক্ত করিয়া চলিয়া যাইতেছে, এমন সময়ে গানের শব্দে ও ছেলেগুলার গোলমালে ঘুম ভাঙিয়া গিয়া রক্ত-চক্ষু পণ্ডিতমশাই উঠিয়া বসিলেন। বোষ্টুমীকে দেখিয়া তাঁহার পিত্ত জ্বলিয়া গেল; কহিলেন, "বেহায়া মাগী, আবার এই দিকে এসেছিস! আবার সেই হতচ্ছাড়া গান গেয়ে ছেলেগুলোর মাথা খাচ্ছিস্। তোর নামে এইবার সাহেবের কাছে দরখাস্ত দিচ্ছি, দাঁড়া। ফের ঐ সব গান গাইবি ত মাথা ভেঙে দোব। গোষ্ঠ গা, রাস গা,—তা নয়, যে-সব গানে ছেলেদের মন বিগ্ড়ে যায়, সেই সব গান গাওয়া হচ্ছে।" বোষ্টুমীও ছাড়িবার পাত্রী নয়,—সে-ও উত্তরে কর্ণ-সুখকর অমৃত-বাণী বর্ষণ করিতে-করিতে চলিয়া গেল।

(১৫)

একটী মোকদ্দমায় দু' পয়সা বেশ পাওনার সম্ভাবনা ছিল। হুঁকায় টান দিতে-দিতে কাছারী-প্রত্যাগত হেমন্তবাবু প্রসন্ন মনে সেই মোকদ্দমার বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন। শান্তি আগে-আগে যখন-তখন এটা চাই, ওটা চাই বলিয়া ফরমাস করিত। সম্প্রতি কোলে আর একটী খুকী হইয়া পর্য্যন্ত সে রাজেন ও খুকীর জন্যই যাহা কিছু ফরমাস করে। হেমন্তবাবু ভাবিতেছিলেন, এবারের টাকাটায় শান্তির অজ্ঞাতসারে একটা কিছু দামী সৌখিন জিনিস কিনিয়া তাহাকে হঠাৎ খুসী করিয়া দিতে হইবে। ঠিক এই সময়ে ঝড়ের মত বেগে শান্তি ঘরের মধ্যে আসিয়া কহিল, "হয় আমার বিদেয় দাও, নয় তো একটা কিছু বিলি-ব্যবস্থা কর। চোখের ওপোর ছেলে যে ক্রমে চোর হয়ে চুরি করতে শিখে, এর পর পাকা ডাকাত হয়ে দাঁড়াবে,—সে আমি সইতে পারবো না।" হেমন্তবাবু থ হইয়া গেলেন। এমন

সময় রাজেন আসিয়া কহিল, "বাবা, তুমি আমায় আট আনা পয়সা দাও। মায়ের আট আনা পয়সা নিয়ে একটা বোষ্টুমীকে দিয়েছি বলে মা কত গাল দিচ্ছে।" "তবে রে পাজী, হতভাগা ছুঁচো।" বলিয়া শান্তি দুমদাম করিয়া রাজেনের পিঠে ঘা-কতক বসাইয়া দিল। হেমন্তবাবু ছেলেদের মার-ধর মোটেই পছন্দ করিতেন না,—হুঁকা ফেলিয়া হাঁ-হাঁ করিয়া ছেলেকে টানিয়া কোলে লইলেন। রাজেন করুণ স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। এই সময় পাশের বাড়ীর একটী ছোট ছেলে আসিয়া নালিশ রুজু করিল, "দেখুন, আপনাদের অমূল্য সেদিন আমার ব্যাট নিয়ে এসেছে, দিচ্ছে না,—আজ সকালে দুটো গুলি নিয়েছে, তাও দিতে চায় না।"

শান্তি কহিল, "আহ্লাদে গোপাল হচ্ছে দিন-দিন,—কাঁধে চেপে নাচ্‌বে এর পর। একটু দাব্ নেই, শাসন নেই,—তা' ছেলে বিগ্‌ড়ুবে না? খোকা ত চুরী কর্ত্তে জান্‌ত না, ও-ই আজ শিখিয়ে দিয়েছে,—তাতেই ও আধুলি চুরী কোরে নিয়ে গেছ্‌লো। ও-সব আহ্লাদে খেলা আমার ভাল লাগে না। যে অধঃপাতে যায় যাক্,—সঙ্গ-দোষে আমার ছেলেকে বিগ্‌ড়ুতে আমি দোবো না। আবার পরের ছেলেরও জিনিস নিয়েছে।" সেই সময়ে, "খোকা বল্ খেলতে যাবি তো আয়" বলিতে-বলিতে অমূল্য আসিয়া ঘরে ঢুকিল। আর যায় কোথা! হেমন্তবাবু পাখাখানা তুলিয়া লইয়া অমূল্যর পিঠে ও বাহুতে যে দিকে পাইলেন, খুব জোরে দু'চার ঘা বসাইয়া দিলেন। অতর্কিত আক্রমণে অমূল্য একবার আর্ত্তনাদ করিয়াই চুপ হইয়া গেল। শব্দ শুনিয়া মোহিনী ব্যস্তভাবে ছুটিয়া আসিল। হেমন্তবাবু পাখা ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, "দূর হয়ে যা আমার সুমুখ থেকে, কুলাঙ্গার কোথাকার! আমি তোর মুখ দেখতেও চাই না। নিজেও গোল্লায় গেছ, আবার খোকাকেও চুরি করতে শেখাচ্ছ!"

অমূল্য পিতার স্নেহ-যত্নে বঞ্চিত হইলেও, এভাবে তিরস্কৃত বা প্রহৃত কখনও হয় নাই। শান্তিকে পছন্দ না করিলেও, রাজেনকে সে খুবই ভালবাসিত। রাজেনও মাতার নিষেধ সত্ত্বেও সর্ব্বদা অমূল্যর সঙ্গ লইত। আজকাল সে বয়সের সঙ্গে বাল-সুলভ নানা প্রকার দুষ্টামী যতই শিখিতেছিল, শান্তি অমূল্যকেই উহার মূল ভাবিয়া পুত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু মুখ ফুটিয়া হেমন্তবাবুর কাছে অমূল্যর বিরুদ্ধেও কিছু বলিতে পারিত না। আজ ঘুম হইতে উঠিয়া টেবিলের উপর আধুলি না দেখিয়া, খোকা স্কুল হইতে আসিলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করায়, সে স্বচ্ছন্দে উহা স্বীকার করিল। শান্তি ধমক দিয়া কহিল, "অমূল্য শিখিয়ে দিয়েছিল,' নয়?" রাজেন সবলে ঘাড় নাড়িল বটে; কিন্তু শান্তি আর দু'চারবার হাঁকাহাঁকি করায় বলিয়া ফেলিল যে, অমূল্যই তাহাকে শিখাইয়া দিয়াছিল। তখন শান্তির মনের কোণে সঞ্চিত ধূমপুঞ্জ অকস্মাৎ বাতাস পাইয়া একেবারে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

অমূল্য নির্দ্দয়ভাবে প্রহৃত হইয়াও চেঁচাইতে পারিল না। সে যেন স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। মোহিনী ছুটিয়া আসিয়া, ব্যাপার দেখিয়া, লাজ-লজ্জার মাথা খাইয়া করুণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ওগো, তোমাদের পায়ে পড়ি,—ওকে ছেড়ে দাও, আর মেরো না।"

অমূল্যকে মারিতে দেখিয়া ভয়ে খোকা আরও চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। মোহিনী কাঁদিতে-কাঁদিতে অমূল্যকে টানিয়া ঘরের বাহিরে আনিবামাত্র, সে ধাকা দিয়া মোহিনীকে এক পাশে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া, বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। মোহিনী "অ মাণিক, শুনে যা, গোপাল আমার, ধন আমার, কোথাও যাস্ না বাপ্" বলিতে-বলিতে পিছনে ছুটিল। তার পর অমূল্যকে সোজা চারুমোহন বাবুর বাড়ী ঢুকিতে দেখিয়া, সে তখন রান্নাঘরে নিজের কাজে গেল। অমূল্যর মুখ দেখিয়া সরলা বলিয়া উঠিলেন "কি হয়েছে রে অমূল্য? তোর মুখ অমন কেন?" অমূল্য আর নিজেকে সামলাইতে পারিল না। "জ্যেঠাইমা গো, বাবা আজ আমায় মেরে ফেলেছে গো!" বলিয়া দড়াম করিয়া সরলার পায়ের কাছে আছাড়িয়া পড়িল। সরলা শশব্যস্তে অমূল্যকে কোলে টানিয়া লইয়াই চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওমা, এ কি ব্যাপার! পিঠে যে ছড়া-ছড়া দাগ পড়ে গেছে,—রক্ত ফুটে বেরিয়েছে! এ কি গোঁয়াতুমী! ও বিন্দুর মাসী, শীগ্‌গীর জল আন গো।" অমূল্যর চোখে-মুখে জল দিয়া মুছাইয়া, তার পর পিঠে ভিজে ন্যাকড়া বাঁধিয়া, সরলা অমূল্যকে তুলিয়া বসাইল। অমূল্য অনেকক্ষণ ফোঁপাইয়া-ফোঁপাইয়া কাঁদিবার পর কিছু শান্ত হইল। তখন সরলা খুঁটিয়া-খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া ব্যাপারটি অবগত হইল। অমূল্যকে সান্ত্বনা দিবার জন্য কহিল, "কেঁদো না বাপ, উনি

ও তোমায় কখনো মারেন না ; কি রকম রাগ হয়ে গেছে, তাই সাম্‌লাতে পারেন নি।" অমূল্য কহিল, "না জ্যেঠাইমা, বাবা আমায় একটুও ভালবাসে না, খোকাকেই শুধু ভাল বাসে।" সরলা কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। ঘটনাচক্রে পুত্রও পিতৃস্নেহে অবিশ্বাসী হইয়া দাঁড়াইতেছে। অমূল্য কি ভাবিয়া আবার কহিল, "জ্যেঠাইমা, বাবা আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে ;—আর আমি ওদের বাড়ী যেতেও চাই না। তোমরা আমায় থাকতে দেবে না? আমি বড় হয়ে চাক্‌রী কোরে টাকা এনে তোমাদের দোবো।" সরলা হাসিয়া ফেলিল ; কহিল, "তুই কি পাগল হলি অমূল্য! রাগের সময় বাপ-মা যে অমন বলে। আমি যে সুধাকে, খোকাকে কত সময় মেরে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিই,—তা তারা কি আর বাড়ীতে আসে না?"

অমূল্য চুপ করিয়া রহিল ; তাহার মন জ্যেঠাইমার এ কথায় সায় দিতে পারিল না। এখন তাহারও বুদ্ধি হইয়াছে। সে এখন বুঝিতে পারিয়াছে, ছোট-মা তার নিজের মা নয়। সুধা-খোকার মতন মায়ের হাতে দিনে পাঁচবার মার খাইতেও সে প্রস্তুত আছে। সুধা খোকা বাড়ীতে ত কত উপদ্রব করে ; সে কিন্তু একটু কিছু করিলেই ছোট-মা কত রকমে বুঝাইতে থাকেন—এ রকম করিতে নাই ; ইত্যাদি। অথচ রাজেনের বেলায় সে-সব নিষেধ খাটে না। অমূল্য যেন ভয়ে-ভয়ে পরের ঘরে বাস করিতেছে। সুধা-খোকাকে ত কই অমন সসঙ্কোচে থাকিতে হয় না! কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অমূল্য কহিল, "জ্যেঠাই-মা, আমি দিদির কাছে যাব, দিদি রাক্ষুসী একবার আমাকে দেখতেও আসে না।" "তাই যাস এখন। ওদিকে ছোটমা তোকে তিন মুল্লুক খুজে বেড়াবে। আয় দেখি, কিছু খাইয়ে দিই।" বলিয়া অমূল্যকে লইয়া সরলা রান্না ঘরে গেল। এদিকে মোহিনী বঁটনা বঁটিতে বসিয়া কেমন করিয়া লঙ্কার হাত চোখে লাগাইয়া বসিল যে, অবশেষে শান্তিকে রান্নাঘরে আসিতে হইল। মোহিনী নিজের ঘরে আসিয়া মেঝেয় উপুড় হইয়া পড়িয়া চক্ষু রগড়াইতে লাগিল।

ফাল্গুনের মিঠা হাওয়ায়, পত্রহীন অশ্বথ, বট, নিম ও আমের ছোট-বড় গাছগুলার গায়ে রোমাঞ্চ ধরিয়া যেন রাতারাতি মঞ্জরিত, পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে ; গৃহস্থের আঙিনায় ও মাটীর টবের বেল-ফুল গাছগুলিতে কুঁড়ি ধরিয়াছে। কোকিলগুলা অনবরত কু-কু করিয়া ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়াছে। ছেলের দলও উহাদের অনুকরণ করিয়া আমোদ অনুভব করিতেছে।

অমূল্য পুকুর-পাড়ে বসিয়া মাঠের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া বসিয়াছিল। সম্মুখের মাঠে আখ কাটা হইতেছে। রাজ্যের ছেলেমেয়ে আখের লোভে সেখানে গিয়া জমা হইয়াছে। কেহ-কেহ চাহিয়া-চাহিয়া এক-আধখানা আদায় করিতেছে, কেহ বা তুলিয়া লইয়াই চম্পট দিতেছে।

পুকুরে এক পাল হাঁস প্যাঁক-প্যাঁক শব্দে মানুষের কাণে যেন খোঁচা দিতেছে। পাড়ে দাঁড়াইয়া একটী ছেলে ক্রমাগত ঢিল মারিয়া নিজেদের হাঁসগুলিকে জল হইতে তুলিবার চেষ্টা করিতেছে ; তাহারা তীব্র কণ্ঠে তাহারই প্রতিবাদ করিতেছে,—এখন আমাদের যাইতে ইচ্ছা নাই, মিছামিছি বিরক্ত করিও না।

হঠাৎ রাজেন আসিয়া অমূল্যর গলা জড়াইয়া কহিল, "দাদা, তোমার বেলফুলের গাছে কুঁড়ি ধরেছে, দেখবে চল।" অমূল্য সাধ করিয়া একটী বেলফুলের চারা পুঁতিয়াছিল। প্রত্যহ জল সেচন করিয়া সেটিকে বড় করিয়াছে। ভীখুকে যখন-তখন হুকুম করে, "গাছটার গোড়ায় চাট্টি ভাল মাটি এনে দে। দেখিস্ শীগ্‌গীর ফুল ফুটবে।" অমূল্যর সাধের গাছটির কথা সকলেই অবগত। মার চিঠিতে এ শুভ সংবাদ রাণী-দিদির কাছেও পঁহুছিয়াছে। এমন কি অমূল্য প্রতিশ্রুত হইয়াছে, উহাতে ফুল ফুটিলে দিদিকে খামের মধ্যে সে একটী উপহার স্বরূপ পাঠাইয়া দিবে, সুতরাং রাজেনের এত বড় শুভ-সংবাদে তাহার খুবই খুসী হইবার কথা। কিন্তু অমূল্যর আজ মন ভাল নাই। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "খোকা, তুই বাড়ী যা,—আমি এখন জ্যেঠাইমাদের বাড়ী যাচ্ছি। তুই আমার সঙ্গে গেলে তোর মা তোকে মারবে, আমিও বকুনী খাব।" রাজেন এত বড় সুখবরটা উৎসাহের সহিতই দিতে আসিয়াছিল, এবং আশা করিয়াছিল, দাদা এখুনি তাহার সহিত গিয়া ফুলের কুঁড়ী দেখিবে। কিন্তু তাহা হইল না। অমূল্যর জন্য তাহার খুব প্রিয় হইলেও, সে তাহার সঙ্গে যাইতে সাহস করিল না। মা যে তাহাকে মারিবে, সে ভয়কে সে গ্রাহ্য করে না। কিন্তু অমূল্য পাছে বকুনী খায়, এ ভয় তাহার যথেষ্ট ছিল, এবং অমূল্যকে সে অত্যন্ত

ভালবাসিত। সুতরাং তাহার বকুনী খাওয়া সে পছন্দ করিত না। অগত্যা ক্ষুণ্ণমনে তাহাকে বাড়ী ফিরিতে হইল।

রাণী আজ পনের দিন হইতে প্রবল জ্বরে শয্যাগত। ক্ষিতীশ অমূল্যকে চিঠি লিখিয়াছে যে, রাণী কেবলই তাহাকে দেখিতে চাহিতেছে। বাবাকেও সে একবার দেখিতে চায়। কিন্তু বাবা যদিই না আসিতে পারেন, অমূল্যকে পাঠাইতে যেন আপত্তি না করেন; কেন না, ডাক্তার বলিতেছেন, আজ দুইদিনমাত্র; রোগীর মনে যেন এসময়ে কোন উদ্বেগ উৎকণ্ঠা না হয়; তা'হ'লেই আশঙ্কা বেশী।

অমূল্য তো এখনই যাইতে রাজী। কিন্তু বাবাকে সে বলিতে পারে নাই, তাই জ্যেঠার শরণাপন্ন হইয়াছে। সে এখন বড়টি হইয়াছে, স্নেহপরায়ণা দিদিকে সে এখন চিনিতে পারিয়াছে। অমূল্যকে ছাড়িয়া থাকিতে কষ্ট হইলেও, মোহিনীরও খুব ইচ্ছা যে, অমূল্য দিদির অসুখে দিদির কাছে যায়। রাণী তাহাকে কাছে পাইলে কত সুখী হইবে।

দিদির অসুখ যাহাতে ভাল হয়, অমূল্য সে জন্য প্রত্যহ বিছানা হইতে উঠিয়াই যোড় হাতে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করে। এ দু'দিন খেলা-ধূলা কিছুই তাহার ভাল লাগিতেছে না।

চারুমোহনবাবু জল খাইতে বসিয়াছেন। সরলা তরকারী কুটিতেছিল। অমূল্য আসিয়া কহিল, "বাবাকে বলেছ জ্যেঠামশাই?"

চারুমোহনবাবু কহিলেন, "সে তো বাবা, এই রসগোল্লা খাবার মত সহজ কাজ নয়। একে তো তোর বাপ আজ-কাল আমার ওপর বড় সদয় নয়; মনে করে, তার ছেলে-মেয়ের সব কথাতেই আমি বুঝি গায়ে পড়ে ওকালতী করতে যাই। তার মেজাজ বুঝে বল্‌ব এখন।"

অমূল্যর মুখ শুকাইয়া গেল। সে আজ যাইতে পাইলে কাল চায় না,—তার দিদি এতক্ষণ যে ভাইটির পথ চাহিয়া আছে! সরলা অমূল্যর শুষ্ক মুখ দেখিয়া ব্যথিত হইয়া কহিলেন, "ভয় কি অমূল্য, ভাবিস্‌নে,—দিদি তোর সেরে উঠ্‌বে। অসুখ অমন কত লোকের হয়।"

অমূল্য কহিল, "জ্যেঠামশাই, তুমি আজ একবার বল্‌বে চল। জামাইবাবুর চিঠিখানা দেখাবে চল না। তা'হলেই তো হবে। আর আমায় কিছু বেদানা আর আঙুর কিনে দিতে বল,—আমি নিয়ে যাব দিদির জন্যে।"

চারুমোহনবাবু কহিলেন, "আচ্ছা, তুই বাড়ী যা,—আমি যাচ্ছি। তা'হ'লে সকালের গাড়ীতেই তোকে পাঠাবার বন্দোবস্ত কর্‌তে হবে।" অমূল্য আশ্বস্ত হইয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল। সরলা কহিল, "আহা, মায়ের পেটের ভাই,—দিদির অসুখ শুনে ছেলে যেন মুস্‌ড়ে গেছে। কিন্তু সাহস কোরে বাপের কাছে বল্‌তে এগুচ্ছে না। তা দেখ, আমরা তো সবেতেই মন্দ হচ্ছি,—তুমি একবার ঠাকুরপোর কাছে বিয়ের কথাটা পেড়ে দেখ; অমন সম্বন্ধ হাত-ছাড়া করা ঠিক না।"

চারুমোহনবাবু কহিলেন, "তোমরা মেয়েমানুষ, বিয়ের নাম শুন্‌লেই নেচে ওঠো। তা' গা থেকে আঁতুড়ের গন্ধ না বেরুলেও, সে ছেলেমেয়েরও বিয়ে দিতে রাজী আছ। ঐ দুধের ছেলে অমূল্য, তার আবার বিয়ে!"

সরলা মাথা নাড়িয়া কহিল, "এ তো আর ঘর-সংসার কর্‌বার বিয়ে নয়। অত বড় জমীদারের দু'টি মেয়ের জন্যে দু'টি ছোট ছেলে খুঁজছে,—ঘরে রাখবে, মানুষ করবে, লেখা-পড়া শেখাবে। তারাই এর পর তালুক-মুলুকের মালিক হ'বে। সে মন্দই বা কি? অমূল্যর একটা অমন হিল্লেও তো হবে। ভবিষ্যতের ভাবনা কিছু থাক্‌বে না, শ্বশুরের পয়সায় রাজত্বিও কর্‌তে পার্‌বে।"

চারুমোহনবাবু কহিলেন, "ধন্য স্ত্রী-জাতি,—টাকাটাই খুব চিনেছ,—টাকার জন্যে ছেলেকে পর করে দিতে চাও। অমূল্যর বাপের কিসের অভাব? সে কেন ঘরজামাই হ'তে যাবে?"

সরলা ফোঁস করিয়া উঠিল, "তাতে দোষই বা কি? অমূল্যর বাবার এ পক্ষেরও দু'টি সন্তান হোলো, আরও পাঁচটি ত হবে। এখন ঐ বিষয় সাত ভাগ হলে, আর কি থাক্‌বে? তা ছাড়া, ঐ অমূল্যকে নিয়ে এখন থেকেই খুটমুট বেধেই আছে,—এর পর কদ্দূরে গড়াবে, তা কে বল্‌তে পারে? তার চাইতে অত বড়লোকরা যখন অমন একটী ছেলে ঘরজামাই করবার জন্যে খুঁজছে, সেই বা কি মন্দ? আমরা ত টাকাটাই চিনি,—টাকার জন্যে ছেলেকে পর কর্‌তে চাই! তোমরা খুব সাধু! স্ত্রীর জন্যে সন্তানের

মায়া কাটাতেও তোমাদের দেরী লাগে না,—অবশ্য দ্বিতীয় কি তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীটির জন্যে।"

"আহা, হা,—বড় ঠিক কথা বলেছ। সে যে হারানিধি গো, তার কদর তো বাড়বেই;—পাছে আবার ফাঁকি দিয়ে পালায়। সেই যে গানটি আছে 'সদা মনে হারাই হারাই, কি আছে কপালে ভাবি তাই'।" চারুমোহনবাবু গানটিতে সুর যোগ করিলেন। সরলা দুই হাতে কাণ চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "চুপ কর গো, এখুনি পাড়ার ছেলেমেয়ের দল, কোন ভিখারী গান গাইতে এসেছে মনে কোরে, দৌড়ে আসবে। আর তা ছাড়া, পাঁচু ধোবার বাড়ীও বেশী দূরে নয়।"

চারুমোহনবাবু কৃত্রিম কোপের সহিত কহিলেন, "তুমি আমার অপমান করছ? না, আর চলে না—তোমার কাছে ক্রমেই আমায় খেলো হয়ে যেতে হচ্ছে। দাঁড়াও দুদিন, ছেলেটার বিয়ে দিতে হবে। তার পর নাৎনীদের কাছে আমার আদর বাড়ে কি না দেখো। তখন আর তুমি আমল পাচ্ছ না—শাসিয়ে রাখ্‌ছি তা।" জনক-জননীর নিকট পুত্রের বিবাহ, পুত্রবধূ, পৌত্র-পৌত্রী পরিপূর্ণ সংসারের কল্পনা বড়ই মনোরম। সরলা হাসিয়া কহিল, "তাই হোক, ভগবানের দয়ায় সেই দিনই হোক্, আমারও আদর নাতিদের কাছে বাড়ে কি না, তাও দেখে নিও।"

(১৭)

একমাস কঠিন পীড়া ভোগ করিয়া রাণী কাল পথ্য পাইয়াছে। অমূল্য আজ কয়েক দিন হইতে দিদির কাছে আসিয়া রহিয়াছে। রাণী বড় আশা করিয়াছিল, তাহার কঠিন ব্যাধির কথা শুনিয়া পিতা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন না, নিজেও আসিবেন। অমূল্য আসিলে পর রাণী ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "বাবা এসেছেন, অমূল্য?"

"না দিদি, তাঁর কাজের ভিড় পড়েছে, তাই আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। ছোটমা'র আসবার ভারী ইচ্ছে,—তা তোমার শ্বশুর-বাড়ীতে তাঁকে তো আস্‌তে নেই।"

অমূল্য দিদির শিয়রে বসিয়া দিদির তপ্ত ললাটে হাত দিল। রাণী শীর্ণ হাত তুলিয়া ভাইয়ের হাতখানি বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া নিঃশ্বাস ফেলিল। বাবাকে তাহার এ সময়ে দেখিতে বড় ইচ্ছা হইয়াছিল। যে স্নেহময় পিতার সঙ্গে শৈশব, বাল্য, কৈশোর জীবন পাকে-পাকে জড়াইয়া ছিল, যাঁহার স্নেহ, যত্ন, আদর, সোহাগে দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর তাহার দেহ-মন গড়িয়া উঠিয়াছে, আজ হঠাৎ সেই পিতাও তাহার মধ্যে এতখানি ব্যবধান আসিল কেন? রোগ-শয্যায় পড়িয়া রাণীর বারবার মনে হইতেছিল, বুঝি সবই তাহার ত্রুটি,—দুরন্ত অভিমানের বশে বালিকা স্নেহময় পিতাকে ব্যথা দিয়া বুঝি তাঁহাকে কঠিন হইতে বাধ্য করিয়াছে। কিন্তু সন্তানের শত দোষ-ত্রুটিও ত পিতামাতার চক্ষে মার্জ্জনীয়। জগৎ-পিতার প্রতিভূ যাঁরা, তাঁহাদের করুণা-মমতার কি অন্ত আছে? রাণীর মনে হইত, যাই হোক্, পিতার পায়ে ধরিয়া সে নিজের অজ্ঞাত দোষ-ত্রুটির জন্য ক্ষমা চাহিবে। কিন্তু পিতা ত আসিলেন না! যদি সে নাই বাঁচে,—তাহা হইলে ত বড় আক্ষেপই থাকিয়া যাইবে। রাণীর চক্ষু জলে ভরিয়া আসিত। মায়ের রোগ শয্যার কথাগুলি তার মনে পড়িত। তিনি যখন বলিয়াছিলেন, "আমার দিন ফুরিয়েছে মা, তোদের ফেলে চল্লুম," রাণী তখন কাঁদিয়া কহিয়াছিল, "আমাদের কার কাছে রেখে চল্লে মা?" তিনি কন্যার মাথায় হাত দিয়া বলিয়াছিলেন, "কিসের দুঃখ মা, তোমাদের বাবার মতন বাবা কজনের হয়? তিনি তোমাদের কত ভালবাসেন, তোমাদের কোন দুঃখু-কষ্ট হবে না। তুমিও বড়টি হয়েছ, তাঁর সেবা-যত্ন কোরো।"

যদি আজ সত্যই রাণীকে পরপারে যাত্রা করিতে হয়, তাহা হইলে, মাতার সম্মুখীন হইয়া সে নিজের কর্ত্তব্য-ত্রুটির কি হিসাব-নিকাশ দিবে? পিতার সব উপেক্ষা-অনাদরের কথা ভুলিয়া গিয়া, শুধু নিজের ত্রুটিগুলিকে মনের মধ্যে বড় করিয়া দেখিয়া, অভিমানিনী কন্যা ব্যাধির পীড়নে আজ সমস্ত অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া বড় আশায় পিতার আসিবার পথ চাহিয়া ছিল। পিতা আসিলেন না। কাজের ঝঞ্ঝাটে মরণাপন্ন কন্যাকেও দেখিতে আসিতে পারিলেন না,—এ সংবাদে রাণীর বুক যেন ভাঙিয়া যাইবার উপক্রম হইল। তাহার মস্তকের অন্তরতম প্রদেশ হইতে একটা আকুল নিশ্বাস যেন হায়, হায় করিয়া উঠিল। যে প্রশ্ন আজ দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহার বুকের মধ্যে সন্দেহ-দোলায় দুলিতেছিল, আজ তাহার শেষ মীমাংসা হইয়া গেল। রাণী মানস-নয়নে দেখিতে পাইল, তাহার

পিতা ও তাহাদের মাঝখানে যেন একখানি উঁচু দেওয়াল গাঁথা হইয়া গিয়াছে। যেটাকে শুধু একটা আড়াল বা ছায়া বলিয়াই মনে হইত, আজ সে বুঝিতে পারিল, উহা সত্যই জড়, কঠিন, পাষাণের স্তূপ। যাক্, একটা মিথ্যা সান্ত্বনা, মিথ্যা ছলনাপূর্ণ আশা ও আশ্বাসের অপেক্ষা সত্যের এ নিষ্করুণ, কঠোরতম আঘাতও শ্রেয়ঃ। এ কথা রাণী সেদিন ব্যথা পাইবার মুহূর্ত্তে না বুঝিতে পারিলেও, ধীরে-ধীরে এখন বুঝিতে পারিতেছে। তাই সে নিজের মনকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিতেছে,—কেন মিথ্যা ও-সকল কথা ভাবিয়া কষ্ট পাওয়া? অমূল্য বাঁচিয়া থাকুক, তাহাই যথেষ্ট!

অমূল্যকে কাছে পাইয়া রাণী অনেকটা আশ্বস্ত হইয়াছে। অমূল্য দিদির কাছে সেখানকার প্রত্যেক ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ঘটনাগুলির উল্লেখ করিতে ভোলে নাই। সুতরাং রাজেনকে চুরি শেখানর অভিযোগে পিতার তাড়নার কথাও রাণীর শুনিতে বাকী রহিল না। তারপর, সরলা, অমূল্যর সহিত যে ধনী জমীদার মহাশয়ের কন্যার সম্বন্ধ আসিয়াছে, সে কথাটি পত্রের দ্বারা রাণীকে জানাইয়া, ভবিষ্যৎ ভাবিয়া, অমূল্যর এ বিবাহ দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত এই কথা লিখিয়াছে। অমূল্যও ইহা শুনিয়াছে। বিবাহের তাৎপর্য্য এখনও সে না বুঝিলেও, নূতনত্বের স্বাদ পাইবার লোভ তাহারও বেশ প্রবল। ঘরের ভাইটি পরের হইয়া যাইবে—রাণী এটা কিছুতেই পছন্দ করিতেছিল না। কিন্তু সরলার চিঠিখানির কথা ভাবিয়া সে ইহাও বুঝিতে পারিতেছিল, মন্দই বা কি? অমূল্য এতে ভালই থাকবে। কৌতূহলবশতঃ রাণী অমূল্যকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁরে অমূল্য, তোর যে বিয়ে হবে,—তা তোকে তারা বউমানুষের মতন সেইখানেই রেখে দেবে,—সে তুই থাকতে পার্‌বি?"

অমূল্য সপ্রতিভ ভাবে কহিল,—"তারা খুব বড় লোক দিদি! তাদের দুটো বড়-বড় হাতী আছে,—একটা বাচ্চা হাতী আছে,—হাতীতে চড়্‌তে ভারী মজা!"

অমূল্যর কথার ভাবে রাণী হাসিয়া ফেলিল; কহিল, "তাই। হাতী চড়বার লোভে পরের বাড়ী গিয়ে থাকতে তোর ভাল লাগবে, নয়?"

অমূল্য সে কথার উত্তর না দিয়া কহিল, "দিদি, আমার দিকে একদৃষ্টে তুমি চাও দেখি।" রাণী চাহিয়া দেখিল, কিছুক্ষণ পরে কহিল, 'হাঁ কোরে আমার চোখের দিকে কি দেখ্‌ছিস্ রে?" অমূল্য হাততালি দিয়া কহিল, "ভারী মজা দিদি,—তুমিও দেখ্‌তে পাবে,—আমার চোখের ভেতর চেয়ে দেখ না। নিজেকে তুমি কতটুকু দেখ্‌তে পাচ্ছ? বাড়ী-ঘর, গাছ-পালা সব যেন কতটুকু। আমাকে চোখের ভেতরটা দেখ্‌তে ভারী মজা লাগে। আরব্য-উপন্যাসের পরীর রাজ্য, মায়াপুরী, কি ঐ রকম যেন একটা কিছু বোলে মনে হয়।"

রাণী হাসিয়া কহিল, "তোর শ্বশুরবাড়ীটাও বুঝি ঐ রকম একটা আলাদীনের মায়াপুরীর মতনই মনে করছিস্, না রে!"

অমূল্য হাসিতে লাগিল। মোট কথা, ত্রয়োদশ বৎসরের বালক এখন ভবিষ্যতের ভাবনা জানে না, বর্ত্তমানের আনন্দই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। খুব বড়লোকের বাড়ী বিবাহ হইবে,—কত বাজনা, কত আতসবাজী হইবে; কলিকাতা হইতে বায়স্কোপ আসিবে,—খাওয়ান-দাওয়ান, হৈহৈ, রৈরৈ ব্যাপার! স্কুলের ছেলেরা অবাক্ হইয়া বাহবা দিবে। হাতীতে চড়িয়া সে বিবাহ করিতে যাইবে, এ সব শুনিয়া ও ভাবিয়া অমূল্য বিবাহের নামে বেশ আনন্দ ও উৎসাহ বোধ করিতেছিল। রাণী আবার কহিল, "সত্যি অমূল্য, তারা যে তোকে ঘরজামাই রাখ্‌বে, তুই তো বাড়ীতে আস্‌তে পাবি না।"

অমূল্য স্বচ্ছন্দে কহিল, "নাই বা পেলুম। নতুন-মাকে যে ভয় কোরে থাকতে হয়।" রাণী ভ্রাতার হৃদয়হীনতায় ব্যথিত হইল। জননীর পুণ্য-স্নেহ-মণ্ডিত, পবিত্র স্মৃতি পূর্ণ আবাস-ভবনখানি যে সন্তানের নিকট কত আদরের ধন, তীর্থেরই ন্যায় পুণ্য ভূমি, অবোধ বালক তাহা কি বুঝিবে? রাণী কহিল, "আর ছোট-মা যে তোর জন্যে কেঁদে-কেঁদে মরবে,—তোর কি একটুও মায়া-দয়া নেই রে?"

অমূল্য অপ্রতিভ হইল; মুখ ম্লান করিয়া কহিল, "তা করবে দিদি,—খোকার জন্যেও বড্ড মন কেমন করবে। ছোট মাকে আমি নিয়ে যাব। কিন্তু নতুন-মা খোকাকে তো আমার কাছে যেতে দেবে না!"

রাণী হাসিয়া কহিল, "পাগল আর কি! ছোট-মার কি অভাগ্যি যে তোর শ্বশুরবাড়ী থাকতে যাবে! বাবার যে তাতে মুখ হেঁট হবে, তা বুঝিস্ না?"

"দিদি, জামাই বাবু এলো,—বাইসিকেলের শব্দ হচ্ছে।

আমি বাইসিকেল চড়তে শিখ্‌ব" বলিয়া ক্ষিপ্রপদে অমূল্য চলিয়া গেল। পিসিমা সেই সময় খুকীকে লইয়া ঘরে ঢুকিয়া কহিলেন, "ভাইকে নিয়ে তো খুব সোহাগ করা হচ্ছে,—কাহিল শরীরে তাতে কিছু হয় না! মেয়েটা যে আজ কদিন মা-ছাড়া হয়ে আছে,—তাকে তো একবার কোলে-কাছে নিতে হয়! কি সব পাষাণী মেয়ে গো!" খুকীকে নামাইয়া দিয়া পিসিমা মন্থর গমনে চলিয়া গেলেন,—খুকী মার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

(১৮)

অনেক তর্ক-বিতর্ক, অনেক ভাবনা, অনেক ভবিষ্যৎ-চিন্তা ও কল্পনা-জল্পনার পর সত্য-সত্যই মানুটার জমীদার হরিতারণ বাবুর অষ্টম বর্ষীয়া কন্যার সহিত মহা ধূম-ধামে অমূল্যর বিবাহ হইয়া গেল। গ্রামের পুত্রবতীরা অমূল্যর রাজার জামাই হইবার সৌভাগ্যকে বারবার প্রশংসা করিয়া, একথাও দুচারবার মনের মধ্যে আলোচনা না করিয়া পারিল না যে, দেশে এত সোণার চাঁদ ছেলে থাকিতে মা-মরা অমূল্যকেই বা জমীদার মশায়ের চোখে লাগিল কেন?

হেমন্তবাবু বড়লোকের সহিত কুটুম্বিতা করিবার লোভে বালক পুত্রের বিবাহ দিতে সম্মত হইলেও, অমূল্যকে ঘর-জামাই থাকিতে দিবার প্রস্তাবে প্রথমটা রাজী হন নাই; যে হেতু তিনি মনে করিয়াছিলেন, এর পর পাঁচজনে আবার এই কথাই বলাবলি করিবে, যে, মা নাই বলিয়া ছেলেটাকে পর্য্যন্ত বিদায় দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছেন।

কিন্তু চারুমোহনবাবু বুঝাইয়া বলিলেন, এরূপ উঁচু-দরের সম্বন্ধ কখনও হাতছাড়া করা উচিত নয়।—জমীদার বাবু বিজ্ঞ লোক; তিনি ছোট ছেলে ঘরে আনিয়া, এখন হইতে লেখাপড়া শিখাইয়া,—উপযুক্ত করিয়া লইবেন। ভবিষ্যতে যে গ্রামের মালিক হইতে হইবে, উহাতে বাস করিলেই আপনা হইতে প্রজাদের প্রতি একটা আন্তরিক মমতা বসিয়া যাইবে। প্রজারাও ভবিষ্যৎ প্রভুটিকে ছোটবেলা হইতে দেখিয়া-শুনিয়া উহার প্রতি অনুরক্ত হইবার সুযোগ পাইবে। সুতরাং এ যুক্তি-সঙ্গত প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করা কখনই শ্রেয়ঃ নয়।

হেমন্তবাবু কহিলেন, "এখন তো এই কথা বল্‌ছ। কিন্তু তোমাদের পরামর্শ মত কাজ করেও যে তিরস্কারের ভাগী হব না, এ ভরসাটাকে ত মনে ঠাঁই দিতে পার্‌ছি না।" কথাটির ভিতর প্রচ্ছন্ন শ্লেষটুকু চারুমোহনবাবু বুঝিতে পারিলেন; যেহেতু প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহে হেমন্তবাবু বিতৃষ্ণা দেখাইলে, যে-যে বন্ধু হেমন্ত-বাবুকে পুনরায় বিবাহ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া-ছিলেন, চারুমোহন বাবুও তাঁহার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন; অথচ বিবাহের ফলে অবশ্যম্ভাবী ব্যাপারগুলিকে যে তিনি নিতান্ত কৃপার চক্ষে দেখেন, এ কথাও হেমন্তবাবুর অবিদিত নহে।

চারুমোহনবাবু আজ স্পষ্ট করিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "দাঁড়ী ঠিক কোরে ধর্‌তে পারলে, দুদিকের পাল্লাই সমান থাকে; তা নইলে ওজনের ভুল-ত্রুটি লোকে ধর্‌বে বই কি! তবে আমি—" হেমন্তবাবু বাধা দিয়া কহিলেন, "মানুষে সংসারের চাল-ডাল ওজনের তুল-দাঁড়ী খুব নির্ভুল করেই ধর্‌তে পারে; কিন্তু হৃদয়ের তুল-দাঁড়ী নিয়ে সে ওজন চলে না ভাই! এক দিকে ঝোঁক বেশী যাচ্ছে জান্‌তে পেরেও, সাম্‌লে উঠ্‌তে পারা যায় না। এ তো শোনা কথা নিয়ে তর্ক নয়,—নিজের জীবন দিয়ে যে বুঝতে পারছি। ঘটনার বাইরে দাঁড়িয়ে সেটার গতিকে আমরা নিজের ইচ্ছামত নিরূপিত করতে পারি,—কিন্তু তার মধ্যে দাঁড়িয়ে, তখন তার গতিতেই আমাদের চল্‌তে বাধ্য হোতে হয়,—এটা খুব খাঁটী সত্য।" চারুমোহনবাবু ইহার উত্তর না দেওয়াই যুক্তি-সঙ্গত বিবেচনা করিয়া নিরুত্তর রহিলেন। যাহা হউক, অবশেষে অমূল্যর বিবাহ দেওয়াই স্থির হইল! সরলা যখন শান্তিকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমারই তো ছেলে বোন্‌,—তোমার কি মত?" শান্তি কহিল, "আমার মত নিয়ে কি হবে দিদি? আমি দোষের ভাগী, দোষ করতেই আছি। সাতে-পাঁচে আমার থাকবার দরকার কি?"

শান্তির স্বভাব সরলার আয়ত্তেই ছিল। সরলা কহিল, "সে কি কথা বোন্‌! যে-সে কাজ নয়, বিয়ের ব্যাপার! তোমার বেটা, তোমার বউ,—তুমি ঘরের গিন্নী,—ব্যাটা-বউ বরণ কোরে ঘরে তুলবে, কল্যেণ করবে; নইলে যে কিছু হবে না।" শান্তি খুসী হইয়া কহিল, "তা তুলবো বই কি! তোমাদের আশীর্ব্বাদে যদি বিয়ে হয়ই, তা হলে বরণ কোরে তুলবো।"

মোট কথা, অমূল্যর যখন এ বিবাহে ভাল হইবারই সম্ভাবনা, অথচ শান্তিদেরও কিছু লোক্সান নাই, বরং লাভের আশাটাই বেশী—তখন তাহারই বা আপত্তি হইবে কেন ?

এইবার সব শেষে মোহিনীর পালা। তাহাকে যদিও এ পর্য্যন্ত কোন পরামর্শ করিবার জন্য কেহ ডাকে নাই, সে কিন্তু নিজের মনে অনেক বোঝাপড়া করিয়া স্থির করিয়াছিল, অমূল্যর যখন ভাল হবে, তাহাকে যত্ন-আত্তি করবার লোক হবে, তখন আর কি। সে সুখে রাজার হালে থাক্‌বে, তার চাইতে আর কি চাই ?

সরলা মোহিনীকে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কি বল্‌ছ ছোট-বৌ ? তোমার এ কাজে কি মত ?"

মোহিনীর হাসি আসিল। তাহার মতামতের অপেক্ষায় কে বসিয়া আছে? সে কহিল, "আমার আর আলাদা মত কি আছে দিদি ? তোমাদের পাঁচজনের মতেই আমার মত। তবে অমূল্য এখন থেকে আমায় ছেড়ে কি থাক্‌তে পারবে ? সে যে রাত্তিরে এখনও আমার গলাটি ধোরে শুয়ে থাকে !" সরলা কহিল, "দু'চারদিন কষ্ট হলেও, তার পর অভ্যেস হয়ে যাবে। তবে তোমারই বড় কষ্ট হবে। তা কি করবে বল। অমূল্যর যাতে ভাল হয় সেই ভাল, কি বল বোন।"

"একশ বার,—সে কথা কি আর বল্‌তে দিদি !" কিন্তু তবু মোহিনী বিশ্বাস করিতে পারিল না যে, অমূল্য তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে।

বিবাহের সময় রাণী শ্বশুরবাড়ী হইতে আসিয়াছিল। শান্তি হাসি-মুখে গৃহিণীর কর্ত্তব্য যথারীতি সম্পন্ন করিতে ত্রুটি করে নাই। মেয়েদের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়া, তাহাদের মনে কোন কিছু ত্রুটিতে ব্যথা পাইবার ফাঁক রাখে নাই। অথবা রাণীই বুঝি এই দিনে সমস্ত মান-অভিমান জলাঞ্জলি দিয়া কোন কিছুতে ক্ষুব্ধ হইবার অবকাশ বিসর্জ্জন দিয়া বসিয়াছে।

ধনী কুটুম্বের বাড়ী হইতে ভারে-ভারে যে সকল জিনিস-পত্র আসিল, অমূল্য বিবাহ করিয়া আসিলে পরে ফুলসজ্জার সহিত নমস্কারী কাপড়-চোপড় যে সকল আসিল,—তাহার মধ্যে বরের মাতার যথোপযুক্ত সম্মান রাখিয়া শান্তিকে যে রেশমের মূল্যবান সাড়ী দেওয়া হইয়াছিল, শান্তি তাহাতে খুব খুসী হইল। অমূল্যের শ্বশুররা উচুদরেরই লোক বটে,—লোকের মান-সম্মান রাখিতে জানে,—এ কথা সে বারবার স্বীকার করিল। নিতবর রাজেনের জন্য যে মখমলের সুটটি দিয়াছিল, ইহাতেও তাহাদের বুদ্ধির প্রশংসা করিল। কিন্তু বড়লোক কুটুম্বের মান রাখিয়া পাল্লা দিয়া তত্ত্ব-তাবাস করিতে গিয়া হেমন্তবাবু যেন বাড়াবাড়ি রকম খরচপত্র করিয়া না বসেন, এ কথা হেমন্তবাবুকে বারবার বলিয়া শান্তি সাবধান করিয়া দিল।

বিবাহ-উৎসব শেষে যখন নিমন্ত্রিত কুটুম্বের দল একে-একে চলিয়া গেল, বর-কন্যাও জোড়ে বিদায় হইল, তখন বাড়ী যেন খাঁ-খাঁ করিতে লাগিল। সকলের নিকটই সে শূন্যতার উপলব্ধি হইল। কয়দিন বাজনায় ও কোলাহলে চারিদিক পরিপূর্ণ ছিল, এখন সব থামিয়া গিয়াছে;—সুতরাং এ শূন্যতা তো স্বাভাবিক। কিন্তু মোহিনীর যেন মনে হইতে লাগিল, তাহার হৃদয় পর্য্যন্ত শূন্য হইয়া গিয়াছে। বিজয়া দশমীর পর প্রতিমা-হীন মণ্ডপের মতন তাহার অন্তর শ্রীহীন, নিতান্তই ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকিতেছে। অমূল্যর বিবাহ বলিয়া কয়দিন সে অক্লান্ত পরিশ্রমে হাসি-মুখে দিবারাত্রি সকল কাজের তত্ত্বাবধান করিতেছিল ; কিন্তু এইবার তাহার দেহ-মন যেন একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িল ! এ কি শুধু সেই গুরু পরিশ্রমেরই অবসাদ, না আরও কিছু ? মোহিনী মনকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল, এইবার তাহার ছুটী হইয়াছে;—আর তাহার কোনো বন্ধন নাই,—সে মুক্তি পাইয়াছে। কিন্তু মন সে সংবাদে খুসী হইল কই ? সমস্ত বুক জুড়িয়া এ কিসের একটা হা-হা শব্দ উঠিতেছে ? সংসারের সব কাজ দিনের পর দিন মোহিনীর কাছে নিতান্ত নীরস ও নিরর্থক বলিয়া মনে হইতে লাগিল। বিছানা হইতে উঠিয়া, অমূল্যকে পড়িতে পাঠাইয়া, তাহার স্কুলের তাগাদায় ভাত রাঁধিবার ব্যস্ততা নাই। অমূল্য পাছে তেল না মাখিয়াই রুক্ষ স্নান করিতে পলাইয়া যায়, সে দিকেও আর চোখ রাখিতে হয় না। রান্না করিতে-করিতে পাঁচবার অমূল্যর পড়িবার ঘরে উঁকি দিয়া,—সে পড়া করিতেছে, না ঘুঁড়ি-লাটাই বা গুলি-খেলা লইয়া ব্যস্ত আছে, সে খোঁজও রাখিতে হয় না।

বৈকালে আর স্কুল-প্রত্যাগত অমূল্যর পথ চাহিয়া জানালায় কি দরজার পাশে দাঁড়াইয়া থাকিতে হয় না। কোন দিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে না আসিলে, পাঁচবার উন্মনা

হইয়া ঘর-বাহির করা, কি ভিখুকে একটু আগাইয়া দেখিবার জন্য কাকুতি-মিনতির পালাও চুকিয়া গেছে। সুতরাং এখন মোহিনীর ছুটী, পুরা ছুটী। কিন্তু পোড়া মন সে কথা মানে কই ?

এক-একদিন রাজেন আসিয়া মোহিনীর কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিত, "দাদা আবার কবে আসবে ছোট-মা ? একলা স্কুলে যেতে আমার ভাল লাগে না—" মোহিনীর চক্ষে জল আসিত। সে কহিত, "আবার আসবে,—শীগ্‌গীরই আসবে।" নিজের মনকেও বুঝি সে এই বলিয়াই প্রবোধ দিত। বালক রাজেন্দ্রও মোহিনীর মতন অমূল্যর অভাব অত্যন্ত অনুভব করিত। দাদার ফুলগাছটি পাছে শুকাইয়া যায়, সেজন্য নিজের হাতে তাহাতে জল দিত। তাহার দুষ্টামী ও একগুঁয়েমী এখন খুব বাড়িয়া গিয়াছিল,—অথচ অমূল্য এখানে নাই; শান্তি সে জন্য আশ্চর্য্য বোধ করিত। সে শিশু-হৃদয়ের রহস্য বুঝিতে পারিত না। পাছে দাদাকে বকুনী খাইতে হয়, সেই জন্যই তখন অনেক রকম দুষ্টামী ইচ্ছা সত্ত্বেও করিতে পারিত না! এখন ত আর দাদা নাই, সুতরাং সে বেপরোয়া।

সরলা মোহিনীর অবস্থা বুঝিতে পারিয়া কহিল, "ছোট বউ, আজন্মকাল এখানকার মাটি আঁকড়েই পড়ে রইলে,—অমূল্যকে ছেড়ে এক পা নড়বারও জো ছিল না। বাপের বাড়ীর কখনও নাম-উদ্দেশও কর না; এখন একবার দিন-কতক সেখানে যাও। তোমার মা নেই,—ভাই-ভাজতো রয়েছে,—ওরা কতবার নিয়ে যেতেও চেয়েছে,—তুমিই সে দিক মাড়াও না। এখন কিছুদিন বেড়িয়ে-চেড়িয়ে এস,—মনটাও ভাল হবে। শরীর যে শুকিয়ে পাত্ হয়ে গেল।"

মোহিনীর মনে এ কথা লাগিল। সে ভাইকে চিঠি লিখিল। মোহিনীর দাদা রামবাবু ভগিনীর চিঠি পাইয়াই লইতে আসিলেন। মাতার মৃত্যুর পর দু'তিনবার ভগিনীকে লইতে আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছিলেন,—এবারে ভগিনী নিজে হইতে যাইতে চাহিয়াছে। হেমন্তবাবু আপত্তি করিলেন না; কিন্তু শান্তির শীঘ্রই সন্তান হইবার সম্ভাবনা,—সুতরাং মোহিনীর এ সময়ে বেয়াক্কিলী বাপের বাড়ী যাওয়ায় সে অত্যন্ত বিরক্ত হইল। সুন্দরী টিপিয়া-টিপিয়া কাণের কাছে কহিল, "অমূল্যর দরদেই সবার প্রিতি দরদ ছিল,—এখন তোমরা যেন কোথাকার কে! খোকাবাবুর কষ্ট হলে কি খুড়ীমার গায়ে লাগে ?"

মোহিনী কথাগুলা শুনিয়াও গায়ে মাখিল না। সে ত ইহার সত্যতা অস্বীকার করিতে পারে না! কিন্তু লোকে ত বুঝিবে না যে, অমূল্য-শূন্য ঘরবাড়ী আজ তাহার কাছে কি ভীষণ রিক্ততায় ভরিয়া উঠিয়াছে! প্রাণের এ শূন্যতার দৈন্য কোথাও গেলে যদি একটুকু লাঘব হয়, সে তাহা করিবে বৈ কি !

১৯

মোহিনী কাশী আসিয়াছে। ভগিনীর মনটা বড় খারাপ; তা ছাড়া, এত দিনের পর ভাইয়ের নিকট আসিয়াছে;—সেজন্য রামবাবু পনের দিনের ছুটি লইয়া স্ত্রী ও ভগিনীকে লইয়া তীর্থ-দর্শনে বাহির হইয়াছেন। রেলে চাকুরী করিলেও, স্ত্রীর পীড়াপীড়িতেও তিনি কখনও কাশী-বৃন্দাবনে যাইতে পারেন নাই, ঠাকুরঝির কল্যাণে এ তীর্থ-দর্শন ঘটিল বলিয়া ভ্রাতৃবধূ ননদিনীর উপর খুব খুসী। রামবাবুর শ্বশুরবাড়ীর সম্পর্কীয় তিন-চারিজন স্ত্রীলোক তীর্থে যাইবার সঙ্গী পাইয়া তাঁহার সঙ্গে কাশী আসিয়াছে। কাশীতে রমণীগণ প্রত্যহ প্রভাতে উঠিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া, গঙ্গাতীরে আহ্নিক-পূজা সারিয়া বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দর্শনে বাহির হয়,—মন্দিরে-মন্দিরে দেব-দর্শন করিয়া, পূজা দিয়া মনে অত্যন্ত পরিতৃপ্তি লাভ করে। কিন্তু মোহিনীর এ কি হইল! পূজা-আস্রা কিছুতেই তাহার সুখ নাই, তৃপ্তি নাই। ঘরে বসিয়া কোসাকুসী নাড়িয়া ইষ্টদেবতার পূজা শেষ করিয়া, ভূলুণ্ঠিত হইয়া, সে দেবতার উদ্দেশে ভক্তিভরে যে প্রণামটি করিত, তাহাতে তাহার বেশ তৃপ্তি হইত, এবং মনে হইত, সে পূজা, সে প্রণাম দেবতার চরণে পৌঁছিয়াছে। কিন্তু আজ এই পুণ্য ভূমি কাশীধামে আসিয়া, বাবা বিশ্বনাথের পূজায় তাহার আসক্তি কই ? বুকের মধ্যে শুধু খাঁ খাঁ করিতেছে,—কিছুই ভাল লাগিতেছে না। মোহিনীর নিজের উপরে রাগ হইল,—ছি, ছি! সামান্য মায়ামোহে সে এমন আচ্ছন্ন হইয়াছে, যে, পরকাল পর্য্যন্ত খোয়াইতে বসিয়াছে। কিম্বা গত-জন্মে এমন কোনও পাপ করিয়া আসিয়াছে; যাহার জন্য বাবা বিশ্বনাথ তাহাকে ঠাঁই দিতে স্বীকৃত নহেন। নতুবা পূজা-পাঠে তাহার মন বসিতেছে না কেন ?

মণিকর্ণিকার ঘাটে যখন প্রাতঃকালে একসঙ্গে শত কাঁসর, ঘণ্টা, শঙ্খ বাজিয়া উঠিয়া সকল নরনারীকে মহান্ বিশ্ব-দেবতার চরণে প্রণত হইবার জন্য আহ্বান করে, যখন "হর হর মহাদেব, শিব শঙ্কর" ধ্বনিতে প্রভাতের নিস্তব্ধ আকাশ মুখর হইয়া পাপী-তাপীর চিত্তকেও ভক্তি-রসে সিক্ত করিয়া তুলে, তখন মোহিনীর সহযাত্রী নারীরা ঘাটে আসিয়া বলাবলি করেন, এ স্থান ছেড়ে আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না ; বাবার চরণে পড়ে থাক্‌তে ইচ্ছে হয়। মোহিনীর উদাস হৃদয়ে তখন কিন্তু সেই ক্ষুদ্র গ্রামের ক্ষুদ্র ঘরখানির কথা মনে পড়ে, যেখানে নিদ্রিত অমূল্যকে সাবধানে মশারি ফেলিয়া রাখিয়া, সে এই প্রত্যূষে উঠিয়া গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত হইত। এমন বারাণসীর মাহাত্ম্যে তাহার পাপ মন ভুলিল না,—কি ঘৃণার কথা! মোহিনীর আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা হইত। সাজান ঘর-সংসার ছাড়িয়া, স্বামী-পুত্র ফেলিয়া কত নারী এ দেবস্থানে বাস করিবার কামনা করে ; আর সে কি না এ ঈপ্সিত ধন হাতে পাইয়াও তাহার মর্য্যাদা রাখিতে অশক্ত? হা পাপীয়সী!

অযোধ্যা, কাশী ও প্রয়াগ হইয়া রামবাবু বৃন্দাবনে আসিলেন। বৃন্দাবনে নানা কারুকার্য্য-খচিত, অগণ্য মন্দির, অনেক কুঞ্জবন। রমণীরা পাণ্ডার নিকট যখন শুনিল যে, দু'চার দিনে বৃন্দাবন-ভ্রমণ হইতে পারে না, যখন তীর্থস্থানে আসা হইয়াছে তখন সমস্ত ভাল রকম না দেখিয়া-শুনিয়া ফিরিয়া যাওয়া কখনই উচিত নয়,—তখন মোহিনী ব্যতীত সকলেরই মন থাকিবার জন্য ঝুকিয়া পড়িল। রামবাবুর ছুটি ফুরাইয়াছে,—তাঁহাকে ত ফিরিতেই হইবে। স্ত্রীকেও অবশ্য রাখিয়া যাইবেন না (যদিও, ঠাকুরঝি যদি থাকিয়া যায়, সেও থাকিতে রাজী)।

ভগিনীকে তিনি থাকিতে বলিলেন,—তীর্থে বেড়াইয়া পুণ্য-সঞ্চয়ও হইবে, মনও ভাল থাকিবে। কিন্তু অবোধ মোহিনী থাকিতে চাহিল না। মনের বোঝা-ই যখন নামিল না, তখন কেন সে মিথ্যা থাকিয়া পুণ্যস্থানের অবমাননা করিবে! পাণ্ডার সহিত রমণীরা যে দিন বৃন্দাবন প্রদক্ষিণ করিতে গেলেন, পাণ্ডা বৃন্দাবন হইতে মথুরা যাইবার প্রশস্ত রাজপথটি দেখাইয়া দিয়া কহিল, এইপথে অক্রূরের রথে যশোদানন্দন মথুরা গিয়েছিলেন, এই ধূলায় বৃন্দাবনের সকল গোপ-গোপী; মা-যশোদা, রাই কিশোরী—সবাই গড়াগড়ি দিয়ে 'হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ' বলে কেঁদেছিলেন। এখানকার ধূলা বড় পবিত্র। সকলেই ভক্তিভরে রজঃ লইয়া মাথায় ও গায়ে মাখিল ও আঁচলে বাঁধিল ; কিন্তু মোহিনীর চিত্ত অপূর্ব্বরসে বিগলিত হইল, তাহার অশ্রুধারা ছুটিল। পাণ্ডা এই ভক্তিমতী নারীর ভাবাধিক্য দর্শনে প্রীত হইয়া কহিল, "নন্দের নন্দন যে স্বয়ং ভগবান ছিলেন মা, তাঁর জন্যে না কেঁদে কি কেউ থাক্‌তে পারে?"

মোহিনীর কাণে বুঝি সে কথা পৌঁছিল না। সে যশোদার মাতৃ-স্নেহের বেদনার গুরুত্বকে নিজের হৃদয়ে প্রত্যক্ষরূপে অনুভব করিয়া সহানুভূতি বোধ করিতেছিল।

বৃন্দাবনে প্রত্যেক স্থানে শ্রীকৃষ্ণের শৈশব, বাল্য ও কৈশোরের খেলাধূলার শত-শত চিহ্ন বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। সমস্তগুলি দেখিয়া দেখিয়া যেন তাহার আগাগোড়া জীবনটির প্রত্যেক ঘটনাই মনের মধ্যে সুস্পষ্টরূপে জাগিয়া উঠে। তাই বুঝি মথুরা এত নিকট হইলেও, মা যশোমতী, প্রাণাধিক পুত্রের সহস্র স্মৃতি-বিজড়িত বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন নাই; হারানিধিকে তাহার পরিত্যক্ত স্মৃতি-চিহ্নগুলির মধ্যেই অনুভব করিয়া, এবং সেই স্মৃতির আনন্দকেই বুকের মধ্যে আঁকড়িয়া ধরিয়া সারাজীবন কাটাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মোহিনীর মন উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিল। পাণ্ডা মহারাজ তাহাকে দেবস্থানে বাস করিয়া মুক্তিলাভের সহজ পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিলেও সে উহা গ্রহণ করিতে পারিল না, সুতরাং সংসারের দুষ্কৃতি-ভোগ এখনও তাহা অদৃষ্টে যথেষ্ট আছে, একথাও পাণ্ডা মহারাজ উল্লেখ করিতে ছাড়িল না। যমুনায় স্নান করিতে গিয়া মোহিনী বিস্মিত হইয়া দেখিত কত দেশের কত বিচিত্র পরিচ্ছদের নর-নারীর মেলা। কত বিচিত্র ভাষায় সকলে কথা কহিতেছে। মোহিনী ইতিপূর্ব্বে নিজেদের ক্ষুদ্র গ্রামখানি ছাড়িয়া কখনও বাহির হয় নাই, সুতরাং তীর্থ-ভ্রমণে বাহির হইয়া নানা দেশ ঘুরিয়া, নর-নারীর বিরাট মেলা দেখিয়া, সকলেরই মধ্যে বিচিত্রতা লক্ষ্য করিয়া সে অবাক্ হইয়া যাইত। এতবড় পৃথিবীর এতখানি উন্মুক্ত স্থান, এতখানি উদার আকাশ, এতখানি খোলা বাতাসে তাহার বুক যেন আরও হায় হায় করিয়া উঠিত। পিঞ্জরের বিহঙ্গিনী বুঝি কানন-ভূমিতে ছাড়া পাইয়াও তাহার বদ্ধ পিঞ্জরে ফিরিবার জন্য এমনি করিয়া

আকুল হয়। হায় দুর্ভাগিনী নারী, সংসার যাহাকে প্রতিপদে সকল জিনিষ হইতেই বঞ্চনা করিয়া চলিতেছে, দেবস্থানে পুণ্য-সঞ্চয়ের পথেও বুঝি সে এমনি করিয়া বঞ্চনা করিতে চায়।

(২০)

সন্ধ্যার বাতাস, আধফোটা শিউলী ফুলের সুগন্ধে মন্থর হইয়া বহিতেছে; ঘরে-ঘরে মেয়েরা সন্ধ্যাদি জ্বালিয়া শঙ্খ বাজাইয়া সন্ধ্যা-সম্বর্দ্ধনা করিতেছে; ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েদের দল আকাশ-প্রদীপটী জ্বালিবার জন্য ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে কোলাহল করিতেছে; কোজাগর পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র আকাশে উঠিয়া মধুর জ্যোৎস্নায় চারিদিক পুলকিত করিয়াছে; মধুর চাঁদের হাসি, মধুর শিউলী ফুলের শুভ্র হাসির সহিত মিলিয়া এক অপূর্ব্ব ভাবের সমাবেশে ছোট-বড় সকলেরই হৃদয়ে তরঙ্গ তুলিয়াছে; মোহিনী সরলাদের আঙ্গিনায় বসিয়া চাঁদের দিকে চাহিয়া অমূল্যর সেই শৈশব-কাহিনী ভাবিতেছিল। সে যখন চাঁদ ডাকিতে শিখিয়াছিল, তখন মোহিনীর কোলে উঠিয়া এবং হাতে মোহিনীর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া, আর একখানি ছোট হাত নাড়িয়া-নাড়িয়া আয় চাঁদ, আয় চাঁদ করিয়া ডাকিত; চাঁদের আলোয় সে শিশুর চাঁদমুখ আরও সুন্দর দেখাইত, এবং মোহিনী মুগ্ধনয়নে অমূল্যর মুখে চুমা খাইয়া ভাবিত আকাশের চাঁদের তুলনায় তার কোলের চাঁদ কত গুণে সুন্দর! মোহিনীর মনে হইতেছিল, কেন অমূল্য চিরদিন তাঁহার কোল-জোড়া করিয়া তেমনই শিশুটি হইয়া রহিল না। আকাশের চাঁদ আজ যুগান্তর পরে তেমনি তরুণ রহিয়াছে, এক তিল কোথাও তাহার কিছু পরিবর্ত্তন হয় নাই; আর তাহার অমূল্য কি না এরই মধ্যে কত বড় হইয়া উঠিল,—তাহার বিবাহ পর্য্যন্ত হইয়া গেল!

তুলসীমূলে প্রদীপ দিতে আসিয়া সরলা কহিল "ছোটবউ, এখনো বসে আছ বোন্ সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হল, তুমি ঘরে যাও, শান্তি আবার বকাবকি করবে হয় তো। আর তোমার যে শরীর, কার্ত্তিক মাসের হিম লেগে অসুখও হতে কতক্ষণ?" মোহিনী কহিল. "তুমিও যেমন দিদি, আমার আবার রোগ বালাই আছে। তবে নূতন-দিদি বকবে বটে, তা আর আমার সে সব বকুনীর ভয় নেই, কে জানে সে সব ভয় কি কোরে এমন ভেঙ্গে গেল।" সরলা স্নেহময়ী জননী, সুতরাং মোহিনীর হৃদয়ের স্নেহের বেদনাকে সে অন্তরের সহিত অনুভব করিত; কিন্তু যাহার চারা নাই, তাহার জন্য কেন আর প্রাণপাত? তবে মানুষের মন বড় অবুঝ। সরলা স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, "এতদিনের পর ভাই-ভাজের কাছে গেলে, তারা মাথায় কোরে রেখেও ছিল, তা কেন থাকতে পারলে না? এখানে মরতে এলে? অমন তীর্থ-ধর্ম্ম করতে গেলে; কিছুদিন বৃন্দাবনে থাকলে সে তো ভালই হতো, কত পুণ্যে লোকের ওসব ঠেঁয়ে যাওয়া ঘটে; তুমি তা হাতে পেয়ে ছেড়ে এলে। অমূল্যকে নিয়ে এতকাল এখানে কাটাতে পেরেছিলে, এখন কি আর এই শূন্য ঘরে তুমি মন পেতে থাকতে পারবে বোন্? তা যে নমাসে ছমাসে তাকে দেখতে পাবে, সে আশাও নেই, তারা অমূল্যকে পাঠাবে না, তারা আবার বাপ-মার চেয়ে এর মধ্যে অমূল্যর বেশী দরদী হোয়েছে। তবে অমূল্য যেখানে থাক্ ভাল থাক্, আমাদের শুনেই সুখ।"

মোহিনী নিঃশ্বাস ফেলিল, কোনো উত্তর দিল না, অমূল্যকে মাঝে মাঝে দেখিতে পাইবার আশা যে তাহার মনে হয় নাই, তাহা নয়, কিন্তু সে আশা দুরাশা হইলেও অমূল্যর স্মৃতিচ্যুত বাড়ীখানিই যে তার দাবদগ্ধ হৃদয়ের চন্দন-প্রলেপ। অভাগিনী নারী পৃথিবীতে আর কোথায় গিয়া শান্তি পাইবে!

সরলা আবার কহিল, "ছোটবউ, তোমার চেহারা বড় খারাপ দেখাচ্চে; ভেতরে-ভেতরে কোন কিছু অসুখ করেনি তো? এখানে তুমি বউ মানুষ, চিকিৎসা-পত্তরের তেমন সুবিধাও হবে না। তবে যখন এসেছ, দিনকতক থেকে যাও, এখানে যে মন টিকবে তা মনে হয় না। শান্তি বলছিল, ভাই-ভাজ কি বারমাস ভাত দেয়? তাতেই চলে এসেছে। আমি বললুম তা নয়, রামবাবু বোন্‌কে খুব ভালবাসে, তার স্ত্রীও সেই রকম। মোট কথা, মোহিনী ফিরিয়া আসাতে শান্তি মনে মনে খুসীই হইয়াছিল। মোহিনী সংসারের সকল কাজ এতদিন মাথায় করিয়া থাকায়, ইহার সাত-সতের হাঙ্গামার জ্বালা কোনো দিন শান্তিকে পোহাইতে হয় নাই। বামুন রাখিয়াও তাহার পিছনে বকিতে-বকিতে হায়রাণ হইতে হইত, সংসারের কোনো না কোনো কাজে খিটখিটনা ঘটিতেই থাকিত। হেমন্তবাবুও অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতেন। দুইমাস পরে

হঠাৎ মোহিনী ফিরিয়া আসায় সকলেই যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। কিন্তু মোহিনীর যেন অত্যন্ত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। সময়ে কোন কাজ করিবার মন নাই। ঠাকুরের কাছে গিয়া রান্না-বান্না দেখাইয়া দেয় না, নিজেও বড় একটা রাঁধিয়া খায় না। একমুঠা শুকন মুড়ি খাইয়া দিন কাটাইয়া দেয়। প্রথম-প্রথম শান্তি চুপ করিয়া থাকিলেও, শেষে বাধ্য হইয়া তাহাকে মুখ খুলিতে হইল। কিন্তু কি আপদ, মোহিনীর তাতেও বড় গ্রাহ্য নাই। তবে ত না আসিলেই হইত। এই কারণেই না ভাই-ভাজ ভাত দিতে পারে নাই! শান্তি মনে করিল, এ আপদ তবে থাকার চাইতে বিদায় হওয়াই ভাল। কিন্তু মোহিনীর সে গতিকও নয়; সে এমন নির্লিপ্ত ও উদাসীন ভাবে সংসারে রহিয়া গেল, যে, সরলার পর্য্যন্ত অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। সে কি পাথরের মানুষ যে, কিছুতেই তার চেতনা হয় না?

হঠাৎ মোহিনীর জ্বর হইল। কয়দিন উপবাস করিবার পর যখন জ্বর উপশম হইল না, তখন কবিরাজ ডাকার প্রস্তাব হইল। কিন্তু মোহিনী আপত্তি করিল। সরলা দেখিতে আসিল, শান্তি উঁচু গলায় কহিল, "তোমরা সব দেখ দিদি, ওষুধ-পত্তর কিছু করবে না। শেষে না অমূল্যর রাজা শ্বশুরের পেয়াদা এসে, বলে বসে 'আমাদের জামাই বাবুর মাকে তোমরা বিনি চিকিৎসাতে মেরে ফেলেছ?' তখন সে বিষম ল্যাঠা।"

মোহিনী ক্ষীণকণ্ঠে জবাব দিল "সেজন্যে তোমাদের হাতে হাতকড়ি পড়বে না দিদি। হিঁদুর ঘরের বিধবা দুচার দিনের জ্বরে উপোস করে মরে না। তবে যদিই মরে, সে দোষ তোমাদেরই বা কেন? কার, তা ভগবান জানেন।" মোহিনীর বাক্‌পটুতায় সরলা পর্য্যন্ত অবাক্ হইয়া গেল। এই কি সেই স্বল্পভাষিণী, কোমলা ও ভীরুস্বভাবা মোহিনী? শান্তি জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল, "চ্যাটাং-চ্যাটাং কথা ত খুব বেড়েছে। অমূল্য, অমূল্য, অমূল্য! অমূল্য ত মুখে লাথি মেরে চলে গেছে। আমরা কি আর কিছু বুঝি না। তাতেই আর কোন কাজে গা লাগতো না। আচ্ছা হিংসুটে স্বভাব! এক গাছের ছাল কি আর এক গাছে লাগে? রাজেনও যে, অমূল্যও সে,—তবে এত বাদাবাদি কিসের? দেখব এর পর কি হয়!" শান্তির কথার ভেতরকার ক্লেশ যে মোহিনীর হৃদয়ে এতটুকুও দাগ বসাইতে পারিল না, তাহা মোহিনীর নির্ব্বিকার মুখের ভাবেই সরলা বুঝিতে পারিল, এবং পরিণামে তাহার কি দাঁড়াইবে ভাবিয়া তাহার স্নেহপরায়ণ চিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। এই সময় পটুয়া আসিয়া ডাকিল, "পট দেখবেন মা ঠাকরুণরা, ভাল ভাল পট আছে।" মোহিনী সরলার দিকে চাহিয়া কহিল, "দেখ না দিদি! আমিও শুয়ে-শুয়ে শুনি।" সরলা পটুয়াকে পট দেখাইতে বলিল। পটুয়া আঙ্গিনায় পট খুলিতে-খুলিতে কহিল, "কি দেখবেন মা-ঠাকরুণরা, রাম রাজা, না বনবাস, কি কংস বধ, না দক্ষযজ্ঞ?" এক-একজনে এক-একরকম ফরমাস করিয়া বসিল। মোহিনী জানালা দিয়া সরলাকে কহিল, "কংসবধই দেখ না দিদি।"

অক্রূর যখন শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবন হইতে আনিতে গিয়াছিল, সেই দৃশ্য খুলিয়া পটুয়া মোটা গলায় গ্রাম্য ভাষায় সুর করিয়া ভাঙ্গা পয়ার ছন্দে বিষয় বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিল। অক্রূরের রথ হইতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া শ্রীকৃষ্ণ ক্রন্দন-শীলা যশোমতীকে সান্ত্বনা দিতেছেন। যশোমতী ধূলাতে আছাড়িয়া পড়িয়া "হা গোপাল হা গোপাল" বলিয়া আকুল স্বরে আর্ত্তনাদ করিতেছেন। ব্রজনারীগণ দু'হাত তুলিয়া অক্রূরকে একবার রথ রাখিবার জন্য মিনতি করিতেছে। সে করুণ কাহিনী শুনিতে-শুনিতে সেই মোটা তুলির মোটা আঁকা পটের ছবি দেখিতে-দেখিতে সকলেই যেন তন্ময় হইয়া গেল! রমণীগণের চক্ষু বাষ্পপূর্ণ হইয়া আসিল। মোহিনী রোগ-শয্যায় শুইয়া স্তিমিত নেত্রে চাহিয়া, কল্পনা নয়নে সে বাস্তব দৃশ্যটিকে দেখিতে-দেখিতে স্পন্দহীন হইয়া গেল,—এতকাল পরে তাহার ছুটী হইল।

বাঙ্গালীর মেয়ে

[শ্রীরমেশচন্দ্র রায় এল্-এম্-এস্]

পুত্র ও কন্যার পার্থক্য করি কেন ?

অবগুণ্ঠনবতী, অসূর্য্যম্পশ্যা, অন্তঃপুরচারিণী বঙ্গললনার কথা প্রকাশ্য ভাবে আলোচনা করিতে চাহি, তজ্জন্য পাঠক-পাঠিকাগণের ক্ষমা ভিক্ষা করি। যে সময়ে পৃথিবীর সর্ব্বত্রেই নারীজাতি স্ব-স্ব অধিকার আদায় করিবার জন্য সচেষ্ট, যে সময়ে রমণীরা সমাজে পুরুষদিগের কার্য্য অবাধে চালাইতেছেন, সে সময়ে কোমলাঙ্গী বঙ্গললনার কথা আনুপূর্ব্বিক বিচার করিয়া দেখিবার বাসনা নিতান্ত অন্যায় নহে।

আমার পূর্ব্বের তিনটি প্রবন্ধে * যে-যে কথার আলোচনা করিয়াছি, তাহার সামান্য-সামান্য পুনরুক্তি কোথাও আবশ্যক হইলে করিব, নতুবা যে সকল কথা সেই প্রবন্ধত্রয়ে আলোচিত হইয়াছে, তাহাদিগের আর পুনরায় আবৃত্তি করিব না।

শৈশবে, বাঙ্গালীর ছেলে ও মেয়ে প্রায় একই ভাবে পালিত হয়; মাত্র দুই-এক ঘরে উভয়ের লালন-পালনের মধ্যে তারতম্য দৃষ্ট হয়। যেখানে সেরূপ পার্থক্যের সৃষ্টি করা হয়, সেখানে আহারে, পরিচ্ছদে, ব্যবহারে, শাসনে, স্নেহ-বিতরণে—সকল বিষয়েই পার্থক্য রাখা হয়। বালকেরা বেশী করিয়া দুধ পায়, বালিকারা ততটা দুধ পায় না; বালকেরা নানাপ্রকার বেশভূষায় মণ্ডিত হয়, বালিকারা মোটামুটি পরিচ্ছদ পাইয়া থাকে; বালকদিগের বিনামা থাকিলেও অনেক স্থলে বালিকাদিগের বিনামা থাকেই না; কোথাও বেড়াইতে যাইবার সময়ে, বালকেরাই বারম্বার যাইতে পায়, বালিকারা তাহা পায় না; বালকেরা বাটীর বাহিরে পাঁচজনের সঙ্গে উঠে-বসে; কিন্তু বালিকারা অন্দরে বসিয়া মাতার বা ভগিনীর নিকটে খেলা করে, নতুবা সামান্য ভাবেও গৃহস্থালীর কাযে সহায়তা করে। এই দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশে, পিতামাতার অভিসম্পাত শিরে ধরিয়া বালিকারা ভূমিষ্ঠ হয় এবং জন্মাবধি প্রতিনিয়তই জনক-জননীর ও অপর আত্মীয়স্বজনের দীর্ঘ-শ্বাসের উত্তাপে, শ্লেষ বা স্পষ্ট দুর্ব্বাক্যের তাড়নায় এবং একটা অস্পষ্ট দুর্ভাগ্যের ছায়ায় বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সে বৃদ্ধি যে কিরূপ সুখের, তাহা বুঝাইবার স্পৃহা আমার নাই।

কেন এরূপ হয়? বাঙ্গালী মাত্রেই জ্ঞাত আছেন যে, একটী বালককে মানুষ করিতে যত অর্থ ব্যয় হয়, একটি কন্যাকে সৎপাত্রস্থ করিতে প্রায় তাহাই অথবা কিঞ্চিৎ অধিক পড়ে। তবে প্রভেদ এই যে, পুত্রের বেলায় সামান্য-সামান্য করিয়া ব্যয় করিতে হয় এবং পুত্র মানুষ হইয়া পিতাকে অর্থ-সাহায্য করিতে পারে; কন্যার বেলায়, এক-কালীন প্রভূত অর্থ ব্যয় করিতে হয়, কন্যা কখনো সে অর্থের প্রতিদান করে না, বরং কন্যার জন্য মধ্যে-মধ্যে আরো ব্যয় করিয়া যাইতে হয়। এক্ষণে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, যাহা কিছু গোলযোগ, এক অর্থ ব্যয় লইয়াই। নতুবা কন্যা কোনও বিপদ লইয়া জন্মায় না এবং পুত্র কিছু সম্পদ লইয়া আসে না। মাঝে হইতে পিতামাতাই গোল বাধান।

আমরা নিজ-নিজ সনাতন আদর্শ হইতে অনেক দূরে গিয়া পড়িয়াছি বলিয়া, সততই উৎপাতের অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছি। আমরা ভুলিয়া গিয়াছি যে, আমরা হিন্দু; আমাদিগের পক্ষে শুধু ইহজীবনই সর্ব্বস্ব নহে, আমাদিগের জন্ম-জন্মান্তর আছে। কোন্ সন্তান কি সূত্র ধরিয়া, আমাদিগকে জনক-জননীরূপে আশ্রয় করিয়া, আমাদিগের কোন্ কর্ম্ম-ক্ষয় করিতে আসে, তাহা আমরা না জানিলেও, মূল কথা বিস্মৃত হই কেন? সন্তান, পুত্রই হউক আর কন্যাই হউক, নিজ কর্ম্মক্ষয় করিতে ত আসেই, পরন্তু সেই সঙ্গে পিতৃমাতৃ-কর্ম্মক্ষয়েরও সুযোগ দেয়। তবে কেন আমরা সে কথা বিস্মৃত হইয়া, একের ভাবী ঐহিক সুখের

* ভারতবর্ষে, ১৩২৫ সনের শ্রাবণ ও ভাদ্রে "বাঙ্গালীর শিক্ষা", মাঘ ও ফাল্গুনে "বাঙ্গালীর খাদ্য" এবং ১৩২৬ সনের বৈশাখে "বাঙ্গালীর ছেলে"।

আশায় তাহাকে সমাদর করি, এবং অপরের তথাকথিত ভাবী অর্থ-দোহন-নীতি স্মরণ করিয়া, তাহাকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করি? বাস্তবিক কন্যা ত অর্থ দোহন করে না; অর্থ-দোহন অপর প্রবল পক্ষ করে—অবলা বালিকা তাহার অনিচ্ছাকৃত হেতু হইয়া, দুর্ভাগা রূপে পরিচিত হয়। বধূকে মারিতে অক্ষম বলিয়া আমরা ঝিকেই প্রহার করি—ঝি'র ত কোন অপরাধ নাই। এই নীতি কাপুরুষোচিত ও অহিন্দু নীতি। আমাদিগের দ্বিতীয় ভ্রম, আমরা কন্যাকে "সম্প্রদান" করিবার অভিনয় করি। যদি আমরা (কন্যা-পক্ষ ও বরপক্ষ) স্মরণ রাখি যে, যে ভারত-ভূমিতে আমরা শুভাদৃষ্ট ক্রমে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহা কর্ম্মভূমি, ভোগ-ভূমি নহে, এবং হিন্দু মাত্রেই সংসারে থাকিয়া কর্ম্মক্ষয় করিতে পারে, তবে আমরা বেশ উপলব্ধি করিতে পারিব যে, বর্ত্তমান কালে, অতি অল্প সংখ্যক লোকেই কন্যাকে নিঃস্বত্ব হইয়া সম্প্রদান করিয়া থাকেন এবং অল্প বর-পক্ষীয়েরা সেই দানকে সমর্য্যাদায় গ্রহণ করেন। কন্যার পিতা ষড়ৈশ্বর্য্যের মোহিনীমূর্ত্তির আবরণে দানের কপট লীলার অভিনয় করিয়া থাকেন মাত্র এবং বরপক্ষীয়েরা দানব মূর্ত্তিতে সেই কপট যজ্ঞস্থলকে অপবিত্র করেন। মৃত্যুর পরে সমস্ত জীবনের উপার্জ্জিত ধন দান করায় পুণ্য বা মহত্ত্ব প্রকাশ পায় না। কিন্তু জীবদ্দশায় বিশ্বজনীন প্রেম মুগ্ধ হইয়া, নিজ জীবনের সমগ্র উপার্জ্জিত ধন দান করায় পুণ্যও আছে, মহত্ত্বও আছে। সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হওয়া কঠিন কার্য্য হইলেও, সংসারী হইয়া, দ্বাদশ বৎসর স্নেহে পালিত কন্যাকে বক্ষ হইতে উৎপাটিত করিয়া নিঃস্বত্ব হইয়া দান করা মহত্তর সন্ন্যাস-সাপেক্ষ, অধিকতর পুণ্য ও মহত্ত্ব-জ্ঞাপক। হিন্দুনামে ভণ্ড হইয়া পড়িয়া আজ আমরা সে দান-ব্রত আর উদ্‌যাপন করি না, আজ আমরা যেন নিয়তির কঠিন কশাঘাত-প্রসূত একটা অপ্রীতিকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করি। যতদিন আমরা জাত-হিন্দু হইয়াও হিন্দু-ভাবাপন্ন না হইব, ততদিন নিরীহ বঙ্গ-বালিকার অদৃষ্টে এই দুঃখ-ভোগ দুর্নিবার্য্য। বাস্তবিকই "স্বখাদ সলিলে আমরা ডুবিয়া মরি!" অমানুষিক জিগীষার প্রেরণায় আজ সমগ্র য়ুরোপ ছারেখারে যাইতে বসিয়াছে, অসুর-প্রবৃত্তির তাড়নায় যে অসংখ্য অর্থ, সামর্থ্য, বুদ্ধি ও প্রাণের আহুতি দিয়াছে, যদি প্রেমের বন্যায় তাহার অর্দ্ধেক অর্থ, ও অর্দ্ধেক প্রাণ দান করিত, তবে আজ পৃথিবী হইতে দুঃখ, দৈন্য, অস্বাস্থ্য ও অবিদ্যা লোপ পাইত। কিন্তু আজ য়ুরোপ ধনে ও জনে দীন হইয়া পড়িলেও মাঝে-মাঝে হৃদয়ের ঐশ্বর্য্যের স্বপ্ন দেখিতে পাইতেছে;—কৈ, আজ আমরা বহুজন্মের হৃদয়ের ঐশ্বর্য্যের অধিকারীর দেশবাসী হইয়াও ত সে ঐশ্বর্য্যের সন্ধানও লইতেছি না? তাই বুঝি আজ আমাদিগের দুর্দ্দশার আরো বাকী আছে? সত্যের অপহ্নবে আমরা মিথ্যার লীলা করিতেছি।

আমাদিগের তৃতীয় ভ্রম—কাচকে মণি জ্ঞান করা। সকলেরই ইচ্ছা যে কন্যাকে সৎপাত্রে দান করা হয়। সৎপাত্র কে? যে যুবক, আত্মনির্ভরশীল, চরিত্রবান, সেই সৎপাত্র। তাহার যদি কিছু অর্থ থাকে এবং সে যদি প্রকৃতই বিদ্বান্ ও সৎকুলোদ্ভব হয়, তবে আরো ভাল। বর্ত্তমান কালে, পাত্রের সততার দিকে আমরা দৃকপাত করি না; পাত্রের সাংসারিক ও তাৎকালিক মূল্য নিরূপণ করিয়া তবে তাহার হস্তে আমরা কন্যাকে সমর্পণ করি। আমরা সর্ব্বপ্রথমেই সন্ধান লই—পাত্রের আছে কি? অর্থাৎ পাত্র নগদ কত টাকার অধিকারী হইতে পারিবেন, সেইটাই আমাদিগের প্রথম ও প্রধান অনুসন্ধানের বিষয়। পাত্র নিজে কত উপার্জ্জন করিবার ক্ষমতা রাখেন, অর্থাৎ তাহার হস্তপদাদি থাকিয়াও আছে কি না, সে ভাবনা আমাদিগের হয় না—অন্ততঃ প্রত্যক্ষে ত নহেই। কাযেই পিতৃধনে ধনী পাত্রকে পাইতে হইলে, তৎকৃত নিরূপিত ধনের মূল্যকে মাথা পাতিয়া লইতে হয়। ধনের নিম্নে আমরা পাত্রের "চাপরাসের" সন্ধান লই—অর্থাৎ তিনি কয়টা পাস করিয়াছেন, তাহাই জিজ্ঞাসা করি। সেই পাশের মূল্যই বা কি, এবং সমাজে ও চাকুরির বাজারেই বা তাহার মূল্য কত, সে কথাও ভুলিয়া যাই,—শুধু পাশের মোহে মুগ্ধ হইয়া আমরা পরিচালিত হই। অন্যায় খেয়াল বা আব্দার ধরিলেই তাহার জন্য বেশী মাশুল দিতে হয়, সে কথা মনে রাখি না। কন্যাপক্ষের যেমন এই ভ্রমগুলি আছে, পাত্রপক্ষেও তেমনি পরধনে ধনী হইবার অন্যায় লোভটিও প্রবল। কাযেই, উভয়তঃ ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়া অন্যায় জেদের মাথায় আপনাদের সর্ব্বনাশ করিতেছি!

দোষ করেন পিতামাতা উভয় পক্ষেই—কিন্তু দোষের

বোঝা অবলা সরলা বালিকাকে আজীবন বহন করিতে হয়। তাই সে শাপদগ্ধা অহল্যার ন্যায় সর্ব্বদাই শিলাখণ্ড রূপে ধরাতলে পড়িয়া থাকে;—সংসারের যত যুগই পরিবর্ত্তিত হউক না কেন, তাহাদের পাষাণোদ্ধার হয় না, যাবত দয়ার অবতার রামচন্দ্রের পাদস্পর্শ সুখ না ঘটে।

কিন্তু এই ভাবে, সংসারের মধ্যে, শৈশব হইতে, পার্থক্য সৃষ্টির ফল কখনো ভাল হইতে পারে না। যে কন্যারা শৈশব হইতে অর্থের মোহিনী মূর্ত্তি দেখিতে অভ্যাস করে, তাহারা পরে গৃহিণী হইয়া অর্থেরই অজুহাতে একান্নবর্ত্তী পরিবারকে শতধা বিভক্ত করিতে কুণ্ঠিতা হয় না। তাঁহারাই পরে অলঙ্কার ও বেশভূষা সংগ্রহের জন্য লালায়িতা হয়, এবং প্রতিক্ষণেই অর্থের হিসাবে সকল জিনিসেরই মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে শিক্ষা করে। তাঁহারাই পরে পুত্রের জননী হইয়া, কন্যাপক্ষ হইতে অমানুষিক অর্থের দাবী করিতে লজ্জা বা দ্বিধা বোধ করেন না; এবং ইচ্ছানুরূপ অর্থ না পাইলে, বালিকা বধূর উপরে নির্য্যাতন করিতেও বিরত হন না। তাঁহারাই স্বীয় কন্যার প্রতি এক প্রকার ব্যবহার করেন এবং বধূমাতার প্রতি অন্য প্রকারের করেন। সংসারে তাই নিত্যই অশান্তি, নিত্যই দুঃখ। অর্থ ই আজ সর্ব্বাপেক্ষা আদরের সামগ্রী, আজ তাই অনর্থ চতুর্দ্দিকে।

এত ভেদনীতি, এত অশান্তি, এত গোলযোগের মধ্যে বাস করিয়া, মেয়েরা কখনো সুস্থদেহী হইতে পারে না। পুরুষদিগের জীবনে দুইটি কঠিন সময় উপস্থিত হয়, যখন তাহাদিগের স্বাস্থ্য ও জীবন লইয়া টানাটানি পড়ে; সে দুইটি, দন্তোদ্গমের কাল ও যৌবনোদ্গমনের কাল। স্ত্রীলোকদিগের জীবনে যৌবনোদ্গমের কাল বিশিষ্টরূপে কঠিন সময় এবং তদ্ব্যতীত প্রৌঢ়ত্বের শেষাংশও অপর কঠিন সময়। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখা যাউক, কোন্ কালে আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোকেরা কি ভাবে জীবন যাপন করেন, এবং তাহার ফল কি।

বালিকার শৈশব

সমস্ত শৈশবকাল ধরিলে, অর্থাৎ জন্মাবধি দশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত, এদেশে, স্থূলহিসাবে, বালক ও বালিকা প্রায় একই ভাবে লালিত ও পালিত হইয়া থাকে। শৈশবের লালন-পালন সম্বন্ধে "বাঙ্গালীর ছেলে" প্রবন্ধে অনেক কথাই বলিয়াছি। সামান্য ধান্যবৃক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া, সকল বৃক্ষকেই যথাযথ ভাবে ফলবান করিতে হইলে, যতটা কৃষি সম্বন্ধীয় জ্ঞান, যতটা পরিশ্রম ও যত্ন করা আবশ্যক হয়, ছেলে মানুষ করিবার জন্য তাহার একতিলও জ্ঞান, ধারাবাহিক যত্ন ও ঐকান্তিক পরিশ্রম করা হয় না। কাজেই, ছেলেরা আপনা-আপনিই বড় হয় মাত্র; মনুষ্যত্বের পথে কতটা অগ্রসর হয় তাহা বিবেচ্য। সংক্ষেপতঃ, মমতা বশতঃ আমরা শিশুদিগকে খাওয়াই-পরাই, কিন্তু কত বয়সে কত খাদ্য ন্যায্য, কি পরিধেয় উপযুক্ত, এ সকল কথা জানি না। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার মূল্য কত, তাহা নিজেরাও উপলব্ধি করি না; কাজেই, শৈশব হইতে শিশুদিগের সে অভ্যাস করাই না। শিখাইবার মধ্যে, শিশুদিগকে রাতদিন জুজুর ভয় দেখিতে শিখাই, কথায় কথায় শাসন করিয়া কাপুরুষ হইতে শিখাই, সারাদিন অপরিষ্কার অবস্থায় থাকিয়া সন্ধ্যায় একবার ফিটফাট হইতে শিখাই, আর শিখাই অসংযম—বাক্যে, কার্য্যে, প্রত্যক্ষে, পরোক্ষে। নিতান্ত অবিবেচনা করিয়া কখনো তাহাদিগকে নিষ্ঠুরভাবে তাড়না করি, অথবা কখনো অন্যায় আদর দিয়া তাহাদিগকে নষ্ট করি। তাহারা কি খায়, কি পরে—সকল সময়ে তাহার সংবাদ লই না, এবং রোগাই হউক, আর রুগ্নই হউক, শয্যাশায়ী না হইলে তাহাদিগের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধানও করি না। পাছে দেহে আঘাত লাগে, এই ভয়ে সকল সময়েই তাহাদিগকে শাসন করি। এবং চাকর-বাকরদিগের সঙ্গে অথবা পাড়ার যাহার-তাহার সংসর্গে ছেলেদিগকে খেলিতে ও বেড়াইতে ছাড়িয়া দিই। ছেলের সঙ্গে ছেলে সাজিয়া, তাহাদিগের সঙ্গে নিজেরা তেমন অন্তরঙ্গ ভাবে কখনো মেলামেশা করি না। ষোল আনা অজ্ঞতার উপরে বিরাটপুরুষ হইয়া বসিয়া, বত্রিশ আনা খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা আমাদিগের ভাবী বংশধরগণের দেহ ও মন গঠন করিয়া থাকি।

দেহ গঠনের মূল ভিত্তি পাঁচটি। পুষ্টিকর অথচ সহজ-পাচ্য আহার্য্য, যথাসম্ভব শারীরিক পরিচালনা, উন্মুক্ত বায়ু-সেবন, সর্ব্বদাই পরিষ্কার থাকা এবং মানসিক স্ফূর্ত্তি—এই পাঁচটির সমন্বয়ে দেহ সুগঠিত হয়। (১) আমরা দেখিয়াছি যে, শিশুরা যে খাদ্য খায়, অধিকাংশ সময়েই তাহা তাহাদিগের পক্ষে অনুপযুক্ত। মাতৃস্তন্য—কোন-কোন শিশু

তিন-চার বৎসর পর্য্যন্ত পায়, আবার কেহ-কেহ ছয় মাস কালও উহা যথেষ্ট পায় না। বঙ্গদেশে সুস্থা ও সবলকায়া জননীর নিতান্ত অভাব; তাহার উপরে, প্রসবের পরে ছয়মাস কাল পর্য্যন্ত মাতৃস্তন্য ভাল থাকে; পরে ঐ দুধে শিশুর যথাযথ পুষ্টি হয় না। পালো-মিশ্রিত, বাসী, সিদ্ধ-করা, মহিষদুগ্ধমিশ্রিত বা "ফুকা" প্রথায় নিষ্কাশিত ক্ষীণদেহ গাভীর দুগ্ধ—গৃহস্থের হস্তে জল, বালি, বা শঠি মিশ্রিত হইয়া তবে শিশুর উদরস্থ হয়। সে দুগ্ধে নবনীত নাই, সে দুগ্ধে ভাইটামীন নাই, সে দুগ্ধে আছে দুগ্ধের নাম ও জননীর মনের তৃপ্তি। কাযেই, জন্মাবধি, তিন দফাতেই শিশুর পুষ্টির অভাব লক্ষিত হইবে—প্রথমে রুগ্না জননীর স্তন্য সেবনে, পরে তথাকথিত গো দুগ্ধ পানে এবং শেষে অন্নগ্রহণ কালীন। দুগ্ধ ছাড়িয়া যখন শিশুরা ভাত খাইতে ধরে, তখন পুরাতন সিদ্ধকরা চাউলকে পুনরায় সিদ্ধ ও ফেন বর্জ্জিত করিয়া, তৎসঙ্গে সামান্য সিদ্ধ ডাইলের উপরিস্থ জল ও মৎস্যের কণা দিয়া শিশু ভাত খাইতে শিখে। সাধারণ গৃহস্থের ঘরে, অনেক শিশু তিনবার ভাতই খায়, দুধ খাওয়া সকলের অদৃষ্টে জুটে না। কিন্তু দুধ না জুটিলেও অন্ততঃ সহরে, একটু চা ও দোকানের মিষ্টান্নের অভাব কোনও কালে হয় না। শিশুর ভোজ্য কমাইয়া,—পরিমাণে না হইলেও গুণে "নিরেস" করিয়া—তাহার বেশ-ভূষার ঘটা বাড়ান হয় বৈ কমান হয় না। দুধ, ঘি, মৎস্য, ডিম্ব, মাংস, ডাল প্রভৃতি,এগুলির মূল্য কি, তাহা গৃহস্থ জানেন না, এবং ইহাদিগের যথাযথ ব্যবহারের দিকে আদৌ দৃষ্টি রাখেন না। কাযেই পুষ্টিকর খাবারের বিশেষ অভাব ঘটে, একথা নিঃসন্দেহ। যেমন হারে পুষ্টির অভাব ঘটে, সেই হারেই বালক-বালিকারা রুগ্ন, বা রোগপ্রবণ বা কৃশ হইয়া থাকে। (২) উপযুক্ত খাদ্যের পরেই অঙ্গচালনার স্থান। যে শিশু চলিতে শিখে নাই, এমন শিশুর পক্ষে একোল-ওকোল পরিবর্ত্তন, রাতদিন উঠা-পড়া—ইহাই যথেষ্ট ব্যায়াম। যে শিশু হাঁটিতে শিখিয়াছে, তাহার পক্ষে, আমাদিগের চক্ষে অনর্থক, কিন্তু তাহাদিগের পক্ষে সার্থক, চাঞ্চল্যই ব্যায়ামের প্রতিনিধি। দৌড়াদৌড়ি, ছুটোপাটি, চীৎকার করা, পড়া, উঠা—যত বেশী হয় ততই মঙ্গল। উক্ত স্বাভাব্য ব্যায়াম হইতে বঞ্চিত করিয়া, শতবন্ধন-যুক্ত জামাজোড়া দ্বারা তাহাদিগকে আবৃত রাখা, এবং তদুপরি দুই সন্ধ্যা কুঁজো হইয়া, স্থিরাসনে পাঠাভ্যাস করান বা লিপি-লিখন অভ্যাস করান যে তাহাদিগের দেহের পক্ষে কতদূর অনিষ্টকর, তাহা বলা যায় না। অল্পবয়স হইতে, অল্প-পরিসর স্থানে বসাইয়া, অল্পালোকের সাহায্যে, দুই সন্ধ্যা ক্ষুদ্রাক্ষরে-মুদ্রিত অমল-ধবল পাঠ্য-পুস্তক হইতে পাঠাভ্যাস করানর ফল—স্বাস্থ্যের হানি, দৃষ্টিক্ষীণতা, মেধার হ্রাস, স্বীয় প্রতিভার সঙ্কোচ। চক্ষু, কর্ণ, ত্বক্ সজাগ হইতে না হইতেই, সজোরে তাহাদিগকে আমরা প্রতিহত করি—আমাদের ছেলেরা তাই চক্ষু থাকিতে পর্য্যবেক্ষণ করিতে শিখে না, কর্ণ থাকিতে শব্দব্রহ্মের সম্বন্ধে বধির হয় এবং হস্তপদাদি থাকিতেও সুধু স্বল্পায়াস-সাধ্য কার্য্যই করিতে পারে। (মেয়েদের তুলনায়, ছেলেরা বেশী বয়স পর্য্যন্ত পাঠ্যাভ্যাস করে বলিয়াই বোধ হয় আমাদের দেশের ছেলেরা মেয়েদিগের অপেক্ষা কম ধীশক্তি-সম্পন্ন। বর্ত্তমান কালের শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে স্বকীয় সেবা, প্রজ্ঞা, ধী সমস্তই নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে—কাজেই পণ্ডিত-মূর্খের সংখ্যা এত বেশী।) দৌড়াইয়া দম বাড়ান, সন্তরণ-পটুতা-সাহায্যে জলে মগ্ন হইবার আশঙ্কা হ্রাস করা, খেলা-ধূলার সাহায্যে ও রীতিমত তৈলাভ্যঙ্গ দ্বারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৌষ্টব সাধন করা—এসকল একরকম দেশ হইতে উঠিয়া যাইতেছে। তৎপরিবর্ত্তে অলস লুডো, ক্যারম, প্রভৃতি ক্রীড়ার বহুপ্রসার ঘটিতেছে। শৈশব হইতে মাংস-পেশীগুলিকে এই ভাবে অলস করিয়া, আমরা যে কি অনিষ্ট করিতেছি তাহা এই সামান্য লেখনী দ্বারা ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা আমার নাই। (৩) উন্মুক্ত বায়ু সেবন কাহাকে বলে, তাহা এই উন্মুক্ত-বায়ু-বহুল দেশবাসীকে বুঝাইয়া দিতে হইবে—আমরা এতই মূঢ়! ভগবান কৃপা করিয়া এই বাঙ্গালা দেশে যে ষড়ঋতু দিয়াছেন, এই শস্য-শ্যামলা বঙ্গদেশে যে সুমন্দ মলয় প্রবাহিত হয়, পৃথিবীর অপর কয়টি দেশে তাহা হইয়া থাকে? এখানে কুহেলিকা বিরল, এখানে অসময় বা দীর্ঘকালব্যাপী বর্ষা নাই, এখানে শীতও প্রবল নহে। তবে কেন বাঙ্গালী ভগবানের মুক্ত-দান, জীবের জীবন, পবনদেবকে দেবতাখ্যা দিয়াও নিজ ঘরদ্বার হইতে দূরে রাখে? শয়নাগারের দরজা-জানালায় পর্দ্দা টাঙাইয়া, বারাণ্ডায় পর্দ্দা লাগাইয়া, মাথা মুড়িয়া দিয়া শুইয়া, সন্ধ্যার প্রাক্কাল হইতে গৃহের মধ্যে অবস্থিত হইয়া

—বাঙ্গালী কি অন্যায় করে! যখন পাকা বাড়ীর বাহুল্য ছিল না, তখন পাকাবাড়ীতে ও মৃত্তিকালিপ্ত গৃহে—সত্য-সত্যই গবাক্ষ নাম সার্থককারী জানালাই ছিল। ইদানীং বড় বড় জানালা দরজার সৃষ্টির সঙ্গে, নানারকমের কার্টেন (পর্দ্দা) ও সার্সির অতিবাহুল্য দেখা যাইতেছে। ফল কথা, যে দিক দিয়াই দেখি, বাঙ্গালীর পক্ষে বিশুদ্ধ বায়ু সেবন এক রকম হয় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু যদিও পুরুষেরা কার্য্য-ব্যপদেশে বা অপর কারণে কিছু কিছু বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিবার অবসর পান, রমণীরা সে সুখে বঞ্চিত। অথচ কলিকাতায় পর্দ্দা স্ত্রীলোকদিগের উত্থান হইয়াছে বলিয়া কত লোকে কত কথাই বলেন! একে ত রাত-দিন আর্দ্র ঘরে, আর্দ্র জমিতে বাস, তাহার উপরে অধিকাংশ সময়েই অন্দরমহলে থাকার ফলে মেয়েদের স্বাস্থ্য প্রথমাবধিই ক্ষুণ্ণ। পুতুল খেলা, বা কুটনা কোটার অভিনয়, ইত্যাদিতে যতটা ব্যায়াম হয় সেটা যথেষ্ট নহে। বঙ্গের ভাবী বংশধরগণের ভাবী জননীদিগের স্বাস্থ্য এরূপ হইলে চলিবে না। জন্মাবধি বালক বালিকাদিগের মনে উন্মুক্ত বায়ু-সেবনের উপকারিতার সংস্কার জাগাইতে হইবে। কিন্তু কে জাগাইবে? বয়োজ্যেষ্ঠরাই যে চতুর্দ্দিক বন্ধ করিবার দারুণ পক্ষপাতী। (৪) সদা-সর্ব্বদা পরিষ্কার থাকার উপকারিতা সকলেই উপলব্ধি করেন, কিন্তু পরিষ্কার থাকা কাহাকে বলে, সেই সম্বন্ধে ঘোর অজ্ঞতা এ দেশে দেখা যায়। আমাদের দেশে, প্রায় প্রত্যেক ঘরেই দেখা যায় যে, নিজ-নিজ গৃহগুলিকে পরিষ্কার রাখাই কর্ত্তব্য মনে হয়, আর গৃহের চতুষ্পার্শে আবর্জ্জনা ফেলায় দোষ হয় না; দিনের মধ্যে দশবার বস্ত্রান্তর পরিগ্রহ করাই শুচিভাব-জ্ঞাপক,—হউক না পরিহিত বস্ত্র মলিন। যে পুষ্করিণীর জলে স্নানাদি সম্পাদিত হয়, সেই পুষ্করিণীর জলই পানার্থ ব্যবহৃত হয়। এক থালা অন্ন ভূমিতে রাখিলেই সেই ভূমি কলুষিত হয়; কিন্তু মক্ষিকাকুল-স্পৃষ্ট, ভুক্তাবশিষ্ট পর্য্যুষিত অন্ন ভোজনে গৃহস্থের বাধা নাই। ভোজন-পাত্র শতবার মার্জ্জিত হইলেও, পূতিগন্ধময় নক্তক (ন্যাতা) কর্ত্তৃক শেষে যে মার্জ্জিত হয়, তাহাতে গৃহস্থের আপত্তি নাই। ভোজন দ্রব্যের আধারে নিত্যই আরসুলা, ইন্দুর প্রভৃতি থাকিলে দোষ হয় না। গুড়ে থাকে না এমন জানোয়ার নাই;—অথচ সেই গুড় ভোজনে, দ্বিধা নাই; কিন্তু হাড়ের সাহায্যে পরিষ্কৃত করা চিনি ভোজনে প্রত্যবায় আছে। কাপড়ে, গামছায়, দেওয়ালে, মেঝেতে সর্দ্দি (কফ) মুছিতে আছে, কিন্তু শৌচ-প্রস্রাব করিলেই বস্ত্রত্যাগ করিতে হয়। এইরূপে কত সহস্র প্রকারের যে অভ্যাস আমাদিগের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে, তাহা বলিতে পারি না।—কাজেই আমরা সেগুলির দোষ দেখিতে পাই না। এখন হইতে জনক জননীকে সেগুলি বুঝিতে হইবে এবং শৈশব হইতেই বালক বালিকাগণের যাহাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার অভ্যাস হইয়া যায়, তাহা করিতে হইবে। আমাদিগের মধ্যে অনেকের ধারণা আছে যে, বালক-বালিকারা সারাদিন ময়লা থাকায় দোষ হয় না। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, অনেকে ছেলে-মেয়েদের তেমন যত্ন করেন না; কেবল হয় ত শুধু বৈকাল-বেলায়, ছেলেদিগকে একবার বাহ্যিক পরিষ্কার করিয়া বেড়াইতে পাঠাইয়া দেন। বালক মাত্রেই জল ভালবাসে এবং ধূলা-কাদা ঘাঁটিতে ভালবাসে। অনবরত ধূলাকাদা ঘাঁটার ফলে নখের নিচে কত ময়লা যে জমিয়া থাকে, তাহা বলা যায় না। আর নখের নিচের ঐ ময়লা উদরস্থ হইয়া ক্রিমি ও উদরাময়ের সৃষ্টি করে। সারাদিন জামাজোড়ার বাহুল্য না করিয়া, সময় মত নখ কাটা ও চুল কাটা; প্রত্যহ তৈলাভ্যঙ্গ করিয়া স্নান করান; একটু অপরিষ্কার হইলেই তখনি পরিষ্কার করিয়া দেওয়া—ইত্যাদি উপায়ে শিশুদিগের মনে এই ধারণা জন্মাইয়া দিতেই হইবে যে, যে ময়লা থাকা দূষণীয়। নতুবা, সকল সময়েই ময়লার বিরুদ্ধে না দাঁড়াইলে—খেয়ালের বশে কখনো-কখনো পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিলে সুফলের আশা খুব কম।

(৫) মনের স্ফূর্ত্তি—শরীরের উন্নতির উত্তরসাধক। ইহজগতে মনের ক্ষমতা যে কত বেশী, তাহার ঠিক ধারণা আমরা চিকিৎসকেরাও সকল সময়ে করিতে পারি না। এমন কি, আমাদিগের এতদূর দুরদৃষ্ট যে, এতদ্দেশীয় কোনও চিকিৎসালয়ে দেহের উপরে মনের ক্ষমতা সম্বন্ধে কোনও তত্ত্ব শিখান হয় না বলিয়া, অধিকাংশ চিকিৎসক ঐ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কিন্তু অপর সাধারণে এই বিষয়ে অবহিত থাকুন আর নাই থাকুন, চিকিৎসক ও শিক্ষক, বিচারক ও শাসক—এই সম্প্রদায়ের লোকের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ঐ তত্ত্ব অবগত হওয়া উচিত। পিতামাতা

যদি মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ হন, তবে সন্তানের মানসিক-বৃত্তি স্বাভাবিক ভাবে কখনো স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারে না। নিতান্ত অজ্ঞতাবশতঃই, পিতামাতা কন্যা-সন্তানকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন, যখন-তখন অন্যায় শাসন করেন এবং রাতদিন ভূতের ও প্রহারের ভয় দেখাইয়া তাঁহাদিগের মানসিক হীনতা সম্পাদন করিয়া থাকেন। গৃহে পিতামাতার অজ্ঞানকৃত হীন ব্যবহার, বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণের অজ্ঞানকৃত দুর্ব্যবহার এবং সমাজে অজ্ঞানকৃত দুর্ব্যবহার;—এরূপ অবস্থায় আমাদিগের বালিকাগণের মানসিক স্ফূর্ত্তি হওয়া দূরের কথা, তাহার সঙ্কোচই হইয়া থাকে। তাই আমাদের বালিকারা সর্ব্বদাই ভীতি-বিহ্বলা, নিত্যই অপ্রস্তুত, চিরকালই যেন শত-অপরাধিনী, সকল কথায় ও কাযে সন্দিহান, সকল চেষ্টাতে উৎসাহহীনা—অথচ প্রগাঢ় ভক্তিমতী, তীক্ষ্ণধী, কিন্তু অজ্ঞানাচ্ছন্না। স্বল্প বয়সে আমাদের বালিকারা যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ও সুবিবেচনার পরিচয় দেয়, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। অথচ তাহারা বিদ্যার দ্বারা মার্জ্জিত, সহানুভূতির দ্বারা পরিপুষ্ট, স্বাস্থ্য দ্বারা উন্নত দেহ ও মন-সম্পন্না কস্মিন্ কালে হইতে পারে নাই।

ফল কথা, বঙ্গদেশে বালিকারা যতদূর অযত্নে এবং অশ্রদ্ধায় লালিত-পালিত হয়, তত অযত্ন ও অশ্রদ্ধা করা কখনো উচিত নহে। আমরা বুঝিতেছি না যে, আমরা কি জিনিসকে অযত্ন করিতেছি। আমাদের সমাজের ভাবী জননী, আমাদের জাতির ও গোষ্ঠীর ভাবী প্রসবিতা যাঁহারা হইবেন, আমরা তুচ্ছ অর্থের মোহে তাঁহাদিগের স্বাস্থ্য, দেহ ও মনকে ক্ষুন্ন করিতেছি। কাযেই আমাদিগের বংশধরেরা আকৃতিতে খর্ব্ব, স্বাস্থ্যে ক্ষুন্ন, মনে কাপুরুষ ও রমণীজনোচিত, আয়ুতে অল্প হইয়া আমাদিগেরই ভার স্বরূপ হইয়া পড়িতেছে। আমরা জমী কর্ষণ করিব না, আমরা জমীতে সার দিব না, অথচ পুষ্টিকর উত্তম ফলবান বৃক্ষ আশা করিব, এ কেমন কথা?

বালিকার বিবাহিত জীবনের প্রথমাংশ—আন্দাজ দশ বারো বৎসর কাল—শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীর কর্ত্তৃত্বাধীনে কাটে। এই সময় রমণী-জীবনে যুগসন্ধিক্ষণ। একদিকে পিতৃকুলের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি, অপর দিকে শ্বশ্রূকুলে নিত্য নূতনের সঙ্গে সামঞ্জস্য করিবার জন্য আন্তরিক প্রয়াস এবং তদুপরি স্ত্রীধর্ম্মের বিকাশ—এই তিনটির একত্র সমাবেশের ফলে কিরূপ মানসিক প্রলয় উপস্থিত হয়, তাহা ধীর চিকিৎসক ব্যতীত অপরের ধারণার অতীত। শ্রীভগবানকে কোটি-কোটি বার প্রণাম করি যে, তিনি বঙ্গ রমণীকে এই প্রবল প্রলয়ের মধ্য দিয়া কিরূপ নিরাপদে পরিচালিত করেন। এই কথাগুলির একটু বিশদ ভাবে আলোচনা করিব।

বিবাহিত জীবনের প্রথমাংশে পিতৃগৃহ-বিচ্যুত হইয়া সম্পূর্ণ নূতনত্বের মধ্যে আসিয়া পড়ায়, বালিকার মনের ভাব কিরূপ হয়, তাহা প্রণিধান করিবার বিষয়। সে যে শুধু নূতন ঘরদ্বার, নূতন আকাশ-বাতাস, নূতন মানুষ-দের মধ্যে আসে তাহা নহে—সে কত নূতন কথা শুনে, নূতন আচার, নূতন ব্যবহার দেখে। নিত্য নূতনের মধ্যে সে আপনাকে হারাইয়া ফেলে; পিতৃগৃহে তাহার মানসিক যে অংশটুকু উন্মেষিত হইয়াছিল, শ্বশুরালয়ে অকস্মাৎ তাহা রহিত হইয়া মানসিক অপরাংশ সবলে উদ্ঘাটিত হইতে আরম্ভ করে। এই আকস্মিক অবস্থা-বিপর্য্যয় একান্তই কষ্টকর—আপাততঃ চিত্ত-বিক্ষোভকর। এই নিত্য পরিবর্ত্তন, নিত্য বিক্ষোভ-চাঞ্চল্য সংযম-সাধক নহে। বাল্যে পুত্র-কন্যার মধ্যে যে পার্থক্য-ভাব অলক্ষ্যে মজ্জাগত হইয়াছে, শ্বশুরালয়ে ভিন্নবর্ত্তিতা ও ব্যবহার-দ্বৈত সেই ভাবকেই পোষণ করে। আমি এমন বলি না যে, সকলেই শ্বশুরালয়ে মন্দ ব্যবহার পায়। যে ভাগ্যবতী বালিকা সেই দুর্ভাগ্য ভোগ করে না, তাহার পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি অত্যন্ত বেশী বলিতে হইবে। কিন্তু, এই কাঞ্চন-কৌলিন্যের যুগে, এই বহ্বান্নবর্ত্তিতা ও স্বার্থ-পূজার দিনে, এই ভোগ-বিহ্বল সমাজে নবোঢ়ার মনের মত শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী নিতান্ত বিরল। বাক্যবাণ, অবমাননা, আহারে কষ্ট দেওয়া, ব্যবহারে রূঢ়তা প্রকাশ করা—এগুলি নিতান্ত শিক্ষিত এবং তথাকথিত ভদ্র-বংশেও বিরল নহে। এবং কি আশ্চর্য্য ও পরিতাপের বিষয় যে, বয়োবৃদ্ধা ও জ্ঞানবৃদ্ধা শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী কল্পিত নিজ মহত্ত্বের গরিমায় এত বিবেকহীনা হন যে, তিনি আশা করেন যে, নবোঢ়া বধূমাতা একনিঃশ্বাসে সমস্ত শৈশবের স্মৃতি ও অভ্যাস ভুলিয়া, রাতারাতি শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণীর জ্ঞানপক্কতা লাভ করিয়া, আঠার আনা তাঁহার মনের তালে তাল দিবার উপযুক্ত হইয়া বসিবে। আবার যে বালিকা নবযৌবনে স্বয়ং ঐ সকল কষ্ট ভোগ করিয়া-ছেন, তিনিই গৃহিণী রূপে স্বীয় পুত্রবধূকে নির্য্যাতিত করিতে

কুণ্ঠা বোধ করেন-না! ফলতঃ, নূতন সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া, "কন্যা"রূপে পালিত হওয়ার সৌভাগ্য সকল বালিকার ভাগ্যে ঘটে না বলিয়া, আজকালকার বালিকারা সকল বিষয়েই অসংযত হইতে শিক্ষা করে।

বিবাহের ঘনাঘনি সময়ে, বালিকার স্ত্রী-ধর্ম্ম আরব্ধ হয়। অজ্ঞতাবশতঃ অনেক বালিকা তজ্জন্য ভীতা হইয়া পড়ে। কেহই তাহাদিগকে শিখাইয়া দেন না যে, বার-চৌদ্দ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে ৪৫।৫০ বৎসর বয়ঃক্রম কাল পর্য্যন্ত মাসিক আর্ত্তবস্রাব হওয়া প্রকৃতির ধর্ম্ম। আর তদপেক্ষা আরো আবশ্যকীয় এ কথাও কেহ শিখান না যে,ঐ মাসিক স্ত্রী-ধর্ম্মকে অগ্রাহ্য করার মত স্বাস্থ্যহানিকর অতি অল্প কাযই আছে। বৃথা লজ্জা করিয়া, অথবা ততোঽধিক বাহাদুরী করিয়া, আর্ত্তবকালকে হেলায়-শ্রদ্ধায় চলিয়া যাইতে দেওয়ার ফলে, আমাদিগের রমণীরা ভগ্নস্বাস্থ্য, চিররুগ্ন ও অল্পায়ুঃ সন্তানের জননী হইয়া থাকেন। যদি শুধু কিঞ্চিৎ স্রাবের ও চারটি দিনেরই মধ্যে সমস্ত ব্যাপারটা নিবদ্ধ থাকিত, তাহা হইলে সকল গোলই মিটিত। হিন্দু-শাস্ত্র-মতে আর্ত্তবযুক্তা রমণীকে কোন জিনিস স্পর্শ করিতে নাই। অথচ মনকে চোখ ঠারিয়া, আমাদের দেশের বধূরা সকল কাযই করেন, এবং চতুর্থ দিবসে যেমন অবস্থাতেই থাকুন না কেন, স্নান করিয়া মনকে শুদ্ধ করিতে দ্বিধা বোধ করেন না। হিন্দুশাস্ত্রের উদ্দেশ্য এই যে, বধূমাতা ঐরূপ শারীরিক অবস্থাপন্না হইলে, সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, শারীরিক ও মানসিক বিশ্রামে কাল কাটাইবেন, যেহেতু ঐ কয়েক দিন স্ত্রীলোকের দেহের পক্ষে মহা প্রলয়ের কাল। ঐ সময়ে শরীর ও মন—কোনটিই প্রকৃতিস্থ থাকে না, এবং ঐ সময়ে ঠাণ্ডা লাগান বা পরিশ্রম করা স্বাস্থ্যের পক্ষে আদৌ অনুকূল নহে। যে রমণী আর্ত্তব কালকে যৌবনে অগ্রাহ্য করিয়া চলেন, তিনি বেশী বয়সে সময়ে-সময়ে উন্মাদগ্রস্তা পর্য্যন্ত হইয়া থাকেন।

বিবাহিত জীবনের মধ্যকাল—সাধারণতঃ স্বাধীন ভাবেই কাটে। অর্থাৎ, প্রায় ঐ সময়-বরাবর শ্বশ্রূঠাকুরাণীরা পরলোকগতা হওয়ায়, বধূরা স্বয়ং গৃহিণী হইয়া উঠেন। নিজ সংসারে গৃহিণী হইলে পরে, যাঁহার যেমন আর্থিক অবস্থা, তাঁহাকে সংসারে তদ্রূপ ব্যবস্থা করিয়া লইতে হয়। দাস, দাসী ও পাচক রাখিবার সামর্থ্য থাকিলে, অনেকটা অলস ভাবেই জীবন যাপন করা চলে; তদভাবে, সংসারের সকল কাযেই গৃহিণীকে "ভূতগত" পরিশ্রম করিতে হয়। আর ঠিক্ এই সময়েই বৎসরে বৎসরে সন্তান প্রসূত হইতে থাকে। কাযেই, এই সময়েই আলস্য বা অতিরিক্ত শ্রমবশতঃ, এবং অপর দিকে বহু প্রসবের ফলে শরীর ভাঙিয়া পড়িতে আরম্ভ করে;—কুড়ি পার হইতে না হইতেই রমণীরা বুড়ী হইয়া পড়েন। দরিদ্রের সংসারে, নিত্য-অভাব প্রযুক্ত, গৃহিণীর আহারের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়; এবং অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল সংসারে চা, দোকানের মিষ্টান্ন প্রভৃতি এবং বৃথা ব্যসনে শরীর খারাপ হইতে থাকে। পুরুষেরা তামাক খাওয়াটাকে দোষ মনে করেন না বলিয়া, স্ত্রীলোকেরাও তামাক পাতা (দোক্তা, সুর্ত্তি, জরদা) ভক্ষণ করাটাকে অন্যায় মনে করেন না। অতিরিক্ত তাম্বুল-চর্ব্বণ, অতিমাত্রায় তামাক পাতা খাওয়া আজকাল যেখানে সেখানে প্রচলিত; এমন কি অল্পবয়স্কা বালিকা নিজ মাতার নিকট হইতেই অম্লানবদনে তামাক পাতা চাহিয়া লয়েন!

যৌবনের শেষাংশ—সুখ-দুঃখ, শ্রম-বিশ্রাম,—এইরূপ একটা সংমিশ্রণ অবস্থা। এই সময়-বরাবর পুত্র উপার্জ্জন-সক্ষম হইতে আরম্ভ করে এবং কন্যাদিগের বিবাহ দিতে হয়। এই সময়ে কাহারো স্বামীর বেতন বৃদ্ধি হয়, কেহ বা কার্য্য, এমন কি সংসার হইতেও অবসর গ্রহণ করেন। মোট কথা এই যে, সাংসারিক অবস্থার অনুকূল-প্রতিকূল অবস্থার অনুপাতে এই সময়ে গৃহিণী দিন যাপন করেন। তবে বোধ হয় এটা অনায়াসে বলা যায় যে, বেশীর ভাগ স্থলে, গৃহিণীরা ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়েন; কিন্তু সংসারের সকল বিষয়েই ওতঃ-প্রোতঃ ভাবে অনুলিপ্ত হইয়া থাকেন। এই বয়সেই সখ, সাধ, বাসনা কামনা তরল না থাকিয়া দানা বাঁধিয়া উঠে—এই সময়েই পুত্রের বিবাহে অর্থোপার্জ্জনের সুযোগ, এই সময়েই পুত্রবধূর উপরে শাসন, এই সময়েই গৃহ-বিচ্ছেদের সময়, এই সময়েই সেবা-গ্রহণ-স্পৃহা, সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা।

বার্দ্ধক্য।

সকলের ভাগ্যে বার্দ্ধক্য উপস্থিত হয় না,—হইলেও বৈধব্য বা অতিমাত্রায় সুখ ভোগের সুযোগ ব্যতীত এই অবস্থায় বলিবার কিছু থাকে না।

উপসংহার।

বাল্যে অভিশাপের সঙ্গে জন্মগ্রহণ করিয়া, শৈশবে দ্বৈতভাবের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়া, কৈশোরে সর্ব্ববিধ নূতনত্বের আবর্ত্তে পড়িয়া, যৌবনের মধ্যভাগে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগের সুযোগ পাইয়া, এই অর্থ-সর্ব্বস্ব যুগে, এই অনাচারের কালে, অসংযমের ক্রোড়ে লালিত-পালিত বর্ত্তমান কালের রমণীর জীবনের কি উদ্দেশ্য থাকে এবং তাহার সাফল্য কতদূর হয়? যে জাতি সেবায় দাসী, কর্ম্মে মন্ত্রণাদাসী, ক্ষমায় ধরিত্রীসদৃশা, শুশ্রূষায় মাতা ;—যাঁহারা আদ্যাশক্তি পরমা প্রকৃতির অংশ ;—যাঁহারা আমাদিগের বংশধরের গর্ভধারিণী, দেশের ও দশের পালিনী, সে রমণী আজ কোথায়? আজ অন্ধভক্তিযুতা, ভয়চকিতা, মূঢ়া, সদাই অপ্রস্তুত কামিনী অনেক ;—আজ চপলা, মুখরা, আত্মসর্ব্বস্ব, ভোগবিলাসিনী ভামিনী বহু ;—আজ বহুরূপধারিণী, বহু লীলাময়ী, বহু ভাবিনি রমণী যথাতথা।

আজ বাঙ্গালীর মেয়ের মাতৃত্বের গুরুত্ব জ্ঞান নাই, আজ তাঁহাদিগের সে যোগ্যতাও বুঝি নাই। আজ সমাজ বহির্মুখী ; মায়েরা তাই প্রাণহীনা, শক্তিহীনা, দাসী। আজ সমাজ ব্রাহ্মণ্য শক্তিহারা, তাই আজ মায়েরা বেদী ছাড়িয়া মাটীতে বিচরণ করিতেছেন।

এক পক্ষে ভর করিয়া কোন বিহঙ্গই উড়িতে সমর্থ হয় না—যুগাবতার রামচন্দ্রকেও স্বর্ণসীতা প্রস্তুত করাইয়া যজ্ঞ করিতে হইয়াছিল। আর আজ আমরা রমণীর অঞ্চলধারক হইয়াও, রমণীর উন্নতির দিকে মন দিই না। তাঁহাদিগকে বিনা বেতনের দাসী করিয়া, সুখভোগের সাধন ও উপকরণ মনে করিয়া, আমরা শুধু সেই ভাবেই চলিতেছি। —চলিতেছি কোন্ পথে? রসাতলে!

আমাদিগের এখনিই ফিরিতে হইবে,—এখনিই জাগিতে হইবে—নতুবা আমরা লোপ পাইব। আমাদিগের কর্ত্তব্য কি? কর্ত্তব্য এই :—

(১) পুত্র ও কন্যা—কাহারো সহিত ব্যবহারের পার্থক্য রাখিতে পারিব না ; বধূমাতা ও কন্যা এতদুভয়ের মধ্যেও কোন ব্যবহারের দ্বৈতভাব রাখিব না। উভয় ক্ষেত্রেই সমান যত্ন, সমান ভালবাসা, সমান ঐকান্তিকতা দেখাইতেই হইবে। যতদিন তাহা না পারিব, ততদিন সে দায়িত্ব গ্রহণ করিব না।

(২) আজীবন সংযমের কঠোর ব্রত আপনারাও লইব, পুত্র কন্যা-নির্ব্বিশেষে সকল সন্তানকেই সংযমের দৃঢ় পথে অগ্রসর করাইয়া দিব। ভোগে দুঃখ, ত্যাগে সুখ।

(৩) অজ্ঞান, অবিদ্যা,—দেশ হইতে দূর করিয়া দিতে হইবে। দেশাচার ও লোকাচারের নামে যে মিথ্যা সমাজে প্রচলিত আছে, তাহাদিগকে ভুলিতে হইবে। প্রকৃত সত্যের সন্ধান করিতে হইবে এবং সন্ধান দিতে হইবে। এক সঙ্গে, স্ত্রী-পুরুষ উভয়কেই সুশিক্ষিত করিতে হইবে— পুঁথির বিদ্যা ত্যাগ করিয়া কার্য্যকরী বিদ্যা শিক্ষা করিতেই হইবে। গ্রামে-গ্রামে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত করিতে হইবে এবং তৎসঙ্গে পাঠ্য-তালিকার পরিবর্ত্তন সংঘটন করাইতে হইবে। জ্ঞানই আলোক, অজ্ঞানই অন্ধকার। সেই সত্য জ্ঞানের বিকাশ ঘরে-ঘরে করিতে হইবে। পুরুষদিগের পক্ষে শুধু আপিস লইয়া থাকিলে চলিবে না, রমণীদিগের শুধু গৃহস্থালীর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে চলিবে না। উভয়কেই উভয়কে শিক্ষাদান করিতে হইবে। শিক্ষা বর্ত্তমান কালের একটি প্রধান অভাব।

(৪) স্বাস্থ্যকে সর্ব্বপ্রকারে উন্নত করিতে হইবে। গৃহকার্য্যে যেটুকু পরিশ্রম করা আবশ্যক, তাহা ত করিতেই হইবে ; পরন্তু যাঁহারা দাসদাসী-পরিবৃতা তাঁহাদিগকে রীতিমত ব্যায়ামও করিতে হইবে। ব্যায়ামে অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি পাইবে বৈ কমিবে না। ব্যায়াম করিতে নিষেধ করিয়া ও মুক্ত বায়ু হইতে বঞ্চিত করিয়া ভগবান রমণীকে সৃষ্টি করেন নাই। যিনি জাতির মাতা হইবেন, যিনি দেশের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসার স্থলগণের জননী হইবেন, তাঁহার স্বাস্থ্য সর্ব্বাগ্রেই উন্নত করা প্রয়োজন। অন্যায় লজ্জা, অন্যায় আত্ম-বিনয় অথবা অন্যায় করিয়া ভগবদ্দত্ত নিজের দেহকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ভগবানের শ্রেষ্ঠ দান এই দুর্লভ মানব দেহকে অসুস্থ করার ন্যায় মহাপাতক আর নাই। নিজ দেহকে অযত্ন করা, আর আত্মহত্যা করা একই কথা। খাদ্য সম্বন্ধে অবহিত হইতে হইবে, শ্রীভগবানের মন্দির এই দেহকে সুস্থ ও স্বস্থ রাখিতে হইবে।

যাদুঘরের এক কোণ

[শ্রী দরবেশ দত্ত রায়]

ছুটির দিন দ্বিপ্রহরে সময় আর কিছুতেই কাটিতেছিল না। হঠাৎ খেয়াল হইল, যাদুঘর দেখিয়া আসি।

ঘুরিতে-ঘুরিতে নীচের তলায় তিনটি প্রস্তর-পুত্তলিকা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সে তিনটির সম্মুখে বহুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম! নিষ্কলঙ্ক প্রস্তরময়ী তিন-জোড়া নয়নে কি অব্যর্থ শরসন্ধান করিয়া আমায় মুগ্ধ করিয়াছিল জানি না; কিন্তু সেই তিনটি দুষ্টা রূপসী আমার চক্ষুর সম্মুখে নিয়তই ঘুরিতে লাগিল। আহারে-বিহারে, শয়নে-স্বপনে ওই তিনটি যুবতী দুই দিন ধরিয়া আমার জগতে সর্ব্বময়ী হইয়া রহিল। ঘরে টেঁকা দায়! শেষে কি ঔপন্যাসিক-কথিত প্রথম দর্শনেই—তাও আবার প্রস্তর—! হায় রে কপাল!

দুই দিন পরে আবার যাদুঘরে চলিলাম। কোন দিকে না চাহিয়া, সর্ব্বাপেক্ষা নীরব সেই অংশে, সেই পুত্তলিকা তিনটির সম্মুখে দাঁড়াইলাম। বোধ হইল যেন সে তিনটি একসঙ্গে আমার দিকে চাহিল। ছয়টি নয়নে বড় স্নিগ্ধ, বড় মধুর, যুবতী-স্বভাবসিদ্ধ বিদ্যুৎ হানিয়া পরস্পরের পানে চাহিল। ওষ্ঠপুটে সুন্দর সেই আননের শোভা, হাসি বিকশিত হইল। ওই হাসি, ওই চাহনি আমায় বলিল, "তুমি যে আজ আসিবে তাহা জানিতাম।"

সন্ধ্যার সময় ঘনঘটা করিয়া বৃষ্টি আসিল। বর্ষণের প্রথম ধাক্কা সামলাইয়া ঝুপঝুপ শব্দে বড় মধুর বৃষ্টি হইতে লাগিল। আমার কক্ষ-সঙ্গী আর তিনজন বাড়ীতে;—কাযেই, একা আমার সুবিধা। এক পেয়ালা গরম চা পানান্তে, ঠাকুর-চাকরকে আমায় ডাকিতে বারণ করিয়া, দ্বার বন্ধ করিয়া অন্ধকার ঘরে শুইয়া পড়িলাম। প্রত্যেক শব্দে চরণ-মঞ্জীরের মধুর ধ্বনি, কঙ্কনের মিঠা আওয়াজ বলিয়া আমার ভুল হইতেছিল। প্রতিক্ষণেই মনে হইতেছিল, তিনটি তরুণী এ উহাকে জড়াইয়া, ব্রীড়া-সঙ্কুচিত, ভয়ত্রস্ত-চরণে আমার বদ্ধদ্বারে আসিয়া ফিরিয়া-ফিরিয়া যাইতেছে। ওগো, দুয়ার কি খুলিয়া দিব?

মুহূর্ত্ত পরেই যাদুঘরের সেই কোণটি আমার চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সেই তিনটি যুবতী—এখন কিন্তু প্রস্তরের নহে—অপূর্ব্ব রূপ-বিভায় স্থানটি উজ্জ্বল করিয়া বসিল। তরুণীদের দেহের অরুণিমা মধুর ঝঙ্কার তুলিতেছিল; পেলব তনুর উপর লাবণ্যের মুহূর্ত্তে-মুহূর্ত্তে নব-নব বিকাশ আমায় মুগ্ধ করিতেছিল। তাহাদের নীলাজ-নয়নে মলয়সমীরান্দোলিত কমলের সলীলতা হাসিতেছিল। চমক ভাঙ্গিলে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমরা কে? কি চাও? কেন তোমরা আমায়—।" ঈষদ্‌ভিন্ন পুষ্প সমীরণের স্পর্শে প্রথমে যেমন করিয়া গন্ধটুকু নিঃশেষ করিয়া দেয়, যেন নিখিল মাধুরী শেষ করিয়া তাহারা তেমনি করিয়া হাসিল। তেমনি স্থিরে, ধীরে, অশ্রু মিশাইয়া। বহুক্ষণ পরে আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমরা কি চাও? কে তোমরা?" "কে আমরা জান্‌তে চাও?" তাহাদের মধ্যে একজন দৈহিক শোভার উপযুক্ত স্বর ও ভঙ্গীতে জিজ্ঞাসা করিল। আমি কহিলাম "হাঁ চাই; বল দেখি শুনি।"

আমার এই অনুরোধ এক নূতন সৌন্দর্য্য প্রকটিত করাইল,—প্রত্যেকে প্রত্যেককে অনুরোধ করিতে লাগিল, 'তুমি বল।' ওই মধুর দৃশ্য কিছুক্ষণ অভিনয় করিয়া একজন কহিল "আমাদের আর একজন এখানে নাই,—কে তাহার অংশটুকু বলিবে? যদিও আমরা সকলে এক সমগ্র জীবনেরই ইতিহাস, তবুও আমরা সব জানিনে; নিজের-নিজের অংশটুকুই জানি। আমরা এক পূর্ণের এক-এক অংশ। তার চেয়েও তোমায় দিব্য চক্ষু দিলাম; তোমার চক্ষুর সম্মুখে আমাদের ইতিহাস অভিনীত হইবে; তুমি দেখিতে পাইবে।" আমি বলিলাম "সঞ্জয়ের মত। তথাস্তু।" দেখিলাম—

নগরের পথে প্রচারিত হইতেছে, বিপুল ধনের ও সেই নগরের অধিপতি বিখ্যাত শ্রেষ্ঠী চন্দনদাসের একমাত্র তরুণী কন্যা সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা মঞ্জরিকা, কল্য লক্ষ্মী-পূর্ণিমার গোধূলি-লগ্নে সিপ্রানদীতে অবগাহন করিবেন,—নদীতীরবর্ত্তী পুষ্প-

কাননে সখীগণ-পরিবৃতা হইয়া ক্রীড়া করিবেন; অপরাহ্নের পর আর যেন কেহ সেখানে না যায়। এই আদেশ অন্যথা করিলে ভীষণ শাস্তি।

নগরের উপকণ্ঠে, নির্জ্জন পল্লীতে, নদীতটবর্ত্তী ছোট একখানি কুটীরবাসী নবীন ভাস্কর প্রদ্যুম্ন সেই কথা শুনিল। বাসনা হইল, লুকাইয়া সে এই রূপ-সুধা পান করিবে।

অনেক দিন হইতেই সে তাহার হৃদয়ে এক নারীকে সৃজন করিয়া রাখিয়াছিল; কত ভাবে তাহারই রূপ প্রস্তরের উপর ফুটাইয়া তুলিতে সম্যক কৃতকার্য্য হইতেছিল না। আজ সেই কল্পনাময়ীকে প্রখ্যাতনামা এই বাস্তব সৌন্দর্য্যের সহিত মিলাইবে, যদি কোন নবীন উদ্দীপনা পায়। সেই কল্পনাময়ীর প্রেমে সে এত মুগ্ধ ছিল যে, কোন রক্তমাংস-দেহ-ধারিণীর পানে সে চাহিয়াও দেখিত না। শত-শত অভিসারিণী তাহার কাছে প্রত্যাখ্যাতা হইয়াছিল। তাই সে পাগল বলিয়াই নগরে বিদিত ছিল। আজ হঠাৎ এই পাগল দুর্দ্দমনীয় বাসনায় অন্ধ হইয়া ঐ রূপসীকে দেখিতে চলিল, কাজটা গর্হিত কি অগর্হিত হইবে তাহা বিবেচনা করিল না।

সিপ্রাকূলে বৃহৎ উপবনদ্বারে শ্রেষ্ঠী-কন্যা তাঁহারই উপযুক্তা রূপবতী, চঞ্চলা, তরুণী সখীগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া শিবিকা হইতে অবতরণ করিলেন। উপবন রূপে উছলিয়া উঠিল। চঞ্চলা ললনাদের হাস্য-পরিহাসে কানন প্রতিধ্বনিত হইল। বেল, মল্লিকা, যুথিকা হাসিয়া-হাসিয়া অভ্যর্থনা করিল। শেফালিকা আনন্দে লাজ বর্ষণ করিল; সরোবরে কুমুদ, কহ্লার দুলিয়া উঠিল, কমলগ্রীব আন্দোলিয়া নাচিতে লাগিল। ক্রীড়াসক্তা যুবতীদের ভয়ে পক্ষীকুল কূজনে কানন প্রতিধ্বনিত করিয়া উড়িয়া-উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল।

বহুক্ষণ পরে পূর্ণিমার শশী ধীরে-ধীরে গগনে দেখা দিল। কিছুক্ষণ পরেই আকাশ, ধরণী, নদী সকলের উপর জ্যোৎস্না স্বীয় পবিত্র তনুখানির নগ্ন কান্তি ফুটাইয়া এলাইয়া লুটাইয়া পড়িল। সেই শোভায় জগৎ মুগ্ধ।

মঞ্জরিকা কহিল, "চল সখী, জলক্রীড়া করিগে।" অভিমানে মঞ্জরিকার বক্ষ হইতে কাঁচলী খসিয়া পড়িল, ওড়না কাঁদিতে-কাঁদিতে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল, নিচোল বুঝি জ্ঞান হারাইল। নূপুর, মেখলা, মৌক্তিক-হার, কেয়ূর, কঙ্কন চিরকাম্য ত্রিদিবচ্যুত হইয়া একস্থানে জড়াজড়ি হইয়া বুঝি অশ্রুজলে ভাসিতে লাগিল। শ্বেতবস্ত্র কটিতে জড়াইয়া মঞ্জরিকা সিপ্রায় নামিল। সিপ্রা আনন্দভরে তাহার দেহখানি দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিল। লাফাইতে-লাফাইতে নিটোল অংস ডিঙাইয়া দুই বাহুর নীচে দিয়া পীবর বক্ষে আছড়াইয়া পড়িল, উঁচু হইয়া অধর-সুধা পান করিতে চাহিল। বার-বার পরাজিত হইয়া চলিয়া গেল, তবুও হাসির শেষ নাই; তখনো বুঝি আশা কর্ণে কহিতেছিল, 'বাসনা চরিতার্থ হইবে।'

বহুক্ষণ জলক্রীড়া হইল। একে-একে সকল রূপসী চলিয়া গেল; জলে রহিল কেবল মঞ্জরিকা ও তাঁহার প্রধানা সখী মদনিকা। আর-আর সখীরা অবগাহনান্তে সঙ্গীতালাপ করিতে লাগিল। সেই স্বর-লহরীতে, বীণার মধুর ঝঙ্কারে সব স্তব্ধ হইল। মদনিকা কহিল, "চল সখি, উঠি।" "না সখী, দেখ ত, কি সুন্দর জ্যোৎস্না,—সিপ্রারই বা কি শোভা! সে তার—যে উপমা আজ পর্য্যন্ত কোন কবি দেন নাই সেই উপমায়—ষোড়শী-দন্ত-ধবল বারিরাশি লইয়া ছুটিয়াছে। দূরে নীলিমায় আর পর্ব্বতের কৃষ্ণতায় কি সুন্দর মিলন! মোহন এই উপবন, যুবতীর কণ্ঠনিঃসৃত মধুর ওই গীত, আর এখানে—জলে দুই সুন্দরী-শ্রেষ্ঠার—তুমি অষ্টাদশীর, আমি ষোড়শীর নগ্ন সৌন্দর্য্য! শুধু আনন্দ; দুঃখ এই, সৌন্দর্য্যভিখারী কোন পুরুষের কবিত্বমাখা পরুষ নয়ন নাই!" "ওগো সখি, তা নয় গো, তা নয়। সবই তোমার ঠিক হল বটে, কিন্তু দুই সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা এই কথাটি—" "কেন?" "জান না কি ভাই? কতবার বলেছি যে!" "ও,—সেই তোমার প্রিয়তম, নবীন ভাস্কর প্রদ্যুম্ন—তারই কথায়! আচ্ছা, তার বাড়ী না বলেছিলে এই সিপ্রারই কূলে?" "হাঁ, আর একটু উজানে।" "আমার কিন্তু ভাই সেই পাগলকে দেখতে ভারি ইচ্ছে করে; দেখতে চাই যে, সে কেমন পাগল। বল না ভাই, এখানে দাঁড়িয়ে, তোমার সেই কাহিনীটা।" "সেই আবার? তা শোন।"

"আর বছর এমনি একদিন ফুল্ল জ্যোৎস্নায় তার সেই কুটীরে গিয়েছিলাম। সেই গভীর নির্জ্জন নিশীথে কেউ কোথাও ছিল না। শুধু অভিসারিণী আমি, আর আমার সম্মুখে সে। তাহার কটি দুই বাহুতে বেড়িয়া বলিলাম, 'ওগো প্রিয়তম, ওগো ঈপ্সিত, আমার রূপ-যৌবন সার্থক কর; —ওগো একবার, শুধু একবার।' সে বলিল, 'না গো না,

ওগো রূপসী, তুমি ফিরে যাও—আর কাউকে জীবন উৎসর্গ করগে। তুমি আমার ক্ষুধা মেটাতে পার্ব্বে না, শান্তি দিতে পার্ব্বে না। তোমার রূপে শুধু লালসা আছে,—আর কিছুই নেই। আমি ও ত চাহি না।' আমি বলিলাম, 'আর একবার চেয়ে দেখ,—ওগো, শুধু আর একবার।' আমার দু' হাত তার মুষ্টির ভিতর নিয়ে, সে ক্ষণিক সুদূর আকাশের দিকে চেয়ে রহিল; তার পর ধীরে-ধীরে নামিয়ে, এক হাত ললাটে দিয়ে, আর এক হাত চিবুকে দিয়ে, মুখ তুলিয়া ধরিল, নয়নে নয়ন মিলাইয়া চাহিয়া রহিল। তার উষ্ণ নিঃশ্বাস আমার মুখে পড়িল। রহিতে পারিলাম না, অকস্মাৎ তার কণ্ঠ বেড়িয়া ধরিলাম। সে এই মোর দুই বক্ষে হাত দিয়া আমায় বাধা দিল। কহিল, 'ওগো সুন্দরী—' আমি কহিলাম, 'না গো না, আমি শুনিব না। শুধু ক্ষণিকের জন্য আমায় বক্ষে চাপিয়া ধর, আমায়—, ভৃঙ্গবৃত্তিতেও আমি স্বীকৃত।' সে কহিল 'কেন তুমি রূপ-যৌবনকে লজ্জা দেওয়াইবে। আমি অমন করিয়া নিখিল ধরার রূপ-যৌবনকে অপমান করিতে পারিব না। প্রেমের উপাসক হইয়া তাহারই মাথা নত করাইব? তুমি চলিয়া যাও।'"

মঞ্জরিকা কহিল, "সখি মদনিকা, সে কি বড়ই রূপবান পুরুষ?" "তবে কি অসুন্দরের জন্য স্বয়ং সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা,—সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা মঞ্জরিকার প্রিয়তমা সখী স্বীয় রূপ-যৌবন বিকাইতে গিয়াছিল?" "ওঠ সখি, আর নয়; চল যাই।"

ধীরে-ধীরে দুই সখী হাত ধরা-ধরি করিয়া উঠিতে লাগিল। বুঝি এমনি করিয়া মথিত, দুর্দ্দমনীয় সমুদ্র শান্ত করিয়া উর্ব্বশী জলধিতল হইতে উঠিয়াছিলেন। সোপানের উপর বিবসনা দুই যুবতী দাঁড়াইল। আলুলায়িত কুন্তল হইতে জলধারা ঝরিয়া পড়িতেছিল। শ্রী অঙ্গ হইতে জলধারা ক্ষরিতে লাগিল। জ্যোৎস্না চুনট লাগাইল। সার্থক তাহার সাধনা, সার্থক তাহার জন্ম। সমস্ত ধরণী স্তব্ধ হইল, সকল অসুন্দর ভয়ে পলাইল। কটিচ্যুত বসন দুই সখী স্বীয় অঙ্গে জড়াইতে লাগিল।

অকস্মাৎ মঞ্জরিকা জলে লাফাইয়া পড়িল। সভয়ে মদনিকা বলিল, "সখি, কি?" সম্মুখের তীরস্থিতবকুল-বৃক্ষটি সে নীরবে দেখাইল? পরিহিতবাসা মদনিকা অগ্রসর হইয়া চাহিল। ফিরিয়া কহিল, "সখি, আর কেহ নয়;—শুধু তোমার কামনা সিদ্ধ করিতে নবীন ভাস্কর প্রদ্যুম্ন আসিয়াছে।" প্রদ্যুম্ন নামিয়া আসিল। জলতটে দাঁড়াইয়া, মদনিকার সম্মুখে মঞ্জরিকাকে কহিল "ওগো রূপসী, ওগো মোর মানসরাণী, প্রেমের জন্য সব সহিতে পারি; আজ শুধু তোমার কাছে নিবেদন করি, আমার সাধনা সার্থক কর, আমার জন্ম সফল কর, ওগো মঞ্জরিকা ওগো মঞ্জরী, ওগো মঞ্জু, ওগো মনু।"

মদনিকার মধ্যস্থতায় বিরূপা সন্তুষ্টা হইল। মঞ্জরিকা কহিল, "এখন হইতে চারি বৎসরের ভিতর এমনি প্রতি লক্ষ্মী-পূর্ণিমার দিনে একটী-একটী সাধনার নিদর্শন দিতে হইবে,—যদি তাহাতে তাহার হৃদয় জয় করিতে পারে;—অন্য উপায় নাই; অন্যথায় রাজদণ্ড।" প্রদ্যুম্ন স্বীকৃত হইয়া চলিয়া গেল। চতুর্থ ব্যক্তি আর কেহ জানিল না। মদনিকাকেও আর কেহ দেখিতে পাইল না। নিরানন্দে সকলে গৃহে ফিরিল! * * * *

এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। আবার সেই লক্ষ্মী-পূর্ণিমা আসিয়াছে। প্রত্যূষেই নগরাধিপতি চন্দনদাসের সভাগৃহ পূর্ণ। প্রতিহারী সভায় প্রদ্যুম্নের আগমন-বার্ত্তা জানাইল। অংসস্পর্শী দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশ বায়ুভরে চোখে-মুখে আসিয়া পড়িতেছে, চন্দন-চর্চ্চিত দেহ হইতে একটি স্নিগ্ধ গন্ধ বাহির হইতেছে,—শ্বেত উত্তরীয় বাতাসে উড়িতেছে; এক হস্তে বীণা, অপর হস্তে বস্ত্রাবৃত কি একটী জিনিস—ভাস্কর সভাগৃহে প্রবেশ করিল।

উদগ্রীব শ্রেষ্ঠী কহিলেন, "প্রদ্যুম্ন, আমার নিকট তোমার কি প্রয়োজন?" নিরুত্তরে বস্ত্রাবৃত জিনিসটি শ্রেষ্ঠীর পদতলে রাখিয়া প্রদ্যুম্ন বীণার তন্ত্রীতে আঘাত করিল। অঙ্গুলী-স্পর্শে ঝঙ্কারের পর ঝঙ্কার, মূর্চ্ছনার পর মূর্চ্ছনা, মীড়ের পর মীড় বীণার প্রতি পর্দ্দা হইতে রণিয়া উঠিল—বড় করুণ, বড় স্নিগ্ধ, বড় হৃদয়স্পর্শী সেই সুর। সমস্ত নীরব। হঠাৎ বাদকের স্বর কাঁপিতে-কাঁপিতে পঞ্চমে স্থির হইল। সে গাহিল "ওগো দেবী, তোমারই তুষ্টি-সাধনার্থে আমার এ আয়োজন। সেই কি শুভ শরতের গোধূলি, যেদিন তোমার নয়নের, তোমার রূপের মোহিনী প্রভাবে এ দীনের জীবনধারা উল্টাইয়া গেল? সেই দিনটি আবার এসেছে—নূতন কিছু পাব না কি? পূজারীর এ নৈবেদ্য কি তোমার মনোমত হইবে না?" "সাধু, সাধু,"—উল্লাসে সভা ধ্বনিত

হইল। বীণা রাখিয়া প্রদ্যুম্ন অপর জিনিসটির আবরণ মুক্ত করিল,—খোদিত স্ত্রী-মূর্ত্তি!

চন্দনদাস কহিলেন, "ভাস্কর, এ কি পুষ্প-শয্যায় নবোঢ়ার প্রবেশ? তাই লাজনম্রা, অপাঙ্গ-দৃষ্টি-ক্ষেপণা, হর্ষমধুরা?" "হাঁ দেব, বিষয় ঐ বটে; কিন্তু এখানে প্রত্যাখ্যানের পূর্ব্বে দুষ্মন্তের সম্মুখে শকুন্তলার প্রবেশ খোদিত হইয়াছে। আননের ঐ ভাবটি কি মিলনানন্দে লজ্জিত, বামেতর অঙ্গ নাচায় শঙ্কিত ভাব প্রকাশ করে না?" দ্বিতীয়বার সভা জয়োল্লাসে প্রতিধ্বনিত হইল। বহুমূল্য হীরক-হার শির হইতে খুলিয়া চন্দনদাস কহিলেন, "কবি, ভাস্কর, প্রদ্যুম্ন, আর কি চাও তুমি?" আশায়, উৎকণ্ঠায় সে অন্তঃপুর-চারিণীদের পর্দ্দার দিকে চাহিল। নিরাশায় বীণার তন্ত্রীতে পুনরায় আঘাত করিল। হাত কাঁপিয়া গেল, রাগিণী উঠিল না। ত্রস্তে প্রদ্যুম্ন সভার বাহিরে চলিয়া গেল। বিস্মিত শ্রেষ্ঠীর সম্মুখে কঞ্চুকী নিবেদন করিল, "দেব, কুমারী মঞ্জরিকা পুত্তলিকাটি চাহিয়াছেন।"

এইবার যুবতীত্রয়ের ভিতর প্রথমা কহিল, এই--"এই সঙ্গীটিই আমাদের দলচ্যুতা। এখন আমাদের মুখ হইতে শুনিতে পার।" আমি কহিলাম "না, এইরূপেই আমি দেখিতে চাই।" "আচ্ছা।"

দ্বিতীয় বৎসর তেমনি পূর্ব্বাহ্নের সভায় সেইদিন প্রদ্যুম্ন প্রবেশ করিল। চন্দনদাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "উন্মাদ! এটি কি প্রণয়লিপি-লিখনরতা নায়িকার মূর্ত্তি খোদিয়াছ?" "হাঁ দেব, দুষ্মন্তের প্রথম লিপির উত্তরে, শকুন্তলা সেই লিপির উল্টাদিকে, লেখনী ও কালি অভাবে লাক্ষারসে গাছের কাঁটা দিয়া লিখিয়াছেন। পূর্ব্ব-প্রণয় স্মরণে আনন হাস্যোজ্জ্বল, কে কোথায় দেখিতে পাইবে তাই সরম-কুঞ্চিত—এই ভাবটি কি ফুটিয়া উঠে নাই?" এটিও সাধারণের প্রশংসালাভ করিল; কিন্তু তাহার মানসরাণীর হৃদয় জয় করিতে পারিল কৈ? প্রদ্যুম্ন বীণা তুলিয়া গান ধরিল; কহিল "দেবী, এত—" কথা ফুটিল না, বিস্মিত সকলের সম্মুখ দিয়া সে ধীরে-ধীরে চলিয়া গেল।

নির্জ্জনে মঞ্জরিকা নিজের কক্ষে পুতুলটি বক্ষের উপর চাপিয়া ধরিল—অজস্র চুম্বন বর্ষিল। কহিল, "ওগো দেবতা, দেখে যাও, অপমানিত তুমি নও; অনাবৃত বুকে টানিয়া তোমারই স্পর্শকে চুম্বন করিতেছি। ওগো দেব, যে প্রেম বিশ্ব-বিজয়িনী, তা' ত ফুটাইতে পার নাই; দুটিতেই লালসার ক্রমবিকাশ দেখাইয়াছ; তাই ইহারা আমাকে সংবিত-হারা করাইতে পারিল না। এখনো যে আমার ভয় হয়, আরো এক বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে,—তুমি যে অধঃপতনের পথে চলেছ।"

তৃতীয় বৎসর পড়িয়াছে। লক্ষ্মী-পূর্ণিমার আর পনের দিন বাকী। গভীর নিশীথে অর্দ্ধ-সমাপ্ত পুতুলটি সম্মুখে করিয়া ভাস্কর জ্যোৎস্নাবিধৌত সিপ্রার দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল। হঠাৎ চাহিয়া দেখিল, তাহার সম্মুখে এক পরমাসুন্দরী যুবতী সন্ন্যাসিনী তাহার দিকে নিষ্পলক নেত্রে চাহিয়া বসিয়া রহিয়াছে। ত্রস্তে প্রদ্যুম্ন উঠিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি? কি চাও?" "চাই যা তা তোমার অদেয়। আমি যা কহি, তা শোন। নগরের কোন খবর রাখ কি?" "না।" "নরপতির বিরাগভাজন হওয়ায় চন্দনদাস নিহত। কন্যা মঞ্জরিকা নৃপতির অন্তঃপুরে বন্দিনী। এই পূর্ণিমায় তোমায় রাজধানী উজ্জয়িনীতে যাইতে হইবে।" বিহ্বল প্রদ্যুম্নের সম্মুখ হইতে সন্ন্যাসিনী সরিয়া গেল।

উজ্জয়িনীর রাজসভায় অপরিচিত কেহ প্রবেশ করিল। সম্রাট জিজ্ঞাসা করিলেন "কে এ?" মন্ত্রী কহিল "দেব, ইনি ইন্দ্রাণী নগরীর প্রথিতনামা উদীয়মান ভাস্কর প্রদ্যুম্ন।" ভাস্কর বীণায় ঝঙ্কার তুলিল। মনোহর মর্ম্মস্পর্শী রাগিণী কাঁদিতে-কাঁদিতে বাতাসে মিলাইল; পঞ্চমে গাহিয়া উঠিল, "ওগো দেবী, আজ নূতন স্থানে নবীন ভাবে তোমায় উপাসনা করিতে হইবে। এতকাল এ অধম কত লোকের প্রশংসা কুড়াইল; কিন্তু মনোরথ পুরিল কৈ? ঈপ্সিত মিলিল কৈ? ওগো দেবী, আর কতদূরে নিয়ে যাবে? কতদিনে আশা পুরিবে? পূজারীর সাধনা কবে সফল হবে?" সমস্ত সভা মন্ত্রমুগ্ধবৎ নিস্তব্ধ।

নরপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওগো কবি, এই পুতুল কোন্ হাবভাব-কুশলা চটুল স্নানার্থিনী যুবতীর? তোমার প্রেয়সীর কি?" "না দেব, এ অচ্ছোদ-সরোবরে স্নানার্থিনী মহাশ্বেতা।" বীণাবাদিনী মহাশ্বেতা গীত সমাপনান্তে অবগাহন করিয়া জল হইতে উঠিতেছেন। দেহের অপূর্ব্ব মাধুরী যেন বর্ষাস্নাত, মেঘান্তরালে অস্ত-রবিকিরণোজ্জ্বল শ্যামলা মৃণ্ময়ীর অরুণিমা। বিবসনা মোহিনীর অনন্ত নীলিমা

বিশেষরূপে প্রকটিত। দুই হস্তে নীবিচ্যুত শ্লথবসন অঙ্গে জড়াইবার প্রয়াস। আনন হইতে তখনো সমাপ্ত-গীতের লাবণ্যরেখা লুপ্ত হয় নাই,—সেই শ্রীতে প্রোজ্জ্বল। দূরে পুণ্ডরীক দর্শনে আনন যেন ধীরে-ধীরে শ্রী-মণ্ডিত হইতেছে। অনুপম শোভা ক্রমে-ক্রমে পলাইতেছে। ভ্রূ-কুঞ্চিত, অধর দংশিত।

সভাগৃহ মুহুর্মুহু জয়োল্লাসে কম্পিত হইল। প্রদ্যুম্নের চরণতলে রাশিকৃত উপঢৌকন উপহৃত হইল। সভাসদের যাহার যাহা ছিল, স্তূপাকার হইয়া সভাতল পূর্ণ করিল। উদ্গ্রীব হইয়া ভাস্কর অন্দরের দিকে চাহিয়া রহিল। কৈ, মঞ্জু-মঞ্জীরের শিঞ্জন ত তাহার প্রাণে নবীনের আবাহন গাহিল না? কৈ 'স্তনভারাদ্-অলস গমনা'র কোমল চরণের নূপুর-ধ্বনি তাহার সম্মুখে নীরব হইল না? উদভ্রান্ত প্রদ্যুম্ন পুনরায় বীণা তুলিয়া লইল। গাহিল, "জানি আমি, জানি প্রিয়া, তোমার সঙ্গে ত আমার মিলন হবে না। তবে কেন অমন করে আশা দিয়েছিলে। শেষ চেষ্টা ছাড়িব না। চিরজীবন কি কাঁদিয়াই কাটাইতে হইবে? চিরকাল—" আর কথা ফুটিল না; সে ছুটিয়া চলিয়া গেল। প্রতিহারী নিবেদন করিল,"দেব, ইন্দ্রাণী নগরীর শ্রেষ্ঠী-নন্দিনী পুত্তলিকাটি চাহিলেন।" নিজের কক্ষে লইয়া গিয়া মঞ্জরিকা পুতুলটিকে সূক্ষ্ম বস্ত্রাবৃত করিয়া কনকহার পরাইয়া দিল।

চতুর্থ বৎসরে প্রদ্যুম্নের জীবনের সেই শুভ পুণ্যাহ আবার আসিয়াছে। হৃদয়ে অনন্ত আশা লইয়া শঙ্কিত পদে সভাতলে ভাস্কর প্রবেশ করিল। তখনো নকীব ফুকরাইয়া পরম ভট্টারকের আগমন-বার্ত্তা জানায় নাই—সভাসদে কক্ষ তখনো সম্পূর্ণ ভরে নাই।

নরপতি কহিলেন, "ভাস্কর, এত প্রত্যূষেই যে!" নিঃশব্দে প্রদ্যুম্ন বীণা তুলিয়া লইল। অঙ্গুলীর স্পর্শে বীণা কাঁদিয়া উঠিল। দুঃখমাখা নানা মধুর রাগিণী লহরে-লহরে গৃহ পূর্ণ করিল। সে গাহিল "আজ শেষ। ওগো দেবী, আজ হয় ত শেষবার আমার বীণা তোমার আবাহন গাহিছে। ওগো প্রিয়া, নবীন ভাবের উদ্বোধন আজও কি সুদূর-পরাহত? ওগো মোর মানসরাণী, তৃষিত চিত্ত কি শান্ত করাবে না? যে সৌন্দর্য্যের একাংশ লইয়া কুহেলিকাময়ী শীতের নিশীথিনী এত গম্ভীর শরতের লক্ষ্মী পূর্ণিমায় পবিত্রা কিশোরীরূপে যে সৌন্দর্য্যের একাংশ প্রকটিত করে, যে সৌন্দর্য্যের একাংশ লইয়া বসন্তের যুবতী দোল-পূর্ণিমা এত মধুময়ী, যে সৌন্দর্য্যের একাংশে বিরহিণী বর্ষারাণী কল্পনাময়ী যে সৌন্দর্য্যের এক-এক অংশ মাতার আননে, যুবতীর ফুল্ল বদনে বিকশিত হয়, তা সবই একাধারে মুহূর্ত্তের জন্ম তোমাতে দেখেছিলাম, ওগো আমার সৌন্দর্য্যাধার! কিন্তু আর দুঃখ নেই, ওগো প্রিয়া, সেই চকিত দামিনী-স্ফুরণের প্রেরণায়ই আমি জীবনের পথে অগ্রসর হইব। তথাচ যাতনা এই যে, হাস্য বিকশিত আনন দেখি নাই; মুহূর্ত্ত, ওগো প্রিয়া, নিমিষমাত্র—মিলন যদি দুরাশাই হয়—শুধু দেখিয়া চলিয়া যাইব। ওগো, সফলকাম কি হইব না?"

গায়ক নীরব হইল। সভাসদেরা স্থাণুবৎ নিশ্চল। মুগ্ধ নৃপতির সম্মুখে আবরণ মুক্ত হইয়া মাতৃমূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। সচকিতে সম্রাট কহিলেন, "কবি ভাস্কর, তোমার দুই পুতুলের মুখাবয়ব একই ধরণের। আদর্শ তোমার,—সে কোন্ সৌভাগ্যবতী? তোমার প্রিয়া কি?"

আনন্দময়ী নবযুবতী শান্তিসুধাধার, ঈষৎ হেলিয়া পুত্রকে আদর করিতেছে—ভাস্কর তাই খোদিয়াছে। তরুণীর আনন অর্দ্ধপ্রস্ফুট গোলাপ-কোরকবৎ। পুত্র-গরবিণী সে যেন এই পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে; মুখে সংসারের সুখ-দুঃখের রেখা নাই; ভূমানন্দে পূর্ণ, চির-শান্তিময়। পুত্রস্নেহে তন্ময়চিত্তা। মহাপ্রলয় হইলেও বুঝি জ্ঞান হইবে না; সমাধিমগ্না;—সেই সমাধি, যে সমাধিতে নিমজ্জিত হইয়া বিরহবিধুরা, দুষ্মন্ত চিন্তাগতাপ্রাণা শকুন্তলা দুর্ব্বাসার "অহময়ং ভোঃ" আহ্বান শুনিতে পান নাই। প্রীতিময়ী সেই বদনে মাতৃত্বের গর্ব্ব, স্নেহ, দৌর্ব্বল্য, উচ্চতা নীচতা—যা কিছু সবই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান। যে দেখে তার আনন্দ, যে বোঝে তার শান্তি। সমস্ত সভা নীরব নিস্তব্ধ। সকলে যেন যোগ-নিমগ্ন।

আচম্বিতে সেই নীরবতাকে সজাগ করিয়া নূপুর-শিঞ্জন ধ্বনিয়া উঠিল। অলঙ্কারের শিঞ্জিতে কক্ষ পূর্ণ হইল। বিস্ময়ে সকলে চাহিয়া দেখিল, অপূর্ব্ব এক মনোমোহিনী যুবতী ছুটিয়া আসিয়া মুহ্য দণ্ডায়মান প্রদ্যুম্নের আলিঙ্গনে ধরা দিল। ভাস্কর কহিল "এলে, এলে প্রিয়া, মঞ্জরিকা, মঞ্জরী, মঞ্জু, মনু। এতদিন পরে কি তোমার সময় হল।" বলিয়া দুই বাহু মঞ্জরিকার বাহুমূলের নীচে দিয়া ক্ষণিক সেই সুন্দর আনন তুলিয়া ধরিল। মুহূর্ত্তের জন্ম চারি চক্ষুর

মিলন হইল। তার পর চিরপ্রার্থিত সেই বেপথুমতীর দেহখানি বক্ষের উপর দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিল।

নরপতি কহিলেন, "কে এ রমণী?" কঞ্চুকী কহিল, "ইন্দ্রাণী নগরীর শ্রেষ্ঠী চন্দনদাসের কন্যা মঞ্জরিকা। সময় চাওয়ায় আগামী মাঘীপূর্ণিমায় যাঁহার সহিত বিবাহ হইবার কথা ছিল।" ক্রুদ্ধ নরপতি কহিলেন, "কি! প্রহরী, বন্দী কর। তার পর দুজনার উচিত শাস্তি বিবেচনা করা যাইবে।" এমন সময় এক সন্ন্যাসিনী ত্রিশূল হস্তে দাঁড়াইল; কহিল "সাবধান! কেহ এদের স্পর্শ করিও না।" ****

প্রথমা যুবতী কহিল "শুনিলে ত?" আমি কহিলাম, "হাঁ! কিন্তু যাও কোথায়? শোন।" "না—না, আর রহিতে পারিব না।" "শোন, শোন।" দ্বারে ধাক্কার শব্দে ঘুম ভাঙিল। মেসের এক অধিবাসী বাহির হইতে বলিল, "কি মশয়, ডাহেন কেন? আমি ভাব্‌ছিলাম আপনি এহোনো ঘুমাচ্ছেন।"

"রুদ্র"

[শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ]

এই ধরণীর শ্মশান-ভূমে রুদ্র এস আজ,
ভস্ম করে নবীন জীবন দাও হে সুররাজ!
তাণ্ডব ঐ নৃত্যে তব প্রলয় আসুক ভবে,
ঘুম হতে আজ উঠুক জেগে বিশ্ববাসী সবে;
দাহন করে স্বর্ণসম শুদ্ধ কর চিত্ত,
ব্যথার আঘাত সইতে প্রভু শক্তি দিও নিত্য;
দুঃখ-শোকের আঁধার ঘরে দীপ্তি কর দান,
নবীন করে জীবন আবার দাও হে ভগবান!

কলঙ্কিত সমাজ-বুকে বজ্র তোমার হানো,—
নির্ম্মলতায় সুরধুনী বিশ্বে পুনঃ আনো;
লক্ষ যুগের কলঙ্ক-ভার সঞ্চিত এর ভালে,
খড়্গা শুধু চল্‌ছে দুখীর রক্ত-শোষণ কালে;
আজ বিষধর ঢাল্‌ছে কেবল তপ্ত হলাহল,
সে বিষ-ধারায় নীল হল হায় বিশ্ব-হৃদিতল।
এই সমাজের বক্ষে প্রভু বজ্র কর দান
ভস্ম হ'তে নবীন জীবন দাও হে ভগবান!

শক্তি-পূজার নাই পুরোহিত—শূন্য পূজাসন,
স্পন্দনহীন শবের মতন সুপ্ত ত্রিভুবন।
চার দিকেতে দিন-মজুরের দীর্ণ হাহাকার,
চায় না তবু চোখ তুলে কেউ—কান্না শুধু সার।
পুণ্য হল নির্ব্বাসিত—পাপ সে লভে জয়,
ধর্ম্মহারা হয়ে ধরার বীর্য্য হল ক্ষয়।
শক্তিরূপে সর্ব্ব পাপের কর অবসান,
এ দুর্দ্দিনে দুঃখীজনে রক্ষ ভগবান!

চিত্তবিহীন ধনীর তনয় অহঙ্কারে হারা,
শান্তি-সদন বিশ্ব মাঝে আন্‌ছে পাপধারা;
সে বিষ-ধারায় কর্‌ছে যে হায় জীবন বিসর্জ্জন,
সাঁঝের আগেই কমল-কলির মুদ্‌ছে দুনয়ন।
মোহের ঘোরে সোণার স্বপন বুন্‌ছে অবিরত,—
আন্‌ছে জরা দুঃখভরা—মৃত্যু-দূতের মত।
ছিন্ন কর রঙ্গীন স্বপন—সংহর সব মান,
নবীন করে জীবন আবার দাওহে ভগবান!

ভস্ম করে' আবার মোদের নূতন করে গড়ো,
অহঙ্কারের মিথ্যা বোঝা কণ্ঠ হতে হরো;
স্বার্থ-ত্যাগের যজ্ঞে মোদের সমিধ্‌ কর প্রভু,
ত্যাগের মাঝেও অশেষ আছে না যাই ভুলে কভু;
জ্ঞানের প্রদীপ দাও জ্বালিয়ে চিত্ত-তপোবনে,
তৈরি কর প্রেম নদীয়া আবার ত্রিভুবনে;
চূর্ণ কর শঙ্কা-সরম, মিথ্যা অভিমান,
মানুষ করে দাও হে মোদের দয়াল ভগবান!

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন

[অধ্যাপক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি-এ, প্রত্নতত্ত্ববাগীশ]

খুব ধূমধামে হাওড়ার অক্লান্তকর্ম্মা সাহিত্য-সেবকগণের পরিচালনে দ্বাদশ সাহিত্য-সম্মিলন সমাধা হইল। মণ্ডপ-নির্ম্মাণে; সন্দেশ-রসগোল্লায় অনেক অর্থব্যয় হইল। দুঃস্থ সাহিত্য-সেবীর জন্য ভাণ্ডার স্থাপিতও হইল। আমরা এই অবসরে সম্মিলনের একটী খুব ছোটখাটো বিবরণ ও সঙ্গে-সঙ্গে যতদূর সম্ভব, এ যাবৎ যাঁহারা সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি রূপে এবং যাঁহারা সভাপতিরূপে সম্মিলনকে পরিচালনা করিয়াছেন, তাঁহাদের চিত্রও পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম।

প্রায় ষোল বৎসরেরও অধিক কাল অতীত হইল। ১৩০৯ সালে মুরশিদাবাদ হইতে তৎকালে প্রকাশিত 'সুধা' পত্রিকার পরিচালক, বর্ত্তমানে সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার মহাশয় ৺ধর্ম্মানন্দ মহাভারতীর সাহায্যে সম্মিলনের সূচনার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সে প্রয়াস কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ১৩১০ সালে ময়মনসিংহে যখন প্রাদেশিক রাজনৈতিক সমিতির অধিবেশন হয়, তখন সঙ্গে-সঙ্গে সাহিত্য-সম্মিলনেরও ব্যবস্থা হয়, কিন্তু নানা-কারণে সে ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হয়। তাহার পর দুই বৎসর সাহিত্য সম্মিলন সম্বন্ধে আর কোন কথা হয় নাই। তার পর, ১৩১২ সালের চৈত্র মাসে যখন বরিশালে প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মিলনের আয়োজন হয়, তখন কবি-জমিদার শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় সাহিত্য-সম্মিলনেরও আয়োজন করেন; কিন্তু একটীর সঙ্গে অন্যটীও পণ্ড হয়। ১৩১৩ সালে বঙ্গ-সাহিত্যের বিক্রমাদিত্য, সকল সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, বরেণ্য কাশীম-বাজারাধিপতি নিজ প্রাসাদে সম্মিলনের আয়োজন করেন; কিন্তু সম্মিলনের প্রাণস্বরূপ মহারাজকুমার মহিমচন্দ্রের অকস্মাৎ পরলোকগমনে সে বৎসর সম্মিলন স্থগিত থাকে। কিন্তু শোকসন্তপ্ত মহারাজ ১৩১৪ সালের ১৭ই ও ১৮ই কার্ত্তিক নিজ শোক বিস্মৃত হইয়া জননী-বাণীর সেবার্থ সম্মিলনকে আহ্বান করেন। সেই বৎসর সম্মিলনের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইল। মণিকাঞ্চনযোগ হইল—মহারাজ হইলেন অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি, আর সভাপতি হইয়াছিলেন স্যার রবীন্দ্রনাথ। প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় হইয়াছিলেন সম্পাদক।

পর বৎসরে, ১৩১৫ সালের ১৮ই ও ১৯শে মাঘ রাজ-সাহীতে সম্মিলন হয়। বিজ্ঞানাচার্য্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির প্রাণ, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বরপুত্র কুমার শরৎকুমার সকলকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন এবং সম্পাদকতা করিয়াছিলেন সুলেখক সুধী শ্রীযুক্ত শশধর রায়।

তৃতীয় অধিবেশন হইয়াছিল ভাগলপুরে—১লা, ২রা, ৩রা ফাল্গুন (১৩১৬) তিনদিন অধিবেশন হইয়াছিল। পরলোকগত সারদাচরণ মিত্র মহোদয় হইয়াছিলেন সভাপতি এবং ভাগলপুরের বাঙ্গালী সমাজের নেতা শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সরকার মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। অন্যতম প্রবীণ উকীল শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু মহাশয় এই সম্মিলনের সম্পাদক ছিলেন।

চতুর্থ অধিবেশন হয় ময়মনসিংহে। সভাপতি হন শ্রীযুক্ত সার জগদীশচন্দ্র বসু, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর।

চুঁচুড়ায় পঞ্চম অধিবেশনে সম্মিলনের প্রাণদাতা কাশীমবাজারাধিপতি সভাপতি, সাধারণের 'সাধারণী'র ৺অক্ষয়চন্দ্র অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি, আর উকীল-সরকার রায় মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বাহাদুর সম্পাদক ছিলেন। পরবর্ত্তী বিজ্ঞান-শাখার সূত্রপাত হয় এই স্থানে। কারণ, এই অধিবেশনে কতকগুলি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পৃথকভাবে পঠিত ও আলোচিত হয়।

চট্টগ্রামে ৯ই ও ১০ই চৈত্র ষষ্ঠ সম্মিলন হয়। পঞ্চম অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি অক্ষয়চন্দ্র সভাপতি ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার রায় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হন। বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি হইয়াছিলেন আচার্য্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র।

কলিকাতায় সপ্তম অধিবেশনে সম্মিলন চারিশাখায়

শ্রীযুক্ত সার ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৩১৪ সালে, কাশীমবাজারে প্রথম অধিবেশন)

স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র
(১৩১৬ সালে, ভাগলপুরে তৃতীয় অধিবেশন)

শ্রীযুক্ত সার ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়
(১৩১৫ সালে, রাজসাহীতে দ্বিতীয় অধিবেশন)

শ্রীযুক্ত সার ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু
(১৩১৭ সালে, ময়মনসিংহে চতুর্থ অধিবেশন)

মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর
(১৩১৮ সালে, চুঁচুড়ায় পঞ্চম অধিবেশন)

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
(১৩২০ সালে, কলিকাতায় সপ্তম অধিবেশন)

স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার
(১৩১৯ সালে, চট্টগ্রামে ৬ষ্ঠ অধিবেশন)

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
(১৩২১ সালে, বর্দ্ধমানে অষ্টম অধিবেশন)

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
(১৩২২ সালে, যশোহরে নবম অধিবেশন)

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
(১৩২৪ সালে, ঢাকায় একাদশ অধিবেশন)

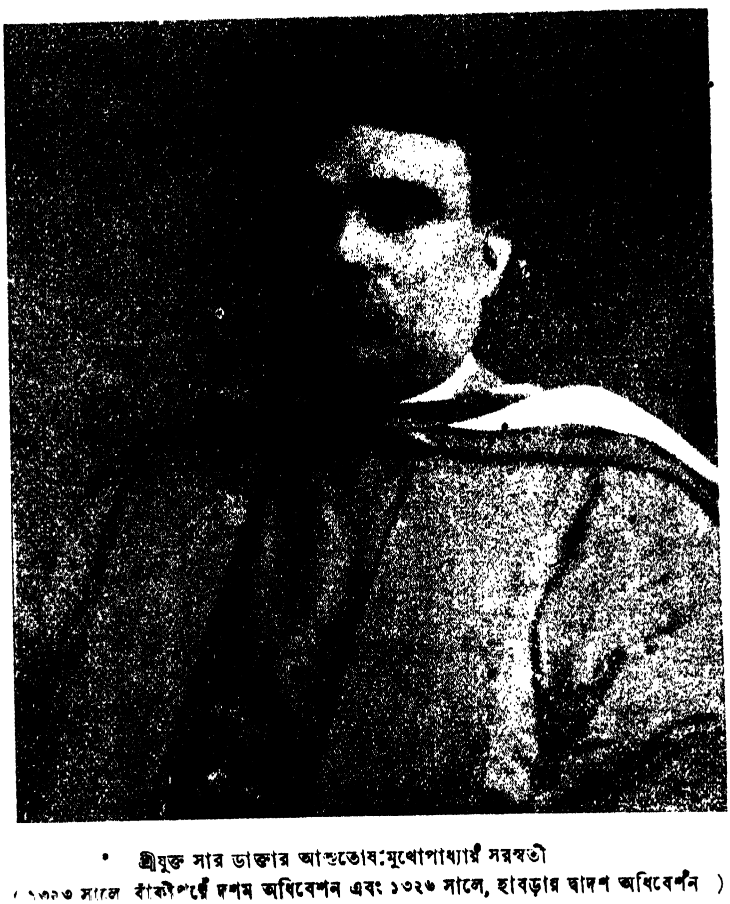

শ্রীযুক্ত সার ডাক্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী
(১৩২৩ সালে বাকীপুরে দশম অধিবেশন এবং ১৩২৬ সালে, হাবড়ায় দ্বাদশ অধিবেশন)

শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সরকার
(ভাগলপুর, তৃতীয় অধিবেশন)

মাননীয় সার মহারাজাধিরাজ বাহাদুর বর্দ্ধমান
(বর্দ্ধমান, অষ্টম অধিবেশন)

স্বর্গীয় মহারাজা কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর

মাননীয় শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ

শাখা-সভার সভাপতিগণ

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়
(ইতিহাস, ১৩২০)

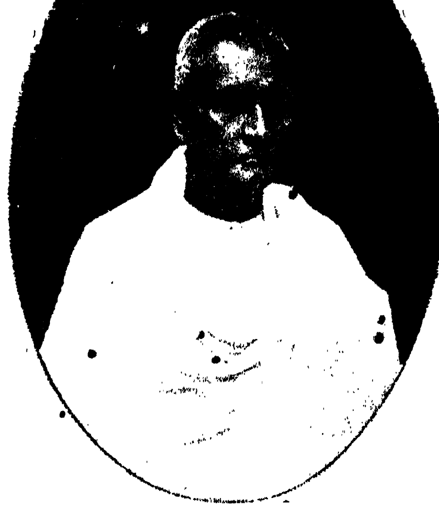

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
(বিজ্ঞান ১৩২০)

শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায়
(দর্শন, ১৩২০)

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন
(সাহিত্য, ১৩২০)

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার
(ইতিহাস, ১৩২১)

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
(ইতিহাস, ১৩২২)

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি রায়বাহাদুর
(বিজ্ঞান, ১৩২১)

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ
(দর্শন, ১৩২২)

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু
(বিজ্ঞান, ১৩২২)

শ্রীযুক্ত শশধর রায়
(বিজ্ঞান, ১৩২৩)

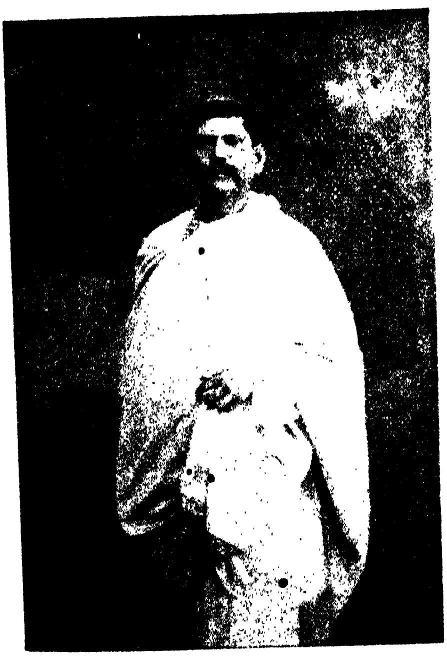

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস
(সাহিত্য, ১৩২৩)

শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার
(ইতিহাস, ১৩২৩)

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
(দর্শন, ১৩২৩)

শ্রীযুক্ত রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর বেদান্তবাচস্পতি
(দর্শন, ১৩২৬)

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু
(বিজ্ঞান, ১৩২৬)

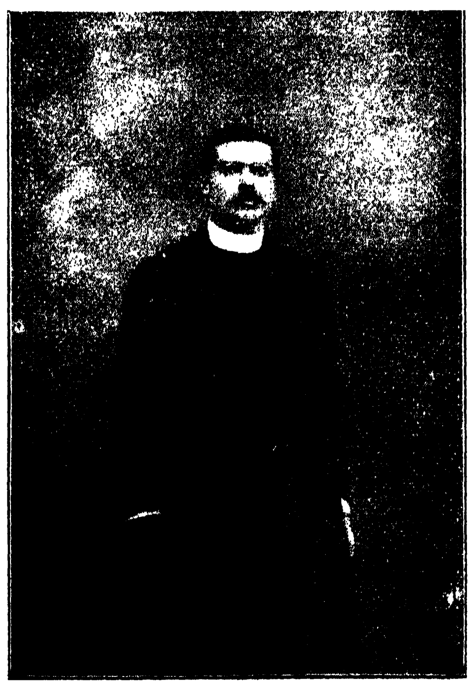

ডাক্তার প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
(ইতিহাস, ১৩২৬)

বিভক্ত হয়। ২৭, ২৮, ২৯শে চৈত্র, ১৩২০ সালে এই সম্মিলন হয়। সাধারণ সভাপতি হইয়াছিলেন দার্শনিকপ্রবর শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর,— ইতিহাস-শাখায় আচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়-কুমার মৈত্রেয়, দর্শনে ডাক্তার পি, কে, রায়, বিজ্ঞানে আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ও সাহিত্যে সভাপতি হইয়াছিলেন কবিসম্রাট মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ। শ্রীযুক্ত ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর ও রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এই তিনজন হইয়াছিলেন সম্পাদক।

বর্দ্ধমানের বিরাট ব্যাপারে, অষ্টম অধিবেশনে মহা-রাজাধিরাজ হইয়াছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। মূল ও সাহিত্যের সভাপতি হইয়াছিলেন মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ, ইতিহাসে শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়, দর্শনে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ, বিজ্ঞানে বিজ্ঞানবিৎ যোগেশচন্দ্র সভাপতি হইয়াছিলেন। সম্পাদক ছিলেন শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র-নাথ মিত্র ও শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সরকার।

পর বৎসর সম্মিলনের নবম অধিবেশন হয় যশোহরে। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার হইয়াছিলেন অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি, সাধারণ সভাপতি ছিলেন মহামহো-পাধ্যায় সতীশচন্দ্র, বিশ্বকোষের নগেন্দ্রনাথ ইতিহাসে, দর্শনে মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ, বিজ্ঞানে শ্রীযুক্ত পি, এন, বসু মহাশয় হইয়াছিলেন সভাপতি। সম্পাদক ছিলেন শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

বঙ্গের বাহিরে বাঁকিপুরে সম্মিলনের দশম অধিবেশন হয়। রায় বাহাদুর পূর্ণেন্দুনারায়ণ, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ, শ্রীযুক্ত শশধর রায় ও শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়গণ যথাক্রমে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, সাধারণ সভাপতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও দর্শনের সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। আমাকেই সম্পাদকতা করিতে হইয়াছিল।

একাদশ অধিবেশন হয় ঢাকায়। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয়গণ অভ্যর্থনা, সাধারণ, দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য ও বিজ্ঞানশাখার সভাপতি হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র সম্পাদকতা করিয়াছিলেন।

এবার দ্বাদশ অধিবেশনও নির্ব্বিঘ্নে শেষ হইয়া গেল। সভাপতি হইয়াছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়; সাহিত্যে সভাপতি ছিলেন মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ। দর্শনে রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর, বিজ্ঞানে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু, ইতিহাসে শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্যার রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "শিক্ষাকার্য্যে সহযোগিতায় প্রয়োজন আছে। ইহাতে ব্যক্তিগত চেষ্টা অপেক্ষা সমবেত চেষ্টাই অধিক সাফল্য লাভ করে। এই নির্ম্মাণ কার্য্যই সাহিত্য-পরিষদের ও সাহিত্য-সম্মিলনের প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্র।"

কুলবধূ

[শ্রীদরবেশ—]

দরশন-সীমা চরণ-নখর পানে,
হাসির সীমানা অধরের পল্লব;
বচন-সীমানা সখী সনে কাণে-কাণে,
শ্রবণের সীমা শিশু-মুখ কলরব।
ঘ্রাণ-সীমা নিতি চয়িত পূজার ফুল,
স্পর্শ-সীমানা স্বামীর চরণ-তল;
গমনের সীমা গৃহ-বাতায়ন-মূল,
অভিমান-সীমা কেবল নয়ন-জল।

কর্ম্মক্ষেত্র আঁধা রন্ধন-শালা,
স্বাদ-সীমা প্রিয়-পাত্রাবশেষ যাহা;
ধর্ম্মক্ষেত্র আঙণে তুলসী-তলা,
ক্রোধ-সীমা তার মৌন হইয়া রহা।
বিলাসের সীমা সিঁদুর-কাজল সাজে,
বাসনার সীমা সবারে তৃপ্তি দিয়া,
রমণী, তোমার সকলি সীমার মাঝে,
অসীম কেবল প্রেম-মণ্ডিত হিয়া।

সখী

(বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাবলি-অবলম্বনে)

(প্রথম শ্রেণী—পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[অধ্যাপক শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম-এ]

১২। প্রফুল্ল এবং দিবা ও নিশি

এ পর্য্যন্ত যে সকল সখীর কার্য্যকলাপ আলোচনা করা হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই নায়িকাকে বিরহকালে সান্ত্বনা দিয়াছেন, মিলনের জন্য সাহায্য করিয়াছেন, ইত্যাদি ভাবে যথারীতি সখীর কর্ত্তব্য সাধন করিয়াছেন। কিন্তু এবারে যে দুইখানি আখ্যায়িকার প্রসঙ্গ তুলিব, সে দুইখানিতে সখীগণ এইভাবে বাঁধা-ধরা নিয়মে সখীর কার্য্য সাধন করা ছাড়াও, নায়িকার অধ্যাত্ম-জীবন-গঠনে, প্রকৃত জ্ঞানলাভে সাহায্য করিয়াছেন। সেই জন্যই সখীদিগের শ্রেণী-বিভাগ-কালে বলিয়াছি যে, 'দেবী চৌধুরাণী'তে নিশি ও দিবা এবং 'সীতারামে' জয়ন্তী উচ্চ অঙ্গের সখী।'

প্রফুল্ল পিত্রালয়ে বাসকালে মাতার স্নেহ-মমতায় ও শ্বশুরালয়ে একরাত্রি বাসের সুবিধার ব্যাপারে সোণার সতীন সাগরের সমবেদনা ও সহায়তা পাইয়াছিল। মাতার মৃত্যুর পর সে ফুলমণি নাপিতানীর সাহচর্য্য লাভ করিয়াছিল, কিন্তু ফুলমণি 'যুগলাঙ্গুরীয়ে'র অমলার মত ত নহেই, 'বিষবৃক্ষে'র মালতী গোয়ালিনীর অপেক্ষাও জঘন্য-প্রকৃতি, প্রফুল্লর সর্ব্বনাশ-সাধনের চেষ্টার সহায়তা করিয়াছিল। সুতরাং ইহা একেবারে সখিত্বের দিক্ দিয়াই যায় না।

ভবানীঠাকুর যখন প্রফুল্লের নবজীবন-গঠনের জন্য তাহাকে শিক্ষা দিবেন স্থির করিলেন, তখন তিনি তাহার বয়স্যা, সহচারিণী অথচ শিক্ষয়িত্রী-হিসাবে নিজ শিষ্যা নিশিকে তাহার কাছে রাখিলেন; বয়সে প্রফুল্লের অপেক্ষা পাঁচ সাত বৎসরের বড় হইলেও, সে বয়স্যার মতই রঙ্গ করিয়া আত্ম-পরিচয় দিল। তাহার পর সে ভবানী-ঠাকুরের শিক্ষামত প্রফুল্লকে লেক্চার দিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু সত্বরই বুঝা গেল যে, সে শুধু শুষ্ক জ্ঞানের ব্যাপারী নহে, দরদের দরদীও বটে। যখন প্রফুল্ল আবেগের সহিত স্বামীর উল্লেখ করিল এবং তাহার 'চক্ষু দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল', তখন 'নিশি বলিল, "বুঝিয়াছি বোন্—তুমি অনেক দুঃখ পাইয়াছ।"' তখন নিশি, 'প্রফুল্লের গলা জড়াইয়া ধরিয়া তার চক্ষের জল মুছাইল।' (১ম খণ্ড, ১৩শ পরিচ্ছেদ।) প্রথম-পরিচয়েই নিশি প্রফুল্লের সমবেদনাময়ী সখীর স্থান অধিকার করিয়া বসিল। ('বোন্' সম্বোধনে হৃদ্যতার পরিচয় পরিস্ফুট।)

এই খণ্ডের ১৫শ পরিচ্ছেদে দেখা যায়, প্রফুল্লের প্রথম-শিক্ষা নিশি ঠাকুরাণীর হাতে হইল, তার পর 'পাঠক-ঠাকুর' সে ভার লইলেন, নিশি সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ-ভাবে সেই শিক্ষার সহায়তা করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় খণ্ডে প্রফুল্ল দেবী-চৌধুরাণী হইয়াছে। সাগরের মানভঞ্জনের জন্য ব্রজেশ্বরকে গ্রেপ্তার করার পর যখন পর্দ্দার আড়াল হইতে ব্রজেশ্বরের সহিত কথা কহিতে কহিতে দেবীচৌধুরাণীর গলাটা ধরা-ধরা হইল, তখন 'নিশি ঠাকুরাণী' দেবীচৌধুরাণীর কাছে আসিয়া বসিল। নিশি একটা সমবেদনার কথা কহিলেই 'দেবীর চক্ষে জল আর থাকিল না।'—দেবী তখন সখীকে ব্রজেশ্বরের সহিত কথা কহার ভার দিলেন। বুঝা গেল, নিশি দেবীর সমবেদনাময়ী সাহায্যকারিণী সখীর কার্য্য করিল। "তুই কথা ক। সব জানিস্ ত।" দেবীর এই কথায় বুঝা গেল, নিশি 'বিশ্বাস-বিশ্রাম-কারিণী।' (২য় খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ।) ৭ম পরিচ্ছেদে দেখা যায়, নিশি দেবীর ইঙ্গিতে ব্রজেশ্বর-সাগর-ঘটিত ব্যাপারে লিপ্ত। আবার সে কার্য্য-সমাধার পর নিশি ব্রজেশ্বরকে রাণী

দেখাইবার জন্য 'আর এক কামরায় লইয়া গেল।' অর্থাৎ সখী মামুলী প্রথায় নায়ক-নায়িকার মিলন-সংঘটন করিল। ৮ম পরিচ্ছেদে 'ব্রজেশ্বরকে পৌছাইয়া দিয়া নিশি চলিয়া গেল।' গিরিজায়াও এইরূপ মৃণালিনীকে হেমচন্দ্রের নিকট পৌছাইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছিল। তাহার পর ব্রজেশ্বরকে বিদায় দিয়া 'দেবী নৌকার তক্তার উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতেছে।' নিশি আসিয়া এই করুণ দৃশ্য দেখিয়া 'তাহাকে উঠাইয়া বসাইল—চোখের জল মুছাইয়া দিল—সুস্থির করিল,—উপদেশ ও সান্ত্বনা দিল। (২য় খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ)। আবার সে সমবেদনাময়ী সান্ত্বনাদায়িনী সখী।

নিশির কথা এতক্ষণ ধরিয়া বলিলাম। এইবার দিবার কথাও তুলিতে হইবে। ১ম খণ্ডের ১৩শ পরিচ্ছেদে নিশি একবার তাহার নাম করিয়াছে, প্রফুল্লের সহিত তাহার আলাপ করিয়া দিবে বলিয়াছে, কিন্তু তখনকার মত আর তাহার প্রসঙ্গ দেখা যায় না। ২য় খণ্ডের ১০ম পরিচ্ছেদে দেবী 'একজন মাত্র স্ত্রীলোক' দিবাকে সঙ্গে লইয়া বজরা হইতে নামিয়া তীরে তীরে গিয়া একটা জঙ্গলে প্রবেশ করিল। কিন্তু দেবী 'একটা গাছের তলায় পৌছিয়া পরিচারিকাকে বলিল,—"দিবা, তুই এইখানে ব'স্। আমি আসিতেছি।"' বুঝা গেল, দিবা 'পরিচারিকা'; নিশি অপেক্ষা নিকৃষ্ট পদবীর, সম্পূর্ণ বিশ্বাসপাত্রীও নহে, নিশির মত তাহার সহিত দেবীর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক নহে। গ্রন্থকার এই ভাবে দিবার পরিচয় দিয়া ৩য় খণ্ডের ২য় পরিচ্ছেদে নিশি ও দিবা উভয়কে একত্র দেবীর পাশে বসাইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে বলিয়াছেন, 'দিবা অশিক্ষিতা', তাহার প্রশ্নের ও উত্তরের ভঙ্গীতেও ইহা সপ্রমাণ হয়। পক্ষান্তরে 'নিশি প্রফুল্লের একপ্রকার সহাধ্যায়িনী ছিল,' আবার শিক্ষয়িত্রীও ছিল। নিশি ও দিবার মধ্যে এরূপ প্রভেদ থাকিলেও উভয়েরই দেবীর প্রতি গভীর প্রীতি-স্নেহ ছিল। এই পরিচ্ছেদেই দেখা যায়, যখন দেবী স্বামি-দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় ও শ্বশুরের অপকার-নিবারণের উদ্দেশ্যে নিজের বিপদ্ ডাকিয়া লইল, ইংরেজের কাছে ধরা দিতে সঙ্কল্প করিল, তখন নিশি ও দিবা উভয়েই সমান আগ্রহের সহিত তাহাকে এই সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিল (২য় পরিচ্ছেদ) এবং তাহার পর নিশি পুনরায় দেবীকে বুঝাইল। (৪র্থ পরিচ্ছেদ।) উভয়েই দেবী সাজিয়া সাহেবের চোখে ধূলা দেওয়ার চেষ্টা করিল ও গোয়েন্দাকে আনিতে বলিল (ষষ্ঠ ও ৭ম পরিচ্ছেদ।) দেবী তাহাদিগকে কর্ত্তব্য উপদেশ দিল, তাহারা 'বাহিরে আসিয়া দাঁড়ী মাঝিদিগকে চুপি চুপি কি বলিয়া গেল' (৫ম পরিচ্ছেদ)। প্রফুল্ল নিজের বিপদ্ আহ্বান করিয়া সখীদ্বয়কে বাঁচাইবার জন্য ব্রজেশ্বরকে অনুরোধ করিল ('আমার দুইটী সখী এই নৌকায় আছে। তারা বড় গুণবতী, আমিও তাহাদের বড় ভালবাসি। তোমার নৌকায় তাহাদের লইয়া যাইও।') ইহা হইতে দেবীর স্নেহের গভীরতাও বুঝা যায়। গোয়েন্দা (শ্বশুর) আসিলে সে তাঁহার অভ্যর্থনার ভার সখীদ্বয়ের উপর দিল। বুদ্ধিমতী নিশি কিরূপে হরবল্লভকে ভয় দেখাইয়া প্রফুল্লের কার্য্য উদ্ধার করিল তাহার সরস বর্ণনা ৮ম পরিচ্ছেদে পাওয়া যায়। ইহা লইয়া নিশি দেবীর সহিত একটু রঙ্গ করিতেও ছাড়িল না ('পরিহাস' সখীর অন্যতম লক্ষণ)।

৯ম ও ১১শ পরিচ্ছেদে উভয় সখীতে আসন্ন-বিচ্ছেদ-কাতর হইয়া গাঢ় স্নেহ-প্রীতি-সমবেদনার সহিত তাহার সহিত আলাপ করিল। প্রফুল্লও প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে তাহাদিগকে স্নেহ-উপহার দিলেন। সখীত্রয়ের বিদায়-দৃশ্য বড়ই করুণ, বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। 'দিবা ও নিশি সঙ্গে সঙ্গে ভূতনাথের ঘাট পর্য্যন্ত চলিল। প্রফুল্ল দিবা ও নিশিকে সব (বহুমূল্য আসবাব ও অলঙ্কার) দিলেন। নিশি কতকগুলি বহুমূল্য রত্নাভরণে প্রফুল্লকে সাজাইতে লাগিল।...দেবীকে নিরাভরণা দেখিয়া সেইগুলি পরাইল। তার পর আর কোন কাজ নাই, কাজেই তিনজনে কাঁদিতে বসিল। নিশি গহনা পরাইবার সময়েই সুর তুলিয়াছিল; দিবা তৎক্ষণাৎ পোঁ ধরিলেন। তার পর পোঁ সানাই ছাপাইয়া উঠিল। প্রফুল্লও কাঁদিল—না কাঁদিবার কথা কি? তিনজনের আন্তরিক ভালবাসা ছিল; কিন্তু প্রফুল্লর মন আহ্লাদে ভরা, কাজেই প্রফুল্ল অনেক নরম গেল। নিশিও দেখিল যে, প্রফুল্লর মন সুখে ভরা; নিশিও সে সুখে সুখী হইল, † কান্নায় সেও একটু নরম গেল। সে বিষয়ে যাহার যে ত্রুটি হইল, দিবা

† অবতরণিকায় উদ্ধৃত সখীর লক্ষণ স্মর্ত্তব্য।—

'নিজ সখী-দুখে দুখী সুখে মানে ক্ষেম।'—গোবিন্দদাস।

'শ্রীমতীর সুখের সুখী দুখের সে দুখী'।—ভক্তমাল।

ঠাকুরাণী তাহা সারিয়া লইলেন।' [নিশি ও দিবার এই চরিত্রের প্রভেদ প্রণিধানযোগ্য।] দিবা ও নিশির পায়ের ধূলা লইয়া, প্রফুল্ল তাহাদিগের কাছে বিদায় লইল। তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া গেল। (১১শ পরিচ্ছেদ।)

গার্হস্থ্য-জীবনে আবার সোণার সতীন সাগর প্রফুল্লের সমবেদনাময়ী সখী হইবে, সুতরাং মধ্যজীবনের সখীদ্বয়ের আর প্রয়োজন নাই।

১৩। শ্রী ও জয়ন্তী

মাতৃবিয়োগের অব্যবহিত পরেই ভ্রাতা বিষম বিপদ্‌গ্রস্ত হইলে শ্রী অগত্যা (পাঁচকড়ির মার সাহায্যে) স্বামী সীতারামের শরণ লইয়াছিল; সীতারামের সহায়তায় ভ্রাতার বিপদ্ কাটিল; কিন্তু শ্রী সীতারামের নিকট জ্যোতিষীর গণনার বৃত্তান্ত শুনিয়া 'প্রিয়প্রাণহন্ত্রী' হইবার আশঙ্কায় স্বামি-সহবাসের আশায় জলাঞ্জলি দিল এবং ভ্রাতা ও পতি উভয়েরই আশ্রয় ছাড়িয়া অকূলে ঝাঁপ দিল। এই সঙ্কল্প-স্থিরীকরণে সে স্বাবলম্বনের উপর নির্ভরশীলা। পরে জয়ন্তীর সহিত কথোপকথন হইতে জানা যায় (১ম খণ্ড ১১শ পরিচ্ছেদ) যে শ্রী শ্রীক্ষেত্রের পথে পাণ্ডার অত্যাচারের ভয়ে যাত্রীর দল ছাড়িয়া একাকিনী নিঃসহায়া, আত্মহত্যায় প্রস্তুত, এই অসহায় অবস্থায় তাহার পার্শ্বচারিণী সখী মিলিল—সন্ন্যাসিনী জয়ন্তী যুটিল। (পূর্ব্বে যাত্রীর দলে থাকিতে শ্রীর জয়ন্তীর সহিত প্রথম দেখা হইয়াছিল, কিন্তু তখন শ্রীর সঙ্গিনীর প্রয়োজন হয় নাই, সুতরাং তখন উভয়ের মিলন ঘটে নাই।)

'শ্রীর মন টলিল। শ্রী দেখিতেছিল, ভিক্ষা এবং মৃত্যু, এই দুই ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। এই সন্ন্যাসিনীর সঙ্গ যেন উপায়ান্তর হইতে পারে বোধ হইল।' (১ম খণ্ড ১১শ পরিচ্ছেদ।) সুতরাং সন্ন্যাসিনী যখন তাহাকে সঙ্গিনী হইতে অনুরোধ করিল তখন শ্রী একটু তর্কের পর সম্মত হইল। 'সন্ন্যাসিনী বিরাগিনী প্রব্রজিতা, অনেক দিন হইতে তাহার সুহৃদ্ নাই; আজ একজন সমবয়স্কা প্রব্রজিতাকে পাইয়া তাহার চিত্ত একটু প্রফুল্ল হইল'। (১ম খণ্ড ১২শ পরিচ্ছেদ।)

প্রথমে উভয়ে উভয়কেই মাতৃসম্বোধন করিল, কিন্তু দুই দিনের পরিচয়ে ঘনিষ্ঠতা বাড়িলে তাহারা 'বহিন' বলিয়া গেল।† 'স্নেহসম্বোধনে শ্রীর প্রাণ একটু জুড়াইল। দুইদিন সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে থাকিয়া, শ্রী তাহাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এ দুইদিন মা! বাছা! বলিয়া কথা হইতেছিল,—কেননা সন্ন্যাসিনী শ্রীর পূজনীয়া। সন্ন্যাসিনী সে সম্বোধন ছাড়িয়া বহিন্ সম্বোধন করায় শ্রী বুঝিল, যে সেও ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছে।' (১ম খণ্ড ১৪শ পরিচ্ছেদ।)

উভয়ে সমবয়স্কা, প্রথম আলাপেই উভয়ের মনে সখ্য-প্রীতির সঞ্চার হইল, জয়ন্তী প্রথম হইতে সমবেদনার সহিত কথা কহিল, শ্রীকে আত্মহত্যা হইতে নিবৃত্ত করিল, একটু নর্ম্মালাপের সুরে শ্রীর মনের কথা জানিয়া লইল, ও তাহাকে সৎপরামর্শ দিল ও তাহার সহায়িনী সঙ্গিনী হইল। (১ম খণ্ড ১১শ পরিচ্ছেদ।) পর পরিচ্ছেদে শ্রীর হাত দেখার প্রস্তাবে জয়ন্তী তাহাকে (১ম খণ্ড ১৩শ পরিচ্ছেদ) জ্যোতিষী গঙ্গাধর স্বামীর নিকট লইয়া গেল; বুঝা গেল, জয়ন্তী সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রীকে সাহায্য করিতেছে। পর-পরিচ্ছেদে দেখা যায়, উভয়ের ঘনিষ্ঠতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে, শ্রীর সমগ্র ইতিহাস জয়ন্তী এখন জানিল, এবং তাহার নবজীবন গঠনের চেষ্টায় জয়ন্তী (নিশির মত) শ্রীকে লেকচার দিতে আরম্ভ করিল। (অধ্যাত্ম-জীবনের পথে নিশি অপেক্ষা জয়ন্তী বোধ হয় অধিক অগ্রসর।) এখন হইতে শ্রী জয়ন্তীর শিষ্যা, অথচ জয়ন্তী আবার শ্রীর বয়স্যা সখী। শ্রী প্রাণ খুলিয়া আবেগ-ভরে তাহাকে গভীর স্বামি-প্রেমের কথা বলিল, শ্রী আর কথা কহিতে পারিল না। মুখে অঞ্চল চাপিয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিল। জয়ন্তীরও চক্ষু ছল ছল করিল।' (১ম খণ্ড ১৪শ পরিচ্ছেদ।) বুঝা গেল, শ্রী জয়ন্তীকে আপনার জন অন্তরঙ্গ সখী বলিয়া জানিয়াছে, তাই তাহাকে সকল কথা জানাইয়া মনের ভার লঘু করিতেছে।

'জানালে আপন জনে মনের যাতনা।
ব্যথিত হৃদয় পায় অনেক সান্ত্বনা॥'

আবার জয়ন্তীও নিশির মত ('দেবী চৌধুরাণী', ১ম খণ্ড ১৩শ পরিচ্ছেদ) সমবেদনাময়ী সখী। এইখানে প্রথম

† নিশিও প্রফুল্লকে কখন কখন মাতৃসম্বোধন করিয়াছে, কেননা প্রফুল্ল দেবী-চৌধুরাণী অর্থাৎ রাণী মা। ('দেবীচৌধুরাণী' ২য় খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ ও ৩য় খণ্ড ১১শ পরিচ্ছেদ।)

খণ্ডের শেষ। দেখা গেল, প্রথম খণ্ডের শেষেই উভয়ের সখিত্ব-বন্ধন নিবিড় হইয়াছে।

গঙ্গাধর স্বামীর পূর্ব্ব-আদেশ মত জয়ন্তী এক বৎসর পরে (২য় খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ) আবার শ্রীকে সঙ্গে করিয়া মহাপুরুষের নিকট আসিয়া উপস্থিত। মহাপুরুষ শ্রীর অসাক্ষাতে জয়ন্তীকে জানাইলেন যে শ্রীর পতি-সন্দর্শনের সময় আসিয়াছে ও জয়ন্তীকে তাহার সঙ্গে যাইতে হইবে। জয়ন্তী শ্রীকে সেই অনুমতি জানাইল, তাহার সহিত স্বামীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল, উভয়ে অনেক জ্ঞানের কথা হইল, শ্রী মনের কথা জয়ন্তীকে খুলিয়া বলিল, সে এখন পুরাপুরি জয়ন্তীর শিষ্যা। (২য় খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ)।

উভয়ে ভৈরবী বেশে সীতারামের রাজধানীতে আসিল, জয়ন্তী সীতারামের রাজ্যরক্ষায় প্রভূত সাহায্য করিল (সে সব এই প্রসঙ্গে অবান্তর কথা), এবং সীতারামের আশা মিটিবে তাঁহাকে এই আশ্বাস দিল (২য় খণ্ড ১৩শ পরিচ্ছেদ)। এই খণ্ডের শেষ পরিচ্ছেদে (১৭শ) জয়ন্তী শ্রীকে বলিল 'এক্ষণে স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর।' কিন্তু শ্রী সাহস করিল না। যাহা হউক, বুঝা গেল এক্ষেত্রেও জয়ন্তী শ্রীর শুভানুধ্যায়িনী সৎপরামর্শদায়িনী সখী, শ্রীও তাহার কাছে কোন কথা লুকায় না।

তৃতীয় খণ্ডে জয়ন্তী শ্রীকে সুখী করিবার জন্য প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত গঙ্গারামকে মুক্ত করিল এবং শ্রীর সহিত সীতারামের মিলন ঘটাইয়া দিল। (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।) এত অধ্যাত্ম-তত্ত্বের মধ্যেও জয়ন্তী সখীর কর্ত্তব্য ভুলে নাই। তাহার পর শ্রী অনেক দিন 'চিত্ত-বিশ্রামে' বাস করার পর জয়ন্তী শ্রীকে আসন্ন বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিল ও তাহার জন্য নিজেকে বিপন্ন করিল (১৬শ পরিচ্ছেদ)। জয়ন্তী সখীর ধরণে একটু পরিহাস করিল, তাহার পর তত্ত্ব-উপদেশ দিল এবং শ্রীর ইচ্ছা পূর্ণ করিল। এখানেও সে 'বিশ্বাস-বিশ্রামকারিণী' শুভানুধ্যায়িনী সৎপরামর্শদায়িনী নায়িকা-সহায়িনী'। জয়ন্তীর উপর শ্রীর অনন্ত বিশ্বাস।' এই উদ্ধার-কার্য্যের ফলে শ্রীর জন্য জয়ন্তী সীতারামের হস্তে নিদারুণ অপমান সহ্য করিল (১৮শ পরিচ্ছেদ), ইহা তাহার সখী-প্রীতির উজ্জ্বলতম নিদর্শন। (সে বীভৎস ব্যাপারের আর বর্ণনা করিব না।)

এই লাঞ্ছনাতেও জয়ন্তী শ্রীর মুখ চাহিয়া অত্যাচারী সীতারামের উদ্ধারকামা হইয়া 'শ্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল, শ্রীর কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত সবিশেষ বলিল, আবার তাহাকে স্বামিসেবা করিতে প্রবৃত্তি দিল, শ্রীও সম্মত হইল (২০শ পরিচ্ছেদ)। উভয়ে একাভিসন্ধি হইয়া সীতারামের রাজ-ধানীতে আসিল (২১শ পরিচ্ছেদ) এবং সীতারামের সর্ব্ব-নাশের সময় তাঁহার (পার্থিব নহে) পারমার্থিক উপকার সাধন করিল (২৩শ পরিচ্ছেদ)। বলা বাহুল্য, জয়ন্তী শ্রীর মুখ চাহিয়াই সীতারামের মঙ্গল সাধন করিল।

জয়ন্তী শ্রীর মুখ চাহিয়া (গোলন্দাজ-বেশী) গঙ্গারামকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সে চেষ্টা বিফল হইল, সীতা-রাম তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিলেন (২৩শ পরিচ্ছেদ)। তাহার পর 'গোলন্দাজ কে ?' ইহা লইয়া শ্রী ও জয়ন্তীতে কথা হইল, সন্দেহ মিটাইবার জন্য উভয়ে রণক্ষেত্রে গেল, শ্রী অনেকক্ষণ পরে চিনিল—'গঙ্গারাম বটে।' 'শ্রীর চক্ষু দিয়া অবিরল জলধারা পড়িতে লাগিল। জয়ন্তী বলিল, "বহিন্—যদি এ শোকে কাতর হইবে, তবে কেন সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলে ? যাই হউক উহার জন্য বৃথা রোদন না করিয়া উহার দাহ করা যাক আইস।" তখন দুইজনে ধরাধরি করিয়া গঙ্গারামের শব উপযুক্ত স্থানে লইয়া গিয়া দাহ করিল।' (২৪শ পরিচ্ছেদ।) ভ্রাতৃ শোকাতুরা শ্রীর সহিত সমবেদন-প্রকাশ ও তাহাকে সাহায্য-দান জয়ন্তীর সখিত্বের শেষ কার্য্য। ইহার পরে উভয়ে একত্র লোকালয় ত্যাগ করিল। এতক্ষণে কবি সখীদ্বয়ের সম্পূর্ণ একাত্মতা বিধান করিলেন। প্রফুল্ল শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া আবার সংসারে প্রবেশ করিল, সুতরাং শিক্ষা-জীবনের সঙ্গিনী-দ্বয়ের সহিত তাহার ছাড়াছাড়ি হইল। পক্ষান্তরে শ্রী সর্ব্বত্যাগিনী হইয়া সংসার ছাড়িল, সুতরাং জয়ন্তীর সহিত তাহার সখিত্ব-বন্ধন দৃঢ়তর হইল। প্রফুল্ল ও শ্রীর চরিত্র-গত পার্থক্যের জন্যই সখীসম্বন্ধে এই প্রভেদ।

শেষ কথা।

এই সুদীর্ঘ আলোচনা হইতে বুঝা গেল, বঙ্কিমচন্দ্র কাব্যের মামুলি প্রথায় বহুস্থলে 'নায়িকা-সহায়িনী' সখীর অবতারণা করিয়াছেন এবং তাহার অনেকগুলি স্থলে সখিত্বের উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। মণিমালিনী, গিরিজায়া, কুল্‌সম্, নির্ম্মলকুমারী, বসন্তকুমারী, সুভাষিণী,

নিশি, জয়ন্তী এই অষ্ট সখীর উজ্জ্বল চিত্রের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কোনও কোনও স্থলে কবি মামুলি প্রথার অনুসরণ করিয়াও যথেষ্ট মৌলিকতা দেখাইয়াছেন, কোনও কোনও স্থলে নূতন আদর্শে সখীচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তত্তৎস্থলে তাহাও বুঝাইয়াছি। উপসংহার-কালে পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। আবার কতকগুলি স্থলে স্নেহময়ী ভগিনী, ননন্দা বা সপত্নী সখীস্থানীয়া, অবতরণিকায় তাহাও দেখাইয়াছি। আশা করি, এই আলোচনা হইতে পাঠকবর্গ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার বিচিত্র লীলার আংশিক পরিচয় পাইয়া প্রীত হইবেন।

বোঝাপড়া

[শ্রীনরেন্দ্র দেব]

দীনু যেদিন স্ত্রীর প্ররোচনায় জ্যেষ্ঠের বারম্বার নিষেধ সত্ত্বেও দাদার বিনানুমতিতেই পৃথক্ হইয়া গেল, স্নেহশীল বৃদ্ধ রাধানাথের অভাব-ঝঞ্ঝাহত বুকখানা সেদিন সেই কঠিন আঘাতে চুরমার হইয়া গেল। দেহের খানিকটা হঠাৎ কোথাও ধাক্কা লাগিয়া প্রবল ঘর্ষণে চিরিয়া গেলে, তীব্র যন্ত্রণার সহিত তাহা হইতে যেমন ঝর্-ঝর্ করিয়া রক্ত পড়ে, রাধানাথের চক্ষের জল সেদিন তেমনই যাতনার সহিত ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

রাধানাথের স্ত্রী ক্ষ্যান্তমণি আপন বস্ত্রাঞ্চলে স্বামীর চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়া, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "চুপ কর, কেঁদে আর কি হবে ; বেটাছেলে যদি মেগের বশ হয়, তবে কি তার আর বুদ্ধিশুদ্ধি ভাল থাকে গো? রাঙা-বৌ আন্‌বো প্রিতিজ্ঞে করে বসেছিলে,—অতগুনো টাকা মহাজনের কাছে হাওলাত করে পণ দিয়ে শেষ কোন্ এক হা'ঘরের মেয়ের কটা চামড়া দেখে বৌ করে নিয়ে এলে,—ছোটনোকের মেয়ে সেয়ানা হয়ে তোমার হাতে-গড়া সংসারটা ভেঙ্গে দিয়ে চলে গেল! বেশ হয়েছে,—তুমি যেমন অবুঝ মানুষ, তেমনি তোমায় জব্দ করে গেল ঐ একটা চাষার মেয়ে এসে। সেই বিয়ের সময়েই তখন এই মাণ্‌কের মা দশবার ক'রে বলেছিল, হ্যাঁগা—টাকা-পয়সা হাতে নেই, ধার-কর্জ্জ করে এত সব করা কেন? তা সে'কথা তখন কাণেই নিলে না—!" স্ত্রীর কথায় এই আঘাতের বেদনার মধ্যেও রাধানাথের হাসি আসিল; রাধানাথ বলিতে লাগিল, "মাণ্‌কের মা! সেদিন তুই কোথায় ছিলি রে? সেই তিরিশ বছর আগে যেদিন মুমূর্ষু বাপ আমায় তাঁর মরণশিয়রে ডেকে সাতবছরের দীনুকে আমার হাতে সঁপে দিয়ে বলে যান, 'দেখিস্ বাবা! আমার দীনু যেন না কষ্ট পায়, বেচারী জন্মাবধি মা-হারা, ভাইটিকে তোর সাধ্যমত যত্ন করিস্ রাধু'—তখন আমার বয়েস কত জানিস্, মাণ্‌কের মা! সবে ১৬।১৭ বছর! ঐ কামারদের 'নেদোর' মতন অতটুকু গ্যাঁড়গেড়েটা পানা ছিলুম। তুই এসে দীনুকে যতবড়টা দেখিছিলি—তার চেয়ে বছরটাক বড় আর কি,—সেই বয়সে কি করে যে জোতজমা বাঁচিয়ে, ক্ষেতখামার চালিয়ে অনাথ ভাইটিকে মানুষ করিছিলুম, তা তুই কি ক'রে জান্‌বি? ধার করেছিলুম কি সাধে রে! ভাইকে যে আমার তালুক করে গড়েছিলুম! সে মনে কল্লে বিশ দিনে আমার বিশ বছরের দেনা মিটিয়ে দিতে পার্‌তো! কিন্তু যার অদৃষ্টে সুখ নেই, তার কি কখন ভাল হয় রে? তার সাক্ষী দেখ্ না, অমন লক্ষ্মণ ভাই আমায় ত্যাগ করে চলে গেল!"

রাধানাথের স্ত্রী ক্ষ্যান্তমণি ওরফে মাণ্‌কের মা নিজেও এবার কাঁদিয়া ফেলিল; চোখ মুছিতে-মুছিতে বলিতে লাগিল, "অবাক্ হয়েছি গো! সেই ঠাকুরপো—যে 'দাদা বল্‌তে, বৌঠান বল্‌তে অজ্ঞান হ'ত—তার যে একদিন এমন মতিগতি হবে, এ স্বপ্নেও ভাবিনি! বৌ-ছুঁড়ি যে তার কাণে কি বিষ-মন্ত্র দিলে! তুমি একগলা দেনায় ডুবে এতকাল ধরে যে ভাইকে রাজা করে গড়্‌লে, সে কি না তোমার বয়েসকালে তোমায় ভাসিয়ে দিয়ে গেল! ছি—ছি! এতটা অধর্ম্ম কি সইবে—" বাধা দিয়া রাধানাথ গর্জ্জিয়া উঠিল, "খবর্দ্দার মাণ্‌কের মা! ভাইকে আমার গাল-মন্দ করিস্‌নে!"

(২)

তাহার পর দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। জমিজমা

লইয়া ছোট ভাই দীনুর সহিত মাম্‌লা-মকর্দ্দমা করিতে রাধানাথ কিছুতেই সম্মত হয় নাই। পাড়া-প্রতিবাসী, আত্মীয়-বন্ধু সকলের কথাই সে অগ্রাহ্য করিয়া, তাহার নিজের অনেক ন্যায্য প্রাপ্যও, দীনু আসিয়া দাবী করিবামাত্রই বিনা আপত্তিতে ছাড়িয়া দিয়াছে। গাঁয়ের লোকের পরামর্শে মাণ্‌কের মা যতবার রাগারাগি, কান্নাহাটি করিবার চেষ্টা করিয়াছে, রাধানাথ তাহাকে বুঝাইয়াছে, "ভগবানকে ডাক দে বউ! 'মাণ্‌কে' রইল, 'মতি' রইল—আর তোর ভাব্‌না কিসের? দু'দশ বিঘে জমি নিয়ে কি ধুয়ে খাবি? আমি ত' আর পরের হাতে' তুলে দিই নি রে—দীনুর থাক্‌লেও যা, আমার থাক্‌লেও তা, তবে আর দুঃখটা কি? দীনু কি আমাদের পর রে?"

দীনু পৃথক্ হইবার পর হইতে ক্রমাগত দুইবৎসর ধরিয়া, এই স্নেহান্ধ লোকটিকে কলিযুগের হালচাল ও তদনুরূপ বৈষয়িক বুদ্ধির উপদেশ করিতে বারম্বার অপারগ হইয়া, মাণ্‌কের মা সম্পত্তি বাঁচাইবার হাল ছাড়িয়া দিয়াছিল বটে; কিন্তু স্বামীর শারীরিক সুস্থতার জন্য শীঘ্রই তাহাকে চিন্তিত হইয়া উঠিতে হইল। আশৈশব বহু ঝড়ঝাপটা মাথায় বহিয়া অকুতোভয়ে এই লোকটি আজ পঞ্চাশের কোটায় আসিয়া পা' দিয়াছিল বটে, কিন্তু যে খুঁটির উপর ভর রাখিয়া সে তাহার পরিশ্রান্ত জীবন-সন্ধ্যার ক্লান্তি দূর করিবে ভাবিয়া রাখিয়াছিল, সহসা সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে চাহিয়া দেখিল, তাহার সেই একান্ত নির্ভরটুকু অন্যে আসিয়া দখল করিয়া লইয়াছে। একে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে তাহার সে অপরিমেয় শক্তি-সামর্থ্য নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছিল, তাহার উপর সহসা দীনুর এই অপ্রত্যাশিত অদ্ভুত আচরণ যখন কঠোর বজ্রাঘাতের মত তাহার বুকের ভিতর আসিয়া বাজিল, গুরু পরিশ্রমে নষ্ট-স্বাস্থ্য বৃদ্ধ তাহা বহু চেষ্টাতেও সামলাইতে পারিল না,—অচিরে শয্যা আশ্রয় করিল।

ঔষধ-পথ্য ও চিকিৎসা প্রভৃতিতে ক্ষ্যান্তমণি তাহার সমস্ত পুঁজিপাটা ও অঙ্গের অলঙ্কার ব্যয় করিয়া, ও বিক্রয় করিয়া এমন কি ঋণের ভার আরও বৃদ্ধি করিয়াও মর্ম্মাহত স্বামীকে বাঁচাইতে পারিল না। রাধানাথ শেষ সময়ে দীনুকে একবার দেখিয়া যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ক্ষ্যান্তমণি দেবরকে ডাকিয়া আনিবার জন্য জ্যেষ্ঠপুত্র মাণিকলালকে পাঠাইয়া দিল। মাণিকলাল কিন্তু খুড়িমার নিকট লাঞ্ছিত হইয়া একা কাঁদিতে-কাঁদিতে ফিরিয়া আসিল। ক্ষ্যান্তমণি অশ্রু মুছিয়া স্বামীকে জানাইল, "ঠাকুরপো গ্রামে নাই, জমীদারী কাজে মফস্বলে গিয়াছে—ফিরিতে বিলম্ব হইবে।" যাহা হউক, রাধানাথকে আর সে অনির্দ্দিষ্ট বিলম্ব পর্য্যন্ত যুঝিতে হইল না। তাহার মুমূর্ষু প্রাণ শেষ পর্য্যন্ত ভাইয়ের প্রতীক্ষায় থাকিয়া-থাকিয়া শেষে হাহাকার করিয়া মরিল।

মাণিক তখন আটবৎসরের বালকমাত্র এবং তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মতি পাঁচ বৎসরের শিশু।

সদ্য-পিতৃহীন বালকদ্বয়ের অশৌচান্ত হইবার সঙ্গে-সঙ্গে তাহাদের সর্ব্বস্বান্তও হইয়া গেল। কেবলমাত্র শ্রীমন্ত সর্দ্দারের চেষ্টায় তাহাদের কুঁড়েটুকু রক্ষা পাইল বটে, কিন্তু আর সমস্তই ঋণের দায়ে নিলামে বিক্রয় হইয়া গেল। কাণাঘুষা চলিতে-চলিতে ক্রমশঃ গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গেল যে, দীনু মাইতি তাহার অধিকাংশই বেনামীতে খরিদ করিয়াছে। নিরুপায় মাণ্‌কের মা তখন গ্রামের অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বাড়ী-বাড়ী ধান ভাণিয়া, চাল ঝাড়িয়া এবং অবসরমত সূতা কাটিয়া অতি কষ্টে নাবালক ছেলে দু'টিকে মানুষ করিতে লাগিল। এই উপায়ে অনাথা সামান্য যাহা অর্জ্জন করিত, তাহাতে তিনটি প্রাণীর দুই-বেলা পেট ভরিয়া আহারের সঙ্কুলান হইত না। কাজেই ক্ষ্যান্তমণিকে মাসের মধ্যে দুইটা একাদশী ছাড়া অতিরিক্ত আরও অনেকগুলা একাদশী করিতে হইত।

৺ইচ্ছায় অল্পদিনের মধ্যেই মাণ্‌কের মার উপবাসের দিনগুলা সংক্ষেপ হইয়া আসিল। শ্রীমন্ত সর্দ্দারের সুপারিশে মাণিকের জমীদার-বাটীতে একটী চাক্‌রী জুটিল। কিন্তু নিতান্ত ছোক্‌রা বলিয়া উদার জমীদার মহাশয় তাহাকে বেতন দিতে সম্মত হইলেন না। কেবলমাত্র পেটভাতের বন্দোবস্তে তাহাকে আপনার পাখাটানা কাজে নিযুক্ত করিলেন।

রাধানাথের প্রাণান্ত যত্নে দীনু বাংলা লেখাপড়া বেশ ভাল রকমই শিখিয়াছিল, এবং দাদারই চেষ্টায় সে জমীদারী-সেরেস্তায় আমলার পদ পাইয়াছিল। সেই-খানেই আজ তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে এই ভৃত্যজনোচিত নীচ কার্য্যে নিযুক্ত হইতে দেখিয়া দীনুর যেন মাথা কাটা গেল। এই ব্যাপারটা তার পক্ষে এতই মানহানিকর বলিয়া বোধ

হইল, যে, সেই দিনই অপরাহ্নে কাছারীর ফেরত—যে দীনু পৃথক্ হইবার পরদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত এই দুইবৎসরের উপর হইল এযাবৎ একবারও সেদিক মাড়ায় নাই, এমন কি দাদার রোগে, মৃত্যুকালে, অশৌচান্তেও উঁকিটি মারে নাই —সে আজ তার নিজের মানের দায়ে একেবারে সরাসর সেই পরিত্যক্ত কুটীর-প্রাঙ্গণে হাজির হইয়া ডাক দিল, "বৌঠাকরুণ!"

প্রাঙ্গণের সম্মুখস্থ দাওয়ার উপর বসিয়া ক্ষ্যান্তমণি তখন তাহার একখানি শতছিন্ন বস্ত্রের সযত্নে সংস্কার করিতেছিল। স্বামীর পরম স্নেহাস্পদের এই চিরপরিচিত অথচ বহুদিনের অশ্রুত ও অপ্রত্যাশিত কণ্ঠস্বর সহসা আজ তাহারই অঙ্গনের মধ্যে ধ্বনিত হইবামাত্র মাণিকের মার কম্পিত হস্তে সেলাইয়ের ছুঁচটা সজোরে বিঁধিয়া গেল। কিন্তু সেদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই—রুগ্ন-শয্যায় স্বামীর সেই আশার বাণী নিত্যই তাহার মনে পড়ে "দীনু কি আমাদের পর রে!" ছুঁচ, সুতা ও কাপড় রাখিয়া ক্ষ্যান্তমণি তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল; এবং ঘরের ভিতর হইতে একখানি পিঁড়ি আনিয়া দাওয়ার উপর পাতিয়া দিল। কাছারীর ফেরত আসিয়াছে দেখিয়া হাত-মুখ ধুইবার জন্য সত্বর এক ঘটি জল আনিয়া উপস্থিত করিল; এবং দীনু কিছু বলিবার পূর্ব্বেই পিঁড়ির সম্মুখে একটী ছোট্ট ধামী করিয়া চারটী মুড়ি, একটু গুড় ও পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল আনিয়া রাখিল। দীনু ব্যস্ত হইয়া বলিল, "থাক্! থাক্! বৌঠাকরুণ! ওসব কেন? আমি এখনি যাব, একটা বিশেষ কাজে এসেছি, বেশীক্ষণ ত বস্‌তে পার্ব্ব না।" মাণ্‌কের মা ততক্ষণে পানের সজ্জা বাহির করিয়া পান সাজিতে সুরু করিয়াছে; মৃদু হাসিয়া বলিল, "সে কি হয় ঠাকুরপো! আজ কদ্দিন পরে যদি দয়া করে এসেছ, একটু বসে যেতে হবে বই কি! বাড়ীর সব খপর কি বল? ছোট-বৌ কেমন আছে? নারাণ কেমন আছে? পুঁটীকে অনেকদিন দেখিনি, সে কত বড়টি হ'ল?" ইত্যাদি প্রশ্ন-জালে দীনুকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

পিঁড়ির উপর বসিয়া দীনু বলিল, "তোমার আশীর্ব্বাদে খবর আর সবই ভালো, কেবল এই ক'দিন বৃষ্টি-বাদলায় ছোট-বৌয়ের হাঁপানী কাশীটা একটু বেড়েছে।" এইরূপ সংক্ষেপে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর সারিয়া দীনু মাইতি অবাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিল, তাই ত এ কি ব্যাপার! কোথায় সে মনে করিয়াছিল বৌঠাকরুণ না জানি তাহাকে কত তিরস্কারই করিবে, হয় ত বা অপমান করিতেও ছাড়িবে না! এই ভয়েই ত এতদিন সে এখানে মুখ দেখাইতে পারে নাই! কিন্তু এ কি!—এ কি অকৃত্রিম সাদর অভ্যর্থনা! বৌঠাকরুণ যে মুহূর্ত্তমাত্র দ্বিধা না করিয়া সহাস্যে, প্রফুল্ল মুখে নির্ব্বিকার চিত্তে তাহার সেই স্বেচ্ছায় পরিত্যক্ত স্নেহাঞ্চল-খানি সাগ্রহে বিছাইয়া দিবে, এ ত দীনু স্বপ্নেও আশা করিতে পারে নাই!

দাওয়ার এক পাশে একখানি জীর্ণ, মলিন মাদুরের উপর কোমরে একটী ঘুন্‌সী-বাঁধা দিগম্বর মতিলাল তখনও ঘুমাইতেছিল। ক্ষ্যান্তমণি তাহাকে ঠেলিয়া তুলিল, "মতি! ওঠ্ ওঠ্—চেয়ে দেখ্ কে এসেছে?" মতি তাড়াতাড়ি উঠিয়া চোখ রগ্‌ড়াইতে-রগ্‌ড়াইতে, নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল "হ্যাঁ মা! বাবা ফিরে এসেছে বুঝি?" পরিহিত বসন-প্রান্তে পুত্রের ললাট ও গ্রীবাদেশ হইতে সযত্নে স্বেদবিন্দু মুছাইয়া দিয়া মা বলিলেন "দুর বোকা ছেলে! চেয়ে দেখ্ না কে এসেছে—যা, পেন্নাম করে পায়ের ধুলো নিয়ে আয়।" মতি এবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়া—যেন চিনিতে পারিল। অমনি ছুটিয়া কাকার কোলের উপর গিয়া বসিল। ক্ষ্যান্তমণি জিজ্ঞাসা করিল, "কে বল্ দেখি, মতি?" মতি কাকার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল "হ্যাঁ, আমি বুঝি জানিনি,—এ ত আমার কাকা!" তার পর দুষ্ট মতি তাহার কাকার কোল হইতে কাঁধের উপর উঠিয়া বসিল; এবং দুই হাতে কাকার চিবুক ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল,—"কাকা, তুমি এসেছ? বাবাও আসবে। তুমি কোথায় চলে গেছলে? তুমি চলে গেলে, বাবা চলে গেল, সব্বাই চলে গেল—আর আমি ঘোঁড়া-ঘোঁড়া খেলতে পাইনি। মা ভাল ঘোঁড়া হতে পারে না—কাকা, আর তোমাকে পালাতে দিচ্ছিনি কিন্তু;—লক্ষীটী কাকা, আর আমি তোমাকে চাবুক মার্ব্ব না কেমন?"—দীনুর চক্ষের পাতা অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। মতিকে কাঁধ হইতে বুকে টানিয়া লইয়া, তাহার গায়ে-মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইতে-বুলাইতে দীনু বলিল "ছেলেগুলো বড্ড রোগা হয়ে গিয়েছে বৌঠান!" ক্ষ্যান্ত-মণি উদাসভাবে বলিল, "কি কর্ব্ব ভাই, সমস্ত দিন যে

দুষ্টুপনা করে,—মাথার উপর শাসন কর্ব্বার ত আর কেউ নেই। তবু তুমি মাণ্‌কেটাকে এখনও দেখনি ঠাকুরপো! সেটার একেবারে অস্থি-চর্ম্ম-সার হয়েছে। তাকে দেখ্‌লে তুমি হয় ত আমাকে ঝাঁটা-পেটা কর্ব্বে।"

মাণ্‌কের বিষয় বলিবার জন্যই দীনু মাইতি আজ এখানে আসিয়াছিল; কিন্তু স্নেহের অত্যাচারে এতক্ষণ তাহা ভুলিয়াছিল। হঠাৎ মাণ্‌কের নাম শুনিয়াই তাহা মনে পড়িয়া গেল। দীনু সাগ্রহে বলিয়া উঠিল—"হ্যাঁ, ভাল কথা বৌঠান, মাণ্‌কেকে তুমি ও কাজে দিয়েছ কেন? ওখানে ত ওকে রাখা হবে না।" ক্ষ্যান্তমণি বেশ সহজ ভাবেই বলিল,"বেশ ত', তুমি যা ভাল বোঝ, কর না,—এ সব তো তোমারই দেখ্‌বার কথা,—আমি মেয়েমানুষ, আমি কি ভাই অত-শত বুঝি?" দীনু এক গাল মুড়ী মুখে পুরিয়া চিবাইতে-চিবাইতে বলিল, "না—তা, বৌঠান; দেখ, আর কোন আপত্তি ছিল না আমার—তবে কি জান—কাজটা বড় খাটো কাজ—"ক্ষ্যান্তমণি এবার একটু যেন বিরক্ত হইয়া বলিল—"বলি হ্যাঁগা ঠাকুরপো—সে ছোঁড়ার কি এই কাজ কর্ব্বার বয়স? এমন বয়সে যে তোম্‌রা ছিলে পাঠশালার পোড়ো!—"দীনু একটু অপ্রতিভ হইয়া সমস্ত গুড়টুকু মুখের ভিতর পুরিয়া বলিল—"আমিও তাই বলতে যাচ্ছিলেম, বৌঠা'ন,—ওকে আবার পাঠশালাতেই দাও। আর দিনকতক পড়াশুনা করুক,—ক্রমে শুভঙ্করীটা দোরস্ত হয়ে গেলে,চাই কি এর পর সেরেস্তায় একটা কর্ম্ম-কাজ কিছু জুটে যেতে পারে, বুঝ্‌লে?" ক্ষ্যান্তমণি যদিও হাসিতে-হাসিতে বলিল, "সবই বুঝি ঠাকুরপো,—কিন্তু কথা হচ্ছে কি জান, জমীদার-বাড়ী ও দুবেলা দুমুটো খেয়ে বাঁচ্‌ছে—পাঠশালে দিলে যে ওকে না খেয়ে পড়তে যেতে হবে! খালি পেটে কি শুভঙ্করীটা ভাল দোরস্ত করতে পার্ব্বে—বাপকে হারিয়ে তুমি যেমন গোবর-গণেশ দাদা পেয়েছিলে, ওর তো ভাই তেমন দাদা কেউ নেই!"—কিন্তু দীনুর পিঠে এই কথা গুলোই যেন সজোরে চাবুক মারিল,—শৈশবের সমস্ত ইতিহাসটা এক নিমেষে যেন তাহার চক্ষের সম্মুখে চিত্রের মত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। অপরাধীর মত নতমুখে সে বলিতে লাগিল,"আমায় মাপ কর, বৌঠা'ন, আমি তোমাদের সঙ্গে বড়ই অধর্ম্ম করেছি! মাণিককে বোলো, কাল থেকে দুবেলা আমার ওখানে খেয়ে পড়তে যাবে। আর গুরুমশাইকে আমি বলে দেবো এখন,—ওর পাঠশালার খরচ আমার কাছে চেয়ে নেবে।" মাণিকের মা শুধু বলিল, "বেশ, কাল থেকে তার সেই ব্যবস্থাই হবে; তবে তুমি নিজে কাল সকালে একবার এসে ছোঁড়াটাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেও;—নইলে হয় ত হতভাগা যেতে চাইবে না!" "আচ্ছা, তাই আস্‌বো" বলিয়া দীনু উঠিয়া পড়িল। ক্ষ্যান্তমণি তাহাকে উঠিয়া পড়িতে দেখিয়া বলিল,"ও কি, এর মধ্যেই উঠে পড়লে যে ঠাকুরপো! ওই কটা মুড়ি,তাও যে সব পড়ে রইল—না—না, তা হবে না,—ও ক'টা দানা গালে ফেলে দাও"—দীনু হাত জোড় করিয়া বলিল,"দোহাই বৌঠান, আর পার্ব্ব না,—জমীদার বাড়ী আজ অনেকগুলো আম খেয়েছি—পেটটা বোঝাই হয়ে রয়েছে—" আমের কথা শুনিয়াই মতি গিয়া কাকার হাত ধরিয়া আব্দার করিল, "আমি আঁব খাব কাকা!—আমাকে আঁব এনে দাও,"—দীনু তখন ছাতাটি বগলে করিয়া চটি জুতাটি পায়ে দিয়াছে। কিন্তু মতি ছাড়ে না কিছুতেই,—আম সে এখনি খাইবেই—অগত্যা ক্ষ্যান্তমণি তাহাকে শাসন করিতে উদ্যত হইল। দীনু তখন ট্যাঁক হইতে একটা চক্‌চকে সিকি বাহির করিয়া মতির হাতে দিয়া বলিল, "এই নাও বাবা, কাল হাট বার আছে, আঁব আনিয়ে খেও।" মতি সিকি পাইয়াই চম্পট দিল। ক্ষ্যান্তমণি পুত্রের এই কাঙালের মত আচরণে অপ্রতিভ হইয়া দেবরকে বলিল, "অলবড়ে ছোঁড়াটা যত বড় হচ্ছে, তত ব্যাদড়া হচ্ছে—জমি-জমা-গুলো গিয়ে পর্য্যন্ত আঁব-কাঁঠাল ত বড় একটা খেতে পাচ্ছে না কি না—"দীনু আর ইহার কোনও উত্তর না দিয়া নিঃশব্দে তাহার এই অসীম সহিষ্ণু বৌঠাকুরুণের পদপ্রান্তে যথার্থ ভক্তির সহিত মাথাটি আজ এই সর্ব্বপ্রথম অকপট শ্রদ্ধায় অবনত করিয়া গৃহে ফিরিল। প্রাঙ্গণ পার হইতে-হইতে শুনিতে লাগিল স্নেহময়ীর সুমধুর আশীর্ব্বাদ—"বেঁচে থাক—সুখে থাক্‌ ভাই, রাজা হও,—অখণ্ড পেরমাই হ'ক—"

রাত্রিতে আহারাদির পর দীনু তক্তাপোষের উপর বসিয়া তামাক খাইতেছে,—দীনুর স্ত্রী মাতঙ্গিনী মেঝেয় বসিয়া বুকে-পিঠে গরম তেল মালিশ করিতেছে। দীনু বার-কয়েক তার ডাবা হুঁকাটায় সজোরে টান মারিয়া, নাক-মুখ দিয়া অনেকটা ধোঁয়া বাহির করিয়া, কাশিতে কাশিতে বলিল,

"শুনেছিস্ বৌ, মাণ্‌কেটা জমীদার-বাড়ী পাখাটানা কাজে ঢুকেছে? ছি—ছি, লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেছে! আমি হলুম সেরেস্তার একটা বড় চাকুরে—একটা মান্যগণ্য আম্‌লা,—আর আমারই ভাইপো সেখানে একটা পাখাটানা বেয়ারা হয়ে রইল! তাও আবার মিনি-মাইনের পেট-ভাতে!—কতদূর অপমানের কথাটা বল্ দিকি!" মাতঙ্গিনী হাঁপাইতে-হাঁপাইতে বলিল "ওমা কি ঘেন্না! বড়্‌কীর আক্কেলকে বলিহারী যাই! হারামজাদা মাগী তোমার মুখ হেঁট করাতেই বজ্জাতি করে ওখানে ছেলে পাঠিয়েছে বোধ হয়! গতরখাগীর বেটীর পেটে-পেটে শয়তানী বুদ্ধি!" দীনু একটু কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, "দূর! তা কেন! বৌঠানের আমি তত দোষ দিইনি—ছোঁড়াটাকে নিয়ে গেছে ঐ শালা শ্রীমন্ত সর্দ্দার!" "বটে!—জমীদারের সর্দ্দার পেয়াদা হয়ে ব্যাটা ধরাকে সরা দেখেছে বুঝি! ড্যাক্‌রার আস্পর্দ্ধা ত কম নয়! ব্যাটা মরতো এতদিন জেলে পচে,—ওই বড়কীর বাপ-শক্‌ররাই ত বাদ সাধলে।" বলিতে-বলিতে মাতঙ্গিনীর হাঁপ আরও প্রবল হইয়া উঠিল। দীনু বলিল, "সেই জন্যই ত ব্যাটা আজও ওদের গোলাম হয়ে আছে।" মাতঙ্গিনী মুখখানা তোলো হাঁড়ীর মত করিয়া বলিল, "এখন উপায়! শত্তুরেরা যে তোমার মুখ দেখান দায় করে তুল্লে!" দীনু এবার তামাকের সমস্ত ধোঁয়াটুকু হুঁকার খোল হইতে যেন নিঃশেষে টানিয়া লইয়া সগর্ব্বে বলিল, "সে উপায় কি না করেই বাড়ী ঢুকিছি রে? শাস্ত্রে আছে 'যাক্ প্রাণ, থাক্ মান।' আজ কাছারীর ফেরত সটান ওবাড়ী গিয়ে হাজির হয়েছিলুম। বড় বৌকে অনেক বুঝিয়ে-সুজিয়ে ছোঁড়াটাকে চাকরী ছাড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করে এসেছি।" এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই মাতঙ্গিনীর মুখখানা বেশ প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল, এবং হাঁপানীর টানও একটু কম পড়িয়াছিল; কিন্তু পরক্ষণেই দীনু যেই বলিল—"কাল থেকে মাণ্‌কে দু'বেলা আমার এখানে খেয়ে ওই বৈকুণ্ঠ পণ্ডিতের পাঠশালে শটুকে পড়তে যাবে"—মাতঙ্গিনীর মুখ আবার অন্ধকার হইয়া উঠিল—এবং সঙ্গে-সঙ্গে হাঁপানির যতটুকু টান কম পড়িয়াছিল, তাহা আবার সুদে-আসলে দ্বিগুণ বেগে আত্মপ্রকাশ করিল। তথাপি চোখ দুইটা কপালে তুলিয়া, দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীটি গণ্ডদেশে স্থাপন করিয়া মাতঙ্গিনী সশব্দে বলিয়া উঠিল "ও সর্ব্বনাশ!—করেছ কি? তোমার কি আক্কেল-বুদ্ধি একরত্তি নেই? বাবু এ কথা শুনলে যে এখনি তোমায় জবাব দেবেন! তাঁর মিনি-মাইনের পাখাটানা বেয়ারাটাকে তুমি ভাঙ্গচি দিয়ে নিয়ে এসেছ,—এ কথা তিনি শুনলে কি আর রক্ষে রাখবেন?" এবার দীনুরও চোখ-দুটা কপালে উঠিয়া গেল এবং তাহার পত্নীর সত্যই এতটা বুদ্ধি-বিবেচনা আছে দেখিয়া, বেচারী বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া ভাবিতে লাগিল—তাই ত'! এ ত ঠিক বলিয়াছে! তার দুর্দ্দান্ত কৃপণ জমীদার প্রভু ত এ কথা শুনলে রক্ষে রাখ্‌বে না! এটা ত দীনুর মাথায় একবারও আসেনি—! হতাশ ভাবে দীনু তখন হাতের সেই প্রায়-নির্ব্বাপিত ধূম্র-লেশহীন হুঁকাটায় বারকয়েক নিষ্ফল টান দিয়া, আস্তে-আস্তে সেটাকে ঘরের কোণে নামাইয়া রাখিয়া মাতঙ্গিনীকে বলিল, "তবে উপায়! আমি যে বড় বৌকে বলে এসেছি কাল ভোরে গিয়ে মাণ্‌কেকে নিয়ে আসবো।" মাতঙ্গিনী একটা ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, "ওঃ! বলে এসেছ ত' একেবারে চোর-দায়ে ধরা পড়েছ না কি? না গেলে কি গলাটা কেটে নেবে?—এত কিসের তার ধরাধরি?—এখন কিছুদিন আর ওদিক মাড়িও না—আর কালই ছোঁড়াটাকে কোন সুযোগে জমীদার-বাড়ী থেকে তাড়াও!" দীনু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "আমি তাড়াব কি রে? সে কি আমাদের সেরেস্তায় কাজ করে? সে যে একেবারে বাবুর খাসে ঢুকেছে!" মাতঙ্গিনী তখন মালিশের তেলের ভাঁড়টা তক্তপোষের নিকট ঠেলিয়া রাখিয়া—তৈল-সিক্ত হাতটা মাথার চুলে ঘসিয়া লইয়া, শয্যার উপর উঠিয়া বসিল; এবং কণ্ঠস্বর একটু মৃদু করিয়া একেবারে দীনুর কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল, "দেখ, এক কাজ করলে হয় না?—দাও না ছোঁড়াটাকে চা-বাগানের কুলি-ডিপোয় চালান দিয়ে!" দীনুর সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল! এতখানি জিভ্ বাহির করিয়া দীনু বলিল, "ছিঃ! এমন কথা মুখে আনিস্ নি! তুই না ছেলের মা?"—মাতঙ্গিনী ইহার কোনও সদুত্তর দিতে পারিল না,—মুখখানা আষাঢ়ের কাল মেঘের মত করিয়া পিছন ফিরিয়া বসিল। দীনু বলিতে লাগিল, "অন্য কোনও একটা সোজা মৎলব ঠাওরা দেখি,—যাতে মনিবও না চটে, চাকরীটাও বজায় থাকে, অথচ কাজ হাঁসিল হয়! তোর মগজটা খুব সাফ্,—খাসা বুদ্ধি

বার করিস্ কিন্তু—" স্বামীর নিকট আত্ম-বুদ্ধির এই অযাচিত উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়া, মাতঙ্গিনী ত্বরায় প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিল; এবং তাহার উর্ব্বর মস্তিষ্কে সেই মুহূর্ত্তেই আর একটা যে সাধু মৎলব আসিয়া ঘন-ঘন ত্রিশূল ঠুকিতেছিল, তাহাই ব্যক্ত করিয়া ফেলিল। সেটা হইতেছে এই যে, কোন প্রকারে মাণিককে চোর প্রতিপন্ন করিয়া জমীদার-গৃহ হইতে বিতাড়িত করা। দীনু অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া, এ কার্য্যটা অপেক্ষাকৃত সহজ সাব্যস্ত করিয়া, এই উপায়ই অবলম্বন করিবে স্থির করিল।

(৩)

পরদিন সকালে দীনু মাণিককে লইতে আসিল না দেখিয়া ক্ষ্যান্তমণি চিন্তিত হইয়া উঠিল। তবে কি দীনুর অসুখ-বিসুখ করিল না কি? না রাতা-রাতি আবার মৎলব ফিরিয়া গিয়াছে? অনেক ভাবিয়া সে স্থির করিল, শেষোক্ত ব্যাপারটাই হওয়া সম্ভব। নিশ্চয়ই ছোট বৌয়ের পরামর্শে ঠাকুরপোর মতি-গতি আবার বদল হইয়াছে। এমন সময় শ্রীমন্ত সর্দ্দার আসিয়া হাঁকিল, "দিদিঠাকরুণ! মাণ্‌কে, মতি কোথা গো? তাদের জন্য আম এনেছি যে!" বলিতে-বলিতে সে গামছা খুলিয়া প্রায় ২।৩ কুড়ি ছোট-বড় আম্র দাওয়ার উপর ঢালিয়া দিল।

মতি তখন হেঁসেল-ঘরে ঢুকিয়া চুপি-চুপি তেল চুরি করিয়া মাখিতেছিল। আমের নাম শুনিয়াই সে তাহার বর্ত্তমান অবস্থা ভুলিয়া গেল; এবং মাথায় এক-খাম্‌চা ও পেটে এক-খাম্‌চা তেল শুদ্ধ ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। তার পর কাহারও অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই, দুই হাতে দুইটি আম তুলিয়া লইয়া, চক্ষের নিমেষে অদৃশ্য হইয়া গেল। মাণিক তখন তাহার পুরাতন শিশুবোধ ও জীর্ণ ধারাপাত-খানি ঝাড়িয়া-মুছিয়া, দপ্তর বাঁধিয়া, মাটীর দোয়াতের শুকনো কালিটুকু জল দিয়া ভিজাইয়া রাখিয়া, ফ্রেমহীন কোণ-ভাঙ্গা ছোট শ্লেটখানি অতি যত্নের সহিত কাঠ-কয়লার সাহায্যে ঘসিয়া-মাজিয়া পরিষ্কার করিতেছিল। শ্রীমন্তর গলা পাইয়া সে শ্লেট হাতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "শ্রীমন্ত-দা! আজ আর আমি জমীদার-বাড়ী যাব না,—কাকা এসে আমায় পাঠশালে নে যাবে বলেছে।" শ্রীমন্তর চক্ষে বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল। সে মাণিকের মার দিকে চাহিতেই ক্ষ্যান্তমণি বলিল, "শ্রীমন্ত-দা! তুমি এসে পড়েছ, ভালই হয়েছে। ছোঁড়াটাকে জমীদার-বাড়ী টেনে নিয়ে যাও, আর এই সিকিটা ঠাকুরপোর হাতে ফিরিয়ে দিও।" বলিয়া আঁচল হইতে সিকিটি খুলিয়া শ্রীমন্তর হাতে দিল; এবং সিকিটির সম্পূর্ণ ইতিহাস ও তৎপ্রসঙ্গে দীনুর আকস্মিক আবির্ভাব হইতে মাণিকের সম্বন্ধে নূতন ব্যবস্থার প্রস্তাব পর্য্যন্ত সমস্ত কথাই তাহাকে জানাইয়া অধীর ভাবে বলিয়া উঠিল, "ও সমস্তই বাজে কথা শ্রীমন্ত-দা! নইলে দেখ না কেন,—এত-খানি বেলা হ'ল তবুও ত কই নিতে এল না! আচ্ছা, ৺ না করুন, ঠাকুরপোর হঠাৎ কোন অসুখ-বিসুখ হয় নি ত?" শ্রীমন্ত মহাক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল, "হেঁ গো দিদিঠাকুরুণ, রাখ না ও কথা তুলে—বলি অসুখ কার বটে গো? সে ভেড়ের-ভেড়েরে যে এখনি হাটে দেখে এলুম গো! সে নিমখারামের একটা কথাও বিশ্বাস যেও না দিদিমণি—তা' তোমায় বলে দিচ্ছি। এ বাড়ীর হালচাল কি জানতে, এ নিশ্চয় সেই ভাল'লোকের মেয়ে তেনাকে পাঠিয়েছ্যালো! কিছু কুমৎলবে আছে মনে হয়। যাই হ'ক, আমি এর একটা বোঝা-পড়া করে লেব'খন।" বলিয়া শ্রীমন্ত-সর্দ্দার সিকিটা ট্যাঁকে গুজিয়া মাণিককে লইয়া জমীদার-বাড়ী চলিয়া গেল। সেই অবধি কি জানি কেন মাণ্‌কের মার প্রাণটা কেমন উতলা হইয়া রহিল।

অপরাহ্নে নিদ্রা-ভঙ্গের পর জমীদার-বাবু গাত্রোত্থান করিয়া, সময় দেখিবার জন্য বালিশের নীচে যখন তাঁর সোণার ট্যাঁক-ঘড়িটি খুঁজিয়া পাইলেন না, তখন বিস্মিত ভাবে এক-বার শয্যার এ কোণ, একবার ও-কোণ চার-কোণ অনুসন্ধান করিয়া, পার্শ্বস্থ টুলের উপর উপবিষ্ট মাণিকের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—ছোক্‌রার তন্দ্রাভিভূত শিথিল হস্ত হইতে ঝালর-দেওয়া রংচংএ পাখাখানি খসিয়া,মাটিতে পড়িয়া লুটাইতেছে; আর ছোকরার ছোট্ট মাথাটি ঘুমে ঢলিয়া অসম্ভব রকম সম্মুখ দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। প্রচণ্ড ক্রোধে জমীদার-বাবু তখন একটা হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন।

শীঘ্রই জমীদার-বাবুর বিস্তৃত অট্টালিকার সদর ও অন্দর মহলে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। কে-কে সে-দিন মধ্যাহ্নে বাবুর ঘরে আসিয়াছিল, তদারক করিয়া জানা গেল যে, দীনু মুহুরী ব্যতীত আর কেহই সে-দিন বাবুর কাছে আসে নাই। দীনু মুহুরী হলপ করিয়া বলিল, সে

একখানি জরুরী চিঠি সহি করাইবার জন্য বাবুর কাছে আসিয়াছিল বটে, কিন্তু ঘরের ভিতর প্রবেশ করে নাই; দুয়ার হইতেই বাবুকে নিদ্রিত দেখিয়া ফিরিয়া গিয়াছে, তবে মাণিককে সেই সময়ে বাবুর মাথার বালিশের নিকট হইতে যেন হঠাৎ চোরের মত সরিয়া আসিতে দেখিয়াছিল। ইত্যাদি। কিন্তু মাণিক বলে, সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, ঘড়ির বিষয় কিছুই জানে না। তথাপি মাণিককে একবার উলঙ্গ করিয়া তাহার কাপড় ঝাড়া লওয়া হইল; এবং এ উপায়েও যখন ঘড়ির একটা কাঁটাও তাহার নিকট পাওয়া গেল না, তখন প্রশ্ন উঠিল যে, মাণিক একবারও ঘরের বাহির হইয়াছিল, কি না? অনেকেই সাক্ষ্য দিল যে, হাঁ তাহারা একবার মাণিককে বাহিরে আসিতে দেখিয়াছে বটে। মাণিকও তাহা অস্বীকার করিল না,—সে যে প্রস্রাব করিতে একবার বাহিরে আসিয়াছিল, তাহা নির্ভয়ে কবুল করিল; এবং ইহাও বলিল যে, জমীদার-বাবু তখনও জাগিয়া ছিলেন,—তিনি চোখ বুজিয়া ফরসীর নলের মুখ হইতে ধোঁয়া টানিয়া ছাড়িতেছিলেন; এবং তাঁহার আলবোলাও তখনও পর্য্যন্ত সুস্পষ্ট ডাকিতেছিল। কিন্তু বিচারক ও তদন্তকারিগণ কেহই আলবোলা ও ফড়শীর নলের সাফাই সাক্ষ্য গ্রহণ করিল না। তাহাদের চক্ষে মাণিকের দোষ সপ্রমাণ হইয়া গেল; এবং আর অধিক কিছু অনুসন্ধানেরও কিছুমাত্র আবশ্যকতা রহিল না। তখন সকলে মিলিয়া, মাণিক ঘড়িটা চুরি করিয়া যথায় লুকাইয়া রাখিয়াছে, তথা হইতে শীঘ্র উহা বাহির করিয়া দিবার জন্য, বালকের উপর মহা পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিয়া দিলেন। মাণিক কিছুই জানে না,—ইহা অসংখ্য বার বলিয়াও যখন রেহাই পাইল না, তখন ভীত হইয়া উঠিল, এবং তাহার চোখ দুটি ছল-ছল করিতে লাগিল। তখন বাবুজীর আর ধৈর্য্য রহিল না। তিনি হুকুম দিলেন,—"মারের চোটে ছোঁড়ার কাছ থেকে ঘড়ি আদায় কর।" তিন-চারজন প্রভুভক্ত তৎক্ষণাৎ মনিবের আদেশ প্রতিপালনে তৎপর হইল। মাণিক এবার পরিত্রাহি চীৎকার করিয়া উঠিল। তখন শ্রীমন্ত-সর্দ্দার বাঘের মত লাফাইয়া পড়িয়া, মাণিককে অত্যাচারীর হস্ত হইতে ছিনাইয়া লইল; গর্জ্জন করিয়া বলিল,—"খবর্দ্দার, কচি ছেলের গায়ে হাত তুলো না।"

তার পর জমীদার-বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"হুজুর! এ দুধের বাচ্ছাটাকে আর মার-ধোর কর্ব্বেন না। আপনারা রাজা-উজীর মানুষ, একটা ফড়িং মেরে আর হাত গঁদাবেন কেন—তার চেয়ে একে জবাব দিন।" দীনু মুহুরী তখনও সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল। সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল,—"সেই ভাল বাবু, ছোঁড়াটাকে বাড়ী থেকে বার করে দিন।" জমীদার মহাশয় হুঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "চোপরাও! আমি কারু কথা শুনতে চাই নি,—আমি ঘড়ি চাই। সহজে না দেয়, আমি ও বিচ্ছু ছোঁড়াকে পুলিশে দোবো!" শ্রীমন্ত-সর্দ্দার যেন কতকটা তাচ্ছিল্যের ভাবে বলিল,—"এখুনি দিন হুজুর, সে ত ভাল কথা। তবে তারা এসে ত শুধু এ বাচ্ছাকে নে যাবে না—আপনার ওই দীনু মুহুরীটারও হাতে হাত-কড়ি প্বরাবে!" দীনুর মুখখানা তখন তার অন্তরের বিভীষিকায় পাংশুবর্ণ হইয়া গিয়াছে,—কণ্ঠতালু শুষ্ক, নীরস বক্ষের ভিতর রক্তের তাল যেন প্রচণ্ড তুফানে অতি দ্রুত ওঠা-নামা করিতেছে।

শ্রীমন্তের এতদূর স্পর্দ্ধা জমীদার মহাশয়ের অসহ হইয়া উঠিল। তিনি ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "তুই এখনি আমার জমীদারী থেকে দূর হয়ে যা! তোকে আর ঐ ছোঁড়াটাকে—তোদের দুজনকেই আমি আজ থেকে বরখাস্ত করলুম।" শ্রীমন্ত "যে আজ্ঞে" বলিয়া তাহার গোটা বৎসরের বাকী মাহিনা-পত্র হিসাব করিয়া চুকাইয়া দিতে বলিল। জমীদার-প্রভু হুঙ্কার দিয়া বলিলেন,—"এক পয়সাও পাবিনে; তুই ঐ ছোঁড়ার জামিন হয়েছিলি, তাই ত ওকে আমি রেখেছিলুম। তোর সমস্ত পাওনা টাকা-কড়ি দপ্তরে বাজেয়াপ্ত হ'য়ে গেল। যা, অমনি শুধু হাতে দূর হয়ে যা।" শ্রীমন্ত আর একটী কথাও কহিল না,—নিঃশব্দে মনিবকে একটী দণ্ডবৎ করিয়া মাণিকের হাত ধরিয়া বাহির হইয়া আসিল।

পথে যাইতে-যাইতে মাণিক বলিল, "শ্রীমন্ত-দা আমি ত ঘড়ী নিই নি!" শ্রীমন্ত সস্নেহে তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া বলিল, "সে আমি জানি ভাই, তোমায় কিছু বলতে হবে না।" মাণিক বলিল, "তবে কেন তুমি তোমার মাইনের টাকা-কড়ি ওদের দিয়ে এলে?" শ্রীমন্ত এবার ঠিক সমবয়স্ক বন্ধুর মত মাণিকের কাঁধের উপর

কৃষ্ণকান্ত ও হরলাল

"হরলাল। আমি বাল্যকালে গুরুমহাশয়ের গোঁপ পুড়াইয়াছিলাম ; এক্ষণে উইলও সেইরূপ পুড়াইব

শিল্পী—শ্রীভবানীচরণ লাহা] [বঙ্কিমচন্দ্র—কৃষ্ণকান্তের উইল

(Engraved at the Bharatvarsha Office).

একটা হাত রাখিয়া বলিল, "ওসব ছোটলোকদের পয়সা কি ছুঁতে আছে মাণ্‌কে? ও হ'ল গরীব-দুঃখীর রক্ত-শোষা কড়ি—নিলে মহাপাতক হয়!" মাণিক এ কথা-গুলো হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না; সুতরাং চুপ করিয়া রহিল।

যেদিন ভোরের ট্রেণে শ্রীমন্ত মাণিককে লইয়া কলিকাতায় রওনা হইল, সেদিন যাবার সময় চোখের জল মুছিতে-মুছিতে ক্ষ্যান্তমণি মাণিকের কোঁচার খুঁটে দশটা পয়সা বাঁধিয়া দিল; এবং শ্রীমন্তর হাতে মাণিককে কলিকাতায় লইয়া যাইবার গাড়ী-ভাড়া হিসাবে বার আনা পয়সা দিতে গেল। শ্রীমন্ত বলিল, "আমার কাছে ত টাকা-পয়সা রয়েছে দিদিঠাক্‌রুণ!" ক্ষ্যান্তমণি বলিল, "তা হ'ক, বিদেশে-বিভুঁয়ে যাচ্ছ, সঙ্গে কিছু বেশী থাকাই ভাল।" শ্রীমন্ত কিন্তু কিছুতেই লইতে চাহে না। তখন ক্ষ্যান্তমণি তাহাকে মাথার দিব্য দিয়া গছাইয়া দিল। শ্রীমন্ত এবার আর প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না বটে, কিন্তু যদি সে ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিত যে, কি করিয়া এই কপর্দ্দকশূন্য অনাথা বিধবা আজ এই ৮৵১০ সাড়ে চৌদ্দ আনা পয়সা সংগ্রহ করিয়াছে, তাহা হইলে সহস্র মাথার দিব্য দেওয়া সত্ত্বেও কিছুতেই সে উহা হাতে করিতে পারিত না। রুগ্ন স্বামীর চিকিৎসার জন্য ক্ষ্যান্তমণি একে-একে সংসারের সমস্ত তৈজসপত্রই বিক্রয় করিয়াছিল; কেবল রাধানাথ সারিয়া উঠিলে পথ্য করিবে বলিয়া একখানিমাত্র কাঁসার থালা অতি কষ্টে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল। পুত্রের বিদেশ-গমন উপলক্ষে তাহাই আজ সকালে কাঁসারীদের নিকট বন্ধক রাখিয়া সে এই ৮৵১০ সাড়ে চৌদ্দ আনা পয়সা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে।

মাণিক যখন তাহাকে গড় হইয়া প্রণাম করিয়া, তাহার দুই পায়ের ধুলা লইয়া গায়ে-মাথায় বুলাইয়া, শ্রীমন্তর সঙ্গে হাসিমুখে চলিয়া গেল, তখন দুয়ারে দাঁড়াইয়া তাহাদের দেখিতে-দেখিতে, ক্ষ্যান্তমণির দু'চোখ দিয়া যেন অফুরন্ত অশ্রুজল নিঃশব্দে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। মতি এতক্ষণ মায়ের অঞ্চল ধরিয়া বায়না করিতেছিল, "ওমা! আমিও কলকাতা যাব,—আমাকেও পয়সা দে না—" কিন্তু হঠাৎ মায়ের চক্ষে সেই অবিরল জলধারা দেখিয়া, সে বালকও তৎক্ষণাৎ একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

(৪)

মস্ত একটা কাঠের সিন্দুকের মধ্যে শালুমোড়া কড়ি-বাঁধা একটা ডাগর সিঁদুর চুপ্‌ড়ির ভিতর সোণার ঘড়ি, ঘড়ির চেনটা লুকাইয়া রাখিতে-রাখিতে সহাস্য বদনে মাতঙ্গিনী বলিল, "দেখ্‌লে ত—আমার বুদ্ধি শুনে চল্‌লে সব দিকে ভাল হয়! কেমন নিখরচায় একটা সোণার ঘড়ি-ঘড়ির-চেন হ'ল—ওদিকে শত্রুও বিদেয় হ'ল! একঢিলে দু'পাখী ম'ল। শ্রীমন্ত মুখপোড়ার যে অন্ন উঠেছে, এতে আমি খুব খুসী! এতদিনে মা-কালী আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছেন। ড্যাকরা মিন্সে বড় বাড় বাড়িয়েছিল,—তেম্‌নি হ'ল; হাতে-হাতে তার শাস্তি ফলেছে। আর হবে নাই বা কেন? মাথার উপর এখনও ভগবান রয়েছেন,—আজও সাঁঝ-সকালে চন্দ্র-সূর্য্যি উদয় হচ্ছেন; পাপের ফল ফল্‌বে না?" বলিতে-বলিতে সিন্দুকের ডালা বন্ধ করিয়া, শিকল আঁটিয়া, ডবল তালা-চাবি লাগাইয়া, আঁচলে-বাঁধা চাবির গোছা মাতঙ্গিনী বেশ প্রফুল্ল চিত্তে কাঁধের উপর ঝনাৎ করিয়া পিঠের দিকে ঝুলাইয়া দিল।

এই সময়ে বেশ জোরে আর এক পশলা বৃষ্টি নামিল। মাতঙ্গিনী তাহার ছোট ঘরের ছোট-ছোট জানালা-দুটী বন্ধ করিয়া দিয়া, নিশ্চিন্ত প্রসন্ন গতিতে আজিকার সুসিদ্ধ কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ তাহার আজ্ঞাবাহী মানুষটীর চিবুক ধরিয়া একটু সোহাগ করিবার জন্য কাছে আসিয়া, সহসা উদ্যত হাতখানি নামাইয়া লইল। দীনু তখন দুই হাতে তাহার মাথার দুইটা রগ টিপিয়া ধরিয়া, চোখ বুজিয়া বসিয়া ছিল। তাহার সমস্ত মুখখানা লাল হইয়া উঠিয়াছে,—সর্ব্ব শরীর ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে! মাতঙ্গিনী ব্যগ্র উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাগা, অমন করে রয়েছ কেন? কি হয়েছে? এত কাঁপুনি ধরেছে কিসের? অসুখ-বিসুখ কিছু করেনি ত?"

দীনু কাঁপিতে-কাঁপিতে অতি কষ্টে বলিল, "শীগ্‌গীর একটা লেপ-কাঁথা কিছু এনে আমায় চাপা দিয়ে বেশ করে টিপে ধর ছোট বৌ,—আমার বড্ড কাঁপুনি ধরেছে—ভয়ানক জ্বর আস্‌ছে!" ঘরের মট্‌কার উপর চালের বাতার সহিত দড়ী দিয়া বাঁধা লেপ-কাঁথা ঝুলিতেছিল;—মাতঙ্গিনী আর দ্বিরুক্তি না করিয়া ছুটিয়া গিয়া উঠান হইতে মইখানা টানিয়া আনিয়া মট্‌কায় লাগাইল; এবং কাঁথা পাড়িতে

তাড়াতাড়ি তাহাতে উঠিতে লাগিল। দুর্ভাগ্যক্রমে প্রায় যখন ডগার নিকট পৌছিয়াছে, তখন তাহার অতিমাত্র ব্যস্ততায় বর্ষার জলসিক্ত বাঁশের সিঁড়িটা তাহাকে শুদ্ধ লইয়া সশব্দে শানের মেঝের উপর হড়্‌কাইয়া পড়িল। দীনু হঠাৎ সেই শব্দে চম্‌কাইয়া চাহিয়া দেখিল, সর্ব্বনাশ হইয়াছে! মই শুদ্ধ মাতঙ্গিনী মেঝের উপর আছাড় খাইয়া সংজ্ঞা হারাইয়াছে। সে প্রবল জ্বরের উপরও মাতালের মত টলিতে-টলিতে উঠিয়া আসিয়া, মাতঙ্গিনীকে তুলিতে গিয়া দেখিল, তাহার মাথার এক জায়গায় অনেকখানি ফাটিয়া গিয়া ভীষণ রক্ত ছুটিতেছে।

মই-সিঁড়ির সহিত মাতঙ্গিনীর পতনের শব্দে নারায়ণ ও পুঁটির ঘুম ভাঙিয়া গেল। পুঁটি ভয় পাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। নারায়ণ উঠিয়া খুকীর হাত ধরিয়া বাপের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। দীনু তখন মাতঙ্গিনীর মাথার যেখানটা কাটিয়া গিয়া রক্ত ছুটিতেছিল, সেখানটা হাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া ছিল। নারায়ণকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিল, "নারাণ উঠিছিস্? শীগ্‌গীর যা বাবা,—একবার দাদাঠাকুরকে ডেকে নিয়ে আয়। বলিস্, মা পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হ'য়ে গেছে,—আপনি এখনি আসুন, বড় বিপদ!" নারায়ণ তৎক্ষণাৎ দরজা খুলিয়া বাহির হইতে গিয়া ফিরিয়া আসিল। দীনু তাহাকে ফিরিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'লরে, গেলিনে?" নারায়ণ একটু কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, "বাইরে যে বড্ড অন্ধকার বাবা!" বালক অন্ধকারে একা যাইতে ভয় পাইতেছে দেখিয়া দীনু বলিল, "এক কাজ কর;—খুকীকে সঙ্গে করে নিয়ে দু'জনে যা, ভয় নেই। ছুটে যাবি, ছুটে আসবি—দেরী করিস্‌নি যেন।" অগত্যা নারায়ণ পুঁটির হাত ধরিয়া তৎক্ষণাৎ আদুড় গায়েই বাহির হইয়া গেল।

সদ্য-বর্ষণ-ক্লান্ত আকাশে তখনও নিবিড়, ঘন-কৃষ্ণ মেঘ পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে। আষাঢ়ের ঘন-ঘটায় ক্ষণে-ক্ষণে বিদ্যুৎ হাসিতেছে। দাদাঠাকুরের আটচালা দীনুর ঘরের খুব নিকটেই,—রায়েদের পুকুরের এপার আর ওপার। নারায়ণ পুঁটির হাত ধরিয়া একপ্রকার ছুটিয়াই যাইতেছিল। মাণিকের অপেক্ষা সে এক বৎসরের ছোট; আর পুঁটি প্রায় মতির সমবয়সী। নারায়ণ ও পুঁটি গিয়া যখন দাদাঠাকুরের খিড়কীতে ঘা' দিল, তখন চড়্‌চড়্ করিয়া আবার একপশলা বৃষ্টি নামিল। অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর দাদাঠাকুর যখন লণ্ঠন-হাতে, লাঠির ঠক্‌ঠক্ শব্দ করিতে-করিতে টোকা মাথায় দিয়া আসিয়া দরজা খুলিলেন, ছেলে-মেয়ে দু'টাই তখন বৃষ্টিতে একেবারে সম্পূর্ণ ভিজিয়া গিয়াছে।

(৫)

কলিকাতায় মাণিক এক কেরাণীবাবুর বাড়ী মাসিক দেড়-টাকা মাহিনার একটি চাকরী পাইয়াছিল; আর শ্রীমন্ত সর্দ্দার এক সওদাগরী আফিসের মালগুদামে আট আনা রোজে গাড়ী বোঝাই ও খালাসের কাজে নিযুক্ত হইয়াছিল।

দুর্ভাগ্যক্রমে মাণিকের মনিব কেরাণীবাবুটি একটী ক্ষুদ্র নবাব-বিশেষ! তাঁহার ঘড়ি ধরিয়া দুই বেলা চা খাওয়া, ঘন-ঘন তামাক খাওয়া, কাপড় কোঁচান, জামা ঝাড়া, জুতায় কালি লাগান, বৈঠকখানা পরিষ্কার রাখা—এ সমস্তই কাজে ঢুকিবার পরদিনই মাণিকের কাঁধে চাপিয়াছিল। তার পর ক্রমশঃ স্নানের পূর্ব্বে বাবুকে তৈল মর্দ্দন করা, আফিস যাইবার সময় জুতার ফিতা বাঁধিয়া দেওয়া, আফিস হইতে আসিলে জুতা মোজা খুলিয়া দেওয়া, গা-হাত-পা টিপিয়া দেওয়া ইত্যাদি সহস্র ছোট বড় ফরমাইস খাটাও সুরু হইল। ডাকিবামাত্র মুখে মুখে হাজির হওয়া চাই, হুকুম জাহির হইবামাত্র তামিল হওয়া চাই, কোন দিন ইহার এতটুকু ব্যতিক্রম হইলেই মাণিকের পৃষ্ঠদেশে প্রভুর চটি-জুতার চিহ্ন কিছুদিনের মত মুদ্রিত হইয়া থাকিত। এই দেড়-টাকা মাহিনায় ছোক্‌রা চাকরটি পাইবার অগ্রে বাবু নিজেই স্বহস্তে সমস্ত কার্য্য করিতেন; কারণ, তাঁহার বেতন ছিল, সেই কেরাণীকুলের সনাতন ৩০৲ টাকা মাত্র, এবং পৈত্রিক সম্বল ছিল একখানি ক্ষুদ্র দ্বিতল বাটী মাত্র। তাঁহার পত্নী সরমাকেও রাঁধুনী ও ঝিয়ের কাজ সমস্তই একা করিতে হইত। পাঁচ বৎসর পরে এবার পাঁচ টাকা বেতন বৃদ্ধি হওয়ায়, তিনি এই ভৃত্যটি নিযুক্ত করিয়া মেজাজটা হঠাৎ খুব উঁচু পর্দ্দায় বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন। বাটীতে কেহ আসিলেই, তিনি অকারণ উচ্চৈঃস্বরে মাণিককে আহ্বান করিয়া, একটা যা হ'ক কিছু ফরমাস্ করিতেন; এবং এই উপায়ে, তিনি যে অধুনা দস্তুর-মত একজন ভৃত্যের মনিব, তাহা সবেগে ঘোষণা করিতে ভুলিতেন না।

বাবুর কাছে মার খাইয়া মাণিক যখন কাঁদিতে বসিত,

তখন সরমা আসিয়া তাহাকে স্নেহবাক্যে ভুলাইত। পয়সা দিয়া খাবার দিয়া, সে বালকের বেদনা দূর করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিত। এই উপলক্ষে স্ত্রী-পুরুষে প্রায়ই বচসা হইয়া যাইত। সরমা বলিত, 'দেখ, তুমি কথায়-কথায় লোক-জনের গায়ে হাত তুলো না। তোমার না পোষায়, জবাব দিলেই পার,—মার ধোর কর্‌বার কি দরকার?" বাবু বলিতেন, "আবাৎ মার্ব্ব, বেটার-ছেলে কুঁড়ের সর্দ্দার—বসে-বসে আমার মাইনে খাবে? মার্ব্ব না? না মার্‌লে কি লোকজন টিট্ হয়? তুমি কিছু জান না। কুকুরকে নাই দিলে মাথায় উঠে! অত আদর দিয়ে তুমি আর চাকরটার মাথা খেয়ো না।"

সরমা বলিত, "ওঃ, ভারি চাকর রেখেছেন বাবু! দেড় টাকা মাইনে দিয়ে একটা দুধের ছেলেকে এনে, তার কাছে দশ-টাকা মাইনের একটা মদ্দর মত কাজ নিতে চাও না কি? ওই কচি বাচ্ছা,—ও কি তোমার এত কাজ পারে?" বাবু বলিতেন, "তবে এসেছে কেন মর্ত্তে চাকরী কর্ত্তে? যাক না,—ঘরে গিয়ে মায়ের কোলে শুয়ে তুলোয় করে দুধ খাক্ না গিয়ে। এখানে এসে মো'লো কেন?" সরমা বলিয়া উঠিত "ষাট্! ষাট্! পরের বাছা দুঃখের ধান্দায় চাক্‌রী করতে এসেছে,—তাকে অমন কোরে রাত-দিন 'মর্' 'মর্' বোলো না; ও-সব অকথা-কুকথা মুখে আন্‌তে নেই।" বাবু বলিতেন, "তবে কি চাকরকে দুবেলা 'আপনি' 'আজ্ঞে' কর্‌তে হবে না কি? বেটার-ছেলেদের জুতোর তলায় রাখলে তবে সিধে থাক্‌বে।" রাগে সরমার চোখ-মুখ রাঙা হইয়া উঠিত; সে বলিত, "ছিঃ—ছিঃ! ওসব হ'ল লক্ষ্মীছাড়া বুদ্ধি,—চাকর-বাকর কি লোকজনের মনে কষ্ট দিলে, লক্ষ্মীশ্রী থাকে না। চাক্‌রী করতে এসেছে বলে কি ওরা মানুষ নয়? তোমরাও ত আফিসে চাক্‌রী কর। তোমরাও ত সায়েবদের চাকর। তারা যদি রাত-দিন তোমাদের সঙ্গে এই রকম ব্যবহার করে, তা'হলে তোমাদের মনের অবস্থাটা কি হয় বল দেখি?" এ কথায় ভয়ানক রাগিয়া উঠিয়া বাবু বলিতেন, "চাকর কি রকম? আমরা সব লেখাপড়া-জানা ভদ্রলোকের ছেলে,—আফিসে হিসেব-কেতাবের কাজ করি,—সাহেবরা আমাদের সঙ্গে বাবু বলে কথা কয়,—আমাদের সঙ্গে এ রকম ব্যবহার কর্ত্তে ব্যাটাদের সাহস কি? যেদিন অপমান কর্ব্বে, সেদিন আমাদের কাছেও অপমান হবে না! গালা-গালি অমনি দিলেই হ'ল! বেটাকে রূল-পেটা করে' তখনি চাকরীতে ইস্তফা নিয়ে চলে আস্‌ব না!" সরমা তীব্র স্বরের সহিত হাসিয়া বলিত, "হ্যাঁ—হ্যাঁ, রেখে দাও না বাবু; তোমার যা বীরত্ব আমি জানি। তাই আফিস থেকে এসে, রোজ বাড়ীতে বসে ছোট-সাহেবের মুণ্ডুপাত কর,—আর এই বাগবাজারে বসে গাল দিলে সাহেব কিছু চৌরঙ্গী থেকে শুন্‌তে পাবে না জেনে, বেশ নিরাপদে মনের সাধ মিটিয়ে তাকে যাচ্ছেতাই গালমন্দ দাও! কই একদিনও ত তার সাম্‌না সাম্‌নি মুখের উপর একটা কড়া জবাব দিয়ে চাকরী ছেড়ে চলে আস্‌তে পার না?" তখন বাবু আর সহ্য করিতে পারিতেন না,—ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করিয়া বলিয়া উঠিতেন, "চাকরী ছেড়ে দিয়ে এলে, আর আমার পিণ্ডি চট্‌কে গিলবে কোত্থেকে তখন? বাপের বাড়ী থেকে কি মাসহারা বরাদ্দ করে এসেছ?" তর্ক যখন এইরূপে ক্রমশঃ ব্যক্তিগত কলহে পরিণত হইত, এবং স্ত্রীর পিতৃ-গৃহের দৈন্যের উল্লেখ করিয়া, দুর্ব্বৃত্ত যখন পত্নীকে ইতরের মুখে কটু কথা বলিয়া, অপমানের অসহ্য কশাঘাতে জর্জ্জরিত করিতে একটুও দ্বিধা বোধ করিত না, নিরুপায়া সরমা তখন নীরবে নতমুখে অশ্রুপাত করিত।

(৬)

সেই রাত্রিতে দাদাঠাকুর আসিয়া মাতঙ্গিনীর মাথা হইতে রক্তপড়া বন্ধ করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার জ্ঞান ফিরাইতে পারেন নাই। সকালে কৈবর্ত্তের মেয়ে নেত্যর মা আসিয়া দেখিল, দীনু মাইতির ঘরে সারি-সারি তিনটি বিছানা পড়িয়াছে। একটীতে দীনু নিজে জ্বর-বিকারে শয্যাশায়ী, আর একটিতে তাহার আহত-পত্নী মাতঙ্গিনী এখনও অজ্ঞান, অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া আছে; অপর একটিতে নারায়ণ ও খুঁটি সেদিন রাত্রে আদুড়-গায়ে জলে ভিজিয়া আসিয়া অবধি জ্বরে পড়িয়াছে। কে কাকে দেখে, কে কার মুখে জল দেয়। অমন যে পাড়া-কুঁদুলী নেত্যর-মা, —সেও আজ মনিবের রাজে আসিয়া যখন এখানের 'এই অবস্থা' দেখিল, তখন তাহারও মুখ দিয়া একটা আন্তরিক সহানুভূতিসূচক 'আহা' বাহির হইয়া গেল।

নিজের বার-মাস হাঁপানী কাশীর ব্যায়রামের অজুহাতে মাতঙ্গিনী ঘরের কাজ-কর্ম্মের সুবিধার জন্য

অল্প বেতনে এই 'নেত্যর-মাকে' নিযুক্ত করিয়াছিল। কথিত আছে যে, ইহার নিদারুণ বাক্যবাণে মর্ম্মাহত হইয়া ইহার একমাত্র বিধবা কন্যা, নৃত্যমণি না কি কাঁচা বয়সে অহিফেন-সেবনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। সে যাহা হউক, তাহার "পাড়া-কুঁদুলী" নামটা কিন্তু সে বর্ণে-বর্ণে সার্থক করিয়া তুলিয়াছিল। যথার্থই 'নেত্যর-মা' লোকের বাড়ী বহিয়া গিয়া ঝগড়া বাধাইয়া আসিত; এবং এখনও তাহার সে অভ্যাসটী পূর্ণমাত্রায় আছে। মাতঙ্গিনী ভিন্ন গ্রামের মধ্যে আর কেহ ইহাকে দু'চক্ষে দেখিতে পারিত না। সেই নেত্যর-মা ওরফে মঙ্গলা দাসীর মুখ দিয়া যখন 'আহা' বাহির হইয়া গেল, তখন দীনু মাইতির ঘরের যে খুব হৃদয়-বিদারক শোচনীয় অবস্থা, সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না। উঁকি মারিয়া-মারিয়া বার-কয়েক সে সকলকেই দেখিয়া আসিল; তার পর কে জানে কোন্ অলক্ষিত শত্রুকে সমস্ত সকালটা গালি দিতে-দিতে সে দীনুর ঘরের সমস্ত কাজগুলি সারিল। গাই দুহিয়া দুধ জ্বাল দিয়া সজ্ঞান রুগী কয়টীকে খাওয়াইল; কিন্তু মাতঙ্গিনীকে কিছুতেই এক পলা দুধও খাওয়াইতে না পারিয়া, বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার রোগের চৌদ্দপুরুষান্ত করিতে-করিতে, গাঁয়ের জমীদার-বাবুর পারিবারিক চিকিৎসক কবিরাজ শ্রীচিন্তামণি কবিভূষণ ধন্বন্তরী ভৈষজ্য-রত্নাকর মহাশয়ের কুটীরে গিয়া দেখা দিল।

"বলি হাঁগা কোব্‌রেজ মশাই! তুমি কেমন ভাল-মানুষের ছেলে গা? তোমার একটু আক্কেল-বিবেচনা নেই? বলি, সমস্ত লাজ-লজ্জার মাথা কি ওই ওষুধের খলে মেড়ে পানের রসে গুলে খেয়েছ' বাছা? দীনুর বাড়ীটা যে কা'ল রাত থেকে একটা হাঁসপাতাল হয়ে রয়েছে, তা কি একবার উঁকি মেরেও দেখে আসতে পারনি,—একটা খবরও নিতে পারনি! না হয় হলেই বা তুমি জমীদার-বাবুর মাইনে করা লোক গো,—তা' বলে কি গরীবদের ব্যামো হলে আর দেখ্‌বে না? এ আবার কি ঢং,—এতো আমার বাপের জন্মেও, কখন শুনিনি! আর এই যদি কর্ব্বে, তবে কার শ্রাদ্ধ কর্ত্তে মরতে আমার মাথা মুণ্ডু এই চিকিচ্ছি-বিদ্যেটা শিখে-ওই ছাই-পাঁশের বড়ি-পাঁচনগুলো মুটো-মুটো টাকা নিয়ে সৃষ্টির লোককে দিয়ে বেড়াও শুনি?" বলিতে-বলিতে নৃত্যর-মা একেবারে কবিরাজ মহাশয়ের বসিবার ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। কবিরাজ এই নৃত্যর-মাটীকে বেশ চিনিতেন; তৎক্ষণাৎ চাদরখানা কাঁধে ফেলিয়া, জুতাটা পায়ে দিতে দিতে বলিলেন, "এই চল বাছা যাই,—আমিও বেরুচ্ছি আর তুমিও এসেছ। তা ভালই হয়েছে, চল। এই একটু আগে দাদাঠাকুর নিত্যপূজা সারতে এসে, আমাকে খবর দিয়ে গেলেন,—চল যাই, এখনি গে দেখে আস্‌ছি।" সারাটা পথ বকিতে-বকিতে নেত্যর-মা কবিরাজ মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া চলিল।

মাতঙ্গিনীর জ্ঞান আর ফিরিল না। সমস্ত আয়ুর্ব্বেদ-সাগর মন্থন করিয়াও, কবিরাজ শ্রীচিন্তামণি কবিভূষণ ধন্বন্তরী ভৈষজ্য-রত্নাকর সেদিন এমন কোনও ঔষধামৃত আবিষ্কার করিতে পারিলেন না, যাহাতে দীনুর এই হৃত-চৈতন্য পত্নীটী পুনঃসঞ্জীবিত হইতে পারে। তবে তিনি তাঁর অসাধারণ নাড়ীজ্ঞান হইতে এটুকু বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, সম্ভবতঃ এই অভাগিনীর পরমায়ু প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে; এবং এ কথা যদিও তিনি কাহাকেও প্রকাশ করিয়া বলেন নাই, তথাপি কি-জানি-কোন্ এক অদ্ভুত উপায়ে শেষটা সকলেই জানিতে পারিয়াছিল যে, কবিরাজ মহাশয় বহুপূর্ব্বেই এরূপ যে হইবে, তাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন। সুতরাং সেদিন বেলা দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে মাতঙ্গিনীর নিঃসজ্ঞ প্রাণবায়ু বহির্গত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে জমীদার-বাটীর এই ধন্বন্তরী ভৈষজ্য-রত্নাকরটীর অত্যাশ্চর্য্য নাড়ীজ্ঞানের প্রশংসায় সমস্ত গ্রামখানি মুখরিত হইয়া উঠিল।

নিষ্কর্ম্মা হতভাগা ছোঁড়ার দল গামছা-কাঁধে কোমর বাঁধিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে,—মাতঙ্গিনীকে শ্মশানে লইয়া যাইবে। গ্রামের যে সকল ছোকরার সহিত তথাকথিত বিশিষ্ট সজ্জনগণ তাঁহাদের দৈনন্দিন সাধারণ জীবনে বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করিতেও অপমান বোধ করেন, একমাত্র তাহারাই দেখিতে পাই—দেশবাসীর এমনিই দুর্দ্দিনে প্রসারিত-করে গ্রামের বিপন্ন দুঃস্থগণের দ্বারে বুকভরা সহানুভূতি ও সমবেদনা লইয়া অযাচিতভাবে আসিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের ও দুঃখের বিষয় যে, সেই তথাকথিত বিশিষ্ট সজ্জনগণের অধিকাংশেরই চুলের টিকিটিও সে সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় না! উৎসবের দিনেও তাহারাই আসিয়া না কোমর বাঁধিলে, অতিথি-অভ্যাগতদের

অনাহারে ফিরিয়া যাইতে হয়। তাই তাহারা নিজেদের গ্রামের মান সম্ভ্রম, নিজেদের গ্রামের সুনাম বজায় রাখিতে অনেক সময় অনিমন্ত্রিতও আসিয়া উপস্থিত হয়; এবং খাটিয়া-খুটিয়া প্রাণপাত পরিশ্রমে সুশৃঙ্খলার সহিত কার্য্য সমাধা করিয়া দিয়া, একটা ধন্যবাদেরও অপেক্ষামাত্র না করিয়া চলিয়া যায়। আজিও দীনুর এই মহাবিপদে তাহারাই সর্ব্বাগ্রে ছুটিয়া আসিয়াছে,—কাহাকেও ডাকিয়া আনিতে হয় নাই।

দীনুর জ্বরের প্রকোপ তখন অনেকটা প্রশমিত হইয়াছে বটে, কিন্তু উত্তাপের একেবারে উপশম হয় নাই। প্রাঙ্গণে প্রশ্ন উঠিয়াছে, 'শবের মুখাগ্নি করিবে কে?' এ কথা তাহার কাণে পৌঁছিতেই, একটা প্রবল চেষ্টায় সে শয্যা ছাড়িয়া, টলিতে-টলিতে প্রাঙ্গণে বাহির হইয়া আসিল। মাতঙ্গিনীকে তখন বাঁশের খাটে শোয়ান হইয়াছে; এবং দাদাঠাকুর যথাশাস্ত্র অপঘাত-মৃত্যুর প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা করিতেছেন। গাঁয়ের সমস্ত সিঁদুর ও আল্‌তা আজ স্বামীর অগ্রগামিনী এই সৌভাগ্যবতী আয়তী নারীর মাথায় ও পায়ে আসিয়া জড় হইয়াছে। সহসা দীনুকে বাহিরে আসিতে দেখিয়া সকলে হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল। দুই-একজন গিয়া সত্বর তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। কেহ বলিল, "তুমি কেন উঠে এলে দীনু খুড়ো—যাও, শোও গে যাও।" কেহ বলিল, "ও কি দীনু-দা! আমরা যখন এয়েছি, তখন সব ব্যবস্থা করে নেবো,—তোমার ব্যস্ত হবার কোন দরকার নেই। যাও ভাই, ঘরের ভেতর যাও,—ছেলে-মেয়ে দুটোকে আগ্‌লাও গে।" রক্তজবার মত দু'টো রাঙা চোখ দিয়া দীনুর তখন অনর্গল অশ্রুধারা ছুটিতেছিল। বুকফাটা করুণ-রোদনের সঙ্গে পাগলের মত দীনু বলিতে লাগিল, "নারাণের অসুখ করেছে, পুঁটিরও জ্বর,—ওরে তাদের কাউকে তোরা ঘাটে নিয়ে যাস্‌নে,—তা'হলে তারা আর বাঁচবে না, মরে যাবে। ওরে, আমি যাব তোদের সঙ্গে, চল্‌ তোরা—আমাকেও নিয়ে চল্‌; আমি যাব, আমি আগুন দোবো, আমি পোড়াব, আমি জ্বাল্‌ব, আমাকেও জ্বালিয়ে দিবি চ'।" এইরূপে শোকের আঘাতে ও রোগের প্রকোপে দীনুর কথাগুলো যখন নিছক প্রলাপে দাঁড়াইতেছিল, তখন পশ্চাৎ হইতে এক চিরপরিচিত স্নেহ-কোমল স্নিগ্ধ-সজল, বেদনাতুর কণ্ঠের আবেগ-ভরা ডাক আসিল, "ঠাকুরপো! ছিঃ ভাই, তুমি না ব্যাটাছেলে! তোমার কি এ সময় অমন কাতর হ'লে চলে?" সচকিতে দীনু ফিরিয়া দেখিল, মতির হাত ধরিয়া মমত'ময়ী বৌঠাকুরাণী যেন মূর্ত্তিমতী অনুকম্পার মত আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। এই আপনার জনটিকে পাইয়া দীনু এবার বালকের মত ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল, "আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে বৌঠান!" ক্ষ্যান্তমণি জননীর মত অসীম স্নেহে দেবরের চোখ দু'টি মুছাইয়া দিয়া আপনার চক্ষু মার্জ্জনা করিলেন। কত না প্রবোধ বচনে ভুলাইয়া, ধীরে-ধীরে দীনুকে হাত ধরিয়া ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া, শয্যার উপর শোয়াইয়া দিলেন। শ্মশান-যাত্রীদের ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, "তোমরা বাছা মতিকে নিয়ে ঘাটে যাও,—ওকে দিয়েই কোন রকমে কাজটা সেরো,—এ অবস্থায় এদের কাউকে আম মেরে ফেল্‌তে পাঠাতে পার্ব্ব না।"

হরিবোল দিতে দিতে শ্মশান-যাত্রীরা শব দেহ তুলিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল; এবং 'নেত্যর-মা' যমরাজের চতুর্দ্দশ পুরুষের নরকের ব্যবস্থা করিতে-করিতে চারিদিকে গোবর-জল ছড়াইয়া দিতে লাগিল।

(৭)

দিন-দুই পরে একদিন জমীদার-বাবুর নাড়ী টিপিতে-টিপিতে কবিরাজ শ্রীচিন্তামণি কবিভূষণ বলিতেছিলেন, "উত্তম! নাড়ীর গতি অতি স্বাভাবিক! বায়ু পিত্ত-কফ্‌ তিনটিই বেশ সরল। শরীরে ব্যাধির কোনও লক্ষণই নাই। ঈশ্বর ইচ্ছায় আপনার স্বাস্থ্য অটুট থাকুক,—আপনি নিশ্চয়ই দীর্ঘজীবী হইবেন।" সহাস্য প্রফুল্লমুখে জমীদার-বাবু বলিলেন, "সে আপনারই ধন্বন্তরী-ব্যবস্থার অনুগ্রহে!" তার পর কবিরাজ মহাশয় আরও একটু অধিকতর তোষামোদের সুরে বলিতে লাগিলেন, "আপনার শ্রীচরণে আমার একটা নিবেদন আছে, যদি অভয় পাই জ্ঞাপন করি, নচেৎ—" একগাল হাসিতে-হাসিতে জমীদার-বাবু বলিলেন, "সে কি কবিরাজ মশাই, আপনার অনুরোধ আমি শুনবো না, এ কি কথা হল? আপনার দয়ায় যে বেঁচে আছি!" দুই হাত জোড় করিয়া বারবার কপালে ঠেকাইয়া, কবিরাজ মহাশয় বলিতে লাগিলেন, "সমস্তই নারায়ণের ইচ্ছা! আমি কে? শুধু উপলক্ষমাত্র। আমাকে

আপনাদের চিরানুগত দাসানুদাস বলেই জানবেন। কিন্তু সে যা হ'ক, এখন আমার বক্তব্যটুকু হুজুরের কাছে নিবেদন করিতে পারি কি না, আজ্ঞা করুন!" জমীদার-বাবু শশব্যস্তে বলিয়া উঠিলেন, "অবশ্য পারেন! অবশ্য পারেন! এখনি আজ্ঞা করুন কি করতে হবে,—আমি সাধ্যমত আপনার অনুরোধ রক্ষা করতে চেষ্টা কর্ব্ব জানবেন।" "আহা-হা, সে আর আপনাকে বলতে হবে না—বলতে হবে না। আপনি এ অধমকে কতখানি স্নেহ করেন, তা বিলক্ষণ জানি। আর তা জানি বলেই, সেই সাহসেই আজ আপনার কাছে এত বড় একটা দায়িত্বপূর্ণ প্রস্তাব উপস্থিত করিতে অগ্রসর হয়েছি।" বলিতে-বলিতে কবিরাজ মহাশয় ধীরে-ধীরে একটী সোণার ঘড়ি ঘড়ীর-চেন বাহির করিয়া প্রভুর সম্মুখে রাখিলেন। জমীদার-বাবু তাঁহার অপহৃত ঘড়ী ও চেন চিনিতে পারিয়া বিস্মিত-দৃষ্টিতে কবিরাজ মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিলেন। মৃদু-মৃদু হাস্য করিতে-করিতে কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, "অবশ্য, এ কার্য্য যে আমার দ্বারা হয় নাই, সে কথা বোধ হয় আপনার নিকট আমাকে আর শপথ করে বলতে হবে না, তবে ঘটনাটা হয়েছিল এইরূপ—" বলিয়া কবিরাজ মহাশয় একে-একে দীনুর মুখ হইতে বিকারের ঝোঁকে ঘড়ী-চেনের বৃত্তান্ত অবগত হওয়া ও মাণ্‌কের-মার সাহায্যে দীনুর মৃত-পত্নীর সিন্দুক হইতে তাহার উদ্ধার ও মাণ্‌কের-মার সদ্‌যুক্তি ও পরামর্শ এবং অনুরোধ মত উহা গোপনে জমীদার মহাশয়কে প্রত্যর্পণ; দীনুর এই অনিচ্ছাকৃত অপরাধ মার্জ্জনা করিবার জন্য মাণ্‌কের মার ও তাঁহার নিজের সানুনয় প্রার্থনা—প্রভৃতি সমস্ত সবিস্তারে তাঁহার গোচর করিয়া তিনি প্রভুর মুখের একটা অভয় বচন ভিক্ষা করিলেন।

জমিদার মহাশয় বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি শ্রীযুক্ত চিন্তামণি ভৈষজ্য-রত্নাকরকে আরও অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া—বহুবিধ প্রশ্ন ও জেরার পর যখন পরিষ্কার বুঝিতে পারিলেন যে, কেবল রেষারিষির উপর ও অল্পমতি স্ত্রীর প্ররোচনায় জ্ঞাতি-শত্রুতা সাধন করিবার মহদুদ্দেশেই দীনুর মত একজন পুরাতন ও বিশ্বস্ত মুহুরী যদিচ এইরূপ গর্হিত কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে কখনও লোভের বশবর্ত্তী হইয়া অথবা সোণার একটা ঘড়ী-ঘড়ীর-চেন পাইবার আশায়, কিম্বা একমাত্র নিছক চুরীর উদ্দেশেই হঠাৎ এরূপ অসাধু কার্য্যটা করে নাই,—তখন তিনি কবিরাজ মহাশয়কে অভয় দিয়া সমস্ত আইন-আদালতের ধারা অগ্রাহ্য করিয়া দীনু মাইতির অপরাধ সর্ব্বান্তঃকরণে মার্জ্জনা করিলেন; এবং তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা দূরে থাক, বরং এই বুদ্ধিমান আমলাটীর অতঃপর আরও কিছু বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। তবে দীনুর এই ব্যাপারে মাঝখান হইতে অনর্থক শ্রীমন্ত সর্দ্দারের মত একটা উপযুক্ত লোক যে জমিদারী সেরেস্তার হাতছাড়া হইয়া গেল, এজন্য যেন একটু বিশেষ ভাবেই তিনি আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন অগত্যা প্রভুভক্ত কবিরাজ মহাশয় শীঘ্রই শ্রীমন্ত সর্দ্দারকে অতি অবশ্য ফিরাইয়া আনিবেন প্রতিশ্রুত হইয়া জমীদার প্রভুর পুনঃ-পুনঃ দীর্ঘ জীবন ঘোষণা করিতে-করিতে হাসিমুখে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

(৮)

কবিরাজ শ্রীচিন্তামণি কবিভূষণ ধন্বন্তরী ভৈষজ্য-রত্নাকরের আন্তরিক যত্ন ও সুচিকিৎসায় এবং ক্ষ্যান্তমণির দিবারাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রমে দীনু যেদিন নীরোগ হইয়া প্রথম পথ্য করিল, ক্ষ্যান্তমণি জরাসুর, মা মঙ্গলচণ্ডী ও গাঁয়ের সিদ্ধেশ্বরী তলায় পূজা পাঠাইয়া দিল; এবং বৈকালে নেত্যর-মাকে ডাকিয়া ঘর-সংসার বুঝাইয়া দিয়া, পুঁটীকে কোলে করিয়া, নারায়ণকে চুম খাইয়া, মতির হাত ধরিয়া গৃহে ফিরিবার উপক্রম করিল। তখন নারায়ণ ও পুঁটী কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিতে লাগিল, "জ্যাঠাইমা, আমরাও যাব তোমার সঙ্গে—আমাদেরও নিয়ে চল।" দীনু ঘরের ভিতর হইতে নেত্যর-মাকে ডাকিয়া বলিল, "ওরে মঙ্গলা,—তুই এক কাজ কর—'যোদো'কে বল্ বড় গাড়ীখানায় বলদ জোড়াটাকে জোয়াল দিক্—আজ দিনটাও ভাল আছে—আমরা সবাই মিলে যাই পুরানো বাড়ীতে।" তার পর আস্তে-আস্তে বাহিরে আসিয়া—গমনোন্মুখ বৌঠাকুরাণীর পা দুইটা একেবারে জড়াইয়া ধরিয়া, সে একান্ত নিরুপায়ের মত অঝঝরে কাঁদিতে লাগিল। পূর্ব্বকৃত অপরাধের অনুতাপে এতদিন তাহার অন্তর দগ্ধ হইতেছিল; আজ চক্ষের জলে বৌঠাকুরাণীর পা দুটী ভিজাইয়া সে যেন কতকটা শান্তি পাইল—করুণ মিনতি-পূর্ণ কণ্ঠে অপরাধীর

মত কাকুতি করিয়া বলিতে লাগিল, "বৌদি, আমায় মাপ কর, তোমার দুটী পায়ে পড়ি—এমন করে আর আমায় কঠিন শাস্তি কোরো না,—আমাকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্তে দাও।" অসীম মমতাময়ী ক্ষ্যান্তমণি পুত্রাধিক এই দেবরের—আপনার স্বর্গগত স্বামীর বড় স্নেহ আদরের এই ভাইটীর আজ এই দীনতা, এই আকুলতা দেখিয়া—আর স্থির থাকিতে পারিল না। তাড়াতাড়ি পায়ের কাছ হইতে দীনুকে হাত ধরিয়া তুলিয়া, তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিবার সময় বারবার তাহার মনে পড়িতে লাগিল, স্বামীর সেই প্রবোধ বাক্য—"ওরে মাণ্‌কের মা! দীনু কি আমাদের পর রে?"

শরীরে একটু বল পাইবামাত্র দীনু নিজে গিয়া কলিকাতা হইতে মাণিক ও শ্রীমন্ত সর্দারকে সঙ্গে করিয়া দেশে ফিরাইয়া আনিল। মাণিকের মনিব কেরাণীবাবুটী সম্প্রতি আফিসের সাহেবের নিকট অপমানিত, লাঞ্ছিত ও কর্ম্মচ্যুত হইয়া বাড়ীতে বেকার বসিয়াছিলেন; সুতরাং মাণিককে কাজ ছাড়িয়া আসিতে আর অধিক বেগ পাইতে হয় নাই। সরমা চক্ষের জল মুছিতে-মুছিতে তাহার পাওনা-গণ্ডা হিসাব করিয়া স্বামীর নিষেধ সত্ত্বেও গোপনে মাণিকের হাতে বুঝাইয়া দিয়াছিল। মাণিক আসিয়া যখন মায়ের পায়ের কাছে দুই মাসের মাহিনা নগদ তিনটাকা ও একজোড়া নূতন কাপড় রাখিয়া প্রণাম করিল, তখন ক্ষ্যান্তমণির দুই চোখ বাহিয়া আবার একবার শ্রাবণের ধারা ঝরিতে লাগিল।

অপ্রকাশিত প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলী

[শ্রীআবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ]

প্রাচীন কালে চট্টগ্রামে সঙ্গীতের বড়ই আদর ও চর্চ্চা ছিল। তাহার ফলে এদেশে তখন বহু সঙ্গীত-গ্রন্থের রচনা ও অনেক সঙ্গীত-শাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিতের আবির্ভাব হইয়াছিল। সেই সঙ্গীত-গ্রন্থগুলি সাধারণতঃ 'রাগমালা' নামে পরিচিত। তাহাতে সঙ্গীত-শাস্ত্রের উৎপত্তি-রহস্য ও রাগ-রাগিণীর বিবরণ লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক রাগ-রাগিণীর সংস্কৃত ধ্যান ও বাঙ্গালায় তাহার অনুবাদ (পয়ার) আছে এবং প্রত্যেক রাগের নীচে সেই রাগে গেয় এক বা ততোহধিক গান প্রদত্ত হইয়াছে। সেই গানগুলি প্রায়ই বৈষ্ণব-পদাবলী এবং বিভিন্ন কবিগণের রচিত। এরূপ অনেকগুলি 'রাগমালা' আমার নিকট সংগৃহীত আছে। এই সব 'রাগমালা'র কল্যাণে অসংখ্য প্রাচীন হিন্দু ও মুসলমান কবির পদাবলী পাওয়া গিয়াছে। পাঠকগণ দেখিয়া থাকিবেন, সে সকল পদ আমি বহুদিন হইতে বঙ্গের নানা মাসিক পত্রে প্রকাশ করিয়া আসিতেছি। অদ্য হিন্দু কবিগণের রচিত কতকগুলি নূতন বৈষ্ণব পদ 'ভারতবর্ষে'র পাঠকবৃন্দের গোচর করিলাম। এই পদগুলির মধ্যে অনেকটা আমার বহু 'রাগমালা'র মধ্যে একখানি 'রাগমালা' হইতে সঙ্কলিত হইল। উহার রচনাকাল ১০৮৯ মঘী সন (১৬৪০ শকাব্দ) বা ২০১ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী। সুতরাং বলা বাহুল্য যে, ঐ পদগুলি তাহার পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল।

অদ্যকার পদগুলির রচয়িতৃগণের নাম এই :—

১। নুরচন্দ্র দাস। ২। গোবিন্দ বল্লভ। ৩। দ্বিজ পার্ব্বতী। ৪। দয়ারাম। ৫। প্রতাপাদিত্য। ৬। মর্কট বল্লভ। ৭। রাধাবল্লভ। ৮। দ্বিজ কুমুদ। ৯। কৃষ্ণদেব দাস। ১০। মুক্তারাম সেন। ১১। নট ভুঞিআ (ভুঞা)। ১২। কানু দাস। ১৩। দ্বিজ জানকী। ১৪। মোহন দাস। ১৫। শ্রীবরের ঝি।

এ সব কবির মধ্যে একমাত্র মুক্তারাম সেনের ভিন্ন আর কাহারও কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। মুক্তারাম সেন চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত আনোয়ারা গ্রামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং তিনি 'সারদা মঙ্গল' নামক চণ্ডী কাব্যের রচয়িতা(১)। তাঁহার যে দুইটি পদ এখানে প্রকাশিত হইল, তাহা তাঁহার রচিত উক্ত গ্রন্থে 'ধুয়া' স্বরূপ ব্যবহৃত দেখা

(১) অল্প দিন হইল, আমার সম্পাদকতায় এই 'সারদা মঙ্গল' বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার ভূমিকায় কবির জীবনী দ্রষ্টব্য।

যায়। 'শ্রীবরের-ঝি' নামে একজন স্ত্রী-কবির অস্তিত্বাভাষ সূচিত হইতেছে বটে, কিন্তু তাঁহার নামটি কি ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। অন্যান্য কবিগণের কোন পরিচয় পাওয়া না গেলেও, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সম্ভবতঃ চট্টগ্রামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করিবার নানা কারণ আছে।

বঙ্গ-সাহিত্যে বৈষ্ণব-কবিতাসমূহ এক অপূর্ব্ব সামগ্রী। উহাদের সৌন্দর্য্য, উহাদের মাধুর্য্য, উহাদের মনোহারিত্ব ভাষায় পরিব্যক্ত করা যায় না। উহাদের উপভোগ যেমন সহজ, ভাষাতে বুঝান তেমন সহজ নহে। চিনির যাহা গুণ, কুসুমের যে সৌন্দর্য্য, তাহা কে কবে কাহাকে বুঝাইতে পারিয়াছে? জগতের আর কোন ভাষায় কবিতা-সুন্দরী এমন মনোহারিণী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দেখা দিয়াছেন কি না,—আর কোন ভাষায় কবিতার ভিতর দিয়া প্রেম এমন মূর্ত্তিমান হইয়া আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে কি না, জানি না। শ্যামের সেই বাঁশরী, সেই বৃন্দাবন, সেই যমুনা-পুলিন, সেই পূর্ব্বরাগ, মান-অভিমান, বিরহ-মিলন—যাহা বৈষ্ণব-কবিগণ প্রাণের ভাষায় হৃদয়ের শোণিত দিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, ভাষার অপরাজেয় মাধুর্য্য-প্রভাবে তাঁহারা যে ভাবের, প্রেমের ও সৌন্দর্য্যের চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা বঙ্গ-সাহিত্যে আর কোথাও মিলে না। পাঠকগণ এই সকল কবিতার মধ্যে অনেকটিতেই তাহার সুন্দর অভিব্যক্তি দেখিতে পাইবেন। নিম্নে আমরা কবিতাগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

তাল—আড় খেমটা।

কি দিব কি দিব বন্ধু মনে ভাবি আমি।
জে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি॥
তুমি তো আমার হে বন্ধু আমি হে তোমার।
তোমার ধন তোমায় দিতে কি হবে আমার॥
নরচন্দ্র দাসে কহে সুন গুর্ণমনি।
তোমার অনেক আছে আমার কেবল তুমি॥ ১।

আসোয়ারী।

আখির পোতলী করি মুই বন্ধুরে রাখিমু।
লোকে জানাজানি হৈলে পলকে (পলক) ঢাকিমু॥ ধু।
বারে বারে বন্ধু মোরে জাও রে ভাড়াইয়া (২)।
বিরলে পাইলে বন্ধু না দিমু ছাড়িয়া॥
মেঘের বরণ বন্ধু কাজলের রেখা।
নব মেঘের আড়ে জেন চান্দে দিল দেখা॥
গোবিন্দবল্লভে বলে তেজিমু জীবন।
দিন মধ্যে একবার দেও দরশন॥ ২।

বিনোদিনী বিলম্ব করিতে না জুয়াএ (৩)
তুয়া পথ নিরক্ষিতে রহিয়াছে প্র
রাধা বোলি মুরড়ি বাজাএ॥
নপুর কিঙ্কিনী কেয়ুর কুণ্ডলমণি
পরিহরি কর লো গমন।
প্রিয় সখীর করে ধরি নীল নীচোপল পরি
দেখ গিয়া ও চান্দ বদন॥
তুয়া রূপ হেরি হেরি আকুল মুরারি
হেরিতে হরল গেয়ান (৪)।
কহে দ্বিজ পার্ব্বতী শুন শুন পুণ্যবতি
অলক্ষিতে নিকুঞ্জ পয়ান (৫)॥ ৩।

বসন্ত।

দেখরে নয়ান ভরি দোলে নারায়ণ।
দেখিলে ওহার (৬) মুখ তরএ সমন॥
দুই পাসে মরকতে ধরিয়া বিমানে।
শ্বেত চামর বাও (৭) করে সখীগণে॥
বৃন্দাবনে সারি সারি পতাকা উড়ে বাএ (৮)।
মত্ত কোকিল সবে পঞ্চম গাএ॥
রাধারে করিয়া বামে দোলে শ্যামরায়।
গোপিনী হেলান দিয়া মুরড়ি বাজাএ॥

(২)। ভাড়াইয়া—ভাঁড়াইয়া ; বঞ্চনা করিয়া।
(৩)। জুয়াএ—যুক্ত হয়।
(৪)। গেয়ান—জ্ঞান।
(৫)। পয়ান—প্রয়াণ।
(৬)। ওহার—উহার।
(৭)। বাও—বায়ু; বাতাস।
(৮)। বাএ—বাতাসে।

কেহ দেহি (৯) কুণ্ডে (কাণ্ড ?) রেণু কেহ দেহি গন্ধ।
হরি গুণ গাহে গোপী হইয়া আনন্দ ॥
কহে দেখ দয়ারামে বড় আশা মনে।
তরু লতা হৈমু গিয়া শ্যাম বৃন্দাবনে ॥ ৪।

রাগ—নট।

বন্ধুর লাগি কোন দেসে জাইমু।
রজনী প্রভাত হৈলে কার মুখ চাইমু ॥ ধু।
ভোখে ভাত নহি খাম্ পিয়াসে ন খাম্ পানি (১০)।
জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠে হৃদের আগুনি ॥
সুতিলে(১১) ন আইসে নিদ্রা বসিলে পোড়ে হিয়া।
বিষ খাই মরি যাইমু কালার বলাই লৈয়া ॥
প্রতাপ আদিত্যে কহে বিড়ম্বন আছে।
মিছা মিছা ভুলি রৈলুল এ ভব মায়া রসে ॥ ৫।

রাগ—মারহাটী।

অগো রাই কালার বাঁসী নিষেধ কর গিআ। ধু।
কুলবতী নারী হৈআ না জানি ঠেকিলুম গিআ
মুই না জানম্ কালার বাঁসী এমন সন্ধানিআ ॥
খাইতে নারো (১২) শুইতে নারো রৈতে নারি ঘরে।
নিরবধি ডাকে বাঁসী আয় কদম তলে ॥
কুলবতী নারী সব রৈআ (১৩) গৃহবাস।
না জানি কালার বাঁসী করে কোন আশ ॥
মর্কটবল্লভে কহে মরমের কথা।
মন মোর মজি রৈল বাঁসী বাজে জথা ॥ ৬

তুরি বসন্ত।

খেলে ত (খেলত ?) শ্রীবৃন্দাবনে নব ঘন সামু।
রঙ্গের রঙ্গিনী সঙ্গে খেলে অভিরাম ॥ ধু।
এক কানু সহস্র গোপী করিয়া মণ্ডরি (মণ্ডলী)।
মাঝে থাকি নটবরে বাজাএ মুররি (মুরলী) ॥
শ্বেত ফুলের মাল্য কার কার হাতে।
কেয়ুর(?) ভুসিত অঙ্গ শিখিপুচ্ছ মাথে ॥
রহিআ মণ্ডলি করে জুবতী সমাজ।
বসন ভুসন মণি মকুতা বিরাজ ॥
পিষ্টেত চামর দোলে বিচিত্র বিচনি (১৪)।
কহে রাধাবল্লভে সুভেস (১৫) কামিনী ॥ ৭।

প্রাচীন সাহিত্যে যেরূপ বানান প্রচলিত আছে, তাহা উল্টাইয়া দিতে গেলে তাহার প্রাচীনত্ব একবারে নষ্ট হইয়া যায় এবং সাহিত্যেতিহাস আলোচনার পথ রুদ্ধ হয়। এজন্য সুধীগণ প্রাচীন বানানে হস্তক্ষেপ করিতে একান্ত নারাজ। পাঠকগণ দেখিবেন, নিতান্ত সংস্কৃত শব্দগুলিতে ভিন্ন অন্যত্র আমরাও বড়-একটা হস্তক্ষেপ করি নাই।

এই সকল পদের ভাষা প্রাচীন সাহিত্যের ভাষা। তৎ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিয়া অকারণ প্রবন্ধ-কলেবর বর্দ্ধিত করিবার এখন আর প্রয়োজন দেখি না।

(৯)। দেহি—দেয়।
(১০)। ভোখে—ক্ষুধায়
পিয়াসে—পিপাসায়।
খাম—খাই।
(১১)। সুতিলে—শুইলে।
(১২)। নারো—নারোম্ নারোঁ ; না পারি।

(১৩)। রৈআ—রহিএ ; থাকি।
(১৪)। পিষ্টেত—পৃষ্টে বিচানি—ব্যজন।
(১৫) সুভেস—সুবেশা।

বিবিধ প্রসঙ্গ

স্বপ্ন

[শ্রীবীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায় বি-এল]

মনে সর্ব্বদা যে সমস্ত পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, স্বপ্ন তাহার একটী বৃহৎ শ্রেণীভুক্ত; এবং তাহাকে মনের একটী অবস্থা বলা যাইতে পারে। ঐ মানসিক অবস্থা সব সময়ে বাহ্য বস্তুর কার্য্যের ফল না হইলেও, চাক্ষুষ দৃশ্যের আকার ধারণ করে। আমাদের জাগ্রত অবস্থায় যে সমস্ত ক্ষণস্থায়ী দৃশ্য আমাদের মনে হয়, বিশেষতঃ নিদ্রার প্রাক্কালে যে সমস্ত দৃশ্য বা মূর্ত্তি আমরা উপলব্ধি করি, যে সমস্ত দৃশ্য মানসিক বিকার কালে অথবা ধর্ম্মের উত্তেজনা বলে বা সমাধি কালে আমাদের মানস পথে উদিত হয়, সে সমস্তই ঐ শ্রেণীভুক্ত। উন্মাদের, ভ্রম বিকার ও কৃত্রিম উপায়ে মনের পরিবর্ত্তন কালে যে সমস্ত দৃশ্য আমাদের মনে উদয় হয়, তাহাও ঐ শ্রেণীভুক্ত।

বাহ্যজগৎ হইতে আমাদের মনের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় স্বপ্ন-দর্শন ঘটে। নিদ্রাকালে ভ্রমণ বা চৌর্য্য প্রভৃতি অপরাধের অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তিগণের যে মানসিক অবস্থা তৎকালে ঘটে, তাহাতে তাহাদের মনের সহিত বাহ্য জগতের কতকগুলি সীমাবদ্ধ সম্বন্ধ থাকে। ডেমোক্রিটস্ বলেন যে, আকাশে বা শূন্যে যে সমস্ত পার্থিব দ্রব্য ভাসিয়া বেড়াইতেছে, তাহারা নিদ্রাকালে আত্মাকে আক্রমণ করে; এবং তাহার ফলে স্বপ্নদর্শন হয়। প্লেটো বলেন যে, জাগ্রত থাকার কালে স্পর্শ বা বোধগতি এবং চিন্তাশক্তির সংমিশ্রণ হইতে স্বপ্ন উৎপন্ন হয়। অ্যারিষ্টোটল্ বলেন যে, বাহ্য ইন্দ্রিয় সকলের কার্য্যশক্তি তাহাদের পশ্চাতে আত্মা ও শরীরের উপর যে সমস্ত চিহ্ন রাখিয়া যায়, তাহা হইতে স্বপ্ন উৎপন্ন হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উন্মাদের মানসিক অবস্থার সহিত স্বপ্ন দর্শনের কতকগুলি কৌতুকাবহ সাদৃশ্য আছে।

পৃথিবীর প্রথম অবস্থায় এবং অনেক অসভ্য জাতির মধ্যে স্বপ্ন ঈশ্বর-প্রেরিত আদেশ বলিয়া বিশ্বাস ছিল ও আছে। অসভ্য জাতিদের ধারণা এই যে, মানবের ও পৃথিবীর সমস্ত পদার্থের দুইটী মূর্ত্তি আছে; এবং স্বপ্ন দর্শন-কালে এক মূর্ত্তি নিদ্রা উপভোগ করে, অন্য মূর্ত্তি ভ্রমণ করে। পুরাকালে হিন্দুর মধ্যে স্বপ্নে প্রদত্ত অনুজ্ঞা দেবতা-প্রেরিত বলিয়া ধ্রুব বিশ্বাস ছিল; এবং স্থানবিশেষে স্বপ্ন অনুসারে কার্য্য হওয়ায়, সেই বিশ্বাস এখন পর্য্যন্ত আমাদের মধ্যে বদ্ধমূল আছে। পুরাকালে স্বপ্নের অর্থ করার জন্য বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন; রাজা যে স্বপ্ন দেখিতেন, তাঁহারা তাহার অর্থ করিতেন। পারস্য দেশের পণ্ডিতেরা কতকগুলি নিয়মানুসারে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করিতেন। আরবীয় পণ্ডিতগণ দুঃখ বা সুখ বা ঐশ্বর্য্য বা বিপদ-বোধক জ্ঞানে প্রত্যেক বাক্যের অর্থ করিতেন। কোন-কোন পণ্ডিতের মতে স্বপ্নগুলি জাগ্রত থাকা কালে চিন্তা ও কার্য্যের ফল স্বরূপ; কিন্তু সেগুলি এরূপ এলোমেলো ও বিচিত্র আকারের যে, তাহাদের প্রকৃত পদার্থের সহিত সাদৃশ্য অতি অল্পই থাকে। কিন্তু সেই মূর্ত্তি ও চিন্তা যতই অদ্ভুত হউক না কেন, স্বপ্নদ্রষ্টা তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হন না। স্বপ্ন সম্বন্ধে নানাপ্রকার কুসংস্কার আছে। এই সভ্যতার দিনে স্বপ্নের ব্যাখ্যার জন্য বহু পুস্তক লিখিত হইতেছে। অনেকের ধারণা যে, স্বপ্নে যাহা দেখা যায়, তাহার বিপরীত ঘটে। পূর্ব্বে প্রত্যেক পদার্থের যে দ্বিমূর্ত্তির কথা বলা হইয়াছে, থিয়সফি সেই মতের পোষক; তবে থিয়সফিষ্টদের মতে সেই মূর্ত্তি ইথার নামক অতি সূক্ষ্ম পদার্থে নির্ম্মিত জন্য তাহার নাম ইথারিক ডবল। থিয়সফির মতেও আত্মা দেহ ছাড়িয়া বিচরণ কালে স্বপ্ন দর্শন করে।

সাধারণ ভাষায় বা চলিত কথা-প্রসঙ্গে স্বপ্ন কাহাকে বলে, তাহা সকলেই জানেন; এমন কি শিশুরাও স্বপ্ন দেখিয়া হাসে, কাঁদে, ভয় পাইয়া চীৎকার করে। স্বপ্নে লোকে ঈশ্বরের আদেশ প্রাপ্ত হয়; কেহ বা স্বপ্নে বিছানা ছাড়িয়া দূরে চলিয়া যায়; কেহ বা স্বপ্নে আঘাত পায় এবং তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত শরীরে থাকে। মহাপ্রভুর ভক্ত পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি স্বপ্নে জগন্নাথ ও বলরাম প্রভুর নিকট চড় খান ও অঙ্গুলির চিহ্ন তাঁহার গালে ছিল। স্বপ্ন কি কারণে দেখা যায় ও কি প্রকারে স্বপ্নের উৎপত্তি হয়, তৎসম্বন্ধে পণ্ডিতগণের ভিন্ন-ভিন্ন মত দেখা যায়। কেহ বলেন, দিনে যাহা চিন্তা করা যায়, তাহাই স্বপ্নে দেখা যায়। কিন্তু লে হণ্ট বলেন যে, তিনি যখন দুই বৎসর জেলে ছিলেন, তখন দিন-রাত্রি জেলের বিষয় চিন্তা করিলেও, মাত্র দুই দিবস জেলের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। জড়বাদীরা (materialists) বলেন যে, স্বপ্ন শারীরিক কারণ হইতে উৎপন্ন হয়; শরীর সুস্থ ও পরিপাক-শক্তি উত্তম থাকিলে স্বপ্ন প্রায়ই দেখা যায় না; আর শরীর অসুস্থ ও জীর্ণ করিবার শক্তির ব্যাঘাত হইলে, নানারূপ ভীতিপ্রদ স্বপ্ন উৎপন্ন হয়। আত্মতত্ত্ববাদীরা বলেন যে, স্বপ্ন আত্মার অস্তিত্বের একটী বিশিষ্ট প্রমাণ। আবার থিয়সফিষ্টেরা (theosophists) বলেন যে, নিদ্রাকালে শরীর বিছানায় থাকে, এবং মন ও বুদ্ধি নানা বিষয় দর্শন করে। বিজ্ঞানের মতে, শরীরের মধ্যে যে অসংখ্য শিরা আছে, তাহাদের মেরুদণ্ড মস্তিষ্কে শেষ হইয়াছে; এবং তাহার সহিত সংযুক্ত সূতার ন্যায় শিরাগুলি সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া আছে। আমাদের দেহ কোন দ্রব্য স্পর্শ করিলে, সেই সূক্ষ্ম শিরার কম্পন (vibration) মস্তিষ্কে পৌঁছিলে, আমাদের স্পর্শ-অনুভূতি

বা বেদনা বা আনন্দ-অনুভূতি জন্মে। কিন্তু একজন লোক একটী গরিবকে অন্যায় পূর্ব্বক কষ্ট দিতেছে দেখিলেও, আমাদের কষ্ট অনুভূত হয়; কিন্তু সে ঘটনা কোনরূপে শিরা স্পর্শ করে না বা শিরার কম্পন উৎপাদন করে না। কৃত্রিম উপায়ে ক্লোরোফরম (chloroform) দ্বারা যে নিদ্রা বা অজ্ঞান অবস্থা হয়, তখন স্পর্শ-শক্তি না থাকিলেও, জ্ঞানের সম্পূর্ণ লোপ হয় না। একটী পাঁচ বৎসরের বালকের পৃষ্ঠে একটী ফোড়া অস্ত্র করার জন্য তাহাকে ক্লোরোফরম করা হয়। ফোড়া কাটা হইয়া গেলে, ডাক্তারেরা কে কি করিল, সে তাহা সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করিল। ঐরূপে দন্ত উঠাইবার জন্য অজ্ঞান করিলে, রোগী অস্পষ্ট চীৎকার করিয়া দন্তের দিকে হাত বাড়াইয়া দেখাইয়া দেয়। অনেকে বলেন, যাঁহারা কাব্যাদি লেখেন, তাঁহারা প্রায়ই স্বপ্ন দর্শন করেন; কিন্তু সুস্থ ও সবল লেখকেরা এ কথা স্বীকার করেন না। তবে তাঁহারা সম্পূর্ণ জাগ্রতাবস্থায় কল্পনা-রাজ্যে ভ্রমণ করেন ইহা সত্য হইলেও, স্বপ্নের সহিত তাহার সম্বন্ধ অতি সামান্য। আবার যাঁহারা অহিফেনসেবী, তাঁহারা অনেক সময় অর্দ্ধ-জাগ্রত অর্দ্ধ নিদ্রিত অবস্থায় থাকেন, এবং সর্ব্বদাই স্বপ্ন দর্শন করেন। নিদ্রিত অবস্থায় লোকের মুখ চাপায় (night-mare) ধরে; কারণ, চিৎ হইয়া শয়ন বা অতিরিক্ত পান ভোজন হইলে, নিদ্রিত ব্যক্তি অস্পষ্ট গোঁ-গোঁ শব্দ করে; এবং তাহার বোধ হয় যে, কোন সিংহ বা ব্যাঘ্র তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে;—কিন্তু তাহার শরীর এত শক্তিহীন যে, সে উঠিয়া পলাইতে বা দৌড়িতে পারিতেছে না।

মিলটন্ এক সময় স্বপ্ন দেখেন যে, তাঁহার মৃতা স্ত্রী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে কবির ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল এবং তিনি বুঝিলেন যে, তিনি অন্ধ,—তাঁহার পক্ষে বিশ্ব চির-নিদ্রায় আচ্ছন্ন। কোরাণে লিখিত আছে যে, একদিন প্রাতঃকালে হজরত মহম্মদ স্বর্গে যাইয়া তথায় নানা দেশ দর্শন করেন। সেই সমস্ত দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে স্বর্গীয় দূতগণের সহিত তাঁহার নানারূপ কথাবার্ত্তার পর, তিনি ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, যে শয্যা হইতে তিনি উঠিয়া স্বর্গে যান, তাহা তখন পর্য্যন্ত গরম আছে। তিনি যাইবার কালে, তাঁহার পায়ে বাধিয়া একটী জলপাত্র উল্‌টাইয়া পড়ে; কিন্তু ঐ পাত্রের জল তখন পর্য্যন্ত সমস্ত নিঃশেষ হইয়া পড়িয়া যায় নাই। আবার এই উপলক্ষে অ্যাডিসন্ বলেন যে, মিশরদেশীয় জনৈক সুলতান তাঁহার ধর্ম্মোপদেশককে বলেন যে, এই আখ্যান সত্য হইতে পারে না। তাঁহার ধর্ম্মোপদেশক এই কথা শুনিয়া বলেন যে, তিনি সুলতানকে বুঝাইয়া দিবেন যে, এই গল্পটী অসম্ভব নহে। ধর্ম্মোপদেশক রাজাকে একটী বড় বাল্‌তিপূর্ণ জল আনাইতে বলিলেন। তাহা আনীত হইলে তিনি সুলতানকে ঐ জলের মধ্যে মাথা ডুবাইয়া তৎক্ষণাৎ উঠাইতে বলিলেন। রাজা বালতির জলে মাথা ডুবাইয়া দেখিলেন যে, তিনি একটী সমুদ্রের কূলস্থিত একটা বৃহৎ পর্ব্বতের পাদদেশে উপস্থিত হইয়াছেন। রাজার প্রথমে মনে হইল যে, ধর্ম্মোপদেশক তাঁহাকে যাদু করিয়াছেন এবং এরূপ জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতার জন্য, ধর্ম্মোপদেশককে নানা প্রকার গালি দিতে লাগিলেন। কিন্তু ক্রমে সময় যাইতে লাগিল এবং সুলতানের ক্ষুধা বোধ হওয়ায় তিনি আহারের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। কতকক্ষণ ভ্রমণ করার পর জনকয়েক কাঠুরিয়াকে এক বনে গাছ কাটিতে দেখিয়া, তাহাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কাঠুরিয়ারা নিকটবর্ত্তী সহরে বাস করিত। তাহারা রাজাকে সেখানে লইয়া গেল। সহরে পরিশ্রমের দ্বারা রাজা কিছু টাকা জমাইলেন এবং একটী ধনী স্ত্রীলোকের পাণি-গ্রহণ করিলেন। বিবাহের পর স্ত্রী লইয়া ঘরকন্না করিতে লাগিলেন এবং রাজার ঐ স্ত্রীর গর্ভে ক্রমে চৌদ্দটী সন্তান জন্মিল। কিছুদিন পরে রাজার স্ত্রীর মৃত্যু হইল ও রাজার ধন-সম্পত্তি সমস্ত নষ্ট হইয়া গেল। এবার তিনি লোকের কাঠ বহিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে লাগিলেন। একদিন রাজা সমুদ্রের ধারে বেড়াইতেছিলেন। স্নান করিবার ইচ্ছা হওয়ায় তিনি জলে নামিলেন। এক ডুব দিয়া মাথা তুলিয়া দেখিলেন যে, তিনি তাঁহার মন্ত্রিগণের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছেন। মিসেস্ বেসান্ট তাঁহার 'স্বপ্ন' নামক পুস্তিকায় একটী সত্য ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। একজন বিখ্যাত ডাক্তারের দুইটী দাঁত উঠাইয়া ফেলা আবশ্যক হয়। অজ্ঞান অবস্থায় থাকার কালে কি ঘটে, তাহা তিনি বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু গ্যাসের ঘ্রাণ লওয়ার পর তিনি তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার মনে হইল যে, তিনি পরদিন নিদ্রা হইতে উঠিয়া বিজ্ঞান-সভায় বক্তৃতা করিলেন; এবং প্রত্যহ আশ্চর্য্য-আশ্চর্য্য তথ্য বাহির করিতে লাগিলেন। একদিন তিনি ইংলণ্ডের রয়াল সোসাইটীর সম্মুখে বক্তৃতা করার কালে একটী লোক বলিল যে সব শেষ হইয়াছে। তিনি এ কথার অর্থ কি জানিবার জন্য মুখ ফিরাইলে, একটী লোক বলিল দুইটাই বাহির হইয়াছে। তখন তিনি বুঝিলেন যে, তিনি দন্ত-চিকিৎসকের চেয়ারে বসিয়া আছেন এবং চল্লিশ সেকেণ্ডের মধ্যে ঐ সমস্ত স্বপ্ন দেখিয়াছেন। একজন জার্ম্মাণ পণ্ডিত বলেন যে, একদিন তিনি তাঁহার ভ্রাতার সহিত এক বিছানায় শুইয়া স্বপ্ন দেখিলেন যে, একটী নির্জ্জন গলির মধ্যে এক ব্যাঘ্র তাঁহাকে তাড়া করিতেছে। তাঁহার এত ভয় হইয়াছে যে, তাঁহার চীৎকার করিবার ক্ষমতা নাই; কিন্তু প্রাণের ভয়ে কেবল দৌড়াইতেছেন। তিনি একটা সিঁড়ির নিকট পড়িয়া গেলেন এবং ব্যাঘ্র তাঁহার উরুদেশে কামড়াইয়া দিল। তিনি চীৎকার করিয়া জাগিয়া উঠিলেন ও শুনিলেন যে, তাঁহার ভ্রাতা তাঁহার উরুতে চিমটি দিয়াছিলেন। আর একজন জার্ম্মাণ পণ্ডিত বলেন যে, এক ব্যক্তি বন্দুকের আওয়াজে জাগরিত হওয়ার পূর্ব্বে স্বপ্ন দেখে যে, সে সৈন্য হইয়া পলাতক হইয়াছে এবং তজ্জন্য অশেষ কষ্ট সহ্য করার পর ধৃত হওয়ায় তাহাকে গুলি করিয়া মারার আদেশ হইয়াছে। এইরূপ অনেক উদাহরণ আছে। অনেক সময় স্বপ্নে ভবিষ্যৎ ঘটনা সূচিত হয়। একদিন এক ভদ্রলোক স্বপ্ন দেখিলেন যে, তাঁহার প্রিয়তম পুত্র নিউইয়র্ক নগরে রাস্তার উপর পড়িয়া আছে। পরদিন তিনি সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহারই ঐ স্বপ্ন দেখার

সময়ে তাঁহার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে। এইরূপে অনেক সময়ে ভবিষ্যতে কি ঘটিবে, তাহাও স্বপ্নে দেখা যায়। ভবিষ্যতে কি বিপদ হইবে বা প্রিয়জনের মৃত্যু হইবে, তাহাও অনেক সময় স্বপ্নে দেখা যায়। আবার অনেক সময় স্বপ্ন এরূপ এলোমেলো হয় যে, তাহার কোন অর্থ হয় না। তবে এ কথা বোধ হয় সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে যে, অধিকাংশ স্বপ্ন অর্থহীন ও উদ্দেশ্যহীন।

সুতরাং উপরিউক্ত দৃষ্টান্তগুলি দ্বারা এই সিদ্ধান্ত হয় যে, স্বপ্ন ব্যক্তি-বিশেষের শরীরের ও মনের শক্তির উপর ও শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। যাঁহারা সর্ব্বদা ধর্ম্মালোচনা করেন, তাঁহারা স্বপ্নে দেবতার আদেশ প্রাপ্ত হন বলিয়া শুনা যায়। আবার যাঁহারা সাহিত্যিক বা লেখক, তাঁহারা তাঁহাদের রচিত পুস্তক বা যে রচনা করিবেন তৎসম্বন্ধে স্বপ্ন দেখেন। স্ত্রীলোকের মধ্যে যাঁহাদের সন্তান হয় নাই বা যাঁহারা সন্তানের প্রার্থি তাঁহারা পুত্র বা সন্তান সম্বন্ধে স্বপ্ন দর্শন করেন। কোন পুস্তকবিশেষ মনোযোগের সহিত পড়িতে-পড়িতে ঘুমাইয়া পড়িলে, সেই সম্বন্ধে স্বপ্ন দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন যে, আমরা যে সময়ে শয়ন করি, আমাদের মনের তৎকালীন অবস্থার উপর অনেক সময় স্বপ্নের ভাল-মন্দ নির্ভর করে। সেই জন্য শয়নের সময় যাহাতে অসৎ চিন্তা আমাদের মনে স্থান না পায়, তৎপক্ষে চেষ্টা করিলে সুস্বপ্ন দৃষ্টি করা ঘটে। তবে স্বপ্ন যখন সাধারণ চিন্তা-শক্তির অন্তর্গত, তখন ইচ্ছাশক্তির অবস্থার উপর স্বপ্নও নির্ভর করে। ইচ্ছাশক্তি মনের শাসন দণ্ড; চিন্তা কালে ইচ্ছা মনকে সংযত করিয়া রাখে, মন দেহকে সংযত করে। সুতরাং মনুষ্যকে জাগ্রত বা নিদ্রিত অবস্থায় চিন্তা করিতে হইলে, সংযমের উপর তাহার চিন্তা নির্ভর করে। চিত্তে যত প্রকার ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়, ততই চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়। আবার যখন আমাদের শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, ভাবস্রোত তত বল প্রাপ্ত হয়। পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তি যত দুর্ব্বল হয়, ততই তাহার চিন্তা অসম্বদ্ধ হইয়া পড়ে। ইচ্ছাশক্তি দুর্ব্বল হইলে যেমন মানসিক শক্তি কোন কার্য্যে লাগে না, সেইরূপ নিদ্রাবস্থায় ইচ্ছাশক্তি সুষুপ্ত হইলে, নানা প্রকার ভাবের নানা খেলা চিত্তকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলে। সেই জন্য আমরা দেখিতে পাই যে, প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির সংসর্গে দুর্ব্বল ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি আসিলে, সে প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির ইচ্ছা অনুসারে কার্য্য করিতে বাধ্য হয়।

আর একটা কথা এখানে বলা যাইতে পারে যে, কোন ব্যক্তিকে মেসমেরাইজ (mesmerise) করিলেও স্বপ্নের ন্যায় অবস্থা ঘটে; কিন্তু সে যাহা দেখে, তাহা অপরের ইচ্ছাশক্তির উপর নির্ভর করে। তবে শারীরিক ইন্দ্রিয়গুলি সুপ্ত অবস্থায় থাকিলেও, সে অবস্থা নিদ্রার অবস্থা নহে, বা তাহার চিন্তা বা উক্তি প্রকৃত স্বপ্ন পদবাচ্য নহে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, স্বপ্নে সত্য বিষয় জানা যায়; ভবিষ্যৎ বিষয় জানা যায়; যাহা ভবিষ্যতে ঘটিবে, তাহা ঘটিয়াছে বলিয়া জানা যায়; স্বপ্নে ভবিষ্যতের ঘটনা যাহা ঘটিবে না, তাহা ঘটিবে বলিয়া জানা যায়; দেবতার আদেশ সত্য-সত্য পাওয়া যায়; কখন-কখন কোন দেবতার মূর্ত্তি বনে কি জঙ্গলে থাকিলে তাহা ধার্ম্মিক লোক স্বপ্নে জানিতে পান। ইহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। আবার অনেক সময়ে স্বপ্ন মিথ্যা হয়, অর্থহীন হয়। সুতরাং এ সম্বন্ধে এই বলা যাইতে পারে যে, স্বপ্ন সম্ভব বা অসম্ভব হউক, তাহা ধ্রুব সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, বা তাহা মিথ্যা হাস্যাস্পদ বলিয়াও উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

স্বপ্নে কেহ দেখিলেন যে, তাঁহার প্রিয়তমা স্ত্রী বা পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে; পরে জাগিয়া পুত্র ও স্ত্রী সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় জীবিত আছে অনুভব করা কি সুখময়! আবার অনেক স্বপ্ন এত ভীতিপ্রদ যে, স্বপ্নেও নিদ্রিত ব্যক্তি ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠে। অনেক সুস্থ ব্যক্তির নিকট লেখক অবগত হইয়াছেন যে, তাঁহারা সাধারণতঃ স্বপ্ন দেখেন না; তবে বহুকাল ব্যবধানে কখন এক-একটা স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু তাহাও পর দিন প্রাতঃকালে অনেক সময় স্মরণ থাকে না। তবে সাধারণতঃ এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, আমরা যদি শরীরের উপর দৃষ্টি না রাখি, উপযুক্ত রূপ শারীরিক পরিশ্রম না করি, বা মাদক দ্রব্য ব্যবহার করি, অতিরিক্ত আহার করি, মানসিক পরিশ্রম সর্ব্বদা করি ও শারীরিক পরিশ্রমে বিমুখ হই, তাহা হইলে তাহার ফলে আমাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হইবে এবং সঙ্গে-সঙ্গে এই সমস্ত ভীতিপ্রদ বীভৎস স্বপ্ন দর্শন ঘটিবে। এতক্ষণ যাহা লিখিত হইল, তাহা দ্বারা ইহাই প্রতীয়মাণ হয় যে শরীরের স্বাভাবিক অবস্থার কোন প্রকার বিকার হইলেই স্বপ্ন দর্শন সুলভ হয়। অতিরিক্ত পান-ভোজন বা মাদক দ্রব্য গ্রহণ দ্বারা আমাদের ইচ্ছাশক্তির দৌর্ব্বল্য ঘটিলে স্বপ্নের আধিক্য হয়। আমাদের মনে সর্ব্বদাই নানা প্রকার চিন্তার উদয় হইতেছে; হয়ত এক সময়ে দুই প্রকার চিন্তার এক সঙ্গে উদয় হইতেছে। কিন্তু আমাদের ইচ্ছাশক্তি এই সমস্ত চিন্তাকে সীমাবদ্ধ রাখায় জাগ্রত অবস্থায় আমাদের জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য ঘটে না। নিদ্রাবস্থায় ইচ্ছাশক্তি একেবারে শক্তিহীন না হইলেও, সুষুপ্ত অবস্থায় থাকে। তাহার পর যদি অনিয়মিত পান ভোজন বা পরিশ্রম দ্বারা শারীরিক স্বাভাবিক অবস্থার বা নিয়মিত অভ্যাসগুলির ব্যতিক্রম ঘটে, তাহা হইলে চিন্তাগুলি অভিভাবকহীন বা শাসকহীন হইয়া পড়ে, এবং পালে-পালে, দলে-দলে সমস্ত চিন্তা এক সঙ্গে বাহির হইতে থাকে। পাঠশালার ছুটী হইলে বাটী গমনাভিলাষী বালকগণের ন্যায় তাহারা সম্মুখে কাহাকেও পাইলে তাহাকে পদদলিত করিয়া কেহ বিজ্ঞবেশে কেহ উন্মাদের বেশে কেহ বালকবেশে নাচিতে-নাচিতে, গাইতে-গাইতে বাহির হয়। বোধ হয় অনেকে স্বপ্নে নিজের মৃত্যু হইয়াছে ভাবিয়া গাত্রে স্পর্শশক্তি আছে কি না জানিবার জন্য, গাত্রে চিমটী কাটিয়া দেখিয়াছেন এবং তৎকালে স্বপ্ন ভঙ্গ হইয়া জাগরিত হইলে ভয়ে শরীর স্বেদযুক্ত হওয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। যখন এরূপ অবস্থা উপস্থিত হয়, তখন মনের উপর উপযুক্ত কর্ত্তৃত্ব থাকে না; তজ্জন্য এইরূপ চিন্তাময় স্বপ্ন নিদ্রার ব্যাঘাত করে। আত্মা শরীর ত্যাগ করিয়া যায় এবং দেহ মৃতবৎ বিছানায় পড়িয়া থাকে বলিয়া যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহারা বলেন যে, আমরা যে দেশ বা স্থান কখন দেখি

নাই, তাহা স্বপ্নে দৃষ্টি করার কারণ এই যে, নিদ্রাবস্থায় আত্মা জড়দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইলে ইহাও বিশ্বাস করিতে হয় যে, আত্মা ভৌতিক দেহ ত্যাগ করিয়া গেলেও মানবের জীবন বা জীবনী-শক্তি থাকিতে পারে। কারণ, নিদ্রাবস্থায় ইন্দ্রিয়সকল সুষুপ্ত অবস্থায় থাকিলেও সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্য্য হইতে থাকে। ইহা বিশ্বাস করিতে হইলে, আত্মার দুই অংশ থাকা বা জীবাত্মার দেহে থাকা ও কতক সময়ের জন্য পরমাত্মীর দেহত্যাগ করিয়া যাওয়া বিশ্বাস করিতে হয়।

শ্রদ্ধাস্পদ ব্রাহ্ম মৃত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মৃত্যুর কিছু দিবস পূর্ব্বে বিশ্বাস করিতেন যে, তাঁহার মৃতা স্ত্রী প্রত্যহ উপাসনার সময় তাঁহার সহিত যোগদান করেন এবং স্বামি-স্ত্রী একত্র ঈশ্বর-আরাধনা করেন। ইহা ভিন্ন তিনি মৃত মহাত্মগণের, যথা রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির উপদেশ অনুসারে তাঁহাদের সহিত কথোপকথন প্রশ্ন-উত্তরের আকারে লিপিবদ্ধ করিতেন; এবং ঐ সকল মহাত্মা কি অবস্থায় আছেন তাহাও লিখিতেন। ইংলণ্ডের বিখ্যাত সংবাদপত্র-সম্পাদক ষ্টেড সাহেব ঐ রূপ মৃত মহাত্মাদিগের নিকট হইতে ইংলণ্ডের ও য়ুরোপের রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রদত্ত প্রত্যাদেশ বা ভবিষ্যৎবাণী লিপিবদ্ধ করিতেন। কিন্তু যে মহাসমর ১৯১৪ সালের আগষ্ট মাসে আরম্ভ হইয়া পৃথিবীর সমস্ত জাতির ধন প্রাণ মান-মর্য্যাদা হরণ করিবে, নগর জনপদ মরুভূমিতে পরিণত হইবে, নিষ্ঠুর জার্ম্মাণ জাতি ও জার্ম্মাণ সম্রাট ইংলণ্ডবাসী নিরপরাধ শিশু-সন্তানদের উপর বোমা বর্ষণ করিয়া তাহাদের প্রাণনাশ করিবে, পৃথিবীর সুসভ্য জাতিরা নিষ্ঠুর অসভ্যের ন্যায় রোগীর হাসপাতালের উপর গোলা বর্ষণ করিবে, এবং খ্রীষ্টিয়ান হইয়া খ্রীষ্ট ধর্ম্মের জগৎ-বিখ্যাত মন্দিরগুলিকে ধূলায় পরিণত করিবে বা এই জগদ্ব্যাপী সমরানল কত দিনে শেষ হইবে, তাহা:ত কই কোন মহাত্মা বলিতেন না! এ পর্য্যন্ত যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাতে মোটামুটি এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, মনুষ্যের মনের ও শরীরের বিশেষ-বিশেষ অবস্থায় স্বপ্ন-দর্শন হয়। স্বপ্ন-দর্শনকারীর স্বভাব, নৈতিক উন্নতি বা অবনতি, অভ্যাস, বিদ্যা-বুদ্ধি, সাংসারিক জ্ঞান, ধর্ম্ম-জ্ঞান, দয়া, নিষ্ঠুরতা, শরীরের অবস্থা, শরীর ব্যাধিগ্রস্ত থাকা বা সুস্থ সবল থাকা, মনের শক্তির প্রবলতা, ইচ্ছাশক্তির দুর্ব্বলতা প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। জড়বাদী যাহাই বলুন না কেন, শুদ্ধ শরীরের অবস্থার উপর স্বপ্ন-দর্শন নির্ভর করে না, মস্তিষ্কের পরিচালনা বা ইচ্ছাশক্তির প্রাবল্যের উপর ইহা অনেক সময়ে নির্ভর করে। আবার, নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে মনের অবস্থা—মনের সুখ বা দুঃখ প্রভৃতি অনুসারে স্বপ্ন আনন্দদায়ক বা কষ্টদায়ক হয়। যাঁহাদের মন পবিত্র বা যাঁহারা সর্ব্বদা ধর্ম্ম বা ঈশ্বরের চিন্তা করেন, তাঁহাদের স্বপ্ন ঐ শ্রেণীর হয়। তস্কর, অধার্ম্মিক, পরপীড়ক ব্যক্তিরা তাহাদের প্রিয় অত্যাচারের স্বপ্ন দর্শন করে। স্বপ্ন কখনও অর্থপূর্ণ বা হিঁয়ালির ন্যায় হয়; আবার কখন কি ঘটিবে তাহা স্পষ্টরূপে জানাইয়া দেয়। গণৎকার গণের উক্তি যেমন অল্পই সত্য হয়, সেইরূপ স্বপ্ন দুই একটী সত বা ভবিষ্যৎ অবস্থার পরিচায়ক হইলেও প্রায়ই মিথ্যা হইয়া থাকে স্বপ্ন দর্শনকারী বুদ্ধিমান, প্রবল ইচ্ছাসম্পন্ন ব্যক্তি হইলে, তাহার স্ব প্রায়ই এলোমেলো বা অর্থশূন্য হয় না, তবে অসম্ভব হইয়া থাকে যে রাত্রে স্বপ্ন দৃষ্ট হয়, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী দুই-এক দিনের চিন্তা গতি ও উদ্দেশ্যের উপর স্বপ্ন বিশেষরূপে নির্ভর করে। রণক্ষে যুদ্ধে নিযুক্ত সৈনিকগণ অনেক সময় মাতা, স্ত্রী, পুত্র কন্যার স্বপ্ন নিজ শয়নের ঘর, প্রিয় অঙ্গুরি বা ঘড়ি প্রভৃতির স্বপ্ন দর্শন কর কবি, গ্রন্থকর্ত্তা, সাহিত্যিকগণ নিজ প্রিয় চর্চ্চার বিষয়ে স্বপ্ন দেখে ভিক্ষুক পরদিন ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যের স্বপ্ন দেখে। এইরূপ সব স্ব বেষ্টনকারী অবস্থার উপর স্বপ্নের প্রকৃতি, অবস্থা, ঔৎকর্ষ, ক্রোধ হাস্যোদ্দীপকতা, করুণরসাশ্রিত অবস্থা প্রভৃতি নির্ভর করিলেও, সময়ে তাহা সত্য নহে। মনের বা আত্মার ও শরীরের উভ যৌথ অবস্থা হইতে স্বপ্নের উৎপত্তি হয়। এবং মনের অবস্থা তৎকা পরিষ্কার না থাকিলে স্বপ্ন যাহা দেখা যায়, তাহাও পরদিন প্রাতে থাকে না। আবার যাঁহাদের চিন্তাশক্তি সামান্য, তাঁহারা স্বপ্ন দর্শন করেন না। তবে এই সিদ্ধান্ত স্বাভাবিক যে, নিদ্রাবস্থায় ম সামান্য কারণে বিচলিত হয়। সেই সময়ে তাহার গাত্রে যদি দু'ফো জল দেওয়া যায়, তবে হয় ত সে স্বপ্ন দেখিবে যে, ঝড়ে বা বৃষ্টিতে তা সমস্ত শরীর ভিজিয়া গিয়াছে। মানসিক শক্তি যাঁহাদের উন্নত, তাঁ উত্তম স্বপ্ন দর্শন করেন, দুর্ব্বল বা অজীর্ণরোগগ্রস্ত ব্যক্তি অস্পষ্ট, অ অর্থহীন স্বপ্ন দর্শন করে। যুবকেরা বৃদ্ধ হইতে অধিক স্বপ্ন দর্শন ক এবং যাঁহারা দিনের বেলা জাগ্রত অবস্থায় ধনী, মানী, ক্ষমতা হইবেন কল্পনা করেন, স্বপ্নেও তাঁহারা ঐরূপ ভাবে ধনী-মানী হইয় দৃষ্টি করেন। দু' একটী স্বপ্ন অত্যন্ত আশ্চর্য্য রূপে ফলবান্ হই তাহার দ্বারা এ সিদ্ধান্ত হয় না যে, সমুদায় স্বপ্নই ঐরূপ ভাবে পরিণত হইবে। অনেকে মৃত্যুর পূর্ব্বে মৃত্যু আসন্ন বুঝিতে পা সুতরাং তাঁহাদের মনে নিজের বা প্রিয়জনের মৃত্যু সম্বন্ধে চিন্তা পাইলে তদ্বিষয়ে স্বপ্ন দর্শন অসম্ভব নহে। শয়নের পূর্ব্বে যদি হইতে দূষিত চিন্তাগুলি বিতাড়িত করিয়া পবিত্র ও ধর্ম্মবিষয়ক দ্বারা মনকে আকৃষ্ট করা যায়, তাহা হইলে হয় ত স্বপ্ন দর্শন ঘটিবে ঘটিলেও, সে স্বপ্ন সুখকর হইবে। এ সম্বন্ধে যে আলোচন হইল, তাহাতে স্বপ্ন কি কারণ হয় ও তাহা কোনরূপে নিবারণ পারা যায় কি না তৎসম্বন্ধে মত এত ভিন্ন-ভিন্ন যে, তাহা হইতে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায় না। তবে পৃ সমস্ত কার্য্যে যেমন সুখ দুঃখ জড়িত, সেইরূপ স্বপ্নও সুখ জড়িত;—কোন সময়বিশেষ সুখের কারণ ও কখন অতীব কারণ হয়।

একটী ধর্ম্ম সম্প্রদায়

[শ্রীআশুতোষ তরফদার]

সাধ্

উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে শব্দের অন্তস্থ হ্রস্ব ইকার, দীর্ঘ ঈকার, হ্রস্ব উকার ও দীর্ঘ উকারের প্রায় উচ্চারণ করিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। যেমন—

গতি=গৎ। পতি=পৎ। কুমারী=কুঙার।
মধু=মধ্। ধাতু=ধাৎ। সাধু=সাধ্।
সাধু অর্থাৎ সাধ্।

সাধুর লক্ষণ সম্বন্ধে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, প্রথমভাগ, অষ্টম খণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ১১৯ পৃষ্ঠায়' প্রতিবেশীর প্রশ্নে ৺রামকৃষ্ণ পরমহংস উত্তর দিয়াছিলেন, "যাঁর মন প্রাণ অন্তরাত্মা ঈশ্বরে গত হয়েছে, তিনিই সাধু। যিনি কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী, তিনিই সাধু। যিনি সাধু, তিনি স্ত্রীলোককে ঐহিক চক্ষে দেখেন না, সর্ব্বদাই তাদের অন্তরে থাকেন; যদি স্ত্রীলোকের কাছে আসেন, তাঁকে মাতৃবৎ দেখেন ও পূজা করেন। সাধু সর্ব্বদা ঈশ্বর-চিন্তা করেন। ঈশ্বরীয় কথা বই কথা কহেন না। আর সর্ব্বভূতে ঈশ্বর আছেন জেনে, তাদের সেবা করেন। মোটামুটি এইগুলি সাধুর লক্ষণ।"

সাধু বলিলে আমরা বুঝি যে, যিনি সংসার-ত্যাগী ও ঈশ্বরে অনুরাগী তিনিই সাধু। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে এক ধর্ম্মমণ্ডলী দেখিতে পাওয়া যায়, আহারা সাধু নামে খ্যাত। ইহারা ঈশ্বরে অনুরক্ত বটে, কিন্তু সংসারী। ইহাদিগের আদিবাসস্থান পঞ্জাব; কিন্তু এক্ষণে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ইহাদিগকে অধিক সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। সম্বৎ ১৭০০ অব্দে (১৫৪৩ খৃষ্টাব্দে) 'সৎনামী' সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক রাই দাসের শিষ্য উধো দাসের নিকট হইতে নরনৌনের নিকটস্থ বিজেশ্বরের বীরভান (বীরভানু), গুপ্ত আদেশ প্রাপ্ত হন। তাহা হইতে তিনি এই 'সাধ্' সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন করেন। উধোদাস ভবিষ্যতে তাঁহাকে দেখিলেই চিনিতে পারিবেন, এইরূপ কতকগুলি বিশেষ বিষয়ে বীরভানকে উপদেশ দেন।

(১ম) তাঁহার (উধোদাসের) ভবিষ্যদ্বাণী নিশ্চয়ই কার্য্যে পরিণত হইবে। (২য়) তাঁহার দেহের ছায়া পতিত হইবে না। (৩য়) মনের কথা বলিতে পারিবেন। (৪র্থ) শূন্যে অবস্থিতি করিতে পারিবেন। (৫ম) মৃতের জীবন দান করিতে পারিবেন। সাধ্দিগকে যুক্ত-প্রদেশের অধিবাসীগণ 'সাধ্' নামেই অভিহিত করে; কিন্তু সাধ্গণ আপন সম্প্রদায় মধ্যে 'সৎনামী' নামে অভিহিত।

সাধ্গণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই তাঁহাদিগকে শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিতে হইবে। অলঙ্কার কিম্বা বিলাসযোগ্য পরিচ্ছদাদির ব্যবহার নিষিদ্ধ। ইহারা টুপির পরিবর্ত্তে একপ্রকার পাগড়ী ব্যবহার করে। ইহারা কখনও মিথ্যা কথা কহিবে না, কিম্বা কোনপ্রকার শপথ করিবে না। কোন প্রকার মাদক দ্রব্য বা ভোগ-বিলাস সম্বন্ধীয় কোন দ্রব্য সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবে। সুরা, অহিফেন, গঞ্জিকা, সিদ্ধি, সুপারী ও ধূম্রকূট ইহাদিগের নিকট অস্পৃশ্য ও ঘৃণ্য। পশু হইতে সামান্য কীট পর্য্যন্ত ইহারা কখন হত্যা করে না। ঈশ্বরকে ইহারা 'সৎ' (সত্য) কহে। যদি কোন য়ুরোপীয় ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হয়, তবে কেবল বক্ষঃ পর্য্যন্ত হস্ত উঠাইয়া অভিবাদন করে। ইহাদিগের মূর্ত্তি পূজায় বা ধর্ম্ম সম্বন্ধে বাহাড়ম্বরযুক্ত ক্রিয়ায় বিশ্বাস নাই। ইহারা নিজেদের ধর্ম্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধে কাহাকেও কোন কথা কহে না,—কেবল মৌনাবলম্বন করিয়া থাকে। ইহাদিগের ধর্ম্ম-সঙ্গীতের নাম 'বাণী'; ধর্ম্ম-গ্রন্থের নাম 'পোথী' (পুঁথী); তাহা হিন্দি ভাষায় লিখিত। গীতগুলির অধিকাংশ নানক ও কবীর-উক্ত সদুপদেশ হইতে গৃহীত। ইহাদের ধর্ম্মালয়ের নাম 'জুমলা ঘর' বা 'চৌকী'। এইস্থানে তাহাদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ প্রায় প্রত্যহ পঠিত হয়। পাঠের সময় সন্ধ্যা। তৎকালে নর-নারী উভয়েই তথায় সমবেত হয়।

সাধ্দিগের প্রধান স্থান দিল্লী, আগরা, জয়পুর ও ফরক্কাবাদ। মির্জ্জাপুরে ইহাদিগের সংখ্যা অতি অল্প। সাধ্গণ তাহাদিগের মধ্যে উচ্চ নীচ কোন শ্রেণী-বিভাগ আছে বলিয়া স্বীকার করে না। মির্জ্জাপুরে ইহারা কেলিকো ছাপে। কাপড় ছাপিয়া ছিট প্রস্তুত করে।

সামাজিক আদান-প্রদান স্থলে ইহারা কুটুম্বের ধন সম্পত্তি, অথবা তাহাদের বাসস্থানের দূরত্ব বা নৈকট্য বিবেচনা করে না। পদ-গৌরবও ইহাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। কেবল পাপজনক কর্ম্ম দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন না করিলেই হইল এবং স্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। ইহারা এক সঙ্গে পান-ভোজন করে। সম্প্রদায় মধ্যে বিদ্বেষ, কিম্বা কলহ অতিশয় লজ্জাজনক বলিয়া বিবেচনা করে। ইহারা এক সঙ্গে এক মোহল্লায় বাস করে এবং পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে। বিধবা, দুঃখী, পিতৃমাতৃহীন শিশুদিগকে প্রতিপালন করে। নিকট সম্পর্কীয় ব্যক্তির সহিত বৈবাহিক বন্ধন হয় না। যদি কোন পরিবারের সহিত একবার বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া থাকে, এবং ঐ সম্বন্ধ যদি স্মরণাতীত না হয়, তবে সেই পরিবারের সহিত পুত্রকন্যার আদান-প্রদান করিবে না। ইহারা শিল্পী ও পরিশ্রমী। ইহারা স্বাবলম্বনকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে বলিয়া উদরান্নের জন্য অন্যের উপর নির্ভর করিতে ঘৃণা বোধ করে।

শৈশব অবস্থায় ইহাদের বিবাহের বাগ্দান হইয়া থাকে। দ্বাদশ, চতুর্দ্দশ বা ষোড়শ বর্ষে বিবাহ হয়। কন্যাপণ নাই; তবে যৌতুকস্বরূপ কন্যা কিঞ্চিৎ লাভ করিয়া থাকে। বহু-বিবাহের প্রচলন নাই। পিতা যদি কোন কন্যাকে পুত্রবধূ করিতে ইচ্ছা করে, তবে পরিবার মধ্য হইতে কোন স্ত্রী বা পুরুষকে দূতী বা দূতরূপে কন্যার পিতা বা অভিভাবকের নিকট প্রেরণ করে এবং পুত্রের বিবাহ প্রস্তাব করিয়া পাঠায়। যদি কন্যাকর্ত্তা প্রস্তাবে সম্মত হয়, তবে দূত বা দূতীকে মিষ্টান্ন ভোজন ও দুগ্ধ পান করিতে দেয়; এবং মধু দান করে।

তাহা হইলেই বিবাহ সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইল (মাঙ্গনি পাক্কী)। ইহাদের ঠিকুজী বা কোষ্ঠী থাকে না।

পুত্র কন্যা প্রাপ্তবয়স্ক হইলে বিবাহের দিন ধার্য্য হয়। কন্যাকর্ত্তা লোক পাঠাইয়া নির্দ্দিষ্ট দিন বরকর্ত্তাকে জ্ঞাপন করে। বরকর্ত্তা আপন সম্প্রদায়ের আত্মীয়-বন্ধুগণকে আহ্বান করিয়া তাহাদিগকে কহে যে, অমুকের কন্যার সহিত, অমুক দিনে তাহার পুত্রের বিবাহ হইবে। কন্যাপক্ষ হইতে আগত ব্যক্তিগণকে ভোজন করাইয়া একটা পাগড়ী ও একখানি চাদর পুরস্কার প্রদান করে। এই সময় হইতে মঙ্গল-গীত গীত হইতে থাকে। বিবাহের দিবস মধ্যাহ্নে কন্যাকর্ত্তা জাতীয় ভোজ প্রদান করে। সায়াহ্নে বর, বরকর্ত্তা ও বন্ধুবান্ধবগণ কন্যার আলয়ে আগমন করে। তথায় সকলে একখানি সুবিস্তৃত চাদরের উপর উপবিষ্ট হয়। সম্মুখস্থিত আসনে বর ও কন্যা উপবেশন করে। তৎপরে বর-কন্যার বস্ত্রপ্রান্ত লইয়া গ্রন্থী প্রদত্ত হয়। বর ও কন্যা চারিবার আসন প্রদক্ষিণ করে। এই সময় কতকগুলি ব্যক্তি মাঙ্গল্য কবিতা আবৃত্তি করিতে থাকে। তৎপরে বর বধূর সহিত স্ব-গৃহে আগমন করে। বধূ কিয়দ্দিবস শ্বশুরালয়ে থাকিয়া ভ্রাতার সহিত পিতৃ-গৃহে প্রত্যাগমন করে। পরে পুনরায় স্বামি গৃহে আসিয়া বাস করে। ইহাদিগের 'গওনা' (দ্বিরাগমন) প্রথা নাই।

যে অপরাধ করিলে জাতিচ্যুত হইবার সম্ভাবনা. রমণী এইরূপ কোন দোষে দুষ্টা হইলে, ইহারা স্ত্রী ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। স্ত্রী ত্যাগ করিবার সময় একবার সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিবর্গকে জানাইতে হয়। ইহাদিগের সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা স্বজাতীয়গণ সভা আহ্বান করিয়া সম্পন্ন করে। তজ্জন্য প্রায়ই আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না।

ধর্ম্ম

সাধুগণ একেশ্বরবাদী; একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা করে। ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা। ইহারা ঈশ্বরকে 'সৎগুরু' বা 'সৎনাম' নামে অভিহিত করে। ইহাদিগের বিশ্বাস এই যে, ঈশ্বর-চিন্তা ও সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা ইহারা ঈশ্বরে লয় প্রাপ্ত হইবে। ইহাদিগের শাস্ত্র এই শিক্ষা দেয় যে, ধনপ্রাপ্তির বা সঞ্চয়ের চেষ্টা হইতে সতত নিশ্চেষ্ট থাকিবে।

উপদেশ

১। একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা কর। তিনিই সকলের স্রষ্টা এবং তাঁহার সংহার করিবার ক্ষমতা আছে। মনুষ্যগণের অনর্থক প্রস্তর, ধাতু, কাষ্ঠ বা বৃক্ষ কিম্বা অন্যান্য সৃষ্ট পদার্থের উপাসনা করা বিধেয় নহে। সমস্ত সম্মান ও সমস্ত প্রশংসা ঈশ্বরেই প্রযুজ্য। ঈশ্বরই ঈশ্বর, ঈশ্বরই ঈশ্বর শব্দ। যে ব্যক্তি তাহার নিকটস্থ কোন পদার্থের চিন্তা করে (ঈশ্বর ব্যতীত) সেই ভ্রম ও পাপে পতিত হয়। যে পাপ করে, সেই নরকে যায়।

২। সর্ব্বদা ধীর ও নম্র-প্রকৃতি হইবে, সাংসারিক কোন পদার্থ যেন তোমার চিত্ত আকর্ষণ করিতে না পারে। সম্পূর্ণরূপে স্বীয় ধর্ম্মের নিয়মাদি পালন করিবে। তোমার ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কোন কর্ম্ম করিও না।

৩। কদাচ মিথ্যা কথা কহিও না। এবং পৃথিবী, জল, বৃক্ষ কিম্বা পশুপক্ষীকে অভিশাপ দিও না। তোমার রসনাকে কেবল ঈশ্বর-স্তোত্রে নিযুক্ত কর এবং কখনও কোন ব্যক্তির ভূমি, সম্পত্তি ও পশু বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিবে না। কাহারও অজ্ঞাতসারে কোন দ্রব্য লইবে না। কাহাকেও বিপন্ন করিও না, কিম্বা কাহাকেও তাহার ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিও না। যাহা কিছু তোমার আছে, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাক। মন্দ বিষয়ে চিন্তা করিও না। লজ্জাহীন বা নিয়ম-বহির্ভূত নৃত্য বা ক্রীড়ায় (স্ত্রী বা পুরুষ হউক) কদাচ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিও না।

৪। মন্দ বিষয় চিন্তা করিও না। আপনাকে ঈশ্বর স্তবে ও যশঃগৌরবে নিযুক্ত কর। গল্প, কাহিনী, গান ও বাদ্যে আমোদ বোধ করিও না। ঈশ্বরের স্তব পাঠে আমোদ উপভোগ কর।

৫। কোন দ্রব্যের প্রতি অতিশয় লোভ করিও না—ধনই হউক অথবা সৌন্দর্য্যই হউক। অপরের অধিকৃত দ্রব্য গ্রহণ করিও না। ঈশ্বরই সকল দ্রব্যের দাতা। তুমি ঈশ্বরে যেরূপ বিশ্বাস স্থাপন করিবে, তদ্রূপ তুমি প্রাপ্ত হইবে।

৬। যদি তোমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করে, "তুমি কে?" তুমি উত্তর দিবে "আমি সাধ্" (সাধু)। জাতির উল্লেখ করিও না এবং বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইও না। আপন ধর্ম্মে দৃঢ়রূপে বিশ্বাস স্থাপন কর। কদাচ মনুষ্যের নিকট হইতে কোন আশা করিও না এবং মনুষ্যের নিকট আত্মগরিমা প্রকাশ করিও না।

৭। শ্বেত বস্ত্র পরিধান করিবে; রসাঞ্জন কিম্বা হেনা ব্যবহার করিবে না। দেহ বা ললাটে কোন জাতীয় চিহ্ন (তিলক) ধারণ করিবে না। মালা, উপবীত বা কোন রত্নাদি ধারণ করিবে না।

৮। নিরামিষ ভোজন করিবে—মৎস্য বা মাংস আহার করিবে না। পান খাইবে না। সৌগন্ধ দ্রব্যের আঘ্রাণ লইবে না। ধূমপান করিবে না ও অহিফেন-সেবন করিবে না। কোন মূর্ত্তি বা মনুষ্যকে প্রণাম করিবার জন্য হস্ত উঠাইবে না বা শরীর নত করিবে না।

৯। জীব-হত্যা করিও না; কাহারও উপর যথেচ্ছাচারী হইও না। শপথ গ্রহণ করিয়া সাক্ষ্য প্রদান করিও না। বলপূর্ব্বক কোন দ্রব্য গ্রহণ করিও না।

১০। প্রত্যেক পুরুষের একমাত্র স্ত্রী ও প্রত্যেক স্ত্রীর একমাত্র স্বামী। বিবাহিত পুরুষ স্ত্রীর খাদ্যাবশেষ ভোজন করিবে না, কিন্তু স্ত্রী স্বামীর ভুক্তবিশিষ্ট অনায়াসে ভক্ষণ করিবে। স্ত্রী স্বামীর অনুগত হইবে।

১১। ফকিরের বেশ ধারণ করিয়া ভিক্ষা মাগিও না। দান গ্রহণ করিও না; আশ্চর্য্য বিষয় দেখিয়া ভীত হইও না; প্রথমে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া তবে কোন বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করিবে।

সৎলোকের সমাগম-স্থল তোমার তীর্থ। তোমাকে সম্ভাষণ করিবার পূর্ব্বে সৎলোক চিনিয়া লও।

১৩। সাধদিগের কোন পর্ব্বদিন নাই। আপন ঘরের ন্যায় পশু পক্ষীর ডাকে বিরক্ত হইও না। ঈশ্বর-বাক্যের অন্বেষণ কর এবং তাহাতেই সন্তুষ্ট থাক।

বিবাহ-সঙ্গীত।

"দরশন দে গুরু পরম সনেহি !
"তুম্ বিনা দুখ পাওয়য় মেরি দেহি !
"নিদ্ না আওয়ে অন্ না ভাওয়াই !
"বার বার মোহিন্ বিরহ সাতাওয়াই ;
"ঘর অঙ্গিন মোহিন্ কছু না সুহাই ;
"ফজর ভই পর বিরহ ন যাই—
"নৈনান্ ছুটাই সলহাল ধারা ;
"নিশ্ দিন পন্থ নিহারু তুমহারা
"যৈসে মীন্ মরই বিনু নীরা,
"ঐসি তুম্ বিনা দুখত শরীরা।"

হে পরম প্রিয়তম গুরু, দর্শন দাও ! তোমা বিনা আমার দেহ দুঃখ পাইতেছে ! নিদ্রা আসে না ; অন্ন রোচে না ; বার বার তোমার বিরহ অনুভব করি ! ঘর-অঙ্গন কিছুই ভাল লাগে না। প্রভাত হ'লেও তোমার বিরহ যায় না। নয়নে সতত ধারা ছুটে, রাত্রি-দিন তোমার পথ চাহিয়া থাকি। যেমন নীর বিনা মৎস্য মরে, ঐরূপ তোমা বিনা আমিও মরণাপন্ন হইয়াছি।

২। "দুখত তুন্ বিনা, রোটত দুয়ারে ;
পরগট দরশন দিজিয়ে।
"বিন্তি করু মেরে সাঙ্গিয়া বলি জাউ,
বিলাম না কিজিয়ে।
"বিবিদ্ বিবিদ্ কর্ ভায়ায়ু ব্যাকুল বিনা
দেখেন্ চিৎ না রহয়।
"অউগুণ অপ্‌রাধী দয়া কিয়াজায় অউগুণ কছু
বিচারি ওঁ।
"পতিত পাওন্ রাখ পতি অব্ পল ছিন না
বিসারিও।
"দয়া কিজো দরশ দিজো অব্ কি বদিকো
ছোড়িও।
ভর্ ভর্ নয়ন নিরখি দেখোন্ নিজ
সনেহ না তোরিও।"

তোমা বিনা দুঃখ পাইতেছি—তোমার দুয়ারে কাঁদিতেছি—প্রকট হ'য়ে দর্শন দাও। আমার প্রিয়তম ! মিনতি করি, বিলম্ব করিও না। নানা প্রকারে ব্যাকুল হ'য়েছি, না দেখিলে চিত্ত সুস্থির হয় না। শরীরে তপ্ত জ্বালা উঠে, আমার কঠিন দুঃখ কে সহ্য করে ? আমি পাপী, অপরাধী,—পাপী ব'লে ঘৃণা করিও না। পতিত-পাবন ! রক্ষা কর, এক পল ভুলিও না। দয়া ক'রো, দর্শন দিও, আমার অপরাধ ক্ষমা ক'রো। আমার উপর পূর্ণ দৃষ্টি রেখো, তোমার প্রেম হইতে আমাকে পৃথক রেখো না।

মৃত্যু-সঙ্গীত।

"তুঝে বিনান্ কিয়া পড়ি তু আপ্‌না নিবের।
"বিজয় তাল বাজন্ত রে মন বাওরা, সুতারিনা ছেড়।
"পর হক ছাড়ো, হক পিছাড়ো, সমঝওয়ালা ফের।
ঝুটা বাজি জগৎকা, মন বাওরে ! শুন সাধ কি টের।
"কায়া তো নগরী সকল ভমরি পঞ্চ জমে সের।
"গুরু জ্ঞান খড়্গ সম্ভললে, বাওরে ! যম
করে না জের।
"তেরা জীওন ছিল পল এক, জগ্‌মে ফিরনা
আইশি ফের।
"তের পড় জাহাজ সমুদ্রমে, মন বাওরে ! ফির্
সকাই ফের।
"সভি মসাফির রাহাকে সব্ খাড়ে কামর কষে।
"লেনা হোয় সো লিজিয়ে, বিতি যাতে আবের।
"কর্ সমরণ সৎগুরু, ছাড়ো দ্বন্দ্ব দুহেলী।
"তিজে ভাম মিলৈন সৎনামসে,
মন বাওরে ! মন বাওরে, জগৎ কিনা জের।"

তেকে বিনয় করি, তুই আপন বিপদের উপায় কর্ (বিপদ আগত প্রায়)। রে ভোলা মন ! বিজয় তাল বাজিতেছে, ঘুমন্তকে জাগাইয়া কি ফল ? পরের হক্ ছাড়ো, হক্ ছাড়ো। বুঝ মানের বিপদ। তোর জাহাজ সমুদ্রে প'ড়ে আছে ভোলা মন ! সাধুর ইঙ্গিত শোন্। কায়া নগরীতে পাঁচ সিংহ আছে গুরুজ্ঞান খড়্গ সামলাইয়া নে, ভোলা মন ! যমের জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার থাকিবে না। তোর জীবন এক পল মাত্র, জগতে আশীবার আস্‌তে হবে। তোর জাহাজ সমুদ্রে প'ড়ে, ভোলা মন ! এখন থেকে সতর্ক না হ'লে কিরূপে পর পারে যাবে ? সকলেই যাত্রী, কোমর বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। যা নেবার নে, সময় ব'য়ে যাচ্ছে। সৎগুরুকে স্মরণ কর্, ঝগড়া বিপদ ছাড়্ ভোলা মন ! সৎগুরুর সঙ্গে মিলন হবে সংসার ক্লেশ রবে না।

প্রবোধচন্দ্রোদয়ের রচয়িতা এবং তাঁহার আশ্রয়দাতা

[শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র শান্ন্যাল]

আজ পর্য্যন্ত শুনিয়া আসিতেছি যে, কালঞ্জর-রাজ কীর্ত্তি বর্ম্মার সেনাপতি গোপাল চেদিরাজ কর্ণকে পরাস্ত করায় কালঞ্জর রাজ্যে যে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তদুপলক্ষে কৃষ্ণমিশ্র নামক উক্ত গোপালের আশ্রিত কালঞ্জরবাসী জনৈক কবি প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক রচনা করেন। এই মতের সৃষ্টিকর্ত্তা যে কে, তাহা নির্ণয় করিতে পারি নাই। তবে এই মত এখন সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু নাটকখানিকে ভালরূপে পড়িতে বসিয়া উহার মধ্যেই এই মতের অসঙ্গতির কয়েকটি প্রমাণ (Internal Evidence) পাইয়াছি। সাধারণের অবগতির জন্য তৎসমুদায় নীচে লিপিবদ্ধ করিলাম। প্রথমতঃ, দ্বিতীয় অঙ্কের প্রবেশকে দেখা যায়, অহঙ্কার গৌড় রাজ্যের অন্তঃপাতী রাঢ়াপুরীর অধিবাসী বলিয়া নিজের পরিচয় দিতেছেন। যথা:—"গৌড়রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়াপুরী। ভূরিশ্রেষ্ঠক নাম ধাম পরমং তত্রোত্তমো নঃ পিতা॥" ইত্যাদি ইত্যাদি [সম্ভবতঃ কবির সময় রাঢ়াপুরী পণ্ডিত-বহুল স্থান ছিল ও তত্রত্য পণ্ডিতদিগের মনে পাণ্ডিত্যের জন্য অতিশয় গর্ব্ব (যাহা অধিকাংশ পণ্ডিতের ভিতরেই দৃষ্ট হয়) ছিল। এই শ্লোকে কবি রূপকের দ্বারা তাহারই বর্ণনা করিয়াছেন।] তৎপরে চতুর্থ অঙ্কের বিষ্কম্ভকে শ্রদ্ধার উক্তি হইতে জানা যায়, সমগ্র পৃথিবী মহামোহের অধিকৃতা হওয়াতে রাঢ়দেশের অন্তর্বর্ত্তী চক্রতীর্থে বিবেক আশ্রয় লইয়াছিলেন ; যথা:—"দেব্যা এত দেবমুক্তম্। অস্তি রাঢ়াভিধানো জনপদ। তত্র ভাগীরথী পরিসরালঙ্কারভূতে চক্রতীর্থে——বিবেক উপনিষদ্দেব্যাঃ সঙ্গমার্থং তপস্তপস্ততীতি (সম্ভবতঃ ইহার ভিতরেও রূপক আছে। বোধ হয় চক্রতীর্থ কবির সময়ে আধুনিক নবদ্বীপ বৃন্দাবন প্রভৃতির মত সংসার-বিরক্ত বৈষ্ণব-বহুল স্থান ছিল, পূর্ব্বোদ্ধৃত বাক্যে কবি তাহাই ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন।)। তদ্ব্যতীত বুঝা যায়, দ্বিতীয়াঙ্কের প্রবেশকের এবং চতুর্থাঙ্কের শেষভাগের ঘটনা-স্থল কাশী, পঞ্চমাঙ্কের প্রবেশকের ঘটনাস্থল প্রাগুক্ত চক্রতীর্থ ও ষষ্ঠাঙ্কের ঘটনাস্থল মন্দর (বা মন্দার) শৈলস্থ মধুসূদনের (১) মন্দির-সান্নিধ্য। ইহাদের মধ্যে রাঢ়াপুরী অদ্যাবধি খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই; চক্রতীর্থ সম্ভবতঃ শুশুনিয়া শৈল; কাশীর পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই; মন্দর (বা মন্দার) পর্ব্বত ভাগলপুর জেলায় অবস্থিত এবং মধুসূদনের মন্দির তথায় অদ্যাবধি বিদ্যমান (২)। এই সমস্ত স্থানই কবির সময়ে গৌড়সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সংক্ষেপতঃ এই কথা বলা যাইতে পারে যে, নাটকীয় প্রয়োজনহেতু যে সকল স্থলে কোনও স্থানের নাম উল্লেখ করিতে হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশ স্থলে কৃষ্ণমিশ্র গৌড়সাম্রাজ্যের অন্তর্বর্ত্তী স্থানেরই নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

সচরাচর দেখা যায় যে, ও রকম স্থলে কবিগণ—বিশেষতঃ সেকালের কবিগণ— স্ব স্ব দেশে অবস্থিত স্থানেরই নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কৃষ্ণমিশ্রও কি তাহা করিতে পারিতেন না? রাঢ়াপুরীর এবং চক্রতীর্থের মত স্থান কালঞ্জরে না থাকুক, সমগ্র মধ্যদেশের ভিতরেও কি ছিল না? আর, সে সকল ঘটনা কাশীতে ও মন্দর পর্ব্বতে ঘটান হইয়াছে, সে সকল ঘটনা কি প্রয়াগে ও কালঞ্জর শৈলে ঘটাইতে পারা যাইত না? কেন তবে কৃষ্ণমিশ্র সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম করিলেন? কি জন্য কালঞ্জরবাসী হইয়া তিনি স্থানের নাম সংগ্রহ করিতে গৌড়ে আসিলেন? বস্তুতঃ কৃষ্ণমিশ্রকে কালঞ্জরবাসী বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলে, পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারা যায় না। এই জন্য উহা আমরা স্বীকার করিতে চাহি না। আমাদের মনে হয়, যখন তাঁহার গ্রন্থে শুদ্ধ গৌড়ীয় নামেরই পুনঃপুনঃ উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তখন তিনি গৌড়েরই লোক ছিলেন। বিশেষজ্ঞগণ জানেন যে, এইরূপ প্রমাণের বলে ভারবিকে মহারাষ্ট্রবাসী বলিয়া সাব্যস্ত করা হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে বোধ হয় ইহাও বলা অনুচিত হইবে না যে, কৃষ্ণমিশ্রের রচনায় গৌড়ীয় রীতির প্রাচুর্য্য লক্ষিত হয়। অবশ্য উহা তাঁহার গৌড়ীয়ত্ব সপ্রমাণ করিবার পক্ষে সাহায্য করে না।

যাহাই হউক, অতঃপর কৃষ্ণমিশ্রের আশ্রয়দাতা (প্রবোধচন্দ্রোদয়ের প্রস্তাবনা ভাগে শিষ্য বলিয়া কথিত) গোপালের সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। ইঁহাকে যে কোন্ প্রমাণের বলে কীর্ত্তিবর্ম্মার সেনাপতি বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহা জানি না। অন্ততঃ প্রবোধ-চন্দ্রোদয়ের কোথাও সে রকম কিছু নাই; এবং গোপাল নামে কীর্ত্তিবর্ম্মার কোনও সেনাপতি ছিলেন কি না, তাহাও অদ্যাপি জানা যায় নাই। এজন্য আমরা ঐ সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে অনিচ্ছুক। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে অনুমান ১০৮০ অব্দে উক্ত গোপালের দ্বারা কর্ণ পরাস্ত হয়েন। গৌড়রাজ তৃতীয় গোপালও প্রায় এই সময়েরই লোক। তদ্ব্যতীত কৃষ্ণমিশ্র উক্ত গোপালকে যেরূপ রণপ্রিয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, সন্ধ্যাকর নন্দীর গ্রন্থে তৃতীয় গোপালকে 'শক্রধোপায়াৎ' (অর্থাৎ সংগ্রামে নিহত হইয়া) স্বর্গে যাইতে দেখিয়া তাঁহাকেও সেইরূপ রণপ্রিয় বলিয়াই মনে হয়। এজন্য আমরা অন্যরূপ অনুমানের সপক্ষে বলবত্তর প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত, উক্ত গোপালকে গৌড়েশ্বর তৃতীয় গোপালের সঙ্গে এক বলিয়াই মনে করি। এখানে হয় ত প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, পালরাজগণ বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন—কৃষ্ণমিশ্রের মত বৌদ্ধবিদ্বেষী বৈদান্তিক বৈষ্ণবকে তাঁহাদের মধ্যে কেহ যে আশ্রয় দিবেন, ইহা কি রকমে সম্ভব? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, পালরাজাদের কেহই সেরূপ গোঁড়া বৌদ্ধ ছিলেন না; বিশেষতঃ শেষ দিককার অনেকেই নামে বৌদ্ধ হইলেও যথার্থতঃ

---

(১) ইঁহার সঙ্গে লক্ষ্মীশূরের উপমা দিয়াই হয় ত সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁহাকে "অপরমন্দার মধুসূদন" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

(২) Statistical Account of Bengal. Vol XIV

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিলেন, তাহা বেশ বুঝা যায়। নারায়ণ পাল শিব-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; তৃতীয় বিগ্রহ পাল "স্মররিপোঃ পূজানুরক্ত" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন; রামপাল নাকি "ধ্যাত্বা পদং চক্রিণঃ" গঙ্গাজলে প্রাণত্যাগ করেন। সন্ধ্যাকর নন্দী মদনপালকে "চণ্ডী-চরণ-সরোজ প্রসাদ-সম্পন্ন-বিগ্রহ-শ্রীকং" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এবং মদন পালের শিলালেখ হইতেও জানা যায় যে, তিনি তাঁহার মহিষীকে মহাভারত শুনাইবার জন্য একজন ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। অতএব তৃতীয় গোপালেরও বৈষ্ণব হওয়া এবং কৃষ্ণমিশ্রকে আশ্রয়দান অসম্ভব নহে। কবি বিহ্লণ কর্ণকে "কালঞ্জর গিরিপতিবিমর্দ্দন" আখ্যা দিয়াছেন। তাঁহার এই উক্তির সঙ্গে প্রবোধচন্দ্রোদয়ের বর্ণনা মিলাইয়া দেখিলে অনুমান হয়, কর্ণের দ্বারা পরাভূত হইয়া কীর্ত্তিবর্ম্মা (বোধ হয়, বিগ্রহপালের সময়ে কর্ণকে পরাস্ত করিয়া গৌড়ীয় বাহিনী যে যশ লাভ করিয়াছিল তাহা মনে হওয়াতে) গোপালের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং তাঁহারই সাহায্যে কর্ণের উৎকট বিজয়লালসা খর্ব্বীকৃত হয়। ইহাকেই পাল বিক্রমবহ্নির শেষ স্ফুলিঙ্গ বলা যাইতে পারে। যাহাই হউক, অতঃপর গৌড়নগরীতে সম্ভবতঃ উৎসবের অনুষ্ঠান হয়, এবং তদুপলক্ষে গোপালের দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া কীর্ত্তিবর্ম্মা সবান্ধবে গৌড়ে আসেন। এই সময়েই প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক বিরচিত হইয়া রাজকীয় নাট্য-মঞ্চে উভয় রাজার সম্মুখে অভিনীত হয়।

মঙ্গলকোট উজানীর বিক্রমকেশরীর শিবমূর্ত্তি

[শ্রীগোপালচন্দ্র রায়]

সন ১৩২২ সালের অগ্রহায়ণ মাসের গৃহস্থে স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী লিখিত "উজানী" নামক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে ও ১৩২০ সালের সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, বিংশ ভাগ তৃতীয় সংখ্যাতে শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু, বি, এ, শ্রীহরিদাস পালিত ও শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ, মহোদয়গণ "উত্তর রাঢ় ভ্রমণ" নামে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তাহাতে তাঁহারা উজানীর গৌরব-রবি পরমশৌর বিক্রমকেশরীর নির্ম্মিত শিবমূর্ত্তির বিষয় উল্লেখ করেন নাই। সেই জন্য তৎসম্বন্ধে যাহা কিছু জানিতে পারা গিয়াছে, তাহা প্রকাশিত হইল। মঙ্গলকোট উজানী অজয় নদের তীরে। কলিকাতা হইতে যাইতে হইলে প্রথমে হাবড়া হইতে বর্দ্ধমান, বর্দ্ধমান হইতে বি, কে, রেলপথে নিগন ষ্টেশনে নামিয়া পশ্চিমে তিন মাইল যাইতে হয়। বর্ত্তমান যুগে উজানি কোগ্রাম নাম ধারণ করিয়াছে। কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে উজাবনী, উজ্জয়িনী ও উজানি এই তিনটী নামই লিখিত আছে।

এখন উক্ত উজানীর রাজা বিক্রমকেশরীর নির্ম্মিত শিবমূর্ত্তি "নাংটেশ্বর শিব" নামে মঙ্গলকোটের অনতিদূরবর্ত্তী "বাবলাডিহি শঙ্করপুর" নামক গ্রামে ব্রাহ্মণ বাড়ীতে আছেন। (বাবলাডিহি যাইতে হইলে নিগন ষ্টেশনে নামিয়া পশ্চিমে দুই ক্রোশ পথ গো-গাড়ীতে যাইতে হয়)।

উক্ত শিবমূর্ত্তি কত দিন পূর্ব্বে পাওয়া গিয়াছে, তাহা কেহ নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলিতে পারে না; তবে প্রাপ্তি সম্বন্ধে যে প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে তাহা এই। (১) "নাংটেশ্বর শিব মঙ্গলকোটের বিক্রমাদিত্যের প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর। মঙ্গলকোটের দক্ষিণে রাউদ নামক পুষ্করিণীতে শিবমূর্ত্তিটী বাবলাডিহির জনৈক ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (ব্রাহ্মণের নাম পাওয়া যায় না, তবে অনুসন্ধানে জানা যায় যে, বর্ত্তমান সেবাইতগণের পূর্ব্বপুরুষ)। কথিত আছে তিনি পরম নিষ্ঠাবান, ধার্ম্মিক ও শিবভক্ত ছিলেন। তিনি বিশ্বনাথকে দেখিবার জন্য কাশীধাম যাইবার ইচ্ছায় মঙ্গলকোটের নিকট অজয় নদের অভিমুখে যাইতেছিলেন। তৎকালে কাশী, কি কোন সুদূর প্রদেশে যাইতে হইলে, উজানী প্রদেশের লোকেরা যে, অজয় নদে নৌকা আরোহণে যাইতেন, তাহা মুকুন্দরামের কবিকঙ্কণের চণ্ডী পাঠে বিশেষ অবগত হওয়া যায়। বাবলাডিহি হইতে মঙ্গলকোট আসিতে হইলে রাউদ পুষ্করিণীর তীর দিয়া আসিতে হয়। ব্রাহ্মণ রাউদ পুষ্করিণীর পাহাড়ের উপর দিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময়ে "ও ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ" এই শব্দ শুনিতে পাইলেন এবং কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া, আপন মনে চলিতে লাগিলেন। পুনরায় সেইরূপ শব্দ শুনিতে পাইয়া, ব্রাহ্মণ চকিত ও স্তম্ভিত হইলেন, এবং যখন তিনি পুষ্করিণীর ঘাটের নিকট আসিলেন, তখন তাঁহার বোধ হইল যেন, জলমধ্য হইতে তাঁহাকে কে ডাকিতেছে। ব্রাহ্মণ অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আপনি?" জল মধ্য হইতে উত্তর হইল, "আমি বিক্রমাদিত্যের শিবমূর্ত্তি, তুই আমাকে তুলিয়া বাটী লইয়া চল, আমি তোর বাটী যাইব"। তখন ব্রাহ্মণ বলিলেন, "প্রভু আপনি রাজার শিব, আমি গরীব ব্রাহ্মণ, কেমনে আমি আপনার সেবা চালাইব" আবার জল মধ্য হইতে উত্তর হইল, "তোকে অন্য কিছু দিতে হইবে না, কেবল শিবায় নমঃ বলিয়া বিল্বপত্রে পূজা করিবি। আর এক বেলা আতপ চাল পোয়া, দুগ্ধ যথাসাধ্য ও মিষ্টান্ন যথাসাধ্য দিয়া ভোগ দিবি। তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট হইব। আর আমার পূজার জিনিস আমি নিজেই যোগাড় করিয়া লইব"। তখন ব্রাহ্মণ বলিলেন, "প্রভু, আপনার মূর্ত্তি দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে।" এই কথা বলিবামাত্র কৃষ্ণ-প্রস্তরময় দিগম্বর শিবমূর্ত্তি ঘাটে দেখিতে পাইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ জল মধ্যে সেই মূর্ত্তি প্রবিষ্ট হইল। ব্রাহ্মণ পরম আহ্লাদিত হইলেন। তাহার পর ব্রাহ্মণ সেই পুষ্করিণীর তীরে শিবের পূজা ও ভোগ দিয়া বাটী লইয়া গিয়াছিলেন। অন্যত্র স্থানীয় লোকের মুখে এই প্রবাদ অন্য রকমে শুনিতে পাওয়া যায়। (২) মঙ্গলকোটের সমীপে কুনুই নামে একটী ক্ষুদ্র নদী আছে। বর্ষার পর নদীর তীরস্থ মৃত্তিকা ভাঙ্গিয়া পড়াতে উক্ত মূর্ত্তি বাহির হয়। তাহা দেখিয়া সূত্রধরেরা বলিয়াছিল যে, আমরা লইয়া ঢেঁকির গড় প্রস্তুত করিব, এবং রজকেরা বলে আমরা কাপড় কাচিব। সকলেই একখানা পাথর বলিয়া

বিবেচনা করিয়াছিল, কারণ মূর্ত্তিটী উবু হইয়া পড়িয়া ছিল। বাবলাডিহি নিবাসী ব্রাহ্মণ উহা দেখিয়া লইয়া যায় ও পূজা প্রকাশ করে। এখন নাংটেশ্বর শিবের যাহারা দৈব ঔষধ খান, কিম্বা ধারণ করেন, তাঁহারা সূত্রধরের চিড়া, কিম্বা রজকের ধৌত কাপড় পুনরায় জলে ধৌত না করিয়া ব্যবহার করেন না। তাহা যদি না করেন, তাহা হইলে দৈব ঔষধের ফল হয় না। এ কথা বাবলাডিহি প্রদেশস্থ লোকেরা বিশেষ রূপে অবগত আছেন।

মূর্ত্তিটী দেখিতে ৬ষ্ঠ কি ৭ম বর্ষ বালকের ন্যায় সম্পূর্ণ উলঙ্গ, তাঁহার চরণের দুই পার্শ্বে নন্দী ও ভৃঙ্গীর মূর্ত্তি আছে। নন্দী ও ভৃঙ্গীর পার্শ্বে দুইটী উলঙ্গ ছোট শিবমূর্ত্তি আছে। কোমরের উভয় পার্শ্বে দুইটী হস্তী ও সিংহ মূর্ত্তি আছে। বাম কর্ণ ও দক্ষিণ কর্ণের নিকট দুইটী উলঙ্গ শিবমূর্ত্তি আছে। চরণের নীচে পদ্ম, তাহার নীচে বৃষের মূর্ত্তি আছে; বৃষের উভয় পার্শ্বে কয়েকটী দেবমূর্ত্তি খোদিত আছে।

মূর্ত্তিটী দেখিলেই অনুমান হয় যে, মূর্ত্তিটী বৌদ্ধযুগের পরে প্রস্তুত; কারণ প্রস্তর হইতে খোদিত করিয়া প্রস্তুত। সমস্ত মূর্ত্তিগুলি একখানি প্রস্তর হইতে খোদিত। জৈন তীর্থঙ্কর শান্তিনাথের মূর্ত্তি যাহা মঙ্গলকোটের অজয় নদের গর্ভে পাওয়া গিয়াছে, এই মূর্ত্তি কতক অংশ ঠিক একরূপ। (উক্ত শান্তিনাথের মূর্ত্তি সাহিত্য পরিষদের জন্য কলিকাতায় আনীত হইয়াছে)।

যখন বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার সঙ্গে-সঙ্গে শাক্ত ও শৈব ধর্ম্মের উন্নতি হয়, সেই সময়ে এই মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। খৃঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে কনিষ্কের সময় নাগার্জ্জুন নামক একজন বৌদ্ধ আচার্য্য মহাযান মত প্রচার করেন। অঙ্গ, বঙ্গ ও মগধের অধিবাসিগণ তাহা গ্রহণ করেন। বৌদ্ধ শূন্যবাদের ভিত্তির উপর তিনি হিন্দু-শাস্ত্রের যোগ ও ভক্তিমার্গ প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি বৌদ্ধ তান্ত্রিকতা প্রবর্ত্তিত করেন। বৌদ্ধ তান্ত্রিকতা হইতেই হিন্দু তান্ত্রিকতা বঙ্গদেশে পুষ্টি লাভ করে; এবং বঙ্গদেশ তান্ত্রিকতার স্রোতে প্লাবিত হয়। (বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত, পরেশ বন্দ্যো পৃঃ ১৪২)।

খৃঃ ২য় শতাব্দীর শেষে পুষ্যমিত্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া পৌরাণিক হিন্দু-ধর্ম্মের পুনরুত্থান করেন। খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্তরাজগণের সময়ে সংস্কৃত ভাষার চরম উন্নতি হয় ও সঙ্গে-সঙ্গে হিন্দু-ধর্ম্মের প্রাবল্যে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অবনতি হয়। (V. Smith. p. 287-88.)

খৃঃ ৫ম শতাব্দীর শেষভাগে গুপ্তরাজগণের অনুগ্রহে ও চেষ্টাতেই বঙ্গদেশে পুনরায় পৌরাণিক হিন্দু-ধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়। এই সময়ে বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতা হিন্দু ধর্ম্মে প্রবেশ লাভ করে। গুপ্তনৃপতিগণ এই তান্ত্রিক-ধর্ম্মে অনুরাগ প্রকাশ করায় বঙ্গদেশে তান্ত্রিকতাই প্রবল হইয়া উঠে। ক্রমে এই তান্ত্রিক-ধর্ম্ম ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়। বঙ্গদেশে এই সময়ে তান্ত্রিকগণ কর্ত্তৃক কালিকা, চামুণ্ডা প্রভৃতি দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। গুপ্তরাজগণের মধ্যে অনেক শৈব ছিলেন। তাঁহাদের সময়ে বঙ্গদেশে অসংখ্য দেব-দেবী প্রতিষ্ঠিত হয়, কালিঘাট, বক্রেশ্বর ইত্যাদি। (বাঃ পুঃ ১৬৩ পৃঃ)

খৃঃ ৫ম শতাব্দীতে যখন হিন্দু-ধর্ম্মের চরম অভ্যুদয় হয়, তখন মঙ্গলকোটে শ্বেত নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি বক্রেশ্বর-মাহাত্ম্য প্রচার করেন; এবং তিনি প্রতিদিন বক্রেশ্বর যাইয়া শিবের আরাধনা করিয়া আসিতেন। তিনি পরম শিবভক্ত ছিলেন। তাহা বক্রেশ্বর-মাহাত্ম্য হইতে অবগত হওয়া যায়। (বক্রেশ্বর মাহাত্ম্য-শ্বেতগঙ্গোপাখ্যান ৫৫ অধ্যায়।)

উক্ত গ্রন্থ প্রামাণ্য না হইলেও উহা হইতে এই মাত্র জানা যায় যে তিনি শৈবধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এবং শিব পূজার জন্য বক্রেশ্বর যাইতেন। কিন্তু মঙ্গলকোটে কোন শিবমূর্ত্তি নির্ম্মাণের বিষয় শুনা যায় না। শ্বেত-রাজার পর বিক্রম কেশরীর নাম শুনা যায়। তিনি খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ও ৭ম শতাব্দীর প্রথমে রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। তিনি চাঁদসদাগরের সময়ের রাজা। স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী মহাশয় ৮ম শতাব্দী বিক্রমকেশরীর রাজত্বকাল বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কবিকঙ্কন প্রণীত চণ্ডীতে বিক্রমকেশরীর বিষয় অবগত হওয়া যায়:—

উজানী নগর, অতি মনোহর, বিক্রমকেশরী রাজা,
করে শিবপূজা, উজানীর রাজা, কৃপা কৈল দশভুজা
যেন রঘু রাজা, হেন পালে প্রজা, কর্ণের সমান দাতা।
* * *
উজানীর কথা, গড় চারি ভিতা, চৌদিকে বেউড় বাঁশ,
রাজার সামন্ত, নাহি পায় অন্ত, যদি ভ্রমে এক মাস।

ইহার দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, তিনি অতি প্রবল প্রতাপশালী ও শৈব ধর্ম্মাবলম্বী রাজা ছিলেন।

একদিন বিক্রমকেশরীর রাজসভায় পুরাণ-পাঠ হইতেছিল; সেই উপলক্ষে কবিকঙ্কণ লিখিয়াছেন:—

পাঠকে পুরাণ কহে জ্যৈষ্ঠের মহিমা,
জ্যৈষ্ঠেতে চন্দন দান সুকৃতের সীমা॥
যেই জন চন্দনেতে করয়ে শিবপূজা।
সপ্তজন্ম অবনীমণ্ডলে হয় রাজা।
শিবের মন্দিরে যেবা করে শঙ্খধ্বনি
অভিপ্রায় বুঝি তার শিব হয় ঋণী।—
* * শঙ্খ চন্দনের তরে ভাণ্ডারী হইয়া।

পুরাণ-পাঠকের মুখে বিক্রমকেশরী উক্ত বিবরণ শুনিয়া ভাণ্ডারীকে ডাকিয়া চন্দন ও শঙ্খ আনিতে বলিলেন। চন্দন অল্প দেখিয়া বিক্রমকেশরী বিশেষ দুঃখিত হইয়া ধনপতি দত্তকে সিংহলে বাণিজ্যার্থ পাঠাইলেন। ইহার দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় যে, তিনি পরম শৈব ছিলেন এবং কেবল শিবপূজার অঙ্গহানি ভয়ে শিবপূজার জন্য ধনপতি সদাগরকে সিংহলে পাঠাইলেন। মঙ্গলকোটে তাঁহার তুল্য প্রতাপশালী শৈব রাজা আর কেহ ছিল না। যদি কোন শিবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ সম্ভব হয়, তবে সে বিক্রমকেশরীর সময়েই। অতএব ইহাই অনুমান

হয় যে নাংটেশ্বর শিবমূর্ত্তি বিক্রমকেশরীর নির্ম্মিত। প্রবাদ অনুসারে দেখিতে গেলেও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়; কারণ বিক্রমকেশরী ও বিক্রমাদিত্য একই ব্যক্তি। খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বঙ্গদেশের সিংহল, যবদ্বীপ, চীন, পারস্য প্রভৃতি দেশের সহিত বাণিজ্য ছিল; তাহা ফাহিয়ানের বিবরণে পাওয়া যায় এবং বিক্রমকেশরীর সময়েও ধনপতি দত্ত ও তদীয় পুত্র শ্রীমন্ত সদাগর সিংহলে বাণিজ্য করিতে যান। ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দীতে দ্রব্যাদির বিনিময় দ্বারা বাণিজ্য নির্ব্বাহ হইত এবং ক্রয়-বিক্রয়ে কড়ি ব্যবহার হইত; তাহাও যে বিক্রমকেশরীর সময়ে হইত, তাহা কবিকঙ্কণের চণ্ডী পাঠে অবগত হওয়া যায়।

বদলাতে নানা ধন এনেছি সিংহলে।
যে দিলে যে বদল পাবে শুন কুতূহলে
লবঙ্গ বদলে তুরঙ্গ দিবে, নারিকেল বদলে শঙ্খ। ইত্যাদি—
দুর্ব্বলা বাজারে যায়, পাছে দশ ভারি জায়
কাহন পঞ্চাশ লয়ে কড়ি।
চতুর সাধুর দাসী, আট কাহনেতে খাসী
তৈল সের দরে দশ বুড়ি।

উপরিউক্ত বিবরণগুলি আলোচনা করিলে সহজেই অনুমান করিতে পারা যায় যে, বিক্রমকেশরী ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ও ৭ম শতাব্দীর প্রথমে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহাতে আমরা ব্রহ্মচারী মহাশয়ের মতে যাইতে পারিলাম না। যদিও শ্বেত-রাজ পরম শৈব ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি শিবপূজার জন্য নিত্য বক্রেশ্বর যাইতেন, রাজধানীতে নির্ম্মিত মূর্ত্তি থাকিলে নিশ্চয়ই সেই সঙ্গে কোনও উল্লেখ থাকিত। তাঁহার সময়ে কেবল শৈবধর্ম্মের উন্নতি আরম্ভ হয়, কিন্তু বিক্রমকেশরীর সময় (৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ও ৭ম শতাব্দীর প্রথম) বাঙ্গালার রাঢ়প্রদেশে শৈবধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয় ও নানা স্থানে শিবলিঙ্গ, শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মঙ্গলকোটে মঙ্গলচণ্ডী মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়। (বাঙ্গলা পুরাবৃত্ত ১৮৫ পৃঃ।) এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়া আমরা নাংটেশ্বর শিবমূর্ত্তিটী বিক্রমকেশরী দ্বারা ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দীর মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া স্থির করিলাম।

মঙ্গলকোটে চন্দ্রসেন নামক আর একজন রাজার নাম পাওয়া যায়; কিন্তু অন্য কোনও বিবরণ এখনও পাওয়া যায় নাই।

খৃঃ ৬৪৭ অব্দে হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যু হইলে তিব্বতবাসী এবং নেপালবাসীরা মিথিলা বঙ্গ প্রভৃতি আক্রমণ করে, এবং সহস্র সহস্র গ্রাম ও নগর লুণ্ঠন করে। খৃঃ নবম শতাব্দীতে নবদ্বীপবাসীরাও উড়িষ্যা এবং বঙ্গ প্রভৃতি আক্রমণ করিয়া কর্ণসুবর্ণে অর্থাৎ মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে ঘোর অত্যাচার করে। এই সকল কারণে প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহ ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছে ও সেই সঙ্গে সঙ্গে অত্যাচার প্রভাবে মঙ্গলকোটের শিবমূর্ত্তি মৃত্তিকা-চাপা পড়িয়াছিল, ইহাই আমাদের অনুমান। বর্দ্ধমান প্রদেশের অনেক স্থলে পুষ্করিণীর পঙ্ক-উদ্ধারের সময় অনেক প্রকার বৌদ্ধযুগের পর নির্ম্মিত প্রস্তর মূর্ত্তি পাওয়া যায়। ১৩২৪ সালে বর্দ্ধমান জেলার লিগন গ্রামের পশ্চিমপাড়ার বাস্তু নামক পুষ্করিণীতে একটী নারায়ণ মূর্ত্তি এবং একটী নৃসিংহমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। তাহা উক্ত গ্রামের সিদ্ধেশ্বরের মন্দিরে রক্ষিত আছে। এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে, বেশ বুঝা যায় যে, বর্দ্ধমান অঞ্চলে বৈদেশিকগণ প্রবল অত্যাচার করিয়াছিলেন। তাহার ফলে প্রস্তরমূর্ত্তিগুলি নষ্ট হইয়াছে, এবং কতক মৃত্তিকা-চাপা পড়িয়াছে। অবশিষ্ট যাহা কিছু ছিল, তাহাও মুসলমান আমলে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং হিন্দুদের মন্দিরের প্রস্তর লইয়া মঙ্গলকোটে মসজিদ নির্ম্মাণ হয়; তাহার চিহ্ন অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই। (১)

এখন বাবলাডিহি গ্রামে নাংটেশ্বরের মূর্ত্তি আছে। শিবরাত্রির সময় প্রকাণ্ড মেলা হয়। তাহাতে বহু লোকের সমাগম হয়।

অবেস্তার সপ্ত দেবতা

[শ্রীহেমন্তকুমার সরকার বি-এ]

এই সপ্ত দেবতা মর্ত্ত-রাজ্যের এক-একটী বিভাগের অধিষ্ঠাত্রী। প্রথম ও দ্বিতীয় দেবতার নাম যথাক্রমে অষ ও বোহুমান। অষ=সংস্কৃত, ঋতে=ইং Righteousness, এবং বোহুমান=সং:বসুমন=ইং Good Mind বা Good thought। এই দুই দেবতাই মজদার সহিত বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট। উভয় নামই ক্লীবলিঙ্গ-বাচক। বোহুমান গবাদি পশুর রক্ষয়িত্রী দেবতা। পারসীক ধর্ম্মে গবাদির যত্ন পুণ্যকার্য্যের মধ্যে পরিগণিত। সুতরাং গবাদি পশুর যত্নকারী ব্যক্তির মন যে 'সু' হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই এবং এই কারণেই বোহুমান তাহাদের রক্ষয়িত্রী দেবতা হইয়াছেন।

তৃতীয় দেবতার নাম "ক্ষত্র বইর্য়ো", সং ক্ষত্রম্ বর্য্যম্, ইং The Sovranty desired। এই দেবতা ধাতুর সহিত সংশ্লিষ্ট। পার্শীদিগের বিশ্বাস যে গলিত লৌহের বন্যায় অবশেষে পৃথিবী পবিত্র হইবে। ইহাতে সমস্ত পাপ দূর হইয়া যাইবে। কিন্তু ধার্ম্মিকগণের নিকট ইহা ঈষদুষ্ণ দুগ্ধে স্নান করার ন্যায় বোধ হইবে।

চতুর্থ দেবতা অরমাইতি, সং অরমতি, The Earth Goddess. স্পেন্ত অর্থাৎ পবিত্র এই বিশেষণটী এই স্ত্রী দেবতার নামের সহিত বিশেষ ভাবে জড়িত। চুপ করিয়া বসিয়া ধর্ম্মাচরণে এই পবিত্রতা লাভ হয় না, অপরের উপকার সাধন না করিলে ইহা সঞ্চিত হইবে না। "ক্ষত্র বইর্য়ো" ভগবানের রাজ্যে, আর "আরমাইতি" সেই

---

(১) Many indeed of the old Mahamadan mosque were built up with materials plundered from still more ancient Hindu temples (In, Arch. Sur. 1902—3, page 21).

জগৎ স্রষ্টা ভগবানের প্রতি মানবের ভক্তি-ভাব—এইরূপ কথাও কেহ-কেহ বলেন।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ দেবতাদ্বয়ের নাম সর্ব্বত্র এক সঙ্গেই দেখা যায়। ইহাদের নাম—হউর্বতাৎ ও অমেরেতাৎ—সং, স্বস্থতা এবং অমৃততা Health and Immortality; বারি এবং বৃক্ষাদি এই স্ত্রী-দেবতাদ্বয়ের রাজ্যে। Free of Life এবং Fountain of youth এই সুপ্রাচীন পরিকল্পনাদ্বয়ের (idea) সহিত ইহাদিগের তুলনা করা যাইতে পারে।

এই সপ্ত দেবতা পবিত্র, কেন না যে নবীন পবিত্র রাজ্যের দিকে মজ্‌দার সৃষ্টি ক্রমশ অগ্রসর হইতেছে, সেই পবিত্রতা বৃদ্ধি করণে এই সকল দেবতা প্রধান সহায়। ইঁহাদের দেবতা নাম হইতে কেহ যেন মনে না করেন, তাঁহাদের কোনো বিশিষ্ট মূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তির স্থান জরথুশ্‌ত্রের ধর্ম্মে নাই। তাঁহার ভগবানকে এমন কি সুন্দর ও প্রেমময় বলিয়াও ডাকিতে পারা যায় না—ইহা এমনই অমূর্ত্ত সূক্ষ্ম ভাবের উপর অবস্থিত। এই সূক্ষ্মত্ব একদিকে জরথুশ্‌ত্রকে যেমন একজন গভীর চিন্তাশীল দার্শনিক ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক করিয়াছে; অন্য দিকে তেমনি তাঁহার ধর্ম্মকে জনসাধারণের বা জগতের ধর্ম্মরূপে গৃহীত হইতে বিশেষ বাধা প্রদান করিয়াছে।

অহুর মজ্‌দার রাজ্যে—'সু' এবং 'কু'—এই দুয়ের দ্বন্দ্ব অহরহ চলিতেছে। অবশ্য 'কু' একদিন 'সু'এর দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইবেই। এমন কি এখনও 'সু'ই অধিকতর ক্ষমতাশালী। যতদিন না 'কু' সমূলে উৎপাটিত হয়—ততদিন জগতে এই দ্বন্দ্ব চলিতে থাকিবে। এই দ্বন্দ্বে মানব সাক্ষী মাত্র নয়—তাহাকেও পবিত্রতা, ভক্তি, সত্যনিষ্ঠা এবং কঠোর পরিশ্রমের সহিত কায়মনোবাক্যে এই 'কু'এর রাজ্য-ধ্বংসে ব্রতী হইতে হইবে। এই 'কু'এর পার্শী নাম দ্রুজ, (সং—দ্রুহঃ) ইং Lie, Injury। এই পাপাত্মার বিশিষ্ট নাম "অংর মইন্যু"—The Hostile Spirit, যাহাকে খৃষ্টানরা শয়তান এবং বৌদ্ধগণ মার বলিয়া থাকেন। মজ্‌দার মানব ও সৃষ্ট জগতের বন্ধু এবং সাহায্যকারী, আর অংর মইন্যু তাহাদের পরম শত্রু। যাহারা সৎপথে না চলে, তাহারা সকলেই এই পাপাত্মার অনুচর। অবেস্তায় আমরা কতকগুলি জাতি ও বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম এই দৈত্যানুচরগণের মধ্যে দেখিতে পাই।

চিণ্‌তো পেরেতু—The Bridge of the Separator। এই সেতু পার হইয়া 'গরো দেমানে', সং গিরো দম্‌, ইং The House of song নামক ভগবদধিষ্ঠিত স্থানে যাইতে হয়। সৎ ব্যক্তির পক্ষে এই সেতু প্রশস্ত, কিন্তু অসতের পক্ষে ইহা ক্ষুরের ন্যায় চিকণ—সেজন্য ইহা হইতে অসৎ ব্যক্তি নীচে পড়িয়া যায়। জরথুশ্‌ত্রের স্বর্গে পরীও নাই, মদিরাও নাই; সে স্বর্গ একমাত্র তাঁহাদের জন্যই, যাঁহারা কেবল সত্যপথে জীবনযাপন করিয়াছেন।

অগ্রদানীর ছেলে

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ]

চুণ-বালি ছাড়া, কঙ্কাল সার
জঞ্জাল-ভরা বাড়ী,
ঘন জঙ্গলে ঘেরা চারিধার,
দেখিলে চিনিতে নারি।
সতত তাহার রুদ্ধ দুয়ার,
কেহ নাহি মনে হয়;
দিনে ধূমটুকু, রাতে আলো ক্ষীণ
বসতির পরিচয়।
শিশু ছেলে লয়ে হোতা থাকে এক
কৃপণ অগ্রদানী,
দুবছর আগে পত্নী তাহার
ধরা ত্যজিয়াছে জানি।

এমনি পাষাণ, যখন-তখন
নিজ কাজে যায় চলে
বিজন পুরীতে একাকী ফেলিয়া
দশ বছরের ছেলে।
চাঁদপানা মুখ ছেলেটী তাহার
করুণা মমতা মাখা,
যেন লোহের স্তম্ভের গায়
কনক কুসুম আঁকা।
তনয় এমনি পিতার বাধ্য,
যাবে না বাহিরে আর,
রহে জীয়ন্ত মণি-মরকত
রুধি-ভাণ্ডার-দ্বার।

পিতা চলে গেলে একাকী বালক
দেখে আন-মনে বসি,
গাছে থলো-থলো ফলিয়াছে আম,
পড়িবারে চায় খসি।
দেখে গাছ-ভরে' ফলিয়া রয়েছে
শ্যাম নারিকেল-কাঁদি,
স্নেহের সলিল রাখিয়াছে যেন
অপরের লাগি বাঁধি।
অশথের গাছে নব কিসলয়
অরুণাভ কচি পাতা,
কবে ছায়া দান করিতে পারিবে
তারি যেন ব্যাকুলতা।
দেখিয়া-দেখিয়া ভরে' উঠে আহা
ছোট বালকের বুক!
ভাবে মনে-মনে অজ্ঞাতে যেন
দানের অতুল সুখ।
সন্ধ্যায় পিতা ডাকে নাম ধরে
যেমন দুয়ারে আসি,
সোহাগে বালক সব ভুলি যায়,
মুখেতে ধরে না হাসি।
পরদিন গৃহে রাখি তনয়েরে
পিতা চলে যায় প্রাতে;
বৎসর যায় সুখ স্মৃতি রাখি
পুরাণো পাঁজির পাতে।
বিকালে বালক চেয়ে-চেয়ে দেখে
উদার আকাশখান,
দেখে সে কেমন মুমূর্ষু রবি
করে হিরণ্য দান।
সন্ধ্যায় দেখে ধনী শশধর
রজতে ডুবায় ধরা,
দেখে নীরদের দান-সাগরেতে
কত যে বিনয় ভরা।
দেখিয়া-দেখিয়া কি এক ব্যথায়
ভরে' উঠে তার বুক,
ভাবে মনে-মনে লওয়া চেয়ে হায়
দেওয়ায় অনেক সুখ।

বহুদিন পর কৃপণ জনক
মরণ আগত স্মরি'
ডাকিয়া তনয়ে শিয়রে আপন
বলিল সোহাগ করি।
"সত্যই বাছা দানে বহু সুখ,
তাই তব করে আজি,
দিয়ে গেনু আমি ভাণ্ডার ভরি
অতুল রত্নরাজি;
এত কৃপণতা এত যে কষ্ট
সকলি সফল লাগে,
তব চাঁদমুখ হবে না ক ম্লান
কভু দারিদ্র্য-দাগে"।
পিতার বিয়োগে বিপুল অর্থ
আসিল যুবার করে,
নিরজনে তারে গড়েছে প্রকৃতি
ঘন অনুরাগ ভরে।
সে বছর হল অন্ন অভাব
এ সারা বাঙ্গালা জুড়ি',
আহার অভাবে পথে পথে মরে
ছেলে-মেয়ে বুড়া-বুড়ী।
অনাহার-ম্লান তনয়ের মুখ
চাহিয়া মরিল মাতা,
বড়-বড় সব জমিদারগৃহে
দু'বেলা পড়ে না পাতা।
তখন দয়ালু স্বভাব-দুলাল
অগ্রদানীর ছেলে,
দু'হাতে তাহার ভাণ্ডার দিল
গরিবের তরে ঢেলে।
খুলি' দিল শত অন্নসত্র,
প্রচুর পান্থশালা;
আপনি খাইত দুঃখীদের সনে
এক-সনে পাতি থালা।
কষ্টার্জ্জিত পৈত্রিক ধন
দীন-হীনে দিল বাঁটি,
চতুর যাহারা, বলিল "এ বেটা
একেবারে হ'ল মাটী।"

শুনিয়া কাহিনী নদীয়ার রাজা
কৃষ্ণচন্দ্র রায়,
চাহিলেন ডাকি উপাধি-ভূষণে
ভূষিত করিতে তায়।
বিনয়ী যুবক নিষেধ করিয়া
বলিল জুড়িয়া পাণি,
"পরের দানেতে আমরা পালিত
পতিত অগ্রদানী।
আমরা নিলাম গরব হারায়ে
সমাজের দান আগে,
সার্থক প্রাণ আজ যদি তাহা
গরিবের কাজে লাগে"।

আসন হইতে নামিয়া তখন,
কোলাকুলি করি রাজা,
বলেন "আমার জীবন ধন্য,
সার্থক তুমি প্রজা।
চৌদ্দ পুরুষ আগে দান লয়ে
পতিত যদিই হলে,
ব্রাহ্মণ চেয়ে ব্রাহ্মণ তুমি
আজি এ দানের বলে।
আজ হতে তুমি দানীর অগ্র
নহ হে অগ্রদানী,
কপিলের শাপ ঘুচাইলে তুমি,
প্রেমের গঙ্গা আনি"।

আমার চুণার দর্শন

[শ্রীবীরেন্দ্রকুমার বসু]

একদিন কাশী হইতে বেলা ৩টার সময় আমি, আমার এক বন্ধু শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ করের সহিত একা-গাড়ীতে চুণার দর্শনার্থী হইয়া কাশী ষ্টেসনাভিমুখে যাইতে লাগিলাম। হেলিতে-দুলিতে অনেক কষ্টে ষ্টেসনে পৌঁছিলাম। দুইখানি মধ্যম-শ্রেণীর টিকিট লইয়া ট্রেণে উঠিলাম। গাড়ীখানি প্যাসেঞ্জার সুতরাং মন্থর-গমনে তাহার আইনসঙ্গত অধিকার। কিছুক্ষণ পরে তিনি মোগলসরাইতে পৌঁছিলেন। দেড় ঘণ্টাকাল ষ্টেসনে অপেক্ষা করিলাম; ইতিমধ্যে এক পেয়ালা চা পান করিয়া কিঞ্চিৎ তৃষ্ণা নিবারণ করিলাম। পরে আমাদের প্রার্থিত বাষ্পীয় রথ ধূম উদ্গীরণ করিতে-করিতে হাজির হইলেন। তখন জিনিষ লইয়া ট্রেণে উঠিলাম। কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া, এক পানি-পাঁড়ের সাহায্যে কুয়ার পবিত্র স্ফটিক জলে তৃষ্ণা নিবারিত হইল।

আমাদের বাষ্পীয় শকট ২।৪টী ষ্টেসন অতিক্রম করিয়া আমাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া পৌঁছিল। তখন সন্ধ্যা আগতপ্রায়। Over-birdge না থাকাতে, লাইন পার হইয়া ট্রেণের পশ্চাৎ দিয়া এপারে আসিলাম। ফটক বন্ধ থাকায়, কয়েক মিনিট অপেক্ষা করিবার পর বড়-বাবু আসিয়া ফটক খুলিবার হুকুম দিলেন। বাহির হইয়া তিন আনা দিয়া একখানি একা ভাড়া করিলাম। একাওয়ালাকে বলিলাম যে, "তোমারা একামে বাতি বাড়ো"। সে বলিল, "হিঁয়া বাতি দেনেকো জরুরি নেহি।" ঐ স্থানে মিউনিসিপ্যালিটী বা পুলীসের কোন সম্বন্ধ নাই। আমরা ঠিক্‌ঠাক হইয়া বসিলাম; কারণ গাঢ় অন্ধকার রজনী, রাস্তা জনহীন, চতুর্দ্দিক ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া ধীরে-ধীরে একা-গাড়ী চলিল। কিছুক্ষণ পরে নরেনবাবুর বাঙ্গলাতে পৌঁছিলাম। বাঙ্গলাটী অতি সুন্দর। সাম্‌নে একটা কুয়া, তাতে সুন্দর স্ফটিক জল। চারিপাশে শাক্-সবজির ক্ষেত।

নরেনবাবু আমাদিগের অভ্যর্থনা করিয়া একটা ঘরে বসিতে দিলেন। আমরা বিছানায় দেহ ঢালিয়া দিয়া ক্লান্তি দূর করিলাম। পরে আহার করিয়া নিদ্রা-দেবীর শরণাপন্ন হওয়া গেল।

যামিনী প্রায় প্রভাত হইয়াছে; তখনও অন্ধকার আছে; নীলাকাশে নক্ষত্রগণ হীনজ্যোতিঃ হইতেছিল; গঙ্গাবক্ষ হইতে ঊষা-সমীরণ বহিতেছিল। আমি ও কৃষ্ণ-

দাদা দুই জনে প্রাণ খুলিয়া গান গাহিতে লাগিলাম। সব গানই আমাদের পূজ্যপাদ স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের রচিত। একটু পরেই মুখ প্রক্ষালন করিয়া নিত্য অভ্যাসের চা সেবন পূর্ব্বক বেড়াইতে বহির্গত হইলাম।

বাটী হইতে বাহির হইয়া প্রথমে রামচন্দ্রের পদ-চিহ্ন দেখিতে গেলাম। চুণারে গুহক চণ্ডালের বাটী। রামচন্দ্র যখন বনে যান, একরাত্রি গুহকের বাটীতে ছিলেন। তাহার পদ-চিহ্ন, একখানি পাথরের উপর রহিয়াছে,—প্রায় দেড় হাত লম্বা,—পদমর্য্যাদা নিতান্ত কম নহে! বাঁ পায়ের চিহ্ন, গোড়ালি ও বুড়ো আঙ্গুলের চিহ্ন আছে। তারপর বরাবর পদব্রজে "দুর্গা-কুয়া" দেখিতে গেলাম। রাস্তা অসমান বা ধূলিপূর্ণ। রাস্তা অতিক্রম করিয়া আমরা এক পাহাড়ের পদপ্রান্তে আসিয়া পৌছিলাম। ক্রমে উপরে উঠিয়া দুর্গা-কুয়াতে গেলাম। দেখিলাম সেখানে সিংহবাহিনী মূর্ত্তি। প্রবাদ এই, গোঁসাই কবুল পুরীর উপর স্বপ্নে আদেশ হইয়াছিল, "আমাকে উঠাইয়া লইয়া প্রতিষ্ঠা কর।" তিনি তদনুসারে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া দুর্গা-প্রতিমা স্থাপন করিয়াছেন। মন্দিরের পার্শ্বেই তাঁহার সমাধি-স্থান। একটু নিম্নে ঝরণা বা দুর্গা-কুণ্ড; জল আছে, তবে পাহাড় হইতে এখন আর জল আসে না।

সেখান হইতে বাহির হইয়া রামবাগে গেলাম। পাহাড়ের নিম্নে এক সমতল ভূমিতে একটী বাগান; গোলাপ আমলকী ইত্যাদি গাছে পূর্ণ। বাগানের মধ্যে একখানি সাদাসিধে বাঙ্গলা; পার্শ্বেই ঝরণা, প্রবেশপথে মেতি গাছের এ্যাভিনিউ ও পরিষ্কার রাস্তা। সেখান হইতে বরাবর ষ্টেসনাভিমুখে আসিলাম। পথে আসিতে-আসিতে আমার কৃষ্ণ-দাদা প্রায় ৩০০।৪০০ কুল সমেত কুল গাছের এক শাখা কাটিয়া লইয়া চলিলেন। ষ্টেসন হইতে একখানি এক্কা লইয়া পীরের দরগায় গেলাম। তথায় পাথরের অতি সূক্ষ্ম কাজ-করা মসজিদ্। সেখান হইতে মহাবীরের মন্দিরে গেলাম। রাত্রিতে অন্নকূট হইবে বলিয়া মন্দিরটি খুব সাজাইয়াছে। পরে "আচার্য্য-কূপ" দেখিতে গেলাম। প্রবাদ এই, বল্লভ আচার্য্যের পিতা তাহার স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া তীর্থে যাইবার সময় এইস্থানে তাঁহার স্ত্রীর প্রসব-বেদনা হয়, এবং এইখানেই এক সন্তান প্রসব করেন। স্বামী বলেন, "তুমি এখানে থাক, তোমার ছেলে হইয়াছে, আমি ঘুরিয়া আসি।" স্ত্রী তখন বলেন, "আমিও যাইব"। এই বলিয়া ছেলেকে কূপের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া, স্বামীর সহিত তীর্থে গমন করেন। পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, ছেলে কূপের মধ্যে খেলা করিতেছে। সেই অবধি লোকেরা কূপ খুব সাজাইয়া রাখিয়াছে। এই কূপের পার্শ্বে বল্লভ আচার্য্যের গদি আছে। আমরা কুয়ার দিকে যাইতেছিলাম, একজন বলিল, "উধার মৎ যাও।" কৃষ্ণ-দাদা বলিল, "কাঁহে, হামলোক মচলি খাতা, উসকো আস্তে নেহি জানে দেওগে।" উহারা বলিল, "নেই, আপ্‌লোক আস্‌নান্ করকে নেহি আয়া, উসি আস্তে।" আমাদের অদৃষ্ট মন্দ, তাই কুয়া দেখিতে পাইলাম না।

সেখান হইতে বাহির হইয়া এক্কা করিয়া বরাবর কেল্লার নিকট গেলাম। কিছু দূরে এক্কা রাখিয়া, ফটকের নিকট যাইতেই একজন সিপাহি বলিল, "কাঁহা যাওগে।" আমরা বলিলাম, "মন্মথবাবু Jailor আছেন, তাঁহার নিকট যাইব।" খুব সম্মানের সহিত সে আমাদের ভিতরে প্রবেশ করিতে দিল। কিন্তু মন্মথবাবুর সহিত পরিচয় ত দূরের কথা, ইহ জীবনে তাঁহার চেহারাও দেখি নাই। ভিতরে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার বাটীতে যাইয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিলাম ও তাঁহাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলাম, যাহাতে এখানকার সব দেখিতে পাই। তাঁহার সহকারীকে তিনি একখানি চিঠি দিলেন। দেখিলাম কেল্লা ত্রিকোণাকার। তিন ধারে বেড়াইবার বাঁধান রাস্তা আছে। অদূরে পুণ্যতোয়া ভাগীরথী তর-তর করিয়া বহিয়া চলিতেছে। গ্রামে ছোট-ছোট বিপনি, বহুদূরে বিন্ধ্য-গিরি। দেখিতে দেখিতে নীচে নামিয়া আসিলাম। আজকাল কেল্লাটা একটা Reformatory হইয়াছে। কেল্লা হইতে বাহির হইয়া গুহকের বাটী দেখিতে গেলাম। সেখানে একটা গর্ত্ত আছে। শুনিলাম যদি কেহ বলে, আমি তেল দিব, ত তখন ৭।৮ মণ দিলেও শেষ হয় না। আর কেহ যদি বলে আমি দিতে পারিব না; তাহা হইতে কয়েক ফোঁটা দিলেই ভরিয়া যায়। আমরা এ আজগুবি ব্যাপার পরীক্ষা করিবার সময় পাইলাম না,—তাড়াতাড়ি সব দেখিতে হইবে কি না! সেখান হইতে দোকান-পশর দেখিতে গেলাম। ৩।৪ খানা পানের দোকান, ২।১টা দর্জ্জির দোকান, ২।১ খানা খাবারের দোকান, ২।৩ খান

চুণারের বিখ্যাত মাটির খেলনার দোকান। আমরা কিছু খরিদ করিলাম। যখন বাসায় ফিরিলাম, তখন বেলা প্রায় ১টা। তাড়াতাড়ি জিনিষগুলি রাখিয়া পবিত্র গঙ্গা-জলে অবগাহন করিয়া সমস্ত পাপ ধৌত করিয়া নির্ম্মল চিত্তে ফিরিলাম। খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া আমি জিনিষগুলি গুছাইতে লাগিলাম। তাহার পর একায় আরোহণ করিয়া ষ্টেসনে আসিলাম। তাহার পর আর কি? গাড়ীতে উঠিয়া যথাসময়ে কাশীধামে পৌঁছিয়া শ্রান্তি দূর করিলাম। আমার কয়েক ঘণ্টায়—বলিতে গেলে এক নিঃশ্বাসে—চুণার দর্শন শেষ হইল এবং পাঠকগণকে তাহার একটা সংক্ষিপ্ত তালিকামাত্র দিয়াই আমি উপসংহার করিলাম। বৃত্তান্ত নাই হউক—ভ্রমণ বটে ত!

চিনির কথা

[শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ]

ভারতজাত চিনি বিদেশ হইতে আমদানী চিনির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারিতেছে না দেখিয়া, যুক্ত-প্রদেশে গুড় ও চিনি প্রস্তুত করিবার দেশীয় প্রণালীর উন্নতি সাধনের জন্য কয়েক বৎসর ধরিয়া চেষ্টা চলিতেছিল। যুদ্ধের পূর্ব্ব বৎসর পর্য্যন্ত বৈদেশিক চিনির আমদানী শনৈঃ-শনৈঃ বাড়িয়া যাইতেছিল; তাহাতে কর্ত্তৃপক্ষ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। চিনি-প্রস্তুত-প্রণালীর সংশোধন ও উন্নতি সাধন করিয়া, চিনি উৎপাদনের পড়তা কমাইয়া, উহা যাহাতে বিদেশী চিনির অপেক্ষা দরে সস্তা হয়, সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইয়াছিল। এই চেষ্টার ফল পুষার এগ্রিকালচারাল রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউট হইতে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ভারত গবর্ণমেণ্টের Sugar Engineer Expert Mr. William Hulme ও Nawabganj Experimental Factoryর Sugar Chemist Mr. R. P. Sanghi উভয়ে মিলিয়া এই পুস্তিকাখানির রচনা করিয়াছেন। সেই পুস্তিকা অবলম্বন করিয়াই বক্ষ্যমান প্রবন্ধটি সঙ্কলিত হইল। ইহার সহিত যে চিত্রগুলি প্রদত্ত হইতেছে, তাহাও ঐ পুস্তিকা হইতে গৃহীত হইয়াছে।

যুক্ত প্রদেশে যথেষ্ট পরিমাণে ইক্ষু উৎপন্ন হয়। এই ইক্ষু-শস্য হইতে যে গুড় ও চিনি উৎপন্ন হয়, তাহার কিয়দংশ পঞ্জাব ও ভারতের অন্যান্য অংশে প্রেরিত হয়। গুড় ও চিনির সম্বন্ধে সরকার হইতে যাহা কিছু অনুসন্ধান হইয়াছে, তাহা প্রথমে বেরিলী জেলায় আরম্ভ হয়। এই উদ্দেশ্যে ১৯১৪-১৫ অব্দে তথায় একটা ক্ষুদ্র Experimental Factory স্থাপিত হয়। বেরিলী ও পিলিভিতের মধ্যস্থলে নবাবগঞ্জের সরকারী farm এই উদ্দেশ্যে নির্ব্বাচিত হয়।

এই কৃষিক্ষেত্রে প্রথমে ইক্ষুর চাষ সম্বন্ধে পরীক্ষা আরম্ভ করা হয়। এক্ষণে যে-যে জাতীয় ইক্ষু উৎপাদিত হয়, তাহাদের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করা হয় এবং ফ্যাক্টরীতে কলের সাহায্যে কোন্ জাতীয় ইক্ষু হইতে কি পরিমাণে গুড় বা চিনি উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা নির্ণয় করা হয়। এই পরীক্ষা হইতে, কোন্ জাতীয় ইক্ষু স্থানীয় ভূমি এবং জল-বায়ুর পক্ষে সম্যক্ উপযোগী, তাহা নির্ণয় করাই এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল।

ইক্ষুর ফলন জমির প্রকৃতি, সার, ঋতু এবং চাষের প্রণালীর উপর খুব বেশী পরিমাণে নির্ভর করে; এই জন্য, কোন্ জাতীয় ইক্ষু এখানকার স্থানীয় অবস্থার পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহা এখনও নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায় নাই। চিনির কারখানার পক্ষে দুই জাতীয় ইক্ষু সমধিক উপযোগী;—অর্থাৎ যাহা সর্ব্বাগ্রে ফলে এবং যাহা সর্ব্বশেষে ফলে। পরীক্ষায় স্থির হইয়াছে যে, সারেথা (Saretha) জাতীয় ইক্ষু কিছু শীঘ্র বপন করা হইলে, নবেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে কলে মাড়িবার উপযোগী হয়; তবে তখনও তাহাদের পূর্ণ পরিণতি ঘটে না। চীন জাতীয় ইক্ষুর ফলনও খুব শীঘ্র হয়। এই ক্ষেত্রে যে সকল জাতীয় ইক্ষুর চাষ হইয়াছিল, তন্মধ্যে বোধ হয় F-33 জাতীয় ইক্ষুই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছিল। এই জাতীয় আখ ফেব্রুয়ারী মাসে পাকে। ধাউড় (Dhour, Kagzi) কাগজী প্রভৃতি জাতীয় ইক্ষু মার্চ্চ মাসে পাকে। উবা (Uba) ও আগুল (Agoul) জাতীয় ইক্ষুও উত্তম; কিন্তু ইহাতে মোম ও আঠাবৎ পদার্থ খুব বেশী পরিমাণে থাকায় ইহাদের লইয়া কারবার চালানো কঠিন। এ বৎসর এই দুই জাতীয় ইক্ষু লইয়া বড় মুস্কিলে পড়িতে হইয়াছে,—নিয়মিত সময় কাটিতে না কাটিতেই ফিল্টারগুলি বুজিয়া যাইতেছিল। রস শোধন করিবার যন্ত্রে থিতাইয়া পড়িতেও খুব বেশী সময় লাগিয়াছিল।

নূতন যে কল-কব্জা বসানো হইয়াছে, তাহাদের কাজ করিবার ক্ষমতা কতদূর, ১৯১৫-১৬ অব্দে তাহা পরীক্ষা করিবার কল্পনা হইয়াছিল। কিন্তু কতকগুলা কল দেরীতে আসিয়া পড়ায়, এবং যথেষ্ট পরিমাণে ইক্ষুরও আমদানী না হওয়ায়, একটা বৎসর মাটী হইয়া যায়। তবে, যখনই আখ পাওয়া যাইতেছিল, তখনই কারখানার কাজ চালানো হইতেছিল। এইরূপে ঐ বৎসরে ৫৪ দিন কাজ চলে। ইহার মধ্যে কয়েকদিন পুরা ২৪ ঘণ্টা এবং কয়েক দিন দুই-চারি ঘণ্টা

মাত্র কাজ হয়। এইরূপ বিশৃঙ্খল অবস্থাতে কাজ করিয়াও অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। আখমাড়া কলগুলি যখন ৬টি রোলার লইয়া কাজ করিয়াছিল, এবং যখন যথাক্রমে নয়টি ও এগারটি রোলার লইয়া কাজ করিয়াছিল, তখন ইহাদের কাজের কিরূপ ইতর-বিশেষ হইয়াছিল, তাহা স্থির করা হয়। রস পরিষ্কার করার সম্বন্ধেও অনেকগুলি পরীক্ষা হইয়াছিল। আধুনিক বড়-বড় চিনির কারখানাগুলিতে অবশ্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রস বিশোধিত হইয়া থাকে; কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখকগণ খুব সরল প্রণালীতে কাজ করিবার মতলব করায়, তাঁহাদিগকে কিছু অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল। সোজাসুজি চূণ দিয়া রস পরিষ্কার করিবার প্রথা ভাল বটে; কিন্তু যে শ্রেণীর আখ পাওয়া গিয়াছিল, তাহাতে সাদা চিনি উৎপন্ন হয় নাই। এই কারণে রস পরিষ্কার করিবার 'সালফাইটেসন' প্রথা অবলম্বিত হয়। সালফিউরিক্ এসিডের দ্বারা কেবল এসিডের মধ্যস্থতায় চিনি সাদা হইতে পারে। প্রকৃত পক্ষে যে-কোন এসিডই রসের বর্ণ-ব্যত্যয় ঘটাইতে পারে। তবে এসিড ব্যবহারের অসুবিধা এই যে, ছাঁকিবার সময় বিপরীত ক্রিয়া সামান্য হইলেও, রস শুকাইবার সময় উহা খুব বেশী হয়। আর যদি ক্যালসিয়াম বাইসাল্‌ফেট উৎপন্ন হয়, তবে তাহা রসের সহিত দ্রব অবস্থায় থাকিয়া, শুকাইবার সময় থিতাইয়া পড়ে। এদিকে phenol-phthálein ব্যবহারে চিনি ঈষৎ লালচে হইলেও, এ ক্ষেত্রে বিপরীত ক্রিয়ার অবকাশ কম থাকে; আর ক্যালসিয়াম সাল্‌ফাইটের অংশ অদ্রব অবস্থায় সমস্ত ময়লা সহ তলায় থিতাইয়া যায়। কিন্তু এই শেষোক্ত প্রক্রিয়ার পূর্ণ পরীক্ষা সময়াভাবে হইতে পারে নাই। সালফাইটেসন প্রণালীতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক জগতে double "sulphitation method ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এদেশে তাপাধিক্যবশতঃ ঐ প্রথা চলে না। রস ছাঁকিবার ও ঘন করিবার অনেক রকম প্রথার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। তাহার ফলে, কারখানার একটু-আধটু পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। রুড়কীর Canal Foundryতে অতিরিক্ত কলকব্জা বসানো হইতেছে।

১৯১৬-১৭ অব্দে বেরিলী জেলায় ও পিলিভিত জেলায় আখের চাষ ভাল হয় নাই; অতি-বৃষ্টির দরুণ অনেক আখ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। যাহা পাওয়া গিয়াছিল, তাহাও নিকৃষ্ট ছিল। আখের অভাবে কারখানার কাজও সুতরাং ভাল চলিতে পারে নাই। বেরিলী জেলায় ইক্ষুর অবস্থা ত এই। তবে পঞ্জাবের পেশোয়ার জেলায় আখ মন্দ হয় না। সেই জন্য পশ্চিমোত্তর সীমান্ত প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট, তথায় চিনির কারখানা স্থাপন করা সম্ভব কি না, তাহা বিবেচনা করিতেছেন। পেশোয়ারের আখ ভাল বটে, কিন্তু যবদ্বীপ ও মারিচ দ্বীপের আখ পেশোয়ারের চাইতেও ভাল বলিয়া বোধ হয়।

বেরিলীর কারখানায় প্রত্যহ চিনি ও গুড় প্রস্তুত করা হইয়াছে; এবং তাহাদের রাসায়নিক বিশ্লেষণ-মূলক পরীক্ষার ফল লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে ইক্ষুর অভাবে, কারখানার কলকব্জার কাজ করিবার শক্তি কতখানি, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। সুতরাং ব্যবসায়-ক্ষেত্রে ইহার সাফল্য কতদূর হইতে পারে, তাহা এখনও অনিশ্চিত।

দেশীয় প্রণালী।

যুক্ত-প্রদেশে উৎপন্ন ইক্ষুর অধিকাংশই ছোট-ছোট দেশীয় আখমাড়া কলে ফেলিয়া, তাহা হইতে নির্য্যাস নিষ্কাসিত হয়। দুই কি তিনটি রোলারের মধ্য দিয়া আখগুলি চালাইয়া পিষিয়া রস বাহির করিয়া লওয়া হয়। এক-একটি রোলারের ব্যাস আট ইঞ্চি। এই কলগুলি দেশীয় কারিগরদের দ্বারা তৈয়ারী, ইহাদের দামও খুব কম। কিন্তু ইহাতে রস অনেকটা নষ্ট হয় বলিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিক কারখানায় ইহা একেবারে অচল। এই যন্ত্রে রোলারগুলি আড়া-আড়ি ভাবে থাকায়, নিষ্কাশিত রস নীচে পড়িবার সময় তাহার কতকটা পিষ্ট ইক্ষু-দণ্ডের দ্বারা শোষিত হইয়া যায়—তাহার আর পুনরুদ্ধার করা হয় না। গরুর দ্বারা এই যন্ত্র চালিত হইয়া থাকে। এইরূপে উত্তম ইক্ষু হইতে শতকরা ৫০ অংশ রস পাওয়া যায়। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে ঐ ইক্ষু হইতেই আরও শতকরা ২৫ অংশ রস পাওয়া যাইতে পারে। এই লোকসান বড় কম নয়। কিন্তু কৃষক নিতান্ত নিরুপায়। অবস্থার গতিকে সে মূল্যবান ভাল কল কিনিতে পারে না; কাজেই তাহাকে বাধ্য হইয়া লোকসান সহ্য করিয়াও এই অল্পমূল্যের কল লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। এ পক্ষে দেশীয় চিনি-প্রস্তুতকারীও তাহার বাদী হইয়া দাঁড়ায়। আখ-মাড়া হইয়া গেলে যে ইক্ষুদণ্ড অবশিষ্ট থাকে, তাহা শুকাইয়া, রস জ্বাল দিয়া গুড় প্রস্তুত করিবার সময়, ইন্ধন রূপে ব্যবহৃত হয়। ইক্ষুদণ্ড হইতে নিঃশেষে রস বাহির করিয়া লইলে, উহা হইতে তাপ কম হয়, সুতরাং বেশী ইন্ধন লাগে। সেইজন্য, ইক্ষু হইতে পূর্ণ রস বাহির করিয়া লওয়া হয়, ইহা তাহারা পছন্দ করে না—ইহাতে তাহার স্বার্থহানি ঘটে।

এই ব্যবস্থাটি, আমাদের মনে হয়, গরীব কৃষকের প্রতি নিতান্ত অন্যায় অত্যাচার। ইহার প্রতিবিধান হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। আমরা পল্লীগ্রামে খেজুর রস হইতে গুড় প্রস্তুত করার প্রণালী দেখিয়াছি। আখের রস হইতে গুড় প্রস্তুত করিবার সময়, পিষ্ট ইক্ষুদণ্ড হইতে ইন্ধন স্বরূপ যে সাহায্য পাওয়া যায়, খেজুরে গুড় প্রস্তুত করিবার সময় সেরূপ সুবিধা কিছুই পাওয়া যায় না। অথচ খেজুরে গুড় প্রস্তুত করিবার জন্য যদি ইন্ধন সংগ্রহার্থ স্বতন্ত্র অর্থ ব্যয় করিতে হয়, তাহা হইলে গুড়ের পড়তা বেশী পড়িয়া যায়। পাসীরা তাহা করে না। তাহারা শুষ্ক বৃক্ষপত্র, তৃণ-গুল্ম প্রভৃতি পোড়াইয়া তাপ উৎপাদন কার্য্য চালাইয়া লয়। ইক্ষু রস জ্বাল দিবার সময়েও কেন এই প্রণালীতে কাজ হইবে না, তাহা বুঝিতে পারি না। চাষাদের ঘাড় ভাঙ্গিয়া সহজে শুষ্ক ইক্ষুদণ্ড পাওয়া যায় বলিয়াই কি তাহাদের উপর

অত্যাচার করিতে হইবে? আখ হইতে উত্তমরূপে রস নিঙড়াইয়া লইবার পর, অবশিষ্ট ইক্ষুদণ্ড যদি রস জ্বাল দিবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত না হয়, তাহা হইলে, শুষ্ক বৃক্ষ-পত্রাদি দিয়াই সে অভাব পূরণ করা উচিত। (১)

যুক্ত-প্রদেশের দেশী আখমাড়া কল কেমন তাহা আমরা জানি না। কিন্তু বাঙ্গলাদেশে—কলিকাতায় এবং অন্যান্য স্থানে, প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে একরূপ আখমাড়া কল দেখিতে পাওয়া যায়। উহা গরুর দ্বারাও চালিত হইতে পারে, এবং বোধ হয় মানুষে হাতে চালাইতেও পারে। ইহা কাঠেরও হয়, লোহারও হয়। এই যন্ত্রে রোলারগুলি খাড়া ভাবে থাকে। সেই জন্য মনে হয়, যুক্ত-প্রদেশের যন্ত্রে যে রস লোকসান হয়, বাঙ্গলায় কলে তাহা না হওয়াই সম্ভব; অন্ততঃ, যদি হয়, তবে তাহা খুব সামান্য। ইহা আমাদের দেশী কারিগরের হাতের তৈয়ারী এবং যন্ত্রগুলি খুব দামী বলিয়াও বোধ হয় না। যুক্তপ্রদেশে আখ মাড়াইয়ের স্থলে বাঙ্গলায় কল চলে কি না, এবং তাহাতে কিছু সুবিধা হয় কি না, তাহা পরীক্ষা করিলে ভাল হয় বলিয়াই মনে হইতেছে। সে যাহাই হউক, দেখিতেছি, আমাদের দেশের দারিদ্র্যই ব্যবসা-বাণিজ্যে আমাদের সাফল্য লাভের পক্ষে সর্ব্বপ্রধান অন্তরায়। দরিদ্র কৃষক একা যদি দামী কল কিনিতে নাই পারে, দুই-তিনজনে মিলিয়া পারে না কি? এইরূপ সমবেত ভাবে কাজ করিবার সুবিধা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। আর, যদি তাহাও সুবিধাজনক না হয়, তবে, কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটীর এটা একটা সুন্দর কার্য্যক্ষেত্র। দামী যন্ত্র সংগ্রহে কৃষককে সাহায্য করাই প্রকৃত কো-অপারেশন। তবে শিক্ষিত ভদ্রলোকদিগেরও এদিকে একটু মনোযোগ দেওয়া দরকার। কৃষককে সমবেত ভাবে কাজ করিবার সুবিধা বুঝাইয়া দিলে, এবং কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে কলকব্জা সংগ্রহে সাহায্য করিলে দেশের যথার্থ মঙ্গল সাধিত হইতে পারে।

চিনি প্রস্তুত করিবার দেশীয় প্রণালী।

চাষীরা খণ্ডসারির (চিনি-প্রস্তুত-কারকের) বেলের (চিনির কারখানার) কাছে আখমাড়া কল ভাড়া করিয়া আনিয়া বসায়। ভারতের সর্ব্বত্র কৃষকের অবস্থা একই রকম—সকল জায়গাতেই সে চাষা; এবং তাহার বুদ্ধিও চাষার বুদ্ধি। কাজেই তাহার হা-ভাতে অবস্থা কিছুতেই ঘুচে না। আর, খন্দসারি মহাজন-শ্রেণীর লোক—সুতরাং তাহার বুদ্ধিও মহাজনী বুদ্ধি। সে নিয়মিত ভাবে যথেষ্ট রস পাইবার জন্য চাষাকে চাষের আগে দাদন দিয়া রাখে। চাষাও হাত পাতিয়া দাদন লয় বলিয়া, ইক্ষু উৎপন্ন হইলে মহাজন নিজের ইচ্ছামত রসের মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দেয়। (আবার, আখ হইতে নিঃশেষে রস বাহির করিয়া লইলে, তাহার তাপের পরিমাণ কমিয়া যাইবে বলিয়া, মহাজন কৃষককে রক্ত-চক্ষুর ভয় প্রদর্শন করিবে, তাহাও সঙ্গত ও স্বাভাবিক!) কেবল ইহাই নহে। খন্দসারি ফসল কেনে না—কেবল রস ক্রয় করে মাত্র। সুতরাং হাজা-শুকার দরুণ ফসল যেমনই উৎপন্ন হউক, তাহাতে ক্ষতি চাষারই—মহাজনের একটী পয়সাও ক্ষতি হয় না। কৃষককে যেমন করিয়াই হউক, রস যোগাইয়া দাদনের টাকা শোধ করিতেই হইবে। এক চাষে, ফসল ভাল হওয়ার দরুণ টাকা শোধ করিতে না পারিলে, পরবর্ত্তী চাষে, কিম্বা তাহারও পরবর্ত্তী চাষে,—হয় ত বা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদসহ—টাকা শোধ করিতে হইবে; এবং যতদিন না টাকা শোধ হয়, ততদিন মহাজন আসল ও সুদের জের টানিয়া চলিবে।

বেলে সাধারণতঃ পাঁচটি লোহার কড়া থাকে। কড়াগুলির আকার বড় হইতে ক্রমশঃ ছোট। প্রথম কড়াটি সর্ব্বাপেক্ষা বড়। তাহাতে রস জ্বাল দিয়া জল অর্দ্ধেক মরিয়া আসিলে, তদপেক্ষা ক্ষুদ্রায়তন দ্বিতীয় কড়ায় তাহা স্থানান্তরিত হয়। সেখানে আরও কিছু ঘন হইয়া তৃতীয় কড়ায় ঢালিত হয়। এইরূপে ঘন হইতে হইতে ক্রমশঃ পঞ্চম কড়ায় আনীত হইলে, রস চিনি হইবার উপযোগী ঘনত্ব প্রাপ্ত হয়। তার পর তাহা দানা বাঁধিবার জন্য বড়-বড় মাটীর গামলায় স্থাপিত হয়। কিছু-কিছু দানা বাঁধিলে, গামলার তলার ছিদ্র খুলিয়া দিয়া মাৎ বাহির করিয়া দেওয়া হয়; এবং উপরে সেওলার (একপ্রকার নদীজাত শৈবাল) দুই-তিন ইঞ্চি পুরু করিয়া চাপা দিতে হয়। শৈবাল-সাহায্যে মাৎ বাহির হইয়া যায়, এবং উপরকার প্রায় আধ ইঞ্চি আন্দাজ চিনি সাদা হইয়া আসে। সাদা অংশ চাঁচিয়া লইয়া পাটায় রাখিয়া দেওয়া হয়, এবং প্রত্যহ শৈবাল বদলাইয়া সমস্ত চিনিটাকে সাদা করিয়া ফেলা হয়। সব চিনি পাটায় আসিয়া পৌঁছিলে, তাহা সূর্য্যোত্তাপে শুকাইয়া লওয়া হয়। তৎপরে কয়েকজন লোক উহাকে পায়ে করিয়া দলিয়া চূর্ণ করিয়া ফেলে। সম্ভবতঃ ইহাই দলো চিনি। [এইখানে প্রবন্ধ-লেখকদ্বয় নিম্নলিখিত মন্তব্যটুকু প্রকাশ করিয়াছেন, "This is called swadeshi sugar for which orthodox Indians will pay higher price than can be obtained for the high class modern factory sugar."]

ইহা ছাড়া আর এক প্রকারেও মাৎ পৃথক করা হয়। ঘন রস অর্থাৎ 'রাব' বা মাৎ মিশ্রিত চিনি, থলিয়ায় পুরিয়া ছয়-সাতটী থলি

(১) এইখানে একটী অবান্তর প্রসঙ্গ উত্থাপনের লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। কাগজের অভাব এবং মূল্যাধিক্যবশতঃ সংবাদ-পত্রাদি পরিচালন এবং পুস্তকাদির মুদ্রাঙ্কণ কিরূপ কঠিন ও ব্যয়সাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। শুনিতে পাই, বাঁশ হইতে কাগজের উপাদান পাওয়া যাইতেছে। বংশদণ্ড হইতে যদি কাগজের উপাদান পাওয়া যায়, তাহা হইলে, রস নিষ্কাশনের পর শুষ্ক ইক্ষুদণ্ড হইতেও কাগজের উপাদান পাওয়া অসম্ভব নহে বলিয়াই মনে হয়। কোন রসায়ন-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত কি ইহার পরীক্ষা করিতে পারেন না? পরীক্ষা সফল হইলে যে কি অপূর্ব্ব ব্যাপার ঘটিতে পারে, তাহা বোধ করি না বলিলেও চলে।

উপরি-উপরি রাখা হয়। সকলের উপরিস্থ থলিয়ার উপর দাঁড়াইয়া একজন লোক একটা দণ্ড হাতে ধরিয়া দোল খাওয়ার ভঙ্গীতে অগ্র-পশ্চাৎ নিজের দেহকে সঞ্চালন করিতে থাকে। ইহার ফলে মাৎ পৃথক হইয়া থলিয়ার ভিতর কেবল চিনি থাকে। তৎপরে তাহাকে শেওলার সাহায্যে সাদা করিয়া পূর্ব্বোক্ত উপায়ে পায়ে দলিয়া গুঁড়া করা হয়।

এই দুইটী দেশীয় প্রণালীতে ১০০ মণ ইক্ষু হইতে তিন মণ মাত্র চিনি পাওয়া যায়। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ১০০ মণ ইক্ষু হইতে অন্ততঃ ১০ মণ পরিষ্কার চিনি পাওয়া যায়। আর একটা প্রণালীতে মাৎ গুড় হইতে আরও খানিকটা চিনি বাহির করিয়া লওয়া হয়। তাহাতে শতকরা আর একমণ করিয়া চিনি পাওয়া যায়। তাহা হইলেও পাঠকেরা সহজেই বুঝিতে পারিবেন, বিদেশী বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে উৎপন্ন চিনির সহিত দেশীয় প্রণালীতে উৎপন্ন চিনির বর্ত্তমান অবস্থায় প্রতিযোগিতা করিবার আদৌ কোন আশা আছে কি না। প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ করিতে হইলে, চাষের অবস্থা হইতে কার্য্যারম্ভ করিতে হইবে। যাহার ফলন অধিক এবং যাহাতে চিনির ভাগ বেশী, এমন উৎকৃষ্ট জাতীয় ইক্ষু নির্ব্বাচন করিয়া, উপযুক্ত সার-প্রয়োগ করিয়া, এবং ক্ষেত্রে জল সেচন ও তথা হইতে অতিরিক্ত জল নিকাশের বন্দোবস্ত করিয়া প্রথমে চাষের উন্নতির ব্যবস্থা করিতে হইবে। তার পর দরিদ্র কৃষককে মহাজনের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে ; কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটীর সাহায্যে সে যাহাতে উৎপন্ন ফসল হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে রস নিষ্কাশন করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে—যন্ত্র-তন্ত্র সংগ্রহ করিয়া দিয়া তাহাকে সাহায্য করিতে হইবে। স্থায়ী চিনির কারখানা স্থাপন বহুব্যয়সাধ্য ব্যাপার। তাহা কৃষকের সাধ্যায়ত্ত নহে এবং খন্দসারির সাধ্যায়ত্ত হইলেও, তাহার প্রবৃত্তির অভাব। অতএব চিনি উৎপাদনের ভার নিরপেক্ষ তৃতীয় ব্যক্তির হাতে যাওয়া কর্ত্তব্য।

যুক্তপ্রদেশের দুই-একজন ধনী কৃষক আখমাড়া কল চালাইবার জন্য অয়েল ইঞ্জিন ব্যবহার করিতেছে। কিন্তু অন্যতম প্রবন্ধ-লেখক বিবেচনা করেন, অয়েল ইঞ্জিনে যে তৈল ব্যবহৃত হয়, তাহার ব্যয় ধরিয়া চিনি উৎপাদনের পড়তা বেশী বই কম পড়িবে না। (কিন্তু আখ ভাল রূপে পেষাই হয় না বলিয়া যে রস লোকসান হয়, সেটা নিবারণ করিলে,—বেশী রস বাহির করিয়া লইতে পারিলেও কি তৈলের খরচা পোষাইতে পারে না ?) দেশীয় আখমাড়া কলে তিনটী করিয়া রোলার থাকে, বিদেশী বৈজ্ঞানিক কলে ১৪টি হইতে ২০টি পর্য্যন্ত রোলার থাকে। তাহাতে রস নিশ্চয়ই বেশী পাওয়া যায়। এরূপ কল ব্যয়সাধ্য এবং এগুলি চালাইতে সম্ভবতঃ অয়েল ইঞ্জিন বা ঐরূপ কোন শক্তির প্রয়োগ আবশ্যক। এ বিষয়ে রীতিমত পরীক্ষা হওয়া উচিত।

যুক্ত প্রদেশের ভূমি এবং আবহাওয়া ইক্ষুর চাষ এবং গুড় ও চিনি উৎপাদনের পক্ষে অন্যতম প্রধান অন্তরায়। এই কারণে এখানকার চিনি কোন কালে যে যবদ্বীপের চিনির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে, এমন আশা করিতে সাহস হয় না। যবদ্বীপের অপেক্ষা বেরিলী জেলায় উৎপন্ন ইক্ষু আকারে ক্ষুদ্র, পরিমাণে কম এবং তাহাতে শতকরা চিনির অংশও খুব অল্প। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে যাভা ও যুক্ত প্রদেশের অবস্থার তারতম্য কিছু বুঝা যাইবে—

প্রতি একারে

যবদ্বীপে উৎপন্ন ইক্ষু	১০০০ মণ
বেরিলী জেলায়	২৫০ মণ

প্রতি একারে চিনির পরিমাণ

যবদ্বীপ	১১০ মণ
বেরিলী জেলা (দেশীয় প্রথায়)	৭॥০
যবদ্বীপে ১০০ একারে জাত ইক্ষু হইতে উৎপন্ন চিনি	৪০৪ টন
বেরিলীতে ঐ	২৭ টন

এই বিষম পার্থক্য হইতে সহজেই বুঝা যাইবে, বেরিলী-জাত চিনি কোন ক্রমে যাভার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে না। তবে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে উন্নত ধরণে চাষ করিয়া যদি একার-পিছু ইক্ষুর ফলনের পরিমাণ বাড়াইতে পারা যায়, এবং ইক্ষু-নির্ব্বাচন-কৌশলে যদি তাহাতে ঘন রস জন্মাইতে পারা যায় এবং আঠার অংশ কমাইয়া চিনির অংশ বাড়াইতে পারা যায়, তাহা হইলে কেবল স্থানীয় বাজারে বেরিলীর চিনি যাভার চিনির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে ; কারণ, যাভার চিনি কলিকাতা পর্য্যন্ত সস্তা হইলেও, দেশের সুদূর অভ্যন্তরে চালান দিতে রেলভাড়া প্রভৃতি বাবদে ব্যয় এত বেশী পড়ে যে, যুক্ত প্রদেশের সহরগুলিতে যাভার চিনির অপেক্ষা কম দরে যুক্ত প্রদেশের চিনি বিকাইতে পারে। চাষের উন্নতি করিলে বেরিলী জেলাতেই প্রতি একারে ৮০০ মণ ইক্ষু উৎপন্ন করা যায়। সেখানকার সরকারী কৃষিক্ষেত্রে ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে। আর আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে চিনি তৈয়ার করিলে প্রতি একারে উৎপন্ন ইক্ষু হইতে ৬৪ মণ পর্য্যন্ত চিনি পাওয়া যাইতে পারে। বৈজ্ঞানিক দেশীয় প্রথায় কোথায় ৭॥ মণ, আর, এ প্রথায় কোথায় ৬৪ মণ ! কি আকাশ-পাতাল প্রভেদ ! এরূপ অবস্থায় চিনির ব্যবসায় আর দেশীয় কৃষক বা খন্দসারের হাতে থাকিবার আশা করা যায় না,—যদি না শিক্ষিত সম্প্রদায় যৌথ মূলধনে এই ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করেন।

যুক্তপ্রদেশের গবর্ণমেণ্ট চিনি-উৎপাদন-প্রণালীর উন্নতি সাধনের জন্য বহুদিন ধরিয়া চেষ্টা করিতেছেন। আমরা অনেক দিন পূর্ব্বেই তাহার কিছু-কিছু আভাষ পাইয়াছিলাম। বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখকদ্বয় এ সম্বন্ধে যাহা করিয়াছেন, এই প্রবন্ধের সহিত প্রকাশিত চিত্রগুলি হইতে তাহা কিছু-কিছু বুঝা যাইবে। বলা বাহুল্য, এই কারখানা অতি ক্ষুদ্রকারে, পরীক্ষার স্বরূপ, এবং মধ্যম শ্রেণীর ধনী লোকদিগকে এই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে উৎসাহিত করিবার জন্য স্থাপিত হইয়াছে। বেরিলীর এই এক্সপেরিমেণ্টাল ফ্যাক্টরী ১৯১৪-১৫ অব্দে গঠিত হয়।

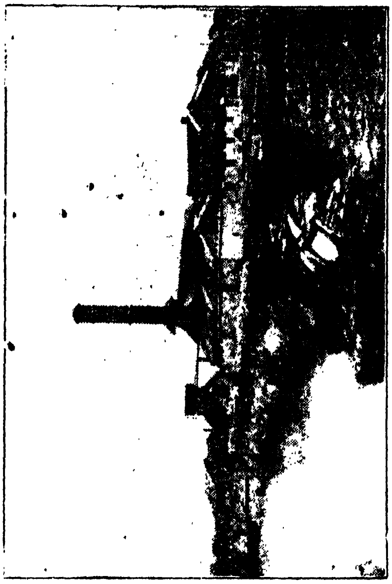

বেরিলীর এক্সপেরিমেণ্টাল ফ্যাক্টরী

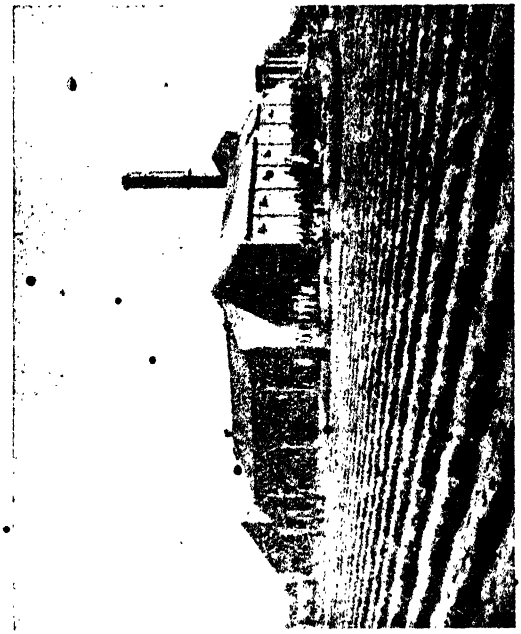

ইক্ষু চাষের জন্য প্রস্তুত জমি

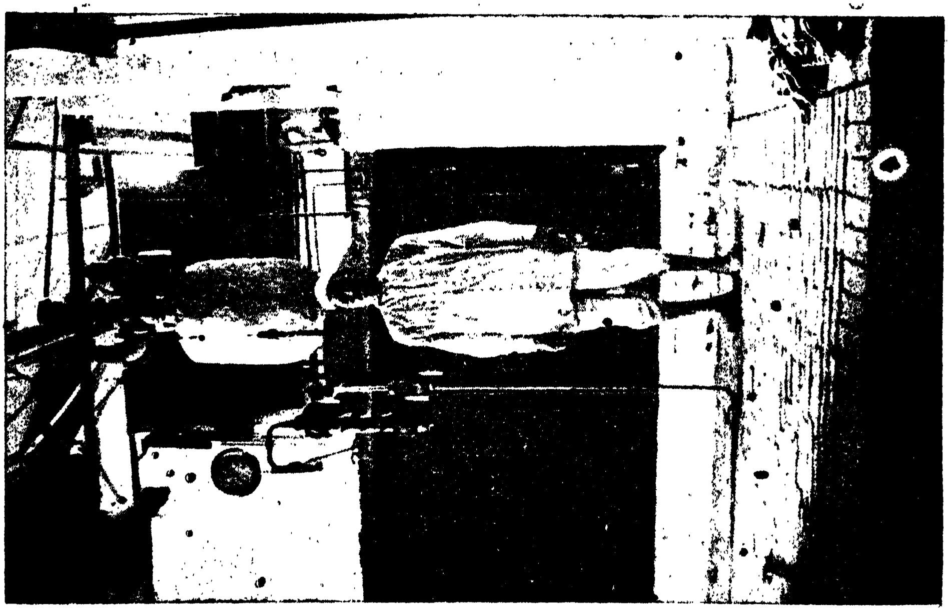

আখমাড়া কল ইঞ্জিন

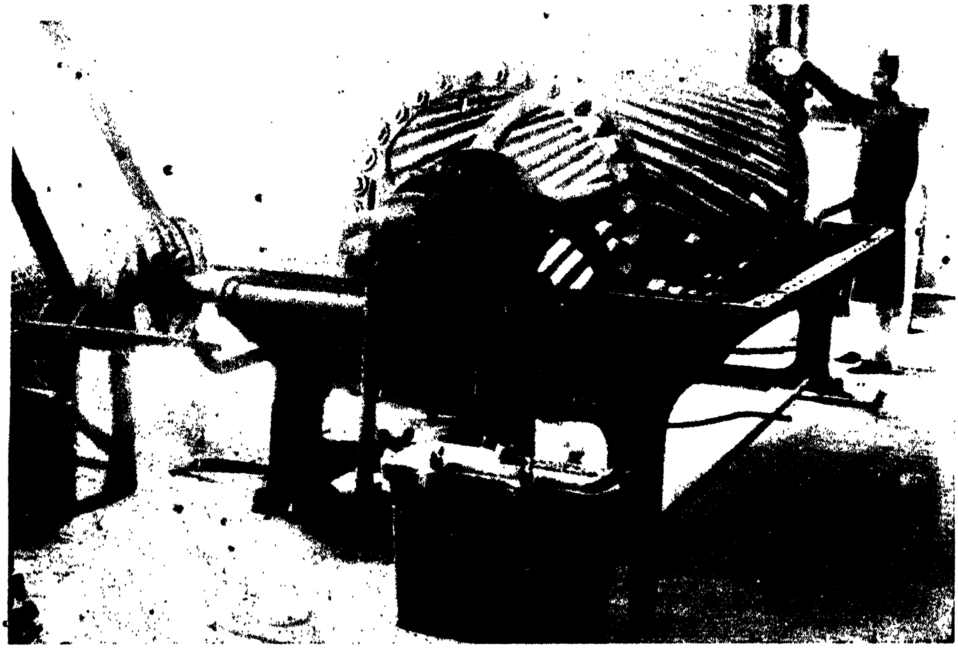

রস মারিবার যন্ত্র (Film Evaporator)

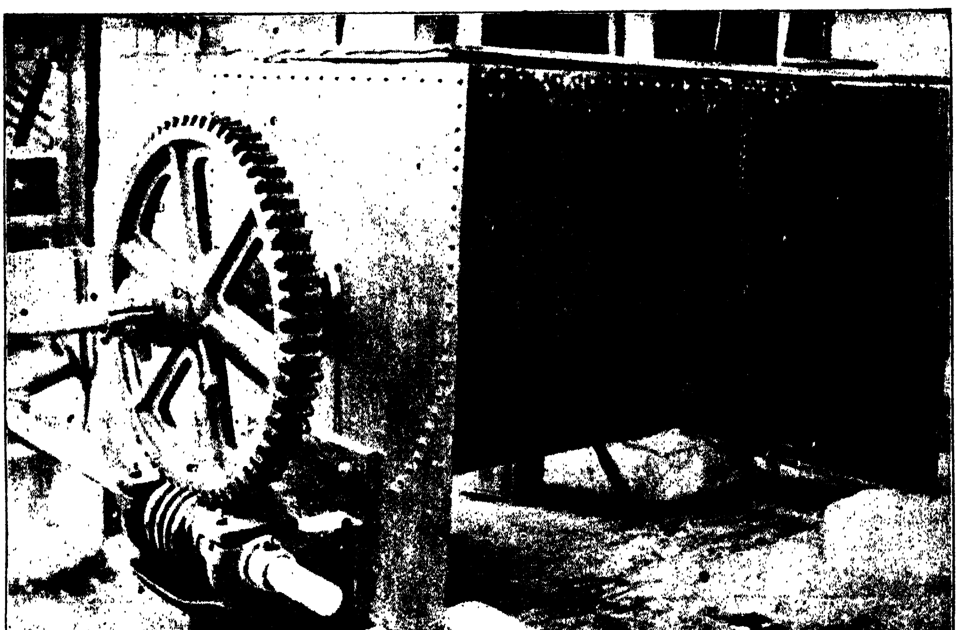

দানা বাঁধাইবার যন্ত্র (Crystallizer)

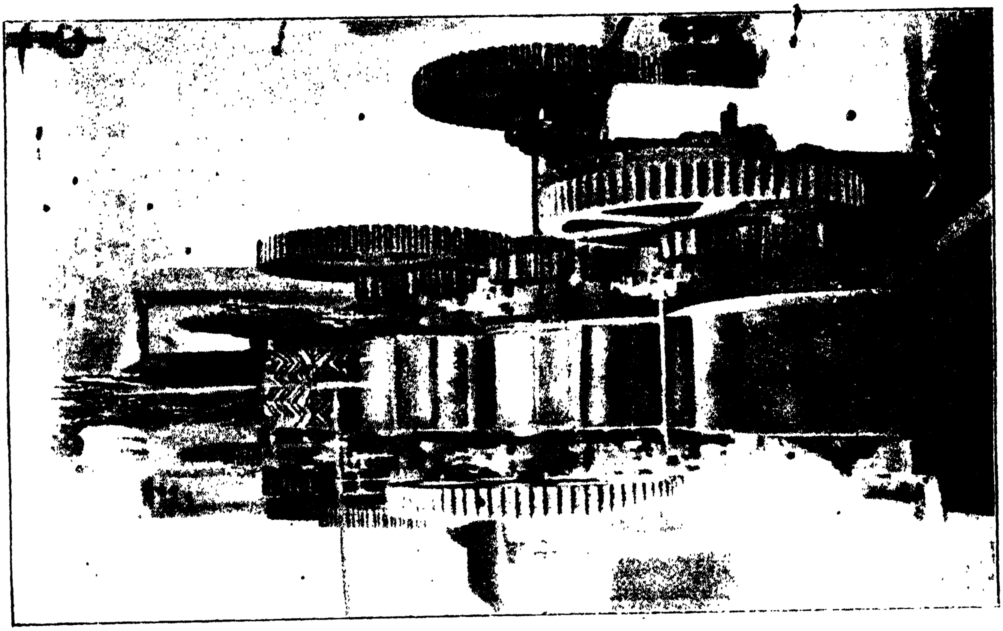

আখমাড়া কল

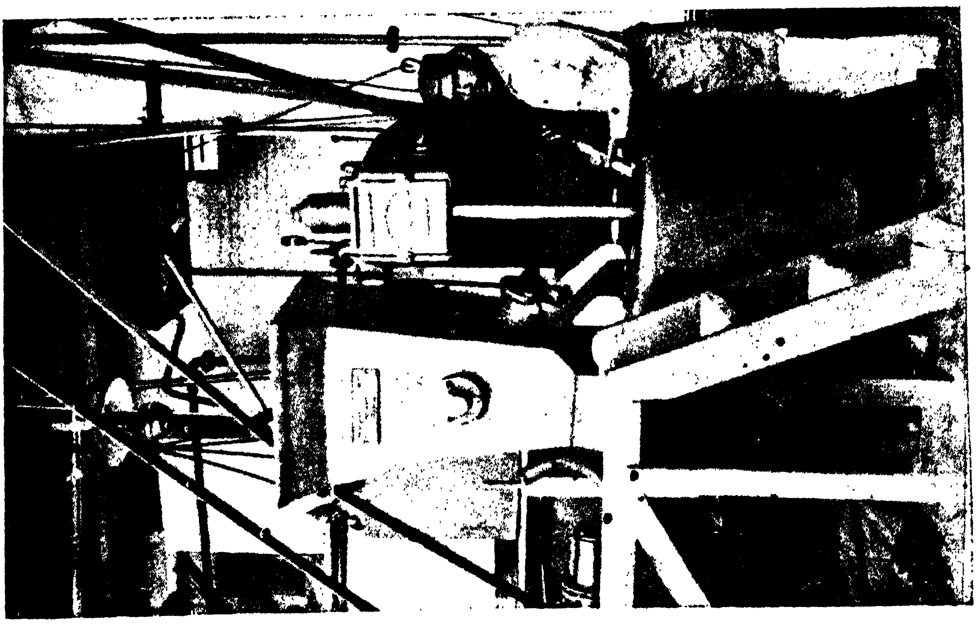

A, পাগ্ মিল ; B, লাইমিং ট্যাঙ্ক ; C, সেণ্ট্রিফিউগ্যাল মেশিন

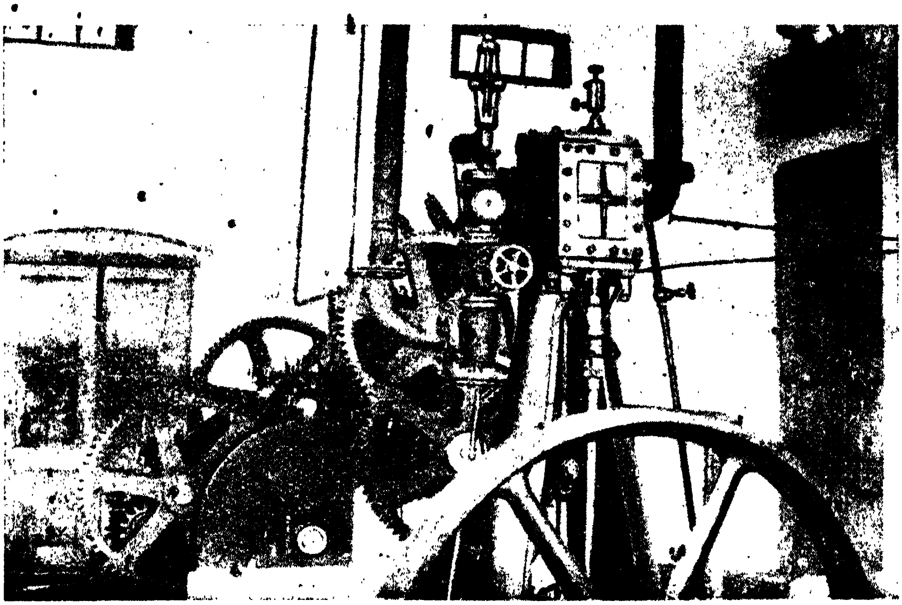

আখমাড়া কল ও ইঞ্জিন

এদেশের সাধারণ লোকের বোধগম্য করিবার অভিপ্রায়ে ইহাতে জটিল কল-কব্জা যথসম্ভব বর্জ্জিত হইয়াছে। আর, মধ্যশ্রেণীর জমিদার বা খন্দসারিয়া যাহাতে অল্প মূলধনে চালাইতে পারে, এরূপ অল্প মূল্যের যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় ১৯১৬-১৭ অব্দে আখ ভালরূপ জন্মে নাই বলিয়া পুরা একটা সিজনের কাজ হয় নাই। খন্দসারিরা দাদন দিয়া কৃষকগণকে এমন ভাবে হাতের মুঠার মধ্যে রাখিয়াছে যে, সরকার বাহাদুর তাহাদের অপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে চাহিয়াও চাষাদের নিকট হইতে ইক্ষু সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। এজন্য কারখানায় ইক্ষুর জন্য সরকারী পরীক্ষা-ক্ষেত্রের উপর প্রধানতঃ নির্ভর করিতে হইয়াছিল। সেই ইক্ষুতে ১৯১৫-১৬ অব্দে ৫৪ দিন এবং ১৯১৬-১৭ অব্দে ৪৪ দিন মাত্র কাজ হইয়াছিল। কিন্তু সাধারণতঃ যুক্ত-প্রদেশে চারি মাস ধরিয়া ইক্ষুর কাজ চলে।

প্রথমতঃ দেখা যায়, আখমাড়া কলে যে পরিমাণ আখ মাড়িয়া রস বাহির করা যায়, রস শুকাইবার কলের কার্য্যক্ষমতা তাহার সমতুল্য নয়। আর দানা বাঁধিবার যন্ত্রটিও তেমন কাজের হয় নাই। সেইজন্য এই যন্ত্রগুলির সংশোধন ও পরিবর্দ্ধনের ব্যবস্থা হইতেছে।

আখমাড়া কলটিতে ১১টী রোলার ঘন-সন্নিবিষ্ট ভাবে আছে। এই কলে ঘণ্টায় এক টন আখ হইতে রস বাহির করা যায়। এই কলের এক মুখে আখগুলি দিয়া কল চালাইয়া দিলে, মুক্ত-নির্য্যাস, পিষ্ট আখের ছিবড়াগুলি একেবারে দগ্ধ হইবার উনুনের উপর গিয়া হাজির হয়।

আখমাড়া কল হইতে বাহির হইয়া রস ছাঁকিবার জালের ভিতর দিয়া খিচ-শূন্য হইয়া এমন পথে এমন ভাবে নীত হয় যে, যাইবার সময় ইহার অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলির সহিত গন্ধকের ধোঁয়া মিশিয়া যাইতে পারে। গন্ধক পোড়াইবার একটা উনুন আছে। সেখানে গন্ধক পোড়াইয়া রস যাইবার পথ দিয়া বাহির করিয়া দিবার ব্যবস্থা আছে। গন্ধক-মিশ্রিত রস আসিয়া একটা চৌবাচ্ছায় পড়ে। সেখানে চূণের জল মিশাইয়া তাহার অম্লত্ব নষ্ট করিয়া ফেলিতে হয়। সেখান হইতে অপর একটা চৌবাচ্ছায় নীত হইয়া রস বিশোধিত হয়। পরে তাহা বিশেষ ভাবে প্রস্তুত সূতার থলিয়ার ভিতর দিয়া ছাঁকিয়া লওয়া হয়। তার পর রস শুকানো বা রস-মারা আরম্ভ হয়। উপযুক্ত রূপ ঘন হইলে তাহাকে দানা বাঁধাইবার যন্ত্রে লইয়া যাওয়া হয়। এই সময় ইহা হইতে মাৎ অংশ পৃথক করিয়া ফেলা হয়। দানা-বাঁধা চিনি শুকাইলেই বিক্রয়ের উপযোগী হয়।

৺রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর

আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ শাস্ত্রী-মহাশয় আর ইহজগতে নাই। সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি আর বেশীদিন বিশ্রাম-সুখ ভোগ করিতে পাইলেন না; জগজ্জননী তাঁহার কর্ম্মক্লান্ত সন্তানকে ক্রোড়ে টানিয়া আজীবন সম্পাদক ছিলেন—প্রাণস্বরূপ ছিলেন। অবসর গ্রহণের অল্প কয়েক দিনের পরেই তাঁহার জীবন-লীলা শেষ হইল। বিগত বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সাহিত্য-শাখার সভাপতি পদে তাঁহাকে নির্ব্বাচিত করা হইয়াছিল; কিন্তু

৺রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর

লইলেন। শাস্ত্রী-মহাশয়ের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল বলিয়াই যে সকলে তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিত, তাহা নহে; তাঁহার মহৎ হৃদয়ই সকলকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ছিলেন, বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের প্রধান অনুবাদকের কার্য্য তিনি বিশেষ পারদর্শিতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন। কলিকাতার সাহিত্য-সভার তিনি তৎপূর্ব্বেই তাঁহার দেহাবসান হয়। তাঁহার সহিত যাঁহাদের পরিচয় ছিল, তাঁহারাই বলিবেন, এমন লোক আর হইবে না; এমন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, এমন কর্ত্তব্যপরায়ণ-সাহিত্য-সেবক, এমন মহদাশয় লোক অতি কমই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার পুত্র-কন্যা ও আত্মীয়গণের এই গভীর শোকে আমরা সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

জেমসেদ্‌পুর *

[শ্রীগৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়]

(১)

মিসেস্ পেরিন মেমোরিয়েল স্কুল—জেমসেদ্‌পুর

জেনারেল ম্যানেজারের বাঙ্গলা—জেমসেদ্‌পুর

রাজপ্রতিনিধি লর্ড চেম্‌সফোর্ড বাহাদুরের ঘোষণার পর 'সাক্‌চী'-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত জেম্‌সেদ্‌জী টাটার নামানুসারে নগরটির নাম 'জেম্‌সেদ্‌পুর' হইয়াছে। ইহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান 'কালিমাটী'—প্রতিষ্ঠাতার বংশের নামানুসারে 'টাটানগর' হইয়াছে। রেলওয়ে ষ্টেসন 'কালিমাটী'কে—'টাটানগর' নামে অভিহিত করিবার উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে; এবং অদূর-

* চৈত্র সংখ্যা "ভারতবর্ষে" প্রকাশিত "টাটার কারখানা" শীর্ষক প্রবন্ধের অপরাংশ।

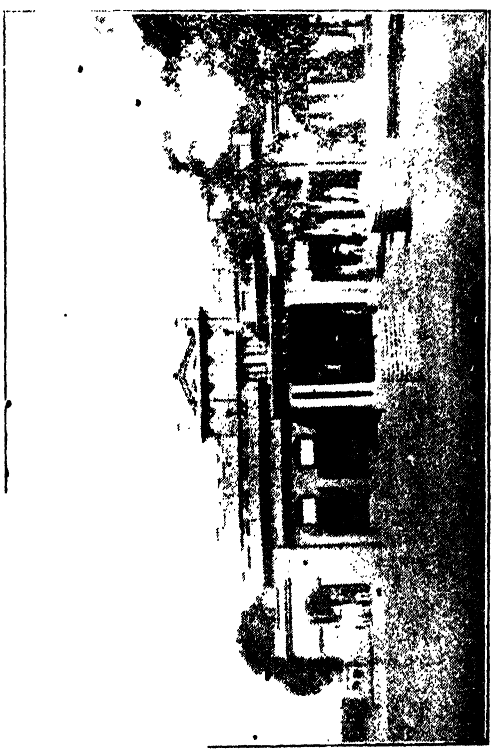

টাটা ইন্‌ষ্টিটিউট্‌—জেমসেদ্‌পুর

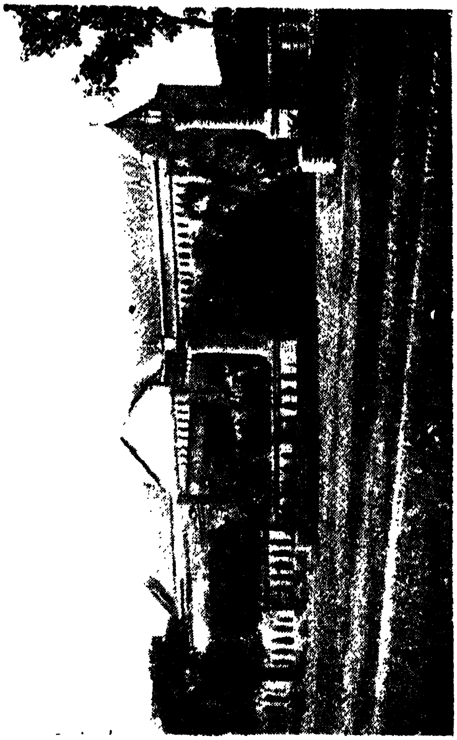

জেনারেল সুপারিন্টেন্ডেন্টের বাঙ্গলা — জেমসেদ্‌পুর

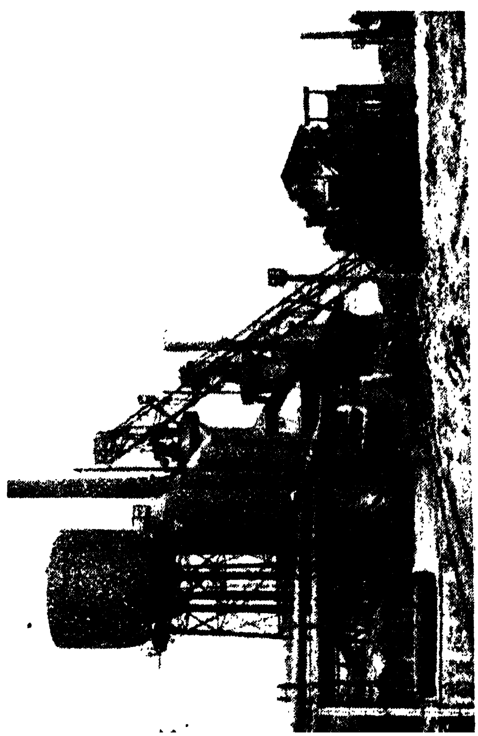

ব্লাষ্ট ফার্ণেস্‌—জেমসেদ্‌পুর

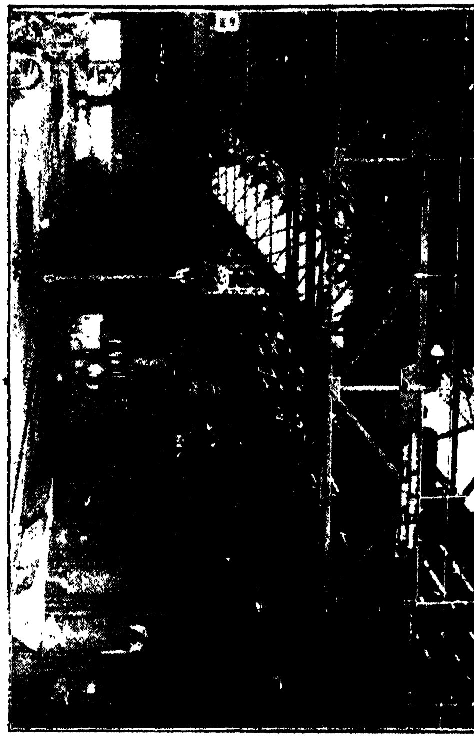

ইস্পাতের কারখানা—জেমসেদ্‌পুর

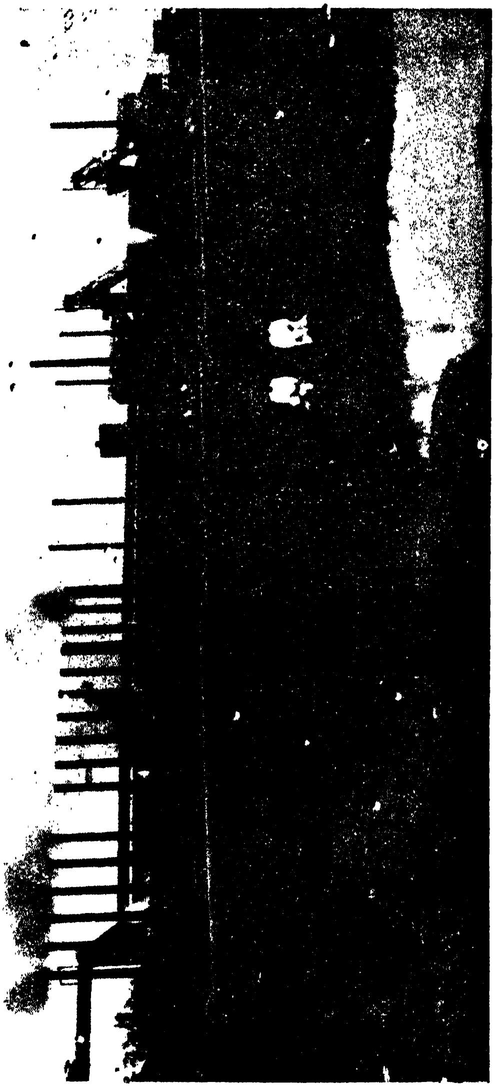

বাহির হইতে কারখানার দৃশ্য—জেমসেদপুর
(শ্রীযুক্ত পুলিনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক গৃহীত)

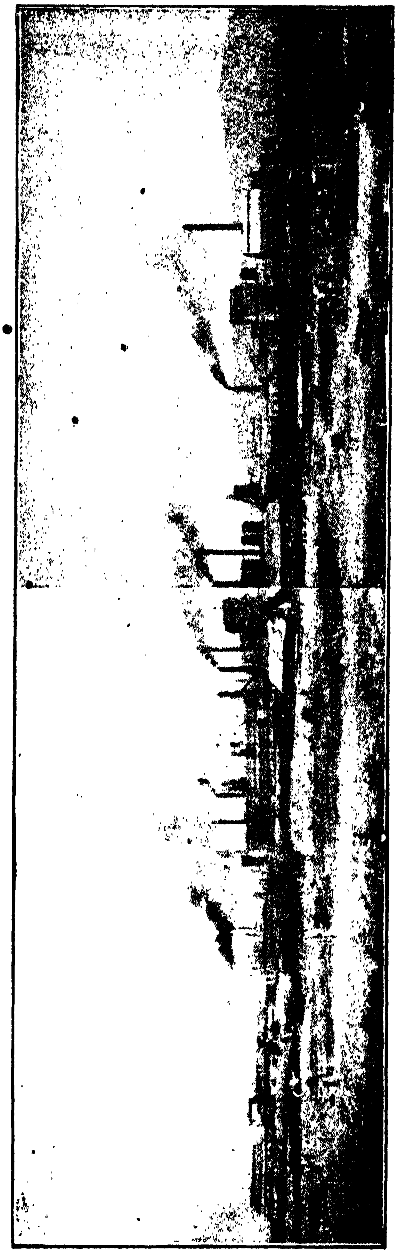

দূর হইতে টাটার কারখানার দৃশ্য
(শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দাস বি-ই কর্তৃক গৃহীত)

ভবিষ্যতে 'জেম্‌সদপুর' নামে আর একটী বৃহৎ রেল-ষ্টেসন খুলিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

নূতন যে কারখানা প্রস্তুত হইতেছে, তাহা বর্ত্তমান কারখানার দ্বিগুণ; এবং অনুমান হয়, আর তিন বৎসর পরে দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইবে। ইহা ছাড়া, অপর কয়েকটী কোম্পানীর আরও কতকগুলি সংশ্লিষ্ট কারখানা (Subsidiaries) প্রস্তুত হইতেছে। নূতন কারখানায়—বর্ত্তমান কারখানায় প্রস্তুত দ্রব্যাদি ব্যতীত, ছোট-বড় লোহার পাত (sheets & plates) ও ঢালাই দ্রব্যাদি (cast iron articles); এবং সংশ্লিষ্ট কারখানাগুলিতে করোগেটেড্ লৌহ (G. C. sheets), লৌহের উপর কলাই করা (Enamelling), কল-কব্জা সংক্রান্ত সূক্ষ্ম ঢালাই (fine

castings ; finishing etc.) ইত্যাদি কাজ হইবে। জেমসেদ্‌পুরের বর্ত্তমান লোকসংখ্যার বিষয় পূর্ব্ব-প্রবন্ধে বলা হইয়াছে ; নূতন কারখানা প্রস্তুত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে দেড়লক্ষ লোকের বাসের উপযোগী বন্দোবস্ত চলিতেছে।

(২)

কয়েকটী মাত্র বিভাগ এখানে ভারতবাসিগণের তত্ত্বাবধানে চলিতেছে,—বাকী সকলগুলি বিদেশীয়গণের হস্তে। কারখানার জেনারেল ম্যানেজার মিঃ টাটোয়েলার ভারতবাসিগণের কার্য্যের পক্ষপাতী; ইহা তাঁহার "ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কমিশনে'র সাক্ষ্য হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়। কিছুদিন পূর্ব্বে য়ুরোপীয় ও আমেরিকানের সংখ্যা এখানে অনেক ছিল ; —অধুনা প্রায় আড়াই শত। বিদ্যুৎবিভাগ ও তথাকার প্রধান এঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (Mr. S. Ghosh A. M. S. T. (Manchester), A. M. I. E. E. etc.—Chief Elec. Engr.) মহাশয়ের বিষয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। বাই-প্রডাক্ট বিভাগ হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত [Mr. D. C. Gupta, S. B., (Harvard), Supdt, Bye-Product plant], এবং বিক্রয় বিভাগ (Sales Dept.)—শ্রীযুক্ত ডি, এম্, মাডান (Mr. D. M. Madan, M. A. L. B.—Sales Manager) মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে চলিতেছে। লুব্রিকেশন (Lubrication) বিভাগের তত্ত্বাবধারক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন (Mr. N. N. Sen. B. Sc. (Purdae) Efficiency Engineer]।

কারখানার বাহিরে, চিকিৎসা বিভাগের ভার সুযোগ্য প্রধান চিকিৎসক রায় সাহেব ডাক্তার শ্রীযুক্ত কান্তিরাম চক্রবর্ত্তী (Rai Saheb Dr. S. Chakravarti—Chief Medical Officer) মহাশয়ের উপর ন্যস্ত। এই বিভাগে বর্ত্তমানে ১২ জন চিকিৎসক নিযুক্ত আছেন—সকলেই বাঙ্গালী। সমগ্র বিভাগটী এখানকার বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের পরিচালক ও প্রত্যেক সৎকার্য্যে অগ্রণী ; এবং প্রধান চিকিৎসক মহাশয়কে সমগ্র দেশীয় সম্প্রদায়ের নেতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কোম্পানীর—গরুমহিষানী, পানপোষ ও রাজগাঙ্গপুর চিকিৎসালয় তিনটী এখানকার চিকিৎসা-বিভাগের অধীন। চিকিৎসালয়ে সমস্ত রোগী বিনামূল্যে চিকিৎসিত হইয়া থাকে। নানাপ্রকার মূল্যবান্ ঔষধে চিকিৎসালয় সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ ; এবং নানাপ্রকার আধুনিক চিকিৎসা-প্রণালীর এখানে সুবন্দোবস্ত আছে। কার্য্যের অত্যধিক বৃদ্ধি হেতু আর একটী প্রকাণ্ড চিকিৎসালয় স্থাপনের ব্যবস্থা হইতেছে।

চিকিৎসা-বিভাগের পর স্বাস্থ্য-বিভাগ ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় (Dr. P. C. Mukerjee, L. M. S.), ও টাউন অফিস বা সহর-বিভাগের ভার নগরাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কে, এস, পাণ্ডালে (Mr. K. S. Pandallai, Town Supdt.) মহাশয়ের উপর রহিয়াছে। এখানকার বাড়ী-ঘর, রাস্তা-ঘাট, হাট-বাজার, জমি-জমা ইত্যাদি সমস্তই কোম্পানীর, এবং এই অফিস হইতে তাহাদের বিলি-বন্দোবস্ত হয়।

ইহার পর রসদ-বিভাগ (Grain Depat.)—শ্রীযুক্ত এ, ভি, ঠক্কর (M. A. V. Thakker, L. C. E.,—Supdt.) মহাশয় এখানকার অধ্যক্ষ। ইনি শ্রীযুক্ত গোখলে প্রতিষ্ঠিত "সারভ্যান্টস্ অব ইণ্ডিয়া" (Servants of India Society) সমিতির একজন প্রধান সভ্য। এই স্থান একটী উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্র দেখিয়া, সমিতি হইতে ইনি এই স্থানে প্রেরিত হইয়াছেন। এই কয়েকটী মাত্র বিভাগ ভারতবাসীদের তত্ত্বাবধানে চলিতেছে। শিবপুর এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের অনেকগুলি ছাত্র এখানে নানা বিভাগে কর্ম্মে নিযুক্ত। বিশেষতঃ নূতন কারখানার (greater extensions) অধিকাংশ কাজ অনেকাংশে তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে চলিতেছে। ইহা বাঙ্গালীদের পক্ষে বিশেষ শ্লাঘার বিষয়। আর প্রেসিডেন্সী কলেজের Research Schollar একজন বাঙ্গালী ছাত্র এখানকার prospecting বিভাগে অতীব যোগ্যতার সহিত কার্য্য করিতেছেন। ইঁহার নাম শ্রীযুক্ত বলরাম সেন, এম্-এস্সি।

(৩)

দূর হইতে জেম্‌সেদপুর দেখিতে অতি সুন্দর। চারিদিকে পাহাড়ের মধ্যে অসংখ্য ছোট-বড় নানাপ্রকার বাংলো সাজান রহিয়াছে। রাত্রিতে সমস্ত সহরটী তাড়িতালোকে আলোকিত হয় ; তখন ট্রেণ হইতে দেখিলে মনে হয়, যেন ট্রামগাড়ীতে আলিপুর হইতে কলিকাতায় আসিতেছি।

বর্ষাকালে বৃষ্টিস্নাত হইয়া পাহাড়গুলি নূতন সৌন্দর্য্য ধারণ করে এবং বসন্তকালে রাত্রিতে যখন পাহাড়ে-পাহাড়ে আগুন লাগে, তখন তাহাদের শোভা শতগুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

ষ্টেসন হইতে সহরটী কিঞ্চিদধিক দুই মাইল। প্রতি ট্রেণের সময় পাল্কী, গাড়ী, টঙ্গা ও কোম্পানীর মটরবাস্ (motor bus) পাওয়া যায়। রেলওয়ে ষ্টেসনে, সহরের ভিতরে কয়েক স্থানে, ও সমগ্র কারখানাতে টেলিফোঁর বন্দোবস্ত আছে।

সহরটী প্রধানতঃ চারি অংশে বিভক্ত। উত্তরাংশে (northern town) সাধারণতঃ সাহেবরা ও ২।৪ জন উচ্চপদস্থ অথবা সৌখিন দেশীয় ভদ্রলোক বাস করেন। এদিকের প্রত্যেক গৃহে বৈদ্যুতিক আলো ও পাখার বন্দোবস্ত আছে। প্রায় প্রত্যেক বাংলো-সংলগ্ন একটী করিয়া সুন্দর বাগান আছে। রাস্তা-ঘাট অতি পরিপাটী ও পরিচ্ছন্ন। এ পল্লীর সমস্তই দেখিবার উপযুক্ত।—বিশেষতঃ নূতন "ডাইরেক্টর বাংলো" ও "টাটা ইন্‌ষ্টিটিউট্"।

দক্ষিণাংশ (বা southern town) দুই ভাগে বিভক্ত; প্রথম "জি, টাউন" (G. Town) ও দ্বিতীয় "এচ্, টাউন" (H. Town)। এ দিকে সাধারণতঃ ভারতবাসিগণ বাস করেন। এ দিকেও "জি-টাউনে"র পার্শি লাইনে অনেক সুন্দর-সুন্দর বাগান আছে; রাস্তা-ঘাট বেশ পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। পূর্ব্বাংশ বা "এল্, টাউন" (Eastern Town বা L. Town) কিছু দিন হইল প্রস্তুত হইয়াছে। পশ্চিমে খরকায়ী নদী ও "রামদাস-ভাটা" নামক সহরতলী। "জি" ও "এচ্, টাউনের" পার্শ্বে আর একটী ক্ষুদ্র পল্লী আছে;—তাহাকে "কুলি-টাউন" (Coolie Town) বলা হয়। সাধারণ শ্রমজীবিগণ এই স্থানে বাস করে। ভিন্ন-ভিন্ন পল্লীতে বিভিন্ন নির্দ্দিষ্ট প্রথানুযায়ী গৃহগুলি প্রস্তুত হওয়ায় সহরের সকল অংশেই তাহাদের বেশ সৌসাদৃশ্য বজায় রহিয়াছে।

সমস্ত সহরটীতে কলের জলের সুবন্দোবস্ত আছে। এই জল সুবর্ণরেখা হইতে বৈদ্যুতিক পাম্প সাহায্যে কারখানায় আসিতেছে এবং তথায় হইতে পরিস্কৃত হইয়া চারিদিকে সরবরাহ হইতেছে। পাম্পিং ষ্টেসন (Pumping Station) একটী দেখিবার স্থান। সুবর্ণরেখার পরপারে বিপুলকায় গম্ভীর মূর্ত্তি "দলমা" পাহাড়। নদী প্রকাণ্ড উচ্চ লৌহ প্রাচীরে আবদ্ধ। প্রাচীরের এক দিকে অগাধ জল ও অন্য দিকে প্রায় শুষ্ক বালুকাময় গভীর খাদ্। সেই উচ্চ প্রাচীর ছাপাইয়া যে জল নীচে আসিয়া পড়ে, তাহাই ক্ষীণ ভাবে বহিয়া গিয়া, গ্রীষ্ম কালে নদীর অস্তিত্ব সপ্রমাণ করে। জলপ্রপাতের নদী স্থানে-স্থানে প্রাচীর ছাপাইয়া নীচে লাফাইয়া পড়িতেছে। এক দিকে অগাধ জল, আর এক দিকে শুষ্ক বালুকাময় খাদ্—মধ্যে ব্যবধান কেবল একটী লৌহ-প্রাচীর,—যেন জীবনের এদিক্-ওদিক্—অদৃষ্টের ঘোর পরিহাস। কারখানায় অষ্টপ্রহর জল আবশ্যক। এই জল তথা হইতে গিয়া, এক স্থানে জমিয়া, একটী প্রকাণ্ড দীঘির সৃষ্টি করিয়াছে। তাহার নাম "কুলিং ট্যাঙ্ক" (Cooling Tank)। পাম্পিং ষ্টেসন কারখানা হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে অবস্থিত।

প্রত্যেক বাড়ীতে নম্বর আছে। রাস্তাগুলির নাম-করণ একটু ভিন্ন প্রকারের, যথা এ, রোড, বি, রোড, ডায়গোনাল্ রোড, হিল্-ভিউ রোড, ফার্ষ্ট এ্যাভেনিউ, সেকেণ্ড এ্যাভেনিউ, ইত্যাদি। দুই দিকে সমান দূরে নানা জাতীয় মূল্যবান্ বৃক্ষরাজি রোপিত হইয়াছে; এবং প্রত্যেকের গায়ে কাষ্ঠফলকে তাহাদের নিজ নাম অঙ্কিত রহিয়াছে। বড়-বড় রাস্তাগুলিতে বৈদ্যুতিক আলোকের বন্দোবস্ত আছে এবং সমস্ত সহরটীতে ঐরূপ আলোকের বন্দোবস্ত হইতেছে।

(৪)

বর্ত্তমানে কোম্পানীর চারিটী বিদ্যালয় আছে,—দিবা ও নৈশ বিদ্যালয় (1. Day, and 2. Night School); শিল্প বিদ্যালয় (3. Technical School) (৪) বালিকা-বিদ্যালয়। নৈশ বিদ্যালয়ে বিনা ব্যয়ে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে; এবং কয়েক শ্রেণীর শ্রমজীবিগণের মধ্যে এই শিক্ষা বাধ্যতামূলক। প্রথমটী উচ্চ ইংরাজী ও চতুর্থটী মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়। ইহা ছাড়া, আর একটী ইংরাজী বিদ্যালয় ও দুইটী বিনা-ব্যয়ে শিক্ষা দিবার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে; এবং একটী উচ্চাঙ্গের টেক্‌নলজিক্যাল (Technological) বিদ্যালয় খুলিবার বন্দোবস্ত চলিতেছে।

জেম্‌সেদ্‌পুর সিংভূম জেলায় অবস্থিত। সিংভূমের

সদর—চাঁইবাসা। যেখানে জনসংখ্যা এত অধিক, মামলা-মোকদ্দমা সেখানে অপরিহার্য্য। এতদুপলক্ষে সর্ব্বদা চাঁইবাসায় যাতায়াত করা সুবিধাজনক নহে। এজন্য এখানে একটী বেঞ্চ কোর্ট (Bench Court) আছে। কোম্পানীর কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। কোম্পানীর দুইটী নাচ্‌ঘর বা ইন্‌ষ্টিটিউট্ (Institutes) আছে; তন্মধ্যে একটী অতি সুন্দর ও সুসজ্জিত। কোম্পানীর যে কোন্ কর্ম্মচারী নিয়মিত দক্ষিণা দিয়া এখানকার সভ্য হইতে পারেন। এগুলির সহিত একটী করিয়া পুস্তকাগার ও খেলা-ধূলা, আমোদ-প্রমোদের বন্দোবস্ত আছে। ইহা ছাড়া, বাঙ্গালীদের নিজস্ব "জেম্‌সেদ্‌পুর ড্রামাটিক্ ক্লাব" (Jamshedpur Dramatic Club) ও সারস্বত-সম্মিলন নামক একটী রঙ্গালয় ও একটী পুস্তকাগার আছে। তন্মধ্যে প্রথমটী প্রধান চিকিৎসক মহাশয়ের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। মান্দ্রাজীগণের "অন্ধ্র ড্রামাটীক ক্লাব (Aadhra Dramatic Club) ও মহারাষ্ট্রীয়গণের মহারাষ্ট্র-সমিতি নামক আর দুইটী সম্মিলনী আছে। (২)

এখানকার দৈনিক বাজার ছাড়া, বৃহস্পতিবার ও রবিবারে হাট হয়। রবিবারের হাট এক বৃহৎ ব্যাপার। নানা প্রকার দ্রব্যাদি, পশু-পক্ষী, ছাগ ভেড়া, গরু-মহিষ, ঘোড়া ইত্যাদি বিক্রয়ার্থে আসিয়া থাকে। সে দিন কারখানার অধিকাংশ বিভাগ অপরাহ্ণে বন্ধ থাকে। হাটে কোল্, সাঁওতাল, হো প্রভৃতি এ দেশের অসংখ্য আদিম অধিবাসীদিগের সমাগম হয়। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই হাটে আসে। হাটে আসিয়া প্রত্যেকেরই মহা আনন্দ। তাহারা স্ত্রী-পুরুষ সাধারণতঃ খুব বলিষ্ঠ ও হৃষ্টপুষ্ট। তাহাদের ভাষা দুর্ব্বোধ্য।

জিনিসপত্র এখানে অগ্নি-মূল্য—বোধ হয় কলিকাতার অপেক্ষা ৪ গুণ; আবার অনেক সময় মূল্য দিয়াও পাওয়া যায় না; তাহার কারণ আবশ্যকমত দ্রব্যাদির আমদানী হয় না।

কোম্পানীর অতিথিগণের, ব্যবসায়ী বা অন্যান্য ভদ্র-লোকদিগের জন্য একটী অতিথিশালা (Guest House) ও তাহার সংলগ্ন অতি সুন্দর একটী হোটেল আছে। এখানকার স্বাস্থ্য মোটের উপর ভাল নয়। ইহার সন্নিকট-বর্ত্তী ঘাটশিলা ও চক্রধরপুর আজকাল স্বাস্থ্যনিবাসে পরিণত হইবার উপক্রম হইয়াছে। এখানে শীত দুরন্ত ও গ্রীষ্ম প্রচণ্ড। ব্যারোমিটারের উত্তাপে ১২২° (f) পর্য্যন্ত উঠিতে দেখা যায়। একটী ঘোড়দৌড়ের মাঠ ও নিয়মিত ঘোড়-দৌড়ের বন্দোবস্তও এখানে আছে।

জেম্‌সেদপুর সম্বন্ধে কেবল বর্ণনাস্বরূপ সমস্ত ব্যাপার প্রকাশ করা একরূপ অসম্ভব। "দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন" আরও কিছু দিন পরে রচিত হইলে ভাল হইত। তাঁহারা 'জামালপুরের রেল-কারখানা' দেখিয়া অবাক্ হইয়া-ছিলেন,—টাটার এই বিশ্ব-বিশ্রুত কারখানা দেখিলে যে অধিকতর বিস্মিত হইতেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ফলতঃ, সকল বিষয়েই জেম্‌সেদ্‌পুর একটী দেখিবার স্থান। ইহা ভারতের একটী গৌরব-কেন্দ্র এবং ভবিষ্যতে ইহার গৌরব ক্রমশঃই বৰ্দ্ধিত হইতে থাকিবে।

---

(২) "টাটার কারখানা" শীর্ষক প্রবন্ধে এখানকার নানা প্রদেশ-বাসীর সম্বন্ধে যেরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা ছাড়া, অনেকগুলি নেপালী, ভুটানী, ত্রিবাঙ্কুরী এবং কোচীনবাসীও এখানে কর্ম্মে নিযুক্ত।

ভ্রাতা-ভগিনী

[শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্-এ, বি-এল্]

(১)

যে বয়সে শতকরা নব্বইজন বাঙ্গালীর ছেলে আপনাকে জগৎ সিংহ, ওসমান প্রভৃতি ঐতিহাসিক প্রেমিকদিগের সমকক্ষ মনে করে, ঠিক সেই বয়স পার হইয়াই আমি আইভিকে প্রথম দেখি। তখন আমার বয়স ২৩ বৎসর, তখ-ও শেষ-ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই নাই। আমার পিস্‌তুতো ভাইয়ের শ্যালক কুড়িগ্রাম হইতে শাদা-টুপির জন্য এক শিশি কুইক্ হোয়াইট চাহিয়াছিলেন, তাই আমি হগ সাহেবের বাজারে গিয়াছিলাম। কেক্-চকলেটের দোকানগুলার নিকট ম্যাক্‌ফারসন্ সাহেব আমার স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া "হ্যালো" বলিয়া সম্ভাষণ করিল। তাহার গুম্ফের প্রান্ত হইতে আমার দৃষ্টি ত্বরায় তাহার বাহু-লগ্ন সুন্দরীর মুখে সতৃপ্তভাবে সন্নিবেশিত হইল। আমার সলজ্জ মন কিন্তু আমার দৃষ্টিকে আবার ম্যাক্‌ফারসনের গুম্ফ-প্রধান মুখের উপর তুলিল। আমরা কলেজে তাহাকে বলিতাম, "গুঁফো ম্যাক্‌ফারসন্" সে সেই সুন্দরীটির দিকে চাহিয়া বলিল, "সান্ন্যাল বাবু, আমার কন্যা মিস্ আইভি বিলিঙ্।"

হাসপাতালে মিলিটারী ছাত্র ও নার্শদের সংস্পর্শে আসিয়া শিখিয়াছিলাম যে, প্রথম পরিচয়ে লোকের সহিত কর-মর্দ্দন করিতে হয়, এবং "কেমন আছ" জিজ্ঞাসা করিতে হয়। আমাকে এ বিষয়ে নির্দ্দোষ দেখিয়া গুঁফো সাহেব প্রীত হইয়া আইভিকে বলিল, "মিঃ সান্ন্যাল আমাকে বড় যত্ন করেচে, উনি না যত্ন করলে আমি বোধ হয় এ যাত্রা বাঁচতাম্ না।"

সুখ্যাতি-শ্রবণের সনাতন রীতি অনুসারে আমি মনে-মনে বড় তৃপ্তি লাভ করিতেছিলাম, বিশেষ সেই সুন্দরীটির নিকট তাহার পিতৃদত্ত সুখ্যাতিতে। অথচ বিনয় সহকারে সাহেবকে বলিলেন, "আঃ, আপনি কি বলচেন? কর্ত্তব্য কাজ করেছি মাত্র।"

আইভির ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে এত বুদ্ধি ছিল, জানিতাম না। সে অত্যন্ত সপ্রতিভভাবে বলিল, "বাবা! এস, সান্ন্যালকে নষ্ট (spoil) ক'র না। মিঃ সান্ন্যাল চকলেট্ খাবেন।"

এরূপ আন্তরিকতায় আমরা তিন জনেই প্রসন্ন হইলাম। তিন জনেই হাসিলাম। গুঁফো ম্যাক্‌ফারসন্, তাহাদের ভাষায় বলিতে গেলে, মাছের মত মদ্য পান করে। সুতরাং তাহার মনটি বড় সাদাসিধা সরল। তাহার কন্যাকে আমার সহিত অত শীঘ্র বন্ধুত্ব করিতে দেখিয়া সে বড় প্রীত হইল। আমি বলিলাম, "ধন্যবাদ, মিস্ ম্যাক্‌ফার"—গুঁফো সাহেব শুধরাইয়া বলিল, "মিস্ বিলিঙ্।" আমি একটু থতমত খাইলাম। মিঃ ম্যাক্‌ফারসনের কন্যা বিলিঙ্! সামলাইয়া লইলাম। সত্যই তো! বিধবা বিবাহের অনুগ্রহে! যাক্, আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম, "ক্ষমা করবেন"। আইভি বলিল, "মিঃ সান্ন্যাল, আমার ভাইয়ের নাম জান? বিল্ বিলিঙ্। বেশ মজার, না? অনেকটা চীনাম্যান্দের মত।"

আবার তিন জনে হাসিলাম। এদিকে পাঁচ-সাতজন কেক্-ওয়ালা "এখানে বাবা" "ভাল কেক বাবা" "তাজা চকলেট্ বাবা" প্রভৃতি মৃদু লালসাময়ী ভাষায় আমাদিগকে সাদরে আহ্বান করিতে লাগিল। আইভির চক্ষুলজ্জা নাই, অযথা বিনয় নাই, শঙ্কা নাই, জড়তা মোটেই নাই। সে একটা দোকানে প্রবেশ করিয়া বড় টিনের বাক্স হইতে চকলেট্ লইয়া চাখিতে লাগিল, আমাকে চাখাইল, "সতাত" পিতাকে চাখাইল। এইরূপ কার্য্যে যতক্ষণ সে ব্যাপৃত ছিল, ততক্ষণ বকিতেছিল—বক্-বক্ বক্। "মিঃ সান্ন্যাল, বাদামের চকলেট্ ভাল।" "এ লোকটার সংগ্রহ মন্দ নয়"। "সিমলাতে ফজলদিনের দোকানের মিষ্টান্ন খুব ভাল।" "ওঃ, সিমলায় আমরা খুব মজা করি।" ইত্যাদি-ইত্যাদি। তাহার হাব-ভাব, কথা-বার্ত্তা চাল-চলন কিছুর মধ্যে আড়ষ্ট ভাব নাই, জড়তা নাই। নির্ম্মল জলের উৎসের মত তাহার অনাবিল, নির্ভীক মনের ভিতর হইতে স্বচ্ছ ভাব উছলিয়া পড়িতেছিল। বাজারের

বাহিরে আসিয়া গাড়ীতে চড়িবার সময় ম্যাক্‌ফারসন্ বলিল, "বাবু, আমাদের বাড়ীতে একবার এস না। মিসেস্ ম্যাক্‌ফারসন্ বড় সুখী হবেন।" মিস্ বিলিঙ্ বলিল, "হ্যাঁ, এস। আমরা খুব সুখী হব।"

তাহারা গাড়ীতে উঠিল। আমি বারান্দার তলায় দাঁড়াইয়া দেখিলাম। তাহার পর কুইক্ হোয়াইটের সন্ধানে গেলাম।

(২)

সে দিন গৃহে আসিয়া ঔষধের গুণ ও মাত্রা মুখস্থ করিতে-করিতে অনেকবার আইভিকে মনে পড়িল। আমাদের রক্তের আদর্শে ও শিক্ষার আদর্শে লাঠালাঠি হয়, সংস্কার ও শিক্ষার ঠোকাঠুকির জন্যই। আমাদের বংশ-পরম্পরাগত জাতীয় আদর্শ যে রমণী-রত্নের ছবি আঁকিয়া দেয়, আমাদের নিত্য-পাঠ্য ইংরাজি নাটক, নভেল, সাহিত্য, উপন্যাসে সে ছবির স্থান নাই। অথচ সেই নাটক, নভেল, সাহিত্য, উপন্যাসের প্রভাবটাই সর্ব্বদা আমাদের উপর বিরাজমান, আর সে চিত্রের চাকচিক্যটাও খুব বেশী; বিশেষ, আমি আমার জীবনের যে অবস্থার কথা বলিতেছি, জীবনের সে অধ্যায়ে। মজ্জাগত পৈত্রিক আদর্শ যতই প্রশংসা করে শান্ত, শিষ্ট, ধীর, স্থির, অল্পভাষী, মরাল-গমনায়;—আমাদের ইংরাজি শিক্ষার আদর্শ রমণী-মূর্ত্তি দেখি, চালাক, চতুর, চট্‌পটে, বাক্‌-প্রগল্‌ভা। স্থিতিশীলতা ও সংস্কার, পাশ্চাত্য আদর্শের অনুমোদন করে না, কিন্তু সজীব মানুষ আমরা, সজীবতাটাকে উপেক্ষাও করিতে পারি না। তাই হিন্দু-সমাজের অন্তরালে থাকিয়াও আমরা শান্ত, শিষ্ট, আর্য্য ললনাকে একটু দুষ্ট, একটু চালাক-চতুর করিবার চেষ্টা করি। কিন্তু বাহিরে সেটুকু জানিতে দিই না, তর্কের সময় এ আকাঙ্ক্ষাটুকুকে সাধামত স্থিতিশীলতার মুখোস পরাইতে যত্নবান হই।

এ সত্যটুকু উপলব্ধি করিয়াছিলাম, মেডিকেল-কলেজে ভর্ত্তি হইয়া। ডাক্তার ও ছাত্রদের ভিতর ইংরাজ ও ফিরিঙ্গি রমণীদের চলা-ফেরা, হাব-ভাবের প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন শ্রদ্ধার ভাব বেশ জাজ্জ্বল্যভাবে ফুটিয়া উঠিত। তাহাদের সজীবতা, তাহাদের আপ্যায়ন-কুশলতায় প্রীত হইত সকলেই—কিন্তু আমাদের স্ত্রীলোকদের সঙ্গে তুলনা করিবার সময় প্রায় এক-বাক্যে সকলেই তাহাদের মুণ্ডপাত করিত। যে দুই-এক-জন সত্যের অনুরোধে মনের ভাবটুকু ধরিয়া প্রকাশ্যভাবে তাহাদের হাব-ভাবের প্রশংসা করিত, আমরা একজোটে তাহাদের আদ্যশ্রাদ্ধ করিতাম, তাহাদের চাটুকার, ইংরাজের 'ধামা-ধরা' প্রভৃতি বলিয়া তিরস্কার করিতাম এবং মেমেদের দুর্নীতির গল্প আবিষ্কার করিয়া তাহাদিগকে বিধ্বস্ত করিতাম।

আমি এতটা কৈফিয়ৎ দিতেছি নিজের হৃদয়ের দুর্ব্বলতা গোপন করিবার জন্য নয়। সে দিন হগ সাহেবের বাজারে অকস্মাৎ মিস্ আইভি বিলিঙের সজীব চাঞ্চল্যটুকু আমার নিকট হইতে সুখ্যাতি আদায় করে নাই, এ কথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। তাহার ভিতর যে একটা প্রাণ ছিল, সে প্রাণটা যে নূতন এবং নবীন, সে প্রাণটুকু আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য কসরত করিতেছে, কেবল এই ধারণাটুকুই আমাকে উৎফুল্ল করিতেছিল। আমরা শারীর-বিজ্ঞান, প্রাণ-বিজ্ঞান পড়িতাম, বোধ হয় তাই আমরা আত্মা ছাড়িয়া প্রাণ ও দেহকে ভালবাসিতাম। আমাদের চক্ষে শ্রেষ্ঠ আর্ট নিরাময়ত্ব। সে হিসাবেও ম্যাক্‌ফারসনের 'সভাত' মেয়ে আইভির শরীরে স্রষ্টার কলা কুশলতার অভাব ছিল না।

দুই তিন দিন পরে আমার জুতার ফিতা ছিঁড়িয়া গেল। ঠিক এক জোড়া জুতার লেশের জন্য মুন্সিপ্যাল্ মার্কেটে যাইবার সিদ্ধান্তটাকে মন যখন সমীচীন বলিল না, তখন আমার বিষয়-সম্পত্তি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়া দিলাম। বাস্তবিক তো এতকাল দেখি নাই—ছিঃ ছিঃ! এমন জরাজীর্ণ ব্রুষে এতাবৎকাল কিরূপে মুখ ধুইতেছি। একখানি চিকিৎসা গ্রন্থে পড়িয়াছিলাম যে, দন্তের উপর মানুষের পরিপাক-শক্তি নির্ভর করে এবং পরিপাক-শক্তিই আসল জীবনী-শক্তি। সত্যই তো, আমরা দাঁত থাকিতে দাঁতের আদর করি না। ভাঙ্গা ব্রুষখানা টান দিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিলাম, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া একেবারে নিউ মার্কেটে গিয়া উপস্থিত হইলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ গুঁফো ম্যাকফারসনের দাঁতের ব্রুষ বা বুটের লেশ ছিঁড়ে নাই, কুমারী বিলিঙেরও চকলেট-লালসাও তেমন বলবতী হয় নাই। তাই বাজারের অলিতে-গলিতে ঘুরিয়াও তাহাদের দেখিতে পাইলাম না।

(৪)

প্রেমের নদী স্বচ্ছন্দে বহে না—ইংরাজি প্রবচন! ছিঃ, ছিঃ, কি বলিতেছি! প্রেমের নদী অর্থাৎ যে কাজটা করিতে চাহি সেই কাজটার ধারা! অর্থাৎ যে কাজটা করিবার জন্য মনটা চঞ্চল হয়, "যাব কি যাব না"—সন্দেহ-নাগর-দোলায় মনটা ঘোর-পাক খায়—সে কাজ করিতে গেলে প্রায়ই বাধা লাগে। আমার কয়েকদিন ধরিয়া ইচ্ছা হইয়াছিল যে, ভদ্রতা ও সৌজন্যের খাতিরে ম্যাক্‌ফারসন সাহেবের বাটী যাইতে। কারণ ভদ্রলোক অমন আন্তরিকতার সহিত আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তাহার কর্ত্রী অত মোলায়েম ভাবে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল যে, আমি তাহাদের বাটী যাইলে সে আনন্দিত হইবে। স্ত্রীলোকের শ্রদ্ধা রাখিবার বাসনা যখন বলবতী হইল, তখন ধীরে-ধীরে ওয়েষ্টন ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইলাম।

এক বাড়ীতে তিন-চারিটি ফিরিঙ্গি-পরিবার বাস করিত। আমি ম্যাকফারসনের অংশে গেলাম। বাহিরে ঘেঁষা বারান্দায় দুইখানা কাঠের টুলে বসিয়া দুইটা বালক সিরাপ পান করিতেছিল। খুব সম্ভব তাহারা "চোরাই মাল" লইয়া আনন্দ করিতেছিল—নগ্নপদ, গায়ে কোট নাই, সার্টের আস্তান গুটান, একজনের শিরে একটা বনাতের টুপি, অপর বালকটি নগ্ন শির। টুপি মাথায় বালকটি গ্লাসের সরবত পান করিতেছিল—খালি-মাথা বোতল হস্তে লোভ-লোলুপ তৃষিত দৃষ্টিতে জুড়িদারের মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। আমাকে দেখিয়াই প্রথমে তাহারা একটু স্তম্ভিত হইল, কিন্তু তখনই সামলাইয়া লইয়া, উভয়ে খুব প্রাণ ভরিয়া হাসিল। শেষে খালি-মাথা ছোট পেণ্টুলেনের দুই পকেটে দুই হাত পুরিয়া বুক ফুলাইয়া আমার নিকট আসিয়া বলিল—"কি চাও বাবু।" "মিঃ ম্যাকফারসন আছেন।" "বাহিরে গেছেন।" "মিসেস—

বলিতে হইল না,—মিসেস ম্যাকফারসন বাহিরে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আবৃত-মস্তক শিশু আমার পাশ দিয়া ছুটিয়া পলাইল। একখানা টুলের উপর বোতলটা পড়িয়া ছিল—অপর টুলের উপর কাচের গ্লাস। মেমের দৃষ্টি প্রথমে সেই পদার্থ দুইটার দিকে গেল; সে কঠোরভাবে বলিল—"বিল্!"

বিল্ ইতস্ততঃ করিয়া আমার নিকট আসিল—বাসনা পলায়ন করে। তাহার মাতা তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। আমাকে দেখিয়া সে একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—"ডাক্তার বাবু!"

আমি অভিবাদন করিলাম। বিলের মুক্ত বাহু ধরিয়া বলিলাম—"এটি বিল্?"

"হাঁ! ভয়ঙ্কর দুষ্ট। আর এই জন্সনদের ছেলেটার জোড়া নেই, যত কু-বুদ্ধি। কাল সরবত কিনে এনেছি—" দাঁতে দাঁত পিসিয়া মেম তাহাকে একটা ঝটকা মারিল। আমি তাহাকে টানিয়া লইয়া বলিলাম—"ছেলেরা অমন ক'রেই থাকে।"

আমি প্রসন্ন ভাবে বিলের দিকে চাহিলাম। তাহার চক্ষে কৃতজ্ঞতা; সে আমার দিকে সরিয়া আসিল। আশ্চর্য্য শিশুবুদ্ধি! বোধ হয় সকল জাতির শিশুর মন এক প্রকার। আমার স্নেহটুকু তাহার মাতার ভাল লাগিল। সে বলিল—"যাও, খেলগে! বাবুকে বিরক্ত কর না।"

আমি বিল্ বিলিঙকে একটু আদর করিয়া ছাড়িয়া দিলাম, সে ছুটিয়া উইলসনদের কক্ষের দিকে পলাইল। মেম সাহেবের আহ্বানে আমি সজ্জিত গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

এই গৃহ-সজ্জা বিষয়েও আমাদের সঙ্গে ফিরিঙ্গিদের একটা পার্থক্য আছে। ম্যাকফারসন সওদাগরি আফিসে কর্ম্ম করিয়া মাত্র তিন শত টাকা বেতন পাইত। অবশ্য তাহাকে বিধবা পিসি বা উপার্জ্জনে অক্ষম কনিষ্ঠকে প্রতিপালন করিতে হইত না। তবুও তাহাকে মেম ম্যাকফারসনের দুই পক্ষের সন্তানসন্ততি প্রতিপালন করিতে হয়। তাহার উপর আমাদের অপেক্ষা পোষাক-পরিচ্ছদ সকল বিষয়ে উহাদের ব্যয় অধিক। উপরন্তু ম্যাকফারসন সাহেবের মদের খরচ আছে। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও তাহাদের গৃহের সাজ-সজ্জা খুব উচ্চদরের—মেজেতে মোটা কার্পেট বিছান, কিংখাপের কোচ চৌকী, দেওয়ালে চারিখানি বড়-বড় হাতে-আঁকা ছবি, আর অনেকগুলি উত্তম ফ্রেমে ফটোচিত্র বাহার করিয়া কটেজ পিয়ানোর উপর সজ্জিত। কোণের মার্ব্বেল টেবিলের উপর গ্রামোফোঁ।

আমার ধারণা ছিল, ইংরাজ ও ফিরিঙ্গিরা বাঙ্গালীদের ঘৃণা করে, সমান ভাবে মিশে না। তখন আমি মাত্র শিশু,—

সুতরাং মেমের আন্তরিক অভ্যর্থনায় বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। গল্পে গল্পে মেম তাহার জীবনের সমস্ত ইতিহাস বলিয়া ফেলিল। তাহার পিতামহ গ্রীক। ষোল বৎসর পূর্ব্বে তাহার বিবাহ হইয়াছিল বিলিঙের সহিত— বিলিঙও ইউরোপীয়। প্রথমে গোরা ছিল; শেষে পল্টন ছাড়িয়া সিমলা পাহাড়ে মিউনিসিপ্যাল কমিটিতে কার্য্য করিত। বিলিঙের কন্যা আইভি—বয়স ১৫ বৎসর; আর পুত্র বিল্, বয়স ১১ বৎসর। বিলের জন্মের পরেই বিলিঙের মৃত্যু হয়—ছোট সিমলায় তাহার সমাধি আছে—মর্ম্মর প্রস্তরের সমাধি; তাহাতে লেখা আছে—"মৃত নয়, নিদ্রিত।" আইভি সিমলায় কন্‌ভেণ্টে পড়ে, তাহার বেতন লাগে না। বিল পড়ে লামাটিনিয়ারে—সেও এবার সিমলার বিশপ কটনে যাইবে। তাহার এ পক্ষের দুই কন্যা আইরন ও আইরিশ। মেম "আই" অক্ষর ভালবাসে, কারণ তাহার মাতার নাম আইভি ছিল।

এইরূপে মেম গল্প করিয়া যাইতেছিল। আমার কিন্তু প্রতীক্ষা-চঞ্চল মন আইভির পদশব্দ ধরিবার জন্য কর্ণকে সজাগ করিয়া রাখিয়াছিল। আমি হাসপাতালে তাহার স্বামীকে যত্ন করিয়াছিলাম বলিয়া সে আমাকে প্রশংসা করিল। আমি পাশ করিয়া বাহির হইলেই এংলো ইণ্ডিয়ান পটিতে সে আমার পশার করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইল।

আমি কথায় কথায় আইভির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলাম। মেম বলিল—আইভি ঠিক আমার মার মত। আমার মা অমনি ছিলেন, সদাই হাস্যময়ী। তবে ভারি একরোখা! আহা! বেচারা আর সাত দিন বাদে স্কুলে চলে যাবে।

আমি এবার নিজের উপর বিরক্ত হইলাম। এ সংবাদে আমার দুর্ব্বল হৃদয় একটু স্তম্ভিত হইল কেন? আমি তো তাহাদের রীতিনীতি অধ্যয়ন করিবার জন্য আসিয়াছিলাম —কুমারী সিমলা যাইবে এ সংবাদে আমার চিত্ত চাঞ্চল্য! ছিঃ—ছিঃ!

ঠিক সেই সময় অনেকগুলা বাণ্ডিল বগলে করিয়া আইভি আসিয়া উপস্থিত হইল; এবং তাহার শুভাগমনের সঙ্গে-সঙ্গে একটা ভীষণ কোলাহল আসিল। মিসেস ম্যাক-ফরসনের দুই পক্ষের চারিটি শিশু একত্র হইল—ছোট তিনটিও যত হাসে, চীৎকার করে, যত হাততালি দেয়, যত নাচে, বুড়টিও ততোধিক হাসে তত চীৎকার করে, তত হাততালি দেয়, তত নাচে। তাহারা কেহই আমাকে লক্ষ্য করে নাই। আইভি তাহার সুগঠিত বাহুলতায় মাতাকে আদর করিয়া তাহার মুখচুম্বন করিল।' বলিল—"মা, বুড়া ছেলে বড় প্রিয়। বাবা (ড্যাডী) আমাদের কত জিনিস দিয়েছে।"

অবশ্য তাহার কথাগুলা যথাযথ বাঙ্গলায় অনূদিত হইয়া যতটা নির্ব্বোধ মনে হইতেছে, ইংরাজি বাক্-ধারা ও সামাজিক রীতি—বিশেষ, যেরূপ মধুর ভাবে কথা কয়টি উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহা ভাবিলে মনে হইবে যে, কথাগুলো নির্দ্দোষ। আইভি অকস্মাৎ আমাকে লক্ষ্য করিল, তাহার কপোল পক্ক বিম্বফলের বর্ণ ধারণ করিল, ইংরাজি বাক্‌ধারায় বলিলে বলিতে হয়,—তাহার আনন্দে কে যেন ভিজা কাপড় জড়াইয়া দিল। আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া মেমের নিকট বিদায় চাহিলাম। সেও থাকিতে বলিল না—তাহাদের সে পবিত্র পারিবারিক উৎসবের মধ্যে তাহারা বাহিরের লোক চাহে না। মেম কর-মর্দ্দন করিল। আইভি খুব বন্ধু ভাবে আমার হাত ধরিয়া জোরে নাড়িয়া দিল;—আবার আসিতে বলিল। বিল প্যাণ্টের পকেটে হাত ভরিয়া আমার কর-মর্দ্দন করিল। মনে কিন্তু আকাঙ্ক্ষা রহিয়া গেল। মনের মধ্যে একটা অভাব, দুরছাই ভাব লইয়া তাহাদের গৃহ ছাড়িলাম।

(৫)

এ ঘটনার পর এক বৎসর হইয়া গিয়াছে—আমি পাশ করিয়া কলেজষ্ট্রীটে একটা ঔষধালয়ে বসি। লোকে বিনা বায়ে আমার নিকট ব্যবস্থা লইয়া যায়। আমার বিবাহ হইয়াছে—আইভির সঙ্গে নয়। বাঙ্গালীর মেয়ে অবলা সরলা দ্বাদশ বর্ষীয়া একটী শিশুর সহিত। মনে মনে বুঝি বটে, কনক অপদার্থ, অপোগণ্ড জড়-প্রকৃতি, ভবিষ্যতে যে মাধবী-লতা আমার মত সহকারকে আলিঙ্গন করিয়া আমাতে আত্মসমর্পণ করিবে, এ সে লতিকার চারা মাত্র। তবু সেই বিবাহ-রজনীর সাত-পাকের জোরে তাহার কথা শুনিতে ভাল লাগে, শ্বশুরবাড়ি নিমন্ত্রণ হইলে, এসেন্স মাখি —থাক্ সে কথা। এ আখ্যায়িকা আইভির। সে সকল কথা অন্য ইতিবৃত্তের বিষয়ীভূত।

আইভির সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল বড়দিনের ছুটিতে। সকালে ঔষধালয়ের কার্য্য শেষ করিয়া গৃহে ফিরিবার বন্দোবস্ত

করিতেছি, এমন সময় একখানা ভাড়াটিয়া ফিটনে চড়িয়া ম্যাকফারসনের মেম, আইভি ও বিল আসিয়া উপস্থিত হইল। সিমলার শীতের হাওয়ায় আইভির অধরোষ্ঠ ও কপোল দুইটি গাছ-পাকা সেবের বর্ণ ধারণ করিয়াছিল! পূর্ণ-যৌবন ও স্বাস্থ্য তাহার সর্ব্বাঙ্গে এক অপূর্ব্ব কমনীয়তার প্রলেপ লেপিয়া দিয়াছিল। তাহার পিতার বংশের শ্বেত বর্ণে, তাহার মাতার কোন্ পূর্ব্ব-পুরুষের কৃষ্ণ আঁখিতারা ও কালো চুলের রাশি তাহার সঙ্গে-সঙ্গে বড়ই সুশোভন হইয়াছিল। এ অল্প দিনের শৈলবাস মিঃ উইলিয়ম বিলিঙের পক্ষেও বড় স্বাস্থ্যকর হইয়াছিল - সে প্রায় ছয়-সাত ইঞ্চি বাড়িয়া গিয়াছিল। আমি সাদরে তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলাম। তাহাদের কাহিনী শুনিলাম—আইরিনের বিষম জ্বর হইয়াছে—বোধ হয় টাইফয়েড।

তখনই তাহাদের সহিত ওয়েষ্টন ষ্ট্রীটে গেলাম। আইরিশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিয়া এক গোছা ফুল আনিয়া আমার হস্তে দিল - সমস্ত শিক্ষাটা আইভির। আমি আইরিনের ঔষধ, পথ্যাপথ্য ও সেবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া যখন গাড়ীতে উঠিতেছি, তখন আইভি দুইটি টাকা লইয়া আমার হস্তে দিল। আমি ইতস্ততঃ করিতেছিলাম। তাহার দত্ত মুদ্রাদ্বয় লইব কি না। সে বলিল, "ডাঃ সান্যাল, আমি জানি, তোমার পক্ষে এ দর্শনী যথেষ্ট নয়। তবে পুরান বন্ধুত্বের খাতির।" তাহার পর সে একটু হাসিল, কুহকিনীর হাসি। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত টাকা দুইটি লইলাম। মুক্ত দন্তের ভিতর দিয়া বলিলাম,— "ধন্যবাদ।"

দিনে দুইবার যাই, যত্ন করিয়া রোগী দেখি, রোগীর নার্শ আইভির সঙ্গে গল্প করি। হাতে রোগী ছিল অনেকগুলি; কিন্তু তাহাদের গৃহে যাইবার সময় যেমন আগ্রহ হয়, এমন আগ্রহ ধনি-গৃহে রোগী দেখিতে গেলে হয় না। ছয় দিনের দিন দেখিলাম—আইভি বড় বিমর্ষ। তাহার হাসিমাখা মুখ প্রথম দেখিলাম গম্ভীর। আমি তাহাকে বলিলাম, "মিস্ বিলিঙ্, তোমার ভগ্নী সারছে। তুমি দুঃখিত কেন?"

সে একটু ইতস্ততঃ করিল। আমি বলিলাম—"মিস্ বিলিঙ, আমি তোমার পরিবারের বন্ধু—সত্য কথা বল, বিমর্ষ কেন?"

সে আমার চক্ষে বোধ হয় সহানুভূতি দেখিল। গাছের বেল যখন পাকে, তখন কাকে নাড়া দিলেও তাহা ঝড়িয়া পড়ে। তাহার মনের মধ্যে কথাগুলা গুমরাইতেছিল। তাহার সহিত আমার খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক না থাকিলেও সে বলিয়া ফেলিল,—"ডাক্তার সান্যাল, সত্য কথা এই যে, আমার মাতা সুখী নয়। তুমি আমাদের পরিবারের বন্ধু—তাই তোমাকে একথা বলছি। ড্যাডি (পিতা) পশু, সব টাকা মদে নষ্ট করে।"

আমি তাহার বন্ধুত্বে গর্ব্বিত হইতেছিলাম। সে কণ্ঠস্বর নামাইয়া বলিল—"শুনেছি, মাতাল হ'য়ে সে মাতাকে প্রহার করে। পশু! আশা করি, সে আমার সাম্‌নে সাহস করবে!"

শেষ কথা কয়টি উচ্চারণ করিবার সময় সে খুব দৃঢ় ভাবে ঘাড় নাড়িল, তাহার ভ্রূ কুঞ্চিত করিল, বাম চক্ষু কুঞ্চিত করিল, আর তাহার ললাটে দেখিলাম—একটি রেখা। বুঝিলাম, যুবতী বিদ্যালয়ে কেবল দড়ি ডিঙ্গাইয়া, কানামাছি খেলিয়া কাল কাটায় নাই। সে জননীর কথা ভাবিয়াছে—আমাদের সমাজের মাতৃহীন বালক-বালিকা যেমন বিমাতার দুষ্ট ব্যবহারে গুমরায়, সেও তেমনি বি-পিতার নিষ্ঠুরতাকে শাসন করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ।

আইরিনের জ্বর সাত দিনেই ছাড়িয়া গেল। কিন্তু এই সাত দিনে চতুর্দ্দশ বার তাহাদের বাড়ী গিয়া বুঝিয়াছিলাম যে, সেই নৃত্যশীলা, ক্রীড়াশীলা, হাস্যময়ী যুবতীর ভিতর নারী-প্রকৃতি খুব প্রবল ভাবে প্রবহমান। আমি অত যত্নবতী নার্শ কলেজে পাঁচ বৎসরের মধ্যে একটিও দেখি নাই। রোগিচর্য্যায় সে আনন্দ পাইত—খুব স্ফূর্ত্তির সহিত 'বৈ-পিত্র' ভগিনীর সেবা-শুশ্রূষা করিত। অপর একটি বিষয়ও লক্ষ্য করিয়াছিলাম। আইভির রূপ তাহার নিকট অজ্ঞাত ছিল না। সে জানিত যে সে রূপসী, এবং রূপসী বলিয়া কতকটা পূজা পাইবার দাবী তাহার আছে। সন্ধ্যার সময় প্রায়ই দুই চারিটা এংলো-ইণ্ডিয়ান যুবক ধপ্‌ধপে সার্ট ও কলার পরিয়া চটকদার রঙ্গীন নেকটাই বাঁধিয়া তাহাদের ড্রয়িং রুমে বসিয়া তাহার মন হরণ করিবার জন্য সম্মোহন বাণ ছাড়িত। সেগুলা আমার চক্ষুঃশূল। কলিকাতার সেই গর্ব্বিত খৃষ্টীয় যুবক উদ্ধত, অর্দ্ধশিক্ষিত,—বোধ হয়, কাষ্টম ও মেজারার ডিপার্টমেণ্টের শিক্ষানবীশ। শেষ

দিন সেইরূপ গোটাতিনেক ছোকরা চলিয়া যাইবার পর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ ভদ্রলোকগুলি কে ?"

ম্যাকফারসন বসিয়া ছিল,—সে বলিল, "উহারা যুদ্ধের পথের যাত্রী।"

সে আইভির দিকে চাহিয়া মুচকী হাসিল। আইভি পাথরের মেজ হইতে গ্রামোফোঁ নামাইয়া তাহার উপর বেঁগ্রাস্ ফুড তৈয়ারি করিতেছিল। সে হাসিয়া বলিল—"এখন উহারা প্রেমের পথের পথিক—শীঘ্রই প্রত্যাখ্যাত হয়ে যুদ্ধ-পথের পথিক হবে। ছ্যাঃ ! কলকাতার ঐ ছোকরা-গুলো আমাদের সমাজের অভিসম্পাত !"

গুঁফো একটু হাসিয়া বলিল,—"আইভি সিমলার এক-জন বড় সাহেবকে বিবাহ করিবে।"

আইভি একটু স্পর্দ্ধার সহিত অথচ একটু বিদ্রূপের সহিত বলিল,—"সত্যই তো ! আমার পিতা ছিল ইংরাজ। আমি শিক্ষা পাচ্চি। আমি কলকাতার একজন মাতাল, অমিতব্যয়ী এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানকে বিবাহ করবার পূর্ব্বে নেটিভ খানসামা বিবাহ করব।" পিতা হাসিয়া বলিল,—"ভিক্‌টোরিয়া ক্রসের গল্পের নায়িকার মত।"

(৪)

তখন আইভি কলিকাতায় ছিল না। উইলিয়মও সিমলায়। সারদিনব্যাপী বরষার বারিধারা, বিশেষ সর্ব্বদিকব্যাপী কালো মেঘ, আনন্দের বা সুখ-চিন্তার পরিপন্থী। কাজ-কর্ম্মের ভিড়ও মন্দ ছিল না। চিকিৎসালয়ে বসিয়া প্রায় দশজন জ্বরের রোগী দেখিয়া-ছিলাম। সন্ধ্যার পর আইভি-জননী আসিয়া উপস্থিত হইল—ওষ্ঠ কাঁপিতেছে, চক্ষু সজল, অতীত ক্রন্দন সূচনা করিতেছে, বেশভূষার তেমন পারিপাট্য নাই। সে বলিল—"ডাক্তার, তোমার কোনও উকীল বন্ধু আছে—পুলিশকোর্টের ?"

অবশ্য আছে—মিঃ এ, টি, শীল। আমি বলিলাম, "কেন ? পুলিশকোর্টে কেন ?" মিসেস ম্যাক্‌ফারসন, তোমাকে অসুস্থ দেখছি যে।"

এইটুকু স্নেহের কথাতেই যে কাঁদিয়া ফেলিল—রুমালে চক্ষু মুছিতে-মুছিতে বলিতে লাগিল—"শয়তান ! পশু ! মাতাল ! শূকর !" অবশ্য আমাকে নয়,—তাহার দ্বিতীয় পক্ষের স্বামীর উদ্দেশে ! সে মদ্যপান করিয়া তাহাকে প্রহার করিয়াছিল। গৃহে একটিও পয়সা নাই—বাজারে দেনা,—লাল বাজারে পোদ্দারের নিকট তাহার অলঙ্কার বন্ধক। পিয়ানো বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। অবশ্য এ সকল ঘরের কথা সে আমার নিকট প্রকাশ করিতেছে—কারণ, আমি তাহার পরিবারের বন্ধু—আমার নিকট তাহারা কৃতজ্ঞ বলিয়া। সে অনেক দিন সহিয়াছে, আর পারে না। আইভি ও বিল শুনিলে চার্লি ম্যাকফারসনকে খুন করিবে। বিল এখন বালক নয়—প্রায় ১৩।১৪ বৎসরের যুবক। সে নিশ্চয় নালিশ করিবে, চার্লিকে জেলে পাঠাইবে, খোরাকী আদায় করিবে। সে—কোম্পানীকে লিখিয়া স্বামীর চাকুরী নষ্ট করিবে, তাহাকে আর্ম্‌স্ হাউসে পাঠাইবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি তাহাকে অনেক বুঝাইলাম,—মাতাল ম্যাক-ফারসন তো আর আসল ম্যাকফারসন নয় ! বাদশাহের হস্তী-ক্রেতার গল্প বলিলাম। আমাদের এক বাদশা হাতী চড়িয়া দিল্লীর রাজপথ দিয়া যাইতেছিলেন। একটা মাতাল গলি হইতে বাহির হইয়া বলিল—"এই হাতীওয়ালা ! হাতী বেচোগে ?" পরদিন সম্রাট তাহাকে রাজসভায় ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিহে বাপু, হাতী কিনবে ?" তখন তাহার নেশা ছিল না। সে ভূলুণ্ঠিত হইয়া করযোড়ে বলিল—"জাহাপনা যে হাতী কিনতে চেয়েছিল, সে খরিদ্দার এখন চলে গেছে !"

কিছুকাল পরেই ম্যাকফারসন আসিয়া পড়িল। তাহাকে দেখিয়া মেম আমার খাস-কামরার ভিতর চলিয়া গিয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল—"ডাঃ সান্যাল মিসেস এম্ এসেছিলেন ?"

আমি তাহাকে বসিতে বলিয়া, খুব ভণিতা করিয়া বলি-লাম—"একটা কেলেঙ্কারী কি ভাল ?"

হাতীর খরিদ্দার চলিয়া গিয়াছিল। সে বড় মর্ম্মাহত, বড় অনুতপ্ত। সে বলিল—"আমি পশুর মত ব্যবহার করিয়াছি। তুমি আমাদের একজন। এ যাত্রায় ভাব করিয়ে দাও ! আমি বড় অনুতপ্ত,—আমি আর মদ স্পর্শ ক'রব না।"

শেষ কথা কয়টা বিশ্বাস করিলাম না। সে যাত্রায় শান্তি-স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।

(৭)

ইতোমধ্যে নিজের জীবনের কতকটা পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। সাত পাঁকের প্যাঁচ কষিয়া বসিতেছিল। যাক সে কথা। সে কাহিনী এ আখ্যায়িকার বিষয়ীভূত নয়। এ আইভির গল্প। আমার সহধর্ম্মিণী কনকমঞ্জরীর নয়।

আইভি কলিকাতায় আসিয়াছিল। আইরিশের পায়ে একটা ফোড়া হইয়াছিল। অস্ত্র করিয়া আমি গাড়ীতে উঠিয়াছিলাম। বড় সুন্দর সাজে সাজিয়া, বুকে গোলাপ ফুল গুঁজিয়া, আইভি আমার গাড়ীর নিকট আসিল। কেমন একটু বাসনার প্ররোচনায় হঠাৎ বলিয়া ফেলিলাম, "আজ আমার আর কাজ নেই,—একটু মাঠে বেড়াব। তুমি একটু টাট্‌কা হাওয়া—"

"চল।" সে উঠিয়া গাড়ীতে আসিয়া পার্শ্বে বসিল। তাহার রেশমী পোষাকের কোমল স্পর্শ আমার পশমী পোষাকের ভিতর দিয়াও যেন অনুভূত হইতেছিল। আমি কি বলিব ঠিক করিতে পারিলাম না। এ বিষয়ে, স্ত্রীলোক হইলেও, সে আমা অপেক্ষা সম্পদশালিনী। সে বলিল—"ডাক্তার, শুনেচ,—আমি স্কুল ছাড়চি?"

আমি সাহস করিয়া বলিলাম—"বিবাহের আশায়?"

সে বলিল—"ফোঃ! বিবাহের আশায়! ডাঃ সান্ন্যাল, বিবাহ করবার মত লোক তো একটাও দেখি না।"

আমি একটু ঈর্ষ্যাদুষ্ট স্বরে বলিলাম—"কেন, টম, ডিক্‌, হ্যারী—যে যুবকগুলাকে তোমার পায়ে-পায়ে ঘুরতে দেখি!"

সে হাসিয়া একটু কটাক্ষ করিয়া বলিল—"হ্যাঁ, পায়ে-পায়ে ঘোরবারই উপযুক্ত। জীবনের ভাগাদার হ'বার উপযুক্ত নয়। আচ্ছা ডাক্তার, তোমাদের তো শুনেছি খুব বাল্যকালে বিবাহ হয়। তুমি বিবাহিত? তোমার একটি শিশু পত্নী আছে? হেঃ!"

সে আমার পার্শ্বে খুব মৃদু একটু কনুইয়ের আঘাত করিল। আমি বলিলাম "না।" আমি মনকে আঁখি ঠারিয়া বলিলাম যে "না"; বলিলাম,—শেষ প্রশ্ন—আমার শিশু-পত্নী আছে কি না—সে কথার উত্তরে। আইভি কিন্তু অন্যরূপ বুঝিল। আমি ব্যঙ্গচ্ছলে বলিলাম—"আইভি, তুমি নেটিভ বিবাহ করিতে সম্মত আছ?"

তাহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব অসাধারণ। সে বলিল—"দেখ ডাক্তার, ইউরোপীয় কিম্বা নেটিভের মধ্যে আমার উপযুক্ত স্বামী পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এদের মধ্যে যারা উপযুক্ত, তারা এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানকে বিবাহ করবে না। আর আমাদের সমাজে এমন লোক নাই, যাকে বিয়ে করতে পারি—উঃ! কি ভীষণ পানদোষ!"

আমি তাহার সহিত একমত হইতে পারিলাম না। গাড়ি ইডেন উদ্যানে আসিয়া থামিল। তাহার হাত ধরিয়া নামাইলাম। কেল্লা হইতে একদল গোরা আসিয়া ব্যাণ্ড বাজাইতেছিল। ওখানে খুব লোকের ভিড়। যুগলে-যুগলে অনেক সাহেব-মেম ঘুরিতেছে। অনেকে আমাদের দিকে চাহিল। প্রায় সকলেই আমাকে ফিরিঙ্গি মনে করিল। যাহারা বাঙ্গালী বলিয়া সন্দেহ করিল, তাহারা একটা বিস্ময়ের চক্ষে আমাদের উভয়ের মুখের দিকে চাহিল। লোকালয় ছাড়িয়া আমরা লহরের ধারের একখানা বেঞ্চে গিয়া বসিলাম। আমি বলিলাম—"তোমার ও ধারণাটা ভুল—ভাল-মন্দ সব সমাজেই আছে। কত দেবচরিত্র ইউরেশীয়ান আছে। তুমি পিতার উপর অভিমান ক'রে এ কথা বল্‌ছ।

সে হাসিল বলিল—"যাক সে কথা। আমি একটা চাকুরির চেষ্টা করছি। একটা চাকুরি পেলেই মাকে ঐ পশুটার হাত থেকে বাঁচাতে পারি। তুমি মার কি উপকার করেছ শুনেছি। আমরা তোমার নিকট ঋণী।"

(৮)

ছয় মাস তাহাদের গৃহে রোগ হয় নাই—সুতরাং তাহাদের কাহাকেও দেখি নাই। একদিন অপর এক য়ুরোপীয় রোগীর বাটীতে মিসেস ম্যাকফার্সনের সাক্ষাৎ পাইলাম। সে আমার গাড়ীতে বাটী আসিতে চাহিল। পথে শুনিলাম, ম্যাকফারসন পানের মাত্রা বাড়াইয়াছে, আইভির সহিত তাহার নিত্য কলহ হয়—তাহাতে মেমের মনে শান্তি নাই। হাজার হউক চার্লি তো তাহার পিতা। সে যখন মেমের উপর একটু-আধটু জুলুম করে, তখন আইভি মিছামিছি মাতার পক্ষ লইয়া গৃহে অশান্তির সৃষ্টি করে। সহজ অবস্থায় ম্যাক্‌ আইভিকে যথেষ্ট সম্মান করে। আইভি গৃহ ছাড়িতে চায়, কোনও কাজ-কর্ম্মের জোগাড় করিতে পারে নাই। শেষে জোন্‌স নামক একটি যুবককে বোধ হয় বিবাহ করিবে; কারণ, সর্ব্বদা তাহার সহিত বন্ধুত্ব!

জোন্‌স্! কখনও তাহাকে দেখি নাই, তাহার নামও

শুনি নাই; আমার জাতি নয়, কুটুম্ব নয়, শত্রু নয়, তবু তাহার ঘাড়টা মটকাইয়া দিবার একটা অদম্য বাসনা আমার প্রাণকে আলোড়িত করিতে লাগিল। জোন্‌স রেলের কর্ম্মচারী, তিনশত টাকা বেতন পায়, মাত্র পঁচিশ বৎসর বয়স। "নেশা করে?" মেম হাসিয়া বলিল—"তুমিও তাহ'লে আইভির মন জান। না, নেশা করে না; বরং ওয়াই, এম, সিয়েতে নেশা করার বিরুদ্ধে বক্তৃতা দেয়। দার্জ্জিলিঙ্গের ছেলে—কেমব্রিজ সিনিয়ার পাশ।"

পরদিন সন্ধ্যার সময় কাজ ছিল না। আস্তে-আস্তে ম্যাডেন সাহেবের বায়োস্কোপে গেলাম। একটাকার আসনে বসিব বলিয়া ধুতি-চাদর পরিয়া গেলাম। সঙ্গে ছিল একটি বন্ধু যোগীদাদা। বায়োস্কোপের ফটকের কাছেই দেখিলাম একটি গৌরবর্ণ ইউরেসিয়ানের বাহু-লগ্ন আইভি। আমাকে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি করমর্দ্দন করিল। কিন্তু তাহার সঙ্গী জোন্‌স খুব গর্ব্বিত ও বিরক্ত হইয়া একটু সরিয়া গেল। আইভি তাহা লক্ষ্য করিল—আমিও করিলাম। সে আমাকে অভিবাদন করিয়া জোন্‌সের দিকে চলিয়া গেল।

আমাদের এ ব্যাপারটি যোগিদা' দেখিল। সে আমার মুখে ম্যাক্‌ফারসন-পরিবারের কথা শুনিলে উপহাস করিত। আইভিকে সে আমার ঔষধালয়ে দেখিয়াছিল। তাহাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া বলিল, "ঝাঁকের কৈ ঝাঁকে মিশিয়ে গেল, বাস্‌! তোমার আশার গাড়ি উজাড় হ'ল। বাবা! গরীবের কথা মান না। ও শয়তানের ঝাড়!"

আমি বলিলাম;—"কি দরকার? যেতে দাও না ও-কথা, যোগী-দা!"

সে বলিল,—"যেতে দাও না? কেমন অপমানটা করলে! ধুতি পরা না থাকলে বোধ হয় অতটা অপমান করত না। মানুষ দেখতে আমার বাকী নাই। যে যত কালো সে তত পাজি।"

বন্ধু ছোট আদালতের উকীল, বাস্তবিক ফিরিঙ্গি দেখিয়াছিল অনেক। আমার কষ্ট হইল আইভির ব্যবহারে। তাহাদের সমস্ত পরিবার আমার নিকট উপকৃত। জোন্‌স আমাকে অপমান করিল। সে তাহাতে একপ্রকার যোগদান করিল। আসনে গিয়া বসিলাম। সে দিন ভিড় ছিল। আশে-পাশে অত লক্ষ্য করি নাই। হঠাৎ কানে আইভির সুর প্রবেশ করিল। তাহারা ঠিক আমার সম্মুখেই বসিয়াছিল। আইভি বলিল,—"সিরিল, ডাক্তার বাবু নিশ্চয় দুঃখিত হ'বেন।"

"ওঃ! দুঃখিত হ'বেন! আমি ইচ্ছা করি না আমার স্ত্রী নেটিভদের সঙ্গে মেলা-মেশা করবে।"

"নেটিভ! তুমি জান না। ভারি শিক্ষিত লোক—"

জোন্‌স্ বলিল, "থাম—থাম! শিক্ষিত লোক! দেখ আইভি, দু' টাকা মাইনে বাড়াবার জন্যে বাবুরা আমার বুটের ফিতে বেঁধে দেয়। আমার স্ত্রী যেন নেটিভদের সঙ্গে—"

আইভির মুখ সিন্দুর বর্ণ হইল। সে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল,—"এখনও তোমার স্ত্রী হই নাই। আমি গর্ব্বকে ঘৃণা করি।"

সে বলিল,—"আমিও অবাধ্য স্ত্রীকে ঘৃণা করি।"

আইভি মাত্র একটি কথা বলিল,—"বাস্তবিক?"

ছায়াবাজি আরম্ভ হইল। সকলে নিঃশব্দে দেখিয়া বাড়ী ফিরিলাম। যোগী-দাদা কেবল মাঝে-মাঝে আমার দিকে চাহিয়া হাসিতেছিল। সে আইভি, জোন্‌স্‌কে আসলে দেখে নাই বা তাহাদের কথা শুনে নাই।

(৬)

পরদিন প্রত্যূষে ম্যাকের পত্র আসিল—"আইরিন পীড়িতা, অনুগ্রহ করিয়া আসিবেন।" যখন তাহাদের গৃহে গেলাম, তখন বেলা দশটা। সাহেব আফিস গিয়াছিল। আইরিনের ব্যবস্থা করিলাম। আইভি আমাকে টানিয়া ড্রয়িংরুমে বসাইল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—"ডাক্তার, আমি বোধ হয় পাগল হ'ব।"

আমি হাসিলাম। ভাবিলাম হাতে পাইয়াছি—ছাড়ি কেন? আমি বলিলাম—"কি, জোন্‌সের প্রেমে? মিস্ বিলিঙ্, আমি সুখী হ'লাম,—এতদিন পরে তোমার স্বজাতি-বিদ্বেষ—"

সে বাধা দিয়া বলিল, "ঠিক্ সেই কথা বলিবার জন্যই তোমাকে ডেকেছি। ডাক্তার সান্ন্যাল, পাগল হ'ব তিনটে ভাবের চাপে—স্বজাতি-বিদ্বেষ, পিতার উপর ঘৃণা, আর মার দুঃখে।"

তাহার মুখে সহজ হাসিটুকু ছিল না। তাহার চক্ষের সাধারণ হর্ষের জ্যোতিঃও ম্লান হইয়াছিল। আমি বলিলাম, —"পাগলামির কারণ যখন ধরতে পেরেছ, তখন আর পাগল

হবার ভয় নেই। ম্যাকফারসনকে ভালবাসিতে আরম্ভ কর, মাকে দুঃখিনী মনে কর না, আর আশা করি, স্বজাতি জোন্‌সের প্রেমে ফিরিঙ্গি-বিদ্বেষ কেটে যাবে।"

সে বলিল,—"শেষ থেকে আরম্ভ করি। আমাদের মধ্যে দেশী ও বিলাতী দুই রকম রক্ত আছে। আমার ভিতর বিলাতী রক্ত, বিলিঙ্‌ রক্ত বেশী। তাই আমি নীচ নই। জোন্‌স্ নেশা করে না, তাই তাকে বিবাহ করতে সম্মত হ'য়েছিলাম—কিন্তু লোকটা বড় নীচ। ওর গর্ব্ব অসহনীয়। ওর ভিতর মুসলমানী রক্তের প্রাবল্য। ও বিবাহের পর আমাকে নিশ্চয় পরদায় পুরবে। পশু! শয়তান!"

বিংশতিবর্ষীয়া যুবতী এত বিশ্লেষণ করিতে শিখিল কোথা হইতে? সে যেমন ভাব-প্রবণা, তেমনি চিন্তাশীলা। তাহার প্রেম ও ঘৃণা সমান মাত্রায় গভীর। পিতা মাতা এবং ভ্রাতার উপর তাহার ভালবাসা অপরিমেয়। বিপিতার উপর ঘৃণাও তেমনি প্রবল। গৃহে ফিরিবার পূর্ব্বে বুঝিলাম, জোনসের সহিত তাহার বিবাহ-সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; আর ষোল বৎসরের বালক বিল সিমলায় ষাট টাকার চাকুরী পাইয়াছে। ইহাতেও ইউরেশীয় দুঃখ করে যে, ইংরাজ তাহার "দাবী" গ্রাহ্য করে না।

এই "দাবী" সম্বন্ধে একটা কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। এক দিন অবশ্য একটু "টানিয়া" ম্যাক্-সাহেব আমার নিকট বলিয়াছিল যে, তাহার অফিসের "ইংরাজ পশুগুলা" তাহাকে মানুষ বলিয়া জ্ঞান করে না। ইউরেশীয়দের কর্ত্তব্য কংগ্রেসে যোগ দান করা। তাহার বর্ণ গৌর, মাতার দিকে একটু কৃষ্ণ দোষ ছিল বটে, কিন্তু তাহার পিতামহ স্কচ ছিল। তবু তাহারা তাহার সহিত একত্রে পান-ভোজন করে না, সমাজে মিশে না ইত্যাদি। যাক্ সে কথা, কারণ এ আখ্যায়িকা আইভির।

(১০)

সে দিন রবিবার, বর্ষা কাল। শুক্রবার রাত্রি হইতে বর্ষণ হইতেছিল। বেলা প্রায় চারিটা বাজিয়াছে। মিসেস্ ম্যাকফারসনের জ্বর হইয়াছিল। আমি দেখিতে গিয়াছিলাম। তাহাদের সাজান-ঘরের বারান্দায় বসিয়া একটি শিখ যুবক তাড়িত-পাখা মেরামত করিতেছিল। বাদলার স্যাঁতসেঁতানি কাটাইবার জন্য ম্যাকফারসন সাহেব শনিবার রাত্রি হইতে সুরা-সাধনা করিতেছিল। মিসেস্ একখানি কোচে শুইয়া ছিল। আমি আইভির সহিত গল্প করিতেছিলাম। পাঞ্জাবী কারিকরের দিকে চাহিয়া আইভি বলিল,—"লোকটার চেহারা দেখ ডাক্তার! যেমন হৃষ্ট-পুষ্ট তেমনি লম্বা। এ সব লোক নীচ হ'তে পারে না।"

আমি বলিলাম,—"হাতের ও মুখের রঙ রৌদ্রে মলিন হলেও, গায়ের রঙ্ বেশ পরিষ্কার।"

লোকটা বুঝিয়াছিল যে, আমরা পরচর্চ্চা করিয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করিতেছি; এবং "পর" যে কে, তাহাও যেন সে বুঝিয়াছিল। সে মাঝে-মাঝে আমাদের দিকে চাহিতেছিল। আর বিনয়ে ও লজ্জায় সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল। সিমলার স্মৃতি আইভির বড় মনোরম, তাহাদের সিমলায় ঐরূপ অনেক পাঞ্জাবী আছে। আমরা তাহার সহিত আলাপ করিবার জন্য বাহিরে গেলাম। বেচারা আরও লজ্জাবনত হইল। আমরা তাহার মুলুক, রেস্তা প্রভৃতির সংবাদ লইয়া তাহার সাদি হইয়াছে কি না এ প্রশ্নের "নেহি জী" উত্তর পাইয়াছি,—অমনি মেম-ম্যাকফারসনকে অতি কাতর কণ্ঠে বলিতে শুনিলাম—"চার্লি, বিরক্ত ক'র না, দয়া কর. আমি অসুস্থ। আমাকে তো হত্যা করছ, একটু শান্তি পেতে দাও।"

চার্লির গোঁফের ভিতর হ'তে উত্তর আসিল,—"চুপ্, কুক্কুরী।

ক্রোধে আইভি কাঁপিতেছিল। রক্তমুখী যুবতী বলিল,—"মিঃ ম্যাক্, খবরদার, ও-রকম কথা আমার মাকে ব'ল না!"

"তোমার মা! কুক্কুরী! আমার টাকা কোথা!"

আইভি আরও উচ্চ কণ্ঠে বলিল,—"মিঃ ম্যাক! পশু!" এ অগ্নিসংযোগে কি বারুদের বস্তা প্রজ্জলিত না হইয়া থাকিতে পারে! সে বলিল,—"তোমার বিলিঙ্ কুকুরের মেয়েকে বারণ কর—না হয় চাবুক মারব।"

আইভি বলিল,—"বিলিঙ্ বেঁচে থাকলে তোমায় ঘোড়ার চাবুক মারত! কাপুরুষ! মাতাল, পশু, ময়লা নীচ, শূকর (ডার্টি লো সোয়াইন!)"

মিসেস ম্যাকফারসন উঠিয়া বারান্দায় আসিয়া, কৃশ হস্তে কন্যার মুখ টিপিয়া ধরিল। ঠিক পশুর মত অঙ্গভঙ্গি

করিয়া মত্ত ম্যাকফারসন অকথ্য ইংরাজি ও হিন্দুস্থানীতে তাহাদের গালি দিতেছিল। আমি কোন কথা কহা যুক্তি-যুক্ত মনে করি নাই। শিখ্ যুবক উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল—তাহারও সহানুভূতি স্ত্রীলোক দুইটির প্রতি।

মেম বলিল,—"হায় চার্লি! ঈশ্বরের খাতিরে স্থির হও।"

"স্থির হ'ব!, ময়লা কুক্কুরী! এই নাও!" মেজের উপর একখানা বড় মাংস-কাটা ছুরি পড়িয়া ছিল। নিমেষের মধ্যে পশু সেটাকে স্ত্রীর দিকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিল। রমণীদ্বয় ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। আমার হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হইল; কিন্তু শিখ্ যুবক অমর সিংহ অবলীলাক্রমে সেই তীক্ষ্ণ ছুরিকা ধরিয়া ফেলিল। স্ত্রী লোক দুইটা বাঁচিয়া গেল; কিন্তু অমর সিংহের হস্ত হইতে রক্তস্রোত বহিতেছিল। আইভি "পুলিস পুলিস" করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার জননী তাহার মুখ টিপিয়া ধরিল; বলিল—"ছিঃ—ছিঃ! আইভি! কেলেঙ্কারী হ'বে,—বেচারা বিলের সমস্ত জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে।"

দেখিলাম, ফিরিঙ্গিদের অদ্ভুত কৌতূহল দমনের দীক্ষা। কক্ষের বাহিরের পরিবারগুলা এত গোলমালেও কেহ আসিল না। আইভি ছুটিয়া গিয়া অমর সিংহের হাত টিপিয়া ধরিল। নিজের রুমাল দিয়া তাহার ক্ষতস্থল বাঁধিল। আর আমি বাঙ্গালী ডাক্তার হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। অমর সিংহ হাসিতেছিল, মাতালটা বিড়-বিড় করিয়া বকিতে-বকিতে শয্যা-গৃহে প্রবেশ করিল। অমর সিংহের ক্ষতস্থান ব্যাণ্ডেজ করিয়া গৃহে ফিরিলাম। আইভির সুরা-বিদ্বেষ ও স্বজাতি-বিদ্বেষের প্রশংসা করিলাম, আর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলাম। তাহার জননীর অবস্থা উপলব্ধি করিলাম! হায়! হায়! এই বিধবা বিবাহ সমাজে চালাইবার জন্ত আবার আমরা ব্যস্ত! বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে আমার মতটা বদলাইতে বাধ্য হইলাম। অন্ততঃ সে দিন।

(১১)

অতিরিক্ত মাদকতায় এবং স্নায়ুর উপর অত চাপ সহিতে না পারিয়া ম্যাক্ফারসন্ বেচারার জ্বর হইল, মাথার শির ছিঁড়িল, পরদিন বেলা দশটার সময় সে ইহলীলা সম্বরণ করিল। আমার কর্ত্তৃত্বাধীনে সারা রাত্রি আইভি তাহার সেবা করিয়াছিল। কিন্তু কোন ফল ফলে নাই। বেলা সাতটার সময় একবার তাহার জ্ঞান হইয়াছিল। সে আইভির দিকে চাহিয়া "ক্ষমা" কথাটা বলিয়াছিল। আইভি তখন তাহাতে গলিয়া গিয়াছিল, তাহার গলা ধরিয়া তাহার মুখ চুম্বন করিয়াছিল।

সমাধি হইয়া গেল। চতুর্থ দিবসে তাহাদের গৃহে গেলাম। সাজান ঘরে কার্পেট নাই, কিংখাপ মোড়া কৌচ নাই, গ্রামোফোঁ নাই, দেওয়ালে চিত্র নাই। ঘরে বিজলির প্রদীপ ছিল, কিন্তু কক্ষের গাঢ় অন্ধকারের সহিত ঝুলিতেছিল একটি হ্যারিকেন ল্যাম্প। কালো পোষাক পরিয়া একখানি বেতের মোড়ায় বিধবা বসিয়া ছিল, একখানা ভগ্ন কেদারায় আইভি। তাহারা নিঃশব্দে আমায় অভিবাদন করিল। মেমের দেহ পরীক্ষা করিলাম। সে অল্প-অল্প কাসিতেছিল। যাহা সন্দেহ করিয়াছিলাম, আজ তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাইলাম। অতিরিক্ত মানসিক সংগ্রামে তাহার যক্ষ্মা হইয়াছে।

সে বলিল, "ডাক্তার, আমার আর নিষ্কৃতি নাই। এত দিন এক রকম সংগ্রাম করছিলাম,—এবার দারিদ্র্যের সঙ্গে বিষম যুদ্ধ। মানুষ তো গেল, তার সঙ্গে গৃহের সাজ-সজ্জা। ওঃ! ঈশ্বর!"

চক্ষে রুমাল দিয়া সে কাঁদিতে লাগিল। আইভি স্থির হইয়া বসিয়া ছিল। তাহার চাঞ্চল্যও ছিল না, স্বাভাবিক সজীবতাটুকুও লোপ পাইয়াছিল। সে দুই হস্তে মাথা ধরিয়া বসিয়া ছিল।

মনের প্রকৃতি সর্ব্বত্র সমান। সে অতীতের নিষ্ঠুরতার ভিতর ভবিষ্যতের কঠোরতার ছায়া দর্শন করে, অথচ মনের মধ্যে আশা পুষিয়া রাখে।

মেম উঠিয়া দাঁড়াইল। আমার কাঁধে হস্ত রাখিয়া বলিল, "ডাক্তার, আমি বড় হতভাগিনী, বড় দুঃখিনী। আমি নিজের জাতির নিকট এত দয়া পাইনি, যত তোমার কাছে পেয়েছি। আমরা সিমলা যাব, বোধ হয় আর দেখা হবে না।" সে কাঁদিতেছিল, আমার প্রাণটা গলিয়া গেল। তাহার কৃশ মুখের মধ্যে মাতৃ-মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। যখন সে সাগ্রহে আমায় বলিল, "বাবা আসবে? ভগবান তোমার ভাল করবেন—" আমি বাধা দিয়া বলিলাম, "মিসেস্ ম্যাক্ফারসন্—আশা করুন।" সে কান্নার সুরে

বলিল, "এক আশা আছে স্যান্যাল, আমার স্বামীর খবরে দেহ রাখ্‌তে। বিলিঙের প্রতীক্ষা বহুদিন ক'রে রয়েছি, চার্লিকে বিবাহ করেছিলাম, শিশু দু'টার জন্য, ভালবেসে নয়। তাঁহাকে নষ্ট করেছিল মদ। মানুষ অবস্থার দাস।" সে কাঁদিতে লাগিল। আমি তাহাকে কৌচে শুইতে বলিলাম। আইভি ইঙ্গিত করিল। আমি বাহিরে গেলাম। সে বলিল, "ডাক্তার, সত্য কথা বল্‌বে। মা'র অবস্থা—"

আজ সে হাস্যময়ী, লীলাময়ী, শক্তিময়ীর হাস্য নাই, লীলা নাই। শক্তি নাই। মৃত্যু-বিজিত গৃহটা যেন ভীম অট্টহাস্য করিতেছিল। তাহার সত্যই শক্তি আবশ্যক হইয়াছিল। সে এক হাতে আমার স্কন্ধে ভর দিয়া, অপর হস্তে আমার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া বলিল, "মা'র অবস্থা সত্য কি? ডাক্তার, তোমায় আমি ভ্রাতার মত শ্রদ্ধা করি, প্রতারণা ক'র না।" আমি তাহার হস্ত ধরিয়া বলিলাম, "আইভি, তোমার মার যক্ষ্মা হ'য়েছে। এ যাত্রা রক্ষা নাই। তবে সিমলায় বিলের কাছে গেলে, কি হয় বলা যায় না।"

শোকে তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল। পাছে মাতা শুনিতে পায়, তাই ক্রন্দনের শব্দ রোধ করিতে গিয়া আরও কাঁপিতেছিল। আমি তাহার স্কন্ধে হাত দিয়া বলিলাম, "আইভি! আইভি!" সে বলিল, "মা আমার! ওঃ! মা আমার! ভগবান! না মা'র মৃত্যু দেখিব না। কখনই না। কখনই না।"

আমার স্কন্ধে ভর দিয়া সে কাঁপিতেছিল। কি গভীর আন্তরিকতা! সে সামলাইয়া বলিল, "ডাক্তার, তুমি আমার ভাই। তোমার নিকট আমরা ঋণী। যদি দেখা না হয়!" আমি বলিলাম, "ছিঃ, আইভি!" সে বলিল, "না, দেখা হবে না।"

আমি কি যেন প্রবৃত্তির বশে তাহার চম্পক-অঙ্গুলি কয়টা মুখে তুলিলাম। খুব স্নেহে তাহার স্কন্ধে হাত দিলাম। সে প্রকৃতিস্থ হইল। আমার গলা ধরিয়া আমার মুখচুম্বন করিল। বলিল, "না ভাই, আর দেখা হবে না।"

(১২)

দেখা হইয়াছিল, নিয়তি-চক্রের ঘোর-পাক—"দেবাঃ না জানন্তি কুতোঃ মনুষ্যায়।" তিন মাস পরে আমার রোগী, জমিদার গোপীবাবু রোগমুক্ত হইয়া বায়ু-পরিবর্ত্তন করিতে চাহিলেন। আমি সঙ্গে না গেলে তিনি যাইবেন না। আমি বলিলাম, "সিম্‌লা পাহাড় অপেক্ষা উত্তম স্থান নাই। শরতের হিমালয় মেঘমুক্ত, হাসিমাখা। অবশ্য হাসি পাষাণের মুখে দেখিবার দুরাশা করি নাই, ভাবিয়াছিলাম হাসি দেখিব তাহার মুখে, আমার পাতান ভগিনীর মুখে। আহা! কি কষ্টই না পাইয়াছে!

প্রথমে হিমালয়ে গিয়া মিঃ উইলিয়ম বিলিঙের সন্ধান পাইলাম না। নিয়তি-চক্রের খেলা আপনিই একদিন বিলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইয়া দিল। খুব ভোরের বেলায় পোষ্ট আফিসে চিঠি ফেলিয়া ছোট সিম্‌লার দিকে যাইতেছিলাম। হিমালয়ের শীতল বায়ু, মুক্ত আকাশ, সরল দেবদারু, কাঁচা ধূনা রজনের গন্ধ—একটা সুখের লহর প্রাণের মধ্যে খেলিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ দেখিলাম, কালো পোষাক পরিধান করিয়া বিল্ চলিয়াছে, তাহার তরুণ মুখে বিষাদের ছায়া। হাতে এক গোছা সাদা গোলাপ। আমি বলিলাম "হ্যালো।" বিল্ আশ্চর্য্য হইয়া গেল। বলিল, "ডাক্তার! ওঃ! ঈশ্বর! ডাক্তার আমার মাকে হারিয়েছি। সাত দিন পূর্ব্বে।" আমি বিষণ্ণ হইলাম, বলিলাম, "তোমার বোনেরা!" সে বলিল, তুমি জান না? আইভি তো নিরুদ্দেশ!" "নিরুদ্দেশ!" "যে দিন তোমার সঙ্গে ওদের শেষ দেখা হয়, তার পরদিন থেকে। মার অসুখ বাড়ে, তাই তোমায় খবর দিতে পারেন নি। আমিও লিখি নাই।"

নিরুদ্দেশ! কি মত্ততা! বলিয়াছিল, মাতার মৃত্যু দেখিবে না। নিশ্চয় কলিকাতায় কোথাও কার্য্য করিতেছে। তবে কি সেদিন বলিলে সে আমার সঙ্গে চলিয়া যাইত? জানিত, আমি অবিবাহিত। বিল্ বলিল, "ডাক্তার যাবে? সিমেট্রী।" চলিলাম,—পাহাড়ের নীচু রাস্তা দিয়া ফার ও ওক্ গাছের ঝর্‌ঝর্ শব্দ শুনিতে-শুনিতে চলিলাম। সমাধি-ক্ষেত্রের ফটকেই দেখিলাম, অমর সিংহ! অমর সিংহ! এখানে! হাঃ নিয়তি-চক্র! "হিঁয়া?" "হাঁ বাবুজি। ডাক্তার সাহেব!"

সে সেলাম করিল। বিলের সহিত চলিলাম। তাহার সহিত কথাবার্ত্তা হইল না। দুই সারি সমাধি; প্রত্যেকটিই প্রায় মর্ম্মরের,—কাহারও উপর পরীর মূর্ত্তি; সকলের উপর

যীশুর ক্রুশ। কোথাও ধূলা নাই, ময়লা নাই। অনেক-গুলি সমাধিতে পুষ্প। দূরে বিল্ ইঙ্গিত করিল, তাহার জনক-জননীর সমাধি। সে বড় ভক্তিভরে অগ্রসর হইতেছিল, অত ভক্তি অত শ্রদ্ধা লইয়া অতি অল্প হিন্দু বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে প্রবেশ করে। এ কি! সমাধির নিকট নতজানু হইয়া প্রার্থনা করিতেছে কে? পাঞ্জাবী রমণী, জড়ীর নাগরা জুতা, সাদা ফ্লানেলের চুড়ীদার পায়জামা, সাদা সার্জের পাঞ্জাবী পিরিহান, দোরোখা সাদা শালে অবগুণ্ঠিতা! বিস্ময়ে বিল সেই মূর্ত্তির দিকে চাহিতেছিল। চারিদিকে পাহাড় যেন বড়-বড় ঢেউগুলা জমাট বাঁধিয়া নিস্তব্ধে সে দৃশ্য দেখিতেছিল। যেন কবরে কোনও দেব-বালা আশীস্ লইয়া আসিয়াছিল। ধ্যানমগ্না শ্বেত-বসনা ললনা। বিল বলিল,—"এ কি?"

আমরা তাহার নিকটস্থ হইলাম, রমণীর ধ্যান ভাঙ্গে না। বিল নীচু হইয়া তাহার মুখের দিথে চাহিল—উভয়ে এক সঙ্গে বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—"বিল্! আইভি!"

আইভি উঠিয়া দাঁড়াইল। ভ্রাতা-ভগিনী পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল। ভগিনী তাহাকে ধরিতে গেল। ভ্রাতা সরিয়া গেল, বলিল,—"এ কি! সমাধিক্ষেত্রে এই সাজে! ফ্যান্সি পোষাকে!"

আইভি বলিল,—"ভাবছ, ফ্যান্সি—বলে গিয়াছিলাম, সেই পোষাকে সমাধি অপবিত্র করতে এসেছি?"

দৃঢ় স্বরে ভ্রাতা বলিল—"নিশ্চয়!"

সে বলিল,—"না বিল্! ভাই আমার, আমাদের এ শোকের পোষাক সাদা।"

বিল বলিল,—"মদ্ খেয়েছ?"

সে বলিল,—"ওঃ! জান না! বলছি শুন! ঐ মদের জন্যেই স্বজাতিকে ঘৃণা করি! ঐ মদের জন্যেই এক দিন মাতা হত্যা হ'চ্ছিলেন। আমার স্বামী বাঁচান।"

"তোমার স্বামী! অমর সিং!"

সে এতক্ষণ আমাকে লক্ষ্য করে নাই। আমার কণ্ঠ-স্বর শুনিয়া সে আমার দিকে চাহিল। দেশীয় ভাষায় সেলাম করিয়া বলিল,—"ডাক্তার, সুপ্রভাত! হাঁ অমর আমার স্বামী। বলেছিলাম, মাতার মৃত্যু দেখব না, ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে মিশব না। তাই! শুধু তাই না, তা'র বীরত্বে আমি প্রেম-উন্মাদিনী হয়েছিলাম। বিবাহের পর দুঃখিত হইনি! আহা! কি যত্ন করে! কি স্নেহ করে! কত উচ্চ ভাবে! কত সাহস! কত মনুষ্যত্ব। সুপ্রভাত বিল্, সুপ্রভাত ডাক্তার!"

সে জনক-জননীর সমাধিতে প্রণাম করিয়া ফটকের দিকে চলিল। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। হঠাৎ আমার হাত ধরিয়া বিল্ বলিল, "ফেরাও।" আমি ডাকিলাম, "আইভি!"

আইভি ফিরিল। সমাজে ফেরা অসম্ভব। আচ্ছা সিম্লাতেই লুক্কায়িত হইয়া থাকুক, তবু মাঝে-মাঝে দেখা হ'বে। বিলের প্রস্তাবে সে সম্মত হইল না। বলিল, "বিল্, স্বামীর পরেই তোকে ভালবাসি। আমি এখানে থাক্‌লে তোর উন্নতি হবে না। যদি জানা-জানি হয়! বিল্, আমি যেখানেই থাকি, তুই আমার প্রাণের ভেতর থাক্‌বি ভাই!"

ভ্রাতা-ভগিনী পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া উভয়ে উভয়ের মুখচুম্বন করিল। তাহার পর উভয়ে নতজানু হইয়া খৃষ্টান-রীতি-অনুসারে প্রার্থনা করিল। আমি পড়িলাম, সমাধির উপর লেখা—'মৃত নহে নিদ্রিত।'

প্রার্থনা

[শ্রীগিরিজাকুমার বসু]

কোরো মোরে নীচগামী ঝরঝার ধারা সম—
করিয়া শীতল, ফলে শস্যে ভরিতে বসুধা;
চাহিনা উঠিতে উর্দ্ধে ক্ষুদ্র পতঙ্গের মত
হইতে নিঃশেষ, মিটাইয়া বিহগের ক্ষুধা;

আমারে করিও ম্লান নিদাঘের ছায়া সম
আর্ত্ত পথিকেরে, স্নিগ্ধ স্পর্শ করিবারে দান,
করিওনা সমুজ্জ্বল শিশির-বিন্দুর প্রায়—
বধে যদি তাহা, নলিনীর কোমল পরাণ।

সম্রাট্ আক্‌বরের জন্মস্থল

আলোচনা

[শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

বিগত সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় আক্‌বরের জন্মস্থল অমরকোট সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আমারও দুই চারিটী কথা নিবেদন করিবার আছে।

অমরকোট দুর্গমধ্যে, কি দুর্গের বাহিরে অনতিদূরে, আক্‌বরের জন্ম হইয়াছিল, এ বিষয়ে মতভেদ আছে। আক্‌বরের জন্মস্থল বর্ত্তমান অমরকোট-দুর্গের প্রায় এক মাইল দূরে অবস্থিত বলিয়া আজিও লোকেরা নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। স্থানীয় জনপ্রবাদে প্রকাশ, আক্‌বর দুর্গের বহির্ভাগে প্রায় এক মাইল দূরে এক মাঠে জন্মগ্রহণ করেন। দুর্গমধ্যে তাঁহার জন্ম না হইবার কারণ স্বরূপ জানা যায় যে, অমরকোট দুর্গাধিপ প্রসাদ হিন্দু ছিলেন; তাঁহার পক্ষে কোন মুসলমান মহিলাকে স্বীয় অন্তঃপুরে স্থান দেওয়া কখনই সম্ভবপর নহে। হুমায়ূনের খাস-অনুচর জোহরও তাঁহার স্মৃতি-কথার একস্থলে লিখিয়াছেন,—'হুমায়ূন্ অমরকোটে এক শিবিরে অবস্থান করিতেন।' (p. 63) ইহা হইতেও দুর্গের বাহিরে হুমায়ূনের অবস্থিতির ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে।

Vincent Smith তাঁহার 'Akbar' (p. 14 n) গ্রন্থে লিখিয়াছেন, বর্ত্তমানে যে স্থলে 'আক্‌বর স্মৃতিচিহ্ন' সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহা আক্‌বরের প্রকৃত জন্মস্থল নহে; অধিকন্তু ইহাতে আক্‌বরের সিংহাসনারোহণের তারিখ ভ্রমপ্রযুক্ত জন্মতারিখরূপে উল্লিখিত হইয়াছে।

আক্‌বর যে অমরকোট দুর্গের বাহিরে জন্মগ্রহণ করেন নাই,—দুর্গমধ্যেই তাঁহার জন্ম হইয়াছিল, এ কথা একপ্রকার নিশ্চয়তার সহিত বলা যাইতে পারে।

'আক্‌বর-নামা' রচয়িতা আবুল্-ফজল্ আকবরের জন্মস্থল প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :—'The place was the auspicious city and fortunate fort Amarkot' (A. N. i 55). অন্যত্র,—"They proceeded towards the 'bounty-encompassed fort' (Hisar-i-faizinhisan) of Amarkot," (A. N. i, 375). গুল্‌বদনও এ বিষয়ে একমত; তিনি স্বীয় গ্রন্থ 'হুমায়ুন্-নামায়' লিখিয়াছেন,—'The Rana gave the Emperor an honourable reception, and took him into the fort and assigned him excellent quarters.' (H. N. p. 157) তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, অমরকোট দুর্গমধ্যেই আক্‌বরের জন্ম হইয়াছিল।

স্থানীয় জনপ্রবাদ মতে, যেহেতু দুর্গাধিপতি প্রসাদ হিন্দু, তাঁহার পক্ষে কোন মুসলমানীকে স্বীয় অন্তঃপুরে স্থান দেওয়া অসম্ভব, কথাটা কতদূর সত্য বলা যায় না। Tarkhan Nama গ্রন্থে (Elliot, i, 318) প্রকাশ, অমরকোটের অধীশ্বর (ইনি এই গ্রন্থে 'বীর শাল' নামে অভিহিত) অমরকোট দুর্গ হইতে স্বীয় লোকজন স্থানান্তরিত করিয়া, উহা হুমায়ূনকে ব্যবহারার্থ প্রদান করেন। Beg Lar Nama (Elliot, i, 290) গ্রন্থানুসারে আমীর শাহ্ কাশিম নামে জনৈক মুসলমান, শাহ্ হুসেনের শাসনকালে সিন্ধুপ্রদেশে আসিয়া, অমরকোট-রাণার এক আত্মীয়াকে বিবাহ করেন। সুতরাং রাণা যে একজন গোঁড়া রাজপুত ছিলেন না, তাহা স্পষ্ট জানা যাইতেছে; কাজেই তাঁহার পক্ষে হুমায়ূন-পত্নী হামীদাকে দুর্গমধ্যস্থ অন্তঃপুরে স্থান দেওয়া বিচিত্র নহে।

তাহা হইলে, বর্ত্তমান অমরকোট দুর্গেই কি আক্‌বরের জন্ম হইয়াছিল? আমাদের মনে হয়, বর্ত্তমান আক্‌বর-স্মৃতিচিহ্নস্থল আক্‌বরের প্রকৃত জন্মস্থল হওয়াও বিচিত্র নহে। শ্রীযুক্ত ভি-এন্-মণ্ডলিক্ (V. N. Mandlik), ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই মার্চ্চ, Bombay Branch of the Asiatic Societyতে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই

প্রবন্ধটী ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত মণ্ডলিক মহোদয়ের গ্রন্থে (Writings and Speeches, Bombay, 1896, p. 199) স্থান পাইয়াছে; ইহাতে প্রকাশ, পুরাতন অমরকোট দুর্গের ধ্বংস-সাধন করা হয়, এবং ১৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দে নূর-মুহম্মদ্ কাল-হোরা কর্ত্তৃক একটী নূতন দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। (See also Calcutta Review, January, 1900).

এই কারণে মনে হয়, আক্‌বরের জন্মস্থল প্রাচীন অমরকোট-দুর্গ হয় ত পূর্ব্বে বর্ত্তমান আক্‌বর-স্মৃতিচিহ্ন-স্থলেই নির্ম্মিত হইয়াছিল। যিনি এক সময়ে সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর ছিলেন, সেই মোগল-কুলচন্দ্র আক্‌বর শাহ্‌র জন্মস্থল লইয়াও মতভেদ!

জীবন-সমস্যা

[শ্রী———]

জগৎপিতা কেন এ জগৎ সৃষ্টি কর্‌লে? যদি কর্‌লে, ত এত পাপরাশিতে পূর্ণ কর্‌লে কেন? ধর্ম্মের শুভ্র পবিত্র জ্যোতিঃ পৃথিবী উদ্ভাসিত করে না কেন?—কেবল অত্যাচার, ব্যভিচার। কেন মানবকে সুখ-দুঃখের ভাগী কর্‌লে? কেন তাদের দুঃখের পূতিগন্ধময় পঙ্কিল জলাশয়ে পচিয়ে মার্‌লে না? আবার কেন বা তা'দের সুখের নন্দন-কাননে বসতি কর্‌তে দিলে না? কেন সুকোমল পারিজাতের নিত্য নূতন স্নিগ্ধ পবিত্র গন্ধে তাদের মন প্রাণ আনন্দ-রসে প্লাবিত কর্‌লে না? তা'রা ত তোমারই সৃষ্ট জীব; তা'দের কি কোন পৃথক সত্ত্বা আছে? কেন কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি রিপুদের সৃজন কর্‌লে? মানুষকে কষ্ট দিবার জন্য কি?—না না তা কি হ'তে পারে? উদার তুমি, মহৎ প্রাণ তোমার, তুমি করুণা-নিদান। তুমি অচিন্ত্য, তুমি অবিনশ্বর; তোমার মহিমা কে বুঝিতে পারে! জানি তোমার মহিমা উপলব্ধি করা আমাদের মত নরকীটের পক্ষে অসম্ভব; জানি তোমার অত্যুদারতা, উচ্চপ্রাণতা অনুভব করা আমাদের পক্ষে বামনের চাঁদে হাত; তথাপি বল্‌ছি, তথাপি প্রাণের কথা জানাচ্ছি।

কেন সংসার মায়ায় সৃষ্টি কর্‌লে? কেন শিশুর চাপল্য, স্ত্রীলোকের কটাক্ষ? কেন মানুষের দম্ভ এ ধরাতলে প্রেরণ কর্‌লে? জগতের সবাইকে কেন ভাই ব'লে ডাক্‌তে শিখালে না? কেন আমরা নিজের ভাইএর সঙ্গে ঝগ্‌ড়া ক'রে নিজের পায়ে কুড়ুল মার্‌ছি? বল্‌তে পার, যে লোক মহা-সাগরের মাঝখানে পড়েছে, পথ হারিয়েছে, সেও কেন মুক্তির আশা করে? বল্‌তে পার, জীবনে যার সব সুখে কালী পড়েছে, যার আপনার বল্‌তে কেউ নাই, সে কেমন ক'রে জীবন-তরণীর কর্ণ ধরে যাবে? বলতে পার, কেমন ক'রে সে তোমাকে পাবে? সংসার-মোহের নিবিড় সূচিভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে ভক্তির উজ্জ্বল আলোক প্রকাশ কর্‌বে? তোমাকে দেখ্‌তে পাবে? বল্‌তে পার, কেমন ক'রে পৃথিবীর সব আশা ত্যাগ করে শুধু, তোমার আশা ক্ষীণ হলেও, আজন্মকাল চল্‌তে থাকবে? বল্‌তে পার, কেমন করে সংসারের এই পাপরাশির মধ্যে আপনাকে শুদ্ধ রাখ্‌তে পারবে?

সৎ পথ বড়ই বিঘ্ন-বহুল। মতিভ্রংশ মানব কেন সে পথে যাবে? সে চায় শুধু সুখ! ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি তার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য; কিন্তু সে জানে না যে, প্রকৃত সুখ কি, পার্থিব সুখ কত দিনের, কতটুকু সময় স্থায়ী। অপার্থিব সুখের যে শেষ নাই, সে যে সকল সুখের উপরে! সে সুখ অনুভব করিবার শক্তি কয় জনের? ভগবৎ প্রেমে কি সুখ, কেহ তাহা বুঝে না কেন? তা হ'লে তা'দের সকল জ্বালা যাইত; পাপাগ্নি-প্রপীড়িত, ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত, কাম-ক্রোধাগ্নি-পীড়িত সংসারে ক্ষণেকের তরে সুখ আসিত। এমন দিন কবে আসিবে?—যদি দরিদ্রের অশ্রুধারা, পিতৃহীনের আর্ত্তনাদ, ব্যর্থ প্রণয়ের হতাশ্বাস, ক্ষুধা-পীড়িতের আর্ত্তনাদ, পুত্রহীনের হাহাকার এ জগতে না থাকিত, তবে ইহা কত সুখের হইত। হায়, যদি

বারাঙ্গনার প্রণয়, চাটুকারের বাক্য, সত্যের অপলাপ, প্রতিহিংসার জ্বালা, অর্থের উন্মাদতা সংসারে না থাকিত, তবে ইহা স্বর্গোপম হইত। কিন্তু তা' হয় না কেন?

মানব কি ভগবানের খেলার সামগ্রী। যদি হয় ত ভালই, তাঁর করুণালাভের সুযোগ হবে। তাঁর করুণা স্বর্গের মন্দাকিনীর মর্ত্ত, মর্ত্তের গঙ্গার মত শতধারায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে মানবের উপর পড়ে; বিতরণে কার্পণ্য প্রকাশ করে না, ভেদাভেদ মানে না। তাঁর করুণা ব্যতিরেকে এই ক্ষুৎ-ব্যাধি-উৎপীড়িত পৃথিবীতে মানুষ এক মুহূর্ত্তও তিষ্ঠিতে পারিত না, সকলেই এক অনিবারণীয় দাবানলে জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরিত!

ক'দিনের তরে জীবন, ক'দিনের তরে সংসার; কাল ত এগিয়ে আসছে। কেন মোহান্ধ তোদের চক্ষু খুলছে না? শমন যে তোদের দ্বারে করাঘাত করছে, স্মরণ আছে কি! ভোগ-সুখে কাল কাটাচ্ছ; ভাবছ যতদিন পারি সুখে থাকি, তার পর যা হয় হবে। মূঢ়! পরের চিন্তা কর। অদূরদর্শী, একবার ভবিষ্যতের দিকে তাকাও; দেখ, সে জ্বালাময়, নরকের কালাগ্নি কি যন্ত্রণাদায়ক! সময় থাকতে দেখ। এখনও ঝড় উঠিতে দেরী আছে বলে 'হাল' ছেড়ে ব'সে থাকলে চলবে না। ঝড়ের মেঘ উঠেছে, দেখেছ কি! এখনই কোথায় তোমার তরী উড়িয়ে নিয়ে যাবে, জানতেও পারবে না। উঠ, কর্ম্মময় সংসারে কর্ম্ম কর। ঈশ্বর আমাদের বিবেক দিয়েছেন, শক্তি দিয়েছেন, আমরা তার ব্যবহার করি না কেন? কেন আমরা পাপের আপাত-মধুর সুখে ভুলে কোন্ অনির্দ্দিষ্ট পথের পথিক হই!—তার শেষ কোথায়, সে খবর কে রাখে? কর্ম্মের ফল মান কি? মানব কর্ম্ম অনুসারে ফল ভোগ করে, আমরা কর্ম্ম-ফলের দাস।

কে তোমার দিকে তাকিয়ে আছে দেখেছ;—ঐ দেখ, চিনতে পারছ? সত্যি বল ত তাঁকে দেখবার ইচ্ছা করে? তাঁকে দেখলে আর ভুলতে পারবে না; তাঁর প্রেমে পড়লে আর এড়াতে পারবে না। সে দিন কবে আসবে? যাক্ সে কথা। সুপথ বড় কঠিন; নয়? সুপথের শেষ কোথায় দেখেছ। সে যে স্বর্গ!—সেখানে যে সুখের শেষ নাই, অতৃপ্ত বাসনার হতাশ্বাস নাই, ভোগের তীব্রতা নাই, স্বার্থের আবিলতা নাই। সেখানে শুধু স্নেহ ভালবাসা। সেখানে রোগের ভয় নাই, রিপুগণের প্রবেশ নাই, কামের জ্বালা নাই, ক্রোধের উন্মত্ততা নাই, লোভের অন্তর্দাহ নাই, মোহের অন্ধকার নাই, মদের মাদকতা নাই, মাৎসর্য্যের সংকীর্ণতা নাই; সেখানে মায়া নাই, তথাপি সকলে সকলকে ভালবাসে। এমন দেশে যেতে কি ইচ্ছা হয় না? সুখ চাও? কেন এত সুখ কি যথেষ্ট নয়? দেখ, যেন ভয় পেও না, মাঝখানে গিয়ে ফিরে এস না। আর তা যদি না পার, তবে ওরে ঘৃণিত! ওরে ইন্দ্রিয়াসক্ত! ওই দেখ্ তোদের জন্য সোজা পথ খোলা র'য়েছে। ওই পথ দিয়ে যা', দেখ্ সেখানে কি সুখ! ওরে পতঙ্গ, দেখ্ আগুণে প'ড়ে কি সুখ! ওরে পথিক! মরীচিকা অনুসরণ করে দেখ্, কি সুখ! ওরে ভ্রান্ত! দেখ্ আলেয়ার শেষ কোথায়!—

আর আলস্যে কাল কাটিও না। "আমিত্বের" বন্ধন ছাড়। তুমি কে একবার ভেবেছ কি? ভাই, আত্মীয়, বন্ধু এরা তোমার কে? কেউ না। তোমার, তোমার বল্‌তে একমাত্র আছেন তিনি। তাঁকে যেদিন তোমার করতে পারবে, সেদিন তোমার জীবন সার্থক। এখন সবে মাত্র মধ্যাহ্ন; সন্ধ্যা হ'তে দেরী আছে। এখনও এস, সংসারের মায়া কাটাতে পারবে। না পার, বেশ, তবে সংসারের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে তাঁকেও এক জন ক'রে নাও; দেখ্‌বে অনেক জ্বালা যাবে, দগ্ধ প্রাণ শীতল হবে।

আর একটা কথা, সংসারে কেন এসেছ, এ কথা কখনও ভেবেছ কি? তোমাদের এখানে কে পাঠালে? —কি বল্‌লে, নিজেই এসেছ। প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে এসেছ!—নাস্তিক! চুপ কর, এত বড় একটা সৌর-জগৎ এমন সুশৃঙ্খলার সহিত চলছে জান ত? এর কি কেউ স্রষ্টা নাই?—ভেবেছ কি, কে পুষ্পে এমন সৌন্দর্য্য দিয়েছিল, চাঁদে এমন সুধা দিয়েছিল, শিশুর অধরে হাসি দিয়েছিল। ভেবেছ কি, কে সতীর হৃদয়ে বল দিয়েছিল, ভক্তের হৃদয়ে ভক্তি দিয়েছিল, মাতার হৃদয়ে স্নেহ দিয়েছিল? এর উত্তর এক ভগবান। আর ভগবানে অবিশ্বাস ক'রে নিজের পাপের বোঝা বাড়াইও না। দেখ, বৈতরণীর ঘাটে কে খেয়া দিচ্ছে? তার কাছে ফাঁকি দেবার উপায় নাই।

...ঠিক বলেছ; অনেক দিনের কথা বটে, কিন্তু ঠিক বলেছ। সংসারে সং-ই সার বটে। ধূলা-মাটী নিয়ে খেলা ক'রছ; দুদিন পরে ভেঙ্গে যাবে। এত সাধের ঘর, এত সাধের খেলা, সব যাবে; কেউ রাখতে পারবে না; কেউ সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে না। তবে উঠ, আসল জিনিস নিয়ে খেলা আরম্ভ কর;—যে খেলা ভাঙ্গবার নয়, যে খেলা ছেলে-খেলা নয়, সেই খেলা খেল।

স্বরলিপি

ভূপালি—ঝাঁপতাল

ভিক্ষাং দেহি জননি গো, ভরিয়ে দে ঝুলি ;
আর কিছু চাহি না ত শুধু পদধূলি—
তোমার পায়ের ধূলি—ধূলি—ধূলি।
শুধু মাগো চাই বর, এই আশীর্ব্বাদ কর,
তোর সেবা-ব্রতে প্রাণ পুণ্য করে তুলি—
পুণ্য করে তুলি—তুলি—তুলি
মনে রাখি যেন তোরে সকল কাজে,
তোর দুঃখ নিশিদিন প্রাণে যেন বাজে ;
বাজে—বাজে।
তব মুখ সব আগে, নিত্য যেন মনে জাগে,
তোমার চিন্তায় যেন সব চিন্তা ভুলি—
সব চিন্তা ভুলি—ভুলি—ভুলি।

কথা ও সুর—শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী] [স্বরলিপি—শ্রীব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩ ০ ১
II গা পা | গা -া রা | মগা রা | সা -া ধ্া I প্া ধ্া | সা -া রা | সা রা | গা -া -া I
ভি ক্ষাং দে ০ হি জ০ ন নী ০ গো ভ রি য়ে ০ দে ঝু ০ লি ০ ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩ ০ ১
I পা -ধা | র্সা র্সা -া | র্রা র্সা | ধা পা -া I পা ধা | পা পা -া | গা -রা | সা -া -া I
আর্ ০ কি ছুই ০ চা হি না ত ০ শু ধু প দ ০ ধূ ০ লি ০ ০

২ ৩ ০ ১ ২´ ৩ ০ ১
I সা সা | সা ধ্া -া | সা -রা | গপা -ধর্সা I ধা -পা | গরা -সরা -া | পা -া | গা -া -া II
তো মার্ পা য়ের্ ০ ধূ ০ লি০ ০ ০ ধূ ০ লি০ ০ ০ ০ ধূ ০ লি ০ ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩ ০ ১
II পা গা | পা পা -ধা | র্সা র্সা | র্সা -া -া I র্সা ধা | পা -া ধা | র্সা ধা | পা -া -া I
শু ধু মা গো ০ চা ই বর্ ০ ০ এ ই আ ০ শী র্বা দ কর্ ০ ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩ ০ ১
I র্সা -র্রা | র্রা র্রা -া | র্সা র্রা | র্গা -া -া I র্রা র্সা | ধা -া পা | গা রা | সা -া -া I
তোর্ ০ সে বা ০ ব্র তে প্রাণ্ ০ ০ পু ণ্য ক ০ রে তু ০ লি ০ ০

১ ৩ ০ ১ ২´ ৩ ০ ১
I সা রা | গা -া পা | ধা -পা | র্সা -া -া I ধা -পা | গা -া -পা | গা -রা | সা -া -া II
পু ণ্য ক ০ রে তু ০ লি ০ ০ তু ০ লি ০ ০ তু ০ লি ০ ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩ ০ ১
II সা ধ্া | সা -া রা | গা গা | গা গা -া I গা রা | গ -া পা | গা -রা | সা -া -া I
ম নে রা ০ খি যে ন তো রে ০ স ক ল ০ কা জে ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১ ২ ৩ ০ ১
I সা রা | সরা -গা গা | রা সা | ধা -া পা I প্া ধ্া | সা -া রা | গা রগা | সা -া -া I
তো র দুঃ ০ খ নি শি দিন্ ০ ০ প্রা ণে যে ০ ন বা ০ ০ জে ০ ০

১ ০ ২ ৩ ০ ১ ০ ২ ৩ ০
I সা -রা | গপা -ধর্সা -ধপা | গা -রা | সা -া -া I পা গা | পা -া ধা | র্সা র্সা | র্সা র্সা -া I
বা ০ জে ০ ০ ০ ০ ০ বা ০ জে ০ ০ ত ব মু ০ খ স ব আ গে ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩ ০ ১
I র্সা ধা | পা -া ধা | সা ধা | পা -া পা I র্সা র্রা | র্রা -া র্রা | র্সা র্রা | র্গা র্গা -া I
নি ত্য যে ০ ন ম নে জা ০ গে তো মা র ০ চি স্তা য় যে ন ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩ ০ ১
I র্রা র্সা | ধা পা গা | গা রা | সা -া -া I সা রা | গা -া পা | ধা -পা | র্সা -া -া I
স ব চি ০ স্তা ভু ০ লি ০ ০ স ব চি ০ স্তা ভু ০ লি ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I ধা -পা | গা -া পা | গা রা | সা -া -া II II
ভু ০ লি ০ ০ ভু ০ লি ০ ০

চার দিন*

[শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী এম-এ]

বনের মধ্যে ঘন পাতার ভিতর দিয়ে যখন গোলা-গুলি-গুলো আপনাদের পথ কেটে নিচ্ছিল, তখন ডাল-পাতা সব ভেঙে কেমন করে আমাদের গায়ে পড়্ছিল, আর আমরা কি রকম যে দৌড়টা তখন দিয়েছিলাম, তা আজও আমার মনে আছে। ঘন কাঁটা-ঝোপ ঠেলে আমরা যখন এগোচ্ছিলাম, তখন শত্রুরা যে বেশ গরম রকমেই গোলা বর্ষণ করতে আরম্ভ করেছিল, আর বনের প্রান্তের ঝোপ-গুলো যে চারিদিক থেকে লাল-হয়ে-জ্বলে-ওঠা আগুনের শিখাতে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল, তাও বেশ মনে আছে। ১ নম্বর কোম্পানীর সেডোরফ (আচ্ছা সে লোকটা আমাদের ফায়ারিং লাইনে কি করে এল ?) যখন হঠাৎ বসে পড়্ল, আর একটাও কথা না বলে, বড়-বড় চোখ তুলে আমার মুখের পানে চেয়ে রৈল, আর তার মুখ থেকে ছোট্ট একটা রক্তের ধারা ঝরে পড়্তে লাগল, তখনকার কথাও মনে পড়ে। হুঁ, আমার কিন্তু সে কথাটা বেশ ভাল করেই মনে পড়ে। আরও মনে পড়ে যে, যেই আমরা বনের শেষে এসে উপস্থিত হলাম, তখনই ঘন ঝোপের মধ্যে আমি সেই তাকেই দেখেছিলাম—লম্বা-চওড়া, গোব্দা-গোব্দা তুর্কী সে,—কিন্তু এই রোগা-সোগা বেঁটে-খাটো আমি মানুষটাই তার দিকে সোজা ছুটে গিয়েছিলাম। কাণে-তালা-ধরিয়ে-দেওয়া এক ভীষণ শব্দ হ'ল ; আর আমার পাশ দিয়ে, কাণ দুটোকে ঝন্ঝনিয়ে প্রকাণ্ড কি একটা ছুটে গেল। আমি ভাব্লাম, যে, লোকটা আমায় লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়্ল। আমার এখনও মনে পড়ে,—কি রকম ভীত স্বরে চীৎকার করে সে একটা কাঁটা ঝোপ ঠেলে পিছিয়ে গিয়েছিল ; সে বেশ ভাল রকমেই সেটা ঘুরে পার হয়ে যেতে পার্ত ; কিন্তু ভয়ে দিশেহারা হয়ে, সে ঐ কাঁটা ঝোপ ঠেলেই রাস্তা করতে গিয়েছিল।

এক আঘাতেই আমি, তাকে নিরস্ত্র করে, আমার সঙ্গীনটা দিয়ে তাকে ফুঁড়ে ফেল্লাম। একটা ভিতরে-টানা, চাপা কান্নার শব্দ, আর একটা মর্ম্মভেদী করুণ আর্ত্তনাদ ! তার পর আমি ছুটে এগিয়ে গেলাম। আমরা যখন এগিয়ে ছুট্ছিলাম, তখন আমরা হুল্লোড় করেই চল্ছিলাম ; কেউ বা যাচ্ছিলাম পড়ে, কেউ বা মার্ছিলাম গুলি। আমি ত কয়বার বন্দুক ছুঁড়েছি—আমার বেশ মনে আছে। আমরা বন ছেড়ে খোলা মাঠে বেরিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ আমাদের হুল্লোড় একটা প্রকাণ্ড গভীর গর্জ্জনে পরিণত হয়ে গেল ; আর, আমরা সকলে সাম্নের দিকে দৌড় দিলাম। অর্থাৎ, আমাদের দলের লোক দৌড় দিল, আমি শুধু পিছিয়ে রৈলাম। একটা কি যেন অদ্ভুত কি হল ; তার পর, আরও আশ্চর্য্য ব্যাপার,—সমস্তই যেন কোথায় পালাল,—চেঁচা-মেচি, বন্দুকের শব্দ, সব মিলিয়ে গেল। আমি আর কিছু শুন্তে পেলাম না, কেবল চোখের সাম্নে খানিকটা নীল কি দেখ্লাম—নিশ্চয় আকাশ। তার পর তাও মিলিয়ে গেল।

আমি এ রকম অদ্ভুত অবস্থায় আর কখনো পড়ি নি। পেটের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে আছি ; আর, আমার সাম্নে একটা মাটীর ঢেলা, কয়েকটা খাড়া-খাড়া ঘাস, তার আবার একটার উপরে নীচু দিকে মাথা করে একটা পিঁপড়ে চড়্ছে, আর কতকগুলো ধুলোর ঢিবি, পুরোনো বচ্ছরের মরা ঘাস, এই ত দেখ্তে পাচ্ছি। এই ত আমার বিশ্বসংসার ;—আবার তাও একটা চোখ দিয়ে দেখ্ছি ; কারণ, আর একটা চোখে কে একটা শক্ত কি জিনিস চেপে রেখে দিয়েছে। আমার মাথাটা যে ডালটার উপর পড়ে আছে, সেটারই এই কাজ। আমার ভয়ঙ্কর অসুবিধা বোধ হচ্ছে ; আর, আমি এটা কিছুতেই বুঝতে পারছি না যে, যখন আমি নড়্তে চাচ্ছি, তখন কেন নড়্তে পারছি না। সময় এম্নি করেই কাট্ছে,—আমি ঝিঁঝিঁর ডাক আর

* Garshin হইতে।

মৌমাছির গুণ-গুণ শব্দ শুন্‌তে পাচ্ছি, আর কিছু না। অনেকক্ষণ পরে, খুব চেষ্টা করে, নিজের শরীরের তলা থেকে ত ডান হাতখানাকে উদ্ধার কর্‌লাম। তার পর দুই হাত দিয়ে মাটীর উপর ভর করে, হাঁটু গেড়ে বস্‌তে চেষ্টা কর্‌ছি। হাঁটু থেকে ধারাল একটা কি গা বেয়ে বুকের দিকে বিদ্যুৎ-শক্তিতে উঠে গেল; আবার সেখান থেকে মাথায় উঠ্‌ল; আমি ত আবার পড়ে গেলাম,—আবার অন্ধকার,—আবার শূন্য।

* * * *

আমার ঘুম ভেঙ্গেছে,—কিন্তু বুলগেরিয়া দেশের কালোটে নীল রাতের গায়ে তারাগুলো ঝক্‌মক্ কর্‌ছে, দেখ্‌তে পাচ্ছি কেন? তাঁবুতে শুয়ে আছি, না? তবে তার থেকে বার হয়েছি কেন? একটু নড়্‌লাম, আর পায়ে কি ভীষণ যন্ত্রণা! এবার আমি বুঝেছি; আমি আহত। বিপদের আশঙ্কা কিছু আছে? পায়ে যেখানে যন্ত্রণা, সেখানটা ধর্‌লাম। বাঁ আর ডান দুটো প-ই জমাট রক্তে ভরা। যখন পায়ে হাত দি তখন যন্ত্রণা আরো বাড়ে! ঠিক যেন দাঁতের ব্যথা; তেম্‌নি ধারাই দপ্‌দপে গা-পাক্‌-দিয়ে-ওঠা যন্ত্রণা। কাণের মধ্যে ঝাঁঝাঁ কর্‌ছে, আর মাথায় যেন সীসে-পোরা। কি রকম অস্পষ্ট ভাবে বুঝ্‌ছি যে, আমার দুটো পায়ে আঘাত লেগেছে। কিন্তু ওরা আমায় তুলে নেয় নি কেন? তুর্কীরা কিছু আর আমাদের হারিয়ে দেয় নি। কি যে ঘটেছে, তা মনে করতে চেষ্টা কর্‌ছি। প্রথমে গোলমেলে ভাবে, পরে ঢের পরিষ্কার করেই সব মনে এল; আর এই ভেবে ঠিক কর্‌লুম যে, আমরা কোন মতেই হারি নি। তার কারণ হচ্ছে, পাহাড়ের উপর যে মাঠ, আমি তাতেই পড়ে গিয়েছিলাম। (এইখানে বলে রাখা ভাল যে, আমার পড়ে যাবার কথা আমার মনে নেই; শুধু মনে আছে যে, আর সকলে ছুটে এগিয়ে গিয়েছিল, আমি তা পারি নি,—আর, শুধু নীল ছাড়া আর কিছু দেখ্‌তে পাই নি।) আর, সেই মাঠটা দেখিয়েই তো আমাদের ছোট-খাট অফিসার সাহেব বলেছিলেন, "ওরে, আমাদের ওখানটায় পৌছোতে হবে।" কাজেই, এর থেকেই প্রমাণ হচ্ছে, আমরা হারি নি। কিন্তু, তাই যদি হল, তবে ওরা আমায় তুল্লে না কেন? এই মাঠে, খোলা যায়গায় নিশ্চয়ই সবই দেখা যাচ্ছে। তা ছাড়া, এ হতেই পারে না যে, আমি একা এখানে শুয়ে আছি। তার পক্ষে ওরা খুব ভয়ানক রকমই গুলি চালিয়েছিল। আমায় মাথা ঘুরিয়ে একবার সব দেখে নিতে হচ্ছে। এখন আমি তা অনেক সহজেই কর্‌তে পার্‌ব; কারণ যখন আমার প্রথম জ্ঞান হয়েছিল, আর, আমি কেবল সেই ঘাস আর নীচু-দিকে-মাথা-করে-ঘাসে-চড়্‌তে-তৎপর সেই পিঁপ্‌ড়েটাকেই দেখ্‌ছিলাম, তখন আমি উঠ্‌তে চেষ্টা করেছিলাম, আর পড়েও গিয়েছিলাম। তবে সেই যেমন ভাবে আগে পড়েছিলাম, তেম্‌নি ভাবে নয়; অর্থাৎ চিৎপাত হয়ে পড়েছিলাম। তাইতেই ত তারাগুলো দেখ্‌তে পাচ্ছি।

আমি উঠে বস্‌তে চেষ্টা কর্‌ছি। যখন দুটো পা-ই ভেদ করে গুলি চলে যায়, তখন এ কাজটা বেশ কঠিন ঠেকে। কয়েকবার তো নিরাশ হয়ে চেষ্টা করা এক রকম ছেড়েই দিয়েছিলাম; কিন্তু এতক্ষণে ভয়ানক যন্ত্রণা সহ্য করে, দু' চোখে জল ভরে কাজটা পেরেছি।

মাথার উপরে এক-টুকরো কালোটে নীল আকাশের গায়ে একটা বড় আর কয়েকটা ছোট তারা জ্বল্‌ছে। আমার চারদিকে কালো লম্বা কি সব?—ঝোপ? আমি ঝোপের ভিতর আছি। তাই তারা আমায় দেখ্‌তে পায় নি। এটা যখন বুঝ্‌তে পার্‌লাম, তখন আমার মাথার চুল সব খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল। কিন্তু আমায় ত ওরা খোলা মাঠে গুলি মেরেছিল; তবে ঝোপের ভিতর এলুম কি করে! আহত হয়ে আমি নিশ্চয়ই হামাগুড়ি দিয়ে এখানে এসেছিলাম,—যন্ত্রণায় কিছু টের পাই নি। মজাটা এই যে, এখন আমি নড়্‌তে পার্‌ছি না—কিন্তু তখন আমি এই ঝোপগুলোর মধ্যে নিজেকে টেনে এনেছিলুম। তবে হতে পারে, তখন আমি একটা গুলি খেয়েছিলাম,—দ্বিতীয় গুলিটা আমায় এখানে এসে ধরেছে। আমার চারিদিকে ফিকে লাল্‌চে রংএর দাগ রয়েছে…

বড় তারাটা ম্লান হয়ে এসেছে, আর ছোটগুলা মিলিয়ে গেছে। চাঁদ উঠ্‌ছে তাই। বাড়ীতে এখন রাতটা কি চমৎকারই না হয়েছে!

কে যেন গোঁঙাচ্ছে, এ রকম শব্দ শুন্‌তে পাচ্ছি। হুঁ, এ ঠিক গোঁঙানি। আমারই মত সকলের-ভুলে-যাওয়া কেউ দু'পায়ে কিম্বা পেটের-ভিতর-গুলি-লাগা কাছে পড়ে না কি? না, তা ত নয়! গোঁঙানিটা খুবই কাছে,—অথচ

কেউ ত আমার অত কাছে নেই…এ হতে পারে না? হঁ; কিন্তু তাই, এই আমিই ঐ রকম করে গোঁঙাচ্ছি, আর আর্ত্তনাদ কচ্ছি! এত বেশী যন্ত্রণা নিশ্চয় হচ্ছে না? হাঁ, বৈ কি, কিন্তু আমি বুঝ্‌তে পারছি না, আমার এত যন্ত্রণা কেন হচ্ছে। তার কারণ যে, মাথাটা আমার সীসের মত ভারী হয়ে গেছে, আর সমস্তই ঝাপ্‌সা-ঝাপ্‌সা লাগ্‌ছে। ভালয়-ভালয় শুয়ে পড়ি, আর ঘুমোই; ঘুমোই… কিন্তু আবার জাগ্‌ব ত? যাক্ গিয়ে, তাতে কিছু আসে-যায় না।

যেই শুতে যাব, অমনি চাঁদ থেকে চওড়া, ফ্যাকাসে একটা আলো এসে, আমি যেখানে আছি, সে যায়গাটাকে আলো করে ফেল্লে; আর, আমি দেখ্‌তে পেলাম, আমার থেকে পাঁচ হাত দূরে কালো মস্ত কি একটা মাটীর উপর পড়ে আছে। চাঁদের আলোতে তার উপরে কি একটা জিনিস চক্ চক্ করছে। বোতাম না আর কিছু?—মড়া, না, আহত কেউ?

কি হবে ভেবে? আমি শুয়ে পড়ি। না, এ হতেই পারে না। আমাদের লোকেরা সব চলে যেতেই পারে না। তারা এখানেই আছে। তারা তুর্কীদের তাড়িয়ে দিয়েছে; আর এই ছিনিয়ে-নেওয়া যায়গাটায় তাঁবু গেড়ে বসেছে। তবে শব্দ শুনতে পাচ্ছি না কেন? তাঁবুর চারিদিকে-জ্বালা আগুণের কাঠ-ফাটার শব্দও নাই কেন? বোধ হয়, আমি খুব দুর্ব্বল হয়ে পড়েছি, তাই শুনতে পাচ্ছি না। তাদের এখানে থাকতেই হবে।

"কে আছিস্ কোথায়? বাঁচা! বাঁচা! বাঁচা!" কে যেন জোর করে আমার মুখ থেকে পাগলের মত এই চীৎকার ছিনিয়ে বার করল; কিন্তু কোনও উত্তর নাই। রাতের বাতাসে সে শব্দ জোরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, কিন্তু আর সব ত চুপ-চাপ। ঝিঁঝিঁগুলো কেবল তাদের ঝিঁ ঝিঁ শব্দ তুলে ধরে আছে। চাঁদটা আমার দিকে করুণায় গলে তাকিয়ে রয়েছে।

ও লোকটা যদি আহত হত, তবে আমার চীৎকারে ও জেগে উঠ্‌ত। ওটা মড়া। আমাদের কেউ, না তুর্কী? যেই হোক না কেন, আমার কাছে একই কথা নয় কি? আমার চোখের পাতার উপর ঘুম নেমে আস্‌ছে।

* * * *

আমার অনেকক্ষণ ঘুম ভেঙ্গে গেছে; তবুও চোখ বুজেই শুয়ে আছি। আমি চোখ খুলতে চাই না; কারণ, আমার এই বোজা চোখের পাতার উপর রোদটা বেশ টের পাচ্ছি; খুলি যদি, ত সূর্য্যের তেজে চোখ-দুটিই যাবে পুড়ে। তা ছাড়া, না নড়াই ভাল……কাল (কালই হবে বোধ হয়) ওরা আমার মেরেছিল…একটা দিন, আর একটা রাত কেটে গেছে; আরও কত যাবে,—আর আমি মরে যাব। একই কথা। না নড়াই ভাল। যদি মনটাকে থামিয়ে রাখতে পারতাম! কিন্তু সেটাকে কিছুতেই থামান যাবে না। পুরোণো কথা আর নতুন—কত রকমের ভাবনা-চিন্তা—সব দলে-দলে মাথায় এসে ঢুকছে। যাক্ গিয়ে, এ সব ত বেশীক্ষণের জন্য নয়;—শেষ শীগ্‌গিরি হয়ে যাবে। খবরের কাগজে কয়েকছত্র লেখা বেরোবে যে, আমাদের হতাহতের সংখ্যা খুবই অল্প:—

আহত ……এত; হত……একজন প্রাইভেট—আই-ভ্যানফ;—না, লোকটার নাম ত দেওয়া হয় না,—ওরা কেবল লেখে হত—একজন। একজন প্রাইভেট, সে যেন একটা কুকুর।

একটা ঘটনা, যা অনেকদিন আগে ঘটেছিল,—তার খুঁটিনাটি সমেত সব হঠাৎ মনে পড়ে গেল। এতেই মনে হ'ল—আমার জীবনটা যেন কত আগের ঘটনা, কত অতীতের কিছু বলে মনে হচ্ছে,—সে জীবনটা পায়ে গুলি লেগে এখানে শুয়ে পড়ে থাকার আগে ছিল।

রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ একটা যায়গায় ভিড় হওয়ার দরুণ থেমে যেতে হয়েছিল; রাস্তার উপর রক্তমাখা সাদা একটা জিনিস, করুণ সুরে কেঁউ-কেঁউ;—তাকে ঘিরে এবং তারি দিকে চুপ করে চেয়ে থেকে, ঐ ভিড়টা জড় হয়েছিল। সেটা একটা কুকুর, যার উপর দিয়ে ট্রামগাড়ী চলে গিয়েছে। আমার এখন যে রকম মরবার দশা হয়েছে, কুকুরটারও সেই রকম হয়েছিল। ভিড়ের মধ্যে দিয়ে একটা ডোম এসে কুকুরটার ঝুঁটি ধরে তুলে নিয়ে গেল, ভিড়ও মিলিয়ে গেল। কেউ এসে কি আমায় নিয়ে যাবে? না—না……তোমায় এখানেই শুয়ে-শুয়ে মরতে হবে। জীবনটা কি সুন্দর! আমি সে দিন কি সুখীই না ছিলাম! আনন্দে মত্ত হয়ে সে দিন রাস্তা দিয়ে চলেছিলাম। গত জীবনের পুরোনো স্মৃতি! আমায় আর যন্ত্রণা দিও না। এখুনকার এই অসহ যন্ত্রণার

মধ্যে আমায় একা ফেলে রেখে যাও,—তা'হলে অন্ততঃ আমাকে আর এই অনিচ্ছার তুলনা করতে হবে না। আঃ! এই যে বাড়ী ফিরে যাবার গভীর বাসনা—এ যে এই ঘায়ের চেয়েও যন্ত্রণাদায়ক!

হাওয়া ক্রমশঃ গরম হয়ে আসছে। রোদে পুড়ে যাচ্ছি; চোখ খুলে সেই ঝোপ, সেই আকাশই দেখছি, শুধু এটা দিনের বেলা……ঐ যে আমার সঙ্গীটি। হুঁ, ও ত তুর্কী, আর মরেও গেছে। কি প্রকাণ্ড দেহখানা! ওরে ও ত সেই লোকটা, চিনতে পেরেছি,—যাকে আমি……

আমার সামনে পড়ে আছে এমন একটা লোক, যাকে আমি মেরে ফেলেছি। তাকে আমি মারলাম কেন? রক্তমাখা হয়ে সে মরে পড়ে আছে। অদৃষ্ট তাকে এখানে আনল কেন? সে কেই বা? হয় ত বা তারও…… আমারই মত……বুড়ী মা আছে। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা সে হয় ত একা-একা অনেকক্ষণ ধরে তার বিশ্রী কুঁড়ে ঘরটার সামনে বসে, উত্তরের দিকে চেয়ে-চেয়ে, তার আদরের পুতলী ছেলেটা, তার রক্ষক, তার অন্নদাতার জন্যে প্রতীক্ষা কর্ব্বে। আর আমি? আমিও—হায় রে, যদি আমি ওর মত হয়ে যেতে পারতাম! ও ত সুখী! কিছু শুনতে পাচ্ছে না, কিছু বুঝতে পারছে না; কাটা-ছেঁড়া যায়গায় কোনও যন্ত্রণা নাই,—গা পাক দিয়ে ঘুরে উঠছে না,—পিপাসায় বুক ফেটে যাচ্ছে না…… সঙ্গীনটা ত সোজাসুজি বুক ফুঁড়ে চলে গেছে। ওর পোষাকটায় একটা প্রকাণ্ড কালো গর্ত্ত হয়ে আছে, আর তার চারি দিকে রক্ত। আমি,—আমি ঐ কাজটী করেছি।

আমি কিন্তু করতে চাই নি। আমি যখন যুদ্ধে ইচ্ছে করেই যোগ দিয়েছিলাম, তখন কারো অনিষ্ট কর্ব্ব, এ মতলব করি নি। আমাকে যে মানুষ মারতে হবে একথা আমার বুদ্ধিতে তখন ঢোকে নি। আমার নিজের বুকটা কি রকম করে গোলাগুলির সামনে পেতে দেবো, সেই কথাটাই শুধু আমার মনে জেগেছিল। তাই আমি এসেছিলাম…… আর এখন……ওরে গণ্ডমূর্খ, বোকারাম!

আর এই হতভাগা লোকটা (ঈজিপ্টের লোক এ—পোষাক দেখেই বোঝা যাচ্ছে)—এর ত আমার চেয়েও কম দোষ। প্রথমতঃ, ঝুড়ীতে-ঠাসা মোরল্লা মাছের মত কোন স্টীমারে চড়িয়ে ত একে এরি মত আরো অনেকগুলোর সঙ্গে কনষ্ট্যান্টিনোপলে আনা হয়েছিল। ও কখখনো রুষিয়া কিম্বা বুলগেরিয়ার নামও শোনে নি। উপরিওয়ালা ওকে হুকুম দিল "যাও!" আর ও এল। যদি ও না আসতে চাইতো, তবে বোধ হয়, ওরা ওকে লাঠৌষধি দিত, নইলে কোনো পাশা-মশাই ওর গা ফুঁড়ে হয় ত গুলি চালিয়ে দিতেন। ষ্টাম্বুল থেকে রাসিচরাক পর্য্যন্ত অনেক ঘুরে অনেক কষ্ট পেয়ে মার্চ্চ করতে-করতে ও এসেছিল। আমরা ওকে তেড়ে এসেছিলুম, ও নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছিলো; কিন্তু ও যখন দেখলে, আমরা ভয়ঙ্কর লোকেরা ওর ইংরেজী বন্দুককে একটুও ডরাই না,—বরং লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে আসছি,—ও তখন ভয়ে জ্ঞানহারা হয়ে গেল; আর, ও যখন পালাতে গেল, তখন কোত্থেকে একজন ছোট্টখাট লোক—যাকে ওর কালো হাতের এক বিশাল ঘুঁসীতেই ও সাবাড় করে দিতে পারত,—লাফিয়ে এসে সরাসরি ওর বুকের মধ্যে তার সঙ্গীন ফুঁড়ে দিল। ওর কি দোষ?

আমারই বা কি দোষ—আমি ওকে মেরেছি যদিও? কেন আমার দোষই বা হবে?……আচ্ছা, কেন আমার এত তেষ্টা পাচ্ছে? তেষ্টা! কে জানে এর মানে কি! আমরা যখন এই ভীষণ গরমের মধ্যেও রুমানিয়ায় সাত মাইল করে বাধ্য হয়ে চলেছিলাম, তখনও এমন কষ্ট পাই নি! ওহ্, যদি কেউ এখন আসে!

ভগবান! হুঁ……ওর ঐ প্রকাণ্ড জলের বোতলটার মধ্যে নিশ্চয় খানিকটা জল আছে। কিন্তু আমায় ত সেটা আনতে হবে। আমার কি খুব কষ্ট হবে? হোক্ গিয়ে, তবু আমি ওখানে যাব।

পা টেনে-টেনে গুঁড়ি মেরে ত চলছি। হাতদুটো এমনি দুর্ব্বল হয়ে গেছে যে, কোন কাজেই যেন আসছে না। কয়েক পা মাত্র যেতে হবে……কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে যেন কতদূর……যেন কত ক্রোশই যেতে হবে। যাই হোক্, আমায় ওখানে পৌছোতে হবেই। আমার গলা জ্বলে যাচ্ছে—আগুণের মত জ্বলে যাচ্ছে। হাঁ, জল না পেলে তুমি তাড়াতাড়ি মরবে সন্দেহ নাই, কিন্তু তবু হয় ত…

আমি ত চলছি। পা দুটো যেন মাটীর সঙ্গে শিকল

দিয়ে বাঁধা, নড়তে গেলে কি ভয়ানক অসহ্য যন্ত্রণা। আমি চেঁচাচ্ছি, চেঁচাচ্ছি আর এগোচ্ছি। এসে পৌছেছি বাবা! হাঁ, বোতলটায় জল আছে দেখ্‌ছি,—ওহ্‌ কত জল! অর্দ্ধেকের চেয়ে বেশী ভরা। আমায় অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কাজ দেবে……এই যতক্ষণ না মরি।

আমার হাতে মরা তুমি,—আমার প্রাণ বাঁচালে। আমি একটা হাতের উপর ভর দিয়ে, বোতলটার মুখ খুল্‌তে গিয়ে, হঠাৎ বেসামাল হয়ে মুখ থুব্‌ড়ে, আমার প্রাণ-বাঁচানো মড়াটার উপর গিয়ে পড়্‌লাম। মড়াটার গায়ে এরি মধ্যে গন্ধ হয়েছে।

*　　*　　*　　*

আমি জল খেয়েছি। জলটা গরম হয়ে উঠেছিল, কিন্তু নষ্ট হয় নি। তা ছাড়া, অনেকটা জল আছে। আমি আরো কয়েকদিন বাঁচব। আমি একটা বইয়ে যেন পড়েছিলাম যে, মানুষে যদি জল খেতে পায়, তা হলে এক সপ্তাহেরও বেশী না খেতে পেলেও বেঁচে থাকে। আর, ঐ বইটাতেই পড়েছিলাম, একটা লোক না খেয়ে মর্ব্বে ঠিক করেছিল; কিন্তু তার মরাটা অনেকদিন পর্য্যন্ত পিছিয়ে গিয়েছিল, শুধু সে জল খেত বলে।

কিন্তু আমি যদি আরো ৫।৬ দিন বাঁচি, তাতেই বা কি? কি বা লাভ হবে? আমাদের লোকেরা ত সব চলে গেছে। বুলগেরিয়ানরাও চলে গেছে। কাছে কোন রাস্তাও নাই। আমাকে মর্‌তেই হবে,—মাঝের থেকে তিন দিনের যন্ত্রণার যাঁয়গায় এক সপ্তাহের যন্ত্রণা দাঁড়াল। এখন যদি শেষ হয়ে যায়, তা' হলে ভাল হয় না? আমার সঙ্গীটির পাশে তার বন্দুকটা পড়ে আছে। হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে—একটা আলো আর শব্দ—ব্যস্‌, সব শেষ হয়ে যায়। টোটাও ওখানে পড়ে আছে,—ওর সে সব কোন কাজেই আসে নি। তবে শেষ করে ফেল্‌ব কি? না, দেখ্‌ব, কি হয়? কি কর্ব্ব, মুক্তি? না, মরণ? আমার এই খোঁড়া পা থেকে তুর্কীরা এসে চামড়া ছিঁড়ে ফেলবে বলে অপেক্ষা কর্ব্ব কি? তার চেয়ে নিজেই নিজেকে শেষ শেষ করে ফেলি না কেন? না, নিরাশ হবার কারণ নেই; আমি শেষ পর্য্যন্ত বাঁচবার চেষ্টা কর্ব্ব। যদি আমাকে ওরা খুঁজে বার করে, তা হলেই ত বেঁচে গেলাম। হয় ত আমার হাড়ে মোটেই লাগে নি—ওরা আমায় সারিয়ে তুল্‌বে। আমি বাড়ী যাব—মাকে দেখ্‌ব—মাশ্যাকে দেখ্‌ব……ও ভগবান, দয়ার ঠাকুর! তারা যেন মনে করে, আমি গোলার ঘা খেয়েই মরেছিলাম। ওরা যদি টের পায় যে, আমি দু, তিন, কি তার চেয়ে বেশী দিন কষ্ট পেয়ে মরেছি!

মাথা ঝন্‌ঝন্‌ করে ঘুর্‌ছে। সঙ্গীটির কাছে আসাতে আমার সমস্ত শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে আর, এই ভয়ানক গন্ধ। লোকটা কি কালো হয়ে গেছে! কাল্‌কে কি পরশু ও কি রকম দেখ্‌তে হয়ে যাবে? আমার নিজেকে টেনে নিয়ে যাবার শক্তি নেই বলেই ত এখানে শুয়ে আছি। একটু ক্ষণ বিশ্রাম করে আমার আগেকার যায়গায় ফিরে যাব। বাতাসটা সেই দিক থেকেই বইছে,—গন্ধটা তখন উল্টো দিকে চলে যাবে।

ভয়ানক ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। রোদে মুখ হাত পুড়ে যাচ্ছে। একটু ছায়াও কোথাও নাই। যদি রাতটা (দ্বিতীয় রাতটা বুঝি) একটু শীগ্‌গির করে আসে।

আমার মাথা কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে—আর আমি যেন জ্ঞান হারিয়ে ফেল্‌ছি।

আমি নিশ্চয় অনেকক্ষণ ধরে ঘুমিয়েছিলাম; কারণ, জেগে দেখলাম, রাত হয়ে গেছে। আগের মতই সব;— আমার ঘাগুলো তেমনি টন্‌টন্‌ করছে,—সে লোকটাও তেম্‌নি শুয়ে আছে—তেম্‌নি বড়, তেম্‌নি নিথর, নতুন কিচ্ছু নেই।

ওর কথা আমার ভাব্‌তেই হচ্ছে। এই লোকটা আর বেঁচে থাক্‌বে না,—শুধু এই জন্যেই কি আমি আমার সব ত্যাগ করে এসেছি—আমি না খেয়ে মরেছি, শীতে জমে গেছি, গরমে পুড়েছি, আর সব শেষে এই এখানে এই ভয়ানক যন্ত্রণা সহ্য কর্‌ছি। শুধু কি ওকে মার্‌ব বলে? এই খুন করা ছাড়া দেশের আর কোনও উপকারে কি আমি এসেছি?

খুন! খুনী! কে?—আমি। আমি যখন যুদ্ধে যাব বলে পাগল হয়ে উঠেছিলাম, মা আর মাশা খুব কেঁদেছিল; কিন্তু বারণ করে নি। যুদ্ধের নেশায় অন্ধ হয়ে আমি সে চখের জলের দিকে তাকাই নি। আমি তখন বুঝ্‌তে পারি নি (কিন্তু এখন পার্‌ছি) যে আমার

প্রিয় যাঁরা, তাদের কি কষ্ট দিচ্ছি। কিন্তু এখন ভেবে আর কি হবে? ভাব্‌লে পরে ত আর সে দিন ফিরে আস্‌বে না। আমার এই আসার ব্যাপারটা আমার বন্ধুদের চোখেও কি রকম অদ্ভুত ঠেকেছিল—"কি রে পাগ্‌লা! না জেনে-শুনে সন্দারী করতে যাচ্ছিস্?" আচ্ছা, তাদের বীরত্ব, তাদের দেশভক্তি, এ সবের আদর্শের সঙ্গে তাদের কথা কি করে খাপ খাইয়েছিল তারা? তাদের চোখে আমি অন্ততঃ বীর, দেশভক্ত এ সবই ছিলাম—তবুও আমি পাগল, হৃদয়হীন রাক্ষস।

আমি এই সব শুনেও কিসিনেফএ গিয়েছিলুম। তারা আমায় একটা কম্ফর্ট ব্যাগ, আর যুদ্ধের যা কিছু সরঞ্জাম তা দিয়েছিল। আমার সঙ্গে আরও হাজার-হাজার লোক ছিল; তাদের মধ্যে কিছু অন্ততঃ, আমারি মত, স্ব-ইচ্ছায় এসেছিল। বাকীরা যদি অনুমতি পেত, ত, বাড়ীতেই থাকত, যুদ্ধক্ষেত্রে যেত না। কিন্তু তারাও আমাদেরি মত হাজার-হাজার মাইল পার হয়ে এসে যুদ্ধ কর্‌ছে, আর হয় তো আরো ভাল করেই কর্‌ছে। তারা তাদের কর্ত্তব্য যা, তা কর্‌ছে; কিন্তু তবু যদি তাদের ছুটী দেওয়া যায়, ত, তারা এখুনি এসব ছেড়ে-ছুড়ে বাড়ী চলে যায়।

ভোরের বেলার হিমে-ভরা বাতাস বইছে; ঝোপগুলো দুল্‌ছে; আর একটা পাখী আধ-ঘুমের ঘোরে ডানা নাড়্‌ছে; তারাগুলো সব মিলিয়ে গেছে। কালোটে-নীল আকাশটা কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, আর নরম পালকের মত মেঘে ছেয়ে গেছে। মাটী থেকে টাট্‌কা কুয়াসা উঠ্‌ছে। আমার—কিসের বল্‌ব?—জীবনের, না যন্ত্রণার?—তৃতীয় দিন আরম্ভ হ'ল। তৃতীয় দিন......আর ক'টা বাকী রৈল?—যাক্ বেশী দিন আর নেই। আমি এত দুর্ব্বল হয়ে পড়েছি যে, সঙ্গীটির কাছ থেকে দূরে সরে যেতে পার্‌ছি না। বেশী দিন আর নেই,—আমিও ওরি মত হয়ে যাব; তখন আর পরস্পর কেউ কারো অসুবিধাজনক হবে না।

আমায় দেখ্‌ছি একবার জল খেতেই হবে। আমি দিনে তিনবার করে জল খাব,—ভোরের বেলা একবার, দুপুরে একবার, আর সন্ধ্যায় আর একবার।

* * *

সূর্য্য উঠেছে। তার প্রকাণ্ড রক্তের মত লাল, গোল দেহটা ডাল-পালার জাফরীর ভিতর দিয়ে চৌখুপী ডোরা-কাটার মত দেখাচ্ছে। এখন থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, আজ খুব গরম হবে। ওগো আমার সঙ্গীটি! আজকের দিনটা কেটে গেলে তুমি কেমন দেখ্‌তে হবে? এখনি ত তুমি ভীষণাকার ধারণ করেছ! হাঁ, সত্যি, ওর চেহারা দেখ্‌লে ভয়ই করে। ওর চুল সব ত খসে যাচ্ছে। ওর চামড়ার রং বেঁচে থাক্‌তে কালো ছিল, এখন কেমন ফ্যাকাসে হলুদে হয়েছে। ওর ফোলা মুখটা এতদূর ফুলেছে যে, চামড়ায় টান পড়ে একটা কাণের পিছনের চামড়াটা ফেটে গেছে। ওর পা এতদূর ফুলেছে যে, ফোলা পায়ের পট্টীর বোতামগুলো ফাঁক করে ঠেলে, ফুল্‌কো লুচীর মত বড়-বড় ফোস্কা বার হয়েছে। আর, ওকে দেখ্‌তে লাগ্‌ছে যেন একটী পর্ব্বতবিশেষ। আজকে রোদ লেগে ও কি হবে? এত কাছে শুয়ে থাকা অসহ্য হয়ে উঠ্‌ছে। যেমন করেই হোক্ না কেন, এখান থেকে আমায় সর্‌তে হচ্ছে। কিন্তু পার্ব্ব কি? আমি এখনও হাতটা তুলে, জলের বোতলের মুখ খুলে, জল খেতে পারি; কিন্তু আমার এই পাথরের মত ভারী, অকর্ম্মণ্য দেহটা নাড়্‌তে পারি কি? তবুও আমি সর্‌ব,—সে যতটুকুই সরি কেন। মনে কর, ঘণ্টায় এক পা,—তবুও সর্‌তে হচ্ছে।

আজ সারা সকালটা সরবার কাজে ব্যস্ত ছিলাম। যন্ত্রণাটা ভয়ঙ্কর রকমেরি হয়েছিল; কিন্তু তাতে কি আসে যায়? ভাল থাকা, সুস্থ থাকা যে কি রকম জিনিস, তা আমি ভুলে গেছি,—কল্পনাও কর্‌তে পারি না। আমি এখন যন্ত্রণার দাস হয়ে গেছি। আজ সারা সকালের চেষ্টার ফলে, আমি আমার পুরোনো যায়গায় ফিরে এসেছি। কিন্তু বেশীক্ষণ আমায় পরিষ্কার বাতাস পেতে হয় নি—পচা ধরেছে এমন একটা মড়ার পাঁচ হাত দূরে যদি পরিষ্কার বাতাস পাওয়া যায় ত পেয়েছি। বাতাসের মুখ ঘুরে গেছে। এর ভিতর আরো ভীষণ, আর বিশ্রী এই যে,—আমার ভয়ানক বমি আস্‌ছে। খালি পেটটা যখন পাক দিয়ে উঠ্‌ছে, তখন আমার নতুন রকমের যন্ত্রণা হচ্ছে;—মনে হচ্ছে, আমার ভিতরের সব যন্ত্রগুলো যেন বেঁকে-চুরে, পাক খেয়ে গেল। আর এই ভয়ঙ্কর বিষাক্ত বাতাস এসে বারবার গায়ে মুখে লাগ্‌ছে। আমি নিতান্ত অসহায় আর নিরাশ হয়ে কান্না সুরু করে দিলাম।

ভয়ানক ক্লান্ত হয়ে আমি আধ-মরার মত পড়ে আছি। হঠাৎ—বিকৃত মস্তিষ্কের ফল না কি? মনে যেন হচ্ছে...... না......হাঁ, তাই ত ......মানুষের গলার স্বর; ঘোড়ার পায়ের শব্দ, আর মানুষের কথা। আমি চেঁচাতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু চুপ করে গেলাম,—যদি ওরা তুর্কী হয়? তা হলেই বা কি? তা হলে আমার এখন যা যন্ত্রণা হচ্ছে, তার উপর আরো যন্ত্রণা বাড়বে; খবরের কাগজে যে সব ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক অত্যাচারের কথা পড়ে চুল খাড়া হয়ে উঠ্‌ত, লোম দাঁড়িয়ে যেত, সেই রকম অত্যাচার সব আমার উপর হবে। ওরা আমায় জীয়ন্তে ছাল তুলে ফেল্‌বে, কাটা পা ঝল্‌সাবে। এর চেয়ে বেশী কিছু না করে ত আমার ভাগ্যি,—এদের যন্ত্রণা দেবার ক্ষমতা যে অসীম এবং বিচিত্র। এখানে মরার চেয়ে তাদের হাতে মরা কি সত্যি বেশী ভাল? কিন্তু ওরা যদি আমাদেরি লোক হয়? —এই সর্ব্বনেশে ঝোপগুলো! তোরা আমায় পাঁচীলের মত আড়াল দিয়ে ঘিরে রেখেছিস্ কেন? এ-গুলোর ভিতর দিয়ে কিছু দেখ্‌তেও পাচ্ছি না। একটা যায়গায় শুধু ছোট্ট জানালার মত একটা ফাঁক আছে,—তাই দিয়ে মাঠের খানিকটা দেখ্‌তে পাচ্ছি। ঐ যে সেই ছোট্ট নদীটা, যার থেকে সে-দিন আমরা যুদ্ধের আগে জল খেয়েছিলাম। আর ঐ যে নদীর বুকে সেই বেলে পাথরের ঢিবিটা, যেটা সাঁকোর মত নদীর তীর দুটোকে বেঁধে দিয়েছে। ওরা ঐটে বেয়ে নিশ্চয়ই আসবে। গলার স্বর মিলিয়ে যাচ্ছে, তারা কি ভাষায় কথা বল্‌ছিলো বুঝ্‌তে পারি নি, আমার কাণও খারাপ হয়ে গেছে। হে ভগবান! যদি তারা আমাদের লোক হয়—আমি চেঁচিয়ে ডাকি। ওখান থেকে তারা আমার চীৎকার শুনতে পাবে—তাদের পাওয়া উচিত। অসভ্য বর্ব্বরদের হাতে পড়ার চেয়ে ত এ ভাল হবে! ওদের আস্‌তে এত দেরী হচ্ছে কেন? আশা করে থাকার বেদনায় আমি বাতাসের দুর্গন্ধের কথা ভুলেই যাচ্ছি—যদিও দুর্গন্ধ কোন রকমেই কমে যায় নি।

কতকগুলো কসাক চোখের সামনে এসে উপস্থিত হল,—তারা নদী পার হচ্ছে। তাদের নীল পোষাক, লাল ডোরা কাটা পা-জামা, বর্শা, বল্লম সবই দেখ্‌তে পাচ্ছি। গোটা-পঁচিশ মাত্র,—আর তাদের আগে-আগে একটা চমৎকার তেজীয়ান ঘোড়া চড়ে, কালো ঘন দাড়ি-আলা একটি অফিসার। তারা নদী পার হতে-হতেই, সে জিনের উপর ঘুরে বসে হুকুম দিল, "কদমে চ অ—লূ।

"আরে, থাম, থাম! দোহাই তোদের! বাঁচা। আমায় বাঁচা—ভাইয়া হো!" বলে কত চেঁচালাম,—কিন্তু ঘোড়ার খট্‌মটি, তলোয়ারের ঝন্‌ঝনি, আর তাদের নিজেদের চেঁচামেচির মধ্যে আমার ভাঙ্গা গলার বেসুরো মোটা আওয়াজ ডুবে গেল—তারা শুনতে পেল না।

ওদের ভাল হোক্! অবসন্ন হয়ে আমি মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে গেলাম, আর ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগ্‌লাম। আমার মুক্তির উপায়,—মরণের হাত থেকে পরিত্রাণের উপায় যে জলটুকু, তাও বোতল থেকে গীড়য়ে পড়েছে,—বোতলটা আমিই পড়ে যবার সময় উলটিয়ে ফেলেছি। জল যখন সবেমাত্র আধ পোথানেক আছে, তখন শুক্‌নো, কাঠ-ফাটা মাটিতে জল শুষে যাচ্ছে দেখে, আমার হুঁস হোলো যে, বোতলটা উল্‌টিয়ে গেছে,—আগে টের পাই নি।

কসাকরা চলে যাবার মুহূর্ত্তে যে ভয়ঙ্কর নিরাশা, যে জমে-যাওয়ার ভাব আমার মনে এসেছিল, তা কি কখনো ভুল্‌ব? আমি চোখ দুটো আধ-বোজা করে মড়ার মত পড়ে রইলাম। বাতাসটা ঘুরে ঘুরে বইতে লাগ্‌ল,—একবার পরিষ্কার, একবার দুর্গন্ধভরা—আর আমার প্রাণ যেন বেরিয়ে যেতে লাগ্‌ল। আমার সঙ্গীটির অকথ্য রকমের বীভৎস চেহারা হয়েছে। আমি একবার চোখ মেলে তার দিকে চুরি করে তাকাতে গিয়ে ভয় খেয়ে গিয়েছি। তার মুখ বলে পদার্থটা নেই;—সেটা হাড় থেকে খসে গিয়েছে। সেই দাঁত-বের-করা, সমস্তক্ষণই হাস্‌ছে—যেন কঙ্কালটা আমার দেহ-মনকে বিদ্রোহী করে তুল্‌ছে? আমি (যখন ডাক্তারী পড়্‌তাম তখন) ঐ রকম অনেক মড়া ঘেঁটেছি বটে, কিন্তু তবুও এই চক্‌চকে-বোতাম আঁটা, যুদ্ধের-পোষাক-পরা এই মড়াটা দেখে ঘেন্নায় আমার গা শিউরে উঠ্‌ছে। আমি ভাব্‌লাম "এরি নাম যুদ্ধ! এই মড়াটা তারি আসল চেহারা।"

সূর্য্যি মশাই প্রতিদিনের মত আমায় তাতিয়ে (পুড়িয়ে) রুটি-সেঁকা করে তুল্‌ছেন। আমার হাতদুটি আর মুখটি ত ফোস্কায় পরিণত হয়ে গেছেন—কিছু আর নাই। যেটুকু জলও বা ছিল, তাও খেয়ে রেখেছি। পাগল-করে-দেওয়া তেষ্টা পেয়েছিল, তাই মনে করেছিলুম, এক চুমুক মাত্র

খাব,—কিন্তু এক ঢোঁকেই, যা বাকী ছিল, সবটুকুই খেয়ে ফেলেছি। উঃ! কসাকগুলো যখন কাছে এসেছিল, তখন কেন চেঁচাইনি? ওরা যদি তুর্কী হত, তা হলেও ত এর চেয়ে ভাল হত! তারা আমায় দুঘণ্টা, কি বড়-জোর তিন ঘণ্টা কষ্ট দিত; কিন্তু এখন, জানিনে ত কতক্ষণ ধরে এখানে যন্ত্রণায় ছটফট করতে হবে। মাগো, আমার জননী! তুমি যদি জানতে আমার কি দশা হবে, তা হলে এই বুড়ো বয়সে তুমি তোমার চুল ছিঁড়তে, মাথা খুঁড়তে, আমার জন্মক্ষণকে কোন মতেই শুভ বলতে না......আর যে মানুষকে যন্ত্রণা দেবার জন্যে এই যুদ্ধ জিনিসটার জন্ম দিয়েছে, তাকে তুমি শাপান্ত করতে। মা আমার স্নেহময়ি! আমায় আজ বিদায় দাও! মাশা, প্রিয়তমে, আমার বড় আদরের ধন তুমি,—তুমিও আমায় বিদায় দাও! ওঃ, কি ভয়ানক কষ্ট!

আবার সেই কুকুরটাকে দেখতে পাচ্ছি। সেই ডোমটার তার উপর একটুও মায়া হয় নি; বরং উল্টিয়ে সে তার মাথাটা একটা দেয়ালের উপর জোরে ঠুকে, তাকে (বেঁচে থাকতে থাকতেই) একটা বাড়ীর সামনের আঁস্তা-কুড়ের ভিতর ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। কুকুরটা তার ভিতর একদিন বেঁচে ছিল। কিন্তু আমি......আমি সেটার চেয়েও হতভাগা,—আমি যে এরি মধ্যে তিনদিন কষ্ট পেয়েছি। কালকে চার দিন হবে—তার পর পাঁচ, তার পর ছয়...

যম, তুমি কোথায়? এস! আমায় নেও। ডাকছি ......কিন্তু যমও আসে না, আমায় নেয় না। আর, আমি এই ভীষণ রোদে পড়ে আছি—এক ফোঁটা জলও নেই যে, জলে-পুড়ে-যাওয়া ছাতিটাকে ঠাণ্ডা করি। তার উপর একটা মড়ার দুর্গন্ধে শরীর বিষিয়ে উঠছে। মড়াটা ত একেবারে পচে উঠেছে,—খসা, গলা একটা মাংসপিণ্ড ছাড়া ও আর কিছুই নাই। যখন শুধু হাড় কখানি আর পোষাকটা হয়ে যাবে, তখন আমার পালা আসবে। আমিও ঐ রকমটা হব।

দিনটা কেটে গেল, রাতও কেটে গেছে। নতুন কিছুই ঘটে নি,—সেই একই রকম চলছে। আবার সেই একই রকম করে নতুন দিন ভোর হচ্ছে—কেটেও যাবে তেমনি করেই।

ভোরের বাতাসে চঞ্চল-হয়ে ওঠা ঝোপগুলো যেন শর্‌শর্‌ করে, ফিস্‌ফিস্‌ করে বলছে "তুই মরবি! তুই মরবি! তুই মরবি!" ওদিককার ঝোপগুলো যেন উত্তর দিচ্ছে, "তুই দেখতে পাবি না! তুই দেখতে পাবি না! তুই দেখতে পাবি না!" আমার কাণের কাছে কে যেন চেঁচিয়ে বল্লে "না, তোরা আর ওদের দেখতে পাবি না।" আমি চমকিয়ে উঠে একেবারে টনটনে রকমের সচেতন হলাম। ঝোপের ভিতর দিয়ে আমাদের নায়েক যাকোফের শান্ত নীল চোখের দৃষ্টি আমার উপর এসে পড়ল।

সে চেঁচিয়ে বল্লে, "ওরে, কোদাল নিয়ে আয়; এখানে তুর্কীদের আরো দুটো পড়ে আছে।"

আমার জন্যে কোদালের দরকার নেই, আমায় কবর দিতে হবে না; আমি বেঁচেই আছি। আমি চেঁচাতে গেলাম; কিন্তু একটা অস্ফুট কাতরাণি ছাড়া আর কিছু আমার তেষ্টায়-শুকিয়ে-ফেটে-যাওয়া মুখ থেকে বেরুলো না।

"আরে রামো! এটা যে বেঁচে! ওরে, এটা যে আমাদেরি আইভ্যানফ! আরে, বেঁচেই আছে! আয়, ভাই সব, আয়! আমাদের বাবু-সাহেব বেঁচে আছেন, ডাক্তার ডাকা যাক্‌।" তার পরেই তারা ব্রাণ্ডি, জল আরো কি সব দিয়ে আমার মুখ ধুয়ে দিল। তার পর সব অন্ধকার হয়ে গেল।

আমায় যারা বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, তারা এমন আস্তে-আস্তে, তালে-তালে পা ফেলছিল যে, আমার খুব আরাম বোধ হচ্ছিল, আর ঘুম পাচ্ছিল। আমি একবার করে জাগছিলাম, আবার ঘুমুচ্ছিলাম। আমার ঘা বাঁধা হয়ে গেছে, তাই আর যন্ত্রণা দিচ্ছে না। আর আমার সমস্ত শরীরে যে কি রকম একটা আরাম বোধ হচ্ছে, তা বলা যায় না।

"থা আ—আম্‌; থা আ—মা!" নতুন একদল এসে আমার দোলনাটা তুলে নিলে।

আমায় নিয়ে যাবার দলের সর্দার হ'ল পিটার আইভ্যানোভিচ—আমাদেরি দলের আর একজন নায়েক, লম্বা, ছিপছিপে চেহারা তার, কিন্তু সাদাসিধে ভাল-মানুষ। ও এত লম্বা যে, যদিও আমি প্রায় কাঁধে চড়েই চলছিলাম, তবুও উপর দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে-তাকিয়ে থেকে, তবে আমি প্রথমে ওর কাঁধ, তার পর মাথা, তার পর লম্বা, খোঁচা দাড়ী সমেত ওর মুখটা দেখতে পেলাম।

আমি নরম সুরে আস্তে আস্তে বল্লাম, "পিটার আইভ্যানোভিচ্?"

সে নীচু হয়ে বল্লে, "কি রে ভাই?"

"ডাক্তার কি বল্লে তোকে? আমি কি শীগ্‌গির মর্ব্ব?"

"কি বল্‌চিস্ তুই, আইভ্যানফ্? তুই মর্‌বি কেন? তোর সে রকম কিচ্ছু হয় নি ত! তুই মর্ব্বি না। তোর আচ্ছা কপাল-জোর যা'হোক কিন্তু। একটা হাড় ভাঙ্গে নি, কি শির ছেঁড়ে নি। কিন্তু তুই কি ক'রে এই সাড়ে তিন দিন কাটালি? কি খেলি?"

"কিচ্ছু না!"

"জলও না?"

"তুর্কীটার জলের বোতলটা নিয়ে নিয়েছিলুম! আর কথা বল্‌তে এখন পার্‌ছি না পিটার আইভ্যানোভিচ্—সে সব পরে বল্‌ব!"

"আচ্ছা, ভাই, আচ্ছা! পরেই বলিস্। তুই এখন ঘুমো একটু!"

আবার ঘুম—আর সব ভুলে যাওয়া!

যখন ঘুম ভাঙ্গল, দেখি, আমাদের হাসপাতালের তাবুতে শুয়ে আছি। আমার চারিদিকে ডাক্তার আর নার্স আমায় ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে—তাদের মধ্যে সেণ্টপিটার্স-বার্গের নামজাদা আমাদের এক ডাক্তার অধ্যাপককে দেখ্‌তে পেলাম। তিনি আমার উপর উপুড় হয়ে কি করছেন—হাত তাঁর রক্তে ভরে গেছে। আমার পা দেখ্‌তে বেশীক্ষণ সময় তিনি নিলেন না। আমার দিকে ফিরে বল্লেন, "ভগবান্ তোমায় খুব দয়া করেছেন বাপু,—তুমি এ যাত্রা বেঁচে গেছে। আমরা তোমার একটা পা শুধু বার করে নিয়েছি, নিতে হ'ল তাই—তা সে রকম কিচ্ছু না ও! এখন কথা বল্‌তে পার?"

হাঁ পারি বৈ কি! শুধু বল্‌তে পারি, তা নয়—এই এতগুলো কথা,—এই সারা ইতিহাসটাই ত বল্‌ছি।

সাময়িকী

এবার এই গুড্‌ফ্রাইডের ছুটীতে আমাদের দেশে চারিটী কনফারেন্স বা সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে তিনটী খাস বাঙ্গালা দেশে,—আর একটী উড়িষ্যা দেশে হইলেও তাহাকে বাঙ্গালার মধ্যেই ধরিয়া লইতে হইবে; কারণ সেটী উড়িষ্যা-প্রবাসী বাঙ্গালীর সম্মিলন। অপর তিনটীর মধ্যে একটী হাওড়ার সাহিত্য-সম্মিলন; দ্বিতীয়টী ময়মনসিংহের প্রাদেশিক সম্মিলন; তৃতীয়টী যশোহর নড়াইলের বঙ্গীয় কায়স্থ-সম্মিলন। ময়মনসিংহের সম্মিলন রাজনৈতিক; তাহাতে রাজনীতির আলোচনা হইয়াছিল; তাহার বিশেষ বিবরণের জন্য সংবাদ-পত্রের উপর বরাত দিয়াই আমরা কার্য্য শেষ করিতে পারি। নড়াইলের বঙ্গীয় কায়স্থ-সম্মিলন সম্বন্ধে এইটুকু বলিতে পারি যে, সেখানে অনেক কায়স্থের শুভাগমন হইয়াছিল। নড়াইলের বাঙ্গালা-বিখ্যাত জমিদার রায়-বংশ বনিয়াদী ঘর; আদর-অভ্যর্থনার ক্রটী সেখানে হওয়া সম্ভবপর নহে। সভায় কায়স্থ-জাতির উন্নতিমূলক বক্তৃতা ও সিদ্ধান্তও হইয়াছিল। বরপণের কথাও উঠিয়াছিল। প্রায় এক শত জন অনুপবীত কায়স্থ-সন্তান উপবীত গ্রহণ করিয়াছিলেন। উড়িষ্যার প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের সম্মিলনে রাজনৈতিক কথার আলোচনা হইয়াছিল; তবে তাহার সঙ্গে মডারেট ও একষ্ট্রিমিষ্টের সম্বন্ধ নাই। উড়িষ্যা একেবারে পাটনা-শাখিল হওয়ার অসুবিধা আলোচনা হইয়াছিল,—উড়িষ্যা ও প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের মধ্যে সদ্ভাব-বৃদ্ধির আলোচনা হইয়াছিল, শিক্ষা-বিস্তারের কথা হইয়াছিল।

তিনটী সম্মিলনের কথা ত দুই কথাতেই সারিলাম; কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের বিবরণ দুই কথায় সারিবার উপায় নাই। যে সম্মিলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহোদয়, যে সম্মিলনে অনেক সাহিত্য-রথীর সমাগম হইয়াছিল, যে সম্মিলনে বিভিন্ন শাখায় সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ ও গবেষণা হইয়াছিল, যে সম্মিলনে দুস্থ সাহিত্য-সেবীদিগের

জন্য, সাহায্য-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, যে সম্মিলনের জন্য ছয়-সাত হাজার টাকা, এই মহার্ঘতার দিনেও ব্যয় হইয়াছে, —সে সম্মিলনের বিবরণ দুই কথায় বলিলে বড়ই অন্যায়—ইংরাজীতে যাহাকে বলে injustice—করা হয়। কিন্তু নানা কারণে সকল কথা বলা যায় না। আমরা দলাদলি, বিবাদ-বিসম্বাদকে বড়ই ভয় করি। এবার সম্মিলন উপলক্ষে ঐ সকলের বড়ই প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল; সুতরাং বিশেষ বিবরণে কাজ নাই। সম্মিলন যে হইয়া গেল, ইহাতেই আমরা আনন্দিত। তবে, যাঁহাদের চেষ্টা, যত্ন ও অধ্যবসায়বলে কার্য্য হইয়া গেল, তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিই—"শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি।"

সম্মিলনের প্রধান সভাপতি শ্রীযুক্ত সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিভাষণ তাঁহার ন্যায় তীক্ষ্ণ প্রতিভাশালী ব্যক্তিরই উপযুক্ত হইয়াছিল; যেমন ভাষা, তেমনি ভাব, তেমনি বিষয়-নির্ব্বাচন। শাখা-সভাপতিগণ সকলেই প্রবীণ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি; তাঁহাদের অভিভাষণও অতি সুন্দর হইয়াছিল। বিভিন্ন বিভাগে প্রবন্ধও নিতান্ত কম আসে নাই;—কিন্তু আমাদেরই দুর্ভাগ্য, কোন প্রবন্ধই আগাগোড়া পড়া হইবার সময় ছিল না; এক নিঃশ্বাসে সাতকাণ্ড রামায়ণ পাঠ হইয়া যাইতে লাগিল। প্রবন্ধের অদৃষ্টে যাহাই হউক, প্রবন্ধ-পাঠকগণের মুখে বিরক্তির সুস্পষ্ট বিকাশ দেখিয়া আমাদের সত্য-সত্যই বড় কষ্ট বোধ হইয়াছিল। সভাপতি মহাশয়গণকে ত নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে 'ফাইল ক্লিয়ার' করিতে হইবে;—তাঁহারাই বা কি করেন!

ইতিহাস-বিভাগে দুইটা প্রশ্ন লইয়া বেশ আলোচনা হইয়াছিল। একটী—মহাকবি কালিদাস কোন্ দেশের লোক?—এই কথা লইয়া আলোচনা। দ্বিতীয়টী—যেখানে সম্মিলনের অধিবেশন হইল, সে স্থানের নাম হাবড়া কি হাওড়া? পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত মন্মথ কাব্যতীর্থ মহাশয় কয়েকটী যুক্তি-প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া, কালিদাস যে বাঙ্গালী ছিলেন, তাহাই প্রতিপন্ন করিতে চান এবং সভায় উপস্থিত সুধিবৃন্দকে তর্ক-সমরে আহ্বান করেন। অনেকেই এই বাদানুবাদে যোগদান করেন। কিন্তু সমর-ঘোষণার পূর্ব্ব পর্য্যন্তও যখন প্রতিপক্ষ প্রস্তুত ছিলেন না, তখন বাদানুবাদ যথার্থ হয় নাই এবং হইতেও পারে না। আমরা সেই জন্য শ্রীযুক্ত কাব্যতীর্থ মহাশয়ের যুক্তিগুলির সার মর্ম্ম এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি; প্রতিপক্ষের এই সকল যুক্তির বিরুদ্ধে কি বক্তব্য আছে, তাহা সংবাদপত্রের মারফত দাখিল করিলে, কাব্যতীর্থ মহাশয় বা তাঁহার পক্ষীয় পণ্ডিতগণ তাহার বিচার করিতে পারেন। আমরা কাব্যতীর্থ মহাশয়ের যুক্তিগুলি লিপিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে একটী কথা বলিতে চাই। তিনি যে সমস্ত যুক্তি দেখাইয়াছেন, কালিদাসের কাব্য-নাটকাদি হইতে তদনুকূল শ্লোক বা কথা (chapter and verse) উদ্ধৃত করিয়া দিলে সাধারণ লোকের কথাগুলি ও যুক্তি বুঝিবার সুবিধা হয়। এক্ষণে কাব্যতীর্থ মহাশয়ের যুক্তিগুলি নিবেদন করিতেছি।

১। কালিদাস এই নাম বাঙ্গালী ভিন্ন অন্য জাতির মধ্যে প্রচলিত নাই। সিংহলের পুস্তকানুযায়ী তাঁহার নিবাস "কালিকাপুরীতে" ছিল। কালিকাপুরী ৺কালিঘাটের নামান্তর।

২। তাঁহার রচনায় ভাব, ভাষা, রূঢ় ও যৌগিক শব্দ, চলিত কথা এবং ছেদো কথা প্রভৃতি বাঙ্গালা ভাষা হইতে অনুবাদিত। তিনি গ্রীষ্মকাল হইতে বর্ষাদি এবং সৌর মাস গ্রহণ করিয়াছেন। হিন্দুস্থানে বসন্তকালে বর্ষাদি এবং চান্দ্রমাস প্রচলিত।

। তিনি রঘুর দিগ্বিজয় "রাঢ়" দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া আসামে সমাপ্তি করিয়াছেন; অযোধ্যার উল্লেখ করেন নাই। কালিদাস ও রঘু "শালি" ধানের ভাত ও পাটালি গুড় খাইতেন; ছাতু, ভুট্টা বা মকাই খাইতেন না।

৪। কালিদাসের প্রচারিত বাঙ্গালা বর্ণমালা বা "মাতৃকা ধর্ম্মাবলী" বিকৃত হইয়া এক্ষণে দেবনাগর ধর্ম্মমালা হইয়াছে। তাঁহার জন্মভূমিতে গোপজাতি অত্যন্ত অধিক ছিল। তাঁহার গ্রন্থে বিষ্ণুও গোপ-বেশ পরিয়াছেন। বিষ্ণুর গোপ-বেশ বাঙ্গালীর উদ্ভাবিত।

৫। আবার গ্রন্থের নায়কদের আচার-ব্যবহার, চরিত্র, মনোবৃত্তি ও রুচিকর দ্রব্যাদি সমস্তই বাঙ্গালীরই মত। বাঙ্গালার গ্রাম্য ছড়ায় ও উপকথায় তাহার নামের আধিক্য পাওয়া যায়।

তাহার পর প্রশ্ন উঠিল, সম্মিলন-স্থানের নাম হাবড়া, না হাওড়া? একজন ভদ্রলোক হাওড়ার ইতিহাস আলোচনা করিলেন, কিন্তু নামতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুই বলিলেন না। প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে কেহ বলিলেন, হাবড়া নামই ত বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। স্থানের নাম লইয়া অপ্রস্তুত ভাবে তখন-তখনই আলোচনা করা বড় সহজ ব্যাপার নহে,—বিশেষ অনুসন্ধানের প্রয়োজন। দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা তখন সভামধ্যে উপস্থিত ছিলাম। সভাপতি শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে এই নামতত্ত্ব সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিতে সহসা অনুরোধ করিয়া বসিলেন। যাঁহারা সবজান্তা, তাঁহারা হয় ত দুই-চারি কথা বলিতে পারিতেন; কিন্তু নামতত্ত্ব, বিশেষতঃ হাওড়ার নাম-তত্ত্ব ত আমার একেবারে অজ্ঞাত সভাপতি মহাশয়ের আদেশ অমান্য করাও যায় না। তখন উপস্থিত-মত যাহা মনে আসিল, তাহাই নিবেদন করিয়া কোন প্রকারে অব্যাহতি লাভ করিলাম। আমার বক্তব্য এই যে, হাওড়া ষ্টেসন হইতে রেলগাড়ী ছাড়িবামাত্র পথের দুই পার্শ্বে অনেক দূর পর্য্যন্ত জল-কাদাপূর্ণ স্থান দেখিতে পাওয়া যায়,—চলতি কথায় এই প্রকার ভূমিকে 'হাওড়' বলে। আমার মনে হয়, পূর্ব্বে এই সমস্ত স্থানই 'হাওড়' ছিল এবং তাহা হইতেই এ স্থানের নাম 'হাওড়া' হইয়াছে, হাবড়া নহে। সৌভাগ্যের বিষয়, স্থানীয় দুই-একজন ভদ্রলোক এই কথার সমর্থন করিলেন। আমি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম এবং ভবিষ্যৎ গুরুতর বিপদের আশঙ্কায় সভাস্থল হইতে অন্তর্হিত হওয়াই সুবোধের কার্য্য মনে করিলাম।

শেষ দিনের অধিবেশনে অনেক বিষয়ের আলোচনা ও বাদানুবাদ হইয়াছিল। তাহার মধ্যে দুস্থ সাহিত্য-সেবকগণের জন্য ভাণ্ডার-প্রতিষ্ঠাই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। হাওড়া-সাহিত্য-সম্মিলনের সম্পাদক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় অনেক দিন হইতে এই ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকটী সাহিত্য-সম্মিলনে এ সম্বন্ধে প্রস্তাবও উপস্থাপিত হইয়াছিল; কিন্তু কার্য্যে কিছুই হয় নাই। এবারের সাহিত্য-সম্মিলনে এই ভাণ্ডার-প্রতিষ্ঠা হইল; এবং অক্লান্তকর্ম্মী শ্রীযুক্ত সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় যখন এই ভাণ্ডারের সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছেন, তখন ইহা যে কেবল মামুলী প্রস্তাবেই পর্য্যবসিত হইবে না, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। যাঁহারা এই সাহিত্য-সম্মিলনের জন্য যত্ন চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকেই আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ করিতেছি।

সেদিন একটী সভায় বক্তৃতা করিতে-করিতে শ্রীযুক্ত সার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় বলিয়াছিলেন, "আমাকে যদি চব্বিশ ঘণ্টার জন্য এ দেশের রাজ্যভার দেওয়া হয়, তাহা হইলে আমার প্রথম কাজ এই হয় যে, আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন পরীক্ষাটা দশ বৎসরের জন্য বন্ধ করিয়া দিই এবং আইন কলেজের অট্টালিকা সমভূমি করিয়া ফেলি।" উকিলের সংখ্যা যে প্রকার বাড়িয়া গিয়াছে, এবং আইন-কলেজে যে প্রকার ছাত্রাধিক্য হইয়াছে, তাহাতে কথাটা নিতান্তই অসঙ্গত নহে। যাঁহারা আইন-আদালতের খবর রাখেন, তাঁহারা জানেন যে, বার-লাইব্রেরীতে উকিলের স্থান সংকুলান হয় না। উপার্জ্জনের কথা যদি বলেন, তাহা হইলে বলিতে পারি, অনেক উকিলের কাছারীতে যাতায়াতের গাড়ীভাড়া পর্য্যন্ত ঘর হইতে দিতে হয়। এ অবস্থা জানিয়া শুনিয়াও দলে-দলে ছাত্রগণ আইন-কলেজে প্রবিষ্ট হয় কেন? ইহার উত্তর অতি সহজ। বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহারা আর্ট বিভাগে পড়ে, তাহারা বি-এ বা এম্-এ পাশ করিবার পর দেখে যে, তাহারা এতকাল যে ভূতের বাগার দিয়াছে, তাহাতে তাহাদিগকে কোন বিষয়েই লায়েক করিতে পারে নাই; সংসার-সংগ্রামের জন্য কোন বিদ্যাই তাহাদের শিক্ষা হয় নাই; এক আইন কলেজ ব্যতীত তাহাদের আর কোন পথ নাই। কাজেই তাহারা আইন-কলেজে প্রবিষ্ট হয়। এদিকে যাহারা বি-এস্‌সি বা এম্-এস্‌সি হয়, তাহাদের মধ্যে যাহাদের সঙ্গতি আছে, মুরুব্বীর জোর আছে, তাহারা কেহ বা বিষয়কর্ম্ম আরম্ভ করে, কেহ বা ভাল চাকুরী জোটাইয়া লয়; আর সকলে চারিদিক অন্ধকার দেখিয়া অবশেষে আইন-কলেজে যায়। তাহাদের জন্য ত কোন পথই খোলা নেই! মধ্যবিত্ত অবস্থার ছেলেরা ব্যবসায়-বাণিজ্য বা বিজ্ঞান-আলোচনায় যে আত্মনিয়োগ করিবার সুবিধাই পায় না। অধম-তারণ আইন-বিদ্যালয় ব্যতীত তাহারা কোথায় যাইবে? তাহার পর যা থাকে কপালে! শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন না হইলে এবং মূলধন দিবার লোকের সদ্ভাব না হইলে, আইন-কলেজের অট্টালিকা সমভূম হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই।

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত "আড়াই চাল" জ্যৈষ্ঠর প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে মূল্য ১৷৷০ টাকা।

শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত "আকালের মা" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য বারো আনা।

শ্রীযুক্ত জয়কুমার বর্দ্ধন রায় প্রণীত "অদৃষ্ট-চক্র" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য তিন টাকা।

শ্রীযুক্ত সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত নূতন নাটক "রাওল বিপ্লব" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য বারো আনা।

স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্তের "মাধবী কঙ্কণের" নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য দেড় টাকা।

শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার রায় চৌধুরী প্রণীত নূতন কবিতাপুস্তক "অনবসিতা" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ছয় আনা।

আট আনা সংস্করণের ৩৭শ সংখ্যক গ্রন্থ শ্রীযুক্ত জলধর সেন প্রণীত "হরিশ ভাণ্ডারী" প্রকাশিত হইয়াছে।

এবং তৎপরবর্ত্তী সংখ্যক গ্রন্থ শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত প্রণীত "কোন্ পথে" যন্ত্রস্থ।

"কর্ম্মক্ষেত্র" প্রণেতা শ্রীযুক্ত শশিভূষণ সেন প্রণীত নূতন উপন্যাস "কল্যাণী" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য দেড়টাকা।

অবসর-প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর বি-এ কবীন্দ্র বিরচিত "সেকাল-একাল" নামক কবিতা পুস্তকখানির প্রতি আমরা পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ইহা সেকেলে পয়ার ছন্দে বিরচিত হইয়া আপনার সেকালত্ব প্রমাণ করিতেছে; অথচ একালের সরসতায় উহা পূর্ণ। কবিতাটি প্রথমে "পূর্ণিমা" পত্রে প্রকাশিত হয়; এক্ষণে সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া পুস্তিকাকারে প্রচারিত হইয়াছে। দামও খুব সামান্য, মাত্র চারি আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

এই জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'ভারতবর্ষে'র ষষ্ঠ বৎসর শেষ হইল; আষাঢ় হইতে সপ্তম বর্ষ আরম্ভ হইবে। ২৫শে জ্যৈষ্ঠের মধ্যে যে সকল পুরাতন গ্রাহক-মূল্য প্রেরণ না করিবেন বা পত্রিকা প্রেরণের নিষেধাজ্ঞা না দিবেন, তাঁহাদিগের নিকট আষাঢ় সংখ্যা-৬৶০ ছয় টাকা দুই আনায় ভি, পি করা হইবে।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works,
9, Nanda K. Chaudhuri's 2nd Lane, CALCUTTA.